পুরাণকোষ

।। মহাভারত-রামায়ণ-মুখ্য পুরাণ ।।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

প্রথম খণ্ড

অ - ঔ

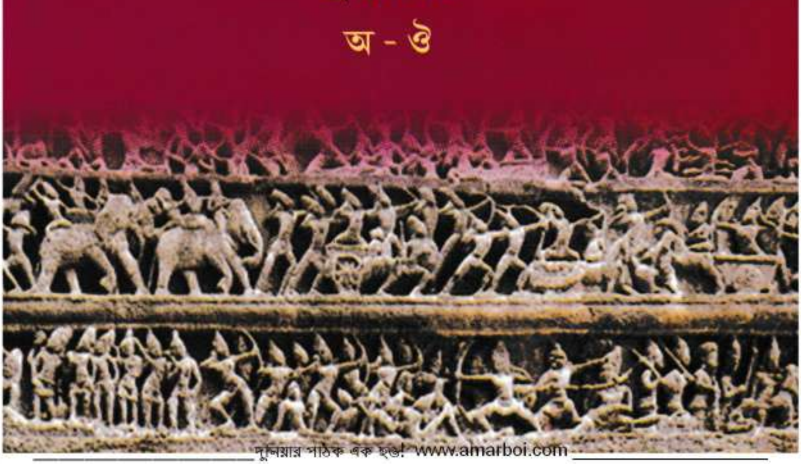

ভারতবর্ষের পৌরাণিক সাহিত্যের আয়তন বিপুল ও বিশাল। অগণন ভারতবাসীর মনেও তার প্রভাব গভীর। দৈনন্দিন জীবনে তারা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ঘটনার উদাহরণ থেকেই খোঁজে তাদের বেঁচে থাকার রসদ আজও। আধুনিক সাহিত্যেও তাদের অসংখ্য উল্লেখ দেখা যায়।

পৌরাণিক সাহিত্যের অসংখ্য চরিত্র, ঘটনা, স্থানের উৎস জানা কিন্তু অত সহজ নয়। অথচ হাতের কাছে নেই এমন কোনো কোষগ্রন্থ যা থেকে এক মুহূর্তে পাওয়া যেতে পারে তার হদিস। দীর্ঘ গবেষণার ফসল এই *পুরাণকোষ* সেই অভাব পূর্ণ করবে।

এতে পৌরাণিক দেবদেবী, অসংখ্য চরিত্র, স্থান ও ঘটনার বিবরণ গ্রন্থিত হয়েছে বর্ণানুক্রমিক ভাবে প্রসঙ্গ উল্লেখ সহ। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পুরাণকোষ। এই কোষের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—প্রত্যেক বিষয়কে মূল আকরগ্রন্থের তথ্য নিবেশ করে সমর্থন করা হয়েছে। এমন একটি শব্দও এখানে বিবেচিত হয়নি যার মৌল উপাদান আকরগ্রন্থের নির্দিষ্ট স্থান সন্নিবেশ না করে মনগড়াভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সাধারণ পাঠকেই নয় গবেষককুলেরও বিদ্যার আধার হয়ে উঠতে পারে এই গ্রন্থ। চার কিংবা পাঁচ খণ্ডে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হবে।

ISBN 978-81-7955-275-9 (Vol.-1)
ISBN 978-81-7955-274-2 (Set)

₹ 800.00

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী: জন্ম পাবনা জেলার (এখন বাংলাদেশে) গোপালপুর গ্রামে, ১৯৫০ সালে। কলকাতায় প্রবেশ ১৯৫৭ সালে। ভারততত্ত্ববিদ এবং ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ বিশেষজ্ঞ।

গুরুদাস কলেজ, কলকাতা থেকে সংস্কৃত রিডার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন ২০১০ সালে। রমাপদ চৌধুরীর প্রেরণায় তাঁর লেখক জীবনের শুরু বহু বছর আগে। তাঁর প্রথম বই *বাল্মীকি রাম ও রামায়ণ* প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। আজ তিনি বিখ্যাত লেখক। তাঁর লেখালেখি প্রধানত প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যগুলির জনপ্রিয় চরিত্র কেন্দ্র করে। পত্র-পত্রিকায় তিনি কলামও লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *মহাভারতের ছয় প্রবীণ*; *কৃষ্ণা, কুন্তি এবং কৌন্তেয়*; *মহাভারতের প্রতিনায়ক*; *মহাভারতের ভারত যুদ্ধ ও কৃষ্ণ*; *দণ্ডনীতি*; *মহাভারতের অষ্টাদশী*; *কথা অমৃতসমান* প্রভৃতি।

তাঁর অনেক গ্রন্থ ওড়িয়া, অসমিয়া, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

পুরাণকোষ

(মহাভারত-রামায়ণ-মুখ্য পুরাণ)

প্রথম খণ্ড
(অ - ঔ)

সম্পাদক
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

সাহিত্য সংসদ

PURĀṆAKOṢA, VOL-I
(An Encyclopedic Dictionary of
Mahābhārata, Rāmāyaṇa and Purāṇa-s)
by Nrisinha Prasad Bhaduri

ISBN 978-81-7955-275-9 (Vol-I)
978-81-7955-274-2 (Set)

© লেখক

প্রচ্ছদ : চন্দন বসু

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭
তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৭

প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক এ.পি. প্রিন্টার্স, ৮/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা ৭০০ ০৬৭

₹ 800.00

উৎসর্গ

একটি ক্ষুদ্র বিষয়ও —
সেটা একটি পদই হোক অথবা
একটি শব্দবন্ধ কিংবা একটি বাক্যমাত্র —
এই সব কিছুই যিনি এক জটিল-ব্যাপ্ত মাহাত্ম্যে পড়তে শিখিয়েছিলেন,

আমার সেই পিতাঠাকুর
ঈশ্বর রামেশ্বর ভাদুড়ীর

—শ্রীচরণকমলেষু

কৃতজ্ঞতা

যাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপ ছাড়া এই বিশাল গ্রন্থের পরিকল্পনা করাই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধুনা তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী—

শ্রীযুক্ত ব্রাত্য বসু

তিনি যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তখন এই গ্রন্থের মর্যাদা বুঝে যে সক্রিয়তায় যতটুকু সময়ের মধ্যে অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন, তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

সূচি

প্রথম খণ্ড

প্রকাশকের নিবেদন *নয়*

অয়মারম্ভঃ *এগারো*

সংক্ষিপ্ত রূপ *তেইশ*

অ-ঔ ১ - ৮১৬

মৌল গ্রন্থপঞ্জী ৮১৭ - ৮৩২

আনুষঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী ৮৩৩ - ৮৪০

প্রকাশকের কথা

রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের একটি পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্স বইয়ের অভাব দীর্ঘ দিনের। কাজটাও বিপুল এবং সময়সাপেক্ষ। শুরু হয়েছিল প্রায় বাইশ বছর আগে। এই সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর 'পুরাণকোষ'-এর প্রথম খণ্ড 'অ' থেকে 'ঔ' শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হল। এর বাকি খণ্ডগুলি আশা করা যায় প্রকাশিত হতে আর বছর খানেক সময় লাগবে। কাজটা সম্পূর্ণ হলে আমাদের ওই দীর্ঘ অপেক্ষারও অবসান ঘটবে।

অভিধান ও কোষ গ্রন্থের প্রকাশনায় সাহিত্য সংসদ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এই বিষয়ে তার প্রকাশনার তালিকাও দীর্ঘ। 'পুরাণকোষ' সেই তালিকায় অবশ্যই একটি গৌরবোজ্জ্বল সংযোজন হিসেবে গণ্য হবে এবং আমরা মনে করি এই গৌরবের সব কৃতিত্বটুকুই গ্রন্থকার নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর, যাঁর সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যে দীর্ঘ চর্চার কথা সর্বজনবিদিত আর এই গ্রন্থ তাঁর সেই একাগ্র অধ্যবসায়েরই ফলশ্রুতি।

আমরা আশা করব এই বইয়ের ব্যবহার সর্ব স্তরের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সার্বিক তৃপ্তি প্রদানে সমর্থ হবে। বিচারের ভার আপনাদের।

জুলাই ২০১৬ দেবজ্যোতি দত্ত
কলকাতা

অয়মারম্ভঃ

এত কাল আমি লেখালিখি করছি, বইপত্তরও বেরিয়েছে কিছু, কিন্তু এই বইটা আমি লিখেছি বললে নেহাতই ভুল বলা হবে। কেননা মহাভারত-রামায়ণ অথবা মুখ্য পুরাণগুলির বিষয়গুলি নিয়ে একটি কোষগ্রন্থ তৈরি করাটাকে তৈরি করাই বলতে হবে, এই গ্রন্থ লেখা যায় না, এটাকে বানাতে হয়—ইংরিজিতে যাকে বলে 'প্রিপেয়ারিং অ্যান এনসাইক্লোপেডিক ডিক্‌শনারি'। এই বইটা আমরা লিখেছি। অবশ্যই আমার সেই প্রাণারাম পুরুষ সেদিন তাঁর 'কুঞ্চিতাধরপুটে' বাঁশীখানি আর স্থির রাখতে পারেননি, অবশ্যই তাঁকে বিষম কৌতুকে ক্ষণেকের জন্য হাসতে হয়েছিল—কেননা সেইদিনই আমি এই বিরাট পুরাণ-কোষ রচনা করবো বলে মনে মনে ভেবেছিলাম। অথচ তাঁর সেই কৌতুক-হাস্যখানিই আমাকে রক্ষা করেছে। আধারগতভাবে অস্থির আমার মতো লোকের কাজে ইন্ধন যোগানোর মানুষ কম ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে প্রথমা ছিলেন আমার গৃহিণী। তিনি সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে কাজ করতেন, আর মাঝে মাঝে আমাকে তিরস্কার করতেন পরম তাচ্ছিল্যভরে। বলতেন—দিন-রাত কী মহাভারত-পুরাণ ঘাঁটো, কে জানে! যেসব বইপত্তর লিখে মানুষের 'আহা-বাহা' শুনছো, ওগুলোর কোনো মানেই নেই। ওগুলো মানুষের কোনো কাজে লাগে না।

গৃহিণীর এমন কথায় একজন আরুরুক্ষু লেখকের মনে কত আঘাত লাগতে পারে, আমার সহৃদয় পাঠককুল সেটা বুঝতে পারেন নিশ্চয়। আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমার এই বই লেখার সঙ্গে তোমার লাইব্রেরির পাঠকের উষ্মার সম্পর্ক কী? তিনি বললেন—লাইব্রেরিতে কেউ যদি এসে সংস্কৃতে লেখা একটি বই—ধরা যাক, সেটা 'প্রমেয়কমলমার্তণ্ড'—সেটা যদি কেউ রিকুইজিশন দেয়, তবে সেটা নামাতে আমাদের তিন মিনিট মাত্র লাগবে, কিন্তু সেদিন একজন 'রিডার' এসে বললেন—মথুরারাজ কংসের পিতামহ আহুকের একটি বোন ছিল, তার নামটা একটু বলবেন? আপনি সংস্কৃতের লোক, সংস্কৃত কলেজের এই লাইব্রেরি, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে হেল্‌প করবেন? আমার স্ত্রী আমাকে বললেন—আমি তো সুধীর সরকারের 'পৌরাণিক অভিধান', অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৌরাণিকা', বেত্তম মুনির 'পুরাণিক এনসাইক্লোপেডিয়া'—সব দেখলাম, কোথাও পেলাম না। তাই বলছিলাম, এইরকম একখানা বিস্তারিত কিছু যদি থাকত তাহলে মানুষের সুবিধা হত।

আমি সব শুনে কিঞ্চিৎ বিমনা হলাম, কিন্তু তখনও আমার অন্যতর 'অনেক কিছু'র মধ্যে একটা বৃহৎ কোষগ্রন্থ তৈরি করবো, এমন উচ্চাভিলাষ পোষণ করতাম না। এরই মধ্যে আমার স্ত্রীর তিরস্কারের আরেক ইন্ধন এল আর এক জায়গা থেকে

এবং সেই ইন্ধনের মহাপাত্র বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয়। তিনি হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আমাকে জোর করে বললেন—'যেসব লেখা তুমি লিখে চলেছো, তা লিখতে থাকো; তাঁর মধ্যেই একটা কাজ আমার প্রকাশনার জন্য করে দিতে হবে। সেটা, হল—মহাভারতের একটা কোষগ্রন্থ তুমি আমাদের জন্য তৈরি করে দেবে। এই কাজের জটিলতা এবং ভলিউম কী হতে পারে তা আমার মতো মহাভারত-পড়িয়ে তখনই বুঝেছিল, কিন্তু সেই দিন একটি উপযুক্ত কোষগ্রন্থের জন্য প্রকাশকের সাতিশয় চেষ্টা, আর এ বিষয়ে আমারই উপযুক্ততা প্রমাণে তাঁর উচ্চগ্রাম প্রশংসা শুনে আমি কেমন বিগলিত বোধ করলাম, যাতে সেদিনের নক্ষত্র-আলোকে আজকের এই গ্রন্থের ভবিষ্যৎ লেখা হয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনা আজ থেকে বিশ-বাইশ বছর আগের। আমি সেদিন প্রকাশককে সপাটে বলেছিলাম—এই গ্রন্থ তৈরি করতে হলে তুমি আমাকে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের তেতাল্লিশ খণ্ড মহাভারত কিনে দাও, মুখ্য পুরাণগুলির কয়েকটি কিনে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। সাহিত্য সংসদের প্রকাশক বিনা বাক্যে আমাকে মহাভারত কিনে দিলেন, পুরাণও কিনে দিলেন বেশ কয়েকটা। আমার কিন্তু এবার বেশ দায় এসে গেল, আমি কাজ আরম্ভ করলাম দ্রুত। তারপর কিছু দিন যাবার পরেই আবার প্রকাশকের কাছে বায়না ধরলাম—এভাবে কাজ করা যায় না। কোষগ্রন্থের এনট্রি করতে হবে 'কার্ডে', আমার চার ইঞ্চি-ছ' ইঞ্চি কার্ড দরকার। প্রকাশক এবার কার্ডেরও ব্যবস্থা করে দিলেন; আমি এবার এক-একটি পুরাণ ধরে ধরে 'রাফ এনট্রি' শুরু করলাম। কার্ডের পর কার্ড, অনন্ত কার্ড।

পুরাণের কাজ করতে-করতেই মনে হল, অনেক পৌরাণিক তথ্যেরই আকর লুকিয়ে আছে মহাভারত-রামায়ণে, সেগুলো বাদ দিলে বিষয়গুলির পারম্পর্য্য থাকে না। অতএব সমান্তরালভাবে আমি মহাভারত-রামায়ণের তথ্যগুলিও বর্তমান কোষগ্রন্থের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করলাম। প্রথম দুই-তিন বছর একাহাতে এই কাজগুলি করছিলাম বলে একটা সময় এল, যখন মনে হল—এর কোনো শেষ নেই যেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখেছিলেন যে, দেবগুরু বৃহস্পতি নাকি দেবরাজ ইন্দ্রকে সমস্ত শব্দরাশির একেকটি ধরে প্রতিটি পদের শব্দার্থ-নিরুক্তি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাতে দেবমানে দিব্য এক হাজার বছর চলে গেল তাতেও তিনি এমন কোনো জায়গায় পৌঁছাতে পারলেন না, যাতে মনে হবে—বেশি দেরী নেই। বৃহস্পতি কোনো শেষ দেখতে পেলেন না—

বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষশতং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং প্রোবাচ। নান্তং জগাম।

আমার অবস্থাও তাই হল। আমি 'বুদ্ধে বৃহস্পতি' নই কোনো, ইন্দ্রের মতো কোনো দেবশিষ্যও ছিল না আমার। আমি নিজের মধ্যে এমনই খেই হারিয়ে ফেললাম, এমন সমস্ত কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল যে, আমার সমস্ত কার্যক্রম

ব্যাহত হয়ে গেল। তার মধ্যে আবার একসময় আমার কর্মস্থল গুরুদাস কলেজের সেমিনার কমিটির ভার পড়ল আমার ওপর। আমি তখন প্রচণ্ড বিদ্যোৎসাহী হয়ে উঠলাম। কলেজে নানান দফায় নানান বিদ্বৎসভার আয়োজন করে আমি এতটাই বিমলানন্দ লাভ করছিলাম যে, সেই কাল-চরণ শেষ পর্যন্ত আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিল। এমনই এক অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে আমার এই কর্মজীবনের শেষ হল যে, এই পুরাণকোষের পদচারণা সেখানে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে।

তবু এই গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় আমাকে কোনো তাড়া দেননি, পুস্তক প্রকাশে দেরি হবার জন্য কোনো তিরস্কারও করেননি কোনো দিন। কিন্তু আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবার গম্ভীর ভাবে আমার সামনে ঘোষণা করলেন—তোমার রিটায়ারমেন্ট বলে কিছু হবার কথা নয়। আগামীকাল থেকে তুমি সাহিত্য সংসদে আসবে, তোমাকে তিন তলায় একটি ঠাণ্ডা ঘর দেবো, তুমি পুরাণ-কোষ শেষ করবে। এতদিনের দেরি হওয়াটা আমার মনের মধ্যেও একটা দোষমানিতা তৈরি করেছিল, ফলে আমি আর 'কালাত্যয় দোষে'র মধ্যে না গিয়ে পরের দিন থেকেই কাজ আরম্ভ করলাম।

কাজ করতে গিয়েই বুঝলাম যে, এই পুরাণ-কোষটাকে আমি যেভাবে খুব বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলতে চেয়েছি, তাতে গ্রন্থের বিস্তার তো বটেই, তাঁর সঙ্গে প্রত্যেকটি 'এন্ট্রি'র তথ্যসূত্র যোগ করা প্রয়োজন। এ কাজ একা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ফলত সহকারীর প্রয়োজন অনুভব করলাম। আমার এক ছাত্রী শ্রীমতী সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সঙ্গে বিনা পয়সায় কাজ করতে চাইল সাহিত্য সংসদে আমি মাস তিনেক কাটাবার পর। অচিরেই আমি বুঝলাম—কাজ যা আছে তাতে দুই জনে রাত দিন খেটেও অন্ত পাবো না। এই সামান্য হতাশার মধ্যে পরম আশার মতো পশ্চিমবঙ্গে চৌত্রিশ বছরের বাম শাসন শেষ হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের নতুন সরকার গড়লেন। এই সুযোগে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করে অভীষ্ট 'পুরাণকোষ' সম্পাদনা করার জন্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন—এই ভাবে ব্যক্তিগত নামে কোনো সাহায্য করা যাবে না। কোনো গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে যদি গবেষণার জন্য সরকারের সাহায্য চাওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই তিনি সাগ্রহে ভেবে দেখবেন। কারণ, কাজের বিষয়টি অগ্রাহ্য ছিল না।

এই সময়ে যখন আমি একটি সঠিক সংস্থা খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন হঠাৎই একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রোফেসর সুরঞ্জন দাস আমাকে ফোন করেন। ঘটনা পরম্পরায় আমার অর্থান্বেষিতার কথা তিনি জানতে পেরেছিলেন এবং আমার বিদ্যাচেষ্টা কোন খাত দিয়ে বয়ে চলে সেটা তাঁর পূর্বাহ্নেই জানা ছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা, এইরকম একটা রিসার্চ প্রোজেক্ট করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো অর্থ পেতে পারি কিনা, তাঁর জন্য আমি আগে দরবার করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থ

আসে, তা বিশ্ববিদ্যালয়েরই নানান বিভাগের মধ্যে বিলি করে দিতে হয়েছে। পৃথক ভাবে আমাকে অর্থ মঞ্জুর করা সম্ভব নয়। তবে তখন সানুতাপে 'না' করলেও সুরঞ্জন আমার সেই মহাভারতীয় সংকল্পের কথা মনে রেখেছিলেন। পরম্পরায় আমার অন্বেষণা এবং যাচনার কথা শুনেই তিনি আমাকে প্রস্তাব দিলেন 'নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ' নামক বিখ্যাত গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে প্রস্তাব পাঠাতে। আমি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করে প্রোজেক্ট জমা দিলাম উচ্চশিক্ষা দফতরে। আর কী ভাগ্য, অথবা ঈশ্বরেচ্ছা অথবা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসুর মহোদয় স্বভাব! একটি ভাল কাজের জন্য, বিদ্যার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক অর্থ মঞ্জুর করা হল উচ্চশিক্ষা দফতর থেকে। আমি বিপুল উদ্যমে কাজ শুরু করলাম। অন্তত চার জন ছাত্রী গবেষণার কাজে নিযুক্ত হল একটি সার্থক পুরাণ-কোষ নির্মাণের জন্য।

এই পুরাণ-কোষের নির্মীয়মান সময়ে বাধা বিপত্তি কম আসেনি। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ এবং চার দশক ধরে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যে অবনমন এবং নিম্নতা তৈরি হয়েছে তাতেও আমার এই গবেষণা ক্ষেত্রটিতে তিন জন যথেষ্টই স্থিতিশীল ছিল বটে, কিন্তু আমার এই প্রকল্পের চতুর্থী জননীটিকে নিয়ে বার বার সমস্যায় পড়তে হয়েছে আমাকে। আবার এরই মধ্যে অন্তত একজন—যার নাম না বললেই নয়—ওর নাম সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়—সে আবার এতটাই ভালো কাজ শিখেছে যে, আমার এই গবেষণা ক্ষেত্রটি এখন এই মেয়েটিকে ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। আমার এখানে দ্বিতীয়া কন্যা ঐন্দ্রেয়ী কঠোর পরিশ্রম করে এখন কিন্তু একটা দিব্য মানদণ্ডে পৌঁছেছে। আর তৃতীয়া পুলোমা মুখোপাধ্যায় নিজেকে তৈরি করে চলেছে এখনও। তবে ওকে ধৈর্য্য ধরে এখনও চলতে হবে গবেষণার জটিল পথ ধরে। অবশেষে আমার চতুর্থী দশায় সেই চতুর্থীর কথা—যিনি এখনও সঞ্চারিণী দীপশিখার মতো—বড়ো বেশি চপলা। কখনো জ্বলে, কখনো নিভে যায়। গবেষণার কাজের দফতরে রাখা এই চতুর্থ কেদারাটি আমার সহকারিণীদের মতে নিতান্তই অপয়া, আমার মতে সেটা অস্থিরা লক্ষ্মীর মতো—একজন 'ভাল'ও যদি ওই চেয়ারে এসে বসে, তবে সে কিছু দিন কাজ করে বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে ভালোভাবে পালায়। এমনকী যার নাম 'অপালা', লৌকিক শব্দার্থে যার পালানোর কথাই নয়, সেই অপালা মল্লিকও স্কুলে চাকরি পেয়ে পালিয়ে গেল। আমি ওর উন্নতি কামনা করি বটে, কিন্তু চার নম্বর চেয়ার সম্বন্ধে আমাদের কুসংস্কারটা রয়েই গেল। শ্রীবিদ্যা নিকেতন স্কুলের শিক্ষক রাজা ভট্টাচার্য কিছু কিছু জায়গায় আমাদের সাহায্য করেছেন। তাকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

আর একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি আমাদের বর্ণসংস্থাপক সুবীর কুমার সরকার। আমাদের বিচিত্রাক্ষর হস্তলেখগুলি যিনি পরম যত্নে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত করেছেন—এইরকম একটা ভাবের কথা বলে তাঁর প্রশংসা শেষ করতে পারতাম আমি। কিন্তু অন্যতর সত্য এই যে, বিরাটাকার এই গ্রন্থের মধ্যে প্রচুর উদ্ধৃতি

আছে যা সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সেগুলিকে যথাসম্ভব শুদ্ধ করে লেখাটা বঙ্গাক্ষরে অভ্যস্ত যান্ত্রিকতায় বাধা সৃষ্টি করে। সুবীর এই কাজটি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সাবধানে করেছেন, তার জন্য তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। ভুল যদি তার পরেও কিছু থাকে, সেটা আমার চক্ষুজ্যোতির সঠিক সমাপতনের দোষ।

আমার সহায়ক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আশীর্বাদ বিস্তার করার পরেও কতগুলি জায়গা থাকে যেখানে কৃতজ্ঞতা বস্তুটা বড়ো লঘু শোনায়, উপরন্তু সেটা যেন সাড়ম্বর মৌখিকতাও হয়ে ওঠে। আমি তাই কৃতজ্ঞতার কথা না বলে আন্তরিক মুগ্ধতা জানাই সেই মানুষগুলিকে যাঁরা নীরবে এই গ্রন্থের সমাপন ঘটিয়েছেন। আমার স্ত্রীর কথা প্রথমে বলতে হবে—অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বহুল তিরস্কার আমার পুরস্কারে পরিণত হয়েছে, কিন্তু এযাত্রা বুঝি আর রক্ষা হল না। এই পুরাণকোষের বহুল বিষয়গুলি যতই তিনি পড়েছেন, ততই তাঁর পরামর্শ ছিল কোনটা কী হতে পারত ইত্যাদি। আমি বার বার তাঁকে বলেছি—'হইলেও হইতে পারিত' বস্তুটা কিন্তু ভয়ংকর, সেখানে মনের মতো হয়ে ওঠাটা কখনোই সম্ভব না। ফলে আমি নিজেই ব্যক্তিগত জীবনেই যা হতে পারলাম না, সেটা একটা গ্রন্থের পক্ষে হওয়া সম্ভব নাকি? তিনি এ কথারও উত্তর দিয়ে বলেছিলেন—তোমার পক্ষে যা সম্ভব নয়, এই গ্রন্থের পক্ষে তা সম্ভব ছিল।

বলুন তো এই মানুষের প্রতি কী কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লাভ আছে কোনো! বরঞ্চ এ-ব্যাপারে আমার পুত্র অনির্বাণের ব্যবহার বেশ ভালো। খেতে বসলে তার দেরি সহ্য হয় না বলে বহুকাল ধরে বারংবার আরব্ধ-ব্যবহিত এবং পুনরারব্ধ এই পুরাণকোষ যত তাড়াতাড়ি আমার ঘাড় থেকে নামে সে ব্যাপারে তার নিঃশ্বাসমুক্তিই এই পুরাণ-কোষকে আশ্বসিত করেছে। আমার পুত্রবধূ সুস্মিতা আমার সমস্ত কাজেই মৌন সহায় আর এই পুরাণকোষের মধ্যে কোথাও যদি কোনো দুরন্তপনা লক্ষ্য করে থাকেন—কী ভাষায়, কী ঘটনা বিস্তারে—তবে সেখানে আমার বাড়ির দুরন্ত ঋষভের দুরন্তপনাই দায়ী। ভগবানের অবতার অবধূত ঋষভদেব আমাদের দুই জনের দুরন্তপনাই ক্ষমা করুন।

ভারতীয় জীবনে 'কৃতজ্ঞ' শব্দটা এমনই, যার সেমানটিক পরিবর্তন ঘটে গেছে অনেকটাই। এখন কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র 'অ্যাকনলেজমেন্ট'-এর পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। বস্তুত 'কৃতজ্ঞ' শব্দের একটা এন্ট্রি হওয়া উচিত এই পুরাণকোষে। কেননা, স্বয়ং ক্রৌঞ্চবিরহী কবি তাঁর নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের পরম গুণ হিসেবে যেটা চেয়েছিলেন, সেটা ছিল—

> তিনি যেন ধর্মজ্ঞ হন, কৃতজ্ঞ হন।
> ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ।

টীকাকারেরা 'কৃতজ্ঞ' শব্দটার অর্থ বোঝানোর জন্য লিখেছেন—কোনোভাবে যিনি একবারও যার কাছে উপকার লাভ করেছেন, তিনি অন্য কোনো

সময় অন্য কোনো ভাবে অপকার লাভ করলেও সেগুলি উপেক্ষা করে পূর্বকৃত উপকারটুকুই শুধু মনে রাখেন, তাকে কৃতজ্ঞ বলে—

কৃতজ্ঞঃ কৃতং কথঞ্চিদ্ জাতোপকৃতিমেব জানাতি স্মরতি,
ন অনন্তরজাতাপকৃতিগণং জানাতীতি।

আমি কৃতজ্ঞতার এই গভীর অর্থে জানাতে চাই, কখনো কোনো অপকারের তো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু এই বিশাল গ্রন্থপ্রকাশে যে পাঁচ জন সহৃদয় বড়ো মানুষ যে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি অকুণ্ঠ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এঁদের মধ্যে প্রথম অবশ্যই তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অধুনা তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মাননীয় ব্রাত্য বসু মহাশয়। তাঁর অনুকূল দক্ষিণ-ভাব ছাড়া এই বিশাল গ্রন্থের একটি মাত্র খণ্ডও এই সময়ের মধ্যে শেষ করা যেত না।

কৃতজ্ঞতা জানাই বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও। কেননা তিনি শিক্ষামন্ত্রী হবার পর-পরই বিধানসভায় শিক্ষাবিষয়ক আলোচনায় মহামতি সূর্যকান্ত মিশ্র বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রশ্ন তোলেন যে পুরাণকোষের জন্য আমাকে দেওয়া অর্থ সম্পূর্ণটাই জনগণের দেওয়া অর্থের অপচয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন এই কথার প্রতিরোধ-বাক্য উচ্চারণ করে বলেছিলেন—যে কোনো ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করলেই সেটা আপনারা বিরোধী স্বভাববশত অপচয় বলে থাকেন। আমি এই কলঙ্কমোচন করার জন্য পার্থবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।

বিধানসভায় এই ঘটনা ঘটার পরপরই অবশ্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দেবেশ রায় মহাশয় আজকাল পত্রিকায় 'ফেঁসে যাব নাকি' নামে একটি পোস্ট-এডিট লেখেন। এখানে বিধানসভায় চলা প্রশ্নোত্তরীর নানান আলোচনার শেষে তিনি সূর্যকান্ত মিশ্র কথিত অপচয় প্রসঙ্গে আসেন। আমি সেই কথাগুলি হুবহু এখানে তুলে দিলাম—

> কিন্তু সূর্যকান্ত মিশ্রও কী পড়া হবে ও কী পড়া হবে না সেটার প্রেসক্রিপশন তৈরীতে পার্থবাবুর চাইতে কম যান না। তিনি বললেন—'নেতাজি ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ'-এ 'মহাভারত-এর পুরাণ-কোষ তৈরির প্রকল্পের জন্য রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। 'এক ব্যক্তিকে'। পরে সেই ব্যক্তির নাম জানা গেল নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। সূর্যকান্ত মিশ্র এও বলেছেন, 'এ তো অর্থের অপচয়। গোটা দেশে 'মহাভারত' নিয়ে অসংখ্য গবেষণা হয়েছে'।
>
> সূর্যকান্তবাবু যে 'মহাভারত'—গবেষণার খোঁজখবর রাখেন তা প্রমাণের জন্য অন্তত দুটো একটা গবেষণা প্রকল্পের নাম বললে পারতেন।
>
> বাংলায় 'মহাভারত' নিয়ে কোনও গবেষণাই হয়নি। যদিও 'মহাভারত'-এর মূল পাঠ উদ্ধারে 'ক্যালকাটা টেক্সট' অন্যতম প্রধান উপাদান। বাংলায় মহাভারত চর্চা মানে তো কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য অনুবাদ আর রাজশেখর বসুর সংক্ষিপ্ত মহাভারত। বর্ধমান রাজসভায় একটা গদ্য অনুবাদও আছে। কিন্তু কোনওটিতেই কোনও টীকা নেই। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের 'মহাভারত' সংস্কৃত ভাষায় বাংলা হরফে এবং বাংলা অনুবাদে একমাত্র 'মহাভারত'।

> *সতেরো*
>
> নৃসিংহপ্রসাদ যে কাজ করছেন তাঁর জন্য তো তাঁকে অভিনন্দিত করা উচিত।
>
> 'মহাভারত'-এর পুরাণ কোষ প্রকল্পের জন্য মাত্র ২১ লক্ষ টাকা অপচয়? চার-পাঁচ জন গবেষণা সহায়কের মাইনেই তো ইউ জি সি নির্ধারিত হারে বছরে ৪০ বা ৫০ লাখ টাকা হওয়ার কথা।
>
> নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এই প্রকল্প পরিচালনার পক্ষে অন্যতম যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর সেই যোগ্যতা তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ রচনায় প্রমাণ করে যাচ্ছেন। তিনি মহাভারত গবেষণায় নতুন বিষয় সৃষ্টি করছেন।
>
> সূর্যকান্ত হঠাৎ তাঁকে নজর করলেন কেন? শুনেছি নৃসিংহপ্রসাদ মতাদর্শের দিক থেকে 'বামপন্থী' নন। কিন্তু তাঁর 'মহাভারত' সংক্রান্ত রচনায় এমন মতামত অবিরত দেখা যায় যে-সব মতামত মার্কসবাদী পণ্ডিতদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন। সূর্যকান্তবাবুর পরামর্শদাতারা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নন।
>
> আমি জানতামই না যে নৃসিংহপ্রসাদকে এমন একটা প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমি অভিনন্দন জানাই।
>
> আর, প্রকল্পটি তো অনুমোদন করেছেন—'নেতাজি ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ'-এর মতো একটি বিদ্যা প্রতিষ্ঠান। এর পরেও বিরোধী পক্ষের নেতা হিসেবে সূর্যকান্ত কী করে কথা বলেন? সেই সদস্যের স্বাধিকার? এম এল এ হলে সবই বলা যায়?

আমি সূর্যবাবুর অপচয়ী প্রসঙ্গে স্থিত হয়ে প্রথমত দেবেশ রায় মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার কলঙ্কমোচনের জন্য। আর সূর্যকান্ত মিশ্রকেও জানাচ্ছি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ—আমাকে খানিক যাচাই করে নেবার জন্য।

দ্বিতীয়ত নিজের ব্যাপারে এতটুকুও তথ্যগোপন না করে জানাই—আমি এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ থেকে একটি পয়সাও নিজে নিইনি। এমনকী এতদিন যে ঢাকুরিয়া-শেয়ালদা ছাড়াও লাইব্রেরির কাজে অন্যত্র যাতায়াত করেছি তাঁর গাড়িভাড়াও নিইনি এক পয়সা। এটাও সবিনয়ে জানাই যে, এটা কোনো গর্বের বিষয়ও নয়, এটা তথ্য নিবেদন। বিশেষত অর্থভোগের ব্যাপারে আমার শারীরিক অক্ষমতাও দায়ী এখানে। সারা জীবন কলেজে পড়িয়ে এখন যা পেনশন পাই আমি, তাতে আমার উদ্বৃত্ত হয়, সেখানে এই পুরাণপ্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত অর্থ যদি জনগণের দেওয়া অর্থ হয়, তবে তা জনগণেরই কাজে লেগেছে। কেননা চার-পাঁচটি ছেলে মেয়ে গত পাঁচ বছর ধরে এই প্রকল্প থেকে বেতন পেয়েছে এবং এখনও পেয়ে চলেছে।

চতুর্থ স্থানে আমার কৃতজ্ঞতা তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসের জন্য। তিনি যদি সেদিন 'বুদ্ধিযোগ' না দিতেন, তাহলে আমাদের এই পুরাণকোষ এখনও প্রকাশের মুখ দেখতে পেত না।

পুরাণ-কোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করে এবার সত্যি কাজের কথায় আসি। সাধারণত এই পুরাণ-কোষ রচনায় এমনটাই আমাদের পরিকল্পনা হওয়া উচিত ছিল যে, আমরা শুধুমাত্র পুরাণগুলি ধরেই একটা কোষগ্রন্থ তৈরি করবো। তাতে আমার

প্রথম বিপত্তি তৈরি করল এই পুরাণগুলিই। প্রথমত আমরা জানি, মুখ্য পুরাণ আঠেরোটি। কিন্তু ঠিক কোন কোন পুরাণ এই আঠেরোটার মধ্যে আসে তাঁর একটা মোটামুটি নিশ্চয়তা থাকলেও বায়ু পুরাণ এবং শিব পুরাণের যে কোনো একটির স্থলাভিষেক নিয়ে দুই পক্ষেই যুক্তি-তর্ক আছে। দ্বিতীয়ত পদ্ম পুরাণ কিংবা স্কন্দ পুরাণ—যেখানে বিচিত্র বিষয়ের অনেকগুলিই এত অপরিকল্পিত ভাবে স্থূলাকারে লিখিত, যাতে তার পৌরাণিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। অন্যদিকে কতগুলি পুরাণ—যেমন গরুড় পুরাণ কিংবা অগ্নি পুরাণ—এগুলির বিষয়বস্তু আবার এতটাই সুপরিকল্পিত-বিধিতে সংগৃহীত, তাতে সেগুলিরও প্রাচীনত্ব খণ্ডিত হয় বলে আমাদের ধারণা।

এমত অবস্থায় এই অষ্টাদশ পুরাণের প্রতিপদ-পাঠ বিচার করে এক একটি অবহেলার যোগ্য শব্দেরও কোষভুক্তি ঘটানোটা আমাদের কাছে বাচালতা বলে মনে হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে, তাতে গ্রন্থ খুব ভারী করে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করা যায় বটে, কিন্তু একটি কোষগ্রন্থের বিষয়গত গুণমানিতা সেখানে ব্যাহত হয়। ফলত এই অষ্টাদশ পুরাণের প্রাতিপদিক বিষয় ভাবনা আমরা ত্যাগ করেছি। কিন্তু বর্জনের সঙ্গে গ্রহণের যে মাত্রাটা থাকে, পারিভাষিক ভাষায় যেটাকে হেয় এবং উপাদেয়-র মিশ্রণে 'হেয়োপাদেয়তা' বলে, সেখানে গ্রহণের বিষয়টা যাতে সাধারণ অর্থে উপাদেয় হয়ে ওঠে, আমরা সেই চেষ্টাই করেছি।

পুরাণ থেকে শত শত 'এনট্রি' আমরা করেছি, কিন্তু সেই সমস্ত 'এনট্রি'গুলিই এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে, যাতে সেটা যদি দু-লাইনেও লেখা হয়ে থাকে, তবে কোনো না কোনো দিক থেকে সেটা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে পাঠকের কাছে। এখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিশারি হল মহাভারত এবং রামায়ণ। এই পুরাণকোষে মহাভারতের গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা এটা মানতেই হবে যে, আমরা প্রথমে মহাভারত-কোষ করব বলেই মনে মনে সংকল্পিত ছিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল—যে বিশাল গ্রন্থখানি নিজেই সাহংকারে বলেছে যে—এই গ্রন্থে যা আছে তা অন্যত্রও আছে, আর এখানে যা নেই তা কোথাও নেই—

যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ।

এ ঘোষণাই আমাকে প্রথম আকৃষ্ট করে। আমি ভাবতে থাকি—এখনকার এই বিদ্যালুন্ঠিত সময়ে, যখন বিদ্যালয়গুলিতে উপেন্দ্রকিশোরের রামায়ণ-মহাভারতও পড়ানো হয় না—এমনই সিলেবাস, যখন শিক্ষকরা রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' পড়াতে গেলে মহাভারতের মূল কাহিনীটিকে রবীন্দ্রনাথ কী করেছেন, সেটাকে তুলনামূলক ভাবে বোঝাতে ব্যর্থ হন, তখন আমি এটাই ভেবেছিলাম যে, মূল মহাভারতের বিষয়-গ্রন্থনা একান্ত জরুরী একটা কাজ, যেটা অজস্র বিদ্যার্থীকে বিদ্যার গভীরে উপনীত করবে।

আমার দিক থেকে পুরাণকোষের মধ্যে মহাভারত-রামায়ণকে টেনে আনার আরও একটা অবিদিত কারণ আছে। মহাভারতের আরম্ভেই মহাভারত ব্যাপারটা

ঠিক কী, সেটা নিয়ে নানান তথ্য দেওয়া হচ্ছিল। সেখানে এক জায়গায় সবিস্ময়ে দেখলাম—মহাভারত এক অর্থে পুরাণও বটে, এমনকী মহাভারত শব্দটা না বলে মহাভারতকেই পুরাণ বলে চিহ্নিত করা হল মহাভারতের মধ্যেই। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিরা সৌতি উগ্রশ্রবার কাছে মহাভারত শুনতে চেয়ে বলেছিলেন—দ্বৈপায়ন ব্যাস যে পুরাণ-কথা বলেছিলেন সেই মহাভারতের ইতিহাস আমরা শুনতে চাই—

দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।

ঋষিদের এই প্রশ্নের উত্তরে উগ্রশ্রবা সৌতি যখন মহাভারত কথার উপক্রম করলেন, তখন মহাভারতের অনেক গুণ প্রকাশ করে একটি শ্লোকে বললেন—এই মহাভারত একদিকে হল সূর্যের মতো যা মানুষের সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে দেয়। অন্যদিকে এই মহাভারতই হল পুরাণের পূর্ণশশী যা পূর্বতন বেদ-বেদাঙ্গের জ্যোৎস্নাটুকু কোমলভাবে প্রকট করে তোলে—

পুরাণ-পূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ।

মহাভারত নিজেই যেখানে এইভাবে পুরাণের সঙ্গে নিজেকে একস্তর করে ফেলে, সেখানে এই পুরাণ-কোষে প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে মহাভারত এবং মহাকাব্যিক সমব্যথায় রামায়ণকেও আমরা সেখানে দূরে সরিয়ে রাখতে পারিনি, কেননা ইতিহাসের প্রাচীন সংজ্ঞাটাই এইরকম যে, ইতিহাস মানেই রামায়ণ এবং মহাভারত। ফলত পুরাণকোষ আসলে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের কোষগ্রন্থ। আমাদের এই গ্রন্থের বিষয়ভুক্তির একটা নতুন তাৎপর্য্য আছে এখানে, বস্তুত আমাদের একটা গভীর বিশ্বাস হল এই যে, প্রাচীন নাম, প্রাচীন মুনি-ঋষির নাম, তাঁদের চরিত্র, রাজা-রাজড়াদের নাম, তাঁদের চরিত্র, প্রত্যেকটি দেশ-নাম, এমনকী ধর্ম, সত্য, বা পাপ-পুণ্যের মতো দার্শনিক শব্দরাশিরও একটা পূর্বোত্তর পরম্পরা আছে। ফলত আমাদের মনে হয়েছে যে, পৌরাণিক অনেক শব্দই বড়ো বেশি ঐতিহাসিক এবং তার মধ্যে অনেক সময়েই সামাজিক সময়ের বিবর্তন লুকিয়ে থাকে। আর সেটা যদি খুঁজে বার করতে পারা যায়, তাহলে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ, এমনকী বেদ-ব্রাহ্মণেরও অন্তর্ভুক্তি আমাদের পুরাণকোষের বিষয়গুলিকে অন্য একটি মাত্রায় নিয়ে যাবে যা এখনও এই বঙ্গভাষায় লিখিত কোনো পুরাণ অভিধানের মধ্যে নেই। ধরা যাক, অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ কিংবা পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়কে আমরা পুরাণেও পাচ্ছি, মহাভারতেও পাচ্ছি আবার বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থেও পাচ্ছি। সেখানে বিচারের প্রয়োজন থাকে না কি? আবার ধরা যাক, গান্ধার দেশ। সে দেশের একটা বৈদিক চরিত্র আছে, তার একটা মহাভারতীয় চরিত্র আছে, অবশেষে একটা পৌরাণিক চরিত্রও আছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই এই পরম্পরাটা ধরতে চেয়েছি গবেষকের অন্বেষণায়। চেষ্টা করেছি সমস্ত আকরগ্রন্থের

তথ্য উল্লেখ করে আমাদের গবেষক পূর্বসূরিদের মতামত জানাতে। আর এমন নয় যে, আমরা এইরকম শুধু পরীক্ষিৎ আর গান্ধার দেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই শুধু মাথা ঘামিয়েছি। আমরা অতি-অপরিচিত একটি পৌরাণিক শব্দও বাদ দিইনি, যেটা সত্যিই দু-লাইনে সেরে দেওয়া যেত, অথচ মহাভারত-রামায়ণের সাক্ষীতে সেই শব্দ আমাদের কাছে জটিল হয়ে উঠেছে। গবেষণার তাগিদে এই জটিলতা আমরা ভালোবাসি, কেননা তাতে এক-একটি পৌরাণিক শব্দ আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থের সাজসজ্জা এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু আভিধানিক জটিলতাগুলি যথাসম্ভব পরিহার করেছি। একটি বিশেষ শব্দ পড়তে গিয়ে তথ্যপঞ্জীর অন্বেষণে দশ বার সংক্ষিপ্ত রূপ দেখাটা পাঠকের কাছে বিড়ম্বনা তৈরি করে। ব্রহ্ম পুরাণকে 'ব্র. পু.' আর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণকে 'ব্রহ্মা. পু.' বলে সংক্ষিপ্ত রূপ দেবার পর পাঠকের যদি এমন ভ্রান্তি ঘটতে থাকে যে, ব্রহ্ম পুরাণেরই সংক্ষিপ্তি বোধ হয় 'ব্রহ্মা. পু.'—এই অকারণ পাঠব্যাহতি আমার নিজের কাছে বিড়ম্বনা বলেই আমি কোনো সময়েই প্রায় অতিবৈজ্ঞানিক সংক্ষেপ-সূত্রের মধ্যে যাইনি।

আসলে সর্বত্রই যা দেখি, তাতে বিদ্যা খানিক অধিগত হলেই পাণ্ডিত্যের একটা অভিমান জন্মায় সততই এবং সে পাণ্ডিত্য যত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয় বা লঘু থেকে লঘুতর হয়, সেখানে খানিক নাট্যের জন্ম হয়, অর্থাৎ কিনা অভিনয়ের আঙ্গিক, বাচিক তথা আহার্য্য গুণগুলি পাণ্ডিত্যের লঘুতাকে একটা আবরণ দেয়। লঘু পণ্ডিতের পক্ষে সেটা মস্ত বাঁচন। আমি দু-চারটে এই রকম অপোগণ্ড কাজ দেখেছি, যেখানে উপলক্ষ্য অনেক সময়েই লক্ষ্য বস্তুর উপরে উঠে গেছে। সাংকেতিক চিহ্ন, সাংকেতিক শব্দ, গ্রন্থের একটি পংক্তি পড়তে না পড়তেই এটা দ্যাখো, সেটা দ্যাখো, লঘু দ্যাখো, বিস্তার দ্যাখো—এই সব জটিল 'কুটিনাটী' বা 'খুঁটিনাটি' এমন একটা আবর্ত তৈরি করে আমার মনে যে, আমি সেখানে বেশ মুহ্যমান বোধ করি। একই সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ উজ্জ্বলনীলমণির লেখক রূপ গোস্বামীর একটি উক্তি আমার বেশ মনে ধরে এই প্রসঙ্গে।

রূপ গোস্বামীর লেখা ভাষার মধ্যে অনেক সময়েই আমি বড়ো আধুনিকতা দেখেছি এবং তাঁর শক্তিটা এমনই যে নিতান্ত সাধু সংস্কৃত ভাষার সংস্কৃতায়িত লৌকিক রূপ তিনি এখানে ব্যবহার করেছেন। 'দানকেলিকৌমুদী' নামে রূপ গোস্বামীর একটি ক্ষুদ্র নাটিকা আছে। সেখানে রাধার প্রতি কৃষ্ণের মানভঞ্জিনী সংলাপে কৃষ্ণ বলছেন—তুমি এবার অন্তত খুশি হও একবার। আর যেটা এমন অনর্থক ভ্রান্তি তৈরি করে তেমন 'কুটিনাটী'র আর প্রয়োজন নেই—

> অপটু-ভ্রমকারিণীভিরাভিঃ কুটিনাটীভিরলং প্রসীদ দেবী।

আমি যখন প্রথম চৈতন্যচরিতামৃতে 'কুটিনাটী' শব্দটি পাই, তখন ভেবেছিলাম, 'কুটিনাটী' মানে খুঁটিনাটী—যেমনটা আছে এখানে—'তোমার বাক্যে পরিপাটি,

তার মধ্যে 'কুটিনাটী', শুনে গোপীর বাঢ়ে আর রোষ'। কিন্তু 'কুটিনাটী' সম্বন্ধে আমার ভুল ভাঙল দানকেলিকৌমুদীতে ওই শব্দটির ওপর জীব গোস্বামী কিংবা সনাতন গোস্বামীর টীকায়। টীকাকার লিখছেন—'কুটি' মানে কুটিলতা, কৌটিল্য, আর নাটী মানে নাট্য, দুয়ে মিলে কুটিলতার নাটক—কৌটিল্যনাট্যম্।

আশ্চর্য দেখলাম, মহাপণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই মত মেনে নিয়েছেন এবং এই নিরিখে খুঁটিনাটীর অর্থ করেছেন ক্ষুদ্র নাটক। অধুনা আমার সরল নিবেদন—আমার কোনো পাণ্ডিত্য নেই বলে আমি কোনো 'কুটিনাটী' এবং 'খুঁটিনাটী'—কোনোটার মধ্যেই যাইনি। আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলোয়, তাতেই অতি সরলভাবে যথাসাধ্য মূল তথ্য উল্লেখ করে এই পুরাণকোষের সজ্জা তৈরি করেছি আমরা।

বানান বিধির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার আধুনিকতম বিধিগুলি আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ হল—মহাভারত-পুরাণগুলির বিচিত্র বিষয়ে পাঠক যে বানান দেখতে অভ্যস্ত, সেগুলির আমূল পরিবর্তন করে বাংলার আধুনিকতম সংস্কারগুলি সেখানে আরোপিত করে দিলে অন্যতম এক দার্শনিক ভ্রান্তি তৈরি হবে। এই ধরনের 'অপটিক্যাল ডিকনস্ট্রাকশন' মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের ব্যবহৃত শব্দকে দ্বিচারণায় প্রবৃত্ত করবে বলেই বহুল ক্ষেত্রে আমরা ঐতিহ্যবাহী বানানগুলিই ব্যবহার করেছি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার প্রকাশকের আধুনিকমনস্কতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। তাই আমরাও এক প্রকার 'ভাষা লিখি যাবনি-মিশাল'।

এই ভাবনায় সূর্য, আর্য, আচার্য, অনার্য-তে আমরা 'য'-ফলা দিচ্ছি না বটে, কিন্তু ধৈর্য্য, শৌর্য্য, সৌন্দর্য্য, সৌকর্য্য ঔদার্য্য বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, লক্ষ্য, মাহাত্ম্য, তাৎপর্য্য, মহার্ঘ্য, সৌহার্দ্য এবং গার্হস্থ্য-তে আমরা 'য'-ফলা দিয়েই লিখেছি। এছাড়া 'এখনো'-কে আমরা এখনও লিখেছি বটে কিন্তু 'কখনও' কিংবা 'কোনও'-র ক্ষেত্রে 'কখনো' এবং 'কোনো' লিখেছি। আর যেসব বানান আমরা মানসিক কাঠিন্যবশত ত্যাগ করতে পারিনি সেগুলিরো একটা মোটামুটি তালিকা দিলাম। যে কাহিনী, শ্রেণী, খ্রিস্টীয়, ঊর্ধ্ব, গোরু, হত, মতো, পরীক্ষিৎ, উর্বশী, ঊষা, হস্তী, পিসী, মাসী ইত্যাদি। অবশ্য 'হস্তীর চলিত রূপে আমরা 'হাতি' লিখেছি অর্থাৎ 'ই'-কার বসিয়েছি।

একেবারে অবশেষ জায়গায় সহৃদয় পাঠকের কাছে আমার প্রণামান্ত নিবেদন—আমার এই বিশাল পুরাণকোষে ভুল অবশ্য কিছু থাকবেই। এতকাল ধরে এই গ্রন্থের পিছনে আমি লেগে আছি, যেখানে এতকালের আকুল পরিশ্রমে আমার ধৈর্য্যেরও কিছু হানি ঘটেছে হয়তো। তবে সেটা কোনো অজুহাতই নয়। আমি তেমন শুদ্ধ মানুষ নই, আর আমার দোষ এবং অশুদ্ধি নিয়ে অত বিচলিতও হই না। বিশেষত সর্বশুদ্ধির চিন্তায় এই গ্রন্থখানিকে যদি ফেলে রেখে দিতাম, তাহলে আরও অনেক কাল আমাকে অপেক্ষা করতে হত এবং গ্রন্থ প্রকাশের জন্য। তাঁর চেয়ে এই ভালো নয় কী যে, কোথাও বানান ভুল, কোথাও মুদ্রাকরের প্রমাদ, কোথাও আমার অজ্ঞানজনিত ভুল, অথবা কোথাও 'যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা'—এই

সব ভুলের জন্য আমরা সহৃদয় পাঠক আমাকে পরম প্রশ্রয়ে সংশোধন করে দেবেন, যাতে এই গ্রন্থ সংস্করণে শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

আর সত্যি বলতে কী, আমি সেই মোহিনী কলার কৌশলও অত শিখিনি। একটি বৃহৎ কোষের নির্মাণে কত রকম প্রতীকী বিভঙ্গ তৈরি করা যায়, সে আমি দেখেছি। কত চিহ্ন, কত মাত্রা, কত সংকেত—সাংকেতিক সেখানে থাকে যে, আমার মনে হয় আমি যেন অভিসারিকার সযত্ন প্রয়াসে তিমিরাভিসারে বেরিয়েছি, যেন চল চপলার চকিত চমক ছাড়া সেই সংকেতস্থানে পৌঁছতেই পারব না আমি, যেন যেতে গেলেই জটিলা কুটিলা আমার কুলশীল ধরে টেনে নেবে অবিরত। আমি সত্যিই এই কোষ-অভিধান-রচনায় কৌশলী হতে পারিনি এতটুকুও। আমি খুব সোজা সরলভাবে এমনই স্থূল পদক্ষেপে বিচরণ করেছি এখানে, যাতে আপনাদের মনে এই ভরসাটা থাকবেই যে, ভাগ্যিস! লোকটা পণ্ডিত নয় এতটুকুও। এবং আপনার মতো তো নয়ই।

আমার খুব বড়ো ভরসার জায়গা হল লৌকিক সেই সমাপেক্ষ বচনটি—'তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল!' যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে যে মহাভারতের মতো বিরাট গ্রন্থে অশুদ্ধ কিছু থাকবেই, সেখানে নতুন করে অশুদ্ধির আরোপ লাগালে তাতে যেন কিছু এসে যায় না। আমার যুক্তিও প্রায় তাই, তবে এতটা সমাক্ষেপী অবিনয়ে নয়, আমি কথাটা বলতে চাই আমার প্রিয়তম লেখক রূপ গোস্বামীর সগর্ব প্রশ্রয়ে। রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের বয়ানে রূপ বলছেন—আমার এই নাটকে কবিতা তেমন সুললিত হয়নি হয়তো, কিন্তু তবু তো এতে ভগবান শ্রীহরির নামগন্ধসুধা মাখানো আছে, বিদ্বান পণ্ডিতেরা সেই জন্যই এই নাটকটি পড়ে আনন্দ পাবেন। এটা তো সত্যিই যে, শালগ্রাম শিলাকে যদি কুয়োর জলেও স্নান করানো হয়, তবুও তো সেই স্নান-চরণামৃতের জল ভক্তিভরে মাথায় ঠেকান পণ্ডিতেরাও, তারপর সেটা পানও করেন—

> অপঃ শালগ্রামাপ্লবন-গরিমোদগার-সরসাঃ।
> সুধীঃ কো বা কৌপীরপি নমিতমূর্ধা ন পিবতি॥

আমার যুক্তিও প্রায় একই রকম। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণগুলির মতো বিশাল-পরিসর গ্রন্থগুলির মধ্যে থেকে বিচিত্র শব্দরাশির অপোদ্ধার করতে বসেছি আপনাদেরই ব্যবহারিক সুবিধার জন্য, আর এই আকরগ্রন্থগুলি মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের মতো জটিল এবং মহান গ্রন্থ বলেই আপনারা সেটাকেই যথোচিত সম্মান দেবেন এবং আমার সমস্ত ভুলত্রুটি মার্জনা করে বিদ্বৎসুলভ উদারতায় এই পুরাণকোষকেও সহ্য-সম্মান করবেন।

জুলাই ২০১৬ — নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
কলকাতা

সংক্ষিপ্ত রূপ

- উর্ধ্বকমা (') – এই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে লুপ্ত 'অ' কারের পরিবর্তে উর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়েছে।
- বিশেষ চিহ্ন – যেসব জায়গায় খণ্ডিত শ্লোকপংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে—যেমন ধরা যাক, মহাভারতের আদিপর্বের ২৮ অধ্যায় থেকে একটি পংক্তি অথবা একটি শ্লোক এবং শান্তিপর্বের ১০৩ অধ্যায় থেকে একটি পংক্তি বা একটি শ্লোক—এসব ক্ষেত্রে পরপর *চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। পরে তথ্য সূত্র দেওয়া হয়েছে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে।
- মহা (গীতাপ্রেস) – গোরখপুর: গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত *মহাভারত*।
- মহা (নির্ণয়সাগর প্রেস) – বম্বে: নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত *মহাভারত*।
- মহা (হরি) – হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত *মহাভারত*।
- মহা (Critical Ed.) – *Mahabharatam*, Bhandarkar Oriental Research Institute.
- মহা (k) – *Mahabharatam*, Pandit Ranichandrashastri Kinjawadekar.
- AGI – *The Ancient Geography of India*, Alexander Cunningham.
- AIHT – *Ancient Indian Historical Tradition*, F.E. Pargiter.
- AIT – *Ancient Indian Tribes*, B.C. Law.
- Annals of BORI – *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute.*
- EAIG – *Encyclopedia of Ancient Indian Geography*, Subodh Kapoor.
- GAMI – *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India.* D.C. Sircar.
- GD – *The Geographical Dictionary*, N.N. Bhattachryya.
- GDAMI – *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*, N.L. Dey.
- GEAMI – *The Geographical Encyclopedia of Ancient and Medieval India*, K.D. Bajpai.
- GESMUP – *Geographical and Economic Studies in the Mahabharata: Upayana Parva*, Moti Chandra.
- GM – *Geography of the Mahabharata*, Bhagwan Singh Suryavanshi.
- GP – *Geography of the Puranas*, S.M. Ali.
- GRI – *Geography of the Rigvedic India*, M.L. Bhargava.
- HGM – *Historical Geography of Madhya Pradesh*, P.K. Bhattacharyya.
- HPAI – *History of Pilgrimage in Ancient India*, Samarendra Narayan Arya.

- IKP – *India as Known to Panini,* V.S. Agrawala.
- JASB – *Journal of the Asiatic Society of Bengal.*
- JRAS – *Journal of the Royal Asiatic Society of* Great Britain and Ireland
- PHAI – *Political History of Ancient India,* H.C. Raychaudhuri.
- TAI – *Tribes in Ancient India,* B.C. Law.
- TIM – *Tribes in the Mahabharata,* K.C. Mishra.

পুরাণকোষ

(মহাভারত-রামায়ণ-মুখ্য পুরাণ)

অ

অ অকার অক্ষরের প্রথম রূপ—

অকারস্ত্বক্ষরো জ্ঞেয়ঃ। *[বায়ু পু. ২০.৮]*

অ, উ, ম, এই তিন বর্ণজাত পবিত্র ওঙ্কার-ধ্বনির প্রথম বর্ণ। ভূর্ভুব—ইত্যাদি লোকের প্রথম ভূর্লোকের স্বরূপ হল অকার—

অকারস্ত্বথ ভূর্লোকঃ। *[বায়ু পু. ২০.৯]*

চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে যে চতুর্দশ স্বরবর্ণ নির্গত হয়েছিল, তার মধ্যে আদি অক্ষর হল 'অ' এবং এই 'অ' থেকেই তেষট্টিটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে—তস্মাৎ ত্রিষষ্টিবর্ণা বৈ অকারপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ। অকারই প্রথম স্বর এবং অকারই চতুর্দশ স্বরের মুখস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ববর্ণস্বরূপ, ব্রহ্মাকল্প এবং সর্ববর্ণের জনক প্রজাপতিরূপে কীর্তিত। অকার থেকেই শুক্লবর্ণ আদিমনু স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি—

চতুর্দশমুখো যশ্চ অকারো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।
ব্রহ্মকল্পঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববর্ণঃ প্রজাপতিঃ॥

মুখাত্তু প্রথমাত্তস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্মৃতঃ।
অকারস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতবর্ণঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥

[বায়ু পু. ২৬.২৮-৩২]

পরম্পরাগত একটি পুরাতন শ্লোক অনুসারে 'ওঁ' (অ,উ,ম) এই ত্রিবর্ণাত্মক ওঙ্কার ধ্বনিতে 'অ' বর্ণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হলেন বিষ্ণু—

অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ।

[দ্র. পুরুষোত্তমদেবকৃত একাক্ষরকোষ]

[Asiatic Society MS. no. G 5291 Fol.1; see also V. S. Apte, Sanskrit-English Dictionary, p. 1]

আবার দেবীভাগবত পুরাণে অকারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হলেন ব্রহ্মা—

অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা।

[দেবীভাগবত পু. ৫.১.২২]

অন্য একটি মতে অকারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হিসেবে বায়ু অথবা বৈশ্বানরের নামও করা হয়েছে। অন্য একটি একাক্ষর কোষে—

অকারঃ কেবলং ব্রহ্ম।

কামধেনুতন্ত্রে অকারের তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—হে সুন্দরী! অকারের তত্ত্ব সম্বন্ধে অতি গোপ্য কথা শ্রবণ কর। শরৎকালীন চন্দ্রের মাধুর্য্য আছে এই অকারের মধ্যে। এই বর্ণ পঞ্চকোণসমন্বিত। এটি পঞ্চদেবময় এবং শক্তিত্রয়াত্মক। এটি নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও সত্ত্ব-রজ-তম ইত্যাদি ত্রিগুণাত্মক। অকার মূর্তিমান কৈবল্য এবং তান্ত্রিক বিন্দুতত্ত্বময়। এই অকারই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিস্বরূপা—

শৃণু তত্ত্বমকারস্য অতিগোপ্যং বরাননে।
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং পঞ্চকোণময়ং সদা॥
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং শক্তিত্রয়সমন্বিতম্।
নির্গুণং ত্রিগুণোপেতং স্বয়ং কৈবল্যমূর্তিমান্॥
বিন্দুতত্ত্বময়ং বর্ণং স্বয়ং প্রকৃতিরূপিণী
(কামধেনুতন্ত্রম্)।

সমুদয় অক্ষর-বর্ণের মধ্যে অ-কার ভগবানের অন্যতম বিভূতি বলে গীতায় কীর্তিত হয়েছে—

অক্ষরাণাম্ অকারো'স্মি।

[ভগবদ্গীতা ১০.৩৩]

অংশ$_{১}$ ঋগ্বেদে আদিত্যদের উদ্দেশে আহুতি দেবার সময় আদিত্যগণের একতম হিসেবে অংশ-এর নাম করা হয়েছে—

ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো ন স্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ। *[ঋগ্বেদ ২.২৭.১]*

☐ বিবস্বান সূর্যের মুখরাগ থেকে বিচ্যুত হয়ে দ্বাদশ আদিত্যের সৃষ্টি হয়—

মুখরাগং তু যৎ পূর্বং মার্তণ্ডস্য মুখচ্যুতম্।
অংশ এই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে অন্যতম।

[দ্র. আদিত্য]

[হরিবংশ পু. ১.৯.৪৬-৪৭]

☐ সৃষ্টির আদিতে জয় নামে যে দ্বাদশ দেবতা ব্রহ্মার দ্বারা অভিশপ্ত হন, এবং প্রতি মন্বন্তরে দ্বাদশ দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরাই বৈবস্বত মনুর সময়ে কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী অদিতির গর্ভে প্রবেশ করে দ্বাদশ আদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। অংশ এই আদিত্যদের মধ্যে অন্যতম।

[বিষ্ণু পু. ১.১৫.১২৭-১৩৩; বায়ু পু. ৬৬.৬৬]

☐ দ্বাদশ আদিত্যের নামের যে তালিকা পুরাণে পাওয়া যায়, মহাভারতে প্রাপ্ত তালিকা তার থেকে কিছু ভিন্ন হলেও মহাভারতেও দ্বাদশ আদিত্যের নামের তালিকায় আমরা অংশকে পাই—

ভগো'ংশশ্চার্যমা চৈব মিত্রঃ।

[মহা (k) ১২.২০৮.১৫; (হরি) ১২.২০২.১৫]

☐ কৃষ্ণার্জুন খাণ্ডব বন দহন করতে উদ্যত হলে ইন্দ্র তাঁদের প্রতিরোধ করতে এলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধল। এই সময় ইন্দ্রের সহায়তার জন্য অংশও এসেছিলেন এবং লক্ষণীয়, তাঁর প্রিয় অস্ত্র ছিল 'শক্তি' (javelin)—

অংশস্তু শক্তিং জগাহ।

[মহা (k) ১.২২৭.৩৫; (হরি) ১.২২০.৩৫]

☐ দেবসেনাপতি পদে স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার নিয়ে অন্যান্য আদিত্যগণ এবং বিবস্বানের সঙ্গে অংশও এসেছিলেন—

পূষ্ণা ভগেনার্যম্না চ অংশেন চ বিবস্বতা।

স্কন্দকে তিনি তাঁর পাঁচটি অনুচরও দান করেন, যাদের নাম—পরিঘ, বট, ভীম, দহতি এবং দহন—

পরিঘঞ্চ বটঞ্চৈব ভীমঞ্চ সুমহাবলম্।
দহতিং দহনঞ্চৈব প্রচণ্ডৌ বীর্যসম্মতৌ॥
অংশো'প্যনুচরান্ পঞ্চ দদৌ স্কন্দায় ধীমতে॥

[মহা (k) ৯.৪৫.৫, ৩৪-৩৫;
(হরি) ৯.৪২.৫, ৩৩]

☐ আধুনিক পণ্ডিতদের মতে অংশ সৌরকুলের দেবতা বা Solar diety এবং অংশ শব্দটি হয়তো অংশু (সূর্যকিরণ) শব্দের সমপ্রকৃতিক। এইজন্যই হয়তো পুরাণে সূর্যের রথে অগ্রহায়ণ মাসে অংশ নামে এক রাক্ষসকে অবস্থান করতে দেখা যায়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১৬;
বিষ্ণু পু. ২.১০.১৮]

অংশ$_২$ স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন তুষিত তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অংশ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১১]

অংশু$_১$ আক্ষরিক অর্থে কিরণ, প্রভা। ঋগ্‌বেদে সোমলতার একটি অংশ পিষ্ট হলে তাকে অংশু বলে। অর্থাৎ অংশু হল সোমধারা—

প্র স্যন্দস্ব সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ।

[৯.৬৭.২৮]

'অংশু'-শব্দের অর্থ সোম, চন্দ্র, সোমের ডাঁটা অর্থাৎ বৈদিকদের পবিত্র পানীয় ওষধি সোমের একটি বিশেষ অংশ। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—হে সবিতা! (অর্থাৎ হে আদিত্য) অঙ্গিরার বংশজাত হিরণ্যস্তূপ এই ঘৃতমিশ্রিত অন্ন তোমার জন্য প্রস্তুত করে যেভাবে তোমাকে আহ্বান করতেন—আমি তাঁর ছেলে অর্চন্, আমাদের সকলের রক্ষার জন্য তোমাকে এই দধি দিয়ে বন্দনা করছি। সোমের অংশ অর্থাৎ সোমের ডাঁটার ব্যাপারে যাগ-যজ্ঞকারীরা যেমন সতর্ক থাকেন, তেমনই আমিও তোমার পরিচর্যার ব্যাপারে সতর্ক আছি—

এক ত্বার্চন্নবসে বন্দমানঃ
সোমস্যেবাংশু প্রতিজাগরাহম্।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১৪৯.৫]

☐ অশ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ত হওয়া, খাওয়া, পান করা। ঋগ্‌বেদের অন্য একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—ঋত্বিকরা সোম নিষ্কাষণ করে সোম-নিষ্কাষণের জন্য পেতে-রাখা গোচর্মের ওপর অবস্থিত আছেন—

অংশুং দুহন্তো অধ্যাসতে দিবি।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৯৪.৯]

এই মন্ত্রাংশে অংশু-শব্দটি ব্যাখ্যা করে নিরুক্তকার যাস্ক লিখেছেন—অংশুঃ শম্ অষ্টমাত্রো ভবতি অননায় শং ভবতীতি বা—অর্থাৎ অংশু (সোম) পান করা হলেই (অষ্টমাত্র) সুখকর হয়, অর্থাৎ জীবন ধারণ করার

পক্ষে সুখকর হয়। ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দের টীকাকার স্কন্দস্বামী এই মন্ত্রের টীকা করার সময় লিখেছেন—ব্যাপ্ত হয় বা পীত হয়—এই অর্থে অশ্'—ধাতুর সঙ্গে 'শম্' শব্দ যুক্ত করে 'উ'-প্রত্যয় করলে অংশ-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। স্কন্দস্বামী আরও লিখেছেন—

অষ্ট (অশ্+ক্ত) মাত্রঃ ব্যাপ্তমাত্রঃ পীতমাত্রঃ।
শমো মকারো'শের্মধ্যমনুপ্রবিষ্টো'নু
স্বারীভূতঃ উকারশ্চ প্রত্যয়ঃ।

অংশু অন্যতম আদিত্য এবং 'অংশু' শব্দের উৎপত্তিতে 'উ'-প্রত্যয় না দিলেই রূপ হবে অংশ—তিনিও একজন আদিত্য—সূর্যরশ্মি। মৈত্রায়ণী সংহিতায় বলা হয়েছে সূর্যরশ্মি সমূহ চন্দ্ররশ্মিকে আপ্যায়ন করে—

যথাদিত্যা (সূর্যরশ্ময়ঃ) অংশুমাপ্যায়য়ন্তি।

[নিরুক্ত (Sarup), ২.৫;
মৈত্রায়ণী সংহিতা (Schroeder), ৪.৯.২৭]

☐ পুরাণে কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভজাত যে দ্বাদশ আদিত্যের নামোল্লেখ পাই, তার মধ্যে অংশ বা অংশুকে অন্যতম আদিত্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো পুরাণ একে অংশ নামে চিহ্নিত করেছে আবার কোনো কোনো পুরাণ অংশু নামে তাঁকে উল্লেখ করেছে। তবে এই অংশ বা অংশুকে পৃথক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করলেও সূর্যের সঙ্গে তাকে একাত্ম করে দেওয়া হয়েছে পুরাণের বিবরণেই। ভাগবত পুরাণ মতে অগ্রহায়ণ মাস এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে চৈত্র মাসে যে সূর্য উদিত হন তার নাম অংশু। আদিত্যদের মধ্যে অন্যতম এই অংশু মৎস্য পুরাণে অংশুমান নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[ভাগবত পু. ১২.১১.৪১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৪.৩৪, ৩৮; ২.৩.৬৭;
বিষ্ণু পু. ১.১৫.১৩১;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ১৪.২৬; ৫১.৬৬-৬৭;
মৎস্য পু. ৬.৪]

অংশু$_{২}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার নীলকণ্ঠ অংশু নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—অংশুর্দেবতাভেদঃ।

আদিত্যদের মধ্যে অন্যতম যে অংশু দেবতা, তাঁর স্বরূপ বলে মহাদেবেরও অন্যতম নাম অংশু।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬৮; (হরি) ১৩.১৬.৬৮]

অংশু$_{৩}$ ভগবান কৃষ্ণের বাল্যকালের ক্রীড়াসঙ্গীদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ১০.২২.৩১]*

অংশু$_{৪}$ যদুবংশীয় জ্যামঘর বংশধারায় পুরুমিত্রের পুত্র ছিলেন অংশু। ইনি বৃষ্ণি অন্ধক বংশের প্রবর্তক সত্বতের পিতা। তবে বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে তাঁকে পুরুহোত্রের পুত্র অংশ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১২.৪৩;
(নবভারত) ৪.১২.১৬]

অংশুধান ভরত-শত্রুঘ্নের মাতুলগৃহে থাকাকালীন সময়ে তাঁদের পিতা রাজা দশরথের মৃত্যু হল। ভরত কেকয় থেকে অযোধ্যায় শীঘ্র আসবার জন্য যমুনা পার হলেন এবং এক মহাবন ছাড়িয়ে এসে অংশুধান নামক গ্রামে পৌঁছোলেন। এই গ্রামের সামনে দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গঙ্গা এখানে অত্যন্ত প্রশস্ত এবং স্রোতস্বিনী হওয়ায় ভরত এই গ্রাম থেকে গঙ্গা পার হতে পারেননি। তিনি তাই অংশুধান-গ্রামের নিকটবর্তী নগর প্রাগ্‌বটে এসে গঙ্গা পার হয়েছিলেন। অংশুধানের আধুনিক অবস্থিতি স্থির করা কঠিন। *[রামায়ণ, ২.৭১.৯]*

অংশুমান$_{১}$ কোনো কোনো পুরাণ মতে সগর রাজার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ষাট হাজার পুত্রসন্তানের প্রায় সকলেই কপিল মুনির ক্রোধানলে ভস্মীভূত হলেও সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে চারজন বেঁচে যান। সগর রাজার এই অবশিষ্ট পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পঞ্চজন (বায়ু পুরাণ মতে পঞ্চবন)। শিব পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, সগর রাজার পর এই পঞ্চজনই রাজা হয়েছিলেন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান। তবে হরিবংশ পুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জই পরবর্তী সময়ে পঞ্চজন নামে পরিচিত হন। এই পঞ্চজন-অসমঞ্জই সগরের পরে রাজা হয়েছিলেন এবং তিনিই অংশুমানের পিতা—

একঃ পঞ্চজনো নাম পুত্রো রাজা বভূব হ।
সুতঃ পঞ্চজনস্যাসীদংশুমান্ নাম বীর্য্যবান্॥

মহাভারতে অংশুমান স্পষ্টভাবেই সগর রাজার পৌত্র এবং অসমঞ্জের পুত্র—

অংশুমন্তং সমাহূয় অসমঞ্জসুতং তদা।
পৌত্রং ভরতশার্দূল ইদং বচনমব্রবীৎ॥

সগরের পুত্র অসমঞ্জ অত্যন্ত দুর্বিনীত ছিলেন। রাজ্যের প্রজারা অসমঞ্জের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সগর রাজার কাছে এসে অভিযোগ

করলেন। সগর ক্ষুব্ধ হয়ে অসমঞ্জকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন। ফলে সগরের পর তাঁর পৌত্র অংশুমানই রাজা হন—

পৌত্রে ভারং সমাবেশ্য জগাম ত্রিদিবং তদা।

[মহা (k) ৩.১০৭.৩৫-৩৬, ৬৪;
(হরি) ৩.৯০.৬২, ৯১-৯২;
হরিবংশ পু. ১.১৫.১২-১৩;
শিব পু. ধর্ম. ৬১.৫৭-৫৮; বায়ু পু. ৮৮.১৪৮-১৪৯;
ভাগবত পু. ৯.৮.১৫, ২৮-২৯, ৩১; ৯৯.১-২;
মৎস্য পু. ১২.৪৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫১.৫১; ২.৫২.১;
২.৫৪.১৭, ৫১; ২.৫৬.৩০; ২.৬৩.১৬৫;
বিষ্ণু পু. ৪.৪.১২-১৫]

☐ সগর রাজা একসময় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলে পৌত্র অংশুমান যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষার কাজে নিযুক্ত হন। অল্পবয়স থেকেই অংশুমান প্রিয়বাদিতার গুণে প্রজাসাধারণের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সগর রাজার অনুমতি অনুসারে অশ্বরক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করলেন অংশুমান। যজ্ঞের শেষ পর্যায়ে অশ্বালম্ভনের সময় এল। এদিকে সগররাজার পুণ্যকর্মে ঈর্ষান্বিত হয়ে ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞাশ্ব হরণ করে নিলেন। রাজার আচার্য-উপাধ্যায়রা উপদেশ দিলেন—যজ্ঞ শেষ হবার আগে যে ভাবেই হোক অশ্ব সংগ্রহ করে আনতে হবে। সগর রাজা তাঁর ষাট হাজার পুত্রকে পাঠালেন যজ্ঞীয় অশ্ব খুঁজে আনার জন্য। আর নিজে অংশুমানকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত রইলেন যজ্ঞভূমিতে।

ষাট হাজার সগর পুত্র সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় করে ফেললেন যজ্ঞাশ্বের সন্ধান করতে করতে। শেষ পর্যন্ত অশ্ব লাভের আশায় ভূমি খনন করতে শুরু করলেন তাঁরা। ভূমি খনন করতে করতে একসময় সগর পুত্ররা কপিল মুনির দর্শন পেলেন। তপস্যারত মুনির আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল যজ্ঞাশ্বটি। তা দেখে কপিলমুনিকেই তাঁরা অশ্বাপহারী চোর বলে সাব্যস্ত করলে মুনি ক্রোধ হুংকারে তাঁদের ভস্মীভূত করে ফেলেন।

ষাট হাজার পুত্র ফিরে আসছে না দেখে সগর রাজা পৌত্র অংশুমানকে অশ্ব অন্বেষণ করার জন্য এবং পিতৃস্থানীয় সগরপুত্রদের খুঁজে বের করার কাজে নিযুক্ত করলেন।

মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী অবশ্য অংশুমান প্রথমে অশ্বরক্ষার কর্মে নিযুক্ত হননি এবং সগরের ষাট হাজার পুত্র কপিলমুনির রোষানলে ভস্মীভূত হবার পরই সগররাজা তাঁর নির্বাসিত পুত্র অসমঞ্জের ছেলে অংশুমানকে ডেকে যজ্ঞীয় অশ্ব উদ্ধার করে আনার ভার দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৩.১০৭.৩৫-৪৮; (হরি) ৩.৯০.৬২-৭৫]

☐ অংশুমান যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে পিতৃব্যগণের পথ ধরে পাতালে উপস্থিত হলেন। পথে দিক্‌পাল এবং দিগ্‌গজদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁরা অংশুমানকে যজ্ঞাশ্ব ফিরে পাবার আশ্বাস দিলেন, আশীর্বাদও করলেন। তাঁদের কাছে দিকনির্দেশ পেয়ে অংশুমান একসময় সেই জায়গায় পৌঁছালেন যেখানে তাঁর পিতৃব্যরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

ভস্মস্থানটি দেখে অংশুমান অনেক কাঁদলেন। এদিকে ইন্দ্রের মায়ায় হারিয়ে যাওয়া যজ্ঞাশ্বটিও তাঁর চোখে পড়ল। অংশুমান কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে পিতৃব্যদের তর্পণ করার জন্য জল খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও জলাশয় খুঁজে পেলেন না। এই সময় তাঁর পিতৃব্যগণের মাতুল খগাধিপতি সুপর্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সুপর্ণই অংশুমানকে খবর দিলেন যে, তাঁর পিতৃব্যরা কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত হয়েছেন। কোনো সাধারণ জলাশয়ের জলে তর্পণ করলে তাঁদের আত্মার শান্তি হবে না। একমাত্র হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার জলেই তাঁদের তর্পণ বিধেয়। তিনি যদি আপন সলিলে সগর পুত্রদের ভস্মস্থান প্লাবিত করেন তবেই সগর রাজার পুত্রেরা স্বর্গলাভ করবেন।

[রামায়ণ ১.৩৯.৫-১৪; ১.৪০.২৭-৩০;
১.৪১.১-২১]

অন্যমতে অংশুমানের দেখা হয়েছিল স্বয়ং কপিল মুনির সঙ্গেই। মহাভারতের বর্ণনায় পিতামহ সগরের আদেশে অংশুমান দুঃখিত-চিত্তে সেইস্থানে এসে উপস্থিত হলেন, যেখানে তাঁর পিতৃপ্রতিম সগরপুত্রেরা ভূতল খনন করেছিল—

জগাম দুঃখাত্তং দেশং যত্র বৈদারিতা মহী।

অংশুমান সেই পথে সমুদ্রে প্রবেশ করে তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ কপিলকে দেখতে পেলেন এবং দেখতে পেলেন যজ্ঞীয় অশ্বটিকেও। অংশুমান প্রথমে যজ্ঞ সমাপ্তির জন্য অশ্বপ্রার্থনা করলেন

কপিল মুনির কাছে। তারপর পিতৃব্যদের উদ্ধার করার জন্য পবিত্র জল চাইলেন—

স বব্রে তুরগং তত্র প্রথমং যজ্ঞকারণাৎ।
দ্বিতীয়মুদকং বব্রে পিতৃণাং পাবনেচ্ছয়া॥

অংশুমানের বিনতি এবং প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে কপিলমুনিই তাঁকে লোকপাবনী গঙ্গাকে ভস্মস্থানে নিয়ে এসে পিতৃব্যগণের উদ্ধারকার্য করার উপদেশ দেন। অংশুমানের কাছে সমস্ত খবর শুনে অংশুমানকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে সগর গঙ্গানয়নের জন্য তপস্যা করতে গেলেন। অংশুমানও পরিণত বয়সে পুত্র দিলীপকে সিংহাসনে বসিয়ে গঙ্গানয়নের জন্য তপস্যা করতে যান। তবে তিনি গঙ্গানয়ন করতে সফল হননি।

রামায়ণের বিবরণ থেকে জানা যায়, সুপর্ণের উপদেশ অনুসারে অংশুমান পিতামহ সগরের যজ্ঞাশ্বটি নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। সব শুনে সগর দুঃখিত মনে যজ্ঞ সমাধা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ রাজত্বকালে গঙ্গাকে ভূতলে নিয়ে আসার কোনো উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। কালক্রমে অংশুমানের পুত্র দিলীপ তাঁর সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন এবং অংশুমান গঙ্গানয়নের জন্য তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। তপস্যারত অবস্থাতেই একসময় তাঁর মৃত্যু হয়। তবে অন্য মতে, কপিল মুনি নিজেই অংশুমানকে বর দিয়েছিলেন যে তাঁর পৌত্র অর্থাৎ দিলীপের পুত্র ভগীরথই গঙ্গা আনয়ন করতে সমর্থ হবেন। দিলীপ পুত্রকে পিতামহ অংশুমানের এই অভিলাষের কথা জানান।

[মহা (k) ৩.১০৭.৪৯-৫৬; (হরি) ৩.৯০.৭৬-৮৪;
রামায়ণ ১.৪১.২২-২৬; ১.৪২.১-৪;
বৃহদ্ধর্ম পু. (মধ্য) ১৮.১৬-৫৪;
বৃহন্নারদীয় পু. ৮.৭৪.১২১-১৩৭]

একমাত্র মৎস্য পুরাণ থেকে জানা যায় যে, হবিষ্মন্ত পিতৃগণের মানসীকন্যা যশোদার সঙ্গে অংশুমানের বিবাহ হয়েছিল। অংশুমানের পুত্র দিলীপ এই যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৫.১৮]

অংশুমান$_২$ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় জনৈক রাজা অংশুমানকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। যদিও মহাভারতে তাঁর বংশপরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণপর্বে এসে আমরা দেখছি যে, কর্ণবধের পর সঞ্জয় নিহত যোদ্ধাদের তালিকায় পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী জনৈক ভোজরাজ অংশুমানের নামোল্লেখ করেছেন, যিনি দ্রোণের হাতে নিহত হন। এই অংশুমান রাজার বংশ পরিচয় আমরা হরিবংশে পাই। সেখানে তাঁকে ক্রথবংশীয় বলা হয়েছে। রুক্মিণী হরণের আগে পর্যন্ত তিনি ভীষ্মকের ভয়ে ভীষ্মকের অনুগত হয়েই বিদর্ভে বাস করতেন, কিন্তু মহাভারতের ঘটনাক্রম থেকে মনে হয় যে, অংশুমান পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণের পক্ষে এবং সেই সূত্রেই পাণ্ডব শিবিরে যোগ দেন।

ভাগবত পুরাণের অধিক পাঠে আমরা একজন অংশুমানের উল্লেখ পাই যিনি কৃষ্ণের অশ্বমেধ যজ্ঞে যজ্ঞাশ্ব রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মহাভারত এবং হরিবংশে প্রাপ্ত অংশুমান এবং ইনি অভিন্ন ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৯; ৮.৬.১৪-১৫;
(হরি) ১.১৭৯.১১; ৮.৪.১৪;
হরিবংশ পু. ২.৫৯.১২;
ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৮৯.২২নং শ্লোকের
উত্তর পাদটীকায় তৃতীয় শ্লোক দ্র.]

অংশুমান$_৩$ বিশ্বেদেবগণের অন্যতম দেবতা। ঋগ্‌বেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে দাঁড়ায় সমস্ত দেবতা। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন— 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব দেবতা—বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেব বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবগণের পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিক কালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

বিশ্বেদেবগণের মধ্যে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম পালটে যায় এবং সংখ্যাও একেক জায়গায় এক এক রকম। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যেসব নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অংশুমান।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩২; (হরি) ১৩.৭৮.৩২]

অংশুমান$_{৪}$ সূর্যের একটি নাম, তাঁর বিশেষণও বটে। ভগবদ্‌গীতার শ্লোকে বলা হয়েছে 'রবিরংশুমান্'। শ্রীধরস্বামী টীকায় লিখেছেন—প্রকাশক জ্যোতি-সমূহের মধ্যে তিনি অংশুমান্—

জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্
বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্যো'হম্।

[মহা (k) ৬.৩৪.২১; (হরি) ৬.৩৪.২১; ভগবদ্‌গীতা, ১০.২১ (শ্রীধরস্বামী-কৃত টীকা দ্র.)]

অংশুমান$_{৫}$ মহাভারতের এক জায়গায় অংশুমানকে বীরুধ বা লতাসমূহের অধিপতি বলা হয়েছে—বীরুধামংশুমাংশ্চ। তাতে মনে হয় এই 'অংশুমান্' অবশ্যই সোম, যিনি সর্বত্র ওষধি-লতার প্রভু বলে চিহ্নিত—

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।

তাছাড়া বৈদিককালে সোমের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে তার ওষধিগুণের মধ্যে অংশু বা দীপ্তিময়তা একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলেই চিহ্নিত। *[মহা (k) ১২.১২২.৩২; (হরি) ১২.১১৯.৩২; ভগবদ্‌গীতা, ১৫.১৩; দ্র. R. Gordon Wasson; Soma, the Divine Mushroom of Immortality]*

অংশুমান$_{৬}$ চন্দ্রের রথের একটি ঘোড়ার নাম অংশুমান ছিল বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১২৬.৫২]*

অংশুমান$_{৭}$ পুরাকালে কৌশিক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁর সাত পুত্র গোহত্যার পাপে প্রথমে ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তারপর পরবর্তী জন্মে মানস সরোবরে চক্রবাক পক্ষী হয়ে জন্মান। এই সাত চক্রবাকের মধ্যে একটির নাম অংশুমান ছিল বলে জানা যায়। *[মৎস্য পু. ২০.১৮]*

অকপি মন্বন্তরের সংখ্যাক্রমে চতুর্থ তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম এক ঋষির নাম। একমাত্র মৎস্য পুরাণেই অকপি নামটি পাওয়া যায় এবং তা কপি নামক এক স্বজাতীয় ঋষির সঙ্গে। *[মৎস্য পু. ৯.১৫]*

তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের যেসব নাম অন্যান্য পুরাণে আছে, তা অনেক সময়েই মৎস্য পুরাণের সঙ্গে এক রকম নয়। বিশেষত অকপির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য অনেক বেশি উল্লেখ্য এবং তা কপির ক্ষেত্রেও একইরকম। খুব কাছাকাছি বর্ণ-সাযুজ্যে হরিবংশ পুরাণে অকপি হয়েছেন অকপীবান্ (অকপীবৎ) এবং কপি হয়েছেন কপীবান্ (কপিবৎ)।

—কপীবানকপীবাংশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়ো'পরে।

[হরিবংশ পু. ১.৭.২১; ব্রহ্ম পু. ৫.২১]

বিষ্ণুপুরাণের মহাবিশেষজ্ঞ এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব বিষ্ণুপুরাণের তামস মন্বন্তরস্থ সপ্তর্ষিদের নামগুলি আলোচনা করে বলেছেন—এখানে 'চৈত্রো'গ্নির্বনকস্তথা। পীবরশ্চর্ষয়োহ্যেতে' —এই অংশটির মধ্যে 'বনক' এবং 'পীবর'—এই দুটিকে একসঙ্গে করলে যেহেতু 'বনকপীবর'—আসে এবং তাতে হরিবংশ-ধৃত পাঠের একাংশ 'কপী'-শব্দটি যেহেতু চলে আসে, তেমনই বায়ুপুরাণের 'বনপীঠ' পাঠটিও পুরাণ-বক্তার অপভ্রংশতায় প্রমাণিত হয়ে ওঠে।

[বিষ্ণু পু. ১.৩.১৮; বায়ু পু. ৬২.৪১-৪২; দ্র. Vishnu Purana, (H.H.Wilson) vol.3, p. 8.]

The seven Rishis were Jyotirdháman, Pr´ithu, Kávya, Chaitra, Agni, Vanaka, and Pívara[1].

[1] Severally, according to the Váyu, the progeny of Bhr´igu, Kasyapa, Angiras, Pulastya, Atri, Vasisht´ha, and Pulaha. There is considerable variety in some of the names. Thus, the Matsya has Kavi, Pr´ithu, Agni, Akapi, Kapi, Jalpa, Dhimat. The Harivamsa has Kávya, Pr´ithu, Agni, Jahnu, Dhátr´i, Kapivat, Akapivat. For the two last the Váyu reads Gátra and Vanapit´ha. The son of Pulaha is in his place (Vishnu Purana, Vol I., p.155, note I),—Arvarivat or Vanakapivat. Gátra is amongst the sons of Vasisht´ha (Vishnu Purana, Vol.I., p. 155). The Váyu is, therefore, probably, most correct, al-

though our text, in regard to these two denominations, admits of no doubt:

[Vishnu Purana, (H.H.Wilson), Vol. 3, p. 8]

অকম্পন$_{১}$ মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে খশার গর্ভে জাত একটি রাক্ষসের নাম।

[বায়ু পু. ৬৯.৯৯, ১৬৩, ১৬৭]

অকম্পন$_{২}$ হিরণ্যকশিপুর সভায় স্থিত অন্যতম অসুর। *[মৎস্য পু. ১৬১.৮১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৩৬]*

অকম্পন$_{৩}$ রাবণ-ভগিনী শূর্পনখার নাক-কান কাটা গেলে প্রতিশোধ নিতে এলেন জনস্থানবাসী খর-দূষণ। অকম্পন তাঁদেরই অনুচর ছিলেন। রাম-লক্ষ্মণের হাতে তাঁরা মারা গেলে অকম্পন নামে এই রাক্ষস প্রথম রাবণের কাছে এসে খর-দূষণের মৃত্যুসংবাদ দেন। রাম-লক্ষ্মণের শক্তি, ক্ষমতা এবং রূপের পরিচয়ও অকম্পনই প্রথমে রাবণকে জানান। সব শুনে রাম-লক্ষ্মণকে বধ করার জন্য রাবণ জনস্থানে যেতে চাইলে অকম্পন রাম-লক্ষ্মণের অশেষ যুদ্ধক্ষমতা খ্যাপন করে রাবণকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলেন। রামচন্দ্রকে জব্দ করার পরিবর্ত উপায় হিসেবে অকম্পনই প্রথম রাবণকে সুন্দরী সীতাকে হরণ করে নিয়ে আসতে বলেন। রাবণ অকম্পনের কথাই মেনে নিয়ে সীতাকে অপহরণ করার সংকল্প করেন। *[রামায়ণ ৩.৩১.১-৩১]*

পরে লঙ্কায় রাম-রাবণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হলে আশ্বিন মাসের প্রতিপদ তিথিতে রাবণ চতুরঙ্গ সৈন্য-সহযোগে ঘোরতর রাক্ষসদের পাঠান। এই সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন অকম্পন। এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে অকম্পন যুদ্ধে যান, কিন্তু পবননন্দন হনুমানের হাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। *[বৃহদ্ধর্ম পু. ১.২১.৩২-৩৩]*

অকম্পন$_{৪}$ অভিমন্যু আর্জুনি চক্রব্যূহে মৃত্যুবরণ করলে শোকস্তব্ধ যুধিষ্ঠির মহর্ষি ব্যাসের কাছে মৃত্যু-ব্যাপারটা বুঝতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুর সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়েই ব্যাস পুরাকালীন রাজা অকম্পনের কাহিনী বলতে থাকেন। তিনি সত্যযুগের জনৈক রাজা। এক সময় শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁর শক্তিমান পুত্র হরি শত্রুদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। হরি মারা পড়লেন। পুত্রের শোকে আতুর রাজা অকম্পন পুত্রের শ্রাদ্ধাদিকার্য করলেন বটে, কিন্তু দিনে রাতে তাঁর সুখ বলে কিছু রইল না। সর্বদাই তিনি মৃত পুত্রের কথা ভাবেন আর দুঃখ পান। রাজার এই শোকাকীর্ণ অবস্থা দেখে দেবর্ষি নারদ একসময় তাঁর কাছে উপস্থিত হন। রাজা অকম্পন তাঁর কাছে মৃত্যুর উৎপত্তি-রহস্য জানতে চান। নারদ সবিস্তারে তাঁর কাছে মৃত্যুর উৎপত্তি বর্ণনা করেন। পরে শান্তিপর্বে শরশয়ান ভীষ্মের কাছে আবারও যখন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন যুধিষ্ঠির, তখন ভীষ্ম পুনরায় দেবর্ষি নারদকথিত মৃত্যু-প্রজাপতি সংবাদ বর্ণনা করে সত্যযুগীয় রাজা অকম্পনের কাহিনী উল্লেখ করেন।

[মহা (k) ১২.২৫৬.৬-১১; ৭.৫৩.২৬-৫৩; (হরি) ১২.২৫৩.৬-১১; ৭.৪৫.২৬-৫৩]

অকর শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। 'অকর' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত, যিনি কোনো কর্ম করেন না। সাংখ্যদর্শন মতে পরম পুরুষ যেমন 'সাক্ষীচেতা কেবলঃ নির্গুণশ্চ', তেমনি বেদান্তদর্শন মতেও পরব্রহ্মের নিরাকার, নির্গুণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের মতোই নিষ্ক্রিয়তাও অন্যতম গুণ। ফলে, শিবের ব্রহ্মস্বরূপতায় তিনি নির্গুণও বটে, নিষ্ক্রিয়ও বটে। এবং সাংখ্যদর্শনে পরমপুরুষের স্বরূপতায় তিনি চৈতন্যস্বরূপ, সাক্ষীস্বরূপ বটে, কিন্তু তাঁর কোনো কর্তৃত্ব নেই বলে তিনি অকর। হয়তো শিবের 'শব' স্বরূপতার মধ্যেও এই নিষ্ক্রিয়তা বা অকর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান কৃষ্ণ নিজের নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপতা বোঝাতে গিয়েও বলেছেন যে, এই বিশ্বে আমার কোনো কর্তব্য কর্ম নেই—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

[ভগবদ্গীতা ৩.২২]

এই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপতার কারণেই মহাদেবও অকর নামে কীর্তিত।

দ্বিতীয়ত শিবের 'অকর' নামটির পূর্বে উপদেশকরঃ এই শব্দে ইনি জগৎগুরুর মতো যেমন উপদেশ করেন তার পরেই অকর নামটি থাকায় 'উপদেশকরঃ'-এর নঞর্থকতা সূচিত হয়। ফলে এই অর্থও করা যায় যে উপদেশ করার ক্ষেত্রে তিনি মৌন মূকভাবে অবস্থান করেন।

টীকাকার নীলকণ্ঠ উপনিষদ থেকে একটি ক্ষুদ্র আখ্যান উদ্ধার করে বলেছেন যে, বাষ্কলি তাঁর গুরু বাধ্বকে বারংবার প্রশ্ন করার পর তাঁর গুরু

কোনো উত্তর দেননি। এখানে একটি প্রাচীন গাথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, 'এটা বড়োই আশ্চর্য যে, বটবৃক্ষের মূলে বৃদ্ধ শিষ্যরা বসে আছেন, কিন্তু গুরু যুবক। গুরু কোনো কথা বলছেন না, তিনি মৌন, অথচ তাঁর সেই মৌনতাই তাঁর প্রতি প্রশ্নের মীমাংসা করে দিচ্ছে। বাস্কলি এই রহস্য শ্লোক উচ্চারণ করলে তৃতীয়বার প্রশ্নের পর গুরু বললেন—আমি যা বলার বলেছি, কিন্তু তুমি বুঝতে পারনি যে, এই পরমাত্মা নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ স্বামী। এই ভাবনা থেকেই বলা যায় যে, 'অকর' শব্দের অর্থ ক্রিয়াকারীতাহীন, এক শান্ত অবস্থা—মহাদেবকে ব্রহ্মের সেই নিষ্ক্রিয়তার ভাবনা থেকেই অকর বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬৯; (হরি) ১৩.১৬.৬৯]

অকর্কর কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন সর্প। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় এর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৩৫.১৬; (হরি) ১.৩০.১৬]

অকর্ণ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩]

অকর্মক ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পিশাচদের যে ষোলটি গণের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ হল অকর্মক গণ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৭৯]

অকল্মষ তামস মনুর পুত্র। *[মৎস্য পু. ৯.১৭-১৮]*

অকূপার অকূপার শব্দের আভিধানিক অর্থ কূর্ম বা কচ্ছপ। সমুদ্রমন্থনের সময় মন্থনদণ্ড মন্দর-পর্বতের আশ্রয়স্থল হিসেবে যে কূর্মরাজ অবস্থান করছিলেন, তাঁকে অকূপার নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয় বর্ণিত কাহিনীতে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন প্রাণী হিসেবে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে বসবাসকারী অকূপার নামে এক কচ্ছপের উল্লেখ পাই।

[মহা (k) ১.১৮.১১; ৩.১৯৯.৮-১১; (হরি) ১.১৪.১১; ৩.১৬৯.৮-১১]

অকৃতচূড় যে বালকের স্মার্ত বিধিসম্মত মস্তক-মুণ্ডন করা হয়নি তাকে বলা হয় অকৃতচূড়। এই ধরনের বালকের মৃত্যুতে এক রাত্রির অশৌচ বিধান আছে। মুণ্ডিতমস্তক বা কৃতচূড় বালকের মৃত্যুতে তিন রাত্রির অশৌচ। *[মৎস্য পু. ১৮.৩]*

অকৃতব্রণ একজন ঋষি। তাঁর প্রকৃত নাম কী ছিল তা জানা যায় না। ইনি পরশুরামের অন্যতম সহচর এবং প্রিয় শিষ্য ছিলেন। পরশুরামের সঙ্গে বাল্যকালে, প্রথম সাক্ষাতের সময় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, শান্ত নামে জনৈক তপস্বী তাঁর পিতা ছিলেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে আত্মীয় বন্ধুহীন, অনাথ বলে কাতরতা দেখিয়েছেন এবং পরশুরামের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এর থেকে মনে হয় অকৃতব্রণ বাল্যকালেই পিতৃহীন হন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ ছিল না।

পরশুরাম মহাদেবের কাছ থেকে দিব্য অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে এক গুহার মধ্য থেকে আর্তচিৎকার শুনতে পেয়ে পরশুরাম সেই শব্দ অনুসরণ করে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন—একটি বাঘ একটি অসহায় ব্রাহ্মণ বালককে আক্রমণ করেছে। ভীত সেই বালক প্রাণভয়ে চিৎকার করছেন, এতটাই তিনি ভয় পেয়েছেন যে, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাঘের দিকে তাকাতেও পারছেন না। চোখ বন্ধ করে শুধুই অসহায় আর্তনাদ করে চলেছেন। ছেলেটির অবস্থা দেখে পরশুরামের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হল। তিনি তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে বাঘটিকে হত্যা করলেন। বাঘটি অবশ্য এক অভিশপ্ত গন্ধর্ব, পরশুরাম তাকে হত্যা করলে তিনি শাপমুক্ত হয়ে পুনরায় গন্ধর্বরূপ প্রাপ্ত হন। ভীত ব্রাহ্মণ-বালক এতক্ষণে অবশ্য জানতেও পারেননি যে তাঁর বিপদ কেটে গিয়েছে। পরশুরামের অভয়বাণী শুনে চোখ খুলে সম্মুখে বাঘের মৃতদেহ এবং তাঁর প্রাণরক্ষক পরশুরামকে দেখতে পেলেন তিনি। পরশুরাম সস্নেহে তাঁকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন যে, তিনি শান্ত নামে এক মহাতপা মুনির পুত্র, এবং এখন তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন। তারপরেই পরশুরামের পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন—আপনাকেই আমি পিতা-মাতা, বন্ধু এবং গুরু বলে মনে করি—

ত্বমেব মন্যে সকলং পিতা মাতা সুহৃদ্‌গুরুঃ।

বালকটির প্রতি স্নেহবশত পরশুরাম তাঁকে আশ্রয় দিলেন। পরশুরাম রক্ষা করায় বালকটি

বাঘের হাত থেকে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছিলেন তাই তাঁর নতুন নাম হল অকৃতব্রণ, অর্থাৎ যাঁর দেহে ব্রণ বা ক্ষত সৃষ্টি হতে পারেনি—

অকৃতব্রণ এবাসৌ ব্যাঘ্রেন ভুবি পাতিতঃ।
রামেণ রক্ষিতশ্চাভূদ্ যস্মাদ্ ব্যাঘ্রং বিনিঘ্নতা॥
তস্মাত্তদেব নামাস্য বভূব প্রথিতং ভুবি।
বিপ্রপুত্রস্য রাজেন্দ্র তদেতৎ সো'কৃতব্রণঃ॥

এরপর থেকেই অকৃতব্রণ পরশুরামের শিষ্য ও সহচর রূপে তাঁর নিরলস সেবা করে গিয়েছেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২৫.৪৮-৭৭]*

☐ পরশুরাম যখন কার্তবীর্য্যার্জুনের রাজধানী মাহিষ্মতীপুরী আক্রমণ করেন, তখনও অকৃতব্রণ তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩৮.২]

☐ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি বিশিষ্ট পৌরাণিক হিসাবে অকৃতব্রণের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত—এই ছয়জন বিশিষ্ট পৌরাণিক আমার পিতা মহর্ষি লোমহর্ষণের কাছ থেকে ছয়টি পুরাণ সংহিতা একটি একটি করে অধ্যয়ন করেন। উগ্রশ্রবা সৌতি এই ছয়জনের কাছ থেকে একত্রে ছয়টি পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। লোমহর্ষণের ছয় শিষ্যের মধ্যে অকৃতব্রণকে 'কাশ্যপ'-নামেও ডাকা হয়েছে।

[ভাগবত পু.১২.৭.৫-৭; বিষ্ণু পু. ৩.৬.১৭; দ্র. Vishnu Purana, ed. (H.H.Wilson) Vol. 3. p. 64]

☐ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে সমাহূত ঋত্বিকদের অন্যতম। *[ভাগবত পু. ১০.৭৪.৯]*

☐ মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনায় অকৃতব্রণকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। তীর্থযাত্রারত যুধিষ্ঠিরের কাছে তিনি পরশুরামের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১১৫-১১৬ অধ্যায়; (হরি) ৩.৯৬-৯৭ অধ্যায়]

☐ কৃষ্ণ যখন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা করেন তখন পথে নারদসহ অন্যান্য ঋষিগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এঁদের মধ্যে অকৃতব্রণ অন্যতম। *[মহা (গীতা প্রেস) ৫.৮৩.৬৪ এবং ৬৫ নং শ্লোকের মধ্যবর্তী দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ]*

☐ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ভীষ্মমুখে বর্ণিত অম্বার উপাখ্যানে অকৃতব্রণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়। শাল্বরাজের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত অম্বা তপস্বীদের স.ঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের দুর্দশা বর্ণনা করলেন। এই সময় তাঁর মাতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হোত্রবাহন আশ্রয়হীনা দৌহিত্রীকে আশ্রয়দান করলেন এবং তাঁকে তাঁর দুঃখমোচনের জন্য পরশুরামের শরণাপন্ন হবার পরামর্শ দিলেন। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময় পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণ সেই স্থানে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন স্বয়ং পরশুরাম পরদিন সেখানে উপস্থিত হবেন। এরপর অম্বার দুর্দশার কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন অকৃতব্রণ। অম্বার অবস্থার জন্য ভীষ্ম দায়ী না শাল্বরাজ, কিংবা অম্বা কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেন—এ বিষয়ে অকৃতব্রণ অম্বার এবং পরে পরশুরামের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। শেষপর্যন্ত পরশুরামকে তিনি ভীষ্মবধের জন্য প্ররোচিত করে বলেছেন—আপনার শরণাগত এই কন্যাটিকে আপনি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন না। বরং আপনি অন্যায়ী ভীষ্মকে হত্যা করুন।

শরণাগতাং মহাবাহো কন্যাং ন ত্যক্তুমর্হসি।
জহি ভীষ্মং রণে রাম গর্জন্তমসুরং যথা॥

[মহা (k) ৫.১৭৮.৯ (হরি) ৫.১৬৬.৯]

ভীষ্ম ও পরশুরামের যুদ্ধের সময় অকৃতব্রণকে পরশুরামের সারথির ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়—

সারথ্যং কৃতবাংস্তস্য যুযুৎসোরকৃতব্রণঃ।

[মহা (k) ৫.১৭৫.২৬-৪৫, ১৭৬-১৭৯ অধ্যায়; (হরি) ৫.১৬৩.২৬-৪৬, ১৬৪-১৬৯ অধ্যায়]

☐ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পরশুরামের সঙ্গে অকৃতব্রণও এসেছিলেন।

[মহা (k) ১৩.২৬.৮; (হরি) ১৩.২৭.৮]

অকৃতশ্রম একজন ঋষি। দ্বাপর যুগে যেসব ঋষি বানপ্রস্থ ধর্ম পালন করে স্বর্গলাভ করেছিলেন অকৃতশ্রম তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১২.২৪৪.১৭; (হরি) ১২.২৪১.১৭]

অকৃতাশ্ব ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পরম্পরায় সংহতাশ্বের পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.৬৫; মৎস্য পু. ১২.৩৪]

অকৃতি মহাভারতে ইনি অকৃতি এবং আকৃতি এই দুই নামেই চিহ্নিত হয়েছেন। অকৃতি ছিলেন কৃষ্ণের শ্বশুর বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের ভাই। মহাভারতের বিবরণে তাঁকে বীরত্বে পরশুরামের তুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণ জরাসন্ধের অনুগত রাজাদের মধ্যে অকৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। ভীষ্মকের ভাই অকৃতি সুরাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের আগে দিগ্বিজয়ের সময় সহদেব এঁকে পরাস্ত করেছিলেন।

[মহা (k) ২.১৪.২২; ২.৩১.৬১; (হরি) ২.১৪.২২; ২.৩০.৬০]

অকোপ অযোধ্যার একজন মন্ত্রী। ইনি রাজা দশরথের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন।

[রামায়ণ ১.৪.৩]

অক্রিমী যেখানকার লোকেরা বেশিরভাগই দুষ্টমতি এবং শক্তিমান, নিজেদের জমি না থাকলে যারা পরের জমি গ্রহণ করে, যেখানে রাজপ্রিয় ব্যক্তিদের আবাস, সেইরকম গ্রামকে অক্রিমী বলে। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৪৯.৪৯]*

অক্রিয় পুরূরবার পুত্র আয়ুর ঔরসে পাঁচ পুত্র হলেন নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজী, রম্ভ এবং অনেনা। এঁদের মধ্যে চতুর্থ রম্ভের বংশে গম্ভীরের পুত্র অক্রিয়।

[ভাগবত পু. ৯.১৭.১০-১১]

অক্রূর১ অক্রূর বৃষ্ণিবংশের জাতক, কৃষ্ণের জ্ঞাতি সম্বন্ধীদের একজন। বৃষ্ণিবীর বলে তিনি বার বার মহাভারতে চিহ্নিত। মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-পর্বে বৃষ্ণিবংশীয় যেসব বীরেরা এসেছিলেন এবং সেই স্বয়ংবরে দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী রাজা-রাজড়াদের নাম করার সময় পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন অক্রূরের নাম করেছিলেন উদ্ধব এবং সাত্যকির সঙ্গে এক পংক্তিতে। তবে এঁরা সকলেই যে দ্রৌপদীকে বিয়ে করার লোভে এই স্বয়ংবর-সভায় এসেছিলেন, সেটা কিন্তু নয়। অক্রূর, উদ্ধবরা শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টার আসনেই ছিলেন।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৮; (হরি) ১.১৭৯.১৮]

□ সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ-পর্ব শেষ হবার পর বলরামের সঙ্গে অন্যান্য বৃষ্ণি বীরেরাও হস্তিনাপুরে এসেছিলেন অনেক উপঢৌকন নিয়ে। এখানে অক্রূরের উপস্থিতি ঘটেছে যশস্বী বীর, দাতা, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বৃষ্ণিকুলের অন্যতম সেনাপতি হিসেবে—

তততো দানপতির্ধীমান্ আজগাম মহাযশাঃ।
অক্রূরো বৃষ্ণিবীরাণাং সেনাপতিররিন্দমঃ॥

[মহা (k) ১.২২১.২৯; (হরি) ১.২১৪.২৯]

□ বৃষ্ণিবংশীয় শ্বফল্কের ঔরসে কাশীরাজপুত্রী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক যেখানে থাকতেন, সেই দেশে কখনো অনাবৃষ্টি, মরক ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হত না। পিতার এই গুণ অক্রূরের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। যে দেশে তাঁর উপস্থিতি ঘটত, সেখানে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটত না। অক্রূরের জননী গান্দিনীও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। জন্মপূর্বকাল থেকে জীবনের প্রতিটি দিনে তিনি ব্রাহ্মণ-সজ্জনদের একটি করে গাভী দান করতেন। অক্রূরের পরিচয় দেবার সময় বলা হয়েছে—তিনি এইরকম গুণী পিতা-মাতার ছেলে—

তস্যৈবং গুণমিথুনাদুৎপত্তিঃ।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৩.৫৬]

□ অক্রূর যে পিতা-মাতার গুণ নিয়েই জন্মেছিলেন সেটা হরিবংশে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তাঁর জন্মকালীন বিশেষণগুলিতে। বলা হয়েছে—শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর জন্মেছিলেন। তিনি দাতা, অনেক যজ্ঞ করেছেন, তিনি ধীর, বিদ্বান, অতিথিবৎসল এবং বহুদক্ষিণা দিয়েছেন সবসময়—

দাতা যজ্বা চ ধীরশ্চ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ।
অক্রূরঃ সুষুবে তস্মাচ্ছ্বফল্কাদ্ ভূরিদক্ষিণঃ॥

[হরিবংশ পু. ১.৩৪.১১]

□ অক্রূরের সঙ্গে উগ্রসেনের কন্যা উগ্রসেনার বিয়ে হয় এবং সুগাত্রী (সুন্দরাঙ্গী) উগ্রসেনার গর্ভে অক্রূরের প্রসেন এবং উপদেব নামে দুটি পুত্র হয়—

অক্রূরেণোগ্রসেনায়াং সুগাত্র্যাং কুরুনন্দন।

বিষ্ণু এবং ভাগবত পুরাণ-মতে অক্রূরের এই দুই পুত্রের নাম দেববান্ এবং উপদেব—

দেববান্ উপদেবশ্চ অক্রূরপুত্রৌ।

[হরিবংশ পু. ১.৩৪.১৪; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.২; ভাগবত পু. ৯.২৪.১৭-১৮]

মহাভারতের সভাপর্বে রাজসূয় যজ্ঞের আগে জরাসন্ধ-বধের প্রয়োজনে কৃষ্ণ যখন অক্রূরের কথা বলেন, তখন তাঁর বিবাহের ব্যাপারে সামান্য ভ্রান্তি তৈরি হয়। কৃষ্ণ বলেছিলেন—কংসের অত্যাচার যখন বেড়ে উঠল, তখন মথুরার ভোজ-

রাজন্য-বৃদ্ধেরা আমাদের জ্ঞাতিগুষ্টির মুক্তি চেয়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছিল, তখন অক্রূরের সঙ্গে আমি আহুকের মেয়ে সুতনুর বিয়ে দিলাম—

দত্ত্বাক্রূরায় সুতনুং তামাহুকসুতাং তদা।

[মহা (k) ২.১৪.৩৩; (হরি) ২.১৪.৩৩]

সমস্যা হল, আহুক উগ্রসেনের বাবা, কংসের তথাকথিত পিতামহ। কৃষ্ণের মাতা দেবকীর সম্বন্ধে আহুক হলেন কৃষ্ণের প্রমাতামহ। ফলত মাতামহীর সমান এক বৃদ্ধা রমণীকে কৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে বিবাহ দিলেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে মহাভারতে যাকে আহুকের মেয়ে সুতনু বলা হয়েছে, তিনি আহুকের ঘরের মেয়ে এইমাত্র, আর মহাভারত-পুরাণে ছেলেকে পিতার নামে বা বংশপরিচয়ে সম্বোধন করা হচ্ছে, এমন উদাহরণ অনেক আছে। অতএব তিনি উগ্রসেনেরই মেয়ে। বিষ্ণু পুরাণে পরিষ্কার লেখা আছে—উগ্রসেনের নয়টি ছেলে এবং পাঁচটি মেয়ে, তাঁদের মধ্যে সুতনু একজন। অতএব হরিবংশের 'সুগাত্রী' মহাভারতের 'সুতনু' এবং বিষ্ণু পুরাণের 'সুতনু'—এঁরা একই লোক এবং সুতনু উগ্রসেনেরই মেয়ে, অক্রূরের সঙ্গে সুতনুরই বিয়ে হয়েছিল।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৫; হরিবংশ পু. ১.৩৪.১৪]

মহাভারত-পুরাণে অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্কে নানান ঘাত-প্রতিঘাত তথা টানা-পোরেন আছে। এই সম্পর্ক বোঝানোর আগে যেটা বলা দরকার, সেটা হল—মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে রাজতন্ত্র ছিল না। এখানে কুল-প্রধানদের সহমতে একটা 'অলিগার্কিক্যাল' শাসন চলত, যেটাকে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে সংঘ। কৌটিল্য 'বৃষ্ণিসংঘ'-শব্দটিই উল্লেখ করেছেন—এটাকে বৃষ্ণিদের corporation বোঝানোর জন্য। আর মহাভারতে গণবৃত্তের কথা বলার সময় কৃষ্ণ-অক্রূর-উগ্রসেনদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে সংঘবৃত্তই চলত এবং সেটা আরও পরিষ্কার হয় রাজসূয়-পর্বে কৃষ্ণের কথায়। তিনি বলেছেন—আমাদের আঠেরোটা কুল আছে—কুলৈরষ্টাদশাবরৈঃ।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, ১.৬.১০;
মহা (k) ২.১৪.৩৫; (হরি) ২.১৪.৩৪]

মহাভারত-হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণে অক্রূরের অবস্থান দেখে তাঁকেও যদু-অন্ধক-কুকুর-বৃষ্ণিসংঘের অন্যতম কুলপ্রধান বলে মনে হয়। মগধরাজ জরাসন্ধের জামাই মথুরাধিপতি কংস যখন শ্বশুরের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠেন, তখন মথুরা-শূরসেন রাজ্যের সংঘশাসন কিংবা গণবৃত্তের মধ্যে এককেন্দ্রিকতা দেখা দেয়। তাতে যদু-বৃষ্ণি-সংঘের অনেকেই কংসের অনুবৃত্তি ত্যাগ করলেও অক্রূর কংসের অনুগত ছিলেন বলেই মনে হয়। তবে বাইরে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করার জন্যে কংসের প্রতি আনুগত্য দেখালেও অক্রূর খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অন্যান্য কুলপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন বলেই মনে হয়। কেননা যে-সময়ে বসুদেবের নির্বাসিত দুই পুত্র কৃষ্ণ এবং বলরামকে কৌশলে হত্যা করার জন্য ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করলেন কংস, তখন অক্রূরকে ডেকে তিনি বলেছিলেন—যদি তুমি বসুদেবের কানভাঙানি না শুনে থাকো, তাহলে আমার একটা প্রিয়কার্য তোমাকে করে দিতে হবে—

যদি বা নোপজপ্তো'সি বসুদেবেন সুব্রত।
অক্রূর কুরু মে প্রীতিমেতাং পরম দুর্লভাম্॥

[হরিবংশ পু. ২.২২.৯৮]

কংস অক্রূরকে পাঠালেন ব্রজভূমিতে কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে আসার জন্য। উদ্দেশ্য—সেই আয়োজিত ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণ-বলরামকে মেরে ফেলা। ভাগবত পুরাণে অবশ্য অক্রূরের এই ব্রজযাত্রার একটা মোহময়ী বর্ণনা আছে এবং সেখানে তাঁকে খুবই কৃষ্ণানুরক্ত ভক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে কংসের কথা শুনলেই বোঝা যায় যে, অক্রূরকে কংস যতটা বিশ্বস্ত বলে মনে করছেন, অন্যদের ততটা নয়। আবার পরের দিন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে বলে অক্রূরের মধ্যে হর্ষও লক্ষ্য করছি আমরা।

[বিষ্ণু পু. ৫.১৫.১৩-২৩]

কংসের আদেশ পাবার পর রাত্রি কাটতেই অক্রূর রথ নিয়ে নন্দব্রজের উদ্দেশে রওনা হলেন এবং সারা পথ তিনি কৃষ্ণের ভগবত্তায় আপ্লুত হয়ে মনুষ্য মূর্তিতে তাঁর সঙ্গে কীভাবে অভিবাদন-আলিঙ্গনে ধন্য হবেন—সেই কথা ভাবতে ভাবতে গোকুলে পৌঁছোলেন সন্ধ্যাবেলায়। কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে তাঁর রাত্রিতেই দেখা হল আতিথ্যের প্রক্রিয়ায়। পরের দিন কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে যাবার কথায় কংসের অসদুদ্দেশ্যের কথা সমস্তটাই অক্রূর জানালেন

কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ সঙ্গে-সঙ্গেই অক্রূরকে আশ্বস্ত করে কংস-বধের ব্যাপারে তাঁদের 'নিশ্চয়' জানালেন। পরবর্তী তিনরাত্রির মধ্যেই কংসবধ হয়ে যাবে—অক্রূরকে এই নিশ্চয়তা দিয়ে ব্রজভূমি থেকে পরের দিনই চলে যেতে হবে—এই খবরটা কংসের আদেশ-ঘোষণা হিসেবে প্রচার করে দিতে বললেন কৃষ্ণ।

[বিষ্ণু পু. ৫.১৭ অধ্যায়; ৫.১৮.১-১১;
ভাগবত পু. ১০.৩৮ অধ্যায়; ১০.৩৯.১-১২]

☐ কৃষ্ণের মথুরা-গমনের সংবাদ সবচেয়ে আকুল করল ব্রজরমণীদের হৃদয়। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের এতকালের সম্পর্ক এবং তাঁদের প্রেম-রোমাঞ্চের পূর্ব স্মৃতি এক সময় বিলাপে পরিণত হল। সেই হৃদয়-বিদারী বিলাপের বশেই 'অক্রূর' মহাশয়কে তাঁরা 'ক্রূর' বলে অভিশাপ দিলেন। অর্থাৎ কিনা যে-অক্রূর তাঁদের প্রাণপ্রিয় নায়কের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছেন, তাঁর ক্রূরতার নিরিখে অক্রূর নাম লাভের যোগ্যতাই নেই—

মৈতদ্‌বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূদ্
অক্রূর ইত্যেতদতীব দারুণঃ।

[ভাগবত পু. ১০.৩৯.১৩-৩৪;
বিষ্ণু পু. ৫.১৮.১২-৩২]

কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে অক্রূরের রথ ব্রজভূমি পেরিয়ে গেল। বেলা দ্বি-প্রহরে সবাই যমুনার তীরে এসে স্নান করে নেবেন বলে ঠিক করলেন। অক্রূর যমুনায় ডুব দিয়ে যখনই ব্রহ্ম ধ্যানে নিমগ্ন হলেন, সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণ-বলরামকে দেখতে পেলেন নারায়ণ-স্বরূপে। মুনি-ঋষি সেবিত নারায়ণ-মূর্তির মধ্যে কৃষ্ণ-বলরামের একাত্মতা দেখে একবার তিনি তীরে এসে কৃষ্ণ-বলরামকে দেখে যাচ্ছেন, আর একবার নদীর জলে ডুবে পুনরায় সেই নারায়ণ-মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর এই আশ্চর্য-দর্শন তাঁর হৃদয়ের মধ্যে কৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত করল। যদিও কৃষ্ণকে এই আশ্চর্য-দর্শনের কথা জানালে তিনি অক্রূরকে একেবারেই এড়িয়ে গেলেন।

[বিষ্ণু পু. ৫.১৮.৩৩-৫৮; ৫.১৯.১-৮;
ভাগবত পু. ১০.৩৯.৪০-৫৭; ১০-৪০ অধ্যায়;
১০.৪১.১-৫]

☐ অক্রূর বায়ুবেগে রথ চালিয়ে মথুরায় এসে পৌঁছোলেন সন্ধ্যাবেলায়। রাজমার্গে কৃষ্ণ-বলরামকে রেখে তাঁদের অনুমত্যানুসারে ঘরে ফিরে গেছেন অক্রূর, বিশেষত মথুরাপতি কংসকেও কৃষ্ণের আগমন-সংবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল তাঁর।

[ভাগবত পু. ১.৪১.৬-১৮; ৪.১৯.৯-১২]

☐ কৃষ্ণ-বলরামকে মারবার জন্য কংস যে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে দর্শক হিসেবে অক্রূর কৃষ্ণপিতা বসুদেবের সঙ্গে মঞ্চে বসেছিলেন। *[বিষ্ণু পু. ৫.২০.২৭]*

☐ কংসবধের পর কৃষ্ণ মথুরা থেকে উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলেন ব্রজভূমিতে। ব্রজের গোপীকূল উদ্ধবকে কিন্তু অক্রূর বলেই সন্দেহ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৪৬.৪৮]

☐ ভাগবত পুরাণে অক্রূর কিন্তু কৃষ্ণের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভক্ত। কৃষ্ণ তাঁকে গুরু বলে সম্বোধন করেছেন এবং যথেষ্ট সম্মান দিয়ে তাঁকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়েছেন দুর্গত পাণ্ডবদের খবর নেবার জন্য। অক্রূর কৃষ্ণের আদেশ মেনে হস্তিনায় গেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বিদুর, ভীষ্ম, পৃথা—এদের সবার সঙ্গে কথা বলে পাণ্ডবদের সমস্ত সংবাদ কৃষ্ণকে জানিয়েছেন।

[ভাগবত পু. ১০.৪৮.২৮-৩৫; ১০.৪৯ অধ্যায়]

☐ ভাগবত পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণে অক্রূরের প্রতি যে বিশ্বাস এবং মর্য্যাদা দেখা গেছে, সেটা হয়তো সাময়িক ছিল। বিশেষত অক্রূরের এই ভব্য চরিত্র মহাভারত এবং হরিবংশের বক্তব্যের সঙ্গে মেলে না। শেষোক্ত গ্রন্থদুটিতে অক্রূরকে আমরা অন্যতম কুলপ্রধানের ভূমিকায় দেখতে পাই এবং কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতা এবং দূষণ-দূষ্যভাব কৃষ্ণের জীবনের শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। অবশ্য কৃষ্ণের সঙ্গে অক্রূরের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার প্রধান বিষয় ছিল স্যমন্তক মণি।

☐ মহাভারতের শান্তিপর্বে কৃষ্ণ সংঘরাষ্ট্রের একজন প্রধান হিসেবে তাঁর দুঃখ যন্ত্রণাগুলি জানাচ্ছিলেন দেবর্ষি নারদকে। এই দুঃখ-যন্ত্রণার অন্যতম কারণ যে অক্রূর, সে-কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণ অনেক কথার মধ্যে এটাও জানিয়েছেন—অক্রূর বলবে—কৃষ্ণ আহুকের পক্ষ নিয়েছে, সেইজন্য আমাকে দেখতে পারে না। আর আহুক বলবে—কৃষ্ণ অক্রূরের পক্ষ নিয়েছে, সেইজন্য আমায় দেখতে পারে না। এদের দুর্বাক্যের জ্বালা আমার মনের মধ্যে ধিকি-ধিকি জ্বলছে। আহুক আর অক্রূরের এই চিরকালীন ঝগড়ায় যে-

কোনো একটি পক্ষ অবলম্বন করা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়; ফলে একজন মায়ের যদি দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী জুয়াড়ী ছেলে হয়, তাহলে মা যেমন দুইজনেরই জয়াকাঙ্ক্ষা করেন। তেমনই আমিও একজনের জয় কামনা করি এবং অন্যজনের অপরাজয় কামনা করি—

একস্য জয়মাশংসে অপরস্যাপরাজয়ম্।

এখানে আহুক বলতে মথুরার রাজা-উপাধিধারী উগ্রসেনকে বোঝাচ্ছে। নারদ কৃষ্ণের কথা শুনে তাঁকে বলেছিলেন—অক্রূর ইত্যাদি মানুষের সঙ্গে আপনার যে এই ভেদ উপস্থিত হয়েছে—এটা আপনার পূর্ব-কর্মের ফল—আপৎ কৃচ্ছ্রা স্বকর্মজা।

[মহা (k) ১২.৮১.১০-১৪;
(হরি) ১২.৭৯.১০-১৪]

☐ নারদ-কথিত কৃষ্ণের এই স্বকর্মের নিদান আছে স্যমন্তক মণির কাহিনীতে। আবার এই স্যমন্তক মণির সঙ্গে জড়িত চরিত্রগুলি হলেন কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামা এবং অক্রূর।

সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ সূর্যের উপাসক ছিলেন এবং সেই সূত্রে সূর্য ছিলেন তাঁর সখার মতো। সূর্যের কাছ থেকেই তিনি স্যমন্তক মণির উপহার পেয়েছিলেন। এই মণিরত্নের প্রভাব ছিল অলৌকিক। প্রতিদিন এই মণি আট ভার সুবর্ণ প্রসব করত এবং এই মণির প্রভাবে রাজ্যে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং অন্যান্য রোগ-মহামারীও হত না। বিষ্ণু পুরাণ জানিয়েছে—মণিটি দেখার পর কৃষ্ণ যদি মণিটি কোনো কারণবশত, বিশেষত রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই চেয়ে বসেন, সেই ভয়ে সত্রাজিৎ তাঁর ছোটো ভাই প্রসেনের কাছে মণিটি রেখে দিলেন। হরিবংশের মতে মণিটি একবার চেয়েও ফেলেছিলেন কৃষ্ণ। যাই হোক, প্রসেন এই স্যমন্তক মণি গলায় পরে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন; হয়তো বা মৃগয়ার নাম করে মণিটি তিনি অন্য কোথাও রেখে আসতে গিয়েছিলেন। বনেই আততায়ী এক সিংহের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু এই মৃত্যুকে কৃষ্ণের জ্ঞাতিগুষ্টি বৃষ্ণি-অন্ধক-যদুবংশীয় লোকেরা ভাল চোখে দেখেননি। তাঁরা কৃষ্ণকেই সন্দেহ করতে থাকেন।

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার তাগিদে কৃষ্ণ স্যমন্তক মণির অন্বেষণে বেড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত আর্যেতর জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করে মণি ফিরিয়ে আনেন দ্বারকায় এবং মণিটি প্রত্যর্পণ করেন মণির আসল মালিক সত্রাজিতের হাতে।

[হরিবংশ পু. ১.৩৮.১৩-২৩, ৩০-৩৬;
বিষ্ণু পু. ৪.১৩.১৬-২২; ব্রহ্ম পু. ১৬.২৯-৩৬]

☐ স্যমন্তক মণির ঘটনার মধ্যে মহামতি অক্রূরের নাটকীয় প্রবেশ ঘটেছে এই সময় থেকেই। একাধিক পুরাণের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে—সত্রাজিতের মেয়ে অনিন্দ্যসুন্দরী সত্যভামাকে পছন্দ করতেন অনেকেই এবং তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অক্রূর। আর দু-জন ছিলেন কৃতবর্মা এবং শতধন্বা, এঁরা দুজনে ছিলেন সহোদর ভাই। *[বিষ্ণু পু. ৪.১৩.৩৫;*
ব্রহ্মা পু. ১৭.২; হরিবংশ পু. ১.৩৯.২]

☐ সত্রাজিৎ কৃষ্ণের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মণিটি পাবার পর কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সুন্দরী সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে সম্প্রদান করেন। কিন্তু অক্রূর এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, কেননা সত্যভামাকে লাভ করার জন্য তাঁর যেমন লোভ ছিল, তেমনই লোভ ছিল স্যমন্তক মণির ওপর। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সত্রাজিতের ওপর। সত্যভামার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তাঁকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব মনে করেই অন্তত স্যমন্তক-মণি যাতে তাঁর অধিকারে আসে সেই বুদ্ধিতে অক্রূর গিয়ে ধরলেন সত্যভামার অন্যতম পূর্বপ্রণয়ী শতধন্বাকে। তাঁকে অক্রূর বললেন—আমাদের সবাইকে অবহেলা করে কৃষ্ণের হাতে সত্যভামাকে তুলে দিয়েছেন সত্রাজিৎ, অতএব তাঁর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আর সত্যভামাকে যখন পাওয়াই গেল না, তখন সত্রাজিৎকে হত্যা করে মহারত্ন স্যমন্তক ছিনিয়ে নিতে বাধা কোথায়? শতধন্বা! তুমিই কেন এই কাজটা করছো না—

ঘাতয়িত্বৈনং তন্মহারত্নং ত্বয়া কিং ন গৃহ্যতে?

কৃষ্ণ যদি এখানে সমস্যা তৈরি করেন, তাহলে আমি এবং কৃতবর্মা তোমাকে সাহায্য করবো।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৩.৩৫]

☐ সত্রাজিৎকে হত্যা করার সুযোগও এসে গেল খুব তাড়াতাড়ি। সমসাময়িক একটি ঘটনায় পাণ্ডবরা তখন দুর্যোধনের চক্রান্তে বারণাবতে ছিলেন। বারণাবতে পুরোচনের কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে পাণ্ডবরা বিদুরের পরামর্শে রক্ষা পেয়ে বেরিয়ে গেছেন নিজেরাই জতুগৃহে আগুন দিয়ে।

কিন্তু লোকমধ্যে যেহেতু এটাই প্রচার হয়েছিল যে, জতুগৃহের আগুনে কুন্তী-সহ পাঁচ পাণ্ডবের মৃত্যু হয়েছে, তাই কৃষ্ণ আত্মীয়কৃত্য করার জন্য দ্রুত বারণাবতে এলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় নেই, এই তো সময়—তখন সুযোগ বুঝে শতধন্বা নিদ্রিত অবস্থায় সত্রাজিৎকে হত্যা করে স্যমন্তক মণি হরণ করলেন।

সত্যভামার কাছে সত্রাজিতের নৃশংস হত্যা এবং স্যমন্তক মণির হরণ-বিবরণ শুনে কৃষ্ণ শতধন্বাকে মেরেই ফেলবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। শতধন্বা কৃষ্ণের এই উদ্যোগের কথা শুনে ভয়ভীত অবস্থায় প্রথমে দাদা কৃতবর্মার কাছে গেলেন। তিনি কৃষ্ণের ভয়ে কোনো সাহায্য করতে অস্বীকৃত হলে শতধন্বা অক্রূরের কাছে গেলেন এবং অক্রূরও একইভাবে কৃষ্ণের বলশালিতার ব্যাপারে অত্যন্ত সম্ভ্রম দেখিয়ে সাহায্যের সমস্ত অঙ্গীকার অস্বীকার করলেন এবং শতধন্বাকে সাহায্য করার কোনো চেষ্টাই দেখালেন না। প্রত্যাখ্যাত শতধন্বা মরণ নিশ্চিত জেনে অসামান্য সরলতায় অক্রূরকে বললেন—আমাকে বাঁচানো যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তাহলে এই স্যমন্তক মণিটি অন্তত আপনার কাছে রাখুন। অক্রূর বললেন—মণিটি নিতে পারি আমি, কিন্তু তুমি কথা দাও যে মরে গেলেও তুমি এই মণির কথা কাউকে জানাবে না। শতধন্বা কথা দিলেন এবং স্যমন্তক মণি চলে এল অক্রূরের হাতে।

কৃষ্ণ পলায়মান শতধন্বাকে পূর্বপ্রতিজ্ঞামত বধ করলেন বটে, কিন্তু শতধন্বার কাছে স্যমন্তক মণি পেলেন না। এই ঘটনায় দাদা বলরাম পর্যন্ত কৃষ্ণের ওপর ক্ষুব্ধ হলেন, এমনকী কৃষ্ণের 'চোর' অপবাদও রটেছিল এই সময়। কিন্তু কৃষ্ণের কিছুই করার ছিল না এখানে।

এদিকে স্যমন্তক মণি নিয়ে অক্রূর কিন্তু খুব শান্তিতে ছিলেন না। স্যমন্তক যেহেতু প্রত্যহ আট ভার সোনা প্রসব করত, তাই সোনা নিয়ে অক্রূরের দুর্ভাবনা চরমে উঠল। তিনি সেই সোনা দিয়ে অজস্র অলঙ্কার তৈরি করে আভূষিতও হতে পারছেন না, আবার সোনা ভাঙিয়ে অর্থব্যয়ও করতে পারছেন না। ফলে চারদিক চিন্তা করে অক্রূর বহুদক্ষিণাযুক্ত বহুতর যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন। বহু বৎসর ধরে এই যজ্ঞ চলছিল এবং যজ্ঞকারী হিসেবে অক্রূর এতটাই বিখ্যাত হয়ে গেলেন যে, তার যজ্ঞগুলি 'অক্রূর-যজ্ঞ' নামে বিখ্যাত হয়ে গেল।

পর পর 'ভূরিদক্ষিণ' এইসব যজ্ঞ করতে প্রচুর অর্থ লাগে বলেই কৃষ্ণ কিন্তু অনুমানে বুঝতে পারছিলেন যে, স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছেই আছে। তিনি এটাও বুঝতে পারছিলেন যে, এই যজ্ঞ করার আরো একটা প্রয়োজন অক্রূরের আছে। সেটা হল—যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারটা শাস্ত্রীয় নিষেধের পর্যায়ে পড়ে। সেটা চরম অধর্ম বলে গণ্য হত। অক্রূর এটা বুঝেই নিয়েছিলেন যে, কৃষ্ণ এই অবস্থায় তাঁকে কিছু করতে পারবেন না। এদিকে স্যমন্তক মণির প্রভাবে দ্বারকায় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, রোগ-ভোগ-মহামারী কিছুই নেই। সব ভাল চলছে। এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল—অক্রূরপক্ষের ভোজ-রাজন্যেরা সাত্বতবংশের এক অধস্তন পুরুষ শত্রুঘ্নকে মেরে ফেলল। অক্রূর এই ঘটনায় ভয় পেলেন এবং দ্বারকা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। অক্রূরের পলায়নের দিন থেকেই দ্বারকায় অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি এবং মরক আরম্ভ হল। দ্বারকায় তখন নানা আলোচনা আরম্ভ হল এবং রাজসভায় এই কথা উঠতেই এক বৃদ্ধ অক্রূরের বাবা শ্বফল্কের উদাহরণ দিয়ে বললেন—তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে কখনোই কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হত না। তাঁর ছেলে অক্রূরের এই গুণ আছে, অতএব তাঁকে দ্বারকাপুরীতে ফিরিয়ে আনা দরকার।

কৃষ্ণ তখন যাদব-প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে অক্রূরকে অভয় দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন দ্বারকায়। অক্রূর দ্বারকায় ফেরামাত্রই সেখানকার সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ হয়ে গেল। কৃষ্ণ কিন্তু এটা বিশ্বাস করলেন না যে, পিতা শ্বফল্কের তপস্যার গুণ অক্রূরের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। বরঞ্চ স্যমন্তক-মণির জন্যই যে, ওই সব প্রাকৃতিক সুক্রিয়া ঘটেছে এবং সেই স্যমন্তক যে অবশ্যই অক্রূরের কাছেই আছে—এ ব্যাপারে কৃষ্ণ প্রায় নিশ্চিত হয়ে সভা ডাকলেন যাদব-বৃষ্ণি-অন্ধক ইত্যাদি সংঘপ্রধানদের। সবার সামনেই কৃষ্ণ অক্রূরকে নিশ্চয়-বোধক প্রত্যয়ে জানিয়ে বললেন—শতধন্বা মৃত্যুর আগে আপনার হাতেই

স্যমন্তক মণি দিয়ে গেছে। এই স্যমন্তক মণি আপনার কাছে থাকায় এই রাজ্যের মহান উপকার হচ্ছে, তাতে আমরাও সেই মণিরত্নের প্রসাদ ভোগ করছি। এই মণি আপনার কাছেই থাকুক, তাতে আপত্তি নেই কারো। কিন্তু মণিটি একবার আপনি দেখান সবাইকে। কারণ, আমার দাদা বলরাম পর্যন্ত আমাকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করেন।

স্পষ্টতই কৃষ্ণ নিজের অপবাদ ঘোচাতে চাইলেন। কিন্তু অক্রূর প্রথমত খুব বিব্রত হলেন, যদিও এটা তিনি বুঝতেই পারলেন যে, তাঁর সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। তিনি স্বীকার করলেন যে, শতধন্বা তাঁকে মণি দিয়েছেন। কিন্তু আজ দিই, কাল দিই করে তাঁর পক্ষে মণিটি আর দেওয়া হয়নি। অক্রূর বললেন—মণিটি নিজের কাছে রেখেছি বলে আমার ক্লেশ কম হয়নি। এবার আপনি নিজেই এই মণিটি গ্রহণ করুন। অথবা আপনার ইচ্ছে হলে যাকে মনে হয় এই মণিটি দিয়ে দিন। অক্রূর এবার নিজের অধমাঙ্গের বস্ত্রখণ্ড থেকে মণিটি বার করে সকলের সামনে রাখলেন। কৃষ্ণ অবশ্য সকলের গুণদোষ বিচার করে স্যমন্তক মণিটি শেষ পর্যন্ত অক্রূরের হাতেই তুলে দিলেন এবং অক্রূর সেই মণি নিজের গলায় পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে স্যমন্তক মণির প্রভাবে অক্রূরকে দেখতে লাগল ঠিক সূর্যের মতো। *[বিষ্ণু পু. ৪.১৩.৭০; ব্রহ্ম পু. ১৭.৬-৪০; হরিবংশ পু. ১.৩৯.৬-৪০; ভাগবত পু. ১০.৫৭.১-৪০]*

স্যমন্তক-সত্যভামার সঙ্গে অক্রূরের সংশ্লিষ্ট ঘটনা মহাভারতের কুরু-পাণ্ডব-কাহিনীর কোন স্থান পর্যন্ত প্রসারিত, তা পুরোপুরি বোঝা যায় না বটে, কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থে ময় নির্মিত যুধিষ্ঠিরের নতুন রাজধানীতে আমরা যেমন অক্রূরকে উপস্থিত থাকতে দেখেছি, তেমনই তাঁকে আমরা বিরাট পর্বে অভিমন্যুর বিবাহ-কালেও বিরাট-নগরের উপনগরী উপপ্লব্যে উপস্থিত দেখছি অক্রূরকে।

[মহা (k) ২.৪.৩০; ৪.৭২.২২; (হরি) ২.৪.১০ শ্লোকের উত্তর পাদটীকায় ১০নং শ্লোক; অভিমন্যুর বিবাহকালে অক্রূরের আগমন সংবাদ হরিদাসের সংস্করণে নেই]

☐ মহাভারতের মৌষলপর্বে কৃষ্ণের ভাই এবং পুত্রদের অসভ্যতায় যখন যদু-বৃষ্ণিদের পরস্পর কলহে মৃত্যু আরম্ভ হল, তখন খবর পেয়ে অর্জুন আসেন সেখানে। কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসের কারণ বলার সময় বলেছেন—আমি সাত্যকি, কৃতবর্মা কিংবা অক্রূরকে এই ধ্বংসের ব্যাপারে দায়ী মনে করি না, বরঞ্চ ঋষির অভিশাপই এই ধ্বংসের কারণ। মৌষলপর্বে পরস্পর হানাহানি করে যদু-বৃষ্ণিরা অনেকেই ধ্বংস হলেও অক্রূর প্রায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। সমস্ত ধ্বংসের খবর কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করেন কৃষ্ণের সারথি দারুক এবং বভ্রু অক্রূর। কৃষ্ণ দারুককে বললেন অর্জুনকে খবর দিতে, আর অক্রূরকে বললেন দ্বারকায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীদের রক্ষা করতে—যাতে দস্যুরা তাঁদের হরণ না করে। কিন্তু কৃষ্ণের আদেশ-মত খানিক দূর একা-একা এগোতেই একজন অনামা ব্যাধের মৌষল তৃণের আঘাতে অক্রূর মারা যান। পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণের স্ত্রীদের অনেককে এবং অক্রূরের স্ত্রীদের অর্জুন নিয়ে যান ইন্দ্রপ্রস্থে। ইন্দ্রপ্রস্থে কৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে প্রতিষ্ঠা করেন রাজা হিসেবে। বজ্র অক্রূরের স্ত্রীদের ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাস করার জন্য বহু অনুরোধ করেন এবং তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করলেও তাঁরা তপস্যা করার জন্য চলে যান।

[মহা (k) ১৬.৬.১০; ১৬.৪.৪-৫;১৬.৭.৭২; (হরি) ১৬.৬.১০; ১৬.৪.৪-৫; ১৬.৭.৮৩]

☐ স্বর্গারোহণ-পর্বে অক্রূর অন্যান্য বৃষ্ণি-অন্ধক প্রধানদের সঙ্গে পূর্বস্বরূপ বৈশ্বেদেবগণের সঙ্গে মিলে গেছেন।

[মহা (k) ১৮.৫.১৬-১৮; (হরি) ১৮.৫.১৫-১৭]

অক্রূর$_2$ পুরাণোক্ত তীর্থনাম। সুধন বণিক এবং এক ব্রহ্মরাক্ষসের উপাখ্যানের মাধ্যমে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। *[বরাহ পু. ১৪৫.৪-৬৮]*

মথুরা নগরীতে অবস্থিত বিভিন্ন তীর্থের প্রসঙ্গে এই তীর্থের নাম উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় মথুরার নিকটে এই তীর্থ। মথুরা-বৃন্দাবনের মাঝামাঝি জায়গায় এখনও অক্রূর নামে একটি গ্রাম আছে। শোনা যায়, এইখানেই অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম দেখা হয়। এই তীর্থস্থানের অধিদেবতার নাম গোপীনাথ।

[HPAI (Arya) p. 80-81]

অক্রূর$_3$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৬]

অক্রূর$_৪$ মহাসেন মূর্তি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৪৪.৫০]

অক্রূর$_৫$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। ক্রৌর্য্য বা ক্রূরতা মানব মনের নানা ধর্মের মধ্যে একটি। ক্রোধ অভিনিবিষ্ট হলে তার থেকে ক্রূরতা জন্ম নেয়। ক্রোধ মানব চরিত্রের প্রধান ছয়টি রিপুর মধ্যে অন্যতম। ভগবদ্‌গীতায় ক্রোধের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিষয় চিন্তা করতে করতে মানুষ প্রথমে তার প্রতি আসক্ত হতে থাকে, আসক্তি থেকে কাম এবং কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি হয়—

ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধো'ভিজায়তে॥

এই প্রসঙ্গে ভগবদ্‌গীতার টীকাকার শঙ্করাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, কামনা প্রতিহত হলে তা ক্রোধের সৃষ্টি করে—তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো'ভিজায়তে। সেই ক্রোধই ক্রূরতার জন্ম দান করে।

ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্ম স্বরূপ বলেই এইসব মানবিক ভাবনার ঊর্ধ্বে তাই কাম-ক্রোধাদি রিপু যেমন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না তেমনই সেই রিপুজাত ক্রূরতারও তিনি ঊর্ধ্বে। তাই তাঁর অক্রূর নাম প্রসিদ্ধ। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১১; (হরি) ১৩.১২৭.১১১ (শঙ্করাচার্যের টীকা দ্র.)]*

অক্রূরকর্মা শিবের অন্যতম নাম। মহর্ষি সংবর্তের উপদেশে রাজর্ষি মরুত্ত হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত মুঞ্জবান পর্বতে বসে মহাদেবের আরাধনা ও স্তব করেন। সেই সময় রাজা মরুত্ত শিব-মহাদেবকে 'অক্রূরকর্মা' নামে সম্বোধন করেছেন। মহাদেব শান্তমূর্তি, ক্রূরতা বা নিষ্ঠুরতা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি কখনওই নিষ্ঠুর কর্ম করেন না—এই ভাবনা থেকেই তাঁকে অক্রূরকর্মা বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১৪.৮.২৫; (হরি) ১৪.৮.২৬]

অক্রোধ *[দ্র. অক্রোশ]*

অক্রোধন আয়ুর (এঁকে তরিতায়ুও বলা হয়) পুত্র—

তরিতায়ুস্ততো'ভবৎ। অক্রোধনস্ত্বায়ুসুতঃ।

প্রতীপ, শান্তনু ইত্যাদি কৌরব রাজার পূর্বপুরুষ।

[মৎস্য পু. ৫০.৩৭]

বায়ুপুরাণের কথককঠাকুর অথবা লিপিকরের কল্যাণে ইনি অযুতায়ু অথবা অযুতায়ুধের পুত্র হয়ে গেছেন। *[বায়ু পু. ৯৯.২৩২]*

মহাভারতে যা পাওয়া যায়—চন্দ্রবংশীয় রাজা অযুতনায়ীর ঔরসে পৃথুশ্রবার কন্যা কামার গর্ভে অক্রোধনের জন্ম। তিনি কলিঙ্গ দেশের মেয়ে করম্ভাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম দেবাতিথি।

[মহা (k) ১.৯৫.২১-২২; (হরি) ১.৯০.২৭]

অক্রোশ শৈরীষক এবং মহোত্থ দেশের অধিপতি জনৈক রাজর্ষি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আগে দিগ্বিজয় যাত্রার সময় পশ্চিম দিক জয় করতে গিয়ে নকুল তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে অক্রোশের পরিবর্তে অক্রোধ পাঠ উপস্থিত।

[মহা (k) ২.৩২.৫-৬; (হরি) ২.৩১.৫-৬]

অক্ষ$_১$ রাবণের ঔরসে মন্দোদরীর গর্ভজাত একজন রাক্ষস। তিনি বীর, শক্তিমান, যুদ্ধপটু। বিশাল তাঁর চেহারা। চোখ দুটি সিংহের মতো ক্রূর। তিনি সবসময় সোনার অঙ্গদ এবং সোনার কুণ্ডলে ভূষিত থাকতেন। *[রামায়ণ ৫.৪৭.১-২২]*

বহু তপস্যা করে কুমার অক্ষ দেব-দানবের অজেয় আটটি ঘোড়ায় টানা একটি সুন্দর রথ পেয়েছিলেন। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সেই রথের বিভিন্ন স্থানে ছিল তূণ, শক্তি ও তোমর। আর রথের আটদিকে কাঠের ফলকে ছিল আটটি তলোয়ার। রথটি বিভিন্ন রত্নখচিত এবং তার ধ্বজ, পতাকা ও সোনার শিকলে শোভিত। রথটি অন্তরীক্ষ বা দুর্গম পর্বতে চলাচলের উপযুক্ত ছিল। *[রামায়ণ ৫.৪৭.৪-৬]*

সীতার খোঁজে লঙ্কায় গিয়ে যখন হনুমান অশোকবন ধ্বংস করছিলেন তখন তাঁকে উচিত শিক্ষা দিতে রাবণ তাঁর বেশ কিছু রাক্ষসবীরকে পাঠান। তাঁরা সকলেই হনুমানের হাতে মারা পড়লে রাবণ তাঁর পাঁচজন মন্ত্রীকে পাঠালেন। হনুমানের হাতে তাঁরাও মারা পড়লেন। তখন রাবণ কুমার অক্ষকে পাঠালেন হনুমানকে দমন করার জন্য। রাজপুত্র অক্ষ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চললেন যুদ্ধ করতে। অবশেষে দুই পক্ষের দেখা হল এবং অক্ষের সঙ্গে হনুমানের ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। অল্পবয়সী যোদ্ধা হলেও অক্ষ হনুমানের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর তেজ বাড়ছিল। তাঁর যুদ্ধ দেখে হনুমানও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, যুদ্ধ যত চলতে থাকবে, অক্ষের যুদ্ধশক্তি আরও বাড়বে—

ন খল্বয়ং নাভিভবেদুপেক্ষিতঃ
পরাক্রমো হ্যস্য রণে বিবর্দ্ধিতে।
প্রমাপণং হ্যস্য মমাদ্য রোচতে
ন বর্দ্ধমানো'গ্নিরুপেক্ষিতুং ক্ষমঃ॥

[রামায়ণ ৫.৪৭.২৪-২৯]

এই রকম ভাবনা-চিন্তা করে তিনি প্রথমে অক্ষের রথের ঘোড়াগুলিকে বধ করলেন। তখন অক্ষ হনুমানের দিকে তেড়ে এলে হনুমান তাঁর পা দুটো ধরে ঘুরিয়ে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অক্ষের মৃত্যু হল।

[রামায়ণ ৫.৪৭.১-৩; ৫.৪৭.৭-৩৬]

অক্ষ$_২$ পাশাখেলা। পণ ধরে পাশাখেলা। ঋতুপর্ণ, শকুনি এই খেলায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ঋতুপর্ণ নলকে এই খেলা শেখান। অক্ষক্রীড়া রাজাদের পরিত্যাজ্য কামজ ব্যসন বলে কথিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৯.৯.১৭; বায়ু পু. ৮৮.১৭৪; বিষ্ণু পু. ৪.৪.১৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৭৩; মৎস্য পু. ১৫৪.৫২০; ২২০.৮]

অক্ষ$_৩$ একজন দানব। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১১]

অক্ষ$_৪$ কৃষ্ণের ঔরসে সত্যভামার পুত্র।

[বায়ু পু. ৯৬.২৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৪৭]

অক্ষ$_৫$ তারকাসুর বধের সময় স্কন্দকে যেসব অনুচর যোদ্ধা সহায়তা করেছিলেন, অক্ষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৭; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৬]

অক্ষ$_৬$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। সংস্কৃত অক্ষ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ত করা। অক্ষ্ ধাতুর সঙ্গে অচ্ প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় অক্ষ। অর্থাৎ যা ব্যাপ্ত করে। ঈশ্বর সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করে আছেন—এই অর্থে অক্ষ পরমেশ্বর মহাদেবের অন্যতম নাম।

অক্ষ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন—

অক্ষঃ রথসন্ধানদারু।

রথের অক্ষকাষ্ঠ যেমন রথের চক্রকে ধারণ করে তেমনই মহাদেবও অক্ষদণ্ডরূপে সংসারচক্রকে ধারণ করেন বলেই তিনি অক্ষ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১২২; (হরি) ১৩.১৬.১২১]

অক্ষক কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব। *[বায়ু পু. ৬৮.৫]*

অক্ষপাদ$_১$ ন্যায়সূত্রকার গৌতমকেই অক্ষপাদ বলা হয়। বিখ্যাত ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, ন্যায়বার্তিকের লেখক উদ্যোতকর, এবং ন্যায়মঞ্জরীর অসামান্য কবিলেখক জয়ন্তভট্ট—সকলেই ন্যায়সূত্রের রচয়িতাকে অক্ষপাদ নামে চিহ্নিত করেছেন বটে, কিন্তু এই অক্ষপাদ যে বস্তুত ঋষি গৌতম, তা স্পষ্ট বোঝা যায় স্কন্দপুরাণের একটি শ্লোক থেকে। এখানে বলা হয়েছে—অক্ষপাদই সেই মহাযোগী গৌতম, যিনি অহল্যার স্বামী এবং যিনি গোদাবরী নদীকে পৃথিবীতে প্রবর্তিত করেছিলেন—

অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যো'ভবন্মুনিঃ।
গোদাবরী সমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ॥

অন্যত্র পদ্মপুরাণে এ-কথাও বলা হয়েছে যে, এই অক্ষপাদ গৌতমই ন্যায়সূত্রের গ্রন্থখানি প্রথম রচনা করেন—

গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যং তু কপিলেন বৈ।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৫৫.৫; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) উত্তরখণ্ড ২৬৩.৬৮]

অক্ষপাদ নামটি নিয়ে অন্তত দুটি লোক প্রচলিত কাহিনী আছে। তার একটি হল—দার্শনিক নৈয়ায়িক গৌতম ন্যায়তত্ত্ব-চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে রাস্তায় যেতে যেতে একটি মজা কুয়োর মধ্যে পড়ে যান। বহু কষ্টে তাঁকে কুয়ো থেকে ওঠানোর পর ভগবান নাকি পরম করুণায় এই দার্শনিকের পায়ের ওপর আরও এক জোড়া চোখ দিলেন রাস্তা দেখার জন্য। দ্বিতীয় কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে—মহর্ষি ব্যাস এখানে গৌতমের শিষ্য। তিনি গুরু গৌতমের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে অবস্থান করার পরেও গৌতম তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন না। মহাভারত এবং বেদান্তসূত্রের মধ্যে ব্যাস গৌতমের ন্যায়তন্ত্রের বিরূপ সমালোচনা করার জন্যই নাকি গৌতম তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন না। অবশেষে প্রণত শিষ্যের প্রতি দয়াবশত গৌতম তাঁর পায়ের ওপরে এক জোড়া চোখের সৃষ্টি করেন এবং তারই মাধ্যমে ব্যাসের দিকে কৃপাদৃষ্টি করেন। দুই কাহিনীতেই ন্যায়সূত্রকারের প্রথম নাম গৌতম, পরে পায়ের ওপরে চোখের সৃষ্টিকল্পনায় তিনি অক্ষপাদ হয়েছেন। আমাদের মনে হয়— নামের

মধ্যে অক্ষ এবং পাদ এই দুটি বিপরীত ইন্দ্রিয় একত্র হওয়ায় এইরকম কাহিনী তৈরি হয়েছে।

[দ্র. ন্যায়কোষ, অক্ষপাদ; Satish Chandra Vidyabhusan, A History of Indian Logic, pp. 47-49]

অক্ষপাদ$_{২}$ সোমশর্মার পুত্র। মহাদেব বলেছিলেন, সাতাশতম দ্বাপরযুগে যখন মহর্ষি জাতুকর্ণ্য ব্যাস হয়ে জন্মাবেন, সেই সময়ে তিনি দ্বিজবর সোমশর্মা নামে বিখ্যাত হয়ে প্রভাস তীর্থে বসবাস করবেন। সেই সোমশর্মার চার পুত্রের মধ্যে অক্ষপাদ অন্যতম।

[বায়ু পু. ২৩.২১৪-২১৬; কূর্ম পু. ১.৫২.২৬; লিঙ্গ পু. (Nagar) ১.৭.৩৪, ৫০]

অক্ষপাদ$_{৩}$ ত্রিপুরাসুরকে দমন করার সময় শিবের অনুগামীগণের মধ্যে একটি গণের নাম অক্ষপাদ।

[লিঙ্গ পু. ১.৭২.৮১]

অক্ষপাদ$_{৪}$ স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, জনৈক অক্ষপাদ মুনি কাশীতে বরণা-নদীর তীরে বরণেশ্বর শিবের উপাসনা করে পাশুপত ধর্মে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

[স্কন্দ পু. (কাশী/উত্তর) ৯৭.৬০-৬১]

অক্ষমালা$_{১}$ স্ফটিক, ইন্দ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, পুত্রঞ্জীব পুষ্পের বীজ, সুবর্ণ, মণি, প্রবাল অথবা পদ্মের বীজ—এর যে কোনো একটির মাধ্যমে তৈরি মালাকেই অক্ষমালা বলা যায়। হাতে কুশের গ্রন্থি ধারণ করে অক্ষমালায় দেবীর জপ প্রশস্ত।

[কালিকা পু. ৫৫.৪১]

অক্ষমালা$_{২}$ শেষনাগের গলভূষণ। তরুণ সূর্যকিরণের মতো এই মালার দ্যুতি—

তরুণাদিত্যমালেব... অক্ষমালা বিরাজতে।

[বায়ু পু. ৫০.৫০]

অক্ষমালা$_{৩}$ অন্য নাম অক্ষসূত্র। রুদ্রাক্ষের মালা। মহিষাসুরবধের জন্য দেবী চণ্ডিকার শক্তি-সঞ্চারকালে দেবতারা যখন তাঁকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছিলেন, তখন দক্ষ প্রজাপতি চণ্ডিকাকে অক্ষমালা প্রদান করেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৮২.২২]*

অক্ষমালা$_{৪}$ বশিষ্ঠের অন্যতমা স্ত্রী—বশিষ্ঠশ্চক্ষমালয়া।

[মহা (k) ৫.১১৭.১১; (হরি) ৫.১০৮.১১]

অনেকেই অক্ষমালাকে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী বলে মনে করেছেন। কিন্তু অরুন্ধতী কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে জন্মেছেন, অতএব তাঁর জন্মকৌলীন্য অনেক বেশি। অন্যদিকে মনু লিখেছেন, অক্ষমালা অধমযোনিজা শূদ্রকন্যা হয়ে জন্মালেও বিভিন্ন সদ্‌গুণের কারণে মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি লোকপূজিতা হয়ে ওঠেন। অন্য একটি মতে অরুন্ধতীই শূদ্রকন্যা হয়ে জন্মান। মহাভারতে আত্যন্তিক প্রেমের দৃষ্টান্তে রুদ্র-রুদ্রাণী, চন্দ্র-রোহিণী, চ্যবন-সুকন্যা ইত্যাদি যুগল উল্লেখের সময় বশিষ্ঠ এবং অক্ষমালার কথা বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৫.১১৭.১১; (হরি) ৫.১০৮.১১; মনুস্মৃতি ৯.২৩]

অক্ষয়তৃতীয়া বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিন। কথিত আছে, এই দিনে গঙ্গাদেবী চতুর্ভুজ মূর্তিতে হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে এই তিথির অন্য নাম সত্যযুগাদ্যা, অর্থাৎ এই তিথিতে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছিল—

পুরাণে কথিতা যা চ যুগাদ্যা প্রথমা সখি।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ১.১৫.২৩-২৪]

এই তিথিতে দান, হোম, জপ—যা কিছু করা যায়, তাই অক্ষয় পুণ্যলাভের হেতু হয়ে ওঠে। এই তৃতীয়া তিথি যদি কৃত্তিকা নক্ষত্র যুক্ত হয়, তবে আরও প্রশস্ত এবং পুণ্যদ হয়ে ওঠে। এই তিথিতে উপবাস এবং ভগবান শ্রীহরির অর্চনা বিহিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৬৫.১-৭]

এই অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতেই ভগবান শ্রীহরির ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের জন্ম হয়েছিল বলে কথিত আছে। কমলাকর ভট্ট তাঁর নির্ণয়সিন্ধু নামক স্মৃতিগ্রন্থে ভার্গবার্চনদীপিকা নামে প্রাচীনতর এক স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত স্কন্দ পুরাণ এবং ভবিষ্য পুরাণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে অর্থাৎ এই অক্ষয়তৃতীয়ার রাত্রির প্রথম যামে পুনর্বসু নক্ষত্রে পরশুরামের জন্ম হয়েছিল। তাঁর জন্মের সময় ছয়টি গ্রহ উচ্চস্থানে ছিল এবং রাহু ছিল মিথুনে। এইরকম গ্রহ সন্ধিতেই রেণুকার গর্ভে ভগবান শ্রীহরি 'রাম' নামে জন্মগ্রহণ করেন। এই দিনের নাম পরশুরামজয়ন্তীও বটে—

বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং পুনর্বসৌ।
নিশায়াঃ প্রথমে যামে রামাখ্যঃ সময়ে হরিঃ॥
সোচ্চগৈঃ ষট্‌গ্রহৈ র্যুক্তে মিথুনে রাহুসংস্থিতে।
রেণুকায়াস্তু যো গর্ভাদবতীর্ণো হরিঃ স্বয়ম্॥

[নির্ণয় সিন্ধু, কমলাকর ভট্টকৃত, জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র সম্পাদিত, ২.৩, পৃ. ১১৮]

অক্ষয়বট গয়ায় অবস্থিত পুণ্য ক্ষেত্র, যেখানে একটি বট বৃক্ষ আছে। *[বায়ু পু. ১০৫.৪৫; ১০৯.১৬]*

এই স্থানে অন্ন দিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করলে পিতৃপুরুষেরা অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ করেন। এই স্থানের এমনই মাহাত্ম্য যে, এখানে ওই বৃদ্ধ বটের কাছে যদি কেউ শাক কিংবা জল দিয়ে একটিমাত্র ব্রাহ্মণকেও ভোজন করায় তাহলে কোটি ব্রাহ্মণভোজন করানোর ফল হয়।

[মহা (k) ৩.৮৪.৮৩; (হরি) ৩.৬৯.৮৪; বায়ু পু. ১১১.৭৯-৮০, ৮২]

অক্ষয়া পিশাচী ব্রহ্মধনার গর্ভে যেসব ব্রহ্মরাক্ষস এবং ব্রহ্মরাক্ষসী জন্মায়, সেই ব্রহ্মরাক্ষসীদের অন্যতমা অক্ষয়া। *[বায়ু পু. ৬৯.১৩৩-১৩৪]*

অক্ষয়াশ্ব ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সংহতাশ্বের পুত্র। মৎস্য পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পাঠে ইনি অকৃতাশ্ব নামে চিহ্নিত হলেও বায়ু পুরাণ তাঁর 'অক্ষয়াশ্ব'—এই নামকরণ করেছে।

[বায়ু পু. ৮৮.৬৩; মৎস্য পু. ১২.৩৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৫]

অক্ষর$_১$ যা ক্ষয় হয় না, যা থেকে কিছু ক্ষরিত হয় না—ন ক্ষরতি। অনশ্বর। প্রধানত সাংখ্য দর্শনে 'সাক্ষী চেতা নির্গুণ' পুরুষ তত্ত্বকে অক্ষর বলা হয়েছে। জীব এবং ঈশ্বরের পার্থক্য নির্ণয় করার সময় ভগবদ্‌গীতা বলেছে—এই পৃথিবীতে দুরকম পুরুষ আছেন—ক্ষর এবং অক্ষর—

> দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
> ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থো'ক্ষর উচ্যতে॥

[ভগবদ্‌গীতা, ১৫.১৬]

এখানে ক্ষর-শব্দের ব্যাখ্যা করে টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখেছেন—'ক্ষর' বলতে দুনিয়ার সমস্ত নশ্বর বস্তুকেই বোঝায়। ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত স্থাবর পদার্থই ক্ষর। আর অক্ষর হলেন অবিনাশী, অনশ্বর কূটস্থ। 'কূট' মানে রাশি। শিলারাশির মহাস্তূপ-স্বরূপ পর্বতের একদেশ ভেঙে গেলে নির্বিকার পর্বতের যেমন কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, তেমনই অবিকার অথচ চেতন পুরুষ হলেন অক্ষর। মহাভারত বলেছে—সেই যাকে ক্ষর বলা হয়েছে এবং এই জগৎ সৃষ্ট হয়ে আবার যার মধ্যে প্রবেশ করেছে—সেই ক্ষর-বিষয়ের ব্যাপারেও আমি শুনতে ইচ্ছা করি, আবার যাকে অক্ষর বলে বলা হয়েছে সেই পরম মঙ্গলময় তুরীয় ব্রহ্মের বিষয়েও শুনতে ইচ্ছা করি—

> যচ্চাক্ষরমিতি প্রোক্তং শিবং ক্ষেম্যম্ অনাময়ম্।

[মহা (k) ১২.৩০২.১২; (হরি) ১২.২৯৫.১২]

☐ সাংখ্য-দর্শনে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের শেষ তত্ত্ব হলেন পুরুষ, যিনি প্রকৃতিও নন বিকৃতিও নন। এই পুরুষই সর্বব্যাপ্ত বিশ্বাত্মা, তাঁকেই এক এবং অক্ষর বলা হয়েছে—

> সাংখ্যে চ পঠ্যতে শাস্ত্রেনামভির্বহুধাত্মকঃ।
> বিচিত্ররূপো বিশ্বাত্মা একাক্ষর ইতি স্মৃতঃ॥

সাংখ্যের পুরুষ এক চরম তত্ত্ব হিসেবেই যেহেতু অবিক্রিয় অক্ষর-পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, তাই চরম দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে হিরণ্যগর্ভ, হরি, শিব, বিষ্ণু এবং ঈশ্বর এঁরা সকলেই 'অক্ষর' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন—

> যদক্ষরম্ অথাব্যক্তম্ ঈশং লোকস্য ভাবনম্।

[মহা (k) ১২.৩০২.১৮-১৯; ১২.৩৪০.১০৭; ১৩.১৭.৮০; ১৩.১৪৯.১৫, ৬৪; ১২.৩৪২.১২৫; (হরি) ১২.২৯৫.১৮-১৯; ১২.৩২৬.১০১; ১৩.১৬.৮০; ১৩.১২৭.১৫, ৬৪; ১২.৩২৮.৩১০]

☐ 'অক্ষর'-কথাটি প্রধানত চরম ব্রহ্মতত্ত্বের পর্যায়-শব্দ হিসেবে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হয়েছে। বেদান্তসূত্রের প্রথম পাদে অন্তত তিনটি সূত্রে 'অক্ষরাধিকরণ' বলে একটি অধিকরণই আছে (অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ইত্যাদি ১.৩.১০-১২), যেখানে প্রধানত বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য—গার্গীর কথোপকথনে ধৃত অক্ষর-স্বরূপ ব্রহ্মের ভাবনাই বিশদাকারে ব্যাখ্যা করেছেন শংকরাচার্য। গার্গী জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কোথায় সেই আকাশ ওতপ্রোত আছে। তার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন— তুমি যা জিজ্ঞাসা করছো, সেটাকে পণ্ডিতেরা 'অক্ষর' বলে নির্দেশ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য এরপর 'অক্ষর'-এর স্বরূপ বোঝানোর সময় ব্রহ্মেরই স্বরূপ বর্ণনা করে বললেন—এই অক্ষর বস্তুটি স্থূলও নয়, সূক্ষ্মও নয়, হ্রস্বও নয়, দীর্ঘও নয়, রক্তবর্ণও নয়, আর্দ্রতাযুক্তও নয়, ছায়াযুক্ত নয়, তমোযুক্তও নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয়, আসক্তও নয়, রস বা গন্ধ নয়, চোখ বা কান নয়, বাক্ বা মন নয়, তেজ বা প্রাণ নয়, মুখযুক্ত নয়, একে পরিমাপ করা যায় না, এর অন্তর বা বাহির নেই। অক্ষর বস্তুটিকে ভক্ষণ করা যায় না এবং সেও কাউকে ভক্ষণ করে না।

স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমো'বায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনো'তেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ,
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি
দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ।
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা
মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ
সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা
অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যো'ন্যা নদ্যঃ
স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্য, প্রতীচ্যো'ন্যা
যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে
গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি, যজমানং
দেবাঃ, দর্ব্বীং পিতরো'ন্বায়ত্তাঃ॥
যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা'স্মিঁল্লোকে
জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি
বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি, যো বা
এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি,
স কৃপণো'থ য এতদক্ষরং গার্গি
বিদিত্বা-স্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥
তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং
শ্রোত্রমতং মন্তুবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ,
নান্যদতো'স্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতো'স্তি শ্রোতৃ
নান্যদতো'স্তি মন্তৃ নান্যদতো'স্তি
বিজ্ঞাতৃ এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ
ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি॥

[বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ (দুর্গাচরণ) ৩.৮.৮-১১]

অক্ষর বলতে যে প্রধানত ব্রহ্মাই বোঝায় তার সম্বন্ধে কতগুলি শ্লোক-প্রমাণ আছে। সেখানে বলা হচ্ছে-ক্ষর-পদার্থের বিরুদ্ধ বলেই অক্ষর বলতে ব্রহ্মকেই বোঝায়। ক্ষর বলতে নশ্বর, কার্য-কারণরূপ সেই সব বস্তুকে বোঝায়, যাকে আমরা শব্দ-বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাইরে হল অক্ষর-তত্ত্ব। এই অক্ষর-তত্ত্ব না জানলে জ্ঞান হয় না এবং এই অক্ষর-স্বরূপের জ্ঞানেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য সম্পূর্ণ হয়—

ক্ষরাদ্ বিরুদ্ধধর্মত্বাদ্ অক্ষরং ব্রহ্ম ভণ্যতে।
কার্য-কারণ-রূপং তু নশ্বরং ক্ষর উচ্যতে॥
যৎ কিঞ্চিদ্‌বস্তু লোকে'স্মিন্ বাচো
গোচরতাং গতম্।
প্রমাণস্য চ তৎসর্বমক্ষরে প্রতিষিধ্যতে॥
যদপ্রবোধাৎ কার্পণ্যং ব্রাহ্মণ্যং যৎপ্রবোধতঃ
তদক্ষরং প্রবোদ্ধব্যং যথোক্তেশ্বরবর্ত্মনা॥

[শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত বচন]

মহাভারতে অক্ষর শব্দটি বহুবার উল্লিখিত এবং খুব সংক্ষেপে অক্ষর-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছে—অক্ষর এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তিনি নিত্য, আর ক্ষর নানাত্বসূচক এবং অনিত্য—

একত্বমক্ষরং প্রাহু র্নানাত্বং ক্ষর উচ্যতে।

[মহা (k) ১২.৩০৫.৩৬; (হরি) ১২.২৯৭.৩৬]

আর ভগবদ্‌গীতা বলেছে—অক্ষর বস্তুত পরব্রহ্ম—অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্ (৮.৩)।

অক্ষর$_{২}$ অ-কার থেকে ক্ষ-পর্যন্ত একান্নটি বর্ণ—

'অ-কারাদি-ক্ষ-কারান্তৈকপঞ্চাশদ্ বর্ণাঃ।'

[মেদিনীকোষ-ধৃত বচন]

বৃহস্পতি-স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, বিধাতা যন্ত্রে ফেলে অক্ষর-রাশি তৈরী করেছেন—

'ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি যন্ত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা।'

এই অক্ষর পাঁচরকম—মুদ্রালিপি, শিল্পলিপি, লেখনী-নিঃসৃত লিপি, গুণ্ডিকা-লিপি, ঘূর্ণ-সম্ভূতা লিপি—

'মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপি-র্লিপিলেখনীসম্ভবা।
গুণ্ডিকা ঘূর্ণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ॥'

[শব্দকল্পদ্রুমে বারাহীতন্ত্র-ধৃত বচন]

□ অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে অসামান্য একটি কাহিনী আছে এবং সেই কাহিনীর সঙ্গেও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা জড়িত। বলা হয়েছে—প্রলয় শেষে জগৎ যখন জলে জলময় হয়ে আছে, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির ভাবনায় দুঃখিত এবং চিন্তান্বিত ছিলেন। তিনি চিন্তিত হওয়ামাত্রই এক কুমার শ্রুতি উচ্চারণ করতে করতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। অশব্দ-অস্পর্শ, অগন্ধ এবং রসবর্জিতা এই শ্রুতি চতুর্মুখ ব্রহ্মা ধারণ করলেন। তারপর তিনি তপস্যায় ধ্যানমগ্ন হয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন—কে এই পুরুষ, যিনি কুমার-বেশে এলেন তাঁর সামনে। এই চিন্তার ফলেই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রহিত, রস-গন্ধ-বর্জিত অক্ষর প্রাদুর্ভূত হল। ধ্যানাবস্থিত অবস্থায় তিনি দেখলেন—ওই দেবস্বরূপ অক্ষর শ্বেত-কৃষ্ণ-রক্ত এবং পীতবর্ণ-তারা অস্ত্রী এবং অনপুংসক।

এইভাবে অক্ষরের স্বরূপ অবগত হয়ে ব্রহ্মা যখন আবার চিন্তা আরম্ভ করলেন, তখন সেই চিন্তা-পরায়ণ ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ থেকে একমাত্র মহাঘোষ শ্বেতবর্ণ অক্ষর আবির্ভূত হল। এই অক্ষরই বেদ, ওঙ্কার অথবা সাক্ষাৎ মহেশ্বর— স ওঙ্কারো ভবেদ্‌বেদঃ অক্ষরং বৈ মহেশ্বরঃ। ব্রহ্মা পুনরায় অক্ষর-বিষয়ক চিন্তা করলে ক্রমে ক্রমে ঋগ্‌বেদ, যর্জুবেদের পর ত্রিবর্ণাত্মক ওঙ্কার আবির্ভূত হল। তারপর চতুর্মুখের মুখ থেকে নানাবর্ণ চতুর্দশ স্বর আবির্ভূত হল।

এই পুরাণ-মতে তেষট্টি-টি বর্ণ অকার থেকেই আসছে এবং অকারই প্রথম স্বর—তস্মাৎ ত্রিষষ্টিবর্ণা বৈ অকার-প্রভবাঃ স্মৃতাঃ। চতুর্দশ বর্ণ থেকে চতুর্দশ মনুর জন্ম বলে বলা হয়েছে। সর্বশেষে বায়ুপুরাণ বলেছে—কল্পে কল্পে মনুরাই স্বর এবং বর্ণরূপে অবস্থান করেন। স্বর যেহেতু সমস্ত বর্ণের সবর্ণতা ধারণ করে, তাই সমস্ত বর্ণের সঙ্গেই স্বরের সম্বন্ধ আছে। *[বায়ু পু. ২৬.৭-৫০]*

ভাগবত পুরাণের বিবরণে ভগবান ব্রহ্মা ওঙ্কার থেকেই অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব) উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স, হ) স্বরবর্ণ (অ থেকে ঔ) স্পর্শ বর্ণ (ক থেকে ম পর্যন্ত) এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে অক্ষরের সমষ্টি সৃষ্টি করেছেন—

> ততো'ক্ষর-সমাম্নায়ম্ অসৃজদ্ ভগবানজঃ।
> অন্তঃস্থোষ্ম-স্বর-স্পর্শ-হ্রস্ব-দীর্ঘাদিলক্ষণম্॥
>
> *[ভাগবত পু. ১২.৬.৪]*

অক্ষর৩ অক্ষরের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি প্রাবাদিক কথা আছে যে, অক্ষর মানে আসলে বর্ণ-নির্মাণ, অতএব বর্ণকেও অক্ষর বলা যায়—

> অক্ষরং বর্ণনির্মাণং বর্ণমপ্যক্ষরং বিদুঃ।

বর্ণই অক্ষর কিংবা অক্ষরই বর্ণ কিনা সে-বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং শেষে দেখা যাবে—বর্ণ তথা অক্ষরেরও দার্শনিক যুক্তিটা উপনিষদ-গীতার মতোই। অক্ষর যেহেতু একটা ভাবকে ব্যাপ্ত করে থাকে, তাই ভাব থেকে সরে না—ন ক্ষরতি বলেই সেটা অক্ষর—

How far *varṇa* coincides, and is synonymous with *akshara*, 'syllable,' or not, is obvious: it coincides with the latter term when it means vowel, otherwise not. The distinction between these terms may therefore be comprised in the following definition: *kára* denotes the pronounceable sound, which *must* always be one syllable, but may also consist of more than one syllable; if denoting one syllable, it may mean a simple vowel (*a, á, i, í, u, ú, ṛi, ṛí, lṛi,*), or a complex vowel (*e, o, ai, au*), or a simple consonant made pronounceable by a vowel (usually the vowel *a*); *karana* denotes more especially the pronounceable sound represented either by more than one syllable or by one syllable containing more than one consonant. *Varṇa*, on the contrary, implies merely the simple letter,—among vowels, especially the simple vowel; among consonants, merely the *single consonant, not accompanied with a vowel sign*. Lastly, *akshara* means 'syllable' in our sense of the word, and may sometimes therefore coincide in value with *kára*, or *varṇa* in the same way that *kára* and *varṇa* are apparently convertible terms when they are the latter parts of compounds, the former of which are *a, á, i, í, u, ú, ṛi, ṛí, lṛi*.

I have, in the foregoing observations, purposely abstained from alluding to the use which has been made of these terms in the existing Prátiśákhyas of Śaunaka and Kátyáyana; in the first place, because it was my object to show their meaning in Páṇini's work, as well as in those old Commentaries which have strictly adhered to his terminology, and because it would have been an uncritical procceding to confound the meaning or bearing of these terms in works belonging to a different class of Hindu literature; Secondly, because the date of these works, themselves,—or, at least, their relative position towards Páṇini,—will have to be ascertained, before any conclusion can be drawn from a difference which may have existed between them in the use of these terms. Though I shall recur to this point, I may now state my belief, that even if grammatical works older than Páṇini had used *varṇa* in the general sense of *akshara*, such a circumstance would not disprove the fact that *varṇa* might have meant a written sign even before Páṇini's time. There is, for instance, an introductory Várttika of Kátyáyana which countenances the assumption that *varṇa* had such a sense in some older grammarian; but the very manner in which it is brought before the reader shows that Kátyáyana contrasts the use of this word in Páṇini with that in his prodecessor, and confirms, therefore, the definition I have given before. At the same time, it leaves the question undecided whether *varṇa* was, or was not, a written letter in this older work.The Várttika I am alluding to occurs at the end of the general introduction, and refers to the following Vaidik passage mentioned in the beginning of the introduction: 'Whoever establishes this speech according to its words, its accent, and its syllables, he is fit to institute or to perform sacrificial work; and that it is a duty to study grammar, follows from the words 'let us be fit to institute, ot to perform sacrificial work.' The Várttika them says: '*akshara*, you must know, means *na kshara*, *i.e.*, not perishable,' and continues, 'or *akshara* comes from *aś*, 'to pervade', with the affix *sara* (*Kaiyyaṭa*: 'because it pervades the sense'); and concludes, 'or they call *varṇa* so in the the Sútra of a former (grammarian)' [*Patanjali: i.e.* 'or in the Sútra of a former (grammarian) *varṇa* has the name *akshara.*' *Kaiyyaṭa:* 'For it is said in another grammar, that the *varṇas* are *aksharas.*' *Nagojibhaṭṭa:* 'In a similar manner the term *aksharasamámnáya* means a multitude of *varṇas*, as seen in the Vedas].

[দ্র. Theodor Goldstucker, Panini: His place in Sanskrit Literature, London: Trubner & Co. 1861, Pp. 42-44]

অক্ষর$_{৪}$ একজন রাজা। তাঁর পুত্রের নাম সুযজ্ঞ। বিখ্যাত মরুত্ত-রাজার পিতামহ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.২৩]

অক্ষর$_{৫}$ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুবর্ণের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি যিনি তাঁর পালনীয় স্বধর্ম থেকে চ্যুত হন না, তাঁকে অক্ষর বলা হয়।

[কালিকা পু.২৮.১৩]

অক্ষরী অত্যন্ত উচ্চমার্গীয় যোগীর সংজ্ঞা। প্রভূত যোগ সাধনের শেষ পর্যায়ে যোগী যখন সমস্ত বায়ুপ্রবৃত্তি রোধ করে সমাহিতমনে ওঙ্কার দ্বারা সমগ্র দেহ আপূরণ করতে পারেন, তখন তিনি ওঙ্কারময় অক্ষরত্ব লাভ করেন। এই অবস্থার নামই অক্ষরী। *[বায়ু পু. ১৯.৪২-৪৩; ২০.৬]*

অক্ষসূত্র রুদ্রাক্ষ বীজের মালা অথবা বলয়। ব্রহ্মা, শিব, গণেশ, সরস্বতী, পার্বতী ইত্যাদি বহু দেবতার হাতেই এই অক্ষসূত্র গ্রথিত থাকে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের বিখ্যাত চিত্রসূত্র-খণ্ডে দেবতার হস্তধৃত অক্ষসূত্রের তাৎপর্য্য বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

> অক্ষসূত্র সর্বগ্রাসী মহাকালের দ্যোতক।

[The Vishnudharmottra, Part III, Ed. by Stella Kramrisch, Chap. 46. 1-19]

সাধারণত তপস্যার কৃচ্ছ্রতা এবং মুনিবৃত্তি বোঝানোর জন্যও অক্ষসূত্রের ব্যবহার আরোপ করেছেন কবিরা—যেমন, কালিদাসের কুমার-সম্ভবে উমার তপস্যায়—

কুশাঙ্কুরাদান-পরিক্ষতাঙ্গুলিঃ/
কৃতো'ক্ষসূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ।

কিংবা রঘুবংশে সুতীক্ষ্ণ মুনির হাতে অক্ষমালার বলয়। *[কুমারসম্ভবম্ ৫.১১; রঘুবংশম্ ১৩.৪৩]*

গবেষকেরা অনেকে বলেছেন ব্রহ্মার হাতে এই অক্ষসূত্র 'অ' থেকে 'ক্ষ'—অর্থাৎ সমস্ত বর্ণরাশির দ্যোতক, কেননা ব্রহ্মার মুখেই শব্দরূপা সরস্বতীর উদ্ভব।

[Susan G. Shumsky, Exploring Chakras: Awaken your untapped Energy, Bookmart Press: USA, 2003, P. 133]

☐ মহামুনি অগস্ত্য যখন জন্মেছিলেন, সেই জন্মলগ্নেই তিনি অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলুসহ জন্মেছিলেন। *[মৎস্য পু. ৬১.৩৬]*

☐ বিষ্ণু বামনরূপে অবতার গ্রহণ করলে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলহ তাঁকে অক্ষসূত্র দান করে অভিনন্দিত করেছিলেন। *[মৎস্য পু. ২৪৫.৮৭]*

☐ মহাভূতঘট-দানের সময় ঋগ্‌বেদের ওপর অক্ষসূত্র স্থাপন করে দান করতে হয়। বস্তুত অক্ষসূত্র এখানে ঋগ্‌বেদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। যেমনটা সামবেদের বীণা এবং বেণু।

[মৎস্য পু. ২৮৯.৮]

অক্ষসূত্রা আপস্তম্ব নামে যে পুরাণ-প্রসিদ্ধ মুনি ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম অক্ষসূত্রা। আপস্তম্বের ঔরসে পতিপ্রাণা অক্ষসূত্রার গর্ভে কর্কি নামে একটি পুত্র হয়। *[ব্রহ্ম পু. ১৩০.২-৩]*

অক্ষহৃদয় অক্ষক্রীড়ার অধিপতি দেবতার হৃদয় বশীকরণের মন্ত্র। আভিধানিক অর্থে অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলার গোপন রহস্য বা কৌশল। মহাভারতের পর্বসংগ্রহ সূত্রের মধ্যে প্রথম অক্ষহৃদয় শব্দটি উচ্চারিত হয়। পরে বনপর্বে বনবাসী যুধিষ্ঠিরের কাছে বৃহদশ্ব মুনি নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান বর্ণনা করেন। নলরাজা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের কাছ থেকে অক্ষহৃদয় বা পাশাখেলার বিদ্যা লাভ করেন। নলোপাখ্যানের বিস্তারিত বর্ণনার পর বৃহদশ্ব মুনি নিজেই যুধিষ্ঠিরকে 'অক্ষহৃদয়' বিদ্যা দান করেন—

ততো'ক্ষহৃদয়ং প্রাদাৎ পাণ্ডবায় মহাত্মনে।

[মহা (k) ১.২.১৬২; ৩.৭২.২৬-৩০; ৩.৭৯.১৮-২১; (হরি) ১.২.১৬৪; ৩.৫৯.২৬-৩০; ৩.৬৫.১৮-২১]

অক্ষি কৃষ্ণপিতা আনকদুন্দুভি অর্থাৎ বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভজাতা অন্যতমা কন্যা।

[মৎস্য পু. ৪৬.১২]

অক্ষীণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ছয় পুত্রের অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.৪.৪৮-৫০; (হরি) ১৩.৩.৬৯]

অক্ষোভ্য বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান শ্রীহরি অক্ষোভ্য নামে সম্বোধিত হয়েছেন। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯৯, ১২০; (হরি) ১৩.১২৭.৯৯,১২০]*

অখণ্ড একাদশী শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথি। ভগবান-বিষ্ণুর পূজায় এই একাদশী অত্যন্ত প্রশস্ত বলে একে অখণ্ড একাদশী বলা হয়।

[বামন পু. ১৭.১১-১৪]

অখণ্ডপরশু ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৭৪; (হরি) ১৩.১২৭.৭৪]

অগজ মৃগ নামক দিগ্‌হস্তীর পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩২]

অগম্যা 'অগম্যাশ্চ ন গচ্ছেত'—কখনো নিয়ম-সংস্কারের বাইরে গিয়ে অগম্যা রমণীর সঙ্গে যৌন-সংসর্গ করবে না—এই নিষেধ জারি করে মহাভারত কতগুলি সম্পর্কের কথা বলেছে, যাঁদের সঙ্গে যৌন-সংসর্গ করা যায় না বলেই তাঁরা অগম্যা। এই তালিকায় আছেন— রাজার স্ত্রী, স্ত্রীর সখী, বিদ্বান মানুষের স্ত্রী, মূর্খের স্ত্রী, বৃদ্ধের স্ত্রী, বন্ধুপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, শরণাগত জনের স্ত্রী বা শরণাগতা রমণী, শ্যালক-সম্বন্ধীর স্ত্রী। লক্ষণীয়, চণ্ডালী প্রভৃতি যেমন বর্ণানুক্রমেই অগম্যা, তেমনই উল্লিখিত জনেরা গুরুস্থানীয়তার কারণে এবং সম্পর্কের মর্যাদাবশতই অগম্যা। তার মধ্যে পরদার-গমনের নিষেধও কার্যকরী হবে।

[মহা (k) ১৩.১০৪.১১৬-১১৮; (হরি) ১৩.৯১.১১৫-১১৬]

বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলেছেন, মাতা, ভগিনী, গুরুপত্নী এবং পিতৃব্যপত্নীর সঙ্গে রতিকর্ম ভয়ঙ্কর অন্যায়। গুরুপত্নী এবং পিতৃব্যপত্নীতে উপগত হলে যথাক্রমে বারো এবং ছয় বৎসর কৃচ্ছ্র নামক প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পাপমুক্তি ঘটতে পারে। অন্যান্য অন্যায় রতিকর্মের বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। এছাড়া পরাশক্তির পূজার্চনের পর ১০০৮ বার পঞ্চদশাক্ষরী শক্তিনাম জপের দ্বারাও পাপনাশ হতে পারে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৮.১-৩৭]*

অগম্যাগামী পুরুষ শবল নামক নরকে, গুরুপত্নীগামী তাল নামক নরকে, ভগিনীগামী পুরুষ তপ্তকুম্ভে, দুহিতৃগামী ব্যক্তি মহাজ্বাল নরকে গমন করে। *[বায়ু পু. ১০১.১৫৪-১৫৭]*

মহাভারতে শাস্ত্রসম্মত এবং সামাজিক প্রথাগত সম্পর্কের বাইরে স্ত্রী-সংসর্গ মাত্রেই অগম্যা-গমনের প্রশ্ন উঠেছে এমনকী সেটাকেও বর্ণসংকর বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা ক্ষত্রিয় পুরুষের কাছে ব্রাহ্মণ-রমণীও এক অর্থে অগম্যা, গৃহস্থ সন্ন্যাসিনীকে বিবাহ করছেন সেটাও অগম্যা অর্থাৎ আশ্রম-সংকর। সগোত্রা রমণীও অগম্যা এবং সবার শেষে বলা হচ্ছে পরস্ত্রী-সংসর্গ হল চতুর্থ বর্ণসংকর, কেননা পরস্ত্রী সব সময়েই অগম্যা—

অগম্যা পরভার্যেতি চতুর্থো বর্ণসংকরঃ।

[মহা (k) ১২.৩২০.৫৯-৬২;
(হরি) ১২.৩১০.৫৯-৬২]

অগরু (অগুরু) ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্যগুলির মধ্যে অগরু এক অন্যতম বিখ্যাত সুগন্ধী দ্রব্য। অতি প্রাচীনকাল থেকে সুগন্ধী অঙ্গরাগ হিসেবে চন্দন এবং অগরু ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে প্রায় সর্বত্র চন্দন এবং অগরুর নাম গন্ধদ্রব্য হিসেবে একত্রে উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

সেকালে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলেই সুগন্ধী চন্দন অগরুর প্রলেপে দেহ চর্চিত করতেন বলে জানা যায়। এমনকী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের সাজসজ্জার বর্ণনা দিতে গিয়ে একাধিকবার তাঁদের চন্দনাগুরুচর্চিত দেহের উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৫.১২৫.১০; ৯.৫৪.২৫;
৯.৯.৪৫; ৮.১৬.৬; (হরি) ৫.১১৭.১০;
৯.৫৪.২৫; ৯.৯.৪৫; ৮.১২.৬]

☐ মহাভারতের স্ত্রীপর্বে দুপক্ষের মৃত যোদ্ধাদের দাহ করার জন্য যে চিতা রচনা করা হয়েছিল, তাতে চন্দনকাষ্ঠের পাশাপাশি অগরুকাষ্ঠের ব্যবহারও দেখা যায়।

কুরুপিতামহ ভীষ্মের দেহত্যাগের পর অন্ত্যেষ্টির সময় তাঁর মরদেহ বহুমূল্য বস্ত্র, অলংকার, চন্দন-অগরুর প্রলেপে সজ্জিত করা হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ১১.২৬.২৮; ১১.১৬.৩৩; ১৩.১৬৭.৭;
(হরি) ১১.২৬.২৪; ১১.১৬.৩৩; ১৩.১৪৫.৭]

☐ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রামের রাজ্যাভিষেকের দিনে অযোধ্যা নগরীর সাজসজ্জার বর্ণনা আছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, অযোধ্যার রাজপথ শোভিত ছিল চন্দন অগরু প্রভৃতি সুগন্ধী দ্রব্য এবং নানাপ্রকার ধনরত্ন দ্বারা। বোঝা যায় শুধু অঙ্গরাগ হিসেবেই নয়, নগরসজ্জায় ব্যবহৃত সুগন্ধী হিসেবেও অগরুর ব্যবহার যথেষ্টই প্রচলিত ছিল।

[রামায়ণ ২.১৭.৩]

☐ ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ-সর্বত্রই চন্দন এবং অগরু মোটামুটি পরিমাণে উৎপাদিত হত বলে ধারণা হয়। মহাভারতের সভাপর্বে ভীমের পূর্বদিক বিজয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যে, পূর্বদিকে অবস্থিত সমুদ্র তীরবর্তী জনপদগুলি জয় করে কর হিসেবে প্রচুর পরিমাণে চন্দন এবং অগরুকাষ্ঠ লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় উল্লেখটি সহদেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের। সম্পূর্ণ দক্ষিণদিক জয় করে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছেছেন সহদেব। সমুদ্রের অপর পারে লঙ্কাপুরী। সেখানে তখনও রাজত্ব করেন রাবণের ভাই বিভীষণ। বিভীষণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কর হিসেবে নানা মূল্যবান দ্রব্য তুলে দেন সহদেবের হাতে। এর মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণে অগরু এবং চন্দনকাঠও। আবার মহাভারতের সভাপর্বের অন্তর্গত উপায়ন পর্বে দুর্যোধনের বিবরণ থেকে জানা যায়, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির যে রাজারা ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন, তাঁরাও উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন চন্দন এবং অগরুকাষ্ঠ।

[মহা (k) ২.৩০.২৮; ২.৩১.৭৫; ২.৫২.১০;
(হরি) ২.২৯.২৬; ২.৩০.৭৩; ২.৫০.১০]

☐ তবে মহাকাব্য-পুরাণে অগরু মূলত সুগন্ধী দ্রব্য হিসেবেই উল্লিখিত হলেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই অগরু ওষধি হিসেবেও ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়। অগরু বৃক্ষ (বিজ্ঞানসম্মত নাম Aquilaria Agallocha) এখনও আয়ুর্বেদিক ঔষধে ব্যবহৃত অন্যতম প্রচলিত উপকরণ। চরক সংহিতায় ঔষধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বলা, অতিবলা প্রভৃতি ওষধির সঙ্গে চন্দন এবং অগরু মেশানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুশ্রুত সংহিতার চিকিৎসাস্থান খণ্ডে লবণমেহ (মূত্রাশয়ের রোগবিশেষ) রোগের ঔষধ হিসেবে পাঠ; অগরু, হরিদ্রার মিশ্রণ সেবন করতে বলা হয়েছে।

সুতরাং গন্ধদ্রব্য হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি ঔষধ হিসেবেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই অগরু ব্যবহৃত হয়ে আসছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। *[চরকসংহিতা (চিকিৎসাস্থান) ৩.১২; সুশ্রুতসংহিতা (চিকিৎসাস্থান) ১১.৯]*

অগর্ভ (প্রাণায়াম) জপ, ধ্যান ইত্যাদি ছাড়াই যে প্রাণায়াম সম্পন্ন হয়, তাকে অগর্ভ প্রাণায়াম বলে। *[বৃহন্নারদীয় পু. ৩১.১২০]*

অগস্ত্য ভগবান শ্রীহরি নিজের উরুদেশ থেকে উর্বশীর সৃষ্টি করলে সমস্ত দেবতাদের মধ্যেই মোহ সৃষ্টি হয়। মিত্রাবরুণ—এই যুগল দেবতার একতর হলেন মিত্র। তিনি উর্বশীর সঙ্গ কামনা করলে উর্বশী তাতে সম্মত হলেন। কিন্তু উর্বশী মিত্রের সঙ্গে গমনোদ্যত হবার সঙ্গে সঙ্গে বরুণ উর্বশীর পিছন পিছন আসতে থাকেন এবং তাঁর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করতে থাকেন। উর্বশী তাঁকে বললেন—মিত্র আমাকে পূর্বে বরণ করেছেন, অতএব আজ আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারিনা। বরুণ বললেন—ঠিক আছে, যাও তুমি। কিন্তু তোমার মনটি রেখে যাও আমার কাছে। উর্বশী তাতে সম্মত হলে মিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন—তুমি যখন এমন বেশ্যার মতো আচরণ করলে, তাহলে তুমি মর্ত্যে গিয়ে পুরূরবাকে ভজনা করো।

মিত্র এবং বরুণ—দুই দেবতাই পরস্পরকে অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন বটে, কিন্তু তাঁদের কামবেগ নিবৃত্ত হল না। তাঁদের বীর্য্য স্খলিত হল। মিত্র ও বরুণ—দুজনেই সেই স্খলিত বীর্য্য ধারণ করলেন জলকুম্ভের মধ্যে। সেই জলকুম্ভেই জন্ম হল বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্য মুনির—

জলকুম্ভে ততো বীর্য্যং মিত্রেণ বরুণেন চ।
প্রক্ষিপ্তমথ সঞ্জাতৌ দ্বাবেব মুনিসত্তমৌ॥

বশিষ্ঠ অগ্রজ, অগস্ত্য কনিষ্ঠ—

বশিষ্ঠস্যানুজো' ভবৎ। *[মৎস্য পু.৬১.১৯]*

তবে দেবী ভাগবতে অগস্ত্য মুনিকেই অগ্রজ বলা হয়েছে—

অগস্তিঃ প্রথমস্তত্র বশিষ্ঠশ্চাপরস্তথা।
[দেবী ভাগবত ৬.১৪.৬৬]

অগস্ত্য মুনির জন্মের এই পৌরাণিক বিবরণের সবচেয়ে প্রাচীন প্রমাণ হল ঋগ্‌বেদ। সেখানেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে যে, বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্য মিত্রাবরুণের তেজে উর্বশীর মন থেকে জন্মেছেন—

তস্ত্রে জন্মোতৈকং বশিষ্ঠাগস্ত্যো
যত্বা বিশ আজভার॥
উতাসি মৈত্রাবরুণো বশিষ্ঠোর্বশ্যা
মনসো'ধিজাতঃ।
দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন
বিশ্বে পুষ্করে ত্বাদদন্তে॥
[ঋগ্‌বেদ ৭.৩৩. ১০-১৩]

কুম্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অগস্ত্য কুম্ভযোনি নামে খ্যাত। কুম্ভ একটি পরিমাণের নাম (১ কুম্ভ = ২০ দ্রোণ = ৬৪ সের)। কুম্ভ মধ্যে জাত, অর্থাৎ কুম্ভ দ্বারা পরিমাপ করা যায় বলে অগস্ত্যের অপর নাম 'মান'। তাঁর আকৃতি পরিমিত লাঙলের জোয়ালের মতো ছিল, এই কারণেও তাঁর নাম হয় 'মান'। তবে এগুলি মূলত পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের মতামত; অগস্ত্যের নাম কেন মান হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে অগস্ত্য এবং তাঁর পরিবার যে 'মান' নামে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ ঋগ্‌বেদে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তিনি অগস্ত্য নাম প্রাপ্ত হন। 'স্ত্যৈ' ধাতুর অর্থ স্তব্ধ করা, 'অগ' শব্দের অর্থ পর্বত। বিন্ধ্য পর্বতের (অগ) উচ্চতর গতি ও দর্পকে স্তব্ধ করেছিলেন বলে তাঁর এই নাম। তিনি শ্বেতবর্ণ, চতুর্বাহু, অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলুধারী—পুরাণে তাঁর এইরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। *[ঋগ্‌বেদ ৭.৩৩.১০,১৩; মৎস্য পু. ৬১.১৯, ২১-৩১; ২০১.২৩-২৯; ভাগবত পু. ৬.১৮.৫; দেবী ভাগবত পু.৬.১৪.৬০-৬৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৫.৩৮; Sanskrit to English Dictionary by Monier Williams; সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী (প্রথম খণ্ড), ভক্তিবল্লভতীর্থ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলকাতা, ১৯৯৭]*

☐ অগস্ত্যের জন্ম সম্পর্কে অন্য একটি তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, অগস্ত্য পুলস্ত্য ঋষির ঔরসে হবির্ভূর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পূর্বজন্মে দহ্রাগ্নি (দহরাগ্নি বা জঠরাগ্নি—শ্রীধর স্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য) নামে বিখ্যাত ছিলেন। *[ভাগবত পু. ৪.১.৩৫]*

☐ অগস্ত্য তাঁর ভ্রমণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে একসময় যখন কাঞ্চীদেশে ছিলেন, সেই সময় দেবদেব জনার্দন হয়গ্রীব-স্বরূপে অগস্ত্যকে দর্শন দেন—

হয়গ্রীবাং তনুং কৃত্বা প্রাদুর্বভূব পুরতো

মুনেরমিততেজসা। হয়গ্রীব তাঁকে ধর্মোপদেশ করেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি), ৩.৫.৩-৩৯]*

☐ মহর্ষি অগস্ত্য মূলত অগ্নির স্বরূপ। একসময় পুরুহূত ইন্দ্র দেবদ্রোহী দানবদের দগ্ধ করার জন্য অগ্নি এবং মরুৎকে (বায়ুকে) আদেশ করেন। বায়ুর সাহায্যে অগ্নি সহস্র সহস্র দানবকে দগ্ধ করতে থাকলে তারক, কমলাক্ষ, কালদংষ্ট্র, পরাবসু এবং বিরোচন ইত্যাদি দানবরা পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে জলদুর্গে আশ্রয় নিলেন। অগ্নি এবং বায়ু আর তাদের ক্ষতি করতে পারলেন না। ফলে এই দানবরা মাঝে মাঝেই সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে দেবতা মনুষ্য-মুনিদের উপর অত্যাচার করে আবার লুকিয়ে পড়তে লাগলেন সমুদ্রের মধ্যে। এই অতর্কিত আক্রমণ চলতে থাকলে অগ্নি এবং বায়ুকে তাপের দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করে ফেলার আদেশ দিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। বহু নির্দোষ প্রাণীর হত্যা হয়ে যাবে—এই ভয়ে অগ্নি ও বায়ু এই পাপাচরণ করতে রাজী হলেন না। আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধে ইন্দ্র তাঁদের অভিশাপ দিলেন —তোমরা দুজনেই একদেহে মুনি হয়ে জন্মাবে। অগ্নি তখন অগস্ত্য নামে বিখ্যাত হয়ে সমুদ্র শোষণ করবেন। তখনই আবার তিনি দেবত্ব লাভ করবেন। এই অভিশাপের ফলেই অগ্নি ও বায়ু একদেহে অগস্ত্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন। *[মৎস্য পু. ৬১.৩-১৮]*

☐ মহর্ষি অগস্ত্য ঋগ্বেদের বহু সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। কোনো একসময় হয়তো বিশেষ কোনো ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইন্দ্রকে বাদ দিয়ে মরুৎগণের উদ্দেশে আহুতি রচনা করার কথা ভাবা হয়েছিল। এইখানে অগস্ত্য হয়তো মধ্যস্থতা করে ইন্দ্রের সঙ্গে মরুৎগণের সুসম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এ বিষয়ে গবেষণা করে এইরকমই মতামত প্রকাশ করেছেন—His greatest feat was the reconciliation of Indra and the Maruts after Indra had been annoyed at his proposing to give the Maruts an offering to the exclusion of Indra. This feat is the subject of three hymns of the Rigveda, and is often referred to in the Brahmanas though the exact details and significance of the legend are variously treated by Olderberg, Sieg, Hertel, and von Schroeder.

[Macdonell and Keith, Vedic Index of Names and Subjects, (Vol 1) p. 6-7].

অস্ত্রবিদ্যাতেও অগস্ত্য ঋষির পারদর্শিতার অসংখ্য প্রমাণ মেলে। বনবাসকালে রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেইসময় অগস্ত্য রামকে তাঁর বৈষ্ণব ধনু, অক্ষয় তূণ এবং ব্রহ্মদত্ত নামে একটি দিব্য তরবারি প্রদান করেন। রাম-রাবণের শেষ যুদ্ধের সময় রাম যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য সেইসময় কর্তব্যবোধের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রামকে 'আদিত্যহৃদয়' নামে এক মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে রামচন্দ্র যুদ্ধে অজেয় হয়ে উঠতে পারেন। মহাভারতে দ্রোণাচার্য অর্জুনকে বলেছেন যে, তিনি অগস্ত্যের শিষ্য অগ্নিবেশ (অগ্নিবেশ্য)-এর কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। দ্রোণাচার্য কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ অগস্ত্যমুনির কাছ থেকে 'ব্রহ্মশির' নামক অস্ত্র লাভ করেছিলেন বলে অশ্বত্থামা উল্লেখ করেছেন। তবে দ্রোণাচার্য নিজে বলেছেন যে, 'ব্রহ্মশির' নামক অস্ত্রটি অগ্নিবেশের কাছ থেকে পাওয়া। দ্রোণাচার্য প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে এই অস্ত্রটি দান করেন। অশ্বত্থামাও দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। অবশ্য পরম্পরা অনুসারে দ্রোণাচার্যকে অগস্ত্যের শিষ্যও বলা যেতে পারে। অগস্ত্যের ব্রহ্মশির নামক অস্ত্রটিও দ্রোণাচার্য শিষ্য পরম্পরাক্রমেই লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়।

[রামায়ণ ৩.১৩.৩২-৩৩; ৭.১০৬.১-৪;
মহা (k) ১.১৩৯.৯; ১০.১২.১৩;
(হরি) ১.১৩৪.৯; ১০.১৩.১৩]

☐ বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরে রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা হলেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর তাঁকে অভিনন্দন জানাতে অগস্ত্য উপস্থিত হয়েছেন অযোধ্যায়। রামের অনুরোধে অগস্ত্য পুলস্ত্য ঋষির বংশধারায় রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসের জন্ম এবং রাবণের জীবন কথা বিশদে বর্ণনা করেন অযোধ্যার রাজসভায় বসে।

সীতাকে নির্বাসনে পাঠাবার পর রাম পুষ্পক বিমানে চড়ে ভারতবর্ষ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন।

এই সময় অগস্ত্য মুনির আশ্রমে গিয়ে রাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অগস্ত্যমুনি সেই সময় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী জলশয্যায় শয়ন করে এক কঠিন তপস্যায় রত ছিলেন। সেই তপস্যা সমাপ্ত হলে রাম অগস্ত্যের কাছে বহু ধর্ম উপদেশ লাভ করেন, অগস্ত্য তাঁকে নানা পৌরাণিক কাহিনী শোনান।

[রামায়ণ ৭.১-৪৬. ৯১-৯৫ সর্গ]

□ মহর্ষি অগস্ত্য একদিন বনের মধ্যে নিজের পিতৃপুরুষদের অধোমুখে ঝুলতে দেখলেন। তাঁরা অগস্ত্যকে বললেন, যেহেতু অগস্ত্য অপুত্রক তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশ লোপ পাবে। এই কারণেই তাঁদের এই অবস্থা। নিজের পিতৃপুরুষদের অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়ে অগস্ত্য পুত্রলাভ ও বংশরক্ষার বিষয়ে চিন্তা করে বিবাহ করতে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু কোনো যোগ্য কন্যার সন্ধান পেলেন না। তখন তিনি সর্বোৎকৃষ্টা এবং সর্বাঙ্গসুন্দরী একটি কন্যাকে নিজের কল্পনার দ্বারা নির্মাণ করলেন। এইসময় বিদর্ভরাজ সন্তান কামনায় তপস্যা করছিলেন। অগস্ত্য এই কন্যাটি কন্যা-সন্তানরূপে তাঁকে দান করলেন। বিদর্ভের রাজমহিষীর গর্ভে এই কন্যা জন্মগ্রহণ করল। তার নাম হল লোপামুদ্রা। অসামান্য সুন্দরী ও পরম গুণবতী এই কন্যা যৌবনে পদার্পণ করলে তাকে সংসারধর্ম পালনের উপযুক্ত বিবেচনা করে অগস্ত্য মুনি বিদর্ভরাজের কাছে গিয়ে কন্যাটিকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করলেন। বিদর্ভরাজ বৃদ্ধ দরিদ্র ঋষির হাতে কন্যাদান করতে সংশয় বোধ করতে লাগলেন কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্যের অভিশাপের ভয়ে কিছু বলতেও পারলেন না। শেষ পর্যন্ত লোপামুদ্রা নিজেই পিতার সংকট দূর করলেন। স্বেচ্ছায় অগস্ত্যকে স্বামীরূপে বরণ করলেন তিনি। তারপর ঋষি পত্নীর মতোই কৌপীন, বল্কল, মৃগচর্ম ধারণ করে স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করলেন। অগস্ত্য গৃহস্থ হওয়া সত্ত্বেও অনেক, অনেক কাল কাটিয়ে দিলেন তপস্যায়। লোপামুদ্রা জীবন ধারণ করলেন সহধর্মচারিতায় তপস্বিনীর মতো। তারপর একদিন লোপামুদ্রার প্রতি হৃদয়াবেগ প্রকাশ করে অগস্ত্য পুত্র উৎপাদনের ইচ্ছাপ্রকাশ করলে লোপামুদ্রা তাতে সম্মতি জানালেন বটে, কিন্তু নিজের পিতৃগৃহের সমান অট্টালিকায়, উত্তম শয্যায় মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে সঙ্গমের অভিলাষ জানালেন স্বামীকে। পত্নীর অভিলাষ পূরণের জন্য ধনসম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন অগস্ত্যমুনি। সম্পদ লাভের আশায় একে একে রাজা শ্রুতর্বা, ব্রধ্নশ্ব এবং মহাধনী রাজা ত্রসদস্যুর কাছে গেলেন অগস্ত্য। রাজাদের তিনি জানালেন—আয় ও ব্যয় হিসাব করে, কারও কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না করে যেটুকু উদ্বৃত্ত সম্পদ দান করা সম্ভব সেটুকুই তিনি সন্তুষ্ট ভাবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু এই রাজারা কেউই অগস্ত্যকে দান করতে সমর্থ হলেন না। কারণ তাঁদের সকলেরই আয় ও ব্যয় সমান, উদ্বৃত্ত কিছুই নেই। রাজারা অগস্ত্যকে পরামর্শ দিলেন —ইল্বল দানব যথার্থই ধনী। তার কাছে গেলে অবশ্যই ধনসম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। রাজাদের সঙ্গে নিয়েই অগস্ত্য পৌঁছালেন ইল্বল দানবের কাছে।

ইল্বল দানব ছিল অত্যন্ত খলস্বভাব এবং মায়াবী বিদ্যায় পারদর্শী। ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষবশত সে ব্রহ্মহত্যার এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। মায়ার প্রভাবে ইল্বল ছোটোভাই বাতাপিকে মেষরূপ ধারণ করাত। তারপর তাকে ছেদন ও রন্ধন করে নিমন্ত্রিত অতিথি ব্রাহ্মণকে পরিবেশন করত ব্রাহ্মণকে বাতাপির মাংস ভোজন করাবার পর ইল্বল বাতাপির নাম ধরে ডাকতে থাকত। আর বাতাপি জীবন্ত হয়ে ব্রাহ্মণের উদরভেদ করে বের হয়ে আসত। এইভাবে সে বহু ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছিল। অগস্ত্য ইল্বল দানবের বাড়িতে উপস্থিত হলে সে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী রাজাদের মেষরূপী বাতাপির মাংস পরিবেশন করল। কিন্তু অগস্ত্যমুনি একাই সমস্ত মাংস আহার করলেন। আহার শেষ হলে ইল্বল যথারীতি বাতাপির নাম ধরে ডাকতে লাগল, কিন্তু বাতাপি আর বেরিয়ে এল না। ইল্বল বিস্মিত হলে অগস্ত্য মৃদু হেসে বললেন— বাতাপি কি করে বের হবে? আমি তাকে হজম করে ফেলেছি।

অগস্ত্য মুনির আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে ইল্বল বিস্মিত হল, হতাশও হল। শেষপর্যন্ত অগস্ত্যমুনিকে এবং তাঁর সঙ্গী রাজাদের প্রার্থনার অনেক বেশি ধন দান করল সে। অবশ্য রামায়ণে বাতাপি বধের ঘটনাটি বর্ণিত হবার পর বলা হয়েছে যে, বাতাপির মৃত্যু সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে ইল্বল অগস্ত্যকে আক্রমণ করে এবং

শেষপর্যন্ত অগস্ত্য তাঁর তপস্যার প্রভাবে ইল্বলকে ভস্মীভূত করেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত প্রভূত ধনসম্পদ আহরণ করে ফিরে এলেন অগস্ত্য মুনি। তাঁর পত্নীর সমস্ত অভিলাষ পূরণ করলেন। এরপর তিনি লোপামুদ্রাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কিরূপ পুত্রলাভ ইচ্ছা করেন—এক সহস্র পুত্র, না দশটি উৎকৃষ্ট পুত্র তুল্য একশত পুত্র কিংবা শতপুত্রের সমতুল্য দশটি পুত্র অথবা সহস্র গুণবান পুত্রের সমতুল্য একটিমাত্র পুত্র। লোপামুদ্রা সহস্র পুত্রের সমতুল্য একটিমাত্র পুত্র প্রার্থনা করলেন। পত্নীর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে সহস্র গুণবানপুত্রের সমতুল্য একটি পুত্রলাভের বর দিলেন। তারপর লোপামুদ্রার গর্ভাধান করে অগস্ত্য বনে গেলেন তপস্যা করতে। দীর্ঘ সাত বছর পর দৃঢ়স্যু নামে অগস্ত্যের মহাতেজস্বী ও মহাপণ্ডিত পুত্রের জন্ম হয়। এই বালক পরবর্তীকালে মহাকবি হয়েছিলেন। তাঁর অপর নাম ইধ্মবাহ। *[দ্র. দৃঢ়স্যু অথবা ইধ্মবাহ]*

ঋগ্‌বেদে অগস্ত্য লোপামুদ্রার যে কথোপকথন আছে সেখানে মিলনকামী অগস্ত্যকে লোপামুদ্রা প্রথমত প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। তিনটি পর্যায়ে অগস্ত্য লোপামুদ্রার মধ্যে এই ঋগ্‌বৈদিক সংলাপ মন্ত্রিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে অগস্ত্য লোপামুদ্রার মিলন কামনা করলে লোপামুদ্রা আজীবন তাঁর সেবা-শুশ্রূষার কাহিনী শুনিয়ে তাঁর শ্রান্তি জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু অগস্ত্য এই শ্রান্তি মানতে চাননি। কিন্তু লোপামুদ্রা প্রণয়সুখ সম্ভোগের জন্য একজন স্বামীর সার্বিক সামর্থ্য কামনা করেছেন। বোঝা যায়, এ সামর্থ্য শুধু শারিরীক নয়, বরঞ্চ উপভোগ যোগ্যতার ক্ষেত্রে আরও যত সাংসারিক উপাদান আছে, সেইদিকেই হয়তো লোপামুদ্রার প্রার্থনা ছিল। বৈদিক এই কাহিনীই মহাভারতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। *[ঋগ্‌বেদ ১.১৭৯ সূক্ত;*
মহা (k) ৩.৯৬-৯৮ অধ্যায়; ৯৯.১-২৯;
(হরি) ৩.৮০-৮২ অধ্যায়, ৮৩.১-৩১]

☐ একসময় দেবর্ষি নারদ পৃথিবী পর্যটন করতে করতে বিন্ধ্যপর্বতে উপস্থিত হলেন। বিন্ধ্যপর্বত তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, সসম্ভ্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং উত্তম আসন দিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। কথাপ্রসঙ্গে নারদ বললেন যে, তিনি ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ এবং লোকপালগণের বাসস্থান সমৃদ্ধশালী, সুমেরু পর্বত থেকে আসছেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নারদ বলতে লাগলেন—ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদার কারণে সুমেরু নিজেকে হিমালয় এমনকী দেবাদিদেবের বাসস্থান কৈলাস পর্বতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলে মনে করছে। নারদের কথা শুনে বিন্ধ্য পর্বত অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। সুমেরু পর্বতের এই গর্ব কীভাবে খর্ব করা যায়, কীভাবে বিন্ধ্য পর্বত সুমেরুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ হবেন—এই কথা ভাবতে লাগলেন। শেষে তাঁর মনে হল—সূর্য এবং গ্রহ নক্ষত্ররা তাঁকে নিত্য প্রদক্ষিণ করে—তাই সুমেরু পর্বতের এত অহঙ্কার। যদি সূর্যের গতিরোধ করা যায় তবে সুমেরু পর্বতের দর্পচূর্ণ হবে। এই কথা ভেবে বিন্ধ্য পর্বত পরদিন অপরাহ্নকালে সূর্যের গতিরোধ করলেন। ফলে উত্তর ও পূর্বদিকের জনপ্রাণী প্রখর সৌরতাপে দগ্ধ হতে লাগল এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে নেমে এল চিররাত্রির দুর্দশা। জগতে হাহাকার উঠল, সমস্ত প্রাণী জগতে ধ্বংস নেমে এল। সৃষ্টি নষ্ট হবার উপক্রম হলে চিন্তিত দেবতারা বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণকে এই সমস্যার কথা জানালেন। নারায়ণ বললেন—বারাণসীতে অতুল শক্তিধর অগস্ত্যমুনি আছেন। তিনিই বিন্ধ্যাচলের দর্পচূর্ণ করতে পারেন। নারায়ণের পরামর্শে দেবতারা অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন। জীবজগতের কল্যাণের জন্য অগস্ত্য সপরিবারে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলেন। অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হলে বিন্ধ্য পর্বত তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্বতের বিনম্র ব্যবহার এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণামে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—বাছা! আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তোমার উচ্চশিখরে আরোহণ করার সামর্থ্য আমার নেই। অতএব যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, ততক্ষণ তুমি এইরকম খর্ব হয়ে থাক। অগস্ত্যের আদেশে বিন্ধ্যপর্বত খর্ব হয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ দেশে গিয়ে অগস্ত্য আর ফিরলেন না। বিন্ধ্য পর্বতের উচ্চতা হ্রাস পাবার ফলে সূর্যের গতিপথ অবাধ হল। প্রকৃতি স্থিত হল পূর্বের মতোই। প্রসঙ্গত অগস্ত্যের এই ফিরে না আসা এবং বিন্ধ্যপর্বতের আশা যে

তিনি ফিরে আসবেন—এই ঘটনা থেকেই হয়তো পরবর্তীকালে অগস্ত্যযাত্রার প্রবাদ তৈরি হয়েছে। বিন্ধ্যপর্বতের গতিরোধ করার জন্যই অগস্ত্য মুনির 'অগস্ত্য' নামের উৎপত্তি—এ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

☐ তবে অগস্ত্যের দক্ষিণদিকে যাত্রা প্রসঙ্গে অন্য একটি কাহিনী স্কন্দ পুরাণে পাওয়া যায়। শিব পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষ্যে কৈলাসে বহু লোক সমাগম হলে সেই ভারে হিমালয় সংলগ্ন ভূভাগ নীচের দিকে বসে গেল। পৃথিবীর দক্ষিণভাগ এর ফলে উত্থিত হল। পৃথিবীর এক ভাগ নিমগ্ন এবং অপর ভাগ উর্ধ্বগত হলে প্রাণীজগতে এবং দেবতাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হল। তাঁরা মহাদেবের শরণাপন্ন হলে মহাদেব পৃথিবীর বিকৃতাবস্থা সংশোধনের জন্য অগস্ত্যকে দক্ষিণে যাত্রা করতে বললেন। মহাদেবের আদেশে অগস্ত্য বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে দক্ষিণে পৌঁছাতেই পৃথিবী পূর্বের মতো সাম্যভাব লাভ করল।

[মহা(k) ৩.১০৪.১-১৫; (হরি) ৩.৮৮.১-১৫;
দেবী ভাগবত পু. ১০.২-৭ অধ্যায়;
স্কন্দ পু. (বিষ্ণু/বেঙ্কটাচল) ৩১.১৮-৩৭]

☐ একসময়ে 'কালেয়' নামক দানবরা দৈত্যরাজ বৃত্রাসুরের অধীনে সমগ্র মর্ত্যবাসীকে অত্যাচার করত, এমনকী দেবতাদের কাছেও তারা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করলে তারা পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রের তলদেশে জলদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল। সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে এসে তারা আশ্রমবাসী তপস্বীদের অত্যাচার করত, আবার গিয়ে লুকিয়ে পড়ত জলদুর্গে। সমুদ্রের তলদেশবাসী এই দানবদের বধ করার চেষ্টা করেও দেবতারা ব্যর্থ হলেন। [অগস্ত্যের জন্ম প্রসঙ্গে এই কাহিনী আলোচিত হয়েছে।] শেষ পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাঁরা নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। নারায়ণ এই দানবদের বধ করার জন্য সমুদ্রকে নষ্ট করার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন—দেবতারা এ কাজের জন্য মহর্ষি অগস্ত্যকে অনুরোধ করুন। তিনিই এই কাজ করতে সমর্থ হবেন। দেবতাদের অনুরোধে জগতের কল্যাণের জন্য অগস্ত্য মহাসমুদ্র পান করলেন। সমুদ্র শুষ্ক হয়ে গেলে দানবরা আর লুকিয়ে থাকতে পারল না। দেবতারা সহজেই তাদের বধ করলেন। কয়েকটি মাত্র জীবিত দানব পালিয়ে গিয়ে পাতালে প্রবেশ করল। এরপর দেবতারা অগস্ত্যকে সমুদ্র আবার পূরণ করে দেবার জন্য অনুরোধ করলে অগস্ত্য বললেন—আমি সে জল হজম করে ফেলেছি। অতএব সমুদ্রকে পূরণ করার অন্য উপায় দেখুন।

সমুদ্র জলশূন্য হওয়ায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেবতাদের ব্রহ্মা আশ্বাস দিলেন—পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করলে সেই জলরাশিতেই সমুদ্র আবার পরিপূর্ণ হবে। পরবর্তীকালে ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করলে গঙ্গা ভগীরথের নির্দেশিত পথ ধরে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে সাগরে প্রবেশ করেন। সেই বিপুল জলরাশিতে শুষ্ক সমুদ্র আবার পরিপূর্ণ হয়েছিল।

[দ্র. গঙ্গা]

অগস্ত্যের এই অদ্ভুত কীর্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাঁকে বর দিতে চাইলেন। অগস্ত্য প্রার্থনা করলেন যে, তাঁর যেন একটি বিমান থাকে এবং দক্ষিণ দেশের পার্বত্য অঞ্চলে তিনি সেই বিমানের বৈমানিক হয়ে বিচরণ করতে চান। পুনশ্চ, তাঁর সেই বিমান আকাশপথে উদয় হলে যে ব্যক্তি তাঁর অর্চনা করবে সে যেন সপ্তলোকের অধিপতি হয়। দেবতারা তাঁকে সেই বর দিলেন।

[মহা (k) ৩.১০৩.৭-১২; ৩.১০৪.১৭-২৪;
৩.১০৫.১-১৬; ৩.১০৬.১-৩;
(হরি) ৩.৮৭.৩৩-৩৮; ৩.৮৮.১৭-২৫;
৩.৮৯.১-১৭; ৩.৯০.১-৩;
মৎস্য পু. ৬১.৩৬-৪১]

☐ বিভিন্ন সময় দেবতাদের অনুরোধে; কখনও বা কর্তব্যের তাগিদে অগস্ত্যকে অত্যাচারী দৈত্য-দানবদের দমনে উদ্যত হতে দেখা যায়। ইল্বল ও বাতাপির কাহিনী আগেই আলোচিত হয়েছে, সমুদ্র শোষণ করে তিনি দেবতাদের অসুর বধে সহায়তা করেছেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব থেকে জানা যায়, একবার দেবতারা অসুরদের হাতে পরাজিত হয়ে অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলে অগস্ত্য তাঁর ক্রোধাগ্নিতে অসুর সেনাকে ভস্মীভূত করেছিলেন। রামায়ণ থেকে স্পষ্ট ভাবে জানা যায় যে অগস্ত্য অত্যাচারী রাক্ষসদের দমন করে দণ্ডকারণ্য তথা

দক্ষিণদেশকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন—

যদা প্রভৃতি চাক্রান্তা দিগয়ং পুণ্যকর্মণা।
তদা প্রভৃতি নির্বৈরাঃ প্রশান্তা রজনীচরাঃ॥
নাম্না চেয়ং ভগবতো দক্ষিণা দিক্ প্রদক্ষিণা।

[রামায়ণ ৩.১১.৮৩-৮৪;
মহা (k) ১৩.১৫৫. ১-১৩; (হরি) ১৩.১৩৩.১-১৩]

□ একসময় ত্রিশিরা ও বৃত্রাসুর নামে দুজন অসুরকে বধ করার ফলে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য ইন্দ্র ইন্দ্রপদ ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। স্বর্গরাজ্য ইন্দ্রশূন্য হলে দেবতা এবং ঋষিরা মর্ত্যবাসী, তেজস্বী, পরমধার্মিক চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষকে ইন্দ্রপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। নহুষ ঋষিদের তপোবলে ইন্দ্রপদ গ্রহণের উপযুক্ত বল ও তেজ লাভ করে স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত হলেন এবং ধর্মরক্ষা ও প্রজাপালন করতে লাগলেন। কিন্তু ক্রমে নহুষ অহঙ্কারী হয়ে উঠতে লাগলেন। ধর্মপথ ত্যাগ করে তিনি বিলাসী ও কামুক হয়ে উঠলেন এবং সর্বদা সুরসুন্দরী পরিবৃত হয়ে আমোদ প্রমোদে দিন কাটাতে লাগলেন। একসময় তাঁর দৃষ্টি পড়ল ইন্দ্রের পত্নী শচীর উপর। নহুষ শচীকে লাভ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন, এমনকী তাঁর উপর বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করলেন না। নিরুপায় শচী ব্রত উপলক্ষ্য করে নহুষের কাছে কিছুদিন সময় চেয়ে নিলেন। শচী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ব্রত সমাপ্ত হলে তিনি নিজেই নহুষের কাছে যাবেন। এরপর অত্যাচারী নহুষের ভয়ভীতা শচীদেবী দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে নহুষের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। বৃহস্পতির কৃপায় শচী নিজের স্বামী, তপস্যারত ইন্দ্রের সন্ধান পেলেন। ইন্দ্রের পরামর্শে শচী নহুষকে বললেন—আপনি যদি ঋষিদের দ্বারা বাহিত শিবিকায় আরোহণ করে আমার ভবনে আসেন তাহলেই আমাকে লাভ করতে পারবেন। একথা শুনে নহুষ শচীদেবীর ভবনে যাবার জন্য ঋষিবাহিত শিবিকার ব্যবস্থা করলেন। মুনি ঋষিরা ধীরে ধীরে শিবিকা বহন করে নিয়ে চলল। অধৈর্য্য নহুষ সেইসব ঋষিদের দ্রুত চলার আদেশ দিতে লাগলেন কটু ভাষায়। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে তিনি অগস্ত্যের মাথায় পদাঘাত করেন। অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তুমি যখন অধৈর্য্য হয়ে সর্প সর্প (চল চল) বলে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করেছ তখন তুমি অজগর সর্প হও—

সর্প সর্পেতি বচনাস্নোদয়ামাস তৌ তদা॥
অগস্ত্য শিবিকাবাহী ততঃ ক্রুদ্ধো শপন্নৃপম্।
বিপ্রাণামবমন্তা ত্বমুস্মত্তো'জগরো ভব॥

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ১৫.৮৪-৮৫]

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নহুষ প্রতিদিনই ঋষিদের নিজের রথের সঙ্গে যুক্ত করে রথ চালনা করাতেন। ইন্দ্র পদ লাভ করে অহঙ্কারে মত্ত নহুষের এই পাপাচারের প্রতিকার করার জন্য ব্রহ্মার আদেশে মহর্ষি ভৃগু, তৎপর হলেন। ভৃগু এবং অগস্ত্য পরামর্শ করে নহুষকে স্বর্গ থেকে পতিত করার উপায় করলেন। ভৃগু অগস্ত্যের জটার মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যকে নিজের রথে যুক্ত করতে চাইলে অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং আনন্দের সঙ্গে সম্মত হলেন। নহুষ অগস্ত্যকে কশাঘাত করতে করতে রথ চালনা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মোহবশত নহুষ অগস্ত্যের মাথায় পদাঘাত করলে তাঁর জটায় অবস্থানকারী ভৃগু ঋষি তাঁকে অভিশাপ দিয়ে অজগর সর্পরূপ দান করেন। নহুষ ভীত ও কাতর ভাবে অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য অনুরোধ করতে থাকলে অগস্ত্য (অথবা ভৃগু) তাঁকে বললেন—তোমার বংশে জাত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তুমি শাপমুক্ত হবে।

এইসময়ে সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রের প্রায়শ্চিত্তের সময় শেষ হয়েছিল। নহুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতারা তাঁর সঙ্গে মিলে নহুষকে বিতাড়িত করার পরামর্শ করছিলেন। এই সময় অগস্ত্যমুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে নহুষের পতনের সংবাদ দিলেন। ঋষি ও দেবতারা মিলে ইন্দ্রকে আবার স্বর্গের সিংহাসনে স্থাপন করলেন।

[মহা (k) ৩.১৮১.৩০-৪৩; ৫.১১-১৭ অধ্যায়;
১২.৩৪২.৪২-৪৯; ১৩.১০০ অধ্যায়;
(হরি) ৩.১৫২.২৮-৪৫; ৫.১১-১৭ অধ্যায়;
১২.৩২৮.১১৯-১৮২; ১৩.৮৭ অধ্যায়;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ১৫ অধ্যায়]

☐ একবার দুরাচারী যক্ষ সুন্দ অগস্ত্যের অভিশাপে নিহত হয়। যক্ষের পত্নী ছিলেন অতুল বলশালী যক্ষিণী তাড়কা। স্বামীর মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়কা পুত্র মারীচকে নিয়ে অগস্ত্যকে বধ করার ইচ্ছায় আক্রমণ করলে অগস্ত্যের শাপে তাড়কা ও মারীচ ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট রাক্ষসী এবং রাক্ষসে পরিণত হয়। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বমিত্রের আশ্রমে যাবার পথে এই তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন।

[রামায়ণ ১.২৫. এবং ২৬ সর্গ;
বায়ু পু. ৬৭.৭১-৭২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৩৪-৩৫]

☐ দক্ষিণ ভারতে পাণ্ড্যদেশে ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মলয়পর্বতে আশ্রম নির্মাণ করে মৌন হয়ে নিষ্ঠাভরে শ্রীহরি বিষ্ণুর আরাধনায় রত ছিলেন। এমন সময় মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেইস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাসনায় রত ছিলেন, তাই মহর্ষি অগস্ত্যকে দেখেও অভ্যর্থনা করলেন না। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে অগস্ত্য ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভিশাপ দিলেন— তুমি যখন এমন জড়বুদ্ধি হস্তীর মতো আচরণ করলে, তখন তুমি হস্তী হও। অগস্ত্যের অভিশাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন হস্তীজন্ম লাভ করলেন। কিন্তু শ্রীহরির কৃপায় তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৮.৪.৭-১৩]

☐ একসময় কুশবতীনগরীতে দেবতাদের এক মন্ত্রণাসভা হয়। কুবের তাঁর সশস্ত্র যক্ষবাহিনী নিয়ে সেই মন্ত্রণাসভায় যোগদান করতে গিয়েছিলেন। পথে যমুনানদীর তীরে তাঁরা মহর্ষি অগস্ত্যকে তপস্যারত অবস্থায় দেখতে পেলেন। কুবেরের সখা তথা রাক্ষসদের অধিপতি অহঙ্কারী মণিমান যক্ষ মোহবশত তপস্যারত মহর্ষি অগস্ত্যের মাথায় থুতু ফেললেন। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে অগস্ত্য কুবেরকে অভিশাপ দিলেন— কুবের! তোমার এই দুরাত্মা সখা যখন তোমার সামনেই আমার অপমান করল, তখন তোমার সৈন্যগণ ও এক ভয়ঙ্কর মানুষের হাতে বিনাশপ্রাপ্ত হবে এবং তুমি নিষ্ক্রিয়ভাবে সেই ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকবে। এর পরে তুমি অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।

এরপর পাণ্ডবদের বনবাসকালে ভীমসেন কুবেরের রাজধানী তথা গন্ধমাদন পার্বত্য অঞ্চলে উপস্থিত হলে ভীমের সঙ্গে কুবেরের যক্ষ ও রাক্ষসবাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এই সময় কুবেরের সখা মণিমান ভীমকে আক্রমণ করেন। কিন্তু একা ভীম সেই বিশাল সেনাবাহিনী এবং মণিমানকে পরাজিত ও নিহত করলেন। এইভাবে মহর্ষি অগস্ত্যের অভিশাপ সত্যে পরিণত হল। কুবেরও শাপমুক্ত হলেন।

[মহা (k) ৩.১৬০.৩৩-৭৭; ১৬১ অধ্যায়;
(হরি) ৩.১৩৩.৩৪-৭৮; ১৩৪ অধ্যায়]

☐ বিদর্ভরাজ শ্বেত মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করে সেই পুণ্যফলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ করেন। *[দ্র. শ্বেত$_{২}$]*

☐ একবার মহর্ষি অগস্ত্য দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী এক মহাযজ্ঞের সঙ্কল্প করলেন। সেই যজ্ঞে বহু মহান তপস্বী, মুনি, ঋষি অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য নিজের সামর্থ্য অনুসারে আমন্ত্রিত ঋষিদের উপযুক্ত আহারের আয়োজন করতেন। এইভাবে নির্বিঘ্নে যজ্ঞ চলতে থাকলে একসময় দেবরাজ ইন্দ্র হঠাৎই বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিলেন। বৃষ্টি বন্ধ হলে চিন্তিত ঋষিরা যজ্ঞকর্মের মাঝে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন— মনে হয় ইন্দ্র এই বারো বছর বর্ষণ করবেন না। অনাবৃষ্টি হলে শস্য উৎপাদন বন্ধ হবে। শস্য উৎপাদন বন্ধ হলে অগস্ত্যের এই যজ্ঞই বা সম্পন্ন হবে কীভাবে, এতজন আমন্ত্রিত মুনি ঋষির ভরণ পোষণই বা তিনি করবেন কীভাবে? অগস্ত্য ঋষিদের অভয় দিয়ে বললেন—ইন্দ্র যদি বারো বছর বর্ষা না করেন, তাহলেও এই যজ্ঞের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি তপোবনে মানসিক যজ্ঞ করব এবং এই যজ্ঞের আয়োজনে ও অতিথি সৎকারেও বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না। অগস্ত্যের তপোবলে যজ্ঞের উপকরণ, ধনসম্পদ, আহারের আয়োজন সমস্তই সৃষ্টি হল। মহর্ষি অগস্ত্যের এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে বিস্মিত ঋষিরাও সানন্দে তাঁর যজ্ঞে অংশগ্রহণ করলেন। অগস্ত্যের তপোবল প্রত্যক্ষ করে ইন্দ্রও যথাসময়ে বর্ষা করলেন। অগস্ত্যের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। স্বয়ং ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে অগস্ত্যের যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। *[মহা (k) ১৪.৯২. অধ্যায়;*
(হরি) ১৪.১০৫ অধ্যায়]

☐ পুরাকালে একসময় প্রভাস তীর্থে সমবেত হয়ে ঋষিরা ঠিক করেছিলেন যে, তাঁরা ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থে ঘুরে বেড়াবেন। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সেই তীর্থযাত্রীদলের নেতা হলেন এবং ঋষিদের তীর্থভ্রমণ করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নানাতীর্থে পরিভ্রমণের পর তাঁরা পবিত্র ব্রহ্মসরোবরে এসে উপনীত হলেন। ঋষিরা ব্রহ্মসরোবরে স্নান করে পদ্মের মৃণাল সংগ্রহ করতে লাগলেন। অগস্ত্য মুনি ব্রহ্ম সরোবর থেকে একটি সুন্দর পদ্মফুল সংগ্রহ করেছিলেন। হঠাৎই দেখা গেল অগস্ত্য মুনির সেই ফুলটি কেউ চুরি করে নিয়েছে। অগস্ত্য দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে অন্যান্য ঋষিদের বললেন—আপনাদের মধ্যেই কেউ নিশ্চয় আমার পদ্মপুষ্পটি অপহরণ করেছেন। সেটি এখনই আমাকে ফিরিয়ে দিন। মহর্ষি অগস্ত্যের অভিযোগ শুনে ঋষিরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন—আমরা শপথ করে বলছি যে, আমরা আপনার পদ্মপুষ্প অপহরণ করিনি। তারপর তাঁরা প্রত্যেকে প্রকৃত অপহরণকারীর উদ্দেশে কঠোর অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন। সকলের শেষে ইন্দ্র বললেন— যিনি আপনার পদ্ম হরণ করেছেন সেই ব্রাহ্মণ সমাপ্তব্রহ্মচর্য্য, যজুর্বেদজ্ঞ অথবা সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করুন অথবা অথর্ববেদ অধ্যয়ন করে স্নান করুন। যিনি পদ্ম হরণ করেছেন, তিনি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করুন, ধার্মিক এবং ন্যায়বান ব্যক্তি হিসাবে তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হোক এবং তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করুন। একথা শুনে মহর্ষি অগস্ত্য বললেন—আপনি পদ্ম অপহরণকারীকে আশীর্বাদ করেছেন। অতএব, অবশ্যই আপনিই পদ্মটি নিয়েছেন। আমার পদ্ম আমাকে ফিরিয়ে দিন। ইন্দ্র অগস্ত্যর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন—আমি এই ঋষিদের মুখ থেকে ধর্মকথা শ্রবণের অভিলাষে পদ্মপুষ্প অপহরণ করেছিলাম। তাঁদের শপথবাক্য আমার সেই অভিলাষ পূরণ করেছে। আপনি এখন আপনার পদ্ম ফিরিয়ে নিন এবং আমাকে মার্জনা করুন। মহর্ষি অগস্ত্য প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রকে ক্ষমা করলেন। *[মহা (k) ১৩.৯৪.৩-৫০; (হরি) ১৩.৮০.৩-৫০]*

☐ ভারতবর্ষে আর্যায়ণের প্রথম পর্যায়ে মহর্ষি অগস্ত্যের গভীর অবদান আছে বলে মনে হয়। আর্যদের মূল বাসভূমি সরস্বতী দৃষদ্বতীর পুণ্য অঞ্চল ছেড়ে তিনি কয়েকবার উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমন করেছেন বটে, কিন্তু বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করার পর সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারত জুড়ে আমরা অগস্ত্যের বহুল উপস্থিতি দেখতে পাই। তাতে একদিকে যেমন এই প্রাচীন ব্রাহ্মণটিকে যথেষ্ট মর্য্যাদাশালী বলে মনে হয়, তেমনই তাঁর পর্যটন এবং পরিক্রমণ আমাদের মুগ্ধ করে।

[দ্র. অগস্ত্যাশ্রম]

অগস্ত্য-আশ্রম$_১$ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সর্বত্রই অসংখ্য অগস্ত্য-আশ্রমের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। একথা সত্য যে, সরস্বতী-দৃষদ্বতী নদী-সংলগ্ন যে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ, সেখানেই প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যসভ্যতার সূচনা ও ব্যাপ্তি ঘটেছিল সবচেয়ে বেশি। যেহেতু ঋষি অগস্ত্য আর্যসভ্যতা বিস্তার-পর্বের অন্যতম কুশীলব, সেহেতু ধারণা করাই যেতে পারে যে, তিনি এই সরস্বতী-দৃষদ্বতী নদী এবং কুরুক্ষেত্র সংলগ্ন আর্যসভ্যতার যে কেন্দ্রস্থল, সেই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উত্তর ভারতের রুদ্রপ্রয়াগ থেকে শুরু করে সমগ্র পূর্ব, পশ্চিম এমনকি দক্ষিণ ভারতের একাধিক স্থানেও অগস্ত্য-আশ্রম নামে একটি পবিত্র স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি প্রাচীন লঙ্কা বা আজকের শ্রীলঙ্কা দেশেও অগস্ত্য গিয়েছিলেন এমন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে, প্রতিটি অগস্ত্য-আশ্রমই ঋষি অগস্ত্যের নামাঙ্কিত পুণ্যস্থান, সেখানে অগস্ত্য স্ব-শরীরে বাস করেছেন এমনটা নাও হতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রভাব সেখানে কাজ করত, এটা স্বীকার করতেই হবে। সম্ভবত ঋষি অগস্ত্য যে সকল স্থানেই আর্যায়ণের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন এবং যেখানেই একবার অবস্থান করেছিলেন, সেখানেই অগস্ত্যাশ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল।

☐ পৌরাণিক ভাবনায় অগস্ত্য-আশ্রমে পিতৃপুরুষের চরণাশ্রিত হয়ে উপবাস ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন করলে বেদোক্ত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। *[পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম, স্বর্গ.) ৬.৫.]*

☐ পূর্বেই এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋষি অগস্ত্য খুব সম্ভবত সরস্বতী-দৃষদ্বতী নদী সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। সেই সম্ভাবনা থেকেই অগস্ত্যের যে কল্পিত

গতিপথ, (যে গতি পথেই অগস্ত্য-আশ্রমগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়) তার ওপর নির্ভর করেই অগস্ত্য-আশ্রমগুলির অবস্থান নিয়ে কিছু তর্কযোগ্য অভিমত প্রকাশ করা যায়।

অগস্ত্য-আশ্রম$_{২}$ মহাভারতের বনপর্বে পুষ্করের কাছে অগস্ত্য সরোবর নামে একটি সরোবরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৮২.৪৪; (হরি) ৩.৬৭.৬৪]

আবার একথাও ঠিক যে, পুষ্করের চার কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বতের উপর অগস্ত্যাশ্রম নামে একটি জায়গা রয়েছে। এখানে অগস্ত্য-গুহা নামে একটি গুহাও দেখা যায়।

☐ এই অগস্ত্য সরোবর ও অগস্ত্যগুহা বা আশ্রমের অস্তিত্ব থেকে সহজেই অনুমেয় যে ঋষি অগস্ত্য পুষ্কর সংলগ্ন অংশে কোনো এক সময়ে অধিষ্ঠান করতেন। তা থেকেই এই অগস্ত্য-আশ্রমটির সৃষ্টি হয়েছে বলেই মনে হয়।

[Indologica Jaipurensia: Research Journal of the Historical Research Documentation Programme, Jaipur. Vol. I, p.10]

অগস্ত্য-আশ্রম$_{৩}$ ঋষি অগস্ত্য সম্ভবত পুষ্কর থেকে বিদর্ভের (যা বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর ও অমরাবতী বিভাগ নিয়ে গঠিত) একটি স্থানে গিয়েছিলেন। মহাভারত ও ঋগ্‌বেদ থেকে জানা যায় যে, অগস্ত্য বিদর্ভরাজের কন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন এবং এই বিবাহসূত্রেই বিদর্ভে তাঁর আগমনও ঘটেছিল। সুতরাং এই অঞ্চলেও একটি অগস্ত্য-আশ্রম থাকাই স্বাভাবিক।

[মহা (k) ৩.৯৬.২০-৩.৯৭.১৫; (হরি) ৩.৮০.২১-৩.৮১.৮]

অগস্ত্য-আশ্রম$_{৪}$ উত্তর প্রদেশে সরই-অঘৎ (Sarai Aghat) নামে একটি স্থান আছে। সেখান থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং সাঙ্কিসা বা সাঙ্কাশ্য থেকে এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে অগস্ত্য-আশ্রম নামে একটি স্থান রয়েছে। পণ্ডিত N.L. Dey এর প্রমাণ হিসেবে পণ্ডিত Alois Anton Fuhrer-এর রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। Fuhrer স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, অধুনা উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত এই সরই অঘৎ স্থানটির নামের সঙ্গেই পৌরাণিক ঋষি অগস্ত্যের নাম জড়িয়ে আছে। অঘৎ বা অগহৎ শব্দটি অগস্ত্যেরই পরিবর্তিত রূপ। অগস্ত্য মুনির আশ্রম ছিল বলেই তাঁর স্মৃতি বিজড়িত এই স্থানটির নামের সঙ্গে পরিবর্তিত বা অপভ্রষ্ট রূপে হলেও মহর্ষি অগস্ত্যের নাম এখনও জড়িয়ে আছে।

[GDAMI (N.L. Dey) p. 2; Alois Anton Fuhrer, The Monumental Antiquities and Inscriptions, p. 88; Uttar Pradesh District Gazetters: Etah, p. 273]

অগস্ত্য-আশ্রম$_{৫}$ রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বারো মাইল দূরে একটি অগস্ত্যাশ্রমের অবস্থান পাওয়া যায়। এখানে অগস্ত্যমুনির নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানেই অগস্ত্য ঋষির আশ্রম বলে অবস্থিত ছিল মনে করা হয়।

মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে যে, পূর্বদিকে প্রয়াগে অগস্ত্য ঋষির প্রধান আশ্রমটি অবস্থিত—

প্রয়াগমিতি বিখ্যাতং তস্মাদ্ভরতসত্তম।
অগস্ত্যস্য তু রাজেন্দ্র তত্রাশ্রমবরো নৃপ॥

[মহা (k) ৩.৮৭.১৯-২০; (হরি) ৩.৭২.১৯-২০]

অগস্ত্য-আশ্রম$_{৬}$ যুধিষ্ঠির গয়শির পর্বত অতিক্রম করে অগস্ত্য আশ্রম বলে একটি স্থানে এসেছিলেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই স্থানকে বাতাপিপুরী বা মণিমতীপুর বলে উল্লেখ করেছেন। *[দ্র. নীলকণ্ঠ টীকা]*

[মহা (k) ৩.৯৬.১; (হরি) ৩.৮০.১]

☐ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, বিহারের পাটনা জেলার অন্তর্গত দিনাপুর তহসিলই এই অগস্ত্যাশ্রমের আধুনিক অবস্থান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দিনাপুরেরই প্রাচীন নাম ছিল মনিয়ারি, যা নীলকণ্ঠ উল্লিখিত মণিমতীপুরীর অপভ্রংশ হতে পারে।

[JASB, V. 81-84; JBORS, II. 441-447]

গঙ্গানদীর ওপরে দানাপুর বা দিনাপুরে একটি বিখ্যাত ঘাট রয়েছে, ১৮৫৯ সালে পর্যন্ত এটি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ঘাটগুলির মধ্যে অন্যতম রূপে বিবেচিত হত।

তবে পণ্ডিতরা বর্তমান মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ (Aurangabad)-এর কাছে অবস্থিত Ellora বা Elapur কেই প্রাচীন মণিমতীপুরী বলে মনে করেন। পণ্ডিত N.L. Dey স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে এই মণিমতীপুরী ইল্বলের রাজধানী ছিল বলে ইল্বলের নাম মাহাত্ম্যেই স্থানটি

পরবর্তী সময়ে ইল্বলপুর বা এলাপুর বা এলোরা নামে বিখ্যাত হয়। এর অদূরেই বাতাপিপুরী নামে একটি স্থানের অস্তিত্ব আজও আছে। বাদামি নামেও এই স্থানটি বিখ্যাত। সেক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের গন্তব্য অগস্ত্যাশ্রম মহারাষ্ট্রের **Ellora** বা **Elapur** অঞ্চলের নিকটবর্তী ছিল বলেই ধারণা হয়। *[দ্র. মণিমতীপুরী]*

[GDAMI (Dey) p. 77, 126]

অগস্ত্য-আশ্রম$_{৭}$ রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মনোরম মহেন্দ্র পর্বতটি অগস্ত্যকর্তৃক নির্মিত এমন কথা বলা হয়েছে। *[রামায়ণ ৪.৪১.১৯]*

স্পষ্টতই এই মহেন্দ্র পর্বতে অন্য একটি অগস্ত্যাশ্রমের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। মহেন্দ্র পর্বত বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত।

[দ্র. মহেন্দ্র পর্বত]

অগস্ত্য-আশ্রম$_{৮}$ মহাভারতের বনপর্বে বৈদূর্য্য পর্বতে অগস্ত্য-আশ্রমের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। এই আশ্রমটি অতি মনোহর।

[মহা (k) ৩.৮৮.১৮; (হরি) ৩.৭৩.১৮]

পণ্ডিতদের মতে, আজকের সাতপুরা পর্বতই প্রাচীন বৈদূর্য্য পর্বত। *[GDAMI (Dey) p. 2; EAIG (Kapoor) p. 14]*

অগস্ত্য-আশ্রম$_{৯}$ রামায়ণে বলা হয়েছে যে, ঋষি অগস্ত্যের আশ্রম তাঁর ভাইয়ের আশ্রম থেকে চার যোজন দক্ষিণে অবস্থিত। এই অগস্ত্য-আশ্রমের বর্ণনায় ঋষি অগস্ত্যের বহুতর কীর্তিকলাপও স্মরণ করা হয়েছে এবং সে সবই দক্ষিণ ভারতে ঘটেছে এমন ঘটনা। অগস্ত্যের পূর্বানুগমনের ফলেই ভারতের দক্ষিণাঞ্চল সকলের বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল—

যস্য ভ্রাত্রা কৃতেয়ং দিক্ শরণ্যা পুণ্যকর্মণা।

অগস্ত্য ঋষির প্রভাবেই দক্ষিণ ভারতে আর্যায়ণ সম্ভব হয়েছিল—একথা প্রতিষ্ঠিত সত্য—

নাম্না চেয়ং ভগবতো দক্ষিণা দিক্ প্রদক্ষিণা।

[রামায়ণ ৩.১১.৩৭-৮৪]

এই তথ্য অনুযায়ী অগস্ত্যের আশ্রমটিকে পণ্ডিতেরা নাসিকের পূর্বদিকে আকোলহ নামে জায়গাটির সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন।

[EAIG (Kapoor) p. 14; GDAMI (Dey) p. 2]

অগস্ত্য-আশ্রম$_{১০}$ মহারাষ্ট্রের নাসিকের চব্বিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অগস্তি পুরী নামে একটি জায়গা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন—অগস্ত্য এখানেও এসেছিলেন এবং তাঁর নামে একটি আশ্রম এখানেও ছিল। *[EAIG (Kapoor) p. 14, GDAMI (Dey) p. 2]*

অগস্ত্য-আশ্রম$_{১১}$ মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে একটি অগস্ত্যাশ্রম রয়েছে।

এই কোলাপুরেরই (**Kolhapur**) প্রাচীন নাম কোলাহলপুর। অগস্ত্য ঋষি এই কোলাহলপুরে একবার এসেছিলেন বলে মনে করা হয়।

[EAIG (Kapoor) p. 14; GDAMI (Dey) p. 2]

অগস্ত্য-আশ্রম$_{১২}$ পাণ্ড্যদেশে গোকর্ণের কাছে দেবসহ পর্বতে একটি অগস্ত্যাশ্রম রয়েছে। যদিও এই আশ্রমটি অগস্ত্যের কোনো শিষ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কেননা মহাভারতে এটি অগস্ত্যশিষ্যের আশ্রম বলেই কথিত হয়েছে—

আশ্রমো'গস্ত্যশিষ্যস্য পুণ্যে দেবসহে গিরৌ।

কিন্তু এখানে কখনো অগস্ত্যের উপস্থিতি ঘটেছিল বলেই অগস্ত্যের নামেই এই আশ্রমের প্রসিদ্ধি ঘটেছে। মহাভারতে এই আশ্রমটিকে তাম্রপর্ণী নদীর কাছে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত একটি শৃঙ্গ থেকে, যেটি অগস্ত্যমুনির নামানুসারে অগস্ত্যকূট গিরিশৃঙ্গ নামে খ্যাত। *[দ্র. অগস্ত্যকূট]*

বর্তমান তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি বা তিন্নেভেলি জেলায় এই পর্বতটির অবস্থান। পাণ্ড্যদেশ বলতেও বর্তমান ভারতের তামিলনাড়ু অঞ্চলটিকেই বোঝায়। সুতরাং এই অগস্ত্য-আশ্রমটি অগস্ত্যকূট শৃঙ্গেরই কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়। *[দ্র. তাম্রপর্ণী]*

[মহা (k) ৩.৮৮.১৫-১৭; (হরি) ৩.৭৩.১৫-১৭; GDAMI (Dey) p. 203]

□ রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীব তাঁর বানরযোদ্ধা ও সহচরদের দক্ষিণ দিকে সীতার সন্ধানে পাঠানোর সময় পথ বর্ণনা করে জানিয়েছিলেন যে, তারা মলয় পর্বতের শীর্ষে বলশালী ঋষি অগস্ত্যের দেখা পাবে। অর্থাৎ সেখানে তিনি অবস্থান করেন। *[রামায়ণ ৪.৪১.১৫]*

□ বলরাম একবার এই মলয় পর্বতেই ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৭৯.১৬]

☐ বিন্ধ্য পর্বতের পরপারে ভারতবর্ষের দক্ষিণে একেবারে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যে ভূ-ভাগ তার আর্যায়ণ অগস্ত্যেরই কীর্তি। এই কারণেই বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বতের (যাকে এখনও লোকে মহামলয় বলে) ওপরে অগস্ত্যাশ্রমের অবস্থান নির্ণীত হয়েছে—

অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুরনমস্কৃতম্।

[বায়ু পু. ৪৮.২৩; ভাগবত পু. ৬.৩.৩৫]

☐ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মলয় পর্বত মূলত পশ্চিমঘাট পর্বতের দক্ষিণাংশ, যে অংশটি কাবেরী নদীরও দক্ষিণভাগে বিস্তৃত হয়েছে, পণ্ডিতরা তাকেই মলয় পর্বত বলে চিহ্নিত করেন। সেক্ষেত্রে পাণ্ড্যদেশের যে অগস্ত্যাশ্রম তীর্থযাত্রার সময় পাণ্ডবরা দর্শন করেছিলেন, তাকে আমরা খুব স্পষ্টভাবেই মলয় পর্বতের অগস্ত্যাশ্রম-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে বুঝতে পারি। এই পর্বত থেকেই তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি।

[EAIG (Kapoor) p. 14;
GDAMI (Dey) p. 122]

অগস্ত্য-আশ্রম$_{১৩}$ রামায়ণে রামচন্দ্র ও লঙ্কারাজ রাবণের যুদ্ধের সময় ঋষি অগস্ত্য যুদ্ধ দেখবার জন্য সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। অগস্ত্য রামচন্দ্রকে আদিত্যহৃদয় মন্ত্র শুনিয়েছিলেন এবং পরামর্শও দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

এ থেকেই বোঝা যায়, ঋষি অগস্ত্য লঙ্কারাজ্যেও গিয়েছিলেন। ফলত সেখানেও তাঁর নামাঙ্কিত একটি আশ্রমের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। *[রামায়ণ ৬.১০৬.১-৬]*

অগস্ত্যকুণ্ড উদ্যন্তক পর্বতে অবস্থিত একটি কুণ্ড। ঋষি অগস্ত্য এই পর্বতকে এখানে স্থাপন করেছিলেন বলেই কুণ্ডটির নাম অগস্ত্যকুণ্ড। ব্যাস শুক প্রভৃতি আটজন ঋষি এখানে তপস্যা করেই মুক্তি লাভ করেছিলেন। বলা হয়, ওই আটজন ঋষিকে স্মরণ করে অগস্ত্যকুণ্ডে আরাধনা করলে শুভফল লাভ হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একাধিক অগস্ত্য-কুণ্ডের সন্ধান বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। যদিও পণ্ডিতরা মনে করেন যে, অন্তত একটি অগস্ত্য কুণ্ড বর্তমান বেনারসের অন্তর্গত।

[Encyclopaedia of the Hindu World,
Vol. I; Ed.by Ganga Ram Garg p. 203]

বর্তমানে কেরালা ও তামিলনাড়ুর সংযোগস্থলে অবস্থিত অগস্ত্যমালাই পর্বতকেই অনেকে প্রাচীন উদ্যন্তক পর্বত বলে মনে করেন। এই অগস্ত্যমালাই পর্বতেও অগস্ত্যকুণ্ড নামে একটি কূপ রয়েছে।

তবে বায়ু পুরাণে যেমনটি আছে, সেই বিবরণ অনুযায়ী ব্যাস প্রভৃতি আটজন ঋষি যে স্থানটিতে বসে তপস্যা করেছিলেন, তার নাম নৈমিষারণ্য। ঋষিদের এই তপোভূমির বাম পাশে যে পর্বতটি অবস্থিত তারই নাম উদ্যন্তক পর্বত। অগস্ত্যকুণ্ড সেখানেই অবস্থিত। সেক্ষেত্রে অগস্ত্যকুণ্ড এবং উদ্যন্তক পর্বত—দুটিই নৈমিষারণ্য অর্থাৎ বর্তমান উত্তর প্রদেশের নিমসর বা নিমখার বনের কাছাকাছি অবস্থিত বলে মনে হয়। গরুড় পুরাণের একটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্র, সরস্বতী নদী কিংবা প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত তীর্থগুলি গয়াক্ষেত্রেও অবস্থিত। এই উল্লেখ থেকে মনে হয় নৈমিষারণ্যের নিকটবর্তী উদ্যন্তক পর্বতের নাম পরবর্তী সময়ে গয়াক্ষেত্রের উপর আরোপিত হয়ে থাকতেও পারে। তাতে এখনকার বিহারেও একটি অগস্ত্যকুণ্ডের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। *[EAIG (Kapoor) p.14;*
বায়ু পু. ১০৮.৪১-৪৫; গরুড় পু. ১.৮৫.২৩;
Journal of the Bihar and Orissa Research
Society, Vol. 20 (1934) p. 107]

অগস্ত্যকূট দক্ষিণ ভারতের একটি পবিত্র পর্বতশৃঙ্গ। এটি অগস্ত্য পর্বত বা অগস্ত্যমালা নামেও পরিচিত।

☐ সীতার খোঁজে সুগ্রীব যখন তাঁর বানর যোদ্ধা ও সহচরদের দক্ষিণ দিকে পাঠিয়েছিলেন তখন মলয় পর্বতের শীর্ষে ঋষি অগস্ত্যকে দর্শন করার কথা তাদের বলেছিলেন।

[রামায়ণ ৪.৪১.১৫]

☐ বলরাম একবার ঋষি অগস্ত্যের সঙ্গে এই অগস্ত্যকূটে সাক্ষাত করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৭৯.১৬]

☐ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এটি বর্তমানে তামিলনাড়ু ও কেরালা রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমানায় অবস্থিত।

☐ পণ্ডিতরা মনে করেন, ঋষি অগস্ত্য এই মলয় পর্বতের শৃঙ্গে তপস্যা করেছিলেন বলেই এটির নাম অগস্ত্যকূট। এটি তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তিস্থল। *[দ্র. অগস্ত্য-আশ্রম$_{১২}$]*

[GM (Suryavanshi) p. 117]

অগস্ত্যতীর্থ$_1$ দক্ষিণ দিকে পাণ্ড্যদেশের অন্তর্গত একটি তীর্থ।

[মহা (k) ৩.৮৮.১৩; (হরি) ৩.৩৭.১৩]

☐ দক্ষিণ ভারতে দক্ষিণ সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত একটি তীর্থস্থান বিশেষ। দ্রৌপদী-সংক্রান্ত বৈবাহিক শর্ত লঙ্ঘন করে অর্জুন যখন বারো বছরের জন্য তীর্থযাত্রায় বেরোন তখন দক্ষিণ সমুদ্রের নিকটবর্তী তীর্থ ভ্রমণের সময়ে এইখানে এসেছিলেন। কথিত আছে—অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ, পৌলমতীর্থ, কারন্ধমতীর্থ এবং ভরদ্বাজতীর্থ—এই পাঁচটি তীর্থস্থান ব্রাহ্মণ-সজ্জন এবং ঋষি-মুনিরা বর্জন করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা অর্জুনকে বলেছিলেন যে, পাঁচটি কুমীর এই পাঁচ তীর্থে ভয় সৃষ্টি করেছে। জলে নামলেই তারা ঋষি-মুনিদের ধরে নিয়ে যায়। বীর অর্জুন এ-কথা শুনে সৌভদ্রতীর্থে স্নান করতে নামলেন। যথাশ্রুত-ভাবেই কুমীর তাঁর পা কামড়ে ধরলো। অর্জুন এই অবস্থাতেই আপন শক্তিতে কুমীরকে নিয়ে জলের উপরে উঠে সরোবরের তীরে নিয়ে এলেন। কুমীর সঙ্গে সঙ্গে এক সুন্দরী নারীর রূপ ধরে ধারণ করল। সে জানাল—আমি এবং আমার চার সখী এক ব্রাহ্মণকে উত্যক্ত করার ফলে তাঁর অভিশাপে কুম্ভীরযোনি লাভ করেছি। অগস্ত্য তীর্থ এবং আর চারটি তীর্থে আমার সখীরাও ওই একইভাবে কুমীর হয়ে আছে। রমণীর অনুরোধে অর্জুন তাঁদেরও তীর্থজল থেকে উদ্ধার করে শাপমুক্ত করলেন এবং এই সকল মন্দতীর্থের জল শোধন করলেন। আমাদের মনে হয় বিভিন্ন কারণে অগস্ত্যতীর্থ মানুষের অগম্য হয়ে উঠেছিল। অর্জুন সেই লুপ্ত তীর্থগুলি উদ্ধার করেন। অগস্ত্যতীর্থ এখানে অন্যতম এক তীর্থ। *[দ্র. বর্গা]*

[মহা (k) ১.২১৬.১-২৩;
(হরি) ১.২০৯.১-২৩, ২১০.১-৩]

☐ এমনও হতে পারে কাছাকাছি অন্য চারটি তীর্থের সঙ্গে অগস্ত্যতীর্থও হয়তো নানারকম ভয়ঙ্কর জলচর জন্তুর প্রাদুর্ভাবের কারণেই তীর্থযাত্রীশূন্য হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত এই একই কারণেই এদেরও মন্দতীর্থ বলা হয়েছে।

☐ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, বর্তমান তামিলনাড়ু ও কেরালার সীমানায় অবস্থিত পর্বত শ্রেণীর অন্তর্গত অগস্ত্যমালাই-ই হল অগস্ত্য তীর্থ। এই অগস্ত্যমালাই থেকেই তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি। অগস্ত্যমালাই-এর আরেক নাম অগস্ত্যকূট। আবার ভিন্নমতে এটি কালীঞ্জর পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত।

[EAIG (Kapoor) p. 13]

অগস্ত্যতীর্থ$_2$ স্কন্দ পুরাণে অন্য একটি অগস্ত্য তীর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটি অরুণাদ্রির দক্ষিণভাগে অবস্থিত। অরুণাচল বা অরুণাদ্রি কৈলাস পর্বতের পশ্চিমে অবস্থিত। অতএব এই অগস্ত্য তীর্থ উত্তর ভারতের প্রত্যন্তে অবস্থিত। কথিত আছে—এই তীর্থে স্নান করলে মানুষ সকল ভাষায় অভিজ্ঞ হয়। অগস্ত্য এই তীর্থে প্রত্যেক মাসে, বিশেষত ভাদ্র মাসে আবির্ভূত হন। ভাদ্র মাসে অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়-ঘটনাকেই অগস্ত্যের বিশেষ আবির্ভাব সূচিত করছে কিনা, সেটা পণ্ডিতকুলের ভাবনার বিষয়।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল মাহাত্ম্য)
৬.১০১-১০২]

অগস্ত্যপদ গয়ায় অবস্থিত বিষ্ণুপদ-সমতুল্য পুণ্যস্থল। এখানে শ্রাদ্ধ করা পুণ্যজনক।

[বায়ু পু. ১০৯.১৯; ১১১.৫৩]

অগস্ত্যপর্বত *[দ্র. অগস্ত্যকূট]*

অগস্ত্যসরস্ অগস্ত্য তীর্থের আরেক নাম।

[দ্র. অগস্ত্যতীর্থ]

অগস্ত্যেশ্বর$_1$ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি অতি পুণ্যফলদায়ক তীর্থ। কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এই তীর্থ দর্শনে বিশেষ ফল লাভ হয়।

[মৎস্য পু. ১৯১.১৫-১৮]

অগস্ত্যেশ্বর$_2$ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্রতীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে ব্যক্তি মৃত্যুর পর রুদ্রলোকে গমন করেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২০.৬]*

অগাবহ মহাভারতে অগাবহ নামে জনৈক বৃষ্ণিবংশীয় বীর যোদ্ধার নাম উল্লিখিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলাকালে অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, এ ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে বৃষ্ণিবংশীয় মহারথীরা পাণ্ডবপক্ষে এসে যোগদান করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির সঙ্গে বৃষ্ণিযোদ্ধা অগাবহর নামও উল্লেখ করেছেন ধৃতরাষ্ট্র। তবে মহাভারতের এই পর্যায়ে বৃষ্ণিবীর হিসেবে

অগাবহর নাম উল্লিখিত হলেও তাঁর পরিচয় উল্লিখিত হয়নি। বৃষ্ণিবীর অগাবহর পরিচয় আমরা পাই পুরাণে। মৎস্য পুরাণ, বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পাঠ অনুযায়ী অগাবহ ছিলেন বসুদেবের ঔরসে বৃকদেবীর গর্ভজাত পুত্র। তবে পুরাণগুলির পাঠান্তরের ফলে অগাবহকে কোথাও স্বগাবহ, কখনো বা আগাবহ নামেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। মৎস্য পুরাণের পাঠে বৃকদেবীর গর্ভজাত পুত্রটির নাম অবগাহ। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরাণে এমনকী মহাভারতেও ব্যবহৃত হওয়ায় 'অগাবহ' পাঠটিই সঠিক বলে ধারণা হয়। *[মহা (k) ৭.১১.২৭; (হরি) ৭.৯.২৭; বায়ু পু. ৯৬.১৭৯, ২৪৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৮০, ২৫৭; মৎস্য পু. ৪৬.১৮]*

□ মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় বৃষ্ণিবংশীয় জনৈক অঙ্গাবহকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এই অঙ্গাবহ এবং অগাবহ সম্ভবত একই ব্যক্তি।

[মহা (k) ২.৩৪.১৬; (হরি) ২.৩৩.১৬]

অগারদাহী (আগারদাহী) যে ব্রাহ্মণ অন্যের ঘরে আগুন দেন, তিনি আগারদাহী বা গৃহদাহী। দেবকার্য এবং পিতৃকার্যে তিনি নিমন্ত্রণের যোগ্য নন। তিনি অপাংক্তেয়।

[বায়ু পু. ৮৩.৬২; মনু সংহিতা ৩.১৫৮]

অগ্নি$_{১}$ বৈদিক দেবতাকুলের অন্যতম প্রধান। ইন্দ্রের পরেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বৈদিক সূক্ত (প্রায় দু-শ) অগ্নির উদ্দেশে উচ্চারিত। এই পৃথিবীতেই অগ্নির ক্রিয়াকর্ম বিশেষভাবে লক্ষিত হয় বলে অগ্নিকে পৃথিবীস্থানীয় দেবতা বলা হয়—

অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ। *[নিরুক্ত ৭.৫]*

□ 'অগ্নি' শব্দের গঠন নিয়ে বৈদিক শব্দকোশ নিঘণ্টুতে অনেক আলোচনা আছে। 'অগ্র' শব্দের সঙ্গে 'নী' ধাতুর যোগে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন। সেনাপতি যেমন অগ্রে সেনা নিয়ে যান, তেমনই অগ্নিও দেবতাদের অগ্রণী বা সেনানী—

অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানীঃ।

অগ্নি সমস্ত দেবতাদের অগ্রে জন্মেছেন বলেও তাঁর এই নাম—

স বা এষো'গ্রে দেবানামজায়ত, তস্মাদগ্নির্নামেতি।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ২.২.২.২; নিরুক্ত ৭.৫, দুর্গসিংহের টীকা দ্র.]

যেহেতু সমস্ত জীবের অগ্রে তিনি জন্মেছেন, যজ্ঞেও যেহেতু তিনি সবার অগ্রে অবস্থান করেন এবং আপন অঙ্গ দিয়ে যেহেতু তিনি যজ্ঞকাষ্ঠ বা অন্নাদি পাক করেন, সেইজন্যও তাঁর নাম অগ্নি—

জাতো যদগ্রে ভূতানামগ্রণীরধ্বরে চ যৎ।
নাম্না সন্নয়তে বাঙ্গং স্তুতো' গ্নিরিতি সূরিভিঃ ॥

[বৃহদ্দেবতা ২.২৪]

তৃণ, কাষ্ঠ অথবা যাতেই অগ্নি 'সন্নত' বা আশ্রিত হন, তাকেই নিজের অঙ্গরূপে পরিণত করেন বা দাহ্যরূপে আত্মসাৎ করেন বলে 'অঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'নী' ধাতুর যোগেও অগ্নিশব্দ নিষ্পন্ন হতে পারে। নিরুক্তকার যাস্ক অগ্নি শব্দের মূল দেখাতে গিয়ে তাঁর পূর্বাচার্য স্থৌলাষ্ঠীবি, শাকপূণির মত উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালের বৈয়াকরণেরা গমনার্থক 'অগি' ধাতুর উত্তর 'নি' প্রত্যয় করে অগ্নিশব্দ নিষ্পন্ন করেন। স্বর্গে হবিঃ নিয়ে যান বলে তাঁকে অগ্নি বলা হয়—

অঙ্গতি স্বর্গে গচ্ছতি হবির্নেতুমগ্নিঃ (সায়ন)।

□ ঋগ্‌বেদে অগ্নির নানা ক্রিয়াকলাপ এবং তার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে অগ্নিকে বলা হয়েছে জাতবেদা। যাস্ক লিখেছেন জাত বা উৎপন্ন সমস্ত বস্তুই ইনি জানেন অথবা উৎপন্ন প্রাণী-মাত্রেই তাঁকে জানে বলে তিনি জাতবেদা। এখানে 'বেদ' মানে জানা। আবার তিনি জাতবিত্ত অর্থাৎ তাঁর থেকেই ধনের উৎপত্তি হয়। সেইজন্যও তিনি জাতবেদা। এমন লোকপ্রবাদও ছিল যে, অগ্নির কাছ থেকে ধন ইচ্ছা করবে—ধনমিচ্ছেদ্ হুতাশনাৎ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—প্রজাপতির সৃষ্ট প্রজারা প্রজাপতিকে পিছনে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল এবং আর ফেরেওনি। প্রজাপতি তখন প্রজাদের অগ্নির দ্বারা বেষ্টন করে দিলেন এবং তারা অগ্নির কাছে ফিরে এল। সেই থেকে তারা অগ্নির কাছেই থাকে। প্রজাপতি তখন বললেন—আমার জাতকেরা (জাত) অগ্নির সাহায্যেই 'বিত্ত' লাভ করেছে। সেইজন্যই অগ্নি জাতবেদা। এখানে 'বেদ' শব্দ লাভার্থক বিন্দ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। মৈত্রায়ণী সংহিতায় আছে—জাত বা জন্মমাত্রেই অগ্নি পশুসমূহ লাভ করেছেন বলে তিনি জাতবেদা। অথর্ববেদের মতে এই পশুরা হল—গরু, অশ্ব, মানুষ, ছাগল এবং অবি। সৃষ্টির প্রথম কল্পে যে সমাজ ছিল, সেখানে অগ্নির অপরিহার্যতা নিয়েই

হয়তো এই উক্তি। অগ্নিকে সুবর্ণ বা স্বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও বলা হয়—

'অগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুঃ'।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ২য় খণ্ড, গ্রন্থমেলা) ৩.১২; পৃ. ১৮৮-১৮৯; মৈত্রায়ণী সংহিতা (শ্রীপাদ ভট্টাচার্য সাতবলেকর), ১.৮.২; অথর্ববেদ (Roth and Whitney) ১১.২.৯; বিষ্ণু পু. ৫.১.১৪]

☐ বেদে কোনো কোনো দেবতার রূপ মানুষের মতো, আবার কেউ বা মানুষের মতো নন। হয়তো প্রাকৃতিক ভাবনায় যে সব দেবতার সৃষ্টি, তাঁরাই দ্বিতীয় প্রকারের 'অপুরুষবিধ' দেবতা। অগ্নি অপুরুষবিধ। *[নিরুক্ত ৭.৭.১-২]*

অগ্নি 'অক্লোপন', যেহেতু অগ্নি স্নিগ্ধ করেন না। স্নেহপদার্থ শুষে নেন বলেই এই নাম—

ন ক্লোপয়তি ন স্নেহয়তি। *[নিরুক্ত ৭.১৪.৫]*

অগ্নি 'সুদত্র' অর্থাৎ কল্যাণ দান করেন। তিনি 'জ্যোতিষী' বা যুগ্মজ্যোতি কারণ বিদ্যুৎ এবং সূর্যও অগ্নি নামে অভিহিত। *[নিরুক্ত ৭.১৭.১; ৭.২০.৪]*

এই সব শব্দ ছাড়াও বেদে অগ্নির নানা কর্ম লক্ষ করে তাঁকে ধামচ্ছৎ, স্ববিদি, দিবস্পৃশি, দ্রবিণোদা, বৃষাকপি, বনস্পতি, তৃতীয়পতি, ত্রিস্থানভাগী ইত্যাদি বহু নামে আহ্বান করা হয়েছে।

[নিরুক্ত ৭.২৪.২; ৭.২৫.১; ৮.২.২.২, ৬; ৮.১৮.১২]

অগ্নি দেবতাদের মুখ-স্বরূপ—

অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখম্।

[কৌষিতকী ব্রাহ্মণ (Lindner) ৩.৬; পৃ. ১২; মহা (k) ২.৩১.৪১; (হরি) ২.৩০.৪০]

অগ্নির মুখ দিয়েই দেবতারা মনুষ্যদত্ত আহুতি গ্রহণ করেন—

তস্মাদ্দেবা অগ্নিমুখা অন্নমদন্তি।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ৭.১.২.৪]

অগ্নি দেবতাদের দূত—

অগ্নিরের দেবানাং দূত আস।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.৫.১.২১]

তিনি হোতারূপে যজ্ঞের আহুতি দেন। তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনিই ঋত্বিক।

[ঋগ্বেদ ১.১.১]

তিনি সমস্ত যজ্ঞকাণ্ডের অধিপতি, গৃহের অধিপতি এবং জনসমষ্টির দূত-স্বরূপ—

মন্দ্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি।

[ঋগ্বেদ ২.৩৬.৫]

অগ্নি অন্নের অধিপতি এবং অন্নের পুত্রও বটে—

অন্নাদো বা এষোন্নপতি-র্যদগ্নিঃ।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (সামশ্রমী) ১.২.২.৮; পৃ. ৬৮]

সমস্ত প্রাণীর প্রাণ, মন এবং চৈতন্য হলেন অগ্নি। তিনি সর্বব্যাপ্ত, সমস্ত দেবতাই অগ্নি-স্বরূপ।

[তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দ আশ্রম) ১.৪.৪.১০]

বেদের একাধিক সূক্তে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বরুণ, অর্যমা, সবিতা এমনকি অদিতি এবং সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর একাত্মতা স্থাপন করা হয়েছে।

[ঋগ্বেদ ২.১ সূক্ত এবং ৫.৩ সূক্ত]

বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে অগ্নির এই একাত্মতার মধ্যে অদ্বৈতবাদের প্রথম দার্শনিক উন্মেষ লক্ষ করা যায়। একটি সূক্তে তা পরিষ্কারভাবে বলাও হয়েছে—

একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি/
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বান-মাহুঃ।

[ঋগ্বেদ ১০.১৬৪.৪৬]

এমনিতে পার্থিব প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকল্পই বিভিন্ন বৈদিক দেবতাকুলের মধ্যে প্রতিস্থাপিত হওয়ার ফলে অগ্নির মধ্যেও অন্য দেবতাদের শক্তি এবং রূপ সংক্রামিত হয়েছে। সূর্য, উষা এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্মান দেবতার সাধারণ রূপ, শক্তি এবং ধর্ম অগ্নির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এমন একটি ভাবনাও প্রচলিত ছিল যে, সৌরকুলের (solar gods) সমস্ত জ্যোতিষ্মান দেবতাই রাত্রিতে অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন বলে দূর থেকে অগ্নিকে ভাস্বর দেখা যায়। উষাকালে অগ্নি আবার সূর্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। সেইজন্য সূর্যালোকে তাঁকে অনুজ্জ্বল দেখা যায়। ঋগ্বেদ বলেছে—রাত্রিকালে অগ্নিই সকল সংসারের মস্তকস্বরূপ হন, পরে, প্রাতে তিনিই সূর্যরূপে উদিত হন—

মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ
সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।

[ঋগ্বেদ ১০.৮৮.৬]

পুরাণগুলির মধ্যেও অগ্নির ওই একই রূপ কল্পনা। সূর্য অস্ত গেলে তাঁর তেজের চতুর্থাংশ অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে বলেই রাত্রিতে অগ্নির দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। আবার সূর্যের উদয় হলে অগ্নিতেজের চতুর্থাংশ সূর্যের মধ্যে আবিষ্ট হয় বলেই দিনের বেলায় সূর্যের তাপ প্রখর হয়।

[মৎস্য পু. ১২৮.১০-১১]

সূর্যের সঙ্গে অগ্নির এই একাত্মতার কারণ এই দুই দেবতার স্বরূপ এবং সাধারণগুণ। অর্থাৎ তেজ এবং উষ্ণতা। অগ্নি এবং সূর্য দুজনেই তমোনাশী, প্রকাশস্বরূপ এবং দুয়েরই সাধারণ গুণ উষ্ণতা—

প্রকাশ্যঞ্চ তথোষ্ণঞ্চ সৌর্যাগ্নেয়ে তু তেজসী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্॥

[মৎস্য পু. ১২৮.১২]

প্রধানত অগ্নির তেজঃস্বরূপতা থেকেই বেদে তাঁকে ত্রিস্থানভাগী বলা হয়েছে। ত্রিস্থান মানে তিনটি স্থান—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক। পৃথিবীতে তিনি পার্থিবাগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং দ্যুলোকে আদিত্য। *[ঋগ্বেদ ১০.৮৮.১০]*

আদিত্য বা সূর্য উত্তম দ্যুস্থানগত দেবতা বলে তিনি উত্তমাগ্নি, অন্তরীক্ষগত বিদ্যুৎ মধ্যমাগ্নি আর যে অগ্নিকে আমরা দেখি, অনুভব করি, এবং যে অগ্নি আমাদের দৈনন্দিন কাজে লাগে, তিনি পার্থিবাগ্নি। *[নিরুক্ত ৭.২৩]*

পুরাণ-মতে পাকাদি কর্মে যে অগ্নি ব্যবহৃত তাই পার্থিবাগ্নি, জীবের জঠরগত অগ্নিকে বৈদ্যুতাগ্নি বলে বৈদ্যুতাগ্নি তিন প্রকার—বৈদ্যুত, জাঠর ও সৌর। এই তিন প্রকার অগ্নির সঙ্গে জলের সম্বন্ধ আছে। সৌর অগ্নি সূর্যকিরণ দ্বারা জল পান করে। বৃক্ষাগ্নিতে বৈদ্যুতাগ্নি প্রবেশ করলে জল দিয়ে সেটা নেভানো যায় না। (যেমন, বৃক্ষের উপর বজ্রপতন হলে বৃক্ষটি আর বাঁচে না।

[বায়ু পু. ৫৩.৮-৯]

যে অগ্নি সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত এবং যিনি তাপ দান করেন, তিনিই উত্তমাগ্নি; তাঁকে শুচি বলা হয়। *[মৎস্য পু. ১২৮.৫-৯]*

বৃহদ্দেবতার শ্লোক অনুযায়ী এই পৃথিবীতে যাঁকে অগ্নিরূপে উপাসনা করা হয় তিনি অন্তরীক্ষলোকে জাতবেদা নামে এবং দ্যুলোকে বৈশ্বানর নামে স্তুত হন—

জাতবেদা স্তুতো মধ্যে স্তুতো বৈশ্বানরো দিবি।

[বৃহদ্দেবতা ১.৬৭]

বৈদিক আচার্যদের মধ্যে কেউ উত্তমাগ্নি আদিত্যকেই বৈশ্বানর বলেছেন, কেউ বা মধ্যমাগ্নি বিদ্যুৎকেই বলেছেন আবার আচার্য শাকপূণির মতে পার্থিবাগ্নিই বৈশ্বানর। অন্যত্র বেদেই।

[ঋগ্বেদ ৩.২৯.১১]

আবার দেখা যায় গর্ভস্থ অগ্নিকেই বলা হয় তনূনপাৎ (হয়তো মেঘগর্ভস্থ বৈদ্যুতাগ্নির এই নাম)। একে বলে আসুর অগ্নি। এই অগ্নিই যখন প্রত্যক্ষ হন তখন তাঁর নাম নরাশংস। এই অগ্নির মাধ্যমে পিতৃগণ স্তুত হন। *[ঋগ্বেদ ১০.৫৭.৩]*

আবার মাতার গর্ভ থেকে জাত হন বলে তাঁর নাম মাতরিশ্বা (এই অগ্নি গ্রীষ্মকালের উষ্ণ বায়ু-স্বরূপ)। প্রবল বায়ুতে বৃক্ষাদির ঘর্ষণ (মাতার গর্ভ) জাত অগ্নিই মাতরিশ্বা।

[অথর্ববেদ (Roth & Haug) ১২.১.৫১]

বস্তুত মানব-সভ্যতার প্রথম কল্পে অগ্নির আবিষ্কার মানুষের মনে যে চমৎকার সৃষ্টি করেছিল এবং অগ্নির মাধ্যমে যে বাস্তব উপকার সাধিত হয়েছিল, তারই ছায়া পড়েছে বৈদিক মন্ত্রবর্ণে—দেবতারা প্রথমে বৈদিক সূক্ত সৃষ্টি করলেন, পরে অগ্নি, পরে হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করলেন। যে অগ্নি এঁদের শরীর রক্ষাকারী যজ্ঞস্বরূপ হলেন, আকাশ, পৃথিবী ও জলের সঙ্গে সে অগ্নির পরিচয় আছে। *[ঋগ্বেদ ১০.৮৮.৮]*

শেষ পংক্তিটি লক্ষ করলে বোঝা যাবে যজ্ঞ, আকাশ, পৃথিবী এবং জল নিয়েই ভারতীয় জীবনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সূর্য এবং অগ্নির একার্থতা এবং একাত্মতা থাকায়।

[ঋগ্বেদ ১০.৮৮.৬]

সন্ধ্যাকালে সূর্যের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, আর প্রাতঃকালে অগ্নির উদ্দেশে সূর্যে আহুতি দেওয়া হয়। উদিত হোমের এই রীতি। যখন সূর্য অস্তযান, তখন অগ্নিই জ্যোতি। যখন সূর্য উদিত হন, তখন সূর্যই জ্যোতি—

যদা হ্যেব সূর্যো স্তমেত্যথাগ্নির্জ্যোতির্যদা
সূর্যো উদেত্যথ সূর্যো জ্যোতিঃ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Goettiengen) ২.৩.১.৩৬; দ্র. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২.১.২.১০; নিরুক্ত ১৮.৫; A.A. Macdonell, Vedie Mythology, p.93]

পরবর্তীকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকটিও এই অর্থে তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে ওঠে—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যা যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥

[ভগবদ্গীতা ৩.১৪]

অন্ন থেকেই জীবগণ জীবন ধারণ করে, পর্জন্য বা মেঘ থেকে জীবের খাদ্য অন্ন জন্মায়, যজ্ঞ থেকেই মেঘের উৎপত্তি এবং যজ্ঞ সৃষ্টি হয় মানুষের অবিরাম ক্রিয়াশীলতা থেকে।

অগ্নির আবিষ্কার চমৎকার থেকেই মানুষের

সমস্ত জীবন-প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁর প্রবেশ ঘটেছে নানাভাবে নানা নামে। ঋগ্‌বেদে উচ্চারিত অগ্নির বিশেষ বিশেষ গুণ অথবা তাঁর বিশেষণগুলিই অনেক সময় অগ্নির নাম হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সমস্ত দেবতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক এবং মনুষ্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করার জন্য গোভিলপুত্রের লেখা সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্ট গৃহ্যাসংগ্রহে বলা হয়েছে—

লৌকিক ভাষায় প্রথমেই অগ্নিকে পাবক (পবিত্রকারী) নামে অভিহিত করা হয়। গর্ভাধান অনুষ্ঠানে অগ্নির নাম মরুৎ। পুংসবন অনুষ্ঠানে তাঁর নাম চন্দ্রমা। শুঙ্গাকর্মে তাঁর নাম শোভন এবং গর্ভাধান অনুষ্ঠানের অন্তর্গত সীমন্তোন্নয়ন কর্মে অগ্নির নাম মঙ্গল। গোদান যজ্ঞে অগ্নির নাম সূর্য। কেশান্ত নামক অনুষ্ঠানে তাঁর নাম অগ্নিই। বিসর্গ বা শরীরান্তর্গত অন্নপাকের পর মলাদি-বিসর্গে তাঁর নাম বৈশ্বানর—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা জনানাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণানসমাযুক্তং পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।

[ভগবদ্‌গীতা ১৫.১৪;
শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.৬.৭.৯]

বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি যোজক নামে খ্যাত। চতুর্থী হোমে তাঁর নাম শিখী (অন্য মতে ধৃতি অথবা অগ্নি)। আবসথ্য যাগে তাঁর নাম ভব এবং বিশ্বদেব যজ্ঞে তিনি পাবক নামে খ্যাত। গার্হপত্য অগ্নির নাম ব্রহ্মা, দক্ষিণাগ্নির নাম ঈশ্বর এবং আহবনীয় অগ্নির নাম বিষ্ণু। অগ্নিহোত্র যাগে এই তিন অগ্নিই লাগে। লক্ষহোমে তাঁর নাম বহ্নি। কোটি হোমে তিনি হুতাশন। প্রায়শ্চিত্ত হোমে তাঁর নাম বিধি। পাকযজ্ঞে তিনি সাহস নামে খ্যাত (ঋগ্‌বেদে তাঁকে সহসের পুত্র বা বলের পুত্র বলা হয়েছে—

অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য

[ঋগ্‌বেদ ১.৫৮.৮]

সবল ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয়েছিল বলেই তিনি বলের পুত্র বা সাহস—বলেন হি মথ্যমানো' গ্নির্জায়তে—সায়ন। দেবতাদের যজ্ঞে তাঁর নাম হব্যবাহ, পিতৃকার্যে তিনি কব্যবাহন। পূর্ণাহুতি দেবার সময় তাঁর নাম মৃড় এবং শান্তিকর্মে তিনি বরদ। জীবের উদরে তিনি জঠরাগ্নি (এই নিরিখেই তাঁকে অন্নের পুত্র বলা হয়েছে। খাদ্যরূপ ইন্ধনের সহায়তায় জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয় বলেই খাদ্য বা অন্নের পুত্র হলেন অগ্নি—

জঠরাগ্নেঃ প্রবর্তমানাদগ্নে-রন্নপুত্রত্বম্—সায়ন)।

শ্মশানে জীবদেহ ভক্ষণ করেন (মৃতদেহ আগুনে পোড়ানো মানে অগ্নির ভক্ষণ) বলে তাঁর নাম ক্রব্যাদ। সমুদ্রমধ্য থেকে উঠে আসা অগ্নির নাম বড়বা এবং জগদ্ ধ্বংসকালে তাঁর নাম হয় সংবর্তক। *[গৃহ্যাসংগ্রহ ১.২-১১]*

অগ্নি যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীনতম সভ্যতার সমবয়সী, সেই কারণে ঈষৎ উচ্চারণের ভিন্নতায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার ভাষা-খণ্ডেই অগ্নির নাম পাওয়া যাবে। ল্যাটিন ভাষায় অগ্নি হলেন ইগ্নিস (Ignis) শ্লাভোনিকে ওগ্নি (ogni)। দুটি অরণি কাষ্ঠের মন্থন এবং ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় বলে অগ্নির বিশেষণ হল প্রমন্থ; তাঁর সঙ্গে গ্রীক দেবতা প্রমিথিউসের (Prometheus) ভাষাগত মিল লক্ষণীয়। একইভাবে ভরণ্য গ্রীক ভাষায় হয়েছে ফোরেনিউস্ (Phoreneus) এবং অগ্নির অন্যরূপ উল্কা হয়েছে ভালকান (Vulcan)। গ্রীক হেপ-এই সতোস (Hephaistos) এবং হেস্‌তিয়াও (Hestia) অগ্নিরই রূপ।

মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের কাছে ইন্দ্রসভার বর্ণনা দিচ্ছিলেন নারদ। সেখানে বলা হয়েছে সাতাশ প্রকারের অগ্নি সেই ইন্দ্রসভায় উপস্থিত থেকে ইন্দ্রের কর্মসহায়তা করেন। এখানে মূল শ্লোকে সপ্তবিংশতিপ্রকার অগ্নির নাম না করা হলেও টীকাকারেরা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে এই সপ্তবিংশতি প্রকার অগ্নির নাম বলেছেন। বলা হয়েছে—ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে যে অগ্নি জন্মেছে, তাঁর নাম অঙ্গিরা। এছাড়া আছেন দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি। অগ্নির আর নামগুলি হল— নির্মথ্য, বৈদ্যুত, শূর, সংবর্ত, লৌকিক, জাঠর অগ্নি, বিষগ, ক্রব্য, ক্ষেমবান্, বৈষ্ণব, দস্যুমান্, বলদ, শান্ত, পুষ্ট, বিভাবসু, জ্যোতিষ্মান্, ভরত, ভদ্র, স্বিষ্টিকৃৎ, বসুমান, ক্রতু, সোম এবং পিতৃমান্ এখানে অঙ্গ থেকে জাত অগ্নিই অঙ্গিরা। অঙ্গিরাকেই অগ্নি ধরলে অগ্নি সাতাশ রকম—

ব্রহ্মণো'ঙ্গাৎ প্রসূতো'গ্নিরঙ্গিরা ইতি বিশ্রুতঃ।
দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যাহবনীয়াবিতি ত্রয়ী॥

নির্মথ্যো বৈদ্যুতঃ শূরঃ সংবর্তো লৌকিকস্তথা।
জাঠরো বিষগঃ ক্রব্যাৎ ক্ষেমবান্ বৈষ্ণবস্তথা ॥
দস্যুমান্ বলদশ্চৈব শান্তঃ পুষ্টো বিভাবসুঃ।
জ্যোতিষ্মান্ ভরতো ভদ্রঃ স্বিষ্টিকৃদ্
বসুমান্ ক্রতুঃ।
সোমশ্চ পিতৃমাংশ্চৈব পাবকাঃ সপ্তবিংশতিঃ ॥

[মহা (k) ২.৭.২১;
(হরি) ২.৭.২১ (নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]

□ বেদ এবং পুরাণে অগ্নির যেমন বর্ণনা আছে, তাতে মানুষের মতো একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি তাঁর কল্পনা করা যায় না বটে, তবে অগ্নির প্রাকৃতিক ভয়াবহতা থেকেই তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মানুষের ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপের সাযুজ্যে প্রতিষ্ঠিত। অগ্নির চিরন্তন শুদ্ধতা এবং পবিত্রভাব হৃদয়ে প্রোথিত থাকার ফলে বৈদিকরা তাঁকে শ্বেতবর্ণ (শুক্রবর্ণ, শুচিবর্ণঃ) শুক্রবর্ণং তমোহনম্। পুনরায় ঋগ্বেদেই অগ্নির রূপ—

হিরণ্যদন্তং শুচিবর্ণমারাৎ।

[ঋগ্বেদ ১.১৪০.১; ৫.২.৩]

বলে কল্পনা করেছেন। তাঁর অন্ত দন্তগুলি সোনার মতো হিরণ্যদন্ত। কেশ হরিদ্বর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ কখনও বা পিঙ্গলবর্ণ—
হরিকেশমীমহে।

[ঋগ্বেদ ৩.২.১৩; ১০.৭.৩]

অগ্নির লেলিহান শিখা থেকেই তাঁর পিঙ্গল কেশ এবং পিঙ্গল শ্মশ্রুর কল্পনা—

হরিশ্মশ্রু হরিকেশঃ।

[শুক্ল যজুর্বেদ (বম্বে ১৯২২) ১৫.১৫]

দাহক্ষমতা এবং অগ্নির প্রাকৃতিক চেহারা লক্ষ্য করে বেদে এক জায়গায় যেমন তিনি লৌহদন্ত।

[ঋগ্বেদ ১০.৮৭.২]

নামে কীর্তিত তেমনই পুরাণে তাঁর চক্ষু পিঙ্গল-বর্ণ, গ্রীবা লোহিতবর্ণ এবং দেহ কৃষ্ণবর্ণ।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৯৯.৫৯]

তিন প্রকার অগ্নির স্মরণে অগ্নির তিনটি মস্তক অথবা তিনটি জিহ্বা।

[ঋগ্বেদ ১.১৪৬.১; ৩.২০.২]

অন্যত্র অগ্নির জিহ্বা সাতটি এবং তা যে অবশ্যই তাঁর লেলিহান শিখার প্রতিরূপ সেটা মহাভারতের বর্ণনায় বোঝা যায়—

সপ্ত জিহ্বাননঃ ক্রূরো লেলিহানো বিসর্পতি।

অগ্নির এই মহাভারতীয় ধ্বংস-রূপের আকর নিহিত আছে শুক্ল যজুর্বেদের বর্ণনায়—

সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ।

[মহা (k) ১.২৩২.৫; (হরি) ১.২২৫.৫;
শুক্ল যজুর্বেদ ১৭.৭৯]

□ পৌরাণিক কল্পনায় এই সপ্তজিহ্বার নামকরণও ঘটেছে। অগ্নির যে জিহ্বা কাল নির্ধারণ করে সেই জিহ্বার নাম কালী; যে জিহ্বা মহাপ্রলয় সৃষ্টি করে তার নাম করালী; যোগশাস্ত্রের 'লঘিমা' গুণযুক্ত জিহ্বার নাম মনোজবা; সমস্ত প্রাণীর কামনা পূরণ করে যে জিহ্বা, তার নাম সুলোহিতা; সমস্ত প্রাণীর রোগ দহন করে যে জিহ্বা তার নাম সধূম্রবর্ণা; অগ্নির যে জিহ্বা থেকে সকলের আত্মা এবং দেহ সৃষ্টি হয়, তার নাম স্ফুলিঙ্গিণী; আর সকলের মঙ্গল বিধান করে যে জিহ্বা, তার নাম হল বিশ্বা। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৯৯.৫২-৫৯]*

অগ্নির এই মনুষ্যরূপের ভাবনার গুরুত্ব বুঝে পৌরাণিকেরা অগ্নির রূপ ধ্যানমন্ত্রে গ্রথিত করেছেন এবং সেই প্রতিমা-শিল্পীদের কাছেও আদরণীয়। এই বর্ণনায় অগ্নি রক্তবর্ণ এবং জটাধারী। গলায় অগ্নিশিখার মালা। তিনি সৌম্য। তাঁর চারটি হাত এবং তিনটি চোখ থাকবে; গোঁফ থাকবে এবং চারটি দাঁত (বাগ্দন্ত, ধিগ্দন্ড, ধনদন্ত এবং বধদন্তের দ্যোতক) থাকবে। ধোঁয়ার বসন তাঁর পরিধানে এবং ধোঁয়ার চিহ্ন করা চারটি শুক পাখি (চারটি শুক চারবেদের দ্যোতক আর পুরাতন এবং সনাতন বলে ধূসর ধোঁয়ার রঙ) তাঁর রথের শোভা। সেই রথের সারথি হলেন বায়ু। ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর মতো তাঁর পাশে থাকবেন রত্নপাত্রহস্তা তাঁর স্ত্রী স্বাহা। তাঁর ডান দিকের দুই হাতে অগ্নিশিখা এবং ত্রিশূল এবং বাঁ দিকের এক হাতে অক্ষমালা অন্যহাতে সম্ভবত কমণ্ডলু অগ্নিতেজ রক্তবর্ণ হওয়ায় তাঁর শরীরও রক্তবর্ণ হবে—

রক্তং জটাধরং বহ্নিং কুর্যাদ্ বৈ ধূম্রবাসসম্।
জ্বালামালাকুলং সৌম্যং ত্রিনেত্রং শ্মশ্রুধারিণম্॥
চতুর্বাহুং চতুর্দংষ্ট্রং দেবেশং বাতসারথিম্।
চতুর্ভিশ্চ শুকৈর্যুক্তং ধূমচিহ্নরথে স্থিতম্॥
বামোৎসঙ্গগতা স্বাহা শক্রস্যেব শচী ভবেৎ।
রত্নপাত্রকরা দেবী বহ্নের্দক্ষিণহস্তয়োঃ॥
জ্বালা-ত্রিশূলৌ কর্তব্যৌ চাক্ষমালা তু বামকে।
রক্তং হি তেজসো রূপং রক্তবর্ণং ততঃ স্মৃতম্॥

[বিষ্ণুধর্মোত্তর পু. ৩.৫৬.১-৪]

সৌরপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণ মতে অগ্নি ছাগবাহন।

অগ্নির ধ্যানমন্ত্র হল—

অংসাসক্তসুবর্ণমাল্যমরুণস্রক্‌চন্দনালংকৃতম্
জ্বালাপুঞ্জ-জটাকলাপবিলসন্মৌলিং
সুশুভ্রাংশুকম্।
শক্তিস্বস্তিকদর্ভমুষ্টিক-জপস্রক্‌স্রুতক্
স্রুবাভীবপন্
দোর্ভির্বিভ্রতমধিকৃতত্রিনয়নং রক্তাভমগ্নিং ভজে॥

[শারদাতিলক তন্ত্র ১৪.৯২]

অথবা

বালার্কারুণসংকাশং সপ্তজিহ্বং দ্বিমস্তকম্।
অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥

[মহানির্বাণ তন্ত্র ৯.২১]

□ বৈদিক গ্রন্থে অগ্নির জন্ম রূপক আকারে বিধৃত। সেখানে তিনি কখনও বলের পুত্র বা সহস-পুত্র, কখনও দুই অরণিকাষ্ঠকে তাঁর পিতা-মাতা কল্পনা করা হয়েছে, আবার অরণি থেকে উৎপন্ন অগ্নি অরণিকাষ্ঠকে দগ্ধ করে বলে অগ্নি পিতা-মাতার ভক্ষণকারী বলেও চিহ্নিত। অন্যত্র আবার দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র বলেও অগ্নি খ্যাত হয়েছেন। ইতিহাস পুরাণে এই সব রূপক নেই। সেখানে একবার তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র বলে পরিচিত হয়েছেন—

ব্রহ্মণো হি প্রসূতো'গ্নিঃ।

আবার কখনও বা ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্রও বটে—

ব্রহ্মণস্তনয়ো' গ্রজঃ।

অন্যমতে অগ্নি ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা বসুর গর্ভজাত পুত্র।

[মহা (k) ১৩.৮৫.১৫১; (হরি) ১৩.৭৪.১৪৯; মার্কণ্ডেয় পু. ৫২.২৬; বিষ্ণু পু. ১.১৫.১১১]

ব্রহ্মা এবং দক্ষ যেহেতু এই জগতের প্রথম লোক-সৃষ্টির কর্তা বলে প্রসিদ্ধ, তাই মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রথম প্রয়োজন অগ্নির পিতা বলেও এঁরাই চিহ্নিত। মৎস্য পুরাণ থেকে এই ভাবনা আরও পরিষ্কৃত হবে। এই পুরাণমতে কল্পান্তকালে ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন যে, জল এবং পৃথিবীর মধ্যে অগ্নি লীন হয়ে আছেন। ব্রহ্মা তখন অগ্নিকে প্রকাশ করার জন্য তাঁকে তিন ভাগে ভাগ করলেন। এইভাবে পাক-কার্যে ব্যবহার করার জন্য পার্থিব অগ্নির সৃষ্টি হল। সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত তাপদানকারী অগ্নির নাম হল শুচি এবং জীব-জঠরে অবস্থিত অগ্নির নাম হল বৈদ্যুতাগ্নি। *[মৎস্য পু. ১২৮.৫-৭]*

□ পুরাণে অগ্নির দাহিকা শক্তিকে অগ্নির স্ত্রী-রূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপে প্রযুক্ত বিভিন্ন প্রকারের অগ্নিকে অগ্নির পুত্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে। এ-বিষয়ে উপাখ্যানও আছে।

পুরাকালে এক সময় দেবতারা ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন—আমাদের আহার্য্য বস্তু কী হবে, আপনি বলে দিন। ব্রহ্মা যজ্ঞে প্রদত্ত 'হবিঃ'কে (ঘি) দেবতাদের খাদ্য হিসেবে স্থির করে দিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা যজ্ঞে 'হবিঃ' আহুতি দেওয়া সত্ত্বেও দেবতারা তা কিছুতেই খাদ্য হিসেবে পাচ্ছিলেন না। ব্রহ্মার কাছে এ ঘটনা জানালে তিনি হরির পরামর্শে শক্তিরূপিণী দেবীর ধ্যান করলে তিনি প্রকৃতির অংশরূপে ব্রহ্মার সামনে আবির্ভূত হয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন। প্রকৃতিরূপিণী দেবীর অংশভূতা এই স্ত্রীর নাম স্বাহা। ব্রহ্মা তাঁকে অগ্নির দাহিকা-শক্তি এবং পত্নী হতে অনুরোধ করলেন। কারণ দাহিকা-শক্তি ছাড়া অগ্নি দেবতাদের হোমদ্রব্য ভস্মীভূত করে আত্মসাৎ করতে পারেন না। এই অনুরোধের পর ব্রহ্মাও আশীর্বাদ করে প্রকৃতির অংশরূপিণী সেই দেবীকে বললেন যে, যজ্ঞে আহুতি দেবার সময় মন্ত্রের অন্তে স্বাহা-দেবীর নাম উচ্চারণ করলেই তবে দেবতারা সেই হোমদ্রব্য গ্রহণ করবেন।

ভগবান শ্রীহরিও স্বাহা-দেবীকে অনুরূপ অনুরোধ করায় তিনি অগ্নিকে পতিরূপে গ্রহণ করতে রাজী হলেন। ব্রহ্মার আদেশে অগ্নি স্বাহা-দেবীর সামনে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর পানিগ্রহণ করলেন। তারপর অগ্নিতেজ গর্ভে ধারণ করে স্বাহাদেবী অন্তঃসত্ত্বা হলেন এবং সময়কালে তিনি তিনটি পুত্রের জন্ম দিলেন, যাঁদের নাম দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি এবং আহবনীয়াগ্নি। *[দেবী ভাগবত পু. ৯.৪৩. ১০-৩৮]*

বিষ্ণু পুরাণে অবশ্য উপরি উক্ত তিন অগ্নির জন্মবৃত্তান্ত অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। পুরূরবা-উর্বশীর উপাখ্যানে দেখতে পাই, গন্ধর্বগণের কাছে বর স্বরূপ পুরূরবা উর্বশীকে প্রার্থনা করেন। ফলে গন্ধর্বগণ পুরূরবাকে একটি অগ্নিস্থালী প্রদান করেন এবং সেটিকে তিনভাগে

ভাগ করে পূজা করতে বলেন। আগে এক অগ্নিই ছিল, পুরুরবা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামে তিনপ্রকার অগ্নি প্রবর্ত্তিত করলেন—অন্য মতে অগ্নির ঔরসে স্বাহার গর্ভে পাবক, পবমান এবং শুচি নামে তিনটি পুত্র হয়।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫২.২৬-২৭; ভাগবত পু. ৪.১.৫৯]

অন্য আরও একটি মতে বৈদিক যজ্ঞ-বরাহের তিন পুত্র। তাঁদের নাম সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর। এই তিনের দেহ থেকেই যথাক্রমে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নির সৃষ্টি হয়। বায়ু পুরাণ মতে অগ্নি তিন প্রকার, যথা—দিব্য, ভৌতিক ও পার্থিব। *[বায়ু পু. ৫৩.৫]*

□ বস্তুত জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অগ্নির বহুধা উপস্থিতির জন্যই অগ্নির বিভিন্ন কল্পনা। মানুষের অন্তঃস্থিত চৈতন্যের মতো অগ্নির সর্বব্যাপিনী প্রাণশক্তির নিরিখেই উপনিষদে তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

[ঈশ উপনিষদ ১৮; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২.১৭;
অথর্ববেদ ১৯.১.৩.২; ঋগ্‌বেদ ১০.৫.৭.
ঐতরেয় আরণ্যক ২.৪.২-৩]

বেদের মধ্যে অগ্নিকে 'সর্বদেবতা' বলা হয়েছে। কথিত আছে, দেবাসুর যুদ্ধে দেবতারা শত্রুপক্ষ থেকে ভীত হয়ে অগ্নিতে তাঁদের শরীর ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁরা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন বলেই অগ্নি 'সর্বদেবতা'—

তে দেবা অগ্নৌ তনূঃ সন্যদধত,
তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ।

[তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.২.১০; পৃ. ৯২৬-৯২৭]

সং যত্তা আসন্ তে দেবা বিভ্যতো'
গ্নিং প্রাবিশন্ তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.২.২.৬; পৃ. ২৪০৪]

বেদে-উপনিষদে অগ্নির এই সর্বদেবময়ত্ব তথা সর্বব্যাপিতা পুরাণগুলির মধ্যেও পরম্পরাক্রমে নেমে এসেছে। আঙ্গিরস ভূতির শিষ্য শান্তিকৃত অগ্নিস্তবে—অগ্নিই সমস্ত দেবতার প্রাণস্বরূপ—ত্বৎপ্রাণাঃ সর্বদেবতাঃ। সূর্য, বায়ু, মেঘ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই সমস্ত দেবতার সঙ্গে অগ্নির একাত্মতা কল্পনা করা হয়েছে।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৯৯. ২৭-৬৯]

বৈদিক ভাবনাতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোকের ত্রিধা বিভিন্ন তেজই অগ্নির তিনটি রূপকল্প সৃষ্টি করেছে। বৈদিক সমাজের গার্হস্থ জীবনেও অগ্নির তিনটি রূপ। বিবাহের পর গৃহস্থ গৃহপতি বাড়ির যে কোনো জায়গায় একটি অগ্নিশালা নির্মাণ করে যথাবিধি শ্রৌত অগ্নি স্থাপন করতেন। এই শ্রৌত অগ্নিরও তিন রূপ—গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি। অগ্নিশালায় চতুষ্কোণ বেদি নির্মাণ করে তার তিন দিকে তিনটি অগ্নি স্থাপন করা হত। বেদির পশ্চিমে গার্হপত্য অগ্নির স্থান, বেদির পূর্ব দিকে আহবনীয়ের স্থান এবং দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নির স্থান। মাটির বেড়া দিয়ে অগ্নির স্থান তৈরি করা হত। গার্হপত্যের স্থান চতুর্ভুজের আকার, আহবনীয়ের স্থান বৃত্তাকার এবং দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্ধবৃত্তাকার। প্রত্যেকটি স্থানের ক্ষেত্রফল সমান। এক হাত লম্বা এবং এক হাত চওড়া।

আহবনীয় অগ্নির কথা ঋগ্‌বেদে প্রথম পাওয়া যায় গৃহস্থের গার্হপত্য অগ্নির সঙ্গে। *[দ্র. সায়ন]*

[ঋগ্‌বেদ ৩.২.১]

আহিতাগ্নি গৃহস্থের অগ্ন্যাধারে আহবণীয় অগ্নির জন্য পৃথক কুণ্ড থাকে। প্রতিদিন দুই বেলা গার্হপত্য কুণ্ড থেকে অগ্নি এনে আহবনীয় কুণ্ডে অগ্নি জ্বেলে সেই অগ্নিতে অগ্নিহোত্র হোম সম্পন্ন করতে হয়। দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতিতেও যথাবিহিত ভাবে আহবনীয় অগ্নি স্থাপন করতে হয়। আহবনীয় অগ্নি দেবতাদের অগ্নি। তাতেই দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। আহুতি দেওয়া হয় বলেই এর নাম আহবনীয়। দেবতারা পূর্ব দিকে বাস করেন। দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব দিকের অধিপতি। এখনও আমাদের পূর্বমুখী হয়ে পূজা করতে হয়। সেইজন্যই আহবনীয় অগ্নির স্থান পূর্বদিকে। দক্ষিণদিক পিতৃগণের। পিতৃগণের রাজা যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দেশে দ্রব্য উৎসর্গ করতে হয়।

গার্হস্থ অগ্নি গৃহস্থ গৃহপতির প্রিয়তম অগ্নি। বিবাহের পর বাড়ির যে কোনো জায়গায় একটি অগ্নিশালা নির্মাণ করে যথাবিধি শৌত অগ্নি স্থাপন করা হত। এই শ্রুতিবিহিত শ্রৌত অগ্নির প্রথম রূপ হল গাহপত্য অগ্নি। বৈদিক গৃহস্থের কাছে গার্হপত্য অগ্নি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই অগ্নিকে কখনই নিবিয়ে দেওয়া হত না। দিনরাত মাস-

বৎসর এই আগুন জ্বলত। আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি দিন-রাত জ্বলত না এবং দেব-পিতৃ-যজনের জন্য প্রয়োজনমত গার্হপত্য আগুন নিয়ে এসে ওই দুই অগ্নি প্রজ্বলন করা হত। পুরাণে তাই প্রার্থনা করা হয়েছে—হে গার্হপত্য অগ্নি! তুমি সমস্ত কর্মের বীজস্বরূপ। আহবনীয় এবং দক্ষিণ—এই দুই অগ্নি তোমার থেকেই উৎপন্ন—

ভগবন্ গার্হপত্যাগ্নে যোনিস্ত্বং সর্বকর্মণাম্।
ত্বত্ত আহবনীয়ো' গ্নির্দক্ষিণাগ্নিশ্চ নান্যতঃ॥

[মার্কণ্ডেয় পু. ৬১.৭৫]

নিয়মিত বৃষ্টি, শস্য এবং ঐহিক সমৃদ্ধির জন্য গার্হপত্য অগ্নিই ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণের আশ্রয়। এই কারণে অপ্সরা-সুন্দরী বরূথিনী যখন এক বৈদিক ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ তখন বলেছিলেন যে, গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণ—এই অগ্নিত্রয়ই তাঁর একমাত্র অভীষ্ট এবং অগ্নিশরণ গৃহই তাঁর একমাত্র স্থান। বরূথিনীর প্রলোভন থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত গার্হপত্য অগ্নির আশ্রয় কামনা করেন এবং আপন সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এই অগ্নির কাছেই প্রার্থনা করেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৬১.৬৫-৭৯]

গার্হপত্য অগ্নির সঙ্গে বৈদিক গৃহস্থের নৈকট্য প্রায় আত্মীয়ের মতো। তাঁকেই প্রকৃত গৃহপতি বলে মানা হত—অগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ।

[ঋগ্‌বেদ ৬.১৫.১৩]

গৃহস্বামী বাড়িতে থাকলে বা না থাকলেও গার্হপত্য অগ্নিকেই আপন প্রতিনিধি-স্বরূপ মনে করতেন বৈদিকেরা। অগ্নির এই মর্যাদা এবং গৃহস্বামীর এই অগ্নি-ভাবনা পুরাণে উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রকটিত হয়েছে—

মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্রের নাম ভূতি। তিনি অতি কোপনস্বভাব এবং অল্প কারণেই অভিশাপ দেন। তাঁর ভয়ে বৃষ্টি, বায়ু, চন্দ্র-সূর্যও তটস্থ হয়ে থাকেন। তাঁর আশ্রমের কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জল আপনিই এসে ধরা দেয় তাঁর কমণ্ডলুতে। এ-হেন ঋষিরও দুর্ভাগ্য ছিল—তিনি অপুত্রক। তিনি একসময় পুত্রকামনায় তপস্যা আরম্ভ করেন। অতি ক্লেশ তিনি সহ্য করতে পারতেন না এবং তাঁর ভয়ভীত চন্দ্র-সূর্য অতিশীত তথা অতি-উষ্ণ তাপ বিকিরণ না করায় তপঃক্লেশও তাঁর তেমন হয়নি। কিন্তু তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় তিনি তপস্যা থেকে বিরত হন।

অঙ্গিরা তনয় ভূতির ভাই হলেন সুবর্চা। তিনি একসময় ভূতিকে যজ্ঞে অভিমন্ত্রিত করেন। যজ্ঞকার্যে গমনেচ্ছু ভূতি তাঁর অতিবিনীত শিষ্য শান্তির ওপর আশ্রমের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। বিশেষত আশ্রমস্থ অগ্নি যাতে প্রজ্বলিত থাকে এবং যাতে কোনোভাবেই অগ্নি নির্বাপিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলে গেলেন। শান্তি গুরুর নির্দেশ পালন করবেন বলে কথা দিলে ভূতি সুবর্চার যজ্ঞে যোগ দিতে গেলেন।

এদিকে গুরুর অগ্নিপোষণের জন্য শান্তি যখন বনে সমিধ-কাষ্ঠ সংগ্রহে গেলেন এবং তিনি যখন গুরুর আদিষ্ট অন্য কোনো কাজেও ব্যস্ত ছিলেন, তখনই একদিন মহর্ষি ভূতির আশ্রমস্থ গার্হপত্য অগ্নি নির্বাপিত হল। শান্তি যেমন দুঃখ পেলেন, তেমনই ভয় পেলেন। গুরুকার্য অবহেলা করার ফলে গুরু তাঁকে অভিশাপ দিতে পারেন, এমনকী স্বয়ং অগ্নিও তাঁকে অভিশাপ দিতে পারেন—এই সব ভাবনায় তার মন ভয়-ব্যাকুল হয়ে উঠল। আশ্রমের অগ্নিশরণ গৃহে শান্তি যে দ্বিতীয়বার অগ্নি সংস্থাপন করবেন তারও উপায় নেই, কারণ গুরু দিব্য দৃষ্টিতে সবই জানতে পারবেন।

বহু চিন্তা করে শান্তি জাতবেদা অগ্নিকেই আশ্রয় করলেন। অগ্নিকে তুষ্ট করার জন্য ভূমিলুণ্ঠিত দেহে হাত জোড় করে তাঁর স্তব আরম্ভ করলেন। শান্তির স্তবগানের বিশেষত্ব এই যে তার মধ্যে বৈদিক অগ্নির সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই কীর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি অপূর্ব শ্লোক যেমন—

ত্বমুত্তমং সত্ত্বমশেষসত্ত্বং/
হৃৎপুণ্ডরীকস্থমনন্তমীড্যম্।
ত্বয়া ততং বিশ্বমিদং চরাচরং/
হুতাশনৈকো বহুধা ত্বমত্র॥

শান্তির প্রার্থনায় অগ্নি স্বরূপ ধারণ করে দিব্যদেহে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বর দিতে চাইলেন। শান্তি অগ্নিদেবকে পূর্ববৎ গুরুর অগ্নিশরণগৃহে প্রজ্বলিত থাকতে বললেন। দ্বিতীয় বরে অপুত্রক গুরুর পুত্রলাভের প্রার্থনা করলেন। নিজের জন্য কিছুই চাইলেন না। অগ্নি তুষ্ট হয়ে শান্তির অভীষ্ট বর দিতে সম্মত হলেন এবং পূর্ববৎ মহর্ষি ভূতির গার্হপত্য অগ্নিরূপে জাজ্বল্যমান হলেন।

এদিকে সুবর্চার যজ্ঞ সমাধা করে এসে মহর্ষি ভূতি তাঁর ভক্ত শিষ্যের কাছে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনে পরম সন্তুষ্ট হলেন।

অগ্নির বরে মহর্ষি ভূতির যে পুত্র হল, তিনিই ভৌত্য মনু।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৯৯.২-৭০; ১০০.১-৩৭]

☐ গার্হপত্য অগ্নির সঙ্গে গৃহস্থের আত্মীয়-সম্পর্ক এতটাই ছিল যে তাঁর ওপরে গৃহস্থের মান-অভিমান, ক্রোধ, এমনকী দরকারে তাঁকে সাক্ষী হিসেবেও মানা হত। এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে অগ্নির সর্বভুক হবার কাহিনী। অথচ ভৃগু অগ্নিরই পুত্র বলে কথিত। *[মহা (k) ১.৫.৭; (হরি) ১.৫.৭]*

মহাভারতে অগ্নির পুত্র ভৃগু, অঙ্গিরা ইত্যাদির জন্ম প্রসঙ্গে মহাদেবের পুত্র দেব সেনাপতি কার্তিকের জন্ম এবং সুবর্ণ (সোনা)-সৃষ্টির উপাখ্যান জড়িয়ে আছে।

মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ এবং মিলন সম্পন্ন হবার পর দেবতারা ভয় পেলেন। তাঁরা ভাবলেন শিব-পার্বতীর তেজে উৎপন্ন ভবিষ্যৎ-পুত্রটি এতই বলবান হবেন যে, তিনি এই তিন ভুবন এবং অবশ্যই দেবতাদেরও পরাভূত করবেন। দেবতারা তাই শিবের কাছে প্রার্থনা করলেন যাতে তাঁর জ্বলিত তেজোবীর্য্য পার্বতীর গর্ভে নিহিত না হয়—ন দেব্যাং সম্ভবেৎ পুত্রো ভবতঃ সুরসত্তম। দেবতাদের কথা মেনে শিব আপন তেজ উর্ধ্বে স্থাপন করে উর্ধ্বরেতা হলেন বটে কিন্তু দেবতাদের পরামর্শে সন্তানকামী স্বামীর তেজ-নিবৃত্তিতে ক্রুদ্ধা পার্বতী দেবতাদের সন্তানহীন হবার অভিশাপ দিলেন।

মহাদেব আপন ক্ষমতায় নিজের অমোঘ বীর্য্য ধারণ করলেন বটে, কিন্তু সেই তেজের একাংশ ভূতলে পতিত হল। ওদিকে ঘটনাক্রমে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান তারকাসুর দেবতা এবং ঋষিদের উৎপীড়ন করছিলেন, তাঁদের বাসস্থান এবং আশ্রম ধ্বংস করছিলেন। তারকাসুর স্বয়ং ব্রহ্মার বরেই দেবতা, অসুর এবং রাক্ষসদের অবধ্য ছিলেন। দেবতারা ব্রহ্মার কাছে অনুযোগ করে বললেন যে, তাঁরই বরে তারকাসুর অবধ্য, অথচ নিজেদের সম্মিলিত তেজে তাঁরা যে কাউকে সৃষ্টি করবেন, সে উপায়ও তাঁদের নেই কারণ পার্বতীর অভিশাপে আর তাঁদের সন্তান হবে না।

সব শুনে ব্রহ্মা বললেন যে, পার্বতী যখন অভিশাপ দেন, তখন দেবতাদের মধ্যে একমাত্র অগ্নিই সেখানে ছিলেন না। অতএব তারকাসুর বধের জন্য অগ্নিই সন্তান উৎপাদন করবেন। মহাদেবের যে আংশিক তেজ ভূতলে পতিত হয়েছে, সেই তেজ গঙ্গার গর্ভে স্থাপন করে দেবতাদের ভয়নাশক এক পুত্র উৎপাদন করবেন অগ্নি। অতএব দেবতারা যেন অগ্নিকে খুঁজে বার করেন।

ব্রহ্মা দেবতাদের কাছে অগ্নির অনেক প্রশংসা করে বললেন—অগ্নিই জগতের নিয়ন্তা, তিনি অনির্বচনীয়, সর্বত্রগামী, সর্বকার্যক্ষম, সমস্ত প্রাণীর হৃদয়বর্তী এবং মহাদেবেরও তিনি জ্যেষ্ঠ—হৃচ্ছয়ঃ সর্বভূতানাং জ্যেষ্ঠো রুদ্রাদপি প্রভুঃ। অতএব দেবতারা যেন অগ্নিকে খুঁজে বার করেন।

ব্রহ্মার এই বাক্যেও সমস্ত প্রাণীর সংকল্পাত্মক চেতনাকেই অগ্নি বলা হয়েছে এবং অগ্নিসৃষ্টির উপকারিতা এবং প্রাচীনত্বহেতুই তিনি মহাদেবের জ্যেষ্ঠ বলে কথিত। অগ্নিকে খুঁজে বার করার তাৎপর্য্যও কিন্তু সেই সংকল্পাত্মক মহাশক্তিকে অন্বেষণ করা।

যাই হোক ব্রহ্মার উপদেশে দেবতারা অগ্নিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু তিনি আত্মা বা জলের মধ্যে লীন হয়ে ছিলেন (তেজ থেকে জল জন্মায় অতএব জলই অগ্নির আত্মা)। এই সময়ে জলচারী অগ্নির তেজে সন্তপ্ত একটি ভেক ডাঙায় উঠে এসে দেখল যে, উদ্বিগ্নচিত্ত দেবতারা অগ্নিকে খুঁজছেন। সে বলল যে, অগ্নি পাতালে জলের মধ্যে নিদ্রিত আছেন এবং অগ্নির তেজে তাপিত হয়েই সে ওপরে উঠে এসেছে। অগ্নিকে জলের মধ্যে খোঁজার পরামর্শ দিয়ে ভেক আবার জলে প্রবেশ করল। ভেকের এই খল ব্যবহার বুঝতে পেরে অগ্নি অন্যত্র চলে গেলেন এবং ভেকদের অভিশাপ দিলেন যে তারা আর কোনও দিন রসের অনুভব করতে পারবে না। কিন্তু ভেক দেবকার্যে সাহায্য করেছিল বলে দেবতারা তাদের আশীর্বাদ করলেন যে, জিহ্বা-রসজ্ঞানশূন্য হলেও ভেক শব্দ করতে সমর্থ হবে। গর্তের মধ্যে আহার শূন্য অচেতন প্রায় হয়ে থাকলেও ভূমি তাদের ধারণ করবে এবং অন্ধকার রাত্রিতেও তারা বিচরণ করতে পারবে।

দেবতারা পাতালে প্রবেশ করে অগ্নিকে পেলেন না। আবারও তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দেবতাদের সঙ্গে হাতির দেখা হল। হাতি বলল—অগ্নি অশ্বত্থ বৃক্ষে অবস্থান করছেন। হাতির কথায় অগ্নি অশ্বত্থ গাছ ছেড়ে শমীলতার ভিতর আশ্রয় নিলেন এবং প্রবঞ্চনার জন্য হাতিকে অভিশাপ দিলেন যে, তাদের জিহ্বা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। দেবতারা কিন্তু সংবাদ-লাভের কৃতজ্ঞতায় হস্তীকে আশীর্বাদ করে বললেন যে, জিহ্বা বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও তারা সব আহার করতে পারবে এবং সুউচ্চে অস্পষ্ট শব্দও করতে পারবে। দেবতারা আবার অগ্নিকে খুঁজতে আরম্ভ করলে একটি শুকপাখি দেবতাদের বলে দিল যে, অগ্নি শমীলতায় অবস্থান করছেন। শুকপাখির ছলনা বুঝতে পেরে সমস্ত শুকপাখিরই জিহ্বা বিপর্যস্ত হবার অভিশাপ দিলেন। ওদিকে কৃতজ্ঞতাবশত দেবতারা আবারও শুকপাখিকে বর দিলেন যে, বিপর্যস্ত জিহ্বা সত্ত্বেও তারা বালক এবং বৃদ্ধের মতো সুন্দর মধুর এবং অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে।

হয়তো ভেক, হস্তী এবং শুকপাখির বিপর্যস্ত জিহ্বা সত্ত্বেও তাদের ডাক শুনে আশ্চর্য কোনও ভাবুক এই অভিশাপ-আশীর্বাদের কাহিনী রচনা করেছিলেন। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত অগ্নির সঙ্গে দেবতাদের দেখা হল এবং তাঁদের চিত্ত ব্যথিত দেখে অগ্নি তাঁদের সাহায্য করতেও স্বীকৃত হলেন। দেবতারা তারকাসুরের অত্যাচারের কথা, রুদ্রাণীর অভিশাপের কথা এবং অবশেষে ব্রহ্মার পরামর্শের কথাও অগ্নিকে বললেন। অপিচ অগ্নির তেজে যে পুত্র জন্মাবেন, তিনিই যে দেবতাদের অসুর-ভয় থেকে মুক্ত করবেন, সে কথাও অগ্নিকে জানালেন দেবতারা।

দেবতাদের প্রার্থনায় রাজী হলে মহাদেবের যে তেজ ভূমিতে স্খলিত হয়ে অগ্নির মধ্যেই পতিত হয়েছিল, সেই তেজ অগ্নি গঙ্গার গর্ভে স্থাপন করলেন গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে। অগ্নির সেই জ্বলিত তেজ গঙ্গা শেষ পর্যন্ত ধারণ করতে অসমর্থ হলেন। তেজোগর্ভধারণে দেবকার্য সাধিত হবে জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সেই তেজ সহ্য করতে না পেরে নিতান্ত অনিচ্ছায় গঙ্গা গর্ভ মোচন করতে চাইলেন। স্বয়ং অগ্নির অনুরোধ এবং সম্মিলিত দেবতাদের অনুরোধেও অগ্নির দ্বারা স্থাপিত সেই জ্বলিত তেজ গঙ্গা ধারণ করতে পারলেন না। তিনি সুমেরু পর্বতের ওপর গর্ভ মোচন করলেন।

সদ্যোমুক্ত সেই গর্ভের বর্ণ-রূপ অগ্নির মতোই উজ্জ্বল এবং স্বর্ণবর্ণ। সমস্ত পার্বত্য ভূমি সেই গর্ভতেজে স্বর্ণাভ হয়ে উঠল এবং এই গর্ভের জনক বলেই অগ্নিকে নাম হল হিরণ্যরেতা (বেদে অগ্নি আপন বর্ণের বিশেষত্বেই হিরণ্যরেতা, হিরণ্যনির্নীক, হিরণ্যশ্মশ্রু)। পৃথিবীর অন্যতম মহার্ঘ্য ধাতু সুবর্ণও সেই থেকে অগ্নির পুত্র বলে কীর্তিত হল—এবং সুবর্ণমুৎপন্নমপত্যং জাতবেদসঃ। সেই সুবর্ণ-স্বরূপ তেজোগর্ভই পরে শরবনে কৃত্তিকাদের দ্বারা লালিত হয়ে কুমার কার্তিকেয়কে সৃষ্টি করে। অতএব তারকাসুরহন্তা কার্তিকেয় এবং সুবর্ণের সৃষ্টির সঙ্গে অগ্নিও এইভাবে জড়িত আছেন।

[মহা (k) ১৩.৮৫.১-৮১;
(হরি) ১৩.৭৪.১-৮১]

□ অন্যত্র স্কন্দ কার্তিকেয়র সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। হর-গৌরী দীর্ঘ-সুরতে প্রবৃত্ত হলে ব্যাকুল দেবতারা শঙ্করের ক্রিয়া-কলাপ জানবার জন্য অগ্নিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। অগ্নি পারাবতের রূপ ধারণ করে মহাদেবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে চিনতে পারেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের অমোঘ বীর্য্য ধারণ করতে বলেন। অগ্নি সেই তেজ গ্রহণ করে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন এবং গঙ্গায় সেই তেজ নিক্ষেপ করেন। এই সময়ে সপ্তর্ষিরা হিমালয়ে হোম করবার সময় অগ্নিকে আহ্বান করলেন কিন্তু অগ্নি সেখানে এসে সপ্তর্ষি পত্নীদের দেখে কামাভিভূত হলেন। অগ্নিপত্নী স্বাহাদেবী অগ্নির মনোভাব বুঝতে পেরে সপ্তর্ষিপত্নীদের রূপ ধারণ করলেন এবং অগ্নির সঙ্গে মিলিত হলেন। একে একে স্বাহাদেবী ছয়জন ঋষিপত্নীর রূপ ধরে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হলেন বটে, কিন্তু তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করতে পারলেন না। অপিচ অগ্নির সঙ্গে মিলিত হলেও ছয়বারের একবারও তিনি তাঁর শুক্রতেজ ধারণ করতে না পেরে ছয় বারই শ্বেতপর্বতের কাঞ্চন কুণ্ডে সেই তেজ নিক্ষেপ করলেন। এদিকে অগ্নিও

একসময়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরদার গমনের অনুতাপে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। এই সময়ে দৈববাণী হল যে, স্বাহাদেবীই সপ্তর্ষিপত্নীদের রূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তবু তথাকথিত পরদারগমনের অপরাধ যা হয়েছে, তার জন্য শ্বেতকির যজ্ঞে ঘি খেয়ে তাঁর অজীর্ণ রোগ হবে। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন তিনি শ্বেতপর্বতে গিয়ে তাঁর পুত্র দর্শন করুন। অগ্নি তখন সেখানে গিয়ে পুত্র দর্শন করলেন। সেই পুত্রই ছয় কৃত্তিকামাতাদের দ্বারা রক্ষিত স্কন্দ কার্তিকেয়।

[স্কন্দ পু.(মাহেশ্বর/কুমারিকা) ২৯.৮১-১১৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অগ্নি কার্তিকেয়র কাছে-বর লাভ করেন যে, যজ্ঞে প্রদত্ত হব্য-কব্য সবই তিনি লাভ করবেন এবং এরপর থেকে দেবতাদের মতো যজ্ঞভাগও তিনি লাভ করবেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ২৯.২১৩-২১৪]

অন্য একটি ঘটনায় হর-গৌরীর মিলনের পর শিবের রেতঃপাতে জগৎ ধ্বংস হবার উপক্রম হলে বিষ্ণু অগ্নিকে স্মরণ করেন। দেবতাদের প্রার্থনায় অগ্নি সেই অমোঘ বীর্য্য পান করলেন। অগ্নি মুখে নিক্ষিপ্ত হবি সমস্ত দেবতারা ভক্ষ্য, অতএব অগ্নি রেতঃপান করলে দেবতারা গর্ভযুক্ত হলেন। এইভাবে দেবতারা পীড়িত হয়ে মহাদেবের স্তব করলে তিনি দেবতাদের রেতোবমন করতে বললেন। বমন করে অন্য দেবতারা সুস্থ হলেন বটে, কিন্তু অগ্নি কোনও স্বস্তি পেলেন না। শিবকে আপন কষ্টের কথা জানালে শিব অগ্নিকে বললেন যে, মাঘ মাসে যারা প্রবল শীতে কষ্ট পাবে অগ্নি যেন তাদের দেহে ওই তেজে নিক্ষেপ করেন। শিবের কথায় একদিন অগ্নি ব্রাহ্ম মুহূর্তে এক জলাশয়ের তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে সকালে ঋষিপত্নীরা এসেছিলেন স্নান করতে। স্নানান্তে শীত কাটানোর জন্য তাঁরা সম্মুখস্থ অগ্নি থেকে তাপ গ্রহণ করতে লাগলেন। সেই সময়ে তাঁদের রোমকূপগুলির মধ্যে অগ্নিধৃত সেই রোতোরাশির পরমাণু সংক্রমিত হল। তাতেই শেষ পর্যন্ত রেতোহীন হয়ে অগ্নি স্বস্তি লাভ করলেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ২৭.৩০-৭৪]

□ মহাভারতে অগ্নি থেকে ভৃত, অঙ্গিরা ইত্যাদি ঋষিদের জন্ম কথিত হয়েছে। বেদে এ বিষয়ে কোনো উপাখ্যান নেই, কিন্তু নিরুক্ত-গ্রন্থে এবং বৃহদ্দেবতায় বলা অছে যে, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্য থেকে ভৃগুর জন্ম হয়। সেই অগ্নিশিখা নির্বাপিত হলে অবশিষ্ট অঙ্গার থেকে জন্মান অঙ্গিরা। ভৃগু এবং অঙ্গিরার জন্মের পর মহর্ষিরা বলেছিলেন—এইখানেই তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হও—অত্র+ত্রি—সেইজন্য তৃতীয় জনের নাম অত্রি—অর্চিষি ভৃগুঃ সংবভূব; অঙ্গারেষ্বঙ্গিরা; অত্রৈব তৃতীয়ম্ ঋচ্ছত ইত্যূচুঃ অস্মাদ্ অত্রিঃ। *[নিরুক্ত ৩.১৭.৫-৭]*

এই তিন সংখ্যাতেই অগ্নিভূ ঋষিদের জন্ম শেষ হয়নি (শুধু তিনই নয়, ন+ত্রি, সেইজন্য আত্রি), অগ্নিস্থান খনন করলে বৈখানসদেরও জন্ম হবে বলে মহর্ষিরা বলেছিলেন।

[বৃহদ্দেবতা ৫.৯৭-১০০]

এ বিষয়ে মহাভারত বলেছে—কোনও সময় বরুণের যজ্ঞকার্য (এখানে মহাদেব এবং বরুণ স্বরূপত অভিন্ন) চলতে থাকলে সমস্ত দেবতারা এবং দেবপত্নীরাও সেই যজ্ঞে যোগ দিতে আসেন। এই সময়ে মহাদেব উপস্থিত হলে দেবতপত্নীরা খুশী হয়ে ওঠেন। তা দেখে মহাদেবের বীর্য্য স্খলিত হয়ে ভূতলে পড়ল। সেই বীর্য্যসিক্ত ধূলি দুই হাতে মুঠো করে তুলে নিয়ে পূষ-দেব (পূষণ) মন্ত্র পড়ে নিক্ষেপ করলেন অগ্নিতে।

যজ্ঞকাষ্ঠের সঙ্গে অগ্নি জ্বলতে থাকলে সেই অগ্নিজ্বালা থেকেই ভৃগুর জন্ম হল। ভৃগু থেকে জন্মালেন কবি নামে অন্য ঋষি। সেই যজ্ঞাগ্নির কিরণ থেকে জন্মালেন মরীচি। তাঁর থেকে কশ্যপের জন্ম। যজ্ঞের কুশ থেকে জন্মালেন বালখিল্য ঋষিরা। বালখিল্যরা জন্মালে যজ্ঞে উপস্থিত ব্যক্তিরা, অত্র, অত্র—এখানে এখানে—এইরকম বলায়—যে ঋষি জন্মালেন তাঁরই নাম অত্রি এবং যজ্ঞশেষ ভস্মরাশি থেকে জন্মালেন বনবাসী বৈখানস-মুনিরা। অগ্নির নয়ন-জল থেকে জন্মালেন সুন্দর অশ্বিনীকুমারদ্বয়। প্রজাপতিরা জন্মালেন অগ্নির ইন্দ্রিয় থেকে, লোমকূপ থেকে ঋষিরা। সেইজনাই অগ্নি সমস্ত দেবতার সঙ্গে একাত্মক।

[মহা (k) ১৩.৮৫.৮৪-১০৯;
(হরি) ১৩.৭৪.৮৫-১০৯]

□ অগ্নি থেকে যেমন ভৃগুর জন্ম, তেমনই সেই ভৃগুর কাছেই তিনি একবার অভিশাপ লাভ

করেছিলেন, অবশ্য সেই কাহিনীর সঙ্গে গার্হপত্য অগ্নির গৃহধিষ্ঠাতৃত্বের কথাও জড়িত। ভৃগুর স্ত্রীর নাম ছিল পুলোমা। তিনি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গৃহে ছিলেন এবং ভৃগু স্নানের জন্য গিয়েছিলেন আশ্রমের বাইরে। এদিকে ওই একই পুলোমা নামের একটি রাক্ষস ছিল। ভৃগুর অনুপস্থিতিতে সে আশ্রমে প্রবেশ করে এবং ভৃগু-ভার্যা পুলোমাকে দেখে রাক্ষস পুলোমা মুগ্ধ হয়। রাক্ষস তাঁকে অপহরণ করার কথা ভাবে এবং তাঁকে আরও ভাল করে দেখে সে বুঝতে পারে যে, এক সময় সে এই রমণীকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। তার দুঃখ দ্বিগুণিত হয়।

ভৃগুভার্যাকে অপহরণ করার জন্য পুলোমা-রাক্ষস চারদিকে তাকালে হোমগৃহে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। সে এবার অগ্নিকে সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করল—সুন্দরী পুলোমা আসলে কার স্ত্রী? পূর্বে তার সঙ্গেই পুলোমার বিয়ে হবে বলে ঠিক ছিল, কিন্তু পুলোমার পিতা অন্যায়ভাবে তাঁকে ভৃগুর হাতে দিয়েছেন। অতএব ভৃগু পুলোমা-রাক্ষসের পূর্ববৃতা মনোনীতা স্ত্রীকে হরণ করে যদি অন্যায় করে থাকে, তবে এই মুহূর্তে ভৃগুর স্ত্রীকে অপহরণ করার মধ্যে কোনও অন্যায় থাকে না। এ-ব্যাপারে অগ্নিই একমাত্র সত্যি কথা বলতে পারেন এবং পুলোমা-রাক্ষস অগ্নির কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল সত্য বলার জন্য।

অগ্নি অস্বস্তিতে পড়লেন, তাঁর দ্বিধাও কম হল না। রাক্ষসের কাছেও মিথ্যা কথা বলা অনুচিত বটে, ওদিকে সত্য বললে ভৃগুর অভিশাপের ভয় আছে। অতএব সব দিক ঠিক রেখে অগ্নি বললেন যে, সুন্দরী পুলোমাকে রাক্ষস পুলোমাই আগে বরণ করেছে বটে, তবে বেদবিধি অনুসারে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে ভৃগুই তাঁকে বিবাহ করেছেন এবং যে কোনো স্বার্থেই হোক কন্যাপিতাও তাঁকে যথাবিধি সম্প্রদান করেছেন। কাজেই তিনি পুলোমা রাক্ষসের পূর্ববৃতা কন্যাও বটে ভৃগুর ভার্যাও বটে।

অগ্নির সত্যবচন শুনে নিজের যুক্তি নিজে সাজিয়ে পুলোমা ভৃগুর স্ত্রীকে হরণ করার চেষ্টা করল কিন্তু গর্ভস্থ ভৃগুপুত্র চ্যবনের তেজে তার মৃত্যু হয়। ওদিকে স্নানান্তে ফিরে এসে ভৃগু তাঁর রোদনপরা স্ত্রী পুলোমার কাছে জানতে চাইলেন যে, রাক্ষসের কাছে কে তাঁর সত্য পরিচয় দিয়েছে। সে রাক্ষস তো পুলোমাকে নিজের পূর্ববৃতা বলে আগেই নিশ্চিত হয়নি। ভৃগুভার্যা অগ্নির সত্যসাক্ষ্যের কথা বলে দিলে ভৃগু অগ্নিকে অভিশাপ দিলেন যে, অগ্নি সর্বভুক হবেন।

অগ্নিও ভৃগুর ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। কেননা পক্ষপাতহীন সাক্ষ্য দেওয়াটাই সাক্ষীর কাজ। অগ্নি ভৃগুকে ব্রাহ্মণ বলে প্রতি-অভিশাপ দিলেন না বটে, কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন যে, তিনি দেবতা এবং পিতৃগণের মুখ-স্বরূপ। সমস্ত আহুতি-দ্রব্য অগ্নিমুখেই দেব-পিতৃগণ ভোজন করেন। অতএব সেই মুখ সর্বভুক হলে কী করে চলে? ক্রোধে ক্ষোভে অগ্নি সেই অভিশাপের প্রতিশোধ নিলেন অন্যভাবে। ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র, অন্যান্য যজ্ঞ, সত্র, উপনয়ন-বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়া এবং রন্ধনকার্য থেকে অগ্নি নিজেকে প্রতিসংহরণ করে নিলেন। সমস্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লুপ্ত হবার জোগার হলে ঋষিরা এবং দেবতারা ব্রহ্মার কাছে জগতের বিপদের কথা জানালেন। ব্রহ্মা অগ্নিকে ডেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, সৃষ্টি-স্থিতি পালন এবং বৈদিক ক্রিয়ার মূল হলেন অগ্নি। তাঁর সর্বভুক হবার কোন কারণ নেই। তিনি সর্বদা পবিত্র। অন্যদিকে ভৃগুর শাপের মর্য্যাদা রক্ষা করে ব্রহ্মা বললেন—অগ্নির সমস্ত শরীর দিয়ে সর্বভক্ষণ করতে হবে না। যে সমস্ত শিখা আছে, সেইগুলিই সর্বভুক হবে আর অগ্নির 'ক্রব্যাদ' (শব-শরীর দাহী অগ্নির নাম) নামে যে মাংসভোজিনী মূর্তি আছে, সেই মূর্তিতে অগ্নি সর্বভুক হবে। এছাড়া অন্য সমস্ত অঙ্গেই অগ্নি সূর্যকিরণের মতো পবিত্র থাকবেন। অগ্নি ব্রহ্মার কথায় সন্তুষ্ট হলেন এবং এ ঘটনায় সমস্ত সুর-মুনি-মানুষের পরম প্রীতি লাভ ঘটল।

[মহা (k) ১.৫.১২-৩৪; ১.৬.১-৪২;
(হরি) ১.৫.১২-৩৪; ১.৬.১-৪১]

☐ মহাভারতে পাণ্ডব-কনিষ্ঠ সহদেবের দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—নানা রাজ্য জয় করে সহদেব যখন মাহিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করলেন, তখন মাহিষ্মতী পুরীর রাজা নীলের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় সৈন্য-সামন্ত সহ সহদেবের জীবন সংশয় হয়ে উঠল। তাঁর হাতী ঘোড়া, রথ, সৈন্য জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। সহদেব

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লে তিনি শুনতে পেলেন —স্বয়ং অগ্নি মাহিষ্মতী পুরী রক্ষা করেন। এও শোনা গেল যে, মাহিষ্মতী নগরের লোকেরা অগ্নিদেবকে পরস্ত্রীতে আসক্ত এক পারদারিক পুরুষ বলে জানত। এর কারণ হল—নীলরাজার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সে প্রতিদিন রাজার অগ্নিহোত্র সম্পাদন করার সময় উপস্থিত হত এবং সে তার মনোহর ওষ্ঠপুট দিয়ে যতক্ষণ না আগুনে ফুৎকার দিত, ততক্ষণ রাজার চেষ্টাতেও আগুন জ্বলত না। এইভাবে ওই কন্যার প্রতি অগ্নিদেবও আসক্ত হয়ে পড়েন। এরপর একদিন অগ্নিদেব ব্রাহ্মণেরূপ ধারণ করে যখন নীলরাজার সুন্দরী কন্যার সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হন, তখন রাজা তাঁকে শাসন করেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিদেব রাজভবনে জ্বলে ওঠেন। রাজা নীল ভীত হয়ে অগ্নির হাতে কন্যাকে দান করেন। অগ্নি তাতে তুষ্ট হয়ে মাহিষ্মতী পুরীকে সদা-সর্বদা সুরক্ষা দেবার বর দেন নীল রাজাকে। সেই সময় থেকে কেউ মাহিষ্মতী আক্রমণ করলেই অগ্নি তাকে দগ্ধ করেন। সহদেব সব শুনে অগ্নির উপাসনা আরম্ভ করলেন এবং বহু স্তব-স্তুতি করে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করলেন। অগ্নি তখন বললেন—আমি তোমার এবং যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু যে পর্যন্ত নীল রাজার বংশ এই মাহিষ্মতী পুরীতে থাকবে, ততদিন এই পুরী আমি রক্ষা করে যাবো। অগ্নি অবশ্য নীলরাজাকে দিয়ে সহদেবের কাছে যুধিষ্ঠিরের বশ্যভাব স্বীকার করালেন এবং রাজকরও দেওয়ালেন যুধিষ্ঠিরের জন্য।

[মহা (k) ২.৩১.২১-৫৮;
(হরি) ২.৩০.২০-৫৭]

☐ অপবিত্র, অমেধ্য বস্তু চিহ্নহীন করে দেবার জন্য আমরা অগ্নি ব্যবহার করি। যে অগ্নি যজ্ঞক্রিয়ায় ব্যবহৃত হন বলে এত পবিত্র, সেই অগ্নিতেই অমেধ্য বস্তুর ধ্বংসসাধন হয় বলেই হয়তো এই 'সর্বভুক' হবার অভিশাপ-কাহিনী। প্রাচীনকালে বন-জঙ্গল পুড়িয়ে যখন নতুন বসতি স্থাপনের প্রয়োজন হয়েছে, তখনও অগ্নির দেবকল্প ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর সনাতন মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রেখে। সেই রকম একটি ঘটনা খাণ্ডব-বন দহনের বিষয়-বস্তু।

পুরাকালে যজ্ঞব্যসনী শ্বেতকি রাজার দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘৃতাহুতি লাভ করে অগ্নিদেবের ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়। তিনি আর কোনো যজ্ঞে ঘৃতাহুতি গ্রহণ করতে চাইতেন না এবং ক্রমে তাঁর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যায়। তেজোহীন তথা অগ্নিমান্দ্যরোগে (ক্ষুধাহীনতা) অসুস্থ অগ্নি ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করেন। রোগের প্রতিকার হিসেবে ব্রহ্মা অগ্নিকে বহুপশুযুক্ত খাণ্ডববন দহন করে সমস্ত প্রাণীর মেদ পান করতে বলেন। তাতেই নাকি তাঁর রুচি ফিরে আসবে। ব্রহ্মার কথা শুনে অগ্নি খাণ্ডব বনে গিয়ে জ্বলে ওঠেন কিন্তু সেখানকার হস্তী, সর্প এবং অন্যান্য পশুরা জল সংগ্রহ করে বনের আর নিভিয়ে ফেলে। বারবার এই প্রজ্বলন এবং নির্বাপন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অগ্নি আবার ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা তখন ধরাধামে অবতীর্ণ নর-নারায়ণ ঋষির স্বরূপ অর্জুন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে খাণ্ডববন-দহনে তাঁদের সাহায্য চাইতে বলেন অগ্নিকে।

এদিকে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব পাবার পর অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে একবার যমুনা-বিহারে গিয়েছিলেন। সেখানে যমুনা তীরবর্তী খাণ্ডব-বন দেখে তাঁরা এক জায়গায় বসে ছিলেন। সেখানে অগ্নি এক ব্রাহ্মণের বেশে তাঁদের কাছে আসেন। ব্রাহ্মণের আকৃতি দীর্ঘ এবং স্থূল। গাত্রবর্ণ সোনার মতো উজ্জ্বল। জটা এবং শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ। প্রথমে অগ্নি নিজেকে বহুভোজী ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে অপরিমিত ভোজন প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ এবং অর্জুন ব্রাহ্মণের ঈপ্সিত অন্ন সংগ্রহ করে দিতে চাইলে ব্রাহ্মণ নিজেকে অগ্নিদেব বলে পরিচয় দিয়ে বলেন যে, তিনি খাণ্ডব-বনটিকেই ক্ষুধার অন্ন হিসেবে চান। অগ্নি এও বললেন যে, খাণ্ডব-বনে তক্ষক নাগ থাকেন এবং তাঁকে রক্ষা করার জন্যই ইন্দ্র সর্বদা ওই বন রক্ষা করে থাকেন। তক্ষক নাগের জন্য অন্যান্য প্রাণীরাও অগ্নির দহন থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। অগ্নি খাণ্ডব-বনে জ্বলে উঠলেই ইন্দ্র জল বর্ষণ করে অগ্নি-নির্বাপন করেন। অগ্নি তাই অর্জুন এবং কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন যাতে তাঁরা অস্ত্রাদির সাহায্যে ইন্দ্রের ওই চেষ্টা নিবারণ করেন এবং অগ্নি নির্বিঘ্নে খাণ্ডব দহন করে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন।

অর্জুন অগ্নির প্রার্থনায় খাণ্ডববনের দহনকার্যে অগ্নিকে সাহায্য করতে চাইলেন বটে, কিন্তু এই

গুরুতর কাজে ইন্দ্রের মতো দেবশক্তিকে বাধা দিতে হলে যে ধরনের উপযুক্ত ধনুক, অস্ত্রাধার এবং রথ প্রয়োজন, তা তাঁর নেই বলে অর্জুন অগ্নিকে জানালেন।' অপিচ খাণ্ডববনের নাগ-পিশাচদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্য তাঁর সখা কৃষ্ণেরও যে উপযুক্ত অস্ত্র প্রয়োজন, সে-কথাও অর্জুন জানালেন অগ্নিকে।

অর্জুনের প্রয়োজন শুনে অগ্নি বরুণদেবকে স্মরণ করলেন এবং তাঁর কাছে চন্দ্রদেবের দেওয়া যে ধনুক, তূণীর এবং কপিধ্বজ রথ ছিল, সেগুলি চাইলেন অর্জুনকে দেবার জন্য। বরুণদেব সঙ্গে সঙ্গে সেই অতিভীষণ গাণ্ডীব ধনুক, দুটি অক্ষয় তূণ এবং কপিধ্বজ রথ এনে দিলেন এবং অগ্নি সেগুলি সব দিলেন অর্জুনকে। আর কৃষ্ণকে অগ্নি দিলেন সুদর্শনচক্র, যার মধ্যস্থান বায়ুনির্মিত। অগ্নি বললেন—শত্রুনিধন করে চক্রটি আবারও কৃষ্ণের হাতে ফিরে আসবে এবং ওই চক্রের সাহায্যে কৃষ্ণ দেবতা, দৈত্য, রাক্ষস সকলকেই বধ করতে পারবেন।

যুদ্ধের উপযুক্ত উপকরণ লাভ করে অর্জুন এবং কৃষ্ণ অগ্নিদেবকে খাণ্ডব বনে জ্বলে উঠতে বললেন এবং অগ্নিও ব্রাহ্মণরূপ ত্যাগ করে খাণ্ডব-দহন আরম্ভ করলেন। অর্জুন এবং কৃষ্ণ রথে চড়ে বনের দুই দিকে অধিষ্ঠিত হয়ে অগ্নিকে সাহায্য করতে লাগলেন। খাণ্ডব-বনের সমস্ত পশুপক্ষী ভয়ঙ্কর আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। দেবতা এবং ঋষিরা আগুনের অনির্বাণ তেজ দেখে শঙ্কিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র আবারও আসলেন জলবর্ষণ করে আগুন নিবিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু জলবর্ষণ হতে থাকলে খানিকটা অগ্নিতেজে এবং খানিকটা অর্জুনের অস্ত্রকৌশলে জলবর্ষণ সম্পূর্ণ নিবারিত হল। পশু-পক্ষী কেউই অর্জুনের অস্ত্রকৌশলে খাণ্ডব বন থেকে বেরোতে পারল না। নাগরাজ তক্ষক খাণ্ডব-দহনের সময়ে সেখানে ছিলেন না। তিনি কুরুক্ষেত্রে ছিলেন বলে অগ্নিদাহ থেকে রক্ষা পেলেন। তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন তাঁর মায়ের কৌশলে এবং ইন্দ্রের মায়ায় দাহ থেকে রক্ষা পেলেন। আর রক্ষা পেলেন ময় দানব এবং চারটি খঞ্জন পক্ষী।

এই চারজন খঞ্জন পক্ষী অবশ্য মন্দপাল নামে ঋষির পুত্র। খুব কম সময়ে বহুতর পুত্রলাভের আশায় মন্দপাল মুনি জরিতা নামে এক খঞ্জন পক্ষিণীর গর্ভাধান করেন। মন্দপাল মুনির চারটি বেদবাদী পুত্র যখন অণ্ডগত তখন অগ্নি খাণ্ডববনে জ্বলে উঠলেন। মন্দপাল তখন অগ্নির স্তব করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। অগ্নি মহর্ষির অভীষ্ট সম্পাদনে স্বীকৃত হলে মন্দপাল অগ্নির কাছে এই প্রার্থনা করলেন যাতে খাণ্ডব দহনের সময়ে অগ্নি তাঁর পুত্র চারটিকে আপন দহন থেকে মুক্তি দেন।

খাণ্ডব-বনে অগ্নি জ্বলে উঠলে মন্দপাল-পত্নী জরিতা তাঁর সদ্যোজাত চারটি পুত্রকে রক্ষা করার জন্য নানা উপায়ের কথা ভাবলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অগ্নি নিকটে এসে গেলে মন্দপালের চার পুত্র জরিতারি, সারিসৃক্ক, স্তম্বমিত্র এবং দ্রোণ—সকলেই অগ্নির স্তব করলেন। অগ্নি তখন বললেন যে, তাঁদের পিতা মন্দপাল পূর্বেই তাঁদের রক্ষার বিষয়ে প্রার্থনা করেছেন। অতএব দহন বিষয়ে তাঁদের কোনও চিন্তা নেই।

এই কথা বলে অগ্নি সেই পক্ষী চারটিকে বাদ দিয়ে সমস্ত খাণ্ডব-বনের পশু-পক্ষীর মেদ-রুধির পান করে পুনরায় খাদ্যে রুচি ফিরে পেলেন। ওদিকে ইন্দ্রও অর্জুন-কৃষ্ণের অস্ত্র-কৃতিত্ব দর্শন করে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেলেন। পনেরো দিন ধরে (মন্দপাল-পুত্রদের সঙ্গে দেখা হবার পর আর ছয় দিন) খাণ্ডবনের প্রাণি-মাংস ভক্ষণের পর তৃপ্ত অগ্নি অর্জুন এবং কৃষ্ণকে স্বস্থানে যাবার অনুমতি দিলেন।

[মহা (k) ১.২২২.১৮-৩৩; ১.২২৩-২৩৪ অধ্যায়;
(হরি) ১.২১৫.১৮-৩৬; ১.২১৬-২২৭ অধ্যায়]

□ রামায়ণে রাবণের গৃহবাসিনী সীতার বিশুদ্ধি-পরীক্ষার সঙ্গে অগ্নি জড়িত। রামচন্দ্র যখন জনাপবাদের ভয়ে সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, তখন সীতা ক্ষোভে লজ্জায় লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বললেন। চিতা প্রস্তুত হলে জ্বলন্ত অগ্নিকে সীতা বলেছিলেন যে, তাঁর মন যেহেতু মুহূর্তের জন্যও রামচন্দ্রের নিষ্ঠা থেকে বিচলিত হয়নি, তাই লোকসাক্ষী এবং শুদ্ধতার প্রতীক অগ্নি যেন তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। এই কথা বলে সীতা নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। খানিক পরেই অগ্নি নিজমূর্তি ধারণ করে সীতাকে কোলে নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হলেন এবং রাবণের গৃহে থাকলেও সীতার পতিনিষ্ঠতা

এবং শুদ্ধি সম্পর্কে রামচন্দ্রকে অবহিত করলেন। সীতার চরিত্র সম্বন্ধে রামচন্দ্র যেন আর কোনো সংশয় প্রকাশ না করেন, এই ছিল রামচন্দ্রের প্রতি অগ্নির আদেশ।

[রামায়ণ ৬.১১৮.১৭-৩৪; ১২০.১-১০]

অন্যত্র দেখি, বনবাসের সময় রামচন্দ্র যখন সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে লক্ষ্মণ এবং সীতার সঙ্গে বসবাস করছেন, তখন অগ্নি ব্রাহ্মণের রূপ ধরে রামচন্দ্রের কাছে আসেন। তিনি রামচন্দ্রকে জানান যে, দৈবক্রমে সীতাহরণের সময় উপস্থিত হয়েছে অতএব তাঁর জননীতুল্য সীতাকে রামচন্দ্র যেন অগ্নির কাছে রেখে দেন। রামচন্দ্র স্বীকার করলে অগ্নিদেব মায়া-সীতা সৃজন করে তাঁকে রামচন্দ্রের কাছে রেখে দেন এবং আসল সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার সময়ে রামচন্দ্রের হাতে তুলে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। অগ্নি আরও বলেন যে, তিনি দেবতাদের আদেশ-ক্রমেই এই কাজ করতে এসেছেন এবং এই কথা যেন কেউ জানতে না পারে। ফলত তত্রস্থ সীতা এবং লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারেই অগ্নির দ্বারা ছায়া সীতার সঙ্গে প্রকৃত সীতার বিপরাবর্তন সাধিত হয়। কালান্তরে রামচন্দ্র সীতাকে রাবণের কাছ থেকে উদ্ধার করে তাঁর অগ্নিপরীক্ষার উদ্যোগ করলে অগ্নি রামচন্দ্রকে প্রকৃত সীতা প্রদান করেন।

[দেবী ভাগবত ৯.১৬.২৭-৩৪; ৪৬-৪৭]

☐ দৈত্যরাজ বলি অমরাবতী অবরোধ করলে অগ্নিদেব কপোতের রূপ ধারণ করে সেখান থেকে পালান। *[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ১৮.৪]*

☐ পূর্বে কোনও এক সময় অগ্নি ব্রহ্মর্ষি-শাপে পীড়িত হলে শিবস্বরূপ অরুণাদ্রির সেবা করে পবিত্র হন। *[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল) ৬.৩৬]*

☐ মহাদেব নিজ সৈন্য এবং দেবতাদের পাঠিয়েছিলেন দানবরাজ শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য, তখন অগ্নি যুদ্ধ করেছিলেন শঙ্খচূড়ের সহচর দানব গোকর্ণের সঙ্গে।

[দেবী ভাগবত ৯.২২.৪]

☐ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ভগবান বিষ্ণু পঞ্চ অগ্নিকে জয় করেছিলেন। *[বিষ্ণু পু. ৫.৩৩.২০]*

☐ মহর্ষি অঙ্গিরার সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক মহাভারত পুরাণে একাধিকবার চর্চিত হয়েছে। মহাভারতের বনপর্বে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেখানে অগ্নি এবং অঙ্গিরা প্রায় অভিন্ন সত্তারূপে প্রকাশিত হয়েছেন। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে—একসময় অগ্নি দেবতাদের উপর রুষ্ট হয়ে জলের নীচে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। সেখানে তপস্যায় তাঁর কাল কাটতে লাগল। এইসময় মহর্ষি অঙ্গিরা তপোবলে অগ্নির মতোই দীপ্তিলাভ করে সংসারে অগ্নির অভাব পূরণ করলেন।

দীর্ঘকাল কেটে গেল, অগ্নিদেব জলের তলাতেই রইলেন। ব্রহ্মা বা অন্যান্য দেবতারাও কেউ তাঁকে ফিরে যাবার জন্য অনুনয় করতে গেলেন না। তখন অগ্নি মনে মনে ভাবলেন—নিশ্চয় প্রজাপতি ব্রহ্মা আমার অনুপস্থিতিতে নতুন কোনও অগ্নি সৃষ্টি করে নিয়েছেন। অগ্নিদেব নিজের দেবত্ব থেকে চ্যুত হয়েছেন—একথা ভেবে তাঁর বড়ো দুশ্চিন্তা হল। কীভাবে আবার নিজেকে অগ্নিদেব রূপে অধিষ্ঠিত করা যায়—এই চিন্তা করতে করতে তিনি জল থেকে উঠে এলেন। এসে দেখলেন, মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁর অভাব পূরণ করে অগ্নিরূপে জগৎকে তপ্ত করছেন, আলোকিত করছেন। অঙ্গিরাকে অগ্নিদেবত্ব লাভ করতে দেখে অগ্নিদেব একটু ভীত ভাবেই ধীরে ধীরে উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে। তখন অঙ্গিরা অগ্নিকে বললেন—আপনিই আবার জগতে অগ্নিরূপে প্রকাশ লাভ করুন। অগ্নি তা শুনে মনে মনে খুশি হলেন, তবু তাঁর দুশ্চিন্তা তখনও কাটেনি। তিনি অঙ্গিরাকে বললেন—আমার দেবত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এখন আপনিই অগ্নি হয়েছেন, লোকে তো এখন আপনাকেই অগ্নি বলে জানে। তারপর ভেবেচিন্তে অগ্নি বললেন—আমি প্রাথমিক অগ্নিত্ব ত্যাগ করছি। আপনিই প্রথম অগ্নি হয়ে থাকুন। আমি প্রাজাপত্য যাগে দ্বিতীয় অগ্নি হব—

নিক্ষিপাম্যহমগ্নিত্বং ত্বমগ্নিঃ প্রথমো ভব।

অঙ্গিরা অগ্নির দুশ্চিন্তা এবং সমস্যাটা বুঝতে পারলেন। তাই অগ্নিকে অনেক মান সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর দেবত্ব ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—আপনি আমাকে পুত্র বলে গ্রহণ করুণ। তাহলেই আর অগ্নিরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে কোনও সমস্যা হবেনা। অগ্নি সানন্দে অঙ্গিরাকে নিজের প্রথম পুত্র বলে গ্রহণ করলেন। ফলে মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র কন্যারা এবং পৌত্র-দৌহিত্র সকলেই অগ্নিরই বংশধর বলে পরিচিত

হয়েছিলেন। মহাভারতে বেশ কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে এই অগ্নিদের বংশ বর্ণনা করা হয়েছে। যাগযজ্ঞে, শ্মশানে, রন্ধনশালায়, মনুষ্যদেহে এবং অন্যান্য নানাস্থানে যেখানে অগ্নি বিরাজ করেন, সেই অগ্নিদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে এবং অঙ্গিরার বংশধারায় তাঁদের পরিচয়ও বিশদে আলোচিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.২১৭-২২২ অধ্যায়;
(হরি) ৩.১৮১-১৮৫ অধ্যায়]

অগ্নি$_{২}$ তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিগণের অন্যতম ঋষি।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৪.৫৯]

অগ্নিকন্যাপুর মহাভারতে উল্লিখিত তীর্থনাম। পিতৃলোক, ধ্রুবলোকের মতো একটি লোক বলে কথিত। অগ্নিকন্যাপুরে স্নান করলে মানুষের পরলোকে পুণ্যস্থিতি লাভ হয়।

[মহা (k) ১৩.২৫.৪৩; (হরি) ১৩.২৬.৪৩]

অগ্নিকা আগ্নেয় এবং বালেয় গন্ধর্বগণের পিতা প্রজাপতি বিক্রান্তের তিনটি সুন্দরী কন্যার অন্যতমা। *[বায়ু পু. ৬৯.১৮-২৩]*

অগ্নিকুণ্ড বৈখানস গৃহ্যসূত্রে W. Caland সম্পাদিত বৈখানস স্মার্তসূত্রে বলা আছে—গৃহস্থের অগ্নিশালার মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নিতে হোম প্রভৃতি করার জন্য পৃথক একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হত। এই অগ্নিকুণ্ডে গৃহস্থ তার প্রাত্যহিক গার্হস্থ কর্ম করতেন। কুণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নির নাম ছিল—ঔপাসন অগ্নি। অর্থাৎ প্রাত্যহিক উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট অগ্নি। পরবর্তীকালে অবশ্য যে কোনো যজ্ঞে অগ্নির আধার বা যেখানে আহুতি দেওয়া হত, সেই অগ্নিস্থানটিই অগ্নিকুণ্ড বলে বিবেচিত হয়েছে। মহাভারতে দ্রৌপদী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন যে অগ্নিবেদি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেটাকেও অগ্নিকুণ্ড বলা হয়েছে—

দিব্যং হব্যবরৈর্যুক্তম্ অগ্নিকুণ্ডাৎ সমুত্থিতঃ।

[W. Caland, Vaikhanasa-smarta-sutra,
1.8.1-10; 4.1.5; 6.14.6;
মহা (k) ৫.১৫১.২০; (হরি) ৫.১৪১.২০]

দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর বীরভদ্রের কথায় দক্ষ শিবকে সন্তুষ্ট করলে দক্ষের অগ্নিকুণ্ড থেকেই শিবের আবির্ভাব ঘটেছিল। *[বায়ু পু. ৩০-১৭২]*

ব্রহ্মার অগ্নিকুণ্ড থেকে রূপযৌবন-সম্পন্না দেবনারী অপ্সরা প্রভাবতীর উদ্ভব হয়।

[বায়ু পু. ৬৯.৫৯]

অগ্নিকুণ্ডতীর্থ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ-নাম। *[বামন পু. ৫১.৫২]*

অগ্নিকেতু একজন রাক্ষস। লঙ্কাযুদ্ধের পূর্বে রামচন্দ্রের সৈন্যদের বিনাশের জন্য যে সমস্ত রাক্ষস-সেনাপতি রাবণের কাছে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ-প্রদর্শন করেছিলেন অগ্নিকেতু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অস্ত্রযুদ্ধে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমানকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে রাবণের অনুমতি চেয়েছিলেন। *[রামায়ণ ৬.৯.২-৬]*

□ লঙ্কাযুদ্ধের সময় বানরদের সঙ্গে রাক্ষসদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্নিকেতু অন্য তিন দুর্ধর্ষ রাক্ষসের সঙ্গে মিলিতভাবে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁরা রামচন্দ্রকে বাণের দ্বারা আহত করেন। ফলস্বরূপ, রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ওই চার রাক্ষসের মস্তক ছেদন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্নিকেতুও ছিলেন।

[রামায়ণ ৬.৪৩.১১, ২৬-২৭]

অগ্নিক্ষেত্র যজ্ঞের জন্য যে মহাবেদি তৈরি করা হয়, তার পূর্ব দিকে প্রসারিত ভূমিখণ্ড বা ক্ষেত্রই অগ্নিক্ষেত্র। যেহেতু এই ভূমির মধ্যে শ্যেন-পক্ষীর আকারে একপ্রকার অগ্নি স্থাপন করে প্রজ্বলিত রাখতে হয়, সেই অগ্নির মুখ্যতার কারণেই এই ভূমিখণ্ড অগ্নিক্ষেত্র নামে পরিচিত প্রসারিত এই ভূমিখণ্ডের সাধারণ পরিমাণ 'সপ্তবিধ'। অর্থাৎ যজ্ঞকারী যজমান যতখানি লম্বা তার সাত গুণ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে হবে এমন ভূমি—উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে সাত পুরুষ পরিমাণ, কখনো আবার তার দুগুণ, তিনগুণ অর্থাৎ চোদ্দ কিংবা একুশ পুরুষ-পরিমাণ বড়ো একটা জায়গাও অগ্নিক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সোমযাগ, অশ্বমেধযজ্ঞের মতো বৃহৎ যজ্ঞকর্মের জন্য একটি বৃহৎ অগ্নিক্ষেত্রের প্রয়োজন হয়। ফলে সাত থেকে চোদ্দ অথবা একুশ পুরুষ-পরিমাণ ভূমির প্রয়োজন হত।

[কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite), ১৬.৭.৩১; ২০.৪.১৫;
আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe), ১৬.১৭.৯;
Chitrabhanu Sen, A Dictionary of the Vedic Rituals, p. 31; দ্র. Nicolas Dejenne, 'The Significance of the Number 'Thrice Seven' In Epic Undertaking, Ed. Robert P. Goldman & Muneo Tokunaga, pp. 69-70.]

□ তবে সুবৃহৎ এই অগ্নিক্ষেত্রই যজ্ঞের

পুরোডাশ ইত্যাদি আহুতি দ্রব্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য শস্য-উৎপাদনের কৃষিক্ষেত্র কিনা, সে ব্যাপারে একটা চর্চা হতেই পারে। কেননা বায়ু পুরাণে দেখছি যে, রাজা সীরধ্বজ জনক অশ্বমেধ যজ্ঞের আগে অগ্নিক্ষেত্র কর্ষণ করেন। এই কর্ষিত অগ্নিক্ষেত্রেই সদ্যজাত সীতাকে পাওয়া গিয়েছিল।

[বায়ু পু. ৮৯.১৭]

পণ্ডিত **J. Eggeling** অনূদিত এবং পণ্ডিত **Maxmuller** সম্পাদিত শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিক্ষেত্রের একটি চিত্র প্রদত্ত হয়েছে।

[Satapatha Brahmana, Pt. 3. In Sacred Books of the East, Vol. XLI, 419]

অগ্নিজিহ্ব$_১$ পাতালের পঞ্চমতল অর্থাৎ মহাতলে বসবাসকারী এক দৈত্য। *[বায়ু পু. ৫০.৩৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.৩৬]*

অগ্নিজিহ্ব$_২$ জনৈক ঋষি। মৎস্য পুরাণে মহর্ষি অগ্নিজিহ্বের বংশকে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত ঋষি বংশের মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় ইনি অঙ্গিরার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৪৩]*

অগ্নিজ্বাল$_১$ এক ধরনের নরকের নাম। আশ্রমবাসী মুনিদের যারা পীড়ন করে তারা এই নরকে যায়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২.১৪৯.১৭৪]*

অন্য মতে চতুরাশ্রমের যে যেখানে অবস্থিত সেই আশ্রমভ্রষ্ট ব্যক্তি এই নরকে গমন করে।

[বায়ু পু.১০১.১৪৮, ১৭১]

অগ্নিজ্বাল$_২$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। পুরাণে মহাভারতে অনেক সময়ই শিব-মহাদেব এবং অগ্নিদেব অভিন্ন সত্তারূপে কল্পিত হয়েছেন। সুতরাং অগ্নিস্বরূপ বা অগ্নির মতোই দহনশক্তি সম্পন্ন—এই অর্থেই শিব অগ্নিজ্বাল নামে কীর্তিত হন। *[মহা (k) ১৩.১৭.৮২; (হরি) ১৩.১৬.৮২]*

অগ্নিতীর্থ$_১$ পুরাকালে দশরথপুত্র রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করার পর বিভীষণকে লঙ্কার অধিপতি নিযুক্ত করে সীতা ও লক্ষ্মণসহ সেতুপথে গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেছিলেন। এরপর রামচন্দ্র নিজের ও জানকীর শুদ্ধিসম্পাদনের জন্য ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, পিতৃগণ, বিভীষণ ও বানরবীরদের নিয়ে লক্ষ্মীতীর্থে অবস্থান করতে লাগলেন এবং দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে সাক্ষী রেখে সীতার শুদ্ধিকরণের জন্য অগ্নিকে আবাহন করলেন। লক্ষ্মীতীর্থের অদূরে সমুদ্র থেকে অগ্নি আবির্ভূত হলেন এবং রামচন্দ্রকে জানালেন যে, সীতা পরম পতিব্রতা এবং তাঁর পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যেই রামচন্দ্র রাবণকে বধ করতে পেরেছেন। রামচন্দ্র অগ্নির বাক্যে নির্ভর করে সীতাকে গ্রহণ করলেন।

সীতার শুদ্ধিসম্পাদনের জন্য লক্ষ্মীতীর্থের অনতিদূরে অগ্নিকে আবাহন করলে অগ্নি সমুদ্রের যে প্রদেশ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই প্রদেশ পবিত্র অগ্নিতীর্থ নামে খ্যাত হয়েছে।

এখনকার তামিলনাড়ুতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর অঞ্চলে রামনাথস্বামী একটি মন্দির আছে। এই মন্দির থেকে একশো মিটার দূরে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল অগ্নিতীর্থ নামে এখনও খ্যাত। প্রসঙ্গত এখানে নিকটবর্তী কোদণ্ডরামর মন্দির এবং কুরুসদাই দ্বীপের নিকটবর্তী পর্বতটি গন্ধমাদন নামে পরিচিত।

[স্কন্দ পু. ব্রহ্ম (সেতুমাহাত্ম্য) ২২.১-২৭]

অগ্নিতীর্থের মাহাত্ম্য সম্পর্কে পুরাণে নিম্নলিখিত কাহিনীটি পাওয়া যায়—

কোনো এককালে পাটলিপুত্রের ধর্মনিষ্ঠ বৈশ্য পশুমানের ঘরে দুষ্পণ্য নামে এক পুত্রের জন্ম হয়েছিল। একসময় এই দুষ্পণ্য শিশুহত্যার অপরাধে নগরী থেকে বিতাড়িত হয়। এরপর ঋষি উগ্রশ্রবার কাছে পিশাচত্ব লাভের শাপ পেয়ে সে পিশাচরূপ প্রাপ্ত হয়। পিশাচরূপী দুষ্পণ্য বহুকালব্যাপী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে এসে তাঁর শিষ্যদের কাছে শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। তখন ঋষি অগস্ত্য তাঁর প্রিয় শিষ্য সুতীক্ষ্ণকে গন্ধমাদন পর্বতের অগ্নিতীর্থে গিয়ে দুষ্পণ্যের মুক্তির জন্য যথাবিধি পূজা করতে আদেশ দেন। সুতীক্ষ্ণ তিনদিন ধরে আচার-অনুষ্ঠান পালন করে অগ্নিতীর্থ থেকে আশ্রমে ফিরলে তাঁর সাক্ষাৎ-মাত্রই দুষ্পণ্য পিশাচরূপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গারোহণ করে।

[স্কন্দ পু. (ব্রহ্ম. সেতুমাহাত্ম্য) ২২.২৭-১১৮]

অগ্নিতীর্থ$_২$ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্যে বর্ণিত হয়েছে যে, হৈহয় বংশীয় রাজাদের সঙ্গে যখন ভৃগুবংশীয় ঋষিদের বিবাদ দেখা দিল, সেই সময় হৈহয় বংশীয় রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্ররা ভৃগুবংশকে হত্যা করছিলেন, মাতৃগর্ভে যে শিশু ভ্রূণ অবস্থায় ছিল তাকেও

বাদ দেননি। এইসময় জনৈক ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণের পত্নী নিজের গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করার জন্য ভ্রূণটিকে লুকিয়ে রাখলেন নিজের উরুর মধ্যে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্রাহ্মণীর উরু ভেদ করে শিশুটির জন্ম হয়। উরু থেকে জন্ম বলে শিশুটির নাম হল ঔর্ব। ঔর্ব মাতৃগর্ভে থাকতেই ক্ষত্রিয়দের উপর অসম্ভব ক্রুদ্ধ ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হবার পর ক্ষত্রিয়দের প্রতি ক্রুদ্ধ ঔর্ব নিজের তেজে সমস্ত পৃথিবীকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। এতে দেবতারা ভীত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা ঔর্বকে ক্রোধ ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন। ব্রহ্মার উপদেশে ঔর্ব তাঁর ক্রোধ রূপ অগ্নিকে ত্যাগ করেন। ব্রহ্মার আদেশে তাঁর কন্যা সরস্বতী ঔর্বের সেই ক্রোধাগ্নিকে একটি পাত্রে রক্ষা করলেন এবং তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার জন্য নদীরূপা সরস্বতী হিমালয় পর্বত থেকে প্রভাসক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় জুড়ে হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সরস্বতীর যাত্রাপথ বিশদে বর্ণিত হয়েছে। সরস্বতীর প্রবাহের দুই তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য পবিত্র তীর্থ। শেষ পর্যন্ত প্রভাস ক্ষেত্রে সরস্বতীর ধারা সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। পুরাণে বর্ণিত আছে সরস্বতী ঔর্বের ক্রোধাগ্নিকে যে পাত্রে রক্ষা করেছিলেন সেটিকে এই স্থানেই তিনি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তাই সরস্বতী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলটি অগ্নিতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ৩৫.১-১২২]

অগ্নিতীর্থ$_৩$ যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। *[মৎস্য পু. ১০৮.২৭]*

অগ্নিতীর্থ$_৪$ সরস্বতী নদীর তীরবর্তী একটি পবিত্র তীর্থ। ভৃগুর অভিশাপের ভয়ে অগ্নিদেব এই তীর্থে শমীলতার আড়ালে লুকিয়েছিলেন। অগ্নির খোঁজে এই তীর্থে পৌঁছে দেবতারাই শমীলতায় আত্মগোপনকারী অগ্নিকে আবিষ্কার করেন। কথিত আছে যে, এইস্থানে স্নান করে অগ্নিদেব প্রজাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করেছিলেন এবং ব্রহ্মার কল্যাণেই অগ্নিতীর্থের সৃষ্টি। মহাভারতের শল্যপর্বে বলা হয়েছে যে, বলরাম একবার অগ্নিতীর্থ দর্শনে গিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৭.১২-২৩; (হরি) ৯.৪৩.১২-২১]

অগ্নিতীর্থ$_৫$ গোদাবরী নদী অর্থাৎ গৌতমী গঙ্গার তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই স্থানটি যম তীর্থ নামেও বিখ্যাত। *[দ্র. যমতীর্থ$_১$]*

[ব্রহ্ম পু. ১২৫ অধ্যায়]

অগ্নিতেজাঃ একাদশ মনু ধর্মসাবর্ণির সময়ে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ঋষির নাম।

[বিষ্ণু পু. ৩.২.৩০]

অগ্নিত্রয় মহাভারতে জরাসন্ধকে বধ করার আগে ভীম বলেছিলেন—কৃষ্ণের মধ্যে নীতি-কৌশল, আমার মধ্যে বল-শক্তি, আর অর্জুনের মধ্যে আছে যুদ্ধক্ষমতা—আমরা তিনজন তিনটি অগ্নির মতো—

মাগধং সাধয়িষ্যাম ইষ্টিং ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ।

আসলে বৈদিক শ্রৌতকর্মে তিন প্রকারের অগ্নির প্রয়োজন হত—গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি। তৃতীয় দক্ষিণাগ্নির নাম ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায় না, কিন্তু গার্হপত্য এবং আহবনীয় অগ্নির নাম ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায়—

দ্বিতা হোতারং মনুষশ্চ বাঘতঃ।

অগ্নিশালায় বেদি নির্মাণ করে তার তিনদিকে তিনটি অগ্নি স্থাপন করা হত। বেদির পশ্চিম দিকে গার্হপত্য অগ্নির স্থান, পূর্বদিকে আহবনীয় এবং দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান। গার্হপত্য অগ্নির স্থান বৃত্তাকার, আহবনীয়ের স্থান চতুষ্কোণ এবং দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্ধবৃত্তাকার।

[ঋগ্‌বেদ ৩.২.১;
মহা (k) ২.১৫.১৩; (হরি) ২.১৫.৯]

অগ্নিধারা একটি বিখ্যাত তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে—এই তীর্থে স্নান করে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৮৪.১৪৬; (হরি) ৩.৬৯.১৪৭]

অগ্নিধারাতীর্থ গয়ায় অন্তর্গত একটি পবিত্র নদী-তীর্থ। উদ্যন্তক গিরি থেকে অগ্নিধারার সৃষ্টি—

অগ্নিধারা গিরিবরাদাগতোদ্যন্তকাদনু।

শ্রাদ্ধকার্য ও পিণ্ডদানের জন্য একটি উৎকৃষ্ট স্থান। *[মহা (k) ৩.৮৪.১৪৬; (হরি) ৩.৬৯.১৪৭;*
অগ্নি পু. ১১৬.৩১; বায়ু পু. ১০৮.৫৯]

□ অগ্নিধারাতীর্থের আধুনিক অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। বেশীরভাগ পণ্ডিতের মতে অগ্নিধারাতীর্থ গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত হলেও একদল পণ্ডিত মনে করেন যে, নাসিকের কাছে গোদাবরী নদীর

উৎসস্থলে গৌতমবনই হল অগ্নিধারা-তীর্থের প্রকৃত অবস্থান। *[EAIG (Kapoor) p. 15]*

অগ্নিপুর মহাভারতে এই তীর্থকে অগ্নির নগর বলে কীর্তন করা হয়েছে—

অগ্নেঃ পুরে নরঃ স্নাত্বা অগ্নিকন্যাপুরে বসেৎ।

[মহা (k) ১৩.২৫.৪৩; (হরি) ১৩.২৬.৪৩]

পণ্ডিতেরা এই স্থানকেই মাহিষ্মতী নগরী বলে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক ইন্দোর থেকে চৌষট্টি মাইল দূরে চুলী মহেশ্বর নামে জায়গাটিই প্রাচীন অগ্নিপুর বলে মনে করা হয়।

[GDAMI (Dey) pp. 2, 120]

অগ্নিপুরাণ এই পুরাণ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেছে—

আগ্নেয়ে হি পুরাণে'স্মিন্ সর্বা বিদ্যা প্রদর্শিতাঃ।

[৩৮৩.৫২]

অর্থাৎ লোকশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিদ্যাই এখানে আলোচিত হয়েছে। জগৎ এবং জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই, যার নির্দেশ অগ্নিপুরাণে পাওয়া যাবে না। এই পুরাণে মোট ৩৮৩টি অধ্যায় আছে। ভাগবত পুরাণ মতে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম অগ্নিপুরাণ ১৫৪০০টি শ্লোকে রচিত। নারদপুরাণ অনুযায়ী এর শ্লোকসংখ্যা ১৫০০০, কিন্তু মৎস্যপুরাণ অনুসারে ১৬০০০, যদিও বর্তমানে প্রচলিত অগ্নিপুরাণ অনেকটাই অন্যরকম এবং এটিকে প্রকৃত অগ্নিপুরাণ বলে মনে করেন না পণ্ডিতেরা। কেননা, প্রথমত, মৎস্যপুরাণ স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী—যে পুরাণে ঈশান-কল্প অনুযায়ী বৃত্তান্ত পরিবেশিত হয়েছে এবং যে পুরাণের বক্তা অগ্নি এবং শ্রোতা বশিষ্ঠ, সেটাই অগ্নিপুরাণ। প্রচলিত অগ্নিপুরাণে বক্তা শ্রোতা ঠিক থাকলেও ঈশান-কল্পানুযায়ী কাহিনী আরম্ভ হয়নি। দ্বিতীয়ত, স্মৃতি-নিবন্ধকারেরা অগ্নিপুরাণ থেকে যে শ্লোক উদ্ধার করেছেন, সেগুলি প্রচলিত অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায় না। ফলে পণ্ডিতেরা মনে করেন—মূল অগ্নিপুরাণ ছিল অন্যরকম এবং তা পূর্বে হয়তো আগ্নেয় পুরাণ অথবা বহ্নিপুরাণ নামে প্রচলিত ছিল।

মানুষের জীবনে যেসব প্রয়োজনীয় কর্মধারা, বিশ্বাস এবং নিয়ম জীবনকে সুখকর করে তোলে, সেসব কিছুই অগ্নিপুরাণে আলোচিত হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের সারাংশ ছাড়াও মন্দির নির্মাণের পদ্ধতি, দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতি, পূজাবিধি, জ্যোতিষশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, বিভিন্ন ব্রত, আয়ুর্বেদ, অশ্বশাস্ত্র, গজশাস্ত্র—এই সমস্ত বিচিত্র বিষয় অগ্নিপুরাণের অন্তর্ভুক্ত। আর যে বিষয়টি অগ্নিপুরাণকে সমস্ত পুরাণ থেকে বিশিষ্ট করে তুলেছে, সেটা হল, ভারতীয় রসশাস্ত্রের আলোচনা। নাটক, রস, রীতি, নৃত্য, রঙ্গকর্ম, অভিনয়-নিরূপণ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, কাব্যের গুণ-দোষ-নিরূপণ, বৈদিক এবং লৌকিক ছন্দ এবং সবার ওপরে ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা এই পুরাণকে প্রাচীন ভারতীয় জনজীবনের বিশ্বকোষ করে তুলেছে। ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে অষ্টাঙ্গ যোগ, বেদান্ত এবং ভগবদ্‌গীতার মর্মও এই পুরাণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট।

প্রাচীন আগ্নেয় বা বহ্নিপুরাণে বিষয়বৈচিত্র্য কেমন ছিল, সে বিষয়ে ধারাবাহিক কিছু পাওয়া না গেলেও প্রাচীন নিবন্ধগুলিতে আগ্নেয় পুরাণের যেসব শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে অদ্ভুত-শান্তি, বিভিন্ন দানকর্ম, পুষ্করিণী এবং উদ্যান-দান, জন্ম-মৃত্যুর শুদ্ধাশুদ্ধি, দাহক্রিয়া, অশৌচবিধি, যম, নিয়ম, উপবাস, বিষ্ণুর স্নানযাত্রা, শালগ্রামতত্ত্ব এবং গঙ্গাস্নান —এইগুলিই হয়তো সেই প্রাচীন পুরাণের বিষয় ছিল। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত অগ্নিপুরাণ থেকেও বহু স্মার্ত এবং নিবন্ধকারেরা নিজেদের অভিমত বিষয়ে শ্লোক উদ্ধার করেছেন। অগ্নিপুরাণে আলোচিত বিভিন্ন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান এখনও বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকায় অনেকে মনে করেন যে, বঙ্গদেশেই অগ্নিপুরাণ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রমাণের সূত্র থেকে গবেষকেরা জানিয়েছেন যে, এই পুরাণ খ্রিস্টীয় নবম শতকে সংকলিত হয়।

[ভাগবত পু. ১২.৭.২৩; ১২.১৩.৫;
অশোক চট্টোপাধ্যায়, পুরাণ পরিচয়, পৃ. ৬৬-৬৯]

অগ্নিপ্রণয়ন আহবণীয় অগ্নিকে ঐষ্টিক বেদির কাছ পুবদিকে নিয়ে (প্র=পূর্বা; নয়ন=নিয়ে যাওয়া) গিয়ে উত্তরবেদিতে স্থাপন করাই, অগ্নিপ্রণয়ন।

[দ্র. ঐষ্টিক বেদি; বেদি]

অগ্নিপ্রভ গণ্ডক নদীর তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। অগ্নিপ্রভ তীর্থের পূর্বোত্তর ভাগ থেকে একটি জলধারা নির্গত হয়ে গণ্ডক নদীতে মিশেছে। এই পবিত্র জলধারায় স্নান করলে

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই জলধারাটি হেমন্তকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে। *[বরাহ পু. ১৪৫.৫২-৫৫]*

অগ্নিপ্রস্কন্দন যযাতির ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত অনু পিতার জরা গ্রহণ করতে না চাইলে যযাতি অনুকে অগ্নিপ্রস্কন্দনে বশীভূত হবার অভিশাপ দেন। অগ্নিপ্রস্কন্দন সম্ভবত আমাশয় রোগের দুর্বিপাক অথবা বিরেচন-কর্মের বিষয় বলে আয়ুর্বেদে নির্ণীত। *[মৎস্য পু. ৩৩.২৪]*

অগ্নিবর্চস্ (অগ্নিবর্চাঃ) সূত রোমহর্ষণের ছয় শিষ্যের অন্যতম শিষ্য, একজন মুনি। *[বিষ্ণু পু. ৩.৬.১৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৬৪]*

অগ্নিবর্ণ মূল রামায়ণে রামচন্দ্রের বিয়ের আগে মহর্ষি বশিষ্ঠ যেখানে সূর্যবংশের পরিচয় দিচ্ছেন, সেখানে অগ্নিবর্ণ সুদর্শনের পুত্র এবং শীঘ্র কিংবা শীঘ্রগ-এর পিতা বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই রামচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন পুরুষ। পুরাণে ভগবান রামচন্দ্রের পুত্র কুশ। অগ্নিবর্ণ সেই কুশের বংশের অধস্তন জাতক। সুদর্শনের পুত্র, শীঘ্রের পিতা।

[রামায়ণ, ১.৭০.৪০-৪১; ভাগবত পু. ৯.১২.৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি), ২.৬৩.২০৯-২১০; বায়ু পু. ৮৮.২০৯; বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪৮]

অগ্নিবাহু$_১$ মন্বন্তর-পর্যায়ে চতুর্দশতম ভৌত্য মনুর পুত্রের নাম। অন্যমতে ভৌত্য মনুর সময়কালে একজন তপস্বী মুনি। ভাগবত পুরাণ এঁকে অগ্নিবাহু নামে চিহ্নিত করেছে।

[বায়ু পু. ১০০.১১৬; ভাগবত পু. ৮.১৩.৩৪; বিষ্ণু পু. ৩.২.৪২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১১৩; মার্কণ্ডেয় পু. ১০০.৩১]

অগ্নিবাহু$_২$ স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতম।

[বায়ু পু. ৩১.১৭-১৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.১০৪; মৎস্য পু. ৯.৪]

অন্য মতে স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে প্রিয়ব্রতের পত্নী ছিলেন কর্দম প্রজাপতির কন্যা কাম্যা। তাঁর গর্ভেই অগ্নিবাহু জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিবাহু জাতিস্মর ছিলেন, এবং রাজ্যভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করে তিনি যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন—

জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ।

[বিষ্ণু পু. ২.১.৭-১১; কূর্ম পু. ১.৩৯.৭-৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৯]

অগ্নিবেশ *[দ্র. অগ্নিবেশ্য$_১$]*

অগ্নিবেশ্য$_১$ (অগ্নিবেশ) মহাভারতে তাঁকে সরাসরি অগ্নির পুত্র বলা হয়েছে; তিনি একজন মুনি—অগ্নেস্তু জাতঃ স মুনিঃ। বিখ্যাত অগস্ত্য-মুনির কাছে তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। পরে মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছেও তিনি অস্ত্র-শিক্ষা করেছিলেন বলে মনে হয়। ভরদ্বাজ মুনি অগ্নিবেশকে আগ্নেয় অস্ত্র দান করেছিলেন। ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণাচার্য অগ্নিবেশের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি ধনুর্বেদ এবং অন্যান্য অস্ত্রের ব্যবহার বা অস্ত্রাগম শিক্ষার জন্য বহুকাল ব্রহ্মচারী হয়ে ইন্দ্রিয়-সংযমের মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে বহু বছর অগ্নিবেশের আশ্রমে থেকেছিলেন, তাতে তাঁর মাথায় জটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দ্রোণাচার্যের অধ্যবসায় এবং চেষ্টা দেখে অগ্নিবেশ ভরদ্বাজ-দত্ত সেই আগ্নেয় অস্ত্র দ্রোণকেই দিয়ে দিলেন। পিতা ভরদ্বাজের দেওয়া সেই আগ্নেয় অস্ত্র এবং অগ্নিবেশের অস্ত্র-অধ্যাপনার নৈপুণ্য প্রশংসা করে দ্রোণাচার্য বলেছেন—আমার গুরু অগ্নিবেশ মহর্ষি অগস্ত্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন, আমি সেই অগ্নিবেশের শিষ্য—

অগস্ত্যস্য ধনুর্বেদে শিষ্যো মম গুরুঃ পুরা।
অগ্নিবেশ ইতি খ্যাতস্তস্য শিষ্যো'স্মি ভারত॥

মহর্ষি অগস্ত্যের কাছ থেকে অগ্নিবেশ্যই ব্রহ্মশির নামক অস্ত্রটি লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। পরবর্তী কালে প্রিয় শিষ্য দ্রোণাচার্যকে অন্যান্য দিব্য অস্ত্রের সঙ্গে এই অস্ত্রটিও দান করেছিলেন। শিষ্য পরম্পরায় দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অর্জুন এবং অশ্বত্থামা এই অস্ত্র লাভ করেন।

[মহা (k) ১.১৩০.৩৯-৪০; ১.১৩১.৪০-৪১; ১.১৩৯.৯; (হরি) ১.১২৬.১৫-১৬; ১.১২৭.৪০-৪১; ১.১৩৪.৯]

□ পাণ্ডবরা বনবাস কালে যখন সরস্বতী নদীর তীরবর্তী দ্বৈতবনে বসবাস করছিলেন সেই সময় যেসব ঋষি-মহর্ষিরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন অগ্নিবেশ্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ৩.২৬.২৩; (হরি) ৩.২৪.২৩]*

অগ্নিবেশ্য$_২$ (অগ্নিবেশ) অগ্নির অবতার, অগ্নি স্বয়ং মনুর পুত্র নরিষ্যন্তের বংশধারায় জাত অধস্তন পুরুষ দেবদত্তের পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। এই

অগ্নিবেশ্যই কানীন এবং জাতুকর্ণ নামেও পরিচিত। অগ্নিবেশ্যায়ন নামে অগ্নিবেশ্যের বংশধারা চলতে থাকে। অগ্নিবেশ্য-কুলে জাত ব্রাহ্মণ-প্রবরের সঙ্গে যেসব ব্রাহ্মণকুলের বিবাহ সম্বন্ধ নেই, তার তালিকাও পাওয়া যায় পুরাণে।

[ভাগবত পু. ৯.২.২১-২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪৭.৪৯; মৎস্য পু. ১৯৬.১২]

অগ্নিবেশ্য$_{৩}$ পুরাণোক্ত এক তপোনিষ্ঠ মুনি। এঁর কন্যাকে দেখে কাশীরাজ কুশধ্বজ মুগ্ধ হন এবং হরণ করেন। রাজার এই গৃধ্রবৎ আচরণ দেখে অগ্নিবেশ্য তাঁকে গৃধ্র হবার অভিশাপ দেন। রাজার অনুনয়ে কৃপাবিষ্ট হয়ে মুনি শেষ পর্যন্ত তাঁকে শাপমুক্তির উপায় হিসেবে বলেন যে, তিনি যখন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে আপন আত্ম-বৃত্তান্তজ্ঞানে সহায়তা করবেন, তখন তিনি গৃধ্রযোনি থেকে মুক্ত হবেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৯.৩৯-৫৭]

অগ্নিবেশ্য$_{৪}$ (অগ্নিবেশ) চতুর্বিংশতিতম দ্বাপর-যুগে নৈমিষারণ্যবাসী মহাযোগী শূলীর পুত্র।

[বায়ু পু. ২৩.২০৭]

অগ্নিবেশ্য$_{৫}$ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী যেসব জনপদের তথা জনজাতির নাম উল্লিখিত হয়েছে অগ্নিবেশ্য তার মধ্যে অন্যতম। অগ্নিবেশ্য সৈন্যদলকে নকুলের তত্ত্বাবধানে ক্রৌঞ্চব্যূহের বামদিকে অবস্থান করতে দেখা যায়।

[মহা (k) ৬.৫০.৫২; (হরি) ৬.৫০.৫৩]

অগ্নিভাব পঞ্চম মন্বন্তরে যখন স্বারোচিষ মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যে কয়টি গণে বিভক্ত ছিলেন অমিতাভ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই অমিতাভ-গণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে অগ্নিভাব অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৩]

অগ্নিভাস রৈবত মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, অমৃতাত্মা তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত চোদ্দজন দেবতার মধ্যে অগ্নিভাস একজন। *[বায়ু পু. ৬২.৪৪-৪৭]*

অগ্নিমন্ত্র রাজার রাজ্যভয় তথা যুদ্ধের ব্যাপারে ঔৎপাতিক লক্ষণ সূচিত হলে পুরোহিত তিন রাত উপোস থেকে ক্ষীরিবৃক্ষের সমিধ, ঘৃত এবং সর্ষপ (সরষে) দিয়ে বৈদিক অগ্নিমন্ত্রে হোম করবেন।

[মৎস্য পু. ২৩১.৯-১০]

অগ্নিমাঠর ব্যাসশিষ্য পৈল ঋক্‌মন্ত্রসমূহ দুইভাগে ভাগ করে দ্বিতীয় ভাগটি বাস্কলি মুনিকে শেখান এবং বাস্কলি নিজে চারখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। সেই চারখানির দ্বিতীয় বেদশাখার নাম অগ্নিমাঠর। অন্য মতে বাস্কলির অন্যতম শিষ্য অগ্নিমাঠর। তাঁর নামেই বেদশাখার নাম।

[বায়ু পু. ৬০.২৩-২৬; বিষ্ণু পু. ৩.৪.১৭-১৮]

অগ্নিমাতা বাস্কলের দ্বিতীয় শিষ্যের অধিকারে থাকা বেদশাখা। সম্ভবত ঋগ্‌বেদের এই শাখাটিকেই বায়ু পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণে অগ্নিমাঠর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৪.২৭]

অগ্নিমান্$_{১}$ অগ্নির একটি প্রকার। যদি সূতিকা-গৃহের অগ্নি অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে স্পর্শ করে তখন আটটি শরাবে রাখা পাক-করা চরু দিয়ে 'অগ্নিমান্' নামক অগ্নিতে হোম করতে হবে।

[মহা (k) ৩.২২১.৩১; (হরি) ৩.১৮৫.৩১]

অগ্নিমান্$_{২}$ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা গার্হপত্য অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখতে পারেন, তিনি 'অগ্নিমান্'। অগ্নিমান্ ব্যক্তি চন্দ্রক্ষয়ে (অমাবস্যায়) পিণ্ডান্বাহার্যক শ্রাদ্ধ করবেন। *[মৎস্য পু. ১৬.২১]*

অগ্নিমিত্র$_{১}$ কলিযুগের মগধরাজ পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পুত্র, সুজ্যেষ্ঠের পিতা। আট বছর রাজত্ব করেছেন।

[ভাগবত পু. ১২.১.১৫; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৫০-১৫১]

অগ্নিমিত্র$_{২}$ বাস্কলের শিষ্য।

[ভাগবত পু. ১২.৬.৫৪-৫৫]

অগ্নিমুখ পাতালের তৃতীয় তল অর্থাৎ বিতলে বসবাসকারী এক দৈত্য।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২৬]

অগ্নিযোনি একজন ঋষি। ব্রহ্মার সৃষ্ট বেদোক্ত সনাতন ধর্মের অনুসরণকারী ঋষিদের মধ্যে ইনি অন্যতম।

[মহা (k) ১২.১৬৬.২৫; (হরি) ১২.১৬১.২৫]

অগ্নির্বাহু *[দ্র. অগ্নিবাহ$_{১}$]*

অগ্নিলিঙ্গ অগ্নিলিঙ্গের মধ্যাংশ থেকে মহেশ্বর শিব একাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক লিঙ্গপুরাণ উচ্চারণ করেছিলেন। *[মৎস্য পু. ৫৩.৩৭-৩৮]*

অগ্নিশমায়ন পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের প্রবরভুক্ত যে সব গোত্র প্রবর্তকের তথা বংশপ্রবর্তক ঋষিদের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি অগ্নিশমায়ন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৭]*

অগ্নিশর্ম শ্বেতবরাহকল্পে গয়াসুর যেখানে দেহ রেখেছিলেন, সেইখানে যজ্ঞসম্ভার আহরণ করে ব্রহ্মা যেসব মানস পুরোহিত সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদেরই অন্যতম। ইনি আপন মুখ থেকে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়, সভ্য এবং আবসথ্য—এই পঞ্চ অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন—যে অগ্নিতে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

[বায়ু পু. ১০৬.৩৪, ৪১-৪২]

অগ্নিশির যমুনা-নদীর তীরভূমির অবস্থিত একটি তীর্থ। সৃঞ্জয়বংশীয় (পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়) সহদেব এখানে লাঠির মত শমীকাঠ (শম্যা) নিক্ষেপ করে যজ্ঞভূমি মেপে যজ্ঞ করেছিলেন। হয়তো সহদেব যমুনার তীরবর্তী অঞ্চল জয় করেছিলেন বলেই এই অগ্নিশির তীর্থে যজ্ঞ করেছিলেন—অগ্নয়ঃ সহদেবেন সেবিতা যমুনামনু। একই জায়গায় ভরত দৌষ্যন্তিকেও আমরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে দেখছি। তার মানে, এই অঞ্চল তখন পাঞ্চাল সহদেবের হাত থেকে পৌরব ভরতের হাতে আসে। *[মহা (k) ৩.৯০.৫-৮; (হরি) ৩.৭৫.৫-৮]*

অগ্নিষোম-প্রণয়ন অগ্নিষ্টোম যাগে সুত্যাদিনের আগের দিন অর্থাৎ যাগের চতুর্থদিন ঐষ্টিক বেদির পূর্বে স্থিত আহবনীয় অগ্নিকে সৌমিক বেদিস্থিত আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন অর্থাৎ সুত্যাদিনে ওই অগ্নিকে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য থেকে নিয়ে অন্যান্য ধিষ্ণ্য জ্বালাতে হয়। সোম-ক্রয়ের পর সোম প্রাচীন বংশশালায় রক্ষিত থাকে। ওই সোমকেও একই সঙ্গে হবির্ধান মণ্ডপে নিয়ে রাখতে হয়। পরের দিন ওই সোমের অভিষব হবে। অধ্বর্যু যেভাবে অগ্নি এবং সোমকে পূর্বদিকে আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপে এবং হবির্ধান মণ্ডপে যথাক্রমে নিয়ে যান, সেই প্রক্রিয়াটাই অগ্নিষোমপ্রণয়ন অর্থাৎ অগ্নি এবং সোমকে প্র (পূর্বদিকে) নয়ন (নিয়ে যাওয়া)। অগ্নিষোম প্রণয়নের সময় হোতা তদনুকূল মন্ত্র পাঠ করেন। *[দ্র. সোমযাগ]*

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (সামশ্রমী), ১ম খণ্ড, ১.৫.৪, পৃ. ২২১-২২৩; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (অমর) ৪.১০.১; পুনশ্চ দ্রষ্টব্য : Chitrabhana Sen, A Dictionary of the Vedic Rituals *অগ্নিষোম-প্রণয়ন in p. 33]*

অগ্নিষোমযম পিতৃশ্রাদ্ধের সময় প্রেত ব্যক্তির পিতৃস্থানরূপে কল্পিত অগ্নি, সোম এবং যমের উদ্দেশে প্রদত্ত আপ্যায়ন।

[মৎস্য পু. ১৫.৩২, ১৬.৩৩]

অগ্নিষ্টোম$_{১}$ সমস্ত সোমযজ্ঞের প্রকৃতি হল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ। যে যজ্ঞের সমস্ত অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে শ্রুতির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে, তার নাম প্রকৃতি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রবর্তন সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। কথিত আছে, পুরাকালে দেবতারা একবার অসুরদের জয় করার জন্য যুদ্ধযাত্রার উপক্রম করলে অগ্নি-দেব যেতে নারাজ হন। দেবতারা অগ্নিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলে অগ্নি বললেন—তোমরা আমার স্তব না করলে আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। নিরুপায় দেবতারা শেষ পর্যন্ত অগ্নির স্তব করেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট অগ্নি তিনটি বৈদিক ছন্দকে (গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী) তিনটি সৈন্য শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং যজ্ঞ-সবনগুলিকে সৈন্যে পরিণত করে যুদ্ধযাত্রা করলেন। যুদ্ধে দেবতাদের জয় হল।

দেবতাদের ওই স্তব থেকেই জয়ফলসূচক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের আরম্ভ। দেবতারা স্তোম দ্বারা অগ্নির স্তব করেছিলেন বলেই এর নাম অগ্নিষ্টোম, অগ্নিস্তোম থেকেই অগ্নিষ্টোম শব্দ এসেছে। অগ্নিষ্টোম গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে একাত্মক, কারণ গায়ত্রীতে চব্বিশটি অক্ষর এবং অগ্নিষ্টোমে স্তোত্র এবং শস্ত্রের সংখ্যা চব্বিশটি। গায়ত্রী যেমন যজমানকে অমৃতে স্থাপন করে, অগ্নিষ্টোমও তাই করে। অগ্নিষ্টোমকে সংবৎসরের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। সংবৎসরের অর্ধমাস চব্বিশটি এবং অগ্নিষ্টোমেও স্তোত্র এবং শস্ত্র চব্বিশটি। অগ্নিষ্টোমের এমনই মর্যাদা যে, বলা হয়—সমস্ত নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনই সমস্ত যজ্ঞক্রতুই অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে। বেদের এই অনুশাসন যে, যিনি স্বর্গাভিলাষী, তিনি যথাবিধি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করবেন। *[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, (আনন্দাশ্রম), ১ম খণ্ড, ১৪.১, পৃ. ৩৯৫-৩৯৭; দেবী ভাগবত ৩.১২.৬১-৬২; ভাগবত পু. ৩.১২.৪০]*

অগ্নিষ্টোম$_{২}$ চাক্ষুষ মনুর ঔরসে নড়্বলার গর্ভজাত দশ পুত্রের অন্যতম। এই কারণে তাঁকে নাড়্বলেয় মনু বলা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৬; বিষ্ণু পু. ১.১৩.৫; বায়ু পু. ৬২.৬৭, ৯১]*

মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তাঁর নাম অগ্নিষ্টুৎ।

[মৎস্য পু. ৪.৪০-৪২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৭৯, ১০৬]

অগ্নিষ্বাত্ত বিশেষ স্থানগত পিতৃগণের পারিভাষিক নাম। ত্রিভুবনের মধ্যে দক্ষিণ দিকে ধরার অধোদেশে এবং অতলের ঊর্ধ্বভাগে অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণ তথা পিতৃলোকের অবস্থান—অন্তরালে এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যাম্ অধস্তাদ্ ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাদ্ যস্যাম্ অগ্নিষ্বাত্তাদয়ো পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি।

[ভাগবত পু. ৫.২৬.৫]

এখানে পিতৃরাজ যমও সপার্ষদে দণ্ডধারণপূর্বক অবস্থান করেন।

[দেবী ভাগবত পু. ৮.২১.১৫-২০]

অন্যমতে সোমপথ নামে কতগুলি পিতৃলোক আছে। সেই সব জায়গায় দেবপিতা মারীচপুত্রদের নিবাসস্থান। এই যাগশীল দেব-পিতৃগণই অগ্নিষ্বাত্ত নামে প্রসিদ্ধ। *[মৎস্য পু. ১৪.১-২]*

অন্যমতে বৈবস্বতগণ যেদিকে অবস্থান করেন, সেইদিকে সোমপদা বা সোমপাদ নামক স্থানে যে পিতৃগণ থাকেন, তাঁদের নাম অগ্নিষ্বাত্ত।

[ভাগবত পু. ৪.১.৬২;
বিষ্ণু পু. ১.১০.১৮; ২.১২.১৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৬;
বায়ু পু. ৭৩.২; ১১০.১০]

যেসব গৃহস্থগণ যজ্ঞাদি-কর্ম করেন না, সেই আর্তব নামক পিতৃগণও অগ্নিষ্বাত্তাদির অন্তর্গত।

গৃহস্থাশ্চাপ্যযজ্বানঃ অগ্নিষ্বাত্তাস্তথার্তবাঃ।

আবার অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ ঘৃতধারা দিয়ে হোম করেন অথবা যাজ্যা হোম করেন, এমন খবরও আছে—

অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তেষাং হোমিনো যাজ্যযাজিনঃ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৬-৭, ১.২৩.৭৫-৭৭;
১.২৮.৪, ১৬, ১৯, ২০, ৭৩;
বায়ু পু. ৩০.৬, ২৭-৩১; ৫২.৬৭-৮;
৫৬.১৩-১৪, ৬৮; ৭৩.২-৪;
মৎস্য পু. ১৪.২-৬; ১৮.২১; ১৯.৫; ১০২.২০;
১২৬.৬৮; ১৪১.৩, ১২, ১৬]

বিরজ নামক লোকে যে পিতৃগণ থাকেন, তাঁরাও অগ্নিষ্বাত্তাদির অন্তর্গত। এই অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের মানসী কন্যা পিবরীর গর্ভে ব্যাসপুত্র শুকদেব পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন—তাঁদের নাম—কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, শম্ভু এবং ভূরিশ্রুত (ভূরিশ্রবা) অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের মানসী কন্যা পিবরীর গর্ভে জাত শুকের কন্যার নাম কীর্তিমতী। তিনি বিখ্যাত ব্রহ্মদত্তের জননী—

উৎপদ্যাস্তে চ পীবর্য্যাং ষড়িমে শুকসূনবঃ।
ভূরিশ্রবা প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চমঃ।
কন্যা কীর্তিমতী চৈব যোগমাতা দৃঢ়ব্রতা॥

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০. ৭৫-৮২;
বায়ু পু. ৭০.৮৫-৮৬]

অগ্নিসত্যপদ হিমালয় অঞ্চলে বদরী নামক পুণ্যস্থানে এই জলময় তীর্থস্থান। হিমালয়ের তিনটি শৃঙ্গ থেকে মুষলধারার মত জল পড়ছে এখানে।

[বরাহ পু. ১৪১.৭]

অগ্নিসম্ভবা স্বর্গের অপ্সরারা যে চোদ্দটি গণে বিভক্ত ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম গণ হল অগ্নিসম্ভবা। অগ্নিসম্ভবা অপ্সরারা পুরাণে ঊর্জার গর্ভজাত বলে চিহ্নিত হয়েছেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জার গর্ভে তাঁদের জন্ম হয়। *[বায়ু পু. ৬৯.৫৪]*

অগ্নিসরঃ হিমালয়ের কোকামুখ অঞ্চলে একটি তীর্থ। গিরিকুঞ্জ নামে একটি পর্বত থেকে পাঁচটি জলধারা পড়ে এই সরোবরের মায়াময় জলরাশি সৃষ্টি করেছে। অন্যমতে হিমালয়ের একটি স্থান, যেটি ম্লেচ্ছদের বাসস্থান বলে পরিচিত হলেও লোহার্গল নামক তীর্থভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় তত্রস্থ অগ্নিসরোবর পুণ্যস্থান বলে চিহ্নিত হয়েছে। লোহার্গল নামক স্থানটিকে আধুনিক কুমায়ুন অঞ্চলের লোহারগলা বলে মনে করেন পণ্ডিতেরা। অতএব অগ্নিসরোবর কুমায়ুনেই অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়।

[বরাহ পু. ১৪০.৩৪; ১৫১.৭-৮, ৫২-৫৪]

অগ্নিসাক্ষ্য *[দ্র. বিবাহ]*

অগ্নিহোত্র সূর্য-স্বরূপ সবিতার স্ত্রী পৃশ্নির গর্ভে জাত মহাযজ্ঞের নাম অগ্নিহোত্র। *[ভাগবত পু. ৬.১৮.১]*

পুরাণ পুরুষ যজ্ঞবরাহের দন্তচর্বণের সঙ্গে অগ্নিহোত্রের তুলনা করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৩.১৩.৩৬]

ভাগবত পুরাণে এই যজ্ঞের প্রকৃতি এবং ফল সম্বন্ধে যা বলা আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে—অগ্নিহোত্র যদি কাম্য কর্ম হিসেবে প্রবৃত্তিমূলক কর্মের আধার হয়ে ওঠে, তবে তা পরিণামে অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে—

হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যম্ অগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্।

[ভাগবত পু. ৭.১৫.৪৮]

দুষ্যন্তপুত্র ভরত এই যজ্ঞ করতেন বলে ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৫.৭.৫]

অগ্নিহোত্রকারী পুরুষেরা পিতৃযানে অবস্থান করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২১.১৬০; ১.৩০.১৩; ৩.১৪.২; ২.২৬.১৪; ২.৩৫.৪৪; ২.৪৪.৫; ২.৬৬.২; মৎস্য পু. ১২৪.৯৮]

শুক্র, অজমীঢ় রাজার অপুত্রক পত্নী ধূমিনী এবং পুরূরবা এই যজ্ঞ করতেন।

[মৎস্য পু. ২৫.৩৩; ৫০.১৮; ১০৭.১৬; ১৮৩.৮১: বায়ু পু. ৯১.২; ৭৭.৯; ১০৭.১৮]

সোমনন্দন বুধ ব্রাহ্মণবেশে অগ্নিহোত্র-পরিচর্যার জন্য ইলাকে কপট আহ্বান জানিয়েছিলেন।

[মৎস্য পু. ১১.৫৮]

চতুর্বেদের মুখ বলা হয় অগ্নিহোত্রকে।

[বায়ু পু. ১০৪.৮৩]

☐ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে সর্বত্রই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেখা হবার পরই তাঁর অগ্নিহোত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে—

"তপো'গ্নিহোত্রং শিষ্যেষু কুশলং পর্যপৃচ্ছত"

[রামায়ণ ১.৫২.৪]

☐ যে কোনো হোমযাগের প্রকৃতি বা model হল অগ্নিহোত্র। *[দ্র. প্রকৃতি-যাগ]*

গৃহস্থ বৈদিক পুরুষ সপত্নীক অগ্ন্যাধান করবার পর প্রতিদিন সেই সংরক্ষিত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিহোত্র করবেন—এটাই বেদবিহিত বিধি। এটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই ত্রৈবর্ণিকের নিত্যকর্ম। জরা এবং মৃত্যু ছাড়া অগ্নিহোত্র-কর্ম থেকে ত্রৈবর্ণিকের রেহাই ছিল না। সেইজন্য শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিহোত্রকে বলা হয়েছে 'জরামর্য' সত্রযাগ —এতদ্ বৈ জরামর্যং সত্রং জরয়া হ্যেবাস্মাৎ মুচ্যতে মৃত্যুনা বা *[১২.৪.১.১]* যজমান নিজেই অগ্নিহোত্র সম্পাদন করতেন। জরা-ব্যাধিতে অপারগ হলে পুত্র, ভ্রাতা, জামাই এবং তদভাবে অধ্বর্যু-নামক ঋত্বিক্‌কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে অগ্নিহোত্র সম্পন্ন করতে হত।

অগ্নিহোত্রের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল—যজমানের স্ত্রীও এই যজ্ঞে সহ-অধিকারী। অবিবাহিত বা বিপত্নীক ব্যক্তির এই যাগে অধিকারই নেই। যে যজমান পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি, তিনি যদি অগ্নিহোত্র করেন, তবে আত্মগত শ্রদ্ধাকে পত্নীরূপে কল্পনা করে অগ্নিহোত্র করতে হত।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১২.৪.৪.১; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭.৩২.৯]

শ্রদ্ধাকে পত্নীরূপে কল্পনা করায় বিবাহিতা স্ত্রীর মর্য্যাদা কতটা সেই কালে ছিল, তাও অনুমান করা যায়।

অগ্নিহোত্র যদিও নিত্যকর্ম, তবু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়েও এই অনুষ্ঠান করা হত; কিন্তু সেক্ষেত্রে আহুতি-দ্রব্যও বিশেষ ধরনের হত। যেমন পশুকাম বা স্বর্গকাম ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধাহুতি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনায় দধি-আহুতি, গ্রাম-কামনায় যবাগূ (যবচূর্ণ দিয়ে প্রস্তুতপানা), অন্ন-কামনায় চাল-ডাল (ওদন), মর্য্যাদা বা বল-কামনায় তণ্ডুল-আহুতি বিধেয় ছিল। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে অগ্নিহোত্রের নিত্যকর্ম কাম্যকর্মে পরিণত হত।

অগ্নিহোত্রের নিত্যকর্মে প্রধান আহুতি ছিল দুধ। এই দুগ্ধ সংগ্রহের জন্যই যজমানকে একটি গাভী পালন করতে হত যার নাম অগ্নিহোত্রী গাভী। রামায়ণে মুনি বশিষ্ঠের কাছে বিশ্বামিত্র শবলা-নাম্নী গাভীটিকে চাইলে তিনি বলেছিলেন —আমার হব্য (ঘৃতের দ্বারা—দেবতাদের উদ্দেশে করণীয় নিত্য যজ্ঞ), কব্য (পিতৃগণের উদ্দেশে করণীয় ঘৃতসাধ্য যজ্ঞ), অগ্নিহোত্র, বলি, আহুতি (আপুতি), হোম—সবকিছুর মূলে এই শবলা নাম্নী গাভী—

অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ॥
আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলির্হোমস্তথৈব চ।

[রামায়ণ ১.৫৩.১৩-১৪]

সন্ধ্যায় এবং সকালে অগ্নিহোত্রের নিত্যকর্ম বিহিত ছিল। সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের প্রথম আহুতি নিবেদিত হত অগ্নির উদ্দেশে। দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রে প্রথম আহুতি নিবেদিত হত সূর্যের উদ্দেশে।

অগ্নিহোত্রের সঠিক সময়-কাল-নিয়ে মতানৈক্য আছে। শ্রৌতসূত্রে সমস্ত অগ্নিহোত্রীদের দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে —উদিতহোমী এবং অনুদিতহোমী। যাঁরা সূর্যোদয়ের পরে হোম

করেন তাঁরা উদিতহোমী—যেমন যজুর্বেদী কঠ, তৈত্তিরীয় এবং মৈত্রায়ণী শাখার ব্রাহ্মণেরা। আর যাঁরা সূর্যোদয়ের আগেই অগ্নিহোত্র করেন তাঁরা অনুদিতহোমী, যেমন বহ্বৃচ এবং ছন্দোগ শাখার ব্রাহ্মণেরা। *[দ্র. রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র; ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭-২২]*

অগ্নিহোত্রহবনী *[দ্র. যজ্ঞায়ুধ]*

অগ্নীধ্র$_1$ মন্বন্তর পর্যায়ে চতুর্দশ মনু ভৌত্য মনুর পুত্র। মতান্তরে ভৌত্য মনুর কালে সপ্তর্ষিদের অন্যতম। *[বায়ু পু. ১০০.১১৬; বিষ্ণু পু. ৩.২.৪২; মার্কণ্ডেয় পু. ১০০.৩১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১১২]*

অগ্নীধ্র$_2$ পুরাকাহিনী এইরকম যে, অগ্নি এক সময় কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্মদা ইত্যাদি ষোলোটি নদীকে কামনা করেছিলেন। বস্তুত এই বিখ্যাত নদীগুলির তীরেই বৈদিক অগ্নির আবাহন-আহুতি প্রচলিত হয় বলেই এই বৈবাহিক কল্পনা। নদী এখানে অগ্নির আধারভূতা 'ধিষ্ণী' হিসেবে চিহ্নিত। অগ্নির বৈদিক প্রকারগুলির মধ্যে অগ্নীধ্র একটি। ঋতু, প্রবাহণ ইত্যাদির সঙ্গে অগ্নীধ্রও ধিষ্ণীর গর্ভজাত সন্তান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। অগ্নীধ্র এখানে নদীপুত্র এবং ধিষ্ণী গর্ভজাত বলেই নিজেও একজন ধিষ্ণি। বৈদিক যাগযজ্ঞের ভাবনায় 'ধিষ্ণ্য' হল একটি অগ্নিস্থান, তাকে 'ধিষ্ণিয়'ও বলে। সোমযাগের আহুতিকালে ছয় থেকে আটটি অগ্নিস্থান তৈরি হয় সারি দিয়ে। সেখানে আগ্নীধ্র বা অগ্নীধ্র নামক ঋত্বিকের জন্য নির্দিষ্ট অগ্নিস্থান বা ধিষ্ণ্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অগ্নীধ্রের ধিষ্ণ্য থেকে আগুন নিয়েই অন্য ধিষ্ণ্যগুলিতে আগুন জ্বালানো হয়। পুরাণে সেই কারণেই অগ্নীধ্র ঋত্বিক্ এবং তাঁর জন্য নির্দিষ্ট অগ্নিকেই ধিষ্ণীর গর্ভজাত বলা হয় বলে পৌরাণিক কল্পনা। *[দ্র. ধিষ্ণ্য এবং আগ্নীধ্র]*
[বায়ু পু. ২৯.১১-১৮, ২৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.২০]

অগ্নীধ্র$_3$ স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর গর্ভে মনুর দশ জন পুত্রের একজন। তাঁকে জম্বুদ্বীপের রাজা করা হয়েছিল—

জম্বুদ্বীপেশ্বরং চক্রে অগ্নীধ্রন্তু মহাবলম্।

[বায়ু পু. ৩১.১৭-১৮; ৩৩.৯, ১১; ভাগবত পু. ৫.১.২৫, ৩৩; ১১.২.১৫]

কোনো কোনো পুরাণে স্বায়ম্ভুব মনুর এই দশপুত্রই স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র বলে কীর্তিত। এই মতে স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। অগ্নীধ্র এই প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। *[বিষ্ণু পু. ২.১.৬-৭]*

অগ্নীধ্র বা আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি হয়ে প্রজাপালন করছিলেন। তিনি এক সময় পুত্রকামনা করে মন্দর-পর্বতে ভগবান ব্রহ্মার তপস্যা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা মনে-মনে জানতে পারলেন অগ্নীধ্রের ইচ্ছে। তিনি দেবসভার গায়িকা অপ্সরা পূর্বচিত্তিকে পাঠালেন অগ্নীধ্রের কাছে—তদুপলভ্য ভগবান্ আদিপুরুষ সদসি গায়ন্তীং পূর্বচিত্তিং নামাপ্সরাম্ অভিযাপয়ামাস। অগ্নীধ্র প্রথম যখন পূর্বচিত্তিকে দেখলেন, সেই অবস্থাটা ছিল নাটকীয়—আপন গাত্র-সৌরভে আমোদিত মধুকরের ভয়ে পালানোর চেষ্টা করছেন পূর্বচিত্তি। অপ্সরার এমন উন্মাদক সৌন্দর্য্য দেখে অগ্নীধ্র প্রলুব্ধ হলেন বটে, কিন্তু রমণীদেহের সঙ্গে অপরিচয়-বশত তিনি তাঁকে অদৃষ্টপূর্ব কোনো মুনি ভেবে সম্বোধন করেছিলেন এবং প্রচুরতর রূপানুরাগ প্রকাশ করেও অবশেষে নিজের সঙ্গে তপস্যা করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। অবশ্য ব্রহ্মার বরে অগ্নীধ্র এটা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন যে, এই রমণী তাঁর স্ত্রী হবার জন্যই তাঁর তপস্যাস্থলে এসেছেন। পূর্বচিত্তির সঙ্গে সহবাস-সুখে বহু বছর কেটে গেল জম্বুদ্বীপাধিপতি রাজার। পূর্বচিত্তির গর্ভে অগ্নীধ্রের নয়টি সন্তান—নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরন্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল। এই নয় পুত্র আসলে প্রাচীনা পৃথিবীর নয়টি বৃহৎ দেশ অথবা দেশনাম। নয়টি সন্তান রাজাকে উপহার দিয়ে পূর্বচিত্তি স্বস্থানে ব্রহ্মার সভায় চলে যান। কিন্তু অগ্নীধ্রের কামনা তৃপ্ত না হওয়ায় অপ্সরা পূর্বচিত্তির কথা ভেবে ভেবে মৃত্যুর পর অপ্সরা লোকে গমন করেন। *[ভাগবত পু. ৫.২.১-২২; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৩.১৪, ৩৩-৩৫]*

অগ্নীশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থক্ষেত্র।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৬৬]

অগ্নৌকরণ এক ধরনের স্মৃতিশাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া। পার্বণশ্রাদ্ধ অথবা মাসিক শ্রাদ্ধের সময় পাক করা অন্ন এবং আজ্য ঘৃত আগুনে আহুতি দেবার

নামই অগ্নৌকরণ। বস্তুত শ্রাদ্ধের উপকরণগুলির মধ্য থেকে ঘৃতাক্ত অন্নপিণ্ড অগ্নিকুণ্ডে দেবার সময় সেই অন্নকেই যেন জিজ্ঞাসা করা হয়—আমি অগ্নিতে করছি—অগ্নৌ করিষ্যামি। অন্নের দিক থেকে তখন যেন একটা ছদ্ম উত্তর আসে—হ্যাঁ করো—কুরুষ্বেতি। এই যে অগ্নিতে ঘৃতাক্ত অন্নপিণ্ড দেবার প্রশ্ন এবং উত্তর—করিষ্যামি এবং কুরুস্ব—এটাকেই বলা হয়েছে—অগ্নৌ (অগ্নিতে) করণ করা—অন্নপিণ্ড দেওয়া। শ্রাদ্ধের প্রক্রিয়ায় মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্নৌকরণ অনুষ্ঠানের কথা মহাভারতে খুব স্পষ্টভাবেই বলা আছে—

কৃত্বাগ্নৌকরণং পূর্বং মন্ত্রপূর্বং তপোধন।

স্মার্ত রঘুনন্দন গোভিল গৃহ্যসূত্র থেকে অগ্নৌকরণের অর্থ এবং তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিয়ে বৈদিককালের পিতৃযজ্ঞের আচার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিষ্ণু পুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধার করে। বিষ্ণু পুরাণ বলেছে—শ্রাদ্ধের সময় ব্যঞ্জন-বর্জিত এবং লবণ-বর্জিত অন্নপিণ্ড অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে—

জুহুয়াদ্ ব্যঞ্জন-ক্ষার বর্জমন্নং ততো'নলে।

এই অন্নপিণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপের প্রক্রিয়ায় অগ্নৌকরণ ব্যাপারটা কীরকম, তা বুঝিয়ে দিয়েছে ব্রহ্মপুরাণ। বলা হয়েছে—তারপর পাক করা অন্নের সঙ্গে ঘি-তিল-আর কুশ একত্র নিয়ে সামনে বসা শ্রাদ্ধদ্রষ্টা ব্রাহ্মণ বা মুনি-ঋষিদের জিজ্ঞাসা করবে—এবার কী অগ্নিতে হোম করবো? মুনিরা বলবেন—হ্যাঁ করো। তারপর শ্রাদ্ধে বসা মানুষটি তিন বার তিন দেবতা—সোম, অগ্নি এবং যমের উদ্দেশে অন্নপিণ্ড অগ্নিতে আহুতি দেবেন—এটাই অগ্নৌকরণ—

ততশ্চান্নং সমাদায় সর্পিস্তিলকুশাকুলম্॥
বিধায় পাত্রে তচ্চৈব পর্য্যপৃচ্ছত্ততো মুনীন্।
অগ্নৌ করিষ্যে ইতি তৈঃ কুরুষ্বেতি চ চোদিতঃ॥
আহুতি-ত্রিতয়ং দদ্যাৎ সোমায়াগ্নের্যমায় চ।

মহামতি পঞ্চানন তর্করত্ন কূর্ম পুরাণের অনুবাদে লিখেছেন যে, শ্রাদ্ধীয় অন্ন ব্রাহ্মণদের ভোজন করালে বা ব্রহ্মচারীকে দান করলেই 'অগ্নৌকরণ' হবে। কিন্তু মূলে আছে—পূর্বে এই অন্ন অগ্নিকে ভোজন করিয়ে তারপর ব্রহ্মচারীকে খাওয়াবে। অতএব প্রথমাংশ 'অগ্নৌকরণ', দ্বিতীয় অংশ নয়—

প্রাশ্যোদন্নং তদগ্নৌ তু দদ্যাদ্ বৈ ব্রহ্মচারিণে।

[রঘুনন্দন-কৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৃ. ৮৫;
বিষ্ণু পু. ৩.১৫.২৪; ব্রহ্ম পু. ২১৯.৬১-৬৩;
কূর্ম পু. ২.২২.৩০; মহা (k) ১৩.৯১.২৩;
(হরি) ১৩.৭৮.২৩]

অগ্ন্যাধান অগ্ন্যাধান কর্মকে অগ্ন্যাধেয় কর্মও বলা হয়। বেদের আমল থেকে মহাভারতের যুগ পর্যন্ত অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয় অনুষ্ঠানের বেশ একটা আড়ম্বর ছিল। এই অনুষ্ঠানের কদিন আগে থেকেই অরণি-কাষ্ঠ-সংগ্রহের একটা পালা চলত। তারপর যজমান পুরোহিত-ঋত্বিক্‌দের বরণ করতেন মধুপর্ক দিয়ে। দেবযজন-ভূমি পরিষ্কার করে নতুন গৃহস্থ স্ত্রীর সঙ্গে প্রস্তুত হতেন অগ্ন্যাধেয় কর্মের জন্য। নির্দিষ্ট দিনে সূর্য যখন মধ্য গগনে, তখন যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ অধ্বর্যু ঔপাসন অগ্নিস্থান থেকে অগ্নি নিয়ে এসে, ব্রহ্মৌদ্য পাক করে চার জায়গায় সেই ঘৃতযুক্ত অন্ন (ব্রহ্মৌদ্য) রাখতেন। সমস্ত ঋত্বিক পুরোহিতেরাই সেগুলো খেতেন।

এই অনুষ্ঠানে মাংস-ভোজনের ব্যবস্থাও ছিল বলে মনে হয়। কেননা আগের দিন থেকে বেঁধে রাখা একটি গোরুর (অভাবে ছাগলের) বসা বা চর্বি অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত। যজ্ঞস্থান পরিষ্কার করার পর মধ্যরাত্রি গত হলে অধ্বর্যু দুটি অরণি-মন্থন করে অগ্নিসৃষ্টি করেন। তখন সামগান চলতে থাকে অথবা ঋক্‌মন্ত্রের উচ্চারণ। মন্থিত অগ্নি একটি পাত্রে ধারণ করে গৃহস্থের ঘরে গার্হপত্য অগ্নিস্থানে স্থাপন করা হয়। এটাই অগ্ন্যাধান এবং এই অগ্নি থেকেই গার্হপত্য এবং দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করা হয়।

[কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (weber) ৪.৭.১; থেকে ৪.৯.৯;
আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ৫.৩.১৭-২০;
বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ২.৮-১১; ২৪.১২-১৩]

যত রকম যজ্ঞই প্রচলিত থাক, অগ্ন্যাধেয় যে গৃহস্থ মানুষের প্রথম প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে মহাভারত সম্পূর্ণ অবহিত। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ করে অর্জুন বলেছিলেন—যে গৃহস্থ প্রতিদিন অগ্ন্যাধেয় অর্থাৎ স্বস্থাপিত অগ্নিতে অগ্নিহোত্র কর্ম করেন, তাঁর মত ধার্মিক আর কে আছে? অগ্ন্যাধেয়-কর্ম করার পর যাঁরা দক্ষিণা দেন না, তাঁদের 'অনাহিতাগ্নি' বলা হয়েছে মহাভারতে। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর একত্রে স্থাপিত এই অগ্ন্যাধেয়ের

অগ্নি মৃত্যুর সময় শবদেহের সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে হত। রামচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের সময় যেমন এই অগ্নিহোত্রের অগ্নি নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাবণের মৃত্যুর পরেও তাই।

[মহা (k) ১২.২৬৮.৩৮; ১২.১৮.৩৬;১২.১৬৫.২৩; (হরি) ১২.২৬২.৩৮; ১২.১৮.৩৬; ১২.১৬০.২৩; রামায়ণ ৬.১১৩.১১০; ৭.১২২.২]

বৈদিক যুগে বেদপন্থী গৃহস্থ নিজগৃহে স্থায়ী অগ্নিশালা নির্মাণ করতেন। গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসে ব্রহ্মচারী বৈদিক বিবাহ করে গৃহস্থ হতেন এবং অগ্নিশালা নির্মাণ করে সেখানে শ্রৌত অগ্নি স্থাপন করতেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবিষ্ট বিবাহিত পুরুষের এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠা-কর্মকেই বলে অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়। বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ যজমান স্বগৃহে অগ্ন্যাধান করবেন বসন্ত ঋতুতে, ক্ষত্রিয় করবেন গ্রীষ্মে আর বৈশ্য বর্ষাঋতুতে—বসন্তে ব্রাহ্মণো'গ্নীনাদধীত, গ্রীষ্মে রাজন্যো, বর্ষাসু বৈশ্যঃ। অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে একটি ঘোড়ার প্রয়োজন হত। গার্হস্থ্য জীবনের আরম্ভসূচক এই অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে অশ্বের উপস্থিতি প্রাচীন আর্যজাতির বিজয়যাত্রার সূচক।

[কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Weber), ৪.৭.১ থেকে ৪.৯.৯; রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭]

অগ্র *[দ্র. ভিক্ষা]*

অগ্রজ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার শঙ্করাচার্য ভগবানের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

অগ্রে জায়ত ইতি অগ্রজঃ।

ঔপনিষদিক ভাবনায় পরমেশ্বর নিরাকার।

সৃষ্টির আদিতে জগত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে জগৎ স্রষ্টা হিসেবে নিজেকে সাকার রূপে প্রতিভাত করেন এবং তারপরে তাঁর দেহ থেকে সমস্ত জড় এবং সচেতন পদার্থের জন্ম হয়। এইভাবে জগৎস্রষ্টা রূপে তিনি সর্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করেন বলেই তিনি অগ্রজ। শাঙ্করভাষ্যে এই প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি সূক্ত উদ্ধৃত হয়েছে যার প্রথম শ্লোকেই বলা হচ্ছে যে, যিনি সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর সেই জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভই কেবল আদিতে বর্তমান ছিলেন। তিনি এই আকাশ ও পৃথিবীকে স্বস্থানে স্থাপন করেছেন—

হিরণ্যগর্ভ সমবর্ততাগ্রে ভূবস্য
জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

[ঋগ্‌বেদ ১০.১২১]

পরবর্তী শ্লোকগুলিতে জগৎস্রষ্টা এই পরম পুরুষের মহিমা বিশদে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান বিষ্ণু এই জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর স্বরূপ বলে তিনিও অগ্রজ নামে কীর্তিত হন।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৮; (হরি) ১৩.১২৭.১০৮]

অগ্রণী$_১$ অগ্নির বিশিষ্ট নাম এবং রূপ। মনুর ঔরসে তাঁর তৃতীয়া পত্নী নিশার গর্ভজাত পঞ্চম পুত্র। বিভিন্ন যজ্ঞাঙ্গীয় ক্রিয়াকর্মে যে অগ্নির উদ্দেশে হবির অগ্রভাগ অর্পণ করা হয় সেই অগ্নির নাম অগ্রণী। যাস্কের নিরুক্তে অগ্নি-শব্দের নিরুক্তি ঘটেছে অগ্রণী শব্দ থেকে।

[মহা (k) ৩.২২১.১৫, ২২; (হরি) ৩.১৮৪.১৫, ২২; The Nighantu and the Nirukta (Sarup), 7.14]

অগ্রণী$_২$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের একটি। অগ্র বলতে আভিধানিক অর্থে যেমন ঊর্ধ্বভাগ বা প্রথম বোঝায় তেমনই 'অগ্র' শব্দ উৎকর্ষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অগ্রশব্দের পর *নী*-ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় অগ্রণী। *নী*-ধাতুর অর্থ নয়ন করা। ভগবান বিষ্ণুর মুমুক্ষু ভক্তরা তাঁর কৃপায় উৎকৃষ্ট লোকে বা উৎকৃষ্ট পদে নীত হন বলেই ভগবান বিষ্ণু অগ্রণী নামে খ্যাত—

অগ্রং প্রকৃষ্টং পদং নয়তি মুমুক্ষূনিতি অগ্রণীঃ।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৮; (হরি) ১৩.১২৭.১০৮]

অগ্রবর শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার নীলকণ্ঠ অগ্রবর শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

অগ্রবরঃ অগ্রে বৃণোতি
যজ্ঞভাগাদিকমিত্যগ্রবরঃ।

তিনি দেবাদিদেব, অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা দুই-ই বেশি। পৌরাণিক কালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তির মাহাত্ম্য বেড়ে যায় এবং সেই সময়ই শিবকে সর্বাগ্রে যজ্ঞ ভাগ দেবার রীতি-প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। দক্ষযজ্ঞের পর শিবের চরম মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই যজ্ঞের সময় তাই তাঁকেই সর্বাগ্রে বরণ করা হয়, সর্বাগ্রে যজ্ঞভাগ দেওয়াও হয় তাঁকেই।

এই কারণেই মহাদেব অগ্রবর নামে খ্যাত। মহাদেবকে একাধিক সময় অগ্নির সঙ্গে একাত্মকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সমস্ত দেবতাকে একসঙ্গে অগ্নিরূপেই যজ্ঞস্থলে আবাহন করা হয়, অগ্নিই সমস্ত দেবতাদের জন্য প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করেন। এই কারণেও অগ্নিস্বরূপ মহাদেব অগ্রবর নামে খ্যাত। বৈদিক কোষের রচয়িতা নিরুক্তকার যাস্ক অগ্নি-শব্দের নিরুক্তি এবং ব্যাখ্যা দেবার সময় লিখেছিলেন —অগ্নি কথাটা বলছি কেন? তিনি উত্তর দিচ্ছেন—তিনি যেহেতু সকলের আগে যান এবং যে কোনো যজ্ঞে যেহেতু সবার আগে অগ্নি প্রণয়ণ করতে হয়—অগ্নিঃ কস্মাৎ? অগ্রণীর্ভবতী। অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে। অগ্নির অগ্রণী-স্বভাব এবং সকলের আগে তাঁর প্রজ্জ্বলন আসলে শিবের মধ্যে আরোপিত হয়েছে। সমস্ত দেবতার আগে তিনি এবং আগে তাঁকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হয়—সেইজন্যই তিনি অগ্রে যজ্ঞভাগ লাভ-করা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তিনি অগ্রবর।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪৯; (হরি) ১৩.১৬.১৪৮; The Nighantu and the Nirukta (Sarup), 7.14, p. 139]

অগ্রযায়ী ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। সম্ভবত অগ্রযায়ী অনুযায়ী নামেও পরিচিত ছিলেন।

[মহা (k) ১.১১৭.১১; (হরি) ১.১১১.১০]

অগ্রহ অগ্নির বিশিষ্ট রূপ এবং নাম। চাতুর্মাস্য-যাগে যাঁর জন্য হবি নির্মিত হয়, তাঁর নাম অগ্রহ। তপ-নামক অগ্নির দুই পুত্র মনু এবং ভানু (অথবা বৃহদ্ভানু)। সুপ্রজা এবং বৃহদ্ভাসা—এই দু-জন ভানুর স্ত্রী। এঁদের গর্ভে ভানুর যে ছয় পুত্র হয়, তার মধ্যে পঞ্চম অগ্রহ।

[মহা. (k) ৩.২২০.১৪; (হরি) ৩.১৮৪.১৪]

অগ্রহার মহাভারতে অন্তত দু জায়গায় অগ্রহার শব্দটা পাই। প্রথম বার বনপর্বে বিদর্ভরাজ ভীম তাঁর জামাই-মেয়ে হৃতসর্বস্ব নল রাজা এবং তাঁর স্ত্রী দময়ন্তীর সংবাদ পাবার জন্য যে ব্রাহ্মণদের পাঠাচ্ছিলেন, তাঁদের খুশী করার জন্য বলেছিলেন—আমি আপনাদের নগরোপম গ্রাম দেবো 'অগ্রহার' হিসেবে—

অগ্রহারং চ দাস্যামি গ্রামং নগরসম্মিতম্।

অগ্রহার আসলে এক ধরনের বৃত্তি। এখানে বৃত্তিভোগীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি দান করা হত এবং সেটা একটা সম্পন্ন গ্রামও হতে পারে। প্রধানত ব্রাহ্মণরাই অগ্রহার-বৃত্তির অধিকারী হতেন, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে, বৈদ্য, অমাত্য, অধ্যাপক, শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী পণ্ডিত, এমনকি মেয়েদেরও অগ্রহার হিসেবে জমি জায়গা, গ্রাম, ক্ষেত দেওয়া হয়েছে। উপরি উক্ত মহাভারতের শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখেছেন—'অগ্র' মানে, আগেই ব্রাহ্মণের ভোগের জন্য রাজা নিজের ধনসম্পত্তি থেকে যেসব জমি-জায়গা, ক্ষেত ইত্যাদি পৃথক করে রাখতেন—

অগ্রং ব্রাহ্মণ ভোজনম্। তদর্থং হ্রিয়ন্তে রাজ
ধনাৎ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে তে' গ্রহারাঃ ক্ষেত্রাদয়ঃ।

[মহা (k) ৩.৬৮.৪; (হরি) ৩.৫৬.৪]

মহাভারতে দ্বিতীয় উদাহরণে কৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামার কাছে দ্রৌপদী নিজের সাংসারিক ভাবনা বলার সময় জানিয়েছিলেন যে, তিনি সকলের আগে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদের জন্য অগ্রহারের ব্যবস্থা করেন—তান্ সর্বান্ অগ্রহারেণ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ—অন্ন-পান, বস্ত্রাদি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ বুঝিয়েছেন যে, এটা প্রধানত ব্রাহ্মণদের ভোজন-বস্ত্র দান করে প্রাথমিক সম্মানিত করার ব্যাপার। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে, এটা বনবাস-কালে দ্রৌপদী বলে থাকলেও তিনি পূর্বের রাজকীয় অভ্যাস ব্যক্ত করছেন। ফলত এখানেও অগ্রহার অর্থ ভূমি-ক্ষেত্রাদির দানই হওয়া উচিত। বিশেষত প্রধানা পট্টমহিষী ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছেন—এই ঘটনা বহু রাজ্যশাসন এবং প্রতিবেদনেও পাওয়া গেছে।

যাঁরা অগ্রহার বৃত্তি পেতেন তাঁদের নাম ছিল অগ্রহারিক। অগ্রহার হিসেবে বহু ব্রাহ্মণকে জীবন ধারণের উপযোগী জমি-জিরেত দিতে দিতে একটি আগ্রহারিক ব্রাহ্মণ-পল্লীও তৈরি হয়ে যেত। সাধারণত চিরকাল বংশানুক্রমে অগ্রহার ভোগ করার জন্য সর্বস্বত্ব প্রদান করে নিষ্কর জমি দেওয়া হত। আবার কোথাও কোথাও অগ্রহারদের কাছ থেকে কর নেওয়া হলেও সেই কর অগ্রহারগুলির ব্যয় নির্বাহ করার জন্যই নির্দিষ্ট থাকত। কোথাও আবার করলব্ধ অর্থে অগ্রহারের কর্মচারীদের বেতন চালানো হত। পরবর্তীকালে 'দেবাগ্রহার'

বৈশ্যাগ্রহার এবং অগ্রহার-বিষয়ে পৃথক নাম 'মহাগ্রহার', 'ব্রহ্মপুরী', 'চতুর্বেদিমণ্ডল', 'অঙ্গভোগ' এমন নামও পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.২৩৩.৪৫; (হরি) ৩.১৯৬.৪৩; বিশদে জানার জন্য: অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৬-৪৬২; D. C. Sircar, Indian Epigraphical Glossary, pp. 10-11]

অগ্রাহ্য ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। সাধারণ মানুষ নিজের কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বরকে জানতে বা গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না, দুষ্কর তপস্যার দ্বারাও তাঁর স্বরূপ অন্তরে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা গ্রহণযোগ্য বা গ্রাহ্য নন বলেই ভগবান অগ্রাহ্য নামে কীর্তিত—

কর্মেন্দ্রিয়ৈর্ন গৃহ্যতে ইতি অগ্রাহ্যঃ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই 'অগ্রাহ্য' ব্রহ্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—আমাদের মন এবং বাণী তাঁর নিকটে পৌঁছাতে বা তাঁকে প্রাপ্ত হতে সমর্থ নয়, তাকে ব্যর্থ হয়েই স্বস্থানে ফিরে আসতে হয়—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২.৯; মহা (k) ১৩.১৪৯.২০; (হরি) ১৩.১২৭.২০]

অঘ কৃষ্ণের মাতুল কংসের অধীন এক ঘাতক ব্যক্তি। অসুর নামে চিহ্নিত। অজগরের রূপ ধারণ করে এই অসুর বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণ এবং তাঁর সখাদের তথা গাভীগুলিকেও গ্রাস করেছিল। কৃষ্ণের সখারা এবং তাঁর গাভীগুলি অঘাসুরের বিশাল গ্রাসকে বৃন্দাবনের শোভা-সমন্বিত একদেশ ভেবে অজ্ঞাতেই সেই গ্রাসের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। বুদ্ধিমান কৃষ্ণ অল্পকালের মধ্যেই অঘাসুরের এই কৌশল বুঝতে পেরে অঘাসুরের গলার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তার নিশ্বাস রোধ করে মেরে ফেলেন। পরমেশ্বর কৃষ্ণের হাতে মৃত্যুবরণ করে অঘাসুর অবশ্য মুক্তি লাভ করে।

[ভাগবত পু. ১০.১২.১৩-৩৮; ১০.১৩.৪; ১০.১৪.৬০]

অঘবিনাশিনী একজন মাতৃকা। অন্ধকাসুরকে বধের জন্য মহাদেব যে মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, কৌমারী ইত্যাদি বহুসংখ্যক মাতৃগণের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের একতমা। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৮]*

অঘমর্ষণ$_{১}$ কৌশিক বংশীয় তেরোজন ব্রহ্মিষ্ঠ মুনিদের মধ্যে অন্যতম। পুরাণে ঋষি বিশ্বামিত্রের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি অঘমর্ষণের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। বিশ্বামিত্র, মধুছন্দা এবং অঘমর্ষণ এই তিনটি আর্ষেয় প্রবরের মধ্যে পরস্পর নিকট সম্বন্ধ ছিল বলেই বৈবাহিত সম্বন্ধ হত না।

[মৎস্য পু. ১৪৫.১১২; ১৯৮.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৭]

☐ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এই অঘমর্ষণ। এই সূক্তটি অঘ অর্থাৎ পাপনাশের মন্ত্র। অঘমর্ষণের নামানুসারে এই সূক্তটি অঘমর্ষণ সূক্ত নামে খ্যাত। মহাভারতেও একাধিকবার এই সূক্তের মাহাত্ম্য চর্চিত হয়েছে।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১৯০ সূক্ত]

☐ মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম বেশ কয়েকজন ঋষির নাম করেছেন যাঁরা বানপ্রস্থ ধর্মের প্রবর্তক এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেই তাঁরা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেছিলেন। এই ঋষিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অঘমর্ষণ।

[মহা (k) ১২.২৪৪.১৬-১৭; (হরি) ১২.২৪১.১৬-১৭]

অঘমর্ষণ$_{২}$ বিন্ধ্যাপাদমূলে অবস্থিত তীর্থ। এখানে প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ তপস্যা করেছিলেন এবং হংসগুহ্য নামে এক স্তব রচনা করে ভগবান শ্রীহরিকে তুষ্ট করেছিলেন।

বর্তমান মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলায় রঘু আউজ্জানগর তহশিলের অন্তর্গত অমুয়া গ্রামের ধারা, কুণ্ডী এবং বেঢ়ক—এই তিনটি জায়গা নিয়ে প্রাচীন অঘমর্ষণ তীর্থ অবস্থিত ছিল বলে পণ্ডিত N.L. Dey মত প্রকাশ করেছেন। এখনও এই স্থানটি অভরখন্ নামে প্রসিদ্ধ। ধারাতে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত, কুণ্ডীতে আছে পুণ্যসলিল সরোবর আর বেঢ়ক নামক স্থানটিতে আছে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞবেদী।'

[ভাগবত পু. ৬.৪.২১, ৩৫; GDAMI (Dey) p. 7]

অঘমর্ষণ$_{৩}$ ঋগ্‌বেদের 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' *[১০.১৯০.১-৩]* অঘমর্ষণ মন্ত্র। উপনয়নের সময় সন্ধ্যা-মন্ত্রের প্রথম দিকেই পাপনাশক অঘমর্ষণ মন্ত্র পড়তে হয়—

'আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন'।

এখান থেকে আরম্ভ করে 'আপো জনয়থা চ ন' পর্যন্ত। স্নান-পানের শুদ্ধির জন্য জলের কাছে এই প্রার্থনা করে জলাধিদেবতা বরুণের কাছে 'হিরণ্যশৃঙ্গং বরুণম্' থেকে আরম্ভ করে 'পুনস্তু পুনঃ পুনঃ' পর্যন্ত মন্ত্রে যাচনা করতে হয় পাপ-প্রক্ষালনের

জন্য। অঘমর্ষণ-সূক্ত বলতে বরুণের কাছে প্রার্থিত পাপ-মুক্তির প্রার্থনাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই মন্ত্র তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং মহানারায়ণোপণিষদে উল্লিখিত আছে। অঘ শব্দের অর্থ পাপ আর মর্ষণ মানে স্খালন, হয়তো সেইজন্যই অঘমর্ষণের অন্য নাম মল-প্রক্ষালন'। অনেকেই স্নানের সময় এই অঘমর্ষণ সূক্ত পাঠ করেন। পূর্ণ সূক্তটির মধ্যে হে বরুণ! তুমি তোমার হাত দিয়ে আমার শরীর থেকে দূর করো এই পাপ—

তন্নো বরুণো রাজা পাণিনা হ্যবমর্শতু—

এই কথাগুলি সূক্ত পাঠকের ভিতর বাহির সর্বত্র যেন শুচিতা সম্পাদন করে।

[তৈত্তিরীয় আরণ্যক (আনন্দাশ্রম) ১০.১; পৃ. ৮০৭; মহানারায়ণোপনিষদ ৪.১১]

মহাভারত বৈদিক আরণ্যক-উপনিষদের ধারা বহন করে স্নানের সময়েই পূর্বকৃত পাপ-প্রক্ষালনের জন্য অঘমর্ষণ মন্ত্রের উচ্চারণ করার পরম্পরা মেনে নিয়েছে। এখানে এই মন্ত্রপাঠের গুরুত্ব যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক পুণ্যের সমতুল্য হয়ে উঠেছে—

অপি চাপ্সু নিমজ্জেত জপংস্ত্রিরঘমর্ষণম্।
যথাশ্বমেধাবভৃথস্তথা তন্মনুরব্রবীৎ॥

[মহা (k) ১২.১৫২.৩০; ১২.২১৪.১৩;১২.২৪৪.১৬; ১৩.২৫.৫৬; (হরি) ১২.১৪৮.৩০; ১২.২১১.১৩; ১২.২৪১.১৬; ১৩.২৬.৫৬]

অঘোর$_১$ বত্রিশতম কল্পে কৃষ্ণবর্ণ তামসরূপ মহেশ্বরের স্বরূপ। *[বায়ু পু. ২৩.২৯,৭৬]*

ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির কামনায় কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় তিনি বিশ্বেশ্বর মহাদেবের বন্দনা করেন 'অঘোর' মন্ত্রে। *[বায়ু পু. ২৩.২৪-২৯]*

অঘোর$_২$ অঘোর মহাদেবের তৃতীয় মূর্তি, অথর্ববেদে এই মূর্তির প্রশংসা করা হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪০.১০৩]

অঘোর$_৩$ মহাদেবের পাঁচটি মুখের মধ্যে অন্যতম। এই মুখ নীলবর্ণ এবং ভীতিজনক দন্তাবলীতে আকীর্ণ এবং এই মুখের অবস্থান দক্ষিণ দিকে। রুদ্রের দক্ষিণ মুখের মতো সকরুণ।

[কালিকা পু. ৫১.১১৮, ১২০]

অঘোর$_৪$ একটি অস্ত্র। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অনুরোধে ভগবান রুদ্র শিব এই অস্ত্রের দ্বারা ত্রিপুর দহন করেন বলে পুরাণে বর্ণিত আছে।

[দেবীভাগবত পু. ১১.৪.৩-৬]

অঘোরকল্প ভবিষ্যপুরাণোক্ত কল্পের বিবরণ। ভগবান ব্রহ্মা আদিত্যমাহাত্ম্য অবলম্বন করে অঘোরকল্পের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে মনুর কাছে এই জগতের স্থিতি এবং তখনকার প্রাণীবর্গের যে লক্ষণ প্রকাশ করবেন সেটাই ভবিষ্যপুরাণ। *[মৎস্য পু. ৫৩.৩০-৩১]*

অঘোরা দেবীর নবপীঠশক্তির অন্যতমা। তিনি দেবী ভুবনেশ্বরীর সেবা করেন।

[দেবী ভাগবত পু. ১২.১২.৩৬]

অঘোরেশ্বরতীর্থ বারাণসী ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। মহর্ষি অঘোর এই স্থলে সিদ্ধিলাভ করেন। *[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৬০]*

অঘ্ন্য গো-জাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত একটি নাম। প্রহার করা বা হত্যা করার অযোগ্য বলেই এই নাম।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪৫.২৮]

অঘ্ন্যা ভারতীয় ভাবনায় গোরু বা গোজাতি সম্বন্ধে প্রযুক্ত একটি নাম। গোরুকে প্রহার করা বা গোবধ করা উচিত নয়—অতএব হত্যার অযোগ্য বলেই এই নাম। মহাভারতে তুলাধার-জাজলির কথোপকথনের সময় স্পষ্টভাবেই একথা বলা হয়েছে যে, গোরুর একটা পর্যায় শব্দ বা নামই হল 'অঘ্ন্যা'—অঘ্ন্যা ইতি গবাং নাম—অতএব কেউ যেন কখনো গোহত্যা করার কথা না ভাবে। কৌতূহলের বিষয় হল, মহাভারতে এর পরের পঙ্‌ক্তিতে একটি পাঠান্তরে গাভীর সঙ্গে বৃষকেও ধরে নিয়ে বলা হয়েছে—সেই ব্যক্তি খুব অমঙ্গলের কাজ করবে যদি সে বৃষ কিংবা গাভীকে হত্যা করে—

মহচ্চকারাকুশলং বৃষং গাং বালভেত্তু যঃ।

পাঠান্তরে এখানে ছোট্ট একটি কাহিনীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে—মনুর পুত্র মহারাজ পৃষধ্র গোবধ করে যে অন্যায় করেছিলেন, সেই অন্যায় হবে যদি কেউ গোহত্যা করে—

মহচ্চকারাকুশলং পৃষধ্রো গামালভন্নিব।

পৃষধ্র ভ্রান্তিক্রমে গোহত্যা করে শূদ্রত্ব লাভ করেছিলেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪৫.২৮; মহা (k) ১২.২৬২.৪৭; (হরি) ১২.২৫৬.৪৭; পাঠান্তর শ্লোকটির জন্য মহাভারত Critical Edition (BORI) ১২.২৫৪.৪৫]

☐ মহাভারত-পুরাণে গোবধ অত্যন্ত নিন্দিত হয়েছে, গোমাংস-ভক্ষণ তো আরও বেশি নিন্দিত। কিন্তু মহাভারতের দুই-তিন জায়গায়

প্রাচীন ব্যবহার হিসেবে গোবধ এবং গোমাংস ভক্ষণের উল্লেখ থাকলেও এই সময়ের মধ্যেই গোহত্যা ভীষণভাবে নিন্দিত হতে থাকে—

বাক্‌পারুষ্যং গোবধো রাত্রিচর্যা।

গোরুর মাংস না খেয়ে গোরুর পুষ্টির দিকেই মহাভারতে নজর পড়েছে বেশি—

ন চাস্যাং মাংসমশ্নীয়াদ্ গবাং পুষ্টিং তথাপ্নুয়াৎ।

[মহা (k) ৮.৪৫.২৯; ১৩.৭৮.১৭;
(হরি) ৮.৩৪.১৩৫; ১৩.৬৩.১৭]

☐ লক্ষণীয় বিষয় হল, বেদ এবং ব্রাহ্মণগুলিতে যজ্ঞের প্রয়োজনে গোহত্যা এবং গোমাংস-ভক্ষণের প্রচলন থাকলেও গোরু যে বধের যোগ্য পশু নয়, বরঞ্চ তার সুরক্ষার ভাবনাই বেশি যুক্তিযুক্ত সেটা কিন্তু ঋগ্‌বেদের কাল থেকেই চিন্তা করা হচ্ছিল। এই 'অঘ্ন্যা' শব্দটি গাভীর বিশেষণ হিসেবে নয়, একেবারে গাভী অর্থেই বিশেষ্য হিসেবে ঋগ্‌বেদে অন্তত সাত বার ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গোরু এখানে কোনোভাবেই বধযোগ্য নয়, এটাই এই মন্ত্রগুলিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। এমনকী অবধ্য পশু হিসেবে 'বৃষ'-ও অন্তত তিনবার 'অঘ্ন্য' বলে চিহ্নিত হয়েছে ঋগ্‌বেদে। আসল ঘটনা এটাই যে, বৈদিক কালে যজ্ঞের প্রয়োজনেই হোক, অথবা প্রবৃত্তির তাড়নাতেই হোক গোবধ এবং গোমাংস ভক্ষণের রীতি-ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও বৈদিক কালের শেষের দিকে অহিংসার মাহাত্ম্য ঘোষিত হতে থাকায় গোজাতির ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে তার মাহাত্ম্যও ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠতে থাকে। এর মধ্যে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের অহিংসা-আন্দোলন আর্যধর্মের অহিংসা-বোধের ইন্ধন হিসেবে কাজ করে। ফলে একটা সময় গোবধ ভীষণভাবে নিন্দিত হতে থাকে। গোরু তখন 'অঘ্ন্যা' হিসেবেই তার প্রধান তাৎপর্য খুঁজে পায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে 'অঘ্ন্যা' গোরু গোমাতায় পরিণত হয়েছে।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৬৪.২৭; ৭.৬৮.৯; ৮.৭৫.৮;
৮.১০২.১৯; ৯.১.৯; ১০.৬০.১১;
মহা (k) ১৩.৭১-৮৩ অধ্যায়;
(হরি) ১৩.৫৮-৭২ অধ্যায়;
A.A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 151;
'The Sanctity of the cow in Hinduism' In
India and Indology Selected Articles by,
W. Norman Brown, pp. 92.100]

অঙ্কপাদতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি মহাতীর্থের নাম। অঙ্কপাদে রাম-জনার্দনকে যে পুণ্যার্থী দর্শন করেন, তাঁকে আর যমলোক দর্শন করতে হয় না।

ভূভার হরণের জন্য বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কংসকে হত্যা করে তাঁরা উগ্রসেনকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। উগ্রসেনই কৃষ্ণ-বলরামকে পরামর্শ দেন উজ্জয়িনীতে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে। তাঁরা উজ্জয়িনীতে গিয়ে ব্রাহ্মণ সান্দীপনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং মাত্র চৌষট্টি দিনের মধ্যেই চতুর্বেদ, সমস্ত আচার এবং ধনুর্বেদ আয়ত্ত করেন। সান্দীপনি চমৎকৃত হলেন, এবং অনেক প্রশংসা করে তাঁদের বিদায় দিলেন।

একসময় অন্য শিষ্যদের কথায় সান্দীপনি গেলেন বলরাম ও কৃষ্ণের লীলা দেখতে। তখন কৃষ্ণ এবং বলরাম জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁরা গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ কী দিতে পারেন। সান্দীপনি খুশি হয়ে বললেন, তাঁর একটিই পুত্র ছিল—তাকে প্রভাসক্ষেত্রে তিমি গ্রাস করেছে। কৃষ্ণ-বলরাম যেন তাকে এনে দেন। তাঁরাও সম্মত হলেন। গুরুপুত্রের সন্ধানে গিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম জানতে পারলেন, পঞ্চজন নামে এক মহাদৈত্য তিমির রূপ ধারণ করে সেই বালকটিকে গ্রাস করেছে। কৃষ্ণ সেই দৈত্যকে বধ করে তার মধ্যে থাকা শঙ্খের ভিতরে বালকটিকে পেলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বরুণের দেওয়া রথে চড়ে দুজনে যমালয় আক্রমণ করলেন। কৃষ্ণদর্শন হওয়ার ফলে নরক থেকে পাপীরা মুক্তি পেল, যমালয় শূন্য হওয়ার উপক্রম হল। যমসৈন্যেরা কৃষ্ণ-বলরামের আক্রমণে হত হল, চিত্রগুপ্তও আহত হলেন। ক্রুদ্ধ যম তাঁর দণ্ড কৃষ্ণের দিকে নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু বলরাম তা ধরে ফেলে সেই দণ্ড যমের প্রতিই ফিরে নিক্ষেপ করতে গেলেন। তখন স্বয়ং ব্রহ্মা সেই স্থানে আবির্ভূত হয়ে বলরামকে নিষেধ করলেন, কৃষ্ণেরও বহু স্তুতি করলেন এবং বললেন, কৃষ্ণ যে স্বয়ং বিষ্ণু তা যম বুঝতে পারেন নি—তাঁকে যেন ক্ষমা করা হয়। কৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রের প্রাণ ফিরে চাইলে যম প্রথমে রাজি হলেন না—কেননা তাহলে বিশ্বের শাশ্বত বা চিরকালীন নিয়ম পালিত হয় না। পরে ব্রহ্মার আদেশে যম সেই বালককে কৃষ্ণ-বলরামের হাতে সমর্পণ করলেন। তাঁরাও

তাকে সান্দীপনির কাছে ফিরিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের এই অক্ষয় কীর্তি যে স্থানে ঘটেছিল—সেই অঙ্কপদ মহাতীর্থ রূপে গণিত হল। এটি পঞ্চম বিষ্ণুক্ষেত্র।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২৭.২-১২২]

অঙ্কুশেশ্বর নর্মদার তীরে অবস্থিত বিশেষ শিবমূর্তি বা শিবলিঙ্গের নাম। এই তীর্থে গেলে মানুষ সবরকমের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে।

[মৎস্য পু. ১৯৪.১]

অঙ্কোল পুণ্যতোয়া নর্মদার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, মৎস্য এবং কূর্ম পুরাণোক্ত একটি তীর্থের নাম। এই তীর্থে স্নান, দান, ভোজন এবং পিণ্ডদানের পুণ্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত কারো অপমৃত্যুর পর পিণ্ডদানের পুণ্য এখানে বেশি। এখানে একটি শিবমূর্তি আছে বলে মনে হয়। কেননা ত্র্যম্বক-শিবের তীর্থ থেকে জল নিয়ে চরু পাক করে অঙ্কোল মূলে পিণ্ডদানের বিধান পাওয়া যাচ্ছে মৎস্য পুরাণে। সম্ভবত এটি আধুনিক গুজরাটের ব্রোচ জেলার অন্তর্গত অংক্রেশ্বর। কানিংহাম সাহেব নর্মদার বাম তীরে অবস্থিত অরিকলেশ্বর নামক যে জায়গাটিকে অক্রূরেশ্বরের সঙ্গে একাত্মক করে দিয়েছেন, সে জায়গাটিকে অঙ্কোট্টক বলে লোকে। সেটাও অঙ্কোল তীর্থ হতে পারে। অন্যদিকে এস.জি.কান্তাওয়ালার মতে নর্মদার উত্তর তীরে লাড়ওয়া থেকে এক মাইল দূরে নিকোরা বলে একটা জায়গা আছে এবং সেখানে অঙ্কোল নামে একটি জায়গা তীর্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। অতএব এটাও পুরাণ-প্রসিদ্ধ অঙ্কোল তীর্থ হতে পারে।

[Purana, Half Yearly Bukelin
Vol. V, No. I, Jan. 1963, p.137;
S.G.Kantawala, Kalyana Tirthanika,
January, 1952, p. 438;
মৎস্য পু. ১৯১.১১৭-১২৪; কূর্ম পু. ২.৩৯.৬১;
AGI (Cunningham), পৃ.৩২২]

অঙ্গ১ একজন প্রাচীন রাজর্ষি। বেশিরভাগ পুরাণ তাঁকে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর বলে চিহ্নিত করেছে। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে উল্মুকের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন অঙ্গ। তবে অন্যমতে তিনি উরুর ঔরসে আগ্নেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কয়েকটি পুরাণ অবশ্য তাঁকে অত্রিমুনির বংশধর বলেও চিহ্নিত করেছে। বায়ু পুরাণ এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে যে মহর্ষি অত্রি স্বায়ম্ভুব মনুর কনিষ্ঠ পুত্র উত্তানপাদকে নিজের পুত্ররূপে কল্পনা করেন। ফলে উত্তানপাদের বংশধরেরা যেমন স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর বলে চিহ্নিত হয়ে থাকেন, তেমনই তাঁদের অত্রি বংশীয়ও বলা হয়।

[বায়ু পু. ৬২.৭৪, ৯২-৯৩, ১০৭;
বিষ্ণু পু. ১.১৩.৬; মৎস্য পু. ৪.৪৪; ১০.৩-৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১০৮, ১২৬;
বৃহদ্ধর্ম পু. ৩.১৩.১০; পদ্ম পু. (ভূমি) ২৮.১৯-২২]

☐ অঙ্গ ভগবান শ্রীহরির পরম ভক্ত ছিলেন। পদ্ম পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় অঙ্গ সুমেরু পর্বতে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। ভগবান বিষ্ণু নানা চেষ্টা করেও তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হয়ে অঙ্গকে দর্শন দিলেন। তপঃক্লিষ্ট অঙ্গ শ্রীহরির কাছে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী পুত্র প্রার্থনা করলেন। শ্রীহরি তাঁকে অনুরূপ বর দিলেন এবং একটি পুণ্যবতী কন্যাকে বিবাহ করতে উপদেশ দিলেন।

[পদ্ম পু. (ভূমি) ৩২.২২-৭৫]

☐ ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় রাজর্ষি অঙ্গ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁর প্রদত্ত হব্য-আহুতি গ্রহণ করলেন না। পুরোহিত-ঋত্বিক্‌রাও এর কারণ বুঝতে পারলেন না। অঙ্গরাজা সভা ডাকলেন। বহু আলোচনার পর সভায় উপস্থিত বিদ্বান-সজ্জনরা রাজাকে বললেন—পূর্বকৃত কোন পাপের ফলে আপনি এখনও অপুত্রক। অতএব যে উপায়ে আপনার পুত্র হয়, সেই ব্যাপারে চেষ্টা করুন আপনি। আপনি পুত্রলাভের জন্য ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন, তিনি প্রীত হলেই আপনি পুত্রলাভ করবেন। এই কথা শুনে অঙ্গ ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করে পুত্রলাভ করেন।

মৃত্যুর কন্যা সুনীথা ছিলেন অঙ্গরাজার পত্নী। তাঁর গর্ভে অঙ্গের পুত্র বেণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহরির আরাধনার ফলে অঙ্গ রাজা পুত্র লাভ করলেন বটে, কিন্তু সেই পুত্র হল তাঁর মাতামহ মৃত্যুর মতোই ক্রূর এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের। এমন অধার্মিক পুত্রের আচরণে অঙ্গ বিরক্ত হতে লাগলেন। ক্রমে সংসারে তাঁর বৈরাগ্য এলো। অঙ্গ রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে গেলেন। তাঁকে ফিরিয়ে আনতে রাজদূত পাঠানো হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। শ্রীহরির

আরাধনাতেই তিনি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। ভগবান বিষ্ণুর পরমভক্ত বলেই তাঁর নাম পুরাণে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষত অঙ্গের বংশধারাতেই বেণের পুত্র পুণ্যশ্লোক পৃথুর জন্ম হয়েছে। এটাও অঙ্গের মর্য্যাদার কারণ।

[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৭-১৮, ২৪-৪১]

☐ প্রাচীন কালে যেসব রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন এবং কালের নিয়মে মৃত্যুলোক ত্যাগ করেন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সেই সব রাজাদের নাম উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে অঙ্গ নামে এক প্রাচীন রাজার নামও উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত উত্তানপাদ বংশীয় রাজর্ষি অঙ্গের কথাই সঞ্জয় উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ১.১.২৩৩; (হরি) ১.১.১৯৪]

অঙ্গ$_{২}$ দেবীভাগবত পুরাণ মতে ষষ্ঠ মন্বন্তরাধিপতি চাক্ষুষ মনুর পিতা ছিলেন অঙ্গ।

[দেবীভাগবত পু. ১০.৯.১-২]

অঙ্গ$_{৩}$ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্ররূপে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। জগতের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণকারী স্বায়ম্ভুব মনুর এই পুত্রের নাম ছিল অঙ্গ।

[মহা (k) ১৩.১৪৭.২৩; (হরি) ১৩.১২৫.২৩]

অঙ্গ$_{৪}$ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে অঙ্গ নামে জনৈক প্রাচীন রাজর্ষির নাম পাওয়া যায়। তবে এঁর পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। রাজর্ষি অঙ্গ একসময় ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের দক্ষিণা হিসেবে সমস্ত পৃথিবীটাকেই দান করবেন বলে স্থির করেন। অঙ্গের সিদ্ধান্তে চিন্তিত ও ভীত হয়ে পৃথিবী পৃথিবীত্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে পলায়ন করেন। সেইসময় প্রজাপতি কশ্যপ ত্রিশ হাজার বছর ধরে পৃথিবী হয়ে রইলেন।

[মহা (k) ১৩.১৫৪.১-৬; (হরি) ১৩.১৩২.১-৬]

অঙ্গ$_{৫}$ মৎস্য পুরাণে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের বংশে আর একজন অঙ্গের নামোল্লেখ পাই। ইনি বেণের পৌত্র তথা পৃথু রাজার কনিষ্ঠ পুত্র হবির্দ্ধানের ঔরসে ধিষণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। *[মৎস্য পু. ৪.৪৫]*

অঙ্গ$_{৬}$ যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় তিতিক্ষুর পুত্র ছিলেন বলি। এই বলি রাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে যে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন অঙ্গ। এই অঙ্গকে বলিরাজা যে নবনির্মিত রাজ্যে অভিষিক্ত করেন অঙ্গের নামানুসারে সেটিও অঙ্গদেশ নামে পরিচিত হয়।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.৫-৬; মৎস্য পু. ৪৮.২৫, ২৯;
বায়ু পু. ৯৯.২৮.৮৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.২৭, ৮৭]

অঙ্গ$_{৭}$ বলির পুত্র অঙ্গের বংশধারায় বিশ্বজিৎ জনমেজয়ের পুত্র ছিলেন অঙ্গ। এই অঙ্গই সম্ভবত সূত অধিরথ নামেও বিখ্যাত ছিলেন এবং কর্ণকে ইনিই পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

[মৎস্য পু. ৪৮.১০২; বায়ু পু. ৯৯.১১২]

অঙ্গ$_{৮}$ দেশবিশেষ। অঙ্গদেশের অধিবাসী মানুষ বলতেও 'অঙ্গ' শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। পূর্ব-ভারতের আরও চারটি জনপদের সঙ্গে সাধারণত একত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র। হয়তো এই পাঁচটি দেশ মিলে একটি confederacy তৈরি হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল অঙ্গদেশ। মহাভারতের একটি অদ্ভুত কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে যযাতি পুত্র অনুবংশীয় রাজা বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি নিয়োগজাত পুত্র জন্মে—এরাই হল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাদি। পুত্রদের নাম অনুসারেই দেশ-নামগুলিও তৈরি হয়।

[মহা (k) ১.১০৪.৫১-৫৫; (হরি) ১.৯৮.৪৯-৫৩]

মহাভারতের বক্তব্য থেকে মনে হয়—অঙ্গদেশীয়রা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের একটি সংকর বর্ণ সৃষ্টি করেছিল; অঙ্গের জন্মই এই সংকর-বর্ণের সূচনা করেছে—

এবমন্যে মহেষ্বাসা ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়া ভুবি।
জাতাঃ পরমধর্মজ্ঞা বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥

[মহা (k) ১.১০৪.৫৬; (হরি) ১.৯৮.৫৪]

মহাভারতের অন্যত্র অঙ্গদেশীয়দের হস্তী-যুদ্ধ বিশারদ এবং ম্লেচ্ছ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[মহা (k) ৮.২২.২-৩; ৮.২২.১৮-১৯;
(হরি) ৮.১৭.২-৩; ৮.১৭.১৮-১৯;
গোপথ ব্রাহ্মণ ২.৯; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮.২২;
পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী ২.৪.৬২; ৬.১.২০;
ব্রহ্ম সংহিতা ১৪.৮]

অঙ্গ নামটি প্রথম পাওয়া যায় অথর্ববেদে এবং সেখানে গান্ধারদেশ তথা মুঞ্জবান এবং

মগধদেশের সঙ্গে অঙ্গদেশ যুক্ত হয়ে আছে। পুরাণ অনুসারে পূর্বভারতের রাজা তিতিক্ষু থেকে বংশ গণনা করলে তাঁর চতুর্থ পুরুষ আর অনু থেকে ধরলে তাঁর চতুর্দশ পুরুষ বলির পুত্র অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

[অথর্ব বেদ ৫.২২.১৪; বায়ু পু. ৯৯.১২-২৮;
মৎস্য পু. ৪৮.১০-১৯; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১]

উক্ত পুরাণগুলিতে এঁদের কখনো ক্ষত্রিয় বলির ক্ষেত্রজ পুত্র হিসেবে বালেয় ক্ষত্রিয়' বলা হয়েছে, আবার ব্রাহ্মণ দীর্ঘতমার ঔরসজাত বলে বালেয় ব্রাহ্মণও বলা হয়েছে। তাতে মহাভারতের কথাই প্রমাণ হয় যে, অঙ্গদেশীয় মানুষেরা প্রধানত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংকরবর্ণ সৃষ্টি করেছিলেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে অঙ্গদেশ ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম।

[অঙ্গুত্তর-নিকায় ৩.৭০.১৭; খণ্ড ১, পৃ. ২১৩;
খণ্ড ৩, ৪২.৪; পৃ. ২৫২; খণ্ড ৩, ৪৫.৪; পৃ. ২৬০;
B.C. Law, Geography of Early
Buddhism, p. 8]

মহাপরিনিব্বান সুত্ত অনুযায়ী অঙ্গদেশে ৮০০০০ গ্রাম ছিল। আপণ এবং অশ্বপুর অঙ্গদেশের অন্যতম প্রধান দুটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

হরিবংশের মতে অঙ্গদেশের রাজধানী পূর্বে ছিল মালিনী, কিন্তু পূর্বোক্ত অঙ্গের বংশজাত রামায়ণখ্যাত রোমপাদের প্রপৌত্র চম্প রাজার নাম অনুসারে পরে মালিনী চম্পায় রূপান্তরিত হয়—

চম্পস্য তু পুরী চম্পা যা মালিন্যভবৎ পুরা।

[হরিবংশ পু. ১.৩১.৪৯]

কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। কেননা মহাভারতে দেখছি, মালিনী নামের জায়গাটি পূর্বে মগধরাজ জরাসন্ধের অধিকারে ছিল। অঙ্গরাজ কর্ণ জরাসন্ধের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলে জরাসন্ধ প্রীত হয়ে মালিনী নগরী কর্ণকে দান করেন এবং পৃথক্‌ভাবে তিনি চম্পাও শাসন করছেন—

প্রীত্যা দদৌ স (জরাসন্ধঃ)
কর্ণায় মালিনীং নগরীমথ।
পালয়ামাস চম্পাঞ্চ কর্ণঃ পরবলার্দনঃ॥

[মহা (k) ১২.৫.৬-৭; (হরি) ১২.৫.৬-৭]

এ থেকে মনে হয় মালিনী এবং চম্পার অবস্থান পৃথক ছিল এবং দুটিই অঙ্গদেশের বিখ্যাত নগরী।

মহাভারতের কালে অঙ্গদেশ কুরুদের অধিকৃত রাজ্য ছিল বলে মনে হয়, কেননা দুর্যোধন কর্ণকে এই রাজ্য দান করেছিলেন।

[মহা (k) ১.১৩৫.৩৬-৩৭;
(হরি) ১.১৩১.৩৬-৩৮]

কিন্তু রামায়ণের কালে অঙ্গদেশ গঙ্গা-সরযূর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল এবং তা ছিল দশরথ-সখা রোমপাদের রাজ্য। *[রামায়ণ ১.৯.৭-৮]*

রামায়ণে বিশ্বামিত্র মুনি রামচন্দ্রকে অঙ্গদেশ দেখিয়ে বলেছিলেন—শিবের তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে মদনদেব যে অনঙ্গ হয়েছিলেন, সেই প্রক্রিয়ায় মদন এই অঙ্গদেশেই তাঁর অঙ্গ মোচন করে অনঙ্গ হয়েছিলেন—

স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ।

[রামায়ণ ১.২৪.১৩-১৪]

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র অনুসারে (তৃতীয় পর্ব) অঙ্গদেশ বৈদ্যনাথ বা আধুনিক দেওঘর থেকে উড়িষ্যার ভুবনেশ-পুরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—

বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং ন হি দুষ্যতি॥

মহাভারতে যেমন দেখা যাচ্ছে, তাতে আধুনিক বিহারের ভাগলপুর এবং মুঙ্গের জেলার সমবায়ে অঙ্গদেশ গঠিত ছিল মনে হয় এবং উত্তরদিকে তা কৌশিকী বা কোশী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমাংশই অঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল। ভাগলপুরের কাছে দুটি গ্রাম চম্পানগর এবং চম্পাপুর এখনও অঙ্গ-রাজধানী চম্পার স্মরণ ঘটায়। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে গঙ্গা এবং চম্পা (আধুনিক চাদন বা ছাদন) নদীর সঙ্গমস্থলে মুঙ্গের জেলার পশ্চিম সীমায় লখিসরাই শহরের কাছে অঙ্গদেশের অবস্থান ছিল বলে মনে হয়। George Birdwood এর মতে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলই ছিল অঙ্গদেশ, এবং তার সঙ্গে যুক্ত ছিল সাঁওতাল পরগণা। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নৃপতি বিম্বিসার এই অঞ্চল মগধের সঙ্গে যুক্ত করেন। বস্তুত চম্পানদী বা চাদন মগধ এবং অঙ্গদেশের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে এবং তাতে

অঙ্গদেশের অস্তিত্ব মগধ থেকে পৃথক ছিল ইতিহাসের বহু পর্যায়ে।

[Saktisangama Tantra, Vol. 3 (Sundarikhanda), 7. 16; E.A. Pargiter, Ancient Countries in Ancient India, Vol. 66 (1897), p. 95; B.C. Law, Geography of Early Buddhism, pp. 6, 36; R. Spence Hardy, Manual of Buddhism, p. 163 fn. (based on an account of Tibetan Dulva; GDAMI (Dey) pp. 7-8]

অঙ্গ$_{৯}$ ষষ্ঠ মন্বন্তরাধিপতি চাক্ষুষ মনুর পুত্র উল্মুক। উল্মুকের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভজাত ছয় পুত্র-সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন অঙ্গ।

[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৬-১৭]

অঙ্গজা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার দেহ থেকে নয়জন পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এই কন্যা সন্তানটির নাম ছিল অঙ্গজা।

[মৎস্য পু. ৩.১২]

অঙ্গদ$_{১}$ কিষ্কিন্ধ্যার বানর-রাজ্যে বানররাজ বালীর ঔরসে তারার গর্ভজাত পুত্র। মৈন্দ নামক অন্য এক বানর-যূথপতির জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে অঙ্গদের বিয়ে হয়। অঙ্গদের পুত্রের নাম ধ্রুব। রামায়ণে অঙ্গদের প্রথম পরিচয় পাই একজন সতর্ক রাজপুরুষ হিসেবে, বালীর পুত্র তারার পুত্র এইভাবে নয়। সুগ্রীবের গর্জন শুনে বালী সংশয়ান্বিত হলে বালীপত্নী তারা বলেন— কুমার অঙ্গদ বনের মধ্যে ভ্রমণ করার সময় গুপ্তচরদের মাধ্যমে খবর পেয়েছে যে, সুগ্রীবের সঙ্গে ইক্ষ্বাকুকুলজাত দশরথের দুইপুত্র রাম এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে মিত্রতা হয়েছে। আমি কুমার অঙ্গদের কথাবার্তা শুনে এটাই বুঝেছি। *[রামায়ণ ৪.১৫.১৫-১৮; মহা (k) ৩.২৮২.২৮; (হরি) ৩.২৩৬.২৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২১৭-২২০]*

□ রামায়ণে অঙ্গদকে যেভাবে পাওয়া যায়, তাতে অঙ্গদের চেহারা এক মহাবলিষ্ঠ পুরুষের মতো। তাঁর স্কন্ধদেশ দৃঢ় সিংহ কিংবা বৃষের মতো। দীর্ঘ বাহু, তাঁর গায়ের রঙও যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল বলেই মনে হয় এবং হয়তো সেইজন্যই তাঁকে 'দীপ্তাগ্নিসদৃশ' বলা হয়েছে। অঙ্গদের চক্ষু দুটি ছিল পিঙ্গলবর্ণ এবং দুই বাহুতে তিনি সোনার অঙ্গদ পরতেন।

[রামায়ণ ৪.২৩.২২; ৪.৫৩.৭; ৬.৪১.৭৫]

এই বিরাট শারীরিক শক্তি অঙ্গদের অন্যতম ভূষণ বটে, কিন্তু তার চেয়েও তাঁর ব্যক্তিত্বের চরম বৈশিষ্ট্য হল—তিনি মহাপ্রাজ্ঞ। রামায়ণের কবি অদ্ভুত পারিভাষিকতায় অঙ্গদের প্রাজ্ঞতার গুণ বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে—অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি, চার রকমের বল এবং বিশেষ ধরনের চোদ্দটা গুণ—এই সবগুলিই অঙ্গদের মধ্যে আছে—

বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্বল-সমন্বিতম্।
চতুর্দশগুণং মেনে হনুমান্ বালিনঃ সুতম্॥

[রামায়ণ ৪.৫৪.২]

সমুদ্রলঙ্ঘনের আগে সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে অঙ্গদ সীতা অন্বেষণের ব্যাপারে বিপর্যস্ত বিষণ্ণ বোধ করছিলেন। সেই সময় হনুমান অঙ্গদ সম্বন্ধে উপরি উক্ত পরিভাষায় তাঁর গুণের কথা বলেন। অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি হল—১. অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা, ২. নিজের কথা শোনানো, ৩. শ্রুত বিষয়ের সারাংশ গ্রহণ, ৪. সেই সার বুদ্ধিতে ধারণ করা, ৫. তর্ক, ৬. বিতর্ক, ৭. অর্থ এবং তাৎপর্য্যের বোধ এবং ৮. তত্ত্বজ্ঞান। চার প্রকার বল হল—বাহুবল, মনোবল, উপায়বল এবং বন্ধুবল। আর চতুর্দশ বিদ্যা হল—১. দেশ-কালের জ্ঞান, ২. দৃঢ়তা, ৩. ক্লেশ সহিষ্ণুতা, ৪. সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান, ৫. দক্ষতা, ৬. তেজ, ৭. মন্ত্রগুপ্তি, ৮. বিসংবাদহীনতা, ৯. শৌর্য্য, ১০. ভক্তি এবং অপরের ভক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতা, ১১. কৃতজ্ঞতা, ১২. শরণাগতবাৎসল্য, ১৩. প্রয়োজনীয় ক্রোধ এবং ১৪. চাঞ্চল্যহীনতা।

একজন নেতৃস্থানীয় মানুষের মধ্যে এই গুণগুলি কাম্য হয় এবং এই গুণগুলি অঙ্গদের মধ্যে আছে বলে হনুমান অঙ্গদকে শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতা বালীর মতো শক্তিমান এবং বৃহস্পতির মতো প্রাজ্ঞ বুদ্ধিমান বলে চিহ্নিত করেছেন—

বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশঃ পিতুঃ।

[দ্র. তিলকটীকা]

[রামায়ণ ৪.৫৪.২]

□ রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আগে আমরা অঙ্গদের নামও শুনি না। বালী এবং সুগ্রীবের শেষ যুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞাত বাক্য পালনের জন্য রামচন্দ্র আড়াল থেকে বালীকে শরবিদ্ধ করেন। মৃত্যুমুখে পতিত বালী রামচন্দ্রের এই গুপ্তহত্যার অন্যায় নিয়ে যত তর্ক করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখিত হয়েছেন পুত্র অঙ্গদের

জন্য। মৃত্যুর আগে প্রিয় পুত্রের কথা স্মরণ করে তিনি রামচন্দ্রকে বলেছেন— নিজের জীবনের জন্য আমি চিন্তা করি না, কিন্তু আমি সুবর্ণ অঙ্গদধারী আমার গুণী পুত্র অঙ্গদের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছি—যথা পুত্রং গুণজ্যেষ্ঠম্ অঙ্গদং কনকাঙ্গদম্। বালী এতটাই স্নেহে এবং যত্নে অঙ্গদকে মানুষ করেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে না দেখে অঙ্গদ কত কষ্ট পাবেন, সেই চিন্তায় ক্লিষ্ট হচ্ছেন তিনি। তিনি এটাও বুঝে গেছেন যে, সুগ্রীব রাজা হয়ে অঙ্গদকে সেই স্নেহ কখনোই দেবেন না, যা তিনি দিয়েছেন। রামচন্দ্রকে তিনি তাই বলেছেন—আমার পুত্রটি একেবারেই বালক এবং সেইজন্য আমার বড়ো প্রিয়—একপুত্রশ্চ মে প্রিয়ঃ—এখনো আমার এই মহাবল পুত্রের বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি—বালশ্চাকৃতবুদ্ধিশ্চ। আপনি সুগ্রীব আর অঙ্গদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের কাজটুকু করবেন। বালী তাঁর পুত্রের জন্য রামচন্দ্রের ওপরেই নির্ভর করছেন বেশী। রামচন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করেন, সেই স্নেহ-ব্যবহার তিনি অঙ্গদের জন্যও বজায় রাখবেন।

[রামায়ণ ৪.১৮.৫১-৬৬]

বালী কথা বলতে-বলতে অচেতন হয়ে পড়লেন। বালীপত্নী তারা পুত্র অঙ্গদকে নিয়ে বালীর কাছে এলেন। একথা বলা ভাল যে, বালী শরবিদ্ধ হওয়ার পর অঙ্গদের সেনা-সৈন্যেরা অনেকে ভয়ে পালালেও বানরদের মধ্যে অনেকেই খুব তাড়াতাড়ি অঙ্গদকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং এমনও বলেছিলেন যে, তাঁরা সব রকমের সুরক্ষা দেবেন অঙ্গদকে—

রক্ষ্যতাং নগরী শূরৈরঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্।
পদস্থং বালিনঃ পুত্রং ভজিষ্যন্তি প্লবঙ্গমাঃ॥

পরক্ষণেই অবশ্য অঙ্গদপক্ষীয়দের ভুল ভাঙে নিজেদের বুদ্ধিতেই এবং বালীপত্নী তারাও তাঁদের নিবৃত্ত করেন। *[রামায়ণ ৪.১৯.৫-১৬]*

বালীর মৃত্যুর পূর্বকালে বালীপত্নী তারা বালীর জন্য বিলাপ করার সময়েও কুমার অঙ্গদের জন্য দুঃখ পেয়েছেন। বালীর উদ্দেশে তিনি বলেছেন—আমি না হয় তোমার বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করবো, কিন্তু এই সুকুমার বীর অঙ্গদ সুগ্রীবের ক্রোধ মাথায় নিয়ে কী অবস্থায় থাকবে—বৎস্যতে কাম্ অবস্থাং মে পিতৃব্যে ক্রোধমূর্ছিতে? তারার নানা যুক্তির কাছে রামচন্দ্রের যুক্তি ধোপে টেকেনি এবং সুগ্রীবকে তারা ভালোমত চিনতেন বলে অঙ্গদের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তাও যুক্তিযুক্ত ছিল। হয়তো বা সেই কথা ভেবেই হনুমান অন্য প্রসঙ্গে না গিয়ে তারাকে চরম সম্মান দেখিয়ে বলেছেন—আপনার পুত্র অঙ্গদ, অন্যান্য বানর-বীরগণ, এবং বালীর এই রাজ্য—এই সমস্ত কিছুরই অধিকারী আপনি। শোকাকুল অঙ্গদ এবং সুগ্রীবকে আপনি সময়োচিত কর্তব্যে নিয়োগ করুন। বালীর শেষ কৃত্য হয়ে যাবার পর অঙ্গদকে অভিষেক করুন এই বানর রাজ্যে। অঙ্গদ রাজ্য শাসন করছেন—এটা দেখলে আপনার শান্তি আসবে মনে—

ত্বয়া পরিগৃহীতো'য়ম্ অঙ্গদঃ শাস্তু মেদিনীম্।
সিংহাসনগতং পুত্রং পশ্যন্তী শান্তিমেব্যসি॥

[রামায়ণ ৪.২০.১৭-১৯; ৪.২১.৮-১১]

☐ মনস্বিনী তারা পুত্রের রাজনৈতিক অবস্থিতি যথেষ্ট বোঝেন। তিনি জানেন যে, সুগ্রীব রাজ্যের কারণেই রামচন্দ্রকে আশ্রয় করে বালীকে হত্যা করেছেন, তাই অঙ্গদকে রাজার আসন দেওয়া অত সহজ হবে না এবং তিনি বলেওছেন যে, অঙ্গদের ব্যাপারে এই চিন্তা তাঁর অধিকারের মধ্যেও আসে না—

ন হ্যেষা বুদ্ধিরাস্থেয়া হনূমন্নঙ্গদং প্রতি।

[রামায়ণ ৪.২১.১৪-১৫]

☐ বালী মৃতপ্রায় অবস্থাতেও অঙ্গদের অবস্থা সবচেয়ে বেশি অনুধাবন করেছেন। বাস্তব বুঝে তিনি সুগ্রীবের কাছেই সানুনয়ে বললেন—তুমি বনবাসীদের এই রাজ্য গ্রহণ করো। কিন্তু আমার সুখলালিত বুদ্ধিমান বালক পুত্রটিকে তুমি তোমার নিজের ছেলের মতো ভেবে লালন-পালন করবে—সর্বতঃ পরি-পালয়। বস্তুত তুমি এখন তার পিতা, যা কিছু এখন সে পাবে, তা তোমার কাছেই পাবে, তুমি এখন তার পরিত্রাতা এবং তার ভয় উপস্থিত হলে অভয়দাতাও তুমি—

ত্বমপ্যস্য পিতা দাতা পরিত্রাতা চ সর্বশঃ।
ভয়েষ্বভয়দশ্চৈব যথাহং প্লবগেশ্বরঃ॥

[রামায়ণ ৪.২২.৬-১২]

☐ বালী যেমন সুগ্রীবকে অনুনয় করলেন,

ঠিক একইভাবে প্রাণপ্রিয় পুত্র অঙ্গদকে উপদেশ দিয়ে বললেন—তুমি সুখ-দুঃখে সর্বত্র সহিষ্ণু হয়ে দেশকাল বিচার করে সুগ্রীবের অনুগত হবে। আমি তোমাকে যেভাবে সপ্রশ্রয়ে লালিত করেছি, সেইভাবে থাকলে সুগ্রীব তোমাকে সমাদর করবে না। সুগ্রীবের শত্রুর সঙ্গে তুমি মিত্রতা কোরো না। সুগ্রীবের প্রতি তোমার অতি-প্রণয়ও প্রয়োজন নেই, অপ্রণয়ও নয়, কেননা দুটোতেই দোষ আছে, অতএব তুমি মধ্যভাবে থাকবে—

ন চাতিপ্রণয়ঃ কার্য্য কতর্ব্যো'প্রণয়শ্চ তে।
উভয়ং হি মহাদোষং তস্মাদন্তরদৃগ্ ভব॥

[রামায়ণ ৪.২২.১৯-২৩]

☐ সম্ভবত অঙ্গদ তাঁর পিতার সিংহাসনে পিতৃব্য সুগ্রীবকে সেইভাবে মেনে নিতে পারবেন না বলেই বালীর উপদেশ ছিল রাজনৈতিক বুদ্ধি-প্রসূত। বালীর মৃত্যুর পর বালীপত্নী তারা যখন বিলাপ করছেন, তখনই কিন্তু রামচন্দ্র অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার সংকল্প জানিয়ে দেন—

পুত্রশ্চ তে প্রাপ্স্যতি যৌবরাজ্যম্।

বালীর অন্ত্যেষ্টি এবং প্রেতকার্য মিটে গেলে সুগ্রীব যখন কিষ্কিন্ধ্যায় রাজা হলেন, তখন রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলেছেন—তোমার বড়ো ভাইয়ের পুত্র অঙ্গদ, যিনি তাঁর পিতার মতোই বীর, তিনিই কিন্তু এই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে যৌবরাজ্য লাভের উপযুক্ত পাত্র—

জ্যেষ্ঠস্য হি সুতো জ্যেষ্ঠঃ সদৃশো বিক্রমেণ চ।
অঙ্গদো'য়মদীনাত্মা যৌবরাজ্যস্য ভাজনম্॥

[রামায়ণ, ৪.২৬.১২-১৩]

পিতার মৃত্যুর পর অঙ্গদই কিষ্কিন্ধ্যার বানর-রাজ্যে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হন এবং রামায়ণের বর্ণনায় রামের আদেশ অনুসারে সুগ্রীব অঙ্গদকে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অঙ্গদের এই অভিষেকে সমস্ত বানরকুল সাধুবাদ জানিয়ে সুগ্রীবকে অভিনন্দিত করেন।

[রামায়ণ ৪.২৬.৩৮-৪০;
মহা (k) ৩.২৯১.৫৯; (হরি) ৩.২৪৫.৫৭]

☐ বালীর মৃত্যুর পর বালীপত্নী তারা প্রচুর বিলাপ করে শেষে সুগ্রীবকে পতি হিসেবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু অঙ্গদ পিতৃশোক ভুলতে পারেন নি। পিতার মৃত্যুর সময় তিনি কোনো বিলাপ করেন নি, কিন্তু পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী সুগ্রীবকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। তবু পিতার শেষ উপদেশ তিনি ভোলেন নি। তাই সুগ্রীব রাজা হওয়ার পর তাঁর সমস্ত আদেশ নির্বিবাদে পালন করেছেন। সুগ্রীব যখন তাঁকে সীতার অনুসন্ধানের জন্য দক্ষিণদিকে পাঠালেন তখনও তিনি নির্বিবাদে সুগ্রীবের আদেশ পালন করলেন। কিন্তু সুগ্রীব যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীতার খোঁজ আনতে বলেছিলেন, তা পেরিয়ে গেলেও সীতার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন দক্ষিণদিকে যাওয়া বানরদলটির সদস্যরা অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন যে, এখন কি করা উচিত। সব থেকে বেশি ভয় পেলেন অঙ্গদ। এই সময়ই তাঁর মনের মধ্যেকার সুপ্ত সুগ্রীববিদ্বেষ প্রকাশিত হল। তিনি বললেন, আমরা অকৃতকার্য হয়েছি, এখন আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। সুগ্রীব কখনোই আমাদের ক্ষমা করবেন না। তিনি আমাকে যৌবরাজ্য দেন নি। রামই দিয়েছেন। তার উপর তিনি আগে থেকেই আমাকে অপছন্দ করেন, এখন তো মাকে আর আমাকে নিশ্চয়ই বধ করবেন—

স পূর্বং বদ্ধবৈরো মাং রাজা দৃষ্টা ব্যতিক্রমম্।
ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন তীক্ষ্মেন কৃতনিশ্চয়ঃ॥

আমি ফিরে যাব না। আমি এখানেই প্রায়োপবেশন করবো, যদি আমরা সীতার সংবাদ জানতে পারি, তবেই সুগ্রীবের কাছে যাবো, নচেৎ এখানেই আমরা মরবো। *[রামায়ণ ৪.৫৩.৬-২৪]*

অঙ্গদের এই কথা শুনে অন্যান্য বানররাও ভয় পেয়ে গেল। তারাও অঙ্গদের সঙ্গে প্রায়োপবেশনে বসতে চাইল। তখন হনুমান অঙ্গদকে বললেন যে, সুগ্রীব ধার্মিক রাজা। তিনি সবসময়ই তোমার মায়েরও মঙ্গল চান। তোমার মা তারা কীসে খুশী হন, সেটা সুগ্রীব সব সময়ই চান। তিনি কখনো তোমার ক্ষতি করবেন না। তুমি তাঁর নিজের সন্তানেরই মতো। তুমি ছাড়া তাঁর তো অন্য সন্তান নেই।

প্রিয়কামশ্চ তে মাতুস্তদর্থং চাস্য জীবিতম্।
তস্যাপত্যঞ্চ নাস্ত্যন্যস্তস্মাদঙ্গদ গম্যতাম্॥

[রামায়ণ ৪.৫৪.২১-২২]

হনুমানের এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ অঙ্গদ বললেন, সুগ্রীবের যে গুণগুলির কথা আপনি বললেন তার

কোনোটিই তাঁর নেই। বড়ো ভাইয়ের পত্নী মাতৃতুল্য, আর তিনি সেই বড়ো ভাইয়ের পত্নীকেই গ্রহণ করেছেন। বালী যখন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন তখন তিনি গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রামের কাছে সীতা-উদ্ধারের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেও, তিনি সেই প্রতিজ্ঞা রাখতেও ভুলে গিয়েছিলেন। ধর্মের ভয়ে নয় শুধুমাত্র লক্ষ্মণের ভয়েই আমাদের তিনি সীতার খোঁজে পাঠিয়েছেন। এইরকম যে সুগ্রীব তাঁকে ধার্মিক বলব কী করে? তাঁকে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি তাঁর শত্রুপুত্র, তাই আমাকে বাঁচতে দেবে না। তাই আমি আর ফিরতে চাই না। আপনারা ফিরে গিয়ে সুগ্রীব, রাম-লক্ষ্মণকে ও মা রুমাকে আমার প্রণাম জানাবেন। স্নেহময়ী তারাকে সান্ত্বনা দেবেন। এই বলে অঙ্গদ কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়েছেন। বানররাও কাঁদতে কাঁদতে সুগ্রীবের নিন্দা আর বালীর প্রশংসা করতে লাগল এবং অঙ্গদকে ঘিরে প্রায়োপবেশনে বসে গেল।

[রামায়ণ, ৪.৫৫.১-১২, ১৭-১৯]

□ ওদিকে জটায়ুর দাদা সম্পাতি বিন্ধ্যপর্বতে বাস করতেন। তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বানরদের দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন, বললেন—বিধাতার অশেষ কৃপায় এরা এখানে এসেছে। এক এক করে এদের আমি খাব। সম্পাতির কথা শুনে ভীত অঙ্গদ হনুমানকে বললেন, দেখ আমাদের সামনে সাক্ষাৎ যম এসে উপস্থিত হয়েছেন। রামের কাজও হল না, সুগ্রীবের আদেশও পালন করতে পারলাম না। এবার আমরা তাহলে জটায়ুর মতো জীবন দেব। সম্পাতি ভাইয়ের কথা শুনে বললেন, আমি আমার ভাইয়ের ব্যাপারে জানতে চাই। আমি উড়তে অক্ষম। সূর্যের তাপে আমার ডানা দুটি নষ্ট হয়ে গেছে। আমাকে এই পর্বত থেকে নামাও। সম্পাতির এই কথা শুনে অঙ্গদ তাঁকে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনলেন। তারপর তিনি তাঁকে সীতাহারণ, জটায়ু বধ, সীতার অনুসন্ধান, প্রায়োপবেশনের সংকল্প সমস্ত জানালেন। সম্পাতিও নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন রাবণ নামের এক রাক্ষস সীতাকে হরণ করে সমুদ্রের অপর পাড়ে যে দ্বীপ আছে, সেখানে নিয়ে গেছে। সীতার সন্ধান পেয়ে বানরেরা প্রায়োপবেশনের সংকল্প ত্যাগ করে কর্তব্য স্থির করতে বসলেন। কিন্তু সীতার অনুসন্ধানের জন্য সমুদ্র পার হতে হবে। এত বড়ো সমুদ্র পার হতে হবে ভেবে বানরেরা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন অঙ্গদ যোগ্য দলপতির মতো তাদের বললেন, এখন দুঃখ করলে আমাদের ক্ষতি হবে। বরং এসো আমরা জেনে নিই সমুদ্র পেরনোর ক্ষমতা কার কতটা আছে। অঙ্গদের এই কথা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বয়সে নবীন হলেও পরিণত বুদ্ধির অধিকারী। তিনি সাহসীও বটে। আমরা দেখি যে, বানরবীররা সকলেই নিজের নিজের লম্ফের পরিমাণ জানানোর পর অঙ্গদও নিজের ক্ষমতার কথা নিঃসঙ্কোচে বলেছেন। আমি এই বিশাল মহাসাগর পার হতে পারব, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার ক্ষমতা আমার আছে কিনা তা বলতে পারি না—

অহমেতদ্‌গমিষ্যামি যোজনানাং শতং মহৎ।
নিবর্তনে তু মে শক্তিঃ স্যান্ন বেতি ন নিশ্চিতম্॥

[রামায়ণ, ৪.৬৪.৮–২২; ৪.৬৫.১-১৯]

অঙ্গদের এই কথা শুনে জাম্ববান তাঁকে বলেছেন, আমরা জানি যে তুমি শক্তিমান, শতসহস্রযোজনও তুমি অনায়াসে পার হতে পার। কিন্তু তুমি আমাদের প্রভু। তোমাকে আমরা এই কাজে পাঠাতে পারি না। আসলে জাম্ববান এখানে অঙ্গদকে সেনাপতির মর্যাদা দিয়ে বলেছেন—কার্যের মূলকে রক্ষা করতে হবে সব সময়। সেনাপতিকে সৈন্যেরা স্ত্রীর মতো রক্ষা করবে—এটাই নীতি। জাম্ববান বলেছেন—আপনি আমাদের যুবরাজ এবং রাজপুত্র, আমাদের নেতা, আপনাকে অবলম্বন করেই আমাদের কার্যসাধন করতে হবে। অতএব কাজটা আমরাই করবো। অঙ্গদ জাম্ববানের কথা মেনে নিয়ে অন্য কাউকে লঙ্কায় পাঠাতে বলেছেন এবং পুনরায় সুগ্রীবের নির্দয় ভাবের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন—সীতার সংবাদ না পেলে আমি বাড়ি ফিরবো না। এই অবস্থায় জাম্ববান হনুমানকে পাঠিয়ে দেন লঙ্কায়।

[রামায়ণ ৪.৬৫.২০-৩৫]

□ হনুমান সীতার খোঁজ নিয়ে ফিরে এসে বানরদের সমস্ত ঘটনার কথা জানালেন। হনুমানের কথা শুনে অঙ্গদ বানরদের বললেন হনুমান কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছেন কিন্তু সীতাকে নিয়ে

আসেন নি। চলুন আমরা রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে সীতাকে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাই।

জিত্বা লঙ্কাং সরক্ষৌঘং হত্বা তং রাবণং রণে।
সীতামাদায় গচ্ছামঃ সিদ্ধার্থা হৃষ্টমানসাঃ॥

[রামায়ণ ৫.৬০.১-১৩]

এর থেকে বোঝা যায় যে অঙ্গদ খুব সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য জাম্ববান সঙ্গে সঙ্গেই এই হঠকারী, নবীন বানরবীরকে নিবৃত্ত করেছেন। এরপর জাম্ববানের পরামর্শে অঙ্গদসহ অন্যান্যরা কিষ্কিন্ধ্যার পথে যাত্রা করেছেন। মহেন্দ্র পর্বত থেকে নেমে বানরেরা কিষ্কিন্ধ্যার পথে রওনা দিলেন। ক্রমে তারা কিষ্কিন্ধ্যার অদূরে মধুবন নামক একটি সুন্দর বনে এসে উপস্থিত হলেন। বনটি সুগ্রীবের এবং এর রক্ষক সুগ্রীবের মামা দধিবক্ত্র। অঙ্গদ জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধ বানরদের অনুমতি নিয়ে বানরদের মধুপানের আদেশ দিলেন। বানররা মহানন্দে মধু পান করতে থাকল। *[রামায়ণ ৫.৬১.১-২, ১২]*

☐ এদিকে দধিবক্ত্র তাদের বাধা দিতে গিয়ে তাদের হাতে লাঞ্ছিত হলেন, অঙ্গদের হাতেও প্রহৃত হলেন। *[রামায়ণ ৫.৬২.২৬-২৭]*

দধিমুখও অঙ্গদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য সুগ্রীবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সুগ্রীব সব শুনে বললেন, অঙ্গদ ও জাম্ববান যে দলের অধিনায়ক, হনুমান যে দলের পরিচালক তারা কখনো কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না।

জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ মহাবলঃ।
হনূমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা॥

ওরা নিশ্চয়ই দক্ষিণদিকে সীতার সন্ধান পেয়েছে। তুমি ওদের আমার কাছে নিয়ে এসো। দধিবক্ত্র ফিরে গিয়ে বানরদের সুগ্রীবের নির্দেশ জানালে অঙ্গদ বললেন, চলুন তাহলে আমরা সুগ্রীবের কাছে যাই। আমি আপনাদের আদেশ করতে পারি না। কারণ আপনারা আমার গুরুজন। আপনারা ছাড়া আমার কোনো কাজেই সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আপনারা যা বলবেন আমি তাই করব। বানর প্রধানরা বললেন, যুবরাজ তুমি ছাড়া এরকম বিনীত কথা কে বলতে পারে? আমরাও সুগ্রীবের কাছে যেতে চাই। এরপর অঙ্গদ ও বানরদের নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার পথে যাত্রা করেছেন। ওদিকে সুগ্রীব দূর থেকে তাদের কলরব শুনে রামকে বললেন, বানরেরা নিশ্চয়ই সীতার সন্ধান পেয়েছে। তা নাহলে অঙ্গদ কিছুতেই আমার কাছে আসত না।

অঙ্গদস্য প্রহর্ষাচ্চ জানামি শুভদর্শন॥
ন মৎসকাশমাগচ্ছেৎ কৃত্যে হি বিনিপাতিতে।
যুবরাজো মহাবাহুঃ প্লবতামঙ্গদো বরঃ॥

[রামায়ণ ৫.৬৩.১৬-২৪; ৫.৬৪.২৯-৩০]

☐ রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের সেনা-সন্নিবেশ করার সময় সুমহতী বানরসেনার মধ্যে অঙ্গদ অন্যতম সেনানায়ক হিসেবে ছিলেন।

[মহা (k) ৩.২৮৩.১৯; (হরি) ৩.২৩৭.১৯]

☐ এরপর অঙ্গদকে আবার দেখতে পাওয়া যায় লঙ্কাকাণ্ডে। রাম তখন বানর সৈন্যদের সঙ্গে সমুদ্রের তীরে অবস্থান করছেন। ওদিকে লঙ্কা থেকে বিভীষণ রামের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছেন। রাম বিভীষণকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছুক হলেও এ বিষয়ে তিনি প্রধান প্রধান বানরদের মতামত জানতে চাইলেন। সবাই নিজের নিজের মতামত জানালেন। অঙ্গদ বললেন যে, বিভীষণ যেহেতু রাবণের কাছ থেকে আসছেন তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ পরে বিভীষণ আমাদের বিপদে ফেলতেই পারেন। সুতরাং সমস্ত কিছু বিচার করেই সৈন্যদল গড়ে তোলা উচিত হবে বলেই আমার মনে হয়। আপনার যদি বিভীষণকে গুণী বলে মনে হয় তাহলে তাঁকে গ্রহণ করুন, আর যদি তাঁকে দোষী বলে মনে হয় তাহলে তাঁকে বর্জন করুন।—

যদি দোষো মহাংস্তস্মিংস্ত্যজ্যতামবিশঙ্কিতম্।
গুণান্ বাপি বহূন্ জ্ঞাত্বা সংগ্রহঃ ক্রিয়তে নৃপ॥

[রামায়ণ ৬.১৭.৩৮-৪২]

☐ লঙ্কাযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় রামচন্দ্র যখন লঙ্কাপুরীর বাইরে অবরোধ করেছিলেন, তখন সেনা-সন্নিবেশে দক্ষিণ দিক রক্ষা করার ভার ছিল অঙ্গদের। সেই দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদের প্রতিপক্ষ ছিলেন মহাপার্শ্ব এবং মহোদর।

[রামায়ণ ৬.৩৭.২৭]

☐ সেনা-সন্নিবেশের পর সেকালের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী যুদ্ধবিরতির একটা শেষ চেষ্টা নেওয়া হত। তদনুযায়ী রামচন্দ্র অঙ্গদকে রাবণের কাছে দূত করে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে সীতাকে ফিরিয়ে দেন, আর সেটা না করলে যেন যুদ্ধ করেন।

বস্তুত এই চরম মুহূর্তে দূত পাঠানোটা যুদ্ধের উস্কানি হিসেবেও কাজ করত। রামচন্দ্র অঙ্গদকেই এই দৌত্যকার্যের উপযুক্ত মনে করেছেন—

প্রেষয়ামাস দৌত্যেন রাবণস্য ততো'ঙ্গদম্।

[মহা (k) ৩.২৮৩.৫৪; (হরি) ৩.২৩৭.৫৪]

রামের বার্তা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই অঙ্গদ লঙ্কাপুরীর প্রাকার পেরিয়ে মন্ত্রী-পরিবৃত রাবণের সামনে উপস্থিত হয়েছেন এবং সাহংকারে রাবণকে স্বনাম-খ্যাপন করে বলেছেন—আমি বালীর পুত্র অঙ্গদ এবং রামচন্দ্রের দূত। কানে যদি শুনতে পাও তো শোনো এবার—রামচন্দ্র বলেছেন—ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এবার যুদ্ধ করো, ক্ষমতা দেখাও তোমার। তোমাকে সবংশে সবান্ধবে শেষ করবো আমি। যদি তুমি আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাও এবং ফিরিয়ে দাও সীতাকে তবেই রক্ষা, নইলে আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে এবং এই রাজ্য পাবে বিভীষণ।

অঙ্গদের মুখে এই সব উত্তেজক কথা শুনে রাবণ ভীষণই রেগে গেলেন এবং সচিবদের আদেশ দিলেন অঙ্গদকে ধরে ফেলার জন্য। রাবণের আদেশ শুনে চার শক্তিশালী রাক্ষস এসে অঙ্গদকে ধরল। অঙ্গদ তাদের নিয়েই লাফ দিয়ে প্রাসাদের ওপরে উঠে গেলেন এবং এমন জোরে ঝাঁকুনি দিলেন যে, তারা মাটিতে পড়ে গেল। তারপর প্রাসাদ-শিখর ভেঙে দিয়ে আরো একবার নিজের নাম জাহির করে শুনিয়ে দিলেন রাবণকে এবং আকাশ-পথেই লাফিয়ে এসে উপস্থিত হলেন রামচন্দ্রের কাছে। অঙ্গদের ক্ষমতা দেখে রাবণ ভবিষ্যতের ভয়টুকু অনুভব করলেন মনে মনে। *[রামায়ণ ৬.৪১.৬০-৯২; মহা (k) ৩.২৮৪.৭-২২; (হরি) ২.২৩৮.৭-২২]*

☐ যুদ্ধের সময় অঙ্গদ প্রচুর বিক্রম প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধের প্রথম দিন যখন রাত্রিতেও যুদ্ধ চলছিল, তখন অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের রথের অশ্ব এবং সারথিকে বধ করছিলেন এবং তারপর ইন্দ্রজিতের মতো মহাবীরকেও পালাতে হয়েছিল। *[রামায়ণ ৬.৪৪.২৯-৩২; মহা (k) ৩.২৮৮.১৪, ১৬; (হরি) ৩.২৪২.১৫, ১৬]*

ইন্দ্রজিতের মতো শক্তিশালী যোদ্ধাকে অঙ্গদের ভয়ে পালাতে দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছেন। রাবণপক্ষের এক বিরাট যোদ্ধা বজ্রদংষ্ট্র অঙ্গদের অসির আঘাতে মারা যান এবং বজ্রদংষ্ট্রের সাহায্যে উপস্থিত রাক্ষস-যোদ্ধাদেরও অনেককে মেরে ফেলেন অঙ্গদ। *[রামায়ণ ৬.৫৪.৩৪]*

সেনা নায়কের সবচেয়ে বড়ো গুণ তিনি কখনো সাহস হারান না। যুদ্ধক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণকে দেখে বানরেরা ভয়ে পালাতে শুরু করলে অঙ্গদ তাদের উৎসাহ দিয়ে বলছেন যে, তোমরা নিজেদের বংশকৌলিন্য ভুলে গিয়ে পালাচ্ছ কেন? আমরা সকলে মিলে যদি একে আক্রমণ করি তাহলে একে সহজেই পরাজিত করতে পারব। কাজেই এস আমরা সকলে মিলে একে আক্রমণ করি—

মহতীমুত্থিতামেনাং রাক্ষসানাং বিভীষিকাম্।
বিক্রমাদ্বিধমিষ্যামো নিবর্ত্তধ্বং প্লবঙ্গমাঃ॥

[রামায়ণ ৬.৬৬.৩-৭]

অঙ্গদের কথায় উৎসাহিত হয়ে বানরেরা কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে শুরু করছে। কিন্তু, বলশালী কুম্ভকর্ণের সঙ্গে তারা পেরে ওঠেনি। কুম্ভকর্ণের ভয়ে তারা পালাতে শুরু করলে অঙ্গদ তাদের আবার উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য পরে অঙ্গদও কুম্ভকর্ণের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। রাবণের *[৬.৬৯.৯৪-৯৫]* পুত্র নরান্তককেও অঙ্গদ হত্যা করেছেন। আর একটি রাতের যুদ্ধে অঙ্গদ রাক্ষসবীর কম্পন ও প্রজঙ্ঘকেও হত্যা করেছেন। অন্য এক রাক্ষস কুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে অঙ্গদের মামা মৈন্দ ও দ্বিবিদ বিপন্ন হয়ে পড়লে অঙ্গদ তাঁদের সাহায্য করতে ছুটে আসেন। কিন্তু রাক্ষস কুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধে তিনিও পেরে ওঠেন নি। পরে অবশ্য সুগ্রীবের হাতে কুম্ভের মৃত্যু হয়। রাবণের অমাত্য মহাপার্শ্বের সঙ্গে যুদ্ধে অঙ্গদ মহাপর্শ্বের বুকে এমন জোরে মুষ্টিপ্রহার করেন যে তাতে মহাপার্শ্বের মৃত্যু হয়—

তেন তস্য নিপাতেন রাক্ষসস্য মহামৃধে।
পফাল হৃদয়ঞ্চাস্য স পপাত হতো ভুবি॥

পুত্র ইন্দ্রজিৎ মারা যাবার পর একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রাবণ যখন রাম-লক্ষ্মণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন অঙ্গদ অন্যান্য বানরবীরদের সঙ্গে রাবণের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। আবার পূর্বে যখন মেঘনাদ ইন্দ্রজিতের বাণে রাম-লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তখন সুগ্রীব, জাম্ববানদের মতো অঙ্গদও বানর-

বীরদের সঙ্গে রামচন্দ্রকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে মহাভারত জানিয়েছে রামোপাখ্যানপর্বে।

[মহা (k) ৩.২৮৯.৪, ১৩; ৩.২৯০.৩;
(হরি) ৩.২৪৩.৪, ১৩; ৩.২৪৪.৩;
রামায়ণ ৬.৬৬.১-৭; ৬.৬৯.৯৪-৯৫; ৬.৭৬.১-২৭;
৬.৭৬.৪৭-৫৮; ৬.৯১.২২; ৬.৯৮.১-২২]

□ রামের অযোধ্যায় যাওয়ার সময় অঙ্গদও তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। অযোধ্যায় রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনের পর ভরত যখন তাঁর পাদুকা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অঙ্গদ রামচন্দ্রের খড়্গ বহন করে নিয়ে গেছেন।

[ভাগবত পু. ৯.১০.৪৩]

রামচন্দ্র অঙ্গদের উপর বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন। রামের রাজ্যাভিষেকের পর বানররা যখন বিদায় নেন তখন রাম অঙ্গদকে কোলে নিয়ে নিজের মহামূল্য অলঙ্কার তাঁকে পরিয়ে দিয়েছেন। রামের কথায় অঙ্গদ সুগ্রীবের সুপুত্র—অঙ্গদস্তে সুপুত্রো'য়ম্।

[রামায়ণ ৭.৪৯.১৬-১৯]

সুগ্রীবের পর অঙ্গদ কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন। পিতার মৃত্যুর পর অঙ্গদ পিতার রাজ্যের উত্তরাধিকার পাননি সুগ্রীবের জন্যই। কিন্তু এই সিংহাসন যে তাঁরই প্রাপ্য ছিল, সে-কথা হনুমান বালীর মৃত্যুর সময়েই বলেছিলেন। অনেক কাল রাজত্ব করার পর সুগ্রীবও হয়তো বুঝেছিলেন যে, মৃতপিতৃক এই মহাবীরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। রামের মহাপ্রয়াণের সংকল্পে বানররাজ সুগ্রীবের মনের মধ্যেও কথঞ্চিৎ বৈরাগ্য আসে এবং তিনি অযোধ্যায় এসে রামচন্দ্রকে এই অভিপ্রেত সংবাদ দেন যে, তিনি নিজেই তাঁকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করে রামচন্দ্রের কাছে এসেছেন—

অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরম্ আগতো'স্মি নরেশ্বর।

[রামায়ণ ৭.১২১.২৩]

অঙ্গদ$_{২}$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একাদশ দিনে ইনি পাণ্ডবপক্ষীয় রথী উত্তমৌজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্রদের মতোই ইনিও নিহত হয়েছিলেন, তবে মহাভারতে অঙ্গদের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় না।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৫; ৭.২৫.৩৮;
(হরি) ১.৬২.৯৭; ৭.২৩.৩৭]

অঙ্গদ$_{৩}$ রামায়ণ-বিখ্যাত রামানুজ লক্ষ্মণের পুত্র। ধরাধাম ত্যাগ করার পূর্বে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের পুত্রদের পৃথক রাজ্যে রাজা হিসেবে স্থাপন করার জন্য লক্ষ্মণকে উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করতে বলেন। অবশেষে ভরতের পরামর্শে কারুপথ বা কারপথ নামক জনপদে লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদের নামাঙ্কিত অঙ্গদীয়া নগরীতে অঙ্গদকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন রামচন্দ্র—

অঙ্গদীয়া পুরী রম্যা অঙ্গদস্য নিবেশিতা।

[ভাগবত পু. ৯.১১.১২; বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪৭;
বায়ু পু. ৮৮.১৮৭-১৮৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৮৮-১৮৯;
রামায়ণ ৭.১১৫.১-৮;
রামায়ণ (Mudholakara) ৭.১০২.১-৮]

অঙ্গদ$_{৪}$ শিনি-বংশের ধারায় বৃহদুক্থের কন্যা বৃহতীর গর্ভে সুনয়ের ঔরসে জাত পুত্রদের একজনের নাম। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পাঠে অঙ্গদ 'আনন্দ' হয়েছেন। *[বায়ু পু. ৯৬.২৪৬-২৪৭;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৫৫-২৫৬]

অঙ্গদ$_{৫}$ কারুপথে অবস্থিত লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদের রাজ্যটিকে 'অঙ্গদ' অথবা নগরীর বিশেষণ হিসেবে 'অঙ্গদা'-ও বলা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—অঙ্গদস্য অঙ্গদাখ্যাতা দেশে কারপথে পুরী। (আমাদের অনুসৃত, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভুল পাঠ আছে—'কারয়তে'। হবে 'কারপথে'।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৮৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (J.L. Shastri, Pt. III. Vol. 24)
২.৬৩.১৮৯, পৃ. ৮৩২; বায়ু পু. ৮৮.১৮৭-১৮৮;
রামায়ণ ৭.১০২.৮]

অঙ্গদীয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে অবস্থিত রামায়ণ খ্যাত লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদের শাসনে থাকা সমৃদ্ধা নগরী। পুরো জনপদের নাম কারুপথ বা কারপথ।

[রামায়ণ ৭.১০২.৮; বায়ু পু. ৮৮.১৮৭-১৮৮]

রামচন্দ্র বেঁচে থাকতেই রামের ইচ্ছানুসারে ভরত কারুপথ নামক দেশ অধিগ্রহণ করে অঙ্গদীয়া নগরী স্থাপন করেন। নগর স্থাপনের পর রামানুজ লক্ষ্মণ অঙ্গদের সঙ্গে ভারতের পশ্চিমে গিয়েছিলেন। অঙ্গদীয়া পুরীতে লক্ষ্মণ এক বছর সময় থেকে সেই দেশে সন্তানের সুস্থিতি ঘটিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। *[দ্র. কারুপথ]*

[রামায়ণ ৭.১০২.৫-১৩]

অঙ্গদেব্যন্তরম্ ললিতোপাখ্যানে মহাদেবীর তান্ত্রিক চক্র-বিস্তারে দেহের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হৃদ্দেবী এবং অন্যান্য দেবীর আবাস।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৩৭.৪০]

অঙ্গদ্বীপম্ জম্বুদ্বীপের একাংশ, অথবা জম্বুদ্বীপের থেকে সর্বাংশে উন্নত একটি দ্বীপের নাম। বহু ম্লেচ্ছজনেরা এখানে বাস করে। এই দ্বীপ নানা রত্নের আকর। বহু নদী, পাহাড় এবং বনে পরিপূর্ণ এই দ্বীপে চক্রগিরি নামে এক পর্বত আছে। এই পর্বতের কটিদেশে নাগ জনজাতির বাস এই প্রদেশ সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

[বায়ু পু. ৪৮.১৪-১৮]

অঙ্গনা বামন নামক হস্তীর পত্নী ছিলেন অঙ্গনা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩৯]

অঙ্গপুত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ দেশীয় হস্তীযুদ্ধ বিশারদ এক বিশাল বাহিনী কৌরব শিবিরে অবস্থান করছিল বলে জানা যায়। এই বাহিনীরই অন্যতম যোদ্ধা হিসেবে আমরা জনৈক অঙ্গপুত্রের উল্লেখ পাই। এঁর প্রকৃত নাম কী ছিল, তা অবশ্য জানা যায় না। সম্ভবত অঙ্গদেশীয় বীর বলে দেশের নামেই তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কর্ণপর্বে নকুলের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। *[মহা (k) ৮.২২.১৯; (হরি) ৮.১৭.১৯]*

অঙ্গভূত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করলে মহাপুণ্য লাভ হয়।

[মৎস্য পু. ২২.৫১]

অঙ্গমলদ পদ্মপুরাণে উল্লিখিত একটি জনপদ।

[পদ্ম পু.(স্বর্গ) ৩.৪৬]

অঙ্গলুব্ধ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবসহস্রনামস্তোত্রে 'নীলস্তথাঙ্গলুব্ধশ্চ'—এই দ্বন্দ্ব-সমাসের অন্তর্গত 'লুব্ধ' শব্দটিকে 'নীল' এবং 'অঙ্গ' দুটি শব্দের সঙ্গেই যুক্ত করেছেন এবং সেভাবেই শব্দ দুটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ শিব তাঁর বিষদিগ্ধ নীলকণ্ঠের জন্যও গর্বিত বোধ করেন। দানব, মানব, দেবতা কারোও কণ্ঠই নীল নয় বলে 'নীল' বলতে একমাত্র নীলকণ্ঠ মহাদেব স্মরণে আসেন বলে নীলের মধ্যে তাঁর নিত্য অবস্থিতি সূচনা করে। অন্যদিকে অঙ্গলুব্ধ শব্দটির মাধ্যমে শিব-মহাদেবের স্বীয় 'অঙ্গ' লিঙ্গের মধ্যে তাঁর নিত্য সন্নিধান বা অবস্থিতি বোঝানো হয়েছে—

অঙ্গলুব্ধঃ অঙ্গং স্বীয়ো'বয়বঃ লিঙ্গমিতি যাবৎ।
তত্র লুব্ধঃ নীলে বা লিঙ্গে নিত্যং
সন্নিহিত ইত্যর্থঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৮৩; (হরি) ১৩.১৬.৮৩]

☐ তবে শব্দের এই সামাসিক জটিলতার মধ্যে শিবের 'অঙ্গলুব্ধ' নামের তাৎপর্য্য আরও ভাল বোঝা যায়। দেবী ভবানী পতির হৃদয়ে আপন ছায়া দেখে শিবের শরীরে নিজের স্থান চেয়েছিলেন। শিব তাতে বলেছিলেন— তোমার অঙ্গ হরণ করে আপন অঙ্গে স্থাপন করতে পারলে আমারও আনন্দ হবে এবং আমার অঙ্গ তোমাকে দিতে পারলেও আমার আনন্দ হবে—

মমাপি প্রীতিরতুলা অঙ্গাহরণ দানয়োঃ।

প্রিয়তমা পত্নীর অঙ্গের প্রতি এই যে লুব্ধতা, এই জন্যই শিবের এক নাম অঙ্গলুব্ধ।

[কালিকা পু. ৪৫.১৫০;
প্রাণতোষিণী তন্ত্রে (বসুমতী) উদ্ধৃত বচন, পৃ. ৩৭৮]

অঙ্গলেপা পশ্চিমভারতের একটি জনপদ। সুগ্রীব সীতাকে খোঁজার জন্য যখন বানরবীরদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠান, তখন পশ্চিমদিকের জনপদগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে অঙ্গলেপা নামক জনপদের উল্লেখ করেছেন।

[রামায়ণ ৪.৪২.১৪]

অঙ্গলোক ভারতবর্ষের অতি-পশ্চিমে পর্বতাকীর্ণ সপ্তনদীপ্লাবিত একটি রাজ্যের নাম।

[মৎস্য পু. ১২১.৪৪]

মধ্যযুগে ইসলামের অভ্যুদয়কালে যখন মক্রান আরবদের অধীনে ছিল তখন 'হিংলাজ' একটি সমৃদ্ধ শহর হিসেবে (মরুতীর্থ হিংলাজ) বেশ বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এই 'হিংলাজ'ই পৌরাণিকদের অঙ্গলোক। এখানকার জনপদবাসীদের 'অঙ্গলোক্য' বলে মৎস্য-পুরাণে বলা হয়েছে। পৌরাণিক সময়ে এই স্থানটিতে আর্যেতর জনজাতির বাস ছিল, যে কারণে পুলিক, কুলখ, বর্বর, যবনদের সঙ্গে 'অঙ্গলোক্য'দের একত্র নিবদ্ধ করা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১২১.৪৩-৪৪; GP (Ali) p. 141]

এন. এল. দে মহাশয় অঙ্গলোকে অবস্থিত জনজাতিকে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের (পঞ্চানন তর্করত্ন) প্রমাণে—

কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্বরা অঙ্গলৌকিকাঃ।

অঙ্গলৌকিক বলেছেন এবং আলেকজাণ্ডারের

সহাগত ঐতিহাসিকদের ভাবনার নিরিখে এদের সঙ্গে আগালাসিয়ান-দের (Agalassians) একাত্মক করে দেখেছেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (নবভারত) ৪৯.৫২]

পুরাকালে এরা শিবি জনজাতির পার্শ্বভূমিতে ছিলেন এবং ভৌগোলিকভাবে এরা হিদাসপিস এবং আকিসাইনস-এর সঙ্গমস্থলের নিম্নবর্তী অঞ্চলে থাকতেন। *[GDAMI. (Dey) p. 8]*

আবার পণ্ডিত সুবোধ কাপুরের মতে যে অঞ্চল বা দেশের মধ্যে দিয়ে সীতা (প্রাচীন Jaxartes এবং আধুনিক সিরদরিয়া) নদী প্রবাহিত, তারই নাম অঙ্গলোক।

[EAIG (Kapoor) p. 52]

অঙ্গলোকবরস্ পুরাণোক্ত জনজাতি।

[বায়ু পু. ৪৭.৪৩]

এটি মৎস্যপুরাণোক্ত অঙ্গলোক বলেই মনে হয়।

অঙ্গলৌহিক ভারতের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি রাজ্য। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪৯]*

অঙ্গাবহ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত এক বৃষ্ণি বংশীয় কুলপ্রধান বীর। তিনি কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, চারুদেষ্ণ ইত্যাদির সঙ্গে এসেছিলেন।

[মহা (k) ২.৩৪.১৬; (হরি) ২.৩৩.১৬]

অঙ্গার$_1$ একজন অসামান্য শক্তিধর প্রাচীন রাজার নাম। যুবনাশ্বের ছেলে মান্ধাতা এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন বলে মান্ধাতার গৌরব বেড়েছে। এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় মান্ধাতাকে ধনুকের ছিলা ধরে এতটাই টানতে হয়েছিল যে, সেই ধনুর টংকার শব্দ শুনে দেবতারা ভেবেছিলেন বুঝি স্বর্গভূমি বিদারিত হয়ে গেল।

[মহা (k) ১২.২৯.৮৮-৮৯; (হরি) ১২.২৯.৮৬-৮৭]

অঙ্গার$_2$ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে জম্বুদ্বীপের নানান জনপদ-বর্ণনার সময় সঞ্জয় এই নামে একটি জনপদের উল্লেখ করেন। দক্ষিণদেশের চোল, মালব, কোঙ্কণ ইত্যাদি দেশ অথবা জাতি-নামের সঙ্গে অঙ্গার উল্লিখিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে স্পষ্টই দক্ষিণ-দেশের (দক্ষিণাশ্চৈব যে দেশাঃ) কোঙ্কণ, অন্ধ্রদেশের সঙ্গে অঙ্গার একত্র উল্লিখিত।

[মহা (k) ৬.৯.৬০; (হরি) ৬.৯.৬০;

ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫৯]

অঙ্গারক$_1$ আভিধানিক অর্থে এটি মঙ্গলগ্রহের অপর নাম। অঙ্গার শব্দের অর্থ লোহিত বর্ণ বা লাল রঙ। মঙ্গলগ্রহ তার লোহিত বর্ণের কারণেই অঙ্গারক নামে খ্যাত। অঙ্গারক অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহ ব্রহ্মার সভায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন বলে মহাভারতের সভাপর্বে উল্লিখিত আছে।

[মহা (k) ২.১১.২৯; (হরি) ২.১১.২৮]

বিভিন্ন পুরাণে এই মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। গরুড় পুরাণে যে বিষ্ণু সহস্রনাম কীর্তন করা হয়েছে সেখানে 'অঙ্গারক' নামটি বিশ্বমূর্তি বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেছে। আর ধ্যান-প্রণামের মন্ত্রে অঙ্গারক পৃথিবী বা ক্ষিতির পুত্র বলেই চিহ্নিত। মেষ এবং বৃশ্চিক মঙ্গলের বা অঙ্গারকের আপন রাশিক্ষেত্র—

মেষস্ত্বঙ্গারকক্ষেত্রং...বৃশ্চিকো'ঙ্গারকস্য চ।

অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ অঙ্গারকের পূজা বিধেয়।

[গরুড় পু. ১.১৫.৪৫; ১.১৬.২০;

১.৩৯.২৩, ২৫; ১.৬০.৭]

পৌরাণিক জ্যোতিষ-ভাবনায় অঙ্গারক-মঙ্গলের দশাকাল আট বছর এবং এই গ্রহের বক্রীভাব মহাভারতের কালেও ভীতির কারণ হিসেবে লক্ষিত হয়েছে, বিশেষত মঘা-নক্ষত্রে অবস্থিত অঙ্গারক-গ্রহের বক্রভাব মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়াত—

মঘাস্বঙ্গারকো বক্রঃ শ্রবণে চ বৃহস্পতিঃ।

[মহা (k) ৬.৩.১৪; (হরি) ৬.৩.১৪]

অর্জুন একবার গিয়ে সংসপ্তক সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসে পুনরায় অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। পুনরায় আবার এলেন সংসপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কর্ণপর্বের এই ঘটনাটাকে অঙ্গারক গ্রহের একবার বক্রী হয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর পুনরায় বক্রী হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[দ্র. মঙ্গল]

[মহা (k) ৮.১৯.১; (হরি) ৮.১৪.১]

অঙ্গারক$_2$ পুরাণ মতে স্কন্দ কার্তিকেয়ের অন্যতম নাম। দেব সেনাপতি স্কন্দই অঙ্গারক অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের স্বরূপ। *[বায়ু পু. ৫৩.৩১]*

অঙ্গারক$_3$ একাদশ রুদ্রের অন্যতম। সুরভি তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে কশ্যপের ঔরসে একাদশ রুদ্র পুত্র উৎপাদন করেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অঙ্গারক। *[বায়ু পু. ৬৬.৬৮-৬৯;*

ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৭০]

অঙ্গারক$_৪$ মহাভারতের বনপর্বে পুরোহিত ধৌম্য সূর্যের যে একশত আট নাম বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল অঙ্গারক।

[মহা (k) ৩.৩.১৭; (হরি) ৩.৩.১৭]

অঙ্গারক$_৫$ সৌবীর রাজপুত্র। জয়দ্রথ যখন বিবাহ করতে শাল্বদেশ যাত্রা করেন তখন সৌবীর দেশের যে দ্বাদশ রাজপুত্র তাঁর সঙ্গে ছিলেন অঙ্গারক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তবে ইনি সম্পর্কে জয়দ্রথের পুত্র ছিলেন না ভ্রাতা এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

[মহা (k) ৩.২৬৫.১০; (হরি) ৩.২১৯.১০]

অঙ্গারপর্ণ একজন গন্ধর্বের নাম। জতুগৃহ-দাহ থেকে মুক্ত হয়ে পঞ্চাল যাবার পথে এই গন্ধর্বের সঙ্গে অর্জুনের দেখা হয়। তাঁর নিজের নামেই গঙ্গাতীরে এই বনের নামও অঙ্গার-পর্ণ। এই অঞ্চলে অর্জুনকে এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের গঙ্গাজল স্পর্শ করতে বাধা দিলে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করে অর্জুন অঙ্গারপর্ণকে পরাজিত করেন। তখন অঙ্গারপর্ণের গান্ধর্বী স্ত্রী কুম্ভিনসী স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চান অর্জুনের কাছে। যুধিষ্ঠিরের সদিচ্ছায় অর্জুন মারণ-যুদ্ধ থেকে বিরত হন এবং অঙ্গারপর্ণ নিজের অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী শুনিয়ে নিজের পূর্ব নাম চিত্ররথ বলে জানান। পরে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয় এবং তিনিই প্রথম পাণ্ডবদের পরামর্শ দেন একজন পুরোহিতের আশ্রয় নেবার জন্য। প্রাচীন রাজনীতির নিয়মে বিজিগীষু রাজা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত বরণ করবেন, এ-কথা বলা হয়েছে। অঙ্গারপর্ণও (চিত্ররথ) রাজ্যহীন পাণ্ডবদের পুরোহিত নিয়োগ করার পরামর্শ দিলেন—

পুরোহিতং প্রকুর্বীত রাজা গুণসমন্বিতম্।
পুরোহিতমতে তিষ্ঠেদ্ য ইচ্ছেদ্‌ভূতিমাত্মনঃ॥

[মহা (k) ১.১৭০.১-৮০; ১.২.১১১;
(হরি) ১.১৬৩.১-৮০; ১.২.১১৩]

অঙ্গারপাত্তন অন্যতম নরক-নাম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৩৩.৬১]

অঙ্গারবাহিকা একটি পবিত্র নদী। পিতৃতীর্থরূপে খ্যাত। *[মৎস্য পু. ২২.৩৫]*

অঙ্গারবাহিনী ভদ্রাশ্ব বর্ষে প্রবাহিনী নদীর নাম।

[বায়ু পু. ৪৩.২৬]

অঙ্গারেশ্বর$_১$ নর্মদা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত অঙ্গারেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থগমনের ফল রুদ্রলোকপ্রাপ্তি। অঙ্গারেশ্বরে ভগবান রুদ্রশিবের অবস্থান। একটি সংস্করণে 'অগারেশ্বর'—এমন প্রাপ্ত মুদ্রণ দেখা যায়। অঙ্গারক-চতুর্থীতে এখানে স্নান প্রশস্ত। *[মৎস্য পু. ১৯০.৯; ১৯১.৫৯-৬০; পদ্ম পু. (মহর্ষি) স্বর্গ ১৭.৬; কূর্ম পু. ২.৩৯.৫-৬]*

বর্তমানে অঙ্গারেশ্বর তীর্থটি গুজরাট রাজ্যের ভারুচ অঞ্চলে অবস্থিত।

[Gujarat State Gazetters:
Vododara: 1979: p. 813]

অঙ্গারেশ্বর$_২$ অগ্নিপুরাণ মতে গয়ায় অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। *[অগ্নি পু. ১১৬.২৯]*

অঙ্গারেশ্বর$_৩$ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত সোমেশ্বর বা সোমনাথের কাছে অবস্থিত একটি পবিত্র শিবলিঙ্গ। এটি সোমনাথের ঈশান কোণে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস খণ্ড/প্রভাসক্ষেত্র
মাহাত্ম্য) ৪.৫.১]

অঙ্গারেশ্বর$_৪$ গয়ার অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ।

[অগ্নি পু. ১১৬.২৯]

অঙ্গারেশ্বর$_৫$ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। নর্মদা নদীর তীরে গুজরাটের ভদোদরায় অঙ্গারেশ্বর নামে এই পবিত্র শিবক্ষেত্রটি এখনও বর্তমান। *[কূর্ম পু. ২.৩৯.৫-৬;*
পদ্ম পু. (মহর্ষি) স্বর্গ ৮.২৯]

অঙ্গারেশ্বর$_৬$ পুরাণ অনুসারে মঙ্গলগ্রহের রঙ লাল, তিনি লোহিতাঙ্গ, তিনি মহাদেবের পুত্র এবং তাঁরই অংশজাত। ফলে মঙ্গলগ্রহ, মহাদেবেরই স্বরূপ। স্কন্দ পুরাণ বলা হয়েছে যে, মহাদেবের সেই লোহিতাঙ্গ রূপ অবন্তীদেশে শিপ্রানদীর তীরে মহাকালবনে প্রকাশিত হয়েছে—যা অঙ্গারেশ্বর তীর্থ নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত অঙ্গারেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শনে সর্বপাপ থেকে মুক্তি ঘটে এবং বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, গয়া ও পুষ্কর দর্শনের সমান পুণ্যলাভ হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্যখণ্ড/অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য) ৩৭.৪১-৪৪;
(আবন্ত্যখণ্ড/চতুরশীতি লিঙ্গমাহাত্ম্য) ৪৪.২৮-৪৬]

অন্য নাম অঙ্গারকেশ্বর। অঙ্গারক বা মঙ্গলগ্রহ কাশীতে এসে নিজের নামে শিবলিঙ্গ তৈরি করে ততদিনই তাঁর তপস্যা করেন, যতদিন তাঁর নিজের শরীর থেকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো তেজ নির্গত না হয়। অঙ্গারক-মঙ্গলের তপস্যায় তুষ্ট শিব তাঁকে বর দেন এবং সেই থেকে

অঙ্গারকেশ্বর শিবও এইস্থানে দর্শনীয় এবং পূজ্য হিসেবে গণ্য হন। পুরাণে বলা আছে কম্বলেশ্বর এবং অশ্বতরেশ্বর লিঙ্গের উত্তরে পাঞ্চমুদ্র নামক মহাপীঠে অঙ্গারকেশ্বরের অবস্থান।

[স্কন্দ (কাশী) ১.১৭.৫-১৯]

অঙ্গিরসী$_১$ প্লক্ষদ্বীপের একটি মহানদী। এই নদীর জল অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যবহ।

[ভাগবত পু. ৫.২০.৪]

অঙ্গিরসী$_২$ প্লক্ষদ্বীপের সাতটি পৃথক ভূমি-বিভাগে যে সাতটি নদী আছে, তাঁদের অন্যতম। এই নদী ভদ্রবর্ষে প্রবাহিত। *[দেবীভাগবত পু. ৮.১২.৮-৯]*

অঙ্গিরা$_১$ (অঙ্গিরস্) সৃষ্টির আদিতে জাত ব্রহ্মার ছয় মানসপুত্রের মধ্যে অঙ্গিরা একজন—

মরীচ্যত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ষড়েতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা বীর্যবন্তো মহর্ষয়ঃ ॥

পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার জন্ম বিষয়ে একাধিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অঙ্গিরাকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মুখ থেকে মহর্ষি অঙ্গিরার জন্ম। বায়ু পুরাণে বর্ণিত উপাখ্যান থেকে জানা যায় যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সূচনাকালে ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু, অঙ্গিরা প্রমুখ সপ্ত ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর মৃত্যুর পর ক্রুদ্ধ শিব তাঁদের অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত সপ্তর্ষি চাক্ষুষ মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে একসময় বরুণ দেবতার যজ্ঞে ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করেছিলেন। সে সময় যজ্ঞসভায় উপস্থিত দেবকন্যাদের দেখে ব্রহ্মার চিত্ত চঞ্চল হল, তাঁর তেজস্খলিত হল। ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির ভাবনা করে সেই তেজবিন্দু যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিলেন। তার ফলে যজ্ঞকুণ্ড থেকে প্রথমে উঠে এলেন ভৃগু, তারপর মহর্ষি অঙ্গিরা। যজ্ঞের অঙ্গার থেকে উৎপত্তি হয়েছিল বলেই তিনি অঙ্গিরা নামে খ্যাত হন।

মহাকাব্য পুরাণে সর্বত্রই আদিতে সৃষ্ট মহর্ষি অঙ্গিরাকে বেদবিৎ ঋষি এবং অন্যতম প্রজাপতি বা বংশ প্রবর্তক প্যাট্রিয়ার্ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে সৃষ্টির আদিতে জাত ব্রহ্মার এই মানস পুত্রদের একাধিক তালিকা মেলে। এঁরা সংখ্যায় কখনো ছয় জন, কখনো বা সাতজন এমনকী ব্রহ্মার দশজন কিংবা একুশজন প্রজাস্রষ্টা মানসপুত্রেরও উল্লেখ মেলে। তা সত্ত্বেও মহাকাব্য পুরাণের বিবরণে সপ্তর্ষির ভাবনাটিই বহুল প্রচলিত এবং আদিতে সৃষ্ট সপ্ত ঋষির মধ্যে অবশ্যই অঙ্গিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। মহাভারতের শান্তিপর্বে একটি শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে অঙ্গিরা আদিতে সৃষ্ট ব্রহ্মার মানসপুত্রদের মধ্যে অন্যতম যিনি প্রবৃত্তি ধর্মে স্থিত হয়ে বিবাহাদি করেছিলেন—

মরীচিরঙ্গিরাশ্চাত্রি পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মানসা নির্মিতা হি তে॥
এতে বেদবিদো মুখ্যা বেদাচার্যাশ্চ কল্পিতাঃ।
প্রবৃত্তি ধর্মিণশ্চৈব প্রাজাপত্যে চ কল্পিতাঃ॥

ভীষ্ম অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষিকে ব্রহ্মার সদৃশ বলেছেন, এমনকী তাঁদের সাত ব্রহ্মা বলেও চিহ্নিত করেছেন—

সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।

আদিতে সৃষ্ট মহর্ষি অঙ্গিরার সম্পর্কে মহাকাব্য পুরাণে নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৬৫.১০; ১.৬৬.৪; ১২.২০৭.১৭;
১২.২০৮.৪; ১২.৩৪০.৬৯; ১২.১০৮.৪-৫;
(হরি) ১.৬০.১০; ১.৬১.৪; ১২.২০১.১৭;
১২.২০২.৪; ১২.৩২৬.৬৫;
ভাগবত পু. ৩.১২.২২, ২৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.৯৬; ১.৯.১৮, ২৩;
মৎস্য পু. ৩.৬; ৫.১৪; ১৫.১৬;
বায়ু পু. ২৫.৮২; ৬৫.৪২; বৃহদ্ধর্ম পু. ২.২.১৩;
দেবীভাগবত পু. ৭.১.১০;
কূর্ম পু. ১.২.২৩-২৪; ১.৭.৩৫]

☐ তবে আদি প্রজাপতি ঋষি হিসেবে অঙ্গিরার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের মন্ত্রে। ঋগ্বেদে অঙ্গিরা শব্দটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বহুবচনে উল্লিখিত। ঋগ্বেদের মন্ত্রে কখনো বা বংশ পরম্পরায় অঙ্গিরা ঋষি এবং তাঁর বংশজাত ঋষিদের একত্রে অঙ্গিরসঃ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো কোনো ঋক্ মন্ত্রে এই অঙ্গিরসরা আদিত্য, রুদ্র কিংবা বসু দেবগণের মতোই দেবতার মর্যাদা লাভ করেছেন। ঋগ্বেদে একাধিক মন্ত্রে আদিত্য, রুদ্র, বসু, মরুৎ দেবগণের সঙ্গে অঙ্গিরসগণকেও আহ্বান করা হয়েছে স্তব করে—

সূর্যেণাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ।

[ঋগ্বেদ ৭.৪৪.৪; ৮.৩৫.১৪]

☐ ঋগ্বেদের একটি দুটি মন্ত্রে অবশ্য আদি ঋষি হিসেবে অঙ্গিরার নাম একবচনেও উল্লিখিত

হয়েছে। সেখানে আদিতে সৃষ্ট প্রজাপতি দক্ষ, অত্রি, মনু প্রভৃতির সঙ্গে অঙ্গিরাকেও প্রজাপতি বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৬২.১-২; ১.১৩৯.৯]

□ অঙ্গিরার জন্মবৃত্তান্তে যে মুহূর্তে অঙ্গার থেকে অঙ্গিরার উৎপত্তির প্রসঙ্গ আসে, সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর অগ্নিস্বরূপতার কথাও এসে যায়। বস্তুত অঙ্গিরাকে সূর্যাগ্নি-স্বরূপে পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করেন অনেকেই। অঙ্গিরার সঙ্গে সূর্য অগ্নির সম্পর্ক এবং তাঁর সূর্য-অগ্নিস্বরূপতার কথা উল্লেখ করে মহাভারতে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে একসময় অগ্নির তেজ নষ্ট হয়ে গেলে কীভাবে অঙ্গিরা অগ্নিতে পরিণত হয়েছিলেন। এমনিতেই মহাভারতে অঙ্গিরা শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে—'অঙ্গার' অর্থাৎ অগ্নি থেকে অঙ্গিরা শব্দের উৎপত্তি—

অঙ্গারেভ্যো'ঙ্গিরাভবৎ, অঙ্গারেভ্যোঙ্গিরাস্তাত।

সম্ভবত এই ভাবনা থেকেই পুরাণে যজ্ঞের অঙ্গার থেকে অঙ্গিরার জন্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *[মহা (k) ১৩.৮৫.১০৫; ১৩.৮৫.১০৭; (হরি) ১৩.৭৪.১০৩; ১৩.৭৪.১০৫]*

□ প্রাচীন কাহিনী হল—কোনো এক সময় অঙ্গিরা অগ্নির থেকেও অধিক তেজঃসম্পন্ন হয়ে ওঠার উদ্দেশে তপশ্চর্যা আরম্ভ করেন। আশ্রমে বসে এই তপস্যা করতে করতে অঙ্গিরা সত্যি সত্যিই অগ্নির থেকেও তেজস্বী হয়ে উঠলেন একদিন। এদিকে স্বয়ং অগ্নিদেবও সে সময় তপস্যা করছিলেন এক বনে। তিনি হঠাৎই দেখলেন—কোনো এক উন্নততর তেজে চতুর্দিক উদ্ভাসিত এবং তার তেজে তিনিও সন্তপ্ত হয়ে উঠেছেন, এদিকে তিনি নিজে হয়ে গিয়েছেন ম্লান এবং তেজোহীন। অগ্নি ভাবলেন—তাহলে কী ভগবান ব্রহ্মা অপর এক অগ্নিদেব সৃষ্টি করলেন—

অন্যো'গ্নিরিহ লোকানাং ব্রহ্মণা সম্প্রকল্পিতঃ।

তা নইলে এমনভাবে তাঁর তেজোবিভূতি নষ্ট হয়ে গেল কী করে? এইসব ভাবতে ভাবতেই অগ্নিদেব মহর্ষি অঙ্গিরাকে দেখতে পেলেন। দেখলেন—মহর্ষি অঙ্গিরাই আপন তেজে সম্পূর্ণ জগতকে সন্তপ্ত করছেন। অগ্নি এবার ভয়ে ভয়ে অঙ্গিরা ঋষির কাছে যেতেই তিনি বললেন—আপনি পুনরায় আপনার তেজঃস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হোন, কেননা এই তিন ভুবনে সকলেই আপনার সর্বদাহিকা শক্তির কথা জানে। তাছাড়া পৃথিবীর অন্ধকার দূর করার জন্য আপনাকেই তো ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন, অতএব আপনি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হোন—

স্বস্থানং প্রতিপদ্যস্ব শীঘ্রমেব তমোনুদ।

অগ্নি একথা শুনে একটু লজ্জিত হয়ে বললেন—আমার তেজঃ স্বভাবের যত কীর্তি ছিল সব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন হুতাশন অগ্নির মর্যাদা পাবার যোগ্য আপনিই, আমাকে আর কেউ অগ্নি বলে চিনবে না—

ভবন্তমেব জ্ঞাস্যন্তি পাবকং ন তু মাং জনাঃ।

অতএব আজ থেকে আমি আমার অগ্নিত্বত্যাগ করছি। আপনিই হোন জগতের প্রথম অগ্নি, আমি দ্বিতীয় প্রাজাপত্যক অগ্নি হয়ে থাকবো। অঙ্গিরা বললেন—না, এটা হতেই পারে না। আপনি সমস্ত লোকের স্বর্গগতিদায়ক তমোনাশী অগ্নি হয়ে থাকুন আর আমাকে আপনার প্রথম পুত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। অগ্নি তাতে সম্মত হলেন এবং সেই সময় থেকে অঙ্গিরা অঙ্গারাত্মক অগ্নির প্রথম প্রকাশ বলে চিহ্নিত হলেন।

হয়তো এই কাহিনীর তাৎপর্যেই মহাভারতে অঙ্গিরাকে কখনো আগ্নেয়, কখনো বা ব্রহ্মা বলেও সম্বোধন করা হয়েছে—

আগ্নেয়স্ত্বঙ্গিরাঃ শ্রীমান্ কবির্ব্রাহ্মো মহাযশাঃ।

বায়ু পুরাণে বরুণের যজ্ঞের অঙ্গার থেকে মহর্ষি অঙ্গিরার জন্মের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেখানেও উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা আপন তেজবিন্দু অগ্নিতে আহুতি দিলেন প্রজাসৃষ্টির ভাবনায়। তার ফলস্বরূপ ভৃগুর পরেই যখন যজ্ঞাগ্নি থেকে অঙ্গিরা উঠে এলেন, সেই সময় স্বয়ং অগ্নিই ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেন যে—অগ্নি থেকে জাত এই পুত্র যেন তাঁর পুত্র বা আগ্নেয় নামে খ্যাত হয়। ব্রহ্মা সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। ফলে যজ্ঞাগ্নি থেকে উৎপন্ন মহর্ষি অঙ্গিরা অগ্নির পুত্র রূপে প্রসিদ্ধ হন।

পুরাণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে—অগ্নি অঙ্গিরাকে আপন পুত্র বলে স্বীকার করায় অঙ্গিরস গোত্রীয়রা সকলেই আগ্নেয় নামে পরিচিত।

[মহা (k) ৩.২১৭.২-১৮; ১৩.৮৫.১২৬;
(হরি) ৩.১৮১.২-১৮; ১৩.৭৪.১২৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.২১, ৩৯-৪০, ১০১]

☐ মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র চিত্রশিখণ্ডী নামেও পরিচিত ছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্য একটি শ্লোকে একুশজন প্রজাপতির একতর হিসেবে অঙ্গিরার নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩৩৪.৩৫; ১২.৩৩৫.২৯; (হরি) ১২.৩২০.৩৫; ১২.৩২১.৩০]

☐ মহাভারত এবং পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার বিবাহ সম্পর্কে একাধিক তথ্য পাওয়া যায়। দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা স্বধা এবং সতী মহর্ষি অঙ্গিরার পত্নী ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের গর্ভজাত পুত্ররা হলেন পিতৃগণ এবং অথর্বাঙ্গিরস্। মহাভারতে সুভানাম্নী অঙ্গিরার পত্নীর উল্লেখ মেলে। *[ভাগবত পু. ৬.৬.২, ১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৭.৪৫; মৎস্য পু. ১৬৭.৪৩; ১৭১.২৭; বায়ু পু. ১.১৩৭; ৩.৩; মহা (k) ৩.২১৮.১; (হরি) ৩.১৮২.১]*

☐ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহর্ষি অঙ্গিরার তিনজন পত্নী ছিলেন—মরীচির কন্যা সুরূপা, কর্দম প্রজাপতির কন্যা স্বরাট্ এবং মনুর কন্যা পথ্যা। এঁদের মধ্যে সুরূপার গর্ভে বৃহস্পতি, স্বরাটের গর্ভে গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয়া পত্নী পথ্যার চার পুত্র হয়। এঁদের নাম অবন্ধ্য, বামদেব, উতথ্য এবং উশিজ। তবে ভাগবত পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণে কর্দম প্রজাপতির কন্যা তথা অঙ্গিরার পত্নী স্বরাটের পরিবর্তে শ্রদ্ধা নামে চিহ্নিত হয়েছেন। সংবর্ত নামেও অঙ্গিরার এক পুত্রের উল্লেখ মেলে।

[বায়ু পু. ৬৫.৯৭-১০৮; ভাগবত পু. ৩.২৪.২২; বিষ্ণু পু. ১.৭.৫-৭; ১.১৫.১৩৬; মৎস্য পু. ১৯৫.৯; ১৯৬.১; মার্কণ্ডেয় পু. ১২৯.১১; দেবী ভাগবত পু. ৪.১৩.২; ৬.৮.২; মহা (k) ১৪.৫.৪; ১৪.৬.১৫; (হরি) ১৪.৫.৪; ১৪.৬.১৫]

☐ এছাড়াও মহাভারতে এবং পুরাণে অঙ্গিরার কন্যা সন্তানদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী অঙ্গিরা সাতটি কন্যাসন্তানের পিতা ছিলেন। এঁদের নাম—ভানুমতী, রাকা, সিনীবালী, অর্চিস্মতী, হবিষ্মতী, মহিষ্মতী, মহামতী এবং কুহু। অঙ্গিরার সূর্যাগ্নি স্বরূপতার কারণেই হয়তো টীকাকার নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অঙ্গিরার কন্যাদের সূর্য চন্দ্রের আবর্তনে যজ্ঞ তিথির স্বরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। পুরাণে অবশ্য অঙ্গিরার চার কন্যাসন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.২১৮.৩-৮; (হরি) ৩.১৮২.৩-৮; ভাগবত পু. ৪.১.৩৪-৩৫; মৎস্য পু. ১০২.১৯; ১০৬.১৭]

☐ অঙ্গিরস্ শব্দের বহুবচন অঙ্গিরসঃ। এই শব্দের দ্বারা অঙ্গিরা ঋষির পুত্র-পৌত্র তথা বংশজাত মুনি ঋষিদের এমনকী তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য-শিষ্য সম্প্রদায়কেও বোঝানো হয়েছে। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে এবং উতথ্যকে অঙ্গিরস বলে সম্বোধন করা হয়েছে একাধিক বার। অঙ্গিরার বংশজাত ভরদ্বাজ ঋষির বংশধর দ্রোণাচার্য এবং তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাও অঙ্গিরস নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১.৭৬.৬; ৩.২২১.১২; ১.১৩১.১১; ৩.২৬.৭; ৩.২২৪.১৪; ৩.২৩১.৪২; ৫.১৯৩.১৫; ৮.১৭.২৩; ১২.২.৫, ১৪; (হরি) ১.৬৪.৬; ৩.১৮৪.১২; ১.১২৭.১২; ৩.২৩.৭; ৩.১৮৬.২৯; ৩.১৯৪.১৪; ৫.১৮৩.১৫; ৮.১২.৫১; ১২.২.৫, ১৪]

☐ অঙ্গিরার বংশপরম্পরা এবং শিষ্য পরম্পরায় নেমে আসা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বরা অঙ্গিরার নামে খ্যাত হয়েছেন বলে তাঁকে আমরা একটা 'ইনস্টিটিউশন' বলতে পারি, কিন্তু তাঁর নিজের কালে তিনি এতটাই বিখ্যাত ছিলেন, যেমনটি তাঁর ভাই ব্রহ্মার অন্য মানসপুত্র ভৃগু। মহাভারতে এমন বলা হয়েছে—অঙ্গিরা ঋষির কালটাই যুগকল্পনায় প্রথম যুগ যখন সনাতন ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল—

উৎপন্নে'ঙ্গিরসে কালে যুগে প্রথম কল্পিতে।

পিতৃশ্রাদ্ধের প্রক্রিয়া ভৃগু অঙ্গিরার কালেই তৈরি হয়েছিল, তবে তা তৈরি হয় নিমি রাজার তত্ত্বাবধানে। *[মহা (k) ১২.৩৩৫.৫৪; ১৩.৯১.১; (হরি) ১২.৩২১.৫৫; ১৩.৭৮.১]*

☐ ধর্মের রক্ষা স্বরূপ দণ্ডকে শিব দান করলেন বিষ্ণুকে। বিষ্ণু দণ্ডকে তুলে দিয়েছিলেন মুনিসত্তম অঙ্গিরার হাতে। অঙ্গিরা দণ্ডের রহস্যগুপ্তি ইন্দ্র এবং মরীচির কাছে ন্যস্ত করেন।

[মহা (k) ১২.১২২.৩৬-৩৭; (হরি) ১২.১১৯.৩৬-৩৭]

☐ যাঁরা সাবিত্রীমন্ত্র জপ করে দানবদের জয় করেছিলেন, অঙ্গিরা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.১৫০.৭৯;
(হরি) ১৩.১২৮.৭৯]

☐ ব্রাহ্মণের শক্তি এবং ক্রোধ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বায়ু দেবতা অঙ্গিরার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। অঙ্গিরা নাকি একবার পিপাসার্ত হয়ে পৃথিবীর সব জল পান করে নিয়েছিলেন। তারপর কৃপাপরবশ হয়ে আবার জলে ভরিয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীকে। বায়ু দেবতা আরও জানিয়েছেন যে, পূর্বে আগুন জ্বালালে নাকি কোনো ধোঁয়া উঠত না, অগ্নি ছিলেন সুবর্ণবর্ণ, সমান ভাবে ঊর্ধ্বে শিখা উঠত তাঁর, কিন্তু অঙ্গিরার ক্রোধে এবং অভিশাপে অগ্নির এই সব গুণ নষ্ট হয়ে যায়। অঙ্গিরা সম্পর্কিত এই তথ্যগুলি মহাভারতের কাহিনীতে অঙ্গিরার পুত্র উতথ্যের উপরেও আরোপিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৫৩.৩-৪, ৮; ১৩.১৫৪.৯-৩২;
(হরি) ১৩.১৩১.৩-৪, ৮; ১৩.১৩২.৯-৩২]

☐ মহর্ষি অঙ্গিরা রাজর্ষি কারন্ধম অবীক্ষিতের পুরোহিত ছিলেন বলে জানা যায়। এই অবীক্ষিত রাজার পুত্র মরুত্তের কন্যাকে অঙ্গিরা বিবাহ করেছিলেন বলেও জানা যায়।

[মহা (k) ১৪.৪.২২; ১২.২৩৪.২৮;
(হরি) ১৪.৪.২২; ১২.২৩১.২৮]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের পরাক্রম দেখে ভয়ত্রস্ত দুর্যোধনকে সুরক্ষা দেবার জন্য দ্রোণ একটি অভেদ্য কবচ দুর্যোধনকে পরিয়ে দেন অঙ্গিরার নামে স্বস্তিপাঠ করে। সেই সূত্রেই দ্রোণ জানান যে এই কবচ স্বয়ং শিব মহেশ্বর ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন বৃত্রবধের সময় বৃত্রের অবধ্য থাকার জন্য। অর্থাৎ এই অভেদ্য কবচ যুদ্ধকালে বৃত্রাসুরও ছিন্ন করতে পারেননি। বৃত্রবধ হয়ে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র এই কবচ তুলে দেন মহর্ষি অঙ্গিরার হাতে—

তং চ মন্ত্রময়ং বদ্ধং বর্ম চাঙ্গিরসে দদৌ।

[মহা (k) ৭.৯৪.৪৫, ৬১-৬৮; ৭.১০৩.১৯;
(হরি) ৭.৮১.৬১-৬৮; ৭.৮৮.৯৯]

☐ দেবসেনাপতি পদে স্কন্দ-কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় মহর্ষি অঙ্গিরা উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.১০; (হরি) ৯.৪২.১০]

☐ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব ঋষি মহর্ষি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন, অঙ্গিরা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১২.৪৭.১০; ১৩.২৬.৪;
(হরি) ১২.৪৬.১০; ১৩.২৭.৪;
ভাগবত পু. ১.৯.৮.]

☐ অর্জুনের পৌত্র রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সময়ও উপস্থিত ছিলেন মহর্ষি অঙ্গিরা। *[ভাগবত পু. ১.১৯.৯]*

☐ একসময় মহর্ষি অঙ্গিরা এলেন শূরসেন অঞ্চলের রাজা চিত্রকেতুর গৃহে। চিত্রকেতু রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। চিত্রকেতুর প্রধানা মহিষী মহর্ষি অঙ্গিরার কাছে পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করলে অঙ্গিরা তাঁকে পুত্র প্রাপ্তির বর দিলেন। অঙ্গিরার বরে রাজা চিত্রকেতুর পট্টমহিষী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। কিন্তু তাঁর সপত্নীরা পাটরাণীর এই সৌভাগ্য সহ্য করতে না পেরে নবজাত শিশুটিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেন। রাজা-রাণী পুত্রশোকে কাতর হয়ে পড়লে অঙ্গিরা নারদের সঙ্গে রাজবাড়িতে উপস্থিত হন অবধূতের বেশে। অঙ্গিরা ভোজরাজের উদাহরণ দিয়ে রাজা-রাণীকে সান্ত্বনা দিলেন।

[ভাগবত পু. ৬.১৪.১৪-৩০, ৩৭-৬১; ৬.১৫.১০-২৬]

☐ নভ বা আষাঢ় মাসে সূর্যের রথে মহর্ষি অঙ্গিরা অবস্থান করেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ১২.১১.৩৭; মৎস্য পু. ১২.৬.১০]

☐ মহর্ষি অঙ্গিরাকে অথর্ববেদের প্রবক্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে পুরাণে।

[কালিকা পু. ২৬.১৬; ভাগবত পু. ১২.৭.৪]

☐ মহর্ষি অঙ্গিরা একবার পিণ্ডারক তীর্থে গিয়েছিলেন বলে ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[ভাগবত পু. ১১.১.১২]*

অঙ্গিরা$_{২}$ (অঙ্গিরস্) চাক্ষুষ মনুর পুত্র উল্মুকের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অঙ্গিরা একজন। *[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৭]*

অঙ্গিরা$_{৩}$ (অঙ্গিরস্) পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, চতুর্থ দ্বাপরে মহর্ষি অঙ্গিরা বেদবিভাগকারী ব্যাস হবেন। *[বায়ু পু. ২৩.১২৬]*

অঙ্গিরা$_{৪}$ (অঙ্গিরস্) পুরাণ মতে, নবম দ্বাপরে যখন মহর্ষি সারস্বত বেদবিভাগকারী ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান শিব ঋষভ নামে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। সেই সময় ঋষভদেবের যে চার

পুত্র মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করবেন অঙ্গিরা তাঁদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ২৩.১৪৪]*

অঙ্গিরাবৃত কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত একজন দানব। *[বায়ু পু. ৬৮.৫]*

অঙ্গিরোগণ বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতাদের আটটি গণ। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্ব, মরুৎ, ভৃগু—এই সাতটি গণের মতো অঙ্গিরোগণও দেবতাদের একটি গণ। এঁরা অঙ্গিরার পুত্র।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৯.৩]

অঙ্গুল মানুষের ঘর-বাড়ি থেকে গ্রাম-নগরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের ক্ষেত্র-পরিমাণ নির্ধারণের জন্য প্রথম এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে দৃশ্য পরিমাণ-প্রমাণ ব্যবহার হত, তার নাম অঙ্গুল বা অঙ্গুলি—

তাসাম্ আয়াম-বিষ্কম্ভান্ সন্নিবেশান্তরাণি চ।
চক্রুস্তদা মহাপ্রজ্ঞং মিত্বা মিত্বাত্মনো'ঙ্গুলৈঃ॥

ঘরের জানলা দিয়ে যদি সূর্যকিরণ এসে পড়ে, সেই জালান্তরাবিষ্ট সূর্যকিরণের মধ্যে যে অসংখ্য ধূলিকণা দেখা যায়, সেই এক-একটি কণার নাম ত্রসরেণু। আটটি ত্রসরেণু একত্রিত করলে সেই পরিমাণের নাম 'বলাগ্র'। আটটি বলাগ্রে এক 'লিক্ষা'; আটটি লিক্ষায় এক 'যূকা'; আট যূকায় একটি যব এবং আটটি যবে এক অঙ্গুল বা এক অঙ্গুলি। *[মৎস্য পু. ২৫৮.১৭-১৮;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৭.৯৬; ৩.২.১২১;
বায়ু পু. ৮.১০০-১০২; ১০১.১১৯-১২১;
কালিকা পু. ৫২.২৫]

অঙ্গুলীয় মহর্ষি সুকর্মার অন্যতম শিষ্য রাজর্ষি হিরণ্যনাভ সুকর্মার কাছ থেকে যজুর্বেদের পাঁচশত সংহিতা অধ্যয়ন করেন এবং নিজের শিষ্যদের তা অধ্যয়ন করান। রাজর্ষি হিরণ্যনাভের শিষ্যদের মধ্যে অঙ্গুলীয় ছিলেন অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬১.৪৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৫৩]

অঙ্গুষ্ঠ$_{১}$ মহাভারতে প্রত্যেক মানুষের অন্তরাত্মা-স্বরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পুরুষ বলে কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—ক্ষুদ্র প্রমাণ সেই অন্তরাত্মা-স্বরূপ' জীব লিঙ্গদেহ আশ্রয় করে সর্বদা লোকান্তরে গমন করে। যোগীরা ছাড়া এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মাকে কেউ দর্শন করতে পারে না—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো'ন্তরাত্মা/
লিঙ্গস্য যোগেন স যাতি নিত্যম্।/
তমীশমীড্যমনুকল্পমাদ্যং/
পশ্যন্তি মূঢ়া ন বিরাজমানম্।//
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্॥

যোগীগণ যোগবলে এই লিঙ্গদেহকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এই আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কারণ এটি অতি সূক্ষ্ম। এজন্যই কঠশ্রুতিতে একে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হয়েছিল। কঠশ্রুতির এই শ্লোকটিতে সূক্ষ্মশরীরের পরিমাণ নির্দেশ করে বলা হচ্ছে—

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত আত্মা, ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিন কালের নিয়ন্তারূপে দেহভ্যন্তরে অবস্থান করে। বুদ্ধি-অহংকার সহ মন-ইন্দ্রিয় ইত্যাদির নির্বিশেষ আশ্রয়রূপে এক সূক্ষ্মশরীরের কল্পনা করে কঠশ্রুতিতে বলা হয়েছে—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো
বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ॥

কঠ-উপনিষদে এই শ্লোকের ঠিক পরবর্তী শ্লোকে আবারও এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের কথা বলে তাকে অধূমক জ্যোতির মতো বলা হয়েছে। সেই পুরুষ আজও বর্তমান আছেন, কালও বর্তমান থাকবেন। কঠোপনিষদের এই দুটি শ্লোকে উল্লিখিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষই যে অন্তঃকরণ বা সূক্ষ্মশরীর সেটা শঙ্করাচার্য টীকায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। অদ্বৈতবাদী এবং নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী দার্শনিক বলেই তিনি অঙ্গুষ্ঠের এই রূপটিকে বলেছেন 'অন্তঃকরণের উপাধি'। বংশপর্ব বা একটি বাঁশের দুটি পর্বের মধ্যবর্তী আকাশের মতো সূক্ষ্মভাবে এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীবদেহে অবস্থান করে এবং একমাত্র যোগীরাই এই অন্তঃকরণস্বরূপ সূক্ষ্মশরীরকে হৃদয়ে অবধারণ করতে পারেন।

[মহা (k) ৫.৪৬.১৫; (হরি) ৫.৪৬.১৬;
কঠোপনিষদ ২.১.১২]

সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি পরিক্রমায়, পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি ঠিকই, কিন্তু জীবাত্মরূপী পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সাধনের সাধক হিসেবে ইন্দ্রিয়গুলি, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চভূতের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে শরীরান্তরে গমনের পূর্বে পূর্বশরীরস্থিত ইন্দ্রিয়গুলি এবং শুভাশুভ কর্মজনিত সংস্কারগুলি

জীবাত্মার সঙ্গে সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করে কিনা, সে সম্পর্কে সাংখ্য দার্শনিকদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ এবং আলোচনা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এটা মানতে হবে যে, সাংখ্যদর্শনে অন্তঃকরণ, চিত্ত এবং সংস্কার এগুলি স্বীকৃত সত্য। কিন্তু সূক্ষ্মশরীরের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়গুলি কীভাবে এক স্থূলদেহ থেকে অন্য স্থূলদেহে গমন করে সেটাকে কাব্যিক ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে মহাভারতের মনু-বৃহস্পতি সংবাদে। এখানে হরিদাসের টীকায় বলা হয়েছে—মানুষ যেমন স্বপ্নের মধ্যে ভূতল-পতিত নিজের অঙ্গকে অন্যের অঙ্গ বলে দেখে, সেইভাবেই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মা একটি স্থূল দেহত্যাগ করে অন্য একটি স্থূল দেহে গমন করে—

যথাত্মনো'ঙ্গং পতিতং পৃথিব্যাং/
স্বপ্নান্তরে পশ্যতি চাত্মনো'ন্যৎ।
শোত্রাদিযুক্তঃ সুমনাঃ সবুদ্ধি/
লিঙ্গাত্তথা গচ্ছতি লিঙ্গমন্যৎ॥

[মহা (k) ১২.২০২.১৪-১৫;
(হরি) ১২.১৯৫.১৪-১৫]

সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অবস্থান অথবা ইন্দ্রিয়বৃত্তির দেহ থেকে দেহান্তরে গমন সম্বন্ধে উপনিষদ-মহাভারতে যেভাবে বলা হয়েছে, সেটা মহাভারতীয় সাংখ্য দর্শনের কথা বলেই এখানে মনুসংহিতার মতও আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত মনুসংহিতার মধ্যে 'ইন্দ্রিয়' শব্দটি উচ্চারণ করেই সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির অন্তর্ভাব এবং গমনপথের কথা বলা হয়েছে। মনুসংহিতা বলেছে, মহাপ্রলয়ের সময় জীবাত্মা তম অর্থাৎ অজ্ঞানকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে অবস্থান করে। তখন নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কোনো কর্মই করে না এবং তখন সে নিজের পাঞ্চভৌতিক শরীর থেকে উৎক্রমণ করে অর্থাৎ দেহত্যাগ করে সূক্ষ্মশরীর ধারণ করে—

তমো'য়ং তু সমাশ্রিত্য চিরং তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ।
ন চ স্বয়ং কুরুতে কর্ম তদোৎক্রামতি মূর্তিতঃ॥

এর পরবর্তী শ্লোকেই মনু আরো একটু বিশদ করে বুঝিয়ে সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের ভাবনা সংযোগ করে বলেছেন—জীবাত্মা যখন অনুমাত্রিক লিঙ্গ-শরীর যুক্ত হয়ে বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর সৃষ্টির এবং মনুষ্যাদি জঙ্গম সৃষ্টির হেতুভূত স্থাবর ও জঙ্গমের বীজকে সমাশ্রয় করে তখন প্রাণাদির সঙ্গে সংসৃষ্ট হয়ে বৃক্ষ ইত্যাদি অথবা মনুষ্য ইত্যাদির স্থূলরূপ ধারণ করে—

যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাসু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্তিং বিমুঞ্চতি॥

[মনুসংহিতা ১.৫৫-৫৬]

মনুসংহিতার এই অণু-মাত্রিক বীজ-স্বরূপই মহাভারত পুরাণে কথিত সেই লিঙ্গ-শরীর অথবা অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ যেহেতু শরীর থেকে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গুলির চলে যাওয়াটাকে 'উৎক্রমণ' বা 'উৎক্রান্তি' বলেছে এবং মনুও যেহেতু এই 'উৎক্রামতি' শব্দই ব্যবহার করেছেন, তাই মেধাতিথি ভাষ্য রচনার প্রথমে প্রশ্ন তুলেছেন যে, আচ্ছা, আত্মা তো সর্বত্র অবস্থিত—আকাশের মত সর্বব্যাপক। তাই যদি হয়, তবে তার আবার উৎক্রান্তি হয় কেমন করে? কারণ যা স্থান-বিশেষে সীমাবদ্ধ, সেটাই এক স্থান থেকে অন্যত্র গমন করতে পারে। কিন্তু আত্মা বিশ্বব্যাপক, বিভূপরিমাণ বলেই স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, পরিচ্ছিন্ন নয়, সুতরাং তার গমনাগমনও সম্ভব নয়।

এর উত্তরে মেধাতিথি বলেছেন, পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলে বর্তমান দেহ লাভ হয়। এই বর্তমান শরীরের সঙ্গে জীবাত্মার যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, সেটা ত্যাগ হওয়ার নামই উৎক্রান্তি বা উৎক্রমণ। কিন্তু কোনো মূর্তিযুক্ত বস্তুর যেমন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন হয়, আত্মার উৎক্রমণ তেমন নয়। এই মতের সমর্থনে মেধাতিথি এবার তাঁর পূর্ব-সময়ের প্রচলিত দার্শনিক মত উদ্ধার করে বলেছেন—বর্তমান ভোগ শরীর ত্যাগ করা এবং ভবিষ্যৎ ভোগ শরীর গ্রহণ করার অন্তর্বর্তী সময়ে জীবের আলাদা একটি সূক্ষ্ম শরীর তৈরি হয়। তাকে 'আতিবাহিক শরীর' বা 'অন্তরাভব শরীর' বলে। এটা ভোগ শরীর নয়। এটারই উৎক্রান্তি বা গমনাগমন ঘটে। এই সূক্ষ্ম শরীর কারো সঙ্গে সংযুক্ত হয় না, অগ্নি প্রভৃতি একে দগ্ধ করতে পারে না এবং পৃথিবী ইত্যাদি পঞ্চমহাভূতও এই সূক্ষ্মশরীরের গমনাগমনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

সূক্ষ্মশরীরকে পারিভাষিক শব্দে 'আতিবাহিক শরীর' অথবা 'অন্তরাভব শরীর' নামে আখ্যা দিয়ে মেধাতিথি এবং কুল্লূকভট্ট এই আতিবাহিক

শরীরের গঠন কীভাবে হয়, তা বোঝানোর জন্য 'পুর্যষ্টক' বলে ব্রহ্মপুরাণের শ্লোকান্তর্গত একটি শব্দের উল্লেখ করেছেন। আটটি (অষ্টক) স্থান বা পুরী দিয়ে এই 'পুর্যষ্টক' গঠিত হয়। অনাদি সংসারে পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত ধর্মাধর্ম-প্রভাবে প্রত্যেক জীবেরই অন্তবর্তী বাসস্থানস্বরূপ এই সূক্ষ্মশরীর। পুরাণে এইরকম বলা হয়েছে যে, সেই জীব পুর্যষ্টকরূপে লিঙ্গ-শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। একে প্রারব্ধ বলা হয়। জীব যদি এই পুর্যষ্টক দ্বারা বদ্ধ হয়, তবেই তার বন্ধন, আর পুর্যষ্টক থেকে মুক্ত হলেই তার মুক্তি। কী দিয়ে এই আটটি পুরী বা পুর্যষ্টক গঠিত হয়? মেধাতিথি বলেছেন—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি, জ্ঞানেন্দ্রিয় সমষ্টির একক, কর্মেন্দ্রিয় সমষ্টির একক এবং অষ্টম মন—এই আটটি দিয়ে গঠিত হয় পুর্যষ্টক বা লিঙ্গ শরীর অথবা সূক্ষ্ম শরীর।

মনুসংহিতার অন্য এক বিখ্যাত টীকাকার কুল্লুকভট্ট অবশ্য এই সূক্ষ্ম-শরীরের গঠন বর্ণনায় মেধাতিথির মত গ্রহণ করেন নি। পুর্যষ্টক বা সূক্ষ্ম-শরীরের আটটি স্থান তিনিও নির্দেশ করেছেন, কিন্তু সদানন্দ অথবা সনন্দ নামে এক মহাজনের শ্লোক উদ্ধার করে তিনি বলেছেন—পঞ্চভূতের একক সমষ্টি, ইন্দ্রিয়ের একক সমষ্টি, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম, পঞ্চবায়ুর একক সমষ্টি এবং অবিদ্যা—এই আটটি নিয়ে পুর্যষ্টক বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয়। এই লিঙ্গ-শরীরই সূক্ষ্ম 'অন্তরাভব' শরীর, এটাকেই প্রতীকীভাবে অঙ্গুষ্ঠ বলা হয়।

[মনুসংহিতা ১.৫৫-৫৬, মেধাতিথি এবং কুল্লুকভট্টের টীকা দ্রষ্টব্য]

অঙ্গুষ্ঠ$_২$ প্রজাসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্মলাভ করেছিলেন বলে পুরাণগুলিতে বলা হয়েছে—

*অঙ্গুষ্ঠাদ্ ব্রহ্মণো জজ্ঞে দক্ষঃ কিল শুভব্রতঃ।
*দক্ষো ঽঙ্গুষ্ঠাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।

প্রজাপতি ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল দক্ষের পত্নীর—এমনটা ব্রহ্ম পুরাণে আছে।

[ব্রহ্ম পু. ২.৫২; ভাগবত পু. ৩.১২.২৩]

অচল$_১$ গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র তথা শকুনির ভ্রাতা। ধৃতরাষ্ট্রের এই শ্যালককে আমরা সর্বপ্রথম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হতে দেখি। অচলের সঙ্গে তাঁর আর এক ভাই বৃষকের নাম সর্বদা একত্রে উচ্চারিত হতে দেখা যায়—'অচলো বৃষকশ্চৈব' অথবা 'বৃষকাচলৌ' এভাবেই প্রায় সর্বত্র এঁদের উল্লেখ পাই। রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত গান্ধাররাজ সুবলের সঙ্গে এঁরাও ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হন।

[মহা (k) ২.৩৪.৭; (হরি) ২.৩৩.৬]

□ উদ্যোগপর্বে কৌরবপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ মহারথ যোদ্ধাদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ভীষ্ম অচল এবং বৃষকের নাম 'মহারথ' যোদ্ধা বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আগে গান্ধাররাজ সুবলের সঙ্গে এঁদের নাম উচ্চারিত হলেও এঁদের পরিচয় বিশদে বর্ণিত হয়নি। উদ্যোগপর্বেই প্রথম এঁদের গান্ধার দেশের দুই মুখ্য মহারথ যোদ্ধা বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৫.১৬৮.১-২; (হরি) ৫.১৫৭.১-২]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে অর্জুনকে আক্রমণ করার সময় এই দুইভাই একই রথে অবস্থান করছিলেন বলে জানা যায়। কোনো একটা সময়ে যখন দুইভাই একই সরলরেখায় অবস্থান করছিলেন সেইসময় অর্জুন একবাণেই তাঁদের দুজনকে বধ করেন।

[মহা (k) ৭.৩০.১১; (হরি) ৭.২৮.১১]

□ স্ত্রী-পর্বে অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁরও অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়। আশ্রমবাসিক পর্বে যখন মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে তাঁদের পরলোকগত আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান, সে সময় এঁরাও আবির্ভূত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১১.২৬.৩৫; ১৫.৩২.১২; (হরি) ১১.২৬.৩১; ১৫.৩৫.১২]

অচল$_২$ তারকাসুরকে বধ করার সময় যেসব অনুচর যোদ্ধা স্কন্দ-কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

অচল$_৩$ অচল অর্থাৎ স্থির। বলা আছে যে, প্রলয়ের সময় সংবর্তক নামক প্রলয়াগ্নিতে পূর্বকল্পের পর্বতগুলি গলে গিয়েছিল। সেই গলিত পর্বতগুলি হাওয়ার তোড়ে যেসব জায়গায় পড়েছিল, সেখানে প্রলয়-পয়োধির শীতল জলে আবার দানা বেঁধে শক্ত হয়ে স্থির হয়ে যায়। অচল হয়ে যাবার ফলেই তাদের নাম হয় অচল। আর

অচলগুলির মধ্যে বিভিন্ন পর্বসন্ধি আছে বলেই অচলের অন্য নাম পর্বত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৭.১০-১১]

অচল$_{৪}$ একজন ভৈরব।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২০.৮২]

অচল$_{৫}$ কলিযুগে বৃহদ্রথ বংশীয় যেসব রাজা মগধে রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি মগধরাজ মহীনেত্রের পুত্র তথা রিপুঞ্জয়ের পিতা ছিলেন। রাজা অচল বত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। *[মৎস্য পু. ২৭১.২৮]*

অচল$_{৬}$ মহর্ষি প্রত্যূষের পুত্র। ইনি একজন দেবর্ষি ছিলেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ৬১.৮৪]*

অচল$_{৭}$ ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রে যেমন অচল শব্দটিকে আমরা ভগবান বিষ্ণুর নাম হিসেবে উচ্চারিত হতে দেখি তেমনই মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারদের মুখে ভগবানের যে দুশোটি নাম শোনা যায়, তার মধ্যেও অচল অন্যতম। যিনি তাঁর পূর্ণ সত্ত্ব ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে কখনও চ্যুত হন না, যিনি ঐশ্বর্য্য মহত্ত্বাদি ঐশ্বরিক সামর্থ্য থেকেও চ্যুত হন না এবং যিনি তাঁর জ্ঞানময় প্রজ্ঞান-গুণ থেকেও চালিত হন না তিনিই অচল। ভগবান বিষ্ণুও এই একই কারণে অচল নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১২.৩৩৮.৪; ১৩.১৪৯.৯২;
(হরি) ১২.৩২৪.৪; ১৩.১২৭.৯২]

অচলা$_{১}$ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোকসংখ্যা ১৪ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

অচলা$_{২}$ পৃথিবী দৃশ্যত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে বলে পৃথিবীকে অচলা বলা হয়।

[দেবী ভাগবত পু. ৯.১০.২৯]

অচলেশ্বর একটি পার্বত্য তীর্থ। কথিত আছে—শৈলরাজ হিমালয় শিবরুদ্রপুরে অচলেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন—তত্র পিত্রা সুশৈলেন স্থাপিতং স্বচলেশ্বরম্।

[লিঙ্গ পু. (Ed. S. Nagar) ১.৯২.১৬৫]

অচলেশ্বর একটি পবিত্র স্থান। শিব-মহাদেবের পাশাপাশি স্কন্দ কার্তিকেয়ের নামেও স্থানটি প্রসিদ্ধ। অচলেশ্বর তীর্থের কাছে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের মন্দিরও অবস্থিত। বর্তমানে এটি অমৃতসরের বাটালা স্টেশন থেকে চার কিলোমিটার দূরে, পাঠানকোট রেললাইনের উপর অবস্থিত। পঞ্জাবের গুরুদাসপুরে মন্দিরটির বর্তমান অবস্থান। মূল মন্দিরটিতে একটি শিবলিঙ্গ ছাড়াও পার্বতী ও কার্তিকের মূর্তি রয়েছে। কথিত আছে এ হল সেই জায়গা, যেখানে বসুগণ এবং সিদ্ধগণ যজ্ঞ করেছিলেন। গুরু নানকও এখানে তপস্যা করেছিলেন বলে শোনা যায়। এখানে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবম ও দশম দিনে একটি বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

[GEAMI (Bajpai), p. 3;
EAIG (Kapoor), p. 4]

অচলোপম শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। তাঁকে স্থির, নিশ্চল ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা হয় বলে তাঁকে যেমন স্থির, স্থাণু প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হয়, একই ব্রহ্মভাবনা থেকেই তিনি অচলোপম নামেও খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠ অচলোপম নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অচলোপমো নিশ্চলতত্ত্বজ্ঞানীত্যর্থঃ।

তিনি নিশ্চল পরব্রহ্মস্বরূপ, এই জগতের কোনো রহস্যই তাঁর কাছে অজ্ঞাত, অবিদিত নেই—এই কারণেই তিনি অচলোপম নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১২৬; (হরি) ১৩.১৬.১২৫]

অচিন্ত্য শিব মহাদেবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনাম স্তোত্রে দুবার অচিন্ত্য শব্দটি মহাদেবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। অচিন্ত্য শব্দের অর্থ যাঁকে তর্ক-যুক্তি-চিন্তার দ্বারা স্বপ্রমাণ করা বা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পণ্ডিতরা মত প্রকাশ করেন যে, যা কিছু তর্কের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, তাই অচিন্ত্য, যা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, তাই অচিন্ত্য—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

[মহা (k) ৬.৫.১১; (হরি) ৬.৫.১১]

উপনিষদে ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—যে পরমাত্মা জীবের অন্তরে জীবাত্মা রূপে নিহিত আছেন, তিনি যেমন অণুর চেয়েও অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর, তেমনই আকাশের থেকেও বিশাল, ব্যাপক—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।

[কঠোপনিষদ ১.২.২০]

ফলে তাঁকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না, চিন্তার মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ করা যায় না—

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

[কেনোপনিষদ ১.৫]

এই ভাবনা থেকেই ব্রহ্মকে অচিন্ত্য বা চিন্তার অতীত বলা হয়। মহাদেবকেও সেই অচিন্ত্য ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মক-রূপে কল্পনা করেই অচিন্ত্য নামে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে—

অচিন্ত্যঃ চিন্ত্যাদুপাস্যাদন্যঃ প্রত্যগাত্মবান্ তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ইতি শ্রুতেশ্চ।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪৭, ১৫২;
(হরি) ১৩.১৬.১৪৬, ১৫১]

যা কিছু জগৎ-প্রকৃতির বাইরে তাকে অচিন্ত্য বলে। তর্ক এবং গবেষণার দ্বারাই অচিন্ত্য বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করতে হয়। *[মৎস্য পু. ১১৩.৬]*

অচীরবতী পৌরাণিক অযোধ্যার ওপর দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী রাপ্তী, যার অন্য নাম অচীরবতী বা ঐরাবতী। প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরীটি অচীরবতী নদীর তীরে অবস্থিত বলে পণ্ডিতদের ধারণা। অনুমান করা যেতে পারে অযোধ্যাস্থিত রাপ্তী নদী তীরবর্তী এই ঘাটটির বা নদী অঞ্চলটির নামই আসলে অচীরবতী। সরযূ নদীর উপনদী রাপ্তী বা প্রাচীন অচীরবতী উত্তরপ্রদেশের বাহারাইচ (Bahraich), গোন্দা (Gonda) এবং বস্তি (Basti) জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোরক্ষপুরের বাহারাজ (Baharaj) অঞ্চলের কাছে সরযূর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অচীরবতী নদী তীরবর্তী প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরী বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, রাপ্তী বা অচীরবতী নদীতে প্রাচীনকালে সন্ন্যাসিনীরা চীর বা বল্কলবস্ত্র পরিহার করে স্নান করতেন, সেই কারণেই নদীটির নাম অচীরবতী। বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার সম্বলিত এই নগরীটির ক্ষেত্রে এমন অনুমান করাই যেতে পারে যে, অচীরবতীর নদী অঞ্চলই হয়তো শ্রাবস্তী। *[বরাহ পু. ২১৪.৪৭;*
GDAMI (Dey) p. 1, 3. 189-190]

অচেতনা মনুর পত্নী। তবে ইনি কোন্ মন্বন্তরাধিপতি মনুর পত্নী ছিলেন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৮২]*

অচ্ছাবাক বৈদিক সোমযাগের অনুষ্ঠানে ঋগ্‌বেদের ঋত্বিক্ হোতা যখন শাস্ত্রপাঠ করেন, তখন তিনজন ঋত্বিক্ হোতাকে সাহায্য করেন। এই তিন সহকারী ঋত্বিকের মধ্যে একজন হলেন অচ্ছাবাক, অন্য দুজন—মৈত্রাবরুণ এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। এই তিনজন সহকারীকে একসঙ্গে 'হোত্রক' বলা হয়। সোমযাগ অনুষ্ঠানের জন্য যে মহাবেদি তৈরি করা হয়, তার পশ্চিমে সদঃশালা বলে একটি মণ্ডপ থাকে। সেই মণ্ডপে একই সারিতে পর পর ছয়টি গোলাকার বা চতুষ্কোণের আকারে অগ্নিস্থান তৈরি করতে হয়। এই অগ্নিস্থানের নাম ধিষ্ণ্য। সোমযাগের সময় অচ্ছাবাক, নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, হোতা এবং মৈত্রাবরুণ—এই ছয়জন ঋত্বিক পর পর ওই ছয়টি অগ্নিস্থানে বসে মন্ত্রপাঠ করেন। সদঃশালার মণ্ডপে প্রথম যে অগ্নিস্থান ভূমিতে তৈরি করা হয়, যার সামনে বসে অচ্ছাবাক শাস্ত্রপাঠ করেন, সেই অগ্নিস্থানের অগ্নিকে ভুবঃস্থানীয় অগ্নি বলে নির্দেশ করা হয়েছে বায়ুপুরাণে। 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' ইত্যাদি দৈব লোকের মধ্যে ভুবঃস্থানীয় অগ্নি অচ্ছাবাকের সঙ্গে সংপৃক্ত। *[বায়ু পু. ২৯.২৮]*

অচ্ছোদ পুরাণ-প্রসিদ্ধ সরোবরগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। মানস এবং বিন্দু-সরোবরের সম-মর্যাদা সম্পন্ন এক সরোবর। উচ্চারণের ভিন্নতায় কখনও অক্ষোদ নামে পঠিত।

[দেবীভাগবত পু. ৬.১২.১০-১১]

অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণ এই সরোবর খনন করেন। কৈলাস পর্বতের পূর্বোত্তর দিকে চন্দ্রপ্রভ নামক পর্বতের সম্মুখে অবস্থিত এই সরোবর অচ্ছোদা নদীর উৎস।

[মৎস্য পু. ১৪.৩; ১২১.৬-৭; বায়ু পু. ৪৭.
৫-৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৬; ২.১০.৫৪]

এই সরোবরে অধিষ্ঠিতা দেবীর নাম শিবধারিণী। *[দেবীভাগবত ৭.৩০.৭৯]*

আধুনিক মতে এই সরোবর তিব্বতে অবস্থিত। চন্দ্রপ্রভ পর্বত সম্ভবত কৈলাস পর্বতমালার উত্তরপূর্বে অবস্থিত Surange La. এই মত মানলে অচ্ছোদ সরোবরের অবস্থিতি তিব্বতেই। অন্য এক দল পণ্ডিতের মতে অচ্ছোদ সরোবর কাশ্মীরে অবস্থিত এবং এর আধুনিক নাম অচ্ছাবল। মার্তণ্ড, আধুনিক মর্তন বা মতন

থেকে এই সরোবর ১০ মাইল দূরে, অনন্তনাগ থেকে ১৫ মাইল। বাণভট্টের কাদম্বরীতে অচ্ছোদ সরোবরের লোকোত্তর বর্ণনা থেকেও মনে হয়—এই সরোবর কাশ্মীরেই।

[GP (Ali), p. 65; GDAMI (Dey), p. 1; GD (Bhattacharya) p. 46; GEAMI p. 3]

একটি পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী পাঁচ গন্ধর্বকন্যা কুবেরের রাজপ্রাসাদে বিবিধ ক্রীড়া কৌতুকে দিন কাটাত। একদিন তারা ভগবতী গৌরীর পূজার জন্য ফুল তুলতে আসে অচ্ছোদ সরোবরে। সেখান থেকে স্বর্ণপদ্ম তুলে গন্ধর্বকন্যারা নৃত্যগীতে মত্ত হয়ে উঠল। ঠিক এই সময়ে মহর্ষি বেদনিধির জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করতে আসেন। কন্যারা হাব-ভাব লাস্যে মুনিকে ভুলিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। বেদনিধির পুত্র বললেন যে, তিনি ব্রহ্মচারী, গুরুকুলে শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিবাহ করতে পারবেন না। গন্ধর্বকন্যারা তাঁর কথায় কান না দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা চালিয়েই গেল। এতে ক্রোধান্বিত মুনি তাদের পিশাচী হবার অভিশাপ দিলেন। প্রত্যুত্তরে গন্ধর্বকন্যারাও বেদনিধির পুত্রকে পিশাচ হবার অভিশাপ দিল। এরা সকলেই অচ্ছোদ সরোবরের তীরে পিশাচ-পিশাচী হয়ে রইলেন। পরে লোমশ মুনির কৃপায় নর্মদার মাহাত্ম্যে সকলেই শাপমুক্ত হলেন।

[পদ্ম পু.(স্বর্গ) ১০.২৬-১২৪]

অচ্ছোদা অচ্ছোদ সরোবর থেকে এই নদী নির্গত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১২১.৭; বায়ু পু. ৪৭.৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৬; ২.১০.৫৪]*

এই নদীর তীরেই বিখ্যাত চৈত্ররথ বন। পুরাণ কাহিনী অনুসারে অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবপিতৃগণের মানসী কন্যা অচ্ছোদা। ইনি নদীরূপা। অন্য নাম অচ্ছোদিকা। *[মৎস্য পু. ১২১.৭-৯]*

□ অচ্ছোদা হাজার বছর ধরে তপস্যা করলে পিতৃগণ তাঁকে বর দিতে আসেন। পিতৃগণের প্রত্যেকেই যুবক, রূপবান এবং সুসজ্জিত। অচ্ছোদা তাঁদের মধ্যে অমাবসু নামে এক দেবপিতাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করেন। এই অন্যায়ের ফলে যোগভ্রষ্টা হয়ে অচ্ছোদা মর্ত্যলোকে পতিত হন। অমাবসু নিজস্ব ধৈর্য্যগুণে অচ্ছোদার সঙ্গ পরিহার করেন। যত্নার্জিত তপস্যার ফল এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল দেখে অচ্ছোদা লজ্জিত হয়ে পিতৃগণের কাছে ভবিষ্যৎ-খ্যাতির জন্য প্রার্থনা জানান। পিতৃগণ জানালেন যে, তাঁকে মৎস্যযোনিতে জন্মাতে হবে। তবে সেই সময়ে অচ্ছোদা বসু রাজার কন্যা বলে পরিচিত হবেন এবং তাঁর নাম হবে সত্যবতী। তিনি পরাশর মুনির ঔরসে দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সন্তান হিসেবে লাভ করবেন। পরে আবার শান্তনুর পত্নীপদ লাভ করে তিনি বিচিত্রবীর্য্য এবং চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্রের জননী হবেন। পিতৃগণ এবার তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন—মৃত্যুর পর প্রোষ্ঠপদ নক্ষত্রে পিতৃলোকে তাঁর আগমন ঘটবে এবং সেখানে তাঁর নাম হবে অষ্টকা। পরবর্তীকালে মর্ত্যলোকে তিনি অচ্ছোদা নদীরূপে বিরাজ করবেন।

[মৎস্য পু. ১৪. ১-২০; ১২১.৭-৯; বায়ু পু. ৭৩.২-২১]

অচ্যুত বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে মোট তিনবার ভগবান শ্রীহরি অচ্যুত নামে সম্বোধিত হয়েছেন। এছাড়াও মহাকাব্য-পুরাণে বহুবার ভগবানের 'অচ্যুত' নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২৪, ৪৮, ৭২; (হরি) ১৩.১২৭.২৪, ৪৮, ৭২]

অচ্যুতস্থল প্রাচীনকালে অন্ত্যজ জনজাতি অধ্যুষিত স্থানকে অচ্যুতস্থল বলা হত। এটি একটি সাধারণ বিশেষণ বিশেষ। মহাভারতে অচ্যুতস্থল নামে বিশেষিত স্থানগুলিতে বসবাসের অনুপযোগী বলা হয়েছে।

যুগন্ধরে দধি প্রাশ্য উষিত্বা চাচ্যুতস্থলে।
তদ্বদ্ভূত লয়ে স্নাত্বা সপুত্রা বস্তুমর্হসি॥

অচ্যুতস্থলে বাস করলে পাপক্ষয়ের জন্য বিশেষ আরাধনার প্রয়োজন হয়। যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আর্য সংস্কৃতি এবং সভ্যতা বহির্ভূত অনার্য শ্রেণী অধ্যুষিত স্থানগুলিই অচ্যুতস্থল নামে পরিচিত ছিল।

[মহা (k) ৩.১২৯.৯; (হরি) ৩.১০৬.৯: বামন পু. ৩৪.৪৭]

□ অচ্যুতস্থলে বাস করলে স্বর্গলাভ হয় না।

[মহা (k) ৮.৪৫.৯৯; (হরি) ৮.৩৪.৯৯]

অচ্যুতায়ুস্ (অচ্যুতায়ু) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৌরব-পক্ষের এক যোদ্ধা। প্রায়ই শ্রুতায়ুঃ-(শ্রুতায়ুস্) এর সঙ্গে এঁর নাম উল্লিখিত। এঁদের দুজনকেই

খুব বলবান এবং মহাকুলজাত বলা হলেও এঁরা ঠিক কোন দেশের রাজা সেটা বলা হয়নি। তবে নামানুক্রমে যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে শ্রুতায়ুকে বড়ো ভাই বলে মনে হয়। বাম এবং দক্ষিণ দিক থেকে যথাক্রমে শ্রুতায়ু এবং অচ্যুতায়ু অর্জুনকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিলেন। শ্রুতায়ু-নিক্ষিপ্ত তোমর এবং অচ্যুতায়ুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত শূল অর্জুনকে খানিক সময়ের জন্য রথের ধ্বজদণ্ড ধরে বসে পড়তে বাধ্য করেছিল এমনকি সারথি কৃষ্ণকেও একটু বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিলে। একটু পরেই অবশ্য অর্জুন নিজেকে সামলে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল—যমালয়ে পৌঁছেও যেন ফিরে এসেছেন—

প্রেতরাজপুরং প্রাপ্য পুনঃ প্রত্যাগতো যথা।

অর্জুন এই দুইজনকে হাত কেটে গলা কেটে মেরে ফেলেন।

শ্রুতায়ুর পুত্র নিয়তায়ু এবং অচ্যুতায়ুর পুত্র দীর্ঘায়ু। এঁরাও পিতৃবধে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে এলে অর্জুনের বাণে মারা যান।

[মহা (k) ৭.৯৩.৭-২৯; (হরি) ৭.৯০.৭-২৫]

অজ$_{১}$ যিনি কোনোদিন জন্মাননি, যিনি কখনো জন্মাবেন না এবং জন্মানও-না কখনো, সমস্ত প্রাণীবর্গের যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ, তিনি অজ—

নহি জাতো ন জায়েয়ং ন জনিষ্যে কদাচন।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানাং তস্মাদহম্ অজঃ স্মৃতঃ।

[মহা (k) ১২.৩৪২.৭৪; (হরি) ১২.৩২৮.২৬০]

পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে যার জন্ম হয় না। যাঁর জন্মদাতা নেই, যিনি জন্মরহিত, তিনি অজ—

ন জায়তে জনিত্রায়ম্ অজস্তস্মাৎ।

[মহা (k) ৫.৭০.৮; (হরি) ৫.৬৬.৫৪]

ভগবান শিব, বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের সঙ্গে বেশির ভাগ সময়েই সমীকৃত।

[মহা (k) ২.১৩.৩৭; ৩.১২.২২; ১২.৩৪৬.২১; (হরি) ২.১৩.৩৮; ৩.১১.২২; ১২.৩৩০.৪৭; বিশদে বোঝার জন্য ভগবদ্গীতার ৪.৬নং শ্লোকে নীলকণ্ঠের টীকা দ্র.]

অজ$_{২}$ ঋগ্বেদে উল্লিখিত একটি জনজাতির নাম। শিগ্রু, যক্ষু—এই দুই জনজাতির সঙ্গে অজদের নাম করা হয়েছে বহুবচনে—

অজাসশ্চ শিগ্রবো যক্ষবশ্চ/বলিং শীর্ষাণি জভ্রুরশ্ব্যানি। *[ঋগ্বেদ, ৭.১৮.১৯]*

মনে হয়, অজগণ, শিগ্রু যক্ষুরা ত্রিৎসু এবং পৈজবন সুদাসের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। ঋগ্বেদের এই মন্ত্র-সূত্র থেকে হাইনরিখ জিমার মন্তব্য করেছেন যে, অজ-শিগ্রু-যক্ষু-রা 'ভেদ'-নামক এক জনগোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিলেন সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।

[দ্র. Vedic Index, vol.I, p. 12]

অজ$_{৩}$ ছাগ। বৈদিক ভাবনায় পূষা (পূষণ্)-র বাহন—তাঁর নামের সম্বোধন এখানে 'অজাশ্ব'-অর্থাৎ অজ বা ছাগকে যিনি অশ্বের মতো বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। *[ঋগ্বেদ, ১.১৩৮.৪]*

বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের আগে আগে ছাগ নিয়ে যাওয়া হত। ভাবা হত—যজ্ঞীয় অশ্বের বলি হবার পর ছাগটিই তাকে পরলোকের পথ দেখিয়ে যাবে। *[ঋগ্বেদ, ১.১৬৮.২-৪]*

এমনকি মানুষের মৃত্যুপথেও অজ বা ছাগের একটি ভূমিকা বর্ণনা করেছে অথর্ববেদ। শবদাহের সময় প্রেত মানুষটির শরীরে অগ্নির অত্যুগ্র তাপটুকু যাতে না লাগে, যাতে একটি অজই সে তাপ প্রথমে গ্রহণ করে, সেজন্য অজ বা ছাগের একটা ভূমিকা তৈরি হয়েছে অথর্ববেদে—

অজং যন্তমনু তাঃ সমৃণ্বতাম্।
অথেতরাভিঃ শিবতমাভিঃ শৃতং কৃধি।

[অথর্ববেদ (হরফ) ২.১.৮-৯, পৃ. ৩৪৭]

অজ$_{৪}$ রামায়ণে আদিকবির মন্তব্যে নাভাগের পুত্র অজ—নাভাগস্য বভূবাজঃ।

[রামায়ণ, ১.৭০.৪৩]

কিন্তু বেশির ভাগ পুরাণে অজ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রঘুর পুত্র এবং তিনি দশরথের পিতা।

[ভাগবত পু. ৯.১০.১; ব্রহ্মাণ্ড পু.২.৬৩.১৮৪; বায়ু পু. ৮৮.১৮৩; বিষ্ণু পু.৪.৪.৮৫-৮৬; বৃহদ্ধর্ম পু. ২.২৯.২৯]

মৎস্য পুরাণ-মতে দিলীপের পুত্রের নামই অজ বা অজক, অজের পুত্র দীর্ঘবাহু, তাঁর পুত্র অজপাল এবং অজপালের পুত্র দশরথ।

[মৎস্য পু. ১২.৪৮-৪৯]

মহারাজ অজের জন্ম এবং জীবন-বর্ণনা রামায়ণে এবং পুরাণগুলিতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের কবি কালিদাস অজের জীবন যেভাবেই কল্পনা করে থাকুন, সেটার পৌরাণিকতা ভিত্তিহীন নয় বলেই কবির

মনোভূমির প্রামাণিকতায় বলা যায়—রাজা রঘু ব্রাহ্ম-মুহূর্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহরে পুত্রলাভ করেছিলেন বলে, ব্রহ্মার নামানুসারে পুত্রের নাম রাখলেন অজ—অতঃ পিতা ব্রহ্মণ এব নাম্না/তমাত্মজন্মানম্ অজং চকার। রঘুবংশ অনুসারে পিতার ইচ্ছায় অজ বিদর্ভনগরে যান ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে। বিদর্ভে যাবার পথে রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হয়ে যখন বিশ্রাম করছেন, তখন একটি বন্য হস্তী তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত করে এবং তাঁর আদেশে সেই হস্তীটিকে হত্যা করা হয়। হস্তীটি মারা-যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে এক তেজঃপুঞ্জময় গন্ধর্বে পরিণত হল। গন্ধর্ব বলল—পূর্বে একটি মহান ব্যক্তিকে তিনি কোনো এক সময় অপমান করেছিলেন বলেই তিনি তাঁকে এক মত্ত হস্তীতে পরিণত করেন। অভিশাপের মুক্তি হিসেবে অজের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই সেই মহাপ্রাণ মানুষটির অভিপ্রেত ছিল। আপন মুক্তির কৃতজ্ঞতা-হেতু গন্ধর্ব কতগুলি অমোঘ বাণ দিলেন অজকে এবং বললেন—ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পরবর্তী কালে ক্ষিপ্ত নৃপতিদের জয় করার জন্য বাণগুলি তাঁর কাজে লাগবে। স্বয়ংবর-শেষে যুদ্ধ জিতে অজ ইন্দুমতীকে নিয়ে রাজধানী ফিরলেন। রঘু তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করলেন। কিছুকাল সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করার পর ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথের জন্ম হল। তারপর একদিন দেবর্ষি নারদের বীণাখণ্ডে রাখা পুষ্পমালা এসে পড়ল ইন্দুমতীর গায়ে; ইন্দুমতী মারা গেলেন তাতেই। রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর এবং ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর অজের বিলাপ—এই দুটিই অপূর্ব কাব্যময়তায় শেষ হয়েছে। রামায়ণে অজের বানপ্রস্থযাত্রার কথাও নেই, দশরথকে অজ কীভাবে সিংহাসনে বসিয়ে গেলেন—সে-কথাও নেই। তবে রঘুবংশীয়দের 'বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি'-র পূর্বোদাহরণগুলি কালিদাস উচ্চারণ করেছেন বলেই আমরা মনে করি—তিনি দশরথকে সিংহাসনকে বসিয়ে মুনিবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

[রঘুবংশম্ ৫.৬ষ্ঠ থেকে ৮ম সর্গ]

অজ$_{৫}$ পাণ্ডবদের জন্য যুদ্ধ করতে এসেছেন এরকম একজন যোদ্ধা, ভীষ্ম যাকে মহারথ সংজ্ঞায় ভূষিত করেছেন।

[মহা (k) ৫.১৭১.১২; (হরি) ৫.১৬০.১২]

অজ$_{৬}$ সূর্যকে অজ বলা হয়েছে, হয়তো 'অনাদিনিধন'—আদি নেই, নিধন নেই, বলে—

গভস্তিমান্ অজঃ কালঃ।

[মহা (k) ৩.৩.১৬; (হরি) ৩.৩.১৬]

অজ$_{৭}$ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নাম।

[মহা (k) ১২.২৩২.২৬; ১২.২৩৯.৩৩; ১২.২৪০.৩৫; (হরি) ১২.২২৯.৮৮; ১২.২৩৬.৩৩; ১২.২৩৭.৩৪; বায়ু পু. ৭৩.৬২; ৯৮.৫৪; ভাগবত পু. ২.১৪.১৯]

অজ$_{৮}$ বিষ্ণুর সহস্রনামের একটি। জন্মরহিত, অনাদিঅনন্ত বিভূতত্ত্বের সঙ্গে একাত্মক বলেই এটা বিষ্ণুর নাম। *[দ্র. অজ$_{১}$]*

[মহা (k) ১২.৩৪০.১০১; ১৩.১৪৯.২৪, ৩৫, ৬৯; (হরি) ১২.৩২৬.৯৫; ১৩.১২৭.২৪, ৩৫, ৬৯]

অজ$_{৯}$ শিব মহেশ্বর। *[দ্র. অজ$_{১}$]*

[মহা (k) ১০.৭.৩; ১৪.৮.২১,৩১; ১৩.১৭.৪৬; (হরি) ১০.৮.৩; ১৪.৮. ২২, ৩২; ১৩.১৬.৪৬]

অজ$_{১০}$ পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনের পরেও গর্ভাবস্থায় স্থিত যেসব ক্ষত্রিয় রাজার সৃষ্টি হয়েছিল, জহ্নুর ছেলে অজ তাঁদের একজন।

[মহা (k) ১২.৪৯.২-৩; (হরি) ১২.৪৮.২-৩]

অজ$_{১১}$ যেসব বিখ্যাত রাজা বৃথা মাংসভক্ষণ বর্জন করেছিলেন, বিশেষ করে শারদ কৌমুদ মাসে, অর্থাৎ কার্তিক মাসে যাঁরা মাংস বর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন। মনে হয় ইনি দশরথের পিতা অজ।

[মহা (k) ১৩.১১৫.৭৫; (হরি) ১৩.১০০.১০৪]

অজ$_{১২}$ কখনো বহুবচনে ব্যবহৃত। বালখিল্যদের মতো একপ্রকার ঋষিদের গণ। এমনটাই মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বুঝিয়েছেন—

অজাদয়ঃ বালখিল্যবদ্ ঋষীণাং গণবিশেষাঃ।

[মহা (k) ১২.২৬.৭; ১.২১১.৫; (হরি) ১২.২৬.৭; ১.২০৪.৫]

অজ$_{১৩}$ ভাগবত পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীধ্রের বংশধারায় ভগবান ঋষভদেবের পুত্র ছিলেন রাজর্ষি ভরত। ভরতের বংশে অন্যতম অধস্তন পুরুষ হলেন প্রতিহর্তা। প্রতিহর্তার ঔরসে স্তুতির পুত্রের নাম অজ। *[ভাগবত পু. ৫.১৫.৫]*

অজ$_{১৪}$ ভূত একজন মুনি। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর সঙ্গে তাঁর দুটি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। এক কন্যার নাম সরূপা (একমতে সুরভি)। ভূতের ঔরসে সরূপার গর্ভে একাদশ রুদ্রের জন্ম হয়, তাঁদের

মধ্যে অজ একজন। প্রত্যেক রুদ্রই অনেকগুলি রুদ্রের অধিপতি অর্থাৎ গণাধিপতি। তার মানে অজ-ও একজন গণাধিপতি।

[ভাগবত পু. ৬.৬.২. ১৭-১৮; অগ্নি পু. ১৮.৪২-৪৪]

অজ$_{১৫}$ সূর্য বংশীয় নিমির অধস্তন পুরুষ। ঊর্ধ্বকেতু জনকের পুত্র, পুরুজিৎ জনকের পিতা।

[ভাগবত পু. ৯.১৩.২২]

অজ$_{১৬}$ দ্বিতীয় মন্বন্তরে, যখন স্বারোচিষ মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা তুষিত এবং পারাবত নামে দুটি গণে বিভক্ত ছিলেন। তুষিত গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অজ একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১০]*

অজ$_{১৭}$ তৃতীয় মন্বন্তরের অধিপতি উত্তম (অথবা ঔত্তম) মনুর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩৯; বায়ু পু. ৬১.১৮৫; ৬২.৯.৩৪; বিষ্ণু পু. ৩.১.১৫; মার্কণ্ডেয় পু. ৭৩.১০]

অজ$_{১৮}$ কুমার কার্তিকেয়র বিশেষণ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৪৮]

অজ$_{১৯}$ চন্দ্রের রথের একটি ঘোড়ার নাম।

[মৎস্য পু. ১২৬.৫২]

অজ$_{২০}$ রাত্রির একটি অংশ। পনেরোটি রাত্রি-মুহূর্তের মধ্যে প্রথমটির নাম। *[বায়ু পু. ৬৬.৪৩]*

অজ$_{২১}$ ভৃগুর পুত্র। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে দেবীর গর্ভে বারোজন ভৃগুবংশীয় সোমপায়ী দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। অজ তাঁদের মধ্যেই একজন।

[বায়ু পু. ৬৫.৮৭]

অজ$_{২২}$ এক দানবের নাম। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৮.১১]

অজ$_{২৩}$ একজন পিশাচ। তাঁর কন্যার নাম ব্রহ্মধনা। খণ্ড নামে অজের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

[বায়ু পু. ৬৯.১২১-১২৩]

অজ$_{২৪}$ অমৃত মন্থনের সময় সমুদ্র থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়েছিল, তাদের মধ্যে ধন্বন্তরিই প্রথম সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হন। এই কারণে ব্রহ্মা ধন্বন্তরিকে অজ বলে সম্বোধন করেছেন। যিনি জন্মান না অথচ মনুষ্যরূপে জন্মেছেন, হয়তো এই অলৌকিক বুদ্ধিতেই ধন্বন্তরিকে অজ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *[বায়ু পু. ৯২.১০]*

অজক$_{১}$ ভাগবত পুরাণ মতে উর্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিজয়। এই বিজয়ের বংশেই রাজর্ষি জহ্নু জন্মগ্রহণ করেন। ভাগবত পুরাণ মতে জহ্নুর পুত্র ছিলেন পুরু, পুরুর পুত্র বলাক এবং বলাকের পুত্র অজক। অজক কুশ নামে এক পুত্র লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.১৫.৩-৪]

অন্যান্য পুরাণ মতে জহ্নুর পুত্র ছিলেন সুহোত্র বা সুনহ। বিষ্ণু পুরাণে জহ্নুর পুত্র সুজহ্নু নামে চিহ্নিত হয়েছেন। এই সুহোত্র বা সুজহ্নুর পুত্রই ছিলেন অজক। অজকের পুত্রের নাম বলাকাশ্ব ছিল বলে জানা যায়। *[বিষ্ণু পু. ৪.৭.৩; বায়ু পু. ৯১.৬০-৬১: ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৩০]*

অজক$_{২}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে দ্বাপর যুগে অজক দানবের অংশে শাল্ব রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দানবরাজ বৃষপর্বা নামে যে বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাঁর ছোটো ভাই ছিলেন অজক। তিনি নিজেও কোথাও রাজা ছিলেন এবং মল্লযুদ্ধে তাঁর বিরাট খ্যাতি ছিল। তাঁরই অংশে শাল্ব-রাজার জন্ম।

[মহা (k)১.৬৫.২৪; ১.৬৭.১৬-১৭; (হরি) ১.৬০.২৪; ১.৬২.১৭; কালিকা পু. ৩৪.৫৪]

অজক$_{৩}$ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা রঘুর পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ছিলেন অজক।

[মৎস্য পু. ১২.৪৮]

অজক$_{৪}$ বায়ু পুরাণে কলিযুগে যেসব রাজা রাজত্ব করেন তাঁদের একটি তালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকা অনুযায়ী বৃহদ্রথ বংশের শাসনকালের অবসানে রাজা প্রদ্যোতের বংশে জনৈক অজকের রাজত্বকালের উল্লেখ পাই। ইনি একুশ বছর (মতান্তরে একত্রিশ বছর) রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।

[বায়ু পু. ৯৯.৩১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১২৬]

অজক$_{৫}$ বৈবস্বত যমের সভায় যে-সমস্ত রাজর্ষিদের দেখা যেত তাঁদের মধ্যে অজক একজন।

[মহাভারত (Critical Ed.) ২.৮.২০]

অজকর্ণ ময় দানবের পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.২৯]

অজগন্ধা মৌনেয় অপ্সরাদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৮]

অজগবম্ *[দ্র. আজগব]*

অজগর পূর্বজন্মে মহারাজ নহুষ। অগস্ত্য শাপে সর্পরূপ লাভ করে তিনি বিশালকায় এক অজগরে পরিণত হন। অজগর-নহুষ ভীমকে নিজের শক্তিতে অভিভূত করে আটকে রাখেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলার আশায়। শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, কথা হয়, এবং তিনি শাপমুক্ত হন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অজগরের কথোপকথন দার্শনিক তাৎপর্যে চিহ্নিত অজগর পর্ব।

[মহা (k) ৯.১৭৮.২৮-৩৩; ৩.১৭৯-১৮১ অধ্যায়; (হরি) ৩.১৪৯.২৩-৩২; ৩.১৫০-১৫২ অধ্যায়]

অজতুঙ্গ শ্রাদ্ধকর্মের উপযুক্ত তীর্থ। এখানে বিরজা নামক বৃক্ষ আছে। এখানে পর্বে পর্বে দেবতাদের ছায়া দেখা যায়। পাণ্ডবরা এখানে পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.৪৮; বায়ু পু. ৭৭.৪৮]*

অজন$_{১}$ বুদ্ধের পিতা-মাতা। 'বুদ্ধো নাম্না'জনসুতঃ' এইখানে 'অজন-সুত'-এর জায়গায় 'বুদ্ধো নাম্না জিন-সুতঃ' পাঠও আছে। অধিকাংশ টীকাকার সেইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

[ভাগবত পু. ১.৩.২৪]

অজন$_{২}$ ভগবান কৃষ্ণের একটি নাম। বস্তুত 'অজন'-শব্দের অর্থ জন্মরহিত, অজ। নারায়ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি ভগবৎস্বরূপকে 'অজ', 'অজন' বলা হয় বলেই কৃষ্ণের লীলাভাবিত জন্মটাও অজন থেকে, তিনি অজন-জন্মা।

[ভাগবত পু. ১০.৩.১, ৫; ১০.৬.২৩]

অজন$_{৩}$ বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে যে তেরোজন দানব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অজন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভাগ্নে। *[মৎস্য পু. ৬.২৭]*

অজনাভ ঋষভ-বর্ষ, পরবর্তীকালে ভারত নামে খ্যাত। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে এর উল্লেখ রয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৩২; (হরি) ১৩.১৪৩.৩২; ভাগবত পু. ৫.৪.৩; ৫.৭.৩; ৯.২.২৪]

অজপার্শ্ব পিতা কুরুবংশীয় রাজা জনমেজয়ের প্রপৌত্র শ্বেতকর্ণ, মাতা যদুবংশীয় সুচারুর কন্যা মানিনী। শ্বেতকর্ণ রাজা অপুত্রক ছিলেন। পুত্র না হওয়ায় দুঃখিত রাজা রাজ্য ত্যাগ করে তপোবনে চলে যান এবং তপস্যা অরম্ভ করেন। এইসময় তপোবনে বসবাসকালে মানিনী গর্ভবতী হলেন। রাজা শ্বেতকর্ণ পূর্বপুরুষ পাণ্ডবদের অনুসরণে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলে তাঁর গর্ভবতী পত্নী মানিনী স্বামীর অনুগমন করলেন। পথে তিনি এক পুত্রসন্তানের জন্মদান করেন। কিন্তু পতিব্রতা মানিনী পুত্রের দিকে না তাকিয়ে মহাপ্রস্থানের পথযাত্রী স্বামীকে অনুসরণ করতে লাগলেন। মানিনী নবজাতক রাজকুমারকে ত্যাগ করলে সেই পার্বত্যদেশে মেঘ এসে সেই শিশুর উপর ছায়া বিছিয়ে দিল। শ্রবিষ্ঠার পুত্র পিপ্পলাদ ও কৌশিক সেই নবজাতক রাজকুমারকে অন্য এক ঋষির আশ্রমে প্রতিপালন করেন। তাঁরা সেই রক্তস্নাত নবজাতককে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করার সময় পাথরে ঘর্ষণ করেছিলেন বলে সেই বালকের পার্শ্বদ্বয় অজ বা ছাগলের মত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। তাই তাঁর নাম হল অজপার্শ্ব—

অজশ্যামৌ তু পার্শ্বৌ তাবুভাবপি সমাহিতৌ।
তথৈব তু সমারূঢ়ৌ অজপার্শ্বস্ততো'ভবৎ॥

মহর্ষি বেমকের আশ্রমে প্রতিপালিত অজপার্শ্বকে ঋষিপত্নী পুত্রের মতোই স্নেহ করতেন। তাই অজপার্শ্ব বেমক-পত্নীর পুত্র বলেই পরিচিত হয়েছিলেন।

[হরিবংশ পু. ৩.১.৭-১৫]

অজপাল মৎস্য পুরাণ মতে অজ-র পুত্র এবং দশরথের পিতা অজপাল। *[মৎস্য পু. ১২.৪৯]*

অজবক্ত্র স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

অজবস্ত মহর্ষি সুকর্মার অন্যতম শিষ্য রাজর্ষি হিরণ্যনাভ সুকর্মার কাছ থেকে যজুর্বেদের পাঁচশত সংহিতা অধ্যয়ন করেন এবং নিজের শিষ্যদের তা অধ্যয়ন করান। রাজর্ষি হিরণ্যনাভের শিষ্যদের মধ্যে অজবস্ত ছিলেন অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬১.৪৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৫২]

অজবিন্দু যে সমস্ত দুর্বৃত্ত রাজারা অহংকারী হয়ে নিজেদের স্বজন-জ্ঞাতিদের উচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন, ভীম তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন দুর্যোধনের জ্ঞাতিচ্ছেদী স্বভাবের প্রসঙ্গে—

যে সমুচ্চিচ্ছিদুর্জ্ঞাতীন্ সুহৃদশ্চ সবান্ধবান্।

আঠেরোজন এইরকম দুর্বৃত্ত রাজার নাম

করার সময় ভীম সুবীর বংশীয় রাজা অজবিন্দুর নাম উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ৫.৭৪.১৪; (হরি) ৫.৬৯.১৪]

অজবিল শ্রীপর্বতে অবস্থিত একটি পবিত্র স্থান।

[লিঙ্গ পু. ১.৯২.১৫৩]

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরভাগে কার্নুল জেলায় এই পুণ্যস্থানের অবস্থিতি।

[GEAMI (Bajpai), p.10]

অজবীথী প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্রেরই তিনরকমের গতিস্থান আছে। এই গতিস্থানগুলি তিনটি তিনটি গ্রহের সমাহারে বীথী নামে চিহ্নিত। দক্ষিণ গতিস্থানে মূলা, পূর্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া—এই তিনটি নক্ষত্রকে একযোগে অজবীথী বলে।

[দেবীভাগবত ৮.১৫.৭]

অজভূঃ মথুরারাজ যদু-বৃষ্ণি বংশীয় উগ্রসেনের নয়টি পুত্রের অনত্যম। *[মৎস্য পু. ৪৪.৭৫]*

অজমীঢ়$_{১}$ পুরুবংশীয় যেসব রাজর্ষির নাম তাঁদের কীর্তির কারণে অথবা রাজনৈতিক কারণে স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অজমীঢ়। অজমীঢ় এতটাই বিখ্যাত ছিলেন যে, পরবর্তী সময়ে চন্দ্রবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা একাধিকবার 'আজমীঢ়' (অজমীঢ়ের বংশধর) নামে সম্বোধিত হয়েছেন। ঋগ্‌বেদেও আজমীঢ়দের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। *[ঋগ্‌বেদ ৪.৪৪.৬]*

☐ অজমীঢ়ের জন্ম এবং তাঁর সন্তান সন্ততির বিবরণ প্রসঙ্গে মহাভারত এবং পুরাণে প্রাপ্ত তথ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ পুরাণ মতে অজমীঢ় ছিলেন পুরুবংশীয় রাজা সুহোত্রের পৌত্র এবং হস্তীর পুত্র। তবে মহাভারতে এক জায়গায় অজমীঢ়কে সুহোত্রের ঔরসে জনৈকা ইক্ষ্বাকু রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র বলা হয়েছে। অন্য একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সুহোত্রের পুত্র হস্তী, হস্তীর পুত্র বিকুণ্ঠন। এই বিকুণ্ঠনের ঔরসে যদুবংশীয়া সুদেবার গর্ভে অজমীঢ়ের জন্ম হয়। ব্রহ্মপুরাণ এবং হরিবংশ মতে সুহোত্রের পুত্র বৃহৎ। বৃহতের পুত্র ছিলেন অজমীঢ়।

অজমীঢ়ের দুই অনুজ ভ্রাতা ছিলেন দ্বিমীঢ় (মহাভারতে সুমীঢ়) এবং পুরুমীঢ়।

অজমীঢ়ের তিন পত্নী—কেশিনী, নীলিনী (নলিনী, নীলী, নীলা প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়), এবং ধূমিনী। তবে মহাভারতে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, অজমীঢ়ের মোট চার পত্নী ছিলেন—কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা এবং ঋক্ষা। এই চার পত্নীর গর্ভে অজমীঢ়ের মোট একশো চব্বিশটি পুত্র হয় যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজ্য স্থাপন করে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের সূচনা করেন।

ব্রহ্ম পুরাণ মতে, অজমীঢ়ের পত্নী কেশিনীর এক পুত্র জহ্নু। রাজর্ষি জহ্নু কুশিকবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত Pargiter অবশ্য এই তথ্যটিকে ভ্রান্ত মনে করেন। তাঁর মতে বিশ্বামিত্র অজমীঢ়ের বহু পূর্বকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর পক্ষে অজমীঢ়ের বংশধর হওয়া অসম্ভব। লক্ষণীয়, মহাভারতের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কেশিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের জহ্নু, জল ও রূপিণ নামে তিন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই জহ্নুই যে কুশিকবংশের প্রতিষ্ঠাতা, মহাভারতেও তা স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে।

কেশিনীর অপর পুত্র কণ্ব। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। অজমীঢ়ের বংশের এই ধারাটি ক্ষত্রিয়বৃত্তি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তাঁরা কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হন। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, অজমীঢ়ের দ্বিতীয় পত্নী নীলিনীর দুই পুত্র—দুষ্মন্ত এবং পরমেষ্ঠী। এঁদের বংশধারায় পাঞ্চালদের জন্ম হয়। পুরাণে নীলিনীর একমাত্র পুত্রের নাম নীল। তাঁর পুত্র সুশান্তি। এই নীল রাজাই যে পাঞ্চালদের পূর্বপুরুষ, পুরাণগুলিতেও তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

অজমীঢ়ের তৃতীয়া পত্নী ধূমিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋক্ষই চন্দ্রবংশীয় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং পুরুবংশের মূলধারাটি ঋক্ষের হাত ধরেই অগ্রসর হয়। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ। তবে মহাভারতে এক জায়গায় সংবরণকে সরাসরি অজমীঢ়ের পুত্র বলা হয়েছে। ধূমিনীর গর্ভে বৃহদ্বসু নামে আর এক পুত্রসন্তান হয়। ইনি নীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

পরবর্তী সময়ে অজমীঢ়ের বংশধরেরা অর্থাৎ মূল ভরতবংশ, পাঞ্চাল এবং নীপ বংশ—এই তিনটি রাজবংশ উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী তিনটি রাজবংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই তিন বংশের মধ্যে আত্মীয়তা একেবারেই ছিল না। মহাভারত ও পুরাণে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা মূলত

এঁদেরই রাজনৈতিক কলহের ইতিহাস। মহাভারতে বর্ণিত আছে, অজমীঢ়ের পৌত্র তথা ঋক্ষের পুত্র সংবরণ পাঞ্চালদের আক্রমণে রাজ্যচ্যুত হন। নীপ এবং পাঞ্চালদের মধ্যেও প্রায়ই যুদ্ধ হত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাঞ্চাল রাজবংশ সমূলে বিনষ্ট হবার আগে পর্যন্ত কুরু এবং পাঞ্চালদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলেছিল।

[মহা (k) ১.৯৪.৩০-৩১; ১.৯৫.৩৬-৩৭;
(হরি) ১.৮৯.১৮-২১; ১.৯০.৪৬-৪৭;
বায়ু পু. ৯৯.১০৪, ১০৯, ১৬৬;
ভাগবত পু. ৯.২১.২১-৩০;
মৎস্য পু. ৪৯.৪৩-৪৫; ৫০.১-২; ৫০.১৭-২০;
বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১০, ১১, ১৮;
ব্রহ্ম পু. ১৩.৮০-১০৫]

অজমীঢ়$_2$ মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত একজন ঋষি। ইনি বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। পুরাণে এঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ হিসেবে। অর্থাৎ ইনি জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১০৯;
মৎস্য পু. ১৪৫.১০৩;
বায়ু পু. ৫৯.১০০; ৯১.১১৬]

অজমুখিকা অন্ধকাসুর কে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অজমুখিকা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২৪]

অজয় ভাগবত পুরাণে কলিযুগের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশগুলির নাম করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে মগধে বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজাদের পর শিশুনাগ-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করবেন। এই শিশুনাগ-বংশীয় রাজা দর্ভকের পুত্র তথা নন্দীবর্ধনের পিতা ছিলেন অজয়।

[ভাগবত পু. ১২.১.৬-৭]

অজস্য একজন গোত্রকৃৎ ঋষি। মরীচির কন্যা সুরূপার গর্ভে অঙ্গিরার ঔরসে জাত। তিনি বংশ বাড়িয়েছিলেন বলেই গোত্রকার বা গোত্রকৃৎ।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৪]

অজা$_1$ অজ বলতে বোঝায় যাঁর জন্ম হয় না। এই অর্থে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই বহুবার অজ বলা হয়েছে মহাভারত পুরাণে। কিন্তু 'অজ'-শব্দের একটা দার্শনিক তাৎপর্য্যও আছে, যার সঙ্গে 'অজা' শব্দটিও যুক্ত। বায়ু পুরাণের প্রথমে শিবের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে পুরাণ আরম্ভ হয়েছে বলে অনেকেই এই পুরাণকে শৈব পুরাণ বলেছেন। এখানে প্রথম অধ্যায়ের প্রথমেই শিবকে অজ (জন্মরহিত) বিশ্বনির্মাতা, চৈতন্যস্বরূপ এবং লোকসাক্ষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিশেষণগুলি প্রধানত সাংখ্যদর্শনের পুরুষ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়—সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পুরুষ এবং প্রকৃতি দুই তত্ত্বই অজ-স্বরূপ। এর পরে যখন যোগ-ধারণার মাধ্যমে প্রকৃতি-পুরুষকে বুঝে নেবার কথা আসছে, সেখানে বায়ু পুরাণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের একটি শ্লোক নির্বিশেষে উদ্ধার করে বলেছে—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমানো'নুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজো'ন্যঃ॥

[বায়ু পু. ১.৭; ২০.২৮;
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪.৫]

এই শ্লোকে অজা অর্থ হল প্রকৃতি এবং তিনি লোহিত শুক্ল এবং কৃষ্ণবর্ণময়ী অর্থাৎ রজঃ (লোহিত) সত্ত্ব (শুক্ল) এবং তমঃ (কৃষ্ণ)—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে একটি অজ, যাকে বদ্ধজীব বলা হয়, সে ভোগ করে। অপর একটি অজ, যাকে মুক্ত জীব বলে মনে করা হয়, সে অন্যের দ্বারা ভুক্তা প্রকৃতিকে বৈরাগ্যবশত পরিত্যাগ করে। বায়ু পুরাণের শিবপর ব্যাখ্যানুবাদে এই শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায়—সেই প্রকৃতিকে (অজাকে) অজ্ঞ জীব উপভোগ করে, তৃপ্তিলাভ করে, কিন্তু অপর অজ শিব তাঁকে অন্যোপভুক্তা বলে পরিহার করেন।

প্রকৃতি এবং পুরুষ দুই তত্ত্বই অনাদি ফলত জন্মরহিত—প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। বায়ু পুরাণ বা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ দুই জায়গাতেই এই শ্লোকে কোথাও প্রকৃতির উল্লেখ না থাকলেও 'লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং' বলার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সম্পূর্ণ বোধ আমাদের তৈরি হয়ে যায়। সেই প্রকৃতিকে 'অজা' বলে সম্বোধন করাটা এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, পণ্ডিত টীকাকারেরা অনেকেই এই শ্লোকটাকেই 'অজা-শ্লোক' বলে চিহ্নিত করেছেন। বায়ু পুরাণে

উক্ত এই অজা-শ্লোক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ থেকে অবিকৃত-ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে বলেই শুধু নয়, এই অজাতত্ত্ব প্রাচীন সাংখ্য-দর্শনের সবচেয়ে বড়ো মৌলিক উপাদান বলেই তার তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে 'অজা' অর্থাৎ উৎপত্তিরহিতা বলার দার্শনিক উপপত্তি এই যে, প্রকৃতি উৎপত্তিরহিতা বলেই তার বিনাশশীলতাও নেই। ঠিক এই কারণেই সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং স্বতন্ত্রতার জন্যই শ্বেতাশ্বতরে প্রকৃতির আরো একটি বিশেষণ হল 'একাম্'। 'এক' শব্দের অর্থ স্বজাতীয়-দ্বিতীয়-রহিত। অন্য প্রকৃতি আরো থাকতে পারে কিন্তু ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বা মূলপ্রকৃতি বলে যাকে নির্দেশ করা হচ্ছে, তার স্বজাতীয় কোনো দ্বিতীয় প্রকৃতি নেই। এই মন্ত্রের শেষ তাৎপর্য্য হল—প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে যেমন বিবিধ এবং বহুরূপ জগৎকে প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে সিদ্ধ করার জন্য তাঁকে স্বগত ভেদযুক্ত বলে মনে করা হয়, সেইরকমই এই শ্বেতাশ্বতরের মন্ত্রেও জগৎকর্ত্রী অজা প্রকৃতিকে বিবিধ বলা হয়েছে—বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। বস্তুত মহত্তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত বিচিত্র কার্যসমূহের সৃষ্টিকর্ত্রী হলেন এই প্রকৃতি। অর্থাৎ মহদাদি স্থূলভূত পর্যন্ত বিবিধ বস্তুনিচয়ের উপাদান কারণ প্রকৃতি এবং তা শুধু স্বগতভেদযুক্তা সমানরূপা, উপনিষদের ভাষায় 'স্বরূপাঃ'।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে মহামতি দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ তাঁর আপন সম্পাদিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভূমিকায় বলেছেন—'অপরাপর প্রসিদ্ধ উপনিষদ হইতে শ্বেতাশ্বতরের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অদ্বৈতবাদের কথা যেমন আছে, দ্বৈতবাদের কথাও তেমনই আছে। এই সকল পড়িলে হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না যে, শ্রুতি দ্বৈতবাদ সমর্থন করিতেছেন, অথবা অদ্বৈতবাদ নির্দেশ করিতেছেন। ...সাংখ্যবাদীরা 'অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং/বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপ্যাঃ'—এই শ্রুতি অবলম্বনে প্রকৃতিবাদ স্থাপন ও সমর্থন করিয়াছেন, এই 'অজা' শ্রুতি এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেরই অন্তর্গত।'

অন্যদিকে এটাও খেয়াল করার মতো ঘটনা যে, সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি একা এবং স্বতন্ত্রা হলেও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ কিংবা বায়ু পুরাণ কিন্তু তাঁকে পরব্রহ্মের অথবা পরম শিবের শক্তি বলে মানবে। তা না হলে এই উপনিষদেই প্রকৃতিকে 'দেবাত্মশক্তি' অথবা 'স্বগুণনিগূঢ়া' প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হত না। বিশেষত শ্বেতাশ্বতরের অন্য মন্ত্রগুলি 'যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ *[৪.৯]* অথবা 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্ *[৪.১০]* অথবা 'যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো/ যস্মিন্নিদং স চ বিচৈতি সর্বম্ *[৪.১১]*—এই মন্ত্রগুলি নিরর্থক হয়ে পড়ত। তাছাড়া মহাভারত, পুরাণ এবং ভগবদ্গীতাতেও প্রকৃতির প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও তা ব্রহ্ম বা পরমাত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল এবং প্রাচীন সাংখ্যভাবনা সেইরকমই। ভাগবত পুরাণে 'অজা' বলতে ভগবানের আত্মশক্তি ত্রিগুণময়ী মায়াকেই বোঝানো হয়েছে, আবার কখনো বা তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকেও বোঝানো হয়েছে। *[ভাগবত পু. ১১.৯.২৮; ১০.১৩.৫২; ১২.১১.৩১; ১০.৩.৪৭]*

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বোক্ত মন্ত্রের দ্বিতীয় অর্ধে প্রাচীন সাংখ্য ভাবনার ত্রৈতবাদ—অর্থাৎ প্রকৃতি-পরমেশ্বর-জীবের অবস্থান সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই মন্ত্রে ত্রিগুণাত্মিকা অজা (অন্য ধারণায় মায়া), ভোক্তা অজ, যাকে জীব বলে ব্যাখ্যা করেছেন পণ্ডিতেরা এবং অভোক্তা অজ অর্থাৎ পরমেশ্বর (ব্রহ্ম)—এই তিনটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শঙ্করাচার্যের অদ্বয়ব্রহ্মবাদের পাশাপাশি প্রাচীন সাংখ্যের দ্বৈতবাদী প্রতিষ্ঠার কথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। আমরা বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এটাকে ত্রৈতবাদ বলেছি বটে, কিন্তু প্রকৃতি অজা এবং একা হওয়া সত্ত্বেও তার ওপরে পরমেশ্বর অথবা ব্রহ্মের নিয়ন্ত্রণের কথাটা শ্বেতাশ্বতর এবং অন্যান্য উপনিষদ থেকে প্রকট হয়ে পড়ায় স্বরূপত পরম ঈশ্বর এবং জীবতত্ত্বের দ্বৈতভাবনাই এখানে প্রাসঙ্গিক। বিশেষত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া', যেটি 'অজা'—শ্লোকের পরবর্তী মন্ত্র, যেখানে একই বৃক্ষস্থিত দুটি পক্ষীর রূপকে যেভাবে ভোক্তা জীব এবং নির্গুণ সাক্ষী-কল্প পরম পুরুষের একত্র অবস্থানের কথা বলা

হয়েছে, তাতে এই মন্ত্রটি প্রাচীন সাংখ্য-দর্শন থেকে আরম্ভ করে অন্য দ্বৈতবাদী দর্শনের অবলম্বন হয়ে ওঠে। এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে—সর্বদা সংযুক্ত দুই সমানস্বভাব সখা পক্ষী একই দেহ-বৃক্ষকে অবলম্বন করে আছে। তাদের মধ্যে একজন স্বাদু ভোগযোগ্য প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করে আর অপর পক্ষীটি ভোগ না করে সাক্ষিরূপে কেবল দর্শনমাত্র করে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যো' ভিচাকশীতি॥

এই মন্ত্রের মধ্যে দুই পক্ষী জীব এবং পরমাত্মা। এদের মধ্যে চিরন্তন কোনো সম্বন্ধ থাকায় দুইজনেই সখা। এরা একই বৃক্ষ অবলম্বন করে আছে এবং সেটা শরীর, কেননা শরীর বৃক্ষের মতোই উচ্ছেদযোগ্য অর্থাৎ ধ্বংসশীল। এই দুয়ের মধ্যে একজন কামনা-বাসনা-বিশিষ্ট লিঙ্গশরীর ধারণ করে বিচিত্র-অনুভূতিযুক্ত স্বাদু পিপ্পল ফল (কর্মফল) সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আর অন্যজন হলেন নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত যিনি পরমেশ্বর ভোগ না করে সাক্ষীর মতো দর্শন করেন।

এই মন্ত্রের নিরপেক্ষ বিচার করলে দেখা যাবে যে এটি পূর্বোক্ত 'অজ'-শ্লোকের পরিপূর্ণ বিস্তার। পূর্বোক্ত 'অজা'-শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হয়েছে অজাতুল্য প্রকৃতিকে এক অজ (বদ্ধ-জীব) ভোগ করে আর অন্য অজ (মুক্তজীব) যাকে সম্পূর্ণ ভোগ করা হয়েছে সেই ভুক্তভোগা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে—

অজো হ্যেকো জুষমাণো'নুশেতে/
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগাম্ অজো'ন্যঃ।

[দ্র. অজ$_{১}$]

[বায়ু পু. ২০.২৮; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪.৬]

অজা$_{২}$ যশোদার গর্ভজাত মায়া। ভগবান শ্রীহরির এই মায়ার মাধ্যমে নয়টি রূপে বিরাজ করেন। এই অজা বস্তুত শক্তিতত্ত্ব।

[ভাগবত পু. ১০.৩.৪৭; ১০.১৩.৫২; ১১.৯.২৮; ১২.১১-৩১]

অজাকর্ণ শ্রাদ্ধকার্যের উপযুক্ত তীর্থ। পিতৃগণ এখানে অবস্থান করেন বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১৫.৩৩]

অজাত যদু বৃষ্ণিবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম। তিনটি মহাবলশালী পুত্রের পিতা। অজাতের তিন পুত্রের নাম—সুদংষ্ট্র, সুনাভ এবং কৃষ্ণ। *[মৎস্য পু. ৪৪.৮২-৮৪]*

অজাতশত্রু$_{১}$ কলিযুগে শিশুনাগ বংশীয় যেসব রাজা রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিষ্ণু পুরাণে তিনি বিম্বসারের (বিম্বিসারের) পুত্র হিসেবে এবং ভাগবত পুরাণে তিনি বিধিসারের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় আমরা যে বিম্বিসার-পুত্র অজাতশত্রুর উল্লেখ পাই পুরাণে সম্ভবত তাঁরই উল্লেখ করা হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. ৪.২৪.৩; বিষ্ণু পু. (Wilson), Vol. IV, p. 180; ভাগবত পু. ১২.১.৬]

☐ অন্যান্য পুরাণে অবশ্য অজাতশত্রুর বংশ পরিচয় এক থাকলেও পিতৃপরিচয় নিয়ে সামান্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে তাঁকে ভূমিমিত্রের পুত্র বলা হচ্ছে এবং বিবিসার বা বিম্বিসার হয়ে গেছেন তাঁর পৌত্র। ইনি পঁচিশ, মতান্তরে সাতাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৯.৩১৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৩১; মৎস্য পু. ২৭২.১০]

অজাতশত্রু$_{২}$ মহাভারতে একাধিকবার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অজাতশত্রু বলা হয়েছে। সভাপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রজাবাৎসল্যের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রজাদের সন্তানস্নেহে পালন করতেন, ফলে প্রজারাও পিতার উপর পুত্র যেমন ভরসা করে তেমনই যুধিষ্ঠিরের উপর ভরসা করত। তাঁর শত্রু কেউ ছিল না বলেই তিনি অজাতশত্রু নামে খ্যাত ছিলেন—

এবং গতে ততস্তস্মিন্ পিতরীবাশ্বসন্ জনাঃ।
ন তস্য বিদ্যতে দ্বেষ্টা ততো'স্যাজাতশত্রুতা॥

[মহা (k)২.১৩.৯; ৬.৮৫.১৯; (হরি) ২.১৩.৯; ৬.৮২.১৯]

অজামিল কান্যকুব্জ নগরের এক শাস্ত্রাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কোনো এক সময় যজ্ঞের প্রয়োজনে কুশ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি একটি দাসীকন্যাকে দেখে প্রেমোন্মত্ত হয়ে পড়েন। তার আকর্ষণে অজামিল শেষ পর্যন্ত বর্ণাশ্রমের সমস্ত কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হন এবং তাঁর বিবাহিত জীবনও বিপর্যস্ত হতে থাকে। বিবাহিত স্ত্রীকে নস্যাৎ করে অজামিল সেই দাসীকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন। সেই দাসীর গর্ভে অজামিলের দশটি

পুত্র হল। একেবারে কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ছিল নারায়ণ, যাকে পিতা-মাতা উভয়েই অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

অজামিলের যখন মৃত্যু হল তখন জীবনভর সমস্ত নীতিভ্রষ্টতার দায়ে যমদূতরা তাঁকে নরকে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হল। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অজামিল তাঁর প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের নাম ধরে ডাকলেন। এই নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুদূতরাও অজামিলের শিয়রে এসে উপস্থিত হল। তারা যমদূতদের প্রয়াস ব্যাহত করে অজামিলকে সমস্ত মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল। তাদের যুক্তি ছিল, মৃত্যুকালে একবারও যদি কেউ হরিনাম উচ্চারণ করে, তবে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি হয় এবং এই সত্যটাই ধর্মের মূল কথা। ধর্মরাজ যমের কাছ যমদূতেরা তাদের নিগ্রহের বার্তা জানিয়ে বিষ্ণুদূতদের তর্কযুক্তি নিবেদন করল। যমরাজ সব শুনে বিষ্ণুদূতদের যুক্তিই মেনে নিলেন। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসে অজামিল অনুতাপগ্রস্ত হলেন। এরপর তিনি গঙ্গাদ্বারে গিয়ে তপস্যা করে দেহত্যাগ করলেন এবং বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হলেন। হরিনাম উচ্চারণ করলে সমস্ত পাপ চলে যায়—এই নাম-মাহাত্ম্য ঘোষণা করাই অজামিল-উপাখ্যানের প্রধান তাৎপর্য্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৬.১.২০; ৬.২য় এবং ৩য় অধ্যায়]

অজামুখ$_১$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৮.৫]

অজামুখ$_২$ অথবা অধোমুখ। পিশাচগণের একটি বর্গ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৮১;
বায়ু পু. ৬৯.২৬৩.২৬৭]

অজিত$_১$ সামগ্রিকভাবে ভগবান শ্রীহরির সংজ্ঞা। কোথাও কখনো কারোর দ্বারা তিনি বিজিত হন না বলেই ভগবান শ্রীহরির এই নাম।

[ভাগবত পু. ২.২.৫]

চাক্ষুষমনুর কালে ভগবান শ্রীহরির প্রকাশ। দেবসম্ভূতির গর্ভে বৈরাজের ঔরসে তাঁর জন্ম হয়। এই সময়ে ক্ষীরসাগর মন্থনের ফলে অমৃতের উৎপত্তি হয় এবং অজিত ভগবান শ্রীহরি এই সময়ে কূর্মরূপে মন্দর পর্বতকে ধারণ করেন।

[ভাগবত পু. ৮.৫.৯-১০]

সমুদ্রমন্থনকর্মে দেবতাদের সহায়তা করার জন্য ব্রহ্মা এই অজিতরূপী শ্রীহরির ধ্যান করেন। ব্রহ্মার ধ্যানে তুষ্ট ভগবান দেবতাদের বলেন দৈত্যদানবদের সঙ্গে সাময়িকভাবে সন্ধি করতে। তারপর সুর-অসুর দুপক্ষের যৌথ উদ্যোগে অমৃতমন্থনের উপদেশ দেন। সমুদ্রমন্থনের ফলে ভবিষ্যতে দেবতাদেরই লাভ হবে এবং অসুরেরা বঞ্চিত হবে—এ কথাও তিনি বলে দেন।

[ভাগবত পু. ৮.৫.২৫-৫০;
৮.৬.১৮-২৫; ৮.৭.১৬]

অজিত$_২$ ষষ্ঠ মন্বন্তর অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন পৃথুক তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই পৃথুক গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অজিত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৭৪]

অজিত$_৩$ স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামক দেবগণ থেকে জাত ভগবান শ্রীহরির নাম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.১১৪]

অজিত$_৪$ সৃষ্টির আদিতে জয় নামক দেবগণ ব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টির প্রকল্প ব্যর্থ করে দিলে ব্রহ্মা তাঁদের অভিশাপ দেন। অভিশাপান্তে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এঁরা অজিতার গর্ভে রুচির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশসংখ্যক এই দেবগণের নাম অজিত। এই অজিত দেবগণের নাম যথাক্রমে বিধি, মুনয়, ক্ষেম, নন্দ, অব্যয়, প্রাণ, অপান, সুধামা, ঋভু, শক্তি, ধ্রুব ও স্থিতি—

ইত্যেতে মানসাঃ সর্বে অজিতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।

[বায়ু পু. ৬৭. ৩২-৩৫]

অজিত$_৫$ আয়ুষ্মন্ত নামক দেবগণের সঙ্গে একত্র হয়ে এঁরা চোদ্দোটি দেবগণ সৃষ্টি করেছেন। এঁদের সকলের বাস মহর্লোকে। মহর্লোক থেকে এঁরা জনলোকে যাত্রা করেছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪.২৭; ৩.১.২২]

অজিত$_৬$ মনু রুচি প্রজাপতিকে আকূতি নামে একটি কন্যা সম্প্রদান করেন। রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যজ্ঞ এবং দক্ষিণা নামে যমজ মিথুন জন্মায়। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের যাম নামে বারোটি পুত্র জন্মায়। যম (যমজ)-এর পুত্র বলে তাঁরা যাম। এঁরাই অজিত দেবগণ নামে বিখ্যাত। এই যাম-দেবগণ অথবা অজিত দেবগণের নাম—যদু, যযাতি, দীধয়, স্রবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাপতি, বিশত্ত, দ্যুতি, বায়স এবং মঙ্গল। ব্রহ্মাণ্ড

পুরাণ মতে দীধয় হয়েছেন বীবধ, শ্রবস হয়েছেন ত্রাসত, প্রজাপতি হয়েছেন প্রযাতি।

[বায়ু পু. ১০. ১৯-২১; ৩১. ৪-৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. ১.৯.৪৬; ১.১৩.৯০]

অজিত দেবগণ স্বায়ম্ভুব মনুর শুক্র-নামক মানসপুত্র বলেও কথিত।

অজিত$_{৭}$ জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। মহাভারতের আদিপর্বে সঞ্জয় যে কয়জন প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে অজিত অন্যতম।

[মহা (k) ১.১.২২৬; (হরি) ১.১.১৮৮]

অজিত$_{৮}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। শিব সহস্রনাম স্তোত্রে অজিত শব্দটি তিন বার ভগবান শিবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি যুদ্ধে অজেয়, আবার তিনি জিতেন্দ্রিয় বলে ইহজাগতিক মায়া-মোহ কোনো কিছুর দ্বারাই বশীভূত হন না—এই কারণে তিনি অজিত নামে খ্যাত।

পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা হলেও পুরাণে বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে যে, তিনি কখনোই কারও দ্বারা বশীভূত হন না। কিন্তু ভক্ত বৎসল ঈশ্বর 'অজিত' হলেও কখনো কখনো ভক্তের ভক্তির দ্বারা 'জিত' হন। ভাগবত পুরাণে উল্লেখ আছে যে ভগবান নিজেই মহর্ষি দুর্বাসাকে বলছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।

টীকাকার নীলকণ্ঠ 'অজিত' ভগবান কখন ভক্তের দ্বারা 'জিত' হন তা পৌরাণিক কাহিনী থেকে উদ্ধার করেছেন। বাণাসুর ছিলেন পরম শিবভক্ত। ভগবান শিব তাঁকে যুদ্ধে অজেয় হবার বর দেন। মহাদেবের বরে অজেয় বাণাসুরকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার স্বয়ং কৃষ্ণও জয় করতে সমর্থ হননি। বাণাসুরকে সহায়তা করার জন্য স্বয়ং ভগবান শিব কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শেষ পর্যন্ত ভক্তবৎসল মহাদেব কৃষ্ণের প্রতি সন্তুষ্ট হলে কৃষ্ণ বাণাসুরকে জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে 'অজিত' ভগবান তাঁর ভক্ত-বৎসলতার কারণে 'জিত' হলেও তিনি তাঁর অজিত সত্তা থেকে কখনোই চ্যুত হন নি। *[মহা (k)১৩.১৭.৫৩, ৯০, ১০৩;*
(হরি) ১৩.১৬.৫৩, ৯০, ১০৩]

অজিত$_{৯}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণে বিষ্ণু সহস্রনামের এই শ্লোকটিতে ভগবান বিষ্ণুর 'জিত' নাম ধৃত হলেও Critical Edition-এ অজিত পাঠ পাওয়া যায়। বিষ্ণু সহস্রনামের টীকাকার শঙ্করাচার্যও 'অজিত' পাঠকেই সঠিক বলে বিবেচনা করে ব্যাখ্যা করেছেন—

ন কেনাপ্যবতারেষু জিত ইতি অজিতঃ।

দেবাসুর সংগ্রামে কিংবা দুষ্টের দমনের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে—কখনোই তিনি পরাজিত হন না, তাই তিনি অজিত। ভাগবত পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর অজিত এবং জিত—দুটি সত্তাকেই তুলে ধরা হয়েছে। তিনি অপরাজিত অজেয়, তাঁকে জয় করার সাধ্য ত্রিলোকে কারও নেই তবু ভক্তবৎসল ঈশ্বর ভক্তের প্রতি অনুরাগ বশত ভক্তের দ্বারা 'জিত' বা বশীভূত হয়ে থাকেন। এই ভাবনা থেকে ভগবান বিষ্ণু নিজের 'অজিত' সত্তার থেকে চ্যুত না হয়েও ভক্তবৎসলতার কারণেই 'জিত' নামেও সম্বোধিত হন—

প্রায়শো'জিত জিতো'প্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

[ভাগবত পু. ১০.১৪.৩;
মহা (k) ১৩.১৪৯.৭২; (হরি) ১৩.১২৭.৭২;
(critical ed.) ১৩.১৩৫.৭২]

অজিতশত্রু একজন ঋষি। ইনি ব্রহ্মার সভায় অবস্থান করতেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.১১.২৪; (হরি) ২.১১.২৩]

অজিতা$_{১}$ দেবীর পীঠশক্তির অন্যতমা। তিনি দেবী ভুবনেশ্বরীর সেবা করেন।

[দেবীভাগবত পু. ১২.১২.৩৫]

অজিতা$_{২}$ ভবমালিনী দেবীর অনুগতা দেবী।

[মৎস্য পু. ১৭৯.৭১]

অজিতা$_{৩}$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জয় নামক বারো জন দেবতার গণ ব্রহ্মার অভিশাপান্তে অজিতার গর্ভে রুচির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম অজিত। *[বায়ু পু. ৬৭.৩৩]*

অজিন$_{১}$ পৃথুর বংশধারায় হবির্ধান আগ্নেয়ী ধিষণার গর্ভে ছয়টি পুত্রের জন্ম দেন। তাঁদের অন্যতম হলেন অজিন। অন্য পাঁচ জন হলেন—প্রাচীনবর্হি, শুক, গয়, কৃষ্ণ এবং ব্রজ।

[বায়ু পু. ৬৩.২৩; বিষ্ণু পু ১.১৪.২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩৭.২৪]

অজিন$_{২}$ মহাভারত-রামায়ণে বানপ্রস্থী এবং অন্যান্য কৃচ্ছ্রসাধনকারী তপস্বীদের পরিধেয় বাস হিসেবে অজিনের ব্যবহার দেখতে পাই। অজিন বস্তুত

মৃগচর্ম এবং হরিণের চামড়াতেই যে অজিন-শব্দের তাৎপর্য্য সেটা অথর্ববেদের একটি পংক্তি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়—

হরিণস্যাজিনেন চ।

তবে হরিণের চামড়ার অজিন বললেই এটা বোঝা যায় যে, অন্য পশুর চামড়া দিয়েও অজিন তৈরি হত। শতপথ ব্রাহ্মণেই অজ এবং ঋষভের অজিন মাটিতে বিছিয়ে যজ্ঞের উপকরণ রাখা হচ্ছে, এমন দেখতে পাচ্ছি—

অথ অজর্ষভস্য অজিনস্ উপস্তৃণাতি।

অজিনবাস পরিধান করা মানুষের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে ওই শতপথ ব্রাহ্মণেই। মহাভারতে আমরা বনবাসের জন্য প্রস্তুত পাণ্ডবদের অধমাঙ্গে অজিনবাস এবং উত্তরীয় নিয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরোতে দেখছি। তবে দুঃশাসন পাণ্ডবদের খুব নিকৃষ্ট পরিধানে দেখতে চেয়েও কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া পরার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু একই সঙ্গে বলেছেন—যতই রুরুচর্মের পরিধান থাক, বনে গেলে অদীক্ষিত বনচর মানুষদের বেশবাস অজিনের সঙ্গেই তা একরকম মনে হবে, কিছুতেই তা রুরুচর্মধারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের মতো দেখাবে না। এতে বোঝা যায়—সাধারণ যে কোনো পশুচর্মই অজিন, কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণসার মৃগ বা রুরুর চামড়া পরিধান করতেন। ধৃতরাষ্ট্রকেও বানপ্রস্থে অজিন পরতে দেখা গেছে।

[অথর্ববেদ (Roth & Whitney), ৫.২১.৭: পৃ. ৯৪;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৫.২.১.২১, ২৪;
৩.৯.১.১২, পৃ. ৪৩৫, ৩১০;
মহা (k) ২.৭৭.১-২, ৭, ৯; ১৫.১৫.৩:
(হরি) ২.৭৪.১-২, ৭, ৯; ১৫.১৭.৩]

অজির স্বায়ম্ভুব মনুর কালে ত্বিষিমন্ত গণের অন্যতম সোমপায়ী দেবতা। পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে একটি সর্পযজ্ঞের সময় পুরোহিত-বর্গের নাম বলতে গিয়ে সুব্রহ্মণ্য পুরোহিতের নাম বলা হয়েছে 'অজির'। *[বায়ু পু. ৩১.৯;*
তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ (চিন্নস্বামী), ২য় খণ্ড, ২৫.১৫.৩]

অজিহ্ম স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, পারাবত তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অজিহ্ম।

[বায়ু পু. ৬২.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১৩]

অজিহ্মান স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, পারাবত তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অজিহ্মান অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬২.১৩]*

অজীগর্ত পুরাণোক্ত অজীগর্তের মূল পরিচয় আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। সূয়বসের পুত্র। দারিদ্র্য-পীড়িত ব্রাহ্মণ। তাঁর তিন পুত্র ছিল— শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ এবং শুনোলাঙ্গুল। পেটের দায়ে একশটি গাভীর পরিবর্তে ইনি মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে বিক্রয় করেছিলেন।

ইক্ষ্বাকুকুলজাত হরিশ্চন্দ্রের মহোদর (জলোদর, উদরী) রোগ হয়েছিল। পুত্র জন্মানোর পর সেই পুত্রকে পশু হিসেবে কল্পনা করে তাঁকে বলি দিয়ে বরুণদেবের উদ্দেশে যাগ সম্পন্ন করার কথা ছিল তাঁর। তাঁর পুত্র রোহিত এই কথা শুনে অরণ্যে প্রস্থান করেন এবং ছয় বছর এখানে-ওখানে বিচরণ করেন। বিচরণশীল অবস্থায় দরিদ্র অজীগর্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি একশত গাভীর পরিবর্তে তাঁর একটি পুত্রকে পিতার যাগের জন্য কিনতে চান। অজীগর্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃপুচ্ছকে কাছে টেনে নিলেন, তাঁর স্ত্রী কাছে টেনে নেন কনিষ্ঠ পুত্রটিকে। মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে বিক্রয় করতে সম্মত হন উভয়েই। রোহিত একশত গাভী অজীগর্তকে দিয়ে শুনঃশেপকে নিয়ে পিতার কাছে যান এবং তাঁকে বলি দিয়ে বরুণের যাগ করতে বলেন।

হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞে অভিষিক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলে পশুরূপে কল্পিত শুনঃশেপকে যূপে বন্ধন করার লোক পাওয়া গেল না। অজীগর্ত তখন নিজেই গাভীর পরিবর্তে পুত্র শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করলেন। অন্যান্য কিছু বৈদিক অনুষ্ঠানের পর যখন শুনঃশেপকে বিশসন বা বধ করার সময় এল, তখন তাঁকে বধ করারও কোনো লোক পাওয়া গেল না। পিতা অজীগর্ত পুনরায় একশ গাভীর পরিবর্তে পুত্রকে যূপকাষ্ঠে ফেলে বধ করতেও রাজী হলেন। অজীগর্ত খড়্গে শান দিয়ে পুত্রকে বধ করতে উদ্যত হলে শুনঃশেপ প্রজাপতি, অগ্নি, সবিতা, বরুণ ইত্যাদি বহু দেবতার স্তব রচনা করে এক সময় যূপবন্ধন থেকে মুক্তি পান এবং শেষপর্যন্ত তিনিই হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞশেষ করেন। যজ্ঞশেষে শুনঃশেপ যখন হোতা বিশ্বামিত্রের

কোলে এসে বসলেন, তখন অজীগর্ত বিশ্বামিত্রের কাছে পুত্র ফেরত চাইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁকে ফেরত না দেওয়ায় অজীগর্ত শুনঃশেপের কাছেই অনেক কাকুতি-মিনতি করে ফিরে আসতে বললেন এবং পিতৃপৈতামহ বংশ ত্যাগ না করতে অনুরোধ জানালেন। শুনঃশেপ পিতার পূর্বকৃত নির্মম ব্যবহারের জন্য ধিক্কার দিলে অজীগর্ত পূর্বলব্ধ তিন শত গাভীও ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু শুনঃশেপ আর অজীগর্তের কাছে ফিরে গেলেন না। বিশ্বামিত্রও অজীগর্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭.৩৩.৩-৪ অধ্যায়; দেবী ভাগবত ২.৫.৪০; ৬.১৩.১৩-১৮; ৭.১৬.১৮-৩০; ভাগবত পুরাণ ৯.৮.২০-২১; ৯.১৬.৩০]

অজেয়$_1$ স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, পারাবত গণ তার মধ্যে অন্যতম। এই গণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অজেয়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১৪]*

অজেয়$_2$ রৈবত মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, বিকুণ্ঠ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অজেয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৭]

অজেয়$_3$ জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। মহাভারতের আদিপর্বের সূচনায় সঞ্জয় পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বহু প্রাচীন রাজর্ষির নামোল্লেখ করেছেন—যাঁরা সুদীর্ঘকাল রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করার পর কালের নিয়মে পরলোকে গমন করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাজর্ষি অজেয় এর নামও উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k)১.১.২৩৪; (হরি) ১.১.১৯৫]

অজেশ একাদশ রুদ্রের অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৫৩.১৯]

অজেশ্বরতীর্থ বারাণসী ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে অজেশ্বর নামে পূজিত হন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৩৭; লিঙ্গ পু. ১.৯২.১৩৬]

অজৈকপাৎ$_1$ মহাভারতে যতবারই অজ একপাদ অথবা অজৈকপাৎ শব্দটি পাওয়া যায়, ততবারই প্রায় অহির্বুধ্ন্য (অহিবুধ্ন্য, অহিবধ্ন্য) শব্দের সঙ্গে তার সহাবস্থান ঘটেছে। সাধারণভাবে অজৈকপাৎ একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন রুদ্র। তাঁকে স্থাণুর পুত্র বলা হলেও স্থাণু রুদ্র-শিবেরই অন্যতর রূপ। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে গালব আর গরুড়ের কথোপকথনের মধ্যে অর্থধনের প্রশংসা করার সময় একবার বলা হয়েছে—অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য এবং ধনপতি কুবের—এই তিনজন ধনকে রক্ষা করেন—

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যৈ রক্ষ্যতে ধনদেন চ।

একাদশ আদিত্যের মতো অষ্টবসুর মধ্যেও অজৈকপাৎ একজন এবং এখানেও তিনি অহির্বুধ্ন্যের সঙ্গেই আছেন। তবে অজৈকপাৎ প্রথিতভাবে রুদ্র-শিবেরই একটি রূপ।

[মহা (k) ১.৬৬.২; ১.১২৩.৬৮; ৫.১১৪.৪; ১২.২০৮.১৯; ১৩.১৫০.১২; (হরি) ১.৬১.২; ১.১১৭.৭২; ৫.১০৬.৪; ১২.২০২.১৯; ১৩.১২৮.১২]

☐ মহাভারত-পুরাণে দেবতা হিসেবে অজৈকপাৎ নামক রুদ্রমূর্তির প্রকৃত পরিচয় তেমন স্পষ্ট নয়। তবে ঋগ্‌বেদে বার বার অজ একপাৎ (অজৈকপাৎ) অথবা 'একপাৎ অজ' অন্তরীক্ষস্থানীয় আকাশচারী দেবতা হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন এবং সেখানে তাঁর রুদ্ররূপটুকুও পাওয়া যায়। ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন—

This being is closely connected with Ahi budhnya, his name occurring five times in juxtaposition with that of the latter and only once unaccompanied by it (10, 65^{13}). The deities invoked in the latter passage, 'the thundering Pāvīravi ('daughter of lighting': PW.), Ekapād aja, the supporter of the sky, the stream, the oceanic waters, all the gods, Sarasvatī', are, however, almost identical with those enumerated in the following hymn: 'the ocean, the stream, the aerial space, Aja ekapād, the thundering flood, Ahi budhnya, and all the gods' (10, 66^{11}). These two passages suggest that Aja ekapād is an aerial deity.

[A.A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 73]

ঋগ্‌বেদে যেখানে যেখানে অজ একপাৎ

দেবতা হিসেবে মান্য হয়েছেন, সেখানে সেখানেই এটা একটা খেয়াল করার মতো বৈশিষ্ট্য যে, বৈদিকেরা অজৈকপাৎ এবং অহির্বুধ্ন্যের কাছে শান্তি ভিক্ষা করছেন বারবার। অজ একপাদের কাছে বার বার প্রার্থনা করছেন, যাতে তিনি ঋত্বিক্ মন্ত্রকারদের স্তুতি শোনেন অন্তত। লক্ষণীয়, এই সব মন্ত্রে অহির্বুধ্ন্য এবং অজ একপাদ এঁরা দুই জনেই নদী, সমুদ্র, পৃথিবীর সঙ্গে এক মাত্রায় স্তুতি লাভ করছেন এবং এগুলির মধ্যে একটি মন্ত্রে একপাৎ অজকে 'দিবো ভর্তা' অর্থাৎ আকাশের ধারণ কর্তা বলে বিশেষিত করা হয়েছে। তাতে বুঝি ভূলোকের ওপরে দ্যুলোকেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট এবং বজ্রবিদ্যুতের কন্যা 'পাবীরবী'র সঙ্গে তিনি একত্রে থাকেন, বলেই 'অজন' (চলমান, driving) অর্থে অজ একপাদ 'বাত্যা' বা প্রবল ঝড়ের দেবতাও হতে পারেন। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি থেকে শান্তি চাওয়াটাও তাই বৈদিক মন্ত্রকারদের কাছে সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল। তাই এমন প্রার্থনা—অজ একপাদ আমাদের শান্তি দিন—

শং নো অজ একপাদ্ দেবো অস্তু।

[ঋগ্বেদ ২.৩১.৬; ৬.৫০.১৪; ১০.৬৪.৪; ১০.৬৫.১৩; ১০.৬৬.১১; ৭.৩৫.১৩]

□ অজ একপাৎ নামটির মধ্যে অর্থ-বিভ্রান্তির একটা দুর্ভাবনা আছে বলেই Macdonell সাহেব মহাপণ্ডিত Roth এবং Grassmann-এর মতো ভাষাবিদ্ জার্মানদের মত উল্লেখ করে বলেছেন—অজ একপাদ হলেন 'One-footed driver or stormer. অন্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Bergaigne শব্দটাকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'the unborn (a-ja) who has only one foot.' অনেক পণ্ডিতের মত এবং ব্যাখ্যা উদ্ধার করার পর Macdonell 'অজ একপাৎ'-কে একপায়ের একটি ছাগল হিসেবে গ্রহণ করেই রূপক ভেঙে লিখেছেন—এটি বিদ্যুতের সংজ্ঞা। দুরন্ত গতিতে ছাগল যখন দৌড়োয় তখন তার চার-পায়ে চলাটাও এক পায়ে চলা বলে মনে হয়—The goat alluding to its agile swiftness in the cloud mountains, and the one foot to the single streak which strikes the earth.

[A.A. Macdonell, vedic Mythology, p. 74]

ঋগ্‌বেদে অজ একপাদ নামে এই যে দেবতার চেহারা এবং প্রকৃতি আমরা লক্ষ্য করলাম, মহাভারতেরকালেই তাঁর সম্যক পূজা উপাসনার বিলুপ্তি ঘটেছে। যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে দ্যুলোকের দেবতাদের নামের সঙ্গে অজ একপাদ নামে এই দেবতার উল্লেখ আছে। নিরুক্তকার নিঘণ্টুতে (৫.৬) ধৃত এই শব্দের অর্থ করার সময় লিখেছেন—'অজ' আসলে 'অজন'; অজন মানে চলমান—অজ একপাত্ অজন একঃ পাদঃ। বস্তুত এইভাবনায় তাঁকে চলমান আদিত্য বলা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্ম চতুষ্পাদ—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং দিক্‌সমূহ—এই তাঁর চার পা। এর মধ্যে অজন-স্বভাব বায়ু এবং দ্যুলোক-স্থিত সূর্য যাকে চলমান (অজন) মনে হয়, তিনিও অজ একপাদের সঙ্গে একাত্মক হতে পারেন। যাস্ক তাঁর দ্বিতীয় নিরুক্তিতে বলেছেন—একপাদ অজের আর এক অর্থ হল—যিনি একপাদের দ্বারা রক্ষা করেন সকলকে—একেন পাদেন পাতি ইতি। পাদ মানে যেহেতু অংশ, তাই দুর্গাচার্য টীকায় লিখেছেন এক পাদের মাধ্যমে অর্থাৎ তিনি তাঁর একটি অংশে এই জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এই জগৎকে রক্ষা করেন। অচেতন নিদ্রার মধ্যে প্রাণ-অপান ইত্যাদি বায়ুর মাধ্যমে তিনি চলমান থাকেন জীবশরীরে। এই অর্থে তিনি অজ একপাৎ।

যাস্কের করা অজ একপাদের তৃতীয় অর্থ হল—এক পায়ের দ্বারা তিনি পান করতে পারেন। অজ একপাৎকে অনেকেই আকাশের সূর্য বলেছেন। সূর্য তাঁর স্বকীয় তেজের একাংশ দিয়ে পৃথিবীর বিস্তারিত জলস্থান থেকে জল পান করেন, পৃথিবীর অন্তর্নিহিত জলীয় অংশও তিনি পান করেন। এই শব্দের চতুর্থ অর্থে যাস্ক বলেছেন—একটাই পা আছে, যাঁর। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ তিনি অদ্বিতীয় এক, তিনি সর্বত্রগামী 'অজন'। আবার এক এবং দ্বিতীয় হলেও বলা যায় তিনি একপাদে অর্থাৎ এক অংশের মাধ্যমে তিনি অখিল জীবের মধ্যে আছেন—একো'স্য পাদ ইতি বা। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে—এইটি আমার অপরা প্রকৃতি। এর থেকে শ্রেষ্ঠ অপর এই জীবস্বরূপ আমার প্রকৃতিটিকে জানবার চেষ্টা করো, এই প্রকৃতির মাধ্যমেই এই জগৎ বিধৃত হয়—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অজ একপাৎ নামটির শেষ অর্থে যাস্ক অথর্ববেদের একটি ভাবনা হৃদয়ে রেখে বলেছেন—এই যে ব্রহ্মস্বরূপ একটিমাত্র পা—ব্রহ্মের এই পরম পদ কখনো উৎখিন্ন হয় না অর্থাৎ এই পাকে কখনো তুলে নেন না তিনি—'একং পাদং নোৎখিদতি'। এই মন্ত্রাংশ অথর্ববেদ থেকে নেওয়া। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হল—

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ হংস উচ্চরন্।
যদঙ্গ স তমুৎখিদেন্নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যাৎ।
ন রাত্রী নাহঃ স্যান্ন ব্যুচ্ছেৎ কদাচন॥

আদিত্য সূর্যের মতো ব্যাপ্ত-স্বরূপ সেই ব্রহ্ম তাঁর নিজের অংশভূত তাঁর পরম পদকে কখনো তুলে নেন না। সলিল-স্বরূপ এই জগতের মধ্যে হংসের মতো তিনি। সেই পরমহংস জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম যদি নিজের অংশ ভূত পদখানি তুলে নিতেন, তাহলে এই জগতে মৃত্যু বা অমৃত কিছুই থাকবে না। আবার দ্যুলোকবিহারী সূর্যই যদি এহ শব্দের অর্থ হয় তবে আকাশকেও সমুদ্রের মতো কল্পনা করেন কবি-ঋষিরা। আকাশ-রূপ সমুদ্রের জলে হংসরূপী সূর্য একপদে বিচরণ করেন। সেই আকাশ থেকে তাঁর একপদ তুলে নিলে—অহোরাত্রি, মাস, বৎসর এই কালমানও আর থাকবে না। তাই তিনি এই অজ একপাৎ।

[নিরুক্তম্ (ক্ষেমরাজ-কৃষ্ণদাস) ১২.২৯, পৃ. ৪৮৪; অথর্ববেদ (Roth & Whitney) ১১.৪.২১, পৃ. ২৫২]

নিরুক্তকার যাস্ক এবং বেদের টীকাকার সায়নাচার্য—দুজনেই অজ একপাৎ বলতে সূর্যকেই বুঝেছেন প্রধানত। কিন্তু মহাভারতে তিনি একাদশ রুদ্রের একজন, যদিও এই রুদ্রের স্বরূপের মধ্যেও তাঁর সূর্যগুণ আছে।

অজৈকপাৎ$_2$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের অজৈকপাৎ নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

অজৈকপাদেকাদশসু রুদ্রেষু কশ্চিৎ।

মহাভারত-পুরাণে একাদশ রুদ্রের একতর অজৈকপাৎ-এর নাম একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। এই একাদশরুদ্রকে রুদ্র-শিবের অনুচর রূপে, কখনো বা রুদ্র-শিবের সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পনা করা হয়। একাদশ রুদ্রের অন্যতম অজৈকপাদের নামও এই ভাবনা থেকেই ভগবান শিবের উপর আরোপিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৩; (হরি) ১৩.১৬.১০৩]

অজৈকপাৎ$_3$ ভূত এবং সরূপার পুত্র একজন রুদ্র। একজন ভূতনায়ক। *[ভাগবত পু. ৬.৬.১৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৭১; বায়ু পু.৬৬.৬৯]*

একাদশ রুদ্রের অন্যতম। স্থাণুর পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে অজৈকপাদের নাম।

[মৎস্য পু. ৫.২৯; মহা (k) ১.৬৬.২; ১.১২৩.৬৮; (হরি) ১.৬১.২; ১.১১৭.৭২]

অজৈকপাৎ$_4$ শালামুখীতে স্থিত অগ্নি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.২৫; বায়ু পু. ২৯-২৪]

অজৈকপাৎ$_5$ রাত্রির একটি মুহূর্তের নাম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৩.৪২]

অজোদর তারকাসুর বধের সময় যেসব অনুচর যোদ্ধা স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬০; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

অঞ্চলদ্বিচরা একটি ভারতবর্ষীয় জনপদ। তবে এর অবস্থান সম্পর্কে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৪৫]*

অঞ্জন$_1$ পুরাণপ্রসিদ্ধ হস্তী। ঐরাবতের ঔরসে অভ্রমূর গর্ভজাত পাতালবাসী একটি হস্তী। সুপ্রতীক নামক হস্তীর বংশে জাত। রামায়ণে একে একটি দিগ্‌হস্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটোৎকচের অনুগামী ছিলেন। পুরাণমতে তিনি যমের বাহন। তাঁর কন্যার নাম অঞ্জনা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় জয়দ্রথের সঙ্গে যুদ্ধকালে সাত্যকি যুধিষ্ঠিরকে 'অঞ্জন-বংশে'র এক হাজার হাতি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, ওই হাতিরা একত্রে 'অঞ্জনক' বলে চিহ্নিত, অর্থাৎ অঞ্জন নামে বিখ্যাত 'ব্রিড্'-এর হাতি—যদেতৎ কুঞ্জরানীকং...কুলমঞ্জনকং নাম। সাত্যকি জানিয়েছেন—এই বিখ্যাত হস্তীগুলি মহাবীর অর্জুন দিগ্‌বিজয়কালে কিরাতদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন। পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির হেরে যাবার পর এই বিখ্যাত মদস্রাবী হস্তীগুলি দুর্যোধনের হস্তগত হয়। সাত্যকি দুঃখ করে বলেছেন—অর্জুনকে এখন নিজের পাওয়া হাতি-গুলির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে। এই

হাতিগুলি কিরাতদের দ্বারা সুশিক্ষিত এবং সেগুলি অত্যন্ত উন্নতমানের হাতি। এঁদের গণ্ডদেশ এবং মুখ থেকে মদবারি ক্ষরিত হত। এরা স্বর্ণবর্ণ কবচ দ্বারা বিভূষিত ছিল। বায়ুপুরাণ মতে, সমুদ্র থেকে কৌশিকী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে অঞ্জন হস্তী ও তার পরিবারবর্গ এক বনে বাস করত।

[মহা (k) ৫.৯৯.১৫; ৬.৬৪.৫৭; ৭.১১২.১৭-১৯, ২৭-৩৬; (হরি) ৫.৯২.৮; ৬.৬৩.৫৭; ৭.৯৬.১৬-১৮, ২৭-৩৫; রামায়ণ ৭.৩১.৩৬; বায়ু পু. ৬৯.২১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩২৭, ৩৩০; বায়ু পু. ৬৯.২৩৮; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৯.২৮]

অঞ্জন$_{২}$ বিখ্যাত হস্তী এবং হস্তী-বংশের বিশেষ নাম। ব্রহ্মা তাঁর উদরে লালিত অণ্ডের একভাগ ইরাবতীর গর্ভে স্থাপিত করলে ইরাবতীর গর্ভ থেকে হস্তীকুলের উদ্ভব হয়। হস্তীকুলের আদিমাতা ইরাবতীর চার পুত্রের মধ্যেও আমরা একজন অঞ্জনকে পাই। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ইরাবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র ঐরাবতের বংশধারায় জাত অঞ্জন হস্তী থেকে পৃথক বলে বোঝা যায়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৯২]

অঞ্জন$_{৩}$ নিমিবংশের অধস্তন পুরুষ কুণির (পাঠান্তরে কৃতির) সন্তান অঞ্জন। পুত্রের নাম ঋতুজিৎ। উইলসন বায়ু পুরাণের প্রমাণে কুণি-কে 'শকুনি'-র সঙ্গে একাত্মক করতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে কুণির পুত্র ঋতুজিৎ-এর সঙ্গে বায়ুপুরাণের পুত্র-নামটি মেলে না। *[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১৩; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.৫.৩১; বায়ু পু. ৮৯.২০; দ্র. H.H. Wilson, Vishnu Purana, vol. 4, p. 334]*

অঞ্জন$_{৪}$ সাম নামক হস্তীর শক্তিতে অঞ্জনাবতীর গর্ভে অঞ্জন নামক বিখ্যাত কুলহস্তীর জন্ম হয়েছে। এখানে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং বায়ু-পুরাণের পাঠ নিয়ে তর্ক আছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৪৩; বায়ু পু. ৬৯.২২৭]

অঞ্জন$_{৫}$ একটি পর্বত। কুলপর্বতগুলির অন্যতম।

[দ্র. অঞ্জনপর্বত]

অঞ্জন$_{৬}$ কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন সর্প। *[বায়ু পু. ৬৯.৬৯]*

অঞ্জন$_{৭}$ সরমার গর্ভে দুল্লোলক ও ললোহ নামে দুটি সারমেয় (অর্থাৎ কুকুর) জন্মগ্রহণ করে। দুল্লোলকের বংশে যেসব কৃষ্ণবর্ণ সারমেয় জন্মগ্রহণ করে তারা একত্রে অঞ্জন নামে পরিচিত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৪২]*

অঞ্জন$_{৮}$ কজ্জল-বিশেষ। প্রকারভেদে ছয় প্রকারের অঞ্জন—সৌবীর, যামুন, তুত্থ, ময়ূরগ্রীবক, দর্বিকা এবং মেঘনীল—

> সৌবীরং যামুনং তুত্থং ময়ূর-যামুনং তথা।
> দর্বিকা মেঘনীলশ্চ অঞ্জনানি ভবন্তি ষট্॥

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ছয় প্রকারের কাজল ব্যবহৃত হয়।

সৌবীর বৃক্ষনিঃসৃত রস, যামুন এক ধরনের প্রস্তর, ময়ূরগ্রীবক এক ধরনের রত্ন, মেঘনীল তৈজস। এগুলিকে শিলা বা তৈজসপাত্রে ঘষে গুঁড়ো বা রস বার করে কাজল তৈরি করা হয়। তামার পাত্রে ঘৃত বা তেল লাগিয়ে নিয়ে আগুনের শিষে ধরলে যে কাজল তৈরি হয়, তার নাম দর্বিকা—

> ঘৃততৈলাদিযোগেন তাম্রাদৌ দীপবহ্নিনা।
> যদঞ্জনং জায়তে সা তু দর্বিকা পরিকীর্তিতা॥

এগুলির মধ্যে 'তুত্থ' একটু অন্যরকম। একজন পণ্ডিত বলেছেন—copper in combination with the burning water' gives rise to 'tuttha' (blue vitriol). আবার অন্য পণ্ডিতেরা মন্তব্য করেছেন যে, সমুদ্রফেন, হরতুকীর গুঁড়োর সঙ্গে 'তুত্থ' বা copper sulphate মিশিয়ে কাজল তৈরি করলে তাতে বিশেষ ধরনের নেত্ররোগের নিরাময় হয়।

[কালিকা পু. ৬৯.১৪৮-১৫৩; Latro-chemistry of Ayurveda, p. 320; Dasari Srilakshi & others, Theraputic Potentials of Sudha Varga Dravyas Vis-A-Vis Calcium Compounds: A Review. In International Research Journal of Pharmacy 2012, 3(10)]

অঞ্জনপর্বত$_{১}$ অথর্ববেদ এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে ত্রিককুদ বা ত্রৈককুদ নামে এক পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনটি শৃঙ্গ বিশিষ্ট বলেই হয়তো পর্বতটি এই নামে খ্যাত। অথর্ববেদে প্রথম এই ত্রিককুদ পর্বতকে অঞ্জনপর্বত বলা হয়েছে—

> দেবাঞ্জন ত্রৈককুদং পরি মা পাহি বিশ্বতঃ।
> ন ত্বা তরন্ত্যোষধয়ো বাহ্যাঃ পর্বতীয়া উত॥

[অথর্ববেদ (Roth whitney), ১৯.৪৪.৬]

অথর্ববেদে এই ত্রৈককুদ বা অঞ্জন পর্বতকে নানা ওষধির আকর বলা হয়েছে। অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে আমরা এই পর্বতের উল্লেখ পাই খনিজ দ্রব্যের আকর হিসেবেও।

তবে এই ত্রিককুদ বা অঞ্জনপর্বত সম্পর্কে সবথেকে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাই তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শতপথ ব্রাহ্মণে। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করলেন। বজ্রের আঘাতে তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড হল। এই সময় বৃত্রাসুরের চোখের কনীনিকা (eye ball) পড়ল এই ত্রিককুদ পর্বতে যা চোখের প্রসাধন দ্রব্য কাজল (অঞ্জন)-এ পরিণত হল। যজ্ঞের সময় এই ত্রৈককুদ অঞ্জন ব্যবহারের বিধি আছে। সেই প্রসঙ্গেই ত্রৈককুদ তথা অঞ্জনপর্বতের কথা এসেছে। অথর্ববেদেও এই পর্বতকে অঞ্জন ও নানা ওষধির আকর বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে সৌবীরাঞ্জন শব্দটির উল্লেখ পাই, রসায়ন শাস্ত্রে যাকে Antimony বলা হয়েছে। প্রসাধন তথা ওষধি হিসেবে এই Antimony-র ব্যবহার বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। চোখের কাজলের এই মূল উপাদানটির অতিবৃহৎ ভাণ্ডার ছিল ত্রিককুদ পর্বত। বোধহয় বৃত্রাসুরের কাহিনী বা ত্রিককুদ-এর সঙ্গে অঞ্জনপর্বতের নাম জড়িয়ে যাবার পিছনে মূল সত্য এটাই। সৌবীরাঞ্জন শব্দটি থেকেই এই পর্বতের অবস্থান সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অঞ্জনপর্বতের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে—মেরু ও কিঙ্কভের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পর্বতগুলির মধ্যে অন্যতম হল অঞ্জনপর্বত। বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু অর্থাৎ প্রাচীন সিন্ধু-সৌবীর অঞ্চলে অবস্থিত কোন পর্বতকেই প্রাচীন ত্রিককুদ বলে ধারণা করা যায়। পণ্ডিত V.S. Agrawala অঞ্জনপর্বতকে সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত সুলেমান পর্বত শ্রেণী বলে নির্দেশ করেছেন। বৈদিক গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যসূত্র থেকে তাঁর ধারণাকে অভ্রান্ত বলা যায়। বিভিন্ন পুরাণে আমরা এই অঞ্জনপর্বতের নাম উল্লিখিত হতে দেখি সুমেরু, হিমালয় এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য পর্বতের সঙ্গে। পুরাণের বিবরণেও একথা স্পষ্ট যে এই পর্বত মূলত ওষধির জন্যই বিখ্যাত ছিল।

পুরাণে সিতোদ বা অসিতোদ হ্রদের পাশে এর অবস্থানের উল্লেখ মেলে। একথাও বলা হয়েছে যে অঞ্জন পর্বত ছিল বিশিষ্ট নাগদের বাসভূমি।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬.১.১.৫; শতপথ ব্রাহ্মণ ৩.১.৩.১১-১২; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৫.১০; বায়ু পু. ৩৬.২৮; ৩৯.৫৯; বরাহ পু. ৮০.২০; IKP (Agrawala), p. 39; GDAMI (Dey) p. 8]

মহাভারতের দ্যূতে পরাজিত পাণ্ডবদের বনগমনের সময় বিদুর যুধিষ্ঠিরকে অঞ্জনপর্বতে যাবার পরামর্শ দেন। বিদুর বলেছেন যে, অঞ্জনপর্বতে মহর্ষি অসিত বাস করেন যাঁর মূল্যবান উপদেশ পাণ্ডবরা লাভ করতে পারবেন। সম্ভবত, এই ত্রৈককুদ অঞ্জন গিরিতে যাবার উপদেশই বিদুর দিয়েছেন বলে মনে হয়।

[মহা (k) ২.৭৮.১৫; (হরি) ২.৭৫.১৩ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র., খণ্ড ২, পৃ. ৬১৭]

অঞ্জনপর্বত$_2$ বরাহমিহির বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে অঞ্জনপর্বতের উল্লেখ করেছেন পূর্বদেশে অবস্থিত পর্বত হিসেবে। মগধ প্রভৃতির সঙ্গে নামোল্লেখ থাকায় এই নামে কোনো পর্বত সে সময় পূর্ব ভারতে ছিল বলেই ধারণা হয়।

[বৃহৎ সংহিতা ১৪.৫]

অঞ্জনপর্বত$_3$ রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত আছে যে, অঞ্জনপর্বত এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছিল বানর জাতির বাসভূমি। হনুমানের পরামর্শে সুগ্রীব এই অঞ্জনপর্বতবাসী বানর সেনাকে রামচন্দ্রের সহায়তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সুগ্রীবের আহ্বানে অঞ্জনপর্বত থেকে তিন কোটি বানর কিষ্কিন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, হনুমানের পিতা বানররাজ কেশরী এই অঞ্জনপর্বতে রাজত্ব করতেন। অঞ্জনা এবং অদ্রিকা নামে দুই শাপভ্রষ্টা অপ্সরা তাঁর পত্নী ছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য একসময় অঞ্জনপর্বতে এসে অঞ্জনা এবং অদ্রিকাকে মহাবলশালী পুত্র লাভের বর দেন। পরে পবনের ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে হনুমান এই অঞ্জন পর্বতেই জন্মগ্রহণ করেন।

[রামায়ণ ৪.৩৭.৫, ২০; ব্রহ্ম পু. ৮৪ অধ্যায়]

হনুমানের বাসভূমি এই অঞ্জনপর্বত কোথায় অবস্থিত ছিল, এ বিষয়ে ভৌগোলিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে

হনুমানের যে জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, সুমেরু পর্বতের নিকটবর্তী কোনো পর্বতে হনুমানের জন্ম হয়। ফলে অধিকাংশ পণ্ডিত বৈদিক সাহিত্যে যে অঞ্জন গিরির উল্লেখ পাওয়া যায় তার সঙ্গে ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত অঞ্জনপর্বতকে একাত্মক মনে করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে অঞ্জনপর্বতের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে খুব স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছে যে, অঞ্জনপর্বত অবস্থিত ছিল ব্রহ্মগিরি পর্বতের পাশে—

গিরির্ব্রহ্মগিরেঃ পার্শ্বে অঞ্জনো নাম নারদ।

এখন পণ্ডিতরা সকলেই একমত যে, ব্রহ্মগিরি পশ্চিমঘাট পর্বতের অন্তর্গত একটি পর্বতশ্রেণী। আধুনিক দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে এর অবস্থান। ব্রহ্মপুরাণে গোদাবরী তথা গৌতমী গঙ্গার উল্লেখ থাকায় অঞ্জন পর্বতের দাক্ষিণাত্যে অবস্থানটিই আরও সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অঞ্জনপর্বতকে বানরজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বলায় আরও স্পষ্ট ধারণা হয় যে, এই অঞ্জনপর্বত কখনোই বেদে বর্ণিত অঞ্জনগিরি নয়। কারণ বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই ধারণা স্পষ্ট ছিল যে, আর্যেতর বানরজাতির বাসভূমি মূলত বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে। পণ্ডিত H.H. Wilson লিখেছেন যে, কর্ণাটকে (Mysore) হনুমান-মালাই নামে একটি পর্বত আছে, যাকে পুরাণে বর্ণিত অঞ্জনপর্বত বলেই মনে হয়। Wilson-এর অনুমান রামায়ণের বিবরণের নিরিখে সত্য বলেই মনে হয়। *[GDAMI (Dey), p. 8; H.H. Wilson, Mackenzie Collection: A Descriptive Calalogue of the Oriental Manuscripts, Vol. I, p. 62]*

অঞ্জনপর্বা (অঞ্জনপর্বন্) ঘটোৎকচের পুত্র তথা ভীমের পৌত্র ছিলেন অঞ্জনপর্বা। ঘটোৎকচ যখন বিশাল রাক্ষসবাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুদ্ধ করতে এলেন, সেই সময় অঞ্জনপর্বাও পিতার সঙ্গে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বত্থামার হাতে অঞ্জন-পর্বার মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৫.১৯৪.২০; ৭.১৫৬.৮১-৯০; (হরি) ৫.১৮৪.২০; ৭.১৩৬.৭৭-৮৬]

অঞ্জনবতী অঞ্জন নামক হস্তীর পুত্রী। প্রথিতায়ু এবং অজ নামে তার দুই পুত্র। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে এই পুত্রদের নাম প্রমাথি এবং পুরুষ। পশু হিসেবে এরা সুন্দর-দর্শন এবং শক্তিমান।

[বায়ু পু. ৬৯.২২৭-২২৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৪৩-৩৪৪]

অঞ্জনসিদ্ধি এক ধরণের যোগসিদ্ধি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৩৬.৫২]

অঞ্জনা বরুণের কন্যা অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলা অভিশপ্ত হয়ে বানরপতি কুঞ্জরের মেয়ে অঞ্জনা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বানররাজ কেশরীর পত্নী। রূপের জন্য ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন। ইচ্ছা মতো রূপ ধারণ করতে পারতেন। তিনি একদিন অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত হয়ে রূপযৌবনশালিনী এক মানবীরূপে পর্বত-শিখরে ভ্রমণ করছিলেন। এই অবস্থায় পবনদেব তাঁকে দেখতে পান। তাঁর অলোকসামান্য রূপ-যৌবন বস্ত্রের অন্তরাল থেকেও প্রকট হয়ে উঠেছিল। পবনদেবের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি অঞ্জনার পরিধান-বসন উড়িয়ে নিয়ে গেলেন এবং বলপূর্বক তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। এরপর অঞ্জনা একটি নির্জন গুহার মধ্যে মহাতেজস্বী, মহাশক্তিধর হনুমানের জন্ম দেন। এই অবস্থায় কেশরী-পত্নী অঞ্জনা নিজের পতিব্রতা ধর্ম নষ্ট হচ্ছে বলে আতঙ্কিত হন। বায়ুদেব তাঁকে বলেন—আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। কিন্তু তোমাকে আলিঙ্গন করে মনে মনে তোমার সঙ্গে আমি মিলিত হয়েছি—

মনসাস্মি গতো যৎ ত্বাং পরিষ্বজ্য যশস্বিনী।

কিন্তু দেবতার এই মানস-মিলন তো ব্যর্থ হবার নয়। এর ফলে তুমি এক মহাশক্তিধর, মহাতেজস্বী পুত্র লাভ করবে, যে উল্লম্ফন এবং অতিক্রমে হবে আমারই মতো গতিশীল। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী, পুত্রহীনা অঞ্জনা বেঙ্কটগিরিতে পুত্র লাভের জন্য বায়ুর তপস্যা করেন। সেই তপস্যার বর হিসাবে বায়ু অঞ্জনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। *[রামায়ণ ৪.৬৬.৮–২০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২২৪-২২৫; বায়ু পু. ৬০.৭৩; স্কন্দ পু. (বিষ্ণু/বেঙ্কটাচল ৩৯.১-৫০]*

অঞ্জনাভ একটি পর্বত। এটি এতই পবিত্র যে, চিত্রকূট পর্বতের সঙ্গে একত্রে অঞ্জনাভের নাম উচ্চারিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৩২; (হরি) ১৩.১৪৩.৩২]

অঞ্জনী মগধরাজ হেমসদনের পত্নী। হেমসদনের ঔরসে অঞ্জনীর গর্ভে বুধ নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪০.২৫৫]

অঞ্জলি এক ধরনের উপাসনা-মুদ্রা। এই মুদ্রায় দুই হাত জোড় করতে হয়। যে এক হাতে দেবোদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে, পরলোকে তার সেই হাত কাটা যাবে বলে ভয় দেখানো হয়েছে।

[ভাগবত পু. ১০.২২.১৯]

অঞ্জলিকাবেধ মত্ত হস্তীকে বশীকরণের বিদ্যা। মহাভারতের দ্রোণপর্ব থেকে জানা যায় যে ভীমসেন এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দ্রোণপর্বের এক জায়গায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত ভীমের অশ্ব-রথ চূর্ণ করে দিলে ভীম পায়ে হেঁটে দৌড়ে উপস্থিত হলেন ভগদত্তের হাতীটির গায়ের কাছে। তিনি হস্তী-বশীকরণের বিদ্যা জানতেন বলেই পালিয়ে গেলেন না। বরঞ্চ হাতীটির বহিঃ-শরীরের কোথাও একটা জায়গায় লুকিয়ে পড়ে হাত দিয়ে এমনভাবে তার নানান জায়গায় তাড়ন-পীড়ন-কণ্ডূয়ন করতে লাগলেন যে হাতীটি যুদ্ধের ব্যাপারে আর কোনো স্পৃহা না দেখিয়ে প্রবলবেগে রথের চাকার মতো ঘুরতে লাগল। এটা সম্ভব হয়েছে 'অঞ্জলিকাবেধ' নামক বিদ্যাটি জানা থাকার ফলেই।

[মহা (k) ৭.২৬.২৩-২৫; (হরি) ৭.২৫.২১নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ২১, পৃ. ২১৯]

অঞ্জলিকাশ্রম এক মহাতীর্থের নাম। এখানে শাকান্ন ভোজন করে বল্কল পরে কিছুদিন বাস করলে কন্যাকুমারী দর্শনের পুণ্য লাভ হয়—

শাকভক্ষশ্চীরবাসাঃ কুমারীর্বিন্দতে দশ ॥

এটি কোকামুখতীর্থের কাছে অবস্থিত।

[মহা (k) ১৩.২৫.৫২; (হরি) ১৩.২৬.৫২]

অঞ্জসী ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত একটি নদী। অঙ্গিরাপুত্র কুৎস ঋষি একটি মন্ত্রে অঞ্জসী, কুলিশী, এবং বীরপত্নী—এই তিন নদীর নাম একই সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন। *[ঋগ্‌বেদ ১.১০৪.৩-৪]*

☐ পণ্ডিত মনোহর লাল ভার্গবের মতে অঞ্জসী নদীটি কৈলর, কুঞ্জহেড়ী, মৌলী, মনৌলী, মোতা ও জানসিয়া অঞ্চলগুলির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে একাধিক ধারায় বিভক্ত হয়ে রাজপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এটি সরস্বতী নদী ব্যবস্থার (River System) অংশ বলেই তিনি মনে করেছেন। এটি বর্তমান রাজস্থানের কোনো একটি অংশ দিয়েই প্রবাহিত ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা তবে এর আধুনিক রূপ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।

[GRI (Bhargava) p. 99, 101;
K.C. Singhal and Roshan Gupta:
The Ancient History of India (Vedic Period);
A New Interpretation; p. 164]

অঞ্জিষ্ঠ ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তরে যখন ঋতসাবর্ণি বা রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, অঞ্জিষ্ঠ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অঞ্জিষ্ঠ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮৯]

অটবীতীর্থ নর্মদার তীরবর্তী এই তীর্থস্থল অত্যন্ত পবিত্র। এই তীর্থে স্নান করলে দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য হওয়া যায়। *[পদ্ম পু. (মহর্ষি) স্বর্গ. ২১.৩১]*

অটবীশবর *[দ্র. অটবীশিখর]*

অটবীশিখর অটবীশবরেরাই মহাভারতে অটবীশিখর নামে খ্যাত হয়েছেন বলে মনে হয়। অটবী অর্থ বন। বনে বনে ঘুরে বেড়ানো 'আটবিক'দের নিয়েই হয়তো এই জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল।

[মহা (k) ৬.৯.৪৮; (হরি) ৬.৯.৪৮]

পণ্ডিতেরা মনে করেন এই জনগোষ্ঠী মধ্য-বিন্ধ্য অঞ্চলের ভিল উপজাতি। পুরাণগুলিতে বা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে যে আটবিকদের কথা আছে, তাঁরা এই অটবীশবরদের সঙ্গে একাত্মক। ঐতিহাসিক ফ্লিটের মতে এঁরা জব্বলপুর অঞ্চলের অদিবাসী।

[HGAI (Law), p. 276]

অটবীশেখর পুরাণোক্ত জনপদ। অটবীশিখর জনজাতির সঙ্গে এই জনপদবাসীরা একাত্মক বলে মনে হয়। *[পদ্ম পু. (স্বর্গ). ৩.৪৪]*

অটমান ভাগবত পুরাণে কলিযুগের বিশিষ্ট রাজাদের রাজত্বকাল বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, কলি যুগে মগধে শুঙ্গ এবং কণ্ব বংশের পতনের পর বলি নামে এক শূদ্র রাজা রাজত্ব করবেন। এই বলির বংশে মেঘস্বাতির পুত্র ছিলেন অটমান। তিনি অনিষ্টকর্মার পিতা।

[ভাগবত পু. ১২.১.২৪-২৫]

অট্টহাস$_1$ একজন মুনি। পুরাণে বর্ণিত আছে যে ইনি

শ্বেতকল্পীয় কলিতে আবির্ভূত হয়ে সংক্ষিপ্ত-ভাবে শিবধর্মের উপদেশ দেবেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪০.২১১, ২১৪]

অট্টহাস$_২$ এই পার্বত্য তীর্থটি হিমালয়ে অবস্থিত।

[বায়ু পু. ২৩.১৯১]

এটি পিতৃতীর্থ হিসেবেও পরিচিত। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ ও দান করলে পুণ্যলাভ হয়।

[মৎস্য পু. ২২.৬৮]

বারাণসীতেও অট্টহাস নামে একটি তীর্থ রয়েছে, যেখানে শিবলিঙ্গের অর্চনা করা হয়—

মুখং লিঙ্গং তু তদ্দেবি পশ্চিমাভিমুখং স্থিতম্।

[দ্র. কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৪৭]

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত লাভপুরের পূর্বভাগে অট্টহাস নামে একটি তীর্থ রয়েছে। কথিত আছে যে, এ-স্থলে সতীদেবীর ওষ্ঠ পতিত হয়েছিল। এখানে সতীকে ফুল্লরা নামে অর্চনা করা হয়। *[GDAMI (Dey) p. 13; EAIG (Kapoor) p. 86]*

অট্টহাস$_৩$ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত একটি পর্বতশৃঙ্গ। মহাদেব বিংশতম দ্বাপরে অট্টহাস নামে এই শৃঙ্গে আবির্ভূত হন। এটি একটি পবিত্র তীর্থ। দেবী মহানন্দা এখানে অবস্থান করেন। *[বায়ু পু. ২৩.১৯১; দেবীভাগবত পু. ৭.৩৮.২৫; মৎস্য পু. ২২.৬৮]*

অট্টালজ্জ দেবী জগদম্বার কৃপায় রাজা বৎস অট্টালয়া নামে একটি রাক্ষসীকে বধ করেন। সেই রাক্ষসীর বধস্থানে যে নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়, তারই নাম অট্টালজ্জ।

[স্কন্দ (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৬৫, ১০৯-১১১]

অঠিদ মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে ভারতবর্ষের অন্তর্গত যেসব জনপদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, অঠিদ তার মধ্যে একটি। একে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে মহাভারতে।

[মহা (k) ৬.৯.৬৪; (হরি) ৬.৯.৬৪ (অনিদাঘ পাঠধৃত হয়েছে)]

অডম্বর স্কন্দ-কার্তিকেয়র শক্তিবৃদ্ধির জন্য ধাতা যে দুই অনুচর তাঁকে দিয়েছিলেন, তাঁদের একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৩৯; (হরি) ৯.৪২.৩৭]

অণিমা একটি যোগসিদ্ধির নাম—যাতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম হওয়া যায়। *[দ্র. অষ্টসিদ্ধি]*

[মার্কণ্ডেয় পু. ৪০.৩১]

অণীমাণ্ডব্য মাণ্ডব্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যপরায়ণ, ধীর তপস্বী। একদিন তিনি তাঁর আশ্রমের দুয়ারে এক বৃক্ষমূলে বসে তপস্যা করছিলেন। কৃচ্ছ্রতার কারণে তিনি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে তপস্যা করার সময় একদিন কতকগুলি চোর তাদের চুরি-করা টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্তর নিয়ে সেই মাণ্ডব্য-মুনির আশ্রমে প্রবেশ করল। ওদিকে রাজার রক্ষী পুরুষেরা চোর খুঁজতে-খুঁজতে সেই আশ্রমেই ঢুকে পড়লে চোরেরা আশ্রমের কোনো একটা জায়গায় চুরির ধন লুকিয়ে রেখে নিজেরাও লুকিয়ে পড়ল। এদিকে রাজরক্ষীরা প্রবেশ করে প্রথমে কোথাও চোরদের দেখতে পেল না এবং তাদের হদিশ জানার জন্য মৌনব্রতধারী মাণ্ডব্য মুনিকেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকল। মৌনী মাণ্ডব্য ভালো-মন্দ, হ্যাঁ-না কোনো উত্তরই দিলেন না। নিরুপায় রক্ষীরা অনেক খুঁজে-পেতে চোরদের এবং তাদের লুক্কায়িত ধনও বের করে ফেলল। কিন্তু প্রথম থেকেই একেবারে মৌন থাকায় মাণ্ডব্য-মুনির ওপরেও এবার রক্ষীদের সন্দেহ হল। তারা চোরদের সঙ্গে মাণ্ডব্য-মুনিকেও ধরে নিয়ে গেল রাজদরবারে।

রাজা ন্যায়-বিচার করে চোরদের সঙ্গে মাণ্ডব্য-মুনিকেও শূলে চড়ানোর আদেশ দিলেন। রাজা এবং রক্ষীরা কেউই অনুধাবন করলেন না যে, একজন মহাব্রতী মুনিকে শূলে চড়ানো হচ্ছে। এমন শাস্তি তাঁর প্রাপ্য হতে পারে না। কিন্তু ঘটনা এই ঘটল যে, শূলে চড়ানোর পর চোরেরা মারা গেল, কিন্তু মাণ্ডব্য মুনি আপন তপস্যা-বলে শূলে-প্রোথিত অবস্থাতেও বেঁচে রইলেন। তাঁর আহার নেই, নিদ্রা নেই, শুধু তপস্যার বলে বলীয়ান হয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন না। রাজার রক্ষীরা অনেক দিন পর মাণ্ডব্য-মুনিকে বেঁচে থাকতে দেখে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা রাজার কাছে নিবেদন করল। রাজা তখনই রাজভবন থেকে বেরিয়ে মাণ্ডব্য-মুনির কাছে এসে অজ্ঞানে অপরাধ করার জন্য ক্ষমা চাইলেন। মাণ্ডব্য রাজার প্রতি প্রসন্ন হলেন। রাজার আদেশে তখনই তাঁকে শূল থেকে নামানো হল; কিন্তু সম্পূর্ণ শূলটি তাঁর দেহ থেকে মুক্ত করা গেল না বলে শূলের বাইরের অংশটুকু কেটে দেওয়া হল এবং

শূলাগ্রভাগ তাঁর দেহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়েই রইল। মাণ্ডব্য মুনি সেই অন্তর্গত শূলখণ্ড নিয়েই তপস্যার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

'অণী' শব্দের অর্থ শূলের অগ্রভাগ। অণীযুক্ত মাণ্ডব্য মধ্যপদলোপী সমাসে অণীমাণ্ডব্য। এইভাবে শূলাগ্র বহন করতে-করতে একদিন অণীমাণ্ডব্য ধর্মের দেবতা ধর্মরাজের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—কোন অজ্ঞাত দুষ্কর্মের ফলে তিনি এই যাতনা ভোগ করছেন। ধর্মরাজ বললেন—আপনি ফড়িং-জাতীয় একটি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে নলখাগড়ার শিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যার জন্য আজকে আপনার এই দুর্ভোগ। মুনি বললেন—আমি কোন বয়সে এই কাজ করেছিলাম। ধর্মরাজ বললেন—বাল্যকালে। মুনি বললেন—জন্ম থেকে বারো বৎসর পর্যন্ত মানুষ যে পাপ বা অন্যায় করে, সেটা অন্যায় বলে গণ্য হয় না, স্বয়ং দেবতারাও তাতে অন্যায় দেখেন না। মাণ্ডব্য মুনি এবার ধর্মকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—আপনি অল্প অপরাধে আমার গুরুদণ্ড দিয়েছেন, এই অপরাধে আপনি মানুষ হয়ে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করবেন। আর জগতে ধর্ম এবং অধর্মের উৎপত্তির বিষয়ে আমি বয়সের সীমাটাও ঠিক করে দিচ্ছি—জন্ম থেকে চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত যে দুষ্কর্ম মানুষ করবে তাতে তার অন্যায়-অপরাধ হবে না—

আচতুর্দশকাদ্ বর্ষান্ ন ভবিষ্যতি পাতকম্।

মহাভারত জানিয়েছে—এই অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপেই ধর্ম বিদুর হয়ে শূদ্রযোনিতে জন্মালেন—

ধর্মো বিদুররূপেণ শূদ্রযোনাবজায়ত।

[মহা (k) ১.১০৭-১০৮ অধ্যায়;
(হরি) ১.১০১-১০২ অধ্যায়;
ভাগবত পু. ৩.৫.২০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৭.২৫]

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে মাণ্ডব্য মুনি নিজেই এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে অন্যান্য মুনিদের সঙ্গে তিনিও কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন। শিবসহস্রনাম স্তোত্র শ্রবণের পর উপস্থিত মুনিঋষিরা সকলেই যখন মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন, সেই সময় মাণ্ডব্য এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে তাঁর তপস্যায় মহাদেব তুষ্ট হয়েছিলেন বলেই তিনি এই দুর্ঘটনা থেকে শেষপর্যন্ত মুক্তিলাভ করেন। *[দ্র. মাণ্ডব্য]*

[মহা (k) ১৩.১৮.৪৬-৪৮;
(হরি) ১৩.১৭.৪৬-৪৮]

অণু ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। অণু শব্দটি সূক্ষ্মত্বের দ্যোতক। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁকে 'অণু' পরিমাণ বলা হয়েছে, কখনো বা 'অণু'র থেকেও 'অণু' সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বলে বর্ণনা করে হয়েছে—

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্।

[শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩.২০]

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম 'অণু' পরিমাণ। চেতনার দ্বারা, অনুভূতির দ্বারা তাঁকে জানতে হয়—

এষো'ণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। *[মুণ্ডকোপনিষদ ৩.১.৯]*

ভগবান বিষ্ণুকে সেই সূক্ষ্ম পরমেশ্বরের সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পনা করা হয় বলে তাঁরও অন্যতম নাম অণু—

সৌক্ষ্ম্যাতিশয়শালিত্বাৎ অণুঃ।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৩; (হরি) ১৩.১২৭.১০৩;
বিষ্ণু সহস্রনাম, দ্র. শঙ্করাচার্যের টীকা]

অণুহ নীপ বংশীয় রাজা বিভ্রাজের পুত্র। বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের কন্যা কীর্তির (কোনো কোনো পুরাণে কৃত্বী বা কীর্তিমতীর) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অণুহের ঔরসে কীর্তির গর্ভে রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন।

[মৎস্য পু. ৪৯.৫৬-৫৭; বায়ু পু. ৯৯.১৭৯; ৭৩.৩১;
বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১২-১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৯৪]

□ মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বহু প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা দীর্ঘকাল রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করার পর কালের নিয়মে পরলোকে গমন করেছেন। রাজর্ষি অণুহের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.১.২৩২; (হরি) ১.১.১৯৩]

অণ্ড অণ্ড বলতে সাধারণত পাখির ডিম অথবা যে কোনো ডিমই বোঝায়। ঋগ্বেদের মধ্যেই এক বিখ্যাত উপমায় বলা হয়েছে—পাখি যেমন ডিম ভেঙে শাবককে নিষ্কাশিত করে— এখানে কিন্তু অণ্ড বস্তুটাকে পাখির গর্ভ হিসেবেই কল্পনা করা হয়েছে—

আণ্ডেব ভিত্ত্বা শকুনস্য গর্ভম্।

একই আমাদের জগৎসৃষ্টির ক্ষেত্রেও সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রথমে এক বিরাট অণ্ডের কল্পনা করা হয়েছে মহাভারতেও। মহাভারতের আরম্ভেই জগৎসৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে উগ্রশ্রবা সৌতি বলছেন—সৃষ্টির প্রথমে যখন সবকিছুই অন্ধকারে ঢাকা, তমসাবৃত, কোথাও কোনো আলোর আভাস নেই, সেই সময় সমস্ত সৃষ্টির বীজ, সমস্ত জন্য পদার্থের কারণ হিসেবে এক বিরাট অণ্ড জন্মাল, অবিনশ্বর অব্যয়-স্বরূপ সেই বীজভূত সেই অণ্ডই অব্যক্তা প্রকৃতির প্রথম ব্যক্ত স্বরূপ—first evolute–

নিষ্প্রভে'স্মিন্ নিরালোকে সর্বতস্তমসাবৃতে।
বৃহদণ্ডমভূদ্ একং প্রজানাং বীজমব্যয়ম্॥

বস্তুত এই বৃহদণ্ডই দর্শনশাস্ত্রের হিরণ্যগর্ভ, যাকে মনুসংহিতা মহাভারতের মতো 'বৃহদণ্ড' না বলে হেমময় অণ্ড বলেছে—

তদণ্ডমভবদ্ হৈমম্।

তবে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রণালীটা সর্বত্রই একরকম। মনুসংহিতাতেও সৃষ্টির প্রথমে সব কিছু অন্ধকারময়, অপ্রত্যক্ষ, অপ্রজ্ঞাত অর্থাৎ চোখে কিছু দেখার নেই, এমনকী অনুমেয় কোনো চিহ্নও নেই যাতে বলা যাবে—এটা এইরকম। এই অন্ধকারের আর একটা হল জল, যা থেকে মহাপ্রলয়ের পর জলে জলাকার একার্ণবের কল্পনা। মনু বলেছেন সেই জলের মধ্যেই পরম ঈশ্বরের বীজ নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা থেকেই সেই সহস্রসূর্যের মতো জাজ্বল্যমান হিরণ্ময় অণ্ডের সৃষ্টি—

আসীদিদং তমোভূতম্ অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্‌হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভবম্॥
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোক পিতামহঃ॥

বস্তুত সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় এই সামগ্রিক অন্ধকারের কল্পনা কিন্তু ঋগ্‌বেদ থেকেই ভাবনা করা হয়েছে—

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে।

তারপরেই সেই অন্ধকার থেকে জন্মানো সেই হিরণ্যগর্ভের কথাও ঋগ্‌বেদেই পাই আমরা—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে।

সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভই প্রথমে জন্মলাভ করে। এই হিরণ্যগর্ভ কিন্তু মহাভারতীয় বৃহদণ্ডের পারিভাষিক নাম।

[মহা (k) ১.১.২৯; (হরি) ১.১.২৯;
মনুসংহিতা ১.৫-৯; ঋগ্‌বেদ ১০.৬৮.৭;
১০.১২৯.৩; ১০.১২১.১]

আসলে মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বীজ নিষিক্ত হলে গর্ভ যেভাবে বৃদ্ধিলাভ করে জগৎসৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রথমে সেই জলের কল্পনা। ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনায় এই জলের গর্ভই হল প্রথম পর্যায়, যা ঋগ্‌বেদের অন্য অন্য মন্ত্রেও কল্পিত হয়েছে।

[ঋগ্‌বেদ ১.৭০.২; ৩.১.১২; ১০.১২১.১; ৬.৪৮.৫]

এর দ্বিতীয় পর্যায় হল হিরণ্যগর্ভ। মাতৃগর্ভে যাকে আমরা জরায়ু বলি, বৈদিক সংস্কৃত এবং আয়ুর্বেদের ভাষায় সাধারণত তাকেই 'উল্ব' বলা হয়, সাধারণ শব্দে সেটাই গর্ভ, কখনো কখনো সেটাকে অণ্ডও বলা হচ্ছে। এটা যেমন—তেমন গর্ভ নয় বলেই হয়তো গৌরবজনক 'হিরণ্য' শব্দটি 'গর্ভ' শব্দের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন গ্রন্থে মহত্তত্ত্বের তিনটি পর্যায়েরই উল্লেখ করে বলা হয়েছে—সকলের আগে প্রথমে জলই ছিল—

আপো হ বা ইদমগ্রে সলিলেমেবাসীৎ।

তারপর সেখানে হিরণ্ময় অণ্ডের সৃষ্টি হল—হিরণ্ময়মণ্ডং সম্বভূব। তারপর সৃষ্ট হলেন এক পুরুষ, যাঁর নাম প্রজাপতি—

পুরুষঃ সমভবৎ স প্রজাপতিঃ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১১.১.৬.১-২;
৬.১.১.১-৫]

বেদ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং মহাভারতের পরম্পরা রক্ষা করে পুরাণগুলিও সেই বৃহদণ্ডের কথা বলেছে অব্যক্তা প্রকৃতি থেকে মহান্ কিংবা মহত্তত্ত্বের প্রথম ব্যক্ত প্রকাশ প্রসঙ্গে। পৌরাণিকেরা মাতৃগর্ভের সাযুজ্যে হিরণ্যগর্ভের কল্পনা করে লিখেছেন—প্রথমে অব্যক্তা প্রকৃতি থেকে এক অতুলনীয় (অপ্রতিম) হিরণ্ময় অণ্ডের আবির্ভাব ঘটে। সেই অণ্ডের আবরণে জল থাকে। সেই জল তেজে, জলাশ্রিত তেজ বায়ুতে জল-তেজ এবং বায়ু আকাশে, আকাশ পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত মহান নামক প্রকাশের চারদিকে অব্যক্তা প্রকৃতির দ্বারা আবৃত থাকে। বস্তুত এই যে হিরণ্ময় অণ্ডের আবেষ্টনী কথা বলা হল—এগুলির ক্রম-প্রকটতা ঘটে সেই বৃহদণ্ডরূপ হিরণ্যগর্ভ বা মহান

বা মহত্তত্ত্ব থেকেই। আসলে এই বৃহদণ্ডের পর্যায় শব্দগুলি হল বুদ্ধি, হিরণ্যগর্ভ, মহান, বিরিঞ্চি ইত্যাদি। আর সর্বশেষ কথা হল এই অণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. ১.১.৪৩-৪৫; ১.১৯.১৫৪-৫, ১৬০; ১.২১.২৪; ২.৫৯.২৭; ৩.২.২৩০-১; মৎস্য পু. ২.২৯-৩২; ২৪৭.৪৩; ২৪৮.১; বায়ু পু. ১.৫০-৫২; ৪.৮২.৯; ১০১.১২৭; ৯.১২২; ৪৯.১৪৭-৫১]

অণ্ডকটাহ অন্ধকারের শেষভাগে চুয়াল্লিশ কোটি উননব্বই লক্ষ আশি হাজার যোজন নীচে অণ্ডকটাহের অবস্থান। এই কটাহের মধ্যভাগের পালক, পূর্বভাগে বসুধামা, দক্ষিণে শঙ্খপাল, পশ্চিমে তক্ষকেশ এবং উত্তরে কেতুমান। এই পালকদের শক্তি হরসিদ্ধি, সুপর্ণাক্ষী, ভাস্করা ও যোগনন্দিনী দেবী অন্যান্য দেবীর সহিত মিলিত হয়ে অণ্ডকটাহের মধ্যভাগ পালন করেন।

বিষ্ণুলোক এবং রুদ্রলোক এই অণ্ডকটাহের বাইরে আছে বলে মনে করা হয়। অণ্ডকটাহের দ্বারাই এই ব্রহ্মাণ্ড সমাবৃত। এই অণ্ডকটাহ আবার দশগুণ জল দ্বারা, সেই জলরাশি দশগুণ তেজ দ্বারা, সেই তেজ দশগুণ বায়ুদ্বারা, সেই বায়ু আবার দশগুণ আকাশ দ্বারা, সেই আকাশ দশগুণ দ্বারা এবং সেই মহত্তত্ত্ব আবার পরা প্রকৃতি দ্বারা সম্যক সমাবৃত।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৯.৩১; ৩৫-৪৪]

অণ্ডজ মহাকাব্য পুরাণে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণকারী প্রাণীকুলকে তাদের জন্মপ্রক্রিয়া অনুসারে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই চারটি ভাগ হল যথাক্রমে—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। অণ্ডজ প্রাণী মূলত তারাই, যারা অণ্ড বা ডিম্ব থেকে জন্মগ্রহণ করে। জলে বসবাসকারী মৎস্যজাতীয় প্রাণী, সাপ, কুমীর এবং অন্যান্য সরীসৃপ, কচ্ছপ এবং পক্ষীকুল এই অণ্ডজ প্রাণীবর্গের অন্তর্ভুক্ত।

[মহা (k) ১.৮৯.১১; ১২.১৫.২৮; ১৪.৮৫.৩৪; (হরি) ১.৭৭.১১; ১২.১৫.২৮; ১৪.১০৮.৩৩; পদ্ম পু. (ভূমি) ৬৬.৫-৭]

অতন্দ্রিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। তন্দ্রা অর্থাৎ নিদ্রাবেশ। সুতরাং অতন্দ্রিত শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল—যিনি নিদ্রাসক্ত নন বা যিনি কখনোই নিদ্রা যান না। জগদীশ্বর সর্বদাই জগতের সৃষ্টি ক্রিয়ায় ব্যস্ত এবং সৃষ্ট জগতের পালনের কাজেও রত। প্রতিটি জীব ও জড় বস্তুর প্রতি তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি, এই জগৎ সংসারের কোনও কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নেই—তাই তিনি অতন্দ্রিত।

আবার তন্দ্রা বা নিদ্রা অন্ধকারের প্রতীক, অচেতনতার প্রতীক। পণ্ডিতজনেরা তাই নিদ্রাকে তমোময়ী বৃত্তি বলে চিহ্নিত করেন। মহাদেব মূর্তিমান জ্ঞানস্বরূপ, অজ্ঞানতা বা অচেতনতা পূর্ণজ্ঞানের আঁধার তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না,—এই অর্থেও তিনি অতন্দ্রিত নামে খ্যাত—

অতন্দ্রিতঃ তন্দ্রা তমোময়ী বৃত্তিঃ
প্রবৃত্তিনিরোধিনী তদ্রহিতঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫১; (হরি) ১৩.১৬.৫১]

অতল পাতালের সাতটি তলের মধ্যে প্রথম তলটির নাম অতল। এই অতল-লোকের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিষ্ণু পুরাণ থেকে এবিষয়ে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় বিষ্ণু পুরাণ মতে সপ্ত পাতালের মধ্যে অতলের মৃত্তিকা শুক্লবর্ণ।

এই অতল লোকে দৈত্যরাজ নমুচি এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট দানব, রাক্ষস, নাগদের সুরম্য বাসভবন নির্মিত ছিল। দেবীভাগবত পুরাণ মতে ময় দানবের পুত্র বলাসুর নাকি এখানেই বাস করতেন।

[বায়ু পু. ৫০.১১, ১৩, ১৫-১৯; বিষ্ণু পু. ২.৫.২-৩; দেবীভাগবত পু. ৮.১৮.১৫; ৮.১৯.১-২; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৯.১]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই অতলকে তত্ত্বল নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.১১]

অতিকপিল কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মানের সাতপুত্রের অন্যতম। বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে অবশ্য 'কপিল' পাঠ ধৃত হয়েছে। জ্যোতিষ্মান কুশদ্বীপকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে তাঁর সাত পুত্রকে সেই সপ্তবর্ষের রাজা নিযুক্ত করেন। কপিল বা অতিকপিল যে বর্ষে রাজা হয়েছিলেন, তাঁর নাম অনুসারেই সেই বর্ষের নামকরণ করা হয়েছিল।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্), ২.৪.৩৬]

অতিকায় রাবণের ঔরসে ধান্যমালিনীর গর্ভজাত। তিনি অত্যন্ত বলশালী এবং পর্বতের মত বিশাল দেহধারী ছিলেন বলেই হয়তো এই নাম—অতিকায়।

যশ্চৈষ বিন্ধ্যাস্তমহেন্দ্রকল্পো
/ধন্বী রথস্থো'তিরথো'তিবীরঃ।
বিস্ফারয়ংশ্চাপমতুল্যমানং
/নাম্নাতিকায়ো'তিবিবৃদ্ধকায়ঃ॥

[রামায়ণ ৬.৫৯.১৬]

তিনি অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে পারতেন। মায়াবিশারদ ছিলেন। কখনো যুদ্ধে পরাজিত হননি। বিজ্ঞানে জ্ঞানী; অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধে সুনিপুণ। কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে তিনি বর লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁকে একটি দিব্যকবচ এবং সূর্যের মতো উজ্জ্বল একটি রথ প্রদান করেন। তিনি এতটাই বিক্রমী বীর যে, অতিকায়-রাক্ষস ইন্দ্র ও বরুণকেও যুদ্ধে পরাজিত করেন; একটি যুদ্ধে ধ্বংস করেন যক্ষদেরও। ধনুর্বিদ্যায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী। দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি তাঁর প্রপিতামহ সুমালীকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শ্রুতিধর। তিনি ঘোড়া এবং হাতির পিঠে চড়ে অসম্ভব নিপুণতায় ধনু-খড়্গ চালনা করতে পারতেন। রাজনীতি-শাস্ত্রে তাঁর যেমন জ্ঞান ছিল, তেমনই বিপন্ন সময়ে তিনি মন্ত্রণা-দানে সুদক্ষ ছিলেন।

[রামায়ণ ৬.৭১.৩০; ৬.৬৯.১০-১৪; ৬.৭১.৩২; ৭.২৭.৩১; ৬.৭১.২৮; ৬.৭১.১৯]

□ পিতৃব্য কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে শোকার্ত অতিকায় ত্রিশিরার বাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যান। বিভিন্ন অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে একটি সুগঠিত সুন্দর রথে চড়ে যুদ্ধে গেলেন তিনি। রথটির দু-পাশে দুটি খড়্গ দশহাত দীর্ঘ ছিল। একহাজার ঘোড়া সেই রথটিকে টানত। বানরেরা তাঁর সিংহনাদ শুনে ভয় পেয়ে যায়। তাঁর চোখ দুটি ছিল সিংহের মত। রাম তাকে দূর থেকে দেখেই বিস্মিত হয়ে বিভীষণকে তাঁর পরিচয় জানতে চান। অতিকায় কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল, শরভ প্রভৃতি বানরবীরদের হারানোর পর লক্ষ্মণ ধনুক হাতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিছু সময় দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলার পরে লক্ষ্মণ বজ্রের মতো একটি বাণ নিক্ষেপ করেন, যার ফলে অতিকায়ের মাথা কাটা যায়।

[রামায়ণ ৬.৬৮.৭; ৬.৬৯.১-৭, ৯; ৬.৭১.১২; ৬.৭১.৩-৭, ১০-১২; ৬.৭১.৩৯, ৪৬, ১১১; বৃহদ্ধর্ম পু. (নবভারত) ১.২২.২০]

অতিকৃচ্ছ্র বারো দিনে করণীয় ব্রত অথবা প্রায়শ্চিত্ত। এই ব্রতে প্রথম তিন দিন দিনের বেলায় এক-এক গ্রাস ভোজন, দ্বিতীয় তিন দিন সন্ধ্যায় এক-এক গ্রাস এবং তৃতীয় তিন দিন অযাচিতভাবে উপস্থিত অন্ন এক-এক গ্রাস ভোজনীয়। একেবারে শেষ তিন দিন উপবাস করতে হবে।

[কূর্ম পু. ২.২৯.২৭; পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৪৬.৪৮; দেবীভাগবত পু. ১১.২৩.৪৭-৪৮; অগ্নি পু. ১৭০.১৫-১৬]

বশিষ্ঠস্মৃতিতে কৃচ্ছ্র এবং অতিকৃচ্ছ্রের একটা পার্থক্য করে বলা হয়েছে—তিন দিন সকালে (দিনে) একবার খাওয়া, তিন দিন রাত্রে একবার খাওয়া, আর তিন দিন অযাচিতভাবে যা পাওয়া যায় তাই খাওয়া—এটা হল কৃচ্ছ্র। আর ওই তিন-তিন দিনের নিয়ম একই থাকবে কিন্তু খাওয়ার সময় একবারে যতটুকু খাওয়া যায়, ততটুকু খেলে, সেটা হবে অতিকৃচ্ছ্র। আর শুধু জলমাত্র খেয়ে পূর্বোক্ত নিয়মে চলার নাম কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র।

[বশিষ্ঠ-সংহিতা (আর্যশাস্ত্র) ২৪.১-৬]

মনুসংহিতার টীকায় কুল্লূকভট্ট বশিষ্ঠ, আপস্তম্ব, পরাশরের মত উদ্ধার করে—দিনে-রাত্রে কয় গ্রাস খাবে, গ্রাসের পরিমাণ কেমন হবে, তারও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কৃচ্ছ্র-ব্রত, যাকে প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্র বলা হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত-ব্রতে সন্ধ্যাবেলায় অর্থাৎ রাতের খাবারে ২২ গ্রাস সকালে বা দিনের খাবারে ২৬ গ্রাস, অর্থাৎ অযাচিত অবস্থায় ২৪ গ্রাস খাওয়া যাবে। গ্রাসের পরিমাণ হবে মুরগীর ডিমের মতো—

কুক্কুটাণ্ড-পরিমাণং যাবাংশ্চ প্রবিশেন্মুখম্।
এতদ্‌গ্রাসং বিজানীয়াৎ শুদ্ধ্যর্থং কায়শোধনম্॥

[মনুসংহিতা ১১.২১২; দ্র. কুল্লূকভট্টকৃত টীকা]

অতিগুল্ম বলরামের অন্যতম পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৬৭]

অতিতেজা ভবিষ্যতের তৃতীয় সাবর্ণি মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম। পুরাণে এঁকে পুলহ বংশীয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮০]

অতিথি$_{১}$ অতিথিকে সম্মান করা, অন্নপান দিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করার ভাবনা ঋগ্বেদের কাল থেকে শুরু হয়েছে। যে কোনো যজ্ঞেই অগ্নির প্রয়োজন হত বলে অগ্নিকে মানুষের প্রিয় অতিথি বলা হয়েছে—

প্রিয়ো বিশাম্ অতিথির্মানুষীনাম্।

বিশেষত অগ্নির জন্য ঋত্বিক্ পুরোহিতেরা যে আহুতির ব্যবস্থা করেছেন, সেটাকে আপ্যায়ন ধরে নিলে গৃহে সমাগত মানুষের প্রতি সৌজন্যের ভাবনা হিসেবেই আতিথ্য এবং অতিথি শব্দটা খুব প্রাচীনকাল থেকেই তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

[ঋগ্বেদ ৫.১.৮-৯; ১.৭৩.১; ৫.৪.৫; ৭.৪২.৪]

☐ প্রথম সূর্য উঠলে প্রাতঃকালীন সবন প্রাতঃ সন্ধ্যার যে বৈদিক বিধান, সেটাকে বলা হয়েছে আতিথ্য। অর্থাৎ সূর্য পৃথিবী পরিক্রমায় যাবার আগেই তাঁকে আতিথেয় সংকার করা হচ্ছে সকাল বেলার আহুতিতে। *[তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২.১.৩]*

☐ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি রচনার কালেই গৃহে থাকা অন্যান্য মানুষদের না খাইয়ে নিজে খেয়ে নেওয়াটা ভীষণ অসৌজন্যের কাজ বলে চিহ্নিত হয়েছে—বস্তুত আতিথেয় ভাবনার আরম্ভ এইখান থেকেই। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে—অপর মানুষেরা অভুক্ত থাকতেও যদি কেউ ভোজন করে তবে সেটাই যখন উচিত হয় না, তখন দেবতারা অভুক্ত থাকলে অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে হোম-যজ্ঞ না করে যদি কেউ আগেই নিজের খাওয়া দাওয়া সেরে নেয় তবে তার সম্বন্ধে আর কী বলা যায়!

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ২.১.৪.২]

☐ কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—অতিথি হিসেবে যে ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করছেন, তিনি অগ্নির মতো। মানুষ তাঁকে শান্ত করার ভাবনা করে, তাঁকে পা ধোয়ার জল দেয়। অতিথিকে অভুক্ত রাখলে মানুষ যে সমস্ত শ্রেয় থেকে বঞ্চিত হয়, তাও বলা হয়েছে এই উপনিষদে।

[কঠোপনিষদ ১.৭-৯]

☐ পরবর্তীকালে শুধু ব্রাহ্মণ-অতিথি নয়, সর্ববর্ণের মানুষই অতিথি হিসেবে সংকারার্হ হয়ে উঠেছেন এবং সেটা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যের উদারতা বলেই ভাবতে হবে। লক্ষণীয়, পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলে একটা গৃহস্থের নিত্য করণীয় কর্মের কথা শতপথ ব্রাহ্মণের কাল থেকে শোনা যাচ্ছে এবং সেগুলিকে প্রায় বৈদিক যজ্ঞের মর্যাদা দিয়ে বলা হচ্ছে—পাঁচটা মহাযজ্ঞ আছে। সেই মহাযজ্ঞগুলি হল—ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। *[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৫.৬.১]*

☐ পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে 'মনুষ্যযজ্ঞ'-ই কিন্তু অতিথি এবং আতিথ্যের তাৎপর্য্যে চিহ্নিত হয়েছে। এখানে 'মনুষ্যে'র ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণ্যের ঐতিহ্যবাহী পণ্ডিতরা ব্রাহ্মণ-অতিথির ব্যাখ্যা করলেও 'মনুষ্য' বলতে এখানে সকল পর্যায়ের মানুষকেই বুঝিয়েছেন অনেকেই। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে মানুষের উদ্দেশে যথাশক্তি খাদ্যদান করাটাই মনুষ্যযজ্ঞ বলে চিহ্নিত হয়েছে—

মনুষ্যেভ্যো যথাশক্তি দানম্।

[আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (olivelle) ১.১০.১৫, পৃ. ৪৪]

☐ পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রকারেরা শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ধর্মসূত্রকারদের এই মহাযজ্ঞের ভাবনা অন্তরে রেখেই মনুষ্যযজ্ঞ বা নৃযজ্ঞকে সরাসরি অতিথিসেবা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন—

নৃযজ্ঞো'তিথিপূজনম্।

[মনুসংহিতা ৩.৭০; ৩.১১০-১১২]

☐ নিরুক্তকার যাস্ক একটি ঋগ্বৈদিক মন্ত্রে *[৫.৪.৫]* অতিথি শব্দের নিরুক্তিতে 'অত্' ধাতুকেই মূল ধরেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মতে অত্ ধাতুর অর্থ যাওয়া—অর্থাৎ অতিথিরা গৃহে গৃহে যান—

অতিথিঃ অভ্যতিতো গৃহান্ ভবতি।
অভ্যতি তিথিষু পরকুলানি ইতি বা।

[নিরুক্ত ৪.৫]

অতিথি কাকে বলা হয়, একথা বোঝাতে গিয়ে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—যিনি একরাত্রিমাত্র পরগৃহে বাস করেন, সেই ব্রাহ্মণকেই অতিথি বলা হয়—

একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥

[মনু সংহিতা ৩.১০২]

বস্তুত সংস্কৃত অত্ ধাতুর অর্থ নিরন্তর ভ্রমণ করা অথবা কোথাও সম্পূর্ণ স্থিত না হওয়া। এই অত্ ধাতু থেকেই অতিথি শব্দের সৃষ্টি। যিনি তিথি-সময় মেনে গৃহে আসেন না, একরাত্রি মাত্র গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করেই চলে যান, তাঁকেই অতিথি বলা হয়।

শ্রীধর স্বামী 'অতিথি'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

অজ্ঞাতপূর্ব গৃহাগত ব্যক্তি।

অর্থাৎ যাঁর পরিচয় জানা নেই, পূর্বে যাঁর সঙ্গে

চেনাশোনাও হয়নি, এমন মানুষ যিনি ঘরে আসেন, তিনি অতিথি। পুরাণে অতিথির বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। যিনি অন্য দেশ থেকে আসেন, যাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাকে না, এমনকী যাঁর নাম-ধাম-গোত্র কিছুই জানা যায় না, যিনি সহায় সম্বলহীন ক্ষুধার্ত অবস্থায় গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হন, তিনিই অতিথি—

অকিঞ্চনমসম্বদ্ধমন্যদেশাৎ সমাগতম্।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—অতিথিদেবো ভব।

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩.১০.১]

প্রাচীন ভারতীয় আর্যসমাজে মানুষ মানবিকতা বোধের বশবর্তী হয়েই সহায় সম্বলহীন গৃহদ্বারে আগত মানুষটির সেবাকে মাতা-পিতা কিংবা গুরুর সেবার মতোই গুরুত্বের সঙ্গে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কালের সঙ্গে সঙ্গে এই বোধ যাতে চেতনা থেকে বিলুপ্ত না হয়ে যায়—এই ভাবনা থেকেই উপনিষদ গ্রন্থে উপদেশ রূপে আবদ্ধ করে তাকে তুলে দিয়েছিলেন ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে। ফলে পরবর্তীকালে পুরাণ গ্রন্থগুলিতে অতিথিকে দেবতারূপে পূজা করার কথা যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনই অতিথির সেবা করার বিধিও বিশদে বর্ণিত হয়েছে। গৃহস্থ প্রতিদিন খেতে বসার আগে একটা নির্দিষ্ট সময় অতিথির আগমনের অপেক্ষা করবেন। অতিথি এলে কখনওই তার নাম-গোত্র বা পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন না। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করবেন এবং তাঁর যথাসাধ্য সেবা করবেন।

প্রাথমিকভাবে অতিথির ব্যাপারে বর্ণভেদ ভাবনা না থাকলেও আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণ্যের তাড়নায় সেটাও আসে। কিন্তু তবু সার্বিকভাবে অতিথির প্রতি সামাজিক মানুষের বিনয়-শ্রদ্ধায় অন্তত বসার আসনটুকু, তৃষ্ণার জল, মধুরবাক্য, যথাশক্তি খাদ্যের ব্যবস্থা এবং অন্তত একরাত্রি থাকবার আনুকূল্য ভারতীয় মানুষের ধর্মচিন্তার মধ্যে এসে পড়ে।

[আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (olivelle) ২.৪.১৬-২০; ২.৯.৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৫.৮-২০;
বিষ্ণু পু. ৩.৯.১৫; ৩.১১.৫৮-৭০, ৭৮, ১০৬-১১০;
বায়ু পু. ৭৯.৭-১৯; কূর্ম পু. ২.১৮.১১৬;
মার্কণ্ডেয় পু. ২৯.২৬-২৯; বৃহন্নারদীয় পু. ২৫.৩৪]

☐ অতিথির প্রতি উদার ও অনুকূল হবার বিধি-নিয়ম মহাভারতে সরস হৃদয়বৃত্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা—ঋদ্ধ, ঐশ্বর্যশালী, ধনী অতিথির প্রতি অর্থবর্ষণের চেয়ে একজন অর্থহীন দরিদ্র অতিথিকে দানের মর্ম বেশি—এই ভাবনার প্রতিষ্ঠা করেছে মহাভারত—

কো গুণো ভরতশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধেস্বভিবর্ষিতম্।

মহাভারতে বলা হয়েছে—ঘরে যদি শত্রুও এসে উপস্থিত হয়, তাঁর প্রতিও আতিথ্য করার প্রয়োজন। কেননা যে মানুষ গাছ কাটতে আসে গাছ তাকেও ছায়া দেয়।

[মহা (k) ৩.১৯৯.২৩-২৮; ১২.১৪৬.৫-৭;
১৩.৭.৬; ৩.২.৫৪-৫৬; (হরি) ৩.১৭০.২৩-২৮;
১২.১৪২.৫-৭; ১৩.৬.৬; ৩.২.৫৪-৫৬]

☐ অতিথির সেবা যে মহাপুণ্যফলদায়ক, অতিথির সেবা করলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় সে কথা যেমন মহাভারতে বহুবার বলা হয়েছে তেমনই অতিথির সেবার জন্য স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, তা অজস্র কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে যে অতিথির সেবা সে যুগে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

একবার রাজর্ষি ঔশীনর শিবির কাছে এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এসে অন্ন প্রার্থনা করেন। শিবি বিনীত ভাবে ব্রাহ্মণকে বললেন—আপনি কী খেতে চান, আদেশ করুন। ব্রাহ্মণ বললেন—তোমার বৃহদ্‌গর্ভ নামে যে পুত্র আছে তাকে কেটে রন্ধন করে আমাকে দাও। শিবি বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হয়ে অতিথির অভিলাষ পূরণ করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১৯৮.১২-১৩;
(হরি) ৩.১৬৮.১২-১৩]

☐ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ শেষ হবার পর ব্রাহ্মণরা, আত্মীয়স্বজন, পাত্রমিত্র সকলে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের প্রশংসা করতে লাগলেন। সকলেই বলতে লাগলেন যে, যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ উপলক্ষ্যে সে দানধর্ম করেছেন, যে ভাবে অতিথি সৎকার করেছেন তেমনটি আর কখনো হয়নি। এমন সময় যুধিষ্ঠিরের সভায় এক নকুল এসে উপস্থিত হল। তার শরীরের অর্ধেক স্বর্ণময়। সেই নকুল এসে সভার মধ্যে সকলের সামনেই যুধিষ্ঠিরকে বলল—কুরুক্ষেত্রে বসবাসকারী এক ব্রাহ্মণ যেমন দান করেছিলেন,

যেমন অতিথি সৎকার করেছিলেন—আপনার এই যজ্ঞ তার চার ভাগের একভাগও হয়নি। শুনে সভার সকলে বিস্মিত হলেন। তখন সেই নকুল যুধিষ্ঠিরকে এক অতিথিবৎসল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান শোনাল। এই ব্রাহ্মণের কাহিনী আজও অতিথি সেবার চরম দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়।

কুরুক্ষেত্রের কাছে এক সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী, পুত্র এবং পুত্রবধূ। সংসারে নিতান্ত দৈন্যদশা, কোনোদিন খাওয়া জোটে কোনোদিন জোটে না। এমন সময় দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হল। ব্রাহ্মণের পরিবার পড়ল চরম বিপদে। একদিন অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণ খানিকটা যব সংগ্রহ করলেন। যবের ছাতু তৈরি করে তা চারভাগে ভাগ করে চারজন সবে খেতে বসেছেন। এমন সময় অতিথি ব্রাহ্মণ দরজায় এসে দাঁড়ালেন। গৃহকর্তা তাঁকে সমাদর করে নিয়ে এলেন বাড়ির ভিতরে, নিজের ভাগের ছাতু তুলে দিলেন অতিথির পাতে। কিন্তু অতিথি ব্রাহ্মণের তাতে পেট ভরল না। তখন ব্রাহ্মণী নিজের ভাগ তুলে দিলেন অতিথির পাতে। কিন্তু তাতেও অতিথি তৃপ্ত হলেন না। তখন ব্রাহ্মণের পুত্র এবং পুত্রবধূ ও নিজেদের ভাগ অতিথিকে অর্পণ করলেন। এবার অতিথি তৃপ্ত হলেন। স্বয়ং ধর্মরাজ অতিথি ব্রাহ্মণের বেশে সেদিন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে এসেছিলেন। ব্রাহ্মণের অতিথি পরায়ণতায় তিনি মুগ্ধ হলেন। ব্রাহ্মণ সপরিবারে স্বর্গে গেলেন।

কাহিনী শেষ করে সেই নকুল বলল— সেই ব্রাহ্মণ স্বর্গে যাবার পর ব্রাহ্মণের কুটিরের মেঝেতে যে সামান্য ছাতুর গুঁড়ো পড়েছিল, আমি তার উপর গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। তাতে আমার শরীরের অর্ধেক স্বর্ণময় হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে আমি বহু ঋষির তপোবনে গিয়েছি, বহু রাজার যজ্ঞে গিয়েছি-কিন্তু আমার শরীরের বাকি অর্ধেক আর স্বর্ণবর্ণ হল না। এখানে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞেও আমি বড়ো আশা করে এসেছিলাম। কিন্তু এখানেও আমার দেহের বাকি সামান্য অংশও সোনার মত হয়নি। তাই বললাম যে, যুধিষ্ঠিরের দানধর্ম বা অতিথি-বৎসলতা সেই ব্রাহ্মণের মত নয়।

এক নকুলের দেহের অর্ধেকটা সোনার মত হয়ে যাবার উল্লেখটা হয়তো কাল্পনিক। কিন্তু অতিথিবৎসলতার যে দৃষ্টান্ত নকুলের বর্ণিত কাহিনীতে পাওয়া যায়, তার মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতেই ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য নকুলের দেহে আরোপিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৪.৯০ অধ্যায়; (হরি) ১৪.১১৩ অধ্যায়]

অতিথি$_{২}$ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ। কুশের পুত্র অতিথি। রাজা অতিথি নিষধ নামে এক পুত্র লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.১২.১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.২০১; মৎস্য পু. ১২.৫২;
বায়ু পু. ৮৮.২০১; বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪৮]

অতিথি$_{৩}$ ষষ্ঠ মন্বন্তরে যখন চাক্ষুষ মনু মন্বন্তরাধিপতি মনু ছিলেন সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন আদ্য তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি গণ। এই গণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অতিথি। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৬৯]*

অতিদীপ্ত ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের অতিদীপ্ত নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

অতিদীপ্তঃ কোটিসূর্যপ্রতীকাশঃ
শক্রতেজো'ভিভাবঃ।

ঈশ্বরের যে বিরাট রূপ কল্পিত হয় তা অত্যন্ত দীপ্তিময় এবং তেজোময়। জগতের কোনো কিছুই তাঁর সেই তেজের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সাধারণ প্রাণী চর্মচক্ষে সেই তেজোরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করতেও সমর্থ হয় না। ভগবদ্গীতায় অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, ভগবানের সেই বিরাট দীপ্তিমান রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে —যদি আকাশে একই সঙ্গে সহস্র সূর্য উদিত হয় তবে সেই প্রভা বা দীপ্তি তাঁর তেজের সঙ্গে তুলনীয় হলেও হতে পারে—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

[ভগবদ্গীতা ১১.১২]

পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেব তাঁর এই অতিদীপ্তি-শালী বিরাট রূপের কারণেই অতিদীপ্ত নামে খ্যাত।

ভগবানের যে কোন প্রকার বিভূতি বর্ণনার ক্ষেত্রেই তাঁর রূপের সঙ্গে দীপ্তিমান বিশেষণ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ভগবদ্গীতায় অন্যত্রও বলা হয়েছে—

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।

[ভগবদ্গীতা ১১.২৪;
মহা (k) ১৩.১৭.৭০; (হরি) ১৩.১৬.৭০]

অতিধূম্র শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের অতিধূম্র নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

অতিধূম্রঃ কালাগ্নিরূপেণ
সর্বদাহকালে'ত্যন্তধূম্রময়ঃ।

জগতের সংহারক ভগবান শিব প্রলয়কালে কালাগ্নিরূপে আবির্ভূত হন। সেই অগ্নি সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে। মহাদেবকে প্রলয়কালের বিধ্বংসী ধূম্রময় কালাগ্নিরূপে কল্পনা করা হয় বলেই তিনি অতিধূম্র নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৮২; (হরি) ১৩.১৬.৮২]

অতিনামা ষষ্ঠ মন্বন্তরে যখন চাক্ষুষ মনু মন্বন্তরাধিপতি মনু ছিলেন, সেই সময় যাঁরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন পুলস্ত্যবংশীয় মহর্ষি অতিনামা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বায়ু পুরাণে ইনি অতিমান নামে চিহ্নিত হয়েছেন। *[মৎস্য পু. ৯.২৩; বিষ্ণু পু. ৩.১.২৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৭৮; বায়ু পু. ৬২.৬৬]*

অতিবর্চা তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচররূপে স্কন্দকে দান করেন। হিমালয় তাঁর যে দুইজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, অতিবর্চা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৪৬-৪৭; (হরি) ৯.৪২.৪৪: স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩০.৫৪]

অতিবল$_{১}$ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচরকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর রূপে স্কন্দকে দান করেন। বায়ু তাঁর যে দুজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন অতিবল তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৪৪-৪৫; (হরি) ৯.৪২.৪২; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩০.৫৩]

অতিবল$_{২}$ কর্দম প্রজাপতির বংশধারায় অনঙ্গ ছিলেন একজন দণ্ডনীতি বিশারদ রাজা। অতিবল তাঁরই সুযোগ্য পুত্র। তাঁকে মহাভারতে নীতিমান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নীতিমান অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে বহুবার রাজনীতিকে নীতি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং এখানে নীতিমান শব্দটি অতিবল রাজার বিশেষণ হিসেবেই প্রযুক্ত হয়েছে কারণ মহাভারতের শান্তিপর্বের যে অংশে নীতিমান হিসেবে অতিবলের নাম উল্লিখিত হয়েছে সেখানে দণ্ডনীতি বা রাজনীতিই মূল আলোচ্য বিষয়। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত অনুবাদে অবশ্য অনঙ্গের পুত্র নীতিমান নামেই চিহ্নিত। অতিবল শব্দটি তাঁর বিশেষণ হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে। এই অনুবাদ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকাই স্বাভাবিক। যাইহোক, নীতিমান অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রজ্ঞ রাজা অতিবল বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে পড়েন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১২.৫৯.৯২; (হরি) ১২.৫৮.৯২]

অতিবল$_{৩}$ ভগবান ব্রহ্মা একটি যজ্ঞ করতে গিয়ে ভগবান হরি এবং হরের মূর্তি স্থাপন করেন। হরের মূর্তিটির নাম অতিবল, তাঁর নামেই অতিবল তীর্থ। এই তীর্থটি আধুনিক মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার মহাবালেশ্বরে অবস্থিত।

[পদ্ম পু. (উত্তর) ৬.১১৩.২৯]

অতিবলা$_{১}$ দেবতার মহাস্নান কার্যে ব্যবহার্য্য আটটি ওষধির মধ্যে অন্যতম। সহদেবী, ব্যাঘ্রী, শঙ্খপুষ্পী ইত্যাদির সঙ্গে বলা এবং অতিবলা নামে ওষধির নাম করা হয়েছে। রামায়ণে বিশ্বামিত্র রাম এবং লক্ষ্মণকে যে বলা এবং অতিবলা বিদ্যা দিয়েছিলেন, সেটি কোনো ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তকারী বিদ্যা বলেই মনে হয়। এই দুটি ওষধি আয়ুর্বেদ-সম্মতভাবে অতিরিক্ত ক্ষুধা তৃষ্ণার দোষ উপশম করে কি না সেটা গবেষণার বিষয়।

[রামায়ণ ১.২২.১৮; মৎস্য পু. ২৬৭.১২]

☐ চরক সংহিতায় এই অতিবলাকে একটি অত্যন্ত উপকারী ওষধি বলা হয়েছে। এর গুণ সম্পর্কে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে—জীবন্তী-কল্ক ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে চারগুণ দুধের সঙ্গে বলাতিবলার কষায় পান করলে শতবর্ষ আয়ু, জরাহীন জীবন এবং নীরোগ থাকা যায়—

অতঃপরং বিদারী স্বরসেন জীবন্তী-
কল্কসংপ্রযুক্তেন, অতঃপরং চতুর্গুণেন পয়সা
বলাতিবলাকষায়েণ শাতাবরী কল্কসংযুক্তেন

অস্য প্রয়োগাদ্ বর্ষশতং বয়ো'জরং তিষ্ঠতি, শ্রুতমবতিষ্ঠতে, সর্বাময়া প্রশম্যন্তি অপ্রতিহতগতিঃ স্ত্রীষু, অপত্যবান্ ভবতীতি। চরক সংহিতায় এই অতিবলাকে দশটি প্রধান ওষধির অন্যতম বলে গণ্য করা হয়েছে—

বলাতিবলা-চন্দনাগুরু-ধবতিনিশখদির-
শিংশপাসন-স্বরসাঃ পুনর্নবান্তাশ্চৌষধয়ো দশ।

[The Charakasamhita, Ed. Vaidya Jadavji Trikamji, Chikitsa-sthana, 2.4, 12; p. 381-382]

অতিবলা$_{২}$ অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে বহুসংখ্যক মাতৃকা সৃষ্টি করেন। এই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অতিবলা। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১২]*

অতিবলি দেবী চণ্ডিকার সন্তুষ্টির উদ্দেশে বলিদান বিহিত। দেবীর উদ্দেশে মনুষ্যবলিদান অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ। *[কালিকা পু. ৫৫.১-৫]*

অতিবাহু$_{১}$ স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্র সন্তানের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৩১.১৭]*

অতিবাহু$_{২}$ গন্ধর্ব-শ্রেষ্ঠদের একজন। এঁর পিতা কশ্যপ মুনি, মাতা প্রজাপতি দক্ষের দশম কন্যা প্রাধা। *[কালিকা পু. ৩৪.৮৩]*

অতিবিভূতি বৈবস্বতমনুর পুত্র নাভাগের বংশধারায় খনীনেত্রের পুত্র ছিলেন অতিবিভূতি। ইনি রাজর্ষি করন্ধমের পিতা। *[বিষ্ণু পু. ৪.১.১৬]*

অতিবৃদ্ধ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম।বৃধ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। আভিধানিক অর্থে বৃদ্ধ শব্দটি মূলত প্রবীণত্ব বা প্রাচীনত্বের দ্যোতক হলেও ভগবান শিবের কোনো জরাগ্রস্ত বলীরেখা বা পক্বকেশযুক্ত মূর্তি কল্পনা করে অতিবৃদ্ধ নামকরণ করা হয়নি। যাঁর গুণ, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য সাধারণের তুলনায় বহুগুণ বেশি তাঁকেও গুণাধিক্য, জ্ঞানাধিক্য বা ঐশ্বর্য্যের আধিক্যের কারণে বৃদ্ধ বলা চলে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এ বিষয়ে একটি প্রচলিত শ্লোক উদ্ধার করেছেন—

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাং তু শৌর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধনবাহুল্যাচ্ছূদ্রাণাং বয়সা'ধিকঃ।

অর্থাৎ জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ, শৌর্য্য বৃদ্ধির ফলে ক্ষত্রিয়, ধনবৃদ্ধির ফলে বৈশ্য এবং বয়ঃবৃদ্ধির ফলে শূদ্র বৃদ্ধ বলে চিহ্নিত হয়। ভগবান শিব আদিদেব রূপে কল্পিত হন সুতরাং তিনি সমস্ত প্রাণী জগতের তুলনায় বয়ঃপ্রবীণ তো বটেই পাশাপাশি তিনি অপরিসীম গুণ, জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্যের আধারস্বরূপ বলেই তিনি অতিবৃদ্ধ নামে কীর্তিত। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই ভাবনা থেকেই অতিবৃদ্ধ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—

গুণৈর্জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিভিরধিকত্বেন বৃদ্ধ ইত্যর্থঃ,
ন তু বলীপলিতাদিনা।

[মহা (k) ১৩.১৭.১১৯; (হরি) ১৩.১৬.১১৮ তে যুধিবৃদ্ধ পাঠ ধৃত হয়েছে]

অতিভানু কৃষ্ণের ঔরসে সত্যভামার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১০]*

অতিমান *[দ্র. অতিনামা]*

অতিমুখ একজন বানরবীর, যাঁকে রামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য দেবতারা সৃষ্টি করেছিলেন। *[রামায়ণ ৭.৪১.৪৮]*

অতিযম তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচররূপে স্কন্দকে দান করেন। বরুণদেব তাঁর যে দুইজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, অতিযম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে একে অতিঘস নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[মহা (k) ৯.৪৫.৪৫-৪৬; (হরি) ৯.৪২.৪৩]*

অতিরথ$_{১}$ পুরুবংশীয় রাজর্ষি মতিনারের চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন অতিরথ। *[মহা (k) ১.৯৪.১৪; (হরি) ১.৮১.১৪]*

অতিরথ$_{২}$ মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে মহাপরাক্রমশালী রথী যোদ্ধার অন্যতম বিশেষণ হিসেবে 'অতিরথ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে 'অতিরথ' শব্দটি যুদ্ধনীতি শাস্ত্রের অন্যতম পারিভাষিক শব্দ। বস্তুত মহারথ যোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠতর—সেকালে তাঁরাই অতিরথ যোদ্ধা হিসেবে বিখ্যাত হতেন। মহারথ যোদ্ধার লক্ষণ বোঝাতে গিয়ে ভগবদ্গীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামী একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে---যে যোদ্ধা একাই দশ হাজার ধনুর্ধর যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ এবং যিনি সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে পারদর্শী তাঁকেই মহারথ যোদ্ধা বলা হয়—

একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্র শাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥

'অতিরথ' যে মহারথের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর সেকথা বোঝাতে গিয়ে পণ্ডিত Dikshitar একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে—মহারথ যোদ্ধার সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে যোদ্ধা একাই অসংখ্য যোদ্ধাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে সমর্থ হন, তাঁকেই অতিরথ বলা যায়—

অমিতান্ যোধয়েত্যশ্চ পূর্বোক্তগুণসংযুতঃ।
বিজ্ঞেয়ো অতিরথীনাম্না শস্ত্রাস্ত্রনিপুণস্তদা॥

ভগবদ্গীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামীও অতিরথের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তো' তিরথস্তু সঃ।

[মহা (k) ৬.২৫.৬; (হরি) ৬.২৫.৬; ভগবদ্গীতা ১.৬ (শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য); Dikshitar, war in Ancient India, p. 13-14]

□ মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের যোদ্ধাদের সামর্থ্য বর্ণনা করতে গিয়ে দুপক্ষে কজন অতিরথ যোদ্ধা আছেন, তা উল্লেখ করেছেন ভীষ্ম। ভীষ্মের মতে, তিনি নিজে, দ্রোণাচার্য, কৃতবর্মা, শল্য, কৃপাচার্য এবং বাহ্লীক কৌরবপক্ষীয় অতিরথ যোদ্ধা। অপর দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় অতিরথরা হলেন—অর্জুন, অর্জুনপুত্র অভিমন্যু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পুরজিৎ এবং ঘটোৎকচ।

[মহা (k) ৫.১৬৪-১৭২ অধ্যায়; (হরি) ৫.১৫৪-১৬১ অধ্যায়]

অতিরাত্র$_১$ ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি চাক্ষুষ মনুর ঔরসে নড্বলার গর্ভজাত দশ পুত্রসন্তানের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬২.৬৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৭৯, ১০৬; মৎস্য পু.৪.৪২; ভাগবত পু. ৪.১৩.১৬; বিষ্ণু পু. ১.১৩.৫]*

অতিরাত্র$_২$ যজ্ঞবিশেষ। এই যাগ সোমযাগের একটি সংস্থা বা প্রকারভেদ। এতটাই তার প্রাচীনত্ব যে, ঋগ্‌বেদের মধ্যেই অতিরাত্র যাগের উল্লেখ করা হয়েছে—

ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে/
সরো ন পূর্ণমভিতো বদন্তঃ।

[ঋগ্‌বেদ ৭.১০৩.৭]

□ সাধারণত রাত্রির তিনটি পর্যায়ে অতিরাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে চারবার সোমরস-ভর্তি চমস ঋত্বিকদের চারদিকে ঘুরিয়ে আনা হয়। এক এক বার ঘুরিয়ে আনার সময় এক এক শস্ত্র এবং এক এক যাজ্যা পাঠ করা হয় যাজ্যার শেষে সোমাহুতি হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রথমে হোতা নামে ঋত্বিকের চমস, তারপর মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিকের, তারপর ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর এবং তারপরে অচ্ছাবাক নামক ঋত্বিকের চমস ঘুরে আসে। এইভাবে আরো দুটি পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। চমস ঘুরে আসে বলে বা পরিক্রমণ করে আসে বলে তার নাম পর্যায়। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের মতে অতিরাত্র যজ্ঞের কাজ দিন থেকেই আরম্ভ হয় এবং সারা রাত ধরে চলতে থাকে। দিনে রাতে মিলে ২৯টা শস্ত্র এবং ২৯টি স্তোত্র পাঠ করা হয়।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ১৪.৩.৮-১৬]

□ রাত্রিকে ত্রিশ দণ্ড সময় ধরে নিয়ে তিন ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে যে দশ দণ্ডকাল সময় পাওয়া যায়, তাতে তিনটি পর্যায়ে অতিরাত্র যাগ সম্পন্ন হয়। রাত্রিবেলায় এই অনুষ্ঠানের শেষে শেষরাত্রি থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত হোতা এক হাজার কিংবা তারও বেশি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন। এই মন্ত্র-সমষ্টিকে বলা হয় অশ্বিন-শস্ত্র। অতিরাত্র যাগ আসলে অগ্নিষ্টোম-যাগের বিকৃতিমূলক সংস্থা। দিনের বেলায় একটা সামান্য অনুষ্ঠান করে রাত্রিবেলায় তিনটি পর্যায়ে অতিরিক্ত সোমাহুতি দেওয়া হয়।

[রামেন্দ্রসুন্দর রচনা-সমগ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫-২১৬; শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ; পৃ. ৫০, ৭৪]

□ অতিরাত্র-যাগের প্রথম সৃষ্টি কীভাবে হল সেটা নিয়ে সুন্দর একটি কাহিনী আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। এক সময় দেবতারা দিনকে আশ্রয় করেছিলেন, আর অসুরেরা আশ্রয় করেছিলেন রাত্রিকে। দুই পক্ষেরই শক্তি সমান, তাই কেউ কাউকে হারাতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় ইন্দ্র একদিন বললেন—কে যাবে আমার সঙ্গে যাতে আমরা একযোগে অসুরদের এই রাত্রির আশ্রয় থেকে সরাতে পারি। ইন্দ্রের ডাকে কেউ সাড়া দিলেন না। কেননা রাত্রির অন্ধকারকে তাঁরা মৃত্যুর মতো ভয় পেয়েছিলেন এবং সেই কারণেই এখনো মানুষ রাত্রিবেলায় ঘর থেকে বাইরে বেরোলেই ভয় পায়, কেননা রাত্রির অন্ধকার মৃত্যুরই মতো।

ইন্দ্রের ডাকে কেউ সাড়া দিল না বটে কিন্তু বৈদিক ছন্দরা—গায়ত্রী-জগতী-ত্রিষ্টুভ্-অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি সব ইন্দ্রকে অনুসরণ করল। সেইজন্য ইন্দ্র এবং ছন্দরাই অতিরাত্র যজ্ঞে রাত্রির কর্ম নির্বাহ করেন। রাত্রিতে অনুষ্ঠিত পর্যায়গুলিতে যে যজ্ঞকর্মগুলি চলে, সেগুলির মাধ্যমেই সম্পূর্ণ যাগভূমি পরিক্রমা করে ইন্দ্র অসুরদের রাত্রির আশ্রয় অপসারণ করেছিলেন। ছন্দেরা সেই সময় ইন্দ্রকে বলেছিল—প্রভু। আমরাই শর্বরী (রাত্রি) থেকে অসুরদের সরিয়ে দেবার জন্য তোমার অনুগমন করেছি। এইজন্যই ছন্দগুলির এক নাম অতিশর্বর। এই ছন্দরাই ইন্দ্রকে রাত্রির অন্ধকার-ভয় থেকে মুক্ত করেছিল—ছন্দের অতিশর্বরত্ব-ভাব এইখানেই। ইন্দ্রের উদ্দেশে এখানে মন্ত্র পড়া হয় অতিশর্বর নামেই—

ইন্দ্রায় ত্বা অতিশর্বরায়।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ১ম খণ্ড, ১৬.৫; পৃ. ৪৪৫-৪৫৭]

☐ কালিকা পুরাণ মতে যজ্ঞবরাহের জিহ্বাদেশের নীচ থেকে অতিরাত্র ও বৈরাজ যজ্ঞের উৎপত্তি হয়। *[কালিকা পু. ৩১.১৫]*

অতিরাত্র$_{৩}$ একজন বনবাসী তপস্বী ব্রাহ্মণ। সুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে অতিরাত্রের কন্যার বিবাহ হয়। *[দ্র. উত্তম$_{১}$]*

[মার্কণ্ডেয় পু. ৭০.৪]

অতিলোমা একজন অসুর। ইনি কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (গীতাপ্রেস) ২.৩৮.২৯নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্র. পৃ. ৮২৫]

অতিশৃঙ্গ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর রূপে স্কন্দকে দান করেন। দেব-পর্বত হিসেবে গণ্য বিন্ধ্যপর্বত তাঁর যে দুইজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, অতিশৃঙ্গ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে একে অগ্নিশৃঙ্গ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[মহা (k) ৯.৪৫.৪৯-৫০; (হরি) ৯.৪২.৪৭; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩০.৫৬]

অতিষণ্ড ধরাধাম থেকে লীলা-সংবরণের সময় বলরামের মুখ থেকে অনন্তনাগের প্রতিরূপ হিসেবে যে শ্বেতবর্ণ বিশালাকৃতি সর্পটি বেরিয়ে এলেন, তিনি সাগরের দিকে গেলে, সাগর বরুণদেবের সঙ্গে অন্যান্য যেসব নাগ-প্রধানেরা সেই নাগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অতিষণ্ড।

[মহা (k) ১৬.৪.১৬; (হরি) ১৬.৪.১৬]

অতিস্থির তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচররূপে স্কন্দকে দান করেন। সুমেরুপর্বত তাঁর যে চারজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, অতিস্থির তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৪৮-৪৯; (হরি) ৯.৪২.৪৬]

অতীন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩০; (হরি) ১৩.১২৭.৩০]

অতীন্দ্রিয় ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩১; (হরি) ১৩.১২৭.৩১]

অতুলাস্তক্য কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত চরক শাখার একজন ঋষি বলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১৫]*

অতুল ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫২; (হরি) ১৩.১২৭.৫২]

অতুল্য শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি নাম। তিনি আদিপুরুষ। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং এ জগতে কোনো কিছুই তাঁর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না—এই অর্থে মহাদেব অতুল্য নামে খ্যাত। ভগবদ্‌গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন ভগবানের ব্রহ্মস্বরূপতা থেকেই তাঁকে অতুল্য বলে বর্ণনা করেছেন। অর্জুন বলেছেন—তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, তুমি গুরু কিংবা গুরুর থেকেও তুমি শ্রেষ্ঠতর। ত্রিলোকে তোমার তুল্য, তোমার সমান অন্য কেউ নেই, তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনও কিছুর অস্তিত্বও সম্ভব নয়—

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য
পূজ্যশ্চ গুরোগরীয়ান্।
ন ত্বৎসমো'স্ত্যভ্যধিকঃ কুতো'ন্যো
লোকত্রয়ে'প্যপ্রতিমপ্রভাবঃ॥

এই শ্রেষ্ঠত্বের ভাবনা থেকেই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান শিবও অতুল্য নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬৩; (হরি) ১৩.১৬.৬৩]

অত্যাকরালগোজ্বাল পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষের একটি জনপদ। অন্য মতে এখানে দুটি জনপদ আছে—অত্যাকরাল এবং গোজ্বাল।

[বায়ু পু. ৪৪.১২]

অত্রি$_{১}$ সৃষ্টির আদিতে মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতি যে ছয়জন প্রধান ঋষি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মহর্ষি অত্রি তাঁদের মধ্যে একজন। এই ছয় আদি প্রজাপতি ঋষির জন্ম সম্পর্কে মহাকাব্য-পুরাণে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। মহর্ষি অত্রিও তার ব্যতিক্রম নন। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত কাহিনীটি হল—মরীচি, অত্রি প্রভৃতি ছয় ঋষি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মন থেকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্র— ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা—

মরীচিরঙ্গিরা অত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ষড়েতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা বীর্যবন্তো মহর্ষয়ঃ॥

অবশ্য মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রাপ্ত দু-একটি শ্লোকে দেখা যাচ্ছে যে, ব্রহ্মার মানসপুত্রের সংখ্যা ছয়ের পরিবর্তে সাত। এই তালিকায় বশিষ্ঠের নামও সংযুক্ত হয়েছে ব্রহ্মার মানসপুত্র হিসেবে। আদিতে সৃষ্ট ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি বা প্রজাস্রষ্টা ঋষিরা সংখ্যায় ছয় জন না সাত জন এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ থাকলেও পুরাণগ্রন্থে এবং লোকমুখে সপ্তর্ষির ভাবনাই বহুলভাবে প্রচলিত। তাঁরা সৃষ্টির আদিতে জাত, ব্রহ্মার মানসপুত্র, বহু শ্রেষ্ঠ ঋষিবংশ, রাজবংশ এমনকী দেবতাদেরও আদিপিতা এবং অন্তরীক্ষে তাঁরা একত্রে সপ্তর্ষি নামক নক্ষত্রমণ্ডল রূপে বিরাজমান—এই ভাবনাই প্রচলিত। অত্রি সৃষ্টির আদিতে জাত সেই সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন।

*[মহা (k) ১.৬৫.১০; ১.৬৬.৪; ১২.২০৭.১৭;
১২.২০৮.৪; ১২.৩৪০.৬৯;
(হরি) ১.৬০.১০; ১.৬১.৪; ১২.২০১.১৭;
১২.২০২.৪; ১২.৩২৬.৬৫]*

□ বেশিরভাগ পুরাণেও অত্রির নাম উচ্চারিত হয়েছে লোক পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র হিসেবেই। তবে পুরাণগুলিতে অত্রির জন্ম সম্পর্কে ভিন্ন উপাখ্যানও পাওয়া যায়। যেমন ভাগবত পুরাণ উল্লেখ করেছে যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার চোখ থেকে জন্মগ্রহণ করেন অত্রি-অক্ষ্ণো'ত্রি।

মহাভারত-পুরাণে বেশিরভাগ শ্লোকেই উল্লিখিত হয়েছে যে, আদিতে সৃষ্ট সপ্তর্ষির মধ্যে অত্রিই দ্বিতীয়। মরীচির পরেই তাঁর জন্ম। কিন্তু বায়ুপুরাণে ঋষিদের জন্ম বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই ঋষিরা ব্রহ্মার মন থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় ছয়জন বা সাতজন নন—মোট দশজন। তাঁদের নাম যথাক্রমে ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু (স্বায়ম্ভুব), দক্ষ, বশিষ্ঠ এবং পুলস্ত্য। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের এই দশজন প্রজাপতি দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শোকার্ত মহাদেবের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হন। এরপর আবার বৈবস্বত মন্বন্তরের সূচনাকালে ব্রহ্মার পুত্ররূপেই তাঁরা পুনর্জন্ম লাভ করেন। ব্রহ্মা বৈবস্বত মন্বন্তরের সূচনাকালে প্রজা সৃষ্টির সঙ্কল্প করে আপন তেজবিন্দু যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দেন। সেই আহুতি ফল স্বরূপ প্রথমে যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ভৃগু। ভৃগুকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন মহাদেব। এরপর জন্ম নিলেন অঙ্গিরা। অগ্নি স্বয়ং তাঁকে পুত্ররূপে কল্পনা করলেন। এরপর একে একে যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠে এলেন ব্রহ্মার দুই পুত্র মরীচি এবং ক্রতু। তার কিছুক্ষণ পর ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্রটি নিজেই 'আমি তৃতীয়'—এই কথা উচ্চারণ করতে করতে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে এলেন। 'আমি তৃতীয়'—এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হল অত্রি—

অহং তৃতীয় ইত্যর্থস্তস্মাদত্রিঃ স কীর্ত্যতে।

তবে আদিতে সৃষ্ট দশ প্রজাপতির কল্পনা অন্যান্য-পুরাণেও আছে। মনু সংহিতাতেও ব্রহ্মার দশ প্রজাপতি পুত্রের হিসেবে অত্রির নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

*[মৎস্য পু. ৩.৬;
ভাগবত পু. ৩.১২.২২.২৪; বিষ্ণু পু. ১.৭.২৫, ৩৪;
বায়ু পু. ৫৯.৮৮; ৬৫.২২, ৪৫; মনু সংহিতা ১.৩৪.৩৫;
কালিকা পু. ৩০.৮৫; মার্কণ্ডেয় পু. ৭৯.৯; ১৭.১-১১:
দেবী ভাগবত পু. ৩.১৩-২২;
কূর্ম পু. ১.২.২৩-২৪; ১.৭.৩৫-৩৬]*

☐ মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত একটি শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে যে, অত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র চিত্রশিখণ্ডী নামেও খ্যাত। মহাভারতের শান্তিপর্বে একুশজন প্রজাপতির মধ্যে অত্রির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩৩৪.৩৫; ১২.৩৩৫.২৯;
(হরি) ১২.৩২০.৩৫; ১২.৩২১.৩০]

☐ মহর্ষি তথা প্রজাপতি হিসেবে খ্যাত অত্রির প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে ঋগ্‌বেদে এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে দীর্ঘায়ু এবং প্রজাপতি ঋষি হিসেবে দধীচি, অঙ্গিরা, মনু প্রমুখের সঙ্গে অত্রির নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রজাপতি বা বংশ প্রবর্তক হিসেবে অত্রির নামের এটিই সম্ভবত প্রাচীনতম উল্লেখ। ঋগ্‌বেদের বহু সূক্তে অত্রির নাম কখনো একবচনে কখনো বা বহুবচনে উল্লিখিত হয়েছে। অত্রির একাধিক পুত্র এবং শিষ্যকে ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবেও দেখা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, মোটামুটি ঋগ্‌বেদের কাল থেকেই অত্রি একজন প্যাট্রিয়ার্ক বা বংশকর পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন যাঁর বংশধর এবং শিষ্যদেরও 'অত্রি' নামেই বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধুমাত্র ঋগ্‌বেদেই অন্তত চল্লিশবার অত্রির নাম একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনেও। ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন সূক্তে কুমার, গয়, সুতম্ভর, পুরু, দ্বিত প্রমুখের নাম উল্লিখিত হয়েছে অত্রির পুত্র হিসেবে। মহাকাব্য-পুরাণে প্রজাপতি অত্রি সম্পর্কে যে কাহিনীগুলির উল্লেখ আমরা পাব, প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থগুলিতেই সেগুলির উৎসের সন্ধানও পাওয়া যাবে বহু ক্ষেত্রেই।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৩৯.৯; ৫.১-৩ সূক্ত; ৫.১১ সূক্ত;
৫.১৬ সূক্ত; ৫.১৮-২৭ সূক্ত]

☐ মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে অত্রির জীবন সম্পর্কে যেমন অজস্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তেমনই পৌরাণিক অজস্র কাহিনীতে এই প্রাচীন ঋষিকে উপস্থিত থাকতেও দেখা গেছে।

☐ মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী মহর্ষি অত্রির পত্নী ছিলেন অনসূয়া। বেশিরভাগ পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী এই অনসূয়া ছিলেন কর্দম প্রজাপতির কন্যা। তবে, বায়ুপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ অত্রিপত্নী অনসূয়াকে দক্ষকন্যা বলে উল্লেখ করেছে। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে অত্রি এবং অনসূয়াকে নিয়ে নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৩.২৪.২২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৯.৫৬; বিষ্ণু পু. ১.৭.৭, ২৫;
বায়ু পু. ১০.২৮, ৩১; ২৮.১৮-১৯]

☐ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে শিব-মাহাত্ম্য কথনের সময় মহাভারত জানিয়েছে যে, এক সময় স্বামীর সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় অত্রিপত্নী অনসূয়া ঘর ছেড়ে এসে মহেশ্বর শিবের শরণাপন্ন হন। স্বামী অত্রির ভয়েই অনসূয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, যদিও স্বামীর আচরণের প্রতিবাদে অনসূয়া স্বামীর ঔরসে পুত্র গর্ভে ধারণ করবেন না বলে স্থির করেন। তারপর তিনি স্বয়ং ভগবান শিবের কাছেই পুত্র কামনা করেন এবং কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন, তাঁর সেই তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব তাঁকে বর দেন—রুদ্রের তেজে স্বামীর সঙ্গ ছাড়াই পুত্রলাভ করবে তুমি—

বিনা ভর্ত্রা চ রুদ্রেণ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

অনসূয়ার এই রৌদ্রতেজসম্পন্ন পুত্রই মহর্ষি দুর্বাসা।

তবে পুরাণগুলিতে অত্রি এবং অনসূয়ার পুত্রলাভ সম্পর্কে আরও নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।

ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা অত্রিকে প্রজাসৃষ্টি করতে বললে অত্রি তাঁর স্ত্রী অনসূয়াকে নিয়ে সন্তানকামনায় ঋক্ষপর্বতে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ঋক্ষ পর্বতের মনোরম পরিবেশেও সস্ত্রীক অত্রি এমনই কঠোর তপস্যা করছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনেই স্ব স্ব বাহনে চড়ে অত্রির সামনে এসে দাঁড়ালেন। অত্রি বললেন—আপনারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা, আপনাদের মধ্যে কাকে আমি আহ্বান করেছি, আপনারাই বলুন। তিন দেবতা সমস্বরে বললেন—তুমি জগদীশ্বর ভগবান বলে যে তত্ত্বের চিন্তা করেছো, তার মধ্যে আমরা তিনজনেই পড়ি। আমাদের তিনজনের অংশেই তোমার তিন বিশ্ববিখ্যাত পুত্র জন্মাবে। তারা তোমার বংশের যশ বিস্তার করবে। যথাসময়ে অত্রিপত্নী অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগশাস্ত্রবেত্তা দত্ত (দত্তাত্রেয়)

এবং শঙ্করের অংশে দুর্বাসা জন্মগ্রহণ করলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের এই অংশাবতরণের কাহিনী অবশ্য অত্রিপত্নী অনসূয়ার একটি জীবন-ঘটনার সঙ্গেও সংপৃক্ত। *[দ্র. অনসূয়া]*

[মহা (k) ১৩.১৪.৯৫-৯৮; (হরি) ১৩.১৩.৯৪-৯৭;
ভাগবত পু. ৪.১.১৭-৩২;
দেবী ভাগবত পু. ৯.১.১২৮; মার্কণ্ডেয় পু. ১৭.১-১১]

□ তবে অত্রির পুত্র চন্দ্রের জন্ম কীভাবে হল এ-বিষয়ে আরও বেশ কয়েকটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

কয়েকটি পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি একসময় সর্বলোকের হিতমানসে গভীর তপস্যা করছিলেন। সেই সময় তাঁর দেহ সোমত্ব লাভ করে। এই অবস্থায় তাঁর নয়নে নিমেষ পড়ছিল না। সৌম্যভাব তাঁর দেহের ঊর্ধ্বদেশ আক্রমণ করলে দশদিক আলো করে, তাঁর চোখ থেকে সোমবিন্দুর মতো জলবিন্দু নিপতিত হল। অত্রির নয়নস্খলিত সোমবিন্দুই সোম বা চন্দ্রে পরিণত হল। বিখ্যাত চন্দ্রবংশের উৎপত্তি ও তাহলে অত্রি থেকেই। ভাগবত পুরাণ মতে অত্রির আনন্দাশ্রু থেকে সোম বা চন্দ্রের সৃষ্টি হয়।

[বায়ু পু. ৯০.১-৭; ভাগবত পু. ৯.১৪.২-৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৫.১, ৪৭;
মৎস্য পু. ২৩.২-২০]

অন্য একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা অত্রিকে প্রজা সৃষ্টি করতে বললে তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তপস্যার ফলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য, মহেশ্বর ইত্যাদি দেবগণের সারভূত অসীম শান্তিনিলয় পরম ব্রহ্ম অত্রির নয়নের মধ্যে অবস্থিত হলেন। এই সময় উমার সঙ্গে উমাপতি মহেশ্বর অত্রির সামনে এসে দাঁড়ালে অত্রির চোখ থেকে যে আনন্দাশ্রুর বিন্দুটি গড়িয়ে পড়ল, তা থেকেই লোকোদ্ভাসী জ্যোৎস্নাকর চন্দ্রের উৎপত্তি।

[মৎস্য পু. ২৩.২-৬]

অত্রির বংশে চন্দ্র, দত্তাত্রেয় ছাড়াও রাজা নিমি জন্মগ্রহণ করেন বলে মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায়। *[মহা (k) ১৩.৯১.৪-৫;*
(হরি) ১৩.৭৮.৪-৫]

অত্রিকে আলোকের অন্যতম উৎস চন্দ্রের পিতা বলে বর্ণনা করায় খুব স্বাভাবিকভাবেই তেজ বা তেজোময় অগ্নির সঙ্গে অত্রির সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। অত্রি যে অগ্নিরই এক রূপ তা আরও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতে। অত্রি থেকেই অগ্নির উৎপত্তি, একথা বলতে গিয়ে মহাভারত বলেছে— 'অগ্নির যতগুলি রূপ আছে, সোমযাগের প্রকারও ততগুলি এবং সব প্রকারের অগ্নিই অত্রির বংশজাত ব্রহ্মার মানসপুত্র। অত্রি যখন বংশবৃদ্ধির কথা ভাবলেন, তখন সকল প্রকার অগ্নিকেই তিনি হৃদয়ে ধারণ করলেন। অতএব অত্রির দেহ থেকেই সব প্রকারের অগ্নির উৎপত্তি হয়েছে।

[মহা (k) ৩.২২২.২৭-২৯; (হরি) ৩.১৮৫.২৬-২৮]

অত্রির তেজোময় অগ্নিস্বরূপতার কথা বলতে গিয়ে মহাভারতে দ্বিতীয় একটি কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। একসময় ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধ চলছিল। স্বর্ভানু রাহুর শরাঘাতে চন্দ্র-সূর্য দুজনেই আহত এবং নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলেন। অন্ধকারে অসুরদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ফলে চন্দ্র-সূর্যের অনুপস্থিতিতে তারা একরকম অজেয় হয়ে দেবতাদের বধ করছিল। পরাজিত বিপন্ন দেবতারা হতাশ হয়ে পথ চলতে চলতে তপস্যারত অত্রিকে দেখতে পেলেন। শান্তক্রোধ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষির কাছে তাঁরা প্রার্থনা করলেন—আপনি চন্দ্র-সূর্যের মতো আলো দান করুন আমাদের, যাতে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা জয়ী হতে পারি। অত্রি তপোবলে চন্দ্র-সূর্যের তেজ প্রকাশ করলেন। তাঁর তেজ সহ্য করতে না পেরেই বহু অসুরের মৃত্যু হল। দেবতারা অনায়াসে পরাস্ত করলেন অসুরদের। অত্রির এমন তেজোময় রূপের কথা বর্ণনা করার পর বায়ু দেবতা অর্জুনকে প্রশ্ন করেছিলেন— এবার বলো তো, কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ অত্রির চাইতেও বড়ো হতে পারেন—

ব্রবীম্যহং ব্রূহি বা ত্বমত্রিতঃ ক্ষত্রিয়ং বরম্।

চন্দ্র-সূর্যহীন আকাশে অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান পাবার সূত্রে অত্রির কথা যে-ভাবে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে তার সূত্র বা উৎস পাওয়া যায় বৈদিক গ্রন্থগুলিতে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, স্বর্ভানু যখন সূর্যকে-আবৃত করেছিলেন বা লুকিয়ে ফেলেছিলেন, সেই সময় অত্রি সূর্যকে পুনরায় প্রকাশ করে স্থাপন করলেন আকাশে, স্বর্ভানুর মায়াজাল দূরীভূত হল—

স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো
দিবো বর্তমানা অবাহন্।
গূড়্হং সূর্যং তমসাপব্রতেন
তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ॥

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রেও অনুরূপ উল্লেখ মেলে, কাহিনীটি ঈষৎ বিস্তৃত আকারে হয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে। এখানে সার্থক একজন দক্ষিণার্থী ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ দক্ষিণা দেবার প্রসঙ্গে অত্রির কথা এসেছে। বলা হচ্ছে—এখানে প্রাতঃকালীন মন্ত্র উচ্চারণের পর যজ্ঞবেদীর সামনে থেকে একজন উপযুক্ত ব্রাহ্মণের খোঁজ করা হবে। সেই যজ্ঞে মহর্ষি অত্রি হোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণার্থীর উদ্দেশে আহ্বান উচ্চারণের পরই যজ্ঞশালায় অসুরদের সৃষ্ট অন্ধকার নেমে এলো। অন্যান্য ঋষিরা তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রিকে বললেন—আপনি আসুন, এই অন্ধকার দূর করুন—

তে ঋষয়ো'ত্রিম্ অব্রুবন্—
এহি প্রত্যঙ্ ইদম্ তমো'পজহীতি।

অত্রি মুহূর্তের মধ্যে সেই অন্ধকার দূর করে দিলেন। তখনই এই ভাবনা হল যে, যিনি এই অন্ধকার দূর করতে পেরেছেন তিনিই প্রকৃত আলোক্জ্যোতি স্বরূপ—

য ইদম্ তমো'পাবধীদিতি তস্মাৎ এতদ্ জ্যোতিঃ।

বস্তুত সংস্কৃত 'অদ্' ধাতু থেকে অত্রি শব্দের উৎপত্তি। 'অদ্' ধাতুর অর্থ খাওয়া, ভক্ষণ করা। যিনি ভক্ষণ করেন—এই অর্থে সর্বগ্রাসী অগ্নির অপর নাম অত্রি—এমন ভাবনা করা যেতেই পারে।

তবে ওই 'অদ্' ধাতুর ভাবনা থেকে অত্রিকে বাক্ বা বাক্য-সরস্বতীর সঙ্গে একাত্মক রূপেও দেখা হয়েছে। আসলে বাক্ বা বাগেন্দ্রিয় যেমন কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় তেমনই প্রয়োজনীয় আহারের জন্যও। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এবং উপনিষদের শঙ্করাচার্যকৃত টীকায় বেশ স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, 'অদ্' ধাতু থেকে অত্রি শব্দের উৎপত্তি। তবে যিনি ভক্ষণ করেন বা যিনি বাক্ স্বরূপ—'অদ্' ধাতু থেকে জাত সেই শব্দটি অত্রি নয়, অত্তি। এই অত্তি শব্দটি থেকেই অত্রি শব্দের জন্ম। শতপথ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে—বাক্-ই অত্রি। আর বাগেন্দ্রিয় বা রসনার মাধ্যমে যেহেতু ভক্ষণ করা যায় তাই শতপথ ব্রাহ্মণ বলছে—বাক্যের দ্বারাই অন্নাদি গ্রহণ করা যায়। সেই বাক বা রসনাস্বরূপ হলেন অত্তি বা রূপান্তরিত হয়ে অত্রি—

বাগেবাত্রির্বাচা হি অন্নং/হ্যন্নং অদ্যতে,
অত্তির্হ বৈ নামৈতৎ যদ্ অত্রিরিতি।

*[মহা (k) ১৩.১৫৬.১-১৫; (হরি) ১৩.১৩৪.১-১৫;
ঋগ্‌বেদ ৫.৪০.৬-৯; অথর্ববেদ ১৩.২.৩৬;
শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.৫.২.৬]*

পৃথিবীর যিনি প্রথম শ্রেষ্ঠ প্রজাপালক রাজা হিসেবে খ্যাত, সেই বেনপুত্র পৃথুরাজা একসময় অত্রিকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করেছিলেন বলে জানা যায়। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় মহর্ষি অত্রি বেনপুত্র পৃথুরাজার কাছে অর্থসাহায্যের জন্য যেতে চাইছিলেন। কিন্তু তাতে ধর্ম নষ্ট হবে ভেবে শেষপর্যন্ত অত্রি সে সংকল্প ত্যাগ করলেন এবং সস্ত্রীক বনে গিয়ে তপস্যায় মনোনিবেশ করবেন বলে স্থির করলেন। তা শুনে পত্নী অনসূয়া বললেন—তুমি পৃথু রাজার কাছে গেলে তিনি যে অর্থ সম্পদ দেবেন তা পুত্র ভৃত্যদের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে তারপর বরং বনে যাও। অত্রি স্ত্রীর কথা মানলেন। কিন্তু বৈন্য পৃথুর সভায় গিয়ে অত্রি তাঁকে বিধাতা, প্রজাপতি ইত্যাদি শব্দে স্তুতি করতে লাগলে সভায় উপবিষ্ট গৌতম প্রভৃতি ঋষিরা অত্রির কথার প্রতিবাদ করলেন। গৌতম এবং অত্রির বিবাদ ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার পর্যন্ত গড়াল। সনৎকুমার রাজার ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্যবাদ খ্যাপন করে অত্রির বক্তব্যকেই সমর্থন করলেন। স্বয়ং রাজা পৃথুও এতে অত্যন্ত প্রীত হয়ে বহু ধনসম্পদ, দাস-দাসী দান করলেন অত্রিকে। অত্রি সেসব নিয়ে এসে পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বনে গিয়ে তপস্যায় মনোনিবেশ করলেন।

মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীর পাশাপাশি ভাগবত পুরাণেও একটি কাহিনী পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, মহারাজ পৃথু নিরানব্বইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পর যখন শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, সেই সময় ইন্দ্র পৃথু রাজাকে হতমান করার জন্য পাষণ্ডের বেশ ধারণ করে পৃথুর যজ্ঞাশ্বটি হরণ করে পালিয়ে গেলেন আকাশপথে। এই সময় অত্রিমুনি ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর প্ররোচনায় পৃথুর পুত্র ইন্দ্রকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ইন্দ্রের জটাজুটধারী ভস্মলিপ্ত ধর্মবেশ দেখে তাঁকে বাণাঘাত করলেন না। অত্রি কিন্তু ছাড়লেন না।

তিনি পৃথুপুত্রকে আবারও প্ররোচিত করলেন। শেষ পর্যন্ত অত্রির কথায় পৃথুপুত্র ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হলেন। ইন্দ্র এবার ছদ্মবেশ ত্যাগ করে যজ্ঞাশ্ব ফেরত দেন। পরে অবশ্য ইন্দ্র আরও একবার অশ্বহরণের চেষ্টা করেছিলেন এবং এবারও অত্রি দেখতে পাওয়ায় তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পুরাণের এই কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতে প্রাপ্ত পৃথুর কাছে অত্রির অর্থ যাচনার উপাখ্যানের কোনো যোগসূত্র আছে কী না—সে বিষয়ে ভাবনা করা যেতে পারে।

[মহা (k) ৩.১৮৫ অধ্যায়; (হরি) ৩.১৫৬ অধ্যায়; ভাগবত পু. ৪.১৯.১০-২১]

□ রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে, চিত্রকূট পর্বতের অরণ্যকুটীর থেকে ভরত প্রভৃতিরা অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর রাম-লক্ষ্মণ সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। এই সময় চিত্রকূট ত্যাগ করে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এসেছিলেন মহর্ষি অত্রির আশ্রমে। মহর্ষি অত্রি পুত্রের মতো পরম স্নেহে রামচন্দ্রের মস্তক আঘ্রাণ করলেন এবং তাঁদের আতিথ্যের ব্যবস্থা করলেন। অত্রিপত্নী সতীশ্রেষ্ঠা অনসূয়া এই সময় সীতাকে পাতিব্রত্য প্রসঙ্গে নানা উপদেশ দেন এবং বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি নানা মূল্যবান উপহারও দেন।

[রামায়ণ ২.১১৭.৫-৮, ২১-২৯]

□ রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে অত্রিকে বহু ব্রহ্মচারী শিষ্যের পোষক কুলপতি ঋষি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তেজঃপ্রভাবে অত্রি সেখানেও সূর্য এবং অগ্নির সঙ্গে উপমিত হয়েছেন—

অত্রিঃ কুলপতির্যত্র সূর্যবৈশ্বানরোপমঃ।

রামচন্দ্রকে তিনি এতটাই স্নেহের চোখে দেখতেন যে, অযোধ্যায় রামের রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি সুদূর দক্ষিণ থেকে এসেছিলেন রামকে আশীর্বাদ করতে। এখানে পশ্চিমদিক থেকে আগত একজন অত্রির উল্লেখও পাওয়া যায়, তবে তাঁকেও অভিন্ন বলেই মনে হয়।

[রামায়ণ (মুধোলকর) ৬.১২৩.৪৮; (তর্করত্ন) ৬.১২৫.৪৭; ৭.১.৩, ৫]

□ তবে রামায়ণে অত্রিকে পশ্চিম বা দক্ষিণ যেখানকার লোক বলেই উল্লেখ করা হয়ে থাকুক না কেন, পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, অত্রির আশ্রম ছিল হিমালয়ের উপত্যকা ভূমিতে। ঐরাবতী নদী পার হয়ে সেখানে যেতে হত। মৎস্য পুরাণে উর্বশীর প্রণয়ী পুরূরবার পূর্বজন্মের একটি উপাখ্যান মেলে। সেখানে বলা হয়েছে যে, উর্বশীর প্রণয়ী পুরূরবা এক সময় মদ্র দেশের অধিপতি পুরূরবা ছিলেন। তিনি হিমালয়ের পথে ঘুরতে ঘুরতে এমন এক স্থানে আসেন যেখানে মহর্ষি অত্রির তপোবন ছিল। এই আশ্রমের অনুকূল অনন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সুন্দর, মনোহারী বর্ণনা আছে পুরাণে। মদ্রপতি রাজা পুরূরবা সেই আশ্রমে এক মাস জলাহারে থেকে ভগবান জনার্দনের উপাসনা করেন। অবশেষে দেবদেব জনার্দন স্বপ্নে রাজাকে জানান যে, পরদিন প্রত্যূষেই মহর্ষি অত্রির সঙ্গে রাজার দেখা হবে এবং তাঁর সমস্ত অভিলাষ পূরণ করবেন। পরের দিন অত্রিকে প্রত্যক্ষ দেখলেন পুরূরবা। অত্রির আদেশে দেবার্চনা করে আগুনে আহুতি দেবার পর মদ্রপতি পুরূরবা সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করেছিলেন।

[মৎস্য পু. ১১৫.৪-৮; ১১৮.৬১-৬৩; ১২০.৪১-৪৮]

এছাড়াও মহাভারত-পুরাণে নানা বিক্ষিপ্ত ঘটনায় অত্রিকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

□ বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনুর কালে সপ্ত ঋষির মধ্যে অন্যতম হলেন অত্রি।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.১, ৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৮.২৮]

□ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে মহর্ষি অত্রি জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় (শুচি এবং শুক্র) মাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন। *[ভাগবত পু. ১২.১১.৩৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.৫-৮]*

□ বামন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় ভগবান শঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে নখাগ্র দিয়ে ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করেন। ব্রহ্মার সেই ছিন্নমস্তক শিব-শঙ্করের বামহস্তে সংলগ্ন হল। বদরিকাশ্রমে গিয়ে নারায়ণকে শিব জানালেন সমস্ত ঘটনা। তখন নারায়ণ শিবকে ত্রিশূল দিয়ে নারায়ণের বাম হাতে আঘাত করতে বললেন। শিব তাই করলেন। নারায়ণের হাতে ত্রিশূলাহত ক্ষতস্থান থেকে তিনটি রক্ত ধারা প্রবাহিত হল। একটি ধারা নক্ষত্র সমাকুল আকাশে চলে গেল। দ্বিতীয় ধারা পৃথিবীতে পতিত হলে ঋষিরা তা ধারণ করলেন। সেই ধারাটি থেকেই অত্রি এবং শিবের অংশে দুর্বাসার জন্ম হয়।

[বামন পু. ২.২১-৫১]

□ জামদগ্ন্য পরশুরাম যখন গভীর বনে

তপস্যা করতে গিয়েছিলেন, তখন অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে অত্রিও সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২৩.৪-৫]*

☐ পরাশরের পিতা শক্তি রাক্ষসের হাতে মারা গিয়েছিলেন। প্রতিশোধস্পৃহায় রাক্ষসদের পুড়িয়ে মারার জন্য পরাশর রাক্ষস-সত্র আরম্ভ করেন। এতে অসংখ্য নির্দোষ রাক্ষসের মৃত্যু হতে লাগল। তখন পরাশরকে নিবৃত্ত করতে যেসব ঋষি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, মহর্ষি অত্রি তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.১৮১.৮-৯; (হরি) ১.১৭৪.৮]

☐ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত ঋষি-মহর্ষিদের মধ্যে অত্রি একজন।

[মহা (k) ২.১১.১৯; (হরি) ২.১১.১৮]

☐ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সর্বদা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে যাঁরা ব্রহ্মর্ষিপদবাচ্য হয়েছিলেন, মহর্ষি অত্রি তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.১৫০.৭৯; (হরি) ১৩.১২৮.৭৯]

☐ পুরাকালে সোম রাজা সোমতীর্থে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অত্রি ছিলেন হোতা।

[মহা (k) ৯.৪৩.৪৭; (হরি) ৯.৪০.৪৩; মৎস্য পু. ২৩.১৬-২০]

☐ তারকাসুর বধের পূর্বে স্কন্দ কার্তিকেয়কে যখন দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করা হল, সেই অনুষ্ঠানে যেসব ঋষিরা উপস্থিত হয়েছিলেন অত্রি তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.১০; (হরি) ৯.৪২.১০]

☐ মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান থেকে জানা যায়, দময়ন্তী নলকে দেখার জন্য বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে এক দিব্য কাননে উপস্থিত হন। সেখানে বহু বিশিষ্ট মহর্ষি-ব্রহ্মর্ষিদের দেখতে পান দময়ন্তী। মহর্ষী অত্রিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ৩.৬৪.৬২; (হরি) ৩.৫৩.৬১]

☐ স্কন্দপুরাণ থেকে জানা যায়, মহীসাগর, সঙ্গম নামক তীর্থে তপস্যা করার সময় অত্রি কোটিতীর্থের দক্ষিণে এক পবিত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি অত্রির নামানুসারে সেটি অত্রীশ্বর লিঙ্গ নামে খ্যাত।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৫২.১৭]

☐ দ্বাপর যুগ প্রবৃত্ত হলে মানুষের বুদ্ধি বৈকল্য ঘটায় মানুষ শিবধর্ম পরিত্যাগ করে। বর্ণাশ্রম বিধ্বস্ত হয়। এই সময় সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য মহর্ষি অত্রি ধর্মশাস্ত্র রচনা করেন এবং শিবধর্মের উপদেশ করেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪০.২০৮-২১৩]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দ্রোণাচার্যের মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখে যেসব ঋষিরা তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, অত্রি তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৭.১৯০.৩৩; (হরি) ৭.১৬৪.২৪]

☐ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব ঋষি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন, অত্রি তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.২৬.৪; (হরি) ১৩.২৭.৪; ভাগবত পু. ১.৯.৭]

☐ অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ রাজা যখন প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করবেন বলে স্থির করেন, সেই সময়ে তাঁর পাশে থাকার জন্য যে সব ঋষিরা সমবেত হয়েছিলেন, অত্রি তাঁদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ১.১৯.৯]*

☐ কৃষ্ণের সময়ে মিথিলার রাজা ছিলেন জনক বহুলাশ্ব। মিথিলাতেই তখন বাস করতেন শ্রুতদেব নামে এক ব্রাহ্মণ। এঁরা দুজনেই কৃষ্ণের গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। এঁদের খুশি করার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং মিথিলায় গিয়েছিলেন এঁদের সঙ্গে দেখা করতে। কৃষ্ণের মিথিলা যাত্রার সময়ে অত্রিও তাঁর সহচর ছিলেন বলে জানা যায়।

[ভাগবত পু. ১০.৮৬.১৩-১৮]

অত্রি$_{২}$ দ্বাদশ দ্বাপরে যখন মহর্ষি শততেজা বেদবিভাগকারী ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান শিব অত্রি নাম গ্রহণ করে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন বলে বায়ু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ২৩.১৫৫]

অত্রি$_{৩}$ চতুর্দশ দ্বাপরে, যখন মহর্ষি সুরক্ষ বেদবিভাগকারী ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান শিব মহর্ষি গৌতম নাম গ্রহণ করে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। সেই সময় গৌতমের যে চার পুত্রসন্তান হবে তাঁদের মধ্যে অত্রি একজন।

[বায়ু পু. ২৩.১৬৪]

অত্রি$_{৪}$ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের চার পুত্র অসুরদের

যজন-যাজন পৌরোহিত্য করতেন। শুক্রাচার্যের এই চার পুত্রের মধ্যে অত্রি একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.৩৭; (হরি) ১.৬০.৩৭]

অত্রি$_৫$ শিব মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম হল অত্রি। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের অত্রি নামটির অর্থ-ব্যাখ্যা করে বলেছেন —

অত্রিঃ অত্রিগোত্রাপত্যত্বাদ্ বুধঃ
তেন সর্বগ্রহস্বরূপীত্যর্থঃ।

নীলকণ্ঠ শিবের এই নামের মধ্যে অত্রিপুত্র চন্দ্র বুধ প্রভৃতি অত্রিবংশীয় গ্রহস্বরূপতার কথা বর্ণনা করলেও মহাদেবের অত্রি নামটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা করা চলে। অত্রি শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'অদ্' ধাতু থেকে। 'অদ্' ধাতুর অর্থ খাওয়া বা ভক্ষণ করা। সেক্ষেত্রে যিনি ভক্ষণ করেন—এই ভাবনা থেকে 'অত্রি' নামটি সর্বগ্রাসী অগ্নির সমার্থক। মহাকাব্য পুরাণে রুদ্র-শিবকে বহুবার অগ্নির সঙ্গে একাত্মক বলে ভাবনা করা হয়েছে। অত্রি অগ্নিস্বরূপ মহাদেবেরই এক নাম।

আবার প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণের এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাবনা অনুযায়ী 'অদ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন মূল শব্দটি হল অত্তি, যার রূপান্তর অত্রি। এই অত্রি বা অত্তিকে সেখানে বাক্ বা বাক্য সরস্বতী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বস্তুত বাগেন্দ্রিয় বা রসনার মাধ্যমে যেমন কথা বলা যায়, তেমনই ভক্ষণ করাও যায়। শতপথ ব্রাহ্মণ তাই বলেছে—বাক্ই অত্রি এবং বাক্যের দ্বারাই অন্নগ্রহণ করা যায়—

বাগেবাত্রির্বাচা হি অন্নং/হ্যন্নং অদ্যতে,
অত্তির্হ বৈ নামৈতৎ যদ্ অত্রিরিতি।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.৫.২.৬]

বাক্ স্বরূপ বলেও মহাদেবকে সহস্রনামস্তোত্রে অত্রি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অত্রি শব্দটিকে আরও একভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'ত্রি' বলতে এখানে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণ বোঝানো হয়েছে। ভগবান শিব ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপ বলেই তাঁর নাম অত্রি।

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৮; (হরি) ১৩.১৬.৩৮]

অত্রায়নি একজন ঋষি। পুরাণে যেসব ঋষিবংশকে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশ-প্রবরভুক্ত বলা হয়েছে তার মধ্যে মহর্ষি অত্রায়নির বংশ অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৯]

অত্রীশলিঙ্গ দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রের তীরে যে কুমারিকা ক্ষেত্র বা কুমারিকা অন্তরীপ অবস্থিত, পুরাণে সেটিকে একটি পুণ্যক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্থানে কেদার লিঙ্গের দক্ষিণ দিকে অত্রীশলিঙ্গ অবস্থিত।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৬৬.১১৭-১২০]

অত্রীশ্বর মুনিবর অত্রি মহীসাগর-সঙ্গমে তপস্যাচরণ করেছিলেন এবং তিনি কোটিতীর্থের দক্ষিণ দিকে অত্রীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অত্রীশ্বর লিঙ্গের সন্নিহিত অঞ্চলে তিনি একটি সরোবরও নির্মাণ করেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৫২.১৭-১৯]

অত্রীশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থক্ষেত্র। মহর্ষি অত্রি এখানে লিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৪৩]

অত্র্যানমস্কর্তা শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। অত্রী শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় মহর্ষি অত্রির পত্নী। যিনি 'অত্রী'কে নমস্কার করেন তিনিই সংস্কৃতে অত্র্যানমস্কর্তা নামে চিহ্নিত হন। এক্ষেত্রে যিনি অত্রির পত্নীকে নমস্কার করেন বলতে অত্রি পত্নীর পুত্র বোঝাবে। মহর্ষি অত্রি প্রজাপতি একাধিক দেবশ্রেষ্ঠ কিংবা ঋষিশ্রেষ্ঠ পুত্রের জনক, তাঁর কোন পুত্রের স্বরূপতায় মহাদেবকে কল্পনা করা হয়—এ বিষয়টিকে এক একজন পণ্ডিত এক একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মহাদেবের শিরোভূষণ চন্দ্র, তাই মহাদেবকে একাধিকবার চন্দ্রস্বরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এই চন্দ্র মহর্ষি অত্রির পুত্র—পুরাণে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। ফলে পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ভারতকৌমুদী টীকায় মহাদেবকে চন্দ্রস্বরূপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন — দেবশ্রেষ্ঠ অত্রিপুত্র চন্দ্ররূপে তিনি অত্রির পত্নীকে নমস্কার করেন—তাই মহাদেব অত্র্যানমস্কর্তা নামে খ্যাত। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই অত্রিপুত্রকে দুর্বাসার স্বরূপতায় কল্পনা করেছেন। অত্রিপত্নী অনসূয়ার গর্ভে, স্বয়ং রুদ্র-শিবের অংশে দুর্বাসার জন্ম। তাই দুর্বাসা রুদ্র-শিবের অংশাবতার হিসেবে খ্যাত, দুর্বাসা মহাদেবের অন্যতম নামও বটে। তাই নীলকণ্ঠের কল্পনায় মহর্ষি দুর্বাসা রূপে স্বয়ং

মহাদেবই মাতা অনসূয়াকে প্রণাম করেন—তাই তিনি অত্র্যানমস্কর্তা নামে খ্যাত—

অত্র্যা অত্রিপত্ন্যাঃ অনসূয়ায়াঃ নমস্কর্তা
দত্তদুর্বাসোরূপেণ তৎপুত্রত্বাৎ।

নীলকণ্ঠ কৃত এই টীকায় 'দত্ত' শব্দটি লক্ষণীয়। মহাদেবের অংশে অনসূয়ার গর্ভে যেমন দুর্বাসার জন্ম, তেমনই পুরাণ মতে ভগবান বিষ্ণুর অংশে অনসূয়ার গর্ভজাত পুত্র হলেন দত্ত বা দত্তাত্রেয়। নীলকণ্ঠ দত্তাত্রেয়কেও মহাদেবের স্বরূপ হিসেবে কল্পনা করেছেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আসলে অভিন্ন সত্তা—এই ভাবনা থেকেই দত্তাত্রেয় রূপে অনসূয়াকে নমস্কার করেন—এই অর্থেও মহাদেব অত্র্যানমস্কর্তা।

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৮; (হরি) ১৩.১৬.৩৮]

অথর্ব মধ্যদেশে অবস্থিত ভূমিখণ্ডের নাম। মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'অথর্ব' নাম উল্লিখিত হলেও অন্যান্য পুরাণে একে কখনো আবন্ত, কখনো অর্বুদ আবার কখনো অর্থবা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিত D.C. Sircar একে অবন্তীরই অপর নাম বলে মনে করেছেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৩৩; GAMI (Sircar) p. 31]

অথর্ববেদ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঋক্-সাম এবং যজুকেই শুধু বেদশব্দে চিহ্নিত করে এই তিনের সমাহারকে ত্রয়ী বলা হয়েছে। অথর্ববেদকে বেদের প্রধান পরিসর থেকে বাদ দিয়ে তিনি ইতিহাস-এর সঙ্গে অথর্ববেদকে একত্রে রেখেছেন। অথর্ববেদের এই বহির্ভুক্তি থেকে অনেকেই মনে করেন অথর্ববেদ অন্য তিন বেদের সমতুল্য নয়। এর কারণ হিসেবে বলা যায়—অথর্ববেদের সঙ্গে যজ্ঞক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঠিক নেই। যজ্ঞ করতে যে ষোলো জন পুরোহিত লাগে, সেখানেও অথর্ববেদ-জানা পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। অথর্ববেদের মধ্যে মারণ, উচাটন, অভিচার ইত্যাদি হিংসামূলক যজ্ঞের ব্যবস্থা থাকায় এটি ত্রয়ীর অন্তর্গত হয়নি।

কৌটিল্যের উল্লিখিত এই ত্রয়ী শব্দটির একটা বোধ হয়তো পুরাণগুলির মধ্যেও আছে, কিন্তু চিরাচরিত বিশ্বাস অনুযায়ী অথর্ববেদকে ধরে চতুর্বেদের ধারণাটাই পুরাণের মধ্যে প্রধান বলে গণ্য হয়েছে। বেদের স্বরূপতায় ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে গিয়ে বিষ্ণু পুরাণ *[৩.৩.২১]* ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদের কথাই বলেছে—

স ঋঙ্‌ময়ঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ময়ঃ।
ঋগ্‌যজুঃসাম-সারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্॥

[বিষ্ণু পু. ৩.৩.২৮-২৯]

আবার অন্যত্র বেদকে 'চতুর্ধা', 'চতুর্বেদ'। ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করে অথর্ববেদকেও সম্পূর্ণ বেদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

*[বিষ্ণু পু. ৩.২.৫৬; ৩.৩.১০, ২০;
৩.৪.২, ১৩, ১৪]*

অথর্ববেদের প্রাচীন নাম 'অথর্বাঙ্গিরস'। অথর্ব মানে ভেষজ বিদ্যা। সাধারণত মনুষ্যজীবনের মাঙ্গলিক ক্রিয়াগুলিই 'ভেষজ' হিসেবে চিহ্নিত। 'আঙ্গিরস' শব্দের দ্বারা শত্রুর অমঙ্গলকারী মারণ উচাটন ইত্যাদি অভিচার ক্রিয়াগুলিকে বোঝায়। অথর্ববেদের এই মঙ্গল এবং অমঙ্গলের নির্দিষ্ট অংশগুলি গোপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। *[১.২.১৭]*

এই বেদের অপর দুটি নাম ভৃগ্বাঙ্গিরস এবং ব্রহ্মবেদ।

অথর্ব শব্দটি যথেষ্ট পুরোনো। ঋগ্‌বেদে এক যাজ্ঞিক পুরোহিতকে অথর্বা বলে ডাকা হচ্ছে—

যমথর্বা মনুষ্পিতা দ্রধ্যঙ্ ধিয়মত্নত।

[ঋগ্‌বেদ ১.৮০.১৬]

পণ্ডিতেরা বলেন—এই অথর্বা (অথর্বন্) নামের পুরোহিতই পার্শীদের প্রিয় গ্রন্থ জেন্দ্ আবেস্তায় 'অথ্রবন্' নামে অভিহিত। প্রাক্‌বৈদিক ইন্দো ইরানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে অথর্ব শব্দটি প্রথমে অগ্নির পুরোহিতকে বোঝাত, কেন না, পুরাতন ইরানীয় ভাষায় 'অথর্' শব্দটির প্রতিরূপ হল 'অতর্' যার অর্থ অগ্নি। আবার 'অঙ্গিরস' শব্দটিকে ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অগ্নিশব্দের বর্ণবিপর্যয় বলে মনে করেন। অন্যদিকে 'অঙ্গিরস' শব্দটিকে ইন্দো-ইরানীয় শব্দতন্ত্রের পূর্বযুগ ইন্দো ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা থেকেও সপ্রমাণ করা যায়। কেননা সংস্কৃত 'অঙ্গিরস' এবং গ্রীক 'অঙ্গেলোস্' (angelos) একই শব্দ। গ্রীক 'অঙ্গেলোস্'—শব্দের অর্থ দূত এবং বেদেও অগ্নিকে দেবতাদের দূত বলা হয়েছে—

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে।

এই শব্দসাযুজ্য থেকে প্রমাণ হয় অথর্ববেদ পরবর্তীকালে লিখিত হলেও এই বেদের প্রাচীনত্ব কম নয় এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি তথা প্রাচীন

উপনিষদগুলির মধ্যেও অথর্ববেদ চতুর্থ বেদ হিসেবেই চিহ্নিত।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৫.৬.৪৮; ১৩.৪.৩.৩;
১৪.৫.৪.১০; ১৩.৬.১০.৬; ১৩.৭.৩.১১;
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২.৪.১০; ৪.১.২; ৪.৫.১১]

অথর্ববেদের মোট মন্ত্রসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশই ঋগ্‌বেদ থেকে নেওয়া অপিচ এই বেদের মৌলিক মন্ত্রগুলির প্রকৃতি অন্য তিন বেদ থেকে অনেকটা পৃথক। মানুষের গার্হস্থ্য জীবন তথা রাষ্ট্রীয় বিধি-ভাবনা এই বেদের মধ্যে স্থান পাওয়ায় অথর্ববেদকে অন্য তিন বেদের পরবর্তীকালের রচনা বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতদের মতে অথর্ববেদের রচনাকাল আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। অথর্ববেদের পুরোহিতকে বলা হত ব্রহ্মা।

অথর্ববেদের সূক্তগুলি কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত। এক থেকে সপ্তম কাণ্ড পর্যন্ত মনুষ্যজীবনের নানা আভ্যুদয়িক কর্মের প্রশস্তি আছে—যেমন দীর্ঘ আয়ুলাভের জন্য মন্ত্র বা আয়ুষ্য। রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের মন্ত্র বা ভৈষজ্য। আধিভৌতিক উপদ্রব দূর করার মন্ত্র বা শান্তিক। শ্রী বা সমৃদ্ধি লাভের মন্ত্র বা পৌষ্টিক। সার্বজনীন মৈত্রীলাভের মন্ত্র বা সংমনস্য। শত্রু শাতনের মন্ত্র বা আভিচারিক। আর আছে প্রায়শ্চিত্ত এবং রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা এবং উন্নতির জন্য বিভিন্ন মন্ত্র। এই হল অথর্ববেদের প্রথম ভাগ।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ কাণ্ডকে অথর্ববেদের দ্বিতীয় ভাগ বলা চলে। এখানে আভ্যুদয়িক কর্মের সঙ্গে দার্শনিক ভাবনাও আছে অনেক। ত্রয়োদশ থেকে বিংশ কাণ্ড পর্যন্ত তৃতীয় ভাগ। শেষের দুই কাণ্ড পরিশিষ্ট। এইভাবে কুড়িটি কাণ্ডের প্রত্যেকটি কাণ্ড কয়েকটি প্রপাঠকে, প্রতি প্রপাঠক কয়েকটি অনুবাকে, প্রতি অনুবাক কতগুলি সূক্ত বা পর্যায়ে এবং প্রতি পর্যায় কতগুলি মন্ত্রে বিভক্ত। সব মিলিয়ে কুড়িটি কণ্ডিকা, আটত্রিশটি প্রপাঠক, নব্বইটি অনুবাক, সাতশ একত্রিশটি সূক্ত বা পর্যায় এবং প্রায় ছ-হাজার মন্ত্র অথর্ববেদে আছে। অথর্ববেদে কিছু গদ্যাংশ আছে—পঞ্চদশ এবং ষোড়শ কাণ্ড গদ্যে রচিত। অথর্ববেদের অধিংকাশ কাণ্ডেই মন্ত্রবিভাগে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি আছে—যেমন প্রথম কাণ্ডের প্রতিটি সূক্তে চারটি করে মন্ত্র আছে, দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রতি সূক্তে পাঁচটি করে; তৃতীয়ে ছটি, চতুর্থে সাতটি এইভাবে কাণ্ডভেদে সূক্তগত মন্ত্রসংখ্যায় সুনির্দিষ্ট ভেদ আছে অনেক জায়গাতেই। চার বেদের মধ্যে অথর্ববেদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে পুরোহিততন্ত্রের উত্থানে। অথর্ববেদে শুভ এবং অশুভ সমস্ত মন্ত্রের ভাষা এবং ভাব ঋগ্‌বৈদিক মন্ত্র থেকে আলাদা। যে পুরোহিত স্বস্তিশান্তি ঘটাচ্ছেন, মঙ্গল প্রসব ঘটাচ্ছেন, সপত্নীর দৌরাত্ম্য নাশ করে স্বামীকে বশীকরণ-মন্ত্রে অন্যতমা পত্নীর সহবাসে আবদ্ধ করছেন—সাধারণ মানুষ তারই মূল্য দিয়েছে বেশি। অন্যদিকে মারণ, উচাটন, অভিচার যে পুরোহিতের আয়ত্ত লোকসমাজে তার প্রাধান্য অনুমানযোগ্য। ফলে অথর্ববেদের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের ওপরে বিশ্বাসও বেড়ে ওঠে। পুরোহিত আস্তে আস্তে magic priest হয়ে ওঠেন। তিনি শুধু যজমানের যজ্ঞ-সহায়ই নন শুধু, holy spell এবং black-magic এর কল্যাণে একদিকে জনসাধারণের মহামান্য গুরুতে পরিণত হন, অন্যদিকে রাজা এবং রাজন্যবর্গের মধ্যেও তাঁর সম্মান বাড়ে। পরবর্তী কালে যাজ্ঞবল্ক্য-সূত্রে *[১.৩১২]* এমন বিধান পাওয়া যাচ্ছে যে, রাজার পক্ষে পুরোধা পুরোহিত নিযুক্ত করা উচিত অথর্ববেদের পুরোহিতকেই। রাজারা শত্রু-বিনাশের জন্য তথা নিজের অভীষ্ট ফল লাভের জন্য আথর্বনিক মন্ত্রের সাহায্য নিতেন এবং এই প্রক্রিয়ায় রাজাদের মধ্যেও আথর্বনিক পুরোহিতের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রামায়ণে দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার সময় মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ বলেছিলেন অথর্ববেদে যে সব মন্ত্র রয়েছে, যজ্ঞসিদ্ধির জন্য আমি বিধি অনুসারে সেই সব মন্ত্র প্রয়োগ করব—

ইষ্টিং তে'হং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
অথর্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ।

[রামায়ণ ১.১৫.২]

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, পরবর্তী কালের তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল নিহিত আছে অথর্ববেদের black magic এর মধ্যে।

অথর্ববেদের জনপ্রিয়তার আরও একটি বড়ো কারণ হল, এই বেদের অন্তর্গত ভৈষজ্য বা চিকিৎসা-শাস্ত্র। অথর্ববেদের মধ্যে বহুতর ব্যাধি, ব্যাধির প্রতিষেধক লতা, গুল্ম, গাছ-গাছড়া,

চিকিৎসা, চিকিৎসক—এ-সব কিছুই বহুলভাবে আলোচিত। এক কথায় আমাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্র, অস্থিবিদ্যা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা এবং ওঝার ঝাড়-ফুঁকের মূলেও আছে এই অথর্ববেদ। চিকিৎসা-বিদ্যা ছাড়াও অথর্ববেদের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টিকর্তার তত্ত্ব, সুগভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব, নির্গুণ পরমেশ্বরের তত্ত্বও স্থান পেয়েছে। অথর্ববেদের বিষয়সূচীর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কালসূক্ত (কালই সৃষ্টির প্রথম সূচনা, জীবনচক্রে কালই প্রধান অবলম্বন), বিরাজ-সূক্ত, ভূমিসূক্ত, ব্রাত্যজীবন, মঙ্গলসূচক মৃগার এবং কুন্তাপ সূক্ত, সভা এবং সমিতি নিয়ে মন্ত্রগুলি পণ্ডিত দার্শনিক এবং ঐতিহাসিকদের কাছে গভীর কৌতূহলোদ্দীপক। অথর্ববেদের মধ্যে এই অসামান্য দার্শনিকতা এবং রাজতন্ত্র সম্বন্ধে নানান ভাবনার নিরিখেই বিষ্ণুপুরাণ বলেছে—অথর্ববেদে রাজগণের কর্মসমুদায় এবং ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে—

রাজ্ঞস্ত্বথর্ববেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি।

[বিষ্ণু পু. ৩.৪.১৪;
দ্র. M. Bloomfield, Hymns of the Atharvaveda, Sacred Books of the East Series. Introduction; V.W. Karambalkar, The Atharvanic Civilizations, poona, 1959; J.C.Heesterman, The Ancient Indian Royal Consecration, The Hague, 1975; V.W.Karambalkar, The Atharvaveda and the Ayurveda, Nagpur, 1961; Sukumari Bhakacharji, Literature in the Vedic Age, Calcutta 1984]

অথর্বশীর্ষ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে ভগবান শিবকে এই নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯১; (হরি) ১৩.১৬.৯১]

অথর্বা একজন ঋষি। এঁকে অথর্ব-নামেও ডাকা হয়, অথর্বন্-নামেও ডাকা হয়। মহাভারতে নানান আখ্যান-উপাখ্যানের মাধ্যমে অগ্নির বহুতর রূপ এবং স্থান নির্ণয় করা হয়েছে। কখনো কখনো এই বহুরূপ অগ্নিকে একটা বংশের আকারেও বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে গৃহপতি অগ্নি অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নি যিনি সব সময় যজ্ঞে পূজিত হন এবং মানুষের আহুতি হিসেবে দেওয়া হব্য দেবতাদের কাছে বহন করেন, সেই গৃহপতি অগ্নি তাঁর আপন বংশধর 'ভরত' নামক অগ্নিকে দেখে খুব ভয় পেলেন। ভরত-অগ্নি মৃত প্রাণীদের দগ্ধ করেন, তাঁকে চিতাগ্নিও বলা হয়। এতকালের পরিচিত 'সহ'-অগ্নি বা গৃহপতি অগ্নি তাঁর সন্তানতুল্য ভরতাগ্নিকে দেখে ভয় পেয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। দেবতারা চারদিকে খুঁজলেন কিন্তু অগ্নিকে পেলেন না। ওদিকে সহ অগ্নি হঠাৎই অথর্বা ঋষিকে দেখে তাঁকে বললেন—আমি বুড়ো হয়েছি, শরীরও খুব দুর্বল। আপনিই এখন থেকে অগ্নি হোন এবং দেবতাদের হব্য বহন করতে থাকুন।

অথর্বা ঋষিকে অগ্নি হয়ে ওঠার আদেশ দিয়ে অগ্নি অন্যত্র চলে গেলেন। কিন্তু সামুদ্রিক মাছেরা অথর্বা-কে সেই খবর দিয়ে দিল। অথর্বার সঙ্গে দেখা হবার পর অগ্নি আবারও পুরানো কথা বললেন এবং সমুদ্রের মধ্যেই তাঁর জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য রূপে পৃথিবীতে প্রবেশ করলেন। পৃথিবীর নানান ধাতুতে প্রবেশ করে তিনি গুরুতর তপস্যাও করতে লাগলেন। এই সময় ভৃগু, অঙ্গিরা ইত্যাদি ঋষিরা এসে তাঁকে তপস্যা থেকে বিরত করলেন। তপস্যার প্রভাবে তাঁর তেজ বর্ধিত হয়েছে তখন, কিন্তু অগ্নি হঠাৎই একদিন আবারও অথর্বা ঋষিকে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে সেই চিরাচরিত হব্যবহনের ভয়ে অগ্নি আবারও সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। সম্পূর্ণ জগৎ এবং দেবতারাও তখন অন্ধকারের ভয়ে অথর্বা ঋষিকে সেবা করতে লাগলেন। অথর্বা ঋষি তখন সমস্ত প্রাণীর সামনেই সেই মহাসমুদ্র মন্থন করে অগ্নিকে খুঁজে বার করলেন এবং পুনরায় তাঁকে মানুষের দেওয়া আহুতি দেবতাদের কাছে বহন করে নিয়ে যাবার কাজে নিযুক্ত করলেন।

[মহা (k) ৩.২২২.৪-২০; (হরি) ৩.১৮৫.৪-২০]

মহাভারতের সভাপর্বে একবার দেখি ঋষি অথর্বা অঙ্গিরা-ঋষির সঙ্গে পিতামহ ব্রহ্মার সভায় অবস্থান করছেন। আবার অন্যত্র দেখা যাচ্ছে—দেবরাজ ইন্দ্র একদিন ঐরাবতের পিঠে বসে দেবতাদের স্তুতি গ্রহণ করছিলেন, সেই সময় অঙ্গিরা ঋষি সেখানে উপস্থিত হয়ে অথর্ববেদের

মন্ত্রে দেবরাজের সম্বর্ধনা করলেন। ইন্দ্র সেদিন খুশী হয়ে অঙ্গিরাকে বরদান করে বললেন—অথর্ব-বেদ এখন থেকে 'অথর্বাঙ্গিরস' নামে বিখ্যাত হবে—

অথর্বাঙ্গিরসো নাম বেদো'স্মিন্ বৈ ভবিষ্যতি।

[মহা (k) ২.১১.২০; ৫.১৮.১-৮;
(হরি) ২.১১.১৯; ৫.১৮.১-১৮;
Wendy Doniger O'Flaherty,
Hindu Myths, pp. 97-103 New Delhi:
Penguin Books India 1994]

মহাভারতে যে অথর্বা ঋষির কথা পাই এবং তাঁর কাহিনীও—তার মূল লুকিয়ে আছে বেদে এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে। ঋগ্‌বেদে ১৪ বার অথর্বন্-শব্দের উল্লেখ আছে, আর বহুবার উল্লেখ আছে অগ্নি-পুরোহিত হিসেবে অথর্বার নাম। ঋগ্‌বেদের নানান উল্লেখ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ভৃগু অঙ্গিরা এবং অথর্বা—এই তিনজন ঋষিই আর্যসমাজে অগ্নির উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। অথবা যে প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করার শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার শৈলীটা এতই বিখ্যাত হয়েছিল যে কোথাও কোথাও অগ্নির উৎপাদক হিসেবেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে ঋগ্‌বেদে—

ইমমু ত্যমথর্ববদগ্নিং মন্থন্তি বেধসঃ।

কর্ম-নির্বাহক ঋত্বিকেরা অথর্বা ঋষির মতো অগ্নিকে মন্থন করেছেন।

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত।

অথর্বা ঋষি মনুষ্যদেহে মস্তকের মতো এই শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্পর থেকে মন্থন করে অগ্নিকে নিষ্কাসিত করেছেন।

এই মন্ত্রে সায়নাচার্য পদ্মপত্রের ওপর প্রজাপতি-কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী মাথায় রেখে পুষ্কর অর্থ করেছেন পদ্ম। কিন্তু পণ্ডিতজনেরা পুষ্কর অর্থে অরণি-কাষ্ঠের ছিদ্র বুঝেছেন। কেননা আগুন বার করার জন্য অরণি-কাষ্ঠের ওপর সামান্য ছিদ্র তৈরি করে তার ওপর অন্য কাষ্ঠদণ্ডের ঘর্ষণ করেই অগ্নি উৎপাদন করতে হয়। ঋষি অথর্বাই হয়তো এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, যা ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রের মধ্যে স্পষ্ট ধরা আছে। অগ্নির উৎপাদক ঋত্বিক অধ্বর্যুকে উদ্দেশ করে এখানে বলা হচ্ছে—তুমি ঊর্ধ্বমুখী অরণির অধোমুখী অরণি স্থাপন করো। তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী অরণি-অগ্নিকে উৎপন্ন করল। *[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৬.৪.২.১;*
ঋগ্‌বেদ ৬.১৫.১৭; ৬.১৬.১৩; ৩.২৯.২;
Macdonell, Vedic Mythology, p. 141]

☐ ঋগ্‌বেদের অন্য একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—ঋষি অথর্বাই সবার আগে যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করেছিলেন। দেবতারা এবং ভৃগুবংশীয়েরা বল প্রকাশ করে গিয়েছিলেন যজ্ঞ-স্থলে, তারপর তাঁরা যজ্ঞকে বুঝতে পারলেন—

যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বি ধারয়দ্দেবা
দক্ষৈঃ ভৃগবঃ সং চিকিত্রিরে।

এই মন্ত্রে ভৃগু বা ভার্গব ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অথর্বার যে সম্বন্ধ লক্ষিত হচ্ছে, তা বস্তুত এক ঐতিহাসিক সত্য। ভৃগু, অঙ্গিরা এবং অথর্বা তিনটি প্রধান এবং পৃথক ব্যক্তিত্ব বটে, কিন্তু তাঁদের সাধারণ একতার সূত্র হল অগ্নির উৎপাদন এবং অগ্নিরক্ষা। পণ্ডিতেরা অনেকেই অথর্বাকে ভৃগুর পুত্র বলেছেন, আর অঙ্গিরাকে বলেছেন অথর্বার পুত্র। কথাটা আছে মৎস্য পুরাণে। জেন্দ আবেস্তায় 'অথ্রবন্' অগ্নিরক্ষক পুরোহিত।

[A.B. Keith, The Religion and Philosophy of The Vedas, pp. 223-226;
মৎস্য পু. ৫১.৯-১০]

☐ সম্পূর্ণ অথর্ববেদটাই অথর্বাদের কীর্তি, এই বেদের অন্য নামই অথর্বাঙ্গিরস বেদ—অর্থাৎ এই বেদের এক ভাগ আঙ্গিরস বেদ অন্য ভাগ আথর্বনিক বেদ। প্রাচীনকালে বড়ো বড়ো যাগ-যজ্ঞের যেমন ব্যবস্থা ছিল, তেমনই পূজাপার্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, মন্ত্রণা, আত্মরক্ষা, শত্রুর উৎপীড়ন, আধি-ব্যাধির নিরূপণ এবং তার চিকিৎসার বিষয়ক যাগ-যজ্ঞের ভাবনাও ছিল। প্রধানত এই অংশটাই ছিল অথর্বাদের অধিকারে। আর বিপরীত শত্রুবধ, মারণ, উচাটন, বশীকরণ —এইসব অমঙ্গলজনক অভিচার-প্রক্রিয়া ছিল আঙ্গিরস পুরোহিতদের অধিকারে। তাই অথর্ববেদে দুই প্রকারের বিদ্যা দুই ঋষির অধিকারে, শুভজনক বিদ্যাটি অথর্বার অধিকার আর অশুভজনক অভিচার বিদ্যা অঙ্গিরসের অধিকার।

[Maurice Bloomfield, Atharvaveda, pp. 7-9]

☐ মুণ্ডক উপনিষদে দেখা যাচ্ছে যে, অথর্বা

হলেন ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র। ব্রহ্মার কাছেই তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন এবং সেই বিদ্যা তিনি অঙ্গিরাকে দান করেন। অঙ্গিরা ভারদ্বাজ সেই বিদ্যা দেন সত্যবাহকে; পুনরায় সত্যবাহ সেটা শিক্ষা দেন আঙ্গিরসদের—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমং সম্বভূব,
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্।
অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
অথর্বণে যা প্রবদেত ব্রহ্মাথর্বা তাং
পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজো'ঙ্গিরসে পরাবরান্।

[মুণ্ডক উপনিষদ ১.১.১-২]

☐ পূর্বে উল্লিখিত মহাভারতের শ্লোকগুলিতে অথর্বা ঋষির যে পরিচয় পেয়েছি, ভাগবত পুরাণেও তাই—তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইনি অঙ্গিরসের ঔরসে সতী-মাতার গর্ভজাত একজন ঋষি। অথর্বার ঔরসে কর্দম ঋষির মেয়ে চিত্তির (নামান্তরে শান্তির) গর্ভে দুটি পুত্র হয় অথর্বার—একজন অশ্বশিরা, অন্যজন দধ্যঙ্ (দধীচি)। আবার বায়ু পুরাণের মতে আঙ্গিরস অথর্বার তিন পত্নী ছিলেন। এক পত্নী মহর্ষি মরীচির মেয়ে সুরূপা, তাঁদের ছেলে হলেন বৃহস্পতি। দ্বিতীয়া পত্নী কর্দমের মেয়ে স্বরাট, তাঁদের ছেলেরা হলেন গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ এবং উতথ্য। আর অথর্বার তৃতীয়া পত্নী হলেন মনুর মেয়ে পথ্যা, তাঁদের ছেলের নাম ধিষ্ণু। এঁরা ছাড়াও বায়ু পুরাণে অথর্বার আরো দুই মানস পুত্র আছেন। তাঁদের নাম সংবর্ত ও বিচিত্ত। বায়ু পুরাণের অন্যত্র অথর্বাকে প্রায় ভৃগু বলেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভৃগুর পুত্র অঙ্গিরা—

অথর্বা তু ভৃগুর্জ্ঞেয়ঃ।

[ভাগবত পু. ৬.৬.১৯; ৪.১.৪১;
বায়ু পু. ৬৫.৯৮-১০১; ২৯.৯]

☐ ঋগ্‌বেদে ছিল—বিশ্বের ধারণকারী পুষ্করকে (অরণি) মন্থন করে অগ্নি উৎপাদন করেছিলেন অথর্বা। মৎস্য পুরাণ সেই পুষ্করকে পুষ্করোদধি-মন্থনের রূপকে ব্যাখ্যা করে বলেছে—অগ্নি দেবতাদের হব্য বহন করে নিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তিনি অথর্বার পুত্র হয়ে জন্মান। তখন তাঁর নাম হয় আথর্বণ।

বায়ু পুরাণে অথর্বার আর এক পরিচয়—অথর্বা লৌকিক অগ্নি এবং তিনি উৎপন্ন হয়েছেন পুষ্করোদধি থেকে। তাঁর পুত্রের নাম দধ্যঙ্গ (দধ্যঙ্, দধীচি)। *[মৎস্য পু. ৫১.৭-১০; বায়ু পু. ২৯.৮]*

অথর্বা ভগবান শিবের অন্যতম একটি নাম—যেমনটি মহাভারতে—

শংযোরভিস্রবন্তায় অথর্বায় নমো নমঃ।

আবার হরিবংশে—

অথর্বাণং সুশিরসং ভূতযোনিম্ (ব্রহ্মযোনিম্)।

[হরিবংশ পু. ২.৭২.৩৩;
মহা (k) ১৩.১৪.৩০৯; ১৩.১৩.৩০৭]

☐ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অথর্বা কোথাও প্রাণের প্রতীক—প্রাণো বা' অথর্বা। কোথাও বা অথর্বা স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা—অথর্বা বৈ প্রজাপতিঃ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৬.৪.২.১;
গোপথ ব্রাহ্মণ ১.৪]

অথর্বাঙ্গিরস অঙ্গিরার ঔরসে সতীর গর্ভে অথর্বাঙ্গিরস নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত মুনি। এই ধারায় পুত্র-প্রপৌত্র এবং শিষ্যেরাও অথর্বাঙ্গিরস নামে একটি গোষ্ঠী বা বর্গে পরিণত হন। সম্পূর্ণ অথর্ববেদটাকেই দুই ভাগে অথর্বাঙ্গিরস বেদ নামে অভিহিত করা হয় এবং ঋক-সামাদি বেদের মধ্যে অথর্ববেদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়েছে অথর্বাঙ্গিরসের নামে—

অথর্বাঙ্গিরসী হ্যেষা শ্রুতীনামুত্তমা শ্রুতিঃ।

অঙ্গিরার ঔরসে সতীর গর্ভজাত অথর্বাঙ্গিরস নামে যে পুত্রটি জন্মান, তাঁকে অথর্ববেদ বলেই চিহ্নিত করেছে ভাগবত পুরাণ। অথর্বাঙ্গিরসী বিদ্যা লোকের ক্ষতিসাধক এক 'কৃত্যা' বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে মহাভারতে।

[মহা (k) ৮.৬৯.৮৫; ৮.৯১.৪৮; ৯.১৭.৪৪;
২.১১.২০; ১২.৩৩৫.৪০;
(হরি) ৮.৫১.৮৩;৮.৬৬.১৫৭; ৯.১৫.৩৬;
২.১২.১৯; ১২.৩২১.৪১;
ভাগবত পু. ৬.৬.১৯; ১২.৬.৫৩;
বায়ু পু. ৬৫.৯৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৫.১২;
মৎস্য পু. ২৬৫.২৮;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ১৪.২০]

অদন্ত শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ ভগবান শিবের এই 'অদন্ত' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অদন্তঃ নাস্তি দন্তো দমকো যস্য।

'অদন্ত' শব্দের অর্থ যাঁর দন্ত নেই (বহুব্রীহি সমাস)। অভিধান গ্রন্থ বাচস্পত্যে অদন্তের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে পুরাণ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলা হয়েছে—যাঁর মধ্যে শঠতা নেই, যিনি যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা না রেখেই সৎকার্য করেন তিনিই অদন্ত—

অদন্তঃ শঠতাহীনং কর্ম কুর্য্যাদলোলুপঃ।

ভগবান শিব দন্ত বা অহংবোধ শঠতা কিংবা যশলোভের উর্ধ্বে বলেই তিনি অদন্ত নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৭৯; (হরি) ১৩.১৬.৭৯]

অদর্শনা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অদর্শনা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৭]*

অদিতি$_{১}$ অদিতি হলেন দেবমাতা। বেদে অদিতির পরিচয় এক ব্যাপ্ত প্রকৃতি হিসেবে। বলা হয়েছে—অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, তিনি পিতা, তিনি পুত্র, তিনিই সকল দেব, তিনি জন্ম এবং জন্মের কারণ—

অদিতি দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষম্/
অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

[ঋগ্‌বেদ ১.৮৯.১০]

অনেকগুলি ঋকমন্ত্রে অদিতিকে মিত্র এবং বরুণের জননী বলে বলা হয়েছে, কখনো বা তিনি মিত্র, বরুণ এবং অর্যমার মাতা। তিনি দ্বাদশ আদিত্যের মাতা। তাঁর পুত্রেরা শক্তিমান, বীর এবং উত্তম গুণসম্পন্ন। *[ঋগ্‌বেদ ৮.২৫.৩; ১০.৩৬.৩; ১০.১৩২.৬; ৮.৪৭.৯; ৩.৪.১১; ৮.৫৬.১১]*

ঋগ্‌বেদে পৃথক কোনো সুক্ত অদিতির উদ্দেশে নিবেদিত না হলেও অন্তত আশি বার তিনি তাঁর দেবপুত্রদের সঙ্গে সংপৃক্তভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। অদিতির শারীরিক বর্ণনা ঋগ্‌বেদে তেমনভাবে নেই, তবে তাঁর 'দেবী' নামটা সমস্ত দেবকুলের জননী হিসেবে তাঁর মাতৃত্বের ব্যাপ্তি সূচনা করে, আর অন্য একটি সূক্তে তাঁকে 'অনর্বা' অর্থাৎ যথাস্থিত এবং পূর্ণ বলায় পণ্ডিতেরা অদিতিকে ব্যাপ্তি রূপিণী বলেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এ ভাবনা তাঁরা প্রমাণ করেছেন অদিতি শব্দের নিরুক্তি থেকেও। ম্যাকডোনেল লিখেছেন—

This notion is nearly allied to the etymology of the name. The word *aditi* is primarily a noun meaning 'unbinding', 'bondlessness', from *di-ti* 'binding' derived from the root *dā*, 'to bind' The past passive participle of this verb is employed to describe Sunaḥśepa 'bound' (*di-tá*) to the stake (5, 2^{7}). Hence as a goddess Aditi is naturally invoked to release her worshippers like a tied (*baddha*) thief (8, 67^{14}). The original unpersonified meaning of 'freedom' seems to survive in a few passages of the RV. Thus a worshipper exclaims, 'who gives us back to great *aditi*, that I may see father and mother? (I, 24^{1}). The Ādityas are besought (7, 51^{1}) to place the offering in guiltlessness (*anāgāstve*) and freedom (*adititve*)' The poet perhaps means the same thing when he prays to Heaven and Earth for 'the secure and unlimited gift of *aditi*' (1.185^{3}). The word *aditi* also occurs several times in the adjectival sense of 'boundless' It is thus used as an attribute twice of Dyaus (5, 59^{8}; 10, 63^{3}) and more frequently of Agni (1, 94^{15}: 4, 1^{20}; 7, 9^{3}; 8, 19^{14}).

[ঋগ্‌বেদ, ২.৪০.৬; ৭.৪০.৪]

ঋগ্‌বেদের সার্বিক মন্ত্র-ভাবনা অদিতিকে শেষ পর্যন্ত পৃথিবী বা ভূমির সঙ্গে একাকার করে দিয়েছে। ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তে পৃথিবীর কাছ থেকে ভেষজ কামনা করা হয়েছে। একইভাবে অন্য একটি ঋকে বলা হয়েছে—যজমান জ্যোতিষ্মতী স্বর্গকরী অদিতিকে (যজ্ঞবেদী) স্বয়ং নির্মাণ করেছেন, আর ক্ষিতি (মৃন্ময়ী বেদী) সম্পূর্ণ করেছেন—

জ্যোতিস্মতীমদিতিং ধারযৎ
ক্ষিতিং স্ববতীমাসচেতে।

সায়নাচার্য এই মন্ত্রে 'অদিতি'-শব্দের অর্থ 'সম্পূর্ণ লক্ষণা ক্ষিতি' বলেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে একেবারে সোজাসুজি 'এই পৃথিবীই অদিতি'—এই কথা বলায় অদিতির সম্বন্ধে মিশ্র ধারণাগুলি পরিণতি লাভ করে। *[ঋগ্‌বেদ ১.১৩৬.৩; শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.৫.১.১০; ৩.২.৩.৬]*

☐ বেদে এবং ব্রাহ্মণে অদিতিকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হয়েছে আদিত্যদের প্রসূতি হিসেবে। কৃষ্ণ যজুর্বেদে অদিতির পুত্রকামনা এবং পুত্রলাভের বর্ণনা আছে। বলা হয়েছে—অদিতি পুত্রকামনায় সাধ্যদেবতাদের জন্য অন্ন খানিক রান্না করে প্রথমে পেলেন চার পুত্র, দ্বিতীয় বারে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় পেলেন মার্তণ্ড নামক আদিত্যকে, তৃতীয় বারে পেলেন বিবস্বান্ নামে আদিত্যকে। এই ছয় জন আদিত্যের নাম সম্ভবত—যেমনটি ঋগ্বেদ বলেছে—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ। অন্য একটি ঋক্‌মন্ত্রে অগ্নি, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর নাম পাওয়া যাচ্ছে। সম্পূর্ণ দ্বাদশ আদিত্যের নাম ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগে একসঙ্গে না পেলেও অন্যত্র তা পাই এবং সেখান থেকেই বোধহয় মহাভারত পুরাণে তা আত্মীকৃত হয়। বৈদিক গ্রন্থ বৃহদ্দেবতায় এসেই আমরা দেখলাম যে, অদিতি কিন্তু দক্ষ-প্রজাপতির জননী নন, বরঞ্চ তিনি দক্ষের কন্যা। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি কশ্যপের সঙ্গে অদিতির বিবাহ হয় এবং সেই সূত্রেই দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম—

তত্রৈকা ত্বদিতির্দেবী দ্বাদশাজনয়ৎ সুতান্।
ভগশ্চৈবার্যমাংশো মিত্রো বরুণ এব চ॥
ধাতা চৈব বিধাতা চ বিবস্বাংশ্চ মহাদ্যুতিঃ।
ত্বষ্টা পূষা তথৈবেন্দ্রো দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে॥

[কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা ৬.৫.৬;
ঋগ্বেদ ২.২৭.১; ৮.৮৫.৪;
বৃহদ্দেবতা ৫.১২৫-১৩০]

☐ বৈদিক অদিতির বিবর্তন যে ভাবেই ঘটুক না কেন, পরবর্তীকালেও তাঁর মূল স্বরূপ এবং সর্বময়ী মাতৃত্বের ভাবনা একইরকম রয়ে গেছে। সেখানেও তিনি দেবমাতা, তিনি হ্রী (লজ্জা), শ্রী (লক্ষ্মী), স্বাহা (অগ্নির স্ত্রী) এবং সরস্বতীর স্বরূপ।

[মহা (k) ৯.৪৫.১৩; (হরি) ৯.৪২.১৩]

☐ প্রজাপতি দক্ষের তেরোটি মেয়ের মধ্যে একজন অদিতি। ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। শোনা যায়, তিনি উপযুক্ত পুত্র লাভের জন্য মৈনাক পর্বতের কোল ঘেঁষা বিনশন নামে এক তীর্থে সাধ্য দেবতাদের উদ্দেশে অন্নপাক করেছিলেন—

অদিতির্যত্র পুত্রার্থে তদন্নমপচৎ পুরা।

তাঁর গর্ভে তিন ভুবনের অধীশ্বর দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়েছে—

অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যাঃ সম্ভূতা ভুবনেশ্বরাঃ।

এই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ইন্দ্র হলেন মুখ্য এবং সকলের ছোট হলেন বিষ্ণু—

তেষাম্ অবরজো বিষ্ণুঃ।

[মহা (k) ১.৬৫.১৪; ১.৬৬.৩৬; ১.১২৩.৩৯;
৩.১২.২৫; ৩.১৩৫.৩;
(হরি) ১.৬০.১৪; ১.৬১.৩৬; ১.১১৭.৪৩;
৩.১১.২৫; ৩.১১১.৩;
ভাগবত পু. ৬.৬.২৫; ৯.১.১০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১৭; ২.৩.৫৬, ১১৭;
বিষ্ণু পু. ১.১৫.১২৪; ৩.১.৪৩-৪৪;
বায়ু পু. ৬৬.৫৫, ৬০, ৬৫]

☐ শোনা যায়, বিষ্ণু বামন অবতার গ্রহণের কালে অদিতি বামনরূপী বিষ্ণুকে পূর্ণ এক হাজার বছর গর্ভে ধারণ করেছিলেন—

পূর্ণে বর্ষ সহস্রে তু প্রসূতা গর্ভমুত্তমম্।

অদিতি থেকে জাত বামনকে পৃশ্নিগর্ভ বলা হয়। পৃশ্নি অর্থ বামন, বেঁটে। যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হবার কালে কৃষ্ণের প্রশংসা করে তাঁকে বলেছিলেন—তুমিই সাত প্রকারে অদিতির গর্ভ থেকে জন্মেছিলে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে বিষ্ণু, বামন এবং বিষ্ণুর অন্যান্য মনুষ্যাবতার পরশুরাম, দাশরথি রাম, যাদব বলরাম এবং কৃষ্ণকেও অদিতির পুত্ররূপে কল্পনা করেছেন। *[মহা (k) ৩.২৭২.৬২; ১২.৪৩.৬;*
(হরি) ৩.২২৬.৬০; ১২.৪৩.৬]

☐ ভাগবত পুরাণে অদিতির গর্ভে বামনরূপধারী ভগবান বিষ্ণুর জন্মবৃত্তান্ত বিশদে বর্ণিত হয়েছে। দৈত্যরাজ বলির অধীনস্থ দৈত্যেরা যখন স্বর্গলোক জয় করলেন তখন দেবমাতা অদিতি স্বর্গচ্যুত দেবতাদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বামী প্রজাপতি কশ্যপ তাঁর বিষণ্ণতার কারণ জানতে পেরে বললেন—তুমি ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষে বারোদিন পয়োব্রত অবলম্বন করে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা কর। তাঁর কৃপায় তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে, তোমার সন্তানদের দুঃখ কষ্টও দূর হবে।

অদিতি ভক্তিভরে ব্রত পালন করলেন। অদিতির আরাধনায় তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। ভগবান বিষ্ণু অদিতিকে বর প্রার্থনা করতে বললে, অদিতি নিজের পুত্ররা যাতে আবার স্বর্গরাজ্য ফিরে পান এবং দৈত্যদের

যুদ্ধে পরাজিত করেন—সেই বর প্রার্থনা করলেন। ভগবান বিষ্ণু অদিতিকে বর দিলেন — আমি নিজের অংশে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব এবং তোমার ও তোমার পুত্রদের দুঃখ দূর করব।

এরপর যথাসময়ে অদিতির গর্ভে ভগবান বিষ্ণুর অংশে বামন জন্মগ্রহণ করেন। বামন রূপধারী ভগবান বিষ্ণুই ত্রিলোক জয় করেন এবং বলিকে আবদ্ধ করে দেবতাদের স্বর্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। *[দ্র. বামন]*

[ভাগবত পু. ৮.১৬-১৮ অধ্যায়]

□ অন্যান্য পুরাণগুলিতে অদিতির প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণুর অদিতির পুত্রত্ব স্বীকারের কাহিনীটিতে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

দৈত্যরাজ বলি স্বর্গের রাজধানী অমরাবতী অধিকার করলে দেবতারা নানারূপ ধারণ করে স্বর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কশ্যপাশ্রমে অবস্থিতা জননী অদিতির কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন। সব শুনে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন অদিতি। দেবতাদের রক্ষা করার জন্য তিনি স্বামী কশ্যপকে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, দৈত্যরা নিজেদের তপস্যার শক্তিতেই অজেয় হয়েছেন। তাদের চেয়ে বেশি তপোবল সঞ্চয় করলেই তবে দেবতাদের জয় হতে পারে। দেবকার্যসিদ্ধির জন্য অদিতি তখন কশ্যপ নির্দিষ্ট পথে ব্রত-তপস্যার দ্বারা জনার্দন হরিকে তুষ্ট করার কথা বললেন। পুত্রদের দুঃখ-শান্তির জন্য অদিতি নির্জন অরণ্যের মধ্যে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা আরম্ভ করলেন। দেবমাতাকে এমন একনিষ্ঠ তপস্যায় ব্রতী দেখে দৈত্যরা দেবমূর্তি ধারণ করে তাঁকে তপস্যা থেকে বিরত করার চেষ্টা করলেন। তাতে ফল না হওয়ায় তাঁরা সেই অরণ্যে আগুন লাগিয়ে দিলেন।

শ্রীহরি সুদর্শন চক্রের সাহায্যে অদিতিকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলে অদিতি তাঁর দর্শনের জন্য উগ্রতর তপস্যায় মনোনিবেশ করলেন। অদিতির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীহরি তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, ইন্দ্র ইত্যাদি তাঁর পুত্রেরা পুনরায় হৃতরাজ্য ফিরে পাবেন এবং তিনি স্বয়ং অদিতির গর্ভে জন্মলাভ করে বলির দ্বারা হৃত রাজ্য উদ্ধার করতে ইন্দ্রকে সাহায্য করবেন। শ্রীহরির কথা শুনে অদিতি বললেন, যদি তিনি ভগবানের বরযোগ্যা বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি যেন তাঁকে ধারণ করতে সক্ষম হন অর্থাৎ তিনি যেন অনতিকৃশ এবং অনতিস্থূল বামনমূর্তিতে তাঁর পুত্র হয়ে জন্মান।

সন্তুষ্ট শ্রীহরি ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীর দিন চন্দ্রমুহূর্তে দ্বিভুজ বটুরূপে অদিতির গর্ভ থেকে জন্মালেন। ইন্দ্রের অনুজ বলে মহর্ষি কশ্যপ বামনদেবের নামকরণ করলেন উপেন্দ্র, খর্বকায় বলে তাঁর নাম হল বামন, রক্তবর্ণ বলে তাঁর নাম হল রক্ত এবং কশ্যপ তথা অদিতি থেকে তাঁর জন্ম বলে তাঁর অন্য নাম হল কাশ্যপেয় এবং আদিতেয়।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ১৮.১৫৭-১৬০;
বৃহদ্ধর্ম পু. ২.২.২৫-২৬; ২.১৬.১-৪৪;
দেবীভাগবত পু. ৪.২.৪২-৪৩; ৯.১.১২৪;
বৃহন্নারদীয় পু. ১০.৪ ১০.৩৪-৫৪;
পদ্ম পু. (ভূমি) ৫.৫৫-৫৯; বৃহদ্ধর্ম পু. ১.১৬.৫৭;
কালিকা পু. ২৬.২৮; ৩৪.৪৪-৪৫; ৪৭.২৬;
মার্কণ্ডেয় পু. ১০১.৯-১১]

□ কশ্যপের তেজে দিতির গর্ভ-সম্ভাবনা হলে অদিতি অসূয়াবশত পুত্র ইন্দ্রকে বলেন যে, দিতির গর্ভে তাঁর পরম শত্রুর জন্ম-সম্ভাবনা হয়েছে, এ বিষয়ে ইন্দ্র যেন চিন্তা করেন। ইন্দ্র এই কথা শুনে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে যোগবলে দিতির গর্ভে প্রবেশ করেন এবং বজ্রের দ্বারা সেই গর্ভস্থ পুত্রকে সপ্তধা কর্তিত করেন। এই ঘটনার পিছনে অদিতি আছেন, এটা জানতে পেরে দিতি তাঁর ভগিনী দেবমাতা অদিতিকে অভিশাপ দিলেন যে, জন্মান্তরে অদিতির পুত্ররাও জন্ম নিয়ে ক্রমান্বয়ে মারা যাবেন এবং তিনি পুত্রশোকগ্রস্ত অবস্থায় কারাগারে বাস করবেন।

অষ্টাবিংশ মন্বন্তরে দ্বাপরযুগের অবসানে অদিতি কৃষ্ণমাতা দেবকী হয়ে জন্মান। অবশ্য একটি পুরাণ মতে এই ঘটনার পিছনে বরুণদেবেরও একটি অভিশাপ ছিল।

[দেবীভাগবত পু. ৪.২.৪২-৪৩]

দিতির ওই শাপের ফলে কৃষ্ণমাতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে কংসের হাতে পরের পর সন্তান হারান। *[দেবীভাগবত পু. ৪.৩.২১-৫৩]*

□ প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা পৃথিবীর পুত্র ভৌম নরকাসুর একসময় দেবমাতা অদিতির হার মণি এবং কুণ্ডল হরণ করেন। ইন্দ্রাদি দেবতারা

চেষ্টা করেও নরকাসুরের ভয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে এসেছেন। দেবতারা তখন বীর স্বভাব কৃষ্ণকেই দস্যু বধের জন্য অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ মেনে নিলেন দেবতাদের আর্জি। তারপর নির্মোচন নামক নগরে নরকাসুর এবং তাঁর সহায়ক মুর দৈত্যকে বধ করে কৃষ্ণ অদিতির মণি-কুণ্ডল উদ্ধার করেন এবং অদিতিকে তা ফিরিয়ে দেন—

আহৃত্য কৃষ্ণো মণিকুণ্ডলে চ/
হত্বা চ ভৌমং নরকং মুরঞ্চ।

[মহা (k) ৫.৪৮.৮০-৮৫; (হরি) ৫.৪৮.৮০-৮৫;
হরিবংশ পু. ২.৬৩ অধ্যায়;
বিষ্ণু পু. ৫.২৯-৩০ অধ্যায়;
ভাগবত পু. ১০.৫৯.১-৩৮]

☐ অদিতি তাঁর দেবতা পুত্রদের জন্য অন্ন পাক করতেন এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁর রান্না খাবার খেলে তাঁর দেবতা পুত্রেরা অসুরদের মারতে সমর্থ হবে। এই রকমই একদিন তাঁর রন্ধন শেষ হয়েছে। এমন সময় চন্দ্রপুত্র বুধ তাঁর ব্রতচর্যা শেষ করে অদিতির কাছে খাদ্য অন্ন ভিক্ষা চাইলেন। অদিতি তাঁর দেবতা পুত্রদের স্বার্থ চিন্তা করে ভাবলেন—তাঁর পক্বান্ন যদি দেবতারা আগে না খান, তাহলে বিপদ হতে পারে তাঁদের। অতএব অদিতি বুধকে ভিক্ষা দিলেন না। এতে রুষ্ট হয়ে বুধ অভিশাপ দিলেন—বিবস্বানের দ্বিতীয় জন্মে অণ্ড নামে যে পুত্র জন্মাবে, তাতে গর্ভাবস্থায় অদিতি নিদারুণ কষ্ট ভোগ করবেন। তারপর অদিতির পুত্র জন্মের সময় পেটে এত ব্যথা হল যে, অণ্ডটি মরেই গেল। মৃত অণ্ড থেকে প্রকট হলেন বিবস্বান্। তিনি শ্রাদ্ধদেব এবং মার্তণ্ড নামে খ্যাত হলেন। *[দ্র. বিবস্বান্ এবং মার্তণ্ড]*

[মহা (k) ১২.৩৪২.৫৬;
(হরি) ১২.৩২৮.১৯০-১৯৯]

☐ পুরাণে অদিতির গর্ভে মার্তণ্ডের জন্ম বিষয়ে অন্য একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা এক বিরাট তেজঃপুঞ্জ সৃষ্টি করলেন। সেই তেজোরাশি অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে বর্ধিত হতে লাগল। কিন্তু দেবমাতা অদিতিও সেই তেজঃপুঞ্জ ধারণে সমর্থ হলেন না। অদিতি যন্ত্রণায় কাতর হলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই তেজ একটি মৃত অণ্ডরূপে জন্মগ্রহণ করল। প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই অণ্ডের একাংশ ইরাবতীর গর্ভে স্থাপন করলেন। সেই তেজ থেকে ইরাবতীর গর্ভে ঐরাবত প্রভৃতি হস্তীর জন্ম হয়। প্রজাপতি কশ্যপ মৃত অণ্ড প্রসব করায় দুঃখিত অদিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—এ অণ্ডটি মরেনি। এই কথা বলে কশ্যপ সেই অণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করলেন। সেই অণ্ড থেকে বিবস্বান্ সূর্য বা মার্তণ্ড জন্মগ্রহণ করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৭৭-২৯৪]

☐ গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করার আগে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে ভূমিস্বরূপ অদিতিরও পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মৎস্য পুরাণে।

[মৎস্য পু. ২৫৩.২৭]

অদিতি$_2$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। দেবী অদিতি কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী, দেবমাতা। মহাদেব জগৎস্রষ্টা, দেবগণের ও জন্মদাতা তাই তাঁকে দেবমাতা অদিতিস্বরূপ হিসেবে কল্পনা করে অদিতি নামে সম্বোধন করা হয়।

'অদিতি' শব্দটির অন্য একটি অর্থ হতে পারে পৃথিবী। শতপথ ব্রাহ্মণের মতো সুপ্রাচীন গ্রন্থে 'অদিতি' পৃথিবীর সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—

ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতিঃ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ২.২.১.১৯]

এই পৃথিবী সমগ্র জীবকুলের জন্মদাত্রী, সমস্ত প্রাণীদের তিনি ধারণ করে আছেন। জীবজগৎকে ধারণ করেন বলে মহাদেবকে পৃথিবী বা অদিতিস্বরূপ বলে কীর্তিত করা হয়েছে, তাই অদিতি মহাদেবের অন্যতম নাম—

অদিতির্দেবমাতা 'ইয়ং বা অদিতি'রিতি শ্রুতেঃ পৃথ্বী বা (নীলকণ্ঠ টীকা)।

পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 'অদিতি' শব্দটিকে অসাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। দিতি শব্দটি সংস্কৃত 'দো' ধাতু থেকে আসছে। 'দো' ধাতুর অর্থ খণ্ডন করা বা ছেদন করা। 'দো' ধাতুর উত্তর 'ক্তি' প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় দিতি। অর্থাৎ যাকে ছেদন বা খণ্ডিত করা সম্ভব। মহাদেব নিরাকার অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁকে খণ্ডন করা যায় না, তাঁর ছেদন বা বিভাজন সম্ভব নয় বলেই তিনি অদিতি নামে খ্যাত—অদিতিঃ খণ্ডনরহিতঃ 'দো অবখণ্ডনে' ইতি দোধাতোঃ 'ক্তি' প্রত্যয়ে দিতি রূপম্ ততোনঞ্ সমাসঃ (ভারতকৌমুদী টীকা)।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯৮; (হরি) ১৩.১৬.৯৮]

অদিতি$_{৩}$ অন্ধকাসুর বধের সময় ভগবান শিব অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করা জন্য নিজের দেহ থেকে বহু সংখ্যক মাতৃকা সৃষ্টি করেন। অদিতি সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.১৫]

অদিতি$_{৪}$ বালগ্রহ অর্থাৎ ছেলেধরা। অদিতিকে বালগ্রাহিণী রেবতী গ্রহ বলা হয়। এই গ্রহরূপে অদিতি বাচ্চা ছেলেদের কষ্ট দেন।

[মহা (k) ৩.২৩০.২৯; (হরি) ৩.১৯২.২৯]

অদীক্ষিত যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য অথবা গণপতিবিষয়ক কোনো মন্ত্রগ্রহণে বিমুখ, তাঁকে অদীক্ষিত বলা হয়েছে।

[দেবীভাগবত পু. ৯.৩৪.৮৩]

অদীন$_{১}$ *[দ্র. অহীন]*

অদীন$_{২}$ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। 'দীন' শব্দটি সংস্কৃতে একাধিক অর্থ বহন করে। দুঃখ, বিষণ্ণতা, কলুষতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি। মহাদেব ব্রহ্মস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তিনি শুদ্ধতা, শুভ্রতার প্রতীক। তাই দুঃখ, বিষণ্ণতা বা কলুষতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি এইসব অবস্থার উর্ধ্বে। তাই তিনি অদীন। তিনি জগদীশ্বর, সমস্ত জগৎ তাঁরই অধীন, এ জগতে যা কিছু মূল্যবান, তিনি সেই সকল সম্পদের অধিকারী। তাই জ্ঞান থেকে শুরু করে সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বলেও তিনি অদীন। ফলে ভক্তের কোন প্রার্থনাই তিনি অপূর্ণ রাখেন না, তাঁর পরমভক্তের কাছে তাঁর অদেয় কিছুই নেই। তাঁর চরণে আত্মনিবেদনকারী ভক্ত সমস্ত কাঙ্খিত সম্পদ লাভে সমর্থ হয়—এই ভাবনা থেকে টীকাকার নীলকণ্ঠ 'অদীন' মহাদেবের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন—যাঁকে শুধুমাত্র প্রণাম করেই সুগ্রীব বা বিভীষণ রাজ্যলাভ করেছিলেন সেই জগদীশ্বরই অদীন নামে খ্যাত—

অদীনঃ মহামনাঃ সুগ্রীববিভীষণাদিভ্যঃ
প্রণতিমাত্রেণ রাজ্যপ্রদঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৯; (হরি) ১৩.১৬.৩৯]

অদৃঢ় মহাভারতের কর্ণপর্ব থেকে জানা যায় যে, ইনি জরাসন্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা সম্ভবত নিজ নিজ মত অনুযায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান। কারণ জরাসন্ধের পরবর্তী মগধরাজ সহদেব পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলেও অদৃঢ় প্রভৃতিকে কৌরব শিবিরে দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত জ্যেষ্ঠপুত্র হয়েও মগধের সিংহাসন লাভ করেননি বলেই তিনি তাই সহদেবের বিপক্ষ শিবিরে যোগ দেন।

[মহা (k) ৮.৭.১৮; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে শ্লোকটি পাওয়া যায় না]

অদৃশ্য বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৬; (হরি) ১৩.১২৭.৪৬]

অদৃশ্যন্তী মহামুনি বশিষ্ঠের পুত্রবধূ, শক্তির স্ত্রী। ঋষি বিশ্বামিত্রের চক্রান্তে শক্তির মৃত্যু হলে বশিষ্ঠ আত্মহত্যা করবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু আত্মহত্যায় অসফল হয়ে ঋষি বশিষ্ঠ একদিন যখন আশ্রমে ফিরে আসছিলেন, তখন হঠাৎই তিনি কানে বেদ-অধ্যয়নের ধ্বনি শুনতে পেলেন। আসলে তাঁর পুত্রবধূ গর্ভিনী অবস্থায় তাঁকে অনুসরণ করছিলেন এবং বশিষ্ঠ সেটা বুঝতে পারেননি। মুনি অভিভূত হয়ে শুনছিলেন—একেবারে ষড়ঙ্গ সহকারে বৈদিক মন্ত্রগান। পিছন থেকে কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে, এটা বুঝে তিনি একটু জিজ্ঞাসু হতেই মেয়েটি বলল—আমি আপনার প্রয়াত পুত্রের স্ত্রী, অদৃশ্যন্তী। আমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছি এবং আপনার পুত্রের মৃত্যুর পর থেকে নিয়ম-ব্রতে কালাতিপাত করি। বশিষ্ঠ বললেন—তোমার কথা বুঝলাম, কিন্তু ষড়ঙ্গ বেদের মন্ত্রধ্বনি কার গলা থেকে ভেসে আসছে? আগে তো এমনটা আমার ছেলে শক্তির মুখে শুনেছি। অদৃশ্যন্তী বললেন— শক্তির ঔরসে আমার গর্ভে যে পুত্রটি আছে, তার এখন বারো বছর হয়ে গেল বেদপাঠ করতে-করতে।

সব কথা শুনে বশিষ্ঠ পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীকে নিয়ে পুনরায় আশ্রমের পথ ধরলেন এবং নিজের আত্মহত্যার সংকল্পও ত্যাগ করলেন। তাঁদের যাবার পথে শাপগ্রস্ত রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষসের সত্তায় তাঁদের পথ আটকে দিলেন। অদৃশ্যন্তী পুত্রের বিপদ-কল্পনায় চীৎকার করে উঠতেই বশিষ্ঠ রাজা কল্মাষপাদকে শাপমুক্ত করলেন। শাপমুক্ত রাজার অনুরোধে বশিষ্ঠ অযোধ্যায় গেলেন, এদিকে বশিষ্ঠের আশ্রমে অদৃশ্যন্তী প্রসব করলেন স্বামী শক্তির মতোই এক তেজস্বী পুত্র। বশিষ্ঠ স্বয়ং তাঁর জাতকর্মাদি ক্রিয়া সাঙ্গ করে তাঁর নাম রাখলেন পরাশর।

পরাসু—অসু মানে প্রাণ, বশিষ্ঠ আত্মহত্যা করে 'অসু' জীবন-বৃত্তের বাইরে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আশায় বুক বাঁধতে সাহায্য করেছিলেন বলেই তিনি পরাশর। পিতা না থাকায় বশিষ্ঠ পিতামহের কাছেই পরাশর এত স্নেহ লাভ করেছিলেন যে, বশিষ্ঠকেই তিনি বাবা-বাবা বলে ডাকতেন। অদৃশ্যন্তী একদিন এই মধুর আহ্বান-ধ্বনি শুনে পুত্রকে বললেন—যাঁকে তুমি 'বাবা-বাবা' বলে ডাক, সেই বর্ষীয়ান বশিষ্ঠ মহাশয় তোমার বাবারও বাবা। তোমার বাবাকে এক রাক্ষস খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে পিতার পিতাকে পিতা বলে ডেকো না। মাতার মুখ থেকে পরাশর যখন শুনলেন যে, তাঁর পিতা রাক্ষসের হাতে নিহত হয়েছেন, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সম্পূর্ণ রাক্ষস জাতিকেই ধ্বংস করবেন বলে স্থির করেন। পরে অবশ্য পিতামহ বশিষ্ঠের উপদেশে নিবৃত্ত হন। মহাকাব্য এবং পুরাণে অদৃশ্যন্তীর জীবনকথা এখানেই শেষ। তাঁর শেষ জীবনের কোনো ঘটনার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

[মহা (k) ১.১৭৭.১০-২৪; ১.১৭৮.১-৮; (হরি) ১.১৭০.১০-২৪; ১.১৭১.১-৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২.১২; ২.৮.৯১; বায়ু পু. ২.১২; ৭০.৮৩]

অদ্বিষেণ একজন ঋষি। পুরাণে যেসব ঋষির নাম বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে, অদ্বিষেণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৫৯.৯৭]

অদ্ভুত$_{১}$ ভবিষ্যত নবম মন্বন্তরে যখন দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন। সেই সময় যিনি ইন্দ্রপদ লাভ করবেন তাঁর নাম অদ্ভুত।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.১৯-২০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৬১; বিষ্ণু পু. ৩.২.২২]

অদ্ভুত$_{২}$ সবন নামক অগ্নির পুত্র।

[বায়ু পু. ২৯.৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.৪১]

অদ্ভুত$_{৩}$ মৎস্য পুরাণে ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনাকে উৎপাত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উৎপাত শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুসারে বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, যে ঘটনাকে সাধারণ যুক্তিতর্ক বা নিয়মনীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, যা সাধারণত ঘটে না তাকেই প্রাচীন মুনি ঋষিরা উৎপাত বলে চিহ্নিত করতেন। এই একই অর্থে এই দুর্লক্ষণগুলিকে অদ্ভুতও বলা হয়েছে। *[দ্র. উৎপাত]*

[মৎস্য পু. ২২৮.২]

অদ্ভুত$_{৪}$ একপ্রকার অগ্নি। অদ্ভুত অগ্নির বিভূরসি নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

[মহা (k) ৩.২২২.২৭; (হরি) ৩.১৮৫.২৫]

অদ্ভুত$_{৫}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৮; (হরি) ১৩.১২৭.১০৮]

অদ্রি$_{১}$ পুরাণোক্ত বলাক নামক রাক্ষসের পিতা।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৬৯.৬৪]

অদ্রি$_{২}$ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বিশ্বগশ্বের পুত্র ছিলেন অদ্রি। ইনি যুবনাশ্বের পিতা।

[মহা (k) ৩.২০২.৩; (হরি) ৩.১৭২.৩]

অদ্রি$_{৩}$ অপ্সরা অদ্রিকা যখন শাপগ্রস্ত হয়ে অঞ্জন পর্বতে মার্জারী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় অদ্রিকার গর্ভে নিঋতির ঔরসে অদ্রি নামে এক পিশাচের জন্ম হয়। ইনি বানররাজ কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র এবং হনুমানের বৈমাত্রেয় ভাই।

[ব্রহ্ম পু. ৮৪ অধ্যায়]

অদ্রিকা প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত অপ্সরাদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৯.৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৭]

□ রাজা উপরিচর বসু যখন ইন্দ্রদত্ত স্বর্গীয় বিমানে অবস্থান করতেন সে সময় অপ্সরা অদ্রিকা তাঁর সঙ্গে সেই বিমানে অবস্থান করতেন বলে জানা যায়। একদিন রাজা উপরিচরবসু (পুরাণ মতে অমাবসু) যখন অদ্রিকার সঙ্গে দিব্য বিমানে অন্তরীক্ষে বিহার করছিলেন, সেই সময় আজ্যপা নামক পিতৃগণের কন্যা অচ্ছোদা সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। অচ্ছোদা পিতৃগণের মানসী কন্যা, তাঁর পিতারা নিরাকার। তাই অচ্ছোদার প্রাণ সর্বদাই পিতৃ-মাতৃস্নেহের জন্য আকুল ছিল। উপরিচরবসু এবং অদ্রিকাকে দেখে তিনি তাঁদেরই পিতা-মাতা বলে সম্বোধন করলেন। এই অপরাধে পিতৃগণ তাঁকে শাপ দিলেন—তুমি মর্ত্যলোকে উপরিচর রাজার ঔরসে অদ্রিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে।

এর কিছুকাল পরে একসময় অপ্সরা অদ্রিকা যমুনার জলে সন্ধ্যাবন্দনারত এক মুনির ধ্যানে বিঘ্ন ঘটালে মুনি অদ্রিকাকে মৎসী হয়ে জন্মানোর অভিশাপ দেন। অভিশপ্তা অদ্রিকা অনুতপ্ত হয়ে কাতর ভাবে শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে

থাকলে সেই দয়ালু ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন— মৎস্যরূপিণী অবস্থায় দুটি মনুষ্য সন্তান প্রসব করলেই অদ্রিকার শাপমুক্তি ঘটবে।

মৎস্যরূপধারী অদ্রিকা যমুনার জলে বাস করতে লাগলেন। পুরাণে অবশ্য তাঁর বাসস্থানের নাম অচ্ছোদ সরোবর বলে চিহ্নিত হয়েছে। এক সময় মৎসী অদ্রিকা যমুনার জলে বিচরণ করতে করতে একটি বটপত্র ভক্ষণ করলেন। এই বটপত্রে রাজা উপরিচরবসুর বীর্য্য রক্ষিত ছিল *[দ্র. উপরিচর বসু, সত্যবতী]* ফলে মৎসী অদ্রিকা তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হল। এই ঘটনার দশ মাস পরে মৎসী অদ্রিকা যমুনা তীরের ধীবরদের জালে আবদ্ধ হল। মাছের পেট চিরে ধীবর দেখল সেখানে এক শিশুপুত্র এবং একটি শিশুকন্যা রয়েছে। ধীবর শিশুপুত্রটিকে রাজা উপরিচর বসুর কাছে নিয়ে গেলে রাজা তাকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। কন্যাটিকে ধীবর নিজের কাছে রেখে লালন পালন করলেন। অদ্রিকা অপ্সরা শাপমুক্ত হয়ে আবার অপ্সরা রূপ লাভ করে স্বর্গে গেলেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন নাম-সাম্যে উপরিচর রাজার স্ত্রী গিরিকা এবং অদ্রিকা বোধহয় একই সত্তার দুটি রূপ।

মৎসী-অদ্রিকার গর্ভজাত পুত্র মৎস্যরাজ নামে এবং কন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতী নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৩.৪২-৭৬; (হরি) ১.৫৮.৪২-১১০;
দেবী ভাগবত পু. ২.১.৩১-৪৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৫৭, ৬৮; বায়ু পু. ৭৩.৩]

☐ এরপর আবার আমরা অদ্রিকার উল্লেখ পাই অর্জুনের জন্মোৎসবে, সেখানে অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে ইনিও নৃত্য পরিবেশন করেছেন।

[মহা (k) ১.১২২.৬১; (হরি) ১.১১৭.৬৫]

☐ ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে একবার অদ্রিকা অপ্সরা শাপগ্রস্ত হয়ে অঞ্জন পর্বতে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় তিনি মার্জারী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বানররাজ কেশরীর অন্যতমা পত্নী ছিলেন তিনি। তাঁর গর্ভে নিঋতি নামক দেবতার ঔরসে অদ্রি নামে এক পিশাচের জন্ম হয়। এরপর অদ্রিকা গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে পুনরায় নিজের রূপ লাভ করলেন এবং স্বর্গে ফিরে গেলেন। *[ব্রহ্ম পু. ৮৪ অধ্যায়]*

অদ্রিজ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং দুর্যোধনের সমর্থনে যে সমস্ত জনজাতি ভীম-অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের একতম হল এই অদ্রিজ জনজাতি। *[মহা (k) ৭.১৬১.৫; (হরি) ৭.১৪১.৫]*

যৌধেয় জনজাতির সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত। অদ্রি অর্থাৎ পর্বত। মনে হয় এঁরা পাহাড়ী জনজাতি। পণ্ডিতদের মতে আলেকজান্ডারের অভিযানের সময়ে এই অদ্রিজ (Adraistai) জনজাতির বাস ছিল রাভি (Hydraotes) নদীর পূর্ব দিকে বারি দোয়াবে এবং তারা আলেকজান্ডারের সৈন্যবাহিনীর আধিপত্য ও মেনে নিয়েছিল। এদের প্রধান ঘাঁটি ছিল পিমপ্রম অঞ্চলে।

[GD (N.N. Bhattacharyya), p. 49;
Cambridge History of India Ed. by
Rapson, Vol. I, p. 371; B.C.Law,
Indological Studies Vol. I, pp. 21-22]

অদ্রিজা ঋক্ষপর্বত অথবা বিন্ধ্যপর্বতে থেকে উদ্ভূত একটি পাপনাশিনী নদীর নাম।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.২২;
(হরি) ১৩.১৪৩.২২; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.২১]

অধঃশিরা$_১$ (অধঃশিরস্) একটি বিশিষ্ট নরক। পুরাণে বহুসংখ্যক নরকের নাম বর্ণিত হয়েছে এবং কোন কোন পাপ করলে মানুষ মৃত্যুর পর কোন বিশেষ নরকে গমন করবে তাও বিশদে বর্ণিত হয়েছে পুরাণে। অধঃশিরাও তার মধ্যে অন্যতম একটি নরক। এই নরককে কোথাও কোথাও অধোমুখ নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২.১৪৮, ১৬৩;
বায়ু পু. ১০১. ১৪৭, ১৬১; বিষ্ণু পু. ২.৬.৪, ১৯]

অধঃশিরা$_২$ কৃষ্ণ যখন যুদ্ধোদ্যোগ-পর্বে শেষ শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, তখন রাস্তায় যেসব মুনি ঋষিরা কৃষ্ণের বিদ্বৎ-প্রবচন শোনার জন্য কুরু রাজসভায় যেতে চাইলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহর্ষি হলেন অধঃশিরা। *[মহা (গীতা প্রেস) ৫.৮৩.৬৪;*
শ্লোকের পর বন্ধনীতে প্রথম শ্লোক]

অধচ্ছায় একজন ঋষি। পুরাণে মহর্ষি মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋষির বংশভুক্ত যেসব ঋষি বংশের উল্লেখ আছে, মহর্ষি অধচ্ছায়ের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। কশ্যপ-বংশীয় অন্যতম গোত্র প্রবর্তক হিসেবে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১৯৯.৪]

অধন শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। তিনি পার্থিব ধন-সম্পদ, বসন-ভূষণের ঊর্ধ্বে, তাই পুরাণে, লোককথায় শঙ্কর মহাদেব দরিদ্র-ভিখারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন বহুবার। সেই ধারণা থেকেই পার্থিব সম্পদে অনাসক্ত মহাদেব অধন নামে খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠ সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই অধন শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—

অধনঃ দিগম্বরত্বাৎ।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০২; (হরি) ১৩.১৬.১০২]

অধর্ম সত্য, শুচিতা, ঋত, ধর্ম ইত্যাদি মহান গুণের বিপ্রতীপে অধর্ম অবশ্যই এক অধম দোষ, যা পরিত্যাগ করতে হয়। ধর্মের মতো অধর্মের কোনো রূপ নেই, শুধু মানুষের মনের মধ্যে থাকা কতগুলি অসদবৃত্তি একত্র করলে অধর্মের রূপ পাওয়া যায়। ঠিক এই কারণেই অধর্মের উৎপত্তি নিয়ে একটা মনুষ্যোচিত রূপক তৈরি করা হয়েছে মহাভারতে এবং এই উৎপত্তি-কথার মধ্যে আমাদের সামাজিক বিবর্তনের একটা দিকও যেন লুকিয়ে আছে। বলা হয়েছে—মানুষের মধ্যে যখন একে অন্যের খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি আরম্ভ হল, তখনই জন্ম হল অধর্মের—

প্রজানামন্নকামানাম্ অন্যোন্যপরিভক্ষণাৎ।
অধর্মস্তত্র সঞ্জাতঃ সর্বভূত বিনাশকঃ॥

এই অধর্ম সমস্ত প্রাণীবর্গকে শেষ করে দেয়। অধর্মের স্ত্রীর নাম নির্ঋতি। তার গর্ভে অধর্মের তিনজন রাক্ষস পুত্র আছে, যারা হল—ভয়, মহাভয় এবং মৃত্যু। এই মহাভারতের মধ্যেই অন্য একটি জায়গায় আবার বলা হয়েছে— অধর্মের ঔরসে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর গর্ভে জন্ম হয় দর্পের—

দর্পো নাম শ্রিয়ঃ পুত্রো জজ্ঞে'ধর্মাদিতি শ্রুতিঃ।

এই দর্পের মোহে রাজারা যাতে অধর্মের সেবা না করেন, সেই উপদেশ দিয়েছেন মান্ধাতা এবং তা দিয়েছেন ঠিক রাজা হবার সময়, কেননা শ্রীদেবী, যিনি ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্যের প্রতীক, সেই উৎস থেকেই দর্প-অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়, আর অধর্মোদ্ভব এই দর্পেই রাজাদের সর্বনাশ হয়। বিষ্ণু পুরাণে আবার অধর্মের স্ত্রীর নাম হিংসা। তাদের দুই পুত্র-কন্যা—অনৃত (অসত্য) এবং নিকৃতি (শঠতা)। অনৃত এবং নিকৃতির স্বঘটিত যৌনাচারে তাদের দু-দুটি যমজ পুত্র-কন্যা হয়। প্রথম যমজ ভয় এবং নরক, আর যমজা কন্যা মায়া এবং বেদনা। ভয় এবং মায়ার পুত্র মৃত্যু, আর নরক এবং বেদনার পুত্র দুঃখ। মৃত্যুর পুত্রকন্যারা হল—ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা, ক্রোধ—যেগুলি থেকে দুঃখ আসে—এগুলি সবই অধর্মের রূপ—

দুঃখোত্তরাঃস্মৃতা হ্যেতে সর্বে চাধর্মলক্ষণাঃ।

ভাগবত পুরাণে কিন্তু স্বয়ং অধর্মের জন্ম হচ্ছে ভগবান ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ থেকে এবং সেই অধর্ম আসলে ভয়ঙ্কর মৃত্যুরই অপর নাম—

অধর্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ।

ভাগবত পুরাণে অধর্মের যথাযথ স্ত্রী হল মৃষা বা মিথ্যা। তাদের যমজ পুত্র-কন্যা হল দম্ভ এবং মায়া। অধর্মের অংশ বলেই দম্ভ এবং মায়ার অন্যায় সহোদর-মৈথুনের ঘটনাও ঘটল। তাদের দত্তক পুত্র-কন্যা হিসেবে গ্রহণ করল নিকৃতি। দম্ভ-মায়ার পুত্র-কন্যারা হল ক্রোধ, হিংসা, দুরুক্তি, কলহ ইত্যাদি।

[মহা (k) ১.৬৬.৫৩-৫৫; ১২.৯০.২৬-২৮;
(হরি) ১.৬১.৫৩-৫৫; ১২.৮৮.২৬-২৯;
বিষ্ণু পু. ১.৭.২৯-৩২;
ভাগবত পু. ৩.১২.২৫; ৪.৮.১-৪;
শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য;
Tom Sewin, 'Adharma' In Way of Life. Ed.
T.N. Madan. pp. 381-401]

☐ অধর্মের ধারণাটা যদি এইরকম হত যে, যা ধর্ম নয়, তাই অধর্ম তাহলে সহজেই অধর্মের সংজ্ঞা তৈরি হতে পারত। কিন্তু ধর্মেরই যেহেতু কোনো একরৈখিক সংজ্ঞা হয় না, তাই অধর্মের ধারণাও বহুলভাবে অন্য বিচিত্র অন্যায়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। বায়ু পুরাণের এক জায়গায় খুব সংস্কারমুক্ত চেতনায় বলা হয়েছে—দেবতারা, পিতৃপুরুষেরা, মুনিরা এবং সমস্ত মানুষেরা আপন আপন জ্ঞানভেদে ভিন্ন ভিন্নভাবে সব কিছু দেখেন বলেই ধর্মতত্ত্বের নিরূপণ করতে পারেন না এবং সেই কারণেই—'এটা ধর্ম অথবা এটা ধর্ম নয়'—এইভাবে কথা বলে থাকেন—

ন চ দেবা ন পিতরো মুনয়ো ন চ মানবাঃ।
অয়ং ধর্মো হ্যয়ং নেতি ব্রুবতে ভিন্নদর্শনাঃ॥

কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম—এটা নিয়ে শাস্ত্র এবং দার্শনিক আলোচনা অনেক হয়েছে। সে আলোচনা বিভিন্ন ধর্মপন্থী এবং বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে বিভিন্ন হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের তর্ক-যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত বেশ কঠিন এবং

দুরূহ হয়ে ওঠে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ধর্ম এবং অধর্মের সবচেয়ে সরল এবং সর্বাশ্রেয়ী সংজ্ঞা তৈরি করেছে বায়ু পুরাণ। এই পুরাণ বলেছে—ধর্ম এবং অধর্ম দুটিই ক্রিয়াত্মক শব্দ। অর্থাৎ ন্যায়-নীতি, শিষ্টাচার সদাচার, বিধি-নিয়ম, বৈদিক কর্ম—যা কিছুই আছে, তা ক্রিয়াত্মক বলেই ধর্মকে ক্রিয়াত্মক বলা যায়, আবার এই কর্মগুলি না করে অন্য রকম করাটাও ক্রিয়াত্মক বলেই অধর্মও ক্রিয়াত্মক শব্দ। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হল—ধর্ম-শব্দের সাধারণ সংজ্ঞা হল—কুশল বা মঙ্গলাত্মক কর্মই ধর্ম, অকুশল বা মঙ্গলহীন কর্মই অধর্ম—

ধর্মাধর্মাবিতি প্রোক্তৌ শব্দাবেতৌ ক্রিয়াত্মকৌ।
কুশলাকুশলং কর্ম ধর্মাধর্মাবিতি স্মৃতৌ॥

[বায়ু পু. ৫৯.২৭-২৮]

□ ধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার সময় মহাভারত বলেছে—ধারণার্থক 'ধৃঞ্' বা ধৃ-ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ যা সকলকে ধারণ করে, যাকে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রা চলতে থাকে, যে বস্তু সাধু উপায়ে অর্থ-কামাদি পার্থিব বস্তু লাভের সহায়তা করে, সেটাই ধর্ম—

ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ-সংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

ধর্মের এই সংজ্ঞাটা খেয়াল করেই বায়ু পুরাণ ধর্মের বিপ্রতীপে অধর্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছে—ধারণার্থক 'ধৃ'-ধাতু থেকে যেহেতু ধর্ম শব্দের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এটাই বলা যায় যে, যা কিছুই সমাজকে ধারণ করে না অথবা যা কিছুই মহান নয়, ভালো নয়, সেটাকেই অধর্ম বলে চিহ্নিত করা যায়—

ধারণা ধৃতিরিত্যর্থাদ্ ধাতোধর্মঃ প্রকীর্তিত।
অধারণে'মহত্ত্বে চ অধর্ম ইতি চোচ্যতে॥

[বায়ু পু. ৫৯.২৮ (নবভারত প্রেসের পাঠে ভুল আছে বলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত এশিয়াটিক সোসাইটির অনুমোদিত পাঠ এখানে দেওয়া হল; মহা (k) ৮.৬৯.৫৮; ১২.১০৯.১১; (হরি) ৮.৫১.৫৭; ১২.১০৬.১১]

□ মহাভারতের আর এক জায়গায় 'ধন' পূর্বক 'স্রু'-ধাতুর সঙ্গে 'মক্' প্রত্যয় যুক্ত করে ধর্ম-শব্দের নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তাতে অর্থ দাঁড়ায়—যা থেকে ধনের প্রাপ্তি ঘটে। ধন বলতে জাগতিক এবং অধ্যাত্ম-সম্পদ দুইই বুঝতে হবে—

ধনাৎ স্রবতি ধর্মো হি ধারণাদ্বেতি নিশ্চয়ঃ।

একেবারে আক্ষরিক অর্থে এই মহাভারতীয় অর্থ না গ্রহণ করলেও বায়ু পুরাণ বলেছে—যা ইষ্টপ্রাপক অর্থাৎ যা আমাদের অর্থ-কামের প্রাপ্তি ঘটায়, সেটাই ধর্ম।

তত্রেষ্টপ্রাপকো ধর্ম আচার্যৈরুপদিশ্যতে।

তাহলে একই সঙ্গে বুঝতে হবে যা আমাদের অভীষ্টপ্রাপ্তি ঘটায় না, যা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে, সেটাই অধর্ম।

[মহা (k) ১২.৯০.১৭; (হরি) ১২.৮৮.১৮; বায়ু পু. ৫৯.২৯]

□ ধর্মের এই বৃহৎ এবং উদার সংজ্ঞা থেকে অধর্মের সংজ্ঞা তৈরি হয়, নঞর্থকভাবে, উলটো প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ ধর্মের লক্ষণ যদি মহাভারতের ভাবনায় নানান রকম হয়—যেমন ক্রোধহীনতা, সত্যবচন, ক্ষমা, সকলকে ভাগ দিয়ে ভোগ করা, স্বদাররতি, অদ্রোহ, ঋজু-স্বভাব, অনৃশংসতা, অহিংসা, শ্রাদ্ধকর্ম, অতিথি-সেবা, শৌচ, অনসূয়া, তিতিক্ষা—এগুলি যদি ধর্মের লক্ষণ হয়, তাহলে ক্রোধ, মিথ্যাবচন, অক্ষমা, আত্মীয়-ভৃত্য ভরণ না করার মতো সংবিভাগশূন্যতা, পরদার-রতি, দ্রোহ, কুটিল স্বভাব, নৃশংসতা, হিংসা, শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কর্ম, অতিথির ব্যাপারে নির্দয়তা, অশুচিতা, অতিতিক্ষা এবং ধৈর্যহীনতা—এগুলি তাহলে অধর্মের লক্ষণ। সারাৎসার করলে বোঝা যায় শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত আচার-আচরণ, মহাজন-সজ্জনের আচার যেখানে নেই, সেইগুলিই খুব বিশদর্থে অধর্ম বলে কথিত হয়েছে।

অধর্মের বিশদ লক্ষণের মধ্যে কিন্তু সেই বিপর্যয়গুলিও আছে যেগুলিকে ইতিবাচকভাবে মহাভারত-পুরাণে স্বধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, দেশধর্ম বলা হয়েছে। অর্থাৎ যথানির্দিষ্টভাবে ব্রাহ্মণ যদি যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ত্যাগ-বৈরাগ্যের আচার ছেড়ে দিয়ে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবৃত্তি বা বৈশ্যের বাণিজ্যিক বৃত্তি গ্রহণ করে সেটাও অধর্ম হবে। মহাভারতে ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁকে কম কথা শুনতে হয়নি। আবার রামায়ণে শূদ্র শম্বুক তপস্যা করছিলেন বলে তাঁকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। একইভাবে কুলধর্ম-ত্যাগের মতো অধর্ম করতে না চেয়ে

মদ্ররাজ শল্য ভগিনী মাদ্রীর বিবাহের জন্য কন্যাশুল্ক চেয়েছিলেন, যদিও কন্যাশুল্ক গ্রহণ করা তখনকার কালেই নিন্দিত ছিল, কিন্তু কুলধর্ম বলে ভীষ্মও শল্যের সবিনয় আবেদনে সাড়া দিয়েছেন, অর্থাৎ অধর্ম করতে চাননি। মহাভারতের বনপর্বে ধর্মব্যাধ জাতিধর্মের বশে মাংস-বিক্রয় করেন, কিন্তু ধর্মব্যাধের ধর্মোপদেশের মধ্যে 'অহিংসা, সত্য' ইত্যাদি ধর্মের অনন্ত উপাদান রয়ে গেছে।

ঠিক এইরকম একটা জায়গা থেকে নতুন একটা বিতর্ক তৈরি হয় যে, শাস্ত্রবিধি এবং সদাচার হিসেবে আমরা যেটাকে অধর্ম বলে মেনে নিচ্ছি তা অনেক সময় অধর্ম না হয়ে ধর্মও হয়ে উঠতে পারে, উলটো দিকে ধর্মও হয়ে উঠতে পারে অধর্ম। এ-কথা মহাভারতের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। যে যুধিষ্ঠির রাজনীতির মধ্যেও ধর্ম, সত্য, সরলতা এবং অহিংসাকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছেন, সেই তিনিও একসময় জটিল-হৃদয় ধৃতরাষ্ট্রের মুখে শান্তির বার্তা, অহিংসার কপট বার্তা সহ্য করতে না পেরে সঞ্জয়কে বলেছিলেন—একথা খুব সত্যি যে, সমস্ত কর্মের মধ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এমনও হয় যে, কোথাও কোথাও অধর্ম ধর্মের রূপ ধারণ করে, আবার কোথাও কোথাও ধর্ম অধর্মের রূপ ধারণ করে, আবার কোথাও কোথাও ধর্মকে ধর্ম বলেই চেনা যায়, এইরকম তর্কযোগ্য ধর্মাধর্ম-বিচারের সময় বিদ্বান্ বুদ্ধিমান লোকেরা বুদ্ধি দিয়েই বোঝার চেষ্টা করেন—

যত্রাধর্মো ধর্মরূপাণি ধত্তে
ধর্মঃ কৃৎস্নঃ দৃশ্যতে অধর্মরূপঃ।
বিভ্রদ্‌ধর্মো ধর্মরূপং তথা চ
বিদ্বাংসস্তং সংপ্রপশ্যন্তি বুদ্ধ্যা॥

অধর্ম কীভাবে ধর্মের রূপ ধারণ করে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রাজ্ঞ টীকাকার বলেছেন—অভিচার, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, কিংবা দস্যু-চোর-হত্যা—এগুলি কিন্তু অধর্মের কাজ। কিন্তু মারণ-উচাটন ইত্যাদি আভিচারিক কর্মের পিছনে কিছু মন্ত্র-তন্ত্র, কিংবা মণি-মন্ত্র-মহৌষধির উপযোগ আছে বলে এগুলিকে ধর্ম বলে মনে হয়। আবার ধর্মও কখনো কখনো অধর্মের চেহারা নেয়—এটা বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, দত্তাত্রেয়, সৌভরি ইত্যাদি মুনি-ঋষিদের মধ্যে কিছু উন্মত্তবৎ আচরণ দেখা যায়, যেগুলিকে অধর্ম বলে মনে হয় আপাত দৃষ্টিতে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন যোগীদের এই সব আচরণ তাঁদের মানসিক বিকারের পরিচয় নয়, বরঞ্চ অন্যতর উচ্ছ্বাস। আমরা সিদ্ধ যোগীদের, সিদ্ধ মহাপুরুষদের ব্যবহারে বিচিত্র রূপ দেখতে পাই, এমনকী ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের ফলে বিভিন্ন বিকারও তৈরি হয় তাঁদের—হাসা, কাঁদা, উন্মত্তের মতো প্রলাপ উচ্চারণ করা, নেচে ওঠা, গেয়ে ওঠা কিংবা একেবারে চুপ করে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে তাঁদের—যেমনটা ভাগবত বলেছে—

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

সিদ্ধ মহাযোগীদের এই আচরণ ছাড়াও অন্য আরও বিপরীত আচরণ, বিপরীত কথা, যেগুলি দেখতে-শুনতে অধর্মের মতো লাগে— যেমনটা চৈতন্যসঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণদেব, তৈলঙ্গস্বামী, বামাখ্যাপা এবং আরও শত শত সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে দেখেছি, সেই ব্যবহার অধর্মের মতো লাগলেও বড়ো মানুষের সিদ্ধিগুণে তা ধর্ম বলেই গণ্য হবে।

[মহা (k) ৫.২৮.২; (হরি) ৫.২৮.২;
নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য; ভাগবত পু. ১১.৩.৩২]

□ ধর্ম কীভাবে অধর্মের রূপ ধারণ করে তার একটা বড়ো উদাহরণ আছে মহাভারতে এবং তথাকথিত অধর্মও কী করে ধর্ম হয়ে ওঠে তারও যুক্তি এইখানেই দেওয়া আছে। ধর্মাধর্মের বিষয়ে এই সম্পূর্ণ যুক্তিতর্কের বিষয়টা আমরা অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের ভাষায় লিখলাম—যুদ্ধের সময় অর্জুন এক সময় ক্রোধপরবশ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কারণ যুধিষ্ঠির নিজেও কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে স্থির থাকতে না পেরে পালিয়ে আসেন আর তারপর নিজের বুদ্ধিটিকে স্থির রাখতে না পেরে অর্জুন ও তাঁর দেবদত্ত গাণ্ডীবকেও গালাগালি করেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর দেবদত্ত ধনু গাণ্ডীবকে যে নিন্দা করবে তাকে তিনি হত্যা করবেন। কাজেই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির ভাষায় এখানে 'বিষমা উপন্যাসঃ'। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ধর্ম। কাজেই ধর্মের বিধানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যা বিধেয় বলে অর্জুন মনে

করেন। রামের ঋজু বুদ্ধিতেও হয়তো এ রকমই মনে হত। উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণ বর্জনের সময় তাই মনে হয়েছিল। অর্জুন এখানে যেন রামের ছায়া অনুসরণ করছেন। কিন্তু মহাভারতে কৃষ্ণ উপস্থিত আছেন। অনিবার্য্যভাবে তিনি যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের মাঝে এসে পড়েন। তিনিই ঘটনার স্রোত অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন। তিনি বোঝান সময় সময় সত্যও মিথ্যা হয়ে ওঠে।

প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
সর্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ এক্ষেত্রে পাপ নয়। বড়ো ভাইকে হত্যা করা মহাপাপ এবং একান্ত অনুচিত। হয়তো একটা শিশুও সে কথা বুঝতে পারতো। কিন্তু মহাবীর মহারথীদের মনে অনেক সময় সহজ কথাটি আসে না। তবে কৃষ্ণ তো চিরশিশু 'বালগোপাল' তাই না রক্ষে!

কৃষ্ণ দু-একটি সুন্দর কাহিনী দিয়ে বক্তব্য পরিষ্কার করলেন যাতে অর্জুনের কর্তব্যবুদ্ধিও পরিষ্কৃত হল। দ্বিতীয় কাহিনীটিই বিখ্যাত। কৌশিক নামে এক মুনি সত্য কথা বলার ব্রত নিয়েছিলেন আজীবন। বিপদ হল একদিন। দস্যুরা হত্যার মানসে কয়েকজন পলায়মান পথিকের অনুসরণ করছে। কৌশিক বসে আছেন তপোবনে। পথিকেরা বলে গেল— প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছি, দস্যুদের অন্য রাস্তা দেখিয়ে দেবেন। কৌশিক নিরুত্তর। দস্যুরা এল। সত্যবাদী কৌশিক মিথ্যা বললেন না। দস্যুরা ফলত ঠিক পথে গিয়ে পথিকদের প্রাণবধ করল। এর পরে কৃষ্ণ বললেন—কৌশিক কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে যাননি নরকেই তাঁর স্থান হয়েছিল। কারণ নিজের সত্যরক্ষা বা প্রতিজ্ঞা রক্ষার চেয়ে নিরপরাধের প্রাণরক্ষা আরও বড়ো ধর্ম। মিথ্যা তাই এখানে ধর্ম এবং মিথ্যা এভাবেই সত্য হয়ে ওঠে। ধর্ম বা নীতিধর্মের বন্ধন এখানে ছিন্ন করা যায় আরও বড়ো ধর্মের রক্ষার খাতিরে।

'প্রাণাত্যয়ে' শ্লোকটি বহুধা বিতর্কিত। এখানে বাক্যবিস্তারের প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের যে এ সম্পর্কে মতবিরোধ তা শুধু তর্কের খাতিরে বলেই ধরে নেব। কোনো সংবেদনশীল হৃদয় নিরপরাধকে শুধু প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য মৃত্যুর মুখে নৃশংসভাবে পাঠাতে পারে না। উত্তর জীবনে রবীন্দ্রনাথ 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় সাধারণ ধর্মবুদ্ধি বা কুসংস্কারের সঙ্গে বৃহত্তর ধর্মবুদ্ধির ঘাতপ্রতিঘাতকে নাটকীয় রূপ দিয়েছেন। মোক্ষদা সেখানে আকুল আর্তনাদ করেছে—

শুধু কি মুখের কথা শুনেছ দেবতা,
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা?

মৈত্র মহাশয় সেখানে 'ফিরায়ে আনিব তোরে' বলে সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। যুক্তিধর্ম থেকে নীতিধর্ম আলাদা করলে এ রকম অঘটনই ঘটে। কৃষ্ণ এখানে নীতিধর্মের প্রচলিত গণ্ডী অতিক্রম করতে বলেছেন। এই অতিক্রমণ থেকে বৃহত্তর যুক্তির ও অধিকতর কল্যাণকর নীতিধর্মের পারে উত্তরণ হয়। এই ঔদার্য্য যথেচ্ছাচারের শৃঙ্খলাহীনতা নয়। এ ধরনের অতিক্রমণে একটা যুক্তি আছে, একটা ছন্দ আছে, সে ছন্দটা বোধ হয় চিরায়ত অনুষ্টুপ নয়, উপেন্দ্রবজ্রা অথবা ইন্দ্রবজ্রা।

[মহা (k) ৮.৬৯.১-৮৮; (হরি) ৮.৫১.১-৮৬; বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, নীতি, যুক্তি ও ধর্ম, পৃ. ১৭-১৮]

অধর্ষণ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। ধর্ষণ শব্দটি 'ধৃষ্' ধাতু থেকে আসছে, 'ধৃষ্' ধাতুর অর্থ ক্রোধ করা, হিংসা করা ইত্যাদি। ঈশ্বরের 'শিব' নামের মধ্যেই তাঁর শান্ত, কল্যাণময় রূপটি চিত্রিত আছে। তিনি কল্যাণময় অহিংসার প্রতিমূর্তি রূপে কল্পিত হন, তাঁর মঙ্গলময় শান্ত রূপ হিংসা-ক্রোধ-ধর্ষণ জাতীয় শব্দের ঊর্ধ্বে বলেই তিনি অধর্ষণ নামে খ্যাত। অথবা কখনওই ক্রুদ্ধ হন না, কোনো অবস্থাই তাঁকে বিচলিত বা হিংসায় প্ররোচিত করতে পারে না বলেও শিব-মহাদেব অধর্ষণ নামে খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই অধর্ষণ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—অধর্ষণঃ অপ্রকম্প্যঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫২; (হরি) ১৩.১৬.৫২]

অধাতা বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১৫; (হরি) ১৩.১২৭.১১৫]

অধিদান্ত যদুবংশীয় হৃদিকের দশ পুত্র সন্তানের মধ্যে অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৪১]*

অধিপতি মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে দেবীর গর্ভে যে বারোজন সোমপায়ী দেবতা জন্মগ্রহণ করেন, অধিপতি সেই বারোজন ভৃগুপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ।

[বায়ু পু. ৬৪.৮৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৯০]

অধিপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনু অধিপুরুষ নামে খ্যাত। মৎস্য পুরাণে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যেহেতু মানব বংশপরম্পরা এই স্বায়ম্ভুব মনু থেকেই আরম্ভ হয় এবং তিনিই যেহেতু সেই ব্যক্তি যাঁকে রূপে গুণে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে চেনা গেল, তাই মানবজাতির আদি পিতা স্বায়ম্ভুব মনু অধিপুরুষ নামে খ্যাত—

> স্বায়ম্ভুব ইতি খ্যাতঃ স বিরাড়িতি নঃ শ্রুতম্।
> তদ্রূপগুণসামান্যাদধিপূরুষ উচ্যতে॥

[মৎস্য পু. ৩.৪৪]

অধিবঙ্গতীর্থ মহাভারতের বনপর্বে মহর্ষি পুলস্ত্যের দ্বারা বর্ণিত যেসব পবিত্র তীর্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে, অধিবঙ্গ তার মধ্যে একটি তীর্থের নাম। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে এই তীর্থস্থানটি যক্ষদের বা গুহ্যকদের বিচরণক্ষেত্র। এই তীর্থে গেলে মানুষ যক্ষদের সঙ্গে বসবাস করার বা যক্ষদের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পায়।

মহাভারতে এই তীর্থের অবস্থান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। পণ্ডিতরাও এই তীর্থের কোনো আধুনিক অবস্থান নির্ণয় করেননি। তবে এই স্থানের নামটিতে 'বঙ্গ' শব্দের উপস্থিতি থেকে মনে হয় যে এই স্থানটি হয়তো উত্তরবঙ্গে কিংবা নেপালের কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত ছিল। মহাভারতে একাধিকবার হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলকে যক্ষদের বাসভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অধিবঙ্গ তীর্থ বঙ্গদেশের নিকটবর্তী হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল হলেও হতে পারে।

[মহা (k) ৩.৮৪.১১৫; (হরি) ৩.৬৯.১১৬]

অধিবাস দেবতার মূর্তি-প্রতিষ্ঠা, সংকল্পিত পূজা এবং উৎসবের পূর্ব দিনে প্রস্তুতি-উৎসব অথবা সংকল্প গ্রহণের পরিপাটি। বর্তমান দিনে বিবাহ, উপনয়ন, ব্রত, পূজা ইত্যাদির পূর্বদিনে সংযম নিয়মের মাধ্যমে অধিবাস পালিত হয়; এমনকী অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তনের পূর্বদিন সন্ধ্যায় সংকীর্তনের অধিবাস পালিত হয়। একে অধিবাসনও বলা হয়। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার আগের দিন অধিবাস-কর্ম করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়—

> প্রতিষ্ঠা-পূর্ব-সায়াহ্নে দেবতাং যো'ধিবাসয়েৎ।
> সো'শ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ॥

অধিবাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপচারগুলির তালিকা দিয়ে মহানির্বাণতন্ত্র বলেছে—মাটি, চন্দন, ধূপাদি গন্ধদ্রব্য, শিলা (পাথর), ধান, দূর্বা, ফুল, ফল, দই, ঘি, স্বস্তিক চিহ্ন (চালের গুঁড়ো দিয়ে বানানো), সিঁদুর, শঙ্খ, কাজল, গোরোচনা, সাদা সরষে, সোনা, রূপো, তামা, দীপ এবং দর্পণ—এই বিংশতি প্রকার দ্রব্য অধিবাস-বিধিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ—

> মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্বা-পুষ্প-ফলং দধি।
> ঘৃতং স্বস্তিক-সিন্দুর-শঙ্খ-কাজ্জল-রোচনাঃ॥
> সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রংদীপশ্চ দর্পণম্।
> অধিবাসবিধৌ বিংশদ্‌দ্রব্যাণ্যেতানি যোজয়েৎ।

[মহানির্বাণ তন্ত্র ১৪.২৪-২৭]

□ অধিবাসের এই পদ্ধতি দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন বোধনের কালে পালিত হয়—অধিবাসের দ্রব্য প্রায় একই রকম।

> দুর্গে দেবি সমাতিষ্ঠ অহং ত্বাম্ অধিবাসয়ে।

[Hillary Rodrigues, Ritual Worship of the Great Goddess, pp. 124-130]

□ অধিবাস বা অধিবাসনের এই তান্ত্রিক আচারের বীজ নিহিত আছে পুরাণে। মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, মূর্তি-প্রতিষ্ঠা বা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে অধিবাসন বা অধিবাস করতে হবে এবং অধিবাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত অতিথি এবং অন্যান্যদের ভক্ষ্য-ভোজ্য দিয়ে যেতে হবে। তিন রাত্রি, পাঁচ রাত্রি, সাত রাত্রি অথবা একবার মাত্রও অধিবাস করা যায়।

[মৎস্য পু. ২৬৫.৪৯-৫২; ২৬৬.১; ২৭৪.৫৭; ২৭৫.৩; ২৮৯.১১]

অধিরথ পূর্বভারতীয় রাজা বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে মামতেয় দীর্ঘতমার ঔরসে যে কজন বালেয় ক্ষত্রিয়ের জন্ম হয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অঙ্গ—অঙ্গদেশও তাঁর নামেই চিহ্নিত। অঙ্গের পুত্র ছিলেন দধিবাহন (অনপান)। এই অঙ্গ-দধিবাহনের বংশে বিশ্বজয়ী এক রাজার নাম জনমেজয়। এই জনমেজয়ের পুত্রের নামও অঙ্গ। মৎস্য এবং বায়ু পুরাণে এই অঙ্গকে মহাভারত-বিখ্যাত কর্ণের পিতা বলা হয়েছে এবং তাতে মনে হয় এই অঙ্গেরই অন্য নাম সূত অধিরথ। পৌরাণিক জানিয়েছেন যে, প্রাচীন অঙ্গের বংশে বৃহদ্ভানু রাজার দুই পত্নী ছিলেন—যশোদেবী এবং সত্যা। সত্যা বোধহয় ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। ফলে সেখান থেকেই 'ব্রহ্মক্ষত্রান্তরজাত'

সূতবংশের সূচনা হয় ক্ষত্রিয় পুরুষ বিজয় থেকে। তাঁরই বংশে সত্যকর্মের পুত্রের নাম সূত অধিরথ।

[মৎস্য পু. ৪৮.১০২, ১০৭-১০৮;
বায়ু পু. ৯৯.১১১-১১২, ১১৪-১১৮;
ভাগবত পু. ৯.২৩.১২-১৩]

☐ মহাভারতে কর্ণের পালক পিতা। তিনি অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা-নগরীর কাছে থাকতেন। ব্রাহ্মণ-রমণী এবং ক্ষত্রিয়ের মিলনজাত সূত-জাতীয় মানুষ ছিলেন তিনি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের তিনি বন্ধু ছিলেন—

"সূতো' ধিরথ ইত্যেব ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ সখা"

সূত অধিরথের স্ত্রীর নাম রাধা।

এই দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে অধিরথ গঙ্গার জলে ভেসে আসা একটি পেটিকার মধ্যে একটি শিশুকে উদ্ধার করেন। শিশুর দেহটিতে সহজাত সোনার বর্ম এবং কুণ্ডল দেখে অধিরথ পুত্রের নাম দেন বসুষেণ (বসু-ধন, ঐশ্বর্য্য)। দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করার জন্য অধিরথ পুত্রকে হস্তিনাপুরে পাঠান। অস্ত্রপরীক্ষার সময় অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে বসুষেণ কর্ণের রাজ্য-পরম্পরা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দুর্যোধন তাঁকে অঙ্গরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করার মুহূর্তে অধিরথ পরম সারল্যে কর্ণকে খোঁজার জন্য প্রবেশ করেন যুদ্ধ পরীক্ষার রঙ্গভূমিতে। সেই সময়ে অভিষেক-আর্দ্রশিরে কর্ণ প্রণাম করেন সূত অধিরথকে—

"কর্ণো' ভিষেকার্দ্রশিরাঃ শিরসা সমবন্দত"।

এই অবস্থায় ভীম বারবার অধিরথের সূত পরিচয়ে কর্ণকে সূতপুত্র বলে অপমান করেন। সূত পিতার সম্বন্ধে কর্ণের অবশ্য যথেষ্ট গর্ববোধ ছিল—

"সূতো হি মামধিরথো দৃষ্টৈবাভ্যানয়দ্ গৃহান্।"

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কুন্তী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কর্ণের ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করে বলেছিলেন—কিছুতেই তোমার মা রাধা নন, তোমার পিতাও কোনোভাবেই অধিরথ নন, তুমি আমার ছেলে, তুমি কৌন্তেয়—

"কৌন্তেয়স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা"।

কর্ণ অবশ্য নিজেকে 'আধিরথি' কর্ণ বলতেই গর্ববোধ করেছেন—

রাধেয়ো'হমাধিরথিঃ।

তবে কর্ণকে পাবার পর অধিরথ এবং রাধার সন্তানলাভের সৌভাগ্যও হয়েছিল বলে ধারণা হয়। কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের একাধিক কনিষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ মেলে।

[মহা (k) ১.১১১.২৩-২৪; ১.১৩৭.২-৫;
৩.৩০৯.১-১৬; ৫.১৪১.৫; ৫.১৪৫.১-২;
৬.১২২.৯; (হরি) ১.১০৫.২৬-২৭;
১.১৩২.২-৫; ৩.২৬৩.১-১৬; ৫.১৩২.৫;
৫.১৩৫.৩৩-৩৪; ৬.১১৭.৯]

অধিরাজ অধিরাজ শব্দটা একটি জনসমন্বিত ভূখণ্ডের রাজা-মাত্রের সংজ্ঞা নয়। বরঞ্চ যে রাজা আরও অনেকগুলি রাজ্য জয় করে তাঁর অবিসংবাদী ক্ষমতা প্রকট করে তুলেছেন, তাঁকে অধিরাজ বলে। ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রার্থনা করা হচ্ছে—চার দিক আমার কাছে নত হোক, আমি যেন সমস্ত শত্রুদের জয় করতে পারি—

মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রঃ।

এই সূক্তের শেষের প্রার্থনা কিন্তু এই— আমি যেন সবার ওপরে থাকি, আমি যেন অধিরাজ হই—

উপরিস্পৃশম্...অধিরাজমক্রন্।

অধিরাজ-পদবীটা যে অন্য অনেক রাজাদের ওপরে কোনো মর্যাদাসম্পন্ন পদ, তা শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। সেখানে বলা হয়েছে—ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যিনি ক্ষত্রপতি, অন্য রাজাদের ওপরে যিনি রাজা—

ক্ষত্রাণাং ক্ষত্রপতিরেধীতি রাজ্ঞাম্ অধিরাজ...।

আমরা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আরো স্পষ্ট করে দেখেছি—এই পৃথিবীর প্রথম বিধিসম্মত রাজা পৃথু যখন রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হলেন, তখন থেকেই তাঁকে 'অধিরাজ' সংজ্ঞায় ভূষিত করা হচ্ছে—

রাজসূয়ে'ভিষিক্তশ্চ পৃথুরেভির্নরোত্তমঃ।
বেদদৃষ্টেন বিধিনা হ্যধি রাজঃ প্রতাপবান্॥

স্বরাট্, সম্রাট্, একরাট্ ইত্যাদির মতো অধিরাজও এক মর্যাদাসম্পন্ন রাজপদবী।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১২৮.২, ৯;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৫.৪.২.২, পৃ. ৪৬০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.২৫-২৬]

অধিরাজ্য পদ্মপুরাণোক্ত একটি জনপদ।

[পদ্ম (স্ব) ৩.৪০]

পুরাণ-কথিত করূষজনপদের সঙ্গে একাত্মক। সম্ভবত মধ্যভারতে বাঘেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত আধুনিক রেওয়া অঞ্চল। এলাহাবাদের দক্ষিণ-

পশ্চিমে একশ একত্রিশ মাইল দূরে এবং সাগর থেকে উত্তর-পূর্বে একশ বিরাশি মাইল দূরে। মহাভারতে সহদেবের দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে অধিরাজ বা অধিরাজ্য দেশের কথা এসেছে। আর একবার এসেছে সাধারণভাবে ভারতবর্ষের নদ-নদী, দেশ-নাম কীর্তন প্রসঙ্গে কিন্তু সহদেবের দিগ্‌বিজয়কালে অধি-রাজাধিপতির নাম বলা হয়েছে দন্তবক্র। দন্তবক্র চেদিরাজ শিশুপালের বড়ো ভাই এবং তিনি রাজত্ব করতেন করূষ দেশে। তাতে বোঝা যায় অধিরাজ বা অধিরাজ্য করূষ-দেশই বটে। *[মহা (k) ২.৩১.৩; ৬.৯.৪৪; (হরি) ২.৩০.৩; ৬.৯.৪৪]*

অধিরোহ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে আরোহণ এবং অধিরোহ এই শব্দদুটি একত্রে উল্লিখিত হয়েছে—

আরোহণো'ধিরোহশ্চ।

বস্তুত আরোহণ এবং অধিরোহ শব্দদুটিতে অর্থগত পার্থক্য বিশেষ নেই। নিম্নস্থান থেকে উচ্চস্থানে গমন করা—বলতে আরোহণ এবং অধিরোহণ দুইই বোঝায়। টীকাকার নীলকণ্ঠ আরোহণ এবং অধিরোহ শব্দ দুটির টীকা একত্রে রচনা করে বলেছেন—

আরোহণ পরমপদমারুরুক্ষুঃ
অধিরোহস্তদেব অধিরূঢ়ঃ।

আরুরুক্ষা শব্দের অর্থ আরোহণ করার ইচ্ছা বা প্রাপ্তির ইচ্ছা। যিনি আরোহণ করতে বা প্রাপ্ত হতে ইচ্ছুক তিনি আরুরুক্ষু। এখানে আরোহণ বা প্রাপ্তি বলতে মূলত পরমেশ্বরের পরমপদ প্রাপ্তির ভাবনার কথাই বলা হয়েছে। ভগবদ্‌গীতায় একটি শ্লোকে ঈশ্বরের পরমপদ লাভে ইচ্ছুক বা আরুরুক্ষু মুনির প্রধান কর্তব্যই হল যোগসাধনা —এমন উল্লেখ পাওয়া যায়—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।

[ভগবদ্‌গীতা ৬.৩]

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে উপনিষদে, মহাকাব্যে সর্বত্র যেখানে স্বয়ং শিবকেই পরমেশ্বর বলে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁকে পরমপদ লাভে ইচ্ছুক বা আরোহণকারী বলে ভাবনা করার প্রয়োজন কী? এর ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে, ভগবান শিব যেমন স্বয়ং পরমেশ্বর স্বরূপ তেমনই তাঁর পরমপদ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যে যোগসাধনার মার্গ অবলম্বন করেন, সেই সাধনমার্গেরও স্বরূপ। সাধকের অন্তরে ভক্তিরূপে, যোগরূপে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ করে তিনিই তাঁদের পরমেশ্বরকে লাভ করার মার্গে আরোহণ করান—এই ভাবনা থেকে তিনি নিজেই আরোহণ বা অধিরোহ নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় ভগবান শিবের যে তপস্বী, যোগীর মূর্তি—সেটিই প্রকাশ পায়। তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর, তাঁর নিজের অপ্রাপ্ত কোনো বস্তুই নেই। ভগবদ্‌গীতায় আপন পরমেশ্বর স্বরূপতা ব্যক্ত করে কৃষ্ণ বলেছেন—এই ত্রিলোকে আমার প্রাপ্তব্য কিছু নেই, আমার কোনো কর্তব্যও নেই। তবু লোকসমক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই আমি নিরন্তর কর্তব্যেরত আছি—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

[ভগবদ্‌গীতা ৩.২২]

ঠিক একইভাবে প্রয়োজন না থাকলেও ভগবান শিব শুধু সাধনমার্গ অবলম্বনকারীদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই নিরন্তর তপস্বী, যোগীরূপে অবস্থান করেন। তাঁর শান্ত তপস্বীমূর্তির কারণেই যোগীশ্বর মহাদেব আরোহণ বা অধিরোহ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১২৫; (হরি) ১৩.১৬.১২৪]

অধিষ্ঠানম্ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৮; (হরি) ১৩.১২৭.৪৮]

অধিসীমকৃষ্ণ বিভিন্ন পুরাণে রাজা অধিসীমকৃষ্ণ, অধিসামকৃষ্ণ বা অধিসোমকৃষ্ণ নামেও চিহ্নিত হয়েছেন তবে অধিসীমকৃষ্ণ নামটিই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। অভিমন্যুর পৌত্র পারীক্ষিত জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র শতানীক। মৎস্য পুরাণ মতে অধিসোমকৃষ্ণ ছিলেন এই শতানীকেরই পুত্র। তবে অন্যান্য পুরাণে দেখা যাচ্ছে শতানীকের পুত্র ছিলেন অশ্বমেধদত্ত। মহাভারতেও এই তথ্যের সমর্থন মেলে। এই অশ্বমেধদত্তের পুত্র ছিলেন অধিসীমকৃষ্ণ। ইনি ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন এবং পুষ্কর ক্ষেত্রে এবং কুরুক্ষেত্রে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তবে মৎস্য পুরাণের শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে যে, অশ্বমেধদত্ত সম্ভবত কোনো ব্যক্তি

ছিলেন না। শতানীক অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলস্বরূপ একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। অশ্বমেধের ফলে প্রাপ্ত (অশ্বমেধদত্ত) সেই পুত্রেরই নাম অধিসোমকৃষ্ণ—

অর্থাশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্য বীর্য্যবান্।
জজ্ঞেঽধিসোমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ॥

অধিসীমকৃষ্ণের পুত্রের নাম নিচক্ষু (অন্যমতে বিবিক্ষু)।

[বায়ু পু. ৯৯.২৫৮, ২৭০; মৎস্য পু. ৫০,৬৬, ৭৮; বিষ্ণু পু. ৪.২১.৩]

☐ ভাগবত পুরাণে এবং বায়ু পুরাণের সূচনায় তাঁকে অসীমকৃষ্ণ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভাগবত পুরাণ মতে ইনি ছিলেন শতানীকের পৌত্র তথা অশ্বমেধজের পুত্র। ভাগবত পুরাণ মতে অসীমকৃষ্ণের পুত্র ছিলেন নেমিচক্র। বায়ু পুরাণের সূচনায় দেখা যাচ্ছে যে, নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা যখন বায়ু পুরাণ শ্রবণ করেন সে সময় রাজা অসীমকৃষ্ণের রাজত্বকাল চলছিল।

[বায়ু পু. ১.১২; ভাগবত পু. ৯.২২.৩৯]

অধীতি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মুখ থেকে বারোজন দেবতার জন্ম হয়। এই বারোজন দেবতা 'জয়' নামক গণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই বারোজন জয় দেবতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধীতি। *[বায়ু পু. ৬৭.৬]*

অধীষ্ট সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মুখ থেকে বারোজন দেবতার জন্ম হয়। আদিতে সৃষ্ট এই বারোজন দেবতা 'জয়' নামক দেবগণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই বারোজন জয় দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন অধীষ্ট। *[বায়ু পু. ৬৭.৬]*

অধৃত ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৩; (হরি) ১৩.১২৭.১০৩]

অধৃতি স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, আভূতরয় তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধৃতি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৫]

অধৃষ্যা পদ্মপুরাণোক্ত একটি নদী।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৩.২১]

মহাভারতে সাধারণ নদ-নদী এবং দেশনাম কীর্তনের প্রসঙ্গে উল্লিখিত একটি নদীর নাম।

[মহা (k) ৬.৯.২৪; (হরি) ৬.৯.২৪]

অধোক্ষজ কৃষ্ণের সম্বন্ধে এই সম্বোধন উচ্চারিত। মহাভারত এই শব্দের অর্থ করে বলেছে—যাঁর অধোদেশ কখনো ক্ষীণ হয় না, অর্থাৎ যিনি কখনো নীচের দিকে নামেন না, তিনি অধোক্ষজ—

অধো ন ক্ষীয়তে জাতু যস্মাত্তস্মাদধোক্ষজঃ।

টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—এখানে এমনভাবেই সমাসবদ্ধ পদটিকে ভাঙা হয়েছে, যেখানে উত্তরপদের অবয়বটুকু লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দের অর্থ হওয়া উচিত—যাঁর অধোদেশ কখনো ক্ষীণ হয়না, অতএব সততই তিনি ঊর্ধ্বরূপ, সংসারধর্মের দ্বারা অস্পৃষ্ট সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী।

পুনরায় শান্তিপর্বে অন্য একটি নিরুক্তিতে বলা হয়েছে—পৃথিবী এবং আকাশ—এই দুটিই সর্বতোমুখী অর্থাৎ সব দিকেই এই দুটির দ্বার উন্মুক্ত। পৃথিবী হচ্ছে অধোরূপ আর অক্ষি—অক্ষ মানে আকাশ। এই দুটিকেই যিনি অনায়াসে ধারণ করেন, তিনি অধোক্ষজ—

পৃথিবীনভসী চোভে বিশ্রুতে বিশ্বতোমুখে।
তয়ো সন্ধারণার্থং হি মামধোক্ষজমঞ্জসা॥

নীলকণ্ঠ, আবারও নিরুক্তি দিয়ে বলেছেন—'অধোক্' শব্দের উত্তরে 'সঞ্জ্' ধাতুর সঙ্গে ক-প্রত্যয় করলে 'অনিদিতাম্' এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে সঞ্জ্ ধাতু থেকে ন-কার লোপ হয়ে যায়। তারপর 'সুষামাদিষ্বাৎ' এই সূত্র অনুসারে 'সঞ্জ্' ধাতুর অন্তর্গত 'স' কারের ষত্ব হয়। ফলে—অধোক্—সজ্-ক(অ)

অধোক্—সঞ্জ্—ক = অধোক্—সজ্ + ক(অ) = অধোক্—ষজ = অধোক্ষজ।

[মহা (k) ৫.৭০.১০; ১২.৪৭.৩৩; (হরি) ৫.৬৬.৫৬; ১২.৪৬.৩৪]

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে যেখানে ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্র বর্ণিত হয়েছে সেখানে ভগবান বিষ্ণু এবং কৃষ্ণকে অভিন্ন রূপে কল্পনা করে ভগবান বিষ্ণুকেও সম্বোধন করা হয়েছে অধোক্ষজ নামে। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫৭; (হরি) ১৩.১২৭.৫৭]*

অধ্বর অধ্বর শব্দের অর্থ যজ্ঞ। 'ধ্বর্' ধাতুর অর্থ হিংসা করা। তাতে ধ্বরণ বা ধ্বর অর্থ হয় হিংসা। যার মধ্যে হিংসা নেই, সেটাকে বলে অধ্বর—

অধ্বর ইতি যজ্ঞনাম। ধ্বরতির্হিংসাকর্মা।
তৎপ্রতিষেধঃ।

[নিরুক্ত ১.৮]

যজ্ঞে সকলের প্রতি অনুগ্রহ সূচিত হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে—যজ্ঞে পশুবধ করার মধ্যে তো হিংসা আছে, তাহলে অধ্বর কথাটির হিংসাহীন ভাব আর থাকে না। টীকাকার স্কন্দস্বামী এখানে মনুর মত উদ্ধার করে বলেছেন—ওষধি, পশু, বৃক্ষ, তির্যক্ প্রাণী অথবা পক্ষী—যজ্ঞের কারণে যদি তাদের ওপর হিংসা করা হয়, তবে তারা উন্নত লোক লাভ করে। ফলত যজ্ঞের মধ্যে হিংসার অনুৎপত্তি ঘটছে। অধ্বর মানে তাই হিংসা-রহিত যজ্ঞ-নাম। অগ্নির দ্বারা পালিত যজ্ঞকে রাক্ষসেরাও হিংসা করতে পারে না বলেও যজ্ঞের অন্য নাম অধ্বর। *[ঋগ্বেদ ১.১.৪; দ্র. স্কন্দস্বামী-কৃত টীকা; সায়নাচার্যের টীকা]*

অধ্বর শব্দটাকে হিংসারহিত যজ্ঞ হিসেবে ধরে নিয়েই মহাভারত-পুরাণ খুব সাধারণভাবে অধ্বর শব্দের ব্যবহার করেছে যজ্ঞের পর্যায়-শব্দ হিসেবে। *[মহা (k) ৭.১০.৬৬; ১৩.১৬.৪৮; (হরি) ৭.৮.৬৩; ১৩.১৫.৫৯; বায়ু পু. ২৯.৪১]*

অধ্বর্যু বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-প্রক্রিয়ার প্রথম উন্মেষকালে ঋগ্বেদের ঋত্বিকই হোতা এবং পুরোহিতের কর্ম একত্রে করতেন। *[দ্র. হোতা, ঋত্বিক]*

পরে যখন যজ্ঞক্রিয়া জটিল হয়ে উঠল, তখন চতুর্বেদের চার জন ঋত্বিক পৃথক পৃথক বৈদিক কর্মের জন্য নির্দিষ্ট হলেন। আহূত দেবতাদের উদ্দেশে সমন্ত্রক আহুতি দেবার কাজ ছিল অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের। ঋগ্বেদের মধ্যেই একই মন্ত্রে হোতা এবং অধ্বর্যুর একত্রে উল্লেখ থাকায় মনে হয়, ঋগ্বেদের কালেই যজ্ঞকর্মের প্রক্রিয়া জটিল হয়ে ওঠে এবং সেই কালেই ঋত্বিক্‌দের কর্মবিভাগ তৈরি হয়ে যায়। ঋগ্বেদের এক জায়গায় ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্ হোতা অধ্বর্যুর উদ্দেশে বলছেন—হে অধ্বর্যু! আমরা দুইজনেই স্তুতি করবো, তুমি আমাকে উত্তর দাও—

শংসাবাধ্বর্যো প্রতি মে গৃণীহীন্দ্রায় বাহঃ
কৃণবাব জুষ্টম্।
[ঋগ্বেদ, ৩.৫৩.৩]

এই মন্ত্রে বোঝা যায় যে, যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় অধ্বর্যু যে বাক্য উচ্চারণ করে হোতাকে দেবতাহ্বানের মন্ত্র উচ্চারণ করতে বলতেন এবং প্রত্যুত্তরে হোতা যে মন্ত্রপাঠের সূচনা করতেন তা ঋগ্বেদের সময়েই চালু হয়ে গেছে।

□ সাধারণত যজুর্বেদের প্রধানতম ঋত্বিককেই বলা হত অধ্বর্যু। যজুর্বেদের ক্রিয়া-কর্মে শিক্ষিত হয়েই ঋত্বিক্ অধ্বর্যু হতেন—

আধ্বর্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
[বায়ু পু. ৬০.১৮]

যজ্ঞের কর্মাঙ্গীন মুখ্য কাজগুলি করতেন অধ্বর্যু এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোনো কর্মই অনুষ্ঠিত হতে পারত না। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে অধ্বর্যু-শব্দের নিরুক্তি ব্যাখ্যা করে বলেছেন—অধ্বর বা যজ্ঞকে যিনি সবকিছুর সঙ্গে যোগ করেন—অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ থেকে শুরু করে সামগান এবং অন্যান্য ক্রিয়া-কর্মগুলিকে যিনি যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত করেন তিনি অধ্বর্যু—

অধ্বরং যুনক্তি ইতি অধ্বর্যুঃ। শতপথ ব্রাহ্মণে অধ্বর্যুকে যজ্ঞের 'পূর্বার্ধ' অর্থাৎ সর্বপ্রধান অংশ বলে সমধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অধ্বর্যু নির্দেশ দিলেই তবে ঋগ্বেদের ঋত্বিক্ আহুতি দেবার কালে অনুবাক্যা এবং যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। বিভিন্ন যাগে প্রধান আহুতির কাজ করা ছাড়াও অধ্বর্যু দর্শপূর্ণমাস-যাগে পত্নীসংযাজ এবং অন্যান্য যজুঃকর্মের অনুষ্ঠান করেন। সোমযাগে তিনি 'গ্রহ' নামের একটি পাত্রে করে সোমরস আহুতি দেন এবং রাজসূয়-যাগে রাজার অভিষেক সম্পন্ন করেন। অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানে অধ্বর্যু অন্যান্য করণীয় কার্যের সঙ্গে সামগানও করতেন বলে শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে।

[নিরুক্ত ১.৮.১; শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১.৯.২.৩; ৯.১.২.৪৩; পৃ. ৮৯, ৭১০]

□ অধ্বর্যুর এই কর্মানুষ্ঠানের নিরিখে আমরা ধরে নিতে পারি যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন। কেননা যাজ্ঞবল্ক্যই ছিলেন তাঁর রাজসূয় যজ্ঞের অধ্বর্যু। জনমেজয়ের সর্পসত্রে যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করেছিলেন অধ্বর্যু হিসেবে বৃত মহর্ষি পিঙ্গল। হরিশ্চন্দ্রের পুরুষমেধ যজ্ঞে অধ্বর্যু ছিলেন আত্মবান্ ঋষি জমদগ্নি। চন্দ্রের রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁর অভিষেক করেন ভৃগু।

[মহা (k) ২.৩৩.৩৩-৩৬; ১.৫৩.১-১০; (হরি) ২.৩২.২৬-২৯; ১.৪৮.১-১০; ভাগবত পু. ৯.৭.২২; মৎস্য পু. ২৩.২০]

□ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, অধ্বর্যুকে আপন বাহু থেকে সৃষ্টি করেছেন পরম পুরুষ।
[মৎস্য পু. ১৬৭.৭]

□ যজুর্বেদ নাকি একটাই ছিল, সেখান থেকে অধ্বর্যুর জন্য আধ্বর্যব মন্ত্রপাঠ তৈরি হয়েছে। বায়ু পুরাণ বলেছে—বেদবিভাগকর্তা ভগবান ব্যাস অধ্বর্যুদের জ্ঞাতব্য পাঠ্য হিসেবে যজুর্বেদের ১২০০০ ছন্দ আধ্বর্যব মন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। *[দ্র. ঋত্বিক্]*

[বায়ু পু. ৬০.১৪-১৮; ৬১.৬৪; বিষ্ণু পু. ৩.৪.১২]

□ যজ্ঞবরাহের সামনে, পিছনে, দক্ষিণ এবং বামপদ থেকে অধ্বর্যু, হোতা এবং যজ্ঞকাষ্ঠের উৎপত্তি হয়েছে। *[কালিকা পু. ৩১.৩০-৩১]*

অধ্যয়ন দশ প্রকার ব্যক্তি অধ্যয়নের উপযুক্ত। আচার্যের পুত্র, সেবা-শুশ্রূষাদি পরিচর্যাকারক ব্যক্তি, জ্ঞানান্তরদাতা, ধার্মিক, পবিত্র, অধ্যয়নের গ্রহণে এবং ধারণে সমর্থ, ধনদাতা, পুত্রাদি, সাধু- এবং আত্মীয়। আর অধ্যাপনার যোগ্য পাত্রের গুণ হল—কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী, বিশ্বস্ত এবং প্রিয় ব্যক্তি.। *[কূর্ম পু. ২.১৪.৩৮-৪১]*

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা এই দুটি ব্রাহ্মণের জাতিগত কর্মের মধ্যে গণ্য ছিল, যদিও অধ্যয়ন বা পড়াশুনো ব্যাপারটা যে কোনো ভদ্র-সজ্জনের সম্বন্ধেই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হত—

যজ্ঞো দানম্ অধ্যয়নং তপশ্চ/
চত্বার্যেতানি অন্ববেতানি সদ্ভিঃ।

যজ্ঞ, দান এবং অধ্যয়নের মধ্যে অবশ্য পুণ্যসঞ্চয়ের লোভ, যশ-প্রতিষ্ঠার লোভ এবং অর্থলাভের ইচ্ছেটাও যথেষ্ট থাকে বলে মহাভারতে একত্র বলা হয়েছে—

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো লোভাদেতৎ প্রবর্ততে।

[মহা (k) ৫.৩৫.৫৫; ৫.৪৩.৪৪; ৭.১৯৭.২৪-২৫; ৮.৫৫.৩৩; ১২.১৪.১৫; ১২.৩৬.১০]

অধ্যাত্মানুগত শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অধ্যাত্মানুগতঃ আত্মানমধিকৃত্য
প্রবৃত্তং শাস্ত্রমনুসরন্ সাধক ইত্যর্থঃ।

অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ আত্মাকে অধিকার করা। সহজ কথায় ইন্দ্রিয়গুলিকে বা জাগতিক প্রবৃত্তিসমূহকে আপন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হওয়া। ভগবান শিব উপনিষদের ভাবনায় পরমাত্মার স্বরূপ তাঁর ইন্দ্রিয় সর্বদাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, জাগতিক কামনা-বাসনার তিনি উর্ধ্বে। তবু তাঁকে অধ্যাত্মানুগত নামে সম্বোধন করায় ভগবান শিবের সংযতেন্দ্রিয় যোগী-তপস্বীর মূর্তিটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি যোগীশ্বর, তপস্বীশ্রেষ্ঠ বলেই তাঁর এই নাম।

[মহা (k) ১৩.১৭.৭৮; (হরি) ১৩.১৬.৭৮]

অধ্রারক ভারতের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি জনপদ।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৪২]

অনঘ$_১$ পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেবার সময় কত বড়ো বড়ো রাজাদেরও সমৃদ্ধ রাজ্য সুখ ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, তার তালিকা দিয়েছেন সঞ্জয়। সেই তালিকা দেবার সময় এই প্রাচীন রাজা অনঘ-এর নাম করেন।

[মহা (k) ১.১.২৩৪; (হরি) ১.১.১৯৫]

অনঘ$_২$ অঘ (পাপ)। পাপ নেই যাঁর, কিংবা পাপ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না—এই অর্থে এটি বিষ্ণুর নাম, শিবের নাম, স্কন্দ কার্তিকেয়রও নাম।

[দ্র. শিব সহস্র নাম এবং বিষ্ণু সহস্র নাম]

[মহা (k) ৩.২৩২.৫; (হরি) ৩.১৯৫.৫]

অনঘ$_৩$ সংক্ষিপ্তভাবে 'গরুড়াত্মজ' বা গরুড়ের ছেলে বলে যাদের নাম করা হয়েছে—

এতে প্রদেশমাত্রেণ ময়োক্তা গরুড়াত্মজাঃ।

—তাঁদের মধ্যে অনঘ একজন।

[মহা (k) ৫.১০১.১২, ১৫; (হরি) ৫.৯৪.১২, ১৫]

অনঘ$_৪$ নারদ যুধিষ্ঠিরকে যমসভা বর্ণনা করার সময় যেসব বড়ো বড়ো রাজাদের, বৈবস্বত যমকে সেবা করতে দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে 'অনয়' কিংবা 'নয়' এই নাম পাওয়া যায়।

[মহা (k) ২.৮.২১; (হরি) ২.৮.২১]

অনঘ$_৫$ অর্জুনের জন্মকালে অতিলৌকিক যে সমস্ত দেবতা-গন্ধর্বরা একত্র হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দেবগন্ধর্ব হিসেবে অনঘের নাম পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১.১২৩.৫৫; (হরি) ১.১১৭.৫৯]

□ বায়ু পুরাণেও আমরা গন্ধর্ব অনঘের নামোল্লেখ পাই। এই পুরাণ মতে অপ্সরা এবং গন্ধর্বরা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত সন্তান, অর্থাৎ মৌনেয়। এই মৌনেয় গন্ধর্বদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনঘ।

[বায়ু পু. ৬৯.১]

অনঘ$_{৬}$ মহাভারতের একটি পাঠে এই নামে একটি জনপদের উল্লেখ আছে। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে দিগ্বিজয়ের সময় ভীমসেন পূর্বদিক জয় করতে গিয়ে মৎস্য দেশ থেকে এইস্থানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং জয় করেন। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে অবশ্য অনঘ শব্দের উল্লেখ নেই। 'অনঘানভয়াংশ্চৈব পশুভূমিঞ্চ সর্বশঃ'—পংক্তিটি পঠিত হয়েছে 'অনবদ্যান্ হয়াংশ্চৈব...' রূপে। ফলে অর্থ করলে দাঁড়ায় এই যে, ভীমসেন মৎস্যদেশে গিয়ে সেখানকার উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং পশুচারণ ভূমি অধিকার করেছিলেন। পাঠ দুটি নিয়ে বিশেষ বিবেচনা করার অবকাশ আছে বলে মনে হয়।

[মহা (k) ২.৩০.৯; (হরি) ২.২৯.৮]

অনঘ$_{৭}$ বশিষ্ঠের ঔরসে ঊর্জার গর্ভে সাতটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অনঘ এই সাতপুত্রের মধ্যে পঞ্চম। বশিষ্ঠের এই সাতপুত্র তৃতীয় মন্বন্তরের সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। *[বিষ্ণু পু. ১.১০.১৩; ৩.১.১৫; মার্কণ্ডেয় পু. ৫২.২৫; ৯৪.২০; কূর্ম পু. ১.১৩.১৩]*

অনঘ$_{৮}$ ভবিষ্যৎ-মন্বন্তর বর্ণনা করতে গিয়ে বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে যে, একাদশ মন্বন্তরে যখন ধর্মসাবর্ণি মনু হবেন, সেই সময় যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, অনঘ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[বিষ্ণু পু. ৩.২.৩১; মার্কণ্ডেয় পু. ৯৪.২০]

অনঘ$_{৯}$ চন্দ্রবংশীয় রাজা ইলিনের ঔরসে উপদানবীর গর্ভে দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। অনঘ এই চার পুত্রসন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ। *[বায়ু পু. ৯৯.১৩৩]*

অনঘ$_{১০}$ পাঞ্চাল রাজ বিভ্রাজের পুত্র অনঘ। ব্রহ্মদত্ত নামে অনঘ একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন।

[মৎস্য পু. ২১.১১]

অনঘ$_{১১}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। অঘ শব্দের আভিধানিক অর্থ দোষ বা পাপ। মহাদেব, দোষ-পাপ প্রভৃতি দোষবোধক শব্দের ঊর্ধ্বে কোন পাপই কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয় না বলেই তিনি অনঘ নামে খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের 'অনঘ' নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন যে, শিব রুদ্ররূপ ধারণ করে যজ্ঞ ধ্বংস করলেও তা তাঁর স্বতন্ত্র শুদ্ধ তেজোময় মূর্তিকে পাপের কালিমা লিপ্ত করতে পারে না। যজ্ঞ ধ্বংসকারী বলে খ্যাত হলেও তিনি নিষ্পাপ, তাই তিনি অনঘ—

অনঘঃ যজ্ঞঘ্নো'পি নিষ্পাপঃ। (নীলকণ্ঠ)

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৮; (হরি) ১৩.১৬.৩৮]

অনঘ$_{১২}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রে দুবার 'অনঘ' শব্দটি ভগবান বিষ্ণুর নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। অঘ শব্দের অর্থ দোষ, দুঃখ অথবা পাপ। ঔপনিষদিক ভাবনায় পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে জাগতিক গুণ বা দোষ-এর ঊর্ধ্বে নিরাকার রূপে কল্পনা করা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে। *[ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮.৭.১]*

এই অর্থেই তাঁকে 'অপহতপাপ্মা' অর্থাৎ পাপহীন বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভগবান বিষ্ণু সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ বলেই তিনিও দোষ-পাপ প্রভৃতি ইহলৌকিক অথবা মানবিক অবগুণের ঊর্ধ্বে-তাই তাঁকে অনঘ বলা হয়—

অঘং ন বিদ্যতে'স্যেতি অনঘঃ।

অথবা অঘং দুঃখং পাপং চাস্য ন বিদ্যত ইতি অনঘঃ (শাঙ্করভাষ্য)।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২৯, ১০২; (হরি) ১৩.১২৭.২৯.১০২]

অনঘা শাকদ্বীপে প্রবাহিতা সাতটি প্রধান নদীর মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.২০.২৬; দেবী ভাগবত পু. ৮.১৩.২২-২৩]*

অনঙ্গ$_{১}$ কাম-প্রণয় বা অনুরাগের অধিষ্ঠাতা দেবতা মদনের অপর নাম। একসময় শিব-মহাদেবের ললাটস্থ নেত্রবহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হন। অঙ্গ অর্থাৎ দেহ। শিবের ক্রোধবহ্নিতে ভস্মীভূত হবার ফলে মদন দেহহীন বা অশরীরী হয়ে গেলেন বলেই তাঁর নাম হল অনঙ্গ।

মহাকবি কালিদাস রচিত কুমারসম্ভব কাব্যগ্রন্থে এই মদনভস্মের ঘটনার দীর্ঘ এবং অসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে—তারকাসুর তখন দেবতাদের পরাস্ত করে ত্রিলোকে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। ব্রহ্মার বরে একমাত্র মহাদেবের পুত্রের হাতেই তারকাসুরকে বধ করা সম্ভব। ফলে যতদিন পর্যন্ত না মহাদেব কোনো পুত্রসন্তানের জন্মদান করেন—ততদিন পর্যন্ত তারকাসুর অজেয় অমর। এদিকে দেবী শক্তি তখন হিমালয়ের কন্যা পার্বতী রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হলে তবেই ভগবান শিব পুত্রলাভ করবেন। শিব তখন ধ্যানমগ্ন, তাই দেবরাজ ইন্দ্র মহাদেবের হৃদয়ে কামনার উদ্রেক ঘটিয়ে তাঁর ধ্যানভঙ্গ করার জন্য নিযুক্ত করলেন মদনকে। মদন কৈলাসপর্বতে উপস্থিত হয়ে নানাভাবে

মহাদেবের তপোভঙ্গ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মদনের পুষ্পধনু থেকে নির্গত মোহনবাণে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ হল। মহাদেব অসম্ভব ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর ললাটের তৃতীয় নেত্র উন্মিলীত হল। সেই নেত্র থেকে নির্গত ক্রোধবহ্নিতে ভস্মীভূত হলেন মদন। এই ঘটনার পর থেকেই দেহহীন মদন দেবতা অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হন।

রামায়ণে শিবের দ্বারা মদন ভস্মের ঘটনাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলা হয়েছে— মহাদেবের নেত্রবহ্নিতে দগ্ধ মদন দেবতা যে স্থানে এসে আপন দগ্ধ শরীর ত্যাগ করেন— সেই স্থানটিই পরবর্তী সময়ে অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হয়—

> অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণ হ॥
> অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদা প্রভৃতি রাঘব।
> স চাঙ্গ বিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ॥

[দ্র. মদন]

[রামায়ণ ১.২৩.১০-১৪; মৎস্য পু. ১৫৪.১০৬-২৭২]

অনঙ্গ$_{২}$ রামায়ণে উল্লিখিত জনৈক বানরবীর। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে যে অনঙ্গ এবং উল্কামুখ হুতাশন নামক বানরবীরের পুত্র। *[রামায়ণ ৪.৪১.৪]*

অনঙ্গ$_{৩}$ কদর্ম প্রজাপতির পুত্র ছিলেন অনঙ্গ। মহাভারতের শান্তিপর্বে অনঙ্গকে ন্যায়পরায়ণ এবং দণ্ডনীতি বিশারদ রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেখানে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা অনঙ্গ প্রথম জীবনে ন্যায় পরায়ণ রাজা হলেও পরবর্তী সময়ে ইন্দ্রিয় পরায়ণ দুরাচার হয়ে উঠেছিলেন।

[মহা (k) ১৩.৫৯.৯১-৯২; (হরি) ১৩.৫৮.৯১-৯২]

অনঙ্গ$_{৪}$ শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত মাধ্যন্দিন শাখার অন্যতম ঋষি ছিলেন অনঙ্গ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১৭]

অনঙ্গ$_{৫}$ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে রাজর্ষি মরুত্তের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। মরুত্ত মুঞ্জবান্ পর্বতে বসে তাঁর পুরোহিত মহর্ষি সংবর্তের উপদেশে ভগবান শিবের স্তব করেছিলেন। এই সময় মরুত্ত রাজা ভগবান শিবকে যে-সব নামে সম্বোধন করেছিলেন, অনঙ্গ তার মধ্যে একটি নাম। *[মহা (k) ১৪.৮.৩৩; (হরি) ১৪.৮.৩৩]*

অনঙ্গবতী জনৈকা বারাঙ্গনা। মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ভক্তিভরে বিভূতি দ্বাদশী ব্রত পালন করার ফলে স্বর্গে গিয়ে কামদেবের দ্বিতীয় পত্নী হয়েছিলেন। *[মৎস্য পু. ১০০ অধ্যায়]*

অনঙ্গা$_{১}$ মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে উল্লিখিত একটি নদীর নাম। সম্ভবত এটি দক্ষিণ ভারতে প্রবাহিনী। পদ্ম পুরাণেও এই নদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে শুক্তিমতী নদীর পরেই এবং মহাভারতের মূল শ্লোকটি এখানে প্রায় অবিকৃত। শুধু শুক্তিমতীর জায়গায় 'মুক্তিমতী' পাঠ ধরা হয়েছে পদ্ম পুরাণে।

[মহা (k) ৬.৯.৩৫; (হরি) ৬.৯.৩৫;
পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৩.৩১]

অনঙ্গা$_{২}$ লাকুল নামক পবিত্র স্থানে হরপ্রিয়া পার্বতীর নাম সর্বমঙ্গলা অনঙ্গা।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল/উত্তরার্ধ) ২.৩০]

অন্যমতে ভরতাশ্রমে দেবী ভগবতী এই নামে প্রসিদ্ধ। *[দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৭৬]*

অনঙ্গাশ্রম রামায়ণে উল্লিখিত একটি তীর্থ। ঋষি বিশ্বামিত্র, তাড়কাবধের উদ্দেশে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা সরযূ নদী পার হয়ে অন্য পারে পৌঁছে সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে একটি আশ্রম দেখতে পান। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আশ্রমটি কার, এই প্রশ্নটি করায় বিশ্বামিত্র তাঁদের জানান যে, কোনো এককালে মূর্তিমান মদনদেব এখানে অবস্থান করতেন। তখন রুদ্রদেব স্বয়ং ওই জায়গায় তপস্যারত ছিলেন। কৌতুকবশত কামদেব তপস্যা শেষ করে ভ্রমণরত রুদ্রকে প্রভাবিত এবং মোহিত করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রদেব তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্রই কামদেবের দেহ দগ্ধ হয়। এইস্থানে রুদ্রের দৃষ্টিতে দগ্ধ হয়ে কামদেবের অঙ্গ ধ্বংস হয় বলেই, এই স্থানটির নাম অনঙ্গ তীর্থ।

[রামায়ণ ১.২৩.১-১৪]

অবশ্য এই কাহিনীটির বিবরণ অন্যত্র পৃথক পাওয়া যায়।

অনধ্যায় অনধ্যায় নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত আছে। বর্ষাকালে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করার সময়ে ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎ ইত্যাদি একসঙ্গে উপস্থিত হলে অনধ্যায়। গ্রামের মধ্যে শব থাকলে, অধার্মিকের সন্নিধানে, রোদন-ধ্বনি কানে আসলে, অনেক লোকের সমাগম হলে সেখানে অনধ্যায় হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যার সময়, অমাবস্যা, চতুর্দশী, পৌর্ণমাসী এবং অষ্টমী তিথিতে অনধ্যায়। উপাকর্ম এবং উৎসর্গ নামক বৈদিক

কর্মের পর তিন রাত্রি অনধ্যায়। অষ্টকাতে এবং ঋতুর অবসান দিনে অহোরাত্র অনধ্যায়। শ্লেষ্মাতক (চালতে) বৃক্ষ, শিমুল, মধুক (মউল), কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), কপিত্থ (কৎবেল) বৃক্ষের ছায়ায় অধ্যয়ন বিধেয় নয়। সমানবিদ্য ব্যক্তির মৃত্যু হলে, সতীর্থ অথবা আচার্যের মৃত্যু হলে তিন রাত্রি অনধ্যায়। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হলে, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ-কালে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের দিনে অনধ্যায়। শবানুগমন, জননাশৌচ, মরণাশৌচ এবং ভূমিকম্প হলে অনধ্যায়। আরণ্যক নামক বেদাঙ্গ পাঠের পর অন্য শাস্ত্রের অনধ্যায় বিহিত। বেদাঙ্গ, মহাভারতাদি ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রপাঠে অনধ্যায়ের দোষ হয় না।

[কূর্ম পু. ২.১৪.৬৬,৭১,৭৬-৭৮, ৮২-৮৩;
বৃহন্নারদীয় পু.২৩.৫৯-৬৪]

রাতে যদি প্রবল বাতাস বয়, দিনে যদি ধূলি প্রবাহ হয়, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন, বৃষ্টি এবং ভীষণ উল্কাপাত ঘটে, তবে সেইসব দিন 'আকালিক অনধ্যায়'। *[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ২৬.১১২-১১৩;*
কূর্ম পু. ২.১৪.৬৬-৬৭]

প্রধানত বেদাধ্যয়নকে কেন্দ্র করে অনধ্যায় স্থির হলেও লৌকিক প্রয়োজনে আরও কিছু অনধ্যায়ের দিন-ক্ষণ তৈরি হয়েছিল। প্রতিপদ, অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় অধ্যয়ন বিরতি ছিল আজ থেকে পঞ্চাশ/ষাট বছর আগের টোলগুলিতে। ত্রয়োদশীর রাত্রে ব্যাকরণ পড়া নিষিদ্ধ ছিল। ঝড়বৃষ্টি, মেঘের ডাক, বজ্রপাত, উল্কা চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ধূলিঝড়, অগ্নিকাণ্ড, যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ, কান্নার শব্দ গানবাজনার শব্দ, পশুদের বিকট ডাক—এসব কানে এলেও অনধ্যায় ছিল। পড়ার সময় গুরু-শিষ্যের মাঝখান দিয়ে কোনো জন্তু গেলেও অনধ্যায় হত। এছাড়াও ঘরে অনেক লোকের সমাগম, উৎসব, অতিথি-সমাগম হলেও অনধ্যায়। গুরুগৃহে বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনে বিশিষ্টানধ্যায়—অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মানে অনধ্যায়। গ্রামের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে মৃতের সৎকার না হওয়া পর্যন্ত অনধ্যায় পালিত হত। অপবিত্র অবস্থায়, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে অথবা শ্মশান ইত্যাদির কাজে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল।

[দ্র. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী,
হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান পৃ. ১২৪]

অনন্ত$_{১}$ পিতা কশ্যপ এবং মাতা প্রজাপতি দক্ষের নবম কন্যা কদ্রুর গর্ভজাত বিখ্যাত পুত্র হলেন অনন্ত। *[কালিকা পু.৩৫.৭৪]*

তুষ্টি অনন্তদেবের পত্নী।

[দেবীভাগবত পু. ৯.১.১০২]

নরকসমূহের অধোভাগে কালাগ্নির অবস্থান, তার নীচে হট্টক, তারও নীচে অনন্তদেব বিরাজমান। তাঁর মস্তকে সমগ্র বিশ্ব সর্ষপবৎ বর্তমান। এই অসাধারণ সামর্থ্যের জন্যই তাঁকে অনন্ত বলা হয়।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৯.২৬-২৭;
দেবীভাগবত পু. ৮.২০.২০-২১; ৮.২১.১-৬]

মহাপ্রলয়ের সময় কালানলে সমস্ত ভুবন দগ্ধ হয় এবং ত্রৈলোক্যগ্রাসে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর যোগনিদ্রার বশবর্তী হন। এই সময় অনন্ত পৃথিবী ছেড়ে তাঁর কাছে যান এবং ত্রৈলোক্য গ্রাসতৃপ্ত পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণা দ্বারা ধারণ করেন। পূর্ব ফণা পদ্মাকারে ঊর্ধ্বে বিস্তৃত করে অনন্তদেব তাঁকে আচ্ছাদন দেন। দক্ষিণ ফণা দিয়ে তিনি পরমেশ্বরের উপাধান রচনা করেন। উত্তর ফণায় বিষ্ণু-নারায়ণের পাদোপধান রচিত হয়। পশ্চিম ফণাকে তালবৃন্তের মতো ধারণ করে অনন্ত দেবদেব বিষ্ণুকে স্বয়ং ব্যজন করেন। ঈশান অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ফণার সাহায্যে তিনি নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, নন্দক, খড়্গ, তূণীরদ্বয় এবং গরুড়কেও ধারণ করেন। আর আগ্নেয় অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ফণার সাহায্যে তিনি নারায়ণের গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেন। ভগবান অনন্ত এইভাবে নিজের দেহকে সম্পূর্ণভাবে নারায়ণের শয্যা করে তোলেন। এবং হয়তো অনন্ত-শয্যা বলতে এতটাই বোঝায়।

[কালিকা পু. ২৭.১২-২৭]

কথিত আছে বসুন্ধরা পৃথিবী কোনো এক সময় অনন্তদেবকে জ্ঞানের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে অনন্ত বাক্‌শক্তিহীন ব্যক্তির মতো নিশ্চুপ হয়ে থাকেন। ভীত অসহায় অনন্তদেব তখন পিতা কশ্যপকে তাঁর সমস্যা জানান। কাশ্যপ অনন্তকে বাক্‌দেবী সরস্বতীর স্তব করতে বলেন। তাঁর অনুগ্রহে অনন্ত বসুন্ধরার সমস্ত ভ্রম নিরসন করে জ্ঞান-বিষয়ে নির্মল সিদ্ধান্ত দেন।

[দেবীভাগবত পু. ৯.৫.১৭-১৮, ৫৭]

ইনি নাগেশ্বর। মনসার ভ্রাতা। তিনি শত মন্বন্তর মূলপ্রকৃতি শক্তির তপস্যা করেছিলেন।

[দেবীভাগবত পু. ৯.১.৭২; ৯.৮]

এই ধরণী বা পৃথিবীকে ধারণ করে আছে সাত-সাতটি শক্তি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম শক্তি হলেন অনন্ত—

ধর্মঃ কামশ্চ কলিশ্চ বসুর্বাসুকিরেবচ।
অনন্তঃ কপিলশ্চৈব সপ্তৈতে ধরণীধরাঃ॥

[মহা (k) ১৩.১৫০.৬১; (হরি) ১৩.১২৮.৪০]

☐ শেষ নাগের অন্য নাম। শেষ নাগের প্রসঙ্গে পর্যায় শব্দ হিসেবে অনন্তের কথা এসেছে। ভূমির অধোদেশে পাতালে তাঁর বাস, তিনি এই ধরণী ধারণ করে আছেন—

শেষো'সি নাগোত্তম ধর্মদেবো
মহীমিমাং ধারয়সে যদেকঃ।

ঠিক এই শ্লোকের পরেই—

অধোভূমৌ বসত্যেবং নাগো'নন্তঃ প্রতাপবান্।

অতএব শেষ এবং অনন্ত একই তত্ত্ব। পুনশ্চ একই শ্লোকের মধ্যে পর্যায়বাচক শব্দ হিসেবে বিশেষ্য-বিশেষণের মতো করে অনন্ত এবং শেষকে একত্রে বলা হচ্ছে। শেষ এবং অনন্ত একত্রে উল্লিখিত হওয়ায় আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, শেষ এবং অনন্ত একই দৈবশক্তি—

শেষং চাকল্পয়দ্ দেবম্ অনন্তং বিশ্বরূপিণম্।

[মহা (k) ১.৩৬.২৩; ৬.৬৭.১৩;
(হরি) ১.৩১.২৪; ৬.৬৬.১১]

☐ ভগবান বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর অবতার হিসেবে কৃষ্ণ অনন্তকে আপন ভগবদ্-বিভূতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—

'অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্ অনন্তো ভুজগেষু চ।

[মহা (k) ৬.৩৪.২৯; ১৩.১৪.৩২২;
(হরি) ৬.৩৪.২৯; ১৩.১৩.৩২০;
ভাগবত পু. ১১.১৬.১৯]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সর্পসুন্দরী উলূপীর গর্ভজাত অর্জুনের পুত্র ইরাবান যখন তাঁর মাতৃবংশের সর্পসৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন, তখন তাঁর বিশাল চেহারাটা বহুসর্পপরিবৃত অনন্তদেবের মতো লাগছিল—

দধার সুমহদ্‌রূপম্ অনন্ত ইব ভোগবান্।

[মহা (k) ৬.৯১.৭৪; (হরি) ৬.৮৭.৭২]

☐ কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামকে ভগবান অনন্তের অবতার বলা হয়। অবতার-সংবরণের কালে অর্থাৎ অবতারেরা যখন পৃথিবী থেকে ফিরে গেলেন তখন অনন্ত বলরামের মুখ থেকে বেরিয়ে রসাতলে প্রবেশ করেন।

[মহা (k) ১৮.৫.২৩; (হরি) ১৮.৫.২২;
ভাগবত পু. ১০.৬৮.৪৬]

☐ বিষ্ণুপুরাণ জানিয়েছে—ঐশ্বরিক গুণের কোনো অন্ত পাওয়া যায় না বলেই ঈশ্বরের নাম অনন্ত—

নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তো'য়মব্যয়ঃ।।

আর মৎস্য পুরাণ বলেছে—আদিদেব ব্রহ্মা এবং ধ্যানী যোগী ঋষিরা ঈশ্বরের অপার মহিমার অন্ত পান না বলে, তিনি অনন্ত।

[বিষ্ণু পু. ২.৫.১২-১৩; মৎস্য পু. ২৪৮.৩৮]

☐ সপ্ত পাতালের বিবরণ দিতে গিয়ে বিষ্ণু পুরাণ অনন্তের মহিমা বর্ণনা করেছে শেষনাগ ও বলরামের একাত্মতায়। বলা হয়েছে পাতালে সকলের অধোভাগে ভগবান বিষ্ণুর যে তামসী তনু শেষ নামে আখ্যাত, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সিদ্ধচারণ যাঁর গুণ বর্ণনা করতে পারেন না, সেই দেবর্ষি-পূজিত দেবতাকেই সিদ্ধ মহাপুরুষেরা অনন্ত বলে থাকেন—

সো'নন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবো দেবর্ষিপূজিতঃ।

অনন্তের সহস্রমস্তক, সহস্রফণা, তাঁর মাথায় স্বস্তিক চিহ্নের ভূষণ। সহস্র ফণার দ্বারা তিনি অসুরদের নিঃশক্তিক করে রেখেছেন।

[বিষ্ণু পু. ২.৫.১২-১৫; ভাগবত পু. ৩.২৬.২৫]

☐ অনন্তের বর্ণনায় এই পুরাণ কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামের রূপ আরোপিত করে লিখেছে—তিনি মদঘূর্ণিত নেত্র, তাঁর কর্ণে কুণ্ডল, কিরীট এবং মালার শোভা তাঁর গলায়। অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্বতের মতো তাঁর শরীর। নীল বসন এবং শ্বেতহারে সজ্জিত। তাঁর এক হাতে লাঙ্গল অন্য হাতে মুষল। স্বয়ং লক্ষ্মী এবং বারুণী দেবী মূর্তিমতী হয়ে তাঁর সেবা করছেন।

কল্পান্ত সময়ে তাঁর মুখ থেকে বিষানল নির্গত হয় এবং উজ্জ্বল-আকৃতি বিশিষ্ট সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র অনন্তের শরীর থেকে উদ্ভূত হয়েই ত্রিজগৎ গ্রাস করেন। প্রলয়কালে পরম পুরুষ নিখিল জগৎকে আপন জঠরে ধারণ করে অনন্ত নাগের ক্রোড়েই যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন।

সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলকে তিনি মুকুটবৎ মস্তকে ধারণ করে শেষ-নাগের স্বরূপে পাতাল-মূলে

স্থিত আছেন এবং তাতেই দেবাসুর মনুষ্য সকলেই সুস্থিত—

আস্তে পাতাল-মূলস্থঃ শেষো'শেষ সুরার্চিতঃ।

[বিষ্ণু পু. ২.৫.১৯-২০; ২.৫.১২-২৭; ৫.১৮.৫৪; ৫.২৫.৩; ভাগবত পু. ৪.৯.১৪]

□ ভাগবত পুরাণ আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেছে—সেই পাতালের মূলদেশে তিরিশ সহস্রযোজন বিস্তারে ভগবান বিষ্ণুর তমোগুণময়ী যে কলা—তিনিই অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ এবং সেই অনন্তকেই পঞ্চরাত্রোপাসক সাত্বত সম্প্রদায়ের সজ্জনেরা তাঁদের চতুর্ব্যূহ উপাসনায় অন্যতম ব্যূহ হিসেবে সঙ্কর্ষণ নামে ডাকেন।

সহস্রমস্তক ভগবান অনন্তদেবের একটি মস্তকেই ধৃত ভূমণ্ডলকে একটি সরষেদানার মতো দেখায়। অর্থাৎ এতটাই বিরাট সেই অনন্তের স্বরূপ। প্রলয়কালে এই বিশ্ব চরাচরকে তিনি যখন সংহার করতে উদ্যত হন, তখন তাঁর ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষ থেকে একাদশ-ব্যূহে সজ্জিত, ত্রিলোচন, সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্রদেব ত্রিশূল হাতে অবতীর্ণ হন।

কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামকে এই অনন্তমূর্তি সঙ্কর্ষণের সাযুজ্যে দেখা হয় বলেই বলরামের রূপ নিহিত আছে এই অনন্তমূর্তির মধ্যেই। ভাগবত সেই বর্ণনা দিয়ে বলেছে—সেই অনন্তের ভুজযুগল রজতস্তম্ভের মতো, সেই বাহুতে ধবল বলয়। পরিধানে নীল বস্ত্র এবং একটি হস্ত লাঙ্গলের ওপরে, একটি কর্ণে কুণ্ডল, দুই নয়ন অনবরত মত্ততাবশতঃ উৎফুল্ল, ঘূর্ণিত এবং বিহ্বল-ভাবাপন্ন। নারদ, তুম্বুরু তাঁর গুণগান করছেন, দেবতা, অসুর, মুনিরা তাঁর ধ্যান করেন। অথচ এই দুরন্ত বল, মহান গুণ এবং বিশাল প্রতাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি ভূমণ্ডলের তলদেশে নিজেকে আধার হিসেবে রেখে লোকস্থিতির জন্য ধারণ করে আছেন এই পৃথিবী।

[ভাগবত পু. ১.১৪.৩৫; ৫.২৫.১-১৩; বিষ্ণু পু. ৫.২৫.৩; ৫.৩৫.৩]

□ রামায়ণে আমরা যে অনন্তনাগের উল্লেখ পাই, সেটাও অনন্তদেবের সাংস্কারিক রূপ। সুগ্রীব সীতাকে খোঁজার জন্য যখন বানর-বীরদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছিলেন, তখন পূর্বদিকের স্থানগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে অনন্তনাগের কথা উল্লেখ করেছেন। জলোদ সাগরের উত্তর তীরে সুবর্ণবর্ণ এক পর্বত আছে, যার নাম জাতরূপশীল। সেখানে চন্দ্রের মতো শুভ্রবর্ণের যে মহানাগ, তিনিই অনন্তদেব।

তিনি সহস্রশিরা, তাঁর পরিধানে নীলবসন। তাঁর বাসভূমি সেই পর্বতের চূড়ায় তাঁর শক্তিচিহ্ন হিসাবে তিনটি শাখাযুক্ত তালধ্বজ বিরাজিত। উল্লেখ্য কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামও নীলবসন এবং তিনি তালধ্বজ রথের অধিকারী।

[রামায়ণ ৪.৪০.৫০-৫৩]

অনন্ত$_{২}$ ভগবান সূর্যের একটি নাম।

[মহা (k) ৩.৩.২৪; (হরি) ৩.৩.২৪]

অনন্ত$_{৩}$ স্কন্দ-কার্তিকেয়র এক সৈনিকের নাম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র., খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৬]

অনন্ত$_{৪}$ কার্তবীর্য্যার্জুনের বংশে রাজা বীতিহোত্র বা বীরহোত্রের পুত্র ছিলেন অনন্ত। দুর্জয় নামে তাঁর এক পুত্র হয়। *[বায়ু পু. ৯৪.৫৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.৫৩]*

অনন্তজিৎ মহাভারতের অনুশাসনপর্বের অন্তর্গত বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৬; (হরি) ১৩.১২৭.৪৬]

অনন্ততীর্থ একটি পবিত্র তীর্থ। নীলমত পুরাণে রাহুলা ও সুরসা নদীতে স্নান করে অনন্ততীর্থে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই তীর্থ দর্শনে নাগলোক লাভ হয়। অনন্তনাগের নামানুসারেই এই তীর্থটির এরূপ নামকরণ।

[নীলমত পু. (মহর্ষি) ১৪০১-১৪০৩]

আধুনিক ইসলামাবাদ, কাশ্মীরের মার্তণ্ড মালভূমির পশ্চিম পাদদেশে এর অবস্থান।

[J. P. Vogel; Indian Serpent Lore or the Nagas in Hindu Legend and Art; p. 229]

অনন্ততৃতীয়াব্রত তৃতীয়া তিথিতে অনন্ততৃতীয়াব্রত পালনীয়। *[দেবীভাগবত পু. ৭.৩৮.৩৭]*

অনন্তপর্বত একটি পবিত্র পর্বত। শ্রাদ্ধকার্যের জন্য পর্বতটি অত্যন্ত উপযুক্ত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.৫৮]

পণ্ডিত Subodh Kapoor জানিয়েছেন যে, বার্হস্পত্য সূত্র অনুযায়ী অনন্ত পর্বত একটি বৈষ্ণব ক্ষেত্র। এর আরেক নাম অনন্তপদ্মনাভ। বর্তমান ত্রিবান্দ্রামের অনন্তপুর অঞ্চল। অনন্তপুরে ভগবান পদ্মনাভের একটি মন্দির রয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব

ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভু একবার এই পবিত্রভূমিতে এসেছিলেন বলে জানা যায়। স্থানটির আরেকনাম পদ্মনাভপুর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পদ্মনাভপুর বা অনন্তপুর অঞ্চলটি ছোটো ছোটো টিলায় ঢাকা একটি অঞ্চল। সম্ভবত এগুলি পশ্চিমঘাট পর্বতেরই বিচ্ছিন্ন অংশ।

*[বার্হস্পত্য সূত্র (Thomas) ৩.১২০;
EAIG (Kapoor) p. 42]*

অনন্তবিজয় জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে অর্জুনের দেবদত্ত, কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের মতোই যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয় নামক শঙ্খটি বেজে উঠেছিল—এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে যুধিষ্ঠির এই শঙ্খ কোথা থেকে লাভ করেছিলেন, কেনই বা তার নাম অনন্তবিজয়—এ বিষয়ে মহাভারতে কোনো উল্লেখ মেলে না। তবে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে মর্ত্যলোকে মূর্তিমান ধর্মস্বরূপ বলে কল্পনা করা হয়। ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী বা ধর্ম কখনোই পরাজিত হতে পারে না—এমন ভাবনা থেকেই ধর্মস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের শঙ্খটির উপর অনন্তবিজয় নাম আরোপিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। *[মহা (k) ৬.২৫.১৬; ৬.৫১.২৬; (হরি) ৬.২৫.১৬; ৬.৫১.২৬; ভগবদ্গীতা ১.১৬]*

অনন্তভাগিন্ (অনন্তভাগী) যেসব ঋষি বংশ পুরাণে ভার্গব বংশের বংশবিবর্ধক গোত্রকার হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন, মহর্ষি অনন্তভাগিন্ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি বংশ অথবা শিষ্য পরম্পরায় মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২০]

অনন্তরূপ$_{১}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। অনন্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ অন্তহীন। অনন্ত অর্থে সেক্ষেত্রে যেমন আদি-অন্তহীন বিশালত্ব বোঝায়। তেমনই এই শব্দটি গণনার অতীত বা অসংখ্য শব্দেরও দ্যোতক। দুই অর্থেই এটি শিব-মহাদেবের নাম হিসেবে প্রযুক্ত হতে পারে। টীকাকার নীলকণ্ঠ অনন্তরূপ নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

অনন্তং রূপমস্য সো'নন্তরূপঃ।

পরমেশ্বরের যে আদি-অন্তহীন বিরাট রূপ কল্পিত হয়, ভগবদ্গীতায় ভগবানের যে বিরাটরূপকে অর্জুন 'নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং' বলে বর্ণনা করেছেন, সেই বিরাট রূপের কারণেই পরমেশ্বরস্বরূপ মহাদেবও অনন্তরূপ নামে কীর্তিত হন। প্রসঙ্গত, বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে আমরা 'অনন্তরূপ' শব্দটিকে ভগবান বিষ্ণুরও অন্যতম নাম হিসেবে উচ্চারিত হতে দেখব। পরমেশ্বরকে ঔপনিষদীক ব্রহ্মভাবনায় নিরাকার রূপেই কল্পনা করা হয়। জগৎসৃষ্টির মাধ্যমে সেই বিমূর্ত পরমাত্মা মূর্ত হন, জগতের প্রতিটি জড়-সজীব পদার্থের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই স্বরূপ প্রতিভাত হয়। নিরাকার পরব্রহ্ম এই অসংখ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন বলেই বহু রূপধারী ভগবান অনন্তরূপ নামে খ্যাত। বিষ্ণু সহস্রনামের শাঙ্করভাষ্য টীকায় এই মর্মেই অনন্তরূপ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

অনন্তানি রূপাণ্যস্য বিশ্বপ্রপঞ্চরূপেণ
স্থিতস্যেতি অনন্তরূপঃ।

অনন্ত শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে—যার অন্ত বা বিনাশ নেই। ভগবান অবিনাশী বলেও অনন্তরূপ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৩৫; (হরি) ১৩.১৬.১৩৪]

অনন্তরূপ$_{২}$ মহাভারতের অনুশাসনপর্বের অন্তর্গত বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১৩; (হরি) ১৩.১২৭.১১৩]

অনন্তশ্রী বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১৩; (হরি) ১৩.১২৭.১১৩]

অনন্তা$_{১}$ পৃথিবী অসংখ্যরূপসম্পন্ন, এজন্য তার এক নাম অনন্তা। *[দেবীভাগবত পু. ৯.১০.৩০]*

অনন্তা$_{২}$ স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী। স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে অনন্তার গর্ভে প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন। *[মৎস্য পু. ৪.৩৩]*

অনন্তা$_{৩}$ যযাতির পৌত্র তথা পুরু রাজার পুত্র জনমেজয়ের পত্নী ছিলেন অনন্তা। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে তাঁকে মাগধী বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তবে মহাভারতের অন্যান্য সংস্করণে তিনি 'মাধবী' বলে চিহ্নিত হয়েছেন। অনন্তার গর্ভে রাজা জনমেজয়ের ঔরসে প্রাচীন্বান্ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়।

[মহা (k)১.৯৫.১২; (হরি) ১.৯০.১৬]

অনন্তাত্মা ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৮; (হরি) ১৩.১২৭.৬৮]

অনন্দ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৯; (হরি) ১৩.১২৭.৬৯]

অনপান যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় রাজা বলির ক্ষেত্রজ পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন অঙ্গ। রাজা বলি অঙ্গকে অঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। অঙ্গের পুত্র দধিবাহন। মহর্ষি দীর্ঘতমার শাপে তিনি অপানদেশ হীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণেই দধিবাহনের অপর নাম ছিল অনপান। *[দ্র. দীর্ঘতমা]*

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১০২-১০৩; বায়ু পু. ৯৯.১০০-১০১]

অনপায়া মৌনেয় অপ্সরাদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৫]

অনবকাশিক *[দ্র. তপস্বী]*

অনবদ্যা$_{১}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষ কন্যা দিতির গর্ভজাত কন্যা। *[কালিকা পু. ৩৪.৭৮]*

অনবদ্যা$_{২}$ অরিষ্টার গর্ভজাত আটজন স্বর্গীয় অপ্সরার মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনবদ্যা।

[বায়ু পু. ৬৯.৪৮]

□অবশ্য মহাভারতের বিবরণ থেকে জানা যায় যে কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা প্রাধার গর্ভজাত সাত অপ্সরার মধ্যে অন্যতমা ছিলেন অনবদ্যা। অর্জুনের জন্মোৎসবে যে সব অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন অনবদ্যা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ১.৬৫.৪৫; ১.১২৩.৬১; (হরি) ১.৬০.৪৬; ১.১১৭.৬৫]*

অনবশা অরিষ্টার গর্ভজাত আটজন স্বর্গীয় অপ্সরার মধ্যে অন্যতমা ছিলেন অনবশা।

[বায়ু পু. ৬৯.৪৮]

অনভিবাদ্য ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় প্রাথমিকভাবে ব্রাহ্মণের অভিবাদনযোগ্য নয়। নাস্তিক, মর্য্যাদাবোধহীন, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, পাতকী, পাষণ্ড, পতিত মূর্খ, নক্ষত্রপাঠক, উন্মত্ত, শঠ, ধূর্ত, ধাবমান, অশুচি, সর্বাঙ্গ তথা মস্তকে যিনি তেল মেখেছেন, উপবিষ্ট, সতত বিবাদশীল, জল মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তি, রমণাসক্ত, ভিক্ষান্নধারী এবং শয়ান ব্যক্তি অভিবাদনযোগ্য নন। স্ত্রীলোকের মধ্যে যিনি স্বামীঘাতিনী, যিনি গর্ভপাত ঘটিয়েছেন, যিনি পরপুরুষে আসক্তা, কৃতঘ্নী, অতিকোপনা, রজস্বলা, যিনি সদ্য সন্তানের জন্ম দিয়েছেন—তিনি অভিবাদনের যোগ্যা নন। এ ছাড়াও যিনি শ্রাদ্ধতর্পণ, দেবার্চনা করছেন অথবা ব্রত, যজ্ঞ, দানকর্মে ব্যস্ত আছেন, তাঁকে অভিবাদন করা উচিত নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, অভিবাদন করলে যিনি প্রত্যভিবাদন না করেন, তাঁকে আর অভিবাদন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

[বৃহন্নারদীয় পু. ২৩.৩৬-৪৬]

অনমিত্র$_{১}$ যদুবংশীয় সাত্বতের পুত্র বৃষ্ণি। এই বৃষ্ণির কনিষ্ঠ পুত্র যুধাজিৎ। যুধাজিতের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিনি, কনিষ্ঠ অনমিত্র। অনমিত্রের তিনপুত্র—নিঘ্ন (অন্যমতে নিম্ন), শিনি (বিষ্ণুপুরাণে অবশ্য অনমিত্রের পুত্র শিনির উল্লেখ নেই) এবং বৃষ্ণি (পৃশ্নি)। অনমিত্রের এই তিন পুত্র থেকে যদুবংশের তিনটি পৃথক ধারার জন্ম হয়। তবে বায়ু পুরাণ অনমিত্রের পরিচয় দিয়েছে যুধাজিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী বৃষ্ণির কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ, দেবমীঢুষ এবং অনমিত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই পুরাণে নিঘ্ন এবং শিনি অনমিত্রের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত হলেও পৃশ্নিকে যুধাজিতের পুত্র বলা হয়েছে। মৎস্য পুরাণে আবার সম্পূর্ণ নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, বৃষ্ণির পত্নী মাদ্রীর গর্ভজাত অনমিত্র নাকি প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি পুত্রের পিতা ছিলেন। এঁদের নাম যথাক্রমে নিঘ্ন, শিনি, যুধাজিৎ, বৃষভ এবং ক্ষাত্র।

অনমিত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র নিঘ্ন (নিম্ন) ছিলেন সত্রাজিৎ এবং প্রসেনের পিতা। দ্বিতীয় পুত্র শিনি সত্যকের পিতা ছিলেন যাঁর থেকে যুযুধান বা সাত্যকি জন্মগ্রহণ করেন। অনমিত্রের কনিষ্ঠপুত্র বৃষ্ণি বা পৃশ্নি ছিলেন শ্বফল্ক এবং চিত্ররথের পিতা তথা অক্রূর প্রভৃতির পিতামহ। মৎস্য পুরাণ মতে অনমিত্রের পুত্র বৃষভের ঔরসে কাশীরাজকন্যা জয়ন্তীর গর্ভে জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই জয়ন্তই ছিলেন অক্রূরের পিতা।

[মৎস্য পু. ৪৫.২-৩, ২২, ২৫; বায়ু পু. ৯৬.১৯, ৯৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২০; ভাগবত পু. ৯.২৪.১২-১৪; বিষ্ণু পু. ৪.১৩.৮; ৪.১৪.১]

অনমিত্র$_{২}$ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা নিঘ্নের পুত্র। ইনি রাজ্য ত্যাগ করে তপস্যার জন্য বনে গমন করেন।

[মৎস্য পু. ১২.৪৭-৪৮]

অনমিত্র$_{৩}$ দশম মন্বন্তরের অধিপতি দক্ষ সাবর্ণি মনুর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনমিত্র।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৯৪.১৫]

অনমিত্র$_{৪}$ একজন রাজর্ষি। এঁর পত্নীর নাম ভদ্রা এবং পুত্রের নাম আনন্দ—যিনি পরবর্তীকালে ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি চাক্ষুষ মনু রূপে খ্যাত হন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৬.৩]

অনয় বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৫; (হরি) ১৩.১২৭.৬৫]

অনরক$_{১}$ এই তীর্থ কুরুক্ষেত্রে যমুনা নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ব্রহ্মা এবং মহাদেবের অবস্থান-মন্দির। এই তীর্থের পশ্চিম দিকে রুদ্রাণী এবং উত্তরে পদ্মনাভ অবস্থিত রয়েছেন। মহাভারতে একে সর্বদেবতীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তীর্থ দর্শন করলে নরক ভোগ করতে হয় না, সেকারণেই এর নাম অনরক—

তেতো গচ্ছেদনরকং তীর্থসেবী নরাধিপ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ॥

[মহা (k) ৩.৮৩.১৬৮-১৭৩;
(হরি) ৩.৬৮.১৬৯-১৭৪;
বামন পু. ৪১.২১-২৫; কূর্ম পু. ২.৩৯.৮৮;
পদ্ম পু. (নবভারত). (স্বর্গ). ১৩.৬০-৬১]

এই তীর্থে স্নান করলে নরক দর্শন করতে হয় না। *[মৎস্য পু. ১৯৩.১-৩]*

এই তীর্থস্থলের বর্তমান নাম নরক-তরী। নরক-তরী প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত একটি গ্রাম, সেখানে ভীষ্ম-কুণ্ড রয়েছে। এটি সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখন এটি হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত।

অনরক হল এমন একটি তীর্থ যেখানে হিন্দুধর্মের প্রধান তিন ধারা অর্থাৎ বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত-মতাবলম্বীরা পুণ্যফল লাভের জন্য দর্শন করে থাকেন। *[Dr. C.L. Khanna, Haryana General Knowledge p. 59]*

অনরক$_{২}$ অবন্তীক্ষেত্রে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে পিতৃপুরুষেরা নরকভোগ থেকে মুক্তি পান।

একসময়ে দেবী পার্বতী কৃষ্ণবর্ণা হয়েছিলেন। নিজের গৌর গাত্রবর্ণ নষ্ট হল দেখে পার্বতী অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। শিব তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন ঠিকই, তবে 'কালী' বলে উপহাস করাতেও ছাড়লেন না। রাগে দুঃখে পার্বতী বিন্ধ্যাচলে গিয়ে নিজের গৌরবর্ণ ফিরে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

এদিকে পার্বতীর বিরহে শিবও অদৃশ্য হলেন। তাঁর ত্রিনয়ন অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি—এঁরাও অদৃশ্য হলেন। সম্পূর্ণ সৃষ্টি ঢেকে গেল দুর্ভেদ্য অন্ধকারে। পাপ-অনাচারে পৃথিবী পূর্ণ হল। দেবতারা অগ্নিকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের বললেন—আপনারা প্রদীপ জ্বালান। দীপের আলোতেই সম্পূর্ণ জগৎ আলোকিত হবে। দেবতারা জিজ্ঞাসা করলেন—দীপ জ্বালাবার জন্য অগ্নি কোথায় পাব? ভগবান নারায়ণ বললেন—অগ্নির সৃষ্টি হয় দেবতা ও মানুষের মনে। আপনারা মন থেকে অগ্নি সৃষ্টি করুন। নারায়ণের আদেশ মত দেবতারা নিজেদের মনে জ্ঞানরূপ, চেতনারূপ অগ্নিকে আবাহন করলেন। দীপ প্রজ্বলিত হল। দীপের আলোকে সমস্ত সংসার আলোকিত হল।

তখন ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের বললেন—তোমরা অবন্তী নগরে অবস্থিত অনরক তীর্থে যাও। কার্তিকমাসের কৃষ্ণ-পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে সেই তীর্থে স্নান করে মৃত্যুর দেবতা যমের উদ্দেশে পূজা ও স্তব করবে। তাতে সকল পাপ দূর হয়, পিতৃপুরুষের মুক্তি লাভ হয়, স্বর্গলাভ হয়। ওইদিনে সহস্র দীপ জ্বালিয়ে সংযত ভাবে ব্রাহ্মণদের দান করবে, গীত-বাদ্য প্রভৃতি আনন্দোৎসব পালন করবে।

দেবতাদের দ্বারা এইভাবে অবন্তীক্ষেত্রে অবস্থিত অনরক তীর্থের মাহাত্ম্যের কথা প্রচারিত হল। এই কাহিনীতে অনরক তীর্থের মাহাত্ম্যের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দীপাবলী অনুষ্ঠান। কার্তিকমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সে দীপাবলী উৎসব এখনও সারা ভারতে পালিত হয়, তারই ব্রত অনুষ্ঠানের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে এই কাহিনীতে।

[স্কন্দ পু. (অবন্তী/আবন্ত্যক্ষেত্র) ৩০.১-১৬]

অনরণ্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজর্ষি। রামায়ণ এবং পুরাণগুলিতে ইক্ষ্বাকুবংশের যে বংশলতিকা পাওয়া যায় তাতে অনরণ্যের পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে।

ভাগবত পুরাণের পাঠ অনুযায়ী ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ত্রসদস্যুর পুত্র ছিলেন অনরণ্য। তবে বায়ু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণে প্রাপ্ত বংশলতিকায় অনরণ্যকে ত্রসদস্যুর পুত্রের পরিবর্তে পৌত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রসদস্যুর পুত্র সম্ভূত। এই সম্ভূতই ছিলেন অনরণ্যের পিতা।

মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কল্মাষপাদের পুত্র সর্বকর্মা। এই সর্বকর্মার পুত্র রাজা অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্রের নামও বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণের পাঠ অনুযায়ী অনরণ্যের পুত্র ছিলেন নিম্ন। তবে অন্যান্য পুরাণে পৃষদশ্ব বা ত্রসদশ্বকে অনরণ্যের পুত্র বলা হয়েছে।

রামায়ণে রাম-সীতার বিবাহের আগে ইক্ষ্বাকুবংশের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের বংশগৌরব এবং বংশলতিকা বর্ণনা করেছেন। রামায়ণে প্রাপ্ত বংশলতিকা অনুযায়ী অনরণ্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বাণের পুত্র। অনরণ্যের পুত্র পৃথু।

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, একসময় দিগ্বিজয়ে বের হয়ে রাবণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় এই অনরণ্যকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। অনরণ্য সসৈন্যে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় জুড়ে সেই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত অনরণ্যের মৃত্যু হয় রাবণের হাতে। মৃত্যুকালে তিনি রাবণকে শাপ দিয়েছিলেন—আমার বংশে ভবিষ্যতে দশরথের পুত্র রাম জন্মগ্রহণ করবেন। সেই রামের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে। লঙ্কার যুদ্ধে যখন ক্রমশ রাবণ পরাজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছেন সেই সময় ভীত রাবণ অনরণ্যের সেই অভিশাপ স্মরণ করেছিলেন।

[রামায়ণ ১.৭০.২৩; ৬.৬০.১-১০; ৭.১৯ অধ্যায়;
মৎস্য পু. ১২.৪৭; বায়ু পু. ৮৮.৭৫-৭৬;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.৭৪;
ভাগবত পু. ৯.৭.৪; বিষ্ণু পু. ৪.৩.১৩]

☐ মহাভারতে প্রাচীনকালের অন্যতম রাজর্ষি হিসেবে অনরণ্যের নাম একাধিকবার স্মরণ করা হয়েছে। আদিপর্বের সূচনায় পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সঞ্জয় বহু প্রাচীন রাজার নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা দীর্ঘকাল রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করার পর কালের অমোঘ নিয়মে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাজা অনরণ্যের নামও উল্লিখিত হয়েছে।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষিদের মধ্যে অনরণ্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া যেসব রাজা শারদ-কৌমুদ মাসে অর্থাৎ কার্তিক মাসে মাংস ভক্ষণ করতেন না—তাঁদের মধ্যেও অনরণ্য অন্যতম ছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.১.২৩৬; ১৩.১১৫.৬৮; ১৩.১৬৫.৫৯;
(হরি) ১.১.১৯৭; ১৩.১০০.৯৭; ১৩.১৪৩.৫৬]

অনরবর্তক দক্ষিণদেশীয় একটি জনপদ।

[পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ. ৩৭.৫৮]

অনর্ক বায়ু পুরাণ থেকে জানা যায় যে, কুষ্মাণ্ড পিশাচরা ষোলটি গণে বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই ষোলটি গণের মধ্যে অনর্ক অন্যতম একটি গণ। *[বায়ু পু. ৬৯.২৬৪]*

অনর্কেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে মোক্ষলাভ হয় বলে উল্লিখিত হয়েছে।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ১১৩]

অনর্থ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫৯; (হরি) ১৩.১২৭.৫৯]

অনর্বন্ *[দ্র. অনর্বা]*

অনর্বা একজন দৈত্য। ইনি বৃত্রাসুরের সেনাপতি ছিলেন। ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের যুদ্ধের সময় ইনি বৃত্রাসুরের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায়। *[ভাগবত পু. ৬.১০.১৯, ৩১]*

অনল$_1$ রাক্ষসরাজ রাবণের মাতামহ সুমালীর ভাই, মালীর ঔরসে গন্ধর্বকন্যা বসুদার গর্ভজাত একজন রাক্ষস। লঙ্কা-যুদ্ধের পূর্বে রামচন্দ্রকে লঙ্কার রক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানানোর প্রসঙ্গে বিভীষণ চারজন নিজস্ব অমাত্যের উল্লেখ করেছেন; অনল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পাখির রূপ ধরে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে রাবণের রক্ষাব্যবস্থা ও যুদ্ধব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন—

"অনলঃ পনসশ্চৈব সম্পাতিঃ প্রমতিস্তথা।
গত্বা লঙ্কাং মমামাত্যাঃ পুরীং পুনরিহাগতাঃ॥"

[রামায়ণ ৬.৩৭.৭-৮; ৭.৫.৪৪-৪৫]

অনল$_2$ ব্রহ্মার পুত্র মনু এবং মনুর পুত্র প্রজাপতি।

প্রজাপতির ঔরসে শাণ্ডিলীর গর্ভজাত পুত্র হলেন অনল। জ্যোতিষ্মান দেবতা। ইনি অষ্টবসুদের মধ্যে অন্যতম। কয়েকটি পুরাণ মতে অষ্টবসুকে কশ্যপের পুত্র বলা হয়। অন্যমতে, ধর্মের ঔরসে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা বসুর গর্ভে অষ্টবসুর জন্ম। অষ্টবসুর অন্যতম অনলের মধ্যে শিবতেজ নিহিত হয়েছিল বলেই অনলের স্ত্রী হিসেবে শিবার কল্পনা এসেছে মৎস্য পুরাণে। কিন্তু অন্যান্য বেশির ভাগ পুরাণে, বিশেষত মহাভারতে শিবা অনিলের স্ত্রী। যাইহোক, অনল যে শিবতেজ গ্রহণ করেছিলেন, সেটি তিনি শরস্তম্বে বা নল-খাগড়ার বনে ত্যাগ করেছিলেন বলেই শরবনজাত কুমার কার্তিকেয় অনলের পুত্র—অগ্নেঃ পুত্র কুমারস্তু শ্রীমান্ শরবনালয়ঃ। ছয় জন কৃত্তিকা দ্বারা পালিত হন বলে কুমার কার্ত্তিকেয় নামেও তিনি পরিচিত। অনলের অন্য তিন পুত্র হলেন শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়। অনলের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, গ্রীবা লোহিতবর্ণ এবং তিনি নিজে কৃষ্ণবর্ণ। অন্য আটটি নাম—হুতাশন, সপ্তার্চি, হব্যবাহন, কৃশানু, অগ্নি, পাবক, শুক্র এবং বহ্নি।

[মহা (k) ১.৬৬.১৭-২০; (হরি) ১.৬১.১৭-২০;
বিষ্ণু পু. ১.১৫.১০২-১১১;
শিব পু. (ধর্ম) ৫৪.১৬-১৭, ২০;
হরিবংশম্ ১.৩.৩১-৩২, ৩৮; মৎস্য পু. ৫.২০-২৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.২০-২১, ২২-২৯;
মহা (k) ১.৬৬.২১-২৯; (হরি) ১.৬১.২১-২৯;
বিষ্ণু পু. ১.১৫.১১২-১১৯; শিব পু. (ধর্ম) ৫৪.২১-২৮;
হরিবংশম্ ১.৩.২৯-৪৭; মৎস্য পু. ৫.২৭;
মার্কণ্ডেয় পু. ৯৯.৫৯-৬০]

অনল$_{৩}$ একজন বানরবীর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৫]

অনল$_{৪}$ একটি পর্বত। এটি রাক্ষসদের বাসস্থান।

[বায়ু পু. ৩৯.৫৩]

অনল$_{৫}$ পক্ষীরাজ গরুড়ের পুত্র সন্তানদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ৫.১০১.৯; (হরি) ৫.৯৪.৯]*

অনল$_{৬}$ বিষ্ণু পুরাণের একটি পাঠ অনুযায়ী ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের বংশধারায় নিষধের পুত্র ছিলেন অনল। অনলের পুত্রের নাম নভ।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.৪.১০৬]

অনল$_{৭}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রে দুবার অনল শব্দটিকে ভগবান বিষ্ণুর নাম হিসেবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। 'অন' শব্দের অর্থ প্রাণ। সংস্কৃতে সকর্মক 'লা' ধাতুর অর্থ দান করা অথবা গ্রহণ করা। পরমেশ্বর নিজের সৃষ্ট প্রাণীর দেহে প্রাণদান করেন, অথবা নিজসৃষ্ট প্রাণীসমূহকে আত্মভাবে গ্রহণ করেন বলে তাঁর নাম অনল—

অনান্ প্রাণান্ আত্মত্বেন লাতীতি জীবঃ অনলঃ।

অথবা অনল শব্দটিকে ভিন্ন ভাবনা থেকেও ব্যাখ্যা করা চলে। সংস্কৃত ণল্ ধাতুর অর্থ গন্ধ। নঙ্ পূর্বক গন্ধবাচক 'ণল্' ধাতু থেকেও অনল শব্দ পাওয়া যায়। টীকাকার শঙ্করাচার্য শ্রুতি থেকে উদ্ধৃত করেছেন, নিরাকার পরমপুরুষকে উপনিষদে রস-গন্ধহীন—অগন্ধমরসম্ বলে বিশেষিত করা হয়। ঈশ্বরের সেই অমূর্ত রূপকেও অনল নামে অভিহিত করা চলে। ভগবান বিষ্ণুকে সেই পরম পুরুষের সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পনা করা হয় বলে তাঁরও নাম অনল—

ণলতের্গন্ধবাচিনো নঙ্পূর্বাদ্ বা
'অগন্ধমরসম্' ইতি শ্রুতেঃ।

সংস্কৃতে অলম্ শব্দটি পর্যাপ্তি বা সীমাবদ্ধতা শব্দের দ্যোতক। যাঁর অসীম-অনন্ত বিরাট রূপের সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়—এই অর্থেও ভগবান বিষ্ণু অনল নামে কীর্তিত—

ন অলং পর্যাপ্তমস্য বিদ্যত ইতি বানলঃ।

আবার তিনি পরম শক্তিমান এবং সমস্ত সম্পদের অধীশ্বর, তাই তাঁর শক্তি বা সম্পদের কোনো সীমা নেই এই অর্থেও তাঁকে অনল নামে সম্বোধন করা হয়—

অলং পর্যাপ্তি শক্তিসম্পদাং নাস্য
বিদ্যত ইতি অনলঃ।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৫, ৮৯;
(হরি) ১৩.১২৭.৪৫, ৮৯]

অনল$_{৮}$ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামস্তোত্রে মোট তিনবার 'অনল' শব্দটিকে আমরা মহাদেবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হতে দেখি। 'অল' শব্দের অর্থ পর্যাপ্তি। যাঁর তীব্র ক্ষুধা বা দহনশক্তি কখনোই পূর্ণ হয় না বা শান্ত হয় না—এই অর্থে 'অনল' শব্দটি অগ্নি অর্থ বহন করে। মহাদেবকে বিভিন্ন সময়ে বহুবার অগ্নির সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাই অগ্নিস্বরূপ মহাদেব অনল নামেও খ্যাত—

অনলো নাস্তি অলং পূর্তির্যস্য
ভুঞ্জানস্য সো'নলোগ্নিঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯০, ১০০, ১০৬;
(হরি) ১৩.১৬.৯০, ১০০, ১০৬]

অনলা$_1$ রাক্ষসরাজ রাবণের মাতামহ সুমালীর দাদা মাল্যবানের ঔরসে তাঁর পরমাসুন্দরী পত্নী সুন্দরীর গর্ভজাত একজন রূপবতী রাক্ষসী। বিশ্বাবসুর পত্নী। বিশ্বাবসুর ঔরসে অনলার গর্ভে কুম্ভীনসী নামে এক রূপসী কন্যার জন্ম হয়; এই কন্যার সঙ্গে মধুরাধিপতি মহাবীর মধু-দৈত্যের বিবাহ হয়। *[রামায়ণ ৭.৫.৩৪-৩৭; ৭.৭৪.১৬]*

অনলা$_2$ ক্রোধবশার নয়জন পুত্রীর মধ্যে একজন হলেন সুরভি। তাঁর কন্যা হলেন অনলা। মহাভারতের দাক্ষিণাত্য সংস্করণ-ধৃত অধিক পাঠ থেকে জানা যায় যে, নাগমাতা সুরসার তিন কন্যার মধ্যে একজন হলেন অনলা। রামায়ণ অনুযায়ী, প্রজাপতি দক্ষের ষাটজন যশস্বিনী কন্যার মধ্যে আটটি সুন্দরী কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। অনলা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রামায়ণে অনলাকে পুণ্যফলগুলির জননী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মহাভারত অনুযায়ী তিনি সাতরকম পিণ্ডফল উৎপাদনকারী বৃক্ষের জননী— সপ্তপিণ্ডফলান্ বৃক্ষান্ অনলাপি ব্যজায়ত। মহাভারতে পিণ্ডফলগুলির নামের উল্লেখ না থাকলেও টীকাকার নীলকণ্ঠ সাতটি পিণ্ডফলের উল্লেখ করেছেন প্রচলিত উৎস থেকে। পিণ্ডফল গুলি হল—খর্জূর (খেজুর), তাল, হিন্তাল (হেঁতাল), তালী (ভূমি আমলকী, দ্র. অমরকোষ), খর্জুরিকা (পশ্চিম দেশ থেকে আগত খেজুর ফল, দ্র. শব্দকল্পদ্রুম), গুবাক (সুপারি) এবং নারিকেল—

খর্জূরস্তালহিন্তালৌ তালী খর্জুরিকা তথা।
গুবাকো নারিকেলশ্চ সপ্ত পিণ্ডফলা ক্রমাঃ॥

অনলার কন্যার নাম শুকী। এই পিণ্ডফলগুলিই রামায়ণের পুণ্য-ফল কিনা, সেটা ভেবে দেখা যেতে পারে। *[মহা (k) ১.৬৬.৬৯-৭১; (হরি) ১.৬১.৬৭, ৭৩; (গীতা প্রেস) ১.৬৬.৭০ সংখ্যক শ্লোকের পর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্রষ্টব্য; রামায়ণ ৩.১৪.১০-১২, ৩১]*

অনশন না খাওয়া। *[রামায়ণ ৫.১৫.২৩]*

☐ এক ধরনের তপস্যা। একাদশী তিথির মাহাত্ম্য উচ্চারণ করার পরেই বলা হয়েছে একাদশীতে উপবাস ইত্যাদি করার মতো ব্রত যেমন নেই, তেমনি অনশনের মতো তপস্যাও আর নেই। এখানে তপস্যা বলতে খাদ্য ত্যাগের মতো কৃচ্ছ্রসাধন বোঝাচ্ছে।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ১.২.৩৫]

☐ অনশন প্রথমত এক কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত হলেও অনশন এক ধরনের বৈধ আত্মহত্যার পথ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে উপনিষদ থেকে মহাভারত-রামায়ণ পর্যন্ত। আমাদের দেশে আত্মহত্যার কোনো বিধি-ছিল না, তবে কাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে বরণ করার জন্য ক্রমিক কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে শরীর শোষণ করে আমৃত্যু অনশন, অগ্নিপ্রবেশ, জলপ্রবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে স্ব-ইচ্ছায় মরে যাওয়াটা উপনিষদের কাল থেকে বিহিত হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, মানুষ যদি বৈদান্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে সংসারের অসারতা বুঝতে পারে, তাহলে হিমালয়ের পুণ্যস্থানে বিধি অনুসারে অনশন-উপবাসের মাধ্যমে আত্মবিসর্জন দিতে পারে—

শারীরমুৎস্রজেত্তত্র বিধিপূর্বম্ অনাশকে।

অনাশক আর অনশন একই কথা। মৎস্য পুরাণে এই অনশন-কৃচ্ছ্রের মাধ্যমে মৃত্যু বরণ করার কথা এসেছে অমরকণ্টক তীর্থের প্রসঙ্গে।

[কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষদ ৪.৩; পৃ. ১২৮ (উপনিষদ গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড); জাবালোপনিষদ্ ১৪; পৃ. ১৪৪ (উপনিষদ গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড); মহা (k) ১৩.২৫.৬২-৬৩; (হরি) ১৩.২৬.৬২-৬৩; মৎস্য পু. ১৮৬.৩৪]

☐ স্বেচ্ছা মৃত্যুর জন্য অনশন বা অনাশক ব্রতের অর্থ করতে গিয়ে সিদ্ধান্তবাগীশ লিখেছেন—যতক্ষণ পর্যন্ত না শরীর নাশ বা ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না খাওয়ার ব্রতটাই অনশন বা অনাশক ব্রত। পরবর্তীকালে এই অনশনের প্রতিজ্ঞাই বৃহত্তর প্রাপ্তির জন্য প্রতিবাদের রূপ ধারণ করেছে।

অনশ্বন্ *[দ্র. অনশ্বা]*

অনশ্বা চন্দ্রবংশীয় রাজা কুরর পুত্র ছিলেন বিদূরথ। এই বিদূরথের ঔরসে সম্প্রিয়ার গর্ভে অনশ্বা জন্মগ্রহণ করেন। অনশ্বা মগধ রাজকন্যা অমৃতাকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের পরীক্ষিৎ নামে এক পুত্রসন্তান হয়।

[মহা (k) ১.৯৫.৪০-৪১; (হরি) ১.৯০.৫০-৫১]

অনসূয় পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের প্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি অনসূয়ের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি অনসূয়, কশ্যপ বংশীয়দের মধ্যে অন্যতম গোত্রকার পিতা বা 'প্যাট্রিয়ার্ক' ছিলেন বলে জানা যায়। *[মৎস্য পু. ১৯৯.১.২]*

অনসূয়া$_1$ প্রথমত অনসূয়া একটি আন্তর গুণ। মহাভারত এই গুণকে শিষ্টাচার এবং ধর্মের মধ্যে গণনা করেছে।

[মহা (k) ৩.২০৭.৯৬; ৫.৩৩.৮১; ৫.৩৯.৫৩; ১২.১৯৬.১০; ১২.২২০.১৮; (হরি) ৩.১৭৫.৯৫; ৫.৩৩.৮৭; ৫.৩৯.৫২; ১২.১৮৯.১১]

অপরের অতিরিক্ত ধনৈশ্বর্য্য দেখে মনে মনে যে নিদারুণ সন্তাপ হয়, তাকে বলে অসূয়া। অসূয়া না করার ধর্মই অনসূয়া বলে চিহ্নিত—

ধনাদ্যৈরধিকং দৃষ্ট্বা ভৃশং মনসি তাপনম্।
অসূয়া কীর্তিতা সদ্ভিস্তদযোগে'নসূয়তা॥

ঈর্ষা, অসূয়া ইত্যাদি দোষকে মনুসংহিতায় ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'অসূয়া' শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখেছেন যে, অন্যের গুণের মধ্যে অনর্থক দোষ আবিষ্কার করাটাই অসূয়া। যার মধ্যে এই অসূয়া নেই তিনি অনসূয়া।

বৃহন্নারদীয় পুরাণেও ক্রোধের প্রসঙ্গের পরেই অসূয়ার কথা বলা হয়েছে। অক্রোধের পরেই তাই অনসূয়ার সংজ্ঞা।

[মনু সংহিতা ৭.৪৮; কুল্লূকভট্টের টীকা দ্র.; বৃহন্নারদীয় পু. (নবভারত) ৩১.৮৬]

অনসূয়া$_2$ কর্দ্দম ঋষির নয়জন কন্যা ছিলেন। নয়জন ব্রহ্মর্ষির সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হয়। এঁদের মধ্যে অনসূয়া ছিলেন অন্যতম। কর্দ্দম অত্রিমুনির হাতে অনসূয়াকে প্রদান করেন—

মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে।

[ভাগবত পু. ৩.২৪.২২; ১.৩.১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৯.৫৬]

বায়ু পুরাণে আবার তাঁকে দক্ষকন্যাও বলা হয়েছে। অত্রি ও অনসূয়ার সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনীশ্বর (কোথাও কোথাও 'শণৈশ্চর' পাঠ আছে) ও সোম নামক পাঁচ পুত্র এবং শ্রুতি নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। বামন পুরাণে দেখা যাচ্ছে—প্রজাপতি দক্ষ তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠানে সদস্য-কর্মে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অত্রিকে আমন্ত্রণ করার সময় অনসূয়াকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

[বায়ু পু. ১০.২৮, ৩১; ২৮.১৯-২০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.২৩-২৪; বামন পু. ১.২.৭-৯]

□ দেবীভাগবত পুরাণে অত্রিপত্নী অনসূয়াকে পরমা প্রকৃতির 'কলা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[দেবী ভাগবত পু. ৯.১.১২৬, ১২৮]

অনসূয়া পরম সতী বলে সমস্ত পুরাণে কীর্তিত।

প্রতিষ্ঠান নগরে কুশিকবংশ-সম্ভূত এক ব্রাহ্মণ পূর্বজন্মকৃত পাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত পতিপরায়ণা। সেই স্ত্রী ব্রাহ্মণকে অনেক সেবাযত্ন করা সত্ত্বেও কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণ তাঁকে প্রচুর লাঞ্ছনা দিতেন। এক সময় তিনি পত্নীকে আদেশ করেন তাঁকে বেশ্যাগৃহে নিয়ে যাবার জন্য। ব্রাহ্মণ কৌশিক এতটাই হৃদয়হীন যে, নিজের পতিব্রতা স্ত্রীর কাছে তাঁর নির্বাচিত বেশ্যারমণীটির রূপমাধুর্য্য বর্ণনা করতে তাঁর এতটুকুও কুণ্ঠা হচ্ছে না। পরিশেষে সাধ্বী পত্নীকে তিনি এটাও জানালেন যে, সেই বেশ্যার সঙ্গ না পেলে তিনি মারাই যাবেন। স্বামীর কথা মেনে পতিব্রতা পত্নী তাঁকে কাঁধে নিয়ে বেশ্যাগৃহের দিকে রওনা দিলেন। এদিকে মহামুনি মাণ্ডব্য কোনো অন্যায় না করা সত্ত্বেও বিনা অপরাধে চুরির দায়ে শূলদণ্ড লাভ করেন। অন্ধকারে শূলারোপিত অবস্থায় তিনি যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। স্ত্রীর কাঁধে চড়ে বেশ্যাগৃহে যাবার পথে অন্ধকারে ব্রাহ্মণ কৌশিকের পা লেগে গেল মাণ্ডব্যমুনির গায়ে। শূলপ্রোত অবস্থায় শরীর চালিত হওয়ায় মুনির যন্ত্রণা বাড়ল এবং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি পদচালনা করে আমায় যন্ত্রণা দিল, সেই ব্যক্তি সূর্যোদয় হওয়ামাত্রই যন্ত্রণাভোগ করতে করতে মারা যাবে। পতিব্রতা কৌশিকপত্নী স্বামীর মৃত্যুর অভিশাপ শুনে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বললেন, কাল থেকে আর সূর্যই উদিত হবেন না।

পতিব্রতা রমণীর বাক্য অনুসারে পরদিন থেকে আর সূর্য উঠল না। নিরন্তর রাত্রি চলতে লাগল। এইভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন কাল চলতে থাকলে দেবতারা ভীত হলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা সন্ত্রস্ত দেবতাদের বললেন, তেজ দ্বারা তেজের

এবং তপস্যার দ্বারা তপস্যার প্রতিরোধ করা যায়। পতিব্রতা কৌশিক-পত্নীর তপস্যা মান্য করে যেহেতু সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন না, অতএব এই তপঃপ্রভাব প্রতিহত করার জন্য অন্যতরা এক পতিব্রতা রমণী অত্রি-পত্নী সতী অনসূয়ার শরণ নিতে হবে। তা না হলে সূর্যালোকের অভাবে দেবতাদের এবং মর্ত্যলোকের সকল কর্ম নষ্ট হবে।

এই ঘটনার মধ্যে লক্ষণীয় ব্যাপার কিন্তু একটাই এবং সেটা হল—অত্রিপত্নী অনসূয়া পৃথিবীর যাবতীয় সতীত্ব-পাতিব্রত্যের একক প্রতীক হয়ে উঠছেন। ফলত কৌশিক-পত্নীর পাতিব্রত্য পাতিব্রত্যের কলা হিসেবে অনসূয়ার পূর্ণ পাতিব্রত্যের সঙ্গে মিশে যায়। দেবতারা অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়াকে নিজেদের সমস্যা এবং বিপন্নতা জানিয়ে প্রসন্ন করলেন। প্রসাদিত অনসূয়া বললেন, ওই সাধ্বী ব্রাহ্মণীর মহিমা মিথ্যে হবার নয়। অতএব তাঁর সম্মান বজায় রেখে যাতে তাঁর স্বামীও বাঁচেন—সেই সুব্যবস্থা করার জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

এর পরে অনসূয়া সেই ব্রাহ্মণ এবং তাঁর পতিব্রতা পত্নীর কাছে গিয়ে কৌশিক-ব্রাহ্মণকে পুরুষের কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণী রমণীর পাতিব্রত্য-ধর্মেরও প্রশংসা করলেন। অনসূয়া ব্রাহ্মণীকে আরও বললেন যে, সূর্যের অনুদয়ে জগৎ ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছে, অতএব তিনি যেন সূর্যকে পুনরায় উদিত হবার অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণী তাঁর স্বামীর প্রতি মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপের কথা জানালে অনসূয়া বললেন যে, স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করবেন এবং তাতে তাঁর স্বামী পূর্বের ন্যায় রোগব্যাধিহীন নবকলেবর ধারণ করবেন।

ব্রাহ্মণী অনসূয়ার কথা স্বীকার করে নিয়ে সূর্যকে উদিত হবার কথা বললেন। ওদিকে সূর্য উদিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগ ঘটল। অত্রিপত্নী অনসূয়া সঙ্গে-সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, তিনি পতিসেবার দ্বারা যে পুণ্যবল অর্জন করেছেন সেই পুণ্যবলের সাহায্যে ব্রাহ্মণ বেঁচে উঠে পত্নীর সঙ্গে শতবর্ষ জীবিত থাকুন। অনসূয়ার কল্যাণে কৌশিক ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হয়ে নবকলেবর ধারণ করলেন। অনসূয়ার মাহাত্ম্যে প্রীত হয়ে দেবতারা তাঁকে বর দিতে চাইলে অনসূয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে তাঁর সন্তানরূপে পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দেবতারা তাঁর এই অভিলাষ পূরণ করার ফলে ব্রহ্মা সোমরূপে মহেশ্বর দুর্বাসারূপে এবং বিষ্ণু স্বয়ং দত্তাত্রেয়রূপে অনসূয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১৬.১৪-৯০]

□ ভাগবত পুরাণে অনসূয়ার এই তিন দৈব সন্তানের কথা বলা হয়েছে সার্বিক এক পৌরাণিক পরম্পরায়, কেননা দেবীভাগবত পুরাণও একইভাবে দত্তাত্রেয় অবতারের প্রসঙ্গে অনসূয়ার পুত্র-প্রার্থনার কথা বলেছে—

যয়া সংপ্রার্থিতা দেবাঃ পুত্রত্বমগমংস্ত্রয়ঃ।

[ভাগবত পু. ৪.১.১৫;
দেবীভাগবত পু. ৪.১৬.৬-৯;
কূর্ম পু. ১.১৩.৭-৮]

□ ভাগবত পুরাণে অবশ্য অন্য এক কাহিনী আছে, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে পুত্র হিসেবে লাভ করার কাহিনীর সঙ্গে কৌশিক-ব্রাহ্মণীর কাহিনীটি যুক্ত নয়। এখানে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে অত্রিমুনি স্ত্রী অনসূয়ার সঙ্গে ঋক্ষপর্বতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দেহেন্দ্রিয়মন সমস্ত সংযত করে কঠোর তপস্যা করতে-করতে অত্রি জগদীশ্বরের আত্মতুল্য একটি সন্তান লাভের ভাবনা ভাবতে লাগলেন। মুনির কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন জনেই দেখা দিলেন তাঁর সামনে। অত্রি বললেন—আমি এক জন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁকে পুত্র রূপে পাবার জন্য শরণাপন্ন হয়েছিলাম—

একো ময়েহ ভগবান্ বিবিধপ্রধানৈ
শ্চিত্তীকৃতঃ প্রজননায় কথং নু যূয়ম্।

কিন্তু একের জায়গায় আপনারা তিন জন এলেন কী করে? ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বললেন—ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি জগদীশ্বর বলে যে তত্ত্বের চিন্তা করেছো, আমরা তিনজনে সেই একই তত্ত্বের তিন রূপ—

যদ্ বৈ ধ্যায়তি তে বয়ম্।

আমরা তিনজনেই নিজ নিজ অংশে তোমার পত্নী অনসূয়ার গর্ভে পুত্র হয়ে জন্মাবো। তারপর অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগশাস্ত্রবেত্তা দত্ত-দত্তাত্রেয় এবং শঙ্করের

অংশে দুর্বাসা জন্মগ্রহণ করলেন। ভাগবত পুরাণ পূর্বে এই কাহিনীর সংক্ষিপ্তসারে জানিয়েছে—

> অত্রেঃ পত্ন্যনসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্।
> দত্তং দুর্বাসসং সোমম্ আত্মেশব্রহ্মসম্ভবান্॥

[ভাগবত পু. ৪.১.১৫; ৪.১.১৭-৩২]

□ অনসূয়ার গর্ভে তিন দেবপুত্রের জন্মের সামান্য একটি বিবরণও আছে পুরাণে। তিন মূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বরদানের পর একদিন মহর্ষি অত্রি চারুসর্বাঙ্গী অনসূয়াকে দেখে কামনা-পরবশ হয়ে মনে-মনে তাঁর সম্ভোগ কামনা করলেন। এই অবস্থায় তাঁর তেজ স্খলিত হল এবং বেগবান বায়ু সেই তেজকে ঊর্ধ্বদিকে তির্যকভাবে বয়ে নিয়ে গেলেন আকাশে।

ব্রহ্মাতেজ-সম্পন্ন সেই শুক্লকান্তি রজোগুণময় তেজই পতন-সময়ে চন্দ্ররূপে পরিণত হল। ব্রহ্মার স্বরূপ এই চন্দ্র অত্রির মানসপুত্ররূপে অনসূয়ার মানস-গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। ভগবান বিষ্ণু সত্ত্বগুণের আধার। তিনি স্বকীয় অংশে দত্ত নামে জন্মালেন অনসূয়ার গর্ভে। অত্রির ছেলে আত্রেয় বলে তিনি এতই বিখ্যাত যে, তাঁর পূর্ণ নাম হল দত্তাত্রেয়। তিনি অনসূয়ার গর্ভবাস লাভ করে সাত দিন পরেই জননীর উদর ভেদ করে জন্মলাভ করেন এবং তিনি অনসূয়ার স্তন্য পান করেছিলেন লালিত শিশুর মতো। আর তমোগুণপ্রধান রুদ্র স্বাংশে অনসূয়ার গর্ভে সৃষ্টি করেন দুর্বাসা মুনিকে। এইভাবে ভগবান প্রজাপতি অত্রিবংশে অনসূয়ার গর্ভে জন্মলাভ করে চন্দ্রের মাধ্যমে প্রজাসৃষ্টি করেন, চন্দ্রবংশ প্রবর্তিত হয় এইভাবে। বিষ্ণু জন্মলাভ করে দত্তাত্রেয় রূপে বিষয়ভোগ লাভ করেও যোগের মাহাত্ম্য প্রকট করেন; আর দুর্বাসা মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করে উন্মত্ত ব্রত অবলম্বন করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১৭.১-১৬]

□ রামায়ণ রচনার পূর্বে বাল্মীকির কাছে দেবর্ষি নারদ সূত্রাকারে রামচন্দ্রের জীবন-কথা জানান। তারপর বাল্মীকি যোগ অবলম্বন করে রামের জীবন হৃদয়ে অবধারণ করার চেষ্টা করেন। লক্ষণীয়, এই সূত্রাকার রামায়ণ ধারণার মধ্যেও কিন্তু অনসূয়ার মতো এক চরিত্রের প্রসঙ্গ এসেছে—তিনি বনবাসকালে সীতাকে কী-উপহার দিয়েছেন, সে-কথা পর্যন্ত সূত্রাকারে এখানে উল্লিখিত হয়েছে বলেই রামায়ণে এক বিশিষ্টা রমণী হিসেবে তাঁর মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অনসূয়া হলেন ঋষি অত্রির পত্নী। দশহাজার বছর তিনি তপস্যা করেছিলেন এবং এক সময় একটানা দশ বছর অনাবৃষ্টি হলে তিনিই মন্ত্রবলে ফলমূল সৃষ্টি করে এবং জাহ্নবীর গতিপথ পরিবর্তন করে ঋষিদের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করেন।

'যয়া মূলফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্তিতা'।

দেবকার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একবার একরাত্রিকে দশ রাত্রির সমান দীর্ঘ করেছিলেন—

> দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ যয়া সন্ত্বরমাণয়া।
> দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ সেয়ং মাতেব তে'হনঘা॥

[রামায়ণ ১.৩.১৮; ২.১১৭.৮-১২]

এই ধর্মচারিণী, ক্রোধহীনা বৃদ্ধা তপস্বিনী নিজের আচরণের জন্যই সকলের কাছে অনসূয়া বলে বিখ্যাত হন।

'অনসূয়েতি যা লোকে কর্ম্মভিঃ খ্যাতিমাগতা'।

ঋষি অত্রি ও রামের উপদেশে সীতা অনসূয়ার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন।

> সীতা ত্বেতদ্বচঃ শ্রুত্বা রাঘবস্য যশস্বিনী।
> তামত্রিপত্নীং ধর্মজ্ঞামভিচক্রাম মৈথিলী॥

[রামায়ণ ২.১১৭.১৬-১৭]

অনসূয়াও সানন্দে সীতাকে গ্রহণ করেছেন। সীতাকে তিনি সবসময় রামের অনুগমন করতে উপদেশ দিয়েছেন—

> তদেবমেনং ত্বমনুব্রতা সতী
> পতিব্রতানাং সময়ানুবর্ত্তিনী।
> ভবস্ব ভর্ত্তুঃ সহধর্ম্মচারিণী
> যশশ্চ ধর্মঞ্চ ততঃ সমাপ্স্যসি॥

[রামায়ণ ২.১১৭.২৯]

সীতার আচার-আচরণে ও কথায় খুশি হয়ে অনসূয়া সীতাকে উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ প্রভৃতি দান করেন। এরপর যখন কথাপ্রসঙ্গে অত্রিপত্নী সীতার কাছে সীতার বিবাহের কথা জানতে চাইলেন তখন সীতা তাঁর জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। এদিকে কথা বলতে বলতে আশ্রমে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এই দেখে অনসূয়া সীতাকে তাঁর উপহার দেওয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করে রামের কাছে যেতে আদেশ করেছেন। *[রামায়ণ ১.৩.১৮; ২.১১৭.৯-২৯; ২.১১৭.১৬; ২.১১৮.১-৫৪; ২.১১৯.১-১৩]*

পুরাণ-রামায়ণের সর্বত্র অনসূয়াকে আমরা পতিব্রতা সতী হিসেবে পেয়েছি। কখনোই তিনি

কোনো ভাবে স্বামীর বাক্য অতিক্রম করেন না। শুধু মহাভারতের এক জায়গায় দেখছি—মহাদেব-শিবের নানান কৃপা-কাহিনী বলতে বলতে অনসূয়ার প্রসঙ্গ এল। যে কোনো কারণেই হোক অনসূয়া এখানে স্বামী অত্রির ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে শিব-মহাদেবের কাছে চলে গেছেন এবং এমনও ভাবছেন যে, তিনি আর কোনো দিন অত্রির কাছে ফিরে যাবেন না। শিবের স্থানে তিনি তিন বছর বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে তপস্যা করেন। তখন মহাদেব তাঁকে তুষ্ট হয়ে বর দেন যে, তাঁর একটি পুত্র হবে এবং রুদ্রের অনুগ্রহে স্বামী ছাড়াই এই পুত্র হবে—

বিনা ভর্ত্রা তু রুদ্রেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

বিশেষত অনুসূয়ার নামেই সেই পুত্র খ্যাতি লাভ করবে। আমরা জানি অনসূয়ার এই পুত্রের নাম দুর্বাসা এবং রুদ্র-শিবের অংশেই তাঁর জন্ম। প্রশ্ন জাগে—পুত্র-লাভের কারণেই জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি অত্রির সঙ্গে তাঁর কোনো বিসংবাদ হয়েছিল কিনা! অন্যথায় স্বামীর সহায়তা ছাড়াই শিব-রুদ্রের অনুগ্রহে দুর্বাসার জন্ম লাভ করা এবং মাতৃনামে তাঁর পরিচিতির ঘটনাও বেশ কৌতূহলজনক। *[মহা (k) ১৩.১৪.৯৫-৯৭; (হরি) ১৩.১৩.৯৫-৯৭]*

অনসূয়েশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থ দর্শন করলে তীর্থযাত্রী পরমগতি লাভ করে। অত্রি পত্নী সতী অনুসূয়া হয়তো কোনো সময় এইস্থানে শিব-মহাদেবের উপাসনা করেন। সেই কারণে এই স্থানে মহাদেব পূজিত হন অনসূয়েশ্বর নামে।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৪২]

অনাজন্মতীর্থ নারদ ঋষির মাহাত্ম্য ধন্য একটি তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরকে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত এই তীর্থে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তীর্থটি সরক তীর্থের পূর্বদিকে অবস্থিত—

সরকস্য তু পূর্বেণ নারদস্য মহাত্মনঃ।
কুরুশ্রেষ্ঠ শুভং তীর্থমনাজন্মেতি বিশ্রুতম্॥

[মহা (k) ৩.৮৩.৮১-৮২; (হরি) ৩.৬৮.৮১-৮২]

☐ বামন পুরাণে অনাজন্ম তীর্থের উৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। একবার বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করে দানবকুল বিনষ্ট করার পর সিংহীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধ মহাদেব অনুরূপ সিংহাকৃতি ধারণ করে নৃসিংহ-হরির সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মত্ত নৃসিংহদেব ও মহাদেব একটি জলাশয়ে পতিত হন। তখন সেই জলাশয়ের কাছেই অবস্থিত একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে ধ্যান করছিলেন ঋষি নারদ। যুদ্ধরত হর ও হরিকে তিনি দেখেন এবং উভয়ের স্তুতি করেন। যে স্থানে শিব ও হরিকে নারদ একত্রে দেখেছিলেন সেই স্থানটিই সে সময় থেকে অনাজন্ম বা জন্ম নামে খ্যাত হয়।

[বামন পু. ৩৬.২৮-৪০]

☐ পদ্ম পুরাণে আবার অনাজন্মের পরিবর্তে রামজন্ম নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

[পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ. ১২.৮২-৮৩]

☐ বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের কৈথাল জেলার অন্তর্গত দোদা (Dyoda) গ্রাম থেকে ৫ কিমি দূরে অবস্থিত একটি স্থানবিশেষ।

অনাতকী পদ্মপুরাণোক্ত একটি নদীর নাম।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৩.২১]

অনাদি ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার শঙ্করাচার্য অনাদি নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

আদিঃ কারণমস্য ন বিদ্যত ইতি
অনাদিঃ সর্বকারণত্বাৎ।

ঈশ্বর নিজেই এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করেছেন, তাঁকেই সৃষ্টির আদিতম কারণ বলা চলে। কিন্তু ঈশ্বর নিজে কিভাবে বা কী কারণে সৃষ্টি হয়েছেন তা কখনোই নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তিনি যেমন অন্তহীন বা বিনাশহীন তেমনই তিনি আদিহীনও বটে তাই ভগবান বিষ্ণু অনাদি নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১৪; (হরি) ১৩.১২৭.১১৪]

অনাদিকল্পেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। যে ব্যক্তি এই তীর্থ দর্শন করেন, তিনি রাজ্য ও স্বর্গ লাভ করেন। এই তীর্থে বীরভদ্র, চণ্ডিকা ও সিদ্ধেশ্বর দর্শন করলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২০.১০-১৩]

অনাদিনিধন ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার শঙ্করাচার্য এই নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

আদির্জন্মঃ নিধনং বিনাশঃ তদ্দ্বয়ং যস্য
ন বিদ্যতে স অনাদিনিধনঃ।

যাঁর আদি নেই অর্থাৎ যিনি জন্মগ্রহণ করেননি এবং যাঁর নিধন অর্থাৎ বিনাশ বা মৃত্যুও নেই—এই অর্থে ভগবান অনাদিনিধন নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১৮; (হরি) ১৩.১২৭.১৮]

অনাদৃষ্ট পুরুবংশীয় একজন রাজর্ষি অনাদৃষ্ট। বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, অনাদৃষ্টের পুত্র রিবেয়ু। *[বায়ু পু. ৯৯.১২৭]*

অনাদৃষ্টি যদু-বৃষ্ণি বংশীয় বসুদেবের ঔরসে অশ্মকীর গর্ভজাত পুত্র অনাদৃষ্টি।

[বায়ু পু. ৯৬.১৮৬]

অনাধৃষ্টি$_১$ পুরুর তৃতীয় পুত্র রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে দশটি মহাবীর পুত্র জন্মেছিল। তাঁদের মধ্যে ঋচেয়ু ছিলেন প্রধান এবং তিনি এই বংশের পরাক্রমী রাজা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে কেউ ধর্ষণ (ধৃষ্টি) অর্থাৎ পরাভূত করতে পারত না বলে তাঁর অন্য নাম হয় অনাধৃষ্টি—মহাভারতের শ্লোকে 'অনাধৃষ্টি' শব্দটাকে ঋচেয়ু-র বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে—

অনাধৃষ্টিরভূত্তেষাং বিদ্বান্ ভুবি তথৈকরাট্।
ঋচেয়ুরথ বিক্রান্তো দেবানামিব বাসবঃ ॥

এই শ্লোকে টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—একরাট্ অদ্বিতীয়ো রাজা; অতএব তস্য কেনাপি ধর্ষণাসম্ভাবাৎ স অনাধৃষ্টি স্তদাখ্যশ্চাভূৎ।

[দ্র. ঋচেয়ু]

[মহা (k) ১.৯৪.৭-১২; (হরি) ১.৮১.৭-১২]

অনাধৃষ্টি$_২$ বৃষ্ণিবংশীয় শূরের ঔরসে ভোজার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অনাধৃষ্টি ছিলেন অন্যতম। বায়ু পুরাণের পাঠে তাঁকে অনাধৃষ্টিকর বলা হলেও এই পাঠ গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে হয়।

[বায়ু পু. ৯৬.১৪৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৪৯; মৎস্য পু. ৪৬.৩]

মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ জরাসন্ধের পরাক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে সাতজন প্রধান বৃষ্ণিবীরের নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইনি অন্যতম—

কৃতবর্মা হ্যনাধৃষ্টিঃ সমীকঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।

অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহের পর অনাধৃষ্টি, বলরাম, উদ্ধব প্রভৃতিরা নানা যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন। অভিমন্যুর বিবাহের সময়েও সুভদ্রা এবং অভিমন্যুকে নিয়ে যাঁরা উপপ্লব্য নগরীতে আসেন তাঁদের মধ্যে অনাধৃষ্টি অন্যতম। আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যখন শিবির থেকে সৈন্য নির্যান আরম্ভ হয়েছে, তখন অনাধৃষ্টি এবং সাত্যকিকে দেখা যায় যে, তাঁরা অন্যান্য যোদ্ধাদের নিয়ে কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে প্রায় ঘিরে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।

[মহা (k) ২.১৪.৫৮; ১.২২১.৩০; ৪.৭২.২২;
৫.১৫১.৬৭; (হরি) ২.১৪.৫৬; ১.২১৪.৩০; (হরিদাস
৪.৭২.২২ শ্লোকটি ধরেননি); ৫.১৪১.৬৭]

অনাধৃষ্টি$_৩$ ধৃতরাষ্ট্রের একটি পুত্রের নাম। ভীষ্মপর্বে ভীমসেন তখন ধনুক-বাণ নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর শরাঘাতে ধৃতরাষ্ট্রের অনেকগুলি ছেলেই রথ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনাধৃষ্টি একজন। ভূপতিত ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন বসন্তকালের কিংশুক ফুল মাটিতে পড়ে আছে—

বসন্তে পুষ্পশবলাঃ কিংশুকাঃ পতিতা ইত।

[মহা (k) ৬.৯৬.২৬-২৭;
(হরি) ৬.৯২.২৬-২৭]

অনাধৃষ্টি$_৪$ বৃদ্ধক্ষেত্রের পুত্র। তিনি কলিঙ্গ-যোদ্ধাদের যুদ্ধে জয় করে সেই দেশের কন্যাহরণ করে বিবাহ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে মনে হয়। কেননা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, বার্ধক্ষেমি অনাধৃষ্টি যখন দ্রোণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তখন কে তাঁকে দ্রোণের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

[মহা (k) ৭.১০.৫৫; (হরি) ৭.৮.৫২]

অনাধৃষ্য ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম।

[মহা (k) ১.৬৭.১০৪; ১.১১৭.২৩;
(হরি) ১.৬২.১০৬; ১.১১১.১২]

অনাময় ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। শাঙ্করভাষ্যে অনাময় শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

আন্তরৈর্বাহ্যৈর্ব্যাধিভিঃ কর্মজৈর্ন
পীড়্যত ইতি অনাময়ঃ।

আময় শব্দের অর্থ দোষ বা রোগ। ঈশ্বর রোগ-দোষ প্রভৃতির উর্ধ্বে, উপনিষদে এবং অন্যান্য গ্রন্থে অনেক সময়েই বলা হয়েছে যে তিনি জাগতিক কর্ম এবং কর্মফলের ও উর্ধ্বে। সুতরাং কর্মফল জাত পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ-এরও

তিনি ঊর্ধ্বে। তাই রোগ-দোষ-পাপরহিত ভগবান অনাময় নামে কীর্তিত হয়ে থাকেন।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৮৬; (হরি) ১৩.১২৭.৮৬]

অনায়ু দক্ষ প্রজাপতির কন্যা তথা কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী। মৎস্য পুরাণের বিবরণ থেকে মনে হয়, অনায়ু সম্ভবত অনায়ুষা নামেও পরিচিতা ছিলেন। দেবী অনায়ু বা অনায়ুষাকে মৎস্য পুরাণে ব্যাধি সমূহের জন্মদাত্রী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে অনায়ুষা ছিলেন অররু, বল, বৃত্র, বিজ্বর এবং বৃষ—এই পাঁচ মহাবলশালী অসুরের মাতা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একস্থানে অনায়ু সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে, তিনি খেতে অত্যন্ত ভালবাসতেন—অনায়ুর্ভক্ষণেরতা।

[মৎস্য পু. ১৭১.২৯.৫৯;

ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৫৬; ২.৬.৩০; ২.৭.৪৬৮]

□ বায়ু পুরাণের পাঠ থেকে স্পষ্ট হয় যে, দক্ষকন্যা দনায়ু এবং অনায়ু বা অনায়ুষা একই ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ভোজনপ্রীতির কথা বায়ু পুরাণেও উল্লিখিত আছে—দনায়ুর্ভক্ষণে রতা।

[বায়ু পু. ৬৮.৩০; ৬৯.৩৪৬]

অনায়ুষা *[দ্র. অনায়ু]*

অনাহিতাগ্নি আহিতাগ্নি শব্দের অর্থ—যে ব্রাহ্মণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করেন। আর যিনি এইভাবে অগ্নিহোত্র করেন না, তিনি অনাহিতাগ্নি। রামায়ণে দশরথের রাজধানী অযোধ্যার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সেখানে কোনো অনাহিতাগ্নি ব্রাহ্মণের দেখা পাওয়া যেত না—নানাহিতাগ্নি-নাযজ্বা। এখানে রামায়ণের 'শিরোমণি' টীকায় বলা হয়েছে— অনাহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ হলেন তিনি, যিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে অগ্নিহোত্র করেন না—

অনাহিতাগ্নিঃ নিরবচ্ছিন্নাগ্নিহোত্র-রহিতঃ।

বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে—পিতৃগণের মধ্যে যাঁরা অবিরাম অগ্নিহোত্র করেননি তাঁরা অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ নামে পরিচিত—

অগ্নিষ্বাত্তাঃ স্মৃতাস্তে বৈ পিতরো'নাহিতাগ্নয়ঃ।

[রামায়ণ ১.৬.১২;

দ্র. রামায়ণ শিরোমণি টীকা; বায়ু পু. ৩০.৬]

অনিকেত নারদ যুধিষ্ঠিরের কাছে কুবের-সভা বর্ণনার সময় এই নামে এক প্রসিদ্ধ কুবেরানুচর যক্ষের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, অনিকেত সদা-সর্বদা কুবেরের সেবায় নিরত। হয়তো তিনি এমনিতে বৃক্ষতলে বাস করতেন বলে তাকে স্থায়ী কোনো আবাসহীন (অনিকেত) বৃক্ষতলবাসী বলা হয়েছে।

[মহা (k) ২.১০-১৮; (হরি) ২.১০.১৭]

অনিতভা একটি নদী। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বৈদিক ঋষি পৃথিবীতে বৃষ্টিধারাকে আহ্বান জানাতে গিয়ে রসা ও কুভা নদীদ্বয়ের সঙ্গে একত্রে অনিতভার নাম উচ্চারণ করেছেন—

রসানিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিন্ধুনি।

[ঋগ্‌বেদ ৫.৫৩.৯]

বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কান্‌দিয়া (Kandia) নদী। এটি সিন্ধু উপত্যকার অন্তর্গত।

[GRI (Bhargava) p. 123;

Sir Aurel Stein; Archeological Explorer;

J. Mirsky; London; University of Chicago

Press; 1977; p. 535]

অনিদায় পদ্মপুরাণোক্ত দক্ষিণদেশস্থ একটি জনপদ।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৩.৬০]

অনিন্দিত শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামস্তোত্রে অনিন্দিত শব্দটিকে আমরা দুবার মহাদেবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হতে দেখি। পরব্রহ্ম স্বরূপ মহাদেব দোষ বা পাপজাতীয় নেতিবাচক শব্দের ঊর্ধ্বে, নশ্বর জীবের চরিত্রের অন্তর্গত এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। এই জন্য মহাদেব অনঘ নামে প্রসিদ্ধ। এই কারণেই তিনি কখনোই নিন্দনীয় হতে পারেন না। বস্তুত পরমেশ্বর স্তুতি-নিন্দা দুইয়েরই ঊর্ধ্বে—তাই মহাদেব অনিন্দিত নামেও প্রসিদ্ধ।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০০, ১১৩;

(হরি) ১৩.১৬.১০০, ১১২]

অনিবর্তী ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৭৭; (হরি) ১৩.১২৭.৭৭]

অনিবৃত্তাত্মা বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯৬; (হরি) ১৩.১২৭.৯৬]

অনিভদ্র একটি বিশেষ জনজাতির নাম। কিরাত জাতির ভেদবিশেষ। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৪০]*

অনিমিষ$_{১}$ বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের সন্তানদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ৫.১০১.১০; (হরি) ৫.৯৪.১০]*

অনিমিষ$_2$ শিবের অন্যতম নাম। নিমিষ বা নিমেষ শব্দের অর্থ চোখের পলক মেলা বা চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে সেই কাল-পরিমাণকেও নিমেষ বলা হয়ে থাকে। অনিমিষ অর্থে যার চোখের পলক পড়ে না। জগৎ পিতা তথা জগৎপালক মহাদেব নিজের সৃষ্ট জগতের এবং তার অন্তর্গত প্রতিটি প্রাণীর প্রতি সর্বদা নিষ্পলক, সজাগ দৃষ্টি রাখেন। জগৎ সংসারের কোনো ঘটনাই পলমাত্রের জন্যও তাঁর চোখ এড়ায় না বলেই তিনি অনিমিষ। নিমিষ শব্দটিকে যদি কাল পরিমাণের দ্যোতক হিসেবে ধরা যায়, সেক্ষেত্রে অনিমিষ শব্দের অর্থ হবে—যিনি কাল পরিমাণের ঊর্ধ্বে। পরমেশ্বর আদিহীন, যখন কাল বা সময়ের ধারণাও ছিলনা তার বহু পূর্ব থেকেই তিনি আছেন এবং সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও তিনি বর্তমান থাকবেন। ফলে তাঁর অক্ষয় অবিনাশী স্বভাব কাল পরিমাণের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে কখনোই আবদ্ধ হতে পারে না, এই অর্থে পরমেশ্বর-স্বরূপ মহাদেব অনিমিষ নামে খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠ শ্রুতি উদ্ধৃত করে এই দুই মর্মেই ভগবানের অনিমিষ নামটিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪১; (হরি) ১৩.১৬.৪১]

অনিমিষ$_3$ ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। শিবসহস্রনাম প্রসঙ্গে অনিমিষ শব্দের অর্থ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, নিমিষ অর্থাৎ চোখের পলক যার পড়ে না তিনিই অনিমিষ। তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎ এবং জগতের প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাণীর প্রতি তাঁর নিষ্পলক সজাগ দৃষ্টি—তাই ভগবান অনিমিষ নামে খ্যাত। নিমিষ অর্থাৎ চোখের পলক ফেলতে যতটা সময় লাগে। সেক্ষেত্রে নিমিষ শব্দটি কাল পরিমাপের দ্যোতক। তিনি নিত্য, তাঁর আদি অন্ত নেই বলেই তিনি কাল পরিমাপের ঊর্ধ্বে, তাই তাঁর অন্যতম নাম অনিমিষ—

নিত্যপ্রবুদ্ধ-স্বরূপত্বাৎ অনিমিষঃ।

ঔপনিষদিক ভাবনায় পরমেশ্বর নিরাকার, তাঁর দেহ নেই সুতরাং নিমিষ প্রভৃতি জীবদৈহিক ভাবনার ঊর্ধ্বে বলেও তাঁর নাম অনিমিষ। পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু মৎস্য অবতার গ্রহণ করেছিলেন। টীকাকার শঙ্করাচার্য বলছেন যে, মাছের চোখ পলকহীন বলেও মৎস্যরূপধারী ভগবান বিষ্ণু অনিমিষ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩৬; (হরি) ১৩.১২৭.৩৬]

অনিয়ম ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৫; (হরি) ১৩.১২৭.১০৫]

অনিরুদ্ধ$_1$ কৃষ্ণের পৌত্র। প্রদ্যুম্নের পুত্র। পাণ্ডব অর্জুনের কাছে ইনি অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। পাণ্ডবরা তখন সবে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যলাভ করেছেন। এই সময়ে বহু রাজা-রাজন্যদের সঙ্গে কৃষ্ণের পুত্র-প্রপৌত্ররাও এখানে যুধিষ্ঠিরের কাছে এসেছিলেন। অস্ত্রবিদ্যা লাভের জন্য অন্য অনেকের সঙ্গে অনিরুদ্ধও কিছুদিনের জন্য অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন অর্জুনের কাছে।

[মহা (k) ২.৪.৩৫; (হরি) ২.৪.১৩]

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্নের সঙ্গে এসেছিলেন।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৭; (হরি) ১.১৭৯.১৭]

অনিরুদ্ধ এতটাই বীর ছিলেন যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীষ্মের পতন ঘটার পর ধৃতরাষ্ট্র এমনও ভয় পাচ্ছেন যে, যদি কৃষ্ণ কোনো ভাবে বলরাম, অনিরুদ্ধ কিংবা প্রদ্যুম্নকে ডেকে আনেন, তবে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটবে।

[মহা (k) ৭.১১.২৭-৩০; (হরি) ৭.৯.২৭-৩০]

পঞ্চরাত্র, সাত্বত বা ভাগবত ধর্মে যে ব্যূহবাদের কথা আছে, সেখানে সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে যে তত্ত্বগুলি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে অন্যতম তত্ত্ব হলেন অনিরুদ্ধ। এই ভাবনাতে ভগবান বাসুদেব নির্গুণ অথচ চৈতন্যরূপী পরমাত্মা হিসেবে চিহ্নিত। ভগবান বিষ্ণুই এই মতে বিশ্বের নিবাস স্থান এবং তিনি নির্গুণ। তাকেই পুরুষ তত্ত্বে বাসুদেব, জীবভূত সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ বলা হয়।

[মহা (k) ১৩.১৫৮.৩৯; (হরি) ১৩.১৩৬.৩৯]

কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ এখানে জীব-চৈতন্যরূপী তত্ত্ব। প্রলয়কালীন সময়ে যখন প্রকৃতি অব্যক্তা থাকেন, তখন তাঁকে প্রধানরূপে চিহ্নিত করে সাংখ্যদর্শন। ব্যূহবাদীদের মতে অনিরুদ্ধ-তত্ত্বই হলেন ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত বা প্রধান। একটি মতে অবশ্য, অনিরুদ্ধকে প্রথম ব্যক্ত তত্ত্ব মহান্-ও বলা হয়েছে। অনিরুদ্ধের

নাভি-কমলেই প্রথম ব্যক্ত স্বরূপ মহান বা ব্রহ্মার উৎপত্তি। কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন এই ব্যূহবাদে মনঃস্বরূপ।

[মহা (k) ১২.৩৪৭.১১-২৩; ১২.৩৪৭.৬১-৭০; ১২.৩৪১.১৪-১৮; ১২.৩৪৩.৬-৭; ১২.৩৪৪.১৩-১৬; ১২.৩৪০.৩০; ১২.৩৫১.১৯; (হরি) ১২.৩৩১.১১-২২; ১২.৩৩১-৬১-৭০; ১২.৩২৭.১৪-১৮; ১২.৩২৯.৬; ১২.৩২৯.৭৮-৮১; ১২.৩২৬.২৮; ১২.৩৩৪.৪৫; ভাগবত পু. ১.৫.৩৭; ১০.১৬.৪৫; ১০.৪০.২১; ১২.১১.২১; মৎস্য পু. ২৭৬.৯]

□ পুরাণে অনিরুদ্ধ এবং বাণাসুরের কন্যা উষার বিবাহ বিষয়ে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। বাণাসুরের কন্যা উষাকে দেবী পার্বতী বর দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে সে মুগ্ধ হবে সেই ব্যক্তিই তার স্বামী হবে। রাজকন্যা উষা এরপর একরাত্রে স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখে একান্ত মুগ্ধ হলেন। জেগে উঠে বিশ্বস্ত সখী চিত্রলেখাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনালেন। উষার কথা শুনে চিত্রলেখা নানা দেব, গন্ধর্ব এবং মনুষ্যের প্রতিকৃতি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এর মধ্যে কে সেই ব্যক্তি যাকে উষা স্বপ্নে দেখেছেন। উষা অনিরুদ্ধের প্রতিকৃতি দেখে তাঁকেই নিজের স্বামী বলে চিহ্নিত করলেন। তখন চিত্রলেখা নিজে দ্বারকায় গেলেন এবং মায়াবলে সেখান থেকে অনিরুদ্ধকে নিয়ে এলেন বাণাসুরের পুরীতে। বাণাসুরের রক্ষীরা অনিরুদ্ধকে দেখে বন্দী করে ফেলল। এদিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধকে না দেখে তাঁর আত্মীয় স্বজনরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন নারদ এসে কৃষ্ণ প্রভৃতিকে উষা-অনিরুদ্ধর বৃত্তান্ত এবং অনিরুদ্ধ যে বন্দী হয়েছেন সে খবর শোনালেন। কৃষ্ণ বলরাম অন্যান্য বৃষ্ণি যোদ্ধা এবং বিশাল যদু সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাণাসুরের রাজধানী অবরোধ করলেন। বাণাসুর যুদ্ধে পরাজিত হলে অনিরুদ্ধ মুক্তি পেলেন এবং উষার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সুসম্পন্ন হল।

[ভাগবত পু. ১০.৬২.১২, ২০-২৭; ১০.৬৩ অধ্যায়; বিষ্ণু পু. ৫.৩২-৩৩ অধ্যায়]

অনিরুদ্ধ$_{২}$ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত একজন বৃষ্ণিবীর। পূর্বে কৃষ্ণের পরিবারের সঙ্গে যে অনিরুদ্ধ দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে এসেছিলেন, তাঁকে 'প্রাদ্যুম্নি' (অর্থাৎ প্রদ্যুম্নের ছেলে অনিরুদ্ধ) বলে উল্লেখ করার পর যখন অন্যান্য বৃষ্ণি-বংশীয় বীরদের মধ্যে অনিরুদ্ধ এই নামটি পৃথকভাবে উল্লিখিত হচ্ছে তখন তাঁকে অন্য কোনো অনিরুদ্ধ ভাবা যেতে পারে।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৯; (হরি) ১.১৭৯.১৯]

অনিরুদ্ধ$_{৩}$ তৃতীয় এক অনিরুদ্ধের নাম মহাভারতে পাওয়া যাবে, যিনি আশ্বিন মাসে মাংস-ভক্ষণ নিষেধ করেছিলেন এমন এক রাজা। চন্দ্র-সূর্যবংশীয় বিখ্যাত রাজাদের সঙ্গে একত্রে তাঁর নাম উল্লিখিত।

[মহা (k) ১৩.১১৫.৬৯; (হরি) ১৩.১০০.৯৮]

অনিরুদ্ধ$_{৪}$ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান বিষ্ণু অনিরুদ্ধ নামে সম্বোধিত হয়েছেন। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩৩, ৮১; (হরি) ১৩.১২৭.৩৩, ৮১]*

অনির্দেশ্যবপু ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান বিষ্ণু এই নামে সম্বোধিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩২, ৮৩; (হরি) ১৩.১২৭.৩২, ৮৩]

অনির্বিণ্ণ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার তাঁকে অনির্বিণ্ণ নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬০, ১০৮; (হরি) ১৩.১২৭.৬০, ১০৮]

অনিল$_{১}$ অষ্টবসুর অন্যতম। মনোজ এবং অবিজ্ঞাতগতির পিতা। *[কূর্ম পু. ১.১৬. ১৪-১৫]*

অনিল$_{২}$ রাক্ষসরাজ রাবণের মাতামহ সুমালীর ভাই মালীর ঔরসে গন্ধর্বকন্যা বসুদার গর্ভজাত এক রাক্ষস। তিনি বিভীষণের অমাত্যদের মধ্যে একজন। *[রামায়ণ ৭.৫.৪৩-৪৫]*

অনিল$_{৩}$ ধাতুগত অর্থে 'অন্' এই ক্রিয়াপদটির অর্থ জীবন ধারণ করা—to breathe, to live. যে প্রাণবায়ুর দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করে তারই নাম অনিল। ঈশোপনিষদের বিখ্যাত পংক্তিতে মৃত্যুর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বায়ুরনিল মৃতং যথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

এখানে প্রাণবায়ু সেই সর্বাত্মক বায়ুতে মিলিত হবার কথা হচ্ছে। একেই অনিল বলা হয়েছে। প্রাণভৃৎ বায়ুই অনিল। মহাভারতে যোগ-ধারণার মধ্যে প্রাণধারণাত্মক এই অনিল বায়ুকে যোগের

মাধ্যমে কীভাবে রুদ্ধ করা যায়, কীভাবেই বা চলাচল করানো যায় সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে—

অবকাশ-বিশেষেণ কথং বারয়তে' নিলঃ।

এখানে প্রাণবায়ুকেই অনিল বলে উচ্চারণ করেছে মহাভারত—

প্রাণানামনিলো দেহান্ যথা চেষ্টয়তে বলী।

মহাকবি কালিদাস এই সত্যটা জানতেন বলেই বায়ুর দ্বারা ঋষিদের যোগধারণের প্রক্রিয়াকে 'অনিল'-শব্দের দ্বারাই চিহ্নিত করেছেন—

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিনা সৎকল্পবৃক্ষেবনে —টীকাকার রাঘবভট্ট লিখেছেন— যোগের প্রাণধারণক্রিয়া অনিল নামক বায়ুর দ্বারাই সম্পন্ন হয়—প্রাণধারণক্রিয়া অনিলেন বায়ুনা।

[ঈশোপনিষদ (দুর্গাচরণ) ১৭;
মহা (k) ১২.১৮৫.১-২; (হরি) ১২.১৭৯.১-২;
অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ (kale) ৭.১২]

☐ অনিল বা বায়ু দেবতাকে অষ্টবসুর একতর বলে ভাবনা করা হয়েছে মহাকাব্য পুরাণে।

[দ্র. অষ্টবসু]

অনিল$_৪$ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অনিল অন্যতম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান শিব অনিল নামে সম্বোধিত হয়েছেন। উপনিষদে বায়ু ব্রহ্মের অন্যতম স্বরূপ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে যে, যোগাভ্যাসরত ব্যক্তির যখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে তুষার, ধূম, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকে—

নীহারধূমার্কনিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিক শশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃ সরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তি করাণি যোগে॥

[শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২.১১]

☐ উপনিষদের ভাবনায় অনিল বা বায়ু ব্রহ্মেরই একটি রূপ। তাই মৃত্যুর পর জীবাত্মা যখন পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়, সেই সময় শরীরস্থিত প্রাণবায়ু প্রকৃতিতে অবস্থানকারী ব্রহ্মস্বরূপ বায়ুতে বিলীন হয়ে যায় বলে ভাবনা করা হয়েছে। ঈশোপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে—এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। অতএব আমার প্রাণবায়ু দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করে মহাবায়ুতে মিলিত হোক, শরীর ভস্মে মিশে যাক—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

[ঈশোপনিষদ ১৭]

☐ ভগবান শিব উপনিষদে বর্ণিত সেই ব্রহ্মের স্বরূপ তাই উপনিষদে ব্রহ্মের যে নানারূপ বর্ণিত হয়েছে তিনি তারও স্বরূপ। অতএব তিনি বায়ু স্বরূপও বটে। এই ভাবনা থেকেই শিবসহস্রনামস্তোত্রে তাঁকে অনিল নামে সম্বোধন করা হয়েছে। একই কারণে অনিলাভ ভগবান শিবের অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০০, ১০৬;
(হরি) ১৩.১৬.১০০.১০৬]

অনিল$_৫$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান শ্রীহরি 'অনিল' নামে সম্বোধিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩৮, ১০০;
(হরি) ১৩.১২৭.৩৮, ১০০]

অনিলাভ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম।

[দ্র. অনিল$_৪$]

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৩; (হরি) ১৩.১৬.১০৩]

অনিষ্টকর্মা ভাগবত পুরাণে কলিযুগের বিশিষ্ট রাজাদের রাজত্বকাল বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, কলি যুগে মগধে শুঙ্গ এবং কণ্ব বংশের পতনের পর বলি নামে এক শূদ্র রাজা রাজত্ব করবেন। এই বলির বংশে অটমানের পুত্র হলেন অনিষ্টকর্মা। তিনি হালেয়-র পিতা।

[ভাগবত পু. ১২.১.২৪-২৫]

অনীক ভবিষ্যত মন্বন্তরের অধিপতি প্রথম সাবর্ণি মনুর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৬৫]

অনীকবান্ তর্ক নামক অগ্নির জ্যেষ্ঠ পুত্র।

[বায়ু পু. ২৯.৪০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.৪৩]

অনীচক পৌরাণিক শাকদ্বীপে অবস্থিত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে অন্যতম হল শ্যামপর্বত। এই শ্যামপর্বত সংলগ্ন ভূভাগকে অনীচক বা অনীচকবর্ষ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে মৎস্য পুরাণে। 'অনীচ' শব্দটির অভিধানিক অর্থ অনিম্ন অর্থাৎ উন্নত। সেক্ষেত্রে এই অনীচক-বর্ষের এই রকম নামকরণের জন্য সেই অঞ্চলের পর্বত সংলগ্ন নতোন্নত ভূমিভাগের ভৌগোলিক চেহারাটাই মূল কারণ বলে মনে হয়। এই অনীচক বর্ষের অপর নাম আনন্দক বর্ষ।

[মৎস্য পু. ১২২.২৩]

অনীচকবর্ষ *[দ্র. অনীচক]*

অনীতি শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। নীতি বলতে এখানে মূলত ঈশ্বরের আরাধনার যে বৈদিক স্মার্ত বিধি; তার কথাই বলা হয়েছে। তপস্যা, জপ, যাগ-যজ্ঞ, দান-ধ্যান প্রভৃতি ঈশ্বরের আরাধনার যে বিবিধ মার্গ ভগবান শিব তারও ঊর্ধ্বে। স্মার্তবিধির ঊর্ধ্বে গিয়ে শুধুমাত্র অচলা ভক্তির দ্বারাই তাঁর পরমপদ লাভ করা যায়, এই ভাবনা থেকেই মহাদেব-শিব অনীতি নামে খ্যাত। পুনশ্চ 'নী'-ধাতুর অর্থ টেনে নিয়ে যাওয়া, যা অধিকাংশ মানুষকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায় তাকেই নীতি বলে। শিব-মহাদেব অনীতি—অর্থাৎ অন্য কারোর দ্বারা তিনি 'নেয়' নন। তিনি সকলকে শুভের দিকে নিয়ে যান, কিন্তু তাঁকে কেউ কোনো দিকে নিয়ে যেতে পারে না বলেই তিনি অনীতি।

[মহা (k) ১৩.১৭.৮০; (হরি) ১৩.১৬.৮০]

অনীল কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ।

[মহা (k) ১.৩৫.৭; (হরি) ১.৩০.৭]

অনীশ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৮০; (হরি) ১৩.১২৭.৮০]

অনীহ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধারায় দেবানীকের পুত্র ছিলেন অনীহ। অনীহ পারিযাত্র নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। *[ভাগবত পু. ৯.১২.২]*

অনু$_1$ মহারাজ যযাতির ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত মধ্যম পুত্রের নাম।

[মহা (k) ১.৭৫.৩৫; ১.৯৫.৯;
(হরি) ১.৬৩.৩৭; ১.৯০.১২]

শুক্রাচার্যের শাপে যযাতি জরাগ্রস্থ হবার পর তিনি তাঁরই অনুমতিক্রমে যখন পুত্রদের ডেকে জরা গ্রহণ করতে বললেন, তখন অনু জরা নিতে অস্বীকার করলেন। বললেন—জরাগ্রস্ত লোক বালক এবং হীনজাতীয় মানুষের মতো অসময়ে খায় আর বেদোক্ত অগ্নিতেও তারা হোম করতে পারে না। আমি এই বয়সে জরাগ্রস্ত হতে চাই না। যযাতি অভিশাপ দিয়ে বললেন—যা তুমি বললে, তোমার তাই হবে। তুমি জরাগ্রস্ত হওয়ার পর তুমিও অগ্নিতে হোম করতে পারবে না।

[মহা (k) ১.৮৪.২৩-২৬: (হরি) ১.৭২.২৩-২৬]

মহাভারতের নিরপেক্ষ কথক-ঠাকুর বৈশম্পায়ন পরের অধ্যায়ে মন্তব্য করেছেন — অনুর বংশে পরপর ম্লেচ্ছজাতির জন্ম হয় — অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।

[মহা (k) ১.৮৫.৩৪; (হরি) ১.৭৩.৩৪]

পরবর্তী গবেষকেরা মন্তব্য করেছেন যে, অনুর বংশে ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি-ভাবনার প্রকৃত তাৎপর্য্য হল—এই বংশে প্রচুর বর্ণসংকর ঘটেছে। ঋগ্‌বেদে *[১.১০৮.৮]* অনুকে ইন্দ্র-অগ্নির উপাসক আর্য হিসেবেই দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু পরবর্তী কালে অনার্য দাস-দস্যু-শূদ্র সংক্রমণের ফলে এই বংশে ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি চিহ্নিত হয়েছে। পাঞ্জাবের ঝাঙ জেলায় শোরকোট অঞ্চলে এঁরা রাজত্ব করতেন।

[TIM (Mishra) pp. ২৮-২৯,৩২,৬৬,২৯৯]

☐ পুরাণে বলা হয়েছে যে, যযাতি পুত্র অনু সভানর, চক্ষু (চাক্ষুষ) এবং পরেক্ষু বা পরমেক্ষু নামে তিন পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৯.১৮.৩৩, ৪১; ৯.১৯.২২; ৯.২৩.১;
বিষ্ণু পু. ৪.১০.১-২; ৪.১৮.১; বায়ু পু. ৯৩.১৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.১৬-১৭;
২.৬৮.৫১-৭৯; ২.৭৪.১২;
মৎস্য পু. ৩৩.২১-২৪; ৪৮.১০]

অনু$_2$ জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, যাঁরা ভগবান বিষ্ণুর প্রভাব সম্যকভাবে জানতেন, রাজর্ষি অনু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ২.৭.৪৪]*

অনু$_3$ বৃষ্ণিবংশীয় কুরুবশের পুত্র ছিলেন অনু। এই অনুর পুত্র ছিলেন পুরুহোত্র (অন্যমতে পুরুমিত্র)। পুরুমিত্র বা পুরুহোত্র বিখ্যাত বৃষ্ণিবীর সাত্বতের পিতামহ ছিলেন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৫-৬; বিষ্ণু পু. (নবভারত)
৪.১২.১৬; (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১২.৪২]

অনু$_4$ বৃষ্ণিবংশীয় অন্ধকের বংশধারায় বিলোমার পুত্র ছিলেন অনু। তিনি তুম্বুরুর সখা ছিলেন এবং বসুদেবের এই পূর্বপুরুষ অনুর নামও আনকদুন্দুভি ছিল বলে জানা যায়। তবে বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে পাঠভেদ থাকায় সেখানে বিলোমের পুত্র ভব নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৪.১৩-১৪;
(নবভারত) ৪.১৪.৪]

☐ বিষ্ণু পুরাণের পাঠান্তরের কারণে অনুর

পরিচয় নিয়ে যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে ভাগবত পুরাণের পাঠ থেকে তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে যে অন্ধকবংশীয় বিলোমের পুত্র কপোতরোমা, কপোতরোমার পুত্র ছিলেন তুম্বুরু গন্ধর্বের প্রিয় সখা অনু। অনুর পুত্র অন্ধক এবং দুন্দুভি। অনুর পুত্রকে (অন্ধককে) যদি তদ্ধিত প্রত্যয়ে শুধুই আনক বলা যায়, তাহলে আনকদুন্দুভি বলতে অন্ধক এবং দুন্দুভি দুজনকেই বোঝানো যায়।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.২০]

অনু$_{৫}$ মহর্ষি লৌগাক্ষীর অন্যতম শিষ্য।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৪১]

অনুকর্মা বিশ্বেদেবগণের অন্যতম দেবতা।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে দাঁড়ায় সমস্ত দেবতা। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন—'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা- বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতা। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেব বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবগণের পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিককালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

☐ পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

☐ বিশ্বেদেবগণের মধ্যে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম পালটে যায় এবং তাঁদের সংখ্যাও একেক জায়গায় এক এক রকম। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বিশ্বেদেব-গণের যে সব নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনুকর্মা।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩২; (হরি) ১৩.৭৮.৩২]

অনুকারী শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। অনুকারী অর্থাৎ যিনি কোনো বিষয় বা কার্যকলাপের অনুকরণ করেন। ভক্তবৎসল শিব-তাঁর ভক্তদের মনোবাঞ্ছার অনুকরণ করেন। অর্থাৎ ভক্ত যে ভাবনা করে বা যা ইচ্ছা করে, তার অনুরূপ ঘটনাই বাস্তবে ঘটান তিনি—ভক্তের প্রসন্নতার জন্য। তাই ভক্তবৎসল শিবের অপর নাম অনুকারী।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯১; (হরি) ১৩.১৬.৯১]

অনুকূল ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫০; (হরি) ১৩.১২৭.৫০]

অনুকৃষ্ণ একজন ঋষি। ইনি কৃষ্ণ যজুর্বেদের চরক শাখার অন্যতম ঋষি ছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১৩]

অনুক্রমণিকা-পর্ব (অনুক্রমণী) মহাভারতের প্রথম অধ্যায়কে অনুক্রমণিকা পর্ব বলা হয়। ক্রম্-ধাতুর অর্থ চলা, যাওয়া। মহাভারত কথা চলার অনুক্রম, মানে কোনটার পরে কোনটা যাচ্ছে—এইরকম একটা বিষয়ানুসারী অনুক্রম, প্রায় একটা বিষয়সূচীই হল অনুক্রমণিকা-পর্ব। কেউ কেউ এটাকে মহাভারতের অবান্তর-পর্ব বলেও উল্লেখ করেন। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় ব্যাসের নির্দেশে বৈশম্পায়ন মহাভারত বর্ণনা করেন। লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি ব্যাসের লেখা মহাভারত-কথা শুনেছিলেন ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে। এরপর উগ্রশ্রবা সৌতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করে সমন্তপঞ্চকে পৌঁছান। সেখান থেকে আসেন নৈমিষারণ্যে, যেখানে মহর্ষি শৌনকের তত্ত্বাবধানে বারো-বছরের এক যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছিল। এখানে উপস্থিত শৌনকাদি ঋষিরা উগ্রশ্রবার কাছে মহাভারত-কথা শুনতে চাইলে উগ্রশ্রবা যথাবিহিত দেবতা স্মরণ করে মহাভারতের কথা বলতে আরম্ভ করেন। এখানেই মহাভারত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা উচ্চারণ করে উগ্রশ্রবা সৌতি বলেন—জগতে এই ইতিহাস-কথা আগের কবিরাও বলেছেন, এখন অন্য কবিরাও বলছেন এবং পরেও অন্যতর কবিরা বলবেন—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥

বস্তুত এই শ্লোকের ওপরে নির্ভর করেই

বিভিন্ন সময়ে মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্তাংশ-গুলি সদর্থকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

উগ্রশ্রবা বলেছেন—মহাভারতের কথন প্রক্রিয়া কখনো সংক্ষিপ্তভাবেও হয়েছে আবার কখনো বা বিস্তারিতভাবে—

বিস্তরৈশ্চ সমাসৈশ্চ ধার্য্যতে যদ্দ্বিজাতিভিঃ।

মহাভারত-পাঠের ক্ষেত্রেও তিনটি প্রকার আছে বলে জানিয়েছেন উগ্রশ্রবা। কেউ কেউ একেবারে প্রথম থেকে অর্থাৎ 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' থেকে (মতান্তরে মহাভারতে যেখানে প্রথম মনুর কথা আরম্ভ হয়েছে—'ধর্মাত্মা স মনু র্ধীমান্' অথবা 'পুরূরবাস্ততো বিদ্বান্ ইলায়াং সমপদ্যত'—এখান থেকে) মহাভারত আরম্ভ করেন। কেউ কেউ পাঠ আরম্ভ করেন 'আস্তীকোপাখ্যান' থেকে। কেউ কেউ আবার 'উপরিচর বসু-র উপাখ্যান থেকে।

মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে॥

মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা প্রাথমিক দৃষ্টিতে এক লক্ষ—

ইদং শতসহস্রন্তু শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।

এর মধ্যে উপাখ্যান ভাগ বাদ দিয়ে চব্বিশ হাজার শ্লোকে মহাভারত রচিত হয়েছিল—এটাও একটা মত—

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারত সংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবৎ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

আর দেড়-শো শ্লোকে রচিত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অনুক্রমণিকা-পর্ব—

ততো'ধ্যৰ্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।

উগ্রশ্রবা বলেছেন—বেদব্যাস ষাট লক্ষ শ্লোকে অপর এক মহাভারত রচনা করেন। তার ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পনেরো লক্ষ পিতৃলোকে প্রতিষ্ঠিত, চোদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বৈশম্পায়ন যে মহাভারত শুনিয়েছিলেন সেখানে ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়-সংবাদের মাধ্যমে মহাভারতের কাব্যিক বিষয়সূচি উপস্থাপনা করেন।

মহাভারতের এই উপক্রমণিকা-পর্বকে মহাভারতের শরীর বলা হয়—

ভারতস্য বপুর্হ্যেতৎ সত্যঞ্চামৃতমেব।

[মহা (k) ১.১.১-২৭৫; (হরি) ১.১.১-২৩৬]

অনুক্রমণিকাধ্যায় মহাভারতের আদিপর্বে মহাভারতীয় বৃত্তান্তগুলির সারাৎসার সূচনা করা আছে। দেড়-শত শ্লোকে সমস্ত পর্বেরই বৃত্তান্ত হল অনুক্রমণিকা। আজকের ভাষায় এটাই মহাভারতের সূচিপত্র। মহাভারত-রচয়িতা ব্যাস প্রথমে এই সারাৎসারটুকুই পুত্রকে শিক্ষা দিয়েছিলেন—

ততো'ধ্যর্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তং সর্বপর্বণাম্।
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্॥

[মহা (k) ১.১.১০৩-১০৪; ১.১.২৬২;
(হরি) ১.১.৬৫-৬৬; ১.১.২২৪]

অনুগীতা মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যাবার পর কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ফিরে যাবেন, সেই সময়ে সভাগৃহের একান্তে দাঁড়িয়ে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন—কৃষ্ণ! সেই যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছিল, সেই সময় আমার সমস্ত ভ্রান্তি দূর করার জন্য ভগবদ্‌গীতার উপদেশ দিয়েছিলে। কিন্তু আজ দুর্ভাগ্যবশত সেই সব উপদেশগুলি অনেকটাই আমি ভুলে গিয়েছি। কিন্তু সেই বিস্মৃত বিষয়গুলিতে আমার কৌতূহল এখনও আছে বলেই আমি তোমাকে আবার সেগুলি বলার জন্য অনুরোধ করছি।

কৃষ্ণ একটু রেগেই গেলেন প্রিয় বন্ধুর ওপর এবং বললেন—সেই সময়ে পরম গুহ্য দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব তোমাকে শুনিয়েছি, কিন্তু বুদ্ধিস্থিতি দিয়ে গ্রহণ-ধারণের মাধ্যমে তুমি যে সেসব কথা মনে রাখোনি, সেটা আমার কোনো প্রিয় কাজ করোনি তুমি—

অবুদ্ধ্যা নাগ্রহীর্যস্ত্বং তন্মে সুমহদপ্রিয়ম্।

তাছাড়া আমার দিক থেকেও একথা ঠিক যে, তখন যেভাবে সমস্ত মন-প্রাণ সংযোগ করে তোমাকে যেসব কথা বলেছিলাম, আজ আমারও তা তেমন করে মনে নেই। তখন সম্পূর্ণ যোগযুক্ত অবস্থায় পরম যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ তোমাকে দিয়েছিলাম, তা আজ সেই ভাবে বলা আর সম্ভব নয়—

ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥

এর পরে অবশ্য কৃষ্ণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কথা অর্জুনকে শোনান এবং মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বের ১৬ অধ্যায় থেকে ৯২ অধ্যায়

পর্যন্ত কৃষ্ণের এই উপদেশটুকু অনুগীতা-পর্ব নামে মহাভারতে চিহ্নিত।

[মহা (k) ১৪.১৬.২-১৩; (হরি) ১৪.১৭.২-১৩;
মহা (k) ১৪.১৬-৯২ অধ্যায়;
(হরি) ১৪.১৭-৬৬ অধ্যায়]

অনুগোপ্তা বিশ্বেদেবগণের অন্যতম দেবতা।

ঋগ্বেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে দাঁড়ায় সমস্ত দেবতা। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন— 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা-বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতা। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেব বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবগণের পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিককালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

বিশ্বেদেবগণের মধ্যে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম পালটে যায় এবং তাঁদের সংখ্যাও একেক জায়গায় এক একরকম। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যে সব নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনুগোপ্তা।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩৭; (হরি) ১৩.৭৮.৩৭]

অনুগ্রহ ভৌত্য মনুর পুত্র। *[মার্কণ্ডেয় পু. ১০০.৩২]*

অনুচক্র তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচররূপে স্কন্দকে দান করেন। প্রজাপতি ত্বষ্টা তাঁর যে দুইজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, অনুচক্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৪০; (হরি) ৯.৪২.৩৮]

অনুচর দ্বাদশ মন্বন্তরে যখন রুদ্রপুত্র সাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, হরিত তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্গত দশজন দেবতার মধ্যে অন্যতম হলেন অনুচর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮৪]

অনুজীবী রাজার অধস্তন কর্মচারী, কিংবা রাজার ওপরে নির্ভর করে যাঁরা জীবন যাপন করেন, তাঁদের ব্যবহার কেমন হবে, রাজার সামনে পিছনে তাঁদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, মন্ত্রী, অমাত্য, রাজপুত্র এবং রাজবল্লভ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের কেমন ব্যবহার হওয়া উচিত। সেই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ এক অধ্যায় জুড়ে বিশদ আলোচনা আছে মৎস্য পুরাণে।

[মৎস্য পু. ২১৬.১-৩৮]

অনুতপ্তা$_1$ শাকদ্বীপের একটি নদী। সুকুমারী গঙ্গার আরেক রূপ। সপ্তগঙ্গার মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৪৯.৯১]

অনুতপ্তা$_2$ প্লক্ষদ্বীপের একটি নদী। এটি প্লক্ষদ্বীপে প্রবাহিত সাতটি মহানদীর মধ্যে একটি।

[বায়ু পু. ৪৯.১৭; বিষ্ণু পু. ২.৪.১১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.১৯]

অনুতাপন কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব। *[ভাগবত পু. ৬.৬.৩১]*

অনুত্তম বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২২; (হরি) ১৩.১২৭.২২]

অনুদাত্ত 'পাঞ্চজন্য' অগ্নি আপন দুই বাহু থেকে উদাত্ত এবং অনুদাত্ত স্বর সৃষ্টি করেন। বেদের মন্ত্রভাগে অনুদাত্তই মূল প্রাকৃত স্বর, আর ব্রাহ্মণভাগে সেটাই মূল থেকে অন্যরকম অর্থাৎ বৈকৃত স্বর। পাঁচ জন ঋষিকে অগ্নি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এই পাঁচ অগ্নিস্বরূপ ঋষির মধ্যে প্রাণের পুত্র হলেন অনুদাত্ত।

[মহা (k) ৩.২২০.৮-১০; (হরি) ৩.১৮৩.৮-১০]

অনুদৃক মরুৎগণের অন্তর্গত অন্যতম দেবতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। *[বায়ু পু. ৬৭.১২৯]*

অনুদ্যূত (অনুদ্যূতপর্ব) প্রথমবার পাশাখেলা শেষ হয়ে যাবার পর পাণ্ডবরা বনবাসের পণ লাগিয়ে দ্বিতীয়বার যে পাশা খেললেন এবং হারলেন, সভাপর্বের সেই অংশকে অনুদ্যূত বা অনুদ্যূতপর্ব বলা হয়। *[মহা (k) ২.৭৪-৮১ অধ্যায়; (হরি) ২.৭১-৭৮ অধ্যায়]*

অনুপদেব অক্রূরের ঔরসে উগ্রসেনা বা উগ্রসেনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৯৬.১১২]

অনুপাবৃত্ত *[দ্র. উপাবৃত্ত]*

অনুপালিকা মহর্ষি বিশ্রবার ঔরসে বাকার গর্ভে (সম্ভবত ইনিই রাকা নামেই খ্যাত ছিলেন) জাত কন্যার নাম অনুপালিকা। বায়ু পুরাণের পাঠে অবশ্য ইনি অশনিকা নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[বায়ু পু. ৭০.৫০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৫৬]

অনুবচন অধ্বর্যু কোনো কর্মে প্রবৃত্ত হলে হোতা বা তাঁর সহকারী তাঁর কর্মানুকূল যে মন্ত্র পাঠ করেন, সেটাই অনুবচন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—

দীক্ষণীয়েষ্টির অগ্নিসমিন্ধন কর্মে অধ্বর্যু প্রবৃত্ত হলে হোতা সামিধেনী মন্ত্র পড়বেন— অর্থাৎ অগ্নি-প্রজ্বালন করার জন্য ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করবেন—সপ্তদশ সামিধেনীরনুব্রূয়াৎ। এখানে 'অনুব্রূয়াৎ' শব্দটিকেই 'অনুবচন' হিসেবে গ্রহণ করেছেন সায়নাচার্য।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ১.১.১ পৃ. ১১; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (অমর) ১.২.২৩]

অনুবন্ধ্যা সোমযাগের সমাপ্তিতে অবভৃথ স্নানের পর বন্ধ্যা গাভী অথবা গাভীর অভাবে বৃষের দ্বারা যে পশুযাগ সম্পন্ন হয়।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ১৩.২৩.৬-৭, পৃ. ৫২০; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite) ১০.৯.১২-১৩; ২০.৮.২৩]

পণ্ডিত R.N. Dandekar জানিয়েছেন—যজ্ঞীয় পশুটিকে আগে থেকেই একটি লাঠি বা খোঁটা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। রান্না করা অন্নের একটি আহুতি অদিতি দেবতার উদ্দেশে দেওয়া হয় ওই বন্ধন কালের মধ্যেই।

অনুবষট্‌কার অধ্বর্যু যখন আহুতি দেন, হোতা সেই সময় যাজ্যা-মন্ত্র পাঠ করে বৌষট্ উচ্চারণ করেন, তারপরে 'অগ্নে বীহি' অর্থা 'অগ্নি তুমি ভক্ষণ কর'—এইরকম বলে আবারও বৌষট্' উচ্চারণ করেন। এই দ্বিতীয় বার 'বৌষট্' উচ্চারণের নামই অনুবষট্‌কার। ইষ্টিযাগে প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎ যাগ হয়, এই যাগে অনুবষট্‌কার বিহিত নয়, আবার প্রবর্গ্য কর্মে অনুবষট্‌কার বিহিত।

[আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (অমর) ২.১৬.১৫, পৃ. ১৩৯]

অনুবাক মহাভারতে অন্তত তিন-চার বার এই কথাটা বলা হয়েছে যে, 'তোমার বুদ্ধিটা অনেকটাই সেই বোকা-বোকা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মতো, যিনি বেদমন্ত্রের অর্থ কিছু বোঝেন না, শুধু বেদাক্ষরের আবৃত্তি-পুনরাবৃত্তি করেই ভাবেন যে, খুব ধর্ম হচ্ছে—

শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্ মন্দ কস্যাবিপশ্চিতঃ।
অনুবাকহতা বুদ্ধিঃ ধর্মমেবৈকমীক্ষতে॥

এই কথাটা কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে। আবার কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির যখন কিছুতেই রাজা হতে চাইছেন না, তখন ভীমও ওই একই কথা বলেছেন যুধিষ্ঠিরকে—

অনুবাকহতা বুদ্ধির্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী।

[মহা (k) ৫.১৩২.৬; ১২.১০.১; (হরি) ৫.১২৩.৬; ১২.১০.১]

অনুবাক মানে সাধারণত অনুবচন। বেদ-পাঠ করানোর সময় আচার্যের পাঠ অনুসরণ করে শিষ্যের আবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তির প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি। এমনিতে কতগুলি ঋগ্‌বৈদিক মন্ত্রের সমষ্টি যেমন এক-একটি সূক্ত, তেমনই কতগুলি সূক্তের সমষ্টি হল এক-একটি অনুবাক, কতগুলি অনুবাক নিয়ে এক-একটি মণ্ডল। আচার্য শিষ্যকে মন্ত্রপাঠ শেখানোর সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ত দিয়ে তৈরি ছোটো ছোটো অনুবাক শেখাতে থাকেন, যেমনটি সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে—

ক্ষুদ্রসূক্তেষ্বনুবাকম্। যাবদ্বা গুরুর্মন্যেত। অনুবাকস্য বা।

কিন্তু পড়ানোর সময় যে প্রক্রিয়া, সেখানে শিষ্য বলেন—এবারে শ্রুতিমন্ত্র বেদমন্ত্র বলতে থাকুন, আচার্য—

শ্রুতিং ভোতঅনুব্রূহীতি।

আচার্য বলবেন—এই আমি তোমাকে বেদমন্ত্র বলছি, আমার উচ্চারণের পরেই তুমি বল—

শ্রুতিং তে অনুব্রবীমি ইতি।

এই পঠন-পাঠনের পদ্ধতির মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা আছে, অর্থ না বুঝে শুধুই স্বাধ্যায়-

অধ্যয়নের শুষ্কতা আছে, যাতে ধর্ম-পালন হয় বটে, কিন্তু বেদের তত্ত্ববোধ হয় না। সেই কারণে মহাভারত সেটাকে অবিদ্বান মন্দ শ্রোত্রিয়ের ধর্মপালনের অভ্যাস-মাত্র বলেছে।

[Katyayana's Sarvanukramani (Macdonell) নামক গ্রন্থে শৌনককৃত অনুবাকানুক্রমণী, শ্লোক ৬-৭, পৃ. ৪৭; Sankhayana Grihyasutram. Ed. S.R. Sehgal 2.7.15, 20-24]

অনুবাক্যা ইষ্টিযাগের অন্তর্গত প্রধান এবং অপ্রধান যাগে যজ্ঞের আহুতি হাতে নিয়ে অধ্বর্যু হোতার উদ্দেশে বলেন 'অমুষ্মা অনুব্রূহি', আপনি অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন। তখন হোতা নির্দিষ্ট দেবতাকে অনুকূল করার জন্য যে মন্ত্রগুলি পাঠ করেন, তার নাম অনুবাক্যা অথবা পুরো'নুবাক্যা।

[কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite) ১.৯.১৩, ১৫; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (অমর) ১.১০.১; আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ১.৫.২৯]

অনুবিন্দ$_১$ প্রায় সব সময়েই বিন্দ নামে অন্যতর এক রাজার সঙ্গে ইনি উল্লিখিত হয়েছেন এবং প্রায় সব সময়েই এঁদের দুজনকেই বলা হয়েছে 'আবন্ত্যৌ' অর্থাৎ অবন্তীদেশের দুই রাজা অথবা দুই অবন্তীদেশের রাজা— 'বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ'। অবন্তীদেশের রাজা হিসেবে দুই জনেরই উল্লেখ থাকায় পণ্ডিতেরা অনেকেই ধারণা করেছেন যে, অবন্তী-দেশে দুই রাজার শাসন বা দ্বৈরাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বৈরাজ্য বা দ্বিরাজক শাসনতন্ত্র প্রধানত পিতা-পুত্রের বা দুই সহোদর ভাইয়ের একই দেশে, ভাগাভাগি করে পৃথক শাসন—

পিতাপুত্রয়োঃ ভ্রাত্রোর্বা।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ৮.২.৭]

বিন্দ এবং অনুবিন্দ দুই ভাই ছিলেন বলে মনে হয় এবং তাঁরা অবন্তীদেশ ভাগ করে রাজ্যশাসন করতেন—বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ সৈন্যেন মহতা বৃতৌ। মহাভারতের সভাপর্বে সহদেবের হাতে দুই ভাইই পরাস্ত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ২.৩১.১০; (হরি) ২.৩০.১০]

পৃথক্‌ভাবে একই দেশ শাসন করলেও দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল যথেষ্ট। এঁরা একসঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিতেন। কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করার সময় অর্জুনপুত্র ইরাবান অনুবিন্দের চার ঘোড়ার রথ বাণ দিয়ে কেটে ফেলেন। তাঁর ধনুকটিও কাটা পড়ে। ইরাবানের যুদ্ধে বিপন্ন হয়ে তাঁকে নিজের রথ ছেড়ে ভাই বিন্দের রথে উঠে যুদ্ধ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত সহদেবের কাছে পরাস্ত হলেও এঁরা চমৎকার যোদ্ধা ছিলেন।

[মহা (k) ৬.৮৩.১৬-২৩; (হরি) ৬.৮০.১৬-২৩]

দ্রোণপর্বের যুদ্ধকালে অর্জুন একদিন দিবাবসানে ক্লান্ত। এই সময়ে বিন্দ-অনুবিন্দ তাঁকে আক্রমণ করেন। ক্রুদ্ধ অর্জুনের বাণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিন্দ নিহত হলে ভগ্নরথ অনুবিন্দ যুদ্ধ করতে নেমে পার্থসারথি কৃষ্ণের মাথায় গদাঘাত করেন, যদিও সেটা তেমন করে লাগেনি তাঁর মাথায়। শেষে অর্জুনের হাতে তিনিও নিহত হন।

[মহা (k) ৭.৯৯.১৭-৩০; (হরি) ৭.৮৬.১৭-৩০]

ভাগবত পুরাণে এই অনুবিন্দ বসুদেবের অন্য এক ভগিনী রাজাধিদেবীর পুত্র। এখানেও তাঁর ভাই বিন্দ, যদিও তাঁরা অবন্তীরাজপুত্র। কিন্তু তাঁদের একটি বোনও আছে, যাঁর নাম মিত্রবিন্দা। মিত্রবিন্দা স্বয়ংবর সভায় কৃষ্ণকে বরণ করতে চাইলে দুর্যোধনের প্ররোচনায় বিন্দ এবং অনুবিন্দ সেই পরিকল্পনা বিনষ্ট করে দেন—

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্যোধন-বশানুগৌ।

কৃষ্ণ সমস্ত রাজাদের সামনেই মিত্রবিন্দাকে হরণ করেন এবং বিবাহ করেন। বিন্দ এবং অনুবিন্দ অনেক আগে থেকেই কৃষ্ণদ্রোহী ছিলেন। মাগধ জরাসন্ধের আনুগত্যে পূর্বে তাঁরা মথুরা অবরোধ করে জরাসন্ধকে সাহায্য করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৫৮.৩০; ভাগবত পুরাণ (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৫০.১১; পাদটীকা ৩নং শ্লোক; ১০.৫২.১১; পাদটীকা ৯নং শ্লোক]

অনুবিন্দ$_২$ কেকয়-দেশের এক রাজা, যিনি ভাইয়ের সঙ্গে কৌরব দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে। লক্ষণীয়, এঁর নামও অনুবিন্দ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিন্দ—

বিন্দানুবিন্দৌ কৈকেয়ৌ সাত্যকিঃ সমবারয়ৎ।

এঁরা দুজনেই কর্ণের সেনাপতিত্ব-কালে সাত্যকির হাতে মারা যান।

[মহা (k) ৮.১৩.৬-৩৬; (হরি) ৮.১০.৬-৩৬]

বায়ু পুরাণে বিন্দ এবং অনুবিন্দকে কেকয়-রাজার ঔরসে শ্রুতকীর্তির পুত্র বলে বলা হয়েছে। শ্রুতকীর্তি কৃষ্ণপিতা বসুদেবের ভগিনী।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১১; বায়ু পু. ৯৬.১৫৬-১৫৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৫৮]

অনুবিন্দ$_৩$ ধৃতরাষ্ট্রের একশ পুত্রের একজন এবং এখানেও তাঁর বড়ো ভাইয়ের নাম বিন্দ। মনে হয়, সেকালে দুই ভাইয়ের নাম হিসেবে বিন্দ এবং অনুবিন্দ বেশ জনপ্রিয় ছিল। বনপর্বে দুর্যোধনের ঘোষযাত্রার ষড়যন্ত্রে ইনি দুর্যোধনের সঙ্গে গিয়েছিলেন দ্বৈতবনে এবং দুর্যোধনের সঙ্গেই গন্ধর্ব চিত্রসেনের হাতে বন্দি হন। দ্রোণের সেনাপতিত্বকালে অনুবিন্দ তাঁর অপর অনেকগুলি ভাইয়ের সঙ্গেই ভীমের হাতে মারা পড়েন।

[*মহা (k) ১.৬৭.৯৪; ১.১১৭.৩; ৩.২৪২.৮; ৭.১২৭.৩৪; ৭.১২৭.৬৬; (হরি) ১.৬২.৯৬; ১.১১১.৩; ৩.২০৫.৮; ৭.১১০.৭৭; ৭.১১০.১০৮*]

অনুবৃত্তা পুলহ প্রজাপতির ঔরসে খবার গর্ভজাত কন্যা সন্তানদের মধ্যে অন্যতম। এই অনুবৃত্তা থেকে মণ্ডূক (ব্যাঙ) এবং মণ্ডূক জাতীয় অন্যান্য প্রাণীদের জন্ম হয়। [*বায়ু পু. ৬৯.২৯১, ২৯৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪১৪, ৪১৮*]

অনুব্রত$_১$ শূরের ঔরসে ভোজরাজকন্যার গর্ভে যে পাঁচটি কন্যার জন্ম হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রুতকীর্তি। ইনি কেকয়রাজের পত্নী ছিলেন। শ্রুতকীর্তির গর্ভে কেকয়রাজের অনুব্রত নামে এক পুত্রসন্তান হয়। মৎস্য পুরাণে এই অনুব্রতকে শ্রুতকীর্তির একমাত্র পুত্র বলা হলেও অন্যান্য পুরাণে শ্রুতকীর্তির সন্তর্দন প্রভৃতি পাঁচ পুত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

[*মৎস্য পু. ৪৬.৫; বায়ু পু. ৯৬.১৫৬-১৫৭; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১১*]

অনুব্রত$_২$ কলিযুগে মগধে রাজত্বকারী অন্যতম রাজা। ইনি বৃহদ্রথের বংশধারায় ক্ষেমের পুত্র তথা সুনেত্রের পিতা ছিলেন। রাজা অনুব্রত ষাট বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।

[*মৎস্য পু. ২৭১.২৫*]

অনুব্রত$_৩$ শাকদ্বীপের অধিবাসীরা যে চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিল তার মধ্যে অন্যতম বর্ণ (সম্ভবত শূদ্র বর্ণের সমার্থক) ছিল অনুব্রত। [*ভাগবত পু. ৫.২০.২৭*]

অনুভানু কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[*বায়ু পু. ৬৮.১৪*]

অনুভূমি একজন ঋষি। ইনি কৃষ্ণ যজুর্বেদের চরক শাখার অন্যতম ঋষি ছিলেন।

[*ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১৩*]

অনুমতি$_১$ স্কন্দ কার্তিকেয়র অভিষেকের সময় উপস্থিত একজন দেবী।

[*মহা (k) ৯.৪৫.১৩; (হরি) ৯.৪২.১৩*]

অনুমতি$_২$ শাল্মলীদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষের মধ্য দিয়ে যে প্রধান সাতটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি নদী হল অনুমতি।

[*ভাগবত পু. ৫.২০.১০; দেবীভাগবত পু. ৮.১২.২৩-২৪*]

অনুমতি$_৩$ দেবী শক্তির একটি রূপ।

[*ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৩২.১২*]

অনুমতি$_৪$ জনৈক ঋষি। মৎস্য পুরাণ তাঁর নাম উল্লেখ করেছে ভৃগুবংশীয় ঋষি হিসেবে। অর্থাৎ মহর্ষি অনুমতি বংশ অথবা শিষ্য পরম্পরায় ভৃগুবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বলে মনে হয়। [*মৎস্য পু. ১৯৫.২৮*]

অনুমতি$_৫$ মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে শ্রদ্ধার গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি ধাতার পত্নী তথা পূর্ণিমার মাতা ছিলেন বলে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য পুরাণ মতে অনুমতি ছিলেন অঙ্গিরার ঔরসে স্মৃতির গর্ভজাত কন্যা।

[*ভাগবত পু. ৪.১.৩৪; ৬.১৮.৩; বায়ু পু. ২৮.১৫; বিষ্ণু পু. ১.১০.৭; মার্কণ্ডেয় পু. ৫২.২০*]

□ পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী উদিত চন্দ্রের আকৃতির বিচারে পূর্ণিমা তিথি দুই প্রকার। যে পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র এককলা কম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সেই পূর্ণিমা তিথিকে অনুমতি বলা হয়ে থাকে।

[*বায়ু পু. ৫৬.৩৫*]

□ মৎস্য পুরাণ থেকে জানা যায়, পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র পূর্ণতা লাভ করেন এবং পিতৃদেবগণ সানন্দে এই ঘটনাকে অনুমোদন করেন বলেই পূর্ণিমার আর একনাম অনুমতি।

[*মৎস্য পু. ১৪১.৩৩*]

□ পুরাণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, যখন সূর্য এবং চন্দ্রকে আকাশে একই সঙ্গে অবস্থান করতে দেখা যায়, মূলত সেই সময়কালটিরই অপর নাম অনুমতি। অনুমতি দুই লব পরিমাণ সময় স্থায়ী হয়ে থাকে।

[*মৎস্য পু. ১৪১.৫০; বায়ু পু. ৫৬.৫৫*]

অনুমন্তা ষষ্ঠ মন্বন্তরে যখন চাক্ষুষ মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, আদ্য তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই

আদ্যগণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনুমন্তা।

বায়ু পুরাণে চাক্ষুষ মন্বন্তরের এই দেবগণকে সাধ্য নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[বায়ু পু. ৬৬.১৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৬৯; ২.৩.১৬]*

অনুমন্ত্রণ বৈদিক যজ্ঞের সময় এক-একটি ক্রিয়া-কর্মের অনুকূলে মন্ত্রের উচ্চারণ। অথবা যজ্ঞক্রিয়ার মধ্যে এক-একটি কর্মের পর তদনুকূল মন্ত্রোচ্চারণ। *[শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৭.২.১৫]*

এমনিতে মহাভারতে খুব সাধারণ সোজাসুজি অর্থে যেমনটি মন্ত্রণা করা হয়েছিল বা বলা হয়েছিল, তেমন কাজ করাকেই অনুমন্ত্রণ বলা হয়েছে। যেমন সেই উদ্যোগ-পর্বে কৃষ্ণ কর্ণকে যেমনটা বলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন—

রথমারোপ্য কৃষ্ণেণ যত্র কর্ণো'নুমন্ত্রিতঃ।

[মহা (k) ১.২.২৩৬; (হরি) ১.২.২৩৮]

অনুম্লোচা বায়ু পুরাণে ইনি 'অনুম্লোচন্তী' নামে চিহ্নিত হয়েছেন। স্বর্গের বিশিষ্ট অপ্সরাদের মধ্যে অনুম্লোচা অন্যতম। পুরাণ মতে ভাদ্রমাসে অপ্সরা অনুম্লোচা সূর্যরথে অবস্থান করেন।

[বায়ু পু. ৬৯.৫০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৫; ১.২৩.১০; ভাগবত পু. ১২.১১.৩৮]

অনুযাজ প্রধান যাগের পরে অনুষ্ঠেয় বলেই এর নাম অনুযাজ। অনুযাজের দেবতা সাধারণত তিন জন—বর্হিঃ, নারাশংস, অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ। পশুযাগে অনুযাজের সংখ্যা এগারো এবং দেবতার সংখ্যাও এগারো। প্রযাজের দেবতারাই অনুযাজের দেবতা। আহুতির দ্রব্য কখনো আজ্য, কখনো দধিমিশ্রিত আজ্য।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর) ৩.১১.৮; পৃ. ১৫৫ (রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড); কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১০.৭.১০; আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ৮.৬.১৮]

অনুযায়ী (অনুযায়িন্) কৌরব ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের একজন। তাঁর অপর নাম হয়তো অগ্রযায়ী। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নাম মহাভারতের আদিপর্বে দু-বার কীর্তিত হয়েছে। সেখানে প্রথমবার আদিত্যকেতু, বহ্বাশী এবং নাগদত্তের সঙ্গে শেষ নামটি অনুযায়িন্—

আদিত্যকেতুর্বহ্বাশী নাগদত্তানুযায়িনৌ।

আবার দ্বিতীয় বার যখন নামগুলি বলা হচ্ছে, সেখানে ওই একই তিনটি নামের সঙ্গে শেষ নামটি অগ্রযায়িন্ অথবা উগ্রযায়িন্। আদিত্যকেতু র্বহ্বাশী নাগদত্তোগ্রযায্যপি (নাগদত্তো'গ্রযায়্যপি। তাতেই মনে হয়—এগুলি তাঁর অন্য নাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হাতে ইনি মারা যান। তখন তাঁকে 'উগ্রয়ায়িন্' বা 'উগ্রযায়ী' বলা হয়েছে। দ্রোণপর্বে যেখানে ভীমসেনের হাতে ধৃতরাষ্ট্রের দশ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে অনুযায়ী এবং উগ্রযায়ী দুজনের নাম পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে বলে অনুযায়ী এবং উগ্রযায়ীর পৃথক অস্তিত্বও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

[মহা (k) ১.৬৭.১০২; ১.১১৭.১১; (হরি) ১.৬২.১০৪; ১.১১১.১০; মহা (k) ৭.১৫৭.১৮; (হরি) ১.১৩৭.১৬-শ্লোকের পর পাদটীকায় ধৃত খণ্ড ২৪, পৃ. ১৩৬২]

অনুরাধা সপ্তদশ নক্ষত্র। বিশাখা-নক্ষত্রের অনুগত। সাতটি তারার সমন্বয়ে গঠিত সর্পাকৃতি রূপ এই নক্ষত্র-মণ্ডলের অনুরাধা-নক্ষত্রের অধিদেবতা হলেন মিত্র (সূর্য) অনুরাধা নক্ষত্র-যুক্ত কালে জন্ম হলে, তার কীর্তি, গায়ের রঙ ভালো হয় বলে কোষ্ঠীপ্রদীপের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে। সে শত্রুজয়ী এবং কলানিপুণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে ভবিষ্যতে। তবে এই নক্ষত্রের দুরবস্থিতিতে খারাপও হয় অনেক—

সংকীর্তিকান্তিশ্চ সদোৎসবঃ স্যাজ্
জেতা রিপূণাঞ্চ কলাপ্রবীণঃ।
স্যাৎ সম্ভবে যস্য কিলানুরাগঃ
সম্পৎ-প্রমাদৌ চ বিবিধৌ চ স্যাতাম্॥

[দ্র. শব্দকল্পদ্রুম]

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রকাণ্ড কথোপকথনে কর্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের 'ঘোর যুদ্ধফল' অনুমান করে বলেছেন—জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রস্থিত মঙ্গল গ্রহ বক্রী হয়ে মিত্রদেবতাকে যোগ করার জন্যই যেন অনুরাধা নক্ষত্রকে প্রার্থনা করছে। এ-কথার গূঢ় অর্থ সিদ্ধান্তবাগীশ বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন—মঙ্গলময় ব্রাহ্মণ দ্রোণ জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের প্রতি বিরাগাত্মক বক্রভাব অবলম্বন করে নিজের মৈত্রীভাব পাণ্ডবদের সঙ্গে যোজনা করে দুর্যোধনের মৃত্যু চাইবেন। আর নীলকণ্ঠ লিখেছেন—জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে থেকে মঙ্গল যদি

বক্রী হয়—তার মানে হল—বক্রী মঙ্গল জ্যেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মিত্রসমূহকে বিনাশ করবে।

[মহা (k) ৫.১৪৩.৯; (হরি) ৫.১৩৪.৯; টীকা দ্র.]

অনুরাধা নক্ষত্রে যদি উপবাসী থেকে উত্তরীয় বস্ত্র এবং অন্নদান করা যায়, তবে সে শতযুগ স্বর্গে বাস করে। মানুষ অনুরাধা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে রাজত্ব অর্জন করে।

[মহা (k) ১৩.৬৪.২২; ১৩.৮৯.৮; (হরি) ১৩.৫৩.২২; ১৩.৭৬.৪২; বায়ু পু. ৬৬.৫০; ৮২.৯]

অনুলোম$_২$ দানবরাজ বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৮.১৯]

অনুলোম$_৩$ প্রাচীন বিবাহ-রীতির অন্যতম একটি ভাবনা। গায়ের লোম যেখানে অনুক্রমাগত-ভাবে নিম্নাভিমুখে থাকে, সেটাকে অনুলোম বলে। রামায়ণে সীতার ঈপ্সিত মারীচরূপী সোনার হরিণের গুণ হিসেবে 'অনুলোম' এবং প্রতিলোমের সুষম বিন্যাসের প্রশংসা করেছিলেন রামচন্দ্র—

প্রতিলোমানুলোমাশ্চ রুচিরা রোমরাজয়ঃ।

[রামায়ণ, ৩.৪৩.২৭]

যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির টীকায় অপরার্ক গৌতমের বক্তব্য উদ্ধার করে লিখেছেন—

ব্রাহ্মণাদির অনুক্রমে অসবর্ণা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহকে অনুলোম বলে এবং সেই বিবাহোৎপন্ন সন্তান অনুলোমজ সন্তান।

[যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১.৯১; অপরার্কের টীকা দ্র.]

মানুষের শরীরে হাত-পায়ের লোম যেদিকে নত হয়ে থাকে, সেইভাবে উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করাকেই 'অনুলোম' বলা হয়। মহাভারতে দুর্যোধন যখন শল্যকে কর্ণের সারথি হওয়া জন্য অনুরোধ করলেন, তখন শল্য খুব ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—তুমি আমাকে এইভাবে নীচজাতির দাসত্ব করাতে পারো না। আমি উঁচু জাতের মানুষ, তোমার বন্ধু হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছি, তুমি আমাকে কেন নীচ জাতির অধীন হিসেবে কাজে লাগাতে চাইছো। এই প্রসঙ্গে শল্য ব্রাহ্মণে-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণের পারস্পরিক বিবাহ-সম্বন্ধের মধ্যে অনুলোম এবং প্রতিলোম বর্ণসংকরের কথা বলেন—

তেভ্যো বর্ণবিশেষাশ্চ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।

অনুলোম বিবাহে ব্রাহ্মণ তাঁর নিজের স্বর্ণ ছাড়াও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কন্যা বিবাহ করতে পারে। ক্ষত্রিয় স্বর্ণ ছাড়াও বৈশ্য এবং শূদ্রের কন্যা বিবাহ করতে পারে। একইভাবে বৈশ্য বৈশ্য কন্যা এবং শূদ্র কন্যা বিবাহ করতে পারে। কিন্তু শূদ্র শূদ্র-কন্যা ছাড়া অন্য কোনো বর্ণে বিবাহ করতে পারছে না। ওপর থেকে নীচের দিকে নামছে বলেই এই বিবাহের নাম অনুলোম বিবাহ এবং এই বিবাহ-জাত সন্তানেরা অনুলোমজ সন্তান। কিন্তু বিপরীত ক্রম হলে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করে, বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করে, কিংবা শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যের কন্যা বিবাহ করে সেগুলি সব প্রতিলোম বিবাহ। অনুলোমই হোক আর প্রতিলোমই হোক স্বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণের বৈবাহিক ঘটনা মাত্রেই সেটা বর্ণসংকর। মনু তাঁদের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'সংকীর্ণযোনি' বলে।

[মহা (k) ৮.৩২.৪৪; (হরি) ৮.২৬.৩৫; মনুসংহিতা ১০.২৫]

অনুষ্টুপ চতুষ্পাদ ছন্দ-বিশেষ। এই ছন্দের প্রত্যেকটি চরণে আটটি করে অক্ষর থাকে। তার মানে সব মিলিয়ে বত্রিশটি অক্ষর-বর্ণ। সম্পূর্ণ রামায়ণ এবং মহাভারতের বেশির ভাগ শ্লোক এই অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা। অন্যান্য কাব্য-সাহিত্যের বহুল শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা হয়েছে বলেই হয়তো শ্লোক কথাটাই অনুষ্টুপ ছন্দের অপর পর্যায় শব্দ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। হয়তো এই কারণেই অনুষ্টুপ ছন্দের প্রতি-চরণে দীর্ঘ-হ্রস্বের স্বরবিধির কথা বলতে গিয়ে শ্লোক-শব্দটাই উল্লেখ করে বলা হয়েছে—শ্লোক অর্থাৎ অনুষ্টুপ ছন্দের চারটি চরণেই ষষ্ঠ অক্ষরটি গুরু হবে; চারটি চরণেরই পঞ্চম অক্ষরটি হবে লঘু। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে সপ্তম অক্ষরটি লঘু হবে, কিন্তু প্রথম এবং তৃতীয় চরণে সপ্তম অক্ষর দীর্ঘস্বরে উচ্চারিত হবে—

শ্লোকে ষষ্ঠং গুরুর্জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্।
দ্বি-চতুষ্পাদয়ো হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ॥

দুর্গামন্ত্রের ছন্দ-সমূহের অন্যতম।

[দেবীভাগবত পু. ৯.৫০.৫৯]

অনুষ্কা ভীষ্মপর্বের জম্বুখণ্ড-নির্মাণ অংশে পুরাবতী (হরিদাসের মহাভারতে পুণ্যবতী) নদীর সঙ্গে অনুষ্কা নামে এক প্রাচীন বহতা নদীর উল্লেখ করা হয়েছে। *[মহা (k) ৬.৯.২৪; (হরি) ৬.৯.২৪]*

অনুষ্ণী পদ্মপুরাণোক্ত একটি নদী।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৩.২১]

মহাভারতে সম্ভবত এরই নাম অনূষ্ণা।

[দ্র. অনূষ্ণা]

অনুহ্রাদ *[দ্র. অনুহ্লাদ]*

অনুহ্লাদ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তৃতীয় পুত্র। পুরাণ মতে ইনি হিরণ্যকশিপুর ঔরসে কয়াধুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনুহ্লাদ। বিভিন্ন পুরাণে অনুহ্লাদকে অনুহ্রাদ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে অনেক সময়। ভাগবত পুরাণ মতে অনুহ্লাদের পত্নী ছিলেন সূর্ম্যা। তাঁর গর্ভে অনুহ্লাদের দুই পুত্র বাস্কল এবং মহিষের জন্ম হয়। বায়ু পুরাণ মতে অনুহ্লাদের দুই পুত্র ছিলেন বায়ু এবং সিনীবালী। এদের সন্তান সন্ততিরা হালাহলগণ নামে খ্যাত।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ থেকে জানা যায় যে অনুহ্লাদের এক কন্যাসন্তান ছিল যাঁর সঙ্গে যক্ষ রজতনাভের বিবাহ হয়। *[মহা (k) ১.৬৫.১৮; (হরি) ১.৬০.১৮;*
বায়ু পু. ৬৭.৭০, ৭৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৩৩; ২.৭.১১৯;
মৎস্য পু. ৬.৯]

□ পাতালের তৃতীয় তল অর্থাৎ বিতলে অনুহ্লাদের সুরম্য বাসভবন ছিল বলে জানা যায়।

[বায়ু পু. ৫০.২৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২৬]

□ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, দ্বাপর যুগে অনুহ্লাদ চেদিরাজ শিশুপাল রূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন।

[মহা (k) ১.৬৭.৭; (হরি) ১.৬২.৭]

অনূচান বেদজ্ঞ ব্যক্তি। মহাভারতে তরুণ অষ্টাবক্র মুনি যখন জনক-সভায় প্রাজ্ঞ পণ্ডিত বরুণ-পুত্র বন্দীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে এই বলে বাধা দেওয়া হয়েছিল যে, একমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধ মহান পণ্ডিতরাই তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে পারবেন। তাতে অষ্টাবক্র বলেছিলেন— বয়স আর পাকা চুল থাকলেই বৃদ্ধ হয় না কেউ। যিনি বেদজ্ঞ ব্যক্তি, সাঙ্গ বেদ যিনি জানেন, তিনিই বৃদ্ধ। অষ্টাবক্র বলেছিলেন—আমাদের মধ্যে যিনি 'অনূচান' অর্থাৎ বেদ-বেদাঙ্গ-বেত্তা, তিনি সব চাইতে বড়ো মানুষ—

যো'নূচানঃ স নো মহান্।

এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ অনূচান শব্দের অর্থ করেছেন—অনূচান হলেন তিনি, যিনি সমস্ত বেদাঙ্গ সহ বেদ অধ্যয়ন করেছেন— অনূচানঃ সাঙ্গ-বেদাধ্যায়ী। অনেকে অবশ্য মনে করেন—অনূচান অর্থ শুধুমাত্র যিনি বেদাঙ্গ জানেন। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রেই এই অর্থ আছে—অঙ্গাধ্যায়ী অনূচানঃ। অন্যেরা অবশ্য বলেছেন—শিক্ষা-কল্প-জ্যোতিষ ইত্যাদি ষড়ঙ্গবিদ ব্রাহ্মণ বেদ না জেনে বেদাঙ্গের ভাবনা করতেই পারবেন না। কেননা বেদাঙ্গগুলি বেদ-ব্রাহ্মণের প্রায়োগিক অংশ। অতএব নীলকণ্ঠের কথাই ঠিক—যিনি সাঙ্গ বেদ জানতেন তিনিই অনূচান। বিশেষত বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে গন্ধর্বায়ন, কালেয় এবং অগ্নিবেশ্য নামে অনূচান ব্রাহ্মণেরা পাঞ্চাল দেশে থাকতেন বলে যে সম্মান দেখানো হয়েছে, তাতে তাঁরা শুধুমাত্র অঙ্গাধ্যায়ী ছিলেন বলে মনে হয় না।

[মহা (k) ৩.১৩৩.১২; (হরি) ৩.১০৯.১২;
বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ১.৭.৪;
বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র (Caland), ২য় খণ্ড,
১৮.২৬, পৃ. ৩৭৪]

অনূচানা অপ্সরাদের মধ্যে অন্যতম। পাণ্ডব অর্জুনের জন্মোৎসবের সময় অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন।

[মহা (k) ১.১২৩.৬১; (হরি) ১.১১৭.৬৫]

অনূদর (অনূদয়) কৌরব ধৃতরাষ্ট্রের একশ পুত্রের একজন। অনূদরের জায়গায় অনূদয় পাঠও আছে।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৯; ১.১১৭.৮;
(হরি) ১.৬২.১০১; ১.১১১.৮]

অনূপ প্রাচীন জনপদ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে অনূপ-দেশের রাজা উপস্থিত ছিলেন। রাজকর এবং দর্শনী হিসেবে এই রাজা বড়ো বড়ো গর্দভ নিয়ে এসেছিলেন। অনুমান করা যায়, এই দেশটি গর্দভ-প্রজননের জন্য বিখ্যাত ছিল।

[মহা (k) ২.৫১.২৪; (হরি) ২.৪৯.২০]

হরিবংশেও অনূপ-দেশ উল্লিখিত হয়েছে। হরিবংশের বেশির ভাগ উল্লেখেই জলপ্রায় সিক্ত ভূমিকে অনূপ-দেশ বলা হয়েছে। কৃষ্ণ যখন মথুরা নগরী ত্যাগ করে সমস্ত পরিজন সহ সাগরতীরবর্তী দ্বারকায় এলেন, তখন সে-জায়গাটাকেও সাগরের অনূপদেশ বলা হয়েছে। দ্বারকার সেই জলপ্রায় ভূমিতে সুন্দর উদ্যান উপবনও তৈরি করা হয়েছিল।

[হরিবংশ পু. ১.৫.৪২; ২.৫৬.২২; ২.৫৮.৫২]

কালিদাসের রঘুর দিগ্‌বিজয়কালে অনূপ-

দেশের অবস্থিতি যেমনটি পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়—নর্মদা নদীর তীরে অনূপদেশের অবস্থিতি ছিল এবং এই দেশের রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী (আধুনিক চুলি মহেশ্বর— মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে যার দূরত্ব ৬৪ মাইল। ডি.সি. সরকারের মতে মধ্যপ্রদেশের নিমাড় জেলার অন্তর্গত মান্ধাতা নামক স্থানটিই মাহিষ্মতী [GAMI (Sircar) p. 35] এক সময়ে এই অনূপদেশ গৌতমী বলশ্রীর পুত্র সাতকর্ণির রাজ্যভুক্ত ছিল।

[দ্র. নাসিক-গুহালিপি এবং রুদ্রদামনের জুনাগর প্রস্তরলিপি; B.C. Law. Indological Studies, Pt. I pp.53-54]

হেমচন্দ্র, তাঁর অভিধান চিন্তামণি গ্রন্থে 'অনূপ' শব্দের অর্থ করেছেন জলযুক্ত স্থান। বাস্তবে 'অনূপ' বলতে বোঝাত সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকার জলাভূমিকে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দিগ্‌বিজয় করতে বেরিয়ে ভীম যখন বঙ্গভূমির নিম্নাঞ্চলে সমুদ্রোপকূলবর্তী ম্লেচ্ছদের জয় করলেন, তখন বলা হয়েছে, সেই ম্লেচ্ছরা সাগর-তীরবর্তী অনূপ-দেশের অধিবাসী—

ম্লেচ্ছনৃপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ।

অনূপদেশের অধিবাসীদের 'অনূপক' অথবা শুধুই 'অনূপ' বলে এক পৃথক জনজাতি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ২.৩০.২৭; ২.৫১.২৪; (হরি) ২.২৯.২৫; ২.৪৯.২০; অভিধান-চিন্তামণি ৪.১৯]

আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যখন বিভিন্ন দেশের রাজারা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগ দিচ্ছেন, তখন বলা হচ্ছে—পাণ্ড্য দেশের রাজা সাগর-তীরবর্তী অনূপবাসীদের নিয়ে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগ দিলেন—তথৈব পাণ্ড্যো রাজেন্দ্রং সাগরানূপবাসিভিঃ। পাণ্ড্য-দেশ দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত। পুনশ্চ এইরকমই সাগরোপকূলবর্তী আরও একটি অনূপদেশ আমরা পশ্চিম-ভারতের কাথিয়াওয়ার অঞ্চলেও দেখছি।

[মহা (k) ৬.১৯.৯; (হরি) ৬.১৯.৯; দ্র. মহাভারত, (Critical Ed.) ৬.৯০.২৭]

তাহলে দাঁড়ায়—ভারতে সৌরাষ্ট্রেও যেমন অনূপ-দেশ ছিল, তেমনই অনূপ দেশ ছিল পূর্বভারতে এবং দক্ষিণভারতেও। তবুও কিন্তু সারা ভারতে অনূপদেশ বলতে প্রধানত পশ্চিম-সাগরের কূলবর্তী মাহিষ্মতী নগরীকেই বোঝাত, তার কারণ পশ্চিম ভারতবর্ষের দেশগুলির সঙ্গেই প্রধানত অনূপ দেশের উল্লেখ ঘটেছে মহাভারতে। বিখ্যাত কার্তবীর্য্যার্জুনকে অনূপপতি বলা হয়েছে—

অথানূপপতির্বীর কার্তবীর্য্যো'ভ্যবর্তত।

[মহা (k) ৩.১১৬.১৯; (হরি) ৩.৯৭.১৯]

কার্তবীর্য্যার্জুন যাদবদের শাখা-বংশ হৈহয়-রাজাদের অধস্তন পুরুষ। অন্য আর একজন অনূপদেশের রাজাকে আমরা মধ্যম পাণ্ডব ভীমের বন্ধু হিসেবে মহাভারতে পেয়েছি।

[মহা (k) ৬.৯৩.২৯; (হরি) ৬.৯০.২৮]

অনূপক ভারতবর্ষে প্রাচীন জলপ্রায় জনপদের যোদ্ধাদের এই নামে ডাকা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এঁদের পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করতে দেখা গেছে। তাঁরা ধৃষ্টদ্যুম্নরচিত ক্রৌঞ্চব্যূহের গ্রীবাদেশে স্থিত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

[মহা (k) ৬.৫০.৪৮; (হরি) ৬.৫০.৪৮]

অনূপপতি$_1$ *[দ্র. অনূপ]*

অনূপপতি$_2$ কোনো এক সমুদ্রতীরবর্তী রাজা, যার রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-শেষে সভা-প্রবেশের সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম সুদর্শন। *[মহা (k) ২.৪.২৮; (হরি) ২.৪.৯ (পাদটীকা ১০.৮, পৃ. ২৬)]*

অনূরু কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে বিনতার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণ। বিনতার ভুলের কারণে তিনি বিকলাঙ্গ অবস্থায় জন্মান। শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগ পদ প্রভৃতি গঠিত হবার আগেই জন্মগ্রহণ করেন বলে তিনি অনূরু নামে (ঊরুহীন) খ্যাত। পরবর্তীকালে ইনি সূর্যদেবের সারথি হন।

[দ্র. অরুণ$_1$]

[ভাগবত পু. ৬.৬.২২; দেবী ভাগবত পু. ১০.৩.১৭; কালিকা পু. ৩৪.৭৩]

অনূহ পিতার নাম বিভ্রাজ। অনূহের সঙ্গে ব্যাসপুত্র শুকদেবের কন্যা কীর্তির বিবাহ হয়। কালক্রমে শুককন্যার গর্ভে অনূহের যে ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র হয়, তাঁর নাম ব্রহ্মদত্ত। সময় এলে নারদের উপদেশে অনূহ যোগমার্গোপযোগী পরম জ্ঞান লাভ করেন। এরপর পুত্র ব্রহ্মদত্তের হাতে রাজ্যভার দিয়ে অনূহ বদরিকাশ্রমে গমন করেন। নারদ অনূহকে যে মায়াবীজ মন্ত্র উপদেশ দেন, সেই মন্ত্রের প্রভাবে দেবীর প্রসন্নতায় অনূহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। *[দেবীভাগবত পু. ১.১৯.৪২-৪৫]*

অনৃত 'ঋত' শব্দের অর্থ ধর্ম বা সত্য। ঋগ্বেদের কাল থেকেই ঋত অর্থাৎ সত্যকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে তিনি দেবতা রূপে পূজনীয় হয়ে উঠেছেন। ঋত-এর বিপরীত রূপ অনৃত বা মিথ্যা। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বৈদিককাল থেকেই অনৃত অত্যন্ত ঘৃণ্য হিসেবেই গণ্য হত।

[ঋগ্‌বেদ ৭.৪৯.৩]

☐ অনৃত শব্দের অভিধানিক অর্থ অসত্য বা মিথ্যা। পুরাণে মূর্তিমান 'অনৃত'কে হিংসা এবং অধর্মের পুত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি ভয় এবং নরকের পিতা।

মিথ্যা কথা বলা যে মহাপাপ, এই উপদেশ প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন গ্রন্থে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীর স্বামী রাজা যযাতির থেকে পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় যযাতিকে যে কথা বলছেন তা একটু অন্য রকমের। দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য যযাতিকে বার বার নিষেধ করেছেন শর্মিষ্ঠাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করতে। শর্মিষ্ঠা যযাতির থেকে পুত্রলাভ করেছেন একথা জানতে পারলে দেবযানী এবং শুক্রাচার্য দুজনেই ক্রুদ্ধ হবেন, অভিশাপ দেওয়াও বিচিত্র নয়। এই ভয়ে যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রস্তাব স্বীকার করা উচিত কিনা বিবেচনা করতে লাগলেন। এই সময় শর্মিষ্ঠা বলছেন— রাজা! পরিহাসের সময়, স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনের সময়, বিবাহের সময়, প্রাণসঙ্কটে এবং সর্বস্ব অপহরণের সময়—এই পাঁচটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বললে পাপ হয় না—

ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন
স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

এরপরে শর্মিষ্ঠা আরও বলছেন—সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কিংবা কোনো একটি বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে সেই সময় মিথ্যা বলা মহাপাপ। শর্মিষ্ঠার এই কথার সমর্থন পাই মনুসংহিতা গ্রন্থে। আচার্য মনু সেখানে কোন কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মিথ্যা বলা পাপ, তা বিশদে আলোচনা করেছেন।

শর্মিষ্ঠার মতে পাঁচটি বিষয়ে মিথ্যা বললে পাপ হয় না—এই কথার প্রতিধ্বনি আমরা মহাভারতে আরও একবার শুনতে পাই। কুরুক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য যেদিন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন, তিনি অস্ত্রত্যাগ না করলে পাণ্ডব সৈন্য সেদিনই ধ্বংস হবে—এই অবস্থায় কৃষ্ণ পাণ্ডবসেনা এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদের রক্ষা করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন—এই মিথ্যা কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ একথা বললেই পুত্রশোকার্ত দ্রোণ অস্ত্রত্যাগ করবেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বলছেন যে, মানুষের জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় না—

অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্ ন স্পৃশ্যতে'নৃতৈঃ।

এর থেকে মনে হয়, আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই জটিল এবং সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, লোককল্যাণের জন্য, বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার জন্য সময়োচিত মিথ্যাভাষণকে অনুমোদন করা হয়েছে। আজকের দিনে আমরা যাকে Situational Ethics বলে থাকি, প্রাচীন সাহিত্যে মিথ্যাভাষণকে সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—জীবন-যাপনের সুষ্ঠু প্রয়োজন বোধে।

[মহা (k) ১.৮২.১৬; ৭.১৯১.৪৭;
(হরি) ১.৭০.১৬; ৭.১৬৪.৩৮;
মনুসংহিতা, ৮.৯৮-৯৯; মৎস্য পু. ৩১.১৬;
বায়ু পু. ১০.৩৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৯.৬৩]

অনেক ভবিষ্যৎ ত্রয়োদশ মন্বন্তরের অধিপতি রৌচ্য মনুর অন্যতম পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১০৪]

বায়ু পুরাণে ধৃত পাঠ থেকে মনে হয় রৌচ্য মনুর এই পুত্রটির নাম অনেকক্ষত্রবন্ধ। তবে বায়ু পুরাণের এই পাঠটি ঠিক নয় বলেই মনে হয়।

[বায়ু পু. ১০০.১০৯]

অনেকক্ষত্রবন্ধ *[দ্র. অনেক]*

অনেকমূর্তি বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯০; (হরি) ১৩.১২৭.৯০]

অনেনা$_{১}$ (অনেনস্) পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ু। আয়ুর ঔরসে স্বর্ভানবীর (স্বর্ভানুর কন্যা) গর্ভে জাত পাঁচ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন অনেনা। ভাগবত পুরাণ থেকে জানা যায় যে ইনি শুদ্ধ নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৭৫.২৫;
(হরি) ১.৬৩.২৮; ভাগবত পু. ৯.১৭.২, ১১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.২; বিষ্ণু পু. ৪.৮.৩]

অনেনা$_{২}$ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ককুৎস্থের অন্যতম পুত্র।

[মহা (k) ৩.২০২.২; (হরি) ৩.১৭২.২;
বায়ু পু. ৮৮.২৫; বিষ্ণু পু. ৪.২.৩৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.২৬;
ভাগবত পু. ৯.৬.২০]

অনেহ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি অনেহর বংশ তার মধ্যে অন্যতম।

[মৎস্য পু. (মহর্ষি) ১৯৬.৩১]

অনৌপম্যা বাণাসুরের পত্নী। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী এবং গুণবতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর শাশুড়ী এবং ননদ সর্বদাই তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। একবার দেবর্ষি নারদ বাণাসুরের গৃহে উপস্থিত হলে অনৌপম্যা তাঁর কাছে এই সমস্যার সমাধান জিজ্ঞাসা করেন। দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে তিনি দান-ধর্ম এবং নানা ব্রতের বিধি শ্রবণ করেছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৮৭.২৫-৫২]*

□ পদ্ম পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ত্রিপুরবাসিনী বাণাসুরের পত্নী অনৌপম্যা ছিলেন অনেক দিব্যগুণের অধিকারী। নারদের পরামর্শ মতো তিনি উপবাস প্রভৃতি আচারে মনোযোগী হন। তাঁর দেখাদেখি ত্রিপুর নগরের অন্যান্য রমণীরাও উপবাস-কৃচ্ছ্রতা আরম্ভ করেন। সর্বদা উপবাস প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে তাঁদের তপঃশক্তি নষ্ট হয়। তাঁরা নিজেদের তেজ ও প্রভাব হারিয়ে ফেলেন।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৭.২৪-৪৮]

অনৌষধ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের অনৌষধ নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

অনৌষধঃ ব্রীহ্যাদ্যন্ন জাতীয় রহিতঃ
অভোক্তেতি যাবৎ।

বস্তুত ঔষধ বলতে আমরা সাধারণত রোগব্যাধি নাশক ভেষজ বুঝলেও ঔষধ বলতে খাদ্যও বোঝায়। ভগবান শিব জাগতিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধের ঊর্ধ্বে, তণ্ডুল ব্যঞ্জনের সমাহারে যে দৈনন্দিন আহার, তাতে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। সেই কারণেই তিনি অনৌষধ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৭৯; (হরি) ১৩.১৬.৭৯]

অন্তঃশিরা (অন্তঃশীলা) এই নদী বিন্ধ্য পর্বত থেকে বেরিয়েছে। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.২৫]*

একটু অন্যভাবে পদ্ম পুরাণেও এই নদীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে নামটি অন্তঃশীলা।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৩.২৫]

অন্তক$_{১}$ অন্ত-শব্দের অর্থ ধ্বংস বা মৃত্যু। প্রাণী জগতের অন্ত বা মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করেন বলে যম অন্তক নামে খ্যাত। পতিব্রতা সাবিত্রী স্বামী সত্যবানের পূর্ণজীবন লাভের আশায় যখন যমলোকে গিয়ে যমরাজের স্তব করেন সেই সময় তিনি যমকে অন্তক বলে সম্বোধন করেছেন—

সর্বেষামেব ভূতানাং যস্মাদন্তকরো মহান্।
তস্মাৎ ত্বমন্তকঃ প্রোক্তঃ সর্বদেবৈর্মহাদ্যুতে॥

[দ্র. যম]

[মৎস্য পু. ১০.১৯; ২১৩.৬]

অন্তক$_{২}$ ভগবান শিবকেও অন্তক নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি সৃষ্টি সংহর্তা, প্রলয়কালে কালাগ্নিরূপে সমগ্র সৃষ্টিকে গ্রাস করেন বলেই তিনি অন্তক নামে খ্যাত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৮১]

অন্তক$_{৩}$ মৎস্য পুরাণ মতে কলিযুগে মগধের রাজা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের বংশধারায় অন্তক নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি শুঙ্গ বংশীয় রাজা বসুমিত্রের পুত্র। ইনি মাত্র দু-বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। বায়ু পুরাণ তাঁকে অন্ধ্রক নামে চিহ্নিত করেছে। *[মৎস্য পু. ২৭২.২৯; বায়ু পু. ৯৯.৩৩৯]*

অন্তক$_{৪}$ বেণনন্দন পৃথুর পৃথিবীদোহনের প্রসঙ্গে অন্তকের কথা এসেছে। পৃথুর গোদোহনকালে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত যম হয়েছিলেন গোদোহনের বৎস-স্বরূপ, অন্তক যম হয়েছিলেন দোগ্ধা; শ্রাদ্ধীয় অন্ন স্বধা হয়েছিলেন দুগ্ধ এবং পাত্র ছিল রৌপ্যময়।

[মহা (k) ৭.৬৯.২৬; (হরি) ৭.৬১.২৬]

অন্তক$_{৫}$ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৮; (হরি) ১৩.১২৭.৬৮]

অন্তকাল প্রলয়কালের সার্বিক বিপর্যয়ের অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—

যথান্তকাল-সময়ে সুঘোরাঃ স্যুস্তথা নৃপ।

[মহা (k) ৯.৪৬.৭১; (হরি) ৯.৪২.৭৮]

অন্তকৃৎ স্কন্দ-কার্তিকেয়ের সৈনিকদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ৯.৪৫.৫৮;*
(হরি) পাঠভেদ অভ্রকৃৎ, ৯.৪২.৫২;
পাদটীকা ৩ নং শ্লোক, পৃ. ৪৭৬]

অন্তচার ভারতবর্ষের উত্তরদিকে অবস্থিত একটি জনপদ। সেই সূত্রে এই জনপদবাসী জনজাতিকেও বোঝায়। এঁদের আর্য-আচারহীন ম্লেচ্ছ-জাতির মধ্যেই গণ্য করা হয়েছে।

[মহা (k) ৬.৯.৬৫, ৬৮; (হরি) ৬.৯.৬৫, ৬৮]

অন্তবাস যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে দুর্যোধন যে-সমস্ত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর রাজাদের যুধিষ্ঠিরের কাছে উপহার নিয়ে আসতে দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একটি জনগোষ্ঠী। ঔষ্ণীক এবং রোমকদের সঙ্গে এঁরা একই পংক্তিতে স্থান পেয়েছেন।

[মহা (k) ২.৫১.১৭; (হরি) ২.৪৯.১৪]

অন্তর যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশধারায় পৃথুশ্রবার পুত্র ছিলেন অন্তর। এই অন্তর নাকি পূর্বজন্মে যজ্ঞের পুত্র উশনা নামে বিখ্যাত ছিলেন। রাজা অন্তর মরুত্ত নামে এক পুত্র লাভ করেন।

[বায়ু পু. ৯৫.২২-২৩]

অন্তরদ্বীপ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজা হতে না চাইলে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের পূর্বক্ষমতা বর্ণনা করে তাঁর বহুদেশ-জয়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেন—তুমি সমুদ্র অতিক্রম করে মধ্যবর্তী দ্বীপসমূহের সঙ্গে নানা জনপদযুক্ত অন্যান্য বহু দ্বীপও জয় করেছ। এই মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিই অন্তরদ্বীপ। শুধু এই উল্লেখ থেকে অবশ্য এটা বোঝা যায় না যে, ভারতবর্ষের কোন দিকে এই দ্বীপমধ্যস্থ দ্বীপগুলি অবস্থিত ছিল।

[মহা (k) ১২.১৪.২৫; (হরি) ১২.১৪.২৫]

অন্তরা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত অপ্সরাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অন্তরা। *[বায়ু পু. ৬৯.৪]*

অন্তরাত্মা শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। উপনিষদে পরম পুরুষ পরমাত্মা ক্ষুদ্র অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত রূপে সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে জীবাত্মা রূপে অবস্থান করেন বলে বর্ণিত হয়েছে—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং
হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

[কঠোপনিষৎ ২.৩.১৭]

ভগবান শিবই সেই পরম পুরুষ যিনি জীবদেহে জীবাত্মা বা অন্তরাত্মা রূপে অবস্থান করেন—এই ভাবনা থেকেই তিনি অন্তরাত্মা নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৮৭; (হরি) ১৩.১৬.৮৭]

অন্তরী সুমেরু পর্বতের দক্ষিণদিকের পর্বতে গঙ্গাতীরস্থিত তীর্থগুলির অন্যতম।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ১.৬.১৬]

অন্তরীক্ষ$_{১}$ আমাদের বাসস্থান এই মর্ত্যলোক এবং পুরাণে কল্পিত স্বর্গলোক বা দ্যুলোকের মধ্যে যে আকাশ—তারই অপর নাম অন্তরীক্ষ। 'অন্তরা' অর্থাৎ মধ্যে বা মধ্যবর্তী। সংস্কৃত 'ঈক্ষ্' ধাতুর অর্থ দেখা। ভূলোক এবং দ্যুলোকের অন্তর্বর্তী মেঘমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল সমন্বিত যে দৃশ্যমান আকাশ—তারই নাম অন্তরীক্ষ। প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে অন্তরীক্ষের সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে এভাবেই—

পুরান্তরা বা ইদমীক্ষমভূদিতি তস্মাদন্তরিক্ষম্।

ব্যাকরণের কোনো নিয়মে 'ঈক্ষ্' ধাতুর 'ঈ'-বর্ণটি হ্রস্বস্বরে পঠিত হওয়ায় 'অন্তরিক্ষ' শব্দটিও সাধু।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৭.১.২.২৩, পৃ. ৫৭৭; বায়ু পু. ৩০.৯৮]

□ তবে অন্তরীক্ষ এবং আকাশ—এই শব্দদুটি যে একেবারে সমার্থক নয়, সে সম্পর্কে ঋগ্‌বেদের কাল থেকেই বেশ স্পষ্ট ধারণা ছিল। ঋগ্‌বেদের অন্তত ১৭জন ঋষি তাঁদের উচ্চারিত মন্ত্রে আকাশ এবং অন্তরীক্ষের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে বলে বর্ণনা করেছেন। ঋগ্‌বেদের অন্যতম ঋষি ঔচথ্য দীর্ঘতমার উচ্চারিত মন্ত্র থেকে এই ভাবনা মোটামুটি স্পষ্ট যে, অন্তরীক্ষ আকাশের একটি অংশমাত্র। আকাশের বিস্তার তার থেকে অনেক বেশি বা অনন্তও বলা যেতে পারে। ঔচথ্য দীর্ঘতমার মন্ত্রের টীকা রচনা করতে গিয়ে সায়নাচার্য স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, দ্যুলোক এবং পৃথিবীর মধ্যে যে স্থানে ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম বা আকাশের একত্র সহাবস্থান, যেখানে জীবসৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়—সেই স্থানটিরই নাম অন্তরীক্ষ—

দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তর্মধ্যে যোনিঃ
সর্বভূতনির্মাণাশ্রয়মন্তরিক্ষং বর্তত ইতি শেষঃ।

ঋগ্‌বেদের অন্যান্য একাধিক মন্ত্রে অন্যান্য ঋষিদের দ্বারাও এই ভাবনার সমর্থন মেলে।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৬০.২; ১.১৬৪.৩৩, সায়নাচার্যকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

□ আধুনিককালে বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর

উপরে বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত স্থানটিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেন, বায়ু মণ্ডলের শেষ সীমার পর থেকে আরম্ভ হয় মহাশূন্য বা মহাকাশ। ঋগ্‌বৈদিক কাল থেকেই বায়ুমণ্ডল সমন্বিত অন্তরীক্ষ এবং তার পরবর্তী অনন্ত মহাশূন্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা ছিল বলে মনে হয়। ঋগ্‌বেদের একাধিক মন্ত্রে অন্তরীক্ষকেও তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে—

ত্রিরন্তরিক্ষং সবিতা মহিত্বনা
ত্রী রজাংসি পরিভূস্ত্রীণি রোচনা।
[ঋগ্‌বেদ ৪.৫৩.৫]

এই তিনটি স্তরের মধ্যে পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর, যেখানে সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, বৃষ্টিপাত হয় তাকে রজঃ এবং অপ্ বলা হয়েছে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে—

পূর্বে অর্ধে রজসো অপ্‌ত্যাস্য
গবাং জনিত্রী অকৃত প্রকেতুম্।
[ঋগ্‌বেদ ১.১২৪.৫]

অন্তরীক্ষের যে অংশ দ্যুলোক বা স্বর্গলোকের নিকটবর্তী, তাকে উত্তম বা পরম বলা হয়েছে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে—

* ন তে দরে পরমা চিদ্রজাংস্যা
তু প্র যাহি হরিবো হরিভ্যাম্।
[ঋগ্‌বেদ ৩.৩০.২]

* এতে পৃষ্টানি রোদসোর্বিপ্রয়ন্তো ব্যানশুঃ
/উদেতমুত্তমং রজঃ ॥
[ঋগ্‌বেদ ৯.২২.৫]

অপরদিকে, অন্তরীক্ষের ভূলোক সংলগ্ন ভাগটিকে বেদের মন্ত্রে উপর বা পার্থিব বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

* বি ভূম্যা অপ্রথয় ইন্দ্র
সানু দিবো রজ উপরস্ত ভায়ঃ ॥
[ঋগ্‌বেদ ১.৬২.৫]

* আপ্রা রজাংসি দিব্যানি পার্থিবা
শ্লোকং দেবঃ কৃণুতে স্বায় ধর্মণে।
[ঋগ্‌বেদ ৪.৫৩.৩]

☐ আধুনিক পণ্ডিতরা ধারণা করেন যে, অন্তরীক্ষ এবং অন্তরীক্ষের গণ্ডি পেরিয়ে যে আকাশ বা মহাকাশ—এ দুইয়ের পার্থক্য সম্পর্কে বৈদিকযুগেই একটা মোটামুটি রকম ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল—Science tells us that the distance between the sun and our earth is 9.3 crore miles. It further reveals that upto 300 miles above the earth, we find air and also the gravitation force of earth. Beyond this 300 miles, there is vacuum and the solar system starts.

When Rishis called Surya Devata the son of Aakaasha, probably they were describing the location of the Surya Devata. By differentiating between Aakaasha and Antariksha, they conveyed the idea that Antariksha is limited to the zone upto which earth's gravitation force works and there is air. Beyond this, is Aakaasha which is the area of operation of Surya Devata.

This view gets confirmed when Rishi Praskadva Kaandava says that Surya Devata has his own solar system in which he shines (8.56.5). Rishi Vasishtha confirms it (7.66.16). Rishi Vibrahaat Saurya says that amongst the planets of the solar system Surya Devata has the best of light, the most excellent (10.170.3).

[A.A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 10; S.S. Gupta, A Study of Deities of Rig Veda, New Delhi, Abhinav Publications, 2005, p. 54]

অন্তরীক্ষ$_2$ জম্বুদ্বীপের অধিপতি অগ্নীধ্রের বংশে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর অংশে ঋষভের জন্ম হয়। রাজর্ষি ঋষভের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্তরীক্ষ অন্যতম। ইনি রাজর্ষি ভরতের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ছিলেন। অন্তরীক্ষ এবং তাঁর নয় ভাই সংসার ত্যাগ করে পরমেশ্বরের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

ভাগবত পুরাণের একাদশ স্কন্ধ থেকে জানা যায়, কঠোর সাধনার ফলে যাঁরা ব্রহ্মকে সম্যক ভাবে জানতে সমর্থ হয়েছিলেন, অন্তরীক্ষ তাঁদের মধ্যে একজন। ব্যাকরণের কোনো নিয়মে 'ঈক্ষ্' ধাতুর 'ঈ' বর্ণটি হ্রস্বস্বরে পঠিত হওয়ায় 'অন্তরিক্ষ' পাঠও পাওয়া যায়।

[ভাগবত পু. ৫.৪.১১; ১১.২.২১]

অন্তরীক্ষ$_{৩}$ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অসুররাজ নরকাসুরের প্রধান সেনাপতি মুর। মুর দানবের পুত্রদের মধ্যে অন্তরীক্ষ একজন। মুর-এর মৃত্যুর পর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে অন্তরীক্ষ এবং তাঁর ভাইয়েরা সকলে মিলে কৃষ্ণকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কৃষ্ণের হাতেই তাঁদের সকলের মৃত্যু হয়। *[ভাগবত পু. ১০.৫৯.১২]*

অন্তরীক্ষ$_{৪}$ ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের বংশধারায় রাজা পুষ্করের পুত্র ছিলেন অন্তরীক্ষ। রাজা অন্তরীক্ষ সুতপা নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[ভাগবত পু. ৯.১২.১২]*

অন্তরীক্ষ$_{৫}$ ষষ্ঠ মন্বন্তরে, যখন চাক্ষুষ মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যে-সব গণে বিভক্ত ছিলেন, আদ্য তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্তরীক্ষ একজন।

[বায়ু পু. ৬২.৫৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৬৯]

অন্তরীক্ষ$_{৬}$ কলিযুগে ইক্ষ্বাকুবংশীয় যে-সব রাজা রাজত্ব করেছিলেন, কিন্নর তাঁদের মধ্যে একজন। মৎস্য পুরাণের পাঠে অবশ্য কিন্নরাশ্ব নাম পাওয়া যায়। কিন্নর বা কিন্নরাশ্ব রাজার পুত্র ছিলেন অন্তরীক্ষ। রাজা অন্তরীক্ষ সুপর্ণ নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন।

*[মৎস্য পু. ২৭১.৯; বায়ু পু. ৯৯.২৮৫;
বিষ্ণু পু. ৪.২২.৩]*

অন্তরীক্ষ$_{৭}$ পুরাণে প্রাচীন কল্পের বিভিন্ন দ্বাপর যুগের মোট আঠাশ জন বেদবিভাগকারী ব্যাসের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ত্রয়োদশ দ্বাপরের বেদব্যাস ছিলেন অন্তরীক্ষ। *[বিষ্ণু পু. ৩.৩.১৪]*

অন্তরীক্ষ$_{৮}$ একজন পুরাণবিদ ঋষি। ইনি মহর্ষি ত্রিবিষ্টর কাজ থেকে পুরাণ শ্রবণ করেছিলেন। অন্তরীক্ষর কাছ থেকে মহর্ষি ত্রয্যারুণ পুরাণ শিক্ষা করেন।

[বায়ু পু. ১০৩.৬১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৪.৮২]

অন্তর্গিরি মহাভারতে বিভিন্ন নদী-দেশের ভৌগোলিক বিবরণ দেবার সময় 'অন্তর্গিরি' শব্দটি এমনভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এটি দেশও বোঝায় আবার সেখানকার অধিবাসীদেরও বোঝায়—

অন্তর্গির্য্যঃ তথৈব চ।

[মহা (k) ৬.৯.৪৯; (হরি) ৬.৯.৪৯]

মৎস্য পুরাণ থেকে 'অন্তর্গিরি' জায়গাটার অবস্থান বোঝা যায়। অন্তর্গিরি-দেশটির নাম উল্লিখিত হয়েছে অঙ্গ, বঙ্গ সুহ্ম ইত্যাদি প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে। *[মৎস্য পু. ১১৪.৪৪]*

B.C. Law মনে করেন (মুঙ্গের এবং) ভাগলপুরের প্রান্তবর্তী রাজমহল পর্বতমালায় অধিবাসীরাই 'অন্তর্গির্য্য' অর্থাৎ অন্তর্গিরিবাসী বলে চিহ্নিত। তাঁর মতে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (২.২৪.৫)। উল্লিখিত কালকবর্ণ আসলে এই অঞ্চল। অনেকে মনে করেন অন্তর্গিরি আসলে সাঁওতাল পরগণার একটি অঞ্চল।

*[GEAMI (Bajpai) P.27; TAI (Law),
P. 388 HGAI (Law), P. 209]*

লক্ষণীয়, মৎস্য পুরাণের মতো মহাভারতের নদীদেশের বিবরণেও মগধের সঙ্গে অন্তর্গিরির উল্লেখ থাকায় একদিকে যেমন মনে হয় যে, এটি প্রাচ্যদেশীয় কোনো পার্বত্য অঞ্চল, তেমনই অন্যদিকে রাজসূয় যজ্ঞের সময় ভারতের উত্তর দিক জয়ের সূত্রে অর্জুন যখন অন্তর্গিরি, বহির্গিরি এবং উপরিগিরি নামে তিনটি অঞ্চল জয় করলেন, তখন সেগুলির বিশেষণ দেওয়া হয়েছে 'ধনদপালিতাম্' অর্থাৎ ধনপতি কুবেরের রাজ্য। তার মানে স্পষ্টতই আধুনিক লাদাখ অঞ্চলের পিছনে ৫০ মাইল দূরে এখনও যে কৈলাস পর্বতমালার অস্তিত্ব আছে, অর্জুনের বিজিত পার্বত্য অঞ্চলগুলি সেইখানেই অবস্থিত—

প্রযযাবুত্তরাং তস্মাদ্দিশং ধনদপালিতাম্॥
অন্তর্গিরিঞ্চ কৌন্তেয়স্তথৈব চ বহির্গিরিম্।
তথৈবোপরিগিরিঞ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥
বিজিত্য পর্বতান্ সর্বান্ যে চ তত্র নরাধিপঃ।

[মহা (k) ২.২৭.৩-৪; (হরি) ২.২৬.৩-৪]

সত্যি কথা বলতে কী, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি এবং উপরিগিরি—শব্দগুলি খুব সোজাসুজি ব্যাখ্যা করাই ভালো। অন্তর্গিরির অধিবাসী যাঁরা, তাঁরা আসলে পর্বতমালার অন্তরে থাকা গভীর উপত্যকা-ভূমির অধিবাসী। বহির্গিরি অধিবাসীরা পর্বতমালার প্রত্যন্ত প্রান্তের অধিবাসী। উপরিগিরি শব্দটিকে ভি.এস. আগরওয়ালা 'উপগিরি' বলে পাঠ করেছেন এবং পাণিনির ব্যাকরণ প্রমাণে তরাই অঞ্চল বলে অভিহিত করেছেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে অন্তর্গিরির পর্যায় হল মহাহিমবন্ত অর্থাৎ হিমালয় পর্বতমালার মধ্যাঞ্চল, আর বহির্গিরি হল

ছুম্লহিমবন্ত অর্থাৎ হিমালয় পর্বতমালার গৌণ অঞ্চলগুলি। *[IKP (Agrawala), p. 39; TIM (Mishra), p. 68]*

রাজসূয় যজ্ঞের আগে অর্জুন উত্তর দিক জয় করার সময় প্রথমে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজা ভগদত্তকে পরাস্ত করেন। এরপর আরও উত্তরে যাত্রা করেন এবং যাত্রাপথে অন্তর্গিরি, বহির্গিরি এবং উপরিগিরি অঞ্চল জয় করেন বলে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণে আমরা অন্তর্গিরির উল্লেখ পাচ্ছি প্রাচ্য দেশীয় জনপদ হিসেবে। তবে মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অন্তর্গিরি জনপদের নাম বহুবচনে উল্লিখিত হওয়ায় আমাদের মনে হয় যে, অন্তর্গিরি হয়তো কোন বিশেষ জনপদ-এর নামই নয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ স্পষ্টই বলছেন যে, অন্তর্গিরি নামে একাধিক জনপদ আছে। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র ধরে পণ্ডিত V.S. Agrawala জানাচ্ছেন—অন্তর্গিরি বলতে কোনো পার্বত্য অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটিকে বোঝায় যে অঞ্চল দুর্গম, উচ্চশৃঙ্গ বিশিষ্ট এবং মোটামুটি ভাবে পার্বত্য জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল—'Heart of Himalaya'। পণ্ডিত Agrawala প্রধান হিমালয় পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত কেদারনাথ বা নন্দাদেবী পর্বতশৃঙ্গ অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছেন এই প্রসঙ্গে। তবে পুরাণে অন্তর্গিরিকে প্রাচ্যদেশীয় জনপদ বলার ফলে কোনো কোনো ভৌগোলিক ঐতিহাসিক একে ভাগলপুরের রাজমহল পাহাড় এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল বলে মনে করেছেন। কিন্তু অর্জুনের দিগ্বিজয়ের বিবরণ পড়লে মনে হয়—প্রাগ্‌জ্যোতিষ অর্থাৎ অসমের উত্তরে পূর্ব-হিমালয়ের যে অন্তর্বর্তী অঞ্চল সেই অন্তর্গিরি অঞ্চলটি অর্জুন জয় করেছিলেন। সরাসরি পূর্ব-ভারতে না হলেও এটি উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত। Dr. Agrawala হিমালয় পর্বতের অন্তর্বর্তী দুর্গম অঞ্চলগুলিকে অন্তর্গিরি বলে মনে করেছেন। হিমালয় পর্বতমালার পূর্বভাগেও এমনই এক অন্তর্গিরির অবস্থান ছিল বলে ধারণা হয়। এই অঞ্চলটি ভোট এবং অন্যান্য পার্বত্য জনজাতি অধ্যুষিত ছিল বলে পণ্ডিতরা ধারণা করেন।

[মহা (k) ৬.৯.৫৪; (হরি) ৬.৯.৪৯; মৎস্য পু. ১১৪.৪৪; IKP (Agrawala), p. 39; G.P. Singh, Researches Into the History and Civilization of the Kiratas, p. 163]

অন্তর্গির্ষ্য ভারতের পূর্বদিকে অবস্থিত জনপদ। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৪২]*

অন্তর্ধান$_১$ *[দ্র. শুচি$_১$]*

অন্তর্ধান$_২$ ধনপতি কুবেরের প্রিয় অস্ত্র। শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্রলাভের পর ইন্দ্রলোকে যাবার ঠিক আগে অর্জুন কুবেরের কাছ থেকে এই অস্ত্র লাভ করেন। কুবের বলেছেন—তাঁর এই অস্ত্র, অস্ত্র-প্রয়োগকারী পুরুষের মানসিক বল, শরীরের কান্তি এবং বিপক্ষের চৈতন্য লোপ করে। ভগবান শঙ্কর যখন ত্রিপুরাসুরের তিনটি পুর-নগর দহন করেন, তখন তিনি এই অন্তর্ধান নামক অস্ত্রটিই ব্যবহার করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৪১.৩৮-৪১; (হরি) ৩.৩৬.৩৮-৪১]

অন্তর্ধান$_৩$ রাজা পৃথুর পুত্র। অন্তর্ধানের ঔরসে তাঁর পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে হবির্ধান নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। *[বিষ্ণু পু. ১.১৪.১; মৎস্য পু. ৪.৪৫; বায়ু পু. ৬৩.২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৭.২৩]*

□ ভাগবত পুরাণ মতে এই পৃথু পুত্রের প্রকৃত নাম ছিল বিজিতাশ্ব। ইনি ইন্দ্রের কাছ থেকে অন্তর্ধান বিদ্যা লাভ করেছিলেন বলেই তিনি অন্তর্ধান নামে বিখ্যাত হন। শিখণ্ডিনীর গর্ভে তাঁর যে তিন পুত্র জন্মায় তাঁদের নাম ছিল পাবক, পবমান এবং শুচি। এই তিনজন অগ্নি ছিলেন। তাঁরা অগ্নিত্ব লাভ করলে অন্তর্ধানের ঔরসে নভস্বতীর গর্ভজাত হবির্ধানই বংশরক্ষা করেন। অগ্নির ভাবনাটি রূপকাশ্রিত।

[ভাগবত পু. ৪.২৪.৫]

অন্তর্ধামা (অন্তর্ধামন্‌) মনুর পুত্রের নাম অঙ্গ। অঙ্গের পুত্র অন্তর্ধামা। অন্তর্ধামার পুত্র হবির্ধামা প্রজাপতি হিসেবে কীর্তিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১৩.১৪৭.২৩-২৪; (হরি) ১৩.১২৫.২৩-২৪]

অন্তর্বেদী দেবরাজ ইন্দ্র যেখানে বৃত্রাসুরের কুক্ষি বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং সেই বলবান দৈত্যের মরদেহ যেখানে পড়ে ছিল, ওই জায়গাটি গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্তী। এই পুণ্যস্থানটির নাম অন্তর্বেদী।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ১৭.২৬৫-২৭৪]

অন্তর্হিতাত্মা শিবসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত ভগবান শিবের অন্যতম নাম। অন্তর্হিত শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে—প্রথমত অন্তর্হিত বলতে বোঝায় অন্তর্গত বা অন্তরস্থিত। উপনিষদের ভাবনায় ব্রহ্ম

বা পরমাত্মা জীবদেহের মধ্যে জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন। কঠোপনিষদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, পরমপুরুষ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতরূপ ধারণ করে জীবের অন্তরে জীবাত্মা রূপে অবস্থান করেন—

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

[কঠোপনিষৎ ২.৩.১৭]

উপনিষদের এই ভাবনা অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপ মহাদেব যেমন অন্তরাত্মা নামে সম্বোধিত হন, তেমনই অন্তর্হিতাত্মা নামেও তিনি খ্যাত। এই নামটির অর্থ আরও পরিষ্কার হয় 'অন্তর্নিহিতাত্মা' বললে। অন্তর্হিত শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে তিরোহিত বা লুপ্ত। পরমেশ্বর শিবের আরাধনার ফলে মানুষের হৃদয়স্থিত অহংবোধ লুপ্ত হয়, তিনি আপন জীবাত্মাকে সেই পরমাত্মার একাংশমাত্র বলে অনুভব করতে সমর্থ হন। সেক্ষেত্রে ভক্তের অহংবোধ বা আত্মবোধ তিরোহিত করেন বলেও ভগবান শিব অন্তর্হিতাত্মা নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৬; (হরি) ১৩.১৬.৩৬]

অস্তিক যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর পাঁচটি পুত্র সন্তান হয়। মৎস্য পুরাণের পাঠ অনুযায়ী যদুর এই পঞ্চপুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অস্তিক।

[মৎস্য পু. ৪৩.৭]

অন্তেবসায়ী চণ্ডালের ঔরসে নিষাদীর গর্ভে যে পুত্র হয় তার সংজ্ঞা অন্তেবসায়ী। প্রধানত শ্মশান ইত্যাদি নিকৃষ্ট স্থানে এঁদের বাস নির্ধারিত ছিল এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট জন-জাতীয়েরাও এঁদের ঘৃণার চোখে দেখত—

নিষাদী চাপি চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্তেবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যৈরপি বহিষ্কৃতম্॥

[মহা (k) ১৩.৪৮.২৮; (হরি) ১৩.৪০.২৮]

অন্ত্য মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে তাঁর পত্নী দেবীর গর্ভে বারোজন ভার্গব সোমপায়ী দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। এই বারোজন ভৃগুপুত্রের মধ্যে অন্ত্য অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৮৯]*

অন্ত্যজ অন্ত্যজ শব্দের সাধারণ অর্থ অন্ত্যবর্ণ শূদ্র জাতির বর্ণ-সাংকর্যে যে সমস্ত তথাকথিত জাতি-বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। মহাভারতে অন্ত্যজ বর্ণের সৈন্যসেনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং টীকাকার নীলকণ্ঠ জানিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী কৈবর্ত এবং ভিল্ল জনজাতীয়রাই আসলে অন্ত্যজ গোষ্ঠী। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, অন্ত্যজ জাতীয় সৈন্যেরা অত্যন্ত সাহসী। তাঁরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে যান এবং ফেরার কথা ভাবেন না।

[মহা (k) ১২.১০১.১৯;
(হরি) ১২.৯৮.১৯; দ্র. নীলকণ্ঠের টীকা]

কিন্তু সাধারণভাবে অন্ত্যজ বলতে শুধুমাত্র কৈবর্ত-ভিলদেরই বোঝায় না। মনু অন্ত্যজ জনের দ্বারা উপদ্রুত ভূমিতে বসবাস করতে বারণ করেছেন—

নোপসৃষ্টে'ন্ত্যজৈ নৃভিঃ।

এখানে কুল্লূকভট্ট অন্ত্যজ অর্থ করেছেন—চণ্ডালাদি। আবার অন্য একটি মনুশ্লোকে অন্ত্যজ বলতে শূদ্র থেকে চণ্ডাল সমস্ত নিম্নতর জনজাতিকে বোঝানো হয়েছে।

[মনুসংহিতা ৪.৬১; ৮.২৭৯]

অত্রিসংহিতায় অন্ত্যজ জনের সাত রকমের ভেদ দেখিয়ে বলা হয়েছে—রজক (কাপড় রাঙায়, কাপড় কাচে এমন ধোপা), চর্মকার (চামার), নট (অভিনেতা) বুরুড (বাঁশের কাজ করে), কৈবর্ত (মাছ-ধরা জেলে), মেদ (এখনকার কর্ণাটকের একটি প্রান্তিক উপজাতীয় গোষ্ঠী, যাদের 'মেদর'-ও বলা হয়), এবং ভিল—এঁরা অন্ত্যজ।

অত্রিসংহিতায় উল্লিখিত অন্ত্যজ বর্ণের এই তালিকাটি যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মিতাক্ষরা টীকায় আপস্তম্বের শ্লোক বলে বলা হয়েছে, কিন্তু অপরার্কের টীকায় এটি অত্রিরই শ্লোক। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মিতাক্ষরায় অন্যত্র একটি উদ্ধৃতিতে অন্ত্যজ এবং অন্ত্যাবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য করে দুই প্রকার অন্ত্যজ গোষ্ঠীর মধ্যে সাতটি করে প্রকার দেওয়া হয়েছে। অন্ত্যাবসায়ীদের মধ্যে আছেন চণ্ডাল, শ্বপচ (যারা কুকুরের মাংস খায়), ক্ষত্তা, সূত, মাগধ এবং আয়োগব। অঙ্গিরার নামে আরোপিত এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, সূত-মাগধ-বৈদেহ-আয়োগবেরা সমাজে তেমন নীচজাতি বলে উল্লিখিত না হলেও এখানে যেন অতিমাত্রায় শুদ্ধি-ভাবনায় গ্রস্ত হয়েছেন স্মৃতিকার।

[অত্রিসংহিতা দ্র. স্মৃতিসন্দর্ভ, শ্লোক ১৯৯;
Summary Record of the 14th meeting of the
National Commission for Scheduled Tribes
held at 12.00 hours on 02.09.2009;
যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, ৩.২৬০; ৩.২৬৮ দ্র. মিতাক্ষরা এবং
অপরার্ক টীকা (আনন্দাশ্রম) পৃ. ১১২৩]

পুরাণে গৃহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড় বা বুরুড়, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী এবং মল্লজাতি অন্ত্যজ সংকর বলে চিহ্নিত। অন্ত্যজ নামক সংকর জাতি বর্ণধর্ম এবং আশ্রমধর্মের বাইরে ছিলেন বলে বলা হয়েছে।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ৩.১৩.৪৩-৪৭, ৫০]

অন্ত্যাবসায়ী মহাভারতে সংকর জাতির তিন-চারটি প্রকার-ভেদের মধ্যে যেখানে মেদ, পুক্কস ইত্যাদির নাম করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি নাম অন্ত্যাবসায়ী। কোথাও কোথাও 'অন্তেবসায়িনাম্' এই পাঠ থাকায় শব্দটিকে 'অন্তেবসায়ী' বলে মনে হলেও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণে সঠিক পাঠ 'অন্ত্যাবসায়ী' হবার কথা।

মহাভারতে 'অন্ত্যাবসায়ী' অবশ্যই তথাকথিত অন্ত্যজ জনজাতি অর্থেই ব্যবহৃত। বিশেষ কোন্ কোন্ উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অন্ত্যাবসায়ী জনজাতির মধ্যে পড়ে, তার উদাহরণ দিতে গিয়ে টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—

অন্ত্যাবসায়িনশ্চর্মকারাদয়ঃ।

অর্থাৎ চর্মকার বা চামার-জাতীয় মানুষেরা হলেন অন্ত্যাবসায়ী। সিদ্ধান্তবাগীশের টীকায় একটি স্মৃতি গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করে বলা হয়েছে—রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ এবং ভিল—এই সাত জনজাতীয়েরা অন্ত্যাবসায়ী বলে চিহ্নিত।

[মহা (k) ১৩.২২.২২;
(হরি) ১৩.২৩.২২; দ্র. নীলকণ্ঠকৃত ভারত ভাবদীপ
এবং সিদ্ধান্তবাগীশ-কৃত ভারতকৌমুদী টীকা]

□ বায়ু পুরাণ 'অন্ত্যাবসায়ী' জনজাতির স্পর্শে গায়ে মাটি ঘষে পরনের কাপড়সহ স্নান করে শুদ্ধ হতে বলেছে। কিন্তু তাতে অস্পৃশ্যতার দিক নির্ণয় হলেও ঠিক কোন কোন উপজাতীয় জন অন্ত্যাবসায়ী, তা বলা নেই। আমরা মনুসংহিতায় প্রথম স্পষ্টভাবে দেখি যে, চণ্ডাল পুরুষের ঔরসে নিষাদ-রমণীর গর্ভজাত সন্তানকে অন্ত্যাবসায়ী বলা হচ্ছে—

নিষাদস্ত্রী তু চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্।

বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্রে অবশ্য অন্ত্যাবসায়ীকে শূদ্র পুরুষ আর বৈশ্য রমণীর সন্তান বলা হয়েছে। শ্মশানে শবদাহ করা তাদের বৃত্তি এবং সাধারণ তারা ঘৃণিত বহিঃসমাজের মানুষ, নিতান্তই 'বাহ্য'। মনুসংহিতার অন্যত্র এক স্থানে অন্ত্যজ এবং অন্ত্যাবসায়ী এই দুটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের একত্রে বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৭৯.২৪; মনুসংহিতা ১০.৩৯;
বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র (Olivelle) ১৮.৩;
মনুসংহিতা ৪.৭৯]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বে আপদ্ধর্ম নামক উপপর্বে বিশিষ্ট মুনি বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত অবস্থায় এক চণ্ডাল-গৃহে প্রবেশ করছেন। ঠিক এইখানে চণ্ডালগৃহের পরিবেশ সংক্রান্ত যে বর্ণনাটি আছে তার শেষে বিশ্বামিত্র বলছেন—আমি এই অন্ত্যাবসায়ীদের ঘর থেকেই কিছু খাবার-দাবার নেবো—

সো'হম্ অন্ত্যাবসায়ানাং হরাম্যেনাং প্রতিগৃহাৎ।

এখানে চণ্ডালাদি অনেকগুলি উপ-জাতীয়দের আবাসস্থলকে 'অন্ত্যাবসায়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন বাহ্য দেশে যে-সব প্রান্তিক জনজাতীয়রা থাকেন তাঁরাই অন্ত্যাবসায়ী।

[মহা (k) ১২.১৪১.২৮-৪১;
(হরি) ১২.১৩৭.২৮-৪১]

অন্ত্যায়ন মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে দেবীর গর্ভজাত বারোজন দেবতার মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৮৯]

□ বায়ু পুরাণে ইনি অন্যায়ত নামে চিহ্নিত হয়েছেন। *[বায়ু পু. ৬৫.৮৭]*

অন্ত্যাশ্রম শ্বেতাশ্বতর মুনি রাজা সুশীলকে নিজের বেদশাখাবিহিত যে সন্ন্যাসীব্রত দান করেছিলেন তার নাম অন্ত্যাশ্রম। *[কূর্ম পু. ১.১৪.৩৭-৩৮]*

অন্ধ$_{১}$ সম্ভবত যাদব-বৃষ্ণি-ভোজ গোষ্ঠীর অন্যতম একটি গোষ্ঠী 'অন্ধক'-দের সংক্ষিপ্ত নাম। মহাভারতের একটি পাঠে 'অন্ধ' নামটি অন্যতর ভোজ এবং কুকুর-গোষ্ঠীর সঙ্গে উল্লিখিত।

[মহা (k) ৫.১৯.১৮; (হরি) ৫.১৯.১৮
(ভোজান্ধকবলৈঃ সহ)]

অন্ধ$_{২}$ একটি 'মিথিক্যাল' পর্বতের নাম।

[মহা (k) ৫.১০৩.১৬; (হরি) ৫.৯৬.১৬]

অন্ধ$_{৩}$ মহাভারতে কথিত এক পশু, যার চোখ ছিল না, কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই তার চোখের কাজ করত। বলাক নামে এক ব্যাধ শিকার করতে গিয়ে পশু না পেয়ে জলপানরত অবস্থায় এই অদ্ভুত-দেখতে পশুটিকে বধ করে ফেললেন। এই অদ্ভুত পশু নাকি ব্রহ্মার বরে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল এবং

সেইজন্যই ব্রহ্মা তার চক্ষু দুটি অন্ধ করে দেন—

তপস্তপ্ত্বা বরং প্রাপ্তং কৃতম্ অন্ধং স্বয়ম্ভুবা।

[মহা (k) ৮.৬৯.৩৯-৪৫; (হরি) ৮.৫১.৩৯-৪৪]

অন্ধ$_{৪}$ একটি নদী-তীর্থ। এটি ভারতের একটি পবিত্র-নদী। এই নদীতে স্নান করলে পুণ্যফল লাভ হয়।

[ভাগবত ৫.১৯.১৭; দেবী ভাগবত ৮.১১.১৬]

এই নদীর আরেক নাম আন্ধিলা বা চান্দন বা চন্দ্রাবতী। আর্যদের কাছে এই নদী 'আন্দোমতী' নামে পরিচিত ছিল।

অন্ধ বা চন্দ্রাবতী নদী ভাগলপুরের চম্পানগরের কাছে গঙ্গা নদীতে মিশেছে।

[GDAMI (Dey), p. 7]

অন্ধ$_{৫}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। নারদ পাতালের ভোগবতী পুরীর বর্ণনা দেবার সময় সেখানে বসবাসকারী নাগদের মধ্যে অন্ধের নাম উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ৫.১০৩.১৬; (হরি) ৫.৯৬.১৬]

অন্ধক$_{১}$ এক পরাক্রান্ত অসুর, অন্ধকাসুর, যাঁকে রুদ্রশিব বধ করেছিলেন। মহাভারতে অন্ধকাসুরের পূর্ণ কাহিনী পাওয়া যায় না। কিন্তু দুই প্রবল পুরুষের যুদ্ধকালে বহু উপমার মধ্যে অন্ধক-রুদ্রের যুদ্ধ উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—'পুরেব ত্র্যম্বকান্ধকৌ', 'মহেশ্বর ইবান্ধকম্', 'যথান্ধকে প্রতিনিহতে হরং সুরাঃ', 'যথা রুদ্রেণ চান্ধকঃ'। *[মহা (k) ৭.৪৯.১১; ৭.১৫৫.৪৪; ৭.১৫৬.৯০; ৮.৫.৫৭; (হরি) ৭.৪৩.১০; ৭.১৩৫.৪৩; ৭.১৩৬.৮৬; ৮.৩.৭২]*

অন্ধকাসুর বধের উপাখ্যানটি বিশদে বর্ণিত হয়েছে মৎস্য পুরাণে। একবার অন্ধকাসুর দেবী পার্বতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করার চেষ্টা করেন। তার ফলেই মহাদেবের সঙ্গে তাঁর ঘোর যুদ্ধ হয়। আবন্ত্যদেশে মহাকাল নামে যে অরণ্য আছে সেখানেই এই মহাযুদ্ধ হয়েছিল বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। মহাদেব অন্ধকের উদ্দেশে পাশুপত নামক ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাতে অন্ধকের মৃত্যু হল না, বরং তাঁর শরীর থেকে নির্গত রক্তধারা থেকে শতসহস্র অন্ধকাসুর সৃষ্টি হল। তখন অন্ধকাসুরের রক্ত যাতে মাটিতে না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে বিপুল সংখ্যক মাতৃকা সৃষ্টি করলেন। এই মাতৃকারা অন্ধকাসুরের দেহ থেকে নির্গত রক্তধারা পান করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তবু অন্ধকের মৃত্যু হল না। তখন ভগবান নৃসিংহ শুষ্করেবতী নামে এক মাতৃকা সৃষ্টি করলেন, তিনি রক্তপান করতে আরম্ভ করলে অন্ধকাসুরের দেহ ক্রমে রক্ত শূন্য হল। তখন মহাদেব অন্ধকাসুর এবং তার দেহ থেকে জাত অন্ধকদের বধ করলেন। মৃত্যুকালে অন্ধকাসুর মহাদেবের স্তব করলে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে নিজের অনুচর নিযুক্ত করেন। বক এবং আড়ি নামে অন্ধকাসুরের দুই পুত্র ছিল বলেও জানা যায়।

[মৎস্য পু. ৫৫.১৬; ১৫৬.১১-১২; ১৭৯.২-৪০]

অন্যান্য পুরাণে অন্ধকাসুরের জীবনকাহিনী আরও বিশদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি কশ্যপপুত্র হিরণ্যাক্ষের পুত্র। অন্ধকাসুর প্রথমে অন্ধ ছিলেন। হিরণ্যাক্ষের জীবদ্দশাতেই তাঁর চক্ষু ঠিক হয়ে যায়। পীতাম্বর বিষ্ণুর কথায় দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ অন্ধকাসুরের হাতে দৈত্য-দানবদের প্রতিপালন-ভার ন্যস্ত করে বদরিকাশ্রমে চলে যান। রাজ্যলাভের পর অন্ধকাসুর প্রথমেই তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করেন। মহাদেবের বরে তিনি দেব-দানব, সুর-সিদ্ধ সকলের অজেয় এবং অবধ্য হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে পৃথিবী জয় করলেন এবং স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলেন। ভয়ঙ্কর দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হল। ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি প্রমুখ দেবতারা পরাজিত হলেন। বিজিত দেবতাদের নিয়ে অন্ধক রসাতলে অশ্মক নামক নগরে উপস্থিত হলেন।

[বামন পু. ৮.৪৩-৪৭; ১০.১-৫৭]

কথিত আছে, অন্ধকাসুরের হাতে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে গেলে ভগবান বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে এই পৃথিবীকে নিজ দন্তে উদ্ধার করেছিলেন। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সর্বত্র অসুর-রাজ্য বিস্তৃত হলে অন্ধক-মন্দর পর্বতস্থিতা ভগবতী পার্বতীকে কামনা করেছিলেন। কালভৈরবের নির্দেশ অমান্য করে অন্ধক মন্দর পর্বতে প্রবেশ করলে কালভৈরব শূল দিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন কিন্তু তাতে শত-সহস্র অন্ধকের সৃষ্টি হয়। তাদের সঙ্গে শিবগণ এবং ভৈরবের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। ভৈরব ভগবান বাসুদেবের শরণাপন্ন হলে বাসুদেব অসুর

সংহারের জন্য এক শত দেবীর সৃষ্টি করেন। তাঁরা সহস্র অন্ধকদের হত্যা করলে মূল অন্ধকাসুর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন এবং পুনরায় মন্দর পর্বত থেকে পার্বতীকে হরণ করার চেষ্টা করেন। ভৈরব তখন মহাদেবের স্তব আরম্ভ করেন অসুর নিধনের জন্য। সকলের কাছে অনুরুদ্ধ হয়ে মহাদেব অন্ধককে ত্রিশূলাগ্রে রেখে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। এর ফলে অন্ধকের সমস্ত পাপ দূর হয়ে গেল। পুণ্য জ্ঞানের আবির্ভাবে তিনি পরমেশ্বরের স্তব শুরু করলেন। স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে অন্যতম গণেশ্বর হিসেবে নিযুক্ত করেন। অন্ধক পার্বতীকেও স্তবে তুষ্ট করলে তিনি তাঁকে পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করেন।

[বামন পু. ৮.৪৩-৪৭; ১০.১-৫৭;
কূর্ম পু. ১.১৬.৭৭-২২৩]

অন্য মতে অন্ধকাসুরকে মহাদেব নিহত করেন। *[কালিকা পু. ৬১.৪৮-৪৯;*
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ১৩.৩৫; ২৯.১০-১১]

অন্ধকাসুরের দুই পুত্র শুম্ভ এবং নিশুম্ভ।

[কালিকা. পু. ৬১.৪৮]

অন্ধক$_{২}$ যদুবংশীয় সাত্বতর ঔরসে তাঁর পত্নী কৌশল্যার গর্ভে জাত পুত্রসন্তানদের মধ্যে অন্যতম। মৎস্য পুরাণ মতে কঙ্কের কন্যা এই অন্ধকের পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শশি (অন্যমতে শুচি) এবং কম্বলবর্হিষ নামে চার পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এই অন্ধকের নামানুসারেই যদু-বৃষ্ণি বংশীয়রা কখনো বা অন্ধক নামে সম্বোধিত হয়েছেন, কখনো বা এঁদের কুকুরান্ধক-বংশীয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.৬;*
বায়ু পু. ৯৬.২; মৎস্য পু. ৪৪.৪৮-৬১;
বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৩; ৪.১৩.১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১, ৩৬, ৫৩]

কৃষ্ণের সমসাময়িক অন্ধক-জাতিগোষ্ঠীর কোনো প্রধানকে অন্ধক নামে ডাকা হয়েছে এবং কুরুক্ষেত্রের আসন্ন যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য দ্রুপদ রাজা তাঁর কাছে দূত পাঠানোর প্রস্তাব দিচ্ছেন—

অমিতৌজসে তথোগ্রায় হার্দিক্যায়ান্ধকায় চ।

[মহা (k) ৫.৪.১২; (হরি) ৫.৪.১২]

অন্ধক$_{৩}$ মহাভারতে উল্লিখিত একটি তীর্থের নাম। যে মানুষ অনাবৃত-স্থানে থেকে সনাতন এই অন্ধকতীর্থে স্নান করে, সে একদিনেই সিদ্ধিলাভ করে।

[মহা (k) ১৩.২৫.৩২-৩৩; (হরি) ১৩.২৬.৩২-৩৪]

সুত্ত নিপাত-এর অঠ্‌ঠকথা অনুসারে দক্ষিণাপথের অশ্মক এবং অলক নামক স্থান দুটির মধ্যভাগ বরাবর যেখান দিয়ে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হয়েছে সে অঞ্চলটির নাম অন্ধক।

[EAIG (Kapoor) p. 43]

অন্ধক তীর্থটি বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত বলে ধারণা করা হয়।

অন্ধক$_{৪}$ অন্ধকবংশীয় বিলোমের পুত্র অনু। ভাগবত পুরাণ মতে এই অনুর অন্যতম পুত্র ছিলেন অন্ধক। অন্ধকের দুন্দুভি নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.২০]*

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বিলোমের পুত্রের নামই অন্ধক ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। এই অন্ধককেই এই পুরাণে তুম্বুর গন্ধর্বের সখা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে ইনিই নাকি দনোদক দুন্দুভি নামেও খ্যাত ছিলেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৮]*

অন্ধক$_{৫}$ ভণ্ডাসুরের অন্যতম সেনাপতি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২১.৮২]

অন্ধক$_{৬}$ পুরাকালে দেবতা ও অসুদের মধ্যে বারো বার ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে অষ্টম যুদ্ধটি অন্ধক যুদ্ধ নামে খ্যাত। মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, এই যুদ্ধে মহাদেবের হাতে বহু অসুর ও পিশাচের মৃত্যু হয়। সম্ভবত অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল তাকেই অন্ধক যুদ্ধ বলা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৪৭.৪৪-৫০]

অন্ধক$_{৭}$ বিষ্ণু পুরাণ মতে দানব রাজ বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন অন্ধক। *[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম) ১.২১.১২;*
বিষ্ণু পু. (নবভারত) ১.২১.১১
(অঞ্জক পাঠ পাওয়া যায়)]

অন্ধক$_{৮}$ অন্ধক জনগোষ্ঠী মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে বসবাসকারী যাদব জনগোষ্ঠীর একাংশ। এঁদের জ্ঞাতি-গুষ্টির মধ্যে অন্য জনগোষ্ঠীরা হলেন বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ইত্যাদি।

যযাতি-দেবযানীর প্রথম পুত্র যদুর ছেলে ক্রোষ্টু। তাঁরই বংশের অধস্তন পুরুষ হলেন সাত্বত। সাত্বতের চার ছেলে—ভজিন (ভজমান), দেবাবৃধ, অন্ধক এবং বৃষ্ণি। *[বিষ্ণু পু. ৪.১৩ (অধ্যায়)]*

অন্ধকদের মহাভোজ বলা হত। মথুরার রাজা অত্যাচারী কংস কিন্তু এই অন্ধক বংশেরই অধস্তন পুরুষ। অন্ধকের বড়ো ছেলে কুকুর এবং তাঁর নামে পৃথক বংশধারা চালু হয়। অন্ধকের দ্বিতীয় পুত্রের বংশে জন্মান কৃতবর্মা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধের শেষেও তিনি বেঁচে ছিলেন। কৃতবর্মা অন্ধকবংশীয় হলেও তাঁকে ভোজও বলা হয়েছে মহাভারতে। বস্তুত অন্ধক, বৃষ্ণি, কুকুর ইত্যাদি যাঁরাই সাত্বতবংশীয় ছিলেন, তাঁদের সকলকেই সাধারণ সম্বোধনে ভোজ বলে ডাকা হত। *[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮.১৪]*

মগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে অন্ধক-বৃষ্ণি-ভোজেরা কীভাবে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, তার বর্ণনা মহাভারতের মধ্যে কৃষ্ণ নিজ-মুখেই করেছেন।

[মহা (k) ২.১৪.৪৯, ৫৯-৬০; (হরি) ২.১৪.৪৮, ৫৭-৫৮]

☐ বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজের শাসনতন্ত্র গণ-রাজ্যের ধাঁচে গড়ে উঠেছিল। কৌটিল্য বৃষ্ণি-অন্ধক-কুকুর বংশীয়ের শাসনতন্ত্রকে সংঘরাষ্ট্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। *[অর্থশাস্ত্র (Kangle), ১ম খণ্ড, ১.৬.১০; ১১.১.৫]*

☐ নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই অন্ধক-বৃষ্ণি-ভোজেদের বিনাশ ঘটেছিল, এ-কথা কৃষ্ণ নিজের জ্ঞাতিগুষ্টির উদাহরণ দিয়েই বুঝিয়েছেন মহাভারতে।

[মহা (k) ১২.৮১.৩-১৯; (হরি) ১২.৭৯.৩-১৯]

অন্ধকার$_{১}$ একটি প্রাচীন পর্বতের নাম। পুরাণ-কথিত ক্রৌঞ্চ পর্বতের পরে বামন পর্বত, বামন-পর্বতের পরে অন্ধকার-পর্বত।

[মহা (k) ৬.১২.১৮; (হরি) ৬.১২.১৮]

অন্ধকার$_{২}$ বারাহ কল্পে মোট বারোটি ভয়াবহ দেবাসুর যুদ্ধ হয়েছিল বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে অষ্টম যুদ্ধটি অন্ধকার যুদ্ধ নামে খ্যাত। অসুরবাহিনী অন্ধকাসুরের নেতৃত্বে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

[বায়ু পু. ৯৭.৭৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭২.৭৫, ৮২]

অন্ধকারক$_{১}$ (অন্ধকার-দেশ) বামন পর্বতের কাছাকাছি উষ্ণদেশের পরবর্তী স্থানের নাম প্রাবরদেশ, তার পরেই অন্ধকার-দেশ। পণ্ডিতেরা অন্ধকার-দেশকে 'সাইবেরিয়া' বলে চিহ্নিত করেছেন, কেননা এখানে ছয় মাস রাত্রি থাকে। কৃষ্ণ-সাগরের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে সাইবেরিয়াকে ধরে অন্ধকার-দেশ।

[মহা (k) ৬.১২.২২; (হরি) ৬.১২.২২; B.S. Suryavanshi. Geography of India, p. 72]

অন্ধকারক$_{২}$ ক্রৌঞ্চদ্বীপের রাজা দ্যুতিমানের সাত পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অন্ধকারক। কোনো কোনো পুরাণ তাঁকে অন্ধকার নামেও চিহ্নিত করেছে। দ্যুতিমান ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে তাঁর সাত পুত্রকে সেই সব বর্ষ বা ভূবিভাগে রাজা নিযুক্ত করেছিলেন। অন্ধকারক যে বর্ষে রাজা হয়েছিলেন তাঁর নাম অনুসারেই সেই বর্ষের নাম হয় অন্ধকারক বা অন্ধকার বর্ষ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.২২, ২৫; ১.১৯.৬৭, ৭২; বায়ু পু. ৩৩.২১, ২৩; ৪৯.৬১.৬৭; বিষ্ণু পু. ২.৪.৪৮; মৎস্য পু. ১২২.৮১, ৮৫]

অন্ধকারক$_{৩}$ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ-পর্বত বা কুলপর্বতের মধ্যে অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১২২.৮১; বিষ্ণু পু. ২.৪.৫০]

অন্ধকূপ একটি নরকের নাম। একবিংশতি নরকের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.২৬.৭]*

অন্ধকেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। অন্ধক এই স্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৬৫]

অন্ধগভানু *[দ্র. ঋচেয়ু]*

অন্ধতামিস্র একটি নরকের নাম। অপরের স্ত্রী এবং ধনসম্পত্তি বঞ্চনাপূর্বক উপভোগ করলে এই নরকে নিক্ষিপ্ত হতে হয়।

[ভাগবত পু. ৫.২৬.৭, ৯; ৩.৩০.২৮, ৩৩; বিষ্ণু পু. ১.৬.৪১; বায়ু পু. ১০১.১৭৬; দেবীভাগবত পু. ৮.২১.২২; ৮.২২.৫-৮]

অন্ধ্র একটি প্রাচীন অনার্য জনজাতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, পুত্রশোকে বিশ্বামিত্র এঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। অন্ধ্র অন্ধ্র জনজাতিটির অপর নাম। *[দ্র. অন্ধ্র]*

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭.১৮]

অন্ধোনতীর্থ নর্মদা নদীর কাছে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। দান-ধ্যান এবং পিণ্ডদানের জন্য স্থানটি অত্যন্ত প্রশস্ত। এই তীর্থ দর্শনে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হওয়া যায়।

[পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ. ৯.১১৭-১২৪]

অন্ধ্র$_{১}$ দেশ-নাম। গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর অন্তর্বর্তী অঞ্চল সেকালে অন্ধ্র নামে পরিচিত ছিল। বানররাজ সুগ্রীব সীতার খোঁজে অঙ্গদকে অন্ধ্রদেশে যেতে আদেশ করেছিলেন।

[রামায়ণ ৪,৪১.১২]

মহাভারতে দক্ষিণাপথে অবস্থিত ভূমির নাম অন্ধ্র। *[মহা (k) ১২.২০৭.৪২; (হরি) ১২.২০১.৪২; পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ ৩.৪৫]*

এই রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল ধনকটক ('ধন্নকড়'), যা এখনকার বিজয়ওয়াড়া *[Epigraphica Indica, Vol. VI, p. 88]* কৃষ্ণা নদীর সম্মুখে এই অঞ্চলকে অমরাবতী বলা হয়েছে। হিউয়েন সাঙ-এর জবানীতে ইলুর থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে বেঙ্গী নামের জায়গাটাই (আধুনিক পেড্ডাবেগী) অন্ধ্রর রাজধানী ছিল অন্ধ্রের প্রাচীনতম রাজধানীর নাম ছিল অন্ধ্রপুর এবং সেটা ছিল টেলবাহা নদীর (টেল বা টেলিংগিরি) ওপর। অনর্ঘরাঘব নাটকে দেখা যায় গোদাবরী নদী অন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে এবং এখানকার মুখ্য দেবতা হলেন ভীমেশ্বর মহাদেব। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রমতে জগন্নাথ (পুরী) এবং ভ্রমরাম্বিকার মন্দিরের মধ্যবর্তী অঞ্চল অন্ধ্র (৩য় অধ্যায়)। চীন দেশে অন্ধ্র-ভূমি An-ta-lo নামে পরিচিত ছিল এবং এই ভূমির পরিমাণ ছিল ৩০০০ লি। *[GDAMI (Dey), p. 7; PHAI (Raychoudhuri), p. 176, also fn. 5; HGAI (Law), pp. 140-141]*

অন্ধ্র$_{২}$ অন্ধ্ররা একটি জাতিনাম হিসেবেও ব্যবহৃত।

[মহা (k) ২.৩১.৭১; (হরি) ২.৩০.৬৯]

অন্ধ্রের আধুনিক ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে এঁদের জাতিগত অবস্থানের কোনো পার্থক্য নেই। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে অন্য মিশ্রণে এদের উৎপত্তি।

[মহা (k) ১২.৬৫.১৩-১৪; (হরি) ১২.৬৩.১৩-১৪]

অন্য মতে, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের নাম আয়োগব। বৈদেহকের ঔরসে আয়োগবীর গর্ভে জাত সন্তানের নাম অন্ধ্র। গ্রামের বাইরে তাঁদের বাস নির্ধারিত ছিল।

[মহা (k) ১৩.৪৮.২৫; (হরি) ১৩.৪০.২৫]

জাতি হিসেবে অন্ধ্রেরা অত্যন্ত প্রাচীন। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থগুলিতে এঁদের সুদৃষ্টিতে দেখা হয়নি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্রদের সমগোত্রীয় এবং সমতুল্য জাতিগোষ্ঠীরা অনেকেই বিশ্বামিত্রের শাপে দস্যু বলে পরিচিত হলেও শাপের কথাটা প্রলেপমাত্র। অধিকাংশ পুরাণে অন্ধ্রেরা অবর জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন কিরাত, পুলিন্দ, হূণ, পুক্কশ, খশ, নিষাদ ইত্যাদি 'অনার্য' জাতির সঙ্গে—

প্রাচ্যৈঃ প্রতীচ্যৈরথ দাক্ষিণাত্যৈ
রুদীচ্য-কাম্বোজ-শকৈঃ খশৈশ্চ।
শাল্বৈঃ সমৎস্যৈঃ কুরুমধ্যদেশ্যৈঃ
ম্লেচ্ছৈঃ পুলিন্দৈর্দ্রবিড়ান্ধ্রকাঞ্চৈঃ॥

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug), ৭.১৮, পৃ. ১৮৩; মহা (k) ৫.১৬০.১০৩; (হরি) ৫.১৪৯.১০৩]

মহাভারতের বনপর্বে এক জায়গায় বলা হচ্ছে যে অন্ধ্র প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতীয়রা পাপাচারী, মিথ্যা এবং অন্যায়ই তাদের চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। এঁরা যখন পৃথিবীর অধিপতি বা রাজা হবেন তখন পৃথিবীও পাপে পরিপূর্ণ হবে। তখনই কলিযুগের অবসানও ঘনিয়ে আসবে ধীরে ধীরে।

[মহা (k) ৩.১৮৮.৩৫; (হরি) ৩.১৫৯.৩৫]

মহাভারতে অন্ধ্রদের দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী বলে একদিকে যেমন তাঁদের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে, তেমনই তাঁদের গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক, মদ্রক ইত্যাদি হীন এবং বর্বর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে—অন্ধ্র জনজাতির মানুষের সংখ্যা কম ছিল না—আন্ধ্রাশ্চ বহবো রাজন্।

[মহা (k) ৬.৯.৪৯; (হরি) ৬.৯.৪৯]

কৃষ্ণ যখন কর্ণকে বুঝিয়ে পাণ্ডব-পক্ষে আনার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, দ্রবিড়, কুন্তল, অন্ধ্র ইত্যাদি জনজাতি তাঁর সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে যাবে।

[মহা (k) ৫.১৪০.২৬; (হরি) ৫.১৩১.২৬]

মহাভারতে একদিকে যেমন অন্ধ্রদের দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী বলে তাঁদের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে তাঁদের গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক, মদ্রক ইত্যাদি তথাকথিত হীন এবং বর্বর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে—

দক্ষিণাপথজন্মানঃ সর্বে নরবরান্ধ্রকাঃ।
গুহাঃ পুলিন্দাঃ শবরাশ্চুচুকা মদ্রকৈঃ সহ॥

[মহা (k) ১২.২০৭.৪২; (হরি) ১২.২০১.৪২]

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে সহদেবের দক্ষিণ-

দেশ জয়ের প্রসঙ্গে যেসব জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উগ্র, কেরল এবং কলিঙ্গনিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্ধ্ররাও আছেন।

[মহা (k) ২.৩১.৭১; ২.৩৪.১১;
(হরি) ২.৩০.৬৯; ২.৩৩.১১]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্ধ্র জনগোষ্ঠী দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন।

[মহা (k) ৮.৭৩.২০; (হরি) ৮.৫৪.২০]

মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে অর্জুন যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হলেন সেই সময়েও অন্ধ্রজাতির সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল।

[মহা (k) ১৪.৮৩.১১; (হরি) ১৪.১০৬.১১]

পুরাণগুলির মধ্যে যে উদার ভক্তি-আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে, সেখানে কিরাত, পুলিন্দ ইত্যাদি অবর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্ধ্রদেরও নাম আছে এবং ভক্তির মাধ্যমে তাঁরাও যে পরম পদ লাভ করতে পারেন, সে-কথা সোচ্চারে বলা হয়েছে—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ।

পৌরাণিক কালে সম্ভবত দক্ষিণ ভারতে আর্যায়ণের ফলেই অন্ধ্রদের প্রতি বিদ্বেষভাব, কিংবা তাদের পাপাচারী বলার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। ভাগবত পুরাণে যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় রাজর্ষি বলির যে ক্ষেত্রজ পুত্রদের উল্লেখ আছে সেখানে বলির পাঁচ পুত্রের বদলে ছয়টি পুত্রের উল্লেখ পাচ্ছি এবং এই কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম অন্ধ্র। ইনি অন্ধ্রদেশের রাজা এবং অন্ধ্র জনপদের প্রতিষ্ঠাতাও বটে। বিভিন্ন পুরাণে বলা হয়েছে যে কলিযুগে মৌর্য, শুঙ্গ, কণ্ব প্রভৃতি রাজবংশের পর ভারতবর্ষে অন্ধ্র বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই অন্ধ্রবংশীয় রাজারা ৩০০ বছর মতান্তরে ৪৫৬ বছর পৃথিবী শাসন করবেন। বায়ু পুরাণে বর্ণিত আছে যে ভগবান বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন ম্লেচ্ছ জাতির সঙ্গে অন্ধ্রজাতিরও বিনাশ করবেন।

[বায়ু পু. ৯৮.১০৮; ৯৯.২৬৮, ৩৬১, ৩৮৫;
৪৫.১২৭; ৪৭.৪৪; ৭৮.৬৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৩.১০৯;
২.৭৪.১৬০, ১৭০, ১৭৮, ১৯৭, ২২৯, ২৩০;
বিষ্ণু পু. ৪.২৪.১২-১৩; মৎস্য পু. ৫০.৭৬;
ভাগবত পু. ২.৪.১৮; ১২.১.২২-২৮]

অন্ধ্র$_৩$ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পুত্র। ইনি রাজর্ষি যুবনাশ্বের পিতা ছিলেন।

[বায়ু পু. ৮৮.২৬;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.২৭]

অন্ধ্রক$_১$ *[দ্র. অন্ধ্র$_২$]*

অন্ধ্রক$_২$ *[দ্র. অন্তক$_৩$]*

অন্ধ্রবাক একটি প্রাচীন পূর্বভারতীয় জনজাতি। এঁদের বাসভূমির আধুনিক নাম সম্পর্কে এখনও কিছু জানা সম্ভব হয়নি। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫৩]*

অন্ন$_১$ অন্নের কারণেই জীবজগৎ জীবনধারণ করে। পর্জন্য (বৃষ্টি) থেকে অন্নসৃষ্টি হয়।

[কালিকা পু. ৩১.৮]

□ মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, জগচ্চক্র প্রবর্তিত হয় যজ্ঞকর্ম থেকে। যজ্ঞকালে অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে যে আহুতি দেওয়া হয়, সেই পুণ্যফলেই বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির ফলে বসুন্ধরা শস্যশালিনী হয়, তাতেই আমাদের ক্ষুধার অন্ন লাভ হয়। অন্ন থেকেই পুরুষ-স্ত্রীর শুক্রশোণিতের পরিণতি হয় এবং তাতেই প্রাণীর সৃষ্টি হয়—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥

গীতার এই কথাটাই মনু একটু অন্যভাবে বলেছেন। মনুর মতে—অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্য-সূর্যের কাছে পৌঁছায়, আদিত্য-তেজেই বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে জীবের সৃষ্টি—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

[ভগবদ্গীতা ৩.১৪; মনুসংহিতা ৩.৭৬]

বস্তুত গীতা এবং মনুতে উল্লিখিত এই শ্লোকের উৎস আমাদের প্রাচীন উপনিষদগুলি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—অন্ন থেকেই প্রাণীর সৃষ্টি, অন্নের দ্বারাই জীব জীবন ধারণ করে, অন্নেই জীব বিলীন হয়। অন্নই সকলের জ্যেষ্ঠ, অন্নই ঔষধ। অন্নকেই ব্রহ্মবোধে উপাসনা করবে। অন্নকে বহুমানন করবে।

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২.২; ৩.৯;
ছান্দোগ্য উপনিষদ ১.৩.৬; ১.১১.৯;
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫.১২.১]

□ শরীরের মধ্যস্থিত জঠরাগ্নি (বৈশ্বানর অগ্নি) প্রাণাপান বায়ুর সাহায্যে প্রাণীভুক্ত ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য এবং চোষ্য এই চার রকমের অন্ন পাক করে। *[ভগবদ্গীতা ১৫.১৪]*

☐ দেহধারী জীব 'পিণ্ড' 'কবল' এবং 'গ্রাসে'র আকারে অন্ন ভোজন করে। অন্ন মূলাশয়ে গিয়ে প্রাণকে যথাক্রমে স্থাপন করে। ভুক্ত এবং অপক্ব আহার বায়ু দুইভাগে বিভক্ত করে এবং তা অগ্নের মধ্যে প্রবেশ করে পক্ব অন্নকে পৃথক গুণবিশিষ্ট করে। অগ্নির ওপর জল, জলের ওপর অন্ন এবং জলের নীচে প্রাণ স্বয়ং অবস্থান করে এবং ধীরে ধীরে অন্নকে উদ্দীপিত করে। বায়ুর দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে অগ্নি জলকে অতি উষ্ণ করে দেয়। তখন সেই অন্ন উষ্ণতার যোগে সর্বতোভাবে পাচিত হতে থাকে। তারপর অন্ন দ্বিধা বিভক্ত হয়, তার রসাংশ এবং মলাংশ পৃথক আকার ধারণ করে। দ্বাদশ প্রকারে বিভক্ত মল (নোংরা) কর্ণ (কানের খোল) অক্ষি (চোখের পিচুটি) নাসিকা (নাকের সর্দি) জিহ্বা (নাল), দন্ত, ওষ্ঠ, লিঙ্গাদি পথে দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। হৃৎপথে সমস্ত নাড়ি একে অন্যের সঙ্গে পরস্পর প্রতিবদ্ধ। প্রাণ সেই সব নাড়ির মুখে সূক্ষ্ম রস স্থাপন করে। সেই রসে নাড়ি পূরিত হয়। পূর্ণ নাড়িগুলি দেহকে সর্বতোভাবে পুষ্ট করে, তারপর সেই নাড়িমধ্যস্থ রস দৈহিক উষ্মায় পাচিত হতে থাকে। পচ্যমান রস দুই রকমের পরিণতি লাভ করে এবং সেই পরিণতি অনুসারেই ত্বক, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও রুধিরের সৃষ্টি হয়। শুক্রের সৃষ্টি অন্নের শেষ পরিণাম। *[পদ্ম পু. (ভূমি) ৬৬.১৬-২৭; অন্নদানের ফল পদ্ম পু. (ভূমি) ৬৯.১৬-২১]*

অন্ন$_{২}$ ভগবানবিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১৮; (হরি) ১৩.১২৭.১১৮]

অন্নকূট একটি পবিত্র পর্বত-তীর্থ। মথুরায় অবস্থিত এই উচ্চভূমিতে দেবরাজ ইন্দ্রের অবস্থান।

বাসুদেব কৃষ্ণ একবার ইন্দ্রের কৃপালাভের জন্য এই অঞ্চলে যজ্ঞ করেন। ইন্দ্রের রোষ থেকে রক্ষার জন্য কৃষ্ণ এই স্থানেই গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন। সে কারণে গোবর্ধন পর্বতেরও আরেক নাম অন্নকূট।

[বরাহ পু. ১৬৪.১০, ২১-২৪]

অন্নজ বিন্ধ্য পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত একটি জনপদ। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভারতবর্ষ বর্ণনার সময় এই স্থানটিকে অন্নজ নামে উল্লেখ করা হলেও অন্যান্য বেশির ভাগ পুরাণে 'অন্নজ'-এর পরিবর্তে অনূপ বা অণূপ পাঠ ধৃত হয়েছে। পণ্ডিত D.C. Sircar বিভিন্ন পুরাণের পাঠান্তর তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে 'অন্নজ' জনপদনামটি প্রকৃতপক্ষে 'অনূপ' দেশেরই নামান্তর বা পাঠান্তর মাত্র। বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবর্তী মাহিষ্মতীপুরী প্রাচীনকালে অনূপ দেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত Sircar 'অন্নজ'কেও মাহিষ্মতীর সঙ্গে অভিন্ন বলেই উল্লেখ করেছেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৫৫; GAMI (Sircar) p. 44]

অন্নতীর্থ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। এখানে স্নান করলে সূর্যলোক লাভ হয়। এটি সুদিন তীর্থের কাছেই অবস্থিত।

[বামন পু. ৩৬.৬৩; Bal Krishnan: Kurukshetra: Political and Cultural History; p. 119]

অন্নপ্রাশন অগ্নি পুরাণে গৃহস্থের করণীয় হোম-যজ্ঞ বিষয়ে নানান অগ্নিকর্মের উপদেশ দেবার সময় গর্ভাধান থেকে বিবাহ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কারগুলির কথা বলা হয়েছে। প্রথমে গর্ভাধান তারপর পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ব্রতবন্ধ অর্থাৎ উপনয়ন, সমাবর্তন, পত্নীসংযোগ বা বিবাহ—এগুলি গৃহস্থাশ্রমের করণীয় সংস্কার। এই প্রতিটি কর্মেই প্রণব-উচ্চারণ, হোম, আটটি আটটি করে আহুতি এবং পূর্ণাহুতির কথা বলা হয়েছে—

গর্ভাধানন্তু প্রথমং ততঃ পুংসবনং স্মৃতম্।
সীমন্তোন্নয়নং জাতকর্ম নামান্নপ্রাশনম্॥

[অগ্নি পু. ২৪.৩৩]

এই সংস্কারের কথা সবাই জানেন এবং প্রায় সকলেই মানেন। মানেন, কেননা এর পিছনে যে বৈজ্ঞানিক কারণ আছে তা আজও সযৌক্তিক। অশন মানে খাওয়া। প্রাশন প্রকৃষ্টরূপে খাওয়া। অন্ন বলতে যেকোনো খাদ্যবস্তু বোঝালেও এখানে অন্ন মানে ভাত। শিশু আগে যেখানে মাতৃস্তন্য, জল অথবা গোরুর দুধ খেত, তার কাছে ভাত বা অন্য কোনো 'সলিড' জিনিস খাওয়া মানেই প্রকৃষ্ট ভোজন অর্থাৎ 'প্রাশন'। অন্নের প্রকৃষ্ট ভোজনই অন্নপ্রাশন। শাস্ত্রমতে সংস্কারের লক্ষণ মেলালে অন্নপ্রাশনের দ্বারা শিশুশরীরে কোনো গুণাধান হয় বলে শাস্ত্রকারেরা বলেননি, কিন্তু দোষাপনয়নের কথা বললে তাঁরা ওই একই কথা বলেন। অর্থাৎ রেতঃ, রক্ত, গর্ভোপঘাতের দোষ নাকি অন্নপ্রাশনের সংস্কারে নষ্ট হয়। আমরা

এটা ভালো করে মানতে পারি না। বরঞ্চ সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি যে শিশু আগে মাতৃস্তন্য পান করত, তাকে শক্ত খাবার অভ্যাস করানোর প্রারম্ভিক সংস্কারের মধ্যে গুণাধানের লক্ষণটাই থাকা উচিত ছিল। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলি থেকেও এই গুণাধানের কথাটাই মনে বেশি আসে।

তবে এই শাস্ত্রীয় লক্ষণের চেয়েও এখানে যে শিশুর শারীরিক প্রয়োজনীয়তাই বেশি এবং সেই প্রয়োজনীয়তার খাতিরেই যে এই সংস্কার শাস্ত্র এবং সমাজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি আজও এই সংস্কার টিকে আছে দেখে। সুশ্রুতের মতো বিশালবুদ্ধি কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—শিশুর ছয়মাস বয়সে তার উপযুক্ত এবং সহজপাচ্য অন্যতম খাবার খেতে দেবে—

ষন্মাসং চৈনম্ অন্নং প্রাশয়েদ্ লঘু হিতঞ্চ।

[সুশ্রুতসংহিতা (Jadavji Trikamji), ১০.৪৯, পৃ. ৪৩৫]

অন্নপ্রাশন সংস্কারের সৃষ্টি যে-প্রয়োজনে হয়েছে, তা একদিকে স্তন্যদায়িনী জননীরও হিতসাধন করবে, অন্যদিকে শিশুটিরও হিতসাধন করবে। মমতাময়ী জননীরা প্রয়োজনাধিক কাল ধরে শিশুটিকে স্তন্যপান করালে তাঁদের শরীর জীর্ণ হতে থাকে, অতএব সেটা যাতে না হয়; আবার অন্যদিকে অধিক বয়স পর্যন্ত স্তন্যপান করার ফলে যে শিশুর শক্ত খাবার খেয়ে বড়ো হবার কথা ছিল, সে পেটে ক্ষুধা নিয়ে অন্যভাবে জীর্ণ-শীর্ণ হতে থাকে। অতএব জননী এবং তাঁর জাতক দুজনেরই সুস্থভাবে জীবনশক্তিলাভের প্রয়োজনেই অন্নপ্রাশন সংস্কার মর্য্যাদা লাভ করেছে।

গৃহ্যসূত্রগুলির মতে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের সাধারণ কাল শিশুর জন্ম থেকে ছয় মাসের মাথায় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে জন্মের সময় থেকে ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশনের সংস্কার পালন করতে বলা হয়েছে—

ষষ্ঠে মাসি অন্নপ্রাশনম্।

মনুর মতও তাই—ষষ্ঠে'ন্নপ্রাশং মাসি—যাজ্ঞবল্ক্যের মতও তাই। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন এবং এমন লোকাচারও এই রকম আছে যে,—শিশুর দাঁত বেরিয়ে গেলে আর অন্নপ্রাশন দেবার মানে থাকে না। সবিনয়ে জানাই—শাস্ত্রের মধ্যে অনেক বচনই এখন অনুচিত এবং হাস্যকর মনে হতে পারে এবং হয়তো আঁকড়ে থাকবারও মানে হয় না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে সমাজের প্রয়োজনে, ব্যক্তির প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন থেকে বহুতর শাস্ত্রবিধির সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এই অন্নপ্রাশনকে কেন্দ্র করেই বলতে পারি যে, শিশুর দাঁত ওঠা না ওঠার সঙ্গে অন্নপ্রাশনের কোনো সম্পর্ক নেই। শাস্ত্রকারদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছেন, যিনি শিশুর দাঁত ওঠার জন্যই অপেক্ষা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন—শাস্ত্রের মত মেনে ছয় মাসের মাথায় অন্নপ্রাশন দিতেই পারো, কিন্তু শিশুর দাঁত উঠলেই ভালো হয়—

ষষ্ঠে অন্নপ্রাশনং জাতেষু দন্তেষু বা।

বেশ বোঝা যায়—দাঁত উঠলে শক্ত খাবার হজম করার সুবিধে হয় বলেই এই কথা বলেছেন তিনি।

এই সম্পূর্ণ বিচারটা পরম উদারতায় উল্লিখিত হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির ওপরে মিত্রমিশ্রের লেখা বীরমিত্রোদয় নামক টীকায়। মিত্রমিশ্র মনু, ব্রহ্মপুরাণ এবং লৌগাক্ষি-স্মৃতি থেকে বচন উদ্ধার করে লিখেছেন—ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দিতে হয়, এটা প্রথম এবং সাধারণ একটা নিয়ম। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ বলেছে—ছয় মাসে অথবা আট মাসেও অন্নপ্রাশন দিতে পারো অথবা খেয়াল করা উচিত যে, কোনটা করলে কুলের সর্বদা মঙ্গল হয়। আর লৌগাক্ষি তো বলেই দিয়েছেন—ষষ্ঠ মাসেও হতে পারে আবার শিশুর দাঁত উঠলেও অন্নপ্রাশন দিতে পারো।

গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতিগুলির বেশির ভাগ ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দেবার পক্ষপাতী হলেও অনেক স্মার্তই বুঝেছেন যে, ব্যক্তি-শিশুর স্বাস্থ্যই এই সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হওয়া উচিত। শিশুর স্বাস্থ্য ঠিক নেই, তরল পদার্থও জীর্ণ হয় না—এই অবস্থায় খুব বিধি মেনে অন্নপ্রাশন দেওয়ার কথা বলেননি শাস্ত্রকাররা। তাঁরা নিয়ম শিথিল করে বলেছেন জন্ম থেকে ধরে ছয়মাসে অন্নপ্রাশন দেওয়া বেশ ভালো। কিন্তু তা না পারলে আট মাসে, নয় মাসে, অথবা দশ মাসেও অন্নপ্রাশন দেওয়া যায়—

জন্মাতো মাসি ষষ্ঠে বা সৌরণোত্তমমন্নদম্।
তদভাবে'ষ্টমে মাসে নবমে দশমে'পি বা॥

দ্বাদশে বাপি কুর্বীত প্রথমান্নপ্রাশনং পরম্।
সংবৎসরে বা সম্পূর্বে কোচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ।

এমনকী স্মার্তপ্রধান অপরার্ক প্রাচীন নিবন্ধকার শঙ্খের মত উল্লেখ করে বলেছেন—জন্মের এক বছর পরে বারো মাসের মাথাতেও অন্নপ্রাশন দিতে বাধা নেই—

সংবৎসরে'ন্নপ্রাশনম্ অর্ধসংবৎসরে ইত্যেকে।

বারো মাসের পরেও যে অন্নপ্রাশনের বিধান দেননি স্মার্তরা তার সবচেয়ে বড়ো কারণও ওই শিশুর প্রয়োজন। ছ'মাসেই যেখানে একটি শিশু শক্ত খাবার জীর্ণ করার উপযুক্ত সেখানে অন্নপ্রাশন এক বছরের পরে চলে গেলে শিশু এবং জননী দুয়ের পক্ষেই অস্বাস্থ্যকর হবে।

[আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (আনন্দাশ্রম), ১.১৬.১-৬, পৃ. ৩.৯;
মনুসংহিতা, ২.৩৪;
যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (চৌখাম্বা), আচারাধ্যায়, ১২,
বীরমিত্রোদয়টীকা (চৌখাম্বা), পৃ. ২৮;
যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (আনন্দাশ্রম), পৃ. ২৮;
নারদের উক্তি বলে উদ্ধৃত হয়েছে— 'জন্মতো মাসি ষষ্ঠে' ইত্যাদি শ্লোকটি, দ্র. বীরমিত্রোদয় (সংস্কার প্রকাশ), পৃ. ২৬৭-২৬৮]

অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান খুব বড়ো নয়। তবে সংস্কারের ছোটো অনুষ্ঠানও বড়ো বলে এখন মনে হয়, তার কারণ যে কোনো এই ধরনের অনুষ্ঠানের আগে নিত্যকর্ম, মাতৃকাপূজা, নান্দীশ্রাদ্ধ ইত্যাদি করতে হয়। তাতে সময় যায় অনেক। অন্নপ্রাশনের মূল অনুষ্ঠানে শিশুর মুখে যে খাবার দেওয়া হত, গৃহ্যসূত্রের ধারা অনুযায়ী তা মোটেই নিরামিষ নয়। শাংখ্যায়ন লিখেছেন —পিতা নিজে সেদিন পাঁঠার মাংস বা পাখির মাংস রাঁধবেন। অবশ্য মাছও রান্না করা যেতে পারে এবং তার সঙ্গে ভাত। সন্তানের পুষ্টি, বুদ্ধি, চেহারার ঔজ্জ্বল্য, অনুভব-শক্তি—এগুলির মধ্যে যদি বিশেষ কোনো গুণের প্রতি পিতামাতার বিশেষ কামনা থাকে, তবে তার জন্য এক-এক রকম পাখির মাংসের ব্যবস্থা করেছেন সূত্রকারেরা—

আজমন্নাদ্যাকামঃ।
তৈত্তিরং ব্রহ্মবর্চসকামঃ।
ঘৃতৌদনং তেজস্কামঃ।
দধি-মধু-ঘৃত মিশ্রমন্নং প্রাশয়েৎ।

তবে এটাও ভাবার কোনো কারণ নেই যে, ছয় মাস থেকে এক বছরের শিশুকে ভালো পরিমাণ মাংস খাইয়ে তার পেটের সর্বনাশ করা হত প্রথম দিন থেকেই।

[আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (আনন্দাশ্রম) ১.১৬.২-৫;
শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র (Oldenberg) সাংখ্যায়ন গৃহ্যসংগ্রহ, পৃ. ২৬-২৭]

আসলে এগুলি প্রতীক মাত্র। রান্না হত অনেক রকম এবং সব রকম রান্নার কণিকামাত্র গ্রহণ করে তা একত্রে মাখা হত। তার মধ্যে ঘি, মধু, দই। এই সম্মিলিত স্বাদিষ্ট বস্তুর আস্বাদ কেমন হত, তা বলতে পারি না এবং শিশুও তা কতখানি উপভোগ করত বা এখনও করে, তা সহজবোধ্য নয়, তবে পরবর্তীকালে জৈন এবং বৈষ্ণবদের প্রভাবে শিশুকে মাংস খাওয়ানোর বায়নাটা উঠে যায়। থেকে যায় স্বর্ণরেণু-ঘষা সহ ঘি-মধু, দই—যা বৈদিক খাদ্য তালিকায় নিরামিষ অবশেষ। একেবারে শেষ যুগে আসে পরমান্ন—

মধ্বাজ্যং কনকোপেতং প্রাশয়েৎ পায়সং তু তম্।

[অপরার্ক-ধৃত পাঠঃ প্রাঙ্মুখং প্রাশয়েচ্ছিশুম্]

—এই পরমান্নের মধ্যেও মধু, ঘি এবং সোনার রেণু ঘষে দেবার রীতি ছিল—এবং স্বভাবতই স্তন্যপানসিক্ত শিশুর মুখে পরমান্নের স্বাদ অবশ্যই মধুর এবং চমৎকার। সোনার ব্যাপারটা হয়তো কবিরাজ মশাইদের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু যা কিছুই পর পর এসেছে তা বৈদিক সমাজ থেকে আধুনিক সমাজের খাদ্যতালিকার বিবর্তন অনুযায়ী এবং অবশ্যই শিশুর ঔদরিক ক্ষমতার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা অনুযায়ী।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকাকার অপরার্ক মার্কণ্ডেয় ঋষির বচন উদ্ধার করে আরও একটি সামাজিক প্রথার উল্লেখ করেছেন, যা আজও চলে। মার্কণ্ডেয় লিখেছেন—অন্নপ্রাশনের সংস্কারকর্ম হয়ে গেলে শিশুকে দেববিগ্রহের সামনে বসিয়ে তার সামনে নানান শিল্পভাণ্ড, শাস্ত্রগ্রন্থ, দূরে ছুঁড়তে হয় না এমন অস্ত্র এবং আরও যে-সব বস্তু শিশু স্পর্শ করুক বলে পিতা-মাতা চান, সেগুলি শিশুর সামনে রাখতে হবে। বস্তুগুলির মধ্যে শিশু যেটি ধরবে, বুঝতে হবে ভবিষ্যতে সেটিই তার জীবিকা হবে—

প্রথমং যৎস্পৃশেৎ বালস্ততো ভাণ্ডং স্বয়ং তদা।
জীবিকা তস্য বালস্য তেনৈব তু ভবিষ্যতি॥

[যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, অপরার্ক-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, ১-১২, পৃ. ২৮;
বীর মিত্রোদয় (সংস্কার-প্রকাশ), পৃ. ২৭৯]

পুত্র-সন্তানের মতো মেয়েদেরও অন্নপ্রাশন দেবার বিধি ছিল। কিন্তু মেয়েদের যেহেতু বিবাহের পর গোত্র আত্মস্থ হবে, তাই তাঁদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে অন্নপ্রাশন দেওয়া হত না। আশ্বলায়ন তাঁর গৃহ্যসূত্রে লিখেছেন— আবৃতৈব কুমার্য্যৈ—অর্থাৎ মন্ত্রগুলিকে আবৃত করে, মন্ত্রোচ্চারণ না করে কন্যান্নপ্রাশনের মূলমন্ত্রগুলি আবৃত রেখে অন্য সমস্ত ক্রিয়া-কর্মগুলি করা যাবে—

কুমার্য্যাস্তু অমন্ত্রকম্ অন্নপ্রাশনং কার্য্যামিত্যর্থঃ।

বীরমিত্রোদয়ের সংস্কার-প্রকাশ অংশে মিত্রমিশ্র মনু, শৌনক এবং আশ্বলায়নের মত উল্লেখ করে একই কথা বলেছেন, অর্থাৎ মেয়েদের অমন্ত্রক অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করতে হবে—জাতধর্ম থেকে চূড়াকরণ পর্যন্ত সব কর্মই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ না করে অনুষ্ঠান করতে হবে, যদিও চূড়াকর্মে হোম করতে হবে মেয়েদের ক্ষেত্রেও—

জাতকৃত্যাদিচূড়ান্তং স্ত্রীণাং কার্য্যমমন্ত্রকম্।
হুতকৃত্যং তু পুংবৎ স্যাৎ স্ত্রীণাং চূড়াকৃতাবপি॥

[বীরমিত্রোদয় (সংস্কার প্রকাশ), পৃ. ২৭৮-২৭৯]

অন্নপ্রাশনের মন্ত্র বলার সময় ভগবতী বাগ্‌দেবীর কাছে স্তুতি করা হয়েছে, যাতে তিনি দুগ্ধদায়িনী ধেনুর সঙ্গে একাত্মিকা হয়ে নবজাতকের সঙ্গে সকলেরই শক্তি এবং সামর্থ্য বিধান করেন—

ধেনুর্বাগস্মান্ উপ সুষ্টুতৈতু।

পরবর্তী কালে রসশাস্ত্রের মধ্যে 'বাক্' অর্থাৎ শব্দার্থভাবনাকে অনেক সময়ে ধেনু বা গোরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

বাগ্‌ধেনোর্দুগ্ধ এতং হি।

কিন্তু অন্নপ্রাশনের সময়ে এই মন্ত্রোচ্চারণে বোঝা যায় প্রাচীনেরা খাবার দিয়ে শরীর মোটা করার চেয়ে যাতে তা বালকের বুদ্ধিবৃত্তি উজ্জীবিত হয় সেটাই চাইতেন। আরও যে মন্ত্রটা আছে, সেটা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নুট্ হ্যাম্‌সুনের 'হাঙ্গার' বইটির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রকৃষ্টরূপে ভোজন যে শুধুমাত্র পেটের মাধ্যমেই হয় না, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিরই যে আহার আছে এবং অন্নপ্রাশনের সময় একটি শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিবৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়গুলোকেও যে তর্পণ করতে হয়, তাই যেন বলা হয়েছে মন্ত্রের মধ্যে—প্রাণবায়ুর দ্বারা আমি অন্ন গ্রহণ করি। অপানবায়ুর দ্বারা আমি গন্ধ গ্রহণ করি। চক্ষুর দ্বারা আমি রূপ গ্রহণ করি। কর্ণের দ্বারা আমি বিদ্যা এবং যশ লাভ করি। অর্থাৎ অন্নপ্রাশন মানে শুধু ভাত খাওয়া নয়, একটি শিশুর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উপভোগযোগ্য করে তোলাই অন্নপ্রাশন—

অনেন আহুতি-চতুষ্টয়েন
চক্ষুরাদীন্দ্রিয়োপভোগ্যান্
বিষয়ান্ অনুভবামি ইতি আশংসা।

এখানে যিনি মন্ত্র বলছেন, তিনি 'আমি করি' বললেও এটা শিশুই যেন বলছে বলে বুঝতে হবে।

[ঋগ্‌বেদ, ৪.১২.৪-৫; ৯.১৬.১৯; ১.২২.১৫; ৮.১০০-১১; পারস্কর গৃহ্যসূত্র, ১.১৯.১-১৩, পৃ. ৮৮]

অন্নাদ১ তৈত্তিরীয় উপনিষদে খুব সরলভাবে বলা হয়েছে—অন্ন বা খাদ্যবস্তুকে কখনো নিন্দা কোরো না। কেননা অন্নই হল এই প্রাণ, আর এই শরীর হল 'অন্নাদ'। অন্ন খায়, গ্রহণ করে (অদ্ ধাতু) বলে শরীর 'অন্নাদ'। উদাহরণে বলা হচ্ছে—জল যেমন অন্ন, তেমনই তার শোষক সূর্যজ্যোতি হল অন্নাদ। এইরকম আরও উদাহরণ দিয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ অন্নোপভোক্তা অন্নাদ-এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে—

অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি

এই সরল অথচ গূঢ় তত্ত্বটিকে বৃহদারণ্যক উপনিষদ আরও গভীর প্রকৃতি-পুরুষের সম্পর্কঘটিত সাংখ্যতত্ত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি শ্লোকে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে— সমস্ত সৃষ্টিই অন্ন ও অন্নাদময়। অন্নাদ হলেন তিনি, যিনি ভোগের কর্তা বা ভোক্তৃ অর্থাৎ ভোক্তা। আর অন্ন হল তাই, যা ভোগের যোগ্য বা ভোগ্য। এর মধ্যে সোম হল অন্ন আর অগ্নি হলেন অন্নাদ অর্থাৎ অন্নের ভোক্তা।

এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলেছেন—যা কিছু আর্দ্র তা প্রজাপতির আত্মনিহিত বীজ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। এই আর্দ্র বস্তুটি হল সোম। এই সোমই অন্ন অর্থাৎ যাকে ভোগ করা হয়। এই অন্নকে যিনি ভক্ষণ করেন, তিনি অগ্নি। অন্ন হল ভোগ্য। অগ্নি হলেন অন্নাদ বা ভোক্তা।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উল্লিখিত অন্ন এবং অন্নাদের ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে আমরা শ্বেতাশ্বতর

উপনিষদের একটি শ্লোকের মধ্যে পেয়ে থাকি। এই শ্লোকটিতে তিনটি তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহদারণ্যকের অন্ন হলেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত ভোগ্য। এই ভোগ্যকে যিনি ভোগ করেন, তিনি হলেন ভোক্তৃ—যাঁকে বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে অন্নাদ। এই অন্ন এবং অন্নাদকে যিনি পরিচালনা করেন, তিনি হলেন প্রেরিতারূপী ঈশ্বর। এই ত্রি-তত্ত্বের ভেদ অতিক্রম করে আত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মকে জানতে হবে।

[তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (দুর্গাচরণ), ভৃগুবল্লী ১.৪৭-৫০ (৭-৯ অনুবাক); পৃ. ১৯৫-১৯৯; বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (দুর্গাচরণ) ১.৪.৪৩.৬; পৃ. ২০১; শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ১.১২]

অন্নাদ$_{২}$ কৃষ্ণের ঔরসে মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৬]*

অন্নাদ$_{৩}$ অর্ক নামক অগ্নির অন্যতম পুত্র। উপনিষদের ভাবনায় অগ্নি হলেন অন্ন বা আহুতিদ্রব্য সমূহের ভোক্তা। তাই তাঁর অপর নাম অন্নাদ। অগ্নির এই অন্নাদ নামটিই অর্ক অগ্নির পুত্রের নাম হিসেবে আরোপিত হয়েছে বলে মনে হয়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.৪৩]*

অন্নাদ$_{৪}$ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১৮; (হরি) ১৩.১২৭.১১৮]

অন্বগ্‌ভানু পুরুর তৃতীয় পুত্র রৌদ্রাশ্বের পুত্র ঋচেয়ুর একটি নাম। ঋচেয়ু এতটাই বিক্রান্ত ছিলেন এবং এতটাই তাঁর ক্ষাত্র তেজ যে, সূর্যও (ভানু) যেন তাঁর অনুগমন করতেন— যেমনটা টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—

অতএব এতস্য তেজোবাহুল্যেন
সূর্যেণাপ্যনুগতত্বাৎ অন্বগ্‌ভানুরিত্যপি নাম।
অন্য নাম অনাধৃষ্টি অথবা ঋচেয়ু।

[দ্র. অনাধৃষ্টি]

[মহা (k) ১.৯৪.৭-১২; (হরি) ১.৮১.৭-১২]

অন্বতা অরিষ্টার গর্ভজাত আটজন বিশিষ্ট অপ্সরার মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬৯.৪৮]*

অন্বষ্টকা *[দ্র. অষ্টকা]*

অন্বাধান ইষ্টিযাগাদির আরম্ভে অগ্নিকে অনুকূল করবার জন্য আহবনীয় অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ১.১.৭; ৪.২.৮: সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৪.১৬.৫]

অন্বাহার্য বৈদিক দর্শপূর্ণযাগ অনুষ্ঠানের শেষে যজ্ঞের অন্তকালে ঋত্বিকদের যথানিয়মে দক্ষিণা দিতে হয়। চার জন ঋত্বিকের তৃপ্তি হয় এমন অপরিমিত চাল নিয়ে ঋত্বিকদের দিতে হয় স্বপাকে রন্ধন করার জন্য। ওই রান্না করা অন্নপিণ্ড বা বস্তুকেই বলে ওদন। অধ্বর্যু দক্ষিণাগ্নিতে অন্নপাকের উপযুক্ত তামা বা পিতলের পাত্র (যাকে অন্বাহার্যস্থালী বলে) চাপিয়ে দক্ষিণাগ্নির আগুনে সেই অন্ন পাক করেন। এই পাকক্রিয়ার নামই অন্বাহার্য-পচন এবং ওই পক্ব অন্নকেই বলে অন্বাহার্য। এই অন্নই দর্শপূর্ণমাস-যাগের দক্ষিণা, এতেই যজ্ঞ দক্ষিণান্ত হয় অর্থাৎ দক্ষিণা দেওয়ার পর যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। অন্বাহার্য-পচনের জন্য একমাত্র দক্ষিণাগ্নিকেই ব্যবহার করা হয় বলে দক্ষিণাগ্নির অপর নাম অন্বাহার্য অগ্নি।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ৩.৩.১২; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite) ২.৫.২৭; বায়ু পু. ৯৭.২৫]

অন্বাহার্য-পচন দক্ষিণাগ্নির অপর নাম। ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুর এই দক্ষিণাগ্নি বা অন্বাহার্য-পচন অন্বাহার্য অগ্নি থেকেই জন্মেছিলেন বলে পুরাণে বলা হয়েছে। *[দ্র. অন্বাহার্য]*

[ভাগবত পু. ৬.৯.১২]

অন্বাহার্যস্থালী *[দ্র. যজ্ঞায়ুধ]*

অন্বাহার্য্যক প্রেত ব্যক্তির উদ্দেশে কুশের ওপর যে অন্নপিণ্ড দেওয়া হয়, সেই পিণ্ডগুলির প্রত্যেকটি থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করে ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে হয়। অন্ন থেকে আহৃত অংশ ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করেন বলেই ওই অন্নাংশের নাম অন্বাহার্য্যক।

যস্মাদন্নাদ্ ধৃতা মাত্রা ভক্ষয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
অন্বাহার্য্যক মিত্যুক্তং তস্মাত্তচ্চন্দ্রসংক্ষয়ে॥

বৈদিক অনুষ্ঠান 'পরিধি-নিক্ষেপে'র সঙ্গে এই অনুষ্ঠান কিয়দংশে তুলনীয়। *[দ্র. শংযুবাক]*

[মৎস্য পু. ১৬.৪৩, ৫১]

☐ পৌরাণিক অন্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ বিষয়ক অন্ন হলেও বৈদিককালে সেটা একটা সাধারণ যজ্ঞাঙ্গ ছিল। সাধারণত যাজ্ঞিক ঋত্বিকরা যে যজ্ঞ করতেন, যজ্ঞের সেই দিনগুলিতে ঋত্বিক-পুরোহিতের যে খাবার ব্যবস্থা করা হত, সেটাকে বলা হত অন্বাহার্য। দক্ষিণাগ্নির আগুনে এই অন্ন পাক করা হত বলে দক্ষিণাগ্নির আর এক নামই ছিল 'অন্বাহার্য্য-পচন' আর যে পাত্রে এই

অন্ন পাক করা হত, তার নাম ছিল 'অন্বাহার্য্য-স্থালী'। *[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ৩.৩.১২; ১.১.৪; ১.১৫.৯; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite) ২.৫.২৭]*

অগ্নিন্দ্রতীর্থ *[দ্র. আত্রেয় তীর্থ]*

অন্য$_1$ মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে তাঁর পত্নী দেবীর গর্ভজাত পুত্রসন্তানদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ৬৫.৮৭]*

অন্য$_2$ পুরাকালে যেসব রাজা তপস্যার প্রভাবে ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজর্ষি অন্য ছিলেন অন্যতম। *[বায়ু পু. ৯১.১১৬]*

অন্যাগোচরী স্কন্দকার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে তাকে অন্যাগোচরা নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোকসংখ্যা ২৭; খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯]

অন্যাদৃক্ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে উনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতার জন্ম হয়। এই উনপঞ্চাশজন মরুৎ সাতটি গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে চতুর্থ গণের অন্তর্ভুক্ত সাতজন মরুৎ দেবতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন অন্যাদৃক্।

[বায়ু পু. ৬৭.১২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৯৬-৯৭]

অন্যাদৃক্ষ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে উনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতার জন্ম হয়। এই উনপঞ্চাশ জন দেবতা সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এর মধ্যে পঞ্চমগণের অন্তর্ভুক্ত সাতজন দেবতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন অন্যাদৃক্ষ।

[বায়ু পু. ৬৭.১২৮]

অন্যায়ত্ *[দ্র. অন্ত্যায়ন]*

অপঃপান অন্যতম নরকের নাম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা তাদের ভার্য্যারা যদি যজ্ঞে সোম পান করার সময় মোহবশত সুরা পান করেন, তবে এই নরকে গতি হয়।

[দেবীভাগবত ৮.২১.২৬; ৮.২৩.৫-৭]

অপগ বায়ু পুরাণে উত্তরে অবস্থিত জনপদ সমূহের তালিকায় এই জনপদটির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৪৫.১২০]

অপগা পদ্মপুরাণোক্ত একটি তীর্থ। এই তীর্থ মানব-তীর্থের একক্রোশ দূরে পূর্বদিকে অবস্থিত।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ১২.৬৮]

অপচিতি মহর্ষি মরীচি প্রজাপতির ঔরসে সম্ভূতির গর্ভে জাত কন্যা সন্তানদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ২৮.৯]

অপস্তন হেমকক্ষ পর্বতে এক সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্যশালী নগরী অবস্থিত। এই নগরী অপস্তন নামক বীর গন্ধর্বজাতির বাসভূমি। গন্ধর্বরাজ কপিঞ্জ এই গন্ধর্বজাতির অধিপতি। *[বায়ু পু. ৩৯.৫২]*

অপথ মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত একটি পার্বত্য জনপদ।

[মৎস্য পু. ১১৪.৫৫]

অপপ্রাবরণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত একটি পার্বত্য জনপদ তথা জনজাতি। মৎস্য পুরাণে এটি কুথপ্রবারণ নামে চিহ্নিত হয়েছে। বায়ু পুরাণে এই জনপদের নাম কুশপ্রাবরণ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৬৭; বায়ু পু. ৪৫.১৩৬; মৎস্য পু. ১১৪.৫৬]

অপবর্গ অপবর্গ শব্দের অর্থ সংসার থেকে মুক্তি। সাংখ্য এবং যোগদর্শনে মুক্ত অবস্থার নাম অপবর্গ। জীবন্মুক্ত অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেও সাধনার সিদ্ধিতে যদি ভোগ-বাসনার বিরতি ঘটে এবং তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়, তবে অপবর্গ মুক্তি সম্পন্ন হয়।

ভাগবত পুরাণে মুক্তি-লাভের অর্থেই অপবর্গ শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অপবর্গ যাঁদের দার্শনিক প্রতিপত্তির জায়গা, সেই সাংখ্যযোগের দার্শনিকরা বলেন—ভোগ এবং অপবর্গ আমাদের এই সৃষ্ট জগতের জীবন-ধারণ প্রক্রিয়ার দুটি অঙ্গ। ভোগ বলতে শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি বিষয় ভোগ আর অপবর্গ হল তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে নিত্য এবং অনিত্য, সৎ এবং অসৎ, প্রাকৃত বস্তু এবং চৈতন্যের বিবেক-জ্ঞান বা এই দ্বন্দ্বের প্রভেদ বুঝতে পারা।

সাংখ্য দর্শনের পরম পুরুষ নির্গুণ। নির্লিপ্ত এবং চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু ভোগ এবং অপবর্গ নির্ভর করে প্রকৃতির মাধ্যমে ঘটে যাওয়া সৃষ্টির মধ্যেই। জাগতিক জীবের অন্তর্গত স্বভাব অনুসারেই সে ভোগের দিকেও যেতে পারে আবার তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে অপবর্গের দিকেও যেতে পারে। বায়ু পুরাণ এইখানে বলেছে—মানুষ বিষয় ভোগ করার সময় যদি অনাসক্তভাবে ভোগ করে এবং বিষয়ে লিপ্ত না হয়, তাহলে সেই পরম সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে অপবর্গ লাভ করে। পরম

চৈতন্যময় পুরুষ এই অপবর্গের মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

[ভাগবত পু. ৩.২৫.১২, ২৫; ৫.৩.৯; ৬.১৭.২৮; ১০.৫১.৫৫; ১০.৬০.৫২-৫৩; ১০.৬৯.৪৫; ১০.৮৭.৪০; বায়ু পু. ১৩.২২-২৪; সাংখ্যকারিকা ২১, ২৪, ৪৪, ৬৫; Yogasutras of Patanjali, ২.১৮-২১]

অপর শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। 'পর' শব্দের অর্থ অন্যতর, আবার 'পর' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। উপনিষদে পরমেশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, তাঁর থেকে উৎকৃষ্ট এ জগতে কিছু নেই, তাঁর থেকে বৃহৎ কোনো বস্তু নেই, আবার তাঁর থেকে সূক্ষ্মও এজগতে কিছু নেই—এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড কেবলমাত্র সেই পরমাত্মার দ্বারাই ব্যাপ্ত হয়ে আছে—

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়ো'স্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক।
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্॥

[শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩.৯]

উপনিষদের এই ভাবনা থেকে এ জগতে তাঁর তুল্য বা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই বলেই পরমেশ্বর শিব অপর নামে খ্যাত। *[মহা (k) ১৩.১৭.৯৮; (হরি) ১৩.১৬.৯৮]*

অপরকাশি ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন জনপদের নাম। কাশীর মূলখণ্ডের পশ্চিমে অবস্থিত বলে মনে হয়। *[মহা (k) ৬.৯.৪২; (হরি) ৬.৯.৪২; পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৩.৩৮]*

আমরা কাশী-নামটি হ্রস্ব 'ই'-কার দিয়ে দেখেছি। কেননা মহাভারতে এই শব্দের বহুবচন 'কাশয়ঃ' 'অপরকাশয়ঃ' বলে উল্লেখ করেছে। কাশী দীর্ঘ ঈ-কার হলে রূপ হত 'কাশ্যঃ'।

অপরকুন্ত পদ্মপুরাণে উল্লিখিত একটি জনপদ।

[পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ. ৩৩.৪৫]

অপরকুন্তি ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন জনপদের নাম। *[মহা (k) ৬.৯.৪৩; (হরি) ৬.৯.৪৩]*

অপরদ্বারকা দ্বারকা-নগরীর পূর্বদ্বাররক্ষিণী দেবী। মহীসাগর-সঙ্গমতীর্থে এই দেবী তাঁর চতুর্বিংশতি কোটি দেবী-পরিবার-সহ বাস করছেন। দেবর্ষি নারদ সুদীর্ঘকাল তপস্যা করে পরমেশ্বরী শক্তিকে দ্বারকানগরীর পূর্বদ্বারে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে এই দেবীর বিশেষ পূজার্চনা হয়।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৫৩.২৬-৩৮]

অপরনন্দা অর্জুন দ্বাদশবর্ষের বনবাসকালে এই নদীটি দেখেছিলেন। নৈমিষারণ্যের পথে যেতে অনেক পদ্মফুলে ঢাকা—'নদীঞ্চোৎপলিনীং রম্যাম্'—দুটি নদী তিনি দেখেছিলেন যার একটির নাম নন্দা, অপরটির নাম অপরনন্দা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও এই নদী দর্শন করেছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে দেববংশ এবং ঋষিবংশের সঙ্গে একত্রে এই নদী দুটি পবিত্র নদী হিসেবে উল্লিখিত। ফলে এটি তীর্থ হিসেবেই গণ্য হয়। পণ্ডিতেরা এটাকে অলকানন্দা বলেই চিহ্নিত করেছেন, বিশেষত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

তথা হ্যালকনন্দা চ নন্দা চ সরিতাং বরা।

এইরকম একটি শ্লোক থাকায় এই ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। *[দ্র. নন্দা]*

[ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, (তর্করত্ন) ৪৩.১৮; মহা (k) ১.২১৫.৬-৭; ৩.১২০.১; ১৩.১৬৫.২৮; (হরি) ১.২০৮.৬-৭; ৩.৯২.১; ১৩.১৪৩.২৮]

অপরপল্লব (অপরবল্লব) মহাভারতে উল্লিখিত একটি জনপদ। পল্লবরাষ্ট্রের পশ্চিমে অবস্থিত এক জনজাতির ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী-অধ্যুষিত জনপদ বলে মনে হয়।

[মহা (k) ৬.৯.৬২; (হরি) ৬.৯.৬২]

অপরম্লেচ্ছ মহাভারতে উল্লিখিত উত্তর-ভারতে অবস্থিত এক জনপদ। এই জনজাতিকে অত্যন্ত ক্রূর বলে বলা হয়েছে—

উত্তরাশ্চাপরম্লেচ্ছাঃ (উত্তরাশ্চাপরে ম্লেচ্ছাঃ)
ক্রূরা ভরতসত্তম।

[মহা (k) ৬.৯.৬৫; (হরি) ৬.৯.৬৫]

অপরসেক মহাভারতে চর্মণ্বতী নদীর দক্ষিণে অবন্তী রাজ্যের উত্তরে উত্তর-মালওয়া অঞ্চলকে 'সেক' বলে চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিতেরা। অপরসেক তার উত্তরে অবস্থিত ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্‌কালে সহদেব এই অপরসেক অঞ্চল জয় করেন।

[মহা (k) ২.৩১.৯; (হরি) ২.৩০.৯]

অপরাজিত$_{১}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতে আস্তীক পর্বে সর্পনাম-কথনের সময় এই নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পুনশ্চ পাতালে ভোগবতী

পুরীর বর্ণনায় সর্পনামের মধ্যে এই নাগের উল্লেখ ঘটেছে। *[মহা (k) ১.৩৫.১৩; ৫.১০৩.১৫; (হরি) ১.৩০.১৩; ৫.৯৬.১৫]*

অপরাজিত$_২$ দ্বাপর যুগে একজন কালকেয় দৈত্যের অংশে জাত রাজা। ইনি যুধিষ্ঠির দুর্যোধনদের সমসাময়িক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য পাণ্ডবরা এঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। *[মহা (k) ১.৬৭.৪৯; ৫.৪.২১; (হরি) ১.৬২.৫০; ৫.৪.২১]*

অপরাজিত$_৩$ একাদশ রুদ্রের সার্বিক বিশেষণ অর্থাৎ একাদশ রুদ্রের সবগুলি নামেরই সাধারণ বিশেষণ এটি। অথবা শেষতম নাম 'পিনাকী'র একক বিশেষণ। তবে বিভিন্ন পুরাণে অপরাজিত একাদশ রুদ্রের অন্যতম হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছেন। *[মহা (k) ১২.২০৮.১৯-২০; (হরি) ১২.২০২.১৯-২০; মৎস্য পু. ১৭১.৩৭; বিষ্ণু পু. ১.১৫.১২৩]*

অপরাজিত$_৪$ কৌরব ধৃতরাষ্ট্রের একশ পুত্রের একজন। একসময় ভীষ্মের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ আরম্ভ হলে অপরাজিত ইত্যাদি সাত ভাই ভীষ্মকে রক্ষা করে চলছিলেন। কিন্তু একটা সময় আসে, যখন এঁরা ভীমের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ আরম্ভ করেন। অপরাজিত ভীমের হাতেই মৃত্যুবরণ করেন।
[মহা (k) ১.৬৭.১০১; ১.১১৭.১০; ৬.৮৮.১৫-২২; (হরি) ১.৬২.১০৩; ১.১১১.৯; ৬.৮৫.১৫]

অপরাজিত$_৫$ ভাগবত পুরাণে যে চারজন দিগ্‌হস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অপরাজিত অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.২০.৩৯]*

অপরাজিত$_৬$ কৃষ্ণের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভজাত পুত্রদের অন্যতম। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৫]*

অপরাজিত$_৭$ একজন বিক্রমশালী দেবতা যাঁর ব্যক্তি পরিচয় জানা যায় না। কিন্তু দৈত্যরাজ বলি স্বর্গলোক আক্রমণ করলে দেবাসুরের যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, সেখানে নমুচি নামক দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। এটুকু উল্লেখ থেকেই আমরা তাঁকে দেবতা বলে চিহ্নিত করতে পারি। *[ভাগবত পু. ৮.১০.৩০]*

অপরাজিত$_৮$ দেবী ললিতার অশ্বের নাম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২২.৭৪]*

অপরাজিত$_৯$ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান বিষ্ণু অপরাজিত নামে সম্বোধিত হয়েছেন। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৮৯, ১০৫; (হরি) ১৩.১২৭.৮৯, ১০৫]*

অপরাজিতা$_১$ মেধাতিথি শাকদ্বীপকে সাতটি বর্ষে (ভূখণ্ড) বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি বর্ষে একটি করে মহানদী আছে। ধূম্রানীক বর্ষে যে মহানদী প্রবাহিত তার নাম অপরাজিতা। *[দেবীভাগবত পু. ৮.১৩.২২-২৩; ভাগবত পু. ৫.২০.২৬]*

অপরাজিতা$_২$ দেবীর নবপীঠশক্তির অন্যতমা। ইনি দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা দেবী ভুবনেশ্বরীর নিরন্তর সেবা করছেন। *[দেবীভাগবত পু. ১২.১২.৩৫]*

তবে এই পুরাণে অপরাজিতা ভুবনেশ্বরীর সেবিকা হিসেবে চিহ্নিত হলেও অন্যত্র অপরাজিতা দুর্গা-ভবানীর অন্য নাম। দেবীপুরাণেই একথা আছে যে, সাম্বৎসরিক দুর্গাব্রত গ্রহণ করলে বৈশাখ মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে দুর্গাপূজার শেষে ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং কুমারী-ভোজনের পর অপরাজিতা ভবানীর কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করতে হয়—

অপরাজিতা-ভবানীং স্বস্তিনামেন বাচয়েৎ।

দুর্গাপূজার শেষ দিন বিজয়া দশমীতে পূজা শেষে ঘট বিসর্জনের পর ঈশান কোণে অষ্টদল একটি পদ্ম আঁকতে হয়। সেই পদ্মের ওপর অপরাজিতার পুষ্পলতা রেখে অপরাজিতার পূজা করতে হয় দুর্গাদেবীর একাত্মতায়। বস্তুত কালিকা পুরাণে বলা দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে অপরাজিতার ধ্যানমন্ত্র আছে, যেখানে সমস্ত বিশেষণগুলিই দুর্গাদেবীর স্বরূপ এবং আকৃতির সঙ্গে মিলে যায়। দুর্গাপূজার শেষে যেমন অপরাজিতা ভবানীর পূজা, তেমনই পূজারম্ভে অপরাজিতা দেবীর নাম সাদৃশ্যে মহনীয় হয়ে ওঠা অপরাজিতার লতা দিয়ে নবপত্রিকা বা কলা বউ বাঁধা হয়। অনেকেই মনে করেন—দুর্গা দেবী তাঁর প্রাথমিক রূপে রাজাদের দুর্গরক্ষিণী দেবী ছিলেন, কিন্তু দুর্গরক্ষিণী হলেও প্রথমে তাঁর নাম দুর্গা ছিল না। বরঞ্চ শত্রুর অপরাজেয় বলেই তাঁর নাম ছিল অপরাজিতা। কেননা কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বলেছেন অপরাজিতা। এই নামমাহাত্ম্য এমনই যে অপরাজিতা নামে লতাপুষ্পের গাছ দেবীর

পূজায় লাগে। অপরাজিতা ফুলও দেবী-পূজার উপকরণ। *[দেবী পুরাণ ৩৩.৯৬; কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle) ২.৪.২২; David Kinsley, Hindu Goddesses, p. 107]*

অপরাজিতা$_{৩}$ গৌতম মুনির ঔরসে অহল্যার গর্ভজাত কন্যা। *[বামন পু. ৪.৩]*

অপরাজিতা$_{৪}$ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অপরাজিতা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৩]*

অপরাজিতা$_{৫}$ স্কন্দ কার্তিকেয়ের পত্নী দেবসেনাকে এই নামে ডাকা হয়েছে। *[মহা (k) ৩.২২৯.৫০; (হরি) ৩.১৯১.৪৮]*

অপরান্ত প্রাচীন এক জনপদ। *[মহা (k) ৬.৯.৪৭; (হরি) ৬.৯.৪৭]*

পরশুরাম একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার পর মহর্ষি কশ্যপ তাঁকে আর ক্ষত্রিয় নিধন করতে বারণ করেছিলেন। তাঁকে তিনি এটাও বললেন যে, আর তুমি এই দেশে থাকবে না, তুমি দক্ষিণ সমুদ্রের পারে গিয়ে থাকো। নির্দেশ শুনে পরশুরাম সেখানে এলেন এবং দক্ষিণ সমুদ্র নিজেই তার জলের মধ্যে শূর্পারক নামে একটি দেশ তৈরি করল, এটারই অন্য নাম অপরান্ত—

ততঃ শূর্পারকং দেশং সো'পরান্তমহীতলম্।

[মহা (k) ১২.৪৯.৬৭; (হরি) ১২.৪৮.৬৮]

পুরাণগুলিতে বর্ণিত 'ভুবনকোষ'-বৃত্তান্তের বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচ ভাগে বিভাজিত ভারতবর্ষের অন্যতম ভাগ অপরান্ত। ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত দেশনামগুলির সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয়েছে এই দেশ। প্রাচীনকালে অপরান্ত বা পাশ্চাত্য বলতে বোঝানো হত উত্তর নর্মদা, ভীরুকচ্ছ, মাহেয়, সারস্বত, কাশ্মীর, সুরাষ্ট্র, আবন্ত্য, অর্ব্বুদ, বাহ্লীক, আভীর ও কালতোয়ক ইত্যাদি দেশগুলিকে। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৩৬, ৫১-৫২; মৎস্য পু. ১১৪.৫১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪৬; ২.৬২.৩৯; বায়ু পু. ৫৮.৮১; বিষ্ণু পু. ২.৩.১৬]*

পণ্ডিতেরা অপরান্ত দেশের প্রতিনাম হিসেবে আধুনিক কোঙ্কন এবং মালাবার অঞ্চলের নাম করেন। টলেমি যাকে Ariake বলেছেন সেটিই অপরান্ত বলে মনে হয়। অন্যদিকে Periplus অনুসারে Ariake নর্মদা (Nerbuda) থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত এবং মোটামুটি ক্যাম্বে উপসাগর থেকে দক্ষিণে আভীর দেশের উত্তর দিক পর্যন্ত এই দেশের অবস্থান। টলেমির Arike 'অপরান্তক' শব্দের সংকোচন আর পেরিপ্লাসের Ariake 'আরণ্যক' শব্দের সংকোচন বলে মনে করেন পণ্ডিতেরা। আর. জি. ভাণ্ডারকরের মতে উত্তর কোঙ্কনই আসলে অপরান্ত। এর রাজধানী সূর্পারক হল আধুনিক বেসিনের (Bassein) এর কাছে সুপর অঞ্চল। সম্রাট অশোক ২৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যোন ধম্মরক্খিত নামে এক ব্যক্তিকে বৌদ্ধ বাণী প্রচারের জন্য অপরান্ত-দেশে পাঠিয়েছিলেন। ভগবানলাল ইন্দ্রজির মতে ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্রের বন্দর অঞ্চলটিকেই অপরান্ত বলা হত। *[Indian Antiquary, Vol.VII, pp. 259, 263]* কালিদাস তাঁর রঘুবংশে [৪.৫৩] রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে অপরান্ত দেশকে মুরলা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত বললেও সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট পর্বতমালা) এবং সমুদ্রের অন্তবর্তী স্থানে অপরান্ত দেশের স্থান নির্দেশ করায়, সমুদ্রের সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্ক উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মল্লিনাথ এই রঘুশ্লোকের টীকা করতে গিয়ে যাদব নামে এক প্রাচীন কোষের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন অপরান্তের লোকেরা হলেন সূর্পরিকদের মতই পশ্চিম দেশের মানুষ, অপরান্তাস্তে পাশ্চাত্যাস্তে চ সূর্পরিকাদয়ঃ। সূর্পরক বা সূর্পরিকদের সঙ্গে একত্রে অপরান্তের নাম উল্লেখের সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রহ্মপুরাণের কথা স্মরণ করতে হবে এবং সেখানে সূর্পরক দেশকে অপরান্তদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্তই করা হয়নি শুধু, এখানকার বাচনভঙ্গীই এমন যাতে বোঝা যায়—অপরান্ত বলতে কেবল কতগুলি প্রতীচ্য দেশই বোঝাচ্ছে না, সেগুলি যে সীমান্তবর্তী দেশ, তাও বোঝা যাচ্ছে। ব্রহ্ম পুরাণ বলেছে—এতক্ষণ তো দক্ষিণ-দেশগুলির কথা শুনলে এবার অপরান্ত দেশগুলির কথা শোন— শূ(সূ)র্পরক, কালিধন, লোল এবং তালকট—এইগুলি হল অপরান্তদেশ। *[ব্রহ্ম পু. ২৭.৫৮-৫৯]*

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উত্তম কার্পাসের প্রাপ্তিস্থান হিসেবে যে দেশগুলির নাম করা হয়েছে। সেখানে মথুরা, কলিঙ্গ-বঙ্গের সঙ্গে অপরান্ত

দেশের নাম করা হয়েছে—'আপরান্তকম্'। এইখানে গণপতিশাস্ত্রীর ত্রিমূলা টীকা এবং ভট্টস্বামীকৃত প্রতিপদপঞ্চিকা টীকায় অপরান্ত দেশকে কোঙ্কন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Vishvanath Shastri) Vol. 2, P.t. 1; p. 198]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণের লিখনকালেও জায়গাগুলি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ছিল বলেই হয়তো এই পুরাণে অপরান্তিকদের সঙ্গেই প্রায় কোঙ্কন-দেশীয়দের নাম করা হয়েছে।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৮.৩৪-৩৫; GDAMI (Dey), pp. 9-10]

পুরাণগুলি এবং মহাভারতে বাটধান, আভীর, শূদ্র, পহ্লব—এইসব জনজাতিদের সঙ্গে অপরান্তবাসীদের উল্লেখ হওয়ায় মনে হয় অপরান্ত-দেশীয়রা আর্যগোষ্ঠীর বহির্ভূত কোনো জনগোষ্ঠী। শেফার-সাহেব মনে করেন যে, অপরান্ত শব্দটি Parthian রাজাদের উচ্চারিত aparnoi শব্দের অপভ্রংশ এবং তদ্দেশবাসীরা পূর্ব-ইরানীয় জনগোষ্ঠীর একটি পরম্পরা। *[Robert Shafer, Ethnography of Ancient India, p. 117]* এই সিদ্ধান্ত থেকে আরও মনে হয় অপরান্ত-দেশবাসীরা ভারতের মাহী নদী থেকে গোয়া পর্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করতেন।

[Bombay Gazetteer, Vol. 1, pt 1, P. 36, note 8]

অপরিগ্রহ যোগী-যতি-মুনিদের পক্ষে কায়মনোবাক্যে সর্বত্যাগ এবং গৃহীদের পক্ষে কায়মনোবাক্যে পরদ্রব্য পরিহার করার নাম অপরিগ্রহ।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৫৫.১৯-২০]

□ মহাভারতে অপরিগ্রহকে নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—

অশব্দম্ অপরিগ্রহম্।

পরিগ্রহ করার অর্থ হল লোকের কাছ থেকে জিনিস পত্র, টাকা-পয়সা নেওয়া। অপরিগ্রহ তার উলটো, কারও কাছে কখনো কিছু না নেওয়ার মানসিক এবং সংকল্পজাত অভ্যাস যার শেষ জায়গায় আছে, পরের জিনিসে প্রয়োজন বোধ না করা। কিন্তু এর প্রথম জায়গাটা হল অন্যের দান গ্রহণ না করার সদিচ্ছা এবং সংকল্প। মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির যখন কিছুতেই আর রাজা হতে চাইছেন না, তখন ভীম তাঁকে কটূক্তি করে তির্যকভাবে বলেছিলেন—সন্ন্যাসী হয়ে তো আর রাজা হওয়া যায় না। সন্ন্যাসী হয়ে যদি রাজসিদ্ধি লাভ করা যেত তাহলে পর্বত এবং বৃক্ষরাও সেই সিদ্ধিলাভ করত, কেননা, তারা নিরুপদ্রবে থাকে, তারাও ব্রহ্মচারী এবং তারা কারও কাছ থেকে কিছু নেয় না—'অপরিগ্রহবন্তশ্চ'। শাস্ত্রকারেরা অবশ্য এই পর্বত-বৃক্ষের ভাবটাই যোগী পুরুষের অভ্যাসের মধ্যে খুঁজেছেন। গীতায় ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের উপদেশে বলা হয়েছে—যোগী একাকী নির্জনে থাকবেন, তাঁর দেহ-মন সংযত থাকবে, কোনো কিছুর জন্য তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবে না এবং তিনি কখনোই পরিগ্রহ করবেন না—

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।

যোগীর এই পরিগ্রহ শূন্যতার কথাটি পাতঞ্জল যোগদর্শনের সূত্রে যম-নিয়মের প্রক্রিয়ার মধ্যে এসেছে। এখানে সংযমের সূত্রে বলা হয়েছে—

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

এখানেও ভীমের বলা ব্রহ্মচর্য্য আর অপরিগ্রহের সাধন যোগসূত্রের মধ্যে এসেছে। অপরিগ্রহের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—ভোগ্য বিষয়বস্তুর অর্জন, বিষয়ের রক্ষণচিন্তা, তার ক্ষয়-চিন্তা, বিষয়-ক্ষয়ে হিংসার চিন্তা—এই সব কটি বর্জনের ভাবনা অপরিগ্রহের ভাবনার মধ্যে পড়ে। মহামহোপাধ্যায় কালীবর বেদান্তবাগীশ অপরিগ্রহের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে যেন অপরিগ্রহ (ত্যাগশক্তি) অবলম্বিত থাকে। অপরিগ্রহ কী? তাহা শুন। ইহা হউক, উহা হউক—এটী চাহি, সেটী চাহি—এতদ্রূপ তৃষ্ণার অধীন হওয়ার নাম পরিগ্রহ। কেবল দেহযাত্রা-নির্বাহের বা শরীররক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য স্বীকার করাকে পরিগ্রহ বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুতরাং শরীর রক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য ভিন্ন ভোগবিলাসের জন্য তুমি দ্রব্যের আহরণ, কী তাহার ইচ্ছাও করিবে না। তাহা হইলেই তোমার অপরিগ্রহব্রত সফল ও সুদৃঢ় হইবে এবং তদ্বলে তোমার চিত্তে যোগোপযুক্ত বৈরাগ্যের বীজ উৎপন্ন হইবে।

[মহা (k) ১৪.১৯.১০; ১২.১০.২৫; ভগবদ্গীতা ৬.১০; পাতঞ্জল দর্শন, দুর্গাচরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, সূত্র ২.৩০, পৃ. ২০১-২০৫]

অপর্ণা মদনভস্মের পর মহাদেব অন্তর্হিত হলে পার্বতী উমা মহাদেবকে লাভ করার জন্য তপস্যায় নিরত হলেন। রুদ্রশিব মদনকে যেখানে দগ্ধ করেছিলেন, সেইখানেই একটি বেদি প্রস্তুত করে অবস্থান আরম্ভ করলেন পার্বতী। তিনি জলাহার পরিত্যাগ করে বৃক্ষের পর্ণমাত্র ভক্ষণ করে তপস্যা করতে লাগলেন। ক্রমে আর্দ্র পত্রের আহার পরিত্যাগ করে শুষ্ক পত্রই আহার হিসেবে বেছে নিলেন। শেষে সরস, নীরস সবরকম পর্ণ-ভক্ষণ পরিত্যাগ করার ফলে পার্বতীর নাম হল অপর্ণা।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ২১.১৩৯-১৪২]

□ ললিতা সহস্রনামের সৌভাগ্যভাস্কর টীকাতে অপর্ণা নামটির অসামান্য একটি অর্থনিরূপণ করে বলা হয়েছে—যিনি ভক্তের কাছে কোনো ঋণ বাকী রাখেন না। যাঁর সব ঋণ শোধ করা হয়ে গেছে; তিনি অপর্ণা। এই প্রসঙ্গে তিনি দেবীস্তব থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলেছেন—এতকাল ধরে তোমার নাম জপ করছি, সেই নামজপের ঋণ শোধ করার জন্য এখনো তুমি দেখা দাওনি আমার সামনে। তবুও যে তোমার নামটা যে অপর্ণা হয়ে গেছে, সেই অপর্ণা-শব্দের রূঢ়ি অর্থটা আমার কাছে ভারস্বরূপ হয়ে গেছে—

ঋণমিষ্টমদত্ত্বেব ত্বন্নাম জপতো মম।
শিবে কথমপর্ণেতি রূঢ়ির্ভারায়তে মম॥

কালিকা পুরাণে অবশ্য সেই উমার তপস্যা প্রসঙ্গেই পর্ণাহার ত্যাগের প্রসঙ্গ এসেছে এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও তাই।

[ললিতাসহস্রনাম (নির্ণয়সাগর প্রেস), শ্লোক নং ১৯৬; দ্র. সৌভাগ্যভাস্কর টীকা, পৃ. ১৫৮]

অপর্ণি একজন ঋষি। পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত তথা গোত্র প্রবর্তক হিসেবে যেসব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি অপর্ণির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৩০]*

অপসব্য সব্য অর্থ হল বাম দিক। অপসব্য মানে কোনো ভাবেই বাঁয়ে নয়, ডান দিক। রামায়ণে এই সাধারণ অর্থে অপসব্য শব্দের ব্যবহার করে প্রহস্ত রাক্ষসের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রাকালে রাক্ষসেরা তুমুল শব্দ করছিল, মাংস-শোণিতভোগী শকুনেরা ডান দিক দিয়ে প্রহস্তের রথের চার পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—

মণ্ডলান্যপসব্যানি খগাশ্চক্রু রথং প্রতি।

মহাভারতে বলা হয়েছে—আমার কথা যদি তোমার বিপরীত মনে হয়—এই 'বিপরীত' অর্থেও 'অপসব্য' শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে—

যদ্যেতদ্ অপসব্যং তে ভবিষ্যতি বচো মম।

টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে অর্থ করেছেন—

অপসব্যং বিপরীতং যদি। *[রামায়ণ ৫.৫৭.৩৪; মহা (k) ৫.১৩৮.২৭; (হরি) ৫.১২৯.২৭]*

□ আর পারিভাষিক অর্থে শ্রাদ্ধক্রিয়ার কোনো কোনো সময় বাঁ কাঁধ থেকে পৈতে ঘুরিয়ে এনে যখন ডান কাঁধে রাখতে হয় এবং সেটা বাঁ হাতের তলায় গলিয়ে দিতে হয়—সেই প্রক্রিয়াটাকে অপসব্য বলে।

[দ্র. কর্মপ্রদীপ; (চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার) ১.২.৮]

অপস্বান্ত বায়ু পুরাণ মতে শত্রুজিতের (সত্রাজিতের) শতপুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অপস্বান্ত।

[বায়ু পু. ৯৬.৫৩]

অপস্মার ভাগবত পুরাণে পূতনা-বধের পর পূতনাকে অপদেবতা মনে করে জননী যশোমতী পুত্রের কল্যাণের জন্য রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করেছেন এবং ভূত-পিশাচাদি অপদেবতাদেরও অপসারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। এই অপদেবতাদের মধ্যে 'অপস্মার' নামে অপদেবতারা বহুবচনে ব্যবহৃত। বস্তুত অপস্মার আয়ুর্বেদিক ভাবনায় এক ধরনের 'এপিলেপ্‌সি', যাতে মূর্ছা এবং সংজ্ঞাহীনতা দুইই হতে পারে। সুশ্রুত-চরকের মতে আমাদের সংজ্ঞা-চেতনাবাহী যে সমস্ত ধমনী আছে, সেগুলি রজঃ এবং তমোগুণের দোষ যুক্ত হলে একধরনের চিত্তভ্রান্তি ঘটে। তাতে হাত-পা ছোঁড়া থেকে আরম্ভ করে চোখ লাল হওয়া, ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে ওঠা, যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই সেটা দেখতে পাওয়া, দাঁত কড়মড় করা, বমি করা, মাটিতে ঠাস করে পড়ে যাওয়া, সংজ্ঞা হারানোর পর আবার সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া—এই সব নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। এটাই বৈদ্যশাস্ত্রমতে 'অপস্মার'—যেটা প্রাচীনকালে রোগ হিসেবে মানুষ বুঝতে পারত না বলেই মানুষের ওপর ভূত-পিশাচের ভর হয়েছে বলে ভাবত। পুরাণে এই রোগকেই অপদেবতার আরোপ বলে ভাবা হয়েছে—

উন্মাদা যে'পস্মারা দেহ-প্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ।

অন্যদিকে আমাদের রসশাস্ত্রকারেরা ভরতমুনি থেকে রূপগোস্বামী তথা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অপস্মারকে নায়ক-নায়িকার বিরহ-মধুর

এক প্রেমবিকার বলে বর্ণনা করেছেন এবং এই সব নান্দনিক ক্ষেত্রে অপস্মার সাধারণত সাময়িক স্মৃতি-লোপ অথবা সাময়িক বোধজ্ঞানশূন্যতা বোঝায়।

[ভাগবত পু. ১০.৬.২৮; সুশ্রুত-সংহিতা (মতিলাল বনার্সিদাস), উত্তরতন্ত্র ৬১.৮-১০; চরক-সংহিতা, চিকিৎসা ১০.৬.৬; Jadunath Sinha, Indian Psychology, Vol. 2, 258-260]

অপস্যতি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের ঔরসে সূনৃতার গর্ভজাত চার পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। মৎস্য পুরাণ মতে ইনি ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। *[মৎস্য পু. ৪.৩৫]*

অপস্যন্ত উত্তানপাদের ঔরসে সূনৃতার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। *[মৎস্য পু. ৪.৩৫]*

অপস্যৌষ মৎস্য পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশজাত যেসব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি অপস্যৌষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৪৫.১০৪]

অপহারিণী পিশাচী ব্রহ্মধনার গর্ভজাত অন্যতম ব্রহ্মরাক্ষসী। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৯৯]*

অপাংনিধি ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৮; (হরি) ১৩.১২৭.৪৮]

অপাংপ্রপতনতীর্থ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে উল্লিখিত তীর্থনাম। এই তীর্থে জলপ্রপাত ছিল বলেই নাম অপাংপ্রপতন। এই তীর্থের জলপ্রপাতে স্নান করলে মহা পুণ্যফল লাভ হয় বলে বর্ণিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.২৫.২৮; (হরি) ১৩.২৬.২৮]

অপাংশু দ্বাদশ মন্বন্তরে যখন রুদ্রসাবর্ণি বা ঋতসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন হরিত তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি গণ। হরিতগণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অপাংশু। তবে বায়ু পুরাণে অপ এবং অংশুকে দুজন পৃথক দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু স্পষ্টই বলা আছে যে, হরিত গণভুক্ত দেবতারা সংখ্যায় দশ, সেহেতু অপাংশু পাঠটিই সঠিক বলে মনে হয়।

[বায়ু পু. ১০০.৮৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮৪]

অপাগ্নেয় একজন ঋষি। পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত তথা গোত্র প্রবর্তক হিসেবে যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি অপাগ্নেয়-এর বংশ তার মধ্যে অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৪৩]

অপাণ্ডু একজন ঋষি। পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত তথা গোত্র প্রবর্তক হিসেবে যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি অপাণ্ডুর বংশ তার মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৯৬;৪৫]*

অপান$_{১}$ পঞ্চভূতে তৈরি এই পার্থিব শরীর। মানব শরীরের মধ্যে অগ্নি (তেজঃ) এবং বায়ু (মরুৎ) কীভাবে ক্রিয়া করে সেই প্রসঙ্গে অপান বায়ুর কথা এসেছে। দেহস্থিত বায়ু পাঁচটি—প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান।

অপান বায়ু জঠরাগ্নিতে, নাভির নিম্নদেশে এবং পায়ু প্রদেশে অবস্থিত হয়ে মূত্র এবং বিষ্ঠা বহন করে। তেজ বা অগ্নি প্রাণ এবং অপান বায়ুকে আশ্রয় করে এই দুই বায়ুর মাঝখানে উদরে অবস্থান করে এবং সেখানে থেকে ভুক্ত অন্ন-পানকে পরিপাক করে।

[মহা (k) ১২.১৮৫.৬, ২০; (হরি) ১২.১৭৯.৬, ১০]

পৃথিবী এবং আকাশে মহাবল এবং মহাপ্রাণ-স্বরূপ সাধ্য নামে দেবতারা অদৃশ্যভাবে বাস করেন। সমানবায়ু এই সাধ্যদেবগণের পুত্র। সমান বায়ুর পুত্র উদান, উদানের পুত্র ব্যান, ব্যানের পুত্র অপান এবং অপানের পুত্র প্রাণ। এই বায়ুগুলির আগের আগেরটির কাজ পরের পরেরটির মধ্যে সংক্রান্ত হয় বলে পুত্র-পিতার সম্বন্ধ রূপক।

[মহা (k) ১২.৩২৮.৩২-৩৩; (হরি) ১২.৩১৭.৩২-৩৩]

অপান$_{২}$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাঁরা সাধ্যগণ অথবা অজিতগণের অন্তর্গত দেবতা ছিলেন অপান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬৭.৩৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.১৬]*

অপান$_{৩}$ স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিতগণের অন্তর্গত বারোজন দেবতার মধ্যে অপান ছিলেন অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬৬.১৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.১৯]*

অপান্তরতমা (অপান্তরতমস্) দ্বৈপায়ন ব্যাসের পূর্বজন্মের নাম। একজন ঋষি। নারায়ণ সম্বোধনসূচক 'ভো' (ও-হে) শব্দ উচ্চারণ করলে সেই প্রতিধ্বনিত শব্দ থেকে অপান্তরতমা নামে একটি পুত্র জন্মাল, সরস্বতী (বাক) থেকে জন্মেছিলেন বলে তাঁর নাম 'সারস্বত'-ও বটে।

অপান্তরতমা নাম সুতো বাক্‌সম্ভবঃ প্রভুঃ। এই পুত্র অবনতমস্তকে নারায়ণের সামনে দাঁড়ালে প্রভু নারায়ণ তাঁকে বেদ কথনে এবং বেদশ্রবণে যত্নবান হতে বললেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঋষি অপান্তরতমা বেদ-বিভাগ করেন। এই ঋষির তপস্যা, সংযম-নিয়ম এবং বেদবিভাগের দক্ষতা লক্ষ্য করে নারায়ণ তাঁকে অন্যান্য মন্বন্তরেও লোকপ্রবর্তক ঋষি হবেন বলে আশীর্বাদ করেন। নারায়ণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন—কৃষ্ণযুগ (কলিযুগ) উপস্থিত হলে তুমি আবারও বেদ-বিভাগ কার্যে নিযুক্ত হবে এবং নানাবিধ ধর্মশাস্ত্র এবং জ্ঞানমার্গীয় শাস্ত্র (বেদান্তসূত্র প্রভৃতি) রচনা করবে। তুমি পরম তপস্বী হবে কিন্তু কামপ্রভৃতি রাগসম্বন্ধ থেকে তুমি মুক্ত হবে না। তবে মহাদেবের অনুগ্রহে তোমার পুত্র বীতরাগ এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হবে। তুমি বশিষ্ঠের বংশে পরাশর মুনির ঔরসে এক কন্যার গর্ভে জন্মাবে। নারায়ণের বর-প্রভাবেই এই ঋষি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব দেখতে পেতেন এবং তাঁরই আশীর্বাদে তিনি ভগবান চক্রপাণি কৃষ্ণের সমসাময়িক।

এই অপান্তরতমাই ভবিষ্যতে 'বশিষ্ঠকুল-নন্দনঃ' দ্বৈপায়ন ব্যাস। অপান্তরতমা ঋষিকে 'বেদাচার্য' বলা হয়, প্রাচীনগর্ভ নামেও তাঁকে ডাকা হয়। *[মহা (k) ১২.৩৪৯.৩৮-৬২, ৬৬; (হরি) ১২.৩৩৩.৩৮-৬১, ৬৫; ভাগবত পু. ৬.১৫.১২; ৯.৪.৫৭]*

অপাস্য একজন ঋষি। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.৯৯]*

অপীতস্তনী দেবী গৌরী একবার দেবদেব মহাদেবের ওপর রাগ করে স্তন্যপানার্থী কার্তিককে পরিত্যাগ করে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন বলেই তাঁর এই নামে প্রসিদ্ধি হয়। *[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল) ২.২১.২৫-২৬]*

অপূরণ কদ্রুর গর্ভজাত বিখ্যাত নাগদের মধ্যে অন্যতম নাগের নাম। *[মহা (k) ১.৩৫.৬; (হরি) ১.৩০.৬]*

অপ্যয় বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৯; (হরি) ১৩.১২৭.১০৯]*

অপ্রকাশ দেবতাদের একটি গণ। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৫২]*

অপ্রতিম$_{১}$ তৃতীয় মন্বন্তরের অধিপতি উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। *[বায়ু পু. ৬২.৩৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩৯]*

অপ্রতিম$_{২}$ তৃতীয় সাবর্ণি মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৯৪.১৪]*

অপ্রতিম$_{৩}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে দশম মন্বন্তরের অধিপতি ধর্মসাবর্ণি মনুর যে দশ পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, অপ্রতিম তাঁদের মধ্যে একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৭০]*

অপ্রতিমৌজা দশম মন্বন্তরে যখন ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, অপ্রতিমৌজা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[বিষ্ণু পু. ৩.২.২৬]*

অপ্রতিরথ$_{১}$ বিষ্ণু পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী পুরুবংশীয় রাজা রন্তিনারের অন্যতম পুত্র ছিলেন অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথ কণ্বের পিতা ছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.২০.৬; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.২]*

অপ্রতিরথ$_{২}$ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৮১; (হরি) ১৩.১২৭.৮১]*

অপ্রতিষ্ঠ একটি নরকের নাম। *[বায়ু পু. ১০১.১৪৯, ১৭৯, ১৮১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২.১৫০, ১৮২-১৮৪]*

অপ্রতীপী কলিযুগে মগধে জরাসন্ধ বংশীয় যেসব রাজা রাজত্ব করেন, অপ্রতীপী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি শ্রুতশ্রবার পুত্র ছিলেন। নিরমিত্র নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। ইনি ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।' *[মৎস্য পু. ২৭১.২১]*

অপ্রমত্ত ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম এটি নাম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৮; (হরি) ১৩.১২৭.৪৮]*

অপ্রমাদ ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা বুদ্ধির গর্ভজাত পুত্র। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৯.৬০; বায়ু পু. ১০.৩৬]*

অপ্রমেয় ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.১৯; (হরি) ১৩.১২৭.১৯]*

অপ্রমেয়াত্মা ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪০; (হরি) ১৩.১২৭.৪০]*

অপ্সরসকুণ্ড মথুরার পশ্চিমভাগে পবিত্র গোবর্ধন পর্বত সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত একটি পবিত্র কুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করলে পুণ্যফল লাভ হয়। *[বরাহ পু. ১৬৪.১৯]*

অপ্সরা ঋগ্‌বেদে সোমরস-নিষ্কাসনের প্রসঙ্গে অপ্সরাদের নাম শুনতে পাই প্রথমে। বলা হয়েছে—সোমরস নিষ্কাসনের সময় আকাশচারিণী কয়েকজন অপ্সরা এসে সকলের মাঝখানে বসেছিলেন এবং তখনই মনীষীদের অভীষ্ট সোমরসকে প্রস্তুত করলেন তাঁরা—

সমুদ্রিয়া অপ্সরসো মনীষিণমাসীনা
অন্তরভি সোমমরক্ষন্।

এই মন্ত্রে সায়ন সমুদ্র শব্দের অর্থ করেছেন 'সমুদ্রম্ অন্তরীক্ষম্'—সমুদ্র হল আকাশ। এমনিতে 'অপ্সরা'-শব্দের মধ্যে অপ্ শব্দের অর্থ জল। সেই ভাবনা থেকেই হয়তো বেদের শব্দনিরুক্তিকার যাস্ক লিখেছেন—অপ্সরারা আসলে জলচারিণী—অপ্সরা অপ্সারিণী। তবে 'সৃ' ধাতুর মধ্যে যেহেতু সরে-সরে যাওয়ার অর্থটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাতে এটাই মনে হয় যে, জল যেমন এক জায়গায় দাঁড়ায় না, তেমনই অপ্সরারাও সরে-সরে যান, একত্র তাঁরা স্থির থাকেন না। সায়নাচার্যের অর্থ ধরে অনেকেই আবার মনে করেন—বেদে অনেক জায়গাতেই সমুদ্রের মতো দেখতে বিশাল ব্যাপ্ত মহাকাশকে সমুদ্র বলে বলা হয়েছে, তাতে আকাশ-সমুদ্রে যাঁরা বিহার করেন তাঁরাই অপ্সরা, এই অর্থ দাঁড়ায়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন —ঋগ্‌বেদের বর্ণনায়—

রপদ্‌গন্ধর্বীরপ্যা চ যোষণা।

এই মন্ত্রে অপ্যা অর্থাৎ 'অপ্' (জল) থেকে জন্মানো অথবা জলচারিণী রমণীই (যোষণা) অপ্সরা এবং 'অপ্যা যোষণা' উষা। ঋগ্‌বেদে সরণ্যূ এবং সবর্ণা সূর্যের পত্নী, কিন্তু তাঁরাও আসলে উষা। ঋগ্‌বেদে সরণ্যূর যমজ পুত্র-কন্যা হলেন যম এবং যমী। তাঁদের মুখে কিন্তু এই শব্দটাও দেখা যাচ্ছে যে, যম বলছেন—গন্ধর্ব আমাদের পিতা আর আপ্যা যোষা আমাদের দুজনেরই মা—

গন্ধর্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ।

সায়নাচার্য এখানে গন্ধর্ব-শব্দের অর্থ করেছেন বিবস্বান্ সূর্য এবং আপ্যা যোষা হলেন সরণ্যূ অথবা সূর্যপত্নী উষা।

ঋগ্‌বেদের মন্ত্র, সায়নাচার্যের ব্যাখ্যা এবং যোগেশচন্দ্রের ভাষ্য মিশিয়ে আমরা যেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি যে, অপ্সরা আসলে আকাশ-সমুদ্রে বিচরণ-করা সূর্যকিরণের রূপ যা বৈদিক উষার নামান্তর। অপ্সরাদের সঙ্গে গন্ধর্বদের নিকট সম্বন্ধ আছে। ঋগ্‌বেদেরই অন্য একটি মন্ত্রে যেখানে অপ্সরাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে তার আগের মন্ত্রেই বৃষ্টিদাতা এক আলোকময় দেবতার নাম বেণ এবং তিনি একজন গন্ধর্ব। তারপরেই বলা হচ্ছে বিদ্যুৎ যেন এক অপ্সরা আর গন্ধর্ব বেণ যেন তাঁর উপপতি। বিদ্যুৎরূপিণী অপ্সরা যেন তাঁর গন্ধর্ব-উপপতিকে দেখে ঈষৎ হাসি দিয়ে আলিঙ্গন করছেন—

ঋতেন যন্তো অধি সিন্ধুমস্থু/
র্বিদদ্ধ-গন্ধর্বো অমৃতানি নাম॥
অপ্সরা জারমুপসিষ্মিয়ানা
যোষা বিভর্তি পরমে ব্যোমন্।

এই মন্ত্রের মধ্যে অপ্সরার সঙ্গে বিদ্যুতের তুলনা, গন্ধর্বের সঙ্গে অপ্সরার ঔপপত্যের সম্পর্ক অবশ্যই অপ্সরাদের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য এবং চারিত্রিক উচ্ছলতা সূচনা করে। আবার একই সঙ্গে এই রূপ এবং বিশেষ চরিত্র মনুষ্যলোকে কী প্রভাব তৈরি করে, তারও একটা চিত্র পাই অথর্ববেদে। এখানে কিন্তু অপ্সরারা গন্ধর্বদের স্ত্রী। অথর্ববেদে অপ্সরাদের সূর্যরশ্মি-সঞ্জাত মৌল চেহারাটিও যেন প্রতিভাসিত হয়। এখানে বলা হচ্ছে—অনবদ্য সূর্যরশ্মিস্বরূপ অপ্সরাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন গন্ধর্ব, তাঁদের স্থান অন্তরীক্ষ-রূপ সমুদ্রে সেখান থেকে তারা আসেন এবং চলে যান। এই মন্ত্রটির পরেই সোজাসুজি অপ্সরাদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে—অন্তরীক্ষে উৎপন্ন অপ্সরারা! শোনো; দ্যুতিময়ী অপ্সরারা! শোনো; নক্ষত্ররূপিণী অপ্সরারা! তোমাদের গৃহেস্থিত গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর সঙ্গে মিলিত হও। হে দেবীগণ! তোমাদের উদ্দেশে নমস্কার। শেষ আথর্বণিক মন্ত্রে বলা হচ্ছে— অপ্সরারা নিয়ত কোলাহলমুখর, তাঁরা কৃষ্ণবর্ণা, পাশাখেলায় আসক্ত এবং মনের মোহ তৈরি করেন—এইরকম গন্ধর্বপত্নী অপ্সরাদের আমরা নমস্কার করছি—

যাঃ ক্লন্দাস্তমিষীচয়ো'ক্ষকামা মনোমুহঃ।
তাভ্যো গন্ধর্বপত্নীভ্যো'প্সরাভ্যো'করং নমঃ॥

ঋগ্‌বেদ, অথর্ববেদে অপ্সরাদের উপপতি এবং পতি হিসেবে যে গন্ধর্বের কথা পাওয়া যায় সেই গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের স্বরূপ নির্ধারণ করে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় স্পষ্ট বলা হয়েছে—সূর্যই হলেন গন্ধর্ব, তাঁর কিরণগুলিই অপ্সরা—

সূর্যো গন্ধর্বস্তস্য মরীচয়ো'প্সরসঃ

এই মন্ত্রের মাধ্যমে আমরা আবারও যেন একবার প্রমাণ করতে পারছি যে, অপ্সরারা বস্তুত সেই সূর্যরশ্মি, যার সঙ্গে ঊষা এবং সরণ্যূ একাকার হয়ে যায়, একাকার হয়ে যায় আপ্যা যোষাও। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় 'রাষ্ট্রভিৎ' নামে গোটা একটি সূক্তের মধ্যে অপ্সরারা গন্ধর্বদের সহচারিণী হিসেবে আসছেন প্রায় প্রত্যেকটি মন্ত্রের মধ্যে। যেমন ঋতধাম অগ্নি যদি গন্ধর্ব-নাম হয় তাহলে ওষধিগুলি হল তার অপ্সরাভার্য্যা। সেই অপ্সরাদের একত্রে বলা হয় ঊর্জ। একইভাবে বিশ্বাসামা নামে সূর্য হলেন গন্ধর্ব এবং তাঁর মরীচিগুলি হল তাঁর অপ্সরা-ভার্য্যা, যাঁদের নাম আয়ুব। গন্ধর্বের নাম চন্দ্রমা, তাঁর স্ত্রী নক্ষস্বরূপিণী অপ্সরাদের নাম বেকুরি। এইভাবে যজ্ঞ গন্ধর্ব, অপ্সরারা তাঁর স্ত্রী দক্ষিণা যাদের নাম স্তবা। মন নামের এক গন্ধর্ব তারা অপ্সরা-ভার্য্যাদের নাম মুদা। এই মন্ত্রগুলির একেবারে শেষে আছে গন্ধর্বের নাম কাম যে রমণীর শরীর কামনা করে এবং চরম ইন্দ্রিয়সুখের অভিলাষ তৈরি করে আর স্ত্রী অপ্সরাদের নাম শোচয়ন্তী—যারা বিষয়কামনার কারণে মানসিক ক্লেশ তৈরি করে—

চারুঃ কৃপণকাশী কামো গন্ধর্বস্তস্যাধয়ঃ
অপ্সরসঃ শোচয়ন্তীর্নাম।

[ঋগ্‌বেদ, ৯.৭৮.৩; ১০.১১.২; ১০.১০.৪; যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃ. ২৯-৩৩; Max Muller, Lectures on the Science of Language, vol. II, p. 529, Fn. 39; ঋগ্‌বেদ, ১০.১২৩.৪-৫; অথর্ববেদ, ২.২.৩-৫; তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম), ৩.৪.৭.১-৩, পৃ. ১৫৬৮-১৫৬৯]

অপ্সরাদের অসামান্য রূপ, তাঁদের স্বচ্ছন্দচারিতা, তাঁদের বিদ্যুৎ-সমান চঞ্চলতা এবং তাঁদের মোহিনী শক্তি—এই রকম যে-সব বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে বিবৃত হয়েছে, তার সূত্রপাত কিন্তু বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতেই হয়ে গেছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার যে অংশে গন্ধর্বরূপী কাম এবং মানসিক কষ্টের উদ্রেককারিণী অপ্সরাদের বিবরণ পেয়েছি, ঠিক তার পরের সূক্তে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—উন্মাদ রোগ পরিহার করার জন্য রাষ্ট্রভৃৎ যজ্ঞ করতে হবে। গন্ধর্ব আর অপ্সরারাই লোককে উন্মত্ত করে—

গন্ধর্বাপ্সরসো বা এতমুন্মাদয়ন্তি য
উন্মাদ্যত্যেতে খলু বৈ গন্ধর্বাপ্সরসঃ।

তৈত্তিরীয়ের মন্ত্র আরও স্পষ্টভাবে উপস্থাপনা করে টীকাকার সায়ন লিখেছেন— যে মানুষই উন্মত্ত হয়, বুঝতে হবে গন্ধর্ব-অপ্সরারাই তাকে উন্মত্ত করেছে—

যঃ পুরুষ উন্মত্তো ভবতি এতং
গন্ধর্বাপ্সরস এব উন্মত্তং কুর্বন্তি।

গন্ধর্বদের কথা থাক, বস্তুত তারা যদি তৈত্তিরীয়ের মতে কামনার প্রতীক হয়—কামো গন্ধর্বঃ—তাহলে অপ্সরারা সেই কামনা জাগিয়ে তুলে মানুষের মনের যে শোচনীয় অবস্থা তৈরি করেন, সেই কারণেই অপ্সরাদের নাম শোচয়ন্তী। পরবর্তী কালে মহাকাব্য পুরাণে আমরা অপ্সরাদের যা পরিচয় পেয়েছি, তাতে অপ্সরারা নৃত্য-গীত এবং নাট্যের প্রতীক হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তার চেয়েও অপ্সরাদের বড়ো বৈশিষ্ট্য হল—তাঁরা সর্বত্র এক উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁদের স্বচ্ছন্দ শারীরিক মাধুর্য্যে মূঢ়-মোহিত হয়ে ওঠে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল। অন্যদিকে তাঁদের চরিত্রের মধ্যেও আছে সেই স্বচ্ছন্দচারিতা। যে ঋগ্‌বেদে অপ্সরাদের একবার গন্ধর্বপত্নী হিসেবে চিহ্নিত, পরক্ষণেই আবার গন্ধর্বদের পেলাম তাঁদের উপপতি হিসেবে, সেই অপ্সরাদের এক সময় 'স্বর্গবেশ্যা' হিসেবেই চিহ্নিত করতে হল টীকাকার সায়নাচার্যকে। পুরূরবা উর্বশীর সংবাদ-সূক্তে একটি ঋক্—

সমস্মিঞ্জায়মান আসত গ্নাঃ—

এখানে ঋগ্‌বেদের শ্রেষ্ঠতমা অপ্সরা উর্বশী মন্তব্য করেছিলেন—পুরূরবা যেদিন জন্মেছিলেন, সেদিন দেববেশ্যা অপ্সরারা এসে ঘিরে ধরেছিলেন তাঁকে—

অস্মিন্ পুরুরবসি জায়মানে সতি গ্নাঃ
অপ্সরসো দেববেশ্যা অপি সমাসত্।

[সায়নাচার্যকৃত টীকা]

অপ্সরাদের সৌন্দর্য্য-মাধূর্য্য এবং যৌনতার প্রসঙ্গ আলোচনা এসেছে জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণে। সেখানে অপ্সরারা বলেছে— আমাদের মধ্যে আছে সেই হাসি, আছে ক্রীড়া-কৌতুক, আর আছে মৈথুন। এগুলি তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক—হাসো মে ক্রীড়া মে মৈথুনং মে। তস্মৈ যুষ্মাবু।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম), ৩.৪.৮.৪, পৃ. ১৫৭৩; ঋগ্বেদ, ১০.৯৫.৭; The Jaiminiya or Talavakara Upanishad Brahmana, ed. Hanns Oertel, in Journal of the American Oriental Society, Vol. 16 (1896), 3.25.5-8]

অথর্ববেদে অপ্সরাদের উদ্দেশে হোম করার সময় যে বিশেষণগুলি দেওয়া হয়েছে, তাতে বোঝা যায়—অপ্সরারা হলেন আমোদিনী এবং প্রমোদিনী—

'আনন্দিনীং প্রমোদিনীম্ অপ্সরাং তামিহ হুবে'।

এই আমোদিনী এবং প্রমোদিনী অপ্সরারা মহাকাব্য-পুরাণের কালে নৃত্য-গীত এবং নাট্যের পটীয়সী প্রতিভূ। দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গসভায় তাঁরা সর্বদা নৃত্যগীত পরিবেশন করছেন, হাব-ভাব-লাস্য-হাস্যে সর্বদাই তাঁরা বিনোদিনী ভূমিকায় আছেন। মহাভারতে ইন্দ্রসভার বর্ণনায় অপ্সরারা প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—

তথৈবাপ্সরসো রাজন্ গন্ধর্বাশ্চ মনোরমাঃ।
নৃত্য-বাদিত্র-গীতৈশ্চ হাস্যৈশ্চ বিবিধৈরপি।
রময়ন্তী স্ম নৃপতে দেবরাজং শতক্রতুম্॥

দেবরাজ ইন্দ্র বৈদিক দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যোদ্ধা বলে যেমন কীর্তিত, তেমনই যৌনতার প্রতীক হিসেবেও তাঁর সুনাম-দুর্নাম কোনোটাই কম নয়। আর সৌরকুলের (Solar gods) অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে ইন্দ্রের এই যৌনতার অনুষঙ্গ খুব একটা অস্বাভাবিকও নয়। (Sukumari Bhattacharji, Indian Theogony, p. 273) মহাকাব্য-পুরাণে অপ্সরারা মাঝে মাঝেই 'দেবকন্যা' বলে কথিত হয়েছেন এবং তার অর্থ 'দেবতাদের মেয়ে' নয়, ঠিক যেমন একই ভাবে ইন্দ্রকন্যা মানেও অপ্সরারা দেবরাজ ইন্দ্রের মেয়ে নয়, তাঁরা আসলে Indra's girls, gods' girl যেমনটি বলেছেন Hopkins—মহাভারতে ইন্দ্রকন্যা অপ্সরারা এতটাই তাঁর কাছের লোক যে, বৃত্রবধের পর ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ যাঁরা ব্রহ্মার অনুরোধে ভাগ করে নিয়েছিলেন অপ্সরারা তাঁদের অন্যতম—

* তথৈমন্ননৃত্যন্ত দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ।
দিব্যবাদিত্র নৃত্যজ্ঞা সুবস্ত্যশ্চারুদর্শনাঃ॥
* ইন্দ্রকন্যাধিরূঢ়ং চ বিমানং লভতে নরঃ।
* ইয়মিন্দ্রাদনুপ্রাপ্তা ব্রহ্মবধ্যা বরাঙ্গনাঃ।
চতুর্থমস্যাং ভাগাংশং ময়োক্তা সম্প্রতীচ্ছত॥
তথেতি হৃষ্টমনস ইত্যুক্ত্বপ্সরসাং গণাঃ।

মহাভারত-রামায়ণে অপ্সরাদের এটাই একটা বৈশিষ্ট্য যে, তাঁরা সব সময়েই ইন্দ্রের অধীনে। একদিকে ইন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য-গীত করাটা যেমন তাঁদের ধর্ম, তেমনই ইন্দ্রের আদেশে ঋষি-মুনিদের ধ্যানভঙ্গ করা থেকে দেবতাদের অভীষ্ট সম্পাদন করাটাও অপ্সরাদের কাজ। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী বিষ্ণু নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর হিরণ্যকশিপু ভাগিনেয় ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষের শক্তিবৃদ্ধির জন্য চরম তপস্যা আরম্ভ করলেন। ইন্দ্র তাঁর সমাধি ভঙ্গ করার জন্য অপ্সরা-সুন্দরীদের পাঠালেন। অপ্সরাদের দেখে বিশ্বরূপের মন বিকল হল অচিরেই। তাঁকে সম্মুগ্ধ দেখে অপ্সরারা বিশ্বরূপকে বললেন—আমাদের এবার ফিরে যেতে হবে যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে। ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ বললেন—কোথায় যাবে তোমরা? যেয়ো না, আমার কাছে বোস, তাতেই ভাল হবে তোমাদের। অপ্সরারা বললেন—আমরা দেবস্ত্রী, আমরা অপ্সরা, বহুকাল আগেই আমরা মহাপ্রভাবশালী ইন্দ্রকে আশ্রয় হিসেবে বরণ করেছি—বয়ং দেবস্ত্রিয়ঃ অপ্সরস ইন্দ্রং দেবং বরদং পুরা প্রভবিষ্ণুং বৃণীমহে ইতি।

অপ্সরারা কখনো দেবস্ত্রী, কখনো ইন্দ্রকন্যা, কখনো দেবকন্যা। স্বর্গে ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে মর্ত্যলোকের নহুষ যখন সেখানে রাজা হয়েছিলেন, তখন তিনি অপ্সরা এবং দেবকন্যাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেবরাজের মতোই ক্রীড়াসুখ অনুভব করতে থাকলেন। এই শ্লোকে অপ্সরারাই দেবকন্যার বিশেষণ—

অপ্সরোভিঃ পরিবৃতো দেবকন্যা-সমাবৃতঃ।
নহুষঃ দেবরাজঃ সন্ ক্রীড়ন্ বহুবিধং তদা॥

[অথর্ববেদ (Roth & Whitney), ৪.৩৮.৪;
মহা (k) ২.৭.২১; ৯.৪৪.১৯; ১৩.১০৭.২১;
১২.২৮১.৪৩-৪৭; ৫.১১.১০;
(হরি) ২.৭.২৫; ৯.৫১.১৯; ১৩.৯৪.২১;
১২.২৭৪.৮৭-৮৯; ৫.১১.১২]

আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল—মহাভারতে প্রায় সব সময়েই অপ্সরাদের আমরা গন্ধর্বদের সহচারিণী হিসেবে দেখতে পাই, অথচ তাঁরা গন্ধর্বদের স্ত্রী কিংবা গন্ধর্বদের অবৈধ রমণী হিসেবেই বেদে-ব্রাহ্মণে পরিচিত। মহাভারতে অপ্সরারা যতবার উল্লিখিত হয়েছেন, সেখানে তাঁরা বহুলাংশেই আছেন একটি গণ হিসেবে এবং তা সব সময়েই প্রায় গন্ধর্বদের সঙ্গে একত্র-হয়তো সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার জন্য গন্ধর্বরা এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার জন্য অপ্সরারা একত্রে গীত-নৃত্যের সমাহারে সগণে একত্রে উল্লিখিত হয়েছেন মহাকাব্য-পুরাণে—

* জেগীয়ন্তে স্ম গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
* জগুশ্চ দেবগন্ধর্বা ননৃশ্চাপ্সরোগণাঃ।

কিন্তু তাই বলে অপ্সরারা শুধু নৃত্যই করতেন তাঁরা গান করতেন না, তা নয়। নৃত্য, গীত এবং অবশ্যই বাজনা বাজানোটাও তাঁদের আপন কলা কীর্তির মধ্যে পড়ে—মহাভারত-পুরাণের প্রায় সর্বত্রই নৃত্যের প্রসঙ্গে অপ্সরাদের নাম এসেছে প্রধানত, কিন্তু এমনও দেখা যাচ্ছে গন্ধর্বরা বাজনা বাজাচ্ছেন আর গান করছেন অপ্সরারা, অথবা অপ্সরারা গানও করছেন, বাজনাও বাজাচ্ছেন—

* অবাদয়ন্ত গন্ধর্বা বাদিত্রং সুমনোহরম্।
জগুশ্চাপ্সরসো রাজ্ঞো যশঃ সম্বদ্ধমেব চ॥
* অপ্সরোগীতবাদিত্রৈ র্নাদিতঞ্চ মনোরমম্।
* গণাশ্চাপ্সরসাং তত্র গন্ধর্বাণাং তথৈব চ।
পুরস্তাদ্দেবদেবস্য জগুর্গীতানি সর্বশঃ॥

[মহা (k) ১২.৩২৪.১৪; ৯.৪৬.৫৯; ৯.৬১.৫৫;
৮.৬৯.৪৪. ৩.১৬৮.১০; (হরি) ১২.৩১৪.৪৩;
৯.৪২.৬৬; ৯.৫৭.৬১; ৮.৫১.৪২; ৩.১৪১.১০]

গন্ধর্বদের মধুর গানের উল্লেখ মহাকাব্যে বারবার হচ্ছে বটে, কিন্তু নৃত্য ছাড়াও গানের ক্ষেত্রেও যে অপ্সরাদের বিশেষজ্ঞতা আরও সূক্ষ্ম মাত্রায় পৌঁছেছিল, সেটা রামায়ণ-মহাকাব্যে তাঁদের গানের বিশ্লেষণ শুনে বোঝা যায়। সীতার খোঁজে লঙ্কায় প্রবেশ করে হনুমান একটি ভবনে অপ্সরাদের গানের মতো একটা গান শুনতে পেয়েছিলেন। সেই গানের বিশেষত্ব হল, সেটা ছিল 'ত্রিস্থান-স্বর-ভূষিতম্'। টীকাকারেরা বলেছেন—বুক (উরম্) কণ্ঠ এবং শিরোভেদে মন্দ্র-মধ্য এবং তার স্বর হল গীতরচনার তিনটি স্থান—

শুশ্রাব রুচিরং গীতং ত্রিস্থান-স্বর-ভূষিতম্

তিলকটীকার ভাষায়—

ত্রিস্থান স্বর ভূষিতম্ উরঃ কণ্ঠ শিরোরূপ
স্থানত্রয়জৈর্মন্দ্র-মধ্য-তার স্বরৈর্ভূষিতম্।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আমরা অপ্সরাদের গীত গাইতে দেখছি, বাদ্যও বাজাতে দেখছি, এখানে গন্ধর্বগণ অনুপস্থিত—

উপাস্তে'প্সরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্।
গায়ন্তি কাশ্চিদ্রম্যাণি বাদয়ন্তি তথাপরাঃ॥
মৃদঙ্গ-বীণা-পণবান্ নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ।

[রামায়ণ ৫.৪.১০; (মুধোলকর) ৭.৭৭.১২-১৩;
(তর্করত্ন) ৭.৯০.১২-১৩]

নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিশেষত্বটা যেহেতু মনোরঞ্জনের অঙ্গ, অতএব স্বর্গ-মর্ত্যের যে কোনো বিশেষ উৎসব-পরিস্থিতিতে অপ্সরাদের উপস্থিত দেখতে পাওয়া যায় মহাকাব্য পুরাণে। মহাভারতের সভাপর্বে নারদ যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের ইত্যাদি দেবতাদের সভার বর্ণনা দেন। এই সব দেব সভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—এঁদের প্রত্যেকটি সভায় অপ্সরারা মনোরঞ্জনের ভূমিকায় আছেন।

[মহা (k) ২.৭.২৪-২৫; ২.৮.৩৮; ২.৯.২৬-২৭;
২.১০.১৪; ২.১১.২৮; (হরি) ২.৭.২৪-২৫;
২.৮.৩৮; ২.৯.২৬-২৭; ২.১০.১৪; ২.১১.২৭]

লক্ষণীয়, এই স্বর্গীয় অপ্সরারাই মর্ত্যজনের মঙ্গল অনুষ্ঠানে, উৎসবে এবং প্রয়োজনে নেমে আসছেন ভূতলে। পাণ্ডব অর্জুনের জন্মকালে স্বর্গের প্রধানতমা অপ্সরারা নৃত্য করেছিলেন, ব্যাসের পুত্র শুকের জন্মকালেও নেচেছিলেন তাঁরা। দেবব্রত ভীষ্মের ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞায় অপ্সরারা আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন। রামায়ণে রামচন্দ্রের বিবাহের সময় যেমন অপ্সরাদের গন্ধর্ব-সনাথ নৃত্য দেখা গেছে, তেমনই পরশুরামের তেজোহরণের সময়েও দেবতা-গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদেরও 'অন্তরীক্ষ'লোকে উপস্থিত হতে দেখেছি। আর একটা বৈশিষ্ট্য হল

পরলোকে অপ্সরাদের অবস্থান। এমনিতেই বলা হয় যে, মানুষ যদি ভাল কাজ করে, তবে সেই সাধুকর্মের ফলে পুণ্যবান মানুষ স্বর্গে অপ্সরাদের সঙ্গ লাভ করে। আর মহাভারতে দেখা যাচ্ছে—যদি মহাবীর যোদ্ধারা যুদ্ধ করতে করতে মারা যান, তবে তাঁদের জন্য স্নান-অশৌচ ইত্যাদি কোনো প্রেতকার্যের প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ স্বর্গের অপ্সরারা তাঁদের বরণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন, স্বর্গে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দৌড়ে যান তাঁদের কাছে এবং এক-একজনকে দেখা মাত্রই বলেন—তুমি আমার স্বামী হবে—

বরাপ্সরা সহস্রাণি শূরমাযোধনে হতম্।
ত্বরমানাভিধাবন্তি মম ভর্তা ভবেদিতি॥

মহাভারতের কালে এই বিশ্বাসটা কতখানি ছিল যে, মৃত্যুপথযাত্রী ভগ্নোরু দুর্যোধন সদম্ভে বলেছেন—আমি যুদ্ধশেষে মৃত্যুর পর যখন স্বর্গলোকে যাবো, তখন আমার পূর্বজ পিতৃপুরুষেরা দেখবেন—দেবতারা আমাকে অভিবাদন করছেন, সুরসুন্দরী অপ্সরারা তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে, তারা সানন্দে ঘিরে ধরবে আমাকে—

অপ্সরোভিঃ পরিবৃতান্ মোদমানাংস্ত্রিবিষ্টপে।

মহাভারতের কর্ণপর্বে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্ন-বধের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার পর যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, সেই যুদ্ধ দেখতে এসে অন্তরীক্ষ থেকে অপ্সরারা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন যোদ্ধাদের ওপর—

রণে স্বকর্মোদ্বহতঃ প্রবীরান্/
অবাকিরন্নপ্সরসঃ প্রহৃষ্টাঃ॥

একই রকম দেখা গেছে রামায়ণে। বীরপ্রিয়া অপ্সরারা রাবণপুত্র মহাবীর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর নৃত্য করেছিলেন, যদিও রামায়ণে অপ্সরাদের নৃত্য সনাতনপন্থী ভাবনায় চিহ্নিত, অর্থাৎ কিনা ইন্দ্রজিতের মতো লোক-ভয়ঙ্কর মানুষটি গতায়ু হওয়ায় যেন স্বর্গে-মর্ত্যে শান্তি ফিরে এসেছে, তাই অপ্সরাদের নৃত্য। হয়তো সেই ভাবনাতে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখার জন্য অন্তরীক্ষে দেবতাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও।

[রামায়ণ ১.৭৩.৩৮; ১.৭৬.১০; ৪.২৪.৩৪; ৬.৯১.৭৬, ৮৬; ৬.১০৯.২৩; ৭.৮২.৩৯; মহা (k) ১২.৩২৪.১৪; ১.১০০.৯৮; ১.১২৩.৬০-৬৬; ১২.৯৮.৪৬; ৯.৫.৩৬; ৮.৫৭.১৪; (হরি) ১২.৩১৪.১৯; ১.৯৪.৯৮; ১.১১৭.৬৪-৬৯; ১২.৯৫.৭৩; ৯.৪.৩৬]

সমুদ্রমন্থনে যে-সব শ্রেষ্ঠ এবং মহার্ঘ্য বস্তু এবং প্রাণীরা উঠে এসেছিল, তাদের মধ্যে অপ্সরারা ছিলেন অন্যতম। অপ্ বা জল থেকে জলের সারভূত জীবনসার বা রস থেকে তাঁদের উৎপত্তি বলেই তাঁদের নাম অপ্সরা বলে জানিয়েছে রামায়ণ—

অপ্সু নির্মথনাদেব রসাত্তস্মাদ্ বরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসো'ভবন্॥

মহাভারতে অবশ্য প্রজাপতি কশ্যপ মুনির ঔরসে দক্ষকন্যা প্রাধার গর্ভে অপ্সরারা জন্মেছিলেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যদিও তাঁদের নাম গণনা করলে তেরো জনের বেশি হয় না। বলা হয়েছে—কশ্যপের ঔরসে প্রাধার গর্ভে জাত অপ্সরারা হলেন—অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা এবং সুপ্রিয়া—

প্রাধাসূত মহাভাগা দেবী দেবর্ষিতঃ পুরা।

এই ঘোষণার পরেই মহাভারত চিরকালীন পুরাণের উল্লেখ করে বলেছে—অমৃত, ব্রাহ্মণ, গন্ধর্বরা গাভীগণ এবং অপ্সরারা অনেকেই দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে পুরাণে বলা হয়েছে—

অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা।
অপত্যং কপিলায়াস্তু পুরাণে পরিকীর্তিতম্॥

একটি অধ্যায়ের একই জায়গায় আগে-পরে একবার অপ্সরাদের প্রাধার সন্তান বলা হয়েছে, আর একবার বলা হল, তাঁরা কপিলার সন্তান। আরও সমস্যা হয়—মহাভারত যখন বলে যে, পুরাণে পরিকীর্তিতম্। লক্ষণীয় বিষয় হল—উপস্থিত প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ এবং বায়ু পুরাণ সবকটিতেই অপ্সরারা কশ্যপের অপরা স্ত্রী দক্ষতনয়া মুনির গর্ভজাত—

* মুনিরপ্সরসস্তথা।
* মুনি মুনীনাং তু গণং গণমপ্সরসাং তথা।

বায়ু পুরাণেও সাধারণভাবে অপ্সরাদের কশ্যপের ঔরসে মুনির গর্ভজাত মৌনেয় অপ্সরা বলা হয়েছে বটে, তবে কশ্যপের অন্যা স্ত্রীর গর্ভজাত এবং গন্ধর্বপত্নী হিসেবেও আরও কতগুলি অপ্সরার নাম করা হয়েছে। কিন্তু

সাধারণভাবে তাঁরা সকলেই মুনির গর্ভজাতা—

গন্ধর্বাপ্সরসঃ পুণ্যা মৌনেয়া পরিকীর্তিতাঃ।

[রামায়ণ, ১.৪৫.৩৩; মহা (k) ১.৬৫.৪৮–৫২;
(হরি) ১.৬০.৪৯-৫৩; ভাগবত পু. ৮.৮.৭;
বিষ্ণু পু. ১.২১.২৪; মৎস্য পু. ৬.৪৫;
বায়ু পু. ৬৯.১]

মহাভারতে অপ্সরাদের জননী হিসেবে প্রাধা, কপিলা এবং প্রাচীন পুরাণগুলিতে মুনি—এই জননী-বিকল্পগুলির সুষ্ঠু একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মহাভারতের পরিশিষ্ট-পর্ব খিল হরিবংশে এবং বায়ু পুরাণে অপ্সরাদের কতগুলি বিশেষ নাম খেয়াল করার মতো। বায়ু পুরাণ বলছে—মুনির গর্ভে যেসব, যৌবনবতী সুন্দরী অপ্সরারা জন্মালেন তাঁরা হলেন 'লৌকিকী অপ্সরা'—লৌকিক্যপ্সরসস্তথা। এই অপ্সরারা হলেন—অন্তরা, দ্বারবত্যা, প্রিয়মুখ্যা, সুরোত্তমা, মিশ্রকেশী, আশী, পর্ণিনী, অলম্বুষা, মারীচী, পুত্রিকা, বিদ্যুদ্‌বর্ণা, তিলোত্তমা, অদ্রিকা, লক্ষণা, দেবী, রম্যা, মনোরমা, সুবরা, সুবাহু, পূর্ণিতা, সুপ্রতিষ্ঠিতা, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুদন্তা, সুরসা, হেমা, শারদ্বতী, সুবৃত্তা, কমলা, সুভুজা এবং হংসপাদা। এঁরাই মুনির গর্ভজাত লৌকিকী অপ্সরা—

গন্ধর্বাপ্সরসো হ্যেতা মৌনেয়া পরিকীর্তিতাঃ।

বিষ্ণু পুরাণেও কিন্তু অনেক অপ্সরারাই মুনির কন্যা—মুনিরপ্সরসস্তথা।

বায়ু পুরাণে আর এক ভাগে আট জন অপ্সরা আছেন, তাঁরা কশ্যপের ঔরসে অরিষ্টার সন্তান, তাঁরা আসলে আটজন গন্ধর্বদের পত্নী। তাঁদের নাম হল—অনবদ্যা, অনবশা, অম্বতা, মদনপ্রিয়া, অরূপা, সুভগা এবং ভাসী। এঁদের জন্ম দিয়েছিলেন অরিষ্টা। ঠিক এর পরেই বায়ুপুরাণ দশজন দিব্য কিংবা দৈবিকী অপ্সরাদের একটা তালিকা দিয়েছে সম্ভবত পূর্বোক্ত লৌকিকী অপ্সরার বিপ্রতীপে—

পঞ্চচূড়াস্ত্বিমা দিব্যা দৈবিক্যপ্সরসো দশ।

এই দশ জন দৈবিকী অপ্সরার চুলগুলি পাঁচভাগে চূড়া করে বাঁধা হয়, হয়তো বা সেটাই দৈবিকী অপ্সরাদের একটা বৈশিষ্ট্য। এই দৈবিকী অপ্সরাদের নাম হল—মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্বচী (পূর্বচিত্তি), প্রম্লোচা, অনুম্লোচন্তী।

লক্ষণীয় বিষয় হল—বায়ু পুরাণের এই দশ অপ্সরা হরিবংশে 'দৈবিকী'-র বদলে 'বৈদিকী অপ্সরা বলে চিহ্নিত হয়েছেন। কিন্তু হরিবংশের সংখ্যায় পূর্বচী বা পূর্বচিত্তির জায়গায় উর্বশী অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, আর মনোবতী নামে এক অপ্সরা দশ-সংখ্যায় বাইরে একাদশ স্থানে থেকেও বৈদিকী অপ্সরা নামে গণ্য হয়েছেন—

অনুম্লোচেত্যভিখ্যাতা প্রম্লোচেতি চ তা দশ।
মনোবতী চাপি তথা বৈদিক্যপ্সরসস্তথা॥

অন্যদিকে বায়ু পুরাণে যে অপ্সরাদের মুনির কন্যা মৌনেয় অপ্সরা বলা হয়েছে, হরিবংশীয় মৌনের অপ্সরাদের মধ্যে তাঁদের সবার নাম নেই। হরিবংশে তাঁদের নাম—অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, তিলোত্তমা, সুরূপা, লক্ষ্মণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুবৃত্তা, সুমুখী, সুপ্রিয়া, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাশ্যা (কাম্যা) এবং শারদ্বতী।

আর বায়ু পুরাণে যাঁরা অরিষ্টার সন্তান, সেই আট জন অপ্সরা হরিবংশে প্রাধার সন্তান, যদিও নামের পার্থক্যে তাঁদের কয়েকজন অন্য রকম। প্রাধার গর্ভজাত আট জন অপ্সরা হরিবংশে হলেন—অনবদ্যা, অনূকা, অনূনা, অরুণপ্রিয়া, অনুগা, সুভগা এবং ভাসী। অর্থাৎ আট জনের কথা বলে নাম করা হল সাত জনের—সুষুবে'ষ্টৌ মহাভাগা প্রাধা দেবর্ষি পূজিতা। সবচেয়ে বড়ো কথা—অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে হরিবংশে 'বৈদিকী' অপ্সরাদের তালিকায় রাখা হলেও বায়ু পুরাণে তাঁকে সমস্ত অপ্সরাকুল থেকে পৃথক রেখে বলা হয়েছে—অনাদিনিধন নারায়ণের উরু থেকে আবির্ভাব ঘটেছিল সর্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরা উর্বশীর। তাঁর স্থান দৈবিকী অপ্সরাদের দশ নামের পরে একাদশ স্থানে—

অনাদিনিধনস্যাথ জজ্ঞে নারায়ণস্য যা।
উরোঃ সর্বানবদ্যাঙ্গী উর্বশ্যেকাদশী স্মৃতা॥

হরিবংশে দশ বৈদিকী অপ্সরার নাম করার পর 'মনোবতী' বলতে উর্বশীকে বোঝানো হচ্ছে কিনা, সেটা গবেষণার বিষয় নয়, কেননা উর্বশী হরিবংশের তালিকায় বৈদিকী অপ্সরাদের দশ নামের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আরও একটা কথা এখানে বলতেই হবে। সেটা হল—অপ্সরাদের বিভিন্ন বর্গ এবং তাঁদের জননীদের কথা উল্লেখ করার পরেই হরিবংশ

বলেছে—প্রজাপতি ব্রহ্মার সংকল্প থেকেই এই সব ভুবনপ্রিয়া অপ্সরাদের জন্ম, ঠিক যেমন অমৃত, ব্রাহ্মণ, গোরু এবং রুদ্রেরাও জন্মেছিলেন প্রজাপতির সংকল্প থেকে—

প্রজাপতেস্তু সংকল্পাৎ সম্ভূতা ভুবনপ্রিয়াঃ।
অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো রুদ্রাশ্চেতি চতুষ্টয়ম্॥

সমস্ত অপ্সরাদের অধিপতি হিসেবে স্থির করা হল কামদেবকে; হয়তো অপ্সরারা কামনার আধার বলেই তাঁদের সমস্ত ক্রিয়া-ব্যবহারই কামদেবের অধীন—

সর্বাপ্সরোগণানাঞ্চ কামদেবঃ প্রভুঃ কৃতঃ।

[বিষ্ণু পু. ১.২১.২৪; বায়ু পু. ৬৯.৪৮,৪৯,৫১; হরিবংশ পু. ৩.৩৬.৪৪-৫০; ৩.৩৭.১২]

ইতিহাস-পুরাণে অপ্সরা-সুন্দরীদের নামের যত তালিকা আছে, সেগুলির মধ্যে সব অপ্সরাদের নাম এমরকম নয়। উর্বশী মেনকা কিংবা রম্ভার মতো বিখ্যাত অপ্সরাদের নাম হয়তো সব তালিকায় একই রকম; কিন্তু ধরুন, ধনপতি কুবেরের সভার সৌরভেয়ী অথবা বিশ্বাচী, বর্গা অথবা বুদবুদ—এঁদের কিন্তু অর্জুন তাঁর পিতৃদেবের ইন্দ্রসভায় দেখতে পাননি। আবার অর্জুন যে দণ্ডগৌরী আর বরুথিনীকে ইন্দ্রসভায় দেখেছিলেন অথবা গোপালী অথবা কুম্ভযোনিকে যেমনভাবে নাচতে দেখেছিলেন—তাঁদের কিন্তু কুবেরের সভায় দেখা যাবে না।

বোঝা যাচ্ছে, অপ্সরাদের মধ্যেও প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারির ব্যাপার আছে। আমাদের মতো করে না বললেও বায়ু-পুরাণ আমাদের কল্পিত প্রথম সারির অপ্সরাদের বলেছেন 'দৈবিকী অপ্সরা' আর দ্বিতীয় সারিকে ফেলেছেন 'লৌকিকী অপ্সরাদের' মধ্যে। দৈবিকী অপ্সরারা সংখ্যায় দশ জন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন মেনকা ঘৃতাচী এবং পুঞ্জিকস্থলা। বিশ্বাচী কিংবা ঘৃতস্থলাও এই দশ জনের একজন বটে তবে মেনকা বা ঘৃতাচীর মতো তাঁদের গুরুত্ব নেই। অন্যদিকে রম্ভার মতো নাম করা অপ্সরা লৌকিকীর মধ্যে পড়ে গেলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় সারির মধ্যে—

যবীয়স্যস্তেযামপ্সরসঃ—রম্ভার নাম লৌকিকী অপ্সরার তালিকায় থাকলেও কর্মগুণে তিনি কিন্তু প্রথম সারির মতোই বিখ্যাত। বায়ুপুরাণে বর্ণনায় অনেকের মধ্যে অনেক নাম থাকলেও উর্বশী, মেনকা এবং তিলোত্তমার নাম সসম্মানে আলাদা করে উল্লিখিত, কারণ রূপ-যৌবন ছাড়াও এঁদের পরিচয় মহাযোগিনী এবং ব্রহ্মবাদিনী বলে—

সর্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যো মহাযোগাশ্চ তাঃ স্মৃতাঃ।

এই প্রসঙ্গে অপ্সরা বেদবতী কিংবা যমনন্দিনী হেমার কথাও এসেছে। রূপ-যৌবনের চেয়েও এঁদের বড় পরিচয় সতীত্বে এবং ধর্মশীলতায়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড থেকে জানা যায়, অপ্সরা হেমা ময়দানবের পত্নী ছিলেন। ময়দানবের ঔরসে হেমার গর্ভে রাবণের মহিষী মন্দোদরীর জন্ম হয়। *[রামায়ণ ৭.১২.৬, ১৮]*

বর্গা, বুদবুদা অথবা সৌরভেয়ীর মতো অপ্সরারা দেবকার্য সাধনের বড়ো উপযোগী ছিলেন না। লক্ষণীয়, উর্বশী, মেনকা কিংবা তিলোত্তমাকে আমরা কখনই নিজে থেকে কোনো মুনি-ঋষি-রাজার মন ভোলাতে দেখিনি। দেবতারা, দেবরাজ ইন্দ্রই তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধি ব্যাহত হবার ভয়ে অপ্সরাদের পাঠিয়ে দিতেন সিদ্ধিকামী মুনি-ঋষিদের ধ্যান ভাঙাতে। কিন্তু অপ্সরাদের অনেকের মধ্যেই যেহেতু গণিকাবৃত্তির সেই 'সাধারণী' প্রেরণাটুকু ছিল, তাই অনেকের মধ্যে নিজস্ব কামপ্রবণতাও যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

মহাভারতে দেখছি—পাঁচ-পাঁচটি তীর্থস্থান, যেখানে আগে মুনি-ঋষিরা সদা-সর্বদা ভিড় জমাতেন, সেই তীর্থগুলি এখন একেবারেই নির্জন। অর্জুন ব্রহ্মচারী হয়ে তীর্থ করতে এসে শুনলেন—ওই পাঁচটি তীর্থের জলেই একটি করে ভয়ঙ্কর জলজন্তু বাস করে এবং তারা মুনি-ঋষিদের ধরে নিয়ে যায়। তাই ভয়ে এখন আর কেউ সৌভদ্রতীর্থ কি অগস্ত্যতীর্থের জলে নামে না। সব শুনে অর্জুন সৌভদ্র-তীর্থেই নামলেন। জলে ডুবে-ডুবে বেশ স্নান করছেন, এমন সময় একটি হিংস্র জলজন্তু তাঁর পা কামড়ে ধরল। অর্জুন আপন শক্তিতে সেই কামড়ে-থাকা জীবটিকে নিয়েই জলের ওপরে উঠে এলেন। জন্তুটি তখনও লাফাচ্ছিল, কিন্তু পারে উঠেই সে এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী হয়ে গেল। তাঁর সারা গায়ে গয়না আর তাঁকে দেখতেও তেমনি সুন্দর।

অর্জুন তো একবারে অবাক। তিনি বললেন—কে তুমি, কল্যাণী! এই জলের ভিতরেই বা তুমি কী করছিলে এতদিন? রমণী

বলল—আমি অপ্সরা বর্গা, ধনপতি কুবেরের প্রিয়তমা নর্তকী আমি। আমি আমার চার অপ্সরা বন্ধুর সঙ্গে ইন্দ্রপুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরবার সময় দেখতে পাই—একজন নিষ্ঠাবান, অথচ রূপবান ব্রাহ্মণ আপন ব্রহ্মতেজে বন আলো করে বেদপাঠ করছেন এবং তিনি একা—

রূপবন্তম্ অধীয়ানম্ একমেকান্তচারিণম্।

তাঁর ওই সূর্যের মতো তেজ আর মোহন রূপ দেখে আমরা পাঁচ অপ্সরা অর্থাৎ আমি, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্‌বুদা আর লতা এই পাঁচজনে ওপর থেকে নেমে এলাম নীচে সেই তপস্বীর আশ্রমে। উদ্দেশ্য একটাই—তাঁর মন ভোলাব। আমাদের রূপ দেখিয়ে তাঁর তপস্যা দেব ভুলিয়ে।

বর্গা বর্ণনা দিতে আরম্ভ করল। বলল—আমরা খিলখিল করে হাসছিলাম। গান জানি, তাই গানও করছিলাম। শরীরের লোভও দেখাচ্ছিলাম—

গায়ন্ত্যো'থ হসন্ত্যশ্চ লোভয়ন্ত্যশ্চ তং দ্বিজম্।

কিন্তু কিছুই হল না অর্জুন। এত গান, এত হাসি সব বৃথা গেল। মুনির মন টলল না—নাকম্পত মহাতেজাঃ। মাঝখান থেকে আমরা অভিশাপ পেলাম—কুমির হয়ে থাকব এই পঞ্চতীর্থের জলে। শাপ শুনে আমরা অনেক অনুনয় করে বললাম—সত্যিই এ দোষ আমাদের। আমরা আমাদের রূপ, কাঁচা বয়েস আর প্রবৃত্তির তাড়নায় এ কাজ করেছি। আপনি ক্ষমা করুন।

তপস্বীর দয়ায় এবং মহর্ষি নারদের করুণায় এই পাঁচ অপ্সরা শেষ পর্যন্ত অর্জুনের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়িই আবার স্বরূপে ফিরে এসেছিলেন বটে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রূপ আর কাঁচা বয়েস অপ্সরারা নিজেদের তাড়নায় ব্যবহার করতেন না। প্রথমে অলম্বুষার কথাটাই ধরুন। তিনি 'লৌকিকী' অপ্সরা। তাঁর প্রধান এবং অন্যতম বলি হলেন মহাপ্রাণ দধীচি মুনি। অবশ্য 'বলি' কথাটা এখানে ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, অলম্বুষার বড়ো কোনো দোষ ছিল না এখানে। দধীচি উগ্রতপা মহর্ষি। তাঁর তপস্যার তেজ এমনই যে দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁকে ভয় পান। ভয় পান—তার কারণও আছে। দেবরাজ স্বর্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর সব সময় ভয় হয় যে, কেউ যদি উগ্র তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একতমকে তুষ্ট করে স্বর্গরাজ্যের রাজত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রত্ব চেয়ে বসেন, তবে তাঁকে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে।

এটা পরিষ্কার—স্বর্গসুখ এমনকি ইন্দ্রত্বও কোনো অপ্রাপ্য বস্তু নয় জ্ঞান-তপস্বীর কাছে, যতখানি ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শন। কিন্তু ইন্দ্র, যিনি আপন ইন্দ্রত্ব নিয়েই বিভোর, তিনি তাঁর মতো করেই ভাবেন যে, তপস্যা করছে মানেই সে ইন্দ্রত্ব চায়। ইন্দ্র দ্বিতীয় কোনো চিন্তা না করে স্বর্গসুন্দরী অলম্বুষাকে পাঠালেন দধীচির কাছে—

দিব্যামপ্সরসাং পুণ্যাং দর্শনীয়াম্ অলম্বুষাম্।

দধীচি তখন সরস্বতী নদীর মধ্যে অর্ধমগ্ন হয়ে দেবতা এবং পিতৃগণের তর্পণ করছিলেন; ঠিক সেই অবস্থায় অলম্বুষা এসে নানারকম অঙ্গভঙ্গি দেখাতে আরম্ভ করল। আর যায় কোথায়! সরল মুনি দধীচির ধৈর্য্য থাকল না। তিনি রমণে প্রবৃত্ত হলেন না বটে, তবে তাঁর জীবকারিণী শক্তি নির্গত হল সরস্বতীর জলে—

রেতঃ স্কন্নং সরস্বত্যাম্।

অলম্বুষা এবং দধীচির কাহিনী আমি এই জন্য উল্লেখ করলাম যে, এই ধরনের ঘটনা নিশ্চেষ্ট দৃষ্টিরমণে কামতৃপ্তিমাত্র। দধীচি রেগে উঠে শাপ দেননি কোনো। বরঞ্চ সরস্বতীর গর্ভে তাঁর যে সন্তান হয়েছিল, তিনি পরবর্তী সময়ে অনন্যসাধারণ সারস্বত মুনি হিসেবে পরিচিত হন।

[বায়ু পু. ৬৯.৫২-৫৩, ৬০-৬২; মহা (k) ১.২১৬.৪-২৩; ১.২১৭.১-২২; ৯.৫১.৫-১৭; (হরি) ১.২০৯.৪-২৩; ১.২১০.১-২২; ৯.৪৭.৫-১৭]

সমাধিসম্পন্ন যোগী মহাপুরুষ এবং ঋষি-মুনিদের তপোভঙ্গ করার জন্য উর্বশী-মেনকা কিংবা ঘৃতাচী-মিশ্রকেশী অথবা রম্ভা-তিলোত্তমাদের মতো অপ্সরা-সুন্দরীদের পাঠানোর বিবরণ বহু বহু আছে। কিন্তু একজন মুনির ধ্যানভঙ্গ করার জন্য পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ অপ্সরাকে পাঠানোর একটি ঘটনা রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পাওয়া যায়। বনবাসকালে রামচন্দ্র বনের পথে যেতে যেতে হঠাৎই একটি মনোরম সরোবরের মধ্য থেকে অপূর্ব গীতবাদ্যের ধ্বনি শুনতে পান। রামচন্দ্র তাঁর পার্শ্বচর ধর্মভৃৎ নামক মুনির কাছ থেকে জানতে পারেন যে, ওই বিশেষ

সরোবরটি মুনি মাণ্ডকর্ণি তপস্যাবলে তৈরি করেছেন এবং সেই সদানীর সরোবরটির নাম হল পঞ্চাপ্সর।

ঘটনা হল—মুনি মাণ্ডকর্ণি এক জলাশয়ের মধ্যে শুধু বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে বহু বৎসর ধরে উগ্র তপস্যা করতে থাকেন সমাধি-ভীরু দেবতা মাণ্ডকর্ণি মুনির এই তপঃকৃচ্ছতা দেখে দেবপদবী হারানোর ভয় পেলেন। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁরা সুন্দরীতমা পাঁচটি অপ্সরাকে পাঠালেন মাণ্ডকর্ণির তপোবিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য। তাঁরা দেবকার্য সিদ্ধ করার জন্য মহর্ষি মাণ্ডকর্ণিকে কামপীড়িত করে তুললেন। মহর্ষি জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ হলেও কামবশে পাঁচ জন অপ্সরাকেই বিয়ে করলেন। পাঁচ অপ্সরা তাঁর স্ত্রী হলেন—

নীতো মদনবশ্যাত্বং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
তাশ্চৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ মুনেঃ পত্নীত্বমাগতাঃ॥

সরোবরের মধ্যে পাঁচ অপ্সরা-পত্নীর জন্য তিনি গৃহ নির্মাণ করালেন। মুনিও যোগবলে যুবক বয়সী হয়ে তাঁদের মনোরঞ্জন করতে আরম্ভ করলেন এবং অপ্সরারাও নৃত্যগীতবাদ্যে মুখরিত করে তুললেন মাণ্ডকর্ণি মুনির গার্হস্থ্য জীবন। সেই থেকে এই সরোবরের নাম ‘পঞ্চাপ্সর’ এবং সরোবরের বাইরে থেকে পাঁচ অপ্সরার ভূষণ-শিঞ্জন শোনা যায় নৃত্য-গীত-বাদ্যের সমান তালে—

তাসাং সংক্রীড়মানানামেষ বাদিত্রনিস্বনঃ।
শ্রূয়তে ভূষণোন্মিশ্রো গীতশব্দো মনোহরঃ॥

মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশে এই পঞ্চাপ্সর-সরোবরের উল্লেখ করেছেন। রঘুবংশের এই কাহিনী সঙ্গে মহাভারতে অর্জুনের দেখা পঞ্চাপ্সর তীর্থের কাহিনীর সাদৃশ্য আছে।

[রামায়ণ, ৩.১১.৫-১৯]

অপ্সরারা যেহেতু রত্নাকর সমুদ্র থেকে ওঠা রত্নস্বরূপ, তাই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব কিংবা ঐরাবত হস্তীর মতো তাঁদেরও একটা মঙ্গল-স্বরূপতা আছে। অন্য মাত্রায় তাঁরা প্রজাপতি কশ্যপ এবং দক্ষকন্যাদের সন্তান, ফলে সেখানেও তাঁদের মর্যাদা কম নয়। এই অভিজাত জন্মের সঙ্গে তাঁদের অসামান্য রূপ এবং যৌবন-লাবণ্য যুক্ত হওয়ায় অপ্সরারা অনেক সময়েই মঙ্গলমূর্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। এই কারণেই অযোধ্যায় রামচন্দ্রের অভিষেকের সময় অপ্সরাদের যেমন নৃত্য করতে দেখা যায়, তেমনই মর্ত্যলীলা সংবরণের জন্য রামচন্দ্র যখন সরযূ নদীতে আত্মবিসর্জন দিতে গেছেন, তখনও তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। রামচন্দ্র পরমধাম বিষ্ণুশরীরে মিলিয়ে গেলে অপ্সরারা তখনও তাঁর গুণগান করেছিলেন। রামাবতারের সময় যেমনটা দেখা গেল, একই ভাবে কৃষ্ণের অবতার-কালে এবং লীলা-সংবরণের সময়েও আমরা দেবতাদের সঙ্গে অপ্সরাদেরও একত্রিত হতে দেখেছি।

[রামায়ণ, ৬.১৩০.৭১; ৭.১২৩.৭, ১৪-১৫;
ভাগবত পু. ১০.৩.৬; ১০.৪.১১; ১১.৩১.২]

কৃষ্ণের ষোলো হাজার অবান্তর মহিষীরাও কৃষ্ণাবতারের পূর্বকালে অপ্সরা ছিলেন বলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে। স্বর্গে অপ্সরাদের যে চোদ্দটি গণ ছিল তাঁদের সম্বন্ধে দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলেন যে, কৃষ্ণের অবতারকালে তাঁদের সবাইকে মর্ত্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কৃষ্ণের অবান্তরা স্ত্রী হবার জন্য—

চতুর্দশ তু যে প্রোক্তা গণাস্ত্বপ্সরসাং দিবি॥
বিচার্য্য দেবৈঃ শক্রেণ বিশিষ্টাস্ত্বিহ প্রেষিতাঃ।
পত্ন্যর্থে বাসুদেবস্য উৎপন্না রাজবেশ্মসু॥
এতা পত্ন্যো মহাভাগা বিষ্বক্‌সেনস্য বিশ্রুতাঃ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি), ২.৭১.২৪৩-২৪৫;
ভাগবত পু. ১০.১.২৩]

পুরাকালে মানস সরোবরে ক্রীড়া করার সময় ষোলো হাজার অপ্সরা নারদকে দেখে তাঁকে প্রণাম না করেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন কীভাবে ভগবান নারায়ণ তাঁদের স্বামী হবেন। তাতে নারদ তাঁদের একটি বিশেষ ব্রতের মাধ্যমে অভীষ্টলাভের বর দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রণাম না করার জন্য অভিশাপও দিয়ে বলেছিলেন যে, নারায়ণ-স্বরূপ কৃষ্ণের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটবে এবং দস্যুবৃত্তি চোরেরা তোমাদের হরণ করে ভোগ করবে। অবশেষে তাঁরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হবেন। এই কাহিনীতে অপ্সরা-স্বভাবের সঙ্গে বেশ্যা-স্বভাবের একাত্মতা লক্ষণীয়।

[মৎস্য পু. ৭০.২-২৫]

মহাকাব্য-পুরাণে অপ্সরাদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল—তাঁদের সর্বাঙ্গীন শারীরিক

আকর্ষণ। রামায়ণে কৌশাম্বীর রাজা কুশনাভ অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে একশ অপ্সরার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁরা যৌবন লাভ করার পর একটি উদ্যানের মধ্যে নাচ-গান-বাজনা করছিলেন—

গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।

তাঁদের সর্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ দেখে বায়ু-দেবতা মুগ্ধ হয়ে তাঁদের বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। সে বিবাহ হয়নি এবং বায়ুর অভিশাপে তাঁরা বিকৃতাঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। যদিও কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে বিবাহের পর ঘৃতাচী-গর্ভজাত সেইসব অপ্সরাদের বিকৃত অঙ্গ সর্বাঙ্গীন চারুতায় পরিণত হয়েছিল।

রামায়ণে অপ্সরাদের এমন একটা বিবাহ-ঘটনা দেখলাম বটে, কিন্তু মহাকাব্যিক নানা অভিসন্ধিতেই এ-কথা পরিষ্কার বোঝা যায়—অপ্সরারা বিবাহ করার জন্য অথবা স্থায়ী কোনো প্রেম-ভালোবাসার জন্য বিবেচিত হননি, বরঞ্চ সার্বত্রিক এক মোহন-বিলোভনের জন্যই তাঁরা চিহ্নিত হয়েছেন। এটা খেয়াল করার মতো ঘটনা যে, রামায়ণের বিবরণে অপ্সরারা যখন সমুদ্রমন্থন থেকে জাত হলেন, তখন দেবতা কিংবা দানব কোনো পক্ষই তাঁদের স্বামী হতে চাইলেন না। কেউ তাঁদের পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন না বলেই তাঁরা 'সাধারণী' বা সকলেরই গম্য বলে অবধারিত হলেন—

ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্নন্তি সর্বে তে দেবদানবাঃ।
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণ স্মৃতাঃ॥

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আর একটি ঘটনায় অপ্সরাদের বৈবাহিক ভাবনা তো বটেই, তাঁদের একের প্রতি ভালোবাসার ধারণাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণ দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছেন। স্বর্গভূমি-বিজয়ের লক্ষ্য নিয়ে একদিন তিনি কুবেরের বাসভূমি কৈলাসে সেনাছাউনি তৈরি করে রাত্রিযাপন করবেন বলে ঠিক করেছেন। বিশ্রবার পুত্র কুবের তাঁর বড়ো ভাই, তাঁর আবাস-স্থান কৈলাস প্রকৃতির লীলাভূমি। সেখানে রাত্রির আরম্ভে জ্যোৎস্নালোকিত আকাশ যখন রাবণের সেনানিবাস স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়ে তুলেছে, ঠিক তখনই সেনাদের মধ্য দিয়ে অসামান্যা সুন্দরী অপ্সরা রম্ভাকে সেনাদের মধ্য দিয়ে যেতে দেখলেন রাবণ। রামায়ণের এই জায়গায় রম্ভার শারীরিক সৌন্দর্যের যে বর্ণনা আছে, তা শুধু রাবণ নয়, পরবর্তী কালের বহু কবিদেরও মুখর করে তুলেছে। বিশেষত রম্ভার শারীরিক সম্ভোগ লাভ করার জন্য রাবণের মুখে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা একমাত্র অপ্সরা সুন্দরীদেরই সহনীয় হতে পারে।

যাই হোক, অপ্সরা রম্ভা এই সময় রাবণের রতি-আক্রমণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন এই বলে যে, তিনি কুবেরের পুত্র নলকূবরের সঙ্গে মিলনের জন্য অভিসারিণী হয়েছেন , তাঁর সঙ্গে মিলন হবে বলেই রাবণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা দাঁড়ায় পুত্রবধূ এবং শ্বশুরের। অপ্সরা রম্ভার মুখে এই কথা শুনে রাবণ সামগ্রিকভাবে অপ্সরাদের বৃত্তি নির্ধারণ করে বলেন— অপ্সরাদের স্বামী বলে কিছু হয় না কোনো পুরুষের একমাত্র স্ত্রী হওয়া অপ্সরাদের সাজে না—

পতিরপ্সরসাং নাস্তি ন চৈকস্ত্রীপরিগ্রহঃ

রাবণের মুখে এই কথাগুলি কামুকতার আধারে ভাষিত হলেও অপ্সরা-চরিত্রের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা কোনো সম্পর্কের বাঁধনে বাধা পড়েন না। তাঁরা স্বচ্ছন্দচারিণী, স্বাধীনা এবং সাধারণী।

[রামায়ণ, ১.৩২.১১-২৭; ১.৩৩.১-২৪; ১.৪৫.৩২-৩৫; ৭.৩১.১-৬০]

মহাকাব্য-পুরাণে অপ্সরারা বহুলভাবে দেবতাদের ব্যবহৃত হয়েছেন রাজা, মুনি-ঋষি এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রলুব্ধ এবং মোহিত করার জন্য। মহাভারতের বনপর্বে অর্জুন যখন তপস্যা শেষে ইন্দ্র-সভায় গেছেন, তখন ইন্দ্রের পাশে বসে তিনি স্বর্গসুন্দরীদের নৃত্য দর্শন করেছিলেন। সেখানে যে অপ্সরারা নৃত্য করছিলেন, তাঁরা সকলেই স্বক্ষেত্রে বিখ্যাত—কিন্তু তাঁদের চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল—তাঁরা সিদ্ধ সংযতেন্দ্রিয় মহাপুরুষদের চিত্ত-প্রমথন করার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন বারবার—

চিত্তপ্রমথনে (চিত্তপ্রসাদনে) যুক্তাঃ
সিদ্ধানাং পদ্মলোচনা।

লক্ষণীয়, এই নৃত্যসভায় উর্বশীর দিকে অর্জুন বারবার তাকিয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে, ইনি সেই উর্বশী যিনি তাঁর আপন বংশ পুরুবংশের প্রথমা জননী। স্বয়ং দেবরাজ তাঁর মনোগত

ভাবের কথা জানতে পারেননি, তিনি উর্বশীর ওপর অর্জুনের দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করেই গন্ধর্ব চিত্রসেনের মাধ্যমে উর্বশীকে অর্জুনের কাছে যেতে বলেন তাঁর সম্ভোগ সম্পাদন করার জন্য। উর্বশীও তাঁর সম্মোহনী বেশ-বাসে অর্জুনের কাছে গিয়ে তাঁর উদগ্র মিলন-কামনা ব্যক্ত করলে তিনি বলেন—আপনি আমার কাছে জননী কুন্তীর মতো। স্বর্গীয় জননী ইন্দ্রাণীর মতো। আমার বহু-পূর্বপিতামহ পুরূরবার সঙ্গে আপনার মিলন ঘটেছিল বলেই এই প্রসিদ্ধ পৌরব-বংশের সূচনা হয়েছিল। সেই দৃষ্টিতে আপনি আমার গুরুর থেকেও গুরুতরা জননীর সমান, আমাদের বংশবৰ্দ্ধিনী জননী হলেন আপনি—

গুরুর্গুরুতরা মে ত্বং মম বংশবিবৰ্দ্ধিনী।

এখানেও কিন্তু কোনো গুরু-সম্পর্কের কথা শুনতে চাননি অপ্সরা উর্বশী। এটা লৌকিক দৃষ্টিতে অবশ্যই ঠিক যে, এই উর্বশী নিশ্চয়ই শত-শত বৎসরের সেই পূর্বা উর্বশী নন; অর্জুনের দেখা উর্বশী এবং বৈদিকী পুরূরবা-উর্বশী সময়ের পার্থক্যেই পৃথক। আমরা এই লৌকিক যুক্তিতেই বুঝতে পারি—মহাকাব্য-পুরাণে বারবার যে অপ্সরাদের এক-একটা গণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাতে মহাভারতের কালেই উর্বশী-মেনকারা এক-একটি প্রতিষ্ঠান বা 'ইনস্টিটিউটে' পরিণত হয়েছেন। অর্থাৎ অনেকগুলি অপ্সরাদের গণের শ্রেষ্ঠতমারা কেউ উর্বশী, কেউ মেনকা অথবা কেউ রম্ভা বলে চিহ্নিত হয়েছেন পরবর্তীকালে। তা না হলে পুরূরবার সময়-কালীন উর্বশীর সঙ্গে অর্জুনের দেখা উর্বশীকে মেলানো যাবে না।

এই যুক্তি মেনে নিলেই অর্জুনের প্রতি উর্বশীর বক্তব্যটাও যুক্তিসহ হয়ে ওঠে। অর্জুনের মুখে মাতৃসম্বোধন এবং পুরূরবার নাম শুনে ইন্দ্রসভার উর্বশী চিরায়ত সব সম্পর্কের কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—পুরুবংশের অধস্তন অনেক পিতা-পিতামহ এবং তাঁদের ছেলে-নাতিরাও আমাদের সঙ্গে রমণ-মিলন করেছেন অনেক তপস্যায় এই স্বর্গলোকে এবং তাতে কোনো ব্যতিক্রম নেই। অতএব তুমি সেই পুরুবংশের অধস্তন হয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারো না—

পুরোবংশে হি যে পুত্রা নপ্তারো বা ত্বিহাগতাঃ।
তপসা রময়ন্ত্যস্মান্ ন চ তেষাং ব্যতিক্রমঃ॥

এই কথা পরিষ্কার করে বলার আগে উর্বশী-অপ্সরা-চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলেছিলেন—অপ্সরাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কের বাঁধন নেই, তারা স্বাধীনবৃত্তি। অতএব আমাকে মাতৃসমা গুরু হিসেবে ভেবে নেবার কোনো কারণ নেই—

অনাবৃতাশ্চ সর্বা স্ম দেবরাজাভিনন্দন।
গুরুস্থানে ন মাং বীর নিযোক্তুং ত্বমিহার্হসি॥

[মহা (k) ৩.৪৩.২৮-৩২; ৩.৪৬.৩৬-৪৩;
(হরি) ৩.৩৮.২৮-৩৩; ৩.৩৯.৫৩-৬০]

ভগবান শ্রীহরির নানা বিভূতির কথা বলতে গিয়ে ভাগবত পুরাণের এক জায়গায় বলা হয়েছে—লক্ষ্মীদেবীর জন্ম তাঁর বক্ষ থেকে আর অপ্সরাদের জন্ম ভগবান শ্রীহরির ক্রীড়া-বিহার-বিলাস থেকে—

দৌর্যস্য শীর্ষ্ণো'প্সরসো বিহারাৎ
প্রসীদতা নঃ স মহাবিভূতিঃ।

বস্তুত এই কথা থেকে আমরা অপ্সরাদের বিলাসী স্বভাবের সার্থকতাটুকু বুঝতে পারি। আর এই বিহার-বৈশিষ্ট্য থেকেই আমরা অপ্সরাদের বিলাস-স্থানগুলির কথা বলতে চাই। ইতিহাস-পুরাণের বর্ণনা-মতো হিমালয়ের কোলে, মুঞ্জবান পাহাড়ের সানুদেশে, বিন্ধ্য পর্বতের পাশে, নর্মদা-গঙ্গার তীরভূমিতে, মানস সরোবরে, সমুদ্রতটবর্তী স্থানে অপ্সরাদের দেখা মেলে। এই স্থানগুলির মধ্যে সব সময়েই আমরা স্বর্গীয়তার অন্বেষণ করতে চাই না। বারবার মনে হয় লোকালয়ের বাইরে এ-সব স্থান—যেখানে দানব-মানব-দেবতারা কারণে এবং অকারণেও যেতেন দাম্পত্য-বহির্ভূত সম্পর্কের অন্বেষণে এবং সেই সম্পর্কের ক্ষণিকতা যেহেতু অপ্সরা-চরিত্রের স্বভাব-অনুমোদিত, অতএব অপ্সরাদের মধ্যেই আমরা পরবর্তী কালের গণিকাবৃত্ত সংগৃহীত হয়েছে বলে মনে করি। আবার যেসব ভদ্রস্থানেও অপ্সরাদের দেখা যেত, সেগুলি হল বড়ো বড়ো দেবতাদের নৃত্যসভা, দেবস্থানের অন্তর্গৃহ যেমনটি আছে পূর্বোল্লিখিত দেবসভা বর্ণনায়। কিন্তু দেবসভার চাইতেও লৌকিক দৃষ্টিতে মূল্যবান সংকেত নিহিত আছে— পাহাড়ের কোলঘেঁষা সেই সব জায়গাগুলি, নদীর তটভূমি, তীর্থস্থান—পুষ্কর অথবা কুরুক্ষেত্র, কাশী অথবা কৈলাস, যেখানে

মানুষ, মুনি, ঋষি, সিদ্ধপুরুষদের সঙ্গে অপ্সরাদেরও দেখা যায়—

গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব নিত্যং সন্নিহিতা বিভো।

[ভাগবত পু. ৮.৫.৪০; ২.১.৩৬;
মহা (k) ৩.৮২.২২; ৩.৮৩.৬;
রামায়ণ, ৩.৩৫.১৬; ৪.৪০.৪৬; ৪.৪১.২১;
৪.৪৩.২২; ৪.৪৬.১৫]

আমরা যে নদী-পাহাড়ের কোলে, তীর্থস্থানগুলিতে এবং নিসর্গ সৌন্দর্যের কেন্দ্রগুলিতে অপ্সরাদের বাসস্থান দেখতে পাচ্ছি, তাতে এই সংকেত জাগ্রত হয়ে ওঠে যে, এই সব অপ্সরাবাসগুলি পরবর্তী কালের নিষিদ্ধদেরও পরিষ্কারভাবে স্বর্গভূমির বেশ্যা চিহ্নিত করায় মর্ত্যে তাঁদের সাধারণ অবস্থানগুলিও যৌনতার সমস্ত আভাস বহন করে বলে আমরা অপ্সরাদের প্রতিরূপ দেখতে পাই গণিকাদের মধ্যে—

উর্বশী মেনকা চৈব রম্ভা চালম্বুষাতথা॥
মঞ্জুঘোষা সুকেশী চ পূর্বচিত্তির্ঘৃতাচিকা।
কৃতস্থলা চ বিশ্বাচী পুঞ্জিকস্থলয়া সহ॥
তিলোত্তমেতি দেবানাং বেশ্যা এতাদৃশো'পরাঃ।

আর অভিজাত গণিকাকুলে নৃত্য-গীত-বাদ্যের আকর্ষণ যেহেতু যৌনতার অন্যতম উপকরণ, সেটাও খুব সার্থকভাবে সমঞ্জস হয়ে ওঠে অপ্সরাদের চরিত্র এবং বৃত্তির সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্রের কথাটা বলতেই হবে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৩৩.১৮-২৫]*

ভরতের নাট্যশাস্ত্র যেহেতু অনেকের মতেই খ্রিস্ট-পূর্ব শতাব্দীতে রচিত, তাই ইতিহাস-পুরাণের চাইতে তার গুরুত্ব কিছু কম নয়। তাছাড়া ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে যেভাবে অপ্সরার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা বুঝলে পুরাণ-ইতিহাসের সমুদ্র-মন্থন-তত্ত্ব। এমনকি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মনস্তত্ত্বও অনেক বাস্তব-সম্মত হয়ে যাবে।

একটা নাটকের মধ্যে যা যা থাকা দরকার, অর্থাৎ বাচিক চমৎকার, ভাবের ব্যঞ্জনা, আঙ্গিক কৌশল—এই সব কিছুর প্রয়োজন দেখিয়ে নাট্যশাস্ত্রের 'রাফ ড্রাফট্' দেখানোর পর 'ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—তুমি কাব্য-নাটকের এত সব ভাবনা ভাবলে, আঙ্গিক, বাচিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের নানা নিয়ম-কানুনের কথাও তুমি বলেছ। তো এইসঙ্গে অভিনয়ের কৈশিকী বৃত্তিটাও তুমি বুঝিয়ে দাও—কৈশিকীমপি যোজয়—এবং তার জন্য আর যা যা তোমার দরকার সেগুলোও বলো।

সমস্ত দেব-মনুষ্যের সম্পর্কে ঠাকুরদাদার মতো ব্রহ্মা তো দুটো কথা উপদেশ দিয়েই খালাস; কিন্তু নাটক নামানোর ঝামেলা যে কী, তা ভরতমুনির মতো একজন সফল পরিচালকের অজানা নেই। কৈশিকী বৃত্তি হল নৃত্য-নাটকের সেই অংশ যা বাচিক, আঙ্গিক বা সাত্ত্বিক অভিনয়ের সম্পূর্ণতা এনে দেয়। অভিনয়ের ভাব-ব্যঞ্জনা এবং সৌন্দর্য্য এই কৈশিকী বৃত্তির যোজনাতেই সম্পন্ন হয়। তুলনা দিয়ে বলতে গেলে—এ হল চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো, সুন্দরী রমণীর লাবণ্যের মতো। বাচিক সংলাপ, নিরলস অঙ্গ-সঞ্চালন এবং রস-ভাবের উপযুক্ত প্রকাশ-ক্ষমতা—এগুলি নৃত্য কিংবা নাটকের যত বড় অঙ্গই হোক, তার সঙ্গে শিল্পিজনোচিত প্রয়োগ-লালিত্য এবং বৈচিত্র্যই কিন্তু নৃত্য কিংবা নাটকের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। কৈশিকী বৃত্তির কাজ এটাই—প্রাণ সঞ্চার করা। বিশেষত শৃঙ্গার রসের অভিনয়ে নায়ক-নায়িকার অভিনয়-কৌশলে এই মিশ্রণই দ্রষ্টা-শ্রোতার হৃদয় আপ্লুত করে তোলে।

ভরতমুনি এতকাল তাঁর নাটক চালিয়ে এসেছেন পুরুষ অভিনেতাদের দিয়েই। কিন্তু শৃঙ্গার-রসের নৃত্য-নাটকে সুন্দরী স্ত্রীলোক ছাড়া যে কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ সম্ভব নয়—এ তিনি ভালোই জানতেন। ফলে ব্রহ্মার কথা শুনে তিনি একটু রেগেই গেলেন। তাঁর বক্তব্য—আপনি তো বলেই খালাস—কৈশিকীটাও লাগাও। তা কৈশিকীর অভিনয়ের লোক-জন দিন আমাকে। পুরুষ মানুষ দিয়ে এই রস-ভাবাসম্পন্ন শৃঙ্গার আমদানি করা সম্ভবই নয়, এর জন্য চাই, রমণী—

অশক্যা পুরুষৈঃ সা তু প্রযোক্তুং স্ত্রীজনাদৃতে।

ব্রহ্মা আর দেরি করেননি। ভরতমুনির নাটকের তপস্যা সিদ্ধ করার জন্য ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে সৃষ্টি করলেন অপ্সরাদের। শৃঙ্গার-রসের ভাব-ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলে অপ্সরারা ভরত-মুনির কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ ঘটালেন নৃত্যে-নাটকে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম দিনগুলির কথা এখানে একবার বলতে হবে। আপনারা জানেন—রঙ্গমঞ্চের প্রারম্ভ-কালে অভিজাত সমাজের বউ-ঝিরা কেউ অভিনয়ের জগতে আসতেন না। ঘরের মেয়েদের প্রকাশ্য মঞ্চাভিনয় সেকালের

সামাজিকের মনে লজ্জার কারণ ঘটাত। ফলে রঙ্গমঞ্চ যখন অভিনেত্রীর প্রয়োজন ঘটল অর্থাৎ পরিচালক দলনেতারা যখন বুঝলেন যে, বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় স্ত্রী-নায়িকার অভিনয় ছাড়া নাটকের সফল পরিচালনা সম্ভব নয়, তখন অভিনেত্রীর আমদানি করা হল গণিকা-পল্লী থেকে। নাটকের স্ত্রীভূমিকায় যেসব হাব-ভাব, ছলা-কলার প্রয়োজন হত, বেশবনিতারা সে প্রয়োজন ভালোই মেটাতে পারতেন।

লক্ষণীয়, অপ্সরারা সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার দিক দিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসসম্ভবা হলেও চারিত্রিক দিক দিয়ে তাঁদের ব্যবহার তৎকালীন সামাজিককতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যদি বেশ্যাদের অভিনয়ে প্রথম সমৃদ্ধ হয়ে থাকে, তবে সংস্কৃতের নাট্যশালাও পুষ্ট হয়েছিল স্বর্গবেশ্যা অপ্সরাদের অভিনয়ে। বিশ্বাস না হলে গুপ্তযুগের তথা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কোষকার অমরসিংহের লেখা অমরকোষ খুলুন। দেখবেন, অপ্সরাদের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন—মেয়েদের মধ্যে উর্বশী, মেনকা, রম্ভার যত অপ্সরারা হলেন স্বর্গবেশ্যা—

স্ত্রীণাং বহ্বপ্সরসঃ স্বর্বেশ্যা উর্বশীমুখাঃ।

একথা আগেও আমরা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উল্লেখ করে বলেছি।

অপ্সরাদের নাম করতে গিয়ে নবরত্নসভার এই মাননীয় সদস্য অমরসিংহ যে নামগুলি করেছেন, তাঁরা হলেন—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা, সুকেশী এবং মঞ্জুঘোষা ইত্যাদি। নাট্যশাস্ত্রে দেখবেন—যাঁদের নায়িকা পেয়ে ভরতমুনি কৃতকৃতার্থ বোধ করলেন, তাঁরাও কিন্তু এই সুকেশী, মঞ্জুকেশী সুলোচনারা। ভরতমুনির সুবিধার্থে ব্রহ্মা একসঙ্গে অন্তত বাইশ/তেইশজন অপ্সরাকে ভরতমুনির হাতে সঁপে দিয়েছেন। উর্বশী, মেনকা রম্ভার মতো নামী দামি স্বর্গসুন্দরীরা ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের তালিকায় নেই বটে, কিন্তু তাঁরাও যে অভিনয়ের জন্যই জন্মেছিলেন, তাঁদের হাবভাব, ব্যবহার যে সত্যি নয়, অথবা সত্যি বলে ভাবলে যে মানুষের চরম অবস্থা হবে, সেকথা আমাদের ইতিহাস পুরাণে বারবার দেখতে পেয়েছি।

[নাট্যশাস্ত্র (GOS) ১.৪১-৫১, পৃ. ২১-২৪]

অপ্সরেশতীর্থ নর্মদার তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে সেই ব্যক্তি স্বর্গলোকে অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়া করে আনন্দ লাভ করে। *[কূর্ম পু. ২.৪০.২২; মৎস্য পু. ১৯৪.১৬-১৭]*

এই তীর্থে স্নান করলে মানুষ নাগলোকে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়া করে আনন্দ লাভ করতে পারে বলে পদ্ম পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৯.২.৬৬]

অপ্সরোগণসেবিত শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। তিনি নটরাজ, নৃত্যগীতাদি শিল্পের স্রষ্টারূপে তাঁকে কল্পনা করা হয়। তাই নৃত্য গীতে পারদর্শী অপ্সরাদের তিনি আরাধ্য দেবতা। অপ্সরাদের দ্বারা তিনি পূজিত হন, সেবিত হন বলেই তাঁর এই নাম।

[মহা (k) ১৩.১৭.১১৭; (হরি) ১৩.১৬.১১৬]

অব্জজাতা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৪; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮]

অব্জহোম্য ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠার পর যুধিষ্ঠিরের সভায় সমাগত ঋষিদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৪.১২; (হরি) ২.৪.৯ শ্লোকের পাদটীকার ৩নং শ্লোক, খণ্ড ৫, পৃ. ২৬]

অব্দুর্গ অব্দুর্গ মানেই সেখানে প্রচুর জল (অপ্) থাকবে। প্রায় চতুর্দিকে জলের জন্যই শত্রুর পক্ষে সে দুর্গ অগম্য হয়ে উঠবে। সেটা নদীর প্রাকৃতিক সুবিধে গ্রহণ করেও হতে পারে, আবার কৃত্রিমভাবে পরিখা তৈরি করে কুমীরের মতো জলজন্তুর ব্যবস্থা করেও অব্দুর্গ বা নদীদুর্গ বা জলদুর্গ বানানো যেতে পারে। রাঘবানন্দ টীকায় লিখেছেন—অব্দুর্গম্ অগাধোদকেন নক্রাদিযুক্তেন নদ্যাদিনা পরিতো বেষ্টিতম্। লক্ষণীয়, মহাভারত ছয় প্রকার দুর্গের তালিকায় অব্দুর্গের উল্লেখ করেনি। কিন্তু জরাসন্ধের অত্যাচারে কৃষ্ণ মথুরা নগরী ছাড়ার পর সমুদ্র-বেষ্টিত দ্বারকায় যে পুরী নির্মাণ করেন, তা নামান্তরে অব্দুর্গ বা জলদুর্গই বটে।

[মানবধর্মশাস্ত্র ৭.৭০; রাঘবানন্দের টীকা দ্র.; মহা (k) ১২.৮৬.৫; (হরি) ১২.৮৪.৫]

অব্ভক্ষ$_1$ *[দ্র. তপস্বী]*

অব্ভক্ষ$_{২}$ অপ্ মানে জল। এক শ্রেণীর ঋষি, যাঁরা তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় জলমাত্র পান করে জীবন ধারণ করেন, তাঁদের অব্ভক্ষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে মহাভারতে। প্রধানত বহুবচনে ব্যবহৃত এই শব্দটির দ্বারা কৃচ্ছ্রসাধনকারী তপস্বীদের একটি বিশেষ শ্রেণীকে বোঝানো হয়।

[মহা (k) ১২.১৭.১১; (হরি) ১২.১৭.১১]

অবকীর্ণ কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে এই তীর্থটি অবস্থিত, শুভফলদায়ী তীর্থ।

☐ একবার নৈমিষারণ্যের ঋষিরা দক্ষিণালাভের জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যান, তাঁদের মধ্যে বক-দালভ্য নামে এক ঋষি এগিয়ে গিয়ে রাজার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে অপমান করেন। ক্রুদ্ধ বক-দালভ্য ক্ষোভবশত নিজের দেহ-মাংস উত্তোলন করে পৃথূদকের অন্তর্গত অবকীর্ণ তীর্থে আহুতিযজ্ঞ শুরু করেন। তাঁর যজ্ঞে ভীত ধৃতরাষ্ট্র অবকীর্ণে গিয়ে বহু রত্ন দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। *[বামন পু. ৩৯.২৪-৩৫]*

☐ এটি একটি আশ্রম তীর্থ। বলরাম একবার এই তীর্থে গিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪১.১; (হরি) ৯.৩৮.১]

☐ পদ্মপুরাণে অরুণা-সরস্বতী সঙ্গম থেকে মহাপুণ্যদায়ক অবকীর্ণ তীর্থে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। *[পদ্ম পু. (মহর্ষি) স্বর্গ. ২৭.৪১-৪৫]*

দর্ভি ঋষি ব্রাহ্মণদের হিতকামনায় এই তীর্থ নির্মাণ করেন। এখানে ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি আচরণকারী ব্রাহ্মণেরা ব্রত, উপনয়ন ও বনবাস করলে ব্রহ্মতেজ যুক্ত হন। দর্ভি কর্তৃক এখানে চার সমুদ্রও আনা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এই তীর্থে স্নান করলে দুর্গতি মুক্ত হবে এবং চার সহস্র গোদানের পুণ্য লাভ হবে।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ১৩.৪৪-৪৮]

বর্তমান হরিয়ানার পেহোয়া (Pehowa) গ্রামে এই তীর্থটির অবস্থান বলে মনে করা হয়।

[Gazetteer of India Haryana, Ed.by Goel & Bushnai; Vol 2; p. 495]

অবগাহ *[দ্র. অগাবহ]*

অবটনিরোধন অষ্টাবিংশ নরকের মধ্যে একটি।

[ভাগবত পু. ৫.২৬.৭]

অবটারোধ এক ধরনের নরক। যারা প্রাণীদের অন্ধকূপে আবদ্ধ রেখে মেরে ফেলে, তাদের যমকিঙ্করেরা এই নরকে এনে নিজের হাতে বিষমিশ্রিত আগুনে বসিয়ে ধোঁয়া দিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে।

[দেবীভাগবত পু. ৮.২১.২৭; ৮.২৩.১৮-২০]

অবটোদা নদী-তীর্থ। এই নদীর নাম উচ্চারণ করলেই মানুষ পবিত্র হয়।

[ভাগবত পু. ৫.১৯.১৭]

অবটোদনরক অবটোদ একটি নরককুণ্ড। এর পরিমাণ চারশো হাত। এই নরকে যমদূততাড়িত দগ্ধদেহ পাপীরা থাকে। নরকে পড়া মাত্রই পাপীদের সমস্ত রকমের রোগ জন্মায়। *[দ্র. নরক]*

[দেবীভাগবত পু. ৯.৩৭.৯১-৯২]

অবতার অবতার শব্দের প্রাথমিক অর্থ অবতরণ, নেমে আসা। অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা অন্যরূপে নেমে আসেন পৃথিবীতে সেটাই ঈশ্বরের অবতরণ বা অবতার। এই অপার মনুষ্যলোক এবং সেই অনন্ত অন্তরীক্ষলোকের মধ্যে যে বিরাট দূরত্ব আছে, সেটা যেন মুছে যায় ঈশ্বরের এই অবতরণের ফলে। সবচেয়ে বড়ো কথা—আর্ত, বিপন্ন, শুদ্ধ মানুষকে তিনি উদ্ধার করেন। উদ্ধারকারী দেবতার এই অবতার ভাবনা শুধু ভারতবর্ষের নয়, প্রাচীন সভ্য জগতে সর্বত্র ছিল। গবেষক লিখেছেন—

The saviour is an essential factor in religion, because many religious people are convinced that the domain of men and the world of the gods are separated by a deep cleft. In order to link up these two worlds a bridge must be laid across the cleft. Man is unable to perform this act. It should be done by a creature who unites the two worlds by his nature. That is the saviour. He is a divine or semi-divine being, who descends from the domain of the gods to the dwelling-places of men, or who operates through other gods for the benefit of men. The figure of the saviour shows many varieties. As he combines in himself a human and a divine element, the emphasis may alternatively be must on the one or the other side of his nature. Saviours, in whom the human factor dominates, are the sacral king, the hero the prophet, the sage and the saint.

[C.J. Bleeker, Isis as Saviour Goddess. In The Saviour God, Ed. by S.G.F. Brandon, P. 2]

□ ভারতবর্ষে ঈশ্বরের অবতার-ভাবনা নিয়ে বিচিত্র গবেষণা হয়েছে, তাতেও কিন্তু খুব স্পষ্ট যে, মুনি-ঋষি থেকে আরম্ভ করে বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা, অনেক বিদ্বান-পণ্ডিতও পরম ঈশ্বরের বিভূতি কিংবা অংশ হিসেবে গণ্য হন। তবে এসব ক্ষেত্রে যতখানি তাঁরা বিপত্তারণ বা উদ্ধারকর্তা ঠিক ততখানি অবতার নন, কিন্তু প্রায় অবতারের মতোই। ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্তটা খুব জরুরী—যা কিছুর মধ্যেই চরম বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য আছে, যাঁর মধ্যে অনেক সম্পন্নতা, চরম সৌন্দর্য্য অথবা যাঁর মধ্যে চরম কোনো প্রভাব দেখা যায়, তার সবগুলির মধ্যেই ঈশ্বরের তেজ আছে, তাঁর অংশ আছে—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজো'শসম্ভবম্॥

[ভগবদ্গীতা ১০.৪১]

এই যে মহাপুরুষ, মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তি, মুনি-ঋষি, সাধু, প্রফেট, এমনকী গুরুরাও যে জাগতিক মানুষের উদ্ধারকারী হিসেবে প্রায় ভগবানের অবতার হিসেবে গণ্য হন, তাঁরা ঈশ্বর এবং জাগতিক মানুষের মধ্যে এক পরম মধ্যস্থ বা 'লিংক' হিসেবে কাজ করেন—

The name *guru* is applied to a man of any caste who is believed to be in peculiarly close communion with the Highest Being or supernatural Power and to hold the secret of divine mysteries, whether on account of asceticism, utterances regarded as inspired, or saintliness of life or character. The basis of the peculiar veneration of the guru still lies in the conviction that he is a link in a long chain of transcendental beginnings, a mediator agle to bring his disciple and God together, or a medium through whom God is willing to reveal Himself. Those who on account of their highly developed spirituality and earnest religious life need no guru are rare. Gandhi wrote: 'I believe in the Hindu theory of guru and his importance in spiritual realisation. I think there is a great deal of truth in the doctrine that true knowledge is impossible without a guru. Only a perfect *jnani* (one who having spiritual knowledge knows the path to Release) deserves to be enthroned as guru' Most of those who want to reach God must follow such a guide, who is no mere man, but 'a channel through which Gods communicates Himself to the adept' Hence the conviction that the guru alone can guide his disciples on the path of spiritual progress to full knowledge of the Highest which leads to ultimate emancipation. Thus he is, to the present day, a 'Respektsperson', performing various functions and entering into different relations to his adherents.

[J. Gonda, The change and continuity in Indian Religion, pp. 281-282]

□ মহাপুরুষ, গুরু, কিংবা মুনি-ঋষিদের সঙ্গে অবতারের পার্থক্য হল—ভারতবর্ষীয় বিশ্বাসে স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপে কিংবা অন্য কোনো রূপে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন অশুভ বিনাশ করার জন্য, লোকহিতের জন্য। ঈশ্বরের অবতার-গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ভগবদ্গীতার বহুবিদিত দুটি শ্লোকে উচ্চারিত হয়েছে। এখানে ভগবান বলছেন—যখন যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধু-ভদ্রের পরিত্রাণ তথা দুষ্ট-দুষ্কৃতি-জনের বিনাশের জন্য এবং অবশ্যই অবশেষে ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্ম বলতে এখানে সামাজিক রাজনৈতিক কিংবা

সার্বিক শৃঙ্খলা বোঝায়, আর অধর্ম বলতে অন্যায়, অনীতি, দুর্নীতি অথবা যা ন্যায়ের বিপরীত, তা সবই অধর্ম, যার প্রতীকী রূপ অসুর, দৈত্য, দানবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অবতার-গ্রহণের এই মৌল উদ্দেশ্য আবার উচ্চারিত হয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের সপ্তশতী চণ্ডীতে। এখানে ভগবতী চণ্ডিকার মুখে স্পষ্ট অবতরণের কথা শুনতে পাচ্ছি—যখন যখনই দৈত্য-দানবদের অশুভ শক্তি বাধা সৃষ্টি করবে এই জগতের, তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রুদের ধ্বংস করি—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

[ভগবদ্গীতা ৪.৭-৮; মার্কণ্ডেয় পু. ৯১.৫০]

□ ভারতবর্ষে অবতার-ভাবনার মধ্যে ভূভার-হরণ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—এই উদ্দেশ্যটাই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং লক্ষণীয়, অনেক সময়েই পুরাণগুলিতে ধরিত্রীমাতা গো-রূপ ধারণ করে প্রথমে ব্রহ্মা তারপর ভগবান বিষ্ণুর কাছে দুষ্টের ভার লাঘব করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন—এই চিত্র দেখতে পাচ্ছি—

ভূমির্দৃপ্ত-নৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত॥

বস্তুত পৃথিবী বা ভূদেবী ভগবান বিষ্ণুর অন্যতমা স্ত্রী হিসেবে কীর্তিত হয়েছেন—'ভূর্বৈষ্ণবী', রামায়ণে 'মাধবী দেবী'—তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি—সীতার পাতাল-প্রবেশের সময় 'মাধবী' বা লক্ষ্মীর সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেছেন, অর্থাৎ ভূ-দেবী শ্রী-দেবীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। মহাভারত-পুরাণে ভূদেবী লক্ষ্মীর পরেই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। অবশ্য শ্রীসূক্তে পৃথিবীকে সোজাসুজি বিষ্ণুপত্নী বলা হয়েছে—

বিষ্ণুপত্নীং ক্ষমাং দেবীম্।

ক্ষমা মানে পৃথিবী, ক্ষ্মা মানেও পৃথিবী, তিনি বিষ্ণুপত্নী। এই ঘনিষ্ঠতার কারণেই ভূভার হরণের মতো একটা ব্যাপার বিষ্ণুর অবতার-গ্রহণের প্রাথমিক কারণ হয়ে উঠবে, এটা কোনো আশ্চর্য নয়। সেখানে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন অবতারের গৌণকর্ম মাত্র।

[ভাগবত পু. ১০.১.১৭-২৩;
ব্রহ্ম পু. ১৮১-১৮২ অধ্যায়]

ভূভার হরণের মতো প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছাড়াও অবতারের অন্যতর আরও কিছু উদ্দেশ্যের কথা পণ্ডিতেরা বলে থাকেন এবং সেগুলি সময়ে সময়ে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, সেই উদ্দেশ্যই প্রধান পরিণাম লাভ করে ভূভারহরণ, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন সেখানে গৌণ হয়ে যায়। লক্ষণীয়, ভগবান বিষ্ণুর মনুষ্য-অবতারের প্রসঙ্গ তৈরি হতেই বৈষ্ণবীয় ভাবনার অনুষঙ্গে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দুষ্টের দমন করে অধর্মের গ্লানি রোধ করাটা ভগবান বিষ্ণুর সাধারণ কর্ম মাত্র, তার জন্য মনুষ্য অবতারের প্রয়োজন হয় না। অবতার মানসে মনুষ্য রূপ পরিগ্রহের মাধ্যমে ভগবানের নিজের প্রয়োজনও কিছু সিদ্ধ হয়। রামচন্দ্রের অবতার প্রসঙ্গেই হয়তো এই কথাটা বেশি উপযুক্ত হয়। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— মনুষ্য কতটা নিজরক্ষা ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই।...

অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং শান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম জানে না; কর্ম কিরূপে করিলে ধর্মে পরিণত হয় তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশি সম্ভাবনা, এমন স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি? অবতারমাত্রেই জনসমক্ষে একটা বড়ো আদর্শ স্থাপন করবেন—এই জিনিসটা বঙ্কিমের মাথায় বড়ো বেশি ক্রিয়া করেছিল। অবতার হয়ে দু-চারটে রাবণ-কুম্ভকর্ণ কী কংস-শিশুপাল বধ করা তাঁর মতে 'অতি অশ্রদ্ধেয় কথা'। ঈশ্বরের অবতারের কাজ হল আদর্শ স্থাপন। আমরা বলি কী, তাঁর কথাটা রামচন্দ্র সম্বন্ধে ভালোই খাটে, কিন্তু কৃষ্ণের চরিত্র বড়োই জটিল। বিশেষত বঙ্কিমের কৃষ্ণ যত আদর্শবাদী নেতা কিংবা মহাভারতের 'বিসমার্ক' হন না কেন, তবু তিনিই সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নন। এর ওপরে আছেন দার্শনিকেরা, যাদের সঙ্গে বঙ্কিমের বিবাদ হতে বাধ্য এবং সেই

বিবাদে বঙ্কিমের হার এতটাই অবশ্যম্ভাবী যে তিনি জেনে বুঝে সে দিকটার ধারও মাড়াননি। দার্শনিক বলবেন—মনুষ্য অবতারের কাজ শুধু দু-চারটে রাবণ-কংস বধ হবে কেন, এমন কী তার উদ্দেশ্য জনসমক্ষে একটা বিরাট আদর্শ স্থাপনও নয়। মানুষ হয়ে জন্মাবার পেছনে ঈশ্বরের নিজেরই উদ্দেশ্য আছে, আছে স্বার্থ। এর সঙ্গে আছেন মহাকবি, তিনি ধুয়া ধরবেন—তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বন্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। ঠিক এই কারণে তিনি রাজার রাজা হয়েও আপনিই আসেন ধরা দিতে; সে যতখানি আমাদের জন্য ঠিক ততখানি তাঁর নিজের জন্যেও।

ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্ম যেখানে একান্তভাবেই দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে দার্শনিকদের মূল কথাটি ছেড়ে দিলে চলে না। দার্শনিকেরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রাচীন পংক্তিটির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলেন—উপনিষদের সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পুরুষ নাকি একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, তাঁর মনে ছিল না এতটুকু আনন্দ—

স বৈ নৈব রেমে, যস্মদ্ একাকী ন রমতে।

কেননা একা একা আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই তিনি জায়া হলেন, নিজেকে এই রকম করে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। শুধু অসুর রাক্ষস বধ নয়, শুধু আদর্শ স্থাপন নয়, আরও কিছু। জন্ম-মরণের আবর্ত তাঁকে স্পর্শ না করলেও—অজো'পি সন্ অব্যয়াত্মা—তিনি জন্ম নিলেন। সমস্ত ভূতবর্গের অধীশ্বর হয়েও—ভূতানামীশ্বরো'পি সন্—তিনি বাঁধা পড়লেন মানব জীবনের সুখ-দুঃখের মায়ায়। তাতে মানুষেরই মত কখনো তার কপালে জুটল সুখ, কখনো দুঃখ কখনো বা যন্ত্রণা। রসিক দার্শনিকেরা এই ব্যাপারগুলোকে বলেছিল 'লীলা'। শব্দটি সাধারণ নয়, কেননা এই শব্দের সাহায্যেই ঈশ্বরের মনুষ্যোচিত ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, অন্য কোনো শব্দের দ্বারা নয়। ব্রহ্মসূত্র লিখেছে—আমাদের জগৎটিই সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের লীলাবশে—

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।

কাজেই সেই লীলাবশেই যদি তিনি তাঁর আপন সৃষ্ট খেলাঘরে কিছুদিন মনুষ্য-ব্যবহার করে আনন্দ পান, তাতে দার্শনিক খুশি হন। কিন্তু খুশি হন না ঐতিহাসিক, তাঁরা এসব লীলা-টীলার ধার ধারেন না। আমরা বলি, তাতে ক্ষতি কিছু নেই। উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারতে মনুষ্য থেকে যাঁর দেবায়ন ঘটেছে, ঐতিহাসিক যে তাঁকে মনুষ্য বলবেন তাতে আশ্চর্য কি! যেমন ধরুন, যেসব পণ্ডিতেরা বাল্মীকির রামায়ণকে মূলত পাঁচ কাণ্ড বলে মনে করেন, তাঁরা রামচন্দ্রের মনুষ্যত্বেই বিশ্বাসী। ইতিহাসের দৃষ্টিতে রামায়ণ আরম্ভ হয়েছে অযোধ্যার রাজবাড়ির অন্তঃকলহ এবং সিংহাসনের অধিকার নিয়ে, শেষ হয়েছে লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ-বিজয়ের সূত্র ধরে। কিন্তু রামচন্দ্রের যৌবনকাল, বিবাহ, আত্মত্যাগ, বনবাসের হাজারো কষ্ট এবং শেষে রাক্ষস-বিজয়—এই সব কিছুর মাধ্যমে ঐতিহাসিক যেখানে পৌঁছোতে চান তা হল রামের মনুষ্যত্ব, পারিন্দার যাকে বলেছেন—**all make up a human being**. আবার দার্শনিকও স্বরূপত রামচন্দ্রের বিষ্ণুত্ব স্বীকার করে নিয়ে যে জায়গাটায় পৌঁছতে চান, তাও কিন্তু রামের মনুষ্যত্বই। দুজনের মধ্যে মূল পার্থক্য হল—প্রথম জন প্রথম থেকেই রামকে মানুষ বলেই জানেন এবং তাঁর ধারণা—ভারতবর্ষীয় মানুষের ব্যক্তিপূজার সুযোগে বিষ্ণুর সঙ্গে রামের সমীকরণ ঘটেছে। আবার অন্যজন, মানে দার্শনিক, তাঁকে প্রথম থেকেই বিষ্ণু বলে জানেন এবং তাঁর ধারণা ঈশ্বরীয় লীলাবশে তিনি মানুষের রূপ ধারণ করেছেন মাত্র। তিনি যে মানুষের মত সমস্ত ব্যবহার—কর্ম, ধর্ম এমনকি অন্যায়ও; করছেন, সেও লীলাবশেই।

ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক—দুই তরফেই যখন ঈশ্বরের মনুষ্যত্ব প্রতিপাদনই কাম্য, সেখানে রামচন্দ্রের পথ ধরেই আমরা কৃষ্ণে পৌঁছতে পারি, যদিও ঐতিহাসিকতা এবং দার্শনিকতা—দুটিই ভীষণভাবে জটিল হয়ে গেছে কৃষ্ণ-জীবন এবং সামগ্রিক কৃষ্ণচরিত্র প্রসঙ্গে। প্রথম, কৃষ্ণের জীবন কথায় ব্যাসদেবের মহাভারতই একমাত্র উপাদান নয়, আরও শতেক পুরাণ কাহিনী আছে যা তাঁকে মহাভারতের একান্ত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয়, অবতারবাদের মূল উদ্দেশ্য যাকে পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেছেন ভূ-ভার হরণ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—এই উদ্দেশ্য কৃষ্ণের ব্যাপারে একেবারেই গৌণ হয়ে গেছে। এমনকি বঙ্কিমের কথামত জীবজগতের সামনে একটা বিরাট আদর্শ স্থাপনও যদি কৃষ্ণ

অবতারের মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণেই দেখা যাবে যে, কৃষ্ণ একেবারেই অন্যরকম।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণচরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ) পৃ. ৪৩৩;
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুরঙ্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী), পৃ. ৪৮৬;
G. Parindar, Avatar and Incarnation, P. 122-123; J.L. Brockington, Righteous Rama, P. 14]

☐ অবতার-তত্ত্বের গভীর ভাবনায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছেন রামচন্দ্র এবং তার থেকেও বেশি আলোচিত হয়েছেন কৃষ্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে চেয়েছেন, তাতে অবতার-গ্রহণের মাধ্যমে মানুষকে আদর্শ জীবন যাপনের শিক্ষাদর্শ স্থাপন করার ব্যাপারে রামচন্দ্রই একমাত্র উদাহরণ হতে পারেন। হয়তো সেই কারণেই এমন প্রবাদ তৈরি হয়েছে যে, রামচন্দ্রের আচরণগুলি অনুসরণ করতে হবে, রাবণের আচরণ নয়—

রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ।

কিন্তু রাম-অবতারের ক্ষেত্রে মনুষ্য ব্যবহারের আদর্শ-স্থাপন যদি ভূভার-হরণের অতিরিক্ত কোনো ulterior motif হয়, তাহলে কৃষ্ণাবতারের ক্ষেত্রে সেটা আরও অনেক বেশি জটিল এক দার্শনিক প্রতিপত্তি তৈরি করে। এটা সবচেয়ে ভালো বলা আছে ভাগবত পুরাণে। এখানে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকা ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন কুন্তী কৃষ্ণকে স্তুতি করে বলেছিলেন—তোমার স্বরূপ যদিও দুর্জ্ঞেয়, তবুও নির্মল মানসের অধিকারী পরমহংস মুনিদের ভক্তিযোগ বিধান করার জন্য তুমি অবতীর্ণ হও, আমরা স্ত্রীলোক হয়ে কীভাবে তোমাকে অনুভব করবো—

তথা পরমহংসানাং মুনীনাম্ অমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগ-বিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ॥

এখানে যে ভক্তির কথা বলা হল তা শুধু শরণাগতির সমার্থক ভক্তিমাত্র নয়, সেটা প্রেমভক্তি। এ-কথা ভাগবতের ভাবনা বিস্তার করে চৈতন্যপার্ষদ রূপ গোস্বামী তাঁর লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখেছেন—ভগবানের আরও বহুতর অবতার আছে। যেসব অবতার মানুষের সামগ্রীক কল্যাণ বিধান করছেন, কিন্তু কৃষ্ণ ছাড়া আর বোধহয় কেউ নেই, যিনি বৃক্ষলতাকেও প্রেম দান করেছেন—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

[ভাগবত পু. ১.৮.২০-২১;
লঘুভাগবতামৃত ১.৫.৩৭]

☐ কুন্তী-কথিত ভক্তিযোগ-বিধান কিংবা রূপ গোস্বামী-কথিত প্রেমভক্তি দানের জন্য কৃষ্ণের অবতার গ্রহণ করাটাও কিন্তু তাঁর অবতরণের জগৎসম্বন্ধী কারণ। অর্থাৎ জাগতিক মানুষের প্রতি করুণায় এই অবতার। কিন্তু কৃষ্ণাবতারের ক্ষেত্রে এই সব জাগতিক কারণ অতিক্রম করে তাঁর অবতরণের নিজস্ব এক গূঢ় কারণ আছে বলে বৈষ্ণব দার্শনিকেরা বলেছেন। এখানে তাঁরা প্রথমে ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত অক্রূরের বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। অক্রূর তখন মথুরা থেকে বৃন্দাবনে আসছিলেন কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্য। রাস্তায় আসতে আসতে অনেক ভাবনার মধ্যে তিনি একবার বললেন— সম্প্রতি নিজের হৃদিস্থিত একটি কার্য সম্পন্ন করার জন্য জগৎস্বামী স্বেচ্ছায় মনুষ্যদেহ ধারণ করেছেন—

সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্য্যমাত্মহৃদিস্থিতম্।
কর্ত্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ম্॥

বৈষ্ণব দার্শনিকেরা মনে করেন—স্বয়ং ভগবান হলেন রসস্বরূপ, কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয় স্বভাবে নিজের মধ্যেই নিজেকে আস্বাদন করা যায় না বলেই সেই রস আস্বাদন করার জন্য এবং তাঁর লীলাপরিকরদের তা আস্বাদন করানোর জন্য তিনি মনুষ্যদেহে কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। ভাগবত পুরাণে ব্রহ্মা একবার বলেছিলেন—তোমার মানুষ হয়ে জন্মানোর অন্য কারণ কিছু নেই। তোমার আপন বিনোদন যাকে লীলা বা ক্রীড়া বলা যেতে পারে, সেই লীলারস আস্বাদনের জন্যই তোমার অবতার গ্রহণ করা—

ন তে'ভবস্যেহ ভবস্য কারণং/
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।

ভাগবত পুরাণের এই আত্মবিনোদন-ভাবনার সঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের স বৈ নৈব রেমে। যস্মাদেকাকী ন রমতে—এই উক্তি ভগবানের আত্মারাম-বৃত্তির অবসান ঘটিয়ে

কৃষ্ণের অবতারে তাঁকে অখিলরসামৃতমূর্তি করে তোলে। কৃষ্ণ-অবতারের মূল কারণ বৈষ্ণব-দার্শনিকতায় সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যাত হয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে এবং সেটাই কৃষ্ণাবতারের মূল উদ্দেশ্য যা পুরাণসম্মত—

সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ॥
পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল।
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ওইছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোনো বড়ো লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিব অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যেনাহি যে-যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলাকরিব যাতে মোরচমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করায় মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে—দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥

[বিষ্ণু পু. ৫.১৭.১২; ভাগবত পু. ১০.২.৩৯;
চৈতন্যচরিতামৃত (নাথ) ১.৪.৫-২৯]

□ আমরা ভগবদ্‌গীতার 'যদ্ যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বম্' শ্লোকটি *(১০.৪১)* মাথায় রাখলে ভাগবত পুরাণের এই মন্তব্য সত্য হয়ে ওঠে যে, অবতারের সংখ্যা নির্ধারণ করা খুব কঠিন, বস্তুত তাঁরা অসংখ্য ঝর্ণার মতো বহু জলধারা—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরে সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ শতসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

পণ্ডিতজনেরা অবতারবাদের প্রথম সূত্র আবিষ্কার করেন ঋগ্‌বেদ থেকে। এখানে বলা হয়েছে—সমস্ত দেবতাদের প্রতিনিধি ইন্দ্র বহু ধরনের রূপ ধারণ করেন এবং বিভিন্ন রূপেই তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়া দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে যজমানের কাছে উপস্থিত হন—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য
রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরু রূপ ঈয়তো
যুক্ত হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥

[ঋগ্‌বেদ ৬.৪৭.১৮; ভাগবত পু. ১.৩.২৬]

পরবর্তী কালে সমস্ত দেবতার সহায়কারী হিসেবে বিষ্ণু প্রাধান্য লাভ করেছেন এবং সৌরকুলের সমস্ত দেবতাদের (Solar gods) মধ্যে বিষ্ণু যখন প্রধানতম হয়ে উঠেছেন, তখন একদিকে এই প্রাধান্যের প্রতিফলন ঘটছে ভগবদ্‌গীতার বিভূতিযোগে—

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ।

তেমনই অন্যদিকে তিনি সমস্ত অবতারের মূল হয়ে উঠছেন। কখনো বা বিষ্ণুর অভিন্ন রূপ নারায়ণও অবতার-মূল হিসেবে কীর্তিত। মহাভারতের শান্তিপর্বে 'নারায়ণীয়' নামের উপপর্বে আমরা এগারোটি অবতারের নাম পাই। তাঁরা হলেন—হংস, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, কৃষ্ণ এবং কল্কি—

হংসঃ কূর্মশ্চ মৎস্যশ্চ প্রাদুর্ভাবাদ্দ্বিজোত্তম॥
বরাহো নরসিংহশ্চ বামনো রাম এব চ।
রামো দাশরথিশ্চৈব সাত্ত্বতঃ কল্কিরেব চ॥

মহাভারতের এই অধ্যায়ে এবং তার পরবর্তী

অধ্যায়ে 'হয়শির' নামে আরও একটি অবতারের কথা বলা হয়েছে। *[ভগবদ্গীতা ১০.২১; মহা (k) ১২.৩৩৯.১০৩-১০৪; ১২.৩৩৯.৫৯; ১২.৩৪০.৯২-৯৩; (হরি) ১২.৩২৫.১০০; ১২.৩২৫.৫৮; ১২.৩২৬.৮৬-৮৭]*

□ পণ্ডিতজনেরা মনে করেন যে, মহাভারতে অবতারবাদের তত্ত্ব তেমনভাবে পূর্ণতা লাভ করেনি। শান্তিপর্বের পূর্বোক্ত শ্লোকগুলিতে বিভিন্ন অবতারের সংখ্যা-বিষয়ে একটি তালিকা দেওয়া ছাড়াও অবতার হিসেবে যাঁরা উল্লিখিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন কৃষ্ণ, বলরাম, দাশরথি রাম, বামন, বরাহ এবং নরসিংহ। এঁদের মধ্যে নরসিংহ এবং বামন খুবই সাধারণভাবে উল্লিখিত, বরাহের জন্য অবশ্য শান্তিপর্বে একটি গোটা অধ্যায় নির্ধারিত হয়েছে এবং দাশরথি রাম মার্কণ্ডেয় মুনির মুখে 'রামোপাখ্যান'-কীর্তনে ভালো গুরুত্ব লাভ করেছেন, কিন্তু তবু অবতার গ্রহণ এবং তার গুরুত্ব মহাভারতে সেইভাবে আলোচিত নয়, বরঞ্চ হরিবংশ, বিষ্ণু পুরাণ বা ভাগবত পুরাণে অবতারবাদ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন পুরাণে আমরা অবতার-সংখ্যা বিভিন্ন রকম পাই। তার মধ্যে কয়েকটি পুরাণের এই সংখ্যায়নে যেমন খুব একটা গুরত্ব দেওয়া হয়নি, এটাও যেমন আছে, তেমনই এক-একটি পুরাণে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বার স্বতো বিভিন্ন সংখ্যায় অবতারের গণনা হয়েছে। মৎস্য পুরাণের একটি অধ্যায়ে বরাহ ইত্যাদি বারোটি অবতার আছে—

বরাহাদ্যা দশ দ্বৌ তু।

—এই কথা বলার পর অবতারগুলির নাম উচ্চারণের সময় প্রথমে এল নরসিংহের নাম, দ্বিতীয়ে এলেন বামন, তৃতীয়ে বরাহ। চতুর্থ অবতারের নাম থেকে অমৃতমন্থন ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের পরিচিত অবতারগুলির নাম সেখানে অনুপস্থিত। অথচ এই পুরাণের শেষ দিকে অন্য একটি প্রসঙ্গে অত্রি-ভৃগু-বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিদের সঙ্গে একেবারে ঠিক ঠিক দশাবতারের নাম আছে—

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহো'থ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কীতি চ ক্রমাৎ॥

আবার মৎস্য পুরাণের প্রতিমা-লক্ষণ-অধ্যায়ে রাম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, মৎস্য এবং কূর্মমূর্তির লক্ষণ বলা হলেও দুইজন রাম-বলরাম এবং পরশুরাম, তথা বুদ্ধ-কল্কি এখানে অনুল্লিখিত। *[মহা (k) ১২.২০৯.৩-৩৬; (হরি) ১২.২০৪.৩-৩৬; মৎস্য পু. ৪৭.৪১-৫৪; ২৮৫.৬-৭; ২৫৯.১-২, ১৫]*

□ মহাভারতের পরিশিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হরিবংশ পুরাণে একটি পূর্ণ অধ্যায়ের মধ্যে অবতার-গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রায় ভগবদ্গীতার অনুকরণে 'যদা যদা হি ধর্মস্য'—শ্লোকের প্রথম পংক্তির সঙ্গে 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়' যুক্ত করে শ্লোকের শেষ চরণে 'তদা সম্ভবতি প্রভুঃ'—তখন তাঁর জন্ম, হয়—এমনটাই বলা হয়েছে। তবে 'অবতার' কথাটির চেয়েও প্রাদুর্ভাব শব্দটি হরিবংশের বেশি পছন্দ—বার বার তাঁর 'অবতার' হয়, এটা হরিবংশে 'প্রাদুর্ভাব' অথবা 'সম্ভব' শব্দে উল্লিখিত—

বহুশঃ সর্বভূতাত্মা প্রাদুর্ভবতি কার্য্যতঃ।
প্রাদুর্ভাবাংশ্চ বক্ষ্যামি পুণ্যান্ দিব্যগুণৈর্যুতান্।

তবে অবতার গ্রহণের বিবরণ দেবার সময় আরম্ভটা হরিবংশে মৎস্যাবতার দিয়ে শুরু হয়নি। বরঞ্চ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রথম আভাসে সাগর-শয্যায় শয়ান বিষ্ণুর নাভিকমলে ব্রহ্মার আবির্ভাব এবং ব্রহ্মাকে আক্রমণোদ্যত দুই দানব মধু-কৈটভকে হত্যা করে প্রথম অবতার হিসেবে এখানে 'পুষ্কর' (নাভিকমল বা পৃথিবী) শব্দের রূপান্তরে হরিবংশে বলেছে—এটা তাঁর 'পৌষ্করক প্রাদুর্ভাব'—

পুষ্করে যত্র সম্ভূতা দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা॥
এষ পৌষ্করকো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।

এই 'পৌষ্করক' প্রাদুর্ভাবের পরেই অবশ্য বরাহ অবতারের প্রাদুর্ভাব বর্ণিত হয়েছে, বাদ গেছেন বিষ্ণুর কূর্মাবতার। বরাহের পরেই অনুক্রমে এসেছেন নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, জামদগ্ন্য পরশুরাম, দাশরথি রাম, তারপর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং অবশেষে কল্কী অবতার বর্ণনা করে হরিবংশের প্রাদুর্ভাব-তালিকা শেষ হচ্ছে, যদিও এই কয়টি অবতার-বর্ণনাতেই যে ভগবান বিষ্ণুর অসংখ্য প্রকাশ-বৈভবের কথা বলা যায় না—এই নিবেদন করে হরিবংশ বলেছে যে, সামান্য দিক্-নির্দেশ করার জন্য শুধু যাঁদের কথা না বললে নয়—কীর্তিতং কীর্তনীয়স্য—তাঁদের কথা বললাম, কিন্তু ভগবান শ্রীহরির দিব্যগুণযুক্ত আরও অনেক-অনেক প্রাদুর্ভাবের কথা বলা যায়—

এতে চান্যে চ বহবো দিব্যা দেবগুণৈর্যুতাঃ।
প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
এতদুদ্দেশমত্রেণ প্রাদুর্ভাবানুকীর্তনম্।
কীর্তিতং কীর্তনীয়স্য সর্বলোকগুরোঃ প্রভোঃ॥

[হরিবংশ ১.৪০.১-২২; ১.৪১.১৪-১৭২]

☐ অগ্নি পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ষোলো অধ্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন অবতারের বর্ণনায় মৎস্য থেকে কল্কি অবতারের বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে বর্ণিত হয়েছে একেকটি অধ্যায়ে। তাতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হলেও বামন, নৃসিংহ, পরশুরামের বর্ণনা অতিসংক্ষিপ্ত। কিন্তু রাম-অবতারের বিস্তার বেশ কয়েক অধ্যায় জুড়ে, কৃষ্ণ অবতারের বর্ণনাও অনেকখানি আছে এবং বুদ্ধ-কল্কি এই দুজনেই এখানে অবতার হিসেবে আছেন। আর লক্ষণীয়, 'দশাবতার' শব্দটা উচ্চারণ করলেও অবতারের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—

অবতারা অসংখ্যাতা অতীতানাগতাদয়ঃ।

[অগ্নি পু. ২-১৬ অধ্যায়]

☐ বিষ্ণুর দশাবতার সম্বন্ধে সবচেয়ে স্পষ্ট উক্তিটি আছে বরাহ পুরাণে—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দাশরথি রামচন্দ্র, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কী—এই দশ অবতার—

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহো'থ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥

বরাহ পুরাণের বিশেষত্ব হল, এখানে কৃষ্ণকে অবতার হিসেবে দশাবতারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সম্ভবত বাদ গেছেন বলরাম।

[বরাহ পু. (নবভারত) ৪.২]

☐ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভগবানের সম্পূর্ণ সত্তার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক বিভাগ তৈরি করে বলা হয়েছে যে, ভগবানের তৃতীয়া যে তনুটি, সেই তনুই প্রজা পালন করেন, ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থানে এই সত্ত্বগুণমণ্ডিতা তৃতীয়া তনুই অবতার গ্রহণ করে—

তৃতীয়া কর্ম কুরুতে প্রজাপালনতৎপরা।
সত্ত্বোদ্রিক্তা তু সা জ্ঞেয়া ধর্মসংস্থানকারিণী॥

এই 'ধর্মসংস্থানকারিণী' তনুর প্রসঙ্গে কূর্ম পুরাণ বরাহ, নৃসিংহ, বামনের উল্লেখমাত্র করে সিদ্ধান্ত দিয়েছে—এত সব অবতারের কথা আর বলতেই চাই না—এঁরা সব তাঁরই অবতার যিনি এখন মথুরায় কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন—

বামনাদীংস্তথৈবান্যান্ ন সংখ্যাতুমিহোৎসহে।
অবতারাংশ্চ তস্যেহ মাথুরঃ সাম্প্রতং ত্বয়ম্॥

বাসুদেব কৃষ্ণ কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে অবতার-মূল বা অবতারী হিসেবে কীর্তিত।

[মার্কণ্ডেয় পু. (নবভারত) ৪.৪৯-৫৬]

☐ ব্রহ্ম পুরাণে অবতার এবং অবতার-সংখ্যার কথাগুলি অনেকটাই হরিবংশের মতো। এখানেও মৎস্য-কূর্মের স্পষ্ট উপস্থিতি বর্ণনার মধ্যে আসেনি। আর শ্লোকগুলিও প্রায় হুবহু হরিবংশ থেকে নেওয়া। অবতার নাম-কীর্তনের সময় এই পুরাণে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে এসেছেন বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, জামদগ্ন্য পরশুরাম, দাশরথি রাম, মাথুর (অর্থাৎ কৃষ্ণ) এবং কল্কী। কিন্তু হরিবংশের মতোই বুদ্ধ নেই এই বৃহৎ তালিকায়। অবতারগুলির নাম উচ্চারণের শেষে হরিবংশের সেই বিনয়-বাক্যটিও হুবহু আছে—এ শুধু উদ্দেশ্য করার জন্য কীর্তনীয় প্রাদুর্ভাবগুলির কতগুলিমাত্র নাম উচ্চারিত হল, আসলে অবতারের সংখ্যা আরও অনেক বেশি—

এতদুদ্দেশমাত্রেণ প্রাদুর্ভাবানুকীর্তনম্।
কীর্তিতং কীর্তনীয়স্য সর্বলোকগুরোর্বিভোঃ॥

[ব্রহ্ম পু. ২১৩.১০-১৬৮]

☐ অবতার-নামের বৈচিত্র্য, অবতার-সংখ্যা এবং বিভিন্ন অবতারের উদ্দেশ্য নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভাবনা করেছে ভাগবত পুরাণ, যদিও এই ভাবনা আরও অনেক গভীর যৌক্তিকতায়, অনেক গভীর নৈপুণ্যে আলোচিত হয়েছে চৈতন্য পার্ষদ রূপ গোস্বামী এবং অন্যান্য চৈতন্যপন্থীদের রচনায়।

ভাগবত পুরাণে অবতারের সংখ্যা বাইশটি। ভাগবত পুরাণে প্রথম অবতার সাংখ্যদর্শনের পরিকল্পনায় সেই সাক্ষী-চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ, যিনি ত্রিগুণা প্রকৃতির মাধ্যমে মহৎ-অহঙ্কার ইত্যাদি বিকারের মাধ্যমে নিজেকে প্রথম প্রকট রূপ দান করেন—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান মহদাদিভিঃ।

পুরুষ-রূপের পর তিনি কুমার, যেখানে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু এই ব্রহ্মাও সাংখ্য-তত্ত্বের প্রথম প্রকৃতির বৈকারিক রূপ বলেই তিনি পুরুষ-রূপের বাইরে কোনো অবতার নন। এই কারণেই দ্বিতীয় অবতার হিসেবে 'শৌকর-বপু' বরাহ অবতারের

নাম এসেছে। তারপর একে একে নারদ, নর-নারায়ণ ঋষি, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্য, কমঠ (কূর্ম), ধন্বন্তরি, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, বেদব্যাস, দাশরথি রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি—এই বাইশটি অবতারের নাম উচ্চারিত হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে সত্ত্বগুণের আকর ভগবান শ্রীহরির অবতারের সংখ্যা করা যায় না। ভাগবত পুরাণের আর এক বৈশিষ্ট্য হল কৃষ্ণকে অবতার-সার এবং অবতার-মূল 'অবতারী' হিসেবে প্রমাণ করা। অর্থাৎ বিষ্ণু নন, কৃষ্ণ থেকেই সমস্ত অবতারের রূপ-পরিগ্রহ, তিনি অবতারের প্রভব, তাঁর থেকেই সমস্ত অবতারের সৃষ্টি, সমস্ত অবতারই ভগবান কৃষ্ণের অংশ—কৃষ্ণ হলেন 'অবতারলীলাবীজ'—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

[ভাগবত পু. ১.৩.১-২৮]

□ পদ্ম পুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে বিষ্ণুর অবতার-গ্রহণের ঘটনাগুলি একটি অভিশাপের সঙ্গে জড়িত। এখানে অবতারের সংখ্যা সাত এবং সাত বারের প্রত্যেক অবতারের মূলে আছে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের অভিশাপ। এখানে বলা হয়েছে—বামনরূপী বিষ্ণুর ছলনায় দৈত্যরাজ বলি যখন বামনের মায়াজালে বদ্ধ হলেন, তখন দানব-দৈত্যরা হীনবল হয়ে পড়লেন। এই সুযোগে দেবতাদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দানবদের ওপর। এদিকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তখন তপস্যায় বসেছেন মহাদেবের। যাতে তাঁর বর লাভ করলে অসুর-দানবদের বিজয়-সিদ্ধি ঘটে। দানব-দৈত্যরা দেবতাদের আক্রমণে বিপন্ন হয়ে শুক্রাচার্যের মায়ের কাছে গেলেন বিপন্মুক্তির জন্য। নিরুপায় হয়ে শুক্রজননী ঘোর-গভীর নিদ্রার এক মায়া তৈরি করলেন—

নিদ্রাং সা ব্যসৃজত্তদা।

দেবতাকুলের মধ্যে সর্বত্র ঘুমের ছায়া নেমে আসায় ভীত-সন্ত্রস্ত ইন্দ্র বিষ্ণুকে ব্যবস্থা নিতে বলেন শুক্রজননীর বিরুদ্ধে। স্ত্রীহত্যা ইত্যাদি পাপের কথা ভেবে ভগবান বিষ্ণু খানিক বিমূঢ় বোধ করলেও দেবকার্য সাধনের জন্য শেষ পর্যন্ত শুক্রজননীর মাথা কেটে ফেলেন চক্রক্ষেপণ করে। এদিকে তপস্যা ভেঙে দানবগুরু বিষ্ণুর এই অন্যায় দণ্ড সইতে না পেরে তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—তুমি এই অন্যায়ের কথাটা জানতে। জানতে যে, স্ত্রীলোককে বধ করার মতো পাপ আর নেই। অতএব জেনেশুনেও তুমি যখন এই কাজ করেছো, তখন আমার অভিশাপে সাত বার তুমি মানুষ হয়ে জন্মাবে পৃথিবীতে—

তস্মাত্ত্বং সপ্তকৃত্বো হি মানুষেষূপযাস্যসি।

এই অভিশাপকে কাজে লাগিয়েই ভগবান বিষ্ণুর সাতটি মনুষ্য-অবতার।

লক্ষণীয়, পদ্মপুরাণের এই অভিশাপের কাহিনী হুবহু ধরা আছে মৎস্য পুরাণে এবং তাতে এটাই মনে হয় যে, প্রাচীনতর মৎস্য পুরাণ থেকেই পদ্ম পুরাণের কাহিনীটি নেওয়া। আরও লক্ষণীয়, এখানে প্রথম তিনটি অবতারকে 'দিব্য সম্ভূতি' বা celestial incarnation বলা হয়েছে এবং সেই তিনের মধ্যে প্রথমে আছে 'যজ্ঞ'। মনে রাখতে হবে, যজ্ঞকে আমাদের শাস্ত্রীয় ভাবনায় সব সময়েই পুরুষ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে এবং বিষ্ণুকে বলা হয়েছে যজ্ঞপতি। এখানে ভাগবতের প্রথম অবতারের স্বরূপ যে পুরুষ, সেই পুরুষ যেন একাকার হয়ে যান যজ্ঞের সঙ্গে। এর পরেই তালিকায় এসেছেন নরসিংহ এবং বামন। এই তিন অবতার হলেন দিব্য অবতার—

এতাস্তিস্রঃ স্মৃতাস্তস্য দিব্যাঃ সম্ভূতয়ো দ্বিজাঃ।

আর শুক্রাচার্যের শাপগ্রস্ত হয়ে লোকহিতের জন্য বিষ্ণুর যে মনুষ অবতারগুলি, তাঁদের নাম হল—(১) দত্তাত্রেয়, (২) রাজচক্রবর্তী মান্ধাতা, (৩) জামদগ্ন্য পরশুরাম, (৪) দাশরথি রাম, (৫) বেদব্যাস, (৬) বুদ্ধদেব এবং (৭) বিষ্ণুযশার পুত্র কল্কী। এই একই তালিকা বায়ু পুরাণেও আছে এবং তার ভাষাও একই। তাতে মনে হয়—পদ্ম পুরাণের এই অংশ বায়ু পুরাণ অথবা মৎস্য পুরাণ থেকে নেওয়া। *[পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ১৩.২১৭-২৪৭; মৎস্য পু. ৪৭.২৩৭-২৪৮; বায়ু পু. ৯৮.৬৯-১১২]*

□ পদ্ম পুরাণের অবতার-কল্পনায় অভিশাপের একটা প্ররোচনা সব সময়েই কাজ করে। এখানে সৃষ্টিখণ্ডেই আর একটি কাহিনীতে লক্ষ্মীদেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভৃগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে। লক্ষ্মী নর্মদা নদীর তীরে নিজের নামে একটি নগরী তৈরি করে পিতা ভৃগুকেই দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সময়কালে সেই লক্ষ্মীর নামাঙ্কিত নগরীটি কন্যাকে আর ফেরত দিলেন না ভৃগু। লক্ষ্মী স্বামী হিসেবে ভগবান বিষ্ণুকে এই

ঘটনা জানিয়ে বিষ্ণুকে প্ররোচিত করেন ভৃগুর সঙ্গে কথা বলার জন্য। বিষ্ণু নিরুপায় হয়ে বারবার ভৃগুকে বলতে থাকেন স্ত্রীর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে। বিরক্ত ক্রুদ্ধ ভৃগু এই উপরোধে এতই রেগে গেলেন যে, তিনি বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন—তোমাকে মর্ত্যে গিয়ে দশবার জন্ম নিতে হবে এবং দশ বার স্ত্রী-বিরহ সহ্য করতে হবে—

নৃলোকে দশ জন্মানি লপ্স্যসে মধুসূদন।
ভার্য্যায়াস্তে বিয়োগেন দুঃখান্যনুভবিষ্যসি॥

বিষ্ণুর দশ জন্ম মানে বিষ্ণুর দশাবতার। পদ্ম পুরাণের ভূমিখণ্ডেও পুনরায় দশ অবতারের কথা এসেছে এবং এখানেও কাজ করেছে ভৃগুর অভিশাপ, যদিও ঘটনাটা আলাদা। এখানে ভৃগু একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। ভগবান শ্রীহরি ভৃগুমুনির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই যজ্ঞ রক্ষা করবেন বলে। এদিকে দানব-দৈত্যদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ লাগায় ইন্দ্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিষ্ণু চলে গেলেন যুদ্ধের সহায়তা করতে। ভৃগুমুনির যজ্ঞ রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেও তিনি চলে গেলেন—

ইন্দ্রস্য বচনাৎ সদ্যো গতো'সৌ দানবৈঃ সহ।
যোদ্ধুং বিহায় গোবিন্দো ভৃগোশ্চৈব মখোত্তমম্॥

যজ্ঞে আহূত দেবতারা যজ্ঞ ছেড়ে চলে গেছেন অথচ বিষ্ণু কথা দিয়েও কথা না রেখে তাঁদের সঙ্গেই চলে গেছেন দেখে দানবরা ভৃগুর যজ্ঞ নষ্ট করে দিলেন। তখন ভৃগু অভিশাপ দিলেন বিষ্ণুকে—

দশ জন্মানি ভুঙ্ক্ষ ত্বং মচ্ছাপকলুষীকৃতঃ।
কর্মণঃ স্বস্য সম্ভোগং সম্ভোক্ষ্যতি জনার্দনঃ॥

অর্থাৎ বিষ্ণু তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে যে অন্যায় কাজ করেছেন তার ফল ভুগতে হবে তাঁকে। আমার অভিশাপে কলুষিত হয়ে তাঁকে সত্যলোকে দশবার জন্ম নিতে হবে।

[পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ৪.৮৭-১০৪;
পদ্ম পু. (ভূমি) ১২১.৪-৮]

□ পদ্ম পুরাণের ভূমিখণ্ডে বিষ্ণুর সঙ্গে দেবজননী অদিতিরও অবতরণের সংবাদ পাচ্ছি। এক সময় দেবতাদের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণু দেবমাতা অদিতির সঙ্গে দেখা করলেন। প্রসন্ন বিষ্ণু অদিতিকে বর দিতে চাইলে তিনি বলেন—তোমার প্রসাদে আমি তো অজর অমর দেবতাদের পুত্র হিসেবে পেয়েছি, কিন্তু এবার তোমাকে আমি পুত্র হিসেবে পেতে চাই। বিষ্ণু অদিতিকে বর দিয়ে বললেন—দেবকার্য-সাধনের জন্য আপনি মানবী হয়ে জন্মাবেন, তখন আমি আপনার পুত্র হয়ে জন্মাবো। এই সূত্রে পরশুরাম, দাশরথি রাম এবং বাসুদেব কৃষ্ণের অবতার-গ্রহণের কথা উচ্চারণ করেন বিষ্ণু।

[পদ্ম পু. (ভূমি) ৫.৫৬-৬৫]

□ দুষ্টের দমন কিংবা শিষ্টের পালন অথবা এক কথায় ভূভারহরণ যাই হোক না কেন ভগবান বিষ্ণুর এই অবতরণ-প্রক্রিয়া বিষ্ণুর নিজ কর্ম জগতের স্থিতি-পালন-হিতের জন্য—এ-কথাটা মহাভারত-পুরাণ-রামায়ণ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত এবং তার সূত্রগুলি অনেক আগে থেকেই আছে অহির্বুধ্ন্যসংহিতার মতো প্রাচীন গ্রন্থে অবতার-শব্দটা উচ্চারণ না করে পরম পুরুষের 'বিভব' বা ঐশ্বর্য্য বলে ঊনচল্লিশটি বিভূতি কল্পনা করা হয়েছে—

বিভবাঃ পদ্মনাভাদ্যাস্ত্রিংশচ্চ নব চৈব হি।

এই তালিকায় ধ্রুব, অনন্ত, আদিদেব বিধি, কপিল এবং বিহঙ্গম গরুড় যেমন আছেন, তেমনই বরাহ (কমঠেশ্বর) অবতার আছেন ষোলো নম্বর অবতারে, নরসিংহ সতেরো নম্বরে। মৎস্য অবতার প্রায় সর্বত্র প্রথম অবতার হিসেবে কল্পিত হলেও অহির্বুধ্ন্যের তালিকায় তিনি 'একশৃঙ্গতনু' নামে আটাশ নম্বরে আছেন। অবশ্য ঊনত্রিশেই বামন অবতার। কৃষ্ণ এই তালিকায় চৌত্রিশতম 'বিভব', পরশুরাম পঁয়ত্রিশে আছেন, দাশরথি রাম ছত্রিশে, আর কল্কী আছেন আটত্রিশ নম্বরে, কিন্তু বুদ্ধের নাম নেই এখানে। *[অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা ১ম খণ্ড ৫.৫০-৫৭]*

□ প্রাচীন পঞ্চরাত্র গ্রন্থ অহির্বুধ্ন্য-সংহিতার এই ঊনচল্লিশটি 'বিভব', যাকে অবতার বলতে অসুবিধে নেই আমাদের, সেই বিভবের সংখ্যা এবং গীতোক্ত সেই বাণী—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।

যেখানেই সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বলের আতিশয্য এবং ঈশ্বরে বিভূতি প্রকট দেখা যায়, সেখানেই পরম ঈশ্বরের তেজ আংশিকভাবে প্রকাশিত—এই মহান তত্ত্ব থেকে বুঝতে পারি অবতার বলতে শুধু পরম ঈশ্বরের মনুষ্যরূপে অবতরণ বোঝায় না, অবতরণ বস্তুত পরম ঈশ্বরের

লীলায়িত হওয়ারও প্রক্রিয়া। মহাভারতের আরম্ভে 'অংশাবতরণপর্ব' নামে একটি উপপর্ব আছে, সেখানে কৌরব-পাণ্ডব থেকে আরম্ভ করে তাঁদের পূর্বপুরুষ, জ্ঞাতিগুষ্টি সকলেই হয় দেবতাদের নয়তো মহা-মহা-অসুরদের অংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এটাও একটা তর্ক বটে যে, 'অবতারলীলাবীজ' কৃষ্ণ মনুষ্যরূপে জন্মাবেন বলেই দেবতা-অসুরদের অংশেও পাণ্ডব-কৌরবরা সকলে জন্মেছেন। এমনকী মহাভারতের এক জায়গায় কৃষ্ণ এবং বলরাম নারায়ণের কেশাবতার বলে কীর্তিত হচ্ছেন। এখানে ভগবন্নারায়ণ নিজের মাথা থেকে একটি শুক্লকেশ এবং একটি কৃষ্ণকেশ ছিঁড়ে ফেলে দিলে শুক্লকেশটি বসুদেবের এক স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করে, আর কৃষ্ণ কেশ প্রবেশ করে দেবকী উদরে। আবির্ভাব ঘটে বলরাম এবং কৃষ্ণের—

তৌ চাপি কেশৌ নিবিশেতাং যদূনাং
কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥
তয়োরেকো বলদেবো বভূব।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব॥

আমরা রামায়ণেও দেখেছি, দেবতাদের অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু যখন দশরথের ঘরে জন্মাবেন বলে ঠিক করলেন, তখন ব্রহ্মা দেবতাদের বিষ্ণুর সহায়তা করার জন্য বানররূপে মর্ত্যভূমিতে জন্মাতে বললেন—

সৃজধ্বং হরিরূপেণ পুত্রাংস্তুল্যপরাক্রমান্।

তারপরেই দেখতে পাচ্ছি, ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্র, সূর্য, কুবের, বিশ্বকর্মা, বরুণ, বায়ু সকলেই বানর হয়ে জন্মাচ্ছেন। অনুরূপভাবে ভাগবত পুরাণে দেবতাদের এবং ব্রহ্মার অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু যখন বসুদেবের ঘরে পূর্ণ অবতার হবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন ব্রহ্মা দেবস্ত্রীদেরও মনুষ্যরূপী বিষ্ণুর প্রিয়সাধনের জন্য মর্ত্যে জন্ম নেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন—

জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিষ্ণুর যখনই অবতার হয়, তখন তাঁর লীলা-সহায় হিসেবে শ্রী বা লক্ষ্মীরও অবতরণ ঘটে।

[মহা (k) ১.১৯৭.৩৩; ১.৬৭ অধ্যায়;
(হরি) ১.১৯০.৩৩; ১.৬২ অধ্যায়;
রামায়ণ ১.১৭ অধ্যায়; ভাগবত পু. ১০.১.২৩]

☐ বিষ্ণু দশ অবতারের কাহিনীর জনপ্রিয়তা এতটাই যে, জয়দেব কবির গীতগোবিন্দে দশাবতারস্তোত্র এবং ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার-চরিত্রে বিষ্ণুর দশ অবতার চরিত্র একেবারে বিখ্যাত হয়ে আছে—

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহঃ পুরুষহরি
হরিবপুর্বামনো জামদগ্ন্যঃ।
কাকুৎস্থঃ কংসহন্তা স চ সুগতমুনিঃ
কর্কিনামা চ বিষ্ণুঃ।

লক্ষণীয়, ক্ষেমেন্দ্রের তালিকায় বলরামের নাম নেই, কিন্তু কংসহন্তা কৃষ্ণ আছেন, আর জয়দেবের গীতগোবিন্দে দশাবতার-স্তোত্রে বলরাম, বুদ্ধ, কল্কিও আছেন, কিন্তু কৃষ্ণের নাম নেই। কৃষ্ণ এখানে অবতার-বীজ—

'কেশবো ধৃতো দশবিধরূপঃ'।

তাঁর থেকেই দশ অবতার, কৃষ্ণই এখানে 'দশাকৃতিকৃৎ'—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলংকলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে
কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

[Jayadeva's Gitagovinda, Ed. Barbara Stoler Miller, p. 131; The Dasavataracharita of Kshemendra, (Durgaprasad & Parab), 1.2;
পঠিতব্য: Nicholas Sutton, Religions Doctrines in the Mahabharata;
G. Parrinder, Avatar and Incarnation;
J.L. Brockington, Righteous Rama, Delhi;
Rajendra Chandra Hazra, 'The Smriti Chapters in the Puranas'
In Indian Historical Quarterly, Vol. XI, 1935. pp. 120-127]

অবধূত$_১$ বারাণসীতে অবস্থিত তীর্থস্থান। এর পশ্চিমদিকে পশুপতীশ্বর লিঙ্গের অবস্থান।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৯৩]

অবধূত$_২$ ভাগবত পুরাণে প্রাপ্ত পুরঞ্জন রাজার উপাখ্যানে অবধূত শব্দটি মূলত ঘ্রাণশক্তির রূপক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৪.২৫.৪৮; ৪.২৯.১১]

অবধূত$_৩$ জনৈক ঋষি। যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু

অবধূতের কাছ থেকে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ১১.৭ অধ্যায়]

অবধূত$_{৪}$ যিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের কোনো নিয়ম-নীতি অনুসারে চলেন না, অথচ সংসারে তাঁর আসক্তি নেই, তাঁর বৈরাগ্য-ভাবের মধ্যেও এক ধরনের যথেচ্ছতা আছে, অথচ তিনি যোগী এবং সর্বদা অন্তরাত্মায় আত্মসাক্ষাৎকার করছেন, এই ধরনের উত্তম সাধককে অবধূত বলা হয়—

যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতি বর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥

অবধূত-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় এবং ধাতুমূল অনুসন্ধান করলে এমনিতেই অর্থ দাঁড়ায়—যিনি সমস্ত কিছু অতিক্রম করেছেন। সেই অর্থটি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জুড়ে অবধূতের প্রচলিত সংজ্ঞা হল—যাঁর কোনো ক্ষয়-বিচ্যুতি নেই—(অ)ক্ষরত্বাৎ, যিনি বরেণ্য—(ব) রেণ্যত্বাৎ, যাঁর সংসারবন্ধন দূরনিক্ষিপ্ত হয়েছে—(ধূ)তসংসারবন্ধনাৎ, এবং যাঁর মধ্যে 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রের ব্রহ্মাদ্বয়ী ভাবনা আত্মভূত হয়েছে—(ত)ত্ত্বমস্যসিদ্ধত্বাৎ, তিনিই অবধূত—

অক্ষরত্বাদ্ বরেণ্যত্বাদ্ ধূতসংসারবন্ধনাৎ।
তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাদ্ অবধূতো'ভিধীয়তে॥

[বাচস্পত্য অভিধান, দ্র. অবধূত, পৃ. ৪২৮; শ্রীমদ্ভাগবতম্, (বিজনবিহারী গোস্বামীকৃত অনুবাদ, ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত), ৫.৫.২৯, পৃ. ৮২:তথ্য]

☐ ভাগবত পুরাণে ভগবদবতার-স্বরূপ ঋষভদেবকে আমরা অবধূত-বেশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে দেখছি। এই অবধূতের বহিরঙ্গ চেহারা জড়, অন্ধ, বধির, মূক, পিশাচের মতো, আচরণ উন্মাদের মতো—

জড়ান্ধ-মূক-বধির-
পিশাচোন্মাদবদ্ অবধূত-বেশঃ।

ঋষভদেব পুর-নগর, গ্রাম, বন, পর্বত সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর আচার-আচরণ, বেশ দেখে সাধারণ মানুষ তাঁকে উন্মাদ মনে করছিল। তারা তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিল, তাঁর দিকে ইঁট-পাথর ছুঁড়ছিল, গায়ে ধুলো ছড়িয়ে দিচ্ছিল, এমনকী গায়ে থু-থু দেওয়া প্রস্রাব করার মতো জঘন্যতাও বাদ গেল না, কিন্তু ঋষভদেব নির্বিকার রইলেন। নিজের দেহে 'আমি-আমার' এমন কোনো দেহাত্মবুদ্ধি তাঁর ছিল না বলেই ঋষভদেব অক্ষুব্ধ চিত্তে পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে থাকলেন—

স্বমহিমাবস্থানেন
অসমারোপিতাহংমমাভিমানত্বাদ্
অবিখণ্ডিতমনাঃ পৃথিবীমেকচরঃ পরিবভ্রাম।

অবধূতের এই চেহারা এই স্বভাব। বৈরাগ্য-সাধনা এবং আত্মজ্ঞানের চরম অবস্থায় অবধূত সন্ন্যাসীর মধ্যে পরমহংস মুনির লক্ষণ দেখা যায়। ঋষভদেব অবধূত বেশে এই জগৎকে সমস্ত জাগতিক লোভ-তৃষ্ণা, হিংসা-দ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে কীভাবে অধিকারী রাখতে হয়, এই 'পারমহংস্য ধর্ম' শিক্ষা দেবার জন্যই পৃথিবী পর্যটন করছিলেন। *[ভাগবত পু. ৫.৫.২৮-৩৫]*

☐ ভাগবত পুরাণে আমরা মহামতি বিদুরকে দেখেছি, তিনিও অবধূত বেশে পর্যটনে বেরিয়ে পড়েছেন, সংসার-জীবনে ক্লান্ত হয়ে। তিনি মাটিতে শয়ন করেন, প্রতি তীর্থে স্নান করেন, কিন্তু অবধূতের মতো অসংস্কৃত দেহে বিচরণ করেন—

সদাপ্লুতো'ধঃশয়নো'বধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশঃ।

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, বিদুর সার্থক-সংজ্ঞায় অবধূত নন বটে, কিন্তু অবধূতের বেশ ধারণ করেছেন আপাতত, আর কিছু কিছু আচরণও তাঁর অবধূতের মতো। কিন্তু তিনি পুরোপুরি অবধূত নন। ভাগবত পুরাণের একাদশে আরও এক অবধূতের সঙ্গে দেখা হচ্ছে যযাতিপুত্র যদুর। তিনি এমনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু আচার-আচরণে তিনি সম্পূর্ণ অবধূত। যদু তাঁকে দেখে বলছেন—আপনি তো বালকের মতো পরিব্রাজন করছেন—

যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ।

যদু আরও বললেন—আপনার শারীরিক সামর্থ্য আছে, আপনি জ্ঞানী, আপনাকে দেখলে সমস্ত কর্মে নিপুণ মনে হয়, আপনি যেমন সুন্দর তেমনই মধুর কথা বলেন। অথচ এমন মানুষ হলেও আপনি জড়, উন্মত্ত এবং পিশাচের মতো থাকেন, কোনো কাজও করেন না, কাজের চেষ্টা করে তা সম্পন্নও করেন না। অথচ আপনার কোনো কষ্ট, যন্ত্রণা নেই, আপনি হৃদয়ের মধ্যে অনন্ত আনন্দ নিয়ে কেমন করে বসে আছেন—

ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগো'মৃত ভাষণঃ।
ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিদ্‌জড়োন্মত্ত-পিশাচবৎ॥

যদুর কাছে প্রশ্ন শুনে অবধূত এবার বললেন—আমার শিক্ষার স্থল অনেক। আমি এই উন্মুক্ত প্রকৃতির কাছে শিক্ষা নিয়েছি, এই জগৎ এবং জীবনের মধ্যে আমার চব্বিশ জন গুরু। এই পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর, হস্তী, মধুহরণকারী ব্যাধ, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুরর-পক্ষী, বালক, কুমারী, শর-প্রস্তুতকারী, সর্প, উর্ণনাভ (মাকড়সা), কাঁচ পোকা—এই চব্বিশ জন আমার গুরু—

পৃথিবী-বায়ুরাকাশমপো'গ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতো'জগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্‌গজঃ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররো'র্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষা-বৃত্তিভিরেতেষাম্ অন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥

[ভাগবত পু. ৩.১.১৯; ১১.৭.২৫-৩৫]

□ উপরি উক্ত শ্লোকগুলিতে অবধূত চব্বিশ জন গুরুর কাছ থেকে যেমন শিক্ষা পেয়েছেন, তেমনই তাদের বৃত্তিও গ্রহণ করেছেন। এই শিক্ষা এবং বৃত্তি নিয়ে পর পর কয়টি অধ্যায় রচিত হয়েছে, যা বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের কাছে অসামান্য সম্পদের মতো। প্রধানত অবধূত-সংবাদ বলে সেগুলি ব্যাখ্যাত হয়। পৃথিবী-বায়ু-আকাশ থেকে আরম্ভ করে সাপ-মাকড়সাও এখানে শিক্ষাগুরু—যে শিক্ষা একজন অবধূত সন্ন্যাসীর জীবন গড়ে তোলে। এই চব্বিশ শিক্ষাগুরুর মধ্যে কপোত এবং অজগরের বৃত্তির কথা মহাভারতে খুব গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। মহাভারত স্পষ্ট করে অবধূত সাধুর কথা খুব বেশী করে বলেনি, কিন্তু আজগর-বৃত্তি অথবা কাপোতিক বৃত্তি নিয়ে মহাভারতে যথেষ্টই আলোচনা আছে। অন্যদিকে অবধূতের আচরণে বারবার এই আজগর বৃত্তি এবং কাপোতিক বৃত্তির উল্লেখ থাকায় আমরা বুঝতে পারি যে, মহাভারত অবধূত সন্ন্যাসীর কথাই জানাচ্ছে। কেননা অবধূতের মধ্যে যেসব গুণ, যেসব বৃত্তি আছে, সেগুলিই বলা আছে মহাভারতের আজগর মুনির জীবনচর্যায় এবং বক্তব্যে।

মহাভারতে দৈত্যকুলপতি প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণের সন্ধান পেয়েছেন, সে ব্রাহ্মণকে তিনি দেখছেন 'চরন্তম্', অর্থাৎ তিনি যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রহ্লাদ তাঁকে বলছেন—'কল্পচিত্ত', যার অর্থ নীলকণ্ঠ বলেছেন—'দৃঢ়চিত্ত'—কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। আমাদের মনে হয়—'কল্পচিত্ত' মানে বহু বিকল্পের সমবায় আছে যে চিত্তের মধ্যে, অথচ সে চিত্ত সার্বিক ভাবেই নিরপেক্ষ, এ জগতে কোনো কিছুর অপেক্ষা নেই, হয়তো বা দৃঢ়চিত্তের তাৎপর্য্য এইখানেই। লক্ষণীয়, ভাগবত পুরাণে যে অবধূত ব্রাহ্মণকে যদু চরমনি অবস্থায় দেখে বলেছিলেন—আপনার আচরণ বালকের মতো, মহাভারতে আজগর-বৃত্তি ব্রাহ্মণকে দেখে প্রহ্লাদও কিন্তু মন্তব্য করেছেন—আপনি আত্মস্থ, শুদ্ধচিত্ত, কোমলস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী, নিশ্চেষ্ট, অসূয়াবিহীন, মধুরভাষী, চতুর, মেধাবী, বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও বালকের মতো বিচরণ করছেন, এটা আশ্চর্য বটে—

স্বস্থঃ শুদ্ধো মৃদুর্দান্তো নির্বিধিৎসো'নসূয়কঃ।
সুবাক্ প্রগল্‌ভো মেধাবী প্রাজ্ঞশ্চরসি বালবৎ॥

আমাদের কাছে আশ্চর্য এটাই যে, মহাভারতে আজগর মুনির সম্বন্ধে এই বক্তব্য ভাগবত পুরাণে মহাত্মা যদুর দেখা সেই অবধূত ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলে যায়। অবধূতের লক্ষণ খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে মহানির্বাণতন্ত্র নামক গ্রন্থে। এখানে বলা আছে যে, এঁদের বহিরাকৃতির মধ্যে কোনো সুসংস্কৃত ভাব থাকে না—কখনো এলোমেলো চুল, কখনো জটাজুটধারী, শরীরও অপরিষ্কার, কোনো নিয়মের ধার ধারেন না। কিন্তু অন্তরে এঁরা যোগী পুরুষ এবং ঠিক ততটাই নির্দ্বন্দ্ব এবং স্থিতধী, যেমনটা মহাভারতের বর্ণনায় আজগর মুনি এবং ভাগবত পুরাণের অবধূত।

[ভাগবত পু. ৫.৫.২৮-২৯; ১১.৭.২৬-২৮;
মহা (k) ১২.১৭৯.২-৪; (হরি) ১২.১৭৩.২-৪;
মহানির্বাণ তন্ত্র ১৪.১৪২-১৪৮;
শব্দকল্পদ্রুম, 'অবধূত', পৃ. ১২৫]

□ মহাভারতে অবধূত মুনির নামই আজগর এবং অজগর-বৃত্তি থেকেই তাঁর এই নাম। তাঁকে দেখে প্রহ্লাদ বলছেন—আপনি তো কিছু চানও না আবার কিছু না পেলে অনুশোচনাও করেন না, দেখে মনে হয় সর্বদাই আপনি তৃপ্ত আছেন। ধর্মকার্যের কোনো অনুষ্ঠান করেন না, অর্থলাভেরও চেষ্টা করেন, কামনা-বাসনাতেও

উদাসীন। তাহলে আপনার জ্ঞান, অধ্যয়ন এবং বৃত্তি কী?

আজগর মুনি প্রথমে ব্রহ্মদর্শনের কথা বলেই নিজে কীভাবে থাকেন, সেই বিষয়ে বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন—কখনো আমি ঈশ্বরেচ্ছায় প্রচুর খাই, আবার কখনো বহু দিন না খেয়ে থাকি। কখনো খুদের কণা জোটে, কখনো তিলের খোল খেয়ে থাকি, কখনো শালিধানের ভাত, আবার কখনো নানা প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্যও খেয়ে থাকি। কখনো খাটে শুই, কখনো মাটিতে, কোনো সময় আবার অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে থাকি। কখনো কৌপীন পরিধান, কখনো শণ দিয়ে তৈরি বস্ত্র, কখনো পট্টবস্ত্র আবার কখনো পশুচর্মও পরিধান করি। কোনো ভোগ্য বস্তু যদৃচ্ছাক্রমে এসে গেলে আমি প্রত্যাখ্যান করি না, আবার দুর্লভ কোনো ভোগ্য বস্তু প্রার্থনাও করি না। এইভাবেই আমি অজগর-ব্রত আচরণ করি। এই ব্রতে ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং পেয় বস্তুর নিয়ম নেই, তাতে স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্য দুইই হতে পারে। কিন্তু দেহাবেশ না থাকায় কোনো সমস্যাও হয় না। বৈরাগ্য, যোগাভ্যাস এবং জিতেন্দ্রিয়তা এবং মানসিক পবিত্রতা তথা সর্বত্র সমবুদ্ধি এই অজগর ব্রতের মূল নিদান। সর্প যেহেতু যদৃচ্ছায় উপস্থিত বস্তুই ভোগ করে, সেইভাবেই রাগ, মোহ, ভয়, দর্প সব ত্যাগ করে ধৈর্য্য মনন এবং জ্ঞানের মাধ্যমে আমি অজগর ব্রত পালন করি, অথচ সর্বদাই হৃষ্ট বোধ করি এবং আমি সর্বদাই শুচি-কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নেই আমার—

অনিয়তশয়নাশনঃ প্রকৃত্যা/
দম-নিয়ম-ব্রত-সত্য-শৌচযুক্তঃ।
অপগতফল-সঞ্চয়ঃ প্রহৃষ্টো/
ব্রতমিদমজগরং শুচিশ্চরামি॥

মহাভারতে এই আজগর-বৃত্তির সঙ্গে অবধূত-স্বভাবের বহু মিল আছে, যদিও অজগর-বৃত্তিতে 'শয়নাশন' বা খাওয়া-শোয়ার অনিয়মটাই প্রধান হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন মহাভারতের কাপোতীবৃত্তি—যেখানে কপোত বা পায়রার মতো কৃষকের বর্জিত ধান্যক্ষেত্র থেকে খুঁটে খেয়ে তৃপ্ত থাকাটাও প্রধান 'শয়নাশনের' নিরপেক্ষতার মধ্যে পড়ে। কিন্তু অবধূতের স্বভাব যেন আরও বেশী গভীর মহিমায় চিহ্নিত। অবধূতের অনিয়মিত বিশৃঙ্খল জীবনের মধ্যে যে শাস্ত্রীয় অনাচার তথাকথিতভাবে লক্ষিত হয়, সেটার মধ্যে কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের চরম পর্যায়ের ইঙ্গিত দেয়—এবং সেই পর্যায় উপলক্ষিত হয় পূর্বকৃত কঠিন সাধনা এবং ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের মহিমায়।

[মহা (k) ১২.১৭৯.৩-৩২; ১২.২৪৩.৩, ২৪; ১৪.৯০.২৪-৮৪; (হরি) ১২.১৭৩.৩-৩২; ১২.২৪০.৩, ২৪; ১৪.১১৩.২৪-৮৪]

অবধ্য উত্তম মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে প্রতর্দন একটি গণ। অবধ্য এই প্রতর্দন গণের অন্তর্ভুক্ত একজন দেবতা। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩০]*

অবন্তিকা একটি পবিত্র পিতৃতীর্থ।

[মৎস্য পু. ২২.৩৩]

অবন্তী$_{১}$ মালব দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী ছিল অবন্তী। একে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী বলা হয়েছে। এখানে পবিত্র শিপ্রা নদী প্রবাহিত, এবং শ্রীহরি এখানে গোবিন্দস্বামী নামে বিরাজ করছেন। *[ব্রহ্ম পু. ৪৩.২৪, ৭৫-৭৭]*

□ পুরাণে অবন্তী নগরীর দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। সুদৃশ্য, ঐশ্বর্যশালী এবং সুরক্ষিত এই নগরীতে বসবাসকারীরা চেহারায় অতি সুন্দর ও উৎফুল্ল স্বভাবের ছিলেন। এখানে ছিল সু-উচ্চ তোরণ, প্রশস্ত পথ-ঘাট, মনোরম বন-উপবন এবং অসংখ্য সুসজ্জিত প্রাসাদ। বিদ্বান ও গুণীজনের আবাস ছিল অবন্তী। এই নগরীতে একাধিক মন্দির দেখা যেত। মহাদেব এখানে মহাকাল নামে বিরাজ করেন। বলা হয়, এই মহাকালরূপী শিবের পূজা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। এই নগরীর আরেক নাম উজ্জয়িনী।

[ব্রহ্ম পু. ৪৩.১-৭০, ৮৯]

□ অবন্তী নগরী বহু নামে পরিচিত ছিল। নারদ পুরাণ অনুযায়ী অবন্তীর অন্যান্য নামগুলি হল—বিশালা, অমরাবতী, কুশস্থলী, কণকশৃঙ্গ, পদ্মাবতী, কুমুদ্বতী ইত্যাদি।

[নারদ পু. (মহর্ষি) ২.৭৮.৩৫-৩৬]

□ স্কন্দ পুরাণেও এই নগরীর একাধিক নাম পাওয়া যায়। যেমন—কনকশৃঙ্গা, কুশস্থলী, পদ্মাবতী এবং উজ্জয়িনী।

"কথং কনকশৃঙ্গেতি খ্যাতা হ্যেষা পুরা মনে॥
কুশস্থলীং কথং নাম তথাবন্তী কথং স্মৃতা।
পদ্মাবতী কথং সাধো কথমুজ্জয়িনী তথা।"

[স্কন্দ পু. আবন্ত্য. (অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য) ৪০.৪-৫]

☐ স্কন্দ পুরাণ থেকে জানা যায় এই নগরীর আদিতম নামটি ছিল কনকশৃঙ্গা, পুরাকালে মণিমুক্তা শোভিত এবং সোনার শৃঙ্গ বিশিষ্ট বহু প্রাসাদ এখানে দেখা যেত। তা থেকেই এই নগরীর এইরকম নামকরণ।

[স্কন্দ পু. আবন্ত্য. (অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য) ৪০.২২, ৩১]

☐ আবার বেদজ্ঞ মনীষীরা তৎপুরুষকল্পে অবন্তীর নামকরণ করেছিলেন কুশস্থলী।

"স্তীর্ণা কুশৈর্যতো ধাত্রা কুশস্থলী ততঃ স্মৃতা ॥"

বিধাতা এখানে কুশ ছড়িয়েছিলেন বলে এর নাম কুশস্থলী।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য) ৪১.১, ৩২]

☐ 'অবন' অর্থ পালন। দেবতা, এবং সমস্ত প্রাণীরই এই নগরীতে 'পালন' ঘটে বলে সমস্ত কল্পেই এই নগরীর নাম অবন্তী।

"দেবতীর্থৌষধি-বীজ-ভূতানাং চৈব পালনম্।
কল্পে কল্পে চ যস্যাং বৈ তেনাবন্তী পুরী স্মৃতা।"

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য) ৪২.৪১-৪২]

☐ মহাদেব, ত্রিপুর নামে এক দানবকে জয় করে এই স্থানটিকে ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ করে তুলেছিলেন বলেই ঋষিগণ ও দেবতারা স্থানটিকে উজ্জয়িনী নামে ভূষিত করেন।

"উজ্জিতো দানবো যস্মাত্ ত্রৈলোক্যে
স্থাপিতং যশঃ।
তস্মাৎসর্বৈঃ সুরশ্রেষ্ঠৈ ঋষিভিঃ সনকাদিভিঃ॥"

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র মাহাত্ম্য) ৪৩.৫৩]

☐ পদ্মপুরাণ মতে এই নগরী সর্বকালে পদ্মা বা লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল। তা থেকেই এর নাম পদ্মাবতী।

"তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু পদ্মা বসতু নিশ্চলা।
অদ্যপ্রভৃতি পূরেষা পদ্মাবতীতি চ স্মৃতা॥"

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য) ৪৪.৩৪]

☐ অগ্নিপুরাণে অবন্তীকে 'পাপনাশিনী' তীর্থরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *[অগ্নি পু. ১০৯.২৪]*

☐ ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকে নর্মদা যেখানে পশ্চিমবাহিনী, তার তীরে অবন্তী অবস্থিত একথা মহাভারতে বলা হয়েছে। এখানে অবশ্য 'আনর্ত' বলে একটি পাঠ আছে কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ 'অবন্তীষু'কেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন।

[মহা (k) ৩.৮৯.১-২; (হরি) ৩.৭৪.১-২]

☐ বিরাট পর্বে অর্জুন কুরুরাজ্যের নিকটবর্তী সুন্দর জনপদগুলির নাম উল্লেখ করার সময় অবন্তীর কথাও বলেছিলেন।

[মহা (k) ৪.১.১২-১৩; (হরি) ৪.১.১১-১২]

☐ এছাড়া ভীষ্মপর্বেও অবন্তীনামের জনপদটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা ৬.৯.৪৪; (হরি) ৬.৯.৪৬]

☐ সভাপর্বে বলা হয়েছে সহদেব, কুন্তিভোজকে জয় করে সামান্য দক্ষিণে গিয়ে অবন্তীদেশীয় দ্বৈরাজ্যক শাসক বিন্দ ও অনুবিন্দকে জয় করেন।

"বিন্দানুবিন্দাবাবন্তৌ সৈন্যেন মহতা বৃতৌ।
জিগায় সমরে বীরাবাশ্বিনেয়ঃ প্রতাপবান॥"

[মহা (k) ২.৩১.১০; (হরি) ২.৩০.১০]

☐ মাদ্রীপুত্র সহদেব একবার দক্ষিণ অবন্তীর রাজধানী মাহিষ্মতী আক্রমণ করেছিলেন এবং সেখানকার রাজা নীলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। মহাভারতে এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। অগ্নির বরে কোনো রাজা মাহিষ্মতী জয় করার চেষ্টা করলেই দগ্ধ হতেন। সহদেবও সেই চেষ্টা করায় অগ্নি তাঁর সৈন্যদলকে ভস্মীভূত করতে শুরু করেন। তখন সহদেব তাঁর সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য মাটিতে কুশ বিছিয়ে তার উপর বসে অগ্নির স্তুতি করেন এবং অগ্নি তাতে তুষ্ট হলে সহদেব শেষ পর্যন্ত অগ্নির দহন-ক্রিয়া রোধ করতে সমর্থ হন। অগ্নি তাঁকে অতিক্রম করতে না পেরে তাঁর সৈন্যদের প্রাণদান করেন। পরে অগ্নির আদেশ মত রাজা নীল, সহদেবের পূজা করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

[মহা (k) ২.৩১.২১-৪৮; (হরি) ২.৩০.২০-৫৮]

☐ ভাগবত পুরাণেও একাধিকস্থানে অবন্তীর উল্লেখ রয়েছে। *[ভাগবত পু. ১১.২৩.৬, ৩১]*

☐ বাসুদেব কৃষ্ণ অবন্তীপুরনিবাসী সান্দীপনি ঋষির কাছে শিক্ষালাভ করতে গিয়েছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৪৫.৩১; ব্রহ্ম পু. ১৯৪.১৯]

☐ বৌদ্ধযুগে অবন্তী যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। একাধিক বৌদ্ধ গ্রন্থে অবন্তীর উল্লেখ রয়েছে। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর লেখায় অবন্তীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে তিনি অবন্তীনগরে গিয়েছিলেন। তাঁর মতে এই নগরী প্রায় ছয়হাজার 'লি' (Li) পরিমাণ স্থান জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তিনি দেখেছিলেন এই নগর ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এখানে বহু পুরোহিত বসবাস করতেন। নগরে

বহু মঠের (convents) ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত। অবন্তী অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক স্থান, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী (অবন্তী)। রাজা প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় লিপিতে পশ্চিম মালবকে অবন্তীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বশিষ্ঠীপুত্র পুলোমায়ী-এর নাসিক প্রশস্তিতেও 'Akaravanti' নামে অবন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার পাণিনির একটি সূত্রে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও অবন্তীর উল্লেখ রয়েছে।

[GDAMI (Dey) p. 13;
EAIG (Kapoor) p. 88-91]

□ পণ্ডিত H.C. Raychaudhuri-এর মতে কোশল, বৎস এবং মগধের পাশাপাশি অবন্তীও প্রাচীন ভারতের একটি অন্যতম প্রভাবশালী জনপদরূপে পরিচিত ছিল।

[PHAI (Roychaudhuri) p.100]

□ E.J. Rapson জানিয়েছেন চারশো খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অবন্তী হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। আসলে সেকালের ভারতবর্ষের চারটি মূল বাণিজ্যপথ যথা—পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রবন্দর সোপার ও ব্রোচ ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগকারী পথ, দাক্ষিণাত্যের পথ এবং অযোধ্যার বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে ছিল অবন্তীর অবস্থান। সুতরাং বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে অবন্তীর প্রাধান্য খুবই স্বাভাবিক। সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থলও ছিল অবন্তী। এমনকি হিন্দু জ্যোতির্বিদরা তাঁদের প্রথম দ্রাঘিমাটি এঁকেছিলেন উজ্জয়িনী থেকেই।

[E.J. Rapson, Ancient India, p. 175]

□ পণ্ডিত Rhys Davids-এর লেখা থেকে জানা যায় আধুনিক মুম্বই শহরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর দিকেই ছিল প্রাচীন অবন্তীর অবস্থান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অবন্তীকে বিন্ধ্যবাসীদের দেশ বলা হয়েছে। এমন কথাও বলা হয়েছে যে, অবন্তী বিন্ধ্যপর্বতের ওপরে অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্বত-সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত—বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ।

অতএব বলা যেতে পারে, বর্তমান মালওয়া, নিমার এবং মধ্যপ্রদেশের নিকটবর্তী কিছু স্থান জুড়ে অবন্তী বিস্তৃত ছিল।

[Rhys Davids, 'Psalms of the Brethren' in
Psalms of the Early Buddhists, p. 107, fn. 1;
মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৫৫]

□ বিন্ধ্য পর্বত অবন্তীকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে ভাগ করে দিয়েছে। উত্তরভাগের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণ ভাগের মাহিষ্মতী, বৌদ্ধ সাহিত্যে দক্ষিণ নর্মদা উপত্যকায় অবস্থিত অবন্তীর দক্ষিণাংশকে 'অবন্তী দক্ষিণাপথ' বলা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যিকরা কখনো কখনো একে অশ্মক বা অশ্মকবন্তি নামেও ডেকেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অশ্মক দেশের রাজধানী ছিল বৃধনা যা বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামাবাদ জেলায় অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় 'অবন্তী-দক্ষিণাপথ'-র সীমানা নর্মদা উপত্যকার দক্ষিণ অংশ পেরিয়েও বিস্তৃত ছিল। অবশ্য উত্তর অবন্তীকে পশ্চিম মালওয়া বলেই চেনা যায়।

[GD (N.N. Bhattacharya) p. 79]

□ পণ্ডিত Rapson-এর মতে বর্তমান মধ্যভারতের গোয়ালিয়রই ছিল প্রাচীন অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালের আগেই অবন্তীতে মগধের সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটেছিল। বিন্দুসার তাঁর পুত্র অশোককে অবন্তীর শাসক নিয়োগ করেছিলেন।

[EAIG (Kapoor), p. 92-93]

অবন্তী২ পারিযাত্র পর্বত থেকে সৃষ্ট একটি নদীর নাম অবন্তী। *[মৎস্য পু. ১১৪.২৪;*
বায়ু পু. ৪৫.৯৮]

□ আধুনিক গবেষকদের মতে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলার মহুঁ থেকে উৎপন্ন হয়ে এই নদীটি চম্বল নদীতে মিশেছে।

[EAIG (Kapoor), p. 93]

অবন্তী৩ কার্তবীর্য্যের শতপুত্রের অন্যতম অবন্তী। এই অবন্তীর নামানুসারেই হৈহয় বংশজাত পাঁচটি বিখ্যাত শাখার একটির নাম আবন্তী। অপর চারটি শাখা—বীতিহোত্র, শার্য্যাত, ভোজ ও কুণ্ডিকের।

[মৎস্য পু. ৪৩. ৪৬-৪৮]

□ আবার অগ্নি পুরাণ মতে হৈহয় বংশের এই পাঁচটি কুলের নাম—বীতিহোত্র, স্বয়ংজাত, ভোজ, শৌণ্ডেকেয় ও অবন্তী।

□ ধ্বনিগত সাদৃশ্য থেকে ধারণা করা যায় রাজা অবন্তী বা আবন্তীর নামানুসারেই অবন্তীরাজ্যের নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, এই অবন্তীরাজই

যদুপতি শূরের কন্যা এবং বসুদেবের বোন রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহজাত দুই সন্তানের নাম বিন্দ ও অনুবিন্দ।

"রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ বিন্দানুবিন্দৌ জজ্ঞাতে।"

[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১১; অগ্নি পু. ২৭৫.১১]

☐ মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে উভয়েই এই বিন্দ ও অনুবিন্দকে অবন্তীদেশীয় পরাক্রমশালী রাজপুত্র বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৫.১৬৬.৬; (হরি) ৫.১৫৫.৩; ভাগবত পু. ১০.৫৮.৩০]

অবন্ধ্য মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে কর্দম প্রজাপতির কন্যা স্বরাটের গর্ভে যেসব পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, অবন্ধ্য তাঁদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ৬৫.১০০]*

অবভৃতা আভীর বংশীয়দের একটি নগরী। এই নগরী নিবাসী সাতজন আভীর বংশীয় নৃপতি কলিযুগে পৃথিবী শাসন করবেন বলে পুরাণে বলা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ১২.১.২৯]*

অবভৃথ সোমযাগের শেষে সপত্নীক যজমান পুরোডাশ আহুতি দিয়ে যে যজ্ঞান্ত স্নান করেন, সেটাই অবভৃথ স্নান। স্নানের পর সপত্নীক যজমান বস্ত্র পরিবর্তন করেন এবং স্নানের পূর্বে দীক্ষাকালে যজমান যে কৃষ্ণাজিন পরে ছিলেন, অবভৃথ স্নানের পর তাও ত্যাগ করেন।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৫.২.৪৬; ৪.৪.৫.১০; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ১.৩; ৮.৫; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) পৃ. ১৪, ৬২৯]

রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠির মহারাজ অবভৃথ-স্নান করে এলে—

ততস্ত্ববভৃথ-স্নানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্—

অন্যদেশ থেকে আসা অতিথিরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেন। মহাভারতের দ্রোণপর্বে জয়দ্রথ বধের আগে এই অবভৃথ-শব্দটিকে একটা রাজনৈতিক মাত্রা দিয়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে রূপকাকারে বলেছিলেন—এই যুদ্ধও যেন এক সোমযাগের অন্তর্গত পশুযাগের মতো। কৃষ্ণ বলেছিলেন—তুমি কৌরবদের এতাবৎ-কৃত অন্যায়গুলি স্মরণ করে দুর্যোধনকে শেষ করে দাও। এতকালের এই শত্রুতার পর অবভৃথ-স্নান হয়ে যাক এইবার—

বৈরস্যাস্য অস্তু অবভৃথঃ মূলং ছিন্ধি দুরাত্মনাম্।

[মহা (k) ২.৪৫.৪০; ৭.১০২.১৮; (হরি) ২.৪৪.৩৬; ৭.৮৮.৬০]

☐ অগ্নি পুরাণে অবভৃথ স্নানের বিধি এবং উপচার সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

[অগ্নি পু. ৬৯. অধ্যায়]

অবর শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। 'বর' শব্দটি বৃ ধাতু থেকে আসছে বৃ ধাতুর অর্থ বরণ করা। যিনি শ্রদ্ধার পাত্র, যিনি বরণীয়, তিনিই বর। সেক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে এটা মনে হওয়াই খুব স্বাভাবিক যে, অবর মানে যিনি শ্রদ্ধার যোগ্য নন, বরণীয় নন। কিন্তু বৈয়াকরণেরা 'অবর' শব্দটিকে নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসে এভাবেও বিশ্লেষণ করে থাকেন যে, যাঁর থেকে 'বর' বা বরণীয় অন্য কেউ নেই। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে 'অবর' অর্থে সর্বশ্রেষ্ঠ সকলের চেয়ে শ্রদ্ধেয় বা বরণীয় বোঝায়। ভগবান শিব সমস্ত দেবতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ—এই অর্থেই তাঁকে 'অবর' নামে কীর্তিত করা হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠও এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'অবর' নামটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—অবরঃ নাস্তি বরো বরণীয়ো সম্পদন্য ইত্যবরঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫৩; (হরি) ১৩.১৬.৫৩]

এখানে এই শব্দের মাধ্যমে দুটি অর্থ সাধিত হয়। শিবের আকৃতি এবং প্রকৃতি মহাভারতে যা পাই—তিনি শ্মশানে-মশানে থাকেন, আর্দ্র গজকৃত্তি তাঁর বসন, তিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, তাতে আপাত দৃষ্টিতে তিনি নিন্দিত 'অবর' বলেই সাধারণ অনুভূতি হতে পারে, এবং হয়তো বা এই অর্থেই তাঁকে সম্বোধন করা যায়। কিন্তু এই অবর চরিত্র তাঁর ঈশ্বর-গুণে আচ্ছাদিত হয়ে যায় বলেই 'অবর' শব্দের অর্থ করতে হয়, তাঁর চেয়ে বরণীয় অন্য কেউ নেই।

অবরগাত্র একজন বানরবীর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৭]

অবরতি তৃতীয় মন্বন্তরে যখন উত্তম মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, প্রতর্দন তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই প্রতর্দন-গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অবরতি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩০]

অবরীয়ান ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের অধিপতি সাবর্ণি মনুর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ১০০.২১]*

অবরোধন রাজা প্রিয়ব্রতের বংশধারায় গয়রাজার ঔরসে গয়ন্তীর গর্ভজাত তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ।

[ভাগবত পু. ৫.১৫.১৪]

অবর্ণী এই নদী পরিপাত্র পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়েছে। *[দ্র. পরিপাত্র]*

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭. ২০]

অবল$_{1}$ পাঞ্চজন্য অগ্নি থেকে পনেরো জন যজ্ঞাপহারী দৈবপ্রভাবসম্পন্ন অসুরদের সৃষ্টি হয় যাঁরা ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞবস্তু অপহরণ করে থাকেন। সেই যজ্ঞাপহারী অসুরদের মধ্যে একজন হলেন অবল।

[মহা (k) ৩.২২০.১১; (হরি) ৩.১৮৩.১১]

অবল$_{2}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের 'অবল' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

> অবলঃ নিঃসামর্থ্যঃ চেতনপ্রযুক্তিং
> বিনা চলনাক্ষমঃ।

প্রশ্ন উঠতে পারে—যে ঈশ্বরকে আমরা জগৎস্রষ্টা, সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করি, তাঁকে অবল বা শক্তি সামর্থ্যহীন কীভাবে বলা চলে? বস্তুত অবল, অশক্ত বলতে এখানে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের নিশ্চল অচেতন অবস্থার কথাই বলা হয়েছে। উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই শুদ্ধ শান্ত শাশ্বত পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম শকট বা জড় পদার্থের মতোই স্থির এবং অচেতন—

> শকটমিবাচেতনমিদং শরীরং।

[মৈত্রায়ণী উপনিষদ ২.৩]

সেই অচেতন নিশ্চল পুরুষের স্বরূপতায় ভগবান শিব স্থির, স্থাণু প্রভৃতি নামেও সম্বোধিত হন। একই ভাবনা থেকে তিনি অবল নামেও খ্যাত। *[মহা (k) ১৩.১৭.৪১; (হরি) ১৩.১৬.৪১]*

অবলা মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভজাত কন্যা। পুরাণে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মবাদিনী হিসেবে। ইনি দত্তাত্রেয়, দুর্বাসা প্রভৃতি অত্রিপুত্রদের কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন।

[বায়ু পু. ৭০.৭৬]

অবশ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত মহাদেবের অন্যতম একটি নাম। সংস্কৃত বশ্ ধাতুর অর্থ অধীন হওয়া বা বশীভূত হওয়া। বশ্ ধাতুর সঙ্গে 'অচ্' প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় বশ। অর্থাৎ যিনি বশীভূত হয়েছেন। অবশ শব্দের অর্থ সেক্ষেত্রে দাঁড়ায়—যিনি কখনোই বশীভূত হন না। ভগবান শিব স্বয়ং পরমেশ্বরস্বরূপ। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেন, জাগতিক মায়া মোহ প্রভৃতিও তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু তিনি নিজে কখনও সেই মায়া দ্বারা আবদ্ধ হন না বা বশীভূত হন না বলেই তিনি 'অবশ' নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬৭; (হরি) ১৩.১৬.৬৭]

অবশাবধ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রুতর্ষি (বেদজ্ঞ) এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। ঋষি অবশাবধ এঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.৫]

অবস্ফূর্য এক প্রকার অগ্নি। এই অগ্নিকে বিবস্বান কিংবা আস্থান অগ্নিও বলা হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.৩১]

অবালা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অবালা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৭]*

অবিকারা একজন মাতৃকা। অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অবিকারা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৬]*

অবিঘ্নতীর্থ গৌতমী গঙ্গা অর্থাৎ গোদাবরীর উত্তর তীরে এই তীর্থটি অবস্থিত। দেবতারা একবার গৌতমী গঙ্গার উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কিন্তু ভগবান গণেশকৃত বিঘ্নের জন্য এই যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়ায় ব্রহ্মার আদেশানুযায়ী দেবগণ আদিদেব গণেশের স্তব আরম্ভ করেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে বিঘ্নরাজ গণেশ তখন তাঁদের নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ার আশ্বাস দেন। সেই সময় থেকেই এই তীর্থ অবিঘ্নতীর্থ নামে অভিহিত হয়। এই তীর্থ সর্ববিধ কামনাপূরণকারী এবং সর্ববিঘ্ন-বিনাশকারী। *[ব্রহ্ম পু. ১১৪.১-২৫]*

অবিজ্ঞাতগতি অষ্টবসুর একতর অনিল বা বায়ু দেবতার পুত্র। *[দ্র. অষ্টবসু]*

অবিজ্ঞাতা ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৪; (হরি) ১৩.১২৭.৬৪]

অবিদ্যা 'অবিদ্যা' এই শব্দটি একটি দার্শনিক প্রতীকে প্রথম ব্যবহার হয়েছে ঈশোপনিষদের মতো প্রাচীন উপনিষদে। সেখানে এই অদ্ভুত কথাটি শ্লোকাকারে বলা হয়েছে—যারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তারা অন্ধকার তমের মধ্যে প্রবেশ করে—

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যোঽবিদ্যামুপাসতে।

আর যারা কেবল দেবতা-চিন্তা বা বিদ্যায় নিরত থাকে, তারা আরও গভীর অন্ধকারে

প্রবেশ করে। উপনিষদের এই বিখ্যাত মন্ত্রে—বৈদিক অগ্নিহোত্র ইত্যাদি কর্ম এবং যাগযজ্ঞাদির মতো কর্মানুষ্ঠান যেহেতু আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলে না, এবং বৈদিক কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে যেহেতু শুধুমাত্র ঐহিক সুখ আর পরলোকে স্বর্গাদি ফল লাভ হয়, তাই এই বৈদিক কর্মকাণ্ডকেই শেষ পর্যন্ত অবিদ্যা বলা হয়েছে। শঙ্কর এখানে টীকায় লিখেছেন—বিদ্যা থেকে যেটা অন্যতরা, সেটাই অবিদ্যা—আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম। যারা শুধু এই কর্মানুষ্ঠানেই অভিনিবেশ করে, তারা জন্ম-মরণের এক দীর্ঘ বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে। বস্তুত সেটাই প্রতীকীভাবে অন্ধকার তমোময় প্রদেশ—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে'বিদ্যামুপাসতে।

বস্তুত আত্মজ্ঞানের অভাব এবং ভোগ্য বিষয়ে অভিলাষই বৈদিক কর্মনিষ্ঠার মূল কারণ। 'সপ্তপ্রকার অন্নের' সৃষ্টি অর্থাৎ কর্মজাত পুণ্যের ফলে ভোগ্য পদার্থের সৃষ্টি এবং সেই ভোগ্যবিষয়েই 'আমি আমার'—এইরকম মমতা তৈরি হওয়াটাই সংসার এবং সেটাই কর্মনিষ্ঠার ফল। অতএব কর্মনিষ্ঠাই শেষ পর্যন্ত অবিদ্যা বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে ঈশোপনিষদে। কিন্তু কর্মনিষ্ঠা আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল হলেও বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানকে ত্যাজ্য বা হেয় বলা হয়নি, কেননা এই অবিদ্যার দ্বারা অবিবেকী পুরুষের অবিশুদ্ধ জ্ঞানটাকে অন্তত অতিক্রম করা যায়—

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

[দ্র. শঙ্করভাষ্য]

[ঈশোপনিষদ ৯-১১]

অন্য পর্যায়শব্দ অজ্ঞান।

অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলে ভাবা, যেটা বস্তুত দুঃখময় তার মধ্যে সুখদর্শন করা, যেটা নিজের নয়, সেটাকে নিজের বলে মনে করা, অশুচি বিষয়কে শুচি বলে ভাবা, বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভে ক্রোধ-দ্বেষ বেড়ে যাওয়া—এগুলি সব অজ্ঞান কিংবা অবিদ্যার লক্ষণ—

অনিত্যে নিত্যসংজ্ঞা চ দুঃখে চ সুখদর্শনম্।
অস্বে স্বমিতি চ জ্ঞানম্ অশুচৌ শুচিনিশ্চয়ঃ॥
রাগদ্বেষবিবৃদ্ধিশ্চ তদজ্ঞানমুদাহৃতম্॥

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৩.৩৫, ৩৯-৪০ শ্লোকের শেষ পংক্তিটি মহর্ষির সংস্করণে নেই।]

□ বিষ্ণু পুরাণে আরও একটু সংক্ষিপ্ত করে অবিদ্যার স্বরূপ নির্ণয় করে বলা হয়েছে—সংসার বৃক্ষের বীজ হল এই অবিদ্যা এবং তা দুই প্রকার—(১) অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি করা এবং (২) যা নিজের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করা। ব্যাখ্যা করে আরও বলা হয়েছে—মানুষ মোহবশত এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে আত্মবুদ্ধি করে এবং সেইজন্যই 'আমি, আমার' এমন ভাবে অবস্থিত থাকে। শরীরের দ্বারা উপভোগ্য ঘর-বাড়ি, ধন-জন, আর পুত্র-পৌত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধিই বস্তুত অবিদ্যা, অজ্ঞান। যেমন পাত্রে রাখা জলের সঙ্গে আগুনের কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র পাত্রের সম্পর্ক থাকায় আগুনে গরম করলেই জলে উষ্ণতা তৈরি হয় এবং তাতে শব্দাদিধর্মও তৈরি হয়, ঠিক সেইরকম প্রকৃতির সংসর্গেই অব্যয় আত্মা অভিমান, অহঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা দূষিত হন, আবৃত হন এবং তাতেই প্রাকৃতিক দেহধর্ম ভোগ করে মানুষ। এই ভোগভাবনাই অজ্ঞান বা অবিদ্যার স্বরূপ। *[বিষ্ণু পু. ৬.৭.১০-২৫]*

□ বিষ্ণু পুরাণের অন্য একটি জায়গায় পঞ্চপর্বা অবিদ্যা অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের অবিদ্যার কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র—অবিদ্যা পঞ্চপর্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ। এগুলির মধ্যে 'তমঃ' হল দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মা বলে ভাবা। 'মোহ' হল আপন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ওপর আমারই একমাত্র প্রভুত্ব স্বামিত্ব আছে বলে ভাবা। 'মহামোহ' হল শব্দ-স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ভোগ করার ইচ্ছা। 'তামিস্র' হল পূর্বোক্ত বিষয়ভোগে বাধা তৈরি হলে ক্রুদ্ধ হওয়া। আর 'অন্ধতামিস্র' হল ভোগ্য বিষয় বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় সেগুলির সংরক্ষণে সর্বদা অভিনিবিষ্ট হওয়া। এই পঞ্চপর্বা অবিদ্যাই পাতঞ্জল যোগ-দর্শনে পঞ্চ ক্লেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে—

অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ।

অন্যত্র এই অবিদ্যা অজ্ঞান, তমঃ অথবা কৈতব বলেও চিহ্নিত।

[বিষ্ণু পু. (নাগ) ১.৫.৫ শ্রীধরস্বামীর 'আত্মপ্রকাশ' টীকা দ্র. পুনশ্চ ভাগবত পু. ১.১.১ (শ্রীধরস্বামী-কৃত টীকা)]

অবিধেয় ভূগর্ভস্থ সাতটি নরকের মধ্যে অন্যতম।
[বায়ু পু. ১০১.১৭৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২.১৮২]

অবিন্ধ্য অবিন্ধ্য একজন মেধাবী, বিদ্বান এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাক্ষস। তিনি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। রামের হাতে রাক্ষসেরা ধ্বংস হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় তিনি সীতাকে রামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য রাবণকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু রাবণ তাতে কর্ণপাত করেননি। *[রামায়ণ ৫.৩৭.১২-১৩]*

অবিমুক্ত শিব-মহেশ্বরের আবাস বারাণসী-ক্ষেত্রকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে। মৎস্য পুরাণে বারাণসী-মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গে কথা বলার সময় দেবী পার্বতী অবিমুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বারাণসীর মাহাত্ম্য জানতে চেয়েছিলেন। তাতে শিব বলেছেন—বারাণসীতেই আমার চিরবসতি। আর এই পুণ্যভূমিকে অবিমুক্ত বলে এই কারণে যে, আমি কোনোদিন বারাণসী ত্যাগ করে যাইনি এবং কোনোদিন ভবিষ্যতেও ত্যাগ করবো না, সেইজন্যই বারাণসীর নাম অবিমুক্ত—

বিমুক্তং ন পুরা যস্মান্মোক্ষ্যতে বা কদাচন।
মহৎ ক্ষেত্রমিদং তস্মাদ্ অবিমুক্তমিদং স্মৃতম্॥

লিঙ্গ পুরাণে, অবিকল এই শ্লোকটিই আছে, শুধু দ্বিতীয় পংক্তিতে 'মহৎ ক্ষেত্রম্' না বলে শিবের মুখে এটা আমার স্থান বা 'মম ক্ষেত্রম্' হয়েছে। স্কন্দ পুরাণে আবার শুধু শিব নন শিব-শিবানী দুজনকে একত্রে 'শিব' আখ্যা দিয়ে দ্বিবচনে বলা হয়েছে—যদি প্রলয়-কালও উপস্থিত হয়, তবু পঞ্চক্রোশ পরিমাণ যে স্থানটি শিব-শিবানী কখনোই পরিত্যাগ করেন না, তাকেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে—

মুনে প্রলয়কালে'পি ন তৎক্ষেত্রং কদাচন।
বিমুক্ত হি শিবাভ্যাং যদ্, অবিমুক্তং ততো বিদুঃ॥

বস্তুত না-বাচক নঞর্থক শব্দ 'ন'-এর পরিবর্তে 'অ' বসিয়ে 'ন বিমুক্তম্' 'অবিমুক্তম্' —এইভাবে পদসিদ্ধি করা হয়েছে এখানে। অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে বারাণসী নগরীর একাত্মতায় গ্রহণ করে জাবালোপনিষদে একটি দার্শনিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে অত্রি আর যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনের মাধ্যমে। সেই অনাদি অনন্ত অব্যক্ত আত্মাকে কীভাবে জানা যায়, অত্রির এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন—অবিমুক্তের উপাসনা করো। অব্যক্ত পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রেই। আর অবিমুক্ত হল সেই ভূমি যা বরণা এবং নাসী মধ্যে অবস্থিত। সমস্ত ইন্দ্রিয়-দোষ নিবারণ করে যেটা, সেটাই হল বরণা, আর ইন্দ্রিয়-কৃত পাপ যেটা নাশ করে সেটা হল নাসী। ভ্রূযুগল এবং নাসিকার সন্ধিস্থল সেই যোগস্থানই বারাণসীর অবিমুক্ত ক্ষেত্র, ভূলোক আর পরলোকের সন্ধিস্থান সেই দ্যুলোকই অবিমুক্ত ক্ষেত্র। *[মৎস্য পু. ১৮০.৫৪;*
লিঙ্গ পু. (পূর্ব) ৯২.৪৫-৪৬;
স্কন্দ পু. (কাশী) ২৬.২-৫; ২৬.২৬-২৭;
জাবালোপনিষদ (উপনিষৎ সংগ্রহ),
২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৪৫]

□ কাশীক্ষেত্রের বারাণসী, শ্মশান, মহাশ্মশানের মতো সাধারণ নামের সঙ্গে ভগবান শঙ্কর নাকি নিজে দুটি নাম দিয়েছিলেন। একটি নাম আনন্দকানন অপরটি অবিমুক্ত। প্রথম নামটি আগে দেন পরে তার নাম দেন অবিমুক্ত—

তস্যানন্দবনং নাম পুরাকারি পিনাকিনা।
ক্ষেত্রস্যানন্দহেতুত্বাদ্ অবিমুক্তম্ অনন্তরম্॥

মৎস্য পুরাণ অবশ্য কাশীক্ষেত্রকে প্রথমত সমস্ত পুণ্যস্থানের মধ্যে সর্বোত্তম শ্মশান নামে চিহ্নিত করে পরে তাকে অবিমুক্ত নামে অভিহিত করেছে—

শ্মশানমিতি বিখ্যাতম্ অবিমুক্তং শিবালয়ম্।

[স্কন্দ পু. (কাশীখণ্ড) ২৬.৩৪;
মৎস্য পু. ১৮৪.৫-৪২; Diana L. Eck, Banaras:
City of Light, pp. 28-29, 354]

অবিমুক্তেশ্বর বারাণসীতে এই পবিত্র তীর্থটি অবস্থিত। নীললোহিত মহাদেব উমাকে বিয়ে করার পর হৈমবতী উমা এবং অন্যান্য প্রধান শিবগণদের সঙ্গে নিয়ে হিমালয় থেকে বারাণসীতে আসেন। এখানেই তিনি অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ রূপে আবির্ভূত হন এবং এখানেই বসবাস করতে থাকেন—

দেবঃ পুরা কৃতোদ্‌বাহঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ।
হিমবচ্ছিখরাদ্ দেব্যা হৈমবত্যা গণেশ্বরৈঃ॥
বারাণসীমনুপ্রাপ্য দর্শয়ামাস শঙ্করঃ।
অবিমুক্তেশ্বরং লিঙ্গং বাসং তত্র চকার হ॥

এই তীর্থক্ষেত্র দর্শন করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

[লিঙ্গ পু. (Shanti Lal Nagar) ৯২.৬, ১০৫;
বায়ু পু. ১০৬.৬৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৬০, ৬৩]

এই তীর্থে মোরগ পূজা করা হয়।

[নারদ পু. (মহর্ষি) ২.৪৯.৫৩-৫৫]

অবিশিষ্ট বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৯; (হরি) ১৩.১২৭.৪৯]

অবিস্থল একাধারে কুরুক্ষেত্রের আসন্ন সংগ্রাম রোধ করার উদ্দেশে এবং জ্ঞাতি ভাই দুর্যোধনের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে পাণ্ডব ভাইয়েরা তাঁদের প্রত্যেকের জন্য কৌরবদের কাছে পাঁচটি গ্রাম মাত্র প্রার্থনা করেছিলেন। এই পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অবিস্থল অন্যতম। *[মহা (k) ৫.৭২.১৪; ৫.৮২.৭; (হরি) ৫.৬৭.২৩; ৫.৬৭.৭]*

□ পণ্ডিতরা মনে করেন কুরুক্ষেত্র সংলগ্ন আসন্দি নামে স্থানটিই অবিস্থল।

[Visheshvaranand Indological Journal; Vol. 3-4, p.280]

অবীক্ষিত$_{১}$ (অবিক্ষিৎ) বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশে জাত ধার্মিক রাজা করন্ধমের পুত্র, কারন্ধম অবীক্ষিত বা অবিক্ষিৎ। বীরত্বে তিনি ইন্দ্রের সমান, যজ্ঞশীল, এবং ধর্মপ্রাণ। নিজের চরিত্রগুণেই তিনি সম্রাট হয়েছিলেন। যথাবিধানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁর যজ্ঞকার্যে পৌরোহিত্য করেছিলেন। তাঁরই পুত্র বিখ্যাত মরুত্ত রাজা।

[মহা (k) ১৪.৪.১৭-২৩; (হরি) ১৪.৪.১৭-২৩; বিষ্ণু পু. ৪.১.১৬; ভাগবত পু. ৯.২.২৬]

মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, পিতা মহারাজ করন্ধম বা বলাশ্ব। মাতা বীরা। পুত্রের জন্মগ্রহণের পর রাজা করন্ধম দৈবজ্ঞদের কাছে পুত্রের জন্মসময়, লগ্ন ও নক্ষত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে দৈবজ্ঞগণ বললেন যে রাজপুত্র প্রশস্ত মুহূর্তে, প্রশস্ত লগ্ন এবং প্রশস্ত নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন। বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র ও বুধ জাতককে অবেক্ষণ করছেন অথচ রবি মঙ্গল ও শনি অবেক্ষণ করছেন না। একথা শুনে আনন্দিত রাজা দৈবজ্ঞদের উদ্দেশে বললেন যে, তাঁরা বারবার 'অবৈক্ষত' শব্দের প্রয়োগ করেছেন, অতএব এই পুত্র অবীক্ষিত নামে খ্যাত হবে। বস্তুত 'অবৈক্ষত' শব্দের অর্থ 'দেখছেন'। বিভিন্ন গ্রহ এই জাতককে দেখছেন, রক্ষা করছেন, অতএব এই পুণ্য শিশুর নাম অবীক্ষিত।

অবীক্ষিত বেদ-বেদাঙ্গে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং কণ্বপুত্রের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি অসামান্য রূপ, গুণ, বুদ্ধি ও তেজের অধিকারী ছিলেন।

একবার বৈদিশাধিপতি বিশালরাজের কন্যা সুদতী বৈশালিনী স্বয়ম্বরকালে তাঁকে বরণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে অবীক্ষিত উপস্থিত সমস্ত রাজাকে পরাজিত করে তাঁকে গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে পরাজিত রাজগণ একত্রে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন কিন্তু অবীক্ষিতের বীরত্বের সামনে তাঁরা ক্রমাগত পরাজিত হতে লাগলেন। শেষে জয় অসম্ভব দেখে বীরগণ একত্রিত হয়ে অন্যায় যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও বন্দি করে বিশালরাজের সভায় নিয়ে গেলেন।

এদিকে অবীক্ষিতের বন্দি হবার সংবাদ শুনে তাঁর পিতা করন্ধম পুত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তিনদিন যুদ্ধের পর যখন রাজগণ পরাজিত প্রায়, তখন বিশালরাজ স্বয়ং এসে করন্ধমের উদ্দেশে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন, অবীক্ষিতকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁর সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে চাইলেন। কিন্তু অবীক্ষিত বললেন যে কন্যার সামনে তিনি শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়েছেন তাকে তিনি বিবাহ করতে পারেন না। কিন্তু রাজকন্যা অবীক্ষিতের শৌর্য্য, বিক্রম ও ধৈর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি অন্য কোনো রাজপুত্রকে বরণ করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু অবীক্ষিতের সিদ্ধান্ত অটল, তাই দুঃখিত হয়ে রাজকন্যা বনে গিয়ে নিরাহারে তপস্যা করতে লাগলেন।

একবার অবীক্ষিতের মাতা বীরা 'কিমিচ্ছক' নামে একটি ব্রত আরম্ভ করলেন। তিনি পুত্রকে বললেন যে ব্রত উপলক্ষে তিনি রাজকোষের অর্ধেক অর্থ দান করতে চান। এদিকে সচিবগণ রাজা করন্ধমকে বললেন, অবীক্ষিত বিবাহ না করলে তাঁর পুত্রলাভ হবে না এবং এতে মহারাজের বংশক্ষয় হবে। তাই অবীক্ষিত যাতে বিবাহ করতে রাজী হন তার উপায় করা দরকার। এইসময় রাজা শুনতে পেলেন যে রাজপুত্র বলছেন, তাঁর মাতা কিমিচ্ছক ব্রতে উপোস করে আছেন, এই সময় অর্থিগণ যা প্রার্থনা করবেন, তিনি তাই দিতে প্রস্তুত। একথা শুনে রাজা পুত্রের কাছে গিয়ে পৌত্রলাভ প্রার্থনা করলেন। অবীক্ষিত বিবাহ করতে সম্মত হলেন।

একদিন মৃগয়ায় গিয়ে অবীক্ষিত বনের মধ্যে এক নারীর বিলাপ শুনতে পেলেন, সেই নারী বলছিলেন যে তিনি করন্ধমপুত্র অবীক্ষিতের পত্নী, দুরাচার দানব তাঁকে হরণ করেছে। অবীক্ষিত কন্যাহরণকারী দনুপুত্র দৃঢ়বেশকে আক্রমণ ও হত্যা করলেন। এতে দেবগণ তাঁর প্রশংসা করলেন এবং তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি পিতার ইচ্ছানুসারে মহাবীর পুত্রলাভের বর চাইলেন। দেবতারা বললেন যে কন্যাকে অবীক্ষিত রক্ষা করেছেন তিনিই তাঁর মহাবীর পুত্রের মাতা হবেন। কিন্তু অবীক্ষিত বললেন যে, তাঁর কারণেই বিশাল রাজকন্যা বিবাহ না করে তপস্যা করছেন। আজ তাঁকে ত্যাগ করে অপর কন্যাকে বিবাহ করা অনুচিত। দেবতারা তখন জানালেন যে, এই কন্যাই বিশালরাজের কন্যা এবং এঁর দ্বারাই রাজপুত্র সহস্র সহস্র যজ্ঞকর্তা সপ্তদ্বীপ শাসক, চক্রবর্তী পুত্রলাভ করবেন। তখন রাজপুত্র কন্যাকে বিবাহ করলেন এবং মরুত্ত নামে তাঁদের এক পুত্রসন্তান হল। পৌত্রমুখ দেখে রাজা করন্ধম আনন্দিত হলেন। করন্ধম রাজ্য ত্যাগ করে বনে গমন করতে চাইলে রাজপুত্র অবীক্ষিত সিংহাসন গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তাঁর পুত্র মরুত্ত রাজা হলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনীতে রাজা হেমধর্মের কন্যা বরা, সুদেবের কন্যা গৌরী, বলির কন্যা সুভদ্রা, বীরভদ্রের কন্যা নিভা, বীরের কন্যা লীলাবতী, ভীমের কন্যা মান্যবতী এবং দম্ভ রাজার কন্যা কুমুদ্বতীকেও অবীক্ষিতের পত্নী বলা হয়েছে। তবে বৈশালিনীর সঙ্গে অবীক্ষিতের বিবাহ এবং পুত্রলাভের যে উপাখ্যান পুরাণে পাওয়া যায় তা থেকে এই বিবাহগুলি পরে সংঘটিত হয়েছিল বলে ধারণা হয়।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১২২.২-৩০; ১২৩-১২৮ অধ্যায়]

অবীক্ষিত$_2$ ভরতবংশে মহারাজ কুরুর মহিষী বাহিনীর গর্ভে অশ্ববাণ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। এঁরই অপর নাম অবীক্ষিত। অবীক্ষিতের আটটি পুত্র ছিল।

[মহা (k) ১.৯৪.৫০-৫১; (হরি) ১.৮৯.৩৮-৪০]

অবীক্ষিত$_3$ যযাতির পুত্র তুর্বসুর বংশধারায় জনৈক রাজা করন্ধমের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বায়ু পুরাণ মতে এই করন্ধমরাজার পুত্রের নাম অবীক্ষিত। অবীক্ষিতের পুত্রের নাম মরুত্ত। *[বায়ু পু. ৯৯.২]*

অবীচি যারা সাক্ষ্য দেবার সময়ে বা অর্থের আদান প্রদানের সময় মিথ্যা কথা বলে তারা মৃত্যুর পর একশো যোজন উঁচু পর্বত থেকে অবলম্বনহীন অবীচি নামক নরকে পতিত হয়। এই নরকের মধ্যভাগ জলের মতো তরঙ্গযুক্ত দেখা যায়। 'বীচি' শব্দের অর্থ তরঙ্গ। তাতে 'অবীচি' মানে দাঁড়ায় তরঙ্গহীন। অথচ অবীচি-নরকের বর্ণনা দিয়ে বলা হচ্ছে—এই নরকের মধ্যভাগ তরঙ্গযুক্ত মনে হয়—

যত্র স্থলং দৃশ্যতে চ জলবদ্ বীচি সংযুতম্।

এখানে ভাগবত পুরাণ সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে—এই নরকে প্রস্তর-পৃষ্ঠময়, কিন্তু এর স্থলভাগ নিস্তরঙ্গ, বীচিহীন। এই স্থানটাকে নিস্তরঙ্গ জলের মতো দেখায় বলেই এর নাম অবীচিমৎ—

যত্র জলমিব স্থলম্ অশ্মপৃষ্ঠমবভাসতে
তদবীচিমৎ।

[দেবী ভাগবত পু. ৮.২৩.১-৪; ৮.২১.২৬;
বিষ্ণু পু. ১.৬.৪১; ২.৬.৪;
ভাগবত পু. ৫.২৬.৭, ২৮]

অবীচিমান্ *[দ্র. অবীচি]*

অবীরা যে নারীর স্বামীও নেই পুত্রও নেই তাঁকে অবীরা বলে। দত্তা এবং অদত্তা ভেদে অবীরা দুই প্রকার। অদত্তা অবীরার থেকে দত্তা অবীরার খানিক মূল্য দেওয়া হয়েছে।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ৩.৮.১২]

অব্জক মুনিরা অব্জক তীর্থকে গোদাবরীর হৃদয় রূপে বর্ণনা করেছেন। এই তীর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের বিশ্রামস্থল।

"অব্জকং হৃদয়ং প্রোক্তং গোদাবর্য্যা মুনীশ্বরৈঃ।
বিশ্রামস্থানমীশস্য বিষ্ণোর্ব্রহ্মণ এব চ॥"

[ব্রহ্ম পু. ১২৯.১২৭]

অব্যক্ত$_1$ সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে অন্তত বাইশটি বিশেষণাত্মক প্রতিশব্দ উচ্চারণ করা হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে অব্যক্ত একটি—

সদসচ্চৈব তৎ সর্বম্ অব্যক্তং ত্রিগুণং স্মৃতম্।

অব্যক্ত মানে ব্যক্ত নয়, অর্থাৎ যার রূপের কোনো স্পষ্টতা নেই, দৃষ্টির অগোচর।

[মহা (k) ১৪.৩৯.২৩-২৪;
(হরি) ১৪.৪৬.২৩-২৪]

প্রকৃতির এতগুলি পর্যায় শব্দ মহাভারতে পাওয়া গেলেও আমরা জানি যে, এই শব্দগুলি কোনো

পরিচিত কোষ-গ্রন্থে ধৃত প্রকৃতির পর্যায়বাচক শব্দ নয়। প্রকৃতির দার্শনিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁর চরিত্র এবং গুণ বিচার করেই এতগুলি শব্দ প্রকৃতির বিশেষণ হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। সাংখ্যীয় প্রকৃতির সম্বন্ধে মহাভারতের প্রথম উপস্থাপন হল এই যে, মহদাদি সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে সর্বপ্রধান হল প্রকৃতি—

বিদ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তত্ত্বানাং পরমেশ্বরী।

মহদাদি তত্ত্বান্তর প্রসবের পরেও প্রকৃতি যে অবিকৃতই থাকে, সেটা মহাভারত কাব্য করে বলেছে। মহাভারত বলেছে—যেমন একটি দীপ থেকে সহস্র সহস্র দীপ উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতির যেহেতু কোনো অপচয় ঘটে না, তাই সে অবিকৃতই থাকে—

দীপাদন্যে যথা দীপাঃ প্রবর্ত্তন্তে সহস্রশঃ।
প্রকৃতিঃ সূয়তে তদ্‌বদ্ আনন্ত্যান্নাপচীয়তে॥

মহাভারতে এইভাবে প্রকৃতিতে অনন্ত, অসীম বলে চিহ্নিত করায় এবং বহুবিধ বিকার সত্ত্বেও তার ক্ষয়-অপচয় নেই বলে স্বীকার করায় আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃতি থেকে অন্য বিকারগুলি সৃষ্ট হলেও প্রকৃতি স্বরূপত অবিকৃতই থাকে—

আনন্ত্যাৎ ন অপচীয়তে।

এই সাধারণ লক্ষণটাই প্রায় সূত্রের আকারে কথিত হয়েছে কপিল-আসুরি সংবাদে। সেখানে বলা হয়েছে অব্যক্তা প্রকৃতির লক্ষণ হল অব্যক্ত, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, তর্কের গোচর নন এবং তাঁর পরিমাণ করা যায় না—

অব্যক্তম্ অগ্রাহ্যম্ অপরিমেয়ম্ অব্যক্তম্।

প্রকৃতিকে প্রথমেই অব্যক্ত নামটির দ্বারা চিহ্নিত করে সংজ্ঞার মধ্যে তাঁকেই 'অব্যক্ত' বলার তাৎপর্য্য হল অব্যক্ত শব্দটি প্রকৃতির পর্যায় শব্দও বটে, আবার সৃষ্টির পূর্বকালীন অবস্থায় প্রকৃতির কোনো ব্যক্তরূপ অথবা কোনো বিকার থাকে না বলেই তিনি অব্যক্ত এবং এই অব্যক্ত প্রকৃতির অন্যান্য পর্যায় শব্দগুলি হল প্রধান, অক্ষর, অজর ইত্যাদি—

রজঃ সত্ত্বং তৎপ্রধানং তত্ত্বম্।
অক্ষরম্ অজরমিতি—
এবমাদীনি অব্যক্তনামানি ভবন্তি।

এখানে অজর শব্দটি ব্যাখ্যা করার সময় সিদ্ধান্তবাগীশ লিখেছেন—মহদাদি অন্যান্য তত্ত্ব প্রকৃতির পরিণাম হিসাবে জন্মালেও প্রকৃতির জীর্ণতা বা ক্ষয় হয় না। অর্থাৎ স্বরূপত তিনি অবিকৃতই থাকেন। পুনরায় অব্যক্তকে বীজধর্মী বলা হয়েছে মহাভারতের এই অধ্যায়ে অর্থাৎ বৃক্ষবীজ যেমন অব্যক্ত অবস্থায় থাকে অথচ বীজের যেমন উৎপাদনরূপ ধর্ম আছে, প্রকৃতিও সেইরকম। প্রকৃতি অচেতন অথচ বিশাল তার ব্যাপ্তি। *[মহা (k) ১২.৩০৭.৭; ১২.২১০.২৬; (পরের দুটি তথ্যসূত্র এই সংস্করণে নেই); (হরি) ১২.২৯৯.৭; ১২.২০৭.২৬; ১২.৩১১.২১; ১২.৩১১.২৮-২৯]*

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে যা কিছু আছে এই জগৎ এবং জীবন—তার সমস্ত কিছুই অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে ব্যক্ত প্রকৃতির পরিণাম। প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্ত প্রকৃতির এই পরিণামকে বিসদৃশ পরিণাম বলা হচ্ছে। কেননা সাংখ্য-শাস্ত্রে স্বীকৃত কার্যাত্মক জড়তত্ত্বগুলি প্রত্যেকটি একে অপরের সঙ্গে বৈষম্যযুক্ত। এই বৈষম্যের জন্যই এই তত্ত্বগুলির প্রত্যেকটিই পৃথক নামের দ্বারা চিহ্নিত। সাংখ্য সৎকার্যবাদ অনুযায়ী এই সৎপদার্থগুলি প্রত্যেকেই এক একটি তত্ত্ব। এদের মধ্যে অবস্থার ভেদে ভিন্নতার বোধ হয়। আসলে কিন্তু এরা অব্যক্ত প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম।

[মহা (k) ১২.৩০৬.৩১-৩২; (হরি) ১২.২৯৮.৩১-৩২; ভগবদ্‌গীতা ৮.১৭-১৮]

ভগবদ্‌গীতার একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, অব্যক্ত থেকেই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থগুলি উৎপন্ন হচ্ছে—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয় সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

গীতার এই শ্লোকটির প্রথম চরণের শব্দগুলি শুনলে খুব স্বাভাবিকভাবে এই প্রতীতি হয় যে, যেন মূল প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত প্রকৃতির পরিণতি ঘটছে। কিন্তু এই শ্লোকের পূর্ব শ্লোকে প্রজাপতি ব্রহ্মার জাগ্রত অবস্থা এবং সুষুপ্তি অবস্থার কাল-পরিমাণ নির্ধারণ করে বলা হচ্ছে—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তে'হোরাত্রবিদো জনাঃ।

এই শ্লোকটিতে যেহেতু বলা হচ্ছে প্রজাপতি ব্রহ্মার সহস্র যুগকালিক দিনের প্রারম্ভে অব্যক্ত অবস্থা থেকে প্রকৃতি ব্যক্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর রাত্রিকালে সব ব্যক্ত তত্ত্বগুলিই পুনরায় অব্যক্তে

বিলীন হয়, অতএব প্রচলিত সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত অব্যক্ত প্রকৃতির কথা এখানে বলা হচ্ছে না। বস্তুত সাংখ্যশাস্ত্রে যে প্রলয়ের কথা বলা হয়েছে, সেখানে দেখা গিয়েছে, মহাপ্রলয়ের শেষেই সমস্ত ব্যক্ত প্রকৃতি অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু মহাপ্রলয়ের পর যে অব্যক্ত প্রকৃতির কথা সাংখ্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে সেটা প্রজাপতি ব্রহ্মার জাগ্রত একটি দিন এবং সুষুপ্তিময় একটি রাত্রির কথামাত্র। এরই পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে—ব্রহ্মার একটি দিন যা মনুষ্য-মানে তা হল এক সহস্র চতুর্যুগ এবং রাত্রির সমপরিমাণ। কিন্তু এইভাবে ব্রহ্মারও একদিন পতন হয়। তাঁর শত বৎসরের পরমায়ু শেষ হলে পরেই প্রকৃত অব্যক্ত অবস্থা শুরু হয়। অতএব ব্রহ্মার একটি রাত্রি এবং দিনের মধ্যে প্রকৃত অব্যক্ত অবস্থা—যাকে আমরা মূলপ্রকৃতি বলি তার একটি আংশিক খণ্ড রূপই পাওয়া যায় মাত্র। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর বলেছেন—

কার্যস্যাব্যক্তং রূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ ব্যজ্যন্তে অভিব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি। কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিনস্যোপক্রমে। তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি।

আচার্য শ্রীধরের টীকার তাৎপর্য্য হল, প্রসিদ্ধ অহোরাত্রবিদগণ ব্রহ্মার যে দিন জানেন, সেই দিন আগত হলে অব্যক্ত কারণ থেকে কার্য ব্যক্ত হয় এবং যাকে তাঁরা ব্রহ্মার রাত্রি বলেন, সেই রাত্রি আগত হলে ব্যক্ত কার্যগুলি অব্যক্ত কারণে প্রলীন হয়।

প্রকৃতি থেকে ব্যক্তের উৎপত্তির এই সাংখ্যীয় ধারণা এতটাই প্রাচীন যে, পুরাকালীন সমস্ত আকর গ্রন্থগুলির মধ্যেই বোধ হয় তার সূত্র পাওয়া যায় এবং তার জন্য কারিকা-যুগীয় সাংখ্যের কোনো অপেক্ষা থাকে না। ধরা যাক মনুসংহিতা। অব্যক্ত থেকে ব্যক্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—

যদা স দেবো জাগর্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্বং নিমীলতি॥

মনু কথিত এই শ্লোকের সঙ্গে গীতোক্ত শ্লোকের পার্থক্য একেবারে নেই বললেই চলে। পূর্বোক্ত গীতাশ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছিলেন—

অহ্ন আগমঃ অহরাগমঃ তস্মিন্ অহরাগমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণ স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে সর্ব্বা ব্যক্তয়ঃ তত্রৈব পূর্ব্বোক্তে অব্যক্তসংজ্ঞকে।

আচার্য শঙ্কর এই শ্লোকের মধ্যে প্রজাপতির নিদ্রাবস্থাকে অব্যক্ত বলেছেন। এই অব্যক্ত অবস্থা থেকেই যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তুসকল উৎপন্ন হয়ে থাকে। রাত্রিকালে অর্থাৎ প্রজাপতির নিদ্রাকালে সেই সকল স্থাবর-জঙ্গম লক্ষণাক্রান্ত বস্তু পূর্বোক্ত অব্যক্তলক্ষণ প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে থাকে। বস্তুত ব্যক্ত প্রকৃতির আরম্ভেই মূল-প্রকৃতি থেকে যে মহানের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে ভগবান ব্রহ্মা একাত্মক বলেই ব্যক্ত-প্রকৃতির প্রথম সূচনা হিসেবে ব্রহ্মাকে এই সব শ্লোকে ব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম মূর্ত প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

[ভগবদ্গীতা ৮.১৭-১৮;
শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকা এবং শাঙ্কর-ভাষ্য দ্র.]

উপরের শ্লোকাংশ এবং টীকাভাষ্য থেকে আমরা 'অব্যক্ত' বলতে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিকে স্পষ্টভাবে না উল্লিখিত হতে দেখলেও সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মূলে যে সৎকার্যবাদী তত্ত্ব সাংখ্যরা স্বীকার করে নিয়েছেন, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আমরা গীতা এবং মনুসংহিতার মধ্যে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি। সাংখ্যদর্শনের সৎকার্যবাদী তত্ত্বে বলা হয়েছে, উৎপত্তির পূর্বে সমগ্র জগৎ প্রকৃতিতে লীন থেকে অব্যক্ত অবস্থায় বিরাজ করে, তারপর সৃষ্টির মুহূর্তে প্রকৃতিগর্ভে স্থিত সেই সৃষ্ট তত্ত্বগুলি নামরূপের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে ব্যক্ত আকৃতি লাভ করে। আবার সৃষ্টিশেষে ওই জগৎপ্রপঞ্চ সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। সাংখ্যদর্শনে উপস্থাপিত এই সৎকার্যবাদী তত্ত্ব শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় একই ভাবে ব্যাখ্যাত হলেও সৃষ্টি এবং প্রলয়ের পশ্চাতে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে গীতায় বলা হয়েছে—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥

গীতায় ব্যাখ্যাত এই শ্লোকের মধ্যে প্রকৃতির উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কল্পক্ষয়ে প্রলয়কাল উপস্থিত হলে সমস্ত ভূতগুলিই তাঁর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায়। তারপর পুনরায় কল্পারম্ভে সৃষ্টিসময়ে তিনি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজ নিজ

প্রাক্তন কর্ম অনুসারে জন্মমৃত্যুর অধীন ভূত সকলকে বারংবার সৃষ্টি করেন।

গীতার এই শ্লোকে অব্যক্ত প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অধীন বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রকৃতিতেই সর্বভূত প্রবিষ্ট হয় এবং কল্পারম্ভে ওই সকল ভূতগুলি পুনরায় ঈশ্বরকর্তৃক প্রকৃতিগর্ভ থেকে বিসৃষ্ট হয়।

গীতায় ব্যাখ্যাত প্রকৃতির উপর ঈশ্বরের এই নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত সাংখ্য সৎকার্যবাদে কিন্তু স্বীকৃত হয়নি। সেখানে দেখানো হয়েছে, প্রকৃতি থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের নির্গমন স্বাভাবিক-ভাবেই হয়ে থাকে। সেদিক থেকে কিন্তু বলা যায়, প্রকৃতি থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের এই নির্গমন সম্বন্ধে গীতোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে মহাভারতে ব্যাখ্যাত সাংখ্যতত্ত্বের যথেষ্টই সাদৃশ্য রয়েছে। সৃষ্টির আদি অবস্থা বর্ণনা করার সময় মহাভারতের অন্য একটি অধ্যায়ে বৈদিক নাসদীয় সূক্তের পরম্পরা লক্ষিত হয়েছে। সেই পরম্পরার সঙ্গে ঔপনিষদিক ব্রহ্মের তাৎপর্যও অনেকটাই মিশে গিয়েছে। মহাভারতের এই অধ্যায়ে পুণ্যাপুণ্যাবিবর্জিত, ইষ্টানিষ্টের প্রয়াসশূন্য জ্ঞানের প্রশ্ন উঠেছিল। একেবারে শেষপর্যায়ে মনু-বৃহস্পতি-সংবাদে আমরা জগৎ-সৃষ্টির কথা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু যেভাবে তিনি জগদুৎপত্তির মূল কারণ নির্ণয় করেছেন, সেখানে বেদ এবং উপনিষদের বৈদান্তিক ব্রহ্মভাবনাই বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের পরিণামী প্রকৃতির ক্রমিক বিক্রিয়া এখানে মূল স্থান অধিকার করেনি। মহাভারতের মনু-বৃহস্পতি-সংবাদে মনু বলেছেন, যাঁর থেকে এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, যাঁকে জেনে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যত্নবান লোকেরা জগৎকে অতিক্রম করে, মন্ত্রের শব্দ যাঁকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না এবং যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁর কথা এইরকম—

তিনি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বিবর্জিত, কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে গ্রহণ করা যায় না, তিনি অব্যক্ত, শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণবিহীন এবং অদ্বিতীয়, অথচ তিনি লোকের ভোগের জন্য ওই শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ পদার্থ সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্ত্রী নন, পুরুষ নন এবং নপুংসকও নন। আবার তাঁকে সৎ, অসৎ কিম্বা সদসৎও বলা যায় না। তবে ব্রহ্মজ্ঞ মানুষেরা তাঁকে দেখতে পান, তিনি অক্ষর অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ এবং তিনি সর্বপ্রকার ক্রিয়াবিহীন—

যতো জগৎ সর্বমিদং প্রসূতং
জ্ঞাত্বাত্মবন্তো ব্যতিযান্তি যত্তৎ।
যম্মন্ত্রশব্দৈরকৃতপ্রকাশং তদুচ্যমানং
শৃণু মে পরং যৎ।
রসৈর্বিমুক্তং বিবিধৈশ্চ
গন্ধৈরশব্দমস্পর্শমরূপবচ্চ।
অগ্রাহ্যমব্যক্তমবর্ণমেকং পঞ্চ
প্রকারান্ সসৃজে প্রজানাম্॥
ন স্ত্রী পুমান্নাপি নপুংসকঞ্চ ন
সন্ন চাসৎ সদসচ্চ তন্ন।
পশ্যন্তি যদ্‌ব্রহ্মবিদো মনুষ্যাস্তদক্ষরং
ন ক্ষরতীতি বিদ্ধি॥

[ভগবদ্গীতা ৯.৭; মহা (k) ১২.২০১.২৫-২৭; (হরি) ১২.১৯৪.২৫-২৭]

☐ আমাদের উপরি-উক্ত বক্তব্যের সূত্র ধরেই বলা যায় যে, ব্যক্ত প্রকৃতির উর্ধ্বে যে এই দুটি তত্ত্ব—অব্যক্ত প্রকৃতি এবং প্রতিবিম্ববৎ পুরুষ—

ব্যক্তমব্যক্তজঞ্চৈব তথা বুদ্ধমচেতনম্।

—এই দুটিকেই মহাভারতের কোনো কোনো জায়গায় 'অব্যক্ত' বলা হয়েছে—প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ অব্যক্তৌ। মহাভারতের টীকাকার সিদ্ধান্তবাগীশ প্রকৃতি এবং পুরুষ—দুটি তত্ত্বকেই অব্যক্ত আখ্যা দিয়ে দুটিকে একাত্মক করে ফেলেছেন চিৎ এবং অচিদ্-আত্মক জীবাত্মা এবং পরমাত্মার স্বরূপে। মহাভারতের ভৃগু-ভারদ্বাজ-সংবাদে সমস্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মূলে এমন এক অনাদি-নিধন অব্যক্তের কথা বলা হয়েছে, যিনি স্বরূপত পরমাত্মা—

অনাদিনিধনো দেবস্তথা'ভেদ্যো' জরামরঃ।
অব্যক্ত ইতি বিখ্যাতঃ শাশ্বতো'থাক্ষয়ো'ব্যয়॥

[মহা (k) ১২.২৩৬.৩১-৩২; ১২.১৮২.১১-১২; (হরি) ১২.২৩৩.৩১-৩২; দ্র. ভারতকৌমুদী টীকা এবং ভারত ভাবদীপ টীকা; ১২.১৭৬.১১-১২]

☐ মহাভারতের কোথাও কোথাও কেবল পুরুষকে অব্যক্ত বলে নির্দেশ করা হলেও পুরুষ যেহেতু নিষ্ক্রিয়, সেইহেতু প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত না হয়ে তিনি সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করতে পারেন না। আবার পুরুষ নিষ্ক্রিয় হলেও যেহেতু পুরুষ চেতন, সেহেতু চৈতন্য ও কর্তৃত্ব একই অধিষ্ঠানে থাকতে পারে না। তাহলে সৃষ্টির উন্মেষ কীভাবে হয়েছে? সেই বিষয়টি বোঝানোর জন্যই হয়তো মহাভারতে বলা হয়েছে—পুরুষ প্রকৃতি থেকে

ভিন্ন, নিরাকার বলে অব্যক্ত, বদ্ধ বলে তাঁকে মনে হয় বলে তিনি অনিত্য এবং নিত্যমুক্ত বলে নিত্য; মুঞ্জে যেমন ইষীকা থাকে, তেমনি প্রকৃতি ঘটিত শরীরে পুরুষ রয়েছেন—

অন্যঃ স পুরুষো'ব্যক্তস্তধ্রুবো ধ্রুবসংজ্ঞকঃ।
যথা মুঞ্জ ইষীকাণাং তথৈবৈতদ্ধি জায়তে॥

মুঞ্জ ইষীকার দৃষ্টান্ত আমরা আগেও উচ্চারণ করেছি। নিরাকার-নিষ্ক্রিয়-চেতন-পুরুষ, প্রকৃতি থেকে ভিন্ন হয়েও সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রকৃতিঘটিত শরীরে অধিষ্ঠান করেন। চেতনপুরুষের এবং অচেতন প্রকৃতির সংহত রূপের এই ভাবনা প্রাচীন সাংখ্যেরই একটা বৈশিষ্ট্য, যে-কারণে প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্র চরকসংহিতার মধ্যেও প্রায় সমান্তরালভাবে 'অব্যক্তম্' এই ক্লীবলিঙ্গান্ত পদের দ্বারা কেবল শুদ্ধ জ্ঞানময় পুরুষ বা কেবল গুণময়ী প্রকৃতি উদ্দিষ্ট হননি; কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির সংহত রূপটিই ওই শব্দের দ্বারা বোধিত হচ্ছে। চরক সংহিতা বলেছে—মন, বুদ্ধি, বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই করণগুলির সঙ্গে আত্মার সংযোগ হলেই কর্ম, সুখ, দুঃখের অনুভব এবং বুদ্ধি প্রবর্তিত হয় না। সংযোগবশতই সমুদয় প্রবর্তিত হয়, সংযোগ ব্যতীত কিছুই হতে পারে না—

যদ্যপি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বময়ো'য়ং
পুরুষঃ সাংখ্যৈরুচ্যতে, তথাপীহ
প্রকৃতিব্যতিরিক্তং চোদাসীনং
পুরুষমব্যক্তসাধর্ম্যাদব্যক্তায়াং
প্রকৃতাবেব প্রক্ষিপ্য অব্যক্তশব্দেনৈব গৃহ্নাতি।
তেন চতুর্বিংশতিকঃ পুরুষঃ ইত্যবিরুদ্ধম্।

চরকসংহিতার অন্য একজন টীকাকার গঙ্গাধরের মতেও 'অব্যক্ত' হলেন পুরুষ ও প্রকৃতির সংহত রূপ—

অব্যক্তস্তু শক্তিব্রহ্মগায়ত্রীশ্বরবিদ্যাবিদ্যাত্মক-
পঞ্চব্রহ্ম
পুরুষকালক্ষেত্রজ্ঞ-প্রধানানীত্যেতৎ-
সমুদায়ত্মকং সমত্রিগুলক্ষণং সংহতরূপম্।

[মহা (k) ১২.৩১৫.১২; ১২.৩০৩.৪৭; (হরি) ১২.৩০৫.৫৮; ১২.২৯৬.৪৭; চরক সংহিতা, শারীর স্থান ১.১৬-১৭; ১.৬৩; পুনশ্চ দ্র. তাপসী মুখার্জী, মহাভারত-পুরাণে সাংখ্যদর্শনের উত্তরাধিকার, পৃ. ১৪১-১৫৫, ৪২৮-৪২৯ (অনুমত্যনুসারে সংক্ষেপিত)]

অব্যক্ত$_{২}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, যাঁর থেকে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, যাঁকে জেনে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যত্নবান লোকেরা জগৎকে অতিক্রম করে, মন্ত্রের শব্দ যাঁকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না, সেই পরমেশ্বর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বিবর্জিত, কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে গ্রহণ করা যায় না, তিনি অব্যক্ত, শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণবিহীন এবং অদ্বিতীয় অথচ তিনি লোকের ভোগের জন্য এই শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ পদার্থ সৃষ্টি করেছেন—

যতো জগৎ সর্বমিদং প্রসূতং
জ্ঞাত্বাত্মবন্তো ব্যতিযান্তি যত্তৎ।
যন্মন্ত্রশব্দৈরকৃত প্রকাশং তদুচ্যমানং
শৃণু মে পরং যৎ।
রসৈর্বিমুক্ত বিবিধৈশ্চ
গন্ধৈরশব্দমস্পর্শমরূপবচ্চ।
অগ্রাহ্যমব্যক্তমবর্ণমেকং পঞ্চ
প্রকারান্ সসৃজে প্রজানাম্॥

দার্শনিকের ভাবনায় এই যে অব্যক্ত নিরাকার ব্রহ্মের কথা আলোচিত হয়, তাঁর স্বরূপ বলেই ভগবান শিবও অব্যক্ত নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪৩; (হরি) ১৩.১৬.১৪২]

অব্যঙ্গ বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২৭; (হরি) ১৩.১২৭.২৭]

অব্যয়$_{১}$ সাধারণত ব্যাকরণে 'অব্যয়' পদ হিসেবে যেখানে সংজ্ঞিত হয়েছে, সেখানে এই পরিচিত শ্লোকটি প্রায়ই উল্লিখিত হয় যে, তিনটি লিঙ্গ (পুং, স্ত্রী, নপুংসক), তিনটি বচন এবং সাতটি বিভক্তিতে যে পদের চেহারার কোনো পরিবর্তন ঘটে না এবং পরিবর্তনের কারণে পদের ক্ষতিসাধন হয় না, তাকে অব্যয় বলে। এই অব্যয়-ভাবনার মধ্যে দেশ-কাল ভেদে সমস্ত অবস্থা-পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনীয়তার এক তত্ত্ব পাওয়া যায় এবং এই তত্ত্ব প্রধানত নিরাকার নির্বিশেষ দ্বিতীয় রহিত ব্রহ্মের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হয়, তেমনই প্রযোজ্য হয় সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় পরমা প্রকৃতি এবং চৈতন্যরূপী পরমাত্মার ক্ষেত্রে। মহাভারতের প্রারম্ভেই মহাভারত-বক্তা সৌতি উগ্রশ্রবা সাংখ্য-দর্শনের তাত্ত্বিকতায় বলছেন —প্রলয়ের পর সমস্ত জগৎ নিষ্প্রভ নিরালোক অন্ধকারে ব্যাপৃত

ছিল, তখন এই জগৎ এবং জীবনের বীজস্বরূপ একটি অণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বৃহৎ অণ্ডের বিশেষণ হিসেবেই অব্যয় কথাটি প্রথম উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতে—

বৃহদণ্ডমভূদেকং প্রজানাং বীজমব্যয়ম্।

টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে 'অব্যয়' অর্থ করেছেন অপরিনামী কূটস্থ বস্তু, যেটি জগৎসৃষ্টির উপাদান কারণ। ঠিক এর পরেই এই অব্যয় ভাবনার মধ্যেই সত্যের প্রতিষ্ঠা, জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। মহাভারতের অন্যত্র অব্যয় বলতে হিরণ্যগর্ভের স্বরূপতায় ব্রহ্মের কথাই বলা হয়েছে—

ঈশানং জ্যোতিরব্যয়ম্।

[মহা (k) ১.১.২৯-৩১; ১২.৩০২.১৬;
(হরি) ১.১.২৯-৩১; ১২.২৯৫.১৬;
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩.১২]

☐ উপনিষদগুলির মধ্যে 'অব্যয়' শব্দটি নির্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মের অন্যতম প্রতিপাদক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার সাধারণ অর্থ হল—সেই পরম জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মের কোনো ক্ষয়-ব্যয় নেই—

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্।

কঠোপনিষদে উচ্চারিত শ্লোকাংশে 'অব্যয়' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য লিখেছেন—যা কিছুরই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ আছে সেই সব কিছুরই ক্ষয়-ব্যয় আছে, কিন্তু এই অনাদিনিধন ব্রহ্ম শব্দস্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি বিষয়ের অতীত বলেই তিনি অক্ষয়, অব্যয়। আবার বলা হচ্ছে—যা কিছুরই ক্ষয়-ব্যয় আছে, তাই অনিত্য। ব্রহ্মের কোনো ক্ষয়-ব্যয় নেই, তাই তিনি অব্যয় এবং ঠিক সেই কারণেই নিত্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সেইজন্যই ব্রহ্মকে সর্বশক্তিমান্, জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অব্যয় বলা হয়েছে—

ঈশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।

[কঠোপনিষদ ৩.১৫; শঙ্করাচার্যের টীকা দ্র.।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩.১২;
মুণ্ডকোপনিষদ ১.১.৬]

☐ পরবর্তীকালে অবতার-সার হিসেবে যখন কৃষ্ণের প্রাধান্য বাড়ল, তখন পরব্রহ্মের এই অব্যয়-ভাব কৃষ্ণের ওপরেই আরোপিত হয়েছে। শান্তিপর্বে ভীষ্মের উক্তিতে বলা হয়েছে—দেবতা এবং দেবর্ষি ঋষিরা এই নারায়ণ-হরি অথবা কৃষ্ণকেই পরম অব্যয় তত্ত্ব বলে নির্ধারণ করেছেন—

দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব যং বিদুঃ পরমব্যয়ম্।

নারায়ণ বা কৃষ্ণের ওপর এই অব্যয়ভাব আরোপিত হবার সবচেয়ে বড়ো কারণ বোধহয় সাংখ্যের চৈতন্যরূপী পুরুষের সঙ্গে নারায়ণ বা কৃষ্ণের তাত্ত্বিক সমতা। মহাভারত সাংখ্যের পুরুষকে অক্ষর, অজ এবং অব্যয় বলে নির্ণয় করে বলেছে—তাঁর ক্ষয় নেই বলেই তিনি অক্ষয়, অব্যয়—

অক্ষয়ত্বাৎ প্রজননে অজমত্রাহুরব্যয়ম্।
অক্ষয়ং পুরুষং প্রাহুঃ ক্ষয়ো হ্যস্য ন বিদ্যতে॥

[মহা (k) ১২.৪৭.১৯; ১২.৩১৮.৪৬;
(হরি) ১২.৪৬.১৯; ১২.৩০৮.৪৬]

☐ নারায়ণ-বিষ্ণুকে যেমন মহাভারতে অব্যয় বলা হয়েছে, তেমনই ভগবান শিবকেও অব্যয় বলে তাঁরও ব্রহ্মস্বরূপতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩১২.১৩; ১২.৩৩৯.১১; ১২.৩৪২.৬;
১৩.১৪.১২৭; ১৩.১৭.৭২; ১৩.১৪৯.১৪; ১৪.৮.২৭;
(হরি) ১২.৩০৪.১৩; ১২.৩২৫.১১; ১২.৩২৮.৩;
১৩.১৩.১২৬; ১৩.১৬.৭২; ১৩.১২৭.১৪; ১৪.৮.২৭]

অব্যয়$_২$ সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অনাসক্ত 'জয়' নামক বারোজন দেবতাকে ব্রহ্মা শাপ দিলেন যে, তাঁরা প্রতি মন্বন্তরে দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করবেন। ফলে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই দেবতারা প্রজাপতি রুচির ঔরসে অজিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। এই মন্বন্তরে এই বারোজন দেবতা 'অজিত' নামক গণ হিসেবে পরিচিত হন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের এই বারোজন অজিত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অব্যয়। *[বায়ু পু. ৬৭.৩৪]*

অব্যয়$_৩$ ভবিষ্যত ত্রয়োদশ মন্বন্তরে যখন রৌচ্য মনু মন্বন্তরাধিপতি হবেন সেই সময় যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন অব্যয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি অব্যয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পুলস্ত্য বংশীয় বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১০২;
বিষ্ণু পু. ৩.২.৩৮; মার্কণ্ডেয় পু. ৯৪.৩০]

অব্যয়$_৪$ ভৃগু ঋষির ঔরসে পুলোমার গর্ভে বারোজন দেবতার জন্ম হয়। ভৃগুর এই বারোজন পুত্রের অন্যতম ছিলেন অব্যয়।

[মৎস্য পু. ১৯৫.১৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৯০]

অব্যয়$_৫$ শিবসহস্রনাম স্তোত্রে উল্লিখিত মহাদেবের

অন্যতম নাম। শিবসহস্রনাম স্তোত্রে মোট দুবার ভগবান শিব অব্যয় নামে সম্বোধিত হয়েছেন।

উপনিষদে 'অব্যয়' শব্দটি নির্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মের অন্যতম প্রতিপাদক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার সাধারণ অর্থ হল—সেই পরম জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মের কোনো ক্ষয় ব্যয় নেই—

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্।

কঠোপনিষদে উচ্চারিত শ্লোকাংশে 'অব্যয়' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য লিখেছেন —যা কিছুরই শব্দ-স্পর্শ, রূপ-রস গন্ধ আছে, সেই সব কিছুরই ক্ষয় ব্যয় আছে। কিন্তু এই অনাদিনিধন ব্রহ্ম শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি বিষয়ের অতীত বলেই তিনি অক্ষয়, অব্যয়। আবার বলা হচ্ছে, যা কিছুরই ক্ষয়-ব্যয় আছে, তাই অনিত্য। ব্রহ্মের কোনো ক্ষয়-ব্যয় নেই, তাই তিনি অব্যয়, ঠিক সেই কারণেই তিনি নিত্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সেই জন্যই ব্রহ্মকে সর্বশক্তিমান, জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অব্যয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ঈশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।

[মহা (k.) ১৩.১৭.৭২, ১৪৯; (হরি) ১৩.১৬.৭২, ১৪৩; কঠোপনিষদ ৩.১৫ শঙ্করাচার্যের টীকা দ্রষ্টব্য; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩.১২; মুণ্ডকোপনিষদ ১.১.৬]

অভদ্রবিনাশিনী গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি শক্তির অন্যতম। *[দেবী ভাগবত পু. ১২.২.১]*

অভয়$_{১}$ ধ্বজজিহ্বের একজন পুত্র। ধ্বজজিহ্ব প্লক্ষদ্বীপকে সাতটি ভূবিভাগ বা বর্ষে ভাগ করে সাতটি পুত্রকে দান করেন এবং পুত্রদের নামানুসারে বর্ষগুলির নামকরণ করেন। গোমেদদ্বীপের একটি বর্ষের নাম অভয়ের নামানুসারে অভয়বর্ষ রাখা হয়।

[দ্র. ধ্বজজিহ্ব, প্লক্ষদ্বীপ]

[দেবীভাগবত পু. ৮.১২.৫-৭; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৭.৭৭]

অভয়$_{২}$ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের এক জন। দ্রোণের সেনাপতিত্বকালে এক সময় তিনি অন্যান্য কয়েক ভাইকে নিয়ে ভীমকে আক্রমণ করেন। দ্রোণকে সহায়তা করতে গিয়ে তিনি দীর্ঘ যুদ্ধের পর ভীমের হাতেই মারা যান।

[মহা (k.) ১.৬৭.১০৪; ১.১১৭.১২; ৭.১২৭.২৫, ৬২; (হরি) ১.৬২.১০৫; ১.১১১.১২; ৭.১১০.৭৮, ১০৪]

অভয়$_{৩}$ মৎস্য পুরাণে মহর্ষি কৌশিক বিশ্বামিত্রের বংশে যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি অভয়ের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি অভয় কৌশিক-বংশীয় অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। *[মৎস্য পু. ১৯৮.৩]*

অভয়$_{৪}$ ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা দয়ার গর্ভজাত পুত্র।

[ভাগবত পু. ৪.১.৫০]

অভয়দ পুরু বংশীয় রাজা মনস্যুর পুত্র। ইনি রাজা সুদ্যু বা সুদ্যুম্ন-র পিতা ছিলেন।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১]

অভয়বর্ষ পৌরাণিক প্লক্ষদ্বীপের সাতটি বর্ষের মধ্যে অন্যতম। *[দ্র. অভয়$_{১}$]*

[ভাগবত পু. ৫.২০.৩]

অভয়া$_{১}$ দেবী ভগবতী উষ্ণতীর্থ নামক স্থানে দেবী অভয়া নামে প্রসিদ্ধ।

[দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৭২]

অভয়া$_{২}$ রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সাতটি ভূবিভাগে বা বর্ষে বিভক্ত করেন। প্রতিটি বর্ষে সেই সেই ভূমিভাগের নামাঙ্কিত একটি করে বর্ষনদী প্রবাহিত। অভয়া নামক বর্ষনদী অভয়বর্ষের অন্তর্গত আমবর্ষে প্রবাহিত। *[দেবীভাগবত পু. ৮.১৩.১০]*

অভয়েশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই তীর্থে ভগবান শিবের পূজা করেন, তাঁর শিবলোকে গতি হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩৫.৫-৬]

অভিকাল রামায়ণে উল্লিখিত একটি গ্রাম। রামচন্দ্র বনবাসে গেলে দশরথের মৃত্যুর পর রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ অযোধ্যার রিক্ত সিংহাসনে ভরতকে অভিষিক্ত করার জন্য সিদ্ধার্থ ও অন্যান্য কয়েকজন দূতকে কেকয় রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন ভরতকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। তাঁরা কেকয় যাওয়ার পথে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামে গ্রাম দুটি পার হয়েছিলেন।

অভিকালং ততঃ প্রাপ্য তেজোভিভবনাচ্চ্যুতাঃ।

[রামায়ণ ২.৬৮.১৭]

☐ রামায়ণে বলা হয়েছে এই গ্রামদুটি পার হয়েই বশিষ্ঠ প্রেরিত দূতেরা ইক্ষুমতী নদীর কাছে এসে পৌঁছেছিলেন। সুতরাং গ্রাম দুটি ইক্ষুমতীর কাছাকাছি অবস্থিত ছিল বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইক্ষুমতী নদীটি কুরুক্ষেত্রের নিকটে প্রবাহিত ছিল। সুতরাং

গ্রাম। দুটিও কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী ছিল বলেই ধারণা করা যায়।

□ এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, রামায়ণে বলা হয়েছে অযোধ্যা থেকে কেকয় রাজ্যে যাওয়ার পথে প্রথমে মালিনী নদী তারপর গঙ্গা নদী এবং কুরুক্ষেত্র পার হয়ে অবশেষে ইক্ষুমতী নদীতে পৌঁছানো যায়। ফলে বোঝা যায় ইক্ষুমতী নদী, কুরুক্ষেত্র, তেজোভিবন এবং অভিকাল গ্রাম দুটির মধ্যে স্পষ্ট ভৌগোলিক নৈকট্য ছিল। *[রামায়ণ ২.৬৮.১২-১৭]*

অভিগম্য শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। অভি উপসর্গের অর্থ হল সামনে, আর গম্য শব্দের অর্থ প্রাপ্য। দুই মিলে সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায়—যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শরণাপন্ন হলেই তাঁকে লাভ করা যায়। মহাদেব শরণাগতবৎসল, শরণাগত মানুষের কাছে খুব সহজে, খুব শীঘ্রই তিনি ধরা দেন, তাই তাঁকে অভিগম্য নামে সম্বোধন করা হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই অর্থেই অভিগম্য নামটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—

অভিগম্যঃ সুখপ্রাপ্যঃ।

ইংরেজিতে তাঁকে ‘easily accessible’ বলা যায়, অভিগম্য শব্দের সাধারণ অর্থও তাই।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯২; (হরি) ১৩.১৬.৯২]

অভিজ্ঞ একটি নরকের নাম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২.১৫০]

অভিজিৎ$_{১}$ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশ-পরম্পরায় যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি অভিজিতের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি অভিজিৎ আঙ্গিরস গোত্র প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৬]*

অভিজিৎ$_{২}$ আটাশটি নক্ষত্রের মধ্যে বাইশতম এই নক্ষত্রের অধিদেবতা ব্রহ্মা। অভিজিৎ নক্ষত্র রোহিণীর ছোটো বোনের মতো বলে তাঁর ভারী ঈর্ষা ছিল রোহিণীর ওপর। অতএব রোহিণীর চেয়ে মর্য্যাদায় বড়ো হওয়ার তাড়নায় তিনি তপস্যা করার জন্য বনে চলে গিয়েছিলেন—

অভিজিৎ স্পর্ধমানা তু রোহিণ্যা কন্যসী স্বসা।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপস্তপ্তুং বনং গতা॥

অভিজিৎ নক্ষত্র এইভাবে আকাশচ্যুত হয়ে বনে গেলে সেই স্থান পূরণ করেন কৃত্তিকা নক্ষত্র। বস্তুত নক্ষত্র-মাসের দিন-সংখ্যা গণনার সুবিধার্থেই অভিজিৎ নক্ষত্রের তপস্যার কথা প্রতীকীভাবে বলা হয়েছে।

□ অভিজিৎ নক্ষত্রের যোগে শ্রাদ্ধ করলে চিকিৎসা বা ভিষক্-শাস্ত্রের সিদ্ধি ঘটে। অভিজিৎ নক্ষত্রের শুভযোগে মধু এবং ঘৃতের সঙ্গে পণ্ডিত মানুষকে দুগ্ধ দান করলে স্বর্গলাভ হয়।

□ অভিজিৎ নক্ষত্রের একটি নক্ষত্র মুহূর্তও আছে। মহাভারতে দেখতে পাচ্ছি—জৈষ্ঠ্য মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দিনের বেলায় অভিজিৎ নক্ষত্র যখন দিনের অষ্টম মুহূর্তটিকে ছুঁয়েছে, তখনই ধর্মের পুত্র যুধিষ্ঠির জন্মেছিলেন—

ঐন্দ্রে চন্দ্রসমাযুক্তে মুহূর্তে'ভিজিতে'ষ্টমে।

পুরাণে উল্লেখ আছে যে, ভগবান কৃষ্ণও অভিজিৎ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভগবান শিব যে মুহূর্তে ত্রিপুর ধ্বংস করেছিলেন, সেটিও অভিজিৎ নক্ষত্র মুহূর্ত ছিল বলে জানা যায়।

*[মহা (k) ১.১২৩.৬; ৩.২৩০.৮-১১;
১৩.৮৯.১১; ১৩.৬৪.২৭;
(হরি) ১.১১৭.৮; ৩.২৯২.৮-১১;
১৩.৭৬.৪৫; ১৩.৫৩.২৭;
ভাগবত পু. ৫.২২.১১; ৫.২৩.৬; ৮.১৮.৫;
১১.১৬.২৭; ৩.১৮.২৭; ৭.১০.৬৭;
মৎস্য পু. ২২.২; বায়ু পু. ৫০.১৩০; ৮২.১২; ৯৬.২০১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২০৫;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ২৯.২০৯;
দেবীভাগবত পু. ৮.১৬.২৪-২৫]*

অভিজিৎ$_{৩}$ যদু-বৃষ্ণি বংশীয় অন্ধকের পুত্র কুকুরের বংশধারায় কপোতরোমার পুত্র অভিজিৎ। অভিজিৎ পুনর্বসু নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন।

*[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৯;
বায়ু পু. ৯৬.১১৮]*

অভিজ্ঞাত শাল্মলীদ্বীপটি সাতটি পৃথক স্থলভাগ নিয়ে গঠিত। এই সাতটি স্থলভাগের মধ্যে অন্যতম অভিজ্ঞাত। প্রিয়ব্রতের পুত্র রাজা যজ্ঞবাহু তাঁর সাতপুত্রের মধ্যে একজনকে অভিজ্ঞাতদ্বীপটি দান করেন।

[ভাগবত পু. ৫.২০.৯]

অভিজ্ঞান প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু অভিজ্ঞানের পিতা। অভিজ্ঞানের নাম অনুসারে শাল্মলীদ্বীপের একটি বর্ষের নামকরণ করা হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৭.৭৩]

অভিধেয়াত্মা ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৭৯; (হরি) ১৩.১২৭.৭৯]

অভিপ্রায় বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৬; (হরি) ১৩.১২৭.১০৬]

অভিবাদন সাধারণত অগ্নিহোত্র সম্পাদন করার পর ব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে বলতেন আমি অমুক দেবশর্মা, আপনার আয়ু এবং আরোগ্য কামনা করছি। এই প্রক্রিয়াকেই অভিবাদন বলে। এর প্রত্যুত্তরে অভিবাদ্য ব্যক্তিও তাঁকে বললেন—'তুমি আয়ুষ্মান হও, সৌম্য।' এটাকে প্রত্যভিবাদন বলে।

অভিবাদন করলেও যিনি প্রত্যভিবাদন করেন না, তাঁকে অভিবাদন করার প্রয়োজন নেই।

[কূর্ম পু. ২.১২.১৭-২১]

অভিবাদ্য শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। অভিবাদন করার অর্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, নমস্কার করা বা প্রণাম করা। যাঁকে অভিবাদন জানানো হয় বা যিনি নমস্কৃত হন তিনিই অভিবাদ্য। মহাদেব জগতের সমস্ত প্রাণীদের তো বটেই, দেবতাদেরও শ্রদ্ধার পাত্র, দেবতারাও সর্বদা ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করেন, তাঁর স্তব করেন। জগদীশ্বর রূপে তিনি সকলের দ্বারা নমস্কৃত হন বলেই তাঁর এক নাম অভিবাদ্য—

অভিবাদ্যঃ সর্বেষাং নমস্কার্যাঃ স্তুত্যো বা।

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৪; (হরি) ১৩.১৬.৩৪]

অভিভূ কাশীদেশের রাজা। যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কাশী রাজ্যের এক রাজার ছেলে (যাঁর নাম করা হয়নি) তিনিও পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন এবং মনে হয়, তিনি কাশীরাজ অভিভূর ছেলে। দ্রোণপর্বে যুদ্ধের সময় এই কাশী রাজপুত্রের উল্লেখ রয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কোন যোদ্ধার রথ চিহ্ন কী রকম। উত্তরে অনেকের মধ্যে কাশী-রাজপুত্রের উল্লেখ করে সঞ্জয় বলেছিলেন— কোঁচবকের বা ক্রৌঞ্চের রঙের মতো অশ্ব তাঁর বাহন, যুবক, কিন্তু কোমল-শরীর এবং মহারথ যোদ্ধা এই কাশী রাজা অভিভূর ছেলে—

যুবানম্ অবহন্ যুদ্ধে ক্রৌঞ্চবর্ণা হয়োত্তমাঃ।
কাশ্যস্যাভিভুবঃ পুত্রম্ . . .।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ইনি এবং তাঁর পিতা অভিভূ পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয়—

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
ভগবদ্গীতাঃ কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। *[ভগবদ্গীতা ১.৫; ১.১৭]*

দ্রোণপর্বের যুদ্ধসময়ে কৌরবপক্ষের গোবাসন রাজা অনেক যোদ্ধা নিয়ে অভিভূর পুত্রকে বাধা দেন। কৌরবপক্ষের বসুদান রাজা কাশীদেশীয় অনেক সৈন্যের সঙ্গে কাশীরাজ অভিভূকে হত্যা করেন—

অভিভূঃ কাশীরাজশ্চ কাশিকৈর্বহুভির্বৃতঃ।

[মহা (k) ৭.২৩.২৬-২৭; ৭.৯৫.৩৮; ৮.৬.২৩-২৪; (হরি) ৭.২১.২৫; ৭.৮২.৩৮; ৮.৪.২৩]

অভিভূত বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র সারণ। সারণের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অভিভূত। *[বায়ু পু. ৯৬.১৬৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭১]*

অভিমন্যু$_{১}$ অর্জুনের ঔরসে সারণের সহোদরা ও শ্রীকৃষ্ণের বোন সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। *[মহা (k) ১.৬৩.১২১; ১.৯৫.৭৮; ১.২১৯.১৭; ১.২২১.৬৫; (হরি) ১.৫৮.১৬০; ১.৯০.১০৪; ১.২১২.১৭; ১.২১৪.৬৫; বিষ্ণু পু. ৪.২০.১২; মৎস্য পু. ৫০.৫৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭৮; ভাগবত পু. ৯.২২.৩৩; বায়ু পু. ৯৬.১৭৬; ৯৯.২৪৯; দেবীভাগবত পু. ২.৭.৩-৪]*

□ চন্দ্রদেবের পুত্র বর্চা (বর্চস্) অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অংশাবতরণ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

যস্তু বর্চা ইতি খ্যাতঃ সোমপুত্রঃ প্রতাপবান্
সো'ভিমন্যুর্বৃহৎ কীর্ত্তিরর্জ্জুনস্য সুতো'ভবৎ॥

[মহা (k) ১.৬৭.১১৩; (হরি) ১.৬২.১১৪]

□ তাঁর বাহু দুটি ছিল দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং চোখ দুটি আকর্ণ-বিস্তৃত। রূপে, আকৃতিতে, শৌর্যে, বীর্যে তিনি ছিলেন কৃষ্ণের সমান। অভিমন্যু এতটাই বীর ও যুদ্ধনায়ক হয়ে উঠেছিলেন যে, সাত্যকি ইত্যাদি বৃষ্ণিবংশীয় বীরেরা স্থির করে ছিলেন যে, তাঁরা নিজেরাই অভিমন্যুর নেতৃত্বে কৌরবদের বধ করবেন এবং

পাণ্ডবদের বনবাস সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিমন্যু কুরুরাজ্য শাসন করবেন।

[মহা (k) ১.২২১.৭৪-৭৭; ৩.১২০.২১; (হরি) ১.২১৪.৭৪-৭৭; ৩.১০০.৪৩]

□ অভিমন্যু তাঁর পিতার কাছেই শস্ত্রবিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন। মাতুলালয়ে দ্বারকাপুরীতে বাসকালে অভিমন্যু কৃষ্ণের কাছে এবং রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের কাছেও শস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.২২১.৭২; ৩.১৮৩.৩০-৩১; (হরি) ১.২১৪.৭১; ৩.১৫৪.৩০-৩১]

পাণ্ডবদের বনবাস-কালে অভিমন্যু দ্বারকায় মাতুলালয়ে ছিলেন। বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হবার পর অভিমন্যুর সঙ্গে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট-এর কন্যা উত্তরার বিবাহ হয়। *[মহা (k) ১.২.২১৪; ৪.৭২.৬৬; (হরি) ১.১.১৩৩; ৪.৬৭.৩৪]*

□ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পাণ্ডবপক্ষের রথী-মহারথীদের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে দুর্যোধনকে ভীষ্ম বলেছেন যে, যুদ্ধের প্রতিপক্ষতায় অভিমন্যু শত্রুহন্তা অর্জুন এবং বাসুদেবের সমান। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং কৌশলজ্ঞও বটে। তিনি মনস্বী এবং সমস্ত সংকল্পে স্থির। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অভিমন্যু সম্বন্ধে বলেছেন—কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের চরিত্রে যে সব গুণ প্রকট, সে সব গুণ অভিমন্যুতে আছে। ধৈর্যে তিনি যুধিষ্ঠিরের মতো, চরিত্রে কৃষ্ণের মতো, কর্মে ভীমের মতো, রূপে, বিক্রমে, বিদ্যায় ধনঞ্জয়ের মতো, বিনয়ে নকুল ও সহদেবের মতো—

যুধিষ্ঠিরস্য ধৈর্যেণ কৃষ্ণস্য চরিতেন চ।
কর্মভির্ভীমসেনস্য সদৃশো ভীমকর্মণঃ॥
ধনঞ্জয়স্য রূপেণ বিক্রমেণ শ্রুতেন চ।
বিনয়াৎ সহদেবস্য সদৃশো নকুলস্য চ॥

[মহা (k) ৫.৫০.৪৩; ৭.৩৪.৮-১০; (হরি) ৫.৫০.৪৩; ৭.৩১.২৮ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য খণ্ড ২১, পৃ. ২৮৩]

□ অভিমন্যুর ঘোড়া দুটি ছিল পিঙ্গল বর্ণের। তাঁর রথের ধ্বজটি সুবর্ণমণ্ডিত কর্ণিকার পুষ্প দিয়ে নির্মিত ছিল—

জাম্বূনদবিচিত্রেণ কর্ণিকারেণ কেতুনা।

[মহা (k) ৬.৪৭.৭-৮; ৭.২৩.৩৩; (হরি) ৬.৪৭.৭-৮; ৭.২১.৩২]

□ মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুকে অনেক সময় অনেক বীরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখা যায়।

ভগদত্তের বিরুদ্ধে ভীমসেনকে যুদ্ধ করতে সাহায্য করেন অভিমন্যু। দ্রোণ, ভীষ্ম, শল্য ইত্যাদি মহারথীদের বিরুদ্ধেও অভিমন্যু বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকেও সহায়তা করেন অভিমন্যু।

[মহা (k) ৫.১৭০.২-৩; ৬.৪৭.৬৬-৬৭; ৬.৫২.৩০; ৬.৬০.২৩-২৪; (হরি) ৫.১৫৯.২-৩; ৬.৪৭.১৯-২৬; ৬.৫২.২৯; ৬.৬০.২৪-২৫]

□ যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে আচার্য দ্রোণের পরামর্শে দুর্যোধন সংশপ্তকদের দিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। তাঁদের আহ্বানে অর্জুন অন্যত্র চলে যান। এই অবসরে আচার্য চক্রব্যূহ তৈরি করে সেনা সন্নিবেশ করেন।

কর্ণ, দুঃশাসন, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ—এই সপ্তরথী ব্যূহে অবস্থান করে পাণ্ডব পক্ষের অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করতে থাকেন। আচার্য দ্রোণের বিক্রম ও চক্রব্যূহের দুর্ভেদ্যতার বিষয় চিন্তা করে বিপন্ন যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকেই চক্রব্যূহ ভেদ করার নির্দেশ দেন। অভিমন্যু জানান, তিনি চক্রব্যূহ ভেদ করার কৌশল শিক্ষা করেছেন পিতার কাছ থেকে, কিন্তু সঙ্কট মুহূর্তে ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল রপ্ত করেননি—

দ্রোণস্য দৃঢ়মত্যুগ্রমনীকপ্রবরং যুধি।
পিতৃণাং জয়মাকাঙ্ক্ষন্নবগাহে' বিলম্বিতম্॥
উপদিষ্টো হি মে পিত্রাযোগো' নীকবিশাতনে।
নোৎসহে তু বিনির্গন্তুমহং কস্যাঞ্চিদাপদি॥

যুধিষ্ঠির ও ভীম অভিমন্যুকে আশ্বাস দিয়ে বলেন—অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবেশের পথ করে দিলেই তাঁরা প্রবেশ করবেন। অভিমন্যুর সারথি ভীত হয়ে তাকে চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে বারণ করলে অভিমন্যু তাঁর রথ দ্রোণের দিকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন।

জ্যেষ্ঠতাতের আশ্বাসবাণীতে অভিমন্যু পরম উৎসাহে দ্রোণের ব্যূহ ভেদ করে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা এই ছয় জন রথী অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলেন। অভিমন্যুও বীর বিক্রমে সকল মহারথীদের প্রতিরোধ করেন। কৌরবপক্ষের

রথীরা অভিমন্যুর বীরত্বে বিব্রত বোধ করতে থাকেন। তাঁর বিক্রমে অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়।

মহাদেবের বরে অজেয় হয়ে জয়দ্রথ সেদিন ব্যূহের দ্বার রক্ষা করছিলেন। তাই প্রাণপণ চেষ্টা করেও ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদি বীরেরা অভিমন্যুকে সাহায্য করার জন্য ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না।

কোশলরাজ বৃহদ্বল অভিমন্যুর দিকে এগিয়ে এলে অভিমন্যু বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। প্রথমে বৃহদ্বল অভিমন্যুর রথের ধ্বজ ছিন্ন করেন। তাঁর রথের সারথিও মাটিতে পড়ে যায়। অভিমন্যু রেগে গিয়ে নটি বাণ দিয়ে বৃহদ্বলকে আক্রমণ করেন। অবশেষে বৃহদ্বল পরাজিত হন।

অভিমন্যু শল্যের পুত্র রুক্মরথকে হত্যা করার পর কৌরবপক্ষের অন্যান্য রথীরা অভিমন্যুকে ক্রমাগত বাণের দ্বারা আক্রমণ করতে থাকেন। এরপর দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলে তিনি লক্ষ্মণকেও হত্যা করেন। প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিমন্যুকে হত্যার নির্দেশ দেন দুর্যোধন—

ততো দুর্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে।
হতৈনমিতি চুক্রোশ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ॥

দ্রোণ, কৃপ, দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ ইত্যাদি সাত জন মহারথী বালক অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলেন। তাঁরা অভিমন্যুকে রথ ও সারথিহীন করেন এবং তাঁদের পরাক্রমে একে একে অভিমন্যুর খড়্গ, বর্ম, ধনু প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। একা যুদ্ধ করতে করতে অভিমন্যু ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় দুঃশাসনের পুত্র গদা দিয়ে অভিমন্যুকে শেষ আঘাত করেন। গুরুতর আঘাত পেয়ে অভিমন্যু ভূপতিত হন এবং প্রাণ ত্যাগ করেন।

[মহা (k) ৬.৪৫.১৪-১৬; ৭.৩৫-৪৭ অধ্যায়; ৭.৪৯.১-১৩; (হরি) ৬.৪৫.১৫-১৭; ৭.৩২-৪২ অধ্যায়; ৭.৪৩.১-১৮; বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪৮]

□ অভিমন্যুর মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অশ্বত্থামা যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন, সেই অস্ত্রে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানটির গতি স্তব্ধ হয়ে যায়।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে আসেন তখন উত্তরা ওই মৃত সন্তানটিকে প্রসব করেন। কৃষ্ণের কৃপায় উত্তরার মৃত পুত্র পুনরায় জীবন লাভ করে। অভিমন্যু-উত্তরার এই পুত্র হলেন পরীক্ষিৎ।

[মহা (k) ১৪.৬৭-৬৯ অধ্যায়; ১৪.৭০.১-১১; (হরি) ১৪.৮৫-৮৭ অধ্যায়; ১৪.৮৮.১-১১; ভাগবত পু. ১.৪.৯; ৩.৩.১৭; ৯.২২.৩৪]

□ মৃত্যুর পরে অভিমন্যু চন্দ্রলোকে যাত্রা করেন—যেহেতু চন্দ্রদেবের পুত্র বর্চ্চার অংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

[মহা (k) ৭.৫৪.৫৬-৫৭; ১৮.৫.১৬-২০; (হরি) ৭.৪৭.৫৫-৫৬; ১৮.৫.১৭-১৯]

অভিমন্যু$_২$ চাক্ষুষ মনুর ঔরসে নড়্বলার গর্ভে দশটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ছিল অভিমন্যু।

[মৎস্য পু. ৪.৪২; বায়ু পু. ৬২.৬৮, ৯১; বিষ্ণু পু. ১.১৩.৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৮০, ১০৭]

অভিমন্যু$_৩$ সাবর্ণি মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৭১]

অভিমুন্য$_৪$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্বিষিমন্ত নামে যেসব দেবতারা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৩১.৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৯৫]

অভিমিত্র কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতার জন্ম হয়। এই ঊনপঞ্চাশ জন দেবতা সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় গণের অন্তর্গত সাতজন দেবতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন অভিমিত্র। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইনি অমিত্র নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[বায়ু পু. ৬৭.১২৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৯৩]

অভিযুক্ত কুশদ্বীপের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মতোই চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিলেন বলে পুরাণে বলা হয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয় বর্ণটির নাম অভিযুক্ত। সম্ভবত এটি বৈশ্যবর্ণের সমার্থক। *[ভাগবত পু. ৫.২০.১৬]*

অভিযুক্তাক্ষিক *[দ্র. অভিয়ু]*

অভিয়ু কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে ঊনপঞ্চাশজন মরুৎ দেবতার জন্ম হয়। এঁরা সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এর মধ্যে চতুর্থগণের অন্তর্গত সাতজন মরুৎ-এর মধ্যে অভিয়ু অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬৭.১২৬]*

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পাঠে ইনি অভিযুক্তাক্ষিক নামে চিহ্নিত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৯৫]*

অভিরাম শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। সংস্কৃত 'রম্' ধাতুর অর্থ আসক্ত হওয়া। 'রম্' ধাতুর সঙ্গে 'ক্ত' প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় 'রত'। রত হওয়া কিংবা অভিরত হওয়া (অভি + √রম্ + ক্ত) বলতে কোনো কিছুর প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত হওয়া বা আসক্ত হওয়া বোঝায়। মানুষ যে বস্তুতে আসক্ত বা অনুরক্ত হয় তাকেই বলা হয় অভিরাম। ভগবান শিবের যে অতিসুন্দর মনোহর মূর্তি কল্পনা করা হয় প্রাণীমাত্রেই সেই রূপে মুগ্ধ হয় বলে তাঁকে অভিরাম বলা হয়। তাঁকে চিন্তা করা বা তাঁর ধ্যান করা তাঁর ভক্তের কাছে প্রীতিজনক। সেক্ষেত্রে ভক্তের চিত্ত হরণ করেন বলেও তিনি অভিরাম নামে খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের অভিরাম নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন— অভিরামঃ প্রীতিজনকঃ। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরমানন্দদায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রশান্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দদায়কম্।

[মুক্তিকোপনিষদ্ ২.৫৪]

যিনি ব্রহ্মাকে নিজ অন্তরে লাভ করেন তাঁর অন্তরে যে অলৌকিক আনন্দ জন্ম নেয়, তিনি সেই আনন্দে আচ্ছন্ন হন, পরব্রহ্মের প্রতিই একান্ত আসক্ত হন—এই ভাবনা থেকেও ব্রহ্মাস্বরূপ মহাদেব অভিরাম নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৫১; (হরি) ১৩.১৬.১৫০]

অভিষব সোমযাগের দিন সোমলতার খণ্ড থেঁতো করে সোমরস নিষ্কাশন করাই অভিষব। হবির্ধান মণ্ডপে হবির্ধান শকটের কাছে উপরব নামে একটি গর্তের ওপর একটি কাষ্ঠফলক (অধিষবণ ফলক) রেখে তার ওপরে গোরুর চামড়া (অধিষবণ চর্ম) বিছিয়ে দিয়ে সোমলতার খণ্ডগুলি পাষাণ (অদ্রি, গ্রাব) থেঁতলে রস বার করতে হয়। চারজন ঋত্বিক পাষাণ দিয়ে আঘাত করে সোমরস নিষ্কাশন করেন। তিনটি সবনের আগেই অভিষব বিহিত। আগের দিন নিয়ে আসা বসতীবরী এবং সোমযাগের দিন সংগৃহীত একধনা—এই দুই জল মিশিয়ে আধবনীয় নামে একটি বৃহৎ পাত্রে রাখা হয়। নিষ্কাষিত সোমরস এই জলে মেশানো হয়। আহুতির আগে এই রস আধবনীয় থেকে নিয়ে দশাপবিত্র নামে মেষলোম নির্মিত ছাঁকনি পাত্রের মাধ্যমে ছেঁকে নিয়ে অর্ধেক দ্রোণকলশে এবং অন্য অর্ধেক পূতভৃতে ঢালা হয়। সোমরস নিষ্কাশন করে তা আহুতিযোগ্য করে তোলার সমস্ত প্রক্রিয়াটাই অভিষব।

[রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১;
শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ;
আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe), ১২.৯.১-১০;
১২.১২.১-৩]

অভিষেক একজন রাজার অভিষেক বৈদিককালে এতটাই মর্যাদাসম্পন্ন ব্যাপার ছিল যে ব্রাহ্মণগুলিতে তার প্রক্রিয়া-বর্ণনা মহাভারত-রামায়ণ কিংবা পুরাণগুলির চাইতে অনেক বেশি স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। সবচেয়ে বড়ো কথা চন্দ্রবংশ-সূর্যবংশীয় রাজাদের মধ্যে বহু-বিখ্যাত রাজাদের কয়েকটি নামও এই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতেই পাব এবং সেই নামগুলি স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে ওঠে। এটা প্রথমেই বলা উচিত যে, বৈদিককালে রাজার অভিষেক-কর্মের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য জয় করার পর রাজসূয়, অশ্বমেধ বা বাজপেয় যজ্ঞের প্রক্রিয়া যুক্ত ছিল বলেই যিনি বা যাঁরা এই যজ্ঞ করেছেন, তাঁদেরই অভিষেক কর্মের কথা বলা হয়েছে। মহাভারতে দুষ্যন্তপুত্র ভরতের যে কীর্তিকথা শুনেছি—

ভরতাদ্ ভারতী কীর্তিঃ।

সেই ভরতের বংশে জন্মেছেন পাণ্ডব-কৌরব সকলে—সেই ভরত নাকি একশ তেত্রিশ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং তাঁর প্রথম অশ্বমেধের পর তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন ঋষি দীর্ঘতমা। একইভাবে তুর কাবষেয় ঋষি পারীক্ষিত জনমেজয়ের অভিষেক করেছিলেন, চ্যবন ভার্গব শর্যাত রাজার অভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন। বশিষ্ঠ সুদাষ পৈজবনের, নারদ-পর্বত আম্বষ্ঠ্য রাজার, সংবর্ত আঙ্গিরস ঋষি মরুত্ত রাজার অভিষেক করেছিলেন।

সাধারণত অভিষেক বা মহাভিষেকের যে কথা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে পেয়েছি, তা বৈদিক রাজসূয় যজ্ঞের অঙ্গ। এই অভিষেক-কর্ম হত পাঁচ দিন ধরে এবং যজ্ঞে দীক্ষিত হবার দিনটি ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষ কেটে গেলে চৈত্র মাসের প্রথম দিন। যজ্ঞের প্রথম দিনে আটজন দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। এই দেবতাদের সার্বিক বিশেষণ হল—এরা 'দেবস্ব'—অর্থাৎ এঁদের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ ক্ষমতা

আছে, যে ক্ষমতা দিয়ে তাঁরা অভিষেক্তব্য রাজার বিশেষ ক্ষমতাটি বাড়িয়ে দেন বা ত্বরান্বিত করেন। তাঁদের স্বভাব রাজার মধ্যে সংক্রমিত হয়। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রগুলিও সেইরকমভাবেই চয়ন করা হয়, যেগুলি দেবতার সেই ভাবটাই প্রকাশ করে যেটি রাজার বিশেষ বিশেষ গুণবৃদ্ধির কারণ। যেমন সবিতা সূর্য 'সত্যপ্রসব', তিনি রাজার মধ্যে সত্যে স্থিত থাকার শক্তি তৈরি করেন। অগ্নিকে বৈদিকেরা বলেন 'গৃহপতি'। অভিষেক-পূর্বকালে তাঁর উদ্দেশে আহুতি গার্হপত্যের সমস্ত কিছুর ওপর রাজার অধিকার সুস্থিত করে। সোম হলেন বনস্পতি। তিনি বন-অরণ্য, কৃষি-কর্মের উন্নতিতে রাজার কৃতিত্বের সূচনা করেন। বৃহস্পতি বাক্য বা শব্দযোজনার নিয়ামক, তিনি রাজার বাগ্মিতা সৃষ্টি করার জন্য আহুতি লাভ করেন। ইন্দ্রের বিশেষণ—তিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি বিরাট যোদ্ধা, তাঁর কাজ হল—সম্পূর্ণ প্রশাসনের ওপর রাজার চরম আধিপত্য বিধান করেন। রুদ্র পশুপতি, তিনি রাজার গোধন এবং পশুধনের উন্নতি বিধান করেন। মিত্র-দেবতা সত্যের প্রতীক, সবিতার মতো তিনিও রাজার সুস্থিতি বিধান করেন সত্যের মধ্যে। আর সর্বশেষে আছেন বরুণ, যিনি ধর্মপতি। ধর্ম বলতে বোঝায় order, law, discipline, ordinance, justice. ধর্মপতি বরুণের উদ্দেশে আহুতি একজন রাজাকে 'upholder of justice' হিসেবেই শুধু প্রতিষ্ঠা করে না, প্রজাকল্যাণের মতো রাজধর্মের মধ্যেও তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

রাজার এই আহুতিগুলির পর পর ঋত্বিক পুরোহিতেরা সোচ্চারে বলতে থাকেন—দেবতারা সব! এই রাজাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবার ব্যাপারে ত্বরান্বিত করুন, তাঁকে নিঃশত্রুক হতে সাহায্য করুন, তাঁকে জ্যেষ্ঠ বা প্রধান হবার ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত করুন, তাঁকে সর্বাধিপত্য-লাভে ত্বরান্বিত করুন, সমস্ত জনগণের ওপর তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করুন—

ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বম্ ইতীমং দেবা অভ্রাতৃব্যং সুবধ্বম্ ইত্যেবৈতদাহ মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায়েতি, নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি মহতে জানরাজ্যায়েতি মহতে জনানাং রাজ্যায়েতি . . .।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৫.৩.৩.১২-১৩, পৃ. ৪৫০; R.K. Mukherji, Hindu Civilization, p. 100]

□ পুরোহিত রাজার মঙ্গলাশংসন করার পরেই ঘোষণা করেন—ইনিই তোমাদের রাজা, আর আমাদের রাজা হলেন সোম, ব্রাহ্মণদের রাজা তিনি। এই ঘোষণার পরেই অভিষেক-স্নানের পর্ব আরম্ভ হয়। অন্তত সতেরোটি পবিত্র জলস্থান থেকে জল নিয়ে আসা হয় এবং সেই জলগুলি হল—নদীর জল, দীঘির জল, কূপের জল, শিশির, স্যন্দমান স্রোতস্বিনীর জল, বৃষ্টির জল, সমুদ্রের জল এবং আরও বহুতর জল, এমনকী তার মধ্যে এঁদো পুকুর ডোবার জলও আছে। কিন্তু এই সমস্ত জলের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল সরস্বতী নদীর জল, যেটা প্রথমেই সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে—

স সরস্বতীরেব প্রথমা গৃহ্নাতি।

এই সমস্ত প্রকারের জল একটি উদুম্বর বৃক্ষের কাঠের তৈরি পাত্রে ভরে নিয়ে সেই পাত্র থেকে রাজার মাথায় ঢেলে রাজার অভিষেক করতে হবে। তবে তার আগে ঔদুম্বর কাষ্ঠ-নির্মিত পাত্রে একত্রে জমানো জল চার ভাগে ভাগ করে খানিক রাখতে হবে পলাশ গাছের কাঠে তৈরি একটি পাত্রে, খানিক ঔদুম্বর পাত্রেই থাকবে, আর খানিক ন্যগ্রোধ বা বটবৃক্ষের পাত্রাধারে রাখতে হবে, আর শেষটুকু রাখতে হবে অশ্বত্থ বৃক্ষের কাষ্ঠপাত্রে। রাজার অভিষেকের সময় ব্রাহ্মণ রাজার মাথায় জল ঢালবেন পলাশের পাত্র থেকে। রাজার ভাই কিংবা ঘনিষ্ঠ কোনো আত্মীয়, যিনি ক্ষত্রিয়, তিনি অভিষেক করবেন উদুম্বর-কাঠের পাত্রে রাখা জলে। একজন মিত্রগোষ্ঠীর রাজা (ally) ন্যগ্রোধ-কাষ্ঠের পাত্রের রাখা জল ঢালবেন, আর একজন বৈশ্য অশ্বত্থবৃক্ষের কাষ্ঠনির্মিত পাত্র থেকে জল ঢেলে রাজার অভিষেক করবেন।

রাজসূয় যজ্ঞের এই অভিষেক প্রক্রিয়ার সময় রাজার পট্টমহিষীকেও অভিষেক-স্নান করানো হত। কথাটা খুব স্পষ্ট ভাবে মহাভারতে উল্লিখিত না হলেও সভাপর্বে পাশাখেলার সময় যখন দ্রৌপদী পণজিতা হলেন, তখন এর একটা পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যাবে। দ্রৌপদীকে সভায় টেনে নিয়ে যেতে এসেছেন দুঃশাসন দ্রৌপদী পালাবার চেষ্টা করতেই দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে চললেন তিনি। মহাভারতের কবি এসময় দ্রৌপদীর চুল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তিনি বললেন—

এই সেই সুদীর্ঘ কেশরাশি, যা রাজসূয় মহাযজ্ঞের সময় মন্ত্রপূত জলে সিক্ত হয়েছিল—

যে রাজসূয়াবভৃথে জলেন
মহাক্রতৌ মন্ত্রপূতেন সিক্তাঃ।

কবির মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, রাজসূয় যজ্ঞের সময় রাজমহিষী দ্রৌপদীও অভিষেক স্নান করেছিলেন।

[মহা (k) ২.৬৭.৩০; (হরি) ২.৬৪.২৯]

অভিষেক-বারিতে সিক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই কিন্তু রাজার অভিষেক শেষ হয়ে যায় না। বস্তুত অভিষেক এক অর্থে একজন রাজার পুনর্জন্ম। এই সময়ে রাজার পরিহৃত বসন-অধিবাস-উষ্ণীষও প্রতীকীভাবে একটি গর্ভের ভাবনায় গ্রহণ করা হয়। অভিষেক-স্নানের পর যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ অধ্বর্য্যু রাজার হাতে একটি ধনুক এবং তিনটি বাণ অর্পণ করেন—শক্তি, বল এবং শাসনের প্রতীক হিসেবে—

বীর্য্যং বা এতদ্ রাজন্যস্য যদ্ধনু-
র্বীর্য্যবন্তমভিষিঞ্চনীতি।

এসবের পরে রাজার একটা শপথ-গ্রহণের ব্যাপার আছে। যেসব ঋত্বিক্-পুরোহিতেরা রাজাকে অভিষেক-স্নান করান, তাঁরা সকলের প্রতিনিধি হিসেবে বলেন—তুমি যদি আমার ক্ষতিসাধন করো, তাহলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তোমার সমস্ত সঞ্চিত সুকর্মগুলি আমার হবে। রাজা বলেন—আমি যদি কোনো অন্যায় আচরণ করি, যদি অন্যথা আচরণ করি, তাহলে যেন আমি আমার সমস্ত পুণ্যকর্মের ফল থেকে বঞ্চিত হই। আমার ধর্ম-কর্ম, আমার দান-ধ্যান, আমার জীবন, আমার বংশও যেন লুপ্ত হয়ে যায়।

এই শপথ গ্রহণ এবং শপথ করানোর মূল উদ্দেশ্য রাজাকে সর্বদা প্রজাকল্যাণ এবং প্রজার হিতে নিয়োজিত করা।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৫.৩.৩.১-১২; ৫.৩.৪.৩; ৫.৩.৪.২২; ৫.৩.৫.১১-১৪, ২৯-৩০; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ৮.৩৯.১-১৫, পৃ. ৯৩৫-৯৩৭]

□ এবার অভিষিক্ত রাজাকে একটি ব্যাঘ্রচর্মের আসনের ওপরে দাঁড় করানো হয়। শক্তি এবং ক্ষমতার প্রতীক এই ব্যাঘ্রচর্মের ওপর রাজাকে দাঁড় করানোর সময় তাঁর পায়ের তলায় এক টুকরো সোনা এবং মাথার ওপরে এক টুকরো সোনা রেখে অভিষিক্ত রাজার অনন্ত জীবন কামনা করা হয়—

তস্মাদ্ রুক্মা উভয়তো ভবতঃ।

এরপর সেই ব্যাঘ্রচর্মের আসন থেকেই রাজা একটি চার ঘোড়ার রথে উঠে পড়েন। একটি বাণ ছোঁড়েন সেই রথ থেকে যেন তাতেই প্রতীকীভাবে রাজ্যস্থিত মানুষের ওপর তাঁর আধিপত্য জন্মায় প্রতীকীভাবে। সেই অবস্থাতেই তিনি রথ নিয়ে যজ্ঞস্থানের চতুর্দিকে যান এক বার করে, চতুর্দিকে তাঁর জয় সূচিত হয়। রথ-ভ্রমণের শেষে অভিষিক্ত রাজা স্ত্রীকে নিয়ে যজ্ঞবেদির সামনে আসেন এবং সেই সময় তিনি প্রজাপতির সন্তান হিসেবে প্রজাপতির সমতা লাভ করেন। রাজা পৃথিবী মাতার দিকে তাকিয়ে বলেন—মা! তুমি যেন আমাকে হিংসা কোরো না কখনো, আমিও তোমাকে হিংসা করি না। কিন্তু তবু যেন পৃথিবী ভীত থাকেন এই ভেবে যে, ইনি তো রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন, ইনি এখন অনেক বড়ো মানুষ হয়েছেন। আমার কোনো বিপত্তি ঘটাবে না তো! আবার রাজাও মনে মনে ভাবেন—এই পৃথিবী (এই রাজ্যভূমি) আমাকে কোনো দিন উৎখাত করে দেবে না তো? এই পারস্পরিক ভয়েই কিন্তু মা-ছেলের অক্ষয় একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। কেননা মা কখনো ছেলেকে হিংসা করে না, ছেলেও মাকে হিংসা করে না—

ন হি মাতা পুত্রং হিনস্তি ন পুত্রো মাতরম্।

এবার রাজা রথ থেকে নামেন এবং এই সময় একটি প্রতীকী পাশাখেলা হয় এবং পাশার চাল এমনভাবেই তাঁকে দিয়ে দেওয়ানো হয়, যাতে তাঁর জয় সূচিত হয়। আমরা মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কালে এই পাশাখেলাটা দেখিনি। কিন্তু যজ্ঞের পর-পরেই দুর্যোধনের ঈর্ষা-অসূয়াতে সেই পাশাখেলার সূচনা হয় এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই পাশাখেলাকে 'সুহৃদদ্যূত' বলে অভিহিত করেন। আমরা বলতে চাই—রাজসূয়ের পর যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময় যে পাশাখেলাটা হতে পারেনি, সেটা 'সুহৃদ্দ্যূতে' যুধিষ্ঠিরের জয় হিসেবে ঘটলেই তাঁর অভিষেক-কর্ম সম্পূর্ণ হত এবং সেই জয় হয়নি বলেই ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁর অভিষেক-কর্ম হলেও 'সুহৃদ্দ্যূত' একেবারে জুয়াখেলায় পরিণত হয়েছিল এবং যুধিষ্ঠিরকে সপরিবারে বনে যেতে হয়েছিল।

যাই হোক, পাশাখেলার প্রতীকী জয় মানে অভিষিক্ত রাজা রাজ্যের সমস্ত জনজাতির মানুষের ওপর তাঁর অধিকার কায়েম করলেন। এরপরেই রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন, যার পারিভাষিক বৈদিক নাম হল আসন্দী। বস্তুত এই আসন্দী বা রাজসিংহাসনই গোটা রাজ্যের প্রতীক—রাষ্ট্রং বা আসন্দী। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে এই আসন হবে খদির কাঠের তৈরি, ঐতরেয়ের মতে এটা উদুম্বর বৃক্ষের কাঠে তৈরি হবে। এই আসন্দীর পায়াগুলি হবে এক হাত লম্বা, পিছনে হেলান দেবার কাঠটি হবে দু-হাত এবং হাত রাখার দুই হাতল হবে দুই অরত্নি পরিমাণ। বসার জায়গাটি মুঞ্জ ঘাসের বুনন দিয়ে তৈরি করে তার ওপরে ব্যাঘ্রচর্ম বিছিয়ে দেওয়া হত সর্বাধিনায়কত্বের প্রতীকতায়—

আসন্দীবৎ বৈ সাম্রাজ্যম্।

অন্য একটি ব্যাঘ্রচর্ম রাখা হত অভিষিক্ত তথা সিংহাসনস্থ রাজার পায়ের তলাতেও। অভিষিক্ত রাজা সিংহাসনে বসার পর পুরোহিত রাজাকে বলেন—দ্যাখো বাপু! এ রাজ্য তোমার বা তোমার পরিবার—পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য নয়, এই রাজ্যভার তোমার ওপর ন্যস্ত হল কৃষির উন্নতির জন্য, সকলের ভালোর জন্য, 'সকলের পোষণ-পালনের জন্য—

ইয়ং তে রাট্... যন্তাসি যমনো... ধ্রুবো'সি ধরুণঃ...
কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায় ত্বা রয্যৈ ত্বা পোষায় ত্বা॥

এরপর রাজা সিংহাসনে বসলে পুরোহিত তাঁর বুকে হাত দিয়ে বলেন—ইনি প্রজাকল্যাণের ব্রত ধারণ করে সিংহাসনে বসেছেন, তিনি ধর্মের ধারক এবং বাহক। এখন তিনি সমস্ত কথা বলবেন না, সমস্ত কাজও তিনি করবেন না। তিনি সেটাই বলবেন যা নীতি-ধর্ম-সম্মত, তিনি সেটাই কর্তব্য হিসেবে করবেন যা নীতি এবং ধর্ম-সম্মত—

ধৃতব্রত বৈ রাজা, ন বা এষ সর্বস্মা
ইব বদনায় সর্বস্মা ইব কর্মণে,
যদেব সাধু বদেৎ, যৎ সাধু কুর্যাৎ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৫.৪.১.১৪;
৫.৪.৩.২০-২১; ১২.৮.৩.৪-৬;
৫.২.১.২৫; ৫.৪.৪.৫]

☐ সাধারণভাবে অভিষেক মানে স্নান। নদীতে স্নান থেকে আরম্ভ নদী-তীর্থগুলিতে স্নানের প্রসঙ্গে বারবার অভিষেক শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতে। কিন্তু অভিষেক শব্দটি যে অর্থে রূঢ় হয়ে গেছে আমাদের মহাকাব্য-পুরাণগুলিতে, সেটা একটি বৈদিক যজ্ঞ-দীক্ষার পুরাতন পরম্পরা এবং সেই যজ্ঞের নাম রাজসূয় যজ্ঞ। বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে কতগুলি বিশেষ যজ্ঞ আছে। যেমন—রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, বৃহস্পতিসব, সৌত্রামণি এবং পুরুষমেধ—এই যজ্ঞগুলি সেকালের রাজতন্ত্র এবং রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে যিনি রাজা হচ্ছেন, প্রজারা এবং রাজ্যের প্রধান পুরুষেরা তাঁকে রাজপদে চাইলেও তাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার জন্য কতগুলি 'রিচুয়াল' বা ধর্মীয় নিয়ম পালন করতে হত। সেগুলির অন্যতম হল অভিষেক ক্রিয়া। সেই অভিষেক ক্রিয়াটি 'ফরমালাইজ' হত প্রধানত রাজসূয় যজ্ঞের মাধ্যমে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে—রাজসূয় যজ্ঞের মাধ্যমেই রাজা হওয়া যায়, আর রাজা সম্রাট পদবী লাভ করেন বাজপেয় যজ্ঞ করে—

রাজা বৈ রাজসূয়েনেষ্ট্বা ভবতি
সম্রাড্‌বাজপেয়েন।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৫.১.১.৩;
Jogiraj Basu, India of the Age of the
Brahmanas, p. 92-111]

☐ তবে এই যজ্ঞক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে অভিষেক-কর্মের কথা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে বারবার বলা হলেও পরবর্তীকালে রাজার অভিষেক ব্যাপারটা একটা পৃথক বৈদিক কর্ম হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে। তার কারণও খুব সহজ। বড়ো বড়ো সামরিক শক্তিসম্পন্ন রাজা ছাড়াও আরও অজস্র ছোটো ছোটো রাজ্য ছিল ভারতবর্ষে। সেই সব ছোটো ছোটো রাজ্যের রাজারা রাজসূয় যজ্ঞ করার সামরিক এবং আর্থিক ক্ষমতা পোষণ করতেন না। অথচ তাঁরা রাজা হতেন। সে-সব জায়গায় শুধুমাত্র অভিষেক-কর্মটাই রাজপদবীর আইনি সম্মতি বিধান করত। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ পাওয়া যাবে—মহাভারতে অস্ত্রপরীক্ষার রঙ্গস্থলে, যখন আধিরথি কর্ণ রাজপুত্র অর্জুনের অস্ত্রক্ষমতা 'চ্যালেঞ্জ' করে বসলেন। এই দুই বিরাট অস্ত্রবীরের অস্ত্র-প্রতিযোগিতা শেষে কোনো

দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে দেয়, সেই ভয়েই গুরু কৃপাচার্য সূতপুত্র কর্ণকে খানিক অপমান করেই বলেছিলেন যে, নীচকুলে জাত সাধারণ একটা মানুষের সঙ্গে কখনো এক রাজপুত্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিযোগিতা হতে পারে না—তখন কর্ণ অপমানিত হলে দুর্যোধন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অঙ্গ-রাজ্যে অভিষিক্ত করেন বিধিনিয়ম মেনেই। এখানে কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ বা অশ্বমেধের কোনো প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু রাজা হয়ে রাজসিংহাসনে বসতে যাবার পূর্ববিধি হিসেবে যেটা প্রয়োজন, সেটা কিন্তু অভিষেক। খুব সংক্ষিপ্ত এই অভিষেক-কর্মে মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণেরা কর্ণকে একটি সোনার পীঠিকা বা পীড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করলেন। তারপর একটি জলপূর্ণ ঘটে 'সলাজ-কুসুম' অর্থাৎ ফুল, খই ইত্যাদি মঙ্গল-জনক বস্তু সেই জলপূর্ণ ঘটের সঙ্গে যুক্ত করে কর্ণের মাথায় ঢালা হল এবং তিনি তখনই অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। অস্ত্ররঙ্গের প্রাঙ্গণে যখন কর্ণের পালক পিতা সূত্র অধিরথ এসে উপস্থিত হলেন তখন সেই অভিষেক-আর্দ্র শির নত করেই তিনি প্রণাম করেছিলেন পিতাকে—

ততস্তস্মিন্ ক্ষণে কর্ণঃ সলাজ-কুসুমৈর্ঘটৈঃ।
কাঞ্চনৈঃ কাঞ্চনে পীঠে মন্ত্রবিদ্ভির্মহারথঃ॥
অভিষিক্তো'ঙ্গরাজ্যে স শ্রিয়া যুক্তো মহাবলঃ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের সময়টা এতটাই অবান্তর-ঘটনাবহুল যে, সঠিক একটা অভিষেক-স্নানের কথা আমরা খুব স্পষ্ট এবং নিয়মিতভাবে দেখতে পাই না। ঋত্বিক-পুরোহিতদের তত্ত্বাবধানে যখন অভিষেকের সূচনা হয়ে যাবার কথা, তখন অন্য ঘটনা অভিষেকের আড়ম্বর আচ্ছন্ন করে দেয়। বরঞ্চ যুধিষ্ঠিরের ময়-নির্মিত রাজসভা দেখে দুর্যোধন যখন রাজসূয়ের আড়ম্বর বর্ণনা করছেন, তখন একবার দেখা যাচ্ছে—শিকেয় রাখা স্বর্ণনির্মিত ঘট থেকে স্বয়ং কৃষ্ণ অভিষেকের জল ঢালছেন যুধিষ্ঠিরের মাথায়, সঙ্গে তিনি একটা মঙ্গল-শঙ্খও বাজাচ্ছেন—

শঙ্খ-প্রবরমাদায় বাসুদেবো'ভিষিক্তবান্।

আবার অন্যত্র সেই দুর্যোধনই ধৃতরাষ্ট্রকে ঈর্ষাভরে জানাচ্ছেন যে, অন্য দেশের অভিষিক্ত রাজারা নানা জায়গা থেকে ছোটো-বড়ো বহু রকমের পাত্র এনে অভিষেকের জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন এবং সেটা তাঁরা করেছিলেন নিজেদের উদ্যোগে, স্বেচ্ছায়—

আজহ্রুস্তত্র সৎকৃত্য স্বয়মুদ্যম্য ভারত।
অভিষেকার্থমব্যগ্রা ভাণ্ডমুচ্চাবচং নৃপঃ॥

এরপরেই দেখা যাচ্ছে—যুধিষ্ঠিরের অভিষেক-স্নানের সময় নারদ এবং দেবল ঋষিকে সামনে রেখে স্বয়ং ধৌম্য পুরোহিত এবং দ্বৈপায়ন ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে স্নান করাচ্ছেন অভিষেকের জন্য নির্দিষ্ট তীর্থবারি দিয়ে। স্বয়ং পরশুরামের সঙ্গে অন্যান্য ঋষি-মহর্ষি, বেদবিদ পণ্ডিতেরা সেই অভিষেক দেখছেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে—

অভিষিষিঞ্চুস্ততো ধৌম্যো ব্যাসশ্চ সুমহাতপাঃ।
নারদং বৈ পুরস্কৃত্য দেবলঞ্চ মহামুনিম্॥
প্রীতিমন্ত উপাতিষ্ঠন্নভিষেকং মহর্ষয়ঃ।
জামদগ্ন্যেন সহিতাস্তথান্যে বেদপারগাঃ॥

আমাদের ধারণা—কৃষ্ণকে যে আমরা কলশ হাতে যুধিষ্ঠিরের মাথায় জল ঢালতে দেখেছি, তা এই ধৌম্য-ব্যাসের শাস্ত্রীয় অভিষেকের পরে। কৃষ্ণের সঙ্গে অতিপ্রিয়ত্বের সম্বন্ধ থাকায় তাঁর কথাটা আগে বলেছেন স্বয়ং মহাভারতের কবি।

[মহা (k) ২.৪৯.২৬-২৭; ২.৫৩.৪, ১০-১১;
(হরি) ২.৪৭.২৬-২৭; ২.৫১.৪, ১০-১১]

□ রামায়ণ এবং মহাভারতের অনেক জায়গাতেই অভিষেক শব্দের উল্লেখ আছে, রাজা-রাজড়াদের অভিষেক হচ্ছে, সে সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এই মহাকাব্য দুটিতেই পূর্বেকার ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত রাজ্যাভিষেকের সুষ্ঠু এবং বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় না। রাজার অভিষেকের সম্ভার নিয়ে অবশ্য দুই মহাকাব্যেই কিছু কথা আছে এবং সেই সূত্রে রাজার অভিষেকের বর্ণনাও কিছু আছে। মহাভারতে অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর যুধিষ্ঠির যখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন, তখন তাঁর অভিষেকের জন্য প্রথমে একটি সুবর্ণময় আসনে বসানো হল। তিনি পূবমুখো হয়ে বসলেন। একই সঙ্গে মণিময়, গজদন্তময় এবং আরও কতগুলি সুবর্ণময় আসনে উপবেশন করলেন স্বয়ং কৃষ্ণ, চার ভাই পাণ্ডব, সাত্যকি, যুযুৎসু, সঞ্জয়, গান্ধারী। আসনে বসলেন দুর্যোধনের পুরোহিত সুধর্মা, যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত ধৌম্য, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর এবং অন্যান্যরা।

যুধিষ্ঠির সোনার আসনে বসে একে একে স্পর্শ করলেন সাদা ফুল, স্বস্তিক, অক্ষত (খই), নানান তীর্থের মাটি এবং স্পর্শ করলেন সোনা, রুপো এবং মণি। তারপর পুরবাসীরা ধৌম্য পুরোহিতকে সামনে রেখে দধি, দূর্বা ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যের সম্ভার সাজানো একটি আভিষেকচনিক পাত্র এনে যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করল। সেই পাত্রের মধ্যেও তীর্থমৃত্তিকা, সোনাদানা, বিভিন্ন রত্ন এবং সিঁদুর-কাজলের মতো মাঙ্গলিক দ্রব্যগুলিও ছিল। যুধিষ্ঠিরের এই অভিষেকের জন্য কতগুলি জলপূর্ণ কলশ আনা হল যেগুলি সোনা, তামা, রুপো এবং মাটি দিয়ে তৈরি। কলশের সঙ্গে আনা হল ফুল, খই, কুশ গোদুগ্ধ, শমী, অশ্বত্থ এবং পলাশ গাছের সমিধ—অর্থাৎ যজ্ঞের আগুন জ্বালানোর জন্য শমী-পলাশ-অশ্বত্থগাছের কাষ্ঠখণ্ড। আর মধু, ঘৃত, তামার ছোটো স্রুব (গলিত ঘৃত পাত্র থেকে তুলে আনার হাতা) এবং একটি স্বর্ণখচিত শঙ্খ—এগুলোও অভিষেকের জায়গায় নিয়ে আসা হল।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের কথাতেই যেহেতু যুধিষ্ঠির রাজ্য নিতে রাজি হয়েছিলেন, তাই কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানেই যুধিষ্ঠিরের এই অভিষেক-ক্রিয়া চলছিল। কৃষ্ণের অনুমতি নিয়েই ধৌম্য পুরোহিত এবার অভিষেক-স্থানের সেই জায়গায় একটা বেদি নির্মাণ করলেন যেখানে পূর্বদিক এবং উত্তর দিক একটু নীচু ছিল। এই বেদির ওপর সর্বতোভদ্র নামের একটি মঙ্গলময় স্বর্ণাসনে যুধিষ্ঠিরকে বসিয়ে তাঁর পাশে বসালেন দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণাকে। এরপর বেদির ওপর মন্ত্র-সহকারে যথানিয়মে অগ্নিস্থাপন করে হোম করলেন ধৌম্য পুরোহিত। যুধিষ্ঠিরের সর্বতোভদ্র আসনটির পায়াগুলি ছিল দৃঢ় এর তার ওপরে একটি ব্যাঘ্রচর্মের আসন বিছানো ছিল। যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ বসার জায়গাটা একেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

কৃষ্ণ এবার উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর জগদ্‌বিখ্যাত পাঞ্চজন্য শঙ্খে জল ভরে সেই মন্ত্রপূত জল যুধিষ্ঠিরের মাথায় ঢেলে অভিষেক-স্নান করালেন যুধিষ্ঠিরকে। ক্রমে ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পুরবাসীরাও যুধিষ্ঠিরের মাথায় জল ঢাললেন। পাঞ্চজন্যের পবিত্র জলে অভিষিক্ত হবার পর রাজা যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞশেষ ভোজন করলেন। বাদ্যকারেরা তখন পণব, আনক এবং দুন্দুভি বাজাতে লাগল। ধৌম্য পুরোহিত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন, যুধিষ্ঠির তাঁদের আশীর্বাদী নির্মাল্য গ্রহণ করে প্রচুর দক্ষিণা দিলেন তাঁদের। যুধিষ্ঠির তাঁদের হাতে এক একটি সোনার মোহর দিলেন, তাঁরাও স্বস্তিবাচন করলেন অনেক। স্বস্তি স্বস্তি আর জয়কারের শব্দে মুখরিত হল যুধিষ্ঠিরের অভিষেক-স্থান। সমস্ত পুরবাসীরা যুধিষ্ঠিরকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত দেখে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করল।

[মহা (k) ১২.৪০.১-২০; (হরি) ১২.৪০.১-২০]

□ মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ নানা ঘটনায় আকুল হয়ে উঠেছিল বলেই যেমন যুধিষ্ঠিরের অভিষেক-প্রক্রিয়ার সঠিক বর্ণনা নেই। একইভাবে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডও কৈকেয়ী বর-প্রার্থনায় এমন আকুল হয়ে উঠল যে, রামচন্দ্রের অভিষেক-প্রক্রিয়ার প্রস্তুতিতে অভিষেক সম্ভার আহরণের আদেশ মাত্র শোনা যায়। অভিষেক তো সেখানে হতেই পারেনি। অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের অভিষেক-ঘোষণার পরেই দশরথের আগ্রহানুসারে পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং বামদেব সচিবদের যে আদেশ করেন, সেখানে সংগ্রহ-দ্রব্যের উপকরণগুলি হল—অগ্নিহোত্র-গৃহে সোনা-রুপো ইত্যাদি ধাতু, বিবিধ রত্ন, পূজার নানা উপাচার, বিভিন্ন ওষধি, অনেকগুলি সাদা ফুলের মালা, ঘি, মধু, খই, অনেকগুলি নতুন কাপড়, রথ, অস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, সুলক্ষণ হাতী, চামর-ব্যজন, ধ্বজ, ধূসর রঙের ছাতা, একশখানা সোনার ঘট, একটি বৃষ-তার শিঙ দুটি সোনায় মোড়া, একটি অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। পরের দিন অভিষেক হবে—এই নিয়মে আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই রামচন্দ্রকে পত্নী-সহ সংযম-নিয়ম উপবাসে থাকতে বলা হয়েছে। আর অভিষেক উপলক্ষে গোটা অযোধ্যাপুরী সাজিয়ে তোলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

[রামায়ণ ২.৩.৫-২০; ২.৫.২]

□ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রামের অভিষেক সম্পূর্ণ হয়নি, তাঁকে বনে চলে যেতে হয়েছিল। লঙ্কাযুদ্ধ জয় করে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে

আসার পর অযোধ্যায় রামচন্দ্রের আজ্ঞাবাহী ভরত বানররাজ সুগ্রীবকে আদেশ করেন যাতে তাঁর দ্রুতগামী অনুচরেরা পুণ্যতোয়া নদীগুলি থেকে অভিষেকের জল সংগ্রহ করে আনতে পারেন। সুগ্রীব আদেশ করলেন যাতে পরের দিনই ভোর বেলায় প্রধান বানর-পুরুষেরাই চতুঃসমুদ্রের জল নিয়ে আসেন রামের অভিষেকের জন্য। বানরমুখ্যদের মধ্যে হনুমান, বেগদর্শী, ঋষভ এবং জাম্ববান কলশ ভরে জল নিয়ে এলেন পুণ্যতোয়া নদীগুলি থেকে। সুষেণ জল নিয়ে এলেন পূর্বসমুদ্র থেকে, ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র থেকে, গবয় পশ্চিম সমুদ্র থেকে, আর হনুমান উত্তর সমুদ্র থেকে জল ভরে আনলেন।

অভিষেকের সময় মুনি বশিষ্ঠের নির্দেশে রামচন্দ্রকে এবং সীতাকে রত্নময় সুবর্ণ পীঠিকায় বসানো হল। তারপর বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম এবং বামদেব অভিষেক-স্নানীয় ঢালতে লাগলেন রামের মাথায়। রামচন্দ্র যেহেতু এতকাল বনবাসে ছিলেন, তাই লঙ্কাযুদ্ধ জয়ের পর অযোধ্যা-নগরীতে তিনি পুনঃপ্রবেশ করেছিলেন মাথায় বিপুল জটা নিয়ে। ফলত নগর প্রবেশের পরেই ক্ষৌরকর্ম করে তাঁর মস্তকমুণ্ডন করা হয় এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা—তিন জনকেই মহামূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়। এরপর তাঁরা রথে চড়ে নগর ভ্রমণ করতে করতে পুরপ্রবেশ করলেন। রামচন্দ্রের অভিষেকের ঘোষণা অযোধ্যায় তাঁর উপস্থিতিমাত্রেই শোনা যায় দশরথের সচিবদের মুখে। অশোক, বিজয়, সিদ্ধার্থ—এই সচিবেরা পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয় এবং অভিষেকের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলতে থাকেন। তারপর ভরতের মাধ্যমে সেই অভিষেকের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

মহর্ষিরা রামচন্দ্রের মাথায় জল ঢালার পর বশিষ্ঠের অনুমতি ক্রমে অন্যান্য ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, বণিক এবং পৌরজনেরাও রামচন্দ্রের অভিষেক করলেন। অভিষেক করলেন স্বর্গের দেবতারাও। স্বয়ং ব্রহ্মা রামচন্দ্রের মূল পিতামহ মনুকে যে স্বর্ণময় কিরীটখানি মাথায় পরিয়ে দিয়ে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন, সেই পরম্পরা-বাহিত কিরীটখানিই বশিষ্ঠ স্থাপন করলেন রামচন্দ্রের মাথায়। শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের মাথায় রাজছত্র ধরে থাকলেন। সুগ্রীব এবং বিভীষণ চামর বীজন করতে লাগলেন।

[রামায়ণ ৬.১৩০.২৩-৭৪]

□ মহাভারত-রামায়ণে অভিষেকের যেটুকু বিস্তৃত বর্ণনা আমরা পেয়েছি তাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বৈদিককালে রাজার অভিষেক-প্রক্রিয়ার মধ্যে যে যাজ্ঞিক আড়ম্বর ছিল, তার সঙ্গে মহাকাব্যিক কালের ধর্মশাস্ত্রীয় প্রক্রিয়াগুলি মিশ্রিত হয়েছে। এমনকী অভিষেক দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যেও ফুল, মালা, খই, নতুন কাপড়, ঘট—এই সংযোজনগুলি অভিষেক-পর্বকে আরও বেশি লোকসংশ্লিষ্ট করে তোলে। এরপর আমরা যখন অগ্নি পুরাণে অভিষেক-বিষয়ে দুই অধ্যায় জুড়ে বর্ণনা পাব, সেখানে অভিষেকের আড়ম্বর সম্পূর্ণভাবে ধর্মশাস্ত্রীয় আচারের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে, যদিও বৈদিক অভিষেক প্রক্রিয়া পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়নি, কখনো বা সেগুলি অন্য আচার-প্রক্রিয়ায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—একজন রাজা তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করার জন্য পুরো এক বছর সময় নিতে পারেন, কিন্তু সংবৎসরের অভিষেক পালন করতেই হবে। হয়তো রাজ-সিংহাসন পাবার পর রাজা সুস্থিত হয়ে সিংহাসনে বসতে পারছেন কিনা, সেই সময়টুকু দেখেই অভিষেকের কথা ভাবতে বলছেন পৌরাণিক। আর যে কথাটা অগ্নি পুরাণ প্রায় বৈধ সিদ্ধান্তের মতো ঘোষণা করেছে, সেটা হল—শাসন চলাকালীন যদি কোনো রাজার মৃত্যু হয়, তাহলে তিথি-নক্ষত্র, দিনক্ষণ কিছুই দেখার কথা নয়, অতিশীঘ্র নবীন রাজার অভিষেক ঘোষণা করতে হবে—

কুর্য্যান্মৃতে নৃপে নাত্র কালস্য নিয়মঃ স্মৃতঃ।

অগ্নি পুরাণের এই সিদ্ধান্তের পিছনে একভাবে একটা রামায়ণী ভাবনা কাজ করছে বলে মনে হয় আমাদের। রামায়ণে রামচন্দ্রের বনবাসের পর ছয়দিনের দিন যখন রাজা দশরথ মৃত্যু বরণ করলেন, তখন অরাজক জনপদের নানান দোষ দেখিয়ে দশরথ রাজার মন্ত্রী-পুরোহিতেরা ভরতের রাজ্যাভিষেক করার জন্য তাড়াতাড়ি মাতুলালয় থেকে ভরতকে আনার চেষ্টা করলেন। শাসক রাজার মৃত্যু হওয়া মাত্রেই তাড়াতাড়ি করে রামানুজ ভরতকে নিয়ে এসে অরাজক জনপদের বিপন্মুক্তি ঘটানোর জন্য

অভিষেকের এই চিন্তাটাই পৌরাণিক সিদ্ধান্তের পূর্বভাবনা হতে পারে। একই ভাবে অভিষেকের আগেই অগ্নি পুরাণে যে ঐন্দ্রী শান্তি-বিধানের কথা বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। কথিত ঐন্দ্র মহাভিষেকের একটা শব্দগত মিল যে আছে, সেটা ভাবতে হয়। অভিষেকের আগে রাজা সিংহাসনে বসেই রাজ্যের মধ্যে সর্বত্র অভয় ঘোষণা করবেন এবং দুর্গত বন্দিদের মুক্তি ঘোষণা করবেন।

অভিষেকের দিন রাজা সকাল থেকে উপবাসী থাকবেন এবং বেদি মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, যাচিত্র, বৈশ্বদৈবত এবং সৌম্য মন্ত্র উচ্চারণ করে হোম-স্বস্ত্যয়ন করবেন। বেদিস্থিত অগ্নির ডান পাশে রাখতে হবে সোনার কলশ এবং সেটাকে 'অপরাজিত' নামক বৈদিক মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে পুজা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির অনুসরণে স্বস্ত্যয়ন, আয়ুষ্য, অভয় এবং অপরাজিত ছাড়াও অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলিও উল্লেখ করেছে এবং তা অগ্নি-পুরাণের বক্তব্য উল্লেখ করেই করেছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ অন্তত ১৮২টি মন্ত্র উচ্চারণ করেছে এই অভিষেককে কেন্দ্র করে এবং সেখানে ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নক্ষত্র, ওষধি, চোদ্দজন মনু, একাদশ রুদ্র, বিশ্বেদেবগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, দানব, ডাকিনী, নাগ-পক্ষী, ঋষি এবং পূর্বতন বিখ্যাত রাজাদের (পৃথু, দিলীপ, ভরত ইত্যাদির) নাম সহ বেদ এবং নদীগুলির উদ্দেশেও স্তুতি আছে।

অভিষেচনীয় রাজার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মস্তক শোধনের জন্য বিভিন্ন দেবালয়ের মৃত্তিকা, হাতীর দাঁতে তোলা মাটি, ষাঁড়ের শিঙে তোলা মাটি, বেশ্যালয়ের দ্বার থেকে আনা মাটি, রথের চাকায় লেগে থাকা মাটি, যজ্ঞস্থানের মাটি এবং আরও অনেক জায়গা থেকে আনা মাটি ব্যবহার কথা বলা হয়েছে অগ্নি পুরাণে। আর মস্তক-শোধনের জন্য বলা হয়েছে পঞ্চগব্যের কথা। অভিষেকস্থানের সময় চতুবর্ণের প্রতিনিধি চারজন অমাত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ অমাত্য পুব দিকে দাঁড়িয়ে ঘৃতপূর্ণ সোনার কলশ থেকে ঘি ঢালবেন রাজার মাথায়, দক্ষিণ দিকে ক্ষত্রিয় অমাত্য দুধ ঢালবেন রুপোর কলশ থেকে, বৈশ্য অমাত্য দধিপূর্ণ তাম্রকুণ্ড থেকে দই দেবেন রাজার মাথায়। আর উত্তর দিক থেকে শূদ্র অমাত্য মাটির কলশ থেকে জল ঢালবেন অভিষেকের জন্য। একই সঙ্গে একজন বহ্বৃক ব্রাহ্মণ মধু দেবেন রাজার মাথায় এবং ছন্দোগ ব্রাহ্মণ কুশের জল দেবেন মাঝে মাঝে। সবার শেষে পুরোহিত রাজসভার সদস্যদের মধ্যে বহিরক্ষাবিধানের নির্দেশ নিজে গিয়ে রাজাকে অভিষেক করাবেন।

এই পুরোহিতই বেদিমূলে গিয়ে একটি শতছিদ্র সোনার ফলা থেকে ওষধি নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে রাজার অভিষেক করবেন, ওষধির পর যথাক্রমে সুগন্ধী ফুল, বীজ, রত্ন এবং কুশের জল দিয়ে সমস্তক অভিষেক ক্রিয়া চালাতে থাকবেন। সেই সময় যজুর্বেদী এবং অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ রাজাকে স্পর্শ করবেন। তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা গোরোচনা এবং সর্বতীর্থের জল দিয়ে রাজার মাথা-গলায় সর্বত্র সিঞ্চন করবেন। গীতবাদ্যের নির্ঘোষ চলতে থাকবে এবং সমস্ত ওষধি-মিশ্রিত একটি জলপূর্ণ কলশ রাজার সামনে রাখবেন। এরপর রাজার কাজ হল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং গ্রহেশ্বরদের অর্চনা করা এবং তারপর দর্পণ, ঘৃত অন্যান্য মাঙ্গলিক দর্শন করবেন। এবার পুরোহিত বসবেন একটি শয্যায় বা খাটে যেখানে শয্যার ওপর একটি ব্যাঘ্রচর্ম বিছানো আছে। এখানে বসেই তিনি মধুপর্ক ইত্যাদির আচ্ছাদন দিয়ে রাজার সিংহাসনটি প্রস্তুত করবেন এবং রাজার হাতে সেই মুকুটটিও দেবেন যেখানে পাঁচটি পশুর চর্মখণ্ড যোজনা করা আছে। এই পাঁচ প্রকার চর্মের আস্তরণেই তৈরি হবে রাজার আসন এবং সেই চর্মগুলি হল বৃষজ (বৃষ বা যাঁর শক্তির প্রতীক, তার চামড়া), বৃষদংশজ (বেড়ালের চামড়া), দ্বীপিজ (হাতির চামড়া), সিংহজ (সিংহের চামড়া) এবং ব্যাঘ্রজ (বাঘের চামড়া)। অভিষেকের পর এই সিংহাসনে অভিষিক্ত রাজা বসবেন। পূর্ণ অভিষেকের পর রাজা সুসজ্জিত অবস্থায় মন্ত্রী-অমাত্য নিয়ে রাজপথ দিয়ে নগর-ভ্রমণ করবেন অশ্বারূঢ় হয়ে। সঙ্গে সৈন্য-সামন্তও থাকবে। *[অগ্নি পু. ২১৮.৭-৩৪;*

বিষ্ণুধর্মোত্তর পু. (Nag) ২.২১.১-৪৬]

অভিষ্যন্ত রাজর্ষি কুরুর ঔরসে বাহিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১.৯৪.৫০; (হরি) ১.৮৯.৩৮]

অভিসার মহাভারতের জয়দ্রথবধ-নামক উপপর্বে 'দার্ব' এবং 'অভিসার' নামে দুটি পৃথক জনগোষ্ঠীকে একত্রে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়—

দার্বাভিসারা দরদাঃ পুণ্ড্রাশ্চৈব সহস্রসঃ।

মহাভারতের অন্যত্র অন্যান্য কাশ্মীরীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অভিসার জনগোষ্ঠীর উল্লেখ থাকায় মনে হয় এঁরা কাশ্মীরের সীমানায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী।

[মহা (k) ৭.৯৩.৪৪; ৬.৯.৫৪;
(হরি) ৭.৮০.৪৩; ৬.৯.৫৪]

অন্যত্র আবার তাঁরা দার্ব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত এবং তাঁরা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন।

[মহা (k) ৮.৭৩.১৯; (হরি) ৮.৫৪.১৯]

সম্ভবত ঝিলম এবং চেনাব নদীর নিম্ন-মধ্য স্থানের পার্বত্য অঞ্চলে এই জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। আধুনিক কাশ্মীরের পুঞ্চ্ এবং তার সংলগ্ন কয়েকটি জেলার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবের একটি অংশের যোগে প্রাচীন অভিসার-ভূমি সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়। দিগ্‌বিজয়ের সময় অর্জুন এই দেশ জয় করেছিলেন। দেশটি রম্য বলে কথিত যদিও নামটা এখানে 'অভিসারী'। কিন্তু পূর্ব শ্লোকে পৃথকভাবে 'দার্ব' দেশটিরও উল্লেখ আছে। এঁদের সকলকেই কাশ্মীরক বলা হয়েছে।

[মহা (k) ২.২৭.১৮-১৯; (হরি) ২.২৬.১৮-১৯]

বরাহ মিহিরের মতে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি অংশের নাম অভিসার, যদিও এখানেও কাশ্মীরের পরেই অভিসারের নাম।

[বৃহৎসংহিতা (Bhat) ১৪.২৯]

অভিবাহ বা অভীষাহ নামে আরও যে একটি পৃথক জনগোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়, পণ্ডিতেরা অনেকেই সেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে 'অভিসার'দের সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে করেছেন, তবে এখানে অভীষাহেরা শূরসেন, শিবি এবং বসাতি জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত। Arrian সম্ভবত 'অভিসার'দের Abissareans বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয়, এঁরা পার্বত্য জনগোষ্ঠী এবং মহারাজ পুরুর পক্ষে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। রাজতরঙ্গিনীতে বারবার এই জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে এবং সম্ভবত রাজপুরী বা রাজৌরি নামক পার্বত্য অঞ্চলে এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা থাকতেন।

যুদ্ধ করাটা এই জনগোষ্ঠীর পেশা ছিল, অর্থাৎ এরা ছিলেন 'আয়ুধজীবী' বা 'মার্সেনারি'। এই কারণে তাঁদের পাণ্ডবপক্ষেও ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করতে দেখা যায় ভীষ্মের বিরুদ্ধে।

আবার পরবর্তী কালে এক অভিসার রাজা আলেকজান্ডারের সহযোগিতায় সমগ্র কাশ্মীরের রাজা হয়ে যান। *[মহা (k) ৬.১৮.১২; ৬.১০৬.৮;*
(হরি) ৬.১৮.১৩; ৬.১০২.৮;
Buddhaprakash, Political and Social
Movement in Ancient Punjab, 201:
R.C. Mazumdar, The Classical
Accounts of India, 218]

অভীতি স্কন্দকার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং
শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য,
শ্লোক সংখ্যা ২৭, খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯]

অভীরু দ্বাপর যুগে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণকারী একজন রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বর্ণিত আছে যে, দ্বাপর যুগে আটজন কালকেয় অসুর মর্ত্যলোকে বিশিষ্ট রাজা রূপে অবতীর্ণ হন। অভীরু কালকেয় দানবের অংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

[মহা (k) ১.৬৭.৫৩; (হরি) ১.৬২.৫৪]

অভীষাহ *[দ্র. অভিসার]*

অভূঃ বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬০; (হরি) ১৩.১২৭.৬০]

অভূমি$_{১}$ মৎস্য পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী অক্রূরের ঔরসে অশ্বিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অভূমি। *[মৎস্য পু. ৪৫.৩৩]*

অভূমি$_{২}$ বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী যদু-বৃষ্ণি বংশীয় চিত্রকের পুত্র ছিলেন অভূমি। *[বায়ু পু. ৯৬.১১৪;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৫]

অভ্যুক্ষণ সাধারণত জলের ছিটে দিয়ে শুদ্ধ করার নাম অভ্যুক্ষণ। বায়ু পুরাণ জানিয়েছে যে, শ্রাদ্ধাদি কার্যে ব্যবহার্য্য পাত্র ধুয়ে রাখার পরে আচমন করে তার ওপর জলের ছিটে দিয়ে অভ্যুক্ষণ করতে হয়। বস্তুত ফুল, মালা, দূর্বা, ঘি আতপ চাল, ইত্যাদি পরের দ্বারা আনীত দ্রব্যের ওপর জলের ছিটে দেবার নামই অভ্যুক্ষণ—

দ্রব্যস্যান্যস্য তু তথা কুর্যাদভ্যুক্ষণং পুনঃ।
পরাহৃতানাং দ্রব্যানাং নিধায়াভ্যুক্ষণং তথা।

[বায়ু পু. ৭৯.৩৩-৩৪]

☐ অভ্যুক্ষণ-ক্রিয়ার সাধারণ অর্থ জলের ছিটে দেওয়াই। কালিদাসের রঘুবংশে সরয়ূ নদীতে স্নান করতে নেমে মেয়েরা যে পরস্পরের গায়ে জল ছেটাচ্ছিল, সেটাও অভ্যুক্ষণ বলে কথিত হয়েছে রঘুবংশে— পরস্পরাভ্যুক্ষণ-তৎপরাণাম্। কিন্তু এই জল ছিটোনোর প্রাথমিক অর্থটা বৈদিক ক্রিয়ারই অঙ্গ ছিল। কেননা সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে সোমযাগের শেষে অবভৃথ স্নানের সময় হোতা নিজের গায়েই জল ছিটিয়ে অভ্যুক্ষণ করেন।

[রঘুবংশ ১৬.৫৭;
শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Hillebrandt) খণ্ড ২, ৮.১১.১৩]

☐ স্মার্ত পণ্ডিতেরা প্রোক্ষণ, অভ্যুক্ষণ এবং অবোক্ষণ—এই তিনটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ দিয়ে একটি পরম্পরাগত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—হাতের তালুতে জল রেখে বুড়ো আঙুল বেঁকিয়ে আলাগা করে দিয়ে আস্তে আস্তে যজ্ঞীয় বস্তুর ওপর জল ছিটিয়ে দেওয়াটাই অভ্যুক্ষণ—

ন্যঞ্চতাভ্যুক্ষণং প্রোক্তম্।

[দ্র. Sanskrit-English Dictionary
(P.K. Gode), Vol. I, p.196]

অভ্রম একজন হস্তী। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ তাঁর নাম উল্লেখ করেছে হস্তীকুলের রাজা হিসাবে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৫৫]

অভ্রমূ ঐরাবত হস্তীর পত্নী অভ্রমূ। ঐরাবতের ঔরসে অভ্রমূর গর্ভে অঞ্জন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম ইত্যাদি এই চার দিগ্‌গজ জন্মগ্রহণ করেন।

[দ্র. দিগ্‌হস্তিনী]
[বায়ু পু. ৬৯.২১৩]

অমৎস্যাশী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র।

[মহা (k) ১৩.৪.৫৯; (হরি) ১৩.৩.৭৮]

অমর$_{১}$ শিবের সহস্রনাম স্তোত্রে অমর শব্দটি দু-বার মহাদেবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ 'অমর' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—অমরঃ বিনাশহীনঃ। তিনি মৃত্যুঞ্জয়, অবিনাশী, জরা-মৃত্যু প্রভৃতিকে তিনি জয় করেছেন বলেই মহাদেব অমর নামে খ্যাত। শিব সহস্রনাম স্তোত্রে একটি শ্লোকে অমর শব্দের ঠিক পূর্বে 'বাসব' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে— বাসবো'মরঃ। দেবরাজ ইন্দ্র তথা স্বর্গলোক-বাসী অন্যান্য দেবতারা অমরত্ব লাভ করেছিলেন— একথা অনেক সময়ই বলা হয়। মহাদেব দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র বা বাসবের স্বরূপ বলেও হয়তো 'অমর' নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬৪, ১৪৮; (হরি) ১৩.১৬.৬৪, ১৪৭]

অমর$_{২}$ মৎস্য পুরাণে ভারতবর্ষের অন্তর্গত যেসব পার্বত্য জনপদের নাম উল্লিখিত হয়েছে অমর তার মধ্যে অন্যতম একটি জনপদ।

[মৎস্য পু. ১১৪.৫৬]

অমর$_{৩}$ মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ধর্মের অন্যতম পত্নী ছিলেন দক্ষকন্যা মরুত্বতী। ইনি মরুৎ নামক দেবগণের জন্মদান করেন। মরুত্বতীর গর্ভজাত মরুৎ দেবগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমর। *[মৎস্য পু. ১৭১.৫২]*

অমর$_{৪}$ একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এখানে অধিষ্ঠান করেন বলে পুরাণে বর্ণিত আছে।

[মৎস্য পু. ১৮১.২৬]

অমরকণ্টক একটি পবিত্র তীর্থ। এখানে জ্বলা সরোবর ও বিশল্যকরণী নদী অবস্থিত। কলিঙ্গদেশের কাছে অবস্থিত অমরকণ্টক একটি ত্রিলোকখ্যাত সিদ্ধক্ষেত্র। এখানে তপস্যা করলে পুণ্যলাভ হয়। অমরকণ্টক পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করার জন্যও প্রকৃষ্ট স্থান। অমরকণ্টকে মহেশ্বর ও দেবী মহেশ্বরীর অবস্থান। বাসুকির সহচররাও এই তীর্থে অবস্থান করেন।

[বায়ু পু. ৭৭.১০-১৭; মৎস্য পু.১৮৮.৮৩-৮৯]

☐ স্কন্দ পুরাণ মতে, অমরকণ্টক থেকে সৃষ্ট নর্মদা নদীর প্রথম ধারার নাম কপিলধারা জলপ্রপাত। অনেকে কপিলধারাকে নর্মদার একটি উপনদী বলেই মনে করেন।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/রেবা) ২১ অধ্যায়]

☐ নাগপুরের অন্তর্গত গণ্ডোয়ানা প্রদেশের মিকুল পর্বতে অমরকণ্টক তীর্থটি অবস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিকুল পর্বতটি, বিন্ধ্য ও সাঁতপুরা পর্বত শ্রেণী দুটিকে সংযুক্ত করে। আবার অমরকণ্টক তীর্থটি সোমপর্বত বা সুরথাদ্রি নামেও পরিচিত। অমরকণ্টকে, চণ্ডিকাতীর্থ নামে একটি পবিত্র স্থান অবস্থিত। মৎস্য পুরাণে একথাও বলা হয়েছে যে, একসময় অমরকণ্টককে, কুরুক্ষেত্রের চেয়েও পবিত্র বলে মনে করা হত।

[মৎস্য পু. ২২.২৮, ১৮৬.১২-৩৪, ১৮৮.৭৯-৮২,
১৯১.২৫; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.২১;
EAIG (Kapoor) p. 13]

□ আবার অন্যমতে, অমরকন্টক তীর্থটি মাল্যবান পর্বতের অন্তর্গত। কূর্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, অমরকণ্টক কলিঙ্গরাজ্যের পশ্চিম সীমানা চিহ্নিত করে। এই পর্বত হিমালয়ের সাতটি প্রস্থের অন্যতম। দেবপ্রস্থ, অমরকন্টকের উত্তর সীমায় অবস্থিত। *[কূর্ম পু. ২.৫.১১]*

অমরগণ্ডিক গন্ধমাদন পর্বতের পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি জনপদ। এটির বিস্তার বত্রিশ হাজার যোজন। *[মৎস্য পু. ১১৩.৪৮]*

□ অমরগণ্ডিকরই আরেক নাম গণ্ডিকা। এই জনপদে কেতুমাল বর্ষীয় মানুষের বাস। অমরগণ্ডিকবাসী পুরুষদের গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ। এঁরা অত্যন্ত সবল এবং মহাবীর্য্যবান। স্ত্রীলোকেরাও খুবই সুন্দর। বায়ু পুরাণের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, গন্ধমাদন পর্বতের পাশে বত্রিশ হাজার যোজন বিস্তৃত একটি গণ্ডশিলা (সম্ভবত বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল) অবস্থিত। এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা জনপদটির নাম গণ্ডিকা।

গণ্ডিকার মধ্যবর্তী স্থানে একটি দিব্য ক্ষমতা সম্পন্ন পনস (কাঁঠাল) বৃক্ষ রয়েছে। বৃক্ষটি স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র স্বরূপ। অমর গণ্ডিকবাসীরা এই পনস বৃক্ষের ফলের রস পান করার কারণে দীর্ঘায়ু হন। *[বায়ু পু. ৪৩.১-৪]*

□ অমরগণ্ডিকর আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে এখনও কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

অমরপর্বত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে নকুলের দিগ্বিজয়ের প্রসঙ্গে উল্লিখিত। পঞ্চনদীর দেশ জয় করে নকুল এখানে এসেছিলেন এবং অমরপর্বত জয় করার পরপরই উত্তর জ্যোতিষ এবং অন্যান্য উত্তর-পশ্চিমের দেশ-নাম উচ্চারিত হওয়ায় মনে হয়, এটি আধুনিক কাশ্মীরের অমরনাথ হবে।

[মহা (k) ২.৩২.১১-১২; (হরি) ২.৩১.১১-১২]

অমরপ্রভু ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১৯; (হরি) ১৩.১২৭.১৯]

অমরহ্রদ বনপর্বে উল্লিখিত সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী ও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র হ্রদের নাম। বায়ুতীর্থ থেকে এই হ্রদে যাওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অমরহ্রদে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করলে স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটে।

[মহা (k) ৩.৮৩.১০৬; (হরি) ৩.৬৮.১০৬]

অমরাবতী অমর শব্দটির অর্থ দেবতা (যাঁদের মৃত্যু নেই)। দেবতারা যেখানে বাস করেন, তারই নাম অমরাবতী। রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থেই অমরাবতীকে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্জুন স্বর্গলোকে গিয়ে ইন্দ্রের অমরাবতী পুরী দর্শন করেছিলেন—

তততো দদর্শ শক্রস্য পুরীং তামমরাবতীম্ ॥

সেখানে সিদ্ধগণ ও চারণগণ বিচরণ করতেন। অর্জুন সেখানে বিখ্যাত নন্দনবন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, অমরাবতীর এই নন্দন কাননেরই অন্যতম প্রধান আকর্ষণ পারিজাত বৃক্ষ। একসময় কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সত্যভামার অনুরোধে স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করে এনেছিলেন দ্বারকায়। *[দ্র. পারিজাত]*

মহাভারতে বলা হয়েছে যে, একমাত্র পুণ্যবান মানুষরাই অমরাবতীতে যেতে পারে। অমরাবতীতে গন্ধর্ব এবং অপ্সরারাও অর্জুনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। *[মহা (k) ৩.৪২.৪২; ৩.৪৩.১-১৬; (হরি) ৩.৩৭.৪১; ৩.৩৮.১-১৬]*

□ ইতিহাস-পুরাণের অনেক জায়গাতেই স্বর্গরাজধানী অমরাবতীর উল্লেখ আছে এবং তা আছে শ্রেষ্ঠ উপভোগ্য স্থান হিসেবে।

স্বর্গের অমরাবতী সবচেয়ে সুন্দর বলেই দশানন, সীতার কাছে তাঁর লঙ্কাপুরীর শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বলতে গিয়ে লঙ্কা নগরীকে দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য বলে উল্লেখ করেছিলেন—

সম্পূর্ণা রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী।

মহাভারতের আদি পর্বেও হস্তিনাপুরকে অমরাবতীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আবার উদ্যোগ পর্বে নাগরাজ বাসুকীর ভোগবতী নগরীর সঙ্গেও অমরাবতীর তুলনা করা হয়েছে।

[রামায়ণ ৩.৪৮.১০; মহা (k) ১.১০৯.৯; ৫.১০৩.১; (হরি) ১.১০৩.৮; ৫.৯৬.১]

□ বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে চন্দ্রতীর্থ, কুমারী, কাবেরী, অক্ষয়প্রভা, শ্রীপর্বততীর্থ, বৈকৃতগিরি ও ঔষির পর্বত যজ্ঞীয় সিদ্ধমণ্ডল বলে খ্যাত এবং এইসব তীর্থে দেহত্যাগ করলে অমরাবতী নগরে যাওয়া যায়। *[বায়ু পু. ৭৭.২৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.২৬, ৩০]*

□ ভাগবত পুরাণেও অমরাবতী পুরীর বৃহৎ বর্ণনা পাওয়া যায়। *[ভাগবত পু. ৮.১৫.১১-২২]*

☐ ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও মৎস্য পুরাণেও অমরাবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২১.৩৭; ২.১৩.২৬, ৩০; বিষ্ণু পু. ১.৯.২৫; মৎস্য পু. ১২৪.৩১]

অমরেশতীর্থ$_{১}$ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে অমরেশ নামে পূজিত হন। *[মৎস্য পু. ১৮৬.২]*

অমরেশতীর্থ$_{২}$ লিঙ্গ পুরাণে বারাণসী ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি অমরেশ তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তীর্থেও অমরেশ নামে পূজিত হন ভগবান শিব। *[লিঙ্গ পু. ১.৯২.১৩৭]*

অমরেশতীর্থ$_{৩}$ দেবীভাগবত পুরাণে অমরেশ তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও এখানে এই তীর্থের অবস্থানের কোনো উল্লেখ নেই। দেবীভাগবত পুরাণ মতে দেবী শক্তি এই তীর্থে চণ্ডিকা নামে পূজিত হন।

[দেবীভাগবত পু. ৭.৩৮.১৯]

☐স্কন্দ পুরাণে অমরেশতীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুরাণে অমরেশতীর্থে পূজিত দেবী চণ্ডিকার উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই এই তীর্থে অধিষ্ঠাতা ভগবান শিবের মাহাত্ম্যও কীর্তিত হয়েছে। স্কন্দ পুরাণ মতে অমরেশতীর্থে ভগবান শিব পূজিত হন ওঙ্কার নামে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল) ২.২.২৬]

অমরেশ্বর ভগবান শিব তাঁর লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করলে অমরেশ্বর লিঙ্গ অমরাবতীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। *[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ৭.২৯]*

অমরেশ্বরগিরি একটি পবিত্র তীর্থ। ত্রিপুরাদেবীর আবাস। দেবর্ষি নারদ মহীসাগরসঙ্গম তীর্থ রক্ষার জন্য দেবী ত্রিপুরাকে অমরেশ্বরগিরি থেকে মহীসাগরসঙ্গম তীর্থে নিয়ে যান।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪.৭.২৬]

অমর্ক দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পুত্রদের মধ্যে অমর্ক একজন। তিনি হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদকে এবং অন্যান্য অসুর বালকদের দণ্ডনীতি ইত্যাদি অধ্যয়ন করাতেন। *[দ্র. প্রহ্লাদ]*

[ভাগবত পু. ৫.১-২]

অমর্ত্ত দেবতাদের একটি অন্যতম গণ। যম এই অমর্ত্ত দেবতাদের শাসন করতেন বলে জানা যায়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৫২]*

অমর্ষ ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধারায় সুগন্ধির পুত্র ছিলেন অমর্ষ। মহস্বান্ নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়।

[বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪৮]

ভাগবত পুরাণে এঁর উল্লেখ পাই সন্ধির পুত্র হিসেবে। ভাগবত পুরাণের পাঠে তিনি অমর্ষণ নামে চিহ্নিত হয়েছেন। *[ভাগবত পু. ৯.১২.৭]*

অমর্ষণ *[দ্র. অমর্ষ]*

অমা$_{১}$ রামের জয়কামনায় দেবী চণ্ডিকা স্থির করেছিলেন রামচন্দ্র লঙ্কানগরীতে আসার দিন থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত তিনি পিতৃস্বরূপে থাকবেন। সেই দিনগুলিতে পিতৃকার্য অমাবস্যার মতোই করা যাবে।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি থেকে এক পক্ষকাল অমা নাম্নী দেবী চণ্ডী সমস্ত তিথি ব্যাপ্ত করে থাকেন।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ১.২০.৫২-৫৩; ১.২১.২৫-২৬]

অমা$_{২}$ সূর্যের কিরণসমূহের মধ্যে অন্যতম। চন্দ্র যে তিথিতে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে অমা নামক সূর্যকিরণে অবস্থান করেন সেই তিথির নাম অমাবস্যা। চন্দ্র ঐদিন 'অমা' রশ্মিতে অবস্থান করেন বলেই এই নাম—

অমাখ্যরশ্মৌ বসতি অমাবস্যা ততঃ স্মৃতা।

[বিষ্ণু পু. ২.১২.৮]

অমাত্য রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বোঝাতে গিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই (Herbert Spencer, J.K. Bluntscli) রাষ্ট্রের শারীর-তত্ত্বের কথা বলেছেন। অর্থাৎ কিনা মানব-শরীরে যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, সেইরকম কয়েকটি অঙ্গের সমূহই রাষ্ট্রশরীর। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেছেন—মানব শরীরের অঙ্গগুলির মতোই রাষ্ট্রশরীরের অঙ্গগুলিও পরস্পর নির্ভরশীল। আমাদের ধারণা, মহাভারত-রামায়ণের কালে রাজতন্ত্রের বিশেষ মাহাত্ম্যের মধ্যেও শুধু রাজাকে দিয়েই যে রাষ্ট্র চলে না, তার প্রমাণ হিসেবে রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে মহাভারতে এবং সেই সপ্তাঙ্গের মধ্যে অমাত্য হল দ্বিতীয় অঙ্গ, রাজার পরেই তার স্থান। রাজতন্ত্রেও একক রাজার স্বাতন্ত্র্য প্রত্যাখ্যান করে জনক-সুলভা-সংবাদে সুলভা দার্শনিক বোধেই জানিয়েছেন যে, 'আমার রাজ্য, আমার রাজ্য' বলে ঘোষণা করে লাভ নেই, পররাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বিগ্রহ থেকে আরম্ভ করে অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসা—এই সব

জায়গাতেই রাজার স্বাতন্ত্র্য নেই, তাঁকে অমাত্যদের কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

[মহা (k) ১২.৩২০.১৩৮-১৩৯;
১২.৩২০.১৫৩-১৫৫;
(হরি) ১২.৩১০.১৩৯-১৪০;
১২.৩১০.১৫৪-১৫৬]

□ মহাভারতের যুদ্ধোদ্যোগ পর্বে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—পাঁচ রকমের বল আছে। মহারাজ! আপনি ক্ষমতা বা রাজশক্তির জোরে বাহুবলকে যে প্রকৃত 'বল' বলে ভাবছেন, সেটা সবচেয়ে কমজোরি। রাজাকে বাদ দিলে রাজার দ্বিতীয় বল হল অমাত্য। বিদুর বলেছেন—বিপদে পড়লে ব্রাহ্মণ যেমন অন্য ব্রাহ্মণকে চিনতে পারেন, স্ত্রী যেমন চিনতে পারেন স্বামীকে, তেমনই রাজা চিনতে পারেন অমাত্যকে।

অমাত্যং নৃপতির্বেদ রাজা রাজানমেব চ।

[মহা (k) ৫.৩৮.২৮; (হরি) ৫.৩৮.২৭]

সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রকৃতি বা অঙ্গ হল অমাত্য। অমাত্য শব্দের আরও দুটি পর্যায়বাচক শব্দ হল সচিব এবং মন্ত্রী। এদের মধ্যে অমাত্য শব্দটাই সবচেয়ে পুরনো। কারণ, পাণিনি এবং নিরুক্তকার যাস্ক এই শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় নিরূপণ করে একটি বিশেষ অর্থও বার করবার চেষ্টা করেছেন। অমাত্য শব্দটি মন্ত্রী অর্থে প্রথম ব্যবহার করা হয় আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে। সেখানে বলা হয়েছে—রাজা যেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর গুরু এবং মন্ত্রীদের চেয়ে বেশি ভালো থাকতে চেষ্টা না করেন—

গুরূন্ অমাত্যাংশ্চ নাতিজীবেৎ।

'সচিব' কথাটা সহায়ক বা সাহায্যকারী অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে। ইন্দ্র নাকি মরুদ্‌গণকে তাঁর সচিব বলে মনে করেন। মন্ত্রী শব্দটা এসেছে 'মন্ত্র' ধাতু থেকে, যার অর্থ মন্ত্রণা করা, আলোচনা করা, পরামর্শ করা। রামায়ণ, মহাভারত এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিতে অমাত্য, সচিব এবং মন্ত্রী শব্দের অর্থ অনেকসময় একাকার হয়ে গেলেও শব্দগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য কিছু আছে। কেউ কেউ নানা বিচার করে দেখিয়েছেন—মন্ত্রী হলেন রাজার পরামর্শদাতা (adviser), অমাত্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিব (personal secretary) এবং সচিব হলেন সহায়ক (helper)। তবে আবারও জানাই যে, মহাভারত-রামায়ণ পুরাণে মন্ত্রী, অমাত্য সচিবেরা একাকার হয়ে গেছেন এবং একে অন্যের ধর্ম আত্মসাৎ করেছেন। *[আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২.২৫.১০; পৃ. ২৮৪;*
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১২.৯]

□ মহাভারতের রাজধর্মপর্বে অমাত্য-মন্ত্রীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কেমন মানুষকে মন্ত্রিত্বে বরণ করা উচিত, সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—যাঁরা সৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, সৎ স্বভাবের মানুষ, ইঙ্গিতমাত্রেই করণীয় কর্ম বুঝতে পারেন, কোমল-স্বভাব, দেশ-কালের অবস্থা বুঝে কাজ করতে পারেন এবং যাঁরা স্বামী বা প্রভু রাজার হিতৈষী, তাঁরাই মন্ত্রী হবেন। যিনি অহঙ্কার করেন না, সত্য কথা বলেন, ক্ষমাশীল, সংযতচিত্ত এবং উন্নত-হৃদয়—তাঁদেরও ভালভাবে পরীক্ষা করে মন্ত্রীর কাজে নিয়োগ করার বিধান দিয়েছে মহাভারত।

মহাভারতীয় ভাবনা থেকে যা বোঝা যায়, তাতে একদিকে যেমন চেনা মানুষ—যাঁরা সম্পর্কে আত্মীয়ও হতে পারেন, কিংবা পুরুষানুক্রমে যাঁরা মন্ত্রী হয়ে আসছেন—

যৌনাঃ শ্রৌতাস্তথা মৌলাঃ

—তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি, বাকপটু এবং কপটতা শূন্য ব্যক্তিকে মন্ত্রী করার কথা বলা হয়েছে। সংখ্যায় অন্তত তাঁরা পাঁচজন হবেন। একই সঙ্গে তাঁদের তেজস্বিতা এবং ব্যক্তিত্বও মন্ত্রী নিয়োগের অন্যতম গুণ, কেননা ব্যক্তিত্বের তেজ না থাকলে সবকাজেই সংশয় তৈরি হয় বেশি—

অবশ্যং জনয়ত্যেব সর্বকার্যেষু সংশয়ম্।

যদি এমন প্রশ্ন ওঠে যে, উচ্চকুলের জাতক, ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থের সম্যক বোধও তাঁর আছে, অতএব তাঁকে মন্ত্রিত্বে বরণ করা যায়, তাহলে মহাভারত বলবে যে, মন্ত্রী যদি অল্পজ্ঞ ব্যক্তি হন, তাহলে মন্ত্রণার বিচিত্র বিষয় তিনি পর্যালোচনা করতে পারেন না। আবার বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁর উচ্চবংশের মর্যাদা না থাকে তাহলে অতিঅল্প কাজ করতে গেলেও তিনি বিভ্রান্ত বোধ করেন।

মহাভারত প্রায় প্রত্যেকটি মন্ত্রী-গুণের আলোচনা করে বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁরা রাজার এবং রাষ্ট্রবিষয়ক গুপ্ত মন্ত্রণা শোনার যোগ্য, তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন; আবার যাঁরা

কুটিল, শত্রুসেবী, অহংকারী, ক্রোধী, লোভী, পূর্বে দণ্ডিত হয়েছেন, অথবা যাঁর পিতা দণ্ডিত হয়েছেন, বিদ্যাহীন, অসুহৃৎ—এমন সব মানুষকে মন্ত্রিত্বের পরিসরে অনুপযুক্ত বলে আখ্যাত করেছেন। অতিগুণশালী মন্ত্রী হলে অন্তত তিনজন তেমন মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে মহাভারতে।

এই অধ্যায়ে সবচেয়ে লক্ষণীয় এটাই যে, রাজা কোনো সিদ্ধান্ত একা নেবেন না, মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবেন— এটাই রাজতন্ত্রের ভাবনার মধ্যে অন্যতর এক মাহাত্ম্য তৈরি করে। আর দ্বিতীয় কথা হল—এই অধ্যায়ের আরম্ভে যুধিষ্ঠির অমাত্য বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম উত্তর দিয়েছেন মন্ত্রী শব্দের উল্লেখ করে। তাতে বোঝা যায় যে, অমাত্য এবং মন্ত্রীর মধ্যে মহাভারত খুব বেশি পার্থক্য কল্পনা করেনি।

[মহা (k) ১২.৮৩ অধ্যায়; (হরি) ১২.৮১ অধ্যায়; মনুসংহিতা ৭.৫৪-৬২; কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle), ১.৮.১-১৯; ১.৯.১-১১]

☐ এর পরেই খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে মহাভারতে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেছেন যে, মন্ত্রী-পুরুষের যতগুলি আদর্শ গুণের কথা বলা হয়েছে, তা কখনো একজন-মাত্র ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে না—

নৈকস্মিন্ পুরুষে হ্যেতে বিদ্যন্তে
ইতি মে মতিঃ।

ভীষ্ম এই কথা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছেন বলেই এবার সমস্যার সমাধান-কল্পে বহুতর মন্ত্রী-নিয়োগের কথা বললেন। এখানে সবচেয়ে তাৎপর্য্যপূর্ণ তথ্য হল এই যে, মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চকুল কিংবা উচ্চবর্ণই শুধু নির্ণায়ক বস্তু হয়ে ওঠেনি। পূর্বে অমাত্য নিয়োগের সাধারণ আলোচনায় প্রথমে পাঁচ পরে তিনজন মন্ত্রী নিয়োগের কথা বলা হলেও বিভিন্ন গুণসম্পন্ন অন্তত আটত্রিশ জন মন্ত্রীকে নিয়োগ করার কথা ভীষ্ম বলেছেন। তার মধ্যে চারজন হবেন বিদ্বান, চতুর এবং গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। অস্ত্রনিপুণ এবং বলবান ক্ষত্রিয় মন্ত্রী হবেন আটজন। একটি রাষ্ট্রের বৃহৎক্ষেত্রই যেহেতু জীবন-ধারণ এবং জীবিকা নিয়ে গঠিত হয়, তাই ধনী বৈশ্যদের মধ্য থেকে অন্তত একুশজন মন্ত্রী নেবার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষিত শূদ্রদের মধ্যে মন্ত্রী নেবার কথা তিনজন। আর একজন থাকবেন রাজার অনুরাগী সূতজাতীয় এক ব্যক্তি। আর থাকবেন একজন পৌরাণিক।

এই মন্ত্রীদের সাধারণ গুণ হল—তাঁরা হবেন চতুর, অসূয়াশূন্য, শাস্ত্রজ্ঞ, বিনয়ী, সমদর্শী এবং পরস্পরের বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দিতে সক্ষম। সবচেয়ে বড়ো কথা এঁদের চরিত্রে যেন সাত প্রকারের ব্যসন-দোষ না থাকে। এই আটত্রিশজন মন্ত্রীর মধ্যে আটজন মন্ত্রী যদি উপস্থিত থাকেন, তাহলেই মন্ত্রণা বিষয় উপস্থাপনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে এবং তারপর সেই মন্ত্রণায় সিদ্ধান্তিত প্রস্তাব রাজ্যের মধ্যে প্রচার করে প্রধান প্রশাসনিক কর্তা 'রাষ্ট্রীয়'কেও জানিয়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ তিনি 'একজিকিউট্' করবেন।

[মহা (k) ১২.৮৫.৪-১২; (হরি) ১২.৮৩.৪-১২]

☐ মন্ত্রীদের সংখ্যা অনেক থাকলেও বহুসংখ্যক মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করলে অনেক সময়েই যেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়, তেমনই আবার একজন-মাত্র মন্ত্রীর সঙ্গে গূঢ় বিষয়ে আলোচনাটাও অবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি রাজার পক্ষপাত সূচনা করবে। আবার রাজা যদি একা-একাই সিদ্ধান্ত নেন, সেটাও ভয়ঙ্কর হতে পারে। এই বিষয়ে সূচনা দেবার জন্যই মহাভারতের সভাপর্বে শাস্ত্রীয় ভাবনার কথা দূরে সরিয়ে রেখে বাস্তব উপদেশ হিসেবে নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছেন—তুমি একা-একাই কোনো মন্ত্রণার সিদ্ধান্ত নাও না তো কিংবা অনেকগুলি মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বিভ্রান্ত হও না তো—

কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।

[মহা (k) ২.৫.৩০; (হরি) ২.৫.৩০; রামায়ণ ২.১০০.১৮]

অমানী বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে উল্লিখিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯৩; (হরি) ১৩.১২৭.৯৩]

অমাবসু$_{১}$ চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভজাত পুত্র। তবে বায়ু পুরাণের অন্য একটি শ্লোকে তাঁকে পুরূরবার জ্যেষ্ঠপুত্র আয়ুর পুত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[মহা (k) ১.৭৫.২৪; (হরি) ১.৬৩.২৭]

☐ পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের কন্যা অচ্ছোদা রাজর্ষি অমাবসুর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন বলে পিতৃলোক থেকে চ্যুত হন। তবে মহাভারতে এই কাহিনীটি অমাবসুর পরিবর্তে রাজা

উপরিচর বসুর উপর আরোপিত হয়েছে। রাজা অমাবসু ভীম নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন।

[*বায়ু পু. ৯১.৫১; ৭৩.৫; মৎস্য পু. ১৪.৫, ৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৫৬, ৬৮; ২.৬৬.২২*]

অমাবসু$_{২}$ [দ্র. বসু$_{১৩}$]

অমাবস্যা বৈদিক ভাবনায় চন্দ্রমা যখন আদিত্য সূর্যে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হন সেই সময়কালের নাম অমাবস্যা।

[*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর) পৃ.৪০৬*]

অমা-শব্দের অর্থ একত্র মিলিতভাবে বাস করা। অমা অর্থ সহ—হে দেবতাগণ, আমাদের সঙ্গে এসো—

অমেব নঃ সুহবা আ হি। [*ঋগ্‌বেদ ২.৩৬.৩*]

একমাত্র পঞ্চদশী তিথিতে রাত্রিবেলায় সূর্য এবং চন্দ্র একত্র মিলিতভাবে বসবাস করেন। সেইজন্যই সেই কালকে অমাবস্যা বলে—

অমা বসেতামৃক্ষে তু যদা চন্দ্র-দিবাকরৌ।
একা পঞ্চদশী রাত্রিরমাবস্যা ততঃ স্মৃতা॥

[*মৎস্য পু. ১৩৯.৪১; বায়ু পু. ৫৬.৪২*]

বস্তুত অমাবস্যা চন্দ্রের ষোড়শী কলা এবং এই তিথিতে চাঁদের ক্ষয়ও নেই উদয়ও নেই অর্থাৎ এই সময়ে চন্দ্রের ক্ষয়-উদয় পরিমাপ করা যায় না—

ন মাতি ক্ষয়োদয়-বিশেষং পরিচ্ছিনত্তি।

স্কন্দ পুরাণে চন্দ্রের এই ষোড়শী কলা অমা-কে বলা হয়েছে মহাকলা—

অমা ষোড়শভাগেন দেবি প্রোক্তা মহাকলা।

স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর মলমাস-তত্ত্ব নামের গ্রন্থে স্কন্দ পুরাণের এই বচন উদ্ধার করে বলেছেন 'অমা' হল চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ ভাগ-পরিমিত দেহধারিণী কলা। সেটি মহাদেবীর আধার শক্তি-স্বরূপা এবং তার ক্ষয়ও নেই উদয়ও নেই।

[*রঘুনন্দন, অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বে মলমাসতত্ত্ব (ইণ্ডিয়ান ট্রেডস্ অ্যাসোসিয়েশন), পৃ. ৩২৮*]

গোভিলগৃহ্যসূত্রে সূর্য এবং চন্দ্রের পরস্পর সন্নিকর্ষ বা নৈকট্যের কালকে অমাবস্যা বলা হয়েছে বলে রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে উল্লেখ করেছেন। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধের কাজ শুভদায়ক। অমাবস্যা সম্বন্ধে পুরাণে আর একটি কল্পকাহিনী সৃষ্টি করে বলা হয়েছে যে, পুরাকালে নদীরূপা অচ্ছোদা হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। দেবপিতৃগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে এলে অচ্ছোদা তাঁদের মধ্যে অমাবসুকে দেখে কামাবিষ্ট হয়ে তাঁকে কামনা করেন। অমাবসু যে তিথিতে নিজের সংযম এবং ধৈর্য্য নষ্ট না করে অচ্ছোদার সঙ্গ পরিহার করলেন, সেই তিথিই অমাবস্যা নামে প্রসিদ্ধ। এই তিথি পিতৃগণের অত্যন্ত আদরণীয় এবং এই তিথিতে অনুষ্ঠিত কর্ম অক্ষয় হয়ে থাকে।

[*মৎস্য পু. ১৪.৭-৮*]

অমাবস্যা দুই প্রকার। যে অমাবস্যায় চন্দ্রদর্শন হয় তার নাম সিনীবালী।

আর যে অমাবস্যায় চন্দ্র দর্শন হয় না তার নাম কুহূ। [*বৃহন্নারদীয় পু. ২৭.২৭*]

অমাহঠ জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে যেসব ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় নাগ নিহত হয়েছিলেন অমাহঠ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[*মহা (k) ১.৫৭.১৬; (হরি) ১.৫২.১৭*]

অমিত$_{১}$ ভাগবত পুরাণ মতে পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন জয়। এই জয়ের পুত্র অমিত।

[*ভাগবত পু. ৯.১৫.২*]

অমিত$_{২}$ একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। পুরাণে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে অঙ্গিরস ঋষি (মহর্ষি অঙ্গিরার বংশজাত) হিসেবে। [*বায়ু পু. ৫৯.৯৮*]

অমিত$_{৩}$ নবম মন্বন্তরে যখন দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন সুধর্মা বা সুশর্মা তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অমিত অন্যতম।

[*বায়ু পু.১০০.৬৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৬০*]

অমিত$_{৪}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং আকাশের মতোই অসীম অনন্ত। তিনি যে বিরাট রূপে এই জগৎকে ধারণ করেন, সেই রূপের আদি-অন্ত অবধারণ বা পরিমাপ করতে পারে না সাধারণ মানুষ। পরিমাপ করা যায় না বলেই পরমেশ্বর স্বরূপ মহাদেব অমিত নামে কীর্তিত হয়েছেন।

[*মহা (k) ১৩.১৭.৫০; (হরি) ১৩.১৬.৫০*]

অমিতধ্বজ$_{১}$ এক প্রাচীন দৈত্যরাজ। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলি-বাসব সংবাদে দৈত্যরাজ বলি যেসব স্বর্গবিজয়ী দৈত্যরাজের নাম উল্লেখ করেছেন, অমিতধ্বজ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[*মহা (k) ১২.২২৭.৫০; (হরি) ১২.২২৫.৫০*]

অমিতধ্বজ$_{২}$ পুরাকালে ধর্মধ্বজ জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন অমিতধ্বজ। বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে মিতধ্বজ পাঠ ধৃত হলেও অমিতধ্বজই সঠিক পাঠ বলে মনে হয়। *[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৬.৬.৭-৮; বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৬.৬.৭]*

অমিতবিক্রম ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম নাম। বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান বিষ্ণুকে অমিতবিক্রম নামে সম্বোধন করা হয়েছে। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৮, ৮১; (হরি) ১৩.১২৭.৬৮, ৮১]*

অমিতাভ$_{১}$ ভবিষ্যত সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, অমিতাভ তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গণ। কুড়ি জন দেবতা এই গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। *[বায়ু পু. ১০০.১৩-১৭; বিষ্ণু পু. ৩.২.১৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১২-১৮]*

অমিতাভ$_{২}$ পঞ্চম মন্বন্তরে যখন রৈবত মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, অমিতাভ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ।এই গণ চোদ্দজন দেবতাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫১, ৫৪; বায়ু পু. ৬২.৪৭ (অমৃতাভ পাঠ ধৃত হয়েছে); বিষ্ণু পু. ৩.১.২১]*

অমিতাশন ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫৩; (হরি) ১৩.১২৭.৫৩]

অমিতাশনা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসেবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৭; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮]

অমিতাশ্ব ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা নিকুম্ভের পুত্র। অন্যান্য পুরাণে ইনি সংহতাশ্ব নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[দ্র. সংহতাশ্ব]

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.২.৪৫-৪৬]

অমিত্র *[দ্র. অভিমিত্র]*

অমিত্রজিৎ$_{১}$ কলিযুগে যেসব ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রাজত্ব করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুতপার (অন্যমতে সুপর্ণের) পুত্র ছিলেন। রাজা অমিত্রজিতের পুত্র বৃহদ্রাজ। বায়ু পুরাণের পাঠে অমিত্রজিতের পুত্রের নাম 'ভরদ্বাজ'। *[ভাগবত পু. ৯.১২.১২-১৩; বিষ্ণু পু. ৪.২২.৫-৬; বায়ু পু. ৯৯.২৮৬]*

অমিত্রজিৎ$_{২}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। অমিত্র, অর্থাৎ শত্রু। মহাদেব অত্যাচারী অসুরদের অর্থাৎ দেবশত্রুদের বিনাশ করেন। সেইজন্য তিনি অমিত্রজিৎ। আবার কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ষড় রিপুর মতো অদৃশ্য শত্রু যেগুলি মানব-মনের মধ্যে অদৃশ্য রূপে থাকে, সেগুলিকেও তিনি অনায়াসে জয় করেছেন। বাহ্য এবং অভ্যন্তরের সমস্ত শত্রুকেই জয় করেন বলে মহাদেব অমিত্রজিৎ নামে খ্যাত—

অমিত্রজিৎ বাহ্যাভ্যন্তরশত্রুজিৎ (নীলকণ্ঠ)।

[মহা (k) ১৩.১৭.৮১; (হরি) ১৩.১৬.৮১]

অমিত্রহা দ্বাদশ মন্বন্তরের অধিপতি রুদ্রসাবর্ণি বা ঋত সাবর্ণি মনুর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৯০০.৯৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৯৪]

অমীনা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে ক্রোধবশার গর্ভজাত কন্যাসন্তানদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন ঋষা। ইনি পুলহ প্রজাপতির পত্নী। ঋষার কন্যাদের মধ্যে অমীনা অন্যতম। এঁর গর্ভে কুমীর প্রভৃতি চার প্রকার জলজন্তু জন্মগ্রহণ করে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪১৪, ৪১৬]

অমুখ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের অমুখ নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অমুখঃ ভোগসাধনহীনঃ অভোক্তেতি যাবৎ।

মুখ বলতে শুধুমাত্র মুখমণ্ডল বা মুখবিবর বোঝাচ্ছে না এখানে। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে 'মুখ' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার সায়নাচার্য মন্তব্য করেছেন যে চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই মুখ বলা হয়—

মুখা মুখানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি।

[ঋগ্‌বেদ ৪.৩৯.৬ সায়নাচার্যের টীকা দ্রষ্টব্য]

এই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভূত হয়, এই ইন্দ্রিয় সমূহের প্রভাবেই আমরা জাগতিক কামনা-বাসনায় আসক্ত হই। পরমেশ্বর শিব ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা বশীভূত হন না, জাগতিক কামনা বাসনারও তিনি উর্ধ্বে তাই তিনি অমুখ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫৯; (হরি) ১৩.১৬.৫৯]

অমুখ্য শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। লক্ষণীয়, শিবসহস্রনামস্তোত্রে মুখ্য এবং অমুখ্য নাম দুটি একত্রে উল্লিখিত হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এর অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন—

মুখ্যঃ পরমঃ অমুখ্যঃ অধমঃ, দেবানামিত্যর্থঃ।

তিনি আদিদেব, পরমেশ্বর, দেবতারাও তাঁর আরাধনা করেন। আবার যে দেবতাদের দ্বারা তিনি পূজিত হন দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব সেই 'অমুখ্য' দেবতাদেরও স্বরূপ, তাঁদের মধ্যেও তিনি স্বয়ং অধিষ্ঠান করেন—এই ভাবনা থেকেই মহাদেব মুখ্য এবং অমুখ্য—এই দুই নামেই আখ্যাত হন। বস্তুত মুখ্য এবং অমুখ্য দুই তত্ত্বই তিনি—এই ভাবনার মধ্যে মহাদেবের সর্বব্যাপ্ত স্বরূপই আখ্যাত হয়। *[মহা (k) ১৩.১৭.৬৬; (হরি) ১৩.১৬.৬৬]*

অমূর্তরয়স্$_{১}$ (অমূর্তরয়া) রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ গয় রাজার পিতা। অমূর্তরয়ার পুত্র হলেন বহুযজ্ঞশালী গয় রাজা—অমূর্তরয়সঃ পুত্রো গয়ো রাজর্ষি-সত্তমঃ। মহাভারতে শমঠ নামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ অমূর্তরয়ার পুত্র গয়ের কাহিনী বলেছিলেন বনবাসী পাণ্ডবদের কাছে।

[মহা (k) ৩.৯৫.১৭-১৮; (হরি) ৩.৭৯.১৮-১৯]

পুরাকালে দৈত্য-দানব-বধের জন্য ভগবান রুদ্র যে তরবারি ব্যবহার করেছিলেন সেটি বিষ্ণু-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার হাত ঘুরে মনুর কাছে এসেছিল। মনুর পরম্পরাক্রমে সেই তরবারি এক সময় যযাতিপুত্র পুরুর হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত আসে অমূর্তরয়ার কাছে, তাঁর কাছ থেকে পান ভূমিশয় নামক রাজা। মহাভারতে অন্য কোনো বিখ্যাত অমূর্তরয়ার নাম না থাকায় এঁকেও বোধহয় বিখ্যাত গয় রাজার পিতা হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়।

[মহা (k) ১২.১৬৬.৭৫; (হরি) ১২.১৬১.৭৫]

অমূর্তরয়স্$_{২}$ (অমূর্তরয়া) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ। কুশের চার পুত্রসন্তানের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমূর্তরয়া।

[বায়ু পু. ৯১.৬২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৩২]

অমূর্তরয়স্$_{৩}$ (অমূর্তরয়া) মৎস্য পুরাণ মতে পুরুবংশীয় রাজা রন্তিনারের ঔরসে মনস্বিনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র ছিলেন অমূর্তরয়া।

[মৎস্য পু. ৪৯.৮]

অমূর্তরয়স্$_{৪}$ (অমূর্তরয়া) ভাগবত পুরাণে আমরা জনৈক রাজর্ষি অমূর্তরয়ার নামোল্লেখ পাই, যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পরম পুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ জানতেন।

[ভাগবত পু. ২.৭.৪৪]

অমূর্তি বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০২; (হরি) ১৩.১২৭.১০২]

অমূর্তিমান্ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯০; (হরি) ১৩.১২৭.৯০]

অমৃত$_{১}$ প্লক্ষদ্বীপের সাতটি বর্ষের মধ্যে একটি।

[ভাগবত পু. ৫.২০.৩]

অমৃত$_{২}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে অমৃত শব্দটি দুবার মহাদেবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। সমুদ্রমন্থনের পর সমুদ্র থেকে ধন্বন্তরি উঠে এসেছিলেন অমৃতের কলস হাতে। অমৃত দেবাসুরের সেই কাঙ্ক্ষিত ভেষজ রস, যা অমরত্ব দান করে। মহাদেব সেই অমৃতের স্বরূপ—এই ভাবনা থেকে তাঁকে অমৃত নামে সম্বোধন করা হয়—

অমৃত সুধারূপঃ।

মৃত শব্দটির অর্থ হয় যার মৃত্যু ঘটেছে। সেক্ষেত্রে অমৃত শব্দটির একটি অর্থ হয়—যাঁর মৃত্যু ঘটে না। তিনি অমর, অবিনশ্বর বলেই অমৃত তাঁর অন্যতম নাম—

অমৃতো মরণবর্জিতঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.১২৪, ১৪০;
(হরি) ১৩.১৬.১২৩, ১৩৯]

অমৃত$_{৩}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। বিষ্ণু সহস্রনামের টীকাকার শঙ্করাচার্য 'অমৃত' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

ন বিদ্যতে মৃতং মরণমস্যেতি অমৃতঃ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—সেই পরমাত্মা জরারহিত, মরণবর্জিত, অমৃত এবং অভয়—

স বা এষ মহানজ আত্মাজরো'মরো'মৃতো' ভয়ো *[বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪.৪.২৫]*

উপনিষদে এই যে অমৃত শব্দটির উল্লেখ আছে, দার্শনিকরা এর অর্থ করেন নিত্য বা অবিনশ্বর, যাঁর জন্মও নেই; মরণও নেই ফলে জীবদেহের মধ্যে যেসব বিকার লক্ষ্য করা যায়, তার কোনওটিই তাঁকে স্পর্শ করে না, তিনি সমস্ত বিকারের উর্ধ্বে। ভগবান বিষ্ণুকে উপনিষদের সেই ব্রহ্মভাবনার সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পনা করেই তাঁকে অমৃত বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২৬; (হরি) ১৩.১২৭.২৬]

অমৃতকুণ্ড সিদ্ধকুণ্ডের কাছে সুধাপূর্ণ অমৃতকুণ্ড অবস্থিত। ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে মহাদেবের প্রীতির জন্য ওই কুণ্ড স্থাপিত করেন।

[দ্র. সিদ্ধকুণ্ড]

[কালিকা পু. ৬০.১০৬]

অমৃতপ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৭; (হরি) ১৩.১২৭.৬৭]

অমৃতপা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব।

[মহা (k) ১.৬৫.২৯; (হরি) ১.৬০.২৯]

অমৃতবপু ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০০; (হরি) ১৩.১২৭.১০০]

অমৃতবৃত্তি অযাচিত বস্তুর দ্বারা অর্থাৎ না চাইতেও যা পাওয়া যায়, এইরকম বস্তুর দ্বারা জীবিকানির্বাহ করার নাম অমৃতবৃত্তি। অযাচিত বস্তুকেই অমৃত বলে। *[কূর্ম পু. ২.২৫.১২]*

অমৃতমন্থন কোনো একসময় মহর্ষি দুর্বাসা পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তখন ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুর্বাসার কাছে ভগবান বিষ্ণুর কাছ থেকে পাওয়া (অন্যমতে জনৈক অপ্সরার থেকে প্রাপ্ত) পারিজাত ফুলের (বা সন্তানক ফুলের) একটি দিব্য মালা ছিল। দুর্বাসা মালাটি ইন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন। ইন্দ্র মালাটি গ্রহণ করে বাহন ঐরাবতের মস্তকে স্থাপন করলেন। ঐরাবত ফুলের গন্ধে বিরক্ত হয়ে মালাটিকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে শুঁকে ফেলে দিল। পারিজাতের মালাটি অনাদরে ভূতলে পতিত হল। এই অপমানে মহর্ষি দুর্বাসা ক্রোধে অন্ধ হলেন। তিনি ইন্দ্রকে বললেন—বশিষ্ঠ, গৌতম প্রমুখ মুনিগণের স্তব, মানুষের চাটুকারবৃত্তি এবং দেবলোকের অতুল ঐশ্বর্য্য তোমাকে এতটাই অহংকারী করে তুলেছে যে, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীহরির প্রসাদ, আমার দেওয়া এই দিব্য মালাটি সাদরে গ্রহণ না করে তুমি সেই মালার অবমাননা করেছ, সেই সঙ্গে আমারও অবমাননা করেছ। এর ফলস্বরূপ সমস্ত দেবলোক শ্রীহীন হয়ে পড়বে।

অচিরেই দুর্বাসার অভিশাপের ফলে দেবলোক শ্রীহীন হতে শুরু করল। স্বর্গের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নষ্ট হতে লাগল, সৌন্দর্য্য ম্লান হল, এমনকি বৃক্ষগুলি পর্যন্ত নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে লাগল। যজ্ঞ, দান, ধর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া বন্ধ হল। দেবগণের চরিত্রে নানাপ্রকার দোষ এবং পাপকর্মে তাঁদের প্রবণতা দেখা গেল। তাঁরা হীনবল, নিরুদ্যম, ধৈর্য্যহীন বৃদ্ধের মত হয়ে যেতে লাগলেন।

দেবতাদের এই দুর্বলতার সুযোগে অসুররা স্বর্গ আক্রমণ করল, হীনবল দেবতারা সহজেই পরাস্ত হলেন। বহু দেবসেনার মৃত্যু হল। পরাজিত দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ বৈকুণ্ঠে গিয়ে শ্রীহরির উদ্দেশে স্বর্গলোকের লুপ্ত ঐশ্বর্য্য, তেজ, শক্তি পুনরায় ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীহরি বললেন যে, দেবগণ যদি সমুদ্র মন্থন করে অমৃতলাভ করেন তবে তাঁদের তেজ এবং শক্তি আবার ফিরে আসবে। এই কাজের জন্য দেবগণ দৈত্যদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করুন এবং প্রস্তাব রাখুন যে, সমুদ্রমন্থনে যে সম্পদ এবং অমৃত সংগ্রহ হবে তা দেবতা ও অসুরদের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে। এইভাবে দেবাসুর মিলে উদ্যোগী হয়ে সমুদ্রমন্থন করুন, অবশ্যই অমৃত পাওয়া যাবে—

দৈবৈরসুরসঙ্ঘৈশ্চ মথ্যতাং কলশোদধিঃ।
ভবিষ্যত্যমৃতং তত্র মথ্যমানে মহোদধৌ॥

[মহা (k) ১.১৭.১২; (হরি) ১.১৩.১২]

তবে ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের আশ্বাস দিলেন, এ সন্ধিপ্রস্তাব মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রমন্থনে দেবগণ ফলভাগী এবং দৈত্যগণ ক্লেশভাগী হবেন। দেবগণ তাতে সম্মত হলেন।

মৎস্যপুরাণে অমৃতলাভের জন্য দেবতাদের আগ্রহের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, আদিকালে দেবগণ অমর ছিলেন না। কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য মহাদেবকে তুষ্ট করে সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করেন যার প্রভাবে তিনি মৃত অসুরবীরদের পুনরায় জীবনদান করতেন। ফলে অসুরদের আর মৃত্যুভয় ছিল না। তারা প্রায়ই দেবতাদের আক্রমণ করত। এই দেবাসুর সংগ্রামে অসংখ্য দেবসেনার মৃত্যু হতে লাগল। ফলে দেবতারা ক্রমশ পরাজিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলেন। অসুর সেনার তুলনায় দেবসেনা সংখ্যায় ও শক্তিতে ক্ষীণ হতে শুরু করলে ভীত হয়ে দেবগণ নারায়ণের শরণাপন্ন হলে তিনি

সমুদ্রমন্থন করে অমৃতলাভ করার পরামর্শ দেন যাতে অমৃত পান করে দেবতারা অমর হতে পারেন।

নারায়ণের পরামর্শে দেবগণ অসুররাজ বলির সভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে অসুররাজ বলি সহজেই সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মত হলেন। এরপর দেবতা ও অসুর যৌথভাবে সমুদ্রমন্থনে উদ্যোগী হলেন। বিশাল সমুদ্রমন্থনের উপযুক্ত মন্থনদণ্ড হিসাবে মন্দর পর্বতকে নির্বাচন করা হল। মন্দর পর্বতকে তুলে নিয়ে সাগরের প্রান্তে স্থাপন করার জন্য দেবাসুর যৌথভাবে বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই বিশাল পর্বতকে উৎপাটন করতে তাঁরা সমর্থ হলেন না। তখন নারায়ণের আদেশে নাগরাজ অনন্ত (অন্যমতে গরুড়) মন্দর পর্বতকে উৎপাটন করে সমুদ্রে স্থাপন করলেন। এরপর দেবতা ও অসুর মিলে মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং অনন্তনাগকে (কয়েকটি পুরাণ মতে বাসুকি নাগকে) মন্থনরজ্জু করে মহা উৎসাহে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করলেন। কিন্তু কিছু সময় পরেই মন্দর পর্বত নিজের ভারে ধীরে ধীরে জলের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। তখন মন্দর পর্বতকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উত্তোলন এবং সমুদ্র মন্থনকালে তাকে ধারণ করার জন্য নারায়ণ স্বয়ং বিশাল কূর্ম্ম বা কচ্ছপরূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতের তলদেশে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। এরপর দেবগণ অনন্তনাগের পুচ্ছভাগ এবং দৈত্যগণ সম্মুখভাগ আকর্ষণ করে সুদীর্ঘকাল সমুদ্রকে মন্থন করলেন। মন্থনের সময় সমুদ্রে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হলে জলজন্তুদের মৃত্যু হতে লাগল। মন্দর পর্বতের নানা বৃক্ষ ও লতাসমূহের নির্যাস এবং তার স্বর্ণময় পর্বতগাত্রের গলিত স্বর্ণ সমুদ্রের লবণজলে পতিত হলে সেই রসের সংস্পর্শে দেবগণ অমরত্ব লাভ করলেন। সমুদ্রের লবণাক্ত জল তরুলতার রসের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুগ্ধ ও ঘৃত সৃষ্টি করল।

সুদীর্ঘকাল সমুদ্রমন্থন চলতে থাকলে সমুদ্র থেকে নানাবিধ সম্পদ উৎপন্ন হল। এই মন্থনের ফলেই সমুদ্র থেকে কামধেনু সুরভি আবির্ভূতা হলেন এবং তিনি ব্রহ্মলোকে হোমধেনুরূপে বিরাজ করতে লাগলেন। এরপর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত প্রভৃতি আট জন দিগ্‌হস্তী এবং তাদের পত্নী অভ্রমু প্রভৃতি আট জন দিগ্‌হস্তিনী সমুদ্র থেকে বহির্গত হল। তারা দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবলোকের গৌরব বৃদ্ধি করল। ঘৃতসাগর থেকে মহামূল্যবান কৌস্তুভ নামক পদ্মরাগমণি উৎপন্ন হলে নারায়ণ তাকে কণ্ঠে ধারণ করলেন। এরপর হলাহল নামক তীব্র বিষ উৎপন্ন হল। বহুকাল ধরে অমৃত-মন্থনের পালা চলছিল। মন্থনরজ্জু হিসেবে বাসুকি নাগ আর তাঁর কাজ করতে পারছিলেন না। ফলে অতিরিক্ত মন্থনের ফলে তাঁর মুখ থেকে কালকূট বিষ বেরিয়ে এল—

অতিনির্মথনাদেব কালকূটস্তথাপরঃ।

বিষের উগ্রতায় সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হবার উপক্রম হল। তখন দেবগণের অনুরোধে ত্রিলোকের রক্ষার জন্য মহাদেব সেই বিষ পান করে নিজকণ্ঠে ধারণ করলেন। এর ফলে তাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করল। এই কারণেই মহাদেবের অপর নাম নীলকণ্ঠ। তবে অন্যান্য পুরাণ মতে, সমুদ্র মন্থনকালে সর্বপ্রথমে কালকূট বিষ উৎপন্ন হয়েছিল। পদ্মপুরাণে এই সময় অলক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটে বলে বর্ণিত হয়েছে, কালকূট বিষ উত্থিত হবার পরেই অলক্ষ্মী আবির্ভূতা হলেন। তাঁর দেহ জরাগ্রস্ত, কেশ রুক্ষ। দেবগণের আদেশে তিনি কলহপ্রিয়, পাপাচারী মনুষ্যগৃহে অধিষ্ঠান করতে লাগলেন। অলক্ষ্মী উদ্দালককে পতিরূপে বরণ করেন।

শেষ পর্যন্ত ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ কলস হাতে সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে এলেন। সমুদ্র মন্থন করে যখন অমৃত উত্থিত হল, তখন অসুররা তার সম্পূর্ণ অধিকার পাবার লোভে কলসটি কেড়ে নিয়ে পলায়ন করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কে অমৃত পরিবেশন করবে, কে সর্বাগ্রে অমৃত পান করবে তাই নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। এদিকে অসুররা অমৃতের কুম্ভ হরণ করায় দেবগণ বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীহরির শরণাপন্ন হলেন। শ্রীহরি কলহরত অসুরদের কাছ থেকে অমৃতের কলস উদ্ধার করার জন্য এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী মূর্তি ধারণ করলেন এবং অসুরদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁর মোহিনীরূপ অসুরগণকে সহজেই মোহিত করল। তারা সেই সুন্দরীর রূপ এবং মধুর ব্যবহারে বশীভূত হয়ে তাঁর হাতে অমৃতপূর্ণ কলস অর্পণ

করে অমৃত বন্টন করার অনুরোধ করল। মোহিনী এই প্রস্তাব শুনে মৃদু হেসে বললেন—আমার কাজ সঙ্গত হোক বা অসঙ্গত হোক, তোমার যদি তার প্রতিবাদ না কর তবে আমি তোমাদের মধ্যে অমৃত ভাগ করে দেবার দায়িত্ব নিতে পারি। অসুরগণ এই প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হল।

এরপর এক সুসজ্জিত সভাগৃহে দেবতা ও অসুর পৃথক পৃথক পঙ্‌ক্তিতে অমৃতপানের জন্য উপবেশন করলেন। মোহিনী মূর্তিধারী শ্রীহরি বিষ্ণু ওই সভায় অমৃতের কলস হাতে প্রবেশ করলেন। ভগবান বিষ্ণু নৃশংস অসুরজাতিকে অমৃতপানের যোগ্য বলে বিবেচনা করলেন না। তিনি অসুরদের তাঁর মধুর ব্যবহারে ভুলিয়ে রাখতে লাগলেন এবং দেবগণকে অমৃতপান করাতে থাকলেন। অসুররা মোহিনীর প্রতি এতটাই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, প্রণয়ভঙ্গের ভয়ে এই ঘটনার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। কিন্তু রাহু নামক অসুর এই ছলনা লক্ষ্য করলেন এবং দেবতার রূপ ধরে দেবগণের পঙ্‌ক্তিতে গিয়ে উপবেশন করলেন। দেবরূপধারী রাহু অমৃত পান করলে চন্দ্র ও সূর্য তাঁকে চিনে ফেলেন এবং তাঁকে চিনিয়েও দিলেন। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশে পৌঁছাবার আগেই ভগবান বিষ্ণুর চক্র রাহুর মস্তক ছেদন করল। অমৃতসিক্ত না হবার ফলে তার দেহ ভূতলে পতিত হল। কিন্তু অমৃত পানের ফলে রাহুর মস্তকটি অমরত্ব লাভ করেছিল। দেবগণের অমৃতপান শেষ হলে ভগবান বিষ্ণু মোহিনীরূপ ত্যাগ করে নিজের স্বরূপে আবির্ভূত হলেন। এরপর দেবাসুরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। কিন্তু অমৃত পান করার ফলে দেবগণ শুধু অমরত্বই লাভ করেননি, তাঁরা অতুল শক্তি ও তেজের অধিকারী হয়েছিলেন। ফলে তাঁরা সহজেই জয়লাভ করলেন। অমৃতের সুরক্ষার ভার কয়েকজন শক্তিশালী দেবতাসহ স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর (কিরীটি) উপর অর্পণ করে দেবগণ সানন্দে দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাহু, তাঁর অবস্থার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকেই দায়ী করেছিলেন এবং সেই কথা ভেবেই আজও রাহুগ্রহ মাঝে মাঝে চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে। কিন্তু তার মুণ্ড দেহহীন হওয়ায় চন্দ্র ও সূর্য কিছু সময় পরেই মুক্ত হন। পুরাণে এইভাবেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৭.৫-১৩, ১৮, ১৯ অধ্যায়;
(হরি) ১.১৩.৫-১৩; ১.১৪ এবং ১৫ অধ্যায় সম্পূর্ণ;
ভাগবত পু. ৮.৫.১১-৫০; ৬-৯ অধ্যায়;
বিষ্ণু পু. ১.৯.১-১১৫; মৎস্য পু. ১৪৯-১৫১ অধ্যায়;
পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৪১ অধ্যায়; ব্রহ্ম পু. ১০৬.১-৪২;
দেবীভাগবত পু. ৯.৪০. ৪১ অধ্যায়;
রামায়ণ ১.৪৫.১৫-৪৫]

অমৃতা$_{১}$ পৌরাণিক প্লক্ষদ্বীপের সপ্তগঙ্গা নামে খ্যাত নদী সমষ্টির অন্যতম একটি ধারা।

[বায়ু পু. ৪৯.১৭; বিষ্ণু পু. ২.৪.১১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.১৯]

অমৃতা$_{২}$ রাজর্ষি কুরুর পৌত্র অনশ্বা মগধদেশের রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। এই মাগধী রাজকুমারীর নাম অমৃতা। অনশ্বার ঔরসে অমৃতার গর্ভে পরীক্ষিতের জন্ম হয়।

[মহা (k) ১.৯৫.৩৯-৪১; (হরি) ১.৯০.৪৯-৫১]

অমৃতা$_{৩}$ দেবী শক্তির অন্যতম রূপ। দেবী ভগবতী বিন্ধ্যপর্বতে এবং বেণায় অমৃতা নামে পূজিত হন।

[মৎস্য পু. ১৩.৪২, ৪৯; ১২২.৩৩]

অমৃতা$_{৪}$ অপ্সরাদের চোদ্দটি গণের মধ্যে অন্যতম। অমৃতা অপ্সরারা বারি অর্থাৎ জল থেকে জন্মগ্রহণ করেন। *[বায়ু পু. ৬৯.৫৬;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৯]

অমৃতাশ বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০০; (হরি) ১৩.১২৭.১০০]

অমৃতাংশূদ্ভব বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৪; (হরি) ১৩.১২৭.৪৪]

অমৃতাশী চাক্ষুষ মন্বন্তরে অমৃতভোজী দেবগণের সংখ্যা আট। এর মধ্যে পঞ্চম গণের নাম অমৃতাশী। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৬.৫২]*

অমৃত্যু বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩৫; (হরি) ১৩.১২৭.৩৫]

অমৃতৌঘা প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ, ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক বর্ষে একটি করে বর্ষনদী আছে। মধুরহ নামক বর্ষের বর্ষনদীর নাম অমৃতৌঘা। *[দেবীভাগবত পু. ৮.১৩.১০;*
ভাগবত পু. ৫.২০.২১]

অমেয়াত্মা ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার তাঁকে অমেয়াত্মা নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২৪, ৩২; (হরি) ১৩.১২৭.২৪, ৩২]

অমোঘ$_{১}$ বার্হস্পত্য অগ্নি অর্থাৎ বৃহস্পতি কুলে জাত অগ্নি। ক্রোধহীন প্রাণীদেরও ক্রোধরূপে প্রকাশ পান, সেই বৃহস্পতির ঘর্ম বা প্রস্বেদই তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর নাম মন্যতী। মন্যতীর রাজসিক অবস্থার পুত্রের নামই অমোঘ, অমোঘ নামক অগ্নি। এই অমোঘ-অগ্নি শত্রুজয়ের জন্য সজ্জিত হয়ে রথে চড়েন এবং শত্রু-সংহার করেন। আসলে রাজা-রাজড়ারা অতিক্রুদ্ধ হয়ে যখন রথে চড়ে শত্রু-সংহার করতে, যেতেন, তখন এক প্রকার সংহারক ক্রোধ তাঁদের মধ্যে ক্রিয়া করত বলেই এই ক্রোধকে অমোঘ অগ্নির রূপকে দেখা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.২১৯.২৪; (হরি) ৩.১৮২.৩২]

অমোঘ$_{২}$ শিবের অনুচর এক যক্ষ। স্কন্দ কার্তিকেয় দেবতাদের সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হলে মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে ভদ্রবটের দিকে রওনা হলেন। সেই সময়ে অমোঘ নামে এই মহাযক্ষ অনেক যক্ষ-রাক্ষসদের সঙ্গে নিয়ে মহাদেবের দক্ষিণ পাশ ধরে চলতে লাগলেন।

[মহা (k) ৩.২৩১.৩৪-৩৫; (হরি) ৩.১৯৪.৬-৭]

অমোঘ$_{৩}$ স্কন্দ কার্তিকেয়র একটি নাম।

[মহা (k) ৩.২৩২.৫; (হরি) ৩.১৯৫.৫]

অমোঘ$_{৪}$ বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার তাঁকে অমোঘ নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২৫, ৩০; (হরি) ১৩.১২৭.২৫, ৩০]

অমোঘ$_{৫}$ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের অমোঘ নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অমোঘঃ নৈষ্ফল্যরহিতঃ।

উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে—যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে সম্যক ভাবে জানার পর সেই ব্রহ্মকে লাভ করার আশায় প্রার্থনা করেন বা তপস্যা করেন, তাঁর সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। তাঁর কোনো প্রার্থনাই নিষ্ফল বা অপূর্ণ থাকে না—

স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আশয়াস্য সর্বে
কামাঃ সমৃধ্যন্ত্যমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি
যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথাকামচারো
ভবতি, য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭.১৪.২]

ভগবান শিব সেই অমোঘ ফলপ্রদ ব্রহ্মের স্বরূপ বলেই তিনি অমোঘ নামে খ্যাত।

শিবের অমোঘ নামটিকে অবশ্য এভাবেও ব্যাখ্যা করা চলে যে, ভক্ত বৎসল শিব ভক্তের কোনো প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন না, ভক্তের অভীষ্ট লাভের আশা নিষ্ফল হয় না, তাঁর প্রসাদে মানুষের সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়—এই কারণেও তিনি অমোঘ।

[মহা (k) ১৩.১৭.১১৪; (হরি) ১৩.১৬.১১৩]

অমোঘা$_{১}$ স্কন্দকার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২১; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ২১, খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮]

অমোঘা$_{২}$ হিরণ্যগর্ভ মুনির কন্যা অমোঘা। তিনি তৃণবিন্দুর আশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। হরিবর্ষের একজন জ্ঞানী এবং ধার্মিক ঋষি শান্তনুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। একদিন শান্তনু মুনি বনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করতে যান। সেই সময় যেখানে অমোঘা একা অবস্থান করছিলেন, সেখানে ব্রহ্মা উপস্থিত হন। সুরূপা অমোঘাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁর মনে কামভাবের উদ্রেক হয়। ব্রহ্মা তাঁকে স্পর্শ করতে গেলে 'এইরকম করবেন না' ইত্যাদি বলতে বলতে অমোঘা কুটিরে প্রবেশ করেন। কুটিরের দরজা বন্ধ করে ভীষণ ক্রোধে অমোঘা ব্রহ্মাকে বলেন যে—আমি মুনিপত্নী, স্বেচ্ছায় গর্হিত কাজ করব না; আর যদি বলাৎকার কর, তা হলে শাপ দেব—

অকার্য্যং ন ময়া কার্য্যং মুনিপত্ন্যা বিগর্হিতম্।
বলাৎ প্রমথ্যা চাহঞ্চেত্ত্বয়া ত্বাঞ্চ শপাম্যহম্॥

অমোঘা এইভাবে ব্রহ্মাকে ভর্ৎসনা করলে শান্তনু মুনির আশ্রমে তাঁর বীর্য্যস্খলন ঘটে। লজ্জিত হয়ে তিনি হংস-যানে অরোহণ করে নিজের আশ্রমে প্রস্থান করেন।

শান্তনু মুনি আশ্রমে ফিরে এসে ভূতলে পতিত ব্রহ্মবীর্য্য ও কয়েকটি হাঁসের পদচিহ্ন দেখে নিজের পত্নীর কাছে সেই বিষয়ে জানতে চাইলেন। অমোঘা শান্তনুর কথা শুনে

ব্যাকুলভাবে তাঁকে বললেন যে, একজন কমণ্ডলুধারী চতুর্মুখ হংস বিমানে করে শান্তনু মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি অমোঘার সম্ভোগ প্রার্থনা করেন। কিন্তু মুনিপত্নীর ভর্ৎসনায় ও অভিশাপের ভয়ে স্খলিতবীর্য্য হয়ে তিনি প্রস্থান করেন। শান্তনুকে তাঁর পত্নী বলেন যে, তিনি যেন এই বিষয়ের প্রতিকার করেন। অমোঘার কাছে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে শান্তনু বুঝতে পারলেন যে, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর আশ্রমে এসেছিলেন। যোগবলে তিনি একথাও জানতে পারলেন যে, জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি ওই ব্রহ্মবীর্য্য তাঁদের কাছে সমর্পণ করেছেন। তাই শান্তনু জগতের হিতের জন্য অমোঘাকে ওই ব্রহ্মবীর্য্য পান করার আদেশ দেন। এই আদেশে অমোঘা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তাঁর স্বামীকে বলেন যে, অন্যের বীর্য্য তিনি ধারণ করতে পারবেন না। আর নিতান্তই যদি এই কাজটি করতে হয় তাহলে শান্তনু নিজে যেন ওই তেজ পান করে অমোঘার মধ্যে নিষেক করেন। শান্তনু অমোঘার গর্ভে ওই তেজ স্থাপন করলে জগতের কল্যাণের জন্য অমোঘা গর্ভবতী হলেন। যথাসময়ে অমোঘার গর্ভ থেকে জলরাশি ভূমিষ্ঠ হয় এবং ওই জলরাশিই ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত হয়।

[কালিকা পু. ৮২.১-৩৫; পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ৫৫ অধ্যায়]

অমোঘাক্ষী বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত দেবী ভগবতী অমোঘাক্ষী নামে প্রসিদ্ধ।

[মৎস্য পু. ১৩.৩৫; দেবীভাগবত পু. ৭.৩৫.৬৫]

অমোঘার্থ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। অমোঘ শব্দের অর্থ যা কখনওই ব্যর্থ হয় না। আর অর্থ শব্দের অর্থ যাচনা, প্রার্থনা বা অভিলাষ। তিনি ভক্তের কোনো যাচনাই অপূর্ণ রাখেন না, তাঁর কৃপায় ভক্তের সকল অভিলাষ পূর্ণ হয় বলেই তাঁকে অমোঘার্থ বলা হয়েছে—

অর্থো'র্থনং যাচ্ঞা অমোঘো'র্থো
যত্র সঃ অমোঘার্থঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯২; (হরি) ১৩.১৬.৯২]

অম্বর$_১$ একজন অসুরবীর। বৃত্রাসুরের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধের সময় যেসব অসুর সেনাপতি বৃত্রাসুরকে সহায়তা করেছিলেন অম্বর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৬.১০.১৯]*

অম্বর$_২$ একটি পবিত্র তীর্থ। দেবী ভগবতী এই তীর্থে বিশ্বকায়া নামে পূজিতা হন। *[মৎস্য পু. ১৩.২৭]*

অম্বরীষ$_১$ ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। অম্বরীষ এবং তাঁর পাঁচ ভাই বৃষাগিরের পুত্র। তাই তাঁদের 'বার্ষাগির' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদে তাঁদের ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করতে দেখা যায়—

এতত্ত্যত্ত ইন্দ্র বৃষ্ণ উক্থং বার্ষাগিরা
অভি গৃণন্তি রাধঃ।
ঋজ্রাশ্বঃ প্রষ্টিভিরম্বরীষঃ সহদেবো
ভয়মানঃ সুরাধাঃ॥

তবে পুরাণে, বিশেষত বায়ু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অম্বরীষ প্রভৃতি তেত্রিশজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে 'আঙ্গিরস' অর্থাৎ অঙ্গিরার বংশজাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুকুৎস, মান্ধাতা, যুবনাশ্ব, ত্রসদস্যু এঁদের নামের সঙ্গে অম্বরীষের নাম উচ্চারিত হয়েছে। পরবর্তী কালে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের বংশতালিকায় আমরা তাঁদের বিশিষ্ট রাজর্ষি হিসাবেও দেখতে পাব। (দ্র. অম্বরীষ$_২$) বায়ু পুরাণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছে যে, অম্বরীষ প্রভৃতি রাজর্ষিরা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন—

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥

[ঋগ্বেদ ১.১০০.১৭;
বায়ু পু. ৫৯.৯৯; ৮৮.৬-৭, ৭২-৭৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১০৮; বিষ্ণু পু. ৪.২.২]

অম্বরীষ$_২$ মহাভারত ও বেশিরভাগ পুরাণ মতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা নাভাগের পুত্র অম্বরীষ—

অম্বরীষশ্চ নাভাগম্ (নাভাগিম্)।

এই নাভাগকে মৎস্য পুরাণে বৈবস্বত মনুর পুত্র বলা হয়েছে, আবার ওই একই অধ্যায়ের অন্যত্র তাঁকে ভগীরথের পুত্র বলা হয়েছে। সেই সূত্রে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অম্বরীষ ভগীরথের পৌত্র। অন্য মতে অম্বরীষ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মান্ধাতার পুত্র। মান্ধাতার ঔরসে শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মুচুকুন্দ—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। রামায়ণে রাম-সীতার বিবাহের পূর্বে বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের গরিমা আলোচনা করতে গিয়ে অম্বরীষ রাজাকে প্রশুশ্রুকের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তবে পুরাণ ও মহাভারতে প্রদত্ত বংশলতিকা পর্যালোচনা করলে রামায়ণে প্রাপ্ত

এই তথ্যটি পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। *[মহা (k) ১২.২৯.১০০, ১০২; (হরি) ১২.২৯.৯৮, ১০০; রামায়ণ ১.৭০.৪২; বিষ্ণু পু. ৪.২.১৯; মৎস্য পু. ১২.২০, ৪৫; বায়ু পু. ৮৮.৬, ৭২-৭৩; দেবীভাগবত পু. ৭.২.২২; কূর্ম পু. ১.২০.২৬-২৭]*

☐ মহাভারতে অন্তত তিনবার—একবার আদিপর্বে, দ্বিতীয়বার বনপর্বে এবং তৃতীয়বার শান্তিপর্বে অনেকগুলি বিখ্যাত রাজার নাম করা হয়েছে, যাঁরা রাজা হিসেবে বিপুল কীর্তি লাভ করার পর কালবশে মৃত্যুবরণ করেছেন। অম্বরীষ সেই কীর্তিমান রাজাদের অন্যতম।

অম্বরীষ মহাশক্তিধর রাজা। তিনি এক রথে যুদ্ধ করতে গিয়ে একবারেই দশ লক্ষ রাজাকে জয় করেছিলেন। অস্ত্রযুদ্ধে অভিজ্ঞ শত্রু রাজারা চার দিক থেকে অম্বরীষকে ঘিরে ধরেছিলেন। কিন্তু মহারাজ অম্বরীষ শারীরিক দিক থেকেও যেমন সবল ছিলেন, তেমনই ভীষণ পটু ছিলেন যুদ্ধে। অম্বরীষ তাঁদের এতটাই বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন যে, শত্রুরাজারা শেষ পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করে দেহবর্ম নামিয়ে রেখে অম্বরীষের অধীনতা স্বীকার করলেন। অম্বরীষ তাঁদের জীবন দান করেছেন এবং এইভাবে সমগ্র পৃথিবী তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল।

অম্বরীষ ধর্মপ্রাণ রাজা ছিলেন। রাজা হিসেবে পৃথিবী তাঁর করায়ত্ত হতেই তিনি শত শত যজ্ঞের আয়োজন করেন। যমুনা নদীর তীরে একবার তিনি যজ্ঞ করেছিলেন—এই প্রসিদ্ধিও আছে। *[মহা (k) ৩.১২৯.২-৩; (হরি) ৩.১০৬.২-৩]*

অম্বরীষ-কৃত এই সব যজ্ঞে ব্রাহ্মণ এবং অন্য লোকেরা নিজের অভীষ্ট যথেচ্ছ অন্ন-পান লাভ করত। যেসব রাজাদের তিনি যুদ্ধে জিতেছিলেন, তাঁদের তিনি দিয়ে দিতেন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের হাতে। আমাদের ধারণা—বিজিত রাজাদের রাজ্য এইভাবে ব্রাহ্মণসাৎ করায় বিজিত রাজারাও যেমন রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তেমনই ব্রাহ্মণরাও ক্ষত্রিয় রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতায় 'কনট্রোল এলিমেন্ট' হিসেবে কাজ করেছেন। হয়তো অম্বরীষের সুকৌশল রাজ্য-শাসনের কথা মাথায় রেখেই তাঁর সম্বন্ধে এই প্রাবাদিক শ্রুতি হয়েছিল যে, অম্বরীষ যেমন যজ্ঞ করতেন, তেমনটা আগেও কেউ করেননি, পরেও কেউ করবেন না।

[মহা (k) ৭.৬৪.১-১৬; (হরি) ৭.৫৬.১-১৫]

☐ ভাগবত পুরাণে রাজা অম্বরীষ নাভাগ পরম বিষ্ণুভক্ত অথবা পূর্ণ বিষ্ণু স্বরূপ বাসুদেব কৃষ্ণের ভক্ত। স্মরণ-মনন ইত্যাদি নববিধা ভক্তি-অঙ্গের যাজন এবং শরীরের সর্ব অঙ্গ দিয়ে ভক্তি অঙ্গগুলির যাজন—এই প্রসঙ্গেই অম্বরীষের নাম উল্লিখিত হয়।

তিনি নিজের চিত্তকে কৃষ্ণের পাদপদ্মধ্যানে নিযুক্ত করেছিলেন, বাক্যকে ভগবান শ্রীহরির গুণকীর্তনে, দুটি হাত ভগবানের মন্দির মার্জনাদির কর্মে, কর্ণদ্বয় ভগবৎ-কথা শ্রবণে, চোখ দুটিকে ভগবদ্‌বিগ্রহের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্রগুলি দর্শনের কাজে, আলিঙ্গন-ক্রিয়াকে ভগবদ্‌ভক্তের অঙ্গালিঙ্গন-কর্মে, নাসিকাদ্বয়কে ভগবদ্‌বিগ্রহের পায়ে দেওয়া তুলসীপত্রের আঘ্রাণে, জিহ্বাকে ভগবৎ-প্রসাদ-ভোজনে এবং পা-দুটিকে ভগবৎ-ক্ষেত্র-পরিক্রমার কাজে এবং মাথাটিকে ভগবানের প্রণাম কার্যে ব্যবহার করতেন।

যজ্ঞ-দানাদি তপস্যার সঙ্গে ভগবদ্‌ভক্তির এই সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা অম্বরীষকে এমনই এক অকিঞ্চন ভগবদ্‌ভক্ত করে তুলেছিল, যাতে একদিকে যেমন গৃহস্থ অবস্থাতেই তাঁর সংসার-বৈরাগ্য তৈরি হয়েছিল, তেমনই আপন হৃদয়ে তিনি ভগবান শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করতেন। ভগবান শ্রীহরি তাঁর ভক্তিভাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সুরক্ষার জন্য শত্রুকুলের ভয়জনক সুদর্শন চক্র তাঁকে দান করেছিলেন

তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীক-ভয়াবহম্‌।

[ভাগবত পু. ৯.৪.১৩-২৮]

☐ এই অম্বরীষ মহারাজ একদিন একাদশী ব্রত সমাপনের পর দ্বাদশী-তিথিতে ব্রাহ্মণদের বহু অন্নপান দেবার পর যখন পারণ করার উপক্রম করছেন, এই সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা এসে উপস্থিত হলেন। অম্বরীষ তাঁকে সবিনয়ে বসিয়ে তাঁর ভোজনের ব্যবস্থা করতেই দুর্বাসা স্নান করার জন্য যমুনায় গেলেন। দ্বাদশী তিথির তখন অর্ধ মুহূর্ত বাকি আছে, তার মধ্যে পারণ করতেই হবে, কিন্তু দুর্বাসা ফিরে আসছেন না—এই অবস্থায় অম্বরীষের ধর্মসংকট এটাই দাঁড়াল যে, দুর্বাসার মতো ব্রাহ্মণ ঋষিকে লঙ্ঘন করাটাও যেমন দোষ,

তেমনই দোষ দ্বাদশীতে পারণ না করা। শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিচার করে অম্বরীষ পারণ করার জন্য কিঞ্চিৎ জলপান করলেন কারণ জলপান করাটাকে পণ্ডিতেরা খাওয়াও বলেন আবার না-খাওয়াও বলেন—

আহুরব্‌ভক্ষণং বিপ্রা হ্যশিতং নাশিতঞ্চ তৎ।

ইতিমধ্যে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াকর্ম সেরে দুর্বাসা ফিরে আসলেন অম্বরীষের গৃহে এবং আপন বুদ্ধিবলে তিনি এটাও বুঝলেন যে, অম্বরীষ জলপান করে ব্রতরক্ষা করেছেন। ভীষণ রেগে গেলেন দুর্বাসা মুনি। অম্বরীষ সবিনয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেও দুর্বাসার ক্রোধ প্রশমিত হল না। তিনি তাঁর মাথার জটা থেকে কালাগ্নিতুল্য এক কৃত্যা সৃষ্টি করলেন। কৃত্যা হল এক ধরনের মারণ-দেবতা, যা ধ্বংস করে, বিনাশ করে। দুর্বাসা-সৃষ্ট সেই কৃত্যা অসিহস্তে ধাবমান হল অম্বরীষের প্রতি, কিন্তু নিজের স্থান থেকে তিনি এতটুকুও নড়লেন না। এবং তাঁর সুরক্ষায় স্থিত বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র সেই কৃত্যাটিকে ভস্মীভূত করল। সুদর্শন চক্র এবার ধাওয়া করল দুর্বাসার পিছনেই। স্বসৃষ্ট কৃত্যা ভস্মীভূত এবং সুদর্শন চক্রকে নিজের পিছনে আসতে দেখে দুর্বাসা ছুটতে আরম্ভ করলেন; যেখানেই তিনি যান, সেখানেই উপস্থিত সুদর্শন চক্র। দুর্বাসা কাউকে এমন দেখতে পেলেন না যে তাঁকে সুরক্ষা দিতে পারে। এবারে তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বাঁচার আবেদন জানালেন। ব্রহ্মা নিজের অক্ষমতা জানালেন, কেননা অম্বরীষের মতো বিশিষ্ট বিষ্ণুভক্তের প্রতি যিনি দ্রোহ আচরণ করেছেন এবং ভগবানের শক্তিস্বরূপ সুদর্শন চক্র যাঁর পিছনে ধাওয়া করেছে, তাঁকে কে রক্ষা করবে। দুর্বাসা একে একে ভগবান শঙ্কর, সনৎকুমার, কপিল, ব্যাস ইত্যাদি মুনির কাছে গিয়েও সুরক্ষার কোনো আশ্বাস পেলেন না। শেষে তিনি বিষ্ণুরই শরণাপন্ন হলে তিনি বললেন—আমি ভক্তের অধীন, ভক্তরা আমার প্রিয় এবং ভক্তের ব্যাপার আমার স্বতন্ত্র ঈশ্বর-শক্তিও কাজ করে না। যাঁর প্রতি ক্রোধবশত আজ তোমার এই অবস্থা, তুমি সেই অম্বরীষের কাছেই শরণাগত হও।

নিরুপায় দুর্বাসা অম্বরীষের কাছে এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন সানুতাপে। অম্বরীষ অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং সুদর্শন চক্রের স্তুতি করে দুর্বাসারই মঙ্গল কামনা করলেন। দুর্বাসা অবাক হয়ে বললেন—আমি অপরাধ করলেও যে তুমি আমারই মঙ্গল চিন্তা করছো, এটা দেখেই বুঝতে পারছি ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য কী। যাই হোক, অম্বরীষের অনুকম্পায় দুর্বাসা বিপন্মুক্ত হয়ে অম্বরীষের ঘরে আহার করলেন, এবং অম্বরীষ খেলেন তাঁর খাওয়ার পরে। ভাগবত পুরাণে অম্বরীষের পরিচয় এটাই যে, তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত এবং সজ্জন। *[ভাগবত পু. ৯.৪-৫ অধ্যায়]*

□ ঋষি বিশ্বামিত্র পুষ্কর তীর্থে যখন কঠোর তপস্যায় নিয়ত ছিলেন, তখন অযোধ্যা রাজ্যের অধিপতি অম্বরীষ বিরাট এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। রাজার যজ্ঞে ঈর্ষালু দেবরাজ ইন্দ্র অম্বরীষের যজ্ঞাশ্বটিকে হরণ করলেন। পশুটি অপহৃত হলে তাঁর পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন—আপনার দুষ্কর্মের জন্যই পশুটি অপহৃত হয়েছে, এখন এই যজ্ঞকর্ম যদি চালিয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে ওই যজ্ঞীয় অশ্বের প্রতিনিধি হিসেবে একটি মানুষকে নিয়ে আসুন আপনি। রাজা অম্বরীষ সহস্র সহস্র গাভীর পরিবর্তে একটি মানুষকে ক্রয় করার জন্য নগরে, জনপদে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে অবশেষে ভৃগুতুঙ্গ নামক পর্বতে ভৃগুপুত্র ঋচীককে পুত্র-পরিবার সহ বসবাস করতে দেখলেন। সমুচিত কুশল বিনিময়ের পর অম্বরীষ অত্যন্ত বিনয় সহকারে ঋচীককে প্রসন্ন করে বললেন—শত-সহস্র গাভীর বিনিময়ে আপনি যদি আপনার একটি পুত্রকে যজ্ঞীয় পশু হবার জন্য আমার কাছে বিক্রয় করেন। ঋচীক মুনির তিনটি পুত্র ছিল। মুনি অম্বরীষের প্রস্তাব শুনে জ্যেষ্ঠ পুত্রটির ওপর মায়া দেখিয়ে তাঁকে কিছুতেই বিক্রয় করতে চাইলেন না তিনি। ঋচীকের পত্নী আবার কনিষ্ঠ পুত্র শুনককে কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না অম্বরীষের হাতে। বাকি রইলেন মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ, যিনি নিজেই নিজেকে নিবেদন করলেন অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশু হবার জন্য। শুনঃশেফের কথা শুনে অম্বরীষ বহুতর ধনরত্ন এবং এক লক্ষ গাভী ঋচীকের হাতে দিয়ে যজ্ঞস্থলের উদ্দেশে রওনা হলেন।

যাবার পথে অম্বরীষ শুনঃশেফকে নিয়ে মাধ্যাহ্নিক স্নানাহার করার জন্য পুষ্করতীর্থে পৌঁছোলেন। মাধ্যাহ্নিক শেষ করে বিশ্রাম করার সময় শুনঃশেফ হঠাৎ দেখলেন যে তাঁর মাতুল

বিশ্বামিত্র মুনি পুষ্করেই গভীর তপস্যা করছেন। শুনঃশেফ তাঁর মাতুলের কোলে ঝাঁপিয়ে পরে বললেন—আমার পিতা-মাতা কেউ নেই। আপনি আমাকে বাঁচান। আমি চাই—মহারাজ অম্বরীষও দীর্ঘায়ু হয়ে ঐশ্বর্য্য লাভ করুন এবং আমিও তপস্যার মাধ্যমে স্বর্গলাভ করি। বিশ্বামিত্র তাঁর আর্তি শুনে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে নিজের পুত্রদের মধ্যে কাউকে অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশু হবার জন্য অনুরোধ করলেন এবং শরণাগত শুনঃশেফকে জীবন দান করতে বললেন। পুত্রেরা কেউ এই আত্মাহুতি দিতে রাজি হলেন না এবং ফলত বিশ্বামিত্রের অভিশাপ লাভ করলেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে বললেন—তুমি অম্বরীষের যজ্ঞে পশু হবার ভাবনা স্বীকার করো। তোমাকে যখন রক্তবর্ণ পুষ্পের মালা পরিয়ে, রক্তচন্দন মাখিয়ে, যজ্ঞের পশুবন্ধন-রজ্জু গলায় পরিয়ে পশুবন্ধন কাষ্ঠের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তুমি অগ্নি-দেবতার মাধ্যমে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর উদ্দেশে স্তুতি করবে। তাতেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে—

বৈষ্ণবং যূপমাসাদ্য বাগ্‌ভিরগ্নিমুদাহর।

শুনঃশেফ এই কথা শুনে অম্বরীষকে তাড়াতাড়ি যজ্ঞস্থলে যেতে বললেন। অম্বরীষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন এবং সেই যজ্ঞে পূর্বোক্ত রূপে শুনঃশেফকে উপস্থিত করা হলে তিনি ইন্দ্র এবং ইন্দ্রানুজ বিষ্ণুর স্তুতি উচ্চারণ করলেন রজ্জুবদ্ধ অবস্থায়। মন্ত্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র শুনঃশেফকে দীর্ঘায়ু দান করলেন এবং অম্বরীষও তাঁর যজ্ঞফল লাভ করলেন প্রাপ্যফলের চেয়েও অনেক বেশি।

[রামায়ণ ১.৬১.৫-২৪; ১.৬২.১-২৭]

☐ যুদ্ধে যাঁরা পালিয়ে যান না, এমন অপরাঙ্মুখ ক্ষত্রিয়েরা স্বর্গে পরমা গতি লাভ করেন—এই প্রসঙ্গে মহাভারতে ইন্দ্র-অম্বরীষ সংবাদ উচ্চারিত হয়েছে। অম্বরীষ নাভাগি মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে যেতে-যেতে দেখলেন —তাঁর সেনাপতি সুদেব দিব্য বিমানে আরোহণ করে তাঁর চেয়েও ওপর দিয়ে যাচ্ছেন। অম্বরীষ দুঃখিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—আমি কঠিন ব্রহ্মচর্য্য এবং গুরূপদিষ্ট আচার পালন করেছি, বেদ অধ্যয়ন, অতিথিসেবা, পিতৃকুলের প্রতি যথাকর্তব্য করেছি। অন্যদিকে যথাবিধানে ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করে শত্রুদেরও জয় করেছি। কিন্তু এই সুদেব প্রথমে আমার সামান্য সৈন্যমাত্র ছিলেন, পরে আমার সেনাপতি হয়ে মারা যান। সেই সুদেব আমার চেয়েও উচ্চগতি লাভ করেছেন কেমন করে? ইনি তো বড়ো বড়ো যজ্ঞ করেননি, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা-দানে তুষ্টও করেননি, তাহলে কী করে এমন পরমা গতি সে লাভ করল?

রাজার কথা শুনে ইন্দ্র বললেন—আপনার রাজত্বকালে রাক্ষসরাজ শতশৃঙ্গের তিন পুত্র সংযম, বিযম এবং সুযম বিরাট রাক্ষস-সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনার যজ্ঞবিঘ্ন উৎপাদন করে এবং আপনার সবগুলি পুত্রকেই বন্দি করে। এই সময়ে আপনি ঈর্ষালু মন্ত্রীদের কপট পরামর্শে সেনাপতি সুদেবকে সমস্ত যোগ্য কর্ম থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে সৈন্য-সামন্তদের পরাজয়ের আর্তি শুনে আপনি আবার সুদেবকে ডেকে পাঠান এবং সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে যেতে বলেন। সেনাপতিকে আপনি এও বলেছিলেন যে, রাক্ষস-সৈন্যদের জয় না করা এবং পুত্রদের বন্দিমোচন না হওয়া পর্যন্ত আপনি তাঁর পুনরাগমন দেখতে চান না।

সুদেব যুদ্ধযাত্রা করে সেইখানে গেলেন যেখানে অম্বরীষের পুত্রেরা বন্দি হয়ে ছিলেন। কিন্তু রাক্ষসদের সৈন্য এতটাই বিশালাকার ছিল যে, সুদেব প্রমাদ গণলেন। এত অল্প সৈন্য নিয়ে কীভাবে যুদ্ধ জিতবেন—সুদেব এই কথা ভেবে তাঁর সমস্ত সৈন্য অম্বরীষের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে সমস্ত বিপন্মুক্তির জন্য দেবাদিদেব মহাদেবের শরণ গ্রহণ করলেন।

সুদেব মহাদেবকে তাঁর মনোবাঞ্ছা জানিয়ে স্তব করলেন এবং চরম শরণাগতিতে মস্তক ছেদন করার জন্য উদ্যত হলেন। এই অবস্থায় মহাদেব তাঁর হাত ধরে সমস্ত কিছু জানতে চাইলেন।

সব শুনে মহাদেব কৃপালু হয়ে সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র সহ আপন পাশুপত অস্ত্রটিও সাজিয়ে একটি রথ উপহার দিলেন সুদেবকে। সুদেব সেই অজেয় রথে চড়ে শৈব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন রাক্ষসদের সঙ্গে। সুদেব রাক্ষসদের জয় করলেন, রাজপুত্রদের বন্দিদশা মোচন করলেন, কিন্তু তাঁর শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হল বিযম নামে সেই রাক্ষসের সঙ্গে। সুদেব সেই রাক্ষসকেও মারলেন বটে,

কিন্তু বাহুযুদ্ধে তাঁর আঘাতে নিজেও মারা পড়লেন।

সুদেবের জীবন-বিবরণ দেবার পর ইন্দ্র অম্বরীষকে বোঝালেন যে, তাঁর সেনাপতি সুদেব যেটা করেছিলেন সেটা যুদ্ধযজ্ঞ। সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে সুদেব সেই যজ্ঞের চরম ফল স্বর্গ লাভ করেছিলেন এবং স্বর্গেও তাঁর স্থান তাঁর প্রভুর চেয়ে উচ্চতর ছিল।

এর পর যুদ্ধ কীভাবে যজ্ঞে পরিণত হয়, সেই বিবরণ দিয়ে ইন্দ্র বৃহৎ একটি যজ্ঞকর্মের বিচিত্র উপকরণের সঙ্গে যুদ্ধে উপকরণের তুলনা করলেন যাতে ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ভূমিকাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে রইল।

[মহা (k) ১২.৯৮.২-৫১; (হরি) ১২.৯৫.২-৭৭ (গীতা প্রেস) ১২.৯৮.১১ এবং ১২ নং. শ্লোকের মধ্যবর্তী দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্রষ্টব্য। R. Kinjawadekar সম্পাদিত সংস্করণে এই অধ্যায়ের ২৬টি শ্লোক অনুপস্থিত]

☐ পুরাকালে এক সময় প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হয়ে ঋষিরা ঠিক করেছিলেন তাঁরা ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থে ঘুরে বেড়াবেন। এই ঋষিদের দলে অন্যান্য কিছু খ্যাতনামা রাজার সঙ্গে অম্বরীষও ছিলেন। ঋষিরা একসময় ব্রহ্ম-সরোবরে উপস্থিত হয়ে অবগাহনের সময় পদ্ম-কুমুদের মৃণাল তুলে নিচ্ছিলেন। ঋষি অগস্ত্য এই সরোবর থেকে একটি পদ্মফুল সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু সেই পদ্মটি হরণ করে নিয়েছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। অগস্ত্য সেটা বুঝতে না পেরে সহ-সমাগত মুনিদেরই সন্দেহ করলেন। মুনিরা এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা অম্বরীষ প্রভৃতি রাজারাও তখন অনেক শপথ নিয়ে অদৃষ্ট অপহরণকারীর প্রতি নানা অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ করতে থাকলেন। অম্বরীষ বলেছিলেন—যে লোক আপনার পদ্মটি হরণ করেছে, সে যেন স্ত্রীলোক, জ্ঞাতি এবং গোহত্যার ব্যাপারে আরও নৃশংস হয় এবং তার যেন দয়া বলে শরীরে কিছু না থাকে।

[মহা (k) ১৩.৯৪.৫-৯, ২৯; (হরি) ১৩.৮০.৫-৯, ২৯]

এই অভিমানী অভিশাপের বহর দেখে বোঝা যায় যে, মহারাজ অম্বরীষ অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। স্ত্রীলোক, জ্ঞাতিকুল এবং গো-সমূহের প্রতি তাঁর দয়ার অন্ত ছিল না এবং ব্রাহ্মণদের গোদান করাটাও তাঁর অভ্যাসের মধ্যে ছিল।

[মহা (k) ১২.২৩৪.২৩; (হরি) ১২.২৩১.২৩]

অবশ্য শুধুই গোদান কেন, কথিত আছে যে, রাজা অম্বরীষ সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণকে দান করে স্বর্গলাভ করেছিলেন—প্রদায় সকলং রাষ্ট্রং সুরালোকমবাপ্তবান্।

[মহা (k) ১৩.১৩৭.৮; (হরি) ১৩.১১৫.৮]

☐ মৃত্যুর আগে অম্বরীষ তাঁর সমগ্র জীবনের উপলব্ধি একত্র করে বলেছিলেন— আমি সমস্ত দোষই জয় করেছি, কিন্তু একটি দোষ আমি জয় করতে পারিনি এবং সেটা হল লোভ। লোভের জন্যই মানুষ বৈরাগ্য লাভ করতে পারে না এবং লোভের জন্যই মানুষ দিনের পর দিন নীচে নামতে থাকে। লোভ থেকে তৃষ্ণার জন্ম, তৃষ্ণা থেকে চিন্তা। সেই চিন্তায় মানুষ প্রথমে কাম-ক্রোধাদি রাজসিক গুণ লাভ করে, তারপর সেগুলি লাভ হয়ে গেলে মানুষ তামসিক গুণ লাভ করে। অম্বরীষের বক্তব্য হল—যে-রাজা প্রজারঞ্জকের ভূমিকা নিয়ে রাজ্য শাসন করেন, তিনি যেন এই লোভ দমন করে রাজত্ব করেন, বস্তুত চিত্তের রাজত্বই প্রকৃত রাজত্ব আর আত্মাই এ-রাজ্যের রাজা—

এতদ্‌রাজ্যং নান্যদস্তীহ রাজ্যম্/
আত্মৈব রাজা বিদিতো যথাবৎ।

অম্বরীষ দৈন্য করে বলেছিলেন বটে যে, তিনি লোভ জয় করতে পারেননি, কিন্তু তিনি লোভ জয় করেই জগৎকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। এতটাই খ্যাতকীর্তি বীর এবং প্রজানুরঞ্জক রাজা ছিলেন অম্বরীষ যে, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর নাম করলে লোকে ধর্মফলের ভাগী হন বলে মহাভারতে বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১৪.৩১.৪-১৩; ১৩.১৬৫.৫৩; (হরি) ১৪.৩৬.৪-১৩; ১৩.১৪৩.৫১]

☐ মৃত্যুর পরে যে সব ধর্মপরায়ণ রাজর্ষি যমের সভায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন অম্বরীষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ২.৮.১২; (হরি) ২.৮.১২]

অম্বরীষ$_3$ মহাভারতে যে নাগ বংশের বর্ণনা আছে, সেই নাগকুলের অন্যতম। যদিও মহাভারতের সর্পনাম-কথন অধ্যায়ে তাঁর নাম নেই। তবে বায়ু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কদ্রুর পুত্রদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে অম্বরীষের নামও উল্লিখিত

হয়েছে। কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামের রসাতল প্রবেশের সময় তাঁর মুখ থেকে যে মহাসর্পটি বেরিয়ে সাগরের দিকে গেলেন, তাঁকে স্বাগত জানালেন কর্কোটক, বাসুকি, তক্ষক ইত্যাদি প্রখ্যাতনামা নাগ-পুরুষেরা। এই নাগদের মধ্যে অম্বরীষও ছিলেন।

[মহা (k) ১৬.৪.১৫-১৬; (হরি) ১৬.৪.১৫-১৬;
বায়ু পু. ৬৯.৭৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৬]

অম্বরীষ$_{৪}$ মহর্ষি পুলহের ঔরসে ক্ষমার গর্ভে তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে মধ্যম পুত্র ছিলেন অম্বরীষ। *[বায়ু পু. ২৮.২৬]*

অম্বষ্ঠ মহাভারত এবং মনুর মতে ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে বৈশ্যা জননীর গর্ভজাত সঙ্করজন্মা সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ—

ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

[মহা (k) ১২.২৯৬.৭-৮;
(হরি) ১২.২৮৯.৭-৮; মনুসংহিতা ১০.৮]

জাতি হিসেবে এঁরা যথেষ্ট প্রাচীন, কেননা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এঁদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এক অম্বষ্ঠ রাজার ঐন্দ্র মহাভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন মহর্ষি পর্বত এবং দেবর্ষি নারদ—

ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ পর্বত-নারদৌ
আম্বাষ্ঠ্যম্ অভিষিষিচতুঃ।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (সামশ্রমী) ৮.৪.৭. পৃ.২৫৮]

টলেমি হয়তো এঁদেরই কথা বলেছেন Ambastai শব্দের মাধ্যমে। গ্রীক উপাদানে যেমনটি এঁদের কথা পাওয়া যাচ্ছে, বিশেষত আরিয়ান যেহেতু আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ কালে Abstanois-দের অসিক্নী নদীর (Aceesines) তীরে স্থাপন করেছেন, তাতে সিন্ধু প্রদেশের উত্তরাংশে পাঞ্জাবের চেনাব অসিক্নী অঞ্চলে এঁদের বসবাস ছিল।

[R.C. Mazumdar: Classical Accounts of
India, pp. 378, 381 (no. 66)]

তার মানে অম্বষ্ঠদের বসতি ছিল মালবদেশের (Malloi) নীচে আর সিন্ধু-চেনাবের সঙ্গমস্থলের ঠিক ওপরে। তাতে মনে হয়, আধুনিক শিকারপুর জেলায় সম্ভবত অম্বষ্ঠদের বসবাস ছিল।

মহাভারতে অম্বষ্ঠদের উল্লেখ করা হয়েছে শিবি, ক্ষুদ্রক, মালব এবং আরও অন্যান্য উত্তর-পশ্চিম দেশীয় কৌকুর, তার্ক্ষ্য, ক্ষুদ্রক, পহ্লব, মালব—ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে।

[মহা (k) ২.৫২.১৫; (হরি) ২.৫০.১৫]

পাণ্ডব-চতুর্থ নকুল রাজসূয় যজ্ঞের কালে অম্বষ্ঠদের পরাজিত করেছিলেন এবং যজ্ঞের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য অম্বষ্ঠেরা উপহার নিয়ে এসেছিলেন।

[মহা (k) ২.৩২.৭; ২.৫২.১৫;
(হরি) ২.৩১.৭; ২.৫০.১৫]

মহাভারতে বহু ঘটনায় অম্বষ্ঠদের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মের সুরক্ষার জন্য এক অম্বষ্ঠ রাজা তাঁর পাশাপাশি থাকতেন। যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে একা, তখনও এই অম্বষ্ঠ রাজা তাঁকে ছেড়ে যাননি। ভীষ্মের সেনা-বাহিনীর মধ্যেও অম্বষ্ঠজাতীয় সৈন্যদের উপস্থিতি দেখেছি।

[মহা (k) ৬.১৮.১৩; ৬.১১৯.৮২; ৬.২০.১০;
(হরি) ৬.১৮.১৩; ৬.১১৪.৮৫; ৬.২০.১০]

ভীষ্মের সেনাপতিত্বকালে অর্জুনের হাতে এক অম্বষ্ঠ রাজা পরাজিত হন। দ্রোণের সেনাপতিত্বকালে তাঁর নির্মিত গরুড়ব্যূহের পৃষ্ঠ ভাগে এক অম্বষ্ঠ রাজাকে দেখা গেছে, কিন্তু যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে অম্বষ্ঠ-জাতীয় এক যুদ্ধবীরকে মারা যেতেও দেখেছি। ভীমের হাতেও মারা পড়েছেন একজন।

[মহা (k) ৬.১১৭.৩৪-৩৬; ৭.২০.১০;
৭.১৫৭.২৮; ৭.১৬১.৩; (হরি) ৬.১১২.১১২-
১১৪; ৭.১৮.১১; ৭.১৩৭.২৩; ৭.১৪১.৩]

বিভিন্ন পুরাণগুলিতে যেমন দেখা যাচ্ছে, তাতে অম্বষ্ঠরা আনব বা যযাতির ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত অনুবংশীয় শিবির বংশ-পরম্পরায় সুব্রত নামক এক রাজার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এক জনগোষ্ঠী।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৭৪.২২; বিষ্ণু পু. ২.৩.১৭;
বায়ু পু. ৯৯.২২; মৎস্য পু. ৪৮.২১;
AIHT, (Pargiter) p. 108-109]

ভাগবত পুরাণের বিবরণে এই অম্বষ্ঠ সুব্রত বৃহৎসেনের পুত্রী লক্ষ্মণাকে বিবাহ করতে গিয়ে স্বয়ংবরের শর্ত অনুযায়ী তিনি মৎস্যচক্ষু ভেদ করতে পারেননি। পরে কৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মণার বিবাহ হয়। *[ভাগবত পু. ১০.৮৩.২৩]*

পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী *[৮.৩.৯৭]* সূত্রে অম্বষ্ঠদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ভাষ্যকার পতঞ্জলি *[৪.১.১৭১]* পাণিনি সূত্রে যেভাবে বলেছেন তাতে অম্বষ্ঠরা রাজতন্ত্রীয় শাসন মেনে

চলতেন বলে মনে হয়। বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্রে সিন্ধুদেশীয়দের সঙ্গে অম্বষ্ঠদের উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত প্রমাণ থেকে এই ধারণা হয় যে, অম্বষ্ঠরা প্রথমত উত্তর-পশ্চিমদেশীয় কোনো যুদ্ধবীর জনগোষ্ঠী ছিলেন। কিন্তু মগধ সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসন প্রবল হয়ে উঠলে সম্ভবত তাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং কৃষি, চিকিৎসা, চর্মশিল্প এবং রজকের বৃত্তিও গ্রহণ করেন। একজন অম্বষ্ঠকে আমরা হাতির মাহুত হিসেবেও দেখতে পেয়েছি। কংসবধের পূর্বে কৃষ্ণ যখন কংসের আমন্ত্রণে মল্লযুদ্ধের জন্য মথুরায় এসেছিলেন, তখন কংস প্রথমে কুবলয়াপীড় নামের মত্তহস্তীটিকে পাঠান কৃষ্ণকে পিষে মারার জন্য। এই কুবলয়াপীড়ের পোষক মাহুত ছিলেন এক অম্বষ্ঠ। তিনি অবশ্য কৃষ্ণের হাতে মারা পড়েছিলেন।

[Barhaspatya Sutram,
Ed. by F.W. Thomas, 3.103, p. 21;
ভাগবত পু. ১০.৪৩.২, ১৪]

আধুনিক কালে বিহার এবং বঙ্গদেশে কায়স্থদের পূর্বপুরুষ এই অম্বষ্ঠরাই। কোনো বৌদ্ধগ্রন্থে একজন অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় হিসেবেই যে তাঁরা বহুলভাবে প্রচলিত ছিলেন, সে-কথা পুরাণ-গুলিতে তাঁদের সঙ্গে আনব ক্ষত্রিয় উশীনর শিবির সম্বন্ধেই বোঝা যায়। মহাভারতেও অম্বষ্ঠরা ক্ষত্রিয় হিসেবে চিহ্নিত—

যে চাম্বষ্ঠা ক্ষত্রিয়াঃ যে চ সিন্ধোঃ।

[মহা (k) ৬.২০.১০; (হরি) ৬.২০.১০]

অম্বষ্ঠ জনগোষ্ঠীর রাজা শ্রুতায়ু মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অন্যতম যুদ্ধবীর বলে কথিত হয়েছেন—

শ্রুতায়ুরপি চাম্বষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াণাং ধুরন্ধরঃ।

[দ্র. শ্রুতায়ু]

[মহা (k) ৮.৫.১৮; (হরি) ৮.৩.৩৪;
TIM (Mishra), p. 71;
GEAMI (Bajpai), Pt I, p. 18]

অম্বা১ কাশীরাজকন্যা। কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকার মধ্যে অম্বাই জ্যেষ্ঠা।

কাশীরাজ একই সঙ্গে তাঁর তিন কন্যার স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান করেন। হস্তিনাপুরে তখন শান্তনুর কনিষ্ঠপুত্র বিচিত্রবীর্য্য যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর মাতা সত্যবতী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভীষ্ম তাঁর বিবাহের উদ্যোগ করছেন। এইসময় ভীষ্ম সেই স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানের সংবাদ শুনলেন। তারপর সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে একা ভীষ্ম কাশীরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে ভীষ্ম তিন রাজকন্যাকে হরণ করলে উপস্থিত অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তাঁর ভয়াবহ যুদ্ধ হল। মহাপরাক্রমশালী ভীষ্ম একা সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে তিন রাজকন্যাকে নিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা করলেন এবং কন্যাকে পিতা যেমন স্নেহ করেন, সেই স্নেহে হস্তিনাপুরের ভাবী রাজবধূর মর্যাদায় তাঁদের হস্তিনাপুর রাজপুরীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ভীষ্ম তিন রাজকন্যার সঙ্গে কনিষ্ঠভ্রাতার বিবাহের আয়োজন করছেন, এইসময় বিবাহের কিছুদিন পূর্বে জ্যেষ্ঠা কাশীরাজকন্যা ভীষ্মকে বললেন—আমি পূর্বেই শাল্বরাজকে পতিরূপে বরণ করেছিলাম, তিনিও আমাকে বিবাহ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আমার পিতারও এই বিবাহে সম্মতি ছিল। সুতরাং স্বয়ম্বর সভায় আমি তাঁকেই বরণ করতাম। এ অবস্থায় বিচিত্রবীর্য্যের সঙ্গে আমার বিবাহ কী করে হতে পারে? অম্বার কথা শুনে ভীষ্ম বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করে অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। অম্বা শাল্বরাজের রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। অপর দুই রাজকন্যার সঙ্গে বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ সুসম্পন্ন হল। মহাভারতের আদি পর্বে এই কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। উদ্যোগপর্বে অম্বার পরবর্তী জীবনের কাহিনী শোনাতে গিয়ে ভীষ্ম এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছেন।

[মহা (k) ১.১০২.২-৬৫; ৫.১৭৩.৪-২৩;
১৭৪ অধ্যায়, ১৭৫.১; (হরি) ১.৯৬.২-৬৫;
৫.১৬২.৪-৩৪, ১৬৩.১]

☐ এদিকে অম্বা শাল্বরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রতি নিজের আন্তরিক অনুরাগ ব্যক্ত করলেন এবং শাল্বরাজকে তাঁর পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু শাল্বরাজ বললেন—পূর্বে ভীষ্ম জোর করে তোমাকে ধরে নিয়ে গেছেন। অতএব আমি তোমাকে আর বরণ করতে পারি না এবং তেমন ইচ্ছাও করি না।

তাছাড়া আমি ভীষ্মকে ভয়ও করি। অম্বার কাতর অনুনয়, অশ্রুজল, অনুরোধ, কোনো কিছুই শাল্বরাজের হৃদয় স্পর্শ করল না। তিনি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে অম্বাকে ফিরিয়ে দিলেন।

শাল্বরাজ প্রত্যাখ্যান করলে পিতৃগৃহ বারণসীতে, পুনরায় হস্তিনাপুরে, এবং শাল্বরাজের গৃহে তো বটেই—কোনোখানেই অম্বার আশ্রয়লাভের কোনো উপায় রইল না। নিজের এই দুর্দশার জন্য গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকেই দায়ী করলেন অম্বা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন। শাল্বরাজধানী ত্যাগ করে অম্বা তপস্বীদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত মুনিদের অম্বা বিস্তারিত ভাবে নিজের দুর্দশার কাহিনী শোনালেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তপস্যায় কাল অতিবাহিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই আশ্রমে শৈখাবত্য নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি অম্বাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন এবং রাজকন্যা অম্বাকে সন্ন্যাসিনীর মতো কঠোর জীবনযাপন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু অম্বা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। এইসময় মহান তপস্বী রাজর্ষি হোত্রবাহন সেইস্থানে উপস্থিত হলেন। তিনি সম্পর্কে অম্বার মাতামহ। দৌহিত্রীর দুর্দশার করুণ কাহিনী শুনে দুঃখিত হোত্রবাহন অম্বাকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁর দুঃখমোচনের জন্য তাঁকে মহর্ষি পরশুরামের শরণাপন্ন হবার পরামর্শ দিলেন। হোত্রবাহন বললেন—একমাত্র পরশুরামই ভীষ্মকে পরাজিত করতে পারেন। যদি ভীষ্ম তাঁর আদেশ পালন না করেন তবে তিনি অবশ্যই যুদ্ধে তাঁকে বধ করবেন এবং তোমাকে অন্যান্য নারীর সমান মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। হোত্রবাহনের এই কথায় অম্বা আশ্বস্ত হলেন এবং পরশুরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা করতে উদ্যোগী হলেন।

হোত্রবাহন এবং অম্বার এই সব কথোপকথনের সময়ই ঘটনাচক্রে পরশুরামের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ সেই তপোবনে এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনিই এই সংবাদ দিলেন যে পরশুরাম পরম বন্ধু রাজর্ষি হোত্রবাহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পরদিন প্রভাতে সেই তপোবনে আসবেন। পরশুরাম উপস্থিত হলে অম্বা তাঁকে নিজের দুর্দশা জানিয়ে ভীষ্মবধের জন্য অনুরোধ করলেন। পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণ এবং অন্যান্য তপস্বীরাও এই অনুরোধ সমর্থন করলেন। তখন পরশুরাম ভীষ্মবধের সঙ্কল্প করে অম্বা এবং অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে রওনা হলেন। ক্রমে হস্তিনাপুর রাজ্যের প্রান্তভাগে উপনীত হয়ে নিজের আগমনের সংবাদ জানিয়ে ভীষ্মের কাছে এক দূত পাঠালেন পরশুরাম। গুরু পরশুরামের আগমন সংবাদ পেয়ে ভীষ্ম তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করলেন। পরশুরাম ভীষ্মকে বললেন—তুমি নিজে যখন বিবাহ করতে চাও না, তখন রাজকন্যা হরণ করেছিলে কেন? তোমার এই কাজের ফলেই আজ অন্য কোনো ব্যক্তি এঁকে বিবাহ করতে চাইছেন না। অতএব আমার আদেশে তুমি কাশীরাজকন্যা অম্বাকে গ্রহণ কর। কিন্তু ভীষ্ম এই আদেশ পিতৃসত্যের কারণে মানতে পারলেন না। ফলে পরশুরামের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। বহুদিন যুদ্ধ চলার পর শেষ পর্যন্ত দেবতা ও ঋষিরা উপস্থিত হয়ে দু-জনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। পরশুরামও ভীষ্মের প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করলেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

ভীষ্মকে পরশুরামও যুদ্ধে জয় করতে সমর্থ হলেন না দেখে নিরাশ হয়ে অম্বা স্বয়ং যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করার সংকল্প গ্রহণ করে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। প্রথমে যমুনানদীর তীরে, তারপর যমুনানদীর মধ্যে বাস করে অম্বা কঠোর তপস্যা করলেন। তারপর কেবলমাত্র অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। এইভাবে ক্রমাগত বারো বৎসর অম্বা কঠোর তপস্যা করলেন। তাঁর আত্মীয়-জ্ঞাতিরা বারবার অনুরোধ করেও তাঁকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হলেন না। এরপর অম্বা বৎসদেশে গমন করলেন এবং সেখান থেকে নানাতীর্থে গমন করে সেখানে স্নান এবং কঠোর ব্রত পালন করলেন। সুদীর্ঘকাল তপস্যার পর দেবাদিদেব মহাদেব এসে অম্বাকে দর্শন দিলেন। মহাদেব বরদান করতে চাইলে অম্বা ভীষ্মকে যুদ্ধে বধ করার বর প্রার্থনা করলেন। মহাদেব অম্বাকে সেই বর দান করলেন। তখন অম্বা জিজ্ঞাসা করলেন—আমি স্ত্রীলোক হয়ে কীভাবে ভীষ্মকে যুদ্ধে পরাজিত করব? মহাদেব বললেন—তুমি

অন্য দেহ লাভ করে পুরুষত্ব লাভ করবে এবং এই জন্মের সমস্ত ঘটনাই তোমার স্মরণে থাকবে। সেই জন্মে তুমি মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা হবে এবং ভীষ্মকে যুদ্ধে বধ করবে। মহাদেবের বর লাভ করে অম্বা যমুনাতীরে চিতা নির্মাণ করে 'আমি ভীষ্মকে বধ করার জনাই দেহত্যাগ করছি' এই কথা বলে অগ্নিতে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করলেন।

পরজন্মে অম্বা দ্রুপদরাজার গৃহে শিখণ্ডী রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। এই পরজন্মটা অবশ্য নিজেকে পৌরুষেয় বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা, না-কি এটা **trans-sexualism** এর উদাহরণ, সেটা নিয়ে এখনও তর্ক চলছে। *[দ্র. সূণাকর্ণ]*

[মহা(k) ৫.১৭৫.২৫-৪৫; ১৭৬-১৮৭ অধ্যায়;
(হরি) ৫.১৬৩.২৬-৪৬; ১৬৪-১৭৭ অধ্যায়]

অম্বা$_২$ একটি নদীর নাম। কথিত আছে, ভীষ্মবধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প অম্বা কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলে নদীশ্রেষ্ঠা ভীষ্মজননী গঙ্গা তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে অম্বাকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হবার পরামর্শ দেন। কিন্তু অম্বা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তা দেখে গঙ্গা বললেন—তুমি যদি ভীষ্মবধের জন্য তপস্যা করতে থাক এবং এই ব্রতে থেকেই যদি তুমি দেহত্যাগ কর, তাহলে তুমি একটি কুটিলা নদী হবে। সেই নদীতে শুধুমাত্র বর্ষাকালেই জল থাকবে, ভয়ঙ্কর জলজন্তু সমূহ থাকার ফলে তুমি সব প্রাণীর ভয়ের কারণ হবে এবং একটি মন্দতীর্থ বলে গণ্য হবে। এরপর অম্বা যখন বৎসদেশে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন তখন তাঁর দেহের অর্ধাংশ থেকে অম্বা নদীর সৃষ্টি হল। শুধুমাত্র বর্ষাকালে জলবাহিনী, বক্রগতি, জলজন্তুপূর্ণ এই নদী মন্দতীর্থ বলে প্রসিদ্ধ—

সা নদী বৎসভূম্যান্তু প্রথিতাম্বেতি ভারত।
বার্ষিকী গ্রাহবহুলা দুস্তীর্থা কুটিলা তথা॥

[মহা(k) ৫.১৮৬.৪০; (হরি) ৫.১৭৬.৪০]

হয়তো অম্বানদীর প্রকৃতি লক্ষ্য করেই কবি তার এমন বর্ণনা দিয়েছেন।

বর্তমান মহারাষ্ট্রে, পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে অম্বা নদীর উৎপত্তি। তারপর এই নদী বক্রগতিতে ১৪০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে **Bombay Harbour**-এ গিয়ে মিশেছে। মূলত বর্ষাকালে এই নদীতে জল থাকে। এই নদী এবং এর উপনদী পাতালগঙ্গা মূলত পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল ও নগরীর বর্জ্যপদার্থ এবং জল বহন করে। ফলে এই নদীর জল দূষিত এবং ব্যবহারের অযোগ্য।

[মহা(k) ৫.১৮৬.৩০-৩৮, ৪০;
(হরি) ৫.১৭৬.৩০-৩৭.৪০;
Indian Journal of Marine Sciences, Vol.20,
September 1991, Page 212-215]

অম্বা$_৩$ জন্মদাত্রী মাতার অন্যতম প্রতিশব্দ। সন্তানের অঙ্গবর্ধন করেন বলে মাতাকে অম্বা বলা হয়েছে—

কুক্ষিসংধারণাদ্ ধাত্রী জননাজ্জননী স্মৃতা।
অঙ্গানাং বর্ধনাদ্ অম্বা বীরসূত্বেন বীরসূঃ॥

[মহা(k) ১২.২৬৬.৩২; (হরি) ১২.২৬০.৩২]

অম্বা$_৪$ এটি সাধারণ মাতৃবাচক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও রূঢ়ভাবে জগদম্বা দুর্গাকে বোঝায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবতাদের দেবীস্তুতিতে—সমস্ত জগতেই এই অম্বা ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং তিনিই স্তব্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এরকম বলা হয়েছে—

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ/
কা তে স্তুতিঃস্তব্যপরা পরোক্তিঃ।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৯১.৫]

অন্য একটি শ্লোকে যেখানে দুর্গার মাহাত্ম্য শুনে সুরথ রাজা দুর্গাপূজার আয়োজন করছেন, সেখানে "দুর্গার দর্শন পাওয়ার জন্য"—এই কথাটি অম্বা শব্দের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে—

সন্দর্শনার্থম্ অম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৯৩.৬]

অম্বালিকা কাশীরাজকন্যা, কাশীরাজের তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা ছিলেন অম্বালিকা। ভীষ্ম কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দেবার জন্য কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে তাঁদের স্বয়ংবর সভা থেকে হরণ করে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন। জ্যেষ্ঠা কাশীরাজকন্যা অম্বা বিচিত্রবীর্যকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও অম্বিকা এবং অম্বালিকা সানন্দে বিচিত্রবীর্যকেই পতিরূপে বরণ করেন। হস্তিনাপুর রাজভবনে দুই রাজকন্যার সঙ্গে মহাসমারোহে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হয়। *[মহা(k) ১.১০২.৬৫-৭০;*
(হরি) ১.৯৬.৬৫-৭০]

☐ বিবাহের সাত বছর পর যক্ষ্মারোগে

আক্রান্ত হয়ে বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মাতা সত্যবতী পুত্রবধূদের গর্ভে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য মহর্ষি ব্যাসকে নিযুক্ত করলেন। দুই পুত্রবধূদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বিকা নিজের দোষেই এক জন্মান্ধ পুত্রসন্তানের জন্ম দেবেন—ব্যাসের মুখে একথা শুনে সত্যবতী চিন্তিত হলেন। কারণ অন্ধ ব্যক্তি রাজা হবার উপযুক্ত নয়। তাই কুরুবংশের ভাবী রাজাকে জন্মদান করার দায়িত্ব বর্তাল অম্বালিকার উপর। সত্যবতী অম্বিকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সেজন্য সচেতনভাবে বোধহয় আগে থেকেই অম্বালিকাকে উপদেশ দিয়ে থাকবেন। ফলে মহর্ষি ব্যাসের সামনে অম্বালিকা চোখ বন্ধ করলেন না ঠিকই, তবে তাঁর বিকটরূপ দেখে তিনি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন। ব্যাস বললেন—তুমি যখন আমার বিকটাকৃতি দেখে পাণ্ডু বা বিবর্ণ রূপ ধারণ করেছ তখন তোমার গর্ভজাত সন্তানও পাণ্ডুবর্ণই হবে—

যস্মাৎ পাণ্ডুত্বমাপন্না বিরূপং প্রেক্ষ্য মামসি।
তস্মাদেষ সুতস্তে বৈ পাণ্ডুরেব ভবিষ্যতি।

[মহা (k) ১.১০৬.১৪-১৮;
(হরি) ১.১০০.১৪-১৮; বিষ্ণু পু. ৪.২০-১০]

এইভাবে অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু রাজা জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সত্যবতী মহর্ষি ব্যাসের উপদেশে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। এই সময় অম্বিকা এবং অম্বালিকাও সত্যবতীর সঙ্গে বনে গমন করেন।

[মহা (k) ১.১২৮.১০-১২;
(হরি) ১.১২২.১০-১২]

অম্বিকা১ কাশীরাজকন্যা, কাশীরাজের তিন কন্যার মধ্যে ইনি ছিলেন দ্বিতীয়া। ভীষ্ম কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেবার জন্য কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে তাঁদের স্বয়ংবর সভা থেকে হরণ করে আনেন। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা বিচিত্রবীর্য্যকে স্বামী রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও অম্বিকা বিচিত্রবীর্য্যকেই স্বামী হিসেবে মেনে নেন। হস্তিনাপুর রাজভবনে মহাসমারোহে বিচিত্রবীর্য্যের সঙ্গে অম্বিকা এবং অম্বালিকার বিবাহ হয়। *[মহা (k) ১.১০২.৬৫-৭০;*
(হরি) ১.৯৬.৬৫-৭০]

□ বিবাহের সাত বছর পর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। সত্যবতী প্রথমে অম্বিকা অম্বালিকার গর্ভে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করার জন্য শান্তনুরাজার জ্যেষ্ঠপুত্র তথা বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভীষ্মকে অনুরোধ করলেন। ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সুতরাং তিনি একাজে সম্মত হলেন না। তখন সত্যবতী নিজের কানীনপুত্র মহর্ষি পরাশরের ঔরসজাত ব্যাসদেবকে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ব্যাসদেব সেই প্রস্তাব শুনে মাতা সত্যবতীকে বললেন—মা, যদি রানী অম্বিকা আমার বিকৃতরূপ সহ্য করতে পারেন তবে তাঁর গর্ভে উৎকৃষ্ট রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করবে। সত্যবতী অম্বিকাকে বললেন যে, তাঁর কোনো দেবর আছেন, যিনি তাঁর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজপুত্র উৎপাদন করবেন। অম্বিকা নিজের শয়নকক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যথাসময়ে উগ্রতপস্বী ব্যাস অম্বিকার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। কিন্তু মহর্ষির সেই উজ্জ্বল চক্ষু, পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী বিকট রূপ অম্বিকা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ভয়ে চোখ বন্ধ করে রইলেন। মহর্ষি ব্যাস সত্যবতীকে জানালেন—মাতার এই দোষের কারণে অম্বিকার গর্ভজাত পুত্র রূপগুণে অতুলনীয়, বলবান হলেও জন্মান্ধ হবে—

কিন্তু মাতুঃ স বৈগুণ্যাদন্ধ এব ভবিষ্যতি।

যথাসময়ে অম্বিকা পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। জন্মান্ধ এই পুত্রের নাম হল ধৃতরাষ্ট্র।

[মহা (k) ১.১০৫.৪৪-৫২; ১.১০৬.১-১০;
(হরি) ১.৯৯.৪৪-৫২; ১.১০০.১-১০;
ভাগবত পু. ৯.২২.২৪; বিষ্ণু পু. ৪.২০.১০]

□ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্রের মনে রাজ্যলোভ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল এবং দুর্যোধন সেই সুযোগে আরও অন্যায় করতে লাগলেন। রাজবাড়ির এই পরিস্থিতি যিনি বুঝেছিলেন, সেই মহর্ষি ব্যাসের উপদেশে সত্যবতী রাজভবন ত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। বানপ্রস্থে যাবার আগে সত্যবতী অন্দরমহলে এসে পুত্রবধূ অম্বিকার উদ্দেশে বলেন—তোমার পুত্রের জন্যই একদিন ধ্বংস হবে এই কুরুকুল। অতএব ধ্বংস না দেখে আমার সঙ্গে বানপ্রস্থে চলো তুমি। অম্বিকা সত্যবতীর এই আদেশ মেনে

নিয়েছিলেন। এই সময় অম্বালিকাও তাঁর সঙ্গে বনে গমন করেন। *[মহা (k) ১.১২৮.১০-১২; (হরি) ১.১২২.১০-১২]*

অম্বিকা$_{২}$ একজন অপ্সরা। অর্জুনের জন্মোৎসবে যেসব অপ্সরা নৃত্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অম্বিকা।

[মহা (k) ১.১২৩.৬২; (হরি) ১.১১৭.৬৬]

অম্বিকা$_{৩}$ দেবী শক্তি তথা জগন্মাতা পার্বতী অম্বিকা নামেও কীর্তিত হয়ে থাকেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে যে দেবী অম্বিকার নাম স্মরণ বা উচ্চারণ মাত্রেও মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়। পুরাণেও বহুবার দেবী পার্বতীকে অম্বিকা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অম্বা শব্দের সাধারণ অর্থও যেহেতু জননী বা মাতা তাই অম্বা শব্দের সঙ্গের স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অম্বিকা শব্দটিও একই অর্থ বহন করে। *[দ্র. অম্বা$_{৪}$]*

[মহা (k) ১৩.১৫০.২৮; (হরি) ১৩.১২৮.২৭]

তবে মহাভারত-পুরাণে অম্বিকা যতই পার্বতী-দুর্গার একাত্মক হয়ে উঠুন না কেন, প্রাচীনতর বেদ-ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে অম্বিকা কিন্তু রুদ্র-শিবের স্ত্রী নন, তিনি রুদ্রের ভগিনী—স্বসা। শুক্ল যজুর্বেদ অর্থাৎ বাজসনেয়ী সংহিতায় বলা হয়েছে—হে রুদ্র! এই তোমার যজ্ঞভাগ। তুমি তোমার ভগিনী অম্বিকার সঙ্গে এই ভাগ গ্রহণ করো—

এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রা অম্বিকয়া তংজুষস্ব।
অব রুদ্র মহীমহ্যব দেবং ত্র্যম্বকম্।

শুক্ল যজুর্বেদের পাশে কৃষ্ণ যজুর্বেদের দৃষ্টান্ত রাখলে প্রায় সমান মর্মের একটি মন্ত্র পাওয়া যায়। সেখানেও অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী এবং তাঁর সঙ্গেই রুদ্রকে তাঁর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে—

জুষস্বৈষতে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রা
অম্বিকয়া তং জুষস্ব।

এই মন্ত্রের শেষ পর্যায়ে রুদ্রকে শিব বলে বেশ চেনা যায়, কেননা এখানে তিনি স্পষ্টভাবেই 'পিনাকহস্তঃ কৃত্তিবাসাঃ' বলে অভিমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু অম্বিকা এখানে স্পষ্টভাবেই তাঁর ভগিনীর নাম এবং তিনি ভ্রাতার রুদ্রোচিত ধ্বংসকার্যে সহায়তা করছেন; সে সহায়তা এতটাই যে, রুদ্রের যজ্ঞভাগের সহভোক্তা অম্বিকা। লক্ষণীয়, শতপথ ব্রাহ্মণে বাজসনেয়ী সংহিতার রুদ্র এবং অম্বিকার উদ্দেশে ভাগকল্পনার অংশটি উদ্ধৃত করে বলেছে—অম্বিকা হলেন রুদ্রের ভগিনী আর সেইজন্যই তিনি ত্র্যম্বকা নামে খ্যাত—

অম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বসা, তয়া সৈব সহ ভাগস্তদ্
যদস্যৈষ স্ত্রিয়া সহ ভাগস্তস্মাৎ ত্র্যম্বকা নাম।

বস্তুত শতপথ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যায় অম্বিকাকে 'ত্র্যম্বকা' সম্বোধন করার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ভগিনী-সম্বন্ধটি ত্র্যম্বক-শিবের স্ত্রী-সম্বন্ধে পর্যবসিত হয়। বিশেষত একত্রে সহ-ভাগ গ্রহণের কল্পনা এবং পূর্বে ত্র্যম্বক-রুদ্রের সঙ্গে অম্বিকার সহকারিত্ব, ধ্বংস-প্রলয়-সাধনে রুদ্র-ধর্ম, রুদ্র-স্বভাবের সঙ্গে অম্বিকার সহচারিত্ব—এই 'সহত্ব' ব্যাপারটাই অম্বিকাকে ত্র্যম্বক-শিবের স্ত্রীলিঙ্গ 'ত্র্যম্বকা'-য় পরিণত করেছে, যাঁর দূরগন্ধ ভেসে আসবে ভবিষ্যতে—

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো'স্তুতে।
—এই চণ্ডীস্তুতির মধ্যে।

অম্বক-শব্দের সাধারণ অর্থ চক্ষু। ত্র্যম্বক বা ত্রি-অম্বক বলতে শিব-মহাদেবকেই বোঝায়-ত্রি-অম্বকং সংযমিনং দদর্শ। কেননা শিব ত্রিনয়ন। আবার সেই অর্থে দুর্গাও ত্রিনয়নী অর্থাৎ ত্র্যম্বকা। দেখার বিষয় এটাই যে, শুক্লযর্জুবেদের ব্যাখ্যায় টীকাকার মহীধর বলেছেন—অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী—এটাই শ্রুতি থেকে প্রমাণিত হয়—

অম্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যোক্তম্।

কিন্তু ওই একই মন্ত্রের টীকায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী টীকাকার সায়নাচার্য কৃষ্ণযজুর্বেদের ভাষ্যে লিখেছেন—অম্বিকা হলেন পার্বতী। তুমি পার্বতীর সঙ্গে নিজের অংশ গ্রহণ করো—

অম্বিকয়া পার্বত্যা সহ অংশ জুষস্ব সেবস্ব।

অম্বিকা যে এইভাবে রুদ্রের ভগিনী থেকে রুদ্রপত্নী রুদ্রাণী ত্র্যম্বকা হয়ে উঠলেন, সেখানে দুয়ের মধ্যে সাধর্ম্যের একটা common factor কাজ করছে। রুদ্র শিব যেমন ধ্বংসের প্রতীক তেমনই পুরাণগুলিতে দুর্গা, চণ্ডী, পার্বতীও অসুরদলনী, মহিষাসুরমর্দিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভ বিনাশিনী অর্থাৎ তিনিও ধ্বংসের প্রতীক। ফলত বৈদিককালে নিজেই যিনি রুদ্রের ধ্বংস সহায়িনী ভগিনী ছিলেন, সেই অম্বিকা রুদ্রের সহধর্মিনী শক্তিদেবতা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। অর্থাৎ রুদ্রাণী, শিবানী, ভবানী,

দুর্গার মতো মহাশক্তি দেবতার সঙ্গে ত্র্যম্বকা এবং অম্বিকা একাকার হয়ে গেলেন।

[শুক্লযজুর্বেদ (হরফ) ৩.৫৭-৫৮, পৃ. ২১; কৃষ্ণযজুর্বেদ (হরফ), ১.১.৮.৬, পৃ. ৩৫৪; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ২.৬.২.৯, পৃ. ১৯৬; মার্কণ্ডেয় পু. ৯১.৯]

অম্বিকাতীর্থ একটি পবিত্র নদী-তীর্থ। দেবী অম্বিকার মাহাত্ম্যধন্য এই পবিত্র স্থানটিতে রুচিকেশ্বর মন্দির অবস্থিত। এখানে নদীর জল পবিত্র ও স্বচ্ছ। *[লিঙ্গ পু. ১.৯২.১৬৬-১৬৭]*

অম্বিকাবন সরস্বতী নদীর তীরবর্তী একটি বন। ভগবান শিব এবং অম্বিকাদেবী এখানে পূজিত হন। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত উরগ নামে এক সর্প এই বনেই কৃষ্ণের পাদস্পর্শে শাপমুক্ত হয়ে তার সুদর্শনরূপ পুনরায় ফিরে পেয়েছিল।

[ভাগবত পু. ১০.৩৪.১-১৮]

☐ বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী তাঁর বিবাহের প্রাক্কালে অম্বিকাবনে গিয়ে সেখানে ঈশ্বরের আরাধনা করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৫৩.৩৯]*

অম্বিকেয় পৌরাণিক শাকদ্বীপের একটি দুর্গম ও হিমময় পর্বত। এর আরেক নাম সুমনা। বরাহদেব দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে অম্বিকেয় পর্বতেই হত্যা করেছিলেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৮৯; মৎস্য পু. ১২২.১৬-১৭]*

বায়ুপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে যথাক্রমে আম্বিকেয় ও আঙ্কিকেয় বলে দুটি পাঠ পাওয়া যায়।

[বায়ু পু. ৯.৮৪; বিষ্ণু পু. ২.৪.৬২]

অম্বুক পিশাচী ব্রহ্মধনার গর্ভজাত একজন রাক্ষস।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৯৮]

অম্বুঘটশ্রাদ্ধ পিতার মৃত্যু হলে যে শ্রাদ্ধে একবছর পর্যন্ত পিণ্ডদান করতে হয় এবং প্রতিদিন প্রেতধর্ম্ম অনুসারে এক বছর পর্যন্ত যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তা অম্বুঘট শ্রাদ্ধ নামে খ্যাত।

[কূর্ম পু. ২.২৩.৮৯]

অম্বুজাল শিবসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত ভগবান শিবের একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অম্বুজালঃ জলসমূহঃ সাগর ইত্যর্থঃ।

'অম্বু' অর্থাৎ জল। জল বলতে এক্ষেত্রে নীলকণ্ঠ যেমন মহাদেবের সাগর স্বরূপতার কথা বলেছেন, তেমনই ভাবা দরকার যে, অম্বু বা জল (অপ্) হল পঞ্চভূতের একতর। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ সংসার নির্মিত। পঞ্চভূতের একতর অপ্ বা জলের স্বরূপ বললেও জলেরই অন্যতর পর্যায়শব্দ অম্বুজাল ভগবান শিবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে।

বায়ু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা ভগবান শিবকে ভব, ঈশ ইত্যাদি আটটি নাম প্রদান করেন। এই আটটি নামের আটটি মূর্তি আছে। 'ভব' দেবের মূর্তির অপর নাম অপ বা জল। ভগবান রুদ্র এই মূর্তিতে জল রূপে অবস্থান করেন—

তদ্বিবেশ ততস্তোয়ং তস্মাদাপো ভবঃ স্মৃতঃ।

সৃষ্টির আদিতে জলের উৎপত্তি ঘটেছিল। ভব মানে সৃষ্টি এবং বিধাতার প্রথম বা আদি সৃষ্টি জল—আপো এব সসর্জাদৌ—মহাদেবও আদিদেব। সেই কারণে পুরাণগুলিতে ভব-এর সঙ্গে জলের ভাবনা মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। এই ভাবনা থেকে মহাদেব যেমন আপ নামে খ্যাত, তেমনই তিনি অম্বুজাল নামেও খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯৭; (হরি) ১৩.১৬.৯৭]

অম্বুধারা ভবিষ্যৎ নবম মন্বন্তরে যখন দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় ভগবান বিষ্ণু ঋষভ নামে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। ভগবান ঋষভের পিতা হবেন আয়ুষ্মান, মাতা অম্বুধারা।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.২০]

অম্বুবাচী সাধারণ্যে প্রচলিত ব্রত। দেবীভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে—অম্বুবাচীর দিনগুলিতে কোনোভাবে ভূ-খনন করবে না অর্থাৎ মাটি খোঁড়া চলবে না। জলের শৌচ বারণ। যারা এই দিনে ভূমি খনন করবে, তাদের ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে—

অম্বুবাচ্যাং ভূখননং জলশৌচাদিকঞ্চ যে।
কুর্বন্তি ভারতে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥

[দেবীভাগবত পু. ৯.৩৪.৪৮]

☐ সাধারণত বাংলাদেশে ৭ই আষাঢ় থেকে তিন দিন, উড়িষ্যায় জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তি থেকে তিন দিন, আবার কোথাও আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে ১০ তারিখ থেকে তিন/চারদিন অম্বুবাচী ব্রত চলে। বাঙালি হিন্দু-বিধবার কাছে অম্বুবাচীর দিনগুলি যে কী ভয়ংকর ব্রত-কর্ষিত কৃচ্ছ্রসাধনে পালিত হত, তা বর্ণনীয় নয়। পরমাশ্চর্যের ব্যাপার হল—বিখ্যাত স্মৃতি শাস্ত্রকারেরা, যাঁরা ব্রতোপবাসের বিধান দেন,

তাঁরাও এই তিন দিনের জন্য বিধবা রমণীদের কোনো ব্রত-নিয়ম উপবাসের বিধান দেননি। অথচ বঙ্গদেশে হিন্দু বিধবাদের কাছে এটি অবশ্য পালনীয় ব্রত হিসেবে পরিচিত ছিল। কোনো দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি পঞ্জিকার মধ্যে সংস্কৃতে লেখা একটি ভুয়ো চলতি শ্লোক ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন অনেক কাল আগে। তাতে লেখা আছে—যতি (সংযমী), ব্রতধারী, বিধবা এবং বামুনরা অম্বুবাচীর দিনে রান্না করে খাবেন না। নিজের বাড়িই হোক অথবা অন্য বাড়ি, কোনো বাড়ির রান্না তাঁরা খাবেন না। খেলে সেটা চণ্ডালের দেওয়া খাবার বলে গণ্য হবে—

যতিনো ব্রতিনশ্চৈব বিধবা চ দ্বিজস্তথা।
অম্বুবাচীদিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ॥
স্বপাকং পরপাকং বা অম্বুবাচী দিনে তথা।
ভোজনং নৈব কর্তব্যং চণ্ডালান্নময়ং ধ্রুবম্॥

এই সংস্কৃত শ্লোকের না আছে কোনো উৎস, না আছে কোনো ভিত্তি। অথচ এই শ্লোকের প্রমাণেই তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা কী নিদান ধরলেন, জানি না, এই শ্লোকের চরম প্রভাব পড়েছে অবুঝ বিধবাদের ওপর। অম্বুবাচীর তিন দিন বিধবারা রাঁধেন না, বাড়েন না, উনুন ধরান না, আগুনে তৈরি রান্নাও খান না। বিধবারা অনেকে আবার অম্বুবাচীর আগে তৈরি রুটি-লুচি কিংবা খই-চিঁড়ে খেয়ে থাকেন। অনেকে সারাদিন না খেয়ে সন্ধ্যায় ফলমূল খান। এইরকম কৃচ্ছ্রসাধনে বিধবাদের দিন কাটে অম্বুবাচীতে। অন্তত এই বঙ্গদেশে এই নিয়মের কড়াকড়ি ছিল। অথচ কোনো খ্যাত-অখ্যাত স্মার্ত গ্রন্থ এই সময়ে বিধবা-সধবার কোনো কৃত্যের উল্লেখ করেনি।

☐ অম্বুবাচী যেহেতু বর্ষা আরম্ভের প্রথম কতগুলি দিন, তাই এই দিনগুলিতে বাংলার চাষীদের কাছে নিবেদন ছিল—তাঁরা যেন এই সময় মাটি না কোপান, চাষ না করেন অর্থাৎ এই তিন দিন তাঁদের ছুটি। অম্বুবাচীতে পৃথিবী নাকি রজস্বলা হন। এই সময়ে কামরূপ কামাখ্যার মেলা, উড়িষ্যায় রজ উৎসব। পণ্ডিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে, প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে অম্বুবাচীর দিনগুলিতে চাষবাস বন্ধ রাখারই নিয়ম-বিধান পাওয়া যায়, বিধবা কিংবা বামুনদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি লিখেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রখ্যাত স্মৃতি শাস্ত্রকারেরা, যেমন বৃহস্পতি রায়মুকুট, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, গোবিন্দানন্দ কবি-কঙ্কনাচার্য, রঘুনন্দন এবং উড়িষ্যার গদাধর —এঁরা প্রত্যেকেই প্রাচীন প্রমাণ উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, অম্বুবাচীর দিনে হলকর্ষণ, বীজবপন, ভূখনন নিষিদ্ধ অর্থাৎ চাষবাসের কাজ বন্ধ, চাষীর ছুটি। এ বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ আছে বৃহস্পতি রায়মুকুটের লেখা স্মৃতি রত্নহারে। তিনি বলেছেন—এই সময়ে ভূমিকর্ষণ কিংবা বীজ বপনের কাজ করা চলবে না—

তত্র কর্ষণবীজবপনাদিকং ন কার্যম্।

শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি এই সূত্র ধরে লিখেছেন—

তত্র ভূকর্ষণবীজবপনাদি ন কর্তব্যম্।
. . . এতদ্দিনত্রয়ং যাবদ্ বেদো'পিনাধ্যেয়ঃ . . .
তথা আর্দ্রাম্বুরবৌ সকৃদবশ্যং
পার্বণবিধিনা শ্রাদ্ধং কার্যম্।
মৃগর্ক্ষে'র্কে নিদাঘস্য তন্মধ্যে'পি দিনত্রয়ম্।
রজস্বলা স্যাৎ পৃথিবী কৃষিকর্মবিগর্হিতা॥

[গদাধর পদ্ধতির অন্তর্গত কালসার,
এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ, পৃ. ৫৮৪;
স্মৃতিরত্নহার, এশিয়াটি সোসাইটির পুঁথি-পত্র, ১০৩খ;
শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি-কৃত কৃত্যতত্ত্বার্ণব, এশিয়াটিক
সোসাইটির পুঁথিপত্র, ৪১;
দ্র. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান,
পৃ. ৯৭-৯৯]

এইরকম একটা মত অবশ্য এখনো চালু আছে যে অম্বুবাচীর সময়ে ধরণী নাকি অপবিত্রা হন, তিনি নাকি রজস্বলা হন এই সময়ে। কামাখ্যাতেও নাকি মহাদেবীর ভূস্বরূপতায় রজোভাবনার চিন্তা করা হয় এই সময়ে। সম্ভবত বাঙালীর স্মৃতিকার রঘুনন্দনেরও আগে এই মত প্রচলিত ছিল। যার জন্য রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী স্মৃতিকার গোবিন্দানন্দ প্রতিবাদ করে বলছেন— আধুনিকেরা বলেন—এই সময়ে পৃথিবী অপবিত্রা হন। কিন্তু তা হতেই পারে না। বস্তুত পৃথিবীই যদি অশুদ্ধা হতেন, তাহলে সর্বত্রই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যেত—তা তো হয় না—

ভূমেরশুদ্ধি কুতঃ? অন্যথা ভোজন-দেবার্চন-পঞ্চমহাযজ্ঞা দীনামপি নিষেধ প্রসঙ্গঃ।

[বর্ষক্রিয়া কৌমুদী, পৃ. ২৮৪;
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, তদেব পৃ. ৯৮, পাদটীকা ৩]

অম্বুবাহিনী মহাভারতে উল্লিখিত একটি নদী। তবে এটির নাম অম্বুবাহিনী না মধুবাহিনী তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। যদিও মহাভারতের শ্লোকে 'অম্বুবাহিনী' নামটিই পাওয়া যায়, কিন্তু পণ্ডিত H.H. Wilson তাঁর বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয় ভাগে যেখানে মহাভারতের জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ অংশে বিভিন্ন নদীর কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি 'মধুবাহিনী' নামটিই গ্রহণ করেছেন। যা থেকে বোঝা যায় অম্বুবাহিনী ও মধুবাহিনী নদী অভিন্ন। আবার একথাও ঠিক যে, ভীষ্মপর্বে অম্বুবাহিনী নদীর নাম যেখানে উচ্চারিত হয়েছে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বেন্না বা মহানদী ইত্যাদি নদীর নাম খুঁজে পাওয়া যায়। নদীর নামের এই শ্লোকভিত্তিক বিন্যাস থেকে ধারণা হয় অম্বুবাহিনী মধ্য-দক্ষিণ ভারতের একটি নদী। *[মহা (k) ৬.৯.২৭; ১৩.১৬৫.২০; (হরি) ৬.৯.২৭; ১৩.১৪৩.২০; The Vishnupurana; H.H. Wilson; Vol. 2; p. 150]*

☐ পণ্ডিত প্রণব কুমার ভট্টাচার্যের মতে, মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত আধুনিক মধুবেনী নদীটিই প্রাচীন মধুবাহিনী। মধ্যপ্রদেশের শিবপুর জেলার মধ্যে দিয়ে মধুবেনী নদীটি বর্তমানে প্রবাহিত। *[HGM (P.K. Bhattacharya) p. 112]*

☐ তবে কেরালার আধুনিক মাল্লাম নদীটির নামও মধুবাহিনী ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু কেরালার মাল্লামের তুলনায় মহাভারত কথিত অম্বুবাহিনীর সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের মধুবেনীর মিল থাকা অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ। *[S. Jayashankar, Temples of Kasaragod District, p. 163]*

অম্বুবীচ দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাঞ্চাল দ্রুপদকে মিত্রগোষ্ঠীতে লাভ করে পাণ্ডবদের যখন শক্তিবৃদ্ধি ঘটল, তখন পাণ্ডবদের কীভাবে হীনবল করা যায়, সেই প্রস্তাব নিয়ে যখন দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করছেন, তখন দ্রোণ দুষ্ট মন্ত্রীদের দুর্মন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অম্বুবীচ নামে এক রাজার প্রাচীনকল্প উল্লেখ করেন। ধৃতরাষ্ট্র চক্ষুহীনতার জন্য রাজা হতে পারেননি, অথচ তিনি দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণ-শকুনির ওপর নির্ভর করে একভাবে রাজত্ব উপভোগ করেন। ঠিক এই প্রসঙ্গেই দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন— মগধ দেশে রাজগৃহ-নগরে অম্বুবীচ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর শরীরে শক্তি ছিল অনেক, কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয় ছিল না তাঁর। তিনি শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারতেন বলেই রাজা হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত কাজই ছিল মন্ত্রী-নির্ভর। মহাকর্ণি নামে তাঁর এক মন্ত্রী অম্বুবীচের রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। রাজার স্ত্রী থেকে আরম্ভ করে রাজার জন্য নির্দিষ্ট ধন, রত্ন, সৈন্য, বাহন সব তিনিই আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁর লোভ এতটাই বেড়ে গেল যে, এবার তিনি রাজার রাজ্যটাও আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তা পারলেন না। প্রাণমাত্র-সার রাজার কপালে তবু রাজ্যটা লেখা ছিল। দ্রোণাচার্য বোঝাতে চাইলেন—ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থাটাও এই অম্বুবীচের মতো। রাজ্যলাভটা তাঁর কপালে রয়েছে বলেই রাজ্যটা এখনও তাঁর দখলে আছে, হয়তো বা তা থাকবেও। কিন্তু মন্ত্রী-নির্ভর হলে সেটাও থাকবে না—যদি তে বিহিতং রাজ্যং ভবিষ্যতি বিশাম্পতে। কাজেই মন্ত্রী-নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্রের আরও সাবধান হওয়া উচিত। *[মহা (k) ১.২০৪, ১৭-২৫; (হরি) ১.১৯৭.১৭-২৫]*

অম্বুমতী মহাভারতের বনপর্বে ভীষ্মের কাছে পুলস্ত্যের তীর্থ-বর্ণনা প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে অম্বুমতীর কথা বলা হয়েছে। এটাকে নদী বলা যায়, নাকি স্থলতীর্থ বলা যায়, সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে এবং পণ্ডিতজনেরা এর কোনো আধুনিক পর্যায়-শব্দও নির্দেশ করতে পারেননি। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ পরবর্তী শ্লোকে 'কাশীশ্বর' শব্দের প্রয়োগ দেখে এটাকে 'মণি-কর্ণিকার' বলেছেন। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক নয়। আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মাবর্ত-কুরুক্ষেত্র ছাড়িয়ে কোনো একটি জলবহুলা নদীকেই অম্বুমতী তীর্থ বলে বলা হয়েছে। *[মহা (k) ৩.৮৩.৫৬; (হরি) ৩.৬৮.৫৬]*

অম্ভোনিধি বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৮; (হরি) ১৩.১২৭.৬৮]*

অম্ভোরুহ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ১৩.৪.৫৯; (হরি) ১৩.৩.৭৮]*

অম্লুনদী বামন পুরাণে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পুণ্যতোয়া নদী হিসেবে অম্লুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই নদীকে পবিত্র তীর্থ বলে উল্লেখ করে

বামন পুরাণ জানিয়েছে যে এই নদীতে স্নান করলে সমস্ত পাপ নাশ হয়। এই নদীতে শুধুমাত্র বর্ষাকালেই জল থাকে বলে বামনপুরাণে উল্লেখ আছে। *[বামন পু. ৩৪.৭-৮]*

অয়ঃকণপ খুব প্রচলিত অস্ত্র নয়। বরঞ্চ এটাকে অস্ত্র নিক্ষেপ করার একটি বিশেষ যন্ত্র বলা যেতে পারে। শব্দার্থ চিন্তা করে টীকাকার নীলকণ্ঠ এই অস্ত্রের প্রকার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—অয়ঃকণ শব্দের অর্থ হল লোহার গুলি, সেই লোহার গুলি যেন পান করতে পারে এমন যন্ত্র। অর্থাৎ এমন এক ধরনের লৌহযন্ত্র যার মধ্যে থেকে বস্তুকণা দিয়ে তৈরি গুলি আগুনের শক্তিতে বেরিয়ে আসে এবং তারার মতো চারদিকে বিকীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে—

অয়ঃকণান্ লোহগুলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধম্ আগ্নেয়ৌষধ-বলেন গর্ভসম্ভূতা লোহগুলিকাঃ তারকা ইব বিকীর্য্যন্তে যেন তৎযন্ত্রম্ অয়ঃকণপং লোহময়ম্। 'কণপ' শব্দটাকে কেউ কেউ 'iron projectile' বলেছেন।

[মহা (k) ১.২২৭.১৫; (হরি) ১.২২০.২৫]

অয়ঃপান একটি নরকের নাম। হয়তো গলিত লৌহ (অয়ঃ) ঢেলে দেওয়া বা গলায় লোহা ঢুকিয়ে দেবার মতো অতি ভয়ঙ্কর শাস্তি এই নরকের বৈশিষ্ট্য। *[ভাগবত পু. ৫.২৬.৭]*

অয়ঃশঙ্কু$_১$ আদিপিতা কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে যে চল্লিশ জন অসুরের জন্ম হয়েছিল, তাঁদের অন্যতম। পাণ্ডব-কৌরবদের কালে তাঁরই অংশে জন্ম নেন কেকয় দেশের এক রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ নামক উপপর্বে প্রাচীন কল্পের যে পাঁচ অসুর কেকয় দেশে রাজা হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অসুর।

[মহা (k) ১.৬৫.২৩; ১.৬৭.১০-১১;
(হরি) ১.৬০.২৩; ১.৬২.১০-১১]

অয়ঃশঙ্কু$_২$ দৈত্যরাজ বলির অনুগত এক অসুরবীর।

[মৎস্য পু. ২৪৫.৩১]

অয়ঃশিরস্$_১$ (অয়ঃশিরা) আদি পিতা কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে যে চল্লিশ জন অসুরের জন্ম হয়েছিল, তাঁদের অন্যতম। পাণ্ডব-কৌরবদের কালে তাঁরই অংশে জন্ম নেন কেকয় দেশের এক রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ নামক উপপর্বে প্রাচীন কল্পের যে পাঁচ অসুর কেকয় দেশের রাজা হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁদের অন্যতম অসুর।

[মহা ১.৬৫.২৩; ১.৬৭.১০-১১;
(হরি) ১.৬০.২৩; ১.৬২.১০-১১;
কালিকা পু. ৩৪.৫৩]

অয়ঃশিরস্$_২$ (অয়ঃশিরা) দৈত্যরাজ বলির অনুগত অন্যতম অসুরবীর। *[মৎস্য পু. ২৪৫.৩১]*

অয়$_১$ মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র। ইনি স্বারোচিষ মন্বন্তরে অন্যতম প্রজাপতি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ৯.৯]

অয়$_২$ বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভজাত যে ছয় পুত্র কংসের হাতে নিহত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অয়। *[বায়ু পু. ৯৬.১৭৩]*

অয়$_৩$ অগস্ত্য বংশীয় জনৈক ঋষি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৯-১২০]

অয়$_৪$ শিব পুরাণে আমরা অষ্টবসুর নামের যে তালিকা পাই সেই তালিকা অনুযায়ী অষ্টবসুর অন্যতম ছিলেন অয়। অন্যান্য পুরাণে ইনি অপ, আপ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছেন। *[দ্র. অষ্টবসু]*

[শিব পু. (ধর্ম) ৫৪.২০]

অযতি বিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির এক ভাই, নহুষ রাজার পুত্র।

[মহা (k) ১.৭৫.৩০; (হরি) ১.৬৩.৩৩]

অয়ন$_১$ ত্রিশ দিন ও রাত অথবা দুই পক্ষে এক মাস হয়। ছয় মাসে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হয়। অয়ন দ্বিবিধ—দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি। এক বৎসরে দেবতাদের এক দিন হয়।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৪৬.২৫; কূর্ম ১.৫.৩-৬:
দেবীভাগবত পু. ৮.১৬.১৩-১৪;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৯.৫০.৫৪]

অয়ন$_২$ ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা সাধ্যার গর্ভজাত দেবতারা সাধ্যদেবগণ হিসেবে পরিচিত। এই 'সাধ্য' দেবতাদের মধ্যে অয়ন একজন।

[মৎস্য পু. ২০৩.১১]

অয়বাহ (আয়বাহ) একটি জনপদের নাম অথবা এই দেশে বসবাসকারী একটি প্রাচীন জনজাতির নাম। বারবাস্য এবং চক্র জনজাতির সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত। *[মহা (k) ৬.৯.৪৫; (হরি) ৬.৯.৪৫]*

অয়াস্য বায়ু পুরাণে এঁকে অয়স্য নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে পথ্যার গর্ভজাত

পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অয়াস্য। পুরাণে এঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র যে পুরুষমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই যজ্ঞে ইনি সামবেদের পুরোহিত বা উদ্‌গাতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। বেদে এই ঋষি আঙ্গিরস অয়াস্য নামে পরিচিত। ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলের ৪৪ থেকে ৪৬ সূক্ত পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রগুলির দ্রষ্টা ঋষি অয়াস্য। আবার দশম মণ্ডলের ৬৭-৬৮ সূক্তের ঋষিও তিনি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অয়াস্য আভূতি ত্বাষ্ট্রের পুত্র এবং তিনি আঙ্গিরস।

[ভাগবত পু. ৯.৭.২৩; বায়ু পু. ৬৫.১০৬;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১০; ২.১.১০৫;
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug), ৭.১৬ (১ম পংক্তি), পৃ. ২৮১;
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (দুর্গাচরণ) ১.৩.৮, ১৯, ২৪;
Vedic Index, Vol. I, pp. 32-33]

অযজ্ঞ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাকাব্য পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনী অনুযায়ী একটা সময় ছিল, যখন শিব-মহাদেব যজ্ঞভাগের অধিকারী ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হবার পর রুদ্র-শিবকে যজ্ঞভাগ দেবার বিধি প্রচলিত হয়। কিন্তু লক্ষণীয়, যে সময় পর্যন্ত তিনি যজ্ঞভাগ পেতেন না, সেই সময়েও দেবাদিদেব মহাদেব যথেষ্ট আদরণীয়ই ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁকে যজ্ঞভাগ দেবার বিধি প্রচলিত হলেও এমনটা কখনওই নয় যে বৈদিক বিধি অনুসারে যাগযজ্ঞ করেই শুধুমাত্র তাঁকে তুষ্ট করা যায়। আশুতোষ শিব শুধুমাত্র ভক্তের আকৃতিতেই তুষ্ট হন, আন্তরিক ভক্তিতেই তাঁকে প্রসন্ন করা যায়। যাগ-যজ্ঞ, বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে শুধুমাত্র ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হন বলেই ভক্তবৎসল মহাদেব অযজ্ঞ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬৪; (হরি) ১৩.১৬.৬৪]

অযম বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৫;*
(হরি) ১৩.১২৭.১০৫]

অযুত$_{১}$ ভাগবত পুরাণ মতে রাজর্ষি জহ্নুর বংশধারায় রাধিকের পুত্র ছিলেন অযুত। অযুতের পুত্র ছিলেন ক্রোধন। *[ভাগবত পু. ৯.২২.১০-১১]*

অযুত$_{২}$ সংখ্যা গণনার অন্যতম একক। দশ সহস্রে এক অযুত হয়। *[বায়ু পু. ১০১.৯৪]*

অযুতনায়িন্ (অযুতনায়ী) পাণ্ডব-কৌরবদের বহুপূর্ব পুরুষ। পুরুবংশীয় রাজা মহাভৌমের ঔরসে প্রাসেনজিতি সুযজ্ঞার পুত্র। ইনি অযুতসংখ্যক, অর্থাৎ দশ হাজার পুরুষমেধ যজ্ঞ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল অযুতনায়ী—

> অযুতনায়ী যঃ পুরুষমেধানাম্ অযুতম্
> আনয়ৎ, তেন অস্য অযুতনায়িত্বম্।

অযুতনায়ী পৃথুশ্রবার মেয়ে কাম্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের পুত্রের নাম অক্রোধন।

[মহা (k) ১.৯৫.২০-২১;
(হরি) ১.৯০.২৫-২৭]

অযুতায়ু$_{১}$ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সিন্ধুদ্বীপের পুত্র। অবশ্য বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে ইনি অযুতাশ্ব নামে চিহ্নিত হয়েছেন। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজর্ষি ঋতুপর্ণের পিতা।

[মৎস্য পু. ১২.৪৬; বায়ু পু. ৮৮.১৭৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৭২;
ভাগবত পু. ৯.৯.১৬-১৭;
বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.৪.৩৭;
(নবভারত) ৪.৪.১৮]

অযুতায়ু$_{২}$ পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। *[বিষ্ণু পু. ৪.৭.১]*

অযুতায়ু$_{৩}$ কুরুবংশীয় রাজা আরাধিতের পুত্র। বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে অবশ্য তাঁর নাম আরাবীর পুত্র হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। রাজা অযুতায়ু অক্রোধন নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[বায়ু পু. ৯৯.২৩২; বিষ্ণু পু. ৪.২০.৩]*

অযুতায়ু$_{৪}$ কলিযুগে মগধদেশে বৃহদ্রথবংশীয় যে সব রাজা রাজত্ব করেছিলেন, অযুতায়ু তাঁদের মধ্যে একজন। জরাসন্ধের প্রপৌত্র শ্রুতশ্রবা এই অযুতায়ুর পিতা ছিলেন। রাজা অযুতায়ু নিরমিত্র নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন।

[বিষ্ণু পু. ৪.২৩.৩; ভাগবত পু. ৯.২২.৪৬;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১১১]

অযোগ চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত একটি জাতি। চতুর্বর্ণের পারস্পরিক মিলনে জাত একটি নির্দিষ্ট সংকর-জাতি—এতে চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যো জায়ন্তে বৈ পরস্পরাত্। ঠিক কোন কোন জাতি-বর্ণের পুরুষের মিলনে এই পৃথক জাতির সৃষ্টি হয়েছে, তা মহাভারতে বলা নেই এবং শব্দটা মহাভারতে একবারই ব্যবহার হয়েছে। হয়তো সবর্ণজাত নয়

বলেই তাঁরা 'অযোগ'—অর্থাৎ যোগ বা মিলন যেখানে শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। আমাদের ধারণা—মহাভারত এবং মনুতে উল্লিখিত 'আয়োগব' শব্দটি এই সাধারণ সঙ্কর-বোধক শব্দের নির্দিষ্ট পরিষ্কার রূপ। নিষাদ, সূত, মাগধ, করণ, ব্রাত্য, চণ্ডালদের সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত।

[মহা (k) ১২.২৯৬.৯; (হরি) ১৩.২৮৯.৯]

অযোগসিদ্ধি বারাণসীর অন্তর্গত এই শৈবতীর্থ ক্ষেত্রটি অত্যন্ত পবিত্র এবং সর্বসিদ্ধিদায়ক বলে পরিচিত—

অযোগ-সিদ্ধিনামানং সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৯৮]

অযোধ্যা বিখ্যাত রামচন্দ্রের জন্মভূমি ও কর্মভূমি এবং আদি কবি বাল্মীকির মনোভূমি। রামায়ণে কোশল নামে এক সমৃদ্ধ জনপদের কথা পাওয়া যায়। সরযূ নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত সেই কোশল রাজ্যের রাজধানীর নাম অযোধ্যা। রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব করেছিলেন। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং অযোধ্যা নগরীটি নির্মাণ করেছিলেন—

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূ তীরে প্রভূত ধনধান্যবান্॥
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্॥

অযোধ্যা নগরীটি দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন ও প্রস্থে তিন যোজন। এটি অসংখ্য কপাট-তোরণ, উদ্যান, বনবীথি, অট্টালিকায় পরিপূর্ণ ছিল। অযোধ্যা জলপূর্ণ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় অত্যন্ত দুর্গম ও সুরক্ষিত ছিল—

দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।

রামের পিতা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথ এই নগরীর জনবসতি বৃদ্ধি করেছিলেন। এখানে দ্বিজকুলতিলক, বেদবেদাঙ্গপারগ, আহিতাগ্নি, গুণবান্, মহর্ষিকল্প ঋষিরা বাস করতেন। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে, অযোধ্যা নগরীটি মৎস্যাকার ছিল, অর্থাৎ এর ভৌগোলিক আকার অনেকটা মাছের চেহারার মতো।

[রামায়ণ ১.১.৮৬; ১.৩.৩৭; .৫.৫-২৩; ১.১৮.১৮-২০; স্কন্দ পু. (বিষ্ণু/অযোধ্যা) ১.৫৪.৬৭]

☐ অথর্ববেদের মতো প্রাচীন গ্রন্থেও অযোধ্যা নগরীর নাম পাওয়া যায়। অযোধ্যার নাগরিক ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করতে গিয়ে অথর্ববেদে বলা হয়েছে—

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা।

অযোধ্যা দেবতাদের পুরী। এর নয়টি প্রবেশদ্বার। *[অথর্ববেদ ১০.২.৩১]*

☐ অযোধ্যা নগরীটি অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যুদ্ধের দ্বারা একে জয় করা সম্ভব ছিল না বলেই নগরীটির নাম অযোধ্যা।

☐ রামচন্দ্র যখন জনককন্যা সীতাকে বিবাহ করে রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন, তখন অযোধ্যাবাসীরা তাঁদের বিশাল অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন। *[রামায়ণ ১.৭৭.৬-৮]*

☐ পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্র, দেবী সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যা ছেড়ে দীর্ঘ বনবাসের উদ্দেশে রওনা হয়ে কোশল দেশের শেষপ্রান্তে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত নিষাদ রাজা গুহ শাসিত বনভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন।

এই সময় কথোপকথনকালে লক্ষ্মণ, গুহের কাছে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, রামচন্দ্রের অনুপস্থিতির ফলে অযোধ্যা রাজার অভাবে সংকটের সম্মুখীন হবে।

[রামায়ণ ২.৫১.১৬]

☐ অযোধ্যার একটি অন্যতম প্রবেশদ্বারের নাম ছিল বৈজয়ন্ত। রামচন্দ্রের বনবাস গমনের পর ভরত অযোধ্যায় ওই দ্বার দিয়েই প্রবেশ করে নগরীর শ্রীহীন চেহারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

[রামায়ণ ২.৭১.৩৩]

☐ অযোধ্যাপুরীর সঙ্গে রামচন্দ্রের মানসিক যোগ ছিল অত্যন্ত গভীর। সে জন্যই ভরত যখন বনবাসী রামচন্দ্রের কাছে এসেছিলেন রাজ্যে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ নিয়ে, তখন রামচন্দ্র সবার আগে তাঁর কাছে প্রিয় অযোধ্যা নগরীর কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছিলেন। সাক্ষাৎ শেষে ভরত আবার রামচন্দ্র পরিত্যক্ত অযোধ্যায় ফিরে আসেন। *[রামায়ণ ২.১০০.৪০-৪২; ২.১১৩.২৩]*

☐ রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পরও পত্নীর জন্য বিলাপ করতে করতে রামচন্দ্রকে অযোধ্যার কথা উচ্চারণ করতে দেখা যায়। *[রামায়ণ ৪.২৮.৫৬]*

☐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিখ্যাত রাজন্যবর্গ যেমন—দশরথ, রামচন্দ্র প্রমুখরা অযোধ্যার পুণ্যভূমিতে শাসন করেছিলেন। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর অযোধ্যা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। রামায়ণ মতে, জনৈক ঋষভ নামক রাজার শাসনকালে অযোধ্যা আবার জনপূর্ণ হয়ে ওঠে—

অযোধ্যাপি পুরী রম্যা শূন্যা বর্ষগণান্ বহূন।
ঋষভং প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপযাস্যতি॥

[রামায়ণ ৭.১২৪.১০]

□ রাজা দশরথ যখন অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন তখন পূর্ব, দক্ষিণ এমনকি সুদূর পঞ্জাবের শাসকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

[রামায়ণ ১.৫.৫-৯]

□ রাজা সৌদাস শাপমুক্তির পর পুত্রলাভের আশায় ঋষি বশিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যা নগরীতেই সৌদাসের পত্নীর সঙ্গে বশিষ্ঠের মিলনের ফলে সৌদাসের স্ত্রী গর্ভবতী হন।

[মহা (k) ১.১৭৭.৩৬-৪৬; (হরি) ১.১৭০.৩৬-৪৬]

□ দিগ্‌বিজয়ের সময় ভীমসেন অযোধ্যা অধিকার করেছিলেন। তাঁর হাতে অযোধ্যার রাজা দীর্ঘপ্রজ্ঞ পরাজিত হন।

[মহা (k) ২.৩০.২; (হরি) ২.২৯.২]

□ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঋতুপর্ণ নামে এক বিখ্যাত রাজা একসময় অযোধ্যায় রাজত্ব করেছিলেন। নিষধরাজ নল অযোধ্যায় ঋতুপর্ণের ছত্রছায়ায় 'বাহুক' নামে এক সারথির ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৬০.২৫; ৩.৬৬.২১;
(হরি) ৩.৫০.২৫; ৩.৫৪.২১]

□ ভৃগুপুত্র পরশুরাম একবার দশরথনন্দন রামচন্দ্রের কাছে অযোধ্যায় গিয়ে তাঁকেই যুদ্ধে আহ্বান করেন। রামচন্দ্র তখন পরশুরামের দর্পচূর্ণ করে তাঁর প্রকৃত বিষ্ণুরূপ দর্শন করিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৩.৯৯.৪২-৬৫; (হরি) ৩.৮৪.৭-২৮]

□ রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারের কাহিনীর উল্লেখ মহাভারতেও পাওয়া যায়। সেই সূত্রেও অযোধ্যার নাম মহাভারতে উচ্চারিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.১৪৮.১৫; (হরি) ৩.১২২.৪৮]

□ ইক্ষ্বাকুবংশীয় আর এক রাজা পরীক্ষিৎও অযোধ্যা শাসন করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১৯২.৩; (হরি) ৩.১৬২.৪]

□ ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শশাদ অযোধ্যার রাজা হয়ে সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.২০২.১; (হরি) ৩.১৭২.১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৯-২১]

□ ঋষি গালব, যযাতি কন্যা মাধবীকে নিয়ে অযোধ্যাপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হর্য্যশ্বের কাছে গিয়েছিলেন, মাধবীর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের পরিবর্তে শুল্ক লাভের জন্য।

[মহা (k) ৫.১১৫.১৮; (হরি) ৫.১০৬.৩৯]

□ সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জস ছল করে প্রায়শই অযোধ্যাবাসী বালকদের সরযূনদীর জলে নিক্ষেপ করতেন। পরে যোগবলে অসমঞ্জস তাঁদের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। *[ভাগবত পু. ৯.৮.১৮]*

□ বিভিন্ন পুরাণে অযোধ্যাকে একটি পুণ্যফলদায়ী পবিত্র তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১৯১.৯৩; অগ্নি পু. ১০৯.২৪]*

□ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, সূর্যবংশীয় রাজা দিবাকর অযোধ্যা শাসন করেছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৭১.৫; বায়ু পু. ৯৯.২৮২]

□ ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পর ঋষি বশিষ্ঠের অনুমোদনক্রমে ইক্ষ্বাকু পুত্র বিকুক্ষি অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। *[বায়ু পু. ৮৮.২০]*

□ রাজা সত্যব্রত চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির পর রাজ্যত্যাগী হলে, ঋষি বশিষ্ঠ যাজ্য ও উপাধ্যায়দের সঙ্গে নিয়ে রাজাহীন অরক্ষিত অযোধ্যার সুরক্ষা বিধান করেছিলেন। *[বায়ু পু. ৮৮.৯৪]*

□ পুরাণে চতুর্বেদকে মানবরূপে কল্পনা করা হয়েছে। মানবরূপী চতুর্বেদের নাসিকাপুটে অযোধ্যার অবস্থান। *[বায়ু পু. ১০৪.৮১]*

□ রামচন্দ্রের রাজধানী অওধই হল প্রাচীন অযোধ্যা। প্রাচীনকালে অযোধ্যা দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এর উত্তর অংশের নাম ছিল উত্তর কোশল এবং দাক্ষিণাংশের নাম ছিল দক্ষিণ কোশল। সরযূ নদী এই দুই প্রদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হত। উত্তর কোশলের রাজধানীর নাম শ্রাবস্তী এবং দক্ষিণ কোশলের নাম অযোধ্যা। রাজা মহাকোশলের আমলে কোশল সাম্রাজ্য একদিকে হিমালয় থেকে গঙ্গা নদী পর্যন্ত আর অন্যদিকে রামগঙ্গা থেকে গণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অযোধ্যা রামচন্দ্রের জন্মস্থান। মনে করা হয় বর্তমান অযোধ্যার 'জন্মস্থান' নামে জায়গাটিতে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লৌকিক ভাবনায় 'ত্রেতা-কি-ঠাকুর' নামক অযোধ্যার একটি জায়গায় রাম, সীতার মূর্তির সামনে যজ্ঞ করেছিলেন। এই নগরীর রত্নমণ্ডপ নামক স্থানে তিনি রাজসভা পরিচালনা করতেন। ফৈজাবাদে স্বর্গদ্বারম্ নামে একটি স্থানে রামের দেহ দাহ করা হয়েছিল বলে

মনে করা হয়। আর অযোধ্যার লক্ষ্মণ-কুণ্ড নামক হ্রদে লক্ষ্মণ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। জনশ্রুতি যে, ফৈজাবাদ জেলার মাঝৌরাতে রাজা দশরথ ভুলবশত অন্ধমুনির পুত্র শ্রবণকে হত্যা করেছিলেন। উল্লেখ্য, ঊনষাটজন সম্রাট অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে গুপ্তরাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক অযোধ্যা পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ বর্ণিত 'অয়ুতে' হল প্রাচীন অযোধ্যা। তাঁর মতে অযোধ্যা নগরীটি নভদেবকলের ১৯০ কিমি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। নভদেবকল বলতে বর্তমান উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলার নাভালকে বোঝানো হয়। সমুদ্রগুপ্তের গয়াতাম্রলিপিতে অযোধ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি বর্তমান ফৈজাবাদ স্টেশন থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। গয়াতাম্রলিপি অনুসারে গুপ্তযুগে অযোধ্যা 'জয়স্কন্ধাবার' বা যুদ্ধ জয়ের ঘাঁটি রূপে ব্যবহৃত হত। বৌদ্ধযুগে অযোধ্যার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল বলে জানা যায়। ফা-হিয়েন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে অযোধ্যায় এসে লক্ষ্য করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। তিনি অযোধ্যায় একটি বৌদ্ধস্তূপও দেখেছিলেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ অবশ্য অযোধ্যায় একশোর বেশি বৌদ্ধমঠ এবং ৩০০০-এর বেশি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেখেছিলেন। মহাযান ও হীনযান-উভয় ধারায় বিশ্বাসী বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা সেখানে বাস করতেন। তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং দেবমন্দির ছিল মাত্র দশটি।

□ কিছু পণ্ডিত মনে করেন সাকেত এবং অযোধ্যা এক এবং অভিন্ন। কিন্তু অধ্যাপক রিজ্ ডেভিস বুদ্ধদেবের সময়ে এই নামের দুটি পৃথক নগরীর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। ধারণা করা হয় যে, শুঙ্গ রাজা পুষ্যমিত্রের শাসনাধীন ছিল অযোধ্যা। রাজা নন্দের শিবির ছিল অযোধ্যায়।

[AIHT (Pargiter) p. 314;
EAIG (Kapoor) p. 94-96;
GDAMI (Dey) p. 14]

অযোনিসঙ্গম/অযোনিসম্ভব এই পবিত্র নদী-তীর্থে পাণ্ডবরা স্নান করেছিলেন। এই তীর্থে স্নান করলে মুক্তি লাভ হয়। এটি নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত। এই তীর্থে স্নান করে স্ত্রী-সঙ্গ না করে পাণ্ডবেশ্বরে যেতে বলা হয়েছে। মৎস্য পুরাণে এই তীর্থকে অযোনিসম্ভব নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

[পদ্ম পু. স্বর্গ. (মহর্ষি) ১৮.৬০-৬১;
মৎস্য পু. ১৯১.৬০]

অয়োবাহু ধৃতরাষ্ট্রের একশ পুত্রের অন্যতম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ঘটোৎকচ বধের দিনে অয়োবাহু প্রভৃতি দশ ভাই মিলে ভীমকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রকে অয়োবাহুর পরিবর্তে অয়োভুজ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অয়োবাহু এবং অয়োভুজ একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। দশ ভাইয়ের সঙ্গে তিনিও ভীমের গদাঘাতে নিহত হন।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৮;
১.১১৭.৬; ৭.১৫৭.১৭; (হরি) ১.৬২.১০০;
১.১১১.৬; ৭.১৩৭.১৬নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা
দ্রষ্টব্য, খণ্ড ২৪, পৃ. ১৩৬২]

অয়োভুজ *[দ্র. অয়োবাহু]*

অয়োমুখ$_1$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব। বৃত্রাসুরের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধে বৃত্রাসুরের অন্যতম সেনাপতি হিসাবে আমরা জনৈক অয়োমুখ দানবের উল্লেখ পাই। বলির সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধের সময়ও বলির সেনাবাহিনীতে অয়োমুখ নামে এক সেনাপতি ছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসুররাজের অনুচর হিসাবে অয়োমুখের নাম থাকায় মনে হয় দনুর পুত্র অয়োমুখ কোনো ব্যক্তি মাত্র নন, হয়তো এই নামে একটি দানবগোষ্ঠী ছিল।

[ভাগবত পু. ৬.৬.৩০; ৬.১০.১৯; ৮.১০.১৯;
মৎস্য পু. ৬.১৭; বিষ্ণু পু. ১.২১.৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৫]

অয়োমুখ$_2$ দক্ষিণ ভারতের একটি পর্বত। সুগ্রীব সীতার সন্ধানে বানরবীরদের যখন বিভিন্ন জায়গায় পাঠান, তখন দক্ষিণদিকের এই পর্বতেও যেতে বলেছিলেন। মনোরম অয়োমুখ পর্বতে গিয়ে মহাশৈল মলয় এবং নিকটবর্তী কাবেরী নদীতেও সীতাকে সন্ধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, অঙ্গদ ও তাঁর অনুচরদের। *[রামায়ণ ৪.৪১.৫, ১৩-১৪]*

□ মৎস্য পুরাণে অয়োমুখ পর্বতের বর্ণনা প্রসঙ্গে একে শাল, তাল, তমাল ও অন্যান্য নানা ধরনের পুষ্পে শোভিত বহুবিধ ধাতু-মণ্ডিত বলা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১৬৩.৭১]*

□ আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে অয়োমুখ পর্বতের অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। অনেকের মতে, এই পর্বতটি বিদর্ভের অন্তর্গত ছিল। আবার, বর্তমান রাজস্থানের প্রতাপগড় জেলায় অয়োমুখ পর্বতের অবস্থান ছিল বলেও ধারণা করা হয়। তবে পণ্ডিত কানিংহ্যাম অয়োমুখকে একটি দেশ বলে উল্লেখ করেছেন। এটি অযোধ্যার পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। তিনি একে হয়মুখ (**Hayamukha**) বা অশ্বমুখ (**Asvamukha**) বলেও বর্ণনা করেছেন। *[AGI (Cunningham), p.443; GD (Bhattacharyya), p.81, 147; EAIG (Kapoor), 96]*

অয়োমুখী$_1$ একজন রাক্ষসী। বীভৎস, ভয়ঙ্কর এবং বিকট তার চেহারা। রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে খোঁজার সময় বনের মধ্যে ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করেন, সেখানে পাতালের মতো গভীর একটি গুহার সামনে এই রাক্ষসীটির দেখা পান। অয়োমুখী লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে জোর করে প্রেমনিবেদন করতে চাইলে লক্ষ্মণ রেগে গিয়ে তার অঙ্গচ্ছেদন করেন। *[রামায়ণ ৩.৬৯.৮-১৮]*

অয়োমুখী$_2$ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অয়োমুখী সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৯]*

অয়োমুখী$_3$ কলির পুত্র বিঘ্নের পত্নী ছিলেন অয়োমুখী। *[বায়ু পু. ৮৪.১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫৯.১৩]*

অর অর বলতে ইংরেজিতে spoke বোঝায়। সেকালেও রথের চাকা তৈরি হত 'অর' দিয়ে। সূর্যের গতিকল্পনায় সংবৎসররূপ রথচক্রের বারোটা মাসকে এক-একটি 'অর' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[দেবীভাগবত পু. ৮.১৫.২৬-৩৪]*

অরজা ভার্গব শুক্রাচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা। রাজা দণ্ড তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রেমনিবেদন করেন। পিতার কাছে তাঁকে প্রার্থনা করার জন্য অরজা দণ্ডকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দণ্ড অরজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে জোর করে বলাৎকার করেন। এই ঘটনার ফলস্বরূপ শুক্রাচার্য দণ্ডরাজ্য ভস্মীভূত করেন। সেই স্থানটিই দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত। অরজা তার পিতার আদেশে একটি সরোবরে অবস্থান করে অপরাধক্ষয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। *[রামায়ণ ৭.৮০.৪-১৬; ৭.৮১.১৮-১৯; ৭.৮১.১৪-১৬]*

অরণি প্রাচীনকালে দুটি কাঠের টুকরো মন্থন করে বা পরস্পর ঘর্ষণের মাধ্যমে অগ্নি উৎপাদন করা হত। যে কাষ্ঠদ্বয় মন্থন করে অগ্নি উৎপাদিত হত, তাদের পারিভাষিক নাম অরণি—

যূপাগ্রং তর্ম নির্মন্থ্যদারুণি ত্বরণির্দ্বয়োঃ।

[অমরকোষ ২. (ব্রহ্মবর্গ) ১৯]

বস্তুত 'অরণি' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'ঋ' ধাতু থেকে। 'ঋ' ধাতুর অর্থ চলা। অরণি কাষ্ঠদ্বয় মন্থনের প্রক্রিয়ায় একটা চলার ভাবনা আছেই, যদিও তা স্থানান্তরে যাওয়া বোঝায় না। তবু সেই চলনাত্মক 'ঋ' ধাতুই অরণি শব্দের উৎস - √ঋ + অনি। *[দ্র. শব্দকল্পদ্রুম, খণ্ড ১, পৃ. ৯৩]*

প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থগুলিতে অরণিকাষ্ঠের উপাদান এবং আকৃতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় বৈদিক গ্রন্থগুলিতে। বৈদিকগ্রন্থ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র এবং আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, অরণিকাষ্ঠ মূলত তৈরি হত শমীগর্ভ অশ্বত্থবৃক্ষের কাঠ দিয়ে—

যো অশ্বত্থঃ শমীগর্ভ আরুরোহ ত্বে সচা।
তং তে হরামি ব্রহ্মণা যজ্ঞিয়ৈঃ কেতুভিঃ
সহেতি শমীগর্ভস্যাশ্বত্থস্যারণী আহরতি।

[আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (অমরনাথ) ২.১.১৭; আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ৫.১.২]

এখন শমীগর্ভ অশ্বত্থকাষ্ঠ বলতে কী বোঝায় তা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। বস্তুত অগ্নি উৎপাদনের জন্য দুটি কাঠের টুকরো থাকে। একটি শমীবৃক্ষের কাঠ, অন্যটি অশ্বত্থবৃক্ষের। অগ্নি উৎপাদনের সময় শমীকাষ্ঠের উপর অশ্বত্থকাষ্ঠ রেখে ঘর্ষণের মাধ্যমে অগ্নি উৎপাদন করা হত। ঠিক যেমন মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান জন্মলাভ করে, তেমনই শমীকাষ্ঠ হলেন উৎপাদিত অগ্নির গর্ভধারিণী জননীর মতো— এমনটাই ভাবনা করা হয়েছে বৈদিক গ্রন্থগুলিতে। গবেষক Frederick J. Simoons তাঁর গ্রন্থে পণ্ডিত Macdonell এবং Keith -এর মন্তব্য উদ্ধার করে বলেছেন—Macdonell and Keith, writing of Vedic India, have said that the lower of the two, apparently a block of wood used in making sacrificial fires, was made from wood of the śami tree, and the upper (the drill), from the wood of the aśvattha (pipal) tree. Hopkins has noted that, in epic mythology, the sacred fig-tree represents 'the male element in the production of fire' and that the śamī is the birthplace of Agni and that Agni is the son of śamī. পরবর্তীকালে, মহাকাব্যের যুগেও এই ভাবনার উল্লেখ মেলে। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় ভৃগুর অভিশাপের ভয়ে অগ্নি দেবতা লুকিয়ে পড়েছিলেন শমীবৃক্ষের মধ্যে—

ভৃগোঃ শাপাদ্ভৃশং ভীতো জাতবেদাঃ প্রতাপবান্।
শমীগর্ভথমাসাদ্য ননাশ ভগবাংস্ততঃ॥

দেবতাদের অনুরোধে অগ্নি শমীবৃক্ষের গর্ভ থেকে আত্মপ্রকাশ করেন—

ততো'গ্নির্তীর্থমাসাদ্য শমীগর্ভস্থমেব হি।

অগ্নির শমীবৃক্ষের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশের এই মহাকাব্যিক বিবরণের মধ্যে প্রাচীন অরণিমন্থনের ভাবনাই নিহিত আছে বলে বোঝা যায়।

শমীকাষ্ঠ থেকেই যেহেতু অগ্নির সৃষ্টি হয়, সেহেতু মহাভারতে কোথাও কোথাও শমীকাষ্ঠ এবং অরণি প্রায় অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে শমীকাষ্ঠকে যে অগ্নির জন্মদাত্রী মাতা বলে কল্পনা করা হয়েছে, সেই রূপক আরোপিত হয়েছে মহাভারতে কুন্তীর উপর। কুরু রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা সাঙ্গ হবার পর রঙ্গভূমিতে তাঁদের অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনী চলছিল। সে সময় কুন্তীপুত্রদের, বিশেষত অর্জুনের অস্ত্রনৈপুণ্য দেখে সকলে যখন মুগ্ধ, তখন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র কুন্তীকে অরণির সঙ্গে তুলনা করেছেন— যেমন অরণি থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তেমনই কুন্তীরূপ অরণি থেকে উৎপন্ন এই তেজস্বী পাণ্ডুপুত্রদের দেখে আমি ধন্য—

ধন্যো'স্ম্যনুগৃহীতো'স্মি রক্ষিতো'স্মি মহামতে।
পৃথারণিসমুদ্ভূতৈস্ত্রিভিঃ পাণ্ডববহ্নিভিঃ॥

[মহা (k) ১.১৩৫.১৭; ৯.৪৭.১৪-১৯;
(হরি) ১.১৩০.১৭; ৯.৪৩.১২-১৮;
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬.৪.২২;
E.W. Hopkins, Epic Mythology, p. 102;
Frederick J. Simoons, Plants of Life, Plants of Death, England, University of Wisconsin Press, 1998, p. 61]

□ অরণি কাষ্ঠের আকৃতি এবং পরিমাপ সম্পর্কেও বৈদিক গ্রন্থগুলিতে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। দুটি অরণিকাষ্ঠের মধ্যে উপরের অশ্বত্থকাঠের টুকরোটি উত্তরারণি এবং নীচের শমীকাষ্ঠটি অধরারণি নামে পরিচিত। দুটি অরণিকাষ্ঠ দৈর্ঘ্যে ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ, প্রস্থে ৮ অঙ্গুলি পরিমাণ এবং এর বেধ ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ। অধরারণির ঠিক মাঝখানে একটি গোলাকার ছিদ্র করা হত। তার উপর অশ্বত্থকাষ্ঠ বা উত্তরারণিটি সংযুক্ত থাকত। এই সংযোগস্থলটির নাম প্রমন্থ। লক্ষণীয়, প্রমন্থ শব্দের অর্থ হল প্রকৃষ্টরূপে মন্থন করা। দুই অরণিকাষ্ঠের সংযোগস্থলে ঘর্ষণের ফলেই অগ্নি উৎপন্ন হত বলেই এই সংযোগস্থলটির নাম প্রমন্থ।

[বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ২.৬; বৈখানস শ্রৌতসূত্র ১.১]

□ অগ্নি উৎপাদনের জন্য অরণিকাষ্ঠ সেকালের দিনে ঘরে ঘরে, বিশেষত নিষ্ঠাবান অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের ঘরে অন্যতম নিত্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য বস্তু ছিল। অরণিকাষ্ঠের অভাব ব্রাহ্মণদের দৈনন্দিন জীবনে কতখানি সমস্যা তৈরি করত, তার প্রমাণ মহাভারতের একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। পাণ্ডবদের বনবাস তখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। এমন সময় একদিন বনবাসী এক তপস্বী ব্রাহ্মণ অরণি মন্থন করে অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় তাঁর পাশ দিয়ে একটি হরিণ দ্রুতগতিতে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হরিণের শিঙে আটকে গেল ব্রাহ্মণের অরণিটি—

অরণীসহিতং মন্থং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ।
মৃগস্য ধর্ষমানস্য বিষাণে সমসজ্জত॥

হরিণের শৃঙ্গে আবদ্ধ অরণি হরিণের সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল গভীর বনে। এদিকে অরণি হারিয়ে অসহায় সেই ব্রাহ্মণ বনে বসবাসকারী পাণ্ডবদের কাছে এলেন সাহায্যের আশায়। ব্রাহ্মণ অনুরোধ করলেন—অরণির অভাবে আমার অগ্নিহোত্রে ব্যাঘাত ঘটছে। আপনারা হরিণটিকে খুঁজে বের করে আমার অরণি ফিরিয়ে এনে দিন—

তমাদায় গতো রাজন্ ত্বরমাণো মহামৃগঃ।
আশ্রমান্তরিতঃ শীঘ্রং প্লবমানো মহাজবঃ॥
তস্য গত্বা পদং রাজন্ আসাদ্য চ মহামৃগম্।
অগ্নিহোত্রং ন লুপ্যেত তদানয়ত পাণ্ডবাঃ॥

[মহা (k) ৩.৩১১.৮-৯; (হরি) ৩.২৬৫.৮-৯]

☐ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পুত্র শুকদেব অরণি মন্থনের ফলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মহাকাব্য-পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী, মহর্ষি ব্যাস একসময় পুত্রলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ব্যাসদেবের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব স্বয়ং এসে তাঁকে দর্শন দিলেন। বেদব্যাসের পুত্রকামনার কথা শুনে শিব-মহাদেব তাঁকে পুত্রলাভের বর দিলেন। এরপর একদিন ব্যাস অগ্নি উৎপাদনের জন্য অরণিমন্থন করেছিলেন। ঠিক সেই সময় তিনি আশ্রমের অনতিদূরে অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখতে পেলেন। অপ্সরা ঘৃতাচীর অপূর্ব দেহসৌন্দর্য্য মহর্ষি ব্যাসের চিত্তকে চঞ্চল করে তুলল। ব্যাস নিজেকে সংযত করার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর স্খলিত তেজ পতিত হল অরণিকাষ্ঠের উপরে। সেই অরণি মন্থনের ফলেই জন্ম নিলেন ব্যাসপুত্র শুক। লক্ষণীয়, এর আগে আমরা পাণ্ডব জননী কুন্তীর উপর অরণির রূপক আরোপিত হতে দেখেছি। শুকদেবের জন্মদাত্রী কোনো অপ্সরা বা অন্য কোনো নারীকে এই কাহিনীতে অরণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কিনা—এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ থাকছে।

[মহা (k) ১২.৩২৩.২৫-২৯; ১২.৩২৪.১-৯; (হরি) ১২.৩১৪.২৫-৩৮]

অরণীপর্ব মহাভারতের আদিপর্বে অষ্টাদশ-পর্বাত্মক মহাভারতকে এক বিরাট বৃক্ষ হিসেবে কল্পনা করে তার মূল, বিস্তার সব কিছুকে বৃক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শাখা-পত্র-পুষ্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বৃক্ষ-কল্পনাতে সভাপর্ব আর অরণ্যপর্বকে বলা হয়ে পক্ষিকুলের বাসস্থান— সভারণ্য-বিটঙ্কবান্। এখানে বনপর্বের শেষাংশে অরণীপর্ব নামে যে উপপর্বটি আছে—যেখানে ব্রাহ্মণের অরণী-কাষ্ঠ শৃঙ্গলগ্ন করে একটি মৃগ পালাচ্ছে এবং পাণ্ডবরা সেই মৃগের অনুসরণ করলেন। এরই অবশেষ হল যক্ষপ্রশ্ন। এই অরণীপর্বই মহাভারতে গ্রন্থিসূত্র বলে চিহ্নিত হয়েছে। মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্বে এই অরণীপর্বের মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলা হয়েছে যে, এই অংশ যখন পড়া হবে তখন ব্রাহ্মণদের জল দান করতে হবে কলসী ভরে।

[মহা ১.১.৮৮-৮৯; ১৮.৬.৫৯; (হরি) ১.১.৫৪-৫৫ পাদটীকা ৩৪ শ্লোক; ১৮.৫.১২৮]

অরণীসুত ব্যাসের পুত্র শুকদেবের অন্য নাম। মহাদেবের তপস্যা করে বরলাভ করার পর ব্যাস অগ্নি উৎপাদন করার জন্য দুটি অরণী মন্থন করছিলেন। এই সময় অপ্সরা ঘৃতাচীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে তাঁর বীর্য্য স্খলিত হয়ে সেই অরণী-কাষ্ঠদ্বয়ের ওপরে পড়ে। সেই অরণীগর্ভ থেকেই ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের জন্ম হয়েছিল বলেই তাঁর এই নাম। *[মহা (k) ১২.৩২৭.৩১; (হরি) ১২.৩১৬.৩০]*

অরণ্য$_{১}$ পিতা পুরুকুৎস নামক রাজা। অরণ্যের পুত্রের নাম বৃহদশ্ব। অরণ্য পরম ধার্মিক ও পিতৃভক্ত ছিলেন। *[দ্র. পুরুকুৎস/বৃহদশ্ব]*

[দেবীভাগবত পু. ৭.১০.৫]

অরণ্য$_{২}$ একজন ঋষি। উদক নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১০৪]*

অরণ্য$_{৩}$ দেবীপুরাণে ভারতবর্ষে অবস্থিত নয়টি প্রসিদ্ধ অরণ্যের নাম উল্লিখিত আছে। এই নয়টি অরণ্যকে মহাপুণ্য ফলদায়ী তীর্থক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই নয়টি অরণ্য হল— সৈন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, কুরুজাঙ্গল, উপলাবৃত, আরণ্য, জম্বুমার্গ, পুষ্কর এবং হিমালয়।

[দেবী পু. ৭৪.২৯-৩০]

অরণ্যস্রোত পশ্চিমে গঙ্গার অন্যতম তীর্থের নাম অরণ্যস্রোত। *[দ্র. গঙ্গা]*

[বৃহৎসংহিতা ৬.২৫]

অরত্নি দৈর্ঘ্য পরিমাপের অন্যতম প্রাচীন একটি একক। মহাকাব্য পুরাণে একাধিক শ্লোকে দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হিসেবে অরত্নির উল্লেখ পাওয়া যায়। হাতের কনুই থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাতের অগ্রভাগ পর্যন্ত (সাধারণ মানুষের হাতের মাপ অনুযায়ী) দৈর্ঘ্যকে এক অরত্নি বলা হয়। Patrick Olivelle কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককগুলিকে একত্রিত করে তার আধুনিক পরিমাপ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। Olivelle-এর মতে এক অরত্নি বর্তমান পরিমাপের একক অনুযায়ী প্রায় ৪৮ সেন্টিমিটারের সমান।

তবে মহাভারতে কোনো কোনো শ্লোকে শুধুমাত্র কনুই বোঝাতেও অরত্নি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *[মহা (k) ৩.১৫৭.৭০; ৮.১৬.৮; (হরি) ৩.১৩০.৭০; ৮.১২.৬; শব্দকল্পদ্রুম খণ্ড ১, পৃ. ৯৪; বায়ু পু. ৪৬.২৬; ৭৪.৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৭.২৬; ২.২.৭; Patrick Olivelle. King, Governance and Law in Ancient India, p. 456]*

অরন্তুক একজন ক্ষেত্ররক্ষক দ্বারপালের নাম। তাঁর নামেই স্থান-নাম। অরন্তুক, তরন্তুক, রামহ্রদ এবং মচক্রুক—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই কুরুক্ষেত্র এবং সমন্তপঞ্চক, যেটাকে পিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞস্থান উত্তরবেদি বলা হয়।

[মহা (k) ৩.৮৩.৫২, ২০৮; ৯.৫৩.২৪; (হরি) ৩.৬৮.৫২, ২০৮; ৯.৪৯.২৫]

অরবিন্দ এই পর্বত-তীর্থটি গয়ায় অবস্থিত আদিগদাধর তীর্থের অন্তর্গত। *[বায়ু পু. ১০৯.১৫; নারদ পু. (মহর্ষি) ২.৪৭.৮৩]*

অরবিন্দাক্ষ বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫১; (হরি) ১৩.১২৭.৫১]

অরালকেশ্বর অরালকেশ্বর নামক তীর্থে মহাদেবের নাম সূক্ষ্ম ও উমার নাম সূক্ষ্মা।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল/উত্তরার্ধ) ২.৩২]

অরালি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ১৩.৪.৫৮; (হরি) ১৩.৩.৭৭ (পাঠান্তরে আরালি—এটা যে ভুল পাঠ তা 'র'-এর পরে দন্ত্য 'ন' থেকেই বোঝা যায়।)]*

অরি একজন ঋষি। পুরাণে যেসব ঋষিবংশকে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশ-প্রবরভুক্ত বলা হয়েছে মহর্ষি অরির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত অন্যতম বংশবর্ধক পুরুষ। *[মৎস্য পু. ১৯৬.১০]*

অরিজ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধারায় ত্বষ্টার পুত্র ছিলেন অরিজ। ইনি রজ নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[বায়ু পু. ৩৩.৫৯]*

অরিজিৎ কৃষ্ণের ঔরসে ভদ্রার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৭]*

অরিঞ্জয় বৃহদ্রথ বংশের শেষ রাজা। কলিযুগে মগধে বৃহদ্রথ বংশীয় রাজারা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন বলে পুরাণে বর্ণিত আছে। বৃহদ্রথের বংশের শেষ রাজা অরিঞ্জয়ও পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৯.৩০৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১২১]

অরিমর্দন$_{১}$ যদুবৃষ্ণি বংশে শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত পুত্রসন্তানদের মধ্যে অন্যতম। ইনি অক্রূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৬; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১১]

অরিমর্দন$_{২}$ রাজর্ষি কুরুর পাঁচ পুত্র সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ। *[বায়ু পু. ৯৯.২১৮]*

অরিমর্দন$_{৩}$ দ্বিতীয় মন্বন্তরে যখন স্বারোচিষ মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, পারাবত তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। পারাবত গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অরিমর্দন।

[বায়ু পু. ৬২.১২]

অরিমেজয়$_{১}$ যদু-বৃষ্ণিবংশীয় শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। ইনি অক্রূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৬.১১০; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.২]

অভিমন্যু বধের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেবেন বলে ধৃতরাষ্ট্র আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

[মহা (k) ৭.১১.২৮; (হরি) ৭.৯.২৮]

অরিমেজয়$_{২}$ এই নামে এক ঋষি কোনো এক সর্পযজ্ঞে যজুর্বেদের পুরোহিত 'অধ্বর্যু'-র কাজ করেছিলেন। *[পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ২৫.১৫]*

অরিষ্ট$_{১}$ মহাভারতের দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠে কৃষ্ণের বাল্যলীলা-সংক্রান্ত কিছু শ্লোক আছে। তার একটিতে অরিষ্টের নাম আছে এবং এখানে সে বৃষের রূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে মারতে এসেছিল। কৃষ্ণ তাঁকে হত্যা করেন নিখিল পশুদের সুরক্ষার জন্য—

জঘান তরসা কৃষ্ণ পশূনাং হিতকাম্যয়া।

[মহা (গীতা প্রেস) ১.৩৮ অধ্যায়, পৃ. ৮০১ হরিদাস এই পাঠ ধরেননি এবং সভাপর্বের ৩৭ অধ্যায়ের শেষে সেটা উল্লেখ করেছেন, যে তিনি এই অংশ গ্রহণ করেননি। (হরি) সভাপর্ব, পৃ. ৩২৩ পাদটীকা]

পুরাণগুলিতে অরিষ্ট কংস-প্রেরিত এক অসুর। সে বৃষের রূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে মারতে এসেছিল। ভাগবত পুরাণে অরিষ্ট নামে বৃষভের ধ্বংসাত্মক চেহারা বর্ণিত হয়েছে এবং কৃষ্ণের কথাতেও এটা ধরা পড়েছে যে, অরিষ্ট গোপালকদের তথা পশুদের ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। কৃষ্ণ তার শিঙ্ ভেঙে নেন এবং সেই শিঙ্ দিয়েই তাকে হত্যা করেন। অরিষ্টবধের সংবাদ কংসকে জানিয়ে ছিলেন নারদ। বিষ্ণু পুরাণের মতে কৃষ্ণ যখন গোপীদের সঙ্গে রাসক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, তখন বৃষভাসুর অরিষ্ট কৃষ্ণকে আক্রমণ করে। ভাগবত পুরাণেও অরিষ্টাসুর বধের পর কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে

মিলিত হয়েছিলেন। হরিবংশের মতে অরিষ্ট-বৃষভের আক্রমণের সময় অর্ধপ্রদোষ, অর্থাৎ সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে। কৃষ্ণ কিন্তু এখানেও গোপীদের সঙ্গেই ছিলেন—প্রদোষার্ধে কদাচিত্তু কৃষ্ণে রতিপরায়ণে। অরিষ্টবধের প্রণালী এই সবগুলি পুরাণেই একরকম। মহাভারতে অধিকাংশ পাঠে অরিষ্টাসুরের কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু সভাপর্বে শিশুপাল কৃষ্ণকে গালাগাল দেবার সময় অশ্বাসুর এবং বৃষভাসুরকে যে কৃষ্ণই মেরেছিলেন, তার একটা তুচ্ছ উল্লেখ করেছেন—

তৌ বাশ্ববৃষভৌ ভীষ্ম যৌ ন যুদ্ধ-বিশারদৌ।

[ভাগবত পু. ১০.৩৬.১-১৬; বিষ্ণু পু. ৫.১৪.১-১৩; হরিবংশ, ২.২১.১-২৪; মহা (k) ২.৪১.৭; (হরি) ২.৪০.৭]

অরিষ্ট$_{২}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। দানবদের মধ্যে যাঁরা হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে মনুষ্যধর্ম পালন করতেন অরিষ্ট তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৮.১৫; ভাগবত পু. ৬.৬.৩০]

অরিষ্ট$_{৩}$ একজন অসুরবীর। ইনি দৈত্যরাজ বলির অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। বলি স্বর্গলোক আক্রমণ করলে সেই সময় দেবাসুর যুদ্ধে বলির সেনাপতি অরিষ্টকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। *[ভাগবত পু. ৮.১০.২২]*

অরিষ্ট$_{৪}$ দৈত্যরাজ বলির পুত্র। ইনি তারকাময় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মৎস্য পু. ১৭৩.২০; ১৭৭.৭]

অরিষ্ট$_{৫}$ বৈবস্বত মনুর নয়জন পুত্র সন্তানের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৮৫.৪; মৎস্য পু. ১১.৩১; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৩.১.৩৩ (বঙ্গীয় সংস্করণে 'ধৃষ্ট' এই পাঠ পাওয়া যায়)]*

অরিষ্ট$_{৬}$ মিত্রাবরুণ এই যুগল দেবতার অন্যতম মিত্র। মিত্রের পত্নী রেবতী। রেবতীর গর্ভে মিত্রের ঔরসে যে তিন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, অরিষ্ট তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৬. ১৮.৬]*

অরিষ্ট$_{৭}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে মৃগ নামক হস্তীর পুত্র, চপল নামক হস্তীর ভ্রাতা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩৩]

অরিষ্টনেমি$_{১}$ ভগবান কৃষ্ণের একটি নাম বা তাঁর বিশেষণ। অরিষ্ট মানে অহিংসিত, নেমি অর্থ এখানে চরণ, যাঁর সদাবন্দ্য চরণদুটিকে কেউ হিংসা করেন না। অথবা নেমি মানে মর্যাদা, যাঁর মর্যাদা কেউ ক্ষুণ্ণ করেনি। অথবা যাঁর চক্রনেমি শুভকারক। *[মহা (k) ৫.৭১.৫; (হরি) ৫.৬৬.৬৬]*

অরিষ্টনেমি$_{২}$ পিতা মহামুনি কশ্যপ, মাতা প্রজাপতি দক্ষের কন্যা বিনতা। *[কালিকা পু. ৩৪.৭৩]*

☐ কশ্যপের ঔরসে বিনতার ছয় পুত্রের অন্যতম। তার্ক্ষ্য তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা—

তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ তথৈব গরুড়ারুণৌ।

[মহা (k) ১.৬৫.৪০; (হরি) ১.৬০.৪০]

যজুর্বেদের স্বস্তিবাচনমন্ত্রে—তার্ক্ষ্য-অরিষ্টনেমি আমাদের শুভবিধান করুন।

—স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো'রিষ্টনেমিঃ।

[শুক্লযর্জুবেদ ২৫.১৯]

—এইরকম একটি বিখ্যাত বহুশ্রুত মন্ত্র আছে। এখানে তার্ক্ষ্য এবং অরিষ্টনেমিকে একই ব্যক্তি ভাবা হয়। অরিষ্টনেমি এবং তার্ক্ষ্য-শব্দের পৃথক প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও এই মন্ত্রে অনেকেই এই দুই শব্দে বৈনতেয় গরুড়কেই নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বেদমন্ত্রে এই দুই নাম তার্ক্ষ্য এবং অরিষ্টনেমি—এই দুই গরুড়াগ্রজের পৃথক স্থান এবং মর্যাদা সূচিত করে।

অরিষ্টনেমি$_{৩}$ বিখ্যাত সূর্যবংশীয় রাজা সগরের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন অরিষ্টনেমির কন্যা। মহাভারতে তিনি সগরকে মোক্ষ ধর্মের সুখ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছেন এবং এখানেও অরিষ্টনেমিকে একবার তার্ক্ষ্য বলেই সম্বোধন করা হয়েছে। *[রামায়ণ ১.৩৮.৪; মহা (k) ১২.২৮৮.২-৪৭; (হরি) ১২.২৮১.২-৪৭]*

অরিষ্টনেমি$_{৪}$ বিখ্যাত ঋষি কশ্যপ, যিনি বহুবংশের পিতা বা প্যাট্রিয়ার্ক হিসেবে চিহ্নিত, তাঁকেও অরিষ্টনেমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে রামায়ণে এবং বলা হয়েছে গরুড় তাঁরই ঔরসে বিনতার গর্ভজাত পুত্র—

অরিষ্টনেমিনঃ পুত্রো বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
গরুত্মানিব বিখ্যাত উত্তমঃ সর্বপক্ষিণাম্॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও গরুড়ের পিতা অরিষ্টনেমি। *[রামায়ণ ৪.৬৬.৪; মার্কণ্ডেয় পু.২.১]*

মহাভারতে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, লোকপিতা কশ্যপেরই অন্য নাম অরিষ্টনেমি—

মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রস্তস্য দ্বে নামনী স্মৃতে।
অরিষ্টনেমিরিত্যেকে কশ্যপেত্যপরে বিদুঃ॥

[মহা (k) ১২.২০৮.৮; (হরি) ১২.২০২.৮]

অরিষ্টনেমি$_{৫}$ অগ্নিপুরাণে অরিষ্টনেমিও একজন বংশজনক পিতা। তাঁর পত্নীদের গর্ভে অন্তত ষোলোটি পুত্রের জন্ম হয়—অরিষ্টনেমি-পত্নীনাম্ অপত্যানীহ ষোড়শ। এমন হতে পারে অরিষ্টনেমির অর্থ এখানেও কশ্যপ। *[অগ্নি পু. ১৯.৩]*

দেবীভাগবতের মতে, অরিষ্টনেমি নিজেই এক বংশকর পিতা। দক্ষ তাঁর পত্নী বীরিণীর গর্ভে ষাটটি কন্যার জন্ম দেন, তার মধ্যে চারটিকে বিবাহ দেন অরিষ্টনেমির সঙ্গে। এই চার কন্যার নাম পতঙ্গী, যামিনী, তাম্রা এবং তিমি।

[দেবী ভাগবত পু. ৭.১.৩৪-৩৮;
শিব পু. (ধর্ম) ৫৪.১৪;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা), ১৪.৮-৯, ২২;
বিষ্ণু পু. ১.১৫.১০৪; বায়ু পু. ৬৩.৪২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.১.৫৪; মৎস্য পু. ৫.১৩; ১৪৬.১৬]

অরিষ্টনেমি$_{৬}$ গন্ধর্বরাজ হংসের পিতা অরিষ্টনেমি (মহাভারত অনুসারে অরিষ্টার পুত্র হংস)। পুরাণ মতে এই হংসই দ্বাপরযুগে কুরুবংশে ব্যাসপুত্র ধৃতরাষ্ট্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিল।

[দেবী ভাগবত পু. ৪.২২.৩৬;
মহা (k) ১.৬৭.৮৩; (হরি) ১.৬২.৮৪-৮৫]

অরিষ্টনেমি$_{৭}$ কোনো এক সময় হৈহয়-বংশের এক রাজকুমার মৃগয়া করতে গিয়ে তৃণলতাবৃত বনের মধ্যে কৃষ্ণমৃগের চর্ম-পরিহিত এক মুনিকে দেখতে পেলেন। রাজকুমার মুনিকে হরিণ ভেবে বাণাঘাতে হত্যা করলেন। তারপর কাছে গিয়ে কৃষ্ণচর্মাবৃত মুনিকুমারকে নিহত দেখে তিনি খুব ভয় পেলেন। রাজকুমার হৈহয়-রাজাদের প্রধান পুরুষদের কাছে ঘটনাটা জানাতেই তাঁরা সবাই মিলে নিহত মুনিকুমারকে দেখে ভীত-কাতর হলেন। মুনিকুমার কার ছেলে হতে পারেন—এটা ভাবতে ভাবতে অরিষ্টনেমির আশ্রমে এলেন। অরিষ্টনেমি এখানে মুনি এবং তাঁর বিশেষণ এখানে 'তার্ক্ষ্য'।

—জগ্মুশ্চারিষ্টনেম্নো'থ তার্ক্ষ্যস্যাশ্রমমঞ্জসা।

অরিষ্টনেমি সব শুনলেন এবং পুত্রকে বাঁচিয়ে তুলে রাজাদের কাছে নিষ্কাম এবং স্থিতধী ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন।

[মহা (k) ৩.১৮৪.৩-২৩; (হরি) ৩.১৫৫.৩-২৩]

অরিষ্টনেমি$_{৮}$ অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হওয়ার সময় বিরাট রাজার কাছে জন্ম-পরিচয় দিয়ে পাণ্ডব-কনিষ্ঠ সহদেব বলেছিলেন—আমি জাতিতে বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি—

বৈশ্যো'স্মি নাম্নাহমরিষ্টনেমিঃ।

[মহা (k) ৪.১০.৫; (হরি) ৪.৯.৫]

অরিষ্টনেমি$_{৯}$ রাজসূয় যজ্ঞের আগে যুধিষ্ঠিরের কাছে নারদ যম-সভার বর্ণনা করেছেন। সেই সভায় আসীন রাজনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। *[মহা (k) ২.৮.৯, ২২; (হরি) ২.৮.৯, ২২]*

অরিষ্টনেমি$_{১০}$ নিমি বংশীয় রাজা ঋতুজিৎ-এর (ভাগবত পুরাণ মতে পুরুজিৎ-এর) পুত্র। অরিষ্টনেমি শ্রুতায়ু নামে এক পুত্র লাভ করেন।

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১৪; ভাগবত পু. ৯.১৩.২৩]

অরিষ্টনেমি$_{১১}$ ময়দানব নির্মিত ত্রিপুরে বসবাসকারী একজন অসুরবীর। দৈত্যরাজ বলি স্বর্গলোক আক্রমণ করলে বলির পক্ষে যে সব অসুরবীর যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অরিষ্টনেমি অন্যতম। ভাগবত পুরাণে এঁকে অরিষ্ট নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। *[দ্র. অরিষ্ট$_{৬}$]*

[ভাগবত পু. ৮.৬.৩১; ৮.১০.২২]

অরিষ্টনেমি$_{১২}$ যদু বংশীয় চিত্রকের অন্যতম পুত্র।

[বায়ু পু. ৯৬.১১৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৫]

অরিষ্টনেমি$_{১৩}$ একজন যক্ষ। পুরাণে বর্ণিত আছে যে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ইনি সূর্যের রথে অবস্থান করতেন। *[ভাগবত পু. ১২.১১.৪২;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১৮;
বায়ু পু. ৫২.১৮; বিষ্ণু পু. ২.১০.১৪]

অরিষ্টসেন মহাবীর কর্ণ মারা যাবার পর পরম দুঃখিত দুর্যোধন অন্যান্য রাজাদের নিয়ে হিমালয় পর্বতের সমতলভূমিতে খানিক সময় কাটাতে গিয়েছিলেন। যে রাজারা সেখানে দুর্যোধনের সঙ্গে গিয়ে রাত্রিবাসও করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শল্য, চিত্রসেন, শকুনির সঙ্গে অরিষ্টসেনও ছিলেন। তাতে বোঝা যায়—অরিষ্টসেন কৌরবপক্ষের অন্যতম বীর যোদ্ধা। *[মহা (k) ৯.৬.৩; (হরি) ৯.৫.৩]*

অরিষ্টা দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী। ইনি সঙ্গীতকলায় পারদর্শী ছিলেন বলে জানা যায়। কশ্যপের ঔরসে তাঁর গর্ভে কিন্নর ও গন্ধর্বরা জন্মগ্রহণ করেন। আটজন বিশিষ্ট অপ্সরাও অরিষ্টার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৬.৬.২৫, ২৯;
বিষ্ণু পু. ১.২১.২৫; মৎস্য পু. ৬.৪৫; ১৪৬.১৮;
বায়ু পু. ৬৬.৫৫; ৬৯.৪৬-৪৮, ৩৪৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৫৬; ২.৭.৪৬৭]

অরিহ$_{১}$ পুরুবংশীয় রাজা অবাচীনের পুত্র। অবাচীনের ঔরসে বিদর্ভরাজকন্যা মর্য্যাদার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। রাজা অরিহ অঙ্গদেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। অরিহের ঔরসে অঙ্গরাজকন্যার গর্ভে মহাভৌম নামে এক পুত্র হয়। *[মহা (k) ১.৯৫.১৮; (হরি) ১.৯০.২৩]*

অরিহ$_{২}$ পুরুবংশীয় রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় একজন অরিহের নাম পাওয়া যায়, যিনি অবাচীন পুত্র অরিহের কয়েক পুরুষ পরের লোক ছিলেন। ইনি পুরুবংশীয় রাজা দেবাতিথির পুত্র। দেবাতিথির ঔরসে বিদেহরাজকন্যা মর্যাদার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। রাজা অরিহের পত্নী ছিলেন অঙ্গরাজকন্যা সুদেবা। অরিহের ঔরসে সুদেবার গর্ভে জাত পুত্রের নাম ঋক্ষ।

[মহা (k) ১.৯৫.২৩; (হরি) ১.৯০.২৯]

অরিহা ভবিষ্যত সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন অমিতাভ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অরিহা অন্যতম। *[বায়ু পু. ১০০.১৬]*

অরুজ লঙ্কেশ্বর রাবণের স্বপক্ষীয় অনুচর যোদ্ধা-বীরদের অন্যতম—যিনি অন্যদের সঙ্গে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.২৮৫.২; (হরি) ৩.২৩৯.২]

অরুণ$_{১}$ মহামুনি কশ্যপের ঔরসে প্রজাপতি দক্ষের অষ্টম কন্যা বিনতার গর্ভে অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তপস্যা দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করে মহেশ্বরের অনুগ্রহে তিনি সূর্যের সারথি নিযুক্ত হন।

[কালিকা পু. ৩৪.৭৩;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর /কুমারিকা) ১৪.২৮;
১৮.৮৩-৮৪;
কূর্ম পু. ১.১৮.১৪-১৫;
মার্কণ্ডেয় পু. ১০৪.৬;
দেবী ভাগবত ২.১২.২০; রামায়ণ ৩.১৪.৩২]

☐ প্রজাপতি দক্ষের কদ্রু ও বিনতা নামে দুই সুলক্ষণা ও সুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁরা কশ্যপ মুনির পত্নী। একবার কশ্যপ কোনো কারণে তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করতে চাইলে কদ্রু সমান বলবান সহস্র পুত্রলাভের বর চাইলেন। বিনতা বর চাইলেন যে, তাঁর দুই পুত্র কদ্রুর পুত্রদের চেয়ে বলবান হবে, এমনকী সকলের চেয়ে তেজে, আকৃতিতে ও বিক্রমে শ্রেষ্ঠ হবে। কশ্যপ দুই পত্নীকে তাঁদের ইচ্ছানুসারে পুত্রলাভের বর দিয়ে তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন।

এর বহুকাল পরে কদ্রু এক হাজার ডিম এবং বিনতা দুটি ডিম প্রসব করলেন। ডিমগুলিকে উপযুক্ত উত্তাপযুক্ত পাত্রে রাখা হল। পাঁচশো বছর পরে কদ্রুর ডিমগুলি থেকে সহস্র সর্পের জন্ম হল। কিন্তু বিনতার ডিমদুটি একইভাবে পড়ে রইল। পুত্রমুখ দেখতে না পেয়ে লজ্জিত ও দুঃখিত হয়ে বিনতা একটি ডিম ভেঙে ফেললেন। তাতে যে-পুত্রটি ছিল তার দেহের উপরের অংশ নির্মিত হয়েছিল কিন্তু নীচের অংশ নির্মিত হয়নি। নিজের এই অবস্থা দেখে বিনতাপুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মাকে অভিশাপ দিলেন—যেহেতু পুত্রলোভে আমাকে এমন অসম্পূর্ণ দেহ দিয়েছ, সেইহেতু তুমি সর্বদা যাকে পরাজিত করতে চাও, পাঁচশত বছর সেই কদ্রুদেবীর দাসী হয়ে থাকবে।

অন্য ডিমটি দেখিয়ে বললেন যে, একেও যদি তুমি পুত্রলোভে অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে এই পুত্র তোমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে। পাঁচশত বছর পর এর জন্ম হবে, ধীর চিত্তে প্রতীক্ষা কর। বিনতার এই বিকলাঙ্গ পুত্রের নাম অরুণ। তার দেহ প্রভাতের সূর্যের মত রক্তবর্ণ ছিল। একবার সূর্য তাঁর আপন উদয়-কালে দেখলেন যে, অরুণ তাঁর নিজের তেজে সূর্যের সমান উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ লাভ করেছে। তা দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব অরুণকে নিজের সারথির কাজে নিযুক্ত করেন। এইভাবে বিনতাপুত্র সূর্যের সারথি হয়ে অরুণ নামে প্রসিদ্ধ ও অমর হলেন।

[মহা (k) ১.১৬.৫-২৩; (হরি) ১.১২.৫-২৫]

☐ অরুণ যেভাবে সূর্যের সারথি নিযুক্ত হলেন, সে-সম্বন্ধে অন্য কাহিনীটি হল—রাহু যখন অমৃত পান করতে আরম্ভ করেছেন, তখন চন্দ্র ও সূর্য তা নারায়ণকে বলে দিয়েছিলেন। তাই রাহু চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে চিরকাল শত্রুতা করে আসছেন এবং এই কারণেই তিনি সূর্যকে গ্রাস করে কষ্ট দেন। তাতে সূর্য ভাবলেন যে, তিনি দেবতাদের মঙ্গলের জন্যই রাহুর অমৃতপানের কথা বলে দিয়েছেন, তাই রাহু তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ। অথচ তিনি একা সেই কষ্ট ভোগ করছেন এবং দেবতারা তা দেখেও প্রতিকারের কোনো চেষ্টা করেন না, এই ভেবে সূর্য দেবতাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং দেবতাদের এবং সমগ্র জগতের

বিনাশের জন্য তেজবিস্তার করতে লাগলেন। সমগ্র জগৎ সূর্যোদয়ের পূর্বেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ভয় পেয়ে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, ক্রুদ্ধ সূর্য প্রচণ্ড তেজে উদিত হবেন এবং তার ফলে ত্রিভুবন ভস্মীভূত হবে, কিন্তু এর প্রতিবিধান স্বরূপ কশ্যপের বিশালদেহী ও মহাতেজস্বী পুত্র অরুণ সূর্যের সম্মুখে থাকবেন, তাঁর সারথির কাজ করবেন এবং তিনি সম্মুখে থাকায় সূর্যের তেজ হ্রাস পাবে, এবং জগতের মঙ্গল হবে। ব্রহ্মার আদেশে অরুণ সূর্য উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবরণ করলেন এবং তাতে সূর্যের তেজ হ্রাস পেল। এই সময় থেকে অরুণ সূর্যের সারথি নিযুক্ত হলেন।

[মহা (k) ১.২৪.৬-২০; (হরি) ১.২০.৬-১৯]

অরুণ মহাদেবের তপস্যা করে তাঁর বরে সূর্যের সারথি হন বলে অন্যত্র উল্লেখ আছে।

[কূর্ম পু. ১.১৮.১৪-১৫]

□ অরুণের পত্নীর নাম শ্যেনী। অরুণের ঔরসে ও শ্যেনীর গর্ভে মহাপরাক্রমী মহাসাহসী সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

[মহা (k) ১.৬৬.৬৯-৭০; (হরি) ১.৬১.৭৪; রামায়ণ ৩.১৪.৩২-৩৩]

অরুণ$_{২}$ পাতালে দেবদ্বেষী খলস্বভাব অরুণ নামে এক মহাদৈত্য ছিল। দেবতাদের জয় করার জন্য সে ব্রহ্মার তপস্যা করেছিল। তার তপস্যায় ভীত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গেলেন। সমস্ত শুনে ব্রহ্মা হিমালয়ে তপস্যারত অরুণকে তাঁর তপস্যা করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দৈত্য অমরত্বের বর প্রার্থনা করল, কিন্তু ব্রহ্মা তাতে সম্মত হলেন না। তখন অরুণ এই বর প্রার্থনা করলেন যে, যুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা তাঁর মৃত্যু হবে না এবং পুরুষ অথবা নারী, দ্বিপদ, চতুষ্পদ উভয়াকার কোনো প্রাণী যেন তাকে কিছু করতে না পারে। ব্রহ্মা তাঁকে সেই বর দিলেন।

অরুণ তখন অন্যান্য দৈত্যদের সমবেত করে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দেবগুরু বৃহস্পতি ছলনা করে সদা গায়ত্রী জপরত অরুণকে গায়ত্রী জপ থেকে বিরত করলেন। এতে তার দৈবশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেল। অবশেষে জগন্মাতা ভুবনেশ্বরী ভ্রামরী রূপে অরুণ দৈত্যের বিনাশ করলেন। *[দেবীভাগবত পু. ১০.১৩.৩৭-১২০; মার্কণ্ডেয় পু. ৯১.৪৮-৫০]*

অরুণ$_{৩}$ একজন বিশিষ্ট নাগ। প্রভাসক্ষেত্রে শেষ নাগের অবতার বলরাম যখন যোগবলে দেহত্যাগ করেন, সেই সময় তাঁর দেহ থেকে এক সহস্র ফণাধারী নাগ বহির্গত হয়ে সমুদ্রে মিশে যায়। সেই নাগকে স্বাগত জানাতে জলাধিপতি বরুণ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাগের সঙ্গে অরুণও উপস্থিত হয়েছিলেন। *[মহা (k) ১৬.৪.১৫; (হরি) ১৬.৪.১৫ (বরুণ পাঠ ধৃত হয়েছে)]*

অরুণ$_{৪}$ সূর্যবংশীয় রাজা হর্যশ্বের পুত্র ছিলেন অরুণ। তিনি ত্রিশঙ্কুর (পূর্ব নাম সত্যব্রত) পিতা।

[দেবীভাগবত ৭.১০.৬-৭]

□ ভাগবত পুরাণ অবশ্য জানিয়েছে যে হর্যশ্বের পুত্র অরুণ ছিলেন ত্রিবন্ধনের পিতা। এই ত্রিবন্ধনই নাকি সত্যব্রত ত্রিশঙ্কুর পিতা ছিলেন।

[ভাগবত পু. ৯.৭.৪]

অরুণ$_{৫}$ প্রাচীন ভারতের এক বিশিষ্ট ঋষি সম্প্রদায়। যে সমস্ত ঋষিরা শুধুমাত্র বেদমন্ত্র জপ করে স্বর্গলাভ করেছেন তাঁদের কয়েকটি সম্প্রদায় হল—অজ, পৃশ্নি, সিকত, কেতু ও অরুণ।

[মহা (k) ১২.২৬.৭; (হরি) ১২.২৬.৭]

অরুণ$_{৬}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্ররা দানব নামে পরিচিত। এই দনুপুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অরুণ। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে অরুণ সূর্যরথে অবস্থান করেন। *[ভাগবত পু. ৬.৬.৩০; বায়ু পু. ৫২.১০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১০]*

অরুণ$_{৭}$ একাদশ মন্বন্তরে যখন ধর্মসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন সেই সময় যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন মহর্ষি অরুণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.২৫]

অরুণ$_{৮}$ কৃষ্ণের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[ভাগবত পু. ১০.৯০.৩৩]

অরুণ$_{৯}$ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উল্লিখিত অনেকগুলি ঋষির একটি বর্গ অথবা গণ। এখানে বলা হয়েছে—প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির তপস্যায় বসেছিলেন। সৃষ্টি কেমন হবে—সেই পর্যালোচনা করার সময় তিনি নিজের শরীরকে প্রকম্পিত করেন। সেই কম্পিত শরীরের মাংসরাশি থেকে তিন প্রকারের ঋষিরা তিনটি বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অরুণ এই ঋষিদের একটি অন্যতম গণ—

স তপস্তপ্ত্বা শরীরমধূনত।
তস্য যন্মাংসমাসীৎ, ততো অরুণা
কেতবো বাতরশনা ঋষয় উদতিষ্ঠন্।

[তৈত্তিরীয় আরণ্যক (আনন্দ আশ্রম); ১.২৩; ১.২৪; ১.২৬; পৃ. ৮৭, ৯৩, ৯৭]

অরুণ$_{১০}$ নরকাসুরের পুত্র। নরকাসুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অরুণ ও তাঁর ছয় ভাই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও নিহত হন।

[ভাগবত পু. ১০.৫৯.১২-১৩]

অরুণ$_{১১}$ পঞ্চম মন্বন্তরের অধিপতি রৈবত মনুর দশ পুত্রসন্তানের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অরুণ।

[মৎস্য পু. ৯.২১]

অরুণ$_{১২}$ ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা সাধ্যার গর্ভে সাধ্যদেবগণের জন্ম হয়। এই সাধ্যদেবগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অরুণ।

[মৎস্য পু. ১৭১.৪৩]

অরুণ$_{১৩}$ সারমেয় অর্থাৎ কুকুরদের জন্মদাত্রী সরমার দুই পুত্র—দুম্লোলক এবং ললোহ। এই দুম্লোলক থেকে বিভিন্ন বর্ণের আটটি সারমেয় শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল। গায়ের রঙের পার্থক্য থেকেই তাদের আটটি পৃথক গণে ভাগ করা হয়েছে। অরুণ দুম্লোলকের পুত্রদের একটি অন্যতম গণ। ঈষৎ লালচে রঙের কুকুরেরা এই গণের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৪৩]*

অরুণ$_{১৪}$ প্রাচীন ভারতীয় আর্য সমাজ চতুবর্ণে বিভক্ত ছিল। এই চার বর্ণ ছিল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে যে, পৌরাণিক শাল্মলী দ্বীপের অধিবাসীরাও এমনই চতুবর্ণে বিভক্তি ছিল। এঁদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্তরা সেখানে অরুণবর্ণ নামে পরিচিত ছিলেন। *[বিষ্ণু পু. ২.৪.৩১]*

অরুণ$_{১৫}$ কৈলাস পর্বতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রাণীবৈচিত্র্যে ভরপুর, রত্নময় ও ওষধিযুক্ত একটি পর্বত। বায়ু পুরাণে অরুণ পর্বতকে শ্রেষ্ঠ পর্বত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

অরুণং পর্বতশ্রেষ্ঠঃ।

বরফাবৃত অরুণ পর্বতের পাদদেশে শৈলোদ নামে একটি সরোবর রয়েছে, যেখান থেকে পবিত্র শৈলোদা নদীর উৎপত্তি। অরুণ পর্বতের নিকটে সুরভি নামে এক স্বর্গীয় বনভূমি অবস্থিত।

[বায়ু পু. ৪৭.১৭-২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.১৮-২৩]

অরুণা$_{১}$ মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী অরুণা সরস্বতী নদীর অপর নাম। একসময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে হত্যা করবেন বলে স্থির করলেন। দুজনের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা, প্রায়ই এঁরা একে অপরের প্রতি কিছু না কিছু প্রতিহিংসা মূলক আচরণ করতেন। সেরকমই একদিন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে হত্যাই করবেন বলে স্থির করে আশ্রমের পাশ দিয়ে বয়ে চলা সরস্বতী নদীকে আদেশ করলেন—বশিষ্ঠকে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে এসো আমার কাছে। সরস্বতী পড়লেন বিপদে। বশিষ্ঠকে যদি বিশ্বামিত্রের হাতে তুলে দেন, তাহলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, আর যদি বিশ্বামিত্রের আদেশ পালন না করেন—তাহলে বিশ্বামিত্র অভিশাপ দেবেন তাঁকে। ভেবে-চিন্তে তাই সরস্বতী বশিষ্ঠকে তাঁর আশ্রম থেকে ভাসিয়ে নিয়ে এলেন বিশ্বামিত্রের সামনে। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে হত্যা করার জন্য একটা উপযুক্ত অস্ত্রের সন্ধান করতে গেলেন। এই ফাঁকে সরস্বতী বশিষ্ঠকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে চললেন পূর্বদিকে। সরস্বতীর এমন বঞ্চনায় ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁকে শাপ দিলেন—তুমি রক্তবহন করবে। বিশ্বামিত্রের শাপে সরস্বতীর জল রক্তের মত লাল হয়ে গেল। এই রক্তবর্ণা সরস্বতী নদীর নাম হল অরুণা। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য মুনি ঋষিরা সরস্বতীকে শাপ মুক্ত করার জন্য তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করেন। মহাদেবের কৃপায় সরস্বতী শাপমুক্ত হন।

কিন্তু সরস্বতীর শাপমুক্তিতে সমস্যায় পড়লেন রাক্ষসরা। সরস্বতীর রক্ত মিশ্রিত জল তাদের প্রিয় পানীয় ছিল। রাক্ষসরা সরস্বতী নদীর কাছে এসে তাঁদের কষ্টের কথা জানালেন। রাক্ষসদের কষ্ট দূর করার জন্য সরস্বতী একটি পৃথক রক্তবর্ণা ধারা রূপেও প্রবাহিত হতে লাগলেন। এই ধারাটিও সরস্বতীর মাহাত্ম্যে একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়।

নমুচি দানবকে বধ করার পর মিত্রবধের পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য ইন্দ্র এই অরুণা নদীতে স্নান করেছিলেন। *[মহা (k) ৯.৪২-৪৩ অধ্যায়; (হরি) ৯.৩৯-৪০ অধ্যায়]*

□ মহাভারতের এই কাহিনী অনুসারে অরুণাকে যেমন সরস্বতীর একটি ধারা বলা হয়, তেমনই পণ্ডিতরা একে সরস্বতীর একটি শাখা নদী

বলেও উল্লেখ করে থাকেন। পণ্ডিত N.L. Dey বর্তমান হরিয়ানার পেহওয়া (Pehawa) বা প্রাচীন পৃথূদকের উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত মার্কণ্ডা নদীটিকে প্রাচীন অরুণা নদী বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত Dey, পণ্ডিত Cunnigham -এর মত উদ্ধার করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

[GDAMI (Dey) p. 11; A. Cunnigham, Report of A Tour in the Punjab in 1878-79, p. 102]

অরুণা$_{৩}$ মহাভারতের বনপর্বে কৌশিকী নদীর উপনদী অরুণার উল্লেখ পাওয়া যায়। অরুণা-কৌশিকীর সঙ্গমকে একটি পবিত্র তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে মহাভারতে। দেবী শক্তি কালিকারূপে এই তীর্থে বিরাজ করেন। পণ্ডিতরা বর্তমান নেপাল থেকে উৎপন্ন গঙ্গার অন্যতম উপনদী কোশীকে প্রাচীন কৌশিকী বলে চিহ্নিত করেন। অরুণা এই কোশী নদীর উপনদী। কোশী এবং তার সাতটি উপনদী একত্রে সপ্তকোশী নামে খ্যাত। অরুণা এই সপ্তকোশীর অন্যতম ধারা।

বর্তমানে এই ধারাটি নেপালে এবং ভারতে 'অরুণা'-র পরিবর্তে অরুণ নামেই পরিচিত। এই নদীটি তিব্বতে উৎপন্ন হয়ে নেপালে প্রবেশ করেছে এবং শেষপর্যন্ত কোশী নদীতে মিলিত হয়েছে।

[Anshul Agarwal, Mukund S. Babel, Shreedhar Maskey, Estimating the Impacts and Uncertainty of Climate Change on the Hydrology and Water Resources of the Koshi River Basin, p. 107]

অরুণা$_{৩}$ ব্রহ্মপুরাণে অরুণা নামে একটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি গৌতমী গঙ্গা বা গোদাবরীর অন্যতম উপনদী। অরুণা এবং বরুণা—এই দুটি নদী একত্রে গোদাবরীতে গিয়ে মিশেছে। এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলকে একটি পবিত্র তীর্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে পুরাণে।

[ব্রহ্ম পু. ৮৯.১, ৪৫-৪৬]

☐ একহাজার খ্রিস্টাব্দে রচিত Sangamner অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপিতে বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চলটিকে অরুণা-বরুণা এবং গোদাবরীর পবিত্র সঙ্গমস্থল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[HPAI (Arya) p. 103]*

অরুণা$_{৪}$ প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি প্রধান নদীর মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.২০.৪]*

অরুণা$_{৫}$ মৌনেয় অপ্সরাদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী ইনি কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে প্রাধার গর্ভজাত অপ্সরা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৫; মহা (k) ১.৬৫.৫০; (হরি) ১.৬০.৫১]

অরুণা-বরুণা সঙ্গম পবিত্র অরুণা ও বরুণা নদী দুটি গৌতমী-গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। এই সঙ্গমস্থলকেই অরুণা-বরুণা সঙ্গম বলা হলেও পদ্মপুরাণ বলেছে যে গোদাবরী (গৌতমী গঙ্গা) অরুণা এবং বরুণার মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে প্রবাহিনী ছিল—অরুণা-বরুণয়োর্মধ্যে যত্র গোদাবরী নদী। এই গৌতমী গঙ্গাই বস্তুত গোদাবরী নদী। গোদাবরীর সঙ্গে অরুণা নদীর সঙ্গমস্থলটি এখনকার মহারাষ্ট্রে নাসিক নামের বিখ্যাত স্থান। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর সঙ্গমনার্ তাম্রশাসনে অরুণা এবং গোদাবরী সঙ্গমস্থলকে তীর্থ বলায় এবং এই সঙ্গমস্থলেই নাসিকের অবস্থিতি হওয়ায় নাসিকই অরুণা-বরুণা-গোদাবরীর সঙ্গম বলে মনে হয়। বরুণা হয়তো খানিক আগে অরুণার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, ফলে তাম্রশাসনটিতে এই নদীর আর পৃথক উল্লেখ করা হয়নি। *[HPAI (Arya), p.103; ব্রহ্ম পু. ৮৯.১, ৪৫-৪৬; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) উত্তরখণ্ড, ১৭৬.৫৯]*

অরুণা-সরস্বতীসঙ্গম এটি একটি নদী-তীর্থ। অরুণা প্রকৃতপক্ষে সরস্বতী নদীর আরেক নাম।

মহান তপস্বীরা একবার সরস্বতী নদীকে বিশ্বামিত্রের দেওয়া রক্ত বহনের শাপ থেকে মুক্ত করে এই নদীর জলকে পুনরায় নির্মল করেছিলেন। এই মুনিশ্রেষ্ঠরাই রাক্ষসগণের মুক্তির জন্য আবার সরস্বতীকে অরুণা নদী রূপে আহ্বান করেছিলেন। সরস্বতী নদীর অরুণা নামে আবির্ভাবের ফলেই এই তীর্থের নাম হয়েছে অরুণা-সরস্বতী সঙ্গম। রাক্ষসরা অরুণায় স্নান ও দেহত্যাগ করে স্বর্গলাভ করে। নদীর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য জানামাত্রই দেবরাজ ইন্দ্র পাপমুক্ত হওয়ার জন্য অরুণায় স্নান করেন। অরুণা নদীতে স্নান করে ইন্দ্র নমুচি হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হন। প্রজাপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্রকে পাপমুক্তির জন্য এই তীর্থে পাঠিয়েছিলেন। বলরাম এই তীর্থে স্নান ও দান করে পুণ্যলাভ করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৩.১৩, ৩০-৩১, ৪১-৪২; (হরি) ৯.৪০.১৩, ২৭-৩০, ৩৭-৪২]

তপস্বীরা ব্রহ্ম-রাক্ষসদের মুক্তি লাভের জন্য অরুণা-সরস্বতী-সঙ্গম তীর্থটি সৃষ্টি করেন। এই পবিত্র তীর্থে স্নান করে ব্রহ্মরাক্ষসরা পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গলাভ করে। বলা হয়, কলিযুগে অধর্মের কালে এই তীর্থে স্নান করলে মুক্তি লাভ হয়।

[বামন পু. ৪০.৪২-৪৫]

অরুণা নদী পেহোয়া বা পৃথূদকের তিন মাইল উত্তর পূর্বে সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিলনস্থলই অরুণা-সরস্বতী সঙ্গম নামে খ্যাত।

[দ্র. অরুণা$_১$]

[GDAMI (Dey) p.11]

অরুণাচল অরুণ নামে পর্বত তীর্থটি কৈলাস পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই পর্বত রুপো দিয়ে তৈরি এমন কথা বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে। শিবের প্রিয় সুন্দর এই পর্বতটি অরুণ পর্বতের নিকটে অবস্থিত।

[বায়ু পু. ৪৭.১৭-১৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. ১.১৮.১৮-১৯]

☐ স্কন্দ পুরাণে এই পর্বতকে অরুণাচল নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সুদৃশ্য এবং পবিত্র পর্বত দেবতাদের আবাস। মহাদেবের একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গ এই পর্বতে রয়েছে। এই শিবলিঙ্গে মহাদেব সর্বদাই বিরাজ করেন। অরুণগিরি বা অরুণাচলে যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্বরা বসবাস করে। এই পর্বত বহুশৃঙ্গ বিশিষ্ট।

☐ এই পর্বত থেকে একটি পবিত্র নদীর উৎপত্তি হয়েছে যা স্বয়ং শিবের পা ধুইয়ে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যেন।

☐ বর্তমানে তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ আরকোট জেলার তিরুভান্নামালাই বা ত্রিনোমালি পাহাড়কেও অরুণগিরি নামে ডাকা হয়। এই পাহাড়ে অরুণাচলেশ্বর এবং অর্ধনারীশ্বর মন্দির অবস্থিত। স্কন্দ পুরাণে এই পাহাড়কে অরুণাচল নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

"তত্র দেবঃ স্বয়ং শম্ভুঃ পর্ব্বতাকারতাং গতঃ।
অরুণাচল সংজ্ঞাবীনন্তি লোকহিতাবহঃ॥"

অর্থাৎ মহাদেব লোকহিতকর রূপে অরুণাচল পর্বতের আকারে এখানে বিরাজ করেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল), ২.৪.
১২-১৩, ২১, ৩৭; ১.২.২-৬৩; ১.৪.৩৭;
EAIG (Kapoor) p.77]

☐ দক্ষিণ ভারতে পঞ্চভূতরূপী শিবের যে মূর্তিগুলি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে অগ্নিরূপী মূর্তিটি অরুণাচলে দেখা যায়।

[EAIG (Kapoor) p.205]

অরুণাস্পদনগর বরুণানদীর তীরবর্তী একটি নগর। এখানে বসবাসকারী এক ব্রাহ্মণ ওষধির বলে অতি অল্প সময়ে সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৬১.৫]*

অরুণি *[দ্র. আরুণি$_৩$]*

অরুণীশতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রে অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্র। অরুণি এই স্থলে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৬০]

অরুণোদা ইলাবৃতবর্ষের পূর্বভাগ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। মন্দর পর্বত থেকে সৃষ্ট এই নদীর মধ্যে দিয়ে পর্বত পাদদেশে অবস্থিত বহু আমগাছের সুমিষ্ট ফলের রস প্রবাহিত হয়—এমন কথা ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে। ভগবতী পার্বতীর অনুচরী যক্ষরমণীরা এই নদীর সুগন্ধময় ধারায় অবগাহন করেন। *[ভাগবত পু. ৫.১৬.১৭-১৮]*

☐ মৎস্য, বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণে অরুণোদাকে নদীর পরিবর্তে মন্দর পর্বতস্থিত একটি হ্রদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হ্রদ বলেই হয়তো 'অরুণোদ'—এই পুংলিঙ্গোচ্চারণে একটি পৃথক পাঠ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পণ্ডিত S.M. Ali অরুণোদকে একটি হ্রদ বলেই মনে করেছেন। *[মৎস্য পু. ১১৩.৪৬;*
বায়ু পু. ৩৬.১৭; GP (Ali) p. 100]

অরুন্তিজ দ্বাদশ মন্বন্তরে যখন রুদ্রসাবর্ণি বা ঋতসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, হরিত তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অরুন্তিজ।

[বায়ু পু. ১০০.৮৮]

অরুন্ধতী মহামুনি বশিষ্ঠের স্ত্রী। পতিব্রতা হিসেবে এতটাই তিনি বিখ্যাত যে, নববধূকে আশীর্বাদ করার সময়ে অনেক সময়েই এই উপমা এসেছে যে, বশিষ্ঠের কাছে অরুন্ধতী যেমন প্রিয়, তেমনই তুমি স্বামীর কাছে প্রিয় হও—

যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্তৃষু।

স্বামীর আস্থাভাজন এক স্ত্রী হিসেবে, কিংবা পরস্পর অচ্ছেদ্য দাম্পত্য সম্পর্কের উদাহরণ

হিসেবে অরুন্ধতীকে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে মহাভারত-রামায়ণে—

* অরুন্ধতী বা সুভগা বশিষ্ঠম্।
* শ্লাঘ্যা বা ব্যপদেশ্যা বা যথা দেবেষ্বরুন্ধতী।
* বিষ্ণুং কীর্তি রুচিঃ সূর্যং বশিষ্ঠং চাপ্যরুন্ধতী।
নৈতাস্তু বিজহত্যেতান্ ভর্তৃন্ দেব্যঃ কথঞ্চন॥

[মহা (k) ১.১৯৯.৬; ৩.১১৩.২৩;
(হরি) ১.১৯২.৬; ৩.৯৪.৬৪;
রামায়ণ ৩.১৩.৭; বায়ু পু. ৩০.৭৩]

☐ অরুন্ধতী দক্ষের কন্যা। যে দশটি কন্যাকে ধর্মের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন দক্ষ, তাঁদের মধ্যে অরুন্ধতী অন্যতমা এবং প্রধানতমা। তবে ধর্মের সঙ্গে অরুন্ধতীর এই বিবাহ বৈবস্বত মন্বন্তরের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন পৌরাণিকেরা এবং মৎস্য পুরাণে এই অরুন্ধতীর গর্ভেই অষ্টবসুর জন্ম—

অরুন্ধত্যা প্রসূতানি ধর্মাদ্ বৈবস্বতে'ন্তরে।
অষ্টৌ চ বসবঃ পুত্রাঃ সোমপাশ্চ বিভোস্তথা॥

এই মৎস্য পুরাণেরই অন্যত্র বলা হয়ে এই পৃথিবীতে যা কিছুই আছে, তা সবই অরুন্ধতীর গর্ভে জন্মেছে—

* পৃথিবীতল-সম্ভূতমরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত।
* পৃথিবীবিষয়ং সর্বমরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত।

ভাগবত পুরাণে আবার অরুন্ধতী প্রজাপতি কর্দম ঋষির কন্যা, দেবহূতির গর্ভে তাঁর জন্ম। কর্দম ঋষি তাঁকে বশিষ্ঠের হাতে তুলে দেন তাঁর বিবাহের পাত্রী হিসেবে। আর একটি পৌরাণিক মতে অরুন্ধতী সোজাসুজি প্রজাপতির কন্যা। প্রজাপতির পুত্র নারদ এবং পর্বত ঋষি, তাঁদের কনিষ্ঠা সহোদরা হলেন অরুন্ধতী। তবে এই প্রজাপতি হয়তো স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা নন। প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র কশ্যপ। সেই কশ্যপ প্রজাপতির দুই পুত্র হলেন নারদ এবং পর্বত এবং কন্যা অরুন্ধতী। স্বয়ং নারদই অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠের সঙ্গে বিবাহ দেন—

কশ্যপান্নারদশ্চৈব পর্বতো'রুন্ধতী তথা।
নারদস্তু বশিষ্ঠায়ারুন্ধতীং প্রত্যপাদয়ৎ॥

বশিষ্ঠের ঔরসে অরুন্ধতীর বিখ্যাত পুত্রের নাম শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর এবং পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

[মৎস্য পু. ২০৩.২; ৫.১৫, ১৯; ২০১.৩০;
বায়ু পু. ৬৬.২, ৩৫; ৬৯.৬৩-৬৫; ৭০.৭৯-৮৪;
ভাগবত পু. ৩.২৪.২৩]

☐ অরুন্ধতীর পাতিব্রত্য এবং তাঁর তপস্যার তেজ এমনই এক পৃথক মর্যাদা তৈরি করেছিল যে, সপ্তর্ষি বা অন্যান্য ঋষিদের স্ত্রীরা কেউই সপ্তর্ষিদের একত্র সহাবস্থানের সময় তাঁদের সঙ্গে পৃথকভাবে উল্লিখিত হননি। কিন্তু অরুন্ধতী আপন মর্যাদাতেই তাঁদের সঙ্গে পৃথক সত্তা সহ একত্র উচ্চারিত সাধ্বী এক রমণী হিসেবে—এখানে 'সাধ্বী' মানে সাধুর স্ত্রী কখনোই নয় এমনকী পতিব্রতা বলে অতিপ্রচলিত অর্থে সাধ্বী নন। তিনি নিজে পৃথকভাবেই এক তপস্বিনী সাধু, 'সাধু'-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সাধ্বী—

কশ্যপো'ত্রির্বশিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজো'থ গৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নিঃ সাধ্বী চৈবাপ্যরুন্ধতী॥

যেখানে, যে প্রসঙ্গে অরুন্ধতীর নাম পৃথকভাবে সপ্তর্ষিদের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে, সেখানে মানুষের কাছে প্রতিগ্রহ না করা এবং সার্বিকভাবে লোভ জয় করার একটা প্রসঙ্গ এসেছিল। একটি কাহিনীতে কীভাবে তাঁরা লোভ ত্যাগ করেছেন, সেটা বলার সময় সাধ্বী অরুন্ধতীর বক্তব্যও সেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বলেছিলেন—ধর্মপালনের জন্য এক পক্ষকাল ধরে যে দ্রব্যসঞ্চয় করা হয়, তার চাইতে পক্ষকাল ধরে তপস্যার সঞ্চয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ—

তপঃসঞ্চয়ো এবেহ বিশিষ্টো দ্রব্যসঞ্চয়াৎ।

[মহা (k) ১৩.৯৩.২১, ৪৯;
(হরি) ১৩.৭৯.২১, ৪৯]

☐ মহাভারতের আদিপর্বে খাণ্ডবদহনের সময় মন্দপাল এবং তাঁর ধর্মপত্নী জরিতার কথোপকথন চলছিল। সেইখানেই একবারের জন্য খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, পতিব্রতা অরুন্ধতী স্বামী বশিষ্ঠকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। বশিষ্ঠ অত্যন্ত বিশুদ্ধ-স্বভাব, সর্বদা প্রিয়জনের হিতকামনা করেন, অন্যদিকে অরুন্ধতীও সর্বদা নিয়ম-ব্রতে জীবন যাপন করেন। সকলের কল্যাণ সাধন করেন, তেমন আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও সপ্তর্ষিগণের মধ্যে বসে থাকা অবস্থায় বশিষ্ঠকে অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত বলে সাময়িক শঙ্কা করেছিলেন। এই সন্দেহ নিতান্তই অমূলক ছিল বলে সেই অন্যায় সন্দেহের কারণে অরুন্ধতীর গায়ের রং খানিক ধোঁয়াটে হয়ে যায়, তাঁর অরুণ-রাঙা গাত্রবর্ণে ধূমের আভাস তৈরি হয়—

অপধ্যানেন সা তেন ধূমারুণসমপ্রভা।

—এর ফলে কখনো তাঁকে পরিষ্কার দেখা যায় আবার কখনো তাঁকে পরিষ্কার দেখা যায় না, এই অবস্থা হয়।

অরুন্ধতীর গাত্রবর্ণে এই যে ধোঁয়াশা-ভাবের কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে, তার পিছনে অরুন্ধতী দেবীর নক্ষত্র পদবী লাভের একটা যোগ আছে। আকাশে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের অবস্থিতি ইংরেজি ভাবনায় Big Dipper (Ursa Major). এই সপ্ত নক্ষত্রের বশিষ্ঠের পর্যায় হল Mizar. এই Mizar এর পাশেই যে স্পষ্টাস্পষ্ট ছোট্ট নক্ষত্রটি তার নাম Alcor—এটাই আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানে অরুন্ধতী। বশিষ্ঠ বা Mizar এর পাশে Alcor বা অরুন্ধতীকে হঠাৎ করে দেখা যায় না, বোঝা যায় না বলেই অরুন্ধতীর গায়ের রং 'ধূমারুণ-সমপ্রভা'।

বস্তুত বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতীকে খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায় না বলে অসামান্য একটি লৌকিক প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে আয়ুর্বেদে একটি মৃত্যুপূর্ব লক্ষণও এই 'ধূমারুণবর্ণা' অরুন্ধতীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়েছে। অরুন্ধতীর নক্ষত্র হয়ে ওঠাটা তাঁর জন্মনক্ষত্রেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। শিব পুরাণের একটি কাহিনীতে 'সন্ধ্যা'র পরিচয় প্রসঙ্গে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা বলেছেন—সন্ধ্যা আমারই মেয়ে, পরবর্তীকালে সে সতীসাধ্বী অরুন্ধতী হয়ে জন্মেছিল মেধাতিথি মুনির ঘরে। তারপর তার বিয়ে হয় মহামুনি বশিষ্ঠের সঙ্গে।

সন্ধ্যার সঙ্গে অরুন্ধতীর এই জন্মান্তরীণ সম্পর্কের মূলে কিন্তু সেই পুণ্য আচার, যেটা সন্ধ্যার আকাশে অরুন্ধতী-দর্শনের মাধ্যমে সংকল্পিত হয়েছে। ব্রহ্মার মেয়ে সন্ধ্যা যখন জন্ম লাভ করেন, তখনই তাঁর রূপ দেখে ব্রহ্মা মোহিত হন। একই সঙ্গে ব্রহ্মার মানস-পুত্ররাও সন্ধ্যার ওপর আসক্ত হয়ে পড়েন। অন্য দিকে কামদেবের অভিসন্ধিতে সন্ধ্যা নিজেও এঁদের ব্যবহারে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মা শেষ পর্যন্ত শিবের ভয়ে নিজেকে সংযত করেন, কিন্তু সন্ধ্যাকেও শিবের ক্রূর পরিহাস শুনতে হয়। ব্রহ্মা কামদেবকে অভিশাপ দেন এবং শিব চলে যান স্ব-ভবনে।

সন্ধ্যা সেই সময় আপন পাপ-শঙ্কায় অতিমাত্রায় অন্তর্জ্বালায় ভুগতে থাকেন। তিনি শরীর বিসর্জন দেবার জন্য চন্দ্রভাগা নদীতে যান। সন্ধ্যার মনের কথা মনে মনে জানতে পেরে ব্রহ্মা তাঁর পুত্র বশিষ্ঠকে পাঠান তপস্যার নিয়ম-বিধি সম্বন্ধে অবহিত করতে। বশিষ্ঠ অন্য মুনির বেশে সন্ধ্যার কাছে যান এবং তাঁকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সন্ধ্যা জটাজুট ধারণ করে কঠোর তপস্যায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট শিব তাঁকে বর দেন। সন্ধ্যা মেধাতিথি মুনির যজ্ঞকুণ্ডে প্রবেশ করেন এবং যজ্ঞাগ্নিতে পূত-পবিত্র-দগ্ধ হয়ে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন। সূর্য সেই সন্ধ্যা-শরীরকে দুই ভাগ করে সকাল এবং বিকেলে সন্ধি-সময়ে প্রতিষ্ঠা করে নিজের রথে স্থান দেন। অন্য দিকে আপন যজ্ঞশেষে যজ্ঞবেদী থেকে মেধাতিথি যে সোনার বরণ কন্যাটিকে পান, ঋষি তাঁর নাম দেন অরুন্ধতী। যেহেতু কোনো অনুরোধেই তিনি তাঁর কর্তব্য-কর্ম থেকে চ্যুত হননি (ন রুন্ধতি), তাই তাঁর নাম হয় অরুন্ধতী। মেধাতিথিই অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠের সঙ্গে বিয়ে দেন। এই কাহিনীতে সন্ধ্যার প্রাধান্য অরুন্ধতীকে সান্ধ্যসময়ে দ্রষ্টব্য নক্ষত্রের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। *[Siva Purana (J.L. Shastri), Vol. I. Chapters 5-7]*

☐ নতুন বিয়ের পর নববধূকে সন্ধ্যা-বেলায় অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করানোর একটি নিয়ম আছে। উদ্দেশ্য, নববধূ অরুন্ধতীর মতো একনিষ্ঠা পত্নী এবং স্বামীর আস্থাভাজন হবেন। অরুন্ধতীকে এক নজরে চেনানো যায় না বলেই প্রথমে সপ্তর্ষিমণ্ডলের স্থূল নক্ষত্রগুলিকেই অরুন্ধতী বলে চেনাতে চেনাতে অবশেষে বশিষ্ঠের পাশে সূক্ষ্মভাবে স্থিতা অরুন্ধতীকে চিনিয়ে দিতে হয়। এই প্রথা থেকেই যে লৌকিক ন্যায় তৈরি হয়েছে, তার নাম 'অরুন্ধতী-দর্শন ন্যায়'। শংকরাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই অরুন্ধতী দর্শন ন্যায়ের প্রসঙ্গ তুলেই স্থূল বস্তু থেকে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম আত্মবস্তুকে বুঝে নেবার কথা বলেছেন।'

অস্পষ্ট-স্বভাব অরুন্ধতী-নক্ষত্রকে অস্পষ্ট দেখার আর একটি নিদান আছে। মহাভারতে মৃত্যুর পূর্বে যেসব দুর্লক্ষণের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা যে, কোনো মানুষ আগে সঠিকভাবেই অরুন্ধতী-নক্ষত্রকে খালি চোখে দেখতে পারত বা চিনিয়ে দিতে পারত, সে যদি আর অরুন্ধতীকে খালি চোখে দেখতে না পায়,

যদি অরুন্ধতী-নক্ষত্রকে পৃথকভাবে চিনতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে মৃত্যুর পূর্বে তার চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেছে, অরুন্ধতী দর্শনের ক্ষেত্রে চক্ষু জ্যোতির এই নিষ্প্রভতা মৃত্যুর একটা লক্ষণের মধ্যে পড়ে—

যো'রুন্ধতী ন পশ্যেত দৃষ্টপূর্বাং কদাচন।
অরুন্ধতীং ধ্রুবং চৈব সোমচ্ছায়াং মহাপথম্।
যো ন পশ্যেৎ স নো জীবেন্নরঃ
সংবৎসরাৎ পরম্॥

[মহা (k) ১.২৩৩.২৭-২৯; ১২.৩১৭.৯;
(হরি) ১.২২৬.২৮-৩০; ১২.৩০৭.৮-৯;
ব্রহ্মসূত্র ১.১.৮ এবং ১.১.১২ শংকরভাষ্য দ্রষ্টব্য]

☐ অরুন্ধতীর সতীত্বের শক্তি নিয়ে বহুতর কাহিনী আছে। তার মধ্যে প্রধান কাহিনীটি স্বাহা এবং অগ্নির প্রসঙ্গে উচ্চারিত। অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষিরা একসময় ইন্দ্রাদি দেবতাদের উদ্দেশে আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেন। ঋষিদের এই ক্রিয়াকলাপের সময় সপ্তঋষির পত্নীরা তাঁদের সঙ্গে বসে ছিলেন। অগ্নি এই সময় ঋষিপত্নীদের রূপ দেখে মোহিত বোধ করেন। ঋষি পত্নীদের আরও ভালোভাবে বেশি দিন ধরে দেখার জন্য অগ্নি ঋষিদের গার্হপত্য অগ্নিস্থানে প্রবেশ করেন। কেননা গার্হপত্য অগ্নিই ঋষিদের ঘরে বিবাহের পর থেকে দিবানিশি জ্বলতে থাকে। অগ্নি গার্হপত্যের স্থান থেকে ঋষিপত্নীদের অলক্ষ্যে তাঁদের নিরন্তর দেখতে দেখতে কামার্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারেন যে, তিনি চাইলেও এই সাধ্বী-সতী ঋষিপত্নীরা কখনোই তাঁর সঙ্গে মিলনে প্রস্তুত হবেন না। নিজের কামনা এইরকম অনিবার্য ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় অগ্নি বনে গিয়ে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেন।

এই ঘটনাটা দক্ষকন্যা স্বাহা-দেবীর নজরে পড়ে। স্বাহা সব সময়েই অগ্নিকে স্বামী হিসেবে কামনা করতেন এবং সব সময় তাঁর গতিবিধি খেয়াল করতেন। সপ্তর্ষিপত্নীদের প্রতি অগ্নির দুর্বার কামনা লক্ষ্য করে স্বাহা দেবী সপ্তর্ষিপত্নীদের প্রত্যেকের রূপ ধারণ করে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হবার প্রয়াস করেন। এই প্রয়াস তাঁর সফল হল অতিসহজে, কিন্তু সপ্তর্ষিপত্নীদের মধ্যে ছয়জনের রূপ ধারণ করে তিনি অগ্নির সঙ্গে সঙ্গত হলেও স্বাহা অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করতে পারলেন না। অরুন্ধতীর তপস্যার শক্তি এবং স্বামী বশিষ্ঠের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতার কারণে দাক্ষায়ণী স্বাহার পক্ষেও অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করা সম্ভব হল না—

দিব্যরূপম্ অরুন্ধত্যাঃ কর্তুং ন শকিতং তয়া।
তস্যাস্তপঃপ্রভাবেণ ভর্তৃশুশ্রূষণেন চ॥

এই ঘটনা যেন পরোক্ষে প্রমাণ করে যে, সপ্তর্ষিদের অন্যান্য পত্নীরা যথেষ্ট সতী-গুণ সম্পন্না হলেও তাঁরা অগ্নিদেবের শক্তি-মাহাত্ম্যে কোনো ভাবে অভিভূত হতে পারতেন, কিন্তু অরুন্ধতীকে কোনোভাবেই লঙ্ঘন করা সম্ভব ছিল না। এতটাই তাঁর সতীত্বের তেজ যে, সপ্তর্ষি পত্নীরা অগ্নির সঙ্গে সঙ্গত হয়েছেন—এই কপট সংবাদ ঋষিদের কাছে এসে পৌঁছোলে ছয় ঋষি তাঁদের পত্নীদের ত্যাগ করেন বলে বলা হয়েছে মহাভারতে, কিন্তু বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে ত্যাগ করার কথা মুখেও আনেননি। কারণ অসম্ভাবের সমস্ত অসম্ভাব্যতার নামই অরুন্ধতী—

তত্যজুঃ ষট্ তদা পত্নীর্বিনা দেবীমরুন্ধতীম্।

ঠিক একই রকম কাহিনী শিবকে নিয়েও আছে। কামদেবের ভয়ে ভীত শিব দারুবনে এসে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করলে মুনি-পত্নীরা অনেকেই শিবের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া এবং বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী—এঁরা স্বামী ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করেননি—

ঋতে ত্বরুন্ধতীমেকাম্ অনসূয়াঞ্চ ভামিনীম্।

[মহা (k) ৩.২২৩.২৬-৪২; ৩.২২৪.১-১৫;
৩.২২৫.৮-৯; (হরি) ৩.১৮৬.৪০-৫৬;
৩.১৮৭.১-১৪; ৩.১৮৮.৭;
বামন পু. (Anandaswarup) ৬.৬২]

☐ অরুন্ধতীর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষমতা নিয়েও একটি কাহিনী আছে মহাভারতের বনপর্বে। ঋষি ভরদ্বাজের কন্যা শ্রুতাবতী সরস্বতী নদীর তীরভূমিতে এক জায়গায় কঠোর তপস্যা করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বামী হিসেবে পাবার জন্য। ইন্দ্র ঋষি বশিষ্ঠের বেশে শ্রুতাবতীকে দেখা দিয়ে তাঁর হাতে পাঁচটি বদর (কুল) দিয়ে সেটা জলে পাক করতে বললেন। শ্রুতাবতী সেই নিয়ম-ব্রত রক্ষা জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন নিজের শরীর ক্ষয় করে। কিন্তু সেই বদর আর পক্ব হল না। ইন্দ্র তাঁকে দেখা দিয়ে

স্বর্গলোকে তাঁর সঙ্গে চিরমিলনের ব্যবস্থা করেন। শ্রুতাবতীর এই তপস্যার স্থানটির নাম হল বদরপাচন তীর্থ।

শ্রুতাবতীর এই কৃচ্ছ্রসাধন এবং তাতে সেই তীর্থনামের প্রসঙ্গেই কিন্তু অরুন্ধতীর কৃচ্ছ্রসাধনের কাহিনী প্রস্তুত হয়। কোনো এক সময় এইস্থানেই সপ্তর্ষিরা অরুন্ধতীকে রেখে ফল-মূল আহরণ করার জন্য হিমালয়ে গিয়েছিলেন। তখন একটা অনাবৃষ্টির কাল চলছিল সেখানে এবং সেটা প্রায় বারো বছর ধরে চলছিল। সেইজন্যই হয়তো অরুন্ধতীকে রেখে সপ্তর্ষিদের হিমালয়ে যাওয়া। এদিকে অরুন্ধতী একা রয়েছেন, সেই সময় ভগবান শিব ব্রাহ্মণের বেশে অরুন্ধতীর কাছে উপস্থিত হলেন। শিব ভিক্ষা চাইতেই অরুন্ধতী বললেন—ঘরে খাবার-দাবার কিছুই নেই, কতগুলি বদর আছে, তুমি তাই খাও—

ক্ষীনো ঽন্নসঞ্চয়ো বিপ্র বদরাণীহ ভক্ষয়।

শিব বললেন—তাহলে এগুলি আমাকে পাক করে দাও। অরুন্ধতী আগুনে বদর চাপালেন পাক করতে। কিন্তু বদর আর পক্ব হয় না। দিনের পর দিন যায়, অরুন্ধতী না খেয়ে থাকেন, বদর পাক করেন আর ব্রাহ্মণবেশী শিবের কাছে নানা কথা শোনেন—

অনশ্নন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ শৃণ্বন্ত্যাশ্চ কথাঃ শুভাঃ।

বহু কাল চলে গেল এইভাবে। কিন্তু তত দিনে—বস্তুত অরুন্ধতী বদর-সেদ্ধ উনুনে চাপানোর পরেই অনাবৃষ্টি দূর হয়ে বৃষ্টি এসে গেছে। কিন্তু তবু ব্রাহ্মণকে বদরগুলি সেদ্ধ করে দিতে হবে, অথচ সেগুলি কিছুতেই সেদ্ধ হচ্ছে না, অরুন্ধতীও তাঁর নিষ্ঠা ছাড়ছেন না—ততদিনে সপ্তর্ষিরাও ফল-মূল আহরণ করে ফিরে এলেন আশ্রমে। এবার শিব ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করে স্বরূপে দেখা দিয়ে সপ্তর্ষিদের বললেন—তোমরা হিমালয়ে গিয়ে অনেক তপস্যা করে তপস্যার যে ফললাভ করেছো, অরুন্ধতীর কৃচ্ছ্রসাধন এবং তপস্যার কাছে তা কিছু নয়—

অস্যাস্তু যত্তপো বিপ্রা ন সমং তন্মতং মম।

ইনি না খেয়ে না দেয়ে শুধু আমি বলেছি বলে এই বদরগুলি সুসিদ্ধ করার চেষ্টায় প্রায় বারো বছর কাটিয়ে দিলেন।

ভগবান শিব অরুন্ধতীকে বর চাইতে বললেন তাঁর কাছে। অরুন্ধতী বললেন—তুমি যদি এতই প্রীত হয়েছো, ভগবান। তাহলে এই কৃপা করো যাতে এই স্থানটি বদরপাচন তীর্থ নামে পরিচিত হয় এবং লোকে এখানে এসে তিন রাত্রি ব্রত-উপবাস করলেই যেন বারো বছরের তপস্যার ফল পায়। শিব-মহাদেব সেই বর দিয়ে চলে গেলেন। সপ্তর্ষিরা অরুন্ধতীর তপঃক্লিষ্ট চেহারা দেখে অবাক হলেন। কোথাও তাঁর মলিনতা নেই, সেই অশ্রান্ত ভাব এবং ক্ষুধা-পিপাসা সয়ে থাকলেও তাঁর শরীরে কোনো ক্লিষ্ট চিহ্ন থাকে না। অরুন্ধতী এই সিদ্ধিটাই লাভ করেছেন, এটাই তাঁর তপস্যার সিদ্ধি—

এবং সিদ্ধিং পরা প্রাপ্তা অরুন্ধত্যা বিশুদ্ধয়া।

অবশেষে বদরপাচন-তীর্থের নাম-বিষয়ে এটাই কৌতূহল আমাদের যে, এই নামটি অরুন্ধতীরই তপস্যার ফল, ইন্দ্র শ্রুতাবতীর কাছে বদর-পাকের ঘটনা পুনরাবৃত্ত করেছেন মাত্র এবং তিনিই শ্রুতাবতীর কাছে অরুন্ধতীর তপঃকৃচ্ছ্রতার কথা বলেন।

[মহা (k) ৯.৪৮.১-৫৬; (হরি) ৯.৪৪.১-৫৭]

□ অরুন্ধতীর জীবন-যাপনের তথ্যে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল 'অক্ষমালা' নামে তথাকথিত এক অন্যা রমণীর নাম। বশিষ্ঠের অতিবিশ্বস্ত স্ত্রী হিসেবে তিনিও পরিচিত। মহাভারতের গালব-চরিত নামে যে উপপর্ব আছে উদ্যোগপর্বে, সেখানে অতিসুখী এবং অতিবিশ্বস্ত পারস্পরিক দাম্পত্যের উদাহরণ হিসেবে কতগুলি বিখ্যাত নাম আছে। সেই নামগুলি মহাভারতে 'কনভেনশনাল' উদাহরণ হিসেবেই উচ্চারিত এবং সেই নামগুলি এইরকম—লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণ, রুদ্রের সঙ্গে রুদ্রাণী, চ্যবনের সঙ্গে সুকন্যা, অগস্ত্যের সঙ্গে লোপামুদ্রা, ভৃগুর সঙ্গে পুলোমা, কিংবা কশ্যপের সঙ্গে অদিতি। এই দম্পতিদের মধ্যে অন্যতম নাম কিন্তু বশিষ্ঠ এবং অক্ষমালা—বশিষ্ঠশ্চাক্ষমালয়া।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল—যে মনু-মহারাজকে আমরা ভীষণই রক্ষণশীল এক ব্যক্তিত্ব মনে করি, তিনি কিন্তু অক্ষমালার সঙ্গে বশিষ্ঠের সম্বন্ধটা একটি বিশেষ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মনুর প্রসঙ্গ ছিল—স্ত্রীলোক যে পুরুষের সঙ্গে স্বামী-সম্বন্ধে আবদ্ধ হবে, সে পুরুষ যদি ভালো হয়, তবে

স্বামীর ভালো গুণগুলি তার স্ত্রীর মধ্যে সংক্রমিত হবে, আর পুরুষটি যদি খারাপ হয় তবে তার মন্দ গুণগুলিও স্ত্রীর মধ্যে প্রবেশ করে—ঠিক যেমন কোনো নদীর জল স্বচ্ছ-স্বাদু হলেও সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হলে সে জল লবণাক্ত এবং আবিল হয়ে পড়ে।

এখানে স্বামীর গুণে গুণী হয়ে ওঠার উদাহরণ হলেন অক্ষমালা। মনু বলছেন—অক্ষমালা শূদ্র-চণ্ডালের মতো অধম জাতিতে জন্ম লাভ করেও বশিষ্ঠের স্ত্রী হওয়া ফলে তিনি সর্বলোকে পূজ্য হয়ে উঠেছিলেন, আর মহাভারতে সেই চটক পক্ষী শারঙ্গী জরিতা যিনি ঋষি মন্দপালের সান্নিধ্যে এসে বিখ্যাত হলেন—

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্॥

মনুসংহিতার মতো এক পুরাতন স্মৃতিগ্রন্থে যখন অক্ষমালার হীনজাতিত্ব নিয়ে একটা ঘোষণা আছে এবং একই সঙ্গে বশিষ্ঠের স্ত্রী বলেও তাঁর ঘোষণা, সেখানে অরুন্ধতীর ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠে পড়ে। ব্যাপারটা আরও বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে যখন খ্রিস্টীয় প্রথম/দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত কাব্যে বিখ্যাত পৌরাণিক চরিত্র এবং তাঁদের নাম উল্লেখ করে হীনজাতীয় স্ত্রীদের প্রতি তাঁদের আকর্ষণের একটা তালিকা দেন। অশ্বঘোষ সেই তালিকায় পর পর লিখেছেন—পরাশর মুনি যমুনা পার হতে গিয়ে কালীর (সত্যবতীর) সঙ্গে সঙ্গত হলেন, আর বশিষ্ঠ মুনি অতিগর্হিত জাতির কন্যা মাতঙ্গী অক্ষমালার সঙ্গে মিলিত হয়ে শুধুমাত্র রিরংসাবশতই কপিঞ্জলাদ (বা কপিঞ্জল) নামে একটি পুত্র লাভ করলেন—

মাতঙ্গ্যাম্ অক্ষমালায়াং গর্হিতায়াং রিরংসয়া।
কপিঞ্জলাদং তনয়ং বশিষ্ঠো'জয়ন্ মুনিঃ॥

[মহা (k) ৫.১১৭.১১; (হরি) ৫.১০৮.১১;
মনুসংহিতা ৯.২৩;
বুদ্ধচরিতম্ (Nandargikar) ৪.৭৭, পৃ. ৫৪]

□ মনু এবং অশ্বঘোষের এই বক্তব্য অবশ্যই আমাদের স্কন্দ পুরাণের একটি কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে বলা হচ্ছে—পুরাকালে সতীধর্ম পরায়ণা এক চণ্ডাল-কন্যা ছিলেন, তাঁর নাম অক্ষমালা—

আসীৎ পুরা মহাদেবি সতী চাধমযোনিজা।
অক্ষমালেতি বৈ নাম্না সতীধর্মপরায়ণা॥

একসময় হঠাৎ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে ঋষিরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে এক চণ্ডালের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। সেই চণ্ডালের বাড়িতে গোলাভরা ধান ছিল। ঋষিরা সেটা জানতে পেরে চণ্ডালের কাছে ক্ষুধার অন্ন প্রার্থনা করলেন। এমনও বললেন—এই দুর্ভিক্ষের সময়ে যার ঘরে এইরকম ধান আছে, তাকে কী আর অন্ত্যজ বলা যায়? আমরা বুঝতে পারি, ব্রাহ্মণদের মুখে এমন অভাবিত অন্ত্যজ-প্রশংসা নিতান্তই আপদ কালে খাওয়ার প্রয়োজনে। সে-কথা বোধ চণ্ডাল মানুষটিও বুঝতে পারল এবং শূদ্রান্ন-ভোজন, অন্ত্যজ মানুষের দেওয়া খাবার খেলে ব্রাহ্মণ ঋষিরা যে কোন নরকে যাবেন, সেসব কথা চণ্ডাল সেইভাবেই বলল, যেমনটি অন্য সময় ব্রাহ্মণেরা সধিক্কারে বলে থাকেন। ঋষিরা অবশ্য চণ্ডালের ধর্মোপদেশে কোনো কানই দিলেন না, বরঞ্চ আপদ-বিপদের কালে শরীররক্ষার জন্য কত অধর্মও যে ধর্ম হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে মুনি-ঋষিদের নানা ব্যবহারের উদাহরণ দিয়ে পুনরায় অন্নভিক্ষা চাইলেন—

দদস্বান্নং দদস্বান্নমস্মাকমিহ যাচতাম্।

চণ্ডাল এবার বলল—ঠিক আছে, আমি আপনাদের ক্ষুধার অন্ন দেব। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে। আমার অক্ষমালা নামে একটি কন্যা আছে। আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ, তিনি আমার এই কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। তারপর আমি আপনাদের সম্বচ্ছরের অন্ন দেব। চণ্ডালের অনুরোধ-ঘোষণা শুনে ঋষিরা একটু বিচলিত হলেন বটে, কিন্তু তারপর যথাযোগ্য আলোচনা করে মহামতি বশিষ্ঠকে রাজি করালেন অক্ষমালার পাণিগ্রহণ করার জন্য। বশিষ্ঠ বিপন্ন সময় বুঝে আপদ্ধর্মের বিবেচনায় চণ্ডালকন্যা অক্ষমালাকে বিবাহ করলেন—

বশিষ্ঠো'পি সমাখ্যায় আপদ্ধর্মং মহামনাঃ।
কালস্যানন্তরপ্রেক্ষী প্রোদ্‌ববাহান্ত্যজাঙ্গনাম্॥

এই কাহিনী উচ্চারণ করার পর স্কন্দপুরাণ বলেছে—তারপর অক্ষমালা যখন আপন তপস্যা এবং সতীধর্মের তেজে সূর্যতেজ রোধ করেছিলেন (রুধ্ ধাতু/রুন্ধ্ ধাতু), তখন থেকে তাঁর নাম হয় অরুন্ধতী—

যদা স্বকীয়তেজোভিরর্কবিম্বমরুন্ধত।
অরুন্ধতী তদা জাতা দেবদানব-বন্দিতা॥

এর পরেই স্কন্দ পুরাণ কিন্তু মনুসংহিতার সেই যুক্তি উল্লেখ করে মনুর কথিত সেই শ্লোকটিও উদ্ধার করেছে সেই মর্মে যেখানে স্বামীর গুণ স্ত্রীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তাতেই অক্ষমালা অরুন্ধতী হয়ে উঠেছেন তপস্যায় সতীত্বে।

[স্কন্দ পু. (নবভারত) প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র ১২৯.৪-৩৭]

☐ অক্ষমালার অর্কবিম্ব রোধ করার কাহিনীর সঙ্গে সন্ধ্যার কাহিনীর অন্তর্গতি যোগ আছে এবং সন্ধ্যাকালে অরুন্ধতী-দর্শনের প্রক্রিয়াও অরুন্ধতীর নক্ষত্র-যোগ সপ্রমাণ করে তোলে। এক্ষেত্রে এটাও লক্ষণীয়, সপ্তর্ষিগণের অন্যতম বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী-নক্ষত্রের অস্পষ্টতা এবং ক্ষুদ্রতাই অক্ষমালারূপী অরুন্ধতী হীনজাতিত্বের প্রতীক বহন করে কিনা সেটা পণ্ডিতদের বিচার্য্য বিষয়। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে অক্ষমালা মাতঙ্গীর হীনজাতি-ভাবনাকে পণ্ডিত টীকাকারেরা ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অক্ষমালা অবশ্যই অরুন্ধতী। এখানে 'অক্ষ' মানে সপ্তর্ষিদের নক্ষত্র-চক্র বা নক্ষত্র-বৃত্ত। অরুন্ধতী নক্ষত্র উত্তর গগনে শোভিত সপ্তর্ষি-মণ্ডলে বশিষ্ঠের পাশে থাকেন, যেন সপ্তর্ষি-চক্রের মালায় তিনিই সবচেয়ে উজ্জ্বল 'লকেটে'র মতো—'নক্ষত্র-চক্রভূষণম্'। লক্ষণীয়, বশিষ্ঠের জ্যোতির্বৈদিক নাম যে Mixar তার অর্থ কিন্তু waistband বা gindle অর্থাৎ এখানেও একটা অক্ষ-চক্রের ভাব আছে, তাতে Alcor বা অরুন্ধতী সেই অক্ষমালার ভূষণ-মণির মতো 'সা হি উত্তরস্যাং দিশি গগনে সপ্তর্ষিমণ্ডলচক্রে বশিষ্ঠ সমীপে মালারূপেণ বর্ততে, সর্বেভ্যশ্চ উজ্জ্বলত্বাত্ তস্যা মালারূপেণ স্থিতত্বাচ্চ নক্ষত্রচক্রভূষণম্। অক্ষস্য নক্ষত্রচক্রস্য মালেব ভূষণত্বাদ্ অক্ষমালা।

[Buddha-charitam (Nandargikar), Notes, p. 49, on 4.77]

অরুন্ধতীবট এই নামের একটি তীর্থ আছে। এই তীর্থে গমন করলে পুণ্যফল লাভ হয়।

[মহা (k) ৩.৮৪.৪১; (হরি) ৩.৬৯.৪১]

অরূপ একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বায়ু পুরাণ এঁর পরিচয় দিয়েছে ভৃগুবংশীয় ঋষি হিসাবে।

[বায়ু পু. ৫৯.৯৭]

অরূপা অরিষ্টার গর্ভজাত আটজন বিশিষ্ট অপ্সরার মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬৯.৪৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৩]*

মহাভারতে অপ্সরা অরূপাকে (পাঠান্তরে অনূপা) কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা প্রাধার গর্ভে জাত কন্যা বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১.৬৫.৪৬; (হরি) ১.৬০.৪৭]

অরূপি একজন ঋষি। পুরাণে যেসব ঋষি বংশের নাম ভার্গব গোত্র প্রবর্তক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে, ঋষি অরূপির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৪-৩৫]*

অরূরু কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনায়ুষার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ধুন্ধু নামক মহাবীর অসুরের পিতা ছিলেন। *[বায়ু পু. ৬৮.৩০-৩১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৩১]*

অরোগা দেবী শক্তির একটি রূপ। দেবী শক্তি বৈদ্যনাথে অরোগা নামে পূজিতা।

[মৎস্য পু. ১৩.৪১]

অরৌদ্র ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১০; (হরি) ১৩.১২৭.১১০]*

অর্ক$_১$ অর্চ্ ধাতুর অর্থ অর্চনা করা, স্তুতি করা, এই অর্থেই অর্ক-শব্দের সাধারণ অর্থারম্ভ। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে অর্চনা করার যোগ্য বা অর্চনীয় অর্থেই অর্ক-শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। মধুচ্ছন্দা ঋষির ইন্দ্রস্তুতিতে প্রথম পংক্তিটি হল—

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণো অর্চন্ত্যর্কম্ অর্কিনঃ।

এর অর্থ—হে ইন্দ্র! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চকেরা অর্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চনা করে। এখানে ক্রিয়াপদে অর্চ্ ধাতু (অর্চন্তি) ব্যবহার করার পর সেই ধাতু-জাত শব্দ অর্ক বলতে অর্চনীয় বলা হয়েছে। আবার যাঁরা অর্চনা করেন এই অর্থে 'অর্কিন্' (মন্ত্রে বহুবচনে অর্কিনঃ') শব্দ প্রয়োগ করে 'অর্ক' শব্দের অর্থে 'অর্চনীয়'-তার বোধটাকেই বড়ো করে তুলেছে। সেইকালে বৈদিক শব্দকোষ-প্রণেতা যাস্ক অর্ক-শব্দের নিরুক্তি-নির্ণয় করে লিখেছেন—অর্ক মানেই দেবতা, কেননা দেবতাকেই অর্চনা করা হয়। অর্ক বলতে মন্ত্র বোঝায়, কেননা মন্ত্রের দ্বারা দেবতাকে অর্চনা করা হয়। অর্ক বলতে খাদ্য অন্ন বোঝায়, কেননা অন্নের দ্বারাই সমস্ত প্রাণীকে সেবা করা যায়। আবার অর্ক মানে বৃক্ষও বটে

এবং বৃক্ষ হিসেবে তা কটুভাবের জন্যই নিতান্তই প্রসিদ্ধ—অর্কো দেবো ভবতি। যদেনমর্চন্তি। অর্কো মন্ত্রো ভবতি। যদনেনার্চতি। অর্কমন্নং ভবতি। অর্চন্তি ভূতানি। অর্কো বৃক্ষো ভবতি। সংবৃত্তঃ কটূকিম্না।

[দ্র. নিরুক্ত (Sarup) ৫.৪, পৃ. ৯৫]

অর্ক যে অর্থে বৃক্ষকে বোঝাচ্ছে তাতে কথ্য বাংলায় এটি 'আকন্দ' হওয়াই সম্ভব। অথর্ববেদোক্ত (৬.৭২.১) বৃক্ষ অর্থে অর্ক শব্দটিকে ধরে পণ্ডিতেরা এর নামকরণ করেছেন—**colotropis gigantia.**

[দ্র. Atharva-veda samhita, Trans. by W. D. Whitney, 6.72.1, P. 335; Vedic Index, vol. I, P. 36]

অর্ক$_{৩}$ অর্চ্-ধাতুর সঙ্গে ঘঞ্-প্রত্যয় করে 'ক'—আদেশে 'অর্ক'-অর্চনীয়। সেই কারণেই এটি বৈদিককালের প্রথম অর্চনীয় সবিতৃ সূর্যের এক নাম এবং তিনি প্রথম থেকেই অর্চনীয় হয়ে উঠেছেন মানুষের কাছে। সূর্যের অষ্টোত্তর শতনামের একটি, যা ধৌম্য পুরোহিত বর্ণনা করেছিলেন। সূর্যের সাঁইত্রিশটি নামের মধ্যে অন্যতম নাম হিসেবে অমরকোষে ধৃত হয়েছে। অমরসিংহ নানার্থবর্গে লিখেছেন অর্ক বলতে বোঝায় স্ফটিক এবং সূর্যকে—

অর্কঃ স্ফটিক-সূর্যয়োঃ। *[দ্র. অমরকোষ, ১ (দিগ্‌বর্গ). ২৯; ৩ (নানার্থবর্গ). ৪]*

□ যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনকের সঙ্গে কথা বলার সময় জানিয়েছেন যে, তিনি সূর্যরূপী অর্কের কাছে পনেরোটি যজুর্বেদের মন্ত্র লাভ করেছিলেন—

দশ পঞ্চ চ প্রাপ্তানি যজূংষ্যর্কাম্ময়ানঘ।

অবশ্য এখানে অর্কশব্দটা সূর্যের পর্যায়-বাচকমাত্র, কোনো বিশেষ অর্থে এখানে ব্যবহৃত নয়। *[মহা (k) ১.১.৪২; ৩.৩.১৬; ১২.৩১৮.২১; (হরি) ১.১.৪২; ৩.৩.১৬; ১২.৩০৮.২১; ভাগবত পু. ৩.২১.৫১]*

অর্ক$_{৩}$ বিষ্ণু সহস্রনামের মধ্যে একতম বিষ্ণু-নাম এবং এই নামটিও বিষ্ণুর অর্চনীয়ত্ব সূচনা করে। সূর্যের সঙ্গে বিষ্ণুর একাত্মতা বেদ-প্রসিদ্ধ। নারায়ণ-বিষ্ণুর ধ্যান মন্ত্রে বিষ্ণুর আবাহন হয়—

'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী' বলে।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯৮; (হরি) ১৩.১২৭.৯৮]

অর্ক$_{৪}$ বিশাল সমৃদ্ধি লাভ করেও অবশেষে মারা গেছেন—এইরকম পুরাতন কীর্তিশালী রাজাদের নাম করার সময় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অর্ক-নামে এক প্রাচীন রাজার নাম করেন সঞ্জয়।

[মহা (k) ১.১.২৩৬; (হরি) ১.১.১৯৭]

অর্ক$_{৫}$ মহাভারতের অংশাবতরণ অধ্যায়ে একজন অর্কের নাম পাওয়া যায়। তিনি পূর্বে অর্ক নামে শ্রেষ্ঠ এক দানব ছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের কালে ঋষিক নামে এক রাজর্ষি হয়ে জন্মান।

[মহা (k) ১.৬৭.৩২-৩৩; (হরি) ১.৬২.৩৩]

অর্ক$_{৬}$ একজন বানর যূথপতি। লঙ্কাযুদ্ধের সময় রামচন্দ্র যখন দক্ষিণদিকে সসৈন্য যাত্রা করেছিলেন, তখন তিনি পনস, কেশরী ও গজ—এই তিন সহচরের সঙ্গে মিলিতভাবে সেনাবাহিনীর একটি দিক রক্ষা করেছিলেন।

[রামায়ণ ৬.৪.২৩, ৩৩]

অর্ক$_{৭}$ ভাগবত পুরাণ-মতে অর্ক অষ্ট-বসুর অন্যতম বসু। তাঁর স্ত্রীর নাম বাসনা। তাঁদের ছেলের নাম তর্ষ। *[ভাগবত পু. ৬.৬.১১, ১৩]*

অর্ক$_{৮}$ ভাগবত পুরাণ-মতে অজমীঢ়ের-বংশে অজমীঢ়ের এক পত্নী নীলিনীর গর্ভে নীল নামে যে পুত্র হয়, তাঁর পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজ, তাঁর পুত্র অর্ক। অর্কের পুত্রের নাম ভর্ম্যাশ্ব। *[ভাগবত পু. ৯.২১.৩০-৩১]*

অর্ক$_{৯}$ বায়ুপুরাণে দেবাবৃধ, বৃষ্ণি—এঁদের বংশ-বিবরণ দেবার এক অর্কবংশের কথাও বলা হবে বলে লোমহর্ষণ সূত প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই অর্ক-বংশ সূর্যবংশও হতে পারে, আবার মথুরা-দ্বারকার যদু-বৃষ্ণি-দেবাবৃধদের একজনের বংশও হতে পারে। *[বায়ু পু. ১.১৪৫]*

অর্ক$_{১০}$ পাক যজ্ঞে যে অগ্নি জ্বলে, সেই অগ্নির নাম সবন। সেই অগ্নির পরম্পরায় বিবিচি-নামে অগ্নি প্রায়শ্চিত্ত-হোমের অগ্নি। এই 'বিবিচি' থেকেই অন্যতর এক অগ্নির জন্ম যাকে অর্ক বলা হয়। তারও অনেকগুলি ছেলে—অনীকবান্, রক্ষোহা, পিতৃকৃৎ ইত্যাদি। বস্তুত যজ্ঞের সময় একটি যজ্ঞবেদির যজ্ঞাগ্নি নিয়ে অন্য একটি হোমকুণ্ডে বা অগ্নিকুণ্ডে স্থাপন করার ফলেই বোধহয় অগ্নির এই সন্তান-পরম্পরা।

[বায়ু পু. ২৯.৩৯-৪০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.৪২-৪৩]

অর্কজ$_{১}$ যে সমস্ত দুর্বৃত্ত রাজারা অহংকারী হয়ে নিজেদের স্বজন-জ্ঞাতিদের উচ্ছিন্ন করে

দিয়েছিলেন ভীম তাঁদের নাম উল্লেখ করেন দুর্যোধনের জ্ঞাতিচ্ছেদী ভাবের প্রসঙ্গে—যে সমুচ্চিচ্ছিদুর্জ্ঞাতীন্ সুহৃদশ্চ সবান্ধবান্। আঠারো জন এইরকম দুর্বৃত্ত রাজার নাম করার সময় 'বলীহা' নামে এক জনজাতির উল্লেখ করে ভীম বলেন—বলীহাদের মধ্যে অর্কজ তাঁর জ্ঞাতি-বন্ধু-সুহৃদদের ধ্বংস করে দুর্নাম কিনেছেন—অর্কজশ্চ বলীহানাম্। আধুনিক গবেষণায় এই 'বলীহা' কারা ছিলেন তা চিহ্নিত করা সম্ভব না হলেও ভীম তাঁদের অসুর বলায় প্রাচীন উপজাতীয় কোনো গোষ্ঠী হবেন বলে মনে হয়।

[মহা (k) ৫.৭৪.১৪; (হরি) ৫.৬৯.১৪]

অর্কজ$_{২}$ অর্ক অর্থে সূর্য। মৎস্য পুরাণে নয়টি গ্রহের নাম করতে গিয়ে শনিগ্রহকে অর্কজ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। শনিগ্রহ বা শনৈশ্চর সূর্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলেই তিনি অর্কজ।

[মৎস্য পু. ৯৩.১০]

অর্কমর্ক পিশাচদের একটি গণ। এরা বামনাকৃতি, বানরের মতো দেহ, গাছে বসবাস করে।

[বায়ু পু. ৬৯.২৭১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৮২, ৩৯০]

অর্কস্থলকুণ্ড মথুরায়, যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র কুণ্ড। এই কুণ্ডে স্নান করলে সবরকম পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

[বরাহ পু. ১৫৭.১০-১১; ১৬০.২০]

অর্চি$_{১}$ রাজা বেণ অত্যাচারী এবং অবিনয়ী ছিলেন। একসময় তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্মণ মুনি ঋষিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সেই ক্রোধের ফলেই দুরাত্মা বেণ রাজার মৃত্যু হল। রাজা বেণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর দেহ থেকে নতুন রাজা সৃষ্টির আশায় ঋষিরা মৃত বেণ রাজার বাহুদ্বয় মন্থন করলেন। দুই বাহু থেকে একটি পুত্র এবং একটি কন্যার উৎপত্তি হল। পুত্রটি হলেন রাজর্ষি পৃথু এবং কন্যাটির নাম ছিল অর্চি। এই অর্চি রাজর্ষি পৃথুর পত্নী ছিলেন। ভাগবত পুরাণ পৃথুকে ভগবান নারায়ণের অংশজাত বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি অর্চিকেও দেবী লক্ষ্মীস্বরূপা বলে চিহ্নিত করেছে। ইনি পরম পতিব্রতা ছিলেন বলে জানা যায়। পৃথুর ঔরসে অর্চির গর্ভে বিজিতাশ্ব নামে এক পুত্র হয়। দীর্ঘদিন প্রজাপালনের পর পুত্র বিজিতাশ্বকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথু যখন বনে গমন করেন অর্চিও তখন স্বামীর অনুগমন করেন। বনে কঠোর তপস্যা ও স্বামীর সেবায় তাঁর দিন কাটতে থাকে। একসময় পৃথু দেহত্যাগ করলে অর্চিও স্বামীর চিতায় প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন।

[ভাগবত পু. ৪.১৫.১-৬; ৪.২৩.১৯-২৮]

অর্চি$_{২}$ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং প্রজাপতি কৃশাশ্বের পত্নী। কৃশাশ্বের ঔরসে তাঁর গর্ভে ধূম্রকেশ নামে এক পুত্র হয়। *[ভাগবত পু. ৬.৬.২০]*

অর্চিত বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৮১; (হরি) ১৩.১২৭.৮১]

অর্চির্মাল্য রামায়ণে উল্লিখিত বানরদের একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত বানররা মহর্ষি মরীচির পুত্র ছিলেন বলে জানা যায়। রামায়ণে তাঁদের অত্যন্ত তেজস্বী, বুদ্ধিমান এবং বলবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সীতার অনুসন্ধানের জন্য সুগ্রীবের নির্দেশে বানরবীর সুষেণের নেতৃত্বে এঁরা পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন। *[রামায়ণ ৪.৪২.৪]*

অর্চিষ্মতী$_{১}$ ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরার ঔরসে তাঁর পত্নী সুভার গর্ভে জাত চতুর্থ কন্যা অর্চিষ্মতী। যাঁর তেজে রাত্রিতেও বিভিন্ন বস্তু চোখে দেখতে পাওয়া যেত তিনি অর্চিষ্মতী। বস্তুত অর্চিষ্মতী পূর্ণচন্দ্র-প্রকাশা পূর্ণিমার রূপ, যেখানে চাঁদের আলোয় পার্থিব প্রকৃতির অনেক কিছুরই রূপ দেখা যায়—টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—

'অর্চিষ্মতী পূর্ণচন্দ্রোপেতা শুদ্ধপৌর্ণমাসী যস্যাং ভাভি-র্জনো রাত্রাবপি পশ্যতি রূপাদিকমিতি —পশ্যত্যর্চিষ্মতী ভাভিঃ।

[মহা (k) ৩.২১৮.৬; (হরি) ৩.১৮২.৬]

অর্চিষ্মতী$_{২}$ বসুদেবের পুত্র সারণের কন্যা-সন্তানদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন অর্চিষ্মতী।

[বায়ু পু. ৯৬.১৬৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৬৮]

অর্চিষ্মন্ত বর্হিষদ, ক্রব্যাদ ইত্যাদির মতো পিতৃগণের একটি গোষ্ঠীর নাম—

অর্চিষ্মন্তো বর্হিষদঃ ক্রব্যাদাঃ পিতরস্তথা।

[মহা (k) ১২.২৩৯.১৫; (হরি) ১২.২৬৩.১৫]

অর্চিষ্মান্$_{১}$ একজন বানরবীর। মারীচের পুত্র। সুগ্রীব সীতাকে খোঁজার জন্য যখন বানরবীরদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠান, তখন দক্ষিণদিকের পর পশ্চিমদিকের স্থানগুলিতে সুষেণ, মারীচ এবং অন্যান্য বানরবীরদের সঙ্গে অর্চিষ্মান্‌কেও পাঠিয়েছিলেন। *[রামায়ণ ৪.৪২.২]*

অর্চিষ্মান্$_2$ ভবিষ্যৎ সাবর্ণি মন্বন্তরে যে দেবতারা আছেন, তাঁদের তিনটি গণ আছে। এক-একটি গণে কুড়ি জন করে দেবতা আছেন। এই দেবগণের একটির নাম সুতপ। সে সুতপগণের দেবতারা সকলেই প্রায় সূর্যের বিভিন্ন বিভূতি বা প্রকার। অর্চিষ্মান্ এই সুতপগণের অন্যতম। প্রভাময় সৌর দেবতা, সূর্যের অন্য নাম—

অর্চিষ্মান্ দ্যোতনো ভানু র্যশঃ কীর্তি র্বুধো ধৃতিঃ।

[বায়ু পু. ১০০.১৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১৫]

অর্চিষ্মান্$_3$ বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৮১; (হরি) ১৩.১২৭.৮১]

অর্চিসন একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বায়ু পুরাণে এঁকে অত্রি বংশজাত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৫৯.১০৪]

অর্জুন$_1$ মহাভারতে অর্জুনই হচ্ছেন একমাত্র সুষম চরিত্র, যাঁর মধ্যে কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি নেই, আবার কোনো কিছুরই কমতি নেই। জানি না, মহামতি ব্যাস সেই কারণেই তাঁকে পাঁচ পাণ্ডব ভাইদের ঠিক মাঝখানে রেখেছেন কিনা! অর্থাৎ একদিকে যুধিষ্ঠির ভীমের মতো বিরাট চরিত্র, আবার অন্যদিকে নকুল-সহদেবের মতো নমনীয় চরিত্র—এই দুয়ের মাঝখানে ঠিক মানদণ্ডের কাঁটাটির মতো দাঁড়িয়ে আছেন অর্জুন। যা কিছুই তাঁকে করতে হয়েছে, সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে করতে হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—সমস্ত কিছুই তাঁর জীবনে একান্ত সুষমতায় চিহ্নিত। কোনো কিছুর মধ্যে বাড়াবাড়ি নেই, আবার খামতিও নেই।

অর্জুনের চরিত্রের আভিধানিক বিশ্লেষণে যাবার আগে, এই সূচনাপর্বেই একবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে ‘সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে’ দণ্ডায়মান অর্জুনের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি। দুই পাশে দুই পক্ষের অজস্র সেনা সাজানো রয়েছে এবং অর্জুন তাঁর রথের সারথি কৃষ্ণকে বললেন—গোবিন্দ, এই দুই সেনাদলের মাঝে আমার রথটি নিয়ে রাখো। আমি একটু দেখে নিই, কার কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি আমি—

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যম্ অস্মিন্ রণসমুদ্যমে।

বিপক্ষের দিকে চেয়ে কী দেখলেন অর্জুন? দেখলেন—শিশুকালে যাঁর কোলে পিঠে মানুষ হয়েছেন, সেই কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। ধবধবে সাদা চুল-দাড়ি, শ্বেতবস্ত্র, সত্ত্বের প্রতিমূর্তি যেন। দাঁড়িয়ে রয়েছেন দ্রোণাচার্য, যিনি পুত্রের স্নেহে হাত ধরে শরসন্ধান শিখিয়েছেন অর্জুনকে। দাঁড়িয়ে আছেন আরও কত পিতৃকল্প মানুষ, অতি আপনজন, কেউ সম্পর্কে মামা, ভাই, শ্যালক, শ্বশুর, কেউ বা পুত্রতুল্য। অর্জুন ভাবলেন— কীভাবে এই সমস্ত লোকের গায়ে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার অস্ত্র আমূল বসিয়ে দেব? এ যে অন্যায়, এ যে একেবারেই মানুষের মতো নয়। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন—আমার রাজ্য চাই না, ধনসম্পদ চাই না, চাই না শত্রু জয় করতে। অতি আপন নিকটজনের গায়ে হাত তোলার থেকে ভিক্ষে করে খাওয়া ভালো। অর্জুন ধনুকবাণ নামিয়ে রাখলেন। বললেন—আমি এই যুদ্ধ করব না—

ন যোৎস্যে ইতি।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার মুহূর্তে অর্জুন শরাসন ছেড়ে দিয়ে আত্মীয় স্বজনের জন্য মমতায় ব্যাকুল হলেন দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। ভগবদ্‌গীতার উপদেশ আরম্ভ হল।

অর্জুনের প্রতি গীতার শিক্ষকের এই উপদেশের নিরিখে যে বিষয়টা আমরা খুব জোর দিয়ে বলতে চাই, তা হল—অর্জুনের আপন স্বভাবের মধ্যেই গীতার এই নির্লিপ্ত বুদ্ধির বীজ ছিল, হয়তো সেইজন্যই গীতার উপদেশের পূর্বাহ্ণেই তিনি এই উপদেশের একমাত্র উপযুক্ত আধার বিবেচিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ, বিরাট রণক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের সামনে অর্জুনের বুদ্ধি বিচলিত হয়েছিল বটে এবং হ্যাঁ, এইরকম বিচলন তাঁর জীবনে আরও কয়েকবার ঘটেছে। তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না যে, অর্জুনের স্বভাব নির্লিপ্ততার বিরোধী ছিল। অন্তত দার্শনিকভাবে যে নির্লিপ্ততার কথা আমরা বলেছি, মনুষ্য জীবনের নানান সংবেদনশীলতায় অর্জুন হয়তো সেখানে প্রাথমিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এই দুর্বলতাও তো মানুষের ধর্মে, সমাজের ধর্মে একান্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু। মায়া, মোহ, মমতা, স্নেহ এমনকী চরম শত্রুতাও বড়ো মানুষকে একান্ত মনুষ্যোচিত ভাবেই বিচলিত করে। কিন্তু এই বিচলন যুক্তির সিদ্ধিতে কাটিয়ে উঠে যিনি

দার্শনিকের বিচারে নিজেকে আস্তে আস্তে ঘটনার পরম্পরা থেকে মুক্ত করতে পারেন, তিনি অর্জুন। যাঁরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্মবোধ এবং মোক্ষলিপ্সার মাহাত্ম্য মাথায় রেখে মহাভারতের নায়ক অনুসন্ধান করেন, আমরা কেবল তাঁদের জানাতে চাই যে, সেটা একমাত্র যুধিষ্ঠিরের কোনো অসামান্য গুণ নয়। বরং তার থেকে অনেক বেশি দার্শনিকতা অর্জুনের মধ্যে আছে। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, এইসব ক্ষেত্রে যে মমতাবোধ দার্শনিকের বোধ তৃপ্ত করে, সাধারণ ভাষায় তাকে বলা যায় 'ব্যালান্স'। অর্জুনের জীবনে প্রায় প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি বিষয়ে এই 'ব্যালান্স' জিনিসটা এত বেশি যে, তা অনায়াসে যুধিষ্ঠিরকেও ছাপিয়ে যাবে।

আমরা অর্জুনের জন্ম কথায় আসি। কুরুবংশীয় রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র পাণ্ডু। বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্রদের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তিনি জন্মান্ধ বলে কনিষ্ঠ হয়েও পাণ্ডুই রাজ্যলাভ করেন। রাজা পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নী কুন্তী এবং মাদ্রীকে নিয়ে বনে বসবাস করছিলেন। শিকার, ভ্রমণ এবং নানা আমোদ-প্রমোদে তাঁদের দিন কাটছিল। এমন সময় পাণ্ডু একদিন শিকারে বেড়িয়ে এক মৈথুনরত মৃগ এবং মৃগী দেখতে পেয়ে শরনিক্ষেপ করলেন। সেই শরাঘাতে যে মৃগের মৃত্যু হল—তিনি সামান্য মৃগ ছিলেন না। ছিলেন মৃগরূপধারী ঋষি কিমিন্দম। মৃত্যুকালে তিনি পাণ্ডুকে শাপ দিয়ে গেলেন—তুমিও স্ত্রীসঙ্গমের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

অপুত্রক রাজা পাণ্ডু মনের দুঃখে বনবাসী হলেন ঠিকই, তবে পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা এবং হস্তিনাপুরে যে রাজ্যপাট তিনি অন্ধ দাদা ধৃতরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছেন, নিজের সেই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে রয়ে গেল। তিনি জ্যেষ্ঠা পত্নী কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্রলাভের জন্য অনুরোধ-উপরোধ করতে লাগলেন। অনেক অনুরোধের পর কুন্তী তাঁকে বললেন বিবাহের আগে দুর্বাসার কাছ থেকে পাওয়া বশীকরণ মন্ত্রের কথা, যে মন্ত্রের আহ্বানে স্বর্গের দেবতা নেমে আসেন মাটিতে। পাণ্ডু দেবতার ঔরসেই পুত্র উৎপাদন করতে বললেন কুন্তীকে। কুন্তীর মন্ত্রের বলে ধর্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির এবং পবনের ঔরসে ভীম জন্মলাভ করলেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় জন্ম নিলেন পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র—অর্জুন।

কুন্তীর গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে পাণ্ডু প্রথম দিকে একটু বেশি তাড়াহুড়োই করেছিলেন। দুর্বাসার দেওয়া বশীকরণ মন্ত্রের কথা শোনা মাত্র পাণ্ডু সেদিনই কুন্তীকে অনুরোধ করেছিলেন মন্ত্রবলে ধর্মকে আহ্বান করার জন্য। ভীমের জন্মের আগে পবন দেবতাকে আহ্বান করার ক্ষেত্রেও তাই। তবে দুক্ষেত্রেই মনে হয় পাণ্ডুর কৌতূহলের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। কুন্তীর বশীকরণ মন্ত্রের শক্তি কতটা তা জানার এবং নিঃসংশয় হবার ব্যাপার ছিল।

কিন্তু ভীমের জন্মের পর কুন্তীর দৈবক্ষমতা সম্পর্কে পাণ্ডু নিশ্চিত হয়েছেন। হস্তিনাপুর রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ কুরুরাজকুমারের পিতা হবার সৌভাগ্যও হয়েছে তাঁর। পাণ্ডু অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন এখন। উত্তরাধিকার এবং বংশরক্ষা— দুই বিষয়েই। এই সময়েই পাণ্ডুর প্রথম মনে হল—মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আসে দৈব এবং পুরুষকার একসঙ্গে যুক্ত হলে। তেমন একটি সর্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পুত্র চাই পাণ্ডুর। এমন একটি শ্রেষ্ঠ পুত্রলাভের আশায় দেবরাজ ইন্দ্রের কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন পাণ্ডু। কুন্তীকেও তিনি তপস্যায় মন দিতে বললেন। প্রায় এক বছর পর পাণ্ডুর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডুকে তেমনই এক সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রলাভের বর দিলেন। তারপর পাণ্ডুর আদেশমতো পুত্রলাভের জন্য বশীকরণমন্ত্রে ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন কুন্তী। ইন্দ্রের ঔরসে যথাসময়ে জন্ম নিলেন অর্জুন। সুতরাং হিসেব মতো যুধিষ্ঠিরের থেকে ভীম এক বছরের ছোটো হলেও ভীমের থেকে অর্জুন প্রায় দুই বছরের ছোটো। যাইহোক, অর্জুনের জন্মলগ্নে দেবতারা নবজাতককে আশীর্বাদ করে বললেন—শিবের মতো শক্তি হবে এই পুত্রের, যুদ্ধে ইনি ইন্দ্রের মতো অজেয় হবেন, কুরুরাজ পরিবারে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনবেন এই অর্জুন—

কুরুলক্ষ্মীং ভবিষ্যতি।

দেবতাদের যিনি রাজা, সেই ইন্দ্রের ঔরসে পুত্রজন্মের কারণেই সম্ভবত শতশৃঙ্গ পর্বতে

অর্জুনের জন্মোৎসব হল বেশ ঘটা করে। বিশিষ্ট দেবতারা, গন্ধর্ব, ঋষিরা এসে কুন্তীর এই পুত্রটিকে আশীর্বাদ করলেন। গন্ধর্ব-অপ্সরাদের নৃত্যগীতে শতশৃঙ্গ পর্বত মুখরিত করে মহাসমারোহে অর্জুনের জন্মোৎসব পালিত হল।

[মহা (k) ১.১২৩.২১-৭৫; ১.৯৫.৬১; ১.৬৭.১১১, ১১৬; (হরি) ১.১১৭.২৪-৭৯; ১.৯০.৮২; ১.৬২.১১২, ১১৭]

□ পাণ্ডুর এই পুত্রটি তপস্যার ফলস্বরূপ বলেই বোধহয় আক্ষরিক অর্থেই সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন—রূপে-গুণে সব দিক থেকেই অতুলনীয়। তবে পাণ্ডুর পাঁচপুত্রের মধ্যে একমাত্র অর্জুনেরই গায়ের রং হল কালো। মহাভারতে অর্জুনের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর গাত্রবর্ণের তুলনা করা হয়েছে ঘন নীল মেঘের সঙ্গে—নীলাম্বুদ সমপ্রখ্যং। অর্জুনের গায়ের রং কালো হলেও তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। মহাভারতে একাধিক শ্লোকে তাঁর রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। দীর্ঘ-সুগঠিত বলিষ্ঠ দুটি বাহু, পদ্মের পাপড়ির মতো বিশাল সুন্দর দুটি চোখ, দেহের গঠন দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি অতুল বলশালী—মহাভারতের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা উদ্ধার করা হল—

* যস্য দীর্ঘৌ সমৌ পীনৌ ভুজৌ পরিঘসন্নিভৌ।
* নীলাম্বুদসমপ্রখ্যং মত্তবারণগামিনম্।
* সিংহোন্নতাংস গজরাজগামী
পদ্মায়তাক্ষো'র্জুন এষ বীরঃ॥

[মহা (k) ৩.৮০.১৪-১৯; ৪.৭১.১৫; ১৫.২৫.৭; (হরি) ৩.৬৬.১৪-১৯; ৪.৬৬.১৪; ১৫.২৮.৭]

□ তবে কুন্তীর তৃতীয়পুত্র পরবর্তী সময়ে অর্জুন নামে বিখ্যাত হলেও জন্মকালে তাঁর অর্জুন নামকরণ হয়নি। মহাভারতের বিরাটপর্বে অর্জুনের সঙ্গে মৎস্যরাজকুমার উত্তরের কথোপকথনের সময় অর্জুন আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে নিজের দশটি নামের উল্লেখ করেছেন। নাম উল্লেখ করার পাশাপাশি সেই নামগুলির অর্থ বা কীভাবে, কী কারণে তিনি সে-নামে পরিচিত হলেন—তাও ব্যাখ্যা করেছেন অর্জুন। এই দশনামের একতর হল কৃষ্ণ। অর্জুন বলেছেন—গায়ের রং কালো বলে জন্মের পর পিতা আমার নাম রাখেন কৃষ্ণ—

কৃষ্ণ ইত্যেব দশমং নাম চক্রে পিতা মম।
কৃষ্ণাবদাতস্য সতঃ প্রিয়ত্বাদ্বালকস্য বৈ॥

এই উল্লেখ থেকেই স্পষ্ট, জন্মের পর এই কৃষ্ণবর্ণ শিশুটির নাম প্রথমে কৃষ্ণই রাখা হয়েছিল গাত্রবর্ণের সাদৃশ্যে। এ নাম রেখেছিলেন পিতা পাণ্ডু। অর্জুনের বাকি সমস্ত নামই এমনকী সর্বাধিক পরিচিত অর্জুন নামটিও তাঁর নানা গুণের ফলে অর্জিত। বিরাটপর্বে উল্লিখিত অর্জুনের দশটি নাম—

অর্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ।
বীভৎসুর্বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ॥

উত্তরের সঙ্গে বৃহন্নলাবেশধারী অর্জুনের কথোপকথনের সময় অর্জুনের মুখেই তাঁর এই দশনামের ব্যাখ্যা শোনা যায়। তাঁর শৈশবের নাম যে কৃষ্ণ, তা বলার পর একে একে বাকী নামগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। নিজের সর্বাধিক পরিচিত এবং লোকমুখে ব্যবহৃত নাম 'অর্জুন'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন—

পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং বর্ণো মে দুর্লভো যতঃ।
করোমি কর্ম শুক্লঞ্চ তস্মান্মামর্জুনং বিদুঃ॥

অর্জুন শব্দের অর্থ শুভ্রতা বা শুক্লবর্ণ। এখানে শুভ্রতা বলতে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ চরিত্রের কথাই বলা হয়েছে। অর্জুন নিজের নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক স্বভাবের জন্য সম্পূর্ণ পৃথিবীতে খ্যাত ছিলেন বলেই তাঁর অর্জুন নাম।

অর্জুন জন্মেছিলেন দিনের বেলায়, তাঁর জন্মক্ষণ ছিল পূর্বফাল্গুনী এবং উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের সন্ধিক্ষণ। সেই কারণে তিনি 'ফাল্গুন' নামে খ্যাত হয়েছিলেন—

উত্তরাভ্যাং চ পূর্বাভ্যাং ফল্গুনীভ্যামহং দিবা।
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ॥

নিজের 'জিষ্ণু' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে অর্জুন বলেছেন—

অহং দুরাপো দুর্ধর্ষো দমনঃ পাকশাসনিঃ।
তেন দেবমনুষ্যেষু জিষ্ণুর্নামাস্মি বিশ্রুতঃ॥

পাকশাসন দেবরাজ ইন্দ্রের অপর নাম। দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র বলেই অর্জুনকে উপরোক্ত শ্লোকে পাকশাসনি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। জিষ্ণু অর্থে বিজয়ী বা অজেয়। অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের মতো একজন অজেয় বীরের পুত্র, আবার তিনি নিজেও দুর্ধর্ষ অপরাজেয় বীর। এই দুই ভাবনা থেকেই তিনি জিষ্ণু নামে খ্যাত।

পাণ্ডবদের বনবাসের সময় অর্জুন স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য। সেই সময় 'নিবাতকবচ' দৈত্যদের সঙ্গে দেবতাদের ঘোর যুদ্ধ হয়। অর্জুনের বীরত্বেই দেবসেনা শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে জয় লাভ করে। যুদ্ধ জয়ের পর পুরস্কার স্বরূপ ইন্দ্র এক মহামূল্যবান কিরীট বা মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন অর্জুনের মাথায়। সেই বহুমূল্য কিরীটের কারণেই অর্জুন বিখ্যাত হন কিরীটি নামে—

পুরা শক্রেণ মে দত্তং যুধ্যতো দানবর্ষভৈঃ।
কিরীটং মূর্ধ্নি সূর্যাভং তেনাহুর্মাং কিরীটিনম্॥

অর্জুনের রথে চারটি শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত থাকত বলে তিনি শ্বেতবাহন নামে পরিচিত ছিলেন—

শ্বেতা রজত সঙ্কাশা রথে যুজ্যন্তি মে হয়াঃ।
সংগ্রামে যুধ্যমানস্য তেনাহং শ্বেতবাহনঃ॥

বীভৎস শব্দের অর্থ হিংস্র বা ক্রূর। বীভৎস শব্দটার মধ্যেই একটা ভয়াবহ নৃশংসতার ভাব আছে—যাকে লোকে ভয় করে, ঘৃণা করে, নিন্দা করে। কিন্তু অতি ঘোর যুদ্ধেও অর্জুন কখনো কোনো নৃশংস কাজ করেন না। মহাভারতে অর্জুনের জীবনের নানা অধ্যায়ে নানা ঘটনার বিবরণ আছে, বহু যুদ্ধের বিবরণও আছে। সেখানে বারবারই লক্ষণীয় তাঁর এই আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠেন না, বরং পরাজিত ব্যক্তির প্রতিও যথেষ্ট সংযত আচরণ করতে দেখা যাবে তাঁকে। মহাপরাক্রমশালী হলেও তিনি নৃশংস নন, বীভৎস কোনো কাজ তাঁকে করতে দেখা যায় না—তাই তিনি বীভৎসু—

ন কুর্য্যাং কর্ম বীভৎসং যুধ্যমানঃ কথঞ্চন।
তেন দেবমনুষ্যেষু বীভৎসুরিতি মাং বিদুঃ॥

অর্জুনের বিজয় নামটিও তাঁর অজেয় যোদ্ধার স্বরূপটিকেই প্রকাশ করে। অর্জুন নিজে বলেছেন যে, আমি যুদ্ধে গিয়ে সে যুদ্ধ জয় না করে ফিরি না বলে লোকে আমাকে বিজয় বলে—

অভিপ্রয়ামি সংগ্রামে যদহং যুদ্ধদুর্মদান্।
নাজিত্বা বিনিবর্তামি তেন মাং বিজয়ং বিদুঃ॥

সব্যসাচী শব্দের অর্থ হল, যিনি দুই হাত সমানভাবে চালনা করতে পারেন। অর্জুন দুই হাতে সমান ক্ষিপ্রতায় শরঃক্ষেপ করতে পারতেন বলেই তিনি সব্যসাচী নামে খ্যাত—

উভৌ মে দক্ষিণৌ পাণী গাণ্ডীবস্য বিকর্ষণে।
তেন দেব মনুষ্যেষু সব্যসাচীতি মাং বিদুঃ॥

অর্জুনের দশনামের মধ্যে শেষতমটি হল ধনঞ্জয়। অর্জুন নিজে তাঁর এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—আমি দিগ্বিজয় করে ধন-সম্পদ আনয়ন করি এবং সেই অর্জিত সম্পদের মধ্যেই বাস করি বা অর্জিত সম্পদ ভোগ করি বলেই লোকে আমাকে ধনঞ্জয় বলে—

সর্বান্ জনপদান্ জিত্বা বিত্তমাচ্ছিদ্য কেবলম্।
মধ্যে ধনস্য তিষ্ঠামি তেনাহুর্মাং ধনঞ্জয়ম্॥

বিরাটপর্বে উল্লিখিত এই দশটি নাম ছাড়াও মহাভারতে অর্জুনের আরও একাধিক নামের উল্লেখ মেলে। যেমন গুড়াকেশ। গীতার উপদেশ দেবার সময় একাধিকবার অর্জুনকে 'গুড়াকেশ পরন্তপ' বলে সম্বোধন করেছেন কৃষ্ণ। 'গুড়াকা' শব্দটির অর্থ নিদ্রা। নিদ্রার 'ঈশ' বা ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি নিদ্রাকে জয় করেছেন—এই অর্থে অর্জুনের গুড়াকেশ নাম—

গুড়াকা নিদ্রা, তস্যা ঈশেন
জিতনিদ্রেণার্জুনেন এবমুক্তঃ।

[ভগবদ্গীতা ১.২৪ শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]।

তবে ভাগবত পুরাণের একটি শ্লোকের টীকা রচনা করতে গিয়ে শ্রীধরস্বামী 'গুড়াকা' শব্দের অর্থ করেছেন ধনুর্বিদ্যা। তিনি ধনুর্বিদ্যার 'ঈশ' বা ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলেও 'গুড়াকেশ' অর্জুনের অপর নাম—

গুড়াকা ধনুর্বিদ্যা তস্যা ঈশ ইতি
বা ধনুর্বেদপারগইত্যর্থঃ।

[ভাগবত পু. ১.১০.১৭নং শ্লোকের শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

লক্ষণীয়, জন্মলগ্নে পিতা পাণ্ডুর দেওয়া নাম 'কৃষ্ণ' বাদে অর্জুনের সব কটি নামই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং নানা গুণের ফলে অর্জিত। তার মধ্যে অর্জুন নামটিই তাঁর সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং প্রচলিত নাম।

[মহা (k) ৪.৪৪.৮-২২; (হরি) ৪.৪০.৮-২২]

□ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে উল্লিখিত না হলেও অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, নর-নারায়ণ—এই যুগল ঋষির মধ্যে যিনি নর নামে খ্যাত ছিলেন, তিনিই অর্জুন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বনপর্বে ইন্দ্রের সঙ্গে লোমশ ঋষির কথোপকথনের সময় ইন্দ্র বলেছেন—

পুরাকালে নর-নারায়ণ—এই দুই যুগল ঋষি বদরিকাশ্রমে বাস করতেন। স্বয়ং ইন্দ্রই তাঁদের ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হতে অনুরোধ করেছিলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে নর-নারায়ণ মর্ত্যলোকে অর্জুন এবং কৃষ্ণের রূপে অবতীর্ণ হন। তাই এ জন্মেও কৃষ্ণ এবং অর্জুন অভিন্নহৃদয় সখা। দিব্যাস্ত্রলাভের জন্য অর্জুনের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে এসেও ভগবান শিব অর্জুনের পূর্বজন্মের এই বৃত্তান্ত স্মরণ করেছেন—

নরস্ত্বং পূর্বদেহে বৈ নারায়ণ সহায়বান্।
বদর্য্যাং তপ্তবানুগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্॥

[মহা (k) ৩.৪০.১; ৩.৪৭.৮-১৩;
(হরি) ৩.৩৫.৮৪; ৩.৪০.৮-১৩]

□ জন্মোৎসবের সমারোহের পর প্রায় ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত শতশৃঙ্গ পর্বতে অর্জুনের শৈশব কেমন কেটেছিল, তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। অর্জুনকে আবার দেখতে পাই কুরুরাজসভায়, যখন পিতৃহীন পাঁচটি পুত্রের হাত ধরে অসহায় সদ্যবিধবা কুন্তী ফিরে এলেন হস্তিনায়। তবে মহাভারতের দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠে কতকগুলি অতিরিক্ত শ্লোক পাওয়া যায় যেখানে পাণ্ডবদের শৈশব এবং প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মেলে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে—শতশৃঙ্গ পর্বতে স্বয়ং মহর্ষি কশ্যপ এসে পাণ্ডবদের উপনয়ন সংস্কার করেছিলেন। পৃষতের পুত্র শুক নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। বানপ্রস্থ অবলম্বন করে দিগ্বিজয়ী সেই রাজর্ষি সেই সময় বাস করছিলেন শতশৃঙ্গ পর্বতেই। পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল তাঁরই কাছে। শতশৃঙ্গ পর্বতে থাকার সময় তাঁর কাছেই অস্ত্রবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করলেন পাণ্ডবরা। দ্রোণাচার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর শিষ্য হিসেবে পরবর্তী সময়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করবেন অর্জুন। রাজর্ষি শুক নাকি সেই শিশু বয়সেই অর্জুনের মধ্যে ভবিষ্যতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

[মহা (গীতাপ্রেস) ১.১২৩.৩১নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্রষ্টব্য, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬১]

□ হস্তিনায় ফিরে আসার পর পাণ্ডবরা রাজবাড়িতে থাকতে লাগলেন ঠিকই, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মতো রাজকীয় বিলাসে তাঁদের দিন কাটেনি। দুর্যোধনের হৃদয়ে জ্ঞাতিবিদ্বেষের বীজ পোঁতা হয়ে গিয়েছিল সেই অল্পবয়সেই। ফলত পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর নানা অত্যাচারও চলছিল। ভীমকে কালকূট বিষ খাইয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবার ঘটনাও ঘটে গেল একবার। এর মাঝে অর্জুনের পৃথক উল্লেখ তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। তবে কুন্তীর এই কনিষ্ঠ পুত্রটি যে নিজের স্বভাবের গুণে কুরু প্রবীণদের বিশেষত কুরু পিতামহ ভীষ্মের আদর ভালোবাসা স্নেহ অর্জন করে নিয়েছিলেন তার উল্লেখ পরবর্তী সময়ে মেলে। পরবর্তী সময়ে ভীষ্ম নিজেই একাধিকবার নিজের পৌত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সবথেকে বেশি প্রিয় হিসেবে অর্জুনের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রৌঢ় বয়সে কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুন বৃদ্ধ কুরুসেনাপতি ভীষ্ম-পিতামহের দিকে তাকিয়ে নিজের বাল্যকাল স্মরণ করেছেন। অর্জুনের এই স্মৃতিচারণ থেকে মনে হয়, বাল্যকালে সবথেকে বেশি স্নেহ, আদর তিনি ভীষ্মের কাছেই পেয়েছেন। অর্জুন স্মরণ করেছেন—ছোটোবেলায় খেলার পরে সেই ধুলোমাখা কাপড় পড়ে, ধুলোমাখা গায়ে পিতামহের কোলে গিয়ে উঠতাম। তাতে তাঁর সাদা কাপড় ময়লা হয়ে যেত, তবু তিনি সস্নেহে আমাকে কোলে নিতেন। আমি তাঁকে 'বাবা' (তাত) বলে ডাকতাম, তিনি সস্নেহে আমাকে বলতেন—বৎস, আমি তোমার বাবা নই, বাবার বাবা—

ক্রীড়তা হি ময়া বাল্যে বাসুদেব মহামনাঃ।
পাংশুরূষিত গ্যাত্রেণ মহাত্মা কলুষীকৃতঃ॥
যস্যাহমধিরুহ্যাঙ্কং বালঃ কিল গদাগ্রজ।
তাতেত্যবোচং পিতরং পিতুঃ পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ॥
নাহং তাতস্তব পিতুস্তাতো'স্মি তব ভারত।

[মহা (k) ৬.১০৭.৯২-৯৪; (হরি) ৬.১০৩.৯২-৯৫]

□ প্রথমে কৃপাচার্য এবং তারপর দ্রোণাচার্যের কাছে কৌরব এবং পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হল। কৃপাচার্যের শিক্ষালয়ের বিশদ বিবরণ মহাভারতে নেই। তবে কুরুরাজকুমারদের আচার্য হিসেবে দ্রোণাচার্যের আগমনের পর থেকেই অর্জুনকে ধীরে ধীরে বাকি রাজপুত্রদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাবে। ক্রমে দ্রোণাচার্যের শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে উঠবেন তিনি।

ভীষ্ম যখন সাদরে দ্রোণকে রাজপুত্রদের আচার্য-পদে বরণ করলেন, সেই সময় শিষ্যদের একান্তে কাছে ডেকে দ্রোণ তাঁদের বললেন—আমার একটা একান্ত ইচ্ছা আছে। তোমাদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তোমরা আমার সে ইচ্ছা পূরণ করবে কথা দাও—

কার্যং মে কাঙ্ক্ষিতং কিঞ্চিদ্ হৃদি সম্পরিবর্ত্ততে।
কৃতাস্ত্রৈস্তৎ প্রদেয়ং মে তদৃতং বদতানঘা॥

রাজকুমাররা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কিন্তু গুরুর ঐকান্তিক ইচ্ছাটি না জেনে-শুনে প্রতিশ্রুতি দেবার মতো গুরুতর কাজ করার সাহস দেখাতে পারলেন না কেউ। এই সময় একশো পাঁচজন রাজকুমারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন কেবল অর্জুন। মহাভারতের কবি এই প্রথম কথা বলালেন অর্জুনকে। একশো পাঁচটি বালকের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে গুরুর সামনে দাঁড়িয়ে গুরুর প্রতি শিষ্যের অকৃত্রিম আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রতিজ্ঞা করলেন অর্জুন—অবশ্যই আপনার ইচ্ছাপূরণ করব গুরুদেব। আপনি যা চান, আমি সব করব—

তচ্ছ্রুত্বা কৌরবেয়াস্তে তূষ্ণীমাসন্ বিশাম্পতে।
অর্জুনস্তু ততঃ সর্বং প্রতিজজ্ঞে পরন্তপঃ॥

এই একটি মাত্র দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে একশো পাঁচজন রাজপুত্রের মধ্যে বিশিষ্ট একজন হয়ে উঠলেন অর্জুন। এই একটি মাত্র বালকের গুরুর প্রতি অপরিসীম আস্থা এবং এর দৃঢ় সংকল্পের মধ্যে নিজের আশাপূর্তির সম্ভাবনা দেখে আচার্য দ্রোণ সেদিন সস্নেহে অর্জুনের মস্তক আঘ্রাণ করলেন, অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেললেন দ্রোণ—

প্রীতিপূর্বং পরিষ্বজ্য প্ররুরোদ মুদা তদা।

তারপর যথাসময়ে রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হল। অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ হিসেবে দ্রোণাচার্যের খ্যাতির কথা অনেক আগেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে কুরু রাজকুমাররা ছাড়াও নানা দেশ থেকে রাজপুত্ররা এবং অন্যান্য বিদ্যার্থীরা এসে জড়ো হলেন দ্রোণাচার্যের গুরুকুলে। অস্ত্রশিক্ষা চলতে লাগল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বেশ বোঝা গেল—অর্জুনই সবার থেকে আলাদা। এর পিছনে অবশ্য কোনো অলৌকিক কারণ নেই। মহাভারতকার অর্জুনের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—যে কোনো ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ হতে গেলে ক্ষমতার সঙ্গে যোগ করতে হয় অভ্যাসকে। অভ্যাসের সঙ্গে চাই উৎসাহ এবং বারংবার, দিনের পর দিন অভ্যাস করতে করতে যদি উৎসাহেও কখনো ভাঁটা পড়ে, তবে শেষ যে জিনিসটা দরকার, সেটা হল বিষয়ের প্রতি অনুরাগ—যা একজনকে আবারও অভ্যাসে নিযুক্ত করে। অর্জুনের এই শিক্ষা এবং অনুরাগের ফলে দ্রোণশিষ্যেরা সবাই এক অস্ত্রবিদ্যা শিখেও অর্জুনের থেকে ছোটো হয়ে রইলেন। দ্রোণও বুঝতে পারলেন—অর্জুনই সবার সেরা এবং উপযুক্ত শিক্ষক যেমন যোগ্য ছাত্রকে বিশেষ নজর দিয়ে পড়ান, দ্রোণও অর্জুনের ব্যাপারে সেইসব ব্যবস্থা নিলেন যাতে অর্জুন আরও পোক্ত হয়ে ওঠেন।

ব্যাস লিখেছেন—দ্রোণাচার্য সবাইকেই সমান শিক্ষা দিতেন, কিন্তু বুদ্ধি, লেগে থাকবার ক্ষমতা বা অধ্যবসায়, শক্তি এবং উৎসাহ—

বুদ্ধিযোগবলোৎসাহৈঃ।

এগুলির দ্বারাই অর্জুন বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন, সকলের থেকে বড়ো হয়ে উঠলেন—

বিশিষ্টো'ভবদর্জুনঃ।

অর্জুনের যে বিশেষ গুণগুলির কথা ব্যাস উল্লেখ করলেন তার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য বোধ হয় এই 'যোগ' শব্দটিই। এই যোগ মূলত মনঃসংযোগ, অধ্যবসায়। এই মনঃসংযোগ বা অধ্যবসায় অর্জুনের মধ্যে এতই বেশি ছিল যে, প্রথিতযশা গুরুদেব দ্রোণাচার্য পর্যন্ত বিশ্রাম পাননি। প্রকৃত ছাত্রের ক্ষমতাই হল, শিক্ষক তার জন্য খেটে পরিশ্রম করে আনন্দ পাবে। অর্জুন দ্রোণকে সেই আনন্দ দিয়েছেন।

অর্জুনের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে দ্রোণ নজর রাখতেন অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় বেশি করেই। এদিকে দ্রোণের বিদ্যালয়ে অর্জুনের পাশাপাশি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করছেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা। রাজপুত্রদের মতোই তিনিও দ্রোণাচার্যের শিষ্য। অশ্বত্থামা ছাত্র হিসেবে যথেষ্টই মেধাবী ছিলেন। কিন্তু দ্রোণ ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, অস্ত্রবিদ্যার প্রতি অর্জুনের এমনই এক সহজাত অনুরাগ আছে যে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাকেও অর্জুন অতিক্রম করে যাবেন অতি সহজে। অর্জুন নিঃসন্দেহে দ্রোণের প্রিয় শিষ্য। কিন্তু অশ্বত্থামা

তাঁর পুত্র। পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতা হিসেবে দ্রোণ চাইতেন যে, অর্জুনের থেকেও অশ্বত্থামা কিছু বেশি শিক্ষালাভ করুন। কিন্তু অর্জুনের নিরন্তর অভ্যাসের জ্বালায় তাঁকে আলাদা করে কিছু শেখানোর উপায় ছিল না। কিন্তু স্নেহ যেহেতু বিষম বস্তু, তাই অন্য শিষ্যদের মধ্যে আপন পুত্রের বিষমতা রাখার জন্যই দ্রোণ শেষ পর্যন্ত উপায় বার করলেন।

বস্তুত সেকালের শিষ্যদের সবাইকে অল্পবিস্তর গুরুসেবা করতে হত। দ্রোণ অর্জুন সহ সমস্ত শিষ্যদেরই বলতেন—যাও জল ভরে নিয়ে এসো। কিন্তু জল ভরে আনার জন্য তিনি প্রত্যেক শিষ্যের হাতে দিতেন বড়ো বড়ো এক একটি কমণ্ডলু। কমণ্ডলুর মুখ ছোটো, তাতে জল ভরতে তাই অনেক সময় লাগত। এদিকে দ্রোণ অশ্বত্থামাকে জল আনার জন্য দিতেন একটি কলসি। ফলে অশ্বত্থামা জল ভরে ফিরে আসতেন অন্যদের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি। এই সময়টুকুর মধ্যে দ্রোণ অশ্বত্থামাকে অস্ত্রবিদ্যার কিছু বিশেষ কৌশল শিখিয়ে দিতেন। অর্জুন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা। গুরুকে তিনি মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু বারুণাস্ত্রে কমণ্ডলু পূর্ণ করে অশ্বত্থামার মতোই তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে লাগলেন। ফলে দ্রোণ সস্নেহে এবং একরকম বাধ্য হয়েই অর্জুন এবং অশ্বত্থামাকে একই রকম শিক্ষা দিতে লাগলেন। পক্ষপাতিত্ব করার উপায় রইল না।

তবু একটা সুপ্ত ইচ্ছা দ্রোণের মধ্যে থেকে গেল। শব্দভেদী বাণ চালানোর বিদ্যা কেবলমাত্র নিপুণ ধনুর্ধররাই শিখতে পারেন। দ্রোণ দেখলেন—গুরু কতটা শেখাবেন, অর্জুন তার অপেক্ষা রাখেন না। নিজেই নিজেকে আরও দক্ষ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান। দ্রোণ তাই চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে শব্দভেদী বাণ চালানোর কৌশল শেখার চেষ্টা করার কোনো সুযোগ বা প্রেরণা অর্জুন না পান। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে দ্রোণ শিষ্যদের আবাসে যে পাচক নিযুক্ত ছিল, তাকে একদিন ডেকে বললেন—তুমি কখনোই অর্জুনকে অন্ধকারে খেতে দিও না। আর আমি যে এমন আদেশ করেছি, সে কথাও যেন সে জানতে না পারে—

অন্ধকারেঽর্জুনায়ান্নং ন দেয়ং তে কদাচন।
ন চাখ্যেয়মিদঞ্চাপি মদ্বাক্যং বিজয়ে ত্বয়া॥

পাচক দ্রোণের আদেশের রহস্য কিছু বুঝল না। সরল মনে যথাসাধ্য সে আদেশ পালন করতে লাগল। কিন্তু অঘটন তৎসত্ত্বেও ঘটেই গেল একদিন। ঠিক আহারের সময়েই অর্জুনের ঘরের তৈলপূর প্রদীপটি নিভে গেল দমকা হাওয়ায়। অর্জুন কিন্তু খেয়ে চলেছেন। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে—এ নিয়ে তাঁর মনে কোনো বিরক্তি নেই। এভাবে অন্ধকারে বসে খেতে খেতেই হঠাৎ তাঁর মনে হল—এই অন্ধকারের মধ্যে বসেই তো বেশ খেয়ে নিলাম। কোনো অসুবিধা তো হল না! এই ছোটো ঘটনাটুকু থেকে অর্জুন উপলব্ধি করলেন—অভ্যাসে সবই হয়। ঘন অন্ধকারেও মুখের গ্রাস যদি মুখেই পড়ে, তাহলে অন্ধকারে অভ্যস্ত মহাবীরের বাণই বা লক্ষ্যে পৌঁছাবে না কেন? শুধুমাত্র শব্দ শুনতে পেলেও তো যথেষ্ট। এমন ভাবনা চিন্তা করে অন্তরের জিজ্ঞাসা এবং অন্তর্গত উচ্চাশার তাড়নায় সেই রাত্রেই অর্জুন ধনুক বাণ হাতে উপস্থিত হলেন নির্জন প্রান্তরে। একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শুধু শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা, নিরলস সাধনা করে যেতে লাগলেন অর্জুন। প্রত্যেকটি বাণ এমনভাবে ছুঁড়তে লাগলেন, যেন অন্ধকারই তাঁর প্রথম শত্রু। আর দ্বিতীয় শত্রু লক্ষ্য। গভীর রাত্রে আধো ঘুমে আধো জাগরণে দ্রোণাচার্যের কানে এসে পৌঁছাল অর্জুনের ধনুকের টঙ্কার শব্দ আর ছুটে যাওয়া তীরের শন্ শন্ আওয়াজ—

তস্য জ্যাতল নির্ঘোষং দ্রোণঃ শুশ্রাব ভারত।

নিজে ভালো ছাত্র এবং ভালো শিক্ষক বলেই দ্রোণ জানতেন—সব বিদ্যা সব কৌশল ভালো ছাত্রকে শেখাতে হয় না। শিখতে শিখতে আপন প্রতিভায় সে আপনি শেখে। যখন জটিলতার জায়গাটা শিষ্য আপনিই ধরে ফেলে, তখন গুরুর আনন্দও হয় দ্বিগুণ। সেদিন রাতের অন্ধকারে অর্জুনের ধনুকের টঙ্কার শব্দ শুনে দ্রোণ যখন বুঝলেন যে, তিনি নিজে যে বিদ্যা অর্জুনকে শেখাতে চাননি, শব্দভেদী বাণ চালনার সেই কৌশল অর্জুন করায়ত্ত করেছেন আপন সাধনার ফলে—তখন দ্রোণের মনও তেমনই অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠল। নিজের পুত্রকেই নিজের শ্রেষ্ঠ শিষ্য রূপে গড়ে তুলতে না পারার দুঃখও

সেই মুহূর্ত থেকে দ্রোণের মন থেকে মুছে গেল। অর্জুন নিজের অধ্যবসায় এবং বিদ্যানুরাগের গুণে অশ্বত্থামাকেও অতিক্রম করে দ্রোণাচার্যের হৃদয়ে এমন এক স্থান অধিকার করলেন, যা হয়তো আপন ঔরসপুত্র অশ্বত্থামার প্রতি দ্রোণের অন্ধ স্নেহকেও অতিক্রম করে গেল। সেদিন রাতের অন্ধকারে আনন্দে, সস্নেহে প্রিয় শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে দ্রোণ বললেন—আমি তোমাকে এমনভাবে শিক্ষা দেব, যাতে জগতে তোমার তুল্য ধনুর্ধর আর দ্বিতীয়টি না হয়। লক্ষণীয়, দ্রোণ শুধু বললেন না, প্রতিজ্ঞা করলেন—

প্রযতিষ্যে তথা কর্তুং যথা নান্যো ধনুর্ধরঃ।
ত্বৎসমো ভবিতা লোকে সত্যমেতদ্‌ব্রবীমিতে॥

দ্রোণ অর্জুনের বিদ্যাশিক্ষায় আরও বেশি করে মনোযোগ দিলেন। এতকাল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্যের এই মনোযোগের সিংহভাগ লাভ করে এসেছেন। কিন্তু এখন থেকে দ্রোণ সযত্নে অতিরিক্ত মনোযোগ দিচ্ছেন পুত্রসম প্রিয়তম শিষ্যের বিদ্যাশিক্ষায়। অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়েছিলেন অর্জুন, পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত বালকের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল গুরু দ্রোণাচার্যের অপার স্নেহে।

বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি এই গুরুকুলে অর্জুনের জীবনে আরও বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল যা পরবর্তী জীবনেও প্রভাব ফেলল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, গুরুপুত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক। যেদিন দ্রোণাচার্যের সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন যে, শিক্ষান্তে তিনি অবশ্যই গুরুর মনোবাসনা পূর্ণ করবেন—সেদিনই পুত্র অশ্বত্থামাকে ডেকে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছিলেন দ্রোণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় পর্যন্ত অর্জুন এই বন্ধুত্ব এবং অশ্বত্থামার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা বারবারই উল্লেখ করেছেন। এমনকী সৌপ্তিক পর্বে মধ্যরাতে সুপ্ত পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামার নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পরেও অতীতের সখ্য ভুলে কোনো নৃশংস প্রতিশোধের কথা শোনা যায় না অর্জুনের মুখে। অপরদিকে অশ্বত্থামা। পিতা দ্রোণ যে তাঁর প্রতি স্নেহে অন্ধ তা তিনি বেশ ভালো জানতেন। তবু প্রিয় শিষ্য হিসেবে অর্জুন যখন সেই স্নেহে ভাগ বসালেন, তখন তাঁর অন্তরে সামান্য ঈর্ষা জন্ম নিয়েছিল কী না বলা যায় না। ঈর্ষা এবং অর্জুনের সমকক্ষ হবার একটা প্রয়াস হয়তো ছিলই কারণ শিষ্য হিসেবে 'ব্রহ্মশির' প্রভৃতি যেসব দিব্যাস্ত্র অর্জুন লাভ করেছিলেন আপন যোগ্যতায়, অশ্বত্থামা পিতার কাছ থেকে তা আদায় করেছিলেন দ্রোণের অন্ধ পুত্রস্নেহের সুযোগ নিয়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রোণ এই দিব্যাস্ত্রগুলি অশ্বত্থামার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, অশ্বত্থামা এগুলি ধারণ করার যোগ্য নন জেনেও। এই ঈর্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্বন্ধটুকু বাদ দিলে অর্জুন তথা অন্যান্য পাণ্ডবদের সঙ্গে অশ্বত্থামার কোনো শত্রুতা সেভাবে প্রকাশ পায়নি।

দ্বিতীয়ত, গুরুকুলে সহাধ্যায়ী কর্ণ। দ্রোণাচার্যের কাছে যেমন দেশ-বিদেশ থেকে রাজপুত্ররা এসেছিলেন শিক্ষার্থী হয়ে, তেমনই এসেছিলেন অধিরথের পুত্র কর্ণও। কর্ণের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই দুর্যোধনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তৈরি হল। ফলে দুর্যোধনের মনে পাণ্ডবদের প্রতি যে তীব্র বিদ্বেষ ছিল তা ধীরে ধীরে সংক্রমিত হল কর্ণের মনেও। কর্ণও দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে পাণ্ডবদের প্রতি নানা বিদ্বেষমূলক আচরণ করতে লাগলেন। কর্ণের হৃদয়ে সংক্রমিত এই বিদ্বেষে অবশ্য ইন্ধন জোগালো অর্জুনের প্রতি কর্ণের ঈর্ষা। অর্জুন যতই দ্রোণাচার্যের প্রিয় থেকে প্রিয়তর শিষ্য হয়ে উঠতে লাগলেন, কর্ণের ঈর্ষার আগুনেও ঘি পড়তে লাগল ততটাই। কর্ণের মনে নিজের সম্পর্কে একটা বেশ উচ্চ ধারণা ছিল—অন্যান্যদের তুলনায় ধনুর্বিদ্যায় অনেক বেশি কুশল ছিলেন বলেই তাঁর ধারণা ছিল যে, ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণের অন্য কোনো শিষ্যই তাঁর থেকে বেশি বড়ো হতে পারবে না। সেখানে অর্জুনের গুণ, অধ্যবসায়ে মুগ্ধ হয়ে দ্রোণ যখন গোড়া থেকেই অর্জুনের প্রতি স্নেহশীল হয়ে উঠলেন, তখন থেকে কর্ণ অর্জুনকেই নিজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে আরম্ভ করলেন। তবে সহাধ্যায়ীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকে, যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ থাকে—তেমনটা কর্ণের মনোভাবে কখনোই ছিল না। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবনা ক্রমে ক্রমে শত্রুতার ভাবনায় রূপান্তরিত হল। আর সে এমনই শত্রুতা যে, সেই অল্পবয়স থেকেই কর্ণ অর্জুনবধের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। অল্প

কিছুকাল পরে অবশ্য কর্ণ দ্রোণাচার্যের গুরুকুল ছেড়ে অস্ত্রশিক্ষা করতে গেলেন মহেন্দ্রপর্বতে, পরশুরামের কাছে। অর্জুন জানতেও পারলেন না যে, তাঁরই এক সতীর্থ তাঁকে বেছে নিল জীবনের প্রথম এবং শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে।

তৃতীয় ঘটনার কেন্দ্রে রইলেন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। লক্ষণীয়, অর্জুন কিন্তু শিক্ষারম্ভের দিন থেকেই একটি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। দ্রোণের অন্য শিষ্যরা কেউ তাঁর থেকে বেশি এগিয়ে যাচ্ছে কী না—সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। দ্রোণের পুত্র পক্ষপাতও যেমন সে দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনই একলব্যের ধনুর্বিদ্যার কুশলতাও অর্জুনের চোখে পড়ল। শরক্ষেপণে একলব্যের ক্ষিপ্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, অর্জুনের মতো নিপুণ ধনুর্ধরের কাছেও তা যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। সেই একলব্য যখন নিজেকে দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলে পরিচয় দিলেন, তখন গুরু দ্রোণের প্রতি অর্জুনের একটু অভিমানই হল। একদিন একান্তে দ্রোণের কাছে গিয়ে সাভিমানে অর্জুন বললেন—গুরুদেব! আপনিই সেদিন আমাকে বলেছিলেন—আমার শিষ্যদের মধ্যে আর কেউ তোমার থেকে শ্রেষ্ঠতর হবে না—

ন মে শিষ্যঃ ত্বদ্বিশিষ্টো ভবিষ্যতি।

অথচ আপনারই শিষ্য একলব্য ধনুর্বিদ্যায় আমার থেকেও অনেক বেশি নিপুণ। এটা কেমন করে হল?

সেদিন একলব্যের কাছে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলেন দ্রোণ। দ্রোণ যখন গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যকে তার অঙ্গুষ্ঠ কেটে দিতে বললেন—তখন অর্জুন সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুন কিন্তু বাধা দেননি গুরুকে। একলব্য যখন হাসিমুখে গুরুদক্ষিণা হিসেবে ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠ কেটে দিলেন, তখন একলব্যের বাণ ছোঁড়ার ক্ষিপ্রতা নিঃসংশয়ে হ্রাস পাবে বুঝে অর্জুন বেশ খুশিই হলেন—

ততোঽর্জুনঃ প্রীতমনা বভূব বিগতজ্বরঃ।

তবে অর্জুনের এমন আচরণকে কেবলমাত্র অমানবিকতা বা ঈর্ষা না ভেবে প্রোফেশনালিজম, ভাবাই ভালো।

তবে অর্জুনের থেকেও এই ঘটনায় দ্রোণের আচরণ আমাদের অনেক বেশি অবাক করে। অর্জুনকে তিনি অনায়াসে বলতে পারতেন যে, অর্জুনের উচিত আরও কঠোর পরিশ্রম করা, আরও মনঃসংযোগ দিয়ে অভ্যাস করা—যাতে তিনি একলব্যের সমতুল্য হতে পারেন, বা তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন। কিন্তু তা না করে দ্রোণ যা করলেন, তা পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতা আপন পুত্রের জন্যও করেন না। দ্রোণ নিজপুত্র অশ্বত্থামার অনেক অনুচিত আবদার পূরণ করেছেন, কিন্তু পুত্রের জন্যও এমন কোনো কাজ তিনি কখনো করেননি। বোঝা যায়—কঠোর পরিশ্রমী এই শিষ্যটি তাঁর হৃদয়ে পুত্রের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এক স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে নানা প্রসঙ্গে অর্জুন যখন দ্রোণকে স্মরণ করবেন, তখন আচার্যশ্রেষ্ঠ হিসেবে দ্রোণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যেমন প্রকাশ পাবে, তেমনই গুরুর কাছে যে পিতার মতোই অপার স্নেহ লাভ করেছেন তিনি—সেই স্মৃতিও রোমন্থন করবেন বার বার। পাশাপাশি দ্রোণকেও বহুবার সর্বসমক্ষেই স্বীকার করতে দেখা যাবে যে, অশ্বত্থামা তাঁর প্রিয় পুত্র অবশ্যই। কিন্তু অর্জুন তাঁর কাছে পুত্রাধিক প্রিয়। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের গুরুত্ব মহাকাব্য-পুরাণের বহুচর্চিত বিষয়। আদর্শ গুরু এবং আদর্শ শিষ্যের একাধিক উদাহরণও পাওয়া যায় সেখানে। কিন্তু আচার্য দ্রোণের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্কের মাধুর্য্য গুরু-শিষ্য সম্পর্ককে এক অন্যতর মাত্রা দিয়েছে।

যাইহোক, রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ প্রায়। কোন রাজকুমার কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন তার একটা তালিকাও দিয়েছেন মহাভারতের কবি। সেই তালিকার একেবারে শেষে অর্জুনের সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য—দ্রোণের এতজন শিষ্যের মধ্যে একমাত্র অর্জুনই অতিরথ হয়ে উঠলেন—

একঃ সর্বকুমারাণাং বভূবাতিরথোঽর্জুনঃ।

দ্রোণাচার্য শিক্ষান্তে ছাত্রদের যে পরীক্ষা নিলেন তাতেও অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল খুব স্বাভাবিকভাবেই। পাখির চোখ বেঁধার পরীক্ষায় অর্জুন যে মনঃসংযোগের পরিচয় দিলেন, তা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। ঘটনাটি এরকম—রাজপুত্ররা ধনুর্বিদ্যায় কতটা পারদর্শী হয়েছেন তা দেখার জন্য দ্রোণ একটি কৃত্রিম পাখি তৈরি করালেন। অনেকটা আসল পাখির মতোই দেখতে সেটি। একটি উঁচু গাছের উপর দিকের

ডালে পাখিটিকে বসালেন দ্রোণ রাজপুত্রদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে। এবার পরীক্ষা আরম্ভ হল। দ্রোণ একে একে শিষ্যদের ডাকলেন লক্ষ্যভেদ করার জন্য। রাজকুমাররা ধনুক বাণ হাতে প্রস্তুত হতেই দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন—কি দেখছ? জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র যুধিষ্ঠির বললেন—এই গাছ, পাখি, আপনি, আমার ভাইয়েরা—সবকিছুই দেখছি। অন্যান্য রাজপুত্রদেরও একই প্রশ্ন করলেন দ্রোণ। আর যুধিষ্ঠিরের মতো সকলেই অল্প-বিস্তর একই উত্তর দিলেন এবং দ্রোণও সকলকেই অল্পবিস্তর তিরস্কার করলেন। সব শেষে অর্জুনের পালা। অর্জুন যখন লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত হলেন, তখনও দ্রোণ একই প্রশ্ন করলেন—কী দেখছ? কিন্তু এখানেই অর্জুন অন্যদের থেকে আলাদা। লক্ষ্যবস্তুর উপর তাঁর মনঃসংযোগ এতটাই বেশি, যে লক্ষ্যবেধের সময় শুধু সেটি ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখেন না। দেখা প্রয়োজন বলেও মনে করেন না। অর্জুন উত্তর দিলেন—আমি শুধু পাখিটাই দেখতে পাচ্ছি গুরুদেব। সন্তুষ্ট হয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন দ্রোণ—যদি শুধু পাখিই দেখছ, তাহলে বলো তো, পাখির কোনো অঙ্গটা বেশি চোখে পড়ছে তোমার? অর্জুন বললেন—শুধু পাখির মাথাটাই দেখতে পাচ্ছি গুরুদেব। আর কিছু নয়।

শিষ্যের এমন চরম মনঃসংযোগের খবর পেয়ে আনন্দে, রোমাঞ্চে ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ দ্রোণের গায়ে পর্যন্ত কাঁটা দিয়ে উঠল—দ্রোণো হৃষ্ট তনূরুহঃ। তারপর তাঁর আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তের মধ্যে অর্জুনের বাণে পাখির মাথা কেটে পড়ল মাটিতে।

এতো গেল লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু একটি নয়, পূর্ব নির্ধারিতও নয়। সব ঘটনাই সেখানে আকস্মিক। এমন বিপদে শিষ্যেরা কিভাবে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়—সে পরীক্ষাও নিতে চাইছিলেন দ্রোণ। সুযোগ এসে গেল একদিন, আকস্মিকভাবেই।

শিষ্যদের নিয়ে সেদিন নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন দ্রোণ। গঙ্গায় ডুব দিতেই একটি হিংস্র জলজন্তু, সম্ভবত কুমীর জাতীয় কোনো প্রাণী দ্রোণের পা কামড়ে ধরল। দ্রোণাচার্যের মতো বীর নিরস্ত্র অবস্থাতেও কুমীরের হাত থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা রাখতেন। তবু শিষ্যদের পরীক্ষা করার জন্য দ্রোণ বাঁচাও! আমাকে রক্ষা কর—বলে আর্ত চীৎকার করে উঠলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রত্যেকটি রাজকুমার আপন কর্তব্য ভুলে গেলেন। হতচকিত বিমূঢ় রাজপুত্রদের মধ্য থেকে তড়িৎ বেগে এসে জলের মধ্যে শরসন্ধান করে নিমেষে যিনি জল-জন্তুটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন— তিনি অর্জুন। দ্রোণ আর দেরি করেননি। অর্জুনের কৃতকার্যতার পুরস্কারস্বরূপ নিজের কাছে সযত্নে রাখা 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র তিনি অর্জুনকে দিলেন। শিখিয়ে দিলেন এই অস্ত্র প্রয়োগ এবং সংবরণের কৌশল।

যাইহোক, রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হল শেষপর্যন্ত। শিক্ষান্তে তাঁদের অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনীর জন্য রঙ্গভূমি নির্মিত হল। রঙ্গভূমিতেও অর্জুন ধনুর্বিদ্যার নানা কৌশল দেখিয়ে চমৎকৃত করলেন দর্শকদের। আগ্নেয় অস্ত্রের প্রয়োগে অগ্নি সৃষ্টি করলেন, বারুণাস্ত্রে আনলেন জল, বায়ব্য অস্ত্রে প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি হল, পর্জন্যাস্ত্রের প্রভাবে আকাশে দেখা দিল ঘন মেঘ। তাছাড়াও অর্জুনের লক্ষ্যভেদের নিপুণতা দেখেও দর্শকরা চমৎকৃত হলেন। রঙ্গভূমিতে সেদিন অর্জুনই ছিলেন কলাকৌশলে সকলের শ্রেষ্ঠ। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রও সেদিন উত্তরাধিকার, জ্ঞাতিকলহ-সব ভুলে অকুণ্ঠ প্রশংসায় ভরে দিয়েছেন অর্জুনকে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—যেমন অরণি থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তেমনি কুন্তী থেকে উৎপন্ন এই তিন পুত্রকে দেখে আমি ধন্য, অনুগৃহীত এবং সুরক্ষিত বোধ করছি—

ধন্যো'স্ম্যনুগৃহিতো'স্মি রক্ষিতো'স্মি মহামতে।
পৃথারণি সমুদ্ভূতৈস্ত্রিভিঃ পাণ্ডববহ্নিভিঃ॥

অর্জুনের অস্ত্রকৌশল দেখানো প্রায় শেষ। এমন সময় রঙ্গভূমির প্রবেশদ্বারে একটি সব্যঙ্গ করতালির ধ্বনি শোনা গেল। হাততালি দিতে দিতে রঙ্গভূমিতে এসে দাঁড়ালেন কর্ণ। মুখে বিদ্রূপের স্পষ্ট ছাপ। অর্জুনের এককালের সহপাঠী কর্ণ। অর্জুনের প্রতি তাঁর ঈর্ষা-বিদ্বেষ বাড়তে বাড়তে এমনই প্রতিহিংসার রূপ ধারণ করেছিল যে, মূলত অর্জুনকে বধ করার জন্যই কর্ণ অমোঘ 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র চেয়েছিলেন দ্রোণের কাছে। দ্রোণ অস্বীকার করলেন সুকৌশলে, কারণ কর্ণ যে মূলত অর্জুনবধের জন্যই এ অস্ত্র

চাইছেন—তা বুঝতে বুদ্ধিমান দ্রোণাচার্যের দেরি হয়নি। তারপরই দ্রোণাচার্যের গুরুকুল ছেড়ে মহেন্দ্র পর্বতে, পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে গেলেন কর্ণ। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে, ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করে সম্প্রতি কর্ণ ফিরে এসেছেন হস্তিনায়। রঙ্গভূমিতে যখন প্রায় সকলেই অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলে মেনে নিয়েছেন, তখন সামনে এসে অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বকে সরাসরি 'চ্যালেঞ্জ' ছুঁড়ে দিলেন কর্ণ। অর্জুন এতক্ষণ ধনুর্বিদ্যার যে যে কৌশল দেখিয়েছেন, সেসব তো তিনি করে দেখালেনই, তারপর সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন অর্জুনকে। কর্ণ যখন অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অহ্বান করছেন, তখন দ্রোণাচার্য বসেছিলেন সামনেই। পূর্ব তিক্ততা স্মরণ করে তাঁকে যে প্রণাম অভিবাদন জানিয়েছিলেন কর্ণ, তাতেও তাচ্ছিল্য ফুটে বেরোচ্ছিল স্পষ্টই। দ্রোণ তাতে অপমানিত বোধ করছিলেন, রুষ্টও হয়েছিলেন। এদিকে কর্ণের বন্ধু দুর্যোধনরা অর্জুনের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা ক্রমশই ঘনিয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু গোটা ঘটনায় দ্রোণ আশ্চর্যভাবে নীরব। অথচ সেদিনের বাগবিতণ্ডা তিনি চাইলে সূচনাতেই বন্ধ করে দিতে পারতেন। শুধুমাত্র এটুকু বললেই যথেষ্ট হত যে, এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে কুরু রাজকুমারদের শিক্ষা সমাপন উপলক্ষ্যে। বহিরাগতের অস্ত্রকৌশল দেখাবার মঞ্চ এটা নয়, আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপযুক্ত স্থান তো নয়ই। কিন্তু দ্রোণ সেসব কিছু বললেন না। কর্ণ যে তাঁরই অন্যতম গুরু পরশুরামের কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করে এসেছেন, তা নিশ্চয় দ্রোণ জানতেন। আজ দ্রোণাচার্যের শ্রেষ্ঠ শিষ্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছেন পরশুরামশিষ্য কর্ণ। বিষয়টি দ্রোণের কাছেও আচার্য হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন, সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্ণকে তাই তিনি বাধা দিলেন না।

এদিকে দ্রোণকে নীরব দেখে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বাধ্য হয়েই আসরে নামলেন কুলগুরু কৃপাচার্য। কর্ণ ক্ষত্রিয় নন, রাজকুলে জন্মাননি সুতরাং এই রঙ্গভূমিতে তিনি রাজপুত্র অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন না—একথা বলে কৃপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ বন্ধ করার একটা চেষ্টা করলেন বটে, তবে দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করায় বিবাদ আবারও চরমে উঠল। অর্জুনও কিন্তু চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলেন সর্বক্ষণ। যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হয় তার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু কর্ণের তাচ্ছিল্য-বিদ্রুপের উত্তরে কথা বলতে তাঁর বোধ হয় রুচিতে বাধল। তবে সূর্যাস্ত হওয়ায় সেদিনের দ্বন্দ্বযুদ্ধও বন্ধ হয়ে গেল।

[মহা (k) ১.১৩২.৪-৭৯; ১.১৩৩.১-২২;
১.১৩৫.৭-৩২; ১.১৩৬ অধ্যায়; ১.১৩৭.১-২৫;
(হরি) ১.১২৮.১০-১১০; ১.১৩০.৭-৩২;
১.১৩১ অধ্যায়; ১.১৩২.১-২৫]

□ দ্রোণ বলেছিলেন অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে রাজকুমারদের কর্তব্য হবে তাঁর সুপ্ত মনোবাঞ্ছা পূরণ করে গুরুদক্ষিণা দেওয়া। এখন সেই গুরুদক্ষিণা দেবার সময় হল। দ্রোণ রাজপুত্রদের বললেন—তোমাদের মধ্যে কেউ পঞ্চালদেশের রাজা দ্রুপদকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করে নিয়ে এসো। সেটাই তোমাদের গুরুদক্ষিণা হবে। দ্রোণাচার্যের আদেশ শুনে রাজপুত্রদের মধ্যে বেশ উত্তেজনা দেখা দিল। শিক্ষান্তে এটাই তাঁদের প্রথম যুদ্ধ। ফলে রাজপুত্ররা সকলেই বেশ উত্তেজিত হয়ে আমি আগে যাব, আমিই গিয়ে দ্রুপদকে বেঁধে আনব—ইত্যাদি বলে মৌখিক বীরত্ব প্রকাশ করতে লাগলেন। কৌরব রাজকুমাররা তো কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে আগেভাগে যুদ্ধ করতে রওনা দিলেন। এখানেও ব্যতিক্রম অর্জুন। তিনি জানতেন, ধনুর্বিদ্যায় দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের সহাধ্যায়ী, কাজেই তাঁকে বেঁধে আনা অত সহজ নয়। তাছাড়া মৌখিক উত্তেজনা দিয়ে আর যাইহোক, যুদ্ধজয় সম্ভব নয়। সুতরাং এতটুকু উত্তেজনা না দেখিয়ে ন্যায়কোচিত দৃঢ়তায় অর্জুন দ্রোণাচার্যকে বললেন—এঁদের পরাক্রম প্রকাশ করা আগে শেষ হোক, আমরা তারপর যাব—

এষাং পরাক্রমস্যান্তে বয়ং কুর্যাম সাহসম্।

অর্জুন ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করতে লাগলেন দক্ষ সেনাপতির মতোই। অর্জুনের চিন্তার বিষয় মূলত তিনটি। প্রথমত তিনি ভাবলেন, কৌরব রাজপুত্রদের সঙ্গে দ্রুপদের আগে এক দফা যুদ্ধ হয়ে গেলে দ্রুপদের এবং তাঁর সৈন্যদের শক্তি কতটা তা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। পাশাপাশি একপ্রস্থ যুদ্ধের পর তাঁরা

বেশ ক্লান্তও থাকবেন, তখন আক্রমণ করে পরাস্ত করাটাও হবে সহজ। দ্বিতীয়ত, কর্ণ রঙ্গভূমিতে যতখানি দম্ভ প্রকাশ করেছিলেন, কার্যকালে তার কতটুকু করে দেখাতে পারেন সে সম্পর্কেও একটা ধারণা করা যাবে। অর্জুন সকলের ভীড়ে মিশে যুদ্ধে যেতে চাইলেন না তার আরও একটা বড়ো কারণ, এমন সম্মিলিত আক্রমণে যদি দ্রুপদ ধরাও পড়েন, তাহলেও তার কৃতিত্ব ভাগাভাগি হয়ে যাবে। অর্জুন তাই প্রথম দফার যুদ্ধের দিকে নজর রেখে শান্ত হয়ে বসে রইলেন। দ্রোণও বুঝতে পারলেন অর্জুনের রণনীতি। মনে মনে সন্তুষ্টও হলেন। এদিকে কর্ণ, দুর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরব রাজপুত্ররা দ্রুপদের বাণের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গেলেন যেন, এই কিছুদিন আগেও রঙ্গভূমিতে যে কর্ণ অর্জুনের বীরত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তাঁকে শেষপর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে হল। প্রথম যুদ্ধেই কর্ণ এবং কৌরবরা অকৃতকার্য হলেন।

এরপর পাণ্ডবদের পালা। অর্জুন বুঝেছেন, দ্রুপদ একপ্রস্থ যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়েছেন, তাঁকে আক্রমণ করার এটাই উপযুক্ত সময়। গুরু দ্রোণকে প্রণাম করে যুদ্ধযাত্রা করলেন অর্জুন। প্রথমেই বড়ো ভাই যুধিষ্ঠিরকে বিরত করলেন তিনি। দাদা, আপনি যুদ্ধ করবেন না—

যুধিষ্ঠিরং নিবার্য্যাশু মা যুধ্যস্বেতি পাণ্ডবম্।

তারপর নকুল-সহদেবকে চক্ররক্ষক করলেন অর্জুন। সঙ্গে রইলেন ভীম। অর্জুনের বাণে এবার পাঞ্চাল সেনার পরাজয়ের পালা। দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধে দ্রুপদকে পরাস্ত করে বন্দি করলেন অর্জুন। তারপর বন্দি দ্রুপদকে নিয়ে ফিরতে উদ্যত হয়ে অর্জুন দেখলেন ভীম তখনও যুদ্ধের নেশায় মেতে পাঞ্চাল যোদ্ধাদের বধ করে চলেছেন। এখানেই অর্জুনের আত্মসংযমের প্রথম পরিচয় মেলে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, রাজা বন্দি হয়েছেন—এ অবস্থায় ভীমের মতো যোদ্ধা যখন কেবল যুদ্ধের নেশায় যুদ্ধ করে চলেন, তখন অর্জুনের ব্যবহারে সভ্য যোদ্ধার আদর্শ আচরণ, নায়কোচিত সংযম প্রকাশ পায়। অর্জুন তাড়াতাড়ি ভীমকে বললেন—এবার থামুন দাদা। দ্রুপদ রাজাও আমাদের আত্মীয়। আমাদের গুরুদক্ষিণা দেবার কার্য যখন সিদ্ধ হয়েছে, তখন অকারণে আর তাঁর সৈন্য বধ করবেন না—

সম্বন্ধী কুরুবীরাণাং দ্রুপদো রাজসত্তমঃ।
মা বধীস্তদ্বলং ভীম গুরুদানং প্রদীয়তাম্॥

দ্রোণ দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্য কেড়ে নিয়ে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। দ্রুপদ এ অপমান ভুলতে পারলেন না। একদিকে তিনি যেমন দিন-রাত দ্রোণবধের উপায় খুঁজে চললেন, অন্যদিকে যে কৃষ্ণবর্ণ তরুণ ধনুর্ধর তাঁকে পরাস্ত করেছিলেন, সেই অর্জুনের পরাক্রম এবং তাঁর নায়কোচিত ব্যবহারও দ্রুপদের মনে গাঁথা হয়ে রইল। ভবিষ্যতে কন্যা দ্রৌপদীর উপযুক্ত বর হিসেবেও দ্রুপদ এই তরুণ ধনুর্ধরকেই মনোনীত করবেন।

[মহা (k) ১.১৩৮.১২-১৪; ১.১৩৮.২৬-৬৩;
(হরি) ১.১৩৩.১২-১৪; ১.১৩৩.২৬-৬৩]

□ এরপর একটি বছর কেটে গেল। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। যুধিষ্ঠিরের যুবরাজ পদে অভিষেকের পরই মহাভারতের কবি উল্লেখ করলেন যে, অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষার আরও কিছু বিশেষ পাঠ সাঙ্গ হল। গদা, ক্ষুর, নারাচ, ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্রেও অর্জুন যথেষ্ট দক্ষ হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নানা ধরনের নানা আকারের অস্ত্রের মোকাবিলা কীভাবে করতে হয়—সে বিষয়েও বিশেষজ্ঞ হলেন অর্জুন। এইসময় কুরুরাজসভায় বসে আরও একবার অর্জুনকে 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন দ্রোণ। অর্জুনের প্রথম যুদ্ধেই তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, অর্জুনের মধ্যে সে সংযম আছে যে, যুদ্ধ করতে গিয়েই তিনি 'ব্রহ্মশিরে'র মতো মারণাস্ত্রের চিন্তা করেন না। যোদ্ধা অর্জুনকে সেজন্য যথেষ্ট প্রশংসাও করেছেন দ্রোণ। তারপর কুরুরাজসভায় বসে ব্যক্তিগতভাবে অর্জুনের কাছে আবার একবার গুরুদক্ষিণা চাইলেন দ্রোণ। ঠিক ছোটোবেলায় যেমন ভাবে দৃঢ়স্বরে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অর্জুন, আজও একই ভাবে বললেন—দেব গুরুদেব। আপনি যা বলবেন, নিশ্চয় দেব—

দদানীতি প্রতিজ্ঞাতে ফাল্গুনেনাব্রবীদ্‌গুরুঃ।

দ্রোণ যেন ভবিষ্যত রাজনৈতিক পরিস্থিতির আভাস পাচ্ছিলেন তখন থেকেই। হয়তো মনে হচ্ছিল কুরুরাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং পররাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের সমন্বয়ে এমন পরিস্থিতি আসবে যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণ এবং অর্জুনকে দাঁড়াতে

হবে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। তাই দ্রোণ গুরুদক্ষিণা চাইলেন—প্রতিজ্ঞা কর, কখনো যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়, তুমি অবশ্যই যুদ্ধ করবে। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন—তাই হবে—

যুদ্ধে'হং প্রতিযোদ্ধব্যো যুধ্যমানস্ত্বয়া'নঘ।

এরপর গুরু দ্রোণের আশীর্বাদ নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হলেন অর্জুন। চললেন উত্তরদিকে। অর্জুন মূলত সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলেই পরিচিত। কিন্তু এই দিগ্বিজয় যাত্রার উল্লেখ করেই অর্জুন সম্পর্কে মহাভারতের কবি উল্লেখ করলেন—ধনুর্বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হলেও অর্জুন গদা এবং অসিযুদ্ধেও পারদর্শী ছিলেন—

গদাযুদ্ধে'সিযুদ্ধে চ রথযুদ্ধে চ পাণ্ডবঃ।
পারগশ্চ ধনুর্যুদ্ধে বভূবাথ ধনঞ্জয়ঃ॥

অর্জুনের দিগ্বিজয়ের বিবরণ মোটামুটি বিশদেই বর্ণিত হয়েছে মহাভারতে। উত্তর এবং পূর্বদিকের বহু রাজাকে পরাস্ত করে, রাশি রাশি সম্পদ কর হিসেবে আদায় করে অর্জুন ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে। অর্জুনের বীরত্বের কথা এবং পাণ্ডবদের যশ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে জ্ঞাতিবিদ্বেষের আগুন এতদিন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, পাণ্ডবদের এই যশ ও সম্পদবৃদ্ধিতে, ঈর্ষায় তা আবার নতুন করে জেগে উঠল। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে বারণাবতের লাক্ষাগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করলেন।

[মহা (k) ১.১৩৯.৬-২৭; (হরি) ১.১৩৪.৬-২৭]

□ বিদুরের বুদ্ধিবলে জতুগৃহ থেকে রক্ষা পেয়ে পাণ্ডবরা ছদ্মবেশে বাস করতে লাগলেন একচক্রায়। ভিক্ষাজীবি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষা করে দিনপাত করতে লাগলেন তাঁরা। এই সময় ব্রাহ্মণদের মুখে তাঁরা শুনলেন পঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্য নগরীতে রাজা দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর অনুষ্ঠিত হবে। ব্যাসের উপদেশে এবং কুন্তীর আগ্রহে পাণ্ডবরা কাম্পিল্যের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পথ চলতে চলতে একদিন তাঁরা এসে পৌঁছালেন গঙ্গাতীরে, সোমাশ্রয়ায়ণ তীর্থে। সন্ধ্যাবেলা, পথ দেখার জন্য অর্জুন একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে করে উপস্থিত হলেন গঙ্গাতীরে। সেই সময় গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ সেখানে জলক্রীড়া করতে এসেছিলেন। কুন্তী এবং পাণ্ডবদের দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁদের সকলকে তখনই সে স্থান ছেড়ে চলে যেতে বললেন। গন্ধর্বের এমন দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হলেন অর্জুন। দুজনের বিবাদ বাধল, আর সেই বিবাদ থেকে শুরু হল যুদ্ধ। অর্জুনের আগ্নেয় অস্ত্রে গন্ধর্ব অঙ্গারপর্ণের রথ দগ্ধ হয়ে গেল, অঙ্গারপর্ণ পরাজিত হয়ে অর্জুনের শরণাপন্ন হলেন। অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী কুম্ভীনসীও স্বামীর প্রাণভিক্ষা করলেন অর্জুনের কাছে। অর্জুন অঙ্গারপর্ণকে জীবনদান করলেন। দগ্ধরথ অঙ্গারপর্ণ বিখ্যাত হলেন চিত্ররথ নামে। পরাজিত অঙ্গারপর্ণ অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলেন। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কাছ থেকে অঙ্গারপর্ণ 'চাক্ষুষী' নামে এক বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন, যার প্রভাবে ব্যক্তি যা কিছু দেখতে ইচ্ছা করবে এবং যে ভাবে দেখতে ইচ্ছা করবে, সেইভাবেই দেখতে পাবে—

যচ্চক্ষুষা দ্রষ্টুমিচ্ছেত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
তৎ পশ্যেদ্ যাদৃশঞ্চেচ্ছেত্তাদৃশং দ্রষ্টুমর্হতি।

অঙ্গারপর্ণ এই 'চাক্ষুষী' বিদ্যা দান করলেন অর্জুনকে। আর দিলেন পাঁচশত গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব। অর্জুনও অঙ্গারপর্ণকে আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল শিক্ষা দিলেন, তাঁদের মধ্যে চিরস্থায়ী সখ্য স্থাপিত হল। অঙ্গারপর্ণের মুখে পাণ্ডবরা শুনলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ রাজা সংবরণের উপাখ্যান, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র ঋষির কাহিনী। অঙ্গারপর্ণ পাণ্ডবদের পুরোহিত বরণ করতে উপদেশ দিলেন। অঙ্গারপর্ণের উপদেশমত মহর্ষি ধৌম্যকে পৌরহিত্যে বরণ করে পাণ্ডবরা আবার যাত্রা শুরু করলেন কাম্পিল্যের উদ্দেশে।

[মহা (k) ১.১৭০.৩-৮০; (হরি) ১.১৬৩.৩-৮০]

□ নির্দিষ্ট দিনে শুভক্ষণে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর আরম্ভ হল। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ স্বয়ংবর সভার পরিকল্পনা করেছিলেন অনেক ভেবেচিন্তে, মূলত শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনের কথা মাথায় রেখেই। একটি কৃত্রিম যন্ত্র নির্মাণ করিয়েছিলেন দ্রুপদ, সেটিকে অনেক উঁচুতে বসানো হয়েছিল। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল লক্ষ্যবস্তু। স্বয়ংবর সভায় রাখা ছিল যজ্ঞধনু, আর কয়েকটি বাণ। শর্ত ছিল, যে ব্যক্তি ধনুকে গুণ পরিয়ে সেই বাণগুলির সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন, তাঁকেই দ্রৌপদী বরণ করবেন স্বামীরূপে। দ্রুপদের আশা ছিল, এমন কঠিন শর্ত পূরণ করতে পারবেন একমাত্র অর্জুনই।

পাশাপাশি অবশ্য আশঙ্কাও ছিল। কারণ বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যুসংবাদ তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুপদের মনে ভয় ছিল, যদি সত্যিই অর্জুনের মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে তাঁর এত পরিকল্পনা, এমনকী স্বয়ংবর সভার এই বিপুল আয়োজনই না বিফলে যায়। যাইহোক, নির্দিষ্ট দিনে সারা ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে রাজা, রাজপুত্ররা সমবেত হলেন দ্রুপদের সভায়। ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণদের ভিড়ে এসে বসলেন পাণ্ডবরাও। যথাসময়ে স্বয়ংবর সভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। শর্ত অনুযায়ী একে একে রাজারা সেই যজ্ঞধনুতে গুণ পরিয়ে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু লক্ষ্যভেদ করা তো দূরের কথা, সেই ধনুক হাতে তুলতেও পারলেন না কেউ। দুর্যোধন, শাল্ব, শল্য, শিশুপাল সকলে একে একে ব্যর্থ হলেন। কর্ণ ধনুকে গুণ পরাতে সমর্থ হলেও দ্রৌপদী সূতপুত্রের গলায় মালা দিতে সম্মত হলেন না। ফলে কর্ণকে ফিরে যেতে হল প্রত্যাখ্যাত হয়ে।

রাজা রাজপুত্ররা সকলে ব্যর্থ হলে ব্রাহ্মণদের মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে উঠে এলেন অর্জুন। ধনুকের কাছে গিয়ে সেটিকে প্রদক্ষিণ করে ঈশ্বরকে স্মরণ করে ধনুক তুলে নিলেন নিজের হাতে। তারপর প্রায় অনায়াসে ধনুকে গুণ পরিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন অর্জুন। ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর একজন লক্ষ্যভেদ করেছেন দেখে ব্রাহ্মণরা একদিকে আনন্দে কোলাহল করে উঠলেন, অন্যদিকে দ্রৌপদী ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের গলায় মালা দিলেন দেখে সমবেত ক্ষত্রিয় রাজারা ঠিক ততটাই ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ রাজারা দ্রুপদকে তিরস্কার করতে লাগলেন এমনকী দ্রুপদরাজা এবং রাজকন্যা দ্রৌপদীকে হত্যা করার কথাও বললেন তাঁরা। কলহ বাড়তে বাড়তে স্বয়ংবর সভা শেষপর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিল, অর্জুনের হাতে অন্যান্য রাজারা এবং কর্ণ পরাস্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে নিয়ে নিরাপদে স্বয়ংবর সভা থেকে বেরিয়ে এলেন ভীম-অর্জুন। পায়ে হেঁটে এসে পৌঁছালেন সেই কুমোরের বাড়িতে যেখানে কুন্তী এবং পাণ্ডবরা আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। কুন্তী ঘরে একলা ছিলেন, ছেলেরা ফিরে আসতে দেরি করছেন দেখে নানা দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় একরকম অন্যমনস্কই ছিলেন তিনি। এমন সময় কুটীরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভীম-অর্জুন একসঙ্গে বলে উঠলেন—মা! দেখো, ভিক্ষা এনেছি।

এই একটি মাত্র বাক্য থেকে মহা বিপত্তি দেখা দিল। অন্যমনস্ক কুন্তী দরজার দিকে না তাকিয়ে, দ্রৌপদীকে না দেখেই বলে দিলেন—যা এনেছ, তা সকলে মিলে ভোগ কর—

প্রোবাচ ভুঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্বে।

পরক্ষণেই দরজার দিকে তাকিয়ে তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন কুন্তী। দ্রৌপদীকে না দেখেই তাঁকে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন—বুঝতে পেরে ভীষণ বিব্রত বোধ করতে লাগলেন কুন্তী। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরের কাছে। খুলে বললেন সমস্যার কথা। যুধিষ্ঠির অবশ্য সহজ সমাধানের কথাই বললেন প্রথমে। স্পষ্টই বললেন—লক্ষ্যভেদ করে স্বয়ংবরে দ্রৌপদীকে জয় করেছেন অর্জুনই, সুতরাং অবিলম্বে অর্জুন এবং দ্রৌপদীর বিবাহের আয়োজন হওয়াই উচিত। কিন্তু এবার আপত্তি তুললেন অর্জুন। তাঁর বড়ো দুই দাদা এখনও অবিবাহিত, এ অবস্থায় দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়া ধর্মসঙ্গত নয় বলে মতপ্রকাশ করলেন অর্জুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আগে আপনার বিবাহ হবে, তারপর মেজো দাদা ভীমের বিবাহ হবে। তার আগে দ্রৌপদীকে আমি বিবাহ করলে ঘোর অধর্ম হবে, আপনি এমন অধর্ম করার আদেশ দেবেন না আমাকে—

মা মাং নরেন্দ্র ত্বমধর্মভাজং কৃথা
ন ধর্মো'য়মশিষ্টদৃষ্টঃ।
ভবান্ নিবেশ্যঃ প্রথমং ততো'য়ং
ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্মা॥

স্বয়ংবরে লক্ষ্যভেদ করেছেন অর্জুন, সুতরাং শর্ত অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করার অধিকার জন্মেছে তাঁর। কিন্তু আকস্মিক ভাবে তৈরি হওয়া এই বিব্রত পরিস্থিতিতে এমন নির্লিপ্ত মন্তব্য অর্জুনের সংযত চরিত্রকেই প্রকাশ করে আরও একবার। যাইহোক শেষপর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে এবং মহর্ষি ব্যাসের উপদেশে স্থির হল পাণ্ডবরা পাঁচভাই মিলে বিবাহ

করবেন দ্রৌপদীকে। যথাসময়ে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হল।

[মহা (k) ১.১৮৫.৮-১১; ১.১৮৮.১-৩০;
১.১৮৯-১৯০ অধ্যায়; ১.১৯১.১-১৬;
(হরি) ১.১৭৮.৮-১১; ১.১৮১.১-৩০;
১.১৮২-১৮৩ অধ্যায়; ১.১৮৪.১-১৬]

□ এদিকে পঞ্চ-পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহের পরই খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বারণাবতের জতুগৃহ থেকে পাণ্ডবরা শুধু প্রাণেই বাঁচেননি, তাঁরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সহায়তা লাভ করেছেন দ্রুপদের জামাতা হবার সুবাদে। ধৃতরাষ্ট্র একরকম বাধ্য হয়েই পাণ্ডবদের সাদরে ফিরিয়ে আনলেন হস্তিনায়। কিছুদিন পর যুধিষ্ঠিরকে খাণ্ডবপ্রস্থে পৃথক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার আদেশ দিলেন ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডবরা নতুন রাজ্য স্থাপন করলেন খাণ্ডবপ্রস্থে।

পাণ্ডবরা সবেমাত্র খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করেছেন, এমন সময় একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে। নব পরিণীতা দ্রৌপদীকে আশীর্বাদ করলেন নারদ। দ্রৌপদী অন্তঃপুরে চলে যেতেই নারদ পঞ্চপাণ্ডবকে উপদেশ দিতে বসলেন। দ্রৌপদী রূপে-গুণে অতুলনীয়া এবং তিনি পঞ্চপাণ্ডবেরই পরিণীতা বধূ। যাতে তাঁকে নিয়ে স্বর্গসুন্দরী তিলোত্তমার মতো সুন্দ-উপসুন্দের ঝগড়া না লাগে—তার জন্য দ্রৌপদীর সঙ্গে পাঁচ ভাইয়ের বসবাসের একটা নিয়ম স্থির করার উপদেশ দিলেন নারদ। সেই উপদেশ মতো পাণ্ডবরা স্থির করলেন—জ্যেষ্ঠের ক্রমানুসারে প্রত্যেক ভাই এক এক বছর দ্রৌপদীর সঙ্গে বসবাস করবেন। যে পাণ্ডব যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাসে থাকবেন, সেই সময় যদি অন্য ভাই সেখানে ভুলবশতও প্রবেশ করেন—তাহলে বারো বছরের জন্য তাঁকে বনে গিয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে।

সেই নিয়ম মতো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন দ্রৌপদী। এমন সময় একদিন পাণ্ডবদের এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধিবাসী এক ব্রাহ্মণের গোরু চুরি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ রাজপ্রাসাদের সামনে এসে চীৎকার করে অভিযোগ জানাতে লাগলেন। অনুরোধ করতে লাগলেন—পাণ্ডবরা যেন তাঁর গোসম্পদ চোরেদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনেন। প্রজাদের প্রাণ এবং সম্পদ রক্ষা করা যে রাজার কর্তব্য এবং সেই কর্তব্য পালনের জন্যই যে প্রজারা রাজকর দিয়ে থাকে—ব্রাহ্মণ সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন বার বার। ব্রাহ্মণের সেই আর্তস্বর এবং তীক্ষ্ণ সমালোচনা পৌঁছাল অর্জুনের কানে। অর্জুন কর্তব্যের তাড়না অনুভব করতে লাগলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মনে পড়ল অস্ত্রাগারে বসে আছেন যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদী। এই সময় যদি অর্জুন সেখানে যান, তাহলে নিয়মানুসারে বারো বছর ব্রহ্মচারী হয়ে বনবাস করতে হবে তাঁকে। খানিকক্ষণ ইতস্তত করলেও অর্জুনের মতো বীরের কাছে শেষপর্যন্ত ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষার ধর্মই প্রধান হয়ে উঠল। অর্জুন অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে নিয়ে এলেন ধনুক-বাণ, ব্রাহ্মণের গোসম্পদ উদ্ধার করেও আনলেন তিনি। তারপর ব্রাহ্মণদের সাধুবাদ এবং ভাইদের অভিনন্দনের মধ্যেই অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে বনবাসে যাবার অনুমতি চাইলেন। অর্জুন বললেন—আমি নিয়মভঙ্গ করেছি। যে সময়ে আপনাকে দর্শন না করলেও চলত, সেই সময়ে আপনাকে বিরক্ত করেছি আমি—

সময়ঃ সমতিক্রান্তো ভবৎসন্দর্শনে ময়া।

অতএব নিয়মানুসারে আমাকে বারো বছরের জন্য বনবাসে যাবার অনুমতি দিন আপনি। যুধিষ্ঠির নানা যুক্তি দিয়ে অর্জুনকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন যে, অস্ত্রাগারে প্রবেশ করায় অর্জুনের কোনো অধর্ম হয়নি, নিয়মভঙ্গও হয়নি—অতএব বনবাসের প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু অর্জুন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার মায়া, সহানুভূতি, করুণা, প্রশ্রয় গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সবিনয়ে বললেন—আমি তো আপনার কাছেই শিখেছি যে, চালাকি করে কখনো ধর্ম হয় না—

ন ব্যাজেন চরেদ্ ধর্মং।

এখন কেন তবে আমাকে সত্য থেকে সরে আসতে বলছেন? যুধিষ্ঠির আর কথা বাড়াননি, বাড়াতে পারেননি। অর্জুন বারো বছরের জন্য ব্রহ্মচারী হয়ে বনবাস করার জন্য দীক্ষিত হলেন।

কয়েকজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থ থেকে বেরিয়ে অর্জুন প্রথমে এসে পৌঁছালেন গঙ্গাদ্বারতীর্থে। সেখানে গঙ্গার তীরে তপোবনে

ঈশ্বরের আরাধনা, হোম-যজ্ঞে অর্জুনের দিন কাটতে লাগল। এই তপোবনে অর্জুনকে দেখে মুগ্ধ হলেন নাগরাজকন্যা উলূপী। মহাভারতে উলূপীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন ঐরাবতনাগের বংশজাত কৌরব্য নাগের কন্যা। অল্প বয়সে উলূপীর বিবাহ হয়েছিল একজন নাগবংশীয় পুরুষের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরেই সেই নাগ গরুড়ের হাতে নিহত হন। উলূপী নিজে বৈধব্য জীবন কাটাচ্ছিলেন। এমনই সময় গঙ্গাদ্বারতীর্থের তপোবনে অর্জুনকে দেখে তাঁর মনে কামনা জাগল। শুধুই দেহজ কামনা নয়, ভবিষ্যত জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার কামনা, জীবনের অবলম্বন একটি পুত্রলাভের কামনাও বটে। একদিন অর্জুন যখন গঙ্গায় স্নান সেরে পিতৃলোকের তর্পণে রত, তখন হঠাৎই উলূপী এসে তাঁকে টেনে নিয়ে চললেন নাগলোকের দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অর্জুন দেখলেন—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন নাগরাজ কৌরব্যের অগ্নিশরণ গৃহে। সামনে সুন্দরী নাগকন্যা উলূপী। একটু বিস্মিত হয়েই অর্জুন উলূপীকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পরিচয়। এমন করে তিনি অর্জুনকে নিজগৃহে টেনে আনলেন কেন—সেকথাও জানতে চাইলেন। উলূপী অর্জুনকে খুলে বললেন তাঁর মনের কথা। অর্জুন একটু চিন্তায় পড়লেন। নিয়মানুসারে তাঁর বারো বছর ব্রহ্মচর্য্য পালন করার কথা। উলূপীর মনস্কামনা পূরণ করতে গেলে অর্জুনের ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হয়। অর্জুন উলূপীকেই জানালেন নিজের ধর্মসংকটের কথা। সহজ যুক্তিতে অর্জুনের সমস্যার সমাধান করলেন উলূপী। তিনি বললেন—আপনার এই যে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম—এতো শুধুমাত্র দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য নারীর সঙ্গে সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তো তা খাটে না—

তদিদং দ্রৌপদীহেতোরনান্যস্য প্রবাসনম্।।
কৃতবাংস্তত্র ধর্মার্থমত্র ধর্মো ন দুষ্যতি।

উলূপীর কাকুতিমিনতি, আত্মসমর্পণ শেষ পর্যন্ত আর এড়াতে পারলেন না অর্জুন। উলূপীর মনস্কামনা পূরণ করলেন তিনি। সেই রাত্রি উলূপীর গৃহে অবস্থান করলেন অর্জুন। পরদিন সূর্যোদয়ের সময় উলূপী নিজে অর্জুনকে আবার পৌঁছে দিয়ে গেলেন গঙ্গাদ্বারতীর্থে। উলূপীর গর্ভে জাত অর্জুনের পুত্রটির নাম ইরাবান। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় অর্জুন উলূপীকে প্রায় স্ত্রীর মর্য্যাদাই দিয়েছিলেন। উলূপীর পুত্র ইরাবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতা অর্জুনকে সহায়তা করার জন্য নাগ সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসেছিলেন। উলূপীকেও কুরুরাজপরিবারের নানা অনুষ্ঠানে অর্জুনের স্ত্রীর মর্য্যাদাতেই উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। উলূপীও অর্জুনকে স্বামীরূপেই স্থান দিয়েছিলেন অন্তরে। তাঁদের একরাত্রির সঙ্গমকে লৌকিক দৃষ্টিতে ঠিক বিবাহ বলা না গেলেও অর্জুনের প্রতি উলূপীর নিষ্ঠা ছিল একজন পতিব্রতা স্ত্রীর মতোই।

*[মহা (k) ১.২০৮-২১২ অধ্যায়; ১.২১৩.১-৩৫;
১.২১৪.১-৩৬; (হরি) ১.২০১-২০৫ অধ্যায়;
১.২০৬.১-৩৫; ১.২০৭.১-৩৬]*

□ যাইহোক, উলূপীর কাছ থেকে ফেরার অল্প কিছুদিন পরই অর্জুন গঙ্গাদ্বার ছেড়ে চলে গেলেন। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছালেন হিমালয় পর্বতে। তারপর নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে একসময় কলিঙ্গদেশ পার হয়ে অর্জুন পৌঁছালেন মণিপুরে। মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন অর্জুন। চিত্রবাহনের রাজপুরীতে চিত্রবাহনের পরমাসুন্দরী কন্যা চিত্রাঙ্গদাকেও দেখলেন অর্জুন। চিত্রাঙ্গদার অপরূপ সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে অর্জুন রাজা চিত্রবাহনকে জানালেন যে, তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করতে চান—

দেহি মে খল্বিমাং রাজন্ ক্ষত্রিয়ায় মহাত্মনে।

অর্জুনের নাম, বংশপরিচয় সব শুনে রাজা চিত্রবাহন বললেন—দেখো অর্জুন! আমাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। অবশেষে সন্তান কামনায় কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করলেন তিনি। মহাদেব তাঁকে বর দিলেন—তোমার বংশে প্রত্যেক পুরুষে একটি করে সন্তান হবে। সেই থেকে বহুদিন পর্যন্ত আমাদের বংশে প্রত্যেকে একটি করে পুত্রসন্তান লাভ করে এসেছেন। কিন্তু ভাগ্যবশত আমার একমাত্র সন্তানটি কন্যা। আমি এই কন্যাকেই নিজের পুত্র বলে ভাবনা করি, এর সন্তান আমারই বংশধর হবে, আমার বংশরক্ষা করবে—

একা চ মম কন্যেয়ং কুলস্যোৎপাদনী ভৃশম্।
পুত্রো মমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষর্ষভ॥
পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংজ্ঞিতা ভরতর্ষভ।

অবশেষে চিত্রবাহন বললেন—আমার কন্যার গর্ভে তোমার যে পুত্র জন্মাবে, সেই পুত্র তোমার বংশধর হবে না। সে আমার বংশরক্ষা করবে—এই শর্তে তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করতে পার। অর্জুন সম্মত হলেন। চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করে তিনটি বছর মণিপুরের রাজভবনে বাস করলেন অর্জুন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হল, তার নাম বভ্রুবাহন। পুত্রের মুখ দেখার পর অর্জুন বিবাহের শর্ত মতো পুত্রটিকে তুলে দিলেন মণিপুররাজ চিত্রবাহনের হাতে। বিদায় নেবার আগে চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বললেন—তুমি এখানে ভালো থেকো, পুত্রটিকে প্রতিপালন করো। রাজা যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবেন সেই সময় তুমি আমাদের রাজধানীতে এসো। পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা হবে তোমার, ভালো লাগবে। চিত্রাঙ্গদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্জুন আবার বের হলেন তীর্থযাত্রায়।

[মহা (k) ১.২১৫.১-২৭; ১.২১৭.২৩-৩৫;
(হরি) ১.২০৮.১-২৭; ১.২১০.২৩-৩৫]

□ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে তীর্থ পর্যটনের সময় অর্জুন পাঁচটি জনশূন্য তীর্থক্ষেত্র দেখতে পান। এই তীর্থগুলির নাম—অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ, পৌলোমতীর্থ, কারন্ধমতীর্থ এবং ভারদ্বাজতীর্থ। মহাভারতে এই তীর্থগুলিকে অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যফলদায়ী তীর্থ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত অর্জুনও এই তীর্থগুলির মাহাত্ম্যের কথা লোকমুখে শুনেই তীর্থদর্শন করতে এসেছিলেন। তাই তীর্থগুলিকে জনহীন দেখে তিনি স্বভাবতই বিস্মিত হলেন। তিনি স্থানীয় তপোবনবাসী তপস্বীদের কাছে জানতে চাইলেন যে, কী কারণে এই তীর্থগুলি জনশূন্য হয়ে আছে। তপস্বীরা অর্জুনকে বললেন—এই পাঁচটি তীর্থে পাঁচটি হিংস্র জলজন্তু বাস করে। তীর্থক্ষেত্রে স্নানরত পুণ্যার্থীদের তারা হরণ করে এবং ভক্ষণ করে। তাই ভয়ে পুণ্যার্থীরা এই পাঁচটি তীর্থক্ষেত্রকে বর্জন করেছেন। একথা শুনে অর্জুন স্থির করলেন যে, তিনি নিজে ওই পাঁচটি তীর্থক্ষেত্রে যাবেন। মুনি-ঋষিরা তাঁকে বার বার বারণ করতে লাগলেন। তবু অর্জুন নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

অর্জুন প্রথমে গেলেন সৌভদ্রতীর্থে। তীর্থ দর্শন করে অর্জুন যেই স্নান করতে জলে নামলেন, তখনই বিশাল এক জলজন্তু এসে অর্জুনের পা কামড়ে ধরল। অর্জুন তপস্বীদের বিবরণ শুনে হয়তো মানসিক ভাবে প্রস্তুতই ছিলেন—এতটুকুও বিচলিত না হয়ে ওই অবস্থাতেই জলজন্তুটিকে টেনে নিয়ে উঠলেন পারে। জল থেকে টেনে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই জলজন্তু রূপান্তরিত হল এক পরমাসুন্দরী রমণীতে। নিজের পরিচয় দিয়ে সে অর্জুনকে জানাল—সে একজন স্বর্গসুন্দরী অপ্সরা, তার নাম বর্গা। একসময় কুবেরের ভবন থেকে ফেরার পথে বর্গা এবং তাঁর চার অপ্সরা সখী সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা এবং লতা—এই পাঁচজন একজন পরম তেজস্বী তপস্বীকে দেখতে পান। অপ্সরাসুলভ চপলতার বশে তাঁরা সেই তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই তপস্বী তাঁদের শাপ দিলেন—তোমরা তোমাদের সুন্দর অপ্সরারূপ ত্যাগ করে জলজন্তুতে পরিণত হবে এবং একশত বছর তোমরা জলে বিচরণ করবে। অভিশাপ শুনে অপ্সরারা অনুতপ্ত হলেন, ভীতও হলেন। তাঁরা অনেক অনুনয় করলেন এমন ভয়ঙ্কর শাপ ফিরিয়ে নেবার জন্য। তাঁদের অনুনয়ে প্রসন্ন হয়ে সেই তপস্বী বললেন—তোমরা জলজন্তু হয়ে জলে স্নানরত মানুষদের আক্রমণ করবে। কোনো ব্যক্তি তোমাদের জল থেকে টেনে তুলতে যদি সমর্থ হয়, তাহলেই তোমরা আবার তোমাদের অপ্সরারূপ ফিরে পাবে। বর্গার কাহিনী শুনে অর্জুন বাকী চার তীর্থে গিয়ে চার অভিশপ্ত অপ্সরাকে উদ্ধার করলেন।

[মহা (k) ১.২১৬ অধ্যায়; ১.২১৭.১-২২;
(হরি) ১.২০৯ অধ্যায়; ১.২১০.১-২২]

□ এরপর ঘুরতে ঘুরতে অর্জুন এলেন পশ্চিম ভারতে। পশ্চিম ভারতের নানা তীর্থ দর্শন করে পৌঁছালেন প্রভাসতীর্থে। কাছেই যদুবংশীয়দের রাজধানী দ্বারকাপুরী। কৃষ্ণ জানতে পারলেন তাঁর প্রিয়বন্ধু অর্জুন এসেছেন প্রভাসে। তিনি দ্বারকা থেকে সোজা প্রভাসক্ষেত্রে এসে অর্জুনের সঙ্গে দেখা করলেন। কাছেই রৈবতক পর্বত। সেখানে এক সুন্দর বাসভবনে অর্জুনের থাকার সুবন্দোবস্ত

করলেন কৃষ্ণ। অর্জুনের মুখ থেকে তিনি শুনলেন তাঁর শর্তভঙ্গের কথা, বারো বছরের বনবাস যাত্রার কথা, হয়তো উলূপী, চিত্রাঙ্গদার কথাও। রৈবতক পর্বতের বাসভবনে অর্জুনের সঙ্গেই রইলেন কৃষ্ণ। পরের দিন তাঁকে নিয়ে গেলেন দ্বারকায়, নিজের রাজভবনে। অর্জুন কিছুকাল কাটিয়ে দিলেন রাজভবনেই, কৃষ্ণের মতো পরম বন্ধুর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে। তারপর একদিন রৈবতকপর্বতে যদুবৃষ্ণিদের বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হল। ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধকবংশীয় সকলে এই উৎসব উপলক্ষে রৈবতক পর্বতে সমবেত হলেন। অর্জুনও যোগ দিলেন আনন্দোৎসবে। এই উৎসবেই বসুদেব-রোহিণীর কন্যা পরমাসুন্দরী সুভদ্রাকে দেখলেন অর্জুন। সুভদ্রার রূপে-গুণে অর্জুন এতটাই মুগ্ধ-মোহিত হলেন যে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সুভদ্রার দিকে। এমনভাবে হাঁ করে কোনো যুবতীর দিকে তাকানো যে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যায়—একথা তাঁর মনেও পড়ল না। অর্জুনের অবস্থা লক্ষ্য করলেন কৃষ্ণ। রসিকতা করে বললেন— বনবাসীর মন এমন কামে আলোড়িত হচ্ছে কেন—

বনেচরস্য কিমিদং কামেনালোড্যতে মনঃ?

কৃষ্ণ বুঝলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করতে চান। সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করার পরামর্শও কৃষ্ণই দিলেন অর্জুনকে। অর্জুন কিন্তু সুভদ্রাহরণের পরিকল্পনা করার পর ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠিয়ে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিলেন, যুধিষ্ঠির সম্মতি দেবার পর অর্জুন সুভদ্রাহরণে উদ্‌যোগী হলেন। কৃষ্ণই অর্জুনকে খবর দিলেন যে, সুভদ্রা পূজা উপলক্ষে যাবেন রৈবতক পর্বতে। নিজের রথখানিও অর্জুনকে দিলেন কৃষ্ণ আর তাতে জুড়ে দিলেন শৈব্য এবং সুগ্রীব নামে দুটি দ্রুতগামী অশ্ব। যোদ্ধার বেশে, যেন মৃগয়ায় যাচ্ছেন এমন একটা ভাব করে অর্জুন রথে চড়ে বের হলেন। রৈবতক পর্বতের কাছে এসে অর্জুন দেখলেন, সুভদ্রার পূজা সবেমাত্র সমাপ্ত হয়েছে, তিনি দ্বারকার রাজপুরীতে ফিরে যাবেন এবার। উপযুক্ত সময় বুঝে অর্জুন হঠাৎই এসে সুভদ্রাকে হরণ করে তুলে নিলেন আপন রথে। রথ ছুটল সোজা ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে।

এদিকে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেছেন—এ খবর যখন যদু-বৃষ্ণিদের রাজসভায় পৌঁছাল, তখন বৃষ্ণি-অন্ধকবংশীয় সংঘমুখ্যরা অর্জুনের উপর অসম্ভব ক্ষিপ্ত হলেন। অর্জুন যাদব রাজপুরীতে বসবাস করে শেষপর্যন্ত যাদবদের রাজকন্যাকেই হরণ করে নিয়ে গেলেন— এমন বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড দিতে উদ্যত হলেন তাঁরা। অবশেষে কৃষ্ণ তাঁদের অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলেন। অর্জুনের সুভদ্রাহরণের স্বপক্ষেও কৃষ্ণ অনেক যুক্তি দিলেন, অর্জুনই যে সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র—সে কথাও বোঝালেন বার বার। সবশেষে কৃষ্ণ বললেন—অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছে যাবার আগেই আপনারা তাঁকে ফিরিয়ে আনুন। দ্বারকাতেই সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ সম্পন্ন হোক। তাতেই সকলের মঙ্গল হবে। কৃষ্ণের যুক্তিগর্ভ ভাষণে বলরাম এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবীরদের ক্রোধ শান্ত হল। তাঁরা সাদরে অর্জুনকে ফিরিয়ে আনলেন দ্বারকায়। দ্বারকার রাজভবনেই অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ সুসম্পন্ন হল। বিবাহের পর অর্জুন এক বছরেরও বেশি সময় রইলেন দ্বারকায়। বারো বছরের বনবাস শেষ হতে তখনও অল্পদিন বাকী ছিল। সেই সময়টুকু পুষ্করতীর্থে কাটিয়ে, সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে অর্জুন ফিরলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

[মহা (k) ১.২১৮-২২০ অধ্যায়; ১.২২১.১-১৫;
(হরি) ১.২১১-২১৩ অধ্যায়; ১.২১৪.১-১৫]

□ অর্জুন বুঝেছিলেন, সুভদ্রাকে বিবাহ করার ঘটনায় দ্রৌপদী ক্ষুব্ধ হবেন সব থেকে বেশি। ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই তাই অর্জুন সোজা চলে গিয়েছেন দ্রৌপদীর ভবনে, তাঁর ক্রোধ-প্রশমিত করার জন্য। দ্রৌপদী সত্যিই যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অর্জুনকে দেখে তাই প্রথমেই কঠিন স্বরে বললেন—আপনি কষ্ট করে এখানে এসেছেন কেন, যেখানে সুভদ্রা আছেন, সেখানেই যান। দ্রৌপদী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন—যেমন দড়িতে দ্বিতীয়বার গিঁট দিলে প্রথমে দেওয়া গিঁট আলগা হয়ে যায় ঠিক তেমনই দ্বিতীয় বিবাহের পরে দ্রৌপদীর প্রতি অর্জুনের প্রণয়ের বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে—

তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা।
সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে॥

দ্রৌপদী আরও অনেক কাঁদলেন, বিলাপ

করলেন। দ্রৌপদীর ক্রোধ শান্ত হয়ে যাবে একসময়, সুভদ্রাকেও তিনি কাছে টেনে নেবেন সাদরে—কিন্তু এ প্রসঙ্গে অর্জুন এবং দ্রৌপদীর সম্পর্কে একটি কথা অবশ্য আলোচ্য। অর্জুন ছাড়াও বাকি পাণ্ডবদেরও দ্রৌপদী ভিন্ন অন্যতরা পত্নী ছিলেন। এমনকী দ্রৌপদীর সঙ্গে বিবাহের আগেই হিড়িম্বার সঙ্গে পরিণয় ঘটেছিল ভীমের—সেকথাও দ্রৌপদীর অজানা নয়। তবু আর কোনো স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদে দ্রৌপদী এমন করে কাঁদেননি। বিলাপ করেননি, স্বামীকে গঞ্জনাও দেননি। আসলে স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদের পর যখন অর্জুনের গলায় বরমাল্য দিয়েছিলেন দ্রৌপদী—তখন সেই বরমাল্য শুধু স্বয়ংবর সভার শর্তপূরণের ফলাফল মাত্র ছিল না, ছিল দ্রৌপদীর আন্তরিক প্রণয়ের ফলাফলও। দ্রৌপদী অর্জুনকে ভালোবাসতেন। পঞ্চস্বামীর একতমা স্ত্রী হয়েও অর্জুনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অন্য চার স্বামীর তুলনায় বেশিই ছিল। প্রতিতুলনায় অর্জুনের ব্যবহারে দ্রৌপদীর প্রতি একটু বেশিই সৌজন্য প্রকাশ পেয়েছে সবসময়, কখনো কখনো সেই সৌজন্য কিছুটা ঔদাসীন্যের কিংবা নির্লিপ্তভাবের রূপ পেয়েছে। স্বয়ংবরে দ্রৌপদীকে জয় করেও ঠিক এইরকম নির্লিপ্তভাবেই দ্রৌপদীকে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন অর্জুন। কখনও দ্রৌপদীর প্রতি তেমন প্রণয়ের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি, যা তাঁর অন্য চার ভাইয়ের চোখে লাগতে পারে। এমন নয় যে দ্রৌপদীর প্রতি অর্জুনের হৃদয়ে আন্তরিকতার অভাব ছিল, কিন্তু তিনি সবসময়েই আচরণ করেছেন এমনই যে তিনি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর একতরমাত্র। তার বেশি কিছু নয়। দ্রৌপদী যে তাঁকে বেশি ভালোবাসতেন সেকথা অর্জুন জানতেন না—এমনটাও নয়। জানতেন বলেই সুভদ্রাকে বিবাহ করে এনে প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলেন দ্রৌপদীর মানভঞ্জন করতে।

[মহা (k) ১.২২১.১৬-১৮;
(হরি) ১.২১৪.১৬-১৮]

□ যাইহোক, অর্জুন বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন দ্রৌপদীকে। কিন্তু তাতে ফল হল না তেমন। অর্জুন চলে এলেন হতাশ হয়ে আর ভাবতে লাগলেন সুভদ্রাকে কীভাবে দ্রৌপদীর সামনে নিয়ে যাওয়া যায়। সুভদ্রা ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছেন নবপরিণীতা বধূর বেশে। পরনে তাঁর রক্তবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র। নানা মূল্যবান অলঙ্কারে সুসজ্জিত দেহ। এ বেশে সুভদ্রাকে দেখলে দ্রৌপদীর ক্রোধ কিছু কমবে না, বরং বাড়বে। অনেক ভেবে চিন্তে তাই অর্জুন সুভদ্রাকে সাজালেন সাধারণ গোপবধূর বেশে। সেই সাধারণ পোশাকে দ্রৌপদীর সামনে গিয়ে দাসীর মতো মাথানত করলেন সুভদ্রা। দ্রৌপদীকে প্রণাম করে বললেন—আমি আপনার দাসী। এমন ব্যবহারের প্রতি উত্তরে রাগ-ক্ষোভ কোনোটাই প্রকাশ করা চলে না। দ্রৌপদীর ক্রোধও শান্ত হল। সাদরে কৃষ্ণের ছোটো বোনটিকে কাছে টেনে নিয়ে দ্রৌপদী আশীর্বাদ করলেন—তোমার স্বামী নিঃসপত্ন (শত্রুশূন্য) হোন—

ববন্দে দ্রৌপদীং ভদ্রা প্রেষ্যাহমিতি চাব্রবীৎ।
প্রত্যুত্থায় তদা কৃষ্ণা স্বসারং মাধবস্য চ॥
পরিষ্বজ্যাবদৎ প্রীত্যা নিঃসপত্নো'স্তু তে পতিঃ।

অল্পদিন পরেই কৃষ্ণ, বলরাম এবং যদুবৃষ্ণি বংশীয় অন্যান্য সংঘমুখ বা সুভদ্রার বিবাহ উপলক্ষ্যে নানা মূল্যবান যৌতুক নিয়ে উপস্থিত হলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। কিছুকাল ইন্দ্রপ্রস্থে কাটিয়ে বলরাম প্রভৃতি সকলে দ্বারকায় ফিরে গেলেও কৃষ্ণ এরপরেও বেশ কিছুদিন অর্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে রইলেন। *[মহা (k) ১.২২১.১৯-৬৩;*
(হরি) ১.২১৪.১৯-৬৩]

□ মহাভারতের কবি এরপরেই প্রথম যে সংবাদটি দিলেন, তা হল অর্জুন এবং সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর জন্ম সংবাদ। সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুই পাণ্ডবদের বংশধরদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন বলে বোঝা যায়। কারণ অভিমন্যুর জন্মের পর একে একে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের জন্ম সংবাদ পাওয়া যায় মহাভারতে। দ্রৌপদীর গর্ভে অর্জুনের ঔরসজাত পুত্রটির নাম ছিল শ্রুতকর্মা।

[মহা (k) ১.২২১.৬৫-৭৭, ৮৩;
(হরি) ১.২১৪.৬৫-৭৭, ৮৩]

□ যাইহোক, কৃষ্ণ খাণ্ডবপ্রস্থে থাকতেই এবং সম্ভবত সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর পুত্রলাভের অনেক আগেই একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল। মহাভারতে খুব স্পষ্ট করে কাল নির্দেশিত না হলেও মনে হয় সুভদ্রা ইন্দ্রপ্রস্থে আসার অল্প কিছুকাল পরের ঘটনা। কৃষ্ণ একদিন অর্জুনকে বললেন—বড়ো গরম পড়েছে। চলো, আমরা

একদিন যমুনার তীরে যাই। সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসব। যমুনার তীরে সেদিন যে বিহারের আয়োজন হয়েছিল, তাতে অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদী, সুভদ্রা দুজনেই গিয়েছিলেন। দুই সপত্নীর মধ্যে সম্পর্কে অনেক নৈকট্য এসেছে ততোদিনে— সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীকে একসঙ্গে নানা আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতে দেখা যায়। একসময় কৃষ্ণ এবং অর্জুন তাঁদের অন্যান্য সহচর, ভৃত্য এবং দ্রৌপদী-সুভদ্রার থেকেও খানিকটা দূরে এসে বসলেন। আমোদ-প্রমোদ হই-হুল্লোড়ের পরিসীমার বাইরে। দুই বন্ধু বসে গল্প করছেন, এমন সময় পিঙ্গলবর্ণ শ্মশ্রু এবং জটাজুটধারী এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন তাঁদের সামনে। কৃষ্ণ, অর্জুন সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন ব্রাহ্মণকে দেখে। ব্রাহ্মণ বললেন—আমি বহুভোজী মানুষ। সবসময়ই আমার ক্ষুধা বড়ো বেশি। আপনারা আমাকে আমার ক্ষুধা অনুসারে খাদ্য দিন। কৃষ্ণ, অর্জুন দুজনেই ব্রাহ্মণের আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। তা দেখে ব্রাহ্মণ আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন—আমি অগ্নিদেবতা। আপনারা যদি সত্যিই আমার আহারের বন্দোবস্ত করতে চান, তাহলে শুনুন—এই যে খাণ্ডব বন, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এই বনকে রক্ষা করেন। আমি বহুবার খাণ্ডববন দগ্ধ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনোবারই সমর্থ হইনি। আপনারা দু-জন যদি সহায়তা করেন, তাহলে আমি খাণ্ডবনটিকে দগ্ধ করতে পারি।

অগ্নিদেবতার প্রস্তাবে কৃষ্ণ-অর্জুন দুজনেই সম্মত হলেন। এইসময় অর্জুন বললেন—আমার কাছে বহু অস্ত্র এমনকী দিব্যাস্ত্রও আছে। কিন্তু সেই অস্ত্রগুলি চালনা করার জন্য উপযুক্ত ধনুক আমার নেই। কৃষ্ণেরও তেমন উপযুক্ত কোনো অলৌকিক অস্ত্র নেই। আপনি যদি আমাদের উপযুক্ত অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আমরা খাণ্ডবদহনে আপনাকে সহায়তা করব।

অর্জুনের কথা শুনে অগ্নি বরুণদেবতার কাছে গেলেন। বরুণের কাছ থেকে গাণ্ডীব ধনুক, দুটি অক্ষয়তূণীর, কপিধ্বজ রথ এনে দিলেন অর্জুনকে। কৃষ্ণকে দিলেন সুদর্শন চক্র এবং কৌমোদকী গদা। কৃষ্ণ এবং অর্জুন খাণ্ডবদহনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

এরপর অগ্নিদেবতা খাণ্ডববন গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। সমস্ত বনভূমিতে আগুন জ্বলে উঠল। তা দেখে দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে জলবর্ষণ করে অগ্নিকে বাধা দিতে এলেন। এই সময় কৃষ্ণ এবং অর্জুন যুদ্ধ করলেন দেবতাদের সঙ্গে। অগ্নি যাতে নির্বিঘ্নে খাণ্ডববন দহন করতে পারেন— সে জন্য ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের অগ্নিনির্বাপণের প্রয়াসকে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করলেন তাঁরা। দেখতে দেখতে খাণ্ডববন পুড়ে ছাই হয়ে গেল একসময়। বনে বসবাসকারী পশুপাখিদেরও মৃত্যু হল দাবানলে। বেঁচে রইলেন মাত্র ছয়জন। তাঁদের মধ্যে দানবশিল্পী ময় অন্যতম। ময়দানবের অনুরোধে অর্জুন খাণ্ডববনের ভয়াবহ আগুন থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। তক্ষক নাগের পুত্র অশ্বসেন কোনোক্রমে বেঁচে যান। আর মন্দপাল ঋষির পুত্র চারটি শার্ঙ্গপক্ষী অগ্নি থেকে রক্ষা পান। মহাভারতে বেশ কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে অর্জুনের এই খাণ্ডবদহনের বিবরণ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১.২২২-২৩৪ অধ্যায়;
(হরি) ১.২১৫-২২৭ অধ্যায়]

☐ খাণ্ডববনের ভয়াবহ আগুন থেকে অর্জুন ময়দানবের প্রাণ রক্ষা করায় ময় আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর প্রাণ রক্ষা করার জন্য বার বার কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে ধন্যবাদ দিলেন দানবশিল্পী ময়। কিন্তু শুধু মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দানবশিল্পী তুষ্ট হলেন না। তিনি অনুরোধ করলেন যে, তিনি অর্জুনের জন্য কোনো উৎকৃষ্ট স্থাপত্য সৃষ্টি করতে চান। তখন কৃষ্ণ এবং অর্জুন ময়দানবকে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্মাণ করতে বললেন, ময়দানব যুধিষ্ঠিরের জন্য এক অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত রাজসভাগৃহ নির্মাণ করলেন। এইসময় ময়দানবই অর্জুনকে বরুণের 'দেবদত্ত' নামক শঙ্খটি উপহার দিয়েছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ২.১-৩ অধ্যায়; (হরি) ২.১-৩ অধ্যায়]

☐ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসভাগৃহ নির্মাণের পর এবং রাজসূয় যজ্ঞের আগে যেটুকু সময়ের উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, অর্জুন এই সময়টুকু নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন ধনুর্বিদ্যার কঠোর অনুশীলনে। এইসময় তিনি

নিজেই অবশ্য শিক্ষকের ভূমিকায়। ইন্দ্রপ্রস্থে বহু বিশিষ্ট বীর আসতেন তাঁর কাছে ধনুর্বিদ্যার পাঠ নিতে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, এছাড়াও যদু-বৃষ্ণি বংশীয় সাত্যকি, সুধর্মা, অনিরুদ্ধ প্রমুখ। অন্যান্য শিষ্যদের মাঝে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবশ্য সাত্যকির নাম। সাত্যকি প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির মতো বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন না হয়তো। মূলত ধনুর্বিদ্যার বিশেষ পাঠ নিতেই তিনি এসেছিলেন অর্জুনের কাছে। পরবর্তী সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেখা যায়, অর্জুন তাঁর এই শিষ্যের পারদর্শিতা সম্পর্কে এতটাই নিঃসংশয় ছিলেন, যে নিজের অনুপস্থিতিতে বহুবার পাণ্ডবপক্ষীয় সেনার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গেছেন সাত্যকির হাতে। সাত্যকির কথাতেও বার বার প্রকাশ পেয়েছে গুরু অর্জুনের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা। অর্জুন এবং সাত্যকির সম্পর্ক গুরু শিষ্য সম্পর্কের নিরিখে ঠিক দ্রোণাচার্য এবং অর্জুনের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও অবশ্যই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ইন্দ্রপ্রস্থে অর্জুনের কাছে বহু রাজপুত্র ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করতে আসতেন—এই সংবাদটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রোণাচার্যের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর শিষ্য শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে ওঠেননি, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আচার্য হিসেবেও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছেন। আর তাই ইন্দ্রপ্রস্থে অর্জুনের শিক্ষালয় কোনো ব্রাহ্মণ আচার্যের গুরুকুল না হলেও রাজপুত্রেরা সেখানে এসে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীর মতোই, সশ্রদ্ধ, সংযতভাবে—

অর্জুনং যে চ সংশ্রিত্য রাজপুত্রা মহাবলাঃ।
অশিক্ষন্ত ধনুর্বেদং রৌরবাজিনবাসসঃ॥

[মহা (k) ২.৪.৩৩-৩৬; (হরি) ২.৪.১১-১৩]

□ মহাভারতে এরপরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কাহিনী এসেছে। তবে মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার কালানুক্রম অনুসারে মনে হয়, রাজসূয় যজ্ঞ ময়দানবের রাজসভা নির্মাণের বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। যাইহোক, নারদের মুখে যুধিষ্ঠির শুনলেন যে, তাঁর স্বর্গত পিতা মহারাজ পাণ্ডু চান যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির এবার রাজসূয় যজ্ঞ করুন। যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্ত নেবার আগে কৃষ্ণের মতামত জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত বললেন ঠিকই তবে সঙ্গে একথাও বললেন যে, মগধরাজ জরাসন্ধকে পরাজিত বা হত্যা না করা পর্যন্ত রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করা কখনোই সম্ভব হবে না যুধিষ্ঠিরের পক্ষে। জরাসন্ধ তখন ভারতবর্ষের সব থেকে প্রতাপশালী সম্রাট। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজাই জরাসন্ধের অনুগত ভক্ত। এই সম্মিলিত রাজশক্তির কারণে জরাসন্ধের সৈন্যবলও এতটাই বেশি যে, তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করা একপ্রকার অসম্ভব। কৃষ্ণ তাই জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ করার পরিকল্পনা করলেন। ভীম এবং অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে গেলেন মগধে। শেষ পর্যন্ত ভীমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধের মৃত্যু হল।

[মহা (k) ২.২০.১-৩০; ২.২১.২২-৫৪;
২.২২-২৪ অধ্যায়; (হরি) ২.১৯.১-৩০;
২.২০.২০-৫০; ২.২১-২২ অধ্যায়]

□ জরাসন্ধের মৃত্যুর পর রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি শুরু হল। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—চার ভাই চারদিকে দিগ্বিজয়ে বের হলেন। এই সময় অর্জুন উত্তরদিক জয় করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মহাভারতের সভাপর্বে সম্পূর্ণ তিনটি অধ্যায় জুড়ে অর্জুনের দিগ্বিজয়ের কথা বিশদে বর্ণিত হয়েছে। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে যাত্রা করে অর্জুন কুলিন্দ, শাকল প্রভৃতি রাজ্য জয় করে গেলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে। সেখানে রাজা ভগদত্তের সঙ্গে অর্জুনের দীর্ঘ যুদ্ধ হয়। আট দিন যুদ্ধ করার পরও অর্জুনকে পরাস্ত করতে না পেরে ভগদত্ত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কর দিতে সম্মত হন। এরপর অর্জুন গেলেন যক্ষ অধ্যুষিত হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে। তারপর অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উলূক প্রভৃতি পার্বত্যদেশ জয় করলেন অর্জুন। ত্রিগর্ত, দার্ব, বাহ্লীক, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশও অর্জুনের পদানত হল। এরপর কৈলাসপর্বতে অবস্থিত কিন্নরদেশ জয় করে, মানস সরোবর পার হয়ে অর্জুন পৌঁছালেন দেবগন্ধর্ব অধ্যুষিত উত্তরকুরু দেশে। সেখানকার গন্ধর্বরাও সসম্মানে কর দিলেন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য। এইভাবে সম্পূর্ণ উত্তরদিক জয় করে বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে অর্জুন ফিরে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

[মহা (k) ২.২৬-২৮ অধ্যায়;
(হরি) ২.২৫-২৭ অধ্যায়]

□ রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহের মধ্যে, এমনকী শিশুপালবধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও অর্জুনের উল্লেখ তেমনভাবে পাওয়া যায় না। তিনি রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আপন স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌সংযমের কারণেই শিশুপালের সঙ্গে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডার মাঝেও তাঁকে একটি কথাও বলতে শোনা যায় না।

অর্জুনের এই অসম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তির পরিচয় আবারও পাওয়া যাবে হস্তিনাপুরের দ্যূতসভায়। দ্যূতসভায় শকুনি কপটতার ফলে এবং কতকটা পাশাখেলার নেশায় যুধিষ্ঠির যখন একের পর এক ধন-রত্ন রাজ্য-সম্পত্তি হেরেই চলেছেন—তখনও কিন্তু অর্জুনকে আমরা একটি কথাও বলতে দেখিনা। এমনকী দ্রৌপদীকে যখন পণ রাখা হল এবং দুঃশাসন দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে টেনে আনলেন রাজসভায় তখনও অর্জুন আশ্চর্যভাবে শান্ত, নীরব। এইসময় দ্রৌপদীর অপমানে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হলেন ভীম। তাঁর সম্পূর্ণ রাগ গিয়ে পড়ল যুধিষ্ঠিরের উপরে। ভীম ভাবছেন, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বাজি না রাখলে দ্রৌপদীর এমন অপমান ঘটতই না। সুতরাং সমস্ত দোষ যুধিষ্ঠিরেরই। ক্রুদ্ধ হয়ে ভীম সহদেবকে বললেন—নিয়ে এসো আগুন, এই যুধিষ্ঠিরের হাত পুড়িয়ে দেব আমি।

ঠিক এইসময় অর্জুন প্রথম কথা বললেন, আশ্চর্য শান্ত, সংযত তাঁর কণ্ঠস্বর। এমনকী দ্রৌপদীর অপমান বিষয়ে বিচলিত হয়েও একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি অর্জুন। তিনি ভীমের ক্রোধ শান্ত করার জন্য কথা বলছেন। অর্জুন বললেন—আর্য ভীম! তুমি তো কই আগে কখনো শ্রদ্ধাস্পদ যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে এমন রূঢ় কথা বলোনি। শত্রুরা কী তোমার ধর্মগৌরবও নষ্ট করে দিল? একটা কথা পরিষ্কার বলি—তুমি শত্রুদের আশা পূরণ কোরো না—এই মুহূর্তে এই অপমানের মধ্যে তুমি ছোটোভাই হয়ে দাদাকে অপমান করো—শত্রুরা সেটাই চায়। তাতেই তাদের সুবিধা। কিন্তু আমি বলব—তুমি ধর্ম এবং ধর্মের বিধি-নিষেধ মেনে চলো। ধার্মিক ধর্মরাজ বড়োদাদাকে কী কেউ অতিক্রম করে—

ভ্রাতরং ধার্মিকং জ্যেষ্ঠং কো'তিবর্ত্তিতুমর্হতি?

ভীম অর্জুনের যুক্তিকেও অতিক্রম করতে পারেননি, তাঁর ব্যক্তিত্বকেও অতিক্রম করতে পারেননি। তিনি নিজেকে সংযত করতে বাধ্য হলেন।

যে কথাগুলি অর্জুন বলেছেন, তার পেছনে তাঁর নিজের যুক্তি হল—মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ের নিয়ম মেনে কৌরবদের সভায় পাশা খেলতে এসেছিলেন, তাঁকে পাশা খেলতে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি ক্ষত্রিয়ের নিয়মেই পাশা খেলেছেন এবং সেটাই আমাদের পক্ষে কীর্তিজনক—

দীব্যাতে পরকামেণ তন্নঃ কীর্তিকরং মহৎ।

প্রসঙ্গত জানাই—সেকালের দিনে এক ক্ষত্রিয়-রাজা অপর ক্ষত্রিয়-রাজাকে পাশা খেলতে আহ্বান জানালে অন্য ক্ষত্রিয়-রাজার পক্ষে 'না' বলাটা ছিল অসভ্যতা। যুধিষ্ঠিরের পক্ষেও তাই 'না' বলাটা সম্ভব হয়নি। এবং সম্ভবত সেই কারণে ভীম-অর্জুনেরাও তাতে বাধা দেননি। বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র যখন যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের মাধ্যমে পাশা খেলবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি জানিয়েছিলেন—খেলাটা হবে বন্ধু-রাজার সঙ্গে বন্ধু-রাজার মতো—

সুহৃদ্দ্যূতং বর্ত্ততামত্র চেতি।

যুধিষ্ঠিরও সেই ভেবে এসেছিলেন। কিন্তু সভায় ঢুকে তিনি অন্যরকম বুঝেছেন। শকুনি-দুর্যোধনের ভাব দেখে তাঁর সন্দেহই হয়েছে। খেলাতে অন্যায়-কপটতা যে হতে পারে—সে আশঙ্কা যুধিষ্ঠির পরিষ্কার ব্যক্তও করেছেন। শকুনিরা বলেছেন—এত যদি ভয় তা হলে আর খেল না, তুমি চলে যাও। যুধিষ্ঠির নিরুপায় হয়ে বলেছেন—আমাকে যখন ডাকা হয়েছে খেলতে, তখন আমি ফিরব না, কারণ সেটাই ক্ষত্রিয়ের ব্রত। বিধি বলবান, অতএব নিজের ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এই অবস্থায় খেলা আরম্ভ করে খেলার পণে হারতে হারতে এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠির গৃহবধূ দ্রৌপদীকেও হারিয়ে বসে আছেন। ভীম তাঁর পাশা-খেলা হাত দুটি পুড়িয়ে দিতে চাইছেন—অর্জুন তাঁকে বলছেন—বড়োদাদাকে এভাবে অতিক্রম কোরো না। ক্ষাত্রধর্মের পাশাপাশি যে বিষয়টিকে অর্জুন মাথায় রেখেছেন তা হল, এমন নিদারুণ পরিস্থিতিতেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং মনে হয়

যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলায় হেরে যাওয়া কিংবা দ্রৌপদীর অপমানের থেকেও এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোধন বাল্যকাল থেকে পাণ্ডবদের ক্ষতিসাধন করার নানা প্রয়াস করেও যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন—তার অন্যতম বড়ো কারণ পাণ্ডব ভাইদের একতা। দ্রৌপদীর বিবাহের পরে পাণ্ডবদের জীবিত থাকার সংবাদ পেয়েও; দুর্যোধন শকুনিরা চিন্তা করার চেষ্টা করেছেন যাতে দ্রৌপদীর মাধ্যমেও পাঁচ ভাইয়ের এই একতায় ফাটল ধরানো যায়। কিন্তু তাতেও তাঁরা সমর্থ হননি। আজ দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠিরকে দোষারোপ করতে গিয়ে ভীম যা করছেন—তাতে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে বিভেদটাই প্রকাশ্যে চলে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অর্জুন ঠিক সেই জিনিসটাই বন্ধ করতে চাইছেন। দ্বিতীয়বারের পাশাখেলার সময়েও তিনি একই রকম নীরব।

অর্জুন কার্যকালে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সমস্ত বাহ্যস্পর্শে তিনি অনাসক্ত অথবা নিতান্ত অনাসক্তভাবেই সমস্ত বিষয় তিনি গ্রহণ করতে পারেন, তাই বলে কি কুরুসভায় পাণ্ডব-কুলবধুর লাঞ্ছনা তাঁর মনে কোনোই প্রতিক্রিয়া তৈরি করেনি? আমরা বলব—মহাকাব্যিক পরিমণ্ডলে নারীর সেই লাঞ্ছনাও তার সমস্ত ব্যাপ্তি নিয়ে ক্ষত্রিয়ের ধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞার ধর্ম যেমন একদিকে অর্জুনকে সেই উন্মুক্ত সভাস্থলে নিশ্চল থাকতে বাধ্য করেছে অন্যদিকে সেই ধর্মই তাঁকে ভবিষ্যতের প্রতিজ্ঞায় আরও দৃঢ় করেছে। অথচ তিনি কথা বলেন খুবই কম। এরই মধ্যে ভীমসেন, দুঃশাসনের রক্তপান, দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ এবং সমস্ত কৌরব-ভাইদের পিষে মারবার প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন। প্রথমবার পাশার জাল থেকে মুক্তি পেয়ে পাণ্ডবরা বেরিয়ে যাবার সময় কর্ণ যখন গালি দিলেন, ভীমও তখন কর্ণকে উলটো গালাগালি দিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও অর্জুন মহাবীরের দূরত্ব নিয়ে ভীমকে বললেন — ফালতু লোকের সঙ্গে কথা বলতে নেই, দাদা।

অর্জুন কথা বলেন না, শুধু মনে মনে দৃঢ় হন। দ্বিতীয়বার পাশাখেলায় হেরে পাণ্ডবরা যখন বনে চললেন, তখনও অবধারিতভাবে দুর্যোধন-কর্ণেরা পাণ্ডবদের এই অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করতে লাগলেন। ভীম আবারও ক্ষেপে উঠে গোটা তিনেক প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি করলেন। আর নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মতো উদ্ধত মহাবীর অর্জুন শুধু বললেন—ভদ্রলোকেরা এত কথা বলে নিজেকে প্রকাশ করে না দাদা! আজ থেকে বনবাসের চোদ্দো বছরের মাথায় যা ঘটবে—সবাই তা দেখতে পাবেন—

ইতঃ চতুর্দশে বর্ষে দ্রষ্টারো যদ্ ভবিষ্যতি।

তবু এইখানে একবার তাঁকে মুখ খুলে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করতে হয়েছে। তার কারণ অবশ্য ভীমই। ভীম নিজে তো কৌরববংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিলেনই, উপরন্তু যুদ্ধ লাগলে পাণ্ডব-ভাইদের মধ্যে কে কাকে হত্যা করবেন, তার একটা 'লিস্ট' বানিয়ে—আমি দুর্যোধনকে মারব, কর্ণকে মারবে অর্জুন, শকুনিকে মারবে সহদেব—এইরকম আস্ফালন করে যাচ্ছিলেন। অর্জুন তাঁকে ধীর স্বরে শান্ত করলেন বটে, কিন্তু সরল ভীম দাদার জন্য তাঁর মায়া লাগল। তিনি দেখলেন—ভীমকে অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেলেছেন, এখন তাঁর নিতান্ত সযৌক্তিক কথাগুলিকে, তাঁর যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদগুলিকে একটু সমর্থন করা দরকার। অতএব তিনিও কর্ণবধের ভীষণ প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করলেন আপাতত শুধু ভীমের ভালো লাগবে বলে—

অর্জুনঃ প্রতিজানীতে ভীমস্য প্রীতিকাম্যয়া।

আসলে অর্জুন যে সেই অস্ত্র পরীক্ষার আসরের দিন থেকে কর্ণকে দুচোখে দেখতে পারেন না, সে-কথা তো ভীমের অজানা ছিল না। কিন্তু আপাতত কুরুসভায় ওই অপমানদিগ্ধ ব্যক্তিটির মানসিক শান্তির জন্য অর্জুন যেন তাঁর ভালো-লাগা, তাঁর ইচ্ছাটাই বড়ো করে দেখলেন। বললেন—ভীম ইচ্ছা করেছেন, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করছি—যদি হিমালয় পাহাড়ও নড়ে চড়ে বসে, সূর্য যদি হারায় তার আলো, তবু আমার এই প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় হবে না। এই কথা বলে অর্জুন দাদা যুধিষ্ঠির আর ভীমের পেছন পেছন বনের পথে চলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মুষ্টিতে ধরা ছিল বালুকা, যে বালুকা ঝুরঝুর করে রাস্তায় ছড়িয়ে যেতে যেতে তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন—আজ থেকে

চোদ্দো বছর পরে এমনি ঝুরঝুর করে বাণ বর্ষণ করবো শত্রু-সৈন্যের ওপর।

[মহা (k) ২.৬৮.১-১০; ২.৭৭.৩২-৩৬;
(হরি) ২.৬৫.১-১০; ২.৭৪.৩২-৩৬]

□ পাণ্ডবরা বারো বছরের জন্য বনবাসে গেলেন। তবে এই পাশাখেলার ঘটনার পর পাণ্ডব, কৌরব উভয়পক্ষই মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বুঝলেন যে, তেরো বছরের পর দুপক্ষের যুদ্ধ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। তাই আসন্ন যুদ্ধ নিয়ে যেমন কৌরব শিবিরে ভাবনাচিন্তা চলতে লাগল, তেমনই পাণ্ডব পক্ষেও প্রস্তুতি আরম্ভ হল। পাণ্ডবরা তখন কাম্যকবনে বাস করছেন। এমন সময় একদিন মহর্ষি ব্যাস এলেন পাণ্ডবদের কাছে। কপট দ্যূতে পাণ্ডবদের ধন-সম্পদ রাজ্য সবকিছুই দুর্যোধন জয় করে নিয়েছেন, পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকে চরম অপমানও করেছেন—এসব ঘটনার জন্য ব্যাস পাণ্ডবদের যথেষ্ট সান্ত্বনা দিলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'প্রতিস্মৃতি' নামে একটি বিদ্যা শিক্ষা দিলেন ব্যাস। ব্যাস বললেন—তুমি এই মন্ত্র অর্জুনকে শেখাবে। তাহলে এই বিদ্যার প্রভাবে অর্জুন সশরীরে স্বর্গে গিয়ে দিব্যাস্ত্র লাভ করতে পারবেন। ব্যাসের উপদেশ মতো অর্জুনকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা শিক্ষা দিলেন যুধিষ্ঠির। তারপর যুধিষ্ঠিরকে এবং পরিবারের সকলকে অভিবাদন করে অর্জুন দিব্যাস্ত্রলাভের জন্য যাত্রা করলেন স্বর্গলোকের উদ্দেশে।

প্রতিস্মৃতিবিদ্যার প্রভাবে একদিনেই হিমালয় এবং গন্ধমাদন পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে গেলেন অর্জুন। ক্রমে পৌঁছালেন ইন্দ্রকীল পর্বতে। সেখানে এক গাছের তলায় পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী কৃশদেহ এক তপস্বীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ অর্জুনকে বললেন—তুমি তপস্যার বলে সশরীরে স্বর্গলোকে এসে পৌঁছেছ। এখানে তোমার অস্ত্রশস্ত্রের কী প্রয়োজন? তুমি ধনুক-বাণ ত্যাগ কর। কিন্তু অর্জুন অস্ত্রলাভের উদ্দেশ্যে স্বর্গলোকে এসেছেন, তাই অস্ত্রত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। তপস্বী অবশ্য ছদ্মবেশধারী দেবরাজ ইন্দ্র। অর্জুনের দৃঢ়তায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি নিজমূর্তি ধারণ করে দর্শন দিলেন অর্জুনকে। বহু তপস্যার পরেও মানুষ সশরীরে স্বর্গলোকে আসতে সমর্থ হয় না। অর্জুন সেই বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—একথা বলে অর্জুনের অনেক প্রশংসাও করলেন ইন্দ্র। তারপর তিনি অর্জুনকে স্বর্গে দেবত্ব দান করতে চাইলেন, আরও নানা স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখালেন তাঁকে। কিন্তু অর্জুন দিব্যাস্ত্রলাভের সংকল্পে অটল। তিনি দৃঢ় স্বরে দেবরাজকে বললেন—আমি আমার ভাইদের বনে রেখে এসেছি শুধুমাত্র শত্রুদমনের সংকল্প নিয়ে, দিব্যাস্ত্র লাভের আশায়। আজ যদি স্বর্গের ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে আমি আমার ভাইদের ত্যাগ করি তাহলে সমস্ত লোক আমার নিন্দা করবে। সুতরাং আমি শুধু দিব্যাস্ত্রই চাই দেবরাজ! অন্য কোনো কিছুতেই আমার কোনো লোভ নেই—

> ন লোকান্ ন পুনঃ কামান্ ন দেবত্বং কুতঃ সুখম্।
> ন চ সর্বামরৈশ্বর্য্যং কাময়ে ত্রিদশাধিপ ॥
> ভ্রাতৃংস্তান্ বিপিনে ত্যক্ত্বা বৈরমপ্রতিযাত্য চ।
> অকীর্তিং সর্বলোকেষু গচ্ছেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥

অর্জুনের সংযম দেখে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিলেন—তুমি তপস্যায় শূলপাণি মহাদেবকে তুষ্ট করো। তাহলেই তুমি সমস্ত দিব্য অস্ত্রশস্ত্র লাভ করতে পারবে। ইন্দ্রের উপদেশে অর্জুন মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন।

[মহা (k) ৩.৩৬.২৪-৪৫; ৩.৩৭.১-৫৯;
(হরি) ৩.৩২.২৪-৪৫; ৩.৩৩.১-৫৯]

□ কঠোর তপস্যায় বেশ কিছুকাল কেটে গেল। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী প্রায় চারমাস। একদিন 'মূক' নামে এক দানব এক বন্য শূকরের রূপ ধারণ করে অর্জুনকে আক্রমণ করল। অর্জুন তা দেখে গাণ্ডীব ধনুকে বাণ যোজনা করে সেই শূকরটিকে বধ করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় কিরাতের ছদ্মবেশে স্বয়ং মহাদেব এসে দাঁড়ালেন অর্জুনের সামনে। সেই ব্যাধ—অর্জুনকে বললেন—তুমি এই শূকরটিকে মেরো না, আমিই আজ এটিকে শিকার করব বলে ঠিক করেছি। তুমি আমার শিকারে আঘাত করতে পারো না। ব্যাধের কথা গ্রাহ্য না করে অর্জুন শূকরটিকে লক্ষ্য করে বাণ চালালেন। অর্জুনের বাণ এবং ব্যাধবেশী মহাদেবের বাণ একই সঙ্গে গিয়ে শূকরটিকে বিদ্ধ করল। তা দেখে অর্জুন এবং ব্যাধ দুজনেই দাবি করলেন যে শূকরটি তাঁরই বাণে নিহত হয়েছে। এই তর্ক থেকে ক্রমে

বিবাদ, শেষে যুদ্ধ আরম্ভ হল। অর্জুন ব্যাধের উপর অসংখ্য বাণ বর্ষণ করলেন, কিন্তু তাতে ব্যাধ আহত হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর গায়ে যেন একটি আঁচড়ও লাগল না। তা দেখে বিস্মিত হয়ে অর্জুন ভাবলেন এমন অলৌকিক ক্ষমতা শুধুমাত্র মহাদেবেরই থাকতে পারে। হয়তো স্বয়ং শিবই ব্যাধের বেশে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সামনে। ক্রমে অর্জুনের অস্ত্রশস্ত্র সব শেষ হয়ে গেল। তবু ব্যাধের ছদ্মবেশে মহাদেব একই রকম নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন অর্জুন ভাবলেন—আমি প্রথমে মহাদেবের পূজা করি, পূজা শেষ হবার পর আবার এই ব্যাধের সঙ্গে যুদ্ধ করব। অর্জুন মহাদেবের মূর্তি তৈরি করে ভক্তি ভরে তাঁর পূজা করলেন। পূজার সময় মূর্তির গলায় অর্জুন যে ফুলের মালাটি পরিয়ে দিলেন, সেটি ব্যাধের মাথায় গিয়ে পড়ল। তা দেখে অর্জুন নিশ্চিতভাবে বুঝলেন যে, ইনি ব্যাধ নন, স্বয়ং শিব। অর্জুন গিয়ে ব্যাধের পায়ে মাথা নত করে প্রণাম করতেই ব্যাধের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে মহাদেব অর্জুনকে দর্শন দিলেন। অর্জুনের ভক্তি, ধৈর্য্য, বীরত্বের অনেক প্রশংসাও করলেন তিনি। অর্জুন মহাদেবের পূজা ও স্তব করলেন। না বুঝে স্বয়ং মহাদেবের উপর বাণবর্ষণ করে ফেলেছেন বলে ক্ষমাও চাইলেন। ভগবান শিব অর্জুনকে ক্ষমা করলেন, তাঁর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গাণ্ডীব ধনুকও আবার ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে। অর্জুন মহাদেবের কাছে পাশুপত অস্ত্র প্রার্থনা করলেন। মহাদেব অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ এবং সংবরণের শিক্ষা দিলেন। পাশুপত অস্ত্র এবং মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ করে অর্জুন অন্যান্য দিব্যাস্ত্র লাভের উদ্দেশ্যে স্বর্গলোকে গেলেন।

[মহা (k) ৩.৩৮-৪০ অধ্যায়;
(হরি) ৩.৩৪-৩৫ অধ্যায়]

□ দেবরাজ ইন্দ্র আপন ঔরসপুত্রকে স্বর্গলোকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ইন্দ্র, কুবের প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা পরম সমাদরে অর্জুনকে নিয়ে গেলেন স্বর্গলোকে। ইন্দ্রপুত্র অর্জুন স্বর্গলোকে পৌঁছাতে সেখানে উৎসবের বাতাবরণ তৈরি হল। ইন্দ্র নিজে এসে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন, মস্তক আঘ্রাণ করলেন তারপর আদর করে নিজের আসনেই বসালেন অর্জুনকে। অন্যান্য বিশিষ্ট দেবতারা, ঋষি এবং পরলোকগত রাজর্ষিরা এলেন অর্জুনকে আশীর্বাদ করতে। অর্জুনের আগমন উপলক্ষ্যে দেবসভায় নৃত্যগীতের আয়োজন হল। তুম্বুরু প্রভৃতি বিশিষ্ট গন্ধর্বরা সেখানে গান গাইলেন। নৃত্য পরিবেশন করতে এলেন উর্বশী, মিশ্রকেশী এবং আরও বহু বিশিষ্ট অপ্সরা।

এরপর ইন্দ্রলোকে বসেই অর্জুন সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ এবং সংবরণের কৌশল শিক্ষা করতে লাগলেন। দিব্যাস্ত্রের কৌশল শিক্ষাও একসময় শেষ হল। স্বভাবতই অর্জুন এবার ফিরতে চাইলেন মর্ত্যলোকে, ভাইদের কাছে। কিন্তু ইন্দ্রের ইচ্ছা তাঁর পুত্র আরও কিছুদিন স্বর্গলোকে থাকুন। ইন্দ্র অর্জুনের সঙ্গে চিত্রসেন গন্ধর্বের বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়ে বললেন—অর্জুন। তুমি চিত্রসেনের কাছে নৃত্য, গীত, বাদ্য শিক্ষা কর। এতে তোমার মঙ্গল হবে। অর্জুনও সম্ভবত বুঝলেন যে, অজ্ঞাতবাসের বছরটিতে আত্মগোপন করার জন্য সঙ্গীতশিক্ষা বেশ কার্যকরী হতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রের উপদেশ মতো তিনি নৃত্য গীত শিক্ষা করতে লাগলেন। যে মনঃসংযোগ নিয়ে বাল্যকালে অর্জুন ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন, ততোটাই মনোযোগ দিয়ে এখন সঙ্গীত শিক্ষা করতে লাগলেন।

[মহা (k) ৩.৪১.১-৪৯; ৩.৪২.১-৪২;
৩.৪৩.১-৩২; ৩.৪৪.১-১১; (হরি) ৩.৩৬.১-৪৯;
৩.৩৭.১-৪১; ৩.৩৮.১-৪৩]

□ অর্জুন ইন্দ্রলোকে শস্ত্র এবং সঙ্গীতশাস্ত্রচর্চায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। দেবরাজ ইন্দ্রের হঠাৎ ধারণা হল যে অর্জুন উর্বশীকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন। হয়তো দেবসভায় উর্বশীর নৃত্যের সময় তাঁর দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন অর্জুন—তা দেখেই ইন্দ্রের মনে এমন ধারণা হল। ইন্দ্র তাই চিত্রসেন গন্ধর্বকে পাঠালেন উর্বশীর কাছে। আদেশ করলেন স্বর্গসুন্দরী উর্বশী যেন অর্জুনকে তুষ্ট করেন। চিত্রসেন দেবরাজের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের রূপগুণের অনেক প্রশংসাও শোনালেন উর্বশীকে। উর্বশী ইন্দ্রের আদেশ মতো সাজসজ্জা করে সন্ধ্যাবেলায় এসে দাঁড়ালেন অর্জুনের ঘরের দরজার সামনে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, প্রায় রাত্রিবেলা। অর্জুনের ভবনের দৌবারিক যখন অর্জুনকে জানাল যে উর্বশী

এসেছেন—তখন অর্জুন একটু বিস্মিত হলেন। তারপর নিজে এসে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন উর্বশীকে। তারপর বিনীতভাবে বললেন—দেবী! আপনি অপ্সরাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, প্রধানা। আমি মাথা নত করে আপনাকে প্রণাম করছি। আমি আপনার দাস মাত্র। আদেশ করুন, আপনার জন্য কী করব—

অভিবাদয়ে ত্বাং শিরসা প্রবরাপ্সরসাং বরে।
কিমাজ্ঞাপয়সে দেবি প্রেষ্যস্তে'হমুপস্থিতঃ॥

উর্বশী চিত্রসেনের মুখে শুনেছিলেন— অর্জুন নাকি তাঁর রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন। অর্জুনের রূপ-গুণের কথা শুনে উর্বশী নিজেও মনে মনে অর্জুনের সঙ্গকামনা করছিলেন। কিন্তু অর্জুন যেমন গুরুজনের মতো শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেন উর্বশীকে—তেমন আচরণ উর্বশী একেবারেই আশা করেননি। উর্বশী নিজে রীতিমতো অপ্রস্তুত, বিব্রতবোধ করতে লাগলেন। মাতৃরূপে পূজিত হবার অভ্যাস অপ্সরাদের থাকে না। কাজেই অর্জুনের ব্যবহার উর্বশীর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। বিস্ময়ের প্রথম পর্যায়টা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠে উর্বশী অর্জুনকে বললেন—চিত্রসেন গন্ধর্ব আমাকে বলছিলেন যে, তুমি ইন্দ্রলোকে আসার পর তোমার জন্যই দেবসভায় যে নৃত্যগীতের আয়োজন হয়েছিল, সেই সভায় তুমি নাকি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলে আমাকে। দেবরাজ এবং চিত্রসেন দুজনেই তোমার সেই মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে বুঝেছেন যে, আমার রূপে তুমি আকৃষ্ট হয়েছো। দেবরাজ তাই তোমার কাছে পাঠিয়েছেন আমাকে।

অর্জুন উর্বশীর কথা শুনে লজ্জায় কানে আঙুল দিলেন। তারপর বললেন—আমি যা শুনলাম, তা না শোনাই ছিল ভালো। মা! আমার কাছে মাতা কুন্তী যেমন, দেবী শচী যেমন, আপনিও তেমনই শ্রদ্ধার পাত্রী। আর আপনার দিকে সেদিনের নৃত্যসভায় আমি কেন অমনভাবে তাকিয়েছিলাম, তাও বলি শুনুন। আপনাকে দেখে আমি ভাবছিলাম—ইনিই সেই উর্বশী যিনি আমাদের বংশের আদিপুরুষ পুরূরবার পত্নী, চন্দ্রবংশের আদি মাতা। আমাদের বংশের আদি মাতা, প্রপিতামহীকে চাক্ষুষ দেখে আমার সত্যিই বিস্ময় হয়েছিল। অতএব আমি আপনার পুত্রের মতো, কিংবা পৌত্রের মতো। আপনি আমার সামনে এমন কথা আর বলবেন না। আপনি চলে যান।

অপ্সরা উর্বশীর আর সহ্য হল না। তিনি অর্জুনের সঙ্গকামনা করে অভিসারিকার মতো সেজে নিশীথ রাতে এসেছিলেন অর্জুনের বাসভবনে। এখন অর্জুনের মুখে মাতা, পিতামহী সম্বোধন শুনে উর্বশী বিব্রত তো হলেনই, ক্রুদ্ধ হলেন তার চেয়েও বেশি। রাগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে উর্বশী অর্জুনকে শাপ দিলেন—তুমি আজ থেকে নপুংসক হও—

তস্মাত্ত্বং নর্তনঃ পার্থ স্ত্রীমধ্যে মানবর্জিতঃ।
অপুমানিতি বিখ্যাতঃ ষণ্ডবদ্বিচরিষ্যসি॥

অর্জুন অকারণে, বিনা অপরাধে এমন ভয়ঙ্কর অভিশাপ পেয়ে ভীষণ দুঃখিত হলেন। এদিকে অর্জুনের মুখ থেকে সব কথা শুনে চিত্রসেন ইন্দ্রকে জানালেন। অর্জুনের সংযত আচরণে মুগ্ধ হলেন ইন্দ্রও। স্বর্গসুন্দরী উর্বশীর প্রলোভন অনেক তপস্বী ঋষিও এড়াতে পারেন না। অর্জুন নিজের ইন্দ্রিয়কে এতটাই সংযত করতে শিখেছিলেন, যে উর্বশীর সাজসজ্জা, আচরণ কোনোকিছুই তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। অর্জুনের আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তির অনেক প্রশংসা করলেন ইন্দ্র। তারপর বললেন—উর্বশী তোমাকে যে অভিশাপ দিয়েছেন, তাতেও একদিক থেকে তোমার মঙ্গলই হবে। তুমি নপুংসক হয়ে নর্তকের বেশে একবছর অজ্ঞাতবাস করতে পারবে। কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না। অজ্ঞাতবাসের একটি বছর শেষ হলে তুমি শাপমুক্ত হবে।

[মহা (k) ৩.৪৫.১-১৭; ৩.৪৬.১-৬৩;
(হরি) ৩.৩৯.১-৭৬]

□ এরপরেও বেশ কিছুদিন কেটে গেল স্বর্গলোকে। অর্জুনকে আরও কিছুদিন স্বর্গলোকে ধরে রাখার ইচ্ছা ইন্দ্রের। তিনি তাই লোমশ ঋষিকে অনুরোধ করলেন যাতে মহর্ষি লোমশ গিয়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অর্জুনের কুশল সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করেন। ইন্দ্র বললেন—অর্জুন যতদিন নিখুঁতভাবে নৃত্যগীত এবং অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন করেন, ততদিন বরং পাণ্ডবরা নানা তীর্থ পর্যটন করে পুণ্য সঞ্চয় করুন। বস্তুত আপন পুত্রকে নিজের কাছে রাখার আগ্রহ ছাড়াও আরও একটা বিষয়ে ইন্দ্র চিন্তিত ছিলেন। সেই সময় নিবাতকবচ দৈত্যেরা প্রায়ই

স্বর্গলোক আক্রমণ করছিল। একমাত্র অর্জুনই এই অসুরদের বধ করতে সমর্থ ছিলেন। তাই দেবাসুর যুদ্ধ পর্যন্ত অর্জুন স্বর্গলোকেই থাকবেন—একথা বলেই ইন্দ্র লোমশ মুনিকে পাঠালেন যুধিষ্ঠিরের কাছে—

অয়ং তেষাং সমস্তানাং শক্তঃ প্রতিসমাসনে।
তান্ নিহত্য রণে শূরঃ পুনর্যাস্যতি মানুষান্॥

লোমশমুনির কাছ থেকে অর্জুনের কুশল সংবাদ পাবার পর লোমশ প্রভৃতি ঋষিদের সঙ্গে পাণ্ডবরা তীর্থযাত্রায় বের হলেন।

[মহা (k) ৩.৪৭.১-৩৫; (হরি) ৩.৪০.১-৩৫]

□ এদিকে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা এবং সঙ্গীতশিক্ষা সমাপ্ত হবার পর একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনকে ডেকে বললেন—তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। অতএব এখন তুমি গুরুদক্ষিণা দাও। অর্জুন বললেন—আদেশ করুন, নিশ্চয় আমি গুরুদক্ষিণা দেব। তখন ইন্দ্র অর্জুনকে বললেন—সমুদ্রের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করে তিন কোটি 'নিবাতকবচ' দৈত্য বসবাস করে। তারা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রচণ্ড অত্যাচারী। তুমি এই নিবাতকবচ দৈত্যদের বধ কর। অর্জুন যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিজের রথখানি সাজিয়ে দিলেন অর্জুনের জন্য, নিজের সারথি মাতলিকে দিলেন অর্জুনের সঙ্গে। দিব্য কবচ, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে অর্জুন যুদ্ধযাত্রা করলেন। মহাভারতের এই অংশে উল্লিখিত হয়েছে, অর্জুনের এই যুদ্ধযাত্রার সময়ই দেবতারা আশীর্বাদ করে 'দেবদত্ত' শঙ্খটি তুলে দিয়েছিলেন অর্জুনের হাতে। মহাভারতে নিবাতকবচ দৈত্যদের সঙ্গে অর্জুনের তুমুল যুদ্ধের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত নিবাতকবচ দৈত্যরা সকলে অর্জুনের হাতে নিহত হন। নিবাতকবচ দৈত্যদের রাজধানী থেকে ফেরার পথে অর্জুন পৌলোম এবং কালকেয় দানবদের নগরী দেখতে পান। দেবতাদের শত্রু এই সব দানবদেরও সংহার করেন তিনি। তারপর ফিরে আসেন ইন্দ্রলোকে।

অর্জুনের বীরত্বে প্রসন্ন হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র এক অভেদ্য কবচ এবং একটি মহামূল্যবান কিরীট বা মুকুট উপহার দিলেন অর্জুনকে। দেবলোক থেকে আরও নানা মূল্যবান অলঙ্কার এবং দিব্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অর্জুন ফিরে এলেন মর্ত্যলোকে। অর্জুন গন্ধমাদন পর্বতে আসবেন জানতে পেরে দ্রৌপদী এবং পাণ্ডবরা সেখানেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অর্জুন সেখানে এসে বহুদিন পর ভাইদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অভিবাদন, আলিঙ্গনের পালা শেষ হলে সকলে অর্জুনকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর স্বর্গলোকবাসের অভিজ্ঞতার কথা। অর্জুন সবিস্তারে সেকথা শোনালেন তাঁদের। দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন স্বর্গলোক থেকে আনা এক দিব্য বহুমূল্য অলঙ্কার। অর্জুন ফিরে আসার পরে বেশ কিছুদিন গন্ধমাদন পর্বতের বনেই বাস করলেন পাণ্ডবরা। বারো বছরের বনবাসের প্রায় এগারো বছর অতিক্রান্ত হল, পাণ্ডবরা বনবাসের শেষ বছরটা কাটাবার জন্য আবার ফিরে এলেন কাম্যক বনে।

[মহা (k) ৩.১৬৫.১-১৪; ৩.১৬৬.১-১৭; ৩.১৬৭.১-৫৭; ৩.১৬৮.১-৮৬; ৩.১৬৯.১-২৪; ৩.১৭০.১-২৯; ৩.১৭১.১-৩০; ৩.১৭২.১-৩৫; ৩.১৭৩.১-৭৫; ৩.১৭৪.১-১৭; ৩.১৭৫.১-২৫; ৩.১৭৬.১-৮; (হরি) ৩.১৩৮.১-১৩; ৩.১৩৯.১-১৮; ৩.১৪০.১-৫৬; ৩.১৪১.১-৮৭; ৩.১৪২.১-৫৩; ৩.১৪৩.১-৬৫; ৩.১৪৪.১-৭৮; ৩.১৪৫.১-১৭; ৩.১৪৬.১-২৫; ৩.১৪৭.১-৮]

□ পাণ্ডবদের বনবাসের তখন প্রায় শেষ পর্যায়। পাণ্ডবরা রয়েছেন দ্বৈতবনে। কাছেই কুরুরাজপরিবারের গোসম্পদ রক্ষিত হয়। দুর্যোধন প্রভৃতিরা স্থির করলেন—তাঁরা মহা সমারোহে দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রা করবেন, যাতে তাঁদের ঐশ্বর্য্য দেখে বনবাসী পাণ্ডবরা মনে কষ্ট পান। দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের কুটিরের অদূরেই শিবির স্থাপন করালেন দুর্যোধন। এদিকে কাছেই অপ্সরাদের নিয়ে বিহার করছিলেন অর্জুনের বন্ধু দেবগন্ধর্ব চিত্রসেন। চিত্রসেনের অনুচরদের সঙ্গে দুর্যোধনের অনুচরদের বিবাদ বাধল। সেই বিবাদ বাড়তে বাড়তে ক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হল। চিত্রসেন কৌরবদের পরাস্ত করে সপরিবারে বন্দি করে নিয়ে চললেন। দুর্যোধন সপরিবারে গন্ধর্বদের হাতে বন্দি হয়েছেন—এ খবর গিয়ে পৌঁছাল যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম এবং অর্জুন গিয়ে যুদ্ধ করে গন্ধর্বদের হাত থেকে দুর্যোধনকে মুক্ত করেন।

[মহা (k) ৩.২৪৩.২০-২২; ৩.২৪৪-২৪৬ অধ্যায়; (হরি) ৩.২০৫.৪২-৪৪; ৩.২০৬-২০৭ অধ্যায়]

☐ দুর্যোধনের ঘোষযাত্রার পরও পাণ্ডবদের বনবাসের অল্পদিন বাকি ছিল। এর মধ্যে একদিন পাণ্ডব-কৌরবদের ভগ্নীপতি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কুটীরে একলা পেয়ে দ্রৌপদীকে হরণ করার চেষ্টা করলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব চারজন জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন করলেন দ্রৌপদীকে উদ্ধার করার জন্য। অর্জুনের বাণে সেদিন জয়দ্রথের বেশ কয়েকজন প্রধান অনুচর নিহত হন। জয়দ্রথও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন ভীমের হাতে। ক্রুদ্ধ ভীম আর একটু হলে জয়দ্রথকে বধই করে ফেলতেন হয়তো। ভীম তাঁর ক্রোধে লাগাম দিতে জানেন না। কিন্তু অর্জুন নিজে যেমন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে ভীমের ক্রোধকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছেন বহুবার। আজকের ঘটনাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। ভীম জয়দ্রথকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন দেখে অর্জুনই তাঁকে শান্ত করতে এগিয়ে এলেন। অর্জুন ভীমকে বললেন—দাদা, ভুলে যাবেন না। এই জয়দ্রথ আমাদের ছোটো বোন দুঃশলার স্বামী। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাই বার বার বারণ করেছেন এঁকে বধ করতে। জয়দ্রথকে বধ করলে দুঃশলা কষ্ট পাবেন, আমাদের জ্যেষ্ঠ মাতা গান্ধারীও কষ্ট পাবেন। এঁদের সকলের কথা ভেবে আপনি শান্ত হোন, জয়দ্রথকে বধ করবেন না। ভীম অর্জুনের কথায় শান্ত হলেন শেষ পর্যন্ত। *[মহা (k) ৩.২৭০-২৭১ অধ্যায়; (হরি) ৩.২২৪-২২৫ অধ্যায়]*

☐ অবশেষে পাণ্ডবদের বারো বছরের বনবাস সমাপ্ত হল। অজ্ঞাতবাসের একটি বছর কে কীভাবে ছদ্মবেশে কাটাবেন—পাণ্ডবরা সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। বিশেষ করে অর্জুনের দেবতার তুল্য রূপ, গুণ, ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব কীভাবে একটি বছর লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবে—তা বুঝেই উঠতে পারছিলেন না যুধিষ্ঠির। কিন্তু অর্জুন অজ্ঞাতবাসের প্রস্তুতি সেরে এসেছেন স্বর্গলোকেই। তিনি বললেন—রাজা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি নিজেকে নপুংসক বলে পরিচয় দেব—

প্রতিজ্ঞাং ষণ্ডকো'স্মীতি করিষ্যামি মহীপতে।

অর্জুন এরপর নিজের পরিকল্পনা শোনালেন বিশদে। রাজ অন্তঃপুরের নপুংসকরা যেমন স্ত্রীলোকের মতো বেণী বাঁধেন, অলঙ্কার পড়েন—অজ্ঞাতবাসে অর্জুনের সাজপোশাকও হবে তেমনটিই। অন্তঃপুরের নপুংসক পরিচারিকার মতোই কথাবার্তা, আচার ব্যবহার করবেন অর্জুন। তবে বাস্তবে ঠিক পরিচারিকার মতো থাকতে হয়নি তাঁকে। স্বর্গলোকে তিনি যে সঙ্গীতশিক্ষা করে এসেছিলেন, তা কাজে লাগল এইসময়। মৎস্যদেশের রাজধানীর সীমার বাইরে একটা উঁচু গাছে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে পাণ্ডবরা একে একে চাকরি নিলেন বিরাট রাজার প্রাসাদে। পরস্পরের মধ্যে গোপনে যোগাযোগের জন্য পাঁচ ভাই নিজেদের এক একটি গোপন নামকরণ করেছিলেন। তবে অর্জুনের গুপ্তনামকরণের জন্য বিশেষ খোঁজাখুঁজি করার দরকার হয়নি। তাঁর দশনামের অন্যতম 'বিজয়' নামটিই অজ্ঞাতবাসের সময়েও তাঁর সাংকেতিক পরিচয় হিসেবে চিহ্নিত রইল।

তারপরে একদিন স্ত্রীলোকের মতো সাজপোশাক অলঙ্কার পড়ে, মাথায় দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে অর্জুন এসে দাঁড়ালেন বিরাট রাজার সভায়। নপুংসক অর্জুন মৎস্যরাজকে বললেন—আমার নাম বৃহন্নলা, আমি নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ। আপনি আপনার কন্যা উত্তরার সঙ্গীতশিক্ষার জন্য আমাকে রাখুন—

গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি ভদ্রো'স্মি
নৃত্যে কুশলো'স্মি গীতে।
ত্বমুত্তরায়ৈ পরিদৎস্ব মাং স্বয়ং
ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকঃ॥

বিরাটরাজা একথা শুনে অর্জুন সত্যিই নপুংসক কী না—তা পরীক্ষা করিয়ে নিলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে রাজ অন্তঃপুরে পাঠালেন বৃহন্নলাকে। বৃহন্নলা অর্জুন সেখানে রাজকন্যা উত্তরা এবং তাঁর সমবয়সী সখীদের নৃত্য-গীত শিক্ষা দিতে লাগলেন—

বৃহন্নলাং তামভিবীক্ষ্য মৎস্যরাট্
কলাসু নৃত্যেষু তথৈব বাদিতে।
অপুংস্ত্বমপ্যস্য নিশম্য চ স্থিরং
ততঃ কুমারীপুর উৎসসর্জ তাম্॥
স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং সুতাং
বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ।
সখীশ্চ তস্যাঃ পরিচারিকাঃ শুভাঃ
প্রিয়শ্চ তাসাং স বভূব পাণ্ডবঃ॥

অর্জুন অল্পদিনের মধ্যেই রাজকন্যা উত্তরা এবং তাঁর সমবয়সী সখীদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। বিশেষত উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক স্নেহে মাধুর্যে এতটাই পরিপূর্ণ ছিল যে, অজ্ঞাতবাসের শেষ পর্য্যায়ে তা মৎস্যরাজ ভবনে একাধিকবার আলোচিত হয়েছে।

[মহা (k) ৪.১.৯-১৪; ৪.২.১১-৩২; ৪.৮.১-১৩; (হরি) ৪.১.৯-১৩; ৪.২.১১-৩২; ৪.১০.১-১৩]

□ অজ্ঞাতবাসের একটি বছরের অর্জুনের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণ মহাভারতে নেই। এমনকী ভীম যখন মধ্যরাতে নির্জন নৃত্যশালায় কীচককে বধ করলেন, তখনও নৃত্যশালার কর্ত্রী বৃহন্নলা-অর্জুন শুধু যে অনুপস্থিত ছিলেন তা নয়, কন্যান্তঃপুরে বসে বাইরের ঘটনার তিলমাত্র আভাসও তিনি পেয়েছেন বলে মনে হয় না। অন্তত অর্জুনের কথায় প্রকাশ পায়নি।

অর্জুনের উল্লেখ পাওয়া যায় পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের শেষে কৌরবসেনা মৎস্যদেশ আক্রমণ করার পর। মৎস্যদেশে সে সময় একই সঙ্গে দুই বহিঃশত্রুর আক্রমণ হল। একদিকে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা মৎস্যদেশ আক্রমণ করলেন। ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেবকে নিয়ে নিজে বিরাট রাজা গেলেন সুশর্মাকে প্রতিরোধ করতে। রাজপুরী যোদ্ধাশূন্য। একা বালক রাজকুমার উত্তর রয়েছেন রাজভবনে, এমন সময়ে খবর এল—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুর্যোধন, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রমুখ মহারথীরা বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে বিরাটরাজার গো-সম্পদ হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন একরকম বিনা বাধায়। বালক রাজকুমার উত্তর সে কথা শুনে অন্তঃপুরে মহিলা মহলের সামনে বেশ একটু অহঙ্কার করেই বলতে লাগলেন—যদি একটি উপযুক্ত সারথি পেতাম তাহলে এখনই গিয়ে গোরু ছাড়িয়ে আনতাম। কিন্তু গেল যুদ্ধে আমার সারথিটি নিহত হয়েছে। সারথি থাকলে এতক্ষণে কুরুসেনার সাধ্য কি যে গোরু চুরি করে নিয়ে যায়? আমি তাদের সঙ্গে এমন যুদ্ধ করতাম যে, ভীষ্ম-দ্রোণ সকলের মনে হত গোরু ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে আর কেউ নয়, স্বয়ং অর্জুন এসেছেন।

বালক রাজকুমার উত্তর ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করছেন—এ আর দ্রৌপদীর সহ্য হল না। উপরন্তু দ্রৌপদী বুঝলেন যে, এমন সংকটে একা যুদ্ধ করে যদি কেউ কুরু মহারথীদের পরাস্ত করতে পারেন এবং গো-সম্পদ রক্ষা করতে পারেন তিনি অর্জুন। তাই ভেবেচিন্তে সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী এসে রাজকুমার উত্তরকে বললেন—আপনাদের যে বৃহন্নলা আছেন, তিনি ধনুর্বেদে অর্জুনের শিষ্য। খাণ্ডব দহনের সময়ে এবং আরও অনেক বড়ো যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথিও হয়েছেন। সুতরাং তাঁকে যদি সারথি করতে পারেন, তাহলে যুদ্ধে আপনার জয় একরকম নিশ্চিত।

দ্রৌপদী এটুকু বলেই থামতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। বৃহন্নলার সঙ্গে উত্তরার ঘনিষ্ঠতা তাঁর চোখ এড়ায়নি। সুতরাং যেন সেদিকেই কটাক্ষ করে বললেন—রাজপুত্র! আপনি বরং আপনার বোন উত্তরাকে বলুন, তিনি যেন বৃহন্নলাকে আপনার সারথি হতে অনুরোধ করেন। উত্তরার কথা বৃহন্নলা কখনোই ফেলতে পারবেন না—

যেয়ং কুমারী সুশ্রোণী ভগিনী তে যবীয়সী।
অস্যাঃ স বীরো বচনং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

উত্তরের কথায় উত্তরা গিয়ে বৃহন্নলাকে বললেন—সৈরিন্ধ্রীর মুখে শুনলাম তুমি নাকি অর্জুনের সারথি ছিলে? তাহলে তুমিই আজ আমার ভাই উত্তরের সারথি হয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধে যাও। উত্তরা শুধু অনুরোধ করলেন না। সেই সঙ্গে জুড়ে দিলেন—আমি তোমাকে ভালোবেসে এমন অনুরোধ করছি। যদি আমার কথা না রাখো, তাহলে আমি প্রাণত্যাগ করব—

অথৈতদ্বচনং মে'দ্য নিযুক্তা ন করিষ্যসি।
প্রণয়াদুচ্যমানা ত্বং পরিত্যক্ষ্যমি জীবিতম্॥

শুধুমাত্র দ্রৌপদীর কটাক্ষ নয়, উত্তরার অনুরোধের ধরনেও বোঝা যায় যে তিনি অর্জুনের কতখানি প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

যাই হোক, বৃহন্নলা উত্তরার অনুরোধে উত্তরের সামনে এলেন। বৃহন্নলাকে দেখে উত্তর সোৎসাহে বলতে লাগলেন—সৈরিন্ধ্রীর মুখে তিনি বৃহন্নলার বীরত্ব এবং সারথ্যের কত কথাই না শুনেছেন। এখন বৃহন্নলা উত্তরের সারথি হতে সম্মত হলেই রাজকুমার উত্তর নিশ্চিন্তে গোরুগুলি ছাড়িয়ে আনতে পারেন।

অর্জুন এখানে খানিকটা নাটক করলেন। কতকটা অন্তঃপুরচর নপুংসক পরিচারকের

মতোই অর্জুন বলতে লাগলেন—আমি গাইতে জানি, নাচতে জানি, বাজাতেও জানি। কিন্তু ওসব যুদ্ধ করা আর ঘোড়া চালানো কি আমার কর্ম?

গীতং বা যদি বা নৃত্যং বাদিত্রং বা পৃথগ্বিধম্।
তৎ করিষ্যামি ভদ্রং তে সারথ্যং তু কুতো ময়ি॥

এটুকু বলেও ক্ষান্ত দিলেন না। যুদ্ধে যাবার আগে বর্মটাই পড়ে বসলেন উলটো করে। অন্তঃপুরের মেয়েরা বৃহন্নলাকে ঘিরে হাসাহাসি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বৃহন্নলাকে সারথি করে রাজকুমার উত্তর সেজেগুজে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। যাবার সময় উত্তরা তাঁর সখীদের নিয়ে এসে আবদার জুড়লেন—বৃহন্নলা! তুমি কুরুযোদ্ধাদের হারিয়ে তাদের বস্ত্রগুলি এনো। তাই দিয়ে আমরা পুতুল সাজাবো। বৃহন্নলা-অর্জুন গম্ভীর হয়ে বললেন—যদি কুমার উত্তর যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাহলে নিশ্চয় নিয়ে আসব।

বালক রাজকুমার উত্তর অন্তঃপুরে বসে যতটা হম্বিতম্বি করছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে এসে সাগরের মতো বিশাল সেনা দেখে ঠিক ততোটাই ভয় পেলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর বৃহন্নলাকে বললেন—এই বিশাল কুরুসেনাকে পরাস্ত করা তো দূরের কথা, আমি এই ব্যূহে প্রবেশ করতেও পারব না। এই বলে বিলাপ করতে করতে উত্তর রথ থেকে নেমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের উপক্রম করলেন।

অর্জুন ততক্ষণে ভালোভাবেই বুঝেছেন যে, যুদ্ধ জয় করা তো দূর অস্ত, যুদ্ধ করারও কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা এই বালক রাজপুত্রের নেই। অজ্ঞাতবাসের একটি বছরও ততদিনে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং কৌরবদের সামনে এখন আর আত্মপ্রকাশ করলেও কোনো ক্ষতি নেই। এ অবস্থায় অর্জুন নিজেই যুদ্ধ করে বিরাট রাজার গোসম্পদ উদ্ধার করবেন বলে স্থির করলেন। বালক উত্তরকে পালাতে দেখে অর্জুন তাই বললেন—আপনি এত বড়ো বড়ো কথা বলে যুদ্ধ করতে এসেছেন, এখন যদি ভয় পেয়ে পালান, তা হলে রাজবাড়ির সকলে হাসবে যে! তার উপর সৈরিন্ধ্রী নিজে আমার সারথ্যের প্রশংসা করেছেন। কাজেই গোরুগুলিকে উদ্ধার না করে ফিরে গেলে আমাকেই বা লোকে বলবে কী? লক্ষণীয়, দ্রৌপদী অর্জুনকে যুদ্ধে পাঠাবার সময় উত্তরার আবদারকে গুরুত্ব দিলেও, অর্জুন নিজে কিন্তু দ্রৌপদীর প্রশংসা এবং প্রেরণায় যুদ্ধ করতে এসেছেন বলেই কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন—

অহমপ্যত্র সৈরিন্ধ্র্যা স্তুতঃ সারথ্য কর্মণি।
ন চ শক্যাম্যনির্জিত্য গাঃ প্রয়াতুং পুরং প্রতি॥

উত্তর অবশ্য সে-সব কথা কানে না তুলে সোজা দৌড়তে আরম্ভ করলেন। আর অর্জুন তাঁকে ধরবার জন্য ছুটলেন পিছনে। এমন কাণ্ড দেখে কৌরবপক্ষের যোদ্ধারাও হাসাহাসি করতে লাগলেন। এদিকে অর্জুন দৌড়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে পলায়নরত উত্তরকে থামালেন। উত্তর এবার কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন—বৃহন্নলা! তোমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা, আটটি মণি, দশটি হাতি, একটা সোনায় বাঁধানো রথ দেব—আমাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু ছেড়ে দাও বললেই কি আর অর্জুন ছেড়ে দেন? তিনি উত্তরকে টানতে টানতে রথের দিকে নিয়ে চলতে চলতে বললেন—বেশ। আপনার সাহস না থাকে আপনি যুদ্ধ করবেন না। আপনার বদলে বরং আমিই যুদ্ধ করি। আপনি আমার সারথি হোন।

উত্তর আর কোনো উপায় না দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সারথির আসনে বসলেন ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে। অর্জুন তাঁকে নিয়ে গেলেন সেই শমীবৃক্ষের কাছে, যেখানে অজ্ঞাতবাসের আগে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন পাণ্ডবরা। অর্জুনের আদেশ মতো শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে আনলেন উত্তর। এইসময়েই অর্জুন আত্মপরিচয় দিয়েছেন উত্তরকে, রাজবাড়িতে অজ্ঞাতবাসরত নিজের অন্যান্য ভাইদের সঙ্গেও উত্তরের পরিচয় করিয়েছেন। সৈরিন্ধ্রীর ছদ্মবেশেই যে পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী বাস করছেন রাজঅন্তঃপুরে—সেকথাও জানালেন উত্তরকে। উত্তর যখন অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলেন তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেছেন নিজের ব্যবহারের জন্য। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে গোটা একবছর ধরে প্রায় চাকর-বাকরের মতো ব্যবহার করেছেন জেনে যথেষ্ট বিব্রতও বোধ করছেন তিনি। এই মুহূর্ত থেকে অর্জুনের প্রতি উত্তরের ব্যবহারও বদলে গেছে অনেকটাই। মৎস্যদেশের রাজপুত্র নয়, যেন সামান্য কোনো ক্ষত্রিয় বালক যুদ্ধের প্রথম পাঠ নিচ্ছেন বহুযুদ্ধে অভিজ্ঞ গাণ্ডীবধারী

অর্জুনের কাছ থেকে। অর্জুনও অভিভাবকের মতো, আচার্যের মতো যুদ্ধের প্রথম পাঠ দিয়েছেন তাঁকে।

এদিকে অর্জুনের শঙ্খধ্বনি শোনামাত্র কৌরব শিবিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। একদিকে ভীষ্ম-দ্রোণ দীর্ঘ তেরো বছর পর অর্জুনকে দেখে যেন দূর থেকেই তাঁর উপর স্নেহাশীষ বর্ষণ করতে লাগলেন। অন্যদিকে দুর্যোধন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন যে, তিনি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস ভঙ্গ করেছেন, সুতরাং শর্তানুযায়ী পাণ্ডবদের আবার একবার বারো বছরের বনবাসে পাঠানো যাবে। দ্রোণের মুখে অর্জুনের প্রশংসা শুনে কর্ণ ক্রুদ্ধ হলেন বলে কথা কাটাকাটিও হল বিস্তর। অর্জুনের মনেও যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি তেমনটা নয়। উত্তরের সঙ্গে যখন তিনি একে একে কুরুমহারথীদের পরিচয় করাচ্ছেন, তখনও ভীষ্ম-দ্রোণ-অশ্বত্থামার প্রতি অর্জুনের আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-আবেগ খুব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তেরো বছর পরে প্রিয় পিতামহ, আচার্য, আচার্যপুত্রের মতো প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা—তাও আবার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। এমন অবস্থায় অর্জুন স্বভাবতই বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তবু যুদ্ধ করতেই হল। মহাভারতের কবি অন্তত দশ-এগারোটি অধ্যায় জুড়ে অর্জুনের যুদ্ধ বর্ণনাই শুধু করেননি। এত বছরের পরিণতিতে তাঁর অস্ত্রমোক্ষণে শিল্পের সুষমা লেগেছিল কতটা—তারও একটা আভাস দিয়েছেন তিনি। সেদিন বিশাল কুরুসেনা এবং এতজন বিশিষ্ট মহারথীর বিরুদ্ধে একা অর্জুনের যুদ্ধ দেখতে স্বর্গলোক থেকে দেবতারা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিলেন বলে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে।

যুদ্ধে লক্ষ্যভেদই যেহেতু অর্জুনের জীবনসাধনার প্রথম কল্প ছিল, তাই কোন কোন মহাস্ত্রের সুচতুর প্রয়োগে তিনি এই একক যুদ্ধ জয় করলেন—তার বর্ণনা মহাভারতের কবি ছাড়া অন্য কারো লেখনীতে পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটাবে। তবে যুদ্ধের বাস্তব খবরটুকু দিতে হলে এ-কথা তো একবার বলতেই হবে যে কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, দুঃশাসন, দুর্যোধনের মতো মহাবীররাও ক্ষত্রিয়ের অপলায়নবৃত্তি ভুলে গিয়ে সার বুঝেছিলেন—

যঃ পলায়তে স জীবতি।

যে পালায় সেই বাঁচে। পালিয়ে গিয়েও সবাই মিলে আরও একবার তাঁরা যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, কিন্তু এইবার অর্জুনের অস্ত্রে ক্রূরতার বদলে শিল্পীর স্পর্শ লাগল। সকলে একযোগে সম্মোহিত হয়ে পড়লেন অর্জুনের বাণে। এই অসাধারণ মুহূর্তেও অর্জুন প্রিয়শিষ্যা উত্তরার জন্য বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ-বস্ত্র সংগ্রহ করার কথা ভোলেননি। কুরু মহারথীদের মূর্ছিত হয়ে পড়তে দেখে অর্জুন রাজকুমার উত্তরকে বললেন—যাও, উত্তরার পুতুল সাজানোর জন্য কুরু মহারথীদের উত্তরীয় আর উষ্ণীষ খুলে নিয়ে এসো। আবার সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান করলেন—কিন্তু দেখো, পিতামহের কাছে কিন্তু ভুলেও যেও না। তিনি এ অস্ত্র প্রতিরোধ করতে জানেন। তিনি আদৌ মূর্ছিত হননি। অর্জুনের এই সশ্রদ্ধ সাবধানবাণী ভীষ্মের মতো বিশেষজ্ঞ ধনুর্ধরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। পাশাপাশি অর্জুন স্মরণে রেখেছেন যে, এই মুহূর্তে যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও ভীষ্ম কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ, যাঁর সস্নেহ লালন-পালনে অর্জুনের বাল্যকাল কেটেছে। আদরণীয় কুরুপিতামহের মাথার উষ্ণীষ খুলে নিয়ে তাঁকে অপমান করবেন বালক উত্তর—এ দৃশ্য সহ্য করা অর্জুনের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধ জয় করে রাজধানীতে ফিরে চললেন অর্জুন। এদিকে খানিকক্ষণ পরে দুর্যোধন এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের জ্ঞান ফিরল। ঘোর কাটল দুর্যোধনের। জ্ঞান ফিরতেই তিনি ভীষ্মকে বললেন—এখনও এই লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, এমন অস্ত্র প্রয়োগ করুন যাতে জীবনে আর কখনো পালাতে না পারে।

মধুর হেসে ভীষ্ম বললেন—এতক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলে তাও বোঝোনি, ধনুক বাণ হাত থেকে খসে পড়েছিল, তখন কোথায় ছিল তোমার এই বুদ্ধি আর কোথায় তোমার বীর্য? তবু অর্জুনের চরিত্র দেখো—আমাদের এই স্খলিত অবস্থাতেও শুধু নৃশংসতা হবে বলে আমাদের কাউকে প্রাণে মারেনি। ত্রৈলোক্য রাজ্য হাতে পেলেও নিজের ধর্মত্যাগ করে অন্যায়-কাজটি সে করবে না এবং ঠিক সেই কারণেই আমরা এখনও বেঁচে আছি। ভীষ্মের কথায় লজ্জিত কুরুপুঙ্গব তাঁর বীরবাহিনী নিয়ে

হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু ভারতযুদ্ধের আগে এই যে এত বড়ো মহড়াটা হয়ে গেল, তাতে অর্জুন নিজে মানসিকভাবে নিজের মধ্যেই বড়ো রকমের আস্থা খুঁজে পেলেন। তেমনই কৌরবদের মেরুদণ্ড প্রমাণ ভীষ্ম-দ্রোণের কাছেও তিনি এগিয়ে রইলেন এক কাঠি। *[মহা (k) ৪.৩৬-৬৬ অধ্যায়; (হরি) ৪.৩৩-৬১ অধ্যায়]*

☐ অর্জুন রাজধানীতে ফিরলেন আবার বৃহন্নলার বেশেই। অস্ত্রশস্ত্র, রথ সব লুকিয়ে রেখে। রাজকুমার উত্তরকেও বার বার শিখিয়ে দিলেন—আমাদের অজ্ঞাতবাসের কথা যেন এখনই কাউকে বলে দিও না। রাজধানীতে ফিরে বোলো যে, তুমিই যুদ্ধে কুরুসেনাকে পরাস্ত করেছো। যুদ্ধজয়ের কৃতিত্বের জন্য অর্জুন লালায়িত নন। একবছর পাণ্ডবরা মৎস্যদেশে বাস করেছেন ছদ্মবেশে। মৎস্যদেশের গোসম্পদ রক্ষা করে অর্জুন কতকটা যেন সেই কৃতজ্ঞতারই প্রতিদান দিয়েছেন। কিন্তু অর্জুন যতই শিখিয়ে-পড়িয়ে দিন, কুমার উত্তর যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব নিজে নিতে পারলেন না। তিনি অর্জুনের পরিচয় প্রকাশ করলেন না ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব চাপিয়ে দিলেন কোনো এক কল্পলোকের দেবকুমারের উপর, যিনি উত্তরের অসহায় অবস্থা দেখে সহায়তা করার জন্য স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছিলেন ভুঁয়ে।

[মহা (k) ৪.৬৭.১-২৩; ৪.৬৮.৫৭-৭৬; ৪.৬৯.১-১৯; (হরি) ৪.৬২.১-২২; ৪.৬৪.১-৩৯]

☐ এ ঘটনার তিনদিন পরে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের অন্তরাল ভেঙে ফেললেন। মাঝের এই তিনদিন অর্জুন আর উত্তর অনেক পরামর্শ করেছেন—কীভাবে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিরাট রাজার সামনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যাতে তিনি বিস্মিত হন। ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান—

মন্ত্রয়িত্বা তু কৌন্তেয় উত্তরেণ রহস্তদা।

বিরাট রাজা সত্যি সত্যিই চমকে গেলেন। তারপর আনন্দে, বিহ্বলতায় নিজের মেয়েকে তুলে দিতে চেয়েছেন অর্জুনের হাতে। অর্জুনের মুখে জবাব যেন তৈরিই ছিল। এক মুহূর্তও চিন্তা না করে তিনি বিরাট রাজাকে বললেন—আপনার মেয়েটিকে আমি নিশ্চয় নেব। তবে পত্নী হিসেবে নয়, পুত্রবধূ হিসেবে—

প্রতিগৃহ্নাম্যহং রাজন্ স্নুষাং দুহিতরং তব।

অর্জুন এখন কিছু প্রৌঢ় হয়েছেন। তাঁর নায়কোচিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এখন পিতৃত্ববোধের সংযোগ ঘটেছে। কাজেই উত্তরার মতো পুতুল খেলার বয়স যায়নি এমন একটি মেয়েকে বিবাহ করা এখন আর তাঁকে মানায় না। কিন্তু বিরাট রাজা সে কথা অনুভব করেননি। তিনি অর্জুনের প্রস্তাব শুনে আবার পাল্টা প্রশ্ন করেছেন—আমার মেয়েকে তো আমি নিজেই আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। তাহলে আপনি তাঁকে বিবাহ করতে চান না কেন—

কিমর্থং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভার্য্যাং দুহিতরং মম।
প্রতিগ্রহীতুং নেমাং ত্বং ময়া দত্তামিহেচ্ছসি॥

অর্জুন বিরাট রাজার এই কথার উত্তরে অনেক যুক্তি দিয়েছেন। তার কতকটাতে তাঁর সামাজিক শালীনতাবোধ প্রকাশ পেয়েছে, কতকটাতে প্রকাশ পেয়েছে বাৎসল্য। আবার উত্তরার প্রতি যে অপার প্রশ্রয় দেখে দ্রৌপদী পর্যন্ত কটাক্ষ করেছেন, তার প্রত্যুত্তরে খানিকটা কৈফিয়তও বটে। অর্জুন বললেন—সম্পূর্ণ একটা বছর আমি আপনার যুবতী কন্যার সঙ্গে অন্তঃপুরে বাস করেছি। এখন যদি তাকে বিবাহ করি তাহলে আমার এবং আপনার কন্যার আমাদের দুজনের চরিত্র সম্পর্কেই লোকে সংশয় প্রকাশ করবে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা হল যে, আপনার কন্যা পিতার মতোই বিশ্বাস করেছে আমাকে, তার যা কিছু গোপনীয় আর যা কিছু প্রকাশ্য—সব কথাই নিঃসঙ্কোচে বলেছে সেই বিশ্বাস থেকেই। তার উপর আমি তার সঙ্গীত-নৃত্য শিক্ষার গুরু। সুতরাং শিষ্যা বলেও সে আমার মেয়ের মতোই বটে—

অন্তঃপুরে'হমুষিতঃ সদাপশ্যং সুতাং তব।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ বিশ্বস্তা পিতৃবন্ময়ি॥
প্রিয়ো বহুমতশ্চাসং নর্তকো গীতকোবিদঃ।
আচার্যবচ্চ মাং নিত্যং মন্যতে দুহিতা তব॥

শেষে অর্জুন বললেন—আপনি তো জানেন মহারাজ, আপন পিতার সঙ্গে একত্রে বাস করলেও কন্যার চরিত্রে দোষ ঘটে না, আবার কন্যা কিংবা পুত্রবধূর সঙ্গে বাস করাও দোষণীয় নয়। সুতরাং আপনার কন্যাকে আমার

পুত্রবধূরূপেই গ্রহণ করা উচিত। আমার পুত্র কৃষ্ণের ভাগিনেয়, সুভদ্রানন্দন মহারথী অভিমন্যুর বধূ হিসেবে আমি আপনার কন্যাটিকে গ্রহণ করতে চাই। বিরাট রাজা সানন্দে এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। গোটা কথোপকথনে লক্ষণীয় বিষয় একটাই। উত্তরাকে বিবাহ না করার পক্ষে অর্জুন যুক্তি দেখিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু তার সবটাই বিরাট রাজার প্রশ্নের উত্তরে। তার আগেই বিরাট রাজার প্রস্তাব শোনামাত্র অর্জুন যেভাবে গোড়াতেই উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে মনোনীত করলেন তাতে মনে হয়, বালিকা উত্তরার মধ্যে হয়তো বিগত একবছর ধরেই অর্জুন নিজের যুবক পুত্রের নবপরিণীতা বধূটিকে দেখছিলেন। পুতুল খেলায় ব্যস্ত এই বালিকাটিকে দেখে হয়তো অভিমন্যুর কথা মনে পড়তো তাঁর। তেরো বছর দেখেননি অর্জুন অভিমন্যুকে। অনেক বড়ো হয়ে গেছে তাঁর সেই ছোটো ছেলেটি এতদিনে—এসব ভাবতে ভাবতেই হয়তো অর্জুন ভেবেছিলেন, ঠিক একজন স্নেহশীল পিতার মতোই—এই উত্তরার সঙ্গে আমার অভিমন্যুর বিবাহ হলে বেশ হয়।

[মহা (k) ৪.৭১.২৯-৩৬; ৪.৭২ অধ্যায়;
(হরি) ৪.৬৬.২৭-৩৪; ৪.৬৭ অধ্যায়]

□ মৎস্য দেশের উপপ্লব্য নগরীতে মহাসমারোহে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ সম্পন্ন হল। এই উপলক্ষে সেখানে পাণ্ডবদের আত্মীয়-কুটুম্ব সহায় রাজারা সবাই প্রায় সমবেত হলেন—দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম এবং আরও কিছু কর্তা ব্যক্তি। এই সব সভায় আমরা অর্জুনকে প্রায় কথা বলতে দেখিনি। তাঁর গাণ্ডীব এবং দিব্য-অস্ত্রের চেতনায় অন্য যোদ্ধাব্যক্তিরা অনেকেই বারংবার বলে গেছেন যে, অর্জুনের সামনে আসলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু অর্জুনকে আমরা কিছু বলতে দেখছি না। এমনকী কুরুসভায় দ্রুপদের যে দূত প্রথম গিয়ে পাণ্ডবদের জন্য রাজ্য যাচনা করছে, সেই দূতও ধৃতরাষ্ট্র এবং কুরুবৃদ্ধদের অর্জুনের ভয় দেখাচ্ছে। বলছে—তোমাদের একদিকে ওই এগারো অক্ষৌহিণী সেনা আর একদিকে অর্জুন—সত্যি বলছি, তোমরা পার পাবে না। আর শুধু পাণ্ডবদের দূতই বা কেন, কারণ ধরে নিতে পারি—সে অর্জুনের গুণ বাড়িয়ে বলছে, কিন্তু দুর্যোধনের পক্ষেও যাঁরা শান্তিকামী আছেন, তাঁরাও অর্জুনের ভয় দেখিয়ে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। স্বয়ং ভীষ্মের মতো অত বড়ো ইচ্ছামৃত্যু যোদ্ধা পর্যন্ত সেই সময় কুরুসভাকে উদ্দেশ করে বলেছেন—অর্জুনের মতো অস্ত্রবিৎ মহারথ যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কে? স্বয়ং ইন্দ্রও যদি বজ্র হাতে নেমে আসেন ভুঁয়ে, তবে তাঁর পক্ষেও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে কি না জানি না, অন্য ধনুর্ধরদের কথা আর কী বলব—কিমুতান্যে ধনুর্ভৃতঃ?

কুরুসভায় অর্জুনের সম্বন্ধে ভীষ্মের ধন্যধ্বনিতে কর্ণের গা যেন জ্বলে গেল। তিনি একেবারে রে রে করে ভীষ্মের কথার প্রতিবাদ করলেন, অনেক অপকথাও বললেন সঙ্গে। ভীষ্ম আর থাকতে পারলেন না। বললেন—এত বড়ো বড়ো কথা বলে তো লাভ নেই—কিন্তু রাধেয় বাচা তে—তুমি তোমার কর্মটা স্মরণ করো। বিরাটরাজার গো-হরণের সময় অর্জুন একা আমাদের ছ-জনকে পরাস্ত করেছিল। অতএব এখন পাণ্ডবদের এই রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়ে যদি তোমার কথা শুনি, তা হলে অর্জুনের বাণে যুদ্ধক্ষেত্রে শুয়ে শুয়ে ধুলো খেতে হবে, বুঝলে—

ধ্রুবং যুধি হতাস্তেন ভক্ষয়িষ্যামঃ পাংশুকান্।

ভীষ্মের কথা শুনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও খানিকটা থতমত খেয়ে শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়কে দূত করে পাঠালেন পাণ্ডবদের কাছে। ধৃতরাষ্ট্রের বার্তায় শান্তির বাণী ছিল, পাণ্ডবদের জন্য সোৎসুক কুশল প্রশ্ন ছিল, কিন্তু হৃতরাজ্যের প্রতিদান নিয়ে কোনো বরাভয় ছিল না। সরলমতি যুধিষ্ঠির পর্যন্ত সে সব কথায় ভুললেন না। কিন্তু ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার, কুরুসভার দূত সঞ্জয়ের সঙ্গে যা কথাবার্তা হল—তা সবই প্রায় যুধিষ্ঠির উবাচ। অর্থাৎ যুদ্ধ, শান্তি বা নীতি-নিয়ম নিয়ে যা কথাবার্তা হল, তা সবই প্রধানত সঞ্জয়ের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের। হ্যাঁ, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অপমান, পাশা-খেলা—ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অর্জুন কিংবা ভীমের মনোভাব যুধিষ্ঠির জানাতে ভোলেননি, কিন্তু অর্জুন সেখানে বড়োদাদাকে অতিক্রম করে কোনো কথাই বলেননি। অথচ সঞ্জয় যখন কুরুসভায় ফিরে পাণ্ডবদের বিশেষত যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য নিবেদন করার জন্য দাঁড়িয়ে

আছেন, তখন—কী আশ্চর্য, ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে প্রথম প্রশ্ন করছেন—বলো সঞ্জয়। কুরুসভায় রাজাদের কাছে বলার জন্য সেই অর্জুন কী বার্তা পাঠিয়েছেন?

সঞ্জয় বললেন বটে, তবে অর্জুনের যা মনোভাব ছিল, তা অর্জুনের জবানীতে বললেন। সেই ওজস্বিনী ভাষার মধ্যে অর্জুনের নিজস্ব অহঙ্কার যতটুকু ছিল, তা সবটাই যেন ভাইদের বীর্য্যবত্তার জন্য। যুদ্ধ লাগলে ভীম কী করবেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু কতটা ক্ষতি করবেন কৌরবদের—সেই স্তুতিতেই অর্জুনের ভাষা প্রধানত খর হয়ে উঠেছিল। ফলত নিজের কথা যখন এল তখন গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অহঙ্কারও কিছু মিশে গেল তাঁর ভাষণে। এই প্রথম আমরা অর্জুনকে জোরালো ভঙ্গিতে বলতে শুনলাম যে, যখন যুদ্ধকালে আমার গাণ্ডীবের টঙ্কার শোনা যাবে তখন মন্দবুদ্ধি কৌরবরা অনুতাপ করবে—কেন যুদ্ধ করতে এলাম। যখন মেঘের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মতো, গাছ থেকে পাকা ফলের মতো আমার বাণগুলি পড়বে দুর্যোধনের সৈন্য-সামন্ত আর তার নিজের ঘাড়ে—তখন তারা অনুতাপ করবে।

অর্জুনের ভাষণ দীর্ঘতর ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর কথায় আত্মগরিমার আভাস পাওয়া গেল, সেই মুহূর্তেই তিনি বন্ধু কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতার দিকে কথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অসংখ্য যুদ্ধে তাঁর পারদর্শিতার খবর দিয়ে অর্জুন বলেছেন—সবার ওপরে বৃদ্ধ পিতামহ, আচার্য দ্রোণ, কৃপ এবং মহামতি বিদুর আছেন—তাঁরা যা বলবেন, তাই হবে। তাতে কুরুকুলের আয়ু বাড়ুক—

এতে সর্বে যদ্ বদন্ত্যেতদস্তু/
আয়ুষ্মন্তঃ কুরবঃ সন্তু সর্বে।

বস্তুত কুরুবৃদ্ধরা প্রত্যেকেই প্রধানত অর্জুনের ভয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়নি। দুর্যোধন গোঁয়ার ছেলের মতো বাবা-মা ঠাকুরদাদা কারও কথাই শোনেননি। উলটো দিক দিয়ে আপনারা অর্জুনকে দেখুন। এই কিছুক্ষণ আগে যাঁকে আমরা কথঞ্চিৎ আত্মগৌরব প্রকাশ করতে দেখেছি, এই যিনি দুর্যোধনের ভবিষ্যৎ অনুতাপ নিয়ে কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেই অর্জুন নিজেকে আত্মজনের স্বার্থে, বিশ্বজনের স্বার্থে কতটা পরিবর্তিত করছেন।

শান্তির সমস্ত প্রস্তাব ক্রমাগতই বিফল হয় দেখে কৃষ্ণ নিজে পাণ্ডবদের দূত হয়ে কুরুসভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার আগে আসন্ন যুদ্ধের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে তিনি প্রত্যেক পাণ্ডবকে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত জিজ্ঞাসা করেছেন। আশ্চর্য মহানুভবতা পাণ্ডবদের— যুদ্ধে লোকক্ষয় এবং স্বজনবিনাশ যাতে না ঘটে, সেজন্য শুধু যুধিষ্ঠির নয়, ভীমের মতো আপাতক্রোধী মানুষও সেখানে শান্তির কথাই বললেন। অর্জুন নতুন করে কোনো বক্তব্য রাখেননি এখানে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—আমার যা বলার ছিল, যুধিষ্ঠিরই তা বলে দিয়েছেন—

উক্তং যুধিষ্ঠিরেণৈব যাবদ্ বাচ্যং জনার্দন।

তবে অর্জুন যে শুধুমাত্র যুধিষ্ঠিরকেই আগাগোড়া সমর্থন করছেন তা কিন্তু নয়। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে পাঠাতেই চাননি। কারণ তিনি জানতেন, শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ হবে। কৃষ্ণের মতো একজন মানুষকে কুরুরাজসভায় অপমানিত হতে হবে, তাঁর প্রস্তাব বিফলে যাবে—এমনটি যুধিষ্ঠির চাননি, কিন্তু অর্জুন বোঝেন—কৃষ্ণ যে শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে যেতে চান তা যতটা না শান্তির জন্য জরুরী, তার থেকেও বেশি জরুরী রাজনৈতিক কারণে।

কৃষ্ণ রাজনীতিটা যুধিষ্ঠিরের থেকে ভালো বুঝতেন এবং সেই কারণেই শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ করার রাজনৈতিক দায় যাতে কৌরবদের ওপর পড়ে—সেইজন্যেই কুরুসভায় যেতে চেয়েছেন। অর্জুন সেটা বুঝেই যুধিষ্ঠিরের শান্তি কামনায় সম্মতি জানিয়েছেন, কিন্তু অহেতুক দার্শনিকতার মধ্যে যাননি, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দার্শনিকতার পরিণতি নয়, রাজনীতিরই পরিণতি। অতএব যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমর্থন করেই অর্জুন কৃষ্ণের দিকে ঝুঁকেছেন।

অর্জুন বললেন—তোমার কথাটা আমার বেশ ভালো লেগেছে, কৃষ্ণ! তুমি নিশ্চয় এটা বুঝেছ যে, এখন আমাদের খারাপ অবস্থার নিরিখে এবং ধৃতরাষ্ট্রের লোভের নিরিখে কিছুতেই সন্ধি হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া তুমি বলেছ—যুদ্ধ যে তুমি চাও না, তা মোটেই নয়। তা যদি হয়, তবে যুদ্ধই

হোক। কৃষ্ণের কাছে নিজের অন্তর্গত মনের কথাটা জানিয়েই আবার যুধিষ্ঠিরের মনোগত ইচ্ছায় স্থিত হয়েছেন অর্জুন—অর্থাৎ যুদ্ধ নয় শান্তিই চাই। যে অদ্ভুত প্রাজ্ঞতায় এখানে তিনি যুধিষ্ঠিরের ওপরে কথা বলে পুনরায় যুধিষ্ঠিরের দিকে ঝুঁকলেন—তা বলে বোঝানো যাবে না। একইভাবে কৃষ্ণকে এবং অন্য ভাইদের স্মরণ করিয়ে দিলেন আরও দুটি পুরাতন কথা। এক, রাজসভায় আহূত হয়ে যুধিষ্ঠির পাশা খেলে কোনো অন্যায় করেননি, বরঞ্চ কপট পাশা খেলে কৌরবরাই তাঁদের বনবাসের কষ্ট দিয়েছে। দুই, যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করার পরেও অর্জুন এবার অত্যন্ত সচেতনভাবে দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। বলেছেন—তুমি তো জানো কৃষ্ণ! কীভাবে দ্রৌপদী সভার মধ্যে অপমানিত হয়েছেন এবং পাণ্ডবদের মনের ভিতর যে সেই অপমান এখনও ক্রিয়া করছে—এও তুমি নিশ্চয়ই জানো। অর্জুনের যুক্তিটাই অন্যরকম। যুধিষ্ঠিরের পাশা-খেলা এবং দ্রৌপদীর অপমান দুটোকে তিনি আলাদা ভাবেন। অর্থাৎ দ্রৌপদীর অপমানের জন্য তিনি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারেন, কিন্তু সেই অপমান যে যুধিষ্ঠিরের জন্যই হয়েছে—এটা তিনি মনে করেন না। যুধিষ্ঠিরকে কপট-পাশায় দুর্যোধনেরা হারিয়েছে এবং তাদেরই অন্যায়-পরম্পরায় দ্রৌপদীর অপমান অন্য একটি অপমানমাত্র। এর জন্য কৌরবেরাই দায়ী, যুধিষ্ঠির নয়।

এই যে একদিকে শুদ্ধবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরকে সবার কাছ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা এবং অন্যদিকে ধর্মপত্নী দ্রৌপদীর অপমানের জন্য তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা—এই দুটোই অর্জুনকে যতখানি 'ব্যালান্সড্' মানুষটি করে তুলেছে, ঠিক ততখানিই যুধিষ্ঠিরের মতো ব্যক্তিত্ব থেকে তাঁকে পৃথক করে ফেলেছে। কৃষ্ণ শান্তির বাণী নিয়ে কুরুসভায় যাবার আগে একবার কুন্তীর কাছে গেলেন। এই অবসরে মহারানী কুন্তী যাঁর কথা বারবার স্মরণ করেছেন—তিনি অর্জুন। বারবার কুন্তী আক্ষেপ করেছেন যে, এত অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও, সে এসব সইছে কী করে? উপহাস করে বলেছেন—আহা যেদিন অর্জুন আমার কোলে এল, দেবতারা আকাশবাণী করে বলেছিলেন—এই ছেলে তোমার বিশ্বজয় করবে। হায় কিসের কী? গম্ভীর হয়ে কুন্তী বলেছেন—আমার কথা বলে তুমি তাকে বোলো, কৃষ্ণ—যে বিপন্ন সময়ের জন্য ক্ষত্রিয় জননীরা বীরপুত্র গর্ভে ধারণ করে, সেই সময় এখন এসে গেছে—

যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালো'য়মাগতঃ।

জননীর হাহাকারে, দ্রৌপদীর অপমানে বীরগর্ভা কুন্তী আহত আপ্লুত হয়ে কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না—এত অস্ত্রশক্তি, এত নিপুণতা নিয়েও অর্জুন কেন চুপ করে আছে? কিন্তু এর উত্তর যে তিনি জননী হিসেবে প্রথম কুশল প্রশ্নেই কৃষ্ণকে বলে নিয়েছেন—সে কথা তাঁর খেয়াল নেই। কুন্তী বলেছিলেন— আমার অর্জুন কেমন আছে কৃষ্ণ? আমার অর্জুন—সূর্যের মতো যার তেজ, শম-দম ইত্যাদি সাধন যার ঋষির মতো, ক্ষমাতে যে সর্বংসহা বসুন্ধরার মতো, আর ইন্দ্রের মতো যার বিক্রম—সেই ধনঞ্জয় অর্জুন কেমন আছে, কৃষ্ণ?

অর্জুনের সম্বন্ধে কুন্তীর এই মূল্যায়ন আমরা খুব বেশি মূল্যবান মনে করি। যে মানুষের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী রোগ আছে, তার চিকিৎসা করা যেমন কঠিন, তেমনই সূর্যের মতো যাঁর তেজ অথচ পৃথিবীর মতো যাঁর ধারণশক্তি, তাঁকে কারণ উপস্থিত হলেই উদ্দীপ্ত করা কঠিন। এই ধাতের মানুষেরা অপেক্ষা করে থাকেন। যখন পৃথিবী তার ধারণসীমা অতিক্রম করে, যখন অন্যায় অন্ধকার রাত্রির মতো ঘন হয়ে ওঠে, তখনই উপযুক্ত সময়ে সূর্যের মতো আত্মপ্রকাশ করেন অর্জুন। দুর্যোধনের অহঙ্কারে এবং নির্বুদ্ধিতায় কৌরবদের কাল পরিণত হয়ে এসেছিল এবং এই উপযুক্ত সময়ে অর্জুনকেও আমরা কথা বলতে দেখেছি, তাঁকে উদ্যোগী হতেও দেখছি। যুধিষ্ঠির-অর্জুনের আশঙ্কা অনুযায়ী কৃষ্ণের শান্তিকামনা সার্থক হল না এবং আবারও বীর জননী কুন্তী যুদ্ধক্ষেত্রে আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে আহ্বান জানালেন, কারণ তাঁর মতে সমস্ত পাণ্ডবরা অর্জুনের ওপরেই প্রধানত ভরসা করে—

যস্য বাহুবলং সর্বে পাণ্ডবাঃ পর্যুপাসতে।

[মহা (k) ৫.২১.১-২১; ৫.৪৮.১-১০৯; ৫.৭৭.১৮-২০; ৫.৭৮.১-১৯; ৫.৯০.২৮-৩৪; ৫.৯০.৬৫-৬৮, ৭৪; ৫.১৩৭.১-১০; (হরি) ৫.২১.১-২১; ৫.৪৮.১-১০৯; ৫.৭১.৩৬-৩৮; ৫.৭২.১-২০; ৫.৮৩.২৮-৩৪; ৫.৮৩.৬৬-৬৯, ৭৬: ৫.১২৮.১-১০]

☐ কৃষ্ণের শান্তি প্রস্তাব ব্যর্থ হবার পর পাণ্ডবরা যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। পাণ্ডবপক্ষের সাত অক্ষৌহিণী সেনার প্রধান সেনাপতি কে হবেন, তা নিয়েও আলাপ আলোচনা শুরু হল। এসময় অর্জুনই ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করার পরামর্শ দেন। কৃষ্ণও অর্জুনের এই পরামর্শের প্রশংসা করেছেন। অর্জুনের কথামতো যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতিপদে বরণ করলেন। এরপর পাণ্ডব-কৌরব উভয়পক্ষের যোদ্ধারা কুরুক্ষেত্রে শিবির স্থাপন করে যুদ্ধ আরম্ভের দিন গুণতে লাগলেন।

কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। দুর্যোধনের শিবিরে বিরাট জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল—কে কতদিনে পাণ্ডবদের উৎখাত করতে পারেন। ভীষ্ম বলেছেন—আমি একমাসে সব শেষ করতে পারি, দ্রোণ বলেছেন—আমিও তাই। কৃপাচার্য সময় নিয়েছেন দু-মাস, অশ্বত্থামা দশদিন আর কর্ণ পাঁচদিন। সব শুনে যুধিষ্ঠির তো একটু ভয়ই পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন—হ্যাঁ গো অর্জুন, সবাই যে দশদিন, পাঁচদিন সব বলছে, তা তুমি কত সময়ে এই বিরাট কুরুসৈন্য ধ্বংস করতে পার? অর্জুন উত্তর দিলেন। সবাই জানেন যে, শুধুমাত্র এই উত্তরের ওপর নির্ভর করে যুধিষ্ঠির অর্জুনের মৃত্যুকালীন বিচার করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের মতে অর্জুনের কথার মধ্যে অহঙ্কার ছিল। তিনি নিজেকে এতবড়ো ধনুর্ধর ভাবতেন যে, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ যা পারেন না, তাই তিনি একদিনে করে দেবেন বলেছিলেন। বস্তুত মহাভারতের যে জায়গাটায় এই প্রশ্নোত্তর-পর্ব ঘটেছে, সেখানে আমরা অর্জুনকে একটুও অহঙ্কারী দেখিনি, বরঞ্চ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। অর্জুন প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—যাঁদের কথা আপনি বললেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—এঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ ধনুর্ধর। যা তাঁরা বলেছেন, তাঁরা তা করতেও পারেন—এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু তার জন্য আপনার কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। মহামতি বাসুদেব সহায় থাকলে—এক নিমেষে আমি সমস্ত ভূত-চরাচর ধ্বংস করতে পারি। তার কারণ আমার কাছে শিবের দেওয়া সেই পাশুপত-অস্ত্র আছে—যা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা— কারও কাছেই নেই। দেবদেব পশুপতি যুগান্তসময়ে তাঁর সংহার-লীলার জন্য যে অস্ত্র প্রয়োগ করেন—তা তিনি আমাকে দিয়েছেন।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু অর্জুন জানিয়েছেন—তবু কিন্তু আমি এই অস্ত্রের সাহায্য নেব না, কারণ এই দিব্য-অস্ত্র সাধারণ যুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য নয়। আমি যুদ্ধ করব, সবাই যেমন যুদ্ধ করে তেমনই, একেবারে বিশিষ্ট অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট অস্ত্র—ঋজুযুদ্ধ। এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে অর্জুন কোনো সময়সীমা উল্লেখ করেননি, বরঞ্চ সবিনয়ে দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইত্যাদি স্বপক্ষীয় ধনুর্ধরদের কথা গৌরব সহকারে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন—এঁরা থাকতে আপনার চিন্তা কী মহারাজ? এই বাক্যগুলির মধ্যে কোথাও কোনো অহঙ্কারের স্পর্শমাত্র আছে বলে আমাদের মনে হয় না। আর ভীষ্ম-দ্রোণ ইত্যাদি মহাধনুর্ধরদের কথার প্রতিক্রিয়ায় অর্জুন যে নিমেষে শত্রুশাতনের সম্ভাবনার কথা বলেছেন—তার মধ্যে তাঁর নিজের অহঙ্কার যতখানি ছিল, তার চেয়ে মহাদেবের দেওয়া পাশুপত-অস্ত্রের গৌরব ছিল একশোগুণ বেশি। তবু কিন্তু তিনি এই অস্ত্রের গৌরব আত্মসাৎ করতে চাননি। বরঞ্চ বলেছেন—আমি ঋজুযুদ্ধ করব অর্থাৎ আমি যা পারি—দিব্য-অস্ত্রের গৌরবে তার বেশি কিছু করব না, বা করে দেখাতে চাই না।

সত্যিই বুঝতে অসুবিধা হয়—অর্জুনের এমন সবিনয় মন্তব্যের মধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অহঙ্কারের চিহ্ন আবিষ্কার করলেন কেমন করে।

[মহা (k) ৫.১৫৭.১-১৫; ৫.১৯৪.৭-২২;
(হরি) ৫.১৪৬.১-১৫; ৫.১৮৪.৭-২২]

☐ যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন দেবী দুর্গার আরাধনা করলেন। দেবী প্রসন্ন হয়ে যুদ্ধে জয়লাভের বর দিলেন অর্জুনকে।

[মহা (k) ৬.২৩.১-১৯; (হরি) ৬.২৩.১-১৯]

☐ উভয় পক্ষের সৈন্য সামন্ত, রথী মহারথীরা সমবেত হলেন কুরুক্ষেত্রে। দু-পক্ষের মহারথীদের শঙ্খধ্বনিতে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যেন কেঁপে উঠল। তবে যুদ্ধ আরম্ভ হতে তখনও কিছু বাকি। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন—আমার রথ দুই সেনার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাও কৃষ্ণ।

আমি সকলকে দেখি। কৃষ্ণ তাই করলেন। দুই সেনার মধ্যে দাঁড়িয়ে—সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে—অর্জুন মোহিত হয়ে দেখতে লাগলেন—এ কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন তিনি? এঁরা তাঁর প্রতিপক্ষ-প্রতিদ্বন্দ্বী? অর্জুনের চোখের সামনে একের পর এক মুখগুলি ভেসে উঠতে লাগল—পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, বন্ধু-বান্ধব—আপনজনদের মুখ—

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্
পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।

[ভগবদ্গীতা ১.২৬]

স্বপক্ষ এবং বিপক্ষে শুধুই পরমাত্মীয়দের ভীড় দেখে অর্জুনের যুদ্ধ করার ইচ্ছে রইল না আর। এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণামে একদিকে যেমন আত্মীয়-পরিজন পরিবার নষ্ট হবে, অন্যদিকে যুদ্ধের বিপুল লোকক্ষয়ের ফলে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেবে, শুরু হবে হাহাকারের যুগ। এসব ভাবতে ভাবতেই, বিলাপ করতে করতে আমি যুদ্ধ করব না কৃষ্ণ—একথা বলে ধনুক-বাণ রেখে রথের উপর বসে পড়লেন—

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।

[ভগবদ্গীতা ২.৯]

আমরা এখন সেই অসাধারণ দার্শনিক মুহূর্তে উপনীত যখন অর্জুন ভগবদ্গীতার উপদেশ শুনছেন কৃষ্ণের কাছ থেকে। যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে কৃষ্ণ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—দেখো অর্জুন! তোমার অসাধারণ অস্ত্রনৈপুণ্য সত্ত্বেও তুমি যা করতে যাচ্ছো—তার কর্তা তুমি নও, কারণ একমাত্র অহঙ্কার-মূঢ় মানুষেরাই নিজেকে কর্তা ভাবে—

অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।

স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণের মতো মহারথ যোদ্ধারা কাল পরিপক্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই মারা গেছেন বা যাবেন—অর্জুন তুমি সেই মৃত্যুর নিমিত্ত মাত্র, কর্তা নও। এই যে বিরাট যুদ্ধভূমিতে দাঁড়ানো সবচেয়ে অস্ত্রনিপুণ ব্যক্তিটিকে একেবারে দার্শনিকভাবে, নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা হল, এইখানেই মহাভারতের শেষ পর্যায়ে যুদ্ধোত্তর শান্তরসের সঙ্গে একমাত্র অর্জুনেরই যেন নায়কত্ব তর্কযোগ্য হয়ে ওঠে। অর্জুন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ধর্মে দুর্যোধনের মতো অন্যায়ী ব্যক্তিকে শাসন করা প্রয়োজন, তাই। অর্জুন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, যেহেতু এই কর্মে তাঁর অধিকার আছে, কিন্তু এই কর্মের ফলে তাঁর আসক্তি নেই। অর্জুন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, যেহেতু যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে ভীষ্ম-দ্রোণের মতো পিতামহ বা আচার্যের, দুর্যোধন-দুঃশাসনের মতো জ্ঞাতিভাইদের শরীরে অস্ত্রাঘাত করতে হবে—এই চিন্তায় তিনি আপন কর্তব্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান এবং পরিশেষে পরম ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের বাণী শুনে তিনি এখন আত্মস্থ, ধীর, আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সংশয়হীন এবং যুদ্ধ করার জন্যই যে যুদ্ধ করতে হবে—এই রকম একটা নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত। ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই আমরা অর্জুনের মধ্যে মহাভারতের নায়ক সন্ধানের সার্থকতা খুঁজে পাই।

কৃষ্ণের উপদেশ শুনে অর্জুন শান্ত হলেন, তাঁর মোহ দূর হল, চেতনা জাগ্রত হল। গাণ্ডীব হাতে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন আবার—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদন্ময়াচ্যুত।
স্থিতো'স্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

[গীতা ১৮.৭৩;
মহা (k) ৬.২৫-৪২ অধ্যায়; (হরি) ৬.২৫-৪২ অধ্যায়;
ভগবদ্গীতা ১-১৮ অধ্যায়]

□ যুদ্ধ আরম্ভ হল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আঠারো দিনের যে বিশদ বিবরণ মহাভারতে পাওয়া যায়, তার একটা বড়ো অংশ জুড়েই রয়েছে কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা এবং সৈন্যদের অর্জুনের হাতে বারংবার পরাজয়ের কাহিনী। তার মধ্যে ভীষ্মের সেনাপতিত্ব কাল প্রথম দশটি দিন। এই দশ দিনে ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের সঙ্গে একাধিকবার অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। তবে কৌরব পক্ষের বহু সৈন্য বধ করলেও প্রথম নয়দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম পিতামহকে বধ করার জন্য অর্জুনের তেমন আন্তরিক কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি। অথচ ভীষ্ম পাণ্ডবপক্ষের বহু সৈন্য সংহার করে চলেছেন। অর্জুন কিছুতেই ভীষ্ম পিতামহকে বধ করার ভাবনা করতে পারছেন না দেখে কৃষ্ণ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে

পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা গুরুতর আহত হচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে ভীষ্মকে বধ করার জন্য নিজেই সুদর্শন চক্র তুলে নিয়েছেন হাতে। অর্জুন অনেক কষ্টে কৃষ্ণকে শান্ত করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কৌরবসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। কৌরবসেনা ধ্বংস করার জন্য অর্জুন পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তখনও ভীষ্মবধের ভাবনা তাঁর মনে আসেনি। বাল্যকালে যাঁর স্নেহছায়ায় অর্জুনের দিন কেটেছে, সেই বুড়ো ঠাকুরদাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে আজ কিছুতেই মন চাইছিল না তাঁর। তাই নবম দিনের যুদ্ধের সময়ও আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন ভীষ্ম, পাণ্ডবপক্ষের অসংখ্য যোদ্ধা নিহত হয়েছেন তাঁর হাতে—তবু অর্জুন ভীষ্মবধের সংকল্প করতে পারছেন না দেখে কৃষ্ণ সেদিনও ঘোড়ার চাবুক হাতে ভীষ্মকে বধ করতে ছুটেছেন। অর্জুন আবারও অনেক অনুনয় করে শান্ত করেছেন কৃষ্ণকে।

নবম দিনের যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবসেনা বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগল। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম প্রতিদিন বহু সংখ্যক পাণ্ডবসৈন্য বধ করে চলেছেন, অথচ তাঁকে বধ করার কোনো উপায় নেই। যুধিষ্ঠির পর্যন্ত হতাশ হয়ে বললেন—হে কৃষ্ণ, আমার বনে যাওয়াই ভালো। একা ভীষ্ম যেভাবে আমাদের সৈন্য ধ্বংস করছেন তাতে আর যুদ্ধ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। একরকম বাধ্য হয়েই এসময় অর্জুনও সম্মত হলেন পিতামহকে বধ করতে। কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম একে অজেয়, তার উপর ইচ্ছামৃত্যু। তাঁকে বধ করাও অত সহজ নয়। কৃষ্ণ তাই পাণ্ডবদের সঙ্গে নিয়ে সেই রাত্রে গেলেন ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করতে। যুদ্ধক্লান্ত ভীষ্মও যেন এঁদেরই পথ চেয়ে বসেছিলেন সেদিন। পাণ্ডবরা পৌঁছাতেই তিনি খুশি হয়ে বললেন—বলো কী চাও। তোমাদের প্রীতিকর কোনো কাজ, সে যত দুষ্করই হোক না কেন, আমি নিশ্চয় করব। যুধিষ্ঠির তখন সবিনয়ে বললেন—তাহলে আপনি নিজেই নিজের বধের উপায় বলে দিন আমাদের। ভীষ্ম এমন প্রস্তাব শুনে বেশ খুশিই হলেন আজ। তিনি বললেন—অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে আমাকে আক্রমণ করুন। শিখণ্ডী সামনে এলে আমি অস্ত্রত্যাগ করব। তখন পিছন থেকে অর্জুন তাঁর তীক্ষ্ণবাণ বর্ষণ করেন আমার উপরে। এতেই তোমাদের মঙ্গল হবে।

পিতামহের প্রতি অনুরাগবশত আজ নয়দিন ধরে অর্জুন তাঁকে আঘাত করেননি। আজ সেই পিতামহেরই আদেশে তার থেকেও অপ্রিয়তর কাজের দায়িত্ব তুলে নিলেন। প্রিয় পৌত্র অর্জুনকে নিজের চিরবিশ্রামের দায়িত্ব দিতে পেরে হয়তো খুশি হয়েছিলেন ভীষ্মও।

দশম দিনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন আক্রমণ করেছেন ভীষ্মকে। তবু অর্জুনের ইচ্ছা—পিতামহকে বধ করার মতো অপ্রিয় কাজটা শিখণ্ডীই করুন। আজীবন ভীষ্মবধের প্রতীক্ষায় থাকা অম্বা-শিখণ্ডিনী আজ সত্যিই অস্ত্রহীন ভীষ্মকে বাণে জর্জরিত করার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ধনুক থেকে বেরিয়ে আসা স্বর্ণমুখ বাণগুলি ভীষ্মের শরীর ভেদ করা তো দূরের কথা, তাঁকে ভালোভাবে আঘাত করতে পর্যন্ত পারেনি। অর্জুন শেষপর্যন্ত বুঝলেন—শিখণ্ডীর বাণে ভীষ্ম সামান্য আহত হলেও হতে পারেন, নিহত হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। একরকম বাধ্য হয়েই শিখণ্ডীর পিছন থেকে ভীষ্মকে তীক্ষ্ণ শরে আঘাত করতে লাগলেন অর্জুন। অর্জুনের বাণগুলি ভীষ্মের শরীর বিদীর্ণ করতে লাগল। যন্ত্রণায় ভীষ্ম চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। সেই অবস্থাতেই যন্ত্রণাকাতর ভীষ্ম বলতে লাগলেন—আমি বুঝতে পেরেছি, আমার শরীর ভেদ করে যে বাণগুলি প্রবেশ করছে সেগুলি শিখণ্ডীর বাণ নয়, অর্জুনের বাণ—

অর্জুনস্য ইমে বাণা নেমে বাণাশিখণ্ডিনঃ।

ভীষ্মের এই কথাটি বারে বারে পুনরাবৃত্ত, হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অর্জুনের বাণে ভীষ্মের শরীর ছেয়ে গেল। সূর্যাস্তের আগে ভীষ্ম রথ থেকে মাটিতে পড়লেন। কিন্তু তাঁর শরীর মাটি স্পর্শ করল না। অর্জুনের বাণ তাঁকে শরশয্যায় শুইয়ে দিল।

পিতামহ হিসেবে ভীষ্ম বুঝেছিলেন—তাঁর মৃত্যুতে অর্জুনের গৌরব আহত হল, আহত হল শ্রেষ্ঠ বীরের অভিমান। তাই মৃত্যুশয্যায় শুয়েও বুড়ো ঠাকুরদাদা কত না চেষ্টা করলেন—

অর্জুনকে শ্রেষ্ঠতার সম্মান দেওয়ার জন্য। একবার বললেন—এই শরশয্যায় শুয়ে আমার মাথাটা ঝুলে যাচ্ছে—আমাকে উপযুক্ত বালিশ দাও। কৌরব, পাণ্ডবরা সবাই তখন তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। ভীষ্মের কথা শুনেই কৌরবরা কত সুন্দর মহামূল্য বালিশ নিয়ে এলেন, কী বলব! কিন্তু ভীষ্ম বললেন—এই কি রণভূমিতে শায়িত ক্ষত্রিয়বীরের উপাধান? ভীষ্ম এবার অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন এই বীরশয়নের উপযুক্ত একটি বালিশ হয়তো তুমিই দিতে পারো বৎস! চোখের জল মুছে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বুঝে বুদ্ধিমান অর্জুন অসাধারণ নিপুণতায় তিনখানি বাণ সংযুক্ত করে পিতামহ ভীষ্মের লম্বিত মস্তক শরীরের সমানপাতী করে রাখলেন। সানন্দে ভীষ্ম তাঁকে অভিবাদন জানালেন—এই না হলে সমস্ত যোদ্ধাদের মধ্যে কেমন করে শ্রেষ্ঠ হলে তুমি!

সেদিনের রাত কাটল। সকালবেলায় কৌরব, পাণ্ডব আর অন্যান্য রাজারা সবাই আবার ভিড় করে এলেন ভীষ্মের কাছে। শরপাতনের যন্ত্রণায় তিনি তখন হাঁপাচ্ছেন, কোনোরকমে বললেন—জল, জল দাও। রাজারা সব মিষ্টমধুর খাবার আর জলের পাত্র এসে ভীষ্মকে জল খাওয়াতে চাইলেন। ভীষ্ম তাঁদের একটু লজ্জা দিয়েই বললেন—আমি কি মানুষের মতো সাধারণ অবস্থায় শুয়ে আছি? যাও সব, অর্জুনকে ডেকে দাও। পিতামহের প্রশংসা-গৌরবে আরও বিনীত অর্জুন এসে দাঁড়ালেন ভীষ্মের কাছে। ভীষ্ম বললেন—তোমার বাণের জ্বালায় আমার সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে—একটু জল দিয়ে এই জ্বালা জুড়োবার ব্যবস্থা করো। অর্জুন রথে উঠলেন, সমন্ত্রক-বাণে পৃথিবী ফুঁড়ে জলের অবিরাম ধারা এনে জুড়িয়ে দিলেন ভীষ্মের শরীর আর তৃষ্ণা। অর্জুনের কাণ্ড দেখে অন্তরের লজ্জায় কৌরবরা শীত-লাগা গোরুর মতো কেঁপে উঠলেন—

সম্প্রাবেপন্ত কুরবো গাবঃ শীতার্দিতা ইব

ভীষ্ম বললেন—আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য হচ্ছি না, অর্জুন। কারণ, ধনুর্ধরদের মধ্যে তুমিই সেই একতম বীর, যে এই অসম্ভব কাজ করতে পারে। তুমি যে শ্রেষ্ঠতম, তুমি যে একাই সমস্ত ক্ষত্রিয়কে উৎখাত করতে পারো—একথা আমি বারংবার দুর্যোধনকে বলেছি। তাঁর মাথায় এই সত্য কথাটি ঢুকল না। ভীষ্ম বারবার অর্জুনের কথা তুলে দুর্যোধনকে আবারও শেষবারের মতো যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন, কিন্তু এই কথাগুলির মধ্যে দুর্যোধনের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রশংসার সান্ত্বনা ছিল অর্জুনের জন্য—যিনি ঈশ্বরেচ্ছায় ভীষ্মের দণ্ডদাতা হলেও, মৃত্যুর কর্তা নন।

□ ভীষ্মের পতনের পর কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি হলেন দ্রোণাচার্য। দ্রোণ ভীষ্মের মতো পাণ্ডব-কৌরবদের পিতামহ নন, তাই পাণ্ডবদের বধ করব না—এমন শর্ত তিনি হয়তো সরাসরি রাখবেন না। তবু পাণ্ডবদের বধ করার ইচ্ছাও দ্রোণের বিশেষ নেই—একথা দুর্যোধন বেশ ভালো করেই জানেন। তাই সেনাপতি পদে দ্রোণের অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোধন অনুরোধ রাখলেন—যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করে এনে দিন। দ্রোণ নিজেও বুঝলেন—দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে বলেননি, কারণ দ্রোণ তাতে সম্মত না হতেও পারেন। তবু বন্দি করে আনার প্রস্তাবটাও দ্রোণ খুব সহজভাবে নিলেন না। তিনি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন—তুমি কি যুদ্ধ জয় করে তারপর ভাইদের অর্ধেক রাজত্ব ফিরিয়ে দেবে বলে স্থির করেছ? দুর্যোধন তখন নিজের অভিসন্ধির কথা খুলে বললেন অকপটে—যুধিষ্ঠিরকে বধ করলেও যুদ্ধ বন্ধ হবে না আচার্য! যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকারী তাঁর ভাইয়েরা আছেন, পুত্রেরা আছে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করতে পারলেই নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ। কারণ যুদ্ধবন্দি মানে দাস। দাসের স্বাধিকারও থাকেনা, উত্তরাধিকারও থাকেনা। দ্রোণ সবই বুঝলেন। যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করে আনার প্রতিজ্ঞাও করলেন, কিন্তু একটু ফাঁক রেখে। এই ফাঁকটুকু রাখলেন প্রিয়শিষ্য অর্জুনের উপর। দ্রোণ বললেন—যদি অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের থেকে দূরে রাখতে পার, তবেই যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করতে পারব।

অনেক পরামর্শ করে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা, তাঁর ভাইয়েরা এবং কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধাদের একটি গোষ্ঠীর উপরে অর্জুনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হল। কৌরবপক্ষের এই যোদ্ধারা সকলে প্রতিজ্ঞা করলেন—হয় আমরা অর্জুনকে বধ করব, নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শল্যপর্ব পর্যন্ত বারে বারে এই সংশপ্তক যোদ্ধাদের সঙ্গে অর্জুনকে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে দেখা যাবে। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা এবং অন্যান্য সংশপ্তক যোদ্ধারা সকলেই অর্জুনের হাতে নিহত হন।

দ্রোণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ আরম্ভ হল। দ্রোণাচার্য আজ কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি, তবু অর্জুনের প্রতি তাঁর মনোভাবটা কতকটা গুরুকুলের দিনগুলির মতোই রয়ে গেছে যেন। এমনকী যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করার ফাঁকটুকুও তিনি অর্জুনের উপর রেখেছেন—যেন এমন পরিস্থিতিতে অর্জুন কীভাবে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবেন—তাই দ্রোণ পরীক্ষা করে দেখতে চান।

সংশপ্তকদের বিরুদ্ধে অর্জুনকে ব্যস্ত রেখেও যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা গেল না। অর্জুন দূরে সরে গেলেও অভিমন্যু, সাত্যকিরা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন, আবার অর্জুনও এসে পড়েন খানিকবাদেই। যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে ত্রিগর্তদেশীয় বহু যোদ্ধা অর্জুনের হাতে নিহত হলেন, নিহত হলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত। কর্ণের তিনটি ভাইও প্রাণ দিলেন অর্জুনের হাতে।

দ্বাদশ দিনে অনেক চেষ্টা করেও যখন যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করা গেল না, তখন দুর্যোধন একদিকে যেমন বেশ হতাশ হলেন তেমনই পাণ্ডবপক্ষপাতী প্রধান সেনাপতি আচার্য দ্রোণের প্রতি যথেষ্ট ক্ষুব্ধও হলেন। সন্ধ্যাবেলায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হবার পর দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে সরাসরিই প্রশ্ন করলেন—আপনি নিজে অজেয় যোদ্ধা, তৎসত্ত্বেও আজ প্রায় হাতের নাগালে পেয়েও যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে দিলেন। এমন কেন করলেন? আপনি কি আমাদেরই শত্রু বলে মনে করেন? এমন অপমানজনক কথা শুনে দ্রোণ আহত হলেন, যথেষ্ট বিরক্তও হলেন, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন, অর্জুনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও। এত দূরে, যাতে সূর্যাস্তের আগে কোনোভাবেই পাণ্ডব যোদ্ধাদের কাছে ফিরে আসতে না পারেন। এই অবসরে আমি এমনভাবে ব্যূহ রচনা করব যে, পাণ্ডবপক্ষের কোনো শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা অবশ্যই নিহত হবেন। পরিকল্পনা মতো অর্জুনকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন সংশপ্তকরা। অর্জুনের অনুপস্থিতির সুযোগে যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করলেন। দ্রোণপর্বে দ্রোণাচার্যের মৃত্যু যত বড়ো ঘটনা, তার থেকেও বড়ো ঘটনা বোধ হয় অভিমন্যুর মৃত্যু, অর্জুনের প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু। অভিমন্যু যখন মারা যান, সেদিন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এই দারুণ সংবাদ দিতে পারেননি। প্রতিদিনের যুদ্ধ শেষ করে অর্জুন যখন ফিরে আসতেন, তখন তিনি রথ থেকে নামতে-না-নামতেই দ্রৌপদীর ছেলেদের সঙ্গে করে অভিমন্যু হাসি-মুখে অর্জুনকে একেবারে শিবিরের ভিতর পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। এই ছিল অভিমন্যুর অভ্যাস। এ হেন ছেলেকে না দেখে এবং যেহেতু অর্জুন পূর্বেই দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহের কথা শুনেছেন—তিনি ভীষণ শঙ্কিত হলেন। ক্রমে ক্রমে সবই প্রকাশ পেল এবং অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন যে আঘাত পেলেন—তার বর্ণনা ব্যাসের লেখনীতেই মানায়, উদ্ধৃতি-পদ্ধতিতে সে শোকের একাংশও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই আকুল অবস্থার মধ্যে অব্যশই যিনি তাঁর পাশে দাঁড়ালেন—তিনি কৃষ্ণ। ভগবদ্‌গীতার অমৃত-কথার মতোই আরও কটি কথা কৃষ্ণের মুখ দিয়ে উৎসারিত হল এবং অবশ্যই দার্শনিকতার যুক্তিতেই মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রশমিত করা ছাড়া কৃষ্ণের আর কিছু করার ছিল না। তবু পুত্রশোক শোক-তপ্ত পিতামাতার অন্তরে এমনই এক শূন্যতা সৃষ্টি করে—যে শূন্যতা প্রগাঢ় দার্শনিকতার দ্বারাও বিলুপ্ত করা যায় না। স্বভাবতই অর্জুন সেই ভয়ঙ্কর জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা নিলেন, কেন না জয়দ্রথই সেই ব্যক্তি, যিনি অভিমন্যুর সাহায্যে এগিয়ে আসা অন্য পাণ্ডবদের চক্রব্যূহে ঢুকতে দেননি।

অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন—পরের দিন সূর্যাস্তের আগেই তিনি জয়দ্রথকে মারবেন, নইলে নিজে আত্মহত্যা করবেন। জয়দ্রথ দুর্যোধনদের জামাই হওয়া সত্ত্বেও আচার্য দ্রোণ এবং সবার হাতে পায়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করলেন।

দ্রোণ যে শুধু জয়দ্রথকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন তাই নয়, পরদিনের যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তিনি যেন সাজিয়ে তুললেন অর্জুনের যুদ্ধবিদ্যার পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে। রচিত হল চক্র-শকটব্যূহ, তারও পিছনে রইল একটি পদ্মব্যূহ। আর সেই পদ্মের গর্ভে রইল সূচীব্যূহ। সেই সূচীব্যূহে লুকিয়ে রইলেন জয়দ্রথ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এই চতুর্দশ দিনটিই যুদ্ধের সব থেকে ঘটনাবহুল দিন। সূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করেছেন অর্জুন। এদিকে দ্রোণাচার্য জয়দ্রথকে লুকিয়ে রেখেছেন প্রায় ধামাচাপা দিয়ে রাখার মতো।

আচার্য স্বয়ং রক্ষা করছিলেন সেই ব্যূহের দ্বার। স্বাভাবিকভাবে আচার্য দ্রোণের সঙ্গেই অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পেরে উঠছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি ছাড়ছিলেনও না। অর্জুনের হাতে সময় ছিল না—অনেক যুদ্ধ করে, অনেক পথ পেরিয়ে শকটব্যূহের সেই জায়গায় পৌঁছতে হবে—যেখানে জয়দ্রথ আছেন। অর্জুন কিন্তু আচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বেশ মত্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণ বললেন—তাড়াতাড়ি, বন্ধু। তাড়াতাড়ি। সন্ধ্যার আগে আমাদের জয়দ্রথকে মারতে হবে। তখন কৃষ্ণের বুদ্ধিতে অর্জুন আচার্যকে প্রদক্ষিণ করে বললেন—আপনি আমার গুরু, পিতা। আপনার কাছে হারলেই বা লজ্জা কী? এইভাবে আচার্যকে তিনি এড়িয়ে এলেন বটে, কিন্তু শকটব্যূহের আরও সব অসাধারণ রক্ষী দুঃশাসন, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, কর্ণ—এঁরা তো আর কেউ ছেড়ে দেবার লোক নন। অতএব যুদ্ধ হতে থাকল ভয়ঙ্কর, সময়ও যেতে থাকল বিস্তর।

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সেদিন বহু কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা অর্জুনের হাতে নিহত হলেন, অসংখ্য সৈন্যবধ করলেন অর্জুন। একসময় অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য সাত্যকি ব্যূহে প্রবেশ করেন। সে সময় কৌরবপক্ষীয় মহারথী ভূরিশ্রবার সঙ্গে সাত্যকির দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। দীর্ঘ যুদ্ধের পর একসময় ভূরিশ্রবার আঘাতে সাত্যকি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে সেই মূর্ছিত অবস্থাতেই বধ করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন অর্জুন। ঘটনা দেখে সাত্যকিকে বাঁচাবার জন্য অর্জুন বাণ চালালেন। তাতে ভূরিশ্রবার তরবারি শুদ্ধ হাতটিই কাটা গেল। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মাঝে এমন তৃতীয় ব্যক্তির আক্রমণের যৌক্তিকতা নৈতিকতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন ভূরিশ্রবা, অর্জুনকে গালমন্দও করেছেন অনেক। পুত্রশোকার্ত অর্জুন ভূরিশ্রবাকে প্রত্যুত্তর দিলেন—আপনি আমাকে যুদ্ধনীতি, ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দেবার আগে বিবেচনা করুন তো, নিরস্ত্র, অসহায় মূর্ছিত অবস্থায় আপনি যে সাত্যকিকে বধ করতে যাচ্ছিলেন, তা কতটা সমর্থনযোগ্য? গতকাল যখন আপনারা সকলে মিলে আমার নিরস্ত্র, অসহায় বালক পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন—তখন আপনাদের নীতিবোধ কোথায় ছিল? অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি ভূরিশ্রবা। হাত কাটা যাওয়ায় তিনি যুদ্ধে অক্ষম, এ অবস্থায় প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। অবশ্য সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে ধ্যানস্থ অবস্থাতেই বধ করেন। অর্জুন আবারও চললেন জয়দ্রথের খোঁজে।

সবচেয়ে মুশকিলে পড়লেন কৃষ্ণ। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন—জয়দ্রথকে সন্ধ্যার আগে মারবেন, নইলে নিজে মরবেন। ক্রোধোদ্দীপ্ত অবস্থায় প্রতিজ্ঞার পিছনে কারণ থাকলেও অহংবোধও থাকে। মহাভারতের সমস্ত যুদ্ধপর্বে কৃষ্ণ চেয়েছেন—অর্জুন যুদ্ধ করুন, কিন্তু শান্ত নিরহঙ্কার ভঙ্গিতে করুন। অথচ এইখানে পুত্রশোকের মতো গভীর দুঃখ অর্জুনকে বিচলিত করে দিয়েছে, তাঁর মনে সামান্যতম হলেও সেই অনীপ্সিত কর্তৃত্বের বোধ এনে দিয়েছে, যা কৃষ্ণ মনে মনে চান না। এক্ষেত্রে আবারও তাঁকে সেই মায়া সৃষ্টি করতে হল। দিবসের শেষ সূর্য তখনও আলো ছড়িয়ে চলেছে, এরই মধ্যে কৃষ্ণের বুদ্ধিযোগে ঘনিয়ে এল আকালিক অন্ধকার। জয়দ্রথ সানন্দে ভাবলেন তিনি বেঁচে গেছেন এবং অর্জুনকেও আত্মহত্যা করতে হবে। তিনি তাঁর লুকোনো জায়গা থেকে মুখটি বার করে সূর্যের সঞ্চার দেখছিলেন, অন্যান্য সৈনিকরাও তাই। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—জয়দ্রথ মুখ বার করেছে—সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল তুমি যেন সংকোচ কোরো না, ও আমারই বুদ্ধি। তুমি মারো জয়দ্রথকে। কিন্তু 'মারো' বললেই কি আর মারা যায়। দুর্যোধন, কৃপ, কর্ণ—সবাই তো লড়ছেন। এই অবস্থায় অর্জুনের অস্ত্রচালনা ছিল ঈর্ষণীয়। কী অসাধারণ দক্ষতায় এই মহারথ যোদ্ধাদের কাবু করে তিনি জয়দ্রথকে মারলেন—তা বলে বোঝানো যাবে না। তবু এই সামান্য একটা 'তবু' রয়ে গেল। অন্য সবার ক্ষেত্রে অর্জুন অসামান্য অস্ত্রকৌশল দেখানোর সুযোগ পেলেন বটে, জয়দ্রথকে তিনি অসাধারণ নিপুণতায় হত্যা

করলেন বটে, তবু তাঁর প্রতিজ্ঞারক্ষার ব্যাপারে কর্তৃত্ব রয়ে গেল কৃষ্ণেরই হাতে। তিনি যে বলেছিলেন—তুমি নিরহঙ্কার হয়ে যুদ্ধ করবে, যুদ্ধের ফলে অনাসক্ত হয়ে যুদ্ধ করবে। তাই যে মুহূর্তে—তা সে পুত্রশোকের মতো গভীর দুঃখ থেকেই হোক অথবা অন্য কোনো কিছু—অর্জুনের মধ্যে অহঙ্কার দেখা গেছে, আসক্তি দেখা গেছে, তখনই কৃষ্ণ ঘটনার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছেন নিজের হাতে। তিনি যে বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন—তুমি আমার শরণ নাও, সমস্ত পাপের দায় আমার।

জয়দ্রথ বধের পর দ্রোণপর্বের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বয়ং দ্রোণাচার্যের মৃত্যু।

আচার্য দ্রোণের হন্তা হিসেবে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আগে থেকেই চিহ্নিত ছিলেন। তবু দ্রোণাচার্যের সেনাপতিত্বের সময় বহুবার অর্জুন তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন এবং প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জয়ী হয়েছেন অর্জুন। এই প্রিয়তম শিষ্যটির ব্যাপারে আচার্যেরও এমন এক শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রশ্রয় ছিল যে, তিনি বোধ হয় জয়ী হতে চানওনি। এই সমস্ত যুদ্ধেই অর্জুন তাঁর অস্ত্র-শিক্ষা শিল্পের স্তরে নিয়ে গেছেন। আচার্যও একাধিকবার অর্জুনকে হাতে পেয়েও কিছু করতে পারেননি। যুদ্ধ যত করেছেন, প্রিয়শিষ্যের নিপুণতায় মুগ্ধ হয়েছেন তার থেকে বেশি। এর জন্য দুর্যোধনের কাছে তাঁকে কথাও শুনতে হয়েছে যথেষ্ট। অর্জুনের ব্যাপারে তাঁর মুগ্ধতা, তাঁর স্নেহ এবং সর্বোপরি তাঁর বিশ্বাস এতটাই ছিল যে, দুর্যোধন বারবার সেটাকে পক্ষপাত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই জয়দ্রথবধের পরেও দুর্যোধন তাঁকে বলেছেন—আপনি আমার পক্ষে যুদ্ধ করলেও আপনি যে পাণ্ডবদেরই ভালো চান—সেটা আমি জানি। অর্জুন আপনার শিষ্য বলেই তাকে আপনি ছেড়ে দেন। আচার্য দ্রোণকে এতই অপমানসূচক কথা বলেছেন দুর্যোধন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত কৌরবদের সারা জীবনের অন্যায়গুলি একের পর এক উচ্চারণ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন এবং শেষে সিদ্ধান্ত করেছেন—তুমি কে হে দুর্যোধন, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেব-দানব কারও পার পাবার উপায় নেই। দ্রোণাচার্য বৃদ্ধও হয়ে গিয়েছিলেন, অস্ত্রপাতনের ক্ষিপ্রতাও তাঁর কমে গিয়েছিল, কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে তিনি যে কোনোভাবেই এঁটে উঠতে পারলেন না—এটা যতখানি আশ্চর্যের, ততখানি আনন্দের। অর্জুনের দিক থেকেও ব্যাপারটা লক্ষণীয়।

আচার্য দ্রোণকে মারার ব্যাপারে অর্জুন সোজাসুজি দায়ী ছিলেন না এবং এটা তাঁর সৌভাগ্য। কিন্তু যেভাবে দ্রোণকে মারা হল—তাতে অর্জুনের সায় ছিল না মোটেই। আচার্যের সাংঘাতিক ক্ষমতা এবং তাঁর হাতে যে পরিমাণ সৈন্যক্ষয় হচ্ছিল—তার বহর দেখে কৃষ্ণ অর্জুনের কাছেই প্রথম প্রস্তাব করলেন যে, এই বৃদ্ধের কাছে তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা খবর দেওয়া দরকার, নইলে দ্রোণাচার্য অস্ত্র-ত্যাগ করবেন না এবং অস্ত্র-ত্যাগ না করলে তাঁকে বধ করা যাবে না। কৃষ্ণের এই প্রস্তাব অর্জুন একটুও অনুমোদন করেননি—

এতন্নারোচয়দ্ রাজন্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।

কিন্তু সবাই মত করলেন এবং সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকেও এ-কথা বলতে হল যে, অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ। সংবাদ শুনে আচার্য অস্ত্র-ত্যাগ করলেন এবং ধ্যানযোগে জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে অবধারণ করলেন। দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার অপমানের শোধ নেবার জন্য খড়্গ নিয়ে লাফিয়ে নামলেন রথ থেকে—দ্রোণের গলা কেটে ফেলতে চান তিনি।

অর্জুন দেখছেন—ধৃষ্টদ্যুম্ন এগোচ্ছেন। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে অর্জুন বললেন—না, ধৃষ্টদ্যুম্ন! না, আচার্যকে এইভাবে মেরো না, ওঁকে তুমি জীবন্ত ধরে নিয়ে এসো—

জীবন্তমানয়াচার্যং মা বধীঃ দ্রুপদাত্মজ।

অর্জুন বারবার চেঁচাতে থাকলে, অর্জুনের চিৎকার শুনে সৈনিকেরাও 'না-না' করতে থাকল। ধৃষ্টদ্যুম্ন কারও কথাই শুনলেন না। অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাধা দেবার জন্য তাঁর পিছনে ছুটলেন, কিন্তু তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধরে ফেলার আগেই যা ঘটার ঘটে গেল। খড়্গের এক কোপে দ্রোণাচার্যের মাথা কেটে ছুঁড়ে দিলেন কৌরবদের সামনে। অর্জুনের ভীষণ, ভীষণ খারাপ লাগল। তাঁর বোধ হয় সেদিনটির কথা মনে পড়ছিল—যেদিন দ্রুপদকে জ্যান্ত বেঁধে আনতে বলেছিলেন দ্রোণাচার্য। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন জন্মাননি। কেউ নয়, এই অর্জুনই সেদিনকার যুদ্ধে দ্রুপদের রথ, অশ্ব এবং সারথিকে জখম করে দ্রুপদকে জীবন্ত বেঁধে

এনেছিলেন। কিন্তু কই দ্রোণও তো তার বেশি চাননি। চরম অপমানিত হয়েও আচার্য নিজে তাঁর গায়ে হাত তোলেননি, তাঁকে মেরে ফেলতেও বলেননি। প্রতি-অপমানে এইটুকু সম্মান তো তিনি আশা করতেই পারতেন। হয়তো সে দৃশ্যটাই অবচেতন থেকে অর্জুনকে দ্রোণের মতোই বলাচ্ছিল—ওঁকে তুমি জীবন্ত ধরে নিয়ে এসো—জীবন্তম আনয়াচার্যম্। ধৃষ্টদ্যুম্ন কথা শোনেননি। কিন্তু এই আচরণ! সবার সামনে, শিষ্যদের সামনে পঁচাশি বছরের বয়স্ক গুরুর চুল ধরে মাথা কেটে ফেলা—অর্জুন কিছুতেই মানতে পারেননি। জীবনের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে হয়তো দ্রোণাচার্যও শুনতে পেয়েছিলেন অর্জুনের চিৎকার। দুর্যোধনের মতো দুর্বিনীত শিষ্যের সাহচর্যে জীবন কেটেছে তাঁর। কুরুক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধও করেছেন দুর্যোধনের পক্ষে। আবার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পাণ্ডবদের মতো প্রিয় শিষ্যরা। অস্ত্রবিশারদ আচার্য হিসেবে জগৎজোড়া খ্যাতি ছিল দ্রোণের, অথচ মৃত্যুকালে অর্জুন ছাড়া আর একটি শিষ্যকেও তিনি পেলেন না যিনি দ্রোণের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মায়া, সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে প্রিয়তম শিষ্যের আন্তরিক ভালোবাসার প্রকাশে হয়তো দ্রোণের হৃদয়ও পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অর্জুন আঘাত পেলেন, মর্মান্তিক আঘাত পেলেন। রাগে দুঃখে আজ অর্জুন সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করলেন যাঁকে এর আগে বহু কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি কখনো অতিক্রম করেননি। কঠোর ভাষায় যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিকে ধিক্কার দিলেন অর্জুন।

অর্জুন বললেন, আপনি রাজ্যলাভের আশায় গুরুর সঙ্গে মিথ্যা আচরণ করলেন। ভদ্র-সজ্জনের ধর্ম আপনি জেনেও এমন অধর্মের কাজ করলেন। জানেন তো রামচন্দ্র অন্যায়ভাবে বালীকে মেরে যে অখ্যাতি চিরকাল বহন করেছেন, দ্রোণবধের জন্য সেই অখ্যাতি আপনিও বহন করবেন চিরকাল। অর্জুনের কথা মিথ্যা হয়নি। এই এক অকীর্তি যুধিষ্ঠিরকে, সত্যবাদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আজও কালিমালিপ্ত করে। অর্জুনের কথা শুনে ভীম আর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে প্রায় উপহাসই করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রশ্রয় পেতেন না, যদি ভীম কনিষ্ঠ ভাইকে উপহাসের ভাষায় কথা না বলতেন। ভীম বলেছিলেন—আহা, আহা এমন সব ধর্মকথা বলছো না ভাই, যেন বনের মধ্যে মুনি উপদেশ দিচ্ছেন—

মুনির্যথারণ্যগতো ভাষতে ধর্ম-সংজ্ঞিতম্।

ক্ষত্রিয়ের সমস্ত গুণ তোমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তুমি যে কেমন করে এমন বোকার মতো কথা বলছ? তুমি এত ধর্মের কথা বলছ—তা, ওই পাশা-খেলা, দ্রৌপদীর অপমান, বনবাস—এগুলো কোন ধর্মে হয়েছে?

ভীম আরও অনেক বকলেন অর্জুনকে। ফলে ধৃষ্টদ্যুম্নও আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পেলেন। তবুও আচার্য দ্রোণের এমন মৃত্যুতে অর্জুনের ধিক্কার গেল না। তিনি 'ছি-ছি' করতেই থাকলেন। যুধিষ্ঠিরের মানসিকতা সম্বন্ধেও তাঁর গ্লানি কমল না।

শোকসন্তপ্ত হয়ে অর্জুন বারে বারে বলতে লাগলেন—এমন পাশবিক মৃত্যু কোনোভাবেই আচার্য দ্রোণের প্রাপ্য ছিল না, পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা যতই যুক্তি দেখান, এ কাজ গুরুতর অন্যায় হয়েছে। উপহাস, নিন্দার পাশাপাশি ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন বার বার বোঝাবারও চেষ্টা করলেন অর্জুনকে যে, এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। তাছাড়া দ্রোণাচার্য তো নিজেই বলেছিলেন, কেবলমাত্র সত্যবাদী ব্যক্তির মুখ থেকে অপ্রিয় সংবাদ শুনলে তবেই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন, সুতরাং এমন মৃত্যু তো তাঁর নিজেরই কাম্য ছিল। অর্জুন কোনো তর্ক যুক্তিই মানতে চাননি। অর্জুনের প্রতিবাদের ফলে পাণ্ডবশিবিরে দ্রোণবধের পর রীতিমতো অন্তর্কলহ দেখা দিল। ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্নের উপহাস গালমন্দ শুনে শেষ পর্যন্ত একবার মাত্র ধিক্কার জানিয়ে নীরব হলেন অর্জুন। বাল্যকালে পিতৃহীন হয়েছেন তিনি, আচার্য দ্রোণের স্থান অর্জুনের হৃদয়ে পিতা পাণ্ডুর থেকে কিছু কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল। ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্নরা দ্রোণের প্রতি তাঁর সেই আন্তরিক শ্রদ্ধাকে, শোককে যেভাবে কটু কথায় ভরে দিতে লাগলেন—তার জবাব দেবার শক্তি অর্জুনের ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

তবে এখানে একটা ছোটো ঘটনা ঘটল। ছোটো হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সবে মাত্র অস্ত্রবিদ্যার একজন জগৎ বিখ্যাত আচার্য আপন

শিষ্যদেরই হাতে নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর শবদেহের সামনেই তাঁর শিষ্যদের বিজয়োল্লাস তখনও থামেনি। এই সময়েই গুরুর মর্য্যাদাহানি হতে দেখে রুখে দাঁড়ালেন আর একজন শিষ্য। গুরু অর্জুন, শিষ্য সাত্যকি। গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং গুরুর মৃত্যুতে শিষ্যের শোকপ্রকাশকে ধৃষ্টদ্যুম্ন যেভাবে অপমান করেছেন—সাত্যকি কঠোর ভাষায় তার জবাব তো দিলেনই, তাঁর গুরু অর্জুনের অপমান যে তিনি সহ্য করবেন না—সেকথাও জানিয়ে দিলেন কড়া ভাষায়। ধৃষ্টদ্যুম্ন তো শুধু কোনো বিপক্ষ যোদ্ধাকে বধ করেননি, পশুর মতো যাঁকে হত্যা করেছেন তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নেরও শিক্ষাগুরু। সাত্যকি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে করতে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকেই হত্যা করতে যাচ্ছিলেন। গুরু অর্জুনের প্রতি সাত্যকির যে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এই ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে—তা সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে।

☐ দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর কর্ণ কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি হলেন। কর্ণপর্বেও যুদ্ধ চলাকালে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অর্জুনের তুমুল কলহ হয়। সেদিন যুধিষ্ঠিরকে তিনি আরও একবার ভীষণভাবে লঙ্ঘন করেছিলেন। বস্তুত বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রের মধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন এতই বেমানান, যে, মাঝে মাঝেই তিনি কেমন হতচকিত হয়ে যেতেন। কর্ণের সেনাপতিত্ব যখন চলছে, তখন যে তিনি সবচেয়ে বেশি লড়াই করবেন তাতে সন্দেহ কী! ঠিক এমনই এক দিনে যুধিষ্ঠির-মহারাজ কর্ণের বাণে খুব মার খেলেন। কর্ণ কিছুতেই আর তাঁকে ছাড়েন না, মেরেই যাচ্ছেন, মেরেই যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির একেবারে আহত, বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন। স্বয়ং অর্জুন অশ্বত্থামার সঙ্গে প্রবল যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, ভীমও ব্যস্ত ছিলেন কৌরব সৈন্য-ধ্বংসে। সময় বুঝে কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে একেবারে বাণে বাণে উত্যক্ত করে তুললেন এবং যতক্ষণ কর্ণ অন্যত্র না সরলেন, ততক্ষণে তাঁকে ওই বাণের আঘাত সহ্য করতে হল। কর্ণ চলে যেতেই যুধিষ্ঠির একেবারে শিবিরে চলে গেলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে না পেয়ে অর্জুন ছুটতে ছুটতে এলেন ভীমের কাছে এবং সেখানেই তিনি খবর পেলেন যুধিষ্ঠির প্রায় পালিয়েই চলে গেছেন শিবিরে। অর্জুন আবারও ছুটতে ছুটতে শিবিরে এলেন এবং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি অর্জুনকে ভীষণ কটু কথা বলতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে তো দুই-ছেলের বয়স্ক মা যেমন এক ছেলের সামনে অন্যতরের প্রশংসা করে নিজের 'পোজিশন' বাড়াতে চান, তেমনই যুধিষ্ঠিরও অর্জুনকে বললেন—ওই এক ভীমের ভরসাতেই আমি যা বেঁচে আছি, নইলে, এতদিনে যা হত...ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর যুধিষ্ঠির কর্ণের অভূতপূর্ব শক্তির প্রশংসা করলেন এবং বললেন তুমি কি আজও সে ব্যক্তিটিকে মারতে পেরেছ—যা তুমি এতকাল বলে এসেছ? অর্জুন প্রথমে নিজের দোষ-স্খালন করার চেষ্টা করলেন। তিনি কতটা ব্যস্ত ছিলেন, কত সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছে অশ্বত্থামার সঙ্গে—সব বলে বোঝাতে চাইলেন অর্জুন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সেদিন এতই মার খেয়েছেন কর্ণের হাতে যে, তিনি অর্জুনকে গালাগালি করতে আরম্ভ করলেন। গালাগালি এতটাই করলেন, যা যুধিষ্ঠিরকে মানায় না। তিনি এতই রেগে গেলেন যে, অর্জুন কর্ণের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন—এমন কথাও বলতে ছাড়লেন না। একেবারে শেষে বললেন—ওইরকম বিরাট একটা খড়্গ কোমরে দুলিয়ে, গাণ্ডীবের মতো একটা ধনুক হাতে নিয়ে, কৃষ্ণের মতো একটা লোককে সারথি বানিয়ে—যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন কী না কর্ণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

আসলে যে দাদাকে অর্জুন দেবতার মতো শ্রদ্ধা করেন, যাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ ছেড়ে শিবিরে এসেছেন তিনি—সেই দাদার মুখে অনেকক্ষণ অকথা এবং অপযশ শুনে অর্জুন মনে মনে একেবারে ক্ষেপেই ছিলেন, শেষে তাঁর সাধের গাণ্ডীব-ধনুকের অপমান শুনে তিনি এমনই রেগে গেলেন যে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে মারতেই গেলেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল—যে ব্যক্তি তাঁর গাণ্ডীবকে অপমান করবে, তাঁকে তিনি মেরেই ফেলবেন। অর্জুন তাই খড়্গ হাতে নিলেন। আসলে আমাদের মনে হয় গাণ্ডীবের থেকেও বড়ো কথা—যুধিষ্ঠির ভাইকে এত অপমান করেছেন এবং তাও এমন এক ভাইকে,

যে যুধিষ্ঠিরের কাছে সদা-বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছে, যে তাঁর আপাত অন্যায়গুলিও সব সময় সমর্থন করেছে—সেই দাদা যুধিষ্ঠির যখন তাঁর যোগ্যতায়, তাঁর ইচ্ছায়, শুভকামনায় অবিশ্বাস করলেন—সেটা অর্জুন সইতে পারলেন না। তিনি গাণ্ডীবের অপমানকে অজুহাত হিসেবে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে মারতে উদ্যত হলেন। মহামতি কৃষ্ণের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মিটে যায়। যাই হোক, আমরা কর্ণবধের কথায় আসি।

কর্ণই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি, যাঁকে অর্জুন তাঁর সমকালীন সময়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করনে। কুরুসভায় দ্রৌপদীর সঙ্গে কর্ণ যে অসভ্য আচরণ করেছিলেন, তার নিরিখে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—আমি কর্ণকে মারব। তবে মনে হয়—দ্রৌপদীর অপমানে যে ক্ষোভ অর্জুনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, তার অনেকটাই মিশে গিয়েছিল সেই চরম ক্ষোভের সঙ্গে, যেদিন কিশোর অর্জুনকে আত্মীয়বন্ধুর সামনে কর্ণের প্রতিস্পর্ধিতায় থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। উন্মুক্ত রঙ্গস্থলে অর্জুন যখন তাঁর অস্ত্রবিদ্যার সার শিল্পগুলি দেখাচ্ছিলেন, তখনই কর্ণের আগমন এবং প্রতিস্পর্ধিতা তাঁকে চরম লজ্জার মধ্যে ফেলে দেয়। এই অপমান তিনি জীবনে ভোলেননি এবং এর জন্য নিজেকে তিনি এমনভাবেই শিক্ষিত করেছিলেন, যাতে কোনোভাবেই কর্ণ তাঁকে প্রতিহত করতে না পারেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে বেশ কয়েকবার তিনি কর্ণকে পর্যুদস্ত করেছেন, কিন্তু এই যুদ্ধই ছিল শেষ জায়গা, যেখানে তিনি তাঁর চরম অস্ত্র-শিক্ষার শেষ শিল্পটি দেখাতে পারতেন।

কিন্তু মহাভারতের কবির কাছে শুধুমাত্র অর্জুনের অস্ত্রনৈপুণ্যই শেষ কথা নয়। কুন্তীর পরিত্যক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রটির সারা জীবনের বঞ্চনার কথা তিনি স্মরণে রেখেছেন, কর্ণের উপর তাঁর মায়া আছে। বিশেষত ধনুর্ধর হিসেবে কর্ণও কিছু কম ছিলেন না, পরবর্তী সময়ে অর্জুনকে আপন ভ্রাতা বলে জানলেও অর্জুনের প্রতি কর্ণের মনের শত্রুতার ভাবও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। সেই ভাবনা সম্বল করেই শেষ যুদ্ধ করতে এসেছেন কর্ণ। ফলে কর্ণপর্বে কর্ণ এবং অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধের যে বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যায়, তাতে অর্জুনের ধনুর্বিদ্যার শিল্পনৈপুণ্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনই প্রকাশ পেয়েছে কর্ণের বীরত্ব। কর্ণের বাণে এক এক সময় অর্জুনকেও যথেষ্ট বিপর্যস্ত বোধ করতে দেখা গেছে। কর্ণের অমোঘ শরের আঘাত থেকে অর্জুনকে বাঁচাতে পায়ের চাপে রথ মাটিতে বসিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণ, অর্জুনের প্রাণরক্ষা হলেও চূর্ণ হয়ে গেছে তাঁর মাথার মুকুটটি। শেষ পর্যন্ত কর্ণের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল ভাগ্যের পরিহাস। মহাভারতের কবি কর্ণবধের ঘটনায় অর্জুনকে প্রতিস্পর্ধিতার গৌরব দেননি, যাতে শত্রুদ্বেষ ইচ্ছা-অভিলাষ, প্রয়োজনীয় সন্তুষ্টির মাত্রা অতিক্রম না করে, তাঁকে যেন আত্মশ্লাঘার দিকে প্রেরিত না করে।

যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের একটা খটাখটি হয়ে যাবার পরেই কিন্তু কর্ণবধের জন্য অর্জুনের গতি ত্বরান্বিত হয়। কর্ণ জীবনে পাণ্ডবদের প্রতি যা যা অন্যায় করেছেন—সেগুলি একের পর এক বলে-বলে কৃষ্ণও অর্জুনের তেজ আরও উদ্দীপ্ত করেছেন। এক সময় অর্জুন সাহঙ্কারে বলেও ফেলেছেন—তুমি আমার সহায় আছ, আমি কার পরোয়া করি। কিন্তু আস্তে আস্তে কথায় কথায় ক্ষত্রিয়ের দর্পাবেশে আরও বলেছেন—আমার সমান ধনুর্ধর আর কে আছে এই জগতে, বীরত্বেই বা কে আছে আমার সমান—

ধনুর্বেদে মৎসমো নাস্তি লোকে/
পরাক্রমে বা মম কো'স্তি তুল্যঃ।

কৃষ্ণ আপাতত অর্জুনের এই সব কথায় প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকা যখন মাটিতে বসে গেছে এবং কর্ণ যখন বারবার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে অর্জুনকে বাণ মারা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছিলেন, তখন কৃষ্ণই তাঁর পূর্বের দুষ্কর্মগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—সেই সব মুহূর্তে তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল, কর্ণ? অর্জুনকে বলেছেন—মারো অর্জুন। এই উপযুক্ত সময়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সতেরো দিনের মাথায় কর্ণ অর্জুনের হাতে মারা পড়লেন। কর্ণবধের সঙ্গে সঙ্গেই কৌরবপক্ষের জয়ের আশা একরকম শেষ হয়ে যায়।

দুর্যোধনের পতনের পর সেদিন রাত্রে কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবরা সকলে ছিলেন শিবির থেকে দূরে, গঙ্গাতীরে। রাতের অন্ধকারে অশ্বত্থামা ঘুমন্ত পাণ্ডবশিবির আক্রমণ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী,

দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র—এছাড়াও পাণ্ডবশিবিরে যারা জীবিত ছিলেন তাঁরা সকলেই নিহত হলেন ঘুমন্ত অবস্থায়, সকালে ফিরে এসে পাণ্ডবরা দেখলেন, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে শিবির, দেখলেন অশ্বত্থামার পাশবিক হত্যালীলার পরিণতি। আত্মীয়, পুত্রদের শবদেহ। দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীম-অর্জুন ছুটলেন অশ্বত্থামাকে ধরতে। অশ্বত্থামা তখন আত্মগোপন করেছেন ব্যাসদেবের আশ্রমে। খুঁজতে খুঁজতে ভীম-অর্জুন পৌঁছালেন সেখানে। পাণ্ডবদের রোষাগ্নি থেকে নিজেকে বাঁচাবার একটাই উপায় খুঁজে পেলেন অশ্বত্থামা। তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন পাণ্ডবদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। অর্জুন অশ্বত্থামার অস্ত্র প্রতিহত করার জন্য নিক্ষেপ করলেন ব্রহ্মশির অস্ত্র।

অশ্বত্থামার এবং অর্জুনের এই দ্বন্দ্বের সময়েও অর্জুনের চরিত্রে যে ধৈর্য্য, সংযম প্রকাশ পেয়েছে—তা সত্যিই আমাদের মুগ্ধ করে। আঠারো দিনের যুদ্ধের শেষে জয়লাভ করলেও পিতামহ, আচার্য, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রদের মৃত্যুর যন্ত্রণা অর্জুনকে কিছু কম কাতর করেনি। এই মুহূর্তে অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন তাঁকে এবং তাঁর ভাইদের বধ করার জন্য। কতকটা আত্মরক্ষার তাগিদে, কতকটা নেহাতই ধ্বংসের খেয়ালে, দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো—প্রতিতুলনায় অর্জুনের মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতিহিংসা স্থান পায়নি। ব্রহ্মশির অস্ত্র চালনার স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তিটুকু দিয়েছেন, তা শুধুই অশ্বত্থামার অস্ত্রকে প্রতিহত করা—কি দায়িত্বপূর্ণভাবে অর্জুন উচ্চারণ করলেন—গুরুপুত্র অশ্বত্থামার, নিজের ভ্রাতাদের এবং সমস্ত লোকের মঙ্গল হোক, অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবৃত্ত হোক—

পূর্বমাচার্যপুত্রায় ততো'নন্তর মাত্মনে।
ভ্রাতৃভ্যশ্চৈব সর্বেভ্যঃ স্বস্তীভূত্বা পরন্তপঃ ।।
দেবতাভ্যো নমস্কৃত্য গুরুভ্যশ্চৈব সর্বশঃ।
উৎসসর্জ্জ শিবং ধ্যায়ন্নস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতাম্ ।।

দুই ব্রহ্মশির অস্ত্রের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন দুই ঋষি—মহর্ষি ব্যাস এবং দেবর্ষি নারদ। তাঁরা বললেন—দুই ব্রহ্মশির অস্ত্র একে অপরের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করলে তার পরিণাম হবে মানবজাতির পক্ষে ভয়ঙ্কর। তোমরা এ অস্ত্র সংবরণ কর। অর্জুন ঋষিদের আদেশ শোনামাত্র নিজের অস্ত্র সংবরণ করেছেন। কিন্তু অশ্বত্থামা পিতার কাছ থেকে ব্রহ্মশির অস্ত্র লাভই করেছেন জেদের বশে। তা চালনা করতে শিখলেও সংবরণ করতে শেখেননি, কিংবা বলা ভালো যে, সে দায়িত্ববোধ তাঁর কোনোদিন ছিল না। অথচ ব্রহ্মশির অস্ত্র যথাযথভাবে সংবরণ না করলে এ অস্ত্র নিক্ষেপকারীকেই হত্যা করবে। অগত্যা ঋষিরা অশ্বত্থামাকে অস্ত্রের গতি পরিবর্তন করতে বললেন। অশ্বত্থামা অস্ত্রের অভিমুখ পরিবর্তন করলেন ঠিকই, কিন্তু ব্রহ্মশির বিদ্ধ হল অর্জুনেরই হৃদয়ে। প্রিয়তম পুত্র অভিমন্যু এবং পুত্রবধূ উত্তরার ভাবী সন্তান ব্রহ্মশির অস্ত্রের আঘাতে নিহত হল মাতৃগর্ভেই। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য অশ্বত্থামা একটি গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করলেন নির্দ্বিধায়—এ জঘন্য ঘটনা অবশ্য কৃষ্ণ সহ্য করতে পারেননি। তিনি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন অশ্বত্থামাকে। প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, অর্জুনের পৌত্র তথা কুরুবংশের একমাত্র বংশধরটিকে জীবন দান করবেন তিনি স্বয়ং।

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হল। পাণ্ডবপক্ষের জয় হল। এবার যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পালা। কিন্তু আঠারো দিনের যুদ্ধে যে বিপুল লোকক্ষয়, জ্ঞাতিক্ষয় হয়েছে, তা দেখে যুধিষ্ঠির এখন বিষণ্ণ বোধ করছেন। তার উপর তিনি যখন জানতে পেরেছেন যে, চিরকাল যাঁকে শত্রুপক্ষীয় মহারথী ভেবে এসেছেন, সেই কর্ণ তাঁরই আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—তখন থেকে যুধিষ্ঠিরের অন্তরে এক বিষাদ নেমে এসেছে। তিনি সিংহাসনে বসতে চাইছেন না। সংসার ত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বনের ভাবনা করছেন যুধিষ্ঠির। এই সময় যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যভার গ্রহণ করার অনুরোধ করেছেন অনেকে, অনেকেই নানা উপদেশও দিয়েছেন। এই সময় যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেবার পাশাপাশি দণ্ড অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ উপদেশ দিয়েছেন অর্জুন। প্রজাপালনই রাজার প্রধান কর্তব্য—এ কথা স্মরণ করিয়ে অনুরোধ করেছেন সিংহাসনে আরোহণ করার। মহাভারতের এই পর্যায়ে এসে শস্ত্রজ্ঞ অর্জুনের আড়ালে থাকা শাস্ত্রজ্ঞ অর্জুনকে খুঁজে পাই আমরা। অর্থ এবং রাজধর্ম বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে অর্জুনের এই দীর্ঘ উপদেশ বাক্যে।

শেষ পর্যন্ত ব্যাস, নারদ, অন্যান্য মুনি ঋষিদের এবং ভাইদের উপদেশ বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। রাজ্যাভিষেকের পর যুধিষ্ঠির দুঃশাসনের বাসভবনটিকে অর্জুনের নতুন বাসভবন বলে নির্দিষ্ট করলেন। রাষ্ট্রের সুরক্ষা, দুষ্টের দমন এবং বিপক্ষ রাজ্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ভার অর্পিত হল অর্জুনের উপর—

পরচক্রোপরোধে চ দুষ্টানাং চাবমর্দনে।
যুধিষ্ঠিরো মহারাজ ফাল্গুনং ব্যাদিদেশ হ।।

*[মহা (k) ১২.৮.১-৩৭; ১২.১৫.১-৫৮;
১২.২২.১-১৫; ১২.৪১.১৩; ১২.৪৪.৮-৯;
(হরি) ১২.৮.১-৩৭; ১২.১৫.১-৫৮;
১২.২২.১-১৫; ১২.৪১.১৩; ১২.৪৪.৮-৯]*

☐ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর বেশ কিছুকাল কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে রইলেন। সেই সময় একদিন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে আপনি আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাতে আমি জেনেছিলাম, অনুভব করেছিলাম যে, আপনি পরমেশ্বরেরই স্বরূপ—

বিদিতং মে মহাবাহো সংগ্রামে সমুপস্থিতে।
মাহাত্ম্যং দেবকীপুত্র তচ্চ তে রূপমৈশ্বরম্।।

কিন্তু কৃষ্ণ! যুদ্ধের ব্যস্ততায় আপনার সেই মূল্যবান উপদেশ আমি সম্পূর্ণ স্মরণে রাখতে পারিনি। আমার অনুরোধ আপনি আবার আমাকে উপদেশ দিন।

কৃষ্ণ অর্জুনের একথা শুনে একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আমি সে সময়ে যোগযুক্ত হয়ে তোমাকে সনাতন শাশ্বত ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলাম। তুমি নিশ্চয় তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করোনি, নয় তো ভুলে গেলে কেমন করে? যাই হোক, সেদিন যেভাবে আমি তোমাকে উপদেশ দিয়েছিলাম, সেইভাবে সমস্ত কথা শোনানো তো সম্ভব নয়। তবু তুমি আমার প্রিয় সখা বলেই তোমাকে পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় সেই গূঢ়তত্ত্ব আবার বলছি, তুমি শোন। এতে তোমার মঙ্গল হবে এবং তুমি উত্তম গতি লাভ করবে—

পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।
ইতিহাসন্তু বক্ষ্যামি তস্মিন্নর্থে পুরাতনম্।।
যথা তাং বুদ্ধিমাস্থায় গতিমগ্র্যাং গমিষ্যসি।
শৃণু ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ গদতঃ সর্বমেব মে।।

এরপর কৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিলেন তা মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্বে দীর্ঘ কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের এই দীর্ঘ উপদেশ অনুগীতা নামে প্রসিদ্ধ। অর্জুন সেই উপদেশ শুনে তৃপ্ত হলেন। এরপর কৃষ্ণ ফিরে গেলেন দ্বারকায়।

*[মহা (k) ১৪.১৬-৫১ অধ্যায়;
(হরি) ১৪.১৭-৬৬ অধ্যায়]*

☐ এর কিছুকাল পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হল। এই উপলক্ষে কৃষ্ণ আবার এলেন হস্তিনাপুরে। কৃষ্ণ রাজপুরীতে প্রবেশ করেছেন সবেমাত্র—এমন সময় অন্তঃপুরে অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরা অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্রের আঘাতে মৃত অভিমন্যুর পুত্রটিকে প্রসব করলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের আনন্দ উদ্‌যোগ মলিন হয়ে গেল একমাত্র বংশধর লাভের আশা শেষ হয়ে যাওয়ায়। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা সকলে হাহাকার করে উঠলেন। একমাত্র পৌত্রটির মৃত্যুসংবাদ অর্জুনও পেয়েছিলেন নিশ্চয়। তবে তাঁর প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ মহাভারতে নেই, অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্রটি উত্তরার গর্ভে আঘাত করার সময়েই কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, অভিমন্যুর পুত্রকে তিনিই জীবনদান করবেন। হয়তো কৃষ্ণের প্রতি অটল বিশ্বাস থেকেই ধৈর্য্য ধারণ করেছিলেন অর্জুন। অভিমন্যুর পুত্র পুনর্জীবন লাভ করার পর আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল রাজপুরীতে।

*[মহা (k) ১৪.৬৬-৬৯ অধ্যায়;
(হরি) ১৪.৮৪-৮৭ অধ্যায়]*

☐ শুভদিনে, শুভক্ষণে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে বের হলেন অর্জুন। কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ যুদ্ধের পর এই দিগ্বিজয় যাত্রা। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর রাষ্ট্রব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যও যেমন এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, তেমনই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভয়াবহ লোকক্ষয়ের পর বিজয়ী পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রের প্রতি শান্তি এবং মৈত্রীর বার্তা দেওয়াও ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই অর্জুন যখন হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা আরম্ভ করলেন তখন যুধিষ্ঠির বার বার বলে দিলেন তাঁকে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাদের আত্মীয়-বন্ধুরা নিহত হয়েছেন, সেসব রাজাকে তুমি বধ কোরো না—

স হি বীরঃ পযাস্যন্ বৈ ধর্মরাজেন বারিতঃ।
হতবান্ধবা ন তে পার্থ হন্তব্যাঃ পার্থিব ইতি।।

যুদ্ধ এবং শান্তির সম্মিলিত বার্তা বহন করে দিগ্বিজয় যাত্রা করলেন অর্জুন। মহাভারতের বেশ কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে অর্জুনের এই দিগ্বিজয়ের বর্ণনা আছে।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া প্রথমে পৌঁছল ত্রিগর্ত দেশে। ত্রিগর্ত দেশীয় যোদ্ধারা বরাবরই দুর্যোধনের মিত্রগোষ্ঠীতে ছিলেন। অশ্বমেধের যজ্ঞাশ্ব ত্রিগর্ত দেশে পৌঁছালে পাণ্ডবদের প্রতি পুরনো শত্রুতাবশতই ঘোড়াটিকে ধরে ফেললেন। অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি। তিনি মিষ্ট কথায় ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু অর্জুনের মিষ্ট কথার প্রত্যুত্তরে ত্রিগর্ত দেশের মহারথীদের নিক্ষিপ্ত শর ধেয়ে এল অর্জুনের দিকে। বাধ্য হয়েই যুদ্ধ করলেন অর্জুন। ত্রিগর্তদেশের রাজা সূর্যবর্মা এবং তাঁর ভাই কেতুবর্মা যুদ্ধে নিহত হলে বালক মহারথী ধৃতবর্মা এসে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। বালক ধৃতবর্মার পারদর্শিতা দেখে প্রধান ধনুর্ধর অর্জুন পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ত্রিগর্ত দেশীয় যোদ্ধারা অর্জুনের হাতে পরাস্ত হন। তবে অর্জুন স্নেহবশত মহারথ ধৃতবর্মাকে বধ করেননি।

ত্রিগর্ত দেশ থেকে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে। যথারীতি এটিও দুর্যোধনের মিত্ররাজ্য। প্রাগ্জ্যোতিষপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরলেন ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত। বজ্রদত্তের সঙ্গে অর্জুনের দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত বজ্রদত্ত পরাস্ত হলেন। অর্জুন তাঁকে অভয় দিয়ে, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানিয়ে অর্জুন আবার রওনা হলেন।

এরপর সিন্ধুদেশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিলেও শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরেছিলেন—এমন বেশ কিছু যোদ্ধা সে দেশে ছিলেন। অর্জুনকে দেখে জয়দ্রথের অনুগত সেই যোদ্ধারা তাঁকে আক্রমণ করলেন। তাঁদের বাণবর্ষণে স্বয়ং অর্জুনও একসময় বেশ বিচলিত বোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিন্ধু দেশীয় সৈন্যরা অর্জুনের হাতে পরাস্ত হলেন। সিন্ধু দেশীয় বীর যোদ্ধাদের পরাজয় সংবাদ পেলেন মৃত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বিধবা পত্নী তথা ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা। বালক পৌত্রের হাত ধরে রথে চড়ে তিনি নিজে এসে দাঁড়ালেন অর্জুনের সামনে। অর্জুন দুঃশলাকে দেখে অস্ত্রশস্ত্র রেখে তাঁর কাছে এসে বললেন—বলো, আমি তোমার কী কাজ করব। অর্জুনের কথা শুনে দুঃশলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—দাদা! এই তোমার ভাগিনেয়র শিশুপুত্র। একে আশীর্বাদ কর। অর্জুন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এই শিশুর পিতা, জয়দ্রথ পুত্র সুরথ কোথায়? দুঃশলা শোক সংবাদ শোনালেন—পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত সুরথ তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ শুনে ভীত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। তোমার নাম শোনামাত্র আমার পুত্রের দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল দাদা! এখন আমার এই পৌত্রটিই আমার একমাত্র সম্বল। এর মুখ চেয়ে তুমি দুর্যোধনের আর জয়দ্রথের সব অপরাধ ক্ষমা কর। পরীক্ষিৎ যেমন তোমার একমাত্র পৌত্র, এই শিশুটিও আমার একটি মাত্র বংশধর। একে তুমি দয়া কর। দুঃশলার বিলাপ শুনে অর্জুনের চোখে জল এল। দুঃশলার শিশু পৌত্রটির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে, দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে অর্জুন সিন্ধু দেশ থেকে বেরিয়ে পড়লেন আবার।

ক্রমে নানা দেশ ঘুরতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া এসে পৌঁছাল মণিপুরে। তখন অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন মণিপুরের সিংহাসনে আসীন। বভ্রুবাহন জানতে পারলেন পিতা অর্জুন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে এসে পৌঁছেছেন মণিপুরে। তাড়াতাড়ি পুরোহিত এবং নানাবিধ উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে এলেন অর্জুনের কাছে। কিন্তু অর্জুন পুত্রের এমন আচরণে মোটেই খুশি হলেন না। ঈষৎ রুষ্ট হয়ে বললেন—যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে আমি এসেছি তোমার রাজ্যে আর তুমি কী না যুদ্ধ না করে আমাকে সমাদর করতে এসেছ? অর্জুন বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করছেন, এমন সময় অর্জুনের পত্নী নাগরাজকন্যা উলূপী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বভ্রুবাহনকে বললেন—বাছা! আমি তোমার বিমাতা। তোমার পিতা অর্জুন যেমনটি চান তুমি তেমনটি করো। এতেই তোমার ধর্ম পালন করা হবে।

উলূপীর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে বভ্রুবাহন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল। অবশেষে বভ্রুবাহনের বাণে অর্জুন নিহত হলেন। বভ্রুবাহন নিজেও

দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়েছিলেন, এখন পিতাকে নিহত হতে দেখে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়ে বভ্রুবাহন নিজেও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

এদিকে বভ্রুবাহনের মা চিত্রাঙ্গদার কানে পৌঁছাল যুদ্ধের কথা। তিনি তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে দেখলেন—স্বামী মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। পুত্র বভ্রুবাহনও মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। শোকে সন্তপ্ত হয়ে চিত্রাঙ্গদা প্রথমে অনেক কাঁদলেন, তারপর উলূপীকে তিরস্কার করতে লাগলেন। চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে বললেন—তুমি কেন এদের যুদ্ধে প্ররোচিত করলে? তুমি তো একজন পতিব্রতা স্ত্রী, এমন করে নিজের স্বামীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে কেমন করে? উলূপীকে চিত্রাঙ্গদা অনেক গালমন্দও করলেন। এদিকে বভ্রুবাহনও চেতনা ফিরে পেয়ে নিহত পিতাকে দেখে বিলাপ করতে লাগলেন। তখন উলূপী নাগলোক থেকে সঞ্জীবন মণি নিয়ে এসে বভ্রুবাহনকে বললেন—বাছা! তুমি শোক কোরোনা। অর্জুন তোমার হাতে পরাস্ত হননি। তিনি দেবতাদেরও অজেয়। কিন্তু পুত্রের হাতে পরাজয়ে সব পিতাই আনন্দিত হন। তাই তুমি যাতে তাঁকে পরাস্ত করতে পার, সেজন্য আমি 'মোহিনী' মায়া সৃষ্টি করেছিলাম। তুমি এই 'সঞ্জীবন' নামক অলৌকিক মণিটিকে স্থাপন করো তোমার পিতার বক্ষে। তাহলেই তিনি পুনর্জীবন লাভ করবেন। বভ্রুবাহন তাই করলেন। অর্জুন বেঁচে উঠলেন আবার। মনে হল যেন ঘুম থেকে উঠলেন এইমাত্র। চেতনা ফিরে পেয়ে শোকার্তা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। উলূপীকে দেখেও বিস্মিত হলেন। তখন অর্জুনকে উলূপী বললেন—আপনি শিখণ্ডীর পিছনে থেকে নিরস্ত্র ভীষ্মের উপর শরবর্ষণ করেছিলেন। সেই পাপস্খালন না করে যদি আপনি ইহলোক ত্যাগ করতেন, তাহলে বসু দেবতাদের রোষে আপনাকে নরকে যেতে হত। সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ আপনি বভ্রুবাহনের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তারপর নাগলোকের এই দিব্য 'সঞ্জীবন' মণির প্রভাবে আপনি আবার জীবন লাভ করেছেন। বসুদেবতারা আপনাকে শাপ দিতে চেয়েছিলেন, ভীষ্মের মাতা গঙ্গাও তা সমর্থন করেছিলেন। এ অবস্থায় আমার এবং আমার পিতার অনুনয়ে প্রসন্ন হয়ে তাঁরা বলেন—অর্জুনের পুত্র মণিপুররাজ বভ্রুবাহন অর্জুনকে যুদ্ধে বধ করবেন। এর ফলেই তাঁর শাপমুক্তি হবে। আজ আপনাকে আমি বসু দেবতাদের সেই শাপ থেকে মুক্ত করলাম। এই বৃত্তান্ত শুনে অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা বভ্রুবাহন—সকলেই অত্যন্ত খুশি হলেন। তারপর অর্জুন বভ্রুবাহনকে বললেন—আগামী চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। তুমি তোমার দুই মাতা উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদাকে সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই হস্তিনাপুরে এসো।

এরপর অর্জুন আবার যজ্ঞাশ্বের সঙ্গে চলতে লাগলেন। ক্রমে নানা দেশ ঘুরে অশ্ব মগধে উপস্থিত হল। মগধরাজ সহদেবের পুত্র মেঘসন্ধি অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াটিকে ধরলেন। মেঘসন্ধির সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হল। মেঘসন্ধি শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলেন। বালক মেঘসন্ধি পরাস্ত হয়ে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়লেন। তা দেখে অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে, অশ্বমেধযজ্ঞের নিমন্ত্রণ করে আবার রওনা হলেন। ক্রমে বঙ্গ, পুণ্ড্র, কোশলদেশ জয় করে অর্জুন গেলেন চেদিদেশে। চেদিরাজ শিশুপালের পুত্র শরভ প্রথমে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। পরে অর্জুনকে নানা উপঢৌকন দিয়ে সম্মানও জানালেন। চেদিদেশ থেকে দশার্ণ তারপর নিষাদরাজ একলব্যের রাজ্য, সেখানে একলব্যের পুত্র অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। একলব্যের পুত্র এবং সম্পূর্ণ নিষাদ সেনাকে পরাস্ত করে অর্জুন আবার অশ্বের পিছনে চলতে লাগলেন। ক্রমে দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মহিষ, কোল্লগিরি, সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ অতিক্রম করে অশ্ব উপস্থিত হল দ্বারকায়। দ্বারকার বৃষ্ণি যোদ্ধারা অশ্ব হরণ করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু রাজা উগ্রসেন তাদের নিষেধ করেন। দ্বারকায় বসুদেব, উগ্রসেন প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার অশ্বের সঙ্গে চলতে লাগলেন অর্জুন। অশ্ব চলল পঞ্চনদ দেশ পার হয়ে গান্ধার দেশে। গান্ধাররাজ শকুনির পুত্র তখন সেখানে রাজত্ব করছিলেন। তিনি অশ্ব হরণ করে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলেন। কিন্তু অর্জুনের বাণের আঘাতে অল্পক্ষণেই তাঁর যুদ্ধের ইচ্ছা লোপ পেল। তিনি যজ্ঞাশ্ব মুক্ত করে দিয়ে সৈন্য সামন্ত নিয়ে পলায়ন করলেন। এদিকে শকুনির পত্নী,

গান্ধার দেশের রাজমাতা ভীত হয়ে নানা উপঢৌকন নিয়ে এসে অর্জুনকে তুষ্ট করলেন, পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করলেন। অর্জুন গান্ধারদেশ থেকে আবার যাত্রা করলেন। শেষ পর্যন্ত যজ্ঞাশ্ব ফিরে এলো হস্তিনাপুরে। অর্জুনের মুখ থেকে তার দিগ্বিজয়ের বৃত্তান্ত শুনে যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডব ভাইরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। যথাসময়ে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হল।

[মহা (k) ১৪.৭৩-৮৪ অধ্যায়; ১৪.৮৫.১-৬;
(হরি) ১৪.৯২-১০৭ অধ্যায়; ১৪.১০৮.১-৬]

☐ দেখতে দেখতে গেল পঁয়ত্রিশটি বছর। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর—সকলে স্বর্গে গেলেন। এরপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে গৃহযুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংস হল। বলরাম এবং কৃষ্ণও ইহলোক ত্যাগ করলেন। যদুবংশ ধ্বংস হবার দুঃসংবাদ নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন দারুক। শোকে পাথর হয়ে গেলেন পাণ্ডবরা। যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অনুমতি নিয়ে অর্জুন দারুকের সঙ্গে দ্বারকায় গেলেন। দ্বারকার রাজসভায় বসে কৃষ্ণ শুনলেন যদুবংশের ধ্বংসবৃত্তান্ত। তারপর শোকে দুঃখে বিলাপরতা রুক্মিণী প্রভৃতির সঙ্গে অর্জুনও বসে কাঁদতে লাগলেন। বসুদেবকে আশ্বাস দিয়ে অর্জুন বললেন— আমি বৃষ্ণিবংশের কুলবধূদের এবং অনিরুদ্ধর পুত্র বজ্রকে এখান থেকে নিয়ে যাব। বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হবেন। অনাথা বৃষ্ণি কুলবধূদের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তিনিই নেবেন। অর্জুনের কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে বসুদেব অগ্নিতে প্রবেশ করে আপন প্রাণ ত্যাগ করলেন। দেবকী প্রভৃতি বসুদেবের পত্নীরাও প্রবেশ করলেন অগ্নিতে। ক্রমে বসুদেবের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করে অর্জুন কৃষ্ণ এবং বলরামের শবদেহ খুঁজে বের করে তাঁদের যথাযথ সৎকার করলেন। তারপর বজ্র, কৃষ্ণের পত্নী এবং অন্যান্য যদুকুলবধূদের নিয়ে দ্বারকা থেকে যাত্রা করলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। পথে পঞ্চনদ দেশে দস্যুদল আক্রমণ করল স্ত্রীলোক লুণ্ঠনের লোভে। কিন্তু গাণ্ডীবধারী অর্জুন আজ বৃদ্ধ হয়েছেন। গাণ্ডীব ধনুক হাতে তুলতেও তাঁর কষ্ট হল, দিব্যাস্ত্রগুলিও স্মরণে এলো না, সাধারণ বাণগুলিও আজ আর লক্ষ্যে পৌঁছাল না। অক্ষয় তূণীরও ক্রমে শূন্য হয়ে গেল। অজেয় অর্জুন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সামান্য দস্যুদলের হাতে পরাস্ত হলেন। দস্যুরা ইচ্ছামতো স্ত্রীলোক লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। অবশিষ্ট সকলকে নিয়ে দুঃখিত মনে অর্জুন পৌঁছালেন ইন্দ্রপ্রস্থে। সেখানে কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করলেন অর্জুন। অবশিষ্ট যদুকুলবধূদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে অর্জুন ফিরলেন হস্তিনায়। মনে মনে বুঝলেন, তাঁর সময় ফুরিয়েছে। এবার ইহলোক ত্যাগ করার পালা।

[মহা (k) ১৬.৫-৮ অধ্যায়; (হরি) ১৬.৫-৯ অধ্যায়]

☐ অর্জুন হস্তিনাপুরে ফেরার পর তাঁর মুখ থেকে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনে পাণ্ডবরাও মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করাই স্থির করলেন। অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে স্থাপন করে পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁরা উপস্থিত হলেন লোহিত সাগরের তীরে। সেখানে স্বয়ং অগ্নিদেব পাণ্ডবদের দর্শন দিলেন। অগ্নি বললেন —অর্জুনের এখন আর গাণ্ডীব ধনুক কিংবা অক্ষয় তূণের প্রয়োজন নেই। অতএব তাঁর এখন সে দুটি বরুণদেবকে ফিরিয়া দেওয়া কর্তব্য। একথা শুনে অর্জুন গাণ্ডীব এবং অক্ষয়তূণ ভাসিয়ে দিলেন সমুদ্রের জলে। তারপর তাঁরা সকলে পথ চলতে লাগলেন আবার।

একসময় অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন দ্রৌপদী। একে একে মৃত্যু হল সহদেব, নকুলের। অবশেষে মাটিতে পড়ে গেলেন অর্জুন। পুণ্যাত্মা অর্জুনকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—অর্জুন কোন পাপে মৃত্যুবরণ করলেন? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—অর্জুন বলেছিলেন—তিনি একাই সম্পূর্ণ শত্রুদের ধ্বংস করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা করেন নি। এই অহঙ্কারের ফলেই তাঁর পতন হল—

একো’হং নির্দহেয়ং বৈ শত্রূনিত্যর্জুনো’ব্রবীৎ।
ন চ তৎ কৃতবানেষ শূরমানী ততো’পতৎ॥

অর্জুনের সম্পূর্ণ শত্রুর একা ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। যুধিষ্ঠিরের বিচার কতটা সূক্ষ্ম বা সঙ্গত—সে পর্যালোচনায় আমরা আর যাব না। যে পাপেই হোক, অর্জুন সশরীরে স্বর্গলাভ করেননি। মহাপ্রস্থানের পথে অবসন্ন হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু সুদীর্ঘ জীবৎকালের প্রতিটি মুহূর্তে ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, সংযম, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা, সর্বোপরি বীরত্বের যে দৃষ্টান্ত অর্জুনের চরিত্রে দেখা যায় তা

সত্যিই বিরল। মহাভারতের কবি অর্জুনকে শুধু পাণ্ডুর সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র রূপেই সৃষ্টি করেননি, তাঁকে সর্বগুণসম্পন্ন তথা মহাভারত-কথার অন্যতম নায়ক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। গড়ে তুলেছেন ভগবদ্গীতার উপদেশ শ্রবণের উপযুক্ত আধার হিসেবে। ভগবদ্গীতার শেষ শ্লোকে সঞ্জয় অর্জুন সম্পর্কে বলেছিলেন—যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর অর্জুন যেখানে আছেন—আমার মতে, সেখানেই কল্যাণ, বিজয়, ঐশ্বর্য্য এবং নীতির অধিষ্ঠান—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।

[ভগবদ্গীতা ১৮.৭৮]

মহাভারত মহাকাব্যের অন্যতম নায়ক অর্জুন আজও আমাদের কল্পনায় বিরাজ করেন কল্যাণ, বিজয়, ঐশ্বর্য্য, নীতির প্রতীক হিসেবেই।

[মহা (k) ১৭.১.৩৮-৪৪; ১৭.২.১৯-২২;
(হরি) ১৭.১.৩৮-৪৪; ১৭.২.২৫-৩১]

অর্জুন$_{২}$ *[দ্র. কার্তবীর্য্যার্জুন]*

অর্জুন$_{৩}$ পঞ্চম মন্বন্তরের অধিপতি রৈবত মনুর পুত্রদের মধ্যে অর্জুন একজন।

[ভাগবত পু. ৮.৫.২]

অর্জুনতীর্থ পুরাণে উল্লিখিত একটি পবিত্র তীর্থের নাম। এই তীর্থে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করলে পুণ্যফল লাভ হয় বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২২.৪৩]*

অর্জুনপাল বৃষ্ণি বংশীয় কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শমীক। শমীকের ঔরসে সুদামিনীর গর্ভে অর্জুনপাল নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৪]

অর্থ$_{১}$ অর্থ-শব্দের আভিধানিক অর্থ হল—যাচন, প্রার্থনা, অভিলাষ, নিবৃত্তি, ধন, বিত্ত, লাভের টাকা, শব্দশক্তির দ্বারা বোধগম্য পদার্থ, বস্তু, দ্রব্য, বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়—শব্দস্পর্শাদি, জ্ঞেয়বস্তু, স্ব-পররাষ্ট্রচিন্তন, কাম্যফল, চতুর্বিধ পুরুষার্থের একতম, ফল, প্রকার, ব্যবহার, অভিযোগ।

[দ্র. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ। পুনশ্চ, Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, V. S. Apte, Practical, Sanskrit-English Dictionary.]

☐ শাস্ত্রে পুরুষার্থ বলে একটি কথা আছে, পুরুষার্থ মানে পুরুষের প্রয়োজন। প্রধানত চারটি প্রয়োজনের পিছনেই মানুষ ছুটে বেড়ায় এবং সেগুলি হল—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—

ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।

এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে অন্যতম হল অর্থ। এই চারটি পুরুষার্থকে চতুর্বর্গও বলে, তাতে ধর্মের পরেই দ্বিতীয় বর্গ হল অর্থ।

যুধিষ্ঠির যখন কিছুতেই রাজা হতে চাইছেন না, তখন অর্জুন তাঁর কাছে ধর্ম এবং অর্থের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন—আমরা রাজার ঘরে জন্মেছি, অমানুষী ক্ষমতায় এই রাজ্য জয় করেছি, এখন সেই ধর্ম-অর্থ ত্যাগ করে মূর্খের মতো বনবাসী হবো কেন? ধর্ম এবং অর্থ একত্রে উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুন বুঝিয়ে দিলেন যে, মহাভারতে উক্ত অর্থ-বর্গের সঙ্গে ধর্মের সংযুক্তি মেনে নিতে হয় সব সময়।

☐ পুরুষার্থ হিসেবে 'অর্থ'-শব্দের খুব সোজাসুজি একটা মানে পাওয়া যাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। তিনি লিখছেন— মানুষের বৃত্তি বা জীবন-ধারণের উপায় হল অর্থ। একই সঙ্গে আরও একটি অর্থ দিয়ে বলেছেন—মনুষ্যবসতি-যুক্ত ভূমিকেও অর্থ বলে—

মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ, মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ।

[মহা (k) ১২.৮.৯; (হরি) ১২.৮.৯;
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (বসাক) ২য় খণ্ড, ১৫.১]

মহাভারত কৌটিল্যের মতো করে অর্থ-পুরুষার্থের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেয়নি বটে, কিন্তু অর্থ বলতে যে ধন-সম্পত্তি, রাজ্যখণ্ড কিংবা রাজার প্রাপ্য অর্থ-ধনই বোঝানো হচ্ছে, সেটা মহাকাব্যিক কথকতা থেকেই বোঝা যায়। অর্জুন বলেছেন—যে লোক ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা করে এবং কোনো চেষ্টাতেই ধনলাভের চেষ্টা করে না, সে লোক-সমাজে বিখ্যাতও হয় না, সে পরিজন-পশুসম্পদও লাভ করতে পারে না। অর্জুন নহুষ-রাজার বাক্য উদ্ধার করে বলেছেন—মুনিদেরই নির্ধনতা শোভা পায়। দারিদ্র্য এক ধরনের পাপ, দারিদ্র্যের প্রশংসা করে না কেউ। অর্জুন অর্থ-ধনের প্রশংসা করেই পুরুষার্থ হিসেবে অর্থের প্রাধান্য দেখিয়ে বলেছেন—অর্থ পুরুষার্থ থেকেই ধর্ম, কাম এবং স্বর্গের সুখ আসে এবং অর্থের দ্বারাই মানুষের প্রাণযাত্রা নির্বাহ হয়—

অর্থাদ্ ধর্মশ্চ কামশ্চ স্বর্গশ্চৈব নরাধিপ।
প্রাণযাত্রাপি লোকস্য বিনা হ্যর্থং ন সিধ্যতি॥

[মহা (k) ১২.৮.৭-১৭; (হরি) ১২.৮.৭-১৭]

□ অন্তত এই শেষ কথাটা পুরোপুরিই কৌটিল্যের মতো—'মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ' এবং 'প্রাণযাত্রাপি লোকস্য বিনা হ্যর্থং ন সিধ্যতি'—এই দুটি পংক্তি যেমন একই রকম তেমনই প্রথম পংক্তিতে অর্থ থেকেই ধর্ম এবং কামের সিদ্ধি—ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ—এ-কথাটাও কৌটিল্যের পংক্তির সঙ্গে তুলনীয়—অর্থই পুরুষার্থ প্রধান, ধর্ম এবং কামের মূলেও অর্থই আছে—অর্থ এব প্রধানঃ ইতি কৌটিল্যঃ। অর্থমূলৌ হি ধর্মকামৌ।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ১.৭.৭; (বসাক) ১ম খণ্ড, পৃ. ৯]

□ অর্জুন বলেছেন—পর্বত থেকে যেমন অনেক নদীধারা বেরিয়ে আসে, তেমনই নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা এবং ক্রমে বেড়ে ওঠা সঞ্চিত অর্থ থেকেই সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হয়। শুধু তাই নয় যার অর্থ আছে, তারই বন্ধু থাকে, যার অর্থ আছে তারই বন্ধু জুটতে থাকে, অর্থ থাকলেই সে উল্লেখযোগ্য পুরুষ হিসেবে গণ্য হয়, যার অর্থ আছে, তাকেই লোকে পণ্ডিত বলে। এখানে অর্থ বলতে নিশ্চিত ভাবে ভূমি, হিরণ্য এবং ধনসম্পদের কথা বলা হচ্ছে, যা কৌটিল্য বলেছেন অর্থ-পুরুষার্থের পারিভাষিকতায়। মহাভারত জানিয়েছে—নির্ধন লোকের যদি মনে যদি মহৎ কার্যসাধনের ইচ্ছেও থাকে, তবু অর্থের অভাবেই সে করতে পারে না। অন্যদিকে অর্থ যদি থাকে তবে সেই অর্থ দিয়েই অর্থবৃদ্ধির ভাবনা করা যায়। ঠিক যেমন মানুষ হাতি দিয়ে হাতি ধরে, তেমনই অর্থ দিয়েই সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করা যায়—

অর্থৈরর্থা নিবধ্যন্তে গজৈরিব মহাগজাঃ।

সত্যি বলতে কী—ধর্ম, কাম, স্বর্গ, আনন্দ, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়দমন—এই সমস্ত কিছুই অর্থপুরুষার্থ থেকে নিষ্পন্ন।

[মহা (k) ১২.৮.১৬-২১; (হরি) ১২.৮.১৬-২১]

□ পুরুষার্থ হিসেবে অর্থলাভের মূল উপায় হল নিরন্তর চেষ্টা, যেটাকে পারিভাষিক ভাবে উত্থান-শক্তি বলেছেন কৌটিল্য—অর্থস্য মূলম্ উত্থানম্। চেষ্টা, নিরন্তর চেষ্টাই হল উত্থান। কৌটিল্য বলেছেন—যিনি রাজা হবেন, তিনি যেন এই 'উত্থানে'র ব্যাপারটাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। না হলে তাঁর সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। রাজা যদি নিশ্চেষ্ট, 'অনুত্থায়ী' হয়ে বসে থাকেন, তা হলে তাঁর যা আছে তাও যাবে, ভবিষ্যতের লাভ তো দূরের কথা। একমাত্র উত্থানশক্তির মাধ্যমেই রাজা তাঁর ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেন, একমাত্র উত্থান থেকেই এই দ্বিতীয় পুরুষার্থের সিদ্ধি।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ১.১৯.৩৫-৩৬]

□ রাজার পরম পুরুষার্থ হিসেবে কৌটিল্য যতই অর্থকে চিহ্নিত করুন, অর্থের প্রাধান্য যেমন মহাভারতেও পাই, ঠিক তেমনই অর্থের মূল হিসেবে উত্থানশক্তির কথাও বোধ হয় কৌটিল্যই প্রথম বলেননি; এই উৎস-সন্ধানে অর্থের প্রাধান্যের কথা প্রথমে বলেছেন কৌটিল্যের পূর্বাচার্য বৃহস্পতি। মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার সময় জানাচ্ছেন যে, রাজধর্মের মূল শক্তি যে 'উত্থান' সে কথা নাকি বৃহস্পতিই প্রথম বলেছেন—

উত্থানং হি নরেন্দ্রানাং বৃহস্পতিরভাষত।
রাজধর্মস্য তন্মূলম্...॥

বৃহস্পতি-লিখিত নীতিশাস্ত্র হয়তো হারিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে। কিন্তু বৃহস্পতি যা বলেছেন তা ভীষ্মের মুখে এইরকম শোনাচ্ছে—উত্থান বা চেষ্টাশক্তি কাজ করেছে বলেই অমৃত লাভ করেছেন দেবতারা। অসুররা আর্যপুরুষদের হাতে যে পর্যুদস্ত হয়েছেন, সেও কিন্তু দেবতাদের উত্থানশক্তির বলেই—

উত্থানেনামৃতং লব্ধমুত্থানেনাসুরা হতাঃ।

এই উত্থানশক্তির জন্যই ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে আধিপত্য লাভ করে স্বর্গরাজ্যের শাসন চালাচ্ছেন। উত্থানশক্তির শক্তিতে শক্তিমান হলে তিনি পণ্ডিতদেরও মাথায় চড়ে বসতে পারেন। বস্তুত পণ্ডিতজনেরা সদোত্থায়ী রাজাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন এবং তাঁদের বশংবদও হন। উলটো দিকে বলা যায়—যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও রাজা যদি উত্থানশক্তিটিই হারিয়ে ফেলেন, তা হলে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের মতো শত্রুরা তাঁকে জব্দ করে। *[মহা (k) ১২.৫৮.১২-১৬; (হরি) ১২.৫৭.১২-১৬]*

□ ভারতবর্ষের বিশাল ধর্মীয় এবং দার্শনিক পরিমণ্ডলের পাশাপাশি যেখানে এই অর্থ এবং তন্মূলক উত্থানশক্তির জয়কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে অবধারিতভাবেই যেটা হবার কথা সেটা হল—অর্থলাভ যেন নিছক অর্থের জন্যই এক নীতিবিহীন অর্থাভিসন্ধিতে পরিণত না হয়, সেই অর্থলাভের মধ্যে যেন ন্যায়নীতি, ধর্মের সংযুক্তি থাকে। সায়নাচার্য পুরুষার্থসুধানিধিতে (২.৭) মহাভারত থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। তাতে বলা আছে যে, অন্যায়ভাবে যখন অর্থ উপায় করা হয় তখন তাকে অর্থদূষণ বলে—

অন্যায়েনার্জিতং দ্রব্যমর্থদূষণমুচ্যতে।

'অর্থদূষণ' শব্দটা মনুস্মৃতি কিংবা অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিতে খানিকটা পারিভাষিক বটে, কিন্তু এইভাবেও অর্থলাভের মধ্যে অন্যায়টুকু নির্দেশ করা যায়।

'ন্যায়লব্ধ', 'ন্যায়-সঞ্চিত', 'যথান্যায়-সঞ্চিত'— এইসব শব্দগুলি 'অর্থ'-এর বিশেষণ হিসেবে বারংবার মহাভারতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকী, অর্থলাভের ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজন ব্যাপারটাই যেহেতু বড়ো হয়ে ওঠে, তাই স্বার্থের তাগিদে অন্যের অনিষ্ট যাতে না হয় সেদিকেও বেশ কড়া নজর ছিল মহাভারতের সামাজিকদের। শান্তিপর্বে আমরা এক ব্যবসায়ী বৈশ্যের সন্ধান পাব, যিনি তাঁর জীবিকা উপার্জনের উপায় জানানোর সময় বলেছেন—কাউকে কোনো কষ্ট না দিয়ে অথবা খুব অল্প কষ্ট দিয়ে মানুষ যদি জীবিকা অর্জন করতে পারে তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড়ো ধর্ম।

[মহা (k) ১২.২৬২.৬; (হরি) ১২.২৫৬.৬; N.C. Bandyopadhyay, Kautilya. Calcutta, 1927, pp. 22-32: Y. Krishnan, "The Meaning of Purusartha-s in the Mahabharata." In Moral Dilemmas in the Mahabharata, ed. Bimal Krishna Matilal, p. 57]

অর্থ$_২$ বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫৯; (হরি) ১৩.১২৭.৫৯]

অর্থ$_৩$ শিবসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অর্থঃ ধনরূপেণার্থনীয়ঃ।

অর্থ শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'অর্থি' ধাতু থেকে, 'অর্থি' ধাতুর অর্থ যাচনা করা, প্রার্থনা করা ব অভিলাষ ব্যক্ত করা। 'অর্থি' ধাতুর সঙ্গে অচ্ প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় অর্থ। অর্থাৎ যা কিছু যাচনা করা হয়, যা কিছু কাঙ্ক্ষিত, তাই অর্থ। সেক্ষেত্রে অর্থ বলতে যেমন ধনসম্পদ বোঝায়। তেমনই সমস্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তুকেই বোঝায়। মানুষ ধনসম্পদ বা যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, মহাদেবের কাছে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করা মাত্র তিনি তা পূরণ করেন। সেক্ষেত্রে ভগবান শিব ভক্তের সমস্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু স্বরূপ, কাঙ্ক্ষিত সম্পদলাভের মাধ্যমে ভক্ত স্বয়ং ভগবানকেই লাভ করে থাকেন—এই ভাবনা থেকে তিনি অর্থ নামে খ্যাত। ধনসম্পদ ইত্যাদি সমস্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করেন—এই ভাবনা থেকে শিবসহস্রনাম স্তোত্রে তাঁকে অর্থকর নামেও সম্বোধন করা হয়েছে—

অর্থকরঃ ধনাদিপ্রদঃ।

তবে আমরা আগেও বলেছি যে অর্থ বলতে শুধুই ধনসম্পদ বোঝায় না। যা কিছু বাঞ্ছিত, কাঙ্ক্ষিত বা প্রার্থিত বস্তু—তাই অর্থ। সেক্ষেত্রে মহাদেবের অর্থ নামটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে তিনিই ভক্তের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, কাঙ্ক্ষিত। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত সমস্ত জাগতিক কামনা বাসনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র তাঁর পরমপদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় আরাধনা করে চলে। তিনি নিজেই তাঁর ভক্তের কাছে সবথেকে প্রিয়, কাঙ্ক্ষিত—তাই তাঁকে অর্থ নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫৩; (হরি) ১৩.১৬.৫৩]

অর্থকর শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। *[দ্র. অর্থ]*

[মহা (k) ১৩.১৭.৭০; (হরি) ১৩.১৬.৭০]

অর্থপ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত মধ্যদেশের অন্তর্গত একটি জনপদ। যদিও তিলঙ্গ এবং মগধের সঙ্গে একত্রে এর নাম উল্লিখিত হয়েছে তবুও এই অঞ্চলটির ভৌগোলিক সত্তা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

[বায়ু পু. ৪৫.১১১; GD (N.N. Bhattacharyya) p. 163]

পণ্ডিত D.C. Sircar এই অর্থপ জনপদটির অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বিভিন্ন পুরাণে

জনপদের নাম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে পাঠান্তর দেখা গেছে, সেটিকেই প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বায়ু পুরাণে যে শ্লোকটিতে অর্থপ এবং তিলঙ্গের নাম উল্লিখিত হয়েছে—অর্থপাশ্চ তিলঙ্গাশ্চ, মৎস্য পুরাণে প্রায় একই প্রসঙ্গে 'আবন্তাশ্চাকলিঙ্গাশ্চ পাঠ দেখতে পাচ্ছি। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্য একটি পাঠে—অর্বুদাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ—এমনটাও দেখা যাচ্ছে। এই পাঠান্তর পর্যালোচনা করে পণ্ডিত D.C. Sircar অবন্তী বা অর্বুদ নামক মধ্যদেশীয় জনপদের সঙ্গেই অর্থপকে একাত্মক বলে মনে করেছেন। প্রসঙ্গত অর্বুদকে (অর্বুদ) পুরাণে পশ্চিম ভারতীয় জনপদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে অর্বুদ জনপদের অবস্থান এবং সেকালের ভৌগোলিক ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে অর্বুদ বা অর্থপকে মধ্য-পশ্চিম ভারতের জনপদও বলা চলে।

[D.C. Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, p. 30-51]

অর্থশাস্ত্র আধুনিক যুগে আমরা যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলি, হয়তো ঠিক সেই অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কথাটা প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত হয়নি। সম্পূর্ণ করে না বোঝানো গেলেও, 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলতে যেসব শব্দ প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হত সেগুলির একটা আনুক্রমিক শব্দপর্যায় ব্যবহার করলে আমরা নিম্নলিখিত শব্দগুলি পেতে পারি; রাজশাস্ত্র, রাজধর্ম, দণ্ডনীতি, অর্থশাস্ত্র, এমনকী রাজনীতি শব্দটিও।

রাজশাস্ত্রের পর্যায় শব্দের মধ্যে অন্যতম হল অর্থশাস্ত্র। প্রথমেই মনে রাখা দরকার—'অর্থশাস্ত্র' শব্দটির আবিষ্কর্তা কিন্তু কৌটিল্য নন। দণ্ডনীতি বা রাজনীতিশাস্ত্রের পর্যায় শব্দ হিসেবে 'অর্থশাস্ত্র' কথাটি প্রায় স্পষ্টভাবে ব্যবহার করা হয়েছে মহাভারতেই। অবশ্য অর্থের শাস্ত্র = অর্থশাস্ত্র এই সমাসবদ্ধ পদটি থেকে 'শাস্ত্র' শব্দটি বাদ দিলে যে শব্দটি থাকে সেই 'অর্থ' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে আছে ভুরিভুরি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ যা চায়, তাকে চার ভাগে ভাগ করে নিলে পাওয়া যায় চতুর্বর্গ। অর্থাৎ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এখানে 'অর্থ' শব্দের মানে শুধুই টাকাপয়সা নয়। অর্থ মানে প্রয়োজন, অর্থ মানে সমৃদ্ধি। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—রাজা যে ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করবেন, তিনি যেন ধর্ম এবং অর্থে অভিজ্ঞ হন। অর্থাৎ, রাজা কীভাবে রাজ্য বাড়াবেন, কীভাবে রাজকোশ বৃদ্ধি করবেন তার জন্য অর্থশাস্ত্রটা জানা প্রয়োজন। মহাভারতের বহু বহু ঋষি এবং পুরোহিতকে দেখা যাবে, যাঁরা অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

'অর্থ' শব্দ বাদ দিয়ে অর্থশাস্ত্রে আসি। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলে দশ দিনের মাথায় ভীষ্ম মারা গেলেন। কৌরবপক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হল এবং কর্ণের মতো বীর প্রস্তাব করলেন—সেনাপতি করা হোক দ্রোণাচার্যকে। কেন? শুধু তাঁর যুদ্ধক্ষমতার জন্যই দ্রোণাচার্যকে সেনাপতি পদ দিতে হবে এমন নয়। কর্ণ বললেন—এই মানুষটার মধ্যে যেন শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতিকে একত্র দেখা যায়—

কো হি... সেনাপতিঃ
স্যাদন্যো'স্মাচ্ছুক্রাঙ্গিরস-দর্শনাৎ।

আমরা আগেই জানিয়েছি—শুক্র এবং বৃহস্পতি-দুজনেই ছিলেন রাজশাস্ত্র প্রণেতা। দ্রোণাচার্য এই দুই ব্যক্তির প্রণীত রাজনীতিশাস্ত্রই জানেন। এরপর দুর্যোধনের অনুরোধে দ্রোণাচার্য কৌরবপক্ষের সেনাপতিত্ব করার জন্য রাজি হবার পরপরই তাঁকে বলতে শুনছি—দুর্যোধন! আমি যেমন ষড়ঙ্গ বেদ জানি তেমনই আমি মানবী অর্থবিদ্যাও জানি—

বেদং ষড়ঙ্গং বেদাহম্ অর্থবিদ্যাঞ্চ মানবীম্।

এই 'অর্থবিদ্যা' কথাটি অবশ্যই কৌটিল্যের উদ্ভাবিত 'অর্থশাস্ত্র' শব্দের পূর্ববর্তী। তার মানে, কৌটিল্যের পূর্বে মনুর লেখা একটি অর্থশাস্ত্র ছিল এবং আমাদের কাছে সেটি লুপ্ত। কৌটিল্য যখন 'ইতি মানবাঃ' বলে মনু-সম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করেছেন, হয়তো তখন এই 'মানবী অর্থবিদ্যা'র গ্রন্থ থেকেই মনুর মত সংকলিত হয়েছে। আবার খুব সরলভাবে ধরলে—মনু যে রাজধর্মের কথা বলেছেন, সেটাকেই হয়তো পারিভাষিকভাবে অর্থশাস্ত্র বলা হত। এই অর্থবিদ্যা প্রাচেতস মনুর লেখা।

মহাভারতের শান্তিপর্বে অবশ্য পরিষ্কারভাবেই 'অর্থশাস্ত্র' শব্দটিই প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে—শ্রেষ্ঠ রাজারা এই অর্থশাস্ত্রকে অবলম্বন করে থাকেন—

যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপশিষ্টজুষ্টে।

অবশ্য মহাকাব্যের মধ্যে 'অর্থশাস্ত্র' শব্দের যতই ব্যবহার থাকুক, কৌটিল্যের সময়ে এসে অর্থশাস্ত্রের মধ্যে রীতিমতো আধুনিক অর্থেই রাষ্ট্রের চেতনা যুক্ত হল। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বোঝবার আগে অর্থ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন সেটা বুঝে নিতে হবে।

অর্থ শব্দের অনেকরকম অর্থ হয়। আমাদের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত 'অর্থ' শব্দের প্রধান অর্থগুলি মোটামুটি—ধন, বিত্ত, লাভের টাকা, বস্তু, দ্রব্য, কাম্যফল, স্ব-পররাষ্ট্র-চিন্তা, ফল ইত্যাদি। কৌটিল্য নিজে অর্থশাস্ত্রের অর্থ দিয়েছেন তাঁর নিজকৃত অর্থশাস্ত্রের শেষ প্রকরণে—যার নাম তন্ত্রযুক্তি। তন্ত্রযুক্তি মানে— তিনি যে বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন তার সার্থকতা বিচার, সোজা কথায়, অর্থশাস্ত্রের অর্থনির্ণয়ের যুক্তি।

কৌটিল্য বলেছেন—মানুষের বৃত্তি বা জীবনধারণের উপায় হল অর্থ—

মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ।

একইসঙ্গে তিনি আরও একটি অর্থ দিয়ে বলেছেন—মনুষ্যযুক্ত ভূমিকেই আমরা অর্থ বলতে পারি—

মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ।

অতএব, যে শাস্ত্র পৃথিবীর লাভ এবং পালনের উপায় বলে দেয়, সেটাই অর্থশাস্ত্র। এই অংশটির অর্থ করার সময় পণ্ডিত শামা শাস্ত্রী বলেছেন—

The subsistence of mankind is termed artha, wealth; the earth which contains mankind is termed artha, wealth; that science which treats of the means of acquiring and maintaining the earth is the Arthasastra, Science of Polity.

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গেলেই যেখানে সবসময় ধর্ম এবং দর্শনের উল্লেখ, সেখানে খ্রিস্টপূর্ব সময়ে যে মানুষটি মনুষ্যজীবনের ধারক হিসেবে 'অর্থ'-এর উল্লেখ করলেন, সেটা ভীষণরকমের আধুনিক হয়ে গেছে। অন্যদিকে 'অর্থ' শব্দের মধ্যেই যেহেতু মানুষের অধ্যুষিত একটি ভূখণ্ডের কথাও রয়ে গেছে, তাই অর্থশাস্ত্রকে একটি রাষ্ট্রের মানুষ, তার ভূমি এবং সেই ভূমিসংযুক্ত মানুষগুলির পালন-পোষণের সহায়ক শাস্ত্র বলা যায়।

কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা না রেখেও আমরা এটা জানাতে পারি যে, কৌটিল্য নিজে নিজেই এই শব্দ সৃষ্টি করেননি বা এই শব্দের ব্যাপ্ত তাৎপর্য্যও তাঁর নিজের তৈরি নয়। তবে সকলের ওপরে এই শব্দটাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শাস্ত্র বা 'তন্ত্র' রচনা করার মধ্যেই তাঁর নিজস্বতা। এর জন্য তাঁকে গালাগালি শুনতে হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু তবু ধর্ম-দর্শন এবং নানা বিধিবিধানের সীমাবদ্ধ সমাজকে অতিক্রম করে তিনি রাজধর্মের মধ্যে অর্থেরই প্রাধান্য স্বীকার করে নেন; তখনই বুঝতে হয় কৌটিল্য মানুষটা তাঁর নিজের সময় এবং সমাজেই থেকে অনেক বেশি আধুনিক। তবে সেই আধুনিকতার মধ্যেও একটা পরম্পরা আছে। আমরা পরে সে কথায় আসছি।

মানুষের জীবনধারণের উপায়স্বরূপ যে 'অর্থ', যা নাকি পৃথিবীর লাভ এবং পালনে সাহায্য করে, সেই অর্থসাধনের প্রধান উপায় কিন্তু দণ্ড—যার কথা আমরা আগে বলেছি—দণ্ড যা নেই তা এনে দেয়, যা আছে তা রক্ষা করে, রক্ষিত বস্তুর বৃদ্ধি করে এবং বাড়তি জিনিসকে ভালো কাজে লাগায়।

পৃথিবীর লাভ এবং পালনের কথাটি মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে অর্থশাস্ত্র যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, তাই কিন্তু রাজাদের রাজ্যশাসনের প্রণালী এবং সেইটাই অর্থশাস্ত্র। এই শাসনের মধ্যে গ্রাম এবং রাজার শাসনকেন্দ্র পুরনগরের শাসনব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই আছে অন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রনীতি। এছাড়া, অন্তঃরাষ্ট্রীয় আইন, যুদ্ধ, কৃষি, বাণিজ্য, কর, খনি, নদী, বন—সব ব্যাপারেই আলোচনা আছে এবং এসবকিছুর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু রাজা এবং রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থ—যেটা মহাভারত নিজের মতো করে বুঝেই রাজনীতিশাস্ত্র বলতে অর্থশাস্ত্র বুঝেছে।

[আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (চিন্নস্বামী) ২.৫.১০.১৫; পৃ. ২১৬;
মহা (k) ৭.৫.১৮; ৭.৭.১; ১২.৩০১.১০৯;
(হরি) ৭.৪.১৮, ৩৫; ১২.২৯৪.১০৮;
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle) ১৫.১.১-২;
R. Shama Sastry, Arthasastra of Kautilya,
১৫.১.১-২; যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ,
প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, পৃ. ৪]

অর্থসাধক অযোধ্যার একজন মন্ত্রী। বনবাস থেকে ফেরার সময় রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করে আনার

জন্য ভরতের নির্দেশে অর্থসাধক অন্য সাতজন মন্ত্রীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। *[রামায়ণ ৬.১২৭.১১]*

অর্থসিদ্ধি ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা সাধ্যার গর্ভে সাধ্যদেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই সাধ্যদেবগণের পুত্র ছিলেন অর্থসিদ্ধি।

[ভাগবত পু. ৬.৬.৭]

অর্দন শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম। অর্দন শব্দটি এসেছে সংস্কৃত অর্দ্ ধাতু থেকে। এর অর্থ পীড়ন করা বা আঘাত করা। যিনি আঘাত করেন, পীড়ন করেন, তাঁকেই অর্দন বলা হয়। যারা পাপী, অনাচারী, তিনি তাদের শাস্তিবিধান করেন, পীড়ন করেন, তাদের ধ্বংস করার জন্য সংহার মূর্তি ধারণ করেন—এই কারণেই মহাদেব অর্দন নামে খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই ভাবনা থেকেই অর্দন শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন—

অর্দয়তি জনং পাপিনং পীড়য়তি
কালান্তকরূপেণেত্যর্দনঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৩; (হরি) ১৩.১৬.৩৩]

অর্ধকীলতীর্থ মহাভারতের বনপর্বে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থগুলির মধ্যে অর্ধকীলতীর্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতে উল্লেখ আছে, পুরাকালে মহর্ষি দর্ভী সকলের কল্যাণের জন্য চারটি সমুদ্রকে যোগবলে এই তীর্থে আহ্বান করেছিলেন। তাই এই তীর্থের জলে স্নান করলে এবং এই তীর্থে ব্রত, ধ্যান, উপবাস, পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সম্পন্ন করলে বহুপুণ্য লাভ হয় বলে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৮৩.১৫৩-১৫৬;
(হরি) ৩.৬৮.১৫৪-১৫৭]

অর্ধচন্দ্রতীর্থ মথুরায় অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।

[বরাহ পু. ১৬৯.৩]

অর্ধনেমি একজন ঋষি। পুরাণে যেসব ঋষি বংশের নাম আঙ্গিরস গোত্র প্রবর্তক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি অর্ধনেমির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৬]*

অর্ধপণ্য পুরাণে মহর্ষি অত্রির প্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি অর্ধপণ্যের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। অর্ধপণ্য অত্রিবংশীয় গোত্রপ্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৭.৩]*

অর্ধবাহু মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে উর্জার গর্ভজাত সাত পুত্রসন্তানের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ২৮.৩৬]*

অর্ধমুণ্ড তেত্রিশতম কল্পের আদিতে মহাদেব আবির্ভূত হলে তাঁর দেহ থেকে চারটি পুত্রসন্তানের উৎপত্তি হয়। অর্ধমুণ্ড এঁদের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ২৩.৫৯]*

অর্ধনারীশ্বর পণ্ডিতজনেরা মনে করেন—অর্ধনারীশ্বর শিবের দিব্য ভাবনার প্রথম প্রকট প্রতীকটুকু লুকিয়ে আছে বেদের যম-যমী সংবাদের মধ্যে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরম পুরুষ যেখানে একা-একা কোনো সুখ পাচ্ছিলেন না, সেই পুরুষ আত্মাকে দুই ভাগে ভাগ করে স্ত্রী-পুরুষ হলেন, এখানেও অর্ধনারীশ্বর-মূর্তির বীজ আছে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মপুরুষকে 'আত্মযোনি' বলায় সেটাই রুদ্র-শিবের স্ত্রী-পুংসাত্মক অভিব্যক্তি বলে নির্দেশ করেছেন পরবর্তী ব্যাখ্যাকারেরা। একই শ্লোকের উত্তরাংশে পুনরায় তাঁকে 'প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ' বলায় প্রকৃতি-পুরুষের স্ত্রী-পুংসাত্মক সাংখ্য-দার্শনিক ভাবনা একত্রে 'পতিঃ' অর্থাৎ রুদ্র-শিবের মধ্যেই নিহিত হয়েছে। তাতেও পণ্ডিতেরা মনে করেন অর্ধনারীশ্বর শিবের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা এখানেই যেটাকে Mircea Eliade সুন্দর করে বলেছেন—

“Divine bisexuality is one of the many formulae of the totality-unity signified by the union of couples of opposities: masculine-feminine, visible-invisible, heaven-earth. light-darkness, as also goodness-wickedness, creation-destruction etc.

[ঋগ্বেদ ১০.১০. সূক্ত; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্
১.৪.৪০.৩; ১.৪.৫৪.১৭, পৃ. ১৯১, ৩৪৯;
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬.১৬;
Mircea Eliade, History of Religious Ideas:
From Stone Age to the Abyssinian
Mysteries, Vol. 1. p. 165; Alain Danielou,
Gods of Love and Ecstasy: The Traditions
of Shiva and Dionysis, pp. 63-68;
Doris Srinivasan, Many heads. arms and
eyes: origin, meaning and form of
multiplicity in Indian Art, pp. 57-58]

☐ মহাভারতে উপমন্যু যখন মহাদেবের গুণখ্যাপন করছিলেন, তখন অনেকগুলি মূর্তিবৈচিত্র্যের মধ্যে অন্যতম ছিল অর্ধনারীশ্বর। উপমন্যু অর্ধনারীশ্বরের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন—তার শরীরের অন্য অর্ধে ধৃত হয়েছেন তাঁর কান্তা পার্বতী—

কস্য চার্ধে স্থিতা কান্তা অনঙ্গঃ কেন নির্জিতঃ।

উপমন্যু বলেছেন—আমি নমস্কার করি সেই শিবমূর্তিকে, যিনি কিরীটধারী, এবং যিনি অর্ধহার এবং অর্ধকেয়ূরযুক্ত এবং যাঁর কানে কুণ্ডল আছে। এখানে টীকাকার হিসেবে সিদ্ধান্তবাগীশ মন্তব্য করেছেন—যে, শিবশরীরের অপরার্ধ স্ত্রীরূপ বলেই এই হার, কেয়ূর আর কুণ্ডলের যোজনা—

দেহার্ধস্য স্ত্রীরূপত্বাৎ।

[মহা (k) ১৩.১৪.২১৭, ২৯৩;
(হরি) ১৩.১৩.২১৫, ২৯১]

☐ লিঙ্গ পুরাণ বলেছে—কল্পান্তরে সৃষ্টির তপস্যায় বসে ব্রহ্মা কিছুই সৃষ্টি করতে পারছিলেন না। ফলে তাঁর নিজের ওপরেই খুব ক্রোধ হল এবং সেই ক্রোধে জল বেরিয়ে এল তাঁর চোখ থেকে। চোখের সেই জল থেকে হঠাৎই জন্ম হল নানান ভূত-প্রেতের। প্রথম সৃষ্টির মধ্যে ভূত-প্রেতের সমাহার দেখে ব্রহ্মার মনে খুব কষ্ট হল এবং তিনি প্রাণত্যাগ করবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু প্রাণত্যাগের মুহূর্তেই ব্রহ্মার মুখ থেকে আবির্ভাব হল প্রাণময় রুদ্রের। সেই রুদ্র-শিবের মূর্তিটি ছিল অর্ধনারীশ্বরের। সেই মূর্তি ভাগ করেই তাঁর একাংশ থেকে উমা মহেশ্বরীকে সৃষ্টি করেছিলেন রুদ্র শিব। *[লিঙ্গ পু. ১.৪১.৪০-৪৪]*

☐ বস্তুত দার্শনিক দৃষ্টিতে শক্তি এবং শক্তিমান তত্ত্বের মধ্যে অভিন্নতা প্রকট করার জন্যই অর্ধনারীশ্বর-রূপের কল্পনা। শিব এবং শিবানী—একই সত্তার দুই রূপ—এই তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্যই একই দেহের অর্ধাংশে শিব এবং অন্য অর্ধাংশে শিবানীকে নিয়ে অর্ধনারীশ্বরের ভাবনা।

☐ পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী এক সময়ে পার্বতী হরের হৃদয়ে নিজ দেহের ছায়া দেখে ভাবলেন—অন্য কোনো রমণী তাঁর স্বামীর হৃদয়ে বিরাজ করছেন। গৌরী চরম কুপিত হয়ে উঠলে শিব তাঁকে আসল সত্যটা বোঝালেন, বিভিন্ন ভাবেই বোঝালেন। শেষে তাঁর ভ্রান্তি দূর হলে লজ্জা এসে জুড়ে বসল পার্বতীর হৃদয়। তিনি এবার সপ্রেমে সাভিমানে শিবকে বললেন—আমার ছায়াও যেমন নিরন্তর তোমার শরীরে অবস্থিতি করে, আমি চাই—আমার আসল শরীরটাও তোমার শরীরের মধ্যে অবস্থান করুক। আমার প্রকৃত শরীরের সমস্ত অংশ তুমি প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে স্পর্শ করো—এমনটা যাতে হয়, তুমি তাই করো।

হর-শিব বললেন—তাই হবে। তুমি আমার অর্ধেক শরীর গ্রহণ করো অথবা তোমার অর্ধেক শরীর আমাকে দাও। আমার অর্ধেক শরীর হোক নারী, আর অর্ধেক হোক পুরুষ। তুমি যদি তোমার শরীর দুই অর্ধে ভাগ করতে পারো, তাহলে আমার শরীরে তোমার অর্ধেক হরণ করে নেবো আমি। দেবী পার্বতী বললেন—আমি দুই শরীর এক করতে চাই। তুমি যদি আমার শরীরের অর্ধ হরণ করো, তবে আমিও তোমার অর্ধেক হরণ করতে চাই। শিব স্বীকার করে নিলেন শিবানীর কথা। দুজনে দুজনের অভিন্ন সত্তায়, শব্দ এবং অর্থের মতো। ঈশ্বর শিব নারীশরীরের অর্ধেক হরণ করে অর্ধনারীশ্বর হলেন। এই ঘটনাটি নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে একইভাবে আছে।

[কালিকা পু. ৪৫.১৫০-১৫৮]

বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দেখা যাচ্ছে—ব্রহ্মার রোষ থেকে নরনারীর দেহধারী এক দেবতার জন্ম হয়েছিল। তিনিই অর্ধনারীশ্বর শিব। সেই মূর্তি দুই ভাগে ভাগ হয়ে হর-পার্বতীর সৃষ্টি হয়। এখানে মূল মূর্তিটাই অর্ধনারীশ্বর।

[বায়ু পু. ৯.৭৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৭.৯৮]

☐ মৎস্য পুরাণের প্রতিমা লক্ষণ অধ্যায়ে অর্ধনারীশ্বর-মূর্তি কেমন হওয়া উচিত, তার বর্ণনা দেওয়া আছে। তাঁর অর্ধাংশ ঈশ-শিবের মূর্তিতে বালচন্দ্রের কলা-সংযুক্ত জটাভার, আর অন্য অর্ধে উমার মূর্তিতে সীঁথির চিহ্ন এবং তিলক। এই মূর্তির দক্ষিণ কর্ণে নাগরাজ বাসুকি, বাম কর্ণে উমার অর্ধে কানে থাকবে কুণ্ডল। দক্ষিণার্ধে শিবের হাতে থাকবে কপাল অথবা ত্রিশূল, বামার্ধে পার্বতীর হাতে পদ্মফুল অথবা দর্পণ। কেয়ূর এবং বলয় দিয়ে ভূষিত করা বামার্ধের বাম বাহু, আর পৈতে দেওয়া হবে যথাস্থানে। বামার্ধে পীন স্তনভার এবং তারই অধমাঙ্গে সুগঠিত নিতম্ব। দক্ষিণে শিবার্ধে শার্দূল-চর্মাবৃত লিঙ্গ ঊর্ধ্বগ অবস্থায় থাকবে। বামভাবে রত্নসমন্বিত লম্বমান কটিসূত্র, দক্ষিণ ভাগ ভুজঙ্গবেষ্টিত।

দেবদেব মহাদেবের দক্ষিণ পা থাকবে পদ্মের ওপর। আর তার বাঁ-দিকে একটু উঁচুতে পার্বতীর পা থাকবে নূপুর এবং রত্ন-ভূষিত হয়ে। সমস্ত আঙুলে থাকবে আংটি। পার্বতীর পা-টি শুধু হবে আলতায় রাঙা। এই হল অর্ধনারীশ্বর মূর্তি—এক অর্ধে দেবদেব শিব অন্য অর্ধে পার্বতীর নারীরূপ—

অর্ধেন দেবদেবস্য নারীরূপং সুশোভনম্।
অধনারীশ্বরস্যেদং রূপমস্মিন্নুদাহৃতম্॥

[মৎস্য পু. ২৬০.১-১০]

শারদাতিলক তন্ত্রে অর্ধনারীশ্বরের একটি বর্ণনা আছে। তাতে অর্ধাংশে অম্বিকা এবং অর্ধাংশে ঈশ-শিব—

নীল-প্রবাল-রুচিরং বিলসৎত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপল-কপাল-ত্রিশূল-হস্তম্।
অর্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্ত-ভূষং
বালেন্দুবদ্ধ-মুকুটং প্রণমামি রূপম্॥

[শারদাতিলক তন্ত্র ১৯.৫৮]

তবে অর্ধনারীশ্বর রূপের অসামান্য বর্ণনা দিয়েছেন মৈথিল বিদ্যাপতি—

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি।
জয় অধ-পুরুষ জয়তি অধ-নারী॥
আধ ধবল তনু আধা গোরা।
আধ সহজ কুচ আধ কটোরা॥
আধ হাড়মাল আধ গজমোতী।
আধ চানন সোভে আধ বিভূতি॥
আধ চেতন মতি আধা ভোরা।
আধ পটোর আধ মুঞ্জ ডোরা॥
আধ যোগ আধ ভোগ বিলাসা।
আধ পিধান আধ নগ বাসা॥
আধ চন্দ আধ সিন্দুর শোভা।
আধ বিরূপ আধ জগ লোভা॥
ভনে কবিরঞ্জন বিধাতা জানে।
দুই কএ বাঁটল এক পরানে॥

[বিদ্যাপতির শিবগীত,
সম্পাদক সুধীরচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ১]

অর্ধস্বন *[দ্র. অর্বসন]*

অর্বরীবান্ পুলহ প্রজাপতির ঔরসে ক্ষমার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী এক ঋষি। স্বারোচিষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের মধ্যে পুলহের পুত্র অর্বরীবান্ ছিলেন অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১৮; বিষ্ণু পু. ১.১০.১০]*

অর্বসন অত্রিবংশীয় ঋষিদের মধ্যে অন্যতম। পুরাণে এঁর পরিচয় পাই বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৩]

☐ মৎস্য পুরাণে ইনি অর্ধস্বন নামে চিহ্নিত হয়েছেন। *[মৎস্য পু. ১৪৫.১০৭]*

অর্বাক্স্রোতা মুখ্যসর্গ, দেবসর্গ এবং তির্যক্স্রোতা এই ত্রিবিধ সৃষ্টির পর অর্বাক্স্রোতা মনুষ্যগণের সৃষ্টি। অর্বাক্স্রোতা কথাটি মহাভারতে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে—যাঁরা প্রধানত কামনা-বাসনার দ্বারা চালিত হন এবং কামনা-বাসনার পূর্তি ঘটলেই যাঁরা আনন্দিত হন, সেই সব মানুষেরা অর্বাকস্রোতা নামে চিহ্নিত। এঁরা প্রধানত রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত—

কামবৃত্তাঃ প্রমোদন্তে সর্বকাম-সমৃদ্ধিভিঃ।
অর্বাক্স্রোতস ইত্যেতে মনুষ্যা রজসা বৃতাঃ॥

দেবতা, ঋষি, মানুষ—এদের সবাইকেই স্বত্ত্ব, রজ, তমগুণের বিভাগ অনুসারে কতগুলো স্তর বা tier এ ভাগ করে মহাভারত সেইগুলিকেই বিভিন্ন 'স্রোত' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—

ত্রীনি স্রোতাংসি, যান্যস্মিন্ আপ্যায়ন্তে পুনঃপুনঃ।

স্রোত মানে 'চিত্তনদীর প্রবাহ'—বলেছেন নীলকণ্ঠ। অর্বাক্-স্রোত মানে স্বর্গভূমির পরবর্তী স্তরে যা বইতে থাকে অর্থাৎ সেই সব মানুষেরা, যারা কামনাপূর্তি হলে আনন্দিত হয়, এই জগতে বারবার জন্মাতে ইচ্ছা করে, ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ লাভ করার জন্য যারা চেষ্টা করে এবং সেইজন্যই দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ, হোম ইত্যাদি করে থাকে। এরাই অর্বাক্স্রোতের মানুষ। পুরাণগুলি অবশ্য এদের সম্পূর্ণ রজোগুণের জাতক না বলে তমগুণ এবং রজোগুণের মিশ্রণে তৈরি প্রকাশপ্রবণ, দুঃখবহুল অথচ সাধক বলে বর্ণনা করেছে। কূর্ম পুরাণ অবশ্য এদের তম-গুণের উদ্রেক বিশিষ্ট অধিক রজগুণ-সম্পন্ন মানুষ, অথচা সত্ত্বগুণও তার মধ্যে আছে— এইভাবে বর্ণনা করেছে।

[মহা (k) ১৪.৩৭.১৬-১৭; ১৪.৩৬.৩;
(হরি) ১৪.৪৪.১৬-১৭; ১৪.৪৩.৩;
মার্কণ্ডেয় পু. ৪৭.২৩-২৭; কূর্ম পু. ১.৭.১০]

অর্বাক$_1$ একজন ঋষি। ইনি পঞ্চবিংশতিতম দ্বাপরে ব্যাস হবেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.১২৩]

অর্বাক$_2$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে পাতালের অন্তর্গত সাতটি তলের মধ্যে পঞ্চমটির নাম অর্বাক তল।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী এই স্থানের ভূমি শর্করাময়। সেই কারণে কখনো কখনো এই স্থান শর্করাভূমি নামেও চিহ্নিত হয়েছে। দৈত্যরাজ বিরোচন এবং অন্যান্য বহু দৈত্য এবং নাগের বাসভূমি এই অর্বাকতল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.১২, ১৪, ৩৫-৩৮]

অর্বাবসু$_{১}$ অর্বাবসু বিশেষ এক সৌরকিরণের নাম। সাতটি প্রধান সৌরকিরণের মধ্যে অর্বাবসু অন্যতম। এই কিরণ বৃহস্পতিকে কান্তিদান করে। বায়ু পুরাণে অর্বাবসুকে অর্বাগ্বসু নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[কূর্ম পু. ১.৪২.৭; বায়ু পু. ৫৩.৪৫, ৪৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৪.৬৭]

অর্বাবসু$_{২}$ মহর্ষি রৈভ্যের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন অর্বাবসু। বেদবিৎ পণ্ডিত হিসেবে দুই ভাই যথেষ্ঠ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহাভারতের কাহিনী থেকে পরাবসু বিবাহিত ছিলেন বলে জানা গেলেও অর্বাবসুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে মহাভারতে কোনো উল্লেখ নেই।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রৈভ্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। একদিন ভরদ্বাজের পুত্র যবক্রীত রৈভ্যের আশ্রমে গিয়ে পরাবসুর সুন্দরী পত্নীকে দেখে মোহিত হয়ে তাঁকে নিজের কামনার কথা জানান এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গমের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। পরাবসুর বুদ্ধিমতী পত্নী কৌশলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং শ্বশুরকে গিয়ে যবক্রীতের আচরণের কথা জানালেন। মহর্ষি রৈভ্য একথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর ক্রোধ থেকে এক রাক্ষস ও রাক্ষসী উৎপন্ন হয়ে দুরাচার যবক্রীতকে হত্যা করল। এদিকে যবক্রীতের পিতা ভরদ্বাজ পুত্রের দুষ্কর্মের কথা কিছুই জানতেন না। পুত্রের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত ভরদ্বাজ তাই রৈভ্যকে শাপ দিলেন —তোমার কনিষ্ঠ পুত্র পরাবসু তোমার মৃত্যুর কারণ হবে। শোকার্ত পিতা ভরদ্বাজ পুত্রের চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এরপর একসময় মহর্ষি রৈভ্যের শিষ্য বৃহদ্যুম্ন রাজা এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। রৈভ্যের দুই পুত্র অর্বাবসু এবং পরাবসু যজ্ঞের পুরোহিত নিযুক্ত হলেন। একদিন শেষ রাত্রে পরাবসু যজ্ঞস্থল থেকে আশ্রমে ফিরছিলেন, পথে কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম-পরিহিত অবস্থায় রৈভ্যকে দেখতে পেলেন। অন্ধকারে রৈভ্যকে দেখে বন্য পশু মনে করে পরাবসু তাঁকে হত্যা করলেন। এইভাবে ভরদ্বাজের শাপে পরাবসুর হাতে পিতৃহত্যা সম্পন্ন হল।

এদিকে পিতৃহত্যা করে পরাবসু আবার যজ্ঞানুষ্ঠানে ফিরে গিয়ে অর্বাবসুকে বললেন— আমি ভুল করে পিতাকে হত্যা করেছি। আপনি আমার হয়ে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করুন। ততক্ষণ আমি একাই এই যজ্ঞের দায়িত্ব নিচ্ছি।

অর্বাবসু ছোটো ভাইয়ের হয়ে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করলেন। তারপর যখন যজ্ঞে ফিরে এলেন, তখন পরাবসু রাজা বৃহদ্যুম্নকে বললেন—আমার এই ভাই পিতাকে হত্যা করেছে। এই ব্রহ্মহত্যাকারীকে আপনি যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করতে দেবেন না। পরাবসুর কথায় রাজা তাঁর ভৃত্যদের আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে অর্বাবসুকে যজ্ঞস্থল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্বাবসু বার বার বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন যে, তিনি পিতৃহত্যা করেননি। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ বিশ্বাস করল না। ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় দুঃখিত হয়ে অর্বাবসু বনে গেলেন। সেখানে তপস্যায় সূর্যদেবকে তুষ্ট করলেন। তপস্বী অর্বাবসুর মুখ থেকে সূর্যের উদ্দেশে গীত বেদমন্ত্র নির্গত হল। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব স্বয়ং এসে অর্বাবসুকে দর্শন দিলেন। অন্যান্য দেবতারাও উপস্থিত হলেন তাঁকে বর দেবার জন্য। অর্বাবসু বর চাইলেন—তাঁর পিতা রৈভ্য যেন জীবনলাভ করেন, পরাবসু যে পিতাকে হত্যা করেছিলেন তা যেন পিতা বিস্মৃত হন, ভাই পরাবসু যেন পিতৃহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হন এবং যবক্রীত এবং ভরদ্বাজও যেন পুনর্জীবন লাভ করেন। তাঁর উচ্চারিত মন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও প্রার্থনা করলেন অর্বাবসু। দেবতারা প্রসন্ন চিত্তে তাঁকে বরদান করে তাঁর সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করলেন।

[মহা (k) ৩.১৩৫.১৩; ৩.১৩৬, ১৩৭ অধ্যায়;
৩.১৩৮.১-২২; (হরি) ৩.১১১.১৩; ৩.১১২.১১৩
অধ্যায়; ৩.১১৪.১-২২]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বে অর্বাবসু এবং পরাবসুকে পূর্বদিকে অবস্থানকারী ঋষি বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১২.২০৮.২৬; (হরি) ১২.২০২.২৬]

□ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লিখিত প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিদের মধ্যে অর্বাবসু একজন।

[মহা (k) ১৩.১৫০.৩০; (হরি) ১৩.১২৮.২৯]

☐ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্বাবসু বিরাজ করতেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.৪.১০; (হরি) ২.৪.৯ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ৫, পৃ. ২৫]

অর্বুদ$_{১}$ একটি পর্বত-তীর্থ। হিমালয়জাত বা হিমালয় পর্বতের পুত্র—হিমবৎ সুতমর্বুদম্। এখানে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম অবস্থিত। অর্বুদ পর্বত যেখানে অবস্থিত, পূর্বে সেখানে একটি খাদ বা গর্ত ছিল।

[মহা (k) ৩.৮২.৪৫;
(হরি) ৩.৬৭.৭৫-৭৬; বিষ্ণু পু. ৬.৮.২৯]

রাজস্থান রাজ্যের সিরোহি জেলার অন্তর্গত আরাবল্লী পর্বতের মাউন্ট আবু। প্রকৃতপক্ষে এটি আরাবল্লী পর্বত শ্রেণীর একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। এটি রাজস্থান রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। অর্বুদ নামের এক নাগ উপজাতীয় অধিপতির নামানুসারেই পর্বতটির এরূপ নামকরণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরাবল্লী একটি প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত। এই পর্বতের মহীখাতটিকে বোঝাতেই মহাভারতে হয়তো খাদ ও গর্তের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

[Ed. by Ganga Ram Garg,
Encyelopaedia of The Hindu World,
p. 127-128]

☐ নর্মদা নদীর তীরবর্তী একটি দেশ।

[বায়ু পু. ৪৬.১৩১]

☐ মৎস্য পুরাণে অর্বুদকে একটি পশ্চিমদেশীয় জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১১৪.৫১]

☐ পশ্চিমদেশীয় একটি অঞ্চল। এখানে সতীর আরেক রূপ ললিতা দেবী অবস্থান করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৬২]

☐ আবার বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে অর্বুদ শুক্তিমান পর্বত থেকে নির্গত নদীগুলির সন্নিহিত একটি অঞ্চল। *[বিষ্ণু পু. ২.৩.১৬]*

☐ লক্ষণীয় যে, শুক্তিমান পর্বত অবস্থানগত ভাবে বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী। সেই দিক থেকে বিচার করলে আরাবল্লী পর্বত শ্রেণীর সঙ্গেও এর ভৌগোলিক নৈকট্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর অন্যদিকে অর্বুদ-দেশটি নর্মদা-নদী-সংলগ্ন একটি ভূখণ্ড। আবার নর্মদার সঙ্গেও আরাবল্লী এবং বিন্ধ্য-পর্বতের ভৌগোলিক নৈকট্য আছে। অতএব ধারণা করা যেতে পারে যে, অর্বুদ নামের দেশটি বিন্ধ্য আরাবল্লী পর্বতের কাছাকাছি অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল।

অর্বুদ$_{২}$ অর্বুদ দেশে বসবাসকারী জাতি। ব্রহ্মশাপে যদু বংশ ধ্বংসের সময় এই জাতির লোকেরাও নিজেদের জ্ঞাতি স্থানীয় অনান্য জাতিকে আক্রমণ করেছিল। ভাগবত পুরাণের অপর একটি শ্লোকেও অর্বুদ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

[ভাগবত পু. ১১.৩০.১৮; ১২.১.৩৮]

অর্বুদ$_{৩}$ একজন নাগ। সভাপর্ব থেকে জানা যায় যে, অর্বুদ নাগ গিরিব্রজপুরে বাস করত। অবশ্য অর্বুদ নাগ এককালে গিরিব্রজপুরে বাস করলেও পরবর্তী সময়ে হয়তো বা আরাবল্লী পর্বতমালা সন্নিহিত অর্বুদ দেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সেই সূত্রেই এই অঞ্চল অর্বুদ জাতির আবাসস্থল এবং অর্বুদ পর্বতের নামকরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

[মহা (k) ২.২১.৯; (হরি) ২.২০.৯]

অর্বুদ$_{৪}$ সংখ্যা গণনার অন্যতম একক। দশ কোটিতে এক অর্বুদ গণনা করা হয়। *[বায়ু পু. ১০১.৯৫]*

অর্বুদ-সরস্বতী নদী-তীর্থ। এখানে শ্রাদ্ধ প্রদান করলে পুণ্যফল লাভ হয়। *[মৎস্য পু. ২২.৩৮]*

অর্ভক কলিযুগে যেসব শিশুনাগ বংশীয় রাজা রাজত্ব করবেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে, অর্ভক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি রাজা অজাতশত্রুর পুত্র এবং উদয়নের পিতা। বিষ্ণু পুরাণের দাক্ষিণাত্য পাঠে অর্ভক থাকলেও বঙ্গীয় সংস্করণে ধৃত দর্ভক পাঠটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। বঙ্গীয় সংস্করণে দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.২৪.১৫-১৬;
(নবভারত) ৪.২৪.৩]

অর্যমা$_{১}$ আমরা দ্বাদশাদিত্য বলি বটে, কিন্তু ঋগ্‌বেদে আদিত্যগণের প্রাথমিক গণনায় ছয় জন আদিত্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ছয় জনের মধ্যেও অর্যমা (অর্যমন্) একজন। অন্য পাঁচ জন হলেন মিত্র, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ—

শৃণোতি মিত্র অর্যমা ভগো নস্তু বিজাতো বরুণো দক্ষো অংশ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আটজন আদিত্য-দেবতার নাম আছে, সেই নামগুলির মধ্যেও কিন্তু অন্যতম হলেন অর্যমা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই আটজন আদিত্যই সূর্যের বিভিন্ন রূপ। একেবারে প্রাতঃকালে অরুণোদয়ের পরেই যখন সূর্যের প্রকাশ একটু তীব্র হয়ে ওঠে 'ভগ' সেই

কালের সূর্য, তারপরের সময়কালে সূর্যের তেজ তেমন প্রখর, তখন সেই সূর্যের নাম পূষা। পূষোদয়ের পরের কালই অর্কোদয়ের কাল, তার পরে আসে মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্নকালের আগে যে পূর্বাহ্ন শেষ হয়, সেই পূর্বাহ্নের শেষ পর্যায়কালের যিনি সূর্য, তাঁরই নাম অর্যমা। কথাটা আরও পরিষ্কার ভাবে আছে তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে। এখানে বোঝা যায় যে, অর্যমা আসলে সূর্যেরই মূর্তিভেদ। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বলছে—

যদাদ্দুরর্যম্নঃ পন্থা ইত্যেষ বাব দেবযানঃ পন্থাঃ।

অর্থাৎ অর্যমার যে পথ সেই পথই দেবযান। টীকাকার সায়নাচার্য এই বাক্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—যে অর্যমা আসলে আদিত্যের মূর্তিভেদ তাঁরই পথ হল এই দেবযান—দেবতাদের যাবার পথ—

যদর্যম্নঃ আদিত্যমূর্তিভেদঃ
তস্য পন্থা অয়মিত্যাদ্দুঃ।

ঠিক এইজন্যই অর্যমাকে অরুণতম দেখায়, অর্যমার দেবযান-পথ তাই অরুণতম রক্তবর্ণ—

তস্মাদেষো'রুণতম ইব দিব উপদৃশে'
রুণতম ইব হি পন্থাঃ।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের এই দ্বিতীয় উক্তিটিও সায়ন আদিত্য-পর ব্যাখ্যা করে বলেছেন—দেবযান পথের কিরণগুলি আদিত্যরূপী হওয়ায় ওই পথের চলার সময় প্রাতঃকালীন অর্যমাকে আকাশে অরুণতম দেখায়। সেইজন্যই প্রাতঃকালীন আদিত্যকে অরুণতম দেখায়, প্রাতঃকালীন আদিত্যই অর্যমা—

দেবযান-মার্গস্য অর্চিরাদিত্যরূপত্বাত্তেন
গতো'র্যমা'রুণতমো দিবি দৃশ্যতে,
প্রাতঃকালীন আদিত্য অর্যমা
সো'রুণতমো ভবতি।

[ঋগ্বেদ ২.২৭.১;
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (Mitra) ১.১.৯.১;
তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ (চৌখাম্বা) ২৫.১২.৩, ৫;
পৃ. ৫৯৭-৫৯৮]

অর্যমাকে আদিত্যমূর্তি ধরে নিয়েই কিন্তু মহাভারতে দ্বাদশ আদিত্যের নাম তালিকায় ধাতার পরে দ্বিতীয় নামই অর্যমার। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও তাই আছে—

ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণাংশো ভগস্তথা।

বিষ্ণু পুরাণে মাধ্যাহ্নিক সূর্য 'বিষ্ণু'কে বেশি সম্মান দিয়ে তালিকাটি একটু পরিবর্তন করে বলা হয়েছে—

তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
অর্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ।

পদ্ম পুরাণেও অর্যমা আদিত্যেরই মূর্তিভেদ, কিন্তু স্কন্দ পুরাণের রেবাখণ্ডের একটি রূপক কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে, অর্যমা-রূপী আদিত্য ভাস্কর-সূর্যেরই একটা রূপ। এখানে কশ্যপের অদিতি-গর্ভজাত বারোজন পুত্র ভাস্কর-সূর্যের পদ লাভ করার জন্য নর্মদা-নদীর তীরে সিদ্ধেশ্বর তীর্থে উগ্র তপস্যা করছিলেন। এই তপস্যায় তাঁরা সিদ্ধিলাভ করলে অর্যমা-সহ বারোজন আদিত্য নিজের নিজের অংশ দিয়ে দিবাকর সূর্যকে সিদ্ধেশ্বর-তীর্থে স্থাপন করলেন।

[মহা (k) ১.৬৫.১৫-১৬; (হরি) ১.৬০.১৫-১৬;
বিষ্ণু পু. ১.১৫.১৩১-১৩২;
পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ৪০.১০০-১০১;
স্কন্দ পু. (রেবা) ১৯১.৭-১১;
কূর্ম পু. ১.১৫-১৭]

স্কন্দ পুরাণে বারো মাসের পর্যায় ক্রমে দ্বাদশ আদিত্যের পর্যায় ধরে বৈশাখ মাসের অধিষ্ঠাতা আদিত্য হিসেবে অর্যমার নাম করা হয়েছে—

উত্তিষ্ঠতি সদা হ্যেতে মাসৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ।
বিষ্ণুস্তপতি বৈ চৈত্রে বৈশাখে চার্যমা সদা॥

তবে স্কন্দ পুরাণে অর্যমাকে বৈশাখের সূর্য বললেও পণ্ডিত জনেরা ছয় ঋতুতে বারো মাস ধরে আদিত্যের যে বিভাগ করেছেন, তাতে ফাল্গুন এবং চৈত্রের মধ্যে সমাহিত বসন্ত ঋতুর আদিত্য হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে অর্যমাকে। পুরাণ-মতে অর্যমা নাকি তিন শত-সহস্র অথবা তিন লক্ষ সূর্য-কিরণের দ্বারা দীপিত হন—

দীপ্যতে গোসহস্রেণ শতৈশ্চ ত্রিভিরর্যমা।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস) ১০.৬২-৬৬;
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বেদের দেবতা
এবং কৃষ্টিকাল, পৃ. ১১৫. ১১৬;
Sukumari Bhattacharji.
Indian Theogony, pp. 219-220]
[মৎস্য পু. ১৪১.৭০]

অর্যমা$_2$ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। ঋগ্বৈদিককালে প্রাথমিক গণনায় ছয়জন আদিত্যের নাম পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণগ্রন্থের কালে আটজন, মহাকাব্য-পুরাণের যুগে এসে

আদিত্যের সংখ্যা বারো। কিন্তু সেই ঋগ্‌বৈদিক কাল থেকেই আদিত্যদের অন্যতম অর্যমা। অর্যমা আদিত্য সূর্যেরই এক রূপ। ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রাতঃকালীন সূর্যকে অর্যমা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *[দ্র. অর্যমা$_১$]*

আদিত্য বা সূর্য এই সংসারে আলোকের উৎস, তেজের উৎস। মহাকাব্য পুরাণে সূর্য মূলত তেজের আধার বলেই কখনো বা নারায়ণস্বরূপ বলে বর্ণিত হয়েছেন, কখনো তাঁকে রুদ্রশিবস্বরূপ বলা হয়েছে। মহাদেবের এই সূর্যস্বরূপতার কারণেই আদিত্য-সূর্যের অন্যতম রূপ অর্যমাও নামেও তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৫; (হরি) ১৩.১৬.১০৫]

অর্যটী ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন জনপদ।

[পদ্ম পু. (নবভারত). স্বর্গ. ৩.৪৬]

অর্হ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৬; (হরি) ১৩.১২৭.১০৬]

অর্হৎ ভাগবত পুরাণের বিবরণে কলিযুগে কোঙ্ক-বেঙ্ক প্রভৃতি জনপদে অর্হৎ নামে এক ব্যক্তির রাজত্বকালের উল্লেখ আছে। এই অর্হৎ অধর্মাচারী, মন্দবুদ্ধি রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে পুরাণে। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, সত্যযুগে রাজর্ষি ঋষভদেব শেষ জীবনে এই কোঙ্ক, বেঙ্কট এবং কূটক দেশে আজগরবৃত্তি অবলম্বন করে চতুরাশ্রম বর্জিত অবস্থায় বসবাস করেছিলেন। কলিযুগে সে দেশের রাজা অর্হৎ ঋষভদেবের এই জীবনকথা শ্রবণ করেন এবং এমন চতুরাশ্রম বর্জিত আচরণকেই তিনি সাধারণের পালনীয় ধর্ম বলে মনে করেন। রাজা অর্হৎ নিজেও পালনীয় আশ্রমধর্ম ত্যাগ করেন এবং আশ্রমধর্ম ত্যাগ করাই প্রকৃত ধর্ম—এ কথা প্রচার করতে থাকেন।

পৌরাণিক এই কাহিনী পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, অর্হৎ বলতে সাধারণত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বোঝানো হয়। পৌরাণিক ভাবনায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষবশতই সম্ভবত অর্হৎ নামে অধর্মাচারী রাজার অবতারণা হয়েছে। বৌদ্ধরা যেহেতু চতুরাশ্রম পালন করতেন না, সেই কারণেই রাজা অর্হৎকে আশ্রমধর্ম বিরোধী প্রচারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে পুরাণে।

[ভাগবত পু. ৫.৬.৯]

অর্হণ ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান নারায়ণের দর্শন লাভের পর তাঁকে যে-সমস্ত উত্তম পার্ষদের দ্বারা পরিবৃত দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অর্হণ। অন্য পার্ষদেরা হলেন সুনন্দ, নন্দ এবং প্রবল। সুনন্দকে সাত্বত-বংশীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্যতম বলায় এই ধারণা গভীর হয় যে, অর্হণও সাত্বতবংশীয়দেরই কেউ হবেন। এখানে ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠ-দর্শন কৃষ্ণবসতি দ্বারকার প্রতিফলনে নির্মিত।

[ভাগবত পু. ২.৯.১৫; ১.১৪.৩২]

অলঙ্কার$_১$ দানের সামগ্রী হিসেবে পুরাণে অলঙ্কারের অনেক মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। অলঙ্কার অর্চিত অবস্থায় দেবতাকে দান করতে হয়। ভূষণ-দান চতুর্বর্গ-ফলপ্রদ, সুখদায়ী, এবং পুষ্টি-তুষ্টি-বিধায়ক। অলঙ্কার চল্লিশ প্রকার।

[কালিকা পু. ৬৯.১৮-৩৭]

□ দানের সামগ্রী হিসেবে অলঙ্কার এই সংকেত দেয় যে, মানুষের কাছে অলঙ্কার কতটা কাম্য ছিল। চতুর্বেদে 'অলঙ্কার' শব্দটা পাওয়া যায় না, কিন্তু 'অরংকৃত', অরংকৃতি শব্দ পাওয়া যায়। 'র' আর 'ল'-এর অভেদে 'অলং' শব্দ দূরগত নয়। ফলে 'অরংকৃত' এবং 'অরংকৃতি' অলঙ্কারই বোঝায়। বেদে নানা অলঙ্কারে শোভিত মরুদ্‌গণকে দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে অলঙ্কার বলতে একটি লোক প্রচলিত শব্দের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি, তার নাম 'অঞ্জি'। বিচিত্র অলঙ্কারে মরুদ্‌গণ এখানে শোভিত এবং তাঁর গলায় সুন্দর একটি হার, যার নাম রুক্ম—

চিত্রৈরঞ্জিভির্বপুষে ব্যঞ্জতে/
বক্ষঃসু রুক্মাঁ অধি যেতিরে শুভে।

অলঙ্কার শব্দের প্রথম প্রাচীন ব্যবহার পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে—

অঞ্জনাভ্যঞ্জনে প্রথচ্ছত্যেষ হ মানুষো'লংকারঃ।

চতুর্বেদে 'অলঙ্কার' শব্দটা না থাকলেও অলঙ্কার ছিল না, এটা হতেই পারে না, আবার শতপথ ব্রাহ্মণে চোখের কাজল কিংবা পায়ে লাগানো চন্দন পঙ্ককেও মানুষের ব্যবহার্য্য অলঙ্কার বলা হল। কিন্তু অলঙ্কার বস্তুটা যে বাহ্য অলঙ্কারও বটে সেটা শতপথ ব্রাহ্মণের একটা শব্দ থেকে প্রমাণ হয়। বালির ওপর সূর্যকিরণ বা অগ্নিকণার প্রতিবিম্বপাতে যে চাকচিক্য তৈরি হয়—

সিকতভিরনুবিকিরতি ইতি অলংকারো নু এব।

আর উপনিষদে বাইরের অলঙ্কার এতটাই প্রচলিত এবং অভীষ্ট যে, মৃত্যুর পর পরলোকে ব্যবহারের জন্য শবদেহের সঙ্গে বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়ে দেবার রীতি তৈরি হয়েছে। অথর্ববেদে প্রেত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলা এই সোনার আংটি তোমার পিতা পরেছিলেন, তুমিও এটা পরো—

ইদং হিরণ্যং বিভৃহি যত্তে পিতাবিভঃ পুরা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সেটা আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—প্রয়াত ব্যক্তির শরীর বসন অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে—

প্রেতস্য শরীরং বসনোলংকারেণ সংস্কুর্বন্তি।

[ঋগ্বেদ ১.২.১; ১.১৪-৫; ৭.২৯.৩;
৮.৪.১৭; ১.৬৪.৪;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১৩.৮.৪.৭; ৩.৫.১.৩৬;
অথর্ববেদ (Roth and Whimey), ১৮.৪.৫৬, পৃ. ৩৫০;
ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৮.৮.৫]

☐ ছান্দোগ্য উপনিষদেই আমরা প্রথমে একটা গয়নার নাম পাই, যার নাম নিষ্ক। পরবর্তী সময়ে নিষ্ক বিশেষ একটি মুদ্রামান হিসেবে ব্যবহৃত হলেও রৈক্ক ঋষির সঙ্গে রাজা জানশ্রুতির কথোপকথন থেকে প্রমাণ হয় যে, রাজা গয়না হিসেবেই নিষ্ক দিয়েছিলেন এবং শঙ্করাচার্যের মতো মহাপণ্ডিত নিষ্ক শব্দের অর্থ করেছেন—

নিষ্কং কণ্ঠহারম্।

নিষ্ক দিয়েই যে সোনার গয়না বানানো হত, অথবা নিষ্ক নিজেই যে সোনার হার হিসেবে ব্যবহার হত, তা মহাভারত থেকেই প্রমাণ হয়ে যায়। বনে যাবার আগে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যে বৈভব ছিল, তার বর্ণনা করতে গিয়ে দ্রৌপদী বলেছেন—যুধিষ্ঠিরের যে শত শত দাসী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে তাদের সকলের গলায় ছিল নিষ্কহার, হাতে ছিল শঙ্খের কেয়ূর। তারা সকলেই ছিল অলংকৃত এবং তাদের আভরণে ছিল সোনা আর মণির বাহার।

শতং দাসীসহস্রাণি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলংকৃতাঃ॥
সনীন্ হেম চ বিভ্রত্যো নৃত্যগীতবিশারদাঃ।

অলঙ্কারের মধ্যে সোনার হার, সোনার দুল এবং বিভিন্ন সমুদ্র-পত্তন থেকে আমদানী করে আনা সাদা মণি-রত্নের ব্যবহার (সম্ভবত মুক্তো, হীরে) মেয়েদের মধ্যে চালু ছিল—

সুবর্ণমালাং বাসাংসি কুন্তলে পরিহাটকে।
নানা-পত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নে চ শোভনে॥

[ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৪.২.১;
মহা (k) ৩.২৩৩.৪৬-৪৭; ১.৭৩.২-৩;
(হরি) ৩.১৯৬.৪৪-৪৫; ৩০; ১.৮৭.২-৩]

পুরুষেরাও কানে দুল পরতেন এবং সেটা সোনার কুণ্ডল। রাজা সৌদাসের পত্নী মদয়ন্তীর কুণ্ডল ছিল রত্ননির্মিত।

[মহা (k) ১৪.৫৮.৩; (হরি) ১৪.৭৪.৩]

☐ রামায়ণে অলঙ্কারের ব্যবহার বেশি মাত্রায় উল্লিখিত। সোনার অন্তত এগারো বারো রকমের পর্যায় শব্দই পাওয়া যায় রামায়ণে—কাঞ্চন, কর্তস্বর, চামীকর, জাম্বূনদ, তাপনীয়, মহারজত, রুক্ম, সুবর্ণ, হাটক, হিরণ্য, হেম ইত্যাদি। আবার মণিরত্নের মধ্যেও প্রবাল, বৈদূর্য্য, ইন্দ্রনীল, মহানীল, বজ্র, বিদ্রুম, স্ফটিক ইত্যাদি মণিরও নাম রামায়ণে বহুল উল্লিখিত। এই নামগুলি মহাভারতেও আছে। ফলে এই দুই মহাকাব্য জুড়েই অলঙ্কারের ব্যবহার স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রচলিত অঙ্গসজ্জার উদাহরণ তৈরি করে। রাজাদের মাথায় মণিমুক্তা-খচিত মুকুট, তেমনই কিরীটও এক মস্তক-ভূষণ। রামায়ণ-মহাভারত থেকে মুকুট আর কীরিটের শ্লোকনির্দেশ করার কোনো অর্থ নেই, এতটাই বেশি সে উদাহরণ। অর্জুনের একটা নামই কিরীটী। রামায়ণে অযোধ্যার অভিজাত মানুষদের এমন কেউ ছিলেনই না যাঁরা মুকুট পরতেন না মাথায়, কিংবা দুল পরতেন না কানে। অঙ্গদ, নিষ্ক এবং হস্তাভরণ সম্ভবত আভিজাত্যের সাধারণ অঙ্গ ছিল—

নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাপ্য নঙ্গদ-নিষ্কধৃক্।
নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে নাপ্যনাত্মবান্॥

[রামায়ণ ১.৬.১০-১১; ৩.৩৮.২;
মহা (k) ১.১৮৭.১, ১৭, ১৯;
(হরি) ১.১৮০.১, ১৭, ১৯]

☐ রামায়ণে লঙ্কাপুরে রাক্ষস রমণীদের কানে ছিল বজ্রমণি, ছিল হীরকখচিত বৈদূর্য্যখচিত কুণ্ডল—

বজ্র-বৈদূর্য্যগর্ভাণি শ্রবণান্তেষু যোষিতাম্।

আর মহাভারতে রাজারা স্বয়ংবর-সভায় মণি-কুণ্ডল ধারণ করে আছেন—

সর্বে প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।

[মহা (k) ৩.৫৭.৪; (হরি) ৩.৪৭.৪;
রামায়ণ ৫.১০.৩২-৩৩]

☐ বিভিন্ন অলঙ্কারের বহুতর প্রকার পুরাণগুলিতেও বর্ণিত। ভাগবত পুরাণে দধিমন্থনের সময়ে তাঁর হাতের কাঁকন এর কুণ্ডলের কম্পন কবিত্বের ভাবনায় প্রকাশিত—

শ্রমভুজ-চলৎ কঙ্কনৌ কুণ্ডলে চ।

এবং সে কবিত্ব আরও বেড়েছে 'রাসরসারম্ভী' কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গোপরমণীরা যখন 'কেহ কাহুক পথ না হেরি' ছুটে যাচ্ছেন—

স যত্র কান্তো জব-লোলকুণ্ডলা।

বস্তুত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে যত অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায় এবং যেসব পরা হত বলে অনুমান করা যায় তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় নাট্যশাস্ত্রে। ভরত শরীরের অলঙ্কারকে চার ভাগে ভাগ করেছেন— (১) আবেধ্য, যা বিঁধিয়ে পরতে হয় যেমন কানের দুল, নাকের নথ, (২) বন্ধনীয়, যা বেঁধে নিতে হয়, যেমন শ্রেণিসূত, অঙ্গদ ইত্যাদি, (৩) প্রক্ষেপ্য, অর্থাৎ পরার পরে আবার খুলে রাখা যায়, যেমন নূপুর, অঙ্গবস্ত্র, এবং (৪) আরোপ্য, যা সঠিক জায়গায় ন্যস্ত করতে হয়, যেমন হার, কেয়ূর ইত্যাদি। পুরুষদের অলঙ্কারের কথাও ভরত সবিস্তারে বলেছেন।

[ভাগবত পু. ১০.৯.৩; ১০.২৯.৪; ১০.৩৩.১৫, ২০; নাট্যশাস্ত্র (GOS) ২১.১২-২৬]

অলঙ্কার$_{২}$ বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সঙ্গীতের অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। গীতালঙ্কারের সংখ্যা অন্তত তিনশ। এই সঙ্গীতালঙ্কারের সংজ্ঞা হল—স্ব-স্ব-অনুগুণ বর্ণ-পদ সমূহের যোগ। পদ-বাক্যের যোগেই সঙ্গীতালঙ্কার অভিব্যক্ত হয়—

অলংকারাস্তু বক্তব্যাঃ স্বৈ স্ববর্ণৈ প্রহেতবঃ।
সংস্থান-যোগৈশ্চ তদা পদানাং চান্ববেক্ষয়া॥
বাক্যার্থ-পদ-যোগার্থৈরলংকরস্য পূরণম্।

গীতবস্তুর স্থান তিনটি—বক্ষ, কণ্ঠ এবং মস্তক। সঙ্গীত-ভাবুকদের মতে বর্ণ চার রকমের—স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহণ এবং অবরোহণ। একইভাবে যেখানে স্বর-সুরের সঞ্চরণ ঘটে, সেটা স্থায়ী। নানা আকারে যার সঞ্চরণ, তার নাম সঞ্চারী। যার গতি নীচের দিকে সেটা অবরোহণ আর যার গতি ওপরের দিকে তার নাম আরোহণ। এই যে স্থায়ী, সঞ্চারী ইত্যাদি বর্ণের কথা বলা হল, তারই বর্ণ, স্থান এবং প্রয়োগ-বিশেষ অনুযায়ী কলা-মাত্রা প্রমাণ ঠিক রেখে তিরিশ রকমের অলঙ্কার প্রয়োগ হয় এবং সেই অলঙ্কারের সাধারণ বিভাগ চারটি। তাদের নাম—স্থাপনী, ক্রমরেজিনী, প্রমাদ এবং অপ্রমাদ। সংস্থান, প্রমাণ, বিকার এবং লক্ষণ—অলঙ্কারের প্রয়োজন এই চারটি।

মানুষের শরীরে পরা অলঙ্কার যেমন শরীরের শোভা বৃদ্ধি করে, তেমনই সময় এবং স্থান বুঝে অলঙ্কারের প্রয়োগও সঙ্গীতবর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। উলটো দিকে অলঙ্কার যদি অযথা অস্থানে বিন্যস্ত হয়—যেমন পায়ে যদি কানের দুল পরা যায়, কিংবা কণ্ঠে কাঞ্চীদাম—তাহলে যেমন উৎকর্ষের বদলে অপকর্ষ তৈরি হয়, তেমনই সঙ্গীতালঙ্কারেও এই ধরনের বিপর্যয়ও সঙ্গীতের অপকর্ষ ঘটায়। অতএব গায়ক সঙ্গীতের নির্দিষ্ট বিহিত কালে পূর্ব বিধান অনুযায়ী রাগ প্রদর্শন করতে-করতে যথাস্থানে অলঙ্কার প্রকটন করবেন—

এবমেব হ্যলংকারো বিপর্য্যস্তো বিগর্হিতঃ॥
ক্রিয়মানো'প্যলংকারো রাগং যশ্চৈব দর্শয়েৎ।
যথোদ্দিষ্টস্য মার্গস্য কর্তব্যস্য বিধীয়তে॥

[বায়ু পু. ৮৭.১-২৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬২.২-২৩]

অলঙ্কার$_{৩}$ সংস্কৃত রসশাস্ত্র এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে অলঙ্কার সম্বন্ধে যে বিস্তারিত, বহুল কাব্যালঙ্কারের বিষয়ে আলোচনা আছে, সেই বিচারে কখনোই আমাদের পুরাণগুলিতে কোথাও অলঙ্কারের তেমন আলোচনা নেই। কিন্তু অগ্নি পুরাণে যেখানে বিচিত্র শাস্ত্রীয় ভাবনা পরতে পরতে উঠে আসছে, সেইখানে অর্থালঙ্কারের কথা বেশ সযৌক্তিকভাবে উচ্চারিত হয়েছে। পরবর্তী কালে আলঙ্কারিকরা যখন বলবেন—

কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারণ্ প্রচক্ষতে।

সে-কথা যেন অনুধ্বনিত হয় অগ্নি পুরাণে—অর্থের অলঙ্করণই অলঙ্কার। লক্ষণীয়, প্রথাগত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতো অগ্নি পুরাণ কিন্তু শব্দালঙ্কারের কথা বললই না, বরঞ্চ বলল—অর্থালঙ্কার ছাড়া শব্দের সৌন্দর্যও তৈরি হয় না—

অলংকরণমর্থানাম্ অর্থালংকার ইষ্যতে।
তং বিনা শব্দসৌন্দর্যমপি নাস্তি মনোহরম্॥

অর্থালঙ্কার ছাড়া শব্দ-সরস্বতীকে আভরণহীন বিধবার মতো লাগে, অতএব অগ্নিপুরাণ প্রায়

আলঙ্কারিক গ্রন্থগুলির মতোই বিভিন্ন অলঙ্কারের নাম করেছে এবং সেইসব অলঙ্কারের লক্ষণও নির্ণয় করেছে। বিখ্যাত অলঙ্কারগুলির মধ্যে উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি, বিভাবনা, বিরোধ, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস স্বভাবোক্তি ইত্যাদির লক্ষণ নিরূপণ করার পর, ঠিক পরের অধ্যায়ে ঔচিত্য, বাচ্যার্থ, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় আলোচনা থাকায় কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ বিষয়ে রস-ভাবনার সঙ্গতি লক্ষ্যিত হয় অগ্নি পুরাণে।

[অগ্নি পু. (Joshi) ২য় খণ্ড, অধ্যায় ৩৪৪ এবং ৩৪৫]

অলক$_{১}$ একজন ঋষি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে শ্রুতর্ষি বা বেদজ্ঞ ঋষি হিসেবে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.৪]

অলকা কৈলাস পর্বতে গন্ধমাদন গিরিশ্রেণীর উপর অবস্থিত যক্ষনগরী। এটি কুবেরের রাজধানী। রাবণ কর্তৃক বিতাড়িত লঙ্কা থেকে হয়ে কুবের কৈলাসের কাছে অলকাপুরী প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বসবাস শুরু করেন। এই পুরীতেই অলকা নামে একটি পদ্মফুলে ভরা সরোবর রয়েছে।

[মহা (k) ৩.১৬০.৩৭-৩৮; ২.১০.৮; ৩.২৬০.১৩;
(হরি) ৩.১৩৩.৩৭-৩৮; ২.১০.৮; ৩.২২৯.১৩;
রামায়ণ ৭.১১.১-৫০; বায়ু পু. ৪৭.১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.১-২; ২.৭.১৬৩;
ভাগবত পু. ৪.৬.২৪]

☐ মহাভারতের বনপর্ব ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অলকাপুরীর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। পরশুরাম কার্তবীর্য্য এবং তাঁর পুত্রদের ও অনান্য বহু নরপতি নিধনের পর গন্ধমাদনপর্বতস্থিত এই নগরীতে এসেছিলেন। পাণ্ডবরাও একবার এখানে এসেছিলেন। পুরাণ ও মহাভারতের বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে, সমগ্র নগরীটি ছিল বহু অট্টালিকা ও মণি-মুক্তা খচিত সেখানে চারদিকে স্বর্ণপ্রাচীর পরিবৃত মনোরম উদ্যান ও জলাশয়ের প্রাচুর্য্য ছিল লক্ষণীয়। অলকানগরীকে বেষ্টন করে প্রবাহিতা অলকানন্দা নদীর জল ছিল সুমিষ্ট। সমগ্র নগরীটি পক্ষীকুলের কলকাকলিতে পূর্ণ ছিল। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের গান এখানে সর্বদাই শোনা যেতো। *[মহা (k) ৩.১৬০.৩৮-৪১;*
(হরি) ৩.১৩৩.৩৮-৪১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪১.১৮-২৪]

☐ পুরাণ ও মহাভারত থেকে জানা যায়, পুরূরবা ও উর্বশী এই নগরীতেই মিলিত হয়েছিলেন। আবার রাজা যযাতিও অপ্সরা বিশ্বাচীর সঙ্গে এখানেই মিলিত হন।

[মহা (k) ১.৮৫.৯; (হরি) ১.৭৩.৯;
বায়ু পু. ৪৭.১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৬]

☐ মহাভারত ও পুরাণ মতে অলকাপুরী কৈলাসের নিকট গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিত ছিল। কালিদাসের রচনাতেও এই প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে অলকা উত্তরকুরু অঞ্চলের একটি নগরী ছিল। আবার অনেকে মনে করেন বদ্রীনাথের অনতিদূরে বসুধারা জলপ্রপাতের কয়েক মাইল পশ্চিমে ভাগীরথী ও শতপন্থ হিমবাহদুটির কাছাকাছি কোনো স্থানে প্রাচীন অলকাপুরী অবস্থিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অলকাপুরী নামে একটি হিমবাহ হিমালয়ের বালাকুন শৃঙ্গের পাদদেশে দেখা যায়। এই হিমবাহটি থেকেই অলকানন্দার উৎপত্তি।

[EAIG (Kapoor) p. 27; S.N. Nair;
The Holy Himalayas; p. 69;
J.C. Agarwal & S.P. Agarwal;
Uttarakhand: Past, Present and Future; p. 223]

অলকাতীর্থ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। প্রথমে পরিমিত আহার করে পরে উপবাস করলে ওই তীর্থের মাহাত্ম্যবলে ব্রহ্ম-হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এটির আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

[কূর্ম পু. ২.৪০.৩৭]

অলকানন্দা এই নদীর নামেই একটি তীর্থের নাম। এই নদী স্বর্গে অবস্থিত বলে কথিত আছে। বিষ্ণুপদ থেকে মন্দাকিনীর উৎপত্তি। মেরুপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পরে একই মন্দাকিনী গতি ভেদে চারটি নামে পরিচিত হন। তার একটি নাম অলকানন্দা। বিষ্ণু-পাদপদ্ম থেকে বেরিয়ে গঙ্গা প্রথমে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হলেন। তারপর চার ভাগে ভাগ হয়ে চারদিকে প্রবাহিত হলেন। তারই এক ভাগের নাম অলকানন্দা।

[বিষ্ণু পু. ২.৮.১০৯; ২.৩-৩২]

গঙ্গার যে প্রবাহ দেবলোকে প্রবাহিত, সেটাই অলকানন্দা নামে পরিচিত।

[মহা. (k) ১.১৭০.২২; (হরি) ১.১৬৩.২১]

পণ্ডিতদের মতে বিষ্ণুগঙ্গা (ধবল গঙ্গা বা ধৌলি) এবং সরস্বতী এই নদী দুটির মিলনের ফলে যে অতিরিক্ত জলধারার সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকেই অলকানন্দার উৎপত্তি, এই নদী গাড়োয়াল হিমালয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ক্যাপ্টেন রেপার এই নদী আবিষ্কার করেন বদ্রীনাথ থেকে সামান্য দূরে। এর উৎসমুখে একটি জলপ্রপাত রয়েছে যার নাম বিষ্ণুধারা। এই নদীটির তীরে গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর অবস্থিত। পরবর্তী কালে গঙ্গার মাহাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় এটাও বলা হয় যে, এটি গঙ্গারই একটি প্রবাহ, যা সাতটি পৃথক ভাগে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। আবার অন্যমতে গঙ্গা নদী পৃথিবীতে প্রবেশের পর অলকানন্দা নামে পরিচিত হয়েছে, পরে ভাগীরথী দেবপ্রয়াগে এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই যৌথ ধারাই আবার গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়েছে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে অলকানন্দা পাঁচটি পবিত্র স্থলে পৃথক নদীর সাথে মিলিত হয়েছে যথা— দেবপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ (পিণ্ডার নদীর সাথে), রুদ্রপ্রয়াগ (মন্দাকিনী নদীর সাথে) ও বিষ্ণুপ্রয়াগ। স্থানভেদে এই নদী অলকানন্দা নামেও পরিচিত।

[বায়ু পু. ৪১.১৮; বিষ্ণু পু. ২.৯.২০৯;
কূর্ম পু. ১.৪৬.৩১; বিষ্ণু পু. ৩.৮.১১৪;
নারদ পু. ২.৬৬.৪; ভাগবত পু. ৫.১৭৫; ৪.৩.২৪;
U.P. Gazetteer for Garhwal
VOL. XXVI. pp. 2 and 140.]

অলতা ইরার কন্যা। তাঁকে পুরাণে বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের মাতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৬০-৪৬১]

অলব্ধ পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোষ্ঠী-প্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি অলব্ধের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি বশিষ্ঠ বংশীয় অন্যতম বংশ প্রবর্তক ছিলেন।

[মৎস্য পু. ২০০.৩]

অলম্বতীর্থ একটি অলৌকিক তীর্থ। স্বর্গীয় এই তীর্থের বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কথিত আছে গরুড় অতিবিশাল গজ এবং কচ্ছপকে ভক্ষণ করার জন্য বসার জায়গা সন্ধান করতে করতে এই তীর্থে এসে উপস্থিত হন। রামায়ণে এই স্থানটি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বলে উল্লিখিত আছে। এখানে সুভদ্র নামে একটি বহুযোজন বিস্তৃত বিশাল বটবৃক্ষ অবস্থিত ছিল। এই বটবৃক্ষটি গরুড়কে নিজের শাখায় বসার জন্য আমন্ত্রণ করে। কিন্তু শাখাটি এই বিশালাকায় পক্ষীর ভারবহনে অসমর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে।

[দ্র. গরুড়]

সীতা হরণের লক্ষ্যে লঙ্কা থেকে পঞ্চবটী বনে আসার সময় রাবণ গরুড়ের পদচিহ্নযুক্ত এই বটবৃক্ষটি দর্শন করেন।

[মহা (k) ১.২৯.৩৮-৪৪; (হরি) ১.২৪.৪০-৪৮;
রামায়ণ ৩.৩৫.২৭-৩৩]

অলম্বাক্ষী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অলম্বাক্ষী সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২২]*

অলম্বুষ একজন রাক্ষস। বক রাক্ষসের ভাই। ভীম বক রাক্ষসকে বধ করায় পাণ্ডবদের সঙ্গে অলম্বুষের পূর্ব-বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাই অলম্বুষকে কৌরবদের পক্ষে যোগদান করতেই দেখা যায়। অলম্বুষকে মহাভারতে একাধিকবার আর্ষশৃঙ্গি বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ নামক কোন রাক্ষসের পুত্র ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষের বিভিন্ন বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে অলম্বুষের যুদ্ধ হয়। সাত্যকিকে বাণ বিদ্ধ করে, অর্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা সাত্যকির ধনুচ্ছেদন করেন অলম্বুষ। সাত্যকিও অলম্বুষের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলে, অলম্বুষ রাক্ষসী মায়া প্রকাশ করে সাত্যকির ওপর বাণ বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত ক্ষুরধার বাণে আহত হয়েও সাত্যকি ঐন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ করেন। অলম্বুষ যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যান।

[মহা (k) ৬.৮৩.৩৯-৪৫; (হরি) ৬.৭৯.৩৯-৪৫]

□ এরপর অলম্বুষ উলূপীর গর্ভজাত পুত্র ইরাবানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। শকুনির অন্যান্য ভ্রাতা এবং কৌরবপক্ষের অন্যান্য সৈন্যদের ইরাবান হত্যা করলে দুর্যোধন ইরাবানকে বধ করার জন্য অলম্বুষকে প্রেরণ করেন। ইরাবানের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক যুদ্ধ হয়। অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হয়ে ইরাবানের ওপর মায়া বিস্তার করলেন। ইরাবান দেখলেন যে তাঁর মাতৃবংশের বিভিন্ন নাগ উপস্থিত হয়েছে। ইরাবান তখন বিশালাকার মূর্তি ধারণ করে নাগদের দ্বারা অলম্বুষকে আবৃত করলে, অলম্বুষ গরুড়ের রূপ ধারণ করে

নাগদের ভক্ষণ করতে লাগলেন। সেই নাগদের ভক্ষিত হতে দেখে ইরাবান বিচলিত হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে অলম্বুষ তরবারি দিয়ে তাঁর মস্তক ছেদন করেন। ইরাবানের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৬.৯০.৪৮-৭৭; (হরি) ৬.৮৭.৪৭-৭৫]

☐ এরপর অলম্বুষকে দ্রোণপর্বে ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখতে পাই। দ্রোণপর্বে বলা হয়েছে, পূর্বে রাম-রাবণের যেরকম যুদ্ধ হয়েছিল, ভীম ও অলম্বুষের মধ্যে সেইরকম ভয়ানক যুদ্ধ হতে লাগল। ভীমসেন অলম্বুষকে বাণবিদ্ধ করলে সেই রাক্ষস গর্জন করতে করতে ভীমের অনুগামী প্রায় তিনশ রথীকে বধ করে ক্রমাগত ভীমসেনকে বাণবিদ্ধ করতে থাকেন। এর ফলে ভীম চৈতন্য হারান। পরে চেতনা লাভ করে তিনি আবার রাক্ষস অলম্বুষকে আক্রমণ করেন।

অলম্বুষের ভাই বক-রাক্ষসকে যে ভীম বধ করেছিলেন—একথা সেই মুহূর্তে অলম্বুষের মনে পড়ায় তিনি ভীমকে বলেন—আজ তুই আমার পরাক্রম দেখ। তুই যে আমার ভাই বককে বধ করেছিলি, সেইসময় আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। আজ তুই আমার পরাক্রম দেখ—এই কথা বলে অলম্বুষ আকাশে উঠে গিয়ে শূল, পট্টিশ, খড়্গ, তোমর, বজ্র প্রভৃতি অস্ত্র ভীমের ওপর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেই নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের আঘাতে ভীমের সৈন্যরা নিহত হল। পাণ্ডব সৈন্যদের পায়ে দলে তাঁদের হত্যা করতে লাগলেন অলম্বুষ। ভীমসেন তখন ত্বাষ্ট্র অস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই অস্ত্র প্রয়োগ করার ফলে অলম্বুষের মায়াজাল বিনষ্ট হয় এবং তিনি আক্রান্ত হন। তখনকার মত রণে ভঙ্গ দিয়ে অলম্বুষ দ্রোণের সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেন।

*[মহা (k) ৭.১০৬.১৬; ৭.১০৮.১৩-৪৪;
(হরি) ৭.৯১.১৬; ৭.৯২.৫২-৮১]*

☐ পাণ্ডবপক্ষ থেকে ঘটোৎকচ, অলম্বুষকে আক্রমণ করলে দুই রাক্ষসের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। ঘটোৎকচ অলম্বুষকে প্রথমে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলেন। তারপর ঘটোৎকচ তাঁর বাহুদ্বয়ের সাহায্যে অলম্বুষকে তুলে ধরে বার বার ঘুরিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেন। অলম্বুষ ঘটোৎকচের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৭.১০৯.১-৩১; (হরি) ৭.৯৩.১-২৯]

অলম্বুষা কশ্যপের ঔরসে মুনির গর্ভজাত (মহাভারত অনুসারে, প্রাধার গর্ভজাত) একজন অপ্সরা। মৌনেয় নামে বিখ্যাত ষোলোজন গন্ধর্বের অধীনস্থ চৌত্রিশজন অপ্সরাদের মধ্যে অলম্বুষা অন্যতম। নৃত্য ও গীত যেহেতু অবিচ্ছেদ্য, তাই বায়ু পুরাণে এই অপ্সরাদের নৃত্যগুরু গন্ধর্ব-কুলের অধীনস্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[মহা (k) ১.৬৫.৫০; (হরি) ১.৬০.৫১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৬; ৩.৩৩.১৮;
বায়ু পু. ৬.৯.৫]*

☐ সূর্য বংশীয় ইক্ষ্বাকুর ঔরসে অলম্বুষার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাঁর নাম বিশাল—

অলম্বুষায়াম্ উৎপন্নো বিশাল ইতি বিশ্রুতঃ।

কিন্তু এই বিশাল বস্তুতর পুরাণগুলির মধ্যে মরুত্তবংশীয় তৃণবিন্দুর পুত্র বলে কথিত হয়েছেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে—তৃণবিন্দুর ঔরসে অলম্বুষার গর্ভে ইলবিলার জন্ম হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ বলেছে—ইলবিলা নামে তৃণবিন্দুর কন্যাটি পূর্বেই ছিল, হয়তো প্রথাসম্মত রাজ্ঞীর গর্ভেই কন্যা ইলবিলার জন্ম হয়েছিল। পরে অলম্বুষার মতো সুন্দরী অপ্সরা তৃণবিন্দুর প্রণয়-প্রত্যাশী হলে অলম্বুষার গর্ভে তাঁর পুত্র বিশাল জন্মগ্রহণ করেন—

তঞ্চালম্বুষা নাম বরাপ্সরা তৃণবিন্দুং ভেজে।
তস্যামসা বিশালো জজ্ঞে।

*[রামায়ণ ১.৪৭.১১-১২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৩৬-৩৭;
বিষ্ণু পু. ৪.১.১৮; ভাগবত পু. ৯.২.৩১-৩৩]*

☐ রামচন্দ্রের সঙ্গে চিত্রকূট পর্বতে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় ভরত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে রাত্রিবাসের জন্য অবস্থান করেন। ভরদ্বাজ মুনি ভরত এবং তাঁর বহুসংখ্যক সেনাদের অলৌকিকভাবে অতিথি সৎকার করার সময় যেসব অপ্সরাগণকে আহ্বান করেছিলেন অলম্বুষা তাদের মধ্যে একজন। ভরদ্বাজের আদেশে মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা—এই তিন অপ্সরার সঙ্গে অলম্বুষা ভরতের সামনে নৃত্য পরিবেশন করেন। *[রামায়ণ ২.৯১.১৭, ৪৭]*

☐ অর্জুনের জন্মের পর যে আঠাশ জন অপ্সরা সম্মিলিতভাবে নৃত্য করেছিলেন অলম্বুষা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.১২৩.৬১; (হরি) ১.১১৭.৬৫]

☐ দধীচির গুরুতর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য অলম্বুষাকে পাঠিয়েছিলেন। সরস্বতী নদীতে তর্পণ করার সময় দধীচি অলম্বুষার শরীর-বিভঙ্গ দেখে কামনায় আকুল হয়ে পড়েন এবং সরস্বতী নদীতেই তাঁর বীর্য্য পতিত হয়। সরস্বতী সেই বীর্য্য গর্ভে ধারণ করেন এবং একটি পুত্রের জন্ম দেন। সময়কালে সরস্বতী সেই পুত্রকে দধীচি মুনির হাতে দেন। তাঁর নাম হয় সারস্বত।

[মহা (k) ৯.৫১.৫-২০; (হরি) ৯.৪৭.৫-২০]

☐ কুবেরের অলকাপুরীতে অষ্টাবক্রকে স্বাগত জানানোর জন্য কুবেরের নির্দেশে অন্য অপ্সরাদের সঙ্গে অলম্বুষাও নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন।

মহাভারতে প্রাতঃস্মরণীয়া অপ্সরা হিসেবে অলম্বুষার নাম উল্লিখিত হয়েছে একাধিকবার। তাঁকে স্মরণ করলে পাপ মুক্ত হওয়া যায় এমন কথাও বলা হয়েছে। বোঝা যায় বৈদিক যুগ থেকেই স্বর্গবেশ্যা বলে পরিচিত হলেও অপ্সরারা দেবী রূপে পূজনীয়াও ছিলেন।

[মহা (k) ৯.৫১.৭; ১৩.১৯.৪৪; ১৩.১৬৫.১৫; (হরি) ৯.৪৭.৭; ১৩.১৮.৪৪; ১৩.১৪৩.১৫]

অলর্ক১ কুবলাশ্বের (ঋতধ্বজ) ঔরসে মদালসার গর্ভে যে চারটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় তার মধ্যে কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। কুবলাশ্বের বাকি পুত্রেরা রাজধর্ম ও সংসার ধর্ম বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাই কুবলাশ্বের অনুরোধে মদালসা অলর্ককে একজন প্রজাবৎসল রাজা ও আদর্শ গৃহস্বামীর কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেন। মায়ের উপদেশ মতোই অলর্কও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করতে লাগলেন। অলর্কই তাঁর পিতার রাজ্য লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন প্রজাপালন করেন। রাজপদে অভিষিক্ত অলর্ককে মদালসাই উপদেশ দিয়েছিলেন—

বৎস রাজ্যেঽহভিষিক্তে প্রজারঞ্জনমাদিতঃ।
কর্তব্যমবিরোধেন স্বধর্মস্য মহীভৃতা॥

প্রজারঞ্জন করাই রাজার স্বধর্ম, প্রধান কর্তব্য। অন্য পুত্রদের মত আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে প্রথমেই যেমন পুত্রকে জগৎ বিমুখ করেন নি, তেমনই এই মায়িক জীবন অতিক্রম করার পথ বাতলে দিতেও ভোলেন নি মদালসা। বানপ্রস্থে যাবার আগে মদালসা তাঁর এই গৃহস্থ পুত্রের জন্য রেখে গেলেন শেষ উপদেশ, সংসারের এই মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির উপায়। নিজের যে স্বর্ণাঙ্গুরীয় তিনি আশীর্বাদস্বরূপ পুত্রকে দিয়ে গেছিলেন, তারই মধ্যে লেখা ছিল কামনার পথ ত্যাগ করে মুক্তির জন্য সাধনার-সাধুসঙ্গের উপদেশ।

অলর্কের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে এক ভ্রাতা সুবাহু। অলর্কের দীর্ঘ শাসনকাল চলার পর বনবাসী এই রাজপুত্র, ভাই-এর তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চারের বাসনায় অলর্কের শত্রুর আশ্রয় নিলেন। কাশীরাজকে দিয়ে অলর্কের কাছে সৈন্যসহ দূত পাঠালেন ও বললেন—সুবাহুকে রাজ্য প্রদান কর। স্বভাবতই অলর্ক তাতে অস্বীকৃত হলেন, তিনি বললেন—আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বয়ং প্রণয় সহকারে রাজ্য প্রার্থনা করুন, আক্রমণের ভয়ে ভূমি প্রদান করব না।

মামেবাভ্যেত্য হার্দ্দেন যাচতাং রাজ্যমগ্রজঃ।
নাক্রান্ত্যা সম্প্রদাস্যামি ভয়েনাল্পামপি ক্ষিতিম্॥

যুদ্ধ আরম্ভ হলে সামন্ত রাজা ও অনুচর-পরিজনদের চক্রান্তে অলর্ক পরাস্ত হলেন। পরাজিত বিষাদগ্রস্ত রাজা মায়ের উপদেশ স্মরণ করলেন। দীর্ঘ রাজ্যভোগের পর মদালসার লেখা শেষ উপদেশ পাঠ করে সংসার ত্যাগ করে তপস্যায় মনোনিবেশ করে তিনি সত্যের পথে স্থিত হয়েছিলেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ২৬-৪৪ অধ্যায়]*

☐ 'আমি অত্যন্ত বলশালী, আমি শক্তি এবং বলের মাধ্যমেই সব কিছু করে ফেলবো'—এইরকম ভেবে যাঁরা সত্য এবং ধর্মের ভাবনায় অধর্ম করেননি—এইরকম কয়েকজন প্রখ্যাত রাজার নাম করার সময় মার্কণ্ডেয় মুনি রামচন্দ্র, নৃগ, নাভাগ, ভগীরথের সঙ্গে বিখ্যাত অলর্ক-রাজার নাম করেন।

[মহা (k) ৩.২৫.১৩; (হরি) ৩.২২.১৩]

☐ অলর্ক তাঁর বৃহৎ ও বিপুল রাজ্য পরিত্যাগ করে যখন ব্রহ্ম ভাবনায় মনোনিবেশ করলেন, এক দার্শনিক ভাবনার উদয় হল তাঁর মনে। মানুষের শরীরে মনই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেটা আমাদের অভীষ্ট সাধন করায়। অতএব শত্রুদের ওপরে যেমন বাণ নিক্ষেপ করে শায়েস্তা করতে হয়, মনের ওপরেও সেই ভাবেই বাণক্ষেপ করা উচিত। এই ভেবে তিনি শরাঘাতে মনকে ধ্বংস করতে চাইলে তাঁর মন মূর্ত হয়ে

বলল—তোমার এই বাণ তো আমাকে মারবে না, মারবে তোমাকেই—তুমি তোমার মর্মচ্ছেদ করলে ছিন্নমর্ম হয়ে তুমি মারা যাবে। তুমি বরং অন্য কোনো বাণের খোঁজ করো, যা দিয়ে মারবে আমাকে। অলর্ক যুক্তিটা বুঝলেন। তারপর ভাবলেন—মন তো দেখা যায় না বরঞ্চ যেসব ইন্দ্রিয়গুলি দেখা যায়, যেগুলির মাধ্যমে মনের শক্তি-তাড়না অনুভব করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে আগে মারি। এইভাবে নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, কর্ণ, চক্ষু—এই ইন্দ্রিয়গুলিকে একে একে তিনি মারতে উদ্যত হলে—প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই তাঁকে জানাল—আপনার বাণে আমরা কেউই মরব না, বরঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলি একে একে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনিই মৃত্যুবরণ করবেন শেষে।

বস্তুত দার্শনিক দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের মূল যেহেতু তন্মাত্রগুলিতে নিহিত এবং তার সঙ্গে যুক্ত আছে পঞ্চভূত, তাই এগুলির বিনাশ অস্ত্রাঘাতে হয় না; আবার মন-বুদ্ধি ইত্যাদি যেহেতু আরও সূক্ষ্ম বস্তু এবং একমাত্র প্রত্যাহার-যোগের মাধ্যমেই যেহেতু বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করে মনে আহিত করা যায়, সেই মনকে আবার আহিত করা যায় বুদ্ধিতে এবং এইভাবে যেহেতু মূলা প্রকৃতিতে বিলীন করা যায় নিজেকে, তাই অলর্ক আবিষ্কার করলেন—যোগাভ্যাসই একমাত্র সেই বাণ, যার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় থেকে আরম্ভ করে অন্তঃকরণ পর্যন্ত জয় করে প্রকৃতিতে সমাহিত করা যায়। শক্তিশালী অলর্ক যোগরূপ একটি-মাত্র বাণ দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়-জয় করে পরব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করলেন—

ইন্দ্রিয়াণি জঘানাশু বাণেনৈকেন বীর্যবান্।
যোগেনাত্মানম্ আবিশ্য সিদ্ধিং পরমিকাং গতঃ॥

[মহা (k) ১৪.৩০.২-২৯; (হরি) ১৪.৩৫.২-২৯]

☐ ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয়। মহর্ষি অত্রির পত্নী ভগবান বিষ্ণুকে পুত্ররূপে চাইলে তিনি নির্দ্বিধায় অত্রি-অনসূয়ার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই অবতারে তিনি রাজা অলর্ক এবং প্রহ্লাদাদি দৈত্যকে আন্বীক্ষিকী বা তর্কযুক্তির বিদ্যা (অন্য মতে আত্মবিদ্যা) উপদেশ করেন—

আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্।

এই অলর্কই ভগবানের অনন্ত প্রভাব অনন্ত মহিমা এবং ঈশ্বরী মায়ার কথা সম্যক জানতেন বলেই সেই মায়া তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলে ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে জানিয়েছেন। *[ভাগবত পু. ১.৩.১১; ২.৭.৪৪]*

☐ অলর্কের বংশ পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন পুরাণগুলি ভিন্ন ভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেছে। কাশীরাজ প্রতর্দনের দুই পুত্র বৎস এবং গর্গ। বৎসের পুত্র অলর্ক। তিনি সন্নতির পিতা—

প্রতর্দনস্য-পুত্রৌ দ্বৌ বৎসো গর্গশ্চ বিশ্রুতৌ।
বৎসপুত্রৌ হ্যলর্কস্তু সন্নতিস্তস্য চাত্মজঃ॥

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৬৯]

বিষ্ণুপুরাণে কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে প্রতর্দনের পুত্রকেই অলর্ক বলা হয়েছে। এখানেও একভাবে তিনি বৎসের পুত্রই বটে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ইতিহাস-পরম্পরা জানিয়ে বলেছে—মহারাজ প্রতর্দনের পিতা দিবোদাস সব সময় ছেলেকে আদর করে বৎস-বৎস বলে ডাকতেন বলে প্রতর্দনের নামই হয়ে গেল বৎস। সেই বৎসের ছেলে অলর্ক অর্থাৎ তিনি প্রতর্দনেরই পুত্র; পৃথক কোনো বৎসের পুত্র নন তিনি, প্রতর্দনের পৌত্রও নন।

অলর্কের সম্বন্ধে পৌরাণিককালেই একটি প্রাচীন গাথা-প্রবাদ চালু ছিল এই মর্মে যে, পূর্বকালে অলর্ক ছাড়া আর কোনো রাজাই চিরন্তন যুবক অবস্থায় ষাট হাজার ষাট শ বছর ধরে এই পৃথিবী ভোগ করতে পারেননি—

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
অলর্কাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং যুবা॥

[বিষ্ণু পু. ৪.৮.৬, ৮]

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অবশ্য জানিয়েছে যে, অলর্ক এত বৎসর আয়ু পেয়েছিলেন অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার আশীর্বাদে—লোপামুদ্রাপ্রসাদেন পরমায়ুরবাপ্তবান্। এই পুরাণ-মতে অলর্ক বোধহয় কোনো অভিশাপও লাভ করেছিলেন কারও কাছে, কিন্তু শাপের অন্তে তিনি ক্ষেমক নামে এক রাক্ষসকে বধ করে বারাণসী নগরীতেই তাঁকে থাকতে দিয়েছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৭০-৭২;
বায়ু পু. ৯২.৬৬-৬৮; মৎস্য পু. ১৮০.৬৮-৬৯;
ভাগবত পু. ৯.১৭.৬-৮]

☐ অলর্ক প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য এক অন্ধ ব্রাহ্মণকে নিজের চোখ দুটি উপরে নিয়ে নির্দ্বিধায় দান করেছিলেন—

যাচমানে স্বকে নেত্রে উদ্ধৃত্যাবিমনা দদৌ।

কৈকেয়ী, রাজা দশরথের কাছে রামের নির্বাসন এবং ভরতের অভিষেক—এই দুই বর প্রার্থনা করলে দশরথ তাঁকে নানান যুক্তি দেখিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কৈকেয়ী তাঁকে প্রতিজ্ঞারক্ষায় কঠোর হবার জন্য ক্রমাগত প্ররোচিত করতে থাকেন; সেই প্রসঙ্গেই কৈকেয়ী রাজা অলর্কের উল্লেখ করে বলেছেন—অলর্ক-রাজা যেমন কথা দিয়ে কথা রেখেছেন, তুমিও আমাকে যে কথা দিয়েছিলে, সেই কথা রাখো। এতে বোঝা যায়—অলর্ক এক সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা ছিলেন। *[রামায়ণ ২.১২.৪৩; ২.১৪.৫]*

□ রাজা অলর্ককে যম-সভায় উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে মহাভারতের বর্ণনায়।

[মহা (k) ২.৮.১৮; (হরি) ২.৮.১৮]

□ যে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা শারদ কৌমুদ মাস অর্থাৎ কার্তিক মাসে মাংসভক্ষণ বর্জন করতেন সেই সমস্ত পুণ্যশীল রাজাদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১১৫.৭৩; (হরি) ১৩.১০০.১০২]

□ প্রথম জীবনে এক ভুবনবিজয়ী রাজা, পরবর্তী সময়ে ব্রহ্ম-সমাধি লাভ করা এক বৈরাগ্যময় পুরুষ—এই পুণ্যকীর্তিই হয়তো এই জনপ্রবাদ তৈরি করেছিল যে, সকাল-সন্ধ্যায় অলর্কের নাম নিলে বহুল পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৫২; (হরি) ১৩.১৪৩.৫০]

অলর্ক$_২$ এক অদ্ভুত কৃমিকীট, যার আকার অতিক্ষুদ্র শূকরের মতো, আটটি পা, দাঁতগুলি তীক্ষ্ণ, সূচের মতো অজস্র লোম তার গায়ে—এই কীট মহাভারতের প্রসিদ্ধ অস্ত্রবীর কর্ণকে দংশন করেছিল।

কর্ণ যখন ভার্গববংশীয় ব্রাহ্মণের পরিচয়ে পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে এসেছিলেন, তখন একদিনের ঘটনা—কর্ণ তখন পরশুরামের কাছে 'ব্রহ্মাস্ত্র' লাভ করে পরম আনন্দিত হয়ে আছেন। তারপর একদিন ক্লান্ত, উপবাস-ক্লিষ্ট পরশুরাম পরম বিশ্বস্ত শিষ্য কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ঘুম গভীর হয়েছে, এই সময়ে একটি মেদ-মাংস-রক্তভোজী ভয়ংকর কীট কর্ণের ঊরুদেশে দংশন করল। গুরুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে এই ভয়ে কর্ণ সেই ভীষণ কীটটাকে ঊরু থেকে সরিয়েও দিতে পারলেন না, কিংবা মেরেও ফেলতে পারলেন না। কর্ণের ঊরুদেশ থেকে রক্তপাত হতে আরম্ভ করল এবং সেই রক্ত পরশুরামের গায়ে চুঁইয়ে পড়তেই তিনি জেগে উঠলেন। রক্তস্পর্শের অপবিত্রতা-বোধে পরশুরাম কর্ণের কাছে ঘটনা কী ঘটেছে তা জানতে চাইলেন। কর্ণ জানালেন সব কিছু। পরশুরাম সেই শূকরাকৃতি অষ্টাপদ কীটটিকে দেখতে পেলেন। এই কীটের নাম অলর্ক। পরশুরামের তেজোদৃষ্টিতেই রক্তসিক্ত সেই কীট মারা গেল এবং দেখা গেল, সেই কীট ভীষণ এক রাক্ষসে রূপান্তরিত হল। পরশুরাম তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে, পূর্বজন্মে সে এক দেবদ্বেষী রাক্ষস ছিল, তার নাম ছিল দংশ। সে নাকি পরশুরামের প্রপিতামহ ভৃগুর সমবয়সী ছিল। এক সময় সে ভৃগুর স্ত্রীকে অপহরণ করার চেষ্টা করতেই সে ভৃগুর এই অভিশাপ লাভ করেছিল যে, সে রক্তপায়ী কীট হয়ে নরক-ভোগ করবে। কিন্তু রাক্ষসের অনুনয়ে করুণা-পরবশ ভৃগু শাপমুক্তির উপায় হিসেবে অলর্ক-কীটকে বলেছিলেন—তাঁর বংশধর পরশুরামের দৃষ্টির তেজে তার মুক্তি হবে। অলর্ক এই কথা বলে পরশুরামকে প্রণাম করে রাক্ষসের পূর্বদেহে বিদায় নিল।

[মহা (k) ১২.৩.২-২৩; (হরি) ১২.৩.২-২৪]

অলাতাক্ষী স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৮; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোকসংখ্যা ৮ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

অলি একজন অসুর। ইনি ব্রহ্মর্ষি পার-এর কাছে এসে তাঁর কন্যা কলাবতীকে প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহর্ষি এই অসুরের প্রার্থনা পূরণ না করায় সে অসম্ভব কটুবাক্যে ঋষি পার-কে ভর্ৎসনা করে তাঁকে বিনাশ করে ফেলে।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৬৪.১১-১২]

অলিপিণ্ডক কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৫]

অলিমদ্র ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত একটি জনপদ তথা জনজাতি। পণ্ডিতরা একে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পেশোয়ারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মর্দন বা হোতি মর্দন জেলা বলে চিহ্নিত করেছেন। স্থানটি এখনও বৌদ্ধ এবং Graeco-

Bactrian সভ্যতার নিদর্শনের কারণে ঐতিহাসিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

[বায়ু পু. ৪৫.১২০; GDAMI (Dey), p. 4]

অলিমান কলিযুগে ভারত শাসনকারী অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি রাজা গোমতীপুত্রের পুত্র ছিলেন। অলিমানের পুত্র ছিলেন শাতকর্ণী শিবশ্রী। তবে বিষ্ণুপুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে রাজা 'অলিমান' পুলিমান নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.২৪.৪৭-৪৮; (নবভারত) ৪.২৪.১৩]

অলেপকতীর্থ তীর্থ-নাম। এই তীর্থের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা শিব। এখানে শিবপূজা করলে পাপনাশ হয়। *[বামন পু. ৩৬.৪৬]*

অলোল শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। লোল শব্দের অর্থ চঞ্চল বা চপল। যিনি চপলতা বা চঞ্চলতা রহিত তিনিই অলোল। মহাদেবের যে মূর্তি কল্পিত হয় তা শান্ত তপস্বীর মূর্তি, সেই অচঞ্চল শান্তরূপের কারণে মহাদেব অলোল নামে খ্যাত। তাঁর নিশ্চল যোগ সমাধি এবং ব্রহ্ম-স্বরূপতার কারণে তাঁকে স্থির বা স্থাণু নামে সম্বোধন করা হয়, সেই ভাবনা থেকেও তিনি অলোল বা অচঞ্চল নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১১০; (হরি) ১৩.১৬.১১০]

অল্পমেধা (অল্পমেধস্) পঞ্চম মন্বন্তরে যখন রৈবত মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, সুমেধা তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অল্পমেধা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৯]

অল্লালনাথ ভগবান শর্বদেব (শিব) স্বীয় লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করলে কান্তিপুরে পতিত লিঙ্গখণ্ড অল্লালনাথ নামে বিখ্যাত হয়।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ৭.৩৩]

অশনা দৈত্যরাজ বলির পত্নী। তাঁর গর্ভে বলির ঔরসে বাণ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। *[ভাগবত পু. ৬.১৮.১৭]*

অশনিকা$_{১}$ *[দ্র. অনুপালিকা]*

অশনিকা$_{২}$ বিশ্রবার ঔরসে বাকা (রাকা)-র গর্ভজাত কন্যার নাম ছিল অশনিকা।

[বায়ু পু. ৭০.৫০]

অশনিপ্রভ একজন রাক্ষসবীর। লঙ্কাযুদ্ধের সময় বানরদের সঙ্গে রাক্ষসদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে দ্বিবিদ নামক বানরবীরের সঙ্গে অশনিপ্রভ যুদ্ধ করেন।

[রামায়ণ ৬.৪৩.১২]

অশনী$_{১}$ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। অশনী সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৯]*

অশনী$_{২}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। মহাদেবকে যে দশভুজ মূর্তিতে কল্পনা করা হয়, সেই দশভুজ মহাদেবের দশটি হাত দশ অস্ত্রে সুসজ্জিত। বজ্র বা অশনি মূলত ইন্দ্রের অস্ত্র হিসেবে খ্যাত হলেও এক্ষেত্রে দশভুজ মহাদেবেরই অন্যতম অস্ত্র হিসেবে কল্পিত হয়েছে। অশনি শব্দের সঙ্গে ধারণার্থক ইন্ প্রত্যয় করে মহাদেবকে অশনী নামে সম্বোধন করা হয়েছে। *[মহা (k) ১৩.১৭.৪৩; (হরি) ১৩.১৬.৪৩]*

অশিজ মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে কর্দম প্রজাপতির কন্যা স্বরাট্-এর গর্ভে জাত পুত্র। এঁকে কোথাও কোথাও উশিজ বলা হয়েছে আবার কখনো অশিজ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইনি বৃহস্পতির ভ্রাতা। বায়ু পুরাণে দীর্ঘতমা ঋষির মাতা মমতা এই অশিজের অথবা উশিজের পত্নী হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছেন। *[বায়ু পু. ৬৫.১০২; ৯৯.১৪১]*

অশিরা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৫]*

অশোক$_{১}$ অযোধ্যার একজন মন্ত্রী। রামচন্দ্রের বনবাসের পর ভরত রাজপদে অভিষিক্ত হলে ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য পুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশে অন্য চারজন দূতের সঙ্গে কেকয়দেশে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ভরতকে বশিষ্ঠের বার্তা প্রদান করেন। মাতামহ ও মাতুলের জন্য আনা মহামূল্যবান ধনরত্ন ভরতের হাতে দেন এবং তাঁকে তাড়াতাড়ি অযোধ্যায় ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেন। রামচন্দ্রের বনবাস থেকে ফেরার সময় রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য ভরতের নির্দেশে অশোকও অন্য সাতজন মন্ত্রীদের সঙ্গে বনোদ্দেশে গিয়েছিলেন। রামের যথাযোগ্য অভিষেকের জন্য নাগরিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন অশোক। রামের রাজ্যাভিষেক এবং সেই সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে অন্য দুই মন্ত্রী—

বিজয় ও সিদ্ধার্থের সঙ্গে অশোক অনেক পরামর্শ করেছিলেন।

[রামায়ণ ২.৬৮.৫; ২.৭০.১, ২-৫, ১১-১২; ৬.১২৭.১১; ৬.১২৮.২৩-২৫]

অশোক$_{২}$ কেতুমালবর্ষের অন্তর্গত সাতটি প্রধান পর্বত বা বর্ষ পর্বতের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৪৪.৪]

অশোক$_{৩}$ পুরাণে ভবিষ্যৎ রাজবংশের বিবরণ দিতে গিয়ে মৌর্য্যবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের পৌত্র তথা বিন্দুসারের পুত্র অশোকের নাম উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য ভাগবত পুরাণের পাঠে তিনি বারিসারের পুত্র অশোকবর্দ্ধন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। পুরাণ মতে, ইনি ২৬ বছর (মতান্তরে ৩৬ বছর) রাজত্ব করেন। সুযশা নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান ছিল বলে জানা যায়।

[ভাগবত পু. ১২.১.১৩-১৪; বায়ু পু. ৯৯.৩৩২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৪৫; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.৮]

নিঃসন্দেহে বিখ্যাত মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোকের কথাই এখানে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে আনুমানিক ২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর প্রবল জ্ঞাতিকলহের মধ্য দিয়ে অশোক রাজ্য লাভ করেছিলেন। ২৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁর প্রথাসম্মত রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। অশোকের প্রায় ৩৬ বছরের ঘটনা বহুল শাসনকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বিশদ গবেষণা এবং আলোচনা করেছেন। *[পঠিতব্য: PHAI (Raychaudhuri) pp. 268-311]*

অশোক$_{৪}$ ভীমসেনের সারথি। তবে মহাভারতে প্রায় সর্বত্রই ভীমের সারথি হিসেবে আমরা 'বিশোক'-এর নামোল্লেখ পাই। একমাত্র ভীষ্মপর্বের এক জায়গায় দেখা যায় যে কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুর সঙ্গে যুদ্ধরত ভীমসেনের রথটি ধ্বংস হলে সারথি অশোক রথহীন ভীমের জন্য নতুন রথ নিয়ে উপস্থিত হন। তবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর কৌমুদী টীকায় বলেছেন যে, 'অশোক' আর 'বিশোক' বোধ হয় একই ব্যক্তি।

[মহা (k) ৬.৫৪.৭০-৭১; (হরি) ৬.৫৪.৬৯]

অশোক$_{৫}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার শঙ্করাচার্য 'অশোক' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

শোকাদিষড়ূর্মিবর্জিত অশোকঃ।

মন-প্রাণ বা দেহের ছয়টি সাধারণ ধর্ম বা বিকারকে পণ্ডিতরা ছয়টি উর্মি নামে চিহ্নিত করেন। এগুলি হল যথাক্রমে, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা এবং পিপাসা—

শোকমোহৌ জরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসে ষড়ূর্ময়ঃ।

ভগবান বিষ্ণু এই ছয়টি অবস্থার ঊর্দ্ধে, ষড়ূর্মির কোনটিই তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না বলেই তিনি অশোক নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫০; (হরি) ১৩.১২৭.৫০]

অশোক$_{৬}$ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত মধ্য-দক্ষিণ ভারতের একটি তীর্থ। বহু আশ্রম যুক্ত এই তীর্থটি শূর্পারক তীর্থের কাছে অবস্থিত।

[মহা (k) ৩.৮৮.১৩; (হরি) ৩.৭৩.১৩]

□ পণ্ডিতদের মতে শূর্পারক তীর্থের আধুনিক নাম সোপার, যা মহারাষ্ট্রের থানে জেলার অন্তর্গত একটি স্থান। সেই সূত্রে বিচার করলে অশোক-তীর্থের আধুনিক অবস্থান সোপারের কাছেই হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়।

[EAIG (Kapoor) p.82]

অশোকবন প্রাচীনকালে অশোকবৃক্ষে শোভিত বহু বনস্থলীকেই অশোকবন নামে চিহ্নিত করা হতো।

□ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, যযাতি তাঁর স্ত্রী দেবযানীর অনুমতিক্রমে শর্মিষ্ঠাকে দাসী রূপে অশোকবনের মধ্যে একটি বাসস্থানে রেখেছিলেন। *[মৎস্য পু. ৩১.১-২]*

□ আবার মৎস্য পুরাণেই অন্য এক জায়গায় ময়দানব কর্তৃক অসুরদের জন্য ত্রিপুরদুর্গ নির্মাণ প্রসঙ্গেও কোনো এক অশোকবনের উল্লেখ করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১৩০.১৬]*

□ কপিঞ্জল ও নাগশৈলের কাছেই আর একটি অশোকবনের সন্ধান পাওয়া যায়।

[বায়ু পু. ৩৮.৬৮]

□ তবে সীতাহরণের পর দশানন লঙ্কা পুরীর যে অশোকবনে সীতাকে বন্দী করে রেখেছিলেন, সেটি সীতার বন্দী-দশা কাটানোর স্থান হিসেবেই অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র স্থানমাহাত্ম্য লাভ করেছে।

□ রামায়ণে বলা হয়েছে, সীতা-হরণের পর রাবণের আদেশে রাক্ষসীরা সীতাকে মনোরম পুষ্পশোভিত অশোকবনে বন্দি করে রেখেছিলেন। দশানন রাক্ষসীদের এমন আদেশও করেছিলেন যে, তারা যেন সীতাকে সান্ত্বনা বা

ভয় দেখিয়ে বা যে, কোনো প্রকারে রাবণের বশবর্তী করার চেষ্টা করে।

[রামায়ণ ৩.৫৬.৩০-৩২; মহা (k) ৩.২৮০.৪২; (হরি) ৩.২৩৪.৪২]

☐ সুন্দরকাণ্ডে রাবণের এই অশোকবনকে এক অতি সুন্দর স্থান বলা হয়েছে—অশোকবনিকা চেয়ং দৃঢ়ং রম্যা দুরাত্মনঃ। হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতার সন্ধান করতে করতে চন্দন, চম্পক এবং আরও বহুরকমের বৃক্ষের শোভায় শোভিত অশোকবনে প্রবেশ করেছিলেন। অশোকবনে একটি অতি সুন্দর সরোবর ছিল এবং বনের চারিদিকে বিশ্বকর্মা নির্মিত প্রাসাদের সারি দেখা যেত। সমস্ত অঞ্চলটি পাখির কলরবে মুখরিত। সেখানে একটি পর্বত ছিল, যার চূড়া থেকে প্রবাহিত হত একটি নদী। সুন্দর লতায় ও পুষ্পে আচ্ছাদিত এই বনের মধ্যে নির্মিত এক প্রাসাদেই হনুমান বন্দি সীতাকে প্রথম দেখতে পান। রামায়ণে রাবণের অশোকবনের সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কখনো এই বনকে তুলনা করা হয়েছে নন্দনকাননের সঙ্গে কখনো বা চৈত্ররথবনের সঙ্গে। এই বনের প্রবেশদ্বারটি ছিল সোনার।

[রামায়ণ ৫.১৩.৫৬-৬১; ১৪.১-৫২; ১৫.১-১৯]

☐ হনুমান নন্দনকাননতুল্য রাবণের এই অশোকবনকে নষ্ট করতে চেয়েছিলেন যাতে লঙ্কারাজ সসৈন্যে তাঁকে আক্রমণ করেন এবং তিনিও তাঁদের সমূলে ধ্বংস করার সুযোগ পান। এই উদ্দেশ্যেই হনুমান মহাবেগে বনটি ধ্বংস করতে শুরু করেন। *[রামায়ণ ৫.৪১.১৪-২০]*

অশোকসুন্দরী শিব-পার্বতীর কল্পনাজাত কন্যা। সর্বগুণসম্পন্না অপূর্ব সুন্দরী।

নন্দনবনে সখীদের সঙ্গে ক্রীড়া করার সময় দৈত্যরাজ বিপ্রচিত্তির পুত্র হুণ্ড নামক দৈত্য অশোকসুন্দরীকে দেখে কামাসক্ত হন এবং প্রেম নিবেদন করেন। অশোকসুন্দরী হুণ্ডকে জানালেন যে, মহাদেবের অনুমতিক্রমে চন্দ্রবংশীয় আয়ু এবং তৎপত্নী ইন্দুমতীর পুত্র নহুষ তাঁর স্বামী হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। হুণ্ড অশোকসুন্দরীকে বোঝাল যে, বধূ হিসেবে তিনি নহুষের বয়োজ্যেষ্ঠা হবেন, অতএব হুণ্ডের সঙ্গেই তাঁর রমণে লিপ্ত হওয়া উচিত। অশোকসুন্দরী রাজি না হওয়ায় হুণ্ড-দৈত্য স্ত্রীরূপ ধারণ করে তাঁকে ছলনা করে নিজগৃহে এক মায়াকাননে নিয়ে গেল। হুণ্ড তখন আত্মপরিচয় দান করে আবারও প্রেম নিবেদন করল। অশোকসুন্দরী ক্রুদ্ধা হয়ে অভিশাপ দিলেন হুণ্ড-দৈত্যকে। তারপর গঙ্গাতীরে গিয়ে পতির আয়ুষ্কামনায় তথা হুণ্ড দৈত্যের বধ-কামনায় তপস্যা করতে শুরু করলেন। এদিকে চন্দ্রবংশীয় রাজা আয়ু দত্তাত্রেয় মুনির কাছে পুত্রলাভের জন্য বর প্রার্থনা করলেন। দত্তাত্রেয় সেই সময়ে রাজার প্রার্থনা পূরণ করলেন না বটে, কিন্তু পরে বেশ কিছু সময় গেলে দত্তাত্রেয় আয়ুকে কপালপাত্রে সুরা এবং পাচিত মাংস প্রদান করতে বলেন। আয়ু তাঁর নির্দেশক্রমে কাজ করলে দত্তাত্রেয় তাঁকে পুত্রপ্রাপ্তির আশীর্বাদ করেন। তিনি আয়ু-রাজার হাতে একটি ফল দিয়ে সেই ফল পত্নী ইন্দুমতীকে দিতে বলেন।

ইন্দুমতী ফল ভক্ষণ করে স্বপ্নে দিব্যদৃশ্য দর্শন করেন এবং কুলগুরু শৌনককে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালে তিনি রাজা আয়ুকে বলেন যে তাঁর ধনুর্বেদ-নিপুণ এক পুত্র জন্মাবে। এদিকে দানব হুণ্ড স্বীয় কন্যার কাছ থেকে নহুষের জন্মবৃত্তান্ত এবং অশোকসুন্দরীর তপস্যার কথা শুনে ইন্দুমতীর গর্ভনাশের চেষ্টা আরম্ভ করল। কিন্তু হুণ্ডের উদ্যম ব্যর্থ হওয়ায় আয়ু এবং ইন্দুমতীর পুত্র জন্মাল। হুণ্ড এবার এক দাসীর সাহায্যে ইন্দুমতীর শিশু পুত্রকে অপহরণ করে পত্নী বিপুলার কাছে রাখল এবং বালককে বধ করে তার পাক করা মাংস হুণ্ডকেই খেতে দিতে বলল। কিন্তু হুণ্ড পত্নী বিপুলা যে দাসীকে এই আদেশ দিল সেই দাসী এবং পাচক—দু-জনেই মায়াবশত বালককে হত্যা না করে তাঁকে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে রেখে এল। মুনি বালকের পরিচয় জেনে তাঁকে আশীর্বাদ করে নহুষ নামে বিখ্যাত করলেন। বালক নহুষ বশিষ্ঠের কাছে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হতে লাগলেন।

হুণ্ড নহুষকে হরণ করার পর আয়ু এবং ইন্দুমতী অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে পড়লে দেবর্ষি নারদ এসে আয়ুকে জানালেন যে, তাঁর পুত্র নহুষ বশিষ্ঠের আশ্রয়ে আছেন। নারদ এও জানালেন যে, নহুষ একদিন হুণ্ড-দৈত্যকে বধ করে, অশোকসুন্দরীকে বিবাহ করে তাঁর কাছে ফিরে আসবেন।

এদিকে নহুষ একদিন বশিষ্ঠের আদেশে বনে গেলেন। সেখানে চারণের মুখে নিজের জন্মবৃত্তান্ত এবং হুণ্ড-দৈত্যের অপহরণ-বৃত্তান্ত শুনলেন। তিনি এও শুনলেন অশোকসুন্দরী নামে এক কন্যা তাঁর জন্য তপস্যা করছেন এবং হুণ্ড-দৈত্য তাঁর প্রতি কামাসক্ত হয়ে তাঁকে মাঝেমাঝেই বিরক্ত করছে। চারণ জানাল, হুণ্ড-দৈত্যকে বধ করে অশোকসুন্দরীকে উদ্ধার করাটা নহুষেরই দায়িত্ব। অপিচ তাঁর পিতামাতাও তাঁর জন্য বহুকাল প্রতীক্ষা করছেন। সব কথা শুনে নহুষ হুণ্ড-বধের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। অন্যদিকে ঘটনা যেমন ঘটেছিল—নহুষের পরিবর্তে পাচকের পরিবেশন করা হরিণ-মাংস খেয়ে হুণ্ড সগর্বে অশোকসুন্দরীকে জানাল যে, এইমাত্র সে আয়ুপুত্রকে বধ করে তাঁর মাংসভক্ষণ করে এসেছে। অশোকসুন্দরী দৈত্যের মিথ্যাভাষণে কুপিত হয়ে জানালেন, আয়ুপুত্র দীর্ঘজীবন লাভ করবেন। হুণ্ডকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেও অশোকসুন্দরী নহুষ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে বিদ্বর নামে এক বিষ্ণুভক্ত কিন্নর এসে অশোকসুন্দরীকে আশ্বস্ত করল এবং বশিষ্ঠাশ্রমে নহুষের বেড়ে ওঠা থেকে আরম্ভ করে নহুষের হুণ্ডবধের উদ্যোগ সম্বন্ধে অশোকসুন্দরীকে অবহিত করল।

নহুষ হুণ্ড-বধের উদ্যোগ গ্রহণ করলে দেবতারা তাঁকে অস্ত্রশস্ত্র দান করে সাহায্য করলেন। ইন্দ্রের সারথি স্বয়ং মাতলি তাঁকে বয়ে নিয়ে চললেন ইন্দ্রের রথে। হুণ্ড-দৈত্যের পুরীতে নহুষের রথ প্রবেশ করলে অশোকসুন্দরী তাঁকে দেখে বিচলিত হলেন মনে মনে, কিন্তু নহুষ জানিয়ে দিলেন যে, হুণ্ডকে বধ না করা পর্যন্ত অশোকসুন্দরীর সঙ্গে তিনি মিলিত হবেন না। দৈত্য হুণ্ড পরিচারকের মুখে নহুষের আগমন বার্তা শুনে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধযাত্রা করল। বিরাট যুদ্ধের পর নহুষের হাতে হুণ্ড দৈত্য মৃত্যু বরণ করল। অন্যান্য দৈত্য-দানবেরা সকলেই পলায়ন করল। হুণ্ড-বধের পর নহুষ অশোকসুন্দরীকে মাতলির রথে চাপিয়ে পিতামাতার কাছে উপস্থিত হলেন। পিতা আয়ু তাঁকে হস্তিনাপুরের রাজপদে অভিষিক্ত করে সপত্নীক স্বর্গে গমন করলেন।

[পদ্ম পু. (ভূমি) ১০২-১১৭ অধ্যায়; ১০৪.১-১৩৯; ১১৬.১-৩১]

অশোকাষ্টমী চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী অশোকাষ্টমী নামে খ্যাত। এই তিথিতে অশোক-পুষ্পের কলি-সহ জলপান ও গঙ্গাস্নান করলে শোক লাভ করে না। *[বৃহদ্ধর্ম পু. (পূ) ১৬.৩-৬]*

অশৌচ জন্ম এবং মরণের কারণে অশৌচ উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণেরা দশ দিন যাবৎ দান-হোমাদি নিত্যকর্ম থেকে বিরত থাকবেন। একই কারণে ক্ষত্রিয়েরা বারো দিন, বৈশ্যেরা পনেরো দিন এবং শূদ্রেরা এক মাস ওই আচরণ করবেন। তারপর সকলেই শাস্ত্রোক্ত বিধানে স্বধর্মাচরণ করবেন। শস্ত্র, জল, উদ্বন্ধন, বহ্নি, বিষ, প্রপাত প্রভৃতিতে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে সগোত্র এবং সমানোদক ব্যক্তিদের এক দিন মাত্র অশৌচ হয়।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৩৫.৩৯-৫০]

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ধর্মাবলম্বী, যতি ও উপকুবণিক ব্রহ্মচারীর মৃত্যুতে এবং পতিত ব্যক্তির মৃত্যুতে কোনো অশৌচ নেই। পতিত ব্যক্তির মরণে দাহ, অস্থিসঞ্চয় বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিছুই নেই এবং অশ্রুপাত, পিণ্ডদান এমনকী শ্রাদ্ধাদিও নেই। যে ব্যক্তি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক আগুনে পুড়ে বা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে তার জন্য অশৌচ, অগ্নিসংস্কার অথবা পিণ্ডাদি দান কিছুই বিহিত নেই।

[কূর্ম পু. ২.২৩.৭১-৭৪]

অজাতদন্ত বালকের মৃত্যু হলে অত্যন্ত নির্গুণ সপিণ্ডের একরাত্র অশৌচ হয়। উপনয়নের পূর্বে মৃত্যু হলে সগুণ সপিণ্ডের সম্বন্ধে স্নান বিহিত আছে এবং উপনয়নের পর মৃত্যু হলেও স্নান বিহিত আছে। *[কূর্ম পু. ২.২৩.১৬-১৭]*

বালকের জন্ম হবার পর যদি অশৌচের মধ্যে মরণ হয়, তাহলে পিতা ও মাতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্বযুক্ত সম্পূর্ণাশৌচ, সপিণ্ডদের এবং সহোদরদের সদ্যঃশৌচ, কিন্তু সহোদর নির্গুণ হলে দশ দিনের পরেও এক দিনের অশৌচ হবে।

[কূর্ম পু. ২.২৩.১৪-১৬]

যে রাজার অধিকারে বাস করা যায়, সেই ক্ষত্রিয় রাজার মৃত্যু হলে, সেই অশৌচের নাম সজ্যোতি অশৌচ। *[কূর্ম পু. ২.২৩.৩২-৩৩]*

প্রদত্ত কন্যার পিতৃগৃহে মৃত্যু হলে পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ। যে নারী পূর্বে অন্য পুরুষের ভার্য্যা ছিল, তার মরণে এবং তার গর্ভজাত পুত্রের মরণে তথা কৃতক পুত্রের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ। আচার্যমরণে ত্রিরাত্র অশৌচ; পরপুরুষরতা স্ত্রীর

মরণেও ত্রিরাত্র অশৌচ। পিসী বা মাসীর ছেলের মৃত্যুতে একদিনের অশৌচ। পক্ষিণী-অশৌচ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বগৃহে মৃত্যু হলে ত্রিরাত্র অশৌচ। শাশুড়ী ও শ্বশুরের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ বিহিত। *[কূর্ম পু. ২.২৩.৩৪-৩৬]*

অশ্ব$_{১}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্ররা দানব নামে পরিচিত। এই দনুপুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অশ্ব।

[মহা (k) ১.৬৫.২৪; (হরি) ১.৬০.২৪; কালিকা পু. ৩৪.৫৪]

☐ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে দানবরাজ অশ্ব দ্বাপর যুগে রাজা অশোক রূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন।

[মহা (k) ১.৬৭.১৭-১৮; (হরি) ১.৬২.১৪]

☐ মহাভারতের শান্তিপর্বে বলি-বাসব সংবাদে দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রের অহঙ্কার দমন করার জন্য তাঁকে বোঝাবার করেন যে, ইন্দ্রের পদ কোনো চিরস্থায়ী পদ নয়। এই প্রসঙ্গে পূর্বকালে যে-সব দৈত্য-দানবরাজ স্বর্গলোক জয় করে ইন্দ্রের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন বলি। সেখানেই দানবরাজ অশ্বের (বরাহাশ্ব) নামও উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.২২৭.৫২; (হরি) ১২.২২৫.৫২]

অশ্ব$_{২}$ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। অশ্ব মূলত গতির প্রতীক, শক্তির প্রতীক। ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে অশ্বের domistication বা গার্হস্থায়ন এক অন্যতম বৃহৎ ঘটনা। বেদ এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে দ্রুতগতি অশ্বের মহিমা তো বটেই, যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উপকরণ হিসেবে অশ্বের উল্লেখ হয়েছে বারংবার। ফলত যন্ত্রশক্তির আবির্ভাবের পূর্বকাল পর্যন্ত গতিশক্তির একমাত্র প্রতীক ছিল ঘোড়া। গতি শক্তির এই অভাবনীয় আবিষ্কার আরও মহিমান্বিত হয়েছে মহাভারত পুরাণের কাহিনীতে সমুদ্র মন্থনের ফলে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের উত্থানের ঘটনার মধ্য দিয়ে। টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের অশ্ব নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— অশ্বঃ উচ্চৈঃশ্রবাদিরূপ। বস্তুত আর্যরা গতিশক্তির আবিষ্কারের প্রতীক হিসেবেই অশ্বকে মহাদেবের উপর আরোপ করেছেন। গতিশক্তির আধার স্বরূপ বলেই তাঁর নাম অশ্ব। অশ্বের অন্য নামই 'আশুগ'। অতএব অশ্ব-শব্দটি দ্বিতীয় এই গতিবোধক আশুগ শব্দটিরই সাংস্কৃতিক অপভ্রংশ কিনা, সেটাও ভেবে দেখতে বলি।

[মহা (k) ১৩.১৭.১১৪; (হরি) ১৩.১৬.১১৩]

অশ্ব$_{৩}$ ঘোড়া। পুরাণে অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশুরা ত্রেতাযুগের আরম্ভে ব্রহ্মার দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বলে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভে যে সব কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুগ্রীবী। এই সুগ্রীবীর গর্ভেই অশ্ব, উষ্ট্র এবং গর্দভদের জন্ম হয়।

[বিষ্ণু পু. ১.৫.৪৯; ১.২১.১৭]

অশ্ব$_{৪}$ তৃতীয় মন্বন্তরে যখন উত্তম বা ঔত্তম মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সে সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, সত্য তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান গণ। এই গণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অশ্ব।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩৫]

অশ্ব$_{৫}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে খশার গর্ভজাত রাক্ষসদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৩৬]

অশ্ব$_{৬}$ যদু বংশীয় পৃশ্নির (অন্যমতে বৃষ্ণির) অন্যতম পুত্র চিত্রক। এই চিত্রকের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অশ্ব। *[বায়ু পু. ৯৬.১১৪]*

অশ্বকর্ণ শ্রাদ্ধকর্মের জন্য প্রশস্ত একটি পবিত্র তীর্থ।

[মৎস্য পু. ১৫.৩৩]

অশ্বকূট ভারতের মধ্যদেশে অবস্থিত এক জনপদ।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৩২]

অশ্বক্রান্তা পুরাণে ও সঙ্গীতশাস্ত্রে সপ্তস্বর তথা সপ্তস্বর-গঠিত একুশটি মূর্ছনার নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই একুশটি মূর্ছনার মধ্যে অশ্বক্রান্তা অন্যতম। পুরাণ মতে অশ্বিনীকুমাররা এই মূর্ছনার অধিদেবতা। *[বায়ু পু. ৮৬.৬৪]*

অশ্বগ্রীব$_{১}$ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্র হলেন অশ্বগ্রীব। *[রামায়ণ ৩.১৪.১৬; মহা (k) ১.৬৫.২৫; (হরি) ১.৬০.২৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১০; কালিকা পু. ৩৪.৫৫]*

☐ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, এই অশ্বগ্রীব দ্বাপর যুগে মর্ত্যে রোচমান রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.১৭-১৮; (হরি) ১.৬২.১৮]

অশ্বগ্রীব$_{২}$ দৈত্যরাজ বলি মানব ও অসুরকুলে জন্মগ্রহণকারী রাজাদের নাম উল্লেখ করেছেন মহাভারতেব শান্তিপর্বে। যেসব রাজারা নিজেদের রাজত্বকালে সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ভোগ করতেন, সমগ্র পৃথিবী যাঁদের অধিকারে ছিল দানবরাজ অশ্বগ্রীব তাঁদের অন্যতম।

[মহা (k) ১২.২২৭.৫০; (হরি) ১২.২২৫.৫০]

অশ্বগ্রীব$_{৩}$ একজন রাজর্ষি। তাঁকে হয়গ্রীব বা বাজিগ্রীব নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করার ফলে তিনি স্বর্গে বিশিষ্টস্থান লাভ করেন।

[মহা (k) ১২.২৪.২৩-২৭;
(হরি) ১২.২৪.২৭-৩০]

অশ্বগ্রীব$_{৪}$ *[দ্র. হয়গ্রীব$_{১}$]*

অশ্বগ্রীব$_{৫}$ যদুবংশীয় পৃশ্নি (অন্যমতে বৃষ্ণি)-এর কনিষ্ঠ পুত্র চিত্রক। এই চিত্রকের পুত্র সন্তানদের মধ্যে অন্যতম হলেন অশ্বগ্রীব।

[বায়ু পু. ৯৬.১১৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৪]

অশ্বজিৎ কুরুবংশীয় রাজা অজমীঢ়ের পত্নী ভূমিনী (হয়তো ধূমিনীকে বোঝানো হচ্ছে)-র গর্ভজাত পুত্র বৃহদনুর বংশধারায় জয়দ্রথের পুত্র তথা সেনজিতের পিতা ছিলেন অশ্বজিৎ।

[মৎস্য পু. ৪৯.৪৯]

অশ্বতর$_{১}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রূর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় এঁর নাম কম্বল নামে অপর এক নাগের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—কম্বলাশ্বতরৌ। মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে একাধিকবার আমরা কম্বল এবং অশ্বতর নাগের নাম একত্রে উচ্চারিত হতে দেখব। *[মহা (k) ১.৩৫.১০;*
(হরি) ১.৩০.১০; ভাগবত পু. ৫.২৪.৩১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩;
বিষ্ণু পু. ১.২১.২১; বায়ু পু. ৬৯.৭০]

□ মৎস্য পুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে যে, এই অশ্বতর নাগ প্রয়াগে বাস করতেন। মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্বে আমরা প্রয়াগে অবস্থিত একটি তীর্থের উল্লেখ পাবো যার নাম অশ্বতর তীর্থ। এই অশ্বতর নাগের বাসস্থানই অশ্বতর তীর্থ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিল বলে মনে হয়।

[মহা (k) ৩.৮৫.৭৬; (হরি) ৩.৭০.৭৬;
মৎস্য পু. ৬.২৯; ১০৪.৫; ১১০.৮;
মার্কণ্ডেয় পু. ২০.৮]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত কুবলয়াশ্ব মদালসার উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, অশ্বতর এবং কম্বল নাগ একসময় দেবী সরস্বতীকে তপস্যায় তুষ্ট করেন এবং সমস্ত স্বরের শ্রুতি, স্বরগ্রাম এবং মূর্ছনাগুলি যাতে তাঁদের আয়ত্তে থাকে সেই প্রার্থনা জানান। পত্নীশোকগ্রস্ত কুবলয়াশ্বের কথা ভেবে অশ্বতর কুবলাশ্বপত্নী মদালসাকেই তাঁর কন্যারূপে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ২৩.২৪-২৮, ৪৯-৫১, ৫৯-৭৩]

□ মহাভারতের সভাপর্বে বরুণের সভার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে বলা হয়েছে যে, যেসব বিশিষ্ট নাগ বরুণের সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর উপাসনা করেন, অশ্বতর তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ২.৯.৯; (হরি) ২.৯.৯]

□ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে নারদ মাতলির কাছে পাতালের ভোগবতীপুরীর যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে সেখানে বসবাসকারী প্রধান নাগের নামোল্লেখ করতে গিয়ে অশ্বতর নাগের নামোল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ৫.১০৩.৯; (হরি) ৫.৯৬.৯]

□ স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, অশ্বতর এবং কম্বল নাগকে মহাদেব তাঁর কর্ণভূষণরূপে ব্যবহার করেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর / কেদার) ২২.৩-৪]

□ ভাগবত পুরাণ মতে কার্তিক মাসে (বিষ্ণু পুরাণ মতে ফাল্গুন মাসে) অশ্বতর নাগ সূর্যরথে অবস্থান করেন। *[ভাগবত পু. ১২.১১.৪৪;*
বিষ্ণু পু. ২.১০.১৮]

□ বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে পাতালের দ্বিতীয় তল অর্থাৎ সুতল লোকে বসবাসকারী প্রধান নাগদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অশ্বতর। *[বায়ু পু. ৫০.২৩;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২৩]

□ মৎস্য পুরাণ থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুর দহনের পূর্বে ত্রিপুরারি মহাদেবের জন্য সমস্ত দেবতা-নাগ-গন্ধর্ব সম্মিলিত ভাবে যে রথ নির্মাণ

করেন সেখানে কম্বল এবং অশ্বতর নাগ সেই রথেও অঙ্গ হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

[*মৎস্য পু. ১৩৩.২০*]

□ বিষ্ণু পুরাণ থেকে জানা যায় যে, এই পুরাণ সর্বপ্রথম নাগলোকে প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মা থেকে পরম্পরাক্রমে বাসুকি নাগ এই পুরাণ শিক্ষা করেন, বাসুকি থেকে বৎস, বৎস নাগ থেকে অশ্বতর এবং অশ্বতর থেকে কম্বল নাগ এই পুরাণ শ্রবণ করেছিলেন। [*বিষ্ণু পু. ৬.৮.৪৫-৪৬*]

অশ্বতর$_২$ অশ্বজাতীয় প্রাণীবিশেষ। পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর আভিধানিক অর্থ করেছেন — অশ্বধর্মের ন্যূনতাযুক্ত অশ্ব। গর্দভ থেকে অশ্বার গর্ভজাত শাবককেই অশ্বতর (খচ্চর) বলা হয়ে থাকে। বিষ্ণু পুরাণ থেকে জানা যায় ত্রেতা যুগের আদিতে অশ্বতর এবং অন্যান্য গবাদি পশুদের সৃষ্টি হয়েছিল। রামায়ণে অন্যান্য গবাদি পশুর মতো অশ্বতরদেরও সুরভির সন্তান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত রামায়ণের পাঠ থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

[*শব্দকল্পদ্রুম Vol. I, p. 145; বিষ্ণু পু. ১.৫.৪৯*]

অশ্বতরতীর্থ প্রয়াগে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ।

[*দ্র. অশ্বতর$_১$*]

অশ্বতীর্থ$_১$ কান্যকুব্জের নিকটে অবস্থিত গঙ্গার তীরবর্তী একটি পবিত্র তীর্থ। পাণ্ডবরা তীর্থভ্রমণকালে এখানে গিয়েছিলেন। ভৃগুবংশীয় ঋচীক, গাধি রাজার মেয়ে সত্যবতীকে বিয়ে করতে চাইলে গাধি কন্যাশুল্ক রূপে তাঁর কাছে মহাবেগবান এমন সহস্র অশ্ব দাবি করেন, যাদের কানের ভিতরের অংশ রক্তবর্ণের এবং বাইরের অংশ শ্যামবর্ণ এবং বাকি সমস্ত অঙ্গ পাংশুবর্ণ। বরুণদেবের কল্যাণে ঋচীক এই জাতীয় সহস্র অশ্ব লাভ করেন। বিচিত্র বর্ণের এই সহস্র অশ্ব সমুদ্রের যে স্থানে আবির্ভূত হয়েছিল, সেই স্থানটিই অশ্বতীর্থ নামে বিখ্যাত। এই তীর্থে স্নান করলে মানুষ সৌভাগ্যবান হয়। এটি শ্রাদ্ধকার্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

[*মহা (k) ৩.৯৫.৩; ৩.১১৫.২৬-২৯; ১৩.৪.১৫-১৭;*
(হরি) ৩.৮৯.৩; ৩.৯৬.২৬-২৯; ১৩.৩.৩৪-৩৬;
পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ. ৯.২৫৩;
মৎস্য পু. ২২.৭১; ১৯৪.৩;
বামন পু. ৮৩.২৬]

□ উত্তর প্রদেশের কনৌজের নিকট গঙ্গা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমেই এই তীর্থের অবস্থিতি নির্ণয় করা হয়েছে। [*GDAMI (Dey) p. 13*]

অশ্বতীর্থ$_২$ গোদাবরী নদী তীরবর্তী একটি তীর্থ। এই স্থানে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হয়েছিল।

[*ব্রহ্ম পু. ৮৯.৪৩*]

অশ্বতীর্থ$_৩$ একটি অশ্বতীর্থের সন্ধান অসমে পাওয়া যায়। এটি কামাখ্যার অশ্বক্রান্ত পর্বতের উপর অবস্থিত। [*EAIG (Kapoor) p. 84*]

অশ্বত্থ ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে যে বৃক্ষগুলিকে দেববৃক্ষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অশ্বত্থ তার মধ্যে অন্যতম। ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগে কৃষ্ণ নিজের পরমেশ্বরস্বরূপতার কথা বলতে গিয়ে জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু তাকে পরমেশ্বরের বিভূতি বলে বর্ণনা করেছেন এবং সে প্রসঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছে— বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থ—

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং। [*ভগবদ্গীতা ১০.২৬*]

□ ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরের বিভূতি হিসেবে অশ্বত্থের উল্লেখ থেকেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে অশ্বত্থবৃক্ষের মাহাত্ম্য ঠিক কোন পর্যায়ে ছিল। ঋগ্বৈদিক যুগ থেকেই অশ্বত্থবৃক্ষের মাহাত্ম্য আলোচিত হয়ে আসছে এবং আধুনিক ভারতেও বট-অশ্বত্থের মতো বৃক্ষগুলি জনসাধারণের কাছে যথেষ্ট আদরণীয় এবং পূজনীয়। অশ্বত্থগাছের এই ধর্মীয় গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখেছেন উদ্ভিদ-বিদ্যাবিদেরাও। অশ্বত্থগাছের ল্যাটিন নাম Ficus Religiosa. এই নামকরণের মধ্যে এই বৃক্ষের ধর্মীয় গুরুত্বের কথাই স্পষ্ট। বোঝা যায়, গাছটি পূজনীয় বলেই তার এমন নাম, religion-এর সঙ্গে এটি যুক্ত।

অশ্বত্থগাছের অপর নাম পিপ্পল। বর্তমানে 'অশ্বত্থ' নামটির পাশাপাশি সারা ভারতে (বিশেষত হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে) 'পীপল' নামেও এই বৃক্ষ প্রসিদ্ধ। তবে অশ্বত্থ এবং পিপ্পল—এই দুটি নামের প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদ এবং পরবর্তী উপনিষদগুলিতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে একটি বিখ্যাত শ্লোকে অশ্বত্থ বা পিপ্পলবৃক্ষে বসে থাকা দুটি পাখির রূপকে বর্ণনা করা হয়েছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং
স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো'ভিচাকশীতি॥

এই পিপ্পল বা অশ্বত্থগাছটি যেন ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ যার শাখায় দুটি পাখীর মতো জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অবস্থান করে। জীবাত্মা সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করে অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মফল ভোগ করে এবং অপর পক্ষীটি অর্থাৎ পরমাত্মা নীরব সাক্ষীরূপে তা দর্শন করেন।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৬৪.২০; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪.৬; মুণ্ডকোপনিষদ ৩.১.১]

☐ বৈদিকগ্রন্থে এবং উপনিষদে অশ্বত্থগাছের যে ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই ভাবনার সার পাওয়া যায় মহাভারতে, ভগবদ্‌গীতার অন্তর্গত শ্লোকে। সেখানে বলা হয়েছে—সংসার বৃক্ষরূপ অশ্বত্থ এমনই এক বৃক্ষ যার মূল ঊর্ধ্বগামী, শাখা-প্রশাখা অধোগামী। এই বৃক্ষ অবিনশ্বর এবং বেদমন্ত্রগুলি এর এক একটি পাতা। যিনি এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে সম্যক্‌ভাবে জানতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত বেদবিৎ—

ঊর্ধ্বমূলমধঃ শাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

[ভগবদ্‌গীতা ১৫.১]

কঠোপনিষদের একটি শ্লোকে ভগবদ্‌গীতার এই ভাবনার কথা পাওয়া যায়। সেখানে অবশ্য 'ঊর্ধ্বমূলো'বাক্‌শাখ' পাঠ ধৃত হয়েছে—

ঊর্ধ্বমূলো'বাক্‌শাখ এষো'শ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥

[কঠোপনিষদ ২.৩.১]

বস্তুত ভগবদ্‌গীতা এবং উপনিষদে অশ্বত্থের যে ঊর্ধ্বগামী মূল-এর কথা বলা হয়েছে, তা অক্ষয় অবিনশ্বর পরব্রহ্মের পরম পদ—

ঊর্ধ্বং মূলং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ
পরমং পদমস্যেতি (শাঙ্করভাষ্য)।

পরমেশ্বরকে অশ্বত্থবৃক্ষের মূল বলে বর্ণনা করার কারণ—তিনি এই সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টির মূল বা কারণ স্বরূপ। আর সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের অধোগামী শাখা-প্রশাখা হল এই নশ্বর জগত সংসারের প্রতীক। অশ্বত্থগাছের মূল মাটির নীচে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গাছের ডালপালা কেটে নিলেও সেই মূলের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সেই মূল থেকেই অশ্বত্থগাছ আবার নতুন করে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কালক্রমে বিশাল আকার ধারণ করে। ঠিক তেমনই পরমেশ্বর বা ব্রহ্মও অবিনাশী। প্রলয়কালে সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস হলেও তাঁর কোনো ক্ষয় হয় না। প্রলয়ের পর তাঁর থেকেই আবার নতুন করে সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। নশ্বর জগতের মায়ায় আচ্ছন্ন না থেকে যে ব্যক্তি এই সংসারবৃক্ষের মূল এবং শাখা-প্রশাখার প্রকৃত স্বরূপ জানতে সমর্থ হন—তিনিই বেদবিৎ।

'অশ্বত্থ' নামটির মধ্যেও এই দার্শনিক ভাবনার বীজ রয়েছে। 'শ্ব'-শব্দের অর্থ হল আগামীকাল। যা আগামীকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়—তাই শ্বত্থ। যে বৃক্ষের আয়ুষ্কাল বা তা কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে—তা নির্ণয় করাই সম্ভব হয় না—সেই দীর্ঘজীবী বৃক্ষের নামই অশ্বত্থ। তবে উপনিষদের ভাবনা একটু অন্যরকম। সেখানে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা নশ্বর জগতের প্রতীকরূপে চিহ্নিত। সুতরাং তা আজ থাকলেও আগামীকালও থাকবে কিনা—তা নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয় বলেই সংসারবৃক্ষের নাম অশ্বত্থ। আবার যেমন প্রলয়ের পর পরমেশ্বর নতুন করে সৃষ্টি আরম্ভ করেন—ঠিক তেমনভাবেই গাছটি নষ্ট হবার পরে তার বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত মূল থেকে নতুন করে তা জন্মলাভ করবে কি না—তাও সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে—সে কারণেই বৃক্ষের নাম অশ্বত্থ। উপনিষদের ভাবনায় অশ্বত্থবৃক্ষের এই যে ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপতা কিংবা পরমেশ্বর স্বরূপতার উল্লেখ পাওয়া যায়—সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে মহাভারতে। পরমেশ্বরের দুই রূপ শিব-মহাদেব এবং শ্রীহরি বিষ্ণু দুজনেই মহাভারতে 'অশ্বত্থ' নামে সম্বোধিত হয়েছেন। বনপর্বে সূর্যের যে অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র পাওয়া যায়, সেখানে সূর্যের অন্যতম নাম হিসেবেও 'অশ্বত্থ' নামটি উচ্চারিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৭০; ১৩.১৪৯.১০১; ৩.৩.২১; (হরি) ১৩.১৬.৭০; ১৩.১২৭.১০১; ৩.৩.২১]

☐ বৈদিক যুগ থেকে অশ্বত্থগাছের উপরে চরাচর জগত সংসারের মাহাত্ম্য আরোপিত হওয়ায় পরবর্তী সময়ে অশ্বত্থ অন্যতম পূজনীয় বৃক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র অশ্বত্থবৃক্ষের বহু উল্লেখ মেলে মহাকাব্য-পুরাণে।

ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, যদুবংশ ধ্বংসের পর ইহলোক ত্যাগের সংকল্প করে বিষণ্ণ

মনে কৃষ্ণ বসেছিলেন এক অশ্বত্থগাছের তলায়, সেখানেই জরানামক ব্যাধের শরের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। *[ভাগবত পু. ৩.৪.৩-৬]*

অশ্বত্থতীর্থ মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত একটি পবিত্রতীর্থের নাম। এই তীর্থে দেবী শক্তি বন্দনীয়া নামে পূজিত হন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১৩.৫১]

অশ্বত্থামা১ দ্রোণাচার্যের ঔরসে শরদ্বানের কন্যা কৃপীর গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম। পরবর্তী সময়ে অশ্বত্থামার জীবন হস্তিনাপুরের কুরু রাজপরিবার তথা কুরু রাজসভার অঙ্গ হিসেবে কাটবে, রাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গেও তিনি ক্রমশ জড়িয়ে পড়বেন, কিন্তু জন্মলগ্নে অশ্বত্থামার চরিত্রের সবথেকে বড়ো গুরুত্ব এই যে, তিনি দ্রোণাচার্যের আনন্দবর্ধনকারী একমাত্র পুত্র। পুত্রের প্রতি অপার স্নেহ পুত্রের জন্মলগ্ন থেকেই দ্রোণাচার্যের হৃদয়কে অধিকার করে নিয়েছিল। দ্রোণপর্বে বর্ণিত আছে যে, পুত্রজন্মের আনন্দে দ্রোণ নাকি দশ হাজার গোরু দান করেছিলেন—

যস্মিন্ জাতে দদৌ দ্রোণো গবাং দশশতং ধনম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো মহার্হেভ্যঃ সো'শ্বত্থামৈষ গর্জতি॥

আমরা জানি, দ্রোণ হতদরিদ্র ছিলেন। দশ হাজার কেন, একটি গোরুও দান করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। দ্রোণ-অশ্বত্থামার প্রথম জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে দুগ্ধবতী গাভীর অভাবের কথাটিও ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। একটিমাত্র শিশুপুত্রকে দুধ খাওয়াবার জন্য একটি গোরুও ছিল না। দ্রোণের এই গোরুর দুধের অভাব পরবর্তী সময়ে দ্রোণ-অশ্বত্থামার জীবনের মোড় ঘুরে যাবার একটা বড়ো কারণ হয়ে দেখা দেবে কিন্তু মহাভারতের কবি যে দশ হাজার গোরুদানের কথা আমাদের জানালেন তাতে মহাকাব্যিক অতিশয়োক্তির অবশ্যই আছে, আর এই অতিশয়োক্তি কারণ বোধ হয় দ্রোণাচার্যের পুত্রস্নেহ ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার একটা আভাস দেওয়া। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব দ্রোণের জীবন-জীবিকা এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত এই পুত্রস্নেহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অশ্বত্থামার চরিত্রের প্রধান গুরুত্ব সেখানেই যে, তিনি দ্রোণাচার্যের মতো ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে গিয়েছেন—দ্রোণকে হস্তিনাপুরে কুরুরাজসভায় আনা থেকে শুরু করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই অশ্বত্থামা রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। তবে দ্রোণাচার্যের মতো ব্যক্তিত্বের জীবনের নিয়ন্ত্রক—এটুকুতেই অশ্বত্থামার গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় না। অশ্বত্থামা নিজে অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্বের অধিকারী। তাঁর স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মহাকাব্যের কাহিনী জটিলতার মধ্যে তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রকে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে।

[মহা (k) ১.৬৩.১০৭-১০৮; ১.১৩১.৫০; ৭.১৯৬.২৯; (হরি) ১.৫৮.১৪৬-১৪৭; ১. ১২৭.৫০; ৭.১৬৭.২৯]

□ জন্মাবার পরেই অশ্বত্থামা নাকি উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের হ্রেষার মত চীৎকার করেছিলেন—

জাতমাত্রেণ বীরেণ যেনোচ্চৈঃশ্রবসা যথা।
হ্রেষতা কম্পিতা ভূমির্লোকাশ্চ সকলাস্ত্রয়ঃ॥

এই হ্রেষাধ্বনির উল্লেখকে পণ্ডিতরা এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাস্তবে হয়তো অশ্বত্থামার কণ্ঠস্বর খানিকটা সূক্ষ্মতীব্র এবং অনুনাসিক ছিল—'কেমন যেন মনে হয় নারীকণ্ঠ সমীচীন, অথচ ঠিক মেয়েলিও নয়, বেশ তীব্র—অশ্বত্থামা হয়তো সেরকম গলায় কথা বলতেন বলেই তাঁর নামটাও রাখা হল 'কনোটেটিভলি'। 'স্থাম' কথাটার মানে হল শব্দ। অশ্বের মতো গলার স্বর বলেই তাঁর নাম হল অশ্বত্থামা—

অশ্বস্যৈবাস্য যৎ স্থাম নদতঃ প্রদিশো গতম্।
অশ্বত্থামৈব বালো'য়ং তস্মান্নাম্না ভবিষ্যতি॥

[মহা (k) ১.১৩০. ৪৭-৪৯; (হরি) ১.১২৬.২৩-২৫]

□ জন্মলগ্নেই যাঁর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে এত কথা বলা হল, বিশেষ করে কণ্ঠস্বরটা তাঁর নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেও, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন সে বিষয়ে কৌতূহল হয়। মহাভারতের শল্যপর্বের আগে তার বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই। অংশাবতরণ পর্বে শুধু একটা আভাস পাওয়া যায় যে, অশ্বত্থামা যথেষ্টই সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু সেখানে বীর কমলপত্রাক্ষঃ—অর্থাৎ পদ্মপলাশলোচন—এটুকু বলেই মহাভারতে কবি নীরব হয়েছেন। শল্যপর্বের সূচনায় দুর্যোধনের উক্তিতেই অশ্বত্থামার রূপ-গুণ বিশদে বর্ণিত হয়েছে। মহারথী অশ্বত্থামা অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর পুরুষের মতোই সুগঠিত দেহ, গৌরবর্ণ, মুখের

মধ্যে একটা ভীষণ ভাব আছে, অনেকটা বাঘের মতো, দেখলেই বেশ রাগী বলে মনে হয়। কিন্তু ইনি কথা বলেন বেশ মধুর স্বরে, কণ্ঠস্বরে একটা শান্ত-মধুর ভাব আছে।

অশ্বত্থামা দেখতে যেমন সুন্দর, গুণেও তেমনই অতুলনীয়। তিনি বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র জানেন এবং সব থেকে বড়ো কথা তিনি যুদ্ধনীতি বিশারদ।

[মহা (k) ৯.৬.৮-১৬; (হরি) ৯.৫.৮-১৬]

☐ মহাভারতে অংশাবতরণ পর্বে অশ্বত্থামার জন্ম সম্পর্কে কবি বলেছেন—শিব, যম, কাম এবং ক্রোধ—এই চারজন দেবতার সম্মিলিত অংশে অশ্বত্থামার জন্ম—

মহাদেবান্তকাভ্যাঞ্চ কামাৎ ক্রোধাচ্চ ভারত।
একত্বমুপপন্নানাং জজ্ঞে শূরঃ পরন্তপঃ॥
অশ্বত্থামা মহাবীর্য্যঃ শত্রুপক্ষভয়াবহঃ।
বীরঃ কমলপত্রাক্ষঃ ক্ষিতাবাসীন্নরাধিপ॥

অংশাবতরণ পর্বের এই বিবরণ শুধু যে অশ্বত্থামার মাহাত্ম্য কীর্তন করার জন্যই উল্লিখিত হয়েছে তা নয়। অশ্বত্থামার চরিত্র এবং তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের একটা বিবরণও পাওয়া যাবে এই বর্ণনা থেকে। রুদ্র-শিব সংহারের প্রতীক, অন্তক বা যমও মৃত্যুর দেবতা। পরবর্তী সময়ে অশ্বত্থামাকে সংহার মূর্তি ধারণ করে পাণ্ডব শিবির পাণ্ডবদের বংশধর এমনকী পাণ্ডবকুলের যে অবশিষ্ট সন্তানবীজ অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে ছিল, তারও ধ্বংস সাধন করতে দেখা যাবে। তাই অংশাবতরণ পর্বেই কবি তাঁকে মূর্তিমান মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৭২-৭৩; (হরি) ১.৬২.৭৩-৭৪]

☐ অশ্বত্থামার বাল্যজীবন কেটেছে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ হলেও শস্ত্রবিদ্যা চর্চা করতেন বলে ব্রাহ্মণ-সমাজে নিন্দিত হতেন। ফলে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু হৃদয়ের কোনো এক কোণে সম্পদলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়তো দ্রোণাচার্যের ছিল। গুরু অগ্নিবেশ্যের আশ্রমে বাল্যবন্ধু দ্রুপদ তাঁকে বলেছিলেন—পিতা যখন আমাকে পঞ্চালের রাজসিংহাসনে স্থাপন করবেন, তখন সে রাজ্যের উপর আমার যতখানি অধিকার হবে, তোমার অধিকারও হবে ঠিক ততখানি। বন্ধুর সেদিনের নেহাতই 'কথার কথা'—টাকে দ্রোণাচার্যের মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষও সত্য বলে মনে করলেন এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধুর কাছে প্রত্যাখ্যাত হলেন। সে যাইহোক দ্রোণের অর্থাকাঙ্ক্ষা, যা কুরু রাজবাড়িতে এসে রাজনৈতিক সমৃদ্ধিলাভের পথ ধরেছিল, সেই আকাঙ্ক্ষাই উত্তরাধিকার সূত্রে জারিত হয়েছে অশ্বত্থামার মধ্যে।

বালক অশ্বত্থামা পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের দুধ খেতে দেখে বাড়িতে এসে কেঁদে ফেলেছিলেন। দ্রোণাচার্য পুত্রের মুখ চেয়ে একটি দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। এরই মধ্যে একদিন প্রতিবেশী বালকরা অশ্বত্থামাকে দুধের বদলে পিটুলী-গোলা জল পান করতে দিলেন। বালক অশ্বত্থামা সেই পিটুলী-গোলা জল পান করে 'আমিও দুধ খেয়েছি' বলে নৃত্য করতে লাগলেন—

পীত্বা পিষ্টরসং বালঃ ক্ষীরং পীতং ময়াপি চ॥
ননর্তোত্থায় কৌরব্য হৃষ্টো বাল্যাদ্বিমোহিত।

প্রতিবেশী বালকরা অশ্বত্থামাকে ঘিরে উপহাস করতে লাগল, আর ধিক্কার দিতে লাগল দরিদ্র দ্রোণকে—যে দ্রোণ অর্থ উপার্জন করতে পারে না, যার পুত্র দুধ ভেবে পিটুলী-গোলা জল খেয়ে আনন্দে নৃত্য করছে তাকে ধিক্—

দ্রোণং ধিগস্ত্বধনিনং যো ধনং নাধিগচ্ছতি॥
পিষ্টোদকং সুতো যস্য পীত্বা ক্ষীরস্য তৃষ্ণয়া।
নৃত্যতি স্ম মুদা যুক্তঃ ক্ষীরং পীতং ময়েতি চ॥

প্রতিবেশী বালকদের মুখে একথা শুনে দ্রোণ রাগে-দুঃখে অন্ধ হলেন। সেই মোহগ্রস্ত অবস্থাটাই হয়তো বাল্যবন্ধুর সেই 'কথার কথা' টাকে খুঁচিয়ে তুলল। দ্রুপদের পুরনো বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে দ্রোণ সপরিবারে উপস্থিত হলেন পাঞ্চাল রাজপুরীতে এবং দ্রুপদের দ্বারা কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেন। অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে দ্রোণ পাঞ্চাল রাজপুরী ছেড়ে চলে গেলেন। সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরে জন্ম নিল প্রতিশোধ-স্পৃহা—যেমন করেই হোক দ্রুপদকে শিক্ষা দিতে হবে। দ্রোণাচার্যের সঙ্গে পাঞ্চালদের চিরস্থায়ী শত্রুতার বীজ অঙ্কুরিত হল এইখানে। অশ্বত্থামাও দ্রোণের মতো পাঞ্চালদের মনে প্রাণে ঘৃণা করতে শিখলেন। বাল্যজীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে এই সংগ্রাম, দরিদ্রের প্রতি ধনীর

উপহাস আর অপমান—জীবনের তিক্ত দিকগুলোকে অশ্বত্থামা এত কাছ থেকে দেখলেন যে, অল্প বয়সেই বালকোচিত নমনীয়তা তাঁর চরিত্র থেকে হারিয়ে গেল।

দ্রুপদের দ্বারা অপমানিত দ্রোণ সপরিবারে চলে এলেন হস্তিনাপুরে, শ্যালক কৃপাচার্যের বাড়িতে। কৃপাচার্য তখন পাণ্ডব-কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছেন। দ্রোণ কৃপাচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে রইলেন, দ্রোণাচার্য যে হস্তিনাপুরে এসেছেন, একথা কাউকে জানতে দিলেন না বরং এগিয়ে দিলেন পুত্র অশ্বত্থামাকে। অশ্বত্থামা এর মধ্যেই পিতা দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করেছেন, কৃপাচার্যের সঙ্গে তিনিও রাজকুমারদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। হয়তো এটা দ্রোণের কৌশল, ভবিষ্যতে তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তাঁর যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা হতে পারে যে, যাঁর বালক পুত্র এত ভালো শেখাতে পারে, তিনি নিজে কত বড়ো অস্ত্রবিশারদ। কিন্তু এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অশ্বত্থামার ব্যক্তিত্ব। পরবর্তী সময়ে তিনি কুরু রাজকুমারদের সহাধ্যায়ী হিসেবে পিতার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। সুতরাং বয়সে তিনি যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরই সমান, হয়তো বা সামান্য বড়ো। এই বয়সেই তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে প্রায়-সমবয়সী বালকদের শিক্ষকের পদ গ্রহণের যোগ্য করে তুলেছে। এই পরিণত ব্যক্তিত্বের খানিকটা তাঁর সহজাত, অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পুত্র হিসেবে তিনি জন্মসূত্রেই সে গুণ পেয়েছেন, আর খানিকটা লাভ করেছেন জীবন সংগ্রামের ফলে।

[মহা (k) ১.১৩১ অধ্যায়; (হরি) ১.১২৭ অধ্যায়]

☐ ক্রমে দ্রোণ আত্মপ্রকাশ করলেন। ভীষ্ম সসম্মানে তাঁকে বরণ করলেন কুরু রাজকুমারদের শিক্ষাগুরু রূপে। দ্রোণ রাজকুমারদের শিক্ষা দিতে লাগলেন, পাশাপাশি পুত্র অশ্বত্থামার শিক্ষা চলতে লাগল। অন্যান্য স্নেহশীল পিতার মতো দ্রোণও চাইতেন যে, তাঁর পুত্র তাঁর শিষ্যদের তুলনায় একটু বেশি শিখুক। তার জন্য উপায়ও বের করে ফেললেন দ্রোণ। আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় জল আনতে তিনি যখন শিষ্যদের পাঠাতেন, তখন রাজকুমারদের দিতেন এক একটি কমণ্ডলু, কিন্তু পুত্র অশ্বত্থামাকে দিতেন কলসী। কমণ্ডলুতে জল ভরতে সময় বেশি লাগে, তুলনায় কলসীতে জল ভরতে কম সময় লাগে। ফলে অশ্বত্থামা জল নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতেন—এই অবসরে দ্রোণ তাঁকে কিছু বেশি শিক্ষাদান করতেন। পুত্রস্নেহে পরবশ দ্রোণের এই পুত্র-পক্ষপাত বড়ো বেশি চোখে লাগে। তবে অর্জুন অল্পদিনেই দ্রোণের কৌশল বুঝে ফেলেন। বারুণাস্ত্রে কমণ্ডলু ভরে একই সময়ে ফিরতে লাগলেন অর্জুন। ক্রমে পুত্র অশ্বত্থামার পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ শিষ্য হিসেবে অর্জুনও দ্রোণের হৃদয় অধিকার করে নিলেন। পরবর্তীকালে বহুবার অর্জুন এবং অশ্বত্থামা দুজনেই গুরুকুলের সেই সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করেছেন।

[মহা (k) ১.১৩২.১৬-২০;
(হরি) ১.১২৮.২৪-২৮]

☐ অস্ত্রশিক্ষা শেষে অশ্বত্থামা গুপ্ত-অস্ত্রবিদ্যায় দ্রোণের অন্যান্য শিষ্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন।

[মহা (k) ১.১৩২.৬২; (হরি) ১.১২৮.৭১]

☐ কুরু রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনের জন্য যে রঙ্গভূমির আয়োজন হয়েছিল, সেখানে অশ্বত্থামা, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি আচার্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ যখন প্রদর্শনীর মাত্রা অতিক্রম করে রীতিমতো দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হল, তখন এই গদাযুদ্ধ পারিবারিক কলহের সৃষ্টি করতে পারে—এই আশঙ্কায় দ্রোণ অশ্বত্থামাকে এই গদাযুদ্ধ থামিয়ে দিতে বলেন। অশ্বত্থামা ভীম এবং দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ বন্ধ করে দেন।

[মহা (k) ১.১৩৫.১-৫; (হরি) ১.১৩০.১-৫]

☐ পাণ্ডবদের শিক্ষা শেষে দ্রোণ আচার্যের মর্যাদায় হস্তিনাপুরে বাস করতে লাগলেন, রাজসভাতেও বিশিষ্ট আসন লাভ করলেন। লক্ষণীয় বিষয়, অশ্বত্থামা কিন্তু ওই আচার্য শ্রেণীর একজন হয়েই হস্তিনাপুরে থেকে গেলেন। কুরু পরিবারের গণ্ডীর বাইরে কোথাও যাবার চেষ্টা করেননি। এমনকী, অর্জুন যে দ্রুপদ রাজাকে পরাজিত করে অর্ধেক পঞ্চাল জয় করে দিলেন দ্রোণাচার্যকে, সেখানে গিয়ে রাজত্ব করার ইচ্ছাও দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। বারণাবতে লাক্ষাগৃহের ঘটনার পর দুর্যোধন প্রভৃতির সঙ্গে সমবয়সের কারণে তাঁর কিছুটা হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে দুর্যোধনের একনিষ্ঠ সমর্থকের ভূমিকায়

আমরা অশ্বত্থামাকে কখনোই দেখতে পাই না। তাঁর চিন্তাধারার পরিধি তাঁর নিজের স্বতন্ত্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যাইহোক, কুরুরাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার পর আবার আমরা অশ্বত্থামার উল্লেখ পাই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়। তবে দ্রৌপদীকে লাভ করার অভিলাষে তিনি কাম্পিল্যে যাননি। নিছক দুর্যোধনের সঙ্গী হিসেবেই তাঁর কাম্পিল্যে যাওয়া। স্বয়ংবর শেষে দুর্যোধনের সঙ্গেই তাঁকে ফিরে আসতে দেখা যায়।

প্রসঙ্গত বলা উচিত যে, অশ্বত্থামা বিবাহ করেন নি। নারী চরিত্রের প্রতি তাঁর একটা নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ভাব ছিল বলে মনে হয়। তাঁর জটিল মনস্তত্ত্বের মধ্যে নারীর প্রতি কোন আবেগ কোনো দিন স্থান পায়নি। *[মহা (k) ১.১৮৬.৬; ১.২০০.৯; (হরি) ১.১৭৯.৬; ১.১৯৩.৯]*

☐ দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের পর আবার অশ্বত্থামার উপস্থিতির উল্লেখ পাই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে। পিতা দ্রোণাচার্য এবং মাতুল কৃপের সঙ্গে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণদের যথাযথ আদর-অভ্যর্থনা করার ভার যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার উপর অর্পণ করেছিলেন। অশ্বত্থামা নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান, হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের পরিমণ্ডলে বাস করার ফলে ব্রাহ্মণদের আদর অভ্যর্থনা কীভাবে করা উচিত, অশ্বত্থামা তা ভালই জানতেন। তাই যুধিষ্ঠির তাঁকে যোগ্য বিবেচনা করেই এ কাজের ভার তাঁর হাতে তুলে দেন। *[মহা (k) ২.৩৪.৮; ২.৩৫.৫; (হরি) ২.৩৩.৮; ২.৩৪.৫]*

☐ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করলেন দেখে শিশুপাল তার বিরোধিতা করেছেন। এই প্রসঙ্গে শিশুপাল অর্ঘ্যদানের যোগ্য হিসেবে অশ্বত্থামার নাম উল্লেখ করেছেন বীর এবং সর্বশাস্ত্রবিশারদ বলে—

অশ্বত্থাম্নি স্থিতে বীরে সর্বশাস্ত্র বিশারদে।

ভীষ্ম শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দার বিরোধিতা করলে শিশুপাল ভীষ্মকে রীতিমত গালাগালি করতে থাকেন। লক্ষণীয় তখনও শিশুপাল একবার অস্ত্রজ্ঞ বলে অশ্বত্থামার নাম উল্লেখ করেছেন। শিশুপাল কৃষ্ণকে গালাগাল দেবার জন্য জগতের প্রায় সমস্ত প্রাণীর থেকেই কৃষ্ণকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তবু অশ্বত্থামার গুণের প্রতি যে সে সময় অনেকেই শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তারই একটা ধারণা শিশুপালের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়।

[মহা (k) ২.৩৭.১১; ২.৪৪.১৪; (হরি) ২.৩৬.১১; ২.৪৩.১৪]

☐ দ্যূতক্রীড়ার সময় কুরুসভায় অশ্বত্থামাও উপস্থিত ছিলেন হয়তো এবং শকুনির কপট দ্যূত কিংবা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বর্বরতা মেনে নিতে না পারলেও অন্যান্য কুরু সভাসদ এবং কুরু প্রবীণদের মতোই তিনিও নীরব ছিলেন। দ্বিতীয় দ্যূতের পর বনবাসে যাবার সময় পাণ্ডবরা অন্যান্য গুরুজনদের পর গুরুপুত্র অশ্বত্থামার কাছ থেকেও বিদায় গ্রহণ করেছিলেন, এটুকু মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ২.৭৮.২; (হরি) ২.৭৫.২]

☐ সমগ্র বনপর্বে, দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা এবং অন্যান্য ঘটনার বহু বিবরণ থাকলেও অশ্বত্থামা প্রসঙ্গে মহাভারতের কবি সম্পূর্ণ নীরব। তবে পাণ্ডবদের বনবাসকালে অশ্বত্থামার কার্যকলাপের খবর কৃষ্ণের মুখে সৌপ্তিক পর্বে বর্ণিত হয়েছে। অশ্বত্থামার চরিত্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দিক এই বিবরণ থেকে উন্মোচিত হয়েছে। তবে মহাভারতের কবি এই বিবরণের জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে রণক্লান্ত, পাণ্ডবপুত্রদের রক্তে কলুষিত অশ্বত্থামার জন্য অপেক্ষা করেছেন।

অশ্বত্থামাকে এরপর বিরাটপর্বে দেখতে পাই বিরাট রাজার গোসম্পদ হরণকারী কুরু সেনাব্যূহে। ভীষ্ম তাঁর ওপর ব্যূহের বাম ভাগ রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই সময় যুদ্ধের আগে উভয় পক্ষেই বেশ একটা গোলমাল দেখা গেল। মৎস্য দেশের রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলা বেশধারী অর্জুনকে সারথি করে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। কিন্তু সাগরের মতো বিশাল কুরুসেনা দেখে বালক রাজকুমার ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করলেন। বৃহন্নলা অর্জুন উত্তরের পিছনে ছুটলেন তাঁকে ধরতে। দূর থেকে এই ঘটনা কুরু যোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। স্ত্রী বেশধারী যে মানুষটি বালক রাজকুমারকে ধরতে ছুটছেন, তাঁর গড়নটা যেন অর্জুনের মতো বলেই মনে হয়েছিল তাঁদের। ধারণা যথার্থ প্রমাণ হতে বেশি দেরি হল না। উত্তরকে আত্মপরিচয় দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রণক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনার পর অর্জুন নিজেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন।

গাণ্ডীবের টঙ্কার শোনা গেল এবং সেই টঙ্কার শব্দে দ্রোণাচার্যের উচ্ছ্বাসও প্রকাশ পেল অর্জুনের জন্য। এই অবস্থায় কর্ণ তাঁকে চরম অপমান করলে কৃপাচার্য দ্রোণের পক্ষ নিয়ে কর্ণকে তিরস্কার করেন। কর্ণ আর কৃপের তর্ক যখন প্রায় কলহের আকার নিয়েছে, সেই সময় অশ্বত্থামা মুখ খুললেন, খানিকটা স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গীতেই। অশ্বত্থামা যথেষ্ট রাগী স্বভাবের মানুষ, তবু অশ্বত্থামাকে এর আগে বা পরে কখনো সেভাবে কলহে অংশ নিতে দেখা যায় না। কিন্তু কর্ণের আত্মশ্লাঘার জবাব তিনি দিলেন এবং যথেষ্ট কঠোর ভাবে দিলেন। কৃপাচার্যের পক্ষ অবলম্বন করার জন্যও বটে, কারণ কৃপাচার্যের মতোই তিনিও হস্তিনাপুরে বসবাসকারী আচার্য গোষ্ঠীর একজন সদস্য। কিন্তু অশ্বত্থামা যে ভাষায় কর্ণকে বিঁধলেন তাতে কর্ণ তো বটেই পরোক্ষ ভাবে দুর্যোধনরাও বাদ পড়লেন না। এতে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়, বাকিরা অর্থাৎ দ্রোণ-কৃপরা কুরুরাজ পরিবারের অন্নদাসত্বের কারণে অনেক অপমান, দুর্যোধনের অনেক দুষ্কর্ম নীরবে সহ্য করলেও অশ্বত্থামা ঠিক সেই গোত্রে পড়েন না। নিজের এবং নিজগোষ্ঠীর মর্য্যাদা বিষয়ে তিনি সচেতন, পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর হৃদয়ে স্নেহও যথেষ্ট, তাই সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলতে তিনি কোনোরকম কুণ্ঠা বোধ করেননি। অশ্বত্থামা কর্ণকে যথেষ্ট তিরস্কার করেছেন, কৌরবদের পাণ্ডব বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র এবং অসদাচরণ থেকে শুরু করে দ্যূতসভার বর্বরতার নিন্দাও করেছেন তীক্ষ্ণ-কঠোর ভাষায়। তারপরেই দ্রোণের মতোই অর্জুনের বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন অশ্বত্থামা। সঙ্গে একথাও বললেন যে, পিতার কাছে পুত্র যেমন প্রিয়, গুরুর কাছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যও ঠিক ততটাই প্রিয়। ফলে আমার পিতা দ্রোণের কাছে আমি আর অর্জুন দুজনেই সমান। সুতরাং অর্জুন আমারও অত্যন্ত প্রিয়। আর একথাও জানি যে, অর্জুন আজ কারও দ্বারাই পরাস্ত হবেন না। ফলে তোমরা বীরপুরুষরা চাও তো অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর গিয়ে, আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যদি বিরাট রাজা যুদ্ধে আসতেন তো যুদ্ধ করতাম, অর্জুনের সঙ্গে অকারণে যুদ্ধ করব না।

[মহা (k) ৪.৪৮-৫০ অধ্যায়;
(হরি) ৪.৪৩-৪৫ অধ্যায়]

☐ যাইহোক, ভীষ্মের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত কর্ণ এবং অশ্বত্থামার বিবাদ বন্ধ হল। অশ্বত্থামা যুদ্ধ করতে রাজীও হলেন। তবে সেদিনের যুদ্ধে অর্জুন সত্যিই অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করার জন্য অর্জুনকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত অর্জুনের কাছে পরাজিত হতে হল। কিন্তু যুদ্ধের সময় কুমার উত্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অশ্বত্থামার প্রতি অর্জুনের শ্রদ্ধা। ছাত্রজীবনের বন্ধুত্ব এবং গুরুপুত্রের মাননীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন অর্জুন, অশ্বত্থামাকে চিনিয়ে দেবার সময় উত্তরকে বলছেন—ওই যে যাঁর ধ্বজে ধনুকের ছবি আঁকা দেখছ তিনিই অশ্বত্থামা—

অস্যাবিদূরে হি ধনুর্ধ্বজাগ্রে যস্য দৃশ্যতে।
আচার্যস্যৈষ পুত্রো বৈ অশ্বত্থামা মহারথঃ॥
সখা মমৈষ মান্যশ্চ সর্বশস্ত্রভৃতামপি।
এতস্য ত্বং রথং প্রাপ্য নিবর্তেথা পুনঃ পুনঃ॥

[মহা (k) ৪.৫২.২২; ৪.৫৫.৪৬;
৪.৫৮.৭২-৭৬; ৪.৫৯.১-১৯; ৪.৬৮.৭২;
(হরি) ৪.৪৭.২২; ৪.৫০.১৩-১৪;
৪.৫৩.৭১-৭৪; ৪.৫৪.১-১৯; ৪.৬৪.১৬]

☐ উদ্যোগ পর্বে কৌরব শিবিরে যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে, তখন একাধিকবার মহারথ যোদ্ধা হিসেবে অশ্বত্থামার নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে একথাও বলেছেন যে, অশ্বত্থামা এ যুদ্ধের পক্ষপাতী নন। কুরু পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কৌরবপক্ষে যুদ্ধ হয়তো করবেন, কিন্তু অশ্বত্থামা এ যুদ্ধের পক্ষে মত পোষণ করেন না। দ্রোণাচার্যও বারে বারে বলছেন যে, অর্জুন এবং অশ্বত্থামা দুজনেই আমার কাছে সমান, বরং অর্জুনই আমার বেশি স্নেহের পাত্র। কিন্তু এই সময় কুরুসভার অন্যান্য সম্মানীয় ব্যক্তিরা যেভাবে দুর্যোধনকে উপদেশ দিচ্ছেন, অশ্বত্থামার আচরণে তেমন কোনো ভাব লক্ষ্য করা যায় না। বরং তিনি নীরব, একটু অস্বাভাবিকভাবেই নীরব। আমরা জানি, অন্নদাসত্বের যে তথাকথিত দায় দ্রোণাচার্যের ছিল, তা অশ্বত্থামার ছিল না। বিরাট পর্বের সংলাপ থেকে বুঝি, দুর্যোধনের অন্যায় আচরণ তিনি মানতে পারেন না। সেক্ষেত্রে পরমাত্মীয় অর্জুনের শিবিরে অশ্বত্থামা হয়তো অনায়াসেই যেতে পারতেন। কিন্তু তাও অসম্ভব। তাঁর পিতার

অপমানকারী দ্রুপদ, পিতার ভাবী হত্যাকারী ধৃষ্টদ্যুম্ন যে শিবিরে আছেন, ধর্ম সেখানে থাকলেও অশ্বত্থামা সেখানে থাকতে পারেন না। ধৃতরাষ্ট্র যদিও বললেন যে, অশ্বত্থামা যুদ্ধ চান না—তবু যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ পাঞ্চালরা রয়েছেন, বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে সে যুদ্ধে অর্জুন বা পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহবশত দ্রোণ উৎসাহ হারাতে পারেন, কিন্তু যিনি বাল্যকাল থেকে সেই ক্রোধ, অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে পুষে রইলেন—তিনি এ যুদ্ধ একেবারেই চান না—একথা মহাভারতের কবিও জোর দিয়ে বলতে পারেন নি। বরং অশ্বত্থামা যে পাঞ্চালদের রক্তে স্নাত হবার জন্যই অপেক্ষায় আছেন তার আভাস পাই কর্ণের কথায়—কর্ণ কৃষ্ণকে বলছেন, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন এই যুদ্ধে কুরু পরিবারের ধ্বংস নিশ্চিত। শুধু তিনটি মাত্র ব্যক্তিকে তিনি রক্তবর্ণ উষ্ণীষধারী, যুদ্ধোন্মত্ত অবস্থায় দেখতে পান—কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা।

অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
রক্তোষ্ণীষাশ্চ দৃশ্যন্তে সর্বে মাধব পার্থিবাঃ।।

দুর্যোধনও বোধহয় জানেন পাঞ্চালদের প্রতি অশ্বত্থামার অপরিসীম ঘৃণার কথা। তাই পিতার উপদেশের উত্তরে যতই বলুন যে অশ্বত্থামার ভরসায় আমি এ যুদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত নিইনি—

নাহং ভবতি ন দ্রোণে নাশ্বত্থাম্নি ন সঞ্জয়ে।

তবু অশ্বত্থামা যে তাঁর শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ মহারথী, সেকথা স্থানান্তরে দুর্যোধনই বহুবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন।

তবে অশ্বত্থামা সম্পর্কে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য শোনা যায় কুরু শিবিরের প্রধান সেনাপতি ভীষ্মের মুখে। নিজের শিবিরের যোদ্ধাদের গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভীষ্ম প্রথমে অশ্বত্থামাকে মহারথ বলে বর্ণনা করছেন। অশ্বত্থামার বীরত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসাও শোনা যাচ্ছে তাঁর মুখে। কিন্তু তারপরই বলছেন—তবু এঁর মধ্যে একটা গুরুতর দোষ আছে তার কারণে আমি এঁকে অতিরথ কিংবা রথী বলতেও রাজী নই—

দোষস্ত্বস্য মহানেকো যেনৈষ পুরুষর্ষভ।

ভীষ্ম বলছেন—এই ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর নিজের জীবন বড়ো বেশি প্রিয়। বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে তাঁর মধ্যে—

জীবিতং প্রিয়মত্যর্থমায়ুষ্কামঃ সদা দ্বিজঃ।

এই যে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষাই হয়তো পরবর্তী সময়ে অশ্বত্থামার বহুকথিত অমরত্বের দ্যোতক হয়ে দাঁড়াবে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যাওয়া ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। ব্রাহ্মণের এমন কোনো গুণ থাকা অপরিহার্য্য নয় হয়তো। বিশেষত পরশুরামের মতো অস্ত্রধারী ব্রাহ্মণও মন্তব্য করেছেন—ব্রাহ্মণদের মধ্যে কষ্ট সহ্য করার শক্তি থাকে না—

অতি দুঃখমিদং মূঢ় ন জাতু ব্রাহ্মণ সহেৎ।

তবু অশ্বত্থামার পিতা দ্রোণাচার্য সম্পর্কে ভীষ্ম এমন মন্তব্য করেননি, এমনকী কৃপাচার্য সম্পর্কেও না। কাজেই অশ্বত্থামা যে প্রতিকূল অবস্থায় শুধুমাত্র নিজের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করবেন, সেকথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভীষ্ম। পরবর্তীসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বত্থামাকে শত্রুসৈন্যকে দমন করতেও যেমন দেখা যাবে, তেমনই বিপদে পড়ে পলায়ন করার দৃশ্যও দেখা যাবে বহুবার। তবে আপাতত দুর্যোধন এক অক্ষৌহিণী সেনা রক্ষার দায়িত্ব অশ্বত্থামার উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, অশ্বত্থামাও সদর্পে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, মাত্র দশদিনেই তিনি পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করতে পারেন। সকলে সসৈন্য ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

[মহা (k) ৫.২৫.১১; ৫.৩০.১৩; ৫.৪৭.৬; ৫.৫০.৩২; ৫.৫৫.৫১; ৫.৫৭.১৫, ৩৭, ৬৮, ৭২; ৫.৬৬.৫; ৫.৯৫.১৯; ৫.১২৪.১৮; ৫.১৩১.৪০; ৫.১৩৯.৪; ৫.১৪৩.৪২; ৫.১৫৮.১৬; ৫.১৬৪.৬; ৫.১৬৭.৩-৯; ৫.১৯৩.১৮; ৫.১৯৫.৬; (হরি) ৫.২৫.১১; ৫.৩০.১৩; ৫.৪৭.৬; ৫.৫০.৩২; ৫.৫৫.৫১; ৫.৫৭.১৫, ৩৭, ৬৮, ৭২; ৫.৬৫.৫; ৫.৮৮.১৯; ৫.১১৫.১৮; ৫.১২২.৪৩; ৫.১৩৯.৪; ৫.১৩৪.৪২; ৫.১৫৩.৬; ৫.১৫৬.৩-৯; ৫.১৮৩.১৯; ৫.১৮৫.৬]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই আমরা অশ্বত্থামাকে কৌরবপক্ষের অন্যতম সেনানায়ক হিসেবে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখব। তবে পাণ্ডবদের থেকেও পাঞ্চালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই অশ্বত্থামাকে কিছু বেশি ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। যুদ্ধের প্রথমদিকেই অশ্বত্থামা শিখণ্ডীকে আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় দিনে অর্জুন

আর ভীষ্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে যেসব কুরু মহারথীরা ভীষ্মের সহায়তার জন্য উপস্থিত ছিলেন, অশ্বত্থামা তাঁদের মধ্যে একজন। ওই দিনেই ধৃষ্টদ্যুম্ন আর অভিমন্যুর সঙ্গে অশ্বত্থামার যুদ্ধ হয়। পঞ্চম দিনের যুদ্ধে অর্জুন এবং অশ্বত্থামার মধ্যে এক দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। যুদ্ধে অশ্বত্থামার পরাজয়ের উপক্রম হয়েছিল বলেই মনে হয় কারণ অর্জুন গুরুপুত্র অশ্বত্থামার মান রক্ষার জন্য সে যুদ্ধ ত্যাগ করলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে—

মমাচার্যসুতো হ্যেষ দ্রোণস্যাপি প্রিয়ঃ সুতঃ।
ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষেণ মাননীয়ো মমেতি চ॥

যুদ্ধের সপ্তম দিনে শিখণ্ডীর সঙ্গে আবার অশ্বত্থামার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। শিখণ্ডী শেষ পর্যন্ত অশ্বত্থামার কাছে পরাজিত হয়ে সাত্যকির রথে চড়ে পলায়ন করেন। অষ্টমদিনের যুদ্ধে ঘটোৎকচের সামনে অশ্বত্থামা বলতে গেলে যুদ্ধই করতে পারেন নি। ঘটোৎকচ যে মায়া সৃষ্টি করেন তাতে ভীত হয়ে কুরুসৈন্যরা পলায়ন করে, অশ্বত্থামাও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করেন। নবমদিনে সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে অশ্বত্থামা আহত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। নবম দিনে অর্জুনকেও তিনি একবার আক্রমণ করেছিলেন। দশম দিনে ভীষ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দ্রুপদ এবং বিরাট রাজাকে অশ্বত্থামা আক্রমণ করেন। দুজনেই অশ্বত্থামার বাণে আহত হয়েছিলেন। এদিকে অর্জুন সেদিন ভীষ্মবধের জন্য শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে আক্রমণ করতে চলেছেন, এই অবস্থায় দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামাকে বললেন—আজ নিশ্চয় কোন বড়ো অঘটন হবে। অর্জুন অজেয় বীরের মতো ভীষ্মের দিকে ধেয়ে আসছেন, তুমি যাও, কুরুসেনাকে রক্ষা কর। দ্রোণাচার্যও জানেন তাঁর পুত্রের কাছে নিজের প্রাণ বড়ো বেশি মূল্যবান, তাই স্পষ্ট বাক্যে আদেশ দিচ্ছেন—পুত্রের দীর্ঘায়ু সবাই কামনা করে, আমিও করি। কিন্তু আজ কুরুসৈন্য রক্ষা করার জন্য তোমাকে ক্ষত্রিয় ধর্মে মনোনিবেশ করতে বলছি—

কো হি নেচ্ছেৎ প্রিয়ং পুত্রং জীবন্তং
শাশ্বতী সমাঃ।
ক্ষত্রধর্মন্তু সংপ্রেক্ষ্য ততস্ত্বাং নিযুনজ্‌ম্যহম্॥

দ্রোণ প্রিয় পুত্রকে বলছেন—কুরুপরিবারের অন্নে তুমি পালিত, তাই আজ কুরুসৈন্যরক্ষার জন্য বীরের মতো স্বর্গলাভ কামনা করে ঝাঁপিয়ে পড়—

নায়ং সংরক্ষিতুং কালঃ প্রাণান্
পুত্রোপজীবিভিঃ।
যাহি স্বর্গং পুরস্কৃত্য যশসে বিজয়ায় চ॥

পুত্রস্নেহান্ধ দ্রোণের মুখে একথা শুনতে বড়ো অদ্ভুত লাগে। তবে বুঝতে পারি, কুরুসেনা নয় ভীষ্মের অবশ্যম্ভাবী পতনই দ্রোণাচার্যকে বিচলিত করে তুলেছে। তবে অশ্বত্থামা একবার ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন, আর কিছু করা হয়তো সেদিন তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

[মহা (k) ৬.৪৫.৪৬-৪৮; ৬.৫১.২, ১৯; ৬.৫২.৪০; ৬.৫৫.২-৭; ৬.৫৬.৪; ৬.৬১.১; ৬.৭৩.৩-১৬; ৬.৭৫.১৬; ৬.৮১.২; ৬.৮২.২৬-২৮; ৬.৯২.২৪; ৬.৯৪.৩৫-৩৬; ৬.১০১.৪৬-৪৭; ৬.১০২.২৪; ৬.১১০.১৬; ৬.১১১.২২-২৭; ৬.১১২ অধ্যায়; ৬.১১৫.৩; ৬.১১৬.৯-১২; (হরি) ৬.৪৫.৪৬-৪৮; ৬.৫১.২, ১৯; ৬.৫২.৪১; ৬.৫৫.২-৭; ৬.৫৬.৪; ৬.৬১.১; ৬.৭২.৩-১৬; ৬.৭৪.১৬; ৬.৭৮.২; ৬.৭৯.২৬-২৮; ৬.৮৮.৫৪; ৬.৯০.৩৮-৪৮; ৬.৯৭.৪৬-৪৭; ৬.৯৮.২৩; ৬.১০৬.১৬; ৬.১০৭.২২-২৭; ৬.১০৮ অধ্যায়; ৬.১১২.৯-১২]

☐ দ্রোণপর্বে যুদ্ধের একাদশ দিনে পাণ্ডবপক্ষীয় অনূপদেশাধিপতি রাজা নীল অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে চক্রব্যূহে অভিমন্যুর সঙ্গে একাধিকবার অশ্বত্থামার যুদ্ধ হয়। অশ্বত্থামা অভিমন্যুর হাতে বেশ আহতও হয়েছিলেন। চতুর্দশ দিনে জয়দ্রথ বধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্জুনকে অন্যান্য কুরু যোদ্ধাদের সঙ্গে অশ্বত্থামাও বেশ কয়েকবার আক্রমণ করেন, কিন্তু অর্জুনকে প্রতিরোধ করতে পারেননি। তবে জয়দ্রথ বধের দিনে এবং তার পরে সমগ্র দ্রোণপর্বে অশ্বত্থামার বীরত্বের কারণে পাণ্ডবসেনাকে, বিশেষত পাঞ্চাল যোদ্ধাদের যথেষ্ট বিচলিত হতে দেখা গেছে। দ্রোণপর্বে শত্রুসেনার মধ্যে বিচরণকারী অশ্বত্থামার রথ ও ধ্বজের বিবরণ পাই—

তত্রৈব সিংহলাঙ্গূলং দ্রোণপুত্রস্য ভারত।
ধ্বজাগ্রং সমপশ্যাম বালসূর্যসমপ্রভম্॥

জয়দ্রথ বধের দিনেই একবার অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কর্ণকে সাহায্য করতে এসে অশ্বত্থামা আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। সাত্যকি আহত, নিরস্ত্র ভূরিশ্রবাকে বধ করতে উদ্যত হলে অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য কুরুযোদ্ধারা সাত্যকিকে বারণ করার একটা নিস্ফল চেষ্টা করেছিলেন।

জয়দ্রথ বধের দিনে যুদ্ধ সূর্যাস্তের পরও শেষ হল না। দ্রোণাচার্য বুঝতে পারছেন কৌরবদের জয় সহজ নয়, সম্ভবও নয়, তবু যে পাঞ্চালদের বধ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন, বিশেষত জয়দ্রথের মৃত্যুর পর দুর্যোধনের কঠোর বাক্যে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছেন, ফলে সূর্যাস্তের পরেও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময় দুর্যোধনের মাধ্যমে দ্রোণ অশ্বত্থামাকে এক বার্তা পাঠাচ্ছেন। দ্রোণ নিজের মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার আগে পুত্রের প্রতি এটিই তাঁর শেষ উপদেশ। আশ্চর্য এই যে, দ্রোণ কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো উপদেশ দেননি। শুধু বলেছেন—নিজের প্রাণের মায়া না রেখে সোমকদের অর্থাৎ পাঞ্চালদের যেন অবশ্যই বধ করেন—

ন সোমকাঃ প্রমোক্তব্যা জীবিতং পরিরক্ষতা।

দ্রোণ আরও বলেছেন—অশ্বত্থামাকে বোলো, সারাজীবন আমি তাঁকে যে উপদেশ দিয়ে এসেছি, তা যেন পালন করেন, দয়া, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য ও সরলতায় স্থির থাকেন, আর এই কথাটা বারে বারে বলো, যেন ধর্মপ্রধান কার্য করেন, ব্রাহ্মণদের অপ্রিয় আচরণ না করেন—

ধর্মপ্রধানকার্য্যাণি কুর্য্যাশ্চেতি পুনঃ পুনঃ।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে দ্রোণ বুঝি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, অশ্বত্থামা অদূর ভবিষ্যতে ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-অসত্যের সব পরিভাষা বিস্মৃত হবেন, তাই শেষ উপদেশে আজ অশ্বত্থামাকে ধর্মপথে থাকতে বলার কথাটাই তাঁর সবচেয়ে বেশি দরকারি বলে মনে হয়েছে। নিজের পুত্রকে দ্রোণ চেনেন। তিনি যে ধর্ম বা সত্যের পথে থাকবেন না এ ভবিষ্যদ্বাণী তিনি আগেও করেছেন (সৌপ্তিক পর্বে বর্ণিত হয়েছে)। দ্রোণের এই শেষ উপদেশ অশ্বত্থামার জটিল মনস্তত্ত্বের আবরণটা যেন আমাদের সামনে খানিকটা উন্মোচিত করে দেয়।

যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে অশ্বত্থামার হাতে ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্বার মৃত্যু হয়। পুত্রশোকার্ত ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ঘটোৎকচকেও অশ্বত্থামার হাতে পরাস্ত হতে হয়। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতিরাও অশ্বত্থামাকে প্রতিরোধ করতে পারলেন না। সেদিন যুদ্ধে দ্রুপদরাজার পাঁচ পুত্র, শ্রুতাহ্বয়, হেমমালী, পৃষধ্র, চন্দ্রসেন এবং কুন্তিভোজের দশটি পুত্র অশ্বত্থামার হাতে নিহত হলেন। সেদিনের যুদ্ধে একা অশ্বত্থামার পরাক্রমেই পাণ্ডবসৈন্য বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল। এদিকে কৃপাচার্য অর্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করছিলেন—কিন্তু অর্জুনের চির প্রতিদ্বন্দ্বী অহংকারী কর্ণের এই প্রশংসা সহ্য হল না। তিনি কৃপাচার্যকে গালাগাল দিলেন, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদার পরোয়া না করে যথেষ্টই নিকৃষ্ট ভাষায় গালাগাল দিলেন। অশ্বত্থামা আর সহ্য করতে পারলেন না। কৃপাচার্যের সমর্থনে অর্জুনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তো হলেনই, কর্ণকে পালটা গালাগালি দিতেও ছাড়লেন না। দুর্যোধন অশ্বত্থামা এবং কর্ণকে অনেক কষ্টে শান্ত করালেন। অশ্বত্থামা শান্ত হয়ে আবার যুদ্ধে মন দিলেন।

অশ্বত্থামা পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করছেন, এদিকে পাণ্ডবরা অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে দিলেন, যাতে পুত্রশোকার্ত দ্রোণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরও দ্রোণকে অস্ত্রত্যাগ করাবার জন্য অর্ধসত্য উচ্চারণ করলেন। দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বিশ্বাস করে অস্ত্র ত্যাগ করলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন নিরস্ত্র দ্রোণকে বধ করলেন—অশ্বত্থামা এতসব ঘটনার কিছুই জানতে পারেননি। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কিছু পরে মাতুল কৃপাচার্যের মুখ থেকে অশ্বত্থামা একথা শুনতে পেলেন। শুনেই তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে যুদ্ধে বধ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন, তারপর ক্রোধে অস্থির হয়ে বললেন—আমি এখনই নারায়ণাস্ত্রে পাণ্ডব-পাঞ্চাল সহ সমস্ত বিপক্ষ যোদ্ধাদের ধ্বংস করব। এই নারায়ণাস্ত্র স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু দ্রোণকে দিয়েছিলেন, দ্রোণ বোধহয় পুত্রের প্রতি স্নেহবশত অশ্বত্থামাকে এই অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল শিখিয়েছিলেন। আজ পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত অশ্বত্থামা পাণ্ডবসেনার উপর সেই নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। নিরস্ত্র গুরু দ্রোণকে নৃশংসভাবে হত্যা করার ব্যাপারটা অর্জুন

কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। পাণ্ডব শিবিরে এই নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ চলছিল, অশ্বত্থামার এই নারায়ণাস্ত্রের সমস্যাটা একটু আকস্মিকভাবেই পাণ্ডবশিবিরে এসে পড়ল। এর জন্য তাঁরা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। তবে কৃষ্ণ নারায়ণাস্ত্র নিবারণের কৌশল জানতেন। তিনি পাণ্ডবসেনাকে অস্ত্রত্যাগ করে নারায়ণাস্ত্রকে প্রণাম করতে বললেন। কৃষ্ণের বিচক্ষণতায় পাণ্ডবশিবিরের প্রাণরক্ষা হল। দুর্যোধন ভেবেছিলেন, একবার পাণ্ডবরা বেঁচে গেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করলে বাঁচবেন না। অশ্বত্থামা বুঝিয়ে বললেন—এ অস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করা যায় না। তবে নারায়ণাস্ত্র থেকে পাণ্ডবসেনা বাঁচল বটে কিন্তু অশ্বত্থামা সেদিন যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলেন। বহু সেনা, রথী-মহারথীর মৃত্যু হল। অশ্বত্থামা শুধুমাত্র সেই দিনেই আগ্নেয়াস্ত্রে এক অক্ষৌহিণী পাণ্ডবসেনা বধ করেন। অশ্বত্থামার এই রুদ্রমূর্তি দেখে মহাভারতের কবি ব্যাসও চিন্তিত হয়েছেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অশ্বত্থামাকে অর্জুন, কৃষ্ণ এবং ভগবান শিবের মহিমা কীর্তন করে শোনালেন। অশ্বত্থামা কাল অর্থাৎ মৃত্যুর অংশজাত, পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত তো বটেই তবে এখন উপদেশ দেবার জন্য বা তাঁকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দ্রোণাচার্যও উপস্থিত নেই। তাই অশ্বত্থামার মধ্যে যে সংহার মূর্তি লক্ষ্য করা গেল, তাকে নিয়ন্ত্রণ করারই একটা চেষ্টা করলেন ব্যাস।

*[মহা (k) ৭.৩১.২৪-২৫; ৭.৩৪.২২;
৭.৩৭.২৪, ৩১; ৭.৪৭.৯,১৪,১৭; ৭.৪৯.৪;
৭.১০৫.১০; ৭.১৩৯.১২১-১২৩; ৭.১৪৩.৫২;
৭.১৫৬.৫৫-১৯০; ৭.১৫৯.৮৩-১০০;
৭.১৬০-১৬১ অধ্যায়; ৭.১৯০-২০০ অধ্যায়;
(হরি) ৭.২৯.২৪-২৫; ৭.৩১.৪০; ৭.৩৪.২৪, ৩০;
৭.৪২.৯, ১৪, ১৭; ৭.৪৪.৪; ৭.৯০.১০;
৭.১২০.১০৪-১০৬; ৭.১২৪.৩৫; ৭.১৩১.৬৯-৭২;
৭.১৩৭.৫৩-১৮২; ৭.১৩৯.১-১৩; ৭.১৩৯.৭৭-৯০;
৭.১৪০ অধ্যায়; ৭.১৬৫-১৭০ অধ্যায়]*

☐ দ্রোণবধের পর দুর্যোধন কর্ণকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন। দুর্যোধনের কর্ণের প্রতি অগাধ আস্থা ছিল, তবু এইসময় বোধহয় অশ্বত্থামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করলে সেটা দুর্যোধনের পক্ষে ভাল হত। পিতার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত অশ্বত্থামা এক অপরাহ্নে এক অক্ষৌহিণী পাণ্ডব সেনা বধ করেছেন। অশ্বত্থামার এই শোক-ক্রোধ-উত্তেজনাকে দুর্যোধন কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু দুর্যোধন সে রাস্তায় গেলেন না। অশ্বত্থামা এতে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন হয়তো, কিন্তু মুখে কিছু না বলে যুদ্ধে মনোনিবেশ করলেন। তবে দ্রোণবধের পর থেকে অশ্বত্থামার যুদ্ধোদ্যম চোখে পড়ার মতো। কর্ণপর্বের সূচনাতেই ভীমের সঙ্গে অশ্বত্থামার দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ভীম এবং অশ্বত্থামা দুজনেই আহত এবং মূর্ছিত হলেন। সংশপ্তকদের সঙ্গে মিলে তিনি দীর্ঘক্ষণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশ্বত্থামা পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করলেন। পাণ্ডবপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধারাও দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর অশ্বত্থামার হাতে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। যুধিষ্ঠির এবং সাত্যকির সঙ্গে অশ্বত্থামার একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণও মেলে। অশ্বত্থামা সাত্যকির সারথিকে বধ করলে সাত্যকি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এদিকে সংশপ্তকদের বিরুদ্ধে অর্জুন যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন, কৌরবপক্ষের বিশাল কাম্বোজ সেনা একা অর্জুনের হাতে নিহত হয়েছেন—এই সময় অর্জুনকে বাধা দিতে আরও একবার অশ্বত্থামা এগিয়ে এলেন। কিন্তু অর্জুনের বাণে অশ্বত্থামা এতটাই আহত হলেন যে, অশ্বত্থামার সারথি মূর্ছিত অশ্বত্থামাকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেলেন। এই দারুণ লোকক্ষয়ের মাঝে স্বয়ং দুর্যোধন কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এলেন। দুর্যোধনের কথার উত্তরে অশ্বত্থামা পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। অশ্বত্থামা বললেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করে আমি যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করব না এবং আমার এই প্রতিজ্ঞা যদি আমি পূর্ণ করতে না পারি তাহলে যেন আমার স্বর্গলাভ না হয়—

ধৃষ্টদ্যুম্নমহত্বাহং ন বিমোক্ষ্যামি দংশনম্।
অনৃতায়াং প্রতিজ্ঞায়াং নহি স্বর্গমবাপ্নুয়াম্॥

নিজের পক্ষের সৈন্যদের শবদেহ দেখে, স্বনিযুক্ত যোদ্ধা, নিজের ভাই এবং পুত্রদের শবদেহ দেখে দেখে দুর্যোধন তখন ক্লান্ত। এ যুদ্ধে জয়লাভ করা যে প্রায় অসম্ভব, তাও তখন যেন বুঝতে আরম্ভ করেছেন তিনি। তাই নিজের পক্ষের যোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে গিয়েও ক্ষত্রিয়ের মতো

যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে স্বর্গলাভ করার কথাই বলেছেন—

যদৃচ্ছয়েতৎ সংপ্রাপ্তং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ কর্ণ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

এমন সময়েও অশ্বত্থামা পাণ্ডববধের কথা মুখ ফুটে উচ্চারণও করলেন না। শুধু ধৃষ্টদ্যুম্ন ছাড়া সমগ্র কুরুক্ষেত্রে আর কেউ যেন তত বড়ো শত্রু নয়। আর কাউকে বধ করার ব্যাপারে যেন কোনও প্রতিজ্ঞা করারও কোনও প্রয়োজন নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরু-পাণ্ডবের বিরাট বিসংবাদের মধ্যে এটা যেন পাঞ্চালদের বিরুদ্ধে অশ্বত্থামার ব্যক্তিগত যুদ্ধক্ষেত্র। যাইহোক, ধৃষ্টদ্যুম্ন বধের প্রতিজ্ঞা করে অশ্বত্থামা সোজা ধৃষ্টদ্যুম্নকে খুঁজতেই ছুটে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সময়ই অশ্বত্থামা তাঁকে আক্রমণ করলেন। সেই যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়তো অশ্বত্থামার হাতেই প্রাণ দিতেন, কিন্তু অর্জুন এসে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করলেন। আহত ধৃষ্টদ্যুম্নও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। অর্জুনের অস্ত্রের আঘাতে অশ্বত্থামাকেও পলায়ন করতে হল। কর্ণপর্বের শেষ পর্যন্ত আরও বেশ কয়েকবার অশ্বত্থামার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামার পরাজয়ের উল্লেখ আছে। বোধহয় এতবার পরাজিত আর হতাশ হয়েই শেষ পর্যন্ত অশ্বত্থামাও দুর্যোধনকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন। অশ্বত্থামা বলছেন, আমি এখনও গিয়ে অর্জুনকে বলতে পারি। অর্জুন আমার কথা ফেলতে পারবেন না। তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত হলেই সন্ধি হয়ে যাবে। এখনও অশ্বত্থামা আত্মবিশ্বাসী যে, গুরুপুত্রের কথা অর্জুন অমান্য করবেন না—

অতো'পি ভূয়াংশ্চ গুণৈর্ধনঞ্জয়ো
ন চাতিবর্তিষ্যতি মে বচো'খিলম্।

এই সৌহার্দ্যের কথা মনে করেই অশ্বত্থামা আজও পাণ্ডবদের শত্রু বলে মনে করতে পারছেন না। কিন্তু দুর্যোধন সন্ধির কথায় কান দিলেন না, সন্ধির কাল বহু আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে, দুঃশাসনও নিহত হয়েছেন। সব থেকে বড়ো কথা এতদিন ধরে দুর্যোধন পাণ্ডবদের বঞ্চনা করে আসছেন, আজ সেই দীর্ঘ প্রতারণার ইতিহাস স্মরণ করে দুর্যোধনও বুঝলেন— আজ পাণ্ডবরাও আমার সন্ধি প্রস্তাবে সরলভাবে বিশ্বাস করবেন না—

ন চাশ্বসিষ্যন্তি পৃথাত্মজা ময়ি প্রসহ্য
বৈরং বহুশো বিচিন্ত্য চ।

অশ্বত্থামার সন্ধি প্রস্তাব তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই ব্যর্থ হল। দুর্যোধনের শেষ ভরসা কর্ণও সেদিন নিহত হলেন।

[মহা (k) ৮.১৪-১৫ অধ্যায়; ৮.১৬-১৭ অধ্যায়; ৮.২০ অধ্যায়; ৮.৫৫ অধ্যায়; ৮.৫৬.১১৮-১৪৭; ৮.৫৭.৯-১০; ৮.৫৯ অধ্যায়; ৮.৮৮.২১-২৯; (হরি) ৮.১১ অধ্যায়; ৮.১২ অধ্যায়; ৮.১৫ অধ্যায়; ৮.৪১.৪২-৮১; ৮.৪২.১১৯-১৪৪; ৮.৪৩.৯-১০; ৮.৪৫ অধ্যায়; ৮.৬৫.২১-২৯]

☐ কর্ণের মৃত্যুর পর কৌরবপক্ষে অল্প কয়েকজন মাত্র যোদ্ধা অবশিষ্ট আছেন, এই সময় দুর্যোধন অশ্বত্থামার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। অশ্বত্থামার রূপ-গুণ-স্বভাবের প্রশংসাও করলেন অনেক। কিন্তু আশ্চর্য—দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি হতে বললেন না। এত স্তুতি করার পর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বলুন, কাকে সেনাপতি করে আমরা যুদ্ধ করব—

ভবাংস্ত্বস্মান্নিয়োগাত্তে কো'স্তু সেনাপতির্মম।
যং পুরস্কৃত্য সহিতা যুধি জেষ্যাম পাণ্ডবান্॥

হে গুরুপুত্র, আপনিই অভিভাবক হিসেবে যোগ্য সেনাপতি নিযুক্ত করে দিন। এই অনুরোধের থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট, দুর্যোধন সেনাপতি হিসেবে এখনও অশ্বত্থামার কথা ভাবছেন না। কারণ যাঁকে এ ধরনের অনুরোধ করা হবে তিনি যে নিজেকে সেনাপতি বলে ঘোষণা করবেন না, এটা রাজা দুর্যোধন ভালোই জানেন। পাণ্ডবদের প্রতি অশ্বত্থামা এবং কৃপ দুজনেই স্নেহশীল একথা ভেবে, কিংবা বোধহয় ভীষ্মের উপদেশ স্মরণ করে যে, এই ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামার প্রাণের মায়া বড়ো বেশি—দুর্যোধন এঁকে যত বড়ো যোদ্ধাই মনে করুন, সেনাপতি বলে ভাবতে পারছেন না। যাইহোক, অশ্বত্থামা শল্যকে সেনাপতি করতে উপদেশ দিলেন। সেনাপতি শল্য খুব বেশি সময় জীবিত ছিলেন না। তবু ওই স্বল্পকালের মধ্যে অশ্বত্থামাকে কয়েকবার শল্য প্রভৃতি কুরুযোদ্ধাদের সহায়তা করতে দেখা যায়। শল্যপর্বেই পাঞ্চালবীর সুরথ অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৯.৬.১৯-২১; ৯.৮.২৬; ৯.১৪ অধ্যায়; ৯.১৬.অধ্যায়; ৯.১৭.৮৩; ৯.২২.২০; ৯.২৩.৮; (হরি) ৯.৫.১৮-২০; ৯.৬.২৫; ৯.১২ অধ্যায়; ৯.১৪ অধ্যায়; ৯.১৫.৭৭; ৯.২০.১৯; ৯.২১.৮]

☐ শল্য, শকুনি প্রভৃতিরা নিহত হলে কুরুসেনা প্রায় পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়াল। কুরুশিবিরে মাত্র তিনজন মহারথী— অশ্বত্থামা, কৃপ এবং কৃতবর্মা বেঁচে রইলেন। আর রইলেন ক্লান্ত, অসহায়, হতাশ দুর্যোধন। দুর্যোধন বিশ্রাম করতে দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করলেন। সঞ্জয়ের মুখে একথা শুনে অশ্বত্থামা, কৃপ এবং কৃতবর্মা পৌঁছালেন দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে। দুর্যোধন ক্লান্ত, এঁদের আহ্বানেও যুদ্ধে যাবার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না। অশ্বত্থামা এই সময় দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছেন—আজ রাত্রি শেষ হবার আগে আমি পাঞ্চালদের হত্যা করব। যদি আমি যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সৎকার্য করে থাকি, তবে আমার এ শপথ কখনওই মিথ্যা হবে না—

ইষ্টাপূর্তেন দানেন সত্যেন চ জপেন চ।
শপে রাজন্ যথা হ্যদ্য নিহনিষ্যামি সোমকান্॥
মাস্ম যজ্ঞকৃতাং প্রীতিং প্রাপ্নুয়াং সজ্জনোচিতাম্।
যদীমাং রজনীং ব্যুষ্টাং ন নিহন্মি পরান্ রণে॥

এই সময়েও যদি 'পাঞ্চালদের বধ করব' না বলে 'পাণ্ডবদের বধ করব' বলতেন, তাহলেও হয়তো দুর্যোধন একটু স্বস্তি পেতেন। কিন্তু না, এখনও অশ্বত্থামার মুখ থেকে পাণ্ডব বিরোধী একটি শব্দও উচ্চারিত হতে দেখলাম না। এদিকে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে অশ্বত্থামা প্রভৃতির সঙ্গে দুর্যোধনের কথোপকথন শুনতে পেল একদল ব্যাধ। তারা পাণ্ডবদের জানাল, দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে আছেন। পাণ্ডবরা দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে এলেন। পাণ্ডবদের রথের শব্দ পেয়ে অশ্বত্থামা কৃপ এবং কৃতবর্মাকে নিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীর ছেড়ে চলে গেলেন এবং এক বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে লাগলেন।

[মহা (k) ৯.৩০ অধ্যায়; (হরি) ৯.২৮ অধ্যায়]

☐ এদিকে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির আহ্বানে দুর্যোধন জল থেকে উঠে আসতে বাধ্য হলেন। ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ হল। দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে মৃতপ্রায় দুর্যোধনকে রেখে পাণ্ডবরা চলে গেলেন। দুর্যোধন একা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। রাতের অন্ধকারে তখন অশ্বত্থামারা এলেন দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের খবর তাঁরা আগেই পেয়েছিলেন, দুর্যোধনকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে তাঁরা দুঃখিত হলেন, অসহায় দুর্যোধনকে দেখে তাঁদের মায়া হল। অশ্বত্থামা বললেন—পাঞ্চালরা অতি নৃশংসভাবে আমার পিতাকে বধ করেছে, তাতেও আমি এত দুঃখিত হইনি, কিন্তু আজ আপনাকে যেভাবে ছল করে বধ করা হয়েছে, তাতে আমি দারুণ ভাবে দুঃখিত হয়েছি—

পিতা মে নিহতঃ ক্ষুদ্রৈঃ সুনৃশংসেন কর্মণা।
ন তথা তেন তপামি যথা রাজন্ ত্বয়াদ্য বৈ॥

আবারও অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করছেন— আজ রাত্রেই আমি পাঞ্চালদের যমালয়ে পাঠাব। মৃত্যু পথযাত্রী দুর্যোধন তখন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন। পাণ্ডববধের আশা মৃত্যু পথযাত্রী দুর্যোধন হয়তো আর করছিলেন না, তবু অশ্বত্থামার ব্যক্তিগত পাঞ্চালবিদ্বেষটাকেই মৃত্যুর আগে যেন সমর্থন করে গেলেন তিনি এবং অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদেও বরণ করলেন অদ্ভুতভাবে।

[মহা (k) ৯.৬৫; (হরি) ১০.২ অধ্যায়]

☐ এদিকে অশ্বত্থামা-কৃপ-কৃতবর্মা গভীর বনে এক বটবৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করতে লাগলেন। কৃপ এবং কৃতবর্মা একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু অশ্বত্থামার চোখে ঘুম এল না। তিনি জেগে সেই বটবৃক্ষের ঘুমন্ত কাকদের দেখতে লাগলেন। এই সময় হঠাৎই এক পেঁচা এসে সেই কাকেদের বাসা আক্রমণ করল। কাকগুলি বাধা দিতেও পারল না, পেঁচাটি ইচ্ছামত সেই কাকদের মেরে ফেলতে লাগল। পেঁচার এই কাণ্ড দেখে অশ্বত্থামাও পাণ্ডব যোদ্ধাদের ঘুমন্ত অবস্থাতেই বধ করার পরিকল্পনা করলেন। যে যুক্তি নিজের মনে সাজালেন, তাতেও নিজের আত্মরক্ষার ভাবনাটাই প্রবল—পাণ্ডবরা যতটা শক্তিশালী, ন্যায় যুদ্ধে তাদের বধ করা সম্ভব নয়, বরং আমারই প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। অথচ দুর্যোধনকে আমি কথা দিয়েছি যে, পাণ্ডব যোদ্ধাদের বধ করব। সেক্ষেত্রে ন্যায়ভাবে যুদ্ধ করলে আমারই প্রাণ যাবে, তার চেয়ে এভাবে আক্রমণ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ—

ন্যায়তো যুধমানস্য প্রাণত্যাগো ন সংশয়।
ছদ্মনা তু ভবেৎ সিদ্ধি শত্রূনাঞ্চ ক্ষয়ো মহান্॥

দুর্যোধনের প্রতি মায়াবশতই হোক, অথবা তিনি বার বার প্রতিজ্ঞা করেও যুদ্ধে পাঞ্চালদের বধ করতে পারেননি, এই হতাশা থেকেই হোক—অশ্বত্থামা নিজেকে কোনোভাবেই

নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। অথচ হত্যার পন্থাও এমন হতে হবে যাতে আত্মরক্ষাটাও নিশ্চিত করা যায়। তাই অশ্বত্থামা ঘুমন্ত পাণ্ডব শিবির আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। কৃপ এবং কৃতবর্মাকে জাগিয়ে জানালেন নিজের পরিকল্পনার কথা। কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে বারণ করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত অশ্বত্থামা গুপ্তহত্যার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে একরকম বাধ্য হয়েই কৃপ ও কৃতবর্মা তাঁর সঙ্গে চললেন।

সেরাত্রে পাণ্ডব শিবিরের দ্বার রক্ষা করছিলেন স্বয়ং মহাদেব। অশ্বত্থামা তাঁর উপর বাণ নিক্ষেপ করলেন কিন্তু মহাদেব সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস করতে লাগলেন। তখন অশ্বত্থামা সেই দীপ্ত পুরুষকে দেখে তাঁকে স্বয়ং রুদ্রশিব বলে চিনতে পারলেন এবং তাঁর স্তব করলেন। আশুতোষ মহাদেব অশ্বত্থামার পূজায় তুষ্ট হলেন। তারপর মহাদেবের কাছ থেকে পাঞ্চালবধের অনুমতি নিয়ে মূর্তিমান কালের মত অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করলেন। পাণ্ডবশিবির নিস্তব্ধ, সুপ্ত। অশ্বত্থামা চোরের মতো একে একে ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নির্মম ভাবে হত্যা করলেন। যাঁরা পালাবার চেষ্টা করলেন তাঁরা শিবিরদ্বারে কৃপ এবং কৃতবর্মার হাতে নিহত হলেন। দীর্ঘ হত্যাকাণ্ডের পর ঘুমন্ত পাণ্ডবশিবিরে শ্মশানের শূন্যতা বিরাজ করতে লাগল। কৃষ্ণ আগেই আন্দাজ করেছিলেন যে, অশ্বত্থামা মধ্যরাতে শিবির আক্রমণ করতে পারেন। তাই পাঁচ পাণ্ডব এবং সাত্যকিকে নিয়ে শিবিরের বাইরে রাত্রি যাপন করেন। এই সাতজন বাদে সেই রাতে অশ্বত্থামার হাতে পাণ্ডবপক্ষের সমস্ত যোদ্ধার মৃত্যু হয়। হত্যালীলা শেষ করে অশ্বত্থামা সেই সুসংবাদ দিতে গেলেন দুর্যোধনের কাছে। মৃতপ্রায় দুর্যোধন পাণ্ডব পুত্রদের মৃত্যু সংবাদে খানিকটা সান্ত্বনা পেলেন হয়তো। *[মহা (k) ১০.২-৯ অধ্যায়; (হরি) ১০.৩-১০ অধ্যায়]*

□ এদিকে পাণ্ডবরা শিবিরে ফিরে বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। পুত্র এবং ভ্রাতাদের মৃত্যুতে কাতর দ্রৌপদী অশ্বত্থামাকে সমুচিত দণ্ড দিতে বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামার জন্ম থেকেই তাঁর মাথায় এক মণি ছিল। মণিটি সত্যিই অশ্বত্থামা মস্তকে ধারণ করে জন্মেছিলেন না পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতা দ্রোণই শিশু অশ্বত্থামার মাথায় তা বেঁধে দিয়েছিলেন তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। অশ্বত্থামার পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ সেই মণি হাতে না পেলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর কথায় ভীম তখনই অশ্বত্থামার খোঁজে বের হলেন। কিন্তু ভীম যতই ক্রোধ প্রকাশ করুন, অশ্বত্থামাকে বধ করা সহজ নয়—একথা কৃষ্ণ ভাল করেই জানতেন। এই হত্যালীলাই শেষ নয়। অশ্বত্থামার তূণে এখনও দ্রোণাচার্যের দেওয়া ব্রহ্মশির অস্ত্র আছে। এই কথার প্রসঙ্গেই কৃষ্ণ আজ অশ্বত্থামার চরিত্র বিশদে বলতে লাগলেন। অশ্বত্থামার জীবনের প্রতি মোহ যে কতখানি, অসৎ কাজেও কতটা ঠাণ্ডা মাথায় তিনি মনোনিবেশ করতে পারেন, পিতার স্নেহকে অশ্বত্থামা নিজের যাবতীয় ইচ্ছাপূরণের জন্য কীভাবে ব্যবহার করেছেন—তা এখন কৃষ্ণের মুখে শোনা যাবে। ব্যক্তি অশ্বত্থামার চরিত্রের অনাবৃত অধ্যায়ের কথা। কৃষ্ণ বলছেন—দ্রোণ অর্জুনকে ব্রহ্মশির অস্ত্রশিক্ষা দিলেন দেখে অশ্বত্থামাও তা পাবার জন্য জেদ ধরলেন। দ্রোণ জানতেন—অশ্বত্থামা চঞ্চলমতি, এ অস্ত্রশিক্ষার তিনি যোগ্য নন। তবু, খানিকটা স্নেহের বশে, খানিকটা অপ্রসন্নভাবে পুত্রকে ব্রহ্মশির অস্ত্র দিলেন—

ততঃ প্রোবাচ পুত্রায় নাতিহৃষ্টমনা ইব॥
বিদিতং চাপলং হ্যাসীদাত্মজস্য মহাত্মনঃ।

তারপরেই দ্রোণ পুত্রকে সাবধান করছেন—তুমি এ অস্ত্র কখনও প্রয়োগ করবে না। কোনও অবস্থাতেই মানুষের ওপর তো নয়ই।

পরমাপদ্ গতেনাপি ন স্ম তাত ত্বয়া রণে।
ইদমস্ত্রং প্রয়োক্তব্যং মানুষেষু বিশেষতঃ॥

পরে যেন খানিকটা নিজের মনেই দূরদর্শী দ্রোণ বলছেন—তুমি সৎপথে থাকবে না। অর্থাৎ সৎপথে থাকার পাত্র তুমি নও—

ন ত্বং জাতু সতাং মার্গে স্থাতেতি পুরুষর্ষভ।

অর্থাৎ কৃষ্ণ বললেন, অশ্বত্থামার যে জটিল ব্যক্তিত্বের তল পাওয়া যায় না, সেই অতলে একজন অসদাচারী জেদী, অহংকারী অশ্বত্থামা আছেন। নিজের প্রাণরক্ষার জন্য কোন হীন কাজ করতেই যিনি পিছপা হবেন না। কৃষ্ণ আরও

বললেন—পাণ্ডবদের বনবাসের সময় অশ্বত্থামা বেশ কিছুদিন দ্বারকায় গিয়ে ছিলেন। নিজের অস্ত্রবিদ্যার অহংকারে মত্ত অশ্বত্থামা তখন 'ব্রহ্মশির' অস্ত্রের বিনিময়ে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ বললেন—বেশ তো, এই নিন। কিন্তু অশ্বত্থামা সেই সুদর্শন চক্র সর্বশক্তি দিয়েও তুলতে পারেননি। অশ্বত্থামার এই সুদর্শন চক্রলাভের আশা ব্যর্থ হয়। যা তপস্যার বলে পাবার, সেই অভীষ্ট অশ্বত্থামা সহজে লাভ করতে পছন্দ করেন—এটাই ছিল কৃষ্ণের বার্তা। কৃষ্ণের এই বিশ্লেষণে এটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে অশ্বত্থামা শুধুমাত্র দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নন—এমন একজন স্বার্থান্বেষী মানুষ, যিনি নিজের স্বার্থে আঘাত লাগাটাকেই সবথেকে বড়ো ঘটনা বলে মনে করেন। কিসের বিনিময়ে, কোন হীন কাজের ফলে সে স্বার্থ রক্ষিত হল, তা তাঁর কাছে নিতান্তই গৌণ। তাই পাণ্ডবরা যখন তাঁকে ধরতে ব্যাসদেবের আশ্রমে পৌঁছালেন, তখনও শুধু নিজের প্রাণ রক্ষার্থে, পাণ্ডবদের হাতে যাতে মরতে না হয় সেইজন্য নির্দ্বিধায় ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন সেই অস্ত্রের গতিরোধ করার জন্য নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করছেন এবং তাঁর অস্ত্রচালনার জন্য যে যুক্তিটুকু তিনি দেখাচ্ছেন, তা শুধুই অশ্বত্থামার অস্ত্রকে প্রতিরোধ করা, ধ্বংসের অভিলাষ সেখানে নেই। কি দায়িত্বপূর্ণ ভাবে অর্জুন উচ্চারণ করলেন—গুরুপুত্র অশ্বত্থামার, নিজের, ভ্রাতৃগণের এবং সমস্ত লোকের মঙ্গল হোক এবং অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবৃত্ত হোক—

পূর্বমাচার্য্যপুত্রায় ততো'নন্তরমাত্মনে।
ভ্রাতৃভ্যশ্চৈব সর্বেভ্যঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা পরন্তপঃ॥
দেবতাভ্যো নমস্কৃত্য গুরুভ্যশ্চৈব সর্বশঃ।
উৎসসর্জ শিবং ধ্যায়ন্নস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতাম্॥

বুঝতে পারা যায়, পুত্রের চেয়েও দ্রোণ অর্জুনকে বড়ো ধনুর্ধর মনে করতেন—এই সত্যে অশ্বত্থামার মনে ঈর্ষা ছিল, কিন্তু কেন অর্জুনই শ্রেষ্ঠ তা যেন দ্রোণাচার্যের শিক্ষাই আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যায়। কেন অর্জুনকে তিনি নিজে 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র দিয়েছিলেন। আর কেন অশ্বত্থামাকে দিয়েও সন্তুষ্ট হননি—অশ্বত্থামা নিজের কার্যকলাপ দিয়েই তা আজ প্রমাণ করলেন। স্বয়ং বেদব্যাস এসে দাঁড়ালেন দুই অস্ত্রের মধ্যে। দুই ব্রহ্মশির অস্ত্রের একের অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ মহা অশুভ ফলদায়ক—এ কথা বলে অস্ত্র ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন ব্যাস। অর্জুন ঋষিকে প্রণাম করে অস্ত্র ফিরিয়ে নিলেন। অশ্বত্থামার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আবার প্রকট হয়ে উঠল। অশ্বত্থামা অস্ত্র ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। অস্ত্রলাভের আনন্দেই তিনি মত্ত ছিলেন, অর্জুন যে দায়িত্ববোধ থেকে তাকে সংবরণ করার শিক্ষাও নিয়েছিলেন, অশ্বত্থামার সেই দায়িত্ববোধ ছিল না। এদিকে ঠিক মতো অস্ত্রসংবরণ না হলে অশ্বত্থামার নিজেরই প্রাণনাশের সম্ভাবনা। কাজেই অশ্বত্থামা রাখ-ঢাক না করেই ব্যাসকে বললেন—আমি পাণ্ডবদের ধ্বংসের জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি। এ অস্ত্র ফিরিয়ে নিতে আমি জানি না। যদি একান্তই পাণ্ডববধ অসম্ভব হয় তবে তাদের বংশধর সন্তানবীজকেই এ অস্ত্র হত্যা করবে। অশ্বত্থামার অস্ত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর প্রাণনাশ করল।

আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই, যে কোনো মূল্যে নিজের প্রাণ রক্ষা করার এ কী পন্থা? নিজের জীবনের দাম কী একটা গর্ভস্থ নিষ্পাপ শিশুর চেয়ে বেশি? কৃষ্ণ তাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন—পাপাত্মা, কাপুরুষ অশ্বত্থামা! তুমি নিজের জীবনের বিনিময়ে এক শিশুর প্রাণ নাশ করেছ। কিন্তু সে শিশুকে আমি জীবনদান করব। কিন্তু তোমার এই পাপের ফলে তুমি সহস্র সহস্র বছরের দীর্ঘ জীবন লোকালয় থেকে দূরে, একা, নিঃসঙ্গভাবে যাপন কর। তোমার গায়ে দুর্গন্ধ যুক্ত ঘা হোক আর তুমি ব্যাধিযুক্ত হয়ে বেঁচে থাক। এমন জীবন, যা থেকে তুমি মুক্তি চাইবে, কিন্তু তোমার মৃত্যু হবে না—

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিষ্যসি মহীমিমাম্।
অপ্রাপ্নুবন্ ক্বচিৎ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কেনচিৎ॥
পূয়শোনিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ।
বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্ সর্বব্যাধিসমন্বিতঃ॥

পুরাণে যাঁদের নাম চারিযুগে অমর বলে উল্লিখিত হয়, অশ্বত্থামা তাঁদের মধ্যে একজন। তবে কে কবে অশ্বত্থামাকে অমরত্বের বর দিলেন তা জানা যায় না। তবে এমন কোনো বর কেউ দেননি বলেই মনে হয়। নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণনাশের ভয়ে অশ্বত্থামা এতো ভীত হবেন

কেন? অশ্বত্থামার চরম জীবনাকাঙ্ক্ষাই তাঁকে অমর বলে অভিহিত করেছে হয়তো। আর আজ কৃষ্ণ যা উচ্চারণ করলেন, তা থেকেও হয়তো অশ্বত্থামার অমরত্বের কাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এতো অমরত্বের বরদান নয়, অমরত্বের অভিশাপ। কৃষ্ণের এই শাপই হয়তো অশ্বত্থামাকে অমর করেছে।

যাইহোক, পরাজিত, শাপগ্রস্ত অশ্বত্থামা মাথার মণিটি খুলে দিলেন পাণ্ডবদের হাতে, তারপর চলে গেলেন লোকালয় থেকে দূরে।

[মহা (k) ১০.১২-১৮ অধ্যায়;
(হরি) ১০.১২-১৮ অধ্যায়]

☐ ভাগবত পুরাণ এই অশ্বত্থামাকে ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন বলে উল্লেখ করেছে। *[ভাগবত পু. ৮.১৩.১৫]*

অশ্বত্থামা$_২$ মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার হাতি, ভীম একে বধ করে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বধ সংবাদ প্রচার করে দেন। *[মহা (k) ৭.১৯০.১৫-১৭;*
(হরি) ৭.১৬৩.১৪-১৬]

অশ্বত্থামা$_৩$ অক্রূরের ঔরসে অশ্বিনীর গর্ভে জাত পুত্রদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ৪৫.৩২]*

অশ্বনদী মহাভারতে উল্লিখিত ভোজদেশের নদী। বৃষ্ণি-ভোজ বংশীয় রাজকন্যা পৃথার গর্ভে সূর্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হয়। লোকভয়ে কুমারী পৃথা একটি পেটিকার মধ্যে করে সদ্যজাত কর্ণকে অশ্বনদীতে ভাসিয়ে দেন—

> জাতমাত্রঞ্চ তং গর্ভং ধাত্র্যা সংমন্ত্র্য ভাবিনী।
> মঞ্জুষায়াং সমাধায় স্বাতীর্ণায়াং সমন্ততঃ॥
> মধুচ্ছিষ্টস্থিতায়াং সা সুখায়াং রুদতী তদা।
> শ্লক্ষ্ণায়াং সুপিধানায়ামশ্বনদ্যামবাসৃজৎ॥

শিশুকর্ণকে নিয়ে সেই পেটিকাটি অশ্বনদী থেকে চর্মণ্বতী এবং সেখান থেকে যমুনা হয়ে ভাসতে ভাসতে গঙ্গায় এসে পৌঁছায়।

[মহা (k) ৩.৩০৮.৭, ৯, ২২, ২৫;
(হরি) ৩.২৬২.৭, ৯, ২১, ২৪]

পণ্ডিত N.L. Dey এর মতে ভোজ রাজ্য বলতে প্রাচীন মালওয়া অঞ্চলের কুটওয়ার (Kutwar) শহরটিকে বোঝানো হয়। কুটওয়ার বা কুন্তলপুর শহরের পাশ দিয়েই বয়ে যেত অশ্বনদী। পণ্ডিতরা মনে করেন অশ্বনদী, চম্বল নদীরই একটি বিলুপ্ত উপধারা। এই অশ্বনদীরই আরেক নাম অশ্বরথ নদী। বর্তমানে সম্পূর্ণ অঞ্চলটিই মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের মোরেনা জেলার অন্তর্গত। *[GDAMI (Dey) p. 109;*
HGM (Bhattacharyya) p. 760]

অশ্বপতি$_১$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্ররা দানব নামে পরিচিত। এই দনুপুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অশ্বপতি।

[মহা (k) ১.৬৫.২৪; (হরি) ১.৬০.২৪;
কালিকা পু. ৩৪.৫৪]

☐ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, দানবরাজ অশ্বপতি দ্বাপর যুগে মর্ত্যে রাজা হার্দিক্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.১৪-১৫; (হরি) ১.৬২.১৫]

অশ্বপতি$_২$ মদ্র দেশের রাজা। রাজা অশ্বপতি নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান লাভের জন্য রাজা একাগ্রচিত্তে দেবী সাবিত্রীর আরাধনা করেন। দেবী প্রসন্ন হয়ে রাজা অশ্বপতিকে সন্তান লাভের বর দান করলেন। সাবিত্রীর বরে রাজা এক কন্যাসন্তান লাভ করলেন। দেবী সাবিত্রীর নামানুসারে রাজা কন্যার নামও রাখলেন সাবিত্রী।

সাবিত্রী বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলে অশ্বপতি কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। নারদের মুখে সত্যবানের রূপগুণের প্রশংসা শুনে অবশেষে রাজা সত্যবানের হাতেই কন্যা সাবিত্রীকে সম্প্রদান করেন।

দেবী ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, রাজা অশ্বপতির পত্নীর নাম ছিল মালতী। মালতী বন্ধ্যা হওয়ার কারণে অশ্বপতি বশিষ্ঠের উপদেশক্রমে সাবিত্রীর আরাধনা করেন। পুষ্করতীর্থে তপস্যা করার পরেও দেবীর দর্শন পান না। তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়—দশ লক্ষ বার গায়ত্রী জপ করার। মহর্ষি পরাশর সাবিত্রী-পূজার নিয়ম-ধ্যান ইত্যাদি সম্বন্ধে অশ্বপতিকে উপদেশ দেন। অশ্বপতি পরাশরের উপদেশ-মত সাবিত্রীর উপাসনা-স্তবাদি করে সাবিত্রীর দর্শন এবং বর পান। সাবিত্রী বর দিলেন যে, রাজা অশ্বপতি যে পুত্র কামনা করছেন এবং তাঁর রাজ্ঞী মালতী যে কন্যা কামনা করছেন—উভয়ের অভিলাষই পূর্ণ হবে। সময়কালে অশ্বপতির যে কন্যা হয়, তাঁর নাম হয় সাবিত্রী। *[মহা (k) ৩.২৯৩-২৯৮ অধ্যায়;*
(হরি) ৩.২৪৭-২৫২ অধ্যায়;
দেবী ভাগবত পু. ৯.২৬.৩-৮৬; ৯.২৭.১-৬]

□ পরবর্তীকালে রাজা অশ্বপতি রাজমহিষী মালবীর গর্ভে একশত পুত্রসন্তান উৎপাদন করেন।

[মহা (k) ৩.২৯৯.১৩; (হরি) ৩.২৫৩.১৩]

অশ্বপতি$_{৩}$ কেকয় দেশের রাজা। ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে রাজর্ষি অশ্বপতির নাম উল্লিখিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে মহর্ষি উদ্দালক শ্রদ্ধার সঙ্গে কেকয়রাজ অশ্বপতির নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি উদ্দালক প্রভৃতি ঋষিদের জিজ্ঞাস্য বৈশ্বানরসংজ্ঞক আত্মাকে জানেন—

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তো'য়ং
কৈকেয় সম্প্রতী মমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি...।

অশ্বপতির ঋষিতুল্য পাণ্ডিত্যের প্রমাণও এর থেকে স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫.১১.৪]

□ রামায়ণ মহাকাব্যের বিবরণ অনুযায়ী ইনি অযোধ্যারাজা দশরথের কনিষ্ঠা পত্নী কৈকেয়ী এবং যুধাজিতের পিতা। ভরত-শত্রুঘ্ন বিবাহের পর মাতুল যুধাজিতের সঙ্গে কেকয়রাজ্যে গেলেন। সেখানে মাতামহ অশ্বপতি তাঁদের সস্নেহ সম্ভাষণ করলেন এবং মাতামহের ও মাতুলের স্নেহরসে সিক্ত ভরত-শত্রুঘ্ন সানন্দে কেকয়রাজ্যে বাস করতে লাগলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

এর মধ্যে অযোধ্যায় রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু রাজর্ষি অশ্বপতি এবং জনককে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হল না। দশরথ মুখে বললেন যে, এঁদের এই শুভ সংবাদ পরে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। দশরথের এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্তের পিছনে অবশ্যই কারণ ছিল। অশ্বপতির কন্যা কৈকেয়ীকে বিবাহ করার সময় দশরথ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কৈকেয়ীর পুত্রই হবে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। অবশ্য ভেবে দেখার মতো বিষয় হল, এ প্রতিজ্ঞা যখন করা হয় তখনও রাজা দশরথ অপুত্রক। পরে যখন তাঁর চারটি পুত্র হয়, তখন কৌশল্যার গর্ভজাত রামই হলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র; ন্যায়ত রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তৎসত্ত্বেও দশরথের ভয় ছিল যে রামের অভিষেক করতে গেলে তাঁর পূর্বের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। আর অশ্বপতি এবং জনকের মতো রাজর্ষি দশরথের এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ঘটনা সমর্থন নাও করতে পারেন—এই আশঙ্কা বোধহয় দশরথের মনে ছিল। তাই সামান্য অজুহাতে তাঁদের নিমন্ত্রণ করার বিষয়টি তিনি এড়িয়ে যান।

[রামায়ণ ২.১.২, ৪৮; ২.১০৭.৩]

□ দশরথের মৃত্যুর পর ভরত-শত্রুঘ্ন মাতামহ অশ্বপতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর রামায়ণে আর তাঁর উল্লেখ মেলে না। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় আমরা অশ্বপতির পুত্র যুধাজিতকে কেকয় দেশের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখি। মধ্যবর্তী চোদ্দ বছরে কোন সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল অথবা তিনি বনবাসে গিয়েছিলেন অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন বলে মনে হয়।

অশ্বপাদতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে শাশ্বত পুণ্যলাভ হয়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৫৩]

অশ্বপ্রভ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রেরা দানব নামে পরিচিত। অশ্বপ্রভ এই দনুপুত্রদের মধ্যে অন্যতম। বায়ু পুরাণের পাঠ অনুযায়ী এখানে ঋষভ এবং অরিষ্ট দুইজন দানবের কথা বলা আছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১৫; বায়ু পু. ৬৮.১৫]

অশ্ববতী মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লিখিত একটি পবিত্র নদী।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.২৫; (হরি) ১৩.১৪৩.২৫]

অশ্ববাহ যদু বংশীয় পৃশ্নির (বৃষ্ণির) দুই পুত্র ছিলেন শ্বফল্ক এবং চিত্রক। এই চিত্রকের পুত্রদের মধ্যে অশ্ববাহ অন্যতম। সম্ভবত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আমরা যে অশ্ববাহকে পাচ্ছি তিনিই বায়ু পুরাণে অশ্ববাহু নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৪; বায়ু পু. ৯৬.১১৩]

অশ্ববাহু *[দ্র. অশ্ববাহ]*

অশ্বমিত্র ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা মরুত্বতীর গর্ভে মরুৎ-দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অশ্বমিত্র। *[মৎস্য পু. ১৭১.৫৩]*

অশ্বমুখ$_{১}$ প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতি আশী কোটি সন্তান উৎপাদন করেন। দক্ষ প্রজাপতির পুত্রদের একাংশ অশ্বমুখ বিশিষ্ট ছিল বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ৪.৫৩]*

অশ্বমুখ$_{২}$ সুমেরু পর্বত থেকে আকাশগঙ্গার সাতটি ধারা সাতটি দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বদিকে প্রবাহিত নলিনী নামক জলধারাটি যেসব

জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, অশ্বমুখ তার মধ্যে অন্যতম একটি জনপদ।

[বায়ু পু. ৪৭.৫৭; মৎস্য পু. ১২১.৫৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২২.৫৬]

অশ্বমুখ$_৩$ প্রজাপতি বিক্রান্ত কিন্নর-গন্ধর্ব জাতির জন্মদান করেন। বিক্রান্তের কিন্নর পুত্রেরা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, অশ্বমুখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬৯.৩১]*

অশ্বমেঢ্র ভণ্ডাসুরের অন্যতম সেনাপতি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২১.৮৯]

অশ্বমেধ কুরু-পিতামহ ভীষ্মের শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেলে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বহুদক্ষিণাযুক্ত নানান যজ্ঞ করার পরামর্শ দেন। যুধিষ্ঠির যেহেতু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের জন্য নিজেই অনন্ত পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছিলেন, অতএব সেই পাপবোধ থেকে মুক্ত হবার জন্য মহর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বললেন— মানুষ যদি পাপ করেও থাকে, তবে যজ্ঞ, দান, তপস্যার মাধ্যমে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়—

যজ্ঞেন তপসা চৈব দানেন চ নরাধিপ।
পূয়ন্তে নরশার্দূল নরা দুষ্কৃতকারিণঃ॥

এরপরেই ঋষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলেন— 'তুমি রাজসূয়, অশ্বমেধ, সর্বমেধ এবং নরমেধ যজ্ঞগুলি পরপর করতে থাকো'। অবশেষে অন্য সব যজ্ঞ বাদ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কথাই বললেন ব্যাস এবং তা বললেন রঘুকুলপতি রামচন্দ্র এবং ভরত দৌষ্যন্তির উদাহরণ দিয়ে। তিনি বললেন—পূর্বে দাশরথি রামচন্দ্র যেমনটা করেছিলেন, তেমনই তুমিও যথাবিধানে প্রচুর দক্ষিণা দান করে, প্রচুর অন্ন-ধন দান করে এবং মানুষের অভীষ্ট বস্তু অনেক দান করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করো। অথবা যেভাবে তোমার পূর্বপুরুষ দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরত যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তুমিও সেইভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করো—

যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা।
বহুকামান্নবিত্তেন রামো দাশরথির্যথা॥

মহাভারতীয় যুধিষ্ঠিরের কাছে রামচন্দ্রের উদাহরণ আমাদের রামায়ণের পরিস্থিতিটা স্মরণ করিয়ে দেয়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ভরত এবং লক্ষ্মণকে রাজসভায় ডেকে রামচন্দ্র তাঁদের সামনে রাজসূয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহামতি ভরত রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপারে আপন অনীহা প্রকাশ করেন এই যুক্তিতে যে, তাতে বহুতর রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হবে এবং অকারণে রক্তক্ষয় হবে—

পৃথিব্যাং রাজবংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে।

রামচন্দ্র ভরতের যুক্তি মেনে নিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের ভাবনা থেকে নিবৃত্ত হলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে অগ্রজ রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়ে বললেন—তুমি বরং অশ্বমেধ যজ্ঞ করো, কেননা অশ্বমেধ যজ্ঞই সমস্ত পাপের অবসান ঘটায়—

অশ্বমেধো মহাযজ্ঞ পাবনঃ সর্বপাপ্মনাম্।
পাবনস্তব দুর্ধর্ষ রোচতাং রঘুনন্দন॥

লক্ষ্মণ এই প্রসঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রসঙ্গ তুলে রামচন্দ্রকে বললেন—বৃত্রাসুরকে বধ করার পর ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ তৈরি হয়। ফলে বৃত্রবধের যশ লাভ করেও ব্রহ্মহত্যার দায়ে তাঁকে অন্ধকারে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল। তারপর ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শে মহর্ষি-উপাধ্যায়দের সহায়তায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হন।

[মহা (k) ১৪.৩.৫, ৯; (হরি) ১৪.৩.৫, ৯; রামায়ণ ৭.৯৬.১৩-১৪; ৭.৯৭.২]

□ দুই মহাকাব্যেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রসঙ্গটা আসছে জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে কৃত পাপ স্খালন করার জন্য। মহাভারতের বহু পূর্বে প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণ এবং শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে পুরুবংশীয় প্রাচীন রাজা পারীক্ষিত জনমেজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহর্ষি ইন্দ্রোত শৌনক এই পারীক্ষিত জনমেজয়ের অশ্বমেধযজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে ইন্দ্রোত এবং পারীক্ষিত জনমেজয়ের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে, মূলত জনমেজয় রাজাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত করার জন্যই মহর্ষি ইন্দ্রোত শৌনক তাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে বলেছেন। শৌনক বলছেন—রাজা! পাপ করার পরে অনুতপ্ত অবস্থায় ব্যক্তি যদি লোক কল্যাণের সংকল্প করে এবং তারপর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তাহলে সে সবরকম জঘন্য পাপ থেকেই মুক্ত হয়।

[মহা (k) ১২.১৫০-১৫২ অধ্যায়; (হরি) ১২.১৪৬-১৪৮ অধ্যায়; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১৩.৫.৩.৫; ১৩.৫.৪.১; শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র (Hillebrandt) ১৬.৭.৭]

এমনকী সে পাপ বা অন্যায় প্রত্যক্ষভাবে নিজের করা নাও হতে পারে, সামগ্রিক পাপবোধ থেকে যে পাপস্খালনের ভাবনা তৈরি হয়, বিশেষত রাজা-রাজড়ারা সারা জীবন ধরে বহুতর যুদ্ধবিগ্রহ করার পর অনিচ্ছাকৃত রক্তক্ষয়ের জন্য যদি অনুতপ্ত হন, তাহলেই যেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করার প্রয়োজন—এইরকম একটা ভাবনা যেন যুধিষ্ঠির এবং রামচন্দ্রের পরিস্থিতি দেখে মনে হয়। তবে মহাকাব্যের ঘটনার গভীরে গেলে আমরা বুঝতে পারি যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের মূল তাৎপর্যটা অবশ্যই রাজনৈতিক। একজন রাজা রাজমণ্ডলের মধ্যে পর পর যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তা অবশ্যই তাঁর প্রতিবেশী তথা দূর-প্রতিবেশী রাজাদের পরাজিত করে অথবা তাঁদের পরাভূত করে রাজকর আদায়ের মাধ্যমে। রাজাদের এই ক্রমিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি ক্রমিক যজ্ঞ করার উপদেশ আছে বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে। অথর্ববেদের অন্তর্গত গোপথ ব্রাহ্মণে ক্রমান্বয়ে একুশটি যজ্ঞের কথা আছে; সেখানে রাজসূয় যজ্ঞের পর বাজপেয়, বাজপেয়ের পর অশ্বমেধ, অশ্বমেধের পর পুরুষমেধ, পুরুষমেধ যজ্ঞের পর সর্বমেধ—এই যজ্ঞক্রমের শেষ পর্যায়—

অগ্নিষ্টোমাদ্ রাজসূয়ো রাজসূয়াদ্ বাজপেয়ো
বাজপেয়াদ্ অশ্বমেধঃ অশ্বমেধাৎ পুরুষমেধঃ
পুরুষমেধাৎ সর্বমেধ . . . তে বা যজ্ঞক্রমাঃ।

লক্ষণীয়, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের কাছেও মহর্ষি ব্যাস একটা ক্রমের উল্লেখ করেছিলেন, এবং সেই ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞকে পৃথকভাবে উল্লেখ করলেও ভীষ্ম কিন্তু ক্রমান্বয়ে রাজসূয়, নরমেধ (পুরুষমেধ) এবং সর্বমেধের উল্লেখ করেছেন।

[গোপথ ব্রাহ্মণ (Mitra) ১.৫.৭, পৃ. ৭৭;
মহা (k) ১৪.৩.৫, ৯; (হরি) ১৪.৩.৫, ৯]

প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহের পর পাপস্খালনের জন্য অশ্বমেধের প্রস্তাব উল্লিখিত হলেও রাজনৈতিকভাবে চরম প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্যই যে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করা হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দুই মহাকাব্যেই। রামায়ণে ভরত রামচন্দ্রকে বলেছিলেন— তোমার যশ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, এখন আর রাজসূয় যজ্ঞ করে অন্যান্য রাজবংশ ধ্বংস করার দরকার নেই, সকলেই তোমার বশে আছে—

পৃথিবীং নার্হসে হন্তুং বশে হি তব বর্ততে।

এই অবস্থায় এক সর্বময় প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করার প্রস্তাব দিচ্ছেন রামচন্দ্রকে। একইভাবে মহাভারতেও কিন্তু কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধজয় হয়ে গেছে, এই অবস্থায় স্বয়ং ব্যাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে বলছেন যুধিষ্ঠিরকে।

তাহলে এই অশ্বমেধের রাজনৈতিক তাৎপর্যটা কী? কেননা অশ্বমেধ যজ্ঞও সমাধা করার পরেই একজন রাজাকে অবিসংবাদী রাজা বলা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ বলেছে—অশ্বমেধ হল সমস্ত যজ্ঞের রাজা। শ্রেষ্ঠার্থবাচক বৃষভ, কিংবা ঋষভ শব্দটাও অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্বন্ধেই উচ্চারিত হয়েছে এখানে—

* রাজা বা এষ যজ্ঞানাং যদশ্বমেধঃ।
* বৃষভ এষ যজ্ঞানাং যদশ্বমেধঃ।
* ঋষভ এষ যজ্ঞানাং যদশ্বমেধঃ।

অশ্বমেধের এই শ্রেষ্ঠতা উচ্চারণ করার পর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেছে—যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তিনি পৃথিবীর সমস্ত ভূতবর্গকে পরাভূত করে বশীভূত করতে পারেন—তাঁর হাতে থাকে সকলের রাশ, তিনি ধারণ করেন সবাইকে—

তস্মাদশ্বমেধযাজী সর্বাণি ভূতান্যভিভবতি।
যন্তারমেবৈনং করোতি।
ধর্তারমেবৈনং করোতি।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অন্য মন্ত্রপ্রযুক্তি থেকে এটাও বোঝা যায় যে, অশ্বমেধকে যে যে শ্রেষ্ঠত্বসূচক উপাধি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি আসলে অশ্বমেধযাজী রাজারই প্রাপ্য। 'বিভু', 'প্রভু' 'ঊর্জস্বান্'—ইত্যাদি তেজোবাচক শব্দের সঙ্গে যখন বলা হয়—এই অশ্বমেধ যজ্ঞ অন্য সমস্ত যজ্ঞ থেকে বিলক্ষণ পৃথক এক যজ্ঞ—এষ বৈ ব্যাবৃত্তো নাম যজ্ঞ—কিংবা যখন বলা হয়— অশ্বমেধ যজ্ঞ হল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যজ্ঞ, যিনি এই যজ্ঞ করেন তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকেন—তখনই বোঝা যায়, রাজনৈতিক দিক থেকে চরম প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্র তথা রাজার ক্ষয়সম্ভাবনাহীন এক চরম রাজনৈতিক স্থিরতা তৈরি হয় অশ্বমেধ যজ্ঞের মাধ্যমে।

শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ যজ্ঞের সূচনা, সৃষ্টি এবং এই যজ্ঞের বিশাল মাহাত্ম্যের কথা বলে একদিকে তার রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথাও বলা হয়েছে, অন্যদিকে অশ্বমেধের ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি মহাপাপের পাবনী শক্তির কথাও বলা

হয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা সূচনা করে শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে—এক সময় প্রজাপতির বাঁ চোখটি অত্যন্ত ফুলে গিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। এটি যতখানি ফুলেছিল ততখানিতেই একটি অশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল—

যদ্ অশ্বয়ত্ তদশ্বস্য অশ্বত্বম্।

দেবতারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে প্রজাপতির চক্ষু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার প্রমাণে যাঁরাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি প্রজাপতিকে পূর্ণ করেন এবং নিজেও সম্পূর্ণ হন—

যো'শ্বমেধেন যজতে সর্ব এব ভবতি।

লক্ষণীয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজা সম্পূর্ণ হন অথবা তিনি একেবারে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন—সর্ব এব ভবতি—এই কথাটা একদিকে যেমন একজন বিশেষ অশ্বমেধযাজী রাজার সার্বভৌমত্বের পরিচয় দেয়, তেমনই একই সঙ্গে এই শতপথ ব্রাহ্মণেই কিন্তু বলা হয়েছে যে, এই অশ্বমেধ যজ্ঞই জ্ঞানে-অজ্ঞানে কৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সমস্ত রোগের সর্বময় ঔষধ, এমনকী ব্রহ্মহত্যার পাপও নিবারণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ—

সর্বস্যা বা এষা প্রায়শ্চিত্তিঃ সর্বস্য ভেষজস্ সর্বং বা এতেন পাপ্মানং দেবা অতরন্নপি বা এতেন ব্রহ্মহত্যামতরংস্তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যো'শ্বমেধেন যজতে।

তবে ব্রহ্মহত্যানিবারণের তাৎপর্য্য থেকেও অশ্বমেধের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য যে এক রাজার সার্বভৌমত্বের মধ্যেই, সেটা প্রমাণ হয় শতপথ ব্রাহ্মণের এই বাক্যে—অশ্বমেধযাজী রাজা সমস্ত দিক জয় করতে পারেন, সমস্ত ভুবন জয় করতে পারেন, সেইজন্য সেই রাজাকে 'যন্তা' বা সকলের নিয়মন-কর্তা এবং 'ধর্তা' বা সকলের ধারণকর্তা বলা হয়—

অশ্বমেধযাজী সর্বা দিশো'ভিজয়তি ভুবনং
জয়তি . . . যন্তারমেবৈনং ধর্তারং করোতি।

[তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ৩.৮.৩.৩, ৫, পৃ. ১১৬২-১১৬৪; শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১৩.২.২.১; ১৩.১.২.২, পৃ. ৯৬৫, ৯৫৭; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ৩.৯.১৯.১-৩, পৃ. ১৩০১-১৩০২; শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১৩.১.২.৩, পৃ. ৯৫৮]

□ শতপথের এই আশ্বমেধিক ভাবনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি—রামায়ণে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পরামর্শ দেবার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার প্রসঙ্গটা কেন তুলেছিলেন। একইভাবে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বহুহত্যাজনিত পাপের আশঙ্কায় যুধিষ্ঠির যখন শোকমগ্ন তখনই হয়তো পাপস্খালনের উপায় হিসেবে অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলেছেন ব্যাস। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর ওপরে অশ্বমেধের রাজনৈতিক তাৎপর্য্যে একজন রাজার সর্বাধিনায়ক সার্বভৌম পদ লাভ করার প্রতিষ্ঠার মর্মটাও এই দুই জায়গাতেই মিথ্যে নয়। যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রে দুর্যোধন-কর্ণরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মারা যাবার পর তাঁর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করার কথা; রামচন্দ্রের ক্ষেত্রেও রাবণ-বধ হয়ে যাবার পর তাঁর রাজমণ্ডলে অবস্থিত অন্য কোনো রাজার পক্ষে রামচন্দ্রের শত্রুতা করার কোনো কথাও ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। অথচ তাঁকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উপদেশ দেওয়া হল সর্বাধিনায়কতার উদ্দেশ্যে। এখানে কারণ একটাই, অশ্বমেধ যজ্ঞ আসলে সম্পূর্ণ নিশ্চিত এক ধারণা দেয় যে, ছোটো-বড়ো কোনো রাজাই আর বিরোধিতা করছেন না এবং সেই উদ্দেশেই একটি অশ্বকে ছেড়ে দেওয়া হয় যথেচ্ছ রাজ্য ভ্রমণ করে আসার জন্য এবং কেউ সেই অশ্বকে বাধা দিলেই যুদ্ধ লাগবে।

ঠিক এইখানেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে সার্বভৌম রাজশক্তির সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। সর্বাধিনায়কত্বের জন্য এই সার্বভৌম রাজশক্তির নিশ্চয়তার কারণেই হয়তো আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে বলা হয়েছে যে, যিনি সার্বভৌম রাজা তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, আর যিনি সার্বভৌম রাজা নন, তিনি তো অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেনই—

রাজা সার্বভৌমো'শ্বমেধেন যজেত।
অপ্যসার্বভৌমঃ।

এখানে সার্বভৌম শব্দটা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'সোভারেইনটি'—অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এবং অশ্বমেধের সঙ্গে যুক্ত এই সর্বোত্তম রাজকীয় উপাধির ব্যাখ্যা আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ বলেছে—সার্বভৌম শব্দটি হল 'সামন্ত' শব্দের পর্যায় শব্দ; যাঁর রাজ্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত তিনিই সার্বভৌম নৃপতি, তিনিই একরাট্—

অয়ং সামন্তপর্যায়ী স্যাৎ সার্বভৌমঃ
সর্বায়ুষঃ . . . সমুদ্রপর্যন্তায়া একরাডিতি।

এখানে সামন্ত শব্দটিকে ইয়োরোপীয় কায়দায় 'ফিউড্যালিজম', 'ফিউডেটারি', অথবা 'ফিউড্যালের' ধারেকাছে না আনাই ভালো। অনেকেই মনে করেন—প্রাচীন ভারতে 'ফিউড্যালিজম' সেইভাবে ছিল না, যে অর্থে আমরা 'ফিউড্যালিজম' কথাটাকে ব্যবহার করি। অন্য পণ্ডিতদের মতে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'ফিউড্যাল' সম্পর্কের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে পেতে হর্ষের সময়ে সে লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ হয়। এই মত রামশরণ শর্মার। একটু-আধটু কাটছাঁট করে এই মত মেনে নিতে আমাদের আপত্তি নেই। শর্মা বলেছেন—অশোকের শিলালিপি এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—এই দুই জায়গাতেই 'সামন্ত' বলতে স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বোঝানো হয়েছে। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ সন্দেহাতীতভাবে অশোকের পূর্বযুগের রচনা এবং এখানেই কিন্তু প্রথম সামন্ত শব্দটি সার্বভৌম রাজার বিশেষণ হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ, 'vassal' তো নয়ই, প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্রও নয়, যিনি সার্বভৌম, যার কর্তৃত্ব প্রতিরোধ করার মতো কেউ নেই, যিনি একরাট, তিনিই সার্বভৌম।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন—(ভূমির) অন্ত পর্যন্ত সার্বভৌম—সামন্তপর্যায়ী স্যাৎ সার্বভৌমঃ। অর্থাৎ, যাঁর রাষ্ট্রে ভূমির অধিকার সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সেই সমুদ্রান্তা পৃথিবীর অধীশ্বরই 'সামন্তপর্যায়ী সার্বভৌম'। সামন্ত শব্দের প্রতিবেশী অর্থ ধরলেও এখানে অর্থ করতে হবে—সামন্তদের অধিকারে থাকা রাষ্ট্রের ওপরেও যাঁর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে, তিনিই সার্বভৌম রাজা। অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে এই সসাগরা ভূমির অবিসংবাদিত আধিপত্য তৈরি হয়।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ২৯.১.১, পৃ. ১৪৩; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, (আনন্দাশ্রম) ৮.৩৯.১; R.S. Sharma, Aspects of Political Ideas and Institutions, pp. 346-348; ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৪]

☐ খ্যাতকীর্তি যেসব রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, তাঁদের দু-চার জনের নাম মহাভারত উল্লেখ করেছে। পাণ্ডব-কৌরবদের পূর্বপুরুষ পুরুর বংশ বর্ণনার সময় অনাধৃষ্টির পুত্র মতিনার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হচ্ছে বটে, কিন্তু তার আগে মতিনারের পিতা স্বয়ং অনাধৃষ্টিকে 'একরাট্' বা একচ্ছত্র রাজা বলায় তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন বলে ধারণা হয়—

* অনাধৃষ্টিরভূৎ তেষাং বিদ্বানং ভুবি তথৈকরাট্।
* অনাধৃষ্টিসুতস্ত্বাসীদ্ রাজসূয়াশ্বমেধকৃৎ।
মতিনার ইতি খ্যাতো রাজা পরমধার্মিকঃ॥

মহাভারতের বনপর্বে স্বামী-বিযুক্তা দময়ন্তীর মুখে তাঁর স্বামী নিষধ-দেশের রাজা বীরসেনপুত্র নলের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা শুনতে পাচ্ছি, তেমনই আবার তাঁর পিতা বিদর্ভাধিপতি ভীমও বাজপেয়-অশ্বমেধের মতো যজ্ঞ করেছিলেন বলে সংবাদ পাচ্ছি। আবার আশ্বমেধিক-পর্বে দাশরথি রাম এবং দুষ্যন্ত-পুত্র ভরতের অশ্বমেধ-যজ্ঞ করার কথা তো আগেই জানিয়েছি আমরা। ব্যাসের প্ররোচনায় যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ করার জন্য প্রস্তুত হলেও যুধিষ্ঠির তাঁর আর্থিক অক্ষমতা জানিয়ে বললেন— অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে আমার সমস্ত পাপক্ষয় হবে সেকথা মেনে নিয়েও বলছি—এই যজ্ঞে অনেক দান-দক্ষিণা দিতে হয়, অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয় যজ্ঞের আয়োজনে, এদিকে আমার রাজকোশ শূন্য, দুর্যোধন নানাভাবে এই পৃথিবী শেষ করে দিয়ে গেছে, রাজকোশকে একটি ধনশূন্য ভাণ্ডমাত্রে পরিণত করেছে। এ অবস্থায় আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবো কী করে? এই যজ্ঞের দক্ষিণায় ভূমিদান করতে হবে, অন্যান্য দান-ধ্যানও কম নয়, আমি কী করে যজ্ঞ করবো?

পৃথিবী দক্ষিণা যত্র বাজিমেধে মহাক্রতৌ।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ব্যাস বললেন—হিমালয় পর্বতের একস্থানে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মরুত্তের যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা প্রচুর ধন-রত্নের সংগ্রহ রেখে চলে গেছেন। সেই ধন-রত্ন নিয়ে এসে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করুন। যুধিষ্ঠির মরুত্ত রাজার ধন-রত্ন নিয়ে এসেই যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।

[মহা (k) ১.৯৪.১২-১৩; ৩.৬৪.১৪, ৪৪-৪৫; ১৪.৩.১১-২১; ১৪.১০.৩৫-৩৭; (হরি) ১.৮১.১২-১৩; ৩.৫৩.১৪, ৪৪-৪৫; ১৪.৩.১১-২১; ১৪.১০.৩৪-৩৬]

☐ মরুত্ত রাজার সংগৃহীত ধন-রত্ন নিয়ে আসতে খানিক সময় গেল অবশ্য। কিন্তু তার পরেই ব্যাস চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে

যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য দীক্ষিত করলেন। স্বয়ং ব্যাস, তাঁর শিষ্য পৈল এবং যাজ্ঞবল্ক্য—এই তিনজন থাকলেন যজ্ঞের তত্ত্বাবধানে। অশ্ববিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরীক্ষিত নীরোগ এবং সুগঠিত-শরীর একটি অশ্বকে সারথি-সহ জোগাড় করতে বললেন ব্যাস। এই অশ্বটিই যজ্ঞশেষে বলির উপকরণ হয়ে উঠবে এবং এই অশ্বটিকেই ব্যাস ছেড়ে দিতে বললেন সাগরান্তা পৃথিবী ঘুরে আসার জন্য—

মেধ্যমশ্বং পরীক্ষন্তাং তব যজ্ঞার্থসিদ্ধয়ে॥
তমুৎসৃজ্য যথাশাস্ত্রং পৃথিবীং সাগরাম্বরাম্।
স পর্য্যেতু যশো দীপ্তং তব পার্থিব বর্ধয়ন্॥

অশ্বরক্ষার দায়িত্বে রাখা হল তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে। সমস্ত ব্যবস্থাটাই করলেন বেদব্যাস; তাঁরই নির্দেশে যুধিষ্ঠির যজ্ঞের আরম্ভকাল পর্যন্ত পশুবন্ধন করে রেখে যজ্ঞে দীক্ষিত হবার পর শাস্ত্রীয় বিধানে অশ্বটিকে ছেড়ে দিলেন। অশ্বরক্ষার দায়িত্বে থাকা অর্জুন অশ্বের স্বেচ্ছা-ভ্রমণে সঙ্গী হলেন উত্তর থেকে দক্ষিণে। বহু বহু রাজার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হল এবং তার মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ছিল মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জুনের নিজপুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ। উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত রাজ্য ঘুরে অশ্বমেধের ঘোড়া হস্তিনায় ফিরে এল।

মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতিথিতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ দেখে যুধিষ্ঠির মূল অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। দিকে দিকে দূতেরা গেল বিভিন্ন রাজাদের নিমন্ত্রণ করতে, যদিও তাঁদের সকলকেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অর্জুন আগেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যজ্ঞনিপুণ ব্রাহ্মণ এবং কুশলী স্থপতিদের দিয়ে ভীম এবার যজ্ঞস্থল নির্মাণ করালেন। অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করা হল নতুন গৃহ নির্মাণ করে। যজ্ঞস্থলে নির্মাণ করা হল স্বর্ণরত্নবিভূষিত যজ্ঞবেদি।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধে আগন্তুক অতিথিদের বর্ণনা এবং তাঁদের আপ্যায়নের বহুল ব্যবস্থার কথা বাদ দিয়ে মূল অশ্বমেধ যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ যেভাবে মহাভারতে বলা হয়েছে, সেটা একটু বলা উচিত। অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভে ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তোমার এই যজ্ঞ 'অহীন' নামে খ্যাত হোক এবং এই যজ্ঞে প্রচুর সোনা ব্যবহৃত হবে বলে এই অশ্বমেধ যজ্ঞ 'বহুসুবর্ণ' নামেও খ্যাত হবে।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে অগ্নিচয়নের জন্য স্বর্ণময় ইষ্টক তৈরি করা হয়েছিল, আঠেরো হাত পরিমাণ বেদি তৈরি করা হয়েছিল চারটি, যেগুলির চেহারা ক্রমান্বয়ে ত্রিকোণ, গরুড়াকৃতি, কূর্মব্যাপ্ত এবং স্বর্ণপক্ষ। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধে পশুবলি যূপ স্থাপন করার সময়ে যাজকেরা বেলকাঠের ছয়টি, খদির কাঠের ছয়টি, দেবদারুকাঠের দুটি এবং শ্লেষ্মাতক (বহুবার) কাঠের একটি যূপ নির্মাণ করার সঙ্গে সঙ্গে সোনাবাঁধানো যূপও তৈরি করানো হল অনেকগুলি। যজ্ঞে ব্যবহার্য্য ছাগ, বৃষ প্রভৃতি এনে রাখা হল যথাস্থানে। যুধিষ্ঠিরের এই যজ্ঞে তিনশটি পশু যূপে বন্ধন করা হয়েছিল এবং বহুরাজ্যে বিচরণ করা সেই দিগ্‌বিজয়ী অশ্বটিকে প্রধানভাবে রাখা হয়েছিল।

অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় যজ্ঞীয় অশ্বটিকে শ্বাসরোধ করে মারার (সংজ্ঞপন) পর অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গ ছেদ করে যেভাবে আহুতি দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে মহাভারত কোনো বিস্তারে যায় নি। শুধু সূত্রমাত্র উল্লেখ করে মহাভারত বলেছে—ব্রাহ্মণরা যথাবিধানে অন্যান্য পশুদের বলি দেবার পর অশ্বটিকে ছেদন করলেন। তারপর মনস্বিনী দ্রৌপদীকে মৃত অশ্বটির কাছে উপবেশন করালেন তিন কলা সময় অর্থাৎ মোটামুটি চার মিনিটের মতো'—

ততঃ সংশ্রপ্য তুরগং বিধিবদ্ যাজকস্তথা।
উপবেশয়াঞ্চক্রু স্ততস্তাং দ্রুপদাত্মজাম্।
কলাভিস্তিসৃভী রাজন্ যথাবিধি মনস্বিনীম্॥

তারপর সেই অশ্বের বসা (তৈলাক্ত মেদ) আগুনে গলিয়ে সেই বসাধূম আঘ্রাণ করলেন যুধিষ্ঠির এবং অন্য চার পাণ্ডব। ষোলো জন ঋত্বিক অশ্বটির অবশিষ্ট অঙ্গগুলি নিয়ম অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। যজ্ঞ এইভাবে শেষ পরিণতি লাভ করল। যুধিষ্ঠির সমগ্র পৃথিবী দান করলেন ঋত্বিকদের। ব্যাস প্রভৃতি ঋত্বিকেরা অবশ্য তাঁকে পৃথিবী ফিরিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির প্রচুর সুবর্ণ দান করলেন পুরোহিত ঋত্বিকদের। প্রথমে ব্যাস সবার প্রতিনিধি হিসেবে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সুবর্ণ-দান গ্রহণ করলেন। তারপর সেটা হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা (অথর্ববেদের

পুরোহিত) এবং অন্যান্য ঋত্বিকদের চার ভাগে ভাগ করে দিলেন। যজ্ঞভবনে রক্ষিত ধন, অলঙ্কার, সোনার তোরণ, সোনার যূপ, ঘট, ইষ্টক ব্রাহ্মণরা ভাগ করে নিলেন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে। এবার যুধিষ্ঠির ধন-দান করলেন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের। ম্লেচ্ছরা এখানে-ওখানে পড়ে থাকা সোনার জিনিস, সোনার টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে গেল। যজ্ঞশেষে পাণ্ডবজননী কুন্তী শ্বশুর বেদব্যাসকে প্রণাম করলে ব্যাস তাঁর আপন প্রাপ্যধনের সম্পূর্ণ অংশ কুন্তীকে দিয়ে দিলেন। যজ্ঞ শেষ হল। যুধিষ্ঠির 'অবভৃথ' নামক যজ্ঞান্ত-স্নান সেরে সম্মিলিত রাজাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরম শোভা লাভ করলেন।

[মহা (k) ১৪.৭২.১-২৪; ১৪.৭৩.১-১২;
১৪.৮৫.১-২৯; ১৪.৮৮.১-৪০; ১৪.৮৯.১-৩০;
(হরি) ১৪.৯১.১-২৩; ১৪.৯২.১-১২;
১৪.১০৮.৩-৩০; ১৪.১১১.১-৪২; ১৪.১১২.১-৩০]

□ রামায়ণে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রাচীন অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তারিত সূত্রগুলি বর্ণনা করেনি। এখানে বিপুল সমারোহে সুগ্রীব-বিভীষণদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে বটে, যোগাড়-যন্তরও কিছু কম নয়, সকল জাতির মানুষের প্রতি দান-মানেরও অভাব নেই কিছু, কিন্তু রামচন্দ্রের অশ্বমেধ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। লক্ষ্মণ অশ্বমেধের ঘোড়াটি নিয়ে বেরিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই অশ্বের বিজয়-ভ্রমণের কথা উহ্য রয়ে গেছে। এই অশ্বমেধ যজ্ঞের আসরে উপস্থিত হয়েছেন কবিবর বাল্মীকি। রামচন্দ্রের দুই অজ্ঞাত-পরিচয় পুত্র রামচন্দ্রের সামনে রামায়ণ গান করেছেন, তারপর সেই মাধ্যমেই আবার সীতাকে ডেকে পাঠানো, সীতার আগমন, সতীত্বের প্রমাণ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর পাতাল-প্রবেশ এবং কাঞ্চনী সীতা-সহ অশ্বমেধ সমাপন—এই সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা অশ্বমেধ যজ্ঞের বিপুল বিস্তার এবং তার যাজ্ঞিক বিশালতা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বরঞ্চ তুলনায় রামায়ণের আদিপর্বে রামপিতা দশরথের অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনেক বেশি উজ্জ্বল। দশরথের এই অশ্বমেধ আশ্চর্যজনকভাবে মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠির-কৃত অশ্বমেধের সঙ্গে তুলনীয়। যজ্ঞভবনে যজ্ঞবেদীর ভূমি-পরিমাণ থেকে আরম্ভ করে যূপ-সংখ্যার পরিমাণ প্রায় একই শব্দে উচ্চারিত। পশুবন্ধনের পরপর অশ্বটিকে মারা হয়ে গেলে রাজমহিষী কৌশল্যা এখানে তিনখানি ছুরি-জাতীয় অস্ত্র দিয়ে অশ্বটিকে ছেদন করেছেন এবং ধর্মানুসারে এক রাত্রি সেই অশ্বের সঙ্গে বাস করেছেন। দশরথের বৈশ্যজাতীয়া পত্নী (পরিবৃত্তা) এবং শূদ্রজাতীয়া (বাবাতা) পত্নীকেও সেই মৃত অশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্যু এবং উদ্গাতা নামের ঋত্বিকরা। অগ্নিগলিত বসার ধূম আঘ্রাণ করাটাও ছিল মহাভারতের মতোই।

যজ্ঞের বিস্তার যেটা মহাভারতে নেই, দশরথের অশ্বমেধে সেটা জানিয়ে বলা হয়েছে —যজ্ঞের প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম সবন, দ্বিতীয় দিনে উক্থ্য সবন এবং তৃতীয় দিনে অতিরাত্র সবন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বৈদিক বিধি অনুসারেই জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যাম যজ্ঞগুলি করা হয়েছে। মহাভারতের মতোই এখানে সমস্ত ঋত্বিকদের হাতে আপন বাহুবলে উপার্জিতা পৃথিবী দান হিসেবে তুলে দিয়েছেন দশরথ। ঋত্বিকরা অবশ্যই সে দান ফিরিয়ে দিয়ে মণি-রত্ন, সুবর্ণ, গোরু এবং বস্ত্রের দান গ্রহণ করেছেন দশরথের কাছ থেকে। দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ হয়েছে এইভাবেই।

[রামায়ণ ৭.১০৪ অধ্যায়-১১২ অধ্যায়;
১.১৩ অধ্যায়-১৪ অধ্যায়]

□ বেদ-পরিবর্তী যুগে মহাভারত-রামায়ণে বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞগুলি পূর্বে বেদ-ব্রাহ্মণের যাজ্ঞিককালে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধগুলির চাইতে অনেক বেশি সরলীকৃত হয়ে উঠেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের বিশাল প্রক্রিয়া এবং অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বহুতর প্রাচীন রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে এবং সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল খ্যাতকীর্তি সেই রাজাদের নাম—যে নামগুলির ঐতিহাসিকতা আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। প্রত্যেকটি নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে যে বিখ্যাত পুরোহিত তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত রাজার যজ্ঞ করেছেন, সেই দুই নামই উল্লেখ করেছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই নামোল্লেখ করার মধ্যে একটা পুনরাবৃত্তির গম্ভীরতা আছে। একটি-দুটি উদাহরণ দিলেই সেখানে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিশালতা প্রমাণ হয় যেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞকে 'ঐন্দ্র মহাভিষেক' নামে আখ্যাত করেছে; হয়তো অশ্বমেধ যজ্ঞ একজন বিজেতা

নরপতিকে ইন্দ্রত্ব লাভের মর্য্যাদা দিয়েছে বলেই এই নাম। ঐতরেয় বলেছে—যে ক্ষত্রিয়কে শপথের পর ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়, তিনি অভিষিক্ত হবার পর সকল প্রকার বিজয় লাভ করেন, সকল লোক জানতে পারেন, সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা এবং পরমতা লাভ করেন। ইহলোকে তিনি স্বয়ম্ভু স্বরাট্ এবং স্বর্গলোকেও সকল কামনা লাভ করে অমরত্ব লাভ করেন—

> স এতেন ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণাভিষিক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ
> সর্বা জিতীজয়তি সর্বাল্লোকান্ বিন্দতি সর্বেষাং
> রাজ্ঞাং শ্রৈষ্ঠ্যমতিষ্ঠাং পরমতাং গচ্ছতি . . .
> অস্মিল্লোঁকে স্বয়ম্ভূঃ স্বরাড়্ অমৃতো মুষ্মিন্
> স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বা অমৃতঃ সম্ভবতি।
>
> *[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ৮.৩৯.৫, পৃ. ৯৪৩]*

☐ যেসব বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ক্রমান্বয়ে, তার বিবরণ দিয়ে বলেছে—ঋষি তুর কাবষেয় (কবষের পুত্র) পারীক্ষিত জনমেজয়ের ঐন্দ্র মহাভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন। তাতে পারীক্ষিত জনমেজয় সর্বদিকে পৃথিবী পর্যটন করে জয় করেছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এবিষয়ে এইরকম যজ্ঞগাথা আছে—জনমেজয় আসন্দীবৎ নামে এক প্রদেশে ধান্যভোজী, কপালে সাদা ফোঁটাওয়ালা, হলুদফুলের মালা গলায় শ্রেষ্ঠ একটি যাগযোগ্য অশ্বকে দেবতাদের উদ্দেশে বন্ধন করেছিলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই গাথার তাৎপর্য্য কিন্তু এই যে, এই গ্রন্থ তার চেয়েও প্রাচীন লোকোক্তি স্মরণ করাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিখ্যাত রাজার অশ্বমেধ-প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ওই একইভাবে বলছে— ভার্গব চ্যবন মনুবংশোৎপন্ন শর্যাতির (শার্যাত মানবের) ঐন্দ্র মহাভিষেক সম্পন্ন করেন। তাতে শার্যাত মানব সর্বদিকে পৃথিবী পর্যটন করে জয় করেছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন—

> এতেন হ বা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ
> চ্যবনো ভার্গবঃ।
> শার্যাতং মানবমভিষিষেচ, তস্মাদ্ উ শার্যাতো
> মানবঃ সমন্তং সর্বতঃ পৃথিবীং জয়ন্ পরীয়ায়,
> অশ্বেন চ মেধ্যেন ইজে . . .।

এইভাবে একই ভাষায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ জানিয়েছে—সোমশুষ্মা বাজরত্নায়ন অশ্বমেধযাজী শতানীক সাত্রাজিতের ঐন্দ্র মহাভিষেক করেছিলেন। পর্বত মুনি এবং নারদ মুনি আম্বাষ্ঠ্য এবং যুধাংশ্রৌষ্টি ঔগ্রসেন্যের ঐন্দ্র মহাভিষেক সম্পন্ন করার পর তাঁরাও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। প্রজাপতি ঋষি কশ্যপ অশ্বমেধযাজী বিশ্বকর্মা ভৌবনের ঐন্দ্র মহাভিষেক করেছিলেন। বশিষ্ঠ অভিষেক করেছিলেন অশ্বমেধযাজী সুদাস পৈজবনের এবং মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-প্রসঙ্গে যে মরুত্ত রাজার কথা এল, তার সম্বন্ধে মহাভারত রচনার কতকাল আগে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ জানাচ্ছে—সংবর্ত আঙ্গিরস আবিক্ষিত মরুত্তের ঐন্দ্র মহাভিষেক করেছিলেন, তাতেই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পেরেছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বেশ বিস্তারিতভাবে বিরোচন-পুত্র অঙ্গের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলেছে। এখানে পুরোহিত ছিলেন উদময় আত্রেয়। এখানে বিশেষ সংবাদ ছিল এই যে বৈরোচনি অঙ্গের কাছে দান-মান পাবার পর পুরোহিত উদময় আত্রেয় নিজেই দান করতে-করতে এতটা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, শেষে তিনি পরিচারকদের দান করতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং পরিচারকরাও দান করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশেষভাবে বলা আছে ভরত দৌষ্যন্তির অশ্বমেধের কথা। তাঁর পুরোহিত ছিলেন মামতেয় দীর্ঘতমা। দুষ্যন্তের পুত্র ভরত নাকি যমুনার তীরে আটাত্তরটি এবং গঙ্গাতীরে বৃত্রঘ্ন নামের একটি জায়গায় অশ্বমেধের জন্য পঞ্চান্নটি অশ্ব বেঁধে রেখেছিলেন। একশ তেত্রিশটি যাগযোগ্য (মেধ্য) অশ্ববন্ধন করার ফলে দুষ্যন্তপুত্র ভরত নিজের বলবত্তর কৌশলে বিপক্ষীয় রাজাদের কৌশল নষ্ট করে দিয়েছিলেন। ভরত সম্বন্ধে শেষ গাথা স্মরণ করে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—মানুষ তো হাত দিয়ে আকাশ ছুঁতে পারে না, কিন্তু অশ্বমেধ ইত্যাদি মহাকর্ম ভরত যা করেছিলেন, তা কোনো মানুষ করতে পারে না—

> মহাকর্ম ভরতস্য ন পূর্বে নাপরে জনাঃ।
> দিবং মর্ত্য ইব হস্তাভ্যাং নোদাপুঃ পঞ্চ মানবাঃ॥

তবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন গ্রন্থে মামতেয় দীর্ঘতমাকে ভরত দৌষ্যন্তির পুরোহিত বলে উল্লেখ করা হলেও মহাভারতে বর্ণিত

হয়েছে যে, ভরত দৌষ্যন্তির পুরোহিত ছিলেন তাঁর মাতামহ, শকুন্তলার পালক পিতা কণ্ব। কণ্বের পৌরোহিত্যেই রাজা ভরত 'গোবিতত' নামে এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এছাড়াও ভরত যমুনা নদীর তীরে একশত, সরস্বতীর তীরে তিন শত এবং গঙ্গাতীরে চারশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং এর প্রত্যেকটিতেই পৌরোহিত্য করেন মহর্ষি কণ্ব—

> শ্রীমান্ গোবিততংনাম বাজিমেধমবাপসঃ।
> যস্মিন্ সহস্রং পদ্মানাং কণ্বায় ভরতো দদৌ॥
> সো'শ্বমেধশতৈরীজে যমুনামনুতীরগঃ।
> ত্রিশতৈশ্চ সরস্বত্যাং গঙ্গামনু চতুঃ শতৈঃ॥

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ৮.৩৯.৯, পৃ. ৯৫৫; মহা (k) ১.৭৪.১৩০-১৩২; (হরি) ১.৮৯.৫-৬]

□ অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্বন্ধে নানা কথা আমরা উচ্চারণ করেছি, কিন্তু বৈদিক নিয়মানুসারে এই যজ্ঞ কীভাবে সম্পন্ন হত, সেটা শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় অনেকটাই বলা আছে। বাকিটা আছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে। শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ যজ্ঞকে 'ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ' বলা হয়েছে, কেননা একমাত্র মহাশক্তিশালী রাজারাই এই যজ্ঞ করতে পারতেন, অক্ষম নিঃশক্তিক রাজারা এই যজ্ঞ করতে গেলে তাঁর নিজের রাজ্যটাই শত্রুর হাতে চলে যাবে বলে শতপথ ব্রাহ্মণ মন্তব্য করেছে। শতপথ বলেছে—অশ্বমেধ আর রাষ্ট্র একই কথা— রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ—অতএব যিনি রাষ্ট্রের অধিকারী শক্তিমান রাজা, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। আর যিনি বলবান নন, তিনি যদি অশ্বমেধ করতে চান এবং তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়াটি যদি শত্রুদের হাতে চলে যায়, তাহলে তাঁর যজ্ঞটার মধ্যেই ছেদ পড়ে যায়, তাতে তিনি পাপ লাভ করেন—

> যো'বলো'শ্বমেধেন যজতে যদি অমিত্রা অশ্বং
> বিন্দেরন্ যজ্ঞো'স্য বিচ্ছিদ্যেত পাপীয়ান্ স্যাৎ...

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১৩.১.৬.৩, পৃ. ৯৬১-৯৬২]

□ শতপথের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্দেশ্য প্রথমে একেবারেই রাজনৈতিক ছিল, পরে এই যজ্ঞের ঐশ্বরিক মাহাত্ম্যই যজ্ঞটিকে প্রধানতম এক শ্রৌত যজ্ঞে পরিণত করে। অশ্বমেধের স্বরূপ এবং পরিচয় হল—"অশ্বমেধ অহীনজাতীয় সোমযাগ, এখানে তিনটি সুত্যাদিবসের অনুষ্ঠান হয়। যদিও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে এটি সোমযাগ, তথাপি সবনীয়পশুরূপে অশ্বের বিশেষ গুরুত্বের জন্য সমগ্র অনুষ্ঠানটি 'অশ্বমেধ' আখ্যা পেয়ে থাকে। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণে অশ্বমেধযাগের মতো শ্রেষ্ঠ কর্ম আর নেই, কারণ এটি সর্বফলপ্রদ এবং ব্রহ্মহত্যাদিগুরুতর পাপনাশক যাগ। ফাল্গুনমাসের অষ্টমী অথবা নবমীতে এই যাগারম্ভ করা হয় এবং যাগকারী প্রথমে প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে পশুযাগের অনুষ্ঠান করে ঋত্বিক্গণকে আহ্বানপূর্বক অশ্বমেধযাগানুষ্ঠানের জন্য সঙ্কল্প করেন। অনন্তর যজ্ঞীয় অশ্বটিকে ঋত্বিগ্গণ সহ রাজপুত্র এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়পুরুষেরা পবিত্র জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করেন। অতঃপর অধ্বর্যু অশ্বটিকে একবৎসরে জন্য বিভিন্নদেশে পরিক্রমার জন্য প্রেরণ করেন। অশ্বটিকে রক্ষার জন্য সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষিপুরুষ থাকে। একবৎসর নানাদেশে পর্যটনকালে যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বীর অশ্বটির গতিরোধ করে তাহলে রক্ষিপুরুষেরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করে অশ্বটিকে মুক্ত করবে। যদি তারা পরাজিত হয় এবং অশ্বটিকে মুক্ত করতে না পারে তাহলে রাজাকে পুনরায় আর একটি অশ্বকে যথাবিধি প্রোক্ষণাদি কর্মের দ্বারা পবিত্র করে যজ্ঞীয় অশ্বরূপে প্রেরণ করতে হবে। কারণ যতক্ষণ না অশ্বটি দিগ্বিজয় করে ফিরে আসে ততক্ষণ অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করা যাবে না। সুতরাং মহা-ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নয়, প্রবল পরাক্রান্ত কোনো নৃপতিই একমাত্র অশ্বমেধযাগে অধিকারী।

যজ্ঞীয় অশ্বটি যখন বৎসরকাল যাবৎ বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করে, সেই সময় যজমান কতকগুলি হোমযাগের অনুষ্ঠান এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলায় যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গায়কগণের দ্বারা গীত স্বীয় দানাদি পুণ্যকর্মের এবং শত্রুজয়াদি বীরকর্মের বর্ণনামূলক গাথা শ্রবণ করেন। তারপর হোতা বেদির দক্ষিণদিকে উপবেশন করে সুবর্ণ নির্মিত আসনে উপবিষ্ট রাজাকে পারিপ্লব আখ্যান শোনান।

পারিপ্লব হল—একশ্রেণির আখ্যানের নাম। অশ্বমেধযাগে হোতা এই আখ্যান পাঠ করেন। পারিপ্লব নামের তাৎপর্য্য চক্রাকারে আবর্ত্তিত আখ্যান। প্রতি দশদিন পর পর এই সমস্ত আখ্যান নূতনভাবে আরম্ভ করা হত বলে এগুলিকে

পারিপ্লব আখ্যান বলা হত। শতপথব্রাহ্মণে এবং আশ্বলায়ন ও শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এই সময় হোতা বিভিন্ন জনপ্রিয় পুরাকাহিনী ও ঘটনা বিবৃত করেন, বিভিন্ন ঋক্‌মন্ত্র আবৃত্তি করেন, বৈদিক দর্শনের কথা বলেন এবং রাক্ষস, যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, বিষক্রিয়া ও তার প্রতীকারের কথা শোনান। এই সময় ব্রহ্মোদ্য বা ধর্মরহস্য বিষয়েও সূক্ষ্ম আলোচনা চলতে থাকে

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১৩.৪.৩, ২; শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Hillebrandt) ১৬.২.১, ৩২; Vol. 3-4]

এইভাবে একবৎসর অতীত হলে এবং অশ্বটি প্রত্যাবর্তন করলে প্রথমে সোমযাগের অনুষ্ঠান হয়। পর পর দুটি সুত্যাদিবসের অনুষ্ঠান হওয়ার পর যূপ নির্মাণ করে অশ্বের দ্বারা পশুযাগ হয়। সেই যাগে অশ্বটিকে বধ করে তার মেদ আহুতি দেওয়া হয়। পশুযাগে অশ্ব ছাড়া আরও কয়েক প্রকারের পশুর উল্লেখ বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের সবগুলিকে আহুতি দেওয়া হত না। পর্যগ্নিকরণের পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হত।

অশ্বমেধযাগে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও দু-একটি প্রচলিত প্রথামূলক অনুষ্ঠান হত। যেমন—যজ্ঞীয় অশ্বটির প্রাণবিয়োগের পর রাজার প্রধানা মহিষীকে মৃত অশ্বটির নিকটে শয়ন করতে হত এবং ঋত্বিক্‌গণ তাঁদের উভয়কে আচ্ছাদনের দ্বারা আচ্ছাদিত করতেন যাতে মহিষী অশ্বটির সঙ্গে সঙ্গমমূলক ক্রিয়াকর্মে রত হতে পারেন। প্রথাটি সম্ভবতঃ রাজ্যের উর্বরতাবৃদ্ধির প্রতীক। আবার মৃত অশ্বটির সঙ্গে মহিষীর শয়নকালে ঋত্বিক্‌বর্গ রাজার অন্যান্য পত্নীর সঙ্গে আপাত দুর্বোধ্য ও গ্রাম্য কথোপকথনে রত থাকতেন।" এই কথোপকথন যথেষ্টই অশ্লীল, যদিও নিয়ম হিসেবে দশরথপত্নী কৌশল্যা এবং অন্তত তিন/চার মিনিটের জন্য হলেও দ্রৌপদীকেও মৃত অশ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

অশ্বমেধ যাগের শেষে যজ্ঞান্ত স্নান (অবভৃথ) করার সময়েই একটি মুণ্ডিতমস্তক রক্তচক্ষু ব্যক্তির মস্তকে জুম্বকাহুতি দেওয়া হত এবং এই প্রাচীন প্রথা পালনের মাধ্যমে অশ্বমেধযাজী রাজা বরুণের পাশ থেকে মুক্ত হন বলে মনে করা হত।

অশ্বমেধ সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ, যেখানে পর-পর অশ্বমেধ কৃত্যগুলি বলা হয়েছে, সেই বিবরণ আমরা R.D. Karmarkar-এর লেখা থেকে উদ্ধার করছি—

There are several features of the Aśvamedha which contribute to the importance of the sacrifice—Thus

(1) The sacrifice (which commences on the 8th day of the bright fort-night of the month of Phālguna, March) lasts for one year and twenty-seven days.

(2) Four thousand cows and four hundred gold coins are given to the four priests on the first day.

(3) The Sāvitreṣṭi is performed every day for full one year, till the return of the horse.

(4) The horse is escorted by 100 Rājaputras, 100 Kṣatriyaputras, 100 Sūtagrāmaṇīputras and one hundred Kṣattṛputras, all armed with different weapons, duing the year the horse is allowed to wander at will.

(5) Singing and playing upon the lute by two Brāhmaṇas (who glorify the performance of sacrifices and the munificent Dakṣiṇā given over) by day, and by two Kṣatriyas (who glorify the valorous deeds of kings) by night, goes on throughout the year.

(6) Similarly the 'Cycle of discourses (or stories)' 'পরিপ্লবাখ্যান'— lasting for ten days, is continued throughout the year; that is, there are in all thirty-six cycles (each lasting for ten days) during the Aśvamedha sacrifice). This পরিপ্লবাখ্যান is one of the unique features of the Aśvamedha.

(7) After the successful return of the horse, the sacrifice goes on for twenty-seven more days (the first twelve days are concerned with the দীক্ষাকর্ম, the next twelve days with and the last three days, with সোমযজ্ঞ।

(8) On the 25th day after the return of the horse, the (অগ্নিষ্টোম) is performed, when there are 21 yupas, and twenty-two viotims are offered.

(9) The 26th is the most important day—'Der Tag' of the sacrifice, for it is on that day that the horse is killed.

The king riding in a chariot yoked with four horses (of which the Horse-victim is one), enters a pond to the east, till the horses get wet. The three queens মহিষী, বাবাতা and পরিবৃক্তা anoint the horse on its return with ghee and 109 pearls are woven by them in its mane and hair of the tail.

As many as 260 (forest-animals) and 337 domesticated ones (including the 12 পর্যঙ্গ victims) are offered as victims; the 260 forest-animals are however not actually killed.

The horse is then made to lie upon a gold sheet laid on sacrificial grass and covered over with a piece of cloth, and then it is killed.

The queens cleanse the face of the horse and the chief queen ceremoniously lies down near the dead horse.

It will thus be seen that the পরিপ্লবাখ্যান and the উপসংবেশন of the queen, are the two unique features of the horse-sacrifice, the other features being found in the case of other sacrifices, though not on such a grand scale.

[শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ, পৃ. ৫৯-৬১;
R.D. Karmarkar, 'The Aśvamedha: Its original signification.' In Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, vol. 30, 1949 (1950), pp. 332-345;
Margart stutley, 'The Aśvamedha and Indian Horse Sacrifice.' In Folklore, vol. 80: No. 4, (Winter, 1969), pp. 253-261;
Subhash Kak, The Aśvamedha : the Rita and its Logic, Delhi Motilal Banarsidass, 2002]

অশ্বমেধজ *[দ্র. অশ্বমেধদত্ত]*

অশ্বমেধদত্ত কুরুবংশীয় অভিমন্যুর পৌত্র ছিলেন সর্পযজ্ঞকারী পারীক্ষিত জনমেজয়। এই জনমেজয় রাজার পুত্র শতানীক। শতানীকের ঔরসে বৈদেহীর গর্ভে অশ্বমেধদত্তের জন্ম হয়। পুরাণ মতে এই অশ্বমেধদত্তের অধিসোমকৃষ্ণ বা অধিসামকৃষ্ণ বা অধিসীমকৃষ্ণ নামে এক পুত্র ছিল।

একমাত্র ভাগবত পুরাণে কিছু ভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই পুরাণ মতে শতানীকের পুত্র ছিলেন সহস্রানীক, তাঁর পুত্র অশ্বমেধজ এবং অশ্বমেধজের পুত্র অসীমকৃষ্ণ।

[মহা (k) ১.৯৫.৮৬; (হরি) ১.৯০.১১৬;
বিষ্ণু পু. ৪.২১.৩; বায়ু পু. ৯৯.২৫৭;
ভাগবত পু. ৯.২২.৩৯; মৎস্য পু. ৫০.৬৬, ৭৮]

অশ্বয়ু একজন ঋষি। পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি অশ্বয়ুর বংশ তার মধ্যে অন্যতম। পুরাণে অন্যতম আঙ্গিরস গোত্র প্রবর্তক হিসেবে তাঁর নামোল্লেখ পাই। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৪২]*

অশ্বরথা গন্ধমাদন পর্বতের পাদদেশীয় অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। ঋষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রম অবস্থিত ছিল এই নদীর তীরে। পাণ্ডবরা একবার অশ্বরথা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গিয়েছিলেন। এক ধরনের পঞ্চবর্ণ ফুল বায়ুবাহিত হয়ে অশ্বরথা নদীতে অবিরত পতিত হয়ে নদীটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করত।

[মহা (k) ৩.১৬০.২২; (হরি) ৩.১৩৩.২২]

অশ্বশঙ্কু কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব।

[মহা (k) ১.৬৫.২৩; (হরি) ১.৬০.২৩]

অশ্বশিরা$_১$ (অশ্বশিরস্) আদি পিতা কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে যে চল্লিশ জন অসুরের জন্ম হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজন। তিনিই কেকয়-দেশের এক রাজা হয়ে জন্মান পাণ্ডব-কৌরবদের কালে। মহাভারতের অংশাবতরণ নামক উপপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রাচীন কল্পের যে পাঁচ অসুর কেকয় দেশের রাজা হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁদেরই একজনের নাম অশ্বশিরা।

[মহা (k) ১.৬৫.২৩; ১.৬৭.১০-১১;
(হরি) ১.৬০.২৩; ১.৬২.১০-১১]

অশ্বশিরা$_২$ মহর্ষি দধীচির অন্য এক নাম। একসময় অশ্বিনীকুমারদ্বয় ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য

মহর্ষি দধীচির কাছে আসেন। দধীচি সেই সময় অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই অশ্বিনীকুমারদের পরে কখনো আসতে বলেন। এই সময় ইন্দ্র এসে দধীচিকে বলেন যে, অশ্বিনীকুমাররা জাতে বৈদ্য, তাদের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কখনোই উচিত নয়। ইন্দ্র দধীচিকে ভয় দেখালেন—যদি তিনি অশ্বিনীকুমারদের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন, তা হলে ইন্দ্র দধীচির শিরচ্ছেদ করবেন। অশ্বিনীকুমারেরা আবার যখন ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য এলেন, তখন দধীচি তাঁদের ইন্দ্রের আদেশের কথা বললেন। অশ্বিনীকুমারদের পরামর্শে দধীচি অশ্বমুখ রূপ ধারণ করে তাঁদের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ফলে ইন্দ্র তাঁর শিরচ্ছেদ করতে সমর্থ হননি আবার অশ্বিনীকুমাররাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। দধীচির সেই অশ্বমুণ্ডধারী রূপ অশ্বশিরা নামে খ্যাত। *[দ্র. দধীচি]*

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ৬.৯.৫২ (টীকা দ্র.)]

অশ্বশিরা$_{৩}$ দৈত্যরাজ বলির অন্যতম অনুচর।

[মৎস্য পু. ২৪৫.৩১]

অশ্বসেন কৃষ্ণের ঔরসে নাগ্নজিতী সত্যার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৩]

অশ্বস্তনিক আগামী দিনে খাদ্যগ্রহণের জন্য যার কিছুমাত্র সঞ্চয় না থাকে, তাকে অশ্বস্তনিক বলে।

[কূর্ম পু. ২.২৫.১৩]

বস্তুতঃ শ্বঃ শব্দের অর্থ আগামী কাল। তার সঙ্গে তন(প্) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'শ্বস্তন' (যেমন অদ্যতন, পুরাতন) তার থেকে শ্বস্তনিক এবং নঞর্থে অশ্বস্তনিক।

মহাভারতে গৃহস্থের যে চারটি বৃত্তির কথা বলা হয়েছে, অশ্বস্তন বৃত্তি তার মধ্যে তৃতীয়।

[মহা (k) ১২.২৪৩.৩; (হরি) ১২.১৪০.৩]

অশ্বাতক একটি প্রাচীন জনজাতি। এঁরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৬.৫১.১৫; (হরি) ৬.৫১.১৫]

☐ অশ্বাতক জনজাতিটি সম্ভবত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে বাস করতো, কারণ আলেকজান্ডার পূর্ব এশিয়া অভিযানের সময় এঁদের জয় করেছিলেন বলে জানা যায়। আলেকজান্ডার প্রাচীন পুষ্কলাবতী বা বর্তমান পাকিস্তানের পেশোয়ারের কাছাকাছি এঁদের বসতি লক্ষ্য করেছিলেন। এই অঞ্চল বরাবরই উচ্চ-প্রজাপতির অশ্বের প্রাপ্তিস্থান রূপে বিখ্যাত। অশ্বের সহজলভ্যতার সঙ্গে 'অশ্বাতক' নামের উৎপত্তির কোনো যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। *[TIM (Mishra) p. 74]*

অশ্বায়ু মৎস্য পুরাণ মতে, পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অশ্বায়ু।

[মৎস্য পু. ২৪.৩৩]

অশ্বারূঢ়া$_{১}$ দেবী ভুবনেশ্বরীর অবতার।

[দেবীভাগবত পু. ১২.১১.১০৬]

অশ্বারূঢ়া$_{২}$ বসন্তরাগের পত্নীগণের অন্যতমা।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ২.১৪.৩৬]

অশ্বাস্য যদুবংশীয় বৃষ্ণির (অন্যমতে পৃশ্নির) দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন চিত্রক। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে এই চিত্রকের অন্যতম পুত্র ছিলেন অশ্বাস্য।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৫]

অশ্বিনীকুমার দেবমাতা অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জাত এক পুত্রের নাম বিবস্বান্। সূর্যেরই অন্য এক নাম বিবস্বান্। বিবস্বানের তিন স্ত্রীর মধ্যে অন্যতমা ছিলেন সংজ্ঞা—তিনি ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মার মেয়ে। সূর্যস্বরূপ বিবস্বানের তীব্র তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা নিজের শরীর থেকে ছায়া নামে নিজের অনুরূপ এক সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করেন। তাঁর হাতেই স্বামী-পুত্রের দেখাশোনার ভার দিয়ে সংজ্ঞা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সংজ্ঞার ছেলে ছিলেন মনু, যম এবং যমুনা নামে এক মেয়ে। অন্য দিকে ছায়ার গর্ভে কালক্রমে জন্ম নিলেন সাবর্ণি মনু, শনি এবং তপতী। ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপিণী হওয়া সত্ত্বেও নিজের ছেলেমেয়েদের ওপর বেশি স্নেহ প্রকাশ করেছিলেন বলে পূর্বরূপিণী সংজ্ঞার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যম এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন এবং তাতে ছায়ার কাছে অভিশাপও লাভ করেন।

এইরকম একটা বিরূপ ব্যবহার কখনো নিজের মায়ের হতে পারে না—এই অভিযোগ পিতা বিবস্বানের কাছে জানালেন যম অর্থাৎ সংজ্ঞার ছেলে। বিবস্বান সংজ্ঞার আচার-ব্যবহার বুঝতে পেরে ত্বষ্টা বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে নিজের তেজ খানিকটা কমিয়ে নেবার কথা জানাতেই বিশ্বকর্মা সূর্যকে একটি ভ্রমিযন্ত্রে স্থাপন করে তাঁর প্রচণ্ড তেজ খানিকটা কমিয়ে দিলেন। সংজ্ঞার

জন্যই বিবস্বান সূর্যের এই তেজোহ্রাসের ভাবনা অথচ সেই সংজ্ঞা তখন এক মরুপ্রদেশে বড়বা বা ঘোটকীর রূপ ধারণ করে চরে বেড়াচ্ছিলেন। বিবস্বান সূর্য পৃথিবীতে নেমে এসে সংজ্ঞারূপী বড়বার সামনে এসে অশ্বরূপ ধারণ করলেন। বিবস্বান কামার্ত হয়ে অশ্বিনী বড়বার মুখে মুখ রাখলেন। বড়বারূপিণী সংজ্ঞা স্বামী-সমাগম বুঝতে না পেরে তাঁকে পরপুরুষ ভেবে ক্ষুব্ধ হলেন। ততক্ষণে বিবস্বান্ সূর্যের তেজোবীর্য্য সংজ্ঞা-বড়বার নাসাপুটে প্রবেশ করেছে। কিন্তু পরপুরুষ-শঙ্কায় সংজ্ঞা বিবস্বান্-সূর্যের তেজ দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে বার করে দিলেন। সেই নাসাস্রুত সূর্যতেজ থেকেই জন্ম হল দুই অশ্বিনীকুমারের। অশ্বিনীরূপী সংজ্ঞার কাছ থেকে জন্ম বলে একদিকে তাঁরা অশ্বিনীর কুমার অর্থাৎ অশ্বিনীর ছেলে, আবার অশ্বরূপী বিবস্বানের ছেলে বলে তাঁরা অশ্বিনৌ—অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়। এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আরও দুটি নাম আছে—নাসাস্রুত হয়ে তাঁদের জন্ম হয়েছে বলে অথবা নাসাস্রাব থেকে তাঁরা জন্মালেন বলে তাঁদের নাম দস্র, দ্বিবচনে দস্রৌ। আবার নাসাগ্রভাগ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাদের অন্য নাম নাসত্য, দ্বিবচনে নাসত্যৌ—

ততঃ স ভগবান্ গত্বা ভূর্লোকমমরাধিপঃ।
কাময়ামাস কামার্ত্তো মুখ এব দিবাকরঃ॥
অশ্বরূপেণ মহতা তেজসা চ সমাবৃতঃ।
সংজ্ঞা চ মনসা ক্ষোভমগমদ্ভয়বিহ্বলা॥
নাসাপুটাভ্যামুৎসৃষ্টং পরো'য়মিতি শঙ্কয়া।
তদ্রেতসস্তুতো জাতাবশ্বিনাবিতি নিশ্চিতম্॥
দস্রৌ স্রুতত্বাৎ সঞ্জাতৌ নাসত্যৌ নাসিকাগ্রতঃ।

[মৎস্য পু. ১১.৩৪-৩৬]

বিষ্ণু পুরাণে এই কাহিনীর রূপ প্রায় এক। শুধু এখানে সংজ্ঞা আর ত্বষ্টার কন্যা নন, একেবারে সোজাসুজি বিশ্বকর্মার কন্যা। এখানেও সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে ছায়াকে রেখে সংজ্ঞা চলে গেছেন এবং যমের ওপর ছায়ার অভিশাপ নেমে আসতেই তখন যম এবং সূর্য দুজনেরই সন্দেহ হয় পরিশেষে ছায়ার কাছেই তাঁরা জানতে পারেন যে, সংজ্ঞা চলে গেছেন। তারপর সূর্য ধ্যানযোগে সংজ্ঞাকে দেখলেন অশ্বীরূপে তিনি তপস্বিনী হয়ে আছেন এক অরণ্যের মধ্যে। সূর্যও তখন অশ্বের রূপ ধারণ করে সেই অরণ্যে এসে সঙ্গত হলেন অশ্বিনী সংজ্ঞার সঙ্গে। জন্ম হল অশ্বিনীকুমার যুগলের—

ততো বিবস্বানাখ্যাতে তয়ৈবারণ্য সংস্থিতাম্।
সমাধিদৃষ্ট্যা দদৃশে তামশ্বাং তপসি স্থিতাম্॥
বাজিরূপধরঃ সো'পি তস্যাং দেবাবথাশ্বিনৌ।

বিষ্ণু-পুরাণে বিশ্বকর্মা তাঁর জামাই বিবস্বান্ সূর্যের তেজ শাতন করেন অশ্বিনীকুমারদের জন্মের পর। হরিবংশ পুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণেও বড়বারূপিণী সংজ্ঞার সঙ্গে অশ্বরূপধারী বিবস্বান সূর্যের মিলন-কাহিনী প্রায় একইভাবে বর্ণিত হয়েছে, যদিও এই দুই গ্রন্থে বিশ্বকর্মা কর্তৃক সূর্যের তেজ-শাতন করার চাইতেও অশ্বিনী-সংজ্ঞার সঙ্গে অশ্বরূপী বিবস্বান সূর্যের নাসা-মিলনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষত পরপুরুষ-শঙ্কিতা সংজ্ঞার নাসাপুটে সূর্যের শুক্রতেজ স্খলনের ঘটনার পর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাসত্য এবং দস্র নাম দুটি এই দুই পুরাণে বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে—

দেবৌ তস্যামজায়েতাম্ অশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি॥

লক্ষণীয়, পুরাণগুলির বর্ণনায় দুই অশ্বিনীকুমার কোথাও দুজনেই নাসত্য এবং দস্র, আবার কোথাও একজন নাসত্য এবং অন্য জন দস্র।

[বিষ্ণু পু. ৩.২.২-৮; হরিবংশ পু. ১.৯.৫৩-৫৫;
মার্কণ্ডেয় পু. ১০৬-১০৮ অধ্যায়;
ভাগবত পু. ৮.১৩.৪. ৮-১০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫৯.৭৪-৭৬;
বায়ু পু. ৮৪ ২৩-২৪]

স্কন্দ পুরাণের প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে দুই অশ্বিনীকুমারের জন্মবৃত্তান্ত প্রায় একই রকম যেমনটা এর আগে দেখেছি আমরা। কিন্তু ওই একই পুরাণের অবন্তীক্ষেত্র মাহাত্ম্যে বিবস্বান্ সূর্যের স্ত্রীর নাম সংজ্ঞা নয়, তাঁর নাম সাবিত্রী এবং সংজ্ঞা-সাবিত্রীর পিতা হিসেবে বিশ্বকর্মার বৈদিক নাম ত্বষ্টা ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। ত্বষ্টাই সাবিত্রীকে সূর্যের হাতে তুলে দিয়েছিলেন—

পুরানুসূর্যাং সাবিত্রীং ত্বষ্টা স্বতনয়াং দদৌ।

এই সাবিত্রী যম-যমুনার জন্মের পর আপন তুল্যরূপ ছায়ার হাতে তাঁর দুই পুত্র-কন্যা রেখে বাপের বাড়ি গেলেন। সূর্যের তেজোভয় এখানেও তাঁর মনে কাজ করেছে—

সবিতুর্ভয় বিহ্বলা।

সাবিত্রী অবশ্য বাপের বাড়িতেও থাকলেন না, তিনি সেই বড়বার রূপ ধরে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ছায়া এবং যমের সংঘাতের ঘটনা বিবস্বান সূর্যকে সন্দেহান্বিত করে তুলল। সূর্য ক্রোধান্বিত হয়ে শ্বশুর ত্বষ্টার বাড়িতে এসে সাবিত্রীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ত্বষ্টা তাঁর খবর দিতে না পেরে বিলাপ করতে করতে সূর্যকেই দোষী সাব্যস্ত করে বললেন—তোমার এই অতিরিক্ত তেজ সহ্য করতে না পেরেই আমার মেয়ে সাবিত্রী কোথায় চলে গেছে। তোমার স্ত্রী যদি সত্যিই তোমার প্রিয় হয়, তবে তুমি তোমার তেজ খানিকটা কমিয়ে নাও—

তব তেজঃপরিভ্রষ্ঠা ভগ্না হ্বাসি গতাবলা।
যদি তে বল্লভা ভার্য্যা তেজস্ত্বং পরিশাময়॥

ত্বষ্টা-প্রজাপতির কথায় বিবস্বান সূর্য শেষ পর্যন্ত তেজ কমাতে রাজী হলেন এবং সুদর্শন চক্রকে শানের মতো ব্যবহার করে ত্বষ্টা সূর্যকে লঘু এবং নির্মল করে দিলেন। অবশেষে মহাকালবনের ঠিকানা দিয়ে ত্বষ্টা সূর্যকে বড়বারূপী সাবিত্রীর কাছে যেতে বললেন। সূর্য ক্ষাতা এবং শিপ্রা নদীর মিলনস্থল মহাকালবনে এসে স্ত্রী সাবিত্রীকে বড়বারূপে বিচরণ করতে দেখলেন। বিবস্বান সূর্য তখন অশ্বরূপ ধারণ করে সঙ্গমলিপ্সায় বড়বারূপিণী সাবিত্রীর নাসিকা-আঘ্রাণ করলেন। তাতেই তাঁর যমজ সন্তান উৎপন্ন হল। তাঁদের চেহারা হল দর্শনীয় এবং সুকুমার, তাঁরা দেবতাদের চিকিৎসক বৈদ্য হিসেবে নির্ধারিত হলেন—

নাসিকা-ঘ্রাণমাত্রেণ যত্র জাতৌ সুতাবুভৌ।
দর্শনীয়ৌ সুনিম্নাঙ্গৌ ভিষজৌ তৌ দিবৌকসাম্॥

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য), ১১.৭৭-২০৫;
স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র মাহাত্ম্য), ৫৬.১৪-৪৯]

মহাভারতে দুই অশ্বিনীকুমারের জন্ম-বৃত্তান্ত খুব বিশদে বর্ণিত হয়নি কখনো। কিন্তু পুরাণে যেমনটি পাওয়া যায়, তার সংকেত যেহেতু ঋগ্‌বেদেই আছে, তাই মহাভারত দুই অশ্বিনীকুমারের বৈদিক নাম দুটি উল্লেখ করে সংজ্ঞার নাসা-নির্গত দেবমূর্তির পৃথক দুই সত্তার কথা বলেছে—

নাসত্যশ্চাপি দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বারশ্বিনাবপি।
মার্তণ্ডস্যাত্মজাবেতৌ সংজ্ঞানাসা-বিনির্গতৌ॥

মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে দুই অশ্বিনীকুমারের জন্মকাহিনী যেমনটি আমরা পেলাম, তার একটা বৈদিক ভিত্তি আছে। আমরা ঋগ্‌বেদে দেখতে পাবো—যখন ত্বষ্টা নামে সেই দেবতা নিজের মেয়ে সরণ্যূর বিবাহ দিচ্ছেন, তখন সমস্ত বিশ্বভুবন সেই বিবাহ দেখতে এসেছিল। যমের মায়ের যখন বিয়ে হল, তখন মহান বিবস্বানের জায়া অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই মৃত্যু রহিত সরণ্যূকে মানুষের কাছে গোপন করা হল। তাঁর মতোই অন্যতরা এক স্ত্রী নির্মাণ করে বিবস্বানকে দেওয়া হল। তখন সরণ্যূ দুই অশ্বিনীকুমারকে গর্ভে ধারণ করলেন এবং যমজ দুটি সন্তানের জন্ম দিলেন—

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং
বিশ্বংভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো
জায়া বিবস্বতো ননাস॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী
সর্বণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্ত দাসীদজহাদু
দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ॥

এই ঋক্‌মন্ত্র দুটিই পরবর্তী পুরাণ-কাহিনীগুলির উৎস। ত্বষ্টা তাঁর মেয়ে সরণ্যূকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিবস্বান সূর্যের সঙ্গে, সেই সরণ্যূ পুরাণে হয়েছেন সংজ্ঞা কোথাও বা সাবিত্রী। যমের জন্ম হওয়ার পর সরণ্যূ অদৃশ্য হলেন, সংজ্ঞা কিংবা সাবিত্রীও তাই, কিন্তু তাঁদের অদর্শন হওয়ার পিছনে একটা পৌরাণিক সত্য আছে—সংজ্ঞা-সাবিত্রী সূর্যের উগ্র তেজ সহ্য করতে পারছিলেন না বলেই অদৃশ্য হওয়ার প্রশ্ন এসেছে এবং এই কাহিনী যে শুধু পৌরাণিক কথক-ঠাকুরদের তৈরি নয়, তার প্রমাণ পাই সুপ্রাচীন গ্রন্থ যাস্কের নিরুক্ত থেকে। উপরি উক্ত ঋক্-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যাস্ক লিখেছেন—ত্বষ্টার কন্যা ত্বাষ্ট্রী যমজ পুত্র-কন্যা যম-যমীকে জন্ম দেবার পর তিনি নিজের মতো (সবর্ণাম্ অন্যাম্) অন্য একজনকে প্রতিনিধি রেখে অশ্বরূপ ধারণ করে পালিয়ে যান। বিবস্বান সূর্যও তখন অশ্বরূপ ধারণ করে মিলিত হন সরণ্যূর সঙ্গে এবং দুই অশ্বিনীকুমারের জন্ম দেন। আর সরণ্যূর মতোই আর একজন 'সবর্ণা', তাঁর গর্ভে জন্মান মনু, বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু—

সা সর্বণামন্যা প্রতিনিধায়াশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব,

স বিবস্বান্ আদিত্যঃ সবর্ণায়াং মনুঃ।

আর এক বৈদিক গ্রন্থ বৃহদ্দেবতাতেও এই কাহিনী পদ্যাকারে লেখা আছে এবং এখানকার কাহিনীর বিশেষত্ব হল—

স্কন্দপুরাণের অবন্তী-ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে নাসিকাঘ্রাণে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম কাহিনীটি একটু অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে স্ত্রীপক্ষের কার্যকরী ক্ষমতার বর্ণিত হয়েছে। বৃহদ্দেবতার বিবরণে অশ্বরূপধারী বিবস্বানকে চিনতে পেরে সরণ্যু নিজেই মৈথুনে প্রবৃত্ত হতে চান এবং অশ্ব-বিবস্বান তাঁর ওপরে আরোহণ করেন, কিন্তু পূর্বোপচিত কামনায় অস্থির অশ্বারোহীর শুক্র ভূমিতে পতিত হল। অশ্বা সরণ্যু গর্ভধারণের ইচ্ছায় সেই শুক্র আঘ্রাণ করা মাত্রেই দুই অশ্বিন্—

নাসত্য এবং দস্র এই যুগল নামে জন্ম নিলেন—

সরণ্যূশ্চ বিবস্বন্তং বিদিত্বা হয়রূপিণম্।
মৈথুনায়োপচক্রাম তাঞ্চ তত্রারুরোহ সঃ॥
ততস্তয়োস্তু বেগেন শুক্রং তদপতদ্ভুবি।
উপাজিঘ্রচ্চ সা ত্বশ্বা তচ্ছুক্রং গর্ভকাম্যয়া॥
আঘ্রাতমাত্রাচ্ছুক্রাত্তু কুমারৌ সংবভুবতুঃ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ যৌ খ্যাতাবশ্বিনাবিতি॥

ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যু বায়ু পুরাণে সুরেণু হয়েছেন এবং তিনিই যে সংজ্ঞা সেটাও পরিষ্কার বলা হয়েছে বায়ু পুরাণে—

সুরেণুরিতি বিখ্যাতা পুনঃ সংজ্ঞেতি বিশ্রুতা।

[ঋগ্‌বেদ, ১০.১৭.১-২; নিরুক্ত (আনন্দাশ্রম), ২য় খণ্ড, ১২.১০; পৃ. ৯৫০; বৃহদ্দেবতা (মিত্র) ৭.১-৬; মহা (k) ১৩.১৫০.১৭; (হরি) ১৩.১২৮.১৭; বায়ু পু. ৮৪.৩২-৭৮; মৎস্য পু. ১১.২২-৩৭; মার্কণ্ডেয় পু. ৭৮.১৬-২২]

দুই অশ্বিনীকুমার পৌরাণিক যুগে দেবতাদের বৈদ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন বটে, কিন্তু বৈদিক ভাবনাতে অশ্বিনীকুমার-যুগলের স্বরূপ বহুভাবে কল্পিত হয়েছে। যাস্ক নিজেই এই প্রশ্ন তুলে নিজেই উত্তর দিয়ে বলেছেন—কেউ কেউ বলেন দুই অশ্বিনীকুমার আসলে দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যৌঃ (অন্তরীক্ষঃলোক) এবং পৃথিবী, কেউ বলেন তাঁরা দিন এবং রাত্রি, আবার কেউ বলেন—সূর্য এবং চন্দ্রই দুই অশ্বিনীকুমার। আর ঐতিহাসিকেরা বলেন—'অশ্বিনীকুমারেরা হলেন দুই পুণ্যকর্মা রাজা। তবে অশ্বিনীকুমারদের চর্চা এই এতগুলি বিকল্প দিলেও যাস্ক যেমন দিন-রাত্রিই বোঝেন, যদিও সেই দিন-রাত্রি আবার মধ্যম এবং উত্তম ভেদে আলো অন্ধকারের সংমিশ্রণ, যেমনটি পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর ব্যাখ্যা করে বলেছেন। অশ্বিনীকুমারদের বিষয়ে বহুবিচিত্র বৈদিক তথ্য সন্ধান করে মিথলজির গবেষক জানিয়েছেন—The twilight and the morning star theory seem the most probable.

[Nirukta, pt. 4, ed. Amareswar Thakur, 12.10, p. 1262; A. A. Macdonell, Vedic Mythology, pp. 49-54]

ইতিহাস-পুরাণের কালে অশ্বিনীকুমার-যুগলের চরিত্র পালটে গেছে। বেদের বিচিত্র মন্ত্রবর্ণে অশ্বিদ্বয় যেহেতু ইন্দ্র এবং সূর্যের নানান গুণে সমৃদ্ধ, তাঁর চেহারা যেহেতু হিরন্ময় সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং অল্পবয়সী তরুণের মতো ভীষণ সুন্দর তাই অশ্বিনীকুমারদের সৌন্দর্য্যের ব্যাপারটা ইতিহাস পুরাণেও বিখ্যাত হয়ে আছে। মহাভারতে দুই অশ্বিনীকুমারের তেজে পাণ্ডুর পত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল-সহদেবের জন্ম হয়। এই যমজ ভাইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—তাঁরা অসাধারণ সুন্দর দেখতে—রূপেণাপ্রতিমৌ ভুবি। তাঁদের জন্মের সময় আকাশবাণী হল—অসামান্য রূপ, উৎসাহ এবং শৌর্য্যাদিগুণযুক্ত এই দুটি বালক যথাসময়ে আপন রূপ এবং তেজে দুই অশ্বিনীকুমারকেও ছাড়িয়ে যাবে—

রূপসত্ত্বগুণোপেতাবেতাবত্যশ্বিনাবিতি।
ভাসতস্তেজসাত্যর্থং রূপদ্রবিণসম্পদা॥

[মহা (k) ১.১২৪.১৭-১৮; (হরি) ১.১১৮.১৭-১৯; ভাগবত পু. ৯.২২.২৮; মৎস্য পু. ৪৬.১০; ৫০.৫০; বিষ্ণু পু. ৪.২০.১১]

বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণে অশ্বিনীকুমার-যুগলের আর এক প্রসিদ্ধি হল—তাঁরা দেববৈদ্য, তাঁরা ভিষক, চিকিৎসক। মহাভারত-পুরাণে দেববৈদ্য এবং চিকিৎসক হিসেবে অশ্বিনীকুমার-যুগলের যে পরিচিতি তাঁরও উৎস অবশ্যই বেদ। বেদের মন্ত্রগুলির মধ্যে অজস্র ঋষি-রাজা-বৃদ্ধ, কন্যা-রমণীদের নাম উল্লেখ করে কীভাবে তাঁদের রোগ নিরাময় করেছেন, কত জনের উপকার করেছেন, বার্ধক্যের চিকিৎসায় কত জনকে তিনি যুবাপ্রায় করে দিয়েছেন তার বিবরণ আছে। নাসত্য এবং দস্র নামক দুই অশ্বিনীকুমার এক

স্বয়ংবরা রমণীকে রাজা বিমর্দের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে অশ্বিনীকুমারেরা নৌকা পাঠিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। অসুরেরা অত্রি-ঋষিকে বার-বার একটা খাঁচায় পুড়ে দিয়ে খাঁচার চার পাশে তুষের আগুন লাগিয়ে দিত। অশ্বিদ্বয় বারবার অসুরদের সেই অগ্নিপীড়ন থেকে অত্রিকে উদ্ধার করে এনেছেন। গৌতম ঋষি একবার মরুভূমিতে জলাভাবে তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন অশ্বিদ্বয় তাঁর কাছে একটি গোটা কুয়ো এনে দিয়েছিলেন।

এগুলি হল উপকারের কথা। কিন্তু এইসব ঐশ্বরিক উপকারের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল অশ্বিনীকুমারদের রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতায় যে রমণীর বহুকাল পুত্র-কন্যা জন্মাছিল না, সেই বধ্রিমতীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তাকে হিরণ্যহস্ত নামে এক পুত্র দিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমারেরা। আজকের দিনে ছিন্নপাদ মানুষকে কৃত্রিম পা দিয়ে হাঁটানোর ব্যবস্থা করা হয়, আশ্চর্য হল ঋগ্‌বেদের কালে অশ্বিনীকুমারদের এই শক্তি লক্ষ্য করছি আমরা। খেল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর কুলপুরোহিত ছিলেন অগস্ত্য। খেলের স্ত্রীর নাম ছিল বিশ্‌পলা। কোনো সময় এক যুদ্ধকালে বিশ্‌পলার একটি পা কাটা যায়। তিনি নিজেই যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন কিনা, সেটা বোঝা যায় না। বিশ্‌পলার পায়ের জন্য অগস্ত্য ঋষি অশ্বিনীকুমারদের স্তুতি করেন। তারপর দেখা যায় অশ্বিনীকুমারেরা রাতের কালে এসে বিশ্‌পলার পা-টাকে লোহার পা করে দিলেন। ঋগ্‌বেদ বলেছে—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রিযোগে সদ্যই বিশ্‌পলাকে চলাফেরা করার জন্য এবং শত্রুর রেখে যাওয়া ধন লাভ করার জন্য লৌহময় জঙ্ঘা পরিয়ে দিয়েছিলে—

সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ/
ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্।

অশ্বিনীকুমারদ্দের চিকিৎসা-বিষয়ে বহু কীর্তির কথা বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে বহুলভাবে বর্ণিত আছে। সেগুলির মধ্যে মহাভারত-পুরাণে যেসব কাহিনী পরম্পরাক্রমে নেমে এসেছে, তার মধ্যে বিখ্যাত হল মহর্ষি চ্যবনের বার্ধক্য-নিবারণের ঘটনা এবং ঘোষার কুষ্ঠ-নিরাময় হওয়ার পর তাঁর বিবাহের ঘটনা। ভিষক হিসেবে কীভাবে অশ্বিদ্বয় চিকিৎসা করেন, তারও সামান্য একটা বিবরণ আছে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে।

[ঋগ্‌বেদ, ১.১১৬.৫-২৪; ১.১১৭.৪-২২; ১.১১৮.৫-৯; ১.৩৪.৬]

বেদপরবর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে অশ্বিনীকুমারেরা পুরোদস্তুর বৈদ্য বলেই পরিচিত, তাঁরা চিকিৎসার জন্যই বিখ্যাত—

অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug), প্রথম খণ্ড, ১.১৮, পৃ. ১৪]

বেদের মধ্যে অশ্বিনীকুমারদের সুচিকিৎসার উদাহরণ হিসেবে নানা ঘটনার উল্লেখ হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধহয় জরাকীর্ণ চ্যবন-মুনির যৌবন ফিরে পাবার কাহিনী। এই কাহিনী আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, এই কাহিনীসূত্রেই দেবসমাজে অশ্বিনীকুমারদের সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত এবং সুস্থিত হয়। মহাভারতের বনপর্বে পাণ্ডবরা লোমশ মুনির সঙ্গে তীর্থদর্শনে বেরিয়ে নর্মদার তীরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নর্মদার তীরভূমিতে এখন যেখানে তাঁরা উপস্থিত সেই স্থান বিখ্যাত হয়ে গেছে মনুপুত্র শর্যাতি রাজার যজ্ঞস্থানের জন্য—এই নাকি সেই যজ্ঞস্থান, যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনী-কুমার-যুগলের সঙ্গে একত্রে সোমপান করেছিলেন—

সাক্ষাদ্ যত্রাপিবৎ সোমমশ্বিভ্যাং সহ কৌশিকঃ।

এই একটা খবরেই একটা সংশয়-সূত্র এসে যায়—তাহলে কী দেববৈদ্য দুই অশ্বিনীকুমার ইন্দ্রের মতো প্রধানতম এক বৈদিক দেবতার সঙ্গে একত্রে সোমপান করতে পারতেন না? ভারতবর্ষের জাতি-বর্ণাশ্রমের কঠিন দৃষ্টিতেও কিন্তু যে ব্রাহ্মণরা বৈদ্যশাস্ত্রে বিদ্যালাভ করে সমাজের মহদুপকার সাধন করেছেন, তাঁরাও কিন্তু মৌল ব্রাহ্মণদের আঘাত লাভ করেছেন বারবার। তাঁরা শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ থাকছেন কী না, তা নিয়েও নিন্দেমন্দ শোনা গেছে মহাভারত-পুরাণে। শেষ পর্যন্ত সমাজের প্রয়োজনেই তাঁদের মর্য্যাদা এবং কদর বেড়েছে। মৌল জনেরা বুঝেছেন ব্রাহ্মণ্যের আড়ম্বরের চেয়েও চিকিৎসার প্রয়োজন অনেক বেশি। ইন্দ্রের সঙ্গে দেববৈদ্য দুই অশ্বিনীকুমারের সোমপানের ঘটনা হয়তো বা সেই মর্য্যাদা আহরণের স্মারক। বৈদ্য চিকিৎসকদের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করার রূপক। তীর্থ করতে-আসা

যুধিষ্ঠিরকে বৈদ্যজনের এই সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা শুনে বুঝে নিতে হচ্ছে ভারতবর্ষের সমাজের মোথিলিটি-কে।

লোমশ বললেন—ভৃগুর পুত্র চ্যবন দেবরাজ ইন্দ্রের ওপর ভীষণ রেগে গিয়ে তাঁর ক্রিয়াকর্ম স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। চ্যবন বৃদ্ধ মুনি হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করেছিলেন সুন্দরী যুবতী সুকন্যাকে আর দুই অশ্বিনীকুমারকে তিনিই সোমপানের ব্রাহ্মণ্য-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন এইখানেই এক সরোবরের ধারে গভীর তপস্যায় রত ছিলেন। তপস্যার একাগ্রতায় সমস্ত বাহ্য জগৎ তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে। তিনি স্থাণুর মতো বসে থাকেন বীরাসনে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মতো। এইভাবে থাকতে থাকতে তাঁর গায়ের ওপর মাটি জমতে লাগল, লতা-তৃণের হালকা আচ্ছাদনও তৈরি হল সেই দেহের ওপর। মনুষ্য শরীরে অবয়বে তৈরি হল উইয়ের ঢিবি, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে বাসা বাঁধল সেখানে—

স বল্মীকো'ভব দৃষ্টিঃ ... সমাকীর্ণ পিপীলিকৈঃ।

অরণ্যের মধ্যে বান্ধবী সখীদের পক্ষে অনেক সুন্দর জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুভব করতে করতে সুকন্যা এসে পৌঁছলেন সেই মৃত্তিকা-স্তূপের কাছে। মহাভারত বলেছে—সুকন্যার রূপ আছে, বয়স আছে, অন্তরে আছে বয়সোচিত কামনা এবং আছে লালিত রাজপুত্রীর অহঙ্কার—

রূপেণ বয়সা চৈব মদনেন মদেন চ।

এমন হলে যা হয়, চ্যবন মুনি সম্মিলিত মৃত্তিকাস্তূপের মধ্য থেকে কোটর-বিবরের ফাঁক দিয়ে হঠাৎই দেখতে পেলেন সুকন্যার এই বিভঙ্গিম ক্রিয়কলাপ। দেখতে পেলেন—এখন এই রমণী নিতান্ত একা, বিনোদিনী সখীরা তাঁর সঙ্গে নেই, তিনি একবস্ত্রা এবং অলঙ্কৃতা। যেন বিদ্যুৎ খেলে বেড়াচ্ছে সমস্ত বন জুড়ে। নির্জন বনের মধ্যে একাকিনী এমন এক রূপসী রমণীর অসতর্ক বিভ্রম দেখে মৃত্তিকা-স্তূপের মধ্যে থাকলেও শুষ্ক-রুক্ষ মুনির মন আন্দোলিত হল—

তাং পশ্যমানো বিজনে স রেমে পরমদ্যুতিঃ।

শর্যাতির মেয়ে সুকন্যা বনের মধ্যে শাখাভঙ্গের খেলায় মেতে ছিলেন। হঠাৎ তাঁরই নজরে পড়ল প্রায় মনুষ্যকৃতি সেই মৃত্তিকাস্তূপ এবং সেই স্তূপের মধ্যে দুটি অসম-বিষম ক্ষুদ্র বিবর তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেই বিবরের মধ্যে উজ্জ্বল কিছু আছে, সেটাও অনুভূতি হল সুকন্যার। তাঁর কী মনে হল কে জানে! হঠাৎ সঙ্গে-সঙ্গেই ছোটো একখানি কাঠি-গোছের কিছু সেই দুটি বিবরের মধ্যে চালান করে দিতেই চ্যবন-মুনি দুই চোখেই ভয়ঙ্কর খোঁচা লাগল—

কিংনু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নির্বিভেদাস্য লোচনে।

চোখে বিদ্ধ হওয়ায় দারুণ ব্যথা-যন্ত্রনায় কষ্ট পেতে থাকতেন চ্যবন মুনি। তাঁর ক্রোধ হল, তপস্যার প্রভাবে যে বিভূতি তৈরি হয়েছিল, তাতেই চ্যবন-মুনি শর্যাতি রাজার সৈন্য-সেনাদের মল-মূত্র স্তব্ধ করে দিলেন—

ততঃ শর্যাতি-সৈন্যস্য শকৃন্মূত্রে সমাবৃনোৎ।

রাজকন্যা সুকন্যার চেতনা হল এবার। তিনি বিপদ বুঝে পিতা নিজেই শর্যাতিকে বললেন—আমি এই অরণ্যে এক বৃহদাকার মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে কোটরগত দুটি উজ্জ্বল বস্তু দেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল—সে দুটি যেন জোনাকি-পোকার মতো কিছু, আমি সে দুটিকে বিদ্ধ করেছি—

খদ্যোতবদ্ অভিজ্ঞাতং তন্ময়া বিদ্ধমন্তিকাৎ।

মেয়ের কথা শুনে শর্যাতি পড়ি-মরি করে সবাইকে নিয়ে সেই মৃত্তিকাস্তূপের কাছে দেখলেন সেই স্তূপের ভিতর তপোমূর্তি চ্যবন-মুনি। তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় তিনি যেমন বৃদ্ধ হয়েছেন, তেমনি বয়সেও তিনি বৃদ্ধ—

তত্রাপশ্যত্তপোবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধঞ্চ ভার্গবম্।

শর্যাতি তাঁর সৈন্যদের জন্য রোগমুক্তি প্রার্থনা করলেন এবং ক্ষমাও চাইলেন মেয়ের জন্য, তাঁর অজ্ঞানে কৃত অপরাধের জন্য। কিন্তু চ্যবন-মুনি নিরস্ত হলেন না এই সম্ভ্রম-প্রদর্শনে। তিনি পরিষ্কার বললেন—দেখুন মহারাজ, আপনার মেয়ের মধ্যে তাঁর অতুলনীয় রূপের গর্ব ছিল। আপন কৌতুক চরিতার্থ করার জন্য তিনি যা ইচ্ছে তাই করছিলেন, নইলে আমার চোখ-দুটোকে জোনাকি-পোকা ভেবে নেবার মোহ তৈরি হত না। চ্যবন বললেন—মহারাজ! আপনি এর বিহিত করুন। আপনার মেয়েটিকে আমি নেবো নিজের জন্য, তারপর আমি যাব এখান থেকে—

তামেব প্রতিগৃহ্যাহং রাজন্ দুহিতরং তব।

রাজা শর্যাতি কাল বিলম্ব না করে সুকন্যাকে

তুলে দিয়েছেন বয়োবৃদ্ধ মুনির হাতে এবং সুকন্যাও রাজোচিত সমস্ত দুরন্ত অভিলাষ ত্যাগ করে বেছে নিলেন তপস্বী মুনির মৌন জীবন। ভালোই চলছিল তাঁদের দাম্পত্য জীবন। কিন্তু চ্যবন-মুনি আর সুকন্যা এই ধর্মজীবনের মধ্যে হঠাৎই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। সেদিন যৌবনবতী সুকন্যা স্নান করতে নেমেছিলেন সরোবরের জলে। স্নান করার সময় তাঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন দেব-বৈদ্য দুই অশ্বিনীকুমার —

কৃতাভিষেকাং বিবৃতাং সুকন্যাং তামপশ্যতাম্।

নন্দনবাসিনী স্বর্গসুন্দরীর মতো সুকন্যাকে নগ্নিকা দেখেও দুই অশ্বিনীকুমার-যমজ কিন্তু এমন কোনো হামলে-পড়া অসভ্যতা করলেন না, যা দেবতারা অনেক সময় করে থাকেন বা করেছেন। তাঁরা সুকন্যার কাছে গিয়ে বললেন—তোমার অধিকারী কে? এই বনের মধ্যেই বা একাকিনী কী করছো? আমরা সব জানতে চাই। খানিক লজ্জা পেলেও সুকন্যা স্পষ্ট জবাব দিলেন—আমি শর্যাতি রাজার মেয়ে, মহর্ষি চ্যবনের ভার্য্যা আমি। অশ্বিনীকুমার-যুগল এবার খানিক উপহাসের সুরে বললেন—তোমার বাবা আর লোক খুঁজে পেলেন না! শেষে কিনা কাল চলে গেছে এমন এক বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিলেন তোমাকে—

কথং ত্বমসি কল্যাণি পিতা দত্তা গতাধ্বনে।

অথচ এই বনের মধ্যে তোমাকে নিতান্ত বিলক্ষণা লাগছে সৌদামিনী বিদ্যুতের মতো। তোমার গায়ে কোনো অলঙ্কার নেই, উত্তম কোনো বস্ত্রও নেই পরিধানে। অথচ এমন অবস্থাতেও তোমাকে কত অসামান্য লাগছে। আমরা স্বর্গলোকেও তোমার মতো সুন্দরী দেখিনি।

অনেক প্রশংসা শুনিয়ে অশ্বিনীকুমারেরা বললেন—এমন সুন্দরী হয়েছ যখন তখন এমন এক জরা-জর্জরিত বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করবে কেন তুমি! তুমি তো এর যোগ্য নয়। এমন এক পুরুষ তিনি, যাঁর কামভোগের শক্তি পর্যন্ত নেই, তোমাকে পালন-পোষণও তিনি করতে পারবেন না। এইভাবে কি তোমার মতো এক সযৌবনা রমণীর জীবন কাটানো চলে? তার চেয়ে বরং এই ভালো হবে যে, আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে তুমি স্বামী হিসেবে বেছে নাও। তোমার এই দীপিত যৌবন বৃথা যেতে দিয়ো না—

মা বৃথা যৌবনং বৃথাঃ।

সুকন্যা বললেন—ওই বুড়ো স্বামীই আমার কাছে বেশ। আমি তাঁকেই বেশ ভালোবাসি, এ বিষয়ে আমার ওপর সন্দেহ না করাই ভালো—

রতাহং চ্যবনে পত্যৌ মৈবং মাং পর্যশঙ্কতম্।

দুই অশ্বিনীকুমার অতিশয় ভদ্রলোক। তাঁরা অসম্ভব সুন্দর একটা প্রস্তাব দিলেন সুকন্যাকে। বললেন—কল্যাণী! আমরা দেব-চিকিৎসকদের মধ্যে প্রধান। অনেক চিকিৎসা জানি আমরা। আমরা সুকিচিৎসায় তোমার স্বামীকে যুবক এবং রূপবান করে দেবো—

যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব।

আমরা আমাদের বিষয়ে কোনো জোর করছি না। তোমার স্বামীকে সুন্দর করে দেবার পর আমরা তিন জনেই এসে দাঁড়াবো তোমার সামনে, তখন যে কোনো একজনকে তুমি স্বামী হিসেবে বরণ কোরো, যাঁকে মনে করবে তাঁকে। যে দুই দেবতা এক মনুষ্যরমণীকে দেখে নগ্ন-সৌন্দর্য্যের মহিমায় স্নান করেছিলেন, তাঁদের মুখেই এমন সমর্য্যাদ প্রস্তাব ভীষণভাবে মানায় যেন। অশ্বিনী-কুমারেরা বললেন— এবার ডাকো তোমার স্বামীকে, আমাদের প্রস্তাবটাও মনে রেখো—

এতেন সময়েনৈনম্ আমন্ত্রয় পতিংশুভে।

যাও স্বামীকে বলো। সুকন্যা ভীষণ খুশি হলেন। এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটবে, সে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। খুব তাড়াতাড়ি তিনি এলেন ভার্গব চ্যবনের কাছে, বললেন অশ্বিনীকুমারদের প্রস্তাবের কথা। মহর্ষি চ্যবনও স্ত্রীর এই প্রস্তাব শুনে মনে-মনে যথেষ্ট খুশি হয়েই বললেন—

করো তুমি, যেটা ভাল মনে হচ্ছে করো—

তচ্ছ্রুত্বা চ্যবনো ভার্যামুবাচ ক্রিয়তামিতি।

সুকন্যা চ্যবন-মুনির সম্মতি জানিয়ে অশ্বিনীকুমারদের বললেন—তাহলে করুন সেই কাজটি। অশ্বিনীকুমারেরা এখানে এক সরোবরের জলে ডুব দিয়ে আসতে বললেন চ্যবনকে এবং ডুব দেবার পরেই চ্যবনমুনি এক দিব্য যুবকের মতো হয়ে গেলেন। এখানে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা অলৌকিকতা থাকলেও পণ্ডিতেরা বলেন যে, আয়ুর্বেদিক চ্যবনপ্রাশ, যেটা চ্যবন মহর্ষির

নামের সঙ্গে চিরন্তন কাল থেকে জড়িত, সেই ওষুধটাই অশ্বিনীকুমার-যুগল প্রয়োগ করেছিলেন চ্যবন-মুনির ওপর এবং সেই ওষধির প্রচার হয়েছে যিনি ওষুধ খেয়ে 'রিজুভিনেটেড' হয়েছেন তাঁর নামে। রোগী সারিয়ে রোগীর নামেই সেই ওষুধের প্রচার অভিনব প্রচার-পন্থা বটে।

যাই হোক, চ্যবন-মুনি যুবকে পরিণত হলে অশ্বিনীকুমার সুকন্যাকে বললেন—এবার তুমি আমাদের তিন জনের মধ্যে একজনকে বেছে নাও স্বামী হিসেবে, অথবা যাঁকে তোমার আগে থেকেই পছন্দ, তাঁকেও তুমি বরণ করতে পারো—

যত্র বাপ্যভিকামাসি তং বৃণীস্ব সুশোভনে।

সুকন্যা বললেন—আপনারা তিনজনেই একই রূপ ধারণ করে আসুন আমার সামনে। তাঁরা এলেন সুকন্যার সামনে এবং সুকন্যা কিন্তু চ্যবন মুনিকেই প্রিয়তম স্বামী হিসেবে চিনে নিলেন। দুই অশ্বিনীকুমারের দেওয়া রসায়নে চ্যবন মুনির শরীরে-মনে যে রসায়ন তৈরি হয়েছিল, তাতে একরূপধারী মুনি আর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্য থেকে চ্যবন-মুনিকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেননি সুকন্যা।

চ্যবন-মুনি সুকন্যার ওপরে যত প্রীত হলেন, ঠিক ততখানিই প্রীত হলেন অশ্বিনীকুমার-যুগলের ওপর। তিনি অশ্বিনীকুমার-যুগলের দৈব প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন সোমরসের ভাগ দিয়ে, আর এই কাহিনীর মধ্যেই সামাজিক ঐতিহাসিকদের একটা দায় চলে আসে। চ্যবন-মুনিই বস্তুত প্রথম সেই মানুষ, যিনি বৈদিক কুলদেবতাদের প্রথম সারিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

[মহা (k) ৩.১২২.১-২৪; ৩.১২২.১-২৯; ৩.১২৩.১-২৪;
(হরি) ৩.১০১.১.৫৪; ৩.১০২.১-২৫;
ভাগবত পু. ৯.৩.১১-২৬;
বায়ু পু. ১০.৭১; ৩০.৮৪; ৩৯.৪৯;
দেবী ভাগবত পু. ৭.৪.২৫-৫৬]

এই বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও যদি সামাজিক ইতিহাসটুকু খতিয়ে দেখি, তাহলেও দেখব বৈদ্য-চিকিৎসক-কবিরাজেরা ব্রাহ্মণদের সমান সম্মান পেতেন না। যেখানে ব্রাহ্মণ-সমাজেরই একাংশ বৈজ্ঞানিকতার ঝোঁকে চিকিৎসার পথ বেছে নিয়েছিলেন, অসুখ সারানোর প্রয়োজনে যাঁদের আর্ত ডাক পৌঁছাত বৈদ্যের কাছে, সেই বৈদ্য পৈতেও পরতেন, সন্ধ্যা-আহ্নিকও করতেন বটে, কিন্তু তবু হাজার অসুখ সারিয়েও চিকিৎসক-কবিরাজরা ব্রাহ্মণের সমান সম্মান পেতেন না। খোদ মহাভারতের মধ্যেই দুই অশ্বিনীকুমারকে একবার শূদ্র বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে—

অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাস্থিতৌ।

আমরা এই সামাজিক অবহেলারই পূর্ব প্রতিরূপ খুঁজে পাই অশ্বিনীকুমার এবং চ্যবন-সুকন্যার কাহিনীতে।

[মহা (k) ১২.২০৮.২৪; (হরি) ১২.২০২.২৩]

চ্যবন-সুকন্যার কাহিনী কিন্তু নব্য-শ্রুত কাহিনী নয়, এ-কাহিনী বেদ-ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পুনরাবৃত্তিমাত্র। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলেই চ্যবনকে আমরা পর পর তিনবার উল্লিখিত দেখেছি এই মর্মে যে, অশ্বিনী কুমারেরা বুড়ো চ্যবনকে যুবক বানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর শরীরে শক্তি এবং জ্যোতি ফিরে এসেছিল—

যুবং চ্যবন মশ্বিনা জরন্তং/
পুন র্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ।

একটি ঋক্‌মন্ত্রে বলা হয়েছে—অশ্বিদ্বয়! তোমরা বুড়ো চ্যবনকে এমন চেহারা দিয়েছো যেন তাঁর ওপরের ছাল-চামড়া পুরো উঠে গেছে, তাতে একদিকে যেমন তাঁর পুত্র-কন্যাদের দ্বারা পরিত্যক্ত জীবন বৃদ্ধিলাভ করেছিল, তেমনই অল্পবয়সী মেয়েরাও তখন তাঁকে স্বামী হিসেবে পেয়েছিল—

আয়ুর্দধ্রাদিৎ পতিমকৃণুতং কণীনাম্।

এখানে হয়তো একটু অতিশয়োক্তি আছে, কেননা সুকন্যা কখনো তাঁকে ছেড়ে গেছেন বলে প্রমাণ পাইনি কোথাও এবং একটি ঋক্‌মন্ত্রে চ্যবনের সেই মসৃণ-চর্ম সুরূপ চেহারাকে তাঁর সুরূপা বধূর কাঙ্ক্ষিত অভিরূপ মূর্তি বলেই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে—

যুবা যদী কৃথঃ পুনরা কামসৃণ্বে বধ্বঃ।

তাই মনে হয়, পূর্ববর্তী মন্ত্রের ভাবার্থ এইরকম যে, একসময় চ্যবনের তপোবৃদ্ধ শরীর দেখে তাঁর পুত্রেরা তাঁকে কুৎসিত চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিল এবং এই অবস্থায় অশ্বিনী-রসায়ণে তাঁর চেহারায় এমন জ্যোতি আসে যে, অল্পবয়সী রমণীদের কাছেও তিনি কাম্য হয়ে ওঠেন।

তবে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রসমস্যা সমস্ত সমাধান করে দিয়েছে বেদের অব্যবহিত পরবর্তীকালে

লেখা শতপথ ব্রাহ্মণ। সেখানে সুকন্যা মহাভারতের মতো শর্যাতি-রাজার কন্যা, তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধ চ্যবনের বিয়ে হয় এবং তাঁর 'রিজুভিনেশন'-এর 'মোটিভ্' তৈরি হয়েছে সেই পুকুরে ডুব দিয়ে ওঠা থেকেই। কিন্তু এই ঘটনার পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দৈব জাতে ওঠাটা হয়েছে সুকন্যার প্ররোচনাতেই। কেননা তিনিই অশ্বিনীকুমারদের প্রথম আর্তি শুনেছেন। চ্যবন যুবক হয়ে যাবার পর অশ্বিনীকুমারদের তিনি বলেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের পুণ্যদেশে যজ্ঞ চলছে সেইখানে দেবতাদের মধ্যে তোমাদের দুজনের জায়গা করে দেবো—

কুরুক্ষেত্রে অমী দেবা যজ্ঞ তন্বতে,
তে বাং যজ্ঞাদ্ অন্তর্যান্তি।

শতপথের এই সুকন্যা-সূত্রই মহাভারতের কাহিনীতে আরও সামাজিক সচেতনতায় পরিবেশিত হয়েছে।

[ঋগ্‌বেদ, ১.১১৬.১০; ১.১১৭.১৩; ৫.৭৪.৫; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber), ৪.১.৫.৮-১৪]

মহাভারতে কথকতার মাহাত্ম্য বেশি বলেই চ্যবন-মুনির যৌবন-লাভের খবর আগে গেল শর্যাতি রাজার কাছে। তিনি হই-হই করে সৈন্য-সামন্ত সহ উপস্থিত হলেন। মেয়ের জন্য রাজার মনে-মনে যে দুঃখ ছিল, তা এক্কেবারে চলে গেল। উৎফুল্ল শর্যাতিকে জামাই চ্যবন মুনি এবার বললেন—মহারাজ! আমি আপনার যজ্ঞ করতে চাই। আপনি সেই বৃহদ্ যজ্ঞের আয়োজন করুন। বরিষ্ঠ চ্যবন মুনি রাজার যজ্ঞ করাবেন—এটা বিরাট খুশির কথা। শর্যাতি মহাসমারোহে যজ্ঞের আয়োজন করলেন। বিরাট যজ্ঞশালায় যজ্ঞ আরম্ভ হল। চ্যবন-মুনি অশ্বিনীকুমারদের উদ্দেশে আহুতি দেবার জন্য সোমপাত্র গ্রহণ করলেন হাতে—

অগৃহ্ণাচ্ চ্যবনো সোমম্ অশ্বিনোর্দেবয়োস্তদা।

কিন্তু মন্ত্র পড়ে আহুতি দিতে গিয়ে দেখলেন —তাঁর হাতটি ধরে ফেলে আটকে দিয়েছে কেউ।

দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি চ্যবনের হাতে-ধরা সোমপাত্র থেকে সোমরস পড়তে দিলেন না। বললেন—শুনুন ঋষি! এই দুই অশ্বিনীকুমার কিন্তু আমার মতে সোমরসের অর্ঘ্য-সম্মান পেতে পারেন না। এই দুজনে আমাদের স্বর্গের দেবতাদের চিকিৎসক-মাত্র। এঁরা ভিষক বৈদ্য, এঁরা দেবতা নন, কাজেই এই দেবভোগ্য সোমরস এঁরা পেতে পারেন না—

ভিষজৌ দিবি দেবানাং কর্মণা তেন নার্হতঃ।

লক্ষণীয়, দেবরাজ দুই অশ্বিনীকুমারকে 'ভিষক্' বলে চিহ্নিত করেছেন—এই শব্দটা বেদে ব্যবহার হয়েছে এবং সেই ভিষক্-এর মর্যাদা যথেষ্ট ছিল বলেই পরবর্তী কালে তাঁরা বৈদ্য নামে বিখ্যাত হয়েছেন। বৈদ্য মানে যিনি বিদ্যা জানেন এবং এই বিদ্যা হল বেদবিদ্যা, আর বেদ মানেই জ্ঞান, ঠিক যেমন, আরবী, ভাষায় 'হিকমৎ' মানে জ্ঞান এবং এই শব্দ থেকেই চিকিৎসক কিন্তু 'হাকিম'। ঘটনা হল, এই ভিষক্ যে বিদ্যাবান বৈদ্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন, তার পিছনে চ্যবন মুনির সঙ্গে ইন্দ্রের এই 'টাসল'টাই দায়ী।

চ্যবন মুনি ইন্দ্রের ভাষ্য প্রত্যাখ্যান করে বললেন—এই দুই অশ্বিনীকুমার যেমন উৎসাহী, তেমনই মহান এঁদের হৃদয়। আমাকে এঁরা জরাবিহীন এক যুবকে পরিণত করে নতুন জীবন দিয়েছেন। আর এটাই বা কেন হবে যে, আপনি আর দু-চারজন দেবতা ছাড়া আর কেউ কেন যজ্ঞীয় সোমরসের ভাগ পাবেন না—

ঋতে ত্বাং বিবুধাংশ্চান্যান্ কথং বৈ নার্হতঃ সবম্।

কেন আপনি অশ্বিনীকুমারদের দেবতা বলে ভাবছেন না? ইন্দ্র যেন গোপন কিছু বলছেন এইভাবে চ্যবন-মুনিকে বললেন—ওরা দুজন দেবতাদের চিকিৎসা করে, দেবতাদের কাজ করে, ওরা 'কর্মকর'। তার মধ্যে আবার দেবলোক ছেড়ে মাঝে মাঝে মর্ত্যলোকের মানুষের মধ্যেও চরে বেড়াচ্ছে এরা। তাহলে বলুন এবার, কী করে এরা সোমরসের অগ্রভাগ পায়—

চিকিৎসকৌ কর্মকরৌ লোকে চরন্তৌ
মর্ত্যানাং কথং সোমমিহার্হতঃ?

দেবরাজ এই এক কথা দু-তিন বার করে বললেন চ্যবনকে।

আসলে একই গোত্রের পুরুষ উন্নতিকামী অন্য আর একজনকে কীভাবে চেপে রাখতে চায়, এটা মর্ত্য ভাবনাতেই বোঝা ভালো। আমরা দেখেছি মহাভারতেও এক জায়গায় চিকিৎসককে মন্দিরের পুরুত ঠাকুর আর নক্ষত্রযাজী জ্যোতিষীদের থেকে নীচুভাবেই দেখা হয়েছে। বিশেষত কর্ম এবং পেশার প্রয়োজনেই যেহেতু

একজন রোগীর মল-মূত্র পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে ক্ষত, পূঁজ, রক্তের সংস্পর্শে আসতে হয়, সেই জন্যই মনু-মহারাজও চিকিৎসক-ভিষকদের বেশ নীচু চোখে দেখেছেন। এমনকী তাঁদের শিকারী ব্যাধের সঙ্গে তুলনা করতেও বাধেনি। একই রকম এই নীচদৃষ্টি ছিল সেই আদিতেও। ফলে দেবতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দেবসমাজে অপাংক্তেয় করে রাখার জন্য স্বয়ং দেবরাজের এই চেষ্টাটাকে আমরা খুব আশ্চর্য হয়ে দেখছি না।

চ্যবন মুনি দেবরাজের পুনরাবৃত্ত বক্তব্য অগ্রাহ্য করে সোমরসের পাত্র নিয়ে আবারও প্রস্তুত হলেন অশ্বিনীকুমারদের জন্য। দেবরাজ দেখলেন—মিষ্টি কথার পরামর্শে কাজ হবে না। তিনি এবার চ্যবন-মুনিকে সাবধান করলেন এবং ভয় দেখিয়ে বললেন—আমি বজ্র প্রহার করবো করবো তোমার ওপর, যদি এই সোমরসের এক ফোঁটাও পড়ে অশ্বিনীকুমারদের আহুতি হিসেবে—

বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপমনুত্তমম্‌।

নিজেদের দেবত্বের জায়গাটুকু ধরে রাখার জন্য এই চেষ্টা আমাদের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যের একাংশের মধ্যেও এমনই উগ্র ছিল। সমাজের এত বড়ো উপকার-সাধক চিকিৎসকদের ঘরে ভাত খেতে বারণ করেছেন যেসব স্মার্তরা, তাঁরাই তো এই ইন্দ্রের বজ্রস্বরূপতার প্রতিরূপ। কিন্তু সমাজের মধ্যেই সেই শুভানুধ্যায়ী উদার-হৃদয় মানুষ থাকেন চ্যবন-মুনির মতো, যাঁরা নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন চিকিৎসকের পরোপকারী সাধন। চ্যবন তাই দেবরাজের দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে সোমপাত্র গ্রহণ করলেন অশ্বিনীকুমারদের দেবত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে।

ইন্দ্র তাঁর বিদ্বেষদৃষ্টিতে বজ্রপ্রহার করতে উদ্যত হলেন চ্যবন মুনির ওপর। কিন্তু মুনি এতকালের তপোবৃদ্ধ বিদ্যাবান মানুষ। তিনি যোগবলে স্তব্ধ করে রাখলেন ইন্দ্রের দুই বাহু এবং সেই বাহুধারী ইন্দ্রকে একেবারে চিরতরে শেষ দেবার জন্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে এক মারণ-দেবতার সৃষ্টি করলেন। এই অপদেবতার নাম কৃত্যা—বিশাল আকারের সেই মারণদেবতা যখন ইন্দ্রকে খেয়ে ফেলার জন্য এগোচ্ছিল, তখন ইন্দ্রও ভয় পেয়ে চ্যবন-মুনিকে বললেন—আমি মেনে নিচ্ছি আপনার কথা, আজ থেকে অশ্বিনীকুমারেরাও আপনাদের ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞে আমাদের মতোই সোমপায়ী সম্ভ্রান্ত দেবতা হিসেবে গণ্য হোন সোমার্হৌ অশ্বিনাবেতৌ অদ্য প্রভৃতি ভার্গব। এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক। আপনি আমাকে আর বিপদে ফেলবেন না। বরঞ্চ এই মারণ-দেবতাকে অন্য কাজে লাগান।

চ্যবন মুনি এবার সোমপাত্র গ্রহণ করে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস গ্রহণ করতে বললেন সমন্ত্রে। তিনি ইন্দ্রকেও বঞ্চিত করলেন না। দুই দেবতা একই পংক্তিতে বসে সোমপান করে দু-জনের পারস্পরিক বন্ধু হলেন। শর্যাতি রাজার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হল এবং যুধিষ্ঠিরও বোধহয় বুঝলেন যে, সমাজে বৃহত্তর সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হলে বুদ্ধিজীবিতার সঙ্গে বোধহয় একটা প্রতিরোধী শক্তি-সন্দর্ভেরও প্রয়োজন আছে। কেননা চ্যবন-মুনি শুধু তাঁর নির্মল তপস্যার শক্তিতে সমাজের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, তাঁর একটা মারণী-শক্তিরও প্রয়োজন হয়েছে— সেটা ছাড়া বোধহয় সমাজের অচলায়তনগুলি ভাঙা যায় না।

[মহা (k) ৩.১২৪.৪-২৫; ৩.১২৫.২-১০; ১.৩.১৫৬.১৬-৩২; (হরি) ৩.১০৩.১-৩২; ১৩.১৩৪.১৫-৩২; স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্যম্‌), ৩০.২-৪১]

□ রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে, ভগবান বিষ্ণু যখন রামচন্দ্র রূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হলেন, সেই সময় ব্রহ্মার আদেশে দেবতারা রামচন্দ্রের সহায়তার জন্য মর্ত্যলোকে বানর পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। অশ্বিনীকুমারদের ঔরসে বানরবীর মৈন্দ এবং দ্বিবিদের জন্ম হয়।

[রামায়ণ ১.১৭.১৪]

□ রামায়ণের তেত্রিশজন প্রধান বৈদিক দেবতার অন্যতম হিসেবে যুগল দেবতা অশ্বিনীকুমারের উল্লেখ মেলে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে এঁদের কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে অদিতির গর্ভজাত দেবতা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাবণ যখন স্বর্গলোক আক্রমণ করেন, সেই সময় দেবাসুর যুদ্ধেও অশ্বিনীকুমারদের অংশ নিতে দেখা যায়।

[রামায়ণ ৩.১৪.১৪-১৫; ৭.৩২.২২; ৭.৩৩.২৭]

□ পুরাণে নানা ঘটনায় অশ্বিনীকুমারদের উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ভাগবত পুরাণে

উল্লিখিত হয়েছে যে, দানবরাজ বৃষপর্বার বিরুদ্ধে দেবতাদের যুদ্ধের সময় অশ্বিনীকুমারদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। *[ভাগবত পু. ৮.১০.৩০]*

□ ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহর্ষি দধীচির কাছ থেকে অশ্বিনীকুমাররা পরব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ লাভ করেছিলেন। *[দ্র. দধীচি]*

[ভাগবত পু. ৬.৯.৫২; ৬.১০.১৭]

□ যদুবংশ ধ্বংস হবার কিছুদিন আগে ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা দ্বারকায় এসে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন এবং কৃষ্ণকে তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। এই সময় অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে অশ্বিনীকুমাররাও কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ১১.৬.২]*

□ বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত চন্দ্রপর্বতে বহু ওষধি পাওয়া যায়, চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে যেগুলির প্রত্যেকটিই অমৃতের সমতুল্য। দেব চিকিৎসক অশ্বিনীকুমাররা চন্দ্রপর্বতের এই ওষধিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

[বায়ু পু. ৪৯.৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৮]

□ মৎস্য পুরাণে প্রাপ্ত একটি উপাখ্যানে অশ্বিনীকুমারদের যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতার উল্লেখ মেলে। তারকাসুর যে সময় স্বর্গলোক আক্রমণ করেছিলেন, সে সময় দেবাসুর যুদ্ধে অশ্বিনীকুমারদের উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এঁরা দেবসেনার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের রথের ধ্বজায় চিত্রিত ছিল রত্নখচিত কুম্ভ। *[মৎস্য পু. ১৪৮.৮৫-৯৬]*

□ বায়ু পুরাণের একটি শ্লোক থেকে অশ্বিনীকুমারদের জন্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি তথ্য পাওয়া যায়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে— সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার দুই কান থেকে অশ্বিনীকুমারদের জন্ম হয়। মৎস্য পুরাণের কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, বলির যজ্ঞসভায় তিন পদ পরিমাণ ভূমি দান হিসেবে লাভ করার পর বামনরূপধারী ভগবান বিষ্ণু যখন ত্রিলোকব্যাপী বিরাট রূপ ধারণ করলেন, সেই সময়ে বামনের দেহ বর্ধিত করার জন্য সমস্ত দেবতারা তাঁর শরীরে প্রবেশ করেন। লক্ষণীয় সে সময় ভগবান বিষ্ণুর দুই কানে অবস্থান করছিলেন দুই অশ্বিনীকুমার।

[মৎস্য পু. ২৪৬.৫৬; বায়ু পু. ৬৫.৫৭]

□ স্কন্দপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, বর্ণমালার বাহান্নটি বর্ণের মধ্যে তেত্রিশটি স্পর্শ বর্ণ। 'ক' কার থেকে 'হ' কার পর্যন্ত এই তেত্রিশ বর্ণই আসলে তেত্রিশ জন দেবতা। এঁদের মধ্যে 'স' এবং 'হ'—এই বর্ণ দুটি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্বরূপ। *[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৫.৭৬, ৮২]*

□ দেবী ভাগবত পুরাণে বৃত্রাসুরের বিরুদ্ধে দেবতাদের সংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে দুই অশ্বিনীকুমার অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে শতবর্ষব্যাপী সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তাঁরা ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দেন।

[দেবী ভাগবত পু. ৬.৩.৩০-৩৮]

অশ্বিনীকুমারতীর্থ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মাহাত্ম্যধন্য একটি তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে কোটিতীর্থ থেকে এই তীর্থে যেতে বলা হয়েছে। এই তীর্থ ভ্রমণে রূপবান হওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৮৩.১৭; (হরি) ৩.৬৮.১৭;

বামন পু. ৩৪.৩১; পদ্ম পু. (স্বর্গ) ১২.১৬]

বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের জিন্দ (Jind) জেলার অন্তর্গত আসান নামক স্থানটিতেই এই তীর্থের অবস্থান বলে মনে করা হয়।

[Gaekwad's Oriental Series, issue. 43.

Oriental Institute, 1928, p. 135]

অশ্মক$_১$ প্রাচীন ভারতবর্ষের এক অন্যতম প্রধান জনপদ। পরবর্তী বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে যে ষোলটি মহাজনপদ আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাদের মধ্যেও অন্যতম ছিল অশ্মক। মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে একাধিকবার এই রাজ্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ৬.৯.৪৪; (হরি) ৬.৯.৪৪;

মৎস্য পু. ২৭২.১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫৮]

□ প্রাচীন উত্তর পশ্চিম ভারতে অবস্থিত অশ্বক এবং অশ্মক—এই দুটি জনপদই বৌদ্ধযুগে অস্সক নামে চিহ্নিত হত বলে এই দুইয়ের অবস্থান নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে উত্তর পশ্চিম ভারতীয় জনপদগুলির সঙ্গে অশ্মকের নাম উল্লেখ করেছেন।

তবে মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ এবং নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকে মনে হয় অশ্মক দক্ষিণ

ভারতে অবস্থিত ছিল। পাণিনির সূত্রে আমরা অশ্মক জনপদের নামোল্লেখ পাই।

[অষ্টাধ্যায়ী ৪.১.১৭৫]।

'অশ্ম' শব্দের অর্থ প্রস্তর বা পাথর। প্রস্তরময় অঞ্চল বলেই এই জনপদের নাম অশ্মক— পাণিনির সূত্রে 'অশ্মক' নামটিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে, অজন্তা এবং নাসিকে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, অশ্মক বা অস্‌সক গোদাবরী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত ছিল। অবন্তী এবং অশ্মক একেবারে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি রাজ্য ছিল বলেই অবন্তীও অনেক সময় অশ্মকাবন্তী নামে চিহ্নিত হয়েছে *[দ্র. অবন্তী]*। আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, বর্তমান মহারাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদের কিছু অংশ জুড়ে প্রাচীন অশ্মক বিস্তৃত ছিল। অর্থশাস্ত্রের টীকাকার ভট্টস্বামীও এই স্থানটিকে আধুনিক মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বলে মনে করেছেন। *[GDAMI (Dey) pp. 12-13]*

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কল্মাষপাদের পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভে মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে কল্মাষপাদ রাজার যে ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম ছিল অশ্মক। মহাভারত এই অশ্মকের সম্পর্কে জানিয়েছে যে এই অশ্মকরাজা পৌদন্য নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—

অশ্মকো নাম রাজর্ষিঃ পৌদন্যং যো ন্যবেশয়ৎ।

এই পৌদন্য নগরটিই পরবর্তীকালে বৌদ্ধগ্রন্থে পোতন বা পোদন নামে উল্লিখিত হয়েছে। পুরাণমতে অশ্মকের পুত্র ছিলেন মূলক। এই মূলককে অশ্মকের অধিপতি বলা হয়েছে। এ থেকে মনে হয়, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অশ্মক দাক্ষিণাত্যে গিয়ে সেখানকার পার্বত্যপ্রদেশে যে নতুন রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর নামানুসারেই সেই রাজ্য অশ্মক নামে খ্যাত হয়। পৌদন্য বা পোতন ছিল তার রাজধানী। বর্তমান হায়দ্রাবাদে অবস্থিত বোধন শহরটিকেই পণ্ডিতরা প্রাচীন পৌদন্য নগরী বলে মনে করেছেন।

[মহা (k) ১.১৭৭.৪৭; (হরি) ১.১৭০.৪৮;
PHAI (Roychaudhuri), p.
GDAMI (Dey) p. 12;
GM (Suryavanshi) p. 33;
GD (Bhattacharyya) p. 75-76]

☐ মহাভারতের বনপর্বে কর্ণের দিগ্বিজয়যাত্রার যে বিবরণ আমরা পাই সেখানে অশ্মকের উল্লেখ নেই। তবে কর্ণপর্বে একজায়গায় উল্লেখ আছে যে, ভারতের অন্যান্য জনপদের মতোই অশ্মকও কর্ণের পদানত হয়।

[মহা (k) ৮.৮.২০; (হরি) ৮.৬.২০]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্মক জাতীয় সেনাকে পাণ্ডবপক্ষে অবস্থান করতে দেখা যায়। তবে দ্রোণপর্বে অশ্মক-রাজপুত্রকে কৌরবপক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখতে পাই। অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করে যখন একা সমগ্র কুরুসেনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন, সে সময় অশ্মক-রাজপুত্র অভিমন্যুর হাতে নিহত হন। একই সঙ্গে দুই শিবিরে অশ্মকদের উল্লেখ সামান্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও এটা মনে হয় যে, অশ্মক জন-জাতীয়েরা যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিলেন এবং তাঁদের অনেকেই 'mercenary' হিসেবে কাজ করতেন।

[মহা (k) ৭.৩৭.২১-২৩; (হরি) ৭.৩৪.২১-২৩]

অশ্মক$_{২}$ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কল্মাষপাদের পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভজাত কল্মাষপাদের ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন অশ্মক। মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে তাঁর জন্ম হয়। মদয়ন্তী বারো বছর গর্ভধারণ করার পরেও (পুরাণ মতে সাত বছর) সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না দেখে দুঃখিত হয়ে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা উদরে আঘাত করেন। এই আঘাতের ফলেই গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় বলে পুত্রের নাম রাখা হল অশ্মক (অশ্ম = পাথর)। রাজা অশ্মক দাক্ষিণাত্যের অশ্মক জনপদ তথা রাজধানী পৌদন্যনগরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল মূলক।

[মহা (k) ১.১৭৭.৪৪-৪৮;
(হরি) ১.১৭০.৪৪-৪৭]

অশ্মক$_{৩}$ একজন ঋষি। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব মুনি-ঋষিরা উপস্থিত হয়েছিলেন, অশ্মক তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১২.৪৭.৫; (হরি) ১২.৪৬.৫]

অশ্মকী$_{১}$ পূরুবংশীয় প্রাচীন্বান্ রাজার পত্নী। ইনি যদুবংশীয়া ছিলেন বলে জানা যায়। প্রাচীন্বানের ঔরসে তাঁর গর্ভে রাজা সংযাতির জন্ম হয়।

[মহা (k) ১.৯৫.১৩; (হরি) ১.৯০.১৮]

অশ্মকী$_{২}$ বৃষ্ণিবংশীয় শূরের অন্যতম পত্নী। শূরের ঔরসে তাঁর গর্ভে দেবমীঢুষের জন্ম হয়।

[বায়ু পু. ৯৬.১৪৩]

অশ্মকী$_{৩}$ অনাধৃষ্টি নামে বসুদেবের এক ভাই ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল অশ্মকী।

[বায়ু পু. ৯৬.১৮৬]

অশ্মকুট্ট (অশ্মকুট্টী) *[দ্র. তপস্বী]*

অশ্মদংশনা অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজ দেহ থেকে যে সব মাতৃকা সৃষ্টি করেন, তাঁরা অন্ধকাসুর বধের পর ক্ষুধার্ত হয়ে গোটা সৃষ্টিটাকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। তখন মহাদেবের অনুরোধে ভগবান নৃসিংহ এঁদের দমন করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক মাতৃকা সৃষ্টি করেন। এই নৃসিংহসৃষ্ট মাতৃকাদের মধ্যে অশ্মদংশনা অন্যতম। পরবর্তীকালে এঁরা দেবী ভবমালিনীর অনুচরী হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

[মৎস্য পু. ১৭৯.৭১]

অশ্মপৃষ্ঠতীর্থ গয়াক্ষেত্রের একটি পবিত্র তীর্থ। অশ্ম মানে পাথর। গয়াক্ষেত্রে গয়শির পর্বতের উপরে অবস্থিত বলেই হয়তো এই তীর্থের এমন নামকরণ হয়েছে। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করলে ব্রহ্মহত্যার পাপও দূর হয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে মহাভারতে।

[মহা (k) ১৩.২৫.৪২; (হরি) ১৩.২৬.৪২]

অশ্মরথ্য পুরাণে মহর্ষি কৌশিক বিশ্বামিত্রের বংশপ্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের উল্লেখ আছে, মহর্ষি অশ্মরথ্যের বংশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এঁকে বিশ্বামিত্রবংশীয় অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১৯৮.১৩]*

অশ্মসারী পুরুবংশীয় শান্তনু রাজার মন্ত্রী। বিষ্ণু পুরাণের দাক্ষিণাত্য সংস্করণে অবশ্য অশ্মরাবিন্ পাঠ ধৃত হয়েছে। পুরুবংশীয় প্রতীপের তিন পুত্রের মধ্যে শান্তনু কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি বনে গমন করলে তিনি রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন। এরপর শান্তনুর রাজ্যে দীর্ঘ অনাবৃষ্টি দেখা দিল। পণ্ডিতজনেরা বললেন—রাজা জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বঞ্চিত করে সিংহাসন গ্রহণ করেছেন বলেই রাজ্যের এই অবস্থা হয়েছে। তখন প্রজাকল্যাণের জন্য শান্তনু রাজা দেবাপিকে তাঁর প্রাপ্য সিংহাসন ফিরিয়ে দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। এই সংবাদ শুনে তাঁর বিশ্বস্ত কূটনীতিবিদ মন্ত্রী অশ্মসারী গোপনে দেবাপির কাছে এক বেদবাদবিরোধী বক্তাকে পাঠালেন। দেবাপি সেই ব্যক্তির দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়ে পড়লেন।

এদিকে শান্তনু নিজে বনে এসে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রাজ্য ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করতে লাগলেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণরাও বেদশাস্ত্রসম্মত যুক্তি দেখিয়ে বোঝাতে লাগলেন যে, অগ্রজই রাজ্যের আসল অধিকারী, সুতরাং দেবাপির উচিত সিংহাসনে আরোহণ করে প্রজাপালন করা। কিন্তু কোনো যুক্তিতর্কই সেদিন দেবাপি শুনলেন না। মন্ত্রী অশ্মসারীর কৌশলগুণে তাঁর মন তখন শাস্ত্রবিরোধিতায় ব্যস্ত। শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণরাও দেবাপির প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আসীন রইলেন শান্তনুই। দেবাপি বেদের বিরোধিতা করায় রাজ্যের উপর শান্তনুর অধিকারই সিদ্ধ হল। ফলে দেবতার কৃপায় অনাবৃষ্টি দূর হল। আমাদের ধারণা, অশ্মসারীর এই কাহিনীটি কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শান্তনুর রাজা হয়ে বসার ঘটনাটিকে 'Legitimise' করে।

[বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৪.২০.৬-৯;
(কাঞ্চীপুরম্) ৪.২০.২১]

অশ্রুবিন্দুমতী প্রেমের দেবতা মদনের সঙ্গে রতির মিলনের পর রতির বামনেত্র থেকে জলের উপর অনেক আনন্দাশ্রুবিন্দু পতিত হল। সেই অশ্রুবিন্দু থেকে একটি পদ্মের উৎপত্তি হয় এবং সেই পদ্ম থেকেই রতির যে কন্যা হয়, তার নাম হয় অশ্রুবিন্দুমতী।

শুক্রাচার্যের অভিশাপ লাভ করে যযাতি জরাগ্রস্ত হবার পর যযাতি একসময়ে অশ্রুবিন্দুমতীর সঙ্গ প্রার্থনা করেন। এই অবস্থায় অশ্রুবিন্দুমতীর সখী বিশালা যযাতিকে জানান যে, জরাপরিব্যাপ্ত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে অশ্রুবিন্দুমতীর মিলন হবে না। যযাতি যদি তাঁর পুত্রকে জরা দান করে তার তারুণ্য গ্রহণ করতে পারেন তবেই এই মিলন সম্ভব। কামাসক্ত যযাতি পুত্রদের কাছে এই বৃত্তান্ত বলে তাঁদের কাছে তারুণ্য প্রার্থনা করতে থাকেন।

[পদ্ম পু. (ভূমি) ৭৭.৭৩-৭৭; ৭৭.৯৩-১০৮]

অষ্টক$_{১}$ মহাভারতের মতে বিশ্বামিত্রের ঔরসে যযাতির কন্যা মাধবীর গর্ভজাত পুত্র অষ্টক। পুরাণগুলিতে অবশ্য বলা হয়েছে বিশ্বামিত্রের ঔরসে দৃষদ্বতীর গর্ভজাত পুত্র হলেন অষ্টক। অষ্টকের পূর্বপুরুষ গাধিরাজা, কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। অষ্টক তাঁর পরবর্তী বংশধর বলে

কান্যকুব্জের রাজপদ লাভ করেছিলেন। লৌহি নামে অষ্টকের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল।

[মহা (k) ৫.১১৯.১৮;(হরি) ৫.১১০.১৮; ভাগবত পু. ৯.১৬.৩৬; বিষ্ণু পু. ৪.৭.১৭; বায়ু পু. ৯১.৯৬, ১০৩; হরিবংশ পু. ১.২৭.৫৭-৫৮; ব্রহ্ম পু. ১০.৬৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৮; ২.৬৬.৭৫; AIHT (Pargiter) p. 146]

☐ যযাতি দেহত্যাগের পর স্বর্গে গমন করেন। সেখানে তিনি প্রধান তপস্বীদের অবজ্ঞা করলে তাঁর পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র যযাতিকে বলেন যে, তাঁর পুণ্য ক্ষয় হওয়ায় তিনি স্বর্গচ্যুত হবেন। তখন যযাতি ইন্দ্রকে বলেন যে, স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে তিনি যেন কোনো সাধু ও সজ্জন ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেন। ভূতলে পতিত হয়ে যযাতি মাধবীর গর্ভজাত পুত্রদের অর্থাৎ নিজের দৌহিত্র—অষ্টক, শিবি, বসুমনা ও প্রতর্দনের সান্নিধ্য লাভ করেন। যযাতি যখন স্বর্গ থেকে পতিত হচ্ছিলেন, সেইসময় অষ্টক এবং তাঁর ভাইয়েরা যজ্ঞ করছিলেন। যযাতি যে তাঁদের মাতামহ—একথা জানতে পেরে অষ্টক ও তাঁর ভাইয়েরা প্রত্যেকে নিজেদের যজ্ঞকৃত পুণ্যের ভাগ যযাতিকে দান করেন। দৌহিত্রদের পুণ্যবলে যযাতি পুনরায় স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৮৬.৬;১.৯২ অধ্যায়; ৫.১২১-১২২ অধ্যায়; (হরি) ১.৭৪.৬; ১.৮০ অধ্যায়; ৫.১১২-১১৩ অধ্যায়; মৎস্য পু. ৩৫.৫; ৩৮.২২; ৪২.৬-৮, ১৪, ১৯, ২৬, ২৮]

☐ পাণ্ডবদের কাছে ক্ষত্রিয়দের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি অষ্টক রাজা সম্পর্কিত আরও একটি কাহিনীর উল্লেখ করেন। অষ্টকরাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর ভাই শিবি, প্রতর্দন, বসুমনা উপস্থিত হন। দেবর্ষি নারদকে সেই স্থানে দেখে চার ভাইয়ের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁদের মধ্যে কে আগে স্বর্গলোক থেকে পতিত হবেন? নারদ মুনি তাঁদের জানান যে অষ্টক সবার আগে পতিত হবেন। তার কারণ—কোনো একসময়ে নারদ অষ্টকের গৃহে বাস করছিলেন। একদিন রথে বিচরণ করতে করতে দেবর্ষি নানান বর্ণের গোরু দেখতে পেলেন। তিনি তখন অষ্টককে জিজ্ঞাসা করলেন—এই গোরুগুলি কার? অষ্টক সেইসময় অহঙ্কার করে বলেছিলেন যে, এই গোরুগুলি আমিই দান করেছি। আর এই অহংকারের জন্যই চার ভাইয়ের মধ্যে সবার আগে অষ্টক স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৩.১৯৮.৫; ৫.১২১-১২২ অধ্যায়; (হরি) ৩.১৬৮.৬; ৫.১১২-১১৩ অধ্যায়]

অষ্টক$_{২}$ বিষ্ণুপুরাণের কাঞ্চীপুরম্ সংস্করণের পাঠে বলা হয়েছে যে যদু-বৃষ্ণি বংশীয় বসুদেবের ভ্রাতাদের মধ্যে অষ্টক একজন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৪.৩০]

অষ্টকা$_{১}$ অগ্রহায়ণ মাস, পৌষ মাস এবং মাঘ মাসের তিনটি কৃষ্ণাষ্টমী তিথিকে পণ্ডিতেরা অষ্টকা বলে থাকেন। *[কূর্ম পু. ২.১৪.৭৭]*

অষ্টকা$_{২}$ *[দ্র. অচ্ছোদা]*

অষ্টকা$_{৩}$ এক প্রকারের শ্রাদ্ধ। সূর্যবংশীয় মহারাজ ইক্ষ্বাকু একদিন তাঁর পিতৃকুলের অষ্টকা শ্রাদ্ধ করার জন্য পুত্র বিকুক্ষিকে শ্রাদ্ধের উপযোগী পবিত্র মাংস নিয়ে আসতে বলেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে ভাগবত পুরাণের অন্বিতার্থ-প্রকাশিকা টীকায় বলা হয়েছে—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করার নিয়ম—

সপ্তম্যাদিত্রয়ঞ্চৈব তথা চৈব ত্রয়োদশী।
চতস্রস্ত্বষ্টকাঃ প্রোক্তা সর্বপক্ষাদ্‌বিশেষতঃ॥

[ভাগবত পু. ৯.৬.৬; দ্র. অন্বিতার্থ-প্রকাশিকা টীকা]

এই টীকার অভিমত অনুযায়ী অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার পর অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে অষ্টকা শ্রাদ্ধ হবার কথা। কিন্তু সাংস্কারিক ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী পূর্বোক্ত চার মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতেই শ্রাদ্ধটা হবার কথা এবং সেইজন্যই তিথির বিশেষণ হিসেবে এর নাম অষ্টকা তিথি। অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত প্রত্যেক কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এক একটি করে অষ্টকা শ্রাদ্ধে প্রথমটার আহুতি শাকসবজি, দ্বিতীয় অষ্টকায় মাংস আহুতি, তৃতীয় অষ্টকায়, যবাদিনির্মিত অপূপ (চালের বা যবের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি পিঠে জাতীয় খাদ্যবস্তু) আহুতি, চতুর্থটিতে সম্ভবত হবিষ্যান্নের আহুতি; হয়তো বা হবিষ্যান্ন সবগুলি অষ্টকাতেই দেওয়া চলতে পারে—

একৈকাষ্টকা ভবতি শাকাষ্টকা, মাংসাষ্টকা,
অপূপাষ্টকা ইতি তত্র
শাকমাংসাপূপানি হবিষ্যোদনং চ।

[জৈমিনীয়-গৃহ্যসূত্র (Caland) ২.৩; পৃ. ২৮]

☐ মৎস্য পুরাণে অবশ্য তিনটি অষ্টকা শ্রাদ্ধের পৃথক নাম আছে এবং সেগুলির আহুতি-দ্রব্যের প্রকার পালটে গেছে। বলা হয়েছে—অষ্টকা তিন প্রকার। প্রথমটি চিত্রী এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ অষ্টকা। দ্বিতীয় হল প্রাজাপত্যা অষ্টকা, আর তৃতীয় অষ্টকা বৈশ্বদেবিকী। প্রথম অষ্টকাতে আহুতিদ্রব্য অপূপ, দ্বিতীয়টিতে মাংস আর তৃতীয় অষ্টকা শাক দিয়ে করতে হয়।

অষ্টকা শ্রাদ্ধের পরের দিন অর্থাৎ পূর্বোক্ত মাসগুলির কৃষ্ণপক্ষের নবম দিনে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ ('অনু'মানে পরে, অষ্টকার পরে 'অন্বষ্টকা') করতে হয়। অষ্টকার পরে অন্বষ্টকাও অবশ্য কর্তব্য। জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র-মতে অন্বষ্টকা অষ্টকার পরের দিন করা যেতে পারে তেমনই অষ্টকা-কর্মের শেষেও করা যেতে পারে—

শ্বোভূতে শ্রাদ্ধমন্বষ্টক্যং তদহর্বা।

[মৎস্য পু. ৮১.১-৪;
জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র (Caland) ২.৩]

অষ্টজিহ্ব স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬২; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং
শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

অষ্টবসু মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতির সাতজন পত্নীর গর্ভে অষ্টবসুর জন্ম হয়। ধূম্রার পুত্র ধর। ব্রহ্মবিদ্যার পুত্র ধ্রুব, মনস্বিনীর পুত্র চন্দ্র, শ্বাসার পুত্র অনিল, রতার পুত্র অহঃ, শাণ্ডিলীর পুত্র অগ্নি এবং প্রভাতার পুত্র প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আটজন বসু।

[মহা (k) ১.৬৬.১৭-২০; (হরি) ১.৬১.১৭-২০]

অবশ্য কয়েকটি পুরাণে অষ্টবসুকে কশ্যপের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য মতে বলা হয়, দক্ষপ্রজাপতি তাঁর দশটি কন্যা ধর্মকে সম্প্রদান করেন। ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে আটটি পুত্রসন্তান হয়। এঁরা হলেন, আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। এঁরাই অষ্টবসু নামে জগতে প্রসিদ্ধ। শিবপুরাণে অবশ্য 'আপ' কে 'অয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাগবতে অষ্টবসুর নিম্নলিখিত নাম পাওয়া যায়—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বসু ও বিভাবসু। এর থেকে মনে হয় অষ্টবসুর মধ্যে কয়েকজন একাধিক নামের অধিকারী ছিলেন।

[বিষ্ণু পু. ১.১৫.১০২-১১১;
শিব পু. (ধর্ম), ৫৪.১৬-১৭, ২০;
হরিবংশ পু. ১.৩.৩১-৩২, ৩৮; মৎস্য পু. ৫.২০-২১]

☐ মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে অষ্টবসুর পুত্রদের পরিচয় বিশদে বর্ণিত হয়েছে।

☐ ধরের পুত্র দ্রবণ এবং হুতহব্যবহ। বিভিন্ন পুরাণে ধর এবং তাঁর পত্নী মনোহরার পঞ্চপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন—দ্রবিণ, হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ।

☐ ধ্রুবের পুত্র কাল। তিনি লোক-উৎপাদক এবং লোক-সংহারক।

☐ চন্দ্রের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে বর্চ্চা নামে একটি পুত্র সন্তান হয়। এই বর্চ্চার প্রভাবেই লোক তেজস্বী হয়ে থাকে।

☐ অহঃ নামক বসুর চারটি পুত্র। এঁরা হলেন—জ্যোতি (অন্যমতে বৈতণ্ড), শম (অন্যমতে শ্রম), শান্ত এবং মুনি (অন্যমতে ধ্বনি)।

☐ অনিল নামক বসুর ঔরসে তাঁর পত্নী শিবার গর্ভে দুই পুত্র—মনোজব (অন্যমতে পুরোজব) এবং অবিজ্ঞাতগতি।

☐ অগ্নি বা অনলের পুত্র কুমার। তিনি ছয়জন কৃত্তিকা দ্বারা প্রতিপালিত হন বলে তাঁর অপর নাম 'কার্তিকেয়'। কার্তিক বা কুমারের তিনজন পৃষ্ঠজ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেন শাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয়।

☐ প্রত্যূষের পুত্র মহর্ষি দেবল।

☐ সর্বকনিষ্ঠ বসু প্রভাস বৃহস্পতির ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তবে বেশিরভাগ পুরাণে বৃহস্পতির ব্রহ্মজ্ঞ তপস্বিনী ভগ্নীকে প্রভাসের পত্নী বলে উল্লেখ করা হলেও বৃহস্পতির ভগ্নীর নাম উল্লিখিত হয়নি। স্কন্দ পুরাণের একটি উপাখ্যানে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, বৃহস্পতির এই তপস্বিনী ভগ্নীর নাম ছিল ভুবনা। প্রভাসের ঔরসে ভুবনার গর্ভে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার জন্ম হয়। পুরাণ মতে, ভুবনার পুত্র বলেই বিশ্বকর্মা ভৌবন নামেও খ্যাত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও বিশ্বকর্মার ভগ্নী ভুবনার নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৬৬.২১-২৯; (হরি) ১.৬১.২১-২৯;
বিষ্ণু পু. ১.১৫.১১২-১১৯; শিব পু. ধর্ম. ৫৪. ২১-২৮;
হরিবংশ পু. ১.৩.২৯-৪৭;
স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ১১০.৬;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.২৮]

☐ মহাতেজস্বী এই বসুদেবতাগণ বশিষ্ঠ ঋষির অভিশাপে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পূর্বকালে বরুণদেব এক পুত্র লাভ করেন তাঁর নাম ছিল বশিষ্ঠ। তিনি 'আপব' নামেও জগতে বিখ্যাত ছিলেন। সুমেরু পর্বতের পাশে তাঁর পবিত্র আশ্রম। সেখানে নানা পশুপক্ষী বিচরণ করত, সকল ঋতুতেই ফুল ফুটত এবং সুস্বাদু ফলমূল ও জল পাওয়া যেত।

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সুরভির গর্ভে এবং প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে নন্দিনী নামে এক গোরূপা কন্যার জন্ম হয়। গো-সমূহের শ্রেষ্ঠ নন্দিনী অপূর্ব সুন্দর ও সকল অভীষ্ট দানে সমর্থ ছিলেন। ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ এই নন্দিনীকে হোমধেনু রূপে লাভ করেন।

একবার অষ্টবসু নিজ নিজ পত্নীর সঙ্গে এই তপোবনে এলেন এবং পরমানন্দে বিহার করতে লাগলেন। এই সময় 'দ্যু' নামক বসুর পত্নী নন্দিনীকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং স্বামীর কাছে বৎস সহ নন্দিনী গাভীকে হরণ করার জন্য বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন। পত্নীর অনুরোধে দ্যু-নামক বসু তাঁর ভাইদের সঙ্গে মিলে নন্দিনীকে অপহরণ করলেন। কিছু সময় পরে মহর্ষি বশিষ্ঠ নন্দিনীকে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু তপোবনের কোথাও তাকে দেখতে পেলেন না। তিনি তপোবলে জানতে পারলেন যে, বসুগণ নন্দিনীকে হরণ করেছেন। এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠ বসুগণকে এই মর্মে শাপ দিলেন যে তাঁর দুগ্ধবতী হোমধেনু হরণের অপরাধে বসুগণ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করবেন। অভিশপ্ত বসুগণ ভীত হয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের কৃপা ভিক্ষা করতে গেলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁর শাপ ফিরিয়ে নিলেন না। শুধু বললেন যে ধর প্রভৃতি বসুগণ মনুষ্যলোকে জন্ম নিলেও এক বৎসরের মধ্যে মুক্তিলাভ করবেন কিন্তু যাঁর কারণে বসুগণ অভিশপ্ত হয়েছেন সেই 'দ্যু'-নামের বসু তাঁর কৃতকর্মের ফলস্বরূপ দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে থাকবেন। তবে তাঁর মত মহাত্মা মনুষ্যলোকে আর কেউ হবেন না। ইনি ধার্মিক, সর্বশাস্ত্রে নিপুণ হবেন, পিতার প্রিয় ও হিতসাধনে নিরত থাকবেন এবং স্ত্রী সম্ভোগ ত্যাগ করবেন।

তখন অভিশপ্ত বসুগণ দেবী গঙ্গার কাছে গিয়ে এই বর প্রার্থনা করলেন যে, স্বয়ং দেবী গঙ্গা যেন মনুষ্যলোকে বসুগণের জন্মদান করেন এবং জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুক্তিদান করেন। গঙ্গা বসুগণকে সেই বর দিলেন।

মহাভারতে অন্যত্র এই কাহিনীটি কিন্তু ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, বসুগণ অন্যমনস্ক ভাবে সন্ধ্যাবন্দনারত বশিষ্ঠ মুনিকে প্রণাম না করেই তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠ তাঁদের মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। বসুগণ গঙ্গার কাছে মনুষ্যলোকে তাঁদের মাতারূপে জন্মদান করার জন্য প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে, প্রতীপ-পুত্র মহারাজ শান্তনু মর্ত্যলোকে তাঁদের পিতা হবেন। গঙ্গা তাঁদের প্রার্থনা পূরণে সম্মত হলেন, তখন বসুগণ তাঁদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যলোক থেকে মুক্তিলাভের প্রার্থনা করলেন। গঙ্গা শান্তনু রাজার পুত্রকামনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করতে সম্মত হলেন না। তখন বসুগণ বললেন যে, তাঁরা প্রত্যেকে নিজ তেজের এক এক অষ্টমভাগ দান করবেন। ফলে শান্তনু এক পূর্ণ তেজস্বী পুত্র লাভ করবেন। কিন্তু সেই পুত্র মর্ত্যলোকে কোনো সন্তানের জন্মদান করবেন না, তবে তিনি অত্যন্ত বলবান হবেন। গঙ্গা এতে সম্মত হলেন। *[মহা (k) ১.৯৮.১৯; ১.৯৯.১-৪৫; ১.৯৬. ১১-১২; মহা. (হরি) ১.৯২.৫০; ১.৯৩. ১-৪৫; ১.৯১. ১১-১২; দেবী ভাগবত ২.৩.২৪-৪৪]*

☐ হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতীপ গঙ্গাতীরে জগতের হিতকামনায় বহুবৎসর যাবৎ তপস্যা করছিলেন। একদিন গঙ্গা অতি মনোহর স্ত্রীরূপ ধারণ করে জল থেকে উঠে তপস্যারত রাজর্ষির দক্ষিণ উরুদেশে গিয়ে বসলেন। তখন রাজা তাঁকে বললেন, 'কল্যাণী! তোমার অভীষ্ট কোন প্রিয় কার্য করব? তুমি উপস্থিত হয়েই আমার দক্ষিণ উরু আশ্রয় করেছে, কিন্তু এই স্থান সন্তান এবং পুত্রবধূদের জন্য নির্দিষ্ট। অতএব তুমি আমার পুত্রবধূ হও। গঙ্গা তাতে সম্মত হলেন। বৃদ্ধ রাজা প্রতীপের পুত্র শান্তনু যৌবনে পদার্পণ করলে প্রতীপ তাঁকে সিংহাসনে স্থাপন করলেন এবং তাঁকে সেই দিব্যাঙ্গনা রমণীর বৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকেই বিবাহ করার আদেশ দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। এরপর

একদিন গঙ্গাতীরে মৃগয়া করতে গিয়ে শান্তনু অপরূপ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত গঙ্গাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং মনুষ্যরূপধারী গঙ্গাকে পত্নীরূপে লাভ করতে চাইলেন। গঙ্গা স্বীকৃত হলেন কিন্তু এই শর্ত রাখলেন যে, তাঁর ভালোমন্দ কোনো কাজেই শান্তনু বাধা দিতে পারবেন না এবং কোনো কটু কথাও তাঁকে বলতে পারবেন না। শান্তনু তাতেই সম্মত হলেন। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে একে একে অষ্টবসু মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মের পরেই গঙ্গা তাঁর সদ্যোজাত পুত্রকে গঙ্গার স্রোতে ডুবিয়ে মনুষ্যলোক থেকে মুক্তি দিতেন। পুত্রশোকে অধীর হলেও রাজা শান্তনু শর্তভঙ্গের ভয়ে কিছু বলতে পারতেন না। এইভাবে ক্রমে সাতজন বসু মুক্তিলাভ করলেন। শেষে অষ্টম পুত্রটিকেও গঙ্গা যখন জলে নিক্ষেপ করবেন তখন শান্তনু অধীর হয়ে তাঁকে বারণ করলেন। গঙ্গা সেই পুত্রটিকে জলের স্রোতে বিসর্জন দিলেন না। এই অবিসর্জিত বসুই সেই 'দ্যু'-নামক বসু এবং তিনিই পরমধার্মিক মহাবল গঙ্গাপুত্র দেবব্রত-ভীষ্ম।

[মহা (k) ১.৯৭. অধ্যায়, ৯৮.১-১৭. ৯৯.৪৭
মহা. (হরি) ১.৯২.১-৪৮; ১.৯৩.৪৭
দেবীভাগবত পু. ২.৩.৪৬-৬০; ৪.১-৪৫]

অষ্টবান স্কন্দের অংশজাত একজন দেবতা। ইনি স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচরও ছিলেন।

[বায়ু পু. ১০১.২৮০]

অষ্টমঙ্গল আট রকমের মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে অগ্নি পুরাণে। মৃগরাজ সিংহ, বৃষ (ষাঁড়), নাগ (হাতি), হাতপাখা, কলশ, নয় প্রকারের ফুলে গাঁথা বৈজয়ন্তী মালা, ভেরী এবং দীপ—

মৃগরাজং বৃষং নাগং ব্যজনং কলশং তথা।
বৈজয়ন্তীং তথা ভেরীং দীপমিত্যষ্টমঙ্গলম্॥

তবে এই সিংহ-ষাঁড়ের মাঙ্গল-বিধান অশ্বসূক্ত পাঠের পর প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। তাতে এই বিধান সাধারণ্যের জন্য নির্দিষ্ট নয় বলেই মনে হয়। এখানে গরুড় পুরাণে কথিত অষ্টমঙ্গল অনেক বেশি মানুষকেন্দ্রিক। এখানে তৎকালীন সমাজের দৃষ্টি থেকে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ, গোরু, আগুন, সোনা, ঘৃত, আদিত্য-সূর্য, জল এবং রাজা—এই আটটিকে অষ্টমঙ্গল বলে—

লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ॥

এগুলির যে কোনো একটিকে দেখাও মঙ্গল, প্রদক্ষিণেও মঙ্গল। *[অগ্নি পু. (নবভারত) ৫৮.৩১;*
গরুড় পুরাণ (নবভারত) ১.২১৭.৭৫-৭৬]

□ মহাভারতের দ্রোণপর্বে ভীম একটি যুদ্ধযাত্রার সময় অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে অষ্ট প্রকার মঙ্গল-দ্রব্যের স্পর্শ লাভ করছেন, এইরকম বলা আছে—

আলভ্য মঙ্গলান্যষ্টৌ পীত্বা কৈরাতকং মধু।

ঠিক এইখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ অষ্টমঙ্গল দ্রব্যের একটি তালিকা দিয়ে বলেছেন, সেই শ্লোকটি নাকি মহাভারতীয় শ্লোকের একটি পাঠান্তর। এখানে অষ্ট প্রকার মঙ্গল বলা হচ্ছে, সেগুলি হল—আগুন, গোরু, সোনা, দূর্বা, গোরোচনা, অমৃত (অমৃত বলতে ঘি বোঝায়—আয়ুর্বৈ ঘৃতম্—আয়ু মানেই ঘি), খই এবং দই—

অনলো গোহিরণ্যঞ্চ দূর্বাগোরোচনামৃতম্।
অক্ষতং দধি চেত্যষ্টৌ মঙ্গলানি প্রচক্ষতে॥

[মহা (k) ৭.১২৭.১৪; নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য। সিদ্ধান্তবাগীশে পূর্বোক্ত 'আলভ্য' ইত্যাদি শ্লোকটি পাদটীকায় দেওয়া আছে। কিন্তু নীলকণ্ঠের টীকায় অষ্টমঙ্গলের তালিকা-শ্লোকটি আছে
পৃ. ১০২৯-১০৩১]

অষ্টসিদ্ধি বিবিধ পুরাণে দেখা যাবে যে, সাধনের ফলে আট প্রকারের সিদ্ধি লাভ করা যায়—

রসোল্লাসাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি যাঃ।

তবে সব পুরাণেই অষ্টসিদ্ধির নাম একরকম নয়। বিষ্ণু পুরাণে 'রসোল্লাস' ইত্যাদি আট প্রকারের সিদ্ধির কথা বলা হলেও পরবর্তী কালে সেগুলি খুব পরিচিত নামে প্রকাশ করা হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত 'রসোল্লাস' ইত্যাদি আট প্রকারের সিদ্ধির সব নামগুলি মূল শ্লোকে দেওয়া নেই বলে 'বিষ্ণুচিত্তী' নামে বিষ্ণু পুরাণের একটি প্রাচীন টীকায় সেই আট প্রকারের সিদ্ধির নাম করা হয়েছে এইভাবে—

কৃতে তু মিথুনোৎপত্তিঃ সিদ্ধিশ্চাপি রসোল্লসা।
সকৃদদৃষ্টিময়ী চান্যা গৃহবৃক্ষাত্মিকাপরা॥
পশ্চাৎ-সংকল্পসিদ্ধিশ্চ কল্পবৃক্ষাত্মিকাপরা।
প্রকাম-বৃষ্টিশ্চাকৃষ্টপচ্যসিদ্ধিস্তথাষ্টমী॥

১. মিথুনোৎপত্তি—সত্যযুগে স্ত্রীলোকের সঙ্গম ছাড়াই সন্তানের জন্ম দেওয়া। এটা এক রকমের যুগ-সিদ্ধি, অর্থাৎ সত্য-যুগের কারণেই এটা সহজ-ভাবে ঘটত।

২. রসোল্লাস—শরীরের মধ্যে স্বাভাবিক রসের উৎপত্তি হওয়ার ফলে ক্ষুধার বোধ না হওয়া।

৩. সকৃদ্দৃষ্টিময়ী—দৃষ্টিপাতমাত্রেই শস্যের উৎপত্তি ঘটানো।

৪. গৃহবৃক্ষাত্মিকা—ইচ্ছামাত্রেই গৃহসৃষ্টি করা, বৃক্ষ সৃষ্টি করা।

৫. সংকল্পসিদ্ধি—সংকল্প করা মাত্রেই অভীষ্ট বস্তু লাভ।

৬. কল্পবৃক্ষাত্মিকা—কল্পতরুর মতো সব কিছু দিতে পারার ভাব, যেমনটা ভরদ্বাজ মুনি রামায়ণে করেছেন। আরণ্যক ঋষি হওয়া সত্ত্বেও ভরতের সেনাবাহিনীকে তিনি যথেচ্ছ খাইয়েছিলেন।

৭. প্রকামবৃষ্টি—কামনামাত্রেই বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব ঘটানো।

৮. অকৃষ্টপচ্যসিদ্ধি—জমিতে হাল-লাঙল না দিয়ে অকৃত্রিমা ভূমিতে শস্যোৎপাদন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ১.৬.১৬;
দ্র. বিষ্ণুচিত্তী টীকা]

তবে পুরাণগুলিতে অষ্টসিদ্ধির সম্বন্ধে অন্য প্রকারের শব্দ যতই ব্যবহৃত হোক, খুব প্রাচীনকাল থেকেই অষ্টসিদ্ধির পরিচিত তালিকাটি হল—১. অণিমা, ২. লঘিমা, ৩. মহিমা, ৪. প্রাপ্তি, ৫. প্রাকাম্য, ৬. বশিত্ব, ৭. ঈশিত্ব, ৮. কামাবসায়িতা। পাতঞ্জল যোগসূত্রের মতো প্রাচীন গ্রন্থে একটি সূত্র হল—

'ততো'ণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ
তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ'।

এখানে ব্যাসভাষ্য এবং বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্ববৈশারদী টীকায় অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অন্যদিকে প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে এই নামগুলি এই শ্লোকে ধরা হয়েছে—

অণিমা মহিমা চ তথা গরিমা
লঘিমেশিতা বশিত্বঞ্চ।
প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং চেত্যষ্টৈশ্বর্যানি যোগযুক্তস্য।
অষ্টৈশ্বর্যসমেতো জীবন্মুক্তঃ প্রবেক্ষ্যতে যোগী॥

[প্রপঞ্চসার-তন্ত্র ১৯.৬২-৬৩, পৃ. ২৩৩]

১. অণিমা—শরীর যদি আয়তন এবং প্রমাণে বৃহৎও হয়, তবু সংযমের বলে অণু-পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র হবার ক্ষমতা।

২. লঘিমা—গুরুভার হওয়া সত্ত্বেও তুলোর মতো লঘু বা হালকা হয়ে যাবার ক্ষমতা।

৩. মহিমা—ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও পাহাড়ের মতো বৃহদাকার বস্তু ধারণ করার ক্ষমতা। কেউ কেউ এটাকেই গরিমা-সিদ্ধি বলেন।

৪. প্রাপ্তি—ইচ্ছামাত্রেই দূরের বস্তুকে কাছে নিয়ে আসার ক্ষমতা।

৫. প্রাকাম্য—ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত। অর্থাৎ কোনো ব্যাঘাত ছাড়াই ইচ্ছাশক্তি সফল করার ক্ষমতা।

৬. বশিত্ব—যে শক্তিতে ভূত-ভৌতিক পদার্থকে বশীভূত আজ্ঞাবহ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৭. ঈশিত্ব—ভৌতিক অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক পদার্থের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা। অর্থাৎ একজন যোগী সমস্ত ভৌতিক পদার্থকে যেমন খুশী 'করতে' পারেন, যেমন ইচ্ছে তেমন 'রাখতেও' পারেন।

৮. কামাবসায়িতা—সত্যসংকল্পতার প্রভাবে যোগী বিষকে অমৃতে পরিণত করে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারেন, আবার অমৃতকে বিষে পরিণত করে জীবিত ব্যক্তিকে মেরেও ফেলতে পারেন। *[দ্র. সিদ্ধি]*

[পাতঞ্জল-দর্শন, বিভূতিপাদ, সূত্র ৪৫]

অষ্টাবক্র$_{১}$ কহোড় মুনির পুত্র। মহর্ষি উদ্দালকের কহোড় নামে এক শিষ্য ছিলেন। উদ্দালক কহোড়ের সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং শিক্ষান্তে নিজের কন্যা সুজাতার সঙ্গে তাঁর বিবাহও দিয়েছিলেন।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, অষ্টাবক্র মাতৃগর্ভে থেকেই পিতার মুখ থেকে শুনে শুনে সাঙ্গ বেদ অধ্যায়ন করেন। একদিন রাত্রে কহোড় যখন বেদ পাঠ করছেন, সেই সময় গর্ভস্থ শিশু পিতাকে বলল—আমি আপনার অনুগ্রহেই মাতৃগর্ভে থেকেও সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করেছি। তা থেকে বোধ হচ্ছে—আপনার এই বেদ পাঠ যেন সমীচীন হচ্ছে না। গর্ভস্থ পুত্রের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে কহোড় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাপ দিলেন—তুমি যখন উদরে থেকেই আমার নিন্দা করছ, তখন তোমার শরীরের আটটি স্থান বক্র হবে। পিতার অভিশাপে শিশু বক্র দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করল এবং দৈহিক বক্রতার কারণে অষ্টাবক্র নামেই বিখ্যাত হল—

স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়দ্/
অষ্টাবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহর্ষিঃ।

এদিকে অষ্টাবক্রের জন্মের কিছুকাল আগে একদিন সুজাতা স্বামীকে কিছু ধনসম্পদ উপার্জনের জন্য অনুরোধ করলেন, যাতে নবজাতকের ভরণ পোষণের সুবিধা হয়। পত্নীর অনুরোধে কহোড় ধন উপার্জনের আশায় জনক রাজার সভায় গেলেন। সেখানে বন্দী নামে এক পণ্ডিত ছিলেন, যিনি তর্কশাস্ত্রীয় বাদবিতণ্ডায় পারদর্শী ছিলেন। বন্দী কহোড়কে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। শর্ত ছিল, যিনি পরাজিত হবেন, তাঁকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। কহোড় বন্দীর কাছে তর্কে পরাজিত হলেন, এবং তাঁকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

অষ্টাবক্রের মাতামহ উদ্দালক সুজাতাকে বললেন—এই দুর্ঘটনার কথা কহোড়ের নবজাত পুত্রকে জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। সুজাতা পিতার কথামতো অষ্টাবক্রকে তার পিতার কথা জানতে দিলেন না। অষ্টাবক্র মাতামহ উদ্দালক-এর ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠতে লাগলেন। মাতামহকেই তিনি পিতা বলে মনে করতেন, সমবয়সী মাতুল শ্বেতকেতুকে নিজের ভাই বলে মনে করতেন। অষ্টাবক্র এবং শ্বেতকেতু সেযুগের শ্রেষ্ঠ দুই বেদবিৎ ঋষি ছিলেন।

একদিন বারো বৎসর বয়সী অষ্টাবক্র মাতামহ উদ্দালকের কোলে বসে আছেন, এমন সময় শ্বেতকেতু এসে তাঁকে হাত ধরে টেনে তুলে দিলেন এবং বললেন—এ তোমার পিতার ক্রোড় নয়। একথা শুনে বালক অষ্টাবক্র কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার পিতা কোথায় আছেন? তখন সুজাতা পুত্রকে জনক রাজার যজ্ঞের কথা, বন্দী নামক তর্কবিশারদের কথা পুত্রকে বিস্তারিত ভাবে জানালেন। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেকথা শুনে মাতুল শ্বেতকেতুকে সঙ্গে নিয়ে জনক রাজার যজ্ঞে উপস্থিত হলেন।

রাজা জনকের দ্বারপালেরা বালক-প্রায় ব্রাহ্মণদের পথ রোধ করল। অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বারপালদের জানালেন—ব্রাহ্মণ, রাজা, স্ত্রীলোক, অন্ধ মানুষ—এঁদের সবার আগে পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত। এঁদের মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণকে সবসময় আগে পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে উপদেশ দিলেন অষ্টাবক্র। বারো বছরের বালকের পাণ্ডিত্য এবং যুক্তিসঙ্গত কথা রাজা জনকের কানে গেল, তাতে জনকও মুগ্ধ হলেন। কিন্তু দ্বারপালেরা এবং রাজা জনক নিজেও বন্দীর পাণ্ডিত্যে বশীভূত ছিলেন, তাই বালক ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের সভায় প্রবেশের অনুমতি দিতে চাইলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর ক্রুদ্ধ হয়ে অষ্টাবক্র বললেন—আমি শুনেছি তর্কে পরাজিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের বন্দী জলে ডুবিয়ে দেয়। তাই আমি তাঁকে তর্কে পরাজিত করার জন্যই এসেছি। কিন্তু এক বালক ব্রাহ্মণকে বন্দীর মতো তর্ক বিশারদের সামনে ছেড়ে দিতে রাজর্ষি জনকের মন চাইছিল না। পরাজিত বালকের পরিণতির কথা ভেবে তিনি সর্বান্তঃকরণে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু অষ্টাবক্র তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তখন বাধ্য হয়ে জনক নিজেই অষ্টাবক্রকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতে লাগলেন, যাতে ভয় পেয়ে বালক অষ্টাবক্র তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন। কিন্তু জনক রাজার সমস্ত প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিলেন অষ্টাবক্র। তখন অষ্টাবক্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে রাজর্ষি জনক তাঁকে তর্কসভায় প্রবেশের অনুমতি দিলেন। বন্দীর সঙ্গে অষ্টাবক্রের বাদবিতণ্ডা আরম্ভ হল। শেষপর্যন্ত বন্দী অষ্টাবক্রের কাছে পরাজিত হলেন। তখন অষ্টাবক্র বললেন—বন্দী পরাজিত ব্রাহ্মণদের জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছে, অতএব একেও জলে ডুবিয়ে দেওয়া হোক। একথা শুনে বন্দী বললেন—আমাকে জলে ডুবিয়ে মারা সম্ভব নয়। আমি বরুণের পুত্র। আর যাঁদের আমি জলে ডুবিয়েছিলাম তাঁদেরও মৃত্যু হয়নি। যে সময় জনক রাজার যজ্ঞ আরম্ভ হয়, ঠিক সেই সময় আমার পিতা বরুণদেবও এক দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণরা সকলেই সেই যজ্ঞ দেখতে গিয়েছেন এবং যথাসময়ে ফিরে আসবেন। যথাসময়ে কহোড় এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণরা বরুণের যজ্ঞ থেকে ফিরে এলেন। জনক রাজাও অষ্টাবক্রকে সম্মানিত করলেন।

কহোড় পুত্রের গুণে ও পাণ্ডিত্যে একান্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। একদিন তিনি অষ্টাবক্রকে আশ্রমের নিকটে প্রবাহিত নদীর জলে প্রবেশ করতে আদেশ করলেন। জলে ডুব দেওয়া মাত্র অষ্টাবক্রের বক্র দেহ সমান ও স্বাভাবিক হল। এই

ঘটনার কারণে নদীটি সমঙ্গা নামে খ্যাত। অষ্টাবক্রের শরীরে বক্রতা ঘুচে যাবার এই কাহিনী সমঙ্গা নদীর মাহাত্ম্য-মাত্র সূচনা করে। বাস্তবে অষ্টাবক্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বক্রই থেকে গিয়েছিলেন বলে মনে হয়। *[মহা (k) ৩.১৩২-১৩৪ অধ্যায়; (হরি) ৩.১০৮-১১০ অধ্যায়; রামায়ণ ৬.১১৯.১৬]*

□ যুবা বয়সে অষ্টাবক্র মহর্ষি ঋষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভার রূপে মুগ্ধ হলেন এবং ঋষি বদান্যের কাছে গিয়ে সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করলেন। বদান্য অষ্টাবক্রকে বললেন, আমি তোমার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেব, কিন্তু তার আগে তুমি উত্তরদিকে যাও। সেখানে হিমালয় পর্বত কুবেরের অলকাপুরী অতিক্রম করে প্রভু মহাদেবের বাসভূমি। আরও উত্তরে এক নীলবর্ণ বন, সেখানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী বাস করেন। তাঁর দর্শন ও পূজা করে ফিরে এসে তবেই তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে।

ঋষির কথা শুনে অষ্টাবক্র উত্তরদিকে যাত্রা করলেন। ক্রমে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিনি কুবের শাসিত অলকাপুরীতে পৌঁছালেন। কুবের মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। অষ্টাবক্রের সম্মানে কুবেরের সভায় বিশিষ্ট অপ্সরারা নৃত্য গীত করতে লাগলেন। অষ্টাবক্র সেইখানেই এক বছরের বেশি সময় কাটিয়ে দিলেন। এরপর আবার বদান্যের আদেশ পালন করার জন্য উত্তরে চলতে লাগলেন। হিমালয়, কৈলাস, মন্দর পর্বত অতিক্রম করে একস্থানে মন্দর পুষ্প পরিপূর্ণ মন্দাকিনী নদী এবং সেই নদীর তীরে অপূর্ব ঐশ্বর্য্যময় এক প্রাসাদ দেখতে পেলেন। প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হয়ে অষ্টাবক্র বাড়ির ভিতরের লোকজনদের উদ্দেশে বললেন—আমি অতিথি হয়ে এসেছি। একথা শুনে সাতটি পরমাসুন্দরী কন্যা সেই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের রূপ দেখে অষ্টাবক্র একান্ত মুগ্ধ হলেন কিন্তু ক্রমে তাঁর মন সংযত হল। তিনি সেই সুন্দরীদের সঙ্গে অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে এক সুসজ্জিত কক্ষে নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত এক জরাজীর্ণা বৃদ্ধা এক বহুমূল্য পালঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই বৃদ্ধা কখনো বৃদ্ধার মূর্তিতে কখনো বা অল্পবয়স্কা কন্যার রূপ ধারণ করে সর্বক্ষণ অষ্টাবক্রের সঙ্গে রইলেন। তাঁর সেবা করতে লাগলেন। তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু অষ্টাবক্রের মন পরনারী সম্ভোগ থেকে অনাসক্ত হয়ে রইল। এই বৃদ্ধা প্রকৃতপক্ষে মূর্তিমতী উত্তর দিক। অষ্টাবক্রের এই ইন্দ্রিয় সংযম দেখে তিনি একান্ত মুগ্ধ হলেন। অষ্টাবক্রকে সুখী দাম্পত্য জীবন ও পুত্রলাভের বর দিলেন তিনি। বৃদ্ধাকে প্রণাম করে অষ্টাবক্র বদান্যের কাছে ফিরে এলেন। অষ্টাবক্রের মতো সচ্চরিত্র উপযুক্ত পাত্র পেয়ে মহর্ষি বদান্যও খুব খুশি হলেন এবং কন্যা সুপ্রভার সঙ্গে শুভদিনে অষ্টাবক্রের বিবাহ দিলেন। *[মহা (k) ১৩.১৯-২১ অধ্যায়; (হরি) ১৩.১৮-১৯ অধ্যায়]*

□ একসময় বৃদ্ধ ঋষি অষ্টাবক্র নদীর জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে তপস্যা করছিলেন। সেই সময় দেবলোকের কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে রম্ভা প্রভৃতি বিশিষ্ট অপ্সরারা স্বর্গলোকে যাচ্ছিলেন। পথে জলে মগ্ন জটাধারী মুনিকে দেখে তাঁরা তাঁর পূজা ও স্তব করলেন। অষ্টাবক্র তাঁদের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। তখন সেই শত সহস্র অপ্সরার দলের প্রত্যেকেই ভগবান শ্রীহরিকে পতিরূপে লাভ করতে চাইলেন। অষ্টাবক্র তাঁদের সেই বর দিয়ে জল থেকে উঠে চলে যেতে উদ্যত হলেন। মহর্ষির বৃদ্ধ এবং অষ্টভাগে বক্র মূর্তি দেখে অপ্সরারা চেষ্টা করেও হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না। তা দেখে অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন—তোমরা যখন আমার বিরূপ শরীর দেখে আমাকে অবমাননা করেছ, তখন ভগবান পুরুষোত্তমকে স্বামীরূপে লাভ করেও তোমরা দস্যুর হাতে ধৃত এবং অপহৃত হবে। অপ্সরারা তখন শাপমুক্তির জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানালে অষ্টাবক্র বললেন—এর পরে তোমরা আবার স্বর্গে ফিরে যাবে। এইভাবেই অষ্টাবক্রের বরে দ্বাপর যুগে ষোল হাজার অপ্সরা মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁরা কৃষ্ণের পত্নী হয়েছিলেন। কিন্তু যদুবংশ ধ্বংসের পর তাঁরা দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হন।

[বিষ্ণু পু. ৫.৩৮.৭০-৮৪]

অষ্টাবক্র$_২$ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লিখিত একটি তীর্থের নাম। এই তীর্থ দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.২৫.৪১; (হরি) ১৩.২৬.৪১]

□ বর্তমান হরিদ্বারের চার মাইল দূরে অবস্থিত রাহুগ্রাম বা রাইলা (Raila)। এই অঞ্চলটির পাশ দিয়ে একটি ছোটো নদী প্রবাহিত, যার নাম অষ্টাবক্র নদী। তবে পণ্ডিতরা অনেকে মনে করেন ঋষি অষ্টাবক্রের আশ্রম বা অষ্টাবক্রতীর্থটি শ্রীনগরের কাছে পাউরি (Pauri) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। পাউরির কাছেই গাড়োয়াল হিমালয়ের অন্তর্গত একটি অংশকে অষ্টাবক্র পর্বত বলেও ডাকা হয়।

[EAIG (Kapoor) p. 79]

অষ্টযোগিনী বেদে আমরা রুদ্রগণ, মরুদ্‌গণ কিংবা বৈশ্বদেবগণের কথা পেয়েছি। পৌরাণিক কালে রুদ্রগণ বা শিবগণই গণশক্তি হিসেবে খ্যাত। এই দৃষ্টিতে দেবী দুর্গার সহকারী সহায়িনীদের কখনো মাতৃকাগণ, কখনো দেবীশক্তি আবার কখনো বা যোগিনীও বলা হয়েছে। যোগিনী বলতে বোঝায় মহাদেবী বা মহাশক্তির কার্যসাধন বা উদ্দেশ্যসাধনে তাঁর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন। যোগিনীরা অনেকটাই দেবীর গণ এবং দেবীশক্তির সঙ্গে একাত্মক এবং তাঁরা দেবীর সখীর মতো—

চণ্ডিকায়াস্তু যোগিন্যঃ সখ্যোঽত্র চ প্রকীর্তিতা।

এই যোগিনীরা সংখ্যায় কখনো আট, কখনো বারো, কখনো চৌষট্টি, কখনো কোটি—

উগ্রচণ্ডাদিকাঃ পূজ্যাস্তথাষ্টৌ যোগিনীঃ শুভাঃ।
যোগিন্যশ্চ চতুঃষষ্টিস্তথা বৈ কোটিযোগিনীঃ।

[কালিকা পু. ৬১.১১১; ৬০.৫২-৫৩]

মহাদেবীর বিভিন্ন রূপের অনুষঙ্গে বিভিন্ন যোগিনীর নাম পাওয়া যায় এবং এমনও হতে পারে যে, যিনি এক বিশিষ্টা দেবীর যোগিনী, অন্যত্র অন্য রূপে তিনিই প্রধানা দেবী এবং পূর্বোক্তা প্রধানা দেবী তাঁর যোগিনী বলে গণ্য হচ্ছেন। অষ্টযোগিনী কথাটা বিখ্যাত বলেই কয়েকটি বিশিষ্ট দেবীমূর্তির অষ্টযোগিনীর নাম দেবী দুর্গার অষ্ট শক্তি বা অষ্টযোগিনীর নাম—

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা—

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডাবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥

[কালিকা পু. ৬৩.১২০]

রুদ্রাণী উমার ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করার পর উমার বিভূতি-স্বরূপা অষ্টযোগিনী বা অষ্টনায়িকার নাম বলা হয়েছে। তাঁরা হলেন—জয়া, বিজয়া, মাতঙ্গী, ললিতা, নারায়ণী, সাবিত্রী, স্বধা এবং স্বাহা।

যোগিন্যো নায়িকাশ্চাপি পৃথক্‌ত্বেন ব্যবস্থিতাঃ॥
জয়া চ বিজয়া চৈব মাতঙ্গী ললিতা তথা।
নারায়ণ্যথ সাবিত্রী স্বধা স্বাহা তথাষ্টমী॥

[কালিকা পু. ৬১. ৪৬-৪৭]

কালীর অষ্টযোগিনীর নাম—

ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হর্ত্রী, বিধায়িনী, করালা এবং শূলিনী—

ত্রিপুরা ভীষণা চণ্ডী কর্ত্রী হর্ত্রী বিধায়িনী॥
করালা শূলিনী চেতি অষ্টৌ তাঃ পরিকীর্তিতাঃ।

[কালিকা পু. ৬১. ৯২-৯৩]

উগ্রচণ্ডার অষ্টযোগিনীর নাম—কৌশিকী, শিবদূতী, উমা-হৈমবতী, ঈশ্বরী, শাকম্ভরী, দুর্গা এবং সপ্তমী মহোদরীর সঙ্গে অষ্টম নামটি হল উগ্রচণ্ডা। কেননা উগ্রচণ্ডার তন্ত্র-মন্ত্র অনুসারেই তাঁর যোগিনীদের পূজা হবে। সেই কারণে সপ্তমী মহোদরীর সঙ্গে উগ্রচণ্ডা যুক্ত হবেন—

কৌশিকী শিবদূতী চ উমা হৈমবতীশ্বরী।
শাকম্ভরী চ দুর্গা চ সপ্তমী চ মহোদরী॥

[কালিকা পু. ৬১. ৪০-৪১]

ভদ্রকালীর অষ্টযোগিনীর নাম—জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা এবং ধাত্রী—

জয়ন্তীং মঙ্গলাং কালীং ভদ্রকালীং কপালিনীম্।
দুর্গাং শিবাং ক্ষমাং ধাত্রীং দলেষ্বষ্টসু পূজয়েৎ॥

উগ্রতারার অষ্টযোগিনীর নাম—মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী।

কামেশ্বরীর অষ্টযোগিনীদের নাম—গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, পাদচণ্ডিকা, দীর্ঘেশ্বরী, প্রকটা ও ভুবনেশী।

শিবদূতীর দ্বাদশ যোগিনীর নাম— ক্ষেমঙ্করী, শান্তা, বেদমাতা, মহোদরী, করালা, কামদা, ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগোদরী, ভগারোহা, ভগজিহ্বা ও ভগা।

কামেশ্বরী বা কামাখ্যার যোগিনীর সংখ্যা চৌষট্টি। তাঁদের নাম—ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শাঙ্করী, জয়ন্তী, সর্বমঙ্গলা, কালী,

কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, মহাকালী, ভদ্রকালী, উমা, তারা, বিজয়া, জয়া ইত্যাদি। এর সঙ্গে যুক্ত হবে উমা, কালী এবং উগ্রচণ্ডার আট-আটটি যোগিনীদের নাম। তাতে সংখ্যা দাঁড়াবে চৌষট্টি।

[কালিকা পু. ৬১. ৩৮-৩৯; ৬১. ৬৬-৬৮; ৬৪. ৭৬-৭৮; ৬১. ১০৭-১০৯; ৬৩. ৩৫-৪২]

অসংখ্যেয় বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪০; (হরি) ১৩.১২৭.৪০]

অসকৃৎ মৎস্য পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর বংশ-প্রবরভুক্ত যেসব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে ঋষি অসকৃৎ-এর বংশ তার মধ্যে অন্যতম। পুরাণে ইনি ভৃগুবংশীয় অন্যতম গোত্র প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। *[মৎস্য পু. ১৯৫.২৮]*

অসঙ্গ বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের বংশধারায় সাত্যকি অর্থাৎ যুযুধানের পুত্র অসঙ্গ।

[মৎস্য পু. ৪৫.২৩; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১]

অসৎ$_1$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৪; (হরি) ১৩.১২৭.৬৪]

অসৎ$_2$ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার দুটি পৃথক শ্লোকে ভগবান শিবকে একই সঙ্গে সৎ এবং অসৎ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

[দ্র. সৎ]

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৮, ১৪৩; (হরি) ১৩.১৬.১০৮, ১৪২]

অসম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, অজিত তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। অজিত গণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অসম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৯৩]*

অসমঞ্জ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, সগর রাজা তাঁর দুই পত্নীকে নিয়ে পুত্র-প্রাপ্তির আশায় মহাদেবের আরাধনা করেন। সগর রাজার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে বর দিলেন—তুমি যে মুহূর্তে বর প্রার্থনা করেছ, সেই মুহূর্তের গুণে তোমার এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র হবে। তারা পরে সকলে একসঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। অপর পত্নীর গর্ভে একটি মাত্র বীর বংশরক্ষক পুত্র হবে। মহাদেবের বরে সগররাজার পত্নী শৈব্যা একটি বংশরক্ষক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের নাম অসমঞ্জ।

[মহা (k) ৩.১০৬ অধ্যায়; (হরি) ৩.৯০.১-২১]

□ পুরাণ-মতে অসমঞ্জ সগর রাজার পত্নী কেশিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সগর রাজার দুই পত্নীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মহর্ষি ঔর্ব তাঁদের পুত্র লাভের বর দেন। ঔর্বের বরে কেশিনী অসমঞ্জকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

[মৎস্য পু. ১২.৪২-৪৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৬০, ১৬৫; বায়ু পু. ৮৮.১৬০, ১৬৫-১৬৬; বিষ্ণু পু. ৪.৪.১-৫]

□ মহাভারত এবং বেশির ভাগ পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ অত্যন্ত অবিনয়ী এবং অত্যাচারী ছিলেন। ছোটো ছোটো ছেলেদের নিষ্ঠুর ভাবে জলে ডুবিয়ে হত্যা করতেন। প্রজারা সগর রাজার কাছে রাজকুমার অসমঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। রাজা সগর পুত্র অসমঞ্জকে ত্যাগ করলেন এবং তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন।

তবে রাজকুমার অসমঞ্জের এই অদ্ভুত এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের কারণ হিসেবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ থেকে জানা যায় যে, অসমঞ্জ শৈশবে এমন নিষ্ঠুর স্বভাব তো ছিলেনই না বরং খুব অল্পবয়স থেকেই তাঁর চরিত্রে বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলে একদিন এক পিশাচ তাঁর উপর ভর করল। পূর্বজন্মে অসমঞ্জ বৈশ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একদিন বনের মধ্যে তিনি এক বিশাল গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেলেন। তিনি সেই ধনসম্পদ উদ্ধার করে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সেই ধনভাণ্ডারের রক্ষক ছিল এক পিশাচ। পিশাচ সেই বৈশ্যকে বলল—দীর্ঘ সময় ধরে আমি এইখানে বসে এই সম্পদ রক্ষা করছি। ফলে আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তুমি যদি গোমাংস দ্বারা আমার ক্ষুধা নিবারণ কর, তবে তোমাকে এই সম্পদ দান করব। ধূর্ত বৈশ্য পিশাচকে বললেন—তুমি আমাকে এই ধনরাশি নিয়ে যেতে দাও। আমি তোমার খাদ্য নিয়ে অবশ্যই ফিরে আসব। পিশাচ সরলভাবে তাঁর কথায় বিশ্বাস করল। বৈশ্য কিন্তু আর ফিরে এলেন না। বৈশ্যের জন্য অপেক্ষা করতে

করতে ক্ষুধায় কাতর সেই পিশাচের মৃত্যু হল। মৃত্যুর পরে দেহহীন সেই পিশাচ বৈশ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যথাসময়ে বৈশ্যও পরলোকে গেলেন। পরজন্মে তিনি সগরের পুত্র অসমঞ্জ রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। পিশাচ তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর পূর্বজন্মের অপরাধের প্রতিশোধ নেবার জন্য অসমঞ্জের দেহে প্রবেশ করল। ফলে রাজকুমার অসমঞ্জ পিশাচের দ্বারা চালিত হতে লাগলেন। তাঁর অবিনীত নিষ্ঠুর আচরণে লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

ইক্ষ্বাকুবংশের মতো খ্যাতিসম্পন্ন এবং মর্যাদাসম্পন্ন রাজবংশে এমন নৃশংস স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম সত্যিই ইক্ষ্বাকুবংশের মর্যাদাহানিকর এক ঘটনা। হয়তো ইক্ষ্বাকুবংশ এবং সেই বংশের জন্মগ্রহণকারী রাজর্ষিদের কথা স্মরণে রেখেই পৌরাণিকেরা অসমঞ্জের দুষ্ট স্বভাবের কারণ হিসেবে এই পিশাচের কাহিনীটির অবতারণা করেছেন। ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্কমোচনের জন্যই হয়তো পৌরাণিকদের এই প্রয়াস।

[মহা (k) ৩.১০৭.৩৫-৪৩; (হরি) ৩.৯০.৬৬-৭২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫১.৩৮-৬৯]

□ ভাগবত পুরাণ অসমঞ্জের চরিত্রটিকে একটু অন্যভাবে বর্ণনা করেছে। ভাগবত পুরাণ মতে অসমঞ্জ পূর্বজন্মে নাকি এক মহাযোগী ছিলেন। কিন্তু কুসঙ্গে পড়ে তিনি যোগভ্রষ্ট হন। সগর রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার পরও তিনি পূর্বজন্মের স্মৃতি বিস্মৃত হননি। সগর রাজা যখন ছোটো ছোটো ছেলেদের জলে ডুবিয়ে মারার অপরাধে অসমঞ্জকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন, তখন অসমঞ্জ নাকি যোগবলে সেই সমস্ত বালককে জীবিত অবস্থার ফিরিয়ে এনেছিলেন। তারপর রাজ্য ছেড়ে তিনি বনে চলে যান। *[ভাগবত পু. ৯.৮.১৫-১৯]*

□ অসমঞ্জ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজর্ষি অংশুমানের পিতা। মহাভারত এবং বেশিরভাগ পুরাণ মতে সগর রাজার পর তাঁর পৌত্র অংশুমানই রাজা হয়েছিলেন। তবে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে যে, কপিল মুনি যখন ষাট হাজার সগর-পুত্রকে নিজের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ করেন, সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে পাঁচজন বেঁচে যান। এঁদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন পঞ্চজন বা পঞ্চবন, যিনি সগরের পরে রাজা হয়েছিলেন। তবে হরিবংশ পুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, অসমঞ্জই পঞ্চজন নামে খ্যাত ছিলেন এবং সগরের পর তিনিই রাজা হন—

একঃ পঞ্চজনো নাম পুত্রো রাজা বভূব হ।
সুতঃ পঞ্চজনস্যাসীদংশুমান্ নাম বীর্য্যবান্॥

এর থেকে মনে হয়, পরবর্তী সময়ে অসমঞ্জের চারিত্রিক সংশোধন হয় এবং সদ্‌গুণ প্রকাশ পায়, যার ফলে সগর রাজা নির্বাসিত পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন।

[হরিবংশ পু. ১.১৫.১২-১৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৪৭;
মৎস্য পু. ১৫.১৮]

অসমাম্নায় শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি। *[দ্র. সমাম্নায়]*

অসমৌজা যদুবংশীয় হৃদিকের দশপুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দেবার্হ। দেবার্হের পুত্র কম্বলবর্হিস্ (কম্বলবর্হি)। কম্বলবর্হির দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন অসমৌজা। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলে জানা যায়। তবে মৎস্য পুরাণের পাঠে ইনি অসমঞ্জা নামে চিহ্নিত হয়েছেন এবং এখানে বলা হয়েছে যে, তমোজা নামে তাঁর এক পুত্র সন্তান ছিল।

[মৎস্য পু. ৪৪.৮৩; বায়ু পু. ৯৬.১৪১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৪২]

অসম্মিত ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২৫; (হরি) ১৩.১২৭.২৫]

অসাক্ষী বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৮; (হরি) ১৩.১২৭.৬৮]

অসি ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার বিস্তারের সূচনাপর্ব থেকে, মূলত প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই অসি ভারতের বহুল প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। তবে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলিতে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে যত না অসির উল্লেখ মেলে, তার থেকে অনেক বেশি উল্লেখ মেলে যজ্ঞে পশুবলি দেবার জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র হিসেবে। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে একাধিকবার যজ্ঞে অশ্ব কিংবা গাভী বলিদেবার প্রসঙ্গে অসি ব্যবহারের উল্লেখ পওয়া যায়।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৬২.২০; ১০.৭৯.৬; ১০.৮৬.১৮]

□ যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে অসি ব্যবহারের সর্বপ্রথম উল্লেখ মেলে অথর্ববেদে। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র হিসেবে ধনুক বাণ, পরশু প্রভৃতির সঙ্গে অসির নামও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। *[অথর্ববেদ (Roth and Whitney) ১১.৯.১]*

□ মহাকাব্য পুরাণের কালে অসি বা তরবারির ব্যবহার যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল বলে বোঝা যায়। পণ্ডিত Dikshitar প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত অসির একাধিক পর্যায়শব্দ উল্লেখ করেছেন—

নিস্ত্রিংশ, বিশসন, খড়্‌গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয়, ধর্মমূল ইত্যাদি। মহাভারতে অবশ্য অসির 'ধর্মপাল' নামও উল্লিখিত হতে দেখা যায়—

অসির্বিশসনঃ খড়্‌গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপালস্তথৈব চ॥

মহাভারতের শান্তিপর্বে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে অসি বা খড়্‌গের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নকুল উল্লেখ করছেন যে, অস্ত্রবিশারদরা মূলত ধনুককেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। কিন্তু নকুলের নিজের মতে তরবারিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র—

ধনুঃ প্রহরণং শ্রেষ্ঠমতীবাত্র পিতামহ।
মতস্তু মম ধর্মজ্ঞ খড়্‌গ এব সুসংশিত॥

নকুলের মন্তব্য উল্লেখ করে পণ্ডিতরা মন্তব্য করেছেন যে, ধনুক বাণই প্রাচীনকালে সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধাস্ত্র বলে বিবেচিত হত। পরবর্তী কালে, সম্ভবত মহাকাব্যের যুগেই অসির গুরুত্ব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

[মহা (k) ১২.১৬৬.২; (হরি) ১২.১৬১.২]

□ নকুলের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম অসি বা খড়্‌গের উৎপত্তি বিষয়ে এক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি সম্পন্ন করার পর লক্ষ্য করলেন, অসুর, দানবরা ধর্ম পরায়ণ নয়—সমস্ত প্রাণীকুলকে অত্যাচার করে এবং নানা অধর্ম অনাচার করেই তারা আনন্দ পায়। তা দেখে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য, লোক কল্যাণের জন্য, ধর্মস্থাপনের জন্য, অসুর বধের জন্য ব্রহ্মা এক অস্ত্র নির্মাণের ভাবনা করলেন। ব্রহ্মার সেই চিন্তা থেকেই জন্ম নিল অসি—

ময়ৈবং চিন্তিতং ভূতমসির্নামৈষ বীর্য্যবান্।
রক্ষণায় চ লোকস্য বধায় চ সুরদ্বিষাম্॥

ব্রহ্মার সৃষ্ট সেই তরবারি ব্রহ্মা দান করলেন রুদ্র-শিবকে। রুদ্রই নাকি প্রথম অসি ব্যবহার করেন দেবাসুর সংগ্রামে। অসি চালনার কলাকৌশলও তাঁরই সৃষ্ট। পরবর্তী সময়ে রুদ্র-শিব ভগবান বিষ্ণুকে সেই তরবারি দান করেন। বিষ্ণুর কাছ থেকে সেই অসি লাভ করলেন মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিরা। তাঁরা লোক কল্যাণের জন্য সেই তরবারি তুলে দিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে। ইন্দ্রের হাত থেকে সেই তরবারি লাভ করলেন দেবতারা, দিক্‌পালরা। তারপর মনুষ্যকুলের রাজা বৈবস্বত মনু প্রজা কল্যাণের জন্য সেই তরবারি লাভ করলেন দেবতাদের কাছ থেকে। বৈবস্বত মনু তাঁর পুত্র ক্ষুপকে সেই তরবারি দিলেন। ক্ষুপ দিলেন ইক্ষ্বাকুকে। ইক্ষ্বাকুর কাছ থেকে তরবারি লাভ করলেন চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা ঐল পুরূরবা। পুরূরবা জ্যেষ্ঠপুত্র আয়ুকে দিয়ে গেলেন সেই তরবারি। আয়ুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই তরবারি লাভ করলেন তাঁর পুত্র রাজর্ষি নহুষ। নহুষের থেকে যযাতি, যযাতির থেকে পুরু সেই তরবারি লাভ করলেন। পুরু রাজা সেই দিব্য তরবারি দিয়ে গেলেন রাজা অমূর্তরয়ার হাতে। অমূর্তরয়ার কাছ থেকে রাজা ভূমিশয় সেই অসি লাভ করলেন। ভূমিশয়ের কাছ থেকে সেই দিব্য তরবারি এসে পৌঁছাল রাজর্ষি ভরত দৌষ্যন্তির হাতে। ভরত দৌষ্যন্তির থেকে রাজা ঐলবিল, তাঁর কাছ থেকে রাজা ধুন্ধুমার, ধুন্ধুমারের কাছ থেকে কাম্বোজ, কাম্বোজের কাছ থেকে রাজা মুচুকুন্দ এই তরবারি লাভ করলেন ক্রমে। মুচুকুন্দর কাছ থেকে তরবারি পেলেন রাজা মরুত্ত, মরুত্তের কাছ থেকে রৈবত, তাঁর থেকে যুবনাশ্ব এবং ক্রমে যুবনাশ্বর কাছ থেকে রঘু এই অসি লাভ করলেন। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজর্ষি রঘু এই তরবারি দিলেন হরিণাশ্বকে, হরিণাশ্ব দিলেন শুনককে, শুনক দিলেন উশীনরকে। উশীনরের কাছ থেকে এই দিব্য অসি লাভ করলেন ভোজরাজা। তিনি তা তুলে দিয়ে গেলেন শিবির হাতে। ক্রমে শিবির কাছ থেকে প্রতর্দন, প্রতর্দনের কাছ থেকে অষ্টক, অষ্টকের কাছ থেকে পৃষদশ্ব তরবারি লাভ করলেন। তারপরে সেই অসি লাভ করলেন ভরদ্বাজ মুনি। তাঁর কাছ থেকে অসি লাভ করলেন দ্রোণাচার্য এবং

দ্রোণাচার্যর কাছ থেকে কৃপাচার্য। ভীষ্ম বলছেন কৃপাচার্যর কাছ থেকে পরম্পরাক্রমে চতুর্থ পাণ্ডব নকুলই নাকি সেই দিব্য তরবারিটি লাভ করেন।

লক্ষণীয়, ব্রহ্মার নির্মিত দিব্য তরবারি পরম্পরাক্রমে বিভিন্ন রাজার হাতে পৌঁছেছে। মহাকাব্য পুরাণে এই রাজারা সকলেই ধর্মরক্ষক, ন্যায়পরায়ণ রাজা হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তরবারির সৃষ্টি এবং প্রয়োগের মধ্যে ধর্মরক্ষার যে ভাবনা রয়েছে, সেই ভাবনা থেকেই আদিতে সৃষ্ট দিব্য তরবারির অধিকারী হিসেবে মহাভারতে এই সব প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। আর মূলত ধর্মরক্ষার জন্য প্রযুক্ত হত বলেই তরবারির অপর নাম ধর্মপালও বটে।

পাশাপাশি একথাও ঠিক যে, একটিমাত্র আদি তরবারিই পরম্পরাক্রমে সেই ধর্মরক্ষক রাজারা লাভ করেছিলেন, না এইসব রাজাদের দ্বারাই ক্রমে ক্রমে তরবারি অস্ত্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল এবং এঁরাই প্রাচীনকালের কিংবদন্তী অসিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন—তাও ভেবে দেখার বিষয়। কারণ আদি তরবারির সর্বশেষ অধিকারী নকুল মূলত অসিযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন বলেই তরবারির অধিকার তাঁর উপর আরোপিত হয়েছে। ন্যায় পরায়ণ রাজর্ষি হিসেবে নয়। *[মহা (k) ১২.১৬৬.৪৩-৮৫;*
(হরি) ১২.১৬১.৪৩-৮৫]

☐ যুদ্ধক্ষেত্রে অসি-চর্ম ধারণ এবং চালনার নানা কৌশলের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহাকাব্য পুরাণে। একজন নিপুণ অসিযোদ্ধা অসি চালনার মোট বত্রিশটি কৌশল নিখুঁত ভাবে জানবেন এবং প্রয়োগ করবেন বলে অগ্নি পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। এই সবকটি কৌশলে দক্ষ একজন নিপুণ যোদ্ধার অসিচালনায় শুধু বাহুবল এবং পরাক্রমই থাকত না। তার সঙ্গে যুক্ত হত শৈল্পিক সুষমা। অগ্নিপুরাণে বর্ণিত অসি চালনার বত্রিশটি কৌশলের নাম যথাক্রমে— ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, শ্যেনপাত, আকুল, উদ্ধূত, অবধূত, সব্য, দক্ষিণ, অনালক্ষিত, বিস্ফোট, করালেন্দ্র, মহাসখ, বিকরাল, নিপাত, বিভীষণ, ভয়ানক, সমগ্র, অর্ধ, তৃতীয়াংশ, পাদ, পাদার্ধ, বারিজ, প্রত্যালীঢ়, আলীঢ়, বরাহ এবং লুলিত—

ভ্রান্তমুদ্‌ভ্রান্ত মাবিদ্ধ মাপ্লুতং বিপ্লুতং সৃতম্।
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ, শ্যেনপাতমথাকুলম্॥
উদ্ধূতমবধূতঞ্চ সব্যং দক্ষিণমেব চ।
অনালক্ষিতবিস্ফোটৌ করালেন্দ্র মহাসখৌ॥
বিকরাল নিপাতৌ চ বিভীষণ ভয়ানকৌ।
সমগ্রার্ধতৃতীয়াংশ পাদপাদার্ধ বারিজাঃ॥
প্রত্যালীঢ়মথালীঢ়ং বরাহং লুলিতং তথা।
ইতি দ্বাত্রিংশতো জ্ঞেয়াঃ খড়্‌গচর্মবিধৌ রণে॥

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান সেনাপতি দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন একজন নিপুণ অসিযোদ্ধা ছিলেন বলে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। দ্রোণপর্বের শেষ পর্যায়ে দ্রোণাচার্যের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্নের অসিযুদ্ধের এক বর্ণনা পাওয়া যায়। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই যুদ্ধে অসিযুদ্ধের দশটি কৌশলের নিপুণ প্রদর্শন করেন বলে মহাভারত উল্লেখ করেছে। এই দশটি কৌশল হল যথাক্রমে—ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, সৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত এবং সমুদীর্ণ—

ভ্রান্তমুদ্‌ভ্রান্তমবিদ্ধমাপ্লুতং প্রসৃতং সৃতম্।
পরিবৃত্তং নিবৃত্তঞ্চ খড়্‌গং চর্ম চ ধারয়ন্।
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ দর্শয়ামাস পার্ষতঃ॥

[মহা (Critical Ed.) ৭.১৬৪.১৪৭-১৫০;
(হরি) ৭.১৬৩.৪৪-৪৯; অগ্নি পু. ২৫২.১-৪]

☐ প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন আকৃতির অসি বা তরবারি নির্মিত হত বলে জানা যায়। পুরাণে খড়্‌গের যে বিভিন্ন আকৃতির কথা আছে সেখানে খড়্‌গ বা অসির পদ্ম পলাশাকৃতি, মণ্ডলাকৃতি; করবীর দলাকৃতি অগ্রভাগের কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও ঘৃতগন্ধ এবং বিয়ৎপ্রভ নামে দু-প্রকার খড়্‌গের উল্লেখ মেলে, যেগুলিকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খড়্‌গ বলা হয়েছে—

খড়্‌গঃ পদ্মপলাশাগ্রো মণ্ডলাগ্রশ্চ শস্যতে।
করবীর দলাগ্রাভো ঘৃতগন্ধো বিয়ৎপ্রভঃ॥

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তিনপ্রকার খড়্‌গ বা অসির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রকারগুলি হল যথাক্রমে, নিস্ত্রিংশ, মণ্ডলাগ্র এবং অসিযষ্টি—

নিস্ত্রিংশ মণ্ডলাগ্রসিযষ্টয়ঃ খড়্‌গাঃ।

আধুনিক পণ্ডিতরা কৌটিল্যের উল্লিখিত এই তিন প্রকারের অসির আকৃতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন—kautilya (Bk. II, ch. 18) mentions swords of three distinct varieties, viz., *nistrimśa* (provided) with a crooked end), *asi-yaṣṭi* (shaped like a staff), and *maṇḍalāgra* (provided with a circular head). It is probable that the first of these resembled the modern *kukri*, incurved with the cutting edge on the inner side; while the second was certainly the typical Indian long sword, with straight and pointed blade (modern *kirich*). The exact shape of the *maṇḍalāgra* in imore difficult to determine, but it might have been the same as the modern leaf-shaped '*paṭṭiśa*.' It is note-worthy that all these three types of sword are represented in the frescocs and sculpturcs at Ajantā, 'while *kirich* and *paṭṭiśa* blades have been found in the Tinnevelly urn-burials.'

[অগ্নি পু. ২৪৫.২৫; কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) Part I, ২.১৮.১২, p. 68; P.C. Chakravarti, The Art of War in Ancient India, p. 164]

☐ অসি বা তরবারির অগ্রভাগের বিভিন্নতার পাশাপাশি অসির দৈর্ঘ্য, তার সম্পূর্ণ আকৃতি, অসি ধারণের স্থান অর্থাৎ এর হাতলের গঠন, হাতল তৈরির উপকরণ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, উৎকৃষ্ট তরবারির দৈর্ঘ্য হবে ৫০ অঙ্গুলি পরিমাণ, তার বেশী নয়। আবার তার থেকে কম দৈর্ঘ্যের তরবারিও ব্যবহার করা হত, কিন্তু ২৫ অঙ্গুলি পরিমাণ দৈর্ঘ্যের থেকে কম দৈর্ঘ্যের অসি ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হত। যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে উৎকৃষ্ট তরবারির লক্ষণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে যে, যে তরবারি দীর্ঘ, ওজনে তুলনামূলক ভাবে হালকা, তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত, দৃঢ় অথচ নমনীয়—সেটিই তরবারি হিসেবে আদর্শ—

দীর্ঘতা লঘুতা চৈব খরবিস্তীর্ণতা তথা।
দুর্ভেদ্যতা সুঘটতা খড়্গানাং গুণসংগ্রহঃ॥

একই গ্রন্থে ব্যবহারের অনুপযুক্ত তরবারির লক্ষণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে—দৈর্ঘ্যে ছোটো অথচ ওজনে ভারী, তীক্ষ্ণতা নেই এবং নমনীয়তা নেই—এমন তরবারি কখনওই ব্যবহার করা উচিত নয়—

খর্বতা গুরুতা চৈব মন্দতা তনুতা তথা।
সুভেদ্যতা দুর্ঘটতা খড়্গানাং দোষসংগ্রহঃ॥

অগ্নিপুরাণ উৎকৃষ্ট খড়্গের গুণ বর্ণনা করার সময় খড়্গের সুমধুর শব্দের কথা উল্লেখ করেছে। মনে হয়, যুক্তি কল্পতরুর বিবরণ অনুযায়ী তীক্ষ্ণধার, নমনীয়, লঘু তরবারি চালনার সময় একপ্রকার মধুর শব্দ সৃষ্টি হত—

দীর্ঘং সুমধুরং শব্দং যস্য খড়্গস্য সত্তম।
কিঙ্কিণীসদৃশং তস্য ধারণং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥

[অগ্নি পু. ২৪৫.২৩-২৪; যুক্তিকল্পতরু (অস্ত্রশস্ত্র/খড়্গ) ৫৯-৬০; পৃ. ১৭৪]

☐ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে তরবারির মুষ্টি বা হাতল (hilt) তৈরির উপাদান সম্পর্কেও নানা তথ্য মেলে। মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন উৎকৃষ্ট খড়্গ, যার মুষ্টি ছিল হস্তীদন্ত নির্মিত—শুদ্ধদন্তসরূনসীন্। মহাভারতের দ্রোণপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর তরবারির মুষ্টি ছিল মণিরত্নমণ্ডিত—মণিময়ৎসরুম্। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সে সময় গণ্ডার কিংবা মোষের শিং, হাতির দাঁত, এমনকী কাঠ অথবা বাঁশ দিয়েও তরবারির মুষ্টি নির্মিত হত। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থেও সোনা এবং রূপোর তৈরি রত্নখচিত মুষ্টির কথা আছে। মনে হয় তখনকার দিনে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজা মহারাজারা আপন আপন সঙ্গতি অনুসারে তরবারির মুষ্টি নির্মাণ করাতেন।

[মহা (k) ২.৫১.১৬; ৭.৪৭.৩৬; (হরি) ২.৪৯.১৩; ৭.৪২.৩৬; কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle) ২.১৮; রাজতরঙ্গিণী (Stein) ৭.১৫.১৭; vol. I, p. 161]

☐ তরবারির কোষ সাধারণত চর্ম নির্মিত হত। মহাভারতের বিরাট পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ভীমসেনের তরবারির কোষ ছিল ব্যাঘ্রচর্ম নির্মিত। নকুলের তরবারি থাকত হস্তীচর্ম নির্মিত কোষে। আর সহদেবের খড়্গের কোষ ছিল গোচর্ম নির্মিত।

[মহা (k) ৪.৪৩.২০-২৩; (হরি) ৪.৩৯.২১-২৪]

☐ যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে যোদ্ধা তাঁর কোমরের বন্ধনিতে কোষযুক্ত খড়্গটি ঝুলিয়ে

নিতেন। মানুষ সাধারণত ডান হাত ব্যবহার করে বেশি, সেহেতু কোমর বন্ধনির বাঁ দিকে কোষ সমেত তরবারি ঝুলিয়ে নেবার ব্যবস্থা থাকত—

বিজিত্বা তু যথান্যায়ং ততো বন্ধং সমাচরেৎ।
কট্যাং বদ্ধ্বা ততঃ খড়্গং বামপার্শ্বাবলম্বিতম্॥
দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিষ্কর্ষেদ্দক্ষিণেন তু।

[অগ্নি পু. ২৫১.৭-৮]

অসিকুণ্ড মথুরায় অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। বরাহ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, পুরাকালে বিমতি নামে এক দুরাচার দুর্বুদ্ধি রাজা ছিলেন। তীর্থগণের অনুরোধে বরাহ রূপধারী ভগবান বিষ্ণু এই বিমতি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে ভগবান বরাহের তরবারি বা অসির আঘাতে বিমতির মৃত্যু হয়। ভগবান বরাহর তরবারি বিমতিকে বধ করার পর ওই স্থানের মাটিতে গেঁথে যায়। গেঁথে যাওয়া তরবারি উত্তোলনের সময় মাটি খুঁড়ে ওই স্থানে এক পবিত্রকুণ্ডের উৎপত্তি হয়েছিল। সেই কুণ্ডটিই অসিকুণ্ড নামে বিখ্যাত হয়েছে। মথুরায় অবস্থিত তীর্থস্থানগুলির মধ্যে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ এবং এই কুণ্ডে স্নান করলে মহাপুণ্যফল লাভ হয় বলে বরাহ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

[বরাহ পু. ১৬৬.১৭-১৯, ২৬]

অসিক্নী$_1$ প্রাচীন ভারতবর্ষের পবিত্র নদীগুলির মধ্যে অন্যতম অসিক্নী।

পণ্ডিতগণের মতে, বৈদিক যুগে অসিক্নী নামে পরিচিত নদীটির নামই পরবর্তীকালে সংস্কৃতে 'চন্দ্রভাগা'-য় পরিণত হয়।

নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন, 'অসিক্ন্যশুক্লাসিতা, সিতমিতি বর্ণ নাম।

তৎপ্রতিষেধো'সিতম্।'

—অর্থাৎ এই নদী কৃষ্ণতোয়া, 'অশুক্লা', 'অসিতা' এমন নদী। সম্রাট আলেকজান্ডারের 'Acesines', বর্তমান চেনাব নদী এবং অসিক্নী এক ও অভিন্ন। আলেকজান্দ্রিয়ার Hesychius যিনি সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বিখ্যাত গ্রীক শব্দকোষ রচনা করেছিলেন, তাঁর মতে চন্দ্রভাগা নদীর নাম আলেকজান্ডারই পরিবর্তন করেছিলেন। গ্রীক ভাষায় চন্দ্রভাগার নাম ছিল। 'Sandrephagas'—যার অর্থ সম্ভবত 'আলেকজান্ডারের প্রতি উৎসর্গীকৃত'। Hesychius অবশ্য 'অসিক্নী' নামটিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, অসিক্নী থেকেই 'Acesines' শব্দটির উৎপত্তি, গ্রীক ভাষায় যার অর্থ 'উপশম-দায়ী' Arrian-এর লেখা আলেকজান্ডারের জীবনী থেকে জানা যায়, সম্রাট আলেকজান্ডার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশকালে সিন্ধু, Hydaspes এবং তারপর 'Acesines' নদী পার হয়েছিলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমানের চেনাব অর্থাৎ পুরাকালের অসিক্নী নদী হিমালয়ের উচ্চ অংশ থেকে সৃষ্ট হয়ে হিমাচল প্রদেশের লাহুল ও স্পীতি জেলায় ঢুকেছে, তারপর জম্মু-কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্গত পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

[ঋগ্বেদ ৮.২০.২৫; ৯.৭৫.৫; নিরুক্ত ৯.২৬;
মহা (k) ৬.৯.২৩ (হরি) ৬.৯.২৩;
ভাগবত পু. ৫.১৯.১৭;
EAIG (Kapoor), p. 80]

অসিক্নী$_2$ প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতির পত্নী। ইনি বীরণ প্রজাপতির কন্যা ছিলেন বলে পুরাণে অনেক সময় তাঁকে বৈরিণী নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ভাগবত পুরাণ মতে অসিক্নীর পিতা ছিলেন প্রজাপতি পঞ্চজন।

দক্ষ প্রজাপতির ঔরসে অসিক্নীর গর্ভে বহু পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। *[দ্র. দক্ষ]*

[বায়ু পু. ৬৫.১২৮, ১৩৪, ১৪৬-১৫১;
বিষ্ণু পু. ১.১৫.৮৯-৯৭, ১০২;
ভাগবত পু. ৬.৪.৫১; ৬.৫.১, ২৪; ৬.৬.১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২.৫, ২১-৩০]

অসিজ্ঞ$_1$ একটি নরকের নাম। *[বায়ু পু. ১০১.১৪৯]*

অসিজ্ঞ$_2$ মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র, দেবগুরু বৃহস্পতির ভ্রাতা। পুরাণে এঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে। *[দ্র. উতথ্য]*

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১১;
বায়ু পু. ৯৯.৩৬]

অসিত$_1$ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ধ্রুবসন্ধির পুত্র রাজা ভরত। তাঁর পুত্র অসিত। তালজঙ্ঘ, হৈহয় ও শশবিন্দুবংশীয় বীরদের সঙ্গে অসিতের শত্রুতা হয়। রাজারা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করলে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং রাজ্য হারিয়ে দুই পত্নীকে নিয়ে হিমালয় পর্বতে বসবাস করতে থাকেন। অবশেষে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেইসময় চ্যবন মুনি হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন। রাজা অসিতের

মৃত্যুকালে তাঁর দুই পত্নীই সন্তানসম্ভবা ছিলেন। এই দুই পত্নীর একজন অন্যজনের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেন। বিষাক্ত খাদ্য শরীরে প্রবেশ করেছে বুঝে ওই পত্নী চ্যবন মুনির কাছে গিয়ে প্রতিকার চাইলে চ্যবন মুনি তাঁকে আশ্বস্ত করেন। যথাকালে অসিতের পত্নী কালিন্দী সুস্থ, সুন্দর এক পুত্রের জন্ম দেন। তার নাম সগর।

[রামায়ণ ১.৭০.২৯-৩৭]

অসিত$_২$ জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজর্ষি মান্ধাতা যে সব রাজাকে পরাজিত করেছিলেন তার মধ্যে আমরা রাজর্ষি অসিতের নামোল্লেখ পাই। *[মহা (k) ৭.৬২.১১; ১২.২৯.৮৮; (হরি) ৭.৫৪.১০; ১২.২৯.৮৬]*

অসিত$_৩$ অসিত একজন প্রাচীন মুনি। তিনি অসিত-দেবল নামেই বেশি পরিচিত।

[দ্র. অসিত-দেবল]

অসিত$_৪$ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত একটি পর্বত। পশ্চিমে নর্মদা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আনর্ত দেশে অসিত পর্বতের অবস্থান। পর্বতটি বহু ফলমূলের বৃক্ষে পরিপূর্ণ—

> বহুমূলফলোপেতস্ত্বসিতো নাম পর্বতঃ ।।

ঋষি বিশ্বামিত্র ও ঋষি কক্ষসেনের আশ্রম দুটি এই পর্বতের কাছেই অবস্থিত।

[মহা (k) ৩.৮৯.১১; (হরি) ৩.৭৪.১১]

☐ পুরাণে অসিত পর্বতকে একটি তীর্থ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋষি অসিতের বাসভূমি এই পর্বতে শ্রাদ্ধকার্য অত্যন্ত পুণ্যফলদায়ী।

[বায়ু পু. ৭৭.৩৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.৩৯]

☐ পণ্ডিত P.K. Bhattacharyya-র মতে অসিত পর্বত উজ্জয়িনীর কাছেই অবস্থিত ছিল। সে কারণেই তিনি ধারণা করেছেন যে, এটি ঋক্ষ পর্বতেরই একটি অংশ হয়ে থাকতে পারে।

[HGM (Bhattacharya) p. 69]

অসিত$_৫$ শাকদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে অন্যতম সোমক। এই সোমক পর্বত শাকদ্বীপের অন্তর্গত কুসুমোৎকর বর্ষে অবস্থিত। এই কুসুমোৎকর বর্ষেরই অন্য নাম অসিত বর্ষ।

[মৎস্য পু. ১২২.২৪]

অসিত-দেবল মহাভারতে অষ্টবসুর মধ্যে একজন হলেন প্রত্যূষ। প্রত্যূষের পুত্রের নাম ঋষি দেবল। আর দেবল-ঋষিরও দুই পুত্র, তাঁরা ক্ষমাবান মনীষী ছিলেন—

> প্রত্যূষস্য বিদুঃ পুত্রমৃষিং নাম্নাথ দেবলম্।
> দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনস্বিনৌ ॥

[মহা (k) ১.৬৬.২৬; (হরি) ১.৬১.২৬]

☐ মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে সব সময়েই প্রায় অসিত-মুনির সঙ্গে দেবল-মুনির নাম একত্র উচ্চারিত হয়েছে, যদিও বহু জায়গাতেই তাঁদের দুজনের নাম পাশাপাশি থাকলেও দুইজনেরই পৃথক সত্তাও টের পাওয়া যায়।

☐ মহাভারতের প্রথমেই আমরা সৌতি উগ্রশ্রবার মুখে শুনি যে, এই মহাভারত-কথার লক্ষশ্লোকী দেবগণকে শুনিয়েছেন নারদ এবং পিতৃগণকে শুনিয়েছেন অসিত-দেবল—

> এক শত-সহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্।
> নারদোশ্রাবয়দ্দেবান্ অসিতো দেবলঃ পিতৃন্ ॥

[মহা (k) ১.১.১০৭; ১৮.৫.৫৬; (হরি) ১.১.৬৯; ১৮.৫.৫৬]

☐ মহাভারতের এই শ্লোক শুনলে 'অসিত'-শব্দটিকে প্রায় দেবলের বিশেষণ বলে মনে হয়, ঠিক যেমন জনমেজয়ের সর্পসত্রেও 'অসিত'কে মনে হয় 'দেবল'ই বটে। পুনশ্চ মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্রহ্মসভা বর্ণনার কালেও অসিত-এর সঙ্গে দেবল একাকার হয়ে যান বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধে—

অসিতো দেবলশ্চৈব নারদঃ পর্বতস্তথা। আবার, অসিতো দেবলশ্চৈব জৈগীষব্যশ্চ তত্ত্ববিৎ।

[মহা (k) ১.৫৩.৮; ২.১১.২৪; (হরি) ১.৪৮.৮; ২.১১.২৩]

☐ কিন্তু অসিত-দেবলকে শেষ পর্যন্ত একই ঋষি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখার আগে জানাতে হবে যে, তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ঋষি অসিতের নাম করা হয়েছে দেবলের পুত্র হিসেবে। একটি সাম-মন্ত্রকে এখানে বলা হয়েছে 'আসিত' অর্থাৎ অসিত-ঋষি উচ্চারিত সামমন্ত্র। ঠিক তার পরেই ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—দেবল-এর পুত্র 'অসিত দৈবল্য' অথবা 'অসিত দেবল' তাঁর স্বদৃষ্ট সাম-মন্ত্রের মাধ্যমে তিন ভুবনের ক্রিয়াকলাপ দেখতে পেয়েছিলেন। অসিতের দ্বারা দৃষ্ট এই 'অসিত সাম' মানব-জীবনের তিনটি আশা পূরণের জন্য প্রযুক্ত হয়।

[পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৪.১১.১৮-১৯]

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, মহাভারতের সভাপর্বে ধৌম্য এবং ব্যাস যেখানে নারদ এবং দেবলকে

সামনে রেখে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক নিষ্পন্ন করছেন, তখন মহাভারতের একটি সম্মত পাঠে অন্তত দেবল-ঋষির নাম উচ্চারণ করেই তাঁকে তদ্ধিত প্রত্যয়ে 'আসিত' অর্থাৎ অসিত-এর ছেলে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—

নারদং চ পুরস্কৃত্য দেবলং চাসিতং মুনিম্।

[মহা (k) ২.৫৩.১০;
(হরি) ২.৫১.১০ (অতিরিক্ত পাঠ)]

মহাভারতের অন্যত্র, যেমন একবার দ্যূত ক্রীড়া-পর্বে শকুনি যখন পাশাখেলার জন্য যুধিষ্ঠিরকে তাড়না করছেন এবং যুধিষ্ঠির ভীত হচ্ছেন, তখন যুধিষ্ঠির অসিত-দেবলের নাম করে বলেন—মুনি অসিত-দেবল জিতেন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞ মানুষ—

এবমাহায়মসিতো দেবলো মুনিসত্তমঃ।

এখানেও 'অসিত'-এর জায়গায় 'আসিত' বলে পাঠ আখ্যাপন করেছেন কেউ কেউ। আমরা পরবর্তী কালে আলোচনা করবো অসিত এবং দেবল একই ব্যক্তি কিনা, কিম্বা অসিতের পুত্র দেবল কিনা। *[মহা (k) ২.৫৯.৯; (হরি) ২.৫৬.৯]*

বায়ু পুরাণের একত্র বলা হয়েছে—অসিত মুনি কশ্যপবংশীয় মুনি এবং দেবলের সঙ্গে তিনি ছয় জন মন্ত্রকার ঋষির মধ্যে অন্যতম—

এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্বে কাশ্যপাংশ্চ নিবোধত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১২-১১৩;
বায়ু পু. ৫৯.১০২-১০৩;
মৎস্য পু. ১৪৫.১০৬-১০৭]

□ বায়ু পুরাণে আরও বলা হয়েছে যে, হিমালয়ের ঔরসে মেনার গর্ভে অপর্ণা (উমা পার্বতী) ছাড়াও একপর্ণা এবং একপাটলা নামে আরও দুটি কন্যার জন্ম হয়। একপর্ণার সঙ্গে মুনিবর অসিতের বিবাহ হয়—

অসিতস্যৈকপর্ণা তু পত্নী সাধ্বী দৃঢ়ব্রতা।

এই একপর্ণার গর্ভেই যোগাচার্য অসিতের মানস পুত্র হলেন দেবল—

দেবলং সুষুবে সা তু ব্রহ্মিষ্ঠং মানসং সুতম্।

অর্থাৎ বায়ু পুরাণে অসিত হলেন দেবলের পিতা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তাঁকে শাণ্ডিল্য গোত্রীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং ব্রহ্মিষ্ঠও বলা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৭২.৭, ১৬-১৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৩২; ২.১০.৮, ১৮-১৯]

□ অসিত, দেবল, কশ্যপ—এঁদের গোত্রপ্রবর একাকার হয়ে গেছে বলেই এঁদের বংশজাত অধস্তন পুরুষদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১৯৯.১৯]*

□ আমরা তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে 'অসিত'কে দেবলের পুত্র হিসেবে পেয়েছি, আবার পুরাণগুলিতে দেবল-কে অসিতের পুত্র হিসেবে উল্লিখিত হতে দেখেছি, এমনকি মহাভারতের দু-এক জায়গাতেও অসিতের পুত্র 'আসিত' দেবল। কিন্তু মহাভারতের বেশিরভাগ জায়গায় অসিত এবং দেবল একত্রে অসিত-দেবল বলে সম্বোধিত হয়েছেন। সামগ্রিক সিদ্ধান্তে অসিত এবং দেবলকে আমাদের একই মানুষ বলে মনে হয়। এটা ভাবার একটা বড়ো কারণ—মহাভারতে শল্যপর্বে আদিত্য-তীর্থ বর্ণনার সময় মহর্ষি অসিত-দেবল এবং জৈগীষব্য মুনির কথোপকথনের মধ্যে বারংবার অসিত এবং দেবলের নামে এক অদ্ভুত বিপরাবর্তন বা 'সোয়াপিং' লক্ষ্য করা যায়।

□ মহাভারতে অসিত-দেবল এবং জৈগীষব্যের মূল কাহিনীতে যাবার আগে পূর্বাধ্যায়ে বলা হয়—ঋষি অসিত-দেবলও এই আদিত্য তীর্থে যোগ অবলম্বন করে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন—

অসিতো দেবলশ্চৈব তস্মিন্নেব মহাতপাঃ।
পরমং যোগমাস্থায় ঋষির্যোগমবাপ্তবান্॥

[মহা (k) ৯.৪৯.২৪; (হরি) ৯.৪৫.২৪]

□ শুধু উপরি উক্ত শ্লোকেই নয় মহাভারতের অন্য যে কোনো স্থলেই আমরা যখন অসিত এবং দেবলের নাম একত্রে পেয়েছি, সে-সব জায়গায় কখনোই ব্যাকরণের নিয়মে তাঁদের নাম দ্বন্দ্ব সমাসে দ্বিবচনে উচ্চারিত হয়নি, ক্রিয়াপদেও আসেনি দ্বিবচন। অতএব অসিত এবং দেবলের পৃথক নাম যেখানে, যে ঘটনাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক, অসিত-এর নাম ব্যবহৃত হলে সেখানে দেবলকেও বুঝতে হবে। কিংবা দেবল-এর নাম উচ্চারিত হলে বুঝতে হবে অসিতকেও। মহাভারতের এই কাহিনীতে পুণ্যাত্মা অসিত-দেবল আদিত্য-তীর্থে বাস করছিলেন। সর্বদাই ধর্মানুষ্ঠানে রত এই মুনি সংযতেন্দ্রিয় হয়ে তপস্যা করতেন, সর্বভূতে তাঁর সমদৃষ্টি—

কাঞ্চনে লোষ্ট্রভাবে চ সমদর্শী মহাতপাঃ।

অসিত-দেবল ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং অতিথিদের

প্রতি তাঁর সেবা দৃষ্টি ছিল বলেই একদিন আদিত্য তীর্থের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন জৈগীষব্য মুনি। তিনি দেবলের আশ্রমে থেকেই যোগ-সমাধির অভ্যাস করতে করতে সিদ্ধিলাভ করলেন। অসিত-দেবল ধর্মের কারণেই জৈগীষব্যকে ত্যাগ করেননি, কিন্তু খাবার সময় এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসার সময়েই শুধু দেবলের সঙ্গে জৈগীষব্যের দেখা হত—

উপাতিষ্ঠত ধর্মজ্ঞো ভৈক্ষ্যকালে চ দেবলম্ (এখানে শুধু 'দেবল'-শব্দ ব্যবহৃত)।

বহুকাল দেবল এইভাবে জৈগীষব্যকে দেখেছেন, কিন্তু একদিন তিনি খেয়াল করলেন যে, এই অলস ভিক্ষু মুনি কখনো কথা বলেন না তাঁর সঙ্গে। এইসব চিন্তা করতে-করতেই দেবল একদিন একটি জলের কলসি নিয়ে যোগবলে আকাশপথে সমুদ্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু যেতে-যেতেই দেবল দেখলেন—জৈগীষব্য আগেই সেখানে চলে গেছেন এবং তখন তাঁর সমুদ্রে স্নান করাও হয়ে গেছে। জৈগীষব্যের প্রভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন দেবল অসিত—

ইত্যেবং চিন্তয়ামাস মহর্ষিরসিতস্তথা (এখানে শুধু অসিত শব্দ ব্যবহৃত)।

সমুদ্র থেকে ফিরে এসে অসিত দেখলেন—জৈগীষব্য আশ্রমে ফিরেছেন তার অনেক আগে। অসিত আশ্চর্য হলেন বটে, কিন্তু কোনো কথা হল না দুইজনের মধ্যে। শুধু আশ্চর্য হয়েই আশ্রমে বসে থাকলেন অসিত দেবল—

অসিতো দেবলো রাজন্ চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্ (অসিত-দেবল একত্র ব্যবহৃত)।

দেবল এবার জৈগীষব্যকে পরীক্ষা করার জন্য যোগবলে আকাশে উঠলেন এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষেরা জৈগীষব্যের পূজা করছেন। দেবল আরও দেখলেন জৈগীষব্য স্বর্গলোক থেকে পিতৃলোকে, পিতৃলোক থেকে যমলোকে এবং এইরকম আরো বিভিন্ন লোকে অনায়াসে চলে যাচ্ছেন। জৈগীষব্যের যোগসিদ্ধির প্রকার দেখে দেবল চমৎকৃত হলেন এবং তাঁকে কোথাও না দেখে সিদ্ধ-যাজ্ঞিকদের কাছে জৈগীষব্যের তপোবিভূতির কথা জানতে চাইলেন। (এখানে একটি শ্লোকে 'দেবল' এবং পরের শ্লোকেই 'অসিত' এককভাবে ব্যবহৃত।) সিদ্ধ মহাপুরুষেরা বললেন—জৈগীষব্য এখন ব্রহ্মলোকে গেছেন। সে কথা শুনে দেবল রেগে ঊর্ধ্বে উঠলেন ব্রহ্মলোকে যাবার জন্য, কিন্তু অধঃপতিত হলেন স্বস্থানে। ঋষিরা বললেন—জৈগীষব্য যেখানে গেছেন, সেখানে তুমি যেতে পারবে না। তাঁদের কথা শুনে দেবল নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন এবং পক্ষীরূপে অলক্ষিত অবস্থায় প্রবেশ করেও দেবল দেখলেন—জৈগীষব্য সেখানে পূর্বাহ্নেই উপস্থিত।

অসিত-দেবল এবার জৈগীষব্যের কাছে মোক্ষধর্ম শিক্ষা করবেন বলে একান্ত ভাবে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। জৈগীষব্য দেবলকে শাস্ত্রানুযায়ী সন্ন্যাসধর্মের উপদেশ দিলেন এবং দেবলও ঠিক করলেন যে, সন্ন্যাসধর্ম পালন করার জন্য তিনি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন। সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে দেবল শেষ পর্যন্ত মুক্তিলাভ করলেন। এই ঘটনার পর নারদাদি ঋষিরা কেউ জৈগীষব্যের এবং কেউ বা অসিত-দেবলের প্রশংসায় উচ্চগ্রাম হয়ে উঠলেন—

এবং প্রভাবো ধর্মাত্মা জৈগীষব্যস্তথাসিতঃ।

[মহা (k) ৯.৫০ অধ্যায়; (হরি) ৯.৪৬ অধ্যায়]

মহাভারতের এই কাহিনীতে অসিত এবং দেবলের নাম-বিনিময়ের প্রমাণ ছাড়াও বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে যেভাবে অসিত-দেবল-এর নাম পাওয়া যায়, তাতে তিনি একই লোক বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। এমনকি দেবলের পূর্বে অসিত—যার অভিধানগত অর্থ কৃষ্ণবর্ণ, হয়তো বা তিনি অতিশয় কৃষ্ণবর্ণই ছিলেন, যার জন্য তাঁর এই নাম, কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে এই নামের একটা কারণও পাওয়া যায় যেন। মঝ্‌ঝিমনিকায় গ্রন্থের আস্সলায়ন-সুত্তে। এখানে কাহিনী আছে—এক অরণ্য-কুটীরে সাতজন ব্রাহ্মণ থাকতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁরা যেহেতু ব্রহ্মার পুত্র, তাই তাঁদের মতো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর কোথাও নেই। কথাটা অসিত-দেবলের কানে গেল। তিনি সপ্তর্ষিদের ঘরে এসে চিৎকার করে তাঁদের ভাবনার প্রতিবাদ করতেই ব্রাহ্মণরা তাঁকে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গারের মতো হয়ে যাবার অভিশাপ দিলেন। কিন্তু অভিশাপের ফল ফলল না, অসিত-দেবল আরও সুন্দর হয়ে উঠলেন। অভিমানী ব্রাহ্মণরা শেষ পর্যন্ত অসিত-দেবলের মাহাত্ম্য মেনে নিলেন, এবং অসিত-দেবলও নানা যুক্তিতে সাত

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ধ্বংস করে দিলেন।

আমাদের কাছে এই কাহিনীর চেয়েও জরুরী হল—দেবলকে কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত করার চেষ্টা, যে কৃষ্ণবর্ণত্ব তাঁর স্বাভাবিক ছিল বলেই মনে হয়। তার আরও একটা বড়ো কারণ বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীর অন্তর্গত ইন্দ্রিয় জাতকে অসিত-দেবলকেই কাল-দেবল বলে সংজ্ঞিত করা হয়েছে। এবং লক্ষণীয় অমরকোষে কাল-শব্দটি পর্যায়-শব্দই হল 'অসিত'।

[অমরকোষ, ১ (ধীবর্গ). ১৪]

ফলে দেবলের বিশেষণ হিসেবেই অসিত-শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

[মজ্ঝিম নিকায় ২.১৫৪.৮৮; জাতক ৩.৪৬৯]

☐ মহাভারতে অসিত-দেবলকে প্রথম দেখি জনমেজয়ের সর্পসত্রে—যজ্ঞকর্মের সদস্য হিসেবে তিনি কাজ করছিলেন অন্যান্য বিখ্যাত মুনিদের সঙ্গে—

অসিতো দেবলশ্চৈব নারদঃ পর্বতস্তথা।

[মহা (k) ১.৫৩.৮-১০; (হরি) ১.৪৮.৮-১০]

☐ অসিত-দেবল সম্পর্কে মহাভারতের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ বোধহয় এই যে, দেবব্রত ভীষ্ম যখন পিতার বিবাহের জন্য দাস-রাজার কাছে সত্যবতীকে যাচনা করতে গিয়েছিলেন, তখন দাস-রাজা সাহংকারে বলেছিলেন—দেখুন, সত্যবতীকে অনেকেই বিবাহ করতে চেয়েছেন। অসিত-দেবলের মতো মহান ঋষি পর্যন্ত সত্যবতীকে লাভ করার জন্য ভীষণভাবে যাচনা করেছেন আমার কাছে, কিন্তু তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি—

অসিতো হ্যপি দেবর্ষিঃ প্রত্যাখ্যাতঃ পুরা ময়া।
সত্যবত্যা ভৃশং চার্থী স চাসীদ্ ঋষিসত্তমঃ॥

[মহা (k) ১.১০০.৮১; (হরি) ১.৯৪.৮১]

☐ মহাভারতে জতুগৃহ-পর্বের পর চিত্ররথ গন্ধর্ব যখন রাজকীয় সিদ্ধিলাভের জন্য বিদ্বান একজন পুরোহিতকে আশ্রয় করতে বলেন, তখন সেই প্রসঙ্গে উপযুক্ত পুরোহিত হিসেবে ঋষি ধৌম্যের নাম করেন। এই ধৌম্যকে দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—

যবীয়ান্ দেবলস্যৈষ বনে ভ্রাতা তপস্যতি।

[মহা (k) ১.১৮৩.২; (হরি) ১.১৭৬.২]

☐ খাণ্ডবপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নতুন রাজ্য স্থাপিত হবার পর যেসব ঋষিরা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন অসিত-দেবল তাঁদের মধ্যে একজন। যুধিষ্ঠিরের কাছে নারদ-বর্ণিত পিতামহ-সভাতেও এই ঋষিকে জৈগীষব্য মুনির সঙ্গে একত্র দেখা গেছে।

[মহা (k) ২.৪.১০; ২.১১.২৪; (হরি) ২.৫.৯
শ্লোকের পর পাদটীকায় ধৃত পাঠ; ২.১১.২৩]

☐ মহাভারতে দ্যূতপর্বে পাঞ্চালী দ্রৌপদীর তর্কযুক্তি এবং মনস্বিতায় ধৃতরাষ্ট্র যখন সকল পাণ্ডবদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন, তখন কর্ণ বলেছিলেন—একজন স্ত্রীলোক শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের বাঁচাল—

স্ত্রীগতিঃ পাণ্ডুপুত্রাণাম্।

এই কথার উত্তরে ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে ঋষি দেবলের বাক্য উদ্ধার করে বলেছিলেন—এই পৃথিবীতে তিনটি জ্যোতিপদার্থ নিয়েই পুরুষের জীবন—তার একটি হল সন্তান, দ্বিতীয় হল কর্ম এবং তৃতীয়টি বিদ্যা—

ত্রীণি জ্যোতীংষি পুরুষ ইতি বৈ দেবলোঽব্রবীৎ।

ভীম কথিত এই তিনটি জ্যোতিঃ পদার্থ পূর্বোল্লিখিত পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে অসিত-দেবলের উপলব্ধ তিনটি সামের (যা তিনটি আশা পূরণ করে) সঙ্গে তুলনীয় কিনা, তা পণ্ডিতদের বিবেচ্য। *[মহা (k) ২.৭২.৫; (হরি) ২.৬৯.৫]*

☐ কৃষ্ণের ভগবত্তা এবং তুরীয় মাহাত্ম্যের একজন প্রবক্তা হিসেবেও অসিত-দেবল বিখ্যাত ছিলেন বলে মনে হয়। প্রথমত পাণ্ডবদের বনবাসের সময় কৃষ্ণ যখন কাম্যক-বনে আসেন, তখন দ্রৌপদী তাঁর 'দয়িতা সখী' হওয়া সত্ত্বেও অসিত-দেবলের বাক্য উদ্ধার করে বলেছিলেন—সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তোমাকে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের স্বরূপতায় বর্ণনা করেছেন ঋষি অসিত-দেবল। এই ঋষি তোমাকে সর্বলোকের স্রষ্টা প্রজাপতি বলেও নির্ণয় করেছেন—

স্রষ্টারং সর্বলোকানাম্ অসিতো দেবলোঽব্রবীৎ।

☐ দ্রৌপদীর এই উচ্ছ্বাস-বাক্য থেকেই শুধু নয়, মহাভারতের অন্য দুটি উল্লেখ থেকেও মনে হয় যে, নরলীল মনুষ্যমূর্তি কৃষ্ণকে যাঁরা তাঁর জীবৎকালেই সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের স্বরূপে দেখেছিলেন, অসিত-দেবল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভগবদ্‌গীতার বিভূতিযোগে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শনের পূর্বেই বিস্ময়-বিমূঢ় অর্জুনও কৃষ্ণকে যখন পরব্রহ্ম বলে মেনে নিচ্ছেন, তখন

তিনিও অসিত-দেবলের বাক্যই উদ্ধার করছেন। পুনরায় ভীষ্মপর্বে দুর্যোধনের কাছে বাসুদেব-কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করার সময় ভীষ্মও সেই অসিত-দেবলের নাম উচ্চারণ করে কৃষ্ণকে ব্রহ্মের ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপে সমস্ত দেবতার মূল বলে আখ্যাপন করেছেন—

দেবাস্ত্বৎসম্ভবাশ্চৈব দেবলস্ত্বসিতো'ব্রবীৎ।

এখানে এটাও খুব লক্ষণীয় যে, দেবলের সঙ্গে অসিত-নামটিকে পরপদে স্থাপন করে এই কথা বলা যে, এমনটাই দেবল বলেছেন, ওই যাঁকে অসিত বলা হয়—

দেবলস্ত্বসিতো'ব্রবীৎ। *[মহা (k) ৩.১২.৫০; ৬.৩৪.১৩ (ভগবদ্গীতা, ১০.১৩); ৬.৬৮.৭; (হরি) ৩.১১.৫১; ৬.৩৪.১৩; ৬.৬৭.৭]*

☐ বনবাসের সময় তীর্থ-পর্যটনের সঙ্গী হিসেবে যুধিষ্ঠির যেসব ঋষিদের পেয়েছিলেন এবং যেসব ঋষিরা তীর্থে যাবার জন্য যুধিষ্ঠিরের অপেক্ষাও করেছিলেন, অসিত-দেবল তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৩.৮৫.১২০, ১২২; (হরি) ৩.৭০.১২০, ১২২]

জয়দ্রথ-বধের জন্য অর্জুন যখন দ্রোণাচার্য এবং অন্যান্য প্রবল-পরাক্রম যুদ্ধবীরদের অতিক্রম করে গেলেন, তখন দুর্যোধন দ্রোণের কাছে এসে বিপন্নতার সমাধান চাইলেন। দ্রোণ কোনো সমাধান দিতে পারেননি, তবে অর্জুনের ভয় থেকে বিমুক্ত হবার জন্য দ্রোণাচার্য গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত একটি সোনার বর্ম দুর্যোধনের বুকে পরিয়ে দিয়ে যাঁদের নামে মন্ত্র পড়ে স্বস্তিবাচন করেছিলেন, অসিত-দেবল ঋষি তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৭.৯৪.৪৫; (হরি) ৭.৮১.৪৫]

মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে আমরা অসিত-দেবলের উপস্থিতি দেখতে পাই। কৌরব-বীরদের অন্ত্যেষ্টি-সংস্কারের পর যেমন আমরা অসিত-দেবলকে যুধিষ্ঠিরের পাশে দেখেছি, তেমনই তাঁকে দেখেছি শরশয়ান ভীষ্মের পাশেও। পরবর্তী সময়ে ভীষ্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে নানা ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছেন, সেখানে জৈগীষব্য মুনির কাছে অসিত-দেবল-এর মোক্ষধর্ম-শিক্ষার সাধারণ খবর পেয়েছি আমরা। কিন্তু ব্রহ্ম-সমাধিলাভের উপায় হিসেবে অসিত-দেবলের প্রশ্ন এবং জৈগীষব্যের উত্তরও ভীষ্মের মুখে উদ্ধৃত হয়েছে জৈগীষব্যাসিত-সংবাদের প্রকারে। ব্রহ্মভাবনার ক্ষেত্রে নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় স্তুতি-নিন্দার উর্ধ্বে উঠে সমস্ত প্রাণীর বন্ধু হয়ে ওঠাটাই যে ব্রহ্মনির্বাণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সেটা অসাধারণ বাগ্মিতায় এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে।

[মহা (k) ১২.২২৯ অধ্যায়; (হরি) ১২.২২৭ অধ্যায়]

বিখ্যাত যেসব ঋষিরা ভগবান বিষ্ণুকে ঋক্মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেই নারদ, পর্বত, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি মুনিদের পংক্তিতে অসিত-দেবলও একজন। *[মহা (k) ১২.২৯২.১৫; (হরি) ১২.২৮৫.১৫]*

মহারাজ দেবরাতের পুত্র রাজর্ষি জনকের সঙ্গে (দৈবরাতির্মহাযশাঃ পপ্রচ্ছ জনকো রাজা) যাজ্ঞবল্ক্যের এক বিস্তারিত কথোপকথন চলে। এইখানে আমরা খবর পাই—মহর্ষি বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের মাতুল হতেন। জনকের পিতা মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যতম পুরোহিত হিসেবে বৃত হন। কিন্তু যজ্ঞের দক্ষিণার অংশ নিয়ে মাতুল বৈশম্পায়নের সঙ্গে তাঁর কিছু বিরোধ তৈরি হয়। এই বিরোধে অসিত-দেবল বৈশম্পায়নের পক্ষে ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য জানিয়েছেন—আমি এই বিরোধে অসিত-দেবলের সম্মতি নিয়ে তাঁর সামনে দক্ষিণার অর্ধেক মাতুল বৈশম্পায়নকে দিয়ে অন্য অর্ধেক নিতে স্বীকৃত হই। এই কাহিনীতে ঋষি হিসেবে অসিত-দেবলের সম্মান আমরা বুঝতে পারি।

[মহা (k) ১২.৩১৮.১৭-২০; (হরি) ১২.৩০৮.১৭-২০]

অসিতা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী মৌনেয় অপ্সরাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন অসিতা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৭]

☐ অসিতা অর্জুনের জন্মোৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.১২৩.৬৩; (হরি) ১.১১৭.৬৭]

অসিতোদ ইলাবৃত বর্ষের একটি সরোবর। এটি মেরুর নিকটে অবস্থিত। মৎস্য পুরাণে অবশ্য এটি সিতোদ সরোবর নামে চিহ্নিত হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. ২.২.২৫; মৎস্য পু. ১১৩.৪৬]

অসিপত্রবন আঠাশটি নরকের মধ্যে একটি। বৈতরণী নদী পার হয়ে যমলোকে যাওয়ার পথে

অসিপত্রবনে প্রবেশ করতে হয়। কল্পনা করা হয়েছে যে, এই বনরূপী নরকে অবস্থিত গাছগুলির পাতা অসি বা তলোয়ারের মতো ধারালো। সে কারণেই এর নাম অসিপত্র বন।

এখানে প্রবেশ করা মাত্রই সমস্ত দেহ ধারালো পাতার আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

[মহা (k) ১২.৩২১.৩২; (হরি) ১২.৩১২.৩২;
ভাগবত পু. ৫.২৬.৭, ১৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৮.৮৪; ৩.২.১৪৯, ১৭৩;
মৎস্য পু. ১৪১.৭০;
বায়ু পু. ১০১.১৭০, ৫৬.৭৯, ১১০.৪৩;
বিষ্ণু পু. ১.৬.৪১, ২.৬.৩]

অসিপর্ণিনী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে ইনি মৌনেয় অপ্সরাদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৬]

অসিপা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৫]*

অসিলোমা$_{১}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব। *[মহা (k) ১.৬৫.২৩;*
(হরি) ১.৬০.২৩; বায়ু পু. ৬৮.৯; ৬৭.৮১;
মৎস্য পু. ৬.২০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৯]

☐ মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অসিলোমা মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। মহিষাসুরের সৈন্যরা দেবী দুর্গাকে আক্রমণ করলে অসিলোমা প্রভৃতি অসুরবীর দেবী দুর্গার হাতে নিহত হয়েছিলেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৮২.৪১]

অসিলোমা$_{২}$ দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পুত্র শম্ভু। শম্ভুর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অসিলোমা।

[বায়ু পু. ৬৭.৮১]

অসুখদ বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৮; (হরি) ১৩.১২৭.১০৮]

অসুর সাধারণত ভাবা হয় যে, অসুর মানেই প্রাচীন আর্যজাতির চরমতম শত্রু এবং হয়তো বা তাঁরাই ভারতবর্ষের আদিতম অধিবাসী ছিলেন, যাঁদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে দেবতারা (সুর) তাঁদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিস্তার ঘটান। পৌরণিকেরা অনেকে বলেছেন যে, প্রথমত অসুরেরা দেবতাদের জ্ঞাতি এবং বন্ধু ছিলেন—

অসুরা যে তদা তেষাম্ আসন্ দায়াদ-বান্ধবাঃ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (নবভারত) ৩২.১১]

☐ বস্তুত প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতেও এই তথ্য পরিষ্কার যে, বৈদিক পুরুষেরা নিজেদের পরিচয় দিতেন দেবতা বলে এবং প্রায় সমগোষ্ঠীয় অন্যদের বলতেন অসুর। হয়তো বা একমাত্র যজ্ঞকর্মই এই পার্থক্যের কারণ ছিল বলে এমনটাও বলা হয়েছে যে দেবতারা যজ্ঞ করতেন বলেই তাঁরা দেবতা—

যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ।

বৈদিক সাহিত্যের প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম বৈদিক যুগে অসুর-শব্দটা যথেষ্টই মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল এবং প্রথম শ্রেণীর সমস্ত দেবতা—

মরুৎ, দ্যৌ, ইন্দ্র, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পূষা, সবিতা অথবা পর্জন্য—সবাইকেই সম্মানসূচক 'অসুর' শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে।

[ঋগ্‌বেদ ১.৬৪.২; ১.৩১.১; ১.৫৪.৩;
২.২৭.১০; ১.১১০.৩; ৫.১২.১; ৫.৪২.১;
৫.৫১.১১; ৫.৪৯.২; ৫.৬৩.৩]

☐ বেদে একশো পাঁচ বার অসুর শব্দের প্রয়োগ আছে, সবই প্রায় প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে ব্যবহৃত, শুধুমাত্র পনেরো বার খারাপ অর্থে ব্যবহৃত। পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, এতে বোঝা যায়—যতদিন দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে মিল ছিল, ততদিন অসুর শব্দেরও মর্যাদা ছিল। কিন্তু ক্রমে এই মিল কমতে থাকে এবং শব্দ হিসেবে অসুরের মর্যাদা কমতে কমতে নঞর্থক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ দেবতা বা সুরের উলটো হল অসুর। সুরাসুর-দ্বন্দ্ব বা দেবাসুরের দ্বন্দ্ব শেষে প্রাবাদিক পর্যায়ে পৌঁছায়। ঋগ্‌বেদের বৃত্রাসুর থেকে শম্বরাসুর পিপ্রু কিংবা বর্চী—কারোরই শক্তি কম ছিল না। শম্বরাসুরের দুর্গ ছিল নব্বই থেকে নিরানব্বইটি। বর্চীর অনুগামী যোদ্ধা ছিল লক্ষাধিক। এঁদের পুর-নগর-দুর্গ এবং সেনা ধ্বংস করেই ইন্দ্র পুরন্দর নামে খ্যাত হয়েছেন পুরাণে।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৩০.৭; ২.১৯.৬; ৭.৯৯.৫; ১০.১৩৮.৩]

☐ ঋগ্‌বেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে দেবতা-অসুর। মহাভারত-পুরাণে অসুর-রাক্ষস-দৈত্যদের প্রায়ই রুদ্র-শিবের উপাসক ভক্ত হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রায় সময়েই রুদ্র শিব তাঁদের বর এবং অভয়দাতা।

[ঋগ্‌বেদ ৫.৪২.১, ১১]

☐ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে দেখা যায় যেন

দেবতারা শেষ পর্যন্ত অসুরদের পূর্ণভাবে জয় করতে পেরেছেন এবং সেই কারণেই যেন তাঁদের দেবত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

[ঋগ্বেদ ১০.১৫৭.৪]

☐ শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেবাসুর দ্বন্দ্বই একটি শব্দের জন্ম দিয়েছে। ভ্রাতৃব্য শব্দের সাধারণ অর্থ হল ভাইয়ের ছেলে কিন্তু সামাজিক এবং আইনি ভাবনা থেকে ভাইয়ের ছেলেরা যেহেতু ভূমি-সম্পত্তির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী হন, তাই ভ্রাতৃব্য মানে দাঁড়িয়েছে স্বাভাবিক শত্রু। ভ্রাতৃব্য-শব্দের এই অর্থ অতি প্রাচীনকালে দেবাসুর-দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই যে সূচিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে অথর্ববেদের মধ্যেই। সেখানে অগ্নির কাছে প্রার্থনা—হে অগ্নি। তুমি ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ শত্রুদের ক্ষয়ে সমর্থ, ভ্রাতৃব্য-নাশের শক্তি দাও তুমি—

ভ্রাতৃব্য-ক্ষয়নমসি/ভ্রাতৃব্যচাতনং সে দাঃ স্বাহা।

[অথর্ববেদ (Roth & Whimey) ২.১৮.১; ১০.৯.১]

☐ স্বর্গরাজ্যের অধিকার এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভাবনা থেকেই বৈমাত্রেয় ভাইরা কীভাবে ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ শত্রু হয়ে গেল, তার নমুনা আছে তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে। এই ব্রাহ্মণে একাধিকবার শত্রু অর্থে ভ্রাতৃব্য শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে অসুরদের সম্বন্ধে—

পরাসুরা অভবন্নাত্মনা পরাস্য
ভ্রাতৃব্যোভবতি য এবং বেদ।
তাসু দেবাসুরা অস্পর্ধন্ত তে দেবা অসুরান্
কামদুঘাভ্য আক্ষারেণা'নুদন্ত নুদতে
ভ্রাতৃব্যং কামদুঘাভ্য আক্ষরেণ তুষ্টুবানঃ।

[তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ (Kashi Sanskrit Series) ৫.৬.১৫; ১১.৫.৯; ১২.৩.১৪]

☐ বৈদিককালেই দেবতা এবং অসুরদের শত্রুতা এত গভীরভাবে মানুষের মনে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল যে, পরবর্তীকালে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে দেবতা এবং অসুরদের প্রাথমিক পরিচয় এটাই যে, অসুরেরা দেবতার চিরন্তন-বিরোধী এক গোষ্ঠী এবং তাঁরা দেবতাদের চিরন্তন শত্রু। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণ গ্রন্থে 'যষাঞ্চ বিরোধ শাশ্বতিকঃ', এই সমাস-সূত্রে যাদের মধ্যে শাশ্বতিক বা চিরন্তন বিরোধ—যেমন সাপ আর বেজি, এই দুয়ের সংস্কৃত সমাস করলে ক্লীবলিঙ্গে সমস্ত পদ তৈরি হবে 'অহিনকুলম্'। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে যে, তাহলে দেব এবং অসুরদের এত যে বিরোধ চর্চিত হয়ে আসছে, সেখানেও তো অহি-নকুলের মতোই ক্লীবলিঙ্গান্ত সমাস হওয়া উচিত। তা কিন্তু হয়নি এবং তাতেই বোঝা যায় দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের শত্রুতা নৈমিত্তিক প্রয়োজনে। তাঁরা জাতশত্রু নন।

অনেকেই মনে করেন যে, অসুরেরা প্রাচীনকালের অনার্য জাতি, তাঁরাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী। বৈদিক বৃত্রাসুর কিংবা পৌরাণিক মহিষাসুর এঁরা সব অনার্য জনজাতির রাজা ছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই দেবতাদের যুদ্ধ চলত। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই ভুল এবং ভিত্তিহীন। মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে এটা প্রমাণিত তথ্য যে দেবতারা অসুর, দৈত্য দানবদের বৈমাত্রেয় ভাই। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি কশ্যপের এক স্ত্রী অদিতি, তাঁর গর্ভজাত পুত্রেরা হলেন দেবতা এবং তাঁর অপর স্ত্রী দিতির গর্ভজাত পুত্রেরা দৈত্য, অন্য আর এক স্ত্রী দনুর গর্ভজাতরা হলেন দানব। বস্তুত অসুর শব্দটা, এমনকী রাক্ষস শব্দটাও দৈত্য-দানবদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তিদের ওপর আরোপিত হয়ে গেছে এবং দৈত্য-দানবদের অনেককেই অসুর কিংবা রাক্ষস নামে সম্বোধন করা গেছে।

শুধু মহাভারত ইত্যাদিতে নয়, তার বহু পূর্বে লিখিত সামবেদীয় তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে পরিষ্কার বলা হয়েছে—প্রজাপতি ব্রহ্মার দুই পুত্র— দেবতা এবং অসুর। অসুরেরা ছিলেন বলবান, কিন্তু দেবতারা দুর্বল। সেই দুর্বলতা দূর করার জন্য দেবতারা প্রজাপতির কাছে গিয়েছিলেন। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের প্রতিধ্বনি করে আরও একটা গ্রাহ্য শব্দনিরুক্তি দিয়ে পঞ্চম/ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দের বৈদিক কোষকার যাস্ক লিখেছেন—'সু' অর্থাৎ ভালো জিনিস থেকে সুর বা দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাপতি, সেইজন্যই সুরদের সুরত্ব। আর 'অসু' বা মন্দ জিনিস থেকে প্রজাপতি অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন, তাই অসুরদের অসুরত্ব—

সোর্দেবান্ অসৃজত তৎ সুরানাং সুরত্বমসোর
-সুরান্ অসৃজত তদসুরাণামসুরত্বম্।

[তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ (kashi Sanskrit Series) ১৮.১.২, পৃ. ৩০৩; নিরুক্ত (ক্ষেমরাজ-কৃষ্ণদাস) ৩.৮.১, পৃ. ১৮৯]

☐ পূর্বোক্ত নিরুক্ত-পংক্তির টীকায় 'সু' শব্দের অর্থ করা হয়েছে—প্রজাপতির প্রশস্ত শরীরাংশ থেকে জন্ম হয়েছে সুরদের, আর তাঁর শরীরের অপ্রশস্ত অংশ থেকে জন্ম হয়েছে অসুরদের। এই কথাটার একটা বড়ো সমর্থন পাওয়া যায় বায়ু পুরাণের একটি কথায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রজাপতির জঘন-দেশ থেকে অসুরদের সৃষ্টি, যে স্থান নিরুক্তের ভাষায় 'অ-সু', 'অপ্রশস্ত'। কিন্তু এই পুরাণেরই দ্বিতীয় পংক্তিতে যে কথাটা বলা হয়েছে, সেটা অনেক বেশি বৈদিক পরম্পরাবাহী এবং তার চেয়েও বেশি মানব-তত্ত্বের আধুনিক তাৎপর্য্যবাহী। বলা হয়েছে—প্রজাপতি সৃষ্টির তপস্যায় বসলে তাঁর জঘনদেশ থেকে অসুরেরা জন্মালেন এবং তা দেবতাদের আগে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা বলেন 'অসু'—শব্দের অর্থ 'প্রাণ' অর্থাৎ প্রাণ-শক্তি। যাঁদের মধ্যে প্রাণশক্তি বেশি আছে তাঁরাই অসুর, ব্রহ্মার প্রাণশক্তি থেকেই তাঁদের জন্ম—

তত্তো'স্য জঘনাৎ পূর্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ।
অসুঃ প্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রৈস্তজ্জন্মানস্ততো'সুরাঃ॥

অসু শব্দের সঙ্গে অস্ত্যর্থে (আছে অর্থে) র (রন্) প্রত্যয় করলে অসুর হয় অর্থাৎ যাঁদের মধ্যে অধিকতর প্রাণশক্তি আছে তাঁরাই অসুর। আছে বা অস্ত্যর্থে 'র' প্রত্যয় সংস্কৃতে খুব বেশি নেই, কিন্তু যেটুকু আছে তাও মানুষ খেয়াল করেন না যেমন মধু বা মিষ্টত্ব যার মধ্যে আছে, সেটা মধুর, শ্রী (সৌন্দর্য) যার মধ্যে আছে শ্রী-র (শ্রীল), এমনই বহুর (বহুল), অধর।

যাই হোক, বায়ু পুরাণ এই অর্থ বৈদিক পরম্পরায় পেয়েছে, কেননা আগেই জানিয়েছি যে, অসুর-শব্দের তাৎপর্য্যের মধ্যে এই প্রাণশক্তি-সম্পন্নতার কারণ থাকাতেই দেবতারাও অনেক সময়েই অসুর নামে চিহ্নিত হয়েছেন। একটি ঋক্‌মন্ত্রে দেবতা-অর্থে ব্যবহৃত অসুর শব্দের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য লিখেছেন—অস্ ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ করা, শত্রুদের যেন উড়িয়ে দেয়, এই অর্থে অস্ ধাতুর সঙ্গে উরন্ প্রত্যয় করে 'অসুর' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। আবার অসু মানে প্রাণ। প্রাণ দেয় বা প্রাণশক্তি দেয়, এটাও অসুর শব্দের অর্থ—

অসুরঃ অসুক্ষেপণে অস্যতি শত্রূন্ ইত্যসুরঃ।
আসক্তরন্। অসূন প্রাণান্ রাতি দদাতি ইত্যসুরঃ॥

[ঋগ্‌বেদ ১.৩৫.৭]

☐ অসুর অর্থ প্রাণশক্তিসম্পন্ন—
সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

ফলত অসুর মানেই দেবতা, সেই অসুর-শব্দ দেবশত্রু অসুরদের সমানার্থবোধক সংজ্ঞা সে-কথা সবচেয়ে বেশি প্রমাণ হয় ইরানীয় প্রাচীন দেবতা বরুণের বিশেষণ থেকে। প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় 'অসুরো মহৎ' বরুণ হলেন Ahura Mazda অহুর মজ্‌দা। পরবর্তী কালে অসুরদের এই সম্মানিত সংজ্ঞা ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় 'বিষমচ্ছেদ'-এর প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে। আসলে ঋগ্‌বেদে অসুর শব্দ আছে, কিন্তু দেবতা-অর্থে সুর-শব্দ কোথাও নেই। অতএব 'অসুর' নামে যে মৌলিক শব্দটি বেদের প্রথম ভাগে তৈরি হয়েছিল, সেটা থেকে 'অ' বাদ দিয়ে সুর শব্দটি তৈরি হল দেবতার বাচক হিসেবে এবং সুর-শব্দটির প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নঞর্থক 'অ'-বর্ণ দিয়ে অসুর হয়ে গেল দেবদ্রোহী এক বিলক্ষণ জাতি।

কিন্তু অসুরেরা যতই দেবদ্রোহী শত্রুপক্ষ হিসেবে গণ্য হোন, দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের ভ্রাতৃত্বের একান্ত আত্মীয় সম্পর্কটুকু বেদ-ব্রাহ্মণ এবং পুরাণ কোথাও অস্বীকৃত হয়নি, ঠিক যেমন অস্বীকৃত হয়নি তাঁদের পারস্পরিক শত্রুতাও। বিশেষত অসুররাও যে পূর্বকালে দেবতার সম্মান পেতেন, সেটা অমরকোষে অসুর শব্দের পর্যায়-শব্দগুলির মধ্যে 'পূর্বদেব' শব্দটি থেকেই সপ্রমাণ হয়। অর্থাৎ এঁরা পূর্বে দেবতা ছিলেন পরে অসুর বলে চিহ্নিত হয়েছেন। এ-কথা প্রমাণ হবে রামায়ণ থেকেও। রামায়ণে কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দিতির পুত্র জন্মের কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হল—দিতির পুত্রেরা হলেন দৈত্য। পূর্বে সসাগরা পৃথিবী দৈত্যদেরই আয়ত্ত ছিল—

তেষামিয়ং বসুমতী পুরাসীৎ সবনার্ণবা।

এতে বোঝা যায় দেবতারাই দৈত্যদের আপন অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এতে আরও বোঝা যায় যে, অসুররা আর্য-জনজাতির চিরন্তন শত্রু কোনো অনার্য জনজাতিও নন, কিংবা নন ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী—আর্যরা যাঁদের দেশভ্রষ্ট করেছিলেন। অসুররা এইরকম বিলক্ষণ কোনো জাতি নন, মহাভারত-পুরাণ কিংবা রামায়ণ অনুসারে দেবতা এবং অসুর এক পিতার ঔরসজাত বৈমাত্রেয় সন্তান। প্রজাপতি

ব্রহ্মার পুত্র কশ্যপের দুই বিখ্যাত স্ত্রী হলেন অদিতি এবং দিতি। অদিতির গর্ভজাত পুত্রেরা হলেন দেব আর দিতির গর্ভজাত পুত্রেরা হলেন দৈত্য। কশ্যপেরই আর এক স্ত্রী দনুর গর্ভজাত পুত্রেরা হলেন দানব।

মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে দেবাসুর-দ্বন্দ্ব একটা পরিচিত বিষয়। সেই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির সময় থেকে অসুরেরা দেবতাদের প্রতিস্পর্ধী হয়ে যুদ্ধ করেছে, এ-কথা বহুবার পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে একমাত্র মৎস্য পুরাণে দেবাসুর যুদ্ধের একটা ক্রমিক ইতিহাস-পর্যায় তৈরি করা হয়েছে, তা নইলে সব জায়গায় বিশেষ বিশেষ সংগ্রাম-বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরের প্রসঙ্গে বলা হল—মহিষাসুর আর ইন্দ্রের শত্রুতাকে কেন্দ্র করে একশো বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল—

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষে'সুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥

রামায়ণ-মহাভারত থেকে দেবাসুর-যুদ্ধের শতেক উল্লেখ না দেখিয়ে মৎস্য পুরাণ থেকে জানাই যে, সব মিলিয়ে দেবাসুর যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল অন্তত বারো বার। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রাজত্বকালে দেবাসুর-যুদ্ধ ভয়ঙ্কর মাত্রায় চলে গেলে ভগবান শ্রীহরিকে অবতার গ্রহণ করতে হয়েছিল—এই কাহিনীর প্রসঙ্গে মৎস্য পুরাণ বলেছে—সম্পত্তির উত্তরাধিকার-লাভের জন্য দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে অন্তত বারো বছর যুদ্ধ হয়। প্রথম বিরাট যুদ্ধটা হয় নৃসিংহ অবতারের কালে; দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তখন দেবতাদের স্বর্গপুরী অধিকার করে নিয়েছেন। তারপরেই নৃসিংহদেবের অবতরণের পর দেবতারা অসুরদের যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গ অধিকার করে নেন। এরপরের যুদ্ধ আরম্ভ হয় দৈত্যরাজ বলির সময়ে। অবশেষে অবতারের স্বরূপে বামনদেব অবতীর্ণ হলেন বলি-বন্ধনের জন্য। তৃতীয়বারের সংঘর্ষে নিহত হন। হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাক্ষ। চতুর্থবার অমৃতমন্থনের সময় যে দেবাসুর যুদ্ধ হয় তাতে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ দেবতাদের কাছে পরাস্ত হন। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনের সময় যে পঞ্চম যুদ্ধ হয়, তাতে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ দেবতাদের কাছে পরাস্ত হন। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনের সময় যে পঞ্চম যুদ্ধ হয়, সেই তারকাময় যুদ্ধে বিরোচন নিহত হন। দৈত্যরাজ বলি কিন্তু এই বিরোচনের পুত্র, তিনি প্রহ্লাদের নাতি। তাঁর কথাটা আগে বলা হয়েছে ভগবদবতার বামনদেবের মর্যাদায়। ষষ্ঠ দেবাসুর যুদ্ধে আড়ীবক নিহত হন, সপ্তম যুদ্ধ ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে, এই যুদ্ধে শেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন মহাদেব। অষ্টম যুদ্ধে অন্ধকাসুর-হত্যাতেও মহাদেবের বড়ো ভূমিকা ছিল। নবম দেবাসুর-যুদ্ধে বৃত্রাসুর নিহত হন। দশম হলাহল নামক দেবাসুর দ্বন্দ্বে ঘোরাসুরের মৃত্যু হয়; একাদশতম যুদ্ধে বিপ্রচিত্তি মারা যান ইন্দ্রের হাতে আর দ্বাদশ দেবাসুর যুদ্ধ কোলাহল নামে পরিচিত। এই বারো বার দেবাসুর সংগ্রাম নথিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য পুরাণ একটা বড়ো তথ্য দিয়ে বলেছে যে, একমাত্র দৈত্যরাজ বলির সময়ে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের একটা বিলক্ষণ সখ্য তৈরি হয়েছিল।

[মৎস্য পু. ৪৭.৩৪-১২৭]

☐ অসুরদের সম্বন্ধে আর একটা খুব বড়ো তথ্য হল—দেববিরোধী হলেও তাঁরা অনেকেই কিন্তু আর্যভাবনাতেই তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধন করেন। ঐহিক সম্পত্তিলাভ করার জন্য, দেবতাদের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য, ত্রিভুবনের অধীশ্বর হয়ে জীবন কাটানোর জন্য, অমরত্ব লাভের জন্য, এমনকী বরদ সিদ্ধিদাতা পরম দেবতাকেও অতিক্রম করার জন্য অসুর, দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসেরা অনেক তপস্যা করেছেন। যাঁদের তুষ্ট করার জন্য তাঁরা তপস্যা করতেন, তাঁরা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একজন। এঁদের মধ্যেও আবার বিষ্ণু ততটা নন, বরদানের ক্ষেত্রে প্রধান জায়গায় আছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা—দৈত্য-দানব, অসুর-রাক্ষসদের তিনি এক পিতামহ। আর বরদাতা হিসেবে অসুরদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা হলেন শিব।

তবে সবার আগে এটাই খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, অসুর কিন্তু একটা সাধারণ generic নাম। দৈত্য, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, কবন্ধ অনেকেই অসুর নামেও পরিচিত এবং এটা উল্লেখ করতেই হবে যে, শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে অসুরদের সঙ্গে রাক্ষস-শব্দটা একত্র উচ্চারিত হয়েছে একাধিক বার, যদিও দেবাসুর যুদ্ধের মতো প্রতিস্পর্ধার গুরুত্ব যেসব জায়গায় আছে, সেখানে রাক্ষসদের উল্লেখ নেই।

কিন্তু যজ্ঞ করার সময় দেবতারা অসুর-রাক্ষসদের কাছ থেকে ভয় পাচ্ছেন—

তে অসুর-রাক্ষসেভ্য আসঙ্গাদ্ বিভয়াঞ্চক্রুঃ।

—এখানে একত্রে ব্যবহৃত অসুর-রাক্ষস দ্বন্দ্বসমাসে বহুবচনে লিখিত হলেও এই শতপথ ব্রাহ্মণেই দ্বন্দ্বসমাসের দ্বৈত চরিত্র নষ্ট হয়ে গেল, মানে দাঁড়াল—অসুরও যা, রাক্ষসও তাই।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১.২.১.৬; ১.২.৪.১৭; ৬.৮.১.১৪]

☐ মহাভারতের প্রজাসৃষ্টির অধ্যায়ে অসুর-দানবদের সৃষ্টির বিষয়ে যা বলা হয়েছে, সেটা একটা পৌরাণিক পরিকাঠামো। সেখানে প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দৈত্যেরা সবাই জন্মেছিলেন, এমন কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, হিরণ্যকশিপু নামে দিতির একটি মাত্র পুত্র জন্মেছিল—

এক এব দিতেঃ পুত্রো হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ।

লক্ষণীয়, এখানে হিরণ্যকশিপু থেকে তাঁর পুত্র-পৌত্রের অনুক্রমে দিতির পুত্র দৈত্যদের একটা বংশপরম্পরা তৈরি করা হয়েছে। তাতে হিরণ্যকশিপুর পাঁচ ছেলের মধ্যে সবার বড়ো হলেন প্রহ্লাদ, তারপর সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি এবং বাস্কল। জ্যেষ্ঠ প্রহ্লাদের বংশধারায় জন্মালেন বিরোচন, কুম্ভ এবং নিকুম্ভ। বিরোচনের একমাত্র পুত্র বলি, যাঁর জন্য ভগবান শ্রীহরিকে বামন অবতার গ্রহণ করতে হয়েছিল। বলির পুত্রও একই রকম বিখ্যাত। তাঁর নাম বাণ, কিন্তু দৈত্য হলেও তিনি অসুর পদবীতে তিনি বেশি বিখ্যাত, তাকে বাণাসুর বলেই বেশি ডাকা হয়; মহাভারত তাই বলেছে—বাণো নাম মহাসুরঃ। বাণাসুর মহাদেবের ভক্ত অর্থাৎ তিনি রুদ্রোপাসক ছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁকে মহাকাল বলে ডাকা হয়েছে—

রুদ্রস্যানুচরো শ্রীমান্ মহাকালেতি যং বিদুঃ।

মহাকাল কিন্তু ভগবান শিবের অন্যতম একটা নাম, সেই নামের সঙ্গে বাণাসুরের এই সাম্য দেবতা এবং অসুরের পার্থক্য ভুলিয়ে দেয়।

মহাভারত দানবদের নাম বলেছে কশ্যপ প্রজাপতির অন্যতরা পত্নী দনুর পুত্র হিসেবে। তাঁরা প্রথমেই সংখ্যায় চল্লিশ জন। বিপ্রচিত্তি তাঁদের মধ্যে সবার বড়ো এবং অন্যেরা হলেন যথাক্রমে—মহাযশ, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জয়, দানব, অয়ঃশির, অশ্বশির, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান, কেতুমান, চস, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, মহাবল, একপাৎ, একচক্র, বিরূপ, অক্ষ, হর, অহর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য এবং চন্দ্রমা।

শেষের দুজন দানব-নাম কিন্তু সূর্য এবং চন্দ্র এবং এই নাম দেখেই মহাভারতে মন্তব্য করতে হয়েছে যে, এই সূর্য এবং চন্দ্রমা কিন্তু দেবতা হিসেবে মান্য সূর্য-চন্দ্র থেকে আলাদা। অর্থাৎ এঁরা দেবতা সূর্য-চন্দ্র নন, এঁরা দানব সূর্য-চন্দ্র—

অন্যৌ তু খলু দেবানাং সূর্যাচন্দ্রমসৌ স্মৃতৌ।
অন্যৌ চ নবমুখ্যানাং সূর্যাচন্দ্রমসৌ তথা।।

আমরা অবশ্য ইতিহাস পুরাণে দেবতা সূর্য-চন্দ্রের যত কীর্তিকলাপ দেখেছি, দানব সূর্য-চন্দ্রের তেমন কোনো কথা-কাহিনী শুনিনি। তাহলে কী ব্যাপারটা এইরকম যে এঁরা দেবতাও বটে দানবও বটে; নাকি এইরকম যে, দৈত্য-দানবেরা যখন স্বর্গরাজ্য দখল করে নিতেন, তখনও আলোক-বিকিরণের দায়িত্বটা এঁদেরই থাকত।

মহাভারত আরও দশজন দনুপুত্র দানবের নাম করেছে, তাঁদের নাম হল—একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপি, শত্রুতপন, শঠ, গবিষ্ঠ, বনায়ু এবং দীর্ঘজীহ্ব।

কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা সিংহিকার গর্ভে চারজন অসুরপ্রতিম পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে এবং জ্যেষ্ঠ হলেন রাহু। যিনি চন্দ্র এবং সূর্যকে উৎপীড়ন করেন; দ্বিতীয় হলেন সুচন্দ্র, তৃতীয় চন্দ্রহন্তা এবং চতুর্থ চন্দ্রপ্রমর্দন। রাহুর পরবর্তী তিনজন সৈংহিকেয় অসুরদের নামের সঙ্গে চন্দ্রবিরোধিতার মাত্রা যোগ হওয়ায় (এমনকী সুচন্দ্র নামটাও দুশ্চন্দ্র হওয়ার কথা কেননা মহাভারতের বহু জায়গাতেই দুর্যোধন সুযোধন হয়েছেন), এগুলি রাহুরই বিশেষণ বলে মনে হয়।

কশ্যপের আর এক স্ত্রী দক্ষকন্যা ক্রোধার গর্ভেও অনেক-রাক্ষসের মতো পুত্র হয়েছিল। তবে এঁদের নাম খুব 'ডিফাইনড' নয়। তাঁদের প্রধান চারজনের নাম গণ, ক্রোধবশ, ক্রূরকর্মা এবং অরিমর্দন।

কশ্যপের ঔরসে আর এক দক্ষকন্যা দনায়ুর

গর্ভেও চার অসুর পুত্রের জন্ম হয়েছিল, যাঁদের নাম বিক্ষর, বল, বীর এবং বৃত্র।

দক্ষের আর এক কন্যা ছিলেন কালা (কালকা)। কশ্যপের ঔরসে তাঁর গর্ভে যমের মতো সাংঘাতিক বলবান কতগুলি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা সকলেই কালকেয় দৈত্য নামে প্রসিদ্ধ। এই কালকেয় দৈত্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চারজন। তাঁদের নাম বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা এবং ক্রোধশত্রু।

এইরকম একটা অধর্মবৃত্তি অসুর-দৈত্য-দানবদের বংশপরম্পরা শোনানোর পর মহাভারত একটা সাধারণীকরণের মাধ্যমে বলছে—মনু ইত্যাদি আদিপুরুষেরা যখন পরস্পর পরস্পরের খাবার খেয়ে নিচ্ছিলেন তখন, সেখান থেকেই অধর্মের জন্ম হয়। সেই অধর্মের স্ত্রী ছিলেন নির্ঋতি। সেই নির্ঋতির গর্ভেই বহুতর রাক্ষসের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের স্বভাব ভয়ঙ্কর এবং সদা-সর্বদা পাপ কাজ করেন তাঁরা। নির্ঋতির গর্ভে আর তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের নাম ভয়, মহাভয় এবং মৃত্যু।

পণ্ডিতদের মতে অধর্ম-নির্ঋতি, কিংবা ভয়-মহাভয়, এগুলি 'অ্যালিগোরিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন'। মনুও এখানে জীবমাত্র। আর পরস্পর পরস্পরের খাবার খেয়ে নেওয়াটা সৃষ্টির আদিতে সেই 'কেওটিক' অবস্থার নির্দেশ করে যা প্রাচীন পুরাণগুলিতে বলা আছে।

[মহা (k) ১.৬৫.১৭-৩৮; ১.৬৬.৫৩-৫৫;
(হরি) ১.৬০.১৭-৩৮; ১.৬১.৫৩-৫৫]

□ আমরা এখানে বৈদিককাল থেকে মহাকাব্যে নেমে আসা অসুর-দানবদের বিস্তীর্ণ পরিচয় দিচ্ছি না। এক অর্থে তাঁরা দেবতাদের থেকেও অনেক বেশি প্রথিত। বৃত্র, বল, শম্বর, নমুচি, পিপ্রু—শক্তি-ক্ষমতায় এঁরা কেউ দেবতাদের চাইতে কম ছিলেন না এবং বৈদিককালেই তাঁদের নাম বার বার এসেছে দেববিরোধী প্রধান শত্রু হিসেবে। একই ভাবে মহাকাব্য-পুরাণে হিরণ্যকশিপু, বিপ্রচিত্তি, বলি, বাণ, নরকাসুর কিংবা রাবণ—এঁরা কেউ জন্মগতভাবে হীন নন, আর যুদ্ধ-ক্ষমতায় ইন্দ্র ইত্যাদি মহান বৈদিক দেবতাকুলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তাঁরা। তাঁদের বশে আনার জন্য দেবতাদের বারবার যেতে হয় ব্রহ্মার কাছে। তিনি আবার তাঁদের নিয়ে কখনো শরণাপন্ন হন বিষ্ণুর, কখনো বা শিবের। আমাদের এটাও ধারণা—বেদ-উপনিষদের উত্তর কালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তির যে বিরাট মাহাত্ম্য তৈরি হয়, সেখানে বহুপ্রথিত অসুর-দানবদের চূড়ান্ত শক্তি-ক্ষমতাই বিপ্রতীপভাবে তাঁদের মাহাত্ম্য তৈরি করেছে। বিশেষত অনেক সময়েই এই সব অসুর-দানব-দৈত্যেরা উপরি-উক্ত ত্রিমূর্তির একতমের আশীর্বাদে পুষ্টি-বৃদ্ধি লাভ করেছেন এবং তাতে বৈদিক দেবতা-কুল ইন্দ্র-যম-বরুণেরা অপ্রতিভ হয়ে গেছেন দানব-দৈত্যদের কাছে। অবশেষে আপন প্রশ্রয়ে বর্ধিত দানব-দৈত্যদের বধ করার জন্য বিষ্ণু তাঁর সহায়ক ভূমিকা থেকে বারবার অবতার গ্রহণ করেছেন। ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখলে পরে অসুর-রাক্ষস, দৈত্য-দানবেরা ত্রিমূর্তির মহিমা-প্রকাশে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মহাকাব্য-পুরাণে যত অসুর রাক্ষস-দৈত্য-দানবদের খবর পাওয়া যায়, তাতে এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ক্ষমতা, বল, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং রাজৈশ্বর্য্য কোনো দিকেই এঁরা দেবতাদের থেকে কম ছিলেন না। সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁদের সঙ্গে দেবতাদের একটা সমস্থানীয়তা আছে। রামায়ণে রাম এবং খরের পুত্র মকরাক্ষের যুদ্ধ দেখতে অন্তরীক্ষ-লোকে যাঁদের একত্র সমবেত হতে দেখছি, সেখানে দেবতাদের সঙ্গে দানবদেরও একসঙ্গে দেখছি—

দেব-দানব-গন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চ মহোরগাঃ।

পুনরায় সেই রামায়ণেই জননী কৌশল্যা যখন বনবাসে গমনোদ্যত রামচন্দ্রের শুভকামনা করছেন তখন বলেছেন—তুমি মুনির বেশে বনচারী হলে দেবতা এবং দৈত্যেরা সকলেই যেন তোমার নিয়ত সুখ-বিধান করে—

তথা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ ভবন্তু সুখদাঃ সদা।

দেবতার সঙ্গে অসুর দানব এবং দৈত্যের ভাবগত নৈকট্য এতটাই যে, মহাভারতের একজায়গায় লক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীর সঙ্গে ইন্দ্র-বাসবের কথোপকথনে শ্রী বলছেন—আগে আমি অসুরদের কাছেই থাকতাম, আমার সত্যবুদ্ধিতে আমি তাদের কাছে থাকাটা ঠিক মনে করেছিলাম বলেই ছিলাম। এখন আমার মনে হয়েছে, তাদের ছেড়ে তোমার কাছেই আসা

উচিত আমার। লক্ষ্মীর কথা শুনে বাসব-ইন্দ্র বললেন—কেমন ছিল তখন দৈত্য-দানবদের চরিত্র যাতে তুমি থাকতে পেরেছিলে সেখানে, আর কী-ই বা হল যাতে তুমি ছেড়ে এলে দৈত্য-দানবদের—

দৃষ্টা কিমিহাগাস্তং হিত্বা দৈতেয়-দানবান্। এর উত্তরে দেবী লক্ষ্মী দৈত্য-দানবদের উত্তম গুণগুলি সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেগুলি আমাদের শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ মানুষদের কাম্য গুণ হিসেবে। পৃথক ভাবে সেগুলি যদি একটাও উল্লেখ না করা যায়, তবে শুধু তাঁদের গুণের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা হয়েছে শ্রীর এই বাক্যটিতে—সত্য, দান, তপস্যা, শৌচ, কারুণ্য, অনিষ্ঠুর বাক্য, মিত্রদের প্রতি দ্রোহহীন আচরণ—এগুলি অসুরদের মধ্যে ছিল। আর নিদ্রা, আলস্য, অসম্প্রীতি, অসূয়া, অবিবেক, কোনো কিছুই ভালো না লাগা, বিবাদ, বিষয়-আকাঙ্ক্ষা—এগুলি তাঁদের মধ্যে ছিল না। আর ঠিক সেইজন্যই দানব-দৈত্যদের সঙ্গে এতকাল ছিলাম আমি—

সাহমেবংগুণেস্বেব দানবেস্ববসং পুরা।

অসুররা শেষ পর্যন্ত এই আর্যপথ ত্যাগ করে অন্যায়-অধর্ম করতে থাকে—সেই অন্যায় অধর্মের যে বিবরণ দিয়েছেন শ্রী, সেগুলি একেবারে সেইরকম যা মহাভারতের অন্য বহু জায়গাতেই আর্যজন-বিগর্হিত আচরণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। লক্ষ্মী আজ দেবতাদের মধ্যে সেই অসমান্য গুণগুলি দেখতে পাচ্ছেন যেগুলি আগে অসুর-দৈত্য-দানবদের মধ্যে ছিল—

নিত্যং দানং তথা দাক্ষ্যমার্জ্জবঞ্চৈব নিত্যদা।
উৎসাহো'থানহঙ্কারঃ পরমং সৌহৃদং ক্ষমা॥
সত্যং দানং তপঃ শৌচং কারুণ্যং বাগনিষ্ঠুরা।
মিত্রেষু চানভিদ্রোহঃ সর্বং তেষ্বভবৎ প্রভো॥
নিদ্রা তন্দ্রীরসম্প্রীতিরসূয়াথানবেক্ষিতা।
অরতিশ্চ বিষাদশ্চ স্পৃহা চাপ্যবিশন্ন তান্॥
সাহমেবংগুণেম্বেব দানবেম্ববসং পুরা।
প্রজাসর্গমুপাদায় নৈকং যুগবিপর্য্যয়ম্॥
ততঃ কালবিপর্য্যাসে তেষাং গুণবিপর্য্যয়াৎ।
অপশ্যং নির্গতং ধর্ম্মং কামক্রোধবশাত্মনাম্॥

[রামায়ণ ৬.৭৯.২৫; ২.২৫.১৭;
মহা (k) ১২.২২৮.২৭-৮১; *(হরি)* ১২.২২৫.২৭-৮০*]*

☐ অসুর-রাক্ষস, দৈত্য-দানবেরা অনেক সময়েই দেবতাদের কথায় স্থাপিত হলেও এটা খেয়াল করার মতো বিষয় যে, দেবরাজ ইন্দ্রের মতো তাঁদের কোনো সর্বকালীন একক রাজা বা অধিপতি ছিলেন না। আমরা কালে কালে এক-একজন দানবেন্দ্র, দৈত্যেন্দ্র কিংবা অসুররাজ, অসুরাধিপকে দেখতে পাই, যাঁরা এক-একটি বিশেষ সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে ওঠেন। সমকালীন সময়ের বিধি, নিয়ম, শৃঙ্খলা, যেগুলিকে এক কথায় ধর্ম বলা হয়েছে—অসুর-রাক্ষস কিংবা দৈত্য-দানবেরা তার বিরোধী। অর্থাৎ নিয়ম-নীতি, ধর্মকে মেনে নিতে পারছেন না বলেই তাঁরা অসুর—

তং ধর্মম্ অসুরাস্তাত নামৃষ্যন্ত জনাধিপ।

ধর্মকে মানেন না বলেই তাঁদের মধ্যে যে অসুর-ভাব তৈরি হয়, সেই অসুর-ভাবের প্রধান লক্ষণই হল—অহঙ্কার, দর্প, ক্রোধ, মোহ। এগুলিই তাঁদের এক-এক জনকে এক-এক সময়ে প্রবল করে তুলেছে এবং মহাভারত-পুরাণ-রামায়ণ ঘোষণা করেছে—তারপর এই সময়ে হিরণ্যকশিপু, এই সময়ে হিরণ্যাক্ষ, এই সময়ে বলি, এই সময়ে দানব ত্রিপুর, তারকাসুর, বাণাসুর, মহিষাসুর, নরকাসুর কিংবা রাবণ প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে উঠলেন। ইন্দ্রের মতো প্রবল পরাক্রান্ত দেবরাজও এঁদের সাহঙ্কর অভ্যুত্থানের সময়ে অসহায় হয়ে স্বর্গচ্যুত হন। তখন অন্তরীক্ষ-লোকে আবার মন্ত্রণা শুরু হয়, অশুভ আসুরী শক্তিকে দমন করে শৃঙ্খলা বা ধর্মের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,

অথবা মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

অসুর-দৈত্যদের বাসস্থান হিসেবে পাতালের নাম আসে প্রায়শই। মহাভারত রামায়ণ-পুরাণে অসুরদের স্থায়ী ঠিকানা পাতালই, যদিও পাতাল বলতে পণ্ডিতেরা অনেকেই ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক বোঝেন। গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখেছেন—

'পাতাল' শব্দ পুরাণে ভুবিবর ও দক্ষিণদেশ এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বর্গ পার্বত্যপ্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের অনেক উচ্চে অবস্থিত এই জন্য স্বর্গ উচ্চ ভূমি। পাতাল সমুদ্র নিকটবর্তী নিম্ন ভূমি। আরও এক কারণে স্বর্গভূমি উচ্চ ভূমি বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল। উত্তর দিককে

পুরাণকারগণ উচ্চ দিক বলিয়া মনে করিতেন। উত্তর, উদক, উদীচী প্রভৃতি শব্দ উর্ধ্ববাচক। দক্ষিণ দিকের অপর নাম অবাচী। অবাচী শব্দ অধোবাচক। 'অবাচী' দক্ষিণ দিক অধোদিক্ ইতি ব্যাড়িঃ।

ভাস্করাচার্যের গোলাধ্যায়ে আছে, 'উদগ্‌দিশং
যাতি যথা যথা নরস্তথা তথা
খান্নত মৃক্ষমণ্ডলম্ ॥'

গোলাধ্যায়, চক্রভ্রমণব্যবস্থা॥ অর্থাৎ মনুষ্য যতই উত্তর দিকে যাইতে থাকে নক্ষমত্রমণ্ডল ততই অবনত দৃষ্ট হয়। এই জ্যোতিষিক ব্যাপার হইতে উত্তরদিক যে উর্ধ্বদিক প্রাচীন হিন্দু তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। পুরাণে যে নক্ষত্র বা গ্রহ যত উত্তরে তাহাকে ততই উচ্চে বলা হইয়াছে। ধ্রুব সকল নক্ষত্রমণ্ডলের উপরে। আধুনিক মানচিত্রেও উপর দিকেই উত্তর দিক। পাতাল শব্দ পত্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দ্রব্যাদি উচ্চ হইতে নিম্নেই পতিত হয়। নিম্নদিক বা দক্ষিণ দিককে পাতাল বলা হইত। পাতালের সপ্ত বিভাগ। অতল সর্ব উচ্চে বা উত্তরে এবং পাতাল সর্বনিম্নে বা দক্ষিণে। পাতালপ্রদেশে বহু সুন্দর নদ, নদী, উপবন ও নগর প্রভৃতি আছে পুরাণে এ কথা বলা হইয়াছে। নারদ পাতালের সমস্ত দেশ দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে পাতাল স্বর্গাপেক্ষাও মনোরম।'

'পুরাকালে পাতালে বলি রাজা ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি বলির রাজ্য। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে পাতাল। পুরাণের বর্ণনার এক আশ্চর্য সূত্র এই যে, কোনো শব্দের দুই প্রকার অর্থ থাকিলে উভয় অর্থই গ্রহণীয় এবং দেখা যাইবে যে উভয়ই সত্য। পাতালে নাগগণ থাকে, ইহার এক অর্থ মাটির নীচে সাপ থাকে, অপর অর্থ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নাগজাতির বাস। নাগজাতির রাজা সর্পের রাজা বলিয়া পরিচিত। বাসুকি একজন নাগরাজা ছিলেন। ইতিহাসে বাসুকি সর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পৌরাণিক বলিয়াছেন, পাতাল সকলেরও নীচে সঙ্কর্ষণ আছেন। সপ্ত পাতালের নিম্নতম প্রদেশের নামও পাতাল। ইহা ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ অংশ।'

মহাভারতে অমৃতমন্থনের কাহিনীতে এক জায়গায় পাতালকে অসুরদের বন্ধু—অসুরানাঞ্চ বান্ধবম্—বলে উল্লেখ করা হয়েছে; আর অন্য এক জায়গায় সোজাসুজি অসুরদের বাসস্থান বলেই পাতালকে চিহ্নিত করা হয়েছে—

নাগানামালয়ঞ্চাপি . . . অসুরাণাং তথালয়ম্।

মহাভারতের বনপর্বে নিবাতকবচ নামের অসুরদের শক্তি ক্ষমতা কতটা, সেটা বোঝানোর জন্য দনুর পুত্র ভয়ঙ্কর দানবদের অক্ষমতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে লক্ষণীয় তথ্যটা হল—সেই দানবরা সকলেই পাতালে থাকেন—

পাতালবাসিনো রৌদ্রা দনো পুত্রা মহাবলাঃ।

একই ভাবে দিতির পুত্র দৈত্যদের সঙ্গেও একত্রে দানবদের উল্লেখ করে, তাঁদেরও স্থায়ী আবাসের নাম করা হয়েছে পাতাল বলেই—

অথ তং নিশ্চয়ং তস্য বুদ্ধা দৈতেয়-দানবাঃ।
পাতালবাসিনো রৌদ্রাঃ পূর্বং দেবৈর্বিনির্জিতাঃ॥

আমাদের বিশ্বাস, যে সমস্ত জনজাতীয় মানুষেরা আর্যদের নীতি-নিয়ম-ধর্মের বিরোধী ছিলেন, তাঁদেরই স্থান নির্দেশ করা হয়েছে পাতালে। এই সূত্রে নাগ, দৈত্য, দানব, অসুর সকলেরই নিবাস-স্থল পাতাল; সেখানে তাঁদের ঘর-বাড়ি, পুর-নগর, বন-উপবন সবই আছে—

এতত্তু নাগলোকস্য নাভিস্থানে স্থিতং পুরম্।
পাতালমিতি বিখ্যাতং দৈত্য-দানবসেবিতম্॥

[মহা (k) ১.২১.৭, ১৩; ১.২২.৯; ৩.৪৭.১৩; ৩.২৫১.২২; ৫.৯৯.১; (হরি) ১.১৭.৭, ১৩; ১.১৮.৯; ৩.৪০.১৩; ৩.২০৯.২০; ৫.৯২.১; গিরীন্দ্রশেখর বসু, পুরাণ-প্রবেশ, পৃ. ২১২, ২২১]

☐ পাতালের মধ্যে কতগুলি বিভাগ আছে। সেগুলি নামগুলি হল—অতল, সুতল, বিতল, গভস্তল, মহাতল, শ্রীতল এবং পাতাল। পুরাণভেদে এই নামগুলিরও কোথাও কোথাও ভেদ আছে। সে যাই হোক, এই তলগুলিতে কোন কোন অসুর-দানব থাকেন, তার একটা বিবরণও দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বায়ু পুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। বলা হয়েছে, পূর্বোক্ত তলগুলির প্রথমটিতে অসুরেন্দ্র নমুচির বাসস্থান এবং ওই একই জায়গায় থাকেন শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধ, নিষ্কুলাদ, ভীম ইত্যাদি রাক্ষসেরা। নাগদের মধ্যে শূলদন্ত, লোহিতাক্ষ, শ্বাপদ, ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কালীয়, কম্বল এবং অনেক দানবরা থাকেন এই প্রথম তলে, যার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ।

দ্বিতীয় তলের মৃত্তিকার রঙ পাণ্ডুবর্ণ। সেখানে প্রথমেই দৈত্যরাজ মহাজম্ভের নগর। এখানেই

থাকেন হয়গ্রীব, কৃষ্ণ, নিকুম্ভ, শঙ্খ, গোমুখ এবং নীল রাক্ষস। নাগদের মধ্যে মেঘ, ক্রথন, কুকুপাদ, মহোষ্ণীষ, কম্বল নাগ, অশ্বতর নাগ এবং কদ্রুর ছেলে তক্ষক এই দ্বিতীয় তলে বসতি তৈরি করেছেন।

তৃতীয় তলের মৃত্তিকার রঙ পীতবর্ণ। এখানে থাকেন দৈতেন্দ্র প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, তারক, ত্রিশিরা এবং শিশুমার ইত্যাদি বিখ্যাত দৈত্যরা। রাক্ষসদের মধ্যে চ্যবন, কুম্ভিল, খর, বিরাধ, ক্রূর এবং উল্কামুখ, আর নাগদের মধ্যে হেমক, পাণ্ডুরক, মণিমন্ত্র, কপিল এবং নন্দ এই তৃতীয় তলে থাকেন।

চতুর্থ তলে বাস করেন দানবেন্দ্র কালনেমি, গজকর্ণ, কুঞ্জর, সুমালী, মুঞ্জ, লোকনাথ এবং বৃকবক্ত্র। এখানেই অবশ্য বহুতর পক্ষীদের নিয়ে বাস করেন বৈনতেয়।

পঞ্চম তলকে বলা হয়েছে শর্করাভূমি। এই জায়গাটা বিরাট এবং এখানে বাস করেন দানবেন্দ্র বিরোচন। তাঁর সহচর আবাসিকেরা হলেন বৈদূর্য্য, অগ্নিজিহ্ব, হিরণ্যাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব এবং মহামেঘ রাক্ষস। এই তলে যে নাগগোষ্ঠীর বাস, তাঁদের মধ্যে আছেন কর্মার, স্বস্তিক এবং জয়।

ষষ্ঠতলে বাস করেন দৈত্যপতি কেসরী, সুপর্বা, পুলোমা, মহিষ এবং রাক্ষসরাজ উৎক্রোশ। এখানেই সুরসার পুত্র শতশীর্ষা ও থাকেন এবং থাকেন কশ্যপ মুনির পুত্র নাগরাজ বাসুকি।

সপ্তম তলে মহামতি বলির আবাস। দৈত্যরাজ বলি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সবই অধিকার করে নিয়েছিলেন। তাঁরই খর্ব করার জন্য ভগবান বিষ্ণুর বামন অবতার; তাঁরই আদেশে বলির পাতালে বসবাস করার সিদ্ধান্ত। বিষ্ণুভক্ত বলির শরণাগতিতে বাঁধা পড়ে পাতালদেশে বলির দ্বারদেশ রক্ষা করেন বিষ্ণু। সপ্তম তলে অর্থাৎ এই পাতালেই বলির পাশাপাশি মুচুকুন্দ দৈত্যের মহানগরও অবস্থিত।

এই পাতাল-বর্ণনার মধ্যে দৈত্য-দানব, অসুর-রাক্ষসদের নামগুলি যাই হোক, পুরাণ-ভেদে এই নামগুলি ভিন্ন-ভিন্নও হতে পারে, কিন্তু এই বর্ণনার বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, এঁদের বাসস্থান, পুর-নগর প্রায় সবটাই পাতাল-প্রদেশে, যে প্রদেশকে আধুনিক দৃষ্টিতে আমরা বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে একেবারে লঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি বলে আমরা মনে করি। পাতাল সম্বন্ধে বায়ু-পুরাণের শেষ কথাটি হল—এই পাতালে দৈত্যদের বহুতর নগর আছে, আছে নাগদের আবাস, দৈত্য-দানব এবং রাক্ষসদের পুর-নগর এবং গৃহ দিয়ে পূর্ণ হয়েছে এই দেশ—

অনেকৈর্দিতিপুত্রাণাং সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।
তথৈব নাগনগরৈ ঋদ্ধিমদ্ভিঃ সহস্রশঃ॥
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।
উদীর্ণৈ রাক্ষসাবাসৈরনেকৈশ্চ সমাকুলম্॥

[বায়ু পু. ৫০.১১-৪৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.১৫-৪৬]

☐ অসুরদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল অসুরদের মায়া। অসুর-দৈত্য-দানব-রাক্ষসেরা মায়া জানেন, তাঁরা মায়াবী; মায়াবলে তাঁরা অন্যের রূপ ধারণ করতে পারেন, অদৃশ্য অবস্থায় শত্রুর ওপর অস্ত্রবর্ষণ করতে পারেন—এই ধরনের জাদুশক্তি তাঁদের আছে—এই ব্যাপারটা অসুরদেরই একান্ত নিজস্ব শক্তি এইভাবেই কিন্তু মহাকাব্য-পুরাণে প্রচারিত হয়েছে। প্রকৃতক্ষেত্রে মায়া কিন্তু অসুরদেরই একান্ত বৈশিষ্ট্য বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বরুণ এবং ইন্দ্রও যথেষ্ট মায়া জানতেন। ব্যাপারটা ভালো করে বোঝানোর জন্য Macdonell সাহেবের একটা বক্তব্য অক্ষত নিবেদন করি—

Māyā This term signifies occult power, applicable in a good sense to gods or in a bad sense to demons. It has an almost exact parallel in the English word 'craft', which in its old signification meant 'occult power, magic', then 'skifulness, art' on the one hand and 'deceitful skill, wile' on the other. The good sense of *māyā*, like that of *asura* (which might be rendered by 'mysternous being') is mainly connected with Varuna and Mitra, while its bad sense is reserved for demons.

[A.A Macdonell, vedic Mythology,
p. 24, 156]

☐ লক্ষণীয়, দেবতাদের বিশেষণ হিসেবে দেবত্ববোধক অসুরের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই কিন্তু মায়া

শব্দের প্রয়োগ হয়েছে ঋগ্‌বেদে, যদিও অন্যায়কারী, অধার্মিক অসুররাও কিন্তু হীন অর্থে 'মায়া' বা জাদুকরী শক্তির অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছিলেন। পিপ্রু নামে এক মায়াবী অসুরকে ইন্দ্র ঋজিশ্বা নামে ব্যক্তির সাহায্যে হীনবল করে দিচ্ছেন—এ-কথা ঋগ্‌বেদেই আছে—

দৃঢ়ানি পিপ্রোরসুরস্য মায়িন/
ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাঁ ঋজিশ্বনা।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১৩৮.৩; ১০.১২৪.৫; ৫.৬৩.৩-৭]

□ বৈদিকোত্তর কালে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে অসুর-শব্দটার সঙ্গেই প্রায় সমার্থে মায়াশব্দের প্রয়োগ করে বলা হয়েছে—অসুর মানেই মায়া—মায়েত্যসুরাঃ (উপাসতে); কৌষিতকী ব্রাহ্মণে অসুরদের মায়ায় হরণ করার কথা বলা হয়েছে—অহ্বণাদ্ অসুরমায়য়া। অন্যত্র শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি ব্রহ্মা অসুরদের অন্ধকার এবং মায়া উপহার দিয়েছিলেন—

(প্রজাপতিঃ) তেভ্যঃ (অসুরেভ্যঃ)
তমশ্চ মায়াং চ প্রদদৌ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১০.৫.২.২০; পৃ. ৭৯৫;
কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ২৩.৪;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ২.৪.২.৫]

□ মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে অসুর-রাক্ষসদের মায়াকর্ম একটা স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য। যখনই অসুর-রাক্ষসদের কথা-প্রসঙ্গ এসেছে, তখনই এই কথাটা বলা হয়েছে যে, তাঁরা মায়াবিদ, মায়াবী, তাঁরা কুটিলতার মাধ্যমে আপন কার্য সিদ্ধ করেন। মহাভারত-রামায়ণে যেখানে-যেখানে অসুর-রাক্ষসদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসেছে, সেসব জায়গায় তাঁদের মায়াজালের বৈশিষ্ট্য সব সময় উল্লিখিত হয়েছে, যদিও একই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, দেবতারা তো বটেই, রামায়ণের বানরেরা অনেকেই ইচ্ছানুরূপী রূপ ধারণ করতে পারেন—হরয়ঃ কামরূপিনঃ। হনুমান এবং অঙ্গদের এই বিশেষত্ব তো প্রধানত উল্লেখ্য। মহাভারতে গন্ধর্ব চিত্রসেনের মায়া কিংবা হনুমানের বৃহৎ কায়-পরিমাণ মায়াবলে সৃষ্ট হলেও সেটা দেবত্বের সংকেত তৈরি করে। আর অসুর-রাক্ষসদের আসুরী বিদ্যার সঙ্গে রাক্ষসী মায়া মহাভারতে দেবতাদের মতোই সহজাত বৃত্তি। শব্দগত সাদৃশ্যে এমনও মনে করা হয় যে, মায়া-ব্যাপারটা ময় নামক সেই বিখ্যাত দানবের সৃষ্টি—মায়াশ্চ ময়জা বিভো। রামায়ণেও এই একই কথা বলা হয়েছে—ময়ো মায়ামিবাসুরীম্।

[মহা (k) ১৩.৪০.৪; (হরি) ১৩.৩৫.১৮;
রামায়ণ ৩.৫৪.১৩]

□ মহাভারতে নাগকন্যা উলূপীর গর্ভজাত অর্জুনের পুত্র ইরাবানের সঙ্গে যাঁকে যুদ্ধ করতে পাঠালেন দুর্যোধন, তাঁর নাম আর্যশৃঙ্গি। আসলে আর্যশৃঙ্গি হলেন অলম্বুষ রাক্ষস তিনি এমন এক বীর রাক্ষস, যিনি দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন ভীমের প্রতি শত্রুতাবশত। আর্যশৃঙ্গি নামের এই রাক্ষসটিকে প্রথমেই মায়াবী বলা হয়েছে এবং তিনি 'মায়াস্ত্রে চ বিশারদঃ।' ইরাবানের সঙ্গে আর্যশৃঙ্গির এই যুদ্ধে ইরাবানকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হয়। লক্ষণীয়, ইরাবান নিজেও এই যুদ্ধে মায়া প্রয়োগ করেছেন অনেক কিন্তু রাক্ষসী মায়ার ব্যাপারে মহাভারতে এই ঘোষণাটুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা এই যে, মায়া-ব্যাপারটা রাক্ষসদের সহজাত বৈশিষ্ট্য—

মায়া হি সহজা তেষাং বয়ো রূপঞ্চ কামজম্।

রামায়ণে রাক্ষসী মায়াতে বিচিত্র রূপ গ্রহণ থেকে আরম্ভ করে নানান অতিলৌকিক ঘটনাকে রাক্ষসদের সাধারণ বৃত্তি বলা হয়েছে—তাঁরা সব সময়েই ছলনাময়—

নিত্যং জিহ্মাং হি রাক্ষসাঃ।

মায়াবলে রাক্ষস-অসুর, দৈত্য-দানবেরা কী কী করতে পারেন, তার শত শত উদাহরণ মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে ছড়িয়ে আছে এবং সেই সব মায়া দেবতা ইন্দ্রের চাইতে কম কিছু নয়। মহাভারতের শল্যপর্বে যুদ্ধে ছলনার আশ্রয় নেওয়ার ঔচিত্য প্রসঙ্গে এটাই বলা হয়েছিল যে, দেবতারা মায়াযুদ্ধের মাধ্যমেই অসুরদের জয় করেছিলেন, স্বয়ং ইন্দ্র অসুর বৃত্রকেও বধ করেছিলেন মায়া খাটিয়ে, দৈত্যরাজ বিরোচনকেও বধ করেছিলেন মায়া দিয়ে—

মায়য়া নির্জিতা দেবৈরসুরা ইতি নঃ শ্রুতম্।
বিরোচনস্তু শক্রেণ মায়য়া নির্জিতঃ স বৈ॥
মায়য়া চাক্ষিপত্তেজো বৃত্রস্য বলসূদন।

এই মায়া হয়তো ছলনা কিংবা অন্যায়-যুদ্ধের ইঙ্গিত করছে, কিন্তু এই ছলনা যখন আসুরী বা রাক্ষসী রূপগ্রহণ করছে, তখন অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ

করা, হাত-পা কেটে গেলেও নতুন হাত-পা তৈরি হওয়া, এমনকী মরে গেলে আবার বেঁচে ওঠা- এই সব অদ্ভুত অতিলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে ইচ্ছানুসারে নূতন রূপ ধারণ করা, সৈন্য-সামন্ত সৃষ্টি করা, বিচিত্র অস্ত্র ব্যবহার করা—এমন বহুতর উপদান আছে যেগুলি অসুর রাক্ষসদের মায়া হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.২২.৩-১৬; ৩.১৭১.১৮-৩০; ৩.১৭২.১-১৫; ৩.২৪১.২৩; ৬.৯০.৪৮-৬৫; ৭.১৭৪.২৯; ৭.১৭৫.৫২-১১৪; ৯.৫৮.৫-৬; (হরি) ৩.১৯.৩-১৬; ৩.১৪৩.১-৩০; ৩.১৪৩.৩১-৪৫; ৬.৮৭.৪৮-৬৫; ৭.১৫১.৬ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য খণ্ড ২৫, পৃ. ১৫৩২; ৭.১৫১.৫৫-১১৪; ৯.৫৪.৫-৬; রামায়ণ ১.২৬.১১, ১৬; ৩.৪৪.৩৮; ৩.৪৫.১৬; ৫.৩১.৯, ১২; ৬.১৭.২১, ২৮; ৬.৩১.৬-৭; ৬.৩৩.১৩; ৬.৫০.৪৯, ৫৪; Donald Mackenzie, Indian Myth and Legend, pp. 61-75; W.E. Hale, Asura in Early Vedic Religion, 1-37, 135-145, 170-182; Alain Danielou, The Myths and Gods of India, pp. 141-143]

অসুরথ যদুবংশ ধ্বংসের সময় যখন যাদবরা নিজেরাই নিজেদের আক্রমণ করলেন, সেইসময় অসুরথকে সুমিত্রের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়। অর্থাৎ তিনিও সম্ভবত যাদব-বংশের একজন বংশধর ছিলেন।

[ভাগবত পু. ১১.৩০.১৬]

অসুরহ *[দ্র. আসুরহ]*

অসুরান্তক ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পুলস্ত্য বংশীয় প্রধান প্রধান বানরবীরদের নাম বর্ণিত হয়েছে। অসুরান্তক এই পুলস্ত্য বংশীয় বানরবীরদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৭.২৩৮]

অসুরেন্দ্রাণাং বন্ধনঃ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

> বন্ধনস্ত্বসুরেন্দ্রাণাং—বামনরূপেণ বলের্বন্ধকর্তা,
> বহুবচনং কল্পভেদাভিপ্রায়ম্।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বামনরূপধারী ভগবান বিষ্ণু দৈত্যরাজ বলিকে আবদ্ধ করেছিলেন। মহাদেবকে বলির বন্ধনকারী ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পনা করে এই নামে কীর্তিত করা হয়েছে। তবে লক্ষণীয়, 'অসুরেন্দ্র' শব্দটি এখানে বহুবচনে উল্লিখিত হয়েছে—'অসুরেন্দ্রাণাং'। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই বহুবচনের প্রয়োগটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিভিন্ন কল্পে একই ঘটনা পুনরাবৃত্ত হয় পৌরাণিক নিয়মে আবার অসুর-রাক্ষসদের বধ-বন্ধন করার জন্য ঈশ্বরকেও পৌরাণিক নিয়মেই মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হতে হয়। যুগে যুগে কল্পে কল্পে অসুররাজদের আবদ্ধ করার জন্য অবতীর্ণ হন বলে ভগবান শিবকেও সেইরকমই ঈশ্বর রূপে ভাবনা করে বলা হয়েছে—তিনি কল্প-কল্পান্তরে অসুর-নায়কদের বধ-বন্ধন করেন।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬২; (হরি) ১৩.১৬.৬২]

অসূয়া মৃত্যুর অন্যতম পুত্র। অধর্ম এবং হিংসার বংশধারায় এর জন্ম। সম্ভবত মানব চরিত্রের দোষ ত্রুটি এবং নেতিবাচক দিকগুলিকেই এখানে ব্যক্তি-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মনুসংহিতায় আট রকমের ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে অসূয়া-শব্দের অর্থ করতে গিয়ে কুল্লূকভট্ট টীকায় লিখেছেন—অন্যের গুণের মধ্যে দোষ আবিষ্কার করার নাম অসূয়া—

> পরগুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়া।

মহাভারতে দ্যূতসভায় অর্জুন কর্ণের বিশেষণ হিসেবে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ তিনি সব সময়েই পাণ্ডবদের গুণের মধ্যেও দোষাবিষ্কার করে বেড়ান। *[বায়ু পু. ১০.৪১; মনুসংহিতা ৭.৪৮ কুল্লূকভট্ট টীকা দ্রষ্টব্য; মহা (k) ৩.৭৭.৩২; (হরি) ২.৭৪.৩২]*

অসোম যক্ষ মণিভদ্রের ঔরসে পুণ্যজনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১২৪]

অস্তি মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা। জরাসন্ধ তাঁর দুই মেয়ে অস্তি এবং প্রাপ্তির সঙ্গে কংসের বিবাহ দেন। কংসের মৃত্যুতে শোকার্ত জরাসন্ধের বিধবা কন্যারা মথুরা ছেড়ে নিজেদের পিত্রালয় মগধে ফিরে যান এবং মথুরার পরিস্থিতির বিবরণ দেন।

[ভাগবত পু. ১০.৫০.১-২; বিষ্ণু পু. ৫.২২.১]

☐ মহাভারতের সভাপর্বে এবং হরিবংশে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে এই অস্তি এবং প্রাপ্তি কংসের মৃত্যুর পর মগধে ফিরে গিয়ে পিতাকে মথুরা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন। স্বামীর মৃত্যুর কারণ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের

পক্ষ অবলম্বনকারী যদু-বৃষ্ণি নেতাদের উপর প্রতিশোধ নিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। কন্যাদের প্ররোচনাতেই জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেন—

দুহিতৃভ্যাং জরাসন্ধঃ প্রিয়াভ্যাং বলবান্নৃপঃ।
নোদিতো বীরপত্নীভ্যামুপায়ান্মথুরাং ততঃ॥

প্রথমবার পরাজয়ের পর জরাসন্ধ মগধে ফিরে গেলেন। কিন্তু অস্তি দেবী তাঁকে আবারও মথুরা আক্রমণ করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। মূলত কন্যাদের বিলাপ শুনে, তাঁদের অনুরোধেই জরাসন্ধ বারে বারে মথুরা আক্রমণ করেছেন। *[মহা (k) ২.১৪. ৩০, ৪৫-৪৭;*

(হরি) ২.১৪.৩০, ৪৫-৪৭;

হরিবংশ পৃ. ২.৩৪.৫-১০]

অস্ত্রশস্ত্র মহাভারত-রামায়ণ এবং পুরাণে অস্ত্রশস্ত্রের অনেক নাম আছে এবং তা প্রধানত আছে মহাভারতের বিরাট, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং শল্যপর্বে, এছাড়াও রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে। অর্থাৎ যেসব জায়গায় যুদ্ধের বর্ণনা বেশি আছে, সেসব জায়গায় অস্ত্রশস্ত্রের নাম এবং ব্যবহারের প্রকারটাও বেশি জানা যায়। আর মহাভারত-রামায়ণ বাদ দিলে পুরাণে যেসব অস্ত্রশস্ত্রের নাম পাওয়া যায়, তা প্রধানত দেবদেবীর নানা প্রহরণের নাম।

অস্ত্র এবং শস্ত্র এই দুটি শব্দই মহাভারত-রামায়ণে বহুলভাবে ব্যবহৃত হলেও এই দুয়ের মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তা এই দুই মহাকাব্যেই স্পষ্ট করে বলা নেই। কিন্তু এই দুই মহাকাব্যেই অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার-প্রকার দেখেই সম্ভবত পরবর্তীকালে অস্ত্র এবং শস্ত্রের একটা তফাৎ করা হয়েছে এবং সেটা সবচেয়ে ভালোভাবে করা হয়েছে একাদশ খ্রিস্টাব্দে ভোজরাজের লেখা যুক্তিকল্পতরু নামে একটি গ্রন্থে। এখানে অস্ত্রের ব্যাপারে সবিস্তারে বলার আগে এই ভেদটুকু বলা হয়নি কিন্তু অস্ত্রনামের প্রকার দেখে সেটা প্রমাণ হয়। এমনিতে অমরকোষ অস্ত্র এবং শস্ত্রের কথা বলছে তখন বলছে—মূল কথাটা হল আয়ুধ, যার অর্থ প্রহরণ অর্থাৎ প্রহার করার জিনিস। অস্ত্রশস্ত্রও প্রধানত প্রহরণই—

আয়ুধং তু প্রহরণং শস্ত্রমস্ত্রমথাস্ত্রিয়ৌ।

এই শ্লোকের টীকায় টীকাকার ক্ষীরস্বামী লিখেছেন—অস্-ধাতুর অর্থ ছোঁড়া। যে প্রহরণ হাত দিয়ে ছুঁড়ে শত্রুর ওপর নিক্ষেপ করতে হয়—অস্যতে ইতি—সেটা অস্ত্র। আর শস্-ধাতুর অর্থ হিংসা করা। যে প্রহরণের মাধ্যমে হিংসা করা হয় সেটা শস্ত্র। শব্দকল্পদ্রুম একটি কাব্যাংশ উদ্ধার করে সম্ভবত ভরত মল্লিকের টীকার প্রমাণে আরও একটু পরিষ্কার করে জানিয়েছে—যে সব প্রহরণ ছোঁড়া হয় না, হাতে রেখেই যেগুলি দিয়ে আঘাত করা হয় সেইগুলি হল শস্ত্র—যেমন খড়্গ, তলোয়ার ইত্যাদি—যেন করধৃতে হন্যতে তৎ শস্ত্রং যথা খড়্গাদি। আর যা কিছু ক্ষেপণ করে আঘাত করার চেষ্টা করা হয়, সেগুলি অস্ত্র, যেমন শূল ইত্যাদি—

যেন ক্ষিপ্তেন হন্যতে তদস্ত্রং যথা কাণ্ডাদি।

শুক্রনীতিসার অস্ত্র এবং শস্ত্রের বিভেদ সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক রচনা করেছে। সেখানে বলা হয়েছে—যে সব প্রহরণ মন্ত্রপূত করে যন্ত্র অথবা অগ্নিসংযোগ করে শত্রুর দিকে ছুঁড়ে মারা হয়, সেইগুলিই অস্ত্র। আর অস্ত্র ছাড়া আর সবই শস্ত্র যেমন তরবারি, কুন্ত ইত্যাদি—

অস্যতে ক্ষিপ্যতে যত্তু মন্ত্র-যন্ত্রাগ্নিভিশ্চ তৎ।
অস্ত্রং তদন্যতঃ শস্ত্রমসিকুন্তাদিকঞ্চ যৎ॥

ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে অস্ত্রের প্রকার দিয়ে বলা হয়েছে—খড়্গ-চর্ম, ধনুর্বাণ, শল্ল, ভল্ল, অর্ধচন্দ্র, নারাচ, শক্তি, যষ্টি, পরশু, চক্র, শূল, পরিঘ ইত্যাদি। প্রধানত এগুলি ছোঁড়া হয় বলেই অস্ত্র।

[অমরকোষ, (ক্ষত্রিয়বর্গ) ৮৩, পৃ. ১৩৪,

দ্র. ক্ষীরস্বামী-কৃত টীকা; শব্দকল্পদ্রুম, দ্র. শস্ত্র;

শুক্রনীতিসার (Oppert) ৪.৭.১৯১, পৃ. ১৯৪

যুক্তিকল্পতরু, ২৮-২৯, পৃ. ১৩৯-১৪০]

☐ মহাভারতে এবং রামায়ণে অস্ত্র এবং শস্ত্রের নাম এবং প্রকার বহুবার পাওয়া যাবে এবং কখনো কখনো এই শব্দ-দুটির ব্যবহারের মধ্য ক্ষেপণ এবং ক্ষেপণ না করা ব্যাপারটা মিশে গিয়ে একাকারও হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে এই বিশেষত্বটুকু রয়েই গেছে যে, অস্ত্র এবং শস্ত্র এই শব্দ-দুটি সব সময়েই প্রায় একত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষ্ণু পুরাণে দেখা যাবে অস্ত্র এবং শস্ত্র একবার একত্রে, আর একবার অতিপৃথকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। মহাভারতে দ্রৌপদী-স্বয়ংবরের পর যখন রাজাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের

যুদ্ধ হয়েছিল, সেই সময় কর্ণ অর্জুনের শস্ত্র এবং অস্ত্রচালনার কৌশলী নিয়ন্ত্রণ দেখে বলেছিলেন—ব্রাহ্মণ! তোমার শস্ত্রাস্ত্রের বিজয়ী ভাবনা দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি—

অবিষাদস্য চৈবাস্য শস্ত্রাস্ত্র-বিজয়স্য চ।

পুনরায় কর্ণপর্বে—সংশপ্তক বাহিনীকে অনেকক্ষণ ধরে পর্যুদস্ত করে প্রহার করার পর কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—এবার কর্ণবধের কথা ভাবো একবার। এতক্ষণ ধরে অর্জুন শস্ত্র আর অস্ত্রের সেতু দিয়ে সংশপ্তকদের আটকে রাখার পর কৃষ্ণের বিরক্তি সৃষ্টি হয়েছে—

দদৃশুঃ সন্তিতীর্যন্তং মহাশস্ত্রাস্ত্রসেতুনা।

অন্যদিকে বিষ্ণু পুরাণে নরকাসুরের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ তাঁর ওপর একদিকে যেমন শস্ত্র এবং অস্ত্রের সমস্ত উপযোগ ঘটিয়েছেন, তেমনই অবশেষে হাত দিয়ে ছোঁড়া যায়, এমনই এক অস্ত্র তাঁর চক্র দিয়ে কৃষ্ণ হত্যা করলেন নরককে—

শস্ত্রাস্ত্রবর্ষং মুঞ্চন্তং ভৌমং তং নরকং বলী।
ক্ষিপ্ত্বা চক্রং দ্বিধা চক্রে চক্রী দৈতেয়চক্রহা॥

নরকাসুর-বিজয়ের পর দেবলোকে পারিজাত-হরণের সময় কৃষ্ণের সঙ্গে যখন দেবতাদের যুদ্ধ লাগল, তখন একদিকে দেবতারা যেমন অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করছেন কৃষ্ণের ওপর, তেমনই অস্ত্র এবং শস্ত্রের পৃথক ব্যবহারও করছেন একটা একটা করে, সেটাও দেখা যাচ্ছে—

মুমুচুস্ত্রিদশাঃ সর্বে অস্ত্রশস্ত্রাণ্যনেকশঃ॥
একৈকমস্ত্রং শস্ত্রঞ্চ দেবৈর্মুক্তং সহস্রধা।

[মহা (k) ১.১৯০.১৬; ৮.১৯.২২;
(হরি) ১.১৮৩.১৬; ৮.১৪.২২;
বিষ্ণু পু. ৫.২৯.২১; ৫.৩০.৫৬-৫৭]

☐ মহাভারতে অস্ত্রভাবনার আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল—মাঝে মাঝে এই রকম একটা বাক্যবন্ধ ভেসে আসে যে, অস্ত্র ব্যবহারে প্রকার চার রকম, কিন্তু কীভাবে চার প্রকারে ব্যবহৃত হয়, তার কোনো ব্যাখ্যাসূত্র পাওয়া যায় না। মহাভারতে কর্ণের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, তিনি দ্রোণ, কৃপ এবং পরশুরামের কাছ থেকে চার রকমের অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন—

দ্রোণাৎ কৃপাচ্চ রামাচ্চ সোঽস্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্।

এখানে চতুর্বিধ অস্ত্র সম্বন্ধে টীকাকারেরা কিছু না বললেও সাধারণভাবে সেগুলি কী কী, তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'নীতিপ্রকাশিকা' নামে একটি গ্রন্থে। এখানে বলা হয়েছে—অস্ত্র চার রকমের হয়। প্রথমটি হল মুক্ত, দ্বিতীয় অমুক্ত, তৃতীয় মুক্তামুক্ত, চতুর্থ মন্ত্রমুক্ত। মুক্ত মানে যা মোচন করাতে হয়, ছাড়তে হয় হাত থেকে, যেমন ধনুক থেকে বাণ। অমুক্ত হল যা মোচন করা হয় না হাতেই থাকে, যেমন খড়্গ, অসি ইত্যাদি। মুক্তামুক্ত হল—যা ছেড়ে দিয়েও হাতে নিয়ে আসা যায়, অর্থাৎ যা মুক্ত হলেও যার উপসংহার সম্ভব। আর মন্ত্রমুক্ত অস্ত্র অস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল—মন্ত্রপূত করে একবার ছেড়ে দিলে তা আর ফেরানো অসম্ভব—

মুক্তঞ্চৈব হ্যমুক্তঞ্চ মুক্তামুক্তমতঃ পরম্।
মন্ত্রমুক্তঞ্চ চত্বারি ধনুর্বেদপদানি বৈ॥
মুক্তং বাণাদি বিজ্ঞেয়ং খড়্গাদিকমমুক্তকম্।
সোপসংহারমস্ত্রং তু মুক্তামুক্তমুদাহৃতম্॥
উপসংহার-রহিতং মন্ত্রমুক্তমিহোচ্যতে।
চতুর্ভিরেব পাদৈস্তু ধনুর্বেদঃ প্রকাশতে॥

নীতিপ্রকাশিকার এই ব্যাখ্যা থেকে প্রথমত বোঝা যায় যে, পূর্বে আমরা যে অস্ত্র এবং শস্ত্রের ভেদ পেয়েছি তা এখানে মুক্ত এবং অমুক্ত নামে চিহ্নিত। দ্বিতীয়ত নীতিপ্রকাশিকায় চার প্রকার আয়ুধ-প্রহরণের সরঞ্জামটাকে কিন্তু চতুর্বিধ অস্ত্র বা 'অস্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্' বলা হয়নি, বলা হয়েছে চার প্রকারের ধনুর্বেদ। আসলে ধনুক-বাণের ব্যবহার ব্যাপারটাই সেকালে অস্ত্রবিদ্যার চরম উৎকর্ষ সূচনা করত বলে অস্ত্র এবং শস্ত্র সবকিছুরই প্রাথমিক পরিচয়-প্রতীক ছিল ধনুর্বেদ, সেটা সমস্ত অস্ত্রের প্রতিনিধি-স্থানীয় বলে অস্ত্রের চতুর্বিধতা ধনুর্বিদ্যার চতুর্বিধতায় পরিণত হয়েছে। হয়তো এই কারণেই একটা প্রাচীন সাধারণ মত উল্লেখ করে নীতিপ্রকাশিকায় বলতে হয়েছে—শস্ত্র, অস্ত্র, প্রত্যস্ত্র এবং পরমাস্ত্র—এই চার রকমের ভেদও ধনুর্বেদের প্রকার বলেই গণ্য করেন প্রাচীনেরা—

শস্ত্রমস্ত্রঞ্চ প্রত্যস্ত্রং পরমাস্ত্রমিতীব চ।
চাতুর্বিধ্যং ধনুর্বেদে কেচিদাহুর্ধনুর্বিদঃ॥

অস্ত্র এবং শস্ত্র—সেটা যে একভাবে সাধারণীকৃত চেতনায় ধনুর্বেদেরই প্রকার সেটা মহাভারতেও চতুর্বিধ অস্ত্রের পরিবর্ত পদবন্ধ হিসেবে চতুর্বিধ ধনুর্বেদের ব্যবহারে পাওয়া যায়। শরদ্বান গৌতম আপন পুত্র কৃপাচার্যকে চতুর্বিধ

ধনুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন—এই শ্লোক-বাক্যের টীকায় নীলকণ্ঠ কিন্তু একেবারেই নীতিপ্রকাশিকায় কথিত মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত এবং মন্ত্রমুক্ত অস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করেই শস্ত্র, অস্ত্র, প্রত্যস্ত্র এবং পরমাস্ত্রের কথা বলেছেন। আবার কর্ণপর্বে যখন দ্রোণের মৃত্যুর পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রশক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন, তখন চতুর্বিধ অস্ত্রের প্রসঙ্গে—

যস্মিন্ মহাস্ত্রাণি সমর্পিতানি/
চিত্রাণি শুভ্রাণি চতুর্বিধানি—

নীলকণ্ঠ টীকায় লিখছেন—চতুর্বিধ অস্ত্রের প্রকার এমন হতে পারে যেগুলি দৃঢ়, দূরে নিক্ষেপ করার মতো, সূক্ষ্ম এবং শব্দ শোনামাত্র লক্ষ্যভেদী। আবার এমনও হতে পারে যে, সেগুলি হল 'বিহিত' অর্থাৎ সকলেই জানে এইরকম পূর্ব বিহিত কৃত্রিম অস্ত্র। কিন্তু চতুর্বিধ অস্ত্রের প্রকার হল—অন্য অস্ত্রের দ্বারা যে অস্ত্রের তেজ নষ্ট করে দেওয়া যায় এমন অস্ত্র, যেমন আগ্নেয় অস্ত্রের প্রত্যস্ত্র হিসেবে জলপ্রধান বরুণাস্ত্র। আবার এমন অস্ত্র, যার কাছে শরণাগত হয়ে আত্মনিবেদন করে সুরক্ষা চাইতে হয় অর্থাৎ প্রণাম-ইত্যাদির দ্বারা যার নিরাকরণ সম্ভব, যেমন নারায়ণাস্ত্র। তৃতীয় হল—যে প্রয়োগ করা জানে, একমাত্র তার কাছেই যে অস্ত্র প্রতিফলিত হয় যেমন ব্রহ্মশির ইত্যাদি। আর হল—যা একবার ছেড়ে দিলে কারো পক্ষে যার নিবারণ অসম্ভব, যেমন পাশুপত ইত্যাদি। অশ্বত্থামা অবশ্য ব্রহ্মশির অস্ত্র পিতার কাছে লাভ করে থাকলেও, এমনকী এই অস্ত্র তাঁর কাছে প্রতিফলিত হয়ে থাকলেও এই অস্ত্র তাঁর ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতা ছিল না।

[মহা (k) ৩.৩০৯.১৮; ১.১৩০.২১; ৮.৭.৬;
(হরি) ৩.২৬৩.১৮; ১.১২৫.২২; ৮.৫.৬;
নীতি প্রকাশিকা (oppert) ২.১০-১২, ১৪]

অস্থিপুর একটি পবিত্র তীর্থ। থানেশ্বরের পশ্চিমে এবং ঔজসঘাটের দক্ষিণে অস্থিপুর অবস্থিত। ধারণা করা হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদের দেহ এই অস্থিপুরেই দাহ করা হয়েছিল। কথিত যে, চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং-কে বৃহদাকার অস্থিখণ্ড এখানেই প্রদর্শন করানো হয়েছিল। *[AGI (Cannigham) p. 336;*
Archeological Survey of India
Reports vol. 14, p. 86-106]

অস্নেহন শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। লক্ষণীয়, শিবসহস্রনাম স্তোত্রে পরপর স্নেহন এবং অস্নেহন—এই দুটি নাম উচ্চারিত হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

স্নেহনঃ পিতৃবৎ প্রজাসু স্নেহবান,
অস্নেহনস্তদ্বিপরীতঃ।

সংস্কৃত 'স্নিহ্' ধাতুর অর্থ স্নেহ করা। 'স্নিহ্' ধাতু থেকে দুটি প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ হল স্নেহন বা স্নেহক। অর্থাৎ যিনি স্নেহ করেন। মহাদেব জগৎস্রষ্টা পরমপুরুষ, সমগ্র জীবজগৎই তাঁর সন্তান, তাই দেব, দানব, মানব, পশু নির্বিশেষে সকলকেই তিনি পিতার মতোই স্নেহ, করেন। তাই স্নেহশীল জগৎপিতা রূপে কল্পনা করে মহাদেবকে 'স্নেহন' নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

অস্নেহন ঠিক স্নেহন-এর বিপরীত। তাঁর সন্তান তুল্য এবং জীবজগৎকে তিনি যেমন স্নেহ করেন তেমনই পাপী, অনাচারী কুসন্তানদের ওপর শাস্তিবিধান করেন। জগতের কল্যাণের প্রয়োজনে তাদের বিনাশের জন্য তিনি সংহারমূর্তিতে আবির্ভূত হন। তাঁর সেই ভয়াবহ রুদ্ররূপকেই 'অস্নেহন' নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯০; (হরি) ১৩.১৬.৯০]

অস্বস্থল মৎস্য পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের বংশ-প্রবরভুক্ত যে সব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি অস্বস্থলের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। পুরাণে তাঁর নামোল্লেখ পাই বশিষ্ঠবংশীয় অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক হিসেবে।

[মৎস্য পু. ২০০.১৪]

অস্বহার্য্য একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। পুরাণে অঙ্গিরার বংশজাত যে সব মন্ত্রকৃৎ ঋষিদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, ঋষি অস্বহার্য্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৪৫.১০৩]

অহ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান শিবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রের এই শ্লোকটিতে কলা, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, মুহূর্ত প্রভৃতি সময় গণনার এককগুলিও একত্রে ভগবান শিবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। অহ অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি দিন। এক অর্থে সেটিও সময় গণনার অন্যতম একক বটে।

বস্তুত ভগবান শিব মহাকালস্বরূপ, সময় স্বরূপ। আমরা যাকে সময় বলি, বাস্তবে তার

আদিও নেই, অন্তও নেই। তা অসীম, অনন্ত। সেই অসীম অনন্ত সময়কে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে গাণিতিক নিয়মে কলা-কাষ্ঠা প্রভৃতি এককের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি আমাদের সুবিধার্থে। অহ বা দিনও তেমনই একটি একক। ভগবান শিব যেমন আদি-অন্তহীন, গণনার অসাধ্য মহাকালের স্বরূপ, তেমনই তিনি আমাদের গণনাসাধ্য এককগুলিরও স্বরূপ। এই ভাবনা থেকেই অহ ভগবান শিবের অন্যতম নাম। একই ভাবনায় শিবসহস্রনামস্তোত্রে তাঁকে অহোরাত্র নামেও সম্বোধন করা হয়েছে।

অথর্ববেদের অন্তর্গত মহানারায়ণোপনিষদে কলা, মুহূর্ত, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অর্ধমাস বা পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, কল্প প্রভৃতি কাল পরিমাণের সব কয়টি গণনাযোগ্য একককেই ভগবান বিষ্ণু-নারায়ণের স্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
কলা মুহূর্তাঃ কাষ্ঠাশ্চাহোরাত্রাশ্চ সর্বশঃ॥
অর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরশ্চ কল্পতাম্।
স আপঃ প্রদুঘে উমে ইমে অন্তরিক্ষমথো সুবঃ॥

উপনিষদের ভাবনায় পরমপুরুষ কখনও বিষ্ণুরূপে কল্পিত, কখনও বা রুদ্ররূপে, রুদ্র-শিব এবং ভগবান বিষ্ণু বস্তুত এক ও অভিন্ন। তাই কাল পরিমাণের এককগুলিও ভগবান বিষ্ণুর উপরে যেমন আরোপিত হয়েছে, তেমনই আরোপিত হয়েছে মহাদেবের উপরেও।

*[মহা (k) ১৩.১৭.১৪২; (হরি) ১৩.১৬.১৪১;
মহানারায়ণোপনিষদ (Jacob) ১.৮-৯]*

অহংযাতি পুরুবংশীয় রাজা সংযাতির পুত্র। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, দৃশদ্বান্ রাজার কন্যা এবং রাজা সংযাতির পত্নী বরাঙ্গীর গর্ভে অহংযাতি জন্মগ্রহণ করেন। রাজা অহংযাতির পত্নী ছিলেন কৃতবীর্য্য রাজার কন্যা ভানুমতী। ভানুমতীর গর্ভে অহংযাতির সার্বভৌম নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তবে পুরাণমতে অহংযাতির পুত্রের নাম ছিল রৌদ্রাশ্ব।

*[মহা (k) ১.৯৫.১৪-১৫; (হরি) ১.৯০.১৯-২০;
ভাগবত পু. ৯.২০.৩; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১]*

অহঃ$_{১}$ (অহন্) মহাভারতোক্ত একটি পুণ্যস্থান। এখানকার জলাশয়ে স্নান করলে সূর্যলোক প্রাপ্ত হয়। *[মহা (k) ৩.৮৩.১০০; ৩.৬৮.১০০]*

অহঃ$_{২}$ অষ্টবসুর অন্যতম বসু। ধর্মের ঔরসে রতার গর্ভে জাত। অহঃ নামক বসুর চারটি পুত্র—জ্যোতি, শম, শান্ত এবং মুনি। স্কন্দ কার্তিকেয়-এর অভিষেকের সময় আমরা এই অহঃ নামক বসুকে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি।

*[মহা (k) ১.৬৬.১৮, ২০, ২৩; ৯.৪৫.১৫;
(হরি) ১.৬১.১৮, ২০, ২৩; ৯.৪২.১৫]*

অহঃ$_{৩}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২৩; (হরি) ১৩.১২৭.২৩]

অহঃসম্বর্ত্তক ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩৮; (হরি) ১৩.১২৭.৩৮]

অহঙ্কার মহাভারতের কপিল আসুরি সংবাদে বলা হয়েছে—

বিরিঞ্চো'ভিমানিনী॥ অবিবেক ঈর্ষ্যা কামঃ
ক্রোধো লোভো মদো দর্পো ম
মকারশ্চৈতান্যহঙ্কারপর্যায়নামানি ভবন্তি॥
এবমাহ—
অহং কর্ত্তেত্যহংকর্ত্তা সসৃজে বিশ্বমীশ্বরঃ।
তৃতীয়মেনং পুরুষমভিমানগুণং বিদুঃ॥

মহাভারতে কপিলের উপদিষ্ট এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য হল বিরিঞ্চিরূপে ব্রহ্মা হলেন প্রকৃতির তৃতীয় তত্ত্ব, অভিমান যাঁর অন্যতম বৃত্তি, যে অভিমানবশতঃ ব্রহ্মা এইরূপ মনে করেন যে, তিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। সেই অহঙ্কার এবং অভিমানের পর্যায় শব্দ হল অবিবেক, ঈর্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, দর্প, এবং মমকার ইত্যাদি।

এখানে অহঙ্কার শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ যাই হোক, আমাদের শব্দশাস্ত্রে কুম্ভকার, কর্মকার, চর্মকার ইত্যাদি শব্দ বহুল পরিমাণ থাকায় ধ্বনিসাম্যে এইরকম একটি বিভ্রান্তি হতে পারে যে অহঙ্কার শব্দটিও বোধ হয় একইরকম। কুম্ভ বা ঘটের নিমিত্ত কারণ বা কর্তারূপে আমরা কুম্ভকারকে বুঝি। কিন্তু অহঙ্কার শব্দটি এরকম নয়। বরঞ্চ শাস্ত্রীয় প্রয়োগে 'ওম্কার', 'বষট্কার', 'স্বাহাকার', ইত্যাদি শব্দের মধ্যে যেমন 'ওম্', 'স্বাহা' অথবা 'স্বধা'র স্বরূপটিই বিধৃত আছে। তেমনি অহঙ্কারের অন্তর্গত 'কার' শব্দটিও অহংরূপ অভিমানাত্মক স্বরূপটাই প্রকাশ করে। অভিমান অহঙ্কারের স্বাভাবিক বৃত্তি বলেই 'কার'—এই শব্দটি এখানে স্বরূপগত অর্থেই প্রযোজ্য।

অহঙ্কারের এই বিশ্লেষণকে সমর্থন করে Van Buitenen তার 'Studies in Samkhya' প্রবন্ধে I am ... I do ... etc; of mamakara : This is kara, not as in Kumbhakara etc, but as Omkara, Vasatkara, Svahakara etc. 'the cry, uttering or ejaculation : Aham!'

[মহা (k) মহাভারতের চিত্রশালা প্রেসের সংস্করণে এই পংক্তিগুলি নেই, কিন্তু নির্ণয় সাগর প্রেসের সংস্করণে ১২.৩২৭.১২-১৩;
(হরি) ১২.৩১১.৪৭-৫০;
J.A.B Van Buitenen, 'Studies in Samkhya' (ii) In JAOS, Vol. 76, p. 17]

☐ মহাভারতের উপরিউক্ত পংক্তিতে অহঙ্কারের যে প্রতিশব্দগুলি দেওয়া আছে, তার মধ্যে ক্রোধ, ঈর্ষা এবং দর্প ছাড়া অন্য সবগুলিই অহঙ্কারের মৌল কারণ হয়ে উঠতে পারে বলেই সেগুলিকে অহঙ্কারের পর্যায়-শব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, ভগবদ্গীতায় একটি শ্লোকে অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং অসূয়াকে একই পংক্তিতে রাখা হয়েছে এবং অন্য একটি শ্লোকে এই সব পর্যায়বাচক শব্দের সঙ্গে পরিহার করার জন্য 'পরিগ্রহ'কে যুক্ত করা হয়েছে। তবে অহঙ্কারের প্রকাশ কীভাবে হতে পারে, সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে এই ভগবদ্গীতাতেই। বলা হয়েছে—কামক্রোধ-পরায়ণ মানুষেরা শত শত আশাজালে আবদ্ধ হয়ে অর্থ-সঞ্চয়ে মন দেয়, আর তার পরে—এই আমি আজ এটা পেলাম, এবার এটা আমি পাবো, আমার এই অর্থধন আছে, আমার আরও অনেক অর্থ আসবে, এই শত্রুকে আমি শেষ করেছি, অন্যগুলোকেও শেষ করবো, আমিই প্রভু, আমি সব করতে পারি, আমি ভোগী, আমি যা কিছু করেছি সব সফল, আমি সুখী, আমি বিত্তশালী, আমি কুলীন, আমার সমান কেউ নেই। আমি যাগ-যজ্ঞ করবো, দান করবো, আমি আনন্দে মেতে থাকবো—এইরকম সব অমূলক অভিমানে মোহিত হয়ে নানা কল্পনা, নানান মোহে যারা আবদ্ধ হয়, তারাই আসলে অহঙ্কারে তাড়িত হচ্ছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরো'হমহং ভোগী সিদ্ধো'হং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যো'ভিজনবানস্মি কো'ন্যো'স্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে'শুচৌ॥

ভগবদ্গীতার এই অহঙ্কার-লক্ষণের শেষ এবং সার কথাটাও গীতাতেই বলা হয়েছে এবং তা অনেক আগেই বলা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। এখানে বক্তব্য হল—প্রকৃতির গুণে চালিত হয়ে মানুষ যে কাজ করে, সেই কাজটা 'আমি করছি' এইরকম কর্তৃত্বের বোধে ভাবাটাই অহঙ্কারের তাৎপর্য—

অহংকার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।

[ভগবদ্গীতা ১৬.১২-১৮; ১৮.৫৩; ৩.২৭]

☐ ভগবদ্গীতায় অহঙ্কার, দর্প, অভিমানে যে লক্ষণ বলা হয়েছে, তার মূর্তিমান উদাহরণ আছে রামায়ণে দশগ্রীব রাবণ এবং অন্যান্য রাক্ষস নেতার মধ্যে, মহাভারতে দুর্যোধন-কর্ণের মধ্যে, পুরাণে হিরণ্যকশিপু কিংবা বেণ রাজার কাহিনীতে। আমরা সেই অহঙ্কার-ভাবনার বিস্তারে যাব না। তবে অহঙ্কারের বা আত্মখ্যাপনের লক্ষণ এবং সেই দর্প-অভিমান ত্যাগ করার কথা মহাভারতে দার্শনিক স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তা মহাভারতে অগণিত অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। কিন্তু অহঙ্কার আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যতখানি ধরা যায় তা দর্প-অভিমান কিংবা গর্বের পর্যায় শব্দ হলেও অহঙ্কার বস্তুত এক গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, যা সাংখ্য-বেদান্তদর্শনের মৌলিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অব্যক্তা প্রকৃতির স্বরূপ-সঞ্জাত প্রথম ব্যক্ত প্রকাশ 'মহানকে' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাভারতের একটি শ্লোকের টীকায় টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছিলেন—সৃষ্টির সময় প্রথম ব্যক্ত তত্ত্বটি হল অস্পষ্ট, অস্ফুট কেবলমাত্র আমিত্বের একটা বোধ। এই 'বোধ' এতই সূক্ষ্ম যে তা আকৃতিতে মহৎ পরিমাণ হলেও প্রকৃতিতে পরমাণু সদৃশ, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়ের কাছে তার যে ব্যক্ত প্রকাশ বোধগম্য হয়, তাকে কোনো নামের দ্বারা সংজ্ঞিত করা যায় না। কুমারিল শ্লোকবার্তিকের প্রত্যক্ষসূত্রে যাকে বালমূকাদিসদৃশ 'সম্মুগ্ধ জ্ঞান' বলেছেন, সেটি সাংখ্যদর্শনের মহত্তত্ত্বের প্রতিরূপ প্রায়। সেই অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন জ্ঞান থেকে দ্বিতীয় যে

বোধগম্য রূপটি অভিব্যক্ত হয়, তাকে বলা হয় 'অহঙ্কার'। এই অহঙ্কার কিন্তু তার জনক মহৎ এর মতো সূক্ষ্ম নয়, বরঞ্চ কিয়দংশে স্থূল। অহঙ্কার থেকে পরবর্তী যে ব্যক্ত তত্ত্বগুলি নির্গত হয়, সেগুলি স্থূল থেকে স্থূলতর হয়।

টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে 'কেবল আমিত্বের বোধ' যখন 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি একজন মানুষের পুত্র' এই নিশ্চয়াত্মক বোধের প্রতীতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে দ্বিতীয় বুদ্ধ্যাত্মক সৃষ্টি বা অহঙ্কার বলা যেতে পারে। আমরা 'বুদ্ধ্যাত্মক' কথাটা ব্যবহার করছি মহাভারতের ভাবনা অনুযায়ী। মহৎ বা বুদ্ধির কার্যস্বরূপ অহঙ্কারের মধ্যে যেহেতু প্রাকৃত বিকার মহৎ বা বুদ্ধির গুণগুলি সব অনুস্যূত থাকে, তাই মহাভারতের একটি শ্লোকে অহঙ্কারকে বলা হয়েছে বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় প্রাকৃত সৃষ্টি।

মহাভারতে যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদে প্রকৃতির এই দ্বিতীয় সৃষ্টি ব্যাখ্যা করার সময় বলা হয়েছে—

মহতশ্চাপ্যহঙ্কার উৎপন্নো হি নরাধিপ।।
দ্বিতীয়ং সর্গমিত্যাহুরেতদ্‌বুদ্ধ্যাত্মকং স্মৃতম্‌।।

যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন—প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব। পণ্ডিতেরা এই অহঙ্কারকেই বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন প্রকৃতির দ্বিতীয় সৃষ্টি বলে থাকেন এবং এই 'অহং-বুদ্ধ্যাত্মক' মহৎ, যাকে আমরা বুদ্ধিও বলি, সেই বুদ্ধ্যাত্মক সৃষ্টির স্পষ্টতর রূপই হল অহঙ্কার।

[মহা (k) ১২.৩১০.১৬-১৮;
(হরি) ১২.৩০২.১৬-১৮]

□ মনে রাখা দরকার, সাংখ্যদর্শনের অন্যতম মৌলতত্ত্ব অহঙ্কারের স্বরূপবোধ এবং সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত সাংখ্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে মহাভারত-পুরাণ অথবা আরও প্রাচীন ঔপনিষদিক সংজ্ঞার খুব একটা পার্থক্য নেই। অস্তিত্বের এক সাধারণ বোধের সঙ্গে যখন আমিত্বের সংযোগ ঘটে, অর্থাৎ শুধুমাত্র 'আছি' এই বোধের সঙ্গে যখন 'আমি আছি'—এইরকম এক ব্যক্তি-ভাবের সমন্বয় ঘটে, তখনই তাকে বলে অহঙ্কার বা অভিমান। সাংখ্যকারিকার টীকায় বাচস্পতি মিশ্র লিখেছেন—প্রথমে বস্তুটি আলোচিত বা বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তারপর 'আমি এতে অধিকৃত', 'আমি এতে সমর্থ', 'আমার জন্যই এই সকল বিষয়', 'আমি ভিন্ন অন্য কেউ অধিকৃত নয়', 'এইজন্য আমি আছি'—এইরকম অভিমান হয়। এই অভিমানরূপ অসাধারণ ব্যাপার যার দ্বারা হয়, তাকেই অহঙ্কার বলে।

সাংখ্যকারিকায় অহঙ্কার সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া নির্দেশিত হয়েছে—বস্তুর আলোচন, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ, মনন, এবং তারপর সেই বস্তুর ওপর অধিকারবোধ তথা আমিত্বের আরোপ—এই বিশদ অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়ার কথা কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটাকে যদি বুদ্ধ্যাত্মক মহতের প্রকাশ বলে গণ্য করি, তাহলে বলতে হবে—নির্দিষ্ট তথা প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের বাইরেও মহৎ এবং অহঙ্কারের একটা সার্থক ভাবনা অনেক কাল ধরে রূপ ধারণ করছিল।

টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম 'মহান'কে একটা অস্পষ্ট আমিত্বের বোধ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহাভারতের এই শ্লোকের টীকাতে তেমনি অহঙ্কার সম্বন্ধেও একটা সংজ্ঞার বোধ তৈরি করার জন্য মহান এবং অহঙ্কারকে পাশাপাশি রেখে নীলকণ্ঠ মহাভারতের শ্লোকের টীকায় বলেছিলেন—

তত উক্তবিশেষালিঙ্গিতো'-
স্মীতিপ্রত্যয়বিষয়ো'হঙ্কারঃ।।

এই শ্লোকে নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, 'অস্মীতিমাত্র' বা 'আমি-মাত্র' এইরূপ যে বোধ তাই হল মহত্তত্ত্ব। টীকাকার নীলকণ্ঠ যেহেতু পরের যুগের মানুষ তাই তিনি সাংখ্যদর্শনের সম্মত কথাই বলেছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে—অভিমানো'হংকারঃ তার মানে 'অহঙ্কার' এবং তার পর্যায় শব্দ 'অভিমান'—এই দুটি শব্দেরই একটা সাধারণ অর্থ আছে বটে, কিন্তু সাধারণ কথকতায় প্রচলিত 'গর্ববোধ' বা 'দর্প' কিন্তু এই দার্শনিক শব্দের অর্থ হতে পারে না। অন্যদিকে অহঙ্কারের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে জার্মান দার্শনিক রিচার্ড গার্বের (Richard Garbe) জার্মান শব্দটিকে যেভাবে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে, তাতে 'delusion' শব্দটি সাংখ্যীয় অহঙ্কারের প্রতিশব্দ হওয়া উচিত নয়। বরঞ্চ Ballantyne তাঁর সাংখ্য পরিভাষায় অহঙ্কার

শব্দের যে অনুবাদ করেছেন, সেই 'conceit' শব্দটির মধ্যে অহং-বুদ্ধ্যাত্মক ভাবনার একটি পূর্বগৃহীত রূপ থাকায় এই শব্দটির একটি গ্রাহ্যতা আসে। তার থেকে অবশ্যই অনেক ভালো হয় যদি বুদ্ধ্যাত্মক মহৎ-এর অনুবাদ করি consciousness এবং মহৎ-জাত অহঙ্কার এর অনুবাদ করি self-consciousness। বস্তুত এইরকম একটা অনুবাদ মাথায় রেখেই পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল আগে সাংখ্যীয় অহঙ্কার এর ধারণা পরিষ্কার করার সময় বলেছিলেন—

'The second evolute of Nature is Egoism. Consciousness is followed by self-consciousness. It is by means of this principle that personality comes to be attached to our cognitions. What was hitherto cognised simply as matter for knowledge is now cognised as matter *for my konwledge*; and thus I comes to be set over against *not I*.'

[সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, কারিকা ২৪, পৃ. ২০৬; Richard Garbe, Samkhya-Sūtra-Vṛtti, p. 97; Satish Chandra Banerjee, Samkhya Philosophy (Samkhya-Karika), p. 141]

□ আমরা মহৎ-এর স্ফুটতর জ্ঞানকেই 'অস্মিতা' বলেছি, অবশ্য 'অস্মিতা' শব্দটিও আমাদের সৃষ্ট কোনো পরিভাষা নয়। এমনকি মহাভারতের প্রাজ্ঞ টীকাকার যে অহঙ্কারকে 'অস্মি + ইতিমাত্র' স্বরূপ বলেছেন, তারও একটা সূত্র আছে অন্যত্র—সেটা সাংখ্যদর্শন নয় অবশ্য, তবে সাংখ্যের সমান-তন্ত্র যোগদর্শনের মধ্যে পতঞ্জলি 'অস্মিতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলেই হয়তো নীলকণ্ঠ লিখেছেন—'অস্মীতিমাত্র'-বোধই অহঙ্কার। যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্য এবং পণ্ডিত-সজ্জনের ব্যাখ্যায় 'অস্মিতা' শব্দটি অবশ্য দুই দিক থেকে প্রযোজ্য। কিন্তু তার আগে অস্মিতা শব্দটি প্রকৃতি-প্রত্যয়ের নিষ্পত্তি বুঝে নেওয়া দরকার। 'অস্মি' কথাটি 'অস্' ধাতুর উত্তম পুরুষের একবচনের প্রযুক্ত হয় এবং তার অর্থ হল—'আছি' বা 'হই'। যেমন অহম্ অস্মি—অর্থ 'আমি হই' বা 'আমি আছি'। 'অস্মি' কথাটি ব্যবহার করলে কর্তা 'অহম্' শব্দ ব্যবহার না করলেও 'আমিত্বের' বোধ হয়। বরঞ্চ বলা উচিত, আমিত্বের সঙ্গে তার সত্তার বোধটুকুও নিহিত থাকে 'অস্মি'—এই ধাতুনিষ্পন্ন প্রয়োগের মধ্যে। বৈদান্তিকেরা আত্ম-ব্রহ্ম-সাযুজ্যের বুদ্ধিতে বলে থাকেন—

'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

লক্ষণীয় সাংখ্যরা যাকে 'অহঙ্কার' বলছেন, 'যোগদর্শন' যাকে 'অস্মিতা' বলছেন অথবা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরাও যে অহঙ্কার নিয়ে চিন্তার প্রসার ঘটান, তাদের প্রত্যেকের মতেই অহঙ্কারের দুটি রূপ। বস্তুত এখানে 'অহম্' এর স্বরূপ নিয়েই সমস্ত ভাবনার অবকাশ। যে অহং বা অস্মিতা করণের সঙ্গে বা বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শরীরে আত্মবুদ্ধি, দেহাত্মবুদ্ধি ঘটায়, যখন মনে হয়, 'আমি চক্ষুষ্মান্', 'আমি শ্রবণশক্তিমান্', অথবা 'আমি আঢ্য, অভিজনবান্'—সেই অহম্-এর অভিমান কিন্তু এক ধরনের বিকার। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণ এবং চিত্তও সেই অভিমান বা অস্মিতারই এক একটি প্রকার অবস্থা বা বিকার। অন্যদিকে বৈদান্তিকের কাছে এই অহম্-এর বৈকারিক রূপ অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি যদি অতিক্রান্ত হয়, অহম্ এর স্বরূপ যদি ব্রহ্মের প্রতিভাত হয়, তাহলে যেমন পরমার্থ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তেমনই সাংখ্য-যোগীর কাছেও অস্মিতার একটি স্বরূপগত রূপ আছে। পাতঞ্জল যোগদর্শনের 'বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী' (সমাধিপাদ, ৩৬ সূত্র) নামক সূত্রে ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে—অস্মিতাতে সমাপন্ন চিত্ত নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের মতো শান্ত, অনন্ত, অস্মিতামাত্র—

তথা অস্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং
নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং শান্তম্
অনন্তম্ অস্মিতামাত্রমিতি।

সাংখ্য এবং যোগদর্শনের প্রক্রিয়ায় আরও একটু পরিষ্কার করেও এই তত্ত্ব বোঝানো যায়। প্রথমেই বলি উপরে উক্ত ব্যাসভাষ্যে 'অস্মিতা' বলতে যদি অহঙ্কারকে বোঝানো হয়ে থাকে, তবে 'অস্মিতা-মাত্র' বলতে সাংখ্যের মহৎ বা বুদ্ধিকে বোঝানো হয়েছে, কেননা সাংখ্যের মহত্তত্ত্বই যোগদর্শনে অস্মিতামাত্র স্বরূপ, অস্মিতা বা অহঙ্কারের সূক্ষ্মতম স্বরূপ, অস্মিতা বা অহঙ্কারের সূক্ষ্মতম স্বরূপকেই অস্মিতামাত্র বলে

চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে। সাংখ্যের মহত্তত্ত্বকে যোগদর্শনে অবশ্য 'সত্তা'ও বলা হয়। সত্তা অর্থ 'আমি আছি' এই রকম ভাব। প্রথম 'আমি আছি' এই ভাবটুকু থাকলেই তবে 'আমি দ্রষ্টা', আমি শ্রোতা, আমি জ্ঞাতা—এই ধরনের স্থূলতর বিকার সম্ভব হয়। এই বিকারভাবটাই অহঙ্কার, অভিমান, অস্মিতা। *[ভগবদ্গীতা ১৬.১৫; পাতঞ্জল দর্শন (হরিহরানন্দ আরণ্য), সমাধিপাদ, সূত্র ৩৬, পৃ. ৯২, সাধনপাদ, সূত্র ১৯, পৃ. ১৫৬]*

□ ভারতবর্ষে সাংখ্যদর্শনে যে অহঙ্কারের কথা বলা হয়েছে এবং মহাভারতেও তা যেভাবে পেয়েছি, সেই অহঙ্কারের তাত্ত্বিক রূপ আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে আগেই দেখতে পেয়েছি। বৃহদারণ্যকের ঋষি বলেছেন—

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ;
সো'নুবীক্ষ্যনান্যদাত্মনো'পশ্যৎ;
সো'স্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ,
ততো'হংনামাভবৎ . . .।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে, 'প্রজাপতি' যিনি অণ্ড হতে জাত প্রথম পুরুষ, এবং যাঁকে অন্যত্র 'মহৎ' শব্দের পর্যায় শব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রথম পুরুষ এই জাগতিক সৃষ্টি-স্থিতি এবং সংহার কার্যের মূলে আছেন, সেই প্রজাপতি সর্বাগ্রে সমুৎপন্ন হয়েই নিজ পৃথগ্‌ভূত কোনো বস্তু দর্শন না করে কেবল আপনাকেই দর্শন করেন এবং পূর্বজন্মজাত সংস্কারানুসারে প্রথমেই আপনাকে 'অহম্' বলে উল্লেখ করেন। তারপর তিনি 'আমি হচ্ছি সকলের আত্মা'—এইরূপ উক্তি করেছিলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত 'প্রজাপতি'র নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই অভিমানই অহঙ্কার। আসলে উপনিষদগুলির মধ্যে কখনোই এরকম হয়নি যে, কোনো ব্রহ্মধর্মী ঋষি বলছেন—এটা সাংখ্যের তত্ত্ব অথবা এটা সাংখ্যদর্শনের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়। আমরা শুধু দেখাতে চাই যে, উপনিষদগুলির মধ্যে সাংখ্যদর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বের বীজ আছে। সেই বীজগুলি কখনোই খুব স্পষ্ট নয় বলেই অস্পষ্ট শব্দ থেকেই দার্শনিক ভাবনার ইঙ্গিতগুলি পেতে হয়।

বস্তুত বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে সাংখ্যীয় অহঙ্কারের এক দৈব এবং শরীরী রূপ কল্পনা করা হয়েছে প্রজাপতি বা ব্রহ্মার স্বরূপের মধ্যে এবং মহাভারতের মধ্যেও তা স্পষ্ট (প্রজাপতিমহঙ্কৃতম্)। কিন্তু এই প্রজাপতির কল্পনাটার মধ্যে অবশ্যই এক বৈদান্তিক আভাস আছে, যা মহাভারত এবং পুরাণগুলির মধ্যে প্রকটভাবেই ধরা পরে। মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ যে তত্ত্বকে খানিকটা নিশ্চয়াত্মক বোধের আকারে দেখেছিলেন, সেই আমিত্ব অভিমানাত্মক আমিত্ববোধ বা 'অহং'কে দুটি রূপে রূপায়িত করা হয়েছে বশিষ্ঠ-জনক-করাল-সংবাদে এবং নীলকণ্ঠ তা উল্লেখ করেন নি। মহাভারতে বশিষ্ঠ জনক রাজার কাছে সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বদর্শন ব্যাখ্যা করার সময় বলেছেন—

এবমপ্যনুমানেন হ্যলিঙ্গমুপলভ্যতে।
পঞ্চবিংশতিমস্তাত লিঙ্গেষু নিয়তাত্মকঃ॥
অনাদিনিধনো'নন্তঃ সর্ব্বদর্শী নিরাময়ঃ।
কেবলং ত্বভিমানিত্বাদ্‌গুণেষু গুণ উচ্যতে॥

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ১.৪.১, পৃ. ১৭৬; কূর্ম পু. ১.৪.৪৭; মহা (k) ১২.৩০৫.২৭-২৮; (হরি) ১২.২৯৭.২৭-২৮]

□ জীবাত্মারূপী অহং এর প্রকটিত প্রকাশ অথবা স্বাভিমানাত্মক অহঙ্কারের ক্রমবিবর্তনের বর্ণনা উপনিষদ, মহাভারতের মতো অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ তথা শাস্ত্রের মধ্যেও পাওয়া যাবে এবং তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, অহঙ্কারের সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ধারণা আমাদের শাস্ত্ররাশির বিভিন্ন অংশে সমন্বিত হচ্ছিল। লক্ষণীয়, মনুসংহিতা যেখানে আমাদের সমাজ, আচার, ধর্ম সম্বন্ধে প্রধানত কথা বলে সেই মনুসংহিতাও কিন্তু সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে সার্বিক উচ্চারণ করতে গিয়ে অহঙ্কার সম্বন্ধে পরিচিত সাংখ্যদর্শনের মতোই মহৎ থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে বলছে—

উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্।
মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্॥

উপনিষদ, মনুসংহিতা, চরকসংহিতা এবং যোগদর্শনের প্রামাণ্যে যে অহঙ্কারের কথা বলা হয়েছে, সেই অহঙ্কার 'ষষ্ঠ অবিশেষ' বলে চিহ্নিত হলেও অথবা তা 'স্বকারণ বিকৃতি'-রূপে মহত্তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট হলেও মহত্তত্ত্ব থেকে কীভাবে, কী কারণে সেই বিকৃতি ঘটে, তা বায়ু পুরাণের মধ্যে

ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বায়ুপুরাণের শ্লোকগুলিতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় এমন এটি অভিনব পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—যার সঙ্গে সাংখ্যদর্শনে ব্যাখ্যাত সৃষ্টিক্রমগুলির অত্যন্ত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। সাংখ্য দর্শনের নির্দিষ্ট প্রস্থান তৈরি হয়ে যাবার পরে বায়ুপুরাণ লিখিত হয়েছে বলেই হয়তো এই সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। বায়ুপুরাণের কীর্তিত এই শ্লোকটি হল—

ত্রিগুণাদ্রজসোদ্রিক্তাদহঙ্কারস্ততো'ভবৎ।
মহতা চাবৃতঃ সর্গো ভূতাদিবিকৃতস্তু সঃ॥

বায়ুপুরাণের এই শ্লোকটির মধ্যে বলা হচ্ছে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণাত্মক। এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ব্যাহত হলে রজোগুণের আধিক্যবশত তা থেকে প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম অহঙ্কারের উদ্ভব হয়।

সৃষ্টির উদ্ভবের পূর্বে সমস্ত ব্যক্ত তত্ত্বগুলি যেমন অব্যক্তা প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত থাকে, সেইরূপ অহঙ্কারও প্রস্ফুটনের পূর্বে মহত্তত্ত্বের দ্বারা আবৃত থাকে। মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত সত্ত্ব, রজ এবং তমের মধ্যে রজোগুণের আধিক্য ঘটলেই তবে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। পুনরায় অহঙ্কারের অন্তর্গত ত্রিগুণের মধ্যে তামস অহঙ্কারের বিকারবশত ভূতাদির সৃষ্টি হয়। এই ভূতাদি থেকে একে একে পঞ্চতন্মাত্রের বা পাঁচটি অবিশেষের উৎপত্তি ঘটে। ষষ্ঠ অবিশেষ অহঙ্কার।

*[মনুসংহিতা ১.১৪; বায়ু পু. ৪.৪৮;
P.V. Kane, History of Dharmasastra,
Vol. V. Pt. 2, pp. 906-907, fn. 1440]*

☐ মহাভারতের মোক্ষধর্ম পর্বে প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম অহঙ্কারকে কখনো 'ব্রহ্মা' কখনো 'প্রজাপতি' রূপে বিশেষিত করা হয়েছে। যেমন মহাভারতের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে—

এষ বৈ বিক্রিয়াপন্নঃ সৃজত্যাত্মানমাত্মনা।
অহঙ্কারং মহাতেজাঃ প্রজাপতিমহঙ্কৃতম্॥

এই শ্লোকটি যে অর্থ নির্দেশ করছে, তা হল—প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হিরণ্যগর্ভ বা বুদ্ধিতত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হয়ে প্রজাপতিস্বরূপ উপাধিযুক্ত মহাতেজা অহঙ্কার তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই অহঙ্কারের বৃত্তি হল অভিমান। অহঙ্কার থেকে পরবর্তী যে চতুর্থ সৃষ্টি সেগুলিকে অহঙ্কৃত বলা হয়েছে। আচার্য নীলকণ্ঠ এই শ্লোকটির টীকায় বলেছেন—

এষ সূত্রাত্মা অহঙ্কারমুপাধিম্,
অহঙ্কৃতং তদভিমানিনং বিরাজম্॥

অহঙ্কারের প্রকৃতি এবং উদ্ভব সম্বন্ধে এই শ্লোকটি পুনরায় আমাদের মনে করিয়ে দেয় উপনিষদে ব্যাখ্যাত অভিমানাত্মক অহং চৈতন্যস্বরূপ নিষ্ক্রিয় সাক্ষী স্বরূপ পুরুষের আত্মস্থ স্বরূপের কথা। অবশ্য এই শ্লোকটির মধ্যে আমরা বায়ুপুরাণে ব্যাখ্যাত জগৎসৃষ্টির আকস্মিক অভিব্যক্তির ব্যাখ্যাও লক্ষ্য করি। মহাভারতের মত ঈশ্বরভিত্তিক গ্রন্থেও বায়ুপুরাণের মতোই আমরা উচ্চারিত হতে দেখি—সেই আকস্মিক এবং স্বাভাবিক উৎপত্তিবাদের কথা—যেখানে বলা হচ্ছে—অভিমানশালী প্রজাপতি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন। এই বক্তব্য আমাদের একথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, কোনো সচেতন সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম অভিমানাত্মক অহঙ্কার নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন এবং তা থেকে অহঙ্কৃতগুলি বা পরবর্তী ব্যক্ততত্ত্বগুলি নিজে নিজেই উদ্ভূত হয়।

মহাভারতের শ্লোকটির মধ্যে যেমন প্রকৃতির দ্বিতীয় অভিব্যক্ত অহঙ্কারকে প্রজাপতিরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেইরকম মহাভারতের অপর একটি শ্লোকে সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তারূপে খ্যাত পরমর্ষি কপিলকে প্রজাপতিরূপে বিশেষিত করা হয়েছে। মহাভারতের এই শ্লোকটি হল—

যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্।

এই শ্লোকটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, মহাভারতের শ্লোকে সাংখ্যমতের আদি প্রতিষ্ঠাতা কপিল একদিকে যেমন প্রজাপতিরূপে বিশেষিত হচ্ছেন, তেমনই কোনো কোনো শ্লোকে প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম অহঙ্কারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন।

*[মহা (k) ১২.৩০২.২১; ১২.২১৮.৯;
(হরি) ১২.২৯৫.২১; ১২.২১৫.৯]*

☐ মহাভারতের অন্য একটি স্থানে—আশ্বমেধিক পর্বে কার্য এবং কারণের অভিন্নতা ঘোষণা করে বলা হচ্ছে—

য উৎপন্নো মহান্ পূর্বমহঙ্কারঃ স উচ্যতে।
অহমিত্যেব সম্ভূতো দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ উচ্যতে॥

অর্থাৎ যা পূর্বে মহতত্ত্বরূপে উৎপন্ন হয়েছিল তাকেই অহঙ্কার বলা হয়। যেহেতু কারণ এবং কার্য অভিন্ন, তাই মহৎ হতেই অহঙ্কার উৎপন্ন হলেও মহৎকে অহঙ্কারও বলা যায়। এই

অহঙ্কারের বৃত্তি হল অহম্, যাকে প্রকৃতির দ্বিতীয় সৃষ্টি বলা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সৎকার্যবাদের ব্যাখ্যার সেই সুর—যা কারণ তাই কার্য হতে পারে, আবার যা কার্যরূপে অভিব্যক্ত হয় তা কারণের মধ্যেই অন্তঃস্যূত—এই ধ্বনি আমরা মহাভারতের শান্তিপর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে তো পেয়েছিই, এবং পেয়েছি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতেও। বুদ্ধচরিতে অরাড়ের সংলাপের মধ্যে—

সশিষ্যঃ কপিলশ্চেহ প্রতিবুদ্ধিরিতি স্মৃতিঃ।
সপুত্রো'প্রতিবুদ্ধস্তু প্রজাপতিরিহোচ্যতে॥

মহাভারতের মতো বুদ্ধচরিতেও সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা কপিলকে মহান বা বুদ্ধির সঙ্গে এবং মহানের পরবর্তী অভিব্যক্ত অহঙ্কারকে প্রজাপতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আমরা দেখছি, যেখানে পরমর্ষি কপিলকে মহান আত্মা রূপে ঘোষিত করা হচ্ছে সেখানে তিনি পরবর্তী অভিব্যক্তিগুলির জনকরূপেও বোধিত হচ্ছেন। এই প্রতিবুদ্ধি বা মহান আত্মা আবার যখন প্রতিবুদ্ধরূপে বা প্রজাপতিরূপে অহঙ্কারের সঙ্গে তুলনীয় হচ্ছেন, তখন তিনি হয়ে যাচ্ছেন জন্য বা কার্যতত্ত্ব। মহাভারতের শ্লোকের মধ্যেও আমরা অহঙ্কাররূপী কারণ থেকে অহঙ্কৃতরূপী কার্যকে স্বাভাবিকভাবে অভিব্যক্ত হতে দেখেছি। বুদ্ধচরিতের শ্লোকের টিপ্পনীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিত জনস্টন মহাভারতে ব্যাখ্যাত পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বক্তব্য উল্লেখ করে অনিরুদ্ধকে অহঙ্কার রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। আবার এই পঞ্চরাত্রের অন্যরকম ব্যাখ্যা আমরা জনস্টনের লেখার মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি। যেখানে বলা হয়েছে—অনিরুদ্ধই পিতামহরূপে অহঙ্কারের জনক হচ্ছেন বা কারণ হচ্ছেন।

[মহা (k) ১৪.৪১.১; (হরি) ১৪.৪৮.১; Buddhacharita of Asvaghosha, trans. & ed. E.H. Johnston, 12.21, pp. 130]

☐ মহাভারতের মোক্ষধর্মপর্বে আমরা দেখছি বশিষ্ঠ জনক রাজাকে প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি এই মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট অহংকারকে ব্যাখ্যা করার জন্য বলেছেন,

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তমাপন্নং বিদ্যাসর্গং বদন্তি তম্।
মহান্তং চাপ্যহঙ্কারমবিদ্যাসর্গমেব চ॥
অবিধিশ্চ বিধিশ্চৈব সমুৎপন্নৌ তথৈকতঃ।
বিদ্যাবিদ্যেতি বিখ্যাতে শ্রুতিশাস্ত্রার্থচিন্তকৈঃ॥

অর্থাৎ মুনিরা অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে প্রথম অভিব্যক্ত সেই মহত্তত্ত্বকে বিদ্যা বলেন, আর অহঙ্কারতত্ত্বকে অবিদ্যা বলে থাকেন। শুক্তিতে যখন রজত ভ্রম হয়, তখন শুক্তিকে শুক্তিরূপে দেখা বা চেনাই হল বিদ্যা আর রজতরূপে ভ্রম করাটাই হল অবিদ্যা। এইভাবে মহাভারতে বিদ্যা এবং অবিদ্যারূপে মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারের স্বরূপ নির্দিষ্ট করে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

ত্রিগুণো'সৌ মহান্ জ্ঞাতঃ প্রধান ইতি বৈ শ্রুতিঃ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধাত্মকঃ।
ত্রিবিধো'য়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত॥

যখন অহঙ্কারে সত্ত্বগুণ, রজোগুণকে এবং রজোগুণ তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়, তখন প্রাচীন আচার্যগণ সেই অহঙ্কারকে 'বৈকৃত' সংজ্ঞায় চিহ্নিত করেন। আবার যখন অহঙ্কারে সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত থাকে এবং তমোগুণ প্রবল হয়, তখন সেই অহঙ্কারের নাম হয় 'ভূতাদি'। এরপর যখন অহঙ্কারে সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ দুর্বলভাবে এবং রজোগুণ প্রবলভাবে অবস্থান করে তখন সেই অহঙ্কার 'তৈজস' নামে চিহ্নিত হয়। ত্রিগুণাত্মক এই অহঙ্কার যদিও এক তবুও তার বিক্রিয়া এবং কার্য সম্পূর্ণই ভিন্ন হয়ে থাকে। *[মহা (k) ১২.৩০২.২২-২৩; মহা (নির্ণয় সাগর প্রেস) ১২.২৩৮.২৬-২৭; (হরি) ১২.২৯৫.২২-২৩; ১২.২২৯.২৬-২৭]*

☐ সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস অহঙ্কারবশত যে ষষ্ঠ অবিশেষ সৃষ্ট হয়, যা যোগদর্শনে বলা হয়েছে, তার মধ্যে কোনটি আগে বা কোনটি পরে—তা নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও একথা সত্য যে রাজস অহঙ্কার থেকেই যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি। এই রাজস অহঙ্কার সৃষ্ট হয়েছে রজোগুণের বিক্ষুব্ধতাবশত। একথা মহাভারতে, পুরাণগুলিতে এবং সাংখ্যদর্শনে— সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে। মহাভারতের শ্লোকে একথাও বলা হয়েছে, সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণগুলির সঙ্গে একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত এবং জীবাত্মা এ সমস্তই অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে—

মহাভূতানীন্দ্রিয়াণি গুণাঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ।
ত্রৈলোক্যং সেশ্বরং সর্বমহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিতম্॥

যেহেতু প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিক্ষোভের উপর নির্ভর করে সমস্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যকে সম্ভব করে তোলে, সেইজন্য সৃষ্টি এবং প্রলয় সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিই গুণগুলির স্বভাব অনুযায়ী হয়ে থাকে। এজন্যই মহাভারতে বলা হয়েছে—

রাজসং তামসঞ্চৈব শুদ্ধাত্মকমকল্মষম্।
তৎসর্বং দেহিনাং বীজং সত্ত্বমাত্মবতঃ সমম্॥

সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাত মহাভারতের শ্লোকের অর্থ হল গুণগুলি মিলিতভাবে দেহিগণের দেহলাভের কারণ হয়, আর সত্ত্বগুণ মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির কারণ হয়ে থাকে। মহাভারতের এই শ্লোকটিতে সৃষ্টির উৎপত্তিতে রজ ও তমোগুণের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে এগুলিকে অতিক্রম করতেও বলা হয়েছে। কারণ কাম, ক্রোধ, অনবধানতা, অভিমান, দর্প এই কয়টি রজোগুণের ফল; আর লোভ, মোহ, ভয়, ক্লান্তি, বিষাদ, শোক, কার্যে অরুচি, ও দুর্জনতা এই কয়টি তমোগুণের ফল। এই দ্বিবিধ ফলবশতই মানুষের নানা কামনা বাসনার জন্ম হয়। অপূরিত কামনার তৃষ্ণাই তখন রাজসিক এবং তামসিক অহঙ্কারের জন্ম দেয়। *[মহা (k) ১২.২১২.১৯, ২৩, ২৮; (হরি) ১২.২০৯.১৯, ২৩, ২৮]*

☐ রজোগুণের স্বভাব প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের স্বভাব নিয়মন—এই দুই গুণের প্রভাব থেকে মুক্তি হয়ে যখন সকল রকম বিষয় তৃষ্ণার মোহ ত্যাগ করে সত্ত্বস্বরূপতার প্রকৃত বোধ জন্ম নেয়, তখনই আর পুনর্জন্মের কোনো আশঙ্কা থাকে না। আর জন্ম না হলে বিষয়তৃষ্ণা বা বাসনাবশত দুঃখও ভোগ করতে হয় না। সুতরাং প্রকৃত অহং বা পুরুষের সত্ত্ব স্বরূপতার বোধ জাগ্রত হয়ে যাবতীয় বন্ধন ঘুচে যায়। বুদ্ধির অধ্যবসায়াত্মিক স্বভাবের মাধ্যমে সংকল্প নিশ্চয়ের পর যে অভিমানাত্মক অহং এর সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তী বিকারগুলির জন্ম দেয় সেই অহংবোধ কিন্তু পুরুষ বা আত্মারই হয়ে থাকে। যতক্ষণ পুরুষের এই সবিশেষ সচেতনতা বা অহংবোধ ভিতরে ক্রিয়া করতে থাকে ততক্ষণই তিনি নিজেকে জাগতিক সমস্ত কিছুর কর্তা বলে অভিমান করতে থাকেন। আসলে তিনি যে পরম অহং, যাঁর কোনো কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব বলে আসলে কিছুই নেই, এই বোধ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর হবে, ততক্ষণই তিনি 'ক্ষুদ্র আমির' রাজত্বেই রাজা হয়ে বিরাজমান থাকবেন। জাগতিক কামনা-বাসনা-ভোগস্পৃহা তাকে বিচলিত করবে। কিন্তু প্রকৃতিতে রজোগুণ এবং তমোগুণের আধিক্য কমে গিয়ে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য যখন বৃদ্ধি পাবে, তখন তিনি ধীরে ধীরে আপন স্থিতপ্রজ্ঞতায় প্রত্যাবর্তন করবেন। তাঁর প্রকৃত অহং স্বরূপতা তখন ক্ষুদ্র আমির সীমারেখার মধ্যে বাঁধা থাকবে না।

অহর কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রেরা দানব নামে পরিচিত। এই দনুপুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অহর।

[মহা (k) ১.৬৫.২৫; (হরি) ১.৬০.২৫; কালিকা পু. ৩৪.৫৫]

অহল কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রেরা দানব নামে পরিচিত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দনুপুত্রদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায়। অহল তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১১]

অহল্যা প্রজা সৃষ্টি করার পর পিতামহ ব্রহ্মা দেখলেন যে, তাদের মধ্যে পৃথক কোনো বিশেষত্ব নেই—না দর্শনে, না লক্ষণে, না রূপে—কোনো বিশেষত্বই নেই। সেই কারণে সমস্ত প্রজাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যত সৌন্দর্য্য ছিল, সেই সব বৈশিষ্ট্য একটি স্ত্রীলোকের মধ্যে নিবেশ করে ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃষ্টি করেন—

যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুদ্ধৃতম্।

[রামায়ণ ৭.৩৫.২১]

অহল্যা হলেন ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট এক সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী। 'হল' মানে বিরূপতা, এই শব্দের সঙ্গে 'ষ্ক্য' প্রত্যয় যোগ করলে হয় 'হল্য' অর্থাৎ যে রমণীর মধ্যে হল্য বা বিরূপতা নেই, তিনি 'অহল্যা'—

যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্তিতম্॥

[রামায়ণ ৭.৩৫.২৩]

ভাগবত পুরাণ মতে, ভর্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গলের যমজ সন্তানদের মধ্যে কন্যা সন্তানটি হলেন অহল্যা। কোনো কোনো পুরাণে অহল্যাকে মুদ্গলের বংশোদ্ভূত বিন্ধ্যাশ্ব (অন্যমতে, বৃদ্ধশ্ব বা বধ্যশ্ব)-এর ঔরসে

মেনকার গর্ভজাত কন্যা বলা হয়েছে। তাঁর যমজ ভাই ছিলেন দিবোদাস।

[ভাগবত পু. ৯.২১.৩৪;
মৎস্য পু. ৫০.৬-৭; বায়ু পু. ৯৯.২০০-২০১]

অহল্যার জন্মমুহূর্ত থেকেই দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার প্রতি কামাসক্ত ছিলেন এবং তাঁকে পত্নীরূপে মনে মনে বরণ করেছিলেন—

স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈবেতি পুরন্দর।

[রামায়ণ ৭.৩৫.২৫]

পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মনোভাব বুঝেই অহল্যাকে গৌতম ঋষির কাছে গচ্ছিত রাখেন এবং বহুকাল ঋষির কাছে থাকা সত্ত্বেও সর্বাঙ্গসুন্দরী অহল্যার প্রতি গৌতমের নিস্পৃহ আচরণ দেখে শেষপর্যন্ত তাঁকেই অহল্যার পতি হবার উপযুক্ত বলে মনে করলেন। গৌতম-ঋষির সঙ্গে অহল্যা মিথিলার নিকটবর্তী একটি উপবনে অনেক বৎসর ধরে তপস্যা করেছিলেন। অহল্যার প্রতি অদম্য কামনার আকর্ষণ থেকে ইন্দ্র মুক্ত হতে পারেননি। একদিন গুরু গৌতম তীর্থস্নানের জন্য আশ্রমের বাইরে গিয়েছিলেন। মুনি আশ্রমে নেই জেনে ইন্দ্র গৌতম মুনির বেশ, সাজসজ্জা জটা-চীর ধারণ করে অহল্যার সঙ্গে মিলনের জন্য আসেন। ইন্দ্র অহল্যাকে বললেন —মিলনকামী ব্যক্তি মিলনের জন্য ঋতুকালের অপেক্ষা করে না। আমি তোমার সঙ্গে এখুনি মিলিত হতে চাই। মহর্ষি গৌতম এমন ধর্মবিরুদ্ধ মিলন-প্রার্থনা করতে পারেন না—এটা অনুভব করেই অহল্যা গৌতমবেশী ইন্দ্রের দিকে চেয়ে তাঁকে গৌতম মুনির বেশধারী জানা সত্ত্বেও অহল্যা দেবরাজ-ইন্দ্রের রতি-কৌশল কেমন তা উপভোগ করার কৌতূহলবশেই তাঁর সঙ্গে মিলনে সম্মত হন—

মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ॥

[রামায়ণ ১.৪৮.১৯]

মিলনান্তে যে কোনো সময়ে গৌতমের আগমন আশঙ্কা করে অহল্যা ইন্দ্রকে চলে যেতে বললেন। মিলনতৃপ্ত ইন্দ্র কুটীর থেকে ফিরে যাবার পথে তীর্থস্নাত গৌতমের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। আপন ছদ্মবেশে ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে গৌতমের মনে হল—তিনি নিশ্চয়ই কোনো অকর্তব্য করে এসেছেন। মুহূর্তকাল পরেই সঠিক ঘটনা বুঝতে পেরে ইন্দ্রকে তিনি অভিশাপ দিলেন—বিফলস্তং ভবিষ্যসি—অর্থাৎ তাঁর কামুক ইন্দ্রিয়টিই যেন খসে পড়ে যায়। মুনির শাপে তখনই তাঁর জননেন্দ্রিয় খসে পড়ে গেল। মুনি এবার স্ত্রী অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন—বহু বৎসর কাল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে নিরাহারে সকলের অদৃশ্য হয়ে এই তপোবনেই কাল যাপন করবে তুমি—

বাতাভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমে'স্মিন্ বসিষ্যসি॥

[রামায়ণ ১.৪৮.৩০]

গৌতম অহল্যাকে এও বলেন, 'তুমি রূপ এবং যৌবনসম্পন্না হয়েও আপন মর্য্যাদায় স্থির থাকতে পারো নি, তাই জগতে তুমি একাই রূপবতী থাকবে না।' ফলে জগতে অহল্যার মতো বহু রূপবতী স্ত্রীলোক উৎপন্ন হতে লাগল। অহল্যা শাপমোচনের উপায় জানতে চাইলে গৌতম তাঁকে বলেন যে, ভগবান বিষ্ণুর মনুষ্য অবতার, রামচন্দ্র তপোবনে এসে অহল্যাকে দেখা দিলে অহল্যার পাপমুক্তি ঘটবে। এই কথা বলে গৌতম আশ্রম ত্যাগ করে—হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে গেলেন। তদবধি অহল্যা সকলের অদৃশ্যা হয়ে নিজেকে তপস্যায় নিয়োজিত করলেন। বহুকাল পরে তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করে দাশরথি রামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যখন জনকের রাজধানী মিথিলার দিকে যাচ্ছেন, তখন ওই গৌতমের তপোবনে প্রবেশ করলেন। বিশ্বামিত্র অহল্যার কাহিনী বিবৃত করলে রামচন্দ্র তপস্যার জ্যোতিতে দীপ্ত ধূমাবৃত অগ্নিশিখার মতো দেখতে পেলেন অহল্যাকে—

ধূমেনাভি পরীতাঙ্গীং-দীপ্তামগ্নিশিখামিব।

[রামায়ণ ১.৪৯.১৪]

রামচন্দ্রের দর্শনে তাঁর শাপকাল শেষ হল এবং তিনি সবার দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠলেন। গৌতমের পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী অহল্যা রাম ও লক্ষ্মণের আতিথেয়তা করেন। রামচন্দ্রও শাস্ত্রবিধি মেনে তা গ্রহণ করলেন। এইখানেই গৌতমের সঙ্গে অহল্যার পুনর্মিলন ঘটে। এরপর তপস্যার দ্বারা পবিত্র অহল্যাকে সঙ্গে নিয়ে গৌতম মুনি রামচন্দ্রকে

বন্দনা করলেন এবং শাস্ত্রীয় নিয়মে তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন।

[রামায়ণ ৭.৩০.২১-৩৩; ১.৪৮.১৬-৩৪;
৪৯.১৪-২২; ৭.৩৫.৩৭-৪৫;
ভাগবত পু. ৯.২১.৩৪;
মহা (k) ১২.৩৪২.২৩; ৫.১২.৬;
(হরি) ১২.৩২৮.৫৩; ৫.১২.৬;
বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪২; ৪.১৯.১৬
মৎস্য পু. ৫০.৭; বায়ু পু. ৯৯.২০১]

□ রামায়ণের এই কাহিনীতে রামচন্দ্রের দর্শনলাভে অহল্যার শাপমুক্তি ঘটেছে—এই পরম অলৌকিকতা এবং ভগবৎ-সত্তায় রামচন্দ্রের করুণা-গুণ যত প্রকট হয়ে উঠেছে, তার অনেক বেশী উদার ভাবনায় অহল্যার কথা ভেবেছে মহাভারত। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ছিল—একটা কাজ কীভাবে করতে হবে—ধীরে? খুব ভেবেচিন্তে? নাকি খুব তাড়াতাড়ি? ভীষ্ম বললেন—এ ব্যাপারে একটা পুরনো ঘটনা তোমাকে শোনাবো এবং সে ঘটনার মর্মগ্রন্থি এইটাই যে, খুব ভেবেচিন্তে সময় নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া উচিত। এবারে ঘটনাটা শোনো। মহর্ষি গৌতমের একটি ছেলে ছিল, তাঁর নাম চিরকারী। যে কোনো কাজই সে করত, সেটা সে এতই ভাবনা করে, সময় নিয়ে করত যে, তার নামই হয়ে গেল চিরকারী। তবে কাজ বলেই নয়, সে যখন ঘুমোত, তখন অনেক বেশী সময় ঘুমিয়ে থাকত, আবার যখন সে জেগে থাকত, তখন অনেক বেশী সময় ধরেই জাগত, আর যে কোনো কাজ শেষ করত বড়ো দীর্ঘ সময় নিয়ে—

চিরং কার্য্যাভিপত্তিশ্চ চিরকারী তথোচ্যতে।

এইরকম একটা লোককে যে মানুষ ভীষণ বোকা বলবে, অলস বলবে এটাই স্বাভাবিক।

যাই হোক, আসল কথায় আসি। ইন্দ্র আর অহল্যার সেই ব্যভিচার ঘটনা ঘটার পর একদিন গৌতম-মহর্ষি পুত্র চিরকারীকে ডেকে বললেন—তুমি তোমার জননীকে হত্যা করো আমার আদেশে—

জহীমাং জননীমিতি।

গৌতম ঋষি পুত্রকে আদেশ দিয়েই আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন তপস্যায়, আর ওদিকে চিরকারী বসলেন ভাবনার তপস্যায়। চিরকারী ভাবলেন—পিতার আদেশই বা তিনি অমান্য করবেন কী করে, আবার ছেলে হয়ে মাকেই বা তিনি হত্যা করবেন কী করে—দু'দিকেই তাঁর ধর্মসংকট, এ অবস্থায় তিনি মুক্তই বা হবেন কী করে—

কথং ধর্মচ্ছলেনাস্মিন্ নিমজ্জেয়ম্ অসাধুবৎ?

চিরকারী তাঁর পিতার সম্বন্ধে রীতিমতো শাস্ত্রীয় সম্ভ্রম পোষণ করেন এবং একই সম্ভ্রম পোষণ করেন মাতার সম্বন্ধেও। বহুতর শ্লোকরাশি, যা কিনা পিতার মাহাত্ম্য এবং পূজ্যতা প্রমাণ করে সেগুলি চিরকারী গভীরভাবে আলোচনা করলেন মনে মনে। আবার মায়ের ব্যাপারে যত শাস্ত্রীয় বিচার আছে, সেগুলিও তিনি পরম যৌক্তিকতায় ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ব্যভিচার এবং পর কামুকতার ক্ষেত্রে পুরুষ মানুষরা যত দায়ী, স্ত্রীলোকেরা তত নন। এমনকী নিজের মায়ের ক্ষেত্রেও—অহল্যার দোষ কতটুকু? ইন্দ্র তাঁর স্বামী গৌতমের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন অতি নিপুণভাবে, ফলত অহল্যা তাঁকে স্বামী বলে ভেবে নিয়েছিলেন বলেই নিজেকে সর্বাত্মকভাবে সমর্পণ করেছিলেন—

তস্যাত্মনা তু সদৃশম্ আত্মানং পরমং দদৌ।

চিরকারী পিতা মাতার গুণ এবং মাহাত্ম্য নিয়ে যে তুল্যমূল্য বিচার করেছিলেন, তাতে শেষের দিকটায় মায়ের পাল্লাটাই যেন একটু ভারী হয়ে গেছে। এর ওপরেও জীবনের বিচিত্র অভিসন্ধি মাথায় রেখে তিনি যখন নিজের জননীকে একজন স্ত্রী হিসেবে বিচার করছেন, সেখানে ব্যভিচারের প্রসঙ্গ ওঠার পরেও উদার সামাজিক শুভৈষণায় ভেবেছেন—ব্যভিচারের ঘটনা পৃথিবীতে যত ঘটে, সেখানে পরম প্রবৃত্তিটা পুরুষের তরফ থেকেই দেখা যায় এবং মেয়েদের যেহেতু শারীরিক শক্তি কম অতএব বলাৎকার, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা প্রধানত পুরুষের ইচ্ছাধীন এবং অন্যায়টা সে-ই প্রথম করে মেয়েরা করে না—

সর্বকার্যাপরাধ্যত্বান্ নাপরাধ্যন্তি চাঙ্গনাঃ।

চিরকারী শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকেই তাঁর পুরুষ প্রবৃত্তির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করে তাঁর মা অহল্যার দিকটা বুঝে নিতে চাইলেন সেই পুরুষ-প্রবৃত্তির বলি হিসেবে। পিতার আদেশ মান্য করে তাঁকে হত্যা করা তো দূরের কথা, চিরকারী মনুষ্য-জীবন-যাপনের গার্হস্থ্য বিচারেই অহল্যা-

জননীকে সমস্ত অন্যায় থেকে মুক্তি দিয়ে বসে রইলেন। সব কাজেই চিরকারী দেরি করেন, এটাতেও দেরি করলেন।

অনেক কাল পরে আশ্রমে ফিরে এলেন মহর্ষি গৌতম। অনেক কাল তপস্যার পর যখন তাঁর মন থেকে ক্রোধ দূরীভূত হয়েছে, তখন সেই তপস্যার অন্তরে গৌতমের মনে প্রচণ্ড অনুতাপ তৈরি হল। তিনি ভাবলেন এটা আমি কী করলাম? দোষটা তো আমারই ছিল। আসলে ঘটনাটা এইরকম যে, দেবরাজ ইন্দ্র আকাশ-পথে যেতে যেতে অহল্যার রূপ দেখে মহামুগ্ধ হয়ে পড়েন। তখন তিনি ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে একেবারে অতিথি হয়ে এলেন গৌতমের আশ্রমে। ঋষি গৌতম নিজেই পূর্বকথা রোমন্থন করে বলছেন—যখন ব্রাহ্মণ অতিথি হয়ে আমার কাছে এলেন দেবরাজ, তখন আমিই তো তাঁকে মধুর বাক্যে আসন-অশন দিয়ে বসিয়েছি, পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করেছি—

স ময়া সান্ত্বিতো বাগ্‌ভিঃ স্বাগতেনাভিপূজিতঃ।

তাঁকে স্বাগত-অভ্যর্থনা জানিয়ে এমন কথাও বলেছি যে, আপনি এই আশ্রমে আসার ফলে আমাদের একজন অভিভাবক জুটল, আমরা অনাথ ছিলাম আপনি আসার ফলে সনাথ হলাম। আমি এটাই ভেবেছিলাম যে, একজন অতিথিকে এইভাবে মর্য্যাদা দিলে তিনি খুশি হবেন এবং তিনি হয়েওছেন সেটা—

পরবানস্মি চেত্যুক্তঃ প্রণয়িষ্যতি তেন চ।

গৌতম স্থিরবুদ্ধিতে এবার ভাবলেন যে, এইভাবে এক ব্রাহ্মণবেশী দেবতা-পুরুষকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িতে রেখে দেওয়াটার মধ্যেই তাঁর চরম অকৌশল তৈরি হয়ে গেছে। তার মধ্যে এমন অতিথিকে বিশ্বাস করে তিনি বাইরে চলে গেলেন—কৌশলহীনতার চরম বিন্দু সেখানেই, অহল্যাকে সেখানে দোষ দিয়ে কী হবে—

অত্র চাকুশলে জাতে স্ত্রিয়া নাস্তি ব্যতিক্রমঃ।

গৌতম অনুতাপগ্রস্ত হলেন অহল্যার জন্য, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তের জায়গায় তিনি নিজেকেও বেশি দোষ দিতে পারলেন না। বললেন—বাড়িতে অতিথি এলে তাঁকে আদর-অভ্যর্থনা করব এটাই স্বাভাবিক, আবার ইন্দ্র-হাজার হলেও সে রাস্তার লোক, তার স্বভাবের মধ্যে এই অতিক্রম থাকবে, এটাও স্বাভাবিক, আর অহল্যার কী দোষ, সে তো পরিস্থিতির শিকার। তাহলে ধর্মের কাছে কার প্রমাদ ঘটল? কেউই তো আমরা তেমন দোষী নই—

এবং ন স্ত্রী ন চৈবাহং নাধ্বগস্ত্রিদশেশ্বরঃ।

টীকাকারেরা বলেছেন—অনুতাপগ্রস্ত এই সিদ্ধান্তে গৌতম ইন্দ্রকে যে শেষ পর্যন্ত প্রায় নির্দোষ বলেই ছেড়ে দিলেন, সেটা মৌখিক তর্কযুক্তির খাতিরে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তিনি তাঁকে নির্দোষ ভাবছেন না। কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটে গেছে, সেখানে তাঁর অনবধানতা এবং অকৌশলই যে প্রধানত দায়ী, সেটা তিনি বুঝেছেন।—প্রমাদস্তু অপরাধ্যতি। তার মানে, সিচুয়েশন, পরিস্থিতি এবং বেখেয়াল। ইন্দ্রকে তিনি বলেছেন—রাস্তার লোক-(অধ্বগ), সে লোকটাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে সুন্দরী বউকে একলা রেখে তিনি বাইরে গেলেন—এই বেখেয়াল 'অনবধান—এটাই অধর্মটা ঘটিয়ে দিল। অতএব অনুতাপের বিষয় এটাই যে, তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রী অহল্যা, কামনার ক্ষেত্রে যিনি গৌতম ঋষিকেই চান, সেই স্ত্রীকে হত্যার আদেশ দিয়ে এলেন তিনি—

হত্বা সাধ্বীঞ্চ নারীঞ্চ ব্যসনিত্বাচ্চ বাসিতাম্।

এখন তাঁর ভরসা একটাই—চিরকারী; সব কাজই যে দেরি করে করে, বিবেচনা করে করে।

গৌতম আশ্রমে ফিরে দেখলেন—চিরকারী আপন সুচিরায়ত বিবেচনায় মাতৃহত্যা করেননি। তিনি পরম আনন্দে পুত্রকে অনেক আশীর্বাদ করলেন এবং অহল্যাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করলেন বিনা বাক্যে। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি সচেতন হলেন—সুন্দরী বউকে আর অরক্ষিত রাখলেন না। চিরকারীকে তিনি বলেছিলেন—আমি প্রয়োজনে বাইরে গেলে তুমি অস্ত্রধারণ করে জননীকে সুরক্ষা দেবে। কিন্তু ক্রোধান্বিত আদেশটুকু—মাকে তুমি মেরে ফেল এই আদেশটা চিরকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল—

হন্যা ইতি সমাদেশঃ শস্ত্রপাণৌ সুতে স্থিতে।

আমরা শুধু বলতে চাই—অহল্যার কাহিনীটা হয়তো রামায়ণ থেকে এখানে একটু আলাদা, কিন্তু ধর্ম এবং নৈতিকতার জায়গাটা এখানে অনেক মানবিকভাবে প্রসারিত। গৌতমও যেমন—'আমি আদেশ দিয়েছি, কেন মানা হয়নি' বলে চেপে ধরে বসে নেই, তেমনই তাঁর পুত্রও

চিরকারিত্বের স্বভাবে বিনা বিবেচনায় পিতৃসত্য পালন করেননি। তার মানে, মহাভারত শাস্ত্রীয় সত্যধর্মকে পাষাণ-রেখায় লিখিত অনতিক্রমণীয় সত্য বলে মনে করে না। সমাজের প্রয়োজনে, বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে সেই সত্য বা ধর্মকে মহাভারতে পুনর্বিবেচিত করেছে।

[মহা (k) ১২.২৬৬.১-৬৯; (হরি) ১২.২৬০.১-৬৯]

☐ রামায়ণের কাহিনীতে অহল্যার যে রূপ এবং চরিত্র মহাভারতে সেটা অনেক সযৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যাত হলেও অহল্যার ব্যাপারে ইন্দ্রের আসক্তির কথাটা প্রায় ঔপপত্যের চিহ্নে চিহ্নিত হয়েছে বহু প্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণে। এখানে ইন্দ্রের একটা বিশেষণই হল—তিনি অহল্যার উপপতি—

অহল্যায়ৈ জারঃ।

বৈদিকরা, বিশেষত কুমারিল ভট্টের মতো দার্শনিক মীমাংসক কিন্তু এখানে ইন্দ্রের অহল্যাতিক্রম কাহিনীকে 'অ্যালিগোরি' হিসেবেই ব্যাখ্যা করছেন এবং তাঁর মত ব্যক্ত করে ম্যাকস্‌মুলার যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তার ওপরেও চর্চা করেছেন শামা শাস্ত্রী মহাশয়। আমরা সেই ছোট্ট প্রবন্ধটি অহল্যার তাৎপর্য্য হিসেবে জানাচ্ছি—

It is related in the Epics that Indra, the sun, loved Ahalyā, the wife of Gotama, who, coming to know of their intimacy, cursed Indra to be spotted and Ahalyā to be a stone. Yielding to her entreaty, he said that when Rāma, the son of Daśaratha, steps over Ahalyā's stony form, she will recover her former form. With a view to account for Indra's immoral conduct, Kumārila, the founder of the school of Vedic exegesis, named after him, explained the story as a form of sun-dawn myth, which is translated by Prof. Max Müller as follws–

'Prajāpati, the lord of creation, is a name of the sun, and he is called so, because he protects all creatures. His daughter Uṣas is the dawn. And when it is said that he was in love with her, this only means that at sun-rise the sun runs (abhyeti) after the dawn, the dawn being at the same time called the daughter of the sun, because she rises when he approaches. In the same manner, if it is said that Indra was the seducer of Ahalyā, this does not imply that god Indra committed such crime, but Indra means the sun and Ahalyā (from ahan and li) the night and as the night is seduced and ruined by the sun of the morning, therefore is Indra called the paramour of Ahalyā.' Criticising Kumārila's view the professor says– 'When the Ṛgveda says that Agni is the lover of maidens (jāraḥ kanīnām, I, 66, 4) and the lover of dawns (uṣasām jāraḥ, VII, 9, 1), when it says, prabodhaya jaritar jāramindram (X, 42, 2), O singer wake up the lover Indra, it would, I think, be rather inappropriate to say that jāra means destroyer. Probably the word is derived form jar, to go, to approach, which is a root in group No. 118 of the the list. The Ṛgveda (X, 3, 3) says about Agni thus–svasāram jāro abhyeti–the lover approaches the sister (the dawn).'

It is to be noted that Ahalyā is one of the five maidens, the mere mention of whose names is stated to destroy all sin. They are (1) Ahalyā, (2) Draupadī, (3) Tārā, (4) Tārā, (5) Mandodari. I take these kanyās (Vedic Kanās) to be the following asterisms, for reason that the word kanā is used in ṚV. X, 61 to denote the same asterisms. Ahalyā is Ārdrā which is compared to a coral stone in the list of asterisms. Draupadī is Viśākhā which is compared to a tree (Aśvattha or pippala) with its root turned up and its branches down; she is the daughter of Dru-pada, the root of the tree. Of the two Tārās, one is Rohiṇi, the mother of Budha, Mercury; the second is P. Phalguni, the wife of Vāli, first, and then of sugrīva, Indra's son, and father of Jupiter. Mandodarī is Śaraṇyu (Aśvinī), the mother of the Aśvins, the two Aśvin asterisms; or Kṛttikā, or P. Āśāḍhā, the mother of Agni, Mars, Ahalyā means not halyā, not fit for ploughing, that is stony ground. Since Ārdrā is stone, she is Ahalyā. She is the wife of Gotama, the best bull, the moon, the husband of the 27 asterisms. The couse implies a solar eclipse by the asterism Ārdrā, when the asterism takes the appearance of a colourless stone and Indra, the sun, appears marked with thousands of spots, and Gotama, the colourless moon, is near the sun, it being a new-moon day. She regains her brilliant colour on a full-moon day when the feet, rays, of Rāma, the sun, 180° from her, fall upon her. This seems to be the simple significance of the allegorical story of Ahalyā.

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৩.৩.৪.১৮, পৃ. ২৫৫;
Shama Sastry, 'Indra and Ahalyā.'
In Annals, Bhandarkar Oriental Research
Institute, Vol. 23, 1942, pp. 480-481]

☐ অহল্যার গর্ভে শরদ্বান্ গৌতমের ঔরসে শতানন্দের জন্ম হয়।

[ভাগবত পু. ৯.২১.৩৪; মৎস্য পু. ৫০.৮;
বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৬; বায়ু ৯৯.২০২]

☐ অহল্যা যে স্থানটিতে তপস্যা করে পাপমুক্ত হন, সেই স্থানটি অহল্যাতীর্থ নামে পরিচিত হয়েছে। *[দ্র. অহল্যাতীর্থ]*

[মৎস্য পু. ১৯১.৯০-৯১]

☐ গৌতম নিজ-কন্যার সঙ্গে শিষ্য উতঙ্কের বিয়ে দিলে উতঙ্ক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আপ্লুত হয়ে গুরুপত্নী অহল্যাকে একটি মহার্ঘ্য উপহার দিতে চাইলেন। অহল্যা প্রথমে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেও শিষ্য উতঙ্কের অনুরোধ-উপরোধ ফেলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বললেন—তুমি তাহলে সৌদাস রাজার পত্নী মদয়ন্তীর কানের মণি-কুণ্ডল দুটি এনে দাও আমাকে। উতঙ্ক গুরুপত্নীর প্রিয়কার্য করার জন্য সৌদাস রাজার কাছে গেলেন। এদিকে আশ্রমে উতঙ্ককে না দেখে গৌতম তাঁর গতিবিধি অহল্যার কাছে জানতে চাইলে অহল্যা গৌতমকে জানালেন যে, মণিকুণ্ডল আনার জন্য উতঙ্ক সৌদাস রাজার কাছে গেছেন। গুরু গৌতম পত্নীর এই যাচনাকে সুদৃষ্টিতে দেখেননি এবং তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ জানিয়ে বলেছেন—সৌদাস এক মুনির শাপে রাক্ষস-বৃত্তি গ্রহণ করে বনের মধ্যে বিচরণ করছেন। তিনি উতঙ্ককে মেরেও ফেলতে পারেন। অহল্যা বললেন—আমি না জেনে এই কাজ করেছি, আপনার তপোবলে রক্ষা হোক উতঙ্কের।

উতঙ্ক অনেক কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত মদয়ন্তীর মণিকুণ্ডল এনে দিয়েছিলেন অহল্যাকে—

প্রায়চ্ছৎ কুণ্ডলে দিব্যে গুরুপত্ন্যাস্তদানঘ।

[মহা (k) ১৪.৫৬.২৩-৩৪; ১৪.৫৮.৫৭;
(হরি) ১৪.৭২.২৩-৩৪; ১৪.৭৬.২৭]

অহল্যাতীর্থ মৎস্য পুরাণ মতে এই তীর্থ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত। অহল্যা নাকি এইখানে তপস্যা করেই মুক্তি লাভ করেছিলেন—

অহল্যা চ তপস্তপ্ত্বা তত্র মুক্তিমুপাগতা।

[মৎস্য পু. ১৯১.৮৯-৯০]

আবার ব্রহ্মপুরাণ মতে, এই তীর্থ গোদাবরী অথবা গৌতমী-গঙ্গার তীরে অবস্থিত। শিবপুরাণের (জ্ঞান/৫৪ অধ্যায়) বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, গোদাবরীকেই গৌতমী গঙ্গা বলা হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে উত্তর দিকে অবস্থিত গোদাবরীর অংশকে গৌতমী গঙ্গা বলে।

[GDAMI (Dey), p. 64]

ইন্দ্র অহল্যার সতীত্বহানি করলে স্বামী মহর্ষি গৌতম তাঁকে নদীরূপ ধারণ করে গৌতমী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় স্বরূপে ফিরে আসতে বলেছিলেন। অহল্যা যেখানে গৌতমী নদীতে মিলিত হন, সেই জায়গাটিকেই অহল্যা-তীর্থ বা অহল্যাসঙ্গম তীর্থ বলা হয়েছে। মহর্ষি গৌতম

অন্যায়কারী ইন্দ্রকেও এই নদীতে স্নান করে শাপমুক্ত হতে বলেছিলেন বলে এক ইন্দ্রতীর্থও বলা হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. ৮৭.৬৪-৭০]

আধুনিক ভালোদ অঞ্চলে অহল্যেশ্বর নামে যে মন্দির আছে, তার সঙ্গে এই তীর্থের একাত্মতা থাকতে পারে।

[GDAMI (Dey), p. 9]

অহল্যাসঙ্গমতীর্থ *[দ্র. অহল্যাতীর্থ]*

অহল্যাহ্রদ মহাভারতোক্ত পুণ্য জলস্থান। একে অহল্যা-কুণ্ডতীর্থও বলা হয়। বিহারের দ্বারভাঙা জেলায় অবস্থিত এই তীর্থেই মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল বলে শোনা যায়। পরম্পরাগত ধারণায় দেবরাজ এই স্থানেই গৌতম-পত্নী অহল্যার সতীত্ব কলুষিত করেছিলেন। এইখানে একটি পুরাতন কূপ আছে, যেটি মিথিলাধীশ রাজর্ষি জনকের নির্মিত বলে মহাভারতে বর্ণিত—

জনকস্য তু রাজর্ষেঃ কূপস্ত্রিদশ-পূজিতঃ।

অহল্যাকুণ্ডে এক বৃক্ষতলে অহল্যাবেদি, যার অদূরেই দ্বারভাঙার মহারাজ মন্দির নির্মাণ করেছেন। অহল্যা-কুণ্ড থেকে তিন মাইল পশ্চিমেই আছে গৌতম-কুণ্ড। এই তীর্থস্থানের প্রচুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে মহাভারতে।

[মহা (k) ৩.৮৪.১০৯-১১১;
(হরি) ৩.৬৯.১০৯-১১১; EAIG (Kapoor), p.16]

অহশ্চর শিব-সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত মহাদেবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে শিবের অহশ্চর এবং নক্তঞ্চর নাম দুটি একত্রে উচ্চারিত হয়েছে যার অর্থ ব্যাখ্যা করে টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন—

অহশ্চরো দেবাদিঃ নক্তঞ্চরো
রাক্ষসাদিস্তদু ভয়রূপঃ।

অহ অর্থে এখানে দিন বা দিবাভাগ, নক্ত অর্থাৎ রাত্রি। পৌরাণিক ভাবনা অনুযায়ী দেবতা, মনুষ্য এবং সাধারণ প্রাণী জগত মূলত দিনের বেলায় বিচরণ করে, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করে, রাত্রে নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। অপর দিকে দুরাচার অসুর রাক্ষসদের কার্যকাল মূলত রাত্রি। তারা রাতের অন্ধকারে বিচরণ করে। সেক্ষেত্রে অহশ্চর এবং নক্তঞ্চর এই দুই নামের মাধ্যমে ভগবান শিবকে মূলত সমগ্র জীবকুলের স্বরূপ বলে ভাবনা করা হয়েছে। জগৎস্রষ্টা শিব থেকেই দেব-দানব মানব-রাক্ষস ইত্যাদি সমগ্র জীবকুলের উদ্ভব, সকলের মধ্যেই তিনি স্বয়ং জীবাত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই তিনি অহশ্চর এবং নক্তঞ্চর দুই নামেই সম্বোধিত হন।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪৭; (হরি) ১৩.১৬.৪৭]

অহিচ্ছত্র পুরাকালে অবিভক্ত পঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী ছিল। পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে অপমানিত হয়ে দ্রোণাচার্য অর্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডব-কৌরব শিষ্যদের মাধ্যমে বাল্যসখা দ্রুপদকে বন্দি করেন। তাঁর মুক্তি-শর্ত হিসেবে পঞ্চাল-রাজ্য ভাগ হয় এবং উত্তর পঞ্চালের অধিকার লাভ করেন দ্রোণাচার্য। উত্তর পঞ্চালের অন্তর্গত অহিচ্ছত্র দ্রোণাচার্যের ভাগে পড়ে—

অহিচ্ছত্রঞ্চ বিষয়ং দ্রোণঃ সমভিপদ্যত।

এবং বলা হয়েছে যে, পঞ্চাল যেখানে চর্মণ্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই স্থানটি পেলেন রাজা দ্রুপদ আর দ্রোণ পেলেন উত্তর পঞ্চাল, যার রাজধানী হল অহিচ্ছত্র। নগরী বা পুরী-শব্দের বিশেষণ হিসেবে এটি অহিচ্ছত্রা পুরী।

[মহা (k) ১.১৩৮.৭০-৭৭;
(হরি) ১.১৩৩.৭০-৭৭]

দ্রোণাচার্যের পঞ্চাল অধিগ্রহণের পূর্বে অহিচ্ছত্র সমস্ত পঞ্চাল দেশেরই রাজধানী ছিল এবং অহিচ্ছত্রকে তখন ছত্রবতী নামেও অভিহিত করা হয়েছে—

পার্ষতো দ্রুপদো রাজা ছত্রবত্যাং নরেশ্বরঃ।

[মহা (k) ১.১৬৬.২১; (হরি) ১.১৫৯.২১]

অহিক্ষেত্র বা অহিক্ষত্র নামেও এই দেশ প্রসিদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। কর্ণ দিগ্‌বিজয়ের সময় এই দেশ জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.২৫৪.৯; ৩.২১০.১৪ (পরে
পাদটীকায় অধিক পাঠ দ্রষ্টব্য), পৃ. ২১২৩]

জৈন গ্রন্থে অহিচ্ছত্রকে জঙ্গল নামক একটি দেশের প্রধান নগর বলায় মনে হয় পঞ্চাল দেশকেও জঙ্গল নামে ডাকা হত, ঠিক যেমন মহাভারতে কুরুজাঙ্গল।

[দ্র. Weber, Indische Studien, XVI P.394]

জৈন গ্রন্থ আচারাঙ্গ-নিরুক্তি (৩৩৫) অনুসারে ধোরনেন্দ্র এই অহিচ্ছত্রেই ভগবান পার্শ্বনাথের পূজা করেছিলেন। অহিচ্ছত্র অন্য যেসব নামে পরিচিত, সেগুলি হল শঙ্খবাই, শঙ্খাবতী এবং প্রত্যগ্ররথ।

প্রাচীন অহিচ্ছত্র এখনকার উত্তর প্রদেশের বেরিলিতে অনোলার নিকটবর্তী রামনগর।

[AGI, Cunningham, PP. 413, 705]

অহিচ্ছত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে প্রাচীন নগরের একটি ধ্বংসাবশেষ এবং দুটি বৃহদাকার মন্দিরের অবশেষ পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে চিত্রিত ধূসরবর্ণের মৃৎপাত্র তথা প্রাচীন উত্তর ভারতে ব্যবহৃত বেশ কিছু কৃষ্ণ-চিক্কণ মৃৎপাত্র। কয়েক বৎসর আগে পুনরায় খনন-কার্য চালানোর পর দেখা গেছে যে, এখানে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের সঙ্গে লৌহের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে—প্রাচীনত্বের বিচারে যা অত্যন্ত জরুরী। পভোসা গুহালিপির প্রমাণে দেখা গেছে যে, বহসাতিমিত্র বলে একজন রাজা ছিলেন অহিচ্ছত্রে, কেননা তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে রামনগর এলাকায়। অন্য একটি পভোসা লিপিতে আষাঢ়সেন নামে অধিচ্ছত্রের (অহিচ্ছত্রের) রাজকুলজন্মা এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যাচ্ছে, যিনি খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই অহিচ্ছত্রে জন্মেছিলেন বলে মনে করা হয়। হরিষেণকৃত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে অচ্যুত নামে এক কীর্তিমান রাজার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁরও নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে অহিচ্ছত্রে অর্থাৎ অধুনা রামনগরে। সপ্তম খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ্ যখন ভ্রমণে এসেছিলেন, তখনও অহিচ্ছত্র স্বনামেই বিখ্যাত ছিল এক নগর হিসেবে।

[V. Smith, Early History of India, 4th ed. pp.391-392]

এখনকার আলমপুরা কোটা অঞ্চল এবং নসরতগঞ্জের একটি দুর্গনিবাসের মধ্যেই প্রাচীন অহিচ্ছত্র শেষ চিহ্নটুকু বর্তমান।

[AGI (Cunningham), Pp 359-363; A. Fuhrer, Monumental Antiquities and Inscriptions, pp. 26-29, 143-144; Epigraphia Indica, Vol. 2, pp. 242-243; GDAMI (Dey) pp. 2-3; B.C. Law, Panchalas and their capital Ahicchatra; GEAMI, Bajpai p.9]

অহিত যক্ষ মণিবরের ঔরসে দেবজনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১২৯]

অহিতা মহাভারতোক্ত একটি নদীর নাম। ভীষ্মপর্বে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ দেবার সময় সঞ্জয় এই নদীর কথা বলেছিলেন।

[মহা (k) ৬.৯.২১; (হরি) ৬.৯.২১]

অহির্বুধ্ন্য১ বায়ু পুরাণে প্রথম যখন 'অহির্বুধ্ন্য' শব্দটি পাওয়া যায়, সেখানে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন অগ্নিস্থানের মধ্যে। বলা হয়েছে—অহির্বুধ্ন্য অগ্নি হলেন গৃহপতি অগ্নি অথবা বলা উচিত গার্হপত্য অগ্নিস্থানের নাম অহির্বুধ্ন্য। অহির্বুধ্ন্যকে অনুদ্দেশ্য বলা হয়েছে, হয়তো গার্হপত্য অগ্নি সব সময় জ্বলে বলে অথবা এই অগ্নি প্রতিদিন জ্বালাতে হয় না বলেই তাঁকে অনুদ্দেশ্য বলা হয়েছে। সেই অনুদ্দেশ্য গৃহপতি অগ্নির নাম অহির্বুধ্ন্য।

তবে বায়ু পুরাণে যে 'অনুদ্দেশ্য গৃহপতি' অগ্নির কথা পাওয়া গেল, তার মূল ভাবনা আছে শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায়। এখানে মূল মন্ত্রে বলা হয়েছে 'অহিরসি বুধ্ন্যঃ'। মন্ত্রব্যাখ্যায় মহীধর আচার্যের মতো প্রাচীন টীকাকার লিখেছেন—পত্নীশালার পশ্চিম দিকে পুরাতন যে গার্হপত্য অগ্নি তারই নাম অহির্বুধ্ন্য। 'অহি' মানে কী? যার ক্ষয় হয় না—

ন হীয়তে ইত্যহিঃ।

নবদম্পতির বিবাহের পর পত্নীশালার পশ্চিম দিকে প্রথম এই গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করতে হয়। যজ্ঞশালার দ্বারে নূতন বা প্রথম উৎপন্ন অগ্নি আর নিভে যায় না বা নিভে যেতে দেওয়া হয় না বলেই এই অগ্নি স্বরূপে কখনো হীন-ক্ষীণ হয় না বলেই তার প্রথম পরিচয় 'অহি'। আর বুধ্ন্য শব্দের অর্থ হল মূল। মূলে উৎপন্ন, গার্হস্থ্য জীবনের প্রথমে উৎপন্ন বলেই এই অহির (অহীন, অক্ষীণ অগ্নি) নাম অহির্বুধ্ন্য। বস্তুত অগ্ন্যাধানের সময় প্রথমে অগ্নিমন্থনের দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয় বলেই এই অগ্নিকে মূল বা বুধ্ন্য বলা হয়েছে—

বুধ্নো মূলং তত্র ভবো বুধ্ন্যঃ,
আধানকালে প্রথমম্ আহিতত্বান্মূলভাবিত্বম্,
স হি প্রথমং মথ্যতে।

[বায়ু পু. ২৯.৬; বাজসনেয়ী সংহিতা (Weber) ৫.৩৩.১৫২-১৫৩]

পরে অন্য একটি অধ্যায়ে বায়ু পুরাণ অহির্বুধ্ন্য-শব্দের অর্থ-পরিচয় দিয়ে বলল—মঙ্গল কর্মের উপযুক্ত পনেরোটি রাত্রি-মুহূর্তের মধ্যে অহির্বুধ্ন্য অন্যতম একটি মুহূর্ত।

কিন্তু এই একই অধ্যায়ে পরবর্তী একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে—ভগবান মহাদেবের প্রসাদে প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা 'সুরভীর' গর্ভে একাদশ রুদ্রের জন্ম দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অহির্বুধ্ন্য একজন রুদ্র।

[বায়ু পু. ৬৬.৪৩-৪৫; ৬৬.৬৯]

মহাভারতেও অহির্বুধ্ন্য একাদশ রুদ্রের মধ্যে গণ্য হয়েছেন এবং আমাদের ধারণা, রুদ্রের নামের মধ্যে অনেক সময়েই এক ধরনের অগ্নিস্বরূপতা কাজ করেছে এবং পৌরাণিক কাহিনীতে অনেক সময়েই, অগ্নি রুদ্রতেজের আধার, অতএব সেই নিরিখে গার্হপত্য অগ্নি 'অহির্বুধ্ন্য' এক সময় রুদ্রের সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেছেন হয়তো—

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যঃ পিনাকী চ পরন্তপঃ।

[মহা (k) ১.৬৬.২; (হরি) ১.৬১.২;
স্কন্দ পু. (প্রভাসক্ষেত্র) ৮৭.৬]

মহাভারত-পুরাণের পূর্ব-পরম্পরায় অহির্বুধ্ন্য কিন্তু রুদ্র কিংবা অগ্নির স্বরূপে ছিলেন না বটে, কিন্তু অগ্নির একটা অনির্দিষ্ট রূপ এবং ভাব যে অহির্বুধ্ন্যের মধ্যে ছিল, তা বোঝা যায়। ঋগ্‌বেদের দুটি জায়গায় অহির্বুধ্ন্য যেভাবে উল্লিখিত হয়েছেন, সেগুলি হল—

* শং নো'হির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ।
অর্থাৎ অহির্বুধ্ন্য নামক
দেবতা আমাদের শান্তি বিধান করুন।

* মা নো'হির্বুধ্ন্যোরিষেধাৎ

অর্থাৎ অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদের হিংসকদের হস্তে সমর্পণ না করেন। ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত এই অহির্বুধ্ন্য শব্দটিকে নিরুক্তকার যাস্ক অন্তরীক্ষে গমনশীল কিংবা একেবারে অন্তরীক্ষ বলেই নির্ধারণ করেছেন। যাস্ক বলেছেন—যেটা অহি, সেটাই বুধ্ন্য। বুধ্ন্য মানে অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষে বাস করেন বলেই সেই দেবতার নাম অহির্বুধ্ন্য—

যো'হিঃ স বুধ্ন্যঃ, বুধ্নমন্তরীক্ষং তন্নিবাসাৎ।

যাস্ক অন্তরীক্ষলোকের সেই দেবনামের কোনো পর্যায়-শব্দ বললেন না বটে, কিন্তু ঋগ্‌বেদের অন্য একটি মন্ত্রে বলা হল—

অব্জামুক্‌থৈরহিং গৃণীষে বুধ্নে নদীনাং
রজঃসুষীদন্।

মেঘের আহন্তা নদীর স্থানে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করো।

এখানে লক্ষণীয়, ঋগ্‌বেদের অনেক মন্ত্রেই 'রজঃ' শব্দটি অন্তরীক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব জলে বা মেঘ থেকে জাত রজ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে উপবিষ্ট অগ্নি বৈদ্যুতাগ্নি বলেই অনুমান করা যায়। তার মানে এখানেও অহির্বুধ্ন্য অগ্নিরই স্বরূপ। আর অগ্নির স্বরূপ হলে তার রুদ্রস্বরূপ হতেও বাধা থাকে না। অহির্বুধ্ন্যকে রুদ্রাগ্নি বলতেই বা বাধা কী?

[ঋগ্‌বেদ ৭.৩৪.১৬-১৭; ৭.৩৫-১৩;
নিরুক্ত (ক্ষেমরাজ-কৃষ্ণদাস) ১০.৩.৪৪, পৃ. ৭৬৪]

অহির্বুধ্ন্য২ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। পুরাণে অহির্বুধ্ন্য বলতে গৃহপতি অগ্নি বা গার্হপত্য অগ্নিস্থান বোঝানো হয়েছে। আবার কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা 'সুরভী'র গর্ভে মহাদেবের বরে যে একাদশ রুদ্রের জন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়—তাঁদের মধ্যেও অহির্বুধ্ন্য একজন।

গার্হপত্য অগ্নির অহির্বুধ্ন্য নামকরণের মূল ভাবনা আছে শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত বাজসনেয়ী সংহিতায়। এখানে মূল মন্ত্রে বলা হয়েছে—'অহিরসি বুধ্ন্যঃ'। মন্ত্র ব্যাখ্যায় মহীধরের মতো প্রাচীন টীকাকার বর্ণনা করছেন যে—পত্নীশালার পশ্চিম দিকে পুরাতন যে গার্হপত্য অগ্নি, তারই নাম অহির্বুধ্ন্য। 'অহি' শব্দের অর্থ হল—যা ক্ষয় হয় না। নূতন স্থাপিত গার্হপত্য অগ্নি কখনো নিভে যায় না, বা তাকে নিভতে দেওয়া হয় না বলেই তার অপর নাম অহির্বুধ্ন্য। এখন পৌরাণিক ভাবনায় ভগবান শিবের অহির্বুধ্ন্য নাম যেমন তাঁর অগ্নিস্বরূপতার কারণে, তেমনই তাঁকে একাদশ রুদ্রের একতর অহির্বুধ্ন্যের সঙ্গে অভিন্ন সত্তা রূপে কল্পনা করেও তাঁর এই নাম।

পাশাপাশি মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের অহির্বুধ্ন্য নামের অর্থব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অহিঃ সর্পঃ তস্য বিশেষণং বুধ্ন্যঃ বুধ্নোঃ
মূলে সাধুরিতি ব্রহ্মাণ্ডমূলং পাতালং
তত্র বর্ত্তত ইতি যাবৎ, শেষ স্বরূপ ইত্যর্থঃ।

নীলকণ্ঠের ভাবনায় 'অহি' অর্থে সর্প। বুধ্ন্য শব্দের অর্থ হল মূল। ব্রহ্মাণ্ডের মূলে অর্থাৎ পাতালে অবস্থান করে যিনি সহস্র ফণায় সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছেন—এই ভাবনা থেকে শেষ বা অনন্ত নাগের অপর নাম অহির্বুধ্ন্য।

ব্রহ্মাণ্ড ধারণকারী অনন্ত নাগের স্বরূপতায় ভগবান শিবও বিখ্যাত অহির্বুধ্ন্য নামে।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৩; (হরি) ১৩.১৬.১০৩; বায়ু পু. ৬৬.৪৩-৪৫; ৬৬.৬৯]

অহিমুখ্য গৃহনির্মাণের আরম্ভে বত্রিশজন দেবতাকে ঈশানকোণে ঘৃত দ্বারা পূজা করার বিধি আছে। এই বত্রিশজন দেবতার মধ্যে অন্যতম হলেন অহিমুখ্য।

[মৎস্য পু. ২৫৩.২৬]

অহিমূর্ছনা পুরাণে এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে সপ্তস্বর তথা সপ্তস্বর দ্বারা গঠিত একুশটি মূর্ছনার নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই একুশটি মূর্ছনার মধ্যে অন্যতম হল অহিমূর্ছনা। বরুণদেব এই মূর্ছনার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। কথিত আছে এই মূর্ছনা বিষধর নাগকেও বশীভূত করতে সমর্থ হয়। *[বায়ু পু. ৮৬.৬১]*

অহীন$_1$ এক ধরনের সত্রযাগ। দুই থেকে বারো দিনে সম্পাদ্য সোমযজ্ঞ। দুই প্রকার সোমযাগের একটির নাম অহীন, অন্যটির নাম সত্র। এই দুই প্রকারের যাগই অনেক দিন ধরে করতে হয়। অহীনযাগে যজমান একজন, অন্যেরা ঋত্বিক্‌। সত্রযাগে যাঁরা যজমান, তাঁরাই ঋত্বিক্‌। অহীন যাগ ১২ দিন থেকে ৩৬০ দিন পর্যন্ত চলতে পারে। সত্রযাগ তার পরেও বিস্তারিত হতে পারে। অশ্বমেধ অহীন জাতীয় সোমযাগ। আর 'দ্বাদশাহ যাগ' সত্রও হতে পারে অহীন যাগও হতে পারে। *[কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite) ১২.১.৪-৬; শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ, পৃ. ৪২, ৫৩, ৬০]*

অহীন$_2$ রাজা ক্ষত্রবৃদ্ধ বা ক্ষত্রধর্মের বংশধারায় সহদেবের পুত্র তথা জয়ৎসেনের পিতা ছিলেন অহীন (বায়ু এবং বিষ্ণু পুরাণ মতে অদীন)।

[বায়ু পু. ৯.৩.১০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.১০; বিষ্ণু পু. ৪.৯.৮]

অহীনক অন্য মতে অহীনগ বা অহীনগু। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধারায় দেবানীকের পুত্র তথা পারিযাত্র বা পারিপাত্রের (অন্যমতে রুরু)-র পিতা ছিলেন অহীনক। *[বায়ু পু. ৮৮.২০২; বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪৮; মৎস্য পু. ১২.৫৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.২০৩-২০৪]*

অহীনগ *[দ্র. অহীনক]*

অহীনগু *[দ্র. অহীনক]*

অহোবীর্য একজন ঋষি। দ্বাপর যুগে যেসব ঋষি বানপ্রস্থ ধর্ম পালন করে স্বর্গলাভ করেছিলেন অহোবীর্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১২.২৪৪.১৭; (হরি) ১২.২৪১.১৭]

অহোরাত্র শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। *[দ্র. অহ]*

[মহা (k) ১৩.১৭.১১৩; (হরি) ১৩.১৬.১১২]

আ

'আ' সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির থেকেই চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপতি মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা-সৃষ্ট এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির দ্বিতীয়টি হল 'আ'-কার। ব্রহ্মার দ্বিতীয় মুখ থেকে এই বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল। এই 'আ'-কার থেকে স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি হয়েছিল। বায়ু পুরাণে 'অ' থেকে 'ঔ' পর্যন্ত চতুর্দশ বর্ণকে মূর্তিমান দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মূর্তিমান 'আ'-কার পাণ্ডুর বর্ণের ছিলেন বলে জানা যায়।

[বায়ু পু. ২৬.৩৩]

আকর *[দ্র. আত্রবর্তী]*

আকর্ণনী একজন মাতৃকা। শুষ্করেবতীদেবীর অনুচরী। অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় মহাদেব যেসব মাতৃকাদের সৃষ্টি করেন, তাঁরা অন্ধকাসুরকে হত্যা করার পর সমগ্র জগৎকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হন। সেইসময় মহাদেব তাঁদের নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়ে নরসিংহদেবের স্তব করেন। নরসিংহদেব ওই মাতৃকাদের হত্যা করার জন্য তাঁর দেহ থেকে একাধিক মাতৃকা সৃষ্টি করেন। নরসিংহের দেহ থেকে উদ্ভূত সেই মাতৃকাদের মধ্যে আকর্ণনী একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.৭২]*

আকর্ষ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যেসব রাজারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আকর্ষ একজন।

[মহা (k) ২.৩৪.১১; (হরি) ২.৩৩.১১]

আকলিঙ্গ মধ্যদেশে অবস্থিত জনপদ। পাঠান্তরে 'কলিঙ্গ' বলে উল্লিখিত হয়েছে। *[দ্র. কলিঙ্গ]*

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৩৩; বায়ু পু. ১০২.১৫, ১৭; মৎস্য পু. ৩.২৩; বিষ্ণু পু. ১.৮.৭-১১; মৎস্য পু. ২৫৩.২৪; ২৬৫.৩৯]

আকাশ$_{১}$ তামস অহংকার বিকারপ্রাপ্ত হয়ে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন করে। সেই শব্দতন্মাত্র থেকেই শব্দের কারণ শূন্যময় আকাশের সৃষ্টি।

[কূর্ম পু. ১.৪.২৪]

আকাশ বস্তুত পঞ্চ মহাভূতের অন্যতম। মহাভারতের শুকানুপ্রশ্ন অধ্যায়ে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি এবং লয়ের কথা বলতে গিয়ে পঞ্চ মহাভূতের নাম এবং সংখ্যা উচ্চারণ করা হয়েছে—ভূমি (ক্ষিতি অথবা পৃথিবী), আপঃ (জল), জ্যোতিঃ (তেজ), বায়ু (মরুৎ), আকাশ (ব্যোম)—

> ভূমিরাপস্তথা জ্যোতির্বায়ুরাকাশ এব চ।
> মহাভূতানি ভূতানাং সাগরস্যোর্ময়ো যথা॥

[মহা (k) ১২.২৫৭.৩; (হরি) ১২.২৪৪.৩]

☐ পঞ্চভূত বা পঞ্চ মহাভূতের কথা প্রথম এসেছে প্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে—যদিও সেখানে পুরোপুরি তিনটি element বা তিনটি ভূতের প্রসঙ্গে ত্রিবিৎকরণের কথা বলা হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেছেন—এখানে তিন মহাভূতের কথায় পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চীকরণ বুঝতে হবে। কেননা ছান্দোগ্যে তেজ, জল আর পৃথিবীর কথা বলা হলেও তৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশ এবং বায়ুর উৎপত্তির কথাও বলা হয়েছে এইভাবে—সেই আত্মা-শব্দবাচক ব্রহ্ম থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়েছে, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে—

> আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ।
> অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৬.৩.৩, পৃ. ৬৫৪; শঙ্করাচার্যের টীকা দ্র. এবং দ্র. H. Zimmer, Philosophies of India. তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শিক্ষাবল্লী ২.১.৪]

☐ মহাভারতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রথমেই আকাশের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, প্রথমে অসীম আকাশ পর্বতের মতোই নিশ্চুপ নিদ্রিত এবং একাকী ছিল। ক্রমে অন্ধকারের মধ্যে যেমন অপর অন্ধকার উৎপন্ন হয়, তেমনই আকাশ থেকে উৎপন্ন হল জল। জল থেকে বায়ু—

> পুরা স্তিমিতমাকাশম্ অনন্তমচলোপমম্।
> নষ্টচন্দ্রার্কপবনং প্রসুপ্তমিব সংবভৌ॥
> ততঃ সলিলম্ উৎপন্নং তমসীবাপরং তমঃ।

[মহা (k) ১২.১৮৩.৯-১০; (হরি) ১২.১৭৭.৯-১০]

☐ মহাভারতের অন্য একটি জায়গায় অবশ্য সাংখ্যীয় অহঙ্কার থেকে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তির কথা বলেছে। সেই ভূতবর্গের মধ্যে আকাশও একটি। তামস অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হয়ে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন করে। সেই শব্দতন্মাত্র থেকেই শব্দের কারণ শূন্যময় আকাশের সৃষ্টি।

[মহা (k) ১৪.৪২.১; (হরি) ১৪.৪৭.৯;
বায়ু পু. ১০২.১৫, ১৭; মৎস্য পু. ৩.২৩;
বিষ্ণু পু. ১.৮.৭-১১; মৎস্য পু. ২৫৩.২৪; ২৬৫.৩৯;
কূর্ম পু. ১.৪.২৪]

☐ আকাশ বা ether-এর গুণ হচ্ছে শব্দ, একথা সমস্ত ভারতীয় দর্শন একত্রে স্বীকার করে—

শব্দগুণম্ আকাশম্।

আকাশ থেকেই আমাদের শব্দের জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞান আমরা শ্রোত্র অথবা কর্ণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করি—

শব্দ-লক্ষণমাকাশম্।

আকাশস্য গুণো ঘোষঃ শ্রোত্রেণ চ স গৃহ্যতে।
শ্রোত্রস্থাশ্চ দিশঃ সর্বাঃ শব্দজ্ঞানে প্রকীর্তিতাঃ॥

[মহা (k) ১৪.৪৩.২২, ৩৩;
(হরি) ১৪.৫৩.২; ১৪.৫৪.৬]

☐ আমরা যে বিশেষ বিশেষ শব্দ শুনি, তার একটা সূক্ষ্ম পরমাণু অবস্থা আছে, তাকে বলে 'তন্মাত্র'। পঞ্চ মহাভূতের একতম হিসেবে আকাশের কারণ হল শব্দ-তন্মাত্র, অর্থাৎ আকাশ নামক মহাভূতের মধ্যে যে শব্দগুণ থাকে, সেটা আকাশের সূক্ষ্মতম অব্যক্ত অংশ। সূক্ষ্ম এবং অব্যক্ত বলেই সাংখ্য-দর্শন-মতে সেটা 'অবিশেষ'। আকাশের গুণ শব্দ তন্মাত্র পরের মহাভূতে সংক্রমিত হয়, ফলে শেষ মহাভূত ক্ষিতি বা পৃথিবীর গুণের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ পাঁচটিই আছে।

[বায়ু পু. ১০২.১৫, ১৭; মৎস্য পু. ৩.২৩;
মহা (k) ১২.২৩২.৪-৮; (হরি) ১২.২২৯.২৯-৩৬;
তাপসী মুখার্জী, মহাভারত-পুরাণে সাংখ্য দর্শনের উত্তরাধিকার, পৃ. ৩৬৭-৩৭৩]

গৃহস্থের বাস্তু পূজায় আকাশকে এক উপদেবতা হিসেবে বাস্তুর ঈশাণ কোণে পুজো করতে বলা হয়েছে। আকাশকে দেবমূর্তি হিসেবে হোমকুণ্ডে স্মরণ করতে বলা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ২৫৩.২৪; ২৬৫.৩৯]

আকাশ$_{২}$ অষ্টমূর্তি শিবের অকাশরূপা তনু। অর্থাৎ আকাশ ভগবান শিবের অন্যতম প্রকৃতি-শরীর। কালিদাস পর্যন্ত তার নাটকের নান্দীশ্লোকে লিখেছেন—

শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।

[বিষ্ণু পু. ১.৮.৭;
দ্র. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, নান্দীশ্লোকঃ যা সৃষ্টিঃ ইত্যাদি]

আকাশগঙ্গা মহাকাব্য-পুরাণে আকাশগঙ্গা নামে ভারতের একাধিক স্থানে অবস্থিত একাধিক তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র প্রস্রবণের নাম আকাশগঙ্গা। এই তীর্থে পিণ্ডদান অত্যন্ত শুভ। *[অগ্নি পু. ১১৬.৫]*

☐ বায়ু পুরাণে অবশ্য একে স্বর্গগঙ্গা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ভরতাশ্রমের প্রান্তে আকাশগঙ্গা বা স্বর্গগঙ্গা নামের প্রবাহটিকে দেখা যায়। অমরকোষে এই স্বর্গগঙ্গাই বিয়ৎগঙ্গা (অর্থাৎ আকাশগঙ্গা) স্বর্নদী সুরদীর্ঘিকা।

[বায়ু পু. ১১২.২৬;
অমরকোষ ১. (স্বর্গবর্গ) ৫২]

☐ পণ্ডিত জনেরা আকাশগঙ্গাকে গয়ার অন্তর্গত একটি পবিত্র অবগাহনের স্থান বলেই মনে করেন। *[HPAI (Arya) p. 21]*

☐ আকাশগঙ্গা নামটি থেকে অবশ্য মনে হয় যে, হিমালয়ের সুউচ্চ স্থান থেকে গঙ্গার যে প্রথম প্রবাহটি নির্গত হয়েছিল, সেটাই আকাশগঙ্গা। কেননা মহাভারতের বনপর্বে তীর্থ-দর্শন-স্নিগ্ধ পাণ্ডবদের লোমশ মুনি বলেছেন—এবার তোমরা মন্দর-পর্বতে যাও, সেখানে বদরিকাশ্রমের কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গানদী, যে-নদীর তীরে মরীচি, পুলহ ভৃগু-অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিরা সামগান করেন, মহাদেব এই নদীর জলই মস্তকে ধারণ করেছেন গঙ্গাদ্বারে। পাণ্ডবরা লোমশ মুনির কথা শুনে গঙ্গার এই প্রথম জলধারাকেই নমস্কার জানালেন আকাশগঙ্গা বলে—

আকাশগঙ্গাং প্রয়তাঃ পাণ্ডবাঃ অভ্যবাদয়ন্।

হয়তো আকাশগঙ্গার এই অগ্রবাহিনী ধারাই মন্দাকিনী এবং হিমালয়ের সু-উচ্চ ভূমিতে তার অবস্থান বলেই মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পথে আবারও আকাশগঙ্গার উল্লেখ পাচ্ছি। বলা হচ্ছে—সেখানে সেই দেবনদী ত্রৈলোক্য-পাবনী গঙ্গা আছেন, তুমি সেই আকাশগঙ্গায় একবার ডুব দিয়ে যেও, যুধিষ্ঠির—

আকাশগঙ্গা রাজেন্দ্র তত্রাপ্লুত্য গমিষ্যসি।

মহাভারতে আরও বলা আছে যে, মহর্ষি ভরদ্বাজ এই আকাশগঙ্গায় এসেছিলেন এবং 'পরিবহ' বায়ুর প্রসঙ্গে আবার আকাশগঙ্গার উল্লেখ করা হয়েছে মহাভারতে।

মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের দীর্ঘ যাত্রার অন্তে স্বর্গলোকে আকাশগঙ্গায় স্নান করে নিজের নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন এবং স্বর্গে গমন করেন। আদিপর্বে আকাশগঙ্গা শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হলেও স্বর্গারোহণ পর্বে 'আকাশগঙ্গা' শব্দটির উল্লেখ নেই। তবে সেখানে স্বর্গলোকে প্রবাহিতা গঙ্গা বলে নদীটিকে উল্লেখ করা হয়েছে—

গঙ্গাং দেবনদীং পুণ্যাং পাবনীমৃষিসংস্তুতাম্।

এই বিবরণ থেকে একে আকাশগঙ্গা বলেই ধারণা করা যায়।

[মহা (k) ১.২.৩৭৫; ৩.১৪২.২-১১;
১২.৩৪২.৫৪; ১২.৩২৮.৪৬; ১৮.৩.৪১;
(হরি) ১.২.৩৭৪; ৩.১১৮.২-১১; ১২.৩২৮.১৮৫;
১২.৩১৭.৪৬; ১৮.৩.৪১]

□ কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে যে, পদযুগল, উরুযুগল, যোনিমণ্ডল, নাভিমণ্ডল, স্তনযুগল, স্কন্ধগ্রীবা ও মস্তক ব্যতীত সতী-শরীরের অন্য অবয়বগুলি দেবতাদের দ্বারা খণ্ডিত হয়ে হাওয়ায় উড়ে আকাশগঙ্গাতে পড়েছিল।

[কালিকা পু. ১৮.৪৬]

□ সহ্যাদ্রি পর্বত থেকে সৃষ্ট একটি প্রস্রবণের নাম আকাশগঙ্গা। এটি একটি বিখ্যাত তীর্থ।

[নৃসিংহ পু. (মহর্ষি) ৬৬.৩৫]

□ বর্তমান তামিলনাড়ুর প্রখ্যাত বালাজী মন্দির থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে একটি আকাশগঙ্গা তীর্থের অবস্থান। *[EAIG (Kapoor) p. 25, 26]*

□ কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে যে, হর-পার্বতীর মৈথুনজাত তেজ অগ্নি প্রথমত গ্রহণ করেছিলেন; তারপর সেই তেজ হিমালয়ের অপরা কন্যা উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আকাশগঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। আকাশগঙ্গার গর্ভেই স্কন্দ-বিশাখের জন্ম হয় এবং তারপরে সেই পুত্রদ্বয়ের একাকার দেহ শরবনে নিক্ষেপ করেন আকাশগঙ্গা। *[কালিকা পু. ৪৬.৬৮-৮৮]*

□ কালিকা পুরাণের আর একটি কাহিনীতে পার্বতী কালী শিবের কাছে সোনার মতো গায়ের রঙ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করলে শিব আকাশগঙ্গার জলে পার্বতীকে স্নান করান। তারপর জল থেকে উঠতেই গিরিজা পার্বতীর গায়ের রঙ বিদ্যুতের মতো গৌর হয়ে ওঠে।

[কালিকা পু. ৪৫.১০২-১০৮]

আকাশজননী দুর্গের উপরিতলে প্রাচীরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসব অবকাশ অথবা ছিদ্র রচনা করা হয় তাকে আকাশজননী বলে। বস্তুতঃ দুর্গ নির্মাণের সময়েই দুর্গের যে বহিঃপ্রাকার তৈরি করা হয়, সেই প্রাকারের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রাবকাশ এইজন্যেই রাখা হত, যাতে দুর্গের ভিতরে অবস্থান করেও ওই ছিদ্র দিয়ে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় অথবা যান্ত্রিক প্রযুক্তিতে দূরস্থিত শত্রুর প্রতি আগ্নেয় বস্তু বা প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করা যায়। ঘটাকাশ, পটাকাশের মতো এখানে 'অবকাশ'-অর্থে 'আকাশ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, প্রাকারের অবকাশযুক্ত এই স্থানে যাঁরা রক্ষী-পুরুষ থাকতেন, তাঁদের উপাধি ছিল আকাশরক্ষী।

মহাভারতে আকাশজননী অর্থাৎ সেই প্রাকারস্থিত অবকাশের পার্শ্বদেশে, সৈন্য ও সেনাপতিদের বসবার জায়গা হিসেবে 'প্রগণ্ডী' সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। হয়তো এই 'প্রগণ্ডী' নামক উপবেশন-স্থানে বসেই প্রাকারস্থিত অবকাশের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ আকাশের মধ্যে দিয়ে বহিঃশত্রুর আনাগোনা লক্ষ্য করা যেত।

[মহা (k) ১২.৬৯.৪৩; (হরি) ১২.৬৭.৪৫]

আকাশনির্বিরূপ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। আকাশ বা ব্যোম পঞ্চমহাভূতের অন্যতম। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম বা আকাশ—এই পঞ্চভূতের দ্বারাই সম্পূর্ণ জগৎ নির্মিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হল, আকাশ থেকে সৃষ্টি হল বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে ক্ষিতি বা পৃথিবীর উৎপত্তি—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাদ্ বায়ুঃ।

মহাভারত পুরাণেও একাধিকবার একথা বর্ণিত

হয়েছে। পঞ্চমহাভূতের স্রষ্টা পরমেশ্বর, পঞ্চভূতের একতর যে ব্যোম বা আকাশ—তা তাঁরই অংশজাত। ভগবান শিব সেই জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মের স্বরূপ, আর পরমপুরুষের থেকে জাত প্রথম সৃষ্টি যে ব্যোম বা আকাশ—তিনি আরও স্বরূপ। এই ভাবনা থেকেই শিবসহস্রনামস্তোত্রে তাঁকে আকাশনির্বিরূপ নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬৭; (হরি) ১৩.১৬.৬৭; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২.১.৪]

আকৃতি$_{১}$ স্বায়ম্ভুব মনুর (বায়ু পুরাণ মতে বৈরাজ মনু) ঔরসে শতরূপার গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে আকৃতি অন্যতম। স্বায়ম্ভুব মনু আকৃতিকে মহর্ষি রুচির হস্তে সম্প্রদান করেন। রুচির ঔরসে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ নামে ভগবান শ্রীহরি এবং দক্ষিণা নামে বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপা দেবী লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। আকৃতির ভ্রাতা থাকা সত্ত্বেও স্বায়ম্ভুব মনু পুত্রিকা-পুত্রের (মেয়ের ঘরের নাতির) উত্তরাধিকারের ধর্ম মেনে যজ্ঞকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের যে দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে 'যাম' নামে দেবতাদের গণ হিসেবে প্রসিদ্ধ হন। যজ্ঞ এবং দক্ষিণার জন্ম-কাহিনীটি রূপক আকারে বিবৃত। বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীও রুচি ও আকৃতির কন্যা। *[ভাগবত পু. ১.৩.১২; ৩.১২.৫৫-৫৬; ৪.১.১-৪; ৪.১৩.১৫; ৮.১.৫; ২.৭.২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.১১৩; ১.১.৫৮; ১.৯.৪২-৪৩; বায়ু পু. ১০.১৭-১৯; বিষ্ণু পু. ১.৭.১৮-১৯; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৩.১.৩৬; বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৩.১.৩৭; দেবী ভাগবত পু. ৮.৩.১১-১৫; বৃহদ্ধর্ম পু. ২.১৯.২২; কূর্ম পু. ১.৮.১১-১২]*

□ শিব পুরাণে বলা হয়েছে যে মহাদেব স্বয়ং রুচি এবং দেবী ভগবতী হলেন রুচি-পত্নী আকৃতি। *[শিব পু. (বায়বীয়) ২.৫.৫০]*

□ ভাগবত পুরাণের অন্য একটি পাঠে বলা হয়েছে যে, আকৃতি সর্বতেজার পত্নী। আকৃতির গর্ভে সর্বতেজার চাক্ষুষ মনু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নড়্বলার গর্ভে এই চাক্ষুষ মনুর পুরু, কৃৎস্ন, ঋত, দ্যুম্ন, সত্যবান, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতীরাত্র (অতিরাত্র), প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক নামে বারোটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৭; বৃহদ্ধর্ম পু. ৩.১৩.৯]

আকৃতি$_{২}$ স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধারায় বিভুর পুত্র পৃথুষেণের পত্নী আকৃতি। আকৃতির গর্ভে পৃথুষেণের নক্ত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। *[ভাগবত পু. ৫.১৫.৬]*

আকৃতি$_{৩}$ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মুখ থেকে যে বারোজন দেবতার সৃষ্টি হয়, তাঁরা একত্রে 'জয়' নামে পরিচিত। আকৃতি, এই জয় নামক দেবতাদের একজন। ব্রহ্মার অভিশাপে এই জয় দেবতারা যখন ছয়টি মন্বন্তরে বিভিন্ন গণের দেবতারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন আকৃতি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৬.৬; ৬৭.৪-৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৬; ২.৪.২]

আকৃতি$_{৪}$ চতুর্বিংশতিতম কল্পের নাম আকৃতি। এই কল্পে ব্রহ্মা-সৃষ্ট আদি পুরুষ আকৃত এবং আকৃতের শক্তিস্বরূপা নারী হলেন আকৃতি। ব্রহ্মা আকৃতিকে প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দেন। তাই তাঁর নামানুসারে এই কল্পের নাম হয় আকৃতি।

[বায়ু পু. ২১.৫৫-৫৬]

আকৃতি$_{১}$ সুরাষ্ট্রদেশের অধিপতি। তাঁকে কৌশিকাচার্য বলা হয়েছে। হয়তো কৌশিক নামে কোনো যোদ্ধা-সম্প্রদায়ের তিনি অস্ত্রগুরু ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় সহদেব তাঁকে পাণ্ডবদের অধীনতা স্বীকার করান।

[মহা (k) ২.৩১.৬১-৬২; (হরি) ২.৩০.৬০]

আকৃতি$_{২}$ *[দ্র. অকৃতি]*

আকৃতি$_{৩}$ মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠির যখন ময়দানব নির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভায় প্রবেশ করেন সেই সময় উপস্থিত রাজাদের মধ্যে আমরা একজন আকৃতির নাম পাই। লক্ষণীয়, বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের ভাই অকৃতি কোথাও কোথাও আকৃতি নামেও চিহ্নিত হয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত এই আকৃতি সুরাষ্ট্ররাজ আকৃতিও হতে পারেন।

[মহা (k) ২.৪.৩১; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ৫, পৃ. ২৬]

আকৃতি$_{৪}$ *[দ্র. আহুতি]*

আক্রন্দ কোন অবস্থায় একজন রাজা অন্য একটি রাজ্য আক্রমণ করবেন—একথা বলতে গিয়ে মৎস্য পুরাণ বলেছে—রাজা যখন বুঝবেন যে, বলবত্তর আক্রন্দের মাধ্যমে পার্ষ্ণিগ্রাহ-রূপ শত্রুটি অভিভূত বা আক্রান্ত হয়েছেন, তখন তিনি যুদ্ধ-যাত্রা করবেন—

যদা মন্যেত নৃপতিরাক্রন্দেন বলীয়সা।
পার্ষ্ণিগ্রাহাভিভূতো'রিস্তদা যাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥

তবে মৎস্য পুরাণের এই শ্লোকটি পাঠ বোধহয় তত স্পষ্ট নয়। এই পাঠে 'পার্ষ্ণিগ্রাহাভিভূতো'রিঃ' —এই সমাসবদ্ধ পদটির মানে দাঁড়াতে পারে—পার্ষ্ণিগ্রাহের দ্বারা অভিভূত বা বিপর্যস্ত হয়েছে যে শত্রু (অরি)। তেমন অর্থ হলে আক্রান্ত এবং বিজিগীষু রাজার যুদ্ধযাত্রা কোনো তাৎপর্য্য থাকে না। কিন্তু এই শ্লোকটিই যখন পাঠান্তরে অগ্নিপুরাণে উচ্চারিত হয়, তখন সম্পূর্ণ শ্লোকটি সঠিকভাবে বোধগম্য হয় এবং সেই বোধের জন্য আক্রন্দ এবং পার্ষ্ণিগ্রাহ ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য্যটুকু আগে বোঝা দরকার।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে একটি ভূখণ্ডের রাজাকে ধ্রুবক ধরে নিয়ে তাঁর নাম দিয়েছেন বিজিগীষু। বিজিগীষু রাজার রাজ্যের চারদিকে যেসব শত্রু-মিত্র থাকেন, তাঁদের নিয়েই তাঁর রাজমণ্ডল গঠিত হয়। রাজমণ্ডলে শত্রু মিত্রের অবস্থান নিয়ে কৌটিল্য একটা 'প্যাটার্ন' বা সাধারণ নিয়মের কথা বলতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন-প্রতিবেশী রাষ্ট্র সাধারণত অথবা বেশির ভাগ সময়েই শত্রু হয়। ওই একই সাধারণ নিয়মে, কৌটিল্যের রাজমণ্ডলের কল্পনাটা এইরকম: বিজিগীষু রাজার সম্মুখস্থ অব্যবহিত রাষ্ট্রটি শত্রুরাষ্ট্র, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে অরি। অরিরাষ্ট্রের পরেই থাকে একটি মিত্ররাষ্ট্র, যেটার ভৌগোলিক অবস্থিতি বিজিগীষু রাজার সম্মুখস্থ অরিরাষ্ট্রের পরেই। এর পরের রাষ্ট্রটি বিজিগীষু রাজার অব্যবহিত শত্রুর মিত্র, এবং একে বলা হয়েছে অরিমিত্র। তার পরের রাষ্ট্রটি মিত্রমিত্র, অর্থাৎ বিজিগীষু রাজার বন্ধুরাষ্ট্রের বন্ধু। তার পরেরটি অবধারিতভাবেই অরিমিত্রমিত্র, অর্থাৎ শত্রুবন্ধুর বন্ধু।

সম্মুখস্থ রাজাদের প্রকৃতি বর্ণনা করেই কৌটিল্য পিছনের দিকে আসছেন। তাঁর মতে, বিজিগীষু রাজার ঠিক পিছনের রাষ্ট্রটির পারিভাষিক নাম 'পার্ষ্ণিগ্রাহ'। ইনি বিজিগীষু রাজার শত্রুর ভালো চান এবং সেইজন্য বিজিগীষুর পার্ষ্ণি বা পশ্চাদ্‌ভাগ গ্রহণ করেন, অর্থাৎ পিছন থেকে তাঁর শত্রুতা আচরণ করেন বলে তাঁর নাম পার্ষ্ণিগ্রাহ। বস্তুত, বিজিগীষু যদি তাঁর সম্মুখভাগে শত্রুদমনে ব্যস্ত থাকেন, তবে পিছনে-থাকা পার্ষ্ণিগ্রাহই সবচেয়ে বেশি সুযোগ পান বিজিগীষু রাজার রাজ্য আক্রমণ করার। এইজন্য, অন্তত পার্ষ্ণিগ্রাহের পিছনের রাষ্ট্রটি বিজিগীষু রাজার বন্ধুরাষ্ট্র হওয়া প্রয়োজন।

পার্ষ্ণিগ্রাহের পিছনে থাকেন 'আক্রন্দ'। ইনি বিজিগীষু রাজার বন্ধুস্থানীয়। আক্রন্দ এই পারিভাষিক নামের মানে হল—বিজিগীষু যেন আপন পশ্চাৎস্থিত শত্রু পার্ষ্ণিগ্রাহকে আয়ত্তে রাখার জন্য, তাঁর পিছনের রাষ্ট্রনায়কের প্রতি ডাক ছেড়ে (আক্রন্দন করা) বলছেন—আমার পার্ষ্ণিগ্রাহটিকে তুমি আটকাও। ঠিক এইজন্যই, বিজিগীষু রাজার এই বন্ধুরাষ্ট্রটির নাম আক্রন্দ। আক্রন্দের পরের রাষ্ট্র অবশ্যই বিজিগীষুর শত্রুর বন্ধু, অর্থাৎ তিনি পার্ষ্ণিগ্রাহের বন্ধু। তাঁর নাম পার্ষ্ণিগ্রাহাসার। পার্ষ্ণিগ্রাহের সাহায্যের জন্য ইনি সরে সরে আসেন বলে তাঁর এই নাম। অনুরূপভাবে, পার্ষ্ণিগ্রাহাসারের পরের রাষ্ট্র বিজিগীষু রাজার বন্ধুর বন্ধু, অর্থাৎ আক্রন্দের বন্ধু। তাঁর নাম আক্রন্দাসার। তিনি আক্রন্দের সাহায্যে সরে সরে আসেন। সুতরাং, বিজিগীষু রাজার সামনে পাঁচটি এবং পিছনে চারটি এবং নিজেকে নিয়ে সর্বসমেত দশ রাজমণ্ডল।

আক্রন্দ এবং পার্ষ্ণিগ্রাহের ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থান বুঝে নিয়ে এখন অগ্নি পুরাণের অনুরূপ শ্লোকটি উদ্ধার করলেই মৎস্য পুরাণোক্ত শ্লোকটির স্পষ্টতা তৈরি হয়ে যায়। অগ্নি পুরাণ বলেছে—রাজা যখন বুঝবেন যে, তাঁর আপন রাষ্ট্রের সীমান্ত-লাগোয়া পার্ষ্ণিগ্রাহ রাজাটি আমার বলবান মিত্ররাষ্ট্র আক্রন্দের আক্রমণে বিপর্যস্ত, তখন তিনি যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন করবেন—

যদা মন্যেত নৃপতিরাক্রন্দেন বলীয়সা।
পার্ষ্ণিগ্রাহো'ভিভূতো মে তদা যাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥

বিজিগীষু রাজার রাজনীতি এবং কূটনীতি এখানে তাঁর যুদ্ধযাত্রা সার্থক করে তোলে বলবান আক্রন্দের মাধ্যমে পার্ষ্ণিগ্রাহের পরাভবে।

[মৎস্য পু. ২৪০.২;
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle), ৬.২.১৮;
অগ্নি পু. ২২৮.১]

আক্রাম এই নদীর উৎস ঋক্ষ বা স্কন্ধপাদ পর্বত। পাঠান্তরে 'ঋক্ষপাদ' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.২৩]

আক্রোধ *[দ্র. আক্রোশ]*

আক্রোশ মহোত্থদেশের অধিপতি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় নকুল কর আদায় করার জন্য পশ্চিমদিকে দিগ্বিজয়ে গিয়েছিলেন। মহোত্থদেশের রাজা আক্রোশের সঙ্গে নকুলের সংঘর্ষ হয়। অবশেষে আক্রোশ নকুলের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নকুল তাঁর কাছ থেকে প্রচুর কর আদায় করেন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে 'আক্রোশ'-এর পরিবর্তে 'আক্রোধ'-এই নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।

[মহা (k) ২.৩২.৬; (হরি) ২.৩১.৬]

আগন্তুকমৃত্যু পুরাণে মোট একশত এক প্রকার মৃত্যুর উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটি হল অনিবার্য মৃত্যু-যখন স্বয়ং লোকসংহর্তা কাল মানুষের প্রাণ হরণ করতে উদ্যত হন। তা ছাড়াও রোগ প্রভৃতি মৃত্যুর একশোটি কারণের কথা পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। এগুলিকে আগন্তুক মৃত্যু বলা হয়। পুরাণ মতে জপ, হোম, ঔষধ-সেবন ইত্যাদির দ্বারা আগন্তুক মৃত্যুকে নিবারণ করা সম্ভব হয়। রোগ, অভিশাপ, হিংস্র জন্তু, বিষ এবং অভিচার—এই পাঁচটিকে আগন্তুক মৃত্যুর দ্বার বলে উল্লেখ করা হয়েছে পুরাণে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪২.১০০-১০২]

আগম১ আগম শব্দের সাধারণ অর্থ হল—'শাস্ত্র', অন্তত মহাভারতের শান্তিপর্বে সাধারণ শ্লোকে আগম শব্দের অর্থ তাই। এই শ্লোকে বলা হচ্ছে—পণ্ডিতেরা সবাই জানেন যে, কেউই পরলোককে প্রত্যক্ষ দেখেনি, অতএব পরলোকের ভাবনা নিয়ে যাঁরা ক্রিয়াকর্ম করবেন তাঁরা আগম বা শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন বলেই তা করবেন। এমন কোনো মানুষ নেই এই পৃথিবীতে যিনি স্বর্গ দেখেছেন বা নরক দেখেছেন, এ ব্যাপারে শাস্ত্র বা আগমই হল চক্ষু যাতে স্বর্গ-নরকের চিত্রটুকু দেখতে পায় মানুষ। অতএব শাস্ত্রকেই অনুসরণ করতে হবে—

* আগমাত্ত্বনতিক্রম্য শ্রদ্ধাতব্যং বিভূষতা॥
* ন চৈব পুরুষো দ্রষ্টা স্বর্গস্য নরকস্য চ।
আগমস্তু সতাং চক্ষুর্নৃপতে তমিহাচর॥
* ধর্মং চরামি সুশ্রোণি ন ধর্মফলকারণাৎ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ॥
* আগমাধিগমাদ্ যোগাদ্ বশী তত্ত্বে প্রসীদতি॥

[মহা (k) ১২.২৮.৪২, ৫৪; ৩.৩১.৪; ৫.৬৯.২১: (হরি) ১২.২৮.৪২, ৫৪; ৩.২৭.৪; ৫.৬৬.৪৬]

কিন্তু মহাভারতের এই শান্তিপর্বেই বিখ্যাত কপিল-স্যমরশ্মি-সংবাদে স্যমরশ্মি নিজের শাস্ত্রাভিজ্ঞতা জানিয়ে যা বলছেন, তাতে মনে হয় যে, বেদাদি শাস্ত্রকেও যেমন আগম বলা হত, তেমনই অন্যান্য অনেক শাস্ত্রও—যা নাস্তিকতার পরিধির বাইরে, সেগুলিকে আগম বলা হত। স্যমরশ্মি বলছেন—আমি নাস্তিক এবং বৌদ্ধদের তর্কশাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাস্ত্রের (আগমের) অর্থ যথাযথভাবেই জেনেছি। তাতে এটাই আমার মনে হয়েছে যে, বেদশাস্ত্রও যেমন আগম, তেমনই বেদের অর্থ বিনিশ্চয় করে এমন সব তর্কশাস্ত্র যেমন পূর্বমীমাংসা দর্শন, উত্তর মীমাংসা দর্শন, সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনের তর্কযুক্তি এগুলিও কিন্তু আগম—

অন্যত্র তর্কশাস্ত্রেভ্য আগমার্থং যথাগমম্।
আগমো বেদবাদাশ্চ তর্কশাস্ত্রাণি চাগমঃ॥

এই যে অসাধারণ একটি কথা বলল মহাভারত অর্থাৎ আগম বলতে বেদশাস্ত্রও বুঝি আবার সমস্ত বেদানুসারী তর্কশাস্ত্রও বুঝি, তাতে আগমশব্দের সমস্ত তাৎপর্য্য নিহিত হয় শাস্ত্র-শব্দটির মধ্যেই। গবেষকেরা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, বেদ-উপনিষদের পাশাপাশি আমাদের দেশে আগম এবং নিগম শব্দটাও খুব চলে। নিগম কিন্তু একেবারেই বেদ-উপনিষদের মতো শ্রুতিশাস্ত্র এবং এই অর্থেই ভাগবত পুরাণকে নিগম-রূপ কল্পতরু-বৃক্ষের পক্ব ফল বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলম্।

প্রতিতুলনায় বেদ-উপনিষদ নয় এমন সমস্ত শাস্ত্রই প্রায় আগম বলে চিহ্নিত, এমনকী যেগুলি তেমন প্রথাসম্মত ভাবে বৈদিক নয় যেমন পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি, যা অনেক সময় সংহিতা-গ্রন্থ নামেও পরিচিত—যেমন জয়াখ্য সংহিতা, অহির্বুধ্ন্য সংহিতা—সেগুলিও আগম নামে পরিচিত, একইভাবে তন্ত্রশাস্ত্রগুলিও অনেকাংশেই আগম। কুলার্ণবতন্ত্র বলেছে—বেদশাস্ত্র এবং পুরাণকারদের নির্দেশ সব প্রকাস্য আর শৈব-আগম, শাক্ত-আগম এই সব শাস্ত্রের মধ্যে অনেক রহস্য আছে—

শৈবশাক্তাগমাঃ সর্বে রহস্যা পরিকীর্তিতাঃ।

আবার শেষের দিকে আগমের সংজ্ঞা নির্ণয় করে কুলার্ণবতন্ত্র লিখছে—যার সার কথা হল

দিব্য গতিলাভ এবং সেই গতির জন্য যে আচারগুলি পালন করতে হয় সেই আচারের কথা বলে আগম—যা অনেক গভীর অর্থপূর্ণ তত্ত্ব ববৃত করে—

আচারকথনাদ্দিব্যগতি-প্রাপ্তি নিদানতঃ।
মহার্থতত্ত্বকথনাদ্ আগমঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥

এই তন্ত্রবার্তা থেকে বোঝা যায় যে, বেদানুসারী শাস্ত্ররাশির সঙ্গে তথাকথিত অবৈদিক শাস্ত্রও আগম বলে গণ্য হত।

[মহা (k) ১২.২৬৯.৪৩; (হরি) ১২.২৬৩.৪৩, নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য; কুলার্ণবতন্ত্র ৩.৪.; ১৭.৪৩, পৃ. ৬৩, ৪৩৯; V.S. Lalrinawma, Major Faith Traditions of India, p. 119-120]

□ সাধারণভাবে ভারতবর্ষে শাস্ত্র-বিভাগের যে রীতি প্রচলিত আছে, তাতে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং স্মৃতির সঙ্গে আগমের নাম আসে এবং পণ্ডিতজনদের এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, মহাভারতের পরের কাল থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ যতখানি তত্ত্ব ও বেদ-উপনিষদের অনুসরণ করে, তার চাইতে অনেক বেশি অনুসরণ করে আগমগুলিকে। এই আগমগুলির কারণেই অন্তত তিন প্রকারের প্রধান ধর্ম-প্রস্থান তৈরী হয়েছে, যাদের ভিত্তি হল বৈষ্ণব আগম, শৈব আগম এবং শক্ত আগম। বৈষ্ণব আগমগুলি যেমন ভগবান বিষ্ণু এবং নারায়ণের মাহাত্ম্য খ্যাপন করে, তেমনই শৈব আগম শিবের মাহাত্ম্য এবং শৈবাচার ব্যাখ্যা করে এবং একইভাবে শাক্ত আগম দুর্গা, কালী ইত্যাদি শক্তি দেবতার দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে। পণ্ডিতদের মতে অন্তত ১০৮টি বৈষ্ণব আগমের গ্রন্থ আছে, ২৮টি শৈব আগমের গ্রন্থ, আর ৭৭টি শক্তি আগমের গ্রন্থ আছে।

[P.T. Srinivasa Iyengar, History of Tamils, pp. 3-15; Surendranath dasgupta, A History of Indian Philosophy, Vol. 5, pp. 20-23]

□ তবে আগমশাস্ত্র পরবর্তীকালে যতই তন্ত্রভাবনার মধ্যে পর্যাবসিত হোক, কিন্তু ভাগবত পুরাণে যখন বলা হয় যে, আগম হল সেই মন্ত্রসমূহ, যার মধ্যে ভগবান শ্রীহরির আপন শক্তি নিহিত আছে, তখনই আমরা বুঝি যে, ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিতে আগম-শব্দের অর্থ সেই ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রসমূহই যেগুলি বেদ-উপনিষদের মর্ম বহন করে নিয়ে আসছে, (আ-গমন) করছে, তাই আগম। আগম-শব্দের মাধ্যমে বেদ-ব্রাহ্মণের মন্ত্র এবং আচার-প্রক্রিয়াই যে বোঝানো হত তার প্রমাণ আছে খ্রিস্টপূর্ব, দেড়শ শতাব্দীতে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির ব্যবহারে। তিনি 'আগম'-শব্দ উল্লেখ করেই এটা লিখেছেন যে, ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম হল ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করা এবং বেদ জানা-

যথা আগমঃ খল্বপি—ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো
ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদো'ধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ।

[ভাগবত পু. ১২.১১.৩১; মহাভাষ্য (Keilhorn) ১.১.১]

□ প্রত্যক্ষ-অনুমান ইত্যাদি প্রমাণ-বিষয়ে যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের মতে আপ্ত-মানুষ যাঁরা, যাঁরা শাস্ত্রার্থতত্ত্ব জানেন সেই আপ্ত পুরুষেরা যেটাকে হেতু-প্রমাণ-সিদ্ধির মাধ্যমে ইহলোকে এবং পরলোকে হিতকর বলে মনে করেন, সেটাই আগম, এটা আপ্তজনের শাস্ত্র—

সিদ্ধং সিদ্ধিপ্রমাণৈস্তু হিতং মাত্র পরত্র বা।
আগমঃ শাস্ত্রমাপ্তানাম্ আপ্তাস্তত্ত্বার্থ বেদিনঃ॥

এই আগমশাস্ত্রকেই তন্ত্রশাস্ত্র মনে করে যে, আগম স্বয়ং শিবের মুখ থেকে নেমে এসে গিরিসূতা মুখে স্থিত হয়েছে এবং সেটা ভগবান বাসুদেবের অভিমত—এই নেমে আসাটাই আগম—

আগতং পঞ্চবক্ত্রাত্তু (শিববক্ত্রেভ্যো)
গতঞ্চ গিরিজাননে।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদ্ আগমমুচ্যতে॥

[ন্যায়কোশ (Jhalkikar) পৃ. ১১৭; শব্দকল্পদ্রুম, পৃ. ১৬৫]

আগম$_{২}$ আগম-শব্দটি প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্র বা আইন-আদালতের একটি অন্যতম উপাদান। সাক্ষীর সইসাবুদ সহ যে প্রামাণিক বিষয় নিয়ে কাগজপত্র তৈরী করা হয়—যাকে দলিল-দস্তাবেজ বলি আমরা—সেটার নামও আগম। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, উত্তরাধিকারসূত্রে নেমে আসা ভোগ্য বস্তুর ব্যাপারে যদি লিখিত-পড়িত আগম না থাকে, তাহলে তার ওপরে মানুষের অধিকার বা স্বামিত্ব নিশ্চিত হয় না—

ন হি আগমরহিতাদ্ ভোগাদ্ ভোগ্যে
ভোক্তুঃ স্বামিত্বং শক্যং নিশ্চেতুম্।

—একথা লিখেছেন প্রখ্যাত টীকাকার অপরার্ক এবং সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যের মূল শ্লোকটি হল—

আগমো'ত্যধিকো ভোগাৎ বিনা পূর্বক্রমাগতাৎ।
আগমে'পি বলং নৈব ভুক্তিঃ স্তোকাপি যত্র নো॥

এই শ্লোকের টীকাতে অপরার্ক নারদের বচন উদ্ধার করে প্রশ্ন তুলেছেন যে, যেখানে লেখাপড়াও করা আছে, সাক্ষীরাও সব বেঁচে আছে, এমন অবস্থাতে পরম্পরাগত ভোগ্যবস্তু যে ভোগ করছে বিশেষত সেটা যদি স্থাবর সম্পত্তি হয়, তবে সেই ভোগটাও তেমন স্থির নয়। কেননা মাঝখানে সেটা কেনা-বেচা হয়েছে কিনা, দান করা হয়েছে কিনা, এ-সব বিষয়ে সর্বশেষ অধিকার নির্ণায়ক 'আগম' প্রয়োজন এবং সেই আগম হতে হবে বিশুদ্ধ কেননা বিশুদ্ধ আগমের কারণেই পরম্পরাগত ভোগ্য সম্পত্তি সপ্রমাণ হয়ে ওঠে, ভোগের যোগ্য হয়ে ওঠে—যথা নারদ-বচন—

বিদ্যমানে'পি লিখিতে জীবৎস্বপি সাক্ষিষু।
বিশেষতঃ স্থাবরাণাং যত্রভুক্তং ন তৎস্থিরম্॥
আগমেন বিশুদ্ধেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্।
অবিশুদ্ধাগমো ভোগঃ প্রামাণ্যং নাধিগচ্ছতি॥

অতএব বিশুদ্ধ প্রমাণ-সম্বলিত আগমের সঙ্গে পরম্পরাগত সম্পত্তির ভোগই স্বত্ব-স্বামিত্বের প্রমাণ, তাতেই অধিকার সুস্থিত হয়। মনু বলেছেন—

যেখানে সম্পত্তির ভোগ হচ্ছে সেখানে লিখিত-পড়িত প্রমাণ অর্থাৎ আগম যদি না থাকে, তাহলে আগমই ভোগের কারণ—এটাই ভাবতে হবে, ভোগ কিন্তু সম্পত্তির অধিকার প্রমাণ করে না—

সম্ভোগো যত্র দৃশ্যেত ন দৃশ্যেতাগমঃ ক্বচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ॥

মহাভারত এই কথাটাই বলেছে একটু সাধারণীকৃতভাবে। বলেছে—লৌকিক নিয়ম-নীতি-ধর্ম যা আছে, সেখানে আগম তৈরি হয়েছে লোকধর্মের সীমাটুকু মানার জন্যই এবং আগম-প্রামাণ্যের অনুবর্তন করাটাই সেখানে শ্রেয়। এখানে মহাদেব বলেছেন—মনুষ্যধর্মের নিয়ামক শাস্ত্র এবং তদনুসারে সকলের আচরিত আচার আছে। সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করে সেই অনুসারে যাঁরা চলেন, তাঁদেরই ধর্মে দৃঢ়ব্রত হতে দেখা যায়—

আগমাঃ লোকধর্মাণাং মর্যাদা সর্বনির্মিতাঃ।
প্রামাণ্যেনানুবর্তন্তে দৃশ্যন্তে চ দৃঢ়ব্রতাঃ॥

বস্তুত এখানে শাস্ত্র অর্থে আগম-প্রামাণ্য এবং আইনি দৃষ্টিতে আগমের প্রামাণ্য একাকার হয়ে গেছে।

[যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (আনন্দাশ্রম) ২.২৭, অপরার্কের টীকা দ্রষ্টব্য; মহা (k) ১৩.১৪৫.৬১; (হরি) ১৩.১২৩.৬১]

আগম$_{৩}$ ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। আগম শব্দের সাধারণ অর্থ হল 'শাস্ত্র'। অর্থাৎ জ্ঞানলাভের সাধন, তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থ। এই ভাবনায় বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি, উপনিষদ বেদানুসারী তর্কশাস্ত্র, দর্শন—সবকিছুকেই একত্রে আগম বলা চলে। এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অধ্যয়নের ফলে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে—এই জ্ঞান বা চেতনাও ঈশ্বরেরই অন্যতম রূপ। শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে মূলত জ্ঞান রূপ ঈশ্বরকেই লাভ করা যায় বা বলা যেতে পারে এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের দ্বারা ঈশ্বর বা ব্রহ্মের স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, আবার জ্ঞানলাভের সাধন যে শাস্ত্র—তিনি তারও স্বরূপ এই ভাবনা থেকেই ভগবান শিব আগম নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫৯; (হরি) ১৩.১৬.৫৯]

আগস্ত্য অগস্ত্যবংশীয় রাক্ষসগণ। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যক্ষরাজ কুবের এদের অধিপতি ছিলেন। *[বায়ু পু. ৬৯.১৯৫-১৯৬; ৪৭.৬১; মৎস্য পু. ১২১.৬২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৫৯-৬২]*

আগাবহ *[দ্র.অগাবহ]*

আগাহী বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের ঔরসে বৃকদেবীর গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে আগাহী অন্যতম।

[বায়ু পু. ৯৬.১৮০]

আগ্ন পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আগ্ন সেই গোত্রের অন্যতম। কশ্যপ থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও কাশ্যপ নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৯.৮]

আগ্নিবেশ্যায়ন বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্তের বংশধারায় অগ্নিদেব স্বয়ং দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিবেশ্য থেকে যে বিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশের সৃষ্টি হয়েছিল

তাঁরা আগ্নিবেশ্যায়ন নামে খ্যাত হয়েছেন। এই অগ্নিবেশ্যই জাতুকর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হন।

[ভাগবত পু. ৯.২.২২]

আগ্নিষ্টোমিকা বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, একুশটি মূর্চ্ছনার মধ্যে আগ্নিষ্টোমিকা একটি মূর্চ্ছনা।

[বায়ু পু. ৮৬.৪১]

আগ্নীধ্র$_1$ আদি মনু স্বায়ম্ভুব এবং শতরূপার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত আগ্নীধ্রের পিতা। তাঁর মাতা প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতী। আগ্নীধ্র লবণসমুদ্র-বেষ্টিত জম্বুদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁর ন'টি পুত্র জম্বুদ্বীপের নটি বর্ষের অধিপতি হয়েছিলেন। তাঁদের নামানুসারে উক্ত বর্ষগুলির নাম নির্দিষ্ট হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৭.৪৫; ৪৮-৪৯;
দেবীভাগবত পু. ৮.৪.৪,২০)]

আগ্নীধ্র$_2$ ক্ষত্রিয় রাজারা যুদ্ধ করার সময় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছেন না, অপরাজিত থেকে স্বর্গলাভ করছেন, এই কথা বলতে গিয়ে যুদ্ধকে একটা যজ্ঞের রূপে প্রকাশ করা হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের মুখ দিয়ে। এই যুদ্ধযজ্ঞে কে কোন ধরনের ঋত্বিক, কে হোতা, কে উদ্‌গাতা, কিংবা যজ্ঞীয় উপকরণগুলি কোনটা কোন যুদ্ধাস্ত্রের রূপক, এইগুলি বলার সময় আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিকের প্রসঙ্গ এসেছে। ইন্দ্র বলেছেন—যে ক্ষত্রিয় বীরের দক্ষিণ দিকের যোদ্ধারা যজ্ঞীয় সদস্য হয়ে ওঠেন, আর উত্তর দিকের যোদ্ধারা আগ্নীধ্র হন সেই বীরের কাছে সমস্ত স্বর্গ সন্নিহিত হয়।

[মহা (k) ১২.৯৮.৩৯; (হরি) ১২.৯৫.৬৫]

□ আগ্নীধ্র নামক এই ঋত্বিকের ব্যবহার এখানে বৈদিককালের অন্যতম ঋত্বিক আগ্নীধ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আগ্নীধ্র বস্তুত অথর্ববেদীয় ঋত্বিক্। ব্রহ্মার সহকারী হলেও যজ্ঞীয় কর্মের প্রকৃতি-বিচারে তিনি যজুর্বেদীয় ঋত্বিক অধ্বর্যুর সহকারী হিসেবেই যজ্ঞকর্ম নির্বাহ করেন। অন্য নাম অগ্নীৎ, অগ্নীধ্, অগ্নীধ্র। প্রত্যেকটি প্রধান যাগের সময় হোতা যখন অনুবাক্য উচ্চারণ করেন, তখন অধ্বর্যু আহুতি দেবার সময় হোতাকে দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ করতে বলেন এইভাবে—

ওঁ আশ্রাবয় অর্থাৎ দেবতাকে অবহিত করে মন্ত্র শোনাও, তখন আগ্নীধ্র বলেন—

ওঁ অস্তু শ্রৌষট্—

এই কথা বলে আগ্নীধ্র বস্তুত যাগের উদ্দিষ্ট দেবতাদের অনুরোধ করেন যাতে দেবতারা হোতার যাজ্যামন্ত্রের পাঠগুলি শোনেন।

আগ্নীধ্রের নামের মধ্যেই অগ্নির নাম আছে এবং আগ্নীধ্রের অগ্নিস্থান থেকেই যেহেতু অন্য অগ্নিস্থানগুলিতে আগুন জ্বালানো হয়, তাই আগ্নীধ্র অগ্নির নামেই এই ঋত্বিকের নামও আগ্নীধ্র অথবা আগ্নীধ্র ঋত্বিকের নামেই অগ্নির নামও আগ্নীধ্র—আপস্তম্বের টীকাকার রুদ্রদত্ত লিখেছেন—

আগ্নীধ্রো' গ্নিরাগ্নীধ্রঃ।

আগ্নীধ্রের কাজ হল অগ্নিসম্পাদন করা, সোমযাগে অন্তত আটটি অগ্নিস্থান বা ধিষ্ণ্যগুলির পরিচর্যা করা, নিজের অগ্নিস্থান বা ধিষ্ণ্য থেকে অন্য ধিষ্ণ্যগুলিতে অগ্নিসম্পাদন করা, কিংবা পুরাতন আহবনীয় অগ্নি থেকে অগ্নি নিয়ে এসে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে স্থাপন করা, সোমযাগ ছাড়াও অন্যান্য ইষ্টিযাগে অধ্বর্যু পুরোহিতের নানান কর্মে সহায়তা করা এবং পাত্নীবত গ্রহানুষ্ঠানে তিনি যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন—

অথাহাগ্নীৎ পাত্নীবতস্য যাজ্ঞতি।
বৃষা বা অগ্নীদ্‌যোষা পত্নী মিথুনমেবৈতৎ
প্রজননং ক্রিয়তে।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ১২.১৮.১-৪;
১১.৩.১৩-১৪; ১১.৯.৪;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৪.৪.২.১৫; পৃ. ৩৮৪]

আগ্নীধ্রক ভাগবত পুরাণ অনুসারে ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তরে অর্থাৎ রুদ্রসাবর্ণি মনুর কালে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, তাঁদের মধ্যে আগ্নীধ্রক একজন।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.২৮]

আগ্নীধ্রীয় *[দ্র. আগ্নীধ্র]*

আগ্নেয়$_1$ একসময় বরুণদেবের আয়োজিত একটি যজ্ঞস্থানে গন্ধর্বদের সঙ্গে দেবপত্নী এবং দেবকন্যারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের দেখামাত্র ব্রহ্মা বিচলিত হলেন এবং তাঁর শুক্র স্খলিত হল। সেই স্খলিত শুক্রের দ্বারা ব্রহ্মা অগ্নিতে হোম করলে, অগ্নিশিখা থেকে প্রথমে 'ভৃগু'র উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা দ্বিতীয়বার সেই শুক্র হোমের অঙ্গারে নিক্ষেপ করলে তা থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন অঙ্গিরা প্রাদুর্ভূত হন। অগ্নি সেই পুত্রকে দেখে ব্রহ্মাকে বলেন—আমি আপনার রেতঃ ধারণ করেছি, অতএব এই পুত্রটি আমার হোক। ব্রহ্মা সে কথায় অনুমোদন করলে অগ্নি অঙ্গিরাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

অঙ্গিরা ও আঙ্গিরাগণ সেই কারণে 'আগ্নেয়' বলে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

[মহা (k) ১৩.৮৫.১২৬; (হরি) ১৩.৭৪.১২৪; বায়ু পু. ৬৫.৩৯-৪৪]

☐ মহাভারতের অনেক প্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই কাহিনীর পূর্ব-পরম্পরা নিহিত আছে বলে আমাদের মনে হয়। সেখানে প্রজাপতির স্খলিত তেজ চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিলেন অগ্নি এবং সেই আগ্নেয় তেজ থেকে একে একে ভৃগু এবং অঙ্গিরার জন্ম হয়।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ৩.৩৩-৩৪]

আগ্নেয়$_{২}$ স্কন্দ-কার্তিকেয়র অভিষেকের সময় উপস্থিত ছিলেন, এমন একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৩৭; (হরি) ৯.৪২.৩৭নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. পৃ. ৪৭৯]

আগ্নেয়$_{৩}$ সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর বংশধারায় দুর্জয়ের পুত্র ছিলেন দুর্যোধন। এই দুর্যোধনের কন্যা সুদর্শনার গর্ভে অগ্নিদেবের সুদর্শন নামে একটি পুত্রের জন্ম হয়। অগ্নির পুত্র বলে সুদর্শনকে 'আগ্নেয়' বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.২.১২, ৩৬; (হরি) ১৩.২.১২, ৩৬]

আগ্নেয়$_{৪}$ কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন অগ্নি। তাই তাঁকে আগ্নেয় বলা হয়। শব্দকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে যে, কৃত্তিকা অগ্নির উপাসক। তাই তাঁকে 'আগ্নেয়' বলা হয়—অগ্নির্দেবতা যস্য। মহাভারতের স্মার্তবিধান অনুযায়ী কৃত্তিকা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করতে বারণ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১০৪.১২৬; (হরি) ১৩.৯১.১২৬]

আগ্নেয়$_{৫}$ ত্রিশটি কল্পের মধ্যে অষ্টাদশতম কল্পটি হল আগ্নেয়। *[মৎস্য পু. ২৯০.৭]*

আগ্নেয়$_{৬}$ পুরাণে প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, বার্হস্পত্য ইত্যাদি যে পনেরোটি রাত্রি-মুহূর্তের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে আগ্নেয় একটি। *[বায়ু পু. ৬৬.৪৩]*

আগ্নেয়$_{৭}$ গন্ধর্বদের একটি গণের নাম আগ্নেয়। তাঁরা কুবেরের অনুচর। বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, দেবকূট পর্বতে আগ্নেয়-গন্ধর্বরা বাস করেন।

[বায়ু পু. ৪০.৫, ৮]

আগ্নেয়$_{৮}$ স্কন্দ-কার্তিকেয়ের জন্মগ্রহণের সময় ভগবান শিবের তেজকে প্রথমে অগ্নি ও পরে গঙ্গা ধারণ করেন। গঙ্গার গর্ভজাত ওই শিশুটি কৃত্তিকাদের দ্বারা প্রতিপালিত বলে তার নাম কার্তিকেয়। আবার অগ্নিদেব ওই তেজোরাশিকে প্রথম ধারণ করেছিলেন বলে স্কন্দ-কার্তিকেয়কে আগ্নেয় বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৩৭.১৩; ৩.২৩২.৩; (হরি) ১.১৩২.১৩; ৩.১৯৫.৩]

আগ্নেয়$_{৯}$ প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত একপ্রকার দিব্য-অস্ত্র। পাণ্ডব ও কৌরব রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর দ্রোণাচার্য কুমারদের বীরত্ব ও অস্ত্রচালনার বিভিন্ন কলা-কৌশল প্রদর্শনের আয়োজন করেন। ওই রঙ্গভূমিতে অর্জুন আগ্নেয় অস্ত্রের দ্বারা অগ্নি সৃষ্টি করে ধনুর্বিদ্যায় নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.২৩৫.১৯; (হরি) ১.২৩০.১৯]

☐ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবদহনে অগ্নিকে সহায়তা করায় অগ্নিদেব তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে 'সুদর্শন' নামে একটি চক্র দান করেন। 'সুদর্শন' চক্র একটি আগ্নেয় অস্ত্র বলে মহাভারতে কথিত হয়েছে। এই চক্রের মধ্যস্থল ছিল বজ্রের মত।

[মহা (k) ১.২২৫.২৪; ৭.১১.২১; (হরি) ১.২১৮.২৪; ৭.৯.২১]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্যর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে নারায়ণ-নামক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করেন। অশ্বত্থামার অস্ত্রের তেজে পাণ্ডবপক্ষের এক-অক্ষৌহিণী সেনা দগ্ধ হয়ে নিহত হয়। *[মহা (k) ১.২.২৬৪; ৭.২০২.৩৮; (হরি) ১.২.২৬৭; ৭.১৬৯.৩৭]*

☐ কর্ণপর্বে দেখা যায়, যখন কর্ণ ও অর্জুনের সংঘর্ষ হয়েছিল, তখন অর্জুন কর্ণের উপর শত্রুনাশক আগ্নেয়-অস্ত্র নিক্ষেপ করেন।

[মহা (k) ৮.৮৯.১৭; (হরি) ৮.৬৫.৫০]

এছাড়াও মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

☐ বায়ু পুরাণে ও বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে যে, সগর রাজা ভৃগুপুত্র ঔর্বের কাছ থেকে আগ্নেয়-অস্ত্র লাভ করেন।

[বায়ু পু. ৮৮.১২৪, ১৩৫; বিষ্ণু পু. ৪.৩.১৮]

আগ্নেয়তীর্থ$_{১}$ অরুণাদ্রির আগ্নেয় দিকে সৌভাগ্যদায়ক আগ্নেয় তীর্থ। পুরাকালে অগ্নি এইস্থানে স্বাহার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল মাহাত্ম্য/পূর্বার্দ্ধ) ৬.১১২, ১১৩]

আগ্নেয়তীর্থ$_{২}$ আঙুলের অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ এবং মূলভাগকে আর্যতীর্থ বলা হয়। দৈব এবং

আর্যতীর্থের মধ্যভাগকে অর্থাৎ আঙুলের মধ্যভাগকে আগ্নেয় তীর্থ বলে।

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ২৬.১৮]

আগ্নেয়স্নান আপাদমস্তক ভস্মলেপনের নাম আগ্নেয় স্নান। *[কূর্ম পু. ২.১৮.১৩]*

আগ্নেয়ী$_1$ অগ্নিদেবের বাসস্থান আগ্নেয়ী নামে প্রসিদ্ধ। *[ভাগবত পু. ১০.৮৯.৪৪]*

আগ্নেয়ী$_2$ *[দ্র. ধিষণা]*

আগ্নেয়ী$_3$ চাক্ষুষ মনু ও নড্বলার পুত্র উরু-র পত্নী আগ্নেয়ী। উরু-র ঔরসে আগ্নেয়ীর গর্ভজাত পুত্ররা হলেন অগ্নি, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয়। *[মৎস্য পু. ৪.৪৩]*

□ বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে উরু আগ্নেয়ীর গর্ভে যে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, তাঁরা হলেন অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং শিব। সম্ভবতঃ 'অগ্নি'-র পরিবর্তে 'অঙ্গ', 'খ্যাতি'-র পরিবর্তে 'স্বাতি' এবং 'গয়'-এর পরিবর্তে 'শিব' (শিবি)—এই নামগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. ১.১৩.৭]

□ কূর্ম পুরাণ মতে উরু-র পত্নী আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা খ্যাতি, ক্রতু, আঙ্গিরস ও শিবি জন্মগ্রহণ করেন। *[কূর্ম পু. ১.১৪.৯-১০]*

আগ্রয়ণ$_1$ 'অগ্রে' অর্থাৎ প্রথমে। 'অয়ন' শব্দের অর্থ আশ্রয়, গতি বা করণীয়। 'অয়ন' কথার অর্থ যজ্ঞও বটে। অর্থাৎ শস্য উৎপাদনের অগ্রে যে যজ্ঞ করা হয়, তা হল 'আগ্রয়ণ'। পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিধানে বলেছেন যে, এই যাগ বর্ষায়, শরতে ও বসন্তকালে অর্থাৎ বীজবপনের আগে অনুষ্ঠিত হয়। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, নতুন শস্যের জন্য সূর্যের উত্তরায়ণের সময় এই যজ্ঞটি যথাবিধানে সম্পন্ন করা উচিত। মহাভারতেও আগ্রয়ণ-যাগের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রকে এই যাগের মাধ্যমে তুষ্ট করা হয়। ইন্দ্রের সঙ্গে যজ্ঞের অগ্নিকেও হবি প্রদান করা হয়। আগ্রয়ণ-যাগের অগ্নির নামও আগ্রয়ণ। তিনি ভানুর চতুর্থ পুত্র।

[হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড পৃ. ২৪৬; মনুসংহিতা ৬.১০; মহা (k) ৩.২২১.১৩; (হরি) ৩.১৮৪.১৩]

□ এই যাগের প্রারম্ভে পিতৃগণের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয় শ্যামাক ধান ও ইক্ষু দিয়ে। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, ত্বষ্টা (বিশ্বকর্মা) ইন্দ্র দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ভূ-তলে পতিত হন। সেইসময় পিতৃগণের পূজার জন্য শ্যামাক ধান উৎপন্ন হয়। ভূপতিত ত্বষ্টার নাসারন্ধ্র থেকে শ্লেষ্মবিন্দু নিপতিত হওয়ায়, তা থেকে ইক্ষু জন্মায়। কথিত হয়েছে যে, শ্যামাক ও ইক্ষু এই দুটি উপাদান দিয়ে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৪.৯; বায়ু পু. ৭৫.৬; ৭৮.৪]*

□ বেদের মধ্যেও শস্য-কামনার ভাবনায় আগ্রয়ণ-যাগের কথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। বর্ষা এবং বসন্তকালে শ্যামাক এবং বেণুযব ইত্যাদি উপাদানের দ্বারা এই যাগ অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে সোম-যাগেরও ব্যবস্থা থাকে।

[দ্র. কৌষিতকী ব্রাহ্মণ (keith) ৪.১৪, পৃ. ৩৬৯-৩৭০]

□ আগ্রয়ণ হল অতি প্রাচীনকালের নবান্ন উৎসব। আশ্বলায়ন তাঁর শ্রৌতসূত্রে লিখেছেন—

আগ্রয়ণং ব্রীহিশ্যামাকযবানাম্।

বৈদিক পণ্ডিত অমর কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—অগ্র + অয়ন = সন্ধিতে অগ্রায়ণ হওয়াই উচিত, কিন্তু প্রাচীন লোকপরম্পরায় আগ্রয়ণ শব্দটিই চলে আসছে। মাঠে নূতন ধান, শ্যামাক অথবা যব উঠলে সেই সেই সময়ে নূতন শস্যে 'আগ্রয়ণ' নামে নবান্ন-ইষ্টি করতে হয়। এই নবান্নযাগই আগ্রয়ণ। শ্যামাক=শ্যামা চাল, echinochloa frumentaceai; জানা যায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে এই চাল পাওয়া যায়। এর পুষ্পদণ্ড ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং গোলাকার ফলের মধ্যে সুজির মতো দানা থাকে। বর্ষায় শ্যামাক, শরৎকালে ব্রীহি এবং বসন্তে যবের আগ্রয়ণ করতে হয়। আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে, ব্রীহির আগ্রয়ণই প্রধান বলে প্রথমে ব্রীহির উল্লেখ করা হয়েছে। ৩নং সূত্রে তাই ব্রীহিযাগের কথাই বুঝতে হবে। 'অল্পাচ্‌তরম্' (পা. ২/২/৩৪) নিয়ম অনুসারে যব-শব্দটিকে শ্যামাক-শব্দের আগে বসানো উচিত, কিন্তু ১৩নং সূত্রে ব্রীহি ও যবের আগ্রয়ণের কথা একসঙ্গে বলা থাকলেও ব্রীহির আগ্রয়ণের সময় যবের আগ্রয়ণের সময় থেকে যে ভিন্ন এ-কথা বোঝাবার জন্যই 'শ্যামাক' শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

আশ্বলায়ন লিখেছেন—

সস্যং নাশ্নীয়াদ্ অগ্নিহোত্রম্ অহুত্বা।

অর্থাৎ আগ্রয়ণ ইষ্টি করে তবে নূতন শস্য খেতে হয়। যদি হাতে সময় না থাকে তাহলে অগত্যা অন্তত নূতন শস্য দিয়ে অগ্নিহোত্র করে তবে সেই নূতন শস্য খাবেন, তার আগে নয়।

আগ্রয়ণের সঙ্গে বর্ষা এবং শরতের একটা সম্পর্ক দেখিয়ে সূত্রকার লিখেছেন—

যদা বর্ষস্য তৃপ্তঃ স্যাদ্ অথাগ্রয়ণেন যজেত।

অর্থাৎ বর্ষার পরে শরৎ ঋতুতে এই ইষ্টিযাগ করতে হয়।

অপি হি দেবা আহুস্ তৃপ্তো
নূনং বর্ষস্যাগ্রয়ণেন হি যজত ইতি।
অগ্নিহোত্রীং বৈনান্ আদয়িত্বা তস্যাঃ
পয়সা জুহুয়াত্॥

অর্থাৎ দেবতারাও বলেন, বর্ষণের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে অবশ্যই আগ্রয়ণের দ্বারা যাগ করবেন। (অথবা) অগ্নিহোত্রের গাভীকে এই (শস্য)-গুলি খাইয়ে তার দুধ দিয়ে আহুতি দেবেন।

[আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (অমর) ২.৯.১-৪]

☐ আগ্রয়ণ নামের বৈদিক কর্মটির মধ্যে যে আমাদের কৃষি-সভ্যতার আয়োজন আছে, সে-কথা আবারও প্রকাশ করেছে আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র। এখানে মূল সূত্রের মধ্যেই নবশস্যের কথা বলা হয়েছে শুধু 'নব'—শব্দটির উল্লেখ করে—

নানিষ্ট্বাগ্রয়ণেন আহিতাগ্নি নবস্যাশ্নীয়াৎ।

এখানে টীকাকার রুদ্রদত্ত লিখেছেন—বছরের নতুন শস্য দিয়ে দেবতাদের উদ্দেশে যে প্রথম পক্ব অন্ন তৈরি হয়, সেটাকেই আগ্রয়ণ বলে। সেটা নিত্যকর্ম। এই নিত্যকর্ম না করে যেন সবটুকু নবশস্য খেয়ে না ফেলেন আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ। *[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ৬.২৯.২]*

আগ্রয়ণ$_2$ বৈদিক ব্যবহারে আগ্রয়ণ শব্দের অন্য একটি তাৎপর্যে আগ্রয়ণ হল সোম-রস রাখার পাত্র। আগ্রয়ণ-স্থালীতে রাখা সোম তিনভাগে ভাগ করে দুটি পাত্র পূর্ণ করার পর অবশিষ্ট সোমরস স্থালীতেই থাকে তাকে বলে আগ্রয়ণ-স্থালী। *[কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite) ১০.১.১৩]*

আগ্রেয় মহাভারতে উল্লিখিত একটি গণরাষ্ট্র। দুর্যোধনকৃত বৈষ্ণব যজ্ঞের প্রাক্কালে দিগ্বিজয়ে বের হয়ে কর্ণ এই রাজ্য জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.২৫৩.২০; (হরি) ৩.২১০.১৪নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ১০, পৃ. ২১২৩]

☐ মহাভারতে রোহিতক এবং মালবদেশীয় গণরাজ্যের সঙ্গে আগ্রেয়দের নাম উল্লিখিত হওয়ায় প্রাচীন গণরাজ্যের ভাবনা এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে ওঠে। আগ্রেয় জনগোষ্ঠীর নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে যৌধেয়, শিবি, ত্রিগর্ত, বেমক ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মুদ্রার সঙ্গে। এদের মুদ্রার বৈশিষ্ট্য হল—কোনো রাজার নামে নয়, একটি জনপদের নামে এদের মুদ্রা। একটি মুদ্রায় লেখা আছে—অগোদক অগাচ জনপদস (স্য)। আগ্রেয় জনগোষ্ঠীকে 'অগ্রোদক' বা 'অগোদক' নামক ভূখণ্ডেরই অধিবাসী মনে করেন পণ্ডিতরা। বৌদ্ধগ্রন্থ পঞ্চরক্ষার পঞ্চম অধ্যায়ে অগোদকে অবস্থিত মুঞ্জকেশ যক্ষ এবং মলয়ধর যক্ষের মন্দির এবং মূর্তির কথা পাওয়া যাচ্ছে। এই অগ্রোদক আধুনিক পঞ্জাবের হিসার অঞ্চল। প্রাচীন অগ্রোদক নিবাসীদের সঙ্গে অগ্রোহ নামক জনপদবাসীদের এক করে দেখেছেন সিলভা লেভি। অগ্রোদক এবং অগ্রোহের গভীর সংযোগ প্রমাণিত হয়েছে হিসার থেকে চোদ্দ মাইল দূরে 'অগ্রোহ' নামক জায়গাটির প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে। আগ্রেয় এবং অগ্রোহ—এই দুটি শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক নৈকট্য থেকে পণ্ডিতেরা মনে করেন—এঁরাই হয়তো টলেমির লেখায় উল্লিখিত হয়েছেন 'অগর' (Agara) নামে। এই শব্দ-সন্ধান থেকে অনেকে এও মনে করেন যে, আগ্রেয়রা হয়তো এখনকার আগ্রার কাছাকাছি কোনো জায়গায় থাকতেন।

[P.L. Gupta, Indian Historical Quarterly, Part XXVII, p. 199; Ethnic Settlements in Ancient India (S.B. Chaudhuri) p. 94 fn.; HGAI (Law) p. 63; Classical Accounts of India (Mazumdar) p. 374; Paramanand Gupta, Geography from Ancient Indian. Coins and Seals, p. 14]

আঙ্খ্রিক্ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.৪.৫৪; (হরি) ১৩.৩.৭৩]

আঙ্গরিষ্ঠ প্রাচীন রাজাদের মধ্যে আঙ্গরিষ্ঠ অন্যতম। ধর্ম-অর্থ-কামের স্বরূপ প্রসঙ্গে অবগত হতে আঙ্গরিষ্ঠ কামন্দক মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোনো রাজা যদি মোহ ও কাম দ্বারা আক্রান্ত হন ও পরে তিনি তাঁর কৃতকর্মে অনুতপ্ত হন, তবে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত কী হবে? শান্তিপর্বে দেখা যায়,

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে ধর্ম-অর্থ-কামের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভীষ্ম কামন্দক মুনি ও আঙ্গরিষ্ঠ রাজার কথোপকথনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। *[মহা (k) ১২.১২৩.১১, ১২; (হরি) ১২.১২০.১১, ১২]*

আঙ্গিরসতীর্থ ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা এই স্থানে শিবের আরাধনা করে উত্তম যোগ লাভ করেছিলেন। কূর্মপুরাণোক্ত পুণ্য তীর্থ।

[কূর্ম পু. ২.৩৯.৩০-৩১; পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৯.৫০]

আঙ্গিরসী$_{১}$ বশিষ্ঠ মুনির পুত্র শক্তির অভিশাপে রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষস রূপ প্রাপ্ত হন। একদিন তিনি খাদ্য অন্বেষণের জন্য বনের মধ্যে বিচরণ করছিলেন। সেই সময় ওই বনে এক ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। এই ব্রাহ্মণীই হলেন আঙ্গিরসী। রাজাকে দেখামাত্র তাঁরা দ্রুত পলায়ন করতে গেলে রাজা ব্রাহ্মণকে ধরে ফেলেন। ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আঙ্গিরসী বারবার রাজাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজা সে কথায় কর্ণপাত না করে ব্রাহ্মণকে নৃশংসভাবে ভক্ষণ করেন। তখন শোকার্ত আঙ্গিরসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কল্মাষপাদকে অভিশাপ দিয়ে বললেন যে, এখনও আমার পুত্র হয়নি। এই অবস্থায় আমার সামনে নৃশংসভাবে আমার স্বামীকে যখন তুমি ভক্ষণ করলে, তখন তুমিও তোমার পত্নীর সঙ্গে সঙ্গত হয়েই জীবন ত্যাগ করবে, আর বশিষ্ঠ মুনির যে পুত্রদের তুমি বিনাশ করেছ, সেই বশিষ্ঠ থেকেই তোমার পুত্ররা জন্মগ্রহণ করবে। এই কথা বলে অঙ্গিরার গোত্রসম্ভূতা এই ব্রাহ্মণী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করেন।

[মহা (k) ১.১৮২.৫-২২; (হরি) ১.১৭৫.৫-২২]

আঙ্গিরসী$_{২}$ ভাগবত পুরাণ অনুসারে দক্ষকন্যা বসুর পুত্রদের অন্যতম বাস্তু। আঙ্গিরসী, বাস্তুর পত্নী। বাস্তুর ঔরসে আঙ্গিরসীর গর্ভে বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন। *[ভাগবত পু. ৬.৬.১৫]*

আচমন ভোজন, পান, নিদ্রা ও স্নানের পর, পথ চলার পর, লোমহীন ওষ্ঠস্পর্শ করলে, বস্ত্র পরিবর্তন করলে, রেত, মূত্র অথবা বিষ্ঠাত্যাগের পর, অপশব্দ উচ্চারণ বা থুতু ফেলার পর, অধ্যয়নের আরম্ভে, কাশি বা শ্বাস (হাই) উঠলে, উঠোনে বা শ্মশানে গেলে ব্রাহ্মণের পুনরাচমন বিধেয়। পুনরায় আচমন, অর্থাৎ উভয় সন্ধ্যায় আচমন করা হয়ে গেলেও পুনরায় আচমন করতে হবে। চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, স্ত্রী, শূদ্র অথবা উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করলে, উচ্ছিষ্ট লোক বা উচ্ছিষ্ট ভোজ্য স্পর্শ করলে, রক্তপাত বা অশ্রুপাত হলে অথবা ভোজনকালে আচমন বিধেয়। উভয় সন্ধ্যায় স্নান করা হয়ে গেলেও বিণ্মূত্র ত্যাগ করলে আচমন বিধেয়। নিদ্রার পরও আচমন করা উচিত। অগ্নি, গোরু, অথবা গঙ্গাজল স্পর্শ করার পর আচমন বিধেয়। স্ত্রীলোকের দেহের স্পর্শে, নীল বস্ত্র পরিধান করলে এবং নিজের দেহ-বিচ্যুত কেশ বা অক্ষালিত বস্ত্র স্পর্শ করলে শুদ্ধির জল, আর্দ্র তৃণ বা পৃথিবী স্পর্শ করা কর্তব্য। পূর্ব বা উত্তরাভিমুখে উপবেশন করে সর্বদা সংযতবাক্ হয়ে অনুষ্ণ এবং ফেনাহীন বিশুদ্ধ জল দ্বারা আচমন করা কর্তব্য। মস্তক বা কণ্ঠ আবরণ করে, মুক্তকচ্ছ বা মুক্তশিখ হয়ে, পাদপ্রক্ষালন করে আচমন করলে অশুদ্ধি থেকেই যায়। জুতো পরে, জলস্থ হয়ে অথবা মাথায় পাগড়ি পরে আচমন করা চলে না। গল্প করতে করতে, হাসতে হাসতে, ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করতে করতে, শয়ন কালে বা রাস্তা চলতে চলতে, না দেখে কেশাদিযুক্ত জল দ্বারা আচমন নিষিদ্ধ। শূদ্র বা অশুচি ব্যক্তির দেওয়া উচ্ছিষ্ট জল অথবা আঙুলের ডগায় যতটুকু জল ওঠে, সেই জল দিয়ে আচমন না করাই উচিত। আচমনকালে শব্দ না করা বা আনমনা না হওয়া উচিত। বর্ণদুষ্ট, রসদুষ্ট, অল্প বা হস্ত দ্বারা আলোড়িত জল দিয়ে আচমন নিষিদ্ধ।

আচমনের জল হৃদয় পর্যন্ত গেলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হন, কণ্ঠ পর্যন্ত গেলে ক্ষত্রিয় পবিত্র হন। মুখমধ্যে প্রবিষ্টমাত্র জল দ্বারা বৈশ্য এবং জিহ্বা তথা ওষ্ঠের প্রান্ত স্পর্শমাত্র হলেই তেমন জলে স্ত্রীলোক এবং শূদ্র পবিত্র হন। ব্রাহ্মণ সর্বদা ব্রাহ্মতীর্থদ্বারা আচমন করবেন।

আচমনে যে তিনবার জলপান করা হয় তাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর প্রীত হন। আচমনের পর অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখ মার্জন করলে গঙ্গা এবং যমুনা প্রীত হন। লোচন দুটি স্পর্শ করলে চন্দ্র এবং সূর্য প্রীত হন। নাসাপুট স্পর্শ করলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত হন। হৃদয়স্পর্শে সমস্ত দেবতা প্রীত হন। মস্তক স্পর্শ করলে প্রীত হন পরম পুরুষ।

আচমনের সময় মুখ থেকে যেসব অতিসূক্ষ্ম জলবিন্দু অঙ্গে পতিত হয়, তাতে অঙ্গ উচ্ছিষ্ট হয় না, আর দন্তলগ্ন বস্তু দন্তের তুল্য বলে পরিগণিত হয়। অন্য কোনো বস্তু হঠাৎ হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্ট হন, তবে সেই বস্তু ভূমিতে নিক্ষেপ করে কেবল আচমন করলেই শুচি হবেন।

[কূর্ম পু. ২.১৩.২-৩১]

আচমন ছয় রকমের—শুদ্ধ, স্মার্ত, পৌরাণিক, বৈদিক, তান্ত্রিক এবং শ্রৌত। বিষ্ঠা-মূত্রাদি ত্যাগের পরে যে শৌচ, তাকে শুদ্ধ শৌচ বলে। শৌচের পর বিধিপূর্বক স্মার্ত এবং পৌরাণিক আচমন বিধেয়। ব্রহ্মযজ্ঞাদি স্থলে বৈদিক এবং শ্রৌত আচমন করতে হয়। অস্ত্রবিদ্যাদি কর্মে তান্ত্রিক আচমন বিহিত।

[দেবীভাগবত পু. ১১.৩.১-৩]

আচমনীয় দেবতার উদ্দেশে দেবতার মুখ প্রক্ষালনের জন্য ফেনবর্জিত কেবল যে নির্মল জল দান করা হয়, তাকে আচমনীয় বলে। অবিমিশ্র কেবল শুদ্ধ জলই আচমনীয় হিসেবে দান করতে হয় এবং যদি সুলভ হয়, তবে গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধি করে আচমনীয় দান করা যায়। সাধক দেবতার উদ্দেশ্যে আচমনীয় দান করে আয়ু, বল, যশ, বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট লাভ করতে পারেন। *[কালিকা পু. ৬৮.৪৮-৫২]*

আচার$_{১}$ জীবনের পথে কিছু পালনীয় কর্তব্য থাকে, সেগুলির নাম আচার। আচার আমরা নিজেরা তৈরি করিনা, সৎ মানুষ, ভালো মানুষ, বড়ো মানুষ যেগুলিকে কর্তব্য বিবেচনায় পালন করতে বলেন, সেটাকেই আচার বলে, সদর্থক বলেই সেটাকে সদাচারও বলে।—

আচার লক্ষণো ধর্মঃ সন্তশ্চারিত্রলক্ষণাঃ।
সাধূনাঞ্চ যথা বৃত্তম্ এতদাচার লক্ষণম্॥

[মহা (k) ১৩.১০৪.৯; ১৩.৯১.৯]

মহাভারতে আরও বলা হয়েছে—সদাচার, স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান এবং বেদ—এই তিনটিই ধর্মের লক্ষণ—

সদাচারঃ স্মৃতির্বেদস্ত্রিবিধং ধর্মলক্ষণম্।

মনু আচার বলতে বুঝেছেন—প্রচলিত আচার এবং পূর্বপ্রচলিত নিয়মবিধি—Customs and usages. মনু লিখেছেন—আচারই পরম ধর্ম এবং সেটা সাধারণত পরাম্পরাক্রমে আসা শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত আচার—

আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ।

[মহা (k) ১২.২৫৯.৩; (হরি) ১২.২৫৪.৩; মনু সংহিতা ১.১০৮]

বস্তুত আচার-ব্যাপার সৃষ্টিই হয়েছে মানুষের ভালো কাজ করার মানসিকতা থেকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ যখন বলেছিল—

সত্যং বদ ধর্মং চর।

তখন এই অনুজ্ঞাবোধক 'চর' কথাটার মধ্যেই একটা ধর্মাত্মিক আচরণ-বিধি চলে আসে এবং এই ধর্ম কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, সত্য কথা বলা, হিংসা না করা—এই সাধারণ ধর্মগুলিই আচার বা আচরণের মধ্যে পড়ে। তার পরেই উপনিষদ বলেছে—যে সব কর্ম দোষহীন, অনিন্দিত কর্ম, সেইগুলিই করবে, অন্য রকম নয়। আমাদের 'সুচরিত' সদাচার, সেইগুলিই পালন করতে হবে, অন্যরকম নয়। তৈত্তিরীয়ের এই উপদেশের মধ্যেই কিন্তু আচার বা আচরণীয় কর্তব্যের মধ্যে কর্মের অন্তর্ভুক্তি ঘটে, পরম্পরাক্রমে আগত শিষ্টজনের আচরণ অর্থাৎ সদাচার। মনু এই ভাবনাটাই ব্যাখ্যা করে বলেছেন—আচার-পালনের মাধ্যমে ধর্মের ফলপ্রাপ্তি হয় দেখেই ঋষি-মুনিরা 'আচার'-কেই সমস্ত তপস্যার মূল বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—

সর্বস্য তপসো মূলম্ আচারং জগৃহুঃ পরম্।

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ (দুর্গাচরণ), শিক্ষাবল্লী ২.২৩, পৃ. ৬১; মনুসংহিতা ১.১১০]

□ মনু যেটাকে শ্রুতি-স্মৃতিতে বলা কর্মসমূহকে আচার বলেছেন, মহাভারত সেটাকেই 'বেদোক্ত এবং শাস্ত্রোক্ত' ধর্ম বলেছে এবং সাধুজনের প্রবর্তিত আচরণকে শুদ্ধভাষায় বলেছে 'শিষ্টাচীর্ণ'—

ততঃ স ধর্মং বেদোক্তং তথা শাস্ত্রোক্তমেব চ।
শিষ্টাচীর্ণঞ্চ ধর্মঞ্চ ত্রিবিধং চিন্ত্য চেতসা॥

এই একই কথা বলা হয়েছে মহাভারতের অনুশাসনপর্বে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে এবং অবশ্যই পুরাণের মধ্যেও একই অনুরণন শোনা যায়। *[মহা (k) ১২.৩৫৩.৬; ১৩.১৪১.৬৫; (হরি) ১২.৩৩৫.১৭; ১৩.১১৯.৬৪; কূর্ম পু. ২.১৫.১৯]*

□ শ্রুতি বা বেদোক্ত আচার বলতে সন্ধ্যাবন্দনা, অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞকর্ম বোঝায়। আর 'স্মৃতিতে উক্ত' বলতে অষ্টক-শ্রাদ্ধ

থেকে আরম্ভ করে বর্ণাশ্রম অনুযায়ী নানান পালনীয় কর্মই আচার হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১০৪ অধ্যায়;
(হরি) ১৩.৯১ অধ্যায়]

এই দুয়ের পরেই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শিষ্টাচার, সদাচার, এমনকী লোকাচারও। শিষ্টাচার তথা সদাচার ব্যাপারটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যাতে শ্রুতি-স্মৃতির শাসনও অনেক সময় গৌণ হয়ে উঠেছে। ম্যাড্রাস হাইকোর্টের একটি বিচার-সভায় উইলিয়ম জোনস-এর মনুস্মৃতির অনুবাদ উদ্ধার করে আচার শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে এইভাবে—'Immemorial custom is transcental Law' এবং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—Under the Hindu system of Law clear proof of usage will outweigh the written text of the law. *[মানব ধর্মশাস্ত্র ১.১০৮;*
গোবিন্দরাজ এবং নন্দন-কৃত টীকা দ্র.;
Vide collection of Madura V. Mootoo
Ramlinga 12 Moo.I.A. 397 at p. 436;
Bhyah Ram Singh V. Bhyah Ugur Singh
13 Moo. I.A. 373 at p. 390]

□ শিষ্টাচারের গুরুত্ব যে কতটা তা বোঝা যায় বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের কথা থেকে। সেখানে বলা হয়েছে—শ্রুতি-স্মৃতি যা বিধান দেয়, সেটা ধর্ম; কিন্তু বেদবচন বা স্মৃতির বচন যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে না থাকে তাহলে শিষ্টাচারই সেখানে প্রমাণ। আর শিষ্ট, সাধু বা সৎ হলেন তাঁরাই, যারা 'অকামাত্মা' অর্থাৎ যাঁরা স্বার্থপর নন, জাগতিক অভিলাষ পূরণের ক্ষেত্রে যাঁরা বিরাগী—

শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিতো ধর্মঃ।
তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।
শিষ্টঃ পুনরকামাত্মা।

মহাভারত বলেছে—যাঁরা সচ্চরিত্র সম্পন্ন, তাঁরাই সাধু। তাঁদের আচারই শিষ্টাচারের লক্ষণ—

সাধবঃ শীলসম্পন্নাঃ শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্।

[বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র (Dharmasutras, olivelle) ১.৪-৬;
মহা (k) ১৩.১৬২.৩৪; (হরি) ১৩.১৪০.৩৪]

□ কিন্তু এই শিষ্ট জনেরা সবসময় শাস্ত্রমতে 'অকামাত্মা' থাকেননি, ফলে যেসব নীতি-নিয়ম-আচারের উল্লেখ শ্রুতি-স্মৃতিতে তেমন বর্গীকৃতভাবে ছিল না—যেমন শূদ্রদের প্রতি ব্যবহার, প্রতিলোম বিবাহ এবং বর্ণাশ্রমাচারের অনেক কিছুই যা প্রথম দিকে শাস্ত্রবিহিত ছিল না, সেগুলিও এই শিষ্টাচারের সূত্র ধরে পরবর্তী কালের ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে এবং ব্রাহ্মণরা সেখানে 'অকামাত্মা' ছিলেন না, তাঁদের সামাজিক স্বার্থ সেখানে কাজ করেছে।

□ আচার-এর প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দেশাচার, কুলাচার, এমনকী বিবাহাদির ক্ষেত্রে স্ত্রী-আচারও প্রায় অবশ্য পালনীয় ধর্মের মধ্যে চলে গেছে। পণ্ডিতেরা মন্তব্য করেছেন—মাতুল-কন্যার সঙ্গে বিবাহ উদীচ্য-শিষ্টেরা নিষেধ করেছেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের শিষ্ট-জনেরা সেটার অনুমতি দেন। এইভাবে দেশভেদে, গ্রামভেদে, বংশভেদেও লোকাচারও ধর্মের মর্যাদা পেয়েছে।

যাঁরা বেদাদিশাস্ত্রবিহিত সাধু আচার অনুসরণ করতেন, তাঁদেরই বলা হত আর্য, যাঁরা বিপরীত কদাচারে লিপ্ত হতেন তাদেরই বলা হত অনার্য—

বৃত্তেন হি ভবত্যার্যো ন ধনেন ন চেজ্যয়া।

সদাচার এবং অসদাচারের দ্বারা আর্যত্ব এবং অনার্যত্ব স্থির করা হত, 'এরিয়ান' 'নন-এরিয়ান'-এর অনুবাদ হিসেবে নয়—

অনার্যত্বম্ অনাচারঃ।

[মহা (k) ৫.৯০.৫৩; ১৩.৪৮.৪১;
(হরি) ৫.৮৩.৫৩; ১৩.৪০.৪১;
বৃহন্নারদীয় পু. ৪.২০-৩১]

আচার$_২$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে একজন গন্ধর্ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১১]*

আচার্য শিক্ষাদাতা গুরুর সর্বোত্তম উপাধি হল আচার্য। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বিভিন্ন পাণিনিসূত্রের ওপর ভাষ্য লিখতে গিয়ে চার প্রকারের শিক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে আচার্য, উপাধ্যায়, শিক্ষক এবং গুরু। এগুলির মধ্যে গুরু হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ উপাধি এবং শিক্ষাদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আচার্য। স্বয়ং পতঞ্জলি ব্যাকরণ-শাস্ত্রের স্রষ্টাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনগুরুর মর্যাদা দিয়েই বারবার তাঁর সম্বন্ধে আচার্য-শব্দটি ব্যবহার করেছেন, ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে পাণিনি সঠিক কী বলতে চাইছেন, সেটা জানানোর সময়েও তিনি সূত্রকারের নাম না বলে

বার বার আচার্য বলে সসম্ভ্রমে তাঁরই কথা বলেছেন—আচার্য প্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। অন্যদিকে ভাগবত পুরাণে স্বয়ং ভগবান নিজের মুখে আচার্য-স্বরূপের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন— ব্রহ্মচারী শিষ্য আচার্যকে আমারই স্বরূপ বলে জানবে, কখনো তাঁকে অবমাননা করবে না। মনুষ্যবুদ্ধিতে তাঁর গুণে দোষ আবিষ্কার করবে না। কেননা আচার্যস্বরূপ গুরুর মধ্যেই সমস্ত দেবতার আবাস—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নারমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥

[মহাভাষ্য (Keilhorn) ১.১.৩, পৃ. ৪৩; ১.২.৪, পৃ. ১৯৩; ভাগবত পু. ১১.১৭.২৭]

মহাভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু আচার্য হিসেবে অসংখ্যবার দ্রোণাচার্যের নাম এসেছে এবং আচার্য-শব্দের উচ্চারণ-মাত্রেই এখানে দ্রোণাচার্যের প্রতি সংকেত তৈরি হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বের একটি জায়গায় অবশ্য আচার্য নামটির অন্য একটি ব্যাখ্যা পাচ্ছি, তবে সে ব্যাখ্যা অন্যভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য বটে। এখানে মাতা পিতার গুরুত্ব বোঝানোর সময় আচার্য-উপাধ্যায় ইত্যাদি গুরুদের কথা এসেছে। এখানে বলা হচ্ছে—দশ জন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সমান একজন আচার্য। দশ জন আচার্যের সমান একজন উপাধ্যায়। দশ জন উপাধ্যায়ের সম্মান একজন পিতার মধ্যে নিহিত এবং দশ জন পিতার গুরুত্বও যিনি আত্মস্থ করতে পারেন, তিনি হলেন মাতা—

দশাচার্য্যান্ উপাধ্যায়ঃ উপাধ্যায়ান্ পিতা দশ।
পিতৃন্ দশ তু মাতৈকা সর্বাং বা পৃথিবীমপি॥

মহাভারতের এই শ্লোকটিতে গর্ভধারিণী মাতার গৌরবই সবচেয়ে বেশি এবং হয়তো সেই মাহাত্ম্য প্রধানতম হয়ে ওঠার কারণেই আচার্য এবং উপাধ্যায়ের ক্রমটিও এখানে উলটে গেছে বলে মনে হয়। মহাভারতের অন্যত্র আচার্য বা উপাধ্যায়ের কোনো তুলনামূলক শ্লোক চোখে পড়েনি, শিক্ষক কিংবা গুরুর সঙ্গে তো নয়ই। কিন্তু আচার্য শব্দের উল্লেখ যেখানেই ঘটেছে, সেখানেই তাঁর চরমতম গুরুর মর্যাদাটুকু প্রসঙ্গ এবং পরিবেশগতভাবেই প্রকট হয়ে ওঠে। মহাভারতের পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়ের মধ্যে আচার্য, উপাধ্যায় এবং গুরু—এই তিনটি শিক্ষকতার উপাধিবাচক পর্যায়-শব্দ হিসেবে এসেছে এবং এখানে গুরু-শব্দটি বিদ্যাদাতার অতিসাধারণ পরিচিত অভিধান। বিদ্যা শিক্ষা করা সত্ত্বেও সেই গুরুকে যে অবমাননা করে অথবা তাঁকে আদর-যত্ন করে না, তাদের মতো পাপী মানুষ আর নেই—এই অভিব্যক্তিটুকু তৎকালীন সমাজের সাধারণ বোধমাত্র—

বিদ্যাং শ্রুত্বা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে
প্রত্যাসন্না মনসা কর্মণা বা।
তেষাং পাপং ভ্রূণহত্যাবিশিষ্টং
নান্যস্তেভ্যঃ পাপকৃদস্তি লোকে॥

সাধারণভাবে গুরুর এই মর্য্যাদার সঙ্গে আচার্যের মাহাত্ম্য কিন্তু আরও অধিক গুরুত্ব দিয়েই উচ্চারণ করা হয়েছে এইখানেই। বিশেষত আচার্য-শব্দটাকে সম্পূর্ণ একটা জাতির সঙ্গে উল্লেখ করে মহাভারত তৎকালীন ভারতীয় সমাজের কৃষ্টিটুকুই প্রকট করে জানিয়েছে—

আচার্যবিশিষ্টা যা জাতিঃ সা দিব্যা সাজরামরা।

অর্থাৎ যে জাতির মধ্যে সদা-সর্বদা আচার্যদের অনুশাসনে চলে সে জাতি দেবতার সঙ্গে সংপৃক্ত থাকে, সে জাতির জরা-বার্ধক্য নেই, সে জাতি অমর হয়ে থাকে। তবে আচার্য-শব্দের এই মর্যাদা প্রকাশ করা সত্ত্বেও মহাভারতের এই অধ্যায়ে উপাধ্যায়কেই গুরুতম অধ্যাপক হিসেবে দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে—যেসব আচার-ব্যবহারে একজন উপাধ্যায়কে প্রীত করা যায়, তাতেই পরব্রহ্মের পূজা সম্পন্ন হয়। উপাধ্যায়ের মতো গুরু মাতা-পিতার থেকেও বেশি সম্মাননীয়—

যেন প্রীণাত্যুপাধ্যায়ং তেন স্যাদ্ ব্রহ্ম পূজিতম্।
মাতৃতঃ পিতৃতশ্চৈব তস্মাৎ পূজ্যতমো গুরুঃ॥

পূর্বে দশজন উপাধ্যায়কে পিতার সমান অথবা দশজন পিতাকে মায়ের সমান বলার পর এখন মাতা-পিতার চেয়েও উপাধ্যায়কে উচ্চতর বলে অবশেষে উপাধ্যায়, পিতা এবং মাতাকে সমান স্তরে নিয়ে আসল মহাভারত এবং সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলল— উপাধ্যায়, পিতা, এবং মাতাকে বাক্যের দ্বারা এবং কর্মের দ্বারা যে ব্যক্তি অবমাননা করে, তার মতো পাপী মানুষ আর নেই—

উপাধ্যায়ং পিতরং মাতরঞ্চ
যে'ভিদ্রুহ্যন্তে মনসা কর্মণা বা।
তেষাং পাপং ভ্রূণহত্যাবিশিষ্টং
তস্মান্নান্যঃ পাপকৃদস্তি লোকে॥

এই শ্লোকের মধ্যে উপাধ্যায়ের চরম মর্যাদা স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু আচার্য বলে কোনো শব্দ এখানে উচ্চারিত হল না, যা এখানে থাকা উচিত ছিল। *[মহা (k) ১২.১০৮.১৬-৩০; (হরি) ১২.১০৫.১৬-৩০]*

মহাভারতের কালের মধ্যেই আচার্য, উপাধ্যায় ইত্যাদির ক্রমিক মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু সেই বিচারে মহাভারতে উপাধ্যায়ের পূর্বোল্লিখিত মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হবে বলেই আমরা মনে করি। গৌতমের ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে—সমস্ত প্রকার গুরুর মধ্যে আচার্য হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যেহেতু তিনি বেদবিদ্যা দান করেন। এই কথার সূত্র ধরেই বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে—বেদের বিদ্যা দান করার জন্য আচার্যই পিতা বলে চিহ্নিত হন অথবা বলা যায়, প্রথমে পিতাই বেদবিদ্যা দান করেন বলে তিনিই আচার্য বলে চিহ্নিত হন—

বেদপ্রদানাৎ পিতেত্যাচার্যম্ আচক্ষতে।

উপনয়ন হবার পর যিনি ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সম্পূর্ণ বেদ শিক্ষা দেন, তাঁকেই আচার্য বলে। আর যিনি পূর্ণ বেদ শিক্ষা দিতে পারেন না, শুধু বেদের একাংশ-মাত্র শিক্ষা দেন, অথবা যিনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ইত্যাদি বেদাঙ্গগুলি শিক্ষা দেন, তিনি উপাধ্যায়। লক্ষণীয়, আচার্য-উপাধ্যায়ের সংজ্ঞা শেষ হবার অনেক পরে, অন্তত দশ অধ্যায় পরে ঠিক মহাভারতীয় পদ্ধতিতেই একটি শ্লোক লিখে বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র জানাচ্ছে যে, উপাধ্যায়ের চেয়ে দশ গুণ বেশি সম্মানিত গুরু হলে আচার্য, একশ আচার্যের সমান একজন পিতা, আর মায়ের গৌরব হল হাজার পিতার সমান। বশিষ্ঠধর্মসূত্রের এই শ্লোকটি মনুসংহিতায় একেবারে একরকম—

উপাধ্যায় দশাচার্য আচার্যানাং শতং পিতা।
পিতুর্দশশতং মাতা গৌরবেনাতিরিচ্যতে॥

এই শ্লোক মাতৃগৌরবের চরম অভিজ্ঞান হলেও উপাধ্যায়ের চাইতে আচার্যের মাহাত্ম্য যে অনেক বেশি, কিংবা গুরু হিসেবে আচার্যের মর্যাদা যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেটা পূর্ণভাবে প্রতিপন্ন করে। *[গৌতম ধর্মসূত্র (Dharmasutras: Olivelle), ২.৫০; বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র (তদেব), ২.৪; ৩.২১-২৩; ১৩.৪৮; মনুসংহিতা ২.১৪৫]*

আচার্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে আপস্তম্ব ধর্মসূত্র খুব সুন্দর করে বলেছে—যাঁর কাছ থেকে ধর্ম-নিয়ম চয়ন-আহরণ করে শিষ্য, তাঁরই নাম আচার্য—

যস্মাদ্ধর্মানাচিনোতি স আচার্যঃ।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে গুরু এবং আচার্যের পার্থক্য করে বলা হচ্ছে—নিষেক থেকে শুরু করে শ্মশান পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্কার উপদেশের পর যিনি বেদানুশীলনে প্রথম উপদেশ শুরু করেন, তিনি গুরু, বস্তুত তিনি পিতা। আর যিনি শিষ্যকে উপনয়ন দেবার পর চতুর্বেদের সামগ্রিক উপদেশ দেন তিনি আচার্য—

স গুরুঃ যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনীয় দদদ্‌বেদম্ আচার্যঃ স উদাহৃতঃ॥

কথাটা বিষ্ণুধর্মসূত্রে প্রায় একইরকম, তবে তাঁকে পিতা এবং মাতার সমান্তরালে 'অতিগুরু' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—

ত্রয়ঃ পুরুষস্য অতিগুরবো ভবন্তি।
মাতা পিতা আচার্যশ্চ।

আচার্যের পদবী সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মনুসংহিতায়। বস্তুত গুরু, উপাধ্যায় এবং আচার্যের পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়ে মনু পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, শিষ্যকে যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দেবার পর শিক্ষা-কল্প ইত্যাদি ষড়ঙ্গ বেদাঙ্গের সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্মরহস্য সহ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান তিনি আচার্য। আর যিনি বেদের একদেশ অর্থাৎ বেদের মন্ত্রভাগ অথবা ব্রাহ্মণভাগ, কিংবা ছয়টি বেদাঙ্গ—শিখা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—ইত্যাদি শিষ্যকে উপদেশ দেন এবং সেই অধ্যাপনার মধ্যে যদি জীবিকা-অর্জনের অনুষঙ্গ থাকে, তাহলে তাঁকে উপাধ্যায় বলে—

একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গনাপি বা পুনঃ।
যো'ধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থম্ উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥

[আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র (Dharmasutras Olivelle), ১.১.১.১৪; যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি (আনন্দাশ্রম), ১.৩৪; বিষ্ণু-ধর্মসূত্র (মহর্ষি) ২৯.১; ৩১.১-২; মনুসংহিতা ২.১৪০-১৪২]

ধর্মসূত্রগুলি, মনুসংহিতা এবং মহাভারত-পুরাণে আচার্যের শ্রেষ্ঠত্ব বৈদিক কাল থেকে পরম্পরাবাহিত হয়ে আসছে। বেদবিদ্যা দেবার আগে সেই উপনয়নেরকালেই আচার্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, উপনয়নের মুহূর্ত থেকেই আচার্য শিষ্যকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ

করেন স্ত্রীলোকের গর্ভধারণের মতো। আচার্যকে মৃত্যুদেবতা যমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কেননা যম নচিকেতাকে বেদরহস্য উপদেশ করেছিলেন। তুলনা করা হয়েছে বরুণের সঙ্গে, কেননা তিনি ভৃগুকে বেদবিদ্যা দান করেছিলেন। পরিশেষে আচার্যের রূপটি অসাধারণ। বলা হচ্ছে, আচার্যই ব্রহ্মচারী। কেননা নিরন্তর বেদবিদ্যা শিক্ষা দিতে দিতে এবং প্রশিক্ষণের পদ্ধতি জানাতে জানাতে তিনি নিজেও তো এক প্রকার ব্রহ্মচারী হয়ে যান—

আচার্যো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঃ।

বস্তুত আচার্যের সঙ্গে ব্রহ্মচারীর একাত্মতা আচার্যের নিরন্তর বিদ্যাভ্যাসের সূচনা করে।

[অথর্ববেদ (Roth & Whitney) ১১.৫.৩, ১৪, ১৬]

আজগব শিবের পিনাক ধনু অজগব বা আজগব নামে খ্যাত। একে 'অজকব', 'অজকাব', এমনকী 'অজগাব'ও বলা হয়। শব্দকল্পদ্রুমে অজকব শব্দটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা থেকে মনে হয় অজকব শব্দের 'ক' বর্ণটি পরবর্তীকালে ভাষার বিবর্তনে 'গ' তে পরিণত হয়েছে। পৌরাণিকরা জানিয়েছেন যে, অজ বলতে জন্মরহিত বিষ্ণু এবং 'ক' বলতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে বোঝায়। ত্রিপুর দহনের সময় শিব যখন পিনাক ধনু হাতে যুদ্ধযাত্রা করেন, সেই সময় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের শিবস্তুতির সুর আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন সেই ধনুকের মধ্যে। তাই পিনাক ধনু অজকব বা অজগব নামে প্রসিদ্ধ হয়। মহাভারত এবং পুরাণে শিবের ধনুক একাধিকবার আজগব নামেও বর্ণিত হয়েছে। পণ্ডিতজনেরা মনে করেন—'গব' অর্থাৎ গোরু-মহিষ জাতীয় প্রাণীদের শিং এবং ছাগলের (অজ) চামড়া দিয়ে ধনুক তৈরি করা হত বলেই ধনুকের নাম আজগব। হয়তো ত্রিপুরারি শিবের পিনাক নির্মাণের জন্যই এই প্রযুক্তি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই এই প্রযুক্তিতে নির্মিত প্রথম ধনুকটির নামই হয়ে গেল আজগব। পৃথুরাজা এই আজগব ধনু লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মান্ধাতার ধনুকের নামও নাকি আজগব ছিল। শিবের পিনাক ধনুর তুল্য দৃঢ়তাসম্পন্ন বলেই হয়তো এই ধনুকগুলিও আজগব নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুদ্যুম্ন এবং নর-নারায়ণ ঋষিও আজগব ধনুর অধিকারী ছিলেন। লক্ষণীয়, ভগবান নারায়ণ বিষ্ণুর ধনুকের নাম শার্ঙ্গরব, এখানেও ধনুক নির্মাণের ক্ষেত্রে 'শৃঙ্গ' অর্থাৎ কিনা গোরু-মহিষ জাতীয় প্রাণীর শিং ব্যবহারের কারণেই ধনুকের এমন নামকরণ। সেক্ষেত্রে আজগব এবং শার্ঙ্গরব নাম দুটির অর্থগত সাদৃশ্য এবং দু-প্রকার ধনুক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সাদৃশ্যও বিবেচনার দাবি রাখে। *[মহা (k) ৭.৬৯.১৩; ৩.১২৬.৩৪;*

(হরি) ৭.৬১.১৩; ৩.১০৪.৩৩;

মৎস্য পু. ২৩.৩৭; বায়ু পু. ৯০.৩১; ৬২.১২৭;

বিষ্ণু পু. ১.১৩.৪০, ৬৯;

ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৫.৩২; ১.৩৬.১৪৮;

দেবীভাগবত পু. ৪৯.৫; ১.১২.৩;

বামন পু. ৭.৪৬; শিব পু. (ধর্ম) ৫৬.২১]

আজানেয় প্রাচীন অশ্বকুলের অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রজাতি। আজানেয় শব্দের অর্থ অমরকোষে বলা হয়েছে—একান্ত পৃথক প্রকারের মহাকুলীন অশ্ব। অত্যন্ত প্রশস্ত জাতের এই অশ্ব যেমন আরোহীর বশ্য হয়, এমন আর কোনো অশ্ব নয়। এই ঘোড়া অনেক দূরপথ সুখারোহণে নিয়ে যেতে পারে আরোহীকে—

আজানেয়াঃ কুলীনাঃ স্যুর্বিনীতাঃ সাধুবাহিনঃ॥

অমরকোষের টীকাকারেরা অশ্বশাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধার করে বলেছেন—অস্ত্রের আঘাতে ভীষণ কষ্ট পেলেও এমনকী পদে পদে স্খলিতগতি হয়ে পড়লেও যে অশ্ব আরোহীর ইঙ্গিত-চেষ্টা বোঝে, সেই অশ্বই উৎকৃষ্ট জাতীয় আজানেয় অশ্ব—

শক্তিভির্ভিন্নহৃদয়াঃ স্খলন্তশ্চ পদে পদে।
আজানন্তি যতঃ সংজ্ঞামাজানেয়াস্ততঃ স্মৃতাঃ॥

[অমরকোষ (Jhalakikar)

২. (ক্ষত্রিয়বর্গ) ৪৪]

□ মহাভারতে আমরা একাধিকবার আজানেয় অশ্বের উল্লেখ পাই। আজানেয় অশ্ব সে যুগে রাজার অন্যতম সম্পদ হিসেবে গণ্য হত। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখে ঈর্ষাকাতর দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে শকুনি দুর্যোধনকে তাঁর ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, দুর্যোধনের ঐশ্বর্য্য কোনো অংশেই পাণ্ডবদের থেকে কম নয়। এই প্রসঙ্গেই দুর্যোধনের আজানেয় অশ্বের প্রসঙ্গ এসেছে। অর্থাৎ যাঁর ঘরে আজানেয় অশ্ব আছে, সে

অন্যাকে ঈর্ষা করবে কেন? বস্তুত আজানেয় অশ্বই তাঁর প্রতিকূল জনের ঈর্ষার বস্তু।

[মহা (k) ২.৪৯.৯; (হরি) ২.৪৭.৯]

☐ সভাপর্বের অন্যত্র উল্লেখ আছে যে, প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত আজানেয় অশ্ব উপহার নিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসেছিলেন।

[মহা (k) ২.৫১.১৫; (হরি) ২.৪৯.১২]

☐ মহাভারতের বনপর্ব থেকে জানা যায় যে, ভীমের রথ আজানেয় অশ্বেরা বহন করত।

[মহা (k) ৩.২৭০.১০; (হরি) ৩.২২৪.১০]

☐ কর্ণপর্বের সূচনায় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কৌরব শিবিরের জীবিত এবং যুদ্ধোদ্যত রথী মহারথীদের কথা বলতে গিয়ে গান্ধাররাজ শকুনির গান্ধার সৈন্যদের কথা বলেছেন। এই গান্ধারসেনার অন্তর্গত অশ্বারোহী বাহিনী আজানেয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অশ্বের দ্বারা সজ্জিত ছিল বলে জানা যায়। *[মহা (k) ৮.৭.১১; (হরি) ৮.৫.১৫ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ২৬; পৃ. ৪২]*

☐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত ললিতা উপাখ্যানে দেবী ললিতার সেনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, সেই বাহিনী আজানেয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অশ্বে সজ্জিত ছিল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১৬.১৭]

আজিহায়ন পুরাণে কশ্যপের গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আজিহায়ন সেই গোত্রের অন্যতম। কশ্যপ থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও কাশ্যপ বলে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৯.৯]

আজ্ঞাচক্র ভ্রূর উপরিভাগ নাড়িত্রয়ের প্রান্তভাগ বলে প্রসিদ্ধ। সেই প্রান্তভাগ তিনটি পথযুক্ত ষট্‌কোণ এবং চার আঙুল পরিমিত। রক্ত-চন্দন-যোগজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং স্থানকে আজ্ঞাচক্র বলে অভিহিত করেন। *[কালিকা পু. ৫৫.৩০]*

আজ্য যজ্ঞে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত ঘৃতের নাম আজ্য। তবে ঘৃত হলেও এই যজ্ঞীয় বস্তুটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি গলিত ঘৃত। যজ্ঞে বারংবার এবং বহুবার ব্যবহার করতে হয় বলে ঘৃত উষ্ণ করে গলিয়ে নেওয়া অবস্থায় যে দ্রবীভূত ঘি পাওয়া যায়। সেটার নাম আজ্য।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—আজ্য হল সেই ঘৃত যা দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করার জন্য ব্যবহার্য্য। মনুষ্য-ব্যবহারের জন্য ঘৃতের নাম সুরভি। সুরভি 'ঘৃত' নামেও পরিচিত, আর পিতৃলোকের উদ্দেশে আহুতিযোগ্য ঘিয়ের নাম আয়ুত—

আজ্যং বৈ দেবানাং সুরভি ঘৃতং মনুষ্যাণাম্,
আয়ুতং পিতৃণাং, নবনীতম্ গর্ভাণাম্।

এখানে আজ্য আর ঘৃতের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেবার জন্য টীকাকার সায়নাচার্য তাঁর পূর্বাচার্যদের উদাহৃত একটি শ্লোক ব্যবহার করে বলেছেন—সর্পিষ্ (ঘৃত) গলিয়ে বিলীন অবস্থায় নিয়ে গেলে তার নাম হয় আজ্য। ঘৃত যদি ঘনীভূত অবস্থাতেই থাকে তবে তার পারিভাষিক নাম হল সুরভি। ঈষদ্‌গলিত ঘৃতের নাম আয়ুত, আর নবনীত (নবনী, ননী) গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভস্থ ভ্রূণের গ্রহণযোগ্য লঘুপাক ঘৃত—

'সর্পির্বিলীনম্ আজ্যং স্যাদ্ ঘনীভূতং
ঘৃতং বিদুঃ' ইতি।
ঈষদ্ বিলীনম্ আয়ুতম্ সুরভি
যোগ্যং প্রিয়মিত্যর্থঃ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আজ্য নিয়ে যে এত আলোচনা হয়েছে, তার কারণ বৈদিক যজ্ঞে উষ্ণ গলিত ঘৃতের মর্য্যাদা এবং ব্যবহারিক সুবিধা। ঋগ্‌বেদের বিখ্যাত সেই পুরুষসূক্তে স্বয়ম্ভু পুরুষকে যখন দেবতারা যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন, তখন রূপকাকারে বলা হয়েছে যে, পুরুষকে হব্য হিসেবে গ্রহণ করে আহুতি দেবার সময় বসন্তকাল আজ্যরূপে ব্যবহৃত হল, গ্রীষ্মকাল হল সেই যজ্ঞের কাষ্ঠরাশি, আর হবিরূপে গৃহীত হয়েছিল শরৎকাল—

বসন্তো'স্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ১.৩, পৃ. ১৭; ঋগ্‌বেদ ১০.৯০.৬; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১২.৩.৩৫; পৃ. ২৯৮]

☐ বৈদিক পরম্পরায় ব্যবহৃত এই আজ্য মহাভারতের কালেও যজ্ঞের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মহাভারতে কপিল-স্যূমরশ্মি-সংবাদে যজ্ঞের প্রয়োজন হিসেবে সতেরোটি যজ্ঞাঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম বারোটি প্রধান উপকরণের মধ্যে গলিত ঘৃত বা আজ্য অন্যতম যজ্ঞাঙ্গ—

ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষা বীরুদাজ্যং পয়োদধি।
হবির্ভূমির্দিশঃ শ্রদ্ধা কালশ্চৈতানি দ্বাদশ॥

এখানে এই যজ্ঞাঙ্গ-কীর্তনের প্রসঙ্গ যেটা ছিল বৈদিক যজ্ঞে হিংসাত্মক গোবধের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? পূর্বকালে ত্বষ্টা মহারাজ নহুষের বাড়িতে অতিথি হয়ে এলে বেদবিহিত নিয়মে অতিথি-সংকারের জন্য গো-বধে প্রবৃত্ত হন এবং সেটা এইজন্যেই যে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত যে সব বিধি-বাক্য আছে সেখানে সমাগত অতিথির জন্য গোবধ করার মতো নির্দেশটাকে নহুষ অতি-প্রাচীন এবং নিত্যসত্য বলে মনে করেছিলেন। তাঁর এই গোবধের প্রবৃত্তি দেখে সাংখ্যদর্শন প্রবক্তা হতাশ হয়ে বলেছিলেন 'হায় বেদ'—বেদা ইত্যব্রবীৎ সকৃত।

ঠিক এই সময়েই মহর্ষি স্যুমরশ্মি সেই গোরুটির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং কপিলের সঙ্গে তাঁর যজ্ঞে পশুবধ সম্বন্ধে আলোচনা হতে থাকে। এই আলোচনার শেষাংশে এসে বোঝা যায়— যজ্ঞে পশুহিংসার পরিবর্তে সেই পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা সেই পশুজাত দ্রব্যের উপকরণগুলি দিয়েও প্রতীকীভাবে একটা অহিংস সম্পাদন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আবারও আজ্যের কথা বলে বলা হচ্ছে—এগুলি যজ্ঞের অঙ্গ। সুতরাং আজ্য (ঘৃত), দুগ্ধ, দধি, গোময় (গোবর), আমিক্ষা (ছানা), গোচর্ম, গোরুর লোম, গোরুর শিং এবং চরণ—এগুলির মাধ্যমেই গোরু যজ্ঞকর্ম নির্বাহ করতে পারে—

আজ্যেন পয়সা দধ্না শকৃদামিক্ষয়া ত্বচা।

[মহা (k) ১২.২৬৮.২৫-২৮;
(হরি) ১২.২৬২.২৫-২৮]

☐ আমাদের ধারণা, যজ্ঞীয়, পশুবধের বিকল্প হিসেবে গব্য ব্যবহারের প্রচলন শুরু হতেই ঘৃতের গুরুত্ব খুব বেড়ে যায় এবং ঘৃতের এত প্রকারভেদও হয়তো সেইজন্য—আজ্য, সুরভি, আযুত, নবনীত ইত্যাদি। দেবভোগ আজ্যের গুরুত্ব তো এতখানিই বেড়েছে যে, মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে, যেখানে যজ্ঞীয় উপকরণের অভাবে গভীর মনোযোগে মানসযজ্ঞ করা হচ্ছে, সেখানে অন্য অনেক উপকরণ বাদ গেলেও আজ্য সব সময় উপস্থিত। মহাভারতে একত, দ্বিত এবং ত্রিত নামে তিনজন খ্যাতনামা মুনি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ত্রিত সব চাইতে বেদনিষ্ঠ এবং বিদ্বান। কোনো এক সময় যজ্ঞদক্ষিণার পশুগুলি বনপথে চরিয়ে নিয়ে যাবার সময় একত এবং দ্বিত তাঁদের এই বিদ্বান ভাইকে প্রবঞ্চনা করে চলে যান। ত্রিত-মুনি হঠাৎ একটি গভীর অথচ প্রায় মজে যাওয়া কুয়োর মধ্যে পড়ে গেলে অন্য দুই ভাই চলে যান। কুয়ো থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় না দেখে ত্রিত একটি মানস যজ্ঞের পরিকল্পনা করেন। কুয়োর মধ্যে একটি ঝুলন্ত লতা দেখে ত্রিত সেটাকে সোমলতা কল্পনা করে নিলেন, সেই কূপের একদেশে স্থিত জলকে অগ্নিরূপে কল্পনা করলেন আর অন্য অংশে থাকা জলকে 'আজ্য'-রূপে কল্পনা করে নিলে—

আজ্যাঞ্চ সলিলং চক্রে / ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্।

ত্রিত-মুনির মানস যজ্ঞ সিদ্ধ হয়েছিল, দেবতারা নেমে নেমে এসে যজ্ঞভাগ নিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে। মহাভারতের অন্য একটি স্থানে আজ্য এবং যজ্ঞ ব্যাপারটাকে দার্শনিকভাবে তপস্যার আঙ্গিকে নিয়ে গিয়ে বলা হয়েছে—হোতাদের যেমন দশ প্রকার যজ্ঞোপকরণ থাকে, তেমনই তপস্যার যজ্ঞোপকরণগুলি হল—চিত্তি অর্থাৎ গভীর চিন্তন, ধীশক্তি যেটাকে অথর্ববেদে বলা হয়েছে—

চিত্তিং জুহোমি মনসা ঘৃতেন।

তার পরের উপকরণ যজ্ঞে ব্যবহার্য্য ঘি-তোলার হাতা; তৃতীয় উপকরণ চিত্ত, যাকে দার্শনিক ভাবে মনও বলা যায়। চতুর্থ উপকরণ আজ্য অর্থাৎ কবোষ্ণ গলিত ঘৃত; পবিত্র পঞ্চম উপকরণ যজ্ঞে সোমরস ছাঁকার জন্য মেষলোমের ছাঁকনি, ষষ্ঠ হল জ্ঞান; এই ছয়ের সঙ্গে আছে অশাঠ্য, অকুটিলতা, দেশ এবং কাল

চিত্তিঃ স্রুক্ চিত্তমাজ্যঞ্চ পবিত্রং জ্ঞানমুত্তমম্।
ন শাঠ্যং ন চ জিহ্মত্বং কালো দেশশ্চ তে দশ॥

মহাভারতের এই শ্লোকে সংখ্যা-গণনায় দশটি যজ্ঞোপকরণের কথা বলা হলেও শ্লোকে ব্যবহৃত ভাষা একটা রূপকের সংকেত দেয়, যেটা, টীকাকার নীলকণ্ঠ সঠিক ব্যাখ্যা করে বলেছেন—চিত্তি হল ক্রিয়াসিদ্ধি উপকারক একটা মাধ্যম, ক্রিয়াসাধক যা জীব এবং ব্রহ্মের একীকরণে সাহায্য করে। যজ্ঞের ক্ষেত্রে স্রুক্ বা ঘি তোলার হাতা যেমন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি-সম্পাদনে সাহায্য করে। জীব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে

একাকার অনুভব করছে যজ্ঞের হাতাও আহুতিদ্রব্য তুলে এনে আহবনীয়ের সঙ্গে একাকার তৈরি করছে। তারপরেই চিত্ত হল গলিত ঘৃত। চিত্ত যেমন করে পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার প্রবিলাপন ঘটায় (মিশিয়ে দেয়) গলিত ঘৃতও তেমনই যজমানের আর্তিস্বরূপ হোতব্য দ্রব্যকে আহূত দেবতার মধ্যে প্রবিলাপন করে—যজমানের আর্তি মিশিয়ে দেবতার করুণার সঙ্গে। সেইজন্য যজ্ঞোপকরণ আজ্য ব্রহ্মাদ্বয়বোধের তপস্যায় চিত্তের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে—

চিত্তিঃ সাধনং জীবব্রহ্মণো
রেকীকরণসাধনং যোগস্তৎস্থানে'ত্র স্রুক্।
হোতব্যং দ্রব্যং পরমাত্মনি প্রবিলাপনীয়ং
চিত্তিং তৎস্থানে'ত্র আজ্যমিতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-ধৃত এই শ্লোকে 'চিত্তি'-র জায়গায় 'চিত্ত'-পাঠ ঠিক নয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, মহাভারতে চিত্তি-চিত্তের সঙ্গে স্রুক্ এবং আজ্যের একাত্মতায় যে দশটি দার্শনিক যজ্ঞোপকরণের কথা বলা হয়েছে, তার মূল নিহিত আছে চিত্ত্যুপনিষদ নামে একটি গৌণ উপনিষদে এবং সেখানে দশটি যজ্ঞোপকরণ হল—

১.চিত্তিঃ স্রুক্, ২. চিত্তমাজ্যম্, ৩. বাগ্‌বেদিঃ, ৪. আধীতং বর্হিঃ, ৫. কেতো অগ্নিঃ, ৬. বিজ্ঞাতমগ্নিঃ, ৭. বাক্‌পতির্হোতা, ৮. মন উপবক্তা, ৯. প্রাণো হবিঃ, ১০. সামাধ্বর্যুঃ।

সমস্ত প্রমাণ থেকে মহাভারতের কালেও আজ্যের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছি আমরা। আজ্যের তাত্ত্বিক গুরুত্ব ছাড়াও গলিত ঘৃতের আহুতিময় যজ্ঞগুলির পবিত্র গন্ধ ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। পার্বতী মহাদেবকে বলছেন—তোমার মুখে আমি গার্হস্থ্য-ধর্ম, মোক্ষধর্ম এবং সজ্জনাচারের কথা অনেক শুনেছি। তাতে তপোবননিবাসী মুনিদের আশ্রম দেখার জন্য বড়ো ইচ্ছে হয় আমার। তপোবনের সর্বত্র মিশে-যাওয়া আজ্যধূমের গন্ধ আমার মনকে আকুল করে তুলছে—

আজ্যধূমোদ্ভবো গন্ধোরুণদ্ধীব তপোবনম্।

[মহা (k) ৯.৩৬.৩৫; ১২.৭৯.২০;
১৩.১৪১.৯২-৯৩; (হরি) ৯.৩৪.৩৪;
১২.৭৭.২০; ১৩.১১৯.৯২-৯৩]

আজ্যপ অন্যতম পিতৃগণ, যাঁরা আজ্য-ধারা পান করেন।

কামদেবের পুষ্পশরে আহত এবং কামতাড়িত হয়ে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ সন্ধ্যাসুন্দরীর দিকে অবলোকন করতে থাকলেন। সেই মানসপুত্রদের মধ্যে ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, এবং অঙ্গিরা কোনোভাবেই মনোবেগ ধারণ করতে পারলেন না। কিন্তু মরীচি, প্রচেতা, অত্রি, পুলহ, ভৃগু এবং নারদ নিজেদের সংযত রাখলেন। কামতাড়িত পুলস্ত্য ঋষির যে ঘর্মজল মাটিতে পড়ল, তা থেকে আজ্যপ পিতৃগণের উৎপত্তি হল। এই পিতৃগণ কব্যবাহী। এঁদের সৃষ্টি হবার পর ব্রহ্মা সর্বভূতেরই পিতামহ হলেন এবং সন্ধ্যা পিতৃগণের জননীরূপে চিহ্নিত হলেন। কেননা সন্ধ্যা ওই কব্যবাহী পিতৃগণের গর্ভধারিণী না হলেও তাঁদের উৎপত্তির কারণ বটে।

[কালিকা পু. ২.৫১-৫৬; ২৬.১৭]

☐ ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, আজ্যপ পিতৃগণের তিনটি শ্রেণী। এঁরা হলেন—
কাব্য, বর্হিষদ এবং অগ্নিস্বাত্ত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৮.১৯; বায়ু পু. ৫৬.১৭]

☐ ভাগবত পুরাণ মতে দক্ষকন্যা স্বধা এই আজ্যপ পিতৃগণের পত্নী। *[ভাগবত পু. ৪.১.৬২]*

☐ ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ অনুসারে আজ্যপ পিতৃগণের 'বিরজা' নামে একটি মানস কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নহুষের পত্নী ও যযাতির জননী। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৯৫;*
বায়ু পু. ৭৩.৪৩]

☐ মহাভারতে ও অনান্য পুরাণগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষযজ্ঞের সময় এই আজ্যপ পিতৃগণও আহূত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১২.২৮৪.৮; (হরি) ১২.২৭৬.৮;
বায়ু পু. ৩০.১০০; মৎস্য পু. ১০২.২১]

☐ পুরাণে বলা হয়েছে যে, বৈশ্য সম্প্রদায়ও এই পিতৃগণের আরাধনা করে থাকেন। আজ্যপ পিতৃগণ নিরাকার এবং তাঁরা ইচ্ছানুসারে আকার-আকৃতি ধারণ করতে পারেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৯৩-৯৪;
বায়ু পু. ৭৩.৪৩]

আজ্যপালোক কর্দম-প্রজাপতির নামাঙ্কিত পিতৃলোক। পুলহ-পুত্রদের বংশধর বৈশ্যরা এই পিতৃলোকের ভাবনা করেন। *[মৎস্য পু. ১৫.২০-২১]*

আজ্যস্থালী *[দ্র. যজ্ঞায়ুধ]*

আটবী$_1$ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বরূপ ধারণ করে তাঁর পনেরোজন শিষ্যকে শুক্ল যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়েছিলেন বলে শিষ্যরাও 'অশ্ব' নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আটবী একজন। *[বায়ু পু. ৬১.২৫]*

আটবী$_2$ দক্ষিণদেশ বিজয়কালে সহদেব কর্তৃক বিজিত একটি রাজ্য। বিনাযুদ্ধে শুধুমাত্র দূত প্রেরণ ও কর গ্রহণের মাধ্যমেই সহদেব আটবীপুরী জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ২.৩১.৭২; (হরি) ২.৩০.৭০]

আড়ম্বর স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর যোদ্ধাদের মধ্যে একজন। তারকাসুরকে বধ করার সময় দেবতারা যখন স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা নিজেদের কয়েকটি অনুচর স্কন্দ কার্তিকেয়কে অনুচর হিসেবে দান করেন। ধাতা যে পাঁচজন অনুচর স্কন্দকে দান করেন আড়ম্বর তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৩৯; (হরি) ৯.৪২.৩৭]

আড়ি ভয়ঙ্কর দানব। স্কন্দ পুরাণ মতে, অন্ধকাসুর আড়ি দৈত্যের পিতৃব্য। তবে মৎস্য পুরাণে আড়ি দৈত্যকে অন্ধকের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহেশ্বর শিবের হাতে অন্ধকাসুর মারা গেলে আড়ি দানব শিবকে পরাজিত করার ইচ্ছায় তপস্যা আরম্ভ করেন। তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মা তাঁকে বর দিতে চাইলে আড়ি অমরত্ব প্রার্থনা করেন। এ-ব্যাপারে ব্রহ্মা নিজের অক্ষমতা জানালে আড়ি ব্রহ্মার কাছে বর চাইলেন যে, যখন তাঁর রূপের পরিবর্তন ঘটবে, তখন যেন তাঁর মৃত্যু হয়। ব্রহ্মা স্বীকৃত হলেন।

এদিকে ঘটনা-পরম্পরায় উমা-পার্বতীকে ত্যাগ করে শিব মন্দর পর্বতে তপস্যা করতে আসেন। আড়ি দানব একথা জানতে পারেন এবং তিনি সর্পরূপ ধারণ করেন। তিনি শিব-পরিচর বীরকের দৃষ্টি এড়িয়ে মহেশ্বরের পুরীতে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি উমার রূপ ধারণ করে আপন যোনির মধ্যে সুতীক্ষ্ণ দন্ত সৃষ্টি করেন। এই অবস্থায় তিনি ভগবান মহেশ্বরের সঙ্গ কামনা করলে তিনি-সব বুঝতে পারেন। শিব তখন স্বীয় লিঙ্গের মধ্যে রৌদ্রাস্ত্র যোজনা করে সেই উমারূপী দানব আড়ির সঙ্গে সঙ্গত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে আড়ি দানবের মৃত্যু হয়। *[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ১৯.১০-৩১; মৎস্য পু. ১৫৬.১২-৩৭]*

আড়ি-বক$_1$ বিশ্বামিত্রের দ্বারা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যচ্যুত হওয়ায় তাঁর কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বিশ্বামিত্রকে শাপ দেন যে, তিনি বকযোনি প্রাপ্ত হবেন। বিশ্বামিত্র সেই শাপ শুনে বশিষ্ঠকে উলটে অভিশাপ দিয়ে বললেন যে, তিনি আড়ি (এক ধরনের জলচর পক্ষী রূপ) প্রাপ্ত হবেন। পরস্পরের শাপে পরস্পর তির্যক-যোনিত্ব এবং ভিন্ন জাতি লাভ করা সত্ত্বেও তারা পরস্পর ক্রোধাবেশে মাঝে মাঝেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। ভগবান ব্রহ্মা পরস্পরের এই যুদ্ধে আশঙ্কিত হয়ে নিজ প্রভাবে মুনিদ্বয়ের তির্যকযোনিত্ব অপনোদন করেন। তাঁরাও স্বস্থানে চলে যান।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৯.১-৩৩]

আড়ি-বক$_2$ পুরাণে বারোটি ভয়ানক দেবাসুর সংগ্রামের কথা আছে। তার মধ্যে আড়ি-বক সংগ্রাম ষষ্ঠতম। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা শশাদের পুত্র ককুৎস্থ ইন্দ্রকে এই যুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন। এই যুদ্ধে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ইন্দ্রের হাতে নিহত হয়েছিলেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭২.৭৪; বায়ু পু. ৮৮.২৫; ৯৭.৮১; মৎস্য পু. ৪৭.৪৪]*

আঢ়ক্য দক্ষিণাপথে অবস্থিত ভোগবর্ধন দেশ।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৪৭]

আতক কৌরব্যনাগের বংশধারায় আতক জন্মগ্রহণ করেন। কৌরব্য-কুল-জাত যে সকল নাগ জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের অগ্নিতে পতিত হয়েছিলেন, আতক তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১.৫৭.১৩; (হরি) ১.৫২.১৪]

আতপ ভাগবত পুরাণ অনুসারে বিভাবসুর ঔরসে ঊষার গর্ভজাত পুত্রদের অন্যতম আতপ। তিনি 'পঞ্চযান' নামক দেবতার পিতা।

[ভাগবত পু. ৬৬.১৬]

আতিথ্যইষ্টি সোমক্রয়ের পর ক্রীতসোমের সম্বর্ধনের জন্য ইষ্টিযজ্ঞ। *[দ্র. সোমযাগ]*

আত্মখণ্ডিক ভারতবর্ষের উত্তরে বসবাসকারী জনজাতিগুলির মধ্যে একটি জাতি।

[মৎস্য পু. ১১৪.৪০]

আত্মতীর্থ ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যৌগিক স্নান আত্মতীর্থ বলে পরিচিত। *[কূর্ম পু. ২.১৮.১৫]*

আত্মনিরালোক শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত

শিবমহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

আত্মনি জীবে নিশ্চিতা দেহাদুপাধের্বা
নির্গত্য আলোচয়তীতি আত্মনিরালোকঃ।

'আলোক' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'লোচ্' ধাতু থেকে। সংস্কৃত 'লোচ্' ধাতুর অর্থ দর্শন করা, প্রকাশিত হওয়া। মহাদেব স্বয়ং নিরাকার পরমাত্মাস্বরূপ, তাঁকে সহজে চাক্ষুষ করা যায় না। কিন্তু পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেব জীবাত্মা রূপে সমস্ত জীবদেহে আত্মপ্রকাশ করেন। জীবদেহে স্থিত জীবাত্মারূপে পরমাত্মাকেই প্রত্যক্ষ করা যায়—এই ভাবনা থেকে মহাদেব আত্মনিরালোক নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬৯; (হরি) ১৩.১৬.৬৯]

আত্মবান$_১$ (আত্মবত্) ভৃগুবংশীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে অন্যতম। চ্যবনের পুত্র আত্মবান নহুষ রাজার কন্যা রুচিকে বিবাহ করেন। রুচির ঊরুদেশ ভেদ করে ঔর্ব ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অপর একটি পাঠে আত্মবান-এর পরিবর্তে আপ্রবান-এই পাঠ পাওয়া যায়।

*[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১০৪; ২.১.৯৩-৯৫;
বায়ু পু. ৫৯.৯৬; ৬৫.৯০-৯১;
মৎস্য পু. ১৪৫.৯৮]*

আত্মবান্$_২$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২২; (হরি) ১৩.১২৭.২২]

আত্মভূ 'আত্মভূ' কথার অর্থ হল যিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ শুক্র-শোণিতে যার জন্ম হয়নি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিদেবকেই আত্মভূ বলা হয়ে থাকে।

[ভাগবত পু. ৩.১২.২০; লিঙ্গ পু. ৯৭.২০১]

আত্মযোনি ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১৯; (হরি) ১৩.১২৭.১১৯]

আত্মসম্ভব 'আত্মসম্ভব' শব্দের অর্থ-যিনি নিজেই নিজের মধ্য থেকে জন্মাতে পারেন। পরম ঈশ্বর আত্মমায়ার মাধ্যমে নিজের মৌল অবস্থা থেকে নিজেই জন্মান বলে তাঁকে আমরা স্বয়ম্ভূত বলি। মৎস্য পুরাণ শুধু ভগবান নারায়ণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে এই শব্দের উল্লেখ করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের দেবতত্ত্বে শিব এবং ব্রহ্মাও আত্মসম্ভব স্বয়ম্ভূ।

☐ মহাভারতে শিব-সহস্রনামের একটি।

*[মৎস্য পু. ২.৩০;
মহা (k) ১৩.১৭.১৪৭; (হরি) ১৩.১৬.১৪৬]*

আত্যন্তিকপ্রলয় বিষ্ণু পুরাণ মতে প্রলয় তিন প্রকার। এদের মধ্যে আত্যন্তিক প্রলয় অন্যতম। যোগীদের মধ্যে সুখ, দুঃখের কোনো বিকার যখন আর দেখা যায় না, সুখ-দুঃখের সমস্ত অনুভূতিই পরমাত্মাতে লয় পায় এবং তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন সৃষ্টি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকেই পৌরাণিকেরা আত্যন্তিক প্রলয় বলে চিহ্নিত করেছেন।

*[বিষ্ণু পু. ৬.৫ অধ্যায়; কূর্ম পু. ২.৪৪.২৫;
বায়ু পু. ১.১৬১; ১০০.১৩২]*

আত্রেয় আত্রেয় জাতীয় মানুষেরা কিরাত জাতির ভেদ বিশেষ। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৩৯]*

আত্রেয়তীর্থ গোদাবরী নদীর উত্তর তটের একটি পবিত্র তীর্থ। এটি অন্বিন্দ্র নামেও পরিচিত। অন্বিন্দ্র শব্দের অর্থ অনু + ইন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রের অনুসারী। ঋষি আত্রেয় ও তাঁর পুত্র একবার মোহবশে ব্রহ্মার কাছে ইন্দ্রসুলভ ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করেছিলেন। ঘটনাক্রমে দৈত্যারা আত্রেয় এবং তাঁর পুত্রের নকল ইন্দ্রপুরীকে ভুল বশত আক্রমণ করলে তাঁরা অত্যন্ত লজ্জিত ও ভীত হন। অবশেষে নকল ইন্দ্রত্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মার কল্যাণে আত্রেয় ঋষি সপরিবারে গৌতমী গঙ্গার তীরে তাঁদের প্রকৃত বাসস্থল তথা আশ্রমে দিনযাপন করতে শুরু করেন। দৈব কল্যাণে আত্রেয় ঋষির সেই আশ্রমটিই আত্রেয়তীর্থ রূপে পরিচিত হয়। এই তীর্থে স্নান করলে ইন্দ্রত্ব লাভ সম্ভব।

[ব্রহ্ম পু. ১৪০.১-৩৯]

আত্রেয়ায়ণি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আত্রেয়ায়ণি সেই গোত্রের অন্যতম। অঙ্গিরা থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আঙ্গিরস নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৬.১২]

আত্রেয়ী$_১$ মহাভারতের সভাপর্বে বরুণের সভা বর্ণনা করতে গিয়ে নারদ সেখানকার প্রধান প্রধান নদীর নাম উল্লেখ করেছেন। বরুণের সভায় স্থান লাভ করেছেন এমনই এক বিশিষ্ট নদীর নাম আত্রেয়ী। লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে একত্রে এই নদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বভারতীয় আরও কয়েকটি নদীর নাম এই

প্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় উৎপন্ন হয়ে যে আত্রেয়ী নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়ে মিশেছে তারই নাম মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। পণ্ডিত N.L. Dey ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

[মহা (k) ২.৯.২২; (হরি) ২.৯.২২;
GDAMI (Dey) p. 13]

আত্রেয়ী$_{২}$ আত্রেয়ী শব্দের আভিধানিক অর্থ রজস্বলা বা ঋতুস্নাতা রমণী। তবে মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ 'আত্রেয়ী' শব্দটিকে গর্ভবতী রমণীর সমার্থক বলে মনে করেছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি আত্রেয়ী রমণীকে হত্যা করবে, তার ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ হবে—

এবন্তু সমভিজ্ঞাতামাত্রেয়ীং বা নিপাতয়েৎ।
দ্বিগুণা ব্রহ্মহত্যা বৈ আত্রেয়ীনিধনে ভবেৎ॥

এখানে ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ হবে—বলার কারণেই হয়তো 'আত্রেয়ী' শব্দের অর্থ হিসেবে 'গর্ভবতী স্ত্রী' ব্যাখ্যাটিকেই বেশি সঠিক বলে মনে হয়, কারণ সে যুগে ভ্রূণ বা গর্ভস্থ শিশুর হত্যা ব্রহ্মহত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হত। সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি জেনে শুনে গর্ভবতী স্ত্রীকে হত্যা করছেন, তিনি সজ্ঞানে একসঙ্গে দুটি প্রাণীকে হত্যা করছেন বলেই হয়তো বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.১৬৫.৫৫; (হরি) ১২.১৬০.৫২;
মনু সংহিতা ১১.৮৮]

আত্রেয়ী$_{৩}$ বীতমন্যু নামে জনৈক ব্রাহ্মণের পত্নী। বীতমন্যুর ঔরসে তাঁর গর্ভে উপমন্যু নামে এক পুত্রসন্তান হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণী দুধের অভাবে পিটুলি-গোলাকেই দুধ বলে শিশুপুত্রকে খাওয়াতে লাগলেন। বালক উপমন্যু দুধের স্বাদ কেমন হয়, তা জানতেন না। তাই পিটুলি-গোলাকেই দুধ ভাবতেন। এরপর একদিন উপমন্যু এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেলেন। সেখানে সত্যি সত্যিই দুধ কেমন খেতে হয়, তা জানতে পারলেন। পরদিন থেকে আত্রেয়ী পিটুলি গোলা খাওয়াতে গেলে উপমন্যু তা খেলেন না, দুধের জন্য কাঁদতে লাগলেন। তখন আত্রেয়ী তাঁর বালক পুত্রকে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করার পরামর্শ দিলেন। আত্রেয়ী বললেন, মহাদেবের কৃপায় মানুষ শুধু দুধ নয়, অমৃত পানের অধিকারও লাভ করে। আত্রেয়ীর উপদেশে উপমন্যু মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেবের কৃপায় তাঁদের দারিদ্র্য দূর হয় এবং উপমন্যু যথেষ্ট দুধ তো বটেই ও অন্যান্য সুস্বাদু ভোজনও লাভ করতে থাকেন।

[বামন পু. ৮২ অধ্যায়]

আদর্শ$_{১}$ বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে ভবিষ্যৎ একাদশ মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর পুত্রদের মধ্যে আদর্শ একজন।

[বায়ু পু. ১০০.৮৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮১]

আদর্শ$_{২}$ 'আদর্শ' কথাটির আভিধানিক অর্থ দর্পণ বা আয়না। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতি তাঁর বিবাহের সময় নতুন বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব অবলোকন করেন। এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই দর্পণ ব্যবহারের চল ছিল। বিষ্ণুপুরাণে আবার মাঙ্গলিক দ্রব্য হিসেবে আদর্শ বা দর্পণ ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে। তার মানে ভোরবেলায় উঠে দর্পণে মুখ দেখাটা মঙ্গলের ভাবনায় চিহ্নিত ছিল।

[ভাগবত পু. ৩.২৩.৩০; ১০.৭০.১১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২৮.১০; বিষ্ণু পু. ৩.১১.২১]

আদি শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে মহাদেব আদি নামেও সম্বোধিত হয়েছেন, সম্বোধিত হয়েছেন আদ্য নামেও। টীকাকার নীলকণ্ঠ ভগবান শিবের 'আদি' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

আদি সর্বস্মাৎ প্রথমঃ।

আদ্য নামের ব্যাখ্যাতেও প্রায় একই ভাবনা পাওয়া যায়—

আদ্যঃ সংসারাৎ প্রাচীনঃ।

আমরা আদিকর নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোচনা করেছি যে সৃষ্টির আদিতে প্রথমে জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি আবির্ভূত হন, পরে তাঁর থেকে সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু উপনিষদে যে নিরাকার নিশ্চল ব্রহ্মের ভাবনা আছে, তিনি হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতিরও স্রষ্টা, তিনিই আদিপুরুষ। তাঁর আদি নেই, অন্তও নেই। প্রলয়কালে সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস হবার পর প্রজাপতিও বিলুপ্ত হন, লীন হয়ে যান সেই ব্রহ্মে। কিন্তু ব্রহ্ম সৃষ্টি বা লয়ের ভাবনার ঊর্ধ্বে। মহাদেবের আদি বা আদ্য

নামকরণ-এর দ্বারা তাঁর সেই নিশ্চল ব্রহ্মস্বরূপতাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভগবদ্‌গীতায় নিজের পরমেশ্বর স্বরূপতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, দেবতারা, মহর্ষিরাও আমার আবির্ভাবের কথা জানেন না, কারণ আমিই আদি এবং এই সম্পূর্ণ জগত সৃষ্টির কারণ স্বরূপ—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥

[ভগবদ্‌গীতা ১০.২]

অন্য একটি শ্লোকে তিনি বলছেন—সমস্ত জীব জড়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রক রূপে অবস্থিত পরমাত্মা আমি স্বয়ং। আমিই এই সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং এর অন্তও আমি, অর্থাৎ আমিই জগৎসৃষ্টির মূল বা কারণস্বরূপ—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥

[ভগবদ্‌গীতা ১০.২০]

উপনিষদে যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে, মহাকাব্য-পুরাণে কখনও কৃষ্ণ বা বিষ্ণু-নারায়ণ কখনও বা রুদ্রশিবকে সেই ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সেই ভাবনা থেকেই ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত আদিপুরুষের সঙ্গে যেমন কৃষ্ণ একাত্ম হয়ে যান, তেমনই একাত্ম হয়ে যান ভগবান শিব। আদি অন্তহীন ব্রহ্মের স্বরূপ বলেই জগৎসৃষ্টির কারণস্বরূপ ভগবান শিব আদি বা আদ্য নামেও সম্বোধিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৭, ৯৪; (হরি) ১৩.১৬.৩৭, ৯৪]

আদিকর$_{১}$ ভগবান বিষ্ণু জগতের প্রথম আদি বলে তাঁর অপর নাম আদিকর।

[মহা (k) ১২.৩৪৭.৬২; (হরি) ১২.৩৩১.৬১]

আদিকর$_{২}$ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের আদিকর নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

আদিকরঃ হিরণ্যগর্ভস্রষ্টাঃ।

ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে কেবল হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, তিনিই সম্পূর্ণ জগতের স্রষ্টা, অধীশ্বর, তিনিই পৃথিবী এবং আকাশকে আপন আপন স্থানে স্থাপন করেন—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূবস্য জাত পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

[ঋগ্‌বেদ ১০.১২১.১]

ঋগ্‌বেদের টীকাকার সায়নাচার্য এই হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বসেছেন—যিনি ব্রহ্মাণ্ডরূপ হিরণ্ময় অণ্ড বা সম্পূর্ণ জগতকে আপন দেহে বা গর্ভে ধারণ করেন, যাঁর দেহ থেকে এই সম্পূর্ণ জগত সৃষ্টি হয়, সেই জগতস্রষ্টা প্রজাপতিই হিরণ্যগর্ভ নামে খ্যাত—

হিরণ্ময়স্যাণ্ডস্য গর্ভভূতঃ প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভঃ।

পৌরাণিক ভাবনায় প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন। আর উপনিষদের ভাবনায় নিশ্চল নিরাকার ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর যখন জগত সৃষ্টির ভাবনা করেন, তখন তাঁর থেকেই জন্ম নেন জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ। ভগবান শিবকে সেই হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টা ব্রহ্মস্বরূপ বলে ভাবনা করেই আদিকর নামে সম্বোধন করা হয়েছে। একই ভাবনা থেকে তিনি আদ্যনির্গম নামেও খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৭; (হরি) ১৩.১৬.৩৭]

আদিকর্তা ভগবান বিষ্ণু জগৎ-সৃষ্টির কারণ হিসেবে ব্যাখ্যাত হন বলে তাঁকে আদি-কর্তা বলা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৫.১৮]

আদিকেশব ভগবান বিষ্ণুর অপর নাম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১৫.১৮]

আদিত্য$_{১}$ আদিত্যই সূর্য। আদিত্য সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলা হয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। যিনি তাপ দেন, তিনিই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ। আদিত্য দিনের সঙ্গে যুক্ত, অগ্নিষ্টোম যাগও এক দিনেই শেষ হয়। তাই আদিত্যই অগ্নিষ্টোম। আদিত্য যখন প্রাতঃকালে উদিত হন, তখন মন্দ তাপ দেন। সেই জন্য অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রাতঃসবন অনুচ্চ-মন্দ স্বরে পাঠ করতে হয়। আদিত্য আরও ওপরে উঠলে, খরতর হন। মাধ্যন্দিন সবনের মন্ত্র তাই উচ্চঃস্বরে পাঠ করতে হয়। তিনি আরও ওপরে উঠলে খরতম তাপ বিকিরণ করেন, ফলে মন্ত্রের স্বর উচ্চতম গ্রামে উচ্চারিত হবে।

আদিত্যের এই দিবসকালীন পরিচয় দেবার পর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এক বৈজ্ঞানিক সত্য উচ্চারণ করে, বলেছে—এই আদিত্য, ইনি কখনো অস্তমিতও হন না, উদিতও হন না। তাঁকে যখন অস্তমিত মনে করা হয়, তখন তিনি সেই দেশে

দিনের সমাপ্তি ঘটান মাত্র, কিন্তু অন্য দেশে তিনি তখন দিবস রচনা করেন। আবার যখন তাঁকে প্রাতঃকালে উদিত হয়েছেন বলে মনে করা হয়, তখন তিনি প্রকৃত পক্ষে রাত্রির সমাপ্তি রচনা করেন। তিনি একদেশে দিবস রচনা করেন, অন্যদেশে রাত্রি সৃষ্টি করেন—

স বা এষ ন কদাচন অস্তমেতি নোদেতি,
তং যদ্ অস্তমেতীতি মন্যন্তে,
অহ্ন এব তদন্তমিত্বাথাত্মানং
বিপর্যস্যাতে রাত্রীমেবাবস্তাৎ কুরুতে,
অহঃ পরস্তাদথ যদেনং
প্রাতরুদেতীতি মন্যতে রাত্রেরেব
তদন্তমিত্বাথাত্মানং বিপর্যস্যাতে
অহরেবাবস্তাৎ কুরুতে রাত্রীং
পরস্তাৎ স বা এষ ন
কদাচন নিম্রোচতি, ন হ বৈ
কদাচন নিম্রোচত্যেতস্য হ
সাযুজ্যং সরূপতং সলোকতামশ্নুতে য এবং বেদ।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (সত্যব্রত সামশ্রমী); ২য় খণ্ড, ৩.৪.৬, পৃ. ২০৭-২০৮; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড, পৃ.২০০]

দেবতাদের যেসব গণ আছে, সেগুলির সংখ্যা আট। তাঁদের অন্যতম হলেন আদিত্যগণ। সাধারণত বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ ইত্যাদি গণের প্রসঙ্গে আদিত্যগণের উল্লেখ থাকবেই—

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্গণাঃ।
ভৃগবো'ঙ্গিরসশ্চৈব তে'ষ্টৌ দেবগণাঃ স্মৃতা॥

মহাভারত এইভাবে আট-সংখ্যা দিয়ে গণের কথা উল্লেখ না করলেও আদিত্যগণকে গণ-দেবতাদের সঙ্গেই একত্রে উল্লেখ করেছে—

তথা বসূনাং রুদ্রাণাম্ আদিত্যানাঞ্চ সর্বশঃ।
সাধ্যানাং মরুতাঞ্চৈব যে চান্যে দেবতাগণাঃ॥

[মহা (k) ১.৩০.৩৩-৩৪; (হরি) ১.২৫.৩৩-৩৪; বায়ু পু. ৩০.৮৩, ৯৯; ৩৯.৪৯; ৬৪.২-৪; মৎস্য পু. ৯.২৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৮.২-৩; ভাগবত পু. ৬.১০.১৭; ৮.১৩.৪]

সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা 'জয়' নামে যে বারোজন দেবতা সৃষ্টি করেন, ব্রহ্মার শাপে সেই বারোজন দেবতাই পরবর্তী স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত; ঔত্তম মন্বন্তরে সত্য, তামস মন্বন্তরে হরি, চরিষ্ণু মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য গণভুক্ত দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। *[বায়ু পু. ৬৬.৬৫-৬৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৫৭-৫৯]*

চাক্ষুষ মন্বন্তরে যাঁরা সাধ্যদেবগণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁরাই আদিত্যগণ নামে পরিচিত হন।

[বায়ু পু. ৬৬.৬৫-৬৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৫৭-৫৯]

মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে—জগৎসৃষ্টির সময়ে ভগবন্নারয়ণ জলে যে বীজ নিক্ষেপ করেছিলেন, সেটি এক বৃহদণ্ডে পরিণত হয়—সেটি তেজে 'সূর্যাযুত-সমপ্রভ'। ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডে প্রবেশ করে সহস্র বৎসর বাস করার পর প্রভাব এবং ব্যাপ্তিতে বিষ্ণুত্ব লাভ করেন। তারপর সেই অণ্ডের মধ্যেই ভগবান সূর্য প্রথম প্রাদুর্ভূত হন। সেই সূর্য আদিতে জন্মলাভ করার ফলে তিনি আদিভূত এবং 'আদি'-শব্দেই তাঁর প্রথম স্থিতি বলে সূর্য আদিত্য বলে পরিচিত হন—

আদিতশ্চাদিভূতত্বাৎ। *[মৎস্য পু. ২.২৮-৩১]*

নিরুক্তকার যাস্ক আদিত্য-শব্দটির ধাতু-প্রত্যয়গত আভিধানিক অর্থ দিয়ে বলেছেন— আ-পূর্বক 'দা' ধাতু থেকে আদিত্য-শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। তাতে আদিত্য শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—আদিত্য পৃথিবী থেকে রস গ্রহণ করেন; অথবা চন্দ্র এবং অন্যান্য নক্ষত্রের দীপ্তি বা জ্যোতিঃ হরণ করেন; অথবা আ-পূর্বক দীপ্ ধাতু যখন আবৃত হওয়া কিংবা আপন দীপ্তিতে আবৃত হওয়া অর্থ বোঝায়, সেই নিরুক্তি থেকেও আদিত্য শব্দ তৈরি হতে পারে। আর শেষ অর্থ—তিনি অদিতির পুত্র তাই আদিত্য—

আদিত্যঃ কস্মাৎ? আদত্তে, রসান্ আদত্তে;
আদত্তে ভাষং জ্যোতিষাম্; আদীপ্তো ভাসেতি;
অদিতেঃ পুত্র ইতি বা।

[নিরুক্ত (ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস) ২.১৩.৩, পৃ. ১৩৫]

একটি পুরাণে আদিত্য রুদ্রের সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেছেন। রুদ্র এখানে 'আদিত্যতনু'।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১০.২২-২৩; ২.১.৬১]

□ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে মাস, ঋতু, দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ আর সূর্যকে ধরে একুশটি আদিত্যের সংখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু আদিত্য এখানে নামত একবিংশ স্থানে এলেও মাস, ঋতু এবং তিন লোকের সূর্য-নির্ভরতাই আদিত্যকে একুশ ভাগে বিভক্ত করেছে—

একবিংশো বা ইতো'সাবাদিত্যা দ্বাদশ মাসা
পঞ্চর্তবস্ত্রয় ইমে লোকা
অসাবাদিত্যঃ একবিংশ . . .।

[তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ২১.৪.৭]

□ কৃষ্ণ যজুর্বেদের বিবরণে দেবমাতা অদিতি পুত্রকামনায় সাধ্য দেবতাদের উদ্দেশে অন্ন পাক করেছিলেন। তাতে প্রথমবারে তিনি চারটি আদিত্য পুত্র লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার অন্ন পাক করে পেলেন মার্তণ্ড নামের আদিত্যকে তৃতীয়বারে পেলেন বিবস্বানকে—

তস্যৈ চত্বার আদিত্যা অজায়ন্ত .
তস্যৈ বৃদ্ধ্যমাণ্ডম্ অজায়ত . . .
ততো বিবস্বান্ আদিত্যো'জয়ায়ত।

[তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুর্বেদসংহিতা (মহর্ষি) ৬.৫.৬]

□ যজুর্বেদের এই মন্ত্রে ছয় জন আদিত্যের নাম পাওয়া গেল, কিন্তু তাঁদের এক-দুইজনের নাম ছাড়া অন্য চারজনের নাম নেই। ঋগ্‌বেদে এক জায়গায় ছয় জন আদিত্যের নাম পাওয়া যায় বটে—

শৃণোতু মিত্র অর্যমা ভগো নস্তু বিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ। কিন্তু মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ ছাড়াও ঋগ্‌বেদে আদিত্যগণের সংখ্যা কখনো সাত আবার কখনো বা আট—

দেবা আদিত্যা যে সপ্ত।
তেভি সোমাভি রক্ষ নঃ।

[ঋগ্‌বেদ ২.২৭.১; ৯.১১৪.৩]

কিন্তু আটটি আদিত্যের কথা যেখানে বলা হয়েছে, সেখানে আবার প্রাথমিক ঘোষণাটি হল—অদিতির শরীর থেকে আটজন আদিত্যই জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাঁদের মধ্যে সাত জনকে তিনি দেবলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মার্তণ্ড নামে পুত্রটিকে তিনি দূরে নিক্ষেপ করলেন। বস্তুত মার্তণ্ডকে প্রাণী-জনের জন্ম এবং মৃত্যুর জন্য রেখে গিয়েছিলেন অদিতি—

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতা স্তম্বস্পরি।
দেবাঁ উপপ্রৈৎ সপ্তভিঃ পুরা মার্তণ্ডমাস্যৎ॥

[ঋগ্‌বেদ, ১০.৭২.৮-৯]

এখানে সবচেয়ে বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল—যে-বিষ্ণুকে পরবর্তীকালে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়েছে—

আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ। *[ভগবদ্‌গীতা, ১০.২১]*

সেই বিষ্ণু কিন্তু মূল আদিত্য সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হননি উপযুক্ত সম্মান নিয়ে। একটি ঋক্‌মন্ত্রে আদিত্যগণের কথা বলা হল বটে কিন্তু অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণের সঙ্গে পৃথক করে রাখা হল বিষ্ণুকেও। কিন্তু অন্য একটি মন্ত্রে আবার ইন্দ্র এবং বরুণ কোনো মতে আদিত্যের সম্বোধনে সম্বোধিত হলেন কিন্তু বিষ্ণু বাদই পড়ে রইলেন আদিত্যের গণনায়। *[ঋগ্‌বেদ, ৭.৮৫.৪]*

অথর্ববেদ অদিতির আট পুত্রের কথা উল্লেখ করেছে বটে কিন্তু নাম দেয়নি—

অষ্টযোনিরদিতিরষ্টপুত্রা।
অষ্টমীং রাত্রিমভিহব্যমেতি।

[অথর্ববেদ ৮.৯.২১]

পণ্ডিতেরা মনে করেন—অথর্ববেদে নামগুলি পরিষ্কার না থাকলেও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই আটটি নাম আছে এবং সেই আদিত্যরা হলেন—মিত্র, বরুণ, অর্যমা, অংশ, ভগ, ধাতা, ইন্দ্র এবং বিশ্বজিৎ।

[তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ১.১.৯.১, পৃ.৫২]

সায়নাচার্য ঋগ্‌বেদের 'ইমা গির আদিত্যেভ্যঃ'। *[২.২৭.১]*

এই মন্ত্রের টীকায় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের নামগুলিই উল্লেখ করেছেন।

□ মূল মন্ত্র-বেদের মধ্যে পরবর্তী কালে খ্যাত দ্বাদশ-সংখ্যক আদিত্যের কথা আমরা পাই না। কিন্তু এই সংখ্যা প্রথম পাই শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। এখানে প্রশ্ন করে বলা হয়েছে—কয় জন আদিত্য আছেন—কতমে আদিত্যা ইতি? কিন্তু উত্তর দেবার সময় খুব সযৌক্তিকভাবে বলা হয়েছে—সংবৎসরের বারোটি মাস আসলে বারোজন আদিত্য—

দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।

অর্থাৎ এক-একজন এক-একটি মাসের অধিদেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণ অবশ্য এক জায়গায় আটজন আদিত্যের কথাও বলেছে। কিন্তু সূর্য-সংক্রমণের মাধ্যমে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্যের অধিষ্ঠান আদিত্যের প্রকৃত রহস্য ভেদ করে দেয়।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৬.৩.৮ এবং ৬.১.২.৮]

আদিত্যের সংখ্যার মধ্যে যে বৈষম্য আছে, তা ব্যাখ্যা করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন—সূর্য এক। কিন্তু তিনি কভু বিষ্ণু, কভু ইন্দ্র, কভু দক্ষ, কভু ঋতুপতি আদিত্য। যখন তাঁহার

বার্ষিকগতি ধ্যান করি, তখন তিনি বিষ্ণু। যখন তিনি উত্তরায়ণ সমাপ্ত করিয়া বর্ষা ঋতু আনয়ন করেন, তখন তিনি ইন্দ্র। যখন তিনি দিবারাত্র সমান করেন, তখন তিনি দক্ষ। আর যখন তিনি এক এক ঋতুর কর্তা তখন তিনি ঋতুপতি আদিত্য। ঋতুগণের অধিপতিগণই প্রধানতঃ আদিত্য নামে অভিহিত হইতেন। সূর্যই ঋতুবিধান করিতেছেন।...

বৎসরে তিন ঋতু ধরিলে আদিত্য তিন, চারি ধরিলে আদিত্য চারি, পাঁচ ঋতু ধরিলে আদিত্য পাঁচ এবং ছয় ঋতু ধরিলে আদিত্য ছয়। চারি ঋতু ধরিলে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ। পাঁচ ঋতু ধরিলে—শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত ...।

[যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, ১০ম প্রকরণ, পৃ.৮৮]

☐ শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য যেভাবে সাংবৎসরিক মাস-গণনার মধ্যে ধৃত হয়েছেন, তাতে দ্বাদশ আদিত্যের মূল স্বরূপ হিসেবে সূর্যই সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালে কূর্ম পুরাণ সেই সূর্য-স্বরূপতাতেই দ্বাদশ মাসের কল্পনা করেছে এবং কোন মাসের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কোন আদিত্য তার নামও বলে দিয়েছে—কূর্মপুরাণের মতে—মাঘ মাসের সূর্য বরুণ, ফাল্গুন মাসে তিনি পূষা, চৈত্রে অংশু বা অংশ, বৈশাখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসের আদিত্য ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে বিবস্বান, ভাদ্রে ভগ, আশ্বিনে পর্জন্য, কার্তিকে ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণে মিত্র, আর পৌষ মাসে বিষ্ণু—

বরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যঃ পূষা তু ফাল্গুনে
চৈত্রে মাসি ভবেদংশুর্ধাতা বৈশাখতাপনঃ।
জ্যৈষ্ঠে মাসে ভবেদিন্দ্র আষাঢ়ে তপতে রবিঃ
বিবস্বান্ শ্রাবণে মাসি প্রোষ্ঠপদ্যাং ভগঃ স্মৃতঃ
পর্জ্জন্যাশ্চাশ্বিনে ত্বষ্টা কার্ত্তিকে মাসি ভাস্করঃ॥
মার্গশীর্ষে ভবেন্মিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।

আদিত্য-শব্দের ধাতু-প্রত্যয়-গত প্রথম অর্থ বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে এবং আদিত্যগণের সংখ্যা দ্বাদশ কেন, তারও প্রথম সদর্থক উত্তর আছে এই প্রাচীন উপনিষদেই। শাকল্যের সেই বিখ্যাত প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়েছিলেন—দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এই একত্রিশ আর ইন্দ্র এবং প্রজাপতি মিলে তেত্রিশ জন দেবতা। শাকল্য জিজ্ঞাসা করলেন—কারা এই আদিত্যগণ? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন সংবৎসরের অবয়ব-রূপে প্রসিদ্ধ বারোটি মাসই দ্বাদশ আদিত্য। কেননা তিনি জগৎকে 'আদান' করেন। 'দান' মানে দেওয়া, 'আদান' মানে গ্রহণ করা, যেহেতু আদিত্য-গণ প্রতিমাসে পুনঃপুন আবর্তন বা যাতায়াতের মাধ্যমে সকল প্রাণীর আয়ু এবং কর্মফল গ্রহণ করে অন্যত্র সংক্রমণ করতে থাকেন বা চলতে থাকেন এবং এই সমস্ত কিছুই তিনি নিয়ে যান, তাই তাঁর নাম আদিত্য—

কতম আদিত্যা ইতি?
দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈতে
আদিত্যাঃ, এতে হি হীদং সর্বমাদদানা যন্তি,
তে যদিদং সর্বমাদদানা যন্তি, তস্মাদাদিত্যা ইতি।

[দ্র. শাঙ্করভাষ্য]

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩.৯.১, ৫]

বরাহ পুরাণে বৃহদারণ্যকের ভাবনা গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে, দ্বাদশ আদিত্য আসলে দ্বাদশ মাসের সূর্য এবং সম্পূর্ণ সংবৎসরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হলেন ভগবান শ্রীহরি—

তে তে মাসাস্তু আদিত্যা স্বয়ং সংবৎসরো হরিঃ।

[বরাহ পু. ২০.৪-৫]

☐ বায়ু পুরাণে উপরিউক্ত উপনিষদ-কথার প্রতিধ্বনি আছে। বলা হয়েছে—সমস্ত সংযোগ-কর্মে মানুষের মনই দ্বারস্বরূপ। একইভাবে আদিত্যকেও দ্বার হিসেবে কল্পনা করা যায়, কেননা আদিত্য ইন্দ্রিয়ের কর্ম প্রত্যক্ষ করেন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বৃত্তিকে আদান করেন বা গ্রহণ করেন, সেইজন্যই তিনি আদিত্য—

আদানাদ্ ইন্দ্রিয়াণাং তু আদিত্য ইতি চোচ্যতে।

[বায়ু পু. ১২.৩৭]

বায়ু পুরাণে অন্যত্র সাংবৎসরিক কাল বিভাগ করেন বলেই আদিত্যকে বলা হয়েছে 'পরিবৎসর'। কালকে প্রপিতামহ হিসেবে সংজ্ঞিত করে এই পুরাণ শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেছে যে, আদিত্যগণ আসলে ভাস্কর সূর্য এবং তিনি সংবৎসরের দিন-কাল বিভাগ করেন—

প্রোক্তঃ সংবৎসরশ্চেতি সূর্যো যো'গ্নিমনীষিভিঃ।
যোজিতঃ প্রবিভাগানাং দিবসানাঞ্চ ভাস্করঃ॥

[বায়ু পু. ৩১.২৯-৩৭]

পণ্ডিতেরা আদিত্যের এই প্রাতিমাসিক আবর্তনে প্রাণীজগতের আয়ু তথা কর্মফল হরণের প্রক্রিয়াটা আরও সহজ করে ধরেছেন সূর্য

রশ্মির মাধ্যমে পৃথিবীর জলশোষণ অর্থাৎ আদানের প্রক্রিয়ায়। আদিত্যের এই আদান অর্থটি মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—আদিত্য-সূর্য নিজের কিরণের মাধ্যমে পৃথিবীর রস আহরণ করেন—

আদত্তে চ রসান্ ভৌমান্ আদিত্যঃ স্বগভস্তিভিঃ।

এই রসস্বরূপ জল আবার মেঘরূপে নেমে আসে। *[মহা (k) ১৩.৬৩.৩৬-৩৮; (হরি) ১৩.৫২.৩৬-৩৮]*

মহাভারত-পুরাণে আদিত্য-সূর্যের এই জলাদান-প্রক্রিয়া কবির প্রতিভায় জলশোষণ এবং বৃষ্টিদানের মাহাত্ম্যে উন্নীত হয়েছে—

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।

কালিদাস লিখেছেন—রঘুবংশীয় রাজা দিলীপ প্রজাদের সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্যই রাজকর গ্রহণ করতেন, ঠিক যেমন আদিত্য পৃথিবী থেকে যে রস আদান বা গ্রহণ করেন, তা তিনি সহস্রগুণ ফিরিয়ে দেন বৃষ্টি-বর্ষণের মাধ্যমে—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুম্ আদত্তে হি রসং রবিঃ॥

[রঘুবংশ ১.১৮; মহা (k) ১২.২৬৩.১১; (হরি) ১২.২৫৬.১১]

□ আদিত্য সূর্যের তেজঃস্বরূপ বলেই তাঁকে বলা হয়েছে—সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থের তিনি আদিরূপ—

আদিত্যো জ্যোতিষাম্ আদিঃ।

আদিত্যের জ্যোতিষ্মত্তার বিষয়টি এতটাই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, যোগযুক্ত সমাধিতে মানুষ যখন সমস্ত ভোগ্য বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরের মধ্যে অন্তর্যামী পরমাত্মাকে অনুভব করেন, তখন সেই আত্মাকে তিনি রশ্মিময় আদিত্যের মতো দেখতে পান—

বিধূম ইব সপ্তার্চিরাদিত্য ইব রশ্মিবান্।
দৃশ্যতে আত্মা তথাত্মনি।

[মহা (k) ১২.৩০৬.২০; ১২.২৪০.১৯; (হরি) ১২.২৯৮.২০; ১২.২৩৭.১৯]

বৈদিক গ্রন্থ শৌনকের বৃহদ্দেবতাতেই দ্বাদশ আদিত্যকে প্রথমে বিষ্ণু বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। বেদে বিষ্ণুর দৈবপ্রকৃতির সঙ্গে সূর্যের দৈবপ্রকৃতির পার্থক্য নেই খুব। কিন্তু আদিত্যগণের প্রাচীন উল্লেখগুলির মধ্যে বিষ্ণুর নামই আমরা যেখানে পাইনি, সেখানে শৌনকের বৃহদ্দেবতায় প্রথমে বলা হল—একা অদিতি দেবী দ্বাদশ পুত্রের জন্ম দেন—

তত্রৈকা ত্বদিতি দেবী দ্বাদশাজনয়ৎ সুতান্।

অর্থাৎ অদিতি নাম-সাম্যে তাঁরা আদিত্যই বটে, কিন্তু তার পরে বারো জন সূর্যস্বরূপ বা আদিত্য-স্বরূপ দেবতার নাম করে বলা হল—এই বারো জন হলেন বিষ্ণু—দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে। অর্থাৎ বিষ্ণু শুধু দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম-মাত্র নন, যেমনটি পরবর্তীকালে বলা হয়েছে সর্বত্র, এখানে বিষ্ণুই দ্বাদশ আদিত্য।

[বৃহদ্দেবতা, ৫.১২৯-১৩০]

মহাভারতে আদিত্য সংখ্যার পূর্ব মত এবং পরবর্তী মত একত্র সংকলিত হয়েছে এবং বিষ্ণু এখানে বারো জন আদিত্যের অন্যতম—

ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণাংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা॥
পর্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ॥

[মহা (k) ১.৬৫.১৫-১৬; ১.১২৩.৬৬-৬৭; (হরি) ১.১১৭.৭০-৭১]

মহাভারতের এই দ্বাদশাদিত্যের নাম সামান্য কিছু পরিবর্তন এবং পরিমার্জনে বিষ্ণু পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, কিংবা স্কন্দ পুরাণে আছে—

তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
অর্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ॥
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ॥

[বিষ্ণু পু. ১.১৫.১৩১-১৩২; মৎস্য পু. ১৭১.৫৫; বায়ু পু. ৬৬.৬৭-৬৮]

পদ্ম পুরাণের তালিকায় বিবস্বান্ এবং সবিতা বাদ পড়েছেন, তাঁদের বদলে এসেছেন বরদ এবং রবি—

'বরুণোংশোর্যমা রবিঃ'
পূষা মিত্রশ্চ বরদো ধাতা পর্জন্য এব হি।

[পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ৪০.১০০-১০১]

স্কন্দ পুরাণে আবার দ্বাদশাংশ আদিত্যের সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। দ্বাদশ আদিত্য যে বস্তুত সূর্যেরই বিচিত্র রূপ, সেটা প্রতিপাদন করার জন্য এই উপাখ্যান বলেছে—কশ্যপের পুত্র দ্বাদশ আদিত্য ভাস্কর-সূর্যের পদ লাভ করার জন্য নর্মদা-নদীর তীরে সিদ্ধেশ্বর নামে একটি জায়গায় উগ্র তপস্যা করেন। এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করার ফলেই আদিত্যগণ নিজের নিজের অংশ

বিভক্ত করে দিবাকর সূর্যকে স্থাপন করলেন ওই সিদ্ধেশ্বর তীর্থেই—

স্থাপিতশ্চ জগদ্ধাতা তস্মিংস্তীর্থে দিবাকরঃ।
স্বকীয়াংশ-বিভাগেন দ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞকৈঃ।

স্কন্দ পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম—

ইন্দ্রো ধাতা ভগস্ত্বষ্টা মিত্রো'থ বরুণো'র্যমা।
বিবস্বান সবিতা পূষা হ্যংশুমান্ বিষ্ণুরেব চ॥
ইত্যেত দ্বাদশাদিত্যা ..।

স্কন্দ পুরাণে অংশ অংশুমান বলে চিহ্নিত হয়েছেন। *[স্কন্দ পু. (রেবা) ১৯১.৭-১১]*

মহাভারতে পাণ্ডবদের বনবাসকালে যুধিষ্ঠির যখন সহাগত ব্রাহ্মণদের পালন-পোষণের দুশ্চিন্তা করছেন, তখন ধৌম্য পুরোহিত তাঁকে সূর্যস্তুতি করতে বলেন। সেই প্রসঙ্গে সূর্যের অষ্টোত্তর শতনাম করার পরেই যুধিষ্ঠির যখন সূর্যের স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন, তখন তিনি বলেছেন পরম ঈশ্বর নিজেকে দ্বাদশ ভাগে ভাগ করে দ্বাদশ আদিত্যরূপে নিজেকে স্থাপন করেন—

কৃত্বা দ্বাদশধাত্মানং দ্বাদশাদিত্যতাং গত।

[মহা (k) ৩.৩.৫৯; (হরি) ৩.৪.২৮]

দ্বাদশ আদিত্য যে প্রকৃতপক্ষে সূর্যই সে-কথা কূর্ম পুরাণে অত্যন্ত স্পষ্ট—

য এতে দ্বাদশাদিত্যা আগতা যজ্ঞভাগিনঃ।
সর্বে সূর্য ইতি খ্যাতা ন হ্যন্যো বিদ্যতে রবিঃ॥

[কূর্ম পু. (পূর্ব) ১৫.১৭]

স্কন্দ পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের সঙ্গে সমান্তরাল মাসগুলি ধরে নিয়ে কোন মাসের অধিষ্ঠাতা কোন আদিত্য সেটা স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিষ্ণুকে দিয়েই গণনারম্ভ—বিষ্ণু চৈত্রমাসে তাপ দেন, বৈশাখে অর্যমা, জ্যৈষ্ঠমাসে বিবস্বান্, আষাঢ়ে অংশুমান, শ্রাবণ মাসে পর্জন্য, ভাদ্রপদে বরুণ, আশ্বিন মাসে ইন্দ্র, কার্তিকে ধাতা, অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র, পৌষে পূষা, মাঘ মাসে ভগ, আর ফাল্গুন মাসে তাপ দেন ত্বষ্টা—

বিষ্ণুস্তপতি বৈ চৈত্রে বৈশাখে চার্যমা সদা॥
বিবস্বান্ জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাংশুমাংস্তথা।
পর্জন্যঃ শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রোষ্ঠসংজ্ঞিকে॥
ইন্দ্রশ্চাশ্বযুজে মাসি ধাতা তপতি কার্তিকে।
মার্গশীর্ষে তথা মিত্রঃ পৌষে পূষা দিবাকরঃ॥
মাঘে ভগস্তু বিজ্ঞেয়স্ত্বষ্টা তপতি ফাল্গুনে।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ১০১.৬০-৬৫]

স্কন্দ পুরাণে চৈত্র-মাস দিয়ে মাসারম্ভ হয়েছে এবং সেই মাসের অধিদেবতা বিষ্ণু। যে বিষ্ণুকে আমরা পূর্বে আদিত্য-সংখ্যার মধ্যেই গণিত হতে দেখিনি, সেই বিষ্ণুই কিন্তু অবশেষে আদিত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর পৌরাণিক বিবর্তনের অন্যতম কারণ অবশ্যই বৈদিক সূর্যের বিষ্ণুতে রূপান্তর, সূর্যের বৈশিষ্ট্যগুলির বিষ্ণুর গুণে সংক্রমণ। *[বিষ্ণু পু. ৫.১.১৬-১৭]*

হয়তো এই কারণেই হরিবংশ পুরাণে আদিত্যের দ্বাদশ সংখ্যা নির্ণয়ের পর বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিষ্ণু সকলের কনিষ্ঠ কিন্তু অন্য গুণে তিনি সকলের চেয়ে বড়ো—

আদিত্যা দ্বাদশৈবেহ সম্ভূতা মুখসম্ভবাঃ।
ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণো'ংশো ভগস্তথা॥
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জন্যো দশমস্তথা।
ততস্ত্বষ্টা ততো বিষ্ণুরজঘন্যো জঘন্যজঃ॥

[হরিবংশ ১.৯.৪৭-৪৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৬৭-৬৯]

□ মহাভারত একথা আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, বিষ্ণু আদিত্যগণের মধ্যে কনিষ্ঠ হলেও গুণে তিনি সকলের চেয়ে অধিগুণশালী—

জঘন্যজস্তু সর্বেষাম্ আদিত্যানাং গুণাধিকঃ।

[মহা (k) ১.৬৫.১৫-১৬; (হরি) ১.৬০.১৫-১৬]

□ মহাভারত পুরাণগুলির বক্তব্য থেকে এইটুকু বলা যায় যে, বিভিন্ন জায়গায় দ্বাদশ আদিত্যের নামগুলি একরকম নয়, একই ক্রমেও তা লিখিত হয়নি। আদিত্যের সংখ্যাও সর্বত্র একরকম নয়। কিন্তু আদিত্যগণ যে সূর্যেরই রূপান্তর সেটা সর্বত্রই প্রমাণ হয়। কোনো ব্যাখ্যায় দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাস, কখনো তিন মাস বা চার মাস একত্র করে ঋতু গণনা, কখনো বা দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশি। এমনকি রাত্রির পঞ্চদশ, মুহূর্তের বিভিন্ন দৈব-নাম বলার সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত, প্রাজাপত্য মুহূর্ত ইত্যাদির মতো আদিত্যের নামেও একটি মুহূর্ত চিহ্নিত হয়েছে এবং তা ব্রাহ্ম এবং সৌম্য মুহূর্তের পরেই।

[বায়ু পু. ৬৬.৪৩-৪৪]

ভগবদ্গীতা এবং ভাগবত পুরাণে আদিত্যদের মধ্যে বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠতম আদিত্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ।

[ভগবদ্গীতা ১০.২১; ভাগবত পু. ১১.১৬.১৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৫]

আদিত্য$_{২}$ ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা-স্নানের মধ্যে সায়ংকালীন স্নান বা তৃতীয় সবনের অধিকৃত দেবতারা হলেন আদিত্যগণ এবং বিশ্বেদেবগণ—

আদিত্যনাঞ্চ বিশ্বেষাং দেবানাং তৃতীয় সবনম্।

সেখানে হোম-মন্ত্রটা হল—

নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যঃ।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ, ২.২৪.১, ১৪, ১৬]

এই মন্ত্রে আদিত্য এবং বিশ্বেদেবগণ প্রায় একাকার হয়ে গেছেন।

মহাভারতে বিশ্বেদেবগণের অন্যতম দেবতাই আদিত্য।

☐ ঋগ্‌বেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে দাঁড়ায় সমস্ত দেবতা। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন—'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা-বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেবা বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবগণের পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিক কালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

☐ পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

☐ বিশ্বেদেবগণের মধ্যে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম পালটে যায় এবং সংখ্যাও এক এক জায়গায় এক এক রকম। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যে সব নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আদিত্য।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩৬; (হরি) ১৩.৭৮.৩৬]

আদিত্য$_{৩}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতার জন্ম হয়। এই ঊনপঞ্চাশ জন দেবতা সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম গণের অন্তর্গত সাতজন দেবতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন আদিত্য।

[বায়ু পু. ৬৭.১২৩]

☐ অবশ্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ধৃত শ্লোকে আদিত্য নামটি পাওয়া যায় না। তার পরিবর্তে সেখানে 'সত্য' পাঠ ধৃত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৯১]

আদিত্য$_{৪}$ শিবসহস্রনাম স্তোত্রে আদিত্য শব্দটি দুবার ভগবান শিবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে আদিত্য শব্দটি পাওয়া যায় অংশু, ভগ এই দুটি নামের মধ্যে। অংশু এবং ভগও কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। কথিত আছে যে, এঁরা আদিত্য সূর্যের প্রধান দুই অনুচরও বটে। অংশু এবং ভগ নামক দুই পার্শ্বচরের মধ্যে অবস্থানকারী যে আদিত্য সূর্য তাঁর স্বরূপ বলেই মহাদেব আদিত্য নামে খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ উদ্ধার করে অংশু এবং ভগের মধ্যস্থিত আদিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

আদিত্যস্তৎসহচারী ভগাপরনামা দেবঃ,

তস্যা অংশুশ্চ ভগশ্চাজায়েতামিতি ব্রাহ্মণাৎ।

আদিত্য শব্দটি দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হয়েছে বসু প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে এখানে আদিত্য বলতে অদিতির পুত্র বোঝানো হচ্ছে—

আদিত্য ইতি অদিতেঃ পুত্র।

কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে যে বিশিষ্ট দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন অদিতির সেই পুত্ররা অর্থাৎ ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবতারা এমনকী কনিষ্ঠ আদিত্য অর্থাৎ বিষ্ণুর অন্যতম অবতার 'বামন'—এঁদের প্রত্যেকের স্বরূপ হিসেবেই ভগবান শিব এখানে আদিত্য নামে চিহ্নিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহাভারতের শান্তিপর্বে যে দক্ষকৃত শিবসহস্রনাম স্তোত্র আছে, সেখানেও 'আদিত্য' মহাদেবের অন্যতম নাম হিসেবে উচ্চারিত। দক্ষ প্রজাপতি বলছেন যে, গোরু যেমন গোষ্ঠের মধ্যে থাকে ঠিক তেমনই সমস্ত দেবতারা তোমারই দেহে অবস্থান করেন। তোমার মধ্যে আমি সোম (চন্দ্র), অগ্নি, জলেশ্বর (বরুণ), আদিত্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং বৃহস্পতিকে দেখতে পাচ্ছি—

মূর্তৌ হি তে মহামূর্তে সমুদ্রাম্বর সন্নিভ।
সর্বা বৈ দেবতা হ্যস্মিন্ গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে।।
ভবচ্ছরীরে পশ্যামি সোমমগ্নিং জলেশ্বরম্।
আদিত্যমথ বৈ বিষ্ণুং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥

নিজ দেহে সমস্ত দেবতাকে ধারণ করেন বা আশ্রয় দেন বলে শিব এখানে মহামূর্তি নামেও সম্বোধিত হয়েছেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাদেবের অষ্টমূর্তি বা অষ্টরূপের প্রসঙ্গ এনেছেন। ভূমি, অম্বু বহ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এবং যজমান— মহাদেবের এই অষ্টরূপ কল্পিত হয়। অষ্টমূর্তি মহাদেব আদিত্য সূর্যের স্বরূপ অথবা আদিত্যকেও তিনি নিজদেহে ধারণ করেন—এই অর্থে শিব আদিত্য নামে কীর্তিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১২.২৮৪.৮০; ১৩.১৭.৬৮, ১৪০; (হরি) ১২.২৭৭.৮; ১৩.১৬.৬৮,১৩৯]

আদিত্য$_৫$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রে 'আদিত্য' শব্দটি দুবার ভগবান বিষ্ণুর নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। টীকাকার শঙ্করাচার্য ভগবানের আদিত্য নামটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থো হিরন্ময় পুরুষঃ আদিত্যঃ।

আদিত্য বলতে মূলত বিবস্বান্ সূর্যকে বোঝায়। সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ সমন্বিত যে সৌরজগত তার কেন্দ্রে আদিত্য-সূর্য অবস্থান করেন। সেই সূর্যের স্বরূপ হিসেবে ভগবান বিষ্ণু আদিত্য নামে খ্যাত।

বিষ্ণু নারায়ণের ধ্যান মন্ত্রে সূর্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী অংশে কনককুণ্ডলবান নারায়ণের হিরণ্ময় মূর্তির অবস্থান কল্পনা করা হয়েছে—

ধেয়ঃসদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥

এই ভাবনা থেকেও ভগবান বিষ্ণুকে আদিত্য বলা হয়।

আদিত্য অর্থে অদিতির পুত্র। ভগবান বিষ্ণু মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা। অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মগহণ করেন। সেই কারণে, অদিতির পুত্র বামন অবতার গ্রহণ কারী ভগবান বিষ্ণু আদিত্য নামে খ্যাত—

অদিত্যাং কশ্যপাদ্ বামনরূপেণ জাত আদিত্যঃ।

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে কনিষ্ঠ এই বামন বা বিষ্ণুর উল্লেখ আমরা ভগবদ্গীতায় পাই। বিভূতিযোগে কৃষ্ণ অর্জুনকে জগতের সকল শ্রেষ্ঠ বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে নিজের স্বরূপতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ।

[ভগবদ্গীতা ১০.২১]

এই ভাবনা থেকেও ভগবান বিষ্ণু আদিত্য নামে খ্যাত। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.১৮, ৭৩; (হরি) ১৩.১২৭. ১৮, ৭৩]*

আদিত্যহৃদয়মন্ত্র প্রথমে ঘৃণি, তারপর সূর্য এবং অন্তে আদিত্যমন্ত্র এবং প্রণব—এই সব মিলিয়ে আদিত্যহৃদয়। *[বৃহদ্ধর্ম পু. ৩.৯.২১-২২]*

আদিত্যকেতু ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। নিজের ভাই সুনাভের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য অন্য ছয় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভীমসেনকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ভীমসেনের হাতেই তিনি নিহত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.১০২; ১.১১৭.১১; ৬.৮৮.১৫, ১৮, ২৮; (হরি) ১.৬২.১০৪; ১.১১১.১০; ৬.৮৫.১৫. ১৮, ২৮]

আদিত্যতীর্থ$_১$ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। বলরাম তীর্থভ্রমণকালে এখানে গিয়েছিলেন। সূর্যদেব, এই তীর্থে যজ্ঞের মাধ্যমে গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর আধিপত্য লাভ করেন।

[মহা (k) ৯.৪৯.১৬-১৭; (হরি) ৯.৪৫.১৬-১৭]

□ পদ্ম পুরাণ মতে, এই তীর্থটি সবরমতী বা সাভ্রমতী নদীর মোহানায় অবস্থিত। প্রয়াগেও আদিত্যতীর্থ নামে একটি পবিত্র ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। *[পদ্ম পু. (মহর্ষি) উত্তর ১৭১.১-৪; EAIG (Kapoor) p. 27]*

আদিত্যতীর্থ$_২$ মৎস্য পুরাণে যুধিষ্ঠিরের কাছে মার্কণ্ডেয় যখন প্রয়াগমাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন, তখন দেখছি, যমুনার উত্তর তীরে প্রয়াগের কাছে আরও একটি আদিত্যতীর্থের অবস্থান পাওয়া যাচ্ছে এবং এখনও পর্যন্ত প্রয়াগ শহরের 'অন্তবেদী পরিক্রমা'র সময় যে আদিত্যতীর্থের দেখা মেলে, সেটি মৎস্য পুরাণ কথিত আদিত্যতীর্থের সঙ্গে একাত্মক বলেই মনে হয়।

[মৎস্য পু. ১০৮.২৯; GEAMI (Bajpai) p. 5]

আদিত্যপর্বত হিমালয়ের পূর্বদিকে অবস্থিত মহাদেবের বাসস্থান। দশযোজনব্যাপী বিস্তৃত এই

স্থানটি অগ্নিশিখা পরিবেষ্টিত হওয়ায় রাক্ষস ও দানবেরা এখানে প্রবেশ করতে পারে না। মহাদেব সহস্র বছর এখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। *[মহা (k) ১২.৩২৭.২০-২৪; (হরি) ১২.৩১৬.২০-২৪]*

আদিত্যায়তনতীর্থ নর্মদার উত্তরকূলে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই তীর্থ অধিকতর পুণ্যদ হয়ে ওঠে। *[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৯.৭৭-৮২; কূর্ম পু. ২.৩৯.৩৬-৩৮]*

আদিত্যাশ্রমতীর্থ তীর্থস্থান বিষয়ে ধর্মসংশয় উপস্থিত হলে প্রজাপতি পুলস্ত্য ভীষ্মকে বিভিন্ন তীর্থ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, বনবাসকালে যুধিষ্ঠির সেই তীর্থগুলির নাম শুনছেন দেবর্ষি নারদের কাছে। নারদকথিত তীর্থসমূহের মধ্যে অন্যতম আদিত্যাশ্রম তীর্থ। তীর্থাধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্যদেব। *[মহা (k) ৩.৮৩.১৮৩-১৮৫; (হরি) ৩.৬৮.১৮৪-১৮৫; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) স্বর্গ. ২৭.৭০-৭১]*

আদিপুরাণ ঋষি সনৎকুমার কথিত আদিপুরাণ একটি উপপুরাণ। *[কূর্ম পু. ১.১.১৬-১৭]*

আদিত্যেশ একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থ দর্শনে সর্বতীর্থ ফল প্রাপ্তি হয়। নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত এই তীর্থক্ষেত্রে একটি পবিত্র শিবলিঙ্গ রয়েছে। *[মৎস্য পু. ১৯১.৫]*

আদিদেব বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান বিষ্ণু আদিদেব নামে সম্বোধিত হয়েছেন। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৯, ৬৫; (হরি) ১৩.১২৭.৪৯, ৬৫]*

আদিপাল ভগবান বিষ্ণুর অপর নাম। গয়ায় তিনি 'আদিপাল' নামে প্রসিদ্ধ। *[বায়ু পু. ১০৯.১৫]*

আদিপুরুষ চতুষ্পাদ ধর্মস্বরূপ ভগবান নিরন্তর জগৎ প্রতিপালন করছেন বলে তিনিই আদিপুরুষ নামে অভিহিত। *[কালিকা পু. ২৮.১২]*

আদিরাজ কুরুরাজের পৌত্র এবং অবীক্ষিতের পুত্রদের মধ্যে আদিরাজ অন্যতম। *[মহা (k) ১.৯৪.৫২; (হরি) ১.৮৯.৪০]*

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে যেসব প্রাতঃস্মরণীয় রাজাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, আদিরাজ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ১৩.১৬৫.৫৫; (হরি) ১৩.১৪৩.৫২]*

আদিষ্টিন্ (আদিষ্টী) যে সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁদের গুরুর নির্দেশ অনুসারে ব্রত আচরণ করেন, তাঁদের আদিষ্টী বলা হয়। আদিষ্টী ব্রাহ্মণেরা ব্রত-আচরণের মধ্যে থাকাকালীন শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করলে তাঁদের ব্রত নষ্ট হয়ে যায়। মহাভারতে এই প্রসঙ্গেই আদিষ্টী ব্রাহ্মণদের কথা বলা হয়েছে। *[মহা (k) ১৩.২২.১৭; (হরি) ১৩.২৩.১৭]*

আদেশ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। আদেশ বলতে যেমন আজ্ঞা কিংবা অনুমতি বোঝায়, তেমনই উপদেশও বোঝায়। টীকাকার নীলকণ্ঠ উপদেশ-এর ভাবনা থেকেই ভগবান শিবের আদেশ নামটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—

আদেশঃ সাক্ষাদুপদেশরূপঃ।

এই উপদেশ এখানে মূলত ব্রহ্মজ্ঞান যার দ্বারা ভক্ত পরব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জানতে সমর্থ হন। ভগবান শিব স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ আবার তাঁর পরমভক্তের সাধনার ফলস্বরূপ তিনিই তাঁকে নিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন—সেই ভাবনায় তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপও বটে। সাধককে তিনি স্বয়ং উপদেশ দেন বলেই তিনি নিজেও আদেশ নামে সম্বোধিত হয়েছেন। *[মহা (k) ১৩.১৭.১১৮; (হরি) ১৩.১৬.১১৭]*

আদ্য$_১$ পুরাণে কৌশিক-গোত্রীয় ঋষি বিশ্বামিত্রের গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আদ্য সেই গোত্রের অন্যতম। বিশ্বামিত্র থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও কৌশিক নামে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৮.১১]*

আদ্য$_২$ চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি 'আদ্য'। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৬৬, ৬৯; শিব পু. (ধর্ম) ৫৮.২৭-২৮; বায়ু পু. ৬২.৫৭]*

আদ্য$_৩$ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। *[দ্র. আদি]*

আদ্যনির্গম ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম নাম। *[দ্র. আদিকর]* *[মহা (k) ১৩.১৭.১৪২; (হরি) ১৩.১৬.১৪১]*

আদ্র সূর্যবংশীয় বিশ্বগের (শীঘ্রগের) পুত্র। *[মৎস্য পু. ১২.২৯]*

আধন বশিষ্ঠের ঔরসে উর্জ্জার গর্ভে যে সাতজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে আধন অন্যতম। *[বায়ু পু. ২৮.৩৬]*

আধবনীয় *[দ্র. যজ্ঞায়ুধ]*

আধারনিলয় ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৫; (হরি) ১৩.১২৭.১০৫]

আধ্বর্যব *[দ্র. অধ্বর্যু]*

আধ্য যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.২৮]

আধ্যাত্মিকী বিদ্যা কর্মবন্ধনের ভয়দূরকারিণী আত্মবিদ্যা, যে বিদ্যার মাধ্যমে জীব নিজের স্বরূপকে চিনতে পারে। সাংখ্যদর্শন-প্রবক্তা কপিল এই আধ্যাত্মিকী আত্মবিদ্যার কথা তাঁর জননী দেবহূতিকে বলেছিলেন। *[দ্র. আত্মবিদ্যা]*

[ভাগবত পু. ৩.২৪.১৭]

আনক$_{১}$ বৃষ্ণিবংশীয় বীর শূরের ঔরসে মারিষার গর্ভজাত পুত্রদের অন্যতম আনক। তিনি কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের অনুজ, ছোট ভাই।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.২৮]

আনক$_{২}$ চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্রটি মৃদঙ্গ নামে পরিচিত। বসুদেব যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন দেবতারা আনক বা মৃদঙ্গবাদন করেছিলেন। মহাভারত ও পুরাণে দেখা যায় যে, কোনো অনুষ্ঠানে বা যুদ্ধের প্রারম্ভে অথবা যুদ্ধজয়ের সূচক হিসাবে আনক বা মৃদঙ্গ বাদন করা হত। *[ভাগবত পু. ১০.৮৩.৩০; মৎস্য পু. ১৩৫.৮৩; ১৪০.৪৩; বায়ু পু. ৯৬.১৪৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৪৭]*

আনকদুন্দুভি$_{১}$ যদুবংশের অন্যতম শাখা কুকুরবংশ। এই কুকুরবংশীয় কপোতরোমার পৌত্র তথা তমের পুত্র। ইনি গোবর্ধন পর্বতে গিয়ে বিপুল তপস্যা করেছিলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মার কাছে বর পান। এই বরলাভ করে আনকদুন্দুভি গানের দ্বারা মহাদেবের স্তব করতে আরম্ভ করেন। সন্তুষ্ট মহাদেব তাঁকে দেবদুর্লভা এক কন্যারত্ন দান করেন। এই কন্যার গর্ভে শোভন নামে এক পুত্র এবং হ্রীমতী নামে কন্যা জন্মেছিলেন। আনকদুন্দুভির বৈশিষ্ট্য হল—তিনি স্ত্রী, পুত্র এবং পৌত্র—সবাইকে নিয়ে শিবের আরাধনায় রত ছিলেন।

[কূর্ম পু. ১.২৪.৫০-৫৩]

আনকদুন্দুভি$_{২}$ যদুবংশীয় বীর শূরের ঔরসে মারিষার (বায়ু পুরাণ মতে ভোজরাজ কন্যা ভাসী) গর্ভে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরই অপর নাম আনক-দুন্দুভি।

বসুদেব জন্মগ্রহণ করা মাত্র দেবতারা তাঁদের দিব্যদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারেন যে, এই বসুদেবের গৃহেই ভগবত অংশ অবতীর্ণ হবেন। তাই দেবতারা স্বর্গে আনক (মৃদঙ্গ) ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন করেছিলেন। জন্মের সময় আনক ও দুন্দুভি ধ্বনিত হওয়ায় বসুদেবের এই নাম হয়েছে। *[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৯; হরিবংশ পু. ১.৩৩.১৮-১৯; মৎস্য পু. ৪৬.২, ১১; বায়ু পু. ৯৬.১৪৪-১৪৫; ৯৬.২১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৪৬, ১৬৪, ২১৭]*

আনকা বৃষ্ণি-বীর উগ্রসেনের পুত্রদের মধ্যে একজন। *[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৪.২০]*

আনন্দ$_{১}$ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

আনন্দ$_{২}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম। পরম ব্রহ্মের বিষ্ণুর একাত্মতা বিভিন্ন পুরাণেই প্রসিদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপতা বিষ্ণুর ওপরেও আরোপিত হয়। শঙ্করাচার্য বিষ্ণুসহস্রনামের টীকায় বিষ্ণুর এই আনন্দস্বরূপতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতির বাক্য উদ্ধার করে লিখেছেন—তিনি সর্বোত্তম আনন্দ-স্বরূপ। অবিদ্যাবশে পৃথিবীতে যত প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে, তারা এই পরম আনন্দ-স্বরূপেরই অংশমাত্র উপভোগ্য করে জীবন ধারণ করে—

> এষো'স্য পরম আনন্দঃ, এতস্যৈবানন্দস্য
> অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৯; (হরি) ১৩.১২৭.৬৯; বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪.৩.৩২; বিষ্ণু সহস্রনাম শঙ্করাচার্যের টীকা]

আনন্দ$_{৩}$ অন্য জন্মে ইনি পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার চক্ষু থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি পরবর্তী সময়ে চাক্ষুষ মনু নামে চিহ্নিত হন।

চাক্ষুষ মনুর পূর্বনাম ছিল আনন্দ। রাজর্ষি অনমিত্র এঁর পিতা। মাতা ভদ্রা। ভদ্রা একদিন শিশু পুত্রকে আদর করার সময় শিশুটি হেসে উঠলে জননী তাকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নবজাতক পুত্র বলল, সামনে উপস্থিত একটি মার্জারী তাকে খেতে চাইছে এবং গৃহে

একজন জাতহারিণী (পেত্নী ধরনের ছেলেধরা) বসে আছে তাকে তুলে নেবার জন্য। এদিকে জননী তাকে আদর করছেন। নবজাতক বলল, তিন জনই কিন্তু নিজের স্বার্থের দিকেই তাকিয়ে আছে, কাজেই কারও স্নেহই সত্য নয়। জননী ভদ্রা বললেন, তিনি কোনো প্রত্যুপকারের আশায় পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করছেন না এবং পুত্র এইভাবে ভেবেছে বলে তিনি পুত্রকে ত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতহারিণী সেই পরিত্যক্ত শিশুকে হরণ করে নিয়ে বিক্রান্ত নামে এক রাজার পত্নীর শয্যায় স্থাপন করল এবং তাঁর নবপ্রসূত শিশুটিকে নিয়ে গেল। পরে তাকেও অন্যত্র স্থাপন করে শেষলব্ধ শিশুটিকে সে খেয়ে ফেলল।

ওদিকে নৃপতি বিক্রান্ত পুত্র লাভ করে এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, পুত্রের নাম রাখলেন আনন্দ। এর পরে উপনয়ন-কালে গুরু আনন্দকে বললেন জননীকে প্রণাম করতে। আনন্দ তখন গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন মাতাকে তিনি প্রণাম করবেন—জননী মাতাকে না পালনী মাতাকে। এই প্রশ্নে গুরু বিস্ময়াপন্ন হয়ে উঠলে আনন্দ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, বিক্রান্ত-রাজার ঔরসজাত পুত্রের নাম চৈত্র, তিনি বিশাল-গ্রামের বোধনামক ব্রাহ্মণের গৃহে পালিত হচ্ছেন। কোন মাকে প্রণাম করবেন—এই প্রশ্নের জবাব গুরুর কাছে না পেয়ে আনন্দ ভাবলেন—এই জন্মেই তিনি দু-দু-টি মাতা লাভ করেছেন, জন্মের পর জন্ম দেহধারণ করলে এরকম আরও কত সম্বন্ধ ঘটবে। তিনি তাই মোক্ষবিরোধী কর্মক্ষয়ের জন্য বাল্যাবস্থাতেই বনে তপস্যা করতে চলে গেলেন। তপস্যায় তুষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মা আনন্দকে তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আনন্দ নিজের আত্মশুদ্ধি এবং মোক্ষের প্রসঙ্গ তুললেন। ব্রহ্মা বললেন, মুক্তি নয়, আনন্দকে তাঁর যোগ্য কাজে নিযুক্ত করা হবে। ষষ্ঠ মনু হয়ে প্রজাপালন করার পর তাঁর মুক্তি হবে। এইভাবে ব্রহ্মা আনন্দকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করে তাঁকে 'চাক্ষুষ মনু' নামে অভিহিত করলেন। চাক্ষুষ মনু উগ্র নামক রাজার কন্যা বিদর্ভাকে বিবাহ করে অনেক বিক্রমশালী পুত্র লাভ করলেন। *[দ্র. চাক্ষুষ মনু]*

[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৬.১-৪৮]

আনন্দ$_{৪}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে উত্তম মনুর কালে যে বারোজন দেবতা 'সত্য' নামক দেবগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আনন্দ একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩৫]

আনন্দ$_{৫}$ প্রিয়ব্রতের বংশধারায় মেধাতিথির সাতজন পুত্রের অন্যতম। আনন্দও প্লক্ষদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন এবং নিজের নামে প্রসিদ্ধ বর্ষ পালন করতেন। *[বায়ু পু. ৩৩.৩২;*
বিষ্ণু পু. ২.৪.৫]

আনন্দ$_{৬}$ লোকসৃষ্টিতে প্রথম কল্পের নাম 'ভব'। এই কল্পে ভগবানের নাম আনন্দ।

[বায়ু পু. ২১.২৮]

আনন্দ$_{৭}$ প্লক্ষদ্বীপের দুন্দুভি পর্বতের বর্ষনাম আনন্দ।

[বায়ু পু. ৪৯.১৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৩৯; ১.১৭.১৬]

আনন্দক পৌরাণিক শাকদ্বীপে অবস্থিত শ্যাম পর্বতটি শাকদ্বীপের যে বর্ষ বা ভূখণ্ডে অবস্থিত, তার নাম অনীচকবর্ষ। এই অনীচক নামক ভূখণ্ডের অপর নাম আনন্দক। *[দ্র. অনীচক-বর্ষ]*

[মৎস্য পু. ১২২.২৩]

আনন্দজল বায়ু পুরাণ অনুসারে, জারুধি পর্বতে অবস্থিত 'আনন্দজল' একটি মহাপুণ্য সরোবর। এই সরোবরে চণ্ড নামে একজন নাগ বাস করতেন। *[বায়ু পু. ৪১.৭২-৭৩]*

আনন্দপুর বারাণসীতে অবস্থিত পদ্মপুরাণোক্ত তীর্থ। *[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ১৮.৯৪]*

আনন্দী বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৭৩;*
(হরি) ১৩.১২৭.৭৩]

আনন্দেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রখ্যাত তীর্থ। বিজয়তীর্থে স্নান করে যে ব্যক্তি আনন্দেশ্বর দর্শন করেন, তিনি নিষ্পাপ শরীর লাভ করেন। স্বর্গে বিজয়ী হন।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.১০]

আনববংশ যযাতির পুত্রদের মধ্যে অনু একজন। যযাতি পুত্র এই অনুর বংশই আনব বংশ নামে বিখ্যাত। অনুর পুত্র সংখ্যা তিন—সভানর, পক্ষ এবং পরপক্ষ। সভানরের পুত্র কালানল। কালানলের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র পুরঞ্জয় এবং পুরঞ্জয়ের পুত্র মহাশাল। বায়ু পুরাণ মতে অবশ্য মহাশাল জনমেজয় পুত্র ও পুরঞ্জয়ের পৌত্র। মহাশাল একজন প্রখ্যাতকীর্তি রাজা

ছিলেন। মহাশালের পুত্র মহামনা ছিলেন সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর একজন চক্রবর্তী রাজা। মহামনার দুই পুত্র উশীনর ও তিতিক্ষু। উশীনরের পঞ্চপুত্রের (মৃগ, কৃমি, নব, সুব্রত, শিবি) মধ্যে এক প্রসিদ্ধ রাজা হলেন শিবি। শিবির চার পুত্রের নাম অনুসারেই বৃষদর্ভ, কেকয়, সুবিদর্ভ ও মাদ্রক জনপদগুলির নামকরণ হয়। অন্য দিকে তিতিক্ষুর পুত্র রুশদ্রথ (উষদ্রথ) পূর্বদেশের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। রুশদ্রথের পৌত্র বলির বংশধারায় জন্মগ্রহণ করেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র। এঁদের নামানুসারেই পাঁচটি পূর্বদেশীয় জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রাজর্ষি অঙ্গের বংশধারায় ধর্মরথ নামে এক রাজর্ষির উল্লেখ মেলে যিনি বিষ্ণুপদ পর্বতে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। অঙ্গের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন লোমপাদ। লোমপাদের বংশধরদের মধ্যে অন্যতম হলেন চম্প। তিনি চম্পাবতী ও মালিনী নামে দুটি পুরী নির্মাণ করেছিলেন। লোমপাদের অন্য এক পুত্র হর্যঙ্গ মন্ত্রবলে ঐরাবতকে ভূতলে আনয়ন করেছিলেন। এঁরা ছাড়াও লোমপাদের অন্যান্য বংশধরদের উল্লেখও পুরাণে রয়েছে। আনব বংশের এই বংশ তালিকাটি থেকে বোঝা যায় অনুর বংশধরেরা এক দীর্ঘসময় জুড়ে ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে রাজ্যশাসন করেছেন।

[বিষ্ণু পু. (Wilson) ৪.১৮ অধ্যায়]

আনর্ত$_১$ বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র শর্যাতি। শর্যাতির পুত্র আনর্ত। এই আনর্ত যে দেশে রাজত্ব করতেন সেই জনপদটি আনর্ত দেশ নামে খ্যাত হয়। আনর্তের পুত্র ছিলেন রেব (বিষ্ণু পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণ মতে রেবত)।

মৎস্য পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী শর্যাতির পুত্র আনর্তই আনর্তদেশের রাজধানী কুশস্থলী নগরী পত্তন করেছিলেন। মৎস্য পুরাণ মতে, আনর্তের পুত্র ছিলেন রোচমান।

[ভাগবত পু. ৯.৩.২৭;
বিষ্ণু পু. ৪.১.২০; বায়ু পু. ৮৬.২৩-২৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬১.১৮;
মৎস্য পু. ১২.২১-২২]

আনর্ত$_২$ একটি পশ্চিম ভারতীয় প্রাচীন জনপদ তথা সেই অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি। আনর্ত বাসুদেব কৃষ্ণের বাসভূমি। এর আরেক নাম অন্তগিরি। *[মহা (k) ৬.৯.৫১; (হরি) ৬.৯.৫১;*
ভাগবত পু. ১.১১.১; ১.১৬.৬২; ১০.১.৩৫;
মৎস্য পু. ১১৪.৫১; বায়ু পু. ৪৬.১৩১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৬২]

☐ শর্যাতির পুত্রের নাম আনর্ত। এঁর নামানুসারেই আনর্ত দেশটির নামকরণ।

আনর্তের পুত্রের নাম রৈবত। এঁর কন্যা হলেন রেবতী, যাঁর সঙ্গে বলরামের বিবাহ হয়েছিল। এই রৈবতও দীর্ঘকাল আনর্ত দেশ শাসন করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.৩.২৭; ১০.৫২.১৫;*
মৎস্য পু. ১২.২২; বিষ্ণু পু. ৪.১.২০]

☐ শর্যাতি, আনর্ত প্রমুখের শাসনকালে আনর্ত দেশের রাজধানীর নাম ছিল কুশস্থলী। পরবর্তীকালে এই কুশস্থলীর স্থানেই কৃষ্ণ দ্বারকা নগরী নির্মাণ করিয়েছিলেন। *[দ্র. দ্বারকা, কুশস্থলী]*
[বায়ু পু. ৮৬.২৪]

☐ কৃষ্ণ ও বলরামের অনুপস্থিতিতে সৌভরাজ শাল্ব একবার আনর্তের প্রধান নগরী দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন।

শাল্বের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সে সময় আনর্তে সঞ্চিত সমস্ত ধন-সম্পদ গোপনে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

[মহা (k) ৩.১৩.৯, ১৮; ৩.১৫.১৪;
(হরি) ৩.১৩.৯, ১৮; ৩.১৪.১৪]

☐ অর্জুন তাঁর দিগ্‌বিজয়ের সময় আনর্ত দেশ জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ২.২৬.৪; (হরি) ২.২৬.৩]

☐ অভিমন্যু এবং উত্তরার বিবাহ উপলক্ষ্যে অর্জুন বিরাট রাজার অধীনস্ত উপপ্লব্য নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ এবং অনান্য যদুবংশীয় ও অভিমন্যুকে আনর্ত দেশ থেকে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৪.৬৭.১৫; (হরি) ৪.৬৭.১৫]

☐ দ্বিবিদ নামে এক বানর নরকাসুরের বন্ধু ছিলেন। ইনি একবার বিভিন্ন পর্বত উৎপাটন করে বাসুদেব কৃষ্ণের বাসভূমি আনর্তের দিকে নিক্ষেপ করেন। পর্বত নিক্ষেপ করে দ্বিবিদ প্রায় আনর্তদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৬৭.৪]

☐ পণ্ডিতরা বর্তমান গুজরাট ও কাথিয়াবাড়কেই প্রাচীন আনর্তদেশ বলে বর্ণনা

করেন। একাধিক যদুবংশীয় শাখা জনজাতি যেমন—বৃষ্ণি, সাত্বত, দশার্হ ইত্যাদি আনর্ত দেশ শাসন করেছিল। *[TIM (Mishra) p. 76]*

আনীকট মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত পশ্চিম ভারতীয় জনপদগুলির মধ্যে একটি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আনীকট পাঠ থাকলেও অন্যান্য পুরাণের পাঠে এই জনপদটি কালীতক (বায়ু পুরাণ), কুন্তল (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ) কিংবা অলীকট (বামন পুরাণ) নামেও চিহ্নিত হয়েছে।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৫০; বায়ু পু. ৪৫.১২৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৬০;
বামন পু. ১৩.৫১]

☐ মহাভারতের সভাপর্বে সহদেবের দিগ্বিজয় যাত্রার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে এই তালাকট বা তালীকট উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিত D.C. Sircar পুরাণে উল্লিখিত আনীকট বা কালীতক এবং মহাভারতের বর্ণিত তালীকটকে অভিন্ন জনপদ বলে মনে করেছেন। পুরাণগুলিতে মূলত পশ্চিম ভারতীয় জনপদ হিসেবে চিহ্নিত হলেও এই তালীকটকে দাক্ষিণাত্যের জনপদ বলেই মনে করছেন পণ্ডিতরা। বর্তমান কর্ণাটকের অন্তর্গত তলকাড় বা তলকাড়ু অঞ্চলটিই প্রাচীনকালে তালীকট নামে খ্যাত ছিল বলে পণ্ডিত Sircar মত প্রকাশ করেছেন।

[মহা (k) ২.৩১.৬৫; (হরি) ২.৩০.৬৩;
GAMI (Sircar) p. 40-41]

আনৃহবান ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তীকালে যেসব রাজর্ষিরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আনৃহবান একজন।

[বায়ু পু. ৯১.১১৬]

আন্দীর যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসুর বংশধারায় মরুত্ত অপুত্রক হওয়ায় পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে (বায়ু পুরাণ মতে দুষ্কৃত) পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.১৭-১৮;
বিষ্ণু পু. ৪.১৬.২; মৎস্য পু. ৪৮.২-৩;
বায়ু পু. ৯৯.৩]

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, দুষ্মন্তের পুত্র সরূপ্য। আন্দীর এই সরূপ্যের পুত্র। পাণ্ড্য, কেরল, চোল এবং কুল্যা নামে আন্দীরের চারটি পুত্র ছিল। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.৫-৬]*

মৎস্য পুরাণ অনুসারে, দুষ্মন্তের পুত্র বরূথ। বরূথের পুত্র ঊীর। পাণ্ড্য, চোল, কেরল ও কর্ণ নামে ঊীরের চারপুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[মৎস্য পু. ৪৮.৪-৫]

বায়ু পুরাণে অবশ্য মরুত্তের পুত্র হিসেবে 'দুষ্কৃত' এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, দুষ্কৃতের পুত্র শরূথ এবং শরূথের পুত্র জনাপীড় এবং পাণ্ড্য, কেরল, চোল, কুল্য প্রমুখরা জনাপীড়ের পুত্র। *[বায়ু পু. ৯৯.৩-৬]*

পুরাণগুলিতে বিভিন্ন মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আন্দীর যে পুরু বংশীয় দুষ্মন্তের পৌত্র, সেই বিষয়ে পণ্ডিত F.E. Pargiter আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শরূথ, দুষ্মন্তের পুত্র। আর শরূথের পুত্র আন্দীর। পাণ্ড্য, কেরল, চোল এবং কুল্যা নামে আন্দীরের চার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ আন্দীরের ওই চার পুত্রের অধিকৃত রাজ্য তাদের নামানুসারেই প্রসিদ্ধ হয়েছে। *[AIHT (Pargiter) p. 108]*

আন্বীক্ষিকী আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ হল তর্ক, যুক্তি, বিচার। রামায়ণ এবং মহাভারতে হেতুবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, নাস্তিকতা এবং বেদনিন্দার সঙ্গে আন্বীক্ষিকী একই সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ায় এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য নিয়ে অনেকে সংশয়ী হয়ে উঠেছেন।

মহাভারতের শান্তিপর্বের একটি শ্লোকে ইন্দ্ররূপী শৃগাল তার শৃগাল-যোনি লাভ করার কারণ হিসেবে নিজের পাপগুলি উল্লেখ করে বলেছেন—আমি পূর্বে পণ্ডিত ছিলাম। ছিলাম হৈতুক এবং বেদনিন্দক। আর আন্বীক্ষিকী ও তর্কবিদ্যাতে আমার অনুরাগ ছিল অসাধারণ। এর ফলে সমগ্র বিদ্বৎসভায় আমি আমার হেতুবিদ্যার বুদ্ধিতেই কথা বলতাম। সেই সময় আমি ব্রাহ্মণদের বাক্যদোষ ধরতাম এবং কঠিন কথাও বলতাম। সমস্ত বিষয়ে আমি সংশয় উত্থাপন করতাম এবং সেই নাস্তিকতার ফলেই আমি শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়েছি।

[মহা (k) ১২.১৮০.৪৭-৪৯;
(হরি) ১২.১৭৪.৪৭-৪৯]

মহাভারতের শান্তিপর্বে হেতুবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, নাস্তিকতা এবং বেদনিন্দার সঙ্গে আন্বীক্ষিকী শব্দের ব্যবহার আন্বীক্ষিকীর এক নতুন তাৎপর্য্য সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের আস্তিকতার বিরুদ্ধে যাঁরাই অস্ত্রশাণিত করেছেন, যুক্তিতর্ককে তাঁরাই আশ্রয় করেছেন সবচেয়ে বেশি। এ কথাটা আরও প্রমাণিত

হয় অন্যতর মহাকাব্য রামায়ণের প্রমাণ থেকে। রামায়ণে ভরত রামচন্দ্রকে বন থেকে ফিরিয়ে নিতে এলে রামচন্দ্র তাঁকে অযোধ্যা রাজ্যের কুশল সম্বন্ধে বহুতর প্রশ্ন করেন। সেই সব প্রশ্নের মধ্যে রামচন্দ্র ভরতকে বলেছিলেন —তুমি লোকায়তিক চার্বাকদের অথবা শুষ্ক, তর্কনিপুণ ব্রাহ্মণদের সেবা কর না তো? কারণ তারা পরলোক এবং পরলোক সাধনের অনর্থপ্রতিপাদনেই সবচেয়ে দক্ষ। বালকের মত অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের পণ্ডিত বলে মনে করে। তারপর আবার আমাদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র বেদ থাকা সত্ত্বেও সেটাকে অবহেলা করে আন্বীক্ষিকীর পথ অবলম্বন করে অনর্থক বিবাদ করে।

[রামায়ণ ২.১০০.৩৮-৩৯]

এখানে লোকায়তিকদের ভাব-প্রকাশের উপায় হিসেবে আন্বীক্ষিকীর উল্লেখ এবং তর্ক-যুক্তির পথকে নিরর্থক বলে চিহ্নিত করায় এই কথা প্রমাণ হয় যে, আন্বীক্ষিকী সেই পুরাতন সময়েও পৃথক একটি প্রস্থান বলে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেও, আন্বীক্ষিকীকে আস্তিকতার বিরুদ্ধ কোনো অস্ত্র হিসেবেই গণ্য করতেন অনেকেই। লক্ষণীয়, সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত ভাবনা, পরিপূর্ণ দর্শন হয়ে ওঠার আগে আন্বীক্ষিকীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই কৌটিল্য আন্বীক্ষিকীর উদাহরণ হিসেবে সাংখ্য-যোগাদির উল্লেখ করেছেন এবং সাংখ্য-যোগ বা লোকায়ত ভাবনার মধ্যে নিরীশ্বরতার নিদর্শন থাকায় সাংখ্য-যোগোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং বিবেক-জ্ঞানের যুক্তি-তর্ক বা আন্বীক্ষিকীর অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা আরো সার্থক হয়ে ওঠে।

বস্তুত ভারতবর্ষে আস্তিকতার বিরুদ্ধে যাঁরাই যুক্তিতর্ক শানিত করেছেন, তাঁদেরকে যে-সব যুক্তিতর্ক আশ্রয় করতে হয়েছে, তা আন্বীক্ষিকীরই নামান্তর। আর হয়তো সেই কারণেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীর উদাহরণে সাংখ্য-যোগের সঙ্গে লোকায়ত শব্দের ব্যবহার।

কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' যে কোনো রাজার পক্ষে শিক্ষণীয় চারটি ঐতিহ্যগত বিদ্যার কথা বলতে গিয়ে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি এই চতুর্বিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এই চতুর্বিদ্যার মধ্যে ত্রয়ীর অর্থ তিন বেদ, বার্তা হল অর্থনীতি, দণ্ডনীতির অর্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ করার সময় কৌটিল্যের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। কিন্তু আন্বীক্ষিকী শব্দটির ব্যাখ্যা করতে বসে কৌটিল্য যেন অনেকটা দ্বিধান্বিত। এই শব্দের ব্যাখ্যায় কৌটিল্য বললেন—'সাংখ্যং, যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী' অর্থাৎ সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত এই তিনটি ভাবনাই আন্বীক্ষিকী। ঠিক এই কথাটি বলেই আন্বীক্ষিকী শব্দটি ভেঙে তিনি বলেন,—'ত্রয়ী' থেকে জানা যায় 'ধর্মাধর্ম', 'বার্তা' থেকে জানা যায় 'অর্থানর্থ' আর 'দণ্ডনীতি' থেকে জানা যায় 'নয়-অপনয়'। কিন্তু সর্বত্রই এই 'ধর্মাধর্ম', 'অর্থানর্থ' এবং 'নয়-অপনয়' বোঝাবার ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কগুলি সরবরাহ করে আন্বীক্ষিকী। বস্তুত ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতির গ্রহণযোগ্যতা এবং বর্জনীয়তার ক্ষেত্রে যে হেতুর অন্বেষণ করা হয়, তাকেই বলে আন্বীক্ষিকী। *[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ১.২.১-৩, ১০-১১]*

আন্বীক্ষিকী শব্দটিকে কৌটিল্য যে তর্ক-যুক্তি-বিচারণার পন্থা হিসেবেই নিয়েছিলেন এবং সাংখ্য-যোগ-লোকায়ত ভাবনাও যে কৌটিল্যের কাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে তর্ক-যুক্তি-বিচারণার অর্থেই গৃহীত হত, তার আরও একটি প্রমাণ হল মহাভারতের পূর্বোক্ত শ্লোকগুলির অন্তর্গত আন্বীক্ষিকী শব্দের টীকা। টীকাকার নীলকণ্ঠ আন্বীক্ষিকী শব্দের ব্যাখ্যা করতে বসে বলেছেন —'ঈক্ষা' বলতে বোঝায় প্রত্যক্ষ। যার অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা। প্রত্যক্ষের পরবর্তী প্রবৃত্তি দ্বারা যে দৃষ্টি তৈরি হয়, সেটাই অন্বীক্ষা। নীলকণ্ঠ লিখেছেন—অন্বীক্ষার অর্থ হল ধূম-দর্শনের দ্বারা বহ্নির অনুমিতি। এই প্রত্যক্ষ এবং অনুমানই আন্বীক্ষিকী এবং তর্কবিদ্যার প্রধান চর্চার বিষয়। নীলকণ্ঠ এবার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, কণাদ এবং অক্ষপাদ যে শাস্ত্র রচনা করেছেন, সেটাই আন্বীক্ষিকীর উদাহরণ—

> ঈক্ষা প্রত্যক্ষং তাম্ অনুপ্রবৃত্তা ঈক্ষা অন্বীক্ষা।
> ধূমাদিদর্শনেন বহ্ন্যাদ্যনুমানং
> তৎপ্রধানামান্বীক্ষিকীং
> তর্কবিদ্যাং কণভক্ষাক্ষচরণাদি প্রণীতং শাস্ত্রম্।

[দ্র. নীলকণ্ঠ-কৃত ভারত-ভাবদীপ টীকা: মহা (k) ১২.১৮০.৪৭-৪৯; (হরি) ১২.১৭৪.৪৭-৪৯]

আমাদের উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে সর্বত্রই তখন আন্বীক্ষিকী

তর্ক-যুক্তি-বিচারণার পদ্ধতিগত অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ছিল সাংখ্য–যোগ, ন্যায়, তর্কবিদ্যা, বৌদ্ধ, জৈন এবং লোকায়ত ভাবনাও তখন প্রাথমিকভাবে তত্ত্বান্বেষণের উপায় হিসেবেই চিহ্নিত ছিল।

আন্বীক্ষিকী বিষয়ে কৌটিল্যের বিচার মেনে নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই একে 'systematic' বা 'reasoning' বা 'logic' বলতে চান। *[Paul Hacker, 'Anviksiki', in Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 4, Ed. Larson and Bhattacharya p. 4]*

এই অর্থে 'আন্বীক্ষিকী' বলতে 'দর্শন' না বুঝিয়ে বোঝায় 'হেতুবিদ্যা'। যেমন বিশ্বরূপ 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি'র টীকায় লিখেছেন— 'আন্বীক্ষিকী' হল 'হেতুবিদ্যা' যার মধ্যে তত্ত্বনিরূপণের সম্পূর্ণ এবং সম্যক দৃষ্টি আছে। ন্যায়সূত্রের টীকাকার বিশ্বনাথ বলেছেন কোনো বিষয় শোনার পর সেই বিষয় সম্বন্ধে একটি দৃষ্টি বা বোধ তৈরি হয়। সেই দৃষ্টি বা বোধকে আমরা যখন তর্ক, যুক্তি বা আলোচনার মাধ্যমে আরও উন্নত করে তুলি, তখন সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে আন্বীক্ষিকী বলা যায়। 'ন্যায়', 'তর্ক' ইত্যাদি শব্দের দ্বারাও এই 'আন্বীক্ষিকী' শব্দটাকে বোঝানো যায়। *[যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, বিশ্বরূপকৃত টীকা, ত্রিবেন্দ্রাম গ্রন্থমালা, ১.১০৩]*

মনু যেভাবে প্রায় বিশেষ্য-বিশেষণভাবে আন্বীক্ষিকীকে আত্মবিদ্যার পর্যায়-শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সেই আন্বীক্ষিকী আত্মবিদ্যার ক্ষেত্র থেকে কীভাবে তর্কযুক্তির পর্যায়-শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকল, তার একটা ঐতিহাসিক ধারা নিশ্চয় করার চেষ্টা করেছেন পণ্ডিতেরা। তাঁরা বলেন—উপনিষদ-ব্রহ্মসূত্রাদির মধ্যে যেভাবে আত্মতত্ত্বের পর্যালোচনা হয়েছে, সেইকালে আন্বীক্ষিকী কথাটা আত্মবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেও পরবর্তীকালে এবং সেটা কৌটিল্যের কালের পূর্বেই তর্ক-যুক্তির পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। বিশেষত ন্যায়সূত্রকার বাৎস্যায়ন যেভাবে আত্মবিদ্যার সঙ্গে আন্বীক্ষিকীর পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, তাতে এই কথা আরও বেশি করে প্রমাণিত হয়। বাৎস্যায়ন লিখেছেন—কৌটিল্য-কথিত-ত্রয়ী-বার্তা-দণ্ডনীতি এবং আন্বীক্ষিকী —এই চারটি পৃথক বিদ্যা-প্রস্থান সমস্ত প্রাণীর অনুগ্রহের জন্য উপদিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে 'আন্বীক্ষিকী' হল 'চতুর্থ বিদ্যা' এবং সেটাই 'ন্যায়-বিদ্যা'। সংশয়-তর্ক-যুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে যদি আন্বীক্ষিকীর পৃথক প্রস্থান গড়ে না উঠত, তাহলে 'আন্বীক্ষিকী' বলতে শুধু 'আত্মবিদ্যা' বা 'অধ্যাত্মবিদ্যা'ই বোঝাতো, যেমনটি উপনিষদগুলির মধ্যে আছে। *[মনু সংহিতা ৭.৪৩; ন্যায়দর্শন, বিশ্বনাথ-কৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি ১.১.১]*

প্রধানত ন্যায়ভাষ্যের বচনের নিরিখেই পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তর্ক-যুক্তির দার্শনিক ভাবনার ব্যাপারে আন্বীক্ষিকী-শব্দের প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে ৫৫০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে, যেমন মেধাতিথি গৌতম আন্বীক্ষিকীর মধ্যে তর্ক-যুক্তির তাৎপর্য্য চিহ্নিত করেন একবার আন্বীক্ষিকী শব্দটি স্পষ্ট ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয়বার 'সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে তর্ক-যুক্তিই একমাত্র আশ্রয়'—এই কথা গৌতম জোর দিয়ে বলায় সতীশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে, এইসব সময় থেকেই অন্বীক্ষিকী তর্ক-যুক্তির তাৎপর্যে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, রামায়ণ এবং মহাভারতের সময়ে এটি একটি পৃথক প্রস্থান বা বিদ্যা হিসেবেই গণ্য হতে থাকে। *[Satish Chandra Vidyabhusana, A History of Indian Logic, pp. 4-8]*

প্রাচীন পণ্ডিতদের লেখা থেকে আন্বীক্ষিকী শব্দটি যখন যুক্তি বা বিচারণার অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে এবং আমরা কৌটিল্যকে যখন আন্বীক্ষিকীর পর্যায় শব্দ হিসেবেই—সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত ইত্যাদি শব্দকে উল্লেখ করতে দেখি, তখনও পর্যন্ত সাংখ্য-যোগ ইত্যাদি শব্দ বোধহয় কোন দার্শনিক প্রস্থানে পরিণত হয়নি। এগুলি তখন যুক্তি, তর্ক এবং তত্ত্ব-অন্বেষণের পর্যায় শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, যাকে আমরা ইংরেজিতে মেথডোলজি (methodology) বলতে পারি। কেউ কেউ এই আন্বীক্ষিকীকে 'enumerative principle' ও বলেছেন। *[Larson and Bhattacharya, Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 4, p.6]*

বস্তুত আন্বীক্ষিকী এমন কোনো সাধারণ ভাবনা নয়, যা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানের পর্যায়শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বরং আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থকে এমন পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যার মধ্যে কেবল দর্শনই নয়, রয়েছে যে কোনও ভাবনার অন্বেষণ। একটি

প্রদীপালোকের মত 'আন্বীক্ষিকী' সমস্ত বিষয়কে আলোকিত করে, যে কোনো কর্মধারার উপায় হিসেবেও কাজ করে সমস্ত ধর্মভাবনার প্রধান আশ্রয় হয়—

প্রদীপঃ সর্বশাস্ত্রানাম্ উপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মানাং শশ্বদ্ আন্বীক্ষিকী মতা॥

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kanle) ১.২.১২]

কৌটিল্য যখনই সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত ইত্যাদিকে আন্বীক্ষিকীর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন, তখনই তিনি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে অন্তত তাঁর সময়ে এই শব্দগুলি অনেকটাই তত্ত্ব-অন্বেষণের উপায়শাস্ত্র বা পদ্ধতিশাস্ত্র হিসেবেই বিবেচিত হত। কৌটিল্যের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ন্যায়ভাষ্যের উপরে লেখা বাৎস্যায়নের আন্বীক্ষিকী শব্দের ব্যাখ্যা থেকে। ন্যায়ভাষ্যকার লিখেছেন—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং আগমের দ্বারা পূর্বেই যে বিষয়ের ভাবনা করা হয়েছে, তার পুনর্বিবেচনা বা প্রমাণের দ্বারা সেই বিষয়গুলির সম্যক পরীক্ষাই হল আন্বীক্ষিকী।

[ন্যায়দর্শন, বিশ্বনাথকৃত ন্যায়সূত্রবৃত্তি ১.১.১]

ঠিক এই মুহূর্তে অমরকোষের টীকাকার বৃহস্পতি রায়মুকুটের টীকায় 'সংখ্যা' শব্দটির অর্থ আমাদের স্মরণে আসে। পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দে 'পদচন্দ্রিকা' নামক টীকায় ব্যাখ্যা করার সময় তিনি 'চর্চা', 'সংখ্যা' এবং 'বিচারণার' সাধারণ অর্থগুলি নিবেশ করার পরেই উপসংহারে বললেন—এই তিনটি শব্দই ব্যবহৃত হয় প্রমাণের দ্বারা অর্থনির্ণয়ের ক্ষেত্রে। অন্য পণ্ডিতেরা অবশ্য শুধুমাত্র 'যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা' বা 'বিমর্শ' অর্থেই এই তিনটি শব্দ প্রয়োগ করেন।

[Padachandrika, Amarakosha, Vol. 2. P. 173]

আপ$_১$ জ্যোতিষ্মান দেবতা। অষ্টবসুর অন্যতম। শান্ত, বৈদণ্ড, শাম্ব এবং মুনিবক্র—এই চারজন 'আপ'-এর পুত্র বলে পরিচিত। এঁরা সকলেই যজ্ঞরক্ষার কাজে অধিকারী।

[মৎস্য পু. ৫.২০-২২; কূর্ম পু. ১.১৬.১১-১২]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আপ-র পরিবর্তে 'আয়ু' বা 'আয়' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। বৈতণ্ড, সাম, শান্ত, স্কন্দ, সনৎকুমার—এঁরা সকলেই আয়ু বা আয়-র পুত্র রূপে পরিচিত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.২১, ২৪]

আপ$_২$ অগ্নি যেভাবে জলের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে কথা বলার সময়ে জল মধ্যস্থিত একপ্রকার অগ্নির কথা বলা হয়েছে। পৌরাণিকের ভাবনায় জল মধ্যগত এই অগ্নির নাম 'সহ'। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন 'সহ' একটি সংজ্ঞা-শব্দ। তিনি ভূলোক এবং ভুবর্লোকে একজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তাঁর মুদিতা নামে এক স্ত্রী ছিলেন। তাঁর গর্ভে ভূলোক এবং ভুবর্লোকের অধীশ্বর অপর এক অগ্নির জন্ম দেন। তাঁর নাম মহাভারতের এই স্থানে বলা না হলেও টীকাকারেরা 'সহসস্পুত্রো'স্তুত' এই মন্ত্রবর্ণের প্রমাণে 'সহ' এবং 'অদ্ভুত' এই দুই অগ্নিকে একই বলে মনে করেন। একই এইজন্য যে, 'আপ' এবং 'মুদিতা'র পুত্রকে মহাভারতে 'ভূপতির্ভুবভর্ত্তা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[দ্র. অদ্ভুত]*

[মহা (k) ৩.২২২.১-৩; (হরি) ৩.১৮৫.১-৩; বায়ু পু. ৬.১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৫.১৩১-১৩৫; ১.৬.৫৬-৫৭; ১.২০.১, ৫]

আপ$_৩$ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা ভগবান শিবকে 'ভব, ঈশ' ইত্যাদি আটটি নাম প্রদান করেন। এই আটটি নামের আটটি মূর্তি আছে। 'ভব' দেবের মূর্তির অপর নাম অপ বা জল। ভগবান রুদ্র এখানে জল রূপে অবস্থান করেন—

তদ্বিবেশ ততস্তোয়ং তস্মাদাপো ভবঃ স্মৃতঃ॥

সৃষ্টির আদিতে জলের উৎপত্তি ঘটেছিল। ভব মানে সৃষ্টি এবং বিধাতার প্রথম বা আদি সৃষ্টি যেহেতু জল—আপো এব সসর্জাদৌ মহাদেবও আদিদেব। সেইকারণে পুরাণগুলিতে ভব-এর সঙ্গে জলের ভাবনা মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। তাই কোথাও কোথাও মহাদেবকে 'আপ'ও বলা হয়েছে। *[বায়ু পু. ২৭.২১-২৭]*

আপ$_৪$ মহর্ষি বশিষ্ঠের সপ্তপুত্রের মধ্যে অন্যতম আপ। স্বারোচিষ মন্বন্তরে মহর্ষি বশিষ্ঠের ওই সাতজন পুত্র সপ্ত-প্রজাপতি নামে বিখ্যাত হন। আপ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ৯.৯]*

আপ$_৫$ বায়ু পুরাণ মতে আপ একটি রাক্ষস। তিনি আশ্বিন ও কার্তিক এই দুই মাসে সূর্যরথে বাস করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১৫; বায়ু পু. ৫২.১৫]

আপ$_৬$ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, ধর্মের ঔরসে সুদেবীর গর্ভজাত আটটি পুত্রের মধ্যে আপ একজন। ধর্মের এই আট পুত্র অষ্টবসু নামে প্রসিদ্ধ হন। আপ ওই অষ্টবসুর অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৭১.৪৭]

আপক রাক্ষসদের একটি গণ। বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, এই ক্রূর প্রকৃতির রাক্ষসরা মর্ত্যে ছোটো বালকদের পক্ষে অনিষ্টকারী।

[বায়ু পু. ৬৯.১৯১]

আপগা এই নদীর নামে একটি তীর্থ রয়েছে। মানুষ তীর্থের পূর্বদিকে, একক্রোশ দূরে এর অবস্থান বলে মহাভারতে বলা হয়েছে। মহাপুণ্যস্থান বলে কীর্তিত। পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধের উপযুক্ত পুণ্যস্থান হিসেবেও চিহ্নিত।

পদ্মপুরাণেও এই নদীর অবস্থিতি মহাভারতের মতোই বর্ণিত—আপগা (অপগা) মানুষস্য তীর্থস্য ক্রোশমাত্রে মহীপতে। অপগা (আপগা) নাম বিখ্যাতা নদী সিদ্ধনিষেবিতা।

আপগা বা অপগা নদীর আরেক নাম আপয়া। সম্ভবত কথ্য ভাষার প্রয়োজনে এই রূপান্তর।

ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীর মধ্যভাগ দিয়ে আপগা প্রবাহিত। প্রাচীন কুরুক্ষেত্র-দেশ, যেহেতু সরস্বতী দৃষদ্বতীর অন্তর দেশে অবস্থিত বলা হয়, তাই আপগা নদীও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত বলেই পণ্ডিতদের ধারণা।

মহাভারতের কর্ণপর্বে অপর এক আপগা নদীর উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে মদ্রদেশের রাজধানী শাকল নগরীর মধ্য দিয়ে এই নদীটি প্রবাহিত—

শাকলং নাম নগরম্ আপগা নাম নিম্নগা।

পণ্ডিত কানিংহামের মতে রাভী নদীর পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত আয়ুক বা আয়াক নদীরই আরেক নাম আপগা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আপগা নদীটি বহু পূর্বেই লুপ্ত। পরবর্তীকালে নদীটির লুপ্ত গর্ভে একটি খাত কেটে তার নামকরণ করা হয় আপগয়া।

[ঋগ্‌বেদ ৩.২৩.৪;
মহা (k) ৩.৮৩.৬৭-৬৯; ৮.৪৪.১০;
(হরি) ৩.৬৮.৬৭-৬৯; ৮.৩৪.৭০;
বামন পু. ৩৪.৭, ৩৬.১-৭; পদ্ম পু. (স্বর্গ) ১২.৬৮;
AGI (Cummingham) p. 185;
EAIG (Kapoor) p. 68.
GRI (Bhargava) p. 62-64.]

আপনাপ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে বাষ্কলির অন্যতম শিষ্য আপনাপ। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৬]*

আপব$_১$ একজন মুনি। জলের মধ্যে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। কার্তবীর্য্যার্জুন তাঁর বাসস্থান দগ্ধ করে দেন। ফলে অভিশাপ লাভ করেন।

এক সময় আদিত্য ব্রাহ্মণরূপে কার্তবীর্য্যের কাছে এসে তাঁর তৃপ্তি বিধান করতে বলেন। কার্তবীর্য্য তাঁকে উত্তম ভোজন দিতে চান। আদিত্য কার্তবীর্য্যের কাছে সমস্ত স্থাবর পদার্থ ভোজ্য হিসেবে চান। কার্তবীর্য্য নিজের ক্ষমতার সীমা জানিয়ে সমস্ত স্থাবর পদার্থ দহন করার অক্ষমতা জানালেন। সূর্য তখন তাঁকে অক্ষয় শর প্রদান করেন। কার্তবীর্য্যার্জুন তখন সেই শরপ্রভাবে গ্রাম, নগর, আশ্রম, তপোবন এবং সমস্তই দগ্ধ করে ফেলেন। মহর্ষি আপব জলের মধ্যে তপস্যায় রত ছিলেন। ব্রত সম্পূর্ণ হলে জল থেকে উঠে তিনি দেখলেন—তাঁর বাসস্থান ধ্বংস হয়ে গেছে কার্তবীর্য্যের শরে। তিনি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে কার্তবীর্য্যকে অভিশাপ দেন।

[মৎস্য পু. ২৪.১-১৪]

আপব$_২$ মহর্ষি বশিষ্ঠের অপর নাম। *[দ্র. বশিষ্ঠ]*

আপয়া *[দ্র. আপগা]*

আপবৎস মৎস্য পুরাণ মতে প্রাসাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার সময় যেসব দেবতাকে পূজা করা হয়, তাঁদের মধ্যে আপবৎস অন্যতম।

মৎস্য পুরাণে আপবৎসকে দধি দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ২৫৩.৩১; ২৬৮.২০]

আপলব ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে আন্ধ্রবংশীয় রাজা কৃষ্ণের পুত্র সাতকর্ণী। সাতকর্ণীর পুত্র আপলব। তিনি বারো বছর রাজত্ব করেছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৬৩]

আপস্তম্ব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। দ্বাপর যুগ প্রবৃত্ত হলে নরগণের বুদ্ধি হ্রাস হয়। তখন জনগণ শিবকে পরিত্যাগ করে লোভে আক্রান্ত হয় এবং অধৈর্য্য সম্পন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমশ বর্ণসঙ্কর বাড়তে থাকে এবং বর্ণাশ্রমধর্ম বিধ্বস্ত হয়। এই সমাজের সুশৃঙ্খলা বিধান করার জন্য আপস্তম্ব ধর্মশাস্ত্র রচনা করেন। আপস্তম্বের নামে 'আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র', 'আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র', 'আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রচলিত হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪০.২০৮-২১০]

□ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, ঋষি আপস্তম্ব দিতির জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন।

[মৎস্য পু. ৭.৩৩-৩৪]

আপস্তম্বতীর্থ গৌতমী গঙ্গা বা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র। আপস্তম্ব নামে এক মহাযশস্বী এবং প্রাজ্ঞ ঋষি ছিলেন। তাঁর মাহাত্ম্য ধন্য এই তীর্থটি তাঁর নামানুসারেই আপস্তম্ব তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়েছে।

[ব্রহ্ম পু. ১৩০.১]

আপস্তম্বি$_{১}$ পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আপস্তম্বি সেই গোত্রের অন্যতম। ভৃগু থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও ভার্গব নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৩]

আপস্তম্বি$_{২}$ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আপস্তম্বি সেই গোত্রের অন্যতম। অঙ্গিরা থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও আঙ্গিরস নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৬.১৮]

আপস্থূণ পুরাণে ঋষি বশিষ্ঠর গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আপস্থূণ সেই গোত্রের অন্যতম। বশিষ্ঠ ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও বাশিষ্ঠী নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ২০০.৪]

আপাদবদ্ধ অন্ধ্রবংশীয় শতকর্ণীর পুত্র আপাদবদ্ধ। তিনি চব্বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৯.৩৫১]

আপিকায়নি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আপিকায়নি সেই গোত্রীয়দের অন্যতম। ভৃগু থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও ভার্গব নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৪১]

আপিশী পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আপিশী সেই গোত্রের অন্যতম। ভৃগু থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও ভার্গব নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৪১]

আপীতক অন্ধ্রবংশীয় লম্বোদরের পুত্র আপীতক। তিনি বারো বছর রাজত্ব করেছিলেন।

[মৎস্য পু. ২৭৩.৫]

আপীতকুচা দেবী গৌরী বৎসলা ধাত্রীর মতো সমস্ত মানুষকে স্তন্যদান করেন বলেই তাঁকে আপীতকুচা-রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল) ১.১২.৪২-৪৩]

দেবী পার্বতী অরুণাদ্রির সঙ্গে মিলিত হয়ে আপীতকুচা নামে অভিহিত হয়েছেন। ইনি অরুণাদ্রীশ মহেশ্বরের উত্তর ভাগে তাঁর শক্তিরূপে অবস্থান করছেন। উত্তরায়ণের সময় উপস্থিত হলে দেবী এইস্থানে দেবতাদের কুশলাশ্বাস প্রদান করেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল) ১.৯.৭৬-৭৭; ১.৮.৫২-৫৩; ১.৮.৬৬-৬৭; ১.৯.১০৬-১০৮]

আপূরণ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতের আস্তীক পর্বে সর্পনাম কথনের সময় বৈশম্পায়ন তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। নারদ মাতলির কাছে পাতালের ভোগবতী পুরী বর্ণনা করতে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী যেসব বিশিষ্ট নাগের নাম উল্লেখ করেছেন আপূরণ তাঁদের মধ্যে একজন। বিষ্ণু পুরাণ মতে ভাদ্রমাসে আপূরণ নাগ সূর্যরথে অবস্থান করেন। *[মহা (k) ১.৩৫.৬; ৫.১০৩.১০; (হরি) ১.৩০.৬; ৫.৯৬.১০; বায়ু পু. ৬৯.৭২; বিষ্ণু পু. ২.১০.১০]*

আপোদ্‌ধৌম্য মহাভারতোক্ত বিখ্যাত মুনি। উপমন্যু, আরুণি এবং বেদ নামে তাঁর তিনজন শিষ্য ছিলেন। গুরুভক্তির জন্য এই তিন শিষ্য বিখ্যাত এবং শিষ্যের খ্যাতিই আপোদ্‌ধৌম্যকে বিখ্যাত করেছে। *[দ্র. আরুণি, উপমন্যু, বেদ]*

[মহা (k) ১.৩.২১, ৩৩, ৭৮; (হরি) ১.৩.২৩, ৩৬, ৮২]

আপোনারা ব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণ যেহেতু জলের মধ্যে অনন্তশয্যায় শায়িত ছিলেন, তাই তাঁকে আপোনারা আখ্যা দেওয়া হয়েছে—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

[কূর্ম পু. ১.৬.৪]

আপোমূর্তি মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে আপোমূর্তি অন্যতম। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জাত পঞ্চ আত্রেয়দের একজন।

[বায়ু পু. ২৮.১৮, ২০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.২৩-২৪]

☐ বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে ভবিষ্যৎ দ্বিতীয় মন্বন্তরে যখন ধর্মসাবর্ণি মনু হবেন, তখন যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন তাঁদের মধ্যে আপোমূর্তি অন্যতম। *[বায়ু পু. ১০০.৭৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৭০]*

☐ মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, তৃতীয় সাবর্ণি

মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন আপোমূর্তি তাঁদের মধ্যে একজন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৯৪.১৪]*

আপ্ত একজন নাগ। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের অন্যতম।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ভোগবতী পুরীতে গিয়ে নারদ, মাতলিকে ওই স্থানে বসবাসকারী যেসব বিশিষ্ট নাগেদের নাম করেছেন, তাদের মধ্যে আপ্ত উল্লেখযোগ্য।

[মহা (k) ১.৩৫.৮; ৫.১০৩.১২;
(হরি) ১.৩০.৮; ৫.৯৬.১২]

আপ্তোর্যাম চতুরানন্ ব্রহ্মার পূর্ব মুখ থেকে যেসব প্রধান যজ্ঞকর্মের উদ্ভব হয়, সেগুলির মধ্যে ষোড়শী, উক্থ্য-এর মতো অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যামেরও উদ্ভব হয়।

বিষ্ণু পুরাণে নির্দিষ্টভাবে আপ্তোর্যামের কথা পৃথকভাবে না বললেও ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ থেকে অতিরাত্র যজ্ঞের সৃষ্টির কথা বলায় আপ্তোর্যাম-এর পরোক্ষ উল্লেখ আমরা বুঝে নিতে পারি।

[ভাগবত পু. ৩.১২.৪০; বিষ্ণু পু. ১.৫.৫২-৫৫]

শ্রৌতসূত্রগুলিতে দেখা যাবে যে, বৈদিক সোমযাগের প্রথম রূপটি ভেসে ওঠে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের মধ্যে। সোমযাগের অপর সাধারণ নামটি হল জ্যোতিষ্টোম যাগ। এই একাহ সোমযাগ বা জ্যোতিষ্টোম যাগের সাতটি সংস্থা বা সাধারণভাবে সাতটি প্রকার আছে। সেগুলি হল—অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র আর আপ্তোর্যাম বা অপ্তোর্যাম। পণ্ডিতেরা মনে করেন—প্রাচীন সংহিতা-গ্রন্থগুলিতে আপ্তোর্যাম প্রাথমিকভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল না, হয়তো বা তা পরে সাতটি সোম-সংস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে সপ্তসংস্থাক সোমযাগের প্রকৃতি-যজ্ঞ হিসেবে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞকেই প্রাধান্য দিয়ে বলা হয়েছে—উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যাম যজ্ঞের মূল প্রকৃতি হল অগ্নিষ্টোম—এগুলি সব অগ্নিষ্টোমের বিকার—

অগ্নিষ্টোমস্য গুণ-বিকারাঃ।

এই সূত্রের টীকায় টীকাকার রুদ্রদত্ত লিখেছেন—আপ্তোর্যাম হল এক সর্বাত্মক যজ্ঞ। যাঁর পশু-সম্পদ নষ্ট হয়েছে, হারিয়ে গেছে, তিনি আপ্তোর্যাম যজ্ঞ করে সব ফেরত পেতে পারেন, সব তিনি জয় করতে পারেন—

যস্মাৎ পশবঃ প্রপ্রেব ভ্রংশেরন্
অপ্তোর্যামেণ সর্বমাপ্নোতি, সর্ব জয়তীতি।

যেহেতু এই যজ্ঞ করলে সব পাওয়া যায়, সেই পাওয়া অর্থে 'আপ্' ধাতুর প্রয়োগে আপ্তোর্যাম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আপস্তম্ব সূত্র করেছেন—অপ্তোর্যাম এবং অতিরাত্র যাগের মাধ্যমে সমস্ত কামনার বস্তু লাভ করে যায়—

অপ্তোর্যামেণাতিরাত্রেণ সর্বান্ কামানবাপ্নোতি।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe,
Vol. 2) ১৪.১.১-৪]

বৈদিক একাহ জাতীয় সোমযাগ বা জ্যোতিষ্টোম যাগের সাতটি সংস্থার একতম হল আপ্তোর্যাম নামক এই সংস্থা। পণ্ডিতরা আপ্তোর্যাম নামের সোম-সংস্থাটির বিচার করে দেখিয়েছেন যে, এটি সোমযাগের সপ্তম সংস্থা এবং অন্যান্য একাহ যাগের মতো বা রাজসূয় অশ্বমেধ যাগের মতো এর পৃথক তাৎপর্য্য কিছু নেই, এটা বরং বিরাট সোম যজ্ঞের শেষ কালে ইচ্ছাপূরণ করার জন্য প্রার্থনা। পণ্ডিত **C.G. Kashikar** আপ্তর্যাম-যজ্ঞের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলেছেন—এই যজ্ঞ করতে হয় নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। এই যজ্ঞের 'দেবযজন-ভূমি' এবং নদীর তীরের মধ্যে এইটুকু ফাঁকও থাকবে না, যার মধ্যে দিয়ে কোনো শকট বা রথ যেতে পারে। যাজ্ঞিক পুরোহিত যেন যজ্ঞস্থলে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখতে পান এবং নদীর জলও দেখতে পান। সাধারণত বসন্তকালে আপ্তোর্যাম যজ্ঞ করা হত। যজ্ঞের জন্য শামিয়ানা খাটিয়ে একটা বড়ো জায়গা তৈরি করা হত।

[দ্র. Shobhana Gokhale,
The Pandharpur Stone Pillar
Inscription of the Yadava King Mahadeva,
Saka 1192. In Studies in Indian Archaeology: H. D. Sankalia Felicitation Volume,
Bombay, 1985. P. 48]

আপ্নুবান্ মৎস্য পুরাণ মতে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে পৌলোমীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে আপ্নুবান্ অন্যতম। তিনি ঔর্বের পিতা।

[মৎস্য পু. ১৯৫.১৫]

ভৃগুবংশীয় যেসব গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের নাম মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আপ্নুবান্ একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৫.২৯]*

আপ্য$_১$ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বরূপ ধারণ করে তাঁর পনেরোজন শিষ্যকে যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়েছিলেন বলে শিষ্যরাও 'অশ্ব' নামে অভিহিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আপ্য একজন। *[বায়ু পু. ৬১.২৫]*

আপ্য$_২$ বায়ু পুরাণে যে দিনাশ্রিত মুহূর্তগুলির কথা বলা হয়েছে, আপ্য তাদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৬.৪০]

আপ্য$_৩$ ভাগবত পুরাণ মতে চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতাদের গণগুলির মধ্যে 'আপ্য' অন্যতম। বিষ্ণু পুরাণে 'আপ্য'-র পরিবর্তে 'আদ্য' এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৮.৫.৮; বিষ্ণু পু. ৩.১.২৮]

আপ্যায়ন$_১$ এঁর পিতার নাম প্রিয়ব্রত এবং এঁর পুত্রের নাম যজ্ঞবাহু। এঁর নাম অনুসারে শাল্মলী দ্বীপের একটি বর্ষের নামকরণ করা হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৭.৭৩; দেবীভাগবত পু. ৮.১২.২১; ভাগবত পু. ৫.২০.৯]

আপ্যায়ন$_২$ 'উপসৎ'-নামে একটি বৈদিক যাগ অনুষ্ঠানের সময় সোমলতাকে সজীব রাখার জন্য সোমলতার ওপর জল ছিটানো হয়। এই কাজটার নাম সোমের আপ্যায়ন। পর পর তিন দিন সকাল সন্ধ্যায় এই আপ্যায়ন-কর্ম চলে।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ১১.১.১১ (রুদ্রদত্তের টীকা দ্র.)]

সোমলতাকে উজ্জীবিত রাখার এই আপ্যায়ন-প্রক্রিয়া পরবর্তীকালের পুরাণেও স্মরণ করা হয়েছে, যদিও সোমের অর্থ চন্দ্র ধরেই এখানে আপ্যায়ন-সঞ্জীবনের ভাবনা সম্পন্ন হয়েছে—

এবা সূর্যস্য বীর্য্যেণ সোমস্যাপ্যায়িতা তনুঃ।

[কূর্ম পু. ১.৪২.৩৬]

আরও পরবর্তীকালে অভিবাদন-আমন্ত্রণ, কুশল-প্রশ্ন এবং ভাগ্যবৃদ্ধির কামনার মধ্যে আপ্যায়ন-শব্দের অর্থ-বিভ্রান্তি ঘটেছে। 'আমি পিতৃলোকের প্রসন্নতা চাইছি যাতে আমার তপস্যার বৃদ্ধি হয়'—

'পিতৃপ্রসাদাদিচ্ছেয়ং তপ আপ্যায়নং পুনঃ'।

এখানে বৃদ্ধি অর্থে আপ্যায়ন-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মহাভারতে। প্রীত করা, সন্তুষ্ট করা অর্থে আপ্যায়ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মনুসংহিতায়—অগ্নি, সোম এবং যমদেবকে হবি প্রদানের মাধ্যমে তুষ্ট করে তবে পিতৃপুরুষের তর্পণ করবে। মৎস্য পুরাণে মনুর কথাটাই প্রায় আবৃত্তি করা হয়েছে তিন জায়গায়। একেবারে শেষ শ্লোকে শ্রাদ্ধভাগের আপ্যায়নও তোষণ অর্থেই ব্যবহৃত।

[মহা (k) ৩.৮৩.৩২; (হরি) ৩.৬৮.৩২; মনুসংহিতা ৩.২১১, ২১৩; মৎস্য পু. ১৫.৩২-৪১; ১৬.৩৩; ১৭.৫৮]

আবতী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য আবতী। তিনি শুক্ল যর্জুবেদের প্রবক্তাদের মধ্যে একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.২৯]*

আবন্ত অপরান্ত বা পাশ্চাত্য দেশের অন্তর্গত একটি স্থান। *[দ্র. অবন্তী]*

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৫২]

আবন্ত্য ভাগবত পুরাণ মতে জৈমিনীর শিষ্য সুকর্মা সামবেদকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করেন। সুকর্মার যেসব শিষ্যরা সামবেদের শাখাগুলি তাঁর কাছ থেকে অধ্যয়ন করেন, তাঁদের মধ্যে আবন্ত্য একজন। এই আবন্ত্যেরও আবার পাঁচশত শিষ্য ছিল বলে জানা যায়।

[ভাগবত পু. ১২.৬.৭৬-৭৮]

আবরণ প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্রের বংশধারায় ঋষভের পুত্র ভরত। বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীর গর্ভে ভরতের পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আবরণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ভাগবত পু. ৫.৭.২]

আবর্ত দাক্ষায়ণী সতীকে দেখে ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়-বিকার লাভ করলে উজ্জ্বল দহন-সন্নিভ ব্রহ্মবীর্য্য ভূতলে নিপতিত হল। তারপর এই বীর্য্য থেকে আবর্ত নামে মহাশব্দসম্পন্ন মেঘের সৃষ্টি হয়। এই মেঘ গর্জন করে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করলে মহাদেব দাক্ষায়ণী সতীকে দেখে কামমোহিত হন।

[কালিকা পু. ১১.২৭-৩১]

আবর্তন$_১$ ভাগবত পুরাণ মতে, জম্বুদ্বীপের স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্র, রমণক, পাঞ্চজন্য ইত্যাদি যেসব উপদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে আবর্তন একটি। সগর রাজার পুত্ররা যজ্ঞীয়-অশ্ব অন্বেষণের জন্য পৃথিবীর চারদিক খনন করায় এই উপদ্বীপগুলি সৃষ্টি হয়েছিল।

[ভাগবত পু. ৫.১৯.২৮-২৯]

আবর্তন$_২$ বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩৮; (হরি) ১৩.১২৭.৩৮]

আবর্তমানেভ্যোবপুঃ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। মহাভারতের অন্যান্য সংস্করণে, শিবসহস্রনাম স্তোত্রের এই শ্লোকটিতে 'বপুরাবর্তমানেভ্যঃ' পাঠ ধৃত হলেও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণে 'বসুধা বর্তমানেজ্যো' পাঠ ধৃত হয়েছে। ফলে পণ্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশ 'আবর্তমানেভ্যো বপুঃ' নামের পরিবর্তে বসুধা এবং বর্তমানেজ্য—এই দুটি নাম গ্রহণ করেছেন। আমরা এখানে দুটি পাঠই আলোচনা করব।

'আবর্তমানেভ্যো বপুঃ' নামের অর্থ করতে গিয়ে মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন—

বপুঃ বপুঃ প্রদাতা আবর্তমানেভ্যঃ স্বর্গচ্যুতেভ্যঃ।

এখানে স্বর্গচ্যুত বলতে তাঁদের কথা বুঝতে হবে, যাঁরা এখনও জীবন-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ করেননি। মৃত্যুর পর শরীর ত্যাগ করে এঁরা পরলোকে যান এবং নিজ পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করার পর আবার জন্মগ্রহণ করেন, নতুন শরীর লাভ করেন। যেসব জীবাত্মা এই 'পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্'—এর চক্রে আবর্তন করেন তাঁরাই আবর্তমান। এই আবর্তমান জীবাত্মাকে যিনি পুনর্জন্মের সময় আবার নতুন বপু বা শরীর দান করেন, সেই পরমপুরুষ মহাদেবকেই 'আবর্তমানেভ্যো বপুঃ' নামে সম্বোধন করা হয়।

আমরা কোনো সংস্করণে না পেলেও টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাভারতের এই শ্লোকটির 'বসুরাবর্তমানেভ্যঃ'—এই পাঠান্তরেও উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে—সংসার চক্রে আবদ্ধদের যিনি 'বসু' অর্থাৎ ধন দান করেন—

বসুরিতি পাঠে সেবকেভ্যো ধনপ্রদ ইত্যর্থঃ।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এক্ষেত্রে 'বসুধা' এবং 'বর্তমানেজ্য' এই দুটি নাম গ্রহণ করেছেন। বসুধা নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তবাগীশ বলেছেন—

বসু তেজো দধাতীতি বসুধাঃ।

'বসু' শব্দের একটি অর্থ হতে পারে তেজ বা দীপ্তি। মহাদেব জগতের সমস্ত তেজের আধারস্বরূপ, তেজ বা বসু ধারণ করেন বলেই তাঁর নাম বসুধা। 'বর্তমানেজ্য' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তবাগীশ বলেছেন—

বর্তমানা ইজ্যা পূজা যস্য সঃ।

'ইজ্য' শব্দটি সংস্কৃত 'যজ্' ধাতু থেকে আসছে। যজ্ ধাতুর অর্থ পূজা করা। যিনি পূজিত হন, তাঁকে 'ইজ্য' বলা হয়। সৃষ্টির আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত যিনি পূজিত হয়ে আসছেন—এই অর্থে মহাদেব বর্তমানেজ্য নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১২১; (হরি) ১৩.১৬.১২০]

আবর্তয় হৈহয়জাতি যে পাঁচটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হল আবর্তয়।

[বায়ু পু. ৯৪.৫২]

আবশীরা মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত একটি জনপদ। পূর্বদেশীয় এই জনপদটি কর্ণ জয় করেছিলেন। *[মহা (k) ৩.২৫৪.৯; (হরি) ৩.২১০.১৪ পরবর্তী পাদটীকা দ্র.]*

আবসথ্য মহাভারতে অগ্নির বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'আবসথ্য' অগ্নির কথা বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.২২১.৫; (হরি) ৩.১৮৪.৫]

বৈদিক যজ্ঞে ব্যবহৃত হত এই রকম এক ধরনের ছোট্ট উনুনের মধ্যে সঞ্চিত আগুনই আবসথ্য অগ্নি। ২৫ আঙুল লম্বা, তিন-কোণা এই উনুনটির মধ্যে আগুন আনা হত গার্হপত্য অগ্নি থেকে। আবসথ্য অগ্নিকে রাখা হত সভ্যাগ্নির পূর্ব পাশে। আবসথ-শব্দের অর্থ বাসস্থান, সেটা অথর্ববেদের মন্ত্র থেকে প্রমাণ হয়—

যদ্ আবসথান্ কল্পয়ন্তি। *[অথর্ববেদ ৯.৩.২.৭]*

কিন্তু আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র থেকে মনে হয়—আবসথ প্রধানত অতিথিদের থাকবার জায়গা। আবসথ্য অগ্নিও হয়তো এই অতিথিশালাতেই জ্বালানো থাকত। এই ধারণার হেতু এই যে, সভা বলতে সেকালে প্রথমত দ্যূতসভা বা পাশাখেলার জায়গা বোঝাত এবং সভ্যাগ্নি জ্বলত সেখানেই—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের 'অগ্রেণাহবনীয়ং সভায়াং সভ্যঃ', এই সূত্রের টীকায় রুদ্রদত্ত লিখেছেন—সভা দ্যূতশালা। তত্র সভ্যো'গ্নিরাধেয়ং। ঠিক তার পরের সূত্রে—তং পূর্বেণ আবসথ আবসথ্যঃ—টীকাকার লিখলেন—'আবসথঃ অতিথীনাম্ বাসভূমিঃ' অর্থাৎ আবসথ হল অতিথিদের থাকবার জায়গা, সেখানে আবসথ্য অগ্নিস্থাপন করতে হবে।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ১ম খণ্ড, ৫.৪.৭-৮; পৃ. ২৪৪-২৪৫]

□ আমাদের ধারণা হয়, সভ্যাগ্নির ঠিক পাশেই

আবসথ্য অগ্নি স্থাপন করা হত। সম্ভবত এই কারণেই সভ্যাগ্নির সঙ্গে আবসথ্য অগ্নিও একত্রে আহবনীয় অগ্নির দুই পুত্র বলে বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে। আসলে দ্যূতশালায় সভ্যাগ্নি স্থাপন করা হত, সেই দ্যূতসভার পুব দিকে থাকত দূর-দূরান্ত থেকে দ্যূতক্রীড়া করতে-আসা অক্ষক্রীড়াবিদদের থাকবার জন্য অতিথিশালা। আবসথ্য অগ্নিস্থাপন করা হত সেইখানেই। খোদ এই শ্রৌতসূত্রেই বলা হয়েছে যে, সাধারণ যে কোনো লৌকিক আগুন থেকেই আবসথ্য অগ্নি জ্বালানো যেত, অথবা আহবনীয় কিংবা গার্হপত্য অগ্নি থেকে আগুন এনেও জ্বালানো যেত। কিন্তু আবসথ্যকে দ্যূতকারদের অতিথিশালা বলেই মনে হয়, তাদের সুবিধের জন্যই এই অগ্নিস্থাপন।

[আপস্তম্ব শৌতসূত্র, তদেব, ৫.১৭.১; ৪.২.১]

বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে আবসথ্য অগ্নি 'শংস্য' অগ্নির পুত্র, সভ্য অগ্নির ভাই। শংস্য অগ্নি বস্তুত আহবনীয় অগ্নি। এই আহবনীয় অগ্নি থেকে আগুন নিয়ে আবসথ্য অগ্নি জ্বালানো হত বলেই হয়তো এই পুত্রত্বের কল্পনা—

তথা সভ্যাবসথ্যৌ বৈ শংস্যস্যাগ্নেঃ সুতাবুভৌ।

বায়ু পুরাণের এই সঠিক পাঠটি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সম্পূর্ণ ভুল করে 'সব' এবং 'অপসব্য' বলা হয়েছে। *[বায়ু পু. ২৯.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.১৩ (ভ্রান্তি বোঝার জন্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (Tagare) দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড. ১.১২.১৩; পাদটীকা পৃ. ১১৫]*

আবহ$_১$ মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের যে বায়ুস্তর, যেখানে সূর্যরশ্মি থেকে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়, সেই স্তরটি হল 'প্রবহ'।

এই 'প্রবহ' স্তর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘগুলি পরবর্তী যে স্তরে যায়, সেই স্তরটিই 'আবহ' নামে চিহ্নিত হয়েছে। যার আধুনিক নাম 'ট্রপোস্ফিয়ার'। মহাভারতে এই 'ট্রপোস্ফিয়ার' অঞ্চলটিকেই দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩২৮.৩৬-৩৭; (হরি) ১২.৩১৭.৩৬-৩৭]

☐ মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, 'আবহ'ই বায়ুমণ্ডলের প্রথম স্তর (ট্রপোস্ফিয়ার)।

[মৎস্য পু. ১৬৩.৩২; বায়ু পু. ৬৭.১১৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২২.৩৪; ২.৫.৮২]

☐ স্কন্দ পুরাণে অবশ্য বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তর হিসেবে 'আবহ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৮.৫৫]

আবহ$_২$ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে আবহ একজন। *[বায়ু পু. ৯৬.১১১]*

আবিক্ষি বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগারিষ্টের বংশধারায় করন্ধমের পুত্র আবিক্ষি।

[বায়ু পু. ৮৬.৮]

আবির্হোত্র ঋষভদেবের পুত্রদের মধ্যে আবির্হোত্র একজন। তিনি ভাগবত ধর্মের উপদেশক ছিলেন বলে ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে।

মানুষ কীভাবে মোক্ষলাভ করে পাপমুক্ত অবস্থায় পরমাত্মাতে লীন হতে পারেন—এ সম্পর্কে আবির্হোত্র নিমিরাজাকে উপদেশ দেন।

[ভাগবত ৫.৪.১১; ১১.২.২১; ১১.৩.৪১-৫৫]

আবেদনীয় শিবসহস্রনামস্তোত্রে উচ্চারিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। আবেদন করা বলতে বোঝায় প্রার্থনা জানানো, কিংবা অভিযোগ জানানো। যাঁর কাছে আবেদন করা যায় তিনিই আবেদনীয়। সেক্ষেত্রে ভগবান শিবের আবেদনীয় নামটি তাঁর জগৎপালক, ভক্তবৎসল মূর্তিটিকেই স্পষ্ট করে তোলে। দেব-দানব-মানব সকলের প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেন, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, অভাব-অভিযোগের সমাধানও করেন তিনিই, আশুতোষ মহাদেবের কাছে জীবকুল তাঁদের প্রার্থনা বা অভাব-অভিযোগ নিয়ে অর্থাৎ আবেদন নিয়ে পৌঁছাতে পারেন এবং তিনি সেই আবেদনে সাড়াও দেন—এই ভাবনা থেকে ভগবান শিব আবেদনীয় নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১১৮; (হরি) ১৩.১৬.১১৭]

আবেশক বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে আবেশক, যক্ষদের একটি গণ। *[বায়ু পু. ৬৯.৪০]*

আব্রবন্তী রামায়ণে উল্লিখিত একটি জনপদের নাম। সীতার সন্ধানের জন্য বানরদের যে দলটিকে সুগ্রীব দক্ষিণদিকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের এই আব্রবন্তী অঞ্চলেও সীতার অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

[রামায়ণ ৪.৪১.১০]

☐ পণ্ডিতরা ধারণা করেন যে, রামায়ণে উল্লিখিত আব্রবন্তী এবং বৃহৎ সংহিতায় প্রাপ্ত

আকর অভিন্ন। রামায়ণে প্রাপ্ত শ্লোকে 'আত্রবন্তীমবন্তীঞ্চ' পাঠ থাকতেও বৃহৎ সংহিতায় অবন্তীর সঙ্গে 'আকর'-এর নাম উল্লিখিত হওয়ায় পণ্ডিতদের এই ধারণা দৃঢ় হয়।

গৌতমী বলশ্রীর নাসিক প্রশস্তিতে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রাচীন বিদিশা নগরীই ছিল আকর এবং অবন্তী দেশের রাজধানী। পণ্ডিতদের ধারণা অনুযায়ী এই 'আকর' হল প্রাচীন মালব দেশের পূর্বভাগ, যার নাম ছিল বিদিশা। আকরের অবস্থিতি পূর্বভাগে আর অবন্তী মালবের পশ্চিমভাগে। যিনি সকৌতুকে কাব্য প্রশ্ন করছিলেন—কোথায় দশার্ণগ্রাম রয়েছে লুকায়ে—তাঁকে বিনীতভাবে বলা যায়, আকর দেশই কারো কারো মতে প্রাচীন দশার্ণ। যাকে গোয়ালিয়র রাজ্য বলা হত, সেখানে আধুনিক ভিলসার কাছে বেশনগর অঞ্চলটিই আকর এবং বিদিশার রাজধানী ছিল। বর্তমান উজ্জয়িনী থেকে ৩৬ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত আগর বা অগর নামের জায়গাটিই সম্ভবত প্রাচীন আকর, ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনেও তাই স্বাভাবিক।

[বৃহৎসংহিতা ১৪.১২; Epigraphia Indica, Vol. XXIII, p. 102; GEAMI (Bajpai) p. 11; Bombay Guzetteer, Vol. I, purt I, p. 36]

আভিহোত্র একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মহর্ষি অত্রির গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলি পুরাণে পাওয়া যায়, আভিহোত্র' সেই গোত্রের অন্যতম। অত্রি ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও আত্রেয় বলে পরিচিত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৪]

আভীর$_1$ বৈশ্যার গর্ভে গোপের ঔরসে আভীর জাতির উৎপত্তি। *[বৃহদ্ধর্ম পু. ৩.১৩.৪১]*

আভীর$_2$ সরস্বতী নদী উপত্যকায় বসবাসকারী একটি প্রাচীন জনজাতি। মহাভারত ও পুরাণে শূদ্রদের সঙ্গে একত্রে আভীরদের নাম উচ্চারিত হতে দেখা যায়—

শূদ্রাভীরগণাশ্চৈব যে চাশ্রিত্য সরস্বতীম্।

আভীরদের পঞ্চনদ উপত্যকার অধিবাসী বলেও বর্ণনা করা হয়। আবার পুরাণে এঁদের দাক্ষিণাত্যবাসীও বলা হয়েছে।

নকুল তাঁর দিগ্‌বিজয়ের সময় অপরান্তদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে বসবাসকারী যে সব জনজাতিগুলিকে জয় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আভীর অন্যতম।

[মহা (k) ২.৩২.১০; ১৬.৮.১৭; (হরি) ২.৩১.৯; ১৬.৮.১৮; ভাগবত পু. ১.১০.৩৫; মৎস্য পু. ১১৪.৪০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪৬, ৫৭; ১.১৮.৪৮; বায়ু পু. ৪৫.১১৫]

☐ হৈহয়রাজ কার্তবীর্য্যার্জুনের সেনাবাহিনীতে অনান্য আর্যেতর জনজাতির মানুষদের মতোই আভীররাও ছিলেন। পরশুরামের সঙ্গে কার্তবীর্য্যার্জুনের যুদ্ধের সময় প্রচুর আভীর জাতীয় যোদ্ধা নিহত হন। কিন্তু কার্তবীর্য্যার্জুনের নিধনের পর পরশুরামের ভয়ে ক্ষাত্রধর্মীয় আভীররা নিজেদের প্রাণরক্ষার তাগিদে পালাতে গিয়ে যুদ্ধে মৃত স্বজাতির মানুষদের শেষকৃত্য করতে পারেননি। সেই অপরাধেই ক্ষত্রিয় আভীররা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

[মহা (k) ১৪.২৯.১৬; (হরি) ১৪.৩৪.১৬]

☐ শল্য পর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, পবিত্র সরস্বতী নদী শূদ্র ও আভীরদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে (ভূমির নীচে) অদৃশ্য হয়েছেন। সরস্বতী যে স্থানে অদৃশ্য হয়েছেন সেটির নাম বিনশন তীর্থ। বলরাম একবার বিনশন তীর্থ দর্শন করেছিলেন—

তত্যে বিনশনং রাজন্ জগামাথ হলায়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাদ্ যত্র নষ্টা সরস্বতী॥

পণ্ডিতরা অনেকেই একে একটি মহাকাব্যিক কৌশল বলেই বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন সরস্বতী নদী তার প্রবাহ পথে বহুবার নানা কারণে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে আবার দৃশ্যমান হয়েছে। সরস্বতী নদী উপত্যকার সঙ্গে ভারতবর্ষের আর্যায়ণের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সরস্বতী নদীর ক্রম অবলুপ্তির কারণেই আর্যরা পূর্বমুখী হয়ে সিন্ধু ও পঞ্চনদ পার হয়ে গঙ্গা অববাহিকা তথা সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েন। অন্যদিকে সরস্বতী নদী উপত্যকায় এককালের আর্যসভ্যতা লালিত জনপদগুলি আর্যেতর জাতিদের দ্বারা অধিকৃত হতে থাকে। আভীর তেমনই এক আর্যেতর হীন জনজাতি বিশেষ। বিনশন নামে যে অঞ্চলটির কথা মহাভারতে পাওয়া যায়, আভীররা সম্ভবত সেখানে বসবাস শুরু করেন সরস্বতী নদী অদৃশ্য

হওয়ার পর। মহাকাব্যকার কৌশলে আভীর বসতি গড়ে ওঠা ও সরস্বতীর অদৃশ্য হওয়াকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। *[দ্র. বিনশন, সরস্বতী]*

[মহা (k) ৯.৩৭.১-২; (হরি) ৯.৩৫.১-২]

☐ সভাপর্বের একটি শ্লোকে আভীর জনজাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে এঁদের জন্ম এবং পরবর্তীকালে নদী তীরবর্তী অথবা বর্ষণপ্রবণ স্থানে ধান চাষ করে এঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন—

ইন্দ্রকৃষ্টৈর্বর্তয়ন্তি ধান্যৈর্যে চ নদীমুখৈঃ।
সমুদ্রনিষ্কুটে জাতাঃ পারেসিন্ধু চ মানবাঃ॥

এ থেকে বোঝা যায় আভীররা জাতিগত ভাবে কৃষিজীবী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্ববৈদিক যুগে সরস্বতী নদী অববাহিকায় কৃষিকাজের প্রমাণ আধুনিক পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেছেন।

তবে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত আভীররা পাণ্ডবদের জন্য যে সব উপহার এনেছিলেন তা দেখে এঁদের কৃষিজীবী বলে মনে করা কঠিন। আভীররা পাণ্ডবদের জন্য গোরু, মেষ, উট, গাধা ইত্যাদি পশু, মূল্যবান রত্ন, সুরা এবং নানা ধরনের কম্বল উপহার হিসেবে এনেছিলেন। উপহারের প্রকৃতি দেখে মনে হতে পারে আভীররা পশুপালক যাযাবর জনজাতি। অবশ্য উপহারের তালিকায় গো-সম্পদের উল্লেখ কৃষিকার্যের ইঙ্গিতবাহী বটে।

[মহা (k) ২.৫১.১১-১৩; (হরি) ২.৪৯.৮-১০; Sir W.W. Hunter: The Indian Empire; London; Trubner & Co. Ludgate Hill; 1882; p. 51]

☐ ভীষ্মপর্বে আভীর জাতি তথা আভীর জাতি অধ্যুষিত দেশের উল্লেখ পৃথক পৃথক ভাবে দু-বার পাওয়া যায়। প্রথমটি—বাহ্লীক, বাটধান ইত্যাদি দেশ-নামের সঙ্গে। দ্বিতীয়টি—ভারতবর্ষের উত্তরদিকে বসবাসকারী হিংস্র ম্লেচ্ছ জাতিদের তালিকায়। অর্থাৎ একবার আভীরদের উত্তর ভারত আর একবার বাহ্লীক সংলগ্ন অর্থাৎ পশ্চিম দিকে বসবাসকারী বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। এ সমস্যার মীমাংসা করতে গিয়ে উইলসন জানিয়েছেন, মহাভারতের কালে সিন্ধুনদ উপত্যকা থেকে শুরু করে একদিকে সুরাট ও অন্যদিকে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কখনো পশ্চিম দিকের অঞ্চল আবার কখনো উত্তরাঞ্চল বলে বর্ণনা করা হত। বিষয়টা নির্ভর করতো আসলে সেকালের পণ্ডিতজনেরা নিজে কোন স্থানে অবস্থান করছেন তার উপর। আভীর জাতির ক্ষেত্রেও সেই একই চিন্তারীতি অনুসৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

পণ্ডিত B.C. Law -এর মতে আভীররা প্রাথমিকভাবে পশ্চিম প্রান্তে বাস করলেও কালক্রমে এঁরা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে নানা জায়গায় বাস করতে শুরু করেন। মনে করা হয় আধুনিক যুগের আহীর (Āhbīra) জনজাতিটি আসলে প্রাচীন আভীরদেরই উত্তরসূরী। পরবর্তীকালে নেপাল, রাজস্থানের কিছু অংশে এবং বিহার তথা মধ্যভারতেও আভীর বসতির সন্ধান পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৬.৯.৪৭, ৬৭; (হরি) ৬.৯.৪৭, ৬৭; বিষ্ণু পু. (উইলসন) p. 133, 167, 184; বায়ু পু. ৪৫.১২৬; TAI (B.C. Law) p. 79]

মৌষলপর্বে আভীর জাতি সম্পর্কে একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে। প্রভাস তীর্থে যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন দ্বারকা থেকে অবশিষ্ট যদুবংশীয় স্ত্রীলোকদের নিয়ে হস্তিনাপুর যাওয়ার পথে আভীর দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এ সময় আভীররা শুধু ধন-সম্পত্তিই নয় বহু যদুবংশীয় মহিলাদেরও হরণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১৬.৭.৪৭-৬৩; (হরি) ১৬.৭.৪৭-৬৬; বিষ্ণু পু. ৫.৩৮.১৪-২৮, ৫০-৫২]

☐ বনপর্বে বলা হয়েছে, কলিযুগে হীন আভীর জাতীয়রা পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে দশজন আভীর জাতীয় রাজা সাতষট্টি বছর রাজত্ব করবেন।

আবার ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে আভীর দেশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা সংস্কারচ্যুত হয়ে পড়বেন। সে যুগে আভীর জাতীয় রাজপুরুষদের আচরণও হবে শূদ্রের মতো।

[মহা (k) ৩.১৮৮.৩৬; (হরি) ৩.১৫৯.৩৬; বায়ু পু. ৯৯.২৬৭; মৎস্য পু. ৫০.৭৬; ২৭৩.১৮; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.১৮; ভাগবত পু. ১২.১.৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৭৪]

☐ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আভীররা কৌরব পক্ষে যোগদান করেছিলেন।

[মহা (k) ৭.২০.৬; (হরি) ৭.১৮.৮]

☐ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে শ্রীহরি যখন

নিধন করেন তখন অসুররাজের দেহ মাটিতে প্রবল আঘাত করে মাটিতে পতিত হয়। তাঁর দেহের ভারে বহু জনপদ ও জলভাগ প্রবলভাবে কম্পিত হয়। সেই জনপদগুলির মধ্যে আভীর জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলও অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৬৩.৭২]

আভূতরজ রৈবত মন্বন্তরে দেবতাদের গণগুলির মধ্যে অন্যতম আভূতরজ। *[মৎস্য পু. ৯.২০]*

আভ্যন্তর শৌচ *[দ্র. শৌচ]*

আভ্যুদয়িক যা করলে মানুষের মঙ্গল এবং উন্নতি হয়। বিবাহ, জাতকর্ম, চূড়াকরণ, মৌঞ্জীবন্ধনাদি, প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠা, ধ্বজারোপণ, দেবপ্রতিষ্ঠাদি, বাপী (পুষ্করিণী), কূপ এবং তড়াগের উৎসর্গকর্ম, গৃহ এবং বাস্তুপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যাতেই ষোড়শ মাতৃকাপূজা হয়ে থাকে সেগুলিই আভ্যুদয়িক বলে কথিত। *[পদ্ম পু. (ভূমি) ৩৯.৮০-৮৩]*

আম$_১$ পিতার নাম প্রিয়ব্রত। এঁর পুত্রের নাম ঘৃতপুষ্টি। এঁরই নামে ক্রৌঞ্চদ্বীপের একটি বর্ষের নামকরণ করা হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৫৭.৬৮]

আম$_২$ পিতা ঘৃতপৃষ্ঠ। ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সাত ভাগে ভাগ করে পুত্রদের নামানুসারে বর্ষগুলির নামকরণ করেন। আমবর্ষ এই বর্ষগুলির অন্যতম। *[দেবীভাগবত পু. ৮.১৩.৭-৮]*

আমগর্ভ সকলের প্রিয়কামনায় পিণ্ডদানের প্রসঙ্গে যাঁরা নিজের গোত্র-প্রবরের অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের জন্য পিণ্ডদানের প্রসঙ্গে 'আমগর্ভ'-দেরও পিণ্ডদান অথবা তর্পণের উদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'আম' অর্থ অপক্ক, কাঁচা। আমগর্ভ অর্থ—যে ভ্রূণ শারীর পরিণতি লাভ না করেই মায়ের গর্ভস্রাব-বশত বিনষ্ট হয়েছে তার জন্য পিণ্ড দান—

বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥

[বায়ু পু. ১১০.৫৩]

আমরথ প্রাচীন ভারতের একটি জনপদের নাম।

[মহা (k) ৬.৯.৫৪; (হরি) ৬.৯.৫৪]

আমলক এই বৃক্ষের সর্ববিধ, অভীষ্টদানের সামর্থ্য আছে। এই তীর্থে গমন করলে অভীষ্ট ফল লাভ হয়। *[বরাহ পু. ১৪৮.৬৭-৭১]*

বরাহ পুরাণ অনুযায়ী এটি উত্তর প্রদেশের স্তুত-স্বামী নারায়ণের মন্দিরের নিকটে অবস্থিত। তীর্থসার অনুযায়ী স্থানটি সহ্যাদ্রি পর্বতের ব্রহ্মগিরি ও ভেদগিরি শৃঙ্গের মাঝখানে অবস্থিত। *[তীর্থসার পৃ. ৭৮]*

আমলকী এক সময়ে প্রভাস তীর্থে ব্রহ্মা, মহাদেবের সঙ্গে পার্বতী, নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মী এবং অন্যান্য দেবতারা তথা শিবানুচরগণ পরস্পর মিলিত হয়ে পরস্পরের দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। এই সময়ে লক্ষ্মী এবং পার্বতী—দু-জনের মনেই ইচ্ছা হল যে তাঁরা ভগবান নারায়ণ এবং শঙ্করকে স্বকল্পিত দ্রব্যে অর্থাৎ স্বসৃষ্ট দ্রব্যের দ্বারা পূজা করবেন। ঠিক তখনই দুই দেবীর চোখ থেকে অমল আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল ভূমিতে। এই অমল অশ্রুজল থেকেই অমলপ্রভ আমলকী বৃক্ষের জন্ম হয় এবং অমল শব্দ থেকেই এই বৃক্ষের ফলের নাম আমলকী। তুলসী এবং বিল্ব বৃক্ষের সমস্ত গুণই এতে বর্তমান। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীতে হরিহররূপী পবিত্র এই বৃক্ষের পাতা দিয়ে হরি এবং হর উভয়েই পূজিত হন।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ১.১২.৩-৩৫]

আমবর্ষ *[দ্র. আম$_২$]*

আমশ্রাদ্ধ *[দ্র. আমান্নশ্রাদ্ধ]*

আমা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচরী মাতৃকাগণের অন্যতমা। *[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩০.৬৬]*

আমান্ন সাধারণত রান্না না করা, কাঁচা সবজিকে আমান্ন বলে। 'আম' মানে কাঁচা। শ্রাদ্ধমন্ত্রে কাঁচা তরি-তরকারি, গোটা সবজিকে বলা হয় 'আমান্ন-ভোজ্যম্'। শ্রাদ্ধকালে শূদ্রবর্ণের জন্য দান হিসেবে কাঁচা তরি-তরকারি দান করার বিধান, সেটাকেই আমান্ন-শ্রাদ্ধ বলে। সন্ন্যাসীর পক্ষে-মধু-মাংসের মতো আমান্ন শ্রাদ্ধভোজন-ও পরিত্যাজ্য।

[দ্র. আমান্নশ্রাদ্ধ]

[বায়ু পু. ১৮.২০; মৎস্য পু. ১৭.৭০-৭১]

আমান্নশ্রাদ্ধ এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রার সময়, পুত্রজন্মকালে, পুরোহিত না থাকলে, রান্নার ব্যবস্থা না থাকলে, স্ত্রী যদি রজস্বলা থাকেন, সেই অবস্থায় আমশ্রাদ্ধ বা আমান্নশ্রাদ্ধ করা বিধেয়।

[দ্র. আমান্ন]

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ২০৬.৫২]

আমোহক পদ্মপুরাণোক্ত তীর্থ। অন্য নাম ঔত্তম তাপসেশ্বর। *[দ্র. তাপসেশ্বর]*

[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৯.১০৪.১০৬]

আম্বিকেয়$_১$ সোমক পর্বতের নিকটে অবস্থিত পুরাণোক্ত পর্বত। অন্য নাম সুমনা। শোনা যায়,

এই পর্বতেই ভগবান বরাহদেব দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে নিহত করেছিলেন। *[দ্র. সুমনা]*

[মৎস্য পু. ১২২.১৬]

আম্বিকেয়$_2$ কাশীরাজকন্যা অম্বিকার পুত্র বলে ধৃতরাষ্ট্রকে আম্বিকেয় বলা হয়েছে।

[দ্র. অম্বিকা ও ধৃতরাষ্ট্র]

আম্বিকেয়$_3$ শাকদ্বীপের একটি পর্বত। বিষ্ণু পুরাণের অপর একটি পাঠে 'আম্বিকেয়'-এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৪৯.৮৪; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম) ২.৪.৬২;
বিষ্ণু পু. (নবভারত) ২.৪.৬৩]

আম্রতক *[দ্র. একাম্রক]*

আম্রাতকেশ্বরতীর্থ কূর্মপুরাণোক্ত পুণ্য তীর্থ। ভদ্রেশ্বর তীর্থ থেকে যেতে হয়।

[কূর্ম পু. ২.৩৯.৪-৫]

আম্রাতক তীর্থে সূক্ষ্মনাসিকা নামে দেবীর অবস্থান। *[দেবীভাগবত পু. ৭.৩৮.২২]*

আয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতাদের গণগুলির মধ্যে তুষিত একটি গণ। এই তুষিতগণের অন্তর্ভুক্ত দেবতা হলেন আয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১১]

আয়তায়ন পুরাণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের গোত্রভুক্ত যে ঋষি-বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আয়তায়ন সেই গোত্রের অন্যতম। বিশ্বামিত্র ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও কৌশিক নামে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৮.৩]*

আয়তি$_1$ ভাগবত পুরাণ মতে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা (ধাতৃ ও বিধাতৃ) নামে দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মেরুর দুই কন্যা আয়তি এবং নিয়তিকে যথাক্রমে ধাতা ও বিধাতা বিবাহ করেন।

আয়তির গর্ভে ধাতার মৃকণ্ড নামে এবং নিয়তির গর্ভে বিধাতার প্রাণ নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে যে, 'প্রাণ'-ই আয়তি ও ধাতা (ধাতৃ)-র পুত্র।

[ভাগবত পু. ৪.১.৪৩-৪৪; বিষ্ণু পু. ১.১০.৩]

□ বায়ু পুরাণের একটি বিবরণে বলা হয়েছে যে, আয়তি বিধাতার ভার্য্যা। বিধাতার ঔরসে আয়তির গর্ভে পাণ্ডু নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

বায়ু পুরাণেরই অপর একটি বিবরণে আবার বলা হয়েছে যে, মেরুর ঔরসে ধারণীর গর্ভজাত কন্যাদের অন্যতম আয়তি এবং তিনি ধাতার পত্নী। *[বায়ু পু. ২৮.৪; ৩০.৩৪]*

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও একটি পাঠে বলা হয়েছে যে, মেরু-কন্যা আয়তি বিধাতার পত্নী ও প্রাণ-এর জননী। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেরই অপর একটি পাঠে উল্লেখ আছে যে আয়তি ধাতার পত্নী।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.৫-৬; ১.১৩.৩৭]

'আয়তি' শব্দের আভিধানিক অর্থ ভবিষ্যৎ। পুরাণে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই মনে হয়।

আয়তি$_2$ নহুষের ছয় পুত্রের অন্যতম। যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি ও কৃতি—এই ছয়জন নহুষের পুত্র।

বায়ু পুরাণে 'আয়তি'-র পরিবর্তে 'আয়াতি' এবং বিষ্ণু পুরাণে 'অযাতি' উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৯.১৮.১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.১২;
বায়ু পু. ৯৩.১৩; বিষ্ণু পু. ৪.১০.১]

আয়াতি রাজা যযাতির ভাই। নহুষের পুত্র।

[মহা (k) ১.৭৫. ৩০; (হরি) ১.৬৩.৩৩]

আয়াপ্য পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, 'আয়াপ্য' সেই বংশের অন্যতম। অঙ্গিরা ঋষি থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এরা আঙ্গিরস নামে পরিচিত হয়েছে।

অঙ্গিরা বংশীয় যে তেত্রিশজন ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আয়াপ্য অন্যতম।

[বায়ু পু. ৫৯.১০১]

আয়ু$_1$ পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে আয়ু অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বায়ু পুরাণ, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, পুরূরবা ও উর্বশীর ছয় পুত্রের মধ্যে আয়ু জ্যেষ্ঠ। মৎস্য পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে উর্বশী ও পুরূরবার আটজন পুত্রের মধ্যে আয়ু জ্যেষ্ঠ। বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, উর্বশীর পুত্র বলে আয়ু ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা গন্ধর্ব রূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৭৫.২৪; ৩.১৭৯.১৩;
(হরি) ১.৬৩.২৭; ৩.১৫০.১১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.২২;
বায়ু পু. ১.১৯২; ৯১.৫১-৫২; বিষ্ণু পু. ৪.৭.১;
ভাগবত পু. ৯.১৫.১; মৎস্য পু. ২৪.৩৩-৩৫]

□ মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বর্ভানু বা রাহুর কন্যা স্বর্ভানবীর (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে প্রভার) গর্ভে নহুষ, গয়, বৃদ্ধশর্মা, রজি এবং অনেনা নামে আয়ুর পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণেও আয়ুর পাঁচ পুত্র হিসেবে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজী ও অনেনা-র নামোল্লেখ করা হয়েছে। বায়ু পুরাণের অপর একটি পাঠে বলা হয়েছে যে, অমাবসু আয়ুর পুত্র। তবে মৎস্য পুরাণে 'ক্ষত্রবৃদ্ধ'-র পরিবর্তে 'বৃদ্ধশর্মা', অনেনার পরিবর্তে 'বিপাপ্ম' এবং 'রম্ভ'-র পরিবর্তে 'দম্ভ'—এই নাম ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্ম পুরাণে আয়ুর পত্নী হিসেবে অবশ্য 'ইন্দুমতী'—এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৭৫.২৫; (হরি) ১.৬৩.২৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.১-২;
ভাগবত পু. ৯.১৭.১; বিষ্ণু পু. ৪.৮.১;
বায়ু পু. ৭৩.৫; মৎস্য পু. ২৪.৩৪-৩৫;
পদ্ম পু. (ভূমি খণ্ড) ১০৩-১০৪ অধ্যায়]

□ লোকহিতের কারণে ব্রহ্মার সৃষ্ট প্রথম তরবারি ভগবান শিব বিষ্ণুকে দান করেন। বিষ্ণু আবার সেই তরবারি মরীচিকে দান করেন। এইভাবেই পরম্পরাক্রমে পুরূরবার হাতে ওই তরবারি আসে। পুরূরবার থেকে আয়ু এবং আয়ুর থেকে নহুষ ওই তরবারি লাভ করেন। শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যে, তপস্যা দ্বারা যাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আয়ু ছিলেন অন্যতম।

[মহা (k) ১২.১৬৬.৭৪; ১২.২৯৬.১৫;
(হরি) ১২.১৬১.৭৫; ১২.২৮৯.১৫]

□ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে যেসব রাজা কার্তিক মাসে বা শুক্লপক্ষে মাংস বর্জন করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইসব রাজাদের মধ্যে আয়ু অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১১৫.৬৮; (হরি) ১৩.১০০.৯৭]

□ দেবরাজ ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে আয়ু রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র নহুষ দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হন।

[দ্র. নহুষ]

[মহা (k) ১২.৩৪২.৪৪; (হরি) ১২.৩২৮.১২৮]

□ অনুশাসন পর্বে যেসব প্রাতঃস্মরণীয় রাজাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, আয়ু তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৫৬; (হরি) ১৩.১৪৩.৫৪]

আয়ু$_{২}$ ভেক-জাতির রাজা আয়ু। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে আয়ু-র কন্যা 'সুশোভনা'-র বিবাহ হয়। সুশোভনা পরীক্ষিতের পূর্বে বহু রাজার সঙ্গে প্রতারণা করেন। কন্যার এই কু-স্বভাবের কথা জানতে পেরে আয়ু রাজা পরীক্ষিতের হাতে সুশোভনাকে সমর্পণ করেন এবং তাঁর অপরাধের জন্য তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, সুশোভনার পুত্ররা ব্রাহ্মণের অহিতকারী হবেন। *[মহা (k) ৩.১৯২.৩২-৩৫;*
(হরি) ৩.১৬২.৩৫-৩৮]

আয়ু$_{৩}$ ভাগবত পুরাণ অনুসারে অষ্টবসুর অন্যতম প্রাণ। প্রাণের ঔরসে উর্জস্বতীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে আয়ু অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৬.৬.১২]*

আয়ু$_{৪}$ যদু বংশধারায় অনুর পুত্র পুরুহোত্র। আয়ু এই পুরুহোত্রের পুত্র এবং সাত্বতের পিতা।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৬]

আয়ু$_{৫}$ ভদ্রার গর্ভে কৃষ্ণের যে দশজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে আয়ু একজন।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৭]

আয়ু$_{৬}$ একজন ঋষি। তিনি সূর্যরথে অবস্থান করেন।

[ভাগবত পু. ৯.১১.৪২]

আয়ু$_{৭}$ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, মরীচি-র কন্যা সুরূপা-র গর্ভে ঋষি অঙ্গিরার যে দশজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে আয়ু একজন।

[বায়ু পু. ৬৫.১০৫]

আয়ু$_{৮}$ একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। কৃষ্ণ যর্জুবেদের চরক শাখার অন্তর্ভুক্ত যেসব ঋষিরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আয়ু অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১৩]*

আয়ু$_{৯}$ একজন অগ্নি। 'আয়ু' কথাটির আভিধানিক অর্থ 'প্রাণ-শক্তি'। যে অগ্নি পশু শরীরে প্রাণ-শক্তি রূপে বিরাজমান, তাকেই পুরাণগুলিতে 'আয়ু-অগ্নি' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, আয়ু-অগ্নি শুচি-অগ্নির পুত্র এবং মহিমান্-এর পিতা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে 'আয়ু-অগ্নি' মহিষ-এর পিতা।

[বায়ু পু. ২৯.৩৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.৩৮-৪০]

আয়ু$_{১০}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার নীলকণ্ঠ 'আয়ু' শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন—আয়ুর্জীবনকালঃ। আয়ু শব্দের আভিধানিক অর্থ জীবনকাল। আবার 'আয়ু' শব্দটি

প্রাণ বা প্রাণশক্তির দ্যোতকও বটে। ঈশ্বর জীবদেহে প্রাণ সঞ্চার করেন বলে তিনি প্রাণস্বরূপ এবং জীবনকালের স্বরূপও বটে। এই দুই অর্থেই মহাদেব আয়ু নামে কীর্তিত হন। শিব-মহাদেবকে বিভিন্ন সময় অগ্নির সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। পুরাণে আয়ু নামে অগ্নির উল্লেখ পাই (আয়ু$_{১}$) যিনি পশু শরীরে প্রাণশক্তি রূপে বিরাজমান। আয়ু অগ্নির স্বরূপ বলেও মহাদেব আয়ু নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯৮; (হরি) ১৩.১৬.৯৮]

আয়ুধী শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। 'আয়ুধ' শব্দের আভিধানিক অর্থ অস্ত্র। যিনি অস্ত্র ধারণ করেন তিনি আয়ুধী। টীকাকার নীলকণ্ঠ 'আয়ুধী' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

আয়ুধং স্বস্যাধারণং শূলং তদ্বান্ শূলীত্যর্থ।

বিভিন্ন পুরাণে মহাদেবের যে দশভুজ মূর্তি কল্পিত হয়, সেখানে তাঁর দশ হাতে নানা প্রকার দিব্য অস্ত্রশস্ত্র কল্পনা করা হয়। শূল, পাশুপত, পিনাক ধনুক প্রভৃতি অসাধারণ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেন বলেই মহাদেব আয়ুধী নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪৩; (হরি) ১৩.১৬.৪৩]

আয়ুর্দা মেধাতিথি শাকদ্বীপকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি বর্ষে একটি করে মহানদী আছে। আয়ুর্দা নামক মহানদী মনোজব বর্ষে প্রবাহিত। *[দেবীভাগবত পু. ৮.১৩.২২-২৩; ভাগবত পু. ৫.২০.২৬]*

আয়ুর্দান ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতাদের গণগুলির মধ্যে পারাবত একটি গণ। এই পারাবত গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতা হলেন আয়ুর্দান। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১৪]*

আয়ুর্বেদ ভগবান বিষ্ণু ধন্বন্তরি অবতার-স্বরূপে আয়ুর্বেদ প্রকাশ করেন। *[বৃহদ্ধর্ম পু. ২.১১.৬৮]*

আয়ুষ্মতী অপ্সরাদের পবিত্র চতুর্দ্দশ গণের মধ্যে 'আয়ুষ্মতী'গণ একটি। সূর্য থেকে এই আয়ুষ্মতী গণের উৎপত্তি ঘটেছে বলে বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে। *[বায়ু পু. ৬৯.৫৫]*

আয়ুষ্মত্য *[দ্র. আয়ুষ্মতী]*

আয়ুষ্মান্$_{১}$ মৎস্য পুরাণ অনুসারে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র। *[মৎস্য.পু. ৬.৯]*

☐ বিষ্ণু পুরাণ মতে সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান। *[বিষ্ণু পু. ১.২১.১]*

আয়ুষ্মান্$_{২}$ ভাগবত পুরাণ অনুসারে ভবিষ্যৎ নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণি মনুর কালে ঋষভদেবের পিতা আয়ুষ্মান্। ভগবান বিষ্ণু আয়ুষ্মানের ঔরসে অম্বুধারার গর্ভে ঋষভদেব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। *[ভাগবত পু. ৮.১৩.২০]*

আয়ুষ্মান্$_{৩}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে রাজা উত্তানপাদের ঔরসে সুনৃতার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৮৯]

আয়োগব মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বর্ণসঙ্করগুলির বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, শূদ্র-পুরুষের ঔরসে বৈশ্যা-স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানরা 'আয়োগব' বলে চিহ্নিত হয়েছে। এরা নিজ শ্রম দ্বারা উপার্জনক্ষম তক্ষা বা ছুতোর। ব্রাহ্মণরা এদের দান গ্রহণ করেন না—

শূদ্রাদায়োগবশ্চাপি বৈশ্যায়াং গ্রাম্যধর্ম্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈরপ্রতিগ্রাহ্যস্তক্ষা স্বধনজীবনঃ॥

আবার বৈদেহ পুরুষ থেকে সৈরিন্ধ্রীর গর্ভজাত সন্তানও 'আয়োগব' বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা সমাজে ব্যাধ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন।

বৈদেহরা বৈশ্য পুরুষ ও ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান। তাঁরা অন্তঃপুরের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত হতেন। এই বৈদেহ পুরুষ ও আয়োগবী স্ত্রীর সন্তানরা তিনটি বর্ণে বিভক্ত—ক্ষুদ্র, অন্ধ ও কারাবর। হীনবর্ণ বলে তাঁরা গ্রামের বাইরে বাস করার যোগ্য বলে বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.৪৮.১৩; ১৩.৪৮.১৯, ২০; ১৩.৪৮.২৫; (হরি) ১৩.৪০.১৩; ১৩.৪০.১৯, ২০; ১৩.৪০.২৫]

আরট্ট সাধারণত পঞ্চনদীর তীরস্থিত পঞ্জাব অঞ্চলকেই আরট্ট বলা হয়। মহাভারতের কালে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই আরট্টবাসীদের সঙ্গে পঞ্চনদীর তীরবাসী সকলকেই ধিক্কার জানানো হয়েছে—

আরট্টানাং পঞ্চনদান্ ধিগস্তু।

মহাভারতে অনেক সময়েই আরট্টদের সঙ্গে বাহীকদের এক করে দেখা হয়েছে—

আরট্টা নাম বাহীকাঃ।

বলা হয়েছে—আর্য পুরুষ যেন এই আরট্ট দেশে দু-দিনও না থাকেন, কেননা বাহীকদের বসতিস্থল এই আরট্ট-দেশের জলে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল একত্রে স্নান করে। আর্যপুরুষের কোনো মহিমা

থাকে না সেখানে। কোনো অবস্থায় যেন ভদ্র মানুষ আরট্ট-দেশে না যায়।

[মহা (k) ৮.৪৫.৩০, ৩৮; ৮.৪৪.৩৮, ৪১, ৪৫; (হরি) ৮.৩৪.১৩৫, ১৪৫; ৮.৩৪.৯৭, ১০০, ১০৪]

আরট্ট দেশ আর আরট্টদেশের জনজাতি একই কিনা, কিংবা আরট্টদেশের মানুষদেরই বাহীক বলা হত কিনা, সেটা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বিতর্ক আছে, যার মীমাংসা হয়নি। কিন্তু মহাভারতে আরট্টীয় জনজাতি বাহীকদের সঙ্গে একাত্মক, আবার আরট্ট-বাহীকদের মতোই বাহীকদের একাত্মক করে দেখা হয়েছে জর্তিক জনজাতির সঙ্গে—

জর্তিকা নাম বাহীকাস্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতম্।

মহাভারতের প্রমাণে B.C. Law বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, আরট্ট, বাহীক কিংবা জর্তিক, এঁদের সকলেরই বাস যেখানে ছিল, সেই বসতির রাজধানী ছিল 'শাকল' অর্থাৎ এখনকার পাকিস্তানের শিয়ালকোট—বৌদ্ধ মিলিন্দের রাজধানীও ছিল এটাই—যদিও পাণিনি-পতঞ্জলির ভাষ্য অনুসারে [সূত্র. ৪.২.১১৭; ৫.৩.১১৪] বাহীকরা ছিলেন পাকিস্তানে অবস্থিত পঞ্জাবের প্রাচীন অধিবাসী। B.C. Law আরট্টদেশবাসীকে গ্রীক Periplus-এর Arattai বলে চিহ্নিত করেছেন। *[মহা (k) ৮.৪৪.১০; TAI (Law), pp. 71-72]*

□ আরট্ট, বাহীক, জর্তিক, এই নামগুলিকে বিভিন্ন জায়গায় এক করে দেখা হলেও আমাদের মনে হয় যেন এগুলি ছোটো ছোটো উপজাতীয় জনজাতির নাম, যাঁদের বৃহৎ এক নিন্দিত নামে বাহীক বলে ডাকা হত। হয়তো বা এই সাধারণীকরণের কারণ একটাই—এঁদের আচার, বিচার এবং সংস্কার আর্য জনজাতির চিরন্তনী ধারণার বাইরে ছিল। বারবার আরট্টদের 'নিন্দিতাঃ' 'নষ্টধর্মাঃ', 'বর্জনীয়াঃ' এবং 'অতিকুৎসিতাঃ' বলা হয়েছে। হয়তো বা এই কারণেই মহাভারতের দিগ্‌বিজয়-পর্ব, উপায়ন-পর্ব এবং প্রধান ভৌগোলিক বিবরণে আরট্ট-দেশের নামই করা হয়নি। আর বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আরট্টে যাবার কথা বারণই করে দেওয়া হয়েছে।

[মহা (k) ৮.৪৪.৩৩; ৮.৪৪.৩৮; ৮.৪৪.৪৭; (হরি) ৮.৩৪.৯২, ৯৭, ১০৬; বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১.২.১৪]

□ মহাভারতের কালে আরট্ট দেশের এই নিন্দনীয়তার কারণ একাধিক। প্রথমত আর্যভাষাভাষী জনজাতি অনেককাল সপ্তসিন্ধুর দেশ ছেড়ে প্রথম পর্যায়ে সরস্বতী-দৃষদ্বতীর তীর আশ্রয় করেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যমুনা নদী ছেড়ে গঙ্গার তীরবাহী অঞ্চলগুলিতে সভ্যতার অগ্রভূমি তৈরি করেন। ফলে তাঁদের পরিত্যক্ত স্থানগুলিতে দেশজ উপজাতির আধিপত্য তৈরি হয়। আরট্ট-শব্দের সংস্কৃত নাম অরাষ্ট্রক অর্থাৎ রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রসংজ্ঞা এখানে উপজাতীয় প্রধানদের শাসনে পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং তার সংস্কৃত সংজ্ঞা দেশজ প্রাকৃতে আরট্ট-শব্দে পর্যবসিত হয়েছে মহাভারতের কালেই। দ্বিতীয়ত, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এখানে ডেমিট্রিয়াস-মিনান্দার রাজাদের শাসন চালু হওয়ায় তথাকথিত আর্য সংস্কৃতির অবক্ষয় আরো ত্বরান্বিত করে।

[V.S. Agrwala, Bharata Savitri, vol. 2, pp. 250-261; Buddha Prakash, Social and Political Movements in Ancient Punjab, p.175]

□ আরট্ট-দেশ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে যতই অসংস্কৃত হোক, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমের এই দেশগুলির অশ্বধন বা ঘোড়া ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত। তাদের চেহারাও যেমন বড়ো, তেমনই তাদের প্রাণশক্তি, অর্থাৎ দম, ফলত এই ঘোড়াগুলি দেখতে ছিল সুগঠিত এবং সুন্দর—মহাসত্ত্বা, মহাকায়াঃ ইত্যাদি।

[মহা (k) ৬.৯০.৩; ৭.২৩.৭৩; (হরি) ৬.৮৭.৩; ৭.২১.৭২ পাদটীকা দ্র. পৃ. ১৯৬]

□ আরট্ট-দেশীয়রা যুদ্ধবীর সৈন্য হওয়া সত্ত্বেও দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং কৃতবর্মা তাঁর সঙ্গে আসা আরট্ট-সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যান। আরট্টদের সঙ্গে এখানে বাহ্লীক বা বাহীক সৈন্যরাও ছিলেন।

[মহা (k) ৭.১৯৩.১৩; (হরি) ৭.১৬৫.১৩]

আরণ্য প্রজাপতি অত্রির পুত্র আরণ্য। চাক্ষুষ মন্বন্তরে যাঁরা দেবতা হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন আরণ্যের পৌত্র। চাক্ষুষ মন্বন্তরের দেবতারা আদ্য, প্রসূত, ভাব্য, পৃথুক ও লেখ—এই পাঁচটি গণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১৫; ১.৩৬.৬৮; বায়ু পু. ৬২.৫৮]

আরণ্যশাস্ত্র আরণ্য শাস্ত্র বলতে বেদ ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির পরম্পরায় আরণ্যক গ্রন্থগুলির কথাই ভাবা উচিত। মহাভারতে পাণ্ডু কিমিন্দম মুনির অভিশাপ লাভ করে বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করে বানপ্রস্থে যেতে চাইলেন। বানপ্রস্থ যেহেতু অরণ্যেই পালনীয়, তাই বানপ্রস্থের ধর্মানুযায়ী ফলমূলের আহার, বল্কল পরা, অগ্নিহোত্র যাপন, শরীরকে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার উপযোগী করে তোলা —পাণ্ডুর আচরণীয় এইসব আচরণগুলিকেই আরণ্যশাস্ত্র বলা হয়েছে মহাভারতে।

[দ্র. আরণ্যক]

[মহা (k) ১.১১৯.৩৭; (হরি) ১.১১৩.৩৭]

আরণ্যক মহাভারতে ভগবান নারায়ণের কথা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—এই নারায়ণী কথা সমস্ত শাস্ত্রের সারাৎসার। বৃহৎ গ্রন্থের সারাৎসার—এরই তুলনা দিতে গিয়ে কবি এখানে বলেছেন—যেমনটি বেদের মধ্যে আরণ্যক। তুলনাটা সবিস্তারে বলা হল এইভাবে দধি মন্থন করে যেমন নবনীত পাই, মলয় পর্বত ঘুরে যেমন চন্দন আহরণ করি, বেদ গ্রন্থরাজি মন্থন করে যেমন আরণ্যকগুলি পাওয়া যায়—আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্যঃ—তেমনই এই নারায়ণ-কথামৃত। আরণ্যকের এই উপমা থেকে আরণ্যক গ্রন্থগুলির শ্রেষ্ঠত্ব যে মহাভারতের কালেও এক প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিল, সেটা প্রমাণ হয়।

☐ মহাভারতে অবশ্য আরণ্যকশাস্ত্র পড়ার একটা অন্যতম ফল হিসেবেই বানপ্রস্থের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—গৃহস্থাশ্রমে বহুকাল সার্থকভাবে জীবন কাটানোর পর আরণ্যক শাস্ত্র পড়ে বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে এবং অক্ষর-ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করার চেষ্টা গ্রহণ করবে। অন্যত্র যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলেছেন—ত্যাগমার্গে ব্রহ্মানুসন্ধানই প্রকৃত সার গ্রহণ করা। তা নইলে বেদবাদ অতিক্রম করে, আরণ্যক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যদি কী খুঁজতে হবে তা না বুঝতে পারা যায়, তবে কলাগাছের খোলা খুলতে খুলতে শেষে কাঠ না পাবার মতো হবে।

[মহা (k) ১২.১৯.১৬-১৭; ১২.৩৪৩.১২-১৪; ১২.৬১.৪-৫; (হরি) ১২.১৯.১৬-১৭; ১২.৩২৯.১১-১৩; ১২.৬০.৪-৫]

☐ বস্তুত এই আরণ্যক হল বেদ-ব্রাহ্মণের পরবর্তী এবং উপনিষদগুলির পূর্ববর্তী শাস্ত্র। অরণ্যের মধ্যে বলা হয়েছে বলে এই শাস্ত্রের নাম আরণ্যক—অরণ্যে উক্তমিতি আরণ্যকম্। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের টীকারম্ভে সায়নাচার্য লিখেছেন—বেদের এই নির্দিষ্ট বিভাগটাকে আরণ্যক বা হয়েছে এই কারণেই যে, অরণ্যেই এগুলি পড়তে হয়—

আরণ্যাধ্যয়নাদ্ এতদারণ্যকমিতীর্য্যতে।

[তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১.১.১; দ্র. সায়নাচার্যের টীকা, ঐতরেয় আরণ্যক ১.১.১; দ্র. সায়নাচার্যের টীকা]

☐ সায়নাচার্য অবশ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের টীকারম্ভে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগকেই একবার আরণ্যক-ব্রত বলে ফেলেছেন।—

'আরণ্যকব্রতরূপং ব্রাহ্মণম্'।

তাতে অনেকের মনে সন্দেহ হয়েছে যে, বেদের এই আরণ্যক ভাগ আসলে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিরই কোনো পরিপূরক অংশ, যেগুলি অরণ্যবাসী যাজ্ঞিকদের সহায়তা করবে।

[দ্র. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) সায়নাচার্যকৃত টীকা, পৃ. ৫]

☐ তবে এই ধারণা ভুল। আরণ্যক গ্রন্থগুলি পৃথক দার্শনিক ভাবনায় লিখিত বৈদিক গ্রন্থ। অন্যদিকে কথাটা ঠিক এই দিকে যে,

According to the other, and no doubt right, interpretation these 'works'—like all other 'books' of the brāhmanic variety, subjects of instruction of Vedic schools—were to be imparted to and studied by advanced students in the solitude of the forest, because their contents were too 'sacred', too secret and esoteric, too uncanny and dangerous to be communicated and learnt in the villages. Their main subject was, indeed, not only the explanation of the sacrificial rites, but the relevant texts themselves and their mystic and allegorical, 'symbolical' and 'philosophical' significance.

[Jan Gonda, A History of Indian Literature, vol. I, Wiesbaden, 1975, p. 423]

☐ বস্তুত বেদে যাগ-যজ্ঞের মতো কর্মকাণ্ড ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির পরিসর, কিন্তু বেদের অধ্যাত্মবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব সৃষ্টি রহস্য

ইত্যাদি জ্ঞানকাণ্ড প্রথমত আরণ্যক এবং তারপর উপনিষদগুলির প্রতিপাদ্য। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে করণীয় যজ্ঞ আরণ্যক-গ্রন্থে জ্ঞান যজ্ঞে পরিণত হয়েছে। নানা বাহ্য ক্রিয়া-বহুল ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের অগ্নিহোত্র যাগ ঋগ্‌বেদের শাঙ্খায়ন (কৌষিতকি) আরণ্যকের দশম অধ্যায়ে পূর্ণ আধ্যাত্মিকতায় ব্যাখ্যা হয়েছে। বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র আসলে 'আধ্যাত্মিক আন্তর অগ্নিহোত্র। বৈদিক আহবনীয় অগ্নি এবং গার্হপত্য-অগ্নি মনুষ্য শরীরের অন্তর্গত প্রাণ এবং অপান বায়ু নামে যৌগিক ভাবনায় উল্লিখিত হয়েছে। আর অগ্নিহোত্রের যজ্ঞ সামগ্রীর মধ্যে দুধ, সমিৎ, আহুতি—এগুলির সম্বন্ধে বলা হয়েছে শ্রদ্ধাই দুগ্ধ, বাক্যই সমিৎ, সত্যই আহুতি এবং প্রজ্ঞা হল আত্মা।

এই ভাবনা থেকে প্রমাণ হয় যে, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে বর্ণিত ক্রিয়াবহুল বাহ্য যাগ-যজ্ঞের প্রকার আরণ্যক গ্রন্থগুলিতে উপাসনা এবং জ্ঞানের আন্তর যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এইগুলি উপনিষদের জ্ঞান কাণ্ডে পর্যবসিত হবে।

[দ্র. যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয়, পৃ. ১৪-১৫]

☐ প্রত্যেকটি বেদের শাখা হিসেবে এক-একটি আরণ্যক এক-একটি বেদের শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যেমন—

ঋগ্‌বেদ—১. ঐতরেয় আরণ্যক (ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় শাখা)

২. কৌষিতকি বা শাঙ্খায়ন আরণ্যক (ঋগ্‌বেদের কৌষিতকি অথবা শাঙ্খায়ন শাখা)।

যজুর্বেদ—১. তৈত্তিরীয় আরণ্যক (কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা)

২. মৈত্রায়ণীয় আরণ্যক (কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখা)

৩. কঠ আরণ্যক (কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ বা চরক শাখা)

৪. বৃহদারণ্যক (শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন বা কাণ্ব শাখা; মাধ্যন্দিন শাখার প্রথম নয়টি অনুচ্ছেদে আরণ্যক গ্রন্থ, শেষ ছয় অনুচ্ছেদে বৃহদারণ্যক উপনিষদ)

সামবেদ—তলবকার আরণ্যক অথবা জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ (সামবেদের তলবকার অথবা জৈমিনীয় শাখা)

অথর্ববেদ—কোনো আরণ্যক গ্রন্থ নেই। গোপথ ব্রাহ্মণকেই এই বেদের আরণ্যক হিসেবে ধরা হয়।

আরব্ধ ভাগবত পুরাণ অনুসারে দ্রুহ্যর বংশধারায় সেতুর পুত্র এবং গান্ধারের পিতা আরব্ধ। বিষ্ণু পুরাণে 'আরব্ধ'-র পরিবর্তে 'আরদ্বান্'—এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.১৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৭.২]

আরাধিত বিষ্ণু পুরাণের একটি স্থানে বলা হয়েছে যে, কুরুবংশধারায় জয়সেনের পুত্র এবং অযুতায়ুর পিতা আরাধিত। বিষ্ণুপুরাণের অপর একটি স্থানে 'আরাধিত'-র পরিবর্তে 'আরাবী'-নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, কুরুবংশধারায় জয়ৎসেনের পুত্র আরাধি। মহাসত্ত্ব হলেন আরাধির পুত্র এবং অযুতায়ুধ তাঁর পৌত্র।

[বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৪.২০.৩; (কাঞ্চীপুরম্) ৪.২০.৪; বায়ু পু. ৯৯.২৩১]

আরাম কৃত্রিম উদ্যান, ইংরেজিতে 'পার্ক' বলা যায়। প্রাচীন রাজাদের সামাজিক কল্যাণ-কর্মগুলির মধ্যে পুষ্করিণী-খননের মতো উদ্যান প্রতিষ্ঠা করাটাও পুণ্যকর্মের অন্তর্গত ছিল। পুরাণে 'আরাম' প্রতিষ্ঠা করার বিধি পরবর্তী কালে স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে লিখিত হয়েছে। ময়দানব ত্রিপুরদুর্গ-নির্মাণের সময় দুর্গের মধ্যে তড়াগ-সরোবরের সঙ্গে 'আরাম' নির্মাণ করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত উদ্যান-আরাম বেদখল করলে অন্যায়কারী দখলদারের ওপর দণ্ডের বিধান নেমে আসত। আগুন দিয়ে আরাম ধ্বংস করলে পরকালে নরকবাসের ঘোষণা করেছেন পৌরাণিকেরা।

[মৎস্য পু. ৫৮.১; ১৩০.৫; ২২৭.৩০; বায়ু পু. ১০১.১৬০]

আরালিক 'আরালিক' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'অরাল' থেকে বিশ্ব-কৃত কোষগ্রন্থে 'অরাল' কথাটির একটি অর্থ পাচক এবং অপর অর্থটি হল মত্তহস্তী। 'আরালিক' শব্দটিকে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে পাচক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অমরকোষেও বলা হয়েছে যে আরালিক কথাটির অর্থ পাচক। তবে নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায় বলেছেন যে, 'আরালিক' শব্দের অর্থ মত্তহস্তীকে বশীভূত

করে যে। অজ্ঞাতবাসের সময় ভীম বিরাটরাজাকে বলেন যে, তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় আরালিক ছিলেন। এক্ষেত্রে এই কথাটির দুটি অর্থ হয়। ভীমসেনকে আমরা পাচক রূপে যেমন দেখতে পাই, তেমনি পরবর্তীকালে মত্ত হাতিদের বশ করতে পারেন, এমন আরালিক হিসাবেও দেখা যায়। *[মহা (k) ৪.২.৯; ৪.১৯.২-৫; (হরি) ৪.২.৯; ৪.১৭.২-৫]*

আরুণায়নি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আরুণায়নি সেই গোত্রের অন্যতম। অঙ্গিরা ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও আঙ্গিরস নামে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৮]*

আরুণি$_1$ গুরু-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ মহাভারতে যে কাহিনীগুলি স্থান পেয়েছে, সেগুলির মধ্যে আপোদ-ধৌম্যের শিষ্য আরুণির উপাখ্যান অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে এই উপাখ্যানটির জনপ্রিয়তাও প্রবল। মহাভারতের আদিপর্বে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে।

প্রাচীনকালে 'আপোদ-ধৌম্য' নামে একজন ঋষি ছিলেন। তাঁর প্রধান তিন শিষ্যের মধ্যে পঞ্চালদেশীয় আরুণি ছিলেন একজন। একদিন ধৌম্য একটি ভাঙা আলে বাঁধ দেওয়ার জন্য আরুণিকে আদেশ করেন। আরুণি গুরুর আদেশ পাওয়া মাত্র আলের ভাঙা জায়গা দিয়ে যাতে জল না বেরোয় তার চেষ্টায় নিয়োজিত হলেন। কিন্তু যতবার আরুণি বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন, ততবার বাঁধ ভেঙে জল নির্গত হওয়ায় দুঃখিত মনে তিনি ভাবতে লাগলেন—কি উপায়ে গুরুর আদেশ পালন করা যায়। কিছুক্ষণ ভাবার পর আরুণি আলের ভাঙা জায়গায় বাঁধ দেওয়ার জন্য একটি উপায় বের করলেন। তিনি নিজেই ওই ভাঙা জায়গায় শুয়ে পড়ে জল আটকে দেবার চেষ্টা করলেন। এর ফলে জল নির্গত হওয়া বন্ধ হল। বহুক্ষণ তিনি এইভাবেই থাকলেন। অনেকক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়েছে দেখে মহর্ষি আপোদ-ধৌম্য তাঁর অন্য দুই শিষ্য উপমন্যু ও বেদ কে জিজ্ঞাসা করলেন—আরুণি কোথায় গেল? শিষ্যেরা ধৌম্যকে জানালেন যে, তিনিই আরুণিকে ভাঙা আলে বাঁধ দিতে পাঠিয়েছিলেন। তখন ধৌম্য তাঁর অপর দুই শিষ্যের সঙ্গে আরুণি যেখানে গেছেন সেখানে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। গুরুর কণ্ঠস্বর শুনে আরুণি আলের ভাঙা জায়গা থেকে উঠে ধৌম্যের কাছে উপস্থিত হলেন। আরুণি বললেন যে, আলের ভাঙা জায়গা দিয়ে জল নির্গত হচ্ছিল বলে তিনি কিছুতেই তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হচ্ছিলেন না, তাই তিনি নিজেই ওই ভাঙা জায়গায় শুয়ে জল আটকানোর চেষ্টা করেছেন এবং গুরুর কণ্ঠস্বর শুনেই তিনি ওই স্থান থেকে উঠে এসেছেন। ধৌম্য আরুণির গুরুভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—আল ভেঙে উঠে আসার জন্য আরুণি 'উদ্দালক' নামে প্রসিদ্ধ হবেন। এরপর ধৌম্য আরুণিকে বললেন যে, যথাযথভাবে গুরুর আদেশ পালন করার জন্য আরুণি সমস্ত বেদবিদ্যার অধিকারী হবেন। *[বি. দ্র. উদ্দালক]*

[মহা (k) ১.৩.২২-৩৩; (হরি) ১.৩.২৩-৩৪]

□ ছান্দোগ্য-উপনিষদেও আরুণিকে আমরা দেখতে পাই। তিনি শ্বেতকেতুকে সুষুপ্তি এবং ব্রহ্মচর্যাদি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। *[ছান্দোগ্য উপনিষদ, (জগদীশ শাস্ত্রী) ৬.১.১-৭; ৬.৮.১-৭]*

□ ভাগবত পুরাণে যেসব প্রধান সিদ্ধপুরুষের কথা বলা হয়েছে, সেইসব ঋষির মধ্যে আরুণির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৬.১৫.১৩]*

আরুণি$_2$ বিনতার অন্যতম পুত্র। তিনি বৈনতেয়। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে বিনতার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১.৬৫.৪০; (হরি) ১.৬০.৪০]

□ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আরুণি একজন।

[মহা (k) ১.১২৩.৭৩; (হরি) ১.১১৭.৭৭]

আরুণি$_3$ যে সব নাগ ধৃতরাষ্ট্র নাগের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আরুণি তাঁদের মধ্যে একজন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে 'আরুণি'র পরিবর্তে 'অরুণি' উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৫৭.১৮; (হরি) ১.৫২.২০]

আরুণি$_4$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষ অবলম্বনকারী একজন বীর যোদ্ধা। শকুনি, দুঃশাসন, কৃতবর্মা প্রমুখদের সঙ্গে আরুণিও যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে আক্রমণ করেন।

[মহা (k) ৭.১৫৬.১২২; (হরি) ৭.১৩৬.১১৮]

আরুণি$_{৫}$ ভবিষ্যৎ পঞ্চদশ দ্বাপরে মহাদেব যখন বেদশিরা নামে খ্যাত হবেন, তখন ওই দ্বাপরে মহাত্মা আরুণি ব্যাস হবেন। *[বায়ু পু. ২৩.১৬৬; শিব পু. (বায়বীয়) ২.৯.৪৮]*

আরুণি$_{৬}$ একজন সাধ্য দেবতা। ধর্মের ঔরসে সাধ্যার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে আরুণি একজন। সাধ্যার পুত্ররা সাধ্য দেবগণ নামে পরিচিত হয়েছেন। *[মৎস্য পু. ১৭১.৪৩]*

আরুণি$_{৭}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে ভবিষ্যৎ তৃতীয় সাবর্ণি (বিষ্ণু পুরাণ মতে ভবিষ্যৎ একাদশ মন্বন্তরে ধর্মসাবর্ণি মনুর কালে) মনুর কালে যাঁরা সপ্তর্ষি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আরুণি অন্যতম। তিনি অত্রিবংশ জাত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৭৯]*

আরুণি$_{৮}$ মধ্যদেশে প্রচলিত যজুর্বেদের অন্যতম শাখা। *[বায়ু পু. ৬১.৯]*

আরুষী মনুর কন্যা এবং চ্যবন মুনির পত্নী। আরুষীর গর্ভে চ্যবন মুনির 'ঔর্ব' নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আরুষীর উরুদেশ ভেদ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এই পুত্রসন্তান ঔর্ব নামে পরিচিত হন।

[মহা (k) ১.৬৬.৪৪; (হরি) ১.৬১.৪৬]

আরোগ্যা বৈদ্যনাথধামে দেবী ভগবতী আরোগ্যা নামে প্রসিদ্ধা। *[দেবী ভাগবত পু. ৭.৩০.৭১]*

আরোচক মহাভারতে উল্লিখিত একটি জনপদের নাম। আরোচক দেশের অধিবাসীদেরও আরোচক নামেই ডাকা হতো।

[মহা (k) ৬.৫১.৭; (হরি) ৬.৫১.৭]

আরোহণ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত মহাদেবের অন্যতম নাম। *[দ্র. অধিরোহ]*

[মহা (k) ১৩.১৭.১২৫; (হরি) ১৩.১৬.১২৪]

আর্চীকপর্বত এই নামের একটি পর্বত-তীর্থ আছে। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, এই পর্বত-তীর্থটি জ্ঞানী মানুষ, মুনি-ঋষি এবং দেবতাদের বাসস্থান। *[মহা (k) ৩.১২৫.১৬-২১; (হরি) ৩.১০৩.৪০-৪৫]*

আর্চ্চনানশ পুরাণে মহর্ষি অত্রির গোত্রভুক্ত যে ঋষি-বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আর্চ্চনানশ সেই গোত্রের অন্যতম। অত্রি মুনি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আত্রেয় নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৭.৫]

আর্জব$_{১}$ গান্ধাররাজ সুবলের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম, শকুনির ভ্রাতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আর্জব তাঁর অনান্য ভ্রাতা—গজ, গবাক্ষ, বৃষক, চর্মবান, শুক্ক প্রভৃতিদের সঙ্গে অর্জুন পুত্র ইরাবানকে আক্রমণ করেন।

[মহা (k) ৬.৯১.২৭, ৩৬; (হরি) ৬.৮৭.২৭, ৩৫]

আর্জব$_{২}$ বাষ্কলির শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৬; বায়ু পু. ৬১.৩]*

আর্ত্তিমান একজন মুনি। তিনি সর্পবিষের চিকিৎসক হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন বলে জানা যায়। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, আর্ত্তিমান মুনির নাম স্মরণ করলে সর্প-ভয় দূর হয়। সম্ভবতঃ তা আর্ত্তিমান মুনির সুচিকিৎসক হিসেবে জনপ্রিয়তার কারণে। *[মহা (k) ১.৫৮.২৩; (হরি) ১.৫৩.২৩]*

আর্দ্রক$_{১}$ যদু বংশধারায় আর্দ্রক (বায়ু পুরাণ মতে আহুক) পুনর্ব্বসু-র পুত্র এবং ধৃতির পিতা।

[দ্র. আহুক]

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১২৪; বায়ু পু. ৯৬.১২৫]

আর্দ্রক$_{২}$ *[দ্র. উদঙ্ক]*

আর্দ্রা একটি নক্ষত্র। *[মহা (k) ১৩.৮৯.৩; (হরি) ১৩.৭৬.৩৭; বায়ু পু. ৮২.৩]*

আর্বত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে ভগবান ব্রহ্মার মানস পুত্রদের মধ্যে আর্বত একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.৯৯]

আর্ষ চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবগণের প্রথম গণের নাম আর্য। এই গণে প্রখ্যাতকর্মা ও হব্যভোজী আটটি দেবতা আছেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৬.৪৯]*

আর্যতীর্থ অঙ্গুলি সকলের মূল ভাগকে আর্যতীর্থ বলে। *[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ২৬.১৭]*

আর্ষবিবাহ আটরকম বিবাহবিধির মধ্যে আর্ষ-বিবাহ অন্যতম। এখানে কন্যাশুল্ক হিসেবে বরের কাছ থেকে দুটি গোরু নেওয়া হত এবং কন্যাদান করা হত। মহাভারতে অবশ্য এই বিবাহের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি। নীলকণ্ঠ আশ্বলায়নের মত উদ্ধার করে বলেছেন—কন্যার মূল্য হিসেবে যদি বরের কাছ থেকে দুটি গোরু নেওয়া হয়, তবে সেই বিবাহকে আর্ষ বিবাহ বলে—

গোমিথুনং দত্ত্বোপযচ্ছেত স আর্ষঃ।

মনুসংহিতায় স্পষ্টভাবে আশ্বলায়নের বক্তব্য সমর্থন করা হয়েছে। তবে অনেকের ভাবনা ভেবে মহাভারত এখানে বলেছে যে, বিবাহে দুটি গোরু বরের কাছ থেকে নেওয়াটাও 'কন্যাশুল্ক' নেবার মতো ঘটনা, এবং অল্প বা বেশি ধন গ্রহণ

করে কন্যাদান করাটাও কন্যা বিক্রয়ের মতো ঘটনা। সেটা মহাভারত সমর্থন করেন না—

আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেদিদাহুর্মৃষৈব তৎ।
অল্পো বা বহু বা রাজন্ বিক্রয়স্তাবদেব সঃ ॥

যদি কোনো মানুষ এইভাবে কন্যাদানের মাধ্যমে অর্থ লাভ করার চেষ্টা করেন, সেটা সনাতন ধর্ম নয়। অন্যদিকে মৎস্য পুরাণে বলা আছে যে, গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যে এই আর্ষবিধি অনুসারে যিনি কন্যা সম্প্রদান করেন, তিনি পুণ্যবান ব্যক্তি। *[দ্র. বিবাহ]*

[মহা (k) ১৩.৪৪.৪; ১৩.৪৫.২০-২১;
(হরি) ১৩.৩৭.৪, ৭৬-৭৭;
বিষ্ণু পু. ৩.১০.২৪; মৎস্য পু. ১০৬.৮-৯]

আর্যাবর্ত ভারতবর্ষের উত্তরাংশ এই নামে অভিহিত। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে যে, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব ও পশ্চিমে দুই সাগরের (অর্থাৎ পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে আরব সাগর) মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটিই আর্যাবর্ত—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥

অমরকোষেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

[মনু সংহিতা ২.২২;
অমরকোষ ২. (ভূমিবর্গ) ৮]

☐ মহাভারতেও আর্যাবর্তের উল্লেখ পাওয়া যায় ভারতবর্ষেরই একটি অংশ রূপে। মহর্ষি ব্যাসের পুত্র শুকদেব পরম মুক্তির সন্ধান করতে করতে বহুদেশ পেরিয়ে আর্যাবর্তে এসেছিলেন। শান্তিপর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, শুকদেব চীন ও হূন জাতি অধ্যুষিত দেশ পেরিয়ে আর্যাবর্তে প্রবেশ করেন—

স দেশান্ বিবিধান্ পশ্যংশ্চীনহূননিশেবিতান্।
আর্য্যাবর্ত্তমিমং দেশমাজগাম মহামুনিঃ ॥

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শুকদেব বর্তমান চীন ও মধ্য-এশিয়া হয়ে আর্যাবর্তে প্রবেশ করেন। ফলে ধারণা করতে পারা যায়, হিমালয় পাদদেশীয় উত্তর ভারতই ছিল প্রাচীন আর্যাবর্ত।

[মহা (k) ১২.৩২৫.১৫; (হরি) ১২.৩১৪.৭১]

☐ আর্যাবর্তের সঙ্গে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের নাম ওতোপ্রোতভাবে মিশে আছে। ইক্ষ্বাকুর একশজন পুত্রের মধ্যে পঁচিশ জন আর্যাবর্তের পূর্বভাগ, পঁচিশজন আর্যাবর্তের পশ্চিমভাগ, তিনজন মধ্যভাগ এবং অন্যান্যরা দক্ষিণ ও উত্তরভাগে রাজত্ব করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.৬.৫]*

☐ ক্ষত্রিয় নিধনের পর পরশুরাম এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যজ্ঞশেষে তিনি যজ্ঞের উপদ্রষ্টাকে আর্যাবর্তে ভূমিদান করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৯.১৬.২১-২২]

☐ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনুর মতে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী দুটির মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ অর্থাৎ—এখনকার পঞ্জাবকে যদি অবিভক্ত হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, তবে তার মধ্যাংশটিই আর্যাবর্ত রূপে পরিচিত ছিল। আধুনিক পণ্ডিতরা মনে করেন সরস্বতী নদীর কাছাকাছি অঞ্চল দিয়েই দৃষদ্বতী নদী প্রবাহিত হত। যদি আমরা মনু ও আধুনিক পণ্ডিতদের মতামতগুলি একসঙ্গে বিচার করি, তবে মনে হয় আর্যাবর্ত এই দুই নদীর মধ্যে অবস্থিত একটি নেহাৎ ক্ষুদ্র ভূখণ্ড। ঋগ্বেদেও এই ভূ-খণ্ডটিকে পবিত্রতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[ঋগ্বেদ ৩.২৩.৪]*

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রেও এই ভূ-ভাগটিকেই বিশেষ উপাসনার যোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (Caland) ২৫.১০.১১-১৬;
কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ২৪.৬.৬]

আর্যাবর্তের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় ব্রহ্মর্ষিদেশ অবস্থিত ছিল। ব্রহ্মর্ষিদেশ বলতে মূলত কুরুক্ষেত্র, মৎস্যদেশ, পঞ্চাল ও শূরসেন অঞ্চল বোঝানো হত। এই ব্রহ্মর্ষিদেশেরই পূর্বে আর্যাবর্ত বা আর্যদের বাসস্থান। অনেকের মতে আবার যমুনা ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটিই আর্যাবর্ত। *[বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১.১.৯-১৩]*

আর্যাবর্তের আরও বিস্তারিত সংজ্ঞাও অনেকে দিয়েছেন। তারা বলেন আর্যাবর্তের পশ্চিমাংশটিই ব্রহ্মাবর্ত রূপে পরিচিত ছিল। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র অনুসারে এই আর্যাবর্তের বিস্তার ছিল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্বে কালক বন (সম্ভবত আধুনিক এলাহাবাদ) থেকে পশ্চিমে সেইস্থান পর্যন্ত, যেখানে সরস্বতী নদী থর মরুভূমিতে মিশে বিলুপ্ত হয়েছে।

[বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র (olivelle), ১.৮-১২;
বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের এই বক্তব্য কিন্তু মহাভাষ্যকার
পতঞ্জলি পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন পাণিনির ২.৪.১০
সূত্রের ভাষ্যে]

মনু এই অঞ্চলটিকে মধ্যদেশ বলেছেন কারণ তাঁর কাছে পূর্ব ও পশ্চিমে আর্যাবর্তের বিস্তৃতি বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত—অর্থাৎ প্রায় সম্পূর্ণ উত্তর ভারতীয় সমভূমি। মনুর মতে এই ভূ-খণ্ডের বাইরের অংশে বর্বর জাতিদের বাস। বিষ্ণুধর্মসূত্রে আর্যাবর্তের একটি বৃহত্তর সংজ্ঞা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, আর্যাবর্ত হল সেই অঞ্চল যেখানে চতুর্বর্ণ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এই বৃহত্তর সংজ্ঞাটি প্রকৃতপক্ষে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্যাবর্ত ও ব্রহ্মাবর্তের সম্প্রসারণের ইঙ্গিতবাহী—

চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশে বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্তস্ততঃ পরম্॥

[বিষ্ণু-ধর্ম সূত্র (মহর্ষি) ৮৪.৪]

আর্য সভ্যতা যতই দক্ষিণ-পূর্বদিকে সম্প্রসারিত হয়েছে ততই পৃথিবীর অর্থাৎ ভারতের কেন্দ্র বদলেছে, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবীর ভরকেন্দ্র সংক্রান্ত আলোচনায় প্লক্ষ প্রস্রবণের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর উৎসমুখে অবস্থিত একটি বটবৃক্ষ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থিত কোনো অঞ্চলকেই সে যুগে পৃথিবীর কেন্দ্র বলে মনে করা হয়েছে। পরে সেই কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়েছে প্রয়াগের অক্ষয়বটের মধ্যে। তাতে আর্যাবর্তের বিশাল বিস্তার আরও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা একথা বলতেই পারি যে, আর্যায়ণের সঙ্গে-সঙ্গেই সভ্যতার ভরকেন্দ্র বদলেছে এবং কালক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছে আর্যাবর্তের ধারণা। *[দ্র. ব্রহ্মাবর্ত]*

[The State in Indian Tradition;
Harmut Scharfe;
Leiden Netherlands, 1989; p. 12-13]

আর্য্যক$_{১}$ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত নাগ পুত্রদের অন্যতম। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে মাতলির কাছে দেবর্ষি নারদ ভোগবতী পুরীর বর্ণনা দেওয়ার সময় যেসব বিশিষ্ট নাগেদের কথা বলেছেন, আর্য্যক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ১.৩৫.৭; ৫.১০৩.১১;*
(হরি) ১.৩০.৭; ৫.৯৬.১১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩]

□ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বর্ণিত একটি কাহিনী থেকে জানা যায় যে আর্যাক নাগের পৌত্র সুমুখের সঙ্গে ইন্দ্রের সারথি মাতলির কন্যা গুণকেশীর বিবাহ হয়েছিল।

[মহা (k) ৫.১০৪ অধ্যায়; (হরি) ৫.৯৮ অধ্যায়]

আর্য্যক$_{২}$ ভাগবত পুরাণ অনুসারে, ভবিষ্যৎ একাদশ মন্বন্তরে ধর্মসাবর্ণি যখন মনু হবেন, সেই সময়ে ভগবান শ্রীহরির অংশ থেকে আর্য্যকের ঔরসে বৈধৃতার গর্ভে ধর্মসেতু জন্মগ্রহণ করবেন।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.২৬]

আর্য্যক$_{৩}$ প্লক্ষদ্বীপের অধিবাসীরা কুরু, বিবিংশ ইত্যাদি যে চারটি বর্ণে বিভক্ত, আর্য্যক তাদের মধ্যে একটি। আর্য্যক আমাদের মধ্যে প্রচলিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি বর্ণের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ' বর্ণের সমতুল্য বলে বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[বিষ্ণু পু. ২.৪.১৭]*

আর্য্যকা ক্রৌঞ্চদ্বীপের সাতটি পবিত্র নদীর মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.২০.২১]*

আর্ষভ$_{১}$ আঙ্গিরস বংশীয় একজন ঋষি। পুরাণে ঋষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আর্ষভ সেই গোত্রের অন্যতম। অঙ্গিরা ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও আঙ্গিরস নামে পরিচিত। *[বায়ু পু. ৬৫.১০৭]*

আর্ষভ$_{২}$ সপ্তস্বরের অন্যতম ঋষভ স্বর বা ঋষভধ্বনি। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ থেকে যে মেঘমন্দ্রস্বর ধ্বনিত হত, তা ঋষভধ্বনির অনুরূপ—

পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষমার্ষভেণৈব পূরিতম্।
শ্রুত্বা সুভৈরবং নাদমুপযায়া জবেন মাম্॥

এই ঋষভধ্বনি সৃষ্টি করে বলেই পাঞ্চজন্য শঙ্খের অপর নাম আর্ষভ।

[মহা (k) ৭.৭৯.৩৯; (হরি) ৭.৭০.৩৮]

আর্ষভ$_{৩}$ বারাণসীতে অবস্থিত পদ্ম পুরাণোক্ত একটি তীর্থ। *[পদ্ম পু. (স্বর্গ) ১৮.৯৪]*

আর্ষভীবীথি উত্তরফাল্গুনী, পূর্বফাল্গুনী এবং মঘা—এই নক্ষত্র ত্রয়ে আর্ষভী বীথি রচিত হয়।

[দেবী ভাগবত পু. ৮.১৫.৫]

আর্ষ্ণিষেণ যোগশিক্ষক। রাজপুত্র দম এঁর কাছে যোগ-শিক্ষা করেছিলেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ১৩৩.৭]*

আর্ষ্টিষেণ$_{১}$ একজন ঋষি। মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নানা তীর্থভ্রমণ করতে করতে তীর্থযাত্রী পাণ্ডবরা একসময় পৌঁছালেন গন্ধমাদন পর্বতে। গন্ধমাদন পর্বতেই মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের

তপোবন। পাণ্ডবরা সেখানে পৌঁছালে আর্ষ্টিষেণ তাঁদের সকলকে তপোবনে স্বাগত জানালেন। আর্ষ্টিষেণের তপোবনেই বেশ কিছুকাল বসবাস করলেন পাণ্ডবরা।

মহাভারতে আর্ষ্টিষেণের আশ্রমের অবস্থান বর্ণনা করে বলা হয়েছে—মহর্ষি আর্ষ্টিষেণ বাস করতেন গন্ধমাদন পর্বতে। তাঁর আশ্রম থেকেই দেখা যায় কুবেরের সুরম্য অলকাপুরী—

অতিক্রম্য চ তং পার্থ আর্ষ্টিষেণাশ্রমে বস।
ততো দ্রক্ষ্যসি কৌন্তেয় নিবেশং ধনদস্য তম্॥

উগ্রতপস্বী আর্ষ্টিষেণ, তপস্যার কৃচ্ছ্রতার ফলেই তাঁর শরীর অত্যন্ত কৃশ—

ততস্তে তিগ্মতপসং কৃশং ধমনিসন্ততম্।

পাণ্ডবরা ধৌম্য পুরোহিত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হলে অতিথিবৎসল মহর্ষি আর্ষ্টিষেণ সস্নেহে, সানন্দে তাঁদের আপ্যায়ন করেন। আর্ষ্টিষেণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন—দেবরাজ ইন্দ্রের পুরী থেকে অর্জুন এই গন্ধমাদন পর্বতেই আসবেন। সেক্ষেত্রে যতদিন অর্জুন না ফিরে আসেন ততদিন যেন পাণ্ডবরা তাঁর আশ্রমেই স্বচ্ছন্দে বসবাস করেন—

বসধ্বং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠা যাবদর্জুনদর্শনম্।

আর্ষ্টিষেণের উপদেশ-মতোই পাণ্ডবরা দীর্ঘকাল বসবাস করেন তাঁর আশ্রমে।

[মহা (k) ৩.১৫৬.১৬; ৩.১৫৮.১০৩; ৩.১৫৯.১-৩৩; ৩.১৬০.১; ৩.১৬০.১২; ৩.১৬১.৩; (হরি) ৩.১২৯.১৬; ৩.১৩১.১০১; ৩.১৩২.১-৩৩; ৩.১৩৩.১; ৩.১৩৩.১৩; ৩.১৩৪.৩]

□ আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে পাণ্ডবদের বসবাসের দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও আর্ষ্টিষেণ ঋষির বিশদ পরিচয় পাই না। একটি মাত্র শ্লোকে মহর্ষি আর্ষ্টিষেণকে 'রাজর্ষি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে ধারণা মাত্র হয় যে, আর্ষ্টিষেণ সম্ভবত ক্ষত্রিয়কুলে বা বলা ভালো ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

[মহা (k) ৩.১৬২.১০; (হরি) ৩.১৩৫.১০]

□ আর্ষ্টিষেণের ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণত্ব লাভের কাহিনীটি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতের শল্যপর্বে। তীর্থ পর্যটন করতে করতে বলরাম উপস্থিত হলেন কপালমোচন তীর্থে। মহাভারতের কবি এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে জানালেন যে, এই তীর্থে তপস্যা করেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন আর্ষ্টিষেণ—

যত্রার্ষ্টিষেণ কৌরব্য ব্রাহ্মণ্যং সংশিত ব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবানৃষিসত্তম॥

মহাভারতের কবি বর্ণনা করেছেন—ক্ষত্রিয়কুলে জাত মহর্ষি আর্ষ্টিষেণ গুরুগৃহে বাস করে বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি কোনো শাস্ত্রেই পারদর্শী হতে পারলেন না। তখন মনের দুঃখে আর্ষ্টিষেণ গুরুর আশ্রম ত্যাগ করে, সরস্বতী নদীর তীরে কপালমোচন তীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। সেই তপস্যার ফলেই শেষ পর্যন্ত তিনি সমস্ত বেদ এবং বেদান্তে সিদ্ধিলাভ করেন এবং ব্রাহ্মণত্ব তথা ঋষিত্ব লাভ করেন। সিদ্ধিলাভের পর আর্ষ্টিষেণ এতটাই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি এই তীর্থস্থানটিকে তিনটি বর দান করলেন। আর্ষ্টিষেণ বললেন—আজ থেকে সরস্বতী তীরের এই তীর্থে স্নান করলে মানুষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করবে। আজ থেকে এখানে কোনো হিংস্র জন্তুর ভয় থাকবেনা এবং এই তীর্থে এসে মানুষ অল্প তপস্যাতেও প্রচুর ফল লাভ করবে। শল্যপর্বে বর্ণিত কাহিনীতে এর পর অবশ্য বলা হয়েছে যে, আর্ষ্টিষেণ দেহত্যাগ করে স্বর্গলোক লাভ করলেন।

[মহা (k) ৯.৩৯.২৫,৩৬; ৯.৪০.১-৯; (হরি) ৯.৩৭.২৪, ৩৪, ৩৭-৪৫]

□ মহাভারতে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনায় আর্ষ্টিষেণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্থূলকেশ ঋষির কন্যা প্রমদ্বরা সর্পদংশনে নিহত হলে নিকটস্থ তপোবনের অন্য যে মুনি-ঋষিরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, আর্ষ্টিষেণ তাঁদের মধ্যে একজন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি হিসেবে আর্ষ্টিষেণের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমটিকেই একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১.৮.২৫; ১২.৩১৮.৬০; ১৩.২৫.৫৫; (হরি) ১.৭.২৪; ১২.৩০৮.৬০; ১৩.২৬.৫৫]

□ পুরাণগুলিতে স্পষ্টভাবেই আর্ষ্টিষেণকে ক্ষত্রোপেত দ্বিজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ

আগে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন। পুরাণে বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে আর্ষ্টিষেণের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। পুরাণগুলিতে অন্যত্র অবশ্য আর্ষ্টিষেণকে শিষ্যপরম্পরায় ভৃগুবংশীয় বা ভার্গব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে লক্ষণীয়, ঋষি আর্ষ্টিষেণের জন্মকথা কিংবা বংশ পরিচয় সম্পর্কে মহাভারত পুরাণ উভয়েই নীরব।

[বায়ু পু. ৯১.১১৬; মৎস্য পু. ১৪৫.৯৯; ১৯৫.৩৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১০৫; ২.১.১০০; ২.৬৬.৮৭]

□ বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে দেবাপি আর্ষ্টিষেণের নাম পাওয়া যায়। লক্ষণীয় মহাভারতের শল্যপর্বে প্রাপ্ত উপাখ্যানে দেবাপি এবং আর্ষ্টিষেণ নামে দুজন পৃথক ব্যক্তির উল্লেখ মেলে, যাঁরা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। ঋগ্‌বৈদিক কালের দেবাপি-আর্ষ্টিষেণই কোনো ভাবে মহাভারতে দুটি পৃথক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন কী না, তা গবেষণা সাপেক্ষ বিষয় হলেও এখানে সেটাই অনুমান-প্রমাণ। তবে দেবাপি নামটি, বিশেষত ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে শান্তনু রাজার যজ্ঞের পুরোহিত হিসেবে দেবাপি-আর্ষ্টিষেণের উপস্থিতি আর্ষ্টিষেণের জন্ম পরিচয় বিষয়ে কৌতূহল উদ্রেক করে। বৃহদ্দেবতা থেকে প্রাপ্ত কাহিনী এবং মহাভারত ও পুরাণগুলিতে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায়—এই দেবাপি এবং শান্তনু—এই দুজনেই ছিলেন কুরুবংশীয় রাজা প্রতীপের দুই পুত্র। দেবাপি জ্যেষ্ঠ, শান্তনু কনিষ্ঠ। দেবাপি অল্প বয়সেই বনে চলে যান এবং তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ফলে কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শান্তনুই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বৃহদ্দেবতায় বর্ণিত কাহিনী থেকে অবশ্য জানা যায় যে, দেবাপি চর্মরোগের কারণে রাজ্যলাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন এবং মূলত সেই কারণেই তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তপস্যার ফলে দেবাপি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন কালক্রমে। এদিকে শান্তনু রাজা হবার পর রাজ্যে দীর্ঘ অনাবৃষ্টি দেখা দিল। শান্তনুর পুরোহিতরা তাঁকে বললেন—আপনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য রাজ্য ভোগ করছেন বলেই প্রজাদের এবং রাজ্যের এ দুরবস্থা। শান্তনু তখন জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপিকে বন থেকে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে বসাতে চাইলেন। কিন্তু দেবাপি এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। পরিবর্তে শান্তনুর রাজ্যের অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য আয়োজিত যজ্ঞে পৌরোহিত্য করলেন তিনি। এই কাহিনীর থেকে ঋগ্বেদের দেবাপি আর্ষ্টিষেণকে বেশ পরিষ্কার ভাবেই মহাকাব্য পুরাণের শান্তনুভ্রাতা দেবাপির সঙ্গে অভিন্ন বলে বোঝা যায়। ঋগ্বেদের সূক্তে শান্তনুর পুরোহিত দেবাপি আর্ষ্টিষেণকে দেবতাদের উদ্দেশে বার বার অনাবৃষ্টি দূর করার প্রার্থনা জানাতে দেখা গেছে।

এখন প্রশ্ন হল, আর্ষ্টিষেণ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ঋষ্টিষেণের পুত্র। বৃহদ্দেবতায় প্রাপ্ত শ্লোকেও বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরু রাজকুমার দেবাপি ছিলেন ঋষ্টিষেণের পুত্র এবং শান্তনুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—

আর্ষ্টিষেণস্তু দেবাপিঃ কৌরব্যশ্চৈব শন্তনুঃ।
ভ্রাতরৌ কুরুষ্বেতৌ রাজপুত্রৌ বভূবতুঃ॥
জ্যেষ্ঠস্তয়োস্তু দেবাপিঃ কনীয়াংশ্চৈব শন্তনুঃ।
ত্বগ্‌দোষী রাজপুত্রস্তু ঋষ্টিষেণ সুতো'ভবৎ॥

অন্য একটি সূত্রে দেখা যাচ্ছে যে, শান্তনুকে ঋগ্বেদের সূক্তে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে 'ঔলান' বলে, অর্থাৎ কী না তিনি 'উলান' নামে জনৈক ব্যক্তির পুত্র। ঋগ্বেদের টীকাকার সায়নাচার্য অবশ্য কুরুবংশীয় শান্তনু এবং এবং ঔলান শান্তনুকে অভিন্ন বলেই মন্তব্য করেছেন—

ঔলানমপি কুরুকুলজাতমপি শান্তনবম্।

অথচ মহাকাব্যে-পুরাণে শান্তনু, দেবাপি দুজনেই পরিচিত প্রতীপের পুত্র হিসেবে। তাহলে ঋষ্টিষেণ কে? প্রতীপের পুত্র তথা শান্তনুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপির নামের পাশে 'আর্ষ্টিষেণ' শব্দটিই বা আসে কোথা থেকে? এই প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান অনুসন্ধান করতে গিয়ে পণ্ডিত পারজিটার মন্তব্য করেছেন যে, প্রতীপ সম্ভবত দেবাপি এবং শান্তনুর পিতামহ, পিতা নন। প্রতীপের হয়তো ঋষ্টিষেণ এবং উলান নামে দুটি পুত্র ছিল যাঁরা অল্পবয়সে একটি একটি পুত্রসন্তান রেখে পরলোকে গমন করেন। প্রতীপের উত্তরাধিকারী হিসেবে যেহেতু পৌত্র শান্তনুই রাজা হন, সেহেতু পরবর্তী সময়ে পুরাণের

কথকঠাকুরদের বর্ণিত কুরুরাজবংশের বংশলতিকা থেকে প্রতীপের দুই পুত্রের নাম বাদ গিয়েছে। নাম দুটি হারিয়ে গিয়েছে এঁদের মধ্যে কেউই সিংহাসনে আরোহণ করেননি বলে। পরিবর্তে পৌরাণিকের বিবরণে প্রতীপের পুত্রের নাম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে দেবাপি এবং শান্তনুর নাম। বৈদিক গ্রন্থ এবং মহাকাব্য পুরাণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলনামুলক বিশ্লেষণ করলে পারজিটারের এই মত যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। কুরুবংশের বংশলতিকা রচনার সময় পুরাণকারদের দ্বারা নেহাত অপ্রয়োজনীয় বলেই বর্জিত কুরুবংশের একটি অধ্যায়ের রহস্য উন্মোচন করাও সম্ভব হয়।

[মহা (k) ১.৯৫.৪৪-৪৫; (হরি) ১.৯০.৫৫-৫৬; বিষ্ণু পু. ৪.২০.৪-৯; মৎস্য পু. ৫০.৩৮-৪১; ঋগ্‌বেদ ১০.৯৮ সূক্ত; বৃহদ্দেবতা ৭.১৪৮-১৫০; নিরুক্ত (Sarup) ২.১০; AIHT *(Pargiter)* p. *165-166]*

আর্ষ্টিষেণ$_{২}$ পুরাণে চন্দ্রবংশীয় রাজা আয়ুর পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধারায় জনৈক রাজা শলের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই শলের পুত্র আর্ষ্টিষেণ। এই আর্ষ্টিষেণও রাজ্য ত্যাগ করে বনে গমন করেন এবং তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ৯২.৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৬]*

আর্ষ্টিষেণ$_{৩}$ একজন বিশিষ্ট ঋষি। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রায়োপবেশনরত রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে ইনিও হস্তিনাপুরে এসেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১.১৯.১০]

আর্ষ্টিষেণ$_{৪}$ কিম্পুরুষ বর্ষে বসবাসকারী একজন বিশিষ্ট গন্ধর্ব। *[ভাগবত পু. ৫.১৯.২]*

আর্ষ্টিষেণ$_{৫}$ একজন প্রাচীন রাজর্ষি। ইনি মৃত্যুর পর যমের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন বলে মহাভারতের সভাপর্বে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ২.৮.১৪; (হরি) ২.৮.১৪]

আর্হতম্ ব্রাহ্ম, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর এবং শাক্ত ইত্যাদি ধর্মদর্শনের সঙ্গে আর্হত-দর্শনকে যুক্ত করে বায়ু পুরাণে 'ষড়্‌দর্শনে'র একটা চিরাচরিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে—ষড়্‌দর্শনানি চোক্তানি। আর্হত-দর্শন অবশ্য বৌদ্ধ অর্হতদের দর্শন। সেটা নাস্তিক দর্শন বলেই গণ্য হয়েছে চিরকাল। সেই দর্শনকে ব্রাহ্ম, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর কিংবা শাক্ত দর্শনের মতো আস্তিক দর্শনের সঙ্গে একই পংক্তিতে রাখাটা পৌরাণিক উদারতা। এটা ঠিক যে, ব্রাহ্ম-শৈবদের দর্শনগুলিও সাংখ্য, ন্যায়, বেদান্তের মতো চিহ্নিত ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত নয়। কিন্তু পৌরাণিক কালে সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্তরা পূর্বতন বেদ-বেদান্তের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়েই নিজেদের উপদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু সেখানেও বৌদ্ধদের আর্হত-দর্শনের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে 'গাণপত্য'-দর্শনকে বাদ দিয়ে আর্হতকে ষড়্‌দর্শনের মধ্যে নিয়ে আসাটা পৌরাণিক দৃষ্টিতে চমকপ্রদ। যদিও এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপভাবনার মধ্যে আর্হতদের নাম করাটা বৌদ্ধদের assimilate করা বা absorb করে নেবার ভাবনাটাও একটা পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য সূচনা করে। *[বায়ু পু. ১০৪.১৬]*

আলক্ষিত পশ্চিমভারতের একটি বন। সুগ্রীব সীতাকে খোঁজার জন্য যখন বানরবীরদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠান, তখন দক্ষিণদিকের পর পশ্চিমদিকের স্থানগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে আলক্ষিত নামক বনের উল্লেখ করেছেন। *[রামায়ণ ৪.৪২.১৪]*

আলম্ব$_{১}$ যুধিষ্ঠির যখন সভাগৃহে প্রবেশ করছিলেন, তখন যে ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আলম্ব অন্যতম।

[মহা (k) ২.৪.১৪; (হরি) ২.৪.১৪ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র., পৃ. ২৬]

আলম্ব$_{২}$ পুরাণে বশিষ্ঠ মুনির প্রবরভুক্ত যে ঋষি-বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, 'আলম্ব' সেই প্রবরের অন্যতম। বশিষ্ঠ ঋষি থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও বাশিষ্ঠী বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. (মহর্ষি) ২০০.১৭]*

আলম্বা ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ অনুসারে খশার কন্যাদের মধ্যে একজন রাক্ষসী। রাক্ষসদের গণগুলির মধ্যে অন্যতম আলম্বেয়গণের উৎপত্তি হয়েছে এই আলম্বা থেকে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৩৮; বায়ু পু. ৬৯.১৬৯, ১৭২]

আলম্বায়ন মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে যে, চারুশীর্ষ মুনি দেবরাজ ইন্দ্রের মিত্র। তিনি আলম্ব গোত্রভুক্ত বলে তাঁকে আলম্বায়ন বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৮.৫; (হরি) ১৩.১৭.৫]

আলম্বি একজন শ্রুতর্ষি। কৃষ্ণযর্জুবেদের চরক শাখার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে অন্যতম আলম্বি।
[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.৬]

আলম্বেয় রাক্ষসদের একটি গণ। খশার কন্যা আলম্বা থেকে এই আলম্বেয় গণের উৎপত্তি হয়েছে। *[বায়ু পু. ৬৯.১৭২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৪০]*

আলুকি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আলুকি সেই গোত্রের অন্যতম। ভৃগু ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও ভার্গব নামে পরিচিত।
[মৎস্য পু. ১৯৫.২৫]

আশী একজন অপ্সরা। মৌনেয়-গন্ধর্বদের অধীনে যে চৌত্রিশ জন অপ্সরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আশী অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬৯.৫]*

আশীঃ (আশীষ্) ভাগবত পুরাণ অনুসারে ভগ নামক আদিত্য তাঁর পত্নী সিদ্ধির গর্ভে তিন পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করেছিলেন। ভগ ও সিদ্ধির-র কন্যাই হলেন আশীঃ (আশিষ্)।

এই 'আশীঃ' (আশিষ্) আশীর্ব্বাদস্বরূপ বলেই মনে হয়। *[ভাগবত পু. ৬.১৮.২]*

আশ্চর্যপুরাণ দুর্বাসা-কথিত আশ্চর্যপুরাণ একটি উপপুরাণ। *[কূর্ম পু. ১.১.১৮]*

আশ্বলায়ন$_{১}$ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ঋষি বিশ্বামিত্রের যে সকল ব্রহ্মবাদী পুত্রদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আশ্বলায়ন অন্যতম। *[মহা (k) ১৩.৪.৫৪; (হরি) ১৩.৩.৭৩]*

আশ্বলায়ন$_{২}$ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, দ্বাপর যুগের, ষড়বিংশ পর্যায়ে যখন পরাশর ব্যাস হবেন, তখন মহাদেব সহিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ হবেন। সেই সময় সহিষ্ণুর যে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে আশ্বলায়ন একজন। *[বায়ু পু. ২৩.২১৩]*

আশ্বলায়ন$_{৩}$ ঋগ্‌বেদের প্রধান পাঁচটি শাখার অন্যতম শাখা-প্রবর্তক ঋষি। গুরু-শিষ্যের পরম্পরায় দেশ-কাল-ভেদে প্রচলিত বেদশাস্ত্রের আবৃত্তিতে, পাঠরীতিতে, উচ্চারণে যে পার্থক্য তৈরি হয়েছে, সেই ভিন্নরীতি এবং স্বতন্ত্র পাঠের প্রয়োজনেই বেদের শাখা তৈরি হয়েছে। শাখার সৃষ্টিকর্তা ঋষির নামেই শাখার নামকরণ। ঋগ্‌বেদের ক্ষেত্রে শাকল নামক ঋষিই প্রথম ঋক্‌সংহিতা অধ্যয়ন করেন। তারপর শাংখ্যায়ন, আশ্বলায়ন, মণ্ডুক এবং বাস্কল নামে চারজন মুনি সেই ঋক্‌সংহিতা অধ্যয়ন করেন নিজেদের দেশ-কালের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে। শৌনকের লেখা চরণব্যূহ-সূত্রের টীকায় আচার্য মহিদাস একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করে আশ্বলায়নের এই শাখা-প্রবর্তকত্বের কথা বলেছেন—

> 'ঋচাং সমূহঃ ঋগ্‌বেদস্তমভ্যস্য প্রযত্নতঃ।
> পঠিতঃ শাকলেনাদৌ চতুর্ভিস্তদনন্তরম্॥
> শাংখ্যাশ্বলায়নৌ চৈব মাণ্ডুকো বাস্কলাস্তথা।
> বহ্বৃচাং ঋষয়ঃ সর্বে পঞ্চৈতে হ্যেকবেদিনঃ॥

[চরণব্যূহসূত্রম্ পৃ. ২৩-২৪]

বেদের এই আশ্বলায়ন শাখার সম্প্রদায়-ভেদ অনুযায়ী তার নিজস্ব মন্ত্রসংহিতা, ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং শ্রোতসূত্র, ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি থাকার কথা। কিন্তু আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্রই শুধু পাওয়া যায়। আর কিছু পাওয়া যায় না। প্রশ্ন উপনিষদে (১.১; ৩.১) আমরা আশ্বলায়নের নাম পাই। কৈবল্য উপনিষদে (১.১) দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং মহাদেব আশ্বলায়নের কাছে নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন।
[বিশদ জানার জন্য, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, অমর কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভূমিকা পৃ. ১৭-২২]

আশ্বলায়নি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আশ্বলায়নি সেই গোত্রের অন্যতম। অঙ্গিরা ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও আঙ্গিরস নামে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৬.১৩]*

আশ্বলায়নী (আশ্বলায়নিন্) পুরাণে কশ্যপের গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আশ্বলায়নী সেই গোত্রের অন্যতম। কশ্যপ ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও কাশ্যপ নামে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৬]*

আশ্বায়নি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, আশ্বায়নি সেই গোত্রের অন্যতম। ভৃগু ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও ভার্গব নামে পরিচিত।
[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৪]

আশ্বিন *[দ্র. মাস]*

আশ্রম$_{১}$ বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম এবং শৈব ভেদে কূর্মপুরাণ চতুরাশ্রম আবার তিন ভাগে বিভক্ত করেছে।
[কূর্ম পু. ১.২.১০০]

ভগবন্নারায়ণের মন, চক্ষু, কর্ণ এবং ত্বক্ থেকে আশ্রম-চতুষ্টয়ের জন্ম হয়েছে বলে মনে করা হয়। *[বৃহদ্ধর্ম পু. ২.১৬.৩০]*

ব্রাহ্মণের পক্ষে চতুর্বিধ আশ্রমধর্ম বিহিত—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ—এই ত্রিবিধ আশ্রম বিহিত। বৈশ্যের পক্ষে গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—এই দ্বিবিধ আশ্রম পালনীয়। আর শূদ্রের পক্ষে একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমই নির্দিষ্ট হয়েছে। *[বামন পু. ১৪. ২-১১৮]*

আশ্রম$_২$ সাধারণ্যে আশ্রম-শব্দের প্রথম অর্থ হল মুনি-ঋষিদের আবাসস্থল। মুনি-ঋষিদের এই আশ্রম সাধারণত অরণ্য অঞ্চলে গড়ে উঠত এবং এখানে এমন এক শান্ত অক্ষুব্ধ পরিবেশের কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে অন্যেরা প্রবেশ করলে তাঁদের দুঃখ-কষ্ট-শ্রম নাশ হয় বলে তাঁরা মনে করেন। কিষ্কিন্ধ্যায় যাবার সময় রামায়ণে সপ্তজন মুনিদের যে আশ্রমটি দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন রামচন্দ্র, সেই আশ্রমের পরিচয় দেবার সময় সুগ্রীব প্রথম যে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা হল—এই আশ্রম যেন সমস্ত 'শ্রম' নাশ করে দেয়—

'আশ্রমং শ্রম-নাশনম্'।

আশ্রমটি যথেষ্ট বড়ো। মনোহর উদ্যান এবং অরণ্যের বৃক্ষ দিয়ে ঘেরা এই স্থানটিতে ফল-মূলেরও অভাব নেই কোনো—

এতদ্‌রাঘব বিস্তীর্ণম্ আশ্রমং শ্রমনাশম্।

কিন্তু সপ্তজন আশ্রমের ভিতর সাতজন মুনির যে কঠোর তপস্যার পরিশ্রমের কথা বলা হয়েছে, তাতে এই আশ্রমটিকে 'শ্রমনাশন' উপাধি দিয়ে কোনোভাবে আশ্রম-শব্দের, মধ্যে শ্রমহীনতার কোনো তাৎপর্য্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব 'অশ্রম'-এর জায়গাটার নামই আশ্রম—এ-কথা বোধহয় 'শ্রমনাশন' উপাধি থেকেও প্রমাণ হয় না। অবশ্য একই রকম কথা কিন্তু মহাভারতে মতঙ্গ-মুনির আশ্রম সম্বন্ধেও উচ্চারিত, এই আশ্রমও শ্রম-শোক নিবারণ করে—

তং প্রবিশ্যাশ্রমং শ্রীমৎ-শ্রম-শোক-বিনাশনম্।

পণ্ডিতজনেরা অনেকেই বিচার করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন—মুনি-ঋষিদের আশ্রম তাঁদের কঠোর তপস্যা এবং শ্রমের স্থান বলেই শ্রম-নিবারক 'অশ্রম' শব্দ থেকে তৈরি হয়নি, বরঞ্চ এই 'শ্রম-নাশন' অথবা 'শ্রম-শোক-বিনাশন' ইত্যাদি শব্দগুলি 'আশ্রম'-শব্দের সঙ্গে 'অনুপ্রাস' ব্যবহার করে শব্দধ্বনি তৈরি করার আবেগমাত্র। আমরা অবশ্য বলতে চাই যে, আশ্রমের এই 'শ্রম-নাশন' বিশেষণের তাৎপর্য্য আসলে অন্য আগন্তুক পথিকের কাছে, বাইরে থেকে দেখে যাদের মনে হয়—মুনি-ঋষিদের আশ্রমগুলি বড়ো শান্তির জায়গা, এখানে প্রবেশ করলে মানুষের শ্রম-শোক সব দূর হয়ে যায় যেন। মুনি-ঋষিদের আশ্রম-সংক্রান্ত বর্ণনা রামায়ণ-মহাভারতে যেখানেই আছে, সেখানেই মুনি-ঋষিদের বহুতর তপঃক্লেশ এবং পরিশ্রমের কথা উল্লিখিত হলেও অন্যের কাছে যে আশ্রম এক বিলক্ষণ শান্তির জায়গা, সে-কথা প্রত্যেক আশ্রমের পরিবেশ বর্ণনায় একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের বক্তব্য সপ্রমাণ হতে পারে রামায়ণ-মহাভারতের বর্ণনায় মুনি-ঋষিদের আশ্রমগুলির নৈসর্গিক তথা আধ্যাত্মিক অবস্থান থেকে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের আরম্ভ থেকেই রামচন্দ্র মুনি-ঋষিদের আশ্রম দেখতে দেখতে চলেছেন, বহু আশ্রমেই তিনি সীতা-লক্ষ্মণসহ থেকেও গেছেন দিনের পর দিন। রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী চোদ্দ বছর বনবাস-জীবনের মধ্যে রামচন্দ্র প্রায় দশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন এইভাবে, নানা মুনি ঋষির আশ্রমে। কোথাও দশ মাস, কোথাও এক বছর, কোথাও চার মাস, কোথায় পাঁচ-ছয় মাস, কোথাও তিন মাস বা আট মাস, কোথাও পনেরো দিন, এমনকী আগে যে আশ্রমে বাস করে এসেছেন, সেই আশ্রমেও অন্য জায়গা ঘুরে ফিরে গেছেন আবার—

এবং কথয়মানঃ স দদর্শাশ্রমমণ্ডলম্।
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্॥
প্রবিশ্য সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ রাঘবঃ।
তদা তস্মিন্ স কাকুৎস্থঃ শ্রীমত্যাশ্রমমণ্ডলে॥
উষিত্বা স সুখং তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
জগাম চাশ্রমাংস্তেষাং পর্য্যায়েণ তপস্বিনাম্॥
যেষামুষিতবান্ পূর্ব্বং সকাশে স মহাস্ত্রবিৎ।
ক্বচিৎ পরিদশান্ মাসানেকং সংবৎসরং ক্বচিৎ॥
ক্বচিচ্চ চতুরো মাসান্ পঞ্চ ষট্ চ পরান্ ক্বচিৎ।
অপরত্রাধিকান্ মাসানধ্যর্দ্ধমধিকং ক্বচিৎ॥
ত্রীন্ মাসানষ্ট মাসাংশ্চ রাঘবো ন্যবসৎ সুখম্।
তত্র সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমেষু বৈ।

রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ॥
পরিসৃত্য চ ধর্ম্মজ্ঞো রাঘবঃ সহ সীতয়া।

ক্রমান্বয়ে দশ বৎসর কাল এইভাবে মুনি-ঋষিদের আশ্রমে থাকতে থাকতে রাম-সহচর লক্ষ্মণ নিজেদের জন্য আশ্রম নির্মাণ করার শিল্পটাও শিখে গেলেন। অগস্ত্যমুনির নির্দেশিত পথে পঞ্চবটী-বনে পৌঁছোবার পর রামচন্দ্র নিজেই লক্ষ্মণকে সপ্রশংসভাবে বলছেন— আশ্রম বানানোর উপযুক্ত জায়গা বাছার ব্যাপারে তোমার মতো মানুষ আর নেই। তুমি এই পঞ্চবটী বনের চার দিকটা দেখে নাও ভালো করে, তারপর বলো কোথায় আমাদের আশ্রম তৈরি হতে পারে—

আশ্রমঃ কতরস্মিন্ নো দেশে ভবতি সম্মতঃ।

রামচন্দ্র এবার আদর্শ আশ্রমস্থলের একটা প্রকার নির্দেশ করে বললেন—এমন একটা জায়গা বাছো যেখানে কাছাকাছি জলাশয় আছে এবং সেই স্থান আরণ্য মাধুর্য্য এবং জলাশয়ের মাধুর্য্যে সুন্দর। যেন এখানে যজ্ঞকর্মের জন্য সমিৎ-কুশ পাওয়া যায়, পাওয়া যায় পুজোর ফুল। রামচন্দ্রের নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও জায়গাটা রামচন্দ্রকেই স্থির করতে হল লক্ষ্মণের আত্যন্তিক অনুরোধে। একটি সুন্দর জায়গা দেখিয়ে রামচন্দ্র বললেন—বনের এই জায়গাটা সমতল, পুষ্পিত বৃক্ষে অতীব শোভাশালী এই স্থান। অদূরে নদী দেখা যাচ্ছে, যার দুই পারেই ফুলের গাছ ভর্তি। হরিণ চরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। হংস-কারণ্ডব আর চক্রবাক পক্ষী সমাকীর্ণ গোদাবরী নদী এখানে পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে।

রামচন্দ্র সাল, তাল, তমাল থেকে কিংশুক, পাটল ইত্যাদি বহু বৃক্ষের নাম করলেন যেগুলি তাঁর ভাবিত আশ্রমস্থলের পরিমণ্ডল। কাছে একটা পাহাড়ও আছে এখানে, যেখানে পার্বত্য হস্তীরও দেখা মিলেছে। আমরা রামচন্দ্রের এই কল্পিত আশ্রমস্থলীর কথাটা এইজন্যই জানালাম যে, একটি আশ্রম কী ধরনের জায়গায় তৈরি হয়ে উঠত এবং তার পারিপার্শ্বিক কী রকম হত। রামচন্দ্রের ইচ্ছামত লক্ষ্মণ যেভাবে একটি আশ্রমকুটীর নির্মাণ করলেন সেটাও এখানে উল্লেখ্য বটে। পঞ্চবটী বনের মধ্যে উচ্চ সমতল ভূমিতে বেশ শক্তপোক্ত থাম পুতে একটি পর্ণকুটীর তৈরি করে তার ছাদে বিছিয়ে দেওয়া হল শমীশাখার আস্তরণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করার জন্য কুশ, কাশ এবং নলখাগড়ার পাতা বিছিয়ে দেওয়া হল। আশ্রম কুটীরের স্তম্ভ তৈরি করা হত বাঁশ দিয়ে, ছাদের কাঠামোও তৈরি করা হত বাঁশ দিয়েই—

অচিরেণাশ্রমং ভ্রাতুশ্চকার সুমহাবলঃ॥
পর্ণশালাং সুবিপুলাং তত্র সঙ্ঘাতমৃত্তিকাম্।
সুস্তম্ভাং মস্করৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাং সুশোভনাম্॥
শমীশাখাভিরাস্তীর্য্য দৃঢ়পাশাবপাশিতাম্।
কুশকাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাং তথা॥
সমীকৃততলাং রম্যাং চকার সুমহাবলঃ।
নিবাসং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুত্তমম্॥

রামচন্দ্র বনবাসে এসে যে আশ্রম বানিয়েছেন তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেখানে কুটীর রচনার প্রণালী এক হলেও আশ্রম বলতে যা বোঝাত, সেই মুনি-ঋষিদের আশ্রমের আরও কিছু বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বের মধ্যেই কিন্তু আশ্রম জায়গাটাকে 'শান্তির জায়গা' বা 'আশ্রমঃ শ্রমনাশনঃ' বলার তাৎপর্য্য লুকিয়ে আছে। সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম ছেড়ে তাঁরই প্রদর্শিত পথে রামচন্দ্র যখন অগস্ত্য মুনির আশ্রমের দিকে যাচ্ছেন, তখন যাত্রাপথে দূর থেকেই তাঁর আশ্রমের পরিবেশ বর্ণনা করে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন রামচন্দ্র। যাবার পথেই নীবার (শ্যামা ধান্য, কাউনের চাল যা থেকে হয়, ঋষি-মুনিদের ব্যবহার্য্য তেমন গাছ), পনস (কাঁঠাল), শাল, অশোক, তিনিশ, করঞ্জ, বেল গাছ, মধূক (মহুয়া), তিনদুক—ইত্যাদি বড়ো-ছোটো গাছ বাইরে থেকেই আশ্রম-পরিবেশের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে। বড়ো বড়ো গাছগুলিতে হাতিরা গা-মাথা ঘষে শরীরের আরাম ঘটায়, বৃক্ষশাখে বানরের অভাব নেই, পাখিদের কলকাকলীতে মুখরিত বনস্থলীর গাছের স্নিগ্ধ পাতাগুলির মতোই শান্ত হরিণ এবং অন্যান্য পশুরা। এরা মানুষ দেখেও ভয় পাচ্ছে না মানেই মুনির আশ্রম আর বেশি দূরে নয়—

স্নিগ্ধপত্রা যথা বৃক্ষা যথা ক্ষান্তা মৃগদ্বিজাঃ।
আশ্রমো নাতিদূরস্থো মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ॥

দূর পথ পার হয়ে আসা পথিকের কাছে এই শান্ত আশ্রম কেমন প্রতিক্রিয়া তৈরি করে রামচন্দ্র প্রথমেই বলেছেন—এই আশ্রম যেন পরিশ্রান্ত মানুষের সমস্ত শ্রান্তি অপনোদন করে দেয়—

আশ্রমো নাতিদূরস্থঃ পরিশ্রান্ত-শ্রমাপহঃ।

হোমাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঘৃতগন্ধী ধূমে পরিব্যাপ্ত হয়েছে আশ্রমভূমি, জায়গায় জায়গায় মুনি-ঋষিদের পরিধান চীর-বল্কল দেখা যাচ্ছে। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্ভয় হরিণ আর বিহঙ্গকুলের শব্দে মুখরিত বনস্থলী বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এটাই অগস্ত্যমুনির আশ্রম।

আমরা বলতে চাই, শুধু অগস্ত্যমুনির আশ্রম বলেই একথা নয়, রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডের আরম্ভ থেকেই আশ্রমগুলির বর্ণনা এই রকম শান্তপদবী বহন করে। আর সেই আশ্রমে যতই না কেন ঋষি-মুনিদের তপস্যার কৃচ্ছ্রতা এবং তাঁদের যজ্ঞক্রিয়া কিংবা সামধ্বনির আলাপ, কিংবা ধ্যান-মৌনতার শ্রান্তি থাকুক, বাইরে থেকে আসা মানুষের কাছে আশ্রমের এই সামগ্রিক পরিবেশটাই কিন্তু শান্তির—

পরিশ্রান্ত-শ্রমাপহঃ। *[রামায়ণ ৪.১৪.১৭-২৫; মহা (k) ৩.৮৪.১০১; (হরি) ৩.৬৯.১০২; Patrick Dlivelle, The Asrama System, pp. 16-24; রামায়ণ ৩.১১.২১-২৭; ৩.১৫.২০-২৩; ৩.১১.৭৪-৮০; ৩.১.১-১০]*

☐ মুনির আশ্রম যে কতটা শান্তির জায়গা হতে পারে, এমনকী সেই আশ্রমে প্রবেশ করে একজন মৃগয়াশীল রাজা যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যেতে পারেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে মহাভারতের মহর্ষি কণ্বের আশ্রম বর্ণনায়। মৃগয়া করতে গিয়ে রাজা দুষ্যন্ত যে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তার অসামান্য নৈসর্গিক বর্ণনা কণ্বাশ্রমের প্রাকৃতির পরিবেশের বর্ণনায় মিশে গেছে। এই আশ্রমে নানা প্রকার বৃক্ষের সমারোহ, হোমাগ্নি জ্বলছে এক জায়গায়, হোমগৃহও অনেকগুলি। বালখিল্য এবং অন্যান্য ঋষিরা বিচরণ করছেন সেখানে। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছতোয়া মালিনী নদী। তপস্বী-জনেরা স্নান করার জন্য যাতায়াত করছেন। হিংসাবহুল ব্যাঘ্রাদি পশুরাও এই আশ্রমের পরিবেশে শান্তস্বভাবে রয়েছে। মালিনীর জলপ্রায় তীরদেশে হংস-কারণ্ডব পক্ষীরা বিচরণ করছে। মালিনীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসছে ফুল এবং জলের ফেনা। দূর থেকে ভেসে আসছে বেদপাঠের শব্দ।

পুণ্যস্বাধ্যায়-সংঘুষ্টাংপুলিনৈরুপশোভিতাম্।

রাজা দুষ্যন্ত সমস্ত সৈন্য-বাহিনীকে দূরে রেখে, শুধু পুরোহিত এবং দু-একজন অমাত্যদের সঙ্গে নিলেন। তারপর রাজচিহ্ন অস্ত্র-অলঙ্কার ত্যাগ করে কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করলেন। আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন—ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ছন্দের পদ এবং ক্রম অনুসারে ঋগ্‌বেদ পাঠ করছেন। যজ্ঞস্থলের মধ্যে যজ্ঞবিদ্যায় পারদর্শী যজুর্বেদী ব্রাহ্মণেরা, বেদাঙ্গবিদ্ ব্রাহ্মণেরা এবং সাম-গায়ক উদ্‌গাতা ঋষিরাও আছেন। তাঁদের বাদ দিলে অন্যান্য শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতজনেরাও ছিলেন যাঁরা শাস্ত্রালোচনায় রত ছিলেন। কেউ ধ্যান করছেন, কেউ জপ করছেন, কেউ হোম করছেন—এই বিরাট আশ্রমিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অনেক জায়গায় সুন্দর সুন্দর আসন পাতা আছে এবং সামনে দেবতার মন্দিরও রয়েছে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণেরা সেখানে পূজা করছেন। রাজা দুষ্যন্তের মনে হল—তিনি যেন ব্রহ্মলোকে এসে উপস্থিত হয়েছেন—

দেবতায়তনানাঞ্চ প্রেক্ষ্য পূজাং কৃতাং দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মলোকস্থমাত্মানং মেনে স নৃপসত্তমঃ॥

মহাভারতে বর্ণিত এই কণ্বমুনির আশ্রম শুধুমাত্র ত্যাগী-বিরাগী ঋষিদেরই আশ্রম নয়, এই আশ্রম বোধহয় একটু বৃহৎ প্রকৃতির আশ্রম; কারণ এখানে যেভাবে বেদপাঠ এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ চলছে, তাতে এখানে কৃচ্ছ্রসাধক ব্রহ্মচারীদের পাঠ নেবার জায়গা বলেও মনে হয়। আবার যাগযজ্ঞের আড়ম্বরের সমান্তরালে শান্ত-স্নিগ্ধ দেবতার মন্দিরগুলি দেবপূজার লৌকিক প্রতিষ্ঠাও সূচনা করে। বাস্তবেই এই আশ্রমটির তাত্ত্বিক পরিধি অনেক বড়ো এবং মহাভারতে অন্যান্য আরো যে-সব আশ্রম আছে, সেগুলি প্রায় রামায়ণে বর্ণিত আশ্রমগুলির মতোই।

[মহা (k) ১.৭০.৩-৪৯; (হরি) ১.৮৪.৩-৫০]

আশ্রমস্থ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। প্রাচীন আর্যসমাজ জীবনকালকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এই চারটি একত্রে চতুরাশ্রম নামে পরিচিত। বস্তুত আশ্রম শব্দের অর্থ হল, ধর্ম বা ব্রত পালনের জন্য শ্রম করা। মহাদেব মানব জীবনকালের এই চারটি পর্যায়ের আচরণীয় ব্রত-ধর্মের স্বরূপ এবং চতুরাশ্রম থেকে অর্জিত

পুণ্যফলের স্বরূপও তিনিই। তাই তাঁকে আশ্রমস্থ নামে সম্বোধন করা হয়েছে—

আশ্রমেষু চতুর্ষু ধর্মরূপেণ তিষ্ঠতীত্যাশ্রমস্থঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯৭; (হরি) ১৩.১৬.৯৭]

আশ্রায়ণি পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, 'আশ্রায়ণি' সেই গোত্রের অন্যতম। কশ্যপ থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও কাশ্যপ বলে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৯.২]

আষাঢ়$_{১}$ *[দ্র. মাস]*

আষাঢ়$_{২}$ একটি নক্ষত্র।

[মহা (k) ১৩.৮৯.১০; (হরি) ১৩.৭৬.৪৪; বায়ু পু. ৮২.১০]

আষাঢ়$_{৩}$ একজন রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, ক্রোধবশ নামে অসুররা পরবর্তীকালে বিভিন্ন শক্তিশালী রাজা রূপে অবতীর্ণ হন। আষাঢ়-ও এমন একজন রাজা যিনি ক্রোধবশ নামক অসুরদের অংশ থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬৪; (হরি) ১.৬২.৬৪]

□ পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বনের জন্য যেসব রাজাদের রণ-নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আষাঢ় অন্যতম।

[মহা (k) ৫.৪.১৭; (হরি) ৫.৪.১৭]

আষাঢ়$_{৪}$ শিব-সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। শিব সহস্রনামস্তোত্রে মহাদেবের আষাঢ় এবং সুষাঢ় নাম দুটি একত্রে উল্লিখিত হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের এই দুটি নামের অর্থও ব্যাখ্যা করেছেন একত্রে। আষাঢ় শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'সহ্' ধাতু থেকে। 'সহ্' ধাতুর অর্থ-সহ্য করা। তবে এক্ষেত্রে প্রযোজক ক্রিয়া হিসেবে শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থ দাঁড়াবে সহ্য করানো। তিনি আমাদের শোক-দুঃখ বেদনা-যন্ত্রণা সমস্ত কিছু সহ্য করার শক্তি বা সামর্থ্য দেন বলেই তিনি আষাঢ় নামে খ্যাত—

আষাঢ়ঃ সাহয়তেঃ কর্ত্তরি নিষ্ঠা আ সমন্তাৎ
সর্বং সাহয়তি সহনং করয়তীত্যাষাঢ়ঃ
সর্বসহনসামর্থ্যপ্রদ ইত্যর্থঃ।

একই ভাবনা থেকে তিনি সুষাঢ় নামেও খ্যাত। সমস্ত অবস্থাকেই তিনি আমাদের কাছে সুন্দর ভাবে সহনীয় করে তোলেন—তাই এই নাম।

[মহা (k) ১৩.১৭.১২১; (হরি) ১৩.১৬.১২০]

আষাঢ়লিঙ্গ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত শিবলিঙ্গ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৯৩]

আষাঢ়েশ আষাঢ়ী নামক পবিত্র স্থানে ভগবান শিবের নাম আষাঢ়েশ। এখানে দেবীর নাম রতীশা। *[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল) ২.২৮]*

মতান্তরে দেবীর নাম রতি।

[দেবী ভাগবত পু. ৭.৩৮.২০]

আসঙ্গ যদুবংশ ধারায় শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত বারোজন পুত্রের অন্যতম আসঙ্গ। তিনি অক্রূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৬]

আসন আসনকে যোগপীঠ বলা হয়। যোগপীঠ-সদৃশ স্থানই আসন। আসন প্রদান করলে সৌভাগ্য এবং মুক্তিলাভ হয়। সাধক চার প্রকারের আসন ব্যবহার করতে পারেন—কাষ্ঠ-নির্মিত, চর্ম-নির্মিত, বস্ত্র-নির্মিত, এবং তৈজস আসন। সাধক পূজাকালে নিজের ইচ্ছেমতো আসনে উপবেশন করতে পারেন না। তিনি এজন্য কাষ্ঠাসন তৈরি করে নেবেন এবং সেই কাষ্ঠাসন চব্বিশ আঙুল লম্বা, ষোলো আঙুল চওড়া এবং চার আঙুল উঁচু হবে। পূজার কাছে যে বস্ত্রাসন ব্যবহৃত হবে, তা দুই হাতের বেশি লম্বা, আধ হাতের বেশি চওড়া এবং তিন আঙুলের বেশি উঁচু হবে না। চর্মাসনে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ নিজের হাতে তৈরি করা যায়, কিন্তু এটা কখনোই ছয় আঙুলের বেশি উঁচু হবে না। লোহা, কাঁসা এবং সিসে ছাড়া অন্য সমস্ত তৈজস আসনই প্রশস্ত। *[কালিকা পু. ৬৮.১৮-৩১]*

আসন্দী বসবার জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠাসনের বৈদিক নাম। ঋগ্‌বেদে শব্দটির উল্লেখ নেই, কিন্তু অথর্ববেদে বিবাহ অনুষ্ঠানে আসন হিসেবে আসন্দীর নাম করা হয়েছে—

যদাসন্দ্যামুপধানে।

অথর্ববেদে ব্রাত্যজনের বসার জায়গা হিসেবে আসন্দীর চেহারাটা কীরকম হবে, তার একটা বর্ণনাও আছে। আসন্দীর ওপরে তোশকের মতো একটা আস্তরণ থাকবে, একটা বালিশ বা 'উপবর্হণ' থাকবে—মূল বসার জায়গাটার নাম 'আসাদ' এবং বসার জায়গাটা থেকে যাতে পড়ে না যায় কেউ, তার জন্য একটা 'উপশ্রয়' অর্থাৎ ধরার মত একটা হাতলও

থাকবে। পরবর্তীকালে এটা সিংহাসন এবং পালকির চেহারা নিয়েছে।

অনান্য ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে এটা বলা আছে যে, উদুম্বর কাঠ দিয়ে এটি তৈরি হয় এবং এখানেই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, সেটি রাজার আসন—

অথৈবৌদুম্বরী রাজাসন্দী।

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রের ওপরে টিপ্পনীতে Whitney সাহেব বেদজ্ঞ পণ্ডিত Lenman -এর উদ্ধৃতিসহ আসন্দীর অনেকগুলি সম্ভাবনা কল্পনা করেছেন—

The *āsandi* appears to be now a throne (cf. AB viii, 5, 6 12), and now something between a lounging chair and a bed, 'a long reclining chair' such as Anglo-Indians use today with more comfort than elegance. That it was usable also as a bier carried by four bearers appears from Digha Nikāya, ii. 23, and Buddaghosa's scholion. Compare also the description below, AV. xv. 3.3. ff.—In Hala's Saptacataka *āsandiā* is glossed by *khaṭvā* (no. 112, ed. 1870) or *paryaṅkikā* (no. 700, ed. 1881).

[অথর্ববেদ সংহিতা (whitney) ১৪.২.৬৫; ১৫.৩.১-৯; পৃ. ৭৬৫, ৭৭৬-৭৭৭; জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (মহর্ষি) ২.২৫; পৃ. ২২৮]

☐ শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—আসন্দী তৈরি হত খদির কাঠ দিয়ে। রাজার আসন হিসেবে এখানে আসন্দীর কথা বলা হয়েছে এবং প্রজারা সেই আসন্দীর উচ্চস্থান খেয়াল করে নীচে বসে। সবচেয়ে বড়ো কথা—আসন্দীতে টুকরো কাঠের পেরেক বসিয়ে এমনভাবে ক্ষুদ্র একটি খাটের মতো তৈরি করা হত যে, তার তুলনা দেওয়া হয়েছে ভরত বংশীয়দের ব্যবহার্য্য বা ব্যবহৃত আসন্দীর সঙ্গে—

সৈষা খদিরী বিতৃষা যেয়ং বর্ধ্রব্যুতা ভরতানাম্।

মহাভারতের ভরত বংশীয়দের এই উপহার আমরা পরম্পরা ক্রমে পেয়েছি বলে মনে করি।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ৫.৪.৪:১; পৃ. ৪৬৫]

আসন্দীবৎ পারীক্ষিত জনমেজয়ের রাজধানী, যদিও ইনি পাণ্ডবদের উত্তরাধিকারী অভিমন্যুর পৌত্র পারীক্ষিত জনমেজয় নন। ইনি শতপথ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত প্রাচীন পারীক্ষিত জনমেজয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে এই আসন্দীবতেই তিনি অশ্বমেধের ঘোড়া বেঁধে রেখেছিলেন— ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরকম একটি প্রাচীন গাথা পাওয়া যায়—যে, এই আসন্দীবৎ নামক স্থানে একটি (সাদা) রুক্মবর্ণ, মাথায় তারকা-চিহ্নযুক্ত ঘোড়াকে ধান্য-শস্যের খানা-পিনা দিয়ে দেবতাদের উদ্দেশে বলি দেবার জন্য বেঁধে রেখেছিলেন জনমেজয়—

আসন্দীবতি ধান্যাদং রুক্মিণং হরিতস্রজম্।
অশ্বং ববন্ধ সারঙ্গং দেবেভ্যো জনমেজয়ঃ॥

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ৮.২১]

পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীতে আসন্দীবৎ নামে স্থান-নামটির উল্লেখ করেছেন, অনিয়মিতভাবে সৃষ্ট এক শব্দ হিসেবে।

[অষ্টাধ্যায়ী সূত্র পাঠ ৮.২.১২]

অর্থাৎ আসন থেকে আসন্দী এবং সেটা থেকে আসন্দীবৎ—উদাহরণে 'আসন্দীবৎ অহিস্থলম্'- লিখেছেন কাশিকাকার জিনেন্দ্র-বুদ্ধি। হস্তিনাপুরের এক নাম নাগসাহ্বয়—এই নাগ মানে যেহেতু 'অহি', তাই অনেকে জনমেজয়ের এই রাজধানীকে হস্তিনাপুরই মনে করেন। বস্তুত জনমেজয়ের রাজধানী হস্তিনাপুরেই ছিল এবং সেটাই প্রধানত কাশিকার জিনেন্দ্রবুদ্ধির প্রণিধানে থাকায় তিনি শতপথ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত প্রাচীন পারীক্ষিত জনমেজয়ের, রাজধানীকে 'অহিস্থল' বলেছেন এবং সেটাকেই পণ্ডিতেরা অনেকেই হস্তিনাপুর বলে মনে করেছেন। *[দ্র. জনমেজয়]*

[AGI (Cunnighum) p-23, 24, 41; Ram Chandra Jain, Ethnology of Ancient Bharata, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1970]

আসারণ একজন যক্ষ। ভাগবত পুরাণ অনুসারে ভাদ্র মাসে সূর্যরথে যাঁরা অবস্থান করেন, তাঁদের মধ্যে আসারণ একজন। *[ভাগবত পু. ১২.১১.৩৮]*

আসুর-বিবাহ মহাভারত ও পুরাণগুলিতে যে আট প্রকার বিবাহের কথা বলা হয়েছে, আসুর-বিবাহ তাদের মধ্যে একটি।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, এই বিবাহে পাত্র স্বেচ্ছায় কন্যার পিতাকে অথবা কন্যাকে, কন্যাশুল্ক দিতেন। এরপর পিতা, কন্যা-সম্প্রদান করতেন। মহাভারতে অবশ্য কন্যালাভের জন্য

কন্যার পিতাকে স্বেচ্ছায় অর্থ দানের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনই বলা হয়েছে যে, কন্যা-বিবাহের জন্য কন্যার পরিবার, আত্মীয়-স্বজনকে যদি নানাভাবে প্রলোভিত করে বিবাহ করা হয়, তবে সেটাও আসুর বিবাহ'—

সম্প্রলোভ্য চ বান্ধবান্। *[দ্র. বিবাহ]*

[মনু সংহিতা ৩.৩১; মহা (k) ১৩.৪৪.৭; (হরি) ১৩.৩৭.৭; বিষ্ণু পু. ৩.১০.২৪]

আসুরদান যা দান করে পরে অনুতাপ করতে হয়, তাই আসুর দান। এমন দান বৃথা।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪.৮২]

আসুরহ (অসুরহ) একজন সাধ্য দেবতা। ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা সাধ্যার গর্ভজাত পুত্রদের অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭১.৪৩]*

আসুরায়ণ$_{১}$ পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, 'আসুরায়ণ' সেই গোত্রের অন্যতম। কশ্যপ থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও কাশ্যপ বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৩]*

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, আসুরায়ণ যোগদর্শনের কৌথুম শাখার অন্যতম প্রবক্তা এবং পরাশরের শিষ্য।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৪৫-৪৬]

আসুরায়ণ$_{২}$ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। আসুরায়ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.৪.৫৬; (হরি) ১৩.৩.৭৫]

আসুরি$_{১}$ মহাভারতে উনিশ জন সাংখ্যদর্শন-প্রবক্তা সাংখ্য গুরুর নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে আসুরি একজন। নারদ, পুলস্ত্য, সনৎকুমার এবং শুক্রাচার্যের সঙ্গে একত্রে আসুরির নাম কীর্তিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩১৮.৬১; (হরি) ১২.৩০৮.৬১]

□ পরমর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের মূল প্রবক্তা। আসুরি ঋষি তাঁর শিষ্য এবং পঞ্চশিখ নামে যে সাংখ্যাচার্য, তিনি আসুরির শিষ্য এবং কপিলের প্রশিষ্য। পরবর্তী সময়ে আসুরির প্রথম শিষ্য পঞ্চশিখ সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে বহুল খ্যাতি লাভ করেন। মহাভারতে বলা হয়েছে—এক সময় আসুরি আপন তপোবনে বসে ছিলেন। এমন সময় কপিলের সাংখ্য মতাবলম্বী বহুতর মুনি সেইখানে এসে পুরুষাবস্থাসম্পন্ন অব্যক্ত তত্ত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন আসুরিকে। আসুরি তপস্যার বলে দেব দর্শন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেছিলেন বলেই দেহ এবং দেহী জীবের ভেদ-বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। মুনিরাও সেই বিষয়েই প্রশ্ন করছিলেন বলেই আসুরি সেই অবিনশ্বর ব্রহ্ম সম্বন্ধে কপিল-মতাবলম্বী সাংখ্য জ্ঞানীদের কাছে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহর্ষি পঞ্চশিখ এই আসুরির শিষ্য ছিলেন। অনেকে মনে করেন—আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ যে পতিপুত্রবতী কপিলা নামে ব্রাহ্মণীর স্তন দুগ্ধে পুষ্ট হয়েছিলেন, সেই কপিলা আসুরির স্ত্রী হতে পারেন।

[মহা (k) ১২.২১৮.৯-১৫; (হরি) ১২.২১৫.৯-১৫]

মহাভারতে উল্লিখিত কপিল-আসুরি এবং পঞ্চশিখের প্রসিদ্ধ বিদ্যাবংশ বা গুরুপরম্পরা ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রাচীন সাংখ্যকারিকায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়ে
চানুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ
বহুধা কৃতং তন্ত্রম্।

[সাংখ্য কারিকা নং ৭০; দ্র. সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৪; ভাগবত পু. ১.৩.১০; ৬.১৫.১৪]

□ আসুরি সিদ্ধ সাংখ্যবেত্তা হওয়া সত্ত্বেও ভগবান শ্রীহরির মায়া বুঝতে পারেননি বলে শিব এই সিদ্ধ যোগীদের সঙ্গে নিজের নামও উচ্চারণ করেছেন। *[ভাগবত পু. ৯.৪.৫৭]*

□ অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে আসুরিও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসেছিলেন বলে বলা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ১০.৭৪.৯]*

আসুরি$_{২}$ ভরতের বংশধারায় সুমতির পুত্র দেবতাজিতের পত্নী আসুরি। দেবতাজিতের ঔরসে আসুরির গর্ভে 'দেবদ্যুম্ন' নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। *[ভাগবত পু. ৫.১৫.৩]*

আসুরীশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৬৭]

আস্তিক ভারতবর্ষে অন্তত ছয়টি দার্শনিক প্রস্থানকে আস্তিক দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং আরও ছয়টি প্রস্থান নাস্তিক দর্শন হিসেবেও চিহ্নিত। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে আছে—

সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা। অন্যদিকে বৌদ্ধদর্শনের চারটি প্রস্থান—বৈভাষিক দর্শন, সৌত্রান্তিক দর্শন, বিজ্ঞানবাদ এবং মাধ্যমিক দর্শনের সঙ্গে জৈন এবং চার্বাক দর্শনকে যোগ করলে নাস্তিক দর্শনও ছয়টি। ভারতীয় দর্শনের বিপুল সম্ভার বিচার করলে বোঝা যায় যে আস্তিক দর্শনের এই ছয় প্রকার ভেদ নিতান্তই কৃত্রিম। অথবা বলা উচিত ভারতবর্ষের প্রধানতম দর্শনগুলির সাধারণ সংখ্যা কীর্তনের জন্যই এইরকম একটা বর্গীকরণ ঘটেছে। নইলে অদ্বৈত-বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা) ছাড়াও বেদান্ত নির্ভর দ্বৈতবাদী দর্শনগুলি, শৈবদর্শন এবং বিশাল শব্দার্থবিষয়ক দর্শন স্ফোটবাদ এখানে বর্গীকৃত হয়নি। অন্যদিকে নাস্তিক দর্শনের মধ্যেও আভিধার্মিক, যোগাচার ইত্যাদি দর্শনও বাদ পড়ে গেছে। অতএব এটাই মেনে নেওয়া ভালো যে আস্তিক এবং নাস্তিক এই দুই বর্গের মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের মৌলিক এবং প্রধান প্রস্থানগুলিই স্থান পেয়েছে, যদিও একটি সামান্য ধর্ম দুই ক্ষেত্রেই কাজ করেছে এবং সেটি হল আস্তিকতা অথবা নাস্তিকতা।

'আস্তিক দর্শন' কথাটা যদিও ইংরেজি theistic philosophy -র অনুকরণে কল্পিত হয়নি তবু theistic philosophy বলতে যা বোঝায় আস্তিক কথাটার অর্থও তাইই হওয়া উচিত ছিল। 'Theism' বলতে বোঝায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং সেই ঈশ্বর শুধুমাত্র আছেন—এই বিশ্বাসের থেকেও তিনি জগৎকারণ, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধীশ্বর এবং তিনি মূর্ত বা অমূর্তভাবে মানুষের পরম আরাধ্য দেবতা—এই বিশ্বাসই কিন্তু theism কথাটার প্রধান তাৎপর্য্য। অন্যদিকে 'আস্তিক' শব্দের অর্থও কিন্তু একইরকম হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অর্থের দিক থেকে দেখলে—'অস্তি শব্দের অর্থ 'আছে' তাহলে ঈশ্বর আছেন বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরাই আস্তিক—এমনই হবার কথা। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ নামক গ্রন্থের সম্পাদক তাঁর স্বকীয় টীকায় দুটি সর্বজনমান্য শ্লোক উদ্ধার করে লিখেছেন—যাঁরা বেদের প্রমাণ মানেন না এবং শাস্ত্র বিচারের ক্ষেত্রে অবৈদিক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করে থাকেন, তাঁরাই নাস্তিক পদবাচ্য। চার্বাক ইত্যাদি ছয় প্রকার দর্শন নাস্তিক দর্শন হিসেবে চিহ্নিত। অন্যদিকে যাঁরা বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন, এই রকম আস্তিক দর্শনের সংখ্যা ছয়টি—ন্যায়-বৈশেষিক ইত্যাদি। সংগ্রহ-শ্লোক দুটি এইরকম—

> অবৈদিক-প্রমাণানাং সিদ্ধান্তানাং প্রদর্শকাঃ
> চার্বাকাদ্যাঃ ষড়্‌বিধাস্তে খ্যাতা লোকেষু কীর্তিতাঃ।
> বেদপ্রমাণকানীহ প্রাহু র্যে দর্শনানি ষট্।
> ন্যায়-বৈশেষিকাদীনি তে স্মৃতা আস্তিকাভিধাঃ॥

[T.R.V. Murti, 'Rise of the Philosophical Schools' In the Cultural Heritage of India, vol. III, p. 30; মাধবাচার্যকৃত সর্বদর্শনসংগ্রহ (অভ্যঙ্কর), পৃ. ১]

□ এই ঐতিহ্যবাহী শ্লোক থেকে এই কথাটাই প্রমাণ হয় যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের চর্চায় আস্তিক বলতে ঈশ্বর আছেন কি নেই, তার থেকেও বেদের প্রামাণ্য মানা হচ্ছে কিনা, সেটাই আস্তিকতার প্রধানতম শর্ত। অথচ এইভাবে ভাবলে আস্তিক শব্দটির মূল অর্থটাই হারিয়ে যায়। কেননা 'অস্তি' মানে তো ঈশ্বর আছেন, আর নাস্তিক মানে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষ আস্তিক এবং অবিশ্বাসীরা নাস্তিক—এটাই সহজ কথা, তাতে পাশ্চাত্যের theist এবং atheist কথাটাও সার্থক হয়। কিন্তু 'অস্তি' বলতে বেদ আছে, এমন অর্থকল্পনা একটু সুদূরপ্রসারী আর বেদের প্রমাণ মানলে তবেই আস্তিকতার প্রসঙ্গ—একথাটাও 'অস্তি' বা 'আস্তিক' শব্দের অভিধার্থ অতিক্রম করে। একইভাবে নঞর্থে নাস্তি বা নাস্তিক শব্দটিও ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বিষয়েই সুপ্রযুক্ত হয়। কেননা বেদ আছে অথবা নেই—এমন কথা শব্দার্থভাবনার পরিপন্থী।

বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসীরা আস্তিক আর বেদের প্রামাণ্য মানেন না যাঁরা, তাঁরা নাস্তিক—এই বিশেষ অর্থে আস্তিক-নাস্তিকের প্রয়োগ যে খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে—একথা প্রাচীনেরাও খানিকটা বুঝেছিলেন বলেই হয়তো যাজ্ঞবল্ক্যের মতো প্রাচীন স্মৃতিকার আস্তিক শব্দের অর্থ করেছিলেন অন্যভাবে। তিনি বলেছিলেন—আস্তিক হচ্ছেন তাঁরাই যাঁরা শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবান অথবা বেদের প্রামাণ্যে শ্রদ্ধাবান—

> আস্তিকঃ শ্রদ্ধাধানশ্চ।

বস্তুত আস্তিক-দর্শন বলতে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী দর্শনগুলিকেই বোঝায় সেকথা দার্শনিকদের বিচারধারার বিশেষত্ব থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা—তর্ক, যুক্তি, প্রমাণ—যে-কোনো ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রেই এমন বিরাট একটা ভূমিকা পালন করে যে, তার ফলে দার্শনিকদের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতগুলিও অনেক সময় বোঝা যায় না। আরও বোঝা যায় না এই কারণে যে, ধর্ম, ধার্মিকতা এবং ঈশ্বরে-বিশ্বাস সব সময়েই ভারতীয় দর্শনগুলির উদ্ভব, বিবর্তন এবং সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু ধর্ম এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস দার্শনিকদের অন্তরে নিহিত থাকলেও তা কখনো তর্ক-যুক্তির পথকে আচ্ছন্ন করেনি। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন লিখেছিলেন—

How completely free from traditional religion and bias the systems are, will be obvious from the fact that the samkhya is silent about the existence of God, though certain about its theoretical indemonstrability. Vaisesika and Yoga, while they admit a supreme being, do not consider him to be the creator of the universe and Jaimini refers to God only to deny his providence and moral government of the world.

[যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি (আনন্দাশ্রম) ১.২৬৭; S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, vol. I. p. 27]

□ প্রচলিত ভাবনা অনুযায়ী যে ছয়টি দর্শনের মধ্যে দুটি দর্শনকে নিরীশ্বর বলা হয়, তার মধ্যে পূর্ব মীমাংসা একটি এবং দ্বিতীয় হল সাংখ্যদর্শন। দ্বৈতবাদী পূর্ব মীমাংসা দর্শন বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে না। অন্যদিকে দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনও ঈশ্বর-স্বীকারের কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না, যদিও বেদের প্রমাণ সাংখ্য দার্শনিকদের কাছে শ্রদ্ধেয় বস্তু। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই বলেই ঈশ্বর স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই—এমনটাই প্রচলিত সাংখ্য-দার্শনিকদের অভিমত। পূর্বমীমাংসা এবং সাংখ্য—এই দুই দর্শনেরই সম্যক বিচার করলে দেখা যাবে—ঈশ্বর স্বীকার না করার ব্যাপারে এই দুই দর্শনেরই প্রবক্তাদের বহিরঙ্গ তর্কযুক্তির আস্ফালনটাই বড়ো, কিন্তু মূলে কোথায় এমন একটা কিছু আছে যাতে বোঝা যায়—ঈশ্বর স্বীকার না করাটা এক ধরনের প্রৌঢ়িবাদ, যা আপাতকথন বলেই মনে হয়। এমনকি ঈশ্বর স্বীকার না করাটা খানিকটা উদ্দেশ্যমূলকও বলা যায়।

পূর্বমীমাংসা দর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব মীমাংসার দার্শনিকদের মতে বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ কোনো পুরুষের দ্বারা রচিত নয়। সেই কারণেই বেদের বক্তা হিসেবেও ঈশ্বরকে মানার কোনো প্রয়োজন নেই। বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্থাপন করা এবং বেদবিহিত কর্মে শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্যই প্রধানত কোনো পৃথক ঈশ্বরের আলোচনা এখানে অভীষ্ট হয়ে ওঠেনি। মীমাংসকদের মতে সৃষ্টিপ্রবাহ বা সংসার অনাদি এবং অনন্ত। মানুষের মৃত্যু হয় বটে, কিন্তু মৃত্যুর পরেও মন থাকে, সেটা শ্রুতিবাক্য থেকেই প্রমাণ করা যায়। নিত্য মন কর্মফলস্বরূপ অদৃষ্টের বশে মৃত্যুর পর অন্য দেহে সম্বদ্ধ হয়। সেই দেহেই তখন জন্মান্তরীণ কর্মফলের ভোগ সম্পন্ন হয় এবং সেই দেহই সেই আত্মার সুখ দুঃখভোগের আশ্রয় হয়ে ওঠে। শরীরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধও অনাদি। আত্মা এবং জীব এখানে সমানার্থক শব্দ।

মীমাংসা দর্শনের অন্যতম দার্শনিক প্রভাকর গুরুর মতে আত্মা চিৎস্বরূপ নয়, সে 'জড়'। মনের সঙ্গে সংযোগ ঘটলে আত্মাতে চেতনার সঞ্চার হয়। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এগুলি মন সংযুক্ত আত্মার গুণ। প্রভাকর মতে প্রত্যেক জ্ঞানেই—জ্ঞান, জ্ঞানের আশ্রয় আত্মা এবং জ্ঞানের বিষয়—এই তিনটিই প্রকাশিত হয়। সেইজন্য প্রভাকর মীমাংসকদের ত্রিপুটি প্রত্যক্ষবাদী বলা হয়।

অন্যদিকে কুমারিলভট্ট বা ভাট্টমতের মীমাংসকরা আত্মাকে চিৎ এবং অচিৎ দুই স্বরূপেই চিহ্নিত করেন। সুষুপ্তির সময়েও যেহেতু জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব হয় না এবং সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যেহেতু পরে এমন অনুভব করে যে, 'আমি এই সময়ে সুপ্ত ছিলাম'—অতএব ওই অনুভবের প্রমাণেই জীবকে চিদ্রূপ বলা যায়। আবার সুষুপ্তির সময়ে আত্মাতে অবস্থিত জড়তা ছাড়া

অন্য বস্তুতে অবস্থিত জড়তার অনুভব সম্ভব হয় না বলে আত্ম অচিদ্রূপও বটে। যেমন জোনাকি পোকার প্রকাশ এবং অপ্রকাশস্বরূপ—কখনো জড়, কখনো অজড়। কিন্তু ভাট্টমতে দেহ-ইন্দ্রিয় ইত্যাদি থেকে আত্মা ভিন্ন এবং তা বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপ্ত।

ভাট্ট মীমাংসকেরা সরাসরি ঈশ্বর স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু কুমারিলভট্ট বা পার্থসারথি মিশ্রের মতো সর্বজনমান্য মীমাংসক আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণের মধ্যে জন্মমৃত্যুহীন আত্মার উপস্থিতি এবং 'আমি' এই আত্মাবিষয়ক অনুভবের মধ্যেও আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণ হয় বলে কুমারিলভট্ট তাঁর শ্লোকবার্তিকের মধ্যে লিখেছেন যে, আত্মতত্ত্ব বিশেষভাবে জানতে হলে উপনিষদগ্রন্থের চর্চা প্রয়োজন। মীমাংসা-ভাষ্যকার শবরস্বামীর মত উপস্থাপিত করে তিনি লিখেছেন—নাস্তিক্যবুদ্ধি নিরসনের উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার শবরস্বামী যুক্তির সাহায্যে শরীরাদি ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব স্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে দৃঢ় করতে হলে বেদান্ত-বিদ্যার অনুশীলনই প্রয়োজন—

ইত্যাহ নাস্তিক্য-নিরাকরিষ্ণু
রাত্মাস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা।
দৃঢ়ত্বমেতদ্‌বিষয়শ্চ বোধঃ
প্রযাতি বেদান্তনিষেবণেন॥

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, বেদান্ত এবং উপনিষদগুলিতে প্রতিপাদ্য আত্মার অস্তিত্ব কুমারিলভট্ট বা শবরস্বামীর মতো প্রাচীন মীমাংসক বেদান্তবিদ্যার সাধ্যবস্তু আত্মানুশীলনের চরম প্রাধান্য স্বীকার করলেও তাঁরা অদ্বৈতবাদী নন। তাঁদের মতে জগৎ মিথ্যা নয়। জীব এবং ঈশ্বর অভিন্ন নন। তাঁরা দ্বৈতবাদী, কিন্তু তাই বলে তাঁরা শরীর সর্বস্ব নিরীশ্বরবাদী চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিকদর্শনের সঙ্গেও সহমত নন। বস্তুত পারমার্থিক আত্মতত্ত্ব নির্ধারণ করা পূর্ব মীমাংসার বিষয়ই নয় এবং সেইজন্যই যে-বিষয়টি তাঁরা উত্তর-মীমাংসা সাধকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবু নিরীশ্বরবাদী চার্বাক দার্শনিকদের সঙ্গে যাতে তাঁদের ভাবনা যাতে একাকার না হয়ে যায়, সেইজন্য তাঁরা তাঁদের দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তে অটল থেকেই এ-কথা স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন যে, আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে ভিন্ন—এইভাবে স্থূল বিষয়গুলির জ্ঞান হলেও নাস্তিক্য বোধ দূর হবে এবং পূর্ব-মীমাংসা-প্রতিপাদ্য যোগাদি কর্ম, পরলোক এবং জন্মান্তরবোধে আস্থা প্রতিপন্ন হবে। আর জন্মান্তর, পরলোক, পাপ, পুণ্য, বিধি, নিয়ম এবং বিস্তীর্ণ কর্মকাণ্ডে বুদ্ধি দৃঢ় হলেই প্রত্যেকটি মানুষ শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করবে এবং অশুভ কর্ম বর্জন করবে। ক্রমশ চিত্তশুদ্ধি ঘটলে উপনিষদ-প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বের উপদেশ শোনার অধিকার জন্মাবে।

এই আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্বমীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি, কিন্তু আত্মতত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনা এই দর্শনের বিষয়ই নয় বলে তাঁরা এখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ঈশ্বর বিষয়ক কথা এবং আত্মতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা পরিহার করেছেন। বেদবিহিত কর্মই মানুষকে সমস্ত শুভ ফল দান করতে পারে—এইভাবে কর্মকাণ্ডের চরমত্ব এবং পরমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এবং বেদবিহিত কর্মে শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেননি মীমাংসকরা। লক্ষণীয় বিষয়, মীমাংসা-সূত্রকার জৈমিনি ঈশ্বরের বিষয়ে যেমন কোনো আলোচনা করেন নি, তেমনই জীবের বিষয়েও কোনো আলোচন করেন নি। বেদ-বিহিত কর্মে বুদ্ধিস্থাপন করার অত্যাগ্রহেই মীমাংসকেরা সর্বজ্ঞ এবং সর্বাধীশ্বর ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।

পণ্ডিতজনেরা মীমাংসাসূত্রকার জৈমিনি এবং বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণ ব্যাসের গ্রন্থদুটির সমসাময়িকতা উল্লেখ করে বলেছেন যে, বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের কয়েকটি সূত্রে জৈমিনির অভিমত যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই জৈমিনীয় মীমাংসাসূত্রেও বাদরায়ণ ব্যাসের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির যে অভিমতগুলি উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি বিচার করলে বোঝা যায় যে, জৈমিনি মুক্তির কথাও যেমন স্বীকার করেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্বও তেমনি স্বীকার করেন। কিন্তু শ্রুতিসিদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর সূত্রগুলিতে কোনো উল্লেখ করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। চতুবর্গের অন্যতম ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কথা বলবেন

বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। অতএব ধর্মের আনুষ্ঠানিক কর্মের আশাতেই তাঁর সূত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রে তাই বলা হয়েছে, 'ধর্মং জৈমিনিরতএব। ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ জৈমিনির মত বলে যে সূত্রগুলি করেছেন, তার সংখ্যা অন্তত পাঁচ ছয়টি। যথা

'পরং জৈমিনি র্মুখ্যত্বাৎ, দর্শনাচ্চ,
ন চ কার্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ,
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ,
ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ।

—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে যেভাবে জৈমিনির আশয় প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বর অস্বীকার করাটা জৈমিনির সূত্র-প্রণয়ণের লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না, ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

প্রচলিত দার্শনিক ভাবনা অনুযায়ী পূর্ব মীমাংসা দর্শনের মতো দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনও ঈশ্বর স্বীকারের কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না। জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা না থাকায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোনো অর্থও হয় না বলেই প্রচলিত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করার প্রধান প্রবক্তা কে? এখানে অবধারিত উত্তর হল, সাংখ্যকারিকার লেখক ঈশ্বরকৃষ্ণ। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী এবং অন্যতর বিখ্যাত ব্যাখ্যা যুক্তিদীপিকাও যে ঈশ্বরকৃষ্ণের নিরীশ্বরবাদিতাই স্থাপন করবে, এতেও কোনো আশ্চর্য নেই। অন্যদিকে বেদান্ত দর্শনের শারীরিক ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর যেভাবে সাংখ্যদর্শনের নিরাকরণ করেছেন, তাতেও সাংখ্য দর্শনের নিরীশ্বর ভাবটাই অধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেখানেও তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে ঈশ্বরকৃষ্ণই প্রধানভাবে বিরাজ করছেন বলেই মনে হয়। দার্শনিক হিসেবে শঙ্করাচার্যের খ্যাতি সমধিক হওয়ায় এবং তাঁর মতো দার্শনিক সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর বলায় সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্ববাদিতা আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমরা যেহেতু মহাভারত-পুরাণে সাংখ্যদর্শনের নানা উপাদান বিচার করতে বসেছি এবং সেই বিচারে সাংখ্যদর্শনের ঐতিহাসিক বিবর্তনও যেহেতু বিশেষ মূল্যবান, তাই শুধুমাত্র ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাগুলির নিরিখেই আমরা সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর বলে সোজাসুজি চিহ্নিত করতে পারি না। সবচেয়ে বড়ো কথা, পণ্ডিতজনরা সাংখ্যদর্শনের বিবর্তনের ইতিহাস লেখার সময় অন্তত চারটি কাল-পর্যায় লক্ষ্য করেছেন এবং সেই চারটি পর্যায়ের মধ্যে অন্তত তিনটি পর্যায়েই সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের উপস্থিতি বেশ স্পষ্ট। এবং শুধু তৃতীয় পর্যায়ে, যেখানে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাগুলি আছে এবং তাঁর অনুগামীদের সিদ্ধান্তই যেখানে বলবান, শুধু সেইখানেই সাংখ্যের নিরীশ্বরভাব কল্পিত। আমাদের বক্তব্য — যে দর্শনের আদি এবং অন্তে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং কর্তৃত্ব স্বীকৃত, সেখানে শুধু তার মধ্যভাগের একটি অংশের দার্শনিক অবস্থান থেকে সেই দর্শনের সম্পূর্ণ বিচার করা যায় না।

[কুমারিলভট্টকৃত শ্লোকবার্তিক, দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত, আত্মবাদ ১৪৮, পৃ. ৫১৫; Brahma-Sutras (Vireswarananda), ৩.২.৪০; ৪.৩.১২-১৪; ৪.৪.৪-৫]

□ যে চারটি পর্যায়ে সাংখ্যদর্শনের ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটেছিল, সেগুলির মধ্যে প্রথম পর্যায় হল — বেদ এবং উপনিষদের মধ্যে যেভাবে সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তি ঘটেছে, সেটা একটা পর্যায়। সময়ের হিসেবে এই পর্যায়ের আরম্ভ ঘটেছে খ্রিস্টপূর্ব নবম-অষ্টম শতাব্দী থেকে এবং তা চলেছে জৈন ধর্মের বিকাশ এবং বৌদ্ধধর্মের প্রারম্ভিক সময় পর্যন্ত। সাংখ্য দর্শনের বিভিন্ন মৌলিক তত্ত্বগুলি এখানে যে-ভাবেই প্রকাশিত হয়ে থাকুন, এই পর্যায়ে ঈশ্বর কোনোভাবেই অনুপস্থিত নন বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় পর্যায় হল — মহাভারতের মোক্ষধর্ম-পর্ব এবং ভগবদ্‌গীতা। দ্বিতীয় এই পর্যায়ের মধ্যে ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকের মতো প্রাচীন উপনিষদের পরবর্তী উপনিষদগুলি যেমন আছে, তেমনই আছে চরক-সংহিতা এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের মতো গ্রন্থ। আর আছে ভগবদ্‌গীতা এবং মহাভারতের মোক্ষধর্ম-পর্বে উচ্চারিত সাংখ্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ। এই পর্যায়ের ব্যাপ্তি ঘটেছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর পর্যন্ত। এখানেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব যথেষ্ট স্পষ্টভাবেই স্বীকৃত। এবং কখনো

তা চির-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের অন্যতম একটি তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত। তৃতীয় পর্যায় হল, যেখানে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা পৃথক একটি তন্ত্র হিসেবে সাংখ্য-দর্শনের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অবশ্য এখানে সাংখ্যকারিকার সঙ্গে পাতঞ্জল যোগসূত্রেরও উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া সাংখ্যকারিকার ওপরে লেখা বিভিন্ন টীকা-ভাষ্য এবং অন্যান্য টীকা-ভাষ্যের কথাও প্রসঙ্গত এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে। পণ্ডিতেরা এই তৃতীয় পর্যায়কে ধ্রুপদী সাংখ্য বা ক্ল্যাসিক্যাল সাংখ্যের প্রসারকাল বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই তৃতীয় পর্যায়ের ব্যাপ্তিকাল খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দশম তথা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। লক্ষণীয়, শুধু এই ধ্রুপদী সাংখ্যের প্রচারের সময়েই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানান সন্দেহ এসেছে। কিন্তু এরপর পুনরায় যখন সাংখ্যদর্শনের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে—কারণ ১১শ থেকে প্রায় ১৫শ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাংখ্যদর্শনের ওপর কোনো মৌলিক গ্রন্থই প্রায় নেই—তাই আনুমানিক পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য যখন লেখা হল, তখন সাংখ্যদর্শনের চর্চায় নতুন একটা দিক উন্মোচিত হল এবং জানিয়ে রাখা ভালো যে, ধ্রুপদী সাংখ্যের ব্যাপ্তি এবং প্রসারকালে ঈশ্বরের অসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ সাংখ্যদর্শনের যে নিরীশ্বরবাদিতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সেই মতবাদ খণ্ডন করে সাংখ্যদর্শনকে সেশ্বর দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাটাই এই চতুর্থ পর্যায়ের লক্ষ্য। এই পর্যায়ে যেমন বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য আছে, তেমনই আছে অনিরুদ্ধের লেখা সাংখ্যসূত্রবৃত্তি এবং মহাদেব বেদান্তীর নিজস্ব ভাষ্য। এই পর্যায়ের ব্যাপ্তি খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

সাংখ্যদর্শনের পরম্পরাগত বিবর্তনের ইতিহাস গবেষণার মাধ্যমে যেভাবে বেরিয়ে এসেছে, তার পর্যায়গুলি উল্লেখ করার কারণ হল—অন্যান্য আস্তিক দর্শনগুলির মতো সাংখ্যদর্শন খুব সুসংগঠিতভাবে বেড়ে ওঠেনি। বেদ, উপনিষদ এবং মহাভারতের মধ্যে বিভিন্ন সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনা যেভাবে স্থান পেয়েছে, সেই তত্ত্বগুলিকে ব্যবহার করে পরবর্তীকালে একটি নির্দিষ্ট সাংখ্যদর্শনের ধারা সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু বেদ-উপনিষদ-মহাভারতে অবস্থিত সাংখ্যতত্ত্বগুলি অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থেও সমানভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় সেগুলিকে আর প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের একান্ত তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। একই কারণে প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে যে নিরীশ্বরবাদিতার কথা বলা হয়, তাও বেদ-উপনিষদ এবং মহাভারতে তেমন স্পষ্ট পাওয়া যায় না। বরঞ্চ এই গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত সূত্র অনুযায়ী সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেই মনে হয়। আমরা পরে সময়মতো সেই আলোচনায় প্রবেশ করব।

প্রথমত এটা জানানো প্রয়োজন যে, আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্যদর্শন প্রাচীনতম বলে দার্শনিকরা মনে করেন। কিন্তু অন্য সমস্ত দার্শনিক প্রস্থানে সূত্রগ্রন্থগুলিকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়, সাংখ্যদর্শনের তেমন কোনো সূত্রগ্রন্থই নেই। পরমর্ষি কপিলের নামে যে সাংখ্যসূত্র গ্রন্থটি আরোপিত, সেটি নিতান্তই পরবর্তীকালের রচনা বলে গবেষকরা মনে করেন।

ভারতবর্ষের দার্শনিক পরম্পরায় সূত্র গ্রন্থগুলিও প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই নিরিখে দেখতে গেলে গৌতমের ন্যায়সূত্র, কণাদের বৈশেষিক সূত্র, পতঞ্জলির যোগসূত্র, বাদরায়ণ ব্যাসের বেদান্তসূত্র, অথবা জৈমিনির কর্মমীমাংসাসূত্রের মতো মর্যাদা কপিলের সাংখ্যসূত্রের নেই, কেননা অধুনাদৃষ্ট সাংখ্যসূত্র কপিলের লেখাই নয়।

[Michel Hulin, 'Samkhya Literature'
In A History of Indian Literature,
vol. VI. p. 127; T.R.V. Murti,
'Rise of the Philosophical Schools'
In the Cultural Heritage, vol. III, pp. 32-35]

□ কপিল ইত্যাদি সাংখ্যদর্শনের প্রাচীন প্রবক্তাগণ ঈশ্বরবাদী না নিরীশ্বরবাদী অথবা কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সাংখ্যের দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে তাঁরা পর্যালোচনা করেছিলেন, সেটা ঠিক ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের আলোচনা করে দেখতে হবে। প্রাচীন বেদ-উপনিষদে ব্যাখ্যাত সৃষ্টির উৎপত্তির ইতিহাস সংক্রান্ত বক্তব্যগুলিকে —যেগুলির কোনো কোনো স্থলে ঈশ্বরের সর্বময় স্বীকৃতি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে অথবা এমন এক বিশেষণবর্জিত পরম শক্তির অস্তিত্ব প্রাচীন আকর গ্রন্থগুলিতে স্বীকৃত হয়েছে,

যাকে ঠিক ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব বলে চিহ্নিত না করতে পারলেও সমস্ত কিছুর উপরেই এই তত্ত্বের স্বীকৃতিকে স্বীকার করে নিতে হবে। মহাভারত-পুরাণ বা ভগবদ্‌গীতায় প্রকৃতি সব সময়েই ঈশ্বর-পরতন্ত্রা এবং অনেক সময়েই প্রকৃতি ঈশ্বরের মায়াশক্তি হিসেবে চিহ্নিত। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রকৃতি, পুরুষ বা মহদাদি ব্যক্ত তত্ত্বের বিবেচনায় মহাভারত-পুরাণ প্রধানত ঔপনিষদিক পরম্পরা অনুসরণ করেছে, যার ফলে বেদান্ত-গম্য ব্রহ্ম এবং মহাভারতীয় সাংখ্য-যোগগম্য পরম তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুব কঠিন।

পূর্বমীমাংসা-দর্শন এবং সাংখ্য-দর্শনের চিরকালীন আলোচনায় এই দর্শন দুটি ঈশ্বর মানে কিনা সেই ভাবনা এত বেশি হয়েছে যে, তাতে বোঝা যায় যে, বেদ মেনে চলার চেয়েও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে কিনা, তার ওপরেই আস্তিকতা নির্ভর করে। অতএব বেদ এবং বেদ প্রামাণ্য মেনে নিচ্ছেন যাঁরা, তাঁরাই শুধু আস্তিক, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলেও চলবে, এমনটা কিন্তু আস্তিকতার লক্ষণ নয়। বস্তুত আস্তিক বলতে বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী—এ-কথা যদি প্রথম শর্ত হয়, তাহলে ভগবান বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষও আস্তিক্যের প্রাথমিক সংজ্ঞার মধ্যে আসবেন। এমনকী পরলোক এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাসী মানুষরাও আস্তিক-সংজ্ঞার পরিসরের মধ্যে এসেছেন, সে-কথা ভগবদ্‌গীতাতে ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম, শম, দম, তপঃ শৌচ ইত্যাদির সঙ্গে যখন আস্তিক্যের কথা বলা হচ্ছে, তখন টীকাকারদের মধ্যে অন্যতম শ্রীধরস্বামী লিখলেন—যাঁরা পরলোক আছে বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরাই আস্তিক—

আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ।

শঙ্করাচার্য কিন্তু বেদের বদলে প্রায় সমার্থক অথচ আর একটু ব্যাপক অর্থে—আগম শব্দটা ব্যবহার করে বলেছেন—আস্তিক্য হল আস্তিকের ভাব। আগমগুলির অর্থে শ্রদ্ধা আছে এই ভাবটাকেই আস্তিক্য বলে—

আস্তিক্যম্ আস্তিকভাবঃ, শ্রদ্ধধানতা আগমার্থেষু।

মহাভারতে দেখেছি—বেদাদি শাস্ত্রে যাঁরা আস্থা রাখেন, তাঁরাই আস্তিক, এই সুপ্রচলিত অর্থ ছাড়াও আস্তিক বোঝানোর জন্য আরও একটি গভীর এবং অধিকতর অর্থগৌরবযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার নাম 'শ্রদ্ধদধান' অর্থাৎ যিনি শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধাশীলতা বেদবাক্যে বা বেদপ্রামাণ্যের প্রতি যেমন হতে পারে তেমনই হতে পারে ঈশ্বরের প্রতি, আবার তেমনই শ্রুতি-স্মৃতিমূলক শব্দপ্রমাণের প্রতি, এমনকী প্রাচীন সংস্কারের প্রতিও। মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই বলা হল—আস্তিক মানুষেরা মহাভারতের এই অনুক্রমণিকা অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে মহাভারত শুনতে থাকলে কোনো দিন কোনো কষ্টে পড়বেন না—

আস্তিকঃ সততং শৃণ্বন্ ন কৃচ্ছ্রেষ্ববসীদতি।

এইখানে আগের শ্লোকেই আস্তিকের বিশেষণগুলি হল—শ্রদ্ধাশীল, আচার-নিয়মে যুক্ত এবং সর্বদা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি—

শ্রদ্দধানঃ সদাযুক্তঃ সদাধর্মপরায়ণঃ।

আসলে শ্রদ্ধাশীলতার অর্থ এখানে এমন এক সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত যেখানে বলা হচ্ছে—শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, ইন্দ্রিয়-সংযম এবং শুচিতার মধ্যে যাঁরা থাকেন সেই সব আস্তিক মানুষকে কুগ্রহগুলিও বর্জন করে চলে অর্থাৎ গ্রহের কোনো প্রকোপের মধ্যে পড়ে তাঁদের বিপন্ন হতে হয় না—

আস্তিকং শ্রদ্দধানঞ্চ বর্জয়ন্তি সদা গ্রহাঃ।

ভগবদ্‌গীতার ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্মের মধ্যে আস্তিক্যের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী পারলৌকিক বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন, সেই ভাবনা যে আস্তিক্যের মধ্যে কতটা তাৎপর্য্যপূর্ণ, সেটা মহাভারতের শান্তিপর্বে গিয়ে বোঝা যায়। এখানে বলা হয়েছে—যারা আস্তিক নয়, যেমন পশুপাখি, তির্য্যক প্রাণী, গোরু-ঘোড়া ইত্যাদি তাদের জন্য ঘাস-বিচুলির ব্যবস্থা করেছেন আমাদের পিতৃলোকে থাকা পিতারা—

অনাস্তিকানাং ভূতানাং প্রাণদাঃ পিতরশ্চ যে।

—এই শ্লোকের অন্যতর পাঠে।

অনাস্তিকান্ আস্তিকানাং প্রাণদাঃ পিতরশ্চ যে।

এই পাঠে আরও বেশি পরিষ্কার হয় যে, অনাস্তিক এবং আস্তিক সকলেরই খাদ্য-ব্যবস্থা করেন যে পিতারা, তাঁরাও বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান করেই সেটা করেন। অর্থাৎ আস্তিক জনেরা যজ্ঞাদিক্রিয়ার মাধ্যমে দেবতা এবং পিতৃলোককে তুষ্ট করেন, তুষ্ট দেবতারা বৃষ্টি দেন, বৃষ্টির ফলে শস্যসৃষ্টি হয়, তাতে অনাস্তিক, আস্তিক সবারই

খাবার জোটে। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাশীল, পরলোকে শ্রদ্ধাশীল মানুষকেই আস্তিক বলা হয়েছে এবং এই বেদবাদিতার বিরুদ্ধ প্রকোষ্ঠে যাঁরা আছেন, তাঁরাই নাস্তিক, খুব খারাপ ধরনের নাস্তিক—

বেদবাদাপবিদ্ধাংস্তু তান্ বিদ্ধি ভৃশনাস্তিকান্।

বস্তুত শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারে বিশ্বাসী বেদপন্থী মানুষেরা সমস্ত মানুষের জন্য যেসব দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার, নিত্যকর্ম, ব্রত-উপবাস, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, স্ত্রীসম্ভোগের নিয়ম, গম্যাগম্যা-বিচার এবং যত বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করেছেন, প্রধানত সেইসব বিষয়ে সার্বিক একটা বিশ্বাসই আস্তিক্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছে এবং এই সার্বিক বেদবিধিতে যাঁরা শ্রদ্ধাশীল নন, তাঁরাই নাস্তিক। মহাভারতের এই সিদ্ধান্তের শেষে যেখানে প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে খুব ভালো করে বোঝা যায় যে, শাস্ত্রীয় নিয়ম-বিধি, আচরিত নিয়ম-শাসন অথবা 'ভক্ষ্যাভক্ষ্য', 'বাচ্যাবাচ্য', 'কর্মাকর্ম' কিছুই মানছি না—এটাকেই নাস্তিক ভাব বলে। মহাভারত এই বিশ্বাসের জায়গাটা এমনভাবেই স্থাপন করেছে যে, নাস্তিকতা বা 'মানছি না'-র জায়গা থেকে আস্তিকতায় ফেরার রাস্তাটাও থেকে যায়। মহাভারত বলছে—একটা মানুষ যদি জেনেবুঝে শিষ্টাচার, বিধিনিয়ম অতিক্রম করে, তবে তার পাপটাও হয় গুরুতর, কিন্তু অজ্ঞানে অসচেতনতায় যদি একটা কাজ করে ফেলে, তবে তাতে দোষ হয় অল্প এবং সে দোষ থেকে মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। ঠিক এইখানে বেশ সবিনয়ে বলা হচ্ছে—শ্রদ্ধাবান আস্তিক মানুষ যদি কোনো অন্যায় কাজ করেন, তাহলে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমেই সেসব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু যেসব বিধি-নিয়ম, প্রায়শ্চিত্তের ভাবনা নাস্তিকের কাছে একেবারেই মিথ্যে, কেননা অহঙ্কার আর বিদ্বেষ ভাবনায় কোনো বিধিই মানেন না—

শক্যতে বিধিনা পাপং যথোক্তেন ব্যপোহিতুম্।
আস্তিকে শ্রদ্দধানে চ বিধিরেষ বিধীয়তে॥
নাস্তিকাশ্রদ্দধানেষু পুরুষেষু কদাচন।
দম্ভদ্বেষ-প্রধানেষু বিধিরেষ ন দৃশ্যতে॥

সমস্ত আলোচনার অবশেষে এটাও কিন্তু ভাববার মতো বিষয় যে, বেদবিধি, শিষ্টাচার, শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচার—ইত্যাদি যদি আস্তিক্যের মূল সংজ্ঞা নির্দেশ করে, তাহলে সেই বৈদিকতা, বেদবিধির সাধন কিন্তু সাধ্য বস্তু ঈশ্বর সাক্ষাৎকার বা ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথাও বলে। অতএব আস্তিক্য-শব্দের তাৎপর্য্য শুধু বেদ মানার মধ্যে নয়, ঈশ্বর বিশ্বাসও আস্তিক্যের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। কেননা বেদোক্ত কর্ম মানেই সাধন, আর ঈশ্বর হলেন সাধ্য— আস্তিকভাবের নিদান এই দুটিই।

[ভগবদ্‌গীতা ১৮.৪২;
মহা (k) ১.১.২৬১-২৬২; ১২.১২.৪-৫;
১২.৩৫.৪৫-৪৭; ৩.২২৯.৫৮;
(হরি) ১.১.২২৩-২২৪; ১২.১২.৪-৫;
১২.৩৫.৪৫-৪৭; ৩.১৯২.৫৮;
(critical ed.) ১২.১২.৪]

আস্তীক জরৎকারু মুনির ঔরসে বাসুকি নাগের ভগিনী—তাঁর নামও জরৎকারু, সেই জরৎকারুর গর্ভজাত পুত্র আস্তীক। আস্তীক মুনির জন্মই হয়েছিল জনমেজয়ের সর্পসত্র থেকে সর্পকুলকে রক্ষা করার জন্য। তিনি অবশ্য সর্পকুলকে রক্ষা করতে সমর্থও হয়েছিলেন। এইরকম একজন মুনির জন্ম কথাটিও অভিনব।

[মহা (k) ১.১৫.৩; (হরি) ১.১১.১০]

☐ সমুদ্র-মন্থনের সময় যখন সমুদ্র থেকে অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা উঠে এসেছিল, তখন কদ্রু বিনতাকে জিজ্ঞাসা করেন উচ্চৈঃশ্রবার গাত্রবর্ণ কি? বিনতা বলেন, উচ্চৈঃশ্রবা সাদা। আর কদ্রু বলেন উচ্চৈঃশ্রবা সাদা কিন্তু তার লেজ কালো। তখন কদ্রু একটি শর্ত রেখে বলেন যদি বিনতার উত্তর সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে কদ্রু তাঁর দাসীবৃত্তি করবেন আর কদ্রু সঠিক প্রমাণিত হলে বিনতাকে তাঁর দাসীত্ব করতে হবে। শর্ত স্থির হওয়ার পর বিনতা সঠিক বলেছেন জেনেও কদ্রু শঠতার আশ্রয় নিলেন, যাতে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে না হয়। সেই কারণে সর্পমাতা কদ্রু তাঁর সর্প-পুত্রদের বললেন—'তোরা উচ্চৈঃশ্রবার লেজ বেষ্টন করে এমনভাবে ঝুলতে থাক, যাতে লেজটি কালো বলেই মনে হয়।'

সর্পদের মধ্যে কেউ কেউ কদ্রুর এই আদেশে রাজী না হওয়ায় কদ্রু তাদের অভিশাপ দিয়ে বললেন—

'তোরা জনমেজয়ের সর্পসত্রের আগুনে পুড়ে মরবি।' *[মহা (k) ১.২০.১-৯; (হরি) ১.১৬.১-৯]*

□ কদ্রুর অভিশাপের কথা শুনে নাগরাজ বাসুকি তাঁর জ্ঞাতিবর্গের অনিষ্টের কথা ভেবে ভীত হলেন। দেবতারাও অভিশপ্ত সর্পদের দুরবস্থার কথা ভেবে এতটাই দুঃখিত হলেন যে তাঁরাও বাসুকির সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে গেলেন এর প্রতিকার জানতে। ব্রহ্মা বললেন—যাযাবর নামক ঋষিবংশে জাত বিদ্বান, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় জরৎকারু নামে একজন মহর্ষি তাঁর পূর্বপুরুষের আদেশানুসারে বংশরক্ষার জন্য নিজের সমান নামের কন্যাকে বিবাহ করবেন। তাঁদের পুত্রই জনমেজয়ের সর্পসত্র থেকে সর্পদের রক্ষা করবেন। ব্রহ্মার কথা শুনে অপর নাগপ্রধান এলাপত্র বাসুকিকে বলেন—জরৎকারু নামে আপনার একটি ভগিনী আছেন। যখন মহর্ষি জরৎকারু কন্যা ভিক্ষা করবেন, তখন নাগজাতির স্বার্থে আপনি মহর্ষিকে কন্যাদান করবেন। নাগেদের মুক্তির উপায়ের কথা শুনে বাসুকি তাঁর ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন।

[মহা (k) ১.৩৮.৫-১৯; ১.৩৯.২;
(হরি) ১.৩৩.৭-২২; ১.৩৪.২]

□ আস্তীক মুনির পিতা মহর্ষি জরৎকারু একদিন নিজের পূর্বপুরুষদের এক গভীর গর্তের মধ্যে উল্টোভাবে (মাথা নীচের দিকে পা উপরে) ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। এই দৃশ্য দেখে জরৎকারু তাঁদের পরিচয় ও অদ্ভুতভাবে অবস্থান করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জরৎকারু তাঁর পিতৃপুরুষের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, শুধুমাত্র ত্যাগ বৈরাগ্যের আশ্রয় নিয়ে তপস্যা করছেন বলেই বিবাহাদি না করে জরৎকারু বংশরক্ষার প্রতি মনোযোগী হন নি। তাই বংশ ক্রমশ লোপ পাওয়ায় পূর্বপুরুষেরা পাপীদের মত অবস্থান করছেন এবং ক্রমশ নরকের দিকে এগিয়ে চলেছেন। জরৎকারু পুত্র উৎপাদনের সাহায্যে বংশরক্ষা করলে তবেই তাঁরা নরকে পতিত হওয়া থেকে নিস্তার পাবেন ও স্বর্গলাভ করবেন। তখন পূর্বপুরুষের কাছে জরৎকারু নিজের পরিচয় দেন। পূর্বপুরুষেরা তাঁকে বিবাহের আদেশ দিলে জরৎকারু বলেন—যে কন্যার নাম আমার নামের সমান হবে এবং যার ভরণপোষণ আমাকে করতে হবে না, সেইরকম কন্যাকেই আমি ভার্যা রূপে গ্রহণ করব।

এরপর নানান জায়গায় জরৎকারু ঘুরতে থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত ভার্য্যা না পাওয়ায় এবং পূর্বপুরুষদের দুর্দশার কথা ভেবে দুঃখিত মনে এক বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি নিজের মনেই বলতে লাগলেন—আমি বিবাহের জন্য একটি মেয়ে চাই। সেইসময় নাগরাজ বাসুকি তাঁর ভগিনী জরৎকারুকে নিয়ে মহর্ষি জরৎকারুর নিকট উপস্থিত হলেন। মহর্ষি জরৎকারু পূর্ব-শর্ত অনুযায়ী জরৎকারু-দেবীকে বিবাহ করলেন।

[মহা (k) ১.১৩.৯-৩১; ১.১৪.১-৭;
১.৪৫-৪৬ অধ্যায়; ১.৪৭.১-৫;
(হরি) ১.১০.৯-৩১; ১.১১.১-৭;
১.৪০-৪১ অধ্যায়; ১.৪২.১-৫]

□ বিবাহের কিছুদিন পর জরৎকারু মুনি বাসুকির ভগিনী জরৎকারুকে পরিত্যাগ করে চলে যান। বিবাহের পরেই জরৎকারু মুনি তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন—'তুমি আমার অপ্রিয় কোনো কাজ করলে কিংবা অপ্রিয় কথা বললে আমি তোমাকে এবং তোমার বাসগৃহকে পরিত্যাগ করব।' একদিন জরৎকারু মুনি তাঁর পত্নীর কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। সূর্যাস্তের সময় হয়ে আসছিল। এদিকে জরৎকারু-দেবী ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, সন্ধ্যার সময় অতিক্রান্ত হলে তাঁর স্বামী সন্ধ্যা বন্দনা করতে পারবেন না, এবং তাতে তাঁর অধর্ম হবে। আবার তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন, তাঁকে জাগালেও মহর্ষির ক্রোধ উৎপন্ন হবে। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে জরৎকারু-দেবী স্বামীর ধর্মলোপের ভাবনা থেকেই মহর্ষি জরৎকারুকে জাগ্রত করার চেষ্টা করলেন। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে জরৎকারু মুনি বাসুকির ভগিনীকে বললেন—'তুমি আমার নিদ্রাভঙ্গ করে আমাকে অবজ্ঞা করেছ। তাই আমি আর তোমার কাছে থাকব না।' তখন বাসুকির ভগিনী জরৎকারু তাঁর জ্ঞাতি ও আত্মীয় পরিজনদের জন্য ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লে, জরৎকারু মুনি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, মহাধার্মিক, বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী এবং তেজস্বী ঋষি তাঁর গর্ভে আছেন।

[মহা (k) ১.৪৭.১৫-৪২; (হরি) ১.৪২.১৫-৪২]

□ পিতা জরৎকারু গর্ভস্থ বালকটিকে লক্ষ্য করে 'অস্তি'—এই কথা বলে বনে গিয়েছিলেন, সেইকারণে বালকটি 'আস্তীক' নামেই বিখ্যাত হয়েছিল। আস্তীক বাল্যকাল থেকেই বুদ্ধিমান

ছিলেন। তিনি ভৃগুবংশীয় চ্যবনের পুত্র প্রমতির কাছে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নাগরাজ বাসুকির ভবনে থেকেই আস্তীক লালিত হতে থাকলেন। আস্তীক মুনির জন্য তাঁর পিতৃকুলের আশঙ্কাও দূর হল। *[মহা (k) ১.৪৮.১৭-২১; (হরি) ১.৪৩.১৭-২১]*

□ পিতৃকুলের মতো মাতৃকুলের ভীতিও দূর করেন আস্তীক। তক্ষক নাগের দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছে জেনে জনমেজয় স্থির করেন তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবেন— একমাত্র তক্ষকের অপরাধেই সমস্ত সর্পকুল বিনাশ করবেন। সর্পসত্রের আয়োজন করা হলে সেই যজ্ঞাগ্নিতে এক এক জন করে সর্প পতিত হল। বাসুকি তাঁর ভগিনী জরৎকারু (মনসা দেবী) কে বললেন—'তোমার পুত্র বালক হলেও সে জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান। সে যেন আমাকে এবং আমার পরিজনদের রক্ষা করে।' জরৎকারু দেবী নাগমাতা কদ্রুর অভিশাপের কথা এবং সেই অভিশাপ থেকে সর্পকুলের পরিত্রাণের জন্য পরিত্রাতা হিসেবে আস্তীকের জন্মবৃত্তান্ত ইত্যাদি সব কথা তাঁর পুত্রকে বললেন। জরৎকারু দেবী আস্তীককে বললেন যে, বাসুকি তোমার পিতার হস্তে আমাকে দান করেছিলেন, তুমি চেষ্টা করলে সে দান ব্যর্থ হবে না। আস্তীক তাঁর মাকে ও মাতুল বাসুকিকে আশ্বস্ত করে জনমেজয়ের যজ্ঞ বন্ধ করার জন্য যাত্রা করলেন। ইতোমধ্যে যজ্ঞের প্রারম্ভে এক বাস্তুকার রাজা জনমেজয়কে বললেন কোনো অপরিচিত অজ্ঞাত ব্রাহ্মণকে যেন প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় কারণ তাতে যজ্ঞে বাধা পড়তে পারে। তাঁর কথা শুনে জনমেজয়ও কড়া প্রহরার বন্দোবস্ত করলেন এবং আদেশ করলেন যে তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো লোক যেন প্রবেশ না করে। আস্তীক যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করার চেষ্টা করতেই দ্বারপালরা স্বাভাবিকভাবেই বাধা দিলেন। তখন আস্তীক, জনমেজয় এবং উপস্থিত সকল পুরোহিত ও মুনি-ঋষিদের স্তব ও গুণকীর্তন করতে লাগলেন। আস্তীকের প্রশংসা বাক্যে সকলেই মুগ্ধ হলেন। জনমেজয় বললেন— ইনি বালক হয়েও বৃদ্ধের মতো কথা বলছেন। আমার মতে ইনি কোনো বালক নন, বৃদ্ধ।'

রাজা জনমেজয় আস্তীককে বর দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেইসময় যজ্ঞের হোতা চণ্ডভার্গব জনমেজয়কে বললেন—এই যজ্ঞাগ্নিতে তক্ষক এখনও নিপাতিত হয়নি, তাই আপনি এই বালককে এখন বরদান করতে পারেন না। তক্ষক নাগ প্রাণভয়ে সেইসময় দেবরাজ ইন্দ্রের উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে লুকিয়েছিলেন। জনমেজয় তক্ষককে নিপাতিত করার জন্য হোতাকে অনুরোধ করলে হোতা তক্ষক নাগকে উদ্দেশ্য করে হোম করতে শুরু করলেন। এর ফলে তক্ষক ইন্দ্রের হাত থেকে বিচ্যুত হয়ে, মন্ত্রের প্রভাবে আকাশ পথে ঘুরতে ঘুরতে যজ্ঞাগ্নির দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। যজ্ঞের অগ্নিতে তক্ষকের মৃত্যু নিশ্চিত—এই কথা মনে করে জনমেজয় আস্তীককে বর প্রদান করতে চাইলেন। আস্তীকও ভাবলেন বর প্রার্থনা করার এটাই উপযুক্ত সময়।

আস্তীক তখন যজ্ঞ বন্ধ করার জন্য জনমেজয়ের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং বললেন এই যজ্ঞাগ্নিতে যেন আর সর্প পতিত না হয়। জনমেজয় বারবার তাঁকে অন্য বর চাইতে বললেন। কিন্তু আস্তীক অন্য বর প্রার্থনা করলেন না। যখন জনমেজয় আস্তীককে বর প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করছিলেন তখন তক্ষক ইন্দ্রের হাত থেকে বিচ্যুত হয়ে আকাশেই অবস্থান করছিলেন। এই ঘটনায় জনমেজয় বিস্মিত হয়ে পুরোহিতদের যজ্ঞ বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন। আস্তীককে বর দান করে জনমেজয়ও আনন্দিত হলেন। তিনি আস্তীককে তাঁর আয়োজিত অশ্বমেধ যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। আস্তীকও তাঁর প্রস্তাবে সম্মানিত বোধ করলেন এবং সর্পসত্র বন্ধ করতে সফল হওয়ায়, আনন্দিত মনে মাতুলালয়ে ফিরে গেলেন।

অনান্য সর্পরাও আস্তীকের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে অনেক আশীর্বাদ করেন। তাঁরা সকলে আস্তীককে বলতে লাগলেন—তোমার কোন ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করব? তখন আস্তীক মুনি বলেন যে, যাঁরা দিনে ও রাতে আমার এই ধর্মোপাখ্যান পাঠ করবে, তাঁদের যেন আর সর্প ভয় না থাকে। এই ধর্মাত্মা আস্তীক সর্পসত্র থেকে সর্পদের মুক্ত করে যথাসময়ে পুত্র-পৌত্র লাভ করেন এবং তারপরে তপস্যার দ্বারা নির্বাণ লাভ করেন।

[মহা (k) ১.৫০.৩৮, ৪৮-৪৯, ৫৪;
১.৫১-৫৬ অধ্যায়; ১.৫৮ অধ্যায়;
(হরি) ১.৪৫.৩৮, ৪৯, ৫৪;
১.৪৬-৫১ অধ্যায়; ১-৫৩ অধ্যায়]

□ দেবীভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, জরৎকারু মুনির সঙ্গে আস্তীকের একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেইসময় জরৎকারু ক্ষীরোদ সাগরের কাছে আস্তীক মুনিকে সরস্বতী মন্ত্র প্রদান করেন। *[দেবীভাগবত পু. ৯.৪.৫৫]*

আহবনীয়পদ গয়ার অন্তর্গত একটি পবিত্র শ্রাদ্ধকার্যস্থল। এখানে শ্রাদ্ধকার্য করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। *[বায়ু পু. ১১১.৫১]*

আহার্য্য অঙ্গিরাবংশীয় যে তেত্রিশ জন শ্রেষ্ঠ ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আহার্য্য একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১০৯;*
বায়ু পু. ৫৯.১০০]

□ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, আহার্য্য উরুক্ষব-এর পিতা। *[মৎস্য পু. ৪৯.৩৮]*

আহিণ্ডক বৈশ্য পুরুষের ঔরসে ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভজাত সন্তানরা নিষাদ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

বৈশ্য পুরুষের ঔরসে ব্রাহ্মণ রমণীর গর্ভজাত সন্তানরা 'বৈদেহ' নামে পরিচিত। 'নিষাদ' বর্ণের পুরুষের ঔরসে 'বৈদেহ' বর্ণের স্ত্রী-র গর্ভজাত সন্তানরাই 'আহিণ্ডক' নামে চিহ্নিত হয়েছে। আহিণ্ডকেরা বোধহয় ঘুরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করতেন, কেননা আহিণ্ডণ অর্থ এদিক-ওদিক ঘোরা—

আহিণ্ড্যতে অটবীতো অটবী।

[মহা (k) ১৩.৪৮.২৭; (হরি) ১৩.৪০.২৭]

আহিতাগ্নি অগ্ন্যাধান সম্পাদন করার পর গৃহস্থ আহিতাগ্নি হন। বিবাহের পর অগ্নি প্রণয়ন করে গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করার পর পবিত্র অগ্নি আহিত হয় ব্রাহ্মণের মধ্যে। সেই আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ সারা জীবন কতগুলি নিয়ম-আচারের মধ্য দিয়ে চলেন, নিয়ত তাঁকে অগ্নিহোত্র কর্ম করতে হয় এবং যজ্ঞের সমস্ত উপকরণগুলি— যেগুলিকে যজ্ঞায়ুধ বলে— সেগুলি মরণকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকে। মহাভারত বলেছে—যে ধর্মাত্মা মানুষ অগ্নিহোত্র হোমের জন্য অগ্ন্যাধেয় করার পর আহিতাগ্নি হন, তিনি পুণ্যকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ সমস্ত বেদই দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য এবং আহবনীয় অগ্নির মধ্যে আহিত। তিনিই আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ—যিনি কোনো দিন হোমকার্য পরিত্যাগ করেন না। অগ্নিহোত্রের জন্য অগ্নিস্থাপন করে হোম না করার চেয়ে, অগ্ন্যাধান না করে অনাহিতাগ্নি থাকাও ভালো। আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র না করে নিষ্ক্রিয় থাকবেন না কখনো—

আহিতাগ্নির্হি ধর্মাত্মা যঃ স পুণ্যকৃদুত্তমঃ।
বেদা হি সর্বে রাজেন্দ্র স্থিতাস্ত্রিষ্বগ্নিষু প্রভো॥
স চাপ্যগ্ন্যাহিতো বিপ্রঃ ক্রিয়া যস্য ন হীয়তে।
শ্রেয়োʼনাহিতাগ্নিত্বম্ অগ্নিহোত্রং ন নিষ্ক্রিয়ঃ॥

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ৫.২৫.১৫;
মহা (k) ১২.২৯২.২০-২১;
(হরি) ১২.২৮৫.২০-২১]

□ মীমাংসাদর্শনের শবরস্বামী তাঁর ভাষ্যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করে বলেছেন—মৃত্যুর পর আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকে তাঁর নিত্য-ব্যবহার করা যজ্ঞপাত্রগুলির সঙ্গে অগ্নিতে দাহ করতে হবে—

আহিতাগ্নিম্ অগ্নিভির্দহন্তি যজ্ঞপাত্রৈশ্চ।

এই কথা থেকে আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিত্য অগ্নিহোত্রক্রিয়া এবং যজ্ঞপাত্রগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। শবরস্বামী যেমনটি লিখেছেন, তা আমরা রামায়ণে রাবণের মৃত্যুর পরবর্তী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঘটনায় প্রমাণ পাই। দেখা যাচ্ছে—অগ্নিক্রিয়া করার জন্য রাবণের দেহ সাজানো হচ্ছে। সেই শবদেহের স্কন্ধদেশে দধি এবং আজ্যপূর্ণ স্রুব, দুই পায়ের ওপর সোমলতাবাহী শকট, উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উলূখল এবং অরণি, উত্তরারণি এবং অন্যান্য দারুপাত্রগুলি স্থাপন করা হয়েছে। শবদেহ-বাহকেরা শিবিকা কাঁধে নিয়ে এগোতে থাকলে অধ্বর্যুরা অগ্ন্যাধেয়ের অগ্নি-পাত্র নিয়ে সামনে সামনে চললেন। তার মানে ঋষিপুত্র রাবণ বিবাহের পর যে অগ্নিস্থাপন করে অগ্ন্যাধান করেছিলেন, সেই অগ্নি এবং আহিতাগ্নি রাবণের সমস্ত যজ্ঞোপকরণগুলি অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকল এবং চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞপাত্রগুলিকেও পুড়িয়ে দেওয়া হল—ঠিক যেমনটি শ্রুতিবাক্য আছে—

আহিতাগ্নিম্ অগ্নিভির্দহন্তি যজ্ঞপাত্রৈশ্চ।

[মীমাংসাদর্শনম্ (Vidya Vilasa Press)
১১.৩.৩৫; শবরভাষ্য দ্র.
রামায়ণ ৬.১১৩.১০৯-১১৮]

আহুক$_১$ বেশিরভাগ পুরাণ মতে ইনি যদু-বৃষ্ণি বংশীয় রাজা পুনর্বসুর পুত্র। তবে হরিবংশ পুরাণে বলা হয়েছে যে, আহুক পুনর্বসুর পৌত্র ছিলেন। পুনর্বসুর পুত্র অভিজিৎ ছিলেন আহুকের পিতা।

□ রাজা আহুক অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী এবং প্রভাবশালী রাজা ছিলেন বলে মনে হয়। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভোজরাজ্য আক্রমণ করেন। এই ভোজরা মূলত বিন্ধ্য পার্বত্য অঞ্চল অধিকার করে ছিলেন এবং পুরাণে এদের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এঁরা ছিলেন যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর বংশধর। ভোজরা আহুকের সেনাবাহিনীর হাতে চূড়ান্ত পর্যুদস্ত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ, পুরাণে আহুকের বিজয়যাত্রায় প্রচুর হাতি ঘোড়ার সমাবেশ যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনই যদু-বৃষ্ণি বংশীয় আহুককে ভোজ নামেও চিহ্নিত করা হচ্ছে। আহুকের বংশধররাও এই সুবাদে বিভিন্ন সময়ে পরবর্তীকালে 'ভোজ' নামে চিহ্নিত হয়েছেন। রাজা হিসেবে ভোজদের পর্যুদস্ত করাটাই আহুকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। আহুকের অন্যান্য চারিত্রিক গুণের কথাও পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

□ বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আহুকের গুণ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বর্ণনার মাঝে হঠাৎই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহুকের পুত্র ছিলেন ধৃতি—

আহুকস্য ধৃতিঃ পুত্রঃ।

এই উল্লেখের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অংশে আহুকের ভোজরাজ্য জয় এবং রাজৈশ্বর্য্যের বিবরণ পাই। আহুকের পুত্র-কন্যার বিবরণ আছে অনেক পরে। স্বভাবতই 'আহুকের পুত্র ধৃতি'— এই সংবাদটি নিয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট সংশয় তৈরি হয়। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের সঙ্গে মৎস্য পুরাণের পাঠ মেলালে অবশ্য নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায় যে, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পাঠ ভ্রান্ত। মৎস্য পুরাণে এই জায়গায় বলা হয়েছে—

আহুকস্য ভৃতিং প্রাপ্তা ইত্যেতদ্বৈ তদুচ্যতে।

অর্থাৎ আহুকের বেতনভুক কর্মচারীরা আহুকের ঐশ্বর্য্য এবং প্রভাব সম্পর্কে বহুল কীর্তন করতো। এই পাঠটিকেই আমাদের গ্রহণযোগ্য মনে হয়। আহুকের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যে এই উল্লেখ প্রাসঙ্গিকও বটে। তার কারণ, সে যুগে বন্দী মাগধ-রা অনেক ক্ষেত্রেই রাজার বেতনভোগী কর্মচারী হতেন। তাঁরা বেতনের বিনিময়ে রাজার গুণকীর্তন করতেন। এতে পূর্ণ সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ যেমন থাকতো, তেমনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তিও অবশ্যই থাকতো। আহুকের কীর্তিও পৌরাণিকরা এই বন্দীদের দ্বারা প্রচারিত বলেই উল্লেখ করেছেন।

□ আহুক নিজের বোন আহুকীকে অবন্তীরাজের হাতে সম্প্রদান করেন। আহুকের এই সিদ্ধান্ত তাঁকে ভোজরাজ্য জয়ে কোনো রাজনৈতিক সহায়তা করেছিল কি না তা অবশ্য স্পষ্টভাবে জানা যায় না।

□ আহুকের পত্নী ছিলেন কাশীর রাজকন্যা। তাঁর গর্ভে আহুকের উগ্রসেন এবং উগ্রসেনা নামে দুই পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.২০-২১;
বায়ু পু. ৯৬.১২০-১২৭; হরিবংশ পু. ১.৩৬.২০-২৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১২০-১২৭;
মৎস্য পু. ৪৪.৬৬-৭১: বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৪-৫]

আহুক$_{২}$ রাজা আহুকের পুত্র উগ্রসেন পুরাণে এবং মহাভারতে অনেক সময়ই তাঁর খ্যাতিমান পিতা আহুকের নামেই চিহ্নিত হয়েছেন। *[দ্র. উগ্রসেন$_{১}$]*

আহুক$_{৩}$ বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আহুক নামে একটি পূর্বদেশীয় জনপদের উল্লেখ আছে। তবে এর অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

[বায়ু পু. ৪৫.১২১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫২]

আহুকান্ধ *[দ্র. আহুকী]*

আহুকী যদুবংশের অন্যতম শাখা কুকুরবংশ। কুকুরবংশীয় পুনর্বসুর একটি পুত্র এবং একটি কন্যাসন্তান হয়, পুত্রের নাম আহুক, কন্যার নাম আহুকী। আহুকীর বিবাহের আগেই সম্ভবত পুনর্বসু পরলোকে গমন করেন। তাই পুরাণগুলিতে সর্বত্রই উল্লিখিত হয়েছে যে, আহুক তাঁর ছোটো বোন আহুকীর বিবাহ দিয়েছিলেন অবন্তীদেশের রাজার সঙ্গে। তবে সেই অবন্তীরাজের নাম কিংবা আহুকীর সন্তান-সন্ততির কোনো উল্লেখ পুরাণগুলিতে মেলে না। একমাত্র বায়ুপুরাণে যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাতে উল্লিখিত হয়েছে যে আহুক তাঁর ছোটো বোন আহুকীর বিবাহ দেন জনৈক আহুকান্ধের সঙ্গে। আর সেই আহুকান্ধ এবং আহুকীর থেকেই জন্ম নেন উগ্রসেন এবং দেবক—

আহুকশ্চাহুকান্ধায় স্বসারং ত্বাহুকীং দদৌ।
আহুকান্ধস্য দুহিতা দ্বৌ পুত্রৌ, সম্বভূবতুঃ॥
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবগর্ভসমাবুভৌ।

বায়ু পুরাণের এই পাঠের ফলে পুরাণে পরিচিত আহুক পুত্র উগ্রসেন আহুকের

ভাগিনেয়তে পরিণত হন। তবে অন্যান্য পুরাণের পাঠ তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে বায়ু পুরাণের এই পাঠটিকে ভ্রান্ত বলেই মনে হয়।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.১১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১২১, ১২৭;
মৎস্য পু. ৪৪.৬৬;
বায়ু পু. ৯৬.১২০, ১২৭;
বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১৫]

আহুতি বিশেষ দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে অগ্নিতে হবি (ঘৃত) বা অন্য কোনো দ্রব্যের নিক্ষেপণকে আহুতি বলে। আহুতি দেবার প্রক্রিয়া হল—প্রথমে একটা পাত্রে ঘি নিয়ে গার্হপত্য অগ্নির ওপরে গরম করে নিতে হত। তারপর অধ্বর্যু 'স্রুব' নামের একটি ছোটো হাতা দিয়ে জুহূ পূর্ণ করবেন, এবং সমিধ হাতে নিয়ে উত্তরদিকে আহবনীয় অগ্নির কাছে যাবেন। আহবনীয়ের চারপাশে দূর্বা ঘাস ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসবেন অধ্বর্যু। এবার স্বাহাকার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমন্ত্রক ঘি জুহূ থেকে সেই আগুনে দেবেন। এটাই আহুতি। পূর্ণ একটি স্রুক্‌পাত্র (হাতার মতো জিনিস) থেকে সম্পূর্ণ আজ্যঘৃত যে আহুতি দেওয়া হয়, তার নাম পূর্ণাহুতি—

উদ্ধৃত্য আহবনীয়ং পূর্ণাহুতিং জুহোতি।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ২.২.১.১;
কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite) ৪.১০.৪-৫;
আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ২.১৪.৭]

আহৃতি ক্রথ-র বংশধারায় লোমপাদের পুত্র বভ্রু। বভ্রুর আহৃতি নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[বায়ু পু. ৯৫.৩৭]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে লোমপাদের পুত্র বভ্রু। সেখানে বভ্রুর পুত্রের নাম হিসেবে 'আকৃতি' নামটি উল্লিখিত হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.৩৮]*

আহৃত্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে অপ্সরাদের একটি গণ। এই 'আহৃত্য'গণের অপ্সরারা ব্রহ্মার মানস-কন্যা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৮]

আহ্বয় মরুদ্‌গণের তৃতীয়গণের অন্তর্ভুক্ত একজন দেবতা। *[বায়ু পু. ৬৭.১২৬]*

আহ্বায়ক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যেসব ব্রাহ্মণরা অর্থের বিনিময়ে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত থাকতেন, তাদের আহ্বায়ক বলা হয়।

[মহা (k) ১২.৭৬.৬; (হরি) ১২.৭৪.৯]

ই

ই সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বরবর্ণ আবির্ভূত হয়। এই চতুর্দশ স্বরের মধ্যে ই-কার তৃতীয়। লক্ষণীয় হ্রস্ব-ই এবং দীর্ঘ 'ঈ'-এখানে একাত্মক রূপেই কল্পিত হয়েছে। মূর্তিমান ই-কার রক্তবর্ণ। এঁকে ক্ষত্রিয়কুলের স্রষ্টারূপে কল্পনা করা হয়েছে। 'ঈ' বর্ণ দিয়ে যজুর্বেদ আরম্ভ হয় বলে এঁকে যজুর্বেদের স্রষ্টা ও অধিপতি আদিত্য সূর্য রূপেও কল্পনা করা হয়। *[বায়ু পু. ২৬.৩৪-৩৫]*

ইক্ষলক কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্যতম ঋষি। ইনি রথীতরের শিষ্য ছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৪]

ইক্ষুকা *[দ্র. ইক্ষুলা]*

ইক্ষুদা *[দ্র. ইক্ষুলা]*

ইক্ষুমতী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে যে, তক্ষক ও অশ্বসেন ইক্ষুমতী নদীর তীরে একসঙ্গে বসবাস করতেন।

[মহা (k) ১.৩.১৪১; (হরি) ১.৩.১৫০]

☐ রামচন্দ্রের বনবাসের পর দশরথের মৃত্যু হলে বশিষ্ঠ ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করার জন্য কেকয়রাজ্যে বহু দূত পাঠিয়েছিলেন। এই দূতেরা ভরতকে কেকয় থেকে আনতে যাওয়ার পথে একাধিক নদী ও জনপদ পার হয়েছিলেন। অযোধ্যা থেকে কেকয় রাজ্যে যাওয়ার পথে তাঁরা প্রথমে মালিনী নদী তারপর গঙ্গা নদী, পঞ্চালদেশ এবং তেজোভিভবন ও অভিকাল নামে গ্রাম দুটি পার হয়ে ইক্ষুমতী নদীর তীরে এসে পৌঁছেছিলেন। ইক্ষুমতী নদী পার হয়ে তাঁরা বাহ্লীক দেশে প্রবেশ করেছিলেন।

[রামায়ণ ২.৬৮.১২-১৮]

☐ কপিল মুনির আশ্রম এই ইক্ষুমতী নদীর তীরে অবস্থিত।

[ভাগবত পু. ৫.১০.১; বিষ্ণু পু. ২.১৩.৪৯]

☐ মৎস্য পুরাণে ইক্ষুমতীকে একটি পবিত্র পিতৃতীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনও বলা হয়েছে যে, ইক্ষুমতী যেখানে গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেই সঙ্গমস্থলে পিতৃগণ সবসময় বিরাজ করেন। *[মৎস্য পু. ২২.১৭]*

☐ পণ্ডিতরা মনে করেন কুমায়ুন হিমালয়, রোহিলখণ্ড (উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ) এবং কনৌজ জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কালিন্দী নদীটিই ইক্ষুমতীর আধুনিক রূপ।

[GDAMI (Dey) p. 77]

☐ বরাহমিহির রচিত বৃহৎ সংহিতাতেও এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। বৃহৎ সংহিতায় কালিন্দী বা ইখান (Ikhan) নদীকে গঙ্গার শাখানদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রোমের ঐতিহাসিক আরিয়ান (Arrian), ইক্ষুমতী নদীকে অক্সিমাগিস (Oxymagis) নামে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন সঙ্কাস্য নগরীটি এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

[বৃহৎ সংহিতা ১৬.৫]

ইক্ষুলা মহাভারতে জম্বু-খণ্ড বিনির্মাণ নামক উপপর্বে বেদস্মৃতা, বেদবতী এবং ত্রিদিবা নদীর সঙ্গে এই নদীর নাম পঠিত হয়েছে। কিন্তু মহাভারতে এই নদীর উৎসস্থল জানানো হয়নি।

[মহা (k) ৬.৯.১৭; (হরি) ৬.৯.১৭]

বায়ুপুরাণে এই নদীকে ত্রিসামা; ঋতুকুল্যা, লাঙ্গুলিনী, বংশধরা এবং ত্রিদিবা ইত্যাদির একত্রে উল্লেখ করে এই নদীগুলিকে মহেন্দ্রপর্বতের কন্যা—মহেন্দ্রতনয়াঃ স্মৃতাঃ—বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইক্ষুলা নদীর উৎসস্থল মহেন্দ্রপর্বত।

[বায়ু পু. ৪৫.১০৬]

মৎস্যপুরাণে এই নদীর নাম ইক্ষুদা এবং এটি ঋষিকুল্যা তথা ত্রিদিবা নদীর সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত। উৎস একই মহেন্দ্র পর্বত।

[মৎস্য পু. ১১৪.৩১]

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এটি ঋষিকুল্যা, ত্রিদিবা, লাঙ্গলিনী, বংশকরার সঙ্গে উল্লিখিত এবং উৎসস্থল সেই মহেন্দ্র পর্বত।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.২৮-২৯]

আধুনিক গবেষণা-মতে মহেন্দ্র পর্বতমালা উড়িষ্যা থেকে মাদুরা জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। পারজিটারের মতে মহানদী এবং গোদাবরী নদীর মধ্যভূমিতে পূর্বঘাট-পর্বতামালার যে অংশ পড়ে, সেটিই মহেন্দ্র পর্বত।

[GDAMI (Dey) p. 119]

এখান থেকেই ইক্ষুলা-নদীর উৎপত্তি। বাসুদেবশরণ আগরওয়ালা এই নদীটিকে ফরুক্কাবাদ জেলা দিয়ে প্রবাহিত ইখনা-নদীর সঙ্গে একাত্ম বলে মনে করেন, যদিও অন্যেরা সঙ্গত কারণেই এটিকে দাক্ষিণাত্যের একটি নদী বলে চিহ্নিত করেন, এস.এম.আলির মতে এটি বাহুদা, কিন্তু বাহুদা উত্তর ভারতীয় নদী বলেই বিখ্যাত, কিন্তু অন্য একটি মতে দাক্ষিণাত্যেও অনুরূপ একটি বাহুদা আছে। *[GP (Ali) p. 1; GM (Survavanshi) p.134; GD (N.N. Bhattacharyya), see Bāhudā]*

ইক্ষ্বাকু বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্র। মহাভারত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, বৈবস্বত মনু দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। শেষে সন্তানলাভের জন্য তিনি মিত্রাবরুণ এই যুগল দেবতার উদ্দেশে এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বৈবস্বত মনুর এই যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন। এই যজ্ঞের ফলে এবং ভগবান শ্রীহরির কৃপায় বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রসন্তান হয়। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ইক্ষ্বাকু। কথিত আছে, বৈবস্বত মনুর ক্ষব বা হাঁচি থেকে এই পুত্রের জন্ম হয়েছিল বলেই তাঁর নাম ইক্ষ্বাকু—

ক্ষুবতস্তু মনোঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুরভিনিঃসৃত।

পুরাণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকু শতপুত্রের জনক ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিকুক্ষি জ্যেষ্ঠ। ইক্ষ্বাকুর পুত্রেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করেছিলেন—একথাও পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

সূর্যবংশের আদি রাজা ইক্ষ্বাকু। বিবস্বান্ সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনু। তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকুর দীর্ঘ বংশধারায় বহু প্রাচীন রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইক্ষ্বাকু সূর্যের পৌত্র বলে তাঁর বংশ যেমন সূর্যবংশ নামে খ্যাত, তেমনই ইক্ষ্বাকুর মতো মহান রাজর্ষির নামানুসারে এই বংশ ইক্ষ্বাকুবংশ নামেও খ্যাত। ইক্ষ্বাকুর বংশধর রাজা-রাজর্ষিরা ইক্ষ্বাকুর নামানুসারে ঐক্ষ্বাকু নামেও সম্বোধিত হয়েছেন। রাজর্ষি ককুৎস্থ, কুবলাশ্ব, যুবনাশ্ব, মান্ধাতা, পুরুকুৎস, অম্বরীষ, ত্রসদস্যু, হর্যশ্ব, বিখ্যাত রাজা সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু, সৌদাস কল্মাষপাদ, ভগবান বিষ্ণুর অবতার রাজা দাশরথি রামচন্দ্র—সকলেই রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১৩.২.৫-৬; (হরি) ১৩.২.৫-৬; ভাগবত পু. ৮.১৩.২; ৯.১.৩, ১২; ৯.২.২; ৯.৬.৪-১০; বায়ু পু. ৬৪.২৯; ৮৫.৪; ৮৮.৯; বিষ্ণু পু. ৪.১.৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬০.২, ২০; ২.৬৩.৮; মৎস্য পু. ৯.৩০; ১১.৪১; রামায়ণ ১.১.৮]

☐ মহাভারতের আদিপর্বের সূচনায় ইক্ষ্বাকুর নাম উল্লিখিত হয়েছে অন্যতম প্রাচীন রাজর্ষি হিসেবে। পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সঞ্জয় বহু প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা সুদীর্ঘকাল বিশাল সাম্রাজ্য এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করার পর কালের অমোঘ নিয়মে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুর নামও উল্লেখ করেছেন সঞ্জয়।

[মহা (k) ১.১.২২৭; (হরি) ১.১.১৮৯]

☐ ইক্ষ্বাকু যেমন প্রাচীন, ন্যায়পরায়ণ রাজর্ষিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তেমনই পরমজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন বলে জানা যায়। ভগবদ্‌গীতায় জ্ঞানযোগ সংজ্ঞক অধ্যায়ের সূচনায় কৃষ্ণ নিজের ভগবদ্ স্বরূপতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, পুরাকালে আমি বিবস্বান্ সূর্যকে জ্ঞানযোগ বিষয়ক উপদেশ দিয়েছিলেন। বিবস্বান্, বৈবস্বত মনুকে সেই উপদেশ দেন, বৈবস্বত মনুর কাছ থেকে ইক্ষ্বাকু জ্ঞানযোগ বিষয়ক উপদেশ লাভ করেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে'ব্রবীৎ।।

[মহা (k) ৬.২৮.১; ১২.৩৪৮.৫২; (হরি) ৬.২৮.১; ১২.৩৩২.৫১-৫২; ভগবদ্‌গীতা ৪.১]

☐ ভাগবত পুরাণের একটি অধ্যায়ে সেই সব প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লিখিত হয়েছে, যাঁরা ভগবান শ্রীহরির পরব্রহ্মস্বরূপতাকে সম্যক্ ভাবে জানেন। এই রাজাদের মধ্যেও ইক্ষ্বাকুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। *[ভাগবত পু. ২.৭.২৩, ৪৪]*

☐ রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে, বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুই সর্বপ্রথম অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। রামায়ণে ইক্ষ্বাকুকে সম্পূর্ণ পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[রামায়ণ ১.৭০.২১; ৪.১৮.৬]

☐ ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুক্ষি বা বিকুক্ষিই ইক্ষ্বাকুবংশের মূল ধারার বাহক ছিলেন বলে

জানা যায়। ইক্ষ্বাকুর অপর পুত্র নিমি মিথিলায় রাজ্যস্থাপন করেন। এই নিমি বংশের পরম্পরায় মহাজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ 'জনক' উপাধিধারী রাজারা মিথিলায় রাজত্ব করেছিলেন। এছাড়াও রামায়ণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুর ঔরসে অপ্সরা অলম্বুষার গর্ভে বিশাল নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বিশালা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

[রামায়ণ ১.৪৭.১১-১২; ১.৭০.২২; ১.৪৭.১১-১২;
রামায়ণ (মুধোলকর) ৭.৫৫.৮; ৭.৫৭.৮;
৭.৭৯.১২-১৬; (তর্করত্ন) ৭.৬৫.৮; ৭.৬৭.৮;
৭.৯২.১২-১৬; বায়ু পু. ৮৯.১-২৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.১-২৪;
বিষ্ণু পু. ৪.৫.১-১৪]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত খড়্গোৎপত্তি উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা আদিতে দুষ্টের দমনের জন্য যে তরবারি নির্মাণ করেন তা বৈবস্বত মনুর পরম্পরায় ইক্ষ্বাকুর হাতে আসে। ইক্ষ্বাকু রাজা পুরূরবাকে সেই তরবারি দান করেছিলেন। *[মহা (k) ১২.১৬৬.৭৩;*
(হরি) ১২.১৬১.৭৩-৭৪]

ইজ্য বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬১; (হরি) ১৩.১২৭.৬১]

ইড়বিড়া *[দ্র. ইলবিলা]*

ইড়াপাত্র *[দ্র. যজ্ঞায়ুধ]*

ইড়াভক্ষণ মহাভারতের সভাপর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমস্ত অতিথিরা চলে আসার পর যজ্ঞের প্রথম দিনেই প্রাথমিক একটি যজ্ঞ শেষ হবার পরেই মন্তব্য করা হল—মন্ত্র শিক্ষাবিশারদ ঋত্বিকদের মন্ত্রপাঠের দ্বারা দেবতাদের উদ্দেশে ইড়া সহকারে আজ্যহোম করা হল। ধরে নেওয়া যায়, তখন প্রথম দিনের যজ্ঞ শেষ হবার পর আজ্য বা ঘিয়ে মাখিয়ে ইড়াভক্ষণও সম্পন্ন হয়েছে—

ইড়াজ্য-হোমাহুতিভির্মন্ত্রশিক্ষাবিশারদৈঃ।

[মহা (k) ২.৩৫.১৮; (হরি) ২.৩৪.১৮]

ইষ্টিযাগ, পশুযাগ প্রভৃতি যাগে প্রধান যাগ সম্পন্ন হওয়ার পর দেবতার আহুতি হিসেবে পরিকল্পিত পুরোডাশ, হবি ইত্যাদির যা অবশিষ্ট থাকে, সেগুলির খানিকটা অংশ যজমান এবং তাঁর নিযুক্ত ঋত্বিকেরা ভাগ করে নিয়ে ভক্ষণ করেন। এই ভক্ষ্য হবি-পুরোডাশ ইত্যাদির নামই ইড়া। ইড়াভক্ষণ না করলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না। অগ্নিহোত্র যাগের পর যে দুধ আহুতি দেওয়া হয় তার অবশিষ্টাংশ ইড়া হিসাবে ভক্ষণীয়। ইষ্টিযাগে অবশিষ্ট পুরোডাশ এবং পশুযাগে অবশিষ্ট পশুমাংস ইড়া হিসেবে ভক্ষণীয়।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ৩.১.১;
৩.২.১-৬; ৮.৭.৩;
১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭, ১৪০-১৪১;
২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬]

ইড়াভক্ষণের জন্য পৌর্ণমাসেষ্টি যাগে পুরোডাশের শেষ অংশকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করা হয়। এই খণ্ডের নাম প্রাশিত্র। এটা ভক্ষণ করেন ব্রহ্মা। অপর খণ্ডের নাম ষড়বত্ত, এই খণ্ড আগ্নীধ্রের প্রাপ্য। আর একটি খণ্ড চার টুকরো করে অধ্বর্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং আগ্নীধ্র—চারজনেই ভক্ষণ করেন। ইড়ার কিছু অংশ যেটি হোতা পৃথক ভাবে ভক্ষণ করেন, সেই অংশের নাম 'অবান্তরেড়া'। পুরোডাশের আর দুটি খণ্ড রেখে দেওয়া হয়। সমস্ত অনুষ্ঠান শেষে ব্রহ্মা এবং যজমান সেই দুই খণ্ড ভক্ষণ করেন। প্রথম, দ্বিতীয় এবং শেষ দুই ভাগ ঘৃতাক্ত করে ভক্ষণের নিয়ম ছিল। *[বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র (caland) ১.১৮:*
আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe), ৩.১.১; ৩.২.১-১১]

ইষ্টিযাগে এবং পশুযাগে যজমান-পত্নীও ইড়া ভক্ষণ করতেন। ইড়াভক্ষণের সঙ্গে-সঙ্গেই যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। আতিথ্যেষ্টি সোমযাগ, পশুযাগ—সব যজ্ঞেরই সমাপ্তি হয় ইড়াভক্ষণে।

ইড়া-ভক্ষণের গভীর প্রতীকী তাৎপর্য্য আছে। দেবতার কাছে যজমানের আত্মসমর্পণ এবং একাত্মতা এই ইড়াভক্ষণের মাধ্যমে সাধিত হয়। পরবর্তীকালে যে কোনো ভোজ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে শেষাংশ প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে ইড়াভক্ষণের পরম্পরা থেকে গেছে। *[দ্র. রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র*
২য় খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮, ৪০-৪২]

ইড়াস্পদ *[দ্র. ইলাস্পদতীর্থ]*

ইতিহাস$_১$ ইতিহাস বলতে এখন আমরা যে অর্থে 'হিস্টরি' (History) বুঝি, সংস্কৃতে সে অর্থ বোঝায় না। সংস্কৃতে 'ইতিহ' শব্দটা অব্যয় শব্দ এবং তার অর্থ পরম্পরাপ্রাপ্ত কাহিনী বা tradition. এইরকম কাহিনীর যে অবস্থান বা আসন সেটাই ইতিহাস (ইতিহ+আস)। অমরকোষের ব্রহ্মবর্গে 'ইতিহ'-শব্দ থেকেই 'ঐতিহ্য' শব্দটা এসেছে এবং ইতিহাসের অর্থ ধরেই সেখানে ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা এইরকম যে, 'ইতিহ' অব্যয়টির দ্বারা পরম্পরার উপদেশ দেওয়া হয়—

পারম্পর্যোপদেশে স্যাদৈতিহ্যমিতিহাব্যয়ম্।

এরপর স্বর্গবর্গে অমরকোষ বলেছে ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তম্।

[অমরকোষ (Jhalakikar) ২. (ব্রহ্মবর্গ) ১২;
১. (শব্দাদিবর্গ) ৪]

এমনিতে পুরাণগুলির মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু পুরাণের শ্রীধরস্বামী-কৃত টীকায় অন্তত তিন জায়গায় তিন বার ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে—ঋষি-মহর্ষি-দেবর্ষিদের বহু বিচিত্র চরিত্র আশ্রয় করে যেসব আখ্যান ভবিষ্যতের ধর্ম-নিয়মের নির্দেশ দেয়, সেই সব বহুতর আখ্যানের নামই ইতিহাস—

আর্ষাদি বহুধাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুত-ধর্মধৃক্॥

অন্যত্র আর একটি জায়গায় ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হল—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের উপদেশযুক্ত পুরাতন ঘটনার বিবরণ নিয়ে যেসব কাহিনী গড়ে উঠেছে, তাকেই ইতিহাস বলে—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।
পুরাবৃত্ত-কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

আর একটি স্থানে যা বলা হয়েছে, সেটা অমরকোষের সংজ্ঞার সঙ্গে মিলে যায়। 'ইতিহ' অব্যয়টিকে ধরেই সেখানে পরম্পরাগত ঘটনার বিবরণই ইতিহাস বলে চিহ্নিত হয়েছে—

ইতিহেত্যব্যয়ং পারম্পর্যোপদেশাভিধায়ি।
তস্যাসনস্ আসঃ অবস্থানমেতেম্বিতি॥

[বিষ্ণু পু. (বিহারীলাল সরকার প্রকাশিত)
১.১.৪; ৩.৪.১০; শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা দ্র.]

□ সাধারণ অর্থে আমরা যাকে history বলি, সেটা সংস্কৃতে পুরাণের সংজ্ঞার মধ্যে আসে। বায়ু পুরাণ বলেছে—যেহেতু এইরকমটা পুরাকালে জীবিত ছিল, যেহেতু পুরাকালে এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, তাই এর নাম পুরাণ—

যস্মাৎ পুরা হ্যনিতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্।

আধুনিক ইতিহাস শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য পুরাণ-শব্দের মধ্যেই আছে—এ-কথা মেনে নিয়েও বলি যে, ইতিহাসের নির্বচন এবং প্রকরণ যেভাবে বলা হয়েছে তাতে পরম্পরাবাহী ঘটনাগুলির বিবরণ যদি বেদ থেকে আরম্ভ করে উপনিষদ এবং শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র পর্যন্ত প্রায় একরকম হয়, সেখানে রাজা, ঋষি এবং দেবতার পরম্পরারও খানিক ঐতিহাসিকতা পাওয়া যায় বটে। পুনশ্চ সেগুলি যদি পুরাণের পুরাবৃত্তের সঙ্গে মিলে যায়, তাতে ইতিহাসের মর্যাদা আধুনিক অর্থেই প্রকট হয়ে ওঠে। ঠিক এই দৃষ্টিতে ভাবনা করেই মহাভারতের মধ্যেই মহাভারতকে কখনো পুরাণ আবার কখনো ইতিহাস বলা হয়েছে—

দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।
ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ।
ইতিহাসাঃ সহব্যাখ্যা বিবিধাঃ শ্রুতয়োঽপি চ।

[বায়ু পু. ১.২০৩;
মহা (k) ১.১.১৭; ১.১.১৯; ১.১.৫০; ১.১.৫৪;
(হরি) ১.১.১৭; ১.১.১৯; ১.১.৫০; ১.১.৫৪]

ইতিহাস$_2$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। ইতিহাস শব্দের অর্থ প্রাচীন যুগের কথা, যা পরম্পরাক্রমে পৌঁছে যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। ঈশ্বর স্বয়ং কাল বা সময়ের নিয়ন্ত্রক। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত যা কিছু ঘটে আসছে তাকেও নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই আর সভ্যতার প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে যে ইতিহাস প্রবাহিত হয়েছে, তারও স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বরই। আমাদের দেশে আর্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের কাল থেকে তাদের জীবন, আচার অনুষ্ঠান ধর্ম সবকিছুকেই তাঁরা গেঁথে রেখেছেন শ্রুতিতে, মহাকাব্যে, পুরাণে। এই কাব্যাকারে গ্রন্থিত ইতিহাসকেও তাই মহাদেবের স্বরূপ হিসেবেই কল্পনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থিত বা অগ্রন্থিত সুদীর্ঘকালের মানব জীবনধারার প্রতিটি মুহূর্তের সাক্ষী ঈশ্বর, লোক পরম্পরায় বয়ে চলা ইতিহাসের ধারার উৎসও তিনিই। তাই মহাদেব ইতিহাস নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৭৮; (হরি) ১৩.১৬.৭৮]

ইধ্ম পলাশ বা খদির কাঠের যজ্ঞীয় কাষ্ঠখণ্ড যজ্ঞের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ একুশটি কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার করা হয় অগ্নিসমিন্ধনের জন্য।

আহবনীয় অগ্নি-সমিন্ধনের জন্যই এগুলি প্রধানত ব্যবহার হয়—

খাদিরং পালাশং
বৈকবিংশতি-দারুমিধ্মং করোতি।

একুশটির মধ্যে পনেরোটি কাষ্ঠখণ্ড সামধেনী মন্ত্রপাঠের সময় ব্যবহার করা হয়। তিনটি কাষ্ঠখণ্ড আহবনীয় অগ্নির পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে রেখে আহবনীয় অগ্নির বেড় তৈরি করা হয়। তখন এই কাষ্ঠখণ্ডগুলির পারিভাষিক নাম হয়—মধ্যম, দক্ষিণ এবং উত্তর। দুটি ইধ্ম-কাষ্ঠখণ্ড গলিত ঘিয়ে ডুবিয়ে অধ্বর্যু আহবনীয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। এটাকে বলে 'আঘার'-কর্ম। আর একটি ইধ্ম-কাষ্ঠ থাকে যেটি প্রধান যাগের পর অনুযাজ-কর্ম বা after-offering -এর জন্য। *[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ১.৫.৬-১০]*

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে কৃষ্ণ যখন কর্ণকে পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দেবার অনুরোধ করেন, তখন কর্ণ দুর্যোধনকে ত্যাগ করে যাবার অপারগতা জানিয়ে কৃষ্ণের সামনে সমূহ যুদ্ধটাকে একটা বৃহৎ যজ্ঞের সাদৃশ্যে বর্ণনা করেন। সেখানে বিভিন্ন যুদ্ধোপকরণ যুদ্ধাস্ত্রগুলিকে যজ্ঞোপকরণের সাম্যে বর্ণনা করার সময় শক্তি-নামক অস্ত্রটিকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠখণ্ড ইধ্মের সঙ্গে তুলনা করেন কর্ণ। শক্তি যেহেতু লাঠির মতো দেখতে, তাই শক্তির সঙ্গে ইধ্মের তুলনা করে গদাগুলিকে 'পরিধি' বলে চিহ্নিত করেছেন কর্ণ। এতে বোঝা যায়—মহাভারতের কালেও ইধ্ম-নামক যজ্ঞকাষ্ঠটি যজ্ঞের উপকরণ হিসেবে এতটাই পরিচিত ছিল যে, অতি-ব্যবহৃত শক্তি-নামক অস্ত্রটি ইধ্ম-নামে উল্লিখিত হয়েছে।

অনুশাসন পর্বের অন্য একটি ঘটনায় উদ্দালকি ঋষি পুত্র নাচিকেতকে বলেন—আমি নদীর তীরে সংগৃহীত যজ্ঞকাষ্ঠগুলি (ইধ্ম), ফেলে রেখে এসেছি। যজ্ঞের প্রয়োজনীয় কুশগাছি, ফুল, এমনকী জলের কলসটাও ফেলে রেখে এসেছি। তুমি নদীর তীর থেকে সেগুলি নিয়ে এসো। নাচিকেত যজ্ঞকাষ্ঠগুলি আনতে গেলেন বটে, কিন্তু ততক্ষণে নদীতে জোয়ার এসেছে এবং ভেসে চলে গেছে যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত যজ্ঞকাষ্ঠ—ইধ্ম এবং অন্য সকল বস্তুও।

সে কাহিনী অন্য, কিন্তু উদ্দালকি মুনির কথা শুনে মনে হয় যে, মহাভারতের কালে যাগ-যজ্ঞপরায়ণ ঋষিরা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নিজের প্রয়োজনে নিজেই ইধ্ম সংগ্রহ করতেন।

[মহা (k) ৫.১৪১.৪০; ১৩.৭১.৩-৬;
(হরি) ৫.১৩২.৪০; ১৩.৫৮.৩-৬]

ইধ্মজিহ্ব রাজা প্রিয়ব্রতের ঔরসে প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর গর্ভে ইধ্মজিহ্ব নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। প্রিয়ব্রত ইধ্মজিহ্বকে প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি নিয়োগ করেন।

ইধ্মজিহ্ব প্লক্ষদ্বীপকে সাতটি বর্ষে ভাগ করে তাঁর সাত পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। ইধ্মজিহ্বের সাত পুত্রের নাম—শিব, সুরম্য, সুভদ্র, শান্ত, শপ্ত, অমৃত ও অভয়। স্কন্দ পুরাণ মতে, ইধ্মজিহ্ব গোমেদ দ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন এবং দ্বীপটিকে তাঁর সাত পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। সে কারণেই গোমেদ দ্বীপের সাতটি বর্ষ ইধ্মজিহ্বের সাত পুত্রের নামে পরিচিত। *[দেবী ভাগবত ৮.৪.৪, ২১; ৮.১২.৪-৭;*
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৭.৭৭]

ইধ্মবাহ *[দ্র. দৃঢস্যু]*

ইন্দিরা একটি পবিত্র নদী। বায়ু পুরাণ মতে, মহর্ষি লোমশ তপঃপ্রভাবে স্বর্গ থেকে এই নদীকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন। *[বায়ু পু. ১০৮.৭৯]*

ইন্দীবর বিদ্যাধর নলনাভের পুত্র। পূর্বকালে ইন্দীবর একবার ঋষি ব্রহ্মমিত্রের কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মমিত্র তাঁকে বিদ্যাদানে অসম্মত হলে ইন্দীবর গোপনে বিদ্যালাভ করেন। সত্য উদ্‌ঘাটনের পর ব্রহ্মমিত্র ইন্দীবরকে গোপনে বিদ্যালাভের কারণে রাক্ষসে পরিণত হওয়ার অভিশাপ দেন। সন্ত্রস্ত ইন্দীবর ক্ষমা পাওয়ার জন্য ব্রহ্মমিত্রকে নানাভাবে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। অবশেষে ব্রহ্মমিত্র তাঁকে বলেন যে, রাক্ষস রূপধারী ইন্দীবরের স্মৃতি সম্পূর্ণ নষ্ট হলে তিনি নিজ সন্তান ভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। এ সময় সন্তানের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি পূর্ব স্মৃতি ফিরে পাবেন এবং তাঁর রাক্ষস রূপ পরিবর্তিত হবে।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৬৩.৩৮-৫২]

ইন্দুমতী মহারাজ আয়ুর পত্নী। দত্তাত্রেয় মুনি প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করে ইন্দুমতী গর্ভধারণ করেছিলেন। একদিন রাত্রে ইন্দুমতী স্বপ্ন দেখলেন,

ব্রাহ্মণজাতীয় এক দিব্যপুরুষ তাঁর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। শঙ্খ-চক্র-গদাধারী চতুর্ভুজ বিশিষ্ট সেই দিব্যপুরুষ এসে ইন্দুমতীকে আহ্বান করে ক্ষীরপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা ক্ষীরধারায় বারংবার তাঁকে স্নান করালেন। তারপর এক উজ্জ্বল তেজধারী শ্বেতনাগ তাঁর মুখ প্রান্তে নিক্ষেপ করলেন। কণ্ঠে মুক্তাফল দিলেন, সর্বশেষে ইন্দুমতীর হাতে একটি পদ্ম দিয়ে প্রস্থান করলেন। মহারাজ আয়ু পত্নীর মুখে এই স্বপ্ন-ঘটনা শুনে তাঁর গুরু মহাভাগ শৌনককে ডেকে এনে স্বপ্ন বিবরণ বললেন। শৌনক রাজাকে স্বপ্নের ফলরূপে বললেন যে, মুনি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে আয়ুর বংশে বৈষ্ণব অংশযুক্ত এক উত্তম, পুরুষ জন্মাবে। ওই পুত্র ধর্মাত্মা, সোমবংশবর্দ্ধন এবং ধনুর্বেদে ও বেদে পারদর্শী হবে। রাজা আয়ু এবং পত্নী ইন্দুমতী এইকথা শুনে খুব খুশি হলেন। *[পদ্মপুরাণ (ভূমিখণ্ড) ১০৪; ৪-২৪]*

ইন্দ্র মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে ইন্দ্রের রূপ-গুণ-চরিত্র যেমন, তার সঙ্গে পুরাতন বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত ইন্দ্রের আচার-ব্যবহার-চরিত্র একেবারেই আলাদা। বেদের ইন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তিনি বৃত্রঘ্ন; নমুচি, শুষ্ণ, চুমুরি, ধুনি, শম্বর, প্রিপ্রু, বল, অর্বুদ, কুযব—এইসব ভয়ঙ্কর অসুর-দানব বধ করে দেবলোকের মহামান্য নায়ক হিসেবে তিনি কীর্তিত হয়েছেন বেদে-ব্রাহ্মণগ্রন্থে। ইন্দ্রের শত শত কীর্তি উল্লেখ করে ঋগ্‌বেদ জানিয়েছে—ইন্দ্র ব্যথিত-শিথিল পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেছেন, তিনি পর্বতগুলিকে স্থির করেছেন, তিনি আকাশকে স্তম্ভিত করেছেন, তিনি মেঘের মধ্যে অগ্নির সৃষ্টি করেছেন, তিনি এই সমগ্র বিশ্বভুবন নির্মাণ করেছেন—

যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্
যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতা অরম্ণাৎ।
যো অন্তরীক্ষং বিমমে বরীয়ো
যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ॥

ঋগ্‌বেদের এই সূক্তটির মধ্যে ইন্দ্রের বহুবিচিত্র কীর্তি অনেক মর্য্যাদা-সহকারে উল্লিখিত হয়েছে একত্রে এবং এই সমস্ত কীর্তির সঙ্গে আরও বহুতর মহিমা নির্মাণ করা হয়েছে ঋগ্‌বেদের অন্য সূক্তগুলিতে, অন্য হাজার মন্ত্রবর্ণের মধ্যে। ইন্দ্র যে দেবতা থেকে দেবরাজ হয়ে উঠেছেন, সেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁরা, তাঁদের নামের তালিকাও যেমন বেশ বড়ো, তেমনই তাঁদের প্রতিহত করে বধ করার শক্তি এবং কৌশল সবটাই ইন্দ্রের করায়ত্ত। ফলে দেবরাজ হতে তাঁর সময় লাগেনি।

যে সমস্ত দৈত্য-দানবদের ইন্দ্র পরাভূত এবং বধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন শম্বর, বল এবং বৃত্র। শম্বরের সঙ্গে ইন্দ্রের বারংবার উল্লিখিত যুদ্ধের বর্ণনার চেয়েও যেটা বেশী কৌতূহলোদ্দীপক, সেটা হল—শম্বর নামের এই দৈত্যটি এক পর্বতের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন, ইন্দ্র নাকি চল্লিশ বছর ধরে খুঁজে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরতে পেরেছিলেন—

যং শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং
চত্বারিশ্যাং শরদ্যন্নবিন্দৎ।

শম্বরাসুর সম্বন্ধে আরও দুটি কথা ঋগ্‌বেদেই যথেষ্ট প্রচলিত এবং তা হল—শম্বরের নাকি একশটা প্রস্তরকঠিন দুর্ভেদ্য পুরী ছিল যেগুলি ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করে ভেঙে দিয়েছিলেন—

যঃ শতং শম্বরস্য পুরো বিভেদাশ্মনেব পূর্বীঃ।

পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন ইন্দ্রের এই কীর্তির ফলেই তাঁর 'পুরন্দর' নামটি বিখ্যাত হয়েছে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে। শম্বরাসুরের আর এক ক্ষমতা হল তাঁর মায়া। মায়া বা ছল-চাতুরীর ক্ষমতা না থাকলে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তাঁর পক্ষে ইন্দ্রের আড়ালে লুকিয়ে থাকাও সম্ভব ছিল না। শম্বরকে 'মহামায়' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে মহাভারতে এবং শম্বরের মায়া কথাটাও যেন এখানে প্রায় প্রাবাদিক—

শম্বরস্য চ যা মায়া।

অবশ্য এইসব অসুরবধের জন্যই হোক অথবা আপন স্বভাবেই—দেবরাজ ইন্দ্রও কিন্তু ছল-চাতুরী জানা মায়াবী পুরুষ হয়ে উঠেছেন। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে—তুমি মায়াবী শুষ্ণ নামক অসুরকে মায়া দিয়েই বধ করেছিলে—

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ

যদিও মায়া-শব্দের দ্বারা এখানে ইন্দ্রের বিভিন্ন রূপ ধারণ করার অলৌকিক ক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব/
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে/
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥

[ঋগ্‌বেদ ২.১২.২-১৪; ৭.১৯.২; ১.৫১.৬; ১.৫৩.৭; ১.১০১.২; ১.১২.১২; ২.১৪.৬; ১.১১.৭; ৬.৪৭.১৮; মহা (k) ১২.১৩০.৩৩; ১৩.৩৯.৬; (হরি) ১২.১২৬.৩৪; ১৩.৩৫.৬]

☐ বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে ইন্দ্র যে দেবতা থেকে দেবরাজ হয়ে উঠেছেন, তা প্রধানত অসুর এবং ভয়ঙ্কর দৈত্য-দানব-বধের নিরিখে। এই রাজপদবী স্বয়ং ইন্দ্রের কাছেও এতটা মর্য্যাদাকর যে, বেদে-ব্রাহ্মণে তাঁর অসামান্য যোদ্ধা গুণ প্রকট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছলনা-কুটিল চরিত্রের দিকটাও ধরা পড়ে এবং লক্ষণীয়, বেদোত্তর কালে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে তাঁর বীরতম যোদ্ধাগুণের চাইতেও যে কোনো উপায়ে তাঁর দেবরাজ-পদবীতে স্থিত হওয়ার আকুলতাই বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রের বীরত্ব চরমভাবে আখ্যাত হয়েছে বিভিন্ন শত্রুবধের কাহিনীতে এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠতম রাজা হিসেবে গ্রহণ করাটাও সেই বীরত্বের ফল হিসেবে বিবেচিত—যেমনটা বলা হয়েছে—তুমি রাজাদের রাজা, তুমি রাজেন্দ্র—

ত্বং রাজেন্দ্র যে চ দেবাঃ।

ঋগ্‌বেদের পরবর্তী অথর্ববেদে ইন্দ্রের এই রাজেন্দ্র-পদবী আর স্তুতি-সম্বোধনের পর্যায়ে নেই। অথর্ববেদে একেবারে বিজ্ঞপ্তির মতো এই ঘোষণা নেমে আসে—ইন্দ্র এই তিন ভুবনের রাজা, সমস্ত মানুষের রাজা তিনি। তিনি নিজের বিস্তারিত সাম্রাজ্যে নিজেই ঈশ্বর। তিনি স্বরাট্। তিনি সমস্ত ইন্দ্রের মধ্যে ইন্দ্র, অর্থাৎ রাজাদেরও রাজা—

* ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনাম্।

* ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যঃ পরেহি।

কেন এই ইন্দ্র রাজার রাজা, সে কথা জানিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেছে—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে তিনি সবার চাইতে তেজস্বী, সবার চাইতে বলিষ্ঠ, শত্রুর তেজ তিনি সবচেয়ে বেশী সইতে পারেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সত্তম এবং সমস্ত কাজই তিনি সমস্ত দেবতাদের চেয়ে বেশী পারেন—

অয়ং দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ
সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িষ্ণুতমঃ।

বেদ এবং ব্রাহ্মণগুলিতে কোন দেবতা কতটা সোমরসের ভাগ পাচ্ছেন, সেটা দিয়েও দেবতার গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচিত হত। এই নিরিখে ইন্দ্রের গুরুত্ব সমধিক। যজ্ঞের আহুতি হিসেবে সোমরসে দেবতার অধিকার এখানে লঘু হয়ে ওঠে। সোমরসের ওপরে ইন্দ্রের যেন স্বাভাবিক সার্বত্রিক অধিকার। যে কোনো বড়ো যুদ্ধের আগে ইন্দ্র সোমপান করে বলবৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন, এই উদাহরণ যেমন ভূরি ভূরি উল্লিখিত হয়েছে ঋগ্‌বেদে, তেমনই দৈত্য-দানববধের পর আপ্লুত যাজ্ঞিকেরা ইন্দ্রকে সোমরস আহুতি দিয়ে আপ্যায়ন করছেন, এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর। একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে—

ওহে ইন্দ্র শতক্রতু!

এই সোমপান করে তুমি বৃত্র প্রভৃতি দানবদের হত্যা করেছিলে—

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।

সোমপান ইন্দ্রের প্রিয় ব্যসন এবং একটি মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সোম পান করে ইন্দ্রের উদর সমুদ্রের মতো বড়ো হয়ে গেছে এবং তাঁর মুখে সোমের শেষ বিন্দুগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে না, অর্থাৎ অবিরাম সোমপান, তাঁর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে—

যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিম্বতে
উর্বীরাপো ন কাকুদঃ।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৭৪.১; অথর্ববেদ (Roth & Whitney) ১৯.৫.১; ৩.৪.৬; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম), ৩৮.১. ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২৮; ঋগ্‌বেদ ১.৪.৮; ১.৮.৭]

☐ বেদ-ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের আকৃতি-প্রকৃতি, শৌর্য্য-বীর্য্য, মান-মর্য্যাদা এবং আশ্রিতজনের প্রতি তাঁর যে করুণার বিবরণ আছে, তা বলতে গেলে একটি পূর্ণ গ্রন্থ তৈরি হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা, ইন্দ্রের এই বিরাট বৈদিক মহিমা মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের কালে একেবারেই খর্ব হয়ে গেছে। বেদ এবং উপনিষদগুলির মধ্যবর্তী সময়ে বহু-দেবতার মাধ্যমে কাম্যকর্মের ফলপ্রাপ্তির ব্যাপারে নশ্বরতা-বোধ তৈরি হতে থাকে, এবং তার সূত্রপাত ঘটেছিল বেদের কালের শেষ দিকেই। কোন দেবতার উদ্দেশে আর এত ঘি পুড়িয়ে যজ্ঞ করবো—

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

—এই ধরনের নৈরাশ্য, কাম্য কর্ম এবং কর্মফলদাতা দেবতার ব্যাপারে এই নৈরাশ্যই ঔপনিষদিক একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদের পথ সুগম করেছে। অবশেষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন এই দেবতাদের ব্রহ্মাত্মকতা প্রকট করা হয়েছে, তেমনই এঁদের চরম মাহাত্ম্য প্রকট হয়ে উঠতে থাকায় বৈদিক দেবতাকুল এমনকী দেবরাজ ইন্দ্রের মহিমাও সম্পূর্ণ খর্বিত হয়ে পড়ে।

মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে ইন্দ্র দেবরাজই থাকলেন বটে, কিন্তু সব সময়েই তাঁর একটা জবাবদিহি করার জায়গা তৈরি হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের কাছে। ইন্দ্র তখনও পূর্বকীর্তিত অসুর-দৈত্যদের হত্যাকারী বীর বলে চিহ্নিত রইলেন বটে, কিন্তু আখ্যান-উপাখ্যানগুলির মাধ্যমে এমন একটা ধারণাও দৃঢ় হতে থাকল যে, শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু-শিবের মতো পরম দেবতার সহায়তাতেই ইন্দ্রের জয় সূচিত হয়। নয়তো বা এমনও হয়েছে যে, পূর্বোক্ত অসুর-দৈত্যদের কাছেও তিনি যথেষ্ট হেনস্থা হয়েছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে অনেক সময়েই দেবলোক ছেড়ে, এমনকী ইন্দ্রাণী শচীকে ছেড়েও। সবচেয়ে বড়ো কথা ইন্দ্রের বীরোচিত মহিমা পরবর্তীকালে এতটাই কলঙ্কিত যে, তিনি সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকেন কখন কোন দানব কিংবা মানব তাঁর স্বর্গলোক দখল করে নেয়। অনেক সময়েই তিনি সুন্দরী অপ্সরাদের পাঠিয়ে দিয়ে তপস্বীদের, মুনি-ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করার চেষ্টা করেছেন এবং তাতে অনেক সময়েই তাঁর অভীষ্ট পূরণ হয়নি, কিন্তু মাঝখান থেকে তাঁর মহত্ত্ব-বিরাটত্বের ভাবটুকু নষ্ট হয়ে গেছে।

ইন্দ্র যে চরম কোনো দেবতা নন, অথবা বৈদিক ইন্দ্রের মতো চরম শক্তিও তিনি ধারণ করেন না, তার প্রতিফলন তৈরি হতে থাকে কেনোপনিষদের মতো প্রাচীন এক উপনিষদের কাল থেকেই। এখানে বলা হয়েছে—সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের শক্তিতেই দেবতারা একসময় অসুরদের জয় করলেন এবং তারপরেই তাঁরা সগর্বে ভাবলেন—আমরাই আসল বিজেতা, এই জয়ের মহিমা আমাদের—

ত ঐক্ষন্তাস্মকমেবায়ং বিজয়ো
অস্মাকমেবায়ং মহিমা।

এই অবস্থায় দেবতাদের দর্প চূর্ণ করার জন্য দেবতাদের সামনে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও দেবতারা ব্রহ্মস্বরূপকে চিনতে পারলেন না। সেই অদ্ভুতরূপী ব্রহ্ম একটি তৃণগাছি সামনে রেখে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্রকে ডাকলেন তাঁদের শক্তিপরীক্ষা করার জন্য। তাঁরা কেউ তৃণগাছিকে কিছুই করতে পারলেন না। শেষে ইন্দ্র যখন গিয়েছিলেন তখন তাঁকে সম্বোধন করে ব্রহ্মস্বরূপিণী উমা হৈমবতী বললেন—এটা পরম ব্রহ্মের বিজয় হয়েছে। অসুরদের ওপর তোমাদের যে জয়, সেই জয়ে ব্রহ্মকে মহিমান্বিত করো নিজেদের নয়।

[কেনোপনিষদ্ (দুর্গাচরণ), তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড]

□ কেনোপনিষদে ইন্দ্রের এই মহিমাচ্যুতি পরবর্তীকালে আরও বিমিশ্র উপায়ে তাঁর চরিত্র গঠন করেছে। বিষ্ণু-কৃষ্ণ কিংবা রুদ্র-শিব অথবা দুর্গা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠায় ইন্দ্র তাঁদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছেন। ইন্দ্র তাঁদের শক্তিতেই শক্তিমান। সবচেয়ে বড়ো কথা ইন্দ্রও যেন একটা নন, বহু ইন্দ্র এবং ইন্দ্রত্ব একটা উপাধি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে পৌরাণিক কালে। দানব-মানব তপস্যার মহাপুণ্যফলে ইন্দ্রত্ব লাভ করতে পারেন। লক্ষণীয়, কেনোপনিষদের কাহিনী এবং তত্ত্ব, তার প্রতিপাদ্য মহাশক্তির শক্তিতেই ইন্দ্রের শক্তিমত্তা—এই কথাটিই অন্যভাবে মহাভারতের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানের মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—একদিন নৈমিষারণ্যে দেবতারা যজ্ঞ করছিলেন এবং সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করছিলেন বিবস্বানের পুত্র যম। বেশ অনেক কাল সময় ধরে যজ্ঞ করছিলেন বলেই কার্যক্ষেত্রে যমের অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ আর মারা যাচ্ছিল না। বিশেষত যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত থাকলে হিংসা করা বারণ বলেই যম আর মানুষের ওপর মৃত্যুর বিধান দিচ্ছিলেন না। ফলে মানুষের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছিল।

এই অবস্থায় ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, দুই অশ্বিনীকুমার এবং আরও সব অন্যান্য দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বহুল মনুষ্যবৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁদের ভয় এবং উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। ব্রহ্মা বললেন—মানুষ থেকে তোমাদের ভয় কী? তোমরা সকলেই তো অমর। দেবতারা বললেন—এই যে সময়টা গেল, এই

সময়ে যাদের ললাটে লিখিত মৃত্যু হল না, তারাও তো সব অমর হয়ে গেল। কাজেই আমাদের আর কোনো বিশেষত্ব রইল না—

মর্ত্যা অমর্ত্যা সম্ভূতা ন বিশেষো'স্তি কশ্চন।

ব্রহ্মা বললেন—যম যজ্ঞ সেরে স্বস্থানে সকর্মে মন দিলেই আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে। যাদের মৃত্যু বিহিত ছিল, তারাও মারা যাবে। দেবতারা ব্রহ্মার কথা শুনে যমের যজ্ঞস্থানে যাবার পথে গঙ্গাতীরে বসেছিলেন, এই সময় তাঁরা দেখলেন একটি সোনার পদ্ম গঙ্গার জলে ভেসে চলেছে। পদ্মের রহস্য ভেদ করার জন্য দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বলবান ইন্দ্র উপস্থিত হলেন সেইখানে, যেখানে গঙ্গা প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন হিমালয় থেকে। সেখানে গিয়ে ইন্দ্র দেখলেন—আগুনপানা চেহারার এক রমণী জল নেবার জন্য গঙ্গায় নেমে কাঁদছে, আর তার চোখ দিয়ে যখন জল পড়ছে, তখন তার অশ্রুবিন্দুগুলি এক-একটি সোনার পদ্ম হয়ে ভেসে যাচ্ছে গঙ্গায়।

ইন্দ্র সেই রোরুদ্যমানা রমণীকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই রমণী বলল—আপনি সামনে এগিয়ে চলুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন—আমি কেন কাঁদছি। ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে রমণী খানিক এগোতেই ইন্দ্র দেখতে পেলেন—হিমালয় পাহাড়ের এক জায়গায় এক যুবক ব্যাঘ্রচর্মের আসনে বসে এক যুবতীর সঙ্গে পাশা খেলছে একমনে। ইন্দ্রকে সে কোনো আদর-অভ্যর্থনাও করল না, এমনকী তাকালোও না তাঁর দিকে। ইন্দ্র ক্রোধে আকুল হয়ে যুবকটিকে বললেন—ওহে শোনো! এই বিশ্বজগৎ আমার অধীনে আছে। আমিই এই জগতের অধীশ্বর। ইন্দ্রের কথা শুনে যুবক একটু হাসল এবং তারপর ধীরে ধীরে ইন্দ্রের দিকে তাকাতেই ইন্দ্রের শরীর স্থাণুর মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। যুবক নিশ্চিন্তে পাশাখেলা শেষ করল এবং তারপর কাঁদতে-থাকা সেই যুবতীকে বলল—ওই লোকটিকে নিয়ে এসো আমার কাছে, এমন অহঙ্কার যাতে আর কখনো না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি।

রমণী এসে ইন্দ্রের শরীর স্পর্শ করল এবং সঙ্গে ইন্দ্রের সমস্ত অঙ্গ একেবারে শিথিল হয়ে গেল এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এবার সেই যুবককে চেনা গেল, তিনি উগ্রতেজা মহাদেব। তিনি বললেন—ইন্দ্র, তুমি এমন অহঙ্কার আর কোরো না। আমি জানি, তোমার অনেক শক্তি, তা তুমি এই সামনের বড়ো পাথরখানা সরিয়ে যে গর্তখানি পাবে, সেখানে প্রবেশ করো। সেখানে দেখবে, তোমারই মতো বলশালী আরও চারজন ইন্দ্র আছে। তারাও তোমারই মতো অহঙ্কার করেছিল বলেই আমি ওখানে আটকে রেখেছি তাদের। ইন্দ্র সেই বিবরে প্রবেশ করে তাঁরই মতো চারজন ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন এবং ভয়ভীত হয়ে মহাদেবের শরণ গ্রহণ করলেন।

এই পঞ্চেন্দ্র উপাখ্যানের শেষ হয়েছে দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর মৌল তত্ত্বে। কিন্তু আমরা যেটা জানাতে চাই সেটা হল—মহাভারত পুরাণের কালে ইন্দ্র একটি উপাধিতে পরিণত হয়েছে এবং তপস্যার পুণ্য বলে কেউ যদি ইন্দ্রপদ লাভ করেন, তবে সেই সেই ইন্দ্রও; অন্যের অমরত্ব লাভের ভয় পান। বিশেষত ইন্দ্রাদি দেবতারা তাঁদের নিশ্চিত অবস্থিতি এবং স্থিরতার জন্য অন্যতর এক পরম শক্তিমানের ওপর নির্ভর করেন। এখানে যে পাঁচজন ইন্দ্রের কথা বলা হল, তাঁদের নাম বিশ্বভুক্‌, ভূতধামা, শিবি, শান্তি এবং তেজস্বী। এঁরা সকলেই ইন্দ্র ছিলেন।

[মহা (k) ১.১৮৭.১-২৯; (হরি) ১.১৯০.১-২৯]

☐ মহাভারত-পুরাণে ইন্দ্র, স্বাধীন কোনো দেবতা নন। তিনি অন্যান্য সমস্ত দেবতারই প্রভু বটে, এমনকী 'ত্রিদশেশ্বর', ত্রিদিবেশ্বর কিংবা সুরেশ্বর এই সব উপাধি মহাকাব্যে তাঁর সাধারণ অভিধা বটে, কিন্তু তাঁকে দেবতাদের ওপর আধিপত্য দান করছেন শিব। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে—পূর্ণ এক অরাজকতার মধ্যে স্বয়ং ধ্যানযোগে দণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই দণ্ডকে নীতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন দেবী সরস্বতী। সেই দণ্ডনীতি সৃষ্টির পরে দেবতাদের সবার ওপর ইন্দ্রের আধিপত্য দান করেন শিব—

ভূয়ঃ স ভগবান্‌ ধ্যাত্বা চির শূলবরায়ুধঃ।
দেবানাম্‌ ঈশ্বরং চক্রে দেবং দশশতেক্ষণম্‌॥

অন্যত্র বনপর্বে বিষ্ণু ভগবানের স্তব করার সময় বলা হচ্ছে—ইন্দ্র, সোম, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা সব সময় নানাবিধ স্তবে তুষ্ট করছেন বিষ্ণুকে। বিষ্ণু অবশ্য বেশির ভাগ

ক্ষেত্রেই বৈদিককালের মতো ইন্দ্রের সহায়তায় নিযুক্ত হয়েছেন। বিভিন্ন দেবাসুর যুদ্ধে কখনো তিনি পরামর্শদাতার ভূমিকায়, কখনো তিনি উপায় কৌশল বলে দিচ্ছেন দৈত্য দানবদের হঠানোর জন্য, কখনো বা নিজেই অবতার গ্রহণ করছেন দেবকার্য সিদ্ধ করার জন্য। মোট কথা, ইন্দ্রত্বের স্থিরতা মহাকাব্যের কালে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব কিংবা সেই পরমা শক্তির ওপর নির্ভর করছে, যিনি বৈদিক বাক্‌সূক্তে পরিষ্কার জানিয়েছেন—আমিই ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার-যুগলকে ধারণ করি—

অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।

লক্ষণীয়, তারকাসুর বধের কারণে শিব-শক্তির সমবায়ে যখন স্কন্দ কার্তিকেয়ের জন্ম হল, তখন সকল প্রকার দেবতেজে সমৃদ্ধ সেই স্কন্দকে দেখে ইন্দ্র কিন্তু ভয় পেয়ে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর সামনে। স্কন্দের সঙ্গে ইন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় ঋষিরা ইন্দ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করে বলেছেন—এই ইন্দ্র সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বল এবং তেজ সঞ্চার করেন, তাঁদের সন্তানবৃদ্ধি এবং সুখবৃদ্ধির কারণও তিনি। সূর্য-চন্দ্রের অভাবে তিনি সূর্য-চন্দ্রের কাজ করেন। প্রয়োজন হলে অগ্নি, বায়ু, জল এবং পৃথিবীর স্বরূপ ধারণ করে সর্বভূতের মঙ্গল সাধন করেন তিনিই। পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হলে দেবতারা সকলে ইন্দ্রের নেতৃত্বে স্কন্দ কার্তিকেয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁকেই ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু স্কন্দ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হয়ে শুধুমাত্র দেবতাদের সেনাপতি হতে চাইলেন এবং সেই কারণে দেবসেনার সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয় এবং তাঁর উপাধি হয় 'দেবসেনাপতি'।

তবে মহাভারতের অন্য জায়গায় ইন্দ্রের বৈদিক মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখে বলা হয়েছে—তিনি ব্রাহ্মণের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জ্ঞাতিভাই, যাঁরা অসুর-দানব ছিলেন, তাঁদের অন্তত নিরানব্বই জনকে তিনি বধ করতে পেরেছিলেন বলে যে যশ এবং মাহাত্ম্য তিনি লাভ করেছিলেন, তার ফলেই তিনি ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন—

ইন্দ্রো বৈ ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ঃ কর্ম্মণাভবৎ।
জ্ঞাতীনাং পাপবৃত্তীনাং জঘান নবতীর্নব॥
তচ্চাস্য কর্ম্ম পূজ্যঞ্চ প্রশস্যঞ্চ বিশাংপতে।
তেনেন্দ্রত্বং সমাপেদে দেবানামিতি নঃ শ্রুতম্॥

[মহা (k) ১২.১২২.২৬-২৭; ৩.২০১.১৮; ৩.২২৯.৭-২০; ১২.২২.১১-১২; (হরি) ১২.১১৯.২৬-২৭; ৩.১৭১.১৮; ৩.১৯১.৮-২১; ১২.২২.১১-১২; ঋগ্‌বেদ ১০.১২৫.১]

☐ ইন্দ্রের জীবন এবং জন্ম-কর্ম নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে মহাভারতে পরিষ্কার ইন্দ্রকে অদিতির পুত্র বলা হয়েছে। অর্থাৎ দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে যে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়, তাঁদের মধ্যে ইন্দ্র (যাঁর অন্য নাম শক্র) হলেন প্রধান—

* দ্বাদশৈবাদিতেঃ পুত্রাঃ শক্রমুখ্যা নরাধিপঃ।
* অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যাঃ সম্ভূতা ভুবনেশ্বরাঃ।
ধাতা মিত্রো'র্য্যমা শক্রো বরুণস্ত্বংশ এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পুষা চ সবিতা দশমস্তথা॥
একাদশস্তথা ত্বষ্টা দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে॥

বেদে দু-দুটি পূর্ণ সূক্ত ইন্দ্রের জন্মরহস্যে ব্যয়িত হয়েছে। তার এক জায়গায় বলা হয়েছে—তোমার মাতা যুবতী অদিতি তোমার প্রসিদ্ধ পিতার গৃহে স্তন্যদানের পূর্বে তোমায় সোমদান করেছিলেন। অন্য একটি মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে—ইন্দ্র অন্যদের মতো সাধারণভাবে মাতৃযোনির পথে জন্মলাভ করতে চাইছেন না তিনি মাতৃগর্ভের পার্শ্বভেদ করে বহির্গত হতে চাইছেন—

নাহমতো নিরয়া দুর্গহৈতত্তিরশ্চতা পার্শ্বান্নির্গমাণি।

এখানে Macdonell মন্তব্য করেছেন—Once he is represented as wishing to be born in an unnatural way through the side of his mother. This trait may possibly be derived from the notion of lightning breaking from the side of the storm-cloud. বেদে ইন্দ্রকে একবার নিষ্টিগ্রীর পুত্র বলা হয়েছে, যদিও সায়ন তাঁকে অদিতি বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে আবার ইন্দ্রের মায়ের নাম একাষ্টকা। তিনি ঘোর তপস্যা করে মহিমান্বিত ইন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করেন—

একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা/
জজান গর্ভে মহিমানমিন্দ্রম্।

তবে পণ্ডিতজনেরা বলেছেন—মাঘ মাসের অষ্টমীতিথির নাম একাষ্টকা। সেই দিক থেকে অর্থ করলে অষ্টকাকর্মের সঙ্গেই ইন্দ্র এখানে যুক্ত হয়েছেন। *[মহা (k) ১.৬৫.১৩-১৬; ১.৬৬.৩৬; (হরি) ১.৬০.১৩-১৬; ১.৬১.৩৬; ঋগ্বেদ ১০.৬৫.১; ১০.৬৬.৩-৪; ১০.১০০.১-১১; ৩.৪৮.২-৩; ৪.১৮.২-৪; A.A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 56; ঋগ্বেদ ১০.১০১.১; অথর্ববেদ (Roth & Whitney) ৩.১০.১২]*

☐ মহাভারতে ইন্দ্রকে সরাসরি ব্রহ্মার পুত্র (ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ) বলা হলেও ব্রহ্মা যেহেতু সৃষ্টির তপস্যায় বসেও নিজে সরাসরি সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মন না দিয়ে তাঁর মানস পুত্রদের মাধ্যমেই প্রজাসৃষ্টি বা প্রাণী সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তাতে বুঝি ব্রহ্মার মানস পুত্র ছিলেন মরীচি। মরীচির পুত্র কশ্যপকেই এখানে ব্রহ্মা বলা হয়েছে এবং কশ্যপকে বহু সময়েই 'প্রজাপতি' নামে সম্বোধন করায় ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর একাত্মতাও তৈরী হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে অবশ্য সোজাসুজি বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র, অগ্নি, সোম—এঁরা সব প্রজাপতির পুত্র। আর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি অন্যান্য সৃষ্টির শেষে ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছিলেন, অথচ সেই অনুজ ইন্দ্রকেই তিনি দেবতাদের অধিপতি করে দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১২.২২.১১-১২; (হরি) ১২.২২.১১-১২; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.১.৬.১৪; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ২.২.১০.১, পৃ. ৪২৬]

☐ ঋগ্বেদের দুটি-তিনটি সূক্তে ইন্দ্রের পত্নী হিসেবে আমরা ইন্দ্রাণীর নাম পাই এবং তাও একবার দুবার মাত্র, যদিও ইন্দ্রাণী এখানে যতটা ইন্দ্রপত্নীর নাম, তার চেয়ে তিনি অনেক বেশী ইন্দ্রশব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ; কেননা ওই মন্ত্রে ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বরুণের স্ত্রী বরুণানী এবং অগ্নির স্ত্রীলিঙ্গে তাঁর স্ত্রী হিসেবে অগ্নায়ীর নাম উল্লেখ হচ্ছে—

ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ী সোমপীতয়ে,

অন্য একটি বিখ্যাত সূক্তে ইন্দ্রাণীকে সকল রমণীর মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী বলা হচ্ছে, কেননা তাঁর স্বামী ইন্দ্র অন্যান্য ব্যক্তির মতো জরাগ্রস্ত হয়ে মারা যান না—

ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহশ্রবম্।
নহ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতিঃ
বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥

অন্যত্র ইন্দ্রের পত্নী হিসেবেই স্ত্রীলিঙ্গে ইন্দ্রাণী বলা হচ্ছে অন্যান্য দেবপত্নী অগ্নায়ী, অশ্বিনী, বরুণানীর মতো—

উত গ্না ব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্যগ্নায্যশ্বিনী রাট্।

[ঋগ্বেদ ১.২২.১২; ১০.৮৬.১১-১২; ৫.৪৬.৮]

ইন্দ্র কীভাবে ইন্দ্রাণীর অধিকার লাভ করলেন, এই প্রসঙ্গে পৌরাণিক অভিধানকারেরা একবাক্যে লেখেন—

The Taittiriya Brāhmana states that he chose Indrānī to be his wife in preference to other goddesses because of her voluptuous attractions, and later authorities say that he ravished her, and slew her father, the Daitya Puloman, to escape his curse.

ইন্দ্রাণীবিষয়ক এই অংশটি অন্যান্য আভিধানিকেরা—যাঁরা ইংরেজিতে লিখেছেন, তাঁরা কে কার লেখা থেকে আত্মসাৎ করেছেন, তা বলা খুব মুশকিল, কিন্তু কথাটা যেভাবে তাঁরা লিখেছেন, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তেমনটি নেই। এখানে বলা আছে—ইন্দ্রাণী দেবী অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী রমণী এবং তিনি ইন্দ্রের উপযুক্তা স্ত্রীও বটে। ইন্দ্রকে তিনি যেভাবে লাভ করেছিলেন সেখানে তাঁর প্রতিযোগিনী রমণীরা কম ছিলেন না। তাঁদের সবাইকে তিনি রূপে-গুণে হারিয়ে দিয়ে ইন্দ্রকে লাভ করেছিলেন এবং ইন্দ্রকে তিনি ধারণ করে আছেন—

ইন্দ্রাণী দেবী সুভগা সুপত্নী।
উদংশেন পতিবিদ্যে জিগায়॥
ত্রিশদস্যা জঘনং যোজনানি।
উপস্থ ইন্দ্রং স্থবিরং বিভর্তি॥

শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রাণীকে ইন্দ্রের প্রিয়া পত্নী হিসেবে পাচ্ছি, কিন্তু পুলোমা-দানবের কন্যা হিসেবে কোনো পরিচয় এখানেও নেই—

ইন্দ্রাণী হ বা ইন্দ্রস্য প্রিয়া পত্নী।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের পত্নীর নাম প্রাসহা। তবে তিনি বাবাতা অর্থাৎ বৈশ্যা শূদ্রজাতীয়া কোনো পত্নী। তিনি ইন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী ইন্দ্রাণী নাও হতে পারেন—

সেনা বা ইন্দ্রস্য প্রিয়া জায়া বাবাতা প্রাসহা নাম।

নিরুক্তকার যাস্ক ইন্দ্রাণী শব্দের অর্থে বলেছেন—ইন্দ্রাণী হলেন ইন্দ্রের পত্নী—ইন্দ্রাণী ইন্দ্রস্য পত্নী। ব্যাখ্যাকারদের মতে ইন্দ্রাণী ইন্দ্রেরই বিভূতি। তিনি ইন্দ্রের মাধ্যমিকা দেবতা।

এরকম একটা প্রায়ই প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্র জামাই হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শ্বশুরকে মেরে ফেলেছিলেন। এই কথার বীজটুকু নিহিত আছে শৌনকের লেখা বৃহদ্দেবতায়। একথা বলা হয়েছে—ইন্দ্র পুং নামক এক দানবের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে কামনা করেছিলেন কিন্তু তা করেছিলেন ওই দানবটিকে বধ করার জন্যই—

স হি তাং কাময়ামাস দানবীং পাকশাসনঃ।
জ্যেষ্ঠাং স্বসারং পুংসশ্চ তস্যৈব বধকাম্যয়া॥

[John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, pp. 125-126; Subodh Kapor, A Dictionary of Hinduism, p. 174;
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ২.৪.২.৭, পৃ. ৪৯০;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১৪.২.১.৮, পৃ. ১০৩৩;
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ১২.১১.২২, পৃ. ৩৪৪;
নিরুক্ত (ক্ষেমরাজ-শ্রীকৃষ্ণদাস) ১১.২.৩৭, পৃ. ৮০৬-৮০৭, ৮৬৭;
বৃহদ্দেবতা (B.J. Series), ৬.৭৭.পৃ. ১৭১]

☐ সম্ভবত বৃহদ্দেবতার ওই দানবী কন্যা এবং পুং-নামক দানবের মধ্যেই পরবর্তীকালীন মহাকাব্য-পুরাণে উচ্চারিত পুলোমা (পুলোমন্) রাক্ষসের নাম এবং তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রের জামাতৃ-সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৃহদ্দেবতায় পুলোমার পরিবর্তে সংক্ষিপ্তভাবে 'পুং' বলা হয়েছে কিনা জানিনা, কিন্তু মহাকাব্য-পুরাণে পুলোমার কাহিনী খুব বিস্তারিত ভাবে কোথাও বলা নেই, কিন্তু ইঙ্গিত আছে। হরিবংশ পুরাণে বলা হয়েছে যে, শত্রুর সঙ্গে যদি আত্মীয় সম্বন্ধও তৈরি হয়, তবু তাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এই যে দেবরাজ ইন্দ্র তিনি পুলোমা রাক্ষসের জামাই হওয়া সত্ত্বেও শ্বশুর পুলোমাকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করেননি—

কৃত্বা সম্বন্ধকং চাপি বিশ্বসেচ্ছত্রুণা ন হি।
পুলোমানং জঘানাজৌ জামাতা সন্ শতক্রতুঃ॥

মাত্র একটি পংক্তির মধ্যে ইন্দ্রের শ্বশুর-হত্যার যে তথ্যটি পাওয়া গেল, তার বিস্তারিত কার্যকারণ-সমন্বিত কাহিনী আমরা অন্য কোথাও পাইনি। তবে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অন্য ঘটনা-প্রসঙ্গে ইন্দ্রাণীর পিতা পুলোমার কথা এসেছে এবং সেখানে রামচন্দ্র দুই জন দানব-বীরের উদাহরণ দিয়ে সুগ্রীবকে বলেছেন—রাক্ষসাধম রাবণ আত্মবিনাশের জন্য মৈথিলী সীতাকে হরণ করেছে। অনুহ্লাদ নামে সেই বিখ্যাত দৈত্য যেমন পুলোমার কন্যা পৌলোমী শচীকে বঞ্চনা করে হরণ করার ফলে নিজেই মরেছিল, তেমনই সীতাকে বঞ্চনা করেছে মারীচ। মারীচকে তো আমি মেরেই ফেলেছি, কিন্তু রাক্ষস রাবণকেও আমি অচিরেই হত্যা করবো, ঠিক যেমন পৌলোমী শচীর পিতা পুলোমাকে হত্যা করেছিলেন স্বয়ং ইন্দ্র—

জহারাত্মবিনাশায় মৈথিলীং রাক্ষসাধমঃ।
বঞ্চয়িত্বা তু পৌলোমীমনুহ্লাদো যথা শচীম্॥
ন চিরাত্তং বধিষ্যামি রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
পৌলম্যাঃ পিতরং দৃপ্তং শতক্রতুরিবারিহা॥

রামায়ণের এই অংশটির ওপরে প্রসিদ্ধ টীকাকারেরা 'পৌরাণিকী প্রসিদ্ধিঃ' অথবা 'পৌরাণিকী কথা' বলে যা জানিয়েছেন, তাতে আমরা বুঝি যে, দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমা নামে এক দানবের কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে কামনা করতে থাকেন। দানব পুলোমা এই কামনার কথা জানতে পেরে ইন্দ্রকে সামনা সামনি প্রত্যাখ্যান করলেন না বটে, কিন্তু একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। অনুহ্লাদ নামে এক দৈত্য পৌলোমীকে পছন্দ করতেন এবং তিনি পুলোমাকে হাত করে তাঁর অনুমতি নিয়েই পৌলোমীকে হরণ করে নিলেন। ইন্দ্র সব জানতে পারলেন। তিনি অনুহ্লাদকেও হত্যা করলেন এবং হরণের ব্যাপারে মদতদাতা পুলোমা দানবকেও মেরে ফেললেন। *[হরিবংশ পু. ১.২০.১৩৩; রামায়ণ ৪.৩৯.৬; তিলক রামায়ণ-শিরোমণি এবং রামায়ণ ভূষণ টীকা দ্রষ্টব্য]*

☐ মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণগুলিতে ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী। অন্যান্য দেবতার স্ত্রীরা যেমন স্ত্রীলিঙ্গে বরুণানী, অগ্নায়ী কিংবা অশ্বিনী, সেখানে ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণীর অন্য একটি নাম আছে, এটা দেবরাজের গৌরব। তবে মহাকাব্য-পুরাণের অনেক আগেই ঋগ্‌বেদে তথা

অথর্ববেদে ইন্দ্রকে শচীপতি বলা হয়েছে এবং ইন্দ্রপত্নীর শচী নামটি থেকেই পরবর্তীকালের মহাকাব্য-পুরাণে ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী যেন পৃথক সত্তায় শচী নামে বিখ্যাত হয়েছেন। ঋগ্বেদে বলা হচ্ছে—কূপের মধ্যে পড়ে যাওয়া কুৎস ঋষি বৃত্রহন্তা শচীপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করছে—

ইন্দ্র কুৎসো বৃত্রহণং শচীপতিং/
কাটে নিবাড়্হ ঋষিরহ্বদূতয়ে।

আর অথর্ববেদে বেশ কয়েকবার ইন্দ্রের বদলে শচীপতি বলেই সম্বোধন করা হচ্ছে ইন্দ্রকে। অথর্ববেদে অবশ্য এই ইঙ্গিতটাও খুব স্পষ্ট, যখন বলা হয় যে, দাস-দস্যুদের মতো শত্রুদের হত্যা করেই তবে তিনি প্রকৃতপক্ষে শচীপতি হয়ে উঠলেন—

হন্তা দস্যূনাম্ অভবচ্ছচীপতিঃ।

এখানে 'শচী'—শব্দের অর্থ শক্তি, সায়নাচার্য যদিও বলেছেন—শচী হল কর্মের পর্যায়শব্দ—'শচীতি কর্ম-নাম'—কিন্তু আমাদের ধারণা—'শক্' ধাতুর অর্থ 'পারা' বা 'সম্পূর্ণ সক্ষম হয়ে ওঠা' এবং এই ধাতু অনুসারেই ইন্দ্রের বিখ্যাত নামই হল 'শক্র'। ঠিক এই দৃষ্টিতে পণ্ডিতজনেরা শচী-শব্দের অর্থ করেছেন শক্তি। শক্তি যাঁর আছে, তিনি যেমন মতুপ্ প্রত্যয়ে শক্তিমান্ ঠিক একই ভাবে 'শচী' যাঁর আছে 'শচীবান্' অর্থাৎ শক্তিমান্। Macdonell লিখেছেন—Indra bears several characteristic attributes expressive of power. *Śakra* 'mighty' applies to Indra about 40 times and only about five times to other gods. *Śacīvat*, 'possessed of might' describes Indra some fifteen times and other deities only twice. The epithet *śacīpati* 'lord of might', occurring eleven times in the RV. belongs to Indra with only one exception (7, 67.5), when the Aśvins as 'lords of might' are besought to strengthen their worshippers with might (*śacībhiḥ*). In one of these passages (10, 24.2) Indra is pleonastically invoked as 'mighty lord of might' (*śacipate śacīnām*). This epithet survives in post-Vedic literature as a designation of Indra in the sense of 'husband of Śacī' (a sense claimed for it by Pischel even in the RV.).

পণ্ডিত-গবেষকদের এটাই বক্তব্য যে, শচীর স্বামী এই অর্থে শচীদেবীও খ্যাত ছিলেন না, ইন্দ্র তো ননই। বেদে শচী-শব্দ শক্তি অথবা কর্ম অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় বলা হল—

যৎ সুরামংব্যপিবঃ শচীভিঃ
সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্।

এখানে অনেক 'শচীর' মাধ্যমে ইন্দ্র সুরা পান করেছিলেন—এর মানে তো এমন হতে পারে না যে, শচী মানে ইন্দ্রপত্নী। টীকাকার মহীধর পর্যন্ত এখানে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—যে শচী বা শক্তিতে ইন্দ্র সুরাপান করেন সেই শচী বা শক্তিতেই ইন্দ্র নমুচি ইত্যাদি দানব বধ করেন।

একই ভাবে অন্যান্য বহু ঋক্মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শচী শব্দের অর্থ কর্ম বা শক্তি ছাড়া অন্য কিছু হয়ই না। বিশেষত কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রায় অথর্ববেদের অনুরূপ একটি মন্ত্রে ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—তিনি শক্তির দ্বারাই অসুরদের মারতে পেরেছিলেন—

হন্তাসুরাণামভবচ্ছচীভিঃ—

এখানে শক্তি ছাড়া শচীর কোনো অন্য অর্থ হয় না, ঠিক যেমন ঐতরেয় আরণ্যকে—ইন্দ্র! তুমি আপন শক্তিতে নদীর মতো এই যজ্ঞভূমিতে এসো—

ইন্দ্র নদীব এদিহি প্রসৃতিরা শচীভিঃ—

দুই জায়গাতেই টীকাকারেরা অর্থ করেছেন—শচীর দ্বারা অর্থাৎ শক্তির দ্বারা—শচীভিঃ শক্তিভিঃ। এই সব বৈদিক শব্দপ্রমাণগুলির মধ্যে ইন্দ্রের স্ত্রী হিসেবে শচী-শব্দের কোনো তাৎপর্য্য খুঁজে পাওয়া যায় না। শচী মানেই শক্তি, কমক্ষমতা, যার জন্য ইন্দ্র শচীপতি এবং শক্র।

[ঋগ্বেদ ১.১০৬.৬; অথর্ববেদ (Roth & Whitney) ৩.১০.১২; A.A. Macdonell, Vedic Mythology. p. 58; শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা (Chowkhamba Sans. Series) ১০.৩৪; কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৪.৩.১১.৩, পৃ. ১৮৮৯; ঐতরেয় আরণ্যক (আনন্দাশ্রম) ১.২.১.৫, পৃ. ১৯]

□ তবে শক্তি এবং শক্তিমানের তত্ত্বের মধ্যে

ভারতীয় ঈশ্বর-ভাবনার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বও একভাবে শক্তি এবং শক্তিমানের তত্ত্বই। ফলত শক্তিমান শক্রের শক্তিই শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর একান্ত নাম হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রের প্রিয়তমা সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে শচীর নাম মহাভারত-পুরাণে একটি উপমার স্থল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেখানেও স্বামী হিসেবে ইন্দ্র-শক্রের প্রধান গুণ যে শক্তি, শচীকে তার প্রতিরূপিণী ভাবা হয়েছে মহাভারতে—

* সদৃশীং প্রতিরূপস্য বাসবস্য শচীমিব।

* সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ সাধ্বী কৌশিকস্য শচী সতী।

সার্থক এক প্রেমিকা এবং সতী-সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে শচী সতীত্বের উদাহরণ হয়ে উঠেছেন মহাকাব্য-পুরাণে। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহের পর—ইন্দ্রাণী-শচীর ইন্দ্রের প্রতি যে নিষ্ঠা, অগ্নির প্রতি স্বাহা দেবীর যে নিষ্ঠা—সেই রকম যেন পাণ্ডবদের প্রতি নিষ্ঠা হয়, এই শুভৈষণায় দ্রৌপদীকে আশীর্বাদ করেছিলেন কুন্তী—

যথেন্দ্রাণী হরিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ।

তাতে বুঝি ইন্দ্রের মতো শচীও একটা দেবীত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, মহাকাব্য-পুরাণের কালে ইন্দ্রের নামটা স্বর্গাধিপতির প্রতীক হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইন্দ্রের নাম একটা উপাধি হয়ে উঠেছে, স্বর্গলোকে যিনি শেষ পর্যন্ত রাজা হবেন, তাঁরই উপাধি হবে ইন্দ্র। পুরাণে মন্বন্তর-পর্যায়গুলিতে দেখা যাবে—এক এক মন্বন্তরে এক এক ইন্দ্র। দৈত্য-দানবদের মধ্যেও ইন্দ্র-পদ লাভ করেছেন এমন উদাহরণ আছে মহাভারত-পুরাণে। আর এই যে ইন্দ্রপদ খালি থাকা সত্ত্বেও দেবতারা কেউ ইন্দ্রপদ নিতে রাজি হচ্ছেন, না এর তো রীতিমতো লৌকিক কারণ আছে। রাজত্ব চালাতে গেলে রাজ্যের উন্নতি এবং রাজ্যের সুরক্ষা নিয়ে রাজাকে চিন্তা করতেই হবে। ঋষিরা, মুনিরা সব সময়েই দেবতাদের সহায়, এখন তার মধ্যে যদি কেউ ব্যক্তি-ইন্দ্রের ওপর রাগ করে তার ইন্দ্র-পদের দিকে নজর দেন, তবে স্বর্গের রাজা হিসেবে প্রতিরোধ তো করতেই হবে। এই ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেল, এই ঋষি রাগ করে অভিশাপ দিচ্ছেন, অমুকে এসে উর্বশীর দিকে তাকাচ্ছেন—এই সব প্রতিরোধের জায়গায় রাজা হিসেবে ইন্দ্রকে তো ব্যবস্থা কিছু নিতেই হবে, সেখানে যদি ব্যক্তিগত হেনস্থা হতে থাকে, রাজাকেই যদি বারবার দোষারোপ করা হয়, তাহলে দেবতারাও ইন্দ্র হতে চাইবেন না। আমাদের লৌকিক জগতেও এমনটা হয়। এখন অনেক বড়ো মানুষই বড়ো ওপরওয়ালার হেনস্থার ভয়ে ব্যাংক ম্যানেজার হতে চান না, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হতে চান না, উপাচার্য হতে চান না, এমনকী সরকারি কর্মে ডিরেক্টরও হতে চান না। স্বর্গলোকেও সেই অবস্থা হল। কোনো দেবতাই আর রাজা হতে চাইলেন না।

ঋষিদের এবং দেবতাদের এবার চোখ পড়ল মর্ত্য রাজা নহুষের ওপর। অনেককাল ধরে তিনি সফলভাবে রাজ্য চালাচ্ছেন মর্ত্যলোকে। তিনি তেজস্বী, যশস্বী এবং ধার্মিক পুরুষ। রাজলক্ষ্মী তাঁর ঘরে বন্দিনী হয়ে আছেন স্বেচ্ছায়। সকলে এবার চাইলেন—নহুষই রাজা হোন দেবতাদের রাজ্যে—

অয়ং বৈ নহুষঃ শ্রীমান্ দেবরাজ্যে' ভিষিচ্যতাম্।

তাঁরা সবাই নহুষের কাছে গিয়ে বললেন, আমাদের স্বর্গলোকে রাজা হতে হবে আপনাকে। নহুষ তাঁদের সব কথা শুনে সবিনয়ে বললেন, দেখুন, আমি দুর্বল মানুষ। আপনাদের মতো এত উচ্চস্তরের মানুষদের পালন করার শক্তি আমার নেই—

দুর্বলো'হং ন মে শক্তির্ভবতাং পরিপালনে।

স্বর্গে রাজা হওয়ার জন্য সেইরকম বলবান লোকের দরকার, ইন্দ্রের সেই বল ছিল, তিনি পেরেছেন। কিন্তু আমি পারব না। দেবতারা এবং ঋষিরা বললেন, আমরা আমাদের তপস্যার ফল দিয়ে সমৃদ্ধ করব আপনাকে। আপনি সেই বলে বলীয়ান হয়ে স্বর্গরাজ্য পালন করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খুব সমীচীন একটা সমস্যার কথা দেবতা-ঋষিরা বলেছিলেন নহুষের কাছে। এই সমস্যা তৈরি হয় রাজনৈতিক প্রশাসনের অভাবে অথবা দুর্বলতায়। সমস্যাটা মাৎস্য-ন্যায়ের, সমস্যাটা প্রত্যেকের নিজেকে বড়ো করে দেখার। প্রশাসনের ভয় না থাকলে বলবত্তর মানুষ দুর্বলতরকে গ্রাস করে। ঋষিরা-দেবতারা বলেছেন, আমাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর পীড়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেছে—

পরস্পরভয়ং ঘোরম্ অস্মাকং হি ন সংশয়ঃ।

দেবতা-ঋষিরা বললেন, পরস্পরের এই স্বার্থান্ধ অবস্থা তো চলতে পারে না। আপনি নহুষ, রাজা হোন এই স্বর্গরাজ্যে—

অভিষিচ্যস্ব রাজেন্দ্র ভব রাজা ত্রিপিষ্টপে।

আর শক্তিলাভের ব্যাপারে আপনাকে বলি, আপনি দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস— যাঁর দিকে একবার তাকাবেন, তাঁরই তেজ আপনি গ্রহণ করতে পারবেন এবং তাতেই আপনি বলবান হবেন সকলের চেয়ে বেশি। ঋষিদের এই যুক্তি থেকে বুঝি যে, দেবতা-দানব, যক্ষ-রাক্ষস—সকলেই আসলে নহুষের কর্তৃত্ব-ব্যক্তিত্ব মেনে নেবেন বলেই ঋষিদের এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে, তিনি এঁদের সকলের তেজ হরণ করতে পারবেন—

তেজ আদাস্যসে পশ্যন্ বলবাংশ্চ ভবিষ্যসি।

ঋষি এবং দেবতাদের এত অনুনয়-বিনয় শুনে নহুষ শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করতে।

নহুষ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হয়ে বসলেন। পূর্বে যিনি ইন্দ্র ছিলেন তিনি তো ত্বষ্টা প্রজাপতির ভয়ে লুকিয়ে আছেন সমুদ্রের জলে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী শচী তো তখনও রয়ে গেছেন স্বর্গলোকে, স্বামীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়। এদিকে স্বর্গরাজ্যের অধিকার পাবার পর নহুষের চরিত্রের অবনতি ঘটল। তিনি নানান কামনায় অধীর হয়ে উঠলেন। নহুষের মাত্রাছাড়া অমোদ-প্রমোদ যেহেতু তাঁকে সব সময় এদিক-ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাই হঠাৎই একদিন প্রাক্তন ইন্দ্রের প্রিয় মহিষী নহুষের চোখে পড়ে গেলেন। ইন্দ্রাণী শচী এক সুন্দরীতমা রমণী—তাঁকে দেখে নহুষের মতো এক সর্বগ্রাসী কামুক পুরুষ মোহিত হবেন, এতে আশ্চর্য কিছু ছিল না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি—নহুষের মনের মধ্যে সেই রাজনৈতিক শক্তি-ক্ষমতার সূত্র কাজ করছে। তাঁর মনে হচ্ছে—ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্রাণী শচীর তো তাঁরই কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকার কথা। তা এতদিন তিনি এইভাবে আমাকে সেবা না করে ঘরে বসে থাকছেন কোন সাহসে'—

ইন্দ্রস্য মহিষী দেবী কস্মান্ মাং নোপতিষ্ঠতি?

এই ঘটনার মানে দাঁড়ায় ইন্দ্র যেমন স্বর্গরাজ্যের অধিপতির উপাধি, তেমনই ইন্দ্রের স্ত্রী যিনি হবেন, তাঁরও বোধহয় ইন্দ্রাণী শচী হওয়া উচিত। তাতে কিন্তু শচী-শব্দের মধ্যে ইন্দ্রশক্তির সেই প্রতীকী তাৎপর্য্যটুকুই বেশী সপ্রমাণ হয়ে ওঠে, কিন্তু অন্যদিকে শচীর মানবী কল্পনা তাঁকে অন্য রূপবতী রমণীর সমান করে তোলে, যিনি ইন্দ্রের মতো স্বামীর অনুপস্থিতিতে ভীষণই বিচলিত এবং অন্য পুরুষের ভয়ে উদ্বেলিত।

[মহা (k) ৫.১০৪.৯; ১৩.১৪৬.৪; ১.১৯৯.৫-৬;
৫.১০.৪৩-৫০; ৫.১১.১-১৮;
(হরি) ৫.৯৭.১০; ১৩.১২৪.৫; ১.১৯২.৫-৬;
৫.১০.৪৩-৫০; ৫.১১.১-১৮]

□ আমরা বোঝাতে চাইছি, বৈদিক মন্ত্রগুলিতে ইন্দ্রের পত্নী শচীর মধ্যেও যেমন তাঁর শক্তির প্রাচুর্য্য ফুটে ওঠে, মহাকাব্যের কালে সেই শচী কিন্তু অনেকটাই মোহময়ী এক স্বর্গীয় রমণীর স্বরূপ লাভ করেছেন, যেখানে ইন্দ্রের শক্তিমত্তার চেয়েও এক সতী-সাধ্বী পতিব্রতা নারীর প্রমুখ সত্তায় বিরাজ করছেন শচী। একইভাবে বৈদিককালে ইন্দ্রের অন্য যেসব শক্তি প্রকাশক নাম আছে, সেগুলিরও অবনমন ঘটেছে মহাকাব্য-পুরাণের কালে।

বেদ-ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের একটি বিখ্যাত নাম শতক্রতু, যার সাধারণ অর্থ ইন্দ্র একশটি বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু বৈদিক দেবতার এই বৈদিক নামটি যদি বৈদিকভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে বলতে হবে যে, বেদ-ব্রাহ্মণের কালে ক্রতু শব্দের অর্থ যজ্ঞ ছিল না। প্রথমত ক্রতু শব্দের অর্থ ছিল কর্ম যেটা সেই বিখ্যাত ইন্দ্রসূক্তের প্রথম ঋকমন্ত্র থেকেই প্রমাণ হয়। এখানে বলা হয়েছে—যিনি জন্মমাত্রেই দেবতাদের প্রধান এবং তিনি তাঁর বীরকর্মের দ্বারা সমস্ত দেবতাদের অতিক্রম করেছিলেন—

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।

এখানে ক্রতু শব্দের অর্থ যদি কর্ম হয়, তাহলে ইন্দ্রের শতক্রতু নামের অর্থ দাঁড়ায়—ইন্দ্র শত শত বীরকর্ম করেই তবে শতক্রতু উপাধি অর্জন করেছেন। ঋগ্‌বেদ-অথর্ববেদের বহু জায়গায় যেখানে-যেখানে ইন্দ্রকে 'শতক্রতু' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, প্রায় সর্বত্রই সে-সব জায়গায় বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠীর যুদ্ধে যাওয়া অথবা যুদ্ধে জয়লাভের আশংসা যুক্ত হয়েছে—

* উধ্বস্তিষ্ঠা ন উতয়ে'স্মিন্ বাজে শতক্রতো
*[হে শতক্রতু! এই সংগ্রামে আমাদের
রক্ষার জন্য উৎসুক হও]*
* যুক্তন্তে অস্তু দক্ষিণ উত সব্যঃ শতক্রতো
*[হে শতক্রতু! তোমার রথের ডান পাশ এবং
বাঁপাশের অশ্বগুলি সুযুক্ত হোক]*
* অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেসু বাজিনম্॥
*[হে শতক্রতু! এই সোমপান করে তুমি
বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদের হনন করেছিলে,
তুমি যুদ্ধে যোদ্ধাদের রক্ষা করেছিলে।]*
[ঋগ্‌বেদ ২.১২.১; ১.৩০.৬; ১.৮২.৫; ১.৪.৮]

বেদ-পরবর্তী কালে বহুকর্মকারী এবং বৃহৎকর্মকারী শতক্রতু শব্দ বহু এবং বৃহদ্‌যজ্ঞকারী অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। অর্থাৎ ক্রতু শব্দের অন্য অর্থ যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের বহুসংখ্যকতার মধ্যেই শতক্রতু শব্দের তাৎপর্য্য নিহিত হয়। আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখছি যে, একশটি যজ্ঞ করেই ইন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র হয়েছিলেন—

পুরা শতমখো দর্পাৎ কৃত্বা মখশতং মুদা।
বভূব সর্বদেবানামধ্যক্ষঃ সম্পদা যুতঃ॥

পুরাণের এই মন্তব্যে এমন ভাব বোঝা যায়, ইন্দ্রত্বপদটা কোনো স্থায়ী পদ নয়। যদি কেউ একশটা যজ্ঞ করার ক্ষমতা এবং সৌভাগ্য অর্জন করতেন, তাহলেই তিনি স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র হতে পারতেন। এই ভাবনাটা যে ছিল, সেটা বোঝা যায়—যখন স্বর্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ইন্দ্র সগর রাজার শততম অশ্বমেধ যজ্ঞটি পণ্ড করার চেষ্টা করলেন—যজ্ঞের অশ্ব হরণ করে নিয়ে। সগর রাজা তাঁর গুরু ঔর্ব ঋষির উপদেশে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর শেষ অশ্বমেধের সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞীয় অশ্বটিকে অপহরণ করেন। সগরের এই যজ্ঞ তাঁর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ ছিল কিনা, তা খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু তাঁর এই যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করার পিছনে ইন্দ্রের মধ্যে যে তাঁর আপন রাজত্ব হারানোর ভয় কাজ করছে, তা ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত পৃথু-যজ্ঞের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়। এখানে বলা হয়েছে—সরস্বতী নদী যেখানে পূর্বদিকে অবস্থিত, সেই ব্রহ্মাবর্ত নামক জায়গাটিতে পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কথা ভেবেছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র পৃথুর এই প্রচেষ্টা জানতে পেরে এটাও লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর নিজকৃত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের চেয়েও পৃথুর যজ্ঞ আরও বেশী সমারোহপূর্ণ—

তদভিপ্রেত্য ভগবান্ কর্মাতিশয়মাত্মনঃ।
শতক্রতুর্ন মমৃষে পৃথোর্যজ্ঞ মহোৎসবম্॥

পৃথু তাঁর শেষ শততম অশ্বমেধ যজ্ঞে যখন যজ্ঞাধিপতি বিষ্ণুর উদ্দেশে আহুতি দেবেন, তার আগেই ইন্দ্র পাষণ্ড-বেশ ধারণ করে যজ্ঞীয় অশ্বটি হরণ করে নিলেন—পৃথুর প্রতি অসূয়াবশতই তিনি এই কাজটি করলেন—

অসূয়ন্ ভগবানিন্দ্রঃ প্রতীঘাতমচীকরৎ॥
চরমেণাশ্বমেধেন যজমানে যজুষ্পতিম্।
বৈণ্যে যজ্ঞপশুং স্পর্ধন্নপোবাহ তিরোহিতঃ॥

সগর এবং পৃথু ছাড়াও রামায়ণে খবর পাওয়া যায় যে, দেবরাজ ইন্দ্র ঈর্ষা-অসূয়াবশত ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ অম্বরীষেরও যজ্ঞাশ্ব হরণ করেছিলেন।

*[রামায়ণ ১.৪৯.৬-১০; ১.৬১.৫-৬;
ভাগবত পু. ৯.৮.৪; ৪.১৯.১-১১;
ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (আর্যশাস্ত্র) কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ৪৭.৭]*

□ ইন্দ্রের শতক্রতু বা শতমখ নামটি প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রের শক্তি-ক্ষমতারই অন্যতর এক সংজ্ঞামাত্র। একইভাবে ইন্দ্র যে সোমপান করেন, সেও তাঁর শক্তিবর্ধনের সংকেত। তবে বেদ-ব্রাহ্মণের মধ্যে ইন্দ্রের সোমপান বিষয়ক যত কাহিনী আছে, মহাভারত-পুরাণে এ-বিষয়ে তেমন কোনো উচ্ছ্বাস নেই। কিন্তু বেদের উচ্ছ্বাসটা এখানে ভীষণই। আমরা এটা A. A. Macdonell -এর ভাষায় শোনাই—

Though the gods in general are fond of Smoa, Indra is preëminently addicted to it. He even stole it in order to drink it. He is the one Soma-drinker among gods and men, only Vāyu, his companion, coming near him in this respect. It is his favourite nutriment. The frequent epithet 'Soma-drinker' (*soma-pā, -pāvan*) is characteristic of him, being otherwise only applied a few times to Agni and Bṛhaspati when associated with Indra, and once besides to Vāyu alone.

Soma is sometimes said to stimulate Indra to perform great cosmic actions such as supporting earth and sky or spreading out the earth. But it characteristically exhilerates him to carry out his warlike deeds, the slaughter of the dragon or Vṛtra or the conquest of foes. So essential is Soma to Indra that his mother gave it to him or he drank it on the very day of his birth. For the slaughter of Vṛtra he drank three lakes of Soma, and he is even said to have drunk at a single draught thirty lakes of the beverage. One entire hymn consists of a moologue in which Indra describes his sensations after a draught of Soma. But just as too much Soma is said to produce disease in men, so Indra himself is described as suffering from excessive indulgence is it and having to be cured by the gods with the Sautrāmaṇi ceremony. Indra also drinks milk mixed with honey.

[ঋগ্‌বেদ ৮.২.১৮; ৮.৪৮.১১; ১.১০৪.৯; ৩.৪৮.১-৩; ৮.৪.৪; ২.১৫.১-২; ২.১৯.২; ৬.৪৭.১-২; ৩.৪৮.১-৩; ৩.৩২.৯-১০; ৫.২৯.৬-৭; ৬.১৭.১১; ৮.৬৬.৪; ১০.১১৯ সূক্ত; A.A. Macdonell, Vedic Mythology, p. 56]

☐ মহাভারতে ইন্দ্রের এই সোমপানের উচ্ছ্বাস খুব পরিশীলিত ভাবে বলা আছে এবং এই সোমপান প্রধানত সোমযাগের সোমাহুতি মাত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির যখন রাজা হতে চাইছেন না, তখন ভীষ্ম তাঁকে রাজ্য গ্রহণ করার উপদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো যজ্ঞে ইন্দ্রকে সোমপান দিয়ে তৃপ্ত করতে বলেছেন—

ইন্দ্রং সোমেন তর্পয়।

অন্যত্র অঙ্গ নামে এক বিখ্যাত রাজার একশটা যজ্ঞে ইন্দ্র সোমপান করে তৃপ্ত হয়েছিলেন, এই সংবাদ আমরা পাচ্ছি—

অমাদ্যদ্ ইন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
যস্য যজ্ঞেষু রাজেন্দ্র শতসংখ্যেষু বৈ পুরা॥

[মহা (k) ১২.৭১.৩৩; ১২.২৯.৩৬; (হরি) ১২.৬৯.৩৩; ১২.২৯.৩৪-৩৫]

☐ লক্ষণীয়, এখানেও যজ্ঞের সংখ্যা একশ এবং সেই একশ যজ্ঞে যজমানের দেওয়া সোমাহুতিই কিন্তু ইন্দ্রকে আমোদিত করছে। বেদের মধ্যে ইন্দ্রের সোমপানের যে আতিশয্য দেখতে পাই, সেটা যে আদতে তাঁর প্রতি সোমাহুতির আতিশয্য সেটা প্রমাণ হয় তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের একটি মন্তব্য থেকে। এখানে বলা হচ্ছে—পুরাকালে বৃত্রাসুরকে বধ করার পর ইন্দ্রের তেজ কমে গিয়েছিল। দেবতারা তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা পাপের প্রতিকার হিসেবে অনেক যজ্ঞ করলেন। কিন্তু তাতেও কোনো প্রতিকার হল না, তখন তাঁরা ইন্দ্রের উদ্দেশে তীব্র সোম প্রদান করলেন—

দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তমৈচ্ছংস্তং ন কিঞ্চন
অধিনোৎ তং তীব্রং সোম এবাধিনোৎ।

মহাভারতের মধ্যে এই সোমাহুতির প্রসঙ্গটাই ইন্দ্রের অতিরিক্ত সোমপানের তাৎপর্যটুকু ব্যাখ্যা করে দেয়। *[তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ১৮.৫.২]*

ইন্দ্রপত্নীর শচী নামটি থেকে শতক্রতু নাম এবং তার সঙ্গে তাঁর সোমপান—এই সমস্ত কিছুই কিন্তু ইন্দ্রের বলাধিক্য এবং শক্তিমত্তার সূচক—যা মহাভারত-রামায়ণে খানিক ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত। অথচ বেদে সেই শক্তির কথা সোচ্ছ্বাসে বর্ণিত হয়েছে। আর ইন্দ্রের এত শক্তি এবং এত রাজকীয় ক্ষমতা, সবটাই কিন্তু অসুর-দানবদের উৎখাত করে দেবতাদের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে ইন্দ্রের এই শক্তিমত্তা কিন্তু অনেকাংশেই অন্য দেব-নির্ভর। বিশেষত বিষ্ণু এবং শিব সেখানে বড়ো একটা নির্ভরতা।

যে বৃত্রসংহার বেদের মধ্যে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি, যাঁকে বধ করার জন্য দধীচির আত্মবিসর্জন এবং বজ্র-নির্মাণ, সেই বজ্রী ইন্দ্র কিন্তু মহাকাব্যে বৃত্রের প্রায় সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। প্রতি তুলনায় বৃত্রের কথা আরম্ভ করলে বলা যায়—ঋগ্‌বেদে প্রায় একটি গোটা সূক্তে ইন্দ্রের বৃত্রবধ-কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে এবং এটি ছাড়াও ইন্দ্রের মহিমাখ্যাপন যেখানেই আছে, সেখানেই কোথাও না কোথাও ইন্দ্রের বীরত্বের প্রতীক হিসেবে বৃত্রবধের উল্লেখ আছে। মন্ত্রবর্ণ বলছে—বৃত্র ছিলেন জগতের আবরণের মতো। ইন্দ্র তাঁকে তাঁর বিধ্বংসী বজ্র দিয়ে বৃত্রের বাহুচ্ছেদন করলেন এবং অবশেষে মেরে ফেললেন। কুঠার দিয়ে কেটে ফেলা বৃষস্কন্ধের মতো অহি পৃথিবী স্পর্শ করে আছে। অত্যন্ত

অহঙ্কারী বৃত্র ভেবেছিলেন তাঁর মতো যোদ্ধা কেউ নেই। সেই অহঙ্কারেই তিনি বহুবিলাসী মহাবীর ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের বিনাশকার্য থেকে সে রক্ষা পেল না। বৃত্র নিজের জীবদ্দশায় নিজের ক্ষমতায় যে নদীস্রোত স্তব্ধ করে রেখেছিল, অহি এখন সেই জলের নীচে শয়ন করে আছে।

এখানে একটি ঋক্‌মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে— বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বজ্রে আহত হবার পর বৃত্রের সঙ্গে তাঁর মাতা দনুও নিহত হয়েছেন। আসলে বৃত্রাসুর আহত হওয়ার পর তাঁর মা দনু বৃত্রকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। দনু তির্যকভাবে বৃত্রের দেহ আবৃত করে শুয়ে পড়েছিলেন যাতে ইন্দ্র বৃত্রের দেহে আঘাত করতে না পারেন। ঋগ্‌বেদের তথ্যটা এইরকম—তখন বৃত্রের মাতা তির্যকভাবে পড়ে থাকলেন। ইন্দ্র তাঁহার অধোভাগে অস্ত্রাঘাত করলেন, তখন মাতা উপরে রইলেন এবং পুত্র রইলেন নীচে। তারপর বৎসের সঙ্গে ধেনুর মতো বৃত্রের মাতা দনুও শুয়ে পড়লেন।

ঋগ্‌বেদে এই সূক্তটির আরম্ভই হয়েছিল ইন্দ্রের শৌর্য্য-বীর্য্য-মহিমা খ্যাপনের উদ্দেশে—

ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্র বোচং/
যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।

কিন্তু এই শৌর্য্য-বীর্য্য-খ্যাপনের প্রধানতম আধার এখানে বৃত্রাসুর, যাকে বার বার 'অহি' নামে সম্বোধন করা হয়েছে ঋগ্‌বেদের বহুমন্ত্রে এবং এখানে তো বটেই। সায়নাচার্য 'অহি' শব্দের অর্থ করেছেন মেঘ—অহিং মেঘম্' আবার নিরুক্তকার যাস্ক 'বৃত্র' শব্দের মানে বলেছেন—মেঘ, তিনি বলেছেন—শব্দের নিরুক্তি করেন যারা, সেই নিরুক্তদের (etymologist) মতে বৃত্র মানে মেঘ। আর ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে ঐতিহাসিকতার উল্লেখ করে যাস্ক বলেছেন—আর ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, বৃত্র হলেন ত্বষ্টার পুত্র। জল-জ্যোতি আর বায়ুর মিশ্রণেই বর্ষণ সম্পন্ন হয়। মেঘের ওপর বিদ্যুতের বজ্রপাতের ঘটনাই বৃত্র আর ইন্দ্রের যুদ্ধরূপকে পরিণত হয়েছে—

তত্র কো বৃত্রঃ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ।
ত্বাষ্ট্রো'সুর ইতৈতিহাসিকাঃ।
অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণো
বর্ষকর্ম জায়তে।
তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি।

বৃত্রের অর্থ মেঘ এবং অহি অর্থও মেঘ এবং পূর্বোক্ত ঋগ্‌বেদের সূক্ত-মধ্যে ধৃত একটি মন্ত্রে বৃত্র এবং অহি এই দুই নাম উচ্চারণ করেই ইন্দ্রের মহিমা কীর্তিত হয়েছে—ভগ্ন কূল অতিক্রম করে নদ যেমন বয়ে চলে, মনোহরণ জল তেমনভাবেই ভগ্ন-পতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে; বৃত্র তাঁর জীবদ্দশায় নিজ মহিমা এবং ক্ষমতায় যে জলকে বন্ধ করে রেখেছিল, অহি এখন সেই জলের নীচে শয়ন করে আছে—

নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং/
মনো রুহাণা অতি যন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিদ্ বৃত্রো মহিনা পর্যতিষ্ঠ/
তাসাম্ অহিঃ পৎসুতঃ শীর্বভূব॥

[ঋগ্‌বেদ ১.৩২.১-১০; নিরুক্ত (ক্ষেমরাজ-কৃষ্ণদাস) ২.১৬.২, পৃ. ১৪৪]

প্রাকৃতিক ভাবনায় যে মেঘ থেকে বৃষ্টির পতন বিঘ্নিত হয়েছে, সেই বৃষ্টি-নিরোধক শক্তিকেই বৃত্র বলেছেন ঐতিহ্যবাহী 'ট্রাডিশনাল' টীকাকারেরা এবং সে মত মেনে নিয়েছেন পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় পণ্ডিতেরাও। মহাভারত-পুরাণে খুব স্বাভাবিক কারণেই ইন্দ্রের বৃত্রসংহার নানা কাহিনীর রূপ ধারণ করেছে কিন্তু বৃত্রের মধ্যে অবরুদ্ধ নদীস্রোত বা অবরুদ্ধ বৃষ্টিহীন মেঘের কল্পনাটা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাবে সর্পজননী কদ্রুকৃত ইন্দ্রস্তুতির মধ্যে এসেছে। কদ্রু ইন্দ্রকেই মেঘ বলে সম্বোধন করে বলেছেন—তুমিই মেঘ, তুমিই বায়ু। তুমি অগ্নি, তুমি আকাশের মাঝে সৌদামিনী, সমস্ত ঘন মেঘ তুমিই বিক্ষিপ্ত করে বৃষ্টিবর্ষণ করো। তোমাকে তাই মহামেঘ বলে লোকে, তুমিই ঘোর প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতি, তুমি বলাহক নামক মেঘ—

ত্বমেব মেঘস্ত্বং বায়ুস্ত্বমগ্নির্বৈদ্যুতো'ম্বরে।
ত্বমভ্রগণবিক্ষেপ্তা ত্বামেবাহুর্মহাঘনম্।।
ত্বং বজ্রমতুলং ঘোরং ঘোষবাংস্ত্বং বলাহকঃ।

লক্ষণীয়, পদ্ম পুরাণের ভূমিখণ্ডে নিরুক্তকার যাস্কের মতো বৈদিক প্রচারে বৃত্রকে বর্ষণহীন মেঘ বলা হয়নি বটে, তবে বৈদিক পরম্পরায় বৃত্রের মেঘাত্মকতাটুকু এই অর্বাচীন পুরাণেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পদ্ম পুরাণে বল নামক অসুরের মৃত্যু ঘটল ইন্দ্রের হাতে। তখন দিতি তাঁর স্বামী কশ্যপের কাছে গিয়ে প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ দিতেই প্রজাপতি কশ্যপ নিজের মস্তকস্থ একটা জটা ছিঁড়ে

নিয়ে শুদ্ধ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে বৃত্র জন্মালেন এবং তাঁর চেহারা ভীষণাকার, তাঁর চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, ঘন মেঘের মতো তাঁর গায়ের রঙ, মুখে ভয়ঙ্করী দন্ত পংক্তি, খড়্গ এবং ঢাল তার দুই হাতে, তাঁর চেহারা অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত কিন্তু তাঁর শেষ উপমা হল মহামেঘের মতো—তিনিই বৃত্র—

* কৃষ্ণাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ পিঙ্গাক্ষো ভীষণাকৃতিঃ।
* সর্বাঙ্গতেজসা দীপ্তো মহামেঘোপমো বলী॥

[মহা (k) ১.২৫.১০-১১; (হরি) ১.২১.৯-১০; পদ্ম পু. (ভূমি) ২৪.৪-৮]

☐ পদ্ম পুরাণে আমরা যেভাবে বৃত্রের জন্ম-বৃত্তান্ত লিখিত হতে দেখলাম, সেটা পৌরাণিক ভাবনায় প্রজাপতি কশ্যপ এবং তাঁর দুই স্ত্রী দিতি এবং অদিতির সপত্নী-সংঘর্ষের ফলস্বরূপ দৈত্য-জননী দিতির অভীষ্ট পুত্র বৃত্র এবং দেবজননী অদিতির পুত্র ইন্দ্রের সংঘর্ষ হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু বেদে ব্রাহ্মণে বৃত্রকে আমার ত্বষ্টার পুত্র হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। ঋগ্‌বেদে অন্তত ৬৫বার ত্বষ্টা নামটির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর কীর্তি, খ্যাতি এবং ক্ষমতার বিবরণ খুব সবিস্তারে পাওয়া যায় না। ত্বষ্টার জন্ম বা দেবতা হিসেবে ত্বষ্টার মর্য্যাদা কিন্তু এটাই যে, ঋগ্‌বেদে তিনি সকলের অগ্রজন্মা বা সবার প্রথমে তিনি জন্মেছেন—

ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপম্ উপ হ্বয়ে
অস্মাকমস্তু কেবলঃ।

আরও একটা তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সকল প্রাণীর স্ত্রী-গর্ভে নিবিষ্ট বীজ এবং ভ্রূণকে উপযুক্ত রূপ দেন—ত্বষ্টা রূপবিধানে সমর্থ, তিনি সমস্ত পশুর (মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর) রূপ ব্যক্ত করেন—

ত্বষ্টা রূপাণি হি প্রভুঃ পশূন্ বিশ্বান্ত্ সমানজে।

এই প্রথমজন্মা পুরুষ এবং গর্ভরূপদানকারী দেবতাই কিন্তু মহাকাব্য পুরাণে আরোপিত হয়েছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা অথবা প্রজাসৃষ্টিকারী কশ্যপের ওপর। আমরা পদ্ম পুরাণে দেখলাম—প্রজাপতি কশ্যপ দেবজননী অদিতির পুত্র ইন্দ্রের বিরুদ্ধতা করার জন্য জটাজাল ছিঁড়ে হোমকুণ্ড থেকে বৃত্রের জন্ম দিলেন, ঠিক একইভাবে না হলেও প্রায় অনুরূপভাবে সুপ্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা দেখছি—ত্বষ্টার পুত্র ছিলেন বিশ্বরূপ, তাঁর তিনটি মাথা, ছটি চক্ষু। ইন্দ্র সেই ত্রিশিরাকে মেরে ফেলেন। তাতে ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হন এবং ইন্দ্রকে সোমপানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। ইন্দ্র দেখলেন, তাঁকে আহুতিস্থানীয় সোমের অধিকার থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তখন তিনি করলেন কী—বলবত্তর ব্যক্তি যেমন দুর্বলতরের বস্তু বলপূর্বক গ্রহণ করে, ইন্দ্র সেইভাবেই যজ্ঞে আহূত না হয়েই দ্রোণ-কলশে রক্ষিত শুক্র-নির্মল সোমরস পান করে ফেললেন।

ইন্দ্রের এই ব্যবহার দেখে ত্বষ্টা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং তিনি নিজেই সেই চলমান যজ্ঞ নষ্ট করে দিলেন এবং দ্রোণকলশে রক্ষিত অবশিষ্ট সোমরস অগ্নিতে ঢেলে দিয়ে বললেন—তুমি ইন্দ্রশত্রু হয়ে বর্ধিত হও। সেই সোম অগ্নিকে লাভ করেই পুরুষরূপে উৎপন্ন হল। সে ওইভাবে 'বর্তমান' হয়ে সৃষ্ট হয়েছিল বলেই তাঁর নাম বৃত্র এবং পদহীন হয়ে জন্মেছিল বলেই তার নাম অহি। দনু এবং দনায়ু পিতা-মাতার মতো তাকে গ্রহণ করেছিল বলেই তার নাম দানব—

[ঋগ্‌বেদ ১.১৩.১০; ১.১৮৮.৯; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১.৬.৩.১-১১; ২.৬.৪.১]

শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রশত্রু বৃত্রের জন্ম এবং পদ্ম পুরাণে বর্ণিত বৃত্র জন্মের সঙ্গে প্রায় অনেকটাই মিলে যায়। বিশেষত যজ্ঞের হোমকুণ্ড থেকে তাঁর জন্মটা পুরাতন-অর্বাচীন দুই গ্রন্থেই একরকম। তবে পদ্ম পুরাণের প্রজাপতি কশ্যপ ত্বষ্টার জায়গায় প্রতিস্থাপিত হলেও মহাভারত কিন্তু বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির পরম্পরা অনেকটাই ঠিক রেখেছে, যদিও কাহিনীর মধ্যে আরও একটু নতুনত্ব এসেছে। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ছিলেন দেবতাদের পুরোহিত, কিন্তু আত্মীয় সম্বন্ধে তিনি অসুরদের মামা ছিলেন অর্থাৎ অসুরেরা তাঁর ভাগনে। বিশ্বরূপের তিনটি মাথা ছিল, ফলত এক মুখ দিয়ে তিনি সোমরস পান করতেন, এক মুখ দিয়ে সুরা পান করতেন, বাকী অন্য মুখটি দিয়ে তিনি অন্ন ভোজন করতেন। সরাসরি দেবতাদের পুরোহিত হওয়ায় তিনি দেবতাদের প্রত্যক্ষভাবে বলতেন যে, যজ্ঞকালে হবির্ভাগ বা সোমরসের ভাগ দেবতাদেরই প্রাপ্য, কিন্তু গোপনে তিনি ভাগনে অসুরদের আশ্বাস

দিয়ে বলতেন—অসুররাও হবির্ভাগ সোমভাগ পাবে। কথাটা ইন্দ্র জানতে পারলেন এবং তিনি ভাবলেন—প্রত্যক্ষে যে কথা দেওয়া হয়, তা সকলেই রাখে, কিন্তু পরোক্ষে যদি কেউ কথা দেয়, সে কথাও সবাই রাখে। ইন্দ্র ভাবলেন—অসুরেরা এই হবির্ভাগ পেলে, তাঁর রাষ্ট্র-বিপর্যয় ঘটে যাবে। অতএব তিনি বজ্র দিয়ে ত্রিশিরা বিশ্বরূপের তিনটি মাথাই কেটে ফেললেন—

স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো
ভাগমবদৎ পরোক্ষমসুরেভ্যঃ,
সর্বস্মৈ বৈ প্রত্যক্ষং ভাগং
বদন্তি যস্মা এব পরোক্ষং
বদন্তি তস্য ভাগ উদিতঃ,
তস্মাদ্ ইন্দ্রো বিভেদীদৃঙ্
বৈ রাষ্ট্রং বি পর্যাবর্তয়তীতি
তস্য বজ্রমাদায় শীর্ষাণ্যচ্ছিনৎ।

[কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ২.৫.১.১, পৃ. ১২০৩]

ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে বধ করার পর ইন্দ্র অঞ্জলিবদ্ধ করে স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্রহ্মহত্যা করেছেন এবং লোকেও তাঁকে ব্রহ্মঘাতক বলে নিন্দা করতে আরম্ভ করল—

তং ভূতান্যভ্যক্রোশদ্ ব্রহ্মহন্নিতি।

এই অবস্থায় ইন্দ্র পৃথিবী, বৃক্ষ এবং রজস্বলা রমণীর রজঃস্রাবের কাছে তাঁর ব্রহ্মহত্যার দোষ স্থানান্তরিত করে নিজে ব্রহ্মহত্যার দায় থেকে মুক্ত হলেন। ওদিকে ত্বষ্টা নিজপুত্র ত্রিশিরার মৃত্যু দেখে পুত্রহন্তা ইন্দ্রের সোমপানের অধিকার কেড়ে নিলেন এবং শতপথ ব্রাহ্মণের মতো এই যজুর্বেদ-সংহিতাতেও ইন্দ্রের জোর-করে-খাওয়া দ্রোণকলশ থেকে অবশিষ্ট সোমরস তাঁর আহবনীয় অগ্নিতে ঢেলে দিলেন সেই বিখ্যাত উক্তি করে—ইন্দ্রশত্রু বর্ধিত হও। এইবার জন্ম হল বৃত্রের, বলবান ইন্দ্রের শত্রু বলেই তিনি খ্যাত হলেন। আহবনীয় অগ্নিতে অবশিষ্ট সোম ঢেলে দেওয়ার অর্থ বহন করে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা তৈত্তিরীয় সংহিতায় 'অবর্তয়ৎ', এই বৃৎ-ধাতু থেকেই তাঁর নাম হল বৃত্র—

যদ্ অবর্তয়ৎ তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বম্।

আবার আহবনীয় অগ্নি এবং সোমের সঙ্গে বৃত্রজন্ম সংশ্লিষ্ট হওয়ায় অগ্নি এবং সোমের সঙ্গে ইন্দ্রশত্রু বৃত্রের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক হয়ে গেল। ইন্দ্র বৃত্রকে দেখে ভয় পেলেন এবং প্রজাপতির কাছে বজ্র নামক অস্ত্র লাভ করে, সেই বজ্র দিয়েই বৃত্রকে বধ করলেন ইন্দ্র।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ২.৫.২.১-৭, পৃ. ১২০৯-১১]

□ মহাভারতে ত্বষ্টাকে একটু অন্যভাবে চরিত্রিত করা হয়েছে। এখানে ত্বষ্টা প্রজাপতি, তিনি দেবশ্রেষ্ঠ এবং মহাতপস্বী। প্রথম থেকেই তিনি ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন বলেই তিনি বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেছিলেন—চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নির মতো তাঁর তিনখানা মুখ, তিনি ত্রিশিরা—

ত্বষ্টা প্রজাপতি হ্যাসীদ্ দেবশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ।
স পুত্রং বৈ ত্রিশিরসম্ ইন্দ্রদ্রোহাৎ কিলাসৃজৎ॥

বিশ্বরূপ ত্রিশিরা এক মুখ দিয়ে বেদ পাঠ করতেন, অন্য একটি মুখ দিয়ে তিনি সুরা পান করতেন আর অপর একটি মুখ দিয়ে বিশ্বরূপ যেন সমস্ত দিকগুলিই গ্রাস করে ফেলতেন। ভাগবত পুরাণ প্রথম মুখটির নাম দিয়েছে 'সোমপীথ', দ্বিতীয়টি নাম 'সুরাপীথ' এবং তৃতীয়টির নাম দিয়েছে 'অন্নাদ', অর্থাৎ সেটা খাবার খাওয়ার মুখ। তবে মহাভারত জানিয়েছে যে, বিশ্বরূপের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইন্দ্রের পদ—

ঐন্দ্রং স প্রার্থয়ৎ স্থানং বিশ্বরূপো মহাদ্যুতিঃ।

বিশ্বরূপ ত্রিশিরা ইন্দ্রপদের ভাবনাতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে গভীর তপস্যায় মন দিলেন এবং তাতেই ইন্দ্র এই ভয় পেলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ইন্দ্রপদ না চলে যায়। ইন্দ্র ভাবলেন—এই ত্রিশিরা বিশ্বরূপের যদি তপস্যার ফলে বাড়বাড়ন্ত হয়, তো এই তিন ভুবনই তাঁর ভোগে চলে যাবে। ইন্দ্র ত্রিশিরাকে প্রলুব্ধ করার জন্য সর্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরাদের নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন ত্রিশিরার কাছে। অপ্সরারা ইন্দ্রকে আশ্বস্ত করে গেল বটে, কিন্তু বিশ্বরূপ ত্রিশিরার সামনে এসে নৃত্য-গীত এবং শত শত অঙ্গভঙ্গী করেও তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারল না। সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করে শান্ত সমুদ্রের মতো তিনি বসে রইলেন। অপ্সরারা ইন্দ্রের কাছে এসে তাদের অক্ষমতা এবং অসহায়তার কথা জানাল। তখন ইন্দ্র অন্য কোনো উপায় না দেখে 'এমন শত্রুকে কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়'—এই নীতিশাস্ত্রীয় বুদ্ধিতে

বিশ্বরূপের ওপর ভয়ংকর বজ্রনিক্ষেপ করলেন। ত্রিশিরা বিশ্বরূপ বজ্রাহত হয়ে ছিন্ন পর্বতশৃঙ্গের মতো পড়ে থাকলেন মাটিতে—

পর্বতস্যেব শিখরং প্রণুন্নং ধরণীতলে।

ত্রিশিরা যখন ওইরকম নিস্পন্দ পড়ে আছেন, তখনও তপস্যার তেজে তাঁর দেহ যেন আলোকিত হয়ে আছে। ইন্দ্রের মনে হল যেন ত্রিশিরা নিহত হলেও তিনি যেন জীবিত ব্যক্তির মতোই তখনও উজ্জ্বল, তাঁর তিনটি মাথাও তখনও যেন জীবিতবৎ। দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। হঠাৎই তিনি একজন কাঠ কাটতে আসা বর্ধকিকে দেখতে পেলেন, তার কাঁধে একখানি কুঠার। ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বর্ধকিকে বললেন—তুমি এখুনি এই লোকটার মাথাগুলি কেটে দাও। কাঠুরে বলল—এই লোকটির গলার জায়গাটা ভীষণই শক্ত, আমার এই কুঠার এটা কাটতে পারবে না। তাছাড়া সজ্জনদের নিন্দিত এই কাজটা আমি করতে যাবো কেন? ইন্দ্র কাঠুরেকে জোর করেই বললেন—আমার অনুগ্রহে তোমার এই কুঠার বজ্রের মতো হয়ে যাবে। তুমি হত্যা করো একে।

বর্ধকি সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের কথা মেনে নিল না, সে ইন্দ্রের পরিচয় জানার পরেও ইন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিল যে, এইরকম নিষ্ঠুর কাজ এবং বিশেষত এক ঋষিপুত্রকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে বধ করার পর ইন্দ্রের কী ব্রহ্মহত্যার পাপ-ভয়ও হয় না? ইন্দ্র বলেছেন—আমি পাপমুক্ত হবার জন্য পরে অনেক দুষ্কর ধর্ম-তপস্যা করবো। আপাতত তুমি আমি যেমন বলছি তেমন করো। কেননা এই মহাবল অসুর আমার শত্রু এবং আমি আগেই একে বজ্রনিক্ষেপ করে মেরেছি। আর তোমার প্রতি অনুগ্রহে আমি তোমাকে জানাচ্ছি—এরপর থেকে মানুষেরা যখন যজ্ঞকালে পশুবধ করবে, তখন পশুর মস্তকগুলি তোমরা ভাগ হিসেবে পাবে।

বর্ধকি শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের বচন অনুসারে তখনই তার কুঠার দিয়ে ত্রিশিরার মস্তকগুলি ছেদন করল এবং ইন্দ্র অত্যন্ত নিরুদ্বেগে স্বর্গে চলে গেলেন। এদিকে ইন্দ্র তাঁর পুত্র ত্রিশিরা-বিশ্বরূপকে বধ করেছেন দেখে প্রজাপতি ত্বষ্টা বললেন—আমার পুত্র ত্রিশিরা তপস্যা করছিল এবং সে নিজে ক্ষমাশীল জিতেন্দ্রিয় মানুষ। তাকে বিনা কোনো অপরাধে বধ করেছে ইন্দ্র, অতএব সেই ইন্দ্রকে বধ করার জন্য আমি 'বৃত্র' নামে আমার অন্য এক পুত্র সৃষ্টি করবো। এই কথা বলে প্রজাপতি আচমন করে অগ্নিতে আহুতি দিলেন, সেখান থেকেই জন্মালেন বৃত্রাসুর। প্রজাপতি বৃত্রকে সম্বোধন করে বললেন—ইন্দ্রশত্রু! তুমি আমার তপস্যার প্রভাবে বৃদ্ধিলাভ করো। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি এবং সূর্যের তুল্য তেজস্বী বৃত্রাসুর আকাশকে ব্যাপ্ত করেই যেন বৃদ্ধিলাভ করল—

সো'বর্ধত দিবং স্তব্ধা সূর্যবৈশ্বানরোপমঃ।

এই যে আকাশ ব্যাপ্ত করে 'বর্তমান' থাকা, এই ঘটনাটাকেই প্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণ বৃত্র-নামের উৎস বলে নির্ণয় করেছে। শতপথ বলেছে—'এইরকম প্রসিদ্ধি আছে যে, দ্যুলোক এবং পৃথিবীর মধ্যে এই যে অবকাশ আছে, বৃত্র এই সমস্ত কিছুকে আবৃত করে শয়ন করে ছিল। এমনভাবে আবৃত করে ছিল বলেই তাঁর নাম হল বৃত্র—

বৃত্রো হ বা ইদং সর্বং বৃত্বা শিশ্যে।
যদিদম্ অন্তরেণ
দ্যাবাপৃথিবী স যদেদং সর্বং বৃত্বা শিশ্যে
তস্মাদ্ বৃত্রো নাম।

[মহা (k) ৫.৯.৩-৪৮; (হরি) ৫.৯.৩-৪৮;
ভাগবত পু. ৬.৯.১৭;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১.১.৩-৪]

□ ত্বষ্টা প্রজাপতির আদেশে ইন্দ্রকে বধ করার উদ্দেশে বৃত্রাসুর স্বর্গে গেল এবং ইন্দ্র আর বৃত্রাসুরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। মহাভারতের মতে বৃত্র নাকি প্রথমেই ইন্দ্রকে গিলে ফেলে ছিলেন। ইন্দ্রকে এইভাবে গ্রাস করে নিলে দেবতারা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে জৃম্ভণ (জৃম্ভিকা) সৃষ্টি করলেন। জৃম্ভণ অর্থ 'হাই তোলা'। বৃত্রাসুর বড়ো বড়ো 'হাই' তুলতে থাকলে সেই ফাঁকে বৃত্রাসুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এলেন ইন্দ্র, যদিও তাতে দুই পক্ষের শত্রুতা কিছু কমল না, যুদ্ধ আরম্ভ হল আবার। ত্বষ্টার তেজে বৃত্রাসুরের তেজ আরও বাড়ল এবং ইন্দ্রকে পিছু হঠতে হল। দেবতারা ইন্দ্রের সঙ্গে একই বিষণ্ণতায় ভুগতে থাকলেন এবং দ্বিপন্নিবৃত্তির জন্য আলোচনায় বসলেন মুনিদের সঙ্গে। সেই আলোচনা-সভায় ইন্দ্র নিজেই দেবতাদের বললেন—বৃত্রাসুর এই সমগ্র জগৎই অধিকার করে নিয়েছে। কিন্তু যে

অস্ত্র একে বিনাশ করতে পারে, তেমন অস্ত্রের সন্ধান আমি পাইনি। আগে যদিও বা বৃত্রের সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ করতে পারতাম, কিন্তু এখন আর এই দুর্ধর্ষ অসুরের সঙ্গে আর পেরে উঠছি না। বরঞ্চ আমরা সকলে ভগবান বিষ্ণুর কাছে যাই। তিনি শরণাগত পালক, তাঁর কাছেই আমরা বৃত্রবধের উপায় জিজ্ঞাসা করি।

বিষ্ণুর কাছে সকলে মিলে গেলেন দেবতা এবং ঋষিরা। তাঁকে স্তবস্তুতি করে সমস্ত বিষয়টা জানালেন তাঁরা। বৃত্রবধে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের সহায় হবার জন্য বিষ্ণুকে সকলে অনুরোধ জানালে বিষ্ণু বললেন—যেখানে ওই বৃত্রাসুর আছে, ঋষি-গন্ধর্বদের নিয়ে তোমরা দেবতারা সকলেই সেখানে যাও এবং বৃত্রাসুরের কাছে অনুনয় করো, তাতেই জয় আসবে তোমাদের। ইতোমধ্যে আমি সকলের অলক্ষ্যে ইন্দ্রের বজ্রের মধ্যে প্রবেশ করবো। কিন্তু বৃত্রকে হত্যা করতে গেলে তার সঙ্গে সন্ধি করো সবার আগে—তার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলো—

* সাম তস্য প্রযুঞ্জধ্বং তত এনং বিজেষ্যথ।
* বৃত্রস্য সহ শক্রেণ সন্ধিং কুরুত মা চিরম্।

[মহা (k) ৫.৯.৪৯-৫৯; ৫.১০.১-১৩;
(হরি) ৫.৯.৪৯-৫৯; ৫.১০.১-১৩]

☐ মহাভারতে বিষ্ণুর মুখে বৃত্রের সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে সন্ধি করে নিতে বলার প্রস্তাবের মধ্যেই কিন্তু ভাগবত এবং অন্যান্য কিছু পুরাণের মধ্যে বৃত্রের মাহাত্ম্যের জায়গাটা প্রকট করে তুলেছে। বিশেষত ভাগবত পুরাণে বৃত্র যখন ইন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করছেন, তখন ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃত্র যে কথাগুলি বলছেন, সেখানে দেবসহায় ভগবান বিষ্ণুর মহিমা তাঁর মুখেই এমনভাবেই বিবৃত হয়েছে, যাতে অসুর হলেও বৃত্র সেখানে দেবতাদের চেয়ে বেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠছেন। এখানে অবশ্য বিষ্ণুর পরামর্শে দধীচি মুনির অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন দেবতারা এবং সেই অস্থি দিয়ে অশ্বিনীকুমারেরা ইন্দ্রের বজ্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। প্রকৃত যুদ্ধের সময় বৃত্রাসুরের অস্ত্রক্ষেপে ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র মাটিতে পড়ে গিয়েছিল এবং এই অবস্থায় বৃত্রই দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন যাতে ভূপতিত বজ্র হাতে তুলে নিয়ে ইন্দ্র পুনরায় আঘাত করেন বৃত্রকে। বৃত্রের এই মানসিক শক্তি দেখে ইন্দ্রও তাঁর প্রশংসা করছেন পঞ্চমুখে এবং সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বৃত্রের উপদেশ, যার সার-কথা হল—যেমন কাঠের তৈরি একটি মেয়ে পুতুল, কিংবা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি একটি পশু কখনোই নিজের ইচ্ছেতে নাচতে পারে না এবং বাজিকর নর্তকের ইচ্ছাতেই এরা নেচে বেড়ায়, তেমনই সমস্ত কিছুই ঈশ্বরেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়, কেউ স্বতন্ত্র নয়। আর এটা ভেবেই অকীর্তি এবং যশ, জয় এবং পরাজয়, মৃত্যু এবং জীবন, সুখ এবং দুঃখ—এই সমস্ত অবস্থাতেই সমানভাবে থাকতে হবে—

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্ ঈশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ॥
তস্মাদকীর্তি-যশসোর্জয়াপজয়য়োরপি।
সমঃ স্যাং সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যু-জীবিতয়োস্তথা॥

ভাগবত পুরাণে দধীচি-মুনির অস্থিসার বজ্রের আঘাতে মৃত্যু হল বৃত্রের। কিন্তু মহাভারতে ঘটনাটা একটু অন্যরকম। এখানে ভগবান বিষ্ণু একদিকে ইন্দ্রের বজ্রমধ্যে প্রবেশ করবেন বলেছিলেন, অন্যদিকে ইন্দ্রকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঋষি-মুনিদের মধ্যস্থতায় বৃত্রের সঙ্গে সন্ধি করে নিতে। সেই নির্দেশমতই ঋষিরা বৃত্রের কাছে গিয়ে বললেন—বৃত্রাসুর। তোমাকে জয় করা যায় না, এমনই তোমার শক্তি। তোমার তেজে এই জগৎ ব্যাপ্ত। অথচ ইন্দ্রকেও যে তুমি পুরোপুরি জয় করতে পারছো, এমনটাও নয়। তোমরা দুজনেই যুদ্ধ করছো অনেক এবং যুধ্যমান অবস্থায় তোমাদের দুই জনেরই কেটে গেল অনেক কাল। এতে যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা হল—দেবতা, অসুর, মানুষ, সকলেই খুব পীড়িত বোধ করছে। এই বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমরা চাই ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার সখ্যভাব তৈরী হোক। তাতে তোমার সুখও হবে, ভালোও হবে।

ঋষিদের কথা শুনে বৃত্র অবনত-মস্তকে শ্রদ্ধা সহকারে জানালেন—আমার আর ইন্দ্রের মধ্যে সন্ধি হতে পারে না। আমরা দুজনেই অত্যন্ত তেজস্বী, আর দুইজন তেজস্বী লোকের সন্ধি হতে পারে না, হয় না এটা—

তেজসোর্হি দ্বয়োর্দেবা সখ্যং বৈ ভবিতা কথম্?

ঋষিরা তবু অনেক বোঝালেন বৃত্রকে। ইন্দ্রের মান, মর্যাদা, দেবত্ব—সব কিছুই সপ্রশংসভাবে প্রতিষ্ঠা করে বৃত্রকে তাঁরা বললেন—আমরা চাই,

ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার চিরস্থায়ী সন্ধি হোক, ইন্দ্রকে তুমি বিশ্বাস করার কথা ভাবো, বুদ্ধিটাকে অন্যরকম হতে দিয়ো না—

তেন তে সহ শক্রেণ সন্ধির্ভবতু শাশ্বতঃ।
এবং বিশ্বাসমাগচ্ছ মা তে ভূদ্‌বুদ্ধিরন্যথা॥

মাননীয় ঋষিদের কথা বৃত্র কিন্তু অবহেলা করলেন না। উদার চিত্তে ঋষিদের এবং দেবতাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন—ঋষিরা যা বলছেন, আমি নিশ্চয় শুনবো এবং আমি শুধু এটাই জানাবো দেবতাদের যে, কী কী ভাবে আমি বধ্য হবো না। বৃত্র বললেন—শুষ্ক কিংবা আর্দ্র বস্তু দিয়ে আমাকে আঘাত করা চলবে না, প্রস্তর কিংবা কাষ্ঠ দিয়েও নয়, অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েও নয়, দিনে বা রাতেও আমাকে আঘাত করা যাবে না, সবচেয়ে বড়ো কথা—ইন্দ্র বা অন্যান্য কোনো দেবতার দ্বারা বধ্য হবো না আমি। ঋষিরা মধ্যস্থ হয়ে বৃত্রের সব শর্ত মেনে নিলেন। বৃত্র এবং ইন্দ্রের সন্ধি স্থাপিত হল।

সন্ধি হল বটে, কিন্তু ইন্দ্র সন্ধির সুযোগে বৃত্রের আঘাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন বলেই তিনি পরম শান্তিতে বৃত্রবধের উপায় খুঁজতে লাগলেন। বিশেষত সন্ধি করার সময় বৃত্রাসুরের কথার মধ্যেই যে ফাঁকগুলি রয়ে গিয়েছিল মহর্ষিদের কথামত সেগুলি স্মরণ করে ইন্দ্র সব সময় বৃত্রাসুরের রন্ধ্র খুঁজে বেড়াতেন। এইভাবে একদিন ইন্দ্র সমুদ্রের কাছে বৃত্রাসুরকে দেখতে পেলেন। তখন সময়টা দিনও নয়, রাত ও নয়, তখন সন্ধ্যাকাল। ইন্দ্র ভাবলেন—সময়টা যখন এত অনুকূল, তখন এখনই এই অসুরকে বধ করতে পারলেই আমার মঙ্গল। তিনি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন এবং দেখতে পেলেন সমুদ্রের মধ্যে এক পর্বত প্রমাণ ফেনপুঞ্জ শক্ত জমাট বেঁধে আছে। এই ফেন শুষ্কও নয়, আর্দ্রও নয়, এটা চিহ্নিত কোনো অস্ত্রও নয় শস্ত্রও নয়, প্রস্তরও নয়, কাষ্ঠও নয়। ইন্দ্র সেই ফেনপুঞ্জকে আপন বজ্রের সঙ্গে নিবদ্ধ করলেন এবং ভগবান বিষ্ণু প্রবেশ করলেন সেই প্রায়-অশ্মীভূত সামুদ্রিক ফেনপুঞ্জের মধ্যে। ইন্দ্র সেটি বৃত্রাসুরের ওপর নিক্ষেপ করলেন। বৃত্র নিহত হলেন।

[ভাগবত পু, ৬.৭ অধ্যায় থেকে ৬.১২ অধ্যায়; ৬.১২.১০, ১৪; মহা (k) ৫.১০.১৭-৪০; (হরি) ৫.১০.১৭-৪২]

□ মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে বর্ণিত ত্রিশিরা-বিশ্বরূপ-বধ এবং বৃত্রবধের সঙ্গে শান্তিপর্বের উপাখ্যান সেভাবে মেলে না এবং এখানে পরম্পরা-বাহিত দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র-নির্মাণের প্রসঙ্গটাও সামুদ্রিক ফেনপুঞ্জের ভাবনা থেকে আলাদা। এখানে দেখা যাচ্ছে—ত্বষ্টা প্রজাপতির পুত্র বিশ্বরূপ দেবতাদের পুরোহিত। তিনি অসুরদের ভাগনে। তৈত্তিরীয় সংহিতার উক্তি প্রায় উদ্ধার করে মহাভারত এখানে বলেছে যে, বিশ্বরূপ দেবপুরোহিত হবার সুবাদে দেবতাদের প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞভাগ দিতেন আর পরোক্ষভাবে হয়তো বা অন্যের হাত দিয়ে যজ্ঞভাগ অসুরদের পাঠাতেন আত্মীয়তার সুবাদে। অসুরেরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে অগ্রবর্তী নিজেদের ভগিনী অর্থাৎ বিশ্বরূপের মায়ের কাছে গিয়ে বললেন—এটা কেমন অবিচার যে, তোমার ছেলে ত্রিশিরা বিশ্বরূপ দেবতাদের পুরোহিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের যজ্ঞভাগ দিচ্ছেন, আর অসুরদের ভাগ দিচ্ছেন পরোক্ষে। এতে দেবতাদের বৃদ্ধি হচ্ছে আর আমরা অসুরেরা দুর্বল এতে ক্ষীণ হয়ে পড়ছি। তুমি বিশ্বরূপকে বলো যেন সে আমাদের পক্ষে থাকে।

এরপর একদিন বিশ্বরূপ নন্দনবনে গেছেন, তখন তাঁর মা তাঁকে বললেন—তুমি বিপক্ষীয় দেবতাদের বাড়বাড়ন্ত করে তোমার মামাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছো কেন? তুমি কিন্তু ন্যায়ের যুক্তিতেই এটা করতে পারো না। মায়ের মুখে তাঁর ক্ষোভের কথা শুনে 'মায়ের বাক্য অলঙ্ঘ্য' মনে করেই অসুর-দৈত্যদের পক্ষ অবলম্বন করলেন এবং মাতৃপক্ষের উন্নতির জন্য তপস্যা আরম্ভ করলেন—

অথ বিশ্বরূপো মাতৃপক্ষবর্ধনঃ
অত্যর্থং তপস্যভবৎ।

ইন্দ্র সেই অপ্সরাদের পাঠালেন তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য। অপ্সরারা বিফল হলেন তাঁদের প্রয়াসে এবং যেমন এসে তেমনই চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ বললেন—তা কেন? তোমরা এখানেই থাকো, তাতেই তোমাদের ভালো হবে। অপ্সরারা বললেন— আমরা দেবস্ত্রী অপ্সরা এবং ইন্দ্র দেবতা, তিনি পরে প্রভাবশালী হবেন, আমরা তাঁকেই বরণ করবো।

ত্রিশিরা বিশ্বরূপ বললেন—আজই ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতারা সব নিঃশেষ হয়ে যাবে—

অদ্যৈব বৈ সেন্দ্রা দেবা ন ভবিষ্যন্তি।

বিশ্বরূপ এবার মন্ত্র জপ করা আরম্ভ করলেন। এখানে লক্ষণীয়, এই সময়েই বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং তিনি এক মুখে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞে প্রদত্ত সোমরস গ্রহণ করতে থাকলেন, অন্য একটি মুখ দিয়ে অন্ন ভোজন করতে থাকলেন এবং তৃতীয় মুখটি দিয়ে সমস্ত দেবগণ সহ ইন্দ্রকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলার উপক্রম করলেন। ইন্দ্র এইভাবে বিশ্বরূপ ত্রিশিরাকে বিশেষরূপে বৃদ্ধি পেতে দেখে, বিশেষত সোমপানে তাঁর বিবর্ধিত শরীর দেখে নিজের বিপদ-সম্ভবনায় সমস্ত দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তাঁকে দেবতার জানালেন—সমস্ত যজ্ঞে প্রদত্ত সোমরস এখন বিশ্বরূপই পান করছেন, দেবতারা এখন যজ্ঞভাগশূন্য অবস্থায় দুর্বল হয়ে পড়ছেন এবং অসুরদের বৃদ্ধি ঘটছে। আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

সব শুনে ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন 'দধীচ'-মুনির কাছে যেতে। সেই তপস্যারত দধীচ-মুনির কাছে দেবতারা এই বর চাইবেন যাতে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁরই অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করার পরামর্শ দিয়ে ব্রহ্মা দেবতাদের পাঠালেন দধীচ-মুনির তপস্যা-স্থলে। দধীচ অতি মহাশয় মুনি। দেবতারা তাঁর কাছে সানুনয়ে বললেন—আপনি জগতের হিতসাধনের জন্য দেহত্যাগ করুন। সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বিষয়ে সমজ্ঞানী যোগ অবলম্বন করে আপন জীবাত্মার মিলন ঘটালেন পরমাত্মার সঙ্গে। তাঁর স্থূল দেহ পড়ে রইল, তখন ধাতা তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্রনির্মাণ করলেন। দধীচ-মুনির অস্থিসম্ভূত সেই বজ্রের মধ্যে প্রবেশ করলেন ভগবান বিষ্ণু। ইন্দ্র সেই বজ্র দিয়ে বধ করলেন ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে। তারপর দেবতারা বিশ্বরূপের শরীর মন্থন করতে থাকলে তা থেকে বৃত্র নামে এক দেবশত্রুর উৎপত্তি হল। ইন্দ্র সেই বজ্র দিয়ে বৃত্রকেও বধ করলেন।

লক্ষণীয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যখন ত্রিশিরা বিশ্বরূপের হত্যাকাহিনীর উল্লেখ করেছে, তখন কিন্তু প্রায় এক নিশ্বাসেই ইন্দ্রের দ্বিতীয় শত্রু বৃত্রেরও উল্লেখ করেছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বরূপ এবং বৃত্রকে হত্যা করার পর ব্রাহ্মণ-হত্যার দায়ে ইন্দ্রকে দেবতারা সোমপানের অধিকার থেকেই বঞ্চিত করেছিলেন, যদিও এখানে সব মিলিয়ে ইন্দ্রের পাঁচটি অপরাধের দায়ে তাঁকে প্রধান যজ্ঞভাগ সোমরস থেকে দেবতারা নিবারিত করেছিলেন বলে বলা হয়েছে। অন্য তিনটি অপরাধ হল—ইন্দ্র যতি-মুনির বেশে থাকা অসুরদের আরণ্য কুকুর (সালাবৃক, হায়না) দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন, ইন্দ্র অরুর্মঘ নামে ব্রাহ্মণ বেশধারী এক অসুরকে হত্যা করেন এবং দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে তিনি অন্যায় অপব্যবহার করেন। বিশ্বরূপ-বৃত্রহত্যা সহ এই পাঁচ অপরাধে ইন্দ্র সাময়িকভাবে সোমপানের অধিকার হারিয়ে ফেলেন।

[মহা (k) ১২.৩৪২.২৮-৪১;
(হরি) ১২.৩২৮.৬৫-১১৮; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
(আনন্দাশ্রম) ২.৩৫.২৮, পৃ. ৮৮০]

☐ ইন্দ্র-কর্তৃক অসুর-দৈত্য-বধের প্রসঙ্গে নমুচির নাম আসে বারবার এবং ত্রিশিরা-বিশ্বরূপ-বধের পরেই তাঁর কথাটা এই কারণেই উল্লেখযোগ্য মনে হয় যে, মহাভারতের একটি কাহিনীতে ইন্দ্র যেভাবে অশুষ্ক-অনার্দ্র সামুদ্রিক ফেন দিয়ে ত্রিশিরা বিশ্বরূপের বধ-সাধন করেছিলেন, সেই সামুদ্রিক ফেনার কথা এসেছে নমুচি-বধের প্রসঙ্গে এবং তা মহাভারতের থেকে অনেক প্রাচীন কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় এবং শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায়।

ঋগ্বেদে যেখানে সাধারণভাবেই ইন্দ্র-কর্তৃক নানান অসুর-বধের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে নমুচিরও সাধারণ উল্লেখই আছে—

যঃ পিপ্রুং নমুচিং যো রুধিক্রাম্।

কিন্তু নমুচি কেমন করে ইন্দ্রের শত্রু হলেন তার একটা ছোট্ট কাহিনীও আছে ঋগ্বেদেই। এই কাহিনীতে বভ্রু নামক ঋষি, যিনি এই বৈদিক সূক্তের রচয়িতা, সেই বভ্রু ইন্দ্রের অসুর-বধের কীর্তি উল্লেখ করার সময় প্রথমে বৃত্রের কথা বলেই নমুচির উল্লেখ করে বলছেন—তুমি মানুষের প্রয়োজনেই তাদের সুখের জন্য নমুচির মস্তক চূর্ণ করেছিলে—

অত্রা দাসস্য নমুচেঃ শিরো যদ্
অবর্তয়ো মনবে গাতুমিচ্ছন্।

এরপরেই বক্তা জানাচ্ছেন যে, নমুচি নাকি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাঁর স্ত্রীদের সামনে দাঁড় করিয়ে ঢাল হিসেবে বা অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করছিল—

স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে।

ইন্দ্র অবশ্য এই কৌশলকে পাত্তাই দিলেন না। বরঞ্চ নমুচির প্রিয়তমা দুই স্ত্রীকে অন্তঃপুরে রুদ্ধ করে রেখে নমুচির সঙ্গে যুদ্ধ করতে নামলেন। তবে ঠিক এই যুদ্ধেই নমুচির মৃত্যু ঘটেছিল কিনা, তা বক্তার বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় না। ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রগুলিতে অসুর নমুচিকে অনেকবারই 'দাস' বলা হয়েছে এবং গবেষকেরা অনেকেই 'দাস' শব্দটাকে দস্যুর সমার্থক বলেছেন।

এই কথার সূত্র ধরেই বলা যায় যে, শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় দেখা যাচ্ছে—নমুচি এক সময়ে ইন্দ্রের প্রাপ্য সোম হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সোমপান না পেয়ে ইন্দ্র একেবারে দুর্বল হয়ে যান, সোমহরণের মাধ্যমে নমুচি যেন ইন্দ্রের সমস্ত শক্তিই পান করে নিয়েছিলেন—

নমুচিনা ইন্দ্রস্য বীর্য্যং পীতম্।

শেষে দেবতাদের অনুরোধে অশ্বিনীকুমার-যুগল সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে সেই সোম পুনরুদ্ধার করে আনেন—

অশ্বিনৌ হ্যেনং নমুচেরধ্যাহরতাতামিতি শ্রুতেঃ।

টীকাকার মহীধর এই কথাগুলি বলেছেন কৃষ্ণযজুর্বেদীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, যেখানে বলা হয়েছে—অসুরপুত্র নমুচির কাছ থেকে যে সোম অশ্বিদ্বয় এনেছিলেন যা সরস্বতী ইন্দ্রের বলসঞ্চয়ের জন্য অভিষুত করেছিলেন, সেই দীপ্ত, শুদ্ধ, রসযুক্ত ও পরম ঐশ্বর্য্যপ্রদ সোম আমি এই যজ্ঞে ভক্ষণ করছি—

যমশ্বিনা নমুচেরাসুরাদধি
সরস্বত্যসুনোদ্ ইন্দ্রিয়ায়।
ইমং তং শুক্রং মধুমন্তমিন্দুং
সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি ॥

টীকাকার মহীধর কিন্তু মন্ত্রটাকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করছেন যেন এখানে নমুচির মৃত্যু হয়ে গেছে। ইন্দ্র সমুদ্রের পুঞ্জীভূত ফেনা দিয়ে নমুচির মস্তককে আঘাত করেছিলেন। তাঁর ছিন্ন-মস্তক দেহের রক্ত সোমের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলে সেই সোম রক্তবর্ণ বা রোহিত হয়ে গিয়েছিল। আর ইন্দ্র সেই রোহিত সোম পান করেছিলেন বলে তাঁর একটি নামও রোহিত। অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতী অবশেষে ইন্দ্রের রোগমুক্তি ঘটান এবং সোমকেও পুনরায় শুদ্ধ-শুক্র করে তোলেন—

তস্মিন্ হতে রুধিরমিশ্রঃ
সোমো জাতস্তং দেবাঃ পপুঃ,
তদভিভাষিন্যেষা ঋক্ . . .
সরস্বতী চ যং সোমমশ্বিভ্যাম্
আনীতম্ অসুনোৎ অভ্যষুণোৎ . . .
ইন্দ্রস্য বীর্য্যায় ভৈষজ্যায় বা।

ঋগ্‌বেদে অবশ্য নমুচির মৃত্যুর পর অশ্বিদ্বয়কে ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপান করতে দেখছি এবং সরস্বতী দেবীকেও এখানে নিকটেই দেখা যাচ্ছে। *[ঋগ্‌বেদ ১০.১৩১.৪, ৫]*

এখানেও অবশ্য নমুচিকে ইন্দ্র কীভাবে বধ করেছিলেন সেটা বলা নেই। যজুর্বেদে ইন্দ্রের নমুচি-বধের বৃত্তান্ত সামান্য একটু বিশদাকারে আছে বটে, কিন্তু খুব অল্প কথায় ঋগ্‌বেদে সেটা স্পষ্ট বলা হয়েছে। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রের অনেক কীর্তি একে একে উচ্চারণ করার পর বলা হল—তুমি জলের 'ফেন' দিয়ে নমুচির মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে মেরেছিলে এবং সমস্ত শত্রুদের তুমি মেরে ফেলেছিলে—

অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্র উদবর্তয়ঃ।
বিশ্বা যদজয়ঃ স্পৃধঃ ॥

ঠিক এইখানে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হচ্ছে—-ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করার পরে অন্যান্য অসুরদেরও পরাভূত করলেন, কিন্তু নমুচি নামক অসুরকে তখন কিছুই করতে পারলেন না। শেষে অনেক শক্তি প্রয়োগ করে নমুচিকে আক্রমণ করলেন। উভয়ে তখন মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু নমুচির আক্রমণে ইন্দ্র কাতর হয়ে পড়লেন। অবশেষে নমুচিই কৃপাপরবশ হয়ে ইন্দ্রকে বললেন—আমরা সন্ধি করি এখন, তারপর তোমাকে মুক্ত করবো। আর আমার শর্ত হল—আমাকে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দিয়ে মারতে পারবে না; দিনেও মারতে পারবে না, রাতেও না। এই অবস্থায় ইন্দ্র জলের ফেনা দিয়ে নমুচিকে মেরে ফেললেন। এই ফেনা শুষ্ক নয়, আর্দ্রও নয়। তখন রাত্রি-দিনের সন্ধি-কাল, প্রভাত সময়, সূর্য তখনও ওঠেনি অর্থাৎ তখন দিনও নয়, রাতও

নয়। রাত্রি-দিনের সেই সন্ধিতে ইন্দ্র জলের পুঞ্জীভূত ফেনা দিয়ে নমুচির মস্তক ঘুরিয়ে ছিন্ন করলেন—

ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা। অসুরান্ পরাভাব্য।
নমুচিমাসুরং নালভত। তং শচ্যাগৃহ্ণাৎ।
তৌ সমলভেতাম্।
সো'সম্মাদভিশুনতরো'ভবৎ।
সো'ব্রবীৎ। সন্ধাং সন্দধাবহৈ। অথ ত্বা বঃ
স্রক্ষ্যামি। ন মা শুষ্কেণ নার্দ্রেণ হনঃ ন
দিবা ন নক্তমিতি। স এতমপাং ফেনমসিঞ্চৎ।
ন বা এষ শুষ্কো নার্দ্রো ব্যুষ্টাসীৎ। অনুদিতঃ সূর্যঃ।
ন বা এতদ্দিবা ন নক্তম্। তস্যৈতস্মিল্লোঁকে।
অপাং ফেনেন শির উদবর্তয়ৎ।

[ঋগ্‌বেদ ২.১৪.৫; ৫.৩০.৭-৯; ৮.১৪.১৩ বাজসনেয়ী সংহিতা ১৯.৩৪ (মহীধরকৃত টীকা দ্রষ্টব্য); ১৯.৭১; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ১.৭.১.৬-৭, পৃ. ৩০৫]

☐ মহাভারতের এক স্থানে আমরা বৃত্রাসুরের প্রতি ইন্দ্রের ফেন-নিক্ষেপ দেখেছিলাম, কিন্তু মহাভারতের পূর্ব-পরম্পরায় বৃত্র বজ্রের দ্বারাই নিহত হয়েছিলেন, আর ফেনের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন নমুচি। এই সত্যটা কিন্তু স্পষ্টভাবে বলা আছে রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে। রাবণের ভ্রাতৃপ্রতিম খর-রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় রামচন্দ্র যখন খরের মাথা কেটে ফেললেন তখন উপমা দিয়ে বাল্মীকি লিখলেন—যেমন বৃত্রকে বজ্র নিক্ষেপ করে মেরেছিলেন ইন্দ্র, যেমন ফেন নিক্ষেপ করে ইন্দ্র নমুচিকে হত্যা করেছিলেন—

স বৃত্র ইব বজ্রেণ ফেনেন নমুচির্যথা।

রামায়ণ থেকে আরও একটা সত্যও সমর্থিত হয় যে, ইন্দ্রের সঙ্গে নমুচির একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধও হয়েছিল। কেননা ইন্দ্রপুত্র বা ইন্দ্রের তেজে উৎপন্ন বালীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হেরে গিয়েছিল, সেই দুন্দুভি নামের অসুরটি হিমালয় পর্বতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলে হিমালয় তাঁকে বলেছিলেন—তুমি ইন্দ্রপুত্র বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করো। ইন্দ্র যেমন নমুচির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছিলেন, তেমনই সেই মহাপ্রাজ্ঞ বালীই তোমার সঙ্গে বাহুযুদ্ধে সমর্থ—

* বালী নাম মহাপ্রাজ্ঞঃ শক্রপুত্রঃ প্রতাপবান্।
* দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাতুং তে নমুচেরিব বাসবঃ॥

রামায়ণের এই দুটি উল্লেখ ছাড়া অন্যত্র ইন্দ্রের সঙ্গে নমুচির উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র বড়ো যুদ্ধে বড়ো যোদ্ধা এবং তাঁর প্রতিপক্ষী যোদ্ধার শক্তিমত্তার সমত্ব বোঝানোর জন্য। মহাভারতেও প্রায় একই রকম ভাবে ইন্দ্র-নমুচির যুদ্ধের খবর পেয়েছি দুই পক্ষেরই যুদ্ধ-ক্ষমতার নিরিখে, কিন্তু এখানে সর্বক্ষেত্রেই ইন্দ্রের শক্তিমত্তার আধিক্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখানে এটাই যে, রাজনীতির উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বলবান শত্রুর সঙ্গে ছলনা করাটা এখানে অন্যতম নীতি হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে স্বয়ং দুর্যোধনের মুখে এবং সেখানেই আসছে নমুচির উদাহরণ। পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁদের ঐশ্বর্য্য এবং শক্তিমত্তার বাড়বাড়ন্ত দেখে ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রায় তিরস্কার করেই বলেছেন যে, ঐশ্বর্য্য এবং ধনলাভের জায়গায় ছলনা-বঞ্চনাও রাজধর্ম হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত হলেন ইন্দ্র। তিনি নমুচির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে ছিলেন ভালো সময়ে। কিন্তু যখন তাঁর নিজের প্রয়োজন হয়েছে, তখন তিনি সন্ধির শর্ত ভেঙে নমুচির গলা কেটে ফেলেছিলেন—অতএব শত্রুনিধনের প্রয়োজনে এটাও এক সনাতন পন্থা—

অদ্রোহে সময়ং কৃত্বা চিচ্ছেদ নমুচেঃ শিরঃ।
শক্রঃ সাভিমতা তস্য রিপৌ বৃত্তিঃ সনাতনী॥

অন্যদিকে মহাভারতের শল্যপর্বে ইন্দ্র-নমুচির বিসংবাদের তথ্য উল্লেখ করে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, এইরকম ছলনা-বঞ্চনায় দেবতাও পাপে লিপ্ত হন। এখানে বলরামের সরস্বতী-তীর্থ-ভ্রমণের প্রসঙ্গে একটি তীর্থের নাম এসেছে যার নাম অরুণা-সঙ্গম তীর্থ, অর্থাৎ যেখানে সরস্বতী আর অরুণা নদীর সঙ্গম হয়েছে। এই তীর্থের মাহাত্ম্য বলার সময় মহাভারতের কথকঠাকুর বৈশম্পায়ন জানাচ্ছেন যে, এক সময় ইন্দ্র এবং নমুচির বিবাদ লেগেই থাকত। ঘটনাক্রমে একবার নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে সূর্যরশ্মির মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন ইন্দ্র নিরুপায় হয়ে নমুচির সঙ্গে সন্ধি করলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইন্দ্র এটাও স্বীকার করে নিলেন যে, না রাত্রিতে, না দিনের বেলায় কোনো শুষ্ক বস্তু দিয়েও তিনি নমুচিকে আঘাত করবেন না, কোনো আর্দ্র বস্তু দিয়েও আঘাত করবেন না। ইন্দ্র নমুচিকে বন্ধুত্বের দিব্য দিয়ে এই শর্ত মেনে

নিলেন। তারপর একদিন ইন্দ্র সমুদ্রের মধ্যে নীহার-সদৃশ সামুদ্রিক ফেনা দেখতে পেয়ে সেই ফেনের আঘাতে নমুচির শিরচ্ছেদ করলেন। ইন্দ্র এই অন্যায় আচরণ করার ফলে নমুচির ছিন্নশির ইন্দ্রকে ধাওয়া করে নিয়ে চলল। সেই ছিন্নমুণ্ড কথা বলে ইন্দ্রকে ধিক্কার দিচ্ছিল — তুমি কথা দিয়ে কথা রাখোনি, তুমি বন্ধুকে হত্যা করেছো। এই কথা বার বার শুনে ইন্দ্র ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর দুর্গতির কথা জানালেন। ব্রহ্মা তখন ইন্দ্রকে অরুণাসঙ্গম তীর্থে যথা নিয়মে যাগযজ্ঞ করে স্নান করতে বললেন। ইন্দ্র যাগযজ্ঞ করে সরস্বতী-অরুণা সঙ্গমে স্নান করে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলেন, কেননা নমুচি কিন্তু প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত এক দানব। তিনি বিখ্যাত ময়-দানবের ভাইও বটে এবং শুধু নমুচির ভাই বলে খাণ্ডবদহনের কালে অর্জুন ময় দানবকে মারেননি, অগ্নিও তাঁকে দগ্ধ করেননি। ফলত নমুচিকে বধ করে ইন্দ্র ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ করেছিলেন। তীর্থে স্নান করে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলেন। ওদিকে নমুচির সেই ছিন্ন মুণ্ডটিও সরস্বতী-অরুণার জলের তলায় ডুবে গেল এবং নমুচিও মৃত্যুর পর পুণ্যলোক লাভ করলেন।

[রামায়ণ ৩.৩০.২৮; ৪.১১.২১-২২; ৭.৬.৩৪-৩৮;
মহা (k) ১.৬৫.২২-২৬; ১.২২৮.৪৪-৪৫;
২.৫৫.১৩; ৯.৪৩.৩১-৪৫; (হরি) ১.৬০.২২-২৬;
১.২২০.৪৪-৪৫; ২.৫৩.১৩; ৯.৪০.৩১-৪৫]

□ ইন্দ্রের আর এক কীর্তি হল বলাসুর-বধ। বেদে এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে বলাসুরের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বারবারই এটা বলা হয় যে, ইন্দ্র বল নামক অসুরের গুপ্ত গুহা থেকে অপহৃত গোধন উদ্ধার করে এনেছিলেন—

যো গা উদাজদপধা বলস্য।

ইন্দ্র যেভাবে বলাসুরের গুহা-অবরোধ থেকে গোরু উদ্ধার করেছিলেন, সেই কাহিনী ঋগ্‌বেদের নানা জায়গা জোরাতালি দিয়েই তৈরি করা যায়। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইন্দ্র গাভীহরণকারী বল নামে এক অসুরের গহ্বর উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। এই সাধারণ কথাটা আরও একটু বিশদ হয়ে ওঠে অন্য একটি মন্ত্রে, যেখানে বলা হচ্ছে—আঙ্গিরস ঋষিদের স্তবে তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বল নামক অসুরকে বিদীর্ণ করছিলেন, পর্বতের দৃঢ়ীকৃত দ্বার তিনি উদঘাটিত করেছিলেন—

ভিনদ্‌বলম্ অঙ্গিরোভির্গৃণানো/
বি পর্বতস্য দৃংহিতান্যৈরৎ।

বলকে ইন্দ্র কেন বধ করেছিলেন, তা সবচেয়ে সম্পূর্ণ করে বলা হয়েছে একটি মন্ত্রে। এখানে বলা হচ্ছে—এই ইন্দ্র পর্বতের মধ্যে গুপ্তভাবে রাখা গোরুগুলিকে উদ্ধার করার ইচ্ছেতে যাগানুষ্ঠানকারী অঙ্গিরাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তারপর তাঁদের স্তবস্তুতিতে উত্তেজিত হয়ে বলের দুর্ভেদ্য পর্বত ভগ্ন করে পণিদের তর্জন-তিরস্কার করেছিলেন—

অয়মুশানঃ পর্যদ্রিমুস্রা
ঋতধীতিভি ঋতযুগ্যজানঃ।
রুজদরুগ্ণং বি বলস্য
সানুং পণির্বচোভিরভি যোধদিন্দ্রঃ॥

পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, বলাসুরের এই কাহিনীর সঙ্গে সরমা, পণি এবং আঙ্গিরস ঋষিদের যোগ আছে। ঘটনাগুলি যদি ঋগ্‌বেদ থেকেই সাজানো যায়, তাহলে একটা কথা মনে রাখতেই হবে যে, বল নামক অসুরটি আঙ্গিরস গোষ্ঠীর ঋষিদের গোধন চুরি করে এমন সুরক্ষিত স্থানে-সম্ভবত কতগুলি পর্বতের মধ্যে কোনো সমস্থানে সেই গোরুগুলিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, যাতে মনে হয় বল নিজেই গোরুগুলিকে রক্ষা করছে, সে নিজেই সেই গোধনের অধিকারী। ঋগ্‌বেদে এই কারণেই তাঁকে—রক্ষিতারং দুঘানাম্—বলা হয়েছে। ঋগ্‌বেদের এই সূক্তে এই মন্ত্রেই বলা হয়েছে—ইন্দ্র বলের পার্বত্য অবরোধ ভেদ করে পণিদের কাঁদালেন এবং গাভীগুলি কেড়ে নিলেন—

অরোদয়ৎ পণিম্ আ গা অমুষ্ণাৎ।

অর্থাৎ বলাসুর বধের ঘটনায় পণিরাও পার্শ্বচরিত্র।

ঋগ্‌বেদের এই সূক্তে অঙ্গিরার বংশধর বৃহস্পতি ইত্যাদি আঙ্গিরস ঋষিদের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে—

বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য
ধাম প্রথমং মনন্ত।

বলাসুর সম্ভবত এই আঙ্গিরস গোষ্ঠীর ঘরে রাখা গাভীগুলিকেই হরণ করে নিয়ে গিয়ে একটি গভীর পার্বত্য অঞ্চলে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল

এবং গোরুগুলির কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় আঙ্গিরস ঋষিদের আকুল প্রার্থনায় উত্তেজিত হয়ে—

ভিনদ্ বলমঙ্গিরোভি র্গৃণানো।

[ঋগ্বেদ ২.১৫.৮]

—ইন্দ্র দেবতাদের শিকারী কুকুরী সরমাকে প্রথমে পাঠালেন গাভীগুলির প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য। সরমাকে দেবশুনী বা দেবতাদের কুকুর বলেছেন নিরুক্তকার যাস্ক।

আমরা ঋগ্বেদের অন্য একটি সূক্তে পণিদের সঙ্গে সরমার কথোপকথন থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পণিরাই প্রধানত এই গাভীগুলি 'রসা' নামে এক পার্বত্যস্থানে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতে পণিরা হল এক ধরনের অসুর যারা দেবতাদের গোরক্ষায় নিযুক্ত থাকত। এই পণিরাই আঙ্গিরস ব্রাহ্মণদের গোধন হরণ করে 'রসা' নামক একটি স্থানে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল এবং সেই গোরুগুলিকে পাহারা দিত এই বলাসুর—

অথ বৈ পণয়ো নামাসুরা দেবানাং
গোরক্ষা আসুঃ।
তাভিরহাপাতস্থুঃ। তা হ রসায়াং নিরুধ্য
বলেনাপিদধুঃ।

এই পণিরা অবশ্য যাস্কের মতে বণিক্ অর্থাৎ যারা বাণিজ্য করে। কেননা 'পণি' থেকেই 'পণ্য' শব্দটা এসেছে। পণ্ডিতদের মতে তাঁর আর্য ভাবধারা বাইরে থাকা 'niggard'. সরমা দেবশুনী এই পণিদের কাছেই গোধনের সন্ধান পায়। পণিরা তার পরিচয় জানতে চাইলে সে ইন্দ্রের দূতী বলেই নিজের পরিচয় দেয় এবং জানায় যে, সে অপহৃত গোধনের খোঁজেই এসেছে এবং যুদ্ধে অপরাজেয় ইন্দ্র অবশ্যই এই গোধন উদ্ধার করবেন। পণিরা সরমাকে কয়েকটি গাভী দিয়ে হাত করতে চায়, অস্ত্রশস্ত্রের ভয় দেখায় এবং সুরক্ষিত পর্বতের মধ্যে গাভীদের ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারেও চরম পন্থার কথা তারা জানিয়ে দেয় সরমাকে। সরমাও উলটে আঙ্গিরস ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৃহস্পতির ভয় দেখায় পণিদের, ভয় দেখায় ইন্দ্রেরও।

*[ঋগ্বেদ ২.১২.৩; ১.১১.৫; ২.১৫.৮;
৬.৩৯.২; ৬.৬৭.১-৬; ১০.১০৮.১-১১;
নিরুক্ত (ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস) ১.১৭, পৃ. ১৪৬;
জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (মহর্ষি) ২.৪৪০, পৃ. ৫৩৭]*

□ এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—এই যে পণিদের বলা পার্বত্য স্থান যা 'রসা' নদীর পারে অবস্থিত—

কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি।

এবং যে নদী পার হওয়াই যায় না, সেখানে সেই অপহৃত গাভীগুলি আছে, যা পর্বতের দ্বারা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত—অদ্রিবুধ্ন—সেটাই বলের দুর্ভেদ্য দুর্গ। হয়তো সেখানে আরও একটি স্থান ছিল পার্বত্য গুহার মতো যার দ্বার বন্ধ করা থাকত একটি পাথর দিয়ে। এমন না হলে এই উচ্চারণ হত না যে, ইন্দ্র বলের পুর-বিদারণ করেছেন এবং তাঁর নগর এবং নগরদ্বার উদ্ঘাটন করেছেন—

ইত্থা বদদ্ভি বলম্ অঙ্গিরোভিঃ
পুরো বি দুরো অস্য বিশ্বাঃ।

[ঋগ্বেদ, ৬.১৮.৫]

ভিনদ্ বলস্য পরিধিরিব ত্রিতঃ।

[ঋগবেদ, ১.৫২.৫]

□ এটা ঠিকই যে বলের গাভী-লুকোনোর দুর্গটিকে 'বিল' কিংবা 'ফলিগ'-নামে একটি চর্মপেটিকার তুলনা করে বলের শক্তিকে খর্ব করে বা কম করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন—

'ত্বং বলস্য গোমতো'পাবরদ্ রিবো বিলম্।

[ঋগ্বেদ ১.১১.৫; ১.৬২.৪]

বলের দুর্গে পণিদের রাখা গোরুগুলি উদ্ধার করার জন্য ইন্দ্র শেষ পর্যন্ত বলের দুর্গ বিদারণ করেছিলেন, নাকি সে নিজেই ভয়ে দুর্গের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গাভীদের মুক্ত করেছিল, সে-কথা একটি মন্ত্রবর্ণের বক্তব্য হয়ে ওঠে বটে।

[ঋগ্বেদ ৩.৩০.১০]

কিন্তু বল এবং ইন্দ্রের এই সমস্ত দ্বন্দ্বটাই একটা রূপক বলে চিহ্নিত করেছেন স্বয়ং সায়নাচার্য। তাঁর মতে মেঘ কিংবা জলই বলের গাভী। বৃত্রবধের প্রসঙ্গে সায়ন ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে জলের সঙ্গে পণিদের দ্বারা অপহৃত গাভীদের তুলনা দেন—

নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।

[ঋগ্বেদ ১.৩২.১১]

—মেঘকেই যেমন বৃত্র বলে বুঝেছেন, তেমনই বল-নামক অসুরকেও তিনি বৃষ্টি-অবরোধকারী এক দেববিরুদ্ধ শক্তি বলে মনে করেন। *[সায়ন-টীকা ঋগ্বেদ, ১.৬.৫]*

আসলে মেঘই বলের গাভী, ইন্দ্র তাদের

উদ্ধার করে দোহন করেছেন, মানে বৃষ্টি দিয়েছেন। যাস্কের নিরুক্তে বৃত্র-নামক অসুরকে সরাসরি মেঘ বলা হয়—

তত্র কো বৃত্র? মেঘ ইতি নৈরুক্তা।

[নিরুক্ত ২.১৬]

বল কিংবা বলের গুহাও যে অন্ধকার মেঘ কিংবা অবরুদ্ধ জল, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর একটা কথা ইন্দ্র বল-নামক অসুরকে হত্যা করেছেন—এ-কথা না বলে বলের পাষাণ-দুর্গ ভেদ করেছেন (ভিদ্-ধাতু), বিদারুণ করেছেন (দৃ-ধাতু), কিংবা ভেঙে দিয়েছেন (রুজ্-ধাতু) এই ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহার করায় ইন্দ্র 'বলভিদ্', 'বলংরুজঃ' বলে যেমন বেদের মধ্যে চিহ্নিত হয়েছেন, তেমনই মহাভারতে একেবারে 'বলভিদ্' নামটাই তাঁর বিখ্যাত হয়ে গেছে।

*[ঋগ্‌বেদ, ৩.৪৫.২; ২.১২.৩;
মহা (k) ১.১৯.৩১; ১.৩৬.২৩; ৩.১২৪.১৪;
(হরি) ১.১৫.৩১; ১.৩১.২৩; ৩.১০৩.১৪]*

□ মহাভারতে অর্জুন যখন কর্ণবধের উদ্যোগ করছেন, তখন ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের সঙ্গে এই তুলনাই করা হয়েছে যে, পুরাকালে ইন্দ্র যেমন বল-নামক অসুরকে বিদারণ করার জন্য ধাবিত হয়েছিলেন, অর্জুনও তেমনই কর্ণবধের উদ্দেশ্যে দ্রুত গমন করতে লাগলেন—যথা মরুত্বান্ বলভেদনে পুরা। কাজেই 'বলভেদন' হিসেবেই ইন্দ্র মহাকাব্যে চিহ্নিত।

[মহা (k) ১.৭৭.৯; (হরি) ১.৫৭.৯]

□ কৃষ্ণকে যেমন মধুসূদন অর্থাৎ মধুদৈত্যহন্তা বলা হয়েছে, তেমনই বহুবার ইন্দ্রকে 'বলসূদন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বল-বিদারণকারী ইন্দ্র বলহন্তা হয়ে গেছেন মহাভারতে। ইন্দ্র এই পৃথিবীতে কী কী করেন এই প্রশ্নে ঋষিরা জানিয়েছেন— ইন্দ্র ভূতবর্গের মধ্যে বল, তেজ আধান করেন, প্রজাদের সুখ দেন, তুষ্ট হলে কামনার ধন দেন, কিন্তু লোক শাসনের ক্ষেত্রে তিনি 'বলসূদন' অর্থাৎ যেভাবে তিনি বল-নামক অসুরকে শাস্তি দিয়েছিলেন, সেই ভাবে শাস্তি দেন।

*[মহা (k) ১.২৫.৭; ১.২১১.২৮; ৩.১৯৩.১৬;
৩.২২৯.৮-১০; ৫.১৬.১৩; ১২.২২৮.২২;
(হরি) ১.২১.৭; ১.২০৪.২৯; ৩.১৬৩.১৫;
৩.১৯১.৮-১০; ৫.১৬.১৩; ১২.২২৬.২৯]*

□ মহাকাব্য মহাভারতে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনায়ুর গর্ভে চারজন বিখ্যাত অসুর-পুত্রদের মধ্যে বল অন্যতম এবং তিনি বিখ্যাত বৃত্রাসুরের ভাই—

দনায়ুষঃ পুনঃ পুত্রাশ্চত্বারো' সুরপুঙ্গবাঃ।
বিক্ষরো বলবীরো চ বৃত্রশ্চৈব মহাসুরঃ॥

মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, বল পরবর্তীকালে পাণ্ড্যরাজ্যের রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে এই পাণ্ড্য রাজ্যের অবস্থিতি ছিল।

*[মহা (k) ১.৬৫.৩৩; ১.৬৭.৪২-৪৩; ২.২৩.৮;
৩.১৬৮.৮১; ৫.১৬.১৪; ৬.৪৫.৪২; ৭.১৪.৪৮;
৭.৩০.৯; (হরি) ১.৬০.৩৩; ১.৬২.৪২-৪৩;
২.২২.৮; ৩.১৪১.৮২; ৫.১৬.১৪; ৬.৪৫.৪৫;
৭.১২.৪৮; ৭.২৮.৯; মার্কণ্ডেয় পু. ১১৭.৮;
কালিকা পু. ৩৪.৫৯-৬০]*

ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র বল-নামক অসুরকে অথবা তাঁর দুর্গ বিদারণ করেছিলেন, এই ঘটনার বিপরীতে বলও ইন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল কিংবা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল, তার আভাসমাত্র আছে। কিন্তু মহাভারতে ভীমকে একই প্রতিরূপ চেষ্টায় জরাসন্ধ আক্রমণ করছেন এখানে উপমাটা কিন্তু ইন্দ্রকে যেভাবে বলাসুর আক্রমণ করেছিল—

প্রত্যুদ্‌যযৌ মহাতেজাঃ শক্রং বল ইবাসুরঃ।

[মহা (k) ২.২৩.৮; (হরি) ২.২২.৮]

কিংবা দেবসেনাদের যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন বল নামক অসুর—

দেবসেনাং যথা বলঃ—

সেইভাবে রাক্ষস অলম্বুষ আক্রমণ করেছিল পাণ্ডবদের।

[মহা (k) ৬.১০০.৩২; (হরি) ৬.৯৬.৩১]

মহাভারতে দনায়ুর চার পুত্রের মধ্যে বল এবং বৃত্র দু-জনেই আছেন, তাঁদের সহোদর ভ্রাতৃত্বের কথাও সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু বলের প্রভাব এবং শক্তির নিরিখেই হোক, অথবা ইন্দ্রের অধিক বলশালিতা প্রমাণ করার জন্যই হোক, বল অনেক জায়গাতেই বৃত্রের সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত হয়েছেন ইন্দ্রের 'এপিথেট' হিসেবে—

প্রহসন্ বলবৃত্রহা।

[মহা (k) ৩.১৬৮.৭০; (হরি) ৩.১৪১.৭১]

নিবাত-কবচকে বধ করার জন্য অর্জুন একখানি রথ পেয়েছিলেন ইন্দ্রের কাছে, সেই রথে চড়ে ইন্দ্র যে-সব অসুর দমন করেছিলেন, তাঁদের নাম করার সময় আবারও বল এবং বৃত্রাসুর এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছেন—

নমুচিং বল-বৃত্রৌ চ প্রহ্লাদ-নরকাবপি।

[মহা (k) ৩.১৬৮.৮১; (হরি) ৩.১৪১.৮২]

বৃত্রাসুরকে আমরা চরমতম 'ইন্দ্রশত্রু' বলে জানি এবং তাঁকে পর্যুদস্ত করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল, তাও আমরা জানি। কিন্তু বল-নামক অসুর বৃত্রের ভাই—তাঁকে হত্যা করার জন্যও ইন্দ্রকে কম বেগ পেতে হয়নি। কৌরব-পক্ষের এক বিরাট যোদ্ধা—তাঁর নাম সুদর্শন। সাত্যকির সঙ্গে তাঁর যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন বলা হয়েছে—বৃত্র আর ইন্দ্রের যুদ্ধ চলছে যেন—বৃত্রেন্দ্রয়োর্যুদ্ধম্। অবশেষে সাত্যকি যখন বীর সুদর্শনের গলা কেটে ফেললেন ভল্ল দিয়ে, তখন বলা হল—ঠিক যেমন পুরাকালে ইন্দ্র অত্যন্ত বলবান বল-নামক অসুরের গলা কেটে ফেলেছিলেন যুদ্ধের সময়—

ভ্রাজিষ্ণু বক্তুং নিচকর্ত দেহাৎ।
পুরা যথা বজ্রধরঃ প্রসহ্য/
বলস্য সংখ্যে'তিবলস্য রাজন্।

[মহা (k) ৭.১১৮.১৫; (হরি) ৭.১০২.১৫]

□ বেদে এবং মহাভারতে বলাসুরকে যেভাবে হত্যা করেছিলেন ইন্দ্র, তার থেকে একেবারেই একটা অন্যরকম বিবরণ আমরা পাই পদ্ম পুরাণে। এখানে দেখা যাচ্ছে— বলাসুর একজন ব্রহ্মচারী তপস্বীর বেশে কৃষ্ণাজিনে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর দণ্ডধারণ করে তপস্যা করতে বসেছিল। সন্ধ্যাবন্দনায় রত বলাসুরকে দেখে ইন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বজ্র নিক্ষেপ করে মেরে ফেলেন বলাসুরকে—

অমলেনাপি পুণ্যেন ব্রহ্মচর্যেণ তেন সঃ।
সাগরস্যোপকণ্ঠে তং সন্ধ্যাসনমুপাগতম্॥
জপমানং সুশান্তং তং দদৃশে পাকশাসনঃ।
বজ্রেণ পাটয়ামাস দেবেন্দ্রো'সৌ বলং তদা॥

[পদ্ম পু. (ভূমিখণ্ড) ২৩.২৬-৪৩]

□ পাক নামে আর এক অসুরের কথা পুরাণে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সবিস্তারে প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারতে ইন্দ্রকে 'পাকশাসন' নামে সম্বোধন করা হয়েছে বহুবার, কিন্তু কেমন করে পাক নামক দৈত্য বা অসুরকে বধ করলেন ইন্দ্র, তা খুব একটা পাওয়া যায় না। বামন পুরাণের এক জায়গায় দেখি—অন্ধাসুরের পরামর্শমত অসুরদৈত্যরা সব পাতালের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মলয়-পর্বতের শোভা দেখে সেইখানেই তাঁরা বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং প্রাথমিক উত্তেজনায় তাঁরা সেই পর্বতে সুখ-সম্ভোগে মত্ত হলেন। এই অবস্থায় সমস্ত পূজনীয় দেবতাদের উদ্দেশে তাঁরা গালাগালি দিতে লাগলেন। ভগবান মহাদেব দৈত্য-অসুরদের এই অবমাননায় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে মলয়পর্বতে পাঠালেন। ইন্দ্র এসে অসুরদের উদ্দেশে যুদ্ধাহ্বান জানালেন। যুদ্ধ আরম্ভ হলে ময় ইত্যাদি দৈত্যাসুরদের বাণাচ্ছন্ন করার পর ইন্দ্র তীক্ষ্ণ একটি বাণে 'পাক' নামক দানবকে মেরে ফেললেন। 'পাক' নামক দানবকে বধ করেছিলেন বলেই ইন্দ্রের এক নাম পাকশাসন—

ততো বাণৈরবচ্ছাদ্য ময়াদীন্ দানবান্ হরিঃ।
পাকং জঘান তীক্ষ্ণাগ্রৈর্মার্গণৈঃ কঙ্কবাসসৈঃ॥
তত্র নাম বিভুর্লেভে শাসনাচ্চ শরৈর্দৃঢ়ম্।
পাকশাসন ইত্যেবং সর্বামরপতির্বিভুঃ॥

[বামন পু. ৭১.৩-১৪]

□ ইন্দ্রের আর এক কীর্তি হল—তিনি সমস্ত পর্বতগুলির পক্ষচ্ছেদ করে তাদের স্থির করেছিলেন। এ-বিষয়ে রামায়ণে দেখা যায়—হনুমান যখন সীতার অন্বেষণে সাগর লঙ্ঘন করছেন, তখন সমুদ্র মধ্যস্থিত মৈনাক পর্বত নিজেকে বর্ধিত করে হনুমানকে বিশ্রাম নিতে বললেন পর্বতের শিখরদেশে। এই সময়ে মৈনাক পর্বত পুরাকালের বৃত্তান্ত শুনিয়ে বলে যে, পূর্বকালে সত্যযুগে সমস্ত পর্বতেরই পাখিদের মতো পাখা ছিল। একসময় পর্বতেরা গরুড়ের মতো দশ দিকে উড়ে বেড়াতে লাগল। পর্বতদের আকাশে উড্ডীন চেহারা দেখে ঋষিরা, দেবতারা এবং মর্ত্যবাসী সমস্ত প্রাণীই এই ভয় পেলেন যে, কখন তাঁদের মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়ে। পর্বতদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে সহস্রাক্ষ, শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্র নিক্ষেপ করলেন এবং শত-সহস্র পর্বতের পক্ষ ছেদন করলেন।

পূর্বং কৃতযুগে তাত পর্বতাঃ পক্ষিণো'ভবন্।
তে'পি জগ্মুর্দিশঃ সর্বা গরুড়া ইব বেগিনঃ ॥
ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবসঙ্ঘাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূতানি চ ভয়ং জগ্মুস্তেষাং পতনশঙ্কয়া ॥
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্বতানাং শতক্রতুঃ।
পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজ্রেণ ততঃ শতসহস্রশঃ ॥

পর্বতসমূহের এই পক্ষচ্ছেদনের কথা রামায়ণে কিছু নতুন নয়। ঋগ্‌বেদেই এ-কথা বলা আছে যে, ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা পর্বতকে পর্বে পর্বে ছিন্ন করেছেন—

ত্ব তমিন্দ্র পর্বতং মহামুরং/
বজ্রেন বজ্রিন্ পর্বশশ্চকর্তিথ।

সায়নাচার্যের মতে পর্বত শব্দের অর্থ পর্বযুক্ত মেঘ অথবা বৃত্রাসুর, কেননা বৃত্রও তো মেঘরূপে কল্পিত এবং একটি ঋকে দেখা যাচ্ছে যে, ইন্দ্র বৃত্রকেও পর্বে পর্বে বিভক্ত করে মেরে ফেলেছিলেন, মেঘ-বৃত্র এইভাবে আঘাত লাভ করেই বর্ষণের ধারা মুক্ত করেছে—

ভি বৃত্রং পর্বশো রুজৎ।

পর্বতকে এইভাবে ভেদ করেছিলেন বলেই ইন্দ্রের এক নাম গোত্রভিৎ। গোত্র মানে পর্বত, গোত্র মানে বংশ এবং গোত্র মানে মেঘ— টীকাকার মহীধর এই অর্থ করেছেন শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার টীকায়—

গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুম্।

মেঘকে যিনি ভেদ করেন, তিনি গোত্রভিৎ। তিনি ইন্দ্র। ইন্দ্র উরন্ত মেঘ একত্র করে অর্থাৎ পর্বতের পক্ষচ্ছেদ করে তাদের স্থির করেন বর্ষণের জন্য—

স প্রাচীনান্ পর্বতান্ দৃংহদোজসা।

[রামায়ণ ৫.১.১১৭-১১৯;
ঋগ্‌বেদ ১.৫৭.৬; ৮.৬.১৩; ২.১৭.৫;
বাজসনেয়ী সংহিতা (Weber) ১৭.৩৮]

□ ইন্দ্রের এত তেজ, এত শক্তি, এত বহুমান কিন্তু মহাকাব্য-পুরাণের কালে থাকেনি। যে মহাসুর বৃত্রকে বধ করে তিনি 'বৃত্রঘ্ন' 'বৃত্রহা' উপাধি লাভ করেছিলেন, সেই ইন্দ্র কিন্তু মহাভারতে বৃত্রাসুরের ভয়ে মুহ্যমান। শেষে বিষ্ণুতেজে তিনি শক্তিলাভ করেন এবং বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু বৃত্রের গর্জনে ভীত হয়ে তিনি কুলিশ বা বজ্র নিক্ষেপ করেই প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যান কোনো ক্রমে—

* বৃত্রে বিবর্ধমানে চ কশ্মলং মহদাবিশৎ।
* স্বতেজো ব্যদধচ্ছক্রে বলমস্য বিবর্ধয়ন্।
* তস্মিন্ হতে দৈত্যবরে ভয়ার্তঃ
শক্র প্রদুদ্রাব সরঃ প্রবেষ্টুম্।

কতটা খারাপ অবস্থা হলে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র বৃত্রাসুরকে হত্যা করে ফেললেও তিনি ভাবলেন যে, তাঁর হাত থেকে বজ্র নিক্ষেপ করা হয়নি এবং বৃত্রাসুরও মারা যাননি—

বজ্রংস মেনে ন করাদ্ বিমুক্তং
বৃত্রং ভয়াচ্চাপি হতং ন মেনে।

দেবীভাগবত পুরাণে ইন্দ্র প্রথমে বৃত্রের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান এবং পরে অন্য এক যুদ্ধের সময় বৃত্র হঠাৎ ইন্দ্রকে মুখের মধ্যে পুরে টপ করে গিলে ফেলেন—

শক্রং জগ্রাহ সহসা বৃত্রঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
অপাবৃত্য মুখে ক্ষিপ্তা স্থিতো বৃত্রঃ শতক্রতুম্ ॥

ভাগবত পুরাণে আমরা দেখেছি—বৃত্রের মহিমাতেই ইন্দ্রের গৌরব আচ্ছন্ন। ইন্দ্র এখানে শতপর্ব বজ্রের আঘাতে বৃত্রের দুই হাত কেটে ফেলেছিলেন—এই অবস্থাতেও বৃত্র তাঁকে হাঁ করে গিলে ফেলেছিলেন। ইন্দ্র তাঁর কুক্ষি ভেদ করে বেরিয়ে এসেই বজ্র দিয়ে তাঁর পর্বত-সদৃশ মাথাটি কেটে ফেলেন, তবে সেই মাথা কাটতে তাঁর পূর্ণ সংবৎসর প্রায় তিনশ ষাট্ দিন লেগেছিল—

বজ্রস্তু তৎকন্ধরমাশুবেগঃ
কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্তমানঃ।
ন্যপাতয়ৎ তাবদহর্গণেন
যো জ্যোতিযাময়নে বার্ত্রহত্যে ॥

[মহা (k) ৩.১০১.৮-১৫; ৩.১০১.১৬;
(হরি) ৩.৮৬.৮-১৫; ৩.৮৬.১৬;
দেবীভাগবত পু. ৬.৪.২৮-২৯;
ভাগবত পু. ৬.১২.৩৩]

□ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্যবত্তা, শক্তি, ক্ষমতা থেকে যে বিরাট একটা চ্যুতি ঘটে গেল ইন্দ্রের জীবনে এবং যেটাকে দেবরাজ ইন্দ্রের বৈদিক আড়ম্বর থেকে মহাকাব্যিক পতন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে, তাতে ইন্দ্রচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল এটাই যে, তিনি নিজের পরিবর্তনশীল ইন্দ্রপদটাকে কীভাবে রক্ষা করবেন, সেই চিন্তাতেই বেশী নিমজ্জিত হলেন। এটা এমনই এক বৈশিষ্ট্য যে পরবর্তী কালে কালিদাসের মতো

নাট্যকার তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গ করতে পাঠানো ইন্দ্রের কথা বলার সময় মন্তব্য করছেন—অন্যের তপস্যা-সমধির ব্যাপারে দেবতারা সব সময়েই ভাবেন যে তাঁদের নিজের পদটিই এবার চলে যাবে—

অস্ত্যেতদ্ অন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্।

কালিদাস গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করে সমস্ত দেবতাদের নাম করলেও এই দেবতা যে ইন্দ্র তাতে কোনো সংশয় থাকে না। কেননা বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গ করার জন্য তিনিই অপ্সরা মেনকাকে পাঠিয়েছিলেন। মহাভারতে এ-ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা করে শকুন্তলা দুষ্যন্তকে নিজের বিচিত্র জন্মকাহিনী শুনিয়ে বলছেন—একসময় বিশ্বামিত্র মুনি উগ্র তপস্যায় রত হবার পর ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবলেন যে, তপস্যার প্রভাবে বিশ্বামিত্র তাঁকে ইন্দ্রপদ থেকেই বিচ্যুত করবেন—

তপসা দীপ্তবীর্যো'য়ং স্থানান্মাং চ্যাবয়েদিতি।

ভীত পুরন্দর শেষ উপায় হিসেবে মেনকাকে বললেন—অপ্সরা-সমাজে তোমার মতো গুণী আর দ্বিতীয় কে আছে? তা তুমি আমার একটা উপকার করো। তুমি কি জান—বিশ্বামিত্র এমন তপস্যা করছেন যে আমার মনটা ভয়ে কাঁপছে সব সময়—মম কম্পয়তে মনঃ। তা এই বিশ্বামিত্রের ভার আমি তোমার হাতেই সঁপে দিলাম মেনকা—

মেনকে তব ভারো'য়ং বিশ্বামিত্রঃ সুমধ্যমে।

এই ভার দেওয়ার অর্থ কী, মেনকা তা জানেন। ইন্দ্র অবশ্য সবিশদে বুঝিয়েও দিলেন—কী করতে হবে মেনকাকে। বললেন—আমার ইন্দ্রত্ব চলে যাবে, মেনকা! বিশ্বামিত্রের ঘোর তপস্যায় সব যাবে আমার। তুমি এখনই যাও সেই উগ্রতপা তপস্বীর কাছে, তাঁকে প্রলোভিত করো—

তং বৈ গত্বা প্রলোভয়।

যেভাবে পারো, রূপ-যৌবনের মাধুর্য্য প্রকাশ করেই হোক, হাত-পায়ের ভঙ্গিমাতেই হোক অথবা মধুর হাসে, মধুর ভাষে—রূপযৌবন-মাধুর্য-চেষ্টিত-স্মিত-ভাষণৈঃ—যেভাবেই হোক এই তপস্বীকে প্রলুব্ধ করে তাঁকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করতে হবে।

মেনকা বলেছিলেন—আপনি স্বয়ং যাকে দেখে ভয় পান, দেবরাজ আমি তাঁকে ভয় পাব না—

ত্বমপ্যুদ্বিজসে যস্য নোদ্বিজেয়মহং কথম্?

যিনি রাগলে সবাইকে ভস্ম করে দিতে পারেন, তপস্যার তেজে যিনি সবাইকে কম্পিত করে তোলেন—সেই আগুনের মুখে, সেই কালজিহ্বার করাল গ্রাসের মধ্যে আমার মতো এক রমণী কী করে প্রবেশ করবে—

হুতাশনমুখং দীপ্তং কথমস্মদ্‌বিধা স্পৃশেৎ?

মুশকিল হল, দেবরাজ ইন্দ্র মেনকার শরণাপন্ন হয়েছেন, স্বর্গরাজ্যের নিয়ন্তা এক রমণীর উপকার প্রার্থী। মেনকা তাই যত ভয়ই পান, অথবা যত অনিচ্ছাই তাঁর থাকুক, তাঁর পক্ষে দেবরাজকে 'না' বলার উপায় নেই। মেনকা তাই বললেন—আপনি বলছেন যখন, তখন আর না বলি কী করে? কিন্তু আপনি আমার বেঁচে ফেরার রাস্তাগুলো ঠিকঠাক খোলা রাখুন। আমি যখন বিশ্বামিত্রের সামনে আমার রূপ-যৌবন এবং মাধুর্য্যের বিলোভন সৃষ্টি করব, তখন বায়ুদেবতা যেন উতল হাওয়ায় আমার লজ্জাবস্ত্র উড়িয়ে নেন—

কামং তু মে মারুতস্তত্র বাসঃ/
প্রক্রীড়িতায়া বিবৃণোতু দেব।

ভালোবাসার দেবতা অঙ্গহীন অনঙ্গ যেন আমার কাজে সহায় হন, যেন সহায় হন ঋতুরাজ বসন্ত। ঋষিকে প্রলুব্ধ করার সময় বনফুলের সুগন্ধ যেন আমোদিত করে দেয় সমস্ত বনস্থলী—

বনাচ্চ বায়ুঃ সুরভিঃ প্রবায়াৎ।

বলা বাহুল্য, দেবরাজ রাজি হলেন মেনকার প্রস্তাবে। সদাগতি সমীরণ সাথী হলেন মেনকার। সর্বচিত্তহর মনমথন কামদেব এলেন বিশ্বামিত্রর মনে বাসনা তৈরি করার জন্য। ইন্দ্রের যোজনায় সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

[মহা (k) ১.৭১.২০-৪২; (হরি) ১.৮৫.২০-৪৪]

□ আমরা বোঝাতে চাইছি, ইন্দ্র মহাকাব্যের যুগে কত সাধারণ ভূমিকায় নেমে এসেছেন। এর আগে মহাভারতে ইন্দ্র যখন ত্রিশিরা বিশ্বরূপের ভয়ে ত্রস্ত, তখনও কিন্তু তিনি যুদ্ধোদ্যোগের আগে অপ্সরাদেরই পাঠিয়েছিলেন ত্রিশিরার তপোভঙ্গ করার জন্য। এখানেও তিনি ইন্দ্রপদ হারানোর ভয়েই অপ্সরাদের প্রলোভন সৃষ্টি করেছিলেন—

তস্য দৃষ্ট্বা তপোবীর্যং সত্যং চামিততেজসঃ।
বিষাদমগমচ্ছক্র ইন্দ্রো'য়ং মা ভবেদিতি॥

আর এটা সত্য কথা যে, ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা-বিশ্বরূপও ইন্দ্রপদ অধিকার করার জন্যই তপস্যা করছিলেন—

ঐন্দ্রং স প্রার্থয়ৎ স্থানং বিশ্বরূপো মহাদ্যুতিঃ।

এইরকম একটি নয়, দুটি নয়, মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে বহু বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে যেখানে কারো বহুল যজ্ঞকর্ম দেখে অথবা কারো উগ্র তপস্যা দেখে ইন্দ্র অপ্সরাদের পাঠিয়েছেন তাঁদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছেন আপন ইন্দ্রপদের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য। আমরা দেখেছি—যে দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে ভবিষ্যতে বজ্র নির্মাণ করাবেন ইন্দ্র, সেই দধীচিও যখন পূর্বকালে তপস্যা করছিলেন, তখনও তাঁর তপস্যার ভয়ে ভীত হয়ে ইন্দ্র অপ্সরা অলম্বুষাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে প্রলুব্ধ করে তপোভঙ্গ করবার জন্য। একই ভাবে ভরদ্বাজ মুনির পুত্র যবক্রীতের তপস্যা নিবারণের জন্য ইন্দ্র নিজেই চেষ্টা করেছিলেন। এখানে একটাই সুবিধে ছিল যে, ইন্দ্র শেষ পর্যন্ত বুঝেছিলেন যে, যবক্রীত স্বল্প সময়ে বেদজ্ঞান লাভের জন্য তপস্যা করছেন, তাঁর ইন্দ্রত্ব লাভের প্রত্যাশী ছিলেন না তিনি। অন্যদিকে মহাভারতের আদিপর্বে দেখুন, গৌতম শরদ্বান ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও অস্ত্রবিদ্যার আসক্তিতে ধনুর্বেদে চরম অধিকার পাবার জন্য তপস্যা করছিলেন, ইন্দ্র কিন্তু তাতেই ভয় পেয়ে জানপদী নামে এক দেবকন্যাকে পাঠালেন শরদ্বানকে মুগ্ধ করার জন্য। আবার পুরাণের মধ্যে দেখা গেছে—ইন্দ্র স্বয়ং নর-নারায়ণ নামে দুই মহর্ষির তপস্যা নষ্ট করে দেবার জন্য অপ্সরাদের পাঠিয়েছেন নর-নারায়ণের আশ্রমে।

*[মহা (k) ৫.৯.৭-১১; ৯.৫১.৫-১০;
৩.১৩৫.৯৬-২৫; ১.১৩০.৫-৬;
(হরি) ৫.৯.৭-১১; ৯.৪৭.৫-১০;
৩.১১১.১৭-২৫; ১.১২৫.৫-৬;
মৎস্য পু. ৬১.২৪-২৬;
স্কন্দ (অবন্তী/অবন্তীক্ষেত্র) ৮.২৯-৪১]*

☐ ইন্দ্রপদ যাবার এই ভয়টাও খুব অমূলক নয়, কেননা স্বর্গের ইন্দ্র বারেবারেই ইন্দ্রপদ হারিয়েছেন। মহাভারতে তারকাসুর, মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুর, পদ্মপুরাণে অদিতির পুত্র বসুদত্ত—এঁরা সবাই স্বর্গের অধিকার লাভ করেছিলেন এবং সেটা ইন্দ্রকে সরিয়ে দিয়ে।

*[কালিকা পু. ৪৭ অধ্যায়;
পদ্ম পু. সৃষ্টি ৪২ অধ্যায়; পদ্ম পু. ভূমি ৫.১০৫-১০৭]*

পৌরাণিক সময়ে ইন্দ্রের বৈশিষ্ট্য মানেই এক ভোগসর্বস্ব দেবতা। ইন্দ্রত্ব মানেই ঐশ্বর্য্য এবং কামনার মোক্ষধাম। ইন্দ্রাণী বা শচী তাঁর একনিষ্ঠা পত্নী হলেও ইন্দ্রের স্ত্রীসম্ভোগ-প্রবৃত্তি তাতে অবরুদ্ধ হয় না। ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন অথবা কামনার সমস্ত উপকরণ উপভোগ করার মধ্যে ইন্দ্রের নাম বারবার এসেছে বেদ-মহাকাব্য-পুরাণে। এখানে স্বর্গের সীমা ছেড়ে মর্ত্যে অবতরণ করতেও কোনো দ্বিধা হয়নি তাঁর। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত হয়ে আছেন গৌতমপত্নী অহল্যা। মহর্ষি গৌতম ইন্দ্রের গুরু ছিলেন, কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও গুরুপত্নী অহল্যা তাঁর আক্রমণ থেকে বাদ যাননি এবং এ ঘটনা এতটাই বিখ্যাত ছিল যে, শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও তাঁকে অহল্যার উপপতি বা 'অহল্যায়ৈ জারঃ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। রামায়ণে ইন্দ্র যেভাবে গুরুপত্নী অহল্যাকে লঙ্ঘন করেছিলেন, তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। *[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৩.৩.৪.১৮]*

☐ রামায়ণে আছে—প্রজা সৃষ্টি করার পর পিতামহ ব্রহ্মা দেখলেন যে, তাদের মধ্যে পৃথক কোনো বিশেষত্ব নেই—না দর্শনে, না লক্ষণে, না রূপে—কোনো বিশেষত্বই নেই। সেই কারণে সমস্ত প্রজাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যত সৌন্দর্য্য ছিল, সেই সব বৈশিষ্ট্য একটি স্ত্রীলোকের মধ্যে নিবেশ করে ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃষ্টি করেন—

যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুদ্ধৃতম্।

[রামায়ণ ৭.৩৫.২১]

অহল্যা হলেন ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট এক সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী। 'হল' মানে বিরূপতা, এই শব্দের সঙ্গে 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় যোগ করলে হয় 'হল্য' অর্থাৎ যে রমণীর মধ্যে হল্য বা বিরূপতা নেই, তিনি 'অহল্যা'—

যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্তিতম্॥

[রামায়ণ ৭.৩৫.২৩]

জন্ম মুহূর্ত থেকেই দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার প্রতি কামাসক্ত ছিলেন এবং তাঁকে পত্নীরূপে মনে মনে বরণ করেছিলেন—

স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈবেতি পুরন্দর।

[রামায়ণ ৭.৩৫.২৫]

পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মনোভাব বুঝেই অহল্যাকে গৌতম ঋষির কাছে গচ্ছিত রাখেন এবং বহুকাল ঋষির কাছে থাকা সত্ত্বেও সর্বাঙ্গসুন্দরী অহল্যার প্রতি গৌতমের নিস্পৃহ আচরণ দেখে শেষপর্যন্ত তাঁকেই অহল্যার পতি হবার উপযুক্ত বলে মনে করলেন। গৌতম-ঋষির সঙ্গে অহল্যা মিথিলার নিকটবর্তী একটি উপবনে অনেক বৎসর ধরে তপস্যা করেছিলেন। অহল্যার প্রতি অদম্য কামনার আকর্ষণ থেকে ইন্দ্র মুক্ত হতে পারেননি। একদিন গুরু গৌতম তীর্থস্নানের জন্য আশ্রমের বাইরে গিয়েছিলেন। মুনি আশ্রমে নেই জেনে ইন্দ্র গৌতম মুনির বেশ, সাজসজ্জা জটা-চীর ধারণ করে অহল্যার সঙ্গে মিলনের জন্য আসেন। ইন্দ্র অহল্যাকে বললেন—মিলনকামী ব্যক্তি মিলনের জন্য ঋতুকালের অপেক্ষা করে না। আমি তোমার সঙ্গে এখুনি মিলিত হতে চাই। মহর্ষি গৌতম এমন ধর্মবিরুদ্ধ মিলন-প্রার্থনা করতে পারেন না—এটা অনুভব করেই অহল্যা গৌতমবেশী ইন্দ্রের দিকে চেয়ে তাঁকে গৌতম মুনির বেশধারী জানা সত্ত্বেও অহল্যা দেবরাজ-ইন্দ্রের রতি-কৌশল কেমন তা উপভোগ করার কৌতূহলবশেই তাঁর সঙ্গে মিলনে সম্মত হন—

মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ॥

[রামায়ণ ১.৪৮.১৯]

মিলনান্তে যে কোনো সময়ে গৌতমের আগমন আশঙ্কা করে অহল্যা ইন্দ্রকে চলে যেতে বললেন। মিলনতৃপ্ত ইন্দ্র কুটীর থেকে ফিরে যাবার পথে তীর্থস্নাত গৌতমের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। আপন ছদ্মবেশে ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে গৌতমের মনে হল—তিনি নিশ্চয়ই কোনও অকর্তব্য করে এসেছেন। মুহূর্তকাল পরেই সঠিক ঘটনা বুঝতে পেরে ইন্দ্রকে তিনি অভিশাপ দিলেন—

বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি।

অর্থাৎ তাঁর কামুক ইন্দ্রিয়টিই যেন খসে পড়ে যায়। মুনির শাপে তখনই তাঁর জননেন্দ্রিয় খসে পড়ে গেল। মুনি এবার স্ত্রী অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন—বহু বৎসর কাল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে নিরাহারে সকলের অদৃশ্য হয়ে এই তপোবনেই কাল যাপন করবে তুমি—

বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমে'স্মিন্ বসিষ্যসি॥

[রামায়ণ ১.৪৮.৩০]

☐ ইন্দ্রকৃত এই অহল্যা-ধর্ষণের কাহিনী নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। মহাভারতে চিরকারীর উপাখ্যানে অহল্যা নির্দোষ বিবেচিত হয়েছেন, কিন্তু সেখানে প্রধান দোষভাগী হিসেবে ইন্দ্রই অভিযুক্ত হয়েছেন। *[দ্র. অহল্যা]*

কিন্তু মহাভারতের অন্যত্র কিন্তু ইন্দ্র-কৃত এই অহল্যাধর্ষণের কথাটা সব সময়েই এক বিখ্যাত সংবাদ হিসেবেই নেমে এসেছে, ঠিক যেমন মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে স্ত্রীরক্ষার প্রসঙ্গে বিপুলের কথা বলতে গিয়ে ইন্দ্রের পরদারকামুকত্বের কথাটাও প্রাবাদিক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবশর্মা নামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর পত্নী ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী, তাঁর নাম রুচি। তাঁর রূপে দেবতা-দানব সকলেই মোহিত হতেন, বিশেষত মুগ্ধ ছিলেন পাকশাসন ইন্দ্র এবং দেবশর্মা যেভাবে ইন্দ্রকে চিনতেন, সেই চেহারাটা হল—ইন্দ্র সর্বদাই পরস্ত্রী কামনা করেন—

পুরন্দরঞ্চ জানীতে পরস্ত্রীকামচারিণম্।

দেবশর্মার একবার প্রয়োজন হল এমন যে, তাঁকে দূরদেশে যজ্ঞ করতে যেতে হবে। এই অবস্থায় তিনি স্ত্রী রুচিকে রক্ষা করার বিষয়ে শিষ্য বিপুলকে ভার দিয়ে প্রধানত ইন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন—ইন্দ্র সুরেশ্বর সব সময় রুচিকে পাবার চিন্তা করছেন, তাঁকে রক্ষা করতে হবে ইন্দ্রের হাত থেকে। সামান্যতম বেখেয়ালও চলবে না—

যজ্ঞকারো গমিষ্যামি রুচিং চেমাং সুরেশ্বরঃ।
যতঃ প্রার্থয়তে নিত্যং তাং রক্ষস্ব যথাবলম্॥

এই প্রসঙ্গে ইন্দ্র কত রকম মায়া জানেন এবং কত কপটতায় তিনি রুচিকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করবেন, সে-সব ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে দেবশর্মা চলে গেলেন। বিপুল ইন্দ্রের মায়া স্মরণে রেখে যোগবলে নিজের মানসিক সত্তাকে অনাসক্ত রাখলেন এবং আপন শরীর দিয়ে রুচির অন্তর্দেহে প্রবেশ করে তাঁর শরীর রক্ষা করতে থাকলেন। ইন্দ্র কিন্তু ঠিক এলেন দর্শনীয়তম

বেশে, কিন্তু বিপুলের যোগ-নিরুদ্ধশরীর রুচিকে কিছুই করতে পারলেন না। দেবরাজকে চিনতে পেরে বিপুল অনন্ত তিরস্কার করলেন ইন্দ্রকে যার মধ্যে অন্যতম ছিল পূর্বকৃত অহল্যা-ধর্ষণের কথা। বিপুল বলেছিলেন—তোমাকে দেবতা-মানুষ কেউ আর পুজো করবে না। তুমি কী মহর্ষি গৌতমের অভিশাপটাও ভুলে গেছো, যেদিন অহল্যাকে লঙ্ঘন করার পর তোমার সারা শরীর সহস্র যোনিচিহ্নে আচ্ছন্ন হয়েছিল—

কিং নু তদ্ বিস্মৃতং শক্র ন তন্মনসি তে স্থিতম্।
গৌতমেনাসি যন্মুক্তো ভগাঙ্ক-পরিচিহ্নিতঃ ॥

ইন্দ্র অবশ্য রুচির শরীরে বিপুলের যোগসংরুদ্ধ আবরণ দেখে আর কোনো কথা না বলেই অন্তর্ধান করেছেন। কিন্তু এই ঘটনায় মহর্ষির দেবশর্মার মুখে ইন্দ্রের চরিতাভিধান তথা ইন্দ্রের প্রতি বিপুলের অপশব্দ-তিরস্কার শুনে এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মহাকাব্যের কালে ইন্দ্রের চারিত্রিক মর্যাদা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাঁর অহল্যা-ধর্ষণের ঘটনাটা তাঁর চরিত্রহীনতার চরম দৃষ্টান্ত হিসেবে বারবার উল্লিখিত হয়েছে—

অহল্যা ধর্ষিতা পূর্বং ঋষিপত্নী যশস্বিনী।

[মহা (k) ১৩.৪০.১৬-৬০; ১৩.৪১.১-২৭; ৫.১২.৬;
(হরি) ১৩.৩৫.২৯-৭২; ১৩.৩৫.৭৩-৯৯; ৫.১২.৬]

□ পূর্বোক্ত দেবশর্মা-রুচি এবং ইন্দ্র-বিপুলের কাহিনী-সংলাপে ইন্দ্রের আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়ে পড়ে। আমরা রামায়ণে দেখেছি যে, ইন্দ্রকৃত অহল্যা-ধর্ষণের পর গৌতম তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন— আজ থেকে তোমার জননেন্দ্রিয় নিষ্ফল হয়ে যাবে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের অণ্ডকোষ মাটিতে খসে পড়ে গিয়েছিল এবং পরে ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়-সংস্থিতির জন্য একটি মেষের অণ্ডকোষ সংযুক্ত করা হয়। ইন্দ্রের কাতর অবস্থা দেখে অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা পিতৃদেবগণের সাহায্যে মেষাণ্ডকোষ প্রতিস্থাপন করলেন ইন্দ্রের শরীরে। তদবধি ইন্দ্র 'মেষবৃষণ' নামেও পরিচিত। একথা মহাভারতেও উল্লিখিত হয়েছে, যদিও সেটা অহল্যাধর্ষণের নিমিত্ত নয়, মহাভারত বলেছে—ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে ইন্দ্রের মুষ্ক পতিত হয় এবং তারপর মেষের মুষ্ক সংযুক্ত করার ফলে তিনি মেষবৃষণ হলেন—

কৌশিক-নিমিত্তং চেন্দ্রো মুষ্কবিয়োগং
মেষবৃষণত্বং চাবাপ।

আর গৌতমের অভিশাপে নাকি ইন্দ্রের দাড়িগোঁফ সব, হরি অর্থাৎ হলুদ হয়ে গেল। বেদে ইন্দ্রের অশ্ব, বজ্র সব হরি'—হলুদ—

'হরিভিঃ কেশিভিঃ' 'হরী হিরণ্যকেশ্যা'।
বেদে ইন্দ্র 'হিরণ্যয়ঃ', দেবো হিরণ্যয়ঃ।
অর্থাৎ সোনার মতো তাঁর গায়ের রঙ—
অহল্যাধর্ষণ-নিমিত্তং হি
গৌতমাদ্ধরিশ্মশ্রুত্বমিন্দ্রঃ প্রাপ্তঃ।
অতএব হরিচ্ছ্মশ্রুই ঠিক।

[রামায়ণ ১.৪৯.২-১০;
মহা (k) ১২.৩৪২.২৩; (হরি) ১২.৩২৮.৫৩-৫৪]

□ রামায়ণে গৌতমের শাপে কলঙ্কিত ইন্দ্রের মুষ্ক-বিয়োগ এবং মুষ্ক-সংযোগের ঘটনা যেমনই থাকুক মহাভারতে এই অভিশাপের অন্য রূপ কিন্তু ইন্দ্রের সহস্রাক্ষ বা সহস্র-নয়ন নামটির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে গেছে। মহাভারতে বিপুল তাঁর গুরুপত্নীকে রক্ষা করার সময় ইন্দ্রকে তিরস্কার করে বলেছিলেন— গৌতম ঋষি তোমার শরীরটাকে ভগচিহ্নে কলঙ্কিত করে তবেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সহস্র ভগ-চিহ্নই যে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের সহস্র নয়নে পরিণত হয়েছিল, তা বলা হয়েছে বিপুল-দেবশর্মার কাহিনীর আগে। এখানে ব্রাহ্মণের মান-অপমানের বিচার-প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে—ব্রাহ্মণের কাছে অপরাধ করেই দেবরাজ ইন্দ্রের শরীর সহস্র যোনিচিহ্নে চিহ্নিত হল, পুনরায় সেই ব্রাহ্মণের করুণাতেই ইন্দ্রের সহস্র ভগ-চিহ্ন তাঁর শত চক্ষুতে রূপান্তরিত হল, তিনি সহস্রাক্ষ হলেন—

তথা ভগসহস্রেণ মহেন্দ্রঃ পরিচিহ্নিতঃ।
তেষামেব প্রসাদেন সহস্রনয়নো হ্যসৌ ॥

ঠিক এইখান থেকেই ভ্রান্তি শুরু হয় ইন্দ্র সহস্রাক্ষ হলেন কী করে? রামায়ণে সহস্র ভগচিহ্নের অভিশাপ দেননি গৌতম। এমনকী গৌতমের অভিশাপে যখন ইন্দ্রের মুষ্ক খসে পড়ল, তখনও রামায়ণের কবি কিন্তু তাঁকে সহস্রাক্ষ বলেই নির্দেশ করছেন 'ইন্দ্র' নামের পরিবর্ত হিসেবে—

গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা।
পেততুঃ বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥

অন্যদিকে ইন্দ্রের 'সহস্রাক্ষ' নামটাও মহাকাব্য-পৌরাণিক কালের থেকেও অনেক প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে সূর্যের সহস্রকিরণধারাই ইন্দ্রের চক্ষু বলে কল্পিত আর অথর্ববেদে সোজাসুজিই ইন্দ্রকে 'সহস্রাক্ষ' বলা হচ্ছে—

উপপ্রাগাৎ সহস্রাক্ষো যুক্ত্বা শপথো রথম্।

এক মহান এবং বিরাট দেবতার এই সহস্রচক্ষুর কল্পনাটার বৈদিক সমাধানই কিন্তু সহস্র ভগচিহ্নের রূপান্তর। বৈদিক ভাবনায় 'ভগ' মানে ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বৈরাগ্য ইত্যাদি ছয় প্রকার বিভূতি বা 'ভগ'-ই কিন্তু পরম ঈশ্বরকে ভগবান বানিয়েছে, সেখানে এটাই বলা যায় যে, ভগ শব্দের 'যোনি' অর্থটা ব্যবহার করে ইন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রথমে খণ্ডিত করে পরে তাঁকে সহস্রচক্ষুতে পরিণত করা হয়েছে মহাকাব্য-পুরাণে।

মহাভারতে ব্রাহ্মণের নিগ্রহ-অনুগ্রহে ইন্দ্রের ভগচিহ্নের চক্ষুতে রূপান্তরের ঘটনা পুরাণে কী ভীষণ আকার ধারণ করেছে! ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অহল্যা ধর্ষণের পর ইন্দ্রের প্রতি গৌতমের অভিশাপ হল—তুমি বেদজ্ঞানী হয়ে এমন একটা খারাপ কাজ করে এই ফলটাই পাবে যে তোমার সারা গায়ে সহস্র যোনিচিহ্ন দেখা দেবে, পূর্ণ এক বছর ধরে সেই যোনিগন্ধ আঘ্রাণ করবে তুমি, তারপর সূর্যের আরাধনা করে তুমি সহস্র চক্ষু লাভ করবে—

বেদং বিজ্ঞায় জ্ঞানী ত্বং যোনিলব্ধো'সি কর্মণা।
যোনিনাং হি সহস্রঞ্চ তব গাত্রে ভবত্বিহ॥
যোনিগন্ধং সমাপ্নুহি পূর্ণবর্ষঞ্চ সন্ততম্।
ততঃ সূর্যং সমারাধ্য যোনিশ্চক্ষুর্ভবিষ্যতি॥

আমরা ঋগ্‌বেদে থেকে সূর্যের সহস্রকিরণকেই ইন্দ্রের সহস্রচক্ষু বলে মন্তব্য করেছিলাম, পুরাণে সেটা নিগ্রহ-অনুগ্রহের প্রকারে বিবৃত হয়েছে। একইভাবে নূতন দেবতার শক্তি এবং প্রতিষ্ঠা ঘটানোর জন্যও ইন্দ্রের অহল্যা ধর্ষণের কাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে পদ্ম পুরাণে, এখানে গৌতম ঋষির অভিশাপ লাভের পর ইন্দ্র জলের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিলেন এবং সেখানে থেকেই দেবী ইন্দ্রাক্ষীর স্তব করেছিলেন। তবে তুষ্টা দেবী বর দিতে চাইলে ইন্দ্র তাঁর দেহে ভগচিহ্নের বিরূপতা দূর কর দিতে বললেন। উত্তরে দেবী ইন্দ্রাক্ষী নিজের মাহাত্ম্য খ্যাপন করে বললেন—মুনিশাপে চিহ্নিত এই ভগচিহ্নগুলি ব্রহ্মাদি দেবতারা কেউ দূর করতে পারবেন না। তবে আমার বুদ্ধিতে আমি একটি উপায় বলছি, তাতে তোমার শরীরে এই সহস্র ভগচিহ্নের মধ্যে সহস্র চক্ষুর সৃষ্টি হবে, তাতেই তুমি সহস্রাক্ষ নামে পরিচিত হবে—

কিন্তু বুদ্ধিং সৃজাম্যদ্য যেন লোকৈর্ন লক্ষ্যতে।
যোনিমধ্যগতং দৃষ্টি-সহস্রন্তে ভবিষ্যতি।
সহস্রাক্ষ ইতি খ্যাতঃ সুররাজ্যং করিষ্যসি॥

পদ্ম পুরাণে এই ইন্দ্রাক্ষী দেবীর কোনো বিশেষ পরিচয় আমরা পাইনি, সম্ভবত পার্বতী-দুর্গার প্রতিরূপেই এখানে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটছে এবং ব্রহ্মাদি দেবতারা যা পারেন না, তিনি সেই ব্যবস্থা করছেন ইন্দ্রের জন্য। লক্ষণীয়, সহস্রচক্ষুর বরদান দেবার পরেও এই ইন্দ্রাক্ষী দেবী ইন্দ্রের মূল সমস্যাটা ভুলে যাননি। তিনি জগন্মাতা, অতএব ইন্দ্রের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তিনি এটাও বর দিলেন যে,—আমার বরে তুমি মেষাণ্ড এবং মেষ-শিশ্নও লাভ করবে—

মেষাণ্ডং তব শিশ্নঞ্চ ভবিষ্যতি চ মদ্‌বরাৎ।
ইত্যুক্ত্বা সা জগন্মাতা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

অর্থাৎ কাহিনীর অন্তে ইন্দ্র এখানেও মেষ-বৃষণ। কিন্তু এই সংবাদের থেকেও যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল পরবর্তী কালের দেববৃত্তে যে সব দেবতার ক্ষমতায়ন ঘটেছে, সেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সঙ্গে মাতৃমূর্তি শক্তি দেবতারাও আছেন, যাঁদের উচ্চতর মহিমায় ইন্দ্রের বৈদিক প্রভাব এবং মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেছে। নাহলে দেখুন, ইন্দ্রের সহস্রচক্ষু হবার কাহিনী মহাভারতে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে ইন্দ্রের সঙ্গে অন্য দেবতাদেরও বিকার লক্ষিত হচ্ছে। যেমন সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যুর জন্য যখন তিল-তিল রূপের সমাহারে বিশ্বকর্মা তিলোত্তমার সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর রূপ দেখে স্থাণু শিব-মহাদেবেরও চার দিকে চারটি মাথা তৈরী হল; তাতে তিনি চতুর্মুখ হলেন, আর সেই অসামান্য রূপ দেখে ইন্দ্র হলেন সহস্রলোচন—

মহেন্দ্রস্যাপি নেত্রাণাং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতো'গ্রতঃ।
রক্তান্তানাং বিশালানাং সহস্রং সর্বতো'ভবৎ।

তবে ইন্দ্রের সহস্রলোচনের ব্যাপারে সবচেয়ে বাস্তব কথাটি বলেছেন কৌটিল্য। অর্থশাস্ত্রে তিনি বলেছেন—ইন্দ্রের মন্ত্রী-পরিষদ গঠিত হয়েছিল

এক সহস্র ঋষিদের নিয়ে। সেই ঋষিদের মাধ্যমেই ইন্দ্র তাঁর রাজকীয় কর্ম পরিদর্শন করতেন অর্থাৎ এক হাজার ঋষির চোখ দিয়ে তিনি দেখতেন। এইজন্যই ইন্দ্রের চোখ দুটি হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে সহস্রাক্ষ বলা হয় —ইন্দ্রস্য হি মন্ত্রিপরিষদ্ ঋষীণাং সহস্রম্।

স তচ্চক্ষুঃ। তস্মাদিমং দ্ব্যক্ষং সহস্রাক্ষমাহুঃ।

[মহা (k) ১৩.৩৪.২৭-২৮; ১.২১১.২৩-২৮;
(হরি) ১৩.৩২.৫৪-৫৫; ১.২০৪.২৩-২৯;
অথর্ববেদ (Haug) ৬.৩৭.১, পৃ. ১১৪;
ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (কৃষ্ণজন্ম খণ্ড), ৪৭.৩১-৩২;
পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ৫৪.৪৬-৪৯; ৫৪.৪-৫০;
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle) ১ম খণ্ড, ১.১৫.৫৫-৫৭]

☐ মহাকাব্য-পুরাণের কালে আমরা ইন্দ্রের মহিমা-চ্যুতির কথা বুঝতে পারি ভগবান বিষ্ণুর মর্য্যাদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। বামন অবতারে ত্রিবিক্রম বিষ্ণু অদিতি গর্ভে ইন্দ্রের ছোটো ভাই উপেন্দ্র জন্মালেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রের সহায়তায় নেমে এসে বামন যেভাবে বলিকে বন্ধন করে তাঁর স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দিলেন, তখনই কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রকে অতিক্রম করে বিষ্ণুর মহিমা উচ্চতর হয়ে ওঠে। আর বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলে কথিত কৃষ্ণের মাধ্যমে ইন্দ্রের মর্য্যাদা আরও বেশি লঙ্ঘিত এবং লঘু হয়ে যায়।

বেদ বা বেদের অব্যবহিত পরের কাল পর্যন্ত ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর কোনো বিবাদ দেখাতে পারা যাবে না। কিন্তু বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের বিবাদ পণ্ডিতরা প্রায়ই ভ্রান্তভাবে দেখাতে আরম্ভ করেন ঋগ্‌বেদ থেকে। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কোনো একজন কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দারুণ শব্দ করছেন—

অংশুমতীম্ অতিষ্ঠদিয়ানঃ
কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।

অনেক পণ্ডিতই অংশুমতী নদীকে যমুনা বলে মনে করেন। কৃষ্ণ বোধহয় শব্দ করে যুদ্ধের আহ্বানই জানাচ্ছিলেন কাউকে। কেননা ঋগ্‌বেদে দেখি—এই শব্দ শুনেই ইন্দ্র এসে কৃষ্ণপক্ষের সৈন্যগুলিকে বধ করেন। ইন্দ্র নিজের মুখেই বলেছেন—দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করছে এবং তার অবস্থিতি ঠিক সূর্যের মত—

অপশ্যং বিষুণে চরন্তমুপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ।
নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসম্ . . .।

যদি প্রক্ষিপ্তবাদই মেনে নিই, তাহলে এই ঋকটি প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকলেই আমাদের সুবিধা। কেননা ঋগ্‌বেদের মূলস্তরে কৃষ্ণের নামোল্লেখ অসম্ভব এবং এই ঋকটি যদি পরবর্তীকালের সংযোজন হয়, তাহলে আমাদেরই অভীষ্টপূরণ হয়। ঋগ্‌বেদে খবর দিয়ে বলেছে, ইন্দ্র নাকি বৃহস্পতির সহায়তায় কৃষ্ণের আগুয়ান সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। তবে সেই সৈন্যবাহিনী ছিল দেবহীন, মানে নিশ্চয়ই কৃষ্ণহীন—

বিশো অদেবীরভ্যা চরন্তী
বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে।

যুদ্ধের এই রীতি কৃষ্ণের সঙ্গে মেলে। কৃষ্ণের চরিত্র যেমন, তাতে বিপদ বুঝলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবার মানুষ তিনি নন। এখানে আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল—কৃষ্ণের সঙ্গে সূর্যের তুলনা। মিথলজিস্টদের কাছে কৃষ্ণ সৌর দেবতা হিসেবেই পরিগণিত। বিশ্বের সমস্ত ধর্মেই সৌর দেবতাকুলের বিশেষ এক মর্য্যাদা আছে, কেননা সূর্য থেকেই বেশীর ভাগ দেবতার উৎপত্তি। সেই দিক থেকে সৌর মণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। মিথলজিস্টদের ধারণা বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের একাত্মতাই শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে সৌর দেবতাকুলের (Solar Gods) সভ্য করে তুলেছে। কিন্তু মজা হল, অনেকেই ওপরের ঋকটিকে উল্লেখ করেছেন—আর্য জাতির প্রতিভূ ইন্দ্রের সঙ্গে অনার্য কৃষ্ণের সংঘর্ষ সূচনা করার জন্য। যে ঋকমন্ত্র উল্লেখ করে পণ্ডিতেরা বলেছেন ইন্দ্র কৃষ্ণকে মেরে ফেলেছিলেন, সেই ঋকমন্ত্রে ইন্দ্র কর্তৃক কৃষ্ণবধের কোন উল্লেখ নেই। ১.১৩০.৮ সংখ্যার ঋক্‌মন্ত্রে দেখা যায়—আর্যজাতির রক্ষার জন্য, ব্রতরহিত আচারহীন ব্যক্তিদের শাসন করার জন্য ইন্দ্র আর্যেতর জাতির কৃষ্ণত্বক ভস্মীভূত করেছেন; ভাবটা এই—তাঁদের ছাল ছাড়িয়ে দিয়েছেন—

ত্বচং কৃষ্ণাম্ অরন্ধয়ৎ।

এই ছাল ছাড়ানোর মানে তো মনে হয় তাদের অনার্য সত্তা নষ্ট করে আর্য করে তুলেছেন। কিন্তু এই ঋকমন্ত্র থেকে ছাল ছাড়ানোর ব্যাপারটা

মাথায় রেখে, ৮.৯৬.১৩-১৫ ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যদি বলি—ইন্দ্র কৃষ্ণ নামক এক অনার্য যোদ্ধাকে মেরে ফেলেছিলেন—তাহলে, বড়োই বিপদ হয়। হ্যাঁ, ইন্দ্র এবং কৃষ্ণের সংঘর্ষের কথাটা সত্যি বটে, তবে তার থেকেও বেশী লক্ষণীয় এই ঋকে কৃষ্ণের সঙ্গে সূর্যের তুলনা। অন্যত্র দেখেছি, যখনই কোনো দেবতা সূর্যের মত বলে কুত্রাপি বেদে ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছেন, তখনই তাঁকে যথাযোগ্য পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে সৌর দেবতার পংক্তিতে একটি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বয়ং ইন্দ্রের মুখেই যার উপমা শোনা যাচ্ছে, 'সূর্যের মত' কিংবা সৌর দেবকুলের শিরোমণি ইন্দ্রই যাঁকে বর্ণনা করছেন জ্যোতিষ্মান্ শরীর বলে—

অধারয়ৎ তন্বং তিত্বিষাণঃ।

সেই সূর্যবর্ণের কোনো উল্লেখই তো গবেষকেরা করলেন না। শুধু এইটেই তাঁদের মনে হল যে, এ হচ্ছে আর্যীকরণের যুগসন্ধিতে আর্যের সঙ্গে অনার্যের সংঘর্ষ। আমাদের জিজ্ঞাসা—আর্যীকরণের যুগে আর্যদের সঙ্গে কী আর্যদেরও সংঘর্ষ বাধেনি, বেধেছে—কুরু-পাণ্ডবের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধই তার একটা বড়ো প্রমাণ। বৈদিক দেবতাদের মধ্যেও কি এক দেবতার সঙ্গে আরেক দেবতার সুসম্পর্ক ছিল? আমাদের ধারণা কৃষ্ণকে সৌর-জাতে তুলবার জন্য বিষ্ণু পর্যন্ত যেতে হবে না, সূর্যবরণ কৃষ্ণ নিজেই তার প্রমাণ অথবা অনার্য হলেও কৃষ্ণের প্রভাব ছিল সূর্যের মতই।

মিথলজিস্টদের ধারণা, ঋগ্‌বেদের যুগে ইন্দ্রপূজার সঙ্গে কৃষ্ণপূজার একধরনের সংঘর্ষ ছিল এবং সে সংঘর্ষে প্রাথমিকভাবে ইন্দ্র জয়ী হলেও পরবর্তীকালে সেই অপমানের শোধ নিয়েছিলেন কৃষ্ণ। তিনি ইন্দ্রপূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঋগ্‌বেদের হিসেব মতো দশ হাজার সৈনিক তখনও কৃষ্ণের পেছনে ছিল কিনা জানি না। কিন্তু অনেক মানুষই যে তাঁর পেছনে ছিল তার প্রমাণ আছে হরিবংশে। ব্রজের গোয়ালারা সব বর্ষারম্ভে ইন্দ্রযজ্ঞ করার আয়োজন করেছিলেন। তখন কৃষ্ণ বললেন—এই উৎসবের প্রয়োজন কি? পক্ককেশ এক গোপবৃদ্ধ এর উত্তরে বৃষ্টি আর কৃষির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন কৃষ্ণকে। তিনি বললেন—ইন্দ্রই আমাদের সনাতন রক্ষক (পাঠক খেয়াল করবেন ঋগ্‌বেদের ধারণাও তাই)। এরপরে গোপবৃদ্ধ ছোট্টখাট্ট যে বক্তৃতাটি দিলেন, এক কথায় তাকে ঋগ্‌বৈদিক ইন্দ্রস্তুতির পৌরাণিক সংস্করণ বলা চলে। হরিবংশ জানাচ্ছে 'ইন্দ্রের সমস্ত প্রভাব জেনেও—প্রভাবজ্ঞো'পি শক্রস্য—কৃষ্ণ বললেন—যারা কৃষিজীবী, যাদের শস্য ফলানোর প্রয়োজন আছে, তারা ইন্দ্রযজ্ঞ করুক। আমরা হলুম গিয়ে গোয়ালা, গোরুই আমাদের জীবন। যার কাছে অভীষ্ট ফল পাই, তাকে বাদ দিয়ে অন্যজনের পূজা করা তঞ্চকতা মাত্র। তার ওপরে যে পর্যন্ত কৃষি-জমি আছে সেই পর্যন্তই ব্রজের সীমা, সেই সীমার পরে বন, বনের পরে পাহাড়; সেই পাহাড়ই আমাদের অবিচল আশ্রয়—

বনান্তা গিরয়ঃ সর্বে সা চাস্মাকং গতির্ধ্রুবা।

অতএব ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রযজ্ঞ করুন, হলযজ্ঞ করুন কৃষকেরা, আর গোয়ালারা করুক গিরিযজ্ঞ—

গিরিযজ্ঞাস্তথা গোপা গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্।

লক্ষণীয়, হরিবংশে শুধু গিরিযজ্ঞের কথাটা স্পষ্টভাবে বলা হলেও ভাগবত পুরাণে দেখা যায়—ব্রজবাসীরা ইন্দ্রপূজার আয়োজন করার প্রস্তাব করতেই কৃষ্ণ বলছেন—এই যজ্ঞটা হোক আমাদের গোরুগুলির উদ্দেশে, ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে, আর এই গোবর্ধন গিরির উদ্দেশে। ইন্দ্রপূজার জন্য আহৃত দ্রব্যসম্ভার ব্যবহার করা হোক গো-ব্রাহ্মণ আর পাহাড়ের পুজোয়—

তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানাম্ অদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগ-সম্ভারা স্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥

হরিবংশে দেখতে পাচ্ছি—কৃষ্ণ আরও বললেন—যার যত গোধন আছে সব নিয়ে সুখস্থানে পাহাড়ের কাছে গাছের তলায় ধুমধাম করে গিরিযজ্ঞ হোক। পূজা হল এবং গিরিযজ্ঞের মাধ্যমে কৃষ্ণই সে পূজা গ্রহণ করলেন। ব্রজবাসীরাও পাহাড়ের চূড়ায় কৃষ্ণকেই অধিষ্ঠিত দেখে প্রধানত তাঁরই শরণাগত হলেন। ঠিক এইভাবেই ইন্দ্রপূজা লুপ্ত হয়ে গেল, ঠিক যেমনটি লুপ্ত হয়ে গেল নাগ-পূজাও। সে আরেক কাহিনী। ইন্দ্রের মত পূজা না পেলেও কালিয়-নাগের অধিকার অস্বীকার করার মতো মানুষ তখন ব্রজে কেউ ছিল না। কৃষ্ণ কালিয়-নাগের মাথায় চড়ে নাচতে শুরু করে দিলেন। শেষে কিন্তু কালিয়ের সঙ্গে কেমন যেন একটা রফা হয়ে গেল। কৃষ্ণের

কথায় কালিয় কিংবা নাগ-পূজকেরা ব্রজ ত্যাগ করেছে এবং কৃষ্ণও কালিয়কে অভয় দিয়েছেন যে তাঁর লোকেরা কালিয়কে বিরক্ত করবে না। ঠিক একই রকমের ঘটনা ঘটেছিল কৃষ্ণ আর ইন্দ্রের বেলাতেও।

কৃষ্ণের গিরিযজ্ঞ জলে ভাসিয়ে দেবার জন্য অনেক বৃষ্টি বর্ষণ করে, ব্রজবাসীদের শতেক পীড়া দিয়েও ইন্দ্র দেখলেন—কৃষ্ণ গোবর্ধন পাহাড়টি হাতে তুলে ধরে সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে সুরক্ষিত রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত আর্যস্বর্গ থেকে ইন্দ্র নেমে এলেন ভুঁয়ে—ভাবলেন এর দ্বারা দেবকার্য সাধিত হবে বুঝি। ঠিক এর পরেই ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের কেমনধারা একটা রফা হয়ে গেল। ইন্দ্র যা বললেন, তার ভাবটা ঠিক এইরকম—বাপু হে! ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতকাল ধরে শ্রাবণ-ভাদ্র আর আশ্বিন-কার্তিক—এই চার মাস আমার পূজা আরাধনার সময় নির্দিষ্ট ছিল। এখন থেকে দুমাস আমার, আর দুমাস তোমার; অর্থাৎ কিনা বর্ষাকালটা আমার থাকল, শরৎকালটা পুরোই তোমার—

এষামর্ধং প্রযচ্ছামি শরৎকালং তু পশ্চিমম্।

তোমাকে লোকে ডাকবে গোবিন্দ বলে, যেহেতু তুমি হলে গিয়ে গোরুদের ইন্দ্র, আর আমাকে তো সবাই মহেন্দ্র বলেই ডাকে—

অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবাম্ ইন্দ্রতাংগতঃ।

তাছাড়া আজকে বলে নয়, তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার ব্যাপারও আছে। সেই যে সেই বলি রাজার রাজত্বের সময়, যখন সে খুব বেশি বেড়ে গিয়েছিল তখন তুমি বামনরূপে আমার ছোটো ভাই হয়ে জন্মেছিলে, তোমার নাম হয়েছিল উপেন্দ্র। তাহলে, তুমি হলে গিয়ে উপেন্দ্র আর আমি হলুম গিয়ে মহেন্দ্র—

মহেন্দ্রং চাপ্যুপেন্দ্রঞ্চ মহয়ন্তি মহীতলে।

প্রাচীন এবং নবীনের এই সন্ধির সময়, প্রাচীন ইন্দ্র আরেকটা কথা মনে করে কৃষ্ণকে বললেন। সেটা হল—বংশ-সম্বন্ধে তোমার পিসী কুন্তীর একটি ছেলে আছে। তার নাম অর্জুন, আমারই অংশে তার জন্ম। সেই অর্জুনকে তুমি একটু দেখে শুনে রেখ। শুধু তাকে রক্ষা করা নয় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিও—

স তে রক্ষাশ্চ মান্যশ্চ সখ্যে চ বিনিযুজ্যতাম্।

ইন্দ্রের বিপুল বাগ্মিতার এই হল সার কথা। নিজে দেবেন্দ্রত্ব মহেন্দ্রত্ব কিছুই বিসর্জন দিতে চান না, অন্যদিকে উপেন্দ্রত্ব আর গোরুদের ইন্দ্রত্ব লাভ করে কৃষ্ণ কতখানি খুশি হতে পারেন—তাও তিনি চিন্তা করলেন না। কৃষ্ণ মনে মনে হাসছিলেন কিনা, হরিবংশ তা জানায়নি। আপাতত ইন্দ্রকে না চটালেও তিনি কিন্তু বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললেন—জানি মশাই জানি, অর্জুনের জন্ম-কর্ম সব আমার জানা আছে। তার দুই দাদা যুধিষ্ঠির ভীমের কথাও আমার ভালোমত জানা আছে। তার ছোটো দুই ভাই নকুল সহদেব এমন কি কুন্তীর কানীন পুত্র সূর্যসম্ভব কর্ণের কথাও আমার জানা আছে। যুদ্ধকামী কৌরবদের সম্বন্ধেও আমার কাছে খবর আছে। আপনি এখন স্বর্গবাসীদের সুখের জন্য মানে মানে প্রস্থান করুন—

তদ্‌গচ্ছ ত্রিদিবং শক্র সুখায় ত্রিদিবৌকসাম্।

আমি থাকতে অর্জুনকে কেউ কিছু করতে পারবে না—

নার্জুনস্য রিপুঃ কশ্চিন্ মমাগ্রে প্রভবিষ্যতি।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৩০.৮; ৮.৯৬.১৩-১৫; বিষ্ণু পু. ৫.১০.১-৪৯; ৫.১১.১-২৫; ৫.১২.১-২৬; হরিবংশ পু. ২.১৬-১৯ অধ্যায়; ভাগবত পু. ১০.২৪-২৬ অধ্যায়]

উপরি উক্ত কাহিনী থেকে বেশ বোঝা যায় যে, ইন্দ্র তাঁর সার্বিক মর্যাদা এবং ঈশ্বর-মহিমা থেকে চ্যুত হয়েছেন এবং তাঁকে তাঁর সত্তার জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে—কৃষ্ণ, রাম, কিংবা বামনের ওপর। এই প্রসঙ্গেই তৎকালীন বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতিতে ইন্দ্রের পূজা কতটা চালু ছিল সেটাও একটা ঐতিহাসিক মাত্রা স্থাপন করে। আশ্চর্য হতে হবে শুনে যে, খোদ বেদের মধ্যে যেখানে ইন্দ্রের মহিমা উচ্চারিত হয়েছে সর্বাধিক, সেই বেদেই কিন্তু এই প্রশ্ন এসেছে— কে ইন্দ্র? ইন্দ্র বলে কেউ নেই। এখানে একটি মন্ত্রের প্রথম পংক্তিতে বলা হচ্ছে—ইন্দ্র আছেন, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি রচনা করো। এর উত্তরে নেম বললেন—ইন্দ্র নামে কেউ নেই। কে তাকে দেখেছে, আমরা কাকে স্তুতি করবো—

নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ
ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম।

ইন্দ্রের উদ্দেশে তাঁর স্তব-স্তুতি রচনা করাটা যেখানে অনভীষ্ট হয়ে উঠছে তাঁর অনস্তিত্বের

সংশয়ে সেখানে অন্য একটি ঋক্‌মন্ত্রে ইন্দ্রের নিজেরই আক্ষেপ শুনতে পাচ্ছি; তিনি বলছেন —ঠিক ভাবে দেখলে বোঝা যায়—আজকে আমার জন্য কোনো হবির্ভাগ, কোনো আহুতি নেই, কালকের জন্য তো নেইই। কী হবে ভবিষ্যতে তা কে জানে। অন্য লোকের মন অত্যন্ত চঞ্চল, যা উত্তমরূপে পাঠ করা যায়, আবার তা ভুলেও যাওয়া যায়—

ন নূনমস্তি নো শ্বঃ কস্তদ্‌বেদ যদদ্ভুতম্।
অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যমুতাধীতং বিনশ্যতি॥

এই সূক্তে কথোপকথন হচ্ছিল ইন্দ্রের সঙ্গে অগস্ত্যের। হয়তো বা এই গোষ্ঠীর কাছ থেকে ইন্দ্র আগে যজ্ঞাহুতি লাভ করতেন, কিন্তু এখন কিছুই পাচ্ছেন না বলে অগস্ত্যদের কাছেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। অগস্ত্য প্রাণ যাবার আশঙ্কায় শেষ ক্লেশ ইন্দ্রের স্তুতি করছেন এবং ইন্দ্র তাঁকে পুরস্কার বলছেন—ভাই অগস্ত্য! তুমি আমাদের সখা হওয়া সত্ত্বেও কেন আমাদের অপলাপ করছো। আমরা নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা জানি। তুমি আমাদের কিছু দিতে চাইছো না—

বিদ্মা হি তে যথা মনো'স্মভ্যমিন্ন দিৎসসি।

ঋগ্‌বেদের এই উক্তিগুলি থেকে বোঝা যায় যে, ইন্দ্রের ব্যাপারে একটা বড়ো বিরুদ্ধতা সেই সময় থেকেই ছিল, যখন ইন্দ্রের মান-মর্য্যাদা চরমে পৌঁছেছিল। বেদ-পরবর্তী যুগে এই বিরুদ্ধতা ক্রমে অবহেলার রূপ ধারণ করলেও পৌরাণিক কালে কিন্তু ইন্দ্রের পূজা করা হত ইন্দ্রের মূর্তি তৈরি করে অথবা ইন্দ্রের প্রতীক হিসেবে ইন্দ্রধ্বজ প্রতিষ্ঠা করে। কালিকা পুরাণে ইন্দ্রের একটি মূর্তিকল্পনাও করা হয়েছে, যদিও সেখানে তাঁকে মহেশ্বরী দুর্গাকালীর গৌণস্থানে সেবারত অবস্থায় দেখা যায়। এই মূর্তিকল্পনায় ইন্দ্র গৌরবর্ণ, তাঁর দুই হাত, বাঁ হাতে বজ্র, ডান হাতে গদা এবং কুশ, তিনি ঐরাবত হস্তীর ওপর বসে থাকবেন, পিঠে বাণ-তূণ বাঁধা থাকবে, কাঁধের ওপর ধনুক—এই মূর্তিতে তিনি মহেশ্বরীর সেবা করছেন—

সহস্রনেত্রো গৌরাঙ্গো দ্বিভুজো বামহস্তগম্।
বজ্রং গদাং কুশং ধত্তে দক্ষিণেনাপি পাণিনা॥
ঐরাবতগজস্থস্তু বাণতূণীরবন্ধনঃ।
ধনুশ্চ কক্ষে গৃহ্নাতি সেবমানো মহেশ্বরীম্॥

এই প্রতিমা সোনার তৈরি হতে পারে, কাঠেরও হতে পারে, অন্য কোনো তৈজস ধাতু তামা-কাঁসারও হতে পারে, কিছু না পেলে মাটি দিয়েও তৈরি হতে পারে ইন্দ্রমূর্তি। সেই মূর্তিকে একটি গোলাকার মণ্ডলের মধ্যে রেখে পুজো করার পর ইন্দ্রধ্বজের পতাকা উত্তোলন করতে হবে—

শক্রস্য প্রতিমাং কুর্য্যাৎ কাঞ্চনীং দারবীঞ্চ বা।
অন্যতৈজসসম্ভূতাং সর্বাভাবে তু মৃন্ময়ীম্।
তাং মণ্ডলস্য মধ্যে তু পূজয়িত্বা বিশেষতঃ।
ততঃ শুভমুহূর্তে তু কেতুমুত্থাপয়েন্নৃপঃ॥

ইন্দ্রপূজার সঙ্গে এই যে ইন্দ্রধ্বজ কিংবা ইন্দ্রকেতু উত্থাপন করার কথা হল, তারও তিথি-নক্ষত্রের অবস্থান বুঝিয়ে কালিকা পুরাণ বলেছে—সূর্য যখন সিংহরাশিতে থাকবেন তখন ভাদ্র মাসের শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতিথিতে ইন্দ্রধ্বজের পূজা করতে হবে, তার আগে শুক্লা অষ্টমীতিথিতেই পুরদ্বারের বেদিতে ধ্বজস্থাপন করতে হবে। এই ধ্বজ লম্বায় খুব কম হলে বত্রিশ হাত আর বেশি হলে বাহান্ন হাত এবং শেষেরটাই প্রশস্ত। *[ঋগ্বেদ ১.১৭০.১-৩; ৮.১০০.৩; কালিকা পু. ৭৯.৪৭-৪৯; ৮৭.২-৪৩]*

স্বয়ং ইন্দ্রের প্রতীক হিসেবে ইন্দ্রধ্বজের পূজা কিন্তু অর্বাচীন কোনো ঘটনা নয়, আমরা মহাভারতের মতো প্রাচীন গ্রন্থেও ইন্দ্রধ্বজ পূজার রীতি দেখতে পাই এবং শুধু তাই নয়, বৃহসংহিতার মতো প্রাচীন গ্রন্থে ইন্দ্রধ্বজের উৎপত্তি নিয়ে একটি কাহিনীও আছে। বলা হয়েছে—অসুরদের উৎপীড়নে আকুল হয়ে দেবতারা এক সময় প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে অসুর-ধ্বংসের উপায় জানতে চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন—ভগবান বিষ্ণু তোমাদের একটি কেতু (ধ্বজ বা পতাকাচিহ্ন) দেবেন, সেই কেতুটি চোখের সামনে এলে অসুর-দৈত্যদের আর কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না। তারা অস্থির বোধ করবে। দেবতারা ব্রহ্মার বরাভয় লাভ করে ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে পৌঁছোলেন ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করে সব বিজ্ঞাপিত করার জন্য। বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন সেই পতাকা, যার তেজ এবং আকৃতি ঠিক শরৎকালীন সূর্যের মতো। সেই কেতু লাভ করে ইন্দ্র পরম আহ্লাদিত হলেন এবং সেই কেতু বা ধ্বজের সাহায্যেই তিনি অসুরদের ধ্বংস-সাধন করলেন। ধ্বজটি একটি আট-চাকার

রথে স্থাপন করে দেবতারা যুদ্ধে নেমেছিলেন অসুরদের সঙ্গে—

তং বিষ্ণুতেজো ভবমষ্টচক্রে
রথে স্থিতং ভাস্বতি রত্নচিত্রে।
দেদীপ্যমানং শরদীব সূর্যং
ধ্বজং সমাসাদ্য সুমোদ শক্রঃ॥

বিষ্ণুর তেজে সৃষ্ট এই ধ্বজ বা কেতুই ইন্দ্রধ্বজ নামে পরিচিত হয়। আমরা হরিবংশে উল্লিখিত ইন্দ্র-কৃষ্ণের কথোপকথন খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ মনে করি। সেখানে ইন্দ্র বলেছিলেন—বর্ষাকাল আমার আর শরৎকাল তোমার—এটাই স্বাভাবিক, কেননা ইন্দ্র মেঘ ভেঙে বৃষ্টি আনেন। আকুল বর্ষণের শেষে স্বল্পবর্ষণের মধ্যে শরতের পদধ্বনি শোনা যায় আর সেই ক্ষীণজল বর্ষশেষেই ইন্দ্রধনু দেখা যায় আকাশে, আর তখনই ভাদ্রপদী শুক্লাদ্বাদশীতে বিষ্ণুতেজ সমৃদ্ধ ইন্দ্রধ্বজের পুজো—ইন্দ্র-বিষ্ণু-কৃষ্ণের সমন্বয় ঘটে যায় এইখানেই।

ইন্দ্রধ্বজের উৎপত্তি-কথা বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় যেমনই থাক, ইন্দ্রধ্বজের কল্পনা মহাভারতের সমবয়সী। মহাভারতে দেবরাজ ইন্দ্র উপরিচরবসুকে একটি বিশাল বাঁশের লাঠি দিয়েছিলেন শিষ্টজনের প্রতিপালনের জন্য। এই বেণুযষ্টি ইন্দ্র দিয়েছিলেন তাঁর নিজেরই প্রতীক হিসেবে ইন্দ্রপুজা করার জন্য। মহাভারতে দেখা যাচ্ছে—রাজা উপরিচর বসু মৃগয়া করতে বেরিয়েছিলেন, তখন ইন্দ্রের উপদেশেই তিনি চেদিরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেন। চেদিরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইন্দ্র তাঁকে রাজধর্মের উপদেশ দিয়ে নিজের বৈজয়ন্তী মালাটি দেন যাতে সমস্ত যুদ্ধে তিনি অক্ষত থাকেন। সেই মালাটি ইন্দ্রমালা নামে বিখ্যাত হয়—

ইন্দ্রমালেতি বিখ্যাতং ধন্যমপ্রতিমং মহৎ।

তারপর আপন অভীষ্ট দান করার জন্য ইন্দ্র উপরিচরবসুকে 'বৈণবী যষ্টি' অর্থাৎ বাঁশের লাঠির মতো একটি দণ্ড মাটিতে প্রোথিত করতে বলেন ইন্দ্রপূজার জন্য। এক বছর অতীত হলে রাজা সেই যষ্টি মাটিতে পুঁতে দেন

* যষ্টিঞ্চ বৈণবীং তস্মৈ দদৌ বৃত্রনিসূদন।
* তস্যা শক্রস্য পূজার্থং ভূমৌ ভূমিপতিস্তদা।
প্রবেশং কারয়ামাস গতে সংবৎসরে তদা॥

এই যে উপরিচরবসু ধ্বজপতাকাসহ মাটিতে বাঁশ পুঁতে ইন্দ্রপূজা আরম্ভ করলেন, তখন থেকে অন্যান্য রাজারাও এক-একটি বংশদণ্ডকে গন্ধমাল্য, অলঙ্কারে নানাভাবে সজ্জিত করে তার ওপর পতাকা লাগিয়ে মাটিতে পুঁতে দেন এবং ইন্দ্রধ্বজের মাধ্যমে ইন্দ্রপূজা আরম্ভ হয়ে যায়। স্বয়ং বরাহমিহিরও বৃহৎ সংহিতায় উপরিচর বসুর নাম করেছেন ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্তক হিসেবে। এই ইন্দ্রপূজার বাড়বাড়ন্ত ততদিন পর্যন্ত চলেছে, যতদিন না বিষ্ণু-কৃষ্ণের মাধ্যমে এই পূজার মহিমা খর্বিত হয়েছে।

[বৃহৎসংহিতা (ইন্দ্রধ্বজ-সম্পদ) ৪৩.১-৬৮;
মহা (k) ১.৬৩.১-২৭; (হরি) ১.৫৮.১-২৭]

পরবর্তীকালের এই অবহেলা সত্ত্বেও বেদে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য-মহিমা ছিল এতটাই যে, উত্তর পঞ্চাল দেশের রাজধানী অহিচ্ছত্রে শুঙ্গ রাজাদের শাখাবংশ—যাঁরা অগ্নিমিত্র, ভানুমিত্র কিংবা ইন্দ্রমিত্র, এই সব নামে রাজত্ব করতেন, তাঁদের মুদ্রার এপিঠে-ওপিঠে আপন নামের সঙ্গে যুক্ত দেবতাদের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। এই বংশের ইন্দ্রমিত্র রাজা মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ১০০ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রার এক পিঠে একটি বেদির ওপর বসা ইন্দ্রদেবের মূর্তি পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো মুদ্রায় একটি দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে বসা অবস্থায় ইন্দ্রের মূর্তি অঙ্কিত আছে।

ভাগবত পুরাণে রুক্মিণী নিজেকে হরণ করার জন্য কৃষ্ণকে যে স্থানসংকেত দিয়েছিলেন, সেখানে অম্বিকাগৃহ বা ভবানীমন্দিরের পরিবর্তে একটি বিকল্প শ্লোকে পৌলোমী ইন্দ্রাণী-মন্দিরের পাঠও উচ্চারিত হয়েছে কোথাও কোথাও। এখানে দেখা যাচ্ছে রুক্মিণীর পিতা বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কুলদেবতা হলেন ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী। তাঁর রাজধানীর একদেশে ইন্দ্রের মন্দিরের পাশে পৌলোমী ইন্দ্রাণীর মন্দিরও বিরাজিত ছিল। তাতে বোঝা যায়, কৃষ্ণের সমকালে অবশ্যই ইন্দ্রপূজা এবং ইন্দ্রাণী-পূজা, দুটি পূজাই বলবৎ ছিল—

উপকণ্ঠে সুরেশস্য পৌলম্যাশ্চ নিকেতনম্।
তৌ বিদর্ভপ্রসূতানাং নৃপাণাং কুলদেবতে॥

একেবারে আধুনিককালে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাঁকুড়া জেলায় ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশীর নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত ইন্দ্রোৎসবের উল্লেখ

করেছেন। এই উৎসবে ইন্দ্রপূজার প্রতীক হিসেবে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলন করা হয়। লক্ষণীয়, বামন পুরাণে বলা হয়েছে ওই একই ইন্দ্রমহোৎসবের দিনে দৈত্যরাজ বলির নামে একটি উৎসব হবে, সেই উৎসব 'দীপপ্রদান' নামেও চালু হবে। বস্তুত ওই দিন বলির উদ্দেশে দীপপ্রদান কিছু হয় না বটে, কিন্তু ওইদিনেই বিখ্যাত বামন-দ্বাদশীব্রত পালিত হয় এবং তা এখনও চলমান এক ব্রত। বামনদ্বাদশীর সঙ্গে শক্রমহোৎসবের একাকার হয়ে যাওয়ায় ইন্দ্র-বিষ্ণুর সহভাবও স্থাপিত হয়—

তথান্যমুৎসবং পুণ্যং বৃত্তে শক্রমহোৎসবে।
দীপপ্রদান-নামাসৌ তব ভাবী মহোৎসবঃ॥

[Surendra Kisor Chakrabarty, A Study of Ancient Indian Numismaties, P. 204-207; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫৩.৪৯, শ্লোকের পাদটীক দ্রষ্টব্য; যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পৌরাণিক উপাখ্যান, পৃ. ৩৬; বামন পু. ৯২.৫৬]

☐ রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে বিভিন্ন ঘটনায় দেবরাজ ইন্দ্রের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

অমৃতমন্থন বা সমুদ্রমন্থন করে অমৃতলাভের ঘটনা পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে এই কাহিনী বিশদে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য দেবতাদের মতোই এই ঘটনায় দেবরাজ ইন্দ্রেরও সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে বিষ্ণু পুরাণে অমৃতমন্থনের পূর্বকালের একটি উপাখ্যান পাওয়া যায় যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় মহর্ষি দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলেই স্বর্গলোক শ্রীহীন হয়ে পড়ে এবং সেই হতশ্রী স্বর্গলোকে শ্রীবৃদ্ধির জন্যই সমুদ্রমন্থন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

বিষ্ণু পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী—কোনো একসময় মহর্ষি দুর্বাসা পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল পারিজাতফুলের একটি মালা। পথে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দুর্বাসার দেখা হল। দুর্বাসা পারিজাতফুলের সেই মালাটি উপহার দিলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র ঋষি দুর্বাসার দেওয়া সেই উপহার গ্রহণ করে নিজের বাহন ঐরাবতের মস্তকে স্থাপন করলেন। কিন্তু পারিজাতফুলের উগ্র গন্ধ ঐরাবত সহ্য করতে পারল না। সে বিরক্ত হয়ে শুঁড়ে তুলে নিয়ে মালাটি ফেলে দিল মাটিতে। দুর্বাসা এই ঘটনায় ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন। তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন—অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তুমি যখন আমার দেওয়া উপহারের অবমাননা করেছ তখন এর ফলও তোমাকে ভোগ করতে হবে। তোমার অহঙ্কারের ফলে স্বর্গলোক শ্রীহীন হয়ে পড়বে।

অচিরেই দুর্বাসার অভিশাপে স্বর্গলোক শ্রীহীন হয়ে পড়ল। দেবতারা হীনবল হলেন। এই সুযোগে অসুররা স্বর্গলোক আক্রমণ করল এবং অনায়াসে পরাস্ত করল দেবতাদের। পরাজিত দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণ নিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁদের অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করে যৌথভাবে অমৃতমন্থনের পরামর্শ দেন।

অবশ্য বেশিরভাগ পুরাণমতে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করার পর যখন দৈত্যদের আর মৃত্যুভয় রইল না, তখন তারা প্রচণ্ড অত্যাচারী হয়ে উঠল। দেবতারা অসুরদের হাতে পরাস্ত হতে লাগলেন কারণ তখনও তাঁরা অমরত্ব লাভ করেননি। এ অবস্থায় দেবতারা যাতে অমরত্ব লাভ করেন সেই জন্যই ভগবান বিষ্ণু সমুদ্রমন্থন করে অমৃত লাভের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শ মতো ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন দৈত্যরাজ বলির সভায়। মুখে তাঁর মধুর বাক্য, যেন অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করে যৌথভাবে ধনসম্পদ এবং অমৃতভোগ করার প্রস্তাব নিয়েই তিনি এসেছেন বলির কাছে। সরল দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রের কথায় বিশ্বাসও করলেন অতি সহজে। সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হল।

তবে বাস্তবে সমুদ্র মন্থনের পরিশ্রম করলেও অসুররা তার ফললাভ করেননি। সমুদ্র থেকে উঠে আসা ধনরত্ন, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, স্বর্গসুন্দরী অপ্সরার দল, পারিজাতবৃক্ষ—সব কিছুই দেবরাজ ইন্দ্রের অধিকারে এসেছিল। সব শেষে অমৃতও এসেছিল ইন্দ্রের অধিকারে।

[মহা (k) ১.১৭.৫-১৩; ১.১৮-১৯ অধ্যায়; (হরি) ১.১৩.৫-১৩; ১.১৪-১৫ অধ্যায়; বিষ্ণু পু. ১.৯.১-১১৫; মৎস্য পু. ১৪৯-১৫১ অধ্যায়; বিশদ দ্র. অমৃতমন্থন]

☐ পক্ষীন্দ্র গরুড়ের জন্মের ক্ষেত্রেও দেবরাজ

ইন্দ্রের পরোক্ষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। একসময় মহর্ষি কশ্যপ পুত্রকামনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে উপস্থিত থেকে ঋষি গন্ধর্ব এবং দেবতারা তাঁকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। এর মধ্যে যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ-আহরণের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন—দেবরাজ ইন্দ্র এবং বালখিল্য মুনিরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শক্তিশালী ইন্দ্র পর্বতপ্রমাণ কাঠের বোঝা নিয়ে আসছিলেন, এমন সময় দেখলেন, ক্ষুদ্রকায় বালখিল্য মুনিরা সকলে মিলে অতি কষ্টে একটি ক্ষুদ্র পাতার বোঁটা বহন করে নিয়ে আসছেন। এমন সময় পথে একটি জলপূর্ণ গোষ্পদ ছিল। বালখিল্য মুনিরা সেই পাতার বোঁটা শুদ্ধ গিয়ে পড়লেন সেই গোষ্পদের মধ্যে। এই ঘটনা দেখে ইন্দ্র আর হাসি চাপতে পারলেন না। এদিকে ইন্দ্রকে উপহাস করতে দেখে বালখিল্য মুনিরা অসম্ভব ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা স্থির করলেন যে, অবিলম্বে তাঁরা এই ইন্দ্রকে অপসারিত করবেন, তাঁর থেকে শক্তিশালী নতুন একজন ইন্দ্র সৃষ্টি করবেন স্বর্গলোকে রাজত্ব করার জন্য। ইন্দ্র বুঝতে পারলেন—বড়ো ভুল হয়ে গিয়েছে। ইন্দ্রত্ব বাঁচাবার জন্য তিনি পিতা কশ্যপের শরণ নিলেন। মহর্ষি কশ্যপ বালখিল্য মুনিদের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করলেন, ইন্দ্রের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনাও করলেন। তারপর বললেন—ব্রহ্মার আদেশে যিনি ত্রিলোকের ইন্দ্র হয়েছেন আপনাদের মতো মুনিশ্রেষ্ঠরা যদি তাঁকে অপসারিত করেন, তাহলে ব্রহ্মার বাক্য মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আপনারা যে সঙ্কল্প করেছেন তা মিথ্যা হয়ে যাক এমনটাও আমি চাই না। অতএব আমার অনুরোধ—আপনাদের যজ্ঞের ফলে যে ইন্দ্র জন্ম নেবেন তিনি যেন পক্ষীন্দ্র হন। বালখিল্য মুনিরা এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন প্রসন্ন মনে। বালখিল্য মুনিদের তপস্যার ফলে কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে বিনতার গর্ভে জন্ম নিলেন পক্ষীন্দ্র গরুড়।

[মহা (k) ১.৩১.৫-৩৫; (হরি) ১.২৬.৫-৩৪]

☐ এই পক্ষীন্দ্র গরুড় সম্পর্কে ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই। গরুড় তাঁর মা বিনতাকে কদ্রুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য যখন অমৃত আনতে যাত্রা করলেন, তখন ইন্দ্র গরুড়কে বাধা দিতে এলেন। ইন্দ্রের বজ্রের প্রহারেও অবশ্য গরুড়ের কোনো ক্ষতি হয়নি। তারপরে অবশ্য ইন্দ্র এবং গরুড়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। গরুড়ও মাতাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার পর ইন্দ্রকে অমৃতের কলস ফিরিয়ে দেন।

[মহা (k) ১.৩৩.১৮-১৯; ১.৩৪.১-১৫:
(হরি) ১.২৮.১৮-১৯; ১.২৯.১-১৫]

☐ রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে, দৈত্যরাজ বিরোচনের কন্যা ছিলেন মন্থরা। এই মন্থরার স্বভাব ছিল অত্যন্ত নৃশংস, ক্রূর প্রকৃতির। একসময় মন্থরা সম্পূর্ণ প্রাণীজগতকে ধ্বংস করতে উদ্যত হন। জীবকুলকে রক্ষা করার জন্য সে সময় ইন্দ্র মন্থরাকে হত্যা করেন। রামায়ণে কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে নারীহত্যা করলে পাপ হয় না—এ প্রসঙ্গে উপদেশ দিতে গিয়ে বিশ্বামিত্র রামকে এই ঘটনার কথা জানিয়েছেন। *[রামায়ণ ১.২৫.২০]*

☐ ভগবান বিষ্ণু রামচন্দ্র রূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন এবং রাবণকে বধ করবেন—একথা দেবতাদের জানিয়েছিলেন ব্রহ্মা। পাশাপাশি উপদেশ দিয়েছিলেন—রামচন্দ্রকে সহায়তা করার জন্য দেবতারা যেন মর্ত্যলোকে নিজের তুল্য বলশালী বানরপুত্র উৎপাদন করেন। রামচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্যই ইন্দ্র নারীরূপ প্রাপ্ত বানররাজ ঋক্ষরজার গর্ভে বালীর জন্মদান করেন। *[রামায়ণ ৭.৪২.৩১-৩৭]*

☐ হনুমানের শৈশবে একসময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর উপর বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন। রামায়ণের বিবরণ অনুসারে ঘটনাটি এরকম—পবনপুত্র হনুমানের মাতা অঞ্জনা একদিন ফল সংগ্রহ করতে বনে গেলেন। এদিকে ঘরে তাঁর শিশুপুত্র হনুমান তখন ক্ষুধায় কাতর। এমন সময় শিশু হনুমান প্রভাতের রক্তবর্ণ সূর্য দেখতে পেলেন। সূর্য দেখে হনুমান মনে করলেন—এটাও একটা কোনো ফল হবে। একথা ভেবে ক্ষুধার্ত হনুমান ফল পেড়ে খাবার জন্য প্রচণ্ড লাফ দিলেন এবং ধেয়ে চললেন সূর্যের দিকে। ক্রমে দীর্ঘ আকাশপথ অতিক্রম করে, হনুমান সূর্যের একেবারে কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন কিন্তু সূর্যদেব শিশুর প্রতি মায়াবশত তাঁকে দগ্ধ করলেন না। এদিকে সেদিনটি ছিল সূর্যগ্রহণের দিন। রাহু যথারীতি সূর্যকে গ্রাস করতে এসে সূর্যের সামনে হনুমানকে দেখতে পেলেন। রাহু

হনুমানকে দেখে বিস্মিত হলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। তারপর সটান ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়ে রাহু বললেন—দেবরাজ! আপনি আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য চন্দ্র আর সূর্যকে আমার খাদ্য বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন। এখন আমার কী এমন অপরাধ হল যে আপনি নতুন একজন রাহুকে খাদ্য হিসেবে সূর্য-চন্দ্র দান করেছেন? আমি আজ সূর্যকে গ্রাস করতে গিয়ে দেখলাম—নতুন এক রাহু সূর্যকে গ্রাস করেছে। রাহুর কথা শুনে ইন্দ্র বিস্মিত হলেন। তিনি তো নতুন কোনো রাহুর কথা জানেন না! ব্যাপার কী তা জানার জন্য বজ্রহস্ত ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করে সূর্যের সামনে উপস্থিত হলেন। এদিকে রাহুও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হনুমান রাহুকে দেখে ভাবলেন—এটাও একটা নতুন রকমের কোনো ফল হবে তাই তিনি লাফ দিয়ে রাহুকে ধরতে গেলেন। রাহু এবার রীতিমতো ভয় পেলেন। তিনি আর্তনাদ করে ডাকতে লাগলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র ব্যাপার দেখে হনুমানের উপর বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বজ্রের আঘাতে হনুমানের বাম চোয়াল ভেঙে গেল। তিনি অচেতন হয়ে পর্বতের উপরে পড়লেন। গোটা ঘটনায় হনুমানের পিতা পবনদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পুত্রের শোকে তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বায়ুর গতি স্তব্ধ করে দিলেন। তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা সকলে মিলে বায়ু দেবতাকে প্রসন্ন করার উদ্যোগ নিলেন। সেই সময় ইন্দ্র হনুমানকে বর দেন যে, তাঁর অস্ত্র বজ্র কখনো হনুমানকে স্পর্শ করবে না। একটি স্বর্ণকমলের মালাও তিনি পরিয়ে দিলেন বালক হনুমানের গলায়। বজ্রের আঘাতে যেহেতু হনুমানের বাম হনু ভেঙে গিয়েছিল, সেই কারণে স্বয়ং ইন্দ্রই তাঁর হনুমান নামকরণ করেন।

[রামায়ণ ৭.৪০.৩২-৪৬; ৭.৪১.১০-১২]

□ রাবণ লঙ্কায় রাক্ষসদের অধিপতি হবার পর তাঁর অত্যাচারে দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি, মনুষ্য সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। এই সময় ইন্দ্রকেও রাবণের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা গেছে। রাবণ ইন্দ্রলোক আক্রমণ করলে ইন্দ্র যুদ্ধের নিপুণ কৌশলে রাবণকে বন্দি করেন কিন্তু রাবণের পুত্র মেঘনাদের হাতে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা সকলেই পরাস্ত হন। পরে অবশ্য স্বয়ং ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় ইন্দ্র বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং রাক্ষসদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ বন্ধ হয়।

কিন্তু মুক্তি পাবার পরেও ইন্দ্র মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। রাবণপুত্র মেঘনাদের হাতে পরাজয়ের কথা স্মরণ করে তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। এইসময় ব্রহ্মার পরামর্শে ইন্দ্র মানসিক শান্তি এবং শান্তিলাভের জন্য বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

[রামায়ণ ৭.৩২-৩৪ অধ্যায়; ৭.৩৫ অধ্যায়]

□ রাবণ আর ইন্দ্রলোক আক্রমণ করেননি বটে, তবে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা রাবণকে যথেষ্ট ভয় করে চলতেন। কারণ ব্রহ্মার বরে রাবণ দেবতাদের অবধ্য। এদিকে রাবণ ব্রহ্মার বরে শক্তিশালী হয়ে শুধুমাত্র যুদ্ধের নেশায় সমকালীন শক্তিশালী রাজাদের আক্রমণ করে চলেছেন একে একে। মরুত্ত রাজার যজ্ঞেও রাবণ যুদ্ধের অভিলাষ নিয়েই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারাও উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হলে যজ্ঞ পণ্ড হয়ে যাবে ভেবে দেবতারা একে একে নানা পশুপাখির রূপধরে আত্মগোপন করলেন। ইন্দ্র সাজলেন ময়ূর। রাবণ যজ্ঞস্থলে পৌঁছে দেবতাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে গেলেন। দেবতারা আপন আপন রূপে ফিরে এলেন আবার। কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ ইন্দ্র ময়ূরকে বর দিলেন—আমার যেমন সহস্রচক্ষু, তেমনই তোমার পুচ্ছে সহস্রচক্ষু অঙ্কিত থাকবে। আর সর্পগণ হতে তোমার কোনো ভয় থাকবে না। বরং তারা আজ থেকে তোমার খাদ্য হবে।

[রামায়ণ ৭.১৮.৪-৫, ২০-২৩]

□ রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে রাখলেন অশোক বনে। সেই সময় থেকে সীতা অন্ন-জল ত্যাগ করলেন। তা দেখে দেবতারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সীতা যদি অনাহারে মারা যান, তাহলে রাবণবধ আদৌ হবে কি না, তাতে সন্দেহ আছে। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্র নিজেই নিদ্রাদেবীকে নিয়ে এলেন লঙ্কায়। নিদ্রাদেবীর মায়ায় সমস্ত রাক্ষস ঘুমে অচেতন হয়ে গেল। ইন্দ্র সীতার হাতে তুলে দিলেন হবিষ্যান্ন—যা খেলে ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। অম্লান পুষ্পমাল্য, অনিমেষ দৃষ্টি—এইসব দেবোচিত লক্ষণ থেকে সীতা বুঝতে পারলেন—ইনি

দেবতা। স্বয়ং দেবরাজ। ইন্দ্র তাঁকে রাম-লক্ষ্মণের কুশলসংবাদ দেওয়ায় সীতা বহুক্ষণ পর খুশি হলেন। স্বামী ও দেবরের উদ্দেশে স্বর্গীয় হবিষ্যান্ন নিবেদন করে নিজেও তা খেলেন।

[রামায়ণ (মুধোলকর) ৩.৫৬ সর্গের পর প্রক্ষিপ্ত সর্গ দ্রষ্টব্য]

☐ লঙ্কায় রাম-রাবণের শেষযুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ইন্দ্র রামকে সাহায্য করার জন্য আপন রথখানি সাজিয়ে পাঠালেন রামের কাছে। পাঠালেন সারথি মাতলিকেও। রাম-রাবণের শেষ যুদ্ধে মাতলিই রামের সারথ্য করেছিলেন।

[রামায়ণ ৬.১০৩.৫-৭]

☐ মহাভারতে দেবরাজ ইন্দ্র সম্পর্কে নানা কাহিনী বর্ণিত হলেও এই মহাকাব্যে তাঁর সবথেকে বড়ো পরিচয়—তিনি কুন্তীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র অর্জুনের পিতা। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র অর্জুন জন্মগ্রহণ করেন ইন্দ্রের ঔরসে।

শতশৃঙ্গ পর্বতে যুধিষ্ঠির এবং ভীমের জন্মের পর পুত্রমুখ দর্শন করে পাণ্ডু তখন যথেষ্ট নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারী, জ্যেষ্ঠ কুরুরাজকুমার যুধিষ্ঠিরের পিতা হয়েছেন পাণ্ডু, সুতরাং উত্তরাধিকারের ভাবনাও এখন আর নেই। এই সময়েই তাঁর মনে হল—মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আসে দৈব এবং পুরুষকার একসঙ্গে যুক্ত হলে। তেমন একটি সর্বগুণ সম্পন্ন পুত্র চাই পাণ্ডুর। এমন শ্রেষ্ঠ পুত্র দেবরাজ ইন্দ্র ছাড়া আর কে দিতে পারেন? একথা ভেবে ইন্দ্রকে তুষ্ট করার জন্য কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন পাণ্ডু। কুন্তীকেও তিনি বললেন তপস্যায় মন দিতে। প্রায় এক বছর পর পাণ্ডুর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র পাণ্ডুকে তেমনই এক সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রলাভের বর দিলেন। তারপর পাণ্ডুর আদেশ মতো পুত্রলাভের জন্য বশীকরণমন্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন কুন্তী। যথাসময়ে ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম নিলেন অর্জুন। নবজাতককে আশীর্বাদ করতে এলেন দেবতারা। এলেন মুনি-ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরারা। ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের জন্মোৎসব পালিত হল মহা সমারোহে শতশৃঙ্গ পর্বতে।

[মহা (k) ১.১২৩.২১-৭৫; (হরি) ১.১১৭.২৪-৭৯]

☐ পাণ্ডবদের বনবাসকালে অর্জুন ভাবী যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য দিব্যাস্ত্রলাভের চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথমে তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র লাভ করলেন অর্জুন। তারপর অন্যান্য দিব্যাস্ত্রলাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন স্বর্গলোকে।

প্রিয়পুত্র অর্জুন স্বর্গলোকে আসছেন—এ সংবাদে আনন্দের জোয়ার বইল ইন্দ্রের হৃদয়ে আর তার ছোঁয়া লাগল দেবলোকেও। দেবতারা সমবেত হলেন অর্জুনকে স্বাগত জানাবার জন্য, ইন্দ্রপত্নী শচী এসে অর্জুনের মস্তক আঘ্রাণ করলেন। দেবসভায় নৃত্যগীতের আয়োজন হল অর্জুনের আগমন উপলক্ষে, ইন্দ্র স্বয়ং নিজের সিংহাসনেই বসতে দিলেন অর্জুনকে।

এরপর ইন্দ্রলোকে বসেই অর্জুন সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ এবং সংবরণের কৌশল শিক্ষা করতে লাগলেন। দিব্যাস্ত্রের কৌশলশিক্ষাও একসময় শেষ হল। অর্জুন এবার ফিরতে চাইলেন মর্ত্যলোকে, ভাইদের কাছে। কিন্তু ইন্দ্রের ইচ্ছা তাঁর পুত্র আরও কিছুদিন স্বর্গলোকে থাকুন। ইন্দ্র অর্জুনের সঙ্গে চিত্রসেন গন্ধর্বের বন্ধুত্ব করিয়ে দিলেন। বললেন— অর্জুন! তুমি চিত্রসেনের কাছে নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা কর। এতে তোমার মঙ্গল হবে। অর্জুন সঙ্গীতশিক্ষায় মন দিলেন ইন্দ্রের উপদেশে।

অর্জুন ইন্দ্রলোকে শস্ত্র এবং সঙ্গীতশাস্ত্রচর্চায় মগ্ন ছিলেন—এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। দেবরাজ ইন্দ্রের হঠাৎ ধারণা হল যে অর্জুন অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন। গন্ধর্ব চিত্রসেনের মাধ্যমে অর্জুনের রূপ গুণের সংবাদ এবং অর্জুনকে তুষ্ট করার জন্য দেবরাজের আদেশ এসে পৌঁছাল উর্বশীর কাছে। উর্বশী সেদিন রাত্রে সাজসজ্জা করে অভিসারিকার মতো উপস্থিত হলেন অর্জুনের ভবনে। অর্জুন এসবের কিছুই জানতেন না, তিনি উর্বশীর কথা শুনে লজ্জিতও হলেন, হতভম্বও হলেন। উর্বশী চন্দ্রবংশের আদিমাতা, ঐল পুরূরবার পত্নী। সুতরাং তিনি অর্জুনের পিতামহীর মতো, শ্রদ্ধার পাত্রী। একথা বলে অর্জুন ফিরে যেতে বললেন উর্বশীকে। উর্বশী ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে শাপ দিলেন—তুমি আজ থেকে নপুংসক হও। অবশ্য ইন্দ্র সব কথা শুনে উর্বশীর অভিশাপের মেয়াদ অজ্ঞাতবাসের একটি বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিলেন। এক বছর নপুংসক হয়ে থাকলে তা অর্জুনের অজ্ঞাতবাসের পক্ষেও

সুবিধাজনক হবে—একথা বলে অর্জুনকে সান্ত্বনা দিলেন ইন্দ্র।

এরপরেও বেশ কিছুকাল স্বর্গলোকে বাস করলেন অর্জুন। অর্জুনকে আরও কিছুকাল স্বর্গলোকে ধরে রাখার ইচ্ছা ইন্দ্রের। তিনি তাই লোমশ ঋষিকে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অর্জুনের কুশল সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করেন। ইন্দ্র বললেন—অর্জুন যতদিন নিখুঁত ভাবে নৃত্যগীত এবং অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন করেন ততদিন বরং পাণ্ডবরা নানা তীর্থ পর্যটন করে পুণ্যসঞ্চয় করুন। বস্তুত আপন পুত্রকে নিজের কাছে রাখার আগ্রহ ছাড়াও আরও একটা বিষয়ে ইন্দ্র চিন্তিত ছিলেন। সেই সময় নিবাতকবচ দৈত্যেরা প্রায়ই স্বর্গলোক আক্রমণ করছিল। একমাত্র অর্জুনই এই অসুরদের বধ করতে সমর্থ ছিলেন। তাই দেবাসুর যুদ্ধ পর্যন্ত অর্জুন স্বর্গলোকেই থাকবেন—একথা বলেই ইন্দ্র লোমশ মুনিকে পাঠালেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

এদিকে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হতে একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনকে ডেকে বললেন—তোমার শিক্ষাসমাপ্ত হয়েছে। অতএব এখন তুমি গুরুদক্ষিণা দাও। অর্জুন বললেন—আদেশ করুন, নিশ্চয় গুরুদক্ষিণা দেব। তখন ইন্দ্র অর্জুনকে বললেন—সমুদ্রের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করে তিন কোটি নিবাতকবচ দৈত্য বাস করে। তারা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রচণ্ড অত্যাচারী। তুমি এই নিবাতকবচ দৈত্যদের বধ করো। অর্জুন যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিজের রথখানি সাজিয়ে দিলেন অর্জুনের জন্য, নিজের সারথি মাতলিকে দিলেন অর্জুনের সঙ্গে। অর্জুন যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসার পর ইন্দ্র এক মহামূল্যবান কিরীট বা মুকুট উপহার দেন তাঁকে, এছাড়াও দিলেন মহামূল্য এক সোনার হার, দিব্য এক অভেদ্য কবচ এবং দেবদত্ত শঙ্খ। অর্জুন ফিরে এলেন মর্ত্যলোকে। [দ্র. অর্জুন$_১$]

□ তবে অর্জুন সমস্ত দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করে মর্ত্যলোকে ফিরে গেলেও ইন্দ্র কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ সূর্যের ঔরসজাত কুন্তীর কানীনপুত্র কর্ণ। কর্ণ যে অর্জুনের চরম শত্রু—সেকথা ইন্দ্র ভালোভাবেই জানতেন। আবার কর্ণের দেহে জন্মের সময় থেকে যে দিব্য কবচ-কুণ্ডল সংলগ্ন হয়ে আছে, অর্জুনের কোনো দিব্যাস্ত্রই যে তাকে ভেদ করতে পারবে না সেকথাও তাঁর অজানা নয়। তাই অনেক ভেবেচিন্তে ইন্দ্র স্থির করলেন যে তিনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের কাছে গিয়ে তাঁর কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা হিসেবে প্রার্থনা করবেন। ইন্দ্র নিশ্চিত ছিলেন যে, দানবীর কর্ণ তাঁর প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ করবেন। যথারীতি ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়ালেন কর্ণের সামনে। কর্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন যে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের প্রার্থিত বস্তু তিনি অবশ্যই দান করবেন। তখন ইন্দ্র কর্ণের কাছ থেকে কবচ এবং কুণ্ডল প্রার্থনা করলেন। কর্ণ বুঝতে পারলেন কোনো সাধারণ ব্রাহ্মণ নন, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে প্রার্থী হয়ে। কারণ আপন পুত্রের প্রাণরক্ষা করার জন্য ইন্দ্র যে কর্ণের কাছে কবচ কুণ্ডল চাইতে পারেন—এ বিষয়ে কর্ণের পিতা সূর্য-দেবতা তাঁকে আগে থেকেই সাবধান করেছিলেন। তাই ব্রাহ্মণ বেশধারী ইন্দ্রের প্রার্থনা শুনে কর্ণ হেসে বললেন—আমার এই কবচ-কুণ্ডলের কারণেই আমি শত্রুর অবধ্য। এখন যদি আপনাকে তা দান করি তাহলে আপনিই লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হবেন। কারণ আপনাকে দান করার ফলে আমি শত্রুর বধ্য হয়ে যাব। সেক্ষেত্রে আপনার উচিত এই কবচ কুণ্ডলের বিনিময়ে আমাকে কিছু দান করা। কর্ণের কথা শুনে ইন্দ্র একটু লজ্জিত বোধ করলেন। কিন্তু উপায় নেই, কর্ণের কবচ কুণ্ডল তাঁর চাইই। তাই ইন্দ্র বললেন—বৎস কর্ণ! আমার প্রধান অস্ত্র বজ্র বাদে আর যা তুমি চাইবে, আমি তোমাকে অবশ্যই দেব। তখন কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ 'শক্তি' অস্ত্র চেয়ে নিলেন।

অবশ্য মহাভারতের আদিপর্বে উল্লেখ পাওয়া যায় যে এই শক্তি অস্ত্র যে কর্ণ প্রার্থনা করবেন এবং তা করবেন অর্জুনের উপর প্রয়োগ করার জন্যই একথা ইন্দ্র বহুকাল আগেই চিন্তা করেছিলেন। সেই কারণেই তিনি ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্মের ঘটনা ঘটান। যাতে যুদ্ধের সময় ভীমের এই মহাবলশালী পুত্রের উপর কর্ণ 'শক্তি' অস্ত্রের প্রয়োগ করতে বাধ্য হন এবং অর্জুনের প্রাণরক্ষা হয়।

[মহা (k) ৩.৩১০.১-৩৬; ১.১৫৪.৪৬;
(হরি) ৩.২৬৪.১-৩৬; ১.১৪৯.৪৬]

☐ নাগজাতির রাজা তক্ষকনাগ দেবরাজ ইন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। পাণ্ডবদের সমসময়ে তক্ষকনাগ সপরিবারে বাস করতেন খাণ্ডব বনে। মূলত তক্ষকনাগকে রক্ষা করার জন্যই ইন্দ্র খাণ্ডববন দহনে অগ্নিকে বাধা দিতেন বার বার।

কৃষ্ণ এবং অর্জুন যখন খাণ্ডবদহনে অগ্নিদেবের সহায়তার জন্য এগিয়ে আসেন সে সময় অবশ্য তক্ষক নাগ নিজে খাণ্ডববনে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর পত্নী-পুত্র সকলেই ছিলেন। মূলত তাঁদের এবং খাণ্ডব বনাঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য ইন্দ্র জলবর্ষণ করতে থাকেন যাতে আগুন নিভে যায়। কিন্তু ইন্দ্রকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণ আর অর্জুন। খাণ্ডববন দহনের প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তার জন্য অর্জুন ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করলেন। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ করার পর ইন্দ্র শেষ পর্যন্ত অর্জুনের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেন।

[মহা (k) ১.২২২-২২৮ অধ্যায়;
(হরি) ১.২১৫-২২০ অধ্যায়]

☐ তবে তক্ষকের সহায়তার জন্য ইন্দ্রকে পরবর্তী সময়েও উদ্যোগী হতে দেখা গেছে। পাণ্ডবদের প্রপৌত্র জনমেজয় যে সর্পযজ্ঞের আয়োজন করেন সেই যজ্ঞেও তক্ষক যাতে দগ্ধ না হন সে জন্য ইন্দ্র তাঁর সুরক্ষার সব রকম বন্দোবস্ত করেছিলেন। এমনকী শেষ পর্যন্ত তক্ষক নাগকে তিনি আপন উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.৫৩.১৬; ১.৫৬.৭-১৪;
(হরি) ১.৪৮.১৬; ১.৫১.৭-১৪]

☐ মহাভারতের শান্তিপর্বে একাধিক উপাখ্যান পাওয়া যায় যেখানে ইন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। শান্তিপর্বে দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের কথোপকথনের উল্লেখ মেলে, মহর্ষি মতঙ্গর সঙ্গে ইন্দ্রের সংবাদও বর্ণিত হয়েছে শান্তিপর্বে। এছাড়াও দৈত্যরাজ শম্বর, প্রহ্লাদ, বলির কাছ থেকে এবং বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট ঋষি-মহর্ষিদের কাছ থেকে ইন্দ্র উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

☐ মহাভারতের শান্তিপর্বে ইন্দ্রকে দণ্ডনীতি বা রাজনীতি শাস্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মা যে বিশাল দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন তা প্রথমে গ্রহণ করেন বিশালাক্ষ মহাদেব। মহাদেব প্রণীত রাজনীতিশাস্ত্র বৈশালক্ষতন্ত্র নামে বিখ্যাত হল। ইন্দ্র সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, তারপর লোকসাধারণের সুবিধার্থে তাকে সংক্ষিপ্ত করে পাঁচ হাজার অধ্যায় সমন্বিত দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন। ইন্দ্র প্রণীত দণ্ডনীতিশাস্ত্র 'বাহুদণ্ডক' নামে প্রসিদ্ধ।

[মহা (k) ১২.৫৯.৮১-৮৩; (হরি) ১২.৫৮.৮১-৮৩]

☐ পুরাকালে ইন্দ্রের বিমাতা তথা দৈত্যকুলের জননী দিতি একসময় স্বামী মহর্ষি কশ্যপের কাছে এমন এক পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করেন, যে পুত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের জয় করতে সমর্থ হবেন। মহর্ষি কশ্যপ দিতিকে বললেন— বেশ, এমনটাই হবে। তুমি সর্বতোভাবে শুচিতা বজায় রেখে চলতে থাকো। তাহলেই তোমার ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র হবে। এই কথা বলে কশ্যপ দিতির গর্ভাধান করে তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র জানতে পারলেন, তাঁর বিমাতা দিতি ইন্দ্রবিজয়ী পুত্রলাভের বরলাভ করেছেন পিতা কশ্যপের কাছ থেকে। কশ্যপ যে দিতিকে শুচিতা বজায় রাখতে এবং ঈশ্বরের আরাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন— সেকথাও ইন্দ্র শুনে থাকবেন। অতএব গর্ভবতী দিতি যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন, সেই সময় স্বয়ং ইন্দ্র এসে দিতির সেবা পরিচর্যা করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য দিতির দোষ অনুসন্ধান করা, ছিদ্রান্বেষণ করা এবং ছিদ্র পাওয়া মাত্র দিতির গর্ভনাশ। দিতি কিন্তু এত কিছু বুঝলেন না। সরল মনে সপত্নীপুত্র ইন্দ্রের সেবা গ্রহণ করতে লাগলেন এবং মনে মনে বেশ প্রসন্নও হলেন ইন্দ্রের প্রতি। ইন্দ্র এদিকে প্রতিদিন সযত্নে দিতির জন্য অগ্নি, সমিধ, কুশ, ফল-মূল সংগ্রহ করে আনেন, দিতির পদসেবা করেন, কোনো কারণে দিতি পরিশ্রান্ত হয়েছেন বলে বুঝতে পারলে তাঁর শ্রান্তি লাঘব করার চেষ্টাও করেন যথাসাধ্য—

তপস্তস্যাস্তু কুর্বন্ত্যাং পরিচর্য্যাং চকার হ।
সহস্রাক্ষঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ পরয়া গুণসম্পদা॥
অগ্নিং সমিৎকুশং কাষ্ঠং ফলংমূলং তথৈবচ।
ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কিঞ্চন॥
গাত্র সংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপয়নৈস্তথা।
শক্রঃ সর্বেষু লোকেষু দিতিং পরিচচার হ॥

ইন্দ্রের সেবায় প্রসন্ন দিতি ইন্দ্রকেই সরলভাবে বলতে লাগলেন—পুত্র! তোমার সেবায় আমি বড়ো প্রীত হয়েছি। আর মাত্র দশটি বছর অপেক্ষা করো, তারপরেই তোমার ভাই জন্ম নেবে। প্রজাপতি কশ্যপের বরে তোমারই তুল্য এক পুত্র লাভ করব আমি। ইন্দ্র প্রসন্ন মুখে সব শোনেন আর দিতির ছিদ্রান্বেষণ করে চলেন। অবশেষে একদিন ইন্দ্র দেখলেন—দুপুরবেলায় শ্রান্ত হয়ে দিতি ঘুমিয়ে পড়েছেন দুই জানুর উপরে মাথা রেখে। তাঁর এলোচুল ছড়িয়ে পড়েছে দুই পায়ের উপর। এটাকে ঠিক শয়নের বিধি বলা যায় না, বিশেষত মাথার চুল পাদস্পর্শ করলে তাকে অশুচি অবস্থাই বলা চলে। এই অবসরে ইন্দ্র দিতির দেহের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর গর্ভস্থ পুত্রটিকে বধ করতে উদ্যত হলেন। বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে দেখে গর্ভস্থ শিশু ভয়ে কেঁদে উঠল। ইন্দ্র সেই গর্ভস্থ বালককে বললেন—কেঁদো না—মা রোদীঃ। তারপর সেই গর্ভস্থ বালককে ইন্দ্র বজ্রের আঘাতে প্রথমে সাতখণ্ডে ভাগ করলেন। এক একটি খণ্ডকে আরও সাত ভাগে ছেদন করলেন। এইভাবে দিতির গর্ভ ঊনপঞ্চাশভাগে বিভক্ত হবার পর দিতির ঘুম ভাঙল। জেগে উঠেই তিনি বুঝলেন যে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে নাশ করেছেন ইন্দ্র। দিতি ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে শাপ দিতে যাবেন, এমন সময় ইন্দ্র সবিনয়ে বললেন—মা! আপনি অশুচি ভাবে শয়ন করেছিলেন, আপনার কেশগুচ্ছ পদতলে পতিত হয়েছিল—সেই দোষ দেখেই আমি আপনার ইন্দ্রহন্তা গর্ভটিকে ছেদন করেছি—

অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োর্গতমূর্দ্ধজা।
তদন্তরমহং লব্ধা শক্র হন্তারমাহবে॥
ভিন্নবান্ গর্ভমেতত্তে বহুধা ক্ষন্তুমর্হসি।

দিতি দুঃখিত হলেন। কিন্তু ইন্দ্রের অকাট্য যুক্তি শুনে তাঁকে দোষারোপ করতেও পারলেন না, অভিশাপ দিতেও পারলেন না। বরং ইন্দ্রকেই তিনি অনুনয় করে বললেন—পুত্র! আমার তোমার উপর কোনো ক্রোধ নেই। বরং আমার অনুরোধ, তুমি আমার এই গর্ভের মঙ্গলজনক কোনো কাজ করো। আমার পুত্রেরা যেন উপযুক্ত স্থান লাভ করেন। দিতির পুত্রকে ইন্দ্র বধ করার সময় বলেছিলেন—কেঁদো না—মা রোদীঃ। সংস্কৃত 'রুদ্' ধাতুর অর্থ রোদন করা। ইন্দ্রের উচ্চারিত 'মা রোদীঃ' বাক্য থেকেই দিতির ঊনপঞ্চাশখণ্ডে বিভক্ত গর্ভ থেকে জাত পুত্রেরা বিখ্যাত হলেন 'মরুৎ' নামে। সাতটি গণে বিভক্ত হয়ে দেবতা রূপে বিচরণ করতে লাগলেন তাঁরা। ইন্দ্রের প্রাণভয় দূর হল, দিতির অনুরোধ রক্ষা করে তিনি তাঁর সন্তানদের দেবত্বও প্রদান করলেন। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দিতির এই ঊনপঞ্চাশজন পুত্রের নামের তালিকাও পাওয়া যায়। *[বায়ু পু. ৬৭.৮৭-১৩৫;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৪৫-১০৬;
রামায়ণ ১.৪৭.৯-২৩;
মহা (k) ৩.১৬৫.৭; (হরি) ৩.১৩৮.৭]

□ পুরাকালে শ্রুতাবতী নামে এক রমণী ইন্দ্রকে স্বামী রূপে লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ইন্দ্র ক্রমে তাঁর প্রতি শ্রুতাবতীর অটল ভক্তি, নিষ্ঠা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। তারপর একদিন শ্রুতাবতীকে পরীক্ষা করার জন্য ইন্দ্র মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপধারণ করে শ্রুতাবতীর তপোবনে এলেন। শ্রুতাবতী তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করে বললেন—আদেশ করুন আপনার কী সেবা করব। আপনার সমস্ত ইচ্ছাই আমি পূরণ করতে পারি শুধু আত্মদান করতে পারি না। অর্থাৎ আপনাকে বিবাহ করতে পারি না। কারণ আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বামীরূপে লাভ করতে চাই। সেই জন্যই তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছি। তখন ছদ্মবেশী ইন্দ্র তাঁকে বললেন—তোমার কঠোর তপস্যার কথা আমি জানি। মানুষ কঠোর তপস্যার ফলে নিজের সব মনস্কামনাই পূর্ণ করতে সমর্থ হয়। আশা করি তোমার মনস্কামনাও পূর্ণ হবে। তবে আপাতত তুমি আমার জন্য এই পাঁচটি বদরীফল পাক কর। শ্রুতাবতী ঋষির আদেশে বদরীফলগুলি সিদ্ধ করতে লাগলেন। সিদ্ধ করতে করতে বহুকাল কেটে গেল, জ্বালানি কাঠও ফুরিয়ে গেল কিন্তু বদরী আর কিছুতেই পক্ক হয় না। তখন নিরুপায় শ্রুতাবতী নিজের পা দুটি জ্বালানির পরিবর্তে অগ্নিতে প্রবেশ করালেন। তাঁর সম্পূর্ণ শরীর ধীরে ধীরে দগ্ধ হতে লাগল তবু তিনি বশিষ্ঠের ছদ্মবেশে আগত ইন্দ্রের আদেশমতো বদরীফল পাক করতে লাগলেন। ইন্দ্র শ্রুতাবতীর নিষ্ঠায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে দর্শন দিলেন এবং স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়ে শ্রুতাবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ

করলেন। শ্রুতাবতীর মাহাত্ম্যধন্য স্থানটি খ্যাত হল বদরিপাচন তীর্থ নামে।

[মহা (k) ৯.৪৮.১-৩১; (হরি) ৯.৪৪.১-৩১]

☐ মহাভারতে এবং পুরাণে ইন্দ্রের ঔরসে শচীর গর্ভজাতপুত্র জয়ন্ত এবং কন্যা জয়ন্তীর উল্লেখ মেলে। রামায়ণে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে দেবাসুর যুদ্ধে অংশ নিতে দেখা যায়। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য যখন সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্য কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন সে সময় শুক্রাচার্যের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র আপন কন্যা জয়ন্তীকে শুক্রাচার্যের কাছে পাঠান। কিন্তু জয়ন্তী শুক্রাচার্যের তপস্যার নিষ্ঠা দেখে এতটাই মুগ্ধ হলেন যে তাঁকে প্রলুব্ধ করার পরিবর্তে তাঁর পতিব্রতা তপস্বিনী পত্নীর মতোই তাঁর সেবা করতে লাগলেন। শুক্রাচার্য সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভের পর জয়ন্তীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং দশবৎসর তাঁর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। জয়ন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী।

[রামায়ণ ৭.৩৩.৬-২১;
মহা (k) ১.১১৪.৪; ১.২২১.৬৪;
(হরি) ১.১০৮.৪; ১.২১৪.৬৫;
মৎস্য পু. ৪৭.১১৪-১৮৮]

☐ তবে দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্রের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদে। দশম মণ্ডলের দুটি সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে জনৈক বসুক্র-র নামোল্লেখ পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে ঋষিপত্নী অর্থাৎ বসুক্রর পত্নী ইন্দ্রকে শ্বশুর বলে সম্বোধন করায় স্পষ্ট হয় যে বসুক্র দেবরাজ ইন্দ্রেরই পুত্র ছিলেন। *[ঋগ্‌বেদ ১০.২৮.১]*

☐ মহাকাব্য-পুরাণে স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সভা এবং ইন্দ্রের অস্ত্র, রথ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতের সভাপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থের ময়দানব নির্মিত যুধিষ্ঠিরের সভায় বসে দেবর্ষি নারদ সেই সভাগৃহের সঙ্গে ইন্দ্রসভার তুলনা টেনেছেন। এপ্রসঙ্গে ইন্দ্রের সুধর্মা সভার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে মহাভারতে, সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় জুড়ে। দেবরাজ ইন্দ্রের সুধর্মাসভা দৈর্ঘ্যে দেড়শো যোজন, বিস্তারে একশো যোজন, উচ্চতায় পাঁচ যোজন। জরা-মৃত্যু-শোকহীন সেই দিব্য সভাগৃহে সিংহাসনে ইন্দ্র এবং তাঁর পত্নী দেবী শচী বিরাজ করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট দেবতারা, সিদ্ধ ঋষি-মহর্ষিরা এবং নৃত্যগীতে বিশেষজ্ঞ গন্ধর্ব এবং অপ্সরারা দেবরাজ ইন্দ্রের সেই সভা অলংকৃত করেন।

পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে ঐরাবত হস্তী যেমন ইন্দ্রের বাহন তেমনই একটি রত্নখচিত দিব্য রথও ইন্দ্র ব্যবহার করতেন। ইন্দ্রের সেই রথের নাম জৈত্র। ইন্দ্রের রথের সারথি ছিলেন মাতলি।

দেবরাজ ইন্দ্রের ধনুকের নাম বিজয়। যক্ষ, কিন্নর গন্ধর্ব ইত্যাদি বিশেষ কোনো জাতির প্রধান ছিলেন দ্রুম। এই দ্রুমের কাছে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। শিক্ষার শেষে দ্রুম ইন্দ্রের বিজয় ধনু রুক্মীকে দান করেছিলেন বলে জানা যায়। আবার মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ নিজের বিজয় ধনুকের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে পুরাকালে বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের জন্য এই বিজয় ধনু নির্মাণ করেন—

সর্বায়ুধ মহামাত্রং বিজয়ং নাম মে ধনুঃ।
ইন্দ্রার্থং প্রিয়কামেণ নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।

ইন্দ্র সেই ধনুক পরশুরামকে দান করেন আর পরশুরামের কাছ থেকেই কর্ণ এই বিজয় নামক ধনুক লাভ করেন। তবে সমসময়ের দুজন মহারথী বিজয় নামক ধনুকের অধিকারী ছিলেন এবং দুজনেই নিজের ধনুককে ইন্দ্রদত্ত বলে বর্ণনা করেছেন—দেখে মনে হয় দুই মহারথীর ধনুকের উপর ইন্দ্রের বিজয় ধনুর মাহাত্ম্য আরোপিত হয়ে থাকবে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে খড়্গোৎপত্তি নামে যে উপাখ্যান পাওয়া যায়, সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা দুষ্টের দমন এবং লোককল্যাণের জন্য যে খড়্গ নির্মাণ করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র সেই খড়্গ পরম্পরাক্রমে লাভ করেন।

[মহা (k) ২.৭ অধ্যায়; ১.১৫৮.১-১০; ৮.৩১.৪২-৪৭;
(হরি) ২.৭ অধ্যায়; ১.১৪৭.১-১০; ৮.২৫.৪১-৪৬;
ব্রহ্ম পু. ১৭১.১-৪৯]

☐ মর্ত্যলোকের বিভিন্ন পরাক্রমশালী রাজর্ষি বিভিন্ন সময়ে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রকে সহায়তা করেছেন আবার বিভিন্ন সময়ে ইন্দ্র তাঁদের সহায়তা করার জন্য নেমে এসেছেন মর্ত্যলোকে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণে পুরাকালের রাজা মুচুকুন্দের কথা পাওয়া যায় যিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাকে নেতৃত্ব দেন এবং

মুচুকুন্দের কারণেই অসুররা পরাস্ত হয়। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজর্ষি ককুৎস্থও একবার দেবসেনার সেনাপতিত্ব করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে বহন করার জন্য ইন্দ্র স্বয়ং বৃষরূপ ধারণ করেছিলেন বলে জানা যায়। সেই বৃষের ককুদে আরোহণ করে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন বলেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় সেই রাজা কুকৎস্থ নামে খ্যাত হন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজর্ষি মান্ধাতা আপন পিতা যুবনাশ্বের কুক্ষিভেদ করে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃহীন পুত্র কীভাবে মাতৃদুগ্ধ লাভ করবে বা মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে অন্য কোন পদার্থ পান করে শিশুর পুষ্টিবর্ধন হবে—একথা ভেবে সকলে চিন্তিত হলেন। এই শিশু কী পান করে জীবনধারণ করবে—একথাই সকলে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় ইন্দ্র এসে বললেন—এই শিশু আমাকে পান করে পুষ্টিলাভ করবে—

কং ধাস্যতি কুমারো'য়ং স্তন্যে রোরূয়তে ভৃশম্।
মান্ধাতা বৎস মারোদীরিতীন্দ্রো দেশিনীমদাৎ॥

সংস্কৃত 'ধে' ধাতুর অর্থ পান করা। ইন্দ্র শিশুটিকে বলেছিলেন যে, এই বালক আমাকেই ধয়ন করবে—মাং ধাতা। ইন্দ্রের তর্জনী থেকে অমৃত পান করে পুষ্টি লাভ করেছিল সেই শিশু। ফলে পরবর্তী সময়ে তাঁর নামই হয়ে গেল মান্ধাতা। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথও কোনো এক দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্রকে সহায়তা করেছিলেন বলে রামায়ণে উল্লেখ আছে।

[বিষ্ণু পু. ৫.২৩.২১; হরিবংশ পু. ২.৫৭.৪৩-৪৬; ভাগবত পু. ৯.৬.১৮-১৯, ৩১; রামায়ণ ২.৯.১১-১৬]

□ রাজা শর্যাতির যজ্ঞে মহর্ষি চ্যবন যখন অশ্বিনীকুমারদের সোমপানের অধিকার দিতে উদ্‌যোগী হলেন, সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র চ্যবনকে প্রবলভাবে বাধা দিয়েছিলেন। চ্যবন যখন দুই অশ্বিনীকুমারকে সোমপানের জন্য আহ্বান করলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র চ্যবনের হাতে ধরা সোমপাত্র থেকে সোমরস পড়তে দিলেন না। ইন্দ্র চ্যবনকে বললেন—শুনুন ঋষি! এই দুই অশ্বিনীকুমার আমার মতে সোমরসের অর্ঘ্য সম্মান পেতে পারেন না। এঁরা দেবতাদের চিকিৎসক মাত্র, অন্যান্য সোমপায়ী দেবতাদের সমতুল্য কখনোই নন।

চ্যবন মুনি ইন্দ্রের ভাষ্য প্রত্যাখ্যান করে বললেন—এই দুই অশ্বিনীকুমার যেমন উৎসাহী, তেমনই মহান এঁদের হৃদয়। আমাকে এঁরা জরাবিহীন যুবকে পরিণত করে নতুন জীবন দিয়েছেন। আর এটাই বা কেন হবে যে, আপনি আর দু-চারজন দেবতা ছাড়া আর কেউ যজ্ঞীয় সোমরসের ভাগ পাবেন না—

ঋতে ত্বাং বিবুধাংশ্চান্যান্ কথং
বৈ নার্হতঃ সবম্।

কেন আপনি অশ্বিনীকুমারদের দেবতা বলে মানতে পারছেন না? ইন্দ্র আরও দু-তিনবার নানাভাবে নিজের যুক্তি বোঝাবার চেষ্টা করলেন চ্যবনকে। তারপর তাঁকে ভয় দেখিয়ে বললেন—সোমরসের এক ফোঁটাও যদি আহুতি হিসেবে অশ্বিনীকুমারদের ভাগে পড়ে, তাহলে আপনার উপরে বজ্রপ্রহার করব আমি—

বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপমনুত্তমম্।

চ্যবন দেবরাজের কথায় ভয় পেলেন না একটুও। তিনি সোমপাত্র গ্রহণ করে আহুতি দিতে উদ্যত হলেন অশ্বিনীকুমারদের উদ্দেশে। ইন্দ্র তা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রপ্রহার করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু চ্যবন তপোবলে স্তব্ধ করে দিলেন দেবরাজকে। তারপর ইন্দ্রকে বধ করার জন্য যজ্ঞাগ্নি থেকে এক মারণ দেবতার সৃষ্টি করলেন চ্যবন। ইন্দ্র দেখলেন—চ্যবনের তপোবলে তাঁর নড়াচড়ার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই, এদিকে চ্যবনের সৃষ্ট শক্তি ধেয়ে আসছে তাঁকে বধ করার জন্য। ভীত হয়ে ইন্দ্র চ্যবনকে বললেন—আমি মেনে নিচ্ছি আপনার কথা। আজ থেকে অশ্বিনীকুমাররাও আমাদের মতো সোমপায়ী সম্ভ্রান্ত দেবতা বলে গন্য হবেন। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। চ্যবন তাঁর সৃষ্ট মারণ শক্তি ফিরিয়ে নিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে অশ্বিনীকুমাররাও সোমরসের অধিকারী হলেন সেই সময় থেকে। শর্যাতিরাজার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হল।

[মহা (k) ৩.১২৪.৪-২৫; ৩.১২৫.২-১০; ১৩.১৫৬.১৬-৩২; (হরি) ৩.১০৩.১-৩২; ১৩.১৩৪.১৫-৩২]

ইন্দ্রকর্মা ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের একটি। সংস্কৃত ইন্দ্ ধাতুর অর্থ প্রভুত্ব করা। যিনি প্রভুত্ব করেন তিনিই ইন্দ্র। এক্ষেত্রে ইন্দ্র বলতে যেমন দেবরাজ পদাধিকারীকে বোঝায় তেমনই জগৎস্রষ্টা জগৎপতি ঈশ্বরকেও বোঝায়। সেক্ষেত্রে ইন্দ্রকর্মা

বলতে বোঝায়, জগতের উপর প্রভুত্ব করার কাজটা যিনি করতে পারেন। ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, জগৎপালক আবার জগতের সংহর্তাও বটে। সুতরাং সমগ্র বিশ্বে প্রতিনিয়ত যা ঘটে চলেছে সেখানে তিনিই কর্তা, তিনিই প্রভু। এই অর্থেই ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রকর্মা নামে খ্যাত—ইন্দ্রের মতো কর্ম যাঁর—

ইন্দ্রস্য কর্মেব কর্মাস্যেতি ইন্দ্রকর্মা,
ঐশ্বর্যকর্মেত্যর্থ (শাঙ্করভাষ্য)।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯৭; (হরি) ১৩.১২৭.৯৭, (শঙ্করাচার্যকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]

ইন্দ্রকীল ভারতবর্ষের একটি পর্বততীর্থ। গন্ধমাদন পর্বতের কাছে অবস্থিত এই পর্বতের অধিপতি কুবের। বনবাসকালে অর্জুন এখানে আসেন এবং এই ইন্দ্রকীল পর্বতেই তপস্বীর বেশধারী দেবরাজ ইন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং এখানেই ইন্দ্র তাঁকে দিব্য অস্ত্রসমূহ দানের প্রতিশ্রুতি দেন। আবার ব্যাধরূপী মহাদেবের সঙ্গে অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতেই দ্বৈরথে মেতেছিলেন। অবশ্য হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে 'ইন্দ্রকীলসমপ্রভঃ'-র পরিবর্তে 'নীলমেঘসমপ্রভঃ' পাঠ পাওয়া যায়। নীলমেঘসমপ্রভ শব্দটি সম্ভবত ইন্দ্রকীল পর্বতের বিশেষণ হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। তবে সিদ্ধান্তবাগীশ নিজের সম্পাদিত সংস্করণে বিশেষণ পদটিকেই বিশেষ্য বলে গ্রহণ করেছেন।

[মহা (k) ২.১০.৩২; ৩.৩৭.৪২; ৩.৩৯.১২; (হরি) ২.১০.২৯; ৩.৩৩.৪২; ৩.৩৫.১২; ভাগবত পু. ৫.১৯.১৬; মৎস্য পু. ২২.৫৩]

☐ পণ্ডিতরা মনে করেন বর্তমান সিকিম রাজ্যের প্রাচীন নাম ইন্দ্রকীল অর্থাৎ ইন্দ্রের উদ্যান। যেহেতু সিকিম হিমালয় পর্বত অধ্যুষিত একটি অঞ্চল সেহেতু এর সঙ্গে প্রাচীন ইন্দ্রকীলের যোগসূত্র থাকা সম্ভব।

[G.P.Singh; Researches into the History and Civilization of the Kiraatas; p. 86]

ইন্দ্রজানু একজন বানর যূথপতি। তিনি এগারো কোটি বানরের অধিপতি ছিলেন। বানরসেনা-সংগ্রহের জন্য সুগ্রীবের নির্দেশে হনুমান দূতপ্রেরণ করেন। তার ফলস্বরূপ যে সমস্ত বানর যূথপতি উপস্থিত হয়েছিলেন, ইন্দ্রজানু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি পণ্ডিত এবং বীর ছিলেন—

'ইন্দ্রজানুঃ কবির্বীরো যূথপঃ প্রত্যদৃশ্যত'।

লঙ্কা-যুদ্ধের শেষে তিনি রাম কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন। *[রামায়ণ ৪.৩৯.৩১-৩২; ৬.৩৯.২২]*

ইন্দ্রজিৎতীর্থ নর্মদা নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত একটি তীর্থ। মেঘবাহন ইন্দ্রদেবতার ভৌতস্বরূপ মেঘরাশির উপস্থিতির জন্যেই এই তীর্থ ইন্দ্রজিৎ নাম লাভ করেছে। *[মৎস্য পু. ১৯০.৩]*

ইন্দ্রতাপন$_{১}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত একজন দানব। পুরাণ মতে দনুর যে সব পুত্ররা মনুষ্যধর্ম অবলম্বন করেন ইন্দ্রতাপন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৮.১৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১৬]

☐ দানবরাজ ইন্দ্রতাপন বরুণের সভায় অবস্থান করতেন বলে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ২.৯.১৫; (হরি) ২.৯.১৫]

ইন্দ্রতাপন$_{২}$ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর একজন অনুচর। *[মৎস্য পু. ১৬১.৮১]*

ইন্দ্রতীর্থ *[দ্র. অহল্যা তীর্থ]*

ইন্দ্রতোয়া গন্ধমাদন পর্বত থেকে উৎপন্ন একটি নদী—

ইন্দ্রতোয়াং সমাসাদ্য গন্ধমাদনসন্নিধৌ ॥

এই পবিত্র নদীতে অবগাহন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

[মহা (k) ১৩.২৫.১১; (হরি) ১৩.২৬.১১]

ইন্দ্রদত্ত প্রজাপতি বিক্রান্তের ঔরসজাত নরমুখ কিন্নরদের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬৯.৩৫]*

ইন্দ্রদমন অত্রিবংশীয় জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি ব্রাহ্মণদের ধনসম্পদ দান করে অক্ষয় স্বর্গলাভ করেছিলেন।

[মহা (k) ১২.২৩৪.১৮; (হরি) ১২.২৩১.১৮]

ইন্দ্রদ্বীপ ভারতবর্ষের নয়টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম। পৌরাণিক নদী নলিনী এই ইন্দ্রদ্বীপের কাছেই সমুদ্রে পতিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৪৫.৭৯; বিষ্ণু পু. ২.৩.৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৯; মৎস্য পু. ১২১.৫৭]

☐ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, পুরাণে আলোচিত ইন্দ্রদ্বীপ বলতে বর্তমান ভিয়েতনাম অথবা ইন্দোনেশিয়াকে বোঝায়। অনেকে মনে করেন আধুনিক আন্দামান দ্বীপটিই প্রাচীন ইন্দ্রদ্বীপ। তবে অল বিরুনীর মতে, ইন্দ্রদ্বীপ ভারতবর্ষের মাঝামাঝি অবস্থিত ছিল। আবার

আবুল ফজল মনে করেন মহেন্দ্র পর্বত এবং প্রাচীন লঙ্কার মধ্যে কোনো এক স্থানে এটি অবস্থিত ছিল।

[GD (N.N. Bhattacharyya) p. 152; J.K. Dodiya; Critical Perspective of the Ramayana, p. 173]

ইন্দ্রদ্যুম্ন$_১$ সত্যযুগের সূর্যবংশীয় একজন রাজা। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ।

আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্নো মহানৃপঃ।
সূর্যবংশে স ধর্মাত্মা স্রষ্টুঃ পঞ্চমপুরুষঃ ॥

মালবদেশের অবন্তী নগরী ছিল ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী। বিষ্ণুভক্ত হিসেবে বিখ্যাত এই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম জড়িয়ে আছে উৎকল বা বর্তমান উড়িষ্যার জগন্নাথধামের উৎপত্তি আখ্যানের সাথে।

ধার্মিক ও প্রজাবৎসল রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একসময় তাঁরই রাজ্যে আগত এক তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য-কথা শোনেন।

ওড্রদেশ ইতি খ্যাতে বর্ষে ভারতসংজ্ঞকে।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥

রাজাকে সেই তীর্থযাত্রী জানান, দক্ষিণ সাগরের তীরে ওড্র (উৎকল) দেশে রয়েছে নীলগিরি পর্বত। এর চতুর্দিক বনাঞ্চলে ঢাকা। এরই এক ক্রোশ দূরত্বে এক কল্পবৃক্ষ আছে যার ছায়া মাত্র স্পর্শে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়। তারই পশ্চিমে রয়েছে রৌহিণ কুণ্ড আর ওই কুণ্ডের পূর্বতটে রয়েছে নীলকান্তমণি নির্মিত বাসুদেব মূর্তি।

রাজা এই বর্ণনা শুনে দ্রুতই সেখানে বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণকে পাঠান। ব্রাহ্মণ ওড্রদেশে গিয়ে শবরপল্লীর বিশ্বাবসু শবরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে তিনি স্মরণ করেন যে, এমন এক প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামের এক রাজা এই ভূমিতে আসবেন এবং বহু যাগ যজ্ঞ করে সেখানে বিষ্ণুতীর্থ পুনঃস্থাপন করবেন। অতঃপর ইন্দ্রদ্যুম্ন পরিচারকবৃন্দকে নিয়ে উৎকল দেশে পৌঁছলেন, প্রজারাও তাঁর অনুগমন করল। সে দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভ্যর্থনা করলেন সাদরে, কিন্তু তিনি এও জানালেন—

বাত্যয়া বালুকাকীর্ণো সাম্প্রতং শ্রুয়তে তু সঃ।
তদ্বশান্মম রাজ্যে'পি দুর্ভিক্ষমরকার্দ্দনম্ ॥

নীল পর্বতের তীরের সেই ভূমি ও বিষ্ণুর নীলকান্তমণি মূর্তিটি মরুঝড়ে বালি আচ্ছাদিত হয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন এমন সংবাদে বিচলিত হলে নারদ তাঁকে আশ্বাস দেন—আপনি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ, অতএব ভক্তের বাঞ্ছাপূরণ হেতু তিনি অবশ্যই আপনাকে দর্শন দেবেন।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণু আরধনায় রত হলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন—আমি যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদির দ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা করব যাতে তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ হবেন। তিনি কলিঙ্গ, উৎকল ও কোশল অধিপতিদের আহ্বান করে অনুরোধ করলেন দ্রুত বিষ্ণু মন্দির নির্মাণের জন্য উপাদান সংগ্রহে অনুচর পাঠাতে। বহু ব্যয়ে মঙ্গলময় অশ্বমেধযজ্ঞ করলেন। জম্বুদ্বীপে সকল জনপদের ব্রাহ্মণরাই এসে উপস্থিত হল সেই যজ্ঞে। সাড়ম্বরে বিধিমত যজ্ঞ ও মন্দির নির্মাণ সমাপন হল।

এরপর রাজা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে চিন্তা করতে লাগলেন পাথর-মৃত্তিকা-দারুময় প্রতিমার মধ্যে কোনটি পরমেশ্বরের মূর্তির জন্য সর্বলক্ষণান্বিত।

'শৈলমৃদ্দারুজাতেষু প্রশস্তং কিং মহীতলে।
বিষ্ণু প্রতিমাযোগ্যঞ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥'

চিন্তাবিষ্ট রাজা স্বপ্নে দেখলেন চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে। তিনিই রাজাকে বলে দিলেন প্রতিমা লাভের উপায়। —হে রাজন, সমুদ্রের কূলের কাছে অর্ধ্ব জলে ও অর্ধ্ব স্থলে এক বৃক্ষ দেখতে পাবে, একা কুঠার হাতে সেই স্থানে গেলে তবেই বৃক্ষটি দেখতে পাবে, সেই বৃক্ষ ছেদন হওয়ামাত্র এক অদ্ভুত আকারে পরিণত হবে তখন সেই বৃক্ষকাষ্ঠ দিয়ে তুমি প্রতিমা নির্মাণ করবে।

রাজা নিশা অবসানে নির্দিষ্ট বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছলে সেখানে বিপ্র বেশধারী বিষ্ণু ও বিশ্বকর্মা এসে উপস্থিত হলেন, বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করলেন কৃষ্ণমূর্তি—অনন্তমূর্তি—সুভদ্রামূর্তি। দিব্যমায়ায় প্রতিমা অল্পকালেই তৈরি হল। রাজা বুঝলেন তাঁরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণবেশী দেবতা। ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর শরণ নিতে পরমেশ্বর বললেন—আমি পুরুষোত্তম।

—মাং পুরুষোত্তমম্।

ভক্তের প্রচেষ্টায় তুষ্ট পরমেশ্বর বিষ্ণু ইন্দ্রদ্যুম্নকে বর দিতে চাইলে রাজা তাঁর পরমপদ প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু ইন্দ্রদ্যুম্নকে আশীর্বাদ

করলেন—দশসহস্র নবশত বর্ষ রাজত্ব ভোগ করার পর তুমি দিব্যপদ লাভ করবে।

দশ বর্ষসহস্রাণি তথা নব শতানি চ।
অবিচ্ছিন্নং মহারাজ্যং কুরু ত্বং নৃপসত্তম॥

—তিনি আরও বললেন, তোমার অক্ষয় কীর্তির স্মারক, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নামে এক তীর্থ প্রখ্যাত হবে যেখানে স্নানমাত্রই মানুষ ইন্দ্রলোক লাভ করবে।

[স্কন্দ পু. (বিষ্ণু/পুরুষোত্তমক্ষেত্র) ৪-৩২ অধ্যায়; ব্রহ্ম পু. ৪৪-৫১ অধ্যায় পঠিতব্য; K. C. Mishra, The Cult of Jagannatha]

ইন্দ্রদ্যুম্ন$_{২}$ মহাভারতে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে জনৈক প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লিখিত হয়েছে। মৃত্যুর পর যেসব প্রাচীন রাজা যম সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৮.২১; (হরি) ২.৮.২১]

ইন্দ্রদ্যুম্ন$_{৩}$ কৃষ্ণের সমসাময়িক একজন রাজা। কৃষ্ণ একসময় এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে যুদ্ধে বধ করেছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ৩.১২.৩২; (হরি) ৩.১১.৩২]

ইন্দ্রদ্যুম্ন$_{৪}$ দ্বৈতবনে বসবাসকারী একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ। বনবাসকালে পাণ্ডবরা যখন দ্বৈতবনে বসবাস করছিলেন সে সময় সেখানকার অন্যান্য তপস্বীদের সঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্নও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন।

[মহা (k) ৩.২৬.২২; (হরি) ৩.২৩.২২]

ইন্দ্রদ্যুম্ন$_{৫}$ বনবাসকালে পাণ্ডবরা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের কাছ থেকে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন প্রাচীন রাজর্ষির উপাখ্যান শোনেন। তবে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কোন বংশে বা কোন যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার বিশদ উল্লেখ মহাভারতে নেই।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পাণ্ডবরা এবং অন্যান্য মুনি ঋষিরা প্রশ্ন করেছিলেন যে, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ঋষির থেকেও প্রাচীন কোনো ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় কী না। উত্তরে মার্কণ্ডেয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা বলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন মার্কণ্ডেয়ের থেকেও প্রবীণ—একথা মার্কণ্ডেয় নিজেই স্বীকার করেছেন।

দীর্ঘকাল পুণ্যবলে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গলোকে বাস করছিলেন। একসময় তাঁর পুণ্য ক্ষয় হল, কীর্তি নষ্ট হল—তিনি স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যভূমিতে পতিত হলেন—

অস্তি খলু রাজর্ষিরিন্দ্রদ্যুম্নো নাম
ক্ষীণপুণ্যস্ত্রিদিবাৎ প্রচ্যুতঃ।

মর্ত্যলোকে এসে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দুঃখিত মনে চিন্তা করতে লাগলেন—আমার সমস্ত কীর্তিই নষ্ট হল। মর্ত্যে আর আমার মতো প্রাচীন কেউ জীবিতও নেই যে, আমার কীর্তির কথা স্মরণ করবে। ভাবতে ভাবতে ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথমে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের কাছে এসে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি আমাকে চিনতে পারেন? মার্কণ্ডেয় তপস্বী ঋষি, তার উপর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। ফলে রাজার কীর্তির কথা তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার থেকেও প্রবীণ কি কেউ আছেন? মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিয়ে গেলেন হিমালয় পর্বতে বসবাসকারী প্রাবারকর্ণ নামে এক পেচকের কাছে। এই পেচক মার্কণ্ডেয়ের থেকেও প্রাচীন। কিন্তু প্রাবারকর্ণও ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা স্মরণ করতে পারলেন না। তাঁর পরামর্শে ইন্দ্রদ্যুম্ন গেলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে বসবাসকারী নাড়ীজঙ্ঘ নামক বকের কাছে। সেই বক বয়সে প্রাবারকর্ণ পেচকের থেকেও প্রবীণ ব্যক্তি। কিন্তু নাড়ীজঙ্ঘও ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথা স্মরণ করতে পারলেন না। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁকে প্রশ্ন করলেন—আপনার থেকেও বয়স্ক ব্যক্তি কেউ কি আছেন? নাড়ীজঙ্ঘ বললেন—এই সরোবরেই অকূপার নামে এক কচ্ছপ বাস করে। সে আমার থেকেও বয়সে প্রবীণ। আপনি বরং তাঁর কাছে যান। ইন্দ্রদ্যুম্ন অকূপারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে চেনেন? অকূপার অনেক চিন্তা করে উত্তর দিলেন—আমি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথা মনে রাখব না! ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাই তো সহস্র সহস্র যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি যত গো দান করেন, সেই গোরুগুলির পদচারণার ফলেই তো আমার বাসস্থান, এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর তৈরি হয়েছিল। অকূপার ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্তির প্রশংসা করলে স্বর্গ থেকে রথ নেমে এলো ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিয়ে যাবার জন্য। ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গলোকে ফিরে এলেন আবার।

[মহা (k) ৩.১৯৯ অধ্যায়; ৩.১৬৯ অধ্যায়]

ইন্দ্রদ্যুম্ন$_{৬}$ দক্ষিণভারতে পাণ্ড্য দেশের রাজা ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, রাজা

ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন, শ্রীহরির আরাধনাতেই তাঁর দিনের বেশিরভাগ সময় অতিক্রান্ত হত। একদিন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মৌনব্রত অবলম্বন করে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করছিলেন, এমন সময় মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় রত, তিনি দেখতেও পেলেন না, অগস্ত্যের অভ্যর্থনাও করলেন না। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মহর্ষি অগস্ত্য ইন্দ্রদ্যুম্নকে শাপ দিলেন—এই অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী রাজার বাস্তবে নরকে যাওয়াই উচিত। যেহেতু ইনি হস্তীর মতো জড়বুদ্ধি, অতএব এই রাজা হস্তীরূপ প্রাপ্ত হবেন।

অগস্ত্যের শাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হস্তীরূপ লাভ করলেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তির কারণেই তাঁর পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হল না। তিনি হস্তীরূপেও ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ভগবান হস্তীরূপ প্রাপ্ত নিজের পরমভক্তকে উদ্ধার করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুলোকে স্থানলাভ করেন এবং বিষ্ণুর পার্ষদত্ব লাভ করেন। *[ভাগবত পু. ৮.৪.৭-১২]*

ইন্দ্রদ্যুম্ন$_{৭}$ প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ্রের বংশধারায় ঋষভের পুত্র ভরত। এই ভরতের বংশধর তেজস (বায়ু পুরাণ মতে তৈজস)-এর ঔরসে ইন্দ্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র রাজা পরমেষ্ঠী।

[বায়ু পু. ৩৩.৫৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৬৪; বিষ্ণু পু. ২.১.৩৬]

ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর একটি সরোবর। নলিনী নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে এই সরোবরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। তবে বায়ু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে নলিনী নদী নয়, পাবনী নামে একটি ধারা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত—এমন কথা বলা হয়েছে। মহারাজ পাণ্ডু বনবাসকালে তাঁর দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রীকে সঙ্গে নিয়ে একবার এই সরোবরে এসেছিলেন। *[মহা (k) ১.১১৯.৪০; (হরি) ১.১১৩.৫০; মৎস্য পু. ১২১.৫৫; বায়ু পু. ৪৭.৫৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৫৬]*

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞাশ্বদের দ্বারা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের উৎপত্তি। যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত সহস্র অশ্বের ক্ষুরের আঘাতে মাটি বিদীর্ণ হয়ে তাদেরই মূত্রে এই সরোবরের উৎপত্তি। ফলে সরোবরটি অতি পবিত্র।

[স্কন্দ পু. (বিষ্ণু খণ্ড/পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য) ৩১.৩-৭]

☐ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অদূরে গুণ্ডিচা মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের অবস্থান বলে পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করেন।

ইন্দ্রনদী পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষের পূর্বভাগ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। এর অন্য নাম ইন্দ্রাবতী।

[বায়ু পু. ৪৩.২৬]

ইন্দ্রপদ$_{১}$ পুরাণ মতে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে আনয়ন করলে গঙ্গা সাতটি ধারায় বিভক্ত হয়ে মর্ত্যে প্রবাহিত হন। এর মধ্যে যে তিনটি ধারা প্রতীচ্য অর্থাৎ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল সিন্ধু। এই সিন্ধু প্রতীচ্যের যেসব জনপদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ইন্দ্রপদ তার মধ্যে অন্যতম। বায়ু পুরাণ স্থানটিকে ইন্দ্রহাস নামে চিহ্নিত করেছে। মৎস্য পুরাণের পাঠে স্থানটি ইন্দ্রমরু নামে চিহ্নিত। পণ্ডিত D.C. Sircar এই শ্লোকে ইন্দ্রপদ বা ইন্দ্রমরু শব্দের ঠিক আগে যে শৈবপুর বা শিবপুর স্থানটির নামোল্লেখ আছে তার অবস্থান নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পঞ্জাব প্রদেশের Jhang জেলায় এই শিবপুর বা শৈবপুর অবস্থিত। ইন্দ্রপদ বা ইন্দ্রমরু এর কাছাকাছি অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়।

স্কন্দ পুরাণে ইন্দ্রপদ নামে এক তীর্থের উল্লেখ পাচ্ছি। সরস্বতী নদীর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই তীর্থে কোন প্রস্রবণ ছিল বলে মনে হয়। কারণ, স্কন্দ পুরাণে এই স্থানে একটি 'দ্রবধারা'র উল্লেখ পাই—

তত্যো'বাগ্‌দক্ষিণে ভাগে দ্রবধারেতি বিশ্রুতম্।
তীর্থমিন্দ্রপদং যত্র তপশ্চক্রে পুরন্দরঃ॥

এইস্থানে উপবাস ও কঠোর তপস্যায় নারায়ণকে তুষ্ট করেছিলেন ইন্দ্র। এই তপস্যার ফলেই তিনি ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন বলে স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ পাই। লক্ষণীয়, পঞ্জাবের Jhang জেলার নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রাচীন সরস্বতী নদীর একটি ধারাও প্রবাহিত হত। সুতরাং অন্যান্য পুরাণোক্ত ইন্দ্রমরু বা ইন্দ্রহাসের সঙ্গে

স্কন্দ পুরাণোক্ত ইন্দ্রপদকে অভিন্ন বলেই মনে হয়। *[মৎস্য পু. ১২১.৪৭; বায়ু পু. ৪৭.৪৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৪৮; স্কন্দ পু. (বিষ্ণু/বদরিকা) ৬.৪৩-৪৬; D.C. Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India, p. 69]*

ইন্দ্রপদ$_{২}$ গয়ায় অবস্থিত একটি তীর্থ। বিষ্ণুপদ বা আদিগদাধরেরই অন্য নাম ইন্দ্রপদ। *[বায়ু পু. ১০৯.১৯]*

ইন্দ্রপালিত কলিযুগে ভারতবর্ষে মৌর্যবংশীয় যে সব রাজা রাজত্ব করেন ইন্দ্রপালিত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি মৌর্যবংশীয় রাজা বন্ধুপালিতের পুত্র ছিলেন। দেববর্মা নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। *[বায়ু পু. ৯৯.৩৩৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৪৭]*

ইন্দ্রপ্রতিম বশিষ্ঠ বংশীয় একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বায়ু পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে যে, বশিষ্ঠের ঔরসে কপিঞ্জলী ঘৃতাচীর গর্ভে ইন্দ্রপ্রতিম বা কুশীতিয় জন্মগ্রহণ করেন। *[বায়ু পু. ৭০.৮৮; মৎস্য পু. ১৪৫.১১০]*

ইন্দ্রপ্রমতি একজন ঋষি। পুরাণে কোথাও কোথাও ইন্দ্রপ্রমদ নামেও চিহ্নিত হয়েছেন তিনি। পুরাণগুলিতে ঋষি ইন্দ্রপ্রমতির পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে বশিষ্ঠ বংশীয় এবং বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বশিষ্ঠের ইন্দ্রপ্রতিম নামে যে পুত্রের উল্লেখ পাই তিনি এবং ইন্দ্রপ্রমতি একই ব্যক্তি কি না সে বিষয়ে ভাবনার অবকাশ থাকছে।

বেদ বিভাগের সময় ব্যাসদেবের শিষ্য মহর্ষি পৈল ঋগ্বেদ সংহিতাকে দুইভাগে বিভক্ত করে দুই শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি এবং বাস্কলিকে শিক্ষা দেন। ইন্দ্রপ্রমতি নিজের অংশটি মহর্ষি মাণ্ডুকেয়কে (অন্যত্র মার্কণ্ডেয়) শিক্ষা দেন। বিষ্ণু পুরাণ অবশ্য জানিয়েছে যে মাণ্ডুকেয় শুধু ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্যই নন, পুত্রও বটে। ইনি ব্রহ্মক্ষেত্রে বসবাস করতেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে।

শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যে সব ঋষি-মহর্ষি কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন ইন্দ্রপ্রমতি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রায়োপবেশনরত রাজা পরীক্ষিৎকেও দেখতে এসেছিলেন তিনি। *[ভাগবত পু. ১.৯.৭; ১.১৯.৯; ১২.৬.৫৪-৫৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৫; ১.৩৩.৩; ১.৩৪.২৫; ২.৮.৯৬-৯৭; বায়ু পু. ৫৯.১০৫; ৬০.২৫, ২৭; বিষ্ণু পু. ৩.৪.১৬, ১৯]*

ইন্দ্রপ্রমদ *[দ্র. ইন্দ্রপ্রমতি]*

ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবদের রাজধানী এবং একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরী। *[মহা (k) ১.১.১৪৯; ২.৩২.১৯; (হরি) ১.১.১১২; ২.৩১.১৮; ভাগবত পু. ১০.৫৮.১; ১১.৩০.৪৮]*

☐ বারণাবতের জতুগৃহ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর পাণ্ডবরা দ্রুপদ কন্যা পাঞ্চালীকে বিবাহ করেন। এরপর ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে পাণ্ডবদের সপরিবারে হস্তিনাপুর প্রত্যাগমন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সহ অন্যান্য কুরুবৃদ্ধরা অনুভব করেছিলেন যে, পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে অবস্থান করলে দুর্যোধন প্রমুখের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ধৃতরাষ্ট্র তখন গ্রহণযোগ্য সমাধান হিসেবে পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য দান করে তাঁদের হস্তিনাপুরের পরিবর্তে খাণ্ডবপ্রস্থ নামে একটি জায়গায় বসতি স্থাপন করার প্রস্তাব দেন। আসলে পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থে পাঠিয়ে দেবার পিছনে ধৃতরাষ্ট্রের গূঢ় অভিসন্ধি ছিল—হস্তিনাপুর থেকে তাঁদের দূরে রাখা সেক্ষেত্রে দুর্যোধনের পক্ষে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণের পথ আরও নিষ্কণ্টক হয়।

প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রের অদূরে অবস্থিত খাণ্ডবপ্রস্থ বা খাণ্ডববন সেকালে কোনো বসবাসযোগ্য স্থান ছিল না। গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলকে বাসযোগ্য করে তোলার পিছনে অর্জুন কর্তৃক খাণ্ডববন দহনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আসলে খাণ্ডব বন সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত না হলে সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থের মতো মনোরম নগরী স্থাপন অসম্ভব ছিল।

পাণ্ডবরা কৃষ্ণ সহ খাণ্ডবপ্রস্থে প্রথমবার পৌঁছে বুঝতে পারেন স্থানটি বসবাসের অনুকূল নয়। প্রথমেই তাঁরা উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করেন। তারপর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে শুরু হয় অঞ্চলটির ভূ-সমীক্ষা। প্রাচীর দিয়ে বেষ্টন এবং প্রাচীরের চারপাশে পরিখা খনন করে নগরীর সুরক্ষাবেষ্টনী নির্মাণ করা হয়। মন্দর পর্বতের সমান বিশাল নগরদ্বার ও মহাত্মা গরুড়ের অর্গলতুল্য দুটি পাখার মতো দৃঢ় এবং বিরাট কপাট স্থাপন করা হল। সংগৃহীত হল নানা প্রকারের অস্ত্র। প্রাচীরের উপর স্থাপিত হল লৌহগোলক নিক্ষেপের যন্ত্র। তাতে যোজনা করা

হয় তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ। এ থেকে বোঝা যায় পাণ্ডবরা রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন কারণ একটি সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থা স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। বোঝা যায় সুরক্ষা বলয়ের ভাবনায় তাঁরা প্রাক্তন হস্তিনাপুরের প্রশাসন থেকে একেবারেই মুক্ত ও স্বাধীন হয়েছেন।

বাস্তব বিচার করে কৃষ্ণকে উদ্যোগপর্বে বলতে দেখা যায় পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর থেকে খাণ্ডবপ্রস্থ গমন প্রকৃতপক্ষে নির্বাসনেরই নামান্তর মাত্র। লক্ষণীয় বিষয় হল, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থানকালেও কখনোই ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করেননি। বরং তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত থেকে অন্যান্য নরপতিদের বশীভূত করেছিলেন—বা বলা ভালো হস্তিনাপুরের পক্ষে করে রেখেছিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থং ত্বয়েবাসৌ সপুত্রেণ বিবাসিতঃ॥
ন তত্র নিবসন্ সর্বান্ বশমানীয় পার্থিবান।
তন্‌পু খানকরোদ্রাজন্ ন চ ত্বামত্যবর্ত্তত॥

কিন্তু একথাও ঠিক যে, খাণ্ডবপ্রস্থের মতো একটি বনাঞ্চলকে বহু পরিশ্রম ও পরিকল্পনায় পাণ্ডবরা অমরাবতীতুল্য ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত করে হস্তিনাপুরের সঙ্গে তাঁদের রাজধানীর ভৌগোলিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য গড়ে তোলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাণ্ডবপ্রস্থের বনভূমিকে বহু পরিশ্রমে ইন্দ্রপ্রস্থের চেহারা দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে ময়দানবের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মহাভারতের আদিপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থকে অমরাবতীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। খাণ্ডব দহনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর ময়দানব অর্জুনের কাছে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোনো মঙ্গলজনক কার্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্জুন তাঁকে কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুরূপ কাজ করার কথা বলেন। কৃষ্ণ তখন ময়দানবকে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের জন্য একটি মনোরম সভাগৃহ নির্মাণ করতে বলেন। ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থের মধ্যভাগে যুধিষ্ঠিরের জন্য একটি সপ্ততল বিশিষ্ট সভাগৃহ নির্মাণ করেন।

আদিপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ণনায় একে প্রশস্ত রাজপথ এবং লৌহচক্রে সজ্জিত নগরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চারিদিকে বিভিন্ন ফল ও ফুলের বৃক্ষ, মনোরম উদ্যান ও সরোবর। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে ভাষাবিদ, বণিক, শিল্পী, যোদ্ধা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষের সেখানে বাস।

[মহা (k) ১.২০৭.২৬-৫০; ২.১.১-২০;
৩.২৩৩.৫০; ৫.৯৫.৫৬-৫৭;
(হরি) ১.২০০.৩৭-৬২; ২.১.১-২০;
৩.১৯৬.৪৮; ৫.৮৮.৫৬-৫৭]

☐ অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার পর দ্যূতক্রীড়ার শর্তানুযায়ী যুধিষ্ঠির কৌরবদের কাছে তাঁদের বিজিত সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার দাবী জানান। সে সময় তিনি দুর্যোধনের কাছে তাঁর পূর্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব জানান।

[মহা (k) ৫.২৬.২৯; (হরি) ৫.২৬.২৯]

☐ যদু-বৃষ্ণি বংশ ধ্বংসের পর অর্জুন কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য দান করেন। *[মহা (k) ১৬.৭.৭২; (হরি) ১৬.৭.৮৩;*
ভাগবত পু. ১১.৩১.২৫; বিষ্ণু পু. ৫.৩৮.৩৪]

☐ বিখ্যাত খাণ্ডবপ্রস্থ বা খাণ্ডব অরণ্যাঞ্চলের উপরই পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীটি নির্মাণ করেন সেই ইন্দ্রপ্রস্থই বর্তমান উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত মুজফরনগর শহর। এই অঞ্চলটি প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল। অবশ্য সমগ্র খাণ্ডববনের পরিধি বিচার করলে বর্তমান মেরঠের বুলন্দশহর থেকে শাহারাণপুর পর্যন্ত অঞ্চলকে এর অন্তর্গত বলা যেতে পারে। পণ্ডিত D. C. Sircar অবশ্য সরাসরি দিল্লী তথা বৃহত্তর দিল্লীকেই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন। *[GAMI (D. C. Sircar) p. 99;*
GDAMI (Day) p. 99]

ইন্দ্রবর্মা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক মালবরাজ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দান করেন। ইন্দ্রবর্মার নাম তাঁর বীরত্বের কারণে উল্লেখযোগ্য তেমন নয়। দ্রোণকে অস্ত্রত্যাগ করাবার উদ্দেশ্যে ভীম যখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটনা করেন, সেই সময় ভীম বুঝেছিলেন যে, এ রটনার সত্যতা যাচাই করতে দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরের কাছেই আসবেন। কারণ একমাত্র যুধিষ্ঠিরই কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। সেক্ষেত্রে ভীমেরও দায়িত্ব ছিল যুধিষ্ঠিরকে যাতে মিথ্যা কথনের পাপ স্পর্শ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তাই ভীম পাণ্ডবপক্ষীয় মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার 'অশ্বত্থামা' নামক হস্তীটিকে বধ করেন এবং প্রচার করে দেন যে অশ্বত্থামা নিহত

হয়েছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মালবরাজ ইন্দ্রবর্মা বিখ্যাত হয়ে আছেন দ্রোণবধের জন্য উচ্চারিত অর্ধসত্যের আধার 'অশ্বত্থামা' নামক হাতিটির মালিক হিসেবেই।

[মহা (k) ৭.১৯০.১৫-১৬; ৭.১৯৩.৫৬; (হরি) ৭.১৬৩.১৪-১৬; ৭.১৬৪.৪২]

ইন্দ্রবাধন কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত একজন দানব। পুরাণ মতে, যেসব দনুপুত্র হিংসাবৃত্তি ছেড়ে মনুষ্য ধর্ম গ্রহণ করেন ইন্দ্রবাধন তাদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৮.১৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১৬]

ইন্দ্রবাহ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয়। রাজা পুরঞ্জয় ইন্দ্রবাহ নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

[দ্র. পুরঞ্জয়]

[ভাগবত পু. ৯.৬.১২]

ইন্দ্রবাহু অগস্ত্য বংশীয় একজন ঋষি।

[মৎস্য পু. ১৪৫.১১৪]

ইন্দ্রমরু *[দ্র. ইন্দ্রপদ$_১$]*

ইন্দ্রমার্গ একটি পবিত্র তীর্থ। এখানে স্নান করলে স্বর্গলাভ হয়। এটি পিতৃতর্পণের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান।

[মহা (k) ১৩.২৫.৯, ১৬; (হরি) ১৩.২৬.৯, ১৬]

ইন্দ্রলোকতীর্থ বদ্রীধামের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ—

ইন্দ্রলোকমিতি খ্যাতং বদর্য্যাঞ্চ মমাশ্রমম্।

দেবরাজ ইন্দ্র, এই তীর্থে বরাহদেবের উপাসনা করে তাঁকে তুষ্ট করেছিলেন। এখানে একটি অতিপবিত্র নদী রয়েছে। এখানে ধর্মরাজের নিত্য অবস্থিতি। *[বরাহ পু. ১৪১.১০-১৩]*

ইন্দ্রশত্রু$_১$ রাবণের পুত্র। লঙ্কাযুদ্ধের পূর্বে রামচন্দ্রের সৈন্যদের বিনাশের জন্য যে সমস্ত বলবান রাক্ষসেরা রাবণের কাছে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ-প্রদর্শন করেছিলেন ইন্দ্রশত্রু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অস্ত্রযুদ্ধে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমানকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে রাবণের অনুমতি চেয়েছিলেন। মনে হয়, রাবণের মহাপরাক্রমশালী জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দ্রজিৎকেই এইস্থানে ইন্দ্রশত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[রামায়ণ ৬.৯.২-৬]*

ইন্দ্রশত্রু$_২$ ভণ্ডাসুরের অমাত্যদের মধ্যে একজন হলেন ইন্দ্রশত্রু। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১২.১২]*

ইন্দ্রসাবর্ণি ভবিষ্যৎ চতুর্দশ মন্বন্তরে ইনি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন। ইন্দ্রসাবর্ণি মনুর কালে শুচি ইন্দ্রপদ লাভ করবেন। দেবতারা পবিত্র, চাক্ষুষ প্রভৃতি গণে বিভক্ত হবেন। এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি হবেন অগ্নি, বাহু, শুচি, শুদ্ধ, মাগধ প্রভৃতি ঋষিরা। ইন্দ্রসাবর্ণি মনুর ঔরসে উরু, গম্ভীর, বুধ প্রভৃতি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। এই মন্বন্তরে ভগবান শ্রীহরি সত্রায়ণের ঔরসে বিতানার গর্ভে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর নাম হবে বৃহদ্ভানু। *[ভাগবত পু. ৮.১৩.৩৩-৩৫]*

ইন্দ্রসেন$_১$ রাজা কুরুর পৌত্র রাজা পরীক্ষিতের পঞ্চম পুত্রের নাম ছিল ইন্দ্রসেন।

[মহা (k) ১.৯৪.৫৫; (হরি) ১.৮৯.৪৩]

ইন্দ্রসেন$_২$ নিষধরাজ নলের ঔরসে দময়ন্তীর গর্ভে একটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে পুত্রটির নাম ছিল ইন্দ্রসেন এবং কন্যা সন্তানটির নাম ইন্দ্রসেনা।

[মহা (k) ৩.৫৭.৪৬; (হরি) ৩.৪৭.৪৬]

ইন্দ্রসেন$_৩$ অর্জুনের অন্যতম সারথি। রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসেনকে দ্বারকায় পাঠিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। কৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞের সংবাদ শুনে এই ইন্দ্রসেনের সঙ্গে তখনই ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

ইন্দ্রসেনকে মহাভারতে আরও অনেকবার উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। তিনি পাণ্ডবদের অনুগত এবং বিশ্বস্ত পরিচারকদের মধ্যে অন্যতম। পাণ্ডবরা যখন বারো বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন, তখন ইন্দ্রসেন এবং আরও চোদ্দজন ভৃত্য তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁরা বারো বছর বনবাস করে রাজা যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের সেবা করেছিলেন, এক বন থেকে অন্য বনে যাবার সময় সহায়তা করেছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবরা ইন্দ্রসেন এবং তাঁর সঙ্গীদের দ্বারকায় পাঠিয়ে দেন। ইন্দ্রসেনকে এরপর আবার উপপ্লব্য নগরে অভিমন্যুর বিবাহের সময় দেখা গেছে।

মহাভারতে এরপর ইন্দ্রসেনকে দেখা যায় স্ত্রী পর্বে মৃতদেহগুলির সৎকারের আয়োজন করার সময়। যুধিষ্ঠিরের আদেশে যাঁরা মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন করছিলেন ইন্দ্রসেন তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ২.১৩.৪০-৪২; ৩.১.১১; ৩.২৩.৪; ৩.৯৩.২৮-২৯; ৪.৪.৫৮; ৪.৭২.২৩; ১১.২৬. ২০-২১; (হরি) ২.১৩.৪০-৪২; ৩.১.১১; ৩.২০.৪; ৩.৭৭.২৮-২৯; ৪.৪.৫৩; ৪.৬৭.২২; ১১.২৬.২০-২১]*

ইন্দ্রসেন$_{৪}$ একজন যোদ্ধা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন।

[মহা (k) ৭.১৫৬.১২২; (হরি) ৭.১৩৬.১১৮]

ইন্দ্রসেন$_{৫}$ প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.২০.৪]*

ইন্দ্রসেন$_{৬}$ ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা ভানুর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন দেবঋষভ। ইন্দ্রসেন এই দেবঋষভের পুত্র ছিলেন। *[ভাগবত পু. ৬.৬.৫]*

ইন্দ্রসেন$_{৭}$ বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্তের বংশধারায় কূর্চের পুত্র ছিলেন ইন্দ্রসেন। ইনি বীতিহোত্র নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২.১৯-২০]

ইন্দ্রসেন$_{৮}$ পাঞ্চালরাজ মুদ্‌গলের পুত্র ব্রহ্মিষ্ঠ। ব্রহ্মিষ্ঠের পুত্র ছিলেন ইন্দ্রসেন। রাজা ইন্দ্রসেন বিন্ধ্যাশ্ব নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন।

[মৎস্য পু. ৫০.৬]

ইন্দ্র-পৃক্ স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধারায় ভগবান ঋষভদেবের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভে জাত একজন পুত্র। *[ভাগবত পু. ৫.৪.১০]*

ইন্দ্রহাস *[দ্র. ইন্দ্রপদ$_{১}$]*

ইন্দ্রাণী দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী পৌলোমী শচী ইন্দ্রাণী নামেও পরিচিত। ঋগ্‌বৈদিককালে ইন্দ্রই ছিলেন প্রধান পূজনীয় দেবতা। সেই ভাবনা থেকেই ইন্দ্রাণী শচীও সৌভাগ্যের প্রতিমূর্তিরূপে পূজিত হতেন। ঋগ্‌বেদের একাধিক মন্ত্রে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বরুণের পত্নী বরুণানী এবং অগ্নির পত্নী অগ্নায়ীকে যজ্ঞে আবাহন করতে দেখা যায়। স্বস্তি এবং মঙ্গলদায়িনী দেবী হিসেবে ঋগ্‌বেদে একাধিকবার ইন্দ্রাণীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে অজর অমর দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী ইন্দ্রাণীকে মূর্তিমতি সৌভাগ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৮৬.১১]

প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী হিসেবে ইন্দ্রাণীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে যেহেতু তিনি দেবরাজের প্রিয়তমা পত্নী, তাই তাঁর মাথার উষ্ণীষটিও নানাবর্ণ নানা রত্নখচিত, মূল্যবান—

ইন্দ্রাণী হ ব ইন্দ্রস্য প্রিয়া পত্নী তস্যা
উষ্ণীষো বিশ্বরূপতমঃ।

[ঋগ্‌বেদ ১.২২.১২; ২.৩২.৮; ৫.৪৬.৮; ১০.৮৬.১১-১২; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১৪.২.১.৮]

বেদ-পরবর্তী যুগে মহাকাব্যের কালেও দেবী ইন্দ্রাণীর পূজার উল্লেখ মেলে। কৃষ্ণের দ্বারা বিদর্ভের রাজনন্দিনী রুক্মিণীকে হরণের ঘটনার ঠিক আগে হরিবংশ পুরাণের বিবরণে দেখা যায় স্বয়ংবরা রাজকন্যা রুক্মিণী বিবাহের মঙ্গল ভিক্ষা করতে এসেছেন কুলদেবীর মন্দিরে। বিদর্ভ রাজকুলের এই কুলদেবী হরিবংশ পুরাণ মতে দেবী ইন্দ্রাণী—

ইন্দ্রাণীমর্চয়িষ্যন্তী কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
দীপ্যমানেন বপুষা বলেন মহতা বৃতা॥

তবে রুক্মিণীহরণ বিষয়ে ভাগবত পুরাণের বিবরণই লোকমুখে সর্বাধিক চর্চিত। সেখানে রুক্মিণীকে দেবী ভবানীর মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা করতে দেখা গেছে। তবে ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্করণে ধৃত অধিক পাঠে কতকগুলি শ্লোক পাওয়া যায় সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিবাহের সাজে সজ্জিতা রুক্মিণী যে দেবালয়ে পূজা করতে গেলেন, সেটি দেবেন্দ্রাণী পৌলোমী শচীর মন্দির—দেবরাজ ইন্দ্রের মন্দিরের ঠিক পাশেই সেই মন্দিরের অবস্থান। এই ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীই বিদর্ভরাজকুলের কুলদেবতা এবং কুলদেবী। বিবাহের আগে রুক্মিণী তাই দেবী শচীর পূজা করে সৌভাগ্য যাচনা করেছেন—

উপকণ্ঠে সুরেশস্য পৌলোম্যাশ্চনিকেতনম্।
তৌ বিদর্ভপ্রসূতানাং নৃপাণাং কুলদেবতে॥
তদন্তিকমুপাগম্য শচীং সুরপতিপ্রিয়াম্।
চিররাধিতপাদাব্জাং সা প্রণম্য বিনির্যযৌ॥

[হরিবংশ পু. ২.৫৯.৩৪; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫৩.৪৯ এবং ৫০নং শ্লোকের মধ্যবর্তী অধিক পাঠ দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৬৯]

□ বৈদিকযুগের অন্যতমা দেবী বেদ-পরবর্তী যুগে দেবী শক্তির অন্যতমা রূপ হিসেবে পূজিত হয়েছেন। পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, দেবী শক্তিই দেবলোকে পূজিত হন ইন্দ্রাণী নামে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য অংশেও দেবী শক্তির অন্যতম রূপ হিসেবে দেবী ইন্দ্রাণী বা ঐন্দ্রীর নাম পাওয়া যায়।

[মৎস্য পু. ১৩.৫২; মার্কণ্ডেয় পু. ৮৮.২০, ৩৪]

□ মৎস্য পুরাণে দেবী ইন্দ্রাণীর প্রতিমার আকৃতি বর্ণিত হয়েছে। একটি শ্লোকে দেবরাজ ইন্দ্রের পার্শ্ববর্তিনী দেবী ইন্দ্রাণীর মূর্তি বর্ণনা করে

বলা হয়েছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের মূর্তির বামে দেবী ইন্দ্রাণীর মূর্তি স্থাপিত হবে। দেবীর হাতে থাকবে পদ্মফুল। অন্য একটি শ্লোকে দেবীর মূর্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা দেবরাজ ইন্দ্রেরই অনুরূপ। ইন্দ্রের শক্তিস্বরূপা দেবী ইন্দ্রাণী ঐরাবত হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্টা। তাঁর ইন্দ্রের মতোই সহস্রনেত্র, চতুর্ভূজা দেবী ইন্দ্রাণীর এক হাতে বজ্র, অপর হাতে শূল, তৃতীয় হস্তে গদা। তাঁর দেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, নানা আভরণে তাঁর দেহ সজ্জিত—

ইন্দ্রাণীমিন্দ্রসদৃশীং বজ্রশূল-গদাধরাম্॥
গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈর্বহুভির্বৃতাম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং দিব্যাভরণ ভূষিতাম্॥

[দ্র. ইন্দ্র$_১$]

[মৎস্য পু. ২৬০.৭০; ২৬১.৩১-৩২]

ইন্দ্রাবতী *[দ্র. ইন্দ্রনদী]*

ইন্দ্রিয় মানুষের ইন্দ্রিয় কয়টি এবং তাদের কাজ কী—এ-ব্যাপারে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই এক কথা বলে। মহাভারতেও অন্তত একশ বার দশ ইন্দ্রিয় এবং একাদশতম মনের ইন্দ্রিয়ত্ব নিয়ে কথা হয়েছে। সেই কারণে ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব বলবার সময় প্রায়ই এই স্বতঃসিদ্ধতার উক্তি করে বলা হয়—পণ্ডিতেরা জানেন অথবা পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, রূপ, শব্দ ইত্যাদি বিষয়জ্ঞানের কারণ হল পাঁচটি ইন্দ্রিয়। চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ত্বক এবং জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় রূপাদি পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞানের কারণ। মহাভারতের নারদাসিত সংবাদে প্রথমে এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা বলেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হিসেবে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ স্পর্শন ও রসন এই পাঁচটি বৃত্তি বলা হয়েছে। তার পরেই বলা হয়েছে—ইন্দ্রিয়গুলি অচেতন বলে রূপ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ—কোনোটাই বুঝতে পারে না, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ জীব চেতন বলে ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে রূপাদি বিষয় বুঝতে পারে। সেটা কীভাবে বুঝতে পারে তার প্রক্রিয়াটাও বলা হয়েছে মহাভারতের এই অধ্যায়ে। বলা হয়েছে—প্রাণিগণ প্রথমে কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে শব্দ প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করে। পরে মনের দ্বারা বিচার করে বুদ্ধির দ্বারা বিষয় নিশ্চয় করে। এইভাবেই জীবাত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বিষয়ের অনুভব করে থাকে। মহাভারতের এই স্থানে জীবাত্মার বিষয় গ্রহণের প্রক্রিয়াটুকু সামান্যাকারে বলেই চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে চিত্ত, মন এবং বুদ্ধিকেও জুড়ে দিয়ে মহাভারত বলেছে—এই আটটি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়—

অষ্টৌ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যাহুরেতান্যধ্যাত্মচিন্তকাঃ।

আমরা বুঝতে পারি যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অচেতনত্ব হেতু জ্ঞান গ্রহণ করার নিজস্ব ক্ষমতা নেই, অথচ তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হচ্ছে, সেইজন্যই জ্ঞান গ্রহণের মাধ্যম চিত্ত, মন, বুদ্ধিকেও একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এখানে।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল যে, মহাভারতে উক্ত প্রাচীন সাংখ্যে অথবা পরবর্তী কারিকা-কৌমুদী ধারায় কর্মেন্দ্রিয়গুলির গুরুত্ব জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির চেয়ে কম হলেও তাদের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকারে কোনো বাধা হয়নি। মহাভারতের নারদাসিত-সংবাদে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে কর্মেন্দ্রিয়গুলিরও কর্ম এবং বৃত্তি পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে—কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি—হস্ত, পদ, পায়ু, শিশ্ন এবং মুখ (মহাভারতের অন্য জায়গায় মুখ এর জায়গায় বাক)। কথা বলা ও ভোজন করার জন্য মুখকে ইন্দ্রিয় বলা হয় এবং চরণযুগলকে গমনেন্দ্রিয় ও হস্তযুগল কার্য করার ইন্দ্রিয়রূপে পরিগণিত—

পাণিপাদঞ্চ পায়ুশ্চ মেহনং পঞ্চমং মুখম্।
ইতি সংশব্দ্যমানানি শৃণু কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি॥
জল্পনাভ্যবহারার্থং মুখমিন্দ্রিয়মুচ্যতে।
গমনেন্দ্রিয়ং তথা পাদৌ কর্ম্মণঃ করণে করৌ॥

মহাভারতে ষষ্ঠ কর্মেন্দ্রিয়রূপে 'বল'কে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই 'বল' বস্তুত পঞ্চবিধ প্রাণবায়ু, প্রাণ-অপান ইত্যাদি। এগুলি কর্মেন্দ্রিয়গুলির প্রেরক হিসেবে কাজ করে বলে মহাভারতীয় সাংখ্যের ধারণা, যদিও প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে 'বল' এর কোনো উল্লেখ নেই। সে যাই হোক, মহাভারতের মতে—বচন, গ্রহণ, গমন, উপসর্গ ও আনন্দ, হল যথাক্রমে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

[মহা (k) ১২.২৭৫.১২-১৮; ১২.৩০২.২৭-২৮;
১২.২৭৫.১৯-২০; (হরি) ১২.২৬৮.৩১-৩৭;
১২.২৯৫.২৭-২৮; ১২.২৬৮.৩৮-৩৯]

মহাভারত, ভগবদ্‌গীতা এবং পুরাণগুলির সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রকৃতিস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্বপাত ঘটলে গুণক্ষোভবশতঃ শুদ্ধ-সত্ত্বস্থ পুরুষ, প্রকৃতির

যাবতীয় পরিমাণগুলির সঙ্গে একাত্মক হয়ে যান। পূর্বজন্মের সংস্কারবশত তিনি জীবাত্মারূপে এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমন করেন। এই আত্মস্বরূপতা বিস্তৃতির কালে অদৃষ্টের প্রেরণায় যেসব শুভ এবং অশুভ কর্ম এবং কর্মফলগুলি ঘটে থাকে—তিনি সেইগুলিরও দ্রষ্টা এবং ভোক্তা হয়ে যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মগুলি দর্শন করেন এবং ভোগ করেন। অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার এই ক্রমিক পরিণতির কথা প্রায় সমস্ত প্রাচীন এবং আধুনিক শাস্ত্রগুলি মোটামুটিভাবে স্বীকার করে নিয়েছে।

অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্বে মহৎ, অহঙ্কার ইত্যাদির সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি কূর্মশরীরবৎ প্রকৃতি শরীরে অব্যক্ত অবস্থায় লীন হয়ে থাকে। আবার প্রলয়-কাল উপস্থিত হলে এগুলি অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। সেজন্যই এগুলিকে লিঙ্গ বা জ্ঞাপক বলা হয়। প্রকৃতিস্থ এই ইন্দ্রিয়গুলি কীভাবে আত্মার বিষয় উপলব্ধির করণ হয়ে লিঙ্গ নামে পরিগণিত হয়, সে সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব/
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে/
যুক্তা-হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত এই বিখ্যাত শ্লোকটির তাৎপর্য্য হল, পরমেশ্বররূপী পরমাত্মা মায়া প্রভাবে নামরূপাত্মক উপাধিবশত প্রতিটি পৃথক পৃথক বস্তুর অনুরূপ রূপসম্পন্ন হয়ে প্রকটিত হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়ের বহুত্ববশত এদের দ্বারা গ্রহণীয় বিষয়গুলি সংখ্যায় বহু। বহুবিচিত্র এই বাহ্যবিষয়গুলিকে প্রকটিত করার জন্যই ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্র বা আত্মার সঙ্গে সম্মিলিত হয়। সাংখ্যদর্শনে ইন্দ্রিয়গুলির আত্মপ্রতিপাদন করতে গিয়ে বলা হয়েছে, প্রকৃতির গুণসাম্য ব্যাহত হলে নিষ্ক্রিয় শুদ্ধস্বভাব পুরুষ যাবতীয় সুখদুঃখাত্মক প্রাকৃতিক পরিণতিগুলির সঙ্গে নিজেকে একেবারে একাত্মক বলে মনে করেন। সেজন্য বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে ইন্দ্রিয়গুলির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

উভয়মপি এতৎ ইন্দ্রস্য আত্মনঃ
চিহ্নত্বাৎ ইন্দ্রিয়ম্ উচ্যতে।

অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উভয়ই ইন্দ্রের (আত্মার) চিহ্ন হওয়ায় ইন্দ্রিয় পদবাচ্য হয়। বাচস্পতি এখানে শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন, ইন্দ্র শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত 'ঘ'—প্রত্যয় মিলিত করে। তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থ হল লিঙ্গ বা জ্ঞাপক। সুতরাং বাচস্পতির বক্তব্য অনুযায়ী ইন্দ্রের বা আত্মার লিঙ্গ হওয়ার চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদির এবং বাক্ পাণি ইত্যাদির ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ২.৫.১৯;
সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (নারায়ণ গোস্বামী)
কারিকা নং ২৬, পৃ.২১২]

উপনিষদে এবং সাংখ্য দর্শনে জীবাত্মারূপী ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির অবস্থান সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছেঃ তার পূর্বপরম্পরা আমরা মহাভারতের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি। মহাভারতে দেখছি সুলভা জনকরাজাকে বলেছেন—

পৃথগাত্মান আত্মানং সংশ্লিষ্টা জতুকাষ্ঠবৎ।
ন চৈষাং চোদনা কাচিদস্তীত্যেব বিনিশ্চয়ঃ॥

সুলভাজনকসংবাদে সুলভা উপরের এই শ্লোকটিতে বলছেন—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এগুলির দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়গুলি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদিরা পরস্পর পৃথক হলেও জতুকাষ্ঠের মতই আত্মাতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু এইগুলির নিজেদের পরিচালিত করার মত কোনো প্রেরণাশক্তি নেই। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যখন বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে, তখন আত্মা এদের কার্যগুলির নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা এবং ভোক্তারূপে পরিদর্শন করেন ও ভোগ করেন।

মহাভারতের অন্য একটি অধ্যায়ে উপরের বক্তব্যের সমর্থনে আবার বলা হচ্ছে—

শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মানমাত্মনা।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ সর্বজ্ঞস্তানি পশ্যতি॥

মহাভারতের মনু-বৃহস্পতিসংবাদের এই শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজে-নিজে নিজের নিজের রূপ দেখতে পায় না। কিন্তু সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী জীবাত্মা সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে দেখতে পান। এ শ্লোকটি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে আত্মা ইন্দ্রিয়ের কার্যগুলির নিষ্ক্রিয়দর্শক হলেও ইন্দ্রিয়গুলি এ ব্যাপারে আরও বেশি নিষ্ক্রিয়।

মহাভারতে আলোচিত ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং জীবাত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কের

আলোচনা থেকে একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ধর্মাধর্ম প্রেরিত সংস্কারের দ্বারা অথবা শুভাশুভ অদৃষ্টজনক কর্মের ফল বশত ইন্দ্রিয়গুলি জীবশরীরের মধ্যে সংসৃষ্ট হয়। সেগুলি নিজেরা নিজেদের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়কে তো জানতেই পারে না এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও জানতে পারে না। কর্মজনক সংস্কারের সঙ্গে বুদ্ধি এবং অহঙ্কার যখন মিলিত হয়, তখন জীবাত্মারূপী আত্মার ইচ্ছায় এবং মনের পরিচালনায় ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব অভীষ্ট সাধনে নিয়োজিত হয়।

ভগবদ্গীতার একটি শ্লোকে উপরে আলোচিত এই বিষয়গুলির মতই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

উপরিউক্ত শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে, পরমাত্মা যখন জীবাত্মারূপে অবভাসিত হন তখন তিনি প্রকৃতিস্থ অজ্ঞান ইন্দ্রিয়গুলিকে সুখ দুঃখ ভোগের জন্য আকর্ষণ করেন। তখনই ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। পরমাত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির প্রকৃত সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় উপরের শ্লোকটির টীকায় বলেছেন—যদিও পরমাত্মা স্বরূপত নিরংশ অর্থাৎ অংশ-অংশিভাববিহীন, তবুও জলে যেমন সূর্যের অংশ কল্পিত হয়, সেইরূপ অংশহীন পরমাত্মার মায়া প্রযুক্ত মিথ্যাভেদবশত অংশ কল্পিত হয়। কিন্তু এই কল্পনা বাস্তবিক অংশের কল্পনা নয়, কিন্তু অংশের সদৃশ। শোত্র থেকে আরম্ভ করে মন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গুলি আত্মার বিষয় উপলব্ধির করণ স্বরূপ। কূর্ম যেমন নিজের মধ্যে উপসংহৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বের করে, তেমনই জীবাত্মাও অজ্ঞানরূপ কারণে লীন এই ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করেন, যাতে তারা বিষয়গ্রহণে যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। গীতাতেও সৃষ্টিকার্যে অদৃষ্টের ভূমিকা স্বীকার করে মধুসূদন সরস্বতী বলছেন— জাগ্রৎকালীন ভোগের জনক অদৃষ্ট যতক্ষণ প্রবল থাকে, ততক্ষণই জীব জেগে থেকে সজাগ ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় সংসৃষ্ট করে এবং তার মাধ্যমে ভোগ সম্পাদন করে। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি নিদ্রিত থাকলেও মন সক্রিয় থেকে ভোগের প্রবৃত্তিতে সাহায্য করে। যখন এই ভোগজনক কর্ম্ম বা অদৃষ্টের ক্ষয় হয়, তখনই নিদ্রা উপস্থিত হয়। ভোগ না থাকায় জাগ্রৎকালীন ভোগসাধক ইন্দ্রিয়গুলি এবং স্বপ্নকালীন ভোগসাধক ইন্দ্রিয়গুলি নির্ব্যাপার থেকে স্বীয় কারণে লীন হয়ে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলিই ভোগের সাধক হচ্ছে, সেজন্য তারাই বিষয় সংসৃষ্ট হয়ে সেই সংসৃষ্ট বিষয়গুলিকে যখন জীবনের সম্মুখে উপস্থিত করে দেয়, তখনই জীবাত্মা সেগুলিকে ভোগ করে থাকেন।

মহাভারতে আত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক গীতার মতই একটি খুব সুন্দর রূপকের আশ্রয় নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহাভারতের মনু-বৃহস্পতি সংবাদে মনু বলেছেন—

যথেন্দ্রিয়ার্থান্ যুগপৎ সমস্তাৎ/
নোপেক্ষতে কৃৎস্নমতুল্যকালম্।
তথা চলং সঞ্চরতে স বিদ্বাং/
স্তস্মাৎ স একঃ পরমঃ শরীরী॥

মনুবৃহস্পতি সংবাদের এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য হল—জীবাত্মা যখন একই সময়ে সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করেন, তিনি যখন বামদিকের ঘটের রূপ দেখেন, তখন দক্ষিণদিকের কোকিলের রবও শুনতে পান। একইভাবে তিনি পিছনের দিকে বায়ু স্পর্শ করেন, আবার যখন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়গুলিকেই ক্রমে ক্রমে অনুভব করেন, তখন চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকটিই বিষয় সমূহের উপরে বিচরণ করে, আর সেই জীবাত্মা সেই সমস্ত বিষয় স্থিরভাবে অবগত হন। এই শ্লোকটি থেকে আমরা একথাই বুঝতে পারি যে, আত্মা একই সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে ইন্দ্রিয়গুলির কার্য প্রত্যক্ষ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং মহাভারতের শ্লোকদুটি থেকে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা যখন মায়া বা অজ্ঞানের প্রভাব বশত জাগতিক বিষয়গুলিকে ভোগের ইচ্ছা করেন ইন্দ্রিয়গুলি যে যে বিষয়গ্রহণে সক্ষম সেই সেই বিষয়গুলিকে জীবাত্মার সম্মুখে উপস্থাপিত করে। জীবাত্মা সেই ইন্দ্রিয়প্রেরিত বিষয়গুলিকে নিরাসক্ত-ভাবে ভোগ করেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি নিজেরা নিজেদের দ্বারা গৃহীত বিষয়কে জানতেও পারে না। এক্ষেত্রে বলা যায়, ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়জ্ঞান

গ্রহণ নিছকই যান্ত্রিক। এর মধ্যে তাদের নিজস্ব কোন প্রেরণা বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক শরীরের কর্মকাল অদৃষ্টবশত শেষ হলে জীবাত্মা যখন অন্য শরীরে গমন করেন, তখন স্থূল শরীরটি পঞ্চভূতে বিলীন হলেও পুরাতন শরীরাস্থিত ইন্দ্রিয়গুলির অবস্থা এবং অবস্থান কেমন হয়ে থাকে? অতীত জীবনের কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে বর্তমান জীবনের কর্মধারার যোগাযোগ যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে কর্মের যারা করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠান সে সময় কোথায় হতে পারে? সেগুলি কী স্থূলদেহের সঙ্গে সঙ্গে বিলয়প্রাপ্ত হয় অথবা জন্মপ্রয়াণান্তর মধ্যবর্তী সময় ইন্দ্রিয়গুলি কোনো সূক্ষ্মশরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবদ্গীতায় খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

জীবাত্মা যখন পূর্বেকার শরীরটি ত্যাগ করে নতুন শরীরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পুরাতন শরীর থেকে চিত্তাশ্রিত বাসনাজাল বা সংস্কাররাশির সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিকেও নতুন দেহে বহন করে নিয়ে চলে যান। ঠিক যেমন বায়ু একটি ফুলের মধ্য থেকে গন্ধাত্মক সূক্ষ্ম অংশগুলিকে বহন করে নিয়ে গিয়ে চারদিক গন্ধময় করে তোলে, কিন্তু ফুলটি ম্লান হয়ে পড়ে থাকে।

[মহা (k) ১২.৩২০.৯৫-৯৯; ১২.২০৩.৫; ১২.২০৩.২; (হরি) ১২.৩১০.৯৭-১০০; ১২.১৯৬.৫; ১২.১৯৬.২; ভগবদ্গীতা ১৫.৭-৮ (মধুসূদন সরস্বতী-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]

ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠাত্রীরূপী বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা করে। ঠিক একইভাবে সাংখ্যকারিকায় ব্যাখ্যাত শ্লোকের মতই মহাভারতের শ্লোকের মধ্যেও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির উপরে বুদ্ধির প্রভুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যদিও মহাভারতে কালের কর্তৃত্ব অথবা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিষয়গুলির উপরে ত্রৈকালিক কালের প্রভুত্ব তেমন করে ব্যাখ্যা করা হয়নি, কিন্তু ত্রিগুণ এবং ইন্দ্রিয় ও কর্মের সঙ্গে কালের নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করাটা অবশ্যই ঔপনিষদিক ভাবনার পরম্পরা বহন করে।

মহাভারতের বিভিন্ন অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়গুলির জনকরূপে কখনও পঞ্চমহাভূতকে ধরা হয়েছে আবার কখনও এইগুলিকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন বলে বলা হয়েছে। মহাভারতের আচার্য পঞ্চশিখ জনক রাজাকে পঞ্চধাতুর বর্ণনা করে বলছেন,

ধাতবঃ পঞ্চধা তোয়ং খং বায়ুর্জ্যোতিষো ধরা॥

মহাভারতে উল্লিখিত অন্যতম সাংখ্যগুরু পঞ্চশিখের এই উপদেশটির অর্থ হল ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চপ্রকার ধাতু পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করে পৃথক পৃথক কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

আচার্য পঞ্চশিখই আবার মহাভারতের অপর একটি শ্লোকে বলেছেন,

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থশ্চ স্বভাবশ্চেতনা মনঃ।
প্রাণাপানৌ বিকারশ্চ ধাতবশ্চাত্র নিঃসৃতাঃ॥

পঞ্চশিখের মুখনিঃসৃত এই শ্লোকের অর্থ হল—ইন্দ্রিয়, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েঃ বিষয়, স্বভাব, চৈতন্যবৃত্ত, মন, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু এবং যে কোন বিকার—এই সমস্তই পঞ্চধাতুর কার্য; পঞ্চধাতুর সম্মেলনে যে শরীর গঠিত হয় পঞ্চধাতুর কার্যগুলিও সেই শরীরে এসে অধিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চশিখের এই উপদেশের মধ্যে আমরা ইন্দ্রিয়গুলির জনকরূপে পঞ্চ ধাতু বা পঞ্চভূতকে দেখতে পাচ্ছি। অথচ আমরা জানি মহাভারতেরই অন্যত্র সাত্ত্বিক অহংকার থেকে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি ঘোষিত হয়েছে। মহাভারতে কেবল সাংখ্যাচার্য্য পঞ্চশিখের উপদেশের মধ্যেই যে আমরা কেবল এই বক্তব্য পাচ্ছি তা নয়, মহাভারতেরই অন্য একটি অধ্যায়ে আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য জনকরাজাকে জগতের সৃষ্টিক্রম বোঝাবার জন্য সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্বগুলিকে নয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। এই নয়টি ভাগের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং মনকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সৃষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করার পর মহাভূতগুলিকে মন থেকে উৎপন্ন চতুর্থসৃষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করলেন। এরপর ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এগুলিকে পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। চক্ষু ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে ষষ্ঠ সৃষ্টিরূপে বর্ণনা বাক্ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে জাত বলে বর্ণনা করে ওইগুলিকে সপ্তম সৃষ্টি রূপে ব্যাখ্যা করেছেন—

অব্যক্তাচ্চ মহানাত্মা সমুৎপদ্যতি পার্থিব।
প্রথমং সর্গমিত্যেতদাহুঃ প্রাধানিকং বুধাঃ॥
মহতশ্চাপ্যহঙ্কার উৎপন্নো হি নরাধিপ।
দ্বিতীয়ং সর্গমিত্যাহুরেতদ্‌বুদ্ধ্যাত্মকং স্মৃতম্॥
অহঙ্কারাচ্চ সম্ভূতং মনো ভূতগুণাত্মকম্।
তৃতীয় সর্গ ইত্যেষ আহঙ্কারিক উচ্যতে॥
মনসস্তু সমুদ্‌ভূতা মহাভূতা নরাধিপ!
চতুর্থং সর্গ্যমিত্যেতন্মানসং বিদ্ধি মে মতম্।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
পঞ্চমং সর্গমিত্যাহুর্ভৌতিকং ভূতচিন্তকাঃ॥
শ্রোত্রং ত্বক্‌ চৈব চক্ষুশ্চ জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চ পঞ্চমম্।
সর্গস্তু ষষ্ঠমিত্যাহুর্বহুচিন্তাত্মকং স্মৃতম্॥
অধঃশ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাম উৎপদ্যতি নরাধিপ।
সপ্তমং সর্গমিত্যাহুরেতদৈন্দ্রিয়কং স্মৃতম্॥

[মহা (k) ১২.২১৯.৫-৮; ১২.৩১০.১৬-২২;
(হরি) ১২.২১৬.৫-৮; ১২.৩০২.১৬-২২]

ব্রহ্মর্ষি ভগবান ভৃগু, ঋষি ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোকগুলির মধ্যে বলছেন, মানসরূপী দেবতা প্রথমে মহানকে সৃষ্টি করলেন তারপর মহান থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে আকাশ, আকাশ থেকে জল, অগ্নি, বায়ু অবশেষে অগ্নি ও বায়ুর সংযোগে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছিল। এইভাবে মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে পঞ্চভূতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার পর ব্রহ্মর্ষি ভৃগু পরবর্তী শ্লোকে ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন—

ইত্যেতৈঃ পঞ্চভির্ভূতৈর্যুক্তং স্থাবরজঙ্গমম্।
শ্রোত্রং ঘ্রাণং রসঃ স্পর্শো
দৃষ্টিশ্চেন্দ্রিয়সংজ্ঞিকাঃ॥

ভরদ্বাজের সংশয়ের উত্তরে ভৃগু উপরের ব্যাখ্যাত শ্লোকটির মধ্যে বললেন, জগতের সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থমাত্রই এই পঞ্চভূত সংযুক্ত এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ও পাঞ্চভৌতিক। যেমন— কর্মেন্দ্রিয় আকাশময়, নাসিকা পৃথিবীময়ী, জিহ্বা জলময়ী, ত্বক্‌ বায়ুময়ী এবং চক্ষু অগ্নিময়। ব্রহ্মর্ষি ভৃগু এইভাবে পাঞ্চভৌতিক ইন্দ্রিয়গুলি এবং স্থাবরজঙ্গম পদার্থ সকলের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করলে ঋষি ভরদ্বাজ ভৃগুর নিকটে আরও প্রশ্ন তুললেন—

স্থাবর জঙ্গম পদার্থ যদি পঞ্চভূতযুক্ত হয়েই থাকে, তবে স্থাবর পদার্থের শরীরে সেই পঞ্চভূত দৃশ্য হয় না কেন? যেমন বৃক্ষসকলের কান, চোখ, জিহ্বা এবং ত্বক ইত্যাদি কোনো ইন্দ্রিয়ই তো দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া বৃক্ষসমূহে জল, অগ্নি, ভূমি, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক কোনো প্রত্যক্ষই তো দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং নিশ্চয়ই এই পদার্থকে ভৌতিক বলা যায় না।

আচার্য ভৃগু খুব সুন্দরভাবে ভরদ্বাজের সংশয়ের উত্তরে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললেন, যে পঞ্চভূতের গুণে শরীর কার্য করে, সমস্ত জঙ্গম পদার্থের শরীরে সেই পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত পৃথক পৃথকভাবে রয়েছে। বৃক্ষ যে অবশ্যই পাঞ্চভৌতিক, তার উদাহরণ দিতে গিয়ে ভৃগু বলেছেন—

ঘনানামপি বৃক্ষাণামাকাশো'স্তি ন সংশয়ঃ।
তেষাং পুষ্পফলব্যক্তির্নিত্যং সমুপপদ্যতে॥

অর্থাৎ বৃক্ষসমূহের ভিতরে পরমাণুর নিবিড় সংযোগ অবশ্যই আছে, না হলে প্রত্যহ তাদের ফুল ও ফলের আবির্ভাব সম্ভব হত না। লতাগুলির পাঞ্চভৌতিকত্ব সম্বন্ধে ভৃগু বলছেন,

বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্ব্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
নহ্যদৃষ্টেশ্চ মার্গো'স্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ॥

অর্থাৎ লতাগুলির অবশ্যই চক্ষু আছে। যদি চক্ষু না থাকত, তবে লতা বৃক্ষকে বেষ্টন করে একই জায়গায় থাকত। বিভিন্ন দিকে গমন করতে পারত না। সেইরকম বাইরের বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের নির্ঘোষে বৃক্ষের ফল ও ফুল বিশীর্ণ হয়, সুতরাং বৃক্ষেরও কর্ণ আছে এবং অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বৃক্ষও শ্রবণ করে।

বায়ব্যগ্ন্যশনিনির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ॥

[মহা (k) ১২.১৮৪.৪-১৮; (হরি) ১২.১৭৮.৪-১৮]

সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি ইন্দ্রিয়গুলির স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে সত্ত্বগুণের প্রকাশস্বভাববশত তা থেকে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রকাশস্বভাব বলেছেন বটে, কিন্তু মহাভারতের শ্লোকে সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয়কে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলি অন্যের প্রেরণা ব্যতীত কোনো কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে না। এমনকি মনের সাহায্য ছাড়া নিজেরাও নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না। জীবাত্মারূপী পুরুষ মনের সাহায্য ছাড়া নিজেরাও নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না। জীবাত্মারূপী পুরুষ মনের মাধ্যমে

ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা প্রদীপের মত বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে থাকেন—

ইন্দ্রিয়ৈস্তু প্রদীপার্থং কুরুতে বুদ্ধিসপ্তমৈঃ।
নির্ব্বিচেষ্টৈরজানদ্ভিঃ পরমাত্মা প্রদীপবৎ॥

মহাভারতের শ্লোকে উল্লিখিত এই প্রদীপের দৃষ্টান্ত দার্শনিকদের ব্যবহার-সিদ্ধ হলেও মহাভারতে ইন্দ্রিয়গুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে এটি যুক্তিদীপিকা টীকাতেও গৃহীত হয়েছে এবং সেটা বাচস্পতি-লিখিত প্রকাশস্বভাব সাত্ত্বিক অহংকারের ইন্দ্রিয়জনকত্বের বিরুদ্ধেই যায় বলে মনে হয়। মহাভারতের মতই যুক্তিদীপিকাটীকায় ইন্দ্রিয়গুলির প্রকাশমানতা অস্বীকার করে বলা হয়েছে—ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়সমূহের ধারক, কিন্তু প্রদীপের ন্যায় প্রকাশক নয়। যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়কে গ্রহণ করার জন্য বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণকে করণান্তর বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে প্রদীপ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোনো একটির দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ সম্ভব হয় বলে অন্যতরের কল্পনা নিরর্থক হয়ে পড়ে। কারণ যারা একই কার্যে সমর্থ, তাদের সেই একই কার্য করার ব্যাপারে যুগপৎ সামর্থ্য থাকে না। যে স্থলে প্রদীপের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয়, সেই স্থলে ইন্দ্রিয়গুলি যদি প্রদীপের ন্যায় বিষয়ের প্রকাশক হত, তাহলে এই বিষয়প্রকাশরূপ কার্যে ইন্দ্রিয় ও প্রদীপ উভয়ই সমর্থ—একথা অবশ্যস্বীকার্য হত। তাহলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা প্রদীপের দ্বারা যখন সেই বিষয়ের প্রকাশ হবে, তখন ইন্দ্রিয় বা প্রদীপ—এদের একতর অন্যতরের কাছে অনাবশ্যক হয়ে পড়ে—

ইন্দ্রিয়েণ প্রদীপবৎপ্রকাশিতান্ বাহ্যানর্থান্
সাক্ষাদন্তঃকরণং গৃহ্নাতীতি
বদতো'ন্তঃকরণমেব হীয়তে।
সাক্ষাদ্বিষয়গ্রহণসমর্থং পুরুষমিচ্ছতঃ
করণানর্থক্যং প্রসজ্যতে।
তস্মাদুক্তমেতৎ গ্রাহকমিন্দ্রিয়ং
ন তু প্রদীপবৎপ্রকাশমিতি।
আহ, ভবতু তাবৎ
গ্রহণমাত্রমিন্দ্রিয়বৃত্তিরপ্রত্যয়া।
তস্মাদুপপন্নমেতৎ প্রকাশকং প্রদীপাদি,
গ্রাহকং শ্রোত্রাদি, ব্যবসায়কমন্তঃকরণমিতি।

অতএব প্রদীপের প্রকাশ ও ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ একরূপ হতে পারে না। তাছাড়া প্রদীপের মত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত বাহ্যবিষয়সমূহকে সাক্ষাৎভাবে অন্তঃকরণ গ্রহণ করে—একথা স্বীকার করলে অন্তঃকরণের অন্তঃকরণত্বই বিনষ্ট হয়। সুতরাং অন্তঃকরণ বিষয়সমূহকে গ্রহণ করে একথা স্বীকার করা যায় না। আবার যদি পুরুষকে বিষয়সমূহের সাক্ষাৎ গ্রাহকরূপে স্বীকার করা হয়, তাহলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের করণত্ব কল্পনা নিরর্থক হয়ে পড়ে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বিষয়সমূহের ধারক; কিন্তু প্রদীপের ন্যায় বিষয়সমূহের প্রকাশক যে নয়, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অতএব প্রদীপ ইত্যাদি প্রকাশক, ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের গ্রাহক এবং অন্তঃকরণ ব্যবসায়ক বা নিশ্চয়ক একথা স্বীকার করতে হবে।

একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, মহাভারতেও জীবাত্মা পুরুষকে ইন্দ্রিয়গুলির সাক্ষাৎ গ্রাহক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। সেখানেও কতগুলি পরম্পরা আছে। মহাভারতে বলা হয়েছে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি বিষয় যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূতে অবস্থান করে। ওই পঞ্চমহাভূত আবার কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা এবং নাসিকারূপ পঞ্চইন্দ্রিয়ে বাস করে। ইন্দ্রিয়গুলি মনকে অনুসরণ করে, মন বুদ্ধিকে অনুসরণ করে। আর বুদ্ধি জীবচৈতন্যকে অনুসরণ করে—

মহৎসু ভূতেষু বসন্তি পঞ্চ
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ তথেন্দ্রিয়েষু।
সর্বাণি চৈতানি মনো'নুগানি
বুদ্ধিং মনো'ন্বেতি মতিঃ স্বভাবম্॥

এখানে পরম্পরাক্রমে জীবচৈতন্য পর্যন্ত চলে আসায় প্রচলিত সাংখ্যের ভাবনা থেকে মহাভারত খানিকটা পৃথক হয়ে পড়বে নিশ্চয়ই, কিন্তু তবু সাদৃশ্যটুকুর কথাও এখানে অনুধাবনযোগ্য। এই আলোচনার মধ্যে আশ্চর্যের সঙ্গেই লক্ষ্য করেছি যে, মহাভারতের প্রচীন ঐতিহ্যে ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি ঠিক যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যুক্তিদীপিকা টীকাতেও প্রায় সেই ব্যাখ্যাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। বাচস্পতির ব্যাখ্যায় তাঁর ভাবনা যদিও কিছু পৃথক, কিন্তু মহাভারতের অন্য একটি অধ্যায়ের কিছু শ্লোক পর্যালোচনা করলে বাচস্পতির বক্তব্যের অনুকূলে কিছু যুক্তি লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের মনু-বৃহস্পতি সংবাদের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ যেমন

তার আলোয় দ্বারা বিষয়কে প্রকাশ করে সেইরূপ এই জগতে ইন্দ্রিয়রূপ প্রদীপগুলি জ্ঞানের অধীন হয়ে, জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে সমস্ত বিষয়কে প্রকাশ করে থাকে—

যথা প্রদীপ্তঃ পুরতঃ প্রদীপঃ
প্রকাশমন্যস্য করোতি দীপ্যন্।
তথেহ পঞ্চেন্দ্রিয়দীপবৃক্ষা
জ্ঞানপ্রদীপ্তাঃ পরবন্ত এব॥

[মহা (k) ১২.১৯৪.৪২; ১২.২০২.২১-২২; ১২.২০২.৯-১০; (হরি) ১২.১৮৭.৪২; ১২.১৯৫.২১-২২; ১২.১৯৫.৯-১০; যুক্তিদীপিকা যদুপতি ত্রিপাঠী সম্পাদিত, পৃ. ২৭৪]

ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি, অবস্থান, স্বরূপ, অভৌতিকত্ব ইত্যাদি মহাভারতের প্রেক্ষিতে আলোচিত হবার পর ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষিত থাকে। সাধারণত ব্যাপারের দ্বারা যা আলোচিত হয়, তাই হল বৃত্তি। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Wilson বৃত্তি শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, The term for 'function' is vritti, explained by vyāpāra, active exercise or application; also by sāmarthyam, 'ability, adequacy, and phala, fruit, result'

আচার্য গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে 'মাত্র' শব্দকে 'বৈশিষ্ট্যসূচক' বলেছেন। যেমন এ গ্রামে ভিক্ষামাত্র পাওয়া যায়—একথা বললে এই গ্রামে ভিক্ষা-ভিন্ন অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই একথাই বুঝতে হবে। সেইরূপ সাংখ্যকারিকায় যখন বলা হল 'আলোচনমাত্র ইন্দ্রিয় বৃত্তি', তখন তার অর্থ দাঁড়ায় আলোচন বা গ্রহণ ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলির অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের যে বৃত্তি তাকেই 'আলোচন' বলেছেন। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা স্ব স্ব বিষয়ের আলোচন হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি রূপের আলোচন, রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি রসের আলোচন, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বৃত্তি শব্দের আলোচন, ত্বগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্পর্শের আলোচন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি গন্ধের আলোচনা করে থাকে।

মহাভারতে বুদ্ধিকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী বলে অভিহিত করা হয়েছে। মানুষের দেহে বুদ্ধি নিজের স্বভাবের গুণে যখন অভিপ্রায় করে, তখনই সে মন হয়ে যায়। যখন বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করে, এবং অপৃথকভাবে সঙ্কল্পশালী মনের উপরে অধিষ্ঠিত হয় তখনই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য করে। আর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানগুলি বুদ্ধির অন্তর্গত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে এই সুখ-দুঃখ এবং মোহকে স্মরণ করে। বুদ্ধি ত্রিগুণের প্রভাববশত সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক এই তিন প্রকার ভাবযুক্ত হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকভাব বশতঃ বুদ্ধির পৃথকত্ব অনুযায়ী ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া বা বৃত্তিও পৃথক হয়। এজন্য মহাভারতে বলা হয়েছে—ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক পৃথক বলে সেগুলির ক্রিয়াও পৃথক পৃথক। সেইজন্যই বুদ্ধি নানা আকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই বুদ্ধি যখন শ্রবণ করে, তখন সে কর্ণ হয়, এবং বুদ্ধি যখন স্পর্শ করে, তখন তাকে ত্বক বলা হয়ে থাকে। বুদ্ধি যখন দর্শন করে, তখন সে চক্ষু হয়, যখন রস আস্বাদ করে তখন রসনা এবং যখন গন্ধ গ্রহণ করে তখন সে নাসিকা হয়। এইভাবে একই বুদ্ধি পৃথক পৃথক আকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে—

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবাদ্‌বুদ্ধি র্বিক্রিয়তে হ্যতঃ।
শৃণ্বতী ভবতী শ্রোত্রং স্পৃশতী স্পর্শ উচ্যতে॥
পশ্যতী ভবতি দৃষ্টীরসতী রসনং ভবেৎ।
জিঘ্রতী ভবতি ঘ্রাণং বুদ্ধি র্বিক্রিয়তে পৃথক॥

ইন্দ্রিয়ের আলোচনবৃত্তিকে জ্ঞান বলে স্বীকার করলে প্রত্যয়বিশিষ্ট অন্তঃকরণের মতোই ইন্দ্রিয়গুলি অনিয়তবিষয় হয়ে পড়বে। সুতরাং শ্রোত্রাদির বৃত্তি আলোচনকে জ্ঞান বলা যায় না। যুক্তিদীপিকাকার বলেন ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়সমূহের ধারক; কিন্তু প্রদীপের মতো প্রকাশক নয়। মহাভারতেও বলা হয়েছে জীবাত্মা মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা লব্ধ বিষয়গুলিকে প্রকাশ করেন। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি জড়াত্মক স্বভাবের জন্য নিজেরা কিছুই করতে পারে না। প্রদীপ যেমন ঘটকে প্রকাশ করে, জীবাত্মাও সেইরূপ বুদ্ধির কাছে প্রকাশিত হন—

রশ্মীংস্তেষাং স মনসা যদা সম্যঙ্‌নিযচ্ছতি।
তদা প্রকাশতে'স্যাত্মা ঘটে দীপো জ্বলন্নিব॥

সুতরাং প্রদীপ ইত্যাদি যেমন বিষয় প্রকাশক তেমনই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলিও বিষয়ের গ্রাহক, অন্তঃকরণ বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক। ইন্দ্রিয়গুলির বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান গ্রহণের ব্যাপারে

মহাভারতেও বলা হয়েছে—মন ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠাত্রী হলেও ইন্দ্রিয়গুলি কীভাবে বাহ্যবিষয়ের আহরণ এবং মনের কাছে প্রেরণ করবে সেই বিষয়টি ভূতাত্মাই নির্ধারণ করে। এই ভূতাত্মা আবার মনকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। জড় ইন্দ্রিয়গুলি অস্পষ্টভাবে বিষয়ের আলোচন বা গ্রহণ করলেও সেগুলির নিশ্চয় বা প্রকাশ মনের এবং ভূতাত্মার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্ভব নয়—

ইন্দ্রিয়াণাং তথৈবৈষাং সর্বেষামীশ্বরং মনঃ।
নিয়মে চ বিসর্গে চ ভূতাত্মা মনসস্তথা॥

মহাভারতের মতই যুক্তিদীপিকাটীকাতেও একইভাবে বলা হয়েছেঃ অন্তঃকরণের দ্বারা নিশ্চিতরূপে গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে প্রদীপের মতই সেগুলিকে প্রকাশ করে—

তস্মাদুপপন্নমেতৎ প্রকাশকং প্রদীপাদি,
গ্রাহকং শ্রোত্রাদি, ব্যবসায়কমন্তঃকরণমিতি।

মহাভারতের অন্য একটি অধ্যায়ে আমরা যুক্তিদীপিকার অনুরূপ বিশ্লেষণ লক্ষ্য করি—

মহাভারতে বলা হচ্ছে অন্ধলোকেরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধ করে এবং বুদ্ধিও তাদের সহকারী হয়—

ইন্দ্রিয়ৈস্তু প্রদীপার্থং ক্রিয়তে বুদ্ধিরন্তরা।
নিশ্চক্ষুর্ভিরজানদ্ভিরিন্দ্রিয়াণি প্রদীপবৎ।।

[Samkhya Karika (Wilson), p. 101:
মহা (k) ১২.২৪৮.৩-৬; ১২.১৯৪.৪৫;
১২.২৩৯.১২; ১২.১৯৪.৪২; (হরি) ১২.২৪৫.৩-
৬; ১২.১৮৭.৪৫; ১২.২৩৬.১২; ১২.১৮৭.৪২;
যুক্তিদীপিকা (যদুপতি ত্রিপাঠী), পৃ. ২৭৪]

সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন, বাহ্যকরণগুলি অন্তঃকরণের সহায়তায় এবং অন্তঃকরণগুলি বুদ্ধির সহায়তায় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, মহাভারতের শ্লোকের মধ্যেও আমরা দেখেছি যে, সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন-অহঙ্কার ইত্যাদির চেয়েও বুদ্ধির প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়েছে। মহাভারতের নারদাসিত সংবাদে এই কথাটাই ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, মন এবং বুদ্ধির তারতম্য সাজিয়ে বলা হয়েছে। এখানে চিত্তকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ওপরে স্থান দিয়ে তার ওপরে মন, তার ওপরে বুদ্ধি এবং তারও ওপরে চৈতন্যময় পুরুষের বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব অন্যভাবে স্বীকার করে ক্ষেত্রজ্ঞের সর্বাধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে—ইন্দ্রিয়গুলি অচেতন বলে নিজে কিছুই বুঝতে পারেনা। কিন্তু জীব চেতন বলে ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে রূপাদি বিষয় বুঝতে পারেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেয়ে চিত্ত শ্রেষ্ঠ, চিত্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হল মন এবং মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হল বুদ্ধি, যদিও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বুদ্ধিরও ওপরে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত প্রাণীও প্রথমে কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃথক-পৃথকভাবে শব্দ প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করে, তারপর মনের দ্বারা বিচার করে এবং বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করে। এইভাবেই বুদ্ধিমান জীবাত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিষয়গুলি অনুভব করেন—

ইন্দ্রিয়াণি ন বুধ্যন্তে ক্ষেত্রজ্ঞস্তৈস্তু বুধ্যতে॥
চিত্তমিন্দ্রিয়সঙ্ঘাতাৎ পরন্তস্মাৎ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ ক্ষেত্রজ্ঞো বুদ্ধিতঃ পরঃ॥
পূর্বং চেতয়তে জন্তুরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ পৃথক্।
বিচার্য্য মনসা পশ্চাদথ বুদ্ধ্যা ব্যবস্যতি।
ইন্দ্রিয়ৈরুপলব্ধার্থান্ বুদ্ধিমাংস্তু ব্যবস্যতি।

মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্য একটি প্রসঙ্গে বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকলাপ বোঝানোর জন্য সম্পূর্ণ মানবদেহটাকেই একটা পুর নগর হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—বুদ্ধি এই পুরের স্বামিনী, আর শরীরস্থ মন সেই বুদ্ধির অমাত্য। ইন্দ্রিয়গুলি পুরবাসী লোক, তাদের জন্য শব্দাদি বিষয় আহরণ করা মনের কার্য। পুরের অধিপতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সঙ্গে পুরবাসী ইন্দ্রিয়গণ মনের আনীত শব্দ প্রভৃতি বিষয় সকল উপভোগ করে—

শরীরং পুরমিত্যাহুঃ স্বামিনী বুদ্ধিরিষ্যতে।
তত্রবুদ্ধেঃ শরীরস্থং মনো নামার্থচিন্তকম্॥
ইন্দ্রিয়াণি জনাঃ পৌরাস্তদর্থন্তু পরাকৃতিঃ।
তত্র দ্বৌ দারুণৌ দোষৌ তমো নাম রজস্তথা।
তদর্থমুপজীবন্তি পৌরাঃ সহ পুরেশ্বরৈঃ॥

মহাভারতের এই শ্লোকগুলিতে সরাসরি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে অন্তঃকরণ বলে উল্লেখ না করলেও জ্ঞান গ্রহণের ব্যাপারে এই তিনটি যদি বৃত্তিমান না হত তবে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানগ্রহণ কখনো যে সম্ভব হতে পারে না সেকথা বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিভিন্ন শ্লোকে খুব স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে অন্তঃকরণগুলির বিষয়গ্রহণ যেভাবে ব্যাখ্যাত

হয়েছে সাংখ্যকারিকাতেও ঠিক একই রকমভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.২৭৫.১৪-১৭; ১২.২৫৪.৯-১০;
(হরি) ১২.২৬৮.৩৪-৩৬; ১২.২৫১.৯-১০]

প্রশ্ন উঠতে পারে—ইন্দ্রিয়গুলি সাংখ্যীয় তত্ত্বভাবনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল বিষয়। অতএব ইন্দ্রিয় নিয়ে এত আলোচনার প্রয়োজন কী? এর উত্তরে বলতে হবে—চরম তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য সাংখ্য-যোগের যে সাধন-চেষ্টার বিবরণ আছে, তাতে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা ইন্দ্রিয়ের নিরুদ্ধতাই প্রথম কল্প। ইন্দ্রিয়গুলি নিরুদ্ধ হলে বিষয়গ্রহণের কামনা থাকে না। কামনা না থাকলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়। সংস্কার নিরুদ্ধ হলে পুনর্জন্ম হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয় যখন বহির্জগৎ থেকে বিরত হয়ে অন্তর্মুখী হয়, তখন বুদ্ধিও বিভিন্ন বিষয়ের পরিস্ফূরণের দ্বারা উপরঞ্জিত হয় না। সুতরাং মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে বাহ্য বিষয় থেকে উপসংহৃত করতে না পারলে বস্তুর স্বরূপ যথার্থরূপে জানা যায় না। বিভিন্ন শাস্ত্রে এই স্বরূপ উপলব্ধির পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হোক না কেন, আত্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞান সকলেই স্বীকার করেন এবং এই তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জন্ম-মরণের প্রবাহের চির অবসান ঘটে। এই বিষয়েও কোনো মতদ্বৈততা নেই।

মহাভারতীয় ইন্দ্রিয়-ভাবনার প্রধান লক্ষণই হল—বিষয় বস্তু থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া—

বিষয়াৎ প্রতিসংহারঃ সাংখ্যানাং বিদ্ধি লক্ষণম্।

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য বিষয়-সংযুক্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করাটাই যে প্রথম কল্প, সেটা বোঝানোর জন্য মহাভারত বলেছে, মানুষ যেমন চক্ষুর মাধ্যম নির্মল জলের মধ্যে নিজের রূপ দেখতে পায়, তেমনই ইন্দ্রিয়গুলি নির্দোষ হলেই মানুষ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় আত্মাকে দেখতে পায়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধ অবশ্যই অবুদ্ধির ফল, এবং তা অজ্ঞানকৃতা। অজ্ঞানকৃতা অবুদ্ধিই মনকে কলুষিত করে এবং মন কলুষিত হলেই ইন্দ্রিয়গুলিও বিষয়ের সংস্পর্শে কলুষিত হয়ে পড়ে। অজ্ঞানের সম্বন্ধ চলতে থাকলে এইভাবেই বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে মানুষ বিষয়ের মধ্যেই ডুবে যায়—

তথেন্দ্রিয়াকুলীভাবে জ্ঞেয়ং জ্ঞানে ন পশ্যতি।
অবুদ্ধিরজ্ঞানকৃতা অবুদ্ধ্যাকৃষ্যতে মনঃ।
দুষ্টস্য মনসঃ পঞ্চ সম্প্রদুষ্যন্তি মানসাঃ ॥
অজ্ঞানতৃপ্তো বিষয়েষ্ববগাঢ়ো ন তৃপ্যতে।

বিষয়-প্রসঙ্গ থেকে ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যাহার কীভাবে করা যায়, সে-বিষয়ে সাংখ্য ভাবুকেরা সমানতন্ত্র যোগের প্রক্রিয়াই মেনে নেবেন এবং মহাভারতও এ বিষয়ে যা বলে তা অনেকটাই যৌগিক প্রক্রিয়া। মহাভারত স্থূলভাবেই জানায় যে সমস্ত জগতই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির আবর্তের ঘূরপাক খাচ্ছে। সেখানে প্রাণীরা দুরন্ত শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত হয়েই দুঃখ ভোগ করছে, কিন্তু সেগুলিতে যদি তারা আসক্ত না হয়, তবেই পরম গতির পথ খুঁজে পায়। আসক্তি থেকে নিরাসক্তির পথ নির্দেশ করার সময় মহাভারত যৌগিক প্রক্রিয়ায় ভাবনাতে বলে—ধৃতিমান ব্যক্তি (যোগসিদ্ধিতে যত্নবান ব্যক্তি) আগে বুদ্ধিকে দমন করবেন, বুদ্ধি দিয়ে মনকে দমন করবেন এবং মনের দ্বারা বিষয়সংসর্গ দমন করবেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন করবেন—

ধৃতিমানাত্মবান্ বুদ্ধিং নিগৃহ্নীয়াদসংশয়ম্।
মনো বুদ্ধ্যা নিগৃহ্নীয়াদ্ বিষয়ান্ মনসাত্মনঃ ॥

মহাভারতের মনু-বৃহস্পতি-সংবাদে একটি অসাধারণ উক্তিতে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়বস্তুতে প্রসারণ এবং সেখান থেকে প্রত্যাহার (যৌগিক পরিভাষায় যেটাকে 'প্রবিলাপন' বলেছেন নীলকণ্ঠ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ইন্দ্রিয়গুলির এক বিষয়ের উপরে পতিত হলেই মানুষ দুঃখভোগ করে এবং বিষয় থেকে সেগুলি নিগৃহীত হলেই সুখ লাভ করে। অতএব ইন্দ্রিয়গুলিকে দৈনন্দিন লয়াভ্যাসের মধ্যে নিরুদ্ধ করতেই হবে—

প্রসৃতৈরিন্দ্রিয়ৈর্দুঃখী তৈরেব নিয়তৈঃ সুখী।
তস্মাদিন্দ্রিয়রূপেভ্যো যচ্ছেদাত্মানমাত্মনা ॥

এই শ্লোকের টীকায় কীভাবে যৌগিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়ের লয়-সাধন করা যায় তার বিবরণ দিয়েছেন নীলকণ্ঠ। ততটা পারিভাষিক শব্দে মহাভারত এই প্রক্রিয়া বলবে না কখনোই, কিন্তু মহাভারত যেহেতু প্রাচীন দর্শনের অন্যতম আকর গ্রন্থ, অতএব সাংখ্যভাবনার সঙ্গে যোগভাবনার মিশ্রণ ঘটিয়ে মহাভারত পঞ্চশিখ জনক-সংবাদের মধ্যে প্রথমে ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে এবং তারপরেই বলেছে—কর্ণ প্রভৃতি যে শব্দ প্রভৃতিকে বিষয় (object) করে, তা ভোগ-সাধক। আর ইন্দ্রিয়

প্রভৃতিকে প্রত্যাহার করে ত্যাগ করাটাই তত্ত্ব-নিশ্চয়ের অন্যতম কারণ—

তেষু কর্ম বিসর্গশ্চ সর্বতত্ত্বার্থনিশ্চয়ঃ।

যে ব্যক্তি শব্দ প্রভৃতি বিষয়কে আত্মভাবে দেখে অর্থাৎ আমার শব্দ আমার স্পর্শ— এইভাবে জানে, মিথ্যাজ্ঞানবশত তার দুঃখ কখনো নিবৃত্তি লাভ করে না। ইন্দ্রিয় থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধি পর্যন্ত সমাহিত করার উপায় হিসেবে কারিকাকৌমুদী সাংখ্যে 'সপ্তদশ বধ' বলে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। স্মরণীয় 'বধ' কথাটা মহাভারতেও উত্থাপিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে—সম্যক্ বধ বা 'সম্যগ্ বধ' আসলে ত্যাগশাস্ত্র—

অত্র সম্যগ্‌বধো নাম ত্যাগশাস্ত্রমনুত্তমম্।

টীকায় সিদ্ধান্তবাগীশ 'সম্যগ্ বধ' শব্দের অর্থ করেছেন 'দুঃখহনন' অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের হনন কীভাবে করা যায় তার শাস্ত্র, যেটি 'ত্যাগ শাস্ত্র' নামে মহাভারতের কথিত। কিন্তু প্রাচীন টীকাকার নীলকণ্ঠ—হন্ ধাতুর বধ করা অর্থ ছাড়াও জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রসিদ্ধ 'গুণন' অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন—

সম্যগ্ বধ হল গুণন—বারংবার সাংখ্যতত্ত্বগুলি যেখানে অভ্যাস করে সদসদ্ বিবেকের কথা বলা হয় সেই সাংখ্যশাস্ত্রই হল—

সম্যগ্ বধ নামক ত্যাগশাস্ত্র।

এই ত্যাগ কীভাবে হতে পারে তার উত্তরে মহাভারত দ্রব্যত্যাগ, ভোগত্যাগ, সুখত্যাগ এবং অবশেষে সর্বত্যাগের মাধ্যমে যোগ সমাধির কথা বলেছেন। এই ত্যাগ বা প্রত্যাহারের মাধ্যমেই ত্রিবিধ দুঃখের নাশ ঘটবে এবং তা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই—বিপ্রহাণায় দুঃখস্য দুর্গতিস্ত্বন্যথা ভবেৎ। এই কথা বলার সময় মহাভারত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবিষয়, পঞ্চ বায়ু ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বগুলির কথা বলে পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বহীন বুদ্ধিতত্ত্বে সমাহিত করার কথা বলেছে—

অলেপমাকাশমলিঙ্গমেব/
মাস্থায় পশ্যন্তি মহত্যসক্তাঃ ॥

[মহা (k) ১২.২৩৬.৩৩; ১২.২০৪.৩-৫; ১২.২১৫.১৮; ১২.২০৪.৯; ১২.২১৯.১৬, ১৯, ৪৬; (হরি) ১২.২৩৩.৩৩; ১২.১৯৭.৩-৫; ১২.২১২.১৮; ১২.১৯৭.৯; ১২.২১৬.১৭, ২০, ৪৭ (নীলকণ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)]

দার্শনিক দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার ব্যাপারটাকেই লৌকিক শাসনে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বলা হয়। ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় শান্ত হয় না কখনো। অতএব ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী জীবনযাপন না করে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের অনুগত করে তোলাকেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহের পথ বলা যেতে পারে, তবে শাস্ত্রকার লক্ষণে বলেছেন—

'বিষয়েভ্য শ্চক্ষুরাদিবারণম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।'

অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এবং ত্বক্ ইত্যাদি যেগুলি বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি থেকে ইন্দ্রিয়গুলিতে বিরত করার কাজটাই 'ইন্দ্রিয় নিগ্রহ'। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সাবধান করে বলা হয়েছে—

'অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি।'

এবং মনুর পরামর্শ হল—

'ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্॥'

ভাগবতপুরাণে মানুষকে সাবধান করে বলা হয়েছে যে, 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ'ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম! কারণ ইন্দ্রিয় যদি বিষয়ের পিছনে না ছোটে, আপনাতে আপনি থাকে—তাহলে সেই শান্ত ব্যক্তির আর দান, ধ্যান কিছুই করার দরকার থাকে না। বিপরীতে নানা ভালো কাজ করা সত্ত্বেও মন যদি অসংযত হয় তাহলে সব ভালো কাজই বৃথা হয়ে যায়। তেমনি কেউ যদি নিরন্তর ইন্দ্রিয়ের সেবাতেই মগ্ন থাকে তাহলে তার চারটি পুরুষার্থের সবকটিই হাতছাড়া হয়ে যায়। ভাগবত বলেছেন তপস্যার প্রথম সোপান হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহ'।

[মনু সংহিতায় ৬.৯২ শ্লোকে শাস্ত্রকার কুল্লূকভট্টের টীকা; মনুসংহিতা ২.৮৮-৯৩; ভাগবত পু. ১১.২৩.৪৭; ৪.২২.৩৩; ৪.২৩.৭ (দ্র. শ্রীধরস্বামী-কৃত টীকা; ভগবদ্‌গীতা ৩.৬, ৭, ৩৪, ৪০, ৪১; ৪.২৬-২৭; ৬.১২.২৪]

ইন্দ্রেশ্বরতীর্থ$_১$ শ্রীপর্বতের অন্তর্গত একটি তীর্থ।

[লিঙ্গ পু. ১.৯২.১৫২]

ইন্দ্রেশ্বরতীর্থ$_২$ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পুণ্য তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে ইন্দ্রেশ্বর নামে লিঙ্গরূপে পূজিত হন। হয়তো কোনো সময় স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এখানে শিবের আরাধনা করেছিলেন বলেই ভগবান শিবের নাম ইন্দ্রেশ্বর ইন্দ্রেশ্বর তীর্থে স্নান ক'রে ইন্দ্রেশ্বরকে দর্শন করলে ইন্দ্রলোকে গতি হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৬]

ইন্দ্রেশ্বরতীর্থ$_{৩}$ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে ইন্দ্রেশ্বর নামে পূজিত হন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৭১; লিঙ্গ পু. ১.৯২.১৫২]

ইন্দ্রোত জনৈক প্রাচীন ঋষি। শুনক বংশীয় ঋষি বলে তিনি ইন্দ্রোত শৌনক নামেই বিখ্যাত। মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত উপাখ্যান থেকে জানা যায় ইনি পুরুবংশের প্রাচীন রাজা পারীক্ষিত জনমেজয়ের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন।

[দ্র. জনমেজয়$_{১}$]

তবে পারীক্ষিত জনমেজয়ের পুরোহিত ইন্দ্রোত শৌনকের প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে। শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রোতকে ইন্দ্রোত দৈবাপ শৌনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইনি দেবাপির সঙ্গে বংশপরম্পরা বা শিষ্য পরম্পরায় ঠিক কীভাবে সম্পর্কিত ছিলেন তা অবশ্য খুব স্পষ্ট নয়।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১৩.৫.৩.৫; ১৩.৫.৪.১; শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র (Hillebrandt) ১৬.৭.৭]

☐ মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত হয়েছে— রাজা পারীক্ষিত জনমেজয় খুবই ন্যায় পরায়ণ রাজা ছিলেন কিন্তু কোনো একসময় অজ্ঞানবশত তাঁর দ্বারা একটি ব্রহ্মহত্যার ঘটনা ঘটে যায়। রাজাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করলে, তাঁর পুরোহিত ব্রাহ্মণরা, অমাত্য, প্রজা সাধারণ সকলেই সেই রাজাকে ত্যাগ করেন। রাজা নিজেও অনুতাপে দগ্ধ হয়ে রাজধানী ছেড়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বনবাসী তপস্বীদের কাছে রাজা ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তিলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন কিন্তু সেই তপস্বী ব্রাহ্মণরা কেউই ব্রহ্মহত্যার পাপগ্রস্ত রাজার সহায়তার জন্য এগিয়ে এলেন না। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাজা জনমেজয় মহর্ষি ইন্দ্রোতর তপোবনে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্রোত রাজাকে দেখামাত্রই ভর্ৎসনা করে বললেন—তুমি যে পাপ করেছ তা ব্রহ্মহত্যার থেকেও জঘন্য। এমন পাপজর্জর দেহ নিয়ে তুমি আমার এই তপোবনে কেন এসেছ? তোমাকে তো চোখে দেখলেও অমঙ্গল হয়। তোমার আগমনে আমার আশ্রমও কলুষিত হল। ইন্দ্রোতর তিরস্কার শুনে রাজা জনমেজয় বিনীতভাবে বললেন— আপনার তিরস্কারের প্রতিটি শব্দই সত্য। আমি ধিক্কারেরই যোগ্য বটে। কিন্তু আমি অনেক আশা নিয়ে আমার পাপমুক্তির উপায় জানতে আপনার কাছে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাবার পথ বলে দিন। যে মহান রাজবংশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, তা যেন আমার পাপে লুপ্ত না হয়ে যায়। ইন্দ্রোত শৌনক রাজা জনমেজয়ের অনুতাপ এবং আত্মগ্লানিতে প্রসন্ন হলেন। তারপর রাজার পাপমুক্তির জন্য তাঁকে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন ইন্দ্রোত। পাপমুক্তির জন্য নানা ধর্মাচরণ এবং লোকহিতকর কাজ করার উপদেশ দেবার পর সবশেষে ইন্দ্রোত বললেন—রাজা! অনুতপ্ত অবস্থায় ব্যক্তি যদি লোক কল্যাণের সংকল্প গ্রহণ করে এবং তারপর অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তবে সে সবরকম জঘন্য পাপ থেকেই মুক্ত হয়। ইন্দ্রোতর উপদেশে রাজা জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। স্বয়ং মহর্ষি ইন্দ্রোত সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন। অশ্বমেধযজ্ঞের ফলস্বরূপ রাজা জনমেজয় ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

[মহা (k) ১২.১৫০-১৫২ অধ্যায়; (হরি) ১২.১৪৬-১৪৮ অধ্যায়]

ইরা$_{১}$ ইরা বা ইলা বলতে পৃথিবীকেই বোঝানো হয়। (বিশদ দ্র. ইলা$_{২}$) মূর্তিমতী পৃথিবীকে দেবী রূপে কল্পনা করে পুরাণে তাঁকে দক্ষের কন্যা তথা কশ্যপ প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মাটি থেকেই যেহেতু গাছপালার জন্ম হয়, সেহেতু পুরাণেও কশ্যপপত্নী ইরা বৃক্ষ-লতা-গুল্ম প্রভৃতির জন্মদাত্রী হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। *[দ্র. ইলা$_{১}$]*

[বায়ু পু. ৬৯.৩৩৯-৩৪২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৫৯-৪৬৩, ৪৬৮; বিষ্ণু পু. ১.১৫.১২৬; ১.২১.২৪; মৎস্য পু. ৬.২,৪৬]

☐ মহাভারতের সভাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে পৃথিবী বা ইরা দেবী রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার সভায় অবস্থান করেন।

[মহা (k) ২.১১.৩৯; (হরি) ২.১১.৩৮]

ইরা$_{২}$ একজন অপ্সরা। ইনি কুবেরের সভায় অবস্থান করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত সংস্করণে 'ইরা'র পরিবর্তে 'ইলা' পাঠ ধৃত হয়েছে।

[মহা (k) ২.১০.১১; (হরি) ২.১০.১১]

ইরাগর্ভশিরা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[মৎস্য পু. ৬.১৮]

ইরাবতী১ বৈদিক যুগের সুবিখ্যাত পবিত্র নদী। বৈদিক যুগেই ইরাবতী নদী, পরুষ্ণী নদীর নামান্তর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ঋগ্‌বেদে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রীর মতো প্রাচীন নদীগুলির সঙ্গে একই মন্ত্রে পরুষ্ণী নদীরও স্তুতি করা হয়েছে নদী সূক্তে—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি
শুতুদ্রী স্তোমং সচতা পুরুষ্ণ্যা।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৭৫.৫]

□ ইরাবতী বৈদিক কালের পরুষ্ণী নদী। পরুষ্ণী শব্দ থেকে কোনোভাবেই ইরাবতী শব্দটি ভাষাগত ভাবে আসে না। কিন্তু ঐরাবতী শব্দটা থেকে ইরাবতী অবশ্যই আসতে পারে। এমনকী ইরাবতীর 'ই'-টুকু বাদ দিয়ে 'রাবতী' থেকে চরম অপভ্রংশতায় 'রাভী'-শব্দের উৎপত্তিও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পরুষ্ণী থেকে ইরাবতী শব্দ-নিষ্পন্নতা প্রমাণ করা না গেলেও প্রাচীন বৈদিককালেই যে পরুষ্ণীকে ইরাবতী নামে ডাকা হত, তার প্রমাণ আছে খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীর কোষগ্রন্থ নিরুক্তে। যাস্ক নিরুক্তে লিখেছেন—ইরাবতীকেই লোকে পরুষ্ণী বলত—

ইরাবতী পরুষ্ণীত্যাহুঃ।

[নিরুক্ত (মহর্ষি) ৯.২৬; পৃ. ১৫১]

ঋগ্‌বেদে আমরা ইরাবতী নামটি নদী-স্তুতি সূক্তে *[১০.৭৫]* দেখিনি। কিন্তু যাস্ক যেহেতু সেইকালে পরুষ্ণীকে ইরাবতী বলেছেন এবং ম্যাক্সমূলার-এর মতো পণ্ডিত যেহেতু একই বর্ণনীতে পর্যায়-শব্দ হিসেবে পরুষ্ণী, ইরাবতী এবং রাভীর নাম করেছেন, তাতে পরুষ্ণীর সমস্ত বিশেষণী তথ্যই ইরাবতী সম্বন্ধে খাটবে।

[Max Muller: India: What can it teach us, pp. 175-176]

খ্রিস্টপূর্ব দেড়শ শতাব্দীতে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির [২.১.২০] সূত্রের ভাষ্যে ইরাবতী নদীর উল্লেখ করেছেন ইরাবতীর জলধৌত দেশ হিসেবে—

দ্বীরাবতীকো দেশঃ। ত্রীরাবতীকো দেশঃ।

[Vyakarana Mahabhasya (Kielhorn), p. 382]

□ ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে পরুষ্ণীকে মহানদী বলে সম্বোধন করা হয়েছে—

সত্যমিত্ত্বা মহেনদি পরুষ্ণ্যবদেদিশম্।

[ঋগ্‌বেদ ৮.৭৪.১৫]

তাতে বুঝি পরুষ্ণী বা ইরাবতী নদীতে জলের প্রাচুর্য্য ছিল যথেষ্ট। ঋগ্‌বেদের অন্য একটি মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বেদ-বিখ্যাত দশরাজ্ঞীয় যুদ্ধে সুদাস রাজা যে জয়ী হয়েছিলেন, তাতে পরুষ্ণী-ইরাবতীর অলৌকিক সাহায্য ছিল তাৎপর্য্যপূর্ণ। পণ্ডিতেরা বৈদিক মন্ত্রের শব্দার্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, খুব সম্ভবত প্রতিপক্ষ শত্রুরা সুদাস রাজাকে দুই দিক থেকে চেপে ধরেছিলেন। সুদাস তীব্র গতিতে পরুষ্ণী বা ইরাবতী পার হয়ে পালিয়ে যান। এরপর শত্রু রাজারা যখন তাঁকে ধরার জন্য চেষ্টা করলেন তখন তাঁরা পরুষ্ণী নদীর কূল ভেঙে নদীর জলধারাই পালটে দিতে চেয়েছিলেন, বলা উচিত, নদীর গতি-পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন এবং বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে তার ছায়া আছে—

ঈয়ুরর্থং ন ন্যর্থং পরুষ্ণীমাশুশ্চনেদভিপিত্বং
জগাম।
সুদাস ইন্দ্রঃ সুতুকাঁ অমিত্রানরন্ধয়ন্মানুষে
বধ্রিবাচঃ॥

[ঋগ্‌বেদ ৭.১৮.৯]

ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে—দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট রাজারা খনন করে নদীর কূল ভেদ করে দিয়েছিল, কিন্তু নদীর জল গন্তব্য প্রদেশেই যাচ্ছিল, অগন্তব্য প্রদেশে যায়নি। কিন্তু সুদাসের অশ্বও গন্তব্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। শেষ কথাটায় প্রমাণ হয়—সুদাস অশ্বের সাহায্যে সুরক্ষিত জায়গায় চলে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন করে প্রতিপক্ষ রাজারা যখন সুদাসকে ধরতে চাইলেন, তখন মাঝপথে পরুষ্ণী নদীর জল হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল এবং সুদাসের শত্রুরা পরুষ্ণী-নদীর জলস্ফীতিতেই প্রাণ হারান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে হাইনরিখ্ জিমার, ম্যাকডোনল এবং গেলড্‌নার এই মত পোষণ করেন।

[Vedic Index, Vol. I. p.499, Fn. 3]

নিরুক্তকার যাস্ক পরুষ্ণী শব্দটার কোনো পদ-নিরুক্তি না দিয়ে নদীর চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন—'পর্ববতী কুটিল গামিনী'—অর্থাৎ এই নদী এক-একটা পর্বে বিভক্ত হয়ে অনেক এঁকেবেঁকে কুটিল গতিতে চলেছে। মহামতি পিশেল (Pischel) নিরুক্তকারের এই অর্থ প্রত্যাখ্যান করে ঋগ্‌বেদের

অন্য দুটি মন্ত্রে পরুষ্ণী নদীর সঙ্গে ঊর্ণ-কথাটির যোগ দেখিয়ে বলেছেন— ভেড়ার লোমের পুঞ্জ বা flocks অর্থে এখানে ‘পরুস্’-শব্দটি ব্যবহৃত, ভেড়ার লোমকেই ঊর্ণ বলে—

শ্রিয়ে পরুষ্ণীমুষমান ঊর্ণাম্ *[ঋগ্‌বেদ ৫.৫২.৯]*
উত স্ম তে পরুষ্ণ্যাম্ ঊর্ণা বসত শুন্ধ্যবঃ।

[ঋগ্‌বেদ ৫.৫২.৯]

ফলত পিশেল মনে করেন পরুষ্ণী নদীর ধারে প্রচুর ভেড়ার পাল পালন করত পশুপালক আর্যজাতি। ভেড়ার লোম এখানে পাওয়া যেত বলেই ঊর্ণ-এর দ্বারা আচ্ছাদিত বলা হয়েছে পরুষ্ণী নদীকে—পরুষ্ণীমুষমাণ ঊর্ণাম্।

□ মহাভারতে অবশ্য পুরুষ্ণীর পরিবর্তে ইরাবতী নামেই এই নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ইরাবতী নদীকে মহাভারতেও একটি পবিত্র নদী তীর্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৪৬.১৮; (হরি) ১৩.১২৪.১৮]

সভাপর্বে নারদ, যুধিষ্ঠিরের কাছে বরুণদেব-এর সভার সৌন্দর্য্য বর্ণনাকালে জানিয়েছিলেন যে, ইরাবতী এক পবিত্র নদী এবং এই নদী উপযুক্ত দেহধারণ করে বরুণদেবের উপাসনা করে।

[মহা (k) ২.৯.১৯; (হরি) ২.৯.১৯]

□ ইরাবতী নদীর তীরবর্তী কোনো এক স্থানে বাসুদেব কৃষ্ণ, জনৈক বীর ভোজরাজাকে হত্যা করেছিলেন বলে অর্জুনের মুখে শোনা গেছে—

ইরাবত্যাং হতো ভোজঃ কার্ত্তবীর্য্যসমো যুধি।

[মহা (k) ৩.১২.৩৩; (হরি) ৩.১১.৩৩]

□ ভারতবর্ষের ম্লেচ্ছ ও আর্য উভয় জাতীয় ব্যক্তিরা পবিত্র ইরাবতী নদীর জল পান করে, এমন উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়।

*[মহা (k) ৬.৯.১৬; (হরি) ৬.৯.১৬;
বায়ু পু. ৪৫.৯৫]*

□ মহাভারতের কর্ণ পর্বে কর্ণ, বাহীক ও মদ্রদেশের নিন্দা করতে গিয়ে একাধিকবার ইরাবতী নদীর উল্লেখ করেছিলেন। কর্ণের এই দীর্ঘ বক্তব্য থেকে ইরাবতী নদী সম্পর্কে নানা তথ্য উঠে আসে। জানা যায় যে, বাহীকদেশ সিন্ধুনদের অন্যতম প্রধান উপনদী ইরাবতীর কাছাকাছি অবস্থিত ছিল এবং ইরাবতী নদী পার হয়েই সে দেশে পৌঁছানো যেত।

*[মহা (k) ৮.৪৪.৭; ৮.৪৪.১৭;
(হরি) ৮.৩৪.৬৭; ৮.৩৪.৭৭]*

□ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইরাবতীর জলবাহী অঞ্চলে যে সব রমণীরা থাকতেন তাঁরা বেশিরভাগই খুব সুন্দরী ছিলেন। যৌনতার দিকেও তাদের প্রত্যক্ষ প্রবণতা ছিল। কর্ণ বলেছেন—বাহীক দেশের গর্বিত রমণীদের এক উপপতি কুরুক্ষেত্রে বাস করার সময় নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে বিলাপ করে বলেছে—কবে আমি শতদ্রু আর ইরাবতী নদী পার হয়ে স্বদেশে যাব—

শতদ্রুকাং নদীং তীর্ত্বাতাঞ্চ রম্যামিরাবতীম্।

কবে স্বদেশে ফিরে শাঁখা পরা সেইসব অলঙ্কৃত সুন্দরী রমণীদের আমি দেখতে পাব। এখানকার মেয়েরা প্রবল শৈত্যের কারণে কম্বল আর মৃগচর্ম পরিধান করলেও তারা যে ভীষণ সাজত, তারও পরিচয় পাওয়া যায় এই কুরুক্ষেত্র প্রবাসী বিরহীর জবানে।

[মহা (k) ৮.৪৪.১৫-১৯; (হরি) ৮.৩৪.৭৫-৭৮]

□ কর্ণের বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, আরট্ট দেশের মধ্যে দিয়েও ইরাবতী নদী প্রবাহিত।

[মহা (k) ৮.৪৪.৩১; (হরি) ৮.৩৪.৯১]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে ইরাবতী নদী হিমালয় পর্বতের পাদদেশ বেরিয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২৫]

□ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, ইরাবতী নদী বহু পিতৃতীর্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত—

ইরাবতী নদী তদ্বৎ পিতৃতীর্থাধিবাসিনী।

[মৎস্য পু. ২২.১৯]

□ দেবতাদের কাছে হব্যভাগ পৌঁছে দেন এমন হব্যবহনকারী অগ্নি যে ষোলোটি নদীকে কামনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে ইরাবতী অন্যতম। *[মৎস্য পু. ৫১.১৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.১৫; বায়ু পু. ২৯.১৪]*

□ এমনকি ত্রিপুরদুর্গ দহনকালে মহাদেবের জন্য যে বিশেষ সাংগ্রামিক রথ প্রস্তুত হয়েছিল, সেই রথের বেণু বা বাঁশ রূপে অন্যান্য প্রধান নদীগুলির সঙ্গে ইরাবতীকেও স্থাপন করা হয়।

[মৎস্য পু. ১৩৩.২৩]

□ প্রহ্লাদ ইরাবতী নদীর তীরে পরমেশ্বরের দর্শন পেয়েছিলেন। *[বামন পু. ৭৯.৭]*

আধুনিক রাভী নদী অর্থাৎ প্রাচীন ইরাবতী বা পরুষ্ণী নদী বর্তমান হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার অন্তর্গত হিমালয় পর্বতের যে অংশ,

সেখান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এটি সিন্ধুর একটি প্রধান উপনদী। উত্তর-পশ্চিম ভারত, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে রাভী নদী প্রবাহিত। গ্রীকরা রাভীকে 'হাইড্রাওটেস' (Hydraotes) নামে ডেকেছেন। পাকিস্তানের সুবিখ্যাত লাহোর শহরটি রাভী নদীর তীরে অবস্থিত।

[GD (N.N. Bhattacharyya) p. 153; GDAMI (Dey) p. 78]

ইরাবতী$_২$ আধুনিক পণ্ডিতরা অনেকেই মনে করেন যে, পূর্বভারতেও ইরাবতী নামে একটি নদী ছিল। পূর্বভারতের আর্যায়ণের সময় পশ্চিমের ইরাবতীর নামে কোন নদীর নামকরণ হওয়াও বিচিত্র নয়। পণ্ডিতদের মতে, ইরাবতী নদীর পরিবর্তিত রূপ রাপ্তী। এই রাপ্তী নদী অওধ বা অযোধ্যার পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

[GDAMI (Dey) p. 79]

গরুড় পুরাণে গণ্ডকী নদীর সঙ্গে ইরাবতীর উল্লেখ থাকায়—কৃষ্ণা বেণী ভীমরথা গণ্ডকী যা ত্রিরাবতী—এটি বিহারে অযোধ্যার পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া রাপ্তীকে বোঝাতেও পারে।

[গরুড় পুরাণ, পূর্বখণ্ড, ৮১.২২]

ইরাবতী$_৩$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা ক্রোধবশার গর্ভজাত নয়টি কন্যা সন্তানের মধ্যে অন্যতমা হলেন ইরাবতী। ইরাবতী পুলহ প্রজাপতির পত্নী ছিলেন।

সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা এক অপরিসীম তেজ সম্পন্ন দেবতা সৃষ্টির পরিকল্পনা করলেন। দেবমাতা অদিতি সেই তেজঃপুঞ্জ ধারণ করলেন আপন গর্ভে। কিন্তু অদিতির গর্ভে সেই তেজ যখন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন সেই তেজোরাশির প্রভাবে সম্পূর্ণ ত্রিলোক সন্তপ্ত হয়ে উঠল। দেবতারা ভয় পেলেন যে, এই তেজ যখন জন্মগ্রহণ করবে তখন তার উগ্রতায় সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। দেবতারা ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন অদিতির গর্ভটির তেজ কিছুটা হ্রাস করেন, যাতে অদিতির গর্ভজাত পুত্রের তেজ জগতকে দগ্ধ না করে, তা যেন সকলের জন্য কল্যাণকর হয়। ব্রহ্মা দেবতাদের অনুরোধে অদিতির গর্ভ থেকে কিছুটা তেজ হ্রাস করে তা দিয়ে নতুন একটি অণ্ড সৃষ্টি করলেন। এই অণ্ডটি ব্রহ্মা স্থাপন করলেন পুলহ প্রজাপতির পত্নী ইরাবতীর গর্ভে, ইরাবতীর সেই গর্ভ থেকেই জন্ম হল এক বলশালী হস্তীর। ইরাবতীর পুত্র বলে তার নামই হল ঐরাবত। পুরাণে অবশ্য ইরাবতীকে সম্পূর্ণ হস্তীকুলের জন্মদাত্রী বলে উল্লেখ করা হয়। পুরাণ মতে ঐরাবত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। এছাড়াও কুমুদ, অঞ্জন এবং বামন নামে তিনটি বিশিষ্ট হস্তী ইরাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

[বায়ু পু. ৬৯.২০৫, ২১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৭২, ২৭৯-২৯২]

ইরাবতী$_৪$ বিরাট রাজার পুত্র উত্তরের কন্যা ইরাবতী। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, এই ইরাবতীর সঙ্গে অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের বিবাহ হয়।

[ভাগবত পু. ১.১৬.২]

ইরামা একটি পবিত্র নদী। প্রলয়কালে ঋষি মার্কণ্ডেয়, বালকরূপী শ্রীহরির উদরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণকালে যে সকল নদীগুলিকে সেখানে দেখেছিলেন তাদের মধ্যে ইরামা অন্যতম।

[মহা (k) ৩.১৮৮.১০৫; (হরি) ৩.১৫৯.১০৫]

ইলবিলা কোনো কোনো পুরাণে ইড়বিড়া পাঠও ধৃত হয়েছে। বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশধারায় রাজা তৃণবিন্দুর কন্যা ছিলেন তিনি। মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ইনি ধনপতি কুবেরের জননী ছিলেন।

[ভাগবত পু. ৪.১.৩৭; ৪.১২.৯; বিষ্ণু পু. ৪.১.১৮]

□ বায়ু পুরাণের পাঠে তৃণবিন্দুর কন্যা ইলিবিলা মহর্ষি পুলস্ত্যের পত্নী এবং মহর্ষি বিশ্রবার মাতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

[বায়ু পু. ৭০.৩১]

ইলা$_১$ বৈবস্বত মনুর সন্তানরা ভারতের বিশিষ্ট রাজবংশগুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু থেকে যেমন সূর্যবংশের মূল ধারা ইক্ষ্বাকু বংশ বিস্তার লাভ করেছিল, তেমনই বৈবস্বত মনুর অপর সন্তান ইল-সুদ্যুম্ন বা ইলার কারণেই সূর্যবংশের ধারা থেকে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়। মহাভারত-রামায়ণ পুরাণে ইল বা ইলার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বিশদে, বিভিন্ন কাহিনীতে তথ্যগত প্রভেদও আছে যথেষ্ট। ইল বা ইলা মহাকাব্য-পুরাণের এক রহস্যাবৃত চরিত্র। তিনি মনুর কন্যা ইলা, না কী মনুর পুত্র ইল বা সুদ্যুম্ন— মহাকাব্যের কবি বা পুরাণের বিবরণ থেকে এর সমাধান পাওয়া যায় না। তবু তিনি পুরুষ ছিলেন কী না—এই

আলোচনার মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত তাঁর ইলা নামটি অন্য এক পৌরাণিক রহস্য তৈরি করে। তার কারণ এই যে, বিখ্যাত চন্দ্রবংশের অঙ্কুর স্থাপিত হয়েছিল তাঁর গর্ভে। চন্দ্রপুত্র বুধের ঔরসজাত ইলার পুত্র পুরূরবা। পুরাণ-মহাভারতে তাঁর নারীত্ব বা পুরুষত্ব নিয়ে বর্ণিত নানা কাহিনীর মধ্যেও তিনি ইলা, তিনি নারী, তিনি চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা পুরূরবার জনক নন, জননী। এটিই ইল বা ইলা চরিত্রের মূল গুরুত্ব।

মহাভারতে ইলাকে বৈবস্বত মনুর অষ্টম সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, মহাভারতে মনুর এই সন্তানটির নাম ইল নয়, ইলা। মহাভারতে বলা হয়েছে—এই ইলা থেকে পুরূরবার জন্ম। ইলা পুরূরবার মাতাও ছিলেন এবং পিতাও ছিলেন বলে মহাভারতের কবি বর্ণনা করেছেন—

পুরূরবাস্ততো বিদ্বানিলায়াং সমপদ্যত।
সা বৈ তস্যাভবন্মাতা পিতা চৈবেতি নঃ শ্রুতম্॥

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করে স্পষ্টই বলেছেন যে, ইলা আসলে পুরূরবার মাতাই ছিলেন। কারণ পুরূরবা বুধের ঔরসজাত পুত্র। কিন্তু যেহেতু ইলা পরে পুরুষত্ব লাভ করেন এবং সুদ্যুম্ন রূপে খ্যাত হন এবং পুত্র পুরূরবা তাঁরই প্রদত্ত রাজ্যে রাজত্ব করেছিলেন—এই কারণেই ইলাকে পুরূরবার পিতাও বলা হয়েছে—

'মাতৈব লব্ধপুংস্ত্বাবা রাজ্যদানাৎ পিতা'প্যভূৎ',
মুখ্যঃ পিতা তু বুধ এব।

বিষ্ণু পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণে বর্ণিত কাহিনী থেকে এই তথ্য খানিকটা সমর্থিত হয়। এই পুরাণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, বৈবস্বত মনুর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। মনু সন্তানলাভের জন্য যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞে আহুতি দেবার সময় দেবী শ্রদ্ধা পুত্রের পরিবর্তে কন্যাসন্তান কামনা করেছিলেন। যজ্ঞের ফলে পুত্র না হয়ে কন্যা হল দেখে বৈবস্বত মনু বেশ দুঃখিত হলেন। তখন পুরোহিত বশিষ্ঠ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, এই কন্যা পরবর্তী সময়ে পুরুষত্ব লাভ করবে এবং সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হবে। অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, মিত্রাবরুণের কৃপায় ইলা পুরুষত্ব লাভ করেন এবং সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। অন্যান্য পুরাণেও সংক্ষেপে এই কাহিনীই সমর্থিত হয়েছে। তবে পুরাণের বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলাই তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন।

[মহা (k) ১.৭৫.১৬-১৮; ১.৯৫.৭;
(হরি) ১.৬৩.১৮-২১; ১.৯০.৯;
(নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য);
ভাগবত পু. ৯.১.১১-২২;
বিষ্ণু পু. ৪.১.৫-৮; বায়ু পু. ৮৫.৭-১৫]

□ পুরুষত্ব লাভ করে ইলা ইল বা সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হলেন। রামায়ণে অবশ্য ইলা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—এমন কোনো কাহিনী পাওয়া যায় না। রামায়ণে ইল নামক রাজাকে কর্দম প্রজাপতির পুত্র বলা হয়েছে। রামায়ণ এবং পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ইল-সুদ্যুম্ন একদিন বনে শিকার করতে গেলেন। শিকারের খোঁজে এ-বনে, সে-বনে ঘুরতে ঘুরতে রাজা এমন এক সুন্দর বনে প্রবেশ করলেন, যেখানে ভগবান শিব দেবী পার্বতীকে নিয়ে বিহার করছিলেন। মহাদেব স্থির করেছিলেন যে, সেই বিহার-বনে যদি কোনো পুরুষ-জীব প্রবেশ করে, তবে সে সঙ্গে সঙ্গে নারীরূপ লাভ করবে। রাজা ইলও তাই এই বনে প্রবেশ করেই নারীরূপ লাভ করলেন। তিনি যে পুরুষ ছিলেন, তিনি যে একজন রাজা—এসব কথা কিছুই তাঁর মনে রইল না। স্ত্রীরূপধারী ইলা কোথায় যাবেন, কী করবেন কিছুই স্থির করতে না পেরে বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। এমন সময় চন্দ্রের পুত্র বুধ পরমাসুন্দরী ইলাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং ইলার কাছে তাঁর নাম-পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন। বুধকে দেখে ইলা নিজেও যথেষ্ট মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাই বুধের কথায় ইলা বুধের ঘরে তাঁর পত্নীর মতো বাস করতে লাগলেন। মৎস্য পুরাণে এই কাহিনীটি কিছুটা ভিন্ন ভাবে নতুন সরসতায় পরিবেশিত হয়েছে। মৎস্য পুরাণ জানিয়েছে, ইলা উদ্‌ভ্রান্তের মতো বনে ঘুরছেন এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে বুঝতে পেরে তাঁর রূপে মুগ্ধ বুধ তাঁকে যেন তাঁর পূর্বস্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—এমন ভাব করে বললেন—তুমি তো আমারই পত্নী ইলা। তুমি গৃহকর্ম ছেড়ে এমন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? ইলা বুধের সেই কথায় বিশ্বাস করলেন এবং বুধের গৃহে তাঁর পত্নীরূপে বসবাস করতে লাগলেন।

এদিকে রাজার আত্মীয়স্বজন-পারিষদরা ইল-

সুদ্যুম্নর সন্ধানে বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। একসময় তাঁরা রাজা ইলের অশ্বটিকে দেখতে পেলেন। মহাদেবের বিহারবনে প্রবেশ করে সেই অশ্ব ঘোটকীর রূপ লাভ করেছিল। রাজার পারিষদরা এই আশ্চর্য ঘটনার কথা জানালেন কুল পুরোহিত বশিষ্ঠকে। বশিষ্ঠ ইল-সুদ্যুম্নের সমস্যার কথা নিবেদন করলেন শিব-পার্বতীর কাছে। ভগবান শিব বশিষ্ঠকে বললেন—ইলা আবার সম্পূর্ণরূপে পুরুষ তো হতে পারবেন না। কিন্তু এখন থেকে সে একমাস পুরুষ এবং একমাস নারী হয়ে থাকবেন। ইল-সুদ্যুম্নের জন্য মহাদেবের আদেশে ইক্ষ্বাকু এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞের ফলে ইল একমাস স্ত্রী এবং একমাস পুরুষ এই অবস্থায় দিন কাটাতে লাগলেন। মৎস্য পুরাণে ইলার এই অবস্থাকে কিম্পুরুষ অবস্থা বলা হয়েছে—

দত্ত্বা কিম্পুরুষো বীরঃ স ভবিষ্যত্যসংশয়ম্।

এর মধ্যে বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরূরবার জন্ম হল। তবে নারীত্ব লাভ করার ফলেই ইলা পৈতৃক রাজ্যের অধিকার পেলেন না। ইলার পরের ভাই ইক্ষ্বাকু রাজা হলেন। পুরূরবার জন্মের পর চন্দ্রপুত্র বুধ ফিরে গেলেন স্বর্গলোকে। ইলাই পুরূরবাকে পালন করেন এবং পুরূরবাকে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানপুরে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, উৎকল, গয় এবং হরিতাশ্ব নামে সুদ্যুম্নর আরও তিনটি মহাবীর পুত্র ছিল এবং এঁরা পৃথক পৃথক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। পুরাণের কাহিনীর বিচারে পুরূরবা এই তিন পুত্রের থেকে কনিষ্ঠ ছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবত ইল-সুদ্যুম্নের কিম্পুরুষ অবস্থালাভের আগেই এই তিন পুত্রের জন্ম হয়েছিল।

শেষ জীবনে কিম্পুরুষ সুদ্যুম্ন পুত্রদের নিজ নিজ রাজ্যে স্থাপন করার পর ফিরে গেলেন সেই দেশে যেখানে ইলা রূপে তিনি বসবাস করেছেন বুধের সঙ্গে, সেখানেই জন্মেছিলেন পুরূরবা। সেই স্থানটি পরে ইলাবৃত বর্ষ নামে খ্যাত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১১.৪০-৬৬; ১২.১-১৮;
ভাগবত পু. ৯.১.৩২-৪২; বিষ্ণু পু. ৪.১.৯-১৩;
রামায়ণ ৭.১০০-১০১ অধ্যায়]

ইলা$_{২}$ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে ভগবান রুদ্র-শিব নীললোহিত রূপে আবির্ভূত হন। ভগবান রুদ্রের একাদশ পত্নীর মধ্যে অন্যতমা ছিলেন ইলা। বস্তুত ইলা এখানে মূর্তিমতী পৃথিবীস্বরূপা। আভিধানিক অর্থে ইলা বলতে পৃথিবী বোঝায়। ভাগবত পুরাণে অন্যত্রও পৃথিবী অর্থে ইলা শব্দের উল্লেখ পাই—

পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।

টীকাকার স্পষ্টই বলছেন যে পুষ্টি অর্থাৎ দৈহিক বলবৃদ্ধির জন্য ইলা অর্থাৎ পৃথিবীর আরাধনা করো, যেহেতু পৃথিবীই শস্য উৎপাদন করেন, খাদ্য দান করেন এবং খাদ্যই দৈহিক শক্তির উৎস—

পুষ্টির্দেহবলং তৎকামঃ ইলাং পৃথ্বীং যজেত।

পৃথিবীস্বরূপা ইলাকেই ভগবান রুদ্রের পত্নীরূপেও কল্পনা করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ২.৩.৫; ৩.১২.১৩]

□ বায়ু পুরাণে বর্ণিত আছে যে সৃষ্টির আদিতে বিশ্বসৃষ্টির কামনায় স্রষ্টারা যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞে তাঁরা ইলাকে পত্নী রূপে কল্পনা করেন। প্রাণ সৃষ্টির মূল এই পৃথিবীই এখানে স্রষ্টার পত্নী রূপে গৃহীত হয়েছেন। *[বায়ু পু. ২.৬]*

□ জগৎ স্রষ্টা তথা জগতের অধীশ্বর ভগবান বিষ্ণুও তাই ইলাপতি নামে খ্যাত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.২৯]

ইলা$_{৩}$ বায়ুর কন্যা। রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ইলার গর্ভে ধ্রুবর ঔরসে উৎকল নামে এক পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়। *[ভাগবত পু. ৪.১০.২]*

ইলা$_{৪}$ ভাগবত পুরাণ মতে কশ্যপ প্রজাপতির অন্যতমা পত্নী ছিলেন দক্ষকন্যা ইলা। ইনি বৃক্ষ ও লতাসমূহের জননী ছিলেন। এখানেও 'ইলা' শব্দের মাধ্যমে ভূমি বা পৃথিবীকেই মূর্তিমতী দক্ষকন্যারূপে কল্পনা করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৬.৬.২৫, ২৮]

ইলা$_{৫}$ বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের অন্যতমা পত্নী। বসুদেবের ঔরসে তাঁর গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৫, ৪৯]

ইলা$_{৬}$ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত একটি পবিত্র নদী-তীর্থ। এটি গোদাবরী নদী-তীরবর্তী। পাণ্ডবরা একবার ইলা নদীতে স্নান করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১৫৬.৮;
(হরি) ৩.১২৯.৮; ব্রহ্ম পু. ১০৮.১]

ইলাবর্ত স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশজাত রাজর্ষি ঋষভের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.৪.১০]*

ইলাবৃত রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র ছিলেন অগ্নীধ্র। প্রিয়ব্রত অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের রাজা নিযুক্ত করেন। অগ্নীধ্রের ঔরসে অপ্সরা পূর্বচিত্তির গর্ভে নয় পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এই নয় পুত্রের মধ্যে ইলাবৃত ছিলেন অন্যতম। রাজা অগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপকে নয় ভাগে ভাগ করে এক একটি বর্ষে তাঁর এক এক পুত্রকে রাজা নিযুক্ত করেন। মেরু পর্বতকে বেষ্টন করে যে বর্ষ অবস্থিত ছিল, সেখানে ইলাবৃত রাজা হন। তাঁর নাম অনুসারেই ঐ স্থানের নাম হয় ইলাবৃত বর্ষ।

[ভাগবত পু. ৫.২.১০; বিষ্ণু পু. ২.১.১৬, ২০; বায়ু পু. ৩৩.৩৯, ৪৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৪৬]

ইলাবৃতবর্ষ জম্বুদ্বীপের একটি বর্ষ। মহাভারত ও পুরাণে ইলাবৃতবর্ষকে জম্বুদ্বীপের মধ্যবর্তী স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্জুন দিগ্‌বিজয়কালে হরিবর্ষ ও হিরণ্যকবর্ষ পার হয়ে ইলাবৃতবর্ষে পৌঁছেছিলেন বলে জানা যায়, ইলাবৃতবর্ষের সর্বোত্তরে ঐরাবতবর্ষ এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষের অবস্থান—

ধনুঃ সংস্থে মহারাজ দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে।
ইলাবৃতং মধ্যমন্তু পঞ্চ দীর্ঘাণি চৈব হি॥

ইলাবৃতবর্ষের মধ্যভাগে কুলপর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মেরু পর্বত অবস্থিত। উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান পর্বত হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষ থেকে ইলাবৃতবর্ষকে পৃথক করেছে এবং দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় পর্বত একে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করেছে। আবার পূর্ব ও পশ্চিমে মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বত কেতুমালবর্ষ ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সঙ্গে ইলাবৃতবর্ষের সীমা নির্দেশ করেছে। ইলাবৃতবর্ষের বিস্তৃতি নয় হাজার যোজন।

[মহা (k) ৬.৬.৩৮; (হরি) ৬.৬.৩৮; মহা (গীতা প্রেস) ২.২৮.৬ শ্লোক পরবর্তী দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্র.; ভাগবত পু. ৫.১৬.৭-১০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৫.২৪; ১.১৫.৩৩-৩৭; মৎস্য পু. ১১৩.১৯, ৩০; বায়ু পু. ৩৪.২২]

☐ স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধারায় ইলাবৃত নামে এক রাজার কথা জানা যায় যিনি সুমেরুর মধ্যবর্তী দেশ বা বর্ষ শাসন করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর নামানুসারেই এই বর্ষের নাম হয়েছিল ইলাবৃতবর্ষ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৪৯]

☐ আবার মৎস্য পুরাণ মতে, বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ইলের নামানুসারে এই ভূ-খণ্ডের নাম ইলাবৃতবর্ষ। *[মৎস্য পু. ১২.১৪]*

☐ পুরাণে ইলাবৃতবর্ষের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। পুরাণ মতে, ইলাবৃতবর্ষ আকারে চ্যাটালো (Platter) বা সরার মতো আকৃতির। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত আরামদায়ক কারণ ইলাবৃতবর্ষে সূর্যের তাপ প্রখর নয়। সূর্য, চন্দ্র এবং অনান্য নক্ষত্ররা এখানকার আকাশে স্তিমিতভাবে প্রকাশিত হয়। ফলে সর্বদাই শীতল জলবায়ু বিরাজ করে এবং জলবায়ুগত কারণে ইলাবৃতবর্ষে বসবাসকারীরা দীর্ঘায়ু হয় ও তাদের গায়ের রং উজ্জ্বল সাদা বর্ণের। এখানে জাম্বূনদ নামে একটি সুমিষ্ট জলধারা প্রবাহিত যা, জম্বু বা জামের রসে পরিপূর্ণ। ফলে ধারণা করা যায় এই অঞ্চলে প্রচুর জম্বুবৃক্ষ বা জাম গাছ জন্মায়। ইলাবৃতবর্ষের মানুষরা প্রচুর পরিমাণে সেইরস পান করে। ফলে শুধু শীতল আবহাওয়া নয় জম্বুরস, যা আধুনিক কালে বেরিওয়াইন (Berrywine) বলা হয়, তা প্রচুর পরিমাণে সেবন করার জন্যও ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের গায়ের রং উজ্জ্বল হতে পারে। পুরাণে জাম্বূনদ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে, জম্বুরসে পূর্ণ এই নদীর ধারা স্বর্ণের আকার ধারণ করে এবং সেই স্বর্ণ এতোই উৎকৃষ্ট যে দেবতারা তা দিয়ে অলঙ্কার নির্মাণ করান—

তত্র জাম্বূনদং নাম কনকং দেবভূষণম্।

[মৎস্য পু. ১১৪.৬৯-৮০; বায়ু পু. ১৪৬.১১-১৬; বিষ্ণু পু. ২.২.১৫-২৬]

এর দুটো যৌক্তিক ব্যাখ্যা হতে পারে—প্রথমত, জামের রস দিয়ে তৈরি উৎকৃষ্টমানের সুরা (wine), যা উজ্জ্বল সোনালি বর্ণের, তার জন্যই জাম্বূনদে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, এমন কথা বলা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত হয়তো এ অঞ্চলে জাম্বূনদের কাছে উৎকৃষ্টমানের স্বর্ণ আকরিক পাওয়া যায় বা এখানে সোনার খনি রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পণ্ডিতরা মনে করেন যে, জাম্বূনদ বলতে আধুনিক জর্ডন নদীকে বোঝানো হয়। আধুনিক জর্ডন নদী ইজরায়েল, জর্ডন ও পশ্চিম

এশিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। এই জর্ডন নদী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে খুবই বিরল প্রকৃতির ইন্দ্রগোপক অর্থাৎ কাঁচপোকার গায়ের রং নীল ও লাল ঘেঁষা বর্ণের সোনা পাওয়া যায়। বাইবেলেও এই বিশেষ ধরনের স্বর্ণের কথা উল্লিখিত রয়েছে। আসলে এই বিরল প্রকৃতির নীল ও লাল রং ঘেঁষা সোনা হল উল্কাপাতের ফলে উৎপন্ন নিকেল মিশ্রিত লোহা (meteoric iron) প্রাচীন আক্কাদের মানুষেরা এই বিশেষ ধরনের ধাতুর ব্যবহার জানতো বলে তথ্য পাওয়া যায়।

[A. E. Nordenshidd, The Voyage of the Vega Round Asia and Europe; p. 489: Black & A Waldron: The Modernization of Inner Asia; p. 252; Dr. Liny Srinivasan: Desi Words Speaks of the Past: p. 219-220]

উপরের দুটি যুক্তি বিবেচনা করলে ইলাবৃতবর্ষের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াই প্রাচীন ইলাবৃতবর্ষ বলে মনে হয়। কারণ, এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জাম বা বেরী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যে কারণে অঞ্চলটি এখনও উৎকৃষ্ট বেরীওয়াইন উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। একই সঙ্গে জাম্বুনদ বা জর্ডন নদীর উপস্থিতিও ইলাবৃতবর্ষের মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থানের বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়। আর একটু গভীরভাবে ভাবলে পৌরাণিক পণ্ডিতদের ধারণা মত ইলাবৃতবর্ষ যদি জম্বুদ্বীপের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াই ইলাবৃতদেশ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ এটিও এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত একথা বলাই যায়।

□ ইলাবৃতবর্ষ একটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এটি দেবতাদের জন্মভূমি এবং দেবগণের যাগ, যজ্ঞ, বিবাহ ও অনান্য অনুষ্ঠান এখানেই সম্পাদিত হয়। সপারিষদ মহাদেব প্রতিদিন এই অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। দৈত্যরাজ বলি ইলাবৃতবর্ষে এক বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন বলে পুরাণে বলা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১৩৫.২-৪; বায়ু পু. ৩৪.২৯]

ইলাম্পদতীর্থ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। ঋষি পুলস্ত্য, ভীষ্মের কাছে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনাকালে এই তীর্থের উল্লেখ করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৮৩.৭৭-৭৮; (হরি) ৩.৬৮.৭৭-৭৮; পদ্ম পু. (নবভারত). স্বর্গ. ১২.৭৮-৭৯]

□ বামন পুরাণে অবশ্য ইড়াস্পদ বলে একটি পাঠ পাওয়া যায়। *[বামন পু. ৩৬.২৪]*

□ বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের কৈথাল (**Kaithal**) জেলার অন্তর্গত একটি স্থান বিশেষ।

[O.P. Bharadwaj; Ancient Kurukshetra: Studies in Historical and Cultural Geography: p. 116]

ইলিন *[দ্র. ঈলিন]*

ইলিনা মৎস্য পুরাণ মতে, পুরুবংশীয় রাজা রন্তিনারের পত্নী। মৎস্য পুরাণে এঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ইনি যমের কন্যা ছিলেন।

[মৎস্য পু. ৪৯.৯]

ইলিবিল ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথ (ইনি রামচন্দ্রের পিতা দশরথের বহু পূর্ববর্তী)-এর পুত্র। রাজা ইলিবিল বিশ্বসহ নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[দ্র. ঐলবিল]*

[বিষ্ণু পু. ৪.৪.৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৮০]

ইলিবিলা *[দ্র. ইলবিলা]*

ইল্বল একজন খলস্বভাব দৈত্য। ভাগবত পুরাণে এর বংশ পরিচয় বিশদে বর্ণিত হয়েছে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র হ্লাদ। হ্লাদের ঔরসে তাঁর পত্নী ধমনীর গর্ভে ইল্বল এবং তার ভাই বাতাপির জন্ম হয় সুতরাং ভাগবত পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ইল্বল হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। অন্যান্য পুরাণ মতে ইল্বল ছিলেন হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয়। হিরণ্যকশিপুর বোন সিংহিকার সঙ্গে দানবরাজ বিপ্রচিত্তির বিবাহ হয়। বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত অসুরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইল্বল। অসুররাজ বৃত্র এবং বলির অনুচরদের মধ্যেও ইল্বলের নামোল্লেখ পাই। অসুররাজ ইল্বল মহাধনী হিসাবে বিখ্যাত। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, ইনি মণিমতী নগরে বাস করতেন। ইল্বল একবার এক তপস্বী ব্রাহ্মণের কাছে ইন্দ্রের সমতুল্য একটি পুত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তার প্রার্থনা পূরণ করলেন না। তাতে ইল্বল সেই ব্রাহ্মণ তথা সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির উপর ক্রুদ্ধ হল এবং মায়ার সাহায্যে ব্রাহ্মণ হত্যা করতে লাগল। ইল্বল মায়ার প্রভাবে ছোটোভাই বাতাপিকে ছাগরূপ বা মেষরূপ ধারণ করাত। তারপর তাকে ছেদন ও রন্ধন করে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে

পরিবেশন করত। ইম্বলের একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, সে মৃতব্যক্তির নাম ধরে ডাকলে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ জীবিত হয়ে উঠত। ব্রাহ্মণকে বাতাপির মাংস ভোজন করাবার পর ইম্বল বাতাপির নাম ধরে ডাকতে থাকত। ফলে বাতাপি জীবন্ত হয়ে ব্রাহ্মণের উদর ভেদ করে বের হয়ে আসত। এই ভাবে ইম্বল বহু ব্রাহ্মণের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

একবার অগস্ত্যমুনি কয়েকজন রাজার সঙ্গে সম্পদপ্রার্থী হয়ে এই ইম্বলের কাছে উপস্থিত হলেন। ইম্বল তাঁদের জন্যও মেষরূপী বাতাপিকে রন্ধন করে পরিবেশন করল। কিন্তু অগস্ত্য একাই সমস্ত মাংস আহার করলেন। তারপর ইম্বল যথারীতি বাতাপির নাম ধরে ডাকতে লাগলো, কিন্তু বাতাপি বেরিয়ে এল না। ইম্বল বিস্মিত হলে অগস্ত্য মৃদু হেসে বললেন—বাতাপি কি করে বের হবে? আমি তাকে হজম করে ফেলেছি। এই কথা শুনে ইম্বল দুঃখিত ও হতাশ হল এবং অগস্ত্য মুনিকে ও অন্যান্য রাজাদের তাদের প্রার্থনার চেয়েও অধিক ধন দান করল। অবশ্য রামায়ণে বাতাপি বধের ঘটনাটি বর্ণিত হবার পর বলা হয়েছে যে, বাতাপির মৃত্যু সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে ইম্বল অগস্ত্যমুনিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে মহর্ষি অগস্ত্য তাকে তপঃপ্রভাবে ভস্মীভূত করেন। পুরাণ মতে বল্বল নামে ইম্বলের এক পুত্র ছিল।

[মহা (k) ৩.৯৬.৪-১৩; ৩.৯৮.১৯-২০; ৩.৯৯.১-১৮; (হরি) ৩.৮০.৪-১৩; ৩.৮২.১৯-২০; ৩.৮৩.১-১৮; রামায়ণ ৩.১১.৫৫-৬৬; ভাগবত পু. ৬.১৮.১৫; ৭.২.৪; ৮.৭.১৪; ৮.১০.২০, ৩২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১৯; বিষ্ণু পু. ১.২১.১১; মৎস্য পু. ৬.২৭]

ইষ$_{১}$ স্বায়ম্ভুব মনুর কনিষ্ঠ পুত্র উত্তানপাদ। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের বংশধারায় বৎসরের ঔরসে স্বর্বীথির গর্ভে জাত পাঁচ পুত্রসন্তানের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইষ।

[ভাগবত পু. ৪.১৩.১২]

ইষ$_{২}$ 'ইষ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ আশ্বিন মাস। পুরাণে একাধিকবার আশ্বিন মাস বোঝাতে ইষ শব্দের উল্লেখ পাই। *[ভাগবত পু. ১২.১১.৪৩; বায়ু পু. ৩০.৯; ৫০.২০২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.১০]*

ইষ$_{৩}$ মৎস্য পুরাণ অনুসারে ঔত্তমি মনুর পুত্রদের মধ্যে ইষ একজন। *[মৎস্য পু. ৯.১২]*

ইষ$_{৪}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে ঔত্তম মন্বন্তরে দেবতাদের গণগুলির মধ্যে সুধামা অন্যতম। ইষ এই সুধামা দেবগণের একজন দেবতা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.২৮]

ইষন্ধর পুরাণে বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের অধিবাসীরা যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্তি ছিল, তেমনই পৌরাণিক শাল্মলী দ্বীপের অধিবাসীরাও চতুর্বর্ণে বিভক্তি ছিল। শাল্মলীদ্বীপে এই চতুর্বর্ণের অন্যতম ছিল ইষন্ধর। সম্ভবত শূদ্র জাতির সমার্থক। *[ভাগবত পু. ৫.২০.১১]*

ইষুধর শাল্মলদ্বীপে বসবাসকারী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মতো চারটি বর্ণে বিভক্ত। এই বর্ণগুলির একটি হল ইষুধর। এই বর্ণটি আমাদের শূদ্র বর্ণের সমতুল্য বলেই মনে হয়।

সম্ভবত এই ইষুধর শব্দটিই ভাগবত পুরাণের পাঠে 'ইষন্ধর' হয়েছে। *[দ্র. ইষন্ধর]*

[দেবীভাগবত পু. ৮.১২.২৫]

ইষুপাদ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রেরা দানব নামে পরিচিত। ইষুপাদ এই দানবদের মধ্যে একজন। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে দ্বাপরযুগে ইনি মর্ত্যে রাজা নগ্নজিৎ রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

[মহা (k) ১.৬৫.২৫; ১.৬৭.২০; (হরি) ১.৬০.২৫; ১.৬২.২১ (তবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে ইষুপাদ-এর পরিবর্তে একপাদ নাম পাওয়া যায়)]

ইষুমান্ যদু-বৃষ্ণি বংশীয় শূরের অন্যতম পুত্র দেবশ্রবা। ইনি বসুদেবের ছোটো ভাই। দেবশ্রবার ঔরসে কংসবতীর গর্ভজাত দুই পুত্র সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন ইষুমান্।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪১]

ইষ্ট বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৭; (হরি) ১৩.১২৭.৪৭]

ইষ্টক কুরুবংশীয় রাজা প্রতীপের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন দেবাপি। ইনি শান্তনু রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দেবাপির দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন ইষ্টক।

[বায়ু পু. ৯৯.২৩৭]

ইষ্টাপূর্ত মহাভারতে বারবার 'ইষ্টাপূর্ত' এবং

'ইষ্টাপূর্তফল'-এর কথা এসেছে, আছে রামায়ণেও। কিন্তু সব জায়গাতেই এই শব্দটি যখনই ব্যবহার হয়েছে, তখনই এই হতাশা এসেছে যে, তুমি যদি এই অন্যায় করো, তাহলে তোমার ইষ্টাপূর্তের ফল তুমি পাবে না। রামায়ণে বিশ্বামিত্র যখন তাড়কা-রাক্ষসী এবং মারীচ-সুবাহুর অত্যাচার থেকে বাঁচতে দশরথের কাছে এলেন, তখন দশরথ প্রথমে বিশ্বামিত্রের সমস্ত প্রার্থনা পূরণ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু এইভাবে কৃতপ্রতিজ্ঞ মহারাজ দশরথের কাছে বিশ্বামিত্র যখন রামচন্দ্রকে চাইলেন তখন দশরথ অল্পবয়সী রামচন্দ্রকে কিছুতেই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যেতে দিতে রাজী হলেন না। তাতে ক্ষুব্ধ বিশ্বামিত্র তো যথেষ্টই কথা শোনালেন এবং অবশেষে বশিষ্ঠ দশরথ রাজাকে বললেন—আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি এমন করে কথা না রাখেন, তাহলে আপনার ইষ্টাপূর্তের সমস্ত ফল নষ্ট হয়ে যাবে—

ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াত্তস্মাদ্ রামং বিসর্জয়।

মহাভারতে গালব-উপাখ্যানে অনুরূপ একটি শ্লোক আছে। এখানে গুরু বিশ্বামিত্র শিষ্য গালবের কাছে দক্ষিণা না চাইলেও গালব বারবার 'আমি আপনাকে কী দক্ষিণা দেবো'—এই কথাটা বলে তাড়না করতে থাকেন। বিশ্বামিত্র প্রথমে কিছু না বললেও শিষ্যের তাড়না সহ্য করতে না পেরে এক অসাধ্য কঠিন বস্তু চেয়ে বসেন। এরপর গালব কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে নিজের মনেই বিলাপ করতে থাকেন এবং এক সময় দক্ষিণাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপর না দেওয়ার প্রশ্নে সেই ইষ্টাপূর্তের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন—'আমি এটা করবো' বলে কর্তব্য বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেও যে তা না করে, সে লোক মিথ্যাবাদিতার পাপে দগ্ধ হয়, তার ইষ্টাপূর্তের সব পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়—

প্রতিশ্রুতি করিষ্যেতি কর্তব্যং তদকুর্বতঃ।
মিথ্যাবচনদগ্ধস্য ইষ্টাপূর্তং প্রণশ্যতি॥

[রামায়ণ, ১.২১.৮;
মহা (k) ৫.১০৭.৮; (হরি) ৫.৯৯.৩৫]

রামায়ণ-মহাভারতের এই দুই উদাহরণ থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে 'ইষ্টাপূর্ত' এমন কিছু, যার অনুষ্ঠানে পুণ্য হয় এবং সেই পুণ্যসঞ্চয় নষ্ট করতে চান না কেউ। ফলে প্রশ্ন আসে ইষ্টাপূর্ত শব্দের তাৎপর্য্য কী? ইষ্টাপূর্ত-শব্দটি একবারই ব্যবহৃত হয়েছে বেদে এবং সেখানে শব্দটি পিতৃলোকের সঙ্গে সংপৃক্ত। এখানে আপন পিতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে—তুমি সেই চমৎকার স্বর্গলোকে পূর্বপিতাদের সঙ্গে মিলিত হও, সেখানে যমের সঙ্গে এবং তোমার এতদিনের 'ইষ্টাপূর্ত'-ধর্মফলের সঙ্গে যুক্ত হও—

সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ স
যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।

এখানে ইষ্টাপূর্তের অর্থ ব্যাখ্যার সময় সায়নাচার্য লিখেছেন—ইষ্টাপূর্ত হল শ্রৌত-স্মার্ত দানের ফল—

শ্রৌত স্মার্ত-দানফলেন সংগচ্ছস্ব।

এখানে ইংরেজী অনুবাদ আরও পরিষ্কার—'The cumulative spiritual result or merit due to a man's performance of sacrifices and charitable acts'

[ঋগ্‌বেদ ১০.১৪.৮; সায়নাচার্যকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

পরবর্তীকালে ইষ্টাপূর্ত ধর্মশাস্ত্রের বিধান বা স্মার্ত বিধান হিসেবে পরিগণিত হলেও 'ইষ্টাপূর্ত' ব্যাপারটা বৈদিককালেই যজ্ঞকর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং বৈদিককালেই তার সংজ্ঞা খুব পরিষ্কার। অথর্ববেদের একটি উক্তিতে খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, পূর্ব পিতা-পিতামহেরা যে সব যজ্ঞকর্ম করেছেন, যে সব লোকহিতকর কাজ করেছেন, তার পুণ্যফল পরবর্তী প্রজন্মকেও ধন-মান-ঐশ্বর্য্যের সুরক্ষা দেয়। মন্ত্র বলছে—আমাদের পিতাদের ইষ্টাপূর্ত আমাদের রক্ষা করুক—

ইষ্টাপূর্তমবতু নঃ পিতৃণাম্।

এমনকী জীবন শেষে স্বর্গের পথে গেলেন যাঁরা, স্বর্গলোকে তাঁদের সুস্থিতি এবং সুখেরও নির্ণায়ক হল ইষ্টাপূর্ত। অক্ষয় সুখ লাভ করার জন্য আকৃত-মন্ত্র পড়া হয়। যজুর্বেদের সেই আকৃতমন্ত্রে বলা হচ্ছে—ইনি যখন দেবযানের পথে আসেন, তখন তাঁর ইষ্টাপূর্তের ফলগুলি যেন প্রকট হয়ে ওঠে। ইনি জীবনকালে যেসব যজ্ঞকর্ম করেছেন, যেসব দান-ধ্যান করেছেন, যত দক্ষিণা দিয়েছেন, সেই সব কথা অগ্নি যেন ভালো করে বলেন দেবতাদের কাছে এবং দেবতাদের মধ্যে তাঁর বসতির ব্যবস্থা করেন।

[অথর্ববেদ (Roth & Whitney), ২.১২.৪;
তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৫.৭.৭.১-৩, পৃ. ২৩৫২;
বাজসনেয়ী সংহিতা (Weber), ১৫.৫৪, পৃ. ৪৮৪]

বৈদিককালের পরম্পরায় ইষ্টাপূর্ত-কর্ম ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মহাভারত, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মতো বিখ্যাত গ্রন্থের টীকাকার মহাভারতের দুটি শ্লোক উদ্ধার করে ইষ্টাপূর্তের সংজ্ঞানির্দেশ করে বলেছেন—গার্হ্যপত্য অগ্নির উদ্দেশে যা কিছুই আহুতি দেওয়া হয়, অথবা গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি—এই ত্রেতাগ্নিতে যে হোমকর্ম করা হয়, অথবা যজ্ঞবেদির ভিতরের অংশে যা আহুতি হিসেবে দেওয়া, তাকে পারিভাষিক বৈদিক শব্দে 'ইষ্ট' বলা হয়। আর জনহিতের জন্য পুষ্করিণী, কুয়ো, দীঘি কাটানো, দেবমন্দির নির্মাণ-প্রতিষ্ঠা করা, অন্নদান করা, বাগান তৈরি করা—এগুলিকে বলে পূর্তকর্ম—

একাগ্নিকর্ম হবনং ত্রেতায়াং যচ্চ হূয়তে।
অন্তর্বেদ্যাং চ যদ্দানমিষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্তমিত্যভিধীয়তে॥

[যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (আনন্দাশ্রম), আচারাধ্যায়, ২০১ সংখ্যক শ্লোকের অপরার্ক-টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ২৯০]

অপরার্কটীকায় উদ্ধৃত উপরিউক্ত মহাভারতীয় শ্লোক দুটি আমরা মহাভারতের সর্বত্র-প্রচলিত সংস্করণগুলিতে দেখতে পাই না। কিন্তু আমাদের বিশেষ ধারণা অপরার্কদেবের মতো মহাপণ্ডিত যখন এই দুটি শ্লোককে মহাভারতের শ্লোক বলেছেন, তাহলে মহাভারতের কোনো দেশীয় সংস্করণে সেটা থাকবেই। যদি এটা মহাভারতে নাও থাকে, তবে ইষ্টাপূর্তের একটা পৌরাণিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা যে চলছিল, তা ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি দেখলেই বোঝা যায়। স্মার্তকুলের পরবর্তী ধুরন্ধর রঘুনন্দন স্বরচিত 'মলমাসতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে তাঁর পূর্বাচার্য জাতূকর্ণ নামে এক আচার্যের নাম করে তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—দৈনন্দিন অগ্নিহোত্রকর্ম, তপস্যা, সত্য, বেদবিহিত কর্মের আচরণ, অতিথিসেবা এবং বৈশ্বদেব কর্ম— এইগুলি ইষ্ট। আর পূর্তকর্ম হল—পুষ্করিণী, কূপ, তড়াগ ইত্যাদি স্থাপন কর্ম—পূর্তধর্মের সংজ্ঞা হিসেবে উদ্ধৃত জাতূকর্ণের শ্লোকটি অপরার্ক-ধৃত মহাভারতীয় শ্লোকের পুনরাবৃত্তিমাত্র। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, ইষ্টাপূর্তের সমস্ত শ্রৌত-স্মার্ত কর্মগুলিই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য—এই তিন জাতির মানুষ, যাঁদের দ্বিজ বলা হয়েছে, তাঁরা করতে পারেন, কিন্তু শূদ্রের 'ইষ্ট'-কর্মে অধিকার নেই, কিন্তু পূর্ত কর্মে তাঁদের অধিকার আছে। লক্ষণীয় পূর্তের জনহিতকর কর্মগুলিতে স্ত্রীলোকেরও অধিকার স্বীকার করা হয়েছে—এবং স্ত্রীণামপি পূর্তাধিকারঃ। রঘুনন্দন এখানে বৃহস্পতি-স্মৃতির প্রমাণ দিয়েছেন—

শূদ্রস্য পূর্তাধিকারমাহ জাতূকর্ণঃ।
—'বাপীকূপতড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্তমিত্যভিধীয়তে'।
আরামঃ পুষ্পফলোপয়হেতুর্ভূভাগঃ।
'অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানুপালনং।
অতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে।
গ্রহোপরাগে যদ্দানং পূর্তমিত্যভিধীয়তে।
ইষ্টাপূর্ত্তং দ্বিজাতীনাং ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে'।
বৈদিকে বেদাধ্যয়নসাধ্যে।
অগ্নিহোত্রাদাবিতি রত্নাকরঃ।
এবং স্ত্রীণামপি পূর্তাধিকারঃ।

[অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব, রঘুনন্দন-প্রণীত, শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, 'মলমাসতত্ত্ব', পৃ. ২৮০]

লক্ষণীয়, ইষ্টাপূর্ত-কর্ম কিন্তু বৈদিক কালে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের অধিকারেই ছিল, বৈশ্য তো দূরের কথা, ক্ষত্রিয়েরও এই কর্মে অধিকার ছিল না। হয়তো এই কারণেই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বলা আছে—

ইষ্টপূর্তং ব্রাহ্মণস্য।

তবে সমাজ এবং সামাজিক প্রয়োজন এখনই এক বহমান প্রক্রিয়া, যাতে এই শিক্ষা তৈরি হয়েছে যে, অগ্নিহোত্র কিংবা অন্যান্য যজ্ঞের 'ইষ্ট' কর্মগুলি ব্রাহ্মণের সম্পাদ্য হলেও ধনৈশ্বর্য্যহীন তপস্বী ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যয়সাধ্য 'বাপী-কূপ-তড়াগ' খননের মতো জনহিতের কর্ম করা সম্ভব ছিল না। ফলে ক্ষত্রিয় রাজাদের অধিকার এল পূর্তকর্মের বিষয়ে; আর ক্ষত্রিয়রা যেহেতু যাগযজ্ঞ যথেষ্টই করতেন, তাই ইষ্ট-কর্মের অধিকার পেতেও তাঁদের দেরি হয়নি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইষ্টাপূর্ত যাতে অবিনাশী (ইষ্টাপূর্ত অপরিজ্জ্যানি) নামে ক্ষত্রিয়দের একটি

অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানের কর্তব্যসূচনায় বলা হয়েছে—পুরাকালে রাজন্য, বৈশ্য এবং শূদ্রকে দেখে যজ্ঞ স্বয়ং পালিয়ে যান। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় দুই জনেই যজ্ঞকে ধরবার জন্য যজ্ঞের অনুসরণ করে—ব্রাহ্মণের হাতে থাকে ব্রাহ্মণের অস্ত্র, আর ক্ষত্রিয়ের হাতে ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র। ধরা পড়ার সময় যজ্ঞ দেখতে পান যে, যজ্ঞ করতে হলে যজ্ঞের যেসব উপকরণ লাগে সেই উপকরণগুলিই ব্রাহ্মণের অস্ত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র ধনুক-বাণ। যজ্ঞ ধনুক-বাণের মতো অস্ত্র দেখে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দুজনকে রেখেই পালাতে আরম্ভ করল, এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ তার পিছনে দৌড়ে ধরে ফেলল, কিন্তু ক্ষত্রিয় তাকে ধরতে না পেরে পালিয়ে এল। আর যজ্ঞ যখন দেখল—তার যুদ্ধাস্ত্র আয়ুধগুলির সঙ্গে (যজ্ঞোপকরণ স্ফ্য, কপাল, সূর্প, কৃষ্ণাজিন, শম্যা ইত্যাদির সঙ্গে) ব্রাহ্মণের অস্ত্রগুলির কোনো তফাৎ নেই, তখন যজ্ঞ ব্রাহ্মণের অধিকারে থাকল। ক্ষত্রিয় তখন ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলল—আমাকেও তুমি যজ্ঞে আহ্বান করো। ব্রাহ্মণ সেই প্রার্থনা পূরণ করে বলল—তুমি আসতেই পারো, কিন্তু তোমাকে অস্ত্র-শস্ত্র ছেড়ে ব্রাহ্মণের যজ্ঞায়ুধ ধারণ করে ব্রাহ্মণ সেজে যজ্ঞের কাছে আসতে হবে। তদবধি ক্ষত্রিয়েরা যজ্ঞ করার সময় ব্রাহ্মণের চেহারায় আসেন।

এই কাহিনী উচ্চারণের প্রায় পরেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলল—এবার ক্ষত্রিয় যজমানের দেবযজনের যোগ্যতা নিশ্চিত হয়ে যাবার পর তার ইষ্টাপূর্তের বিনাশ যাতে না হয় তার জন্য আহবনীয় অগ্নিতে হোমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যজ্ঞদীক্ষার আগে—

অথাত ইষ্টাপূর্তস্যাপরিজ্যানিঃ ক্ষত্রিয়স্য
যজ্ঞমানস্য, স পুরস্তাদ্ দীক্ষায়াঃ ...।

আমরা এই বিবরণ থেকে বুঝতে পারি-ইষ্টাপূর্ত কর্মে ক্ষত্রিয়ের অধিকার এসেছে পরে এবং হয়তো বা বৈশ্যের অধিকার এসেছে আরও পরে। আর পূর্ত-কর্মে ব্রাহ্মণের অক্ষমতা ছিল বলে, সেখানে সামাজিক প্রয়োজনেই চতুর্বর্ণ এবং স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, ইষ্টাপূর্তের অধিকার লাভে জাতিবর্ণের ক্রমান্বয়টা সময়ের ব্যবধানে এসেছে সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায় যখন সায়নাচার্য ইষ্ট এবং পূর্তের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। তিনি পূর্বাচার্যদের মত উল্লেখ করে বলেছেন—বর্ণাশ্রমে ক্রমিক অন্বয়ে ইষ্ট এবং পূর্তের ধর্ম তৈরি হয়েছে। কূপখনন, পুষ্করিণী-খননের কাজটা অবশ্য সকলেই করতে পারে। অবশেষে তাঁর বক্তব্য অনেকে অবশ্য এটাও বলেন যে, 'ইষ্ট' মানে হল বেদবিহিত শ্রৌত-কর্ম আর পূর্ত হল ধর্মশাস্ত্র এবং স্মৃতিবিহিত স্মার্ত কর্ম—

বর্ণাশ্রমান্বয়ী ধর্ম ইষ্টং পূর্তমথেতরৎ।
প্রপাতটাকাদিরূপং তচ্চ সর্বত্র দৃশ্যতে॥
স্মার্তং পূর্তং শ্রৌতমিষ্টমিতি কেচিদিহোচিরে॥

[তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম), ৩য় খণ্ড, ৩.৯.১৪, পৃ. ১২৮৭; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম), ২য় খণ্ড, ৭.৩৪.৩, পৃ. ৮৬৫; সায়নাচার্য-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

বৈদিক কর্মকাণ্ডে ইষ্টাপূর্ত-কর্মের যে মর্য্যাদা কীর্তিত হয়েছে, ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং প্রধানত মুমুক্ষুত্বের প্রতিপাদক উপনিষদগুলিতে ইষ্টাপূর্তের পুণ্য তেমন সমাদরে চিহ্নিত হয়নি, কেননা পুণ্যও জীবের বন্ধন সৃষ্টি করে, যাতে জন্ম-মরণের চক্র চলতে থাকে। মুণ্ডকোপনিষদে নিঃশংসয়ভাবে বলা হয়েছে—যাঁরা শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত ইষ্টাপূর্ত কর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থসাধক কর্ম হিসেবে মনে করেন, তাঁরা তদতিরিক্ত প্রকৃত শ্রেয়স্কর আত্মজ্ঞানের কথা ভাবতেই পারেন না। তাঁরা পুণ্যকর্মের ফলে যে ভোগায়তন স্বর্গলাভ করেন, সেটা আসলে সুকৃত কর্মের ফল ভোগ করেন। কিন্তু তাতে এই মনুষ্যলোকে আবারও তাঁদের জন্ম নিতে হয়—

ইষ্টাপূর্তাং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতে'নুভূত্বেমং
লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

মোক্ষকামী মানুষের পক্ষে ইষ্টাপূর্তকর্মের এই বিড়ম্বনা ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং প্রশ্নোপনিষদেও একই হতাশায় বর্ণিত এবং এখানে যেভাবে ইষ্টাপূর্তের ফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে ইষ্টাপূর্তের ফল খুব বেশি হলে পিতৃলোক, যেটা আমাদের পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্র থেকেও সমর্থিত হয়।

[মুণ্ডকোপনিষদ (দুর্গাচরণ), ১.২.১০, পৃ. ৩৭; ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ), ৫.১০.৩, পৃ. ৫৫০; প্রশ্ন (দুর্গাচরণ), ১.৯, পৃ. ১৬]

বৈরাগ্যবান, সংসার বিরক্ত আত্মজ্ঞানী মানুষের কাছে ইষ্টাপূর্ত-কর্মের কোনো মূল্য না থাকলেও সাধারণ সংসারী মানুষ এবং বিত্তশালী মানুষের কাছে ইষ্টাপূর্ত-কর্মের ফল অত্যন্ত অভীষ্ট বলেই পরবর্তীকালে মহাভারত-পুরাণে ইষ্টাপূর্ত-ফল অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য হয়েছে এবং তা হয়েছে এই কারণেই যে, তাতে ইহলোকে এবং পরলোকে সার্বিক সম্পদ বৃদ্ধি হয়। বিশেষত ইষ্টাপূর্তের প্রথম ভাগ 'ইষ্ট'-সাধনের মধ্যে যেহেতু যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যকর্মই প্রাধান্য লাভ করে এবং পূর্তকর্ম যেহেতু সেই সব ব্রাহ্মণ্য সাধনের চেয়ে নিম্নমানের বলেই পুরাণ-স্মৃতিগুলিতে চর্চিত, তাই একটা সময় দেখা যাচ্ছে—দু-একটি পুরাণ এই ব্রাহ্মণ্যবর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে এবং বচন দিচ্ছে—ইষ্ট-কর্মের ফলে স্বর্গলাভ পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু সর্ববর্ণের অনুষ্ঠেয় পূর্তকর্মের ফলেই মোক্ষলাভ হতে পারে—

ইষ্টাপূর্তং দ্বিজাতীনাং প্রথমং ধর্মসাধনম্।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্তে মোক্ষঞ্চ বিন্দতি॥

বরাহ পুরাণের এই মন্তব্যটা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ এক সামাজিক সংকেত সূচনা করে। অন্যান্য গ্রন্থে যেখানে ইষ্টকর্মে স্ত্রী-শূদ্রের অধিকারই নেই, সেখানে পূর্তকর্মে স্ত্রী-শূদ্র পর্যন্ত অধিকার আছে এবং তাতে আত্মজ্ঞানলভ্য মোক্ষলাভ হয়—এ কথাটা পৌরাণিক উদারতার সংকেত। বরাহ পুরাণের এই অংশে প্রচুর-প্রচুর গাছ পুঁতে 'ইকোলজি'র ব্যালান্স তৈরি করাটা এতটাই পুণ্যজনক বলে প্রশংসিত হয়েছে যে, সেটা অসাধারণ এক আধুনিকতা তৈরি করে। বিশেষত এই ধরনের পূর্তকর্ম যখন মোক্ষলাভের অঙ্গীকার বহন করে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে পুকুর-দীঘি কাটানোর কথা আছে, আর পদ্ম পুরাণে ধর্ম-মঠ-গোলকের নির্মাণের কথা আছে।

[বরাহ পু. ১৭২.৩৩-৪২; অগ্নি পু. ২০৯.২-৪; অত্রিসংহিতা, স্মৃতিসন্দর্ভ, (গুরুমণ্ডল প্রেস), ৪৩-৪৬; মহা (k) ১৩.৫৮ অধ্যায়, (হরি) ১৩.৪৭; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম), ৬.২৪৩.১০-১৪; ৬.২৪৪.৩৪-৩৫]

ঈ

ঈ$_১$ সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই চর্তুদশ স্বরধ্বনি থেকেই চর্তুদশ মন্বন্তরাধিপতি মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্ট এই চর্তুদশ স্বরধ্বনির চতুর্থতম হল 'ঈ' কার বর্ণ। এই ঈ কার বর্ণ থেকে মনুর সৃষ্টি হয়েছিল। বায়ু পুরাণে অ থেকে ঔ পর্যন্ত চতুর্দশ বর্ণকে মূর্তিমান দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মূর্তিমান 'ঈ' কার রক্ত বর্ণের ছিলেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ২৬.৩৫]*

ঈ$_২$ শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। ছান্দোগ্য উপনিষদে অগ্নিকে 'ঈ'-কার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের শঙ্করাচার্যকৃত টীকাতে অগ্নির 'ঈ'-কার স্বরূপতার কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তবে পরবর্তী সময়ে পণ্ডিত আনন্দগিরি এই শাঙ্করভাষ্যের টীকা রচনা করতে গিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করেছেন। সামবেদের যে গীতিগুলিতে 'ঈ'-কার নিহিত থাকে সেগুলিকে আগ্নেয় বা অগ্নিস্বরূপ বলে ভাবনা করা হয়— ঈনিধনানীতি। ঈকারো নিধীয়তে যেষু সামসু অন্যাগ্নেয়ানি প্রসিদ্ধানি। এই প্রসিদ্ধি থেকেই ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাবনায় অগ্নি ঈকার স্বরূপ—অগ্নিরীকারঃ।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ১.১৩.১]

বৈদিক কাল থেকে পৌরাণিক কাল পর্যন্ত ভগবান শিব বহু সময়েই অগ্নির সঙ্গে অভিন্ন সত্তা রূপে কল্পিত হয়েছেন। তাই অগ্নির ঈ-কার স্বরূপতাও খুব স্বাভাবিকভাবেই আরোপিত হয়েছে ভগবান শিবের নাম হিসেবে।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৭; (হরি) ১৩.১৬.১০৭]

ঈজিক একটি প্রাচীন উত্তর ভারতীয় জনপদ তথা জনজাতি। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫০]*

ঈড্য$_১$ মৎস্য পুরাণ অনুসারে ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর পুত্রদের মধ্যে একজন ঈড্য।

[মৎস্য পু. ৯.৩৩]

ঈড্য$_২$ শিবসহস্রনাম স্তোত্রে বর্ণিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। ঈড্য শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'ঈড়্' ধাতু থেকে। 'ঈড়্' ধাতুর অর্থ স্তব করা বা স্তুতি করা। যিনি স্তবের যোগ্য বা যাঁর স্তব করা হয় তিনিই ঈড্য। দেবাদিদেব শিব সম্পূর্ণ প্রাণীজগতের পূজনীয় এমনকী ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারাও তাঁর পূজা ও স্তব করেন বলেই তিনি ঈড্য নামে খ্যাত—

ঈড্যঃ স্তুত্যঃ (নীলকণ্ঠকৃত টীকা)।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪৮; (হরি) ১৩.১৬.১৪৭]

ঈদৃক্ দিতির পুত্র 'মরুৎ' দেবতারা যে সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন, সেই দেবগণগুলির মধ্যে পঞ্চম দেবগণ ঈদৃক্। *[বায়ু পু. ৬৭.১২৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৯৬-৯৭]*

ঈরা$_১$ একটি প্রাচীন নদী-নাম। লোমশ ঋষি তাঁর তপস্যার প্রভাবে ঈরা নদীটিকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। *[বায়ু পু. ১০৮.৭৯]*

ঈরা$_২$ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত একটি পবিত্র নদীর নাম। সম্ভবত ইরাবতী নদীকেই এখানে সংক্ষেপে ইরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[দ্র. ইরাবতী$_১$]*

[বায়ু পু. ১০৮.৭৯]

ঈরি মহাভারতের সভাপর্বে যমসভার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে উল্লেখ আছে যে, যমের সভায় একশত ঈরি (বহুবচনে) অবস্থান করেন। এঁরা হয়তো বিভিন্ন কল্পে জাত রাজর্ষি যাদের প্রত্যেকেরই নাম ঈরি। তবে এঁরা ঈরি নামে একজন রাজর্ষির শত সংখ্যক বংশধরও হতে পারেন। *[মহা (k) ২.৮.২৩; (হরি) ২.৮.২৩]*

ঈলিন মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী পুরুবংশীয় রাজা তংসুর পুত্র ছিলেন ঈলিন। তংসুর পত্নী কালিন্দীর গর্ভে ঈলিন জন্মগ্রহণ করেন। ঈলিনের পত্নীর নাম রথন্তরী। ঈলিনের ঔরসে রথন্তরীর গর্ভে পাঁচ পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে দুষ্যন্ত জ্যেষ্ঠ। অপর চার পুত্রের নাম যথাক্রমে শূর, ভীম, প্রবসু এবং বসু। ঈলিনের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দুষ্যন্ত রাজ্য লাভ করেন।

বায়ু পুরাণে পুরুবংশীয় রাজা ত্রসুর পুত্র ইলিনকে দুষ্যন্তের পিতা বলা হয়েছে। তবে বায়ু পুরাণের পাঠ-অনুযায়ী দুষ্যন্ত ইলিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। ইলিনের চার পুত্রের নাম এই পুরাণ মতে যথাক্রমে সুষ্যন্ত, দুষ্যন্ত, প্রবীর এবং অনঘ।

বিষ্ণু পুরাণ এই ঈলিনকেই ঐলিন নামে উল্লেখ করেছে। *[দ্র. ঐলিন]*

[মহা (k) ১.৯৪.১৬-১৮; ১.৯৫.২৭-২৮;
(হরি) ১.৮১.১৬-১৮; ১.৯০.৩৪-৩৫;
বায়ু পু. ৯৯.]

ঈশ$_{১}$ ঈশ বলতে সাধারণত অধিকারী, নিয়ন্তা, স্বামী, প্রভু ইত্যাদি বোঝায়। এই অর্থে 'নরেশ', 'ক্ষিতীশ' কিংবা 'সুরেশ' যেমন বোধগম্য, তেমনই রমেশ, গণেশ, শ্রীশ, উমেশ, দ্বারকাধীশ—এগুলিও বোধগম্য। আবার মহাভারতে তপতীকে সম্বরণ যখন গান্ধর্ব বিবাহে উদ্যোগী করার চেষ্টা করছেন, তখন তপতী বলেছিলেন—আমি আমার এই কন্যা-শরীরের অধিকারী নই—

ন চাহম্ ঈশা দেহস্য।

এখানেও ঈশ বলতে অন্য কোনো বিশেষ বোঝায় না। কিন্তু বিশেষ অর্থে মহাদেব শিবকেই ঈশ বলে লক্ষিত করা হয়, এটা যেমন কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের নান্দীশ্লোকে আছে, তেমনই আছে পুরুষোত্তমদেবের ত্রিকাণ্ডশেষের মতো কোষ-গ্রন্থে। এখানে বলা হয়েছে—ঈশ বলতে যেমন 'প্রভু' বোঝায় তেমনই বোঝায় দেবদেব শঙ্কর মহাদেবকে—প্রভুশঙ্করয়োরীশঃ। মেদিনীকোষেও তাই—

ঈশঃ প্রভৌ মহাদেবে।

মহাভারতের বিরাটপর্বে অর্জুন আর কৌরবদের যুদ্ধ দেখার জন্য যেসব দেবতারা পৃথক পৃথক বিমানে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ঈশ-মহাদেব একজন। মৎস্য পুরাণে 'ঈশ' নামে যাঁর প্রতিমালক্ষণ তৈরি করা হয়েছে, তিনি শূলপাণি মহাদেব তো বটেই, কিন্তু ঈশ বলতে যে প্রধানত মহাদেব শিবকেই বোঝায়, তা স্পষ্ট অনুমান করা যায় পুরাণের এই ঘোষণা থেকে যে, 'এবার আমরা ঈশের মূর্তিলক্ষণ বলছি'—এই কথার পরেই ত্রিনয়ন বৃষারূঢ় শিবের লক্ষণ দেওয়া হচ্ছে—

তথৈবেশং প্রবক্ষ্যামি ধবলং ধবলেক্ষণম্।
ত্রিশূলপাণিনং দেবং ত্র্যক্ষং বৃষগতং প্রভুম্॥

[দ্র. ঈশ্বর]

[ত্রিকাণ্ডশেষ ৩.৪২৭;
মেদিনীকোষ, শান্তবর্গ ৩, পৃ. ১৬২;
মহা (k) ৪.৫৬.১১; (হরি) ৪.৫১.১১;
মৎস্য পু. ২৬১.২৩]

ঈশ$_{২}$ মৎস্য পুরাণে অবশ্য ঈশ সাধ্য-দেবতাদের মধ্যেও একজন। ধর্মের ঔরসে সাধ্যার গর্ভে তাঁর জন্ম। *[মৎস্য পু. ১৭১.৪৩]*

ঈশ$_{৩}$ ঈশ বলতে অবশ্য ভগবান বিষ্ণুকেও বোঝানো হয়েছে—

যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমসাদ্যমীশম্—

তবে এখানে ঈশ বলতে বোধহয় সর্বেশ্বর, সর্বলোকপ্রভু ভেবেই চরম ভগবত্তার আরোপ করে বিষ্ণু বা পরমেশ্বর প্রভুকে ঈশ নামে ডাকা—যেমনটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কিংবা ভগবদ্গীতায়—

*ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশম্...।
*প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।

[বিষ্ণু পু. ৬.৮.৫৮; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১.৮;
ভগবদ্গীতা ১১.৪৪; ভাগবত পু. ৬.৮.২২]

ঈশ$_{৪}$ বিশ্বেদেবগণের অন্যতম দেবতা।

ঋগ্বেদের মধ্যে অনেকগুলির সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে দাঁড়ায় সমস্ত দেবতা। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন—'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা-বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশজন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেবগণ বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবগণের পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিককালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

□ পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

□ বিশ্বেদেবগণের মধ্যে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম পালটে যায় এবং সংখ্যাও একেক জায়গায় এক এক রকম।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যেসব নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঈশ। *[মহা (k) ১৩.৯১.৩৫; (হরি) ১৩.৭৮.৩৫]*

ঈশতীর্থ নর্মদা নদীর তীরবর্তী একটি তীর্থ। পদ্ম পুরাণে কনখল তীর্থ থেকে এখানে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই তীর্থ দর্শনে ব্রহ্মালোক লাভ হয়। *[পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ. ৯.২৩৭]*

ঈশান$_১$ *[দ্র. পঞ্চমুখ]*

ঈশান$_২$ পৌরাণিক শাকদ্বীপের সাতটি সীমা-পর্বত (Boundary Mountain) -এর মধ্যে অন্যতম ঈশান। *[ভাগবত পু. ৫.২০.২৬]*

ঈশান$_৩$ মৎস্য পুরাণ মতে দশম কল্পের নাম। *[মৎস্য পু. ২৯০.৫]*

ঈশানাধ্যুষিত সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী একটি তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে যে, সরস্বতী নদীর তীরে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ রয়েছে যার কাণ্ড সংলগ্ন হয়ে ছিল একটি উই ঢিবি। সেই উই ঢিবির কাছ থেকে একটি শম্যাকে (লাঠির মতো দেখতে যজ্ঞকাষ্ঠ) ছয়বার পরপর সবেগে ছুঁড়ে দিলে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, ততখানি দূরেই রুদ্র-শিব অধ্যুষিত ঈশান তীর্থের অবস্থান। নির্দিষ্ট এই অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলস্থানটি সাধারণত সরস্বতীর জলে সিঞ্চিত থাকত। সেই স্থান থেকে নির্গত ধারায় কোনো পুণ্যার্থী স্নান করলে সহস্র কপিলাগাভী দান ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে বলে মহাভারতে বলা হয়েছে। ঈশান-তীর্থ এই অশ্বত্থ-মূল থেকে ছয়-যষ্টি দূরে। সেটাও এক পুণ্য তীর্থ।

প্লক্ষাদ্দেবী স্রুতা রাজন্ পুণ্যাদেবী সরস্বতী।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত বল্মীকান্নিঃসৃতে জলে॥
অর্চ্চয়িত্বা পিতৃন্ দেবানশ্বমেধফলং লভেৎ।
ঈশানাধ্যুষিতং নাম তত্র তীর্থং সুদুর্লভম্॥
ষট্‌সু শম্যানিপাতেষু বল্মীকাদিতি নিশ্চয়ঃ।
কপিলানাং সহস্রঞ্চ বাজিমেধঞ্চ বিন্দতি॥

[মহা (k) ৩.৮৪.৭-১০; (হরি) ৬.৬৯.৭-১০]

ঈশ্বর$_১$ ঈশ্বর-শব্দের সাধারণ অর্থ হল প্রভু, অধিকারী, স্বামী, শক্তিশালী রাজা এবং অতিসক্ষম। কপীশ্বর, সুরেশ্বর, কোশলেশ্বর কিংবা মুনীশ্বর, কমলেশ্বর—এইরকম বিভিন্ন শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়। শ্রেষ্ঠার্থে ঈশ্বর-শব্দের এই ব্যবহার কিন্তু ঈশ্বর বলতে আমরা যা বুঝি, তার বিপরীত। বস্তুত ভারতবর্ষের ধর্ম-দর্শনে দেবতারা কিন্তু ঈশ্বর নন, আবার পূর্ব-চিহ্নিত অর্থভাবনায় তাঁরা ঈশ্বরও বটে। কোনো কোনো জায়গায় ঈশ্বর দেবতাদের সঙ্গে একীকৃত হয়ে যান বলেই ঈশ্বরকে পৃথক করে পরমেশ্বর বা পরমাত্মা নামে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। লক্ষণীয় ঋগ্‌বেদে বহুদেবতার উপাস্যতার কথা থাকলেও একেশ্বরবাদের দিকে যখন তার দার্শনিক গতি তৈরি হয়েছে, তখন এক সর্বব্যাপ্ত পুরুষকল্পনার মাধ্যমে সেই ঈশ্বরের নিত্য অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। পুরুষসূক্তে বলা হচ্ছে—

এই পুরুষের হাজার হাজার মাথা, হাজার হাজার চোখ, হাজার হাজার পা। তিনি সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে দশাঙ্গুলি-পরিমিত হয়ে বিরাজ করছেন। ভূত এবং ভবিষ্যৎ সবই সেই পুরুষ। যেহেতু তিনি যজ্ঞে প্রদত্ত অন্নের দ্বারা সব কিছু অতিক্রম করেন, অতএব তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর (অমৃতত্বস্য ঈশানঃ)। এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সবই তাঁর মহিমা—তিনি সকলের চেয়ে বৃহত্তর, বিশ্বভুবনে তাঁর একটিমাত্র পাদ, দ্যুলোকে অমৃতরূপী তার তিন পাদ বিস্তৃত—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাতাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদো'স্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্র-দর্শনের সঙ্গে ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের কোনো দার্শনিক পার্থক্য নেই। একইভাবে হিরণ্যগর্ভসূক্তে ঋষি আহুতি দেবার জন্য কোনো দেবতা খুঁজে পাননি—

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

তিনি স্তুতি করলেন বিশ্বস্রষ্টা এক সর্বভূতাত্মার। তিনিও বিশ্বসৃষ্টির আদি বীজ এবং তিনিও সর্বব্যাপ্ত। এরপরেই বাগম্ভৃণীর মুখে সেই বিখ্যাত উক্তি—আমি একাদশ রুদ্র, আমিই অষ্ট বসু, আমি মিত্র, আমিই বরুণ, আমিই ইন্দ্র, অগ্নি, দুই অশ্বিনীকুমার—অর্থাৎ আমিই সব। বেদের এই 'অহম্'-ই সমস্ত উপনিষদের সারসত্য কথা। এখানেই অখিল প্রাণী-জগৎ সেই বিরাট ব্যাপ্ত ব্রহ্মের সঙ্গে একাকার হয়ে ওঠে।

'সো'হম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

—এই সব মহাবাক্যের মধ্যে যেমন জীবাত্মার সঙ্গে পরব্রহ্মের একাত্মতা স্থাপিত হয়, তেমনই সেই জ্যোতির্ময় মহাসত্তাকে অবধারণ করাটা কঠিন হয়ে পড়ে বলেই সর্বশক্তিমান পরম ঈশ্বরের দার্শনিক প্রতিষ্ঠাও ঘটতে থাকে অন্যতর এক সাধন-প্রক্রিয়ায়। তাতে পরম ঈশ্বরের একটা রূপ তৈরি হয়। তাতে 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্' পরব্রহ্ম পরম ঈশ্বররূপে প্রকট হন। উপনিষদ বলতে থাকে—তিনি এক মনোময় প্রাণশরীর, তিনি জ্যোতির্ময়, তিনি—

সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদম্।

[ঋগ্বেদ ১০.৯০.১-৩; ১০.১২১.১;
১০.১২৫.১-৮; ৪.৪২.২-৩; ৪.২৬.১-৩;
কঠোপনিষদ ৩.১৫; ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩.১৪.২]

☐ ধাতুগত দিক থেকে 'ঈশ্'-ধাতুর মধ্যে প্রভুত্ব করা কিংবা শাসন করার একটা বৃহৎ তাৎপর্য্য নিহিত আছে এবং সেই তাৎপর্যেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরম শক্তিমান্ ঈশ্বরের একটা রূপ ফুটে ওঠে—

ইমাঁল্লোকানীশতে ঈশনীভিঃ।

ঈশ্বরের এই সর্বাধিষ্ঠাতৃ রূপ স্কন্দ পুরাণে একটি শ্লোকে প্রায় ঈশ্বরের সংজ্ঞার আকারে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা Apte-র অভিধানে উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে— আমিই সব কিছুর চরম অধিষ্ঠাতা হিসেবে আছি এবং আমাকে কেউ শাসন করতে পারে না। আমি সকলকে বিরাট ঐশ্বর্য্য দান করি বলেই আমি ঈশ্বর বলে কীর্তিত হই—

ঈশ এবাহমত্যর্থং ন চ মামীশতে পরে।
দদামি চ সদৈশ্বর্যম্ ঈশ্বরস্তেন কীর্তিতঃ॥

[শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (জগদীশ শাস্ত্রী) ৩.১;
V.S. Apte, Sanskrit-English Dictionary
Vol. I, p. 394]

☐ ঈশ্বর-ভাবনার মধ্যে সব সময়েই সর্বশক্তিমান চৈতন্য-স্বরূপের একটা সবিশেষ রূপ প্রকট হয়ে ওঠে। মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের সমস্ত দেবতার ধ্যানমন্ত্র এবং স্তবরাশির মধ্যে বারংবার তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে পরব্রহ্মের একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পৌরাণিক দেবতারাও এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন। ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ বলা হয় এবং নির্বিশেষ অবস্থায় আত্মচৈতন্যের বোধের সঙ্গে আনন্দ এবং নিত্যসত্তার (সৎ) বোধ মিশে যায়। বস্তুত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সময় চৈতন্য তথা জ্ঞানের তীব্র বোধের সঙ্গে আনন্দ এবং সত্তার বোধটা ecstacy-র চরম সূক্ষ্ম প্রকারে পৌঁছায় বলেই উপনিষদের শ্লোকটিতে আনন্দের উচ্ছ্বাস ও জ্ঞানাত্মক হয়ে ওঠে—

* আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়।
* বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
* মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৈবেদ্য ৬০;
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (জগদীশ শাস্ত্রী) ৩.৮;
মহা (k) ১২.৪৭.৪০; (হরি) ১২.৪৬.৪১]

☐ এই যে নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম তাঁরই সবিশেষ রূপ হল এই ঈশ্বর, তিনিই জীব-জগৎ সৃষ্টি করেন—

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

পরব্রহ্মই সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বরস্বরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এটা আমাদের ধর্মদর্শনে বহুলভাবে স্বীকৃত। ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবানের মুখে আমরা শুনতে পাই—আমি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছি, এই জগৎ আমার একটি সামান্য অংশে ধৃত হয়ে আছে। আকাশে সর্বত্রব্যাপ্ত বায়ুর মতো আমার অবস্থিতি। পরমাত্মস্বরূপ আমি জীবাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।

অন্তর্যামী ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে আছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে'র্জুন তিষ্ঠতি।

এই ছোট্ট কথাটা একদিকে সাংখ্যদর্শনের যুক্তিতে ঈশ্বরকে সাক্ষীচৈতন্যের নির্লিপ্ততা এবং স্বাতন্ত্র্য দেয়, অন্যদিকে ঈশ্বরী মায়ার মাধ্যমে জীবজগৎকে কর্মে প্রযুক্ত করে ঈশ্বর যেন এক কর্তার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হন—

য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি,
যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্,
এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।

[ভগবদ্গীতা ১০.৪২; ৯.৬; ১৫.১৫; ১৮.৬১;
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (জগদীশ শাস্ত্রী) ৬.১১;
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩.৭]

লক্ষণীয় উপনিষদের পরম জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম, সাংখ্যদর্শনের 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ' পরমাত্মা পৌরাণিক কল্পনায় মূর্তিমান ঈশ্বর হয়ে ওঠেন। ভাগবত পুরাণ ঘোষণা করে—সেই একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—তত্ত্ববিদ ব্যক্তিরা তাঁকে কেউ বলেছেন ব্রহ্ম, কেউ বলেছেন পরমাত্মা, আবার কেউ বা বলেছেন ভগবান—

বদন্তি তত্-তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভাগবত পুরাণে যেমন ভগবান বা ঈশ্বরকে ব্রহ্মময় পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মক করে ফেলা হয়েছে, এই পরিণতিতেই ঈশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভগবান বিষ্ণু, কৃষ্ণ এবং শিবের। আর শক্তি দেবতা হিসেবে দুর্গা, কালীও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন পরমেশ্বরী হিসেবে। আমরা দেখবো বিষ্ণু পুরাণের মতো প্রাচীন পুরাণে ভগবান বিষ্ণুই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল কারণ, তিনিই জগৎসৃষ্টির মূলে আছেন এবং তিনিই এই ত্রিজগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনি ব্রহ্মময়—

সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতো'স্য জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে॥

একইভাবে বায়ু পুরাণে পরমাত্মস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ এবং বিশ্বমূর্তি বিরাট হিসেবে কীর্তিত হয়েছেন, ঠিক যেমন শিব এবং বিষ্ণুর মতোই ব্রহ্মাও বায়ু পুরাণের অন্য এক জায়গায় বিরাট-স্বরূপ এক ঈশ্বর।

[ভাগবত পু. ১.২.১১; বিষ্ণু পু. ১.২.১-৭; বায়ু পু. ৩.১-২৪; ৯.১১৭-১২২]

□ নিরাকার নির্বিশেষ পরব্রহ্ম যেভাবে সবিশেষ সাকার ঈশ্বর হয়ে উঠলেন, তার দার্শনিক প্রক্রিয়াটাও খুব জটিল নয়। এমনিতে জগৎসৃষ্টি এবং তার স্থিতি-লয় কখনো নির্বিশেষ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের কাজ হতে পারে না বলে জীব-ব্রহ্মাদ্বয়বাদী শঙ্করাচার্য মত প্রকাশ করেছেন এবং সেটা ব্রহ্মসূত্রের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—এই দ্বিতীয় সূত্রের শারীরক ভাষ্যেই শঙ্করাচার্য পরিষ্কার করে দিয়েছেন। জগৎসৃষ্টি বা জগদ্ব্যাপার মায়ার দ্বারা উপহিত ব্রহ্মের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, এটাই শঙ্করাচার্যের মত। শঙ্করের সমালোচনা করে আচার্য রামানুজ ওই একই সূত্রের ব্যাখ্যায় সমস্তকল্যাণগুণাত্মক সগুণ সবিশেষ এবং সাকার ব্রহ্মের তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন এবং 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের আরম্ভেই ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করে রামানুজ পরম ঈশ্বরকে পরব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মক করে দিয়েছেন—

যতঃ, যস্মাৎ সর্বেশ্বরান্নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক-স্বরূপাৎ সত্য-সংকল্পাৎ জ্ঞানানন্দাদ্যনন্ত-কল্যাণ-গুণাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ পরম-কারুনিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে তদ্ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ। *[রামানুজকৃত শ্রীভাষ্য, শ্রীউত্তরমূর্তি বীররাঘবাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত, প্রথম সম্পুট ১.১.২; পৃ. ১০৪-১০৫]*

□ *Sūtra 2. Janmādyasya Yataḥ.*

(The Brahman is that) from whom (proceed) the creation, & c., of this (Universe).

The word *janmādi* means creation, preservation, and destruction. The attributive compound (here) denotes that (collection of things) which is characterised (as having 'creation' at its beginning). The word *asya* denotes the world which is constituted in an unthinkably varied and wonderful fashion, and which is mixed up with (all) the individual souls, beginning with Brahmā and ending with a clump of grass, each of which has its own particularly assigned enjoyment of the fruits (of *karmas*) limited to particular times and places. The word *yataḥ* denotes that the Highest Person who is the Lord of all, who possesses a nature which is hostile to all that is evil, who wills the truth, who possesses innumerable auspicious qualities, such as knowledge, bliss, & who is omniscient, omnipotent, and merciful in the highest degree, and from whom proceed creation, preservation, and destruction, (it denotes that that Highest Person) is the *Brahman*. This is the meaning of this *sūtra*.

[Śrībhāṣya of Ramanujacharya, Trans. M. Rangacharya & M.B.V. Aiyangar, Vol. I, p. 257]

☐ মহাভারতের কোনো কোনো অধ্যায়ে কিন্তু সৃষ্টির জন্য পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংসর্গের প্রয়োজন স্বীকার করলেও প্রকৃতিকে পরমেশ্বর বা পরম পুরুষের ইচ্ছাধীন রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ভগবদ্গীতায় মহাভারতেরই অনুসরণে বলা হয়েছে, প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়েই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন।

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকৃত না হলে অচেতন প্রকৃতির পক্ষে জগৎ সৃষ্টি কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। প্রকৃতির সংযোগের কারণ হল পুরুষার্থতা—একথা সাংখ্যদর্শনে স্বীকার করা হলেও গীতায় কিন্তু এই সংযোগের কারণ রূপে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই স্বীকার করা হয়েছে। গীতার শ্লোকে বলা হয়েছে, আমি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজ নিজ প্রাক্তন কর্মনিমিত্ত ও তৎস্বভাববশত জন্মমৃত্যুর অধীন ভূত সকলকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করে থাকি—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥

গীতায় উল্লিখিত শ্লোকটির মধ্যে বলা হয়েছে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উদ্ভব পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ হয়েছে। আচার্য শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলেছেন—

নন্বসঙ্গো নির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ প্রকৃতিমিতি দ্বাভ্যাম্ স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্বং ভূতগ্রামং কর্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথং? প্রকৃতেবর্শাৎ প্রাচীনকর্মনিমিত্ত-তত্তৎ-স্বভাববলাৎ।

শ্রীধরের ভাষ্যের মর্মার্থ হল, আমি আমার অধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে কর্মাদিবশে পরবশ এবং প্রলয়ে লীন—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ ভূতগ্রামকে পূর্বার্জিত অদৃষ্ট অনুসারে বারংবার বিবিধরূপে সৃষ্টি করি। ভগবদ্গীতার এই শ্লোকের বিশেষত্ব হল—পরমেশ্বর বা পরমপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত কৃষ্ণ প্রকৃতিকে বলছেন—আমারই প্রকৃতি—'প্রকৃতিং স্বাম্।' ঠিক যেমন এর আগের শ্লোকে বলা হয়েছে—কল্পান্তে সমস্ত প্রাণী আমারই প্রকৃতিতে লীন হয় এবং কল্পের আদিতে আমি সেই সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করে থাকি।

[ভগবদ্গীতা ৯.৭]

প্রকৃতিকে এখানে তাঁর নিজের শক্তিরূপে চিহ্নিত করায় (প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্) পুরুষের সার্বিক প্রাধান্য এখানে সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। তাত্ত্বিকভাবে দেখতে গেলে এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে,শ্রুতি-স্মৃতির বহু জায়গাতেই প্রকৃতি এই জগৎসৃষ্টির উপাদান-কারণও বটে। আবার নিমিত্ত-কারণও বটে, যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আদি সাংখ্যের সমস্ত বীজ নিহিত, *[৪.১০]* যেখানে মায়াকে প্রকৃতি বা উপাদান—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।

—বলায় প্রকৃতিকে (অপর নাম মায়া) যেমন জগতের উপাদান মনে হয়, তেমনই ওই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বহুবিখ্যাত 'অজা'-শ্লোকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই বহু প্রজার সৃষ্টিকারিণী বলায় জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে প্রকৃতিকে নিমিত্ত হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে বলা যায়।

[ভগবদ্গীতা ১৩.২; ৯.৮ (শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য); শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪.৫, ১০]

☐ এই ভাবনা এবং তাত্ত্বিকতার মধ্যে প্রচলিত সাংখ্যের প্রকৃতিকারণতাবাদ সিদ্ধ হয় ঠিকই, কিন্তু মহাভারতীয় সাংখ্যের চেহারা এটা নয়। মহাভারত কিংবা ভগবদ্গীতায় চরম স্থানে ব্রহ্ম বা পরমপুরুষের শ্রেষ্ঠতমত্বের ভাবনা থাকায় তিনিই এই জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ উভয়ই হয়ে উঠবেন। সেই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কথাই আবার আসে এখানে। পূর্বোক্ত শ্লোকে 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ'-এর অব্যবহিত পূর্বে শ্বেতাশ্বতর বলেছে—

'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ'। *[৪.৯]*

অর্থাৎ মায়াধীশ্বর (মায়া বলতে এখানে প্রকৃতি বোঝানো হয়েছে) প্রকৃতি থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন। তার মানে, প্রকৃতির ওপরের অপর এক তত্ত্বের অধ্যক্ষতায় এই জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে অপর কোনো বৃহত্তর তত্ত্বের অধিষ্ঠান এখানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে ভগবদ্গীতার যে শ্লোকটি—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

এখানেও বৈদান্তিক ভাবনায় প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হিসেবে ব্রহ্ম বা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানকেই জগৎসৃষ্টির ক্ষেত্রে নিমিত্ত কারণ ভাবা হয়। শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ

সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি। অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে। সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্তৃত্বমুদাসীনং চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ।

শ্রীধরের এই টীকার অনুবাদ করে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ বলছেন, গীতার শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমার অধ্যক্ষতাহেতু বা অধিষ্ঠাতৃত্বহেতু এই ব্যক্ত এবং দৃষ্ট জগৎ বারবার উদ্ভূত হয়। আমার সন্নিধিই জগৎ বৈচিত্র্যের কারণ। এই অনুবাদের মধ্যে স্বামী-টীকার একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অনুবাদ নেই, যা থাকলে শ্রীধর স্বামীর বক্তব্য আরও পরিষ্কার হয়ে উঠত। টীকায় বলা হয়েছে—

ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন।

—তার মানে ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা বা অধিষ্ঠাতৃত্বই জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে নিমিত্ত কারণ। জগৎসৃষ্টির ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকা নিতান্ত গৌণ বলেই হয়তো এই গীতা-শ্লোকের টীকায় পরমপুরুষের কথা অন্যভাবে নিবেদন করে শঙ্করাচার্য বলেছেন—ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর কোনো বিকার নেই। অথচ তিনিই প্রেরণা দেন বলে তাঁর ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতি এই চরাচরজগৎকে প্রসব করে থাকে। আসলে তিনি মুক্ত, চৈতন্যস্বরূপ এবং নির্গুণ। আচার্য শঙ্কর এবং শ্রীধর এই দুই মহাত্মার রচিত গীতাভাষ্যের মধ্যে আমরা মহাভারতে ব্যাখ্যাত সেই নির্গুণ, নিরাকার পরমাত্মার সন্ধান পাচ্ছি—যাঁর অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হয়েই প্রকৃতি-জগতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু কোনোক্রমেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলে কিন্তু ঈশ্বরের উদাসীনত্ব বাধিত হয় না। কারণ তিনি অনাসক্তভাবেই প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করেন। সন্নিধিমাত্রেই এখানে ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কল্পনা করা হয়েছে। এই সান্নিধ্য মহাভারত, গীতা এবং সাংখ্যদর্শনে একইরকমভাবে আলোচিত। কিন্তু এই সান্নিধ্যের কারণ নিয়েই প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যার সঙ্গে মহাভারত এবং গীতার ব্যাখ্যার বৈসাদৃশ্য বর্তমান। গীতায় পুরুষ ও প্রকৃতির সান্নিধ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। আর প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় সংহতির কারণ পুরুষার্থতা।

[ভগবদ্গীতা ৯.১০; শ্রীধরস্বামীকৃত এবং শঙ্করাচার্যকৃত টীকা দ্র.]

□ বস্তুত পুরাণগুলির মধ্যে আদি সাংখ্যের এই বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রকৃতি-পুরুষের মত সাংখ্যীয় পরতত্ত্বের ওপরেও আরও একটি তত্ত্ব আছে যেটাকে সাংখ্য-যোগের দৃষ্টিতে পরমাত্মা বলা হচ্ছে, ব্রহ্মবাদী ভাবনায় তাকেই ব্রহ্ম বলা হচ্ছে এবং দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবীয় ভাবনায় তাঁকেই আবার ভগবান বলা হচ্ছে। ভাগবতপুরাণে প্রথমে সাধারণভাবে বলা হয়েছে—এই সাংখ্যীয় পুরুষ, যিনি সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করেন, তিনি সেই পরম তত্ত্বের অবতার—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য *[২.৩.৪২]*।

কিন্তু তারপরেই এই পরম তত্ত্বকে 'ভগবান' শব্দ অভিহিত করে জানানো হয়েছে—সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টির ইচ্ছা-চেতনা তাঁর মধ্যে যখন লীন হয়ে থাকে, তখন সেই শুদ্ধ জীবসমূহের আত্মা (বহুপুরুষের) অন্তঃস্থিত রশ্মিস্থানীয় আত্মা পরমস্বরূপ ভগবান একাই ছিলেন। তখন পুরুষ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পার্থিব সৃষ্টি ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে স্থিত ছিল—

ভগবানেক এবাসীদগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছয়ানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় জীব গোস্বামী পরিষ্কার লিখেছেন—জগৎকারণ কারণার্ণবশায়ী পুরুষ থেকে আরম্ভ করে পার্থিব পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব তখন একাকী অবস্থিত ভগবানের সঙ্গে একীভূত অবস্থায় ছিল—

ইদং বিশ্বং পুরুষাদি-পার্থিব-পর্যন্তং
তদানীমেকাকিনাস্থিতেন ভগবতা সহ
একীভূয়াসীদিত্যর্থঃ।

বিষ্ণুপুরাণ আরও প্রাচীন পুরাণ বলেই মহাভারতীয় আদিসাংখ্যের প্রকৃতি সেখানে আরও বিশদ ভাবনায় বিধৃত। বিষ্ণু পুরাণ প্রথমে সাংখ্যের দৃষ্টিতে আগে বলে নেয় যে, ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি ছাড়াও সর্বভূতের অধিষ্ঠাতা হিসেবে সর্বপুরুষে অধিষ্ঠিত হিসেবে যে সর্বব্যাপী নিত্য, শুদ্ধ পুরুষের কথা বলা হয়, তিনি পরমাত্মারই অংশ—

একঃ শুদ্ধোঽক্ষরো নিত্যঃ সর্বব্যাপী তথা পুমান্।
সোঽপ্যংশঃ সর্বভূতস্য মৈত্রেয় পরমাত্মনঃ॥

এরপরেই সেই পরম তত্ত্ব পরমাত্মাকে ব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর ভগবানকে এক করে দিয়ে বিষ্ণু

পুরাণ বলে—তিনিই সকলের পরম আশ্রয়, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং সকলের অধীশ্বর। সেই অব্যয় মহাপুরুষই ব্যক্ত, তিনিই অব্যক্ত এবং সেই বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর হরিই বিশ্বরূপে বিরাজ করছেন—

স ব্রহ্মা তৎ পরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।
ব্যক্ত স এব চাব্যক্তং স এব পুরুষো'ব্যয়ঃ।
পরমাত্মা স বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ॥

পূর্বে ভাগবত পুরাণ এবং এখন বিষ্ণু পুরাণ থেকে যে প্রমাণগুলি দেওয়া হল, তাতে নতুন এই ভাবনাটা প্রকট হয়ে ওঠে যে, আদি সাংখ্যের ধারায় প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতকারী পুরুষও অসঙ্গ এবং নির্লিপ্ত, বহু পুরুষের মধ্যে অর্ন্তযামী সাক্ষী চৈতন্যের মতো অবস্থান করলেও তিনি অন্যতর এক তত্ত্ব। এই ভাবনা থেকেই হয়তো মহাভারতে চতুর্বিংশতম, পঞ্চবিংশতম এবং ষড়বিংশতম তত্ত্বের প্রসঙ্গ এসেছে এবং সেই ষড়বিংশতম তত্ত্বকে ঈশ্বর বলতে কোনো অসুবিধে হয় না।

[ভাগবত পু. ২.৩.৪২; ৩.৫.২৩ (ভাগবত মহাপুরাণ কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ক্রমসন্দর্ভ, পৃ. ১৭১; বিষ্ণু পু. ৬.৪.৩৬; ৬.৪.৩৮, ৪৫]

□ কূর্ম্মপুরাণে বলা হয়েছে, নির্গুণ এবং নিরঞ্জন মহাদেব হলেও সৃষ্টি-পালন-সংহার গুণ দ্বারা তিনি ত্রিমূর্তিতে অবস্থিত। তিনি গুণভেদে একমূর্তি, দ্বিমূর্তি ও ত্রিমূর্তিবিশিষ্ট। আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করে ত্রিলোকমধ্যে বিচরণ করেন, সৃষ্টি করেন, সংহার করেন এবং রক্ষা করেন। যেহেতু তিনি সৃষ্টি করে প্রজাগণকে পুনরায় গ্রাস করেন অতএব সেই গুণগরিমার জন্যই তাঁকে অদ্বিতীয় বলা হয়ে থাকে—

একো'পি সন্ মহাদেবস্ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ।
সর্গ-রক্ষা-লয়গুণৈর্নির্গুণো'পি নিরঞ্জনঃ॥
একধা স দ্বিধা চৈব ত্রিধা চ বহুধা গুণৈঃ॥
যোগেশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ।
নানাকৃতিক্রিয়ারূপনামবন্তি স্বলীলয়া॥
যস্মাৎ সৃষ্টানুগৃহ্ণাতি গ্রসতে চ পুনঃ প্রজাঃ॥
গুণাত্মকত্বাৎ ত্রৈকাল্যে তস্মাদেকঃ স উচ্যতে॥

কূর্ম্মপুরাণে যেমন মহাদেবের একতমত্ব এবং সর্বাধিনায়কত্ব স্থাপন করা হয়েছে, তেমনই আর-এক মহাদেব-সম্বন্ধী পুরাণ লিঙ্গপুরাণে ব্রহ্মভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব সূচনা করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ত্রিমূর্তিকে ব্রহ্মের অধীন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে—গন্ধ-রূপ-রসশূন্য, শব্দ-স্পর্শাদিগুণ বর্জ্জিত, নির্গুণ, সত্য, সনাতন, পরম ব্রহ্ম হলেন অলিঙ্গ। এই পরব্রহ্মের মায়া দ্বারা সেই এক অব্যক্ত লিঙ্গ ষড়বিংশতি প্রকারে বিস্তৃত আবির্ভূত হয়েছেন। তা থেকে শিবস্বরূপ প্রধান দেবত্রয় আবির্ভূত হন।

[কূর্ম পু. ১.৪.৫৩-৫৫; পৃ. ২৩]

□ নির্গুণ জগদ্ব্যাপারবর্জ মুক্ত পুরুষকে উপনিষদের একব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করা হবে কিনা অথবা মহাভারতের কোনো কোনো অধ্যায়ে স্বীকৃত পরমেশ্বরকে ষড়বিংশতত্ত্ব বলা যাবে কিনা, অথবা পুরাণ, গীতা, ইত্যাদিতে ব্যাখ্যাত পুরুষোত্তমকে এই পরমার্থের সঙ্গে তুলনা করা যাবে কিনা—যদি সেটা করা হয়েও থাকে, তবে সেই তত্ত্বের অস্তিত্ব প্রচলিত কারিকা-কৌমুদী নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনে কতটা প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, সেই আলোচনা একটা গভীর বিতর্কিত বিষয়। প্রাচীন আর্যশাস্ত্রগুলিতে এবং সুপ্রাচীন সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার দিকে একটি গতি অবশ্যই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যদি আমরা 'সাংখ্যসূত্র' গ্রন্থটিকে কপিলেরই লেখা বলে মেনেও নিই তাহলে দেখা যাবে—সেই সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বরবিষয়ক এমন সব যুক্তি-তর্ক রয়েছে, যেগুলি নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনকে ঈশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শনের দিকেই নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। যেমন পরবর্তীকালে সাংখ্যের প্রসিদ্ধ আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের ভূমিকা ভাষ্যে কাপিলসাংখ্যকেও সেশ্বরবাদী বলেছেন। সম্ভবত বিজ্ঞানভিক্ষুর আবির্ভাব কাল ষোড়শ খ্রিস্টাব্দ। সাংখ্যকারিকার তত্ত্বকৌমুদী টীকায় নিরীশ্বর সাংখ্য মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তিনি যথেষ্ট অনুধাবন করেছেন। তথাপি কোন যুক্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষু কাপিল সাংখ্যকে সেশ্বরবাদী বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন, সাংখ্যসূত্রে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ সেই প্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন। সাংখ্যসূত্রের পর পর তিনটি সূত্রে ঈশ্বর প্রসঙ্গ অস্বীকার করে বলা হয়েছে—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।

এই যুক্তির অর্থ হল ঈশ্বর যেহেতু নিত্য এবং অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ নন তাই ঈশ্বরবিষয় প্রত্যক্ষ না হওয়াতে তিনি অসিদ্ধ, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সাংখ্যসূত্র

দেখেই সাংখ্যকে নিরীশ্বরবাদী বলা হয়। যেহেতু লৌকিক প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরকে সিদ্ধ করা যায় না, তাই সাধারণভাবে ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। কিন্তু এর দ্বারা তার অভাব সূচিত হয় না। বিশেষত সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শন দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় যোগদর্শনে যেহেতু ঈশ্বরের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, সেইজন্য সমানতন্ত্র যোগদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংখ্যও পারমার্থিকভাবে নিরীশ্বরবাদী হতে পারেন না। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অভাব সূত্রকারের অভিপ্রেত হত, তাহলে সূত্রকার 'ঈশ্বরাভাবাৎ'—এইভাবেই সূত্র রচনা করতেন। কিন্তু তিনি তা না করায় 'অসিদ্ধে' এরূপ পদ প্রয়োগ করায় বোঝা যায় যে, যেহেতু ঈশ্বর লৌকিক প্রমাণগম্য নন, তাই তিনি অসিদ্ধ। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন,

অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধ
একদেশিনাং প্রৌঢ়বাদেনৈবেতি
প্রাগেব প্রতিপাদিতম্।
অন্যথা হীশ্বরাভাবাদিত্যেবোচ্যেত।

বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যের বক্তব্য হল, ঈশ্বরের অপলাপ সূত্রকারের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু বিচারক্ষেত্রে প্রতিবাদীকে নিরুত্তর করার জন্যই এইরকম একটা সূত্র তৈরি করা হয়েছে। সাংখ্যকারিকার প্রাচীন টীকা যুক্তিদীপিকাতে বহু যুক্তির মাধ্যমে শ্রৌত ঈশ্বর সমর্থিত হয়েছে—

যদি তর্হি শ্রুতি বচনৎ মূর্তিমান ঈশ্বরঃ পরিগৃহ্যতে, তেন সিদ্ধমস্যা'স্তিত্বম্। কস্মাৎ? ন হ্যসতো মূর্ত্তিমত্ত্বমুপপদ্যতে ইতি-কৃত্বা। তদপদ্যযুক্তম্, অভিপ্রায়ানববোধাৎ। ন হ্যেকান্তেন বয়ং ভগবতঃ শক্তিবিশেষং প্রত্যাচক্ষ্মহে, মাহাত্ম্যশরীরাদি-পরিগ্রহাৎ। যথা তু ভবতোচ্যতে প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ প্রয়োক্তা নাস্তীত্যয়মস্মদভিপ্রায়ঃ, তস্মাদেতস্য বাধকম্। অতো ন প্রধান-পুরুষয়োরভিসম্বন্ধো'ন্যকৃতঃ।

সুতরাং শ্রুতিতে যে হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, সেই ঈশ্বরই হলে সগুণ ঈশ্বর বা জন্য ঈশ্বর। হয়তো এই ঈশ্বরের সিদ্ধির উদ্দেশে সাংখ্যসূত্রে বলা হয়েছে,

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।

অর্থাৎ ওই প্রকার ঈশ্বরসিদ্ধি আমাদের মতে সিদ্ধ। সর্বদোষরহিত, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান এইরূপ বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক আদর্শই মুক্তিকামীদের উপাস্য ঈশ্বরের আদর্শ। হরিহরানন্দ আরণ্য তাঁর পাতঞ্জল দর্শনে বিজ্ঞানভিক্ষুর এই সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন—এই ঈশ্বরই সগুণ ঈশ্বর। সাংখ্যসূত্রে এই সগুণ ঈশ্বরেরই সিদ্ধি করা হয়েছে। এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেছেন, 'নিত্যেশ্বরস্য বিবাদাস্পদত্বাৎ' অর্থাৎ একজন জগৎব্যাপারবর্জ অনাদিমুক্ত পুরুষ জগতের সৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত আছেন—এই বক্তব্য সাংখ্যদর্শনে অস্বীকৃত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বা জন্য ঈশ্বর সাংখ্যসম্মত বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতিসম্ভূত ইচ্ছার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, মূল উপাদানের স্রষ্টা নন।

আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে সৃষ্টিকার্যের পিছনে এক জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যেহেতু জড়জগতের উপাদান কারণ জড়াত্মিকা প্রকৃতি, সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর বক্তব্য হল সগুণ ঈশ্বর বা জন্য ঈশ্বর হলেন এই জগতের নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতপক্ষে আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্মসূত্র এবং যোগশাস্ত্রের সঙ্গে অবিরোধ প্রতিপাদনের জন্য এইরূপ সমন্বয়মুখী প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। কঠশ্রুতির বাক্য উল্লেখ করে বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর জন্য ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্রুতিবাক্যটি হল,

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ॥

কঠোপনিষদের এই মন্ত্রে এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষের কথা বলা হচ্ছে, যিনি জীবাত্মরূপে দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালের নিয়ন্তাও তিনি। এই সর্বজ্ঞ, সর্বকালের নিয়ন্তা জীবাত্মই বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সগুণ ব্রহ্ম বা জন্য ঈশ্বর।

[সাংখ্য দর্শনম্ ((দুর্গাচরণ) ১.৯২-৯৩; বিজ্ঞানভিক্ষুর প্রবচনভাষ্য দ্রষ্টব্য; যুক্তিদীপিকা (যদুপতি ত্রিপাঠি) পৃ. ১৯৩; সাংখ্যসূত্র ১.৯৩; ৩.৫৫; পাতঞ্জল যোগদর্শন (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ), পৃ. ৮১৮; কঠোপনিষদ ২.১.১২]

□ ভারতবর্ষের সমস্ত দার্শনিক প্রস্থানে ঈশ্বর আছেন না নেই—এই তর্কের শেষে আছে

আস্তিক আর নাস্তিকের পার্থক্য—ঈশ্বরে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা আস্তিক, যাঁরা করেন না, তাঁরা নাস্তিক, অর্থাৎ তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাসী নন। ভারতবর্ষে নাস্তিক্যের ধারা অবশ্যই একটা আছে—যেখানে চার্বাক থেকে বৌদ্ধরা অনেকেই আছেন। কিন্তু ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাস অধিকাংশ দার্শনিকের এবং সাধারণ মানুষ চরম আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন ঈশ্বরকেই। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণগুলির মধ্যে নিশ্চয় ন্যায়-বৈশেষিক কিংবা মীমাংসাক দর্শনের ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু রামায়ণে ভগবান বিষ্ণুর অবতার-হিসেবে রামচন্দ্র পরম ঈশ্বর হিসেবে মানুষের চরম আশ্রয় হয়ে উঠেছেন কিন্তু সেটা রামায়ণ লিখিত হবার পরে অথবা বিষ্ণুর অবতার হিসেবে রামচন্দ্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হবার পরে। কিন্তু খোদ রামায়ণের মধ্যে যিনি পরম ঈশ্বর বলে গণ্য হয়েছেন, তিনি প্রধানত বিষ্ণু এবং কখনো কখনো শিব।

রামায়ণ যেহেতু বেদ-পরবর্তী যুগে লিখিত, তাই শরণাগতির কালে বৈদিক যজ্ঞের উপকরণগুলি থেকে বৈদিক দেবতারা অনেকেই স্মরণে এসেছেন ঈশ্বরের সাজাত্যে। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বর দিতে স্বীকৃত হলে কৈকেয়ী কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নাম করছেন না, তিনি বলছেন—ইন্দ্র যাঁদের সবার আগে, সেই তেত্রিশ দেবতা সাক্ষী থাকুন, সাক্ষী থাকুক চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা—

> তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ।
> চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহরাত্র্যহনী দিশঃ॥

একইভাবে রামচন্দ্রের বনগমনের সময় কৌশল্যা যখন পুত্রের জন্য দেবতাদের কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করছেন, সেখানেও ধাতা, বিধাতা, অর্যমা, অগ্নি, বায়ু, পূষা, ভগ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতারা আছেন, কিন্তু সেখানে পরম ঈশ্বরের চিহ্নমাত্র নেই। একই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, কৈকেয়ীর অন্যায় প্রয়াসে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক বন্ধ হয়ে গেলে এবং কৌশল্যার কানে এই দুঃসংবাদ তখনও এসে পৌঁছোয়নি, এই সময়ে রামচন্দ্র মায়ের কাছে বনগমনের অনুমতি নিতে গিয়ে দেখলেন—জননী কৌশল্যা আগের দিন রাত্রি থেকে প্রস্তুতি নিয়ে পুত্রের হিতের জন্য ভগবান বিষ্ণুর পূজা করছেন—

> কৌশল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিত্বা সমাহিতা।
> প্রভাতে ত্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী॥

আবার রামচন্দ্রকে দেখছি—তাঁর রাজ্যাভিষেক ঘোষণার আগের দিন একাগ্র মনে ভগবান নারায়ণের ধ্যান করে বিষ্ণুমন্দিরের মধ্যেই কুশশয্যায় শয়ন করেছিলেন বৈদেহী সীতার সঙ্গে—

> ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে॥
> বাগযতঃ সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ।
> শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ॥

এখানে তো বিষ্ণু আর নারায়ণ প্রায় একাকার হয়ে যান। আর সবার শেষে এটাও মনে হয় যে, রামায়ণের কালেই বৈদিক দেবতাদের মাহাত্ম্য অবশেষে বিষ্ণু-নারায়ণের মধ্যে সংক্রমিত হয় এবং বিষ্ণু কিংবা নারায়ণই শেষ পর্যন্ত পরম ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন রামায়ণে এবং সেইজন্যই বিষ্ণুর অবতার-কল্পনাও রামায়ণে ঈশ্বর-ভাবনার একটা নিদান হয়ে ওঠে।

[রামায়ণ ২.১১.১৩-১৬; ২.২৫.৭-২৬; ২.২০.১৪; ২.৬.১-৪]

☐ মহাভারতে ঈশ্বরের ধারণা খুব জটিল। দার্শনিক দিক থেকে ঈশ্বরের ভাবনা কেমন হয় বা কেমন হওয়া উচিত, সেটা আমরা প্রথম দিকেই দেখিয়েছি, যেখানে একটি ব্যক্তিদেবতাকে কেন্দ্র করেই ঈশ্বর-ভাবনা তৈরি হয়। পরম ঈশ্বরকে একটি ব্যক্তিদেবতার মাধ্যমে ভাবাটাই কিন্তু মহাভারতের সবচেয়ে উদার এক ক্ষেত্র। এখানে অগ্নি থেকে ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতা তো আছেনই, আছেন দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। নির্দিষ্ট এই রকম এক এক দেবতাকে নির্দিষ্ট উপাসক ব্রহ্মস্বরূপতা স্থাপন করে তাঁকে পরম ঈশ্বরের বিভূতি বলে কল্পনা করেছেন। ভগবদ্গীতায় যেটা বলা আছে—যে ভক্ত যে মূর্তিতেই আমার পূজা করুন না কেন, আমি সেই সেই মূর্তিতেই তাঁর শ্রদ্ধা জন্মাই—

> যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
> তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

[৭.২১]

☐ মহাভারতে উপাসকের কাছে তাঁর উপাস্য দেবতা কোনো জড় বস্তুবিশেষের চেতনারূপে কল্পিত হন না, উপাসকের কাছে তাঁর দেবতাই সর্বস্ব, তিনিই বিশ্বের পরিচালিকা শক্তি, তিনিই

ঈশ্বর, তিনিই ভগবান। এর ফলে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব সমস্ত দেবতাই পরব্রহ্মরূপে মহাভারতে স্বীকৃত। সেই দেবতাই পরম ঈশ্বর। আর পুরাণগুলি তো পৃথক পৃথক দেবতার শ্রেষ্ঠত্বের আধারেই সপ্রশংসভাবে লিখিত এবং সেখানে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কালী, মহাদেবী, স্কন্দ-কার্তিকেয় প্রত্যেকেই পরম ব্রহ্মস্বরূপ, পরম ঈশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

ঈশ্বর$_{২}$ বিশ্বেদেবগণের অন্যতম দেবতা। ঋগ্‌বেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে দাঁড়ায় সমস্ত দেবতা। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন— 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা—বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেবা বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবগণের পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিককালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

☐ পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

☐ বিশ্বেদেবগণের মধ্যে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম পালটে যায় এবং সংখ্যাও একেক জায়গায় এক এক রকম। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যে সব নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঈশ্বর।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩৭; (হরি) ১৩.৭৮.৩৭]

ঈশ্বর$_{৩}$ কুরু-র পৌত্র এবং বাহ্লর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[কালিকা পু. ৮৯.২৬]*

ঈশ্বর$_{৪}$ যযাতির পুত্র পুরুর ঔরসে পৌষ্টীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে ঈশ্বর অন্যতম।

[মহা (k) ১.৯৪.৫; (হরি) ১.৮১.৫]

ঈশ্বর$_{৫}$ দক্ষকন্যা ক্রোধার পুত্ররা ক্রোধবশ অসুর নামে পরিচিত। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, এই ক্রোধবশ অসুরদেরই কোনো একজন পরবর্তীকালে ঈশ্বর নামে এক বিক্রমশালী রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬৬; (হরি) ১.৬২.৬৬]

ঈশ্বর$_{৬}$ ব্রহ্মার পৌত্র এবং স্থাণু অর্থাৎ মহাদেবের অংশোদ্ভূত যে এগারোজন রুদ্র ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঈশ্বর।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের জন্মোৎসবে যেসব রুদ্ররা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বর অন্যতম।

[মহা (k) ১.৬৬.৩; ১.১২৩.৬৯;
(হরি) ১.৬১.৩; ১.১১৭.৭৩]

ঈশ্বরী দেবী উগ্রচণ্ডার অষ্টযোগিনীর মধ্যে অন্যতমা। *[কালিকা পু. ৬১.৪১]*

ঈষীকহস্ত মৎস্য পুরাণ মতে মহর্ষি পরাশরের বংশধররা যেসব গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন, শ্বেত পরাশর তার মধ্যে একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম ঋষি হলেন ঈষীকহস্ত।

[মৎস্য পু. ২০১.৩৬]

উ

উ সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই চতুর্দশ স্বরধ্বনি থেকেই চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপতি মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্ট এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির পঞ্চম ধ্বনি 'উ'কার বর্ণ।

এই উ-কার বর্ণ থেকে তামস মনুর সৃষ্টি হয়েছিল। বায়ু পুরাণে অ থেকে ঔ পর্যন্ত চতুর্দশ বর্ণকে মূর্তিমান দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

মূর্তিমান 'উ' কার তাম্রবর্ণ ছিলেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ২৬.৩৬]*

উক্থ$_1$ (উক্থ্য$_1$) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ। কুশের বংশধারায় ছলের পুত্র উক্থ। উক্থ বজ্রনাভ নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪৭]*

উক্থ$_2$ (উক্থ্য$_2$) যজ্ঞ বিশেষ। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার দক্ষিণমুখ মতান্তরে পূর্বমুখ থেকে এই যজ্ঞ সৃষ্টি হয়। *[বিষ্ণু পু. ১.৫.৫৩; বায়ু পু. ৯.৫০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৮.৫১; ভাগবত পু. ৩.১২.৪০]*

প্রাচীন জ্যোতিষ্টোম যাগের সাতটি প্রকারের মধ্যে একটি প্রকার হল উক্থ্য (য-ফলা দিয়েই বৈদিক পাঠ) বস্তুত উক্থ্য যাগ অগ্নিষ্টোম যাগের বিকৃতি যাগ। উক্থ্য যাগে অগ্নিষ্টোমের মতো তিনটি সবনে বারোটি শাস্ত্রপাঠ হওয়ার পর তৃতীয় সবনে আরও অতিরিক্ত তিনটি শাস্ত্রপাঠ করেন হোতার তিন সহকারী। সুতরাং উক্থ্য যাগে পনেরোটি শাস্ত্র, অতএব স্তোত্রও পনেরোটি। এই যাগে সবনীয় পশু দুটি, একটি ছাগ অগ্নির উদ্দেশে, আর একটি ছাগ ইন্দ্র এবং অগ্নি এই দুই দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়।

[আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (অমর চট্টোপাধ্যায়), ৬.১.১-৩; রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬; H.W. Bodewitz, The Jyotistoma Ritual: Jaiminiya Brahmana, I pp. 101-107]

মহাভারতে উক্থ্য-যাগের কথা অতিস্পষ্ট করে না বললেও বিখ্যাত অঙ্গরাজার যজ্ঞ প্রসঙ্গে সপ্তসংস্থা সোমযাগের কথা আছে। আমরা জানি উক্থ্য সেই সপ্তসংস্থা সোমযাগেরই অন্যতম প্রকারভেদ। আবার দ্রোণপর্বে যযাতিরাজার যজ্ঞ-প্রসঙ্গে অতিরাত্র, চাতুর্মাস্যের সঙ্গে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কথা বলায় উক্থ্য-এর মতো প্রসিদ্ধ যাগ আপনিই অগ্নিষ্টোমের প্রকার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। বরঞ্চ এ-বাবদে রামায়ণ অনেক স্পষ্ট। রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণে কল্পসূত্রমতে, অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে উকথ্য সবন, তৃতীয় দিনে অতিরাত্র এইভাবে একটা ক্রমসংখ্যান করা হয়েছে। এই ভাবনাগুলি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রামায়ণ-মহাভারতের কালেও যজ্ঞের পালনীয়তা কমেনি এবং উক্থ্য-এর মতো বেদবিহিত বৈদিক যাগের যথেষ্ট মান্যতাও ছিল।

[রামায়ণ ১.১৪.৪১; মহা (k) ১২.২৮.৩৭; ৭.৬৩.২; হরি ১২.২৯.৩৫; ৭.৫৫.২]

উক্থ$_3$ (উক্থ্য$_3$) উক্থ্য বলতে কিন্তু শাস্ত্রপাঠের একটা সাধারণ প্রকারও বোঝায় এবং সেটা সামগানের আকারেও পঠিত হয়। উদ্‌বংশীয় শাস্ত্রপাঠে 'উদ্‌বংশম্ ইব যেমিরে' বলে তিনবার উক্থ্য স্তোত্র পাঠ বা গান করা হয় বলে জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে। এই পাঠে এবং গানের প্রসঙ্গে বৃহদুক্থ্য, মহদুক্থ্য কথাটাও মহাব্রত-সাম হিসেবে পরিচিত। মহাভারতে উপমন্যু অশ্বিনস্তুতিতে উক্থ্য-শব্দ ব্যবহার করেছেন।

[মহা (k) ১.৩.৬৫; (হরি) ১.৩.৬৫; H.W. Bodewitz, The Jyotistoma Ritual: Jaiminiya Brahmana, I. P. 106-107]

উক্ত কলিযুগে পুরুবংশীয় রাজারা কৌশাম্বী নগরীতে রাজত্ব করেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ছিলেন পুরুবংশীয় রাজা নেমিচক্রের পুত্র। চিত্ররথ নামে তাঁর এক পুত্র ছিল বলে জানা যায়। *[ভাগবত পু. ৯.২২.৪০]*

উগ্র$_1$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চতুর্থ দিনে ভীমের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ১.৬৭.১০৩; ১.১১৭.১২; ৬.৬৪.২৯, ৩৪; (হরি) ১.৬২.১০৫; ১.১১১.১২; ৬.৬৩.৩০, ৩৫]

উগ্র$_{২}$ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে অন্ধক প্রভৃতিদের সঙ্গে আমরা জনৈক উগ্রের নামোল্লেখ পাই। যাদব বীরদের সঙ্গে নামোল্লেখ থাকায় তাঁকেও যদু-বৃষ্ণি বংশীয় বলেই মনে হয়, যদিও তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। উদ্যোগপর্বে পাণ্ডবরা পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যেসব বীর যোদ্ধাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, উগ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৫.৪.১২; (হরি) ৫.৪.১২]

উগ্র$_{৩}$ মহর্ষি কবির আট পুত্র সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন উগ্র। মহাভারতে তাঁকে অন্যতম প্রজাপতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.৮৫.১৩৩; (হরি) ১৩.৭৪.১৩১]

উগ্র$_{৪}$ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্র কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে 'উগ্র' জাতীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এঁদেরকেই উগ্রক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হয়তো এঁরাই 'উগ্রক্ষত্রিয়' বলে কথিত জনজাতির পূর্ব পুরুষ।

[মহা (k) ১২.২৯৬.৮; ১৩.৪৮.৭;
(হরি) ১২.২৮৯.৮; ১৩.৪০.৭;
বৃহদ্ধর্ম পু. ৩.১৩.৩৪; গরুড় পু. ১.৯৬.৩]

উগ্র$_{৫}$ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির জন্য আত্মতুল্য এক পুত্র লাভের আশায় তপস্যা করতে লাগলেন। ব্রহ্মার এই পুত্রকামনার ফলে ভগবান নীললোহিত জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মাবার পরেই শিশু নীললোহিত উচ্চস্বরে রোদন করতে থাকলে ব্রহ্মা তাঁর নাম রাখলেন রুদ্র। এরপর নীললোহিতকে ব্রহ্মা আরও আটটি নাম প্রদান করেন। এর মধ্যে সপ্তম নামটি হল উগ্র। পুরাণমতে, নীললোহিত শিবের উগ্র নামধারী মূর্তিই হল অষ্টমূর্তি শিবের যজ্ঞকর্তার রূপ অর্থাৎ যজমান-রূপ মূর্তি। যজমান মূর্তিধারী উগ্র-শিবের পত্নী ছিলেন দীক্ষা। সন্তান নামে তাঁদের এক পুত্রসন্তান হয়।

[বায়ু পু. ২৭.১৫, ৫৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১০.১৬, ৮৩;
মৎস্য পু. ২৬৫.৪১; বিষ্ণু পু. ১.৮.৬]

উগ্র$_{৬}$ ভাগবত পুরাণ মতে, ভূতের ঔরসে দক্ষকন্যা সরূপার গর্ভজাত পুত্ররা রুদ্রগণ হিসেবে পরিচিত। এই রুদ্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন উগ্র।

[ভাগবত পু. ৬.৬.১৭]

উগ্র$_{৭}$ পঞ্চম মন্বন্তরে যখন রৈবত মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, অমিতাভ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন উগ্র। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৩]*

উগ্র$_{৮}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে উনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। এই মরুৎ দেবতারা সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এই সাতটি গণের মধ্যে চতুর্থ গণের অন্তর্ভুক্ত মরুৎ দেবতাদের মধ্যে উগ্র ছিলেন অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৭.১২৬;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৯৪]

উগ্র$_{৯}$ যাতুধান রাক্ষসদের মধ্যে অন্যতম। উগ্র রাক্ষসের বজ্রহা নামে এক পুত্র ছিল বলে জানা যায়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৮৯, ৯২]*

উগ্র$_{১০}$ ভবিষ্যত একাদশ দ্বাপর যুগে যখন মহর্ষি ত্রিবৃৎ ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান শিব গঙ্গাদ্বার তীর্থে উগ্র নামে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর চারটি পুত্রসন্তান হবে, যাদের নাম যথাক্রমে—লম্বোদর, লম্ব, লম্বাক্ষ ও লম্বকেশক।

[বায়ু পু. ২৩.১৫২]

উগ্র$_{১১}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের উগ্র নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

উৎকর্ষেণ গ্রসতীত্যুগ্রঃ।

'গ্রস্‌' ধাতুর অর্থ গ্রাস করা। মহাদেব প্রলয়কালে সংহারমূর্তি ধারণ করে সৃষ্টিকে গ্রাস করেন বলেই তাঁর নাম উগ্র। তবে পুরাণে ভগবানের উগ্র নামের পশ্চাতে অন্য একটি কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা সনক, সনন্দ প্রভৃতি নামে যে মানস পুত্র সৃষ্টি করলেন, তাঁরা সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। তা দেখে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হলেন। ব্রহ্মার ক্রোধজাত তেজোরাশি তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে নির্গত হল। মহাদেব নীললোহিত রূপে সেই তেজঃপুঞ্জ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন। নবজাতক রোদন করতে থাকলে ব্রহ্মা তাঁকে শান্ত করার জন্য তাঁর আটটি নামকরণ করেন এবং সেই আটটি নামে শিবের অষ্টমূর্তি কল্পনা করেন। নীললোহিত মহাদেবের এই অষ্টনামের সপ্তমটি হল উগ্র। ইনি যজ্ঞকর্তার রূপধারী, অর্থাৎ যিনি নিজে যজ্ঞ করেন সেই যজমানের রূপধারী। পুরাণে বর্ণিত এই কাহিনী থেকেও মহাদেবের উগ্র নামের কারণ স্পষ্ট হয়।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০০; (হরি) ১৩.১৬.১০০]

উগ্র$_{১২}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের একটি। উগ্র শব্দের অর্থ তেজোময় বা তেজোদীপ্ত। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বিষ্ণুর যে বিশ্বরূপ বা বিরাট রূপ বর্ণিত হয়েছে—যাঁর তেজোরাশিকে মহাভারতের সঞ্জয় আকাশে সহস্র সূর্যোদয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা—

সেই সূর্যতেজোময় ভগবানের বিরাট মূর্তিকে 'উগ্ররূপ' বলে সম্বোধন করেছেন অর্জুন। ভগবান বিষ্ণু তাঁর অতিদীপ্ত বিরাট রূপের কারণে উগ্র নামে কীর্তিত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে যে,ঈশ্বরের শাসনেই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা নিজেদের কক্ষপথে চালিত হয়—

ভীষোদেতি সূর্যঃ।

এক্ষেত্রে ঈশ্বরের শাসন বা নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে উগ্র বলা হয়েছে। সূর্য প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্র তাঁর শাসনাধীন বলেই ঈশ্বর উগ্র নামে খ্যাত—

সূর্যাদীনামপি ভয়হেতুত্বাৎ উগ্রঃ (শাঙ্করভাষ্য)।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫৮;
(হরি) ১৩.১২৭.৫৮]

উগ্রকর্মা$_{১}$ ভণ্ডাসুরের সভায় উপস্থিত একজন অসুরবীর। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১২.১২]*

উগ্রকর্মা$_{২}$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগদানকারী শাল্বদেশের রাজা। ইনি ভীমসেনের হাতে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ৮.৫.৪২; (হরি) ৮.৩.৫৮]

উগ্রকর্মা$_{৩}$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী কেকয় রাজকুমার বিশোকের সেনাপতি। কর্ণ বিশোককে হত্যা করলে উগ্রকর্মা কর্ণ ও তাঁর পুত্র প্রসেনকে আক্রমণ করেন। কর্ণের হাতে উগ্রকর্মা নিহত হন।

[মহা (k) ৮.৮২.৪-৫; (হরি) ৮.৬১.৪-৫]

উগ্রক্ষত্রিয় *[দ্র. উগ্র$_{৪}$]*

উগ্রচণ্ডা কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে মহাদেবী দুর্গা তিন বার তিন মূর্তিতে মহিষাসুরকে বধ করেছেন। আদি সৃষ্টিতে বা সৃষ্টির আদিতে তিনি উগ্রচণ্ডারূপে মহিষাসুরকে বধ করেছেন। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে তিনি ভদ্রকালী-রূপে এবং তারপর দুর্গারূপে মহিষাসুরকে বধ করেছেন। মহিষাসুরকে দেবী উগ্রচণ্ডারূপ দর্শন করালে দেখা যায় ভদ্রকালীর ষোলোটি হাতের চাইতে আরও দুটি বাহু যুক্ত হয়ে তাঁর হাতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আঠেরোটি। অর্থাৎ উগ্রচণ্ডা অষ্টাদশভুজা।

ষোড়শভুজা ভদ্রকালীমূর্তিতে দেবীর দক্ষিণ বাহুগুলিতে যে অস্ত্রগুলি থাকে সেগুলি হল—শূল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, বাণ, শক্তি, বজ্র এবং দণ্ড। আর বাঁদিকের হাতগুলিতে থাকে খেটক, চর্ম (ঢাল), চাপ, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু এবং মুষল। ষোড়শভুজা ভদ্রকালী মূর্তির সঙ্গে আরও দুটি হাত যুক্ত হলেই অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডার মূর্তি তৈরি হয়। ওই অতিরিক্ত দুই হাতের ডান দিকের হাতে নীচের দিকে থাকবে গদা, বাঁদিকের হাতে একটি সুরাপূর্ণ পাত্র, আর মাথায় থাকবে মুণ্ডমালা—

যা মূর্তি ষোড়শভুজা ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা।
তথৈব মূর্তিং বাহুভ্যামপরাভ্যাঞ্চ বিভ্রতী॥
দক্ষিণাধো গদাং বামপাণিনা পানপাত্রকম্।
সুরাপূর্ণঞ্চ শিরসা মুণ্ডমালাং বিলেশয়ম্॥

উগ্রচণ্ডার গায়ের রঙ কাজলের মতো কালো। তাঁকে দেখতে ভয়ঙ্কর লাগে। সিংহবাহিনী দেবীর চক্ষু রক্তবর্ণ, শরীরের আয়তন অতিবৃহৎ এবং তিনি অষ্টাদশভুজা।

[কালিকা পু. ৬০.১১৮-১১৯; ৬০.৫৮-৬২;
৬০.১২২-১২৫; ৬১.২]

উগ্রচণ্ডার পুজো হবে দুর্গাপূজার নিয়মে। উগ্রচণ্ডা দেবী দুর্গার অষ্টযোগিনীর মধ্যে অন্যতমা। আবার উমা কিংবা দুর্গাও উগ্রচণ্ডার যোগিনীদের মধ্যে আছেন। *[দ্র. অষ্টযোগিনী]*

[কালিকা পু. ৬১.৩১; ৬০.৪০-৪১]

উগ্রতপা চতুর্দশ দ্বাপরে, যখন মহর্ষি সুরক্ষ ব্যাস হবেন, ভগবান শিব সেই সময় মহর্ষি অঙ্গিরার বংশে গৌতম নামে অবতার গ্রহণ করবেন। ভগবান গৌতমের চার পুত্রের মধ্যে উগ্রতপা একজন। *[বায়ু পু. ২৩.১৬৪]*

উগ্রতীর্থ$_{১}$ দ্বাপর যুগে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণকারী একজন রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, দ্বাপরযুগে ক্রোধবশ অসুরদের অংশে যেসব রাজা মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, উগ্রতীর্থ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬৫; (হরি) ১.৬২.৬৬]

উগ্রতীর্থ$_{২}$ বারাণসীর বিখ্যাত তীর্থগুলির মধ্যে একটি। *[পদ্ম পু. (নবভারত). স্বর্গ. ২৮.১০৬]*

☐ আধুনিক বারাণসীতেও উগ্র নামে একটি কুণ্ড রয়েছে। সম্ভবত এটিই প্রাচীন উগ্রতীর্থ।

[The Geographical Information in the Skanda Cult; Umakanth Thakur; p. 49]

উগ্রতেজা$_{১}$ একজন বিশিষ্ট নাগ। প্রভাস তীর্থে সমুদ্রতীরে যখন শেষ নাগের অবতার বলরাম যোগবলে দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁর মুখ থেকে সহস্র ফণাযুক্ত এক বিরাট নাগ বেরিয়ে এসে সমুদ্রে প্রবেশ করে। সেই নাগকে স্বাগত জানাতে নাগলোক থেকে বাসুকি প্রভৃতি যেসব বিশিষ্ট নাগ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন উগ্রতেজা তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ১৬.৪.১৬; (হরি) ১৬.৪.১৬]*

উগ্রতেজা$_{২}$ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। তিনি তেজের আধার, সংসারের সমস্ত শক্তির উৎস, সূর্য প্রভৃতি নক্ষত্রও তাঁর তেজোরাশির একাংশের দ্বারাই দীপ্ত হয়। তিনি নিজে সহস্র সূর্যের তুল্য তেজস্বী। তাঁর তেজ সহ্য করা সাধারণ প্রাণীর অসাধ্য বলেই মহাদেব উগ্রতেজা নামে খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠও উগ্রতেজা নামের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবেই—

স এব উগ্রতেজাঃ দুঃসহস্পর্শঃ।

লক্ষণীয়, সহস্রনামস্তোত্রে উগ্রতেজার পরেই মহাতেজা নামটি উচ্চারিত হচ্ছে। অসহনীয় তেজদীপ্তিসম্পন্ন ঈশ্বরের তেজ গ্রহণ করেই সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র সমূহ দীপ্তিমান হয়, জগৎ আলোকিত হয় বলেই তিনি মহাতেজা—

ন তত্র সূর্যো ভাতে ন চন্দ্র-তারকং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫৭; (হরি) ১৩.১৬.৫৭]

উগ্রদংষ্ট্রা দেবীভাগবত পুরাণ মতে দেবী কালিকার সহচরীদের মধ্যে উগ্রদংষ্ট্রা একজন। দানবরাজ শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয়েছিল তখন দেবী কালিকার সঙ্গে উগ্রদংষ্ট্রা দেবীও রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

[দেবীভাগবত পু. ৯.২২.৪৬]

উগ্রদংষ্ট্রী মেরুর কন্যা। প্রিয়ব্রতবংশীয় রাজা অগ্নীধ্রের পুত্র হরিবর্ষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

[ভাগবত পু. ৫.২.২৩]

উগ্রদৃষ্টি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যেসব দেবতারা ত্রিষিমন্তগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, উগ্রদৃষ্টি তাঁদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৩১.৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৯৩]

উগ্রধন্বা ভণ্ডাসুরের সভায় উপস্থিত একজন অসুরবীর। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১২.১২]*

উগ্রযায়ী *[দ্র. অনুযায়ী]*

উগ্ররেতা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মানসপুত্র রূপে ভগবান শিব নীললোহিত রুদ্র নাম ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা জন্মকালে ভগবান নীললোহিতকে যেসব নাম প্রদান করেন উগ্ররেতা তার মধ্যে অন্যতম।

[ভাগবত পু. ৩.১২.১২]

উগ্রশ্রবা$_{১}$ মহাভারতে মঙ্গল-উচ্চারণ-শব্দের পরেই মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কথকঠাকুর উগ্রশ্রবা নিজেই যেন পরিচয় করে নিচ্ছেন তাঁর অনন্ত পাঠকের সঙ্গে—মহাভারতে দেখবেন প্রথমেই বলা হচ্ছে লোমহর্ষণ সূতের ছেলে 'পৌরাণিক' উগ্রশ্রবা এসেছেন শৌনকের আশ্রমে—

লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ
পৌরাণিকো নৈমিষারণ্যে।

প্রাচীন সমাজের মুনি-ঋষিরা সূতদের যথেষ্ট সম্মান করতেন, কারণ তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি পড়াশুনো ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মতোই গভীর—পুরাণের ভাষায়—অমলপ্রজ্ঞাঃ। যদি ধরে নিই—মনুর বিধান মতো ক্ষত্রিয়-পুরুষ আর ব্রাহ্মণী সুন্দরীর মিলনে যে সূত-জাতি তৈরি হয়েছিল, কালক্রমে তাঁরাই 'পৌরাণিক', ঐতিহাসিক হয়ে গেলেন, তাহলেও বলতে হবে—রাজবংশ এবং মুনিবংশের ইতিহাসই শুধু নয়, মহাভারতের মতো বিশাল এই ইতিহাস শোনানোর জন্যও নয়, কালে কালে মহাভারতের বিভিন্ন সংযোজন-পর্ব শোনাবার পক্ষে তাঁরাই সবচেয়ে উপযুক্ত লোক—যাঁদের ভাষ্য দেওয়ার ক্ষমতা পৃথুরাজের সময় থেকেই চিহ্নিত এবং যাঁরা জন্মগতভাবে সঙ্কর।

বারো বছরের চলমান যজ্ঞ-ক্রিয়ার মধ্যেই এক পৌরাণিক এসে উপস্থিত হয়েছেন নৈমিষারণ্যে, শৌনকের তপোবনে। যে সে পৌরাণিক নন, একেবারে পৌরাণিকোত্তম রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা। সেকালে রোমহর্ষণের মতো কথকঠাকুর দ্বিতীয় ছিলেন না। জাতের বিচারে তিনি ব্রাহ্মণদের থেকে সামান্য খাটো, কেন না তাঁর জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ বংশজাতা মায়ের গর্ভে, কিন্তু তাঁর বাবা ক্ষত্রিয়। রোমহর্ষণের প্রথম বর্ণে 'র' আর 'ল' অভেদে উচ্চারিত হয়।

রোমহর্ষণ আর লোমহর্ষণ একই কথা লোমহর্ষণের আসল নাম কী ছিল, তাও বোধহয় সবাই ভুলে গেছে। তাঁর কথকতা, গল্প বলার ঢঙ ছিল এমনই উঁচু মানের যে তাঁর কথকতার আসরে শ্রোতাদের গায়ের লোম খুশিতে খাড়া হয়ে উঠত। তাই তাঁর নামই হয়ে গেল লোমহর্ষণ।

লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যঃ সুভাষিতৈঃ।

স্বয়ং ব্যাসের তিনি প্রিয় শিষ্য।

সেই লোমহর্ষণের ছেলে এসে উপস্থিত হয়েছেন শৌনকের আশ্রমে। উগ্রশ্রবা তাঁর নাম। কথকতায় লোম খাড়া করার ক্ষমতা তাঁরও আছে। কথকতায় তাঁর চরম সুনাম হয়েছে বলেই তাঁর খ্যাতি (শ্রবস্) এখন শীর্ষে উঠেছে, তাই তাঁর নাম উগ্রশ্রবাও বটে লোমহর্ষণি উগ্রশ্রবা। তিনি সূতও বটে সূতের ছেলে সৌতি উগ্রশ্রবা।

বস্তুত মহাভারত বা পুরাণের যুগে সূত বলে একটা আলাদা 'ক্লাস'ই ছিল। পুরাণগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে যেদিন আমরা প্রথম রাজা পেয়েছি, সেদিন থেকে আমরা 'সূত'কেও পেয়েছি। পুরাণ মতে এই পৃথিবীর প্রথম সার্থক রাজা হলেন পৃথু—যাঁর নামে এই পৃথ্বী বা পৃথিবী। তা পৃথু যেদিন জন্মালেন, সেইদিনই পিতামহ ব্রহ্মা সোমযজ্ঞের আহুতি-ভূমিতে সূত এবং মাগধদের সৃষ্টি করলেন। সমাগত মুনি-ঋষিরা সূত-মাগধদের অনুরোধ করলেন মহান পৃথুর স্তব করতে।

সেই যে প্রথম সূত-মাগধেরা পৃথুর স্তব করেছিলেন, তারপর থেকেই এঁরা চিহ্নিত হয়ে গেলেন রাজবংশের কীর্তি-গায়ক হিসেবে। বিভিন্ন রাজবংশের কীর্তিখ্যাতি, মুনি-ঋষিদের আশ্চর্য সব তপশ্চর্যা—সব এই সূতেরা স্মৃতিতে ধরে রাখতেন বলেই সূতেরাই ছিলেন সে যুগের ঐতিহাসিক, যাকে তৎকালীন পুরাণের ভাষায় বলা হয় 'পৌরাণিক'—

সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তাঃ।

সূতজাতি নাকি ভারতের প্রথম বর্ণসঙ্কর। শোনা যায় রাজা পৃথু, যাঁর নামে এই পৃথিবী শব্দটি, সেই পৃথুর যজ্ঞে দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির জন্য যে ঘৃতাহুতি প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেই ঘিয়ের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের ঘৃতাহুতি মিশে যায়। এদিকে আহুতি দেওয়ার সময় বৃহস্পতির ঘৃতাহুতি হাতে নিয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারিত হয়। ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা, ক্ষত্রিয়ত্বই রাজার সংজ্ঞা। ফল যা হওয়ার তাই হল, এই হবির্মিশ্রণের ঘটনা থেকেই সূত জাতির উৎপত্তি। পৃথিবীর প্রথম বর্ণসঙ্কর—

সূত্যায়ামভবৎ সূতঃ প্রথমং বর্ণবৈকৃতম্।

হয়তো এই কারণেই মহাভারত বিশালবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ব্যাসের লেখা হলেও, সে কাহিনী বৈশম্পায়নের মতো এক ব্রাহ্মণের মুখে প্রাথমিকভাবে উচ্চারিত হলেও আমরা যে কথক-ঠাকুরের মুখে মহাভারতের কথা শুনছি, তিনি কিন্তু একজন সঙ্করজন্মা কবি, তিনি সূত-জাতীয়। মহাভারতের বিচিত্র সংযোজন-পর্বের নিরিখে যে সাঙ্কর্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেই সাঙ্কর্য এই সূতজাতীয় কথকঠাকুরের মধ্যেও আছে। হয়তো সেই কারণেই কোনো ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়ও নয়, কিংবা বৈশ্যও নয়, একজন সূত-জাতীয় ব্যক্তিই মহাভারতের বক্তা নির্বাচিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১.১.১; (হরি) ১.১.১;
বায়ু পু. ১.১২-৩৯; মৎস্য পু. ১.২-৪;
গর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ড, ১২.৩৬]

□ জনমেজয় পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সর্প-যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সেই সর্প-যজ্ঞেই মহাভারত-কথার সূচনা। আস্তীক মুনি এসে জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের ছেদ টানলেন। যজ্ঞ স্তব্ধ হল এবং মহাভারতের কথা আরম্ভ হল। সর্পযজ্ঞে যোগদান করেছিলেন যত রাজ্যের মুনি-ঋষিরা। আর উপস্থিত ছিলেন মহামুনি ব্যাস। কুরু-পাণ্ডবের বংশধারায় ব্যাসের নিজের রক্ত আছে, মমত্ব আছে। ফলে বানপ্রস্থে ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পরেই তিনি মহাভারত রচনা করেন। রচনা করেন কৌরব-পাণ্ডববংশের পূর্ব এবং উত্তর ইতিহাস। গোটা মহাভারতটা লিখতে তাঁর তিন বছর সময় লেগেছিল। হয়তো হাতে-কলমে লেখা যাকে বলে সেভাবে তিনি মহাভারত লেখেননি, কিন্তু মহাভারতের পুরো বয়ানটা মনে মনে পুরো ছকে নিতে তাঁর সময় লেগেছিল তিন বছর—

ত্রিভির্বর্ষৈর্মহাভাগঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো'ব্রবীৎ।

উগ্রশ্রবা সৌতি মহাভারতের কথা বলছেন নৈমিষারণ্যে বসে। এখানে তিনি বক্তা। কিন্তু তিনিই আবার শ্রোতা হিসেবে ছিলেন মহারাজ জনমেজয়ের সভায়। সেখানে বক্তা ছিলেন ব্যাস-

শিষ্য বৈশম্পায়ন। মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে যে মহামতি ব্যাস প্রথমে 'জয়সংহিতা' রচনা করেছিলেন যেখানে শুধু কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধের কথাই ছিল। পরে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন কৌরব-পাণ্ডবদের উদ্ভব থেকে আরম্ভ করে তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় জুড়ে 'ভারতসংহিতা' তৈরি করেন। সেই বৃহত্তর ভারতসংহিতাই জনমেজয়ের সর্পসত্রে ব্যাসের আজ্ঞায় শুনিয়েছিলেন মহর্ষি বৈশম্পায়ন। তারপর আরও অনেক আখ্যান-উপাখ্যান সংগ্রহ এবং সমন্বয় করে উগ্রশ্রবা সৌতি মহাভারতের কথা শোনান নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদের সে দিক থেকে লোমহর্ষণি উগ্রশ্রবা সৌতি মহাভারতের তৃতীয় সংস্করণের স্রষ্টা।

[মহা (k) ১.৬২.৪১-৪২; (হরি) ১.৫৭.৪০; A.D. Pusalkar, The Epics and Puranas, Intro. XX-XXXIV; The Jaya-Samhita, i-e. The Ur-Mahabharata, Ed. by K.K. Sharma, vol. I & II]

□ উগ্রশ্রবা সৌতি যে মুহূর্তে মহাভারতের আখ্যান আরম্ভ করেছেন, সে মুহূর্তেই তিনি জানেন—তিনি যা বলছেন, সেই কথা-কাহিনী তাঁর পূর্বজরা হয়তো আরও একভাবে শুনেছেন এবং আরও অন্য কোনোভাবে বর্ণনাও করেছেন হয়তো—

ব্যাচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ।

তিনি জানেন—মহাভারতের কথা ভারতের মতোই বিচিত্র এবং ততোধিক বিচিত্র এক মানবগোষ্ঠীর জীবনের প্রতিফলন। তিনি জানেন—ভারতের তথাকথিত আর্য সম্প্রদায় কোনো ভাবেই রক্তের বিশুদ্ধতা রাখতে পারে নি। শত কবির দর্শন মনন এবং কখনো বা স্থূল হস্তের অবলেপও ঘটেছে এখানে। একটি বিশাল জাতির ইতিহাস কখনো কোনো একক কবির মনন-সীমায় আবদ্ধ হতে পারে না। জন-জাতির শরীরে মনে যখন যে প্রভাব এসেছে, কবিরাও তা ধরে রেখেছেন মহাকাব্য-ইতিহাসের 'প্যানোরমায়'।

ভারত-কথার আরম্ভেই তিনি স্বীকার করেন, আমিই কিন্তু প্রথম লোক নই—যে এই কাহিনী শোনাচ্ছে। আমার আগেও কবিরা এই কথা বলেছেন, পরেও বলবেন—

আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।

সঙ্কর বলেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের এমন বিচিত্র সঙ্কর মহাভারতের ইতিহাস বলার ভার সূতেরই ওপর। সঙ্কর বলেই কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন কবির ভিন্ন ভিন্ন সংযোজন তাঁর কাছে অচ্ছুৎ নয়, তাঁরা সব মিলিয়ে দিতে পারেন। মহাভারতের প্রত্যেকটি ঘটনার ওপর, প্রত্যেক আগন্তুক তত্ত্ব এবং তথ্যের ওপর সূতের মায়া আছে। আর মায়া আছে তাঁদের ওপর—যাঁরা পূর্বে তাঁদেরই মতো করে মহাভারতের কথা শুনিয়েছেন। সহমর্মিতা আছে তাঁদের ওপর—যাঁরা তাঁর সম-সময়ে মহাভারতের আখ্যান বলে যাচ্ছেন। শুভেচ্ছা আছে তাঁদের জন্য—যাঁরা ভবিষ্যতে ভারত-কথার মর্য্যাদাতেই মহাভারত শোনাবেন—

আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।

হয়তো এই কারণেই উগ্রশ্রবা সৌতি অনেকগুলি পুরাণেরও কথকঠাকুর। ভাগবত পুরাণ, হরিবংশ পুরাণ এবং পদ্মপুরাণ উগ্রশ্রবা সৌতির কথকতা।

[V. Vaidya, The Mahabharata: A Critism, pp. 1-12]

উগ্রশ্রবা২ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে উগ্রশ্রবা একজন। মহাভারতের আদিপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের নামের যে দুটি তালিকা আমরা পাই, সেই দুটিতেই উগ্রশ্রবার নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৬৭.১০০; ১.১১৭.৯; (হরি) ১.৬২.১০২; ১.১১১.৯]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচ বধের দিন উগ্রশ্রবা প্রভৃতি দশজন ধার্তরাষ্ট্র একত্রে ভীমসেনকে আক্রমণ করেন। এই সময় ভীমের হাতে উগ্রশ্রবা নিহত হন।

[মহা (k) ৭.১৫৭.১৮; (হরি) ৭.১৩৭.১৮নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ২৪, পৃ. ১৩৬২]

উগ্রসেন১ মথুরায় বসবাসকারী যদুবংশীয়রা বৃষ্ণি-অন্ধক প্রভৃতি একাধিক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ছিলেন। যদুবংশের বা বলা ভালো অন্ধকদের একটি শাখার নাম কুকুর। এই শাখায় জন্মগ্রহণ করেন যদুবংশীয় সংঘমুখ্য রাজা আহুক। আহুক মথুরার সংঘরাষ্ট্রের সংঘমুখ্যদের মধ্যে প্রধান বলেই মূলত রাজা উপাধিধারী ছিলেন। তা-সত্ত্বেও আপন পরাক্রম-প্রতিপত্তির বলে তিনি

দিগ্বিজয়ী রাজা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই আহুক রাজার পুত্র উগ্রসেন। রাজা আহুকের ঔরসে কাশীরাজকন্যা কাশ্যার গর্ভে উগ্রসেন-এর জন্ম হয়। উগ্রসেনের ছোটো ভাই দেবক।

আহুকের খ্যাতি পরম্পরাক্রমে উগ্রসেনের উপরেও আরোপিত হয়েছে। আহুকের পর উগ্রসেনই মথুরা-শূরসেন অঞ্চলের সংঘ শাসন ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। আহুকের পরম্পরায় মহাকাব্য পুরাণে উগ্রসেনকেও বহুবার আহুক নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৫; হরিবংশ পু. ১.৩৭.২৭; বায়ু পু. ৯৬.১২৮; মৎস্য পু. ৪৪.৭১; ভাগবত পু. ৯.২৪.২১]

মহাভারতে কিংবা পুরাণগুলিতেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উগ্রসেনের পত্নীর নাম উচ্চারিত হয়নি। একমাত্র পদ্মপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিদর্ভরাজ সত্যকেতুর কন্যা পদ্মাবতী ছিলেন উগ্রসেনের পত্নী। এই পদ্মাবতীর গর্ভজাত উগ্রসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র কংস।

তবে কংস উগ্রসেনের ঔরসজাত পুত্র ছিলেন না। হরিবংশ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় উগ্রসেনের পত্নী সখীদের নিয়ে সুযামুন পর্বতে বিহার করছিলেন। সেই সময় সৌভবিমানের অধিপতি দানবরাজ দ্রুমিল উগ্রসেনের পত্নীকে দেখে তাঁর রূপে মুগ্ধ হলেন। দানব দ্রুমিল ছল করে উগ্রসেনের রূপ ধারণ করে এসে দাঁড়ালেন উগ্রসেন পত্নীর সামনে। সুযামুন পর্বত, উপবনের সুরম্য প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে উগ্রসেনপত্নীর চিত্ত চঞ্চল হয়েই ছিল, এখন স্বামীকে সামনে দেখে তিনি বিশেষ কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু একসময় তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর স্বামীর রূপ ধারণ করে যিনি তাঁর কাছে এসেছেন, তিনি উগ্রসেন নন, অন্য কোনো পুরুষ। উগ্রসেনের পত্নী অনেক কাঁদলেন, বিলাপ করলেন, দ্রুমিলকে তিরস্কারও করলেন অনেক। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। দ্রুমিলের সঙ্গে মিলনের ফলে উগ্রসেনের পত্নীর গর্ভাধান সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেই গর্ভজাত পুত্রের নামই কংস। পদ্মপুরাণে অবশ্য দ্রুমিলের পরিবর্তে কুবেরের অনুচর যক্ষ গোভিলের নাম পাওয়া যায়। তবে যক্ষ কিংবা দানবের ভাবনার থেকেও দ্রুমিলের সম্পর্কে হরিবংশ পুরাণে ব্যবহৃত বিশেষণ 'সৌভপতি' শব্দটি আমাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ মহাকাব্য-পুরাণে 'সৌভপতি' বিশেষণে আমরা যাঁকে বিশেষিত হতে দেখি, তিনি শাল্ব দেশের রাজা। কোনো কল্পলোকের ব্যক্তি নন। শাল্ব জনজাতির রাজধানীর নাম ছিল সৌভপুর। পণ্ডিত পারজিটার লিখেছেন—শাল্ব রাজারা রাজত্ব করতেন রাজস্থানের আবু পাহাড়ের কাছাকাছি অঞ্চলে। অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে, শাল্বরা যমুনা থেকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত মোটামুটি ছড়িয়ে পড়েছিল। যাই হোক, আমরা ধারণা করতে পারি যে, হরিবংশে উল্লিখিত সৌভপতি দ্রুমিল সুযামুন পর্বতের কাছেই কোথাও থাকতেন। তবে তিনি শাল্ব জনজাতির রাজা ছিলেন, না তাঁর অধীনস্থ কোনো সামন্ত রাজা ছিলেন—তা খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় না। তবে সেই সময় শাল্বরা জরাসন্ধের অনুগামী ছিলেন। সুতরাং ধারণা হয় যে, যে ব্যক্তি এমন ভাবে হঠাৎ এসে উগ্রসেনপত্নীকে ধর্ষণ করে গেলেন, তিনিও জরাসন্ধেরই লোক এবং তাঁর ঔরসজাত উগ্রসেনের এই ক্ষেত্রজ পুত্রটিও পরবর্তী সময়ে জরাসন্ধের একান্ত অনুগত হয়ে ওঠে।

[হরিবংশ পু. ২.২৮.৫৪-১০৯; পদ্ম পু. ভূমি ৪৮.১-২৭; ৪৯.১-৫৫; ৫০.১-৬২]

উগ্রসেনের এই জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র কংস ছাড়াও উগ্রসেন আরও আট পুত্র এবং পাঁচ কন্যা সন্তানের পিতা ছিলেন। তবে উগ্রসেনের এই পুত্রকন্যাদের নামের তালিকা এক একটি পুরাণে এক এক রকম। বিষ্ণু পুরাণে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী উগ্রসেনের আট পুত্রসন্তানের নাম যথাক্রমে ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি এবং তুষ্টিমান্। বিষ্ণু পুরাণ মতে, উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার নাম যথাক্রমে—কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী এবং কঙ্কী। হরিবংশ পুরাণে উগ্রসেনের পুত্র-কন্যাদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় তার সঙ্গে বিষ্ণু পুরাণের পার্থক্য বিশেষ নেই। শুধুমাত্র সুনাম-এর পরিবর্তে সুনামা, স্বভূমির পরিবর্তে সভূমিক, যুদ্ধমুষ্টির পরিবর্তে অনাধৃষ্টি এবং তুষ্টিমান্-এর পরিবর্তে পুষ্টিমান্ পাঠ পাওয়া যায়। কন্যাদের নামের মধ্যে শুধুমাত্র কঙ্কীর পরিবর্তে কঙ্কা পাঠ

মেলে। বায়ু পুরাণ মতে উগ্রসেনের পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ন্যগ্রোধ, সুনামা, কদ্বশঙ্কু, ভূময়, সুতনু, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধদুষ্ট এবং সুপুষ্টিমান্। এই পুরাণে উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার যে নাম পাওয়া যায় তা অনেকটাই অন্যরকম। বায়ু পুরাণের পাঠ অনুযায়ী উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার নাম যথাক্রমে কর্মবতী, ধর্মবতী, শতঙ্কু, রাষ্ট্রপালা এবং কঙ্কা। মৎস্য পুরাণে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী উগ্রসেনের আট পুত্রের নাম যথাক্রমে ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, অজভূ, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি, সুমুষ্টিদ। মৎস্য পুরাণে উগ্রসেনের কন্যাদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় তা অনেকটাই বিষ্ণু পুরাণ এবং হরিবংশের অনুরূপ। শুধুমাত্র 'সুতনু'র পরিবর্তে এই পুরাণে সুতন্তু পাঠ পাওয়া যায়। ভাগবত পুরাণের তালিকা অন্যান্য পুরাণের থেকে কিছুটা পৃথক। এই পুরাণ মতে উগ্রসেনের আট পুত্রের নাম যথাক্রমে সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, সৃষ্টি এবং তুষ্টিমান্। ভাগবত পুরাণের পাঠানুসারে উগ্রসেনের কন্যাদের নাম যথাক্রমে কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ এবং রাষ্ট্রপালিকা।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৫; হরিবংশ পু. ১.৩৭.৩০-৩২;
বায়ু পু. ৯৬.১৩২-১৩৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১২৯-১৩৪;
মৎস্য পু. ৪৪.৭৪-৭৬; ভাগবত পু. ৯.২৪.২৪-২৫]

তবে উগ্রসেনের জীবনের দীর্ঘ সময় প্রভাবিত হয়েছে তাঁর জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পুত্র কংসের দ্বারা। সেকালের দিনে এমন ক্ষেত্রজ পুত্রকে ত্যাগ করার রীতি ছিল না। বরং সে পুত্রকে সাদরে মানুষ করার মধ্যেই বংশের সম্মান ছিল। তবু কংস বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্রে যেসব দুর্লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল তাতে উগ্রসেন বিরক্ত হলেন, তাঁর অন্তরে তিক্ততাও জন্ম নিল স্বাভাবিক ভাবেই—কারণ যে দুরাচারকে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের মর্যাদা দিয়েছেন, সেই কংস উগ্রসেনের আপন ঔরসপুত্র নন।

উগ্রসেনের সঙ্গে তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্রের তিক্ত সম্পর্কের সম্পূর্ণ সুযোগ নিলেন মগধরাজ জরাসন্ধ। কংসের সঙ্গে তিনি আত্মসম্পর্ক গড়ে তোলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। জরাসন্ধের দুটি মেয়ে ছিল। তাঁদের নাম অস্তি আর প্রাপ্তি। মথুরা শূরসেন অঞ্চলে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরবার জন্য তিনি এই মেয়ে দুটির বিয়ে দেন কংসের সঙ্গে। কংস জরাসন্ধের এই ব্যবহারে ধন্য হয়ে যান। বলা বাহুল্য, কংসের এই বিবাহ হয়েছিল পিতা-মাতার বিনা অনুমতিতে। জামাই কংসকে জরাসন্ধ এরপর রাজনৈতিক মদত দিতে থাকেন যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে মথুরা শূরসেনের রাজনৈতিক পরিবর্তনে। কংস জরাসন্ধের সাহায্যে নিজ পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসন থেকে হঠিয়ে দিয়ে নিজে মথুরার সিংহাসন দখল করেন। এর মধ্যে যে জরাসন্ধের সাহায্য বহুল পরিমাণে ছিল, তার প্রমাণ আছে মহাভারতের সভাপর্বে, যেখানে জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনা করার সময় বাসুদেব কৃষ্ণ নিজ মুখে যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন—বার্হদ্রথ কুলে জাত জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি এবং প্রাপ্তিকে বিয়ে করে শ্বশুরের বলে বলীয়ান হয়ে কংস আমাদের যাদবকুলের আত্মীয় জ্ঞাতিদের দলিত পিষ্ট করে ছেড়েছিল—

বলেন তেন স্বজ্ঞাতীন্ অভিভূয় বৃথামতিঃ।

পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসন-চ্যুত করেই কংস নিশ্চিন্ত থাকেননি। তিনি তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে। কারণ উগ্রসেন যদি কারাগারের বাইরে থাকেন, তবে তিনি যদু-বৃষ্ণিদের আঠারটা কুলকে একত্রিত করে কংসের বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণ রচনা করতে পারেন, তবে যে স্বনিযুক্ত মথুরাধিপতি কংসের সমূহ বিপদ হবে, সে কথা কংস খুব ভালো করেই জানতেন।

যদু-বৃষ্ণিদের মধ্যে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে রাজতন্ত্র ছিল না। শাসনব্যবস্থা চলত সংঘরাষ্ট্রের পরিকাঠামো অনুযায়ী। উগ্রসেন মথুরার অভিজাত সংঘমুখ্যদের দ্বারা নির্বাচিত রাজা ছিলেন। সুতরাং তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার পর কংসও রীতি অনুযায়ী এই সংঘমুখ্যদের সমর্থন পাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কংসের চরিত্রে এমনিতেই স্বৈরতন্ত্রের বীজ ছিল, তার উপর জরাসন্ধের বলে বলীয়ান হয়ে তিনি অন্যান্য সংঘমুখ্যদের মতামতের পরোয়া খুব বেশি করতেন না। ফলে উগ্রসেনের বন্দিদশায় কংসের প্রভাবে, জরাসন্ধের মদতে মথুরায় একরকম একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল বলা চলে। যদুবংশের বিভিন্ন সংঘ—অন্ধক, কুকুর, বৃষ্ণি, পৃশ্নি, ভোজ, শিনি, সাত্বত—সব সংঘের মুখ্যরাই সাময়িক ভাবে এ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে কংসের সভা অলঙ্কৃত

করতে লাগলেন। কতকটা নিরুপায় হয়ে, আর কতকটা জরাসন্ধের ভয়ে। তবে সামনাসামনি কংসের মন যুগিয়ে চললেও এঁদের মধ্যে অনেকেই আনুগত্য পোষণ করতেন সিংহাসনচ্যুত রাজা উগ্রসেনের প্রতি। ফলে উগ্রসেনের মুক্তি এবং কংসের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য তলে তলে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন কৃষ্ণপিতা বসুদেব।

কংস যখন জানতে পারলেন যে, বসুদেব এবং দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র তাঁর মৃত্যুর কারণ হবেন—তখন তিনি বসুদেবকেও বন্দি করলেন। তবে উগ্রসেন কিংবা বসুদেবের বন্দিদশাকে আমরা কোনো শৃঙ্খলে আবদ্ধ অন্ধকার কারাগৃহে বসবাস বলে মনে করি না। সংঘরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে বসে সংঘরাষ্ট্রের প্রধান দুই সংঘমুখ্যকে এভাবে বন্দি করে রাখা কংসের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে উগ্রসেন, বসুদেব—এঁরা দুজনেই আদতে কংসের নজরবন্দি হয়ে রইলেন। হরিবংশ পুরাণের বিবরণে এর প্রমাণও পাওয়া যাবে। যাই হোক, বন্দিদশাতেও উগ্রসেনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা কংসের পতনের জন্য বসুদেবের ভাবনাচিন্তায় ভাটা পড়েনি। কংসের ভয়ে বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী রোহিণী মথুরা ছেড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বৃন্দাবনে নন্দ গোপের গৃহে। ভবিষ্যতে যিনি কংসহন্তা হবেন, সেই কৃষ্ণকেও যাতে শৈশবেই কংস হত্যা করতে না পারেন—তার জন্য বসুদেব তাঁকে সদ্যোজাত অবস্থাতেই রেখে এসেছেন নন্দের কাছে। বাসুদেব কৃষ্ণ বেড়ে উঠেছেন বৃন্দাবনে গোপবালকদের মাঝে, নন্দ-যশোমতীর স্নেহছায়ায়।

এদিকে দিন যত গড়িয়েছে কংসের অত্যাচারও বেড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে মথুরার সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করে বলেছেন—কংসের অত্যাচারে মথুরা-শূরসেন অঞ্চল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তখন কংসকে বধ করে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলকে জরাসন্ধের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যদু-বৃষ্ণিদের আঠারটি কুলের প্রধানরা একত্রিত হয়ে কৃষ্ণের সাহায্য চেয়েছিলেন। পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, কৃষ্ণ যখন মথুরায় এসে কংসকে বধ করেন, তখন তিনি দ্বাদশবর্ষীয় বালক। সুতরাং এই ঘটনাপ্রবাহ থেকে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণের জন্মের বেশ কয়েক বছর আগে থেকে কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যু পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘ সময় উগ্রসেন কাটিয়েছেন কংসের নজরবন্দি অবস্থায়।

হরিবংশ পুরাণে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষ্ণ-বলরামকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় আনিয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেবার ঠিক আগে কংস যদু-বৃষ্ণি সংঘমুখ্যদের সভা ডেকেছেন এবং সেই সভায় কংস আপন বিরুদ্ধপক্ষীয় বসুদেবকে দোষী সাব্যস্ত করার এবং তাঁর পাশ থেকে অন্যান্য সংঘমুখ্যদের সমর্থন যাতে সরে যায়—তার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই সভাতেই সংঘমুখ্য এক প্রবীণের মুখ থেকে খুব কঠোর ভাষায় কংসের বিরোধিতাও শোনা যায়। লক্ষণীয়, হরিবংশ পুরাণে বর্ণিত এই সভায় কিন্তু বসুদেব, উগ্রসেন দুজনেই উপস্থিত। শুধু তাই নয়, রাজসভায় কোনো রাজদ্রোহী বন্দির মতো নিয়ে আসা হয়নি তাঁদের। বরং তাঁরা উপস্থিত আছেন সংঘরাষ্ট্রীয় সভার মাননীয় সংঘমুখ্যের মর্যাদাতেই। এই উল্লেখ থেকেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয় যে, উগ্রসেন শৃঙ্খলে আবদ্ধ কারাগৃহের বন্দি ছিলেন না। কংস তাঁকে তাঁর আপন প্রাসাদেই নজরবন্দি রেখেছেন এতকাল।

[মহা (k) ২.১৪.৩০-৩২; (হরি) ২.১৪.৩০-৩২;
হরিবংশ পু. ২.২২.১-৮৪;
ভাগবত পু. ১০.৪৪.৩২-৩৩]

□ মথুরার রাজসভায় তর্কবিতর্কের পর কংস অক্রূরকে পাঠালেন বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় নিয়ে আসার জন্য। অক্রূরও যদু-বৃষ্ণিদের অন্যতম একজন সংঘমুখ্যই বটে, সংঘমুখ্য হিসেবে তাঁর প্রভাবও যথেষ্ট। বসুদেবের মতোই অক্রূরও হয়তো কংসের অত্যাচার সমর্থন করতেন না। তবে হরিবংশের উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি করেছে বলে বুঝতে পারলেও কংস এখনও পর্যন্ত অক্রূরকে নিজের বিশ্বস্ত বলেই মনে করেন। তাই ধনুর্যজ্ঞের আমন্ত্রণের অছিলায় কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় আনার ভার তিনি তাঁরই উপর ছেড়ে দিয়েছেন। উগ্রসেন প্রসঙ্গে অক্রূর সম্পর্কে এত কথা উল্লেখ করার কারণ মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণের মুখ থেকে পাওয়া একটি তথ্য। কৃষ্ণ

বলছেন— যদু-বৃষ্ণি কুলপ্রধানরা যখন একত্রিত হয়ে কৃষ্ণের সহায়তা চাইছেন কংসবধের জন্য, সে সময় কৃষ্ণ প্রথমেই আহুক উগ্রসেনের কন্যা সুতনুর সঙ্গে অক্রূরের বিবাহ দেন বা মনে হয় এ বিবাহ তাঁরই পরামর্শে সংঘটিত হয়েছিল—

দত্তক্রূরায় সুতনুং তামাহুকসুতাং তদা।
সংকর্ষণদ্বিতীয়েন জ্ঞাতিকার্যং ময়া কৃতম্॥

পুরাণগুলিতে যদু-বৃষ্ণি বংশের বংশলতিকা বর্ণনা করার সময় প্রায় সর্বত্রই উল্লিখিত হয়েছে যে উগ্রসেনের কন্যা উগ্রসেনা সুতনু বা সুগাত্রী বভ্রু অক্রূরের পত্নী ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের উক্তি থেকে মনে হয় যে অক্রূর আসলে কংসের পক্ষে ছিলেন, তাঁকে উগ্রসেনের পক্ষে টেনে আনার জন্যই এই বিবাহ দেওয়া হয়। সে কারণেই এই বিবাহকেও জ্ঞাতিকার্য বলেই উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণ। যাই হোক, কৃষ্ণের বুদ্ধিতে অক্রূর উগ্রসেনের পক্ষে আসেন এবং কংসবধে কৃষ্ণকে সহায়তাও করেন। কিন্তু কংসবধের পর কৃষ্ণ যখন রাজপদে উগ্রসেনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, সেই সময় থেকে খুব সম্ভব রাজপদে অধিষ্ঠিত হতে না পারার কারণেই উগ্রসেনের সঙ্গে অক্রূরের সম্পর্ক আবার তিক্ত হয়ে যায় এবং এই তিক্ততা এঁরা দুজনেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করেছেন। কৃষ্ণের মতো বিশালবুদ্ধি রাজনীতিবিদও এঁদের তিক্ত সম্পর্কের কথা বলে আক্ষেপ করেছেন। কৃষ্ণ নারদকে বলেছেন— আহুক উগ্রসেন এবং অক্রূরের মতো দুই ব্যক্তি, যাঁরা সর্বক্ষণ নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেন— তাঁরা যার আত্মীয় সে কি সুখে থাকতে পারে? কৃষ্ণের অসহায় স্বীকারোক্তি—আমি এঁদের দুজনের কাউকেই ত্যাগ করতে পারি না। ফলে আমার অবস্থা হল সেই মায়ের মতো, যাঁর দুই পুত্রই দ্যূতকার বা জুয়াড়ী। তারা যখন পাশা খেলতে যাবার আগে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তখন সেই মা যেমন একজনকে জয়ের আশীর্বাদ দিয়ে অপর জনকে বলেন তোমারও যেন পরাজয় না হয়—অক্রূর এবং আহুকের প্রতিনিয়ত কলহের মধ্যে আমার অবস্থাও অনেকটা সেরকমই—

সো'হম্ কিতবমাতেব দ্বয়োরপি মহামতে।
একস্য জয়মাশংসে দ্বিতীয়স্যাপরাজয়ম্॥

[মহা (k) ২.১৪.৩৩; ১২.৮১.১১;
(হরি) ২.১৪.৩৩; ১২.৭৯.১১]

যাইহোক, কৃষ্ণ বলরাম মথুরায় আসার পরদিন কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যু হল। মথুরা-শূরসেন অঞ্চল জরাসন্ধের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত হল এর ফলে। কংসবধের পর কংসের মৃতদেহ পড়ে রইল রঙ্গভূমির ধুলোয়। যদু-বৃষ্ণি সংঘমুখ্যরা তখন সমবেত হয়েছেন বসুদেবের গৃহে। সূর্য অস্ত গেছে। এমন সময় জনশূন্য রঙ্গভূমিতে কংসের মাতা এবং পত্নীরা কংসের মৃতদেহ ঘিরে বসে বিলাপ করতে লাগলেন। বিলাপ করতে করতেই একসময় সামনে উগ্রসেনকে দেখে উগ্রসেনপত্নী বললেন— কংসের তো মৃত্যু হয়েছে। আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুতাও শেষ হয়ে যায়। তাহলে এখন তো গিয়ে কৃষ্ণকে বলুন যেন তিনি আমার এই মৃত পুত্রের অন্ত্যেষ্টির অনুমতি দেন—

বীরভোগ্যানি রাজ্যানি বয়ং চাপি পরাজিতাঃ।
গচ্ছ বিজ্ঞাপ্যতাং কৃষ্ণঃ কংসসংকারকারণাৎ॥
মরণান্তানি বৈরাণি শান্তে শান্তির্ভবিষ্যতি।
প্রেতকার্য্যাণি কার্য্যাণি মৃতঃ কিমপরাধ্যতে॥

হতে পারে, দ্রুমিলের ধর্ষণের ফলে কংসের জন্ম হয়েছিল আর তা নিয়ে উগ্রসেনের পত্নীর আক্ষেপও ছিল অনেক। তবু কংস তাঁর প্রথম সন্তান। কংসের মৃত্যুতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েছেন। অপরদিকে উগ্রসেনও কিন্তু তিক্তভাবে আজ বলতে পারছেন না যে, এই দুরাচার আমার পুত্র নয়, অতএব এর মৃত্যুতে আমার কোনো দুঃখ নেই। তিনি তো পুত্রের মতোই পালন করেছেন কংসকে। ফলে আজ কংসের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে উগ্রসেনও আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছেন। তাঁর অন্তরে বৈরাগ্য এসেছে। বসুদেবের বাড়িতে, যেখানে কৃষ্ণ এবং সংঘমুখ্যরা সকলে রয়েছেন, সেখানে পৌঁছে উগ্রসেন কৃষ্ণের কাছে কংসের অন্ত্যেষ্টি করার অনুমতি চাইলেন। তারপর বললেন কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে—আমার পুত্র যেসব অন্যায় করেছে, তার প্রতিশোধ তুমি নিয়েছ। সৎপুরুষেরা এখন উজ্জীবিত, শত্রুরা এখন আরও ভীত এবং যদু-বৃষ্ণিকুল এখন স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত—

স্থাপিতো যাদবো বংশো গর্বিতাঃ সুহৃদঃ কৃতাঃ।

কংসের মৃত্যুতে সর্বথা তোমারই প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমি চাই, কংসের সৈন্যবাহিনী এবং অধিকৃত ধনৈশ্বর্য্য এখন তোমারই অধিকারে আসুক—

প্রতিগৃহাণ কৃষ্ণেদং কংসস্য বলমব্যয়ম্।

সমস্ত যদু-বৃষ্ণিদের এখন তুমিই গতি। অতএব আমার প্রার্থনা স্বীকার করে তুমি অনুমতি দাও যাতে আমি কংসের অন্তিম সংস্কার করতে পারি। আর আমার কিছুই প্রয়োজন নেই। কংসের অন্ত্যেষ্টি হয়ে গেলে স্ত্রী এবং পুত্রবধূদের নিয়ে বানপ্রস্থে যেতে চাই আমি।

কৃষ্ণ বেশ অবাক হলেন। চমকে গেলেন—

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য কৃষ্ণঃ পরমবিস্মিতঃ।

অত্যাচারী এবং অন্যায়ী কংসকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রক্রিয়ায় উগ্রসেন যথেষ্ট সক্রিয়ভাবেই যুক্ত ছিলেন। কংস বিরোধী গোষ্ঠীর কাছে যে তিনিই ভাবী রাজা—একথাও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তবু কৃষ্ণ বুঝলেন—শত হলেও কংস তাঁর পুত্র। ক্ষেত্রজ পুত্র, তবু তো পুত্র। তাই উগ্রসেন আজ বড়ো শোকাতুর, তাঁর অন্তরে বৈরাগ্য এসেছে, যা খুবই স্বাভাবিক। শেষপর্যন্ত কৃষ্ণের কথায় উগ্রসেন সিংহাসনে বসতে রাজি হলেন। কংসের অন্তিম সংস্কারও সম্পন্ন হল।

মথুরা থেকে দ্বারকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হবার পরেও কিন্তু উগ্রসেনই রয়ে গেছেন রাজপদে। মহাভারত-পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী উগ্রসেন অতি দীর্ঘায়ু ব্যক্তি কারণ কৃষ্ণের এই মাতামহ যদুবংশ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। শুধু জীবিতই নয়, আসীন ছিলেন সিংহাসনেও।

[মহা (k) ১.২১৯.৮; ২.২.৩৩; ৫.২৮.১২;
(হরি) ১.২১২.৮; ২.২.৩২; ৫.২৮.১২;
হরিবংশ পু. ২.৩১.৪৭-৫২; ২.৩২.১-৬৪;
বিষ্ণু পু. ৫.২১.৮-১০; ৫.২৪.৭]

☐ মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে নানা বিক্ষিপ্ত ঘটনায় রাজা উগ্রসেনকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। যদিও জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণের সময় রাজা উগ্রসেন যথেষ্টই প্রবীণ হয়েছিলেন তবু অন্যান্য বৃষ্ণি যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে মথুরা নগরীর উত্তর দ্বার রক্ষা করতে দেখা যায়। মথুরায় জরাসন্ধ এবং তাঁর মিত্ররাজারা একাধিকবার আক্রমণ করেছিলেন, প্রায় সবক্ষেত্রেই রাজা উগ্রসেনকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫০.২০নং
শ্লোকের উত্তর পাদটীকায় তৃতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্য;
১০.৫০.৪১; ১০.৫০.৪১নং শ্লোকের উত্তর
পাদটীকায় ২৫, ৩২-৩৩ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য]

☐ পাণ্ডবরা যখন পাশাখেলায় হেরে বারো বছরের জন্য বনবাসে গেলেন, সে সময় কৃষ্ণ এবং অন্যান্য যদু-বৃষ্ণি সংঘমুখ্যরা কাম্যক বনে এসেছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে। সে সময় উগ্রসেনও নিজে এসে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে। *[মহা (k) ৩.১৫.১২; (হরি) ৩.১৪.১২]*

☐ যদুবংশ ধ্বংসের প্রাক্কালে, যখন ঋষিদের শাপে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব এক মুষল প্রসব করেন, সেই সময় ভীত রাজা আহুক উগ্রসেন ওই মুষলটিকে চূর্ণ করে সমুদ্রে ফেলে দেবার আদেশ দেন। তারপর এই মর্মে আদেশ জারি করেন যে, যদু-বৃষ্ণিদের মধ্যে মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হবে। অবশ্য প্রভাসক্ষেত্রে যে প্রমোদ বিহারের দিনে গৃহযুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংস হয়—সেই অভিশপ্ত দিনটিতে উগ্রসেনের নিষেধাজ্ঞায় কর্ণপাত করেননি কেউই। যদু-বৃষ্ণিকুলের প্রত্যেকেই আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিলেন সেদিন।

তবে যদুবংশের ধ্বংস হবার ঠিক কোন পর্যায়ে এবং কীভাবে উগ্রসেনের মৃত্যু হয়েছিল, মহাভারতে তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। পুরাণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে এবং কৃষ্ণ ও বলরাম ইহলোক ত্যাগ করেছেন—এ দুঃসংবাদ শোনার পর শোকে দুঃখে উগ্রসেন অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণ ত্যাগ করেন।

[মহা (k) ১৬.১.২০-৩১; (হরি) ১৬.১.২৯-৩৪;
ভাগবত পু. ১১.৩১.১৫; ১১.৩১.১৮-১৯;
৫.৩৭.১১-১২, ৫৭; ৫.৩৮.৪]

☐ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে উগ্রসেনের সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। তবে স্বর্গারোহণ পর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজা উগ্রসেন মৃত্যুর পর বিশ্বেদেবগণে লীন হয়ে যান। এর থেকে ধারণা হয়, দ্বাপর যুগে বিশ্বেদেবগণের অংশেই উগ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন।

[মহা (k) ১৮.৫.১৭; (হরি) ১৮.৫.১৭]

উগ্রসেন$_{২}$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.১০০; ১.১১৭.৯;
(হরি) ১.৬২.১০২; ১.১১১.৯]

উগ্রসেন$_{৩}$ চন্দ্রবংশীয় রাজা পরীক্ষিতের পুত্র। (ইনি অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের বহু পূর্ববর্তী ছিলেন)। সেই পারীক্ষিত জনমেজয়ের (দ্র. জনমেজয়$_{২}$) ছয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন উগ্রসেন।

[মহা (k) ১.৯৫.৫৪; (হরি) ১.৮৯.৪৩]

উগ্রসেন$_{৪}$ অভিমন্যুর পৌত্র পারীক্ষিত জনমেজয় (জনমেজয়$_{১}$)-এর অনুজদের মধ্যেও আমরা জনৈক উগ্রসেনের নামোল্লেখ পাই। জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করলে উগ্রসেন ও ভীমসেন নামে তাঁর দুই ভাই যজ্ঞভূমি রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৩.১; (হরি) ১.৩.১;
ভাগবত পু. ৯.২২.৩৫]

উগ্রসেন$_{৫}$ মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত দেবগন্ধর্বদের মধ্যে অন্যতম। অর্জুনের জন্মোৎসবে অন্যান্য বিশিষ্ট গন্ধর্বদের সঙ্গে উগ্রসেনও উপস্থিত ছিলেন। বিরাটপর্বে একা অর্জুন যখন বিশাল কুরুসেনা আক্রমণ করলেন সেই সময় যুদ্ধ দেখতে দেবতা গন্ধর্ব প্রভৃতিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। উগ্রসেনও সেই সময় যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন।

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে উগ্রসেন গন্ধর্ব সূর্যের রথে অবস্থান করেন।

[মহা (k) ১.৬৫.৪২; ১.১২৩.৫৫; ৪.৫৬.১২;
(হরি) ১.৬০.৪২; ১.১১৭.৫৯; ৪.৫১.১২;
ভাগবত পু. ১২.১১.৩৮; বায়ু পু. ৫২.১০; ৬৯.১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১০; ২.৭.১;
বিষ্ণু পু. ২.১০.১০]

উগ্রসেন$_{৬}$ মহাভারতের বনপর্বে মহর্ষি অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে উগ্রসেন বলে সম্বোধন করেছেন। লক্ষণীয়, পুরাণে নিমিবংশীয় সমস্ত রাজাকেই জনক বলা হয়। জনক এই রাজবংশের পারিবারিক নাম। মহর্ষি অষ্টাবক্র যে রাজার সঙ্গে কথা বলেছেন, সম্ভবত তাঁর নাম ছিল উগ্রসেন। তবে মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ উগ্রসেন শব্দটিকে বিশেষণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উগ্রতেজ সম্পন্ন সেনার অধিপতি রাজাকে উগ্রসেন বলা হয়েছে বলে নীলকণ্ঠ মন্তব্য করেছেন। তবে পণ্ডিত Pargiter-এর মতে, উগ্রসেন বিশেষণ নয়, নিমিবংশীয় ওই রাজার নাম ছিল।

[মহা (k) ৩.১৩৪.১; (হরি) ৩.১১০.১;
AIHT (Pargiter), p. 96,328]

উগ্রসেনা বৃষ্ণি বংশীয় অক্রূরের পত্নী। বায়ু পুরাণে অবশ্য আমরা উগ্রসেনী নাম পাই। উগ্রসেনা এবং উগ্রসেনী নামে একজনকেই চিহ্নিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। মৎস্য পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী উগ্রসেনার গর্ভে অক্রূরের দুটি পুত্র হয়, যাদের নাম দেববান এবং উপদেব। বায়ু পুরাণ মতে তাঁদের নাম দেব এবং অনুদেব।

[বায়ু পু. ৯৬.১১২; মৎস্য পু. ৪৫.৩১]

উগ্রসেনী *[দ্র. উগ্রসেনা]*

উগ্রা$_{১}$ দেবী ভগবতী কনখল তীর্থে দেবী উগ্রা নামে বিরাজ করেন। *[দেবী ভাগবত পু. ৭.৩৮.২৫;*
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল মাহাত্ম্য) ২.২.৩৫]

উগ্রা$_{২}$ দেবী উগ্রতারার আটজন যোগিনীর একজন।

[কালিকা পু. ৬১.৬৮]

উগ্রায়ুধ$_{১}$ মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে যুধিষ্ঠির জনৈক চক্রবর্তী রাজা উগ্রায়ুধের নাম উল্লেখ করেছেন। উগ্রায়ুধ পরাক্রমশালী ভীষ্মের হাতে পরাজিত এবং নিহত হয়েছিলেন। তবে এই উগ্রায়ুধ কোন বংশের রাজা ছিলেন বা ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর শত্রুতার কী কারণ ছিল এর কোন বিশদ বিবরণ মহাভারতে নেই। তবে মহাভারতের অন্যান্য কাহিনীতে, খিল হরিবংশ এবং অন্যান্য পুরাণে এই উগ্রায়ুধের পরিচয় আমরা বিশদভাবে পাই। শুধুমাত্র একজন চক্রবর্তী রাজা হিসেবে নয়, উগ্রায়ুধের উত্থান-পতনের ইতিহাস কুরু-পাঞ্চালদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

পুরাণ মতে উগ্রায়ুধ ছিলেন পুরুবংশীয় দ্বিমীঢ়ের পুত্র (হরিবংশ পুরাণ মতে অজমীঢ়েরই অন্যতম পুত্র) যবীনরের বংশধারায় কৃতের পুত্র। তাঁর উত্থানের মাধ্যমে যযাতির পুত্র পুরুর বংশরেখায় জ্ঞাতিশত্রুতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

রাজা অজমীঢ়ের পত্নী নীলিনীর গর্ভজাত পুত্র নীলের বংশধারায় পাঞ্চালদের উদ্ভব। পঞ্চালরাজ পৃষতের পিতামহ উগ্রায়ুধের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত

ও নিহত হলেন। পৃষত পালিয়ে গেলেন দক্ষিণে কাম্পিল্য নগরে। উগ্রায়ুধ পঞ্চালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এইসময় কাম্পিল্য নগরী ছিল নীপ বংশীয়দের রাজধানী। নীপ ছিলেন অজমীঢ়েরই অন্য পত্নী ধূমিনীর গর্ভজাত বৃহদ্বসুর বংশের এক রাজা। নীপ এবং নীপবংশীয় ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি মহান রাজর্ষির রাজধানী ছিল কাম্পিল্য। কাম্পিল্যে যে সময় পৃষত গিয়ে আশ্রয় নিলেন, সে সময় নীপবংশের শেষ রাজা ভল্লাটের পুত্র জনমেজয় দুর্বুদ্ধি সেখানে রাজত্ব করছিলেন। পুরাণে বার বার বলা হয়েছে যে, এই জনমেজয়ের কারণেই উগ্রায়ুধ নীপবংশ ধ্বংস করেন। মহাভারতেও নীপবংশীয় জনমেজয়ের উল্লেখ আমরা পাই অবিনয়ী, জ্ঞাতিচ্ছেদী রাজা হিসেবে। সম্ভবত জনমেজয়ের কারণেই নীপবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে উগ্রায়ুধ নীপবংশ ধ্বংস করে কাম্পিল্য দখল করে নেন। ফলে দুই রাজ্যেই উগ্রায়ুধের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। পুরাণ মতে ক্ষেম নামে তাঁর এক পুত্র ছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পুরু রাজবংশের মূলধারায় (অর্থাৎ হস্তিনাপুরে) রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হল। দুই বালক পুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্য আর বিধবা পত্নী সত্যবতীকে রেখে শান্তনু রাজা পরলোক গমন করলেন। শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম সিংহাসনের অধিকারী নন, তবু এ অবস্থায় শাসনভার ন্যস্ত হল তাঁরই হাতে। হরিবংশের বর্ণনায় মহামতি ভীষ্মের বয়ানে দেখতে পাচ্ছি—শান্তনুর পারলৌকিক ক্রিয়া তখনও সম্পন্ন হয়নি, এমন সময় ভীষ্মের কাছে উগ্রায়ুধের দূত এসে পৌঁছাল। উগ্রায়ুধ প্রস্তাব দিলেন, শান্তনুর বিধবা সুন্দরী সত্যবতীকে তাঁর কাছে পাঠাতে হবে, তাতেই হস্তিনাপুরের মঙ্গল। ক্রুদ্ধ ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের এবং মন্ত্রীদের পরামর্শে পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখলেন বটে, ভাল কথায় বোঝাবার চেষ্টাও করলেন অনেক, কিন্তু উগ্রায়ুধ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। শেষ পর্যন্ত উগ্রায়ুধ যুদ্ধে ভীষ্মের হাতে পরাজিত ও নিহত হলেন। ফলে একই সঙ্গে পঞ্চাল ও কাম্পিল্যের সিংহাসন শূন্য হল। এই সুযোগে পৃষত এই দুই রাজ্য অধিকার করলেন এবং উত্তর পঞ্চাল (পূর্বতন পঞ্চাল) এবং দক্ষিণ পঞ্চাল (কাম্পিল্য এবং সংলগ্ন এলাকা) এই দুই রাজ্যেই তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

সম্ভবত এই ঘটনার ফলেই পুরুবংশীয় রাজা সম্বরণের সময় থেকে কুরু ও পাঞ্চালদের মধ্যে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল তাতে সাময়িক বিরতি পড়ে এবং দুই রাজ্যের মধ্যে সাময়িক মৈত্রী স্থাপিত হয়।

মৎস্য পুরাণে এই উগ্রায়ুধের কাহিনীটি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বর্ণিত। সেখানে উগ্রায়ুধ চিহ্নিত হয়েছেন সূর্যবংশজাত তপোবনবাসী রাজর্ষি হিসেবে। তবে মৎস্য পুরাণের কাহিনীটিতে অলৌকিকতার অভিনবত্ব যতই থাকুক, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে এই কাহিনী যে ইতিহাস-সম্মত নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

[মহা (k) ১২.২৭.১০; ৫.৭৪.১৩;
(হরি) ১২.২৭.১০; ৫.৬৯.১৩;
বায়ু পু. ৯৯.১৮২, ১৯১; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৫;
ভাগবত পু. ৯.২১.২৯; মৎস্য পু. ৪৯.৫৯-৭৮;
হরিবংশ পু. ১.২০ অধ্যায়;
The Vishnu Purana (Wilson), Vol.4,
p. 143-144; AIHT (Pargiter) p. 166]

উগ্রায়ুধ$_২$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অনাতম। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় অন্যান্য কৌরব ভ্রাতাদের সঙ্গে উগ্রায়ুধও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৯; ১.১১৭.৭; ১.১৮৬.২;
(হরি) ১.৬২.১০১; ১.১১১.৭; ১.১৭৯.২]

উগ্রায়ুধ$_৩$ মহাভারতের শল্যপর্বে জনৈক কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধা উগ্রায়ুধের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র কৌরবপক্ষের পরাজয়ের খবর শুনে যেসব পরাক্রমশালী কৌরবযোদ্ধার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছিলেন, তাঁদেরই অন্যতম উগ্রায়ুধ। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ধনুর্বিদ্যার অন্যতম বিশারদ বলেছেন, তবে এই উগ্রায়ুধ কোন দেশের বা কোন বংশসম্ভূত যোদ্ধা ছিলেন তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

[মহা (k) ৯.২.৩৭; (হরি) ৯.২.৩৬]

উগ্রায়ুধ$_৪$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী জনৈক পাঞ্চাল যোদ্ধা। চিত্র, উগ্রায়ুধ প্রভৃতি আটজন একত্রে কর্ণকে আক্রমণ করলে কর্ণের বাণে তাঁরা সকলেই নিহত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৮.৫৬.৪৪-৪৮; (হরি) ৮.৪২.৪৪-৪৮]

উগ্রায়ুধ$_{৫}$ মহাভারতের কর্ণপর্ব থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে অংশগ্রহণকারী জনৈক সংশপ্তক যোদ্ধার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁকে জনৈক উগ্রায়ুধের পুত্র বলা হয়েছে। অর্জুন তাঁকে হত্যা করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ৮.১৯৭; (হরি) ৮.১৪.৭]

উগ্রায়ুধ$_{৬}$ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বর্ণিত শিব সহস্রনামে উল্লেখ না থাকলেও মহাভারতে দু-বার ভগবান শিব উগ্রায়ুধ নামে কীর্তিত হয়েছেন। মহাভারতের দ্রোণপর্বে ব্যাসদেব অর্জুনকে শিবের যে শতরুদ্রীয় স্তব শুনিয়েছেন সেখানেও শিব উগ্রায়ুধ নামে উল্লিখিত হয়েছেন। শান্তিপর্বেও আমরা এই নামেই শিব-মহাদেবকে চিহ্নিত হতে দেখি। ত্রিশূল, পিনাক ধনুক প্রভৃতি উগ্র বা ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেন বলেই তাঁর এই নাম। *[মহা (k) ৭.২০২.৪৫; ১২.২৮৯.১৮; (হরি) ৭.১৭০.৪০; ১২.২৮২.১৮]*

উগ্রাস্য অসুরাধিপতি মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী দুর্গা তাকে ত্রিশূল দিয়ে বধ করেন। *[দেবী ভাগবত পু. ৫.৬.১৫; মার্কণ্ডেয় পু. ৮৩.১৮]*

উগ্রেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এর দর্শনে সকল পাপ প্রশমিত হয়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৭০]

উচ্চৈঃশ্রবা$_{১}$ অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা। হস্তীকুলের মধ্যে যেমন ঐরাবত শ্রেষ্ঠ, ঠিক তেমনই অশ্বকুলের অধিপতি হলেন উচ্চৈঃশ্রবা। বস্তুত, শ্রবস্ শব্দের অর্থ হল কান বা শ্রবণেন্দ্রিয়। সেক্ষেত্রে উচ্চৈঃশ্রবা শব্দের একটি অর্থ হতে পারে দীর্ঘকর্ণ। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের কান দুটির সুন্দর আকৃতির কারণে তার এমন নাম হয়ে থাকতে পারে। তবে উচ্চৈঃশ্রবা শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে যার নাম বা যশ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অশ্বকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন বলেই তাঁর নাম উচ্চৈঃশ্রবা।

উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম বা উৎপত্তি বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণে অমৃতমন্থনের যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সমুদ্রমন্থনের সময় সমুদ্রের তলদেশ থেকেই উঠে এসেছিলেন উচ্চৈঃশ্রবা।

তবে বায়ুপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উল্লেখ করেছে যে, সুরভির কন্যা গান্ধর্বী ছিলেন অশ্বকুলের জন্মদাত্রী। উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি বিশিষ্ট অশ্বগুলি তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

[মহা (k) ১.২.৯১; ১.১৭.২; ১.১৮.৩৭; ৫.১০২.১২; (হরি) ১.২.৯২; ১.১৩.২; ১.১৪.৩৯; ৫.৯৫.১২; রামায়ণ ১.৪৫.৬৯; বায়ু পু. ৬৬.৭৩; ৭০.১০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৭৬; ২.৮.১০; মৎস্য পু. ৮.৮; ভাগবত পু. ৮.৮.৩]

□ মহাকাব্য পুরাণে সর্বত্রই উল্লিখিত হয়েছে যে, সমুদ্রমন্থন থেকে জাত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গলোকে বিরাজ করেন। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব দেবলোকবাসী বলেই প্রচলিত ধারণা যে, উচ্চৈঃশ্রবা দেবরাজ ইন্দ্রের অশ্ব। কিন্তু মহাকাব্য পুরাণে ইন্দ্রকে বহুবার ঐরাবতে আরোহণ করতে দেখা গেলেও কখনোই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বে আরোহণ করতেন—এমন উল্লেখ মেলে না। অশ্বপালন এবং অশ্বের ব্যবহার আর্য সভ্যতার অন্যতম অবদান। হয়তো সেই কারণেই অশ্বকুলের অধিপতি উচ্চৈঃশ্রবার অধিকারী হিসেবে আর্যসভ্যতার প্রাচীন দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের ভাবনা এসেছে। তবে রামায়ণে একটি শ্লোকে উচ্চৈঃশ্রবাকে সূর্যের রথের অন্যতম অশ্ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[রামায়ণ ৭.২৫.৫]

□ মহাভারতে কশ্যপ প্রজাপতির দুই পত্নী কদ্রু এবং বিনতার যে উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, তাতে উচ্চৈঃশ্রবার উপস্থিতি পরোক্ষ হলেও, গোটা ঘটনায় উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কশ্যপের দুই পত্নী দক্ষপ্রজাপতির কন্যা কদ্রু এবং বিনতা। দুই সতীনে সদ্ভাব তো ছিলই না বরং সবসময়ই তাঁরা ছোটোখাটো বিষয়ে একে অপরকে পরাস্ত এবং পদানত করার চেষ্টা করতেন। একদিন কদ্রু বিনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বলো দেখি, উচ্চৈঃশ্রবার গায়ের রং কেমন? বিনতা সহজভাবেই উত্তর দিলেন— ধবধবে সাদা। তারপরই তিনি কদ্রুকে বললেন—কেন, তোমার কী ধারণা? তোমার উত্তর যদি অন্যরকম হয় তাহলে তুমিও সেটা বলো। তারপর চলো, আমরা পণ রাখি। যার উত্তর ভুল হবে সে পাঁচশো বছর অপরজনের দাসী হয়ে থাকবে। কদ্রুর মাথায়

দুষ্টবুদ্ধি জন্মাল। তিনি বললেন—বেশ, তাই হবে। তবে কি জানো, আমার ধারণা উচ্চৈঃশ্রবার গায়ের রং ধবধবে সাদাই বটে, শুধু তার লেজটি কালো। স্থির হল, পরদিন সকালে উঠে দুজনে মিলে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখতে যাবেন। এরপর কদ্রু নিজের সর্পপুত্রদের ডেকে বললেন—শোনো বাছারা। তোমরা গিয়ে উচ্চৈঃশ্রবার লেজের উপর ঝুলে থাকো। যাতে উচ্চৈঃশ্রবার লেজটিকে কালো বলে মনে হয়। তাহলেই আমি জিতব এবং বিনতা আমার দাসী হয়ে থাকবে। পুত্রদের মধ্যে অনেকেই মাতার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন। কিন্তু কয়েকজন এমন অন্যায় কাজ করতে সম্মত হলেন না। কদ্রু সেই পুত্রদের শাপ দিলেন—তোমরা যখন আমার আদেশ পালন করলে না, তখন তোমরা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে পুড়ে মরবে। তবে কদ্রুর অনুগত পুত্রেরা মায়ের আদেশ বেশ ভালোভাবেই পালন করেছিলেন। ফলে পরদিন ভোরে উঠে যখন কদ্রু-বিনতা উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখতে গেলেন। তখন স্পষ্টই দেখা গেল যে, উচ্চৈঃশ্রবার লেজ কালো। এই ঘটনার পর প্রায় পাঁচশো বছর শর্ত মতো বিনতা কদ্রুর দাসী হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.২০.১-৮; ১.২২.১-৪;
(হরি) ১.১৬.১-৮; ১.১৯.১-৪]

উচ্চৈঃশ্রবা$_{২}$ পুরুবংশীয় রাজর্ষি কুরুর জ্যেষ্ঠপুত্র অবিক্ষিৎ। এই অবিক্ষিতের পুত্রদের মধ্য উচ্চৈঃশ্রবা একজন।

[মহা (k) ১.৯৪.৫৩; (হরি) ১.৮৯.৪০-৪১]

উচ্ছিখ জনমেজয়ের সর্পসত্রে তক্ষকবংশীয় যে-সব নাগ ভস্মীভূত হয়েছিলেন উচ্ছিখ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ১.৫৭.৯; (হরি) ১.৫২.৯]*

উচ্ছৃঙ্গ তারকাসুরকে বধ করার জন্য যখন দেবতারা স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তার জন্য অনুচর রূপে স্কন্দকে দান করেন। বিন্ধ্যপর্বত তাঁর যে দুইজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, উচ্ছৃঙ্গ তাঁদের মধ্যে একজন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে একে উচ্ছিহ্নত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[মহা (k) ৯.৪৫.৪৯-৫০; (হরি) ৯.৪২.৪৭]

উচ্ছৃত তারকাসুর বধের আগে দেবতারা স্কন্দ কার্তিকেয়কে সেনাপতি পদে বরণ করেছিলেন এবং দেবতারা তাঁদের পার্ষদ দেবতাদের কার্তিকেয়কে দান করেছিলেন। সেই সময় বিন্ধ্যপর্বত উচ্ছৃত নামে এক অনুচর দান করেছিলেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩০.৫৬]

উচ্ছেষণাদ পিশাচদের একটি গণ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৮৩]

উজ্জন্তপর্বত একটি পবিত্র পর্বত। এখানে যোগেশ্বররূপী মহাদেবের আবাস। উজ্জন্ত পর্বতে ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রম। মৎস্য পুরাণে অবশ্য উজ্জন্ত বা উজ্জানককে একটি জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[বায়ু পু. ৭৭.৫৩; ৪৫.৯২;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২২; মৎস্য পু. ১২১.৫৬]

□ গিরনার পাহাড়। এটি একাধিক নামে পরিচিত যেমন—উরজয়ৎ, উর্জয়ন্ত ইত্যাদি। অনেকে আবার রৈবতক পর্বতকেই উজ্জন্ত পর্বত বলে মনে করেন। *[EAIG (Kapoor) p. 676]*

উজ্জানকতীর্থ বাতিকখণ্ড দেশের অন্তর্গত একটি হ্রদ-তীর্থ। ঋষি বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী এবং যবক্রী মুনি এই হ্রদেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন—

এষ উজ্জানকো নাম যবক্রীর্যত্র শান্তবান্।
অরুন্ধতী সহায়শ্চ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥

চৈত্রমাস উজ্জানক তীর্থ দর্শনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত সময়। মহাদেব এই তীর্থে অধিষ্ঠান করেন। ঋষি আর্ষ্টিষেণ ও ঋষি পিঙ্গারের আশ্রম উজ্জানক তীর্থে অবস্থিত।

[মহা (k) ৩.১৩০.১৫-১৭; ১৩.২৫.৫৫;
(হরি) ৩.১০৭.১৫-১৭; ১৩.২৬.৫৫]

উজ্জ্বল ওঙ্কারক্ষেত্রে কুঞ্জল নামে এক শুক বসবাস করত। তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উজ্জ্বল।

[পদ্ম পু. (ভূমিখণ্ড) ৮৫.৩০-৩২]

উঞ্ছবৃত্তি *[দ্র. শিলোঞ্ছবৃত্তি]*

উঞ্জিক যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু। যদুর পুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন উঞ্জিক।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.২]

উড্ডীয়ান উড্ডীয়ান নামক স্থানে দেবী সতীর উরুদ্বয় পতিত হয়। দেবী এই স্থানে ‘কাত্যায়নী’ নামে বিরাজমানা। *[কালিকা পু. ১৮.৪২]*

উড্র ভারতের একটি প্রাচীন জনপদ। উৎকল দেশের অংশ। মহাভারত ও পুরাণে একে ভারতের দক্ষিণ

সীমার একটি প্রসিদ্ধদেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

তত্রান্তে ভারতে বর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিতঃ।
ওড্রদেশ ইতি খ্যাতঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কঃ॥
এখানে ওড্রেশ্বর জগন্নাথদেব পূজিত হন।

[ব্রহ্ম পু. ২৮.১; কালিকা পু. ৬৪.৪৪]

☐ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রাচীনকালে আর্যাবর্তের সীমাকেই ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা বলে গণ্য করা হত। সেদিক থেকে বিচার করলে আর্যাবর্তের দক্ষিণ সীমায় ওড্রদেশ বা উৎকল অবস্থিত ছিল বলেই একে ভারতবর্ষের দক্ষিণার্ধের জনপদ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে মনে হয়। উড্রদেশের রাজা দিগ্‌বিজয়ী সহদেবের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

[মহা (k) ২.৩১.৭১; (হরি) ২.৩০.৬৯]

☐ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য উড্র দেশের অধিপতি ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৫০.২২; (হরি) ৩.৪৩.২২]

☐ অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে উৎকল বা উড়িষ্যার দক্ষিণাংশকে উড্র বা ওড্রদেশ বলে উল্লেখ করা হতো। ওড্রদেশের ভৌগোলিক সীমা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পণ্ডিত N.L. Dey-এর মতে উড্র দেশ উত্তর দিকে ব্রজমণ্ডল বা উড়িষ্যার জয়পুর নামে স্থানটি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। *[GP (S.M. Ali) p. 236; GDAMI (Dey) p. 142]*

☐ পণ্ডিত Subodh Kapoor-এর মতে প্রাচীন ওড্রদেশ বলতে মহানদী ও সুবর্ণ ঋক্ষনদীর অববাহিকা অঞ্চলটিকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ উড়িষ্যার কটক, সম্বলপুর ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি অংশ ওড্র দেশের অন্তর্গত ছিল। উড্রদেশের উত্তরে ছিল জাসপুর (Jashpur) ও সিংভূম এবং দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা, পূর্বে বঙ্গোপসাগর। *[দ্র. উৎকল]*

[EAIG (Kapoor) p. 502]

উৎকচা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে খশার গর্ভজাত কন্যাসন্তানদের মধ্যে একজন। ইনি উৎকচেয় নামক রাক্ষসগোষ্ঠীর জন্মদাত্রী। মা উৎকচার নামেই তাদের পরিচয়। *[বায়ু পু. ৬৯.১৭০, ১৭২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৩৮]*

উৎকর্ষিণী কালিকা পুরাণে বাসুদেব কৃষ্ণের পূজায় তাঁর সাথে আটজন যোগীর পূজা করার বিধান আছে। এই যোগীদের মধ্যে বলভদ্র একজন। কালিকা পুরাণে প্রত্যেক যোগীর একজন করে যোগিনী কল্পিত হয়েছে। বলভদ্রের যোগিনীর নাম উৎকর্ষিণী। *[কালিকা পু. ৮০.১২৮]*

উৎকল$_1$ রাজা ইল-সুদ্যুম্নের অন্যতম পুত্র। সুদ্যুম্ন তাঁকে যে জনপদের রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, উৎকলের নামানুসারে সেই জনপদটিই উৎকল নামে খ্যাত হয়।

[দ্র. উৎকল$_2$]

উৎকল$_2$ একটি প্রাচীন মধ্য ভারতীয় জনপদ। মৎস্য পুরাণে একে বিন্ধ্যপর্বত সংলগ্ন একটি দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলা পুরুষত্ব লাভ করে সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন। রাজা সুদ্যুম্নের তিন পরাক্রমশালী পুত্রদের অন্যতম উৎকল। তিনিই এই জনপদটির শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর নামানুসারেই এই দেশটির নাম উৎকল—

পুনঃ পুত্রত্রয়মভূৎ সুদ্যুম্নস্যাপরাজিতম্॥
উৎকলো বৈ গয়স্তদ্বদ্ধরিতাশ্বশ্চ বীর্য্যবান্।
উৎকলস্যোৎকলা নাম গয়স্য তু গয়া মতা॥

মহাবীর কর্ণ একবার দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে উৎকলদেশ জয় করেছিলেন। উৎকলদেশের অধিবাসীরাও উৎকল নামে পরিচিত।

উৎকলকে মহাভারতে ও পুরাণে কোথাও কোথাও উড্র, ওড্র বা ঔড্র বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৬.৯.৪১; ৭.৪.৮; ৮.২২.২১; (হরি) ৬.৯.৪১; ৭.৩.৩১; ৮.১৭.২১; ভাগবত পু. ৯.১.৪১; বায়ু পু. ৮৫.১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৬৩; ২.৬০.১৮; মৎস্য পু. ১১৪.৫২, ৫৪; ১২.১৭; বায়ু পু. ৪৫.১৩২, ৮৫.১৯; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৫৩, ১১১.১৫-১৬]

☐ বর্তমান উড়িষ্যা। উৎকল বলতে মূলতঃ উত্তর কলিঙ্গ ও চৌদুয়ার (chauduar) অঞ্চলকে বোঝানো হয়। মহাভারতের বনপর্বের একটি অংশে কলিঙ্গদেশ বা উড়িষ্যার সীমারেখা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, যা থেকে মনে হয় মহাভারতের কালে উত্তর কলিঙ্গের সীমা ছিল বৈতরণী নদী পর্যন্ত। তবে কালিদাসের রঘুবংশে আবার উৎকলকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন জনপদ রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রঘুবংশ থেকে জানা যায় যে, ঋষিকুল্যা নদী থেকে সুবর্ণরেখা ও

মহানদী পর্যন্ত অঞ্চলটি উৎকল নামে পরিচিত ছিল। পূর্বে কপিশ নদী থেকে পশ্চিমে মহাকাল পর্বত পর্যন্ত ছিল এর বিস্তার। ব্রহ্ম পুরাণেও উৎকল ও কলিঙ্গকে দুটি পৃথক জনপদরূপেই উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.১১৪.৩-৫; (হরি) ৩.৯৫.৩-৫; ব্রহ্ম পু. ৪৭.৭-৮; GDAMI (Dey), p. 213; EAIG (Kapoor), p. 677]

☐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এবং বায়ু পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, উৎকলদেশ বামন নামক দিগ্‌হস্তীর বংশধরদের বাসভূমি। বর্তমান যুগেও ওড়িশা রাজ্যের বিভিন্ন অভয়ারণ্যে প্রচুর হাতি দেখতে পাওয়া যায়। হাতিদের সংরক্ষণের জন্য ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কাছে Chandaka Elephant Reserve গড়ে উঠেছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৫৮; বায়ু পু. ৬৯.২৪০]

☐ স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডের পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য উপপর্বে উৎকল দেশে বিরাজমান দারুব্রহ্ম তীর্থ বা জগন্নাথ ধামের উল্লেখ রয়েছে। উড়িষ্যার পুরীধামই স্কন্দ পুরাণে উল্লিখিত সেই পবিত্র তীর্থ। স্কন্দ পুরাণ এই তীর্থটির আদিবৃত্তান্ত, উৎপত্তি রহস্যের সাথে একটি অবস্থানগত বিবরণও দিয়েছে। জৈমিনি অন্যান্য মুনিদের বলছেন—দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে এই ক্ষেত্রটি দশ যোজন বিস্তৃত, এর একপাশে সমুদ্র আর মধ্যে বৃহৎ নীল পর্বত। নীল পর্বতের মধ্যস্থলে অক্ষয় বটের মূল থেকে বায়ু কোণে রৌহিণ নামে একটি কুণ্ড আছে। বর্তমান পুরীর অবস্থানের সাথে এই বিবরণ নিখুঁতভাবে মিলে যায়। *[দ্র. ইন্দ্রদ্যুম্ন$_{১}$]*

[স্কন্দ পু. (বিষ্ণু/পুরুষোত্তমক্ষেত্র) ১-৩০ অধ্যায়]

উৎকল$_{৩}$ রাজর্ষি ধ্রুবের পত্নী ছিলেন বায়ুর কন্যা ইলা। ইলার গর্ভে ধ্রুবর ঔরসে উৎকল নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ইনি বাল্যকাল থেকে শান্ত, আসক্তি শূন্য ছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি ব্রহ্মাকে জানতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং জাগতিক সমস্ত বস্তু এবং ব্রহ্মাকে একাত্মক বলে জানার ফলে তাঁর ইহলৌকিক কামনা বাসনা কিছু ছিল না। তিনি জীবন্মুক্ত ছিলেন। সাধারণ মানুষজন তাঁকে মূর্খ বা পাগল বলে মনে করত। তাই ধ্রুবর মৃত্যুর পর মন্ত্রীরা বিচার বিবেচনা করে জ্যেষ্ঠপুত্র উৎকলের পরিবর্তে কনিষ্ঠ পুত্র বৎসরকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

[ভাগবত পু. ৪.১০.২; ৪.১৩.৬-১০]

উৎকল$_{৪}$ একজন দৈত্য। ইনি বৃত্রাসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইন্দ্র-বৃত্রাসুরের যুদ্ধে ইনি বৃত্রাসুরের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। তবে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন বৃত্রাসুরের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত সেই সময় উৎকল প্রভৃতি সেনাপতিরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন বলে জানা যায়। *[ভাগবত পু. ৬.১০.২০]*

উৎকল$_{৫}$ দৈত্যরাজ বলির সেনাপতিদের মধ্যেও আমরা উৎকল নামে এক দৈত্যের উল্লেখ পাই। বলি স্বর্গলোক আক্রমণ করলে যে ভয়ানক দেবাসুর যুদ্ধ হয়, উৎকল সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ৮.১০.২১, ৩৩]*

উৎকল$_{৬}$ একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

[মৎস্য পু. ১৪৫.১০৩]

উৎকলা ভাগবত পুরাণ অনুসারে স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধারায় চিত্ররথের পুত্র সম্রাটের পত্নী উৎকলা। তাঁর গর্ভে সম্রাটের মরীচি নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৫.১৫.১৫]

উৎকুর দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের পুত্রদের মধ্যে একজন। *[গরুড় পু. ১.৬.৪৬; বায়ু পু. ৬৭.৬৭]*

উৎকোচক মহাভারতে উল্লিখিত একটি তীর্থের নাম। এটি একটি তপোবন। দেবলের ছোটো ভাই ধৌম্য এই তপোবনে তপস্যা করেছিলেন। সেখানে তাঁর একটি আশ্রমও ছিল। পাণ্ডবরা গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণের পরামর্শে এই উৎকোচক তীর্থে গিয়ে ধৌম্যকে সসম্মানে পুরোহিত পদে বরণ করেন।

[মহা (k) ১.১৮৩.২, ৬; (হরি) ১.১৬৭.২, ৬]

উৎক্রাথিনী স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৬ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

উৎক্রোশ$_{১}$ তারকাসুরকে বধ করার জন্য যখন দেবতারা স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তার জন্য অনুচর

রূপে স্কন্দকে দান করেন। ইন্দ্র তাঁর যে দুইজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, উৎক্রোশ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৩৫-৩৬; (হরি) ৯.৪২.৩৪]

উৎক্রোশ$_{২}$ একজন রাক্ষস। তিনি পাতালের ষষ্ঠ তলে বসবাস করেন বলে বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে। *[বায়ু পু. ৫০.৩৮]*

উৎপলাক্ষী$_{১}$ দেবী ভগবতী সহস্রাক্ষ নামক স্থানে দেবী উৎপলাক্ষী নামে প্রসিদ্ধা।

[দেবী ভাগবত পু. ৭.৩০.৬৫; মৎস্য পু. ১৩.৩৪]

উৎপলাক্ষী$_{২}$ দেবী ভগবতী সুর্বণাক্ষ নামক স্থানে দেবী উৎপলাক্ষী নামে প্রসিদ্ধা।

[দেবী ভাগবত পু. ৭.৩৮.২৮]

উৎপলাবততীর্থ মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্বে একে পঞ্চাল দেশের অন্তর্গত একটি পবিত্র বনভূমি এবং তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানটি মূলত বনাঞ্চল বলেই বোধহয় অনুশাসনপর্বের অন্তর্গত তীর্থমাহাত্ম্যে একে উৎপলাবন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র একসময় উৎপলাবনে এক বহুদক্ষিণাযুক্ত বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মহর্ষি পরশুরাম। তিনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের অনেক প্রশংসাও করেছিলেন। এই উৎপলাবততীর্থে স্নান এবং পিতৃতর্পণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায় বলে বর্ণিত হয়েছে মহাভারতের অনুশাসন পর্বে।

[মহা (k) ৩.৮৭.১৫-১৬; ১৩.২৫.৩৪;
(হরি) ৩.৭২.১৫-১৬; ১৩.২৬.৩৪]

□ পণ্ডিত N. L. Dey-র মতে, বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহর থেকে চোদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত বিঠূর নামক স্থানটিই প্রাচীন উৎপলাবত বা উৎপলারণ্য। লক্ষণীয়, কানপুরের অবস্থান প্রাচীন দক্ষিণ পঞ্চাল জনপদের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচীন পঞ্চাল দেশ বলতেও মূলত উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমিকেই বোঝায় (Upper Gangetic Plain) সেক্ষেত্রে বিঠূর অঞ্চলে উৎপলারণ্যের অবস্থান বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। তবে উৎপলারণ্যের অবস্থান নির্ণয় করেই পণ্ডিত Dey লিখছেন যে, এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল রামায়ণের কবি বাল্মীকির আশ্রম। সীতা এই আশ্রমেই লব-কুশের জন্ম দান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, রামায়ণে বাল্মীকির তপোবন গঙ্গা এবং তমসা নদীর নিকটে অবস্থিত ছিল বলে উল্লিখিত হলেও স্থানটি পঞ্চালের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল কী না—তেমন কোনো আভাস সেখানে মেলে না। তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও রামায়ণের ঘটনা প্রবাহ এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করলে N. L. Dey-র মন্তব্যের যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যায়। লক্ষণীয়, রামায়ণের তমসা নদী গঙ্গার দক্ষিণতীরের উপনদী যেটি গঙ্গায় এসে মিশেছে প্রতিষ্ঠানপুর বা বর্তমান এলাহাবাদের অনতিদূরে। স্থানটি বর্তমান কানপুর থেকেও খুব বেশি দূরে নয়। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে—সীতাকে বনবাসে নিয়ে যাবার সময় অযোধ্যা থেকে যাত্রা করে লক্ষ্মণ গঙ্গাতীরে পৌঁছান এবং গঙ্গা পার হবার পর সেখানকার বনভূমিতে সীতাকে রেখে আসেন। কাছেই তমসা নদী এবং বাল্মীকির তপোবন। শত্রুঘ্ন যখন মথুরা জয় করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখনও গঙ্গা পার হয়ে এই স্থানে এসেছিলেন। বর্ষাকাল, তার উপর সন্ধ্যা নেমে এসেছে এবং সামনে গভীর বনভূমি। তা দেখে শত্রুঘ্ন সেই রাত্রিটুকু বাল্মীকির তপোবনেই আশ্রয় নেন এবং সীতার পুত্রজন্মের খবর শুনতে পান। গঙ্গা তীরের এই বনভূমি প্রায় পঞ্চাল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া যথেষ্ট সম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ, বাল্মীকির তপোবন থেকে যমুনাতীর পর্যন্ত শত্রুঘ্ন বনের মধ্য দিয়েই চলছিলেন এবং বিভিন্ন ঋষি-মহর্ষিদের তপোবনে আশ্রয় নিচ্ছিলেন রাত্রে। এই সুবিস্তৃত বনভূমিটিকেই মহাভারতে পঞ্চালের নিকটবর্তী উৎপলাবন বলা হয়েছে।

[রামায়ণ ৭.৫৬.২৩; ৭.৫৯.১-১৯; ৭.৭৮.১-৭;
৭.৭৯.১-১৭; GDAMI (Dey) p. 213, p. 202]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঔত্তম মনুর জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে রাজা উত্তমের উপাখ্যান এসেছে। এই উত্তম রাজত্ব করতেন প্রতিষ্ঠানপুরে। কাছেই উৎপলাবতবন। প্রতিষ্ঠানপুর বা আধুনিক এলাহাবাদ অঞ্চলটির কাছেই যে উৎপলাবন অবস্থিত ছিল তা রামায়ণের উল্লেখ থেকেও বেশ স্পষ্ট। সমস্যা হয়েছে রাজা উত্তমের পিতা উত্তানপাদের রাজধানীটি ব্রহ্মাবর্ত নামে চিহ্নিত হওয়ায়। কারণ, ব্রহ্মাবর্ত বলতে আমরা সাধারণত

সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড বা কুরুক্ষেত্রকেই বুঝি। তবে পণ্ডিত N. L. Dey মন্তব্য করেছেন যে উত্তানপাদ বা উত্তমের রাজ্য ব্রহ্মাবর্ত আদৌ কুরুক্ষেত্র নয়। এটি বিঠুর অঞ্চলের কাছেই অবস্থিত একটি স্থান। এই নামে সেখানে গঙ্গার একটি ঘাটও আছে বলে জানা যায়। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৬৯-৭০ অধ্যায়; GDAMI (Dey) p. 40]*

উৎপলাবতী মলয় পর্বতজাত একটি পবিত্র নদী। অবশ্য বামন পুরাণ মতে উৎপলাবতীর উৎপত্তিস্থল শুক্তিমান্ পর্বত।

[বায়ু পু. ৪৫.১০৫; মৎস্য পু. ১১৪.৩০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩৬; বামন পু. ১৩.৩২]

□ যদিও মহাভারতে উৎপলাবতী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে আমাদের প্রাপ্ত সংস্করণগুলির মধ্যে শুধুমাত্র বম্বে সংস্করণ ও কিশোরীমোহন গাঙ্গুলীর অনুবাদেই উৎপলাবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পণ্ডিত উইলসন বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত ভারতবর্ষ বর্ণনার শেষে মহাভারতের 'জম্বুখণ্ডবিনির্মাণ' অধ্যায়ে, উল্লিখিত উৎপলাবতী নদীর নাম প্রসঙ্গত জানিয়েছেন।

[বিষ্ণু পুরাণ, (H.H. Wilson); Vol. 2; p. 154]

□ আধুনিক ভাবনায় এটি পেরিয়ার নদী। তামিলনাড়ুর শিবগিরি শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে নদীটি কেরালা রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। তবে N.L. Dey আবার তামিলনাড়ুর তিন্নেভেল্লি অঞ্চলে (Tinnevelly) ভাইপার (Vypar) নদীটিকেই উৎপলাবতী বলে মনে করেছেন।

[GP (Ali) p. 123; GDAMI (Dey) p. 213]

উৎপলাবর্ত *[দ্র. উৎপলাবর্ত্তক]*

উৎপলাবর্ত্তক একটি পবিত্র তীর্থস্থান। দেবী ভগবতী উৎপলাবর্ত্তক নামক স্থানে দেবী লোলা নামে খ্যাত হয়েছেন।

[দেবী ভাগবত পু. ৭.৩০.৭৫; মৎস্য পু. ১৩.৪৫]

উৎপলিনী মহাভারতে উল্লিখিত নৈমিষারণ্যের অন্তর্গত একটি নদী। বনবাসের সময় অর্জুন এই নদী-তীর্থে এসেছিলেন।

[মহা (k) ১.২১৫.৬; (হরি) ১.২০৮.৬]

পণ্ডিতরা নৈমিষারণ্যকে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত বলে মনে করেন। সেই সূত্রে বিচার করলে উৎপলিনী নদীটিও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কথা। কিন্তু এই নদীটিকে আধুনিক নামে চিহ্নিত করা কঠিন।

উৎপাত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন নিশ্চিত সেই সময় একদিন মহর্ষি ব্যাস এলেন হস্তিনাপুরে। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলতে লাগলেন—এই যুদ্ধে গুরুতর ধ্বংস উপস্থিত হবে। কারণ চারপাশে বহু দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এরপর ব্যাসের মুখে সেই দুর্লক্ষণের দীর্ঘ বর্ণনা আছে। যেমন চন্দ্রের কলঙ্ক তিরোহিত হওয়া, গোরুর গর্ভে গর্দভের জন্ম, বিচিত্র-বিকটদর্শন পশুদের জন্ম, ব্রাহ্মণ পত্নীদের গর্ভে গরুড়াকৃতি পক্ষী কিংবা ময়ূরের জন্ম ইত্যাদি। মহাভারতের কবি এই অধ্যায়টিকে উৎপাতকথন নামে চিহ্নিত করেছেন।

[মহা (k) ৬.২-৩ অধ্যায়; (হরি) ৬.২-৩ অধ্যায়]

□ মহাভারতের এই বিবরণ থেকে উৎপাত বলতে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। আভিধানিক অর্থে উৎপাত বলতে বোঝায় আকস্মিক পতন। অর্থাৎ বলা যায়—যে ঘটনা সাধারণত ঘটে না, সাধারণ যুক্তি তর্ক বা নিয়ম নীতি দিয়ে যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকেই উৎপাত বলা হয়। মৎস্য পুরাণে উৎপাত বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং কোন ধরণের উৎপাত কোন ভাবী দুর্ঘটনা সূচিত করে তা বিশদে আলোচিত হয়েছে। উৎপাত মৎস্য পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী মূলত তিন প্রকারের হয়ে থাকে—দিব্য, আন্তরীক্ষ এবং ভৌম। নির্দিষ্ট তিথির পরিবর্তে অন্য কোন তিথিতে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হলে তা দিব্য উৎপাত হিসেবে চিহ্নিত হত। মহাভারতের উৎপাতকথন অধ্যায়েও যুদ্ধের পূর্বে সূচিত দুর্লক্ষণের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার পরিবর্তে একটি ত্রয়োদশী তিথিতে একই দিনে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছে যা লোকক্ষয়ের সূচক—

চন্দ্রাদিত্যাবুভৌ গ্রস্তাবেকাহ্না হি ত্রয়োদশীম্।
অপর্বণি গ্রহং যাতৌ প্রজাসংক্ষয়মিচ্ছতঃ ॥

উল্কাপাত প্রভৃতি আন্তরীক্ষ্য উৎপাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ভৌম উৎপাত বলতে বোঝানো হয়েছে ভূমিকম্প ইত্যাদি। মৎস্য পুরাণে তিনপ্রকার দুর্লক্ষণের অজস্র উদাহরণ এবং এদের মধ্যে কোনটি কোন দুর্লক্ষণ সূচিত করে, তা

বিশদে আলোচিত হয়েছে। পুরাণে এবং মহাভারতে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে যেগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে নানা উৎপাতের সূচনা হয়। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুর জন্মকালে উৎপাত দেখা দিয়েছিল। মহাভারতে দুর্যোধনের জন্মকালে, দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পর প্রকৃতিতে নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছিল বলে জানা যায়।

[ভাগবত পু. ৩.১৭.৩-১৫;
মৎস্য পু. ১৬৩.৩৮-৫২; ২২৮-২৩৮ অধ্যায়]

উৎপাতকতীর্থ মহাভারতে উল্লিখিত একটি তীর্থ নাম। উৎপাতক তীর্থে স্নান ও পিতৃতর্পণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.২৫.৪১; (হরি) ১৩.২৬.৪১]

উৎসঙ্গ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ভারতকৌমুদী টীকায় ভগবান শিবের উৎসঙ্গ নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

উৎকৃষ্ট সঙ্গো যস্য স উৎসঙ্গঃ।

পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে মানব হৃদয়ে জ্ঞান, শান্তি আনন্দের সঞ্চার হয়—এই ভাবনা থেকে পরমেশ্বর স্বরূপ ভগবান শিব উৎসঙ্গ নামে খ্যাত।

নীলকণ্ঠ তাঁর ভারতভাবদীপ টীকায় উৎসঙ্গ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

উৎসঙ্গঃ অসঙ্গঃ।

উৎসঙ্গ শব্দের অর্থ উৎক্রান্ত সঙ্গ। অর্থাৎ যিনি ঘর সংসার পরিবার পরিজন এবং যাবতীয় জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য মোহমায়া ত্যাগ করেছেন বা সেগুলিকে অতিক্রম করে এসেছেন। ভগবান শিবের জাগতিক সুখ দুঃখ, মায়া মোহের অতীত যে সন্ন্যাসীর রূপ—সেই সন্ন্যাসী মূর্তির কারণেই তিনি উৎসঙ্গ নামে খ্যাত।

উৎসঙ্গ শব্দের অপর একটি অর্থ হল অঙ্ক বা ক্রোড়। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি নিজক্রোড়ে ধারণ করে আছেন—এই ভাবনা থেকেও তিনি উৎসঙ্গ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৮৪; (হরি) ১৩.১৬.৮৪]

উৎসর্গ ভাগবত পুরাণ অনুসারে মিত্র-র ঔরসে রেবতীর গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে উৎসর্গ অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৬.১৮.৬]*

উৎসবসঙ্কেত মহাভারতে উল্লিখিত একটি জনপদ তথা জনজাতি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আগে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে অর্জুন এই জনজাতিকে পরাজিত করেছিলেন। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে নকুলও এদের পরাজিত করেছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে। *[মহা (k) ২.২৭.১৬; ২.৩২.৯;*
(হরি) ২.২৬.১৬; ২.৩১.৮]

☐ উৎসবসঙ্কেত নামক জনজাতিটি উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত বলে মনে হয়। কারণ অর্জুন উৎসবসঙ্কেতদের সাতটি দলকে পরাজিত করে ছিলেন বলে মহাভারতের দিগ্‌বিজয় পর্বে বর্ণিত হয়েছে—

গণানুৎসবসঙ্কেতানজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ।

এই উৎসবসঙ্কেতদের জয় করার পর অর্জুন রওনা হয়েছিলেন কাশ্মীরের পথে। আবার নকুল যে উৎসবসঙ্কেতদের জয় করেছিলেন তাঁরা বাস করতেন পুষ্করারণ্যে—

পুনশ্চ পরিবৃত্যাথ পুষ্করারণ্যবাসিনঃ।
গণানুৎসবসঙ্কেতানজয়ৎ পুরুষর্ষভঃ॥

কালিদাসের রঘুবংশে উৎসবসঙ্কেতদের পার্বত্য জনজাতি বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সেখানে উৎসবসঙ্কেত জনজাতির কথা উল্লিখিত হয়েছে—

তত্র জন্যং রঘোর্ঘোরং পর্বতীয়ৈর্গণৈরভূৎ।
নারাচক্ষেপণীয়াশ্মনিষ্পেষোৎপতিতানলম্॥
শরৈরুৎসবসংকেতান্ স কৃত্বা বিরতোৎসবান্।

[রঘুবংশ ৪.৭৭-৭৮]

রঘুবংশের সম্পাদক পণ্ডিত M.R. Kale এই উৎসবসঙ্কেতদের হাটক বা লাদাখের জনজাতি বলে উল্লেখ করেছেন। উত্তরপশ্চিম কাশ্মীরে অবস্থিত লাদাখ পার্বত্য অঞ্চলে এদের বসবাস ছিল বলে মনে হয়। তবে পণ্ডিত V.S. Agrawala তাঁর ভারত-সাবিত্রী গ্রন্থে হিমাচল প্রদেশের কুলু-কাংড়া অঞ্চলে উৎসবসঙ্কেতদের বাসস্থান নির্দেশ করেছেন। আবার নকুল যে উৎসবসঙ্কেতদের জয় করেছেন তাঁদের পুষ্করারণ্য বা বর্তমান রাজস্থানের অন্তর্গত পোখরান অঞ্চলের অধিবাসী বলা হয়েছে। মহাভারতের এই বিবরণ থেকেই আমাদের ধারণা হয় যে, উৎসবসঙ্কেত জাতিটি উত্তরপশ্চিম ভারতের বেশ বড়ো একটা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত।

পণ্ডিত V.S. Agrawala উৎসবসঙ্কেত

নামটির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন—এই জনজাতির স্ত্রী-পুরুষরা মেলার মতো উৎসবের আয়োজন করে এক জায়গায় সমবেত হত। সেই সমাগমই ছিল স্ত্রী-পুরুষদের বিবাহের জন্য সঙ্গী খুঁজে নেবার জায়গা। 'সঙ্কেত' শব্দের অর্থ নারী-পুরুষের বা প্রণয়ীযুগলের মিলন স্থান। জীবনসঙ্গী খুঁজে নেবার জন্য এমন বিচিত্র উৎসবের আয়োজন হত বলেই এই জনজাতি উৎসবসঙ্কেত নামে বিখ্যাত হয়েছিল বলে পণ্ডিত Agrawala মত প্রকাশ করেছেন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে ধ্বজিনী-উৎসবসঙ্কেত বা ধ্বজযুক্ত উৎসবসঙ্কেত বলে জনজাতিটির উল্লেখ করা হয়েছে—ধ্বজিন্যুৎসবসঙ্কেতা। ধ্বজ শব্দের অর্থ চিহ্ন। এই সব জনজাতির লোকজন কোনো নির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করত বা নিজেদের উৎসব-অনুষ্ঠানে সেই চিহ্নযুক্ত পতাকা ব্যবহার করত বলে হয়তো ভীষ্মপর্বে এদের নামের আগে 'ধ্বজিনী' শব্দটিকে বিশেষণ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। *[মহা (k) ৬.৯.৬১; (হরি) ৬.৯.৬১;*
M.R. Kale, Raghuvansam, p. 116-117;
V.S. Agrawala, Bharata Savitri,
Vol. I, p. 136; TIM (Mishra) p. 82]

উৎসাহ বায়ু পুরাণ মতে নারায়ণের ঔরসে শ্রী-র গর্ভে যে দুইজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উৎসাহ একজন। *[বায়ু পু. ২৮.২]*

উৎসুক বায়ু পুরাণ অনুসারে বলরামের পুত্রদের মধ্যে উৎসুক অন্যতম। *[বায়ু পু. ৯৬.১৬৪]*

উতঙ্ক মহর্ষি বেদের শিষ্য। গুরুভক্ত, আস্থাভাজন। কোনো এক সময় মহর্ষি বেদ যাজনকর্মের জন্য স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হলে গুরু তাঁকে আপন গৃহের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করে যান। গুরুর কথামতো উতঙ্ক গুরুগৃহের গার্হপত্য অগ্নিরক্ষা থেকে আরম্ভ করে হোমধেনুর পরিচর্যা প্রভৃতি নানা নিত্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন। একদিন হল কী, গুরুর আশ্রমের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা উতঙ্কের কাছে এসে বললেন—আপনার গুরুপত্নী বিষণ্ণা হয়ে আছেন। তিনি ঋতুমতী হয়েছেন। অথচ আপনার গুরু প্রবাসে। এ অবস্থায় ঋতুস্নাতা গুরুপত্নীর গর্ভ যাতে বিফল না হয়, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন।

উতঙ্ক বললেন—স্ত্রীলোকের কথায় আমি এই কাজ করতে পারি না। আমার অধ্যাপক আমাকে এমন কথা বলেননি যে, অন্যায় কাজও আমাকে করতে হবে—

ন হ্যহম্ উপাধ্যায়েন সন্দিষ্টঃ
অকার্য্যমপি ত্বয়া কার্য্যম্ ইতি।

মহর্ষি বেদ কিছুদিন পরে ফিরে এলেন এবং উতঙ্কের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে পরম সন্তুষ্ট হলেন। উতঙ্কের গুরুশুশ্রূষা এবং প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করে মহর্ষি তাঁকে অভীষ্টলাভের আশীর্বাদ করে গুরুগৃহবাসের কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে চাইলেন। অভীষ্ট বিদ্যালাভের পর গুরুকে দক্ষিণা না দিলে অধর্ম হবে ভেবে উতঙ্ক মহর্ষি বেদকে দক্ষিণা দিতে চাইলেন।

দক্ষিণা গ্রহণে মহর্ষি বেদের কোনো উৎসাহ ছিল না। তিনি উতঙ্ককে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বললেন এবং তাতে উতঙ্ক আরও অধৈর্য্য হয়ে পুনরায় দক্ষিণার কথা বলাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—তুমি তোমার গুরুপত্নীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যা চাইবেন—তাই দিও। উতঙ্ক গুরুপত্নীর কাছে গিয়ে বললেন—আমি অনৃণী হয়ে ঘরে ফিরে যেতে চাই। অতএব আদেশ করুন—কী গুরুদক্ষিণা দিতে পারি আমি। গুরুপত্নী বললেন—পৌষ্য রাজার স্ত্রী যে কুণ্ডল দুটি ধারণ করেন, সেই কুণ্ডল দুটি আমাকে এনে দাও। সামনে আমার পুণ্যকব্রত, ওই ব্রতের দিনে কুণ্ডল দুটি ধারণ করে ব্রাহ্মণদের খাদ্য পরিবেশন করতে চাই আমি। আমার এই ইচ্ছাটুকু পূরণ করলেই তোমার মঙ্গল হবে।

উতঙ্ক পৌষ্য-রাজার বাড়ির উদ্দেশে চললেন। পথে একটি বৃষ এবং সেই বৃষারূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। বৃষারূঢ় ব্যক্তি উতঙ্ককে ওই বৃষটির বিষ্ঠা ভক্ষণ করতে বললেন। উতঙ্ক ঘৃণ্য-ভক্ষণে রাজী না হওয়ায় বৃষারূঢ় ব্যক্তি নির্বিচারে ওই বিষ্ঠা-ভক্ষণের উপদেশ দিলেন উতঙ্ককে এবং বললেন—তাঁর গুরু মহর্ষি বেদও ওই বিষ্ঠা ভক্ষণ করেছেন এক সময়ে।

উতঙ্ক আর কী করেন। নির্বিচারে বৃষের বিষ্ঠা-মূত্র ভক্ষণ করে তাড়াতাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আচমন সারলেন। এরপরে পৌষ্য রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে গুরুদক্ষিণার জন্য প্রয়োজনীয়

রাজমহিষীর কুণ্ডল যাচনা করলেন উতঙ্ক। পৌষ্য রাজমহিষীর কাছে স্বয়ং যেতে বললে তিনি তাঁর দেখা পেলেন না। পৌষ্য বললেন—আপনি নিশ্চয়ই অশুচি অবস্থায় আছেন, তাই পতিব্রতা মহিষীর সঙ্গে দেখা হয়নি। উতঙ্কের স্মরণে এল—তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আচমন সেরেছিলেন। চলন্ত অবস্থায় অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় আচমন-আচারসম্মত নয়। উতঙ্ক শাস্ত্রাচার মেনে, আচমন প্রণালী মেনে শুদ্ধ হবার পর রাজমহিষীর দেখা পেলেন।

গুরুদক্ষিণার জন্য পৌষ্য-রাজমহিষীর কাছে স্বর্ণকুণ্ডল যাচনা করলে সমাবর্তনার্থী উতঙ্ককে সবশ্রেষ্ঠ দানপাত্র মনে করে রাজমহিষী কুণ্ডল-দুটি দিলেন। কিন্তু উতঙ্ককে সাবধান করে রাজমহিষী বললেন—এই কুণ্ডল-দুটির ওপরে নাগরাজ তক্ষকের বেশ লোভ আছে। উতঙ্ক রাজমহিষীকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে পৌষ্য-রাজার কাছে বিদায় নিয়ে গুরুগৃহের দিকে চললেন।

পথে যেতে যেতে উতঙ্ক দেখতে পেলেন—একজন উলঙ্গ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁকে অনুসরণ করছে। তারপর এক সময় উতঙ্ক যখন সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য কুণ্ডল-দুটি পুকুরের ধারে মাটিতে রেখে স্নান করতে নামলেন, অমনই সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সেই কুণ্ডল-দুটি অপহরণ করল। এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীই ছদ্মবেশে নাগরাজ তক্ষক।

উতঙ্ক তৎক্ষণাৎ তার পিছনে ধাওয়া করতে করতে নাগলোকে এসে পৌঁছলেন। নাগলোকের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি দেখে উতঙ্ক আশ্চর্য হলেন এবং বিখ্যাত নাগদের উদ্দেশে স্তুতিগীত উচ্চারণ করলেন; কিন্তু তাতেও তক্ষকের দেখা মিলল না। শেষ পর্যন্ত অশ্ববেশী অগ্নি-দেবতার সাহায্যে উতঙ্ক তক্ষকের সন্ধান পেলেন। তক্ষক অগ্নিদগ্ধ হবার ভয়ে পৌষ্য-রাজমহিষীর কুণ্ডল-দুটি উতঙ্ককে দিয়ে দিলেন।

যেদিন পুনরায় উতঙ্ক কুণ্ডল-দুটি হাতে পেলেন, সেইদিনই তাঁর গুরুপত্নীর পুণ্যক ব্রতের দিন। অগ্নি-দেবতার দেওয়া শীঘ্রগামী অশ্বের সাহায্যে উতঙ্ক যখন গুরুগৃহে উপস্থিত হলেন, তখন বেদ-মহিষী স্নান-প্রসাধনে সজ্জিত হয়ে তাঁর আগমনের অপেক্ষাই করছিলেন। উতঙ্ক কুণ্ডল-দুটি গুরুপত্নীর হাতে দিয়ে পথের সমস্ত বাধা-বিঘ্নের কাহিনী মহর্ষি বেদকে জানালেন। সেই বৃষ-বিষ্ঠা ভক্ষণ থেকে আরম্ভ করে যা যা উতঙ্ক দেখেছিলেন এবং যা যা তাঁর আশ্চর্যজনক লেগেছিল, সব জানালে মহর্ষি বেদ সেই সব ঘটনার রহস্যগুলি বললেন।

মহর্ষি এবার তাঁকে গুরুগৃহ ছেড়ে যাবার অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু উতঙ্ক ঘরে না ফিরে হস্তিনাপুরের তৎকালীন রাজা পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। পূর্বে তক্ষকের ব্যবহারে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং উতঙ্ক জানতেন যে, তক্ষকের দংশনেই পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছে। নিজের ক্রোধের সঙ্গে রাজা জনমেজয়ের ক্রোধও উদ্রিক্ত হলে তবেই যে, তক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধটা সবচেয়ে বেশি নেওয়া যাবে, সেটা বুঝেই উতঙ্ক রাজা জনমেজয়কে পিতৃহন্তা তক্ষক-নাগকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য উৎসাহিত করলেন। অর্থাৎ জনমেজয় যে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন, উতঙ্কের ক্রোধও সেখানে একটা কারণ—

জনমেজয়স্য সর্পসত্রে নিমিত্তান্তরম্ ইদমপি।

[মহা (k) ১.৩.৮২-২০৪; ১.৪.২;
(হরি) ১.৩.৮৭-২০৪; ১.৪.২]

□ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে উতঙ্কের এই কুণ্ডল আহরণের কাহিনীটিই বিশদে বর্ণিত হয়েছে আরও একবার, যদিও সেখানে উতঙ্ক বাদে অন্যান্য চরিত্রগুলির নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। আশ্বমেধিক পর্বে উতঙ্ককে মহর্ষি গৌতমের শিষ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যা গুরুদক্ষিণা হিসেবে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুদাস (কল্মাষপাদ) রাজার পত্নী মদয়ন্তীর দিব্য রত্নখচিত কুণ্ডলটি নিয়ে আসতে বলেছিলেন উতঙ্ককে। চরিত্রগুলির নাম বদলে গেলেও কাহিনীটি মোটামুটি একই রকম।

[মহা (k) ১৪.৫৬-৫৮ অধ্যায়;
(হরি) ১৪.৭২-৭৬ অধ্যায়]

□ একসময় কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের পথে মরুভূমির মধ্যে মহর্ষি উতঙ্ককে দেখতে পান। ভগবান বিষ্ণুই যে কৃষ্ণ রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন উতঙ্ক তা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন, সুতরাং স্বয়ং ভগবানের দর্শন-লাভ করে আপ্লুত হয়ে তিনি কৃষ্ণের স্তব করেন। এরপর উতঙ্কের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ তাঁকে

অধ্যাত্ম বিষয়ক উপদেশ দেন। মহর্ষি উতঙ্ক মরুভূমিতে গুরুতর জলকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে বর দেন যে, উতঙ্ক যখনই জল খেতে চাইবেন, তখনই মরুভূমির আকাশে মেঘ সঞ্চার হবে এবং উতঙ্ক প্রয়োজনীয় জল লাভ করবেন। মরুভূমিতে সৃষ্ট এই মেঘ উতঙ্ক মেঘ নামে প্রসিদ্ধ হয়। *[মহা (k) ১৪.৫৩-৫৫ অধ্যায়; (হরি) ১৪.৬৮-৭১ অধ্যায়]*

উতথ্য$_১$ মহর্ষি অঙ্গিরার দ্বিতীয় পুত্র, দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, একজন প্রখ্যাত বৈদিক ঋষি। পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে স্বরাটের গর্ভজাত পুত্রসন্তানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উতথ্য। বৃহস্পতির বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন তিনি।

পুরাণে তপস্বী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবেও একাধিকবার উতথ্যের উল্লেখ পাই। আঙ্গিরস গোত্রপ্রবর্তকদের মধ্যেও তিনি অন্যতম ছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৬.৫; ১.১০৪.১০;
(হরি) ১.৬১.৫; ১.৯৮.১০;
ভাগবত পু. ৪.১.৩৫; ১.১৯.৯;
বায়ু পু. ৬৫.১০০, ১০১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.৯৯; ২.১.১০৫;
মৎস্য পু. ১৪৫.৯৩, ১০৪; ১৯৬.৪;
বিষ্ণু পু. ৪.১৯.৬]

□ কয়েকটি পুরাণে এবং মহাভারতে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে উতথ্য ঋষির পত্নী ছিলেন মমতা। মমতা যখন গর্ভবতী ছিলেন সেই সময় একদিন উতথ্যের অনুপস্থিতির সুযোগে বৃহস্পতি বলপূর্বক তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এই সময় গর্ভস্থ শিশু বৃহস্পতিকে বাধা দিলেন। ফলে বৃহস্পতির শাপে উতথ্যের এই পুত্র দীর্ঘকালের জন্য অন্ধ হয়ে যান। মহর্ষি উতথ্যের এই দৃষ্টিহীন পুত্রের নাম দীর্ঘতমা। মামতেয় দীর্ঘতমার এই কাহিনীটি উতথ্য ছাড়াও উশিজ, অসিজ প্রভৃতি অঙ্গিরার পুত্রদের উপর আরোপিত হয়েছে। যদিও আমাদের মনে হয় উতথ্য, উশিজ এবং অসিজ একই ব্যক্তি। তবে মমতা উতথ্যের পত্নী হিসেবেই অধিক পরিচিত।

[মহা (k) ১.১০৪.৯-২৪; (হরি) ১.৯৮.৯-২৪]

□ মহর্ষি উতথ্য সম্পর্কে মহাভারতের অনুশাসনপর্বে একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে। চন্দ্র নিজের কন্যা ভদ্রার উপযুক্ত স্বামী হিসেবে মহর্ষি উতথ্যকে মনোনীত করেন। উতথ্যকে পতিরূপে লাভ করার জন্য চন্দ্রের কন্যা ভদ্রা কঠোর তপস্যা করেন। এরপর চন্দ্রের পিতা মহর্ষি অত্রি উতথ্যকে ডেকে নিজের পৌত্রী ভদ্রার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। এদিকে বরুণদেব মনে মনে ভদ্রার প্রতি আসক্ত ছিলেন। একদিন যমুনাতীরস্থ অত্রির আশ্রম থেকে বরুণ ভদ্রাকে হরণ করলেন। উতথ্য দেবর্ষি নারদকে বরুণের কাছে দূত হিসেবে পাঠালেন এবং পত্নী ভদ্রাকে ফিরিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু বরুণ সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উতথ্য তপোবলে পৃথিবীর সমস্ত জল শোষণ করলেন। সরস্বতী নদী উতথ্যের ক্রোধাগ্নিতেই শুষ্ক হয়ে যায় বলে কথিত হয়েছে। উতথ্যের তপস্যার প্রভাব দেখে ভীত হয়ে শেষ পর্যন্ত বরুণ ভদ্রাকে ফিরিয়ে দিলেন।

[মহা (k) ১৩.১৫৪ অধ্যায়;
(হরি) ১৩.১৩২ অধ্যায়]

উতথ্য$_২$ সপ্তবিংশতিতম দ্বাপরে যখন মহর্ষি কৃতঞ্জয় ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান শিব গুহাবাসী নাম ধারণ করে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর যে চারটি পুত্র সন্তান হবে উতথ্য তাঁদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ২৩.১৭৭]*

উতথ্য$_৩$ ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে যখন দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন মরীচি তার মধ্যে অন্যতম গণ। এই গণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে উতথ্য একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৫৯]

উতথ্যগীতা যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনলাভের পর রাজা যুধিষ্ঠির ও শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের রাজধর্ম-বিষয়ক এক দীর্ঘ পর্যালোচনা বর্ণিত আছে মহাভারতের শান্তিপর্বের একাধিক অধ্যায় জুড়ে। রাজধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রগুলি আলোচনার সময় ভীষ্ম বলেছেন—যুধিষ্ঠির! অঙ্গিরাপুত্র বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ উতথ্য মান্ধাতাকে যে ক্ষত্রিয়ধর্মের কথা বলেছিলেন এবং রাজকর্তব্য বিষয়ে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা তোমায় বলছি। ঋষি উতথ্যের রাজধর্ম বিষয়ক এই ভাষ্যই উতথ্য গীতা নামে খ্যাত।

উতথ্য বলেন—রাজা হলেন তিনি, যিনি ধর্মস্থাপনের জন্য জন্মে থাকেন, নিজের অভিলাষ পূরণের জন্য নয়।

'ধর্ম্মায় রাজা ভবতি ন কামকরণায় তু।'

রাজাই 'লোকস্য রক্ষিতা'। ধর্মস্থাপন, ধর্মরক্ষার এই প্রসঙ্গটি উতথ্যের উপদেশের মধ্যে বারে বারেই ফিরে এসেছে। বলাই বাহুল্য, এই ধর্মের অর্থ আচরণীয় পথ বা মার্গ, ঈশ্বর সাধনা নয়। বর্ণবিভাজিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিটি বর্ণের, বৃত্তির মানুষের প্রতি রাজার আচরণ কেমন হওয়া উচিত বা বলা ভালো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সুচারুভাবে চালনা করার জন্য কোন কোন দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে তারই সার উতথ্যগীতা।

ব্রহ্মা ধর্মের সৃষ্টি করলেন জগতের মঙ্গলার্থে আর ঋষিরা সেই ধর্মের রক্ষক হিসাবে সৃষ্টি করলেন রাজাকে, যিনি স্বয়ং প্রজাহিতার্থে প্রজাসমাজে ধর্ম প্রবর্তন করবেন এবং সমাজে ধর্মকে রক্ষাও করবেন। তাই রাজনীতিশাস্ত্রে রাজাকে বলা হয়েছে—ঈশ্বরের প্রতিনিধি। আর উতথ্য বলেন—রাজার থেকেই চতুর্যুগের উৎপত্তি, রাজাই যুগের কারণ।

রাজাকে এমন সর্বাধিনায়কের মর্য্যাদা দিয়েও উতথ্য একথা স্মরণ করান যে, যদি রাজা ধর্মাচরণ করেন তবেই তিনি দেবত্ব লাভ করতে পারেন। পৃথিবীর অধিপতি হতে পারেন নতুবা অধর্মাচারী রাজার নরকে স্থান হয়।

চতুর্বর্ণ-বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্ট। শূদ্রের দ্বিজাতি সেবা, বৈশ্যের কৃষি, ক্ষত্রিয়ের দণ্ডনীতি আর ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা ইত্যাদি। রাজাকে উতথ্যের উপদেশ এই যে, প্রতিটি শ্রেণির মানুষকেই রাজা যেন যথাযোগ্য সম্মান করেন। যেমন বণিককে পুত্রের মতো রক্ষা করা, কৃষককে কর ভারে পীড়িত না করা, অমাত্যদেরকে রাজ্যচালনা ও যুদ্ধে নিযুক্ত করা ইত্যাদি।

এরই মধ্যে বিশিষ্টভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন ব্রাহ্মণদের কথা—

'ধর্মস্য ব্রাহ্মণো যোনিস্তস্মাত্তান্ পূজয়েৎ সদা।'

অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাই ধর্মের কারণ তাই ব্রাহ্মণ সর্বদা পূজনীয়। বিদ্বেষশূন্য হয়ে তাদের অভিলাষ পূরণই কর্তব্য। রাজা যেন প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করেন এবং ঋত্বিক, পুরোহিত আচার্যদের যেন কখনোই অবমাননা না করেন।

এ প্রসঙ্গে উতথ্য পুরাকথার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, বিরোচনের পুত্র বলি বাল্যকাল থেকেই ব্রাহ্মণদের অশ্রদ্ধা করতেন এবং এর ফলস্বরূপ রাজলক্ষ্মী তার কাছ থেকে অপসৃতা হয়েছিলেন। রাজা যদি প্রজাশাসনে অন্যায় আচরণ করেন, তবে এই চতুর্বর্ণ সমাজ, চতুর্বেদ, চতুরাশ্রম বিপর্যস্ত হয়। উতথ্যের সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায় যে, রাজা প্রধানত চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতিভূ হিসেবেই কাজ করছেন, যেমনটি ঠিক মনুসংহিতায় পাওয়া যায়—

চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ।
[মনুসংহিতা ৭.১৭]

এছাড়াও উত্তম খাদ্য ভাগ করে খাওয়া, কর্মচারী ও ভৃত্যদের সম্মান দেওয়া, অতিথি সেবা, দীন-অনাথ বৃদ্ধরা যাতে কষ্টে না থাকেন তার ব্যবস্থা করা, ভূমিদান, আশ্রিতকে রক্ষা করা, মিত্রের বৃদ্ধি ও শত্রুর দমন, রাজ্যরক্ষার্থে যুদ্ধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের পুত্রের অপরাধও ক্ষমা না করা—এই রাজধর্মের কথাই উতথ্যগীতার তাৎপর্য্য সূচনা করে।

রাজ্যবাসীরা যদি অধর্মাচরণ করে, যদি সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পরে তখন কলি (কলহ) বা পাপ এসে রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে। রাজা সমাজে চলতে থাকা ধর্মের এই অবক্ষয় রোধ করতে না পারলে গুরুতর বিপর্যয় নেমে আসে। অরাজক জনপদে যেখানে রাজার শাসন নেই, সেখানে বলবত্তর মানুষের পেশী শক্তির সঙ্গে চুরি, অপহরণ ইত্যাদি অন্যায় ঘটতে থাকে। ভার্য্যা, পশু, ক্ষেত্র, গৃহ ইত্যাদি অরক্ষিত হয়ে পড়ে—

নৈব ভার্য্যা ন পশবো ন ক্ষেত্রং ন নিবেশনম্।
সংদৃশ্যেত মনুষ্যাণাং যদা পাপবলং ভবেৎ॥

আর এই সব অন্যায়ের অলৌকিক প্রাকৃতিক রূপকগুলি হল দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, যেমনটা পৌরাণিকেরা লিখে থাকেন।

ভিন্নবর্ণের স্ত্রী-পুরুষের মৈথুন বা বর্ণসঙ্করও অন্যতর এক উৎপাত, অতএব বর্ণসঙ্করও রাজার প্রজাশাসনে অসাবধান হওয়ার ফল বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সেইজন্য—রাজ্যে ব্যাধি, বিকৃতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ করতে রাজাকে বর্ণসঙ্কর বা অন্যান্য বিশৃঙ্খলা রোধে সচেষ্ট হতে উপদেশ দেন উতথ্য।

রাজা যদি ইন্দ্রিয়দমন করেন, তবে তিনি সাক্ষাৎ ধর্মরাজস্বরূপ। দর্পের পৌরাণিক কাহিনীর

উল্লেখ করে উতথ্য বলেন—অধর্ম থেকে দর্প নামে শ্রীর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই দর্প কালক্রমে বহু দেবতা, অসুর ও রাজর্ষিদের ঐশ্বর্য্য, সম্মান নষ্ট করে দিয়েছিল। দর্পকে জয় করেই মানুষ রাজা হয় আর তার কাছে পরাজিত হয়েই মানুষ অধম দাসে পরিণত হয়।

উতথ্যের অভিমত, যদি চিরকাল রাজা থাকতে ইচ্ছা কর তবে তোমার মনোবৃত্তি যেন দর্পের এবং অধর্মের সেবা না করে—

'স যথা দর্পসহিতমধর্ম্মং নানুসেবতে।
তথা বর্ত্তস্ব মান্ধাতশ্চিরঞ্চেৎ স্থাতুমিচ্ছসি॥'

রাজা সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, দৃঢ়তার সঙ্গে প্রজাশাসন করবেন, প্রজাকে পীড়ন করবেন না, দুর্বলের ওপর অত্যাচার করবেন না। উতথ্য বলেন—দুর্বলের চোখ, মুনির চোখ ও সাপের চোখ অসহনীয়। যে ব্যক্তি দুর্বলের শাপানলে দগ্ধ হয় কালে কালান্তরে তার বংশ লুপ্ত হয়—

'দুর্ব্বলস্য চ যচ্চক্ষুর্মুনেরাশীবিষস্য চ।
অবিষহ্যতমং মন্যে মা স্ম দুর্ব্বলমাসদঃ॥

রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাবধানতা অবলম্বন করার পরামর্শও দিয়েছেন উতথ্য। যেমন—মত্ত, অসাবধান ব্যক্তি বা বালকের সংসর্গ থেকে রাজাকে দূরে থাকতে হবে। দণ্ডিত অমাত্য, পর্বত, দুর্গম স্থান, হস্তী, অশ্ব, সর্প এসব থেকেও দূরে থাকবেন রাজা। ব্যক্তিগত জীবনযাপনে সংযমী হতে হবে তাঁকে।

বিচক্ষণ রাজা সবসময়ই বিচার বিশ্লেষণ করে উপদেষ্টামণ্ডলীর পরামর্শ নিয়ে তবেই নীতি নির্ধারণ করবেন। উতথ্য এ বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে বলেন—আশ্রমবাসী তপস্বীর কথাও যেন রাজা যথার্থ বিচার করে তবেই বিশ্বাস করেন।

রাজা সবসময় অন্যের ছিদ্রদর্শী হবেন অথচ নিজের দুর্বলতাগুলিকে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কৌশলে আড়াল করবেন। সাবধানতা ও পবিত্রতা দুই-ই রাজার জন্য উন্নতিজনক।

'অপ্রমাদশ্চ শৌচঞ্চ রাজ্ঞো ভূতিকরং মহৎ।'

রাজাকে সার্বিকভাবে একটি জনজাতির নায়ক হয়ে উঠতে গেলে রাজনীতির যে পাঠ প্রয়োজন, উতথ্য তা-ই উপস্থাপিত করেছেন মান্ধাতার কাছে। ঋষি প্রদত্ত রাজনীতির এই পাঠের মধ্যে উঠে এসেছে ভারতীয় রাজাদর্শের সনাতন সত্য—

'যস্মিন্ ধর্ম্মো বিরাজেত তং রাজানাং প্রচক্ষতে।'
—যার মধ্যে ধর্ম বিরাজমান তিনিই রাজা।

[মহা (k) ১২.৯০-৯১ অধ্যায়;
(হরি) ১২.৮৮-৮৯ অধ্যায়]

উত্তম$_{১}$ স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র তথা উত্তানপাদ রাজার পুত্র। রাজা উত্তানপাদের প্রিয়তমা পত্নী সুরুচির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। সুরুচির প্রতি প্রণয়বশত রাজা উত্তানপাদ সারাক্ষণ এই উত্তমকেই আদর করতেন। অপর পত্নী সুনীতির পুত্র ধ্রুব পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। উপরন্তু ধ্রুবর বিমাতা সুরুচি তাঁকে এই বলে বিদ্রূপ করতেন যে, যেহেতু ধ্রুব সুরুচির গর্ভজাত নয়, সেহেতু পিতৃস্নেহে তাঁর অধিকার নেই।

পরবর্তীকালে ধ্রুব তপস্যায় ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করে ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করলেন। নারায়ণের বরে রাজ্যলাভও করলেন। এরপর একদিন রাজকুমার উত্তম হিমালয় পার্বত্য অরণ্যে মৃগয়ায় গেলেন। সেখানে এক যক্ষের হাতে উত্তমের মৃত্যু হয় বলে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে (দ্র. ধ্রুব)। উত্তম অকৃতদার ছিলেন বলেও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এই পুরাণে।

[ভাগবত পু. ৪.৮.৭-১৩; ৪.১০.৩;
বিষ্ণু পু. ১.১১.২]

তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত কাহিনীতে উত্তমকেও আমরা একজন প্রভাবশালী প্রজাবৎসল রাজা হিসেবেই দেখি। বভ্রুর কন্যা বহুলা ছিলেন তাঁর পত্নী। রাজা বহুলাকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন, সবসময় বহুলা যাতে সন্তুষ্ট থাকেন সেই চেষ্টা করতেন। কিন্তু উত্তম বহুলাকে ভালবাসলেও বহুলা স্বামীকে ভালবাসতেন না। রাজার আদর অনুরাগ সবকিছুই তাঁর কাছে বিরক্তির কারণ ছিল। ক্রমে ক্রমে পত্নীর এই অবজ্ঞা রাজার কাছেও অসহ্য হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ উত্তম রাজা বহুলাকে নির্বাসনে পাঠালেন। রাজার আদেশে রাজকর্মচারীরা রানীকে গভীর বনে রেখে এল। বহুলা কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হলেন না। বরং রাজার কাছে থাকতে হল না—এই ভেবেই মনের আনন্দে বনে বাস করতে লাগলেন। এইসময় নাগরাজ কপোতক বনের মধ্যে পরমাসুন্দরী স্বামী পরিত্যক্তা বহুলাকে দেখে একান্ত মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে বিবাহ করার বাসনায় পাতালে নিজের প্রাসাদে

নিয়ে গেলেন। নাগরাজ কপোতকের নন্দা নামে এক কন্যা ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে বহুলা তাঁর মাতার সপত্নী হতে চলেছেন, তখন কপোতক যাতে বহুলাকে বিবাহ করতে না পারেন সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। নন্দা বহুলাকে লুকিয়ে রাখলেন নিজের ঘরে। কপোতক নন্দাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেও বহুলার সন্ধান পেলেন না। তখন রেগে গিয়ে কপোতক নন্দাকে 'মূক হও'—এই অভিশাপ দিলেন। নন্দা বাক্‌শক্তিহীন হলেন, বহুলাও তাঁর ঘরে নিরাপদে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে রাজা উত্তম প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করে অত্যন্ত দুঃখে কাল যাপন করতে লাগলেন। এই সময়ে একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে অভিযোগ করলেন—মহারাজ! আমার পত্নীকে কে যেন হরণ করে নিয়ে গেছে। আপনি তাকে শাস্তি দিন এবং ব্রাহ্মণীকে খুঁজে এনে দিন। একথা শুনে রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন—আমি তো আপনার পত্নীকে কখনো দেখিনি। আপনি তাঁর আকৃতি ও স্বভাবের একটা বর্ণনা দিন যাতে তাঁর সন্ধান করতে সুবিধা হয়। ব্রাহ্মণের মুখে তাঁর কুশ্রী, বিকৃতরূপা, কর্কশস্বভাব পত্নীর বর্ণনা শুনে রাজা বললেন—আপনার এমন কুৎসিত, কুলক্ষণা পত্নীতে কি প্রয়োজন, আপনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সুখে সংসার করুন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। তখন রাজা ব্রাহ্মণীর সন্ধানে বের হলেন। ক্রমে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে সেখানে রাজা এক ঋষির আশ্রম দেখতে পেলেন। রাজা পত্নীকে পরিত্যাগ করেছেন—তাই মহর্ষি তাঁকে যোগ্য সমাদর করলেন না, মৃদু তিরস্কারও করলেন। তবে রাজার অনুরোধে অপহৃত ব্রাহ্মণীর সন্ধানও দিলেন তাঁকে। অত্রির পুত্র বলাক নামে এক মনুষ্যস্বভাবভোজী রাক্ষস ব্রাহ্মণের যজ্ঞকর্মে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য তাঁর পত্নীকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। রাজা ঋষির কথা অনুযায়ী উৎপলাবত বনে গিয়ে সেই ব্রাহ্মণীর সন্ধান পেলেন। রাজার আদেশে বলাক রাক্ষস ব্রাহ্মণীর কর্কশ স্বভাব ভক্ষণ করে, বিনীত, সুস্বভাব যুক্ত সেই ব্রাহ্মণীকে তাঁর স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন।

এদিকে রাজা পত্নী বহুলাকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেই তপোবনে ফিরে গিয়ে মহর্ষির কাছে বহুলার বর্তমান অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। বহুলা কপোতক নাগের ভবনে বাস করছেন, একথা জানতে পেরে রাজা উত্তম বলাক রাক্ষসের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করলেন। যে ব্রাহ্মণের পত্নীকে রাজা উদ্ধার করে এনেছিলেন তিনি রাজার মঙ্গলের জন্য মিত্রবিন্দা যজ্ঞ করলেন। এর ফলে বহুলা স্বামীর অনুগত স্বভাব ও স্বামীর প্রতি অনুরাগ লাভ করলেন। বহুলা রাজপুরীতে ফিরে এলে রাজা-রানী সুখে সংসার জীবনযাপন করতে লাগলেন। বহুলার অনুরোধে সেই ব্রাহ্মণ সারস্বত যজ্ঞের দ্বারা নাগরাজ কপোতকের কন্যা নন্দার বাক্‌শক্তি আবার ফিরিয়ে আনলেন। নাগকন্যা নন্দার বরে উত্তম রাজার ঔরসে বহুলার গর্ভে ঔত্তম মনুর জন্ম হল। মার্কণ্ডেয় পুরাণ এই ঔত্তম মনুকেই তৃতীয় মন্বন্তরের মনু বলে চিহ্নিত করেছে।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৬৯-৭২ অধ্যায়;
গরুড় পু. ১.৬.১]

উত্তম$_{২}$ বেশিরভাগ পুরাণ মতে তৃতীয় মন্বন্তরের অধিপতি বা মনু ছিলেন উত্তম। ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র ছিলেন বলে জানা যায়। পবন, সৃঞ্জয়, যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি এই উত্তম মনুর পুত্র ছিলেন বলে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণ মতে উত্তম (ঔত্তম) মনুর পুত্ররা হলেন অজ, পরশু দিব্য ইত্যাদি। বায়ু পুরাণ থেকে জানা যায় উত্তম মনুর পত্নী সত্যার গর্ভে সত্য নামে বারোজন দেবতা জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৫.১.২৮; ৮.১.২৩-২৪;
বিষ্ণু পু. ৩.১.৬, ১৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩, ২৫, ৩৭, ৪১; ১.৩৭.১৬;
বায়ু পু. ৬৭.৩-৩৭; দেবী ভাগবত পু. ৮.৪.৮; ১০.৮]

উত্তম$_{৩}$ শাল্মলী দ্বীপের সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে দ্বিতীয়টির নাম উত্তম। বিষ্ণু পুরাণে সম্ভবত এটিই উন্নত নামে কথিত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৩৬; বিষ্ণু পু. ২.৪.২৬]

উত্তম$_{৪}$ একবিংশতিতম দ্বাপরে মহর্ষি উত্তম বেদব্যাস হবেন বলে জানা যায়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.১২২]

উত্তম$_{৫}$ ভৃগুবংশীয় মহর্ষি। চাক্ষুষ মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন উত্তম তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৭৭; বিষ্ণু পু. ৩.১.২৯]

উত্তম$_{৬}$ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভায় উপস্থিত একজন রাজা। শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে রাজসূয় যজ্ঞসভায় অর্ঘ্যদানের উপযুক্ত হিসেবে শিশুপাল যেসব রাজার নাম উল্লেখ করেন উত্তম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তবে মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃতপাঠে উত্তমের পরিবর্তে 'উত্তর'—এই নাম পাওয়া যায়। *[মহা (k) ২.৪৪.২০; (হরি) ২.৪৩.২০]*

উত্তম$_{৭}$ প্রাচীন ভারতের একটি জনপদের নাম। এইস্থানে বসবাসকারীরাও উত্তম নামেই পরিচিত ছিলেন। ভীষ্মপর্বের সূচনায় সঞ্জয় উত্তর ভারতের যেসব জনপদ তথা জাতি সমূহের পরিচয় দিয়েছেন উত্তম তার মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৬.৯.৪১; (হরি) ৬.৯.৪১]

উত্তম$_{৮}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬১; (হরি) ১৩.১২৭.৬১]

উত্তমক ভবিষ্যৎ নবম মন্বন্তরে যখন দক্ষসাবর্ণি মনু মন্বন্তরাধিপতি হবেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন মরীচি তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে উত্তমক অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৫৯]*

উত্তমপুর জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত একটি তীর্থ। হংসশৈলের দক্ষিণদিকে এর অবস্থান। এখানে শ্রেষ্ঠ ঋষিদের বাস। এটির আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কিছু জানা যায় না।

[কূর্ম পু. ১.৪৭.৫৫]

উত্তমার্ণ বিন্ধ্যপর্বত সংলগ্ন একটি প্রাচীন জনপদ।

[বায়ু পু. ৪৫.১৩২]

উত্তমৌজা$_{১}$ জনৈক পাঞ্চাল রাজকুমার। উত্তমৌজার নাম বেশিরভাগ সময়েই তাঁর ভাই যুধামন্যুর সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব থেকেই পাণ্ডবপক্ষীয় গুরুত্বপূর্ণ মহারথ যোদ্ধা হিসেবে আমরা উত্তমৌজার নামোল্লেখ পাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উত্তমৌজাকে আমরা অর্জুনের চক্ররক্ষকের ভূমিকায় দেখি। অর্জুনের রথের ডানদিকের চাকাটি যাতে শত্রুপক্ষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দায়িত্ব উত্তমৌজা গ্রহণ করেন। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে খুব একটা বীরত্বের পরিচয় দিতে দেখা যায় না। দ্রোণপর্বের সূচনায় পাণ্ডবযোদ্ধারা যখন একজোট হয়ে দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করেন সেই সময় আমরা উত্তমৌজাকেও যুদ্ধরত অবস্থায় দেখি। তাঁর রথের ঘোড়াগুলি ঘন মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে। দ্রোণপর্বে উত্তমৌজা একবার দুর্যোধনের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। কর্ণপর্বে একবার কৃতবর্মা উত্তমৌজাকে আক্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়। যুদ্ধে উত্তমৌজা কৃতবর্মার হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। কর্ণের পুত্র সুষেণ উত্তমৌজার হাতে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কর্ণবধের পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে মৃত কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদের নামের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে যুধামন্যু এবং উত্তমৌজার নামোল্লেখ পাই। তবে যুদ্ধের ঠিক কোন পর্যায়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল এ সম্পর্কে কোনও বিবরণ মেলে না। শল্যপর্বের সূচনায় আবার এঁদের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়। সৌপ্তিক পর্বে অশ্বত্থামার হাতে নিহত ঘুমন্ত পাঞ্চাল যোদ্ধাদের মধ্যেও উত্তমৌজার উল্লেখ মেলে। অশ্বত্থামা উত্তমৌজাকে হত্যা করলে অন্ধকারে কোনো রাক্ষসের হাতে ভাই উত্তমৌজা নিহত হয়েছেন ভেবে যুধামন্যু গদা হাতে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করেন। অশ্বত্থামার হাতে এই সময় যুধামন্যুরও মৃত্যু হয়। এই বিবরণটিকেই আমাদের সঠিক বলে মনে হয়।

[মহা (k) ৫.৫৭.৩২; ৫.১৪১.২৫; ৫.১৬৪.৬; ৬.১৫.১৯; ৬.৯৮.৪৭; ৭.২৩.৮; ৭.১৩০.২৬-৪১; ৮.৬.২৪; ৮.৬১.৫৭-৬০; ৮.৭৫.৯-১৩; ৯.১.৩১; ১০.৮.৩৫; (হরি) ৫.৫৭.৩২; ৫.১৩২.২৫; ৫.১৫৩.৬; ৬.১৫.১৯; ৬.৯৪.৪৭; ৭.২১.৮; ৭.১১৪.২৭-৪০; ৮.৪.২৪; ৮.৪৭.৫৭-৬০; ৮.৫৬.৯-১৩; ৯.১.২৯; ১০.৯.৩২-৩৩]

উত্তমৌজা$_{২}$ মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত একজন রাজা। জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করার সময় উত্তমৌজা সসৈন্যে মথুরার পশ্চিম দ্বারে অবস্থান করছিলেন।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫০.১১নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকায় পঞ্চম শ্লোক দ্র.]

উত্তমৌজা$_{৩}$ ভবিষ্যৎ দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর একজন পুত্র। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৭১; গরুড় পু. ১.৮৭.৩৯]*

বিষ্ণু পুরাণ তাঁর পরিচয় দিয়েছে ব্রহ্ম সাবর্ণি মনুর পুত্র হিসেবে।

[বিষ্ণু পু. ৩.২.২৮; মার্কণ্ডেয় পু. ৯৪.১৫]

উত্তর$_১$ পিতা মৎস্যরাজ বিরাট, মাতা সুদেষ্ণা। মহাভারতের বিরাটপর্বের একস্থানে তাঁকে ভূমিঞ্জয় নামে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর নিজেও অর্জুনের কাছে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

অহং ভূমিঞ্জয়ো নাম নাম্নাহমপি চোত্তরঃ॥

টীকাকার নীলকণ্ঠও ভূমিঞ্জয়কে উত্তরেরই আর এক নাম বলে উল্লেখ করেছেন—

ভূমিঞ্জয়যিত্যুত্তরস্যৈব নামান্তরম্।

[মহা (k) ৪.৩৫.৯; (হরি) ৪.৩২.৯]

☐ দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় মৎস্যরাজ বিরাটের সঙ্গে তাঁর দুই পুত্র উত্তর এবং শঙ্খও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.১৮৬.৮; (হরি) ১.১৭৯.৮]

☐ দুর্যোধন এবং অন্যান্য কুরুযোদ্ধারা বিশাল কুরুসৈন্য নিয়ে বিরাটরাজার প্রায় ষাট হাজার গোরু হরণ করলেন। তখন রাজধানীতে রাজকুমার উত্তর ছাড়া আর কোনো যোদ্ধা নেই। ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সকলেই বিরাট রাজার সঙ্গে গিয়েছেন। এমন সময় রাজার গোশালার কর্মচারীরা এসে রাজকুমার উত্তরকে গোসম্পদ হরণের সংবাদ দিল। একথা শুনে উত্তর অন্তঃপুরে মহিলাদের সামনে নিজের বীরত্বের বড়াই করে বলতে লাগলেন—যদি একটি বিচক্ষণ সারথি পেতাম তাহলে এখনই যুদ্ধে কুরুসেনাকে হারিয়ে গোরুগুলিকে উদ্ধার করে আনতাম। কুমার উত্তর বোঝাতে চাইলেন—শুধু সারথির অভাবে তিনি বিশাল কুরুসেনা ধ্বংস করতে পারলেন না। তা নইলে তিনি দেখিয়ে দিতেন কুরুদের। সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী উত্তরের বাক্‌সর্বস্ব অহঙ্কার শুনে তাঁকে বৃহন্নলার কথা জানিয়ে বললেন—রাজপুরীতে বৃহন্নলা নামে যে ব্যক্তি আছেন তিনি অর্জুনের সারথি ছিলেন, আবার ধনুর্বিদ্যায় তিনি অর্জুনের শিষ্য। তাঁকে সারথি করলে অবশ্যই আপনার জয় হবে। রাজকুমার উত্তর সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদীর একথা শুনে বৃহন্নলাকে সারথি করে যুদ্ধযাত্রা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। রাজকুমারী উত্তরার অনুরোধে বৃহন্নলাও উত্তরের সারথি হতে সম্মত হলেন। এরপর উত্তর যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে গোসম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য যাত্রা করলেন। কিন্তু কৌরবদের বিশাল সুসজ্জিত সেনাবাহিনী দেখে উত্তর একান্ত ভীত হলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি কুরু মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই অসম্ভব, জয় করার তো কোনো সম্ভাবনাই নেই এই কথা ভেবে উত্তর কাঁদতে কাঁদতে অর্জুনকে বললেন—আমি একাকী বালক অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞও নই। এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তুমি ফিরে চল। তখন বৃহন্নলাবেশী অর্জুন বললেন—রাজকুমার, অন্তঃপুরে নারীদের সামনে বীরত্বের বড়াই করে এখন যদি পলায়ন করেন, তাহলে সকলের কাছে আপনি উপহাসের পাত্র হবেন। তার উপর সৈরিন্ধ্রী সকলের সামনে আমার সারথ্য ও ধনুর্বিদ্যার প্রশংসা করেছেন। অতএব গোরুগুলিকে উদ্ধার না করে আমি ফিরে যেতে পারি না। একথা শুনে ভীত উত্তর দ্রুত পলায়ন করলে অর্জুন তাঁর পিছনে দৌড়তে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত চুল ধরে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। উত্তর ভয়ে কাতর হয়ে কাঁদতে থাকলে অর্জুন তাঁকে আশ্বাস দিলেন—আমিই কুরুসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং আপনাকেও রক্ষা করব। আপনি আমার সারথির কাজ করুন। এরপর অর্জুনের আদেশে উত্তর শমীবৃক্ষে আরোহণ করে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে আনলেন। এইসময় অর্জুন উত্তরকে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানালেন। উত্তর বললেন—আপনি যদি অর্জুনের দশটি নাম আমাকে বলতে পারেন তবেই বিশ্বাস করব আপনিই স্বয়ং অর্জুন। অর্জুন তাঁর দশ নাম বলে ব্যাখ্যা করে উত্তরের অবিশ্বাস দূর করলেন। উত্তর অর্জুনকে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং নির্ভয়ে তাঁর সারথ্য করতে সম্মত হলেন। এরপর অর্জুন একা সমস্ত কুরুযোদ্ধাকে পরাজিত করে মৎস্যদের গোসম্পদ উদ্ধার করেন। যুদ্ধ জয় করার পর অর্জুন রাজকুমার উত্তরকে পাণ্ডবদের পরিচয় গোপন রাখতে অনুরোধ করলেন। উত্তর সম্মত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। পুত্রের জয়ে আনন্দিত বিরাট রাজা উত্তরকে তাঁর বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করতে বললে উত্তর সবিনয়ে বললেন—আমি শত্রুদের জয় করতে পারিনি, গোরুও উদ্ধার করতে পারিনি। উপরন্তু কুরুসেনার বিশালতা দেখে পলায়ন করেছিলাম। কিন্তু এইসময় একজন দেবপুত্র আবির্ভূত হয়ে

আমাকে পলায়ন করতে বারণ করলেন। সেই দেবপুত্রই আমার রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করে কুরুসেনাকে পরাজিত করেছেন, আপনার গোসম্পদ এবং আমার প্রাণরক্ষা করেছেন। এই মহান কার্য করার পর সেই দেবপুত্র অদৃশ্য হলেন। মনে হয়, তিনি কাল বা পরশুদিন পুনরায় আবির্ভূত হবেন। এই বর্ণনার সময় অর্জুনের তথা পাণ্ডবদের প্রতি উত্তরের আন্তরিক শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে।

[মহা (k) ৪.৩৫.৯; ৩৬ থেকে ৬৯ অধ্যায়;
(হরি) ৪.৩২.৯; ৩৩ থেকে ৬৪ অধ্যায়]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথমদিনে রাজকুমার উত্তর এবং বীরবাহুর মধ্যে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। ঐ দিনেই উত্তর শল্যকে আক্রমণ করেন এবং শল্যরাজার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৬.৪৫.৭৭; ৬.৪৭.৩৫-৩৯;
(হরি) ৬.৪৫.৭৭; ৬.৪৭.৩৫-৩৯]

☐ যুদ্ধক্ষেত্রের বীরের মত মৃত্যুবরণ করার জন্য উত্তর স্বর্গে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন বলে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ১৮.৫.১৭-১৮; (হরি) ১৮.৫.১৬-১৭]

☐ পুরাণে বর্ণিত আছে যে, উত্তরের কন্যা ইরাবতীর সঙ্গে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতের বিবাহ হয়েছিল। এখন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উত্তর সম্পর্কে পরীক্ষিতের মাতুল ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে মাতুলকন্যাকে বিবাহ করার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। ভাগবত পুরাণে দাক্ষিণাত্য প্রভাবের কারণেই পরীক্ষিতের বিবাহ সম্পর্কে এমন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে বলে মনে হয়। *[ভাগবত পু. ১.১৬.২]*

উত্তর$_২$ উত্তর দিকে অবস্থিত হবনীয় অগ্নির একটি প্রকার। যে ব্রাহ্মণ শরীরের অসুস্থতার কারণে তিনদিনের বেশি সময় নিত্যসাধ্য অগ্নিহোত্রের অগ্নিতে হোম করতে পারেননি, বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তিনি আটটি শরায় (অষ্টাকপাল) প্রস্তুত চরু দিয়ে 'উত্তর' নামক অগ্নিতে হোম করবেন এইরূপ বিধি আছে। *[মহা (k) ৩.২২১.২৯; (হরি) ৩.১৮৪.২৯ (হরিদাসী টীকা দ্রষ্টব্য)]*

উত্তর$_৩$ একজন অত্যাচারী রাজা। জরাসন্ধ বধের পূর্বে কৃষ্ণ চারজন অত্যাচারী রাজার নাম করে জরাসন্ধকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এই চারজনের মধ্যে দন্তোদ্ভব, কার্ত্যবীর্য্যার্জুনের পরে উত্তরের নাম রয়েছে অধিকাংশ মহাভারতীয় পাঠে। অন্য পাঠটি হল মরুত্ত রাজা। কিন্তু তিনি অন্যায়ী রাজা বলে মহাভারতে চিহ্নিত হননি কখনো। তাই 'উত্তর' পাঠটিই আমাদের সঠিক বলে মনে হয়।

[মহা (k) ২.২২.২৪; (হরি) ২.২১.২৪]

উত্তর$_৪$ পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের প্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উত্তরের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি উত্তর কশ্যপবংশীয় অন্যতম গোত্র প্রবর্তক ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৯.১৭]

উত্তর$_৫$ মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বেদলাভের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূর্যদেব মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বর দিয়েছিলেন যে, বেদান্তসহ সমগ্র বেদ আপনি লাভ করবেন—

প্রতিষ্ঠাস্যতি তে বেদঃ সখিলঃ সোত্তরো দ্বিজ।

আলোচ্য শ্লোকটিতে উত্তর শব্দটি যথেষ্ট তাৎপর্য্যপূর্ণ। খিল এবং উত্তর সহ সমগ্র বেদ—বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার নীলকণ্ঠ 'উত্তর' বলতে উপনিষদ বুঝিয়েছেন। আমাদের আস্তিক দর্শনশাস্ত্রের দুটি অংশ। একটি হল পূর্ব মীমাংসা, অপরটি উত্তর মীমাংসা। এই উত্তর মীমাংসা, বলতে মূলত বেদান্ত বা উপনিষদকে বোঝানো হয়। সেই কারণেই হয়তো এই শ্লোকে উত্তর শব্দটি উপনিষদের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩১৮.১০; (হরি) ১২.৩০৮.১০]

উত্তর$_৬$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। টীকাকার শঙ্করাচার্য উত্তর শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

জন্মসংসারবন্ধনাদুত্তরতীতি উত্তরঃ।

তিনি জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির ঊর্ধ্বে, সাংসারিক বন্ধন বা ইহলৌকিক যাবতীয় ভাবনার মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ করা যায় না বলেই ভগবান বিষ্ণু উত্তর নামে খ্যাত। উত্তর শব্দের অন্য একটি অর্থ হতে পারে উৎকৃষ্টতর বা শ্রেষ্ঠতর। ঋগ্বেদে দেবরাজ ইন্দ্রকে অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে বলা হয়েছে—তিনি সমগ্র বিশ্বের থেকে অথবা সমস্ত দেবতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ—বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ। ভগবান বিষ্ণু পরমেশ্বর স্বরূপ। তিনি জগৎসৃষ্টির কারণ স্বরূপ। অতএব তিনি এই জগৎ জাগতিক

বস্তুসমূহ, দেবদেবী সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সকলের উর্ধ্বে—এই কারণেও তাঁর নাম উত্তর—

সর্বোৎকৃষ্ট ইতি বা, 'বিশ্বস্মাদিন্দ্র
উত্তরঃ' ইতিশ্রুতেঃ।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৬; (হরি) ১৩.১২৭.৬৬]

উত্তরকুরু দেবী ভাগবতী উত্তরকুরু নামক স্থানে দেবী ওষধি নামে প্রসিদ্ধা।

[দেবী ভাগবত পু. ৭.৩০.৮০]

উত্তরজ্যোতিষ একটি প্রাচীন জনপদ, নকুল দিগ্‌বিজয়কালে এই জনপদটি জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ২.৩২.১১; (হরি) ২.৩১.১০]

☐ উত্তর-পশ্চিম ভারতের যবন শাসিত জনপদগুলির মধ্যে একটি। এই স্থানটি বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা হয়। *[Astronomical Dating of Events & Select Vignettes from Indian History; Ed. by Kosla Vepa; USA; Indic Studies Foundation: 2008; p. 241]*

উত্তরফাল্গুনী একটি নক্ষত্র বিশেষ।

[গরুড় পু. ১.৫৯.১৬]

উত্তরবেদি *[দ্র. বেদি]*

উত্তরভাদ্রপদ একটি নক্ষত্র বিশেষ।

[গরুড় পু. ১.৫৯.১৬]

উত্তরমালিকা অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য ভগবান শিব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকা সৃষ্টি করেন। অন্ধকাসুর বধের পর এই মাতৃকাগণ ক্ষুধার্ত হয়ে সমস্ত সৃষ্টি ভক্ষণ করতে উদ্যত হলেন। এঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ভগবান শিব নৃসিংহের শরণাপন্ন হন। নৃসিংহ এঁদের দমন করার জন্য শুষ্করেবতী প্রভৃতি মাতৃকাকে প্রেরণ করেন। দেবী শুষ্করেবতীর অনুচরীদের মধ্যে একজন ছিলেন উত্তরমালিকা।

[মৎস্য পু. ১৭৯.৭২]

উত্তরা১ মৎস্যরাজ বিরাটের ঔরসে রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভজাত কন্যা উত্তরা।

মহাভারতের বিরাটপর্বে পাণ্ডবরা যখন একবছর অজ্ঞাতবাসের জন্য ছদ্মবেশে মৎস্য দেশে বিরাট রাজার পুরীতে আশ্রয় নেন, সেই সময় অর্জুন নপুংসক বৃহন্নলার ছদ্মবেশে বিরাট রাজার সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন—আমি নৃত্য, গীত, বাদ্যে নিপুণ। আপনি আপনার কন্যা উত্তরার ভার আমার হাতে তুলে দিন—

ত্বমুত্তরায়ৈ পরিদৎস্ব মাং স্বয়ং ভবামি
দেব্যা নরদেবানর্ত্তকঃ।

বিরাটরাজা বৃহন্নলাকে উত্তরা এবং তাঁর সমবয়সী বালিকাদের নৃত্য-গীত-বাদ্য শিক্ষা দেবার জন্য নিযুক্ত করলেন। বৃহন্নলার কাছে উত্তরা নৃত্য-গীত শিক্ষা করতেন, সেই কারণে তাঁকে গুরুর মতো কিংবা পিতার মতো ভক্তিও করতেন এবং ভালও বাসতেন। অর্জুনও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং স্নেহশীল পিতার মতোই তাঁর যাবতীয় আবদার পূরণ করতেন। অর্জুন নিজেই অজ্ঞাতবাসের শেষে উত্তরার সঙ্গে তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলেছেন—

অন্তঃপুরে'হমুষিতঃ সদাপশ্যং সুতাং তব।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ বিশ্বস্তা পিতৃবন্ময়ি॥
প্রিয়ো বহুমতশ্চাসং নর্তকো গীতকোবিদঃ।
আচার্যবচ্চ মাং নিত্যং মন্যতে দুহিতা তব॥

উত্তরার প্রতি অর্জুন যে কতখানি স্নেহশীল ছিলেন, তা গোহরণ পর্বে বিরাট যুদ্ধের ঠিক আগে দ্রৌপদীর কথা থেকে স্পষ্ট হয়। রাজকুমার উত্তর যখন—'একটি উপযুক্ত সারথি পেলে এখনই কুরুসেনাকে পরাস্ত করে গোরুগুলিকে ছাড়িয়ে আনতাম'—বলে আস্ফালন করছেন, সেই সময় দ্রৌপদী উত্তরকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন—উত্তরাকে দিয়ে বৃহন্নলাকে সারথি হওয়ার জন্য অনুরোধ করান। উত্তরার অনুরোধ তিনি ফেলতে পারবেন না—

যেয়ং কুমারী সুশ্রোণী ভগিনী তে যবীয়সী।
অস্যাঃ স বীরো বচনং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

সত্যিই উত্তরার অনুরোধ অর্জুন ফেলতে পারেননি। উত্তরা নিজেও জানতেন যে, অর্জুন (বৃহন্নলা)-এর তিনি বিশেষ স্নেহের পাত্রী, তাই অনুরোধটি যাতে কোনো অবস্থাতেই ব্যর্থ না হয়, সেই জন্য অনুরোধ বাক্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন—তুমি যদি আমার কথা না রাখ, আমি প্রাণত্যাগ করব—

অথৈতদ্বচনং মে'দ্য নিযুক্তা ন করিষ্যসি।
প্রণয়াদুচ্যমানা ত্বং পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্॥

যাইহোক, উত্তরার অনুরোধে বৃহন্নলা শেষ পর্যন্ত উত্তরের সারথি হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। যাত্রাকালে উত্তরা বৃহন্নলার কাছে আবদার জানাচ্ছেন—তুমি যুদ্ধ জয় করে কুরুযোদ্ধাদের

বস্ত্র আমাদের পুতুল সাজানোর জন্য নিয়ে এসো। অর্জুন উত্তরার সেই আবদারও পূরণ করেছেন।

[মহা (k) ৪.১০.৮-১২; ৪.৩৬.২১-২৪; ৪.৩.৭ অধ্যায়; (হরি) ৪.১০.৮-১২; ৪.৩৩.১৬-১৮; ৪.৩৪ অধ্যায়]

□ মহাভারতে এই পর্যায়ে উত্তরার রূপ লাবণ্যের একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা আছে। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে অবশ্য এই অংশটি অনুপস্থিত। এই বর্ণনা থেকে জানা যায় উত্তরা অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন।

[মহা (k) ১.৩৭.১-৫]

□ অজ্ঞাতবাসের শেষে বিরাট রাজা অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু অর্জুন উত্তরাকে বরণ করলেন পুত্রবধূরূপে। কারণ হিসেবে অর্জুন বলছেন—গত একবছর উত্তরা এবং আমি একত্রে বাস করেছি। উত্তরা আমার প্রতি পিতার মতোই বিশ্বাস করেছেন, আমিও তাঁর সাথে কন্যা এবং প্রিয় শিষ্যার মতোই আচরণ করেছি। এখন যদি তাকে বিবাহ করি তাহলে লোকে মনে করবে—আমি হয়তো তার প্রতি আসক্ত ছিলাম। আমার আর উত্তরার দুজনের চরিত্র নিয়েই লোকে প্রশ্ন তুলবে। অর্জুন উত্তরার প্রতি অধিক স্নেহ পোষণ করতেন, এটা সর্বজনবিদিত হয়ে উঠেছিল। ফলে অর্জুনের এই কথাটা অযৌক্তিকও নয়। বিশেষত উত্তরার প্রতি অর্জুনের অতিরিক্ত স্নেহশীলতা দেখে পাণ্ডবদের কিংবা পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদীর মনেও এমন একটা সংশয়িত ভাবনা তৈরি হওয়া বিচিত্র ছিল না। বিশেষত উত্তরা যুবতী, রূপে-গুণে অতুলনীয়া। ক্ষত্রিয়কুলজাতা উত্তরাও যে অর্জুনের মতো সুন্দর বীর পুরুষের প্রতি আসক্ত হতে পারেন একথা মনে হওয়াও স্বাভাবিক। কীচকবধের পর দ্রৌপদীর মুখে অর্জুনের সম্বন্ধে অভিমান ফুটে ওঠে—

'তুমি তো ভালই আছো এই কন্যান্তঃপুরে নর্তক হয়ে'—এই অভিমান সত্যের জায়গা নিত যদি অর্জুন বিরাট রাজার বিবাহ-প্রস্তাবে রাজী হতেন। সেক্ষেত্রে অর্জুন প্রথমেই যে পিতা-কন্যা বা গুরু-শিষ্যা সম্বন্ধের কথা বলেছেন, তা বোধহয় এই যাবতীয় সন্দেহের উত্তর। তারপরেই যেভাবে নিজের পুত্রের রূপ-গুণ-বীরত্বের বর্ণনা করে বিরাটরাজার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ করছেন অর্জুন, তা থেকে মনে হয়, গত একটি বছর ধরে রাজকুমারী উত্তরাকে বোধহয় তিনি পুত্রবধূ রূপেই কল্পনা করে এসেছেন। পরমাসুন্দরী এই কন্যাটিই তাঁর বীর পুত্রের ভার্য্যা হবার উপযুক্ত—এই ভাবনা থেকেই হয়তো পিতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়েছেন উত্তরার প্রতি। তাই বিরাট রাজার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহশীল পিতার দীর্ঘদিনের কল্পনাকে প্রকাশ করেছেন অর্জুন।

শুভদিনে উপপ্লব্য নগরে মহাসমারোহে অভিমন্যু উত্তরার বিবাহ সুসম্পন্ন হল।

[মহা (k) ৪.৭১ অধ্যায়; (হরি) ৪.৬৬ অধ্যায়]

□ অভিমন্যু-উত্তরার মধুর দাম্পত্য জীবন মাত্র ছয়-সাত মাস স্থায়ী হয়েছিল। স্ত্রী পর্বে বিলাপরতা উত্তরা নিজেই সে কথা জানিয়েছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হলে তাঁর গর্ভবতী পত্নী উত্তরা সেই সংবাদ শুনে মূর্ছিতা হলেন। তারপর তাঁকে কাতরস্বরে বিলাপ করতে দেখে কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দেন। মহাভারতের স্ত্রী পর্বেও উত্তরাকে অভিমন্যুর মৃতদেহের উপর আছড়ে পড়ে বিলাপ করতে দেখা গেছে।

[মহা (k) ৭.৭৮.৩৭-৪০; ১১.২০.৪-২৯; (হরি) ৭.৬৯.৩৫-৩৯; ১১.২০.৪-২৯]

□ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়েই হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে আর একবার শোকের আবহ তৈরি হল। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে আহত উত্তরার গর্ভজাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হল মৃত অবস্থায়। স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরার জীবনের শেষ অবলম্বন ছিল এই পুত্রটি। পুত্রের মৃত্যুতে উত্তরা তাই একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর করুণ বিলাপ শুনে কৃষ্ণ এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। কৃষ্ণের কৃপায় শেষ পর্যন্ত লুপ্তপ্রায় কুরুবংশ রক্ষা পেল। উত্তরার পুত্র জীবনলাভ করল। তাঁর নাম হল পরীক্ষিৎ।

[মহা (k) ১.৯৫.৮২-৮৪; ১৪.৬৮-৭০ অধ্যায়; (হরি) ১.৯০.১০৮-১১৩; ১৪.৮৬-৮৮ অধ্যায়; বায়ু পু. ৯৯.২৪৯; ভাগবত পু. ১.১০.৯-১০; ৯.২২.৩৩; বিষ্ণু পু. ৪.২০.১২]

□ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী যখন

হস্তিনাপুর ছেড়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন সেইসময় রাজপুরীর যেসব পুরাঙ্গনা কিছুদূর পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করেন তাঁদের মধ্যে উত্তরাও ছিলেন।

[মহা (k) ১৫.১৫.১০; (হরি) ১৫.১৮.১০]

□ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বানপ্রস্থ অবলম্বনের কিছুকাল পরে পাণ্ডবরা সপরিবারে তাঁদের দেখতে তপোবনে গেলেন। উত্তরাও সেই সময় তপোবনে গিয়েছিলেন। সেই আশ্রমে ব্যাসদেব উপস্থিত হয়ে শোকসন্তপ্ত কুরু পরিবারকে তপোবলে তাঁদের মৃত পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করালেন। স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যে নেমে এলেন কুরু পরিবারের সদস্যরা। পিতা-মাতার সঙ্গে পুত্রের, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর দেখা হল। এরপর ব্যাসদেব বললেন—যেসব বিধবা নিজের নিজের পতিলোক লাভ করতে চান, তাঁরা গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করুন। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও মনে হয় এই সময় উত্তরাও গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন। কারণ এরপর আর কোথাও আমরা তাঁর উল্লেখ পাই না।

[মহা (k) ১৫.২৫.১৫; ১৫.৩৩.২১-২৬;
(হরি) ১৫.২৮.১৫; ১৫.৩৬.২১-২৬]

উত্তরা$_{২}$ একটি নক্ষত্রের নাম। *[বায়ু পু. ৮২.৭]*

উত্তরাপথ প্রাচীন আর্যাবর্তের সুদূর উত্তর-পশ্চিম ভাগ। মহাভারতে উত্তরাপথকে মূলতঃ যৌন, কম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্বর জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বলা হয়েছে—

উত্তরাপথজন্মানঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি তানপি।
যৌনকাম্বোজগান্ধারাঃ কিরাতা বর্ব্বরৈঃ সহ॥

অর্থাৎ সুদূর আলেকজান্দ্রিয়া, সিন্ধু উপত্যকার পশ্চিমাংশের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং কাশ্মীরের রাজৌর হয়ে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগই উত্তরাপথ নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য কালক্রমে উত্তরাপথের সীমানা বিন্ধ্যপর্বত নয়, বরং মধ্যদেশ (মূলতঃ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল ও অওধ) পর্যন্ত সরে এসেছে। মহাভারত থেকে আরও জানা যায় যে, উত্তরাপথের অধিবাসীরা ব্রাহ্মণ্য ভাবনার পরিপন্থী ছিলেন। *[মহা (k) ১২.২০৭.৪৩-৪৪;*
(হরি) ১২.২০১.৪৩-৪৪;
PHAI (Roychaudhuri) p. 211, 273;
GDAMI (Dey) p. 214]

□ পণ্ডিত N.N. Bhattacharya-র মতে পুরাণে উদীচ্য নামে যে স্থানটির কথা পাওয়া যায়, সেটিই আসলে উত্তরাপথ। রসশাস্ত্রকার রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে মতপ্রকাশ করেছেন যে, পৃথুদক বা আধুনিক পেহোয়ার-এর উত্তর দিকের অংশটিই উত্তরাপথ নামে পরিচিত ছিল। *[GD (N.N. Bhattacharya) p. 299;*
কাব্যমীমাংসা (Dalal) ১৭.১০; পৃ. ৯৪]

□ মনুর পুত্র করূষের নামানুসারে কারূষ বংশীয় রাজাদের উত্থান ঘটে। এই কারূষ বংশীয় রাজারাই উত্তরাপথের শাসক ছিলেন। অবশ্য বায়ু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকু বংশজাত শকুনি এবং তাঁর পাঁচশো ভাই উত্তরাপথ শাসন করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৯.২.১৬; বায়ু পু. ৮৮.৯-১০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৯-১০;
দেবী ভাগবত পু. ৭.৮.৫৫]

□ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চালুক্যবংশীয় বিনয়াদিত্যের শিলালিপিতে হর্ষবর্ধনকে 'সকলত্তোরপথনাথ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, সম্রাট হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তরাপথ জয় করে অঞ্চলটি শাসন করেছিলেন। তবে হর্ষবর্ধনের সময় উত্তরাপথ বলতে সম্ভবত বৃহত্তর উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষকে বোঝানো হতো না। কারণ হর্ষবর্ধন পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত অঞ্চল শাসন করেছিলেন। ফলে একথা বলাই যায় যে, সে সময় উত্তরাপথের উত্তর-পশ্চিম সীমা বৃহত্তর পাঞ্জাব অঞ্চল থেকেই শুরু হতো। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে উত্তরাপথের সীমানা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে।

[History of Kanauj:
Rama Shankar Tripathi: p. 120]

উত্তরাষাঢ়া একটি নক্ষত্র বিশেষ।

[গরুড় পু. ১.৫৯.১৬; বায়ু পু. ৮২.১১]

উত্তরী বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, দীপক রাগের পত্নীদের মধ্যে একজনের নাম উত্তরী।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ২.১৪.৫৭]

উত্তরেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে পুণ্যার্থী তাঁর সমস্ত বংশকে নরক থেকে উদ্ধার করেন।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৭৭-৭৮]

উত্তানবর্হি মনুর পুত্র শর্যাতি। শর্যাতির পুত্রদের মধ্যে উত্তানবর্হি অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৯.৩.২৭]*

উত্তারণ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১২; (হরি) ১৩.১২৭.১১২]

উত্তেজনী স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ৫ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

উত্থানশক্তি *[দ্র. অর্থ]*

উদ্গল ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কৌশিক বিশ্বামিত্রের গোত্রভুক্ত ঋষিদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে মহর্ষি উদ্গলের নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৭]

উদ্গাতা ঋগ্‌বেদেই সাম গান করেন এমন ঋত্বিকদের সামগ বলা হয়েছে। যজ্ঞকর্মে সামগ ব্রাহ্মণদের পারিভাষিক নাম উদ্। সামগায়ী উদ্‌দের গায়ত্রী-ত্রিষ্টুভ-ছন্দে গাওয়া গানকে কপিঞ্জল পাখির গানের সঙ্গে তুলনা করে ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে—পাখি! তুমি গান গাও ঠিক উদ্গাতার মতো—

উদ্গাতেব শকুনে সাম গায়সি।

[ঋগ্‌বেদ ২.৪৩.১-২]

☐ যজ্ঞ কর্মে নিযুক্ত চতুর্বেদের প্রতিনিধি চার রকমের ঋত্বিকের মধ্যে উদ্গাতা হলেন সামবেদের পুরোহিত। যজ্ঞের সময় মাঝে স্তোত্রগানের নির্দেশ ঋগ্‌বেদের মধ্যেই পাওয়া যায়। *[ঋগ্‌বেদ ৬.৬৯.২; ৮.৩২.২৭; ৯.১০৪.১]*

কিন্তু বোধহয় একমাত্র সোমযাগের ক্ষেত্রেই এই সামবেদীয় ঋত্বিক উদ্গাতা এবং তাঁর তিন সহকারী প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা এবং সুব্রহ্মণ্য-এর সঙ্গে শস্ত্রপাঠের সঙ্গে স্তোত্রগান করতেন। ঋক্‌মন্ত্রগুলির নাম শস্ত্র। ঋগ্‌বেদের ঋত্বিক্ হোতা সোমযাগে শস্ত্রপাঠ আরম্ভ করার আগে (স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাৎ) উদ্গাতা সামমন্ত্র গান করতেন, অর্থাৎ স্তোত্রগান করতেন। হোতা যতগুলি শস্ত্রপাঠ করতেন, উদ্গাতা ততগুলিই স্তোত্রগান করতেন। অগ্নিষ্টোম-যাগে অগ্নিষ্টোম নামক সামগানের দ্বারাই যজ্ঞ সমাপ্ত হত বলে সমগ্র অনুষ্ঠানটার নামই ছিল অগ্নিষ্টোম। সোমযাগ ছাড়া অন্য কোনো স্থলে সামগানের প্রয়োজন হত না বলে, উদ্গাতারও প্রয়োজন হত না। সোমযাগে সোমরস নিষ্কাশনের সময় উদ্গাতা বহুসংখ্যক স্তোত্র গান করতেন। *[মানব শ্রৌতসূত্র ৭.২.২.১৮; লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৩.৪.২; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite) ৩.৩.১৮]*

☐ জনমেজয়ের সর্পসত্রে উদ্গাতা ছিলেন কৌৎস জৈমিনি, আর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উদ্গাতার দায়িত্ব পালন করেছেন ঋষি সুসামা।

[মহা (k) ১.৫৩.১-১০; ২.৩৩.৩৩-৩৬; (হরি) ১.৪৮.১-১০; ২.৩২.২৬-২৯]

☐ ভগবান বিষ্ণু উদ্গাতাকে যজ্ঞ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন বলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে—

উদ্গাত্রাদীংশ্চ যঃ কৃত্বা যজ্ঞাল্লোকাননুক্রমান্।

মৎস্য পুরাণ মতে পরম ঈশ্বর দুই বাহু থেকে উদ্গাতার সৃষ্টি করেছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৭২.২৯; মৎস্য পু. ১৬৭.৭]

☐ পরশুরামের পিতা জমদগ্নি কার্তবীর্য্যার্জুনের হাতে মারা যাবার পর পরশুরাম যজ্ঞ শেষ করে উদ্গাতাকে সম্পূর্ণ উত্তর দিগ্‌ভাগ দান করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.১৬.২১]*

☐ বলির যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণুকেই হোতা, উদ্গাতা সব একাধারে কল্পনা করা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ২৪৬.১২]

☐ সামগানের মাধ্যমেই উদ্গাতার কর্ম সিদ্ধ হয়—

উদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে। *[বায়ু পু. ৬০.১৮]*

উদ্গাহ পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে; মহর্ষি উদ্গাহর বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি বশিষ্ঠ বংশীয় অন্যতম গোত্র-প্রবর্তক ছিলেন।

[মৎস্য পু. ২০০.১২]

উদ্গীথ$_1$ স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধারায় রাজা ভূব (অন্যমতে ভূম)-এর পুত্র ছিলেন উদ্গীথ। ভাগবত পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ভূম রাজার পত্নী ছিলেন ঋষিকুল্যা। এই ঋষিকুল্যার গর্ভেই উদ্গীথের জন্ম। উদ্গীথের পত্নী ছিলেন দেবকুল্যা। উদ্গীথের ঔরসে দেবকুল্যার গর্ভে প্রস্তাব নামে এক পুত্র হয়।

[বায়ু পু. ৩৩.৫৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৬৭; ভাগবত পু. ৫.১৫.৬; বিষ্ণু পু. ২.১.৩৮]

উদ্গীথ$_2$ বেদ ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে এই শব্দটি অনেকবার পাওয়া যায়। উদ্গীথ শব্দের সাধারণ

অর্থ—সামবেদীয় ঋত্বিক্ উদ্‌গাতার যজ্ঞসম্বন্ধী কর্ম। শংকরাচার্য ছান্দোগ্য উপনিষদের টীকায় এই কথাই লিখেছেন— উদ্‌গীথ-শব্দটির মধ্যে একটা ভক্তির উপলক্ষণ আছে অর্থাৎ সামবেদের পুরোহিত যাঁকে আমরা উদ্‌গাতা বলি তাঁর যজ্ঞসম্বন্ধী কর্মের মধ্যে ভক্তি ভাবটা অনুক্ত চিহ্নের মতো থেকেই যায়—

উদ্‌গীথম্ উদ্‌গীথভক্ত্যুপলক্ষিতম্
ঔদগাত্রং কর্ম।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ), ১.২.১. পৃ. ২৯]

উদ্‌ভ্রম ধনপতি কুবেরের একজন অনুচর। *[মৎস্য পু. ১৮০.৯৯]*

উদ পঞ্চম মন্বন্তরে যখন রৈবত মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন ভব্য তার মধ্যে একটি গণ। এই ভব্য গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন উদ। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৭১]*

উদক্‌সেন নীপবংশীয় রাজা বিশ্বক্‌সেনের পুত্র। ভাগবত পুরাণে অবশ্য উদক্‌স্বন—এই পাঠ পাওয়া যায়। উদক্‌সেন ভল্লাট নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন।

[বায়ু পু. ৯৯.১৮১; মৎস্য পু. ৪৯.৫৯; ভাগবত পু. ৯.২১.২৬; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৩]

উদক$_১$ অরণ্যের পুত্র। ইনি বরুণের পুত্রত্ব বা বরুণত্ব লাভ করেছিলেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১০৪]*

উদক$_২$ সময় গণনার অন্যতম একক। সাত প্রস্থে এক উদক হয় বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। *[বায়ু পু. ১০০.২১৫]*

উদকক্রীড়ন দুর্যোধন কুরু-পাণ্ডবদের বনভোজনের জন্য প্রমাণকোটিতে যে অস্থায়ী শিবির স্থাপন করিয়েছিলেন, সেই শিবিরের নাম উদকক্রীড়ন। মূলত গঙ্গাবক্ষে বালক রাজকুমারদের জলক্রীড়া এবং বনভোজনের উদ্দেশ্যে এই অস্থায়ী আবাস নির্মিত হয়েছিল বলেই এমন নামকরণ করা হয়েছে। *[দ্র. প্রমাণকোটি]*

উদগ্র$_১$ শিব-মহাদেবের একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের উদগ্র নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

উদগ্রঃ ঊর্জিতরূপঃ।

ঊর্জিত অর্থাৎ তেজস্বী বা তেজোময়। ভগবান শিবকে অনেক সময়েই অগ্নিরূপে কল্পনা করা হয়। দহনশক্তি সম্পন্ন অগ্নিস্বরূপ বলে তাঁর উদগ্র নাম।

ঈশ্বর পুরুষকে জগতের সমস্ত শক্তি বা তেজসমূহের উৎস বা আধার রূপে কল্পনা করা হয়। ঈশ্বরের এই মহাজাগতিক রূপের কল্পনা তাঁকে অগ্নি বা সূর্যের থেকেও বহুগুণ বেশি তেজস্বী রূপে প্রকাশ করে সূর্য বা অগ্নির তেজও সেই তেজোময় মূর্তির একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। ভগবদ্‌গীতায় পরমেশ্বরের এই দীপ্তরূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে যদি আকাশে একই সঙ্গে সহস্র সূর্য উদিত হয় তাহলে হয়তো সেই দীপ্তি পরমেশ্বরের এই বিরাট বিশ্বরূপের দীপ্তির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

[ভগবদ্‌গীতা ১১.১২]

এই বিরাট তেজোদীপ্ত রূপের ভাবনা থেকেও ভগবান শিব উদগ্র নামে খ্যাত। উদগ্র বলেই তিনি রুদ্রদেবও বটে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪৪; (হরি) ১৩.১৬.৪৪]

উদগ্র$_২$ মহিষাসুরের সেনাপতিদের মধ্যে একজন। ইনি দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং দেবী তাঁকে হত্যা করেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৮২.৪০; ৮৩.১৬]*

উদগ্রজ পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উদগ্রজের বংশ তাঁদের মধ্যে একটি। উদগ্রজ কশ্যপবংশীয় গোত্রপ্রবর্তকদের মধ্যে একজন ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৯.২]*

উদঙ্ক শুঙ্গবংশীয় রাজা বসুমিত্রের পুত্র। বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে অবশ্য ইনি আর্দ্রক নামে চিহ্নিত হয়েছেন। পুলিন্দক নামে তাঁর এক পুত্র সন্তান ছিল। *[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.২৪.৩৫; (নবভারত) ৪.২৪.১০]*

উদচন *[দ্র. যজ্ঞায়ুধ]*

উদপানতীর্থ সরস্বতী নদীর তীরবর্তী একটি প্রাচীন তীর্থ। মহর্ষি গৌতমের বেদজ্ঞ কনিষ্ঠ পুত্র ত্রিত পুরাকালে এইস্থানে একটি কূপের মধ্যে প্রলম্বিত লতার রসকে সোমরস কল্পনায় পান করেছিলেন বলেই তীর্থটির নাম উদপান। বলরাম তাঁর তীর্থযাত্রাকালে উদপান তীর্থ দর্শন করেন। সম্ভবত এই অঞ্চলে সরস্বতী নদী

অন্তঃসলিলা রূপে প্রবাহিতা। ভূমির আর্দ্রতা এবং উদ্ভিদের শ্যামল বর্ণ দেখে বলরাম উদপান তীর্থে অন্তঃসলিলা সরস্বতীর অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন—

স্নিগ্ধত্বাদোষধীনাঞ্চ ভূমেশ্চ জনমেজয়।
জানন্তি সিদ্ধা রাজেন্দ্র নষ্টামপি সরস্বতীম্॥

উদপান তীর্থটি বিনশন তীর্থের নিকটবর্তী।

[মহা (k) ৯.৩৫.৮৯-৯০; (হরি) ৯.৩৩.৮২-৮৩]

□ মহর্ষি গৌতমের তিন পুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত। এঁদের মধ্যে ত্রিতই যাজন কর্ম ও বেদ পাঠে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। কালে কালে ত্রিত মহর্ষি গৌতমের মতই সকলের শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলেন। ত্রিতের গ্রহণযোগ্য তার কারণেই একত ও দ্বিত তাঁর প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করতেন। তাঁরা দুজনে নিরন্তর ত্রিতের ক্ষতি সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। একদিন ঘটনাচক্রে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী একটি কূপে ত্রিত পড়ে গেলে তাঁর ভ্রাতারা তাঁকে উদ্ধার না করে চলে যান। ত্রিত সেই জলপূর্ণ কূপের মধ্যে জলকে অগ্নি এবং নিজেকে হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা এবং সদস্য রূপে কল্পনা করে একটি যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু করেন। কূপমধ্যে প্রলম্বিত একটি লতা সোমলতা এবং কাঁকরগুলি শর্করারূপে কল্পিত হয়। ত্রিতের যজ্ঞের বেদধ্বনি শুনে স্বয়ং দেবগণ কূপের চারপাশে আবির্ভূত হন। ত্রিতের যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। দেবতাদের বরে ত্রিত যে কূপটিতে পতিত হয়েছিলেন সেটি পবিত্র হয়ে ওঠে। সেখানে অবগাহন করলেই যাজ্ঞিকের গতি লাভ হয়। এরপর সরস্বতী নদীর জলে কূপটি পরিপূর্ণ হয়ে গেলে ত্রিত জলের ঊর্ধ্বচাপে ভূমিতে উঠে আসেন। কালক্রমে সেই কূপ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল উদপাদ তীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করে। *[দ্র. একত, দ্বিত ও সরস্বতী, বিনশন]*

পদ্ম পুরাণানুসারে এই তীর্থটি অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্টস্থান। জনকরাজা এখানে একটি কূপ খনন করিয়েছিলেন। ত্রিত ঋষি সম্ভবত সেই কূপেই পতিত হন।

[পদ্ম পু. (মহর্ষি) স্বর্গ ৩৮.২৭]

উদয়গিরি শাকদ্বীপের পূর্ব দিকে একটি মনোরম ও পবিত্র পর্বত। মৎস্য পুরাণ মতে, এটি দেব ও ঋষিদের দ্বারা অধ্যুষিত মেরু পর্বতেরই একটি পূর্বভাগীয় বিস্তার—

দেবর্ষি-গন্ধর্বয়ুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে।
প্রাগায়তঃ স সৌবর্ণ উদয়ো নাম পর্বতঃ॥

এটির নাম উদয়াচল যা বর্ণে সোনালী। উদয়াচল ছিল পৃথিবীর প্রথম রাজা পৃথুরূপী শ্রীহরির রাজ্যের সীমানা। ঋষি অগস্ত্যের সঙ্গেও পবিত্র উদয়গিরি সম্পর্কযুক্ত। পুরাণ মতে, অগস্ত্য মুনি উদ্যন্তক পর্বতকে উদয়গিরির বাম দিকে স্থাপন করেন।

[মহা (k) ৮.১২.২২; ৮.৬০.৪০; ১২.২৯৩.৪;
(হরি) ৮.৯.২২; ৮.৪৬.৪০; ১২.২১৬.৪;
মৎস্য পু. ১২২.৮; ১৬৩.৬৯; বায়ু পু. ৪৯.৭৮;
বিষ্ণু পু. ২.৪.৬২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৮৪]

□ বলে রাখা ভালো যে, এই উদয়গিরি এবং উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে অবস্থিত বিখ্যাত উদয়গিরি এক নয়। পণ্ডিতদের মতে পুরাণে উল্লিখিত মেরু পর্বত বলতে মূলত গাড়োয়ালের অন্তর্গত রুদ্র হিমালয়কেই বোঝানো হয়। ফলে আমাদের আলোচিত উদয়গিরি, রুদ্র হিমালয়েরই পূর্বদিকে সম্প্রসারিত একটি অংশ বলে ধরে নেওয়া যায় এবং সেখানেই সূর্যকে প্রথম দেখা যায়—

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরি ভালে। *[EAIG (Kapoor) p. 462]*

উদয়ন$_১$ কুরুবংশীয় রাজা শতানীকের পুত্র। ইনি সর্পসত্রকারী জনমেজয় পুত্র শতানীকের অনেক পরবর্তী সময়ের রাজা ছিলেন। শতানীকের পুত্র উদয়ন। উদয়ন রাজা অহীনর নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[মৎস্য পু. ৫০.৮৬;*
বিষ্ণু পু. ৪.২১.৪]

উদয়ন$_২$ শিশুনাগ বংশীয় রাজা অর্ভক (দর্ভক)-এর পুত্র। তবে বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে উদয়াশ্ব পাঠ ধৃত হয়েছে। রাজা উদয়ন নন্দিবর্দ্ধন নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.২৪.১৬-১৭;
(নবভারত) ৪.২৪.৩]

উদয়েন্দু একটি বিখ্যাত কুরু নগর। ভীমের ছেলে সুতসোম উদয়েন্দু নগরে সোমযাগের সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে সহস্র সোম বা চন্দ্রের সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৭.২৩.২৯; (হরি) ৭.২১.২৮]

উদরী একপ্রকার রোগ বলে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে। রোগাক্রান্ত অবস্থায় উদরে জল জমে যায়

এই অবস্থাকেই উদরী বলে। সুশ্রুত সংহিতায় একে 'উদকোদর' বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ 'উদকোদর' থেকেই 'উদরী' কথাটি এসেছে।
*[বৃহদ্ধর্ম পু. ৩.১২.৬২;
সুশ্রুত সংহিতা ২.৭ অধ্যায়]*

উদরেণু পুরাণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি উদরেণুর বংশ তার মধ্যে একটি। উদরেণু বিশ্বামিত্রবংশীয় অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।
[মৎস্য পু. ১৯৮.১৮]

উদর্ষি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে দেবকীর যে ছয়টি পুত্রকে কংস হত্যা করেছিল উদর্ষি তাঁদের মধ্যে একজন।
[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭৫]

উদশ্রবা রৈবত মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন অমৃতাভ তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে উদশ্রবা ছিলেন অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬২.৪৬]*

উদাপি *[দ্র. উদায়ু]*

উদাবসু$_1$ ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় রাজর্ষি জনকের পুত্র ছিলেন উদাবসু। উদাবসু নন্দিবর্দ্ধন নামে এক পুত্র লাভ করেন।
*[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১২; বায়ু পু. ৮৯.৬;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.৬;
ভাগবত পু. ৯.১৩.১৪; রামায়ণ ১.৭১.৪-৫]*

উদাবসু$_2$ বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশধারায় প্রজাতির পুত্র উদাবসু। প্রজাতির জ্যেষ্ঠপুত্র খনিত্র উদাবসুকে দক্ষিণদেশের রাজা হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। গৌতমবংশীয় কুশাবর্তে উদাবসুর পুরোহিত ছিলেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ১১৭.২০-২৪]*

উদাবহ পুরাণ মতে সাতটি উৎপাত বা দুর্লক্ষণ সূচক বায়ুর মধ্যে উদাবহ অন্যতম।
[মৎস্য পু. ১৬৩.৩২]

উদাবহি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উদাবহির বংশ তার মধ্যে একটি। উদাবহি বিশ্বামিত্র বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ছিলেন।
[মৎস্য পু. ১৯৮.১৮]

উদাবর্ত্ত যে সমস্ত দুর্বৃত্ত রাজারা অহঙ্কারী হয়ে নিজেদের স্বজন-জ্ঞাতিদের উচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন, ভীম তাঁদের নাম উল্লেখ করেন দুর্যোধনের জ্ঞাতিচ্ছেদীভাবের প্রসঙ্গে—যে সমুচ্চিচ্ছিদুর্জ্ঞাতীন্ সুহৃদশ্চ সবান্ধবান্। আঠেরোজন এইরকম দুর্বৃত্ত রাজার নাম করার সময় ভীম হৈহয় বংশীয় রাজা উদাবর্ত্তের নাম উল্লেখ করেছেন। *[দ্র. হৈহয়]*
[মহা (k) ৫.৭৪.১৩; (হরি) ৫.৬৯.১৩]

উদায়ী বায়ু পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী কলিযুগে শিশুনাগবংশীয় যেসব রাজা মগধে রাজত্ব করেন, উদায়ী তাঁদের মধ্যে একজন। ইনি শিশুনাগ বংশীয় রাজা দর্শকের পুত্র ছিলেন। উদায়ীর পুত্র নন্দিবর্ধন। রাজা উদায়ী তেত্রিশবছর রাজত্ব করেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। তাঁর রাজত্বকালে মগধে কুসুমপুর নামে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। *[বায়ু পু. ৯৯.৩১৮-৩২০]*

উদায়ু বিষ্ণু পুরাণ মতে উদায়ু দেবকীর ছয় পুত্রের একজন। দেবকীর এই ছয়টি পুত্রই কংসের হাতে নিহত হয়। অবশ্য বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে উদায়ুর পরিবর্তে উদাপি পাঠ ধৃত হয়েছে।
*[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৫.২৬-২৭;
(নবভারত) ৪.১৫.১৩]*

উদারধী উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবর বংশধারায় প্রাচীনগর্ভের ঔরসে সুবর্চার গর্ভে রাজা উদারধী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পূর্বজন্মে ইন্দ্র ছিলেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। উদারধীর পত্নী ছিলেন ভদ্রা। উদারধীর ঔরসে ভদ্রার গর্ভে দিবঞ্জয় নামে এক পুত্র হয়। *[বায়ু পু. ৬২.৮৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৯৯, ১০১;
গরুড় পু. ১.৬.৩]*

উদারাক্ষ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।
*[মহা (k) ৯.৪৫.৬৩; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং
শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]*

উদাসী$_1$ দেবকীর যে ছয়টি পুত্র কংসের হাতে নিহত হয়েছিল, মৎস্য পুরাণ মতে তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উদাসী। সম্ভবত একেই অন্যান্য পুরাণে উদায়ু, উদাপি বা উদর্ষি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাগবত পুরাণ এঁকে উদ্‌গীথ নামে চিহ্নিত করেছে। *[মৎস্য পু. ৪৬.১৩]*

উদাসী$_2$ *[দ্র. উদায়ী]*

উদাসীন গৃহস্থ দুই রকমের হয়। যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর সংসারী হয়ে কুটুম্ব-ভরণ করেন, তাঁর নাম সাধক। আর তিন রকমের ঋণ শোধ করার পর স্ত্রী-পুত্র এবং অর্থ-ধন পরিত্যাগ

মোক্ষ-লাভের জন্য একাকী সর্বত্র বিচরণ করেন, তাঁকে বলা হয় উদাসীন—

> গুণ্যানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্যাধনাদিকম্।
> একাকী যস্তু বিচরেদুদাসীনঃ স মৌক্ষিকঃ॥

শাস্ত্রানুসারে মানুষ জন্মমাত্রেই তিন প্রকার ঋণে আবদ্ধ হয়। এই কথাটা কতকাল আগে বলেছে কৃষ্ণযজুর্বেদ। প্রথম ঋণ ঋষিদের কাছে, আচার্য এবং গুরুদের কাছে। সে ঋণ শোধ হয় ব্রহ্মচর্য পালন করে গুরুর কাছে শিক্ষালাভের মাধ্যমে। দ্বিতীয় ঋণ দেবতার কাছে। যাগ-যজ্ঞ যথাসাধ্য করে সেই শোধ করার চেষ্টা হয়। তৃতীয় ঋণ পিতৃকুলের কাছে যাঁরা আমাদের জন্ম দেন। সে ঋণ শোধ হয় বিবাহাদি করে পুত্রলাভ করার পর—

> জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য, এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারী...।

স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে মোক্ষানুসন্ধানের জন্য যে গৃহস্থ উদাসীন-পদবী লাভ করতে চাইছেন, শাস্ত্রকারেরা কিন্তু তাঁকে কোনোভাবেই সংসারের ক্ষেত্রে ঠ্যালার নাম বাবাজি হতে দেবেন না। গৃহস্থ হয়ে সংসার-ধর্ম আরম্ভ করার পর হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হল আর উদাসীনের পথ ধরলেন, এমনটা স্বয়ং মনু নিষেধ করে চলেছেন—ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ এবং পিতৃ-ঋণ পরিশোধ না করেই মোক্ষসাধনের পথে যাবেন, তাঁকে পতিত হতে হবে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করে ব্রহ্মচর্য্যের মাধ্যমে ঋষি-ঋণ, পুত্র-কন্যা লাভ করে পিতৃ-ঋণ এবং যজ্ঞ-দান ইত্যাদি কর্ম শেষ করে তবেই মোক্ষের চিন্তা করতে হবে। এমনটা না করে উদাসীন হওয়া চলবে না বলেই শাস্ত্রকারদের ধারণা।

[কূর্ম পু. ১.২.৩৯; কৃষ্ণযজুর্বেদীয় যজুর্বেদ-সংহিতা (আনন্দাশ্রম), খণ্ড ২, ৬.৩.১০.৫, পৃ. ২৪৩৭; মনুসংহিতা, ৬.৩৫-৩৭]

উদিত ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তরে যখন ঋতসাবর্ণি বা রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন সুপার তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে উদিত একজন। *[বায়ু পু. ১০০.৯৪]*

উদীচী একটি পবিত্র মহানদী। লোমশ ঋষি তপোবলে স্বর্গ থেকে উৎপন্ন উদীচী নদীকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। নদীটি পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধকার্যের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত।

[বায়ু পু. ১০৮.৮০]

উদীর্ণ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৮০; (হরি) ১৩.১২৭.৮০]

উদুম্বর$_1$ পুরাণে মহর্ষি কৌশিক বিশ্বামিত্রের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উদুম্বরের বংশ তার মধ্যে একটি। মহর্ষি উদুম্বর কৌশিক বংশীয় গোত্র-প্রবর্তকদের মধ্যে একজন ছিলেন। *[মৎস্য পু. (মহর্ষি) ১৯৮.২০; বায়ু পু. ৯১.৯৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৭০]*

উদুম্বর$_2$ ব্রাহ্মণগ্রন্থে উদুম্বর-শাখাকে অন্নস্বরূপ এবং রসস্বরূপ মনে করা হয়েছে। সোমযাগের সময় মহাবেদিতে প্রোথিত উদুম্বরশাখা বা ঔদুম্বরী স্পর্শ করে উদ্গাতা এবং তাঁর সহকারীরা স্তোত্র গান করেন। উদুম্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, পুরাকালে দেবতারা নিজেদের মধ্যে অন্ন এবং রস ভাগ করে নিয়েছিলেন। ভাগ করার সময় ভূমিতে পতিত অন্ন এবং রসের অংশ থেকেই উদুম্বরের উৎপত্তি। সেইজন্যই নাকি উদুম্বর বৃক্ষে বৎসরের মধ্যে তিনবার ফল ধরে। উদুম্বর স্পর্শ করা মানে ভক্ষণীয় অন্ন এবং রসকেই স্পর্শ করা।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ২৪.৫; পৃ. ৬৩৯; দ্র. সায়নাচার্যের টীকা]

□ মহাভারতে পবিত্র দেববৃক্ষগুলির মধ্যে উদুম্বর বৃক্ষের নাম আছে। অর্জুন যখন দিব্য অস্ত্র লাভ করে স্বর্গ থেকে ফিরে আসছেন, অন্যান্য পাণ্ডবরা তখন দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের সানুদেশ ধরে নির্দিষ্ট একটি স্থানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন। যেতে যেতে তাঁরা গন্ধমাদনের সানুদেশে প্লক্ষ, উদুম্বর, অশ্বত্থ, আমলক, হরীতক, বিভীতক ইত্যাদি পবিত্র বৃক্ষগুলি দেখতে পেয়েছেন।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে দেখেছি—অতি মহান এক রাজা ঋষিদের নানা দান দিতে চাইলে তাঁরা নিতে অস্বীকার করলেন। এমনকী ভাল রান্না করা মাংসের আহার ত্যাগ করে ঋষিরা বনের দিকে গেলেন। এই সময় সেই রাজার মন্ত্রীরা বনে গিয়ে ঋষিদের খাবার জন্য উদুম্বর বৃক্ষের ফল আহরণ করা আরম্ভ করলেন—

প্রচীয়োদুম্বরাণি স্ম দাতুং তেষাং প্রচক্রিরে।

এতে বোঝা যায় উদুম্বর বৃক্ষের মান্যতা এতটাই ছিল যে তার ফলগুলিও খাদ্য হিসেবে গ্রাহ্য ছিল ব্রাহ্মণ ঋষিদের কাছে। এখানে অবশ্য রাজমন্ত্রীরা উদুম্বর ফলের মধ্যে সোনা পুরে ব্রাহ্মণদের দান দিতে চেয়েছিলেন—

উদুম্বরাণ্যখান্যানি হেমগর্ভাণ্যুপাহরন্।

হয়তো এই প্রকারে দানেও উদুম্বর ফলের ব্যবহার হত। মহাভারতের এইস্থানে উদুম্বর বৃক্ষের ফল খাদ্য বলে মনে হলেও অন্যত্র নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকায় আছে উদুম্বর অর্থাৎ উদুম্বরের ফল। বলা হয়েছে, মঙ্গলকামী মানুষ যেন কখনো উদুম্বর বৃক্ষের ফল না খায়—

উদুম্বরং ন খাদেচ্চ ভবার্থী পুরুষোত্তমঃ।

তবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এখানে পূর্ণশ্লোকের মধ্যে 'শনশাক' কথাটা দেখে উদুম্বরের শাক অর্থ করেছেন, যা ঠিক বলেই মনে হয়। কেননা উদুম্বরের পক্ব ফল খাওয়া সে যুগের ব্রাহ্মণ্য অভ্যাসের মধ্যে ছিল এবং উদুম্বরের ফল যে যথেষ্ট স্বাদু এবং মধুর তা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেফের কাহিনীতে—

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি, চরন্‌স্বাদুমুদুম্বরম্—

এই উক্তি থেকে প্রমাণ হয়।

[মহা (k) ৩.১৫৮.৪৭; ১৩.৯৩.৩৯-৪০;
১৩.১০৪.৯২; (হরি) ৩.১৩১.৪৫;
১৩.৭৯.৩৯-৪০; ১৩.৯১.৯০;
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (সামশ্রমী) খণ্ড ৪, ৭.১৫; পৃ. ৭২]

□ আমাদের মনে হয় খাদ্যতালিকায় উদুম্বর ফল না খাওয়ার এই সাধারণ নিষেধের অন্য কারণ একটা থাকতে পারে—হয়তো বা উদুম্বর-বৃক্ষের সুরক্ষাই তার প্রধান কারণ। এটা মানতে হবে যে, সেকালের যজ্ঞকর্মে যজ্ঞোপকরণগুলির অনেকগুলিই প্রধানত উদুম্বর বৃক্ষের কাঠ দিয়ে তৈরী হত। তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং বৃহদারণ্যকের মতো প্রাচীন বেদ ও উপনিষদে উদুম্বর কাষ্ঠের প্রশংসা করার পর বলা হয়েছে—মন্থহোম করতে হয় চারটি উদুম্বরের পাত্র দিয়ে। মন্থহোমের জন্য যে স্রুব, চমস, কাষ্ঠ এবং যে দুটি মন্থন-দণ্ড লাগে, সেই চারটিই উদুম্বর কাঠের তৈরি—

চতুরৌদুম্বরো ভবতি।

মহাভারতে আমরা উদুম্বর কাষ্ঠের সিংহাসনও দেখেছি, কিন্তু কাষ্ঠ-ব্যবহারের প্রয়োজনের নিরিখেই যে শুধু উদুম্বরের ফল খাওয়া হত না, মহাভারতের ওই পূর্বোক্ত আদেশ ঠিক নয় বলেই আমাদের মনে হয়। প্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণে একটা কাহিনী শুনিয়ে বলা হয়েছে—একবার দেবতা এবং অসুরদের লড়াই লেগেছিল—সেখানে সমস্ত বৃক্ষেরা অসুরদের সহায়তা করেছিল আর শুধু উদুম্বর ছিল দেবতাদের পক্ষে। এই যুদ্ধে দেবতাদের জয় হয়। এর পর দেবতারা খুশি হয়ে উদুম্বর বৃক্ষকে বর দিয়ে বলেন—অন্য সমস্ত বৃক্ষের সার এবং সরসতা এই উদুম্বর বৃক্ষের মধ্যে আসুক। এই সার-সরসতার ফলেই অন্য বৃক্ষের মতোই এর ফল হয়, সেইজন্যই এই উদুম্বর বৃক্ষে আর্দ্রভাব থাকে, সর্বদাই সে দুগ্ধময় এবং উদুম্বর মানেই তা সম্পূর্ণ এক খাদ্য। সমস্ত বনস্পতিরা তাদের খাদ্যরস দিয়ে এই উদুম্বর বৃক্ষকে প্রীত করেছে—

সর্বমন্নং যদুদুম্বরঃ। সর্বে বনস্পতয়ঃ
সর্বৈর্ণৈবেনম্ এতদন্নেন প্রীণাতি।

শতপথ ব্রাহ্মণে উদুম্বর বৃক্ষ প্রায় সমস্ত বৃক্ষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এবং সেটা আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে একটা উদুম্বর কাঠের তৈরি আসনের কথা বলার সময়। এই বৃক্ষের সার এবং সরসতার কথা বলে শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে—উদুম্বর আসলে সমস্ত বনস্পতি—

সর্বে এতে বনস্পতয়ো যদুদুম্বরঃ।

অথর্ববেদে উদুম্বর বৃক্ষের সার্বিক পুষ্টি নিয়ে সম্পূর্ণ একটি সূক্ত লেখা হয়েছে এবং তারই পুষ্টি-বিশ্লেষণ ঘটেছে চরক সংহিতার চিকিৎসা-স্থানের মধ্যে। *[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৩.৪.৮.৪;*
অথর্ববেদ (পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত), ১৯.৩১.১-১৪; বৃহদারণ্যক
উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৬.৩.১৩;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৬.৬.৩.৩; ৬.৭.১.১৩;
চরক সংহিতা (Trikamji) চিকিৎসা স্থান ১৪.২১৪]

উদুম্বর বৃক্ষের মাহাত্ম্য পুরাণেও প্রকট হয়ে উঠেছে। বাড়ির দক্ষিণ দিক, যাকে 'যাম্য' দিক বলা হয় সেই যমের দক্ষিণ দুয়ারে উদুম্বর বৃক্ষ পরম শুভদায়ী এক বৃক্ষ বলে চিহ্নিত হয়েছে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে।

[বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ (নাগ) ২.৩০.১;
E.B.Findly, Plant Lives, pp. 11-13,
318-319; C.P. Khare, Indian
Herbal Remedies, p. 222]

উদুম্বর৩ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০১; (হরি) ১৩.১২৭.১০১]

উদুম্বরী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। উদুম্বরী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.১৮]

উদুম্লান কৌশিক বংশীয় একজন ঋষি।

[বায়ু পু. ৯১.৯৮]

উদ্দল মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বরূপ ধারণ করে যজুর্বেদ লাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। এই কারণে তাঁর শিষ্যরাও বাজি বা অশ্ব নামে বিখ্যাত হন। যাজ্ঞবল্ক্যের এই শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উদ্দল। *[বায়ু পু. ৬১.২৫]*

উদ্দালক বৈদিক যুগ থেকে মহাকাব্য-পুরাণ পর্যন্ত যেসব ঋষি-মহর্ষিদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উদ্দালক তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম। মহাভারতে উদ্দালকের জীবন কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হলেও উদ্দালকের প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং গোপথ ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত উল্লেখ অনুযায়ী উদ্দালক জনৈক মহর্ষি অরুণের পুত্র ছিলেন। তাই তাঁর নাম আরুণি। মহাভারতের কাহিনী থেকে ধারণা হয় আরুণি নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। উদ্দালক নাম তাঁর অনেক পরে হয়েছিল।

মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আরুণি মহর্ষি আপোদ্‌ধৌম্যের শিষ্য ছিলেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যেমন আরুণিকে কুরুপঞ্চাল দেশীয় বলে উল্লেখ করেছে, অনুরূপ উল্লেখ মহাভারতেও পাওয়া যায়। মহর্ষি আপোদ্‌ধৌম্যের প্রধান তিন শিষ্যের মধ্যে আরুণি ছিলেন অন্যতম। একদিন আপোদ্‌ধৌম্য আরুণিকে ডেকে তাঁর কৃষিজমির ভাঙা আলে বাঁধ দিতে আদেশ করলেন। আরুণি গুরুর আদেশ পাওয়ামাত্র পৌঁছালেন সেই জায়গায় যেখানে আল ভেঙে জল বেরিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। আরুণি ভাঙা আল মেরামত করার অনেক চেষ্টা করলেন, জল যাতে বেরিয়ে না যায় তার জন্যও যত্ন করলেন অনেক। কিন্তু কোনো চেষ্টাতেই কোনো ফল হল না। তখন দুঃখিত মনে আরুণি চিন্তা করতে লাগলেন যে কোন উপায়ে গুরুর শস্যক্ষেত্র রক্ষা করা যায়। অনেক ভেবেচিন্তে আলের যে ভাঙা অংশ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছিল, আরুণি সেখানে শুয়ে পড়লেন। এতে কাজ হল। ক্ষেত থেকে জল আর বেরিয়ে যেতে পারল না। নিরুপায় আরুণি গুরুর শস্যক্ষেত্র রক্ষা করার জন্য সেখানেই শুয়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। এদিকে আরুণি ফিরে আসছেন না দেখে তাঁর গুরু চিন্তিত হলেন। আপোদ্‌ধৌম্য তাঁর দুই শিষ্য উপমন্যু এবং বেদকে সঙ্গে নিয়ে আরুণিকে খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছালেন সেই ভাঙা আলের কাছে। সেখানে আরুণিকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন তাঁরা। গুরুর কণ্ঠস্বর শুনে সেই ভাঙা আল থেকে উঠে এসে আরুণি জানালেন অন্য কোনো উপায় না দেখে তিনি নিজেই শুয়ে পড়েছিলেন ভাঙা আলের জায়গায়—যাতে শস্যক্ষেত্র থেকে জল কোনোভাবেই বেরিয়ে যেতে না পারে। আপোদ্‌ধৌম্য আরুণির গুরুভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে অনেক আশীর্বাদ করলেন তাঁকে। তারপর বললেন—যেহেতু তুমি আল ভেঙে উঠে এসেছ, তাই আজ থেকে তোমার নাম হবে উদ্দালক—

যস্মাদ্ ভবান্ কেদারখণ্ডং বিদার্য্য
উত্থিতস্তস্মাদুদ্দালক এব নাম্না ভবান্
ভবিষ্যতীত্যুপাধ্যায়েনানুগৃহীতঃ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৪.১.১-২;
গোপথ ব্রাহ্মণ ১.৩.৬;
মহা (k) ১.৩.২২-৩৩; (হরি) ১.৩.২৩-৩৪]

□ আরুণি উদ্দালককে মহাভারতে আপোদ্‌ধৌম্যর শিষ্য বলে উল্লেখ করা হলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যাচ্ছে যে, আরুণির পিতা অরুণও তাঁকে শিক্ষাদান করেছিলেন। এছাড়াও মদ্রদেশীয় মহর্ষি পতঞ্চল কাপ্যও আরুণি-উদ্দালকের শিক্ষাগুরু ছিলেন বলে জানা যায়। বিভিন্ন উপনিষদে বহুবার অন্যতম দার্শনিক ঋষি হিসেবে আরুণির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৬.৫.৩; ৩.৭.১]

□ তৈত্তিরীয় সংহিতায় জনৈক ঋষি কুসুরুবিন্দকে ঔদ্দালকি বলে সম্বোধন করায় ধারণা হয় যে তিনি উদ্দালক-আরুণির পুত্র ছিলেন। পাশাপাশি শতপথ ব্রাহ্মণে জনৈক প্রোতি কৌশাম্বেয় কৌসুরুবিন্দিকে উদ্দালকের শিষ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌসুরুবিন্দিকে

কুসুরুবিন্দের পুত্র বলে ধরে নিলে মনে হয় তিনি উদ্দালকের পৌত্র ছিলেন। তবে ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং মহাকাব্যে উদ্দালকের সর্বাধিক পরিচিত যে পুত্রের উল্লেখ মেলে, তিনি মহর্ষি শ্বেতকেতু। মহাভারতে অবশ্য মহর্ষি উদ্দালকের এক কন্যাসন্তানেরও উল্লেখ মেলে। এই কন্যার নাম সুজাতা। উদ্দালক নিজের প্রিয় শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে সুজাতার বিবাহ দেন। কহোড়ের ঔরসে সুজাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন মহর্ষি অষ্টাবক্র। অষ্টাবক্র সম্পর্কে উদ্দালকের দৌহিত্র ছিলেন। তবে উদ্দালকের জামাতা কহোড় অষ্টাবক্রের জন্মের কিছুকাল আগেই বন্দী নামে এক পণ্ডিতের কাছে তর্কে পরাস্ত হন। বাগ্‌যুদ্ধের শর্তানুযায়ী বন্দী কহোড়কে ডুবিয়ে দেন জলে। ফলে বাল্যকালে অষ্টাবক্র মাতামহ উদ্দালকের দ্বারাই প্রতিপালিত হন।

উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু বহু ব্রাহ্মণকে প্রতারণা করেছিলেন বলে মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ মেলে। শ্বেতকেতুর এমন আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে মহর্ষি উদ্দালক আপন পুত্রকে ত্যাগ করেন।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৭.২২.১;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১২.২.২.১৩;
বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৬.১.১;
মহা (k) ১.১২২.৯-১৬; ৩.১৩২.৭-২০; ১২.৫৭.১০;
(হরি) ১.১১৬.৯-১৬; ৩.১০৮.৭-১০; ১২.৫৬.১০]

☐ মহাভারতের সভাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইন্দ্রের সভায় যে-সব বিশিষ্ট মুনি-ঋষিরা অবস্থান করতেন উদ্দালক তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৭.১২; (হরি) ২.৭.১২]

☐ একসময় উত্তরকোশল দেশে মহর্ষি উদ্দালক এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। উদ্দালকের আহ্বানে সেই যজ্ঞস্থলে সরস্বতী নদী আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

[মহা (k) ৯.৩৮.২৪; (হরি) ৯.৩৬.২২-২৪]

☐ পুরাণে অন্যতম বেদবিৎ ঋষি হিসেবে উদ্দালকের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৪১.৪৪; ৬১.২৫]

উদ্ধব মূলত ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের জীবনের বৃন্দাবন পর্ব সাঙ্গ হবার পর এবং মথুরাপর্বের সূচনাকাল থেকে কৃষ্ণের অন্যতম বিশ্বস্ত পার্শ্বচর হিসেবে আমরা উদ্ধবের উল্লেখ পাই। ভাগবত পুরাণ তাঁর পরিচয় দিয়েছে যদু-বৃষ্ণিদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে। রাজনীতি শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল অসামান্য, তিনি নাকি স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তার পাশাপাশি ভাগবত পুরাণ একথাও জানিয়েছে যে, তিনি কৃষ্ণের দয়িত সখা, কৃষ্ণ মথুরায় আসার পর থেকেই উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে—

বৃষ্ণীণাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।

তবে ভাগবত পুরাণে উদ্ধবের পিতার নাম বা পরিচয় বিশদে উল্লিখিত হয়নি। উদ্ধব যদু-বৃষ্ণি কুলেরই একজন ছিলেন—সেকথা নিঃসংশয়ে বোঝা গেলেও অন্যান্য পুরাণগুলিতে এমনকী মহাভারতেও উদ্ধবের নাম একাধিকবার উল্লেখ করা হলেও তাঁর পরিচয় সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। একমাত্র মৎস্য পুরাণের একটি শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে যে, উদ্ধব ছিলেন বসুদেবের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র। হয়তো তিনি কৃষ্ণের প্রায় সমবয়সী, হয়তো বা বয়সে সামান্য একটু বড়ো। কিন্তু কৃষ্ণ মথুরায় আসার পর অল্পদিনের মধ্যেই খুড়তুতো ভাই উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৪৬.২৩; ভাগবত পু. ১০.৪৬.১]

☐ কৃষ্ণ তখন মহর্ষি সান্দীপনির আশ্রম থেকে বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করে ফিরেছেন মথুরায়। জরাসন্ধ তখনো মথুরা আক্রমণ করেননি। খানিকটা অলসভাবেই কাটছে মথুরায় কৃষ্ণের দিনগুলি। এ সময় তাঁর বড়ো বেশি করে মনে পড়ছে ফেলে আসা ব্রজভূমি নন্দগ্রামের কথা, পালক পিতা নন্দ, মাতা যশোমতী, খেলার সাথী গোপবালক এবং গোপীদের কথা। মথুরায় আসার সময় কৃষ্ণ তাঁদের বলেছিলেন— আবার আমি ফিরে আসব তোমাদের কাছে। কিন্তু যাওয়া আর হল কই? মথুরার বর্তমান রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছেন কৃষ্ণ, কংস মারা যাবার পর কংসের দুই বিধবা পত্নী যখন মগধ দেশে বাপের বাড়িতে চলে গেলেন, তখন থেকে জরাসন্ধের আক্রমণের ভাবনাও চলছে। মথুরা ছেড়ে যাবার উপায় আর নেই কৃষ্ণের। তবু তাঁর জানতে ইচ্ছা হয়, নন্দগ্রামে সকলে কেমন আছেন। কৃষ্ণের বিরহে কেমন করে দিন কাটছে তাঁদের। তাঁদের সান্ত্বনা দিতেও ইচ্ছা হয় কৃষ্ণের। দয়িত সখা উদ্ধবকে কৃষ্ণ একদিন খুলে বললেন মনের কথা।

কৃষ্ণ বললেন—সখা আমার! সেই আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেই ব্রজভূমি বৃন্দাবনে যাবেন একবার? আমার মাতা-পিতা নন্দ-যশোমতীর কাছে গিয়ে আমার ভালোবাসা জানাবেন তাঁদের—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।

মাতা-পিতার কথা থেকেই কৃষ্ণ সোজাসুজি ব্রজগোপীদের সর্বাতিশায়ী প্রেমভাবনার স্মৃতিতে চলে এলেন। বললেন—আর গোপিনীকুলের সকলের কাছে আগে আমার খবর দিও। আমি সেখানে না থাকায় তাঁদের যে মানসিক দুঃখ সৃষ্টি হয়েছে, আমার একটা খবর দিলে যদি বা সে দুঃখ কিছু কমে—

গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়।

কৃষ্ণ কিন্তু তাঁর ভালোবাসার রমণীদের স্বসুখবাসনাহীন আত্মত্যাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, কিন্তু কী করবেন—মথুরাপুরীর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা তাঁকে এমনই এক সঙ্কটে আবদ্ধ করেছে যে, তাঁর আর ফিরে যাবার উপায় নেই। কৃষ্ণ অসীম লজ্জায় উদ্ধবকে জানিয়েছেন—ব্রজভূমিতে যে গোপিনীদের আমি ফিরে যাবার আশ্বাস দিয়ে চলে এসেছি, তারা আমাকে ছাড়া কিছুই জানে না। তাদের মন-প্রাণ, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ-ভাবনা—সব আমাতেই সমর্পিত। আমাকেই তারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে এবং বৃন্দাবনে থাকলেও তাদের মন পড়ে আছে আমারই কাছে—

মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।

কৃষ্ণ নিরুপায় হয়ে মিথ্যা কথা বলছেন এখন। তিনি জানেন এখন তাঁর ফেরবার কোনো উপায় নেই। অন্যদিকে এই সরলা গোপরমণীদের বাঁচিয়ে রাখারও কোনো উপায় নেই। নাগরিক জটিলতা যে রমণী বোঝে না, সে শুধু বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকে। হাজার বিরহ-যন্ত্রণার মধ্যেও প্রতিদিন এক নতুন আশা জাগে এই সরলা রমণীদের মনে—নিশ্চয়ই তিনি ফিরে আসবেন—এই আশাই তাদের বাঁচিয়ে রাখে—

আশাবন্ধৈঃ সখি নবনবৈঃ কুর্বতী প্রাণবন্ধম্।

কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন—আমি তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম, আমারই কথা স্মরণ করে তারা বেঁচে আছে কোনোমতে—

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।

তুমি শুধু তাদের গিয়ে সেই মিথ্যে কথাটাই বল। বল যে আমি ঠিক ফিরে আসব। যদি বল—এ তো মিথ্যে কথা, জেনেশুনে প্রিয়তমা রমণীদের এমন মিথ্যে বলছেন কেন? তাহলে বলি—ওদের নিজের বলতে কিছু নেই, মনটাই ওদের আমিময় হয়ে গেছে, সেখানে এই প্রিয়সংবাদটুকুই তাদের বাঁচিয়ে রাখবে—

প্রত্যাগমন সন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ।

কৃষ্ণের সন্দেশ বহন করে উদ্ধব গেলেন ব্রজভূমিতে। তিনি মথুরা-নগরের নাগরকবৃত্তিসম্পন্ন মন্ত্রী। এর আগে কোনো দিন গ্রামে যাননি। তিনি যখন ব্রজভূমি বৃন্দাবনে পৌঁছলেন, তখন সূর্য অস্ত গেছে। গোরুগুলি মাঠ থেকে ফিরে আসছে গোঠে। সঙ্গে অনেক বাছুরও। বেশ কিছু মতিচ্ছন্ন ষাঁড়ও দেখা যাচ্ছে, তারা পুষ্পবতী গাভীর অধিকারলাভের আশায় পরস্পর লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে। সমস্ত পথ গো-গোবৎস-ষণ্ডের খুরোদ্ধতধূলিতে ধুলো-ধুলোময়। তাতে উদ্ধবের রথটি ভালো করে দেখাই গেল না—

ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশুনাং খুররেণুভিঃ।

অন্তত ব্রজগোপীরা এই রথ দেখতে পেলেন না। তাছাড়া সন্ধ্যাকালে একটা সাময়িক ব্যস্ততাও তৈরি হয়েছে। বিকাল-বেলায় এখন গোরু দুইবার সময়। ফলে গোরুদের হাম্বারব, গোবৎসের চিৎকার এবং রাখাল-বালকদের বেণুগীতে উদ্ধবের রথচক্রের শব্দ তেমন করে তাঁদের কানেও গেল না—

গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিঃস্বনেন চ।

অন্যদিকে সব কিছুর মধ্যে যেটা উদ্ধবের কাছে আশ্চর্য লাগল, সেটা হল—আজ এতদিন পরেও কৃষ্ণ-বলরামের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ে গোপযুবতীরা গান গায়—

গায়ন্তীভিশ্চ কর্মাণি শুভানি বলকৃষ্ণয়োঃ।

ব্রজভূমির কোলাহল এড়িয়ে, ব্রজরমণীদের দুগ্ধকর্মের ব্যস্ততা আড়ালে রেখে উদ্ধব খানিকটা নিস্তব্ধ পদসঞ্চারেই গোপালক নন্দ যশোমতীর ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। যারা কৃষ্ণের কথা এমন গভীর স্মৃতিতে এখনও গান করে যায়, তাদের কাছে কৃষ্ণের বদলে নিজে এসে উদ্ধব বুঝি খানিকটা বিব্রতই বোধ করছিলেন। যাই হোক, নন্দগোপের কাছে নিজের পরিচয় দিতে

কৃষ্ণের সমবয়সী উদ্ধবকে কৃষ্ণের মতো করেই জড়িয়ে ধরলেন নন্দরাজ। আদর করে বসালেন উত্তম আসনে—

নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চয়ৎ।

বৃন্দাবন থেকে মথুরার পথ নয়-নয় করেও খুব কম নয়। তার মধ্যে মৃদু বন্ধুর উদ্‌ঘাতিনী ভূমি, উদ্ধবের পথশ্রম হয়েছে কিছু। ব্রজরাজ নন্দ আগে তাঁর নৈশ আহারের ব্যবস্থা করলেন। সুখশয়নের ব্যবস্থা করলেন উত্তম শয্যায়, এমনকী একটি গোপবালককে দিয়ে তাঁর পথশ্রমে ক্লান্ত শরীর খানিকটা মর্দন করারও ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু নন্দরাজার অতি আকুতিতে এবং অত্যাদরে উদ্ধব কিন্তু শুয়ে পড়তে পারলেন না পরিশ্রমে গা এলিয়ে।

সুখ-বিশ্রান্ত উদ্ধবকে নন্দরাজ যখন প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন, তখন ব্রজভূমিতে আঁধার নামছে একটু একটু করে। গোপালক নন্দ কৃষ্ণের এই সখাটির কাছে কেমন যেন সহজ হতে পারছেন না। প্রাণ-মন ঢেলে জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না নন্দ—হ্যাঁগো, আমাদের ছেলেটা মা-বাপের কোল ছেড়ে কেমন করে দিন কাটাচ্ছে? নন্দর কথার মধ্যে খানিকটা আড়ষ্ট ভাব আছে, তার সঙ্গে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের প্রতি খানিকটা অভিমানও যেন প্রকাশ পেল। সত্যিই তো, কৃষ্ণকে মথুরায় নিজেদের কাছে ফিরে পাবার পর নন্দের সঙ্গে সেভাবে কোনো কথাই হয়নি বসুদেবের। বসুদেবও তার পর থেকে আর যোগাযোগ করেননি নন্দর সঙ্গে। তাই নন্দ খানিকটা সাভিমানেই বললেন—আমাদের পরম বন্ধু, শূরসেনের পুত্র মহামতি বসুদেব ভালো আছেন তো? এখন তো তিনি ছেলে ফিরে পেয়েছেন, তা সেই ছেলের সঙ্গে কুশলে আছেন তো? নিজের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কংসের ভয়মুক্ত বসুদেব এখন নিশ্চয়ই বেশ সুখে আছেন—

আস্তে কুশলী অপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ।

তবে বেশিক্ষণ এমন যান্ত্রিকভাবে কথা বলতে পারলেন না নন্দবাবা। তাঁর হৃদয় জুড়ে হাহাকার নেমে এল। অসীম মমতায় যাঁকে শিশু থেকে যৌবনসন্ধি পর্যন্ত বড়ো করেছেন সেই কৃষ্ণের কথা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যশোমতী মাতার অন্তর মিলিয়ে। বললেন—একবারের তরেও কি এখানে তার মায়ের কথা মনে পড়ে কৃষ্ণের? এখানকার বন্ধু বান্ধব সখাদের কথাও কি মনে পড়ে কখনো—

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্?

এই ব্রজভূমি, শান্ত বৃন্দাবন, সরল গোপজনের কথা, শ্যামলী-ধবলী নামে গোরুগুলির কথা, এই গোবর্ধন গিরি—এ সবের জন্য তার মন কেমন করছে না একবারও?

আসলে নন্দবাবা তাঁর হৃদয় দিয়েই পুত্রের ভাবনা বিচার করছেন। মথুরাপুরীতে যে অসম্ভব রাজনৈতিক ব্যস্ততা কৃষ্ণকে গ্রাস করেছে, সে সম্বন্ধে গ্রাম্য গোপজনের কোনো ধারণাই নেই। বিশেষত এতদিন পরে কৃষ্ণের বদলে উদ্ধবকে দেখে তাঁর হতাশা আরও বেড়েছে। বারবার জিজ্ঞাসা করছেন—কৃষ্ণ কি একবারও আসবে তার স্বজন মাতা-পিতা-বন্ধুদের দেখার জন্য—

অপ্যায়াসতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্?

যদি আসত তাহলে তার চাঁদচুয়ানো হাসিমুখখানি দেখতে পেতাম একবার—

তর্হিদ্রক্ষ্যাম তদ্বক্তং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্।

একবারে হাহাকার ঝরে পড়ল নন্দবাবার বুক থেকে। ব্রজভূমিতে তাঁর এই ঘর, ঘরের প্রাঙ্গণ থেকে আরম্ভ করে মাঠে ঘাটে গোঠে সর্বত্র কৃষ্ণের এমন এক সংক্রমণ সঞ্চরণ আছে, যা নন্দবাবা ভুলতে পারছেন না একটুও। প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক কর্ম তাঁর কাছে গভীর স্মৃতি হয়ে আছে। বলেছেন—ছেলে আমার বড়ো হয়ে গেছে। কত দেখেশুনে রাখত আমাদের। সেই দাবানলে গ্রস্ত হচ্ছিল ব্রজভূমির গোধন এবং অন্যান্যরাও, আমার কৃষ্ণ শুধু সবাইকে চোখ বুজতে বলেছিল, তার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। তাছাড়া আরও কত উৎপাত গেল—সেই বৃষভাসুর, কালিয় নাগ, কত বিপদের কথা আর বলব? ব্রজভূমির সমস্ত বিপন্নতায় আমার কৃষ্ণই ছিল সকলের সহায়।

নন্দরাজ অন্য সাধারণ জনের কাছে কৃষ্ণের ত্রাতার ভূমিকাটি যত বড়ো করেই দেখান তাঁর পিতৃহৃদয়ের কাছে এই ত্রাতা বা তাঁর যত পরিত্রাণ কর্ম এ সবের তেমন কোনো মূল্য নেই। কিন্তু এই এক একটি ঘটনার পর সেই পরিত্রাতা পুরুষ জনক জননীর কাছে যেমন ভয়ে ভয়ে, যেমন লজ্জায়, যেমন বালকোচিত সরলতায় তাকাতেন,

উঁকি মারতেন মায়ের ঘরে—লীলাপাঙ্গ নিরীক্ষিতম্—অথবা কথা বলতেন যেভাবে—সেই সব ছোট্ট ছোট্ট বাল্য স্মৃতিগুলি নন্দরাজের হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধছে। তিনি উদ্ধবকে বলেছেন—সেই শিশুর হাসি, কথা বলা, সেই তাকানো—এতেই তো আমাদের অন্য সব কাজ নষ্ট হয়ে যেত—

হসিতং ভাষিতঞ্চাঙ্গ সর্বাঃ নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ।

কৃষ্ণের মতো একজন বিরাট পুরুষ, যিনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে হেলায় কংসবধ করলেন, যিনি ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকদের সকলকে একত্র করে মথুরা শূরসেন অঞ্চলে যাদব-রাজ্যের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করেছেন, সেই কৃষ্ণের ব্যাপারে তাঁর এই গ্রাম্য পিতামাতার কোনো সচেতনতা নেই—এটা দেখে উদ্ধব বেশ অবাক হলেন। কৃষ্ণের সম্বন্ধে অনেক দার্শনিক ভগবত্তার তত্ত্ব নন্দগোপের কাছে বললেন উদ্ধব, কিন্তু কোনো কাজ হল না। নন্দ শুধু শুনেই গেলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। নানা কথা বলতে বলতে এবং শুনতে শুনতেই রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল—এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা।

সকাল হতে গোপপল্লীতে ব্যস্ততা আরম্ভ হল। পুরুষ-মহিলা সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নানা কাজে—দুধ দোয়ানো, দধি দুগ্ধ বিক্রয় করতে নিয়ে যাওয়া, গোরুগুলিকে চরাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা—আরও নানা কাজ। ঘরে বসে গোপপল্লীর এই কর্মব্যস্ততা দেখতে দেখতে উদ্ধব শুনতে পেলেন—গোপরমণীরা কৃষ্ণের গান গাইছে। উদ্ধব আশ্চর্য হয়ে শুনতে লাগলেন— এই সুন্দর ব্রজভূমিতে যা যা কৃষ্ণ করে গেছেন, কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, আসঙ্গ—যা যা তাদের ভালো লেগেছিল, তা সবই উদ্ধবের কানে ভেসে আসছে—

উদ্‌গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবসম্পৃহদ্ ধ্বনিঃ।

উদ্ধব একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। এতদিন পরেও এরা কৃষ্ণকে এইভাবে মনে রেখেছে!

সকালবেলার কর্মব্যস্ততা খানিকটা শিথিল হয়ে আসার পর গোপরমণীদের চোখ পড়ল নন্দরাজার ঘরের দুয়ারে দাঁড়ানো উদ্ধবের রথখানার দিকে। ভীষণ কৌতূহলও হল—কার রথ এটা? কিছুদিন আগেই এমনই এক উজ্জ্বল রথে চড়ে অক্রূর এসেছিলেন ব্রজে, আর যাবার সময় সেই রথে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রজভূমির প্রাণ—কৃষ্ণকে। আবারও এক রথ এসে দাঁড়িয়েছে নন্দরাজার দুয়ারে। গোপরমণীদের মধ্যে তাই কৌতূহল, আলাপ আলোচনার অন্ত রইল না। উদ্ধব সেই রমণীকুলের ক্রুদ্ধ প্রলাপ আলাপ শুনতে পেলেন। সখা কৃষ্ণের কাছে এদের কথা তিনি শুনেছেন। কৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠিয়েছেন এঁদেরই সান্ত্বনা দেবার জন্য। উদ্ধব ভাবলেন—কৃষ্ণের প্রয়োজন, দায়িত্ব এবং গৌরব এই সরলা রমণীদের একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। অতএব আহ্নিক-কৃত্য সম্পন্ন হবার পরেই উদ্ধব বেরিয়ে পড়লেন আকুলা ব্রজরমণীদের সঙ্গে দেখা করতে—

ততঃ স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবো'গাৎ কৃতাহ্নিকঃ।

কৃষ্ণের সখা কৃষ্ণের প্রণয়িনীদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন, অতএব একটু রসিকতাও তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি একটি পীত বস্ত্র পরিধান করলেন সযতনে, কানে পরলেন দুল, হয়তো বা গুঁজে দিলেন মাথায় ময়ূরের পাখাটিও, গলায় দুলিয়ে নিলেন পদ্মফুলের মালা—

পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লস/
ন্মুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলম্।

তাঁদেরই সামনে এমন সাক্ষাৎ কৃষ্ণবেশী কৃষ্ণসখা উদ্ধবকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন ব্রজরমণীরা। ভাবলেন—কে এই সুন্দরদর্শন পুরুষ—পরিধানে সেই পীতবাস, সেই বনমালার বিভূষণ—

সুবিস্মিতাঃ কো'য়মপীব্যদর্শনঃ/
কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেষভূষণঃ।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্রজরমণীরা চারদিকে ঘিরে ধরলেন তাঁকে। অন্তত এটা তাঁরা বুঝলেন যে, এই কৃষ্ণবেশী পুরুষটি অক্রূর নন অথবা নন এমন কোনো লোক যিনি তাঁদের কষ্ট আরও বাড়াতে এসেছেন। উদ্ধবকে দেখে কেউ খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন তাঁরা, কেউ বা আড়-চোখে তাকালেন, আবার কেউ বা ভালো মুখে সলজ্জে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন—

সব্রীড়হাসেক্ষণ সূনৃতাদিভিঃ।

কে গা তুমি? কোথা থেকে এসেছ? উদ্ধব বললেন—আমি মথুরা-পুরীতে থাকি। আমি উদ্ধব, আমি তোমাদের কৃষ্ণের সখা।

পরিচয় শুনে ব্রজরমণীরা উদ্ধবকে একটু সরিয়ে নিয়ে গেলেন, অন্যত্র, কারও ঘরে নয়, দুয়োরে নয়, একেবারে অন্যত্র—হয়তো তমাল-বিপিনে, হয়তো বা কদমশাখার তলায়। উদ্ধবকে আসন দিলেন বসতে। মনের মধ্যে অনেক আশা—পরাণসখা কৃষ্ণের খবর পাওয়া যাবে এই লোকটির কাছ থেকে। এদিকে বুক ভরা অভিমান—নিজেদের করুণ অবস্থার কথা কিছুতেই জানাবেন না। এত সব গোপিনীকুলের মধ্যে মানবতী রাধিকাও ছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু তিনি হাসেনও না, আড় চোখে তাকানও না, কথা বলেন না। তাঁর সখীরাই তাঁর হয়ে কথা আরম্ভ করে বললেন—বুঝেছি গো তুমি কৃষ্ণের অনুচর, অনুগামী পার্ষদ। তা তিনি হঠাৎ তোমায় এখানে পাঠালেন কী করতে? নন্দবাবা অথবা যশোমতী মায়ের মনোব্যথায় সান্ত্বনা দিতে—

ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

চরম অভিমানে রমণীরা যতখানি সম্ভব কটু ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন—হ্যাঁ, এটা বুঝি বটে, পিতা-মাতার অহৈতুক স্নেহ, সে বড়ো কড়া বাঁধন। মুনি-ঋষি পর্যন্ত এমন স্নেহের বাঁধন এড়াতে পারেন না। অতএব সেটাই শুধু একটা কারণ হতে পারে, নইলে এই গোরু-রাখালের জায়গায় কৃষ্ণের মতো মানুষের মনে রেখে দেবার মতো আর তো কিছু আছে বলে দেখি না—

অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে।

ব্রজরমণীরা কৃষ্ণকে হাতের সামনে পাচ্ছেন না বটে, কিন্তু কৃষ্ণের অন্তরসখাকে সামনে পেয়ে তাঁদের আকুল অভিমান আর বাঁধ মানছে না। তাঁরা তাঁদের মানসিক অবস্থাটুকু শুধু কৃষ্ণকে জানাতে চান। বলতে চান—যে মানুষটি আমাদের এমন করে ভালোবেসেছিল, যাঁর আকর্ষণে তাঁরা গৃহ, বন্ধু, স্বজন ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন, এবং যে মানুষটি এই সরলা গোপবধূদের মনে ভালোবাসার সমস্ত বিশ্বস্ততা নিয়েই ধরা দিয়েছিলেন, সেই তিনি এতকাল তাঁদের ভুলে থাকতে পারছেন কী করে এবং এত দিন পরেও তিনি নিজে আসতে পারলেন না, তিনি আবার ঢঙ্ করে নিজের কাপড় চোপড় গয়না পরিয়ে একটি দূত পাঠিয়েছেন কেন?

এত ভালোবাসা উদ্ধব দেখেননি, রসিকতা করতে গিয়ে তিনি মহা ফাঁপড়ে পড়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন—এমন ভালোবাসায় মুখে আগল থাকে না। নইলে কৃষ্ণের উদ্দেশে এমন কথা বলবার সাহস গোটা মথুরায় কারও নেই। তিনি বুঝতে পারছেন—এই শেষ নয়, তাঁকে আরও শুনতে হবে। তিনি এই ভালোবাসা দেখে মুগ্ধও হচ্ছেন, আবার ভয়ও পাচ্ছেন—আরও কীই না শুনতে হবে। ব্রজরমণীরা এবার ব্যঙ্গোক্তি ছেড়ে প্রত্যক্ষ তিরস্কারে এসে বললেন—আসলে মশাই! পুরুষ মানুষের প্রেম—সবটাই স্বার্থ। আর স্বার্থচিন্তায় যে মানুষ ভালোবাসে সে ভালোবাসা সবটাই লোকদেখানো, তার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। আমরা কৃষ্ণের এই লোক-ঠকানো স্বার্থপর ভালোবাসা বুঝিনি, তাই মরেছি—

অন্যেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাদবর্থবিড়ম্বনম্।

নইলে এটাই তো স্বাভাবিক, পুরুষ মানুষের ভালোবাসা, সে তো মধুকরের মতো, গোপী-পুষ্পশতের মধু পান করে সে পালায় মথুরায়—

পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ।

সত্যিই এটুকুতেই গোপিনীদের অভিমান-অভিযোগ তিরস্কার শেষ হবার নয়। তাঁদের অনেকদিনের জমে থাকা অভিমান কঠোর তিরস্কার হয়ে ঝরে পড়ল। পণ্ডিতরা অনুমান করেন—এই কথালাপ, তিরস্কার যখন চলছিল, সেই সময় শ্রীরাধিকাও সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন হয়তো। ভাগবত পুরাণে তাঁর নাম সরাসরি উল্লিখিত না হলেও একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মানময়ী রমণীকে তাঁরা রাধা বলেই মনে করেছেন। গোপীদের সমবেত কোলাহল-তিরস্কারের মাঝে এবার কথা বললেন তিনি। সাভিমানে বললেন—কৃষ্ণ এখন মথুরাপতি হয়েছেন, অতএব তিনি এখন মথুরার রমণীদেরই প্রসন্ন করতে থাকুন। রাধার বক্তব্য অনেক দীর্ঘ। তাতে রাগ, অভিমান, তিরস্কার সবই আছে। তবু একটু আগেই ক্রোধে যাঁর মুখদর্শনই করতে চান না বলে মন্তব্য করছিলেন সব শেষে তাঁকেই উদ্দেশ করে বলছেন—আর্যপুত্র কৃষ্ণ কি এখনও মথুরাতেই আছেন? এখনও কি তাঁর মনে পড়ে এই নন্দগাঁয়ের যশোমতী মায়ের ঘরের কথা? একবারও কি মুখে উচ্চারণ করেন এই দাসীদের কথা। জানি না—কবে কখন আবার তাঁর অগুরুগন্ধী হাতখানি আমাদের মাথায় রাখবেন শীতল শান্তির মতো—

ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে/
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্যধাস্যৎ কদা নু?

উদ্ধব গোপীদের মানসিক অবস্থা দেখে অবাক হলেন খুব। তিনি গোপীদের কৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক কথা শোনালেন, অনেক সান্ত্বনাও দিলেন। কৃষ্ণের বক্তব্যও শোনালেন তাঁদের। গোপরমণীরা সেকথা শুনলেন না, সে কথায় ভুললেনও না।

সেদিন কিছু হল না বটে, কিন্তু কয়েক মাস ব্রজভূমিতে বাস করার পর সেখানকার সমস্ত মানুষ জন এবং গোপরমণীদের সার্বক্ষণিক কৃষ্ণভাবনার নৈরন্তর্য্য দেখে উদ্ধব অবাক হয়ে গেলেন একেবারে। পরিশেষে সবার পায়ে মাথা নত করে গেলেন—এমন প্রেম তিনি দেখেননি, দেখবেনও না আর। এবারে তিনি বুঝে গেলেন যে, তথাকথিত ব্যভিচারদষ্টা এই বনচারী গোপরমণীদের হৃদয়ে কৃষ্ণের জন্য যে প্রেম নিহিত আছে, সে প্রেম বোঝার জন্য আগে তাঁদের পায়ের ধুলো মাথায় নিতে হয়, তারপর সশ্রদ্ধ দার্শনিকতায় বুঝতে হয় এই প্রেমের তাৎপর্য্য—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।

ব্রজভূমিতে উদ্ধবের পদার্পণ থেকে প্রত্যাবর্তন —এই সম্পূর্ণ কাহিনীটি ভাগবত পুরাণের সম্পূর্ণ দুটি অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। উদ্ধবের এই কৃষ্ণের দূত হিসেবে ব্রজভূমিতে যাবার ঘটনাটির উপর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী 'উদ্ধব সন্দেশ' নামে এক অপূর্ব কাব্য রচনা করেছেন।

[ভাগবত পু. ১০.৪৬-৪৮ অধ্যায়]

□ মথুরায় ফিরে আসার পর উদ্ধব কৃষ্ণের ব্যক্তিগত জীবনের আরও একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলেন। কৃষ্ণের মথুরায় আসার প্রথম দিনটিতে যেদিন কৃষ্ণের করস্পর্শে ত্রিবক্রা কুব্জা দেহের বক্রতা দূর হয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তের মধ্যে, সেদিনই কুব্জা কৃষ্ণের সঙ্গ প্রার্থনা করেছিলেন। কৃষ্ণ তখন সময় পাননি। তখন কংসবধ এবং অন্যান্য নানা ব্যস্ততা ছিল তাঁর। আজ এতদিন বাদে কৃষ্ণের সময় হয়েছে কুব্জার প্রার্থনা পূরণ করার। তিনি উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন কুব্জার ভবনে। বৃন্দাবনে যে ব্রজরমণীদের উদ্ধব দেখে এসেছেন, তাঁদের থেকে কুব্জা অনেক ভিন্ন। তাঁদের মতো কৃষ্ণপ্রেমে জীবন বিলিয়ে দিতে কুব্জা পারেননি। তিনি শুধুমাত্র নিজের অঙ্গজ বাসনা তৃপ্ত করতে চেয়েছেন। কৃষ্ণ কুব্জার সেই বাঞ্ছা পূরণ করতে গিয়েছেন বৃষ্ণিদের প্রবর মন্ত্রী উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে। *[ভাগবত পু. ১০.৪৯.১-১২]*

□ ভাগবত পুরাণের এই ঘটনা প্রবাহে বৃষ্ণিদের মন্ত্রী, কৃষ্ণের জ্ঞাতি ভাই উদ্ধবকে আমরা একটু পৃথক ভূমিকায় দেখতে পাই। দেখতে পাই অনুগত কৃষ্ণসখার ভূমিকায়, কৃষ্ণভক্তের ভূমিকায়। ভাগবত পুরাণ উল্লেখ করেছে যে, উদ্ধব সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যিনি একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের পরমেশ্বর স্বরূপতাকে সম্যক্ ভাবে জানতে সমর্থ হয়েছিলেন। উদ্ধবকে কৃষ্ণের অবসর সময়েও পার্শ্বচরের ভূমিকায় দেখা যায়। এমনকী কৃষ্ণ উদ্ধবের সঙ্গে পাশা খেলে সময় কাটাচ্ছেন—এমন উল্লেখও মেলে।

*[ভাগবত পু. ৯.২৪.৬৬-৬৭; ১০.৪৭.৫৬;
১০.৬৯.২০]*

□ তবে এর পাশাপাশি যদুবৃষ্ণি সংঘের এই বিচক্ষণ মন্ত্রীকে আমরা মহাভারত-পুরাণে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় উপস্থিত থাকতে দেখব। জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মন্ত্রণাদাতার ভূমিকাতেও দেখতে পাব একাধিকবার।

□ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যদু-বৃষ্ণিকুলের যে-সব সংঘমুখ্য উপস্থিত ছিলেন উদ্ধব তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৮; (হরি) ১.১৭৯.১৮]

□ অর্জুন তাঁর বারো বছরের বনবাসকালে নানা স্থানে ভ্রমণ করার পর প্রভাসক্ষেত্রে পৌঁছালেন। কৃষ্ণ প্রভাসক্ষেত্র থেকে অর্জুনকে নিয়ে গেলেন দ্বারকায়, নিজের বাসভবনে। এর কিছুদিন পর রৈবতক পর্বতে যদু-বৃষ্ণিদের বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হয়। এই উৎসবে অন্যান্য সংঘমুখ্যদের সঙ্গে উদ্ধবকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১.২১৯.১১; (হরি) ১.২১২.১১]

□ সুভদ্রার বিবাহের পর, অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। এর কিছুদিন পর দ্বারকা থেকে যদু-বৃষ্ণি কুলের বহু বিশিষ্ট জন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়েছিলেন সুভদ্রার বিবাহ উপলক্ষে নানা মূল্যবান যৌতুক নিয়ে, এই সময় উদ্ধবও এসেছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

[মহা (k) ১.২২১.৩০; (হরি) ১.২১৪.৩০]

□ ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য যখন কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে ডেকে পাঠালেন, তখন ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে রওনা হবার আগে কৃষ্ণ নারদ, উদ্ধব এবং অন্যান্য যদুবংশীয় বিশিষ্ট জনদের নিয়ে এক আলোচনা সভা ডাকলেন, সেই সভায় উদ্ধবই মন্তব্য করেছিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যদু-বৃষ্ণিরা সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন এবং সেটা করাই হবে উচিত কাজ। কিন্তু এটাও বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন যে, মগধরাজ জরাসন্ধ যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা এককথায় অসম্ভব। জরাসন্ধকে বধ করে যদি জরাসন্ধের কারাগারে বন্দি রাজাদের মুক্ত করা যায়, তবেই যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারেন। এদিকে জরাসন্ধ এবং তাঁর মিত্র শক্তির বিশাল সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করাও সম্ভব নয়। এ অবস্থায় উদ্ধবই গোপনে মগধরাজ্যে প্রবেশ করে জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা এবং সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁকে বধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ কিন্তু উদ্ধবের এই পরামর্শকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মহাভারতের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, কার্যক্ষেত্রেও এই উপায়ই প্রয়োগ করে জরাসন্ধকে বধ করা সম্ভব হয়েছিল।

[ভাগবত পু. ১০.৭০.৪৫-৪৭; ১০.৭১.১-১১; ১০.৭২.১৫]

□ উদ্ধবের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা তৎকালীন সময়ে প্রায় প্রাবাদিক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সম সময়ে হস্তিনাপুরের কুরু রাজসভার বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন বিদুর। অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের পরামর্শে দুর্যোধনকে কপট দ্যূতক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্য উপদেশ দিতে ডেকেছিলেন। সে সময় ধৃতরাষ্ট্রের মুখেই শোনা যায় যে বৃষ্ণি বংশজাত উদ্ধব এবং ব্যাসপুত্র বিদুর এঁরা দুজন ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ দুই রাজনীতিবিদ —

বিদুরো বাপি মেধাবী কুরূণাং প্রবরো মতঃ।
উদ্ধবো বা মহাবুদ্ধির্বৃষ্ণীনামর্চিতো নৃপ ॥

[মহা (k) ২.৫০.১১; (হরি) ২.৪৮.৬]

□ তবে উদ্ধব শুধু মন্ত্রীই ছিলেন না। তিনি বিচক্ষণ যোদ্ধা ছিলেন বলেও মহাভারত পুরাণে উল্লেখ মেলে। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণের সময় মথুরার পূর্বদ্বার রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল উদ্ধবের হাতে। শাল্ব যখন দ্বারকা আক্রমণ করেন সে সময়েও উদ্ধব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ মেলে। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। *[মহা (k) ৩.১৫.৯; (হরি) ৩.১৪.৯; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫০.২০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকার পঞ্চম শ্লোক দ্রষ্টব্য; ১০.৬৬.২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকার দ্বিতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্য]*

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে, শান্তির সমস্ত প্রয়াস যখন বিফলে গেছে তখন বিদুর যুদ্ধ বন্ধ করার একটা শেষ চেষ্টা করতে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক উপদেশ দিলেন বিদুর, দুর্যোধনকে ত্যাগ করার পরামর্শও দিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে রাজসভায় দুর্যোধন বিদুরকে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় গালাগালি দিলেন। রাজপুরী ছেড়ে চলে যেতেও বললেন। এই অবস্থায় প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে মনের দুঃখে বিদুর হস্তিনাপুর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন। মনের শান্তির জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তীর্থে তীর্থে। এই সময় যমুনার তীরে উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। এই সময় উদ্ধব বিদুরকে কৃষ্ণের বাল্যকাল থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ কৃষ্ণ জীবনকথা শুনিয়েছেন। কৃষ্ণের ভগবত্ত স্বরূপতার কথাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বিদুরের কাছে। সম সময়ের দুই শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের এই অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনার বিষয়টি ভাগবত পুরাণের মোট চারটি অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৩.১-৪ অধ্যায়]*

□ যদুবংশ ধ্বংসের প্রাক্কালে উদ্ধব যখন বুঝলেন যে, কৃষ্ণ তাঁর নরলীলা সাঙ্গ করে নিজ ধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে চান, তখন কৃষ্ণের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে ভেবেই উদ্ধব অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। এই সময় কৃষ্ণ উদ্ধবকে সংসার ত্যাগ করে হরিভক্তিতে আত্মনিয়োগ করার উপদেশ দেন। কৃষ্ণের উপদেশে উদ্ধব সংসার ত্যাগ করে বদরিকাশ্রমে চলে যান, এবং সেখানেই ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। উদ্ধবের উদ্দেশে বর্ণিত কৃষ্ণের শেষ উপদেশ ভাগবত পুরাণের একাদশ স্কন্ধের বেশ কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত হয়েছে।

মহাভারতেও বর্ণিত হয়েছে যে যদুবংশের ধ্বংস উপস্থিত একথা জানতে পেরে উদ্ধব দ্বারকা ত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কৃষ্ণ তাঁকে বাধা দেননি। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, কৃষ্ণভক্ত এই ঋষিতুল্য মানুষটি সেই সময় তপস্যার তেজে যেন সূর্যের মতো দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিলেন—

তত‍ঃ কাল পরিতান্তে বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ।
অপশ্যন্নুদ্ধবং যান্তং তেজসাবৃত্য রোদসী॥

[মহা (k) ১৬.৩.১১-১৩; (হরি) ১৬.৩.১১-১৩; ভাগবত পু. ১১.৬.৪০-৪৯; ১১.৭-২৯ অধ্যায়]

☐ সেকালের তুখোড় রাজনীতিবিদ্ উদ্ধবকে পরবর্তী সময়ের রাজনীতিবিদ্ কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে চিহ্নিত করেছেন বাতব্যাধি নামে।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, সম্পাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, ১ম খণ্ড, ভূমিকা দ্রষ্টব্য]

উদ্বলায়ন পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উদ্বলায়নের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। উদ্বলায়ন কশ্যপ বংশীয় গোত্র-প্রবর্তকদের মধ্যে একজন ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৮]*

উদ্বহ দ্বাপর যুগে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণকারী একজন রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, দ্বাপর যুগে ক্রোধবশ অসুরদের অংশে যেসব রাজা মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, উদ্বহ তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬৪; (হরি) ১.৬২.৬৫]

উদ্ভব$_{১}$ মৎস্য পুরাণ মতে চন্দ্র বংশীয় রাজর্ষি নহুষের সাত পুত্রের মধ্যে একজন ছিলেন উদ্ভব।

[মৎস্য পু. ২৪.৫০]

উদ্ভব$_{২}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান বিষ্ণু উদ্ভব নামে সম্বোধিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫৪, ৯৮; (হরি) ১৩.১২৭.৫৪, ৯৮]

উদ্ভস একটি প্রাচীন জনজাতি। ভীষ্মপর্বে শবর ও বৎস জনজাতির সঙ্গে একত্রে উদ্ভসদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এঁরা পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছিলেন।

[মহা (k) ৬.৫০.৫৩; (হরি) ৬.৫০.৫৩]

উদ্ভিদ্ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের 'উদ্ভিদ্' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—উদ্ভিৎ উদ্ভিদ্যাবির্ভবতীতি বা ফলম্ উদ্ভিনত্তীতি বা স্থাবররূপো যজ্ঞাদিরূপো বা। সংস্কৃত 'ভিদ্' ধাতুর অর্থ ভেদ করা। যা ভূমি ভেদ করে উঠে আসে—এই অর্থে উদ্ভিদ বলতে গাছপালা বোঝায় (উদ্+√ভিদ্+ক্বিপ্)। বৃক্ষ, গুল্ম, তৃণ, বল্লী, লতা—এই পাঁচ প্রকার উদ্ভিদ প্রকৃতিতে দেখা যায়। শিবকে এই বৃক্ষ বা ওষধি সমূহের অধীশ্বররূপে কল্পনা করে উদ্ভিদ্ নামে সম্বোধন করা হয়। অনুরূপ ভাবনায় শিবসহস্রনাম স্তোত্রে একাধিক বার ভগবান শিবকে মহৌষধ নামে কিংবা বকুল, চন্দন, ছদ প্রভৃতি বৃক্ষের স্বরূপতাতেও কল্পনা করা হয়েছে। সেই কারণে সাধারণভাবেই উদ্ভিদ্ মহাদেবের অন্যতম নাম।

দ্বিতীয়ত টীকাকার নীলকণ্ঠ উদ্ভিদ শব্দের অর্থে দ্বিতীয় একটি বিকল্প দিয়ে বলেছেন—

শিবমহাদেব স্বয়ংই যজ্ঞস্বরূপ।

কেননা বৈদিক যজ্ঞকর্মের আচার-আড়ম্বর ভেদ করে তিনি যজ্ঞের পুণ্যফল দান করেন। মানুষের পাপ ও পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপও তিনি। তিনি কর্মকাণ্ড ভেদ করে কর্মফল প্রদান করেন। কর্মানুসারে কর্মফলরূপে উৎপন্ন হন বলেও কর্মফলস্বরূপ শিব উদ্ভিদ্ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪৮; (হরি) ১৩.১৬.১৪৭]

উদ্ভিদ$_{১}$ কোনো কোনো পুরাণে ইনি উদ্ভিজ্জ কিংবা উদ্ভিত নামেও চিহ্নিত হয়েছেন। উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ ছিলেন কুশদ্বীপের রাজা জ্যোতিষ্মানের সাতপুত্রের মধ্যে একজন। জ্যোতিষ্মান কুশদ্বীপকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে নিজের সাত পুত্রকে এক একটি বর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। উদ্ভিদ যে বর্ষে রাজত্ব করতেন তাঁর নামানুসারে সেই বর্ষের নাম হয় উদ্ভিদবর্ষ বা উদ্ভিজ্জবর্ষ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.২৭-২৮; ১.১৯.৫৭; বায়ু পু. ৩৩.২৫; ৪৯.৫২]

উদ্ভিদ$_{২}$ বায়ু পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যে উদ্ভিদ নামে একটি জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।

পণ্ডিত D.C. Sircar এই জনপদটিকে আভীরের সঙ্গে একাত্মক বলে মনে করেছেন।

[বায়ু পু. ৪৫.১২৭; GAMI (D.C. Sircar) p. 40]

উদ্যন্তপর্বত গয়ার নিকট অবস্থিত একটি পর্বত-তীর্থ। এই উদ্যন্ত পর্বতেই বিখ্যাত যোনিদ্বার

তীর্থটি অবস্থিত। এখানে গায়ত্রীদেবীর পদচিহ্ন দেখা যায়।

[মহা (k) ৩.৮৪.৯৩-৯৫; (হরি) ৩.৬৯.৯৪-৯৬]

☐ এখনকার গয়ার ব্রাহ্মণী পাহাড় নামক পাহাড়কে উদ্যন্ত পর্বত বলে চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিতেরা। *[EAIG (Kapoor) p. 668]*

উন্নত$_{১}$ ভৃগুবংশীয় দ্যুতিমানের পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.৯]

উন্নত$_{২}$ মৎস্য পুরাণ মতে কুশদ্বীপের সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে দ্বিতীয়টির নাম উন্নত। এটি বহু উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের সমাবেশে গঠিত এক পর্বতমালা এবং নানা ধাতব খনিজের ভাণ্ডার। এই পর্বতের অপর নাম হেমপর্বত। *[মৎস্য পু. ১২২.৩৩]*

উন্নত$_{৩}$ বায়ু পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী শাল্মলদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে দ্বিতীয়টির নাম উন্নত।

[বায়ু পু. ৪৯.৩৩; বিষ্ণু পু. ২.৪.২৬]

উন্নত$_{৪}$ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে সপ্তর্ষিগণের অন্যতম ঋষি।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৬.৫৪]

উন্নত$_{৫}$ পৌরাণিক শাল্মলদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে একটি উন্নত।

[গরুড় পু. ১.৫৬.৬]

উন্নতি দক্ষের কন্যা। ইনি ধর্মের একজন পত্নী ছিলেন। ধর্মের ঔরসে তাঁর গর্ভে দর্প নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

[ভাগবত পু. ৪.১.৪৯, ৫১]

উন্নেতা স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধারায় রাজর্ষি প্রতিহর্ত্তার পুত্র ছিলেন উন্নেতা। উন্নেতা ভুব নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন।

[বায়ু পু. ৩৩.৫৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৬৬]

উন্মত্ত$_{১}$ রাক্ষসরাজ রাবণের মাতামহ সুমালীর দাদা মাল্যবানের ঔরসে তাঁর পরমাসুন্দরী পত্নী সুন্দরীর গর্ভজাত একজন রাক্ষস। *[রামায়ণ ৭.৫.৩৪-৩৭]*

উন্মত্ত$_{২}$ মহাদেবের অনুচর একজন ভৈরব।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. ৩.১৯.৭৮]

উন্মত্তবেষপ্রচ্ছন্ন শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম।

[দ্র. উন্মাদ]

[মহা (k) ১৩.১৭.৩৪; (হরি) ১৩.১৬.৩৪]

উন্মত্তা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। উন্মত্তা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৮]*

উন্মাথ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর রূপে স্কন্দকে দান করেন। যম তাঁর যে বিশিষ্ট দুইজন অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, উন্মাথ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৩০; (হরি) ৯.৪২.২৯;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩০.৪৬]

উন্মাদ$_{১}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লোকভাবিনী লক্ষ্মী এবং নারায়ণের পুত্র হিসেবে উন্মাদের নাম করা হয়েছে। মনে হয়, এই নামটি রূপকাকারে বিবৃত। তা না হলে উন্মাদের পুত্রের নাম সংশয়—এরকম একটি মানসিক অবস্থার কথা বলা হত না। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অব্যবহিত পরের শ্লোকে লক্ষ্মী-নারায়ণের অন্য পুত্রগুলিকে মানসপুত্র বলায়—

তস্যান্যে মানসাঃ পুত্রাঃ।

—উন্মাদ বলতেও মানুষের মানসিক অবস্থাই বোঝাচ্ছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.৩-৪]*

উন্মাদ$_{২}$ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচরকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর রূপে স্কন্দকে দান করেন। পার্বতী তাঁর যে তিনজন অনুচর স্কন্দকে দান করেন উন্মাদ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫১-৫২; (হরি) ৯.৪২.৪৯;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩০.৫৮]

উন্মাদ$_{৩}$ অপদেবতার গণ হিসেবে ভাগবত পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে কোনো পুণ্যকর্মে ভূতাপসারণ কিংবা অপদেবতার অপসারণ একটি অঙ্গ ছিল। পূতনা রাক্ষসীর মৃত্যুর পর নরলীল কৃষ্ণকে ভবিষ্যতের বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্য বিষ্ণুনাম কীর্তনের মাধ্যমে মাতা যশোমতী অন্যান্য ভূতপ্রেত পিশাচের সঙ্গে এই উন্মাদগণেরও অপসারণের চেষ্টা করেন। পুরাণে কথিত হয়েছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির সময়ে যে রকম দেবতা-ঋষি-অসুর-মানবদের সৃষ্টি করেছেন তেমনি এই ভূত পিশাচ তথা উন্মাদাদি গণেরও সৃষ্টি করেছেন। *[ভাগবত পু. ১০.৬.২৮; ২.১০.৩৯]*

উন্মাদ$_{৪}$ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে ভগবান শিব যেমন উন্মাদ নামে সম্বোধিত হয়েছেন তেমনই সম্বোধিত হয়েছেন উন্মত্তবেষপ্রচ্ছন্ন নামে। উন্মাদ অর্থাৎ উন্মত্ত অবস্থাগ্রস্ত। এখানে উন্মত্ত অবস্থা বলতে মূলত এমনই এক বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অবস্থার কথা বলা হচ্ছে যে অবস্থায় ব্যক্তি আপন আনন্দে আপনি হাসেন, আপন দুঃখে আপনি কাঁদেন—নিজের সত্তার বাইরে অন্য কোনো কিছুর প্রতি যাঁর কোনো জ্ঞান থাকে না। লক্ষণীয়, উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়েও এমনই এক উন্মত্ত অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদের ভাবনায় ব্রহ্ম নিরাকার, অচেতন, ইন্দ্রিয়হীন সুতরাং ইন্দ্রিয় সমূহের কার্যকারিতারও তিনি ঊর্ধ্বে। বাহ্য বিষয়ে অচেতন এই ব্রহ্ম নিজের মধ্যেই আনন্দমগ্ন, নিজের সঙ্গেই তিনি ক্রীড়া করেন—নিরাকারা নিষ্পরিগ্রহা অশিক্ষা অযজ্ঞোপবীতা অন্ধা বধিরা মুগ্ধাঃ ক্লীবা মূকা উন্মত্তা ইব পরিবর্তমানা .. সমাহিতা আত্মরতয় আত্মক্রীড়া আত্মমিথুনা আত্মানন্দাঃ প্রণবমেব। ভগবান শিবকে সেই আত্মসমাহিত উন্মত্ত ব্রহ্মের স্বরূপতায় উন্মাদ নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

অবশ্য পুরাণগুলিতে এবং লৌকিক ভাবনায় ভগবান শিবের উন্মত্ত রূপেরই একটা প্রচলিত ধারণা এবং বিবরণ মেলে। সেই বর্ণনায় শিব ভিখারীর বেশে উন্মাদের মতো পথে পথে ফেরেন, বেশ-ভূষা, আশপাশের লোকজন সব বিষয়েই অচেতন তাঁর সেই মূর্তি। এমন উন্মত্তরূপের দ্বারা পরমেশ্বর শিব আপন স্বরূপকে আচ্ছাদিত বা প্রচ্ছন্ন রাখেন বলেই তিনি উন্মত্তবেষপ্রচ্ছন্ন নামেও খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৭০, ৩৪; (হরি) ১৩.১৬.৭০, ৩৪; নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদ (জগদীশ শাস্ত্রী) ৬]

উপক ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার সপ্তধারার অন্যতম হ্লাদিনী। হ্লাদিনী নদী যেসব জনপদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, উপক তার মধ্যে একটি। হ্লাদিনী নদীকে পণ্ডিতেরা উত্তর ব্রহ্মপুত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। উপক তারই তীরস্থ কোন জনপদ বলে মনে হয়।

[মৎস্য পু. ১২১.৫২]

উপকার শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের 'উপকার' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

উপকারঃ প্রীণনরূপ।

'প্রীণন' মানে তৃপ্তি উৎপাদন করা, প্রীত করা। উপকার শব্দের অর্থও প্রায় অনুরূপ। 'কৃ' ধাতুর অর্থ করা। 'উপ' উপসর্গের পর কৃ ধাতুর উত্তর 'ঘঙ্' প্রত্যয় থেকে উপকার শব্দের উৎপত্তি। অর্থ হল হিতসাধন করা বা আনুকূল্য করা। যিনি হিতসাধন করেন তাঁকে উপকারক বা উপকার দুই নামেই সম্বোধন করা যায়। ভগবান শিবের এই নাম সকলের মঙ্গলকারী, দয়ালু, ভক্তবৎসল মূর্তিটিকেই প্রকাশ করে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯৩; (হরি) ১৩.১৬.৯৩]

উপকীচক মহাভারতের বিরাটপর্বে বিরাট-রাজার শ্যালক কীচক ভীমের হাতে মারা যান। দ্রৌপদীকে অপমান করার ফলে রাজার নৃত্যশালায় তাঁর পিণ্ডীকৃত দেহ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে এখানে উপকীচকদের অবতারণা করা হয়েছে। উপকীচকদের সম্বন্ধে মহাভারতের শ্লোক উদ্ধার করে পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেছেন যে, কীচকের মৃত্যুর পর তার সকল বান্ধবজন সেইস্থানে এসে কীচককে ঘিরে কাঁদতে লাগল—

তস্মিন্‌কালে সমাগম্য সর্ব্বে তত্রাস্য বান্ধবাঃ।
রুরুদুঃ কীচকং দৃষ্ট্বা পরিবার্য্য সমন্ততঃ॥

'বান্ধব' কথাটির অর্থ আত্মীয়-স্বজন। সেই অর্থে উপকীচকরা কীচকের আত্মীয়ই হবার কথা। কিন্তু কোনোভাবেই এই উপকীচকরা কীচকের ভাই নয়, আত্মীয়ও নয়, তবে স্বদেশের এবং স্বগোষ্ঠীয় মানুষ বলে তাঁর আত্মীয়সম। উপকীচকরা কীচকের দেহ সৎকার করতে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখল—দ্রৌপদী অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা দ্রৌপদীকে দেখামাত্রই বলে উঠল—যার জন্য কীচক নিহত হয়েছে, সেই অসতীটাকে শীঘ্র হত্যা কর—

হন্যতাং শীঘ্রমসতী যৎকৃতে কীচকো হতঃ॥

উপকীচকরা এবার দ্রৌপদীকে মৃত কীচকের সঙ্গেই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করল। বিরাটের কাছে তারা সৈরিন্ধ্রীকে দাহ করার অনুমতি চাইল। বিরাটরাজা উপকীচকদের শক্তি সম্বন্ধেও অবগত ছিলেন। তাছাড়া এই উপকীচকরা যে-কোনো যুদ্ধে তাঁকে সাহায্যও করত। ফলে তিনি সৈরিন্ধ্রীকে দাহ করার অনুমতি

দিয়েই ছিলেন। তখন উপকীচকরা সৈরিন্ধ্রীকে শবদেহের খাটের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে শ্মশানের দিকে যাত্রা করল। দ্রৌপদী উপকীচকদের থেকে রক্ষা পাবার আশায় উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন—জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন, জয়দ্বল যাঁরা আছেন, তাঁরা আমার কথা শুনুন, উপকীচকরা আমাকে পুড়িয়ে মারবে বলে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। দ্রৌপদীর চিৎকার শুনে ভীম পাচকের বেশ ত্যাগ করে রাজবাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে শ্মশানের দিকে গেলেন। উপকীচকদের সামনে গিয়ে ভীম দেখলেন যে, সামনেই চিতা সাজানো আছে। ভীম একটি বিশাল তাল গাছ উপড়ে নিয়ে উপকীচদের আক্রমণ করলেন। উপকীচকরা ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে দেখে যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারা বলতে লাগল যে, এই ভয়ানক লোকটাই বোধ হয় সৈরিন্ধ্রীর স্বামী। অতএব সৈরিন্ধ্রীকে ছেড়ে দাও।

এরপর উপকীচকরা সৈরিন্ধ্রীকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ভীমসেন একশ পাঁচজন উপকীচককে একাই বধ করলেন। সেনাপতি কীচককে ভীমসেন আগেই হত্যা করেছিলেন। আর এই একশ পাঁচজন উপকীচককে বধ করে ভীমসেন দ্রৌপদীকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছিলেন।

[মহা (k) ৪.২৩ অধ্যায়; (হরি) ৪.২১ অধ্যায়]

উপকুর্বাণ কথাটার সাধারণ অর্থ—ব্রহ্মচর্য্য-পালন করে গুরুর কাছে শিক্ষা নেবার পর যে শিষ্য গুরুর প্রাপ্য দক্ষিণা দিয়ে তাঁর উপকার সাধন করেন। ফলত দক্ষিণা দেবার পর্যায়ে আসা মানেই সেই শিষ্য সমাবর্তনের যোগ্য ব্রহ্মচারী এবং সমাবর্তনের পরেই যিনি ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত শেষ করে এবার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবেন। কূর্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের দুটি ভাগ—একটি উপকুর্বাণ এবং অপরটি নৈষ্ঠিক। যিনি গুরুকুলে বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ শেষ করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন, তাঁরই পারিভাষিক নাম—উপকুর্বাণ—

যো'ধীত্য বিবিধান্ বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ।
উপকুর্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ॥

[কূর্ম পু. ১.২.৭৬-৭৭;
দক্ষ-সংহিতা (আর্য্যশাস্ত্র) ১.৭-৮]

উপকৃষ্ণ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

উপক্ষত্র বিষ্ণু পুরাণ মতে যদুবংশীয় অনমিত্রের বংশধারায় শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত পুত্রসন্তানদের মধ্যে উপক্ষত্র ছিলেন একজন। ইনি অক্রূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। *[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.২]*

উপগুপ্ত ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় রাজা উপগুরুর পুত্র ছিলেন উপগুপ্ত। উপগুপ্ত অগ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। বস্বনন্ত নামে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। *[ভাগবত পু. ৯.১৩.২৪-২৫]*

উপগুরু ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় রাজা সত্যরথের পুত্র ছিলেন উপগুরু। উপগুপ্ত নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। *[ভাগবত পু. ৯.১৩.২৪]*

উপচিতি মহর্ষি মরীচির ঔরসে সম্ভূতির গর্ভজাত কন্যা সন্তানদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.১২]

উপচিত্র$_1$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়দ্রথ বধের দিনে তিনি ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৫; ১.১১৭.৪; ৭.১৩৬.২০; (হরি) ১.৬২.৯৭; ১.১১১.৪; ৭.১১৭.৫৮]

উপচিত্র$_2$ বৃষ্ণি বংশীয় বসুদেবের ঔরসে মদিরার গর্ভজাত একজন পুত্র। বায়ু পুরাণের পাঠে ইনি মদিরার গর্ভজাত কন্যা উপচিত্রা নামে চিহ্নিত হয়েছেন। *[বায়ু পু. ৯৬.১৭০;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭২]

উপচিত্রা *[দ্র. উপচিত্র]*

উপজলা মহাভারতে উল্লিখিত একটি নদী। যমুনার দুইপাশ দিয়ে জলা ও উপজলা নদী দুটি প্রবাহিত। এই নদীর তীরেই যজ্ঞের মাধ্যমে ইন্দ্রের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন অগ্নি।

[মহা (k) ৩.১২৩.২১; (হরি) ৩.১০৭.২১]

উপত্যক পর্বতাধ্যুষিত একটি ভারতীয় জনপদ। হয়তো বা যাঁরা পর্বতের উপত্যকা প্রদেশেই বাস করতেন, তাঁদের সাধারণ নামই ছিল উপত্যক।

[মহা (k) ৬.৯.৫৫; (হরি) ৬.৯.৫৫]

উপদানবী$_1$ দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা। ইনি শর্মিষ্ঠার ভগ্নী ছিলেন। গরুড় পুরাণে উপদানবীর পরিবর্তে ঔপদানবী পাঠ পাওয়া যায়।

[বিষ্ণু পু. ১.২১.৭; গরুড় পু. ১.৬.৫০]

উপদানবী$_{২}$ ভাগবত পুরাণ মতে দানবরাজ বৈশ্বানরের চার কন্যাসন্তানের মধ্যে একজন ছিলেন উপদানবী। দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। *[ভাগবত পু. ৬.৬.৩৩-৩৪]*

উপদানবী$_{৩}$ ময় দানবের কন্যা। চন্দ্রবংশীয় রাজা ঈলীনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঈলীনের ঔরসে উপদানবীর গর্ভে দুষ্যন্ত প্রভৃতি চার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। *[মৎস্য পু. ৬.২১; ৪৯.১০; বায়ু পু. ৬৮.২৩-২৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.২৩, ২৫]*

উপদেব$_{১}$ বৃষ্ণি বংশীয় আহুকের পুত্র দেবক। দেবকের পুত্র সন্তানদের মধ্যে একজন ছিলেন উপদেব। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.২২; মৎস্য পু. ৪৪.৭২; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৩০]*

উপদেব$_{২}$ অক্রূরের ঔরসে উগ্রসেনার গর্ভজাত একজন পুত্র ছিলেন উপদেব। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৮; মৎস্য পু. ৪৫.৩১; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৩]*

উপদেব$_{৩}$ দ্বাদশ মন্বন্তরের মনু রুদ্রসাবর্ণির পুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন উপদেব। *[বায়ু পু. ১০০.৯৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. ৩.১.৯৪; ভাগবত পু. ৮.১৩.২৭; বিষ্ণু পু. ৩.২.৩৫; গরুড় পু. ১.৮৭.৪৭; মার্কণ্ডেয় পু. ৯৪.২৬]*

উপদেবা বৃষ্ণিবংশীয় আহুকের পুত্র দেবক। দেবকের কন্যা সন্তানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উপদেবা (মৎস্য পুরাণ মতে উপদেবী)। ইনি বসুদেবের অন্যতম পত্নী ছিলেন। বসুদেবের ঔরসে উপদেবার গর্ভে দশটি (অন্যমতে চারটি) পুত্রসন্তান হয়। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.২৩, ৫১; বায়ু পু. ৯৬.১৩০, ১৭৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৩১, ১৬২; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৫; মৎস্য পু. ৪৬.১৭]*

উপদেবী *[দ্র. উপদেবা]*

উপদেশকর শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। উপদেশকর অর্থাৎ যিনি উপদেশ দেন। সাধারণত উপদেশ দান করেন গুরু কিংবা মাতা-পিতা এবং অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠরা। ভগবান শিব দেবতা, মানব সকলেরই স্রষ্টা ও পালক অর্থাৎ অভিভাবকস্বরূপ, তিনিই আমাদের অন্তরে জ্ঞান বা চেতনাস্বরূপ—সুতরাং তিনি গুরুও বটে। উপনিষদে ব্রহ্মাকে গুরু হিসেবে, সমস্ত বেদ-মন্ত্রের উপদেশদাতা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে—

স গুরুর্ভবতি স সর্বেষাং মন্ত্রাণামুপদেষ্টা ভবতি।
[নৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষদ ৫.২]

এই ভাবনা থেকেই জ্ঞানস্বরূপ তথা জ্ঞান প্রদানকারী রূপেও পরমেশ্বর মহাদেব উপদেশকর নামে সম্বোধিত হন। *[মহা (k) ১৩.১৭.৬৯; (হরি) ১৩.১৬.৬৯]*

উপনন্দ$_{১}$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে উপনন্দ কুরুক্ষেত্রে ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমসেনের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রকে উপনন্দক নামেও উল্লিখিত হতে দেখি। বস্তুত উপনন্দ ও উপনন্দক বলতে একই ব্যক্তিকে বোঝায়। এখানে স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। *[মহা (k) ১.৬৭.৯৬; ১.১১৬.৫; ৮.৫১.৭, ১৮; (হরি) ১.৬২.৯৮; ১.১১১.৫; ৮.৪৯.৭, ১৮]*

উপনন্দ$_{২}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। নারদ, মাতলির কাছে ভোগবতী পুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী বিশিষ্ট নাগদের নাম উল্লেখ করেছেন। উপনন্দের নামও এইসময় উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ৫.১০৩.১২; (হরি) ৫.৯৬.১২]*

উপনন্দ$_{৩}$ যুধিষ্ঠিরের রথের ধ্বজাতে নন্দ ও উপনন্দ নামে দুটি মৃদঙ্গ ছিল। রথ চলতে থাকলে সুন্দর শব্দ করে বাজত। মহাভারতের দ্রোণপর্বে উপনন্দ 'উপনন্দক' নামে চিহ্নিত হয়েছে। *[মহা (k) ৩.২৭০.৬; ৭.২৩.৮৫; (হরি) ৩.২২৪.৬; ৭.২১.৭৯]*

উপনন্দ$_{৪}$ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর যোদ্ধা। তারকাসুর বধে ইনি স্কন্দকে সহায়তা করেছিলেন। *[মহা (k) ৯.৪৫.৬৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]*

উপনন্দ$_{৫}$ বৃষ্ণিবংশে শূরের পুত্র বসুদেবের ঔরসে মদিরার গর্ভে যেসব পুত্র সন্তানের জন্ম হয় উপনন্দ তাঁদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭১; বায়ু পু. ৯৬.১৬৯]*

উপনন্দ$_{৬}$ একজন প্রবীণবয়স্ক গোপ। তাঁকে 'দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞ' বলে চিহ্নিত করে পুরাণকার তাঁর বয়সোচিত বিচক্ষণতাকেই নির্দেশ করেছেন। গোকুলের মন্ত্রণাসভায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপর পূতনা প্রভৃতি কংসের অনুচরদের আক্রমণ এবং তা

থেকে আশ্চর্যভাবে কৃষ্ণ-বলরামের প্রাণরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উপনন্দ গোকুলবাসীকে গোকুল ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শেই গোকুলের অধিবাসীরা বৃন্দাবনে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। *[ভাগবত পু. ১০.১১.২২-৩০]*

উপনয়ন বহুশ্রুত শব্দ, বহু তর্কিতও বটে। উপনয়ন এখন যেমন এক ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছে, সেকালে তেমন ছিল না। উপনয়ন ছিল প্রধানত ছাত্রাবস্থার দ্যোতক, যাকে অন্য পরিভাষায় বলা যায় ব্রহ্মচর্য্য। পরবর্তীকালে উপনয়নের পূর্বে আরও একটি সংস্কারের সৃষ্টি হয়, যার নাম বিদ্যারম্ভ। ইস্কুলে যাবার আগে যেমন হাতেখড়ি, এও তেমনই। পাঁচ বছর বয়সেই বিদ্যারম্ভের সূচনা হত। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন—পরবর্তীকালে ব্যাকরণ এবং অন্যান্য শিক্ষণীয় বিদ্যা পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে এসে যাওয়ায় বেদ-বিদ্যা লাভের সময় পিছোতে থাকে। ফলে বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান করে প্রাথমিক পড়াশুনো আরম্ভ হয়ে যেত। পরে আট বছর বয়সে অথবা আরও কিছু পরে গুরুকুলে গিয়ে বেদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা আহরণের সূচক হিসেবে উপনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হত।

উপনয়ন শব্দটি আসছে নী ধাতু থেকে, যার অর্থ নিয়ে যাওয়া 'উপ' মানে আছে। উপনয়ন মানে কাছে নিয়ে যাওয়া। কার কাছে নিয়ে যাওয়া? বৈদিক, ঔপনিষদিক, স্মার্ত—যাঁর কাছেই জিজ্ঞাসা করুন, একই উত্তর হবে—আচার্যের কাছে শিক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার নামই উপনয়ন। আজকাল যেমন 'পৈতে' বললেই মাথা ন্যাড়া করা, কান ফোটানো এবং গলায় একটি নবতন্ত্রী সূত্রধারণের কথা মনে আসে, খোদ বৈদিক যুগে এ রকম ছিল না বলেই মনে হয়। প্রথম কথা হল মাথা ন্যাড়া করা বা কানবেঁধানোর সঙ্গে পৈতের কোনো সম্বন্ধই নেই, কারণ এসব অনুষ্ঠান আগেই হয়ে যেত অন্নপ্রাশনের দুই-তিন বছরের মধ্যেই। পৈতের পরে বরং চুল-দাড়ি রাখারই নিয়ম। আর গলায় যে যজ্ঞসূত্রের অধিষ্ঠান দেখি আজকাল, তাও ব্রাহ্মণ্যাচারের মধ্যে এসেছে অনেক পরে।

বস্তুত 'উপনয়ন' শব্দটার পূর্বরূপ হল ব্রহ্মচর্য্য, যা নাকি একটি বালকের ছাত্রাবস্থা সূচনা করে। ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা 'ব্রহ্মচারী' শব্দটি পাচ্ছি—

ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্ বিষঃ
স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্।

কিন্তু উপনয়ন শব্দটি ঋগ্বেদে মোটেই পরিষ্কার নয়। একটি ঋকের মধ্যে অবশ্য পণ্ডিতেরা উপনয়ন শব্দটির গন্ধ পেয়েছেন, কারণ মন্ত্রটি উপনয়নের সময় বলতে হয় এখনও। এই মন্ত্রর মধ্যে সুবাস, সুবেশ এক যুবক যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে এবং বলা হচ্ছে—এই যুবককে দেবভাবপ্রাপ্ত আচার্য ঋষিরা উন্নীত করেন—

তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি
স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।

এখানে 'উন্নয়ন্তি'—এই ক্রিয়াটির ধাতুগত অর্থ উপনয়ন শব্দের প্রতিশব্দ বলে মনে করেন বৈদিকেরা। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে উপনয়নার্থী বালককে একটি অচ্ছিন্ন (অহত) কাপড় পরিয়ে অলঙ্কৃত করে উপনয়ন দিতে বলেছে—

অলঙ্কৃতং কুমারম্ . . . অহতেন
বাসসা সংবীতম্।

[ঋগ্বেদ ১০.১০৯.৫; ৩.৮.৪; আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (রবি তীর্থ) ১.১৯.৮, পৃ. ১৭৩]

□ ঋগ্বেদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উপনয়ন সংস্কারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত না হলেও অথর্ববেদে এসেই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে উপনয়নের যে রূপ আমরা পাই, তার অনেকটাই পাওয়া যায় অথর্ববেদে, আর ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচনার সময় ব্রহ্মচারী হবার জন্য ছাত্ররা যেভাবে গুরুর কাছে এসেছে, তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। উপনিষদগুলির মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য এবং উপনয়নের সময়কালীন গায়ত্রীমন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যার মাহাত্ম্যে চিহ্নিত, আর গৃহ্যসূত্রগুলি রচনার সময় উপনয়ন একেবারে আচার ব্যবহারে ঠাসা হয়ে সর্বৈব এক ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত হল।

বস্তুত উপনয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য বালকের ছাত্রাবস্থা অথবা আরও বিশদার্থে যৌবনসন্ধির সূচনা করত সুপ্রাচীন কালে। এখনকার দিনে প্রথম স্কুলে যাবার জন্য বাবা-মা যেমন তাঁদের বালকটিকে সুবেশে সুসজ্জিত করে নিয়ে যান এবং ইস্কুলের শ্রেণীপ্রধান তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সভ্যতার প্রথম উন্মেষেও যে সেইরকমই

ছিল তারই পরিচয় মেলে ওই পূর্বকথিত ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে—সুন্দর বসন পরিধানে যুবকটি আসছে, তাকে ঘিরে আছে মেখলা। সে যখন দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করবে, তখনই তার মাহাত্ম্যের সূচনা হবে—

যুবা সুবাসঃ পরিবীত অগাৎ স উ
শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।

উপনয়ন-সংস্কারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ যে দ্বিতীয় বার জন্ম লাভ করে—সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে—যে জন্য তাকে দ্বিজ বলা হয়, সেই দ্বিজত্বের তাৎপর্যও হয়তো প্রথম ওই ঋক্‌মন্ত্র থেকেই উৎসারিত—

স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।

কিন্তু দ্বিতীয় জন্ম বা নবজন্মের তাৎপর্যটা যে বহুকাল থেকে চলে আসছে তা বোঝা যাবে পার্শিদের 'নৌ জত্' (নবজন্ম) অনুষ্ঠান থেকে। পার্শিদের 'নৌ জত্' পরবের সময় হল বালক-বালিকার ছয় বৎসর বয়সে। বিদ্যারম্ভের সময়টুকু উপনয়নের মধ্যে ধরে নিলে আমাদের এই সংস্কারটিও নৌ জত্-এর সঙ্গে মিলে যাবে। ভাষাতত্ত্বের নিরিখে অতএব জোর দিয়েই বলা যায় আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠী যখন ইরানি গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মক ছিল, তখন থেকেই এই সংস্কারের সূচনা হয়েছে। *[ঋগ্‌বেদ ৩.৮.৪]*

☐ মনুসংহিতায় এই বহুল প্রচলিত শ্লোকটি নেই—যেখানে বলা হয়েছে—জন্মের নিরিখে সকলেই শূদ্র হয়ে জন্মায় কিন্তু উপনয়ন-সংস্কারের পরে যখন তার দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয় তখনই তাকে দ্বিজ বলে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ
সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ ভবেদ্ বিপ্রো
ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

মনু বরঞ্চ প্রকারান্তরে জানিয়েছেন, উপনয়ন-সংস্কারের ফলে কোন কোন বর্ণের এই দ্বিতীয় জন্ম লাভের উপযুক্ততা আছে। তিনি লিখেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন বর্ণের পক্ষে উপনয়ন-সংস্কারের বিধান থাকায়, তাঁরাই শুধু দ্বিজ বলে অভিহিত হন। কিন্তু চতুর্থ বর্ণের পক্ষে উপনয়ন-সংস্কারের বিধান না থাকায় তাঁরা দ্বিজাতি নন—তাঁরা একজাতি—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য
স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু
শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ *[মনুসংহিতা ১০.৪]*

☐ ব্রহ্মচর্য্য এবং উপনয়নের অনুষ্ঠানের মধ্যে যে দ্বিতীয় জন্মের তাৎপর্য্য আছে, তার সূত্রটা অথর্ববেদের মধ্যেও খানিকটা রূপকের মাধ্যমে ধরা আছে। ব্রহ্মচারী আচার্যের কাছে বিদ্যা শিখতে আসত এবং আচার্য তার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে গর্ভস্থ ভ্রূণের মতো তিন রাত্রি রক্ষা করতেন—

আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।

মন্ত্ররূপক বলেছে—সেই ব্রহ্মচারী যখন আচার্যের গর্ভাবিহিত অবস্থা থেকে জন্মলাভ করে, তখন দেবতারা তার চারপাশে থাকেন। হয়তো এই মন্ত্রের মধ্যে তিন রাত্রির কথাটা থাকায়—

তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি।

এখনো পৈতের পর অন্তত তিনরাত্রি অসূর্যস্পর্শা হয়ে ঘরে থাকবার বিধান। অথর্ববেদে যা রূপক আকারে বিবৃত, শতপথ ব্রাহ্মণে তা আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে—উপনয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে আচার্য তাঁর শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করেন এক সময়। এটা ব্রহ্মচারীকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করার প্রতীক। শতপথ বলেছে— ব্রহ্মচারীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে আচার্য তাকে আপন অন্তরে গর্ভের মতো ধারণ করেন—

আচার্যো গর্ভীভবতি হস্তমাধায় দক্ষিণম্।

এর তিন দিন পর গায়ত্রীর সঙ্গে জন্মলাভ করে শিষ্য ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হন—

তৃতীয়স্যাং স জায়তে সাবিত্র্যা সহ ব্রাহ্মণঃ।

দেখুন, এখানেও সেই তিন দিনের কথা, এখন যেটা ত্রিরাত্রিক গৃহগর্ভবাসে পরিণত হয়েছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে একটি বালকের উপনয়ন-প্রক্রিয়া যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে—বিদ্যালাভার্থী বালক প্রথমে আচার্যের কাছে এসে বলত—আমি ব্রহ্মচর্য্যের জন্য এসেছি, আমি ব্রহ্মচারী হতে চাই। গুরু বলতেন—তোমার নাম কী বৎস? বালক নাম বললে পরে গুরু যদি তাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করতে চাইতেন, তবে তার কাছে এসে (এই কাছে আসাই—উপনয়তি, উপনয়ন) তার দক্ষিণ হাতখানি নিজের হাতে ধরতেন—

অথাস্য হস্তং গৃহ্ণাতি।

তারপর বালকের নাম ধরে বলতেন—তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ইন্দ্র তোমার আচার্য; তোমার আচার্য হলেন অগ্নি এবং আমিও তোমার আচার্য। এরপর আচার্য তাঁর নবাগত শিষ্যকে ক্ষিতি-অপ-তেজ ইত্যাদি পঞ্চভূত এবং ওষধি বনস্পতির তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিতেন মন্ত্র পড়ে। আসলে গুরুগৃহে থাকতে হলে ছাত্রকে নিজের মাকে ছেড়ে এসে প্রকৃতিমায়ের কোলে আশ্রয় নিতে হত বলেই হয়তো এই নিয়ম।

[অথর্ববেদ (Roth & Whitney) ১১.৫.১, ৩, ৬-৭;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৫.৪.১২, পৃ. ৮৬৩;
১১.৫.৪.১-১৭; পৃ. ৮৬১-৮৬৩]

☐ **অঙ্গীকরণ** বালককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাচিক অঙ্গীকারটুকুই সব নয়, আচার্য তাঁর নবাগত শিষ্যকে এক মুহূর্তের মধ্যে আপন গৃহের একজন করে তুলতেন তাঁর নিজের কর্মভার শিষ্যের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে। আচার্য বলতেন—এই জল পান করো, বৎস—অপো'শান। আমার ঘরের কাজ করো। এই যে গার্হপত্য অগ্নি জ্বলছে দিনরাত, একে নিভতে দেওয়া চলবে না, এতে সমিধ-কাষ্ঠ নিক্ষেপ করবে সময়ে সময়ান্তরে। আরও একটা কথা, দিনে ঘুমোনো চলবে না—মা সুযুপ্থা ইতি। আচার্য এরপর শিষ্যের কানে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতেন।

কবে লেখা হয়েছে এই শতপথ ব্রাহ্মণ? খুব কম করে হলেও খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম-নবম শতাব্দী হবে। তো শতপথ তারও আগেরকালের রীতি উল্লেখ করে বলেছে—প্রাচীন কালে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে এলে তার আগমনের দিন থেকে এক বছর পরে গায়ত্রী মন্ত্রের দীক্ষা দিতেন আচার্য। তারপরে এটা ছয় মাসের মাথায় এসে দাঁড়ায়। তারপর চব্বিশ দিনের মাথায়, আরও পরে বারো দিনের মাথায়, শেষে তিনদিন পরে। অর্থাৎ সেই যে আচার্য শিষ্যের হাতখানি ধরে তাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করতেন, তারপর তিনদিন পর সাবিত্রী-মন্ত্র তার কানে উচ্চারণ করলে সে ব্রাহ্মণ হয়ে নবজন্ম লাভ করত—

তৃতীয়স্যাং স জায়তে সাবিত্র্যা সহ ব্রাহ্মণঃ।

এই যে এক বছর থেকে ক্রমে ক্রমে গায়ত্রী-দীক্ষার সময় তিনদিনের মাথায় নেমে এল—এতে বেশ বোঝা যায় যে, গুরুগৃহের ছাত্রজীবনের চেয়েও গায়ত্রী-মন্ত্রের ধর্মীয় মাহাত্ম্য অধিক গুরুতর হয়ে উঠেছিল। শতপথ, তৈত্তিরীয়, গোপথ ইত্যাদি প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি তথা ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকের মতো প্রাচীন উপনিষদগুলির প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বোঝা যায়—তখনকার দিনে উপনয়ন বা ব্রহ্মচর্য্য এক বিশাল আচারক্লিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠেনি। বিদ্যাকামী শিষ্য হাতে একখণ্ড সমিধ-কাঠ নিয়ে গুরুগৃহে উপস্থিত হলেই আচার্য বুঝতে পারতেন—বালকটি গুরুগৃহে থেকে বিদ্যালাভ করতে চায়। গুরু তাঁকে তখন অঙ্গীকার করে নিতেন পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায়।

উপনয়ন-সংস্কারের আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব, যা পরবর্তী কালে গৃহ্যসূত্রগুলির সময় থেকে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, সে গুরুত্ব যে বেশি ছিল তা উপনিষদের দু-একটি উদাহরণ থেকে আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। উপনিষদের কালেও এমন মনভোলা, শুধুই বিদ্যাব্যসনী আচার্য ছিলেন অশ্বপতি কেকয়। তাঁর কাছে ঔপমন্যব প্রাচীনশাল, তাঁর আরও চারজন বিদ্যার্থী বন্ধুর সঙ্গে সকালবেলাতেই উপস্থিত হয়েছিলেন সমিধ-কাঠ হাতে নিয়েই—

তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে।

যাতে গুরু অশ্বপতি বুঝতে পারেন যে, তাঁরা উপনয়নের পর গুরুগৃহে থেকেই বিদ্যালাভ করতে চান। মনভোলা আচার্য অশ্বপতি বিদ্যা বোঝেন, অনুষ্ঠান বোঝেন না। তিনি সমিধকাঠের প্রতীকটুকু দেখলেন। দেখেই বিদ্যাবচন আরম্ভ করে দিলেন আপন মনে। উপনয়নের ধারও ধারলেন না—

তান্ হ অনুপণীয় এব এতদ্ উবাচ।

আবার অতি সাধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই যে উপনয়ন হয়ে যেত তারও উদাহরণ রয়েছে সেই বিখ্যাত সত্যকামের উদাহরণে, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন—অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী-তীরে। জাবাল সত্যকাম যখন হারিদ্রুমত গৌতমের কাছে এসে জননী জবালার কাহিনী শোনাল, গৌতম সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলেছেন—তুমি সত্যবাক্য থেকে চ্যুত হওনি। অতএব আর দেরি নয়। তুমি সমিধ-কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনো, তোমাকে এখনই উপনয়ন দেব—

সমিধং সৌম্য আহর উপ ত্বা নেষ্যে,
ন সত্যাদগা ইতি।

অর্থাৎ উপনয়ন তখন এতটাই সহজ ছিল। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকের বিদ্যা-সংবাদ গুরুত্বহীন হয়ে উঠতে আরম্ভ করল, বড়ো হয়ে উঠল ব্রাহ্মণ হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার তাগিদ এবং এই প্রতিষ্ঠারই প্রতিভূ হয়ে উঠল উপনয়ন।

আগে ছাত্রাবস্থা এবং বিদ্যালাভের দিকে নজর রেখে শিষ্যের প্রতি কতগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করতেন আচার্য। বিধির মধ্যে প্রধান ছিল গার্হপত্য অগ্নি জিইয়ে রাখার জন্য সমিধ কুড়িয়ে আনা এবং সেই অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা। প্রতিদিনের এই শৃঙ্খলা পালনের সঙ্গে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম পরিধান করা বা দাড়ি রাখার মতো নিয়ম পালন করতে হত, যাতে ছাত্রজীবনে বিলাসিতার কোনো প্রশ্রয় না থাকে। অন্যদিকে যে-সব আহারে শারীরিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সে-সব ছিল একেবারে বারণ। শতপথ বলেছে—ব্রহ্মচারী হয়ে যেন মধুপান কোরো না কখনও—

ন ব্রহ্মচারী সন্ মধু অশ্নীয়াৎ।

এ ছাড়া ভালো বিছানায় উচ্চাসনে শোয়া, নাচা-কোঁদা, গান গাওয়া, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো বা এটা-ওটা খেয়ে খালি খালি থু-থু ফেলাও চলবে না পড়াশোনার কালে—

নোপরিশায়ী স্যান্ন গায়নো ন নর্তনো ন সরণো ন নিষ্ঠীবেদ্।

আবার ভালো লাগল না, তো শ্মশানে গিয়ে উদাসীন হয়ে বসে রইলাম—তাও চলবে না।

ন শ্মশানমাতিষ্ঠেৎ।

পরিশ্রমের মধ্যে আছে দৈনন্দিন ভিক্ষা করা অর্থাৎ নিজের খাবার নিজে জোগাড় করার অভ্যাস তৈরি করা। অবশ্য ভিক্ষার কোনো অভাব হত না, কারণ অন্য গৃহের স্নেহশালিনী জননীরা ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষার দেবার জন্য উন্মুখ স্নেহে অপেক্ষা করতেন। সবমিলিয়ে বুঝি—কৃচ্ছ্রতা, শৃঙ্খলা এবং পরিশ্রম এই তিনটিই বিদ্যার্জনের অনুষঙ্গ ছিল প্রাচীন কালে।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৫.৪.১-১৭, পৃ. ৮৬১-৮৬৩; ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৫.১১.৬-৭, পৃ. ৫৮৫-৫৮৭, দ্র. শঙ্করভাষ্য; ৪.৪.১-৫, পৃ. ৪০৩-৪০৯, দ্র. শঙ্করভাষ্য; গোপথ ব্রাহ্মণ ২.৫-৭, পৃ. ২৬-২৭; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৩.৬.২.১৫]

☐ বেদ, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ গ্রন্থগুলির মধ্যে উপনয়নের তাৎপর্য্য প্রধানত একটি বালকের ব্রহ্মচর্য্য পালনের মধ্যেই। ব্রহ্মচর্য্যের তাৎপর্য্য এতটাই যে, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে অনেক সময়েই উপনয়ন শব্দটাই ব্যবহৃত হয়নি। বরঞ্চ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য্য—এই শব্দগুলিই উপনয়ন বা উপনীত ব্রাহ্মণের তাৎপর্য্য বহন করে। দ্বিতীয়ত মহাভারত-পুরাণের কালে উপনয়ন ব্যাপারটা এতটাই প্রচলিত ছিল এই সংস্কারের কথা বারবার নাম করে উল্লেখ করারও প্রয়োজন হয়নি। বিশেষত উপনয়ন কথাটা একেবারে শব্দত উল্লেখ করে বলাটা মহাভারতে প্রায় ঘটেনি বললেই চলে। একবার দেখা যায়, যখন আদিপর্বে পঞ্চ পাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা জন্মালেন, তখন স্মার্ত বিধি অনুসারে তাঁদের যেমন জাতকর্ম ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হল, তেমনই তাঁরা একটু বড়ো হতেই পরপর চূড়াকরণ-উপনয়ন ইত্যাদি কর্মও সম্পন্ন করে দিলেন পাণ্ডবদের পুরোহিত ধৌম্য—

জাতকর্মাণ্যানুপূর্ব্যাৎ চূড়োপনয়নানি চ।
চকার বিধিবদ্ ধৌম্যস্তেষাং ভরতসত্তম॥

এমনকী উপনয়ন সংস্কারের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে দ্রৌপদীর ছেলেরা যে বেদাধ্যয়নও আরম্ভ করলেন, সে কথাও খুব স্পষ্টভাবে এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.২২১.৮৭; (হরি) ১.২১৪.৮৭]

☐ মহাভারতের অন্যত্র সেই ব্রহ্মচর্য্যের কথাই বারবার মহাভারতে এসেছে এবং ব্রহ্মচারী অবস্থায় একজন উপনীত ছাত্রের কী করণীয়, সে বিষয়ে মহাভারতে বিশদ আলোচনা শান্তিপর্বে। এখানে চতুরাশ্রমের প্রসঙ্গে কথা বলার সময় আয়ুর চার ভাগের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে এই ব্রহ্মচর্য্য এমনই শ্লাঘনীয় আচার যে, মহাভারত বলেছে—এর দ্বারা ঋষি-মুনিরাও সমস্ত লোক জয় করে আপন অভীষ্ট তথা আত্মজ্ঞানের শ্রেয় পথটি লাভ করতে পারেন—

ব্রহ্মচর্য্যেণ বৈ লোকান্ জয়ন্তি পরমর্ষয়ঃ।
আত্মনশ্চ ততঃ শ্রেয়াংস্যন্বিচ্ছন্মনসাত্মনি॥

ব্রহ্মচারীর আচরণীয় কর্তব্যগুলি বলতে গিয়ে মহাভারত বলেছে—ব্রহ্মচারীর মনে কোনো ঈর্ষা-অসূয়ার স্থান নেই—ব্রহ্মচারী অনসূয়কঃ। ব্রহ্মচারী গুরু বা গুরুপুত্রের বাড়িতে থাকবে।

আচার্য-গুরু ঘুমোনোর পর ব্রহ্মচারী শিষ্য ঘুমোবে, আচার্য ঘুম থেকে ওঠার আগে শিষ্য জাগবে। আচার্যের খাওয়া না হলে খাবে না, তিনি জল না খেলে শিষ্যও জল খাবে না, তিনি দাঁড়িয়ে থাকলে শিষ্যও দাঁড়িয়ে থাকবে। অধ্যয়নের আগে গুরুকে ব্রহ্মচারী জানাবে—এবার আমাকে বেদজ্ঞান উপদেশ করুন—

অভিবাদ্য গুরুং ব্রয়াদধীষ্ব ভগবন্নিতি।

মহাভারত এইভাবেই উপনয়ন-প্রাপ্ত ব্রহ্মচারীর সংযম-নিয়ম, গুরু-শুশ্রূষা এবং বেদাধ্যয়নের চিত্র এঁকেছে; ঠিক যেমনটা আমরা দেখেছি গোপথ ব্রাহ্মণ কিংবা শতপথ ব্রাহ্মণে।

[মহা (k) ১২.২৪২.৫-৭, ১৬-২৯; (হরি) ১২.২৩৯.৬, ১৬-২৯]

□ গৃহ্যসূত্রগুলি এবং স্মার্তদের হাতে পড়ে উপনয়ন যখন ধর্মের মাহাত্ম্যে সজ্জিত হল, তখন উপনয়নের শুভ দিন-ক্ষণ বিচার থেকে আরম্ভ করে গায়ত্রী-জপ, হোমকর্ম, বিশেষ বিশেষ ব্রতপালন—এইগুলিই ব্রহ্মচারীর প্রধান কর্ম হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণের উপনয়নের বয়সকাল স্মার্তমতে জন্ম থেকে অষ্টমবর্ষ। ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন এগারো বছরে, বৈশ্যের বারোতে।

গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়ীত।
গর্ভৈকাদশেষু রাজন্যম্,
গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যম্।

এই নিয়মে যথাক্রমে ষোলো, বাইশ, এবং চব্বিশের পর আর উপনয়ন চলত না। ব্রাহ্মণের পক্ষে বয়সটা যে কম ধরা হয়েছে, তার কারণ অনেক সময়েই এঁরা পিতার কাছেই বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে পিতা আরুণি বেদাধ্যয়ন করিয়েছিলেন শ্বেতকেতুকে। কিন্তু ক্ষত্রিয়বৈশ্যকে যেহেতু গুরুগৃহেই যেতে হত, তাই বাপ-মায়ের সান্নিধ্য আরও কিছুদিন অনুমত হয়েছে শাস্ত্রকারদের বিধিতে।

[আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র (মহাদেব শাস্ত্রী) ৯.২-৩, পৃ. ১৫১-১৫২; ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৬.১]

□ উপনয়নের মন্ত্র এবং অন্যান্য বিধি সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু এখানে তার পরিসর নেই। তবে যে-কথা না বললে নয়, সেটা হল—পৈতে বা উপবীত বলতে আজকাল যে বামুনের গলায় সূত্রগুচ্ছ দেখি, প্রাচীনকালে পৈতের এই চেহারা ছিল না। গুরুগৃহে আসলে ব্রহ্মচারীর পরিধান ছিল দুটি—অধমাঙ্গের বসন এক খণ্ড, আর এক খণ্ড উত্তমাঙ্গের বসন যার নাম উত্তরীয়। এই উত্তরীয়-বসনখানিই যজ্ঞোপবীতের কাজ করত। তবে সেই উত্তরীয়টি যে সব সময়েই সুতোর কাপড় হত, এমন কথা নেই, কখনো তা কৃষ্ণসার মৃগচর্ম যার নাম ছিল অজিন—সেটাই যজ্ঞোবপীত বা পৈতের কাজ করত—অজিনং বাসো বা দক্ষিণতো উপবীয় দক্ষিণং বাহুমুদ্ধরতে অবধত্তে সব্যমিতি যজ্ঞোপবীতমেতদ্। পরবর্তীকালে বিকল্প হিসেবে সূত্রগুচ্ছের ব্যবহার সিদ্ধ হয় এবং সেটাই এখন প্রতীকীভাবে প্রধান হয়ে উঠছে পৈতে নামে।

গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতির মধ্যে পৈতের মন্ত্র হিসাবে যা আছে এবং এখনও যা ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে দুটি মন্ত্র এখানে লক্ষণীয়। এক হল—মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু ইত্যাদি। বিয়ের কথা হলেই এই মন্ত্রটির সন্ধান পড়ে। মনে রাখতে হবে—এটা প্রাথমিকভাবে একটি উপনয়নের মন্ত্র। এই মন্ত্রবলে গুরু শিষ্যকে আপন ব্রত, কর্ম, এবং ভাবনার সঙ্গে একাত্ম এবং একমুখীন করে তোলেন। আর এই মন্ত্রই যখন বিবাহের সময়ে পঠিত হয়, তখন স্বামী তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে একাত্মক করে তোলেন নিজের সঙ্গে। অন্য মন্ত্রটি অশ্মারোহণের মন্ত্র এবং এটিও উপনয়ন এবং বিবাহে একত্তর হয়ে গেছে। উপনয়নের সময় এই মন্ত্র পড়ে গুরু শিষ্যকে একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে বলেন—এই পাথরের মতো স্থির হও ইত্যাদি। গুরুগৃহের বাসকালে শিষ্য যাতে ব্রতে, নিয়মে, কৃচ্ছ্রতায় এবং অবশ্যই গুরুর স্নেহভাবনায় স্থিরবুদ্ধি হয়ে থাকে সেই জন্যই এই মন্ত্র পড়া। আর বিবাহের সময় পরগৃহাগতা কন্যা যাতে শ্বশুরবাড়িতে মনস্থির করে স্বামীর অনুগামিনী হয়, সেই জন্যই স্বামী মন্ত্র পড়েন—এই প্রস্তরখণ্ডের মতো স্থির হও—অশ্মেব ত্বাং স্থিরা ভব। হয়তো উপনয়ন সংস্কারে গুরু এবং শিষ্যের একাত্মতা এবং পারবশ্যের মতো বিবাহেও স্বামী-স্ত্রীর একাত্মতা এবং পারবশ্য একরকম বলেই বিবাহই স্ত্রীলোকের উপনয়ন—একথা মনু জানিয়েছেন—স্বামী সেবা, স্বামীর ঘরে গুরুজনদের সঙ্গে বাস করা, গার্হপত্য অগ্নির

পরিচর্যা—এগুলির মাধ্যমেই স্ত্রীলোকের উপনয়ন সম্পন্ন হয়।

[তৈত্তিরীয় আরণ্যক (আনন্দাশ্রম) ২.১, পৃ. ১১৯; মনুসংহিতা ২.৬৭]

☐ মেয়েদের কোনো উপনয়ন হত কিনা, এটা একটা বড়ো প্রশ্ন। তবে বহু প্রাচীনকালে অবশ্যই হত। স্মৃতিচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে দেবনভট্টের মতো একজন স্মার্ত পণ্ডিত পূর্বকালে মেয়েদের উপনয়ন প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রকার হারীতের বচন উদ্ধার করে লিখেছেন—স্ত্রীলোক দুই প্রকার। এক প্রকার হলেন ব্রহ্মবাদিনীরা, আর দ্বিতীয় প্রকার হলেন সদ্যোবধূরা। যাঁরা ব্রহ্মবাদিনী তাঁদের উপনয়নও হবে, ব্রাহ্মণোচিত অগ্নিসমিন্ধন, বেদপাঠ এবং নিজের ঘরে বা নিকট আত্মীয়-পরিজনের কাছে ভিক্ষাচরণ করে সার্থকভাবেই ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে যাঁরা সদ্যোবধূ অর্থাৎ যাঁরা বিবাহিত জীবনে সংসার-ধর্ম পালন করবেন, সেইসব মেয়েদের বিবাহ ঠিক হওয়া মাত্রেই কোনো ভাবে একটা উপনয়ন দিয়ে নিয়ে তার বিবাহ দিতে হবে—

তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়মগ্নীন্ধনং
বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্যেতি।
সদ্যোবধূনাং তু উপস্থিতে বিবাহে
কথঞ্চিদুপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।

ব্রহ্মচারিণী এবং সদ্যোবধূ দুয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু উপনয়ন স্বীকার করা হয়েছে, অন্যান্য ধর্মনিবন্ধেও মেয়েদের এই উপনিয়ন-বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায় দেবনভট্ট যমসংহিতার বচন তুলে বলেছেন—পুরাকল্পে কুমারী মেয়েদের কুশঘাসের তৈরী উপবীত ধারণের (মৌঞ্জীবন্ধনের) নিয়ম ছিল। তাঁরা বেদের অধ্যাপনাও করতেন গায়ত্রীমন্ত্রও জপ করতেন। আর উপনয়ন-প্রাপ্ত ব্রহ্মচারিণীরা বেদ-অধ্যয়ন করতেন পিতা, পিতৃব্য কিংবা ভ্রাতার কাছে। স্ত্রীলোকের শরীর বলেই ব্রহ্মচারীদের মতো তাঁদের অজিন পরা বারণ ছিল, জটাধারণও তাদের করতে হত না। আর ব্রহ্মচারীর অবশ্য কর্তব্য যে ভিক্ষবৃত্তি, সেটা বাড়ির লোকের কাছেই করার বিধান ছিল—

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা॥
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে॥
বর্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেব চ॥

মেয়েদের উপনয়ন-সংস্কার বা বেদাধ্যয়নের মতো কর্ম বিহিত না থাকলে মহাভারতে সেই ব্রাহ্মণ পাণ্ডবজননী কুন্তীকে অথর্বশিরস্ শ্রুতি থেকে বহুতর মন্ত্র গ্রহণ করাতে পারতেন না—

ততস্তামনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ।
মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্নথর্বশিরসি শ্রুতম্॥

এটা তো দুর্বাসা মুনির দেওয়া সেই অমোঘ মন্ত্র, যে মন্ত্রের মাধ্যমে কুন্তী প্রথমে কর্ণকে এবং পরে পাণ্ডবদের পুত্র হিসেবে লাভ করেছিলেন। উপনয়ন-সংস্কারহীন এক রমণীর পক্ষে দুর্বাসার এই মন্ত্রধারণ সম্ভব ছিল না। আবার রামায়ণে রামচন্দ্র যখন তাঁর যৌবরাজ্যাভিষেকের প্রথম সুসংবাদটি দিতে এলেন জননী কৌশল্যাকে তখন তিনি কৌশল্যাকে আমীলিতলোচনে প্রাণায়াম করতে দেখেছিলেন এবং তিনি বিষ্ণু-জনার্দনের ধ্যান করছিলেন সেই সময়—

প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানং জনার্দনম্।

পণ্ডিত জনেরা অনেকেই মনে করেন যে, এই প্রাণায়াম প্রক্রিয়া এবং ধ্যান কোনো যৌগিক প্রক্রিয়াও হতে পারে কিন্তু এই অভ্যাসগুলির প্রাথমিক নিদান উপনয়ন-সংস্কারের মধ্যে আছে বলেই আমাদের ধারণা স্ত্রীলোকের উপনয়ন সেকালে কোনো অঘটন ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক পরবর্তী কালে বাণভট্টের কাদম্বরীতে মহাশ্বেতাকে যেখানে তপস্যারত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, তখন তাঁকে পুরোপুরি পৈতে-পরা অবস্থায় তপস্যার কৃচ্ছ্রতা বরণ করতে দেখছি—

মণ্ডলীকৃতেন ব্রহ্মসূত্রেণ পবিত্রীকৃতকায়াম্।

আসলে স্ত্রীলোকের এই উপনয়ন-সংস্কার বিহিত থাকা সত্ত্বেও হয়তো তেমন বহুল প্রচলিত ছিল না। যদি বা এই সংস্কার মানাও হত, সেক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য্যের পরিধি ছিল এতটাই সংক্ষিপ্ত যে, তাদের সমাবর্তন হয়ে যেত রজোদর্শনের আগেই। ব্রহ্মর্ষি হারীত এমনই বিধান দিয়েছেন—

প্রাগ্‌রজসঃ সমাবর্তনম্।

একদিকে ব্রহ্মচর্য্য-পরিধির এই সংক্ষিপ্ত সময় অন্যদিকে পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রকার মনু-যাজ্ঞবল্ক্যদের

এ-বিষয়ে উদাসীন অনুল্লেখ স্ত্রীলোকের উপনয়ন-সংস্কারকে বহুল প্রচলনের জায়গা ছেড়ে দেয়নি, অবশেষে বিবাহেই তাঁদের উপনয়নের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

[Smritichandrika by Devana Bhatta, Vol. I (Samska Kanda) p. 62; মহা (k) রামায়ণ ২.৪.৩৩; বীরমিত্রোদয়, সংস্কারপ্রকাশ, পৃ. ৪০৪; কাদম্বরী (হরিদাস), চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৫৪]

□ উপনয়নের পর শিষ্যের পাঠকাল নির্ধারিত ছিল মোটামুটি তার চব্বিশ বছর পর্যন্ত। গুরুগৃহে বাসের কাল খুব কম করে ছিল বারো বছর। তাতে একজন ব্রহ্মচারী তার আঠারো কিংবা কুড়ি বছর কাল পার করলেই বিদ্যামুক্তির স্নান করে স্নাতক বলে চিহ্নিত হতেন। স্নানের পর হত সমাবর্তন। শব্দ দুটি এখনও প্রচলিত। সমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর অনুমতি নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেন বিদ্যালব্ধ ব্যক্তি। সকলেই যে ফিরে আসতেন তা নয়। অনেকেই, যাদের ইচ্ছা এবং একাগ্রতা বেশি ছিল, তাঁরা গুরুগৃহে থাকতেন আরও বেশি কাল, যতদিন না সম্পূর্ণ বিদ্যা তাঁদের অধিগত হত।

উপনিধি বসুদেবের ঔরসে ভদ্রার গর্ভে জাত একজন পুত্র। *[বিষ্ণু পু. ৪.১৫.১৩]*

উপনিষদ মহাভারতে-পুরাণে উপনিষদ গ্রন্থগুলিতে উক্ত ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্বকে চরম সম্মান দেওয়া হয়েছে। মহাভারত গ্রন্থখানিই যে সমস্ত বেদ-উপনিষদের আখ্যানাত্মক বিস্তার, একথা বলেই কিন্তু মহাভারতের তাত্ত্বিক মহিমা খ্যাপন করেছেন স্বয়ং মহাভারতের কথক-ঠাকুর—

ব্রহ্মান্ বেদরহস্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্থাপিতং ময়া।
সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়া॥

মুনি-ঋষি-তত্ত্বজ্ঞানীদের মাহাত্ম্য এবং জ্ঞান সূচনা করার জন্যও বার বার এই কথা বলা হয়েছে যে, তিনি বেদ, বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ জানেন—অর্থাৎ কতটা তাঁর জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা অথবা কতটা তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাপ্তি—

* সাঙ্গোপনিষদান্ বেদান্ চতুরাখ্যান পঞ্চমান্।
* বেদোপনিষদাং বেত্তা ঋষিঃ সুরগণার্চিতঃ।

[মহা (k) ১.১.৬২; ৩.৪৫.৮; ২.৫.২; (হরি) ১.১.৫৫নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ১, পৃ. ৩৭; ৩.৩৯.৯; ২.৫.২]

□ উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞান যেহেতু সংসার-নিবৃত্তির কথা বলে, জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রশংসা করে উপনিষদগুলি যেহেতু মানুষকে আত্মানুসন্ধানের পথ দেখায়, তাই চতুরাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস বা চতুর্থ আশ্রমের পালনীয় ধর্মটাকেই উপনিষদ্-ধর্ম বলে আখ্যাত করা হয়েছে—অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম আসলে সন্ন্যাসীর ধর্ম—

* চতুর্থশ্চৌপনিষদো ধর্মো সাধারণ স্মৃতঃ।
বানপ্রস্থা গৃহস্থাশ্চ ততো'ন্যঃ সংপ্রবর্ততে॥
* চতুর্থোপনিষদ্ধর্মঃ সাধারণ ইতি স্মৃতিঃ।
সংসিদ্ধৈঃ সাধ্যতে নিত্যং . . .
যতিধর্মঃ সনাতনঃ॥

[মহা (k) ১২.২৪৪.১৫; ১২.২৭০.৩০-৩১; (হরি) ১২.২৪১.১৫; ১২.২৬৪.৩০-৩১]

□ মহাভারতের কালে উপনিষদের তত্ত্বের মহিমা এতটাই আদর্শ বিবেচিত হত যে, উপনিষদ শব্দটার অর্থই হয়ে গিয়েছিল ধর্ম, মন্ত্র অথবা বীজ। যেমন ন্যায়ানুসারে প্রাপ্তধন দিয়ে যাগযজ্ঞ করবে, অতিথিসেবা করবে এটাই গৃহস্থধর্মের মন্ত্র অথবা এটাই গৃহস্থের ধর্ম—

সৈষা গৃহস্থোপনিষৎপুরাণী।

আবার বেদের মূল হল সত্য, সত্যের মূল ইন্দ্রিয়-সংযম (দম), সংযমের মূল দান, দানের মূল তপস্যা, তপস্যার মূল ত্যাগ, ত্যাগের মূলে আছে সন্তোষ, সুখ—এই মূলের মর্ম বোঝাতে 'উপনিষৎ'-শব্দের প্রয়োগ যে একত্রে উপনিষদের সামগ্রিক মর্মটাকেই উদ্ঘাটিত করে—

বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্দমঃ।
দমস্যোপনিষদ্দানং দানস্যোপনিষত্তপঃ॥
তপস্যোপনিষত্ত্যাগস্ত্যাগস্যোপনিষৎ সুখম্।
সুখস্যোপনিষৎ স্বর্গঃ স্বর্গস্যোপনিষচ্ছমঃ॥

মহাভারতের অন্য একটি প্রসঙ্গে ওই একই ভাবে 'মূল' অর্থে উপনিষদ শব্দ ব্যবহার করে অবশেষে উপনিষদ মানেই যে, মোক্ষানুসন্ধানের তত্ত্ব সেটা পরিষ্কার করে দিয়ে বলা হয়—বেদের মূল হল সত্য, সত্যের মূলে আছে দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহের শক্তি, দমের মূলে আছে মুক্তিকামিতা বা মোক্ষ—

বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্দমঃ।
দমস্যোপনিষন্মোক্ষঃ এতৎ সর্বানুশাসনম্॥

[মহা (k) ১.৯১.৩; ১২.২৫১.১১-১২; ১২.২৯৯.১৩; (হরি) ১.৭৯.৩; ১২.২৪৮.১০-১১; ১২.২৯২.১৩]

☐ উপনিষদ শব্দটির সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় শাকল সংহিতার অন্তর্গত খিলসূক্তে উপনিষৎ-শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে 'নিষৎ' কথাটির সঙ্গে—

এবা নিষচ্চাপনিষচ্চ বিপ্রা যুবাং রেভতৌ।

[১.৩.৭]

পণ্ডিতজনেরাই জানিয়েছেন এই ঋকের অর্থ বোঝা যায় না এবং অর্থ বোঝার জন্য তাঁরা মহাভারতের স্মরণ নিয়েছেন। মহাভারতেও ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তুতিতে বলা হয়েছে—সূক্ষ্মের থেকেও সূক্ষ্ম বিরাটের থেকেও, বিরাটকে বেদ-মন্ত্রে, বৈদিককর্ম-প্রকাশক এবং মন্ত্রার্থ-বিবরণ-সমন্বিত ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে বৈদিক কর্মাঙ্গ-সম্বন্ধী তথা দেবতা-জ্ঞান-বিষয়ক 'নিষৎ' গ্রন্থগুলিতে অর্থাৎ আরণ্যক গ্রন্থগুলিতে এবং আত্মবিদ্যাবিষয়ক উপনিষদগুলিতে যাঁকে সত্য এবং সত্যকর্মা বলা হয়েছে—

যং বাক্যেম্বনুবাক্যেষু নিষৎসূপনিষৎসু চ।

এখানে বাক্ বৈদিক মন্ত্রভাগ, অনুবাক ব্রাহ্মণ এবং নিষৎ-কে আরণ্যক বলেই বোঝাতে চেয়েছেন টীকাকার নীলকণ্ঠ, আর উপনিষদ বলতে আত্মবিদ্যার কথাই তিনি বলেছেন—

নিষৎসু কর্মাঙ্গাদ্যববদ্ধ দেবতাজ্ঞানাদিবাক্যেষু
উপনিষৎসু কেবলাত্মজ্ঞাপক বাক্যেষু।

মূল মহাভারতীয় শ্লোকে বাক-অনুবাকের অর্থ যে বেদ-ব্রাহ্মণই হবে এবং তার অনুক্রমে 'নিষৎ' কথাটা যে আরণ্যকেরই পরিভাষা, সেটা নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন শ্লোকে ব্যবহৃত উপনিষৎ কথাটা থেকেই। অতএব এই ব্যাখ্যা, অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং এই ব্যাখ্যাকে যখন কীথ-সাহেব 'absurd' বলেন, তখন বুঝতে পারি, তিনি ভারতের পরম্পরাবাহী পরিভাষাগুলি তেমনভাবে অনুধাবন করেননি। কিছু না বুঝেই তিনি লিখেছেন—The epic invests an absurd 'Niṣad' as a form of literature besides Upaniṣad.

[মহা (k) ১২.৪৭.২৫-৩১; (হরি) ১২.৪৬.২৫-৩১; A.B. Keith, The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads, p. 492, fn.1]

☐ মহাভারতে উল্লিখিত 'নিষৎ' শব্দটি অবশ্যই আরণ্যক গ্রন্থগুলির পারিভাষিক প্রয়োগ, কেননা উপনিষদে আচার্যের সমীপে 'নিষণ্ণ' বা উপবিষ্ট হয়ে নিগূঢ় তত্ত্বজিজ্ঞাসার যে রীতি, তার সূত্রপাত ঘটেছে আরণ্যক গ্রন্থগুলির মধ্যেই। আধুনিককালের মন্ত্রদর্শী পুরুষ অনির্বাণ ঋগ্‌বেদ থেকে 'নিষৎ' শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে বলেছেন—'নিষদ্' হচ্ছে সেই গভীর ভাবনা যাতে মন্ত্রের উচ্চারণের পর মনে হবে—দেবতা যেন আধারে (আমাদের মানসাসনে) নিষণ্ণ বা উপবিষ্ট হয়েছেন ('অভিস্ববা নিষদা গা,' ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র ২.২১.৫)। নিষৎ শব্দের অর্থ দেবতার আবেশ, যেখানে দেবতার আবেশ হয়, তাকে নিষৎ বলতে চেয়েছে ঋগ্‌বেদ স্বয়ং—

* রণা বা যে নিষদি সত্তে অস্য/
পুরা বিবিদ্রে সদু নূতনাসঃ।
* অরাধি হোতা নিষদা যজীয়ান্।

দেবতার এই অন্তরাবেশের ঘটনাকেই শতপথ ব্রাহ্মণ দীক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছে। দীক্ষাকালে শিষ্যের শরীরে-মনে আচার্য-গুরুর উচ্চারিত মন্ত্রের আবেশ ঘটে—

যা বৈ দীক্ষা সা নিষৎ

নিষৎ-শব্দের মধ্যে দেবতার এই আবেশ-কল্পনা এবং একই সঙ্গে নিষৎ এবং দীক্ষার একাত্মতাই কিন্তু উপনিষৎ-শব্দটার গভীর তাৎপর্য্য তৈরি করেছে। ঋগ্‌বেদে উপনিষদকে বলা হয়েছে যজুর্বেদের রস, শতপথ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাক্যই উপনিষদ, সেই উপনিষদ শাংখ্যায়ন আরণ্যকের ভাষায় বেদের মস্তক বা বেদশির—

'তামেতাম্ উপনিষদং বেদশিরো ন যথা
কথঞ্চন বদেৎ। তদেতদ্ ঋচাভ্যুদিতম্।'

বলা হয়েছে—উপনিষদ হল ঋগ্‌বেদের মাথা, যজুর্বেদের উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ ওপর দিক, সামবেদের শির এবং অথর্ববেদের মুণ্ড। উপনিষদকে বাদ দিয়ে বেদ হল কন্ধকাটা কবন্ধ—

ঋচাং মূর্ধানং যজুষামুত্তমাঙ্গং/
সাম্নাং শিরো'থর্বণাং মুণ্ডমুণ্ডম্।
নাধীতে'ধীতে বেদমাপুস্তমজ্ঞং/
শিরচ্ছিত্ত্বাসৌ কুরুতে কবন্ধম্॥

[ঋগ্‌বেদ ২.২১.৫; ৬.২৭.১, ২; ১০.৪৩.২; শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ৪.৬.৮.১-২; Sankhyayara Brahmana (keith), ১৩.১. ১৪; অনির্বাণ, বেদমীমংসা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪-১১৫]

□ বেদের অন্তভাগ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে যে দার্শনিকতার সূচনা, বেদ-ব্রাহ্মণে পর আরণ্যক গ্রন্থগুলিতে যে অধ্যাত্মচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তারই পরিণতি ঘটেছে উপনিষদের মধ্যে।

উপনিষদ শব্দের দুই/তিন রকম অর্থ করা হয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি গ্রাহ্য বলে যে মতটা উল্লেখ করা হয়, সেটা বলেছেন প্রাজ্ঞতম টীকাকার শঙ্করাচার্য। তাঁর মতে 'সদ্' ধাতুর অর্থ—জীর্ণ করা, বিনাশ করা অথবা গমন করা। 'নি'—এই উপসর্গের অর্থ নিশ্চিতরূপে অথবা নিঃশেষে। 'উপ'—এই উপসর্গের অর্থ নিকটে। যে বিদ্যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ অবিদ্যাকে নিঃশেষে জীর্ণ করে অথবা নিশ্চিত বিনাশ করার পর মুক্তিকামী মানুষকে পরম পরায়ণ ব্রহ্মের কাছে নিয়ে যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যাকেই উপনিষদ বলে। উপনিষদ কথাটার প্রধান অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা, যে গ্রন্থ পড়ে এই ব্রহ্মাবিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায় গৌণ অর্থে সেই গ্রন্থকেও উপনিষদ বলে। উপনিষদ-গ্রন্থকে গৌণ বলা হয়েছে এইজন্যই যে শুধুমাত্র গ্রন্থপাঠ করেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না, ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে আচার্য বা গুরুর কাছে (উপ) গিয়ে নিষণ্ণ (নি+সদ্) হতে হয়, বসতে হয় তাঁর কাছে, প্রপন্ন হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হয় মোক্ষলাভের উপায়, সেইজন্যই ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় নিয়ে রচিত এই গ্রন্থগুলিকে বলা হয় উপনিষদ।

উপনিষদের আর এক নাম রহস্য। 'রহঃ' মানে নিভৃত গোপন স্থান, 'রহস্য' মানে গোপনীয় তত্ত্ব। অতিগভীর গম্ভীর এই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্বিচারে যেখানে-সেখানে প্রকাশ্য নয় বলেই উপনিষদের তত্ত্ব রহস্য। উপনিষদের মধ্যেই বলা হয়েছে—অন্যত্র তো নয়ই অপ্রশস্ত মানুষ, পুত্র কিংবা উপযুক্ত শিষ্য নয় এমন মানুষকেও এই তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া চলবে না—

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥

[কঠোপনিষদ (দুর্গাচরণ), শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্যভূমিকাঃ 'সদের্ধাতোঃ সংসার-নিবৃত্তি-ব্রহ্মপ্রাপ্তি লক্ষণা' পর্যন্ত। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ (দুর্গাচরণ), ৬.২২; পঠিতব্য: বিধুশেখর ভট্টাচার্য, উপনিষদ্ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) পৃ. ৭-৮]

□ শাস্ত্রের ক্রমিকতা অনুযায়ী বেদের পরে ব্রাহ্মণগুলি রচিত হয়েছে, তার পরে রচিত হয়েছে আরণ্যক গ্রন্থগুলি। সেই আরণ্যকগুলির সমসাময়িককালে অথবা প্রায় অব্যবহিত সময়ে প্রধান উপনিষদগুলি রচিত হয়ে যায়। বেদ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত শাস্ত্রগুলির প্রথম পরিচয়ে এটাই বলা হয় যে, বেদ এবং ব্রাহ্মণগুলিতে যদি কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে আরণ্যক এবং উপনিষদে আছে জ্ঞানকাণ্ডের কথা। এটাও অবশ্য মানতে হবে যে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধানত কর্ম এবং গৌণত জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা আছে বটে, কিন্তু এগুলির যে অংশে কর্ম এবং জ্ঞান দুয়েরই সাংকেতিক এবং অধ্যাত্মিক আলোচনা আছে, সেইগুলিকেই কিন্তু আরণ্যক বলে। আরণ্যক গ্রন্থের রচনা এবং পাঠ অরণ্যের মধ্যেই সম্পন্ন হত। অত্যন্ত দুরূহ এবং কঠিন বলে যত্র-তত্র এগুলির উপদেশ দেওয়া হত না। নিভৃত নির্জনে বনের মধ্যেই আরণ্যক-গ্রন্থের পঠন-পাঠন-উপদেশ দেওয়া হত। আমাদের কাছে পরম্পরা-প্রাপ্ত উপনিষদগুলি বেশির ভাগই আরণ্যক শাস্ত্রের অন্তর্গত। কিন্তু সম্যক মাহাত্ম্য উদ্ভাবন করে উপনিষদগুলিকে প্রথমত বেদের সঙ্গেই যুক্ত করা হয়েছে। আবার মাঝে মাঝে এগুলি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির সঙ্গেও যুক্ত।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—কেন উপনিষদ সামবেদের জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও এটাকে আরণ্যক উপনিষদই বলা হচ্ছে। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের প্রথম অংশটিকে আরণ্যক বলা হয় এবং ছান্দোগ্যোপনিষদ সেই আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত। ঐতরেয় উপনিষদ ঐতরেয় আরণ্যকের এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত। আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদগুলিকে আরণ্যকোপনিষদ বলে, ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদগুলিকে ব্রাহ্মণোপনিষদ এবং বেদের মন্ত্রভাগের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদকে মন্ত্রোপনিষদ বলা হয়। মন্ত্রোপনিষদ একটাই আছে যা ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের অংশ নয়। সেটি হল ঈশোপনিষদ। এটি শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্রভাগের অংশ হিসেবে পরিচিত। আমাদের এই ভাবনাগুলি একটি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়—ঋগ্‌বেদ—১। ঐতরেয়, ২। কৌষীতকি,

সামবেদ—৩। ছান্দোগ্য, ৪। কেন, যজুর্বেদ—(ক) কৃষ্ণযজুর্বেদ, ৫। তৈত্তিরীয়, ৬। কঠ, ৭। শ্বেতাশ্বতর, (খ) শুক্লযজুর্বেদ, ৮। বৃহদারণ্যক, ৯। ঈশাবাস্য বা ঈশ অথর্ববেদ—১০। প্রশ্ন, ১১। মুণ্ডক, ১২। মাণ্ডুক্য।

এমনিতে প্রায় দুশোর বেশি উপনিষদ পাওয়া যায়, যেগুলির অধিকাংশই অর্বাচীন। প্রধানত উপরি উক্ত এই বারোটি উপনিষদই প্রাচীন বলে গণ্য হয়, কেননা মহামতি শঙ্করাচার্য এই উপনিষদগুলির টীকা রচনা করেছেন। পণ্ডিতেরা অবশ্য প্রাচীনতার নিরিখে এই উপনিষদগুলিরও সময় এবং স্তর বিভাগ করেছেন। তাঁদের মতে প্রথম স্তরে আছে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় এবং কৌষিতকী উপনিষদ। এই উপনিষদগুলি প্রধানত রচিত এবং সেই গদ্যভাষার সঙ্গে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির গদ্যভাষার অনেক মিল আছে বলেই এই উপনিষদগুলিকে যথেষ্ট প্রাচীন বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় স্তরে আছে—কেন উপনিষদ। এটির কিছু অংশ পদ্যে লেখা, এবং অতি অল্প অংশই গদ্যে লেখা। অন্যদিকে কঠ, ঈশ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক ইত্যাদি উপনিষদ পদ্যে রচিত হলেও এগুলি যথেষ্টই প্রাচীন। তৃতীয় স্তরে প্রশ্ন, মৈত্রায়ণী, মাণ্ডূক্য এই তিন উপনিষদ গদ্যে রচিত হলেও এগুলির গদ্যভাষা বৃহদারণ্যক অথবা ছান্দোগ্যের মতো প্রাচীন নয়। আর চতুর্থ স্তরে আছে অর্বাচীন সেই উপনিষদগুলি যেগুলির ভাষা, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সূক্ষ্মতা পূর্বোল্লিখিত উপনিষদগুলির খুব কাছাকাছি আসে না।

আমাদের কাছে প্রাপ্ত এবং প্রকাশিত উপনিষদের সংখ্যা অনেক হলেও পরম্পরায় নেমে আসা একটি শ্লোক অনুযায়ী প্রধান উপনিষদের সংখ্যা দশটি—

ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডুক্য-তিত্তিরি।
ঐতরেয়শ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা॥

উপনিষদগুলির মূল ভাব এবং তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করাটা অল্প পরিসরে একেবারেই অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও দিগ্‌দর্শনের জন্য বলা যেতে পারে যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব এবং ব্রহ্মে ভেদ নেই—এই কথাটাই উপনিষদের সার কথা। 'তুমিই সেই তিনি'— 'তত্ত্বমসি', কিংবা 'তিনিই আমি 'সো'হম্'—এই কথাগুলি জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রমাণ করার উপনিষদ-বাক্য—

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ।
সো'য়ং নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥

জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের, ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের একাত্ম-ভাবটা যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে বলা হয়েছে সবিশদে—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তেমনই কঠোপনিষদে নচিকেতার মুখে আত্মজিজ্ঞাসুর চরম জ্ঞানলিপ্সা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথাও উপনিষদের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। উপনিষদের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য লিখেছিলেন—

'উপনিষদের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে সমগ্র মানবের প্রথম ও প্রধান কথা, আর তাহা হইতেছে তাহার আত্মাকে বা নিজেকে লইয়া। এই আমি আছি, ইহার পর আর থাকিব না, এই চিন্তা সে সহিতে পারে না।

সে চায়—যে প্রকারে হউক, তাহাকে থাকিতেই হইবে। দুঃখের, অশান্তির তো তাহার ইয়ত্তা নাই। কিরূপে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? পরম সম্পদ, পরম আনন্দ, পরম শান্তি কি পাওয়া যায়? আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা এইসব বিষয়ে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ উপনিষদগুলিরই মধ্যে পাওয়া যায়।'

[বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক নং ২০;
ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৬.২ খণ্ড;
বিধুশেখর ভট্টাচার্য, উপনিষদ, পৃ. ১২-১৩]

□ উপনিষদের বিদ্যাকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—পরা এবং অপরা। পরা অর্থ উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং অপরা হল নিকৃষ্ট বিদ্যা। ঋগ্‌বেদ ইত্যাদি গ্রন্থে ফলের আশা নিয়ে বিরাট যাজ্ঞিক কর্ম করার যে প্রচার হয়েছিল সেটাকে অপরা বিদ্যা বলা হয়েছে এবং অপরা বিদ্যার সামগ্রিক নিন্দা ভেসে এসেছে উপনিষদ-সার ভগবদ্‌গীতায়—

* ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
* যামিমাং পুষ্পিতা বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥

উপনিষদ পরা বিদ্যার কথা বলে। জাগতিক ভোগ্যবস্তু লাভের জন্য যেসব ক্রিয়াকর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, সেখানে ঔপনিষদিক জ্ঞানের কোনো তাৎপর্য্য নেই। আত্মবিদ্যা তথা ব্রহ্মবিদ্যাই সমস্ত

উপনিষদের আলোচ্য বস্তু। শুক্লযজুর্বেদের সঙ্গে সংযুক্ত একমাত্র সংহিতোপনিষদ ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই বলা হচ্ছে—এই ধনধান্যে ভরা জগৎ দেখতে পাই আমরা, এটা প্রকৃত সত্য নয়। আকাশের মতো সর্বব্যাপী ব্রহ্ম এই জগতের ভিতর-বাহির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সোনার একটি অলঙ্কারের ভিতরে-বাইরে যেমন সোনা ছাড়া আর কিছু নেই, তেমনই ব্রহ্ম ছাড়া এই জাগতিক পদার্থেরও কোনো অস্তিত্ব নেই। আত্মা এবং ব্রহ্ম এক। তাই সর্বভূতের মধ্যে আপন আত্মাকে দেখা এবং আত্মার মধ্যে সমস্ত ভূতবর্গকে দেখাটাই ঔপনিষদিক বিদ্যার সবচেয়ে বড়ো উপলব্ধি। এই ঈশোপনিষদেরই দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে—যাঁরা আত্মজ্ঞানে অক্ষম এবং নানা ভোগের অভিলাষী, তাঁরা যাবজ্জীবন বেদাদি শাস্ত্রবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মগুলি করবেন। আত্মবিদ্যা কী এবং কেনই বা আত্মবিদ্যাই একমাত্র আলোচ্য এবং উপাস্য বিষয় হওয়া উচিত, তার বিশদ আলোচনা বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎসুজাত-সংবাদে ওই একই কথা আছে অন্যভাবে। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী স্বামীর দেওয়া ভোগ-সুখের অধিকার প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—যাতে আমি অমৃতা হতে পারবো না, সেটা নিয়ে আমি কী করবো—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করেছিলেন উপনিষদের মর্ম উদ্ধার করে। একইভাবে নারদের কাছে সনৎসুজাত বলেছেন—ভূমার মধ্যেই সুখ, অল্পের মধ্যে কোনো সুখ নেই, ভূমাকেই জানতে হবে—

যো বৈ ভূমা তৎসুখং,
নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্,
ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।

সনৎসুজাত বললেন—সেটাই প্রভূত এবং ভূমা, মানুষ যেখানে অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না এবং অন্য কিছু জানে না। আর যেখানে অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শোনে, অন্য কিছু জানে, সেটাই অল্প। যেটা, ভূমা, সেটাই অমৃত, আর যেটা অল্প, সেটাই জাগতিক—

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি
নান্যদ্‌বিজানাতি স ভূমা,
অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যচ্ছৃণোতি
অন্যাদ্‌বিজানাতি তদল্পং;
যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্।

মুণ্ডক উপনিষদ আরও সহজ করে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করে বলেছে—অমৃতই ব্রহ্ম। সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে, উত্তরে, ওপরে-নীচে সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে আছে ব্রহ্ম। এই বিশাল-বিস্তীর্ণ বিশ্বই ব্রহ্ম—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম/
পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

কেনোপনিষদে বলা হয়েছে—যিনি কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাকেরও বাক্, প্রাণেরও প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু, তিনিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের যে শক্তিকে আমরা শক্তি বলে মনে করি, সেটাকে কোনো শক্তিই বলা যায় না। যা থেকে এই সব শক্তির উদ্ভব, সেই শক্তিই ব্রহ্ম।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

উপনিষদের বিচিত্র আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কর্মফলবাদ, জন্মান্তরবাদ থেকে তৈত্তিরীয় উপনিষদের নীতি-উপদেশও আছে। কিন্তু সমস্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণের মূল এবং শেষ তাৎপর্য্য হল আত্মানুসন্ধান। *[ভগবদ্‌গীতা ২.৪২-৪৫; ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ২.৪.৩-৫; ৭.২৪.১, ২৫.১; বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৩.৮.৮-১০; মুণ্ডকোপনিষদ্ (দুর্গাচরণ), ২.২.১১-১২; কেনোপনিষদ (দুর্গাচরণ) ১.২-৮; পঠিতব্য: Paul Deussen, The Philosophy of the Upanishads, New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1979 (1906); কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য, উপনিষদের উপদেশ, ১ম-৩য় খণ্ড, কলকাতা ১৯০৬-১৯১০; অনির্বাণ বেদমীমাংসা, খণ্ড ১, পৃ. ১১৪-২৫৫]*

উপপ্লব্য মহাভারতে উল্লিখিত একটি নগরী। মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানীর কাছেই এটির অবস্থান। নগরীটি উপপ্লব নামেও পরিচিত। বারো বছরের বনবাস এবং বিরাট রাজার রাজ্যে এক বছরের অজ্ঞাতবাস শেষে পাণ্ডবরা বিরাটের শাসনাধীন উপপ্লব্য

নগরীতে আসেন এবং এখানেই অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাটরাজার কন্যা উত্তরার বিবাহ হয়। এই বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাণ্ডবদের সমস্ত বন্ধু ও শুভকাঙ্ক্ষীরা একই সঙ্গে উপপ্লব্যে মিলিত হন। এরা হলেন—কৃষ্ণের নেতৃত্বে বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজ বংশীয় রাজারা, কাশীরাজ, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর বীর পুত্ররা এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি। আসলে উপপ্লব্যই সেই স্থান যেখানে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহকে কেন্দ্র করে পাণ্ডবরা যুদ্ধে অথবা বিনাযুদ্ধে তাঁদের অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করেছিলেন। মনে রাখা দরকার, দীর্ঘ তেরো বছরের বিচ্ছেদ শেষে এখানেই পাণ্ডবরা প্রথমবারের মতো তাঁদের বন্ধু ও পরিজনদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মিলিত হন। ফলে উপপ্লব্যেই রাজ্য পুনরুদ্ধারের কৌশল ঠিক হওয়া খুব স্বাভাবিক। উপপ্লব্য নগরীটি অবস্থানগত কারণেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। সম্ভবত এটি বিরাট রাজ্যের রাজধানীর অদূরে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি উপনগরী (Satellite Township) কারণ উদ্যোগ পর্বে আমরা জানতে পারছি যে, পাণ্ডবরা যে সময় থেকে উপপ্লব্যে বসবাস শুরু করেন, তখন থেকেই এই নগরীর অধিবাসীরা শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয় এবং খুশিও হয়ে ওঠে পাণ্ডবদের সুরক্ষায়—

নোদ্বিগ্নাঃ পরচক্রাণাং ব্যবসনানাম্।

আমাদের ধারণা—এই শত্রু বোধহয় কুরুরাজাই, কেননা হস্তিনাপুরের উত্তর সীমানাতেই বিরাট-রাজ্যের অবস্থিতি, ঠিক যেমন এখনকার দিল্লীর প্রান্তেই রাজস্থানের জয়পুর। হয়তো বা সীমান্ত সংঘাত লেগে থাকত বলে পাণ্ডবরা আসায় খুশি এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল জনপদবাসীরা। সেই খুশিতেই কৃষ্ণ যখন শান্তিদৌত্যের জন্য উপপ্লব্য থেকে হস্তিনাপুরে যাচ্ছিলেন, তখন নগরীর অধিবাসীরা তাঁর দর্শনের জন্য নির্ভয়ে উপপ্লব্যের পথের মধ্যেই একত্রিত হয়—

উপপ্লব্যাদথাগম্য জনাঃ পুরনিকসিনঃ।
পথ্যাতিষ্ঠংস্তঃ সহিতা বিষ্বক্‌সেনাদিদৃক্ষয়া॥

এই তথ্য থেকে একটি বিষয় মনে হয় যে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার জন্য উপপ্লব্য হয়তো বহুবার কৌরবদের দ্বারা আক্রান্ত হত। নগরীতে পাণ্ডবদের উপস্থিতিই অধিবাসীদের মন থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় দূর করে নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। শান্তিদৌত্যে ব্যর্থ হওয়ার পর বাসুদেব কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে উপপ্লব্যে ফিরে এসে পাণ্ডবদের জানান যে, দুর্যোধন এবং তাঁর অন্যান্য মন্ত্রণাদানকারীরা যুদ্ধ এড়ানোর যাবতীয় প্রস্তাব ও সম্ভাবনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনিবার্য্য। আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে উপপ্লব্যের গুরুত্ব অনেক কারণ, পাণ্ডবরা এই নগরীটিকে একাধারে যুদ্ধশিবির (War camp) এবং রসদ সরবরাহকারী স্থান (Supply Line) রূপে ব্যবহার করেছিলেন। বিরাট রাজার রাজধানীর সঙ্গে উপপ্লব্যের নৈকট্য আবার একই সঙ্গে সীমান্তবর্তী অবস্থান এবং কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে প্রায় সমদূরত্ব একে কৌশলগতভাবে বিশেষ মাত্রা দান করে। পাণ্ডবরা রণসাজে সজ্জিত হয়ে উপপ্লব্য থেকেই কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে পাঠিয়ে বিদায় জানিয়ে দ্রৌপদী ও অনান্য স্ত্রীলোকেরা আবার উপপ্লব্যেই ফিরে এসেছিলেন বলে জানা যায়। উদ্যোগ পর্ব থেকে এও জানা যায় যে, পাণ্ডবরা যুদ্ধযাত্রার পূর্বে প্রচুর সৈন্য নিয়োগ করে উপপ্লব্যকে এমনভাবে সুরক্ষিত করেছিলেন, যাতে তাঁদের অনুপস্থিতিতেও বংশের স্ত্রীলোক এবং ধন সম্পত্তি নিরাপদ থাকে। এই সূত্রেই আরও জানা যায় যে, উপপ্লব্য নগরীতে একাধিক দুর্গ ছিল এবং সমগ্র নগরীটি প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত ছিল—

উপপ্লব্যে তু পাঞ্চালী দ্রৌপদী সত্যবাদিনী।
সহ স্ত্রীভির্নিববৃতে দাসীদাসসমাবৃতা॥
কৃত্বা মূলপ্রতীকারং গুল্মৈঃ স্থাবরজঙ্গমৈঃ।
স্কন্ধাবারেণ মহতা প্রযযুঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ॥

ফলে বলাই যেতে পারে যে, উপপ্লব্য একটি দুর্গনগরীই ছিল, যাকে পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় একটি নিরাপদ শিবির রূপে ব্যবহার করেছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে উপপ্লব্যে এসে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ জয়ের একটি কৌশলগত ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন, যেখানে ধর্ম থাকে সেখানেই বাসুদেব কৃষ্ণের অবস্থান। আর যেখানে কৃষ্ণ অবস্থান করেন সেখানে জয় নিশ্চিত—

উপপ্লব্যে মহর্ষির্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়নো'ব্রবীৎ।
যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥

আরও একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপপ্লব্যের কথা মহাভারতের সমগ্র আখ্যানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসযজ্ঞের ফলে কুরুবংশ প্রায় লোপ পেতে বসলেও অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে কুরুকুলের উত্তরাধিকারী পরীক্ষিতের জন্ম হয়। সৌপ্তিক পর্বে বাসুদেব কৃষ্ণের মুখে জানা যায় যে, কোনো এক সদাচারী ব্রাহ্মণ উপপ্লব্যেই উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের জন্মগ্রহণের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপপ্লব্যের ব্রাহ্মণের সেই ভবিষ্যৎবাণী পরবর্তী কালে সত্যি হয়েছিল—অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রভাব এড়িয়েও কুরুকুলরক্ষক পরীক্ষিৎ জন্ম নেন।

[মহা (k) ১.২.২১৮; ১.২.২২০; ৪.৭২.১৪; ৫.৮.২৫; ৫.২৩.১; ৫.৮৪.১৮; ৫.৮৬.১; ৫.১৩৭.৩২; ৫.১৪৪.৪; ৫.১৪৭.১; ৫.১৫১.৬০-৬১; ৭.৮৫.২১; ৯.৩৫.৫; ৯.৩৫.৮; ৯.৬২.৩১; ১০.১১.৫; ১০.১১.১২; ১০.১৬.২; ১১.২৫.৩৪; (হরি) ১.২.২৩৭; ১.২.২৩৯; ৪.৬৭.১৪; ৫.৮.২৫; ৫.২৩.১; ৫.৭৮.১৮; ৫.৮৮.১; ৫.১২৮.৩২; ৫.১৩৫.৪; ৫.১৩৭.১; ৫.১৪১.৬০-৬১;৭.৭৪.২১; ৯.৩৩.৫; ৯.৩৩.৭; ৯.৫৮.৩১; ১০.১২.৪; ১০.১১.১২; ১০.১৬.২; ১১.২৫.৩৪]

☐ উপপ্লব্যের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। যদিও এ সম্পর্কে খুব নির্দিষ্ট করে কিছু বলা না গেলেও সকলেই একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে, প্রাচীন উপপ্লব্য, রাজস্থান ও হরিয়ানার সীমান্ত বরাবর অবস্থিত ছিল। অনেকে আবার উপপ্লব্যকেই মৎস্যদেশের রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ধারণাটি সম্ভবত ঠিক নয়, কারণ প্রাচীন মৎস্যদেশের রাজধানীর নাম ছিল বিরাট পত্তন বা বিরাটনগর। তবে উপপ্লব্যের সঙ্গে হস্তিনাপুরের নৈকট্যের প্রমাণ মহাভারতেই পাওয়া যায়। কারণ বাসুদেব কৃষ্ণ শান্তিদৌত্যের সময় দুইদিনের মধ্যে উপপ্লব্য থেকে হস্তিনাপুরে এসে পৌঁছে ছিলেন।

[Source Materials of Kumauni History; N. Mishra; p. 9]

উপবর্হন ক্রৌঞ্চ দ্বীপের সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে একটি। *[ভাগবত পু. ৫.২০.২১]*

প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করেন। এই বর্ষগুলির মধ্যে সাতটি পর্বত আছে। উপবর্হন এই পর্বতগুলির মধ্যে একটি। এই পর্বতটি সুধামক বর্ষে অবস্থিত বলে দেবীভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে।

[দেবীভাগবত পু. ৮.১৩.৯]

উপবর্হিণ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষপর্বতের মধ্যে একটি।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ৫.২০.২১]

উপবাহ্যকা যদুবংশীয় ভজমানের কন্যা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.৩]

উপবিম্ব বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে বসুদেবের ঔরসে ভদ্রার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন উপবিম্ব। *[বায়ু পু. ৯৬.১৭১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭৩]*

উপবেদ শুক্রনীতিসার মতে, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ এবং তন্ত্র—এই চারটি শাস্ত্রকে উপবেদ বলা হয়—

ঋগ্ যজুঃ সাম চাথর্বা বেদা আয়ুর্ধনুঃ ক্রমাৎ।
গান্ধর্বশ্চৈব তন্ত্রাপি উপবেদাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

তবে ভাগবত পুরাণ মতে চারটি উপবেদ হল—আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ এবং স্থাপত্যবেদ—

আয়ুর্বেদং ধনুর্বেদং গান্ধর্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যঞ্চাসৃজদ্ বেদং ক্রমাৎ পূর্বাদিভির্মুখৈঃ॥

ভাগবত পুরাণ মতে সৃষ্টির আদিতে চতুর্বেদের সঙ্গে সঙ্গে এই চারটি গ্রন্থও ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত বেদ-পরবর্তী যুগে বিশেষ বিশেষ যেসব শাস্ত্র বিশাল মর্য্যাদা লাভ করেছে, সেগুলিকে প্রায় বেদবৎ শ্রদ্ধা জানিয়ে উপবেদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নাট্যবেদ বা আয়ুর্বেদ এমনই মর্য্যাদার উদাহরণ।

[ভাগবত পু. ৩.১২.৩৮; শুক্রনীতিসার ৪.৩.২৭]

☐ মহাভারতের সভাপর্বে ব্রহ্মার সভা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, উপবেদগুলিও দেবমূর্তি ধারণ করে ব্রহ্মার সভায় অবস্থান করেন।

[মহা (k) ২.১১.৩৩; (হরি) ২.১১.৩২]

☐ ত্রিপুর দহনের আগে মহাদেবের জন্য যে সর্বদেবময় রথ নির্মিত হয়েছিল, উপবেদগুলি

সেই সময় রথের ঘোড়ার লাগাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ৭.২০২.৭৫; (হরি) ৭.১৭০.৬৭]

উপবেণা পবিত্র অগ্নি সৃষ্টিকারী একটি নদী।

[মহা (k) ৩.২২২.২৪; (হরি) ৩.১৮৫.২৪]

উপমঙ্গু বৃষ্ণি বংশীয় শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। ইনি অক্রূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। *[বায়ু পু. ৯৬.১১০]*

ইনিই বিষ্ণু পুরাণে উপমদ্গু নামে চিহ্নিত হয়েছেন। *[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.২]*

উপমন্যু$_1$ মহর্ষি আপোদধৌম্যের শিষ্য। গুরুভক্তি এবং নির্বিচারে গুরুবাক্য-পালনের জন্য বিখ্যাত।

অধ্যাপক আপোদধৌম্য একদিন উপমন্যুকে তাঁর গোরুগুলিকে রক্ষা করা এবং চরানোর আদেশ দিলেন। উপমন্যু গোরু চরান আর সন্ধ্যাবেলায় এসে গুরুকে প্রণাম করেন। গুরু তাঁকে যথেষ্ট স্থূলদেহ দেখে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ কর? তোমাকে যথেষ্ট মোটা দেখাচ্ছে! উপমন্যু বললেন যে, তিনি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। গুরু বললেন যে, ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে না দিয়ে তাঁর ভোজন করা উচিত নয়।

তারপর থেকে উপমন্যু ভিক্ষা করে এনে সবটাই গুরুর কাছে নিবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু গুরু তাঁকে ভোজনের একটুও ফেরত দিতেন না। উপমন্যু প্রতিদিন গোরু চরান, ভিক্ষা করেন এবং ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তু গুরুকে দান করেন। হৃষ্টপুষ্ট উপমন্যুকে দেখে গুরু আবার একদিন তাঁকে বললেন—তুমি তো এখনও যথেষ্ট মোটা হচ্ছো? তা কী দিয়ে জীবিকা নির্বাহ কর? তোমার ভিক্ষালব্ধ বস্তুও তো সব আমিই গ্রহণ করি। তাহলে কী কর তুমি? উপমন্যু বললেন—তিনি গুরুর কাছে ভিক্ষা নিবেদন করে গিয়ে আবারও ভিক্ষা করেন। গুরু বললেন—এই অতিরিক্ত উপার্জন ঠিক নয়, এতে অন্য ভিক্ষাজীবি ব্যক্তিদের জীবিকার ব্যাঘাত ঘটে।

উপমন্যু কথা দিলেন যে, তিনি আর দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করবেন না। উপমন্যু পূর্বের মতো চলতে থাকলে গুরু আবার একদিন তাকে বললেন—তোমার ভিক্ষার সবটাই তো আমিই নিয়ে নিই। তুমি দ্বিতীয়বারও ভিক্ষা কর না। তবু তোমাকে এত স্থূল দেখাচ্ছে কেন। তুমি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ কর? উপমন্যু বললেন—আমি গো-রক্ষা করি এবং সেই গোরুগুলির দুধ খেয়েই আমার দিন চলে। গুরু বললেন—আমি তো তোমাকে দুধ খাবার অনুমতি দিইনি।

সেই থেকে উপমন্যু আর দুধও খান না। কিন্তু কিছুদিন পরেই গুরু তাঁকে আবারও তাঁর স্থূলদেহের কথা তুলে একই প্রশ্ন করলেন। উপমন্যু বললেন—বাছুরগুলি দুধ খাবার সময় যে ফেনা উদ্গিরণ করে আমি তাই খেয়ে জীবনধারণ করি। গুরু বললেন—আসলে বাছুরগুলি খুবই দয়ালু এবং তোমার প্রতি করুণায় তারা বেশি-বেশি ফেনা উদ্গিরণ করে। এতে বাছুরগুলোর খাওয়া কম হয়। তুমি এইভাবে বাছুরগুলোকে বঞ্চিত করতে পার না।

এইভাবে গুরুর দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে উপমন্যুর সব কিছুই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থায় বনের মধ্যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে একদিন উপমন্যু আকন্দের পাতা খেয়ে ফেললেন। সে পাতা কোনোভাবে স্বাদু তো নয়ই, খাবার সময়ে তা পেটে জ্বালা তৈরি করে। সেই পাতার রস খেয়ে উপমন্যুর চক্ষু-পীড়া হল এবং তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। অন্ধ অবস্থায় চলতে গিয়ে উপমন্যু এক মজা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেলেন।

এদিকে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। উপমন্যু আশ্রমে ফিরলেন না। অধ্যাপক আপোদধৌম্য তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে শিষ্যদের নিয়ে বনের মধ্যে খুঁজতে গেলেন উপমন্যুকে। বনের মধ্যে উপমন্যুর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এক সময় তাঁর সাড়া মিলল। কুয়োর মধ্যে থেকেই সে তার ক্ষুধার্ত অবস্থায় আকন্দ পাতা খাওয়ার কথা এবং অন্ধ হয়ে কুয়োর পড়ে যাবার ঘটনা গুরুকে জানাল। গুরু তখন তাঁকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করতে বললেন এবং বললেন যে, ওই দেবতাই তাঁর চক্ষু ফিরিয়ে দেবেন।

উপমন্যু অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করতে লাগলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বেদোক্ত গুণাবলী স্মরণ করে। বৈদিক এবং লৌকিক বাক্যে অশ্বিনীকুমারের স্তব শেষ হবার পর অশ্বিনীকুমারদ্বয় পরম সন্তুষ্ট হয়ে সেখানে এলেন এবং তাঁর হাতে একটি পিষ্টক (পিঠে জাতীয় জিনিস) দিয়ে বললেন—তুমি এই পিষ্টক ভক্ষণ

কর। উপমন্যু বললেন—আমি তো গুরুকে না দিয়ে এই পিষ্টক ভক্ষণ করতে পারব না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন—পূর্বে তোমার অধ্যাপকও আমাদের এইভাবেই স্তব করেছিলেন। তাঁকেও আমরা এইরকমই একটি পিষ্টক দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো গুরুকে না দিয়েই সেটা ভক্ষণ করেছিলেন। তুমিও তেমনই কর। উপমন্যু স্বীকৃত হলেন না। গুরুকে নিবেদন না করে তিনি দেবতার দেওয়া পিষ্টক কিছুতেই ভক্ষণ করতে রাজী হলেন না।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপমন্যুর গুরুভক্তিতে অত্যন্ত সুখী হয়ে বললেন—তোমার গুরুর দন্তগুলি হবে লোহার মতো কালো আর তোমার দন্তগুলি হবে সোনার মতো। তোমার চোখও ঠিক হয়ে যাবে এবং অশেষ মঙ্গল লাভ হবে। চক্ষুলাভ করে উপমন্যু অধ্যাপক আপোদধৌম্যের কাছে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন এবং গুরুর আশীর্বাদে সমস্ত বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রে তিনি অত্যন্ত কুশল হয়ে উঠলেন।

[মহা (k) ১.৩.৩৩-৭৭; (হরি) ১.৩.৩৬-৮১]

উপমন্যু$_{২}$ মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র বসু। বসুর পুত্র উপমন্যু। মহর্ষি উপমন্যুকে পুরাণে বেদজ্ঞ, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপমন্যু ঋষির বংশধররা ঔপমন্যব নামে খ্যাত। *[বায়ু পু. ৭০.৮৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.৩, ১৫; ২.৮.৯৮]*

উপমন্যু$_{৩}$ বারাণসীতে অবস্থিত তীর্থস্থান।

[দ্র. কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৯৭]

উপমন্যু$_{৪}$ বীতমন্যু নামে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঔরসে আত্রেয়ীর গর্ভজাত পুত্র। দারিদ্র্যের কারণে তাঁর বাবা মা তাঁকে দুধ খাওয়াতে পারতেন না। পরিবর্তে পিটুলি গোলাকেই দুধ বলে খাওয়াতেন। দুধ কেমন খেতে হয় বালক উপমন্যু তা জানতেন না ফলে বিনা প্রতিবাদে দুধের বদলে পিটুলি গোলা পান করতেন। একদিন অন্য এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপমন্যু নিমন্ত্রণে গেলেন। সেখানে অন্যান্য আহার্য্যের সঙ্গে দুধও ছিল। বালক উপমন্যু আসল দুধের স্বাদ সেদিন জানতে পারলেন। পরদিন তাঁর মা তাঁকে পিটুলি গোলা খেতে দিলে উপমন্যু আসল দুধের জন্য কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁর মা তাঁকে বললেন—বাছা! ভগবান মহাদেবের আরাধনা কর, তাঁর আশীর্বাদে মানুষ শুধু দুধ নয়, অমৃত পানের অধিকারও লাভ করে। মায়ের উপদেশে উপমন্যু মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত মহাদেবের বরে উপমন্যুর দরিদ্রতা দূর হল, তিনি দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু ভোজনের অধিকারী হলেন। উপমন্যুর এই কাহিনী সে যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে চিত্রই উন্মোচন করুক, এই কাহিনীর মধ্যে মহাভারতের দ্রোণ-অশ্বত্থামার জীবন-ছায়া আছে। *[বামন পু. ৮২ অধ্যায়]*

□ মহাভারতে উপমন্যুর এই কাহিনীটিই আরও একটু বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় এখানে উপমন্যুর পরিচয় দেওয়া হয়েছে বৈয়াঘ্রপদ্য উপমন্যু বলে। উপমন্যু ঋষি নিজেই জানিয়েছেন যে, সত্যযুগে ব্যাঘ্রপাদ নামে যে ঋষি ছিলেন, ইনি তাঁর বংশধর। একসময় কৃষ্ণ পরম শিবভক্ত ঋষি উপমন্যুর আশ্রমে যান এবং শিব-মহাদেব কিভাবে প্রসন্ন হন, কিভাবে তাঁর কাছ থেকে অভীষ্ট বর লাভ করা যায়—তা জিজ্ঞাসা করেন। উপমন্যুও কৃষ্ণকে এ বিষয়ে উপদেশ দেন। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি তণ্ডীর দ্বারা সংকলিত শিবসহস্রনাম স্তোত্রটিও তিনি কৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন। *[মহা (k) ১৩.১৪-১৮ অধ্যায়; (হরি) ১৩.১৩-১৭ অধ্যায়]*

উপমন্যুতীর্থ বারাণসীতে অবস্থিত তীর্থস্থান।

[দ্র. কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৯৭]

উপমায় ভণ্ডাসুরের পুত্র। ইনি ভণ্ডাসুরের অন্যতম সেনাপতিও ছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২১.৮৪; ৩.২৬.৪৯]

উপযাজ একজন ঋষি। মহর্ষি যাজ এবং উপযাজ দুই ভাই ছিলেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণহন্তা পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করলে এঁরা সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন। *[দ্র. যাজ]*

[মহা (k) ১.১৬৭.১০-৩২; (হরি) ১.১৬০.১০-৩২]

উপয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা শ্বেত-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে উপয় অন্যতম। *[মৎস্য পু. ২০১.৩৬]*

উপরিচরবসু ইনি পুরুবংশীয় রাজা অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষের বংশধর চেদিরাজ কৃতকের পুত্র। তাঁর প্রকৃত নাম বসু, পরবর্তীকালে তিনি উপরিচর নামে খ্যাত হন। মৎস্যপুরাণে রাজা উপরিচরবসু বা খচরবসুকে উত্তানপাদের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজা বসু তপোবনে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁর তপস্যায় উদ্বিগ্ন দেবতারা চিন্তা করলেন—রাজা নিশ্চয় ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য এমন কঠোর তপস্যা করছেন। তখন দেবতারা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করেন এবং রাজধর্ম পালন করার পরামর্শ দেন। দেবরাজ ইন্দ্র, বসু রাজার সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় বসু রাজার রাজত্বকালে চেদিদেশ ঐশ্বর্য্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। উপরন্তু দেবরাজ তাঁকে আকাশচর বিমান উপহার দেন। যুদ্ধে সর্বদা বসু রাজাকে রক্ষা করবে এবং তাঁর জয় সূচনা করবে, এমন এক উৎকৃষ্ট বৈজয়ন্তী মালা এবং ইন্দ্রধ্বজও বসুরাজকে দান করলেন ইন্দ্র। আনন্দিত বসুরাজ রাজধানীতে ফিরে এসে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে মহাসমারোহে ইন্দ্রের পূজা ও যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তাঁর দ্বারা প্রচলিত এই ইন্দ্রপূজা ও উৎসব ইন্দ্রোৎসব নামে মর্ত্যলোকে খ্যাত হয়। ইন্দ্র এই পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং সপরিবারে চেদিরাজ বসুর যজ্ঞে উপস্থিত হন এবং নানাভাবে তাঁর তৃপ্তি বিধান করেন।

রাজা বসু ইন্দ্রপ্রদত্ত দিব্যবিমানে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ পরিবৃত হয়ে বাস করতেন। আকাশে (উপরি) বিচরণ করতেন বলেই তিনি উপরিচরবসু নামে বিখ্যাত হন। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে বলা হয়েছে যে, রাজা উপরিচর যখন অদ্রিকা নামে এক অপ্সরার সঙ্গে সেই দিব্য বিমানে অবস্থান করছিলেন, তখন পিতৃস্নেহ বঞ্চিত দেবকন্যা অচ্ছোদা তাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করেন। এই অচ্ছোদাই পরে উপরিচর রাজার কন্যা সত্যবতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। *[মহা (k) ১.৬৩.১-৩৫; (হরি) ১.৫৮.১-৪৮; ৯২-১০৪]*

☐ একবার রাজা উপরিচর পিতৃপুরুষগণের আদেশে মৃগয়ায় গেলেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল রাজ অন্তঃপুরে—প্রিয়তমা মহিষী গিরিকার কাছে। মৃগয়া করতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেও রাজা ক্রমাগত পত্নীকেই চিন্তা করতে লাগলেন। ফলে সেই গভীর অরণ্যেই তাঁর শুক্র ক্ষরিত হল। আমার শুক্র নিষ্ফল না হয়—একথা ভেবে উপরিরবসু সযত্নে তা বৃক্ষপত্রে ধারণ করলেন এবং এক শ্যেনপক্ষীর মাধ্যমে রাজপুরীতে রাজমহিষীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শ্যেন পক্ষীর ঠোঁট থেকে স্খলিত বীর্য্য পতিত হল যমুনা-নদীর জলে। সেই সময় অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা কোনো এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে মৎস্যরূপ ধারণ করে যমুনার জলে বাস করছিলেন। তিনি সেই শুক্র পান করে গর্ভবতী হলেন। দশ মাস পরে সেই মৎস্যরূপী অপ্সরা যমুনা নদী তীরে বসবাসকারী ধীবরগণের জালে আবদ্ধ হলেন। মাছের পেটের ভিতর জেলেরা একটি পুত্র এবং একটি কন্যাসন্তান দেখতে পেল। এই অভিনব ব্যাপার দেখে তারা শিশুদুটিকে রাজা উপরিচরবসুর সভায় নিয়ে গেল। রাজা পুত্রসন্তানটিকে গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হল মৎস্য। পরবর্তী কালে তিনি বিখ্যাত রাজা হন এবং তাঁর নামেই প্রাচীন মৎস্য দেশের প্রতিষ্ঠা। কন্যাসন্তানটি দাসরাজের গৃহে প্রতিপালিত হতে লাগল। তাঁর নাম *সত্যবতী*। *[দ্র. সত্যবতী]*

☐ রাজা উপরিচরবসুর মোট সাতটি পুত্র ছিল। বসু রাজা তাঁর পুত্রদের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং এই কীর্তিমান পুত্রেরা নিজ নিজ নাম অনুসারে দেশ ও নগর স্থাপন করেন এবং তাঁদের দ্বারা সে সকল রাজবংশের সৃষ্টি হয় তার প্রত্যেকটিই ভারতবর্ষে বিখ্যাত ছিল। বসু রাজার পুত্র বৃহদ্রথ মগধ দেশে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি বিখ্যাত মগধরাজ জরাসন্ধের পিতা। অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে প্রত্যগ্রহ (বা পত্যগ্র), কুশাম্ব বা মণিবাহন, মাবেল্ল, মৎস্য এবং যদুই প্রধান।

[মহা (k) ১.৬৩.৩০-৩৩; (হরি) ১.৫৮.৪৪-৪৬; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৯]

☐ রাজা উপরিচরবসু শ্রীহরি বিষ্ণুর পরমভক্ত ছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে। তিনি একসময় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং সেই যজ্ঞে বৃহস্পতি স্বয়ং তাঁর পুরোহিত ছিলেন। উপরিচরবসুর ভক্তিপূর্ণ আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে নারায়ণ স্বয়ং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হন এবং সকলের

কাছে অদৃশ্য থাকলেও নিজের পরম ভক্ত উপরিচর রাজাকে দর্শন দান করেন।

[মহা (k) ১২.৩৩৬.৫-১৩;
(হরি) ১২.৩২২.৫-১৩]

☐ একবার দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যলোকে উপস্থিত হয়ে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেখানে রাজা উপরিচরও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞে পশুবলি প্রসঙ্গে দেবতা ও দেবগুরু বৃহস্পতির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। দেবতারা পশুবলির পক্ষে এবং বৃহস্পতি প্রমুখ পুরোহিতেরা বিপক্ষে তর্ক করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ন্যায়পরায়ণ রাজা উপরিচরকে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য অনুরোধ করলেন। রাজা দেবগণের পক্ষে মতপ্রকাশ করলে ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তুমি যখন দেবতাদের পক্ষ নিয়ে অহিংসা-পোষক বেদবাক্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে, এখন তুমি আর আকাশমার্গে ভ্রমণের অধিকারী থাকবে না। তুমি এখন থেকে পাতালে বাস করবে। রাজা উপরিচর এই অভিশাপের ফলে পাতালবাসী হলেন। কিন্তু পাতালে বসেই তিনি নিরন্তর ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে নারায়ণ গরুড়কে বললেন—তুমি এখনই গিয়ে আমার ভক্ত এই রাজাকে পুনরায় আকাশে উঠিয়ে আনো। গরুড় সেই কাজ সম্পন্ন করলে রাজা উপরিচর শাপমুক্ত হলেন এবং সশরীরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হলেন। মৎস্যপুরাণেও যজ্ঞে পশুবলির ঔচিত্য বিষয়ক এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। সেখানে রাজা উপরিচরবসুকে 'খচরবসু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩৩৭.৬-৪১; (হরি) ১২.৩২৩.৩-৪২;
মৎস্য পু. ১৪৩.১৭, ১৯-৩৬]

☐ মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায়—যেসব রাজর্ষি যমের সভায় পারিষদরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজা উপরিচরবসু অন্যতম।

[মহা (k) ২.৮.২০; (হরি) ২.৮.২০]

উপরিবাহ্যক বা উপবাহ্যক বায়ু পুরাণ অনুযায়ী যদু বংশধারায় রাজা ভজমানের ঔরসে সৃঞ্জয়ীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে উপরিবাহ্যক বা উপবাহ্যক একজন। *[বায়ু পু. ৯৬.৩]*

☐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটি পাঠে উপবাহ্যককে বলা হয়েছে উপবাহ্যকা এবং উল্লেখ আছে তিনি ভজমানের কন্যা। তবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এই পাঠটিতে ত্রুটি আছে বলে মনে হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.৩]

উপরিমণ্ডল যেসব ঋষিবংশের নাম পুরাণে ভার্গব গোত্রকার হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি উপরিমণ্ডলের বংশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি উপরিমণ্ডল বংশ অথবা শিষ্য পরম্পরায় ভৃগুবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২৫]

উপলপ মৎস্য পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উপলপের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক।

[মৎস্য পু. ২০০.৯]

উপলম্ভ অক্রূরের ঔরসে শৈব্য কন্যা রত্নার গর্ভে যে এগারোটি পুত্রসন্তান হয় উপলম্ভ তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। *[মৎস্য পু. ৪৫.২৯]*

উপশান্ত শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ভারতকৌমুদী টীকায় 'উপশান্ত' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

উপশান্তঃ নিবৃত্তক্রোধঃ।

রুদ্র শিব সহজেই ক্রুদ্ধ হন কিন্তু অতি অল্প চেষ্টাতেই তাঁর ক্রোধ শান্ত, নিবৃত্ত হয়। এই কারণে তিনি উপশান্ত নামে খ্যাত।

উপ শব্দের একটি অর্থ হতে পারে সান্নিধ্যে বা কাছে। যাঁর সান্নিধ্য লাভ করলে শান্ত হওয়া যায়—এই অর্থেও মহাদেব উপশান্ত নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৭; (হরি) ১৩.১৬.১০৭]

উপশান্তশিবতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৫২;
লিঙ্গ পু. ১.৯২.১০৭]

উপপ্রকৃতি একজন দেবী। বৃত্রাসুরকে বধ করার ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব ত্যাগ করে এক অজ্ঞাত স্থানে তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলেন। কিন্তু স্বর্গে ইন্দ্রপদ শূন্য রাখা সম্ভব নয়—তাই দেবতারা মর্ত্যের চন্দ্রবংশীয় ধর্মাত্মা রাজর্ষি নহুষকে ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত

করলেন। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নহুষ ক্রমে অহঙ্কারী হয়ে উঠলেন এবং ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত অনাচারী হয়ে উঠলেন। একসময় তাঁর দৃষ্টি ইন্দ্রপত্নী শচীর উপর পড়ল। নহুষ শচীকে লাভ করতে চান—একথা জানতে পেরে শচী দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হলেন। বৃহস্পতি পরামর্শ দিলেন—এ অবস্থায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইন্দ্রকে খুঁজে বের করা। বৃহস্পতি শচীকে দেবী উপশ্রুতির আরাধনা করার উপদেশ দিলেন। মহাভারতে দেবী উপশ্রুতিকে দেবী রাত্রি বলা হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ দেবী উপশ্রুতিকে 'সন্দেহনির্ণায়িকা দেবী' বলে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত রাত্রি শব্দটি এখানে শুধুমাত্র রাত্রিকাল এই অর্থ বহন করে না। রাত্রি যেমন অন্ধকারের দ্যোতক, তেমনই অজানা বা অর্ধেক জানা, অর্ধেক না জানা রহস্যাবৃত তথ্যেরও দ্যোতক। দেবী উপশ্রুতি সেই অজানা রহস্যের আবরণ উন্মোচন করেন, সন্দেহ নিবারণ করেন। এই অর্থেই তাঁকে রাত্রির অর্থাৎ রহস্যের মূর্তিমতী দেবী বলা হয়েছে।

সংস্কৃত শব্দকোষ গুলিতে উপশ্রুতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

নক্তং নির্গতং যৎকিঞ্চিচ্ছুভাশুভকরং বচঃ।
শ্রূয়তে তদ্ বিদুর্বুধা দৈব প্রশ্নমুপশ্রুতিম্॥

রাত্রিতে শ্রুত শুভ অথবা অশুভ দৈবপ্রশ্নকেই অভিধানিক অর্থে উপশ্রুতি বলা হয়। দেবী উপশ্রুতি সেই রহস্যাবৃত বিষয়কেই স্পষ্ট রূপ দেন। দেবী শচীর আরাধনা এবং পতিভক্তিতে তুষ্ট হয়ে দেবী উপশ্রুতি তাঁকে সেই স্থানের সন্ধান দিয়েছিলেন যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র আত্মগোপন করেছিলেন।

[মহা (k) ৫.১৩.২৬-২৭; ৫.১৪.১-১২; ১২.৩৪২.৪৮; (হরি) ৫.১৩.২৬-২৭; ৫.১৪.১-১২; ১২.৩২৮.১৪২-১৫৪]

উপশ্লোক ভাগবত পুরাণ মতে দশম মন্বন্তরাধিপতি ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর পিতার নাম উপশ্লোক।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.২১]

উপসুন্দ *[দ্র. তিলোত্তমা]*

[দ্র. সুন্দ]

উপহারিণী পিশাচী ব্রহ্মধনার গর্ভজাত একজন ব্রহ্মরাক্ষসী। *[বায়ু পু. ৬৯.১৩৪]*

উপহূত এটি পিতৃগণের একটি বিশেষ বর্গ। সাধ্য প্রভৃতি পিতৃগণের মতোই এঁরা পূজিত হন। মূলত ক্ষত্রিয়রা 'উপহূত' পিতৃগণের উপাসনা করে থাকেন। যশোদা নামে এই পিতৃগণের এক মানসী কন্যা ছিলেন। রাজর্ষি বিশ্বমহতের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ইনি রাজর্ষি খট্টাঙ্গের মাতা ছিলেন।

[বায়ু পু. ৭৩.৩৯-৪১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৮৯-৯০]

উপাংশু-জপ 'উপাংশু' শব্দের প্রধান এবং সাধারণ অর্থ হল মন্ত্রজপের একটি বিশেষ প্রকার। আবার নির্জন অর্থেও উপাংশু-শব্দের প্রয়োগ হয় অব্যয়-শব্দ হিসেবে—

উপাংশুর্জপভেদে স্যাদ্ উপাংশু বিজনে'ব্যয়ম্।

[মেদিনীকোষ, শান্তবর্গ, ১৭, পৃ. ১৬৩]

অগ্নি পুরাণে মন্ত্রপরিভাষার মধ্যে বলা হয়েছে যে, মন্ত্র জপ চারভাবে করা যায়—উচ্চস্বরে জপ, উপাংশু জপ, জিহ্বা জপ এবং মানস জপ। এর মধ্যে উচ্চস্বরে মন্ত্র জপ করার থেকে শব্দহীন উপাংশু জপ দশগুণ ভালো বলে অগ্নি পুরাণে বলা হয়েছে—

উচ্চৈর্জপাদ্ বিশিষ্টঃ স্যাদ্ উপাংশুর্দশভির্গুণৈঃ।

উপাংশু-জপ ঠিক কীরকম সেটা স্পষ্ট করে মহাকাব্য-পুরাণে না বলা থাকলেও এই মন্ত্রজপ অনেকটা নিজের কাছে নিজে বিড়-বিড় করে অস্পষ্ট বলার মতো উচ্চারণ। সশব্দে উচ্চ-উচ্চারণের চাইতে এতে মনঃসংযোগ আরও গভীর করতে হয়, তাতে মন্ত্র আত্মস্থ হয় বেশি। হয়তো এই কারণেই মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞকর্মের চাইতে জপযজ্ঞকে দশগুণ বেশি ফলদায়ক, আবার জপযজ্ঞের চাইতে উপাংশু জপকে একশোগুণ বেশি ফলদায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

এই মনুশ্লোকে উপাংশু-শব্দটি ব্যাখ্যা করার সময় টীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখেছেন—উপাংশু হল সেইরকম জপ যা সামনে থাকলেও পরলোক শুনতে পায় না—

যৎ সমীপস্থো'পি পরো ন শৃণোতি তদুপাংশুঃ।

শব্দকল্পদ্রুমে নাম না করে একটি আগমের প্রমাণ দিয়ে বলা হয়েছে—ইষ্টদেবতার ওপর মনঃস্থির করে জিহ্বা এবং ঠোঁটের সামান্য চালনা করে শুধুমাত্র নিজের শ্রবণযোগ্য হয় এইভাবে যে মন্ত্র জপ করা হয়, তাকে বলে উপাংশু জপ—

জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্ দেবতাগতমানসঃ।
নিজশ্রবণযোগ্যঃ স্যাদ্ উপাংশু স জপঃ স্মৃতঃ॥

[অগ্নি পু. ২৯৩.২৮, পৃ. ৫৫৮;
মনুসংহিতা ২.৮৫, কুল্লূকভট্ট-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য;
শব্দকল্পদ্রুম, পৃ. ২৬২]

☐ মহাভারতে উপাংশু-জপের কথা সেভাবে না থাকলেও সঘোষ এবং সশব্দ মন্ত্রোচ্চারণের চেয়ে নির্ঘোষ এবং প্রায়-শব্দহীন উচ্চারণেই যে মন্ত্রজপের ক্ষেত্রে প্রশস্ত, তা মহাভারতের অনুগীতা নামক উপপর্বে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। এখানে মন্ত্ররূপা সরস্বতী অথবা প্রাণ এবং অপান বায়ুর মধ্যে অবস্থিত বাগ্‌দেবীর দুটি রূপ বলা হয়েছে, তিনি কখনো 'ঘোষিণী', আবার কখনো নির্ঘোষা। কিন্তু নির্ঘোষা বাক্ ঘোষিণী বাগ্‌রূপের চাইতে ভালো—

ঘোষিণী জাতনির্ঘোষা নিত্যমেব প্রবর্ততে।
তয়োরপি চ ঘোষিণ্যা নির্ঘোষৈব গরীয়সী॥

এখানে নির্ঘোষা বলতে উপাংশু-জপ অথবা, মানস জপ বোঝায়। নীলকণ্ঠ টীকায় লিখেছেন —'নির্ঘোষা হংসমন্ত্ররূপা' অর্থাৎ নির্ঘোষা মন্ত্রের মধ্যে উচ্চস্বরের স্থান নেই, শুধু নিশ্বাস-প্রশ্বাসে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সূক্ষ্ম জীবাত্মার (অহম্-এর) সঙ্গে পরমাত্মার (সঃ) সংযোগ স্থাপন করা—এবং সবসময় সর্বাবস্থায় করা—নির্ঘোষা তু হংসমন্ত্ররূপা সর্বস্ববস্থাসু প্রবর্ততে ইতি গরীয়সী—সেই জন্যে ঘোষিণী মন্ত্রজপের চাইতে এটা ভালো। David Frawley লিখেছেন—

Yet at a higher level beyond duality, Ha and Sa are the natural sounds of the Self, which is the inner breath of awareness, the unitary Prana that is Self-existent and immortal. Ha is the Self as I (aham) and Sa is the Self as that or the inner Being. Hamsa also refers to the supreme or Paramahamsa, which is the liberated soul that dwells in the state of the Supreme Shiva. In this regard, Hamsa teachings are an integral part of Shiva Yoga and Shiva is also Hamsa. Hamsa as sound and prana vibration is also Om or Pranava, of which Lord Shiva is the indicator.

Hamsa represents the union of Shiva and Shakti, which are Ha and Sa, Sun and Moon, Prana and Apana, the incoming and outgoing vital energies. All dualities, starting with the breath, are a reflection of the greater two-in-one power of Shiva and Shakti, which gets divided in the lower worlds.

[মহা (k) ১৪.২১.২১; (হরি) ১৪.২৩.২১,
নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য; David Frawley, Śiva:
The Lord of Yoga, 2015]

☐ মন্ত্রে প্রকার-ভেদের মধ্যে 'লিখিত' নামে একটি প্রকার আছে, তাতে হয়তো লিখে লিখে বারংবার উচ্চারণের কাজ হয়, কিন্তু মন্ত্রোচারণের সাধারণ প্রকারভেদ প্রধানত তিনটি এবং সেটি নরসিংহ বা নৃসিংহ পুরাণের উদ্ধৃতি দিয়ে চৈতন্য-পরিকর গোপালভট্ট গোস্বামী হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে লিখেছেন— যজ্ঞ তিন রকমের—বাচিক, উপাংশু এবং মানস। এই জপযজ্ঞগুলির মধ্যে পরের পরেরটি বেশি ফলদায়ক। নরসিংহ পুরাণ উপাংশু-মন্ত্রজপের লক্ষণ দিয়ে বলেছে—ঈষৎ ওষ্ঠ-সঞ্চালন করে আস্তে আস্তে মন্ত্র উচ্চারণ করার সময় যে মন্ত্র শুধু নিজেই কিঞ্চিৎ শুনতে পায়, অথবা শুধু জানতে পারে, সেই মন্ত্রজপের নামই উপাংশু জপ—

শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিন্মাত্রং স্বয়ং বিদ্যাদ্ উপাংশুঃ স জপ স্মৃতঃ॥

[নরসিংহ পু. (মহর্ষি) ৫৮.৭৮-৮২;
হরিভক্তি বিলাস, ১৭.৭৩-৭৬, পৃ. ১০৯৯]

উপাংশু-ব্রত মহাভারতে উপাংশু-ব্রত বলে একটি শব্দ পাওয়া যায়। শব্দটির অর্থ হল—অন্যের অজ্ঞাত এবং অন্যের কাছে পূর্বাহ্নে অনুচ্চারিত কোনো সংকল্প। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় শ্রুতশ্রবা-ঋষির পুত্র সোমশ্রবাকে পৌরোহিত্যে বরণ করতে চাইলে তিনি তাঁর অন্য এক মহাতেজস্বী পুত্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শর্ত হিসেবে এটাও জানান যে, তাঁর সেই তেজস্বী পুত্রটির একটি উপাংশু-ব্রত আছে। ব্রতটা এই—তাঁর কাছে কোনো ব্রাহ্মণ যদি কিছু চান, তবে সেটা সে তাঁকে দেবেই। এই ব্যাপারে তুমি যদি সাহায্য করো তবে তাকে নিয়ে যাও তুমি—

অস্য তু একম্ উপাংশুব্রতম্—যদেনং কশ্চিদ্
ব্রাহ্মণঃ কঞ্চিদর্থ যাচেত্তং তস্মৈ দদ্যাদ্ অয়ম্।

এখানে এই গদ্যপংক্তিতে উপাংশু-ব্রতের অর্থ নীলকণ্ঠের টীকায়—নিগূঢ়ভাবে গৃহীত কোনো নিয়ম—নিগূঢ়বন্নিয়মঃ। আবার এই নীলকণ্ঠই হরিবংশের টীকায় উপাংশু-শব্দের অর্থটা আরও পরিস্কার করে বলেছেন—'উপাংশু-ব্রত' হল সেটাই যার সংকল্প-নিয়ম অন্য কারো জানা নেই—

উপাংশু-ব্রতং পরেসাম্ অবিদিত-নিয়মম্।

তার মানে উপাংশু-ব্রত খুব ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত এক নিয়ম-ব্রত।

মহাভারতের দ্রোণপর্বের আর একটি অধ্যায়ে মহাযুদ্ধের সময় অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে কথা দিয়েছিলেন কর্ণকে বধ করবেন বলে। কিন্তু যুদ্ধের বিপরীত পরিস্থিতিতে অর্জুন সেকথা রাখতে পারেননি বলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে তিরস্কার করে তাঁর গাণ্ডীব ধনুটি কৃষ্ণের হাতে দিয়ে দিতে বলেছিলেন। জ্যেষ্ঠের এই কথার অর্জুন অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং আপন শিবিরে এসে একটি খড়্গ হাতে যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। মহামতি কৃষ্ণ অর্জুনের এই কাণ্ড দেখে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা জিজ্ঞাসা করেন। তখন অর্জুন বলেন—আমার একটি গোপন নিয়ম-সংকল্প আছে—আমাকে যদি কেউ বলে যে, তোমার এই গাণ্ডীব অন্য কাউকে দিয়ে দাও তাহলে আমি তার মাথা কেটে নেবো—এই আমার উপাংশু-ব্রত—

অন্যস্মৈ দেহি গাণ্ডীবমিতি মাং যো'ভিচোদয়েৎ।
ভিন্দ্যামহং তস্য শির ইত্যুপাংশুব্রতং মম॥

কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় এবং বাস্তব উপদেশে যুধিষ্ঠির-হত্যার অঘটনটা আর ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু উপাংশু-ব্রতের এই গোপনতাও খুব খেয়াল করার মতো। *[মহা (k) ১.৩.১৯; ৮.৬৯.৯-১০; (হরি) ১.৩.১৮; ৮.৫১.৯; হরিবংশ পু. ১.১৩.৩, ১৩]*

উপাংশুযাগ ইষ্টিযাগে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে ঘৃতাহুতি দেবার সময় উপাংশু অর্থাৎ অনুচ্চ-নীচ স্বরে যে মন্ত্রপাঠ করা হয়, তার নাম উপাংশু যাগ। উপাংশু যাগে উপাংশু মন্ত্রজপের গুরুত্ব বুঝিয়ে অধ্যাপক অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—উপাংশু হচ্ছে 'করণবদ্ অশব্দম্ অমনঃপ্রয়োগম্'। শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করতে গেলে যেমন জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতি চালনা করতে হয় তেমনভাবেই মুখকে চালনা করতে হবে, কিন্তু উচ্চারিত শব্দ এতই অস্ফুট হবে যে নিজে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ আর তা শুনতে পাবে না, কিন্তু তাই বলে উপাংশু মানে মনে মনে উচ্চারণ নয়। অন্য এক লক্ষণেও এই কথাই বলা হয়েছে—

'শনৈর্ উচ্চারয়েন্ মন্ত্রং মন্দ্রম্
ওষ্ঠৌ প্রচালয়েত্।
অপরৈর্ অশ্রুতং কিঞ্চিত্ স
উপাংশু-জপঃ স্মৃতঃ॥'

সূত্রে যে জপ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে তা হল √জপ্, অনু - √মন্ত্র, (+ অভি - √মন্ত্র), আ √প্যা, উপ - √স্থা ধাতু দ্বারা যে কর্ম বা মন্ত্র বিহিত হয়েছে তা। এগুলির অন্য লক্ষণও অবশ্য আছে—

'জপম্ উচ্চারণং বিদ্যাত্ ক্রত্বর্থম্
অপি তদ্ ভবেত্।
অর্থতঃ কার্যলাভশ্ চেদ্ অর্থ
এব ক্রতোর্ ভবেত্॥
মন্ত্রম্ উচ্চারয়ন্নেব মন্ত্রার্থত্বেন সংস্মরেত্।
শেষিণং তন্মনা ভূত্বা স্যাদ্ এতদ্ অনুমন্ত্রণম্॥
এতদ এবাভিমন্ত্রস্য লক্ষণঞ্চ্ চেক্ষণাধিকম্।
অদ্ভিঃ সংস্পর্শনাধিক্যাত্
তদ্ এবাপ্যায়নং স্মৃতম্॥
উপস্থানং তদ্ এব স্যাত্ প্রণতিস্থানসংযুতম্।
বাহ্যং কার্যং যদ্ এতেষু মন্ত্রকালে ক্রিয়তে তত্॥'

—যজ্ঞের প্রয়োজনে এক ধরনের যে মন্ত্র উপাংশু স্বরে পাঠ করা হয়, তাকে বলে 'জপ'। এই জপমন্ত্রের যে অর্থ সেই অর্থের মধ্য দিয়েই যদি অভীষ্ট কার্যটি নির্বাহিত হয় তাহলে যজ্ঞই অর্থবহ হয়ে ওঠে, অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। মন্ত্র উচ্চারণ করার সময়ে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতাকে তন্ময় হয়ে স্মরণ করার নাম 'অনুমন্ত্রণ'। 'অভিমন্ত্রণ' মন্ত্রের ক্ষেত্রে দেবতাকে একাগ্র হয়ে স্মরণ করা হয় এবং যে কাজটি করা হচ্ছে সেই কর্তব্য কর্মের দিকে তাকিয়ে থাকতেও হয়। যদি দেবতাকে স্মরণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর দিকে তাকিয়ে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই মন্ত্র ও কর্মকে বলে 'আপ্যায়ন'। 'উপস্থান' হচ্ছে দেবতাকে স্মরণ করতে করতে দুই হাত জোড়

করে প্রণাম নিবেদন করা। মন্ত্র পাঠ করার সময়েই এই স্মরণ, দৃষ্টিপাত, জল-নিক্ষেপ ইত্যাদি কর্ম করতে হয়। অনুমন্ত্রণ, আপ্যায়ন ও উপস্থান কর্মকরণ (কর্মসম্পৃক্ত) মন্ত্র হলেও এই সূত্রে তাদের পৃথক উল্লেখ করায় বুঝতে হবে যে, অন্যান্য কর্মকরণ মন্ত্রের মতো মন্ত্রের শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মটি না করে এগুলির ক্ষেত্রে মন্ত্রপাঠ চলার সময়েই তা করতে হবে।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ৩.৮.৮;
আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (অমর), ১.১.২০; পৃ. ১০-১১]

উপাবৃত্ত প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রধান জনপদ। মহাভারতে ভীষ্মপর্বের সূচনায় প্রাচীন ভারতের যে বিবরণ সঞ্জয়ের মুখে শোনা যায়, সেখানে উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, স্বরাষ্ট্র বা সুরাষ্ট্র এবং কেকয়ের নাম একত্রে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। মহাভারতে উল্লিখিত এই উপাবৃত্ত জনপদটির নাম আমরা প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ বৌধায়ন ধর্মসূত্রে উচ্চারিত হতে দেখি, সেখানে উপাবৃত্ত এবং সিন্ধু সৌবীরের নিম্নজাতীয় অধিবাসীদের উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, এই জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করা হত না, মূলত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বর্ণসঙ্করের আধিক্যের কারণেই হয়তো এদের হীনভাবে দেখা হত—

উপাবৃৎসিন্ধুসৌবীরা এতে সংকীর্ণযোনয়ঃ।

মহাভারতের কর্ণপর্বের বিবরণ থেকেও এই তথ্যের সমর্থন মেলে। কর্ণ সুরাষ্ট্র, সিন্ধু-সৌবীরের অধিবাসীদের অনাচারী, বর্ণসঙ্কর বলে চিহ্নিত করেছেন। K.C. Mishra পণ্ডিত B.C. Law এর মতামত উদ্ধার করে জানিয়েছেন যে উপাবৃত্ত শব্দটি মূলত নিকটবর্তী শব্দের দ্যোতক বলেই মনে হয়। মহাভারতের শ্লোকে সুরাষ্ট্র দেশের সঙ্গে উপাবৃত্ত এবং অনুপাবৃত্তের উল্লেখ দেখে মনে হয়—এই দুটি সুরাষ্ট্রের নিকটবর্তী কোনো উপজাতি অধ্যুষিত জনপদ ছিল। শক রাজা রুদ্রদামনের শিলালিপি (জুনাগড়ে অবস্থিত) থেকেও এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

[মহা (k) ৬.৯.৪৮; (হরি) ৬.৯.৪৮;
বৌধায়ন ধর্ম সূত্র ১.১.৩২-৩৩;
TAI (Law), p. 389;
TIM (Mishra), p. 83]

উপাবৃদ্ধি পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উপাবৃদ্ধির বংশ তার মধ্যে একটি। উপাবৃদ্ধি বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ছিলেন।

[মৎস্য পু. ২০০.৫]

উপাসঙ্গ বসুদেবের ঔরসে দেবরক্ষিতার গর্ভজাত পুত্র। বিভিন্ন পুরাণে উপাসঙ্গ এবং উপসঙ্গ—এই দুই ভাবেই তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণ মতে উপাসঙ্গ বজ্র এবং সংক্ষিপ্ত নামে দুটি পুত্র লাভ করেন। অন্যান্য পুরাণে অবশ্য পুত্রদের নামে পাঠভেদ দেখা যায়। *[বায়ু পু. ৯৬.১৭৮, ২৪৮;*
মৎস্য পু. ৪৬.১৬; ৪৭.২২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৮১, ২৫৮]

উপেন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩০; (হরি) ১৩.১২৭.৩০]

উপেন্দ্রা ভারতবর্ষের একটি নদী।

[মহা (k) ৬.৯.২৭; (হরি) ৬.৯.২৭;
পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ. ৩.২২]

উভক্ষয় ভরতবংশীয় রাজা ভীমের পুত্র। উভক্ষয়ের পত্নীর নাম বিশালা। বিশালার গর্ভে উভক্ষয়ের ত্রয্যারুণি, পুষ্করী এবং কপি নামে তিন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। *[বায়ু পু. ৯৯.১৬২]*

উভয়জাত জনৈক ঋষি। পুরাণে ভার্গব গোত্রের প্রবর্তক হিসেবে তাঁর বংশের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৩১]*

উভয়সৃষ্টি শাকদ্বীপের একটি নদী।

[ভাগবত পু. ৫.২০.২৬]

উমা উমা পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা। ভগবান শিব-মহাদেবের স্ত্রী। বাল্মীকি রামায়ণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাড়কা-বধের জন্য রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যাচ্ছেন অযোধ্যা থেকে। যাবার পথে সুরধুনী গঙ্গাকে দেখে রামচন্দ্র গঙ্গার সৃষ্টি-কথা শুনতে চাইলেন বিশ্বামিত্রের কাছে। সেই প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্র জানালেন—সমস্ত ধাতুর আকর হিমবাহ পর্বত হলেন পর্বতকুলের রাজা, তাঁর স্ত্রীর নাম মেনা। মেনার গর্ভে তাঁর দুটি অসামান্যা সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম হল গঙ্গা আর কনিষ্ঠা কন্যা হলেন উমা—

গঙ্গা চ সরিতাং শ্রেষ্ঠা উমা দেবী চ রাঘব।

উমা প্রথম বয়সেই তপস্বিনী হয়ে উগ্র তপস্যা

শুরু করেন। হিমবান পর্বত সেই ব্রতপালনরতা তপস্বিনী উমাকে অপ্রতিরূপশালী রুদ্রের হাতে সমর্পণ করেন। হিমালয়ের এই কনিষ্ঠা কন্যা উমা সমস্ত দেবতা, দানব, মানব—ত্রিলোকস্থিত সকলের কাছেই পরম সম্মানিত—

> যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্ রঘুনন্দন।
> উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥
> উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
> রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্॥

এই যে তপস্বিনী উমার উগ্র তপস্যার কথা শোনা গেল, ঠিক এই তপোব্যবহারের সঙ্গেই তাঁর নামকরণের তাৎপর্য্য তৈরি হয়েছে বলে পুরাণকারেরা জানিয়েছেন। কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে—কালী-স্বরূপিনী পার্বতী মহাদেবকে পাবার জন্য উগ্র তপস্যা করতে যাবেন বলে অনুমতি চাইলেন মা মেনার কাছে। মেনা তখন মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন—এই কঠিন তপস্যা তোমার জন্য নয়। ঋষি-মুনির শরীরে যে ক্লেশ সহ্য হয়, তা তোমার সইবে না। পার্বতী জোর করে বললেন—তপস্যায় যেতেই হবে আমায়। এবার তপোবনে গমনোদ্যত পার্বতীকে মেনা বিরক্ত হয়ে বললেন—'উ-মা'। অর্থাৎ 'ওঃ, কক্ষনো না'। সংস্কৃতে হাহাকারার্থক 'উ' শব্দের সঙ্গে দৃঢ় নিষেধার্থক শব্দ 'মা' যোগ করে পার্বতীর নামই হয়ে গেল উমা—

> যতো নিরস্তা তপসে বনং গন্তুঞ্চ মেনয়া।
> উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী॥

মহাকবি কালিদাস তাঁর বিখ্যাত কুমারসম্ভব কাব্যে মদনভস্মের পর পার্বতী যখন তপস্যার জন্য বনে যাবেন বলে স্থির করেছেন, তখন পার্বতীকে তিনি নিষেধ করে বলেছিলেন—ওহে (উ) না, না কিছুতেই না (মা)। এমন করে বলেছিলেন, তাতেই তাঁর নাম হয়ে গেল উমা—

> উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা/
> পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।

[রামায়ণ, ১.৩৫.১৯-২১; কালিকা পু. ৪৩.১৩-২৩; কুমারসম্ভব, ১.২৬]

মহাভারতে যেসব জায়গায় উমা নামটি পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় উমা নামটি যে কারণেই আসুক, নামটি যথেষ্টই পুরোনো। মহাভারতেও উমা শৈলসুতা এবং শিবপত্নী—এখানে শিবের পরিচয় হয় উমাকে দিয়ে—শিবের নাম এখানে উমাপতি, উমাকান্ত, উমাধব অর্থাৎ উমার স্বামী—

> উমায়াঃ শৈলপুত্র্যা ধবো ভর্ত্তা উমাধবঃ।
> উমাপতিরুমাকান্ত জাহ্নবীধৃগ্ উমাধবঃ।

মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রার উপপর্বে বলা আছে—চৈত্রমাসে মানস সরোবরে যজ্ঞ করলে শিব উমার সঙ্গে এসে ভক্তজনকে দর্শন দেন—

> সহোময়া চ ভবতি দর্শনং কামরূপিণঃ।
> অস্মিন্ সরসি সত্রৈর্বৈ চৈত্রমাসি পিনাকিনম্॥

পার্বতীর অনেক নামের মধ্যে উমা নামটি যথেষ্ট পুরাতন এবং মহাভারতে এমন একটা সংবাদ পাওয়া যায় যে, উমাই রুদ্র-শিবকে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করার প্ররোচনা দিয়েছিলেন। ঘটনা ঘটেছিল এইরকম যে, দক্ষ তাঁর অনুষ্ঠেয় যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেননি। দধীচি মুনি দক্ষকে তিরস্কারসূচক প্রতিবাদ জানান। দক্ষ সেখানে সাহঙ্কারে জবাব দিলে দধীচি যজ্ঞনাশের আশঙ্কা করেন। ওদিকে শিবের ঘরে বসে শিবানী তাঁর স্বামীর ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন, কেননা দেবাদিদেব শিব দক্ষের আচরণে ক্ষুব্ধ না হয়ে নিজেই যথেষ্ট আত্মতৃপ্ত হয়ে বসে আছেন এবং তিন ভুবনের সকলেই তাঁকে কত সম্মান দিয়ে পূজা-আরাধনা করেন, তার প্রশংসাবাদ শোনাচ্ছিলেন স্ত্রীকে। দেবী তখন বলেন—স্ত্রীদের সামনে এসব গর্ব অনেক পুরুষই করে থাকে। ভগবান শিব এইবার দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। মহাভারত এইখানে উমা নাম ব্যবহার করায় একটা তর্ক ওঠেই যে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পরের কল্পে দাক্ষায়ণী সতী পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা হয়ে জন্ম লাভ করেন, তাঁর উমা নামটিও শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহপূর্ব তপস্যার পরিণতি। ফলে দক্ষযজ্ঞের প্ররোচনায় উমা নামের এই ব্যবহার আসলে এতটুকুই সংকেত দেয় যে, দেবী ভগবতীর অন্যতম প্রাচীন নামটিই হল উমা এবং সে নাম ভগবান শিবের সঙ্গে তাঁর প্রণয়-পরিণয়ের সঙ্গেও জড়িত—

> ইত্যুক্ত্ব ভগবান্ পত্নীম্ উমাং প্রাণৈরপি প্রিয়াম্।

[মহা (k) ৩.১৩০.১৫; ১৩.১৭.১৩৭; ১২.২৮৩.২৯; (হরি) ৩.১০৭.১৫; ১৩.১৬.১৩৬; ১২.২৭০.২৯]

উমার নাম নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক কিছু তর্ক-বিতর্কও আছে। অনেকেই

মনে করেন—উমা নামটি আসলে প্রাগৈতিহাসিক আদিম সংস্কৃতির মাতৃনাম বা মাতৃদেবীর নাম 'অম্ম' শব্দটির সামান্য বিবর্তিত ভারতীয় রূপ। S. K. Dikshit তাঁর বইতে লিখেছেন যে, ব্যাবিলনীয়, আক্কাদীয় এবং দ্রাবিড় ভাষায় ব্যবহৃত উম্মো, উম্মো বা উম্মি ভারতীয় উমা নাম্নী মাতৃবিষয়িনী দেবীরই শব্দ-প্রকার মাত্র—

The Babylonian word for 'mother' is Ummu or Umma, the Accadian Ummi, and the Dravidian is Umma. These words can be connected with each other and with Uma, the Mother Goddess, whom Bhrigu is said to have coveted.

হপকিন্স্ সাহেব আবার এই ধারণাটাই আর একটু অন্যভাবে প্রকট করে উমা শব্দের আদিম অপভ্রষ্ট রূপগুলির বিবরণ দিয়েছেন—

All these forms of Uma (=Amma, the great mother-goddess) go back to the primitive and universal cult of the mother-goddess (cf. Aditi).

Who in popular mythology appears as kalamma and as Ellamma, that is as destructive or as kind.

[S. K. Dikshit, Mother Goddess, P. 59; E.W. Hopkins, Epic Mythology, P. 226]

তবে আমাদের সাংস্কৃতিক পরম্পরার দিক থেকে এটাই মনে হয় যে, উমা শব্দটি অতিমাত্রায় প্রাচীন এক সংস্কৃত শব্দ এবং এই শব্দের মধ্যে শৈলরাজ হিমালয়ের পিতৃহৃদয় চিহ্নিত হয়েছে সেই কেনোপনিষদের কাল থেকে। কেনোপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য ব্রহ্মের অনির্বচনীয়তার কথা বলা হচ্ছিল। 'অবাঙ্মনসঃ গোচর' ব্রহ্মের বিচিত্র স্বরূপ-ব্যাখ্যার পর অবশেষে একটি ছোট্ট কাহিনীর অবতারণা করে ঋষি বললেন— দেবতারা একসময় অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করে আত্মাভিমানী হয়ে পড়েছিলেন। তখন সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম একটি বিশেষ মূর্তি ধারণ করে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেও তাঁরা তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারলেন না। ব্রহ্ম সেই দেবতাদের সামনে একটি তৃণখণ্ড রেখে অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেবতার শক্তি পরীক্ষা করলেন। অগ্নি এবং বায়ু দুজনেই শক্তিপরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ইন্দ্র নিজের শক্তি-প্রদর্শনে অগ্রসর হতেই তিনি আকাশে পরম শোভাশালিনী এক রমণীর দেখা পেলেন—উপনিষদ তার নাম দিয়েছে—উমা হৈমবতী—

স তস্মিন্নেবাকাশে শ্রিয়মাজগাম
বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্।

এই উমা হৈমবতী কে—এই প্রশ্নে শঙ্করাচার্যের মতো নির্গুণ-নিরাকারবাদী দার্শনিকও প্রথমে বললেন তিনি 'বিদ্যা'—

বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা।

এই বিদ্যা অবশ্যই ব্রহ্মবিদ্যা। দ্বিতীয় অর্থে শঙ্কর বললেন—অথবা এই উমা হলেন সেই হিমালয়দুহিতা, যিনি নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গেই অবস্থান করেন—

অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহবর্ততে ইতি। এই পংক্তিটির মধ্যে উমাকে যেমন হিমালয়-দুহিতা বলা হল, তেমনই 'সর্বজ্ঞ ঈশ্বর' বলতে মহেশ্বর শিবের সঙ্গে সতত অবস্থিতা শক্তি হিসেবে পরম-শক্তিমান ঈশ্বরের শক্তিতত্ত্বেরও ইঙ্গিত দেওয়া হল। হয়তো বা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা—

'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্'।

এই পংক্তির সঙ্গেও পরমা প্রকৃতি উমা মাহেশ্বরীর সঙ্গে মায়াধীশ শঙ্কর মহাদেবের একাত্মতা তৈরি হয় শঙ্করের ব্যাখ্যায়। আমরা শুধু জানতে চাই, সামবেদীয় তলবকার উপনিষদের মতো প্রাচীন কেনোপনিষদে হিমালয়-দুহিতা হৈমবতী উমার নাম পার্বতী, দুর্গা বা চণ্ডীর চেয়েও অনেক বেশি প্রাচীন এক অনুষঙ্গ তৈরি করে যেখানে হিমালয়ের কন্যা বলে উমা প্রায় স্পষ্টতই নিরূপিত এবং পরোক্ষত শিবজায়া হিসেবে তিনি পরা বিদ্যাস্বরূপিনী।

[কেনোপনিষদ (দুর্গাচরণ), ৩.১২, পৃ. ৬২-৬৩, শঙ্করাচার্যের টীকা দ্রষ্টব্য]

গবেষকেরা এমন মন্তব্যও করেছেন যে, হিমালয়ের কন্যা উমাকে নিয়ে পুরাণগুলিতে যত কাহিনীর অবতারণা হয়েছে, তার উৎস হল কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী। অন্য একটি মতে অকারাদি বর্ণ-সমাম্নয়ের প্রত্যেকটি বর্ণের একজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন, তাতে উ-কার ভগবান শিবের সঙ্গে একাত্মক—

অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।

অন্যদিকে মা অর্থে লক্ষ্মী এবং বৃহত্তর আশয়ে লক্ষ্মী-শব্দে পত্নী বোঝায় বলে উকারাত্মক শিবের স্ত্রী হলেন উমা। ভারতচন্দ্র এই অর্থ ধরেই উমা-পার্বতীর শব্দ-নিষ্পত্তি করে লিখেছেন—

উশব্দে বুঝহ শিব মা-শব্দে শ্রী তার।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার।

পুরাণগুলিতে উমার জন্ম এবং যৌবনের কথা অনেক সরলভাবে এসেছে। লিঙ্গ পুরাণের ক্রম মানলে হিমালয়ের দুই ছেলে মৈনাক এবং ক্রৌঞ্চের জন্ম হয়ে গেলে তারপর উমার জন্ম এবং তারও পরে জন্মেছেন গঙ্গা—

অসূত মেনা মৈনাকং ক্রৌঞ্চস্তস্যানুজামুমাম্।
গঙ্গাং হৈমবতীং জজ্ঞে ভবাঙ্গাশ্লেষপাবনীম্॥

কিন্তু মহাভারতে আমরা যেভাবে উমাকে দক্ষযজ্ঞের প্ররোচনা দিতে দেখেছি, সেটা বোধহয় হিমালয় সুতা পার্বতীর উমা নামটি ব্যবহার করার জন্যই ব্যবহৃত। আর কূর্ম পুরাণে তো শুধু প্ররোচনা নয়, দক্ষযজ্ঞের সময় পতিনিন্দা শুনে উমার ক্রোধ এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে, তিনি নিজের শরীর থেকে ভদ্রকালীকে সৃষ্টি করে তাঁকে গণ সহ পাঠিয়েছিলেন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য—

মন্যুনা চোময়া সৃষ্টা ভদ্রকালী মহেশ্বরী।

তবে শিবপুরাণে উমার নাম না করে সোজাসুজি পার্বতীর নাম করা হয়েছে, তিনি তাঁর ক্রোধ থেকে ভদ্রকালীকে সৃষ্টি করে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করতে পাঠিয়েছিলেন—

মন্যুনা চাসৃজদ্ ভদ্রাং ভদ্রকালীং মহেশ্বরীম্।

দক্ষযজ্ঞের কালে দাক্ষায়ণী সতীর নামও উমা ছিল কিনা, তা এইসব পৌরাণিক প্রমাণ থেকে খানিক গ্রাহ্য হয়ে উঠলেও সম্ভবত কেনোপনিষদের উমা হৈমবতীর প্রচার তৈরি হয়েছে বৈদিক যুগের শেষভাগে। আর বৈদিক দেবতাবৃত্তে রুদ্র শিবের স্থানলাভ এবং সেই সূত্রে দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের ব্যাপারটাও বৈদিক কালের দেবতা-সমন্বয়ের শেষপর্ব সূচনা করে। ফলে দক্ষকন্যা সতী পরজন্মে পার্বতী উমা হলেন—এই ঘটনার উমা নামটি যেন দাক্ষায়ণী-পার্বতীর পূর্বাপর জন্মের সেতু তৈরি করে। ফলত দক্ষযজ্ঞের প্ররোচনাতেও উমা আছেন আবার শিবের জন্য পার্বতীর তপস্যাতেও উমা আছেন—

অথ দেবী সতী যা তু প্রাপ্তে বৈবস্বতে'ন্তরে।
মেনায়াং তদ্উমাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্॥
অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেনোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥

[শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত পুরাণবচন, পৃ. ২১৮; অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ), পৃ. ৪৯; লিঙ্গ পু. (Nagar) ১খণ্ড, ৬.৭; কূর্ম পু. ১.১৫.৪৩; শিব পু. (বায়বীয়), ১.১৭.৩৫; বায়ু পু. ৩০.৭০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি), ১.১৩.৭৭]

গবেষণার তর্কযুক্তিতে আমাদের এটাই মনে হয়, পার্বতীর উমা-নামটি শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহপূর্ব সময় এবং বিবাহের পরেও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর দাম্পত্যের অভিজ্ঞান বহন করে। মহাভারতের দুটি কাহিনীতে উমার কৈশোরগন্ধী তারুণ্যের সন্ধান পাই।

শূলপাণি মহাদেবের সঙ্গে দেবী ভগবতীর বিবাহের পর বারবার যখন তাঁদের দাম্পত্য সমাগম ঘটছে, তখন দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে উমা-মহেশ্বরকে প্রসন্ন করে বললেন—আপনি তপস্বী এবং অতিতেজস্বী, দেবী উমাও তপস্বিনী এবং তেজস্বিনী। আপনাদের দুয়ের সমাগমে যে পুত্র জন্মাবেন, তিনিও অতিশয় বলবান হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। আপনার সেই অতিতেজস্বী পুত্র দেবতাদের সকলকে অভিভূত-পরাভূত করে ফেলবেন। অতএব আপনার কাছে আমরা বর চাই যে, আপনি আপনার সন্তান-সৃষ্টিকারী তেজ নিগৃহীত করুন—

অপত্যার্থং নিগৃহ্নীষ্ব তেজঃ পরমকং বিভো।

বিশেষত আপনার তেজ ধারণ করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ কোনো স্থানেরই নেই বরঞ্চ সে তেজ পতিত হলে সেই তেজ-প্রভাবে সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাবে। অতএব এই উমা-দেবীর গর্ভে আপনার যেন পুত্র না হয় সেইভাবে আপনি নিজ নিগৃহীত করুন। ভগবান রুদ্রশিব 'তথাস্তু' বলে দেবতাদের কথা মেনে নিয়ে নির্গমনোদ্যত তেজ নিজের মধ্যে ধারণ করলেন এবং ঊর্ধ্বরেতা হলেন সেই সময় থেকে—

ঊর্ধ্বরেতাঃ সমভবত্ততঃ প্রভৃতি চাপি সঃ।

এইভাবে দেবতারা শিবের সন্তান উৎপত্তির সম্ভবনা নষ্ট করে দিলে উমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবপত্নীদেরও নিঃসন্তান হবার অভিশাপ দিলেন।

এখানে উমাকে রুদ্রাণী-রূপে দেখতে পাই

বটে, উমা-শিবের দাম্পত্য সংস্থাপনে উমার স্বভাব এবং রূপ বেশির ভাগ সময়েই খুব স্নিগ্ধ এবং বধূজনোচিত। হয়তো এই কারণেই নানা ভয়ঙ্করী কালীমূর্তির মধ্যে উমার কথা বলার সময় কালিকা পুরাণ উমাকে 'সৌম্যমূর্তি' বলে চিহ্নিত করেছে—

উমায়াঃ সৌম্যমূর্তেস্তু তন্ত্রং ত্বং শৃণু ভৈরব।

উমার ধ্যানমূর্তিটিও লক্ষ্য করার মতো—উমার গায়ের রঙ সোনার মতো, তিনি দ্বিভূজা, বাঁ হাতে নীল পদ্ম এবং ডান হাতে শ্বেতশুভ্র একখানি চামর ধারণ করে শিবের পরিচর্যা করছেন কখনো বা শিবের ডান কাঁধে ডান হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। এই পুরাণ বলেছে—শিবকে বাদ দিয়েও যদি উমার ধ্যান করতে হয়, তবে সেই সোনার বরণ উমার দুই হাতে নীলপদ্ম আর চামর থাকবে। ব্যাঘ্রচর্মে স্থিত একটি পদ্মের উপর তিনি পদ্মাসনে বসে থাকবেন। আর তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকবেন আটজন বেতাল-ভৈরব এবং তাঁর সখীপ্রায় অষ্টযোগিনী।

বিনাপি শম্ভুং রুদ্রাণীং ভক্তস্তু পরিচিন্তয়েৎ।
দ্বিভুজাং স্বর্ণগৌরাঙ্গীং পদ্মচামরধারিণীম্॥

রুদ্রাণী উমার এক হাতে যদি পরম মঙ্গলের প্রতীক পদ্ম থাকে তবে তাঁর ডান হাতের চামরখানি কিন্তু স্বামী-পরিচর্যার প্রতীক। উমার মূর্তিভাবনায় এই শিবভাবিনী গৃহবধূর চরিত্রটি মহাভারতের একটি কাহিনী থেকেও পরিষ্কার হয়।

দেবদেব মহাদেব তখন তপস্যা করছিলেন হিমালয় পর্বতে। অসামান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেখানে খানিক দূরে মহাদেবের যে সভাটি ছিল, সেখানে তাঁর ভূতগণ সহ যক্ষ-কিন্নর, অপ্সরা-গন্ধর্বদের আমোদ-প্রমোদ চলছিল। ফল-ফুল-লতাগাছিতে ভরা হিমালয় সেদিন পক্ষিকুলের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সেখানে অদূরেই বসে আছেন ব্যাঘ্রচর্মের ওপরে বসে আছেন মহাদেব। ঠিক এই অবস্থায় শৈলসুতা ভূতস্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মহাদেবের কাছে এলেন। তিনি মহাদেবের মতোই বস্ত্র পরিধান করেছেন, মহাদেবের মতোই ব্রতধারিণী ছিলেন, কিন্তু কৌতুকের বশে পর্বতের এক পাশ থেকে মহাদেবের পাশে এসে হঠাৎই দুই হাত দিয়ে মহাদেবের নয়ন দুটি আবৃত করে দিলেন।

মহাদেবের নয়ন আবৃত হলে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হয়ে উঠল। যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত লোক বিষণ্ণ হয়ে উঠল। শশী-সূর্যনেত্র ভগবান মহাদেবের চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন চন্দ্র-সূর্য। এই অবস্থায় মহাদেবের ললাট থেকে বিশাল উজ্জ্বল এক আগুনের শিখা বেরিয়ে এল। তাঁর ললাটদেশে সৃষ্টি হল সেই তৃতীয় নয়ন যার প্রভা সূর্যাগ্নির মতো উজ্জ্বল। শিবের ললাট-নির্গত অগ্নিময় শিখা তিন ভুবন আলোকিত করল বটে, কিন্তু সেই আলোকময় তেজ হিমালয়ের বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি সব দগ্ধ করতে লাগল। শৈলসুতা উমা পিতা হিমালয়ের এই দুরবস্থা দেখে শিবের শরণাপন্ন হলেন। পার্বতীর স্ত্রীস্বভাবের মৃদুতা এবং কাতরতা দেখে রুদ্র-শিব প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে হিমালয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে পর্বতরাজের মনোহর প্রাকৃতিক পরিবেশ আবারও ফিরে এল—

উমাং শর্বস্তদা দৃষ্ট্বা স্ত্রীভাবগতমার্দবাম্।
পিতু দৈন্যমনিচ্ছন্তীং প্রীত্যাপশ্যত্তদা গিরিম্॥

পার্বতীর ইচ্ছাপূরণ করে শিব এবার বধূস্বভাবিনী উমাকে বললেন—তুমি অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের মতো চপলতা করে আমার চক্ষু মুদে দিয়েছিলে বলেই তো এই জগৎ আলোকশূন্য হয়ে পড়েছিল। তখন লোকরক্ষার জন্যই আমাকে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করতে হয়েছে। সেই তেজে পর্বত দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল বটে কিন্তু তোমাকে খুশি দেখার জন্য পর্বতরাজকে তো আবারও প্রকৃতিস্থ করেছি আমি—

ত্বৎপ্রিয়ার্থঞ্চ মে দেবি প্রকৃতিস্থঃ পুনঃ কৃতঃ।

[মহা (k) ১৩.৮৪.৬০-৭৫; ১৩.১৪০.২-৪৫;
(হরি) ১৩.৭৩.৬০-৭৫; ১৩.১১৮.২-৪৫;
কালিকা পু. ৬১.৪২-৪৭]

বরাহ পুরাণে অবশ্য খুব স্পষ্টভাবেই বলা আছে যে, দেবী যখন দক্ষকন্যা ছিলেন তখন তাঁর নাম উমা ছিল। শিবকর্তৃক দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর গৌরী পরজন্মে শিবপত্নী হবার জন্য উগ্র তপস্যা করার জন্য হিমালয় পর্বতে গেলেন। সেখানে বহুকাল তপস্যা করার পর নিজের শরীরাগ্নিতে নিজ দেহ দগ্ধ করলেন এবং জন্ম নিলেন শৈলসুতা পার্বতী হয়ে। হিমালয়-গৃহে জন্মের পর তিনি উমা নামে বিখ্যাত হলেন এবং তাকে তখন

কৃষ্ণা নামেও ডাকা হত। হয়তো শরীরাগ্নিতে দগ্ধ হবার ফলেই তাঁর নাম কৃষ্ণা হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাঁর গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়নি। কেননা কৃষ্ণা সম্বোধনের পরেও পুরাণের বর্ণনায় তিনি অতীব শোভনা মূর্তিতে হিমালয়ের ঘরে অবস্থান করছিলেন—

স্বশরীরাগ্নিনা দগ্ধা ততঃ শৈলসুতাভবৎ।
উমা নামেতি মহতী কৃষ্ণা চেত্যভিধানতঃ॥
লব্ধা তু শোভনাং মূর্তিং হিমবন্তগৃহে শুভাম্।
পুনস্তপশ্চকারোগ্রং দেবং স্মৃত্বা ত্রিলোচনম্॥

পুরাণ জানিয়েছে—মহাদেবকে স্বামী হিসেবে পাবার জন্য উমা আবারও উগ্র তপস্যা করেন এবং শিব বৃদ্ধবেশে দেখা দিয়ে উমার মন বোঝার চেষ্টা করেন। অবশেষে উমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শৈলরাজের অনুজ্ঞায় তাঁকে বিবাহ করেন—

বিধিনা সোময়া পাণিং জগ্রাহ পরমেশ্বরঃ।

[বরাহ পু. ২২.৩-৪৫]

স্কন্দ পুরাণে পার্বতী-গৌরীর অন্য রূপ একানংশার সঙ্গে উমার একাত্মতা স্থাপিত হয়েছে—

ততস্তবাপি সহজা সৈকানংশা ভবিষ্যতি।
রূপাংশেন চ সংযুক্তা ত্বমুমাখ্যা ভবিষ্যসি॥

আবার অন্যত্র ওই স্কন্দপুরাণেই শিব বিষ্ণুকে বলছেন—যেমন আমি, তেমনই তুমি, যেমন তুমি তেমনই উমা, যেমন উমা তেমনই গঙ্গা—অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব, উমা এবং গঙ্গা—এঁরা সকলেই একাকার হয়ে গেলেন—মাহাত্ম্যে এবং মর্য্যাদায়—

যথাহং ত্বং তথা বিষ্ণো যথা ত্বন্তু তথা হ্যমা।
উমা যথা তথা গঙ্গা চতূরূপং ন ভিদ্যতে॥

*[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য), ১৮.২৪;
স্কন্দ পু. (কাশী/পূর্বার্ধ), ২৭.১৮৩]*

উমাতুঙ্গ এটি পবিত্র শিবক্ষেত্র। উমাতুঙ্গের বরফাবৃত শৃঙ্গ দর্শনে মানুষের মন পবিত্র হয় এবং অর্জিত পুণ্য অক্ষয় থাকে। শ্রাদ্ধকার্যের জন্য এটি একটি উত্তম স্থান। *[বায়ু পু. ৭৭.৮১-৮২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.৮৭-৮৮]*

☐ আবার কূর্ম পুরাণ মতে, এই তীর্থে উমাদেবী সর্বদা অবস্থান করেন।

[কূর্ম পু. ২.৩৬.৩১]

উমাদেবী দেবী ভগবতী বিনায়ক পীঠে দেবী উমা নামে প্রসিদ্ধা। *[দেবী ভাগবত পু. ৭.৩০.৭১]*

উমাবন হিমালয় পর্বতের উপর অবস্থিত একটি বন। এই বনেই মহাদেব অর্ধনারীশ্বর রূপ ধারণ করেছিলেন—

তত্রৈবোমাবনং নাম সর্বলোকেষু বিশ্রুতম্।
অর্দ্ধনারীনরং রূপং ধৃতবান্ যত্র শঙ্করঃ॥

[বায়ু পু. ৪১.৩৬]

☐ পুরাণে উমাবন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, দেবী ভগবতী, মহাদেবকে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য যখন কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তিনি এই উমাবনে এমন এক নিয়ম করেছিলেন যে, এখানে কোনো পুরুষ প্রবেশ করলেই সঙ্গে সঙ্গেই সে রূপবতী অপ্সরায় পরিণত হবে। এমনকি পশু ও পিশাচদের জন্য এই একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। একবার রাজা সুদ্যুম্ন এই উমাবনে প্রবেশ করে ইলা দেবীর রূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

*[বায়ু পু. ৮৫.২৫-২৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬০.২৭]*

☐ কুমায়ুন হিমালয়ের অন্তর্গত লাহুল জেলার কোটালগাদ ও ফোর্ট হেস্টিংসই উমাবনের আধুনিক অবস্থান বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

[GDAMI (Dey) p. 211]

উমাব্রত একজন ঋষি। ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্য তিনি নিজের মন থেকে বহু ঋষির জন্মদান করেন। উমাব্রত ব্রহ্মার এই যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন।

[বায়ু পু. ১০৬.৩৯]

উম্লোচা একজন বিশিষ্ট অপ্সরা। ইনি অর্জুনের জন্মোৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.১২৩.৬৫; (হরি) ১.১১৭.৬৯]

উরঃসঙ্কীর্ণ ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্গত একটি পার্বত্য জনপদ। পণ্ডিত S.M.Ali উত্তর চীনকেই ভদ্রাশ্ববর্ষ বলে চিহ্নিত করেছেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে উরঃসঙ্কীর্ণ উত্তর চীনেই অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা যায়। S.M.Ali আরও বলেছেন যে, এই অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতির নাম উরঃসঙ্কীর্ণ। তাদের নামানুসারেই সম্ভবত এই জনপদটির এরূপ নামকরণ।

তাছাড়াও বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে, এই উপজাতির মানুষের গায়ে রঙ সোনার পদ্মের মতো। অর্থাৎ হলুদ বা পীত বর্ণের। সেভাবে

বিচার করলেও বলতে পারি, উত্তর চীনের মানুষের স্বাভাবিক গাত্র বর্ণ হলুদ।

[বায়ু পু. ৪৩.২১; GP (Ali) p. 108]

উরকাম ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা অশ্মকের পুত্র উরকাম।

[বায়ু পু. ৮৮.১৭৮]

উরগ একটি প্রাচীন জনপদ, এই জনপদে বসবাসকারীরাও উরগ নামেই পরিচিত ছিল। বিভিন্ন পুরাণের একাধিক শ্লোক থেকে সিদ্ধ হয় যে, উরগ উপজাতি বলতে নাগ জাতিকেই বোঝায়। *[দ্র. নাগ]*

[মহা (k) ৬.৯.৫৪; (হরি) ৬.৯.৫৪; মৎস্য পু. ৫.১; ভাগবত পু. ২.১৬.৪৪]

উরগা একটি প্রাচীন নগর। অর্জুন দিগ্‌বিজয়কালে রাজা রোচমানকে বশীভূত করে উরগা নগরী জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ২.২৭.১৯; (হরি) ২.২৬.১৯]

উরুক্রিয় *[দ্র. উরুক্ষয়$_{১}$]*

উরুক্ষব পুরুবংশীয় রাজর্ষি ভরতের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভরদ্বাজ ভুমন্যু সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভুমন্যুর চার পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহাবীর্য্য। মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষব। উরুক্ষবের ঔরসে বিশালার গর্ভে ত্র্যষণ, পুষ্করি এবং কবি (বায়ু পুরাণ মতে ত্র্যয়ারুণি, পুষ্করী এবং কপি) নামে তিন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা সকলেই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন এবং 'উরুক্ষব' ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ হিসেবে খ্যাত হন।

[মৎস্য পু. ৪৯.৪০; বায়ু পু. ৯৯.১৬২]

উরুক্ষয়$_{১}$ কলিযুগে ইক্ষ্বাকুবংশীয় যেসব রাজা রাজত্ব করেছিলেন উরুক্ষয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রাজা বৃহদ্বলের পুত্র ছিলেন। বৎসদ্রোহ নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। ভাগবত পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে যে, বৃহদ্বলের পুত্র ছিলেন বৃহদ্রণ, তাঁর পুত্র উরুক্রিয়। উরুক্রিয়ের পুত্রের নাম বৎসবৃদ্ধ।

[মৎস্য পু. ২৭১.৪; ভাগবত পু. ৯.১২.১০]

উরুক্ষয়$_{২}$ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে উরুক্ষয়ের বংশ তাঁদের মধ্যে একটি। মহর্ষি উরুক্ষয় অঙ্গিরার বংশজাত একজন গোত্র প্রবর্তক ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.২৯]

উরুবল্ক বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের ঔরসে ইলার গর্ভজাত পুত্র। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৯]*

উরুশৃঙ্গ শাকদ্বীপের সীমায় অবস্থিত একটি বর্ষ পর্বত। *[ভাগবত পু. ৫.২০.২৬]*

উরুশ্রবা বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্তের বংশধারায় সত্যশ্রবার পুত্র ছিলেন উরুশ্রবা। দেবদত্ত নামে উরুশ্রবার এক পুত্র সন্তান হয়।

উর্ধ্বায়ন প্লক্ষদ্বীপে হংস, পতঙ্গ, উর্ধ্বায়ন ও সত্যাঙ্গ নামে যে চারটি বর্ণ আছে, তাদের মধ্যে উর্ধ্বায়ন অন্যতম। সম্ভবতঃ আমাদের সমাজে প্রচলিত বৈশ্য বর্ণের সমতুল্য এই উর্দ্ধায়ন বর্ণ।

[দেবী ভাগবত পু. ৮.১২.১২]

উর্ব কলিযুগে যেসব কুরুবংশীয় রাজা রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উর্ব। ইনি কুরুবংশীয় রাজা মেধাবীর পৌত্র। মেধাবীর পুত্র রিপুঞ্জয়ের ঔরসে তাঁর জন্ম। অবশ্য বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে বলা হয়েছে যে, কুরুবংশীয় রাজা মেধাবীর পুত্র ছিলেন নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের পুত্র মৃদু। রাজা উর্ব (পাঠান্তরে মৃদু) তিগ্ম নামে এক পুত্র লাভ করেন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.২১.১৩; (নবভারত) ৪.২১.৩]

উর্বরা একজন বিশিষ্ট অপ্সরা। মহর্ষি অষ্টাবক্র কুবেরের সভায় উপস্থিত হলে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য যে সব অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন উর্বরা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.১৯.৪৪; (হরি) ১৩.১৮.৪৪]

উর্বশী$_{১}$ স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশী অন্যতমা। তবে শুধু অন্যতমা বললে উর্বশীকে ভাল ভাবে বোঝা যায় না। মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচীদের মতো অপ্সরাদের ভীড়ের থেকে উর্বশীর অবস্থান একটু পৃথক। তিনি শ্রেষ্ঠতরা বলেই চিহ্নিত হয়েছেন সর্বত্র, উর্বশীকে কেন্দ্র করে যত কাহিনী পাওয়া যায় তাতে উর্বশীর উপস্থিতি, আচার-আচরণ, কার্যকলাপ সব কিছুতেই এমন একটা স্বতন্ত্র ভাব আছে। যেখানে কাহিনীতে অকথিত হলেও যেন বোঝা যায় যে, উর্বশী ঠিক আর পাঁচটা সাধারণ অপ্সরার মতো নন। স্বর্গসুন্দরীদের মধ্যেও তিনি অন্যতমা, শ্রেষ্ঠতমা।

স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাদের কথা উল্লিখিত হয়ে আসছে বৈদিক যুগ থেকেই। উর্বশীরও প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদের মন্ত্রেই। তবে উর্বশীর জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে পুরাণগুলিতে।

পুরাণে সাধারণভাবে অপ্সরাদের দক্ষকন্যা মুনি, প্রাধা-কিংবা অরিষ্টার গর্ভজাত সন্তান বলেই পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা আগেই জানিয়েছি, বাকি অপ্সরাদের ভীড়ে উর্বশীকে মিলিয়ে দেওয়া চলে না। পুরাণে তাই উর্বশীর জন্মবৃত্তান্তও অন্যান্য অপ্সরাদের তুলনায় পৃথক, স্বতন্ত্র।

পুরাকালে ভগবান শ্রীহরির অংশসম্ভূত নর-নারায়ণ নামে দুই যুগল ঋষি ছিলেন। তাঁরা বহুতর কৃচ্ছ্রসাধন করে বহু বছর ধরে তপস্যা চালিয়ে যাওয়ায় একসময় দেবতাদের মনেও ভয় দেখা দিল। দেবরাজ ইন্দ্র তো ভীষণই চিন্তিত হলেন যে, এবারে হয়তো তাঁর স্বর্গ-সিংহাসনটাই চলে যাবে। অনেক ভেবেচিন্তে ইন্দ্র তাই এই যুগল ঋষির সমাধি ভঙ্গ করার চেষ্টা করলেন এবং নর-নারায়ণকে রূপে ভোলাবার জন্য ডাক পড়ল স্বর্গসুন্দরী 'বারাঙ্গনা' অপ্সরাদের—

বারাঙ্গনা গণো'য়ং তে সহায়ার্থাং ময়েরিতঃ।

ইন্দ্র সোচ্ছ্বাসে তিলোত্তমা রম্ভাদের অনেক প্রশংসা করে বললেন—এঁরা একাই আমার এই গুরুতর কাজ সম্পন্ন করে দিতে পারে—

একা তিলোত্তমা রম্ভা কার্যং সাধয়িতুং ক্ষমা।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, স্বর্গবেশ্যা অপ্সরাদের অন্যতম কাজই হল তপস্বীদের বিচলিত করা, তাঁদের ধ্যানভঙ্গ করা। কিন্তু উর্বশীই বোধহয় এই স্বর্গসুন্দরীদের মধ্যে সব থেকে বেশি 'ডিগনিফায়েড'—যিনি বারবার, বারংবার দেবকার্য সাধনের জন্য মুনি-ঋষিদের ধ্যান ভাঙানোর কাজে ব্যবহৃত হননি, অন্তত মেনকা, ঘৃতাচী, রম্ভার মতো তো হননইনি। উর্বশী স্থানে যে এই অপ্সরাদের তুলনায় একটু উচ্চ, একটু পৃথক তা বোধহয় এ থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়। যাইহোক, আমরা আবার উর্বশীর জন্মকথায় ফিরে যাই।

ইন্দ্রের আদেশে রম্ভা তিলোত্তমা গেলেন গন্ধমাদন পর্বতে, নর-নারায়ণের তপোবনে। অপ্সরাদের আবির্ভাবে সেই তপোবনে অকালে ফুটল বসন্তের ফুল, কোকিল ডাকল বকুল গাছে—

বভুরঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাগ্রেষু মনোহরাঃ।

রম্ভা তিলোত্তমা মনোহরণ শরীর বিভঙ্গে নাচতে লাগলেন যুগল ঋষির সামনে, সঙ্গে চলল তন্ত্রী-লয় সমন্বিত গান। অপ্সরাদের নৃত্য গীতে যুগল ঋষির ধ্যান ভাঙল এবং সাময়িক বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে তাঁরা একে অপরকে জিগ্যেস করলেন—কী হয়েছে বলো তো? আজ কি হঠাৎ কালধর্মের বিপর্যয় ঘটে গেল—

কালধর্মবিপর্য্যাসঃ কথমদ্য দুরাসদঃ।

এমনটা তো হবার কথা ছিল না। এসব আলোচনা করতে করতেই নৃত্যপরা দুই অপ্সরা রম্ভা তিলোত্তমার দিকে চোখ পড়ল যুগল ঋষির। তাঁরা দেখলেন-শুধু রম্ভা, তিলোত্তমা নয়, মেনকা-ঘৃতাচী থেকে শুধু করে কাঞ্চনমালিনী বিদ্যুন্মালারাও সেখানে উপস্থিত। অপ্সরারা মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করতে এসেছেন দেবরাজের আদেশে, কিন্তু মুনি যুগলকে দেখে তাঁরা ভয়ও পাচ্ছেন একটু একটু। কিন্তু দেবকার্য সিদ্ধির জন্য মুনিদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আবারও নৃত্য আরম্ভ করলেন তাঁরা, যথেষ্ট কামোদ্দীপক সেই নৃত্য।

মুনিরা নিজেদের পরিশীলন অনুসারেই বুঝে গেলেন ব্যাপারটা। বুঝলেন—এতে অপ্সরাদের দোষ নেই কিছু। তাঁদের মনোহরণ ভঙ্গিতে এতটুকুও অভিভূত না হয়ে নারায়ণ ঋষি তাঁদের বললেন—তোমরা তো স্বর্গ থেকে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছ। তোমরা বসো, আমরা যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করব। তবে নারায়ণের মনে একটু রাগ-অভিমানও হয়তো হল—সেটা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি। তিনি মনে মনে ভাবলেন—দেবরাজ তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য তিলোত্তমা, রম্ভাদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ আর এমন কী! সৌন্দর্য্য বস্তুটার কি অন্ত আছে কোনো? আমি এদের থেকেও শতগুণ সুন্দরী, গুণবতী অপ্সরা সৃষ্টি করতে পারি নতুন করে—

বরাক্যঃ কা ইমাঃ সর্বাঃ সৃজাম্যদ্য নবাঃ কিল।

একথা ভাবতে ভাবতেই নারায়ণ নিজের উরুতে চপেটাঘাত করলেন একবার। নারায়ণের উরু থেকেই সৃষ্টি হল সেই সর্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীর, নারায়ণের ভাবনা অনুযায়ী যিনি রূপে গুণে অন্য অপ্সরাদের থেকে শতগুণ বেশি। উরু থেকে জন্মালেন বলে তাঁর নাম হল উর্বশী—

নারায়ণোরু সম্ভূতা হ্যুর্বশীতি ততঃ শুভা।

জন্মকথা অনুসারে এক হিসেবে উর্বশীকে এই নারায়ণ ঋষির কন্যা বলা যেতে পারে। যাইহোক

উর্বশীর রূপ দেখে উপস্থিত অপ্সরারা চমৎকৃত হলেন, লজ্জিতও হলেন। তাঁরা লজ্জায় নারায়ণ ঋষির সামনে মাথা নত করলেন। নারায়ণ বললেন—তোমাদের উপর কোনো ক্ষোভ নেই আমার। আমার এই উরু সম্ভবা উর্বশীকে আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তোষের জন্য উপহার হিসেবে পাঠাচ্ছি। এই পরমাসুন্দরীকে তোমরাই নিয়ে যাও তোমাদের সঙ্গে—

উপায়নমিয়ং বালা গচ্ছত্বদ্য মনোহরা।

অর্থাৎ জন্মলগ্নেই জানা গেল যে, উর্বশী অন্য অপ্সরাদের তুলনায় রূপে গুণে অনেকটাই বেশি, এক কথায় অনবদ্যা, অতুলনীয়া। রম্ভা-তিলোত্তমারা তাঁকে সসম্মানে নিয়ে গেলেন স্বর্গে, নিবেদন করলেন দেবরাজ ইন্দ্রের সামনে নর-নারায়ণ প্রেরিত উপহার হিসেবে। ইন্দ্র অবাক হলেন যুগল ঋষির তপস্যার শক্তি দেখে, যে শক্তিতে উর্বশীর মতো সুন্দরী রমণী সৃষ্টি হতে পেরেছে—

যেনোর্বশ্যঃ স্বতপসা তাদৃগ্‌রূপাঃ প্রকল্পিতাঃ।

এই শ্লোকে 'উর্বশী' শব্দটা বহুবচনে উল্লিখিত হয়েছে। আসলে নারায়ণ ঋষি তাঁর তপোবল ক্ষয় করে সৃষ্টি করেছিলেন অসামান্যা উর্বশীর—

তরসোৎপাদয়ামাস নারীং সর্বাঙ্গসুন্দরীম্।

আর স্বর্গ থেকে যে অপ্সরারা তাঁদের ভোলাতে এসেছিলেন, তাঁদের পরিচর্যার জন্যও তিনি আরও অনেক সমতুল্য অপ্সরাদের সৃষ্টি করেন।

এই সম্পূর্ণ কাহিনী থেকে উপাখ্যানের আবরণটুকু বাদ দিলে এটুকুই আমাদের মনে আসে যে, উর্বশী সমস্ত মনুষ্যকুলের তপস্যার ফল যেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গের অলৌকিকতার থেকেও নর এবং নারায়ণের মানুষী ভাবনাটাই বড়ো হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড়ো কথা—অন্য অপ্সরাদের জন্মকথা যেমন একসঙ্গে শুনিয়ে দিয়েছে পুরাণগুলি, ঠিক তেমন সাধারণভাবে উর্বশীর সৃষ্টি হয়নি। তাঁর সৌন্দর্য্য শুধুই স্বর্গলোক মাতিয়ে তোলা মোহিনী মায়ামাত্র নয়, তা তপস্যার ফল। বৈদিকগ্রন্থ থেকে শুরু করে সর্বত্র উর্বশীকে যে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়েছে, পুরাণকার তাঁর এই কাহিনীর মাধ্যমে সে কথাটাই যেন আরও একটু স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে দিলেন, একটু উচ্চস্বরেই বুঝিয়ে দিলেন যে, অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশীই প্রথমা।

ঋগ্‌বেদ থেকে শুরু করে মহাকাব্য-পুরাণে আমরা বহুবার বিশিষ্ট অপ্সরাদের নাম উচ্চারিত হতে দেখব, উল্লেখ হতে দেখব কোষগ্রন্থ অমরকোষেও, এমনকী মহাভারতের একটি শ্লোকে ভীষ্ম নয় জন প্রধান অপ্সরাকে প্রাতঃস্মরণীয়া, প্রণম্যা বলে উল্লেখ করেছেন—সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু প্রথম নামটি 'উর্বশী'।

তবে পুরাণ কাহিনীতে উর্বশীর নামকরণের ক্ষেত্রে নারায়ণের উরু থেকে জাত—এমন কথা থাকলেও শুক্লযজুর্বেদের টীকাকার মহীধর উর্বশীর নামের অর্থ একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

উরুঃ পৃথুঃ কামো বশো যস্যা সো'র্বশী।

উরু শব্দের অর্থ স্থূল। যিনি স্থূল কামনাকে নিজের বশে রাখতে সমর্থ তিনিই উর্বশী। নিরুক্তকার যাস্কও প্রায় একই ভাবনা থেকে 'উর্বশী' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন—

উরুর্বা বশো'স্যাঃ।

কোষগ্রন্থকার পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উর্বশী নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'উরু' শব্দের অর্থ যেমন পৃথু বা স্থূল, তেমনি উরু শব্দের অর্থ মহান্ বা এক অর্থে মহাপুরুষ। হরিচরণের মতে, যিনি মহাপুরুষদের বশীভূত করতে সমর্থ—তিনি উর্বশী।

[ঋগ্‌বেদ ৭.৩৩.১১-১২; বাজসনেয়ী সংহিতা
(Weber) ১৫.১৯, মহীধরের টীকা দ্রষ্টব্য;
মহা (k) ১.৭৪.৬৮; ১৩.১৬৫.১৫;
(হরি) ১.৮৮.৬৮; ১৩.১৪৩.১৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৬;
স্কন্দ পু. (আবন্ত/অবন্তীক্ষেত্র) ৮.২৯-৪১;
মৎস্য পু. ৬১.২৪-২৬;
পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) সৃষ্টি. ২২.২২-২৮]

□ তবে ঋগ্বেদের কাল থেকেই অপ্সরাশ্রেষ্ঠা'র পরিচয়ের পাশাপাশি উর্বশীর যে পরিচয়টি উচ্চারিত হয়ে এসেছে, তা হল—তিনি চন্দ্রবংশের আদি রাজা ঐল পুরূরবার প্রিয়তমা, তিনি চন্দ্রবংশীয় রাজকুলের আদি জননী। বস্তুত অপ্সরাদের যতই 'স্বর্গবেশ্যা' বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হোক না কেন, যতই বলা হোক ছলা-কলায় রূপে মন ভোলানোই তাঁর প্রধান কাজ—শুধু এইটুকু পরিসরে জীবনযাত্রায় স্বর্গীয় সুখ-ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য্য থাকলেও তার মধ্যে

একধরনের যান্ত্রিকতাও থাকে। অপ্সরারা এমন যান্ত্রিক জীবনে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে চাননি, রাখেনওনি। মহাকাব্য-পুরাণে বহুবার বহু অপ্সরাকেই আমরা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মদাত্রী, জননীর ভূমিকায় দেখতে পাব। হয়তো অপ্সরা বলেই তাঁরা তাঁদের পুত্রকন্যাদের প্রতি স্নেহ-মায়া প্রকট করতে পারেননি সেভাবে, আর পাঁচটা সাধারণ মায়ের মতো। তবু সন্তানধারণে তাঁরা অস্বীকৃত হননি বলেই বোঝা যায় যে, মাতৃত্বের পরিসরে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের হৃদয়েও কিছু কম ছিল না। ফলস্বরূপ বশিষ্ঠ অগস্ত্য, দ্রোণ, কৃপের মতো বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের আমরা অপ্সরা জননীর গর্ভে জন্ম নিতে দেখি, অপ্সরাগর্ভে জন্ম নিতে দেখি ভরতজননী শকুন্তলাকে। স্বর্গসুন্দরী অপ্সরা উর্বশীও মাতৃত্বের পরিসরে উন্নীত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন চন্দ্রবংশের আদি জননীর মর্য্যাদায়। তবে মাতৃত্বের আগেও উর্বশীর চরিত্রের যে দ্বিতীয় পর্য্যায়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা প্রেমিকার। স্বর্গলোকের মন ভোলানোর খেলা দূরে সরিয়ে রেখে উর্বশী নিজে এসে ধরা দিয়েছেন মর্ত্যের রাজা পুরূরবার ঐকান্তিক প্রেমের বাঁধনে।

উর্বশী-পুরূরবার প্রণয়ের সূচনাতেও একটি ছোটো কাহিনী আছে। বৃহদ্দেবতার মতো প্রাচীন গ্রন্থ থেকে শুরু করে পুরাণগুলিতেও সে কাহিনীর উল্লেখ মেলে। একবার আদিত্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। যুগল দেবতা মিত্র এবং বরুণ উপস্থিত ছিলেন সে যজ্ঞে। উর্বশীও এসেছিলেন সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ খেতে। প্রাথমিকভাবে দেখতে গেলে অত্যন্ত সহজ সরল পরিস্থিতি। উর্বশী যে নিজের ভাবে ভঙ্গিতে যুগল দেবতাকে লুব্ধ করার চেষ্টা করছিলেন তাও নয়। কিন্তু মুশকিল হল—উর্বশীর চলনেই নাচ, বলনেই গান। সুতরাং মিত্র এবং বরুণ দুজনেই তাঁকে দেখে মোহিত হলেন। মিত্রই প্রথম সঙ্গ কামনা করলেন উর্বশীর কাছে। উর্বশী সম্মতও হলেন। কিন্তু উর্বশী যেই মিত্রের সঙ্গে তাঁর পিছনে পিছনে চললেন সঙ্গে সঙ্গে বরুণ উর্বশীর পিছনে পিছনে আসতে থাকেন এবং তাঁর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করতে থাকেন। উর্বশী তাঁকে বললেন—মিত্র আমাকে পূর্বে বরণ করেছেন, অতএব আজ আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারিনা। বরুণ বললেন—ঠিক আছে, যাও তুমি। কিন্তু তোমার মনটি রেখে যাও আমার কাছে। উর্বশী তাতে সম্মত হলে মিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন—তুমি যখন এমন বেশ্যার মতো আচরণ করলে, তাহলে তুমি মর্ত্যে গিয়ে পুরূরবাকে ভজনা করো।

মিত্র এবং বরুণ—দুই দেবতাই পরস্পরকে অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন বটে, কিন্তু তাঁদের কামবেগ নিবৃত্ত হল না। তাঁদের বীর্য্য স্খলিত হল। মিত্র ও বরুণ—দুজনেই সেই স্খলিত বীর্য্য ধারণ করলেন জলকুম্ভের মধ্যে। সেই জলকুম্ভেই জন্ম হল বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্য মুনির—

জলকুম্ভে ততো বীর্যং মিত্রেণ বরুণেন চ।
প্রক্ষিপ্তমথ সঞ্জাতৌ দ্বাবেব মুনিসত্তমৌ॥

এই কাহিনী অনুযায়ী কিন্তু উর্বশীকে এক দিক থেকে বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্যের মতো মহান ঋষিরও জননী বলা চলে। ঋগ্‌বেদে মন্ত্রেই এই কাহিনীর প্রথম বীজ পাওয়া যায়, আর সেখানেও কিন্তু বেশ স্পষ্টভাবেই উর্বশীকে অগস্ত্য এবং বশিষ্ঠের জননী বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্য মিত্রাবরুণের তেজে উর্বশীর মন থেকে জন্মেছেন—

তত্তে জন্মোতৈকং বশিষ্ঠাগস্ত্যো যত্ত্বা বিশ
আজভার॥
উতাসি মৈত্রাবরুণো বশিষ্ঠোর্বশ্যা
মনসো'ধিজাতঃ।
দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে
পুষ্করে ত্বাদদন্ত॥

[ঋগ্‌বেদ ৭.৩৩.১০-১৩;
বৃহদ্দেবতা (মিত্র) ৫.১৩১-১৩৫, পৃ. ১৫২;
মৎস্য পু. ৬১.২৭-৩১; ২০১.২৫-২৯;
পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) সৃষ্টি ২২.২৯-৩৩;
ভাগবত পু. ৬.১৮.৬,
দেবীভাগবত পু. ৬.১৪.৬০-৬৬]

□ যাই হোক, মিত্রাবরুণের অভিশাপের ফলে একরকম স্থির হল যে, স্বর্গসুন্দরী উর্বশী মর্ত্যলোকের রাজা পুরূরবার প্রণয়িনী হবেন ভবিষ্যতে। কিন্তু তখনও পুরূরবাকে চেনেন না উর্বশী। তখনও তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষটির সঙ্গে।

স্বর্গলোকে বেশ ভালোই দিন কেটে যাচ্ছিল তাঁর। ইন্দ্রের দেওয়া বাসভবনে অলস-শৃঙ্গার রচনা করে, বৈজয়ন্ত প্রাসাদের স্ফটিক সভায় নৃত্য

কৌশল প্রদর্শন করে দিন কাটছিল। তারপর একদিন অন্যান্য অপ্সরার সঙ্গে উর্বশী গেলেন ধনপতি কুবেরের নৃত্যসভায়, অলকাপুরীতে। নৃত্যগীত শেষ করে রম্ভা, মেনকা, সহজন্যাদের সঙ্গেই উর্বশী ফিরে আসছিলেন ইন্দ্রপুরীতে। আর সঙ্গে ছিলেন প্রিয়সখী চিত্রলেখা।

কিন্তু অর্ধেক পথ আসতে না আসতেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হিরণ্যপুরে থাকতেন দানব কেশী। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর অত্যাচার এবং হঠাৎ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছিলেন বারেবারেই। মনোমোহিনী স্বর্গসুন্দরীদের ওপর যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়াটাও এই অত্যাচারের একটা অঙ্গ ছিল। কেশী দানব সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে হরণ করার। কুবের-সভা থেকে উর্বশী ফিরে আসছিলেন—এ খবর কেশীর জানা ছিল। সময়-মতো কেশী ঝাঁপিয়ে পড়লেন অপ্সরা-সুন্দরীদের ছোট্ট দলটির ওপরে। সবাইকে তিনি ধরলেন না। একমাত্র উর্বশী আর তাঁর প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে নিয়ে তিনি নিজের রথে উঠলেন এবং আকাশবাহী রথখানি চালিয়ে দিলেন সবেগে।

রম্ভা, মেনকা, সহজন্যা—যাঁরা উর্বশীর সহগামিনী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কান্নার রোল উঠল। সমস্বরে শব্দ শোনা গেল—বাঁচাও বাঁচাও! কে কোথায় আছ বাঁচাও!

এমন আর্তচীৎকার শুনে রথে চড়ে যিনি উর্বশীকে উদ্ধার করতে এলেন, তিনি চন্দ্রবংশের রাজা ঐল পুরূরবা। দানবের হাত থেকে উদ্ধার পাবার পর ত্রাণকর্তা সেই রাজার দিকে উর্বশী চেয়ে দেখলেন, এবং মুগ্ধ হলেন। পুরূরবা উর্বশীকে সসম্মানে ইন্দ্রলোকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন নিজ রাজ্যে। কিন্তু মর্ত্যের রাজা যে উর্বশীর হৃদয়াসনে স্থান পেয়ে গেলেন, তা বোধহয় পুরূরবা নিজেও তখনও বুঝতে পারেননি।

এদিকে উর্বশী দানবের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছেন—এ ঘটনায় ইন্দ্রলোকে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি এসে ইন্দ্রসভায় লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নাটক অভিনয় করাবার দায়িত্ব নিলেন। লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয়ের দায়িত্ব পড়ল অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীর উপর। কিন্তু নাটক অভিনয়ে উর্বশীর মন নেই। তাঁর মন পড়ে রয়েছে পুরূরবার কাছে। তবু ভরতমুনির আদেশ মতো অভিনয় করতেই হল।

নাটক আরম্ভ হল ইন্দ্রসভায়, নির্দিষ্ট দিনে, যথাসময়ে। মহাকবি কালিদাস তাঁর বিক্রমোর্বশীয় নাটকে উর্বশীর সেদিনের মানসিক অবস্থা বিশদে বর্ণনা করেছেন, যদিও পুরাণের বর্ণনা অতিসংক্ষিপ্ত।

লক্ষ্মীর ভূমিকায় উর্বশী নাটকের 'পার্ট' বলতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর প্রিয়বান্ধবী বারুণীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভিজ্ঞা মেনকা। লক্ষ্মীবেশে উর্বশী যেন দেব-দানবের সমুদ্রমন্থন থেকে এখনই উঠে এসেছেন—আদিম বসন্তপ্রাতে, মথিত সাগরে। ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে। সমুদ্রের ধারে দেব-দানব এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে একতম স্বামী-রূপে কাকে লক্ষ্মী বরণ করবেন—এই ছিল বারুণী-মেনকার প্রশ্ন—সখি সমাগত এতে ত্রৈলোক্য-সুপুরষাঃ সকেশবাশ্চ লোকপালাঃ। কতমেস্মিংস্তে ভাবাবিনিবেশঃ। ঠিক এইখানে লক্ষ্মীদেবীর দ্বিধাহীন উত্তর আসবার কথা— পুরুষোত্তম বিষ্ণুর প্রতিই আমার একমাত্র নিষ্ঠা। কিন্তু 'পুরুষোত্তম' শব্দটি আর লক্ষ্মীর মুখে উচ্চারিত হল না। লক্ষ্মীর মধ্যে থেকে কথা কয়ে উঠলেন উর্বশী এবং পুরুষোত্তমের জায়গায় লক্ষ্মী বলে উঠলেন আমি ভালোবাসি পুরূরবাকে—

ততস্তয়া পুরুষোত্তম ইতি ভণিতব্যে
পুরূরবসি ইতি নির্গতা বাণী।

সংলাপে ভুল হয়ে যাওয়াতে ভরতমুনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কঠিন অভিশাপ নেমে এল উর্বশীর ওপর—দেব-স্থান স্বর্গভূমিতে তোমার স্থান হবে না কোনো, তোমাকে যেতে হবে মর্ত্যভূমিতে। আগে একবার মিত্রাবরুণ অভিশাপ দিয়েছিলেন, এবার দিলেন ভরতমুনি। তবে উর্বশী যে তাতে খুব দুঃখ পেলেন তা নয়। তিনি মর্ত্যের রাজা পুরূরবার কাছে এলেন।

ভাগবত পুরাণ কিন্তু লক্ষ্য করেছে—শুধু যে পুরূরবার কথা ভাবতে ভাবতেই উর্বশী সংলাপ ভুলেছেন—তা কিন্তু নয়। মনঃসংযোগের অভাব ঘটার পিছনে একটা বাহ্য কারণও কিন্তু ছিল। তিনি দেবর্ষি নারদ—স্বর্গ মর্ত্যে যাঁর অবাধ বিচরণ। সেই নারদ সেদিন ইন্দ্রসভায় এসে

মর্ত্যরাজা পুরূরবার গুণগান করে শোনাচ্ছিলেন। উর্বশীর চঞ্চল মন চঞ্চলতর হয়ে উঠেছিল বারংবার পুরূরবার নাম শুনে। তারই পরিণাম সংলাপে ভুল। যাই হোক উর্বশী এলেন পুরূরবার কাছে। উর্বশীকে দেখে প্রথম দর্শনেই আত্মহারা হলেন পুরূরবা। উর্বশীকে প্রেয়সী রাজমহিষী হয়ে রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত হতে অনুরোধ করলেন পুরূরবা। রাজার কথা শুনে উর্বশী লজ্জানম্র মধুর স্বরে বললেন—আমাদের মিলনে কোনো বাধা নেই রাজা। শুধু আমার দিক থেকে কয়েকটি শর্ত আছে।

পুরূরবার তখন এমনই অবস্থা যে উর্বশীর শর্তপূরণ করা যদি প্রাণান্তকরও হয়, তাহলেও তিনি তা স্বীকার করতে সম্মত। উর্বশী শর্তগুলি বলতে লাগলেন একে একে। উর্বশী বললেন—মহারাজ! আমার দুটি মেষশিশু আছে। তাদের আমি পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করি।

সেই মেষ দুটি বাঁধা থাকবে আমার বিছানার পাশে। তুমি সে দুটিকে কখনো সরিয়ে নেবে না আমার কাছ থেকে—

শয়ন-সমীপে মমোরণকদ্বয়ং
পুত্রভূতং নাপনেয়ম্।

এই আমার প্রথম শর্ত। আমার দ্বিতীয় শর্ত—আমি যেন তোমাকে উলঙ্গ না দেখি, মহারাজ। তৃতীয় শর্ত—আমি শুধু মাত্র ঘি খেয়ে থাকব—ঘৃতামাত্রঞ্চ মমাহার ইতি। রাজা পুরূরবা সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে বললেন—তাই হবে—এবমস্তু।

পুরূরবা-উর্বশী বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার আগে আমরা একটা জরুরি কথা সেরে নিই। এখুনি যে উর্বশীর মুখে প্রাক্ বিবাহের শর্তাবলী শুনলাম—এই শর্তগুলি সমস্ত পুরাণে একই রকম। কিন্তু সবচেয়ে প্রাচীন যে গ্রন্থটি থেকে এই শর্তাবলীর কথা পুরাণগুলিতে এসেছে তার নাম শতপথ ব্রাহ্মণ, যা ঋগ্‌বেদের অব্যবহিত পরবর্তীকালেই রচিত। ঋগ্‌বেদে যে কাহিনীটুকু পাই তাতে মনে হয় উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার যেন পূর্বে মিলন হয়েছিল। সেই মিলনের পর উর্বশী রাজাকে ছেড়ে চলে গেছেন এবং কোনো ক্রমে আবারও দেখা হয়েছে অধিষ্যমান পুরূরবার সঙ্গে। পুরূরবা আকুল প্রেমিকের মতো তাঁকে ছেড়ে যেতে না করছেন এবং উর্বশী আপন তর্কযুক্তিতে রাজাকে নিরস্ত করে ফিরে যেতে বলছেন। এই হল ঋগ্‌বেদ।

পণ্ডিতরা অনুমান করেন—পুরূরবা-উর্বশী কাহিনীর দুটি স্তর আছে। সবচেয়ে পুরাতন স্তরটি—যা ঋগ্‌বেদে দেখতে পাই, তা অবশ্যই বিয়োগান্ত। কোশাম্বী (D. D. Kosambi) নানা জার্মান পণ্ডিতের মত আলোচনা তুলে দিয়ে বলেছেন—Hermann Oldenberg's discussion postulates a lost prose shell for the Vedic hymn without attempting to explain its many intrinsic difficulties. The original suggestion was made by Windisch, on the model of Irish myth and legend. The argument is that the Satapatha Brahmana version is much more comprehensible than the bare Rgveda dialogue, hence some such explanatory padding must originally have existed.

ঠিক এই কারণেই আমাদের শতপথ ব্রাহ্মণের পুরূরবা-উর্বশী সংক্রান্ত উপাখ্যানটি উল্লেখ করতে হবে। করতে হবে, কারণ মহাভারত-পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে শতপথের মিল সবচেয়ে বেশি। এমনকী গেলড্‌নারের মতো জার্মান পণ্ডিত শতপথের কাহিনীটিকে বেশি গুরুত্ব না দিলেও পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনীকে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছেন—the whole episode was just one more of such itihasa-puranas.

শতপথ ব্রাহ্মণে দেখছি—উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার যখন বিয়ে হয়, তখন উর্বশীর শর্তাবলীর মধ্যে মেষশিশু-দুটি রক্ষা করার শর্ত প্রথমেই ছিল না। শতপথের শর্তাবলীতে রীতিমতো আধুনিকা রমণীর পরিচ্ছন্নতা এবং বিদগ্ধতা আছে। উর্বশী বলেছেন—দিনের মধ্যে তিনবার তুমি আমার সঙ্গে আলিঙ্গন-রমণে মিলিত হতে পারবে রাজা! তবে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যেন কখনো আমার শয্যায় এসো না। আরও একটা কথা, আমি যেন কখনো তোমায় নগ্ন না দেখি। আমাদের মতো মেয়েদের সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করার এই নিয়ম—

অকামা স্ম মা নিপদ্যাসৈ মো স্ম ত্বা
নগ্নং দর্শমেষ বৈ ন স্ত্রীণামুপচার ইতি।

দেখুন, শতপথের বিবরণে প্রথমে মেষশিশুর শর্ত নেই কোথাও, তবে পরে মেষশিশুর প্রসঙ্গ এসেছে। আবার উর্বশীর ঘৃতাহারেরর প্রসঙ্গটি শতপথেও নেই, কিন্তু খোদ ঋগ্‌বেদেই তার উল্লেখ আছে যেহেতু, তাই পৌরাণিকেরা সেই সূত্র ধরেই একেবারে প্রথম মিলনের শর্তাবলীর মধ্যে ঘৃতাহারের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। পরের ঘটনাগুলি শতপথ ব্রাহ্মণ, পুরাণ এবং ঋগ্‌বেদ মিলিয়ে এইরকম দাঁড়াবে—

শতপথ বলেছে—তারপর উর্বশী বহুকাল বাস করলেন পুরূরবার সঙ্গে এবং এতকালই রইলেন যে, তিনি গর্ভিণীও হলেন—

সা হাস্মিঞ্জ্যোগুবাস।
অপি হাস্মাদ্‌গর্ভিণ্যাস।

শতপথের ভাষা প্রায় বেদের ভাষা, সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞের বোধগম্য নয় তত। কিন্তু পৌরাণিকেরা ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর মর্ত্যবাসে বহুকাল থাকারও অর্থ খুঁজে পেয়েছেন আধুনিক স্বচ্ছতায়। স্বপ্নলোকের অভীষ্টতমা রমণীটিকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করে পুরূরবার মন আর ঘরে টিকল না। কত সুন্দর সুন্দর জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়ালেন উর্বশীকে নিয়ে। এমন সব জায়গা—নিসর্গসৌন্দর্য্য যেখানে স্বর্গের আভাস দেয়, মনে হয় দেবতাদের বিলাসভূমি যেন ভূলোকে নামিত। নন্দনবন, চৈত্ররথনবন, অলকাপুরী—এই সমস্ত স্থানে উর্বশীর সঙ্গসুখে দিন কাটাতে লাগলেন পুরূরবা—

রেমে সুর-বিহারেষু কামং চৈত্ররথাদিষু।

কতদিন কেটে গেল রাজার, উর্বশীর সুখামোদী মিলন-চুম্বনে।

ওদিকে নন্দনবাসিনীর অভাবে স্বর্গপুরী অন্ধকার। দেবরাজ ইন্দ্র দিনে দিনে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছেন। উর্বশীর পদছন্দোহীন নৃত্যগীত স্বর্গের ইন্দ্রসভায় আর তেমন জমে ওঠে না। নায়িকাশ্রেষ্ঠের অভাবে ভরত মুনির নাট্য সম্প্রদায় ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। নামভূমিকায় উর্বশীহীন রঙ্গমঞ্চ—সে যেন প্রাণহীন শবশরীরের উদ্‌বর্তন। দেবরাজ গন্ধর্বদের ডেকে বললেন—আর নয়, এবার উর্বশীকে স্বর্গে নিয়ে এসো পুনরায়। উর্বশী ছাড়া আমার এই দেবসভা নিতান্তই বেমানান—

উর্বশী-রহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে।

শতপথ ব্রাহ্মণে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে গন্ধর্বদের কোনো মন্ত্রণা নেই। সেখানে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন স্বয়ং গন্ধর্বরা। তার কারণও আছে। খোদ বেদের মধ্যে অপ্সরারা সর্বত্রই প্রায় গন্ধর্বপত্নী—

তাভ্যো গন্ধর্বপত্নীভ্যো'প্সরাভ্যোকরং নমঃ।

বেদের মতো পুরাণে-ইতিহাসেও সর্বত্র অপ্সরাদের নাম উচ্চারিত হয় গন্ধর্বদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে। ভাগবতে কৃষ্ণের রাসনৃত্যের সময়ও অপ্সরা এবং গন্ধর্বদের একসঙ্গে নৃত্যের তালে তালে নাচ-গান করতে দেখছি—

জগুর্গন্ধর্বপতয়ো ননৃশ্চাপ্সরোগণাঃ।

তবু যে পৌরাণিকেরা উর্বশীর যন্ত্রণায় দেবরাজের মন্ত্রণসভা বসালেন গন্ধর্বদের সঙ্গে, তারও একটা তাৎপর্য্য আছে। বেদের মধ্যে অপ্সরারা প্রধানত গন্ধর্বপত্নী বলে পরিচিত হলেও দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের যে একটা ভোগ্যসম্বন্ধ আছে, সে কথাও বেদের মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। কুত্রাপি যেমন তাঁদের 'দেবপত্নী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে—দেবপত্নীপ্সরাবধীতম্ —তেমনই প্রকট হয়ে উঠেছে দেবতাদের সঙ্গে অপ্সরাদের প্রায় অবৈধ কোনো সম্পর্ক—

অপ্সরাজারম্ উপসিস্মিয়াণা।

দেবতারা অপ্সরাদের 'জার' অর্থাৎ উপপতি প্রেমিক। কাজেই উর্বশীর অভাবে গন্ধর্বরা যেমন চিন্তিত হতে পারেন, তেমনই বিচলিত হতে পারেন দেবতারা, এমনকী দেবরাজও।

যাই হোক, পুরূরবার ভালোবাসায় উর্বশী যখন আরও বেশি ভালোবেসে ফেলেছেন তাঁর মর্ত্যভূমির হৃদয়-রাজ্যকে এবং সেই ভালোবাসায় যখন তিনি স্বর্গভূমির সুখস্মৃতিও ভুলতে বসেছেন—

প্রতিদিন-প্রবর্ধমানানুরাগা অমরলোক-
বাসে'পি ন স্পৃহাং চাকর।

—ঠিক তখনই বুঝি মন্ত্রণা-সভা বসল গন্ধর্বলোকে অথবা একেবারে ইন্দ্রসভায়। উর্বশীকে মর্ত্যভূমি থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে ঊর্ধ্বলোকে। ঠিক এই জায়গায় শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা মেষ-শিশুর আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি—যে মেষ-শিশু দুটিকে গন্ধর্বরা এই এক্ষুনি গিয়ে

অলক্ষিতে বেঁধে দিয়ে এলেন উর্বশীর শয্যার দুই পাশে—

তস্যৈ হাবিদ্বর্য্যুরণা শয়ন উপবদ্ধাস। পুরাণের বর্ণনায় অবশ্য মেষ-দুটি বহু আগে থেকেই আছে।

প্রতিষ্ঠান-পুরের চারপাশে তখন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। রাজা অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে উর্বশীর আলিঙ্গনসুখে মত্ত আছেন। আবরণ-বস্ত্রের মর্যাদা নেই সামান্যতম। ঠিক এই সময় গন্ধর্ব বিশ্বাবসু অন্য গন্ধর্বদের সঙ্গে নিয়ে উর্বশীর অলক্ষে হরণ করে নিলেন একটি মেষশিশু। মেষের ডাক শুনে উর্বশীর প্রেমাচ্ছন্ন নিদ্রাসুখ ভগ্ন হল। তিনি হাহাকারে কেঁদে উঠলেন—আমার বীর স্বামী বেঁচে নেই নিশ্চয়, অথবা সহায় নেই সমব্যথী কোনো মানুষ, নইলে পুত্রস্নেহে লালিত আমার এই মেষশিশুটিকে হরণ করল কে—

শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায়—

অবীর ইব বত মে'জন ইব পুত্রং হরন্তীতি।

গন্ধর্বরা ততক্ষণে দ্বিতীয় মেষ-শিশুটিকেও হরণ করেছেন। উর্বশীর আর্তি শোনা গেল আবার একই ভাষায়—আমার স্বামী নেই, সহায় নেই—সা হ তথৈবোবাচ।

প্রথম মেষশিশু হৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা পুরূরবা টের পেয়েছেন। বিশেষত উর্বশীর আক্ষেপ-বচনও তাঁর কানে গেছে। তিনি শুধু ইতস্তত করেছিলেন। মেষচোর খুঁজবার জন্য ক্ষীণ দীপবর্তিকাটি জ্বালালেও যে উর্বশী তাঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পাবেন। আর তেমন দেখলে তো উর্বশী আর দ্বিতীয়বার লজ্জিত বাসর-সজ্জায়-সজ্জিত হয়ে ধরা দেবেন না পুরূরবার বাহুবন্ধনে। কিন্তু দ্বিতীয় মেষ শিশুটি হরণের পরে উর্বশীর ধিক্কার যেন রাজার হৃদয়ে শেল বিঁধিয়ে দিল। সুরশত্রু কেশী-দমন বীর রাজার পক্ষে এই অপবাদ সহ্য করা কঠিন হল। আর সত্যিই তো উর্বশী রাজার সম্বন্ধে মোটেই ভালো কথা বলেননি। শতপথ ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র দুটি কথা—'অবীর,' 'অজন'—পুরাণের শব্দে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—বীরের 'ব' নেই, নিজেই নিজেকে শুধু বীর মনে করে এমন একটা ক্লীব অসভ্য লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে—

হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা।

নইলে চোরে আমার ছেলে নিয়ে পালাচ্ছে আর উনি কিনা পুরুষ হয়েও মেয়েছেলের মতো দিনের বেলায় দরজা বন্ধ করে ভয়ে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে আছেন—

যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্।

যে উর্বশী পুরূরবার হৃদয়হারিণী বলে কথা, আকস্মিক তাঁর এই ভাব-পরিবর্তন রাজা পুরূরবাকে একবারে বিভ্রান্ত করে তুলল। তিনি যথাবৎ নগ্ন অবস্থাতেই উর্বশীর মেষ খুঁজতে যাবার উপক্রম করলেন। গন্ধর্বরা সময় বুঝে বিদ্যুতের জ্যোতির এক ঝলক সৃষ্টি করলেন নিমেষে। চল চপলার চকিত চমকে উর্বশী দেখলেন—রাজা উলঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্য রাজার এতদিনের ভালোবাসা তুচ্ছ করে উর্বশী প্রতিষ্ঠান-পুরের রাজপ্রাসাদে ছেড়ে চলে গেলেন চিরদিনের মতো—

তৎপ্রভয়া চোর্বশী রাজানম্ অপগতাম্বরং দৃষ্ট্বা অপবৃত্তসময় তৎক্ষণাদেব অপক্রান্তা। যে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রাজার প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হয়েছিল—আমাদের ভালোবাসা হোক চিরন্তনী—

রতি গৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ—

এক মুহূর্তে সেই ভালোবাসার বাঁধন ভেঙে দিলেন উর্বশী।

বিদগ্ধা স্ত্রীর কাছে আত্মগৌরব সাহঙ্কারে প্রকাশ করার জন্য সেই মধ্যরাত্রেই রাজা নগ্ন অবস্থাতেই বেরোলেন মেষ চোর ধরে আনতে। গন্ধর্বরা চকিত আলোর মায়া সৃষ্টি করেই বুঝেছেন— দেবকার্য সিদ্ধ হয়েছে। তাঁরা মেষ শাবক দুটি ফেলে রেখে পালিয়ে চলে গেলেন। রাজাও উর্বশী খুশি হবেন ভেবে সানন্দে মেষ দুটি হাতে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। দেখলেন শূন্য শয্যা। প্রিয়তমা পত্নী কোথায় চলে গেছেন। উর্বশীর প্রেমে উন্মত্ত রাজা সেই নগ্ন অবস্থাতেই তাঁকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন—

তাঞ্চ অপশ্যন্ অপগতাম্বর এব
উন্মত্তরূপো বভ্রাম।

সেই নন্দনবন, চৈত্ররথ, অলকা, গন্ধমাদন—সর্বত্র ঘুরেও রাজা উর্বশীর খোঁজ পেলেন না। রাজা বুঝলেন—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। গান্ধর্বী মায়ার চকিত আলোকে রাজাকে নগ্ন দেখা মাত্র উর্বশী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তবু উর্বশীকে ফিরে পাবার আশা ত্যাগ করলেন না পুরূরবা, উর্বশীর অনুসন্ধানও বন্ধ হল না। অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে কুরুক্ষেত্রে এসে এক

পদ্ম সরোবর দেখতে পেলেন পুরূরবা। দেখলেন—উর্বশী অন্যান্য অপ্সরা পরিবৃত হয়ে সেখানে স্নান করছেন। উর্বশীও কিন্তু দেখতে পেয়েছেন উদ্‌ভ্রান্ত বিরহকাতর রাজাকে। দেখা মাত্রই অপ্সরা সখীদের তিনি জানিয়েছেন—এই হলেন সেই মর্ত্য রাজা। যাঁর সঙ্গে এতকাল সহবাস করেছি আমি—

অয়ং বৈ স মনুষ্যো যস্মিন্নহমবাৎসম্ ইতি।

কুরুক্ষেত্রে যে পদ্ম সরোবরে পুরূরবা উর্বশীকে খুঁজে পেলেন, সেই পদ্ম দিঘির নাম 'অন্যতঃপ্লক্ষা'। এ সংবাদ পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে।

যাইহোক, উর্বশীর কথা শুনে অন্য অপ্সরারা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন পুরূরবার দিকে। প্রায় ঈর্ষাকাতর ভাষায় বললেন—ইচ্ছে হয়, আমরাও যেন এই মর্ত্যরাজার সঙ্গ সুখ লাভ করি। অপ্সরা পরিবৃত হয়ে উর্বশী রাজার দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়ালেন। পুরূরবা তো সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার বাহু-বন্ধনে বেঁধে ফেলেন আর কি! উর্বশী জানেন, অথবা এতদিন পুরূরবার সহবাস পরিচয়ের ফলে জেনেছেন যে, মর্ত্যের বন্ধন দেবতার চেয়েও অনেক বেশি, হয়তো মধুরতরও বটে। সে বন্ধনে একবার জড়ালে দেবতাকেও মায়া সৃষ্টি করতে হয় বন্ধনমুক্তির জন্য। উর্বশী তাই আর দাঁড়ালেন না। প্রিয়তম স্বামীকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে তাঁর অলস গমন শুরু হল। কিন্তু অলস-গমনা রমণীর সেই ললিত গতি পুরূরবার মনে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলল পুনর্বার। কথাটা ঋগ্‌বেদের জবানীতে এইরকম—

পুরূরবা বললেন—এত তাড়াতাড়ি তুমি চলে যেও না উর্বশী। তোমার হৃদয় কি এতই নিষ্ঠুর, আমাদের দু'জনের কিছু কথাবার্তা এখনই যে হওয়া উচিত—

হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি
মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।

উর্বশী নিজের চারপাশে স্বর্গীয় উদাসীনতা সৃষ্টি করে বললেন—কী হবে তোমার সঙ্গে কথা বলে—

কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং।

—আমি তো চলে এসেছি প্রথম উষার মতো। তুমি ফিরে যাও পুরূরবা। তুমি আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। হাওয়াকে যেমন হাত দিয়ে ধরা যায় না, তেমনই আমাকেও তুমি ধরে রাখতে পারবে না—

দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি।

পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গলাভের জন্য আকৃতি প্রকাশ করলেন। বললেন—এখন তুমি নেই, আর আমার তূণ থেকে বাণ নির্গত হয় না। তুমি আসার পর থেকে কোনো যুদ্ধে যাইনি। ললাটে অঙ্কিত হয়নি কোনো জয়টীকা। রাজকার্যে কোনো উৎসাহ নেই। আমার সৈন্যরা পর্যন্ত সিংহনাদ করে না। পুরূরবা এইটুকু বলেই থামলেন না। স্মরণ করলেন পুরনো দিনের কথা। এমনকি দিনে-রাতে তাঁর সোচ্ছ্বাস সম্ভোগ-স্মৃতিও পুনরুক্ত হল—

দিবানক্তং শ্নথিতা বৈতসেন।

স্বর্গসুন্দরী উর্বশী। কথা তিনি কিছু কম জানেন না। তিনি চলে এসেছেন। তাতে যে পুরূরবার কোনো দোষ ছিল না, রাজা যে তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদায় প্রেমে এবং আদরে রেখে ছিলেন, সে কথা তিনি সাবেগে স্বীকার করে নিলেন। বললেন—দিনের মধ্যে তিনবার তুমি আমায় আলিঙ্গন করতে রাজা। আমার কোনো সতীন আমার সমান আদর পায়নি তোমার কাছে, আমাকেই তুমি প্রতিনিয়ত সন্তুষ্ট করেছ। তুমি আমার রাজা, আমার বীর।

সন্দেহ নেই পুরূরবার স্ত্রী ছিলেন আরও কয়েকজন—সুজূর্নি, শ্রেণি, আপি, গ্রন্থিনী প্রমুখ। কিন্তু উর্বশী চলে আসার পর তাঁদের কারও সাহস হয়নি বিরহে আকুল রাজাকে সঙ্গ দেওয়ার। উর্বশী সে সব কথা জানেন। রাজাকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—পৃথিবী পালনের জন্য আমার গর্ভে পুত্র লাভ করেছ তুমি। কিন্তু তুমি তো আমার কথা শোননি। আমি তো বারবার বলেছি, কী হলে আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি শোননি। এখন আর এত কথা বলে কী লাভ—

অশাসং ত্বা বিদুষী সস্মিন্নহন্ন ম
আশৃণোঃ কিমভুগ্‌বদাসি।

উর্বশী পূর্বশর্তের কথা স্মরণ করিয়েও পুত্র জন্মের সান্ত্বনা দিয়ে পুরূরবার দগ্ধ হৃদয়ে সুখের কোমল প্রলেপ দিয়েছেন এবং শেষ কথা বলেছেন নির্দ্বিধায়—তুমি ঘরে ফিরে যাও। আর তুমি আমাকে পাবে না—

পরে হ্যস্তং নহি মূঢ়মাপঃ।

উর্বশীর কথা শুনে পুরূরবা মরতে চেয়েছেন। বলেছেন—তোমার প্রণয়ী দূর হয়ে যাক তোমার সামনে থেকে। সে যেন মরণের কোলে শয়ন করে, হিংস্র নেকড়েরা খেয়ে নিক তাকে—

অধা শায়ীত নিয়তেরুপস্থে অধৈনং
বৃকা রভসাসো অদ্যুঃ।

উর্বশী সপ্রণয়ে বলেছেন—এমন করে মরতে চেয়ো না পুরূরবা, এমন করে নষ্ট কোরো না নিজেকে। তুমি কি জানো না মেয়েদের মন কেমন কঠিন। স্ত্রীলোকের হৃদয় এবং নেকড়ের হৃদয় একই রকম, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা কি স্থায়ী হয় কখনো—

ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতাঃ।

পুরূরবা তবু বলেছেন—তুমি ফিরে এস উর্বশী। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার বিরহে—

নিবর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে।

কবিগুরুর উর্বশী কল্পনায় উর্বশীর যতই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে 'অবন্ধনা'—ভাবটুকু থাক বেদ-পুরাণ-মহাভারতের উর্বশী কিন্তু পুরূরবার প্রেমেই পড়েছিলেন। খোদ বেদে পুরূরবার প্রতি উর্বশীর শেষ পরামর্শ হল—দেবতারা বলছেন—তুমি তো এইভাবে মৃত্যুর দুয়ারে এসে পৌঁছেছ; তোমার পুত্র অবশ্যই দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করবে, আর তাতেই তুমি স্বর্গে গিয়ে পরমানন্দ লাভ করবে।

বেদের এই বিবরণের সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের কিছু তফাত আছে। শতপথের বিবরণ আরও মানবিক। শতপথ আর পুরাণগুলিতে দেখা যাবে-উর্বশী বলেছেন—কেন এমন অবিবেক পাগলের মতো ব্যবহার করছ—

অলম্ অনেন অবিবেকচেষ্টিতেন। আমি গর্ভবতী, আমার গর্ভে তোমারই পুত্র আছে। ঠিক এক বৎসর পরে আবার ফিরে এসো এইখানে। তোমার ছেলেকে দেব তোমারই হাতে। আর ঠিক এক রাত্রির জন্য তোমার সঙ্গে মিলন হবে আবার—

অব্দান্তে ভবতা অত্র আগন্তব্যম।
কুমারস্তে ভবিষ্যতে।
একাঞ্চ নিশাং ত্বয়া সহ বৎস্যামি।

বিষ্ণুপুরাণের এই গদ্যাংশের সঙ্গে ঋগবেদের অব্যবহিত পরবর্তী শতপথ ব্রাহ্মণের প্রায় কোনো তফাত নেই। শতপথে দেবতার কথা বলেননি উর্বশী। বলেছেন—গন্ধর্বরা তোমাকে বর দেবেন রাজা। তাঁদের তুমি বোলো—আমিও একজন গন্ধর্ব হতে চাই। পরের দিন সকাল বেলায় পুরূরবা গন্ধর্বদের কাছে গন্ধর্ব হবার বর চাইলেন—

যুস্মাকমেবৈকা'সানীতি।

কারণ গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদের সম্বন্ধ চিরন্তনী। এরপর পুরূরবা গন্ধর্বদের কাছ থেকে যজ্ঞের অরণিকাষ্ঠ এবং অগ্নিস্থালী লাভ করলেন। দুটি অরণি মন্থন করে অগ্নি উৎপাদন করে পুরূরবা আহুতি দিলেন যজ্ঞে আর সেই থেকে তিনি গন্ধর্ব হয়ে গেলেন—

তেনেষ্ট্বা, গন্ধর্বাণামেক আস!

আর গন্ধর্ব হয়ে যাওয়া মানেই চিরকাল উর্বশীর সঙ্গে প্রেমালাপ আর সহবাস। পুরূরবা এই চেয়েছিলেন—উর্বশীর সঙ্গে উর্বশী-লোকে চিরবাস।

তবে অগ্নিস্থালী লাভ করেই যে পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গে গন্ধর্বলোকে চলে গেলেন—এমনটা কিন্তু নয়। গন্ধর্বদের দেওয়া অরণিকাষ্ঠ এবং অগ্নিস্থালী নিয়ে ফিরে এলেন পুরূরবা। অরণি মন্থনে যে পবিত্র অগ্নি জন্মায়, সেই অগ্নিই পরবর্তী পুরাণগুলিতে বেদ বিখ্যাত অগ্নির তিন স্বরূপ—

গার্হপত্য অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি নামে বিখ্যাত হয়েছে। পুরূরবা সেই অগ্নির প্রণেতা বলেই তিনি বেদে অগ্নিদেবের বন্ধু বলে প্রশংসিত হয়েছেন। তাৎপর্যাপূর্ণ ভাবে অগ্নির উৎপত্তির ক্ষেত্রে জড়িয়ে গিয়েছে উর্বশীর নামটিও। এ ঘটনার এক বছর পরে প্রতিশ্রুতি মতো উর্বশী পুরূরবার কাছে এলেন। রাজার হাতে তুলে দিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং প্রতিশ্রুতি মতো একটি রাত বাস করলেন পুরূরবার সঙ্গে। তবে তার পরেও এক বছর অন্তর এক রাতের জন্য উর্বশী পুরূরবার কাছে এসেছিলেন বলে ধারণা হয় কারণ মহাকাব্যে এবং প্রায় সব কয়টি পুরাণেই উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার ঔরসজাত পুত্রের সংখ্যা ছয়টি—আয়ু ধীমান, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু এবং শতায়ু—মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী উর্বশীর গর্ভজাত

পুত্রদের নাম। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আয়ু চন্দ্রবংশীয় মূলধারার বাহক ছিলেন।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৯৫ সূক্ত; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৫.১.১-১৭, পৃ. ৮৫৫-৮৫৮; মহা (k) ১.৪৪.১০; ১.৭৫.২৩-২৫; ৫.১১৭.১৪ (হরি) ১.৩৯.১০; ১.৬৩.২৬-২৭; ৫.১০৮.১৪; পদ্ম পু. (নবভারত) সৃষ্টি. ১২.৫২-৭৫; মৎস্য পু. ২৪.১২-৩২; ভাগবত পু. ৯.১৪.১৬-৪৭; ৯.১৫.১; বিষ্ণু পু. ৪.৬.২০-৪৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৫.৪৬; ২.৬৬.৪-৫; বায়ু পু. ২.১৬; ৯১.৪]

☐ অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীর সম্পর্কে প্রচলিত উপাখ্যানগুলির মধ্যে উর্বশী-পুরূরবার উপাখ্যানই সর্বাধিক প্রচলিত এবং বিখ্যাত। তবে অন্যান্য অনেক ঘটনায় উর্বশীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

☐ মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, শতশৃঙ্গ পর্বতে ইন্দ্রের অংশে অর্জুনের জন্মগ্রহণের পর যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল, সেই উৎসবে উর্বশী সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন।

[মহা (k) ১.১২৩.৬৬; (হরি) ১.১১৭.৬৯]

☐ পাণ্ডবদের বনবাসের সময় অর্জুন যখন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য ইন্দ্রপুরীতে গিয়েছিলেন তখন ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের সম্মানে ইন্দ্রসভায় যে নৃত্যগীতের আয়োজন হয়েছিল, সেখানেও নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন উর্বশী। মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে, অর্জুন দেবসভায় চন্দ্রবংশের আদি পিতামহীকে দেখে চমৎকৃত হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু উর্বশীর প্রতি অর্জুনের সেই মুগ্ধ দৃষ্টিকে পিতা ইন্দ্র বুঝলেন একেবারে অন্যরকম। ইন্দ্রের ধারণা হল অর্জুন আকৃষ্ট হয়েছেন উর্বশীর প্রতি। তাই ইন্দ্র চিত্রসেন গন্ধর্বকে পাঠালেন উর্বশীর কাছে। আদেশ করলেন—স্বর্গসুন্দরী উর্বশী যেন অর্জুনকে তুষ্ট করেন। চিত্রসেন দেবরাজের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের রূপগুণের অনেক প্রশংসাও শোনালেন উর্বশীকে। উর্বশীর মনে অর্জুনের রূপ-গুণের বর্ণনা রেখাপাত করল যথেষ্টই, তিনি কামমোহিত হলেন। তারপর সন্ধ্যাবেলায় অভিসারিকার মতো সাজসজ্জা করে উর্বশী উপস্থিত হলেন অর্জুনের ভবনে। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ, প্রায় রাত্রিবেলা। অর্জুনের ভবনের দৌবারিক যখন অর্জুনকে জানাল যে উর্বশী এসেছেন—তখন অর্জুন একটু বিস্মিত হলেন। তারপর নিজে এসে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন উর্বশীকে। অর্জুন বিনীতভাবে উর্বশীকে বললেন—দেবী! আপনি অপ্সরাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, প্রধানা। আমি আপনার দাস মাত্র। আদেশ করুন, আপনার জন্য কী করব—

অভিবাদয়ে ত্বাং শিরসা প্রবরাপ্সরসাং বরে।
কিমাজ্ঞাপয়সে দেবি প্রেষ্যস্তে'হমুপস্থিতঃ॥

উর্বশী চিত্রসেনের মুখে শুনেছিলেন— অর্জুন নাকি তাঁর রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন। অর্জুনের রূপ-গুণের কথা শুনে উর্বশীও মনে মনে অর্জুনের সঙ্গকামনা করে এসেছেন অভিসারিকার সাজে সেজে। কিন্তু অর্জুন যেমন গুরুজনের মতো শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেন উর্বশীকে—তেমন আচরণ উর্বশী একেবারেই আশা করেননি। উর্বশী নিজে রীতিমতো অপ্রস্তুত, বিব্রতবোধ করতে লাগলেন। মাতৃরূপে পূজিত হবার অভ্যাস অপ্সরাদের থাকে না। কাজেই অর্জুনের ব্যবহার উর্বশীর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। বিস্ময়ের প্রথম পর্যায়টা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠে উর্বশী অর্জুনকে বললেন—চিত্রসেন গন্ধর্ব আমাকে বলছিলেন যে, তুমি ইন্দ্রলোকে আসার পর তোমার জন্যই দেবসভায় যে নৃত্যগীতের আয়োজন হয়েছিল, সেই সভায় তুমি নাকি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলে আমাকে। দেবরাজ এবং চিত্রসেন দুজনেই তোমার সেই মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে বুঝেছেন যে, আমার রূপে তুমি আকৃষ্ট হয়েছ। দেবরাজ তাই তোমার কাছে পাঠিয়েছেন আমাকে।

অর্জুন উর্বশীর কথা শুনে লজ্জায় কানে আঙুল দিলেন। তারপর বললেন—আমি যা শুনলাম, তা না শোনাই ছিল ভালো। মা! আমার কাছে মাতা কুন্তী যেমন, দেবী শচী যেমন, আপনিও তেমনই শ্রদ্ধার পাত্রী। আর আপনার দিকে সেদিনের নৃত্যসভায় আমি কেন অমন ভাবে তাকিয়েছিলাম, তাও বলি শুনুন। আপনাকে দেখে আমি ভাবছিলাম—ইনিই সেই উর্বশী যিনি আমাদের বংশের আদিপুরুষ পুরূরবার পত্নী, চন্দ্রবংশের আদি মাতা। আমাদের বংশের আদি-মাতা, প্রপিতামহীকে চাক্ষুষ দেখে আমার সত্যিই বিস্ময় হয়েছিল। অতএব আমি আপনার পুত্রের

মতো কিংবা পৌত্রের মতো। আপনি আমার সামনে এমন কথা আর বলবেন না। আপনি চলে যান।

অর্জুনের এই বারংবার মাতা, পিতামহী সম্বোধন উর্বশীর আর সহ্য হল না। তিনি অর্জুনের সঙ্গ কামনা করে নিশীথ রাতে অভিসারিকার সাজে সেজে এসেছিলেন অর্জুনের বাসভবনে। অর্জুনের আচরণে তিনি বিব্রত তো হলেনই, ক্রুদ্ধ হলেন তার চেয়েও বেশি। রাগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে উর্বশী অর্জুনকে শাপ দিলেন—তুমি আজ থেকে নপুংসক হও—

তস্মাত্ত্বং নর্তনঃ পার্থ স্ত্রী মধ্যে মানবর্জিতঃ।
অপুমানিতি বিখ্যাতঃ ষণ্ডবদ্বিচরিষ্যসি॥

অর্জুন অকারণে, বিনা অপরাধে এমন ভয়ঙ্কর অভিশাপ পেয়ে ভীষণ দুঃখিত হলেন। কিন্তু অর্জুনকে ইন্দ্র সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—উর্বশী তোমাকে যে অভিশাপ দিয়েছেন, তাতেও একদিক থেকে তোমার মঙ্গলই হবে। তুমি নপুংসক হয়ে নর্তকের বেশে এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে পারবে। কেউ তোমাকে চিনতেও পারবে না। অজ্ঞাতবাসের একটি বছর শেষ হলে তুমি শাপ মুক্ত হবে।

[মহা (k) ৩.৪৫.১-১৭; ৩.৪৬.১-৬৩; (হরি) ৩.৩৯.১-৭৬]

□ মহাভারতের সভাপর্বে কুবেরের সভায় যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানে কুবেরের সভায় অবস্থান করেন—এমন বিশিষ্ট অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশী অন্যতম। অনুশাসন পর্বে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে মহর্ষি অষ্টাবক্র যখন কুবেরের সভায় এসেছিলেন, সেই সময় যাঁরা অষ্টাবক্রর সম্মানে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন উর্বশী তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ২.১০.১১; ১৩.১৯.৪৪; (হরি) ২.১০.১১; ১৩.১৮.৪৪]*

□ মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মহর্ষি বিভাণ্ডক এক সময় একটি হ্রদে স্নান করছিলেন, সেই সময় হ্রদের তীরে অপ্সরা উর্বশীকে দেখে তাঁর চিত্ত চঞ্চল হল, জলের মধ্যেই বিভাণ্ডকের রেতস্খলিত হল। সেই সময় সেই হ্রদে এক হরিণী জলপান করছিলেন। মহর্ষি বিভাণ্ডকের স্খলিত তেজ সেই হরিণী জলের সঙ্গে পান করে ফেলেন। ফলে হরিণীর গর্ভে বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়।

[মহা (k) ৩.১১০.৩৫; (হরি) ৩.৯৩.১৪-১৫]

□ কূর্মপুরাণে তালজঙ্ঘবংশীয় রাজা দুর্জয় এবং উর্বশীর কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। একদিন রাজা দুর্জয় কালিন্দী নদীর তীরে অপ্সরা উর্বশীকে দেখতে পেলেন। উর্বশী সেখানে মধুর স্বরে গান করছিলেন। দুর্জয় উর্বশীকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং উর্বশীর কাছে গিয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা জানালেন। উর্বশীও সুপুরুষ রাজা দুর্জয়কে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফলে দুর্জয় এবং উর্বশী কালিন্দী তীরের উপবনে দীর্ঘকাল বিহার করতে লাগলেন। কতদিন কেটে গেল, রাজার সে দিকে লক্ষ্যই রইল না। অবশেষে হঠাৎ একদিন রাজার হুঁশ হল যে, তিনি দীর্ঘকাল রাজধানী ছেড়ে উপবনে উর্বশীর কাছে রয়েছেন—এবার তাঁর রাজপুরীতে ফেরা দরকার। রাজা উর্বশীর কাছে রাজপুরীতে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন। উর্বশী বললেন—আপনার সঙ্গে বিহার করে আমি এখনো পরিতৃপ্ত হইনি। আরও একটা বছর আপনি আমার কাছে থাকুন। রাজা দুর্জয় উর্বশীকে বললেন—আমি রাজপুরীতে গিয়ে আবার অল্পদিন পরেই ফিরে আসব। উর্বশী বললেন—ঠিক আছে, তাহলে প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো অপ্সরার সঙ্গে আপনি কখনো মিলিত হবেন না। রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন এবং ফিরে এলেন রাজপুরীতে। এর কিছুকাল পর রাজা দুর্জয় আবার উর্বশীকে স্মরণ করলেন কিন্তু সেই উপবনে ফিরে এসে কোথাও উর্বশীকে দেখতে পেলেন না। উর্বশীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে একসময় মানস সরোবরের তীরে উর্বশীর দেখা পেলেন। উর্বশীর সঙ্গে বিহার করে আবারও দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করলেন রাজা। উর্বশী কিন্তু বুঝতে পারলেন যে, রাজার এমন আচরণ তাঁর পতিব্রতা পত্নী, প্রজা, রাজ পুরোহিত সকলের অসন্তোষের কারণ হবে। তিনি তাই রাজাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজা দুর্জয় উর্বশীকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না। তখন বাধ্য হয়ে, দুর্জয় যাতে উর্বশীকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না তখন বাধ্য হয়ে, দুর্জয় যাতে উর্বশীকে দেখে বিরক্ত হন, সেই জন্য উর্বশী পিশাচীর মতো বিকট রূপ ধারণ করলেন। রাজা উর্বশীকে কুরূপা হতে দেখে বিরক্ত হলেন এবং উর্বশীকে ফেলে রেখে ফিরে এলেন রাজধানীতে। *[কূর্ম পু. ১.২৩.৬-৪৭]*

☐ ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে—একসময় প্রমতি নামে এক পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। একবার ইন্দ্রলোকে গিয়ে প্রমতি দেখলেন ইন্দ্র অন্যান্য দেবতা এবং অপ্সরা পরিবৃত হয়ে পাশা খেলছেন। ইন্দ্র দিগ্বিজয়ী রাজা প্রমতিকে দেখে অক্ষক্রীড়ার আমন্ত্রণ জানালেন। ইন্দ্র এবং প্রমতির এই পাশা খেলায় পণ রাখা হল অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে। খেলা আরম্ভ হল। এবং শেষপর্যন্ত রাজা প্রমতি জয়ী হলেন। উর্বশী ছাড়াও ইন্দ্রের জৈত্র নামক রথ, বজ্র-সবকিছুই পাশা খেলায় জয় করে নিলেন প্রমতি। পাশাখেলা সেখানেও থামল না। দেবগন্ধর্বরা তাঁদের গান্ধর্ববিদ্যা পণ রেখে প্রমতির সঙ্গে পাশা খেললেন। প্রমতি সেই গান্ধর্ববিদ্যাকেও জয় করলেন। এরপর অহঙ্কারে মত্ত হয়ে প্রমতি উর্বশীকে বললেন—তুমি গিয়ে আমার অন্যান্য দাসীদের সঙ্গে কাজকর্ম কর। অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশী একথায় আহত হলেন, অপমানিতও বোধ করলেন। তিনি বললেন—আমি দেবতাদের সঙ্গে যেমন আচরণ করি আপনার সঙ্গেও তেমনই আচরণ করব। কিন্তু আমাকে দিয়ে এমন সামান্য দাসীর কাজ করানো আপনার উচিত হয় না। একথা শুনে প্রমতি উপহাস করে উর্বশীকে বললেন—তুমি এমন লজ্জা করছ কেন? তোমার মতো সুন্দরী শত সহস্র দাসী আছে আমার, তারা সকলেই ঘরের কাজকর্মে নিযুক্ত। তুমিও তাদের সঙ্গেই কাজে লেগে যাও গিয়ে। প্রমতির এত বড়ো বড়ো কথা শুনে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ভ্রাতা চিত্রসেন অত্যন্ত বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি প্রমতিকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তাঁকে দ্যূতক্রীড়ার আমন্ত্রণ জানালেন। খেলা আরম্ভ হল। চিত্রসেনের কাছে প্রমতি ধাপে ধাপে পরাজিত হতে লাগলেন। উর্বশী থেকে আরম্ভ করে পাশাখেলায় জয় করা সমস্ত স্বর্গীয় সম্পদই প্রমতি একে একে হারলেন। উর্বশীও দাসীবৃত্তির থেকে মুক্তি পেলেন।

[ব্রহ্ম পু. ১৭১.১-৪৯]

☐ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ মাসে উর্বশী সূর্যের রথে অবস্থান করেন।

[ভাগবত পু. ১২.১১.৪১; বায়ু পু. ৫২.১৮; মৎস্য পু. ১২৬.১৯; বিষ্ণু পু. ২.১০.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু (মহর্ষি) ১.২৩.১৮]

☐ উর্বশী সম্পর্কে প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ থেকে শুরু করে পুরাণগুলি পর্যন্ত যে বহুসংখ্যক কাহিনী পাওয়া যায় তা থেকে প্রাথমিক ভাবে মনে হতে পারে যে, কোনো অজর অমর চিরযৌবনা কোনো সুন্দরীর কথা আমরা শুনছি বা পড়ছি। তবে তা না ভেবে এমনটাও ভাবা যেতে পারে যে, আদি অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীর নাম পরবর্তী সময়ে একটি প্রতিষ্ঠান বা ইন্সিটিউশনে পরিণত হয়েছিল। যিনি নৃত্য-গীতে এবং সৌন্দর্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হতেন, তিনিই আপন সময়কালে উর্বশী নামে বিখ্যাত হতেন।

উর্বশী$_{২}$ দেবী শক্তির একটি রূপ। দেবী শক্তি বদরিকাশ্রমে উর্বশী নামে পূজিত হন। লক্ষণীয়, বদরিকাশ্রম হল সেই স্থান, যেখানে নারায়ণের উরু থেকে অপ্সরা উর্বশীর জন্ম হয়, হয়তো অপ্সরা শ্রেষ্ঠা উর্বশীই এখানে দেবী শক্তির প্রতিরূপ হিসেবে পূজিত হন। *[মৎস্য পু. ১৩.৪৯]*

উর্বশীকুণ্ড ভস্মকূট পর্বতে অবস্থিত একটি তীর্থ। এখানে সুধা-শিলার মধ্যে উর্বশীর বাস। এই কুণ্ড দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশটি ধনুক এবং প্রস্থে বত্রিশটি ধনুকের সমান। দেবী কামাখ্যা এই কুণ্ডে অবস্থান করেন। এই তীর্থদর্শন অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক। এই পবিত্র কুণ্ডটির জলপান করলে মানুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

[কালিকা পু. ৭৯.৩৮-৪৩]

আসামের কামাখ্যা মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে উর্বশী-দ্বীপ বলে একটি স্থান রয়েছে। প্রাচীনকালে এখানেই একটি কুণ্ড ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সম্ভবত সেটিই উর্বশীকুণ্ড। এই উর্বশীকুণ্ডের কাছেই নীলাচল পাহাড়, যেটি কালিকাপুরাণ বর্ণিত ভস্মকূট পর্বত বলেই মনে হয়।

[Kamakhya Temple: Past and Present; Kaliprasad Goswami; p. 120]

উর্বশীতীর্থ$_{১}$ ব্রহ্মপুত্র নদীর বক্ষে অবস্থিত একটি তীর্থ। ভীষ্ম তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনাকালে যুধিষ্ঠিরকে এই পুণ্যক্ষেত্রের কথা বলেছিলেন। কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত কার্তিকমাসের পূর্ণিমায় উর্বশী তীর্থে স্নান করলে পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল পাওয়া যায়—

উর্বশীং কৃত্তিকাযোগে গত্বা চৈব সমাহিতঃ।
লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ॥

[মহা (k) ১৩.২৫.৪৬; (হরি) ১৩.২৬.৪৬]

উর্বশীতীর্থ$_{২}$ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে পুণ্য লাভ হয়

বলে উল্লিখিত হয়েছে। পদ্মপুরাণেও এই তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই তীর্থের অবস্থান উল্লিখিত হয়নি।

[মহা (k) ৩.৮৪.১৫৭; (হরি) ৩.৬৯.১৫৭; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) স্বর্গ. ৩৮.৬৪]

উর্বশীতীর্থ$_{৩}$ গোদাবরী নদী অর্থাৎ গৌতমী গঙ্গার তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। ব্রহ্মপুরাণে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে একটি কাহিনী উদ্ধার করা হয়েছে—

একসময় প্রমতি নামে এক পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। একবার ইন্দ্রলোকে গিয়ে প্রমতি দেখলেন ইন্দ্র অন্যান্য দেবতা এবং অপ্সরা পরিবৃত হয়ে পাশা খেলছেন। ইন্দ্র দিগ্বিজয়ী রাজা প্রমতিকে দেখে অক্ষক্রীড়ার আমন্ত্রণ জানালেন। ইন্দ্র এবং প্রমতির এই পাশা খেলায় পণ রাখা হল অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে। খেলা আরম্ভ হল। এবং শেষপর্যন্ত রাজা প্রমতি জয়ী হলেন। উর্বশী ছাড়াও ইন্দ্রের জৈত্র নামক রথ, বজ্র-সবকিছুই পাশা খেলায় জয় করে নিলেন প্রমতি। পাশাখেলা সেখানেও থামল না। দেবগন্ধর্বরা তাঁদের গান্ধর্ববিদ্যা পণ রেখে প্রমতির সঙ্গে পাশা খেললেন। প্রমতি সেই গান্ধর্ববিদ্যাকেও জয় করলেন। এরপর অহঙ্কারে মত্ত হয়ে প্রমতি উর্বশীকে বললেন—তুমি গিয়ে আমার অন্যান্য দাসীদের সঙ্গে কাজকর্ম কর। অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশী একথায় আহত হলেন, অপমানিতও বোধ করলেন। তিনি বললেন—আমি দেবতাদের সঙ্গে যেমন আচরণ করি আপনার সঙ্গেও তেমনই আচরণ করব। কিন্তু আমাকে দিয়ে এমন সামান্য দাসীর কাজ করানো আপনার উচিত হয় না। একথা শুনে প্রমতি উপহাস করে উর্বশীকে বললেন—তুমি এমন লজ্জা করছ কেন? তোমার মতো সুন্দরী শত সহস্র দাসী আছে আমার, তারা সকলেই ঘরের কাজকর্মে নিযুক্ত। তুমিও তাদের সঙ্গেই কাজে লেগে যাও গিয়ে। প্রমতির এত বড়ো বড়ো কথা শুনে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ভ্রাতা চিত্রসেন অত্যন্ত বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি প্রমতিকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তাঁকে দ্যূতক্রীড়ার আমন্ত্রণ জানালেন। খেলা আরম্ভ হল। চিত্রসেনের কাছে প্রমতি ধাপে ধাপে পরাজিত হতে লাগলেন। উর্বশী থেকে আরম্ভ করে পাশাখেলায় জয় করা সমস্ত স্বর্গীয় সম্পদই প্রমতি একে একে হারলেন। শেষ পর্যন্ত নিজের রাজকোষ, সৈন্য, রাজ্য সব কিছুই হারালেন প্রমতি। প্রমতির সর্বস্বান্ত অবস্থা দেখে তাঁর বালক পুত্র সুমতি বড়ো কষ্ট পেলেন। তিনি কুলপুরোহিত মধুছন্দাকে জিজ্ঞাসা করলেন হৃতরাজ্য, সম্পদ ফিরে পাবার উপায়। কুলপুরোহিতের উপদেশে সুমতি গৌতমীগঙ্গার তীরে গিয়ে কঠোর তপস্যায় ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করলেন। ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদে হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন সুমতি। সুমতির অনুরোধে দেবতা এবং গন্ধর্বরা প্রমতির সব অপরাধ ক্ষমা করলেন। গোদাবরীর তীরে যে স্থানে সুমতিকে ভগবান বিষ্ণু দর্শন দিয়েছিলেন, সেই স্থানটি উর্বশীতীর্থ বা কৈতবতীর্থ নামে বিখ্যাত।

[ব্রহ্ম পু. ১৭১.১-৪৯]

উর্বশীপুলিন একটি পবিত্র পিতৃতীর্থ। শ্রাদ্ধকার্যের জন্য স্থানটি অত্যন্ত শুভ। *[মৎস্য পু. ২২.৬৬]*

উর্বশীরমণ প্রয়াগের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। স্থানটিতে সম্ভবত হাঁসের আধিক্য থাকার কারণেই উর্বশীরমণ তীর্থকে হংসপাণ্ডুর শুভ্র বর্ণের বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তীর্থ দর্শনে ধন ও নারীসঙ্গ লাভ হয়। *[মৎস্য পু. ১০৬.৩৪-৪৩]*

উর্বশীরমণ সম্ভবত একটি মনোরম উদ্যান, যা প্রতিষ্ঠানপুরের প্রান্তে অবস্থিত ছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। পুরূরবা ও উর্বশী এই উদ্যানে বিহার করতেন বলেই সম্ভবত এর নাম উর্বশীরমণ। পণ্ডিত D.P. Dubey-র মতে প্রয়াগে গরিগা (Gariga) নদীর পূর্ব ধারে এখনো একটি বালুকাময় স্থান রয়েছে। তাঁর মতে এই স্থানটিতেই প্রাচীন উর্বশীরমণ অবস্থিত ছিল। হস্তিনাপুর সৃষ্টি হবার আগে প্রতিষ্ঠানপুরেই কৌরবদের পূর্বপুরুষরা রাজত্ব করতেন। পুরূরবার রাজত্বও এই প্রতিষ্ঠানপুরেই ছিল বলে মনে হয়। ফলে উর্বশীরমণ প্রতিষ্ঠানপুরের প্রান্তে হবারই সম্ভাবনা।

[Bharatiya Vidya, New Delhi; Vidya Bhavan; 1969; p. 16; Prayaga: the site of Kunbhamela; D.P. Dubey: p. 39]

উর্বশীশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৭২]

উর্বস সিন্ধুনদের জলসিঞ্চিত একটি জনপদ। এটি সম্ভবত কাশ্মীরের অন্তর্গত একটি স্থান।

[মৎস্য পু. ১২১.৪৭]

উর্মিকুণ্ড এক নরক বিশেষ। এই নরকে পাপীরা বিভিন্ন কদাকার জন্তুদের দ্বারা দংশন-ক্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। *[দেবীভাগবত পু. ৯.৩৭.৬৮-৭০]*

উললা *[দ্র. আরুণি]*

উলূক$_{১}$ গান্ধাররাজ শকুনির পুত্র। শকুনির এই পুত্রকে আমরা সর্বপ্রথম দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত থাকতে দেখি। লক্ষণীয়, দ্যূতকার অনেক সময়েই 'কিতব' নামেই বিখ্যাত হতেন। কিতব অর্থই দ্যূতকার। আর সর্বশ্রেষ্ঠ দ্যূতকার বলে শকুনি কিতব অভিধা লাভ করেছিলেন। ধূর্ত, খলস্বভাব দ্যূতকার শকুনির পুত্র বলে উলূক বহুক্ষেত্রে কৈতব্য নামে চিহ্নিত হয়েছেন। পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে নিজের পরিচয় হিসেবে বহন করতে হয়েছে সারা জীবন ধরে।

[মহা (k) ১.১৮৬.২২; (হরি) ১.১৭৯.২২]

☐ দ্যূতসভা, পাণ্ডবদের বনবাস প্রভৃতি সময়ে উলূক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সম্ভবত এই দীর্ঘসময় তিনি পিতার থেকে দূরে পিতৃরাজ্য গান্ধারে অবস্থান করছিলেন। দীর্ঘকাল পর উদ্যোগ পর্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধোদ্যোগের সময় আমরা উলূককে উপস্থিত থাকতে দেখি। সম্ভবত যুদ্ধ উপলক্ষ্যে তিনি গান্ধার সৈন্য নিয়ে হস্তিনাপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নকুল 'কৈতব্য' উলূককে যুদ্ধে বধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলেও জানা যায়।

যুদ্ধের দিন কয়েক আগে দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে দুর্যোধন শকুনিপুত্র উলূককে পাণ্ডবশিবিরে দূত হিসেবে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে উলূকের সঙ্গে যে সব বার্তা পাণ্ডব শিবিরে পাঠানো হয়েছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় বেশ কিছু কটুবাক্য বলে পাণ্ডবদের অপমান করে যুদ্ধে উত্তেজিত করা ছাড়া এই দৌত্যকর্মের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তবে শকুনিপুত্র উলূক এই পর্যায়ে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা থেকে মনে হয় কুরু-পাণ্ডবের পারস্পরিক বিদ্বেষের ব্যাপারে তাঁর পিতা যত উৎসাহী ছিলেন, তিনি নিজে ততটা উৎসাহী ছিলেন না। পাণ্ডবদের তিনি সম্মানও করতেন। তাঁদের বীরত্বকে খানিকটা সমীহও করতেন। দূত হিসেবে পাণ্ডবশিবিরে পৌঁছেই তাই তিনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বলেছেন—মহারাজ! আপনি দূতের কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। আমাকে দুর্যোধন যা বলতে বলেছেন, আমি আপনাদের ঠিক সেই কথাই বলব। আমি দূতমাত্র, অতএব আপনারা আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন না—

অভিজ্ঞ্য দূতবাক্যানাং যথোক্তং বদতো মম।
দুর্যোধনসমাদেশং শ্রুত্বা ন ক্রোদ্ধমর্হসি॥

দুর্যোধনের আদেশ মত উলূক কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবদের গালাগালি দিলেন। পাণ্ডবদের প্রত্যুত্তর শুনেই বোঝা যায় এতে তাঁরা ক্রুদ্ধও হয়েছেন যথেষ্ট। বস্তুত, উলূকের এই দৌত্যকর্ম পাণ্ডবশিবিরের যুদ্ধোদ্যম অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছিল। *[মহা (k) ৫.৪৭.৯; ৫.৫৭.২৩; ৫.১৬০-১৬৪ অধ্যায়; (হরি) ৫.৪৭.৯; ৫.৫৭.২৩; ৫.১৪৯-১৫২ অধ্যায়]*

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিনেই চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুর সঙ্গে উলূকের তুমুল যুদ্ধ হয়। ভীষ্মপর্বে যুদ্ধের পঞ্চম দিনে সহদেব উলূককে আক্রমণ করেন। দ্রোণপর্বে দুর্যোধনের অনুরোধে শকুনি অর্জুনকে আক্রমণ করলে উলূকও শকুনিকে সহায়তা করার জন্য অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। অর্জুনের বাণে শকুনির রথের ঘোড়াগুলির মারা গেলে শকুনি নিজের রথ ত্যাগ করে পুত্র উলূকের রথে আশ্রয় নিয়েছেন। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর কৌরবসৈন্য রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এই সময় উলূককেও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে দেখা যায়। কর্ণ পর্বের সূচনায় কৌরব সেনাপতি কর্ণ যে মকরব্যূহ রচনা করেন তার নেত্রভাগে শকুনি এবং উলূক অবস্থান করছিলেন। এই দিন পাণ্ডবশিবিরে যোগদানকারী ধার্তরাষ্ট্র যুযুৎসুর সঙ্গে উলূকের গুরুতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। যুযুৎসু সেই যুদ্ধে উলূকের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কর্ণপর্বেই একবার সহদেবের সঙ্গে উলূকের তুমুল যুদ্ধ হয়। উলূক পরাজিত হয়ে পালিয়ে ত্রিগর্ত সেনাদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেন। প্রায় একই সময়ে সাত্যকির হাতে পরাজিত হয়ে রথহীন অবস্থায় শকুনি পুত্র উলূকের রথে আশ্রয় নেন। কর্ণবধের পর যে সব যোদ্ধারা কৌরব শিবিরে জীবিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উলূকের নামোল্লেখ পাই।

শল্যপর্বের সূচনাতেই নকুল ও সহদেব শকুনি এবং উলূককে আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত সহদেবের হাতে উলূকের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৬.৪৫.৭৮-৭৯; ৬.৭২.৫; ৭.১৭১.৩৬-৩৯; ৭.১৯৩.১৪; ৮.৭.১৯; ৮.১১.১৫; ৮.২৫.১-১২; ৮.৪৬.১২; ৮.৪৮.৩০; ৮.৬১.১২, ৪২-৪৪, ৪৯; ৯.১.২৬; ৯.৮.৩৩; ৯.২২.২৮-২৯; ৯.২৮.২৯-৩৩; (হরি) ৬.৪৫.৭৮-৭৯; ৬.৭১.৫; ৭.১৪৮.৩৭-৩৯; ৭.১৬৫.১৪; ৮.৫.১৯; ৮.৮.১৫; ৮.২০.১-১২; ৮.৩৫.১২-১৩; ৮.৩৬.৫৪; ৮.৪৭.১২, ৪২-৪৪, ৪৯; ৯.১.২৪; ৯.৬.৩২; ৯.২০.২৬; ৯.২৬.২৭-৩১]

উলূক$_{২}$ একজন যক্ষ। অমৃত আনয়নের সময় গরুড়ের সঙ্গে যেসব যক্ষবীরের যুদ্ধ হয় উলূক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ১.৩২.১৯; (হরি) ১.২৭.১৯]*

উলূক$_{৩}$ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের একজন পুত্র। তপস্যারতা অম্বা তীর্থ পর্যটনের সময় উলূকের আশ্রমে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে অন্যান্য ঋষি মহর্ষিদের সঙ্গে ইনিও কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন।

[মহা (k) ৫.১৮৬.২৬; ১২.৪৭.১১; ১৩.৪.৫১; (হরি) ৫.১৭৬.২৬; ১২.৪৬.১১; ১৩.৩.৭০]

উলূক$_{৪}$ মহাভারতের সভাপর্বে অর্জুনের দিগ্বিজয় যাত্রার পথে আমরা উলূক নামে এক জনপদ তথা জনজাতির নাম উল্লেখ পাই। অর্জুন মূলত উত্তরদিক জয় করেন এবং যেসব দেশ বা রাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল তাদের মধ্যে বেশিরভাগই হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের জনপদ। উলূকও এমনই একটি পার্বত্য জনপদ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এবং মহাভারতে অন্যত্র এটি উলূত নামেও চিহ্নিত। উলূক জাতির রাজা বৃহন্ত অর্জুনের হাতে পরাজিত হন। পণ্ডিতেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগদানকারী কুলূত জনজাতির সঙ্গে উলূক বা উলূত জনজাতিকে অভিন্ন এবং একাত্ম বলেই মনে করেছেন। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে উত্তর-পশ্চিমের জনপদ হিসেবে এই কুলূতের নামোল্লেখ পাই। বর্তমান পঞ্জাবে বিপাশা নদীর তীরে যে কুলু অঞ্চলটি অবস্থিত পণ্ডিতরা তাকেই প্রাচীন উলূক বা কুলূত জনপদ বলে চিহ্নিত করেছেন।

[মহা (k) ২.২৭.৫-১০; ৬.৯.৫৪; (হরি) ২.২৬.৫-১০; ৬.৯.৫৪; বৃহৎ সংহিতা ১৪.২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. ১.১৬.৪৮; IKP (Agrawala), p. 54]

উলূক$_{৫}$ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধারায় বলের পুত্র ছিলেন উলূক। বজ্রনাভ নামে উলূকের এক পুত্রসন্তান হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.২০৫]

উলূক$_{৬}$ দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের অন্যতম পুত্র।

[মৎস্য পু. ৬.১৪]

উলূক$_{৭}$ ষড়্‌বিংশতিতম দ্বাপরে যখন মহর্ষি পরাশর ব্যাস হবেন, ভগবান শিব সেই সময় সহিষ্ণু নামে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর যে চারজন পুত্র হবে উলূক তাঁদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ২৩.২১৩]

উলূক$_{৮}$ সপ্তবিংশতিতম দ্বাপরে যখন মহর্ষি জাতুকর্ণ ব্যাস হবেন, ভগবান শিব সেই সময় সোমশর্মা নাম গ্রহণ করে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। সোমশর্মার চার পুত্র সন্তানের মধ্যে উলূক একজন। *[বায়ু পু. ২৩.২১৬]*

উলূক$_{৯}$ বেণুমন্ত পর্বতের উপরিভাগে বিদ্যাধরদের বাস। উলূক বিদ্যাধরগণের অন্যতম অধিপতি ছিলেন। *[বায়ু পু. ৩৯.৩৮]*

উলূক$_{১০}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভে কাকী, শ্যেনী প্রভৃতি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী কাক এবং উলূক বা পেচককুলের জন্মদাত্রী ছিলেন কাকী। পুরাণে অবশ্য উলূকদের তাম্রার কন্যা ভাসীর সন্তান বলা হয়েছে। মৎস্য পুরাণে এঁদের শুকীর সন্তান বলা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৬.৩১; বিষ্ণু পু. ১.২১.১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৫৫; মহা (k) ১.৬৬.৫৭; (হরি) ১.৬১.৫৬]

□ উলূক বা পেচক প্রাচীনকালে দুর্লক্ষণ বা উৎপাতের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হত। মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে রাজভবনের দ্বারে বা গৃহে যদি উলূক দেখা যায় সেই রাজার হয় ধন সম্পদ নষ্ট হয়, নয়তো মৃত্যু হয়।

[মৎস্য পু. ২৩৭.১২]

উলূকজিৎ ভণ্ডাসুরের বোন ধূমিনীর পুত্র। ইনি

ভণ্ডাসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধে দেবী ললিতার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২১.৮৪; ৩.২৮.৬, ৩৮, ১০০]

উলূকী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। উলূকী সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৫]*

উলূখল *[দ্র. যজ্ঞায়ুধ]*

উলূত *[দ্র. উলূক$_4$]*

উলূপ পুরাণে মহর্ষি অত্রির গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উলূপের বংশ তার মধ্যে একটি। উলূপ অত্রি বংশের একজন গোত্র প্রবর্তক ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৮.৫]

উলূপী ঐরাবত কুলে জাত নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা। এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের ভার্য্যা উলূপী। দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডবের বিবাহের পর পাণ্ডব ভাইদের মধ্যে যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়, তার জন্য নারদের পরামর্শে পাণ্ডবরা একটি উপায় স্থির করেন। তা হল—দ্রৌপদী এক-এক বছর করে তাদের প্রত্যেকের ঘরে বাস করবেন। আর কোনো একজনের সঙ্গে দ্রৌপদী বাস করার সময় যদি অন্য কেউ এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে সেই অন্যজন ব্রহ্মচারী হয়ে বারো বছর বনে বাস করবেন। এরপর একদিন একটা ঘটনা ঘটল। জনৈক ব্রাহ্মণের গোরু দস্যুরা চুরি করল। এতে ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ হয়ে দেশের রাজার প্রতি দোষারোপ করে পাণ্ডবদের উদ্দেশে আক্রোশ প্রকাশ করছিলেন।

কথাগুলি অর্জুনের কানে যায় এবং ব্রাহ্মণের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিতে যান। সেই ঘরে তখন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অবস্থান করছেন। অর্জুন দস্যুদের হাত থেকে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি রক্ষা করলেন বটে কিন্তু নিয়ম ভঙ্গের কারণে তিনি বারো বছরের জন্য ব্রহ্মচারী হয়ে বনে যেতে বাধ্য হলেন। অনেক তীর্থ, বন-পাহাড়-নদী পেরিয়ে এসে অর্জুন উপস্থিত হলেন গঙ্গাদ্বারে—যার বর্তমান নাম হরিদ্বার। গঙ্গাদ্বারের অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে অর্জুনের মন পুলকিত হয়ে উঠল এবং তিনি সেখানে একটি আশ্রম বানিয়ে ফেললেন—

স গঙ্গাদ্বারমাসাদ্য নিবেশমকরোৎ প্রভুঃ।।

ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ করে যজ্ঞের আগুন জ্বাললেন, আরম্ভ হল অগ্নিহোত্র, পুষ্পাহুতি, যজ্ঞাগ্নি-সংরক্ষণ। গঙ্গার ওপর থেকে অর্জুনের এই ক্রিয়াকাণ্ড দেখতেও পেতেন অনেকে—

তেষু প্রবোধ্যমানেষু জ্বলিতেষু হুতেষু চ।
কৃতপুষ্পোপহারেষু তীরান্তরগতেষু চ॥

এইরকম চলছে, তার মধ্যে একদিন ব্রাহ্মণরা কাজেকর্মে মনোযোগ দিতেই অর্জুন নামলেন গঙ্গায় স্নান করতে। গঙ্গাদ্বারের শীতল জলে স্নান করে স্নিগ্ধ হবার পর পিতৃলোকের তর্পণ করলেন অর্জুন। স্নান-তর্পণের পর অগ্নিহোত্র সম্পন্ন করার ইচ্ছে হল তাঁর। অর্জুন জল থেকে উঠতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই এই ঘটনা ঘটল। নাগকন্যা উলূপী এসে অর্জুনের পা টেনে ধরে তাঁকে জলের ভিতরে টেনে নিয়ে গেলেন—

অবকৃষ্টো মহাবাহুর্নাগরাজস্য কন্যয়া॥

অর্জুনও কোনো বাধা না দিয়ে নাগসুন্দরীর টানে চলে গেলেন গভীর জলে—অন্তর্জলে মহারাজ উলূপ্যা কাময়ানয়া।। অর্জুনকে নিয়ে এসে উলূপী দাঁড় করালেন কৌরব্য ভবনের অগ্নিশরণ গৃহে, যেখানে অগ্নিহোত্র কর্ম সম্পন্ন করা যায়। অসমাপ্ত অগ্নিহোত্র সমাপ্ত করে অর্জুন উলূপীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

উলূপী জানান যে, তিনি ঐরাবত বংশীয় নাগ কৌরব্যের কন্যা। প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর অর্জুন উলূপীকে বললেন— তুমি হঠাৎ এইরকম একটি দুঃসাহসিক কাজ কেন করলে—কিমিদং সাহসং ভীরু কৃতবত্যসি ভাবিনি। উলূপী কোন ভনিতা না করে স্পষ্ট ভাবে বললেন—আপনি যখন গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছিলেন, তখন আপনাকে দেখেই আমি মোহিত হয়েছি। আপনাকে পাবার জন্য আমার শরীর ও মন উৎসুক হয়ে আছে। আমি চাই আপনিও নিজেকে দান করুন আমাকে এবং আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন—

দৃষ্টৈব পুরুষব্যাঘ্র কন্দর্পেণাস্মি পীড়িতা॥

সেকালে নারীই হোক বা পুরুষ নিজের অভিলাষ অকপটভাবে স্বীকার করতে যে তাদের লজ্জা হত না তা উলূপীকে দেখলে বোঝা যায়।

অর্জুনকে তিনি বলেছেন—আপনাকে পাওয়ার জন্য যেমন আমি ব্যাকুল হয়ে আছি,

ঠিক তেমন আপনারও উচিত আমার প্রিয় আচরণ করা। আর এমনও নয় যে আমার একটি স্বামী আছে, যার কাছে আমি আত্মনিবেদন করতে পারি। তাই আমাকে নিয়ে আপনার দ্বিধার কোনো কারণ নেই।

অবশ্য বর্তমানে উলূপীর স্বামী না থাকলেও পূর্বে ছিল। অর্থাৎ উলূপী যে বিবাহিতা রমণী তার সবিশেষ প্রমাণও মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আছে। সেই সবিশেষ পরিচয় থেকেই জানা যায় যে, নাগকন্যার আগে বিবাহ হয়েছিল স্বজাতীয় এক নাগ পুরুষের সঙ্গেই। কিন্তু উলূপীর এমনই দুর্ভাগ্য যে তাঁর সর্প-স্বামী পক্ষীরাজ গরুড়ের হাতে মারা যান। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর সুন্দরী উলূপী পিতৃগৃহেই থেকে গেলেন। স্বল্পকালের জন্য হলেও দাম্পত্যের আস্বাদ পেয়েছিলেন উলূপী। তার মনের বাসনাগুলোকে কামনার আগুন জ্বলছিলই। তেমনই একজন পুরুষকে তিনি চাইছিলেন, যার সঙ্গলাভে তিনি নন্দিত হতে পারেন। গঙ্গাদ্বারে এসেই তিনি দেখতে পেলেন অর্জুনের মত পুরুষসিংহকে। তাই দেখামাত্রেই স্ত্রীজনোচিত কোনো লজ্জা না করে, কোনো দ্বিধা মনে না রেখে অর্জুনকে জলের গভীরে টেনে নিয়ে এলেন। অর্জুনের কাছে আত্মনিবেদন করার মধ্যে উলূপীর নিজস্ব আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। বরং তাঁর মধ্যে এতটাই সত্যমধুর আত্মনিবেদন ছিল, যাতে অর্জুন একটি কথা পর্যন্ত বলতে পারেননি।

উলূপীর প্রস্তাব শোনার পর তাঁকে অর্জুন নিজের অসহায়তার কথা জানান। তিনি বলেন যে, এই বারো বছর তাঁর ব্রহ্মচর্য্য পালন করার কথা—

ব্রহ্মচর্যমিদং ভদ্রে মম দ্বাদশবার্ষিকম্‌॥

একই সঙ্গে নাগকন্যাকে অর্জুন বলেন যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং সবার সামনে এই নিয়ম স্থির করে দিয়েছেন এবং তিনিও যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান। নাগকন্যার সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রধান অন্তরায় ছিল আগের প্রতিজ্ঞা ও ব্রহ্মচর্য্য। তাই অর্জুন উলূপীর ওপরেই সমস্যাটি ছেড়ে দিয়ে বললেন—এমন কোনো উপায় বের করতে যাতে পাণ্ডবদের নিয়মও মিথ্যে না হয়ে যায় এবং নাগকন্যার প্রিয় আচরণও করা যায়—

কথঞ্চ নানৃতং তৎ স্যাত্তব চাপি প্রিয়ং ভবেৎ॥

উলূপী তখন শান্তভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে, তিনি অর্জুনের সব খবরই রাখেন। তিনি এটাও জানেন যে, অর্জুনকে ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গীকার করেই বনে আসতে হয়েছে। কিন্তু উলূপী বলেন—এই নিয়ম শুধুমাত্র দ্রৌপদীর জন্য এবং পাণ্ডবদের পারস্পরিক অবস্থান ঠিক রাখার জন্য—

তদিদং দ্রৌপদীহেতোরন্যোন্যস্য প্রবাসনম্‌॥

কিন্তু উলূপীর নিজের ক্ষেত্রে তো সেই নিয়মের কোনো তাৎপর্য্যই নেই।

বুদ্ধিমতী উলূপী বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই যুক্তি বিশেষ জোরালো নয়। তাই অর্জুনকে তিনি বললেন যে, আমি পীড়িত। আর পীড়িত রমণীকে জীবন দান করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। আমি আপনার শরণাগত। শরণাগত নারীর জীবন রক্ষা করলেই আপনার ধর্ম রক্ষা হবে।

নাগকন্যার কাতর প্রার্থনায় অর্জুন সম্মত হলেন এবং কৌরব্য নাগের ভবনে উলূপীর সঙ্গে তিনি রাত্রি যাপন করলেন। শেষ দিনে উলূপীর কাছ থেকে অর্জুনের বিদায় গ্রহণের সময় নাগকন্যা তৃতীয় পাণ্ডবকে এই বর দিলেন যে, জলে তিনি অজেয় হবেন এবং সমস্ত জলচর প্রাণী তাঁর বশ্য থাকবে। এর কিছুদিন পর উলূপী একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর পুত্রের জন্ম দেন—সেই ক্ষেত্রজ পুত্র হলেন ইরাবান্‌। উলূপী কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তির পরেও অর্জুনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। অর্জুনকেই চিরকালের জন্য স্বামী হিসাবে বরণ করেছেন। অথচ অর্জুনের স্ত্রী হিসাবে তাঁর যে সম্মানটুকু প্রাপ্য ছিল হস্তিনাপুর থেকে, তা তিনি দাবী করেননি কোনদিনও। এরপর উলূপীকে আমরা আবার দেখতে পাব আশ্বমেধিক পর্বে। সেখানে অর্জুন মণিপুর রাজ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। মণিপুরের রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হয়েছিল উলূপীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পরে। মণিপুর রাজ্যে তখন তাঁর ঔরস পুত্র চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত বভ্রুবাহন রাজা হয়েছেন। অর্জুন অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে মণিপুর রাজ্যে এলে মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন তাঁর পিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু যুদ্ধে ইচ্ছুক অর্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের এই আচরণকে কাপুরুষোচিত মনে করে পুত্রকে ধিক্কার জানাতে থাকেন। অর্জুন বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করছেন

দেখে তা সহ্য করতে না পেরে উলূপী ভূমি ভেদ করে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। বভ্রুবাহনের কাছে উলূপী নিজেকে তাঁর বিমাতা হিসাবে পরিচয় দিয়ে বললেন— যুদ্ধার্থী পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করলে বভ্রুবাহনের ধর্ম রক্ষা হবে, আর অর্জুনও সন্তুষ্ট হবেন। তাই উলূপী বভ্রুবাহনকে বললেন তাঁর উচিত পিতার বাক্য পালন করা। উলূপীর কথায় উৎসাহিত হয়ে বভ্রুবাহন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। পুত্রের অস্ত্রের আঘাতে আপাতদৃষ্টে নিহত হলেন অর্জুন। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে রণস্থলে মণিপুরপতি বভ্রুবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদা উপস্থিত হন। শঙ্কিত ও বিমূঢ় হয়ে তিনি উলূপীকেই দায়ী করে বলেন—তুমিই বভ্রুবাহনকে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছ। আমার পুত্রের হাতে শুধুমাত্র তোমার জন্যই মহাবীর অর্জুনের মৃত্যু ঘটেছে। বভ্রুবাহনও নিজেকে পিতৃহন্তা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন। চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহনকে উলূপী আশ্বস্ত করে বলেন যে, অর্জুন অজেয়। বভ্রুবাহনের পক্ষে অর্জুনকে হত্যা করা সম্ভবই নয়। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার মৃত স্বামীকে আমি বাঁচিয়ে তুলবো। উলূপী নাগলোকের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সঞ্জীবন মণিটিকে স্মরণ করে বভ্রুবাহনকে বললেন যে, এই মণিটি অর্জুনের বক্ষঃস্থলে স্পর্শ করালেই তিনি আবার বেঁচে উঠবেন। বিমাতার নির্দেশমত বভ্রুবাহন সঞ্জীবন মণি অর্জুনের বক্ষঃস্থলে স্পর্শ করানো মাত্র তিনি চেতনা লাভ করে নিদ্রোত্থিতের মত উঠে বসলেন। কিন্তু উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে রণস্থলে দেখে অর্জুনের মনে আশঙ্কা তৈরি হল। তিনি ভাবলেন নাগকন্যা উলূপীর সঙ্গে হয়তো মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহন ও তাঁর মাতা চিত্রাঙ্গদার কোনো বিবাদ হয়েছে। কিন্তু পরে উলূপীর মুখে সব ঘটনা জানতে পারলেন। শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অষ্টবসুর একজনের অংশে জন্মানো গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে অন্যায়ভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হত্যা করার জন্য বসুগণ গঙ্গার দুঃখ স্মরণ করে অর্জুনকে নরকবাসের অভিশাপ দেন। উলূপী সেই শাপবাক্য শুনতে পেয়ে তাঁর পিতাকে জানান। তখন কৌরব্য নাগ বসুগণের কাছে গিয়ে শাপমোচনের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করলে বসুগণ বলেন যে, অর্জুনের পুত্র মণিপুর অধিপতি বভ্রুবাহন অর্জুনকে রণভূমিতে ধরাশায়ী করলে তিনি শাপমুক্ত হবেন। এই কারণেই উলূপী পুত্র বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়েছিলেন। একথা শুনে অর্জুনও আনন্দিত হলেন।

চৈত্র-পূর্ণিমায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে বভ্রুবাহন ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে উলূপীকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে অর্জুন বিদায় নিলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞের শেষে যথাসময়ে বভ্রুবাহন তাঁর দুই মাতা উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে নিয়ে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়েছেন।

উলূপী হস্তিনায় কুন্তী, দ্রৌপদী এবং সুভদ্রার দ্বারা বিশেষভাবে আপ্যায়িত হন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর উলূপী হস্তিনাপুরেই থেকে যান এবং গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত হন। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের সময় পর্যন্ত উলূপী হস্তিনাপুরেই বাস করেছেন। পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করবার পর উলূপী হস্তিনাপুরেও আর থাকেননি, পিতৃগৃহেও ফিরে যাননি। তিনি গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেন—

বিবেশ গঙ্গাং কৌরব্য উলূপী ভুজগাত্মজা॥

[মহা (k) ১.২১২.২৮-৩১; ১.২১৩-২১৪ অধ্যায়;
১৪.৭৯-৮১; ১৪.৮৭.২৬-২৮; ১৪.৮৮.১-৪;
১৭.১.২৭; (হরি) ১.২০৫.২৭-৩১;
১.২০৬-২০৭ অধ্যায়; ১৪.৯৯-১০৪;
১৪.১১১.১-৬; ১৭.১.৩০]

উল্কামুখ$_1$ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। নারদ মাতলির কাছে পাতালের ভোগবতী পুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী প্রধান নাগদের নাম উল্লেখ করেছেন। উল্কামুখ তাঁদের মধ্যে একজন। বায়ু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পাতালের তৃতীয় তল অর্থাৎ বিতলে তাঁর মনোরম বাসভবন ছিল।

[মহা (k) ৫.১০৩.১২; (হরি) ৫.৯৬.১২;
বায়ু পু. ৫০.২৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২৯]

উল্কামুখ$_2$ এক প্রকার নরক। কোনো পত্নী যদি তার স্বামীকে তিরস্কার করে তবে সে উল্কামুখ নরকে পতিত হয় এবং স্বামীর গাত্রলোমের সমান বছর তাকে ওই নরকে অবস্থান করতে হয়। সেখানে যমের দূতেরা পাপীদের মুখে উল্কা প্রদান করে।

[দেবী ভাগবত পু. ৯.৩২.২০;
৯.৩৫.১৮-২০; ৯.৩৭.৯৮-৯৯]

উল্কামুখ$_৩$ একজন বানরবীর। অগ্নির পুত্র। সুগ্রীব সীতাকে খোঁজার জন্য যখন বানরবীরদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছিলেন, দক্ষিণ দিকের স্থানগুলিতে হনুমান, অঙ্গদ, জাম্ববান প্রভৃতি বানরবীরদের সঙ্গে উল্কামুখকেও পাঠিয়েছিলেন।

[রামায়ণ ৪.৪১.৪]

উল্কামুখী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। উল্কামুখী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২৪]

উল্বণ মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে উর্জার গর্ভজাত সাত পুত্রসন্তানের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ৪.১.৪১]*

উল্মুক$_১$ বলরামের ঔরসে রেবতীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। প্রভাসক্ষেত্রে যদুবংশ ধ্বংস হবার সময় যখন যদুবংশীয়রা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন সেই সময় উল্মুককেও আমরা যুদ্ধরত অবস্থায় দেখি। কৃষ্ণের হাতে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়।

[ভাগবত পু. ১১.৩০.১৭; বিষ্ণু পু. ৫.২৫.১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৬৬]

উল্মুক$_২$ জরাসন্ধের অনুগামী একজন রাজা। ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধে প্রাপ্ত অধিক পাঠ থেকে জানা যায় যে, জরাসন্ধ যখন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মথুরা অবরোধ করেছিলেন সেই সময় উল্মুক রাজা সসৈন্যে মথুরার পূর্ব দ্বারে অবস্থান করছিলেন।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫০.১১নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকায় দ্বিতীয় শ্লোক দ্র.]

উল্মুক$_৩$ ষষ্ঠ মন্বন্তরাধিপতি চাক্ষুষ মনুর ঔরসে নড়্বলার গর্ভজাত একজন পুত্র। উল্মুকের পত্নী ছিলেন পুষ্করিণী। উল্মুকের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং গয় —এই ছয়টি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৬-১৭]

উশঙ্গব জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। মৃত্যুর পর যেসব প্রাচীন রাজর্ষি যম সভায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন উশঙ্গব তাঁদের মধ্যে একজন। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে ইনি উষদ্‌গব নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[মহা (k) ২.৮.২৬: (হরি) ২.৮.২৬]

উশীনর$_১$ মহাভারতের আদিপর্বে সঞ্জয় যেসব প্রাচীন রাজাদের নামোল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উশীনর অন্যতম।

[মহা (k) ১.১.২৩৩; (হরি) ১.১.১৯৪]

☐ মহাভারতে বলা হয়েছে যে, ভোজবংশীয় রাজা উশীনরের ঔরসে যযাতির কন্যা মাধবীর গর্ভে শিবি জন্মগ্রহণ করেন।

পুরাণগুলিতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, অনুবংশীয় মহামনার পুত্র উশীনর। উশীনর এবং দৃষদ্বতীর পুত্র হলেন শিবি।

[মহা (k) ৫.১১৮.২০; (হরি) ৫.১০৯.২০; ভাগবত পু. ৯.২৩.২-৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৭; মৎস্য পু. ৪৮.১৫-১৮; বায়ু পু. ৯৯.১৮-১৯; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১]

☐ বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের কাছে লোমশ ঋষি ধার্মিক উশীনর রাজার কর্তব্যপরায়ণতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কপোত ও শ্যেনের কাহিনী শোনান। তবে এই কপোত ও শ্যেনের উপাখ্যানটি উশীনরের পুত্র শিবিরাজার কাহিনী হিসেবে বেশি প্রচলিত। সম্ভবতঃ এই কাহিনীটির মধ্যে দানধর্মের চরম ভাবনা শিবি-রাজার এমন অনুপম মাহাত্ম্য স্থাপন করে যে, তাঁর পূর্ববংশ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীর ওপরেও শিবির মাহাত্ম্য আরোপিত হয়েছে। ফলত শিবিরাজার পিতা উশীনর এবং শিবির পুত্র বৃষদর্ভও শ্যেন-কপোতের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন।

[দ্র. শিবি এবং শ্যেন-কপোতীয় কাহিনী]

[মহা (k) ৩.১৩০.২২-৩১; (হরি) ৩.১০৭.২২-৫৫]

☐ যমের রাজসভায় যেসব পুণ্যবান রাজারা অবস্থান করতেন এবং তাঁর উপাসনা করতেন, তাঁদের মধ্যে উশীনর একজন।

[মহা (k) ২.৮.১৪; (হরি) ২.৮.১৪]

☐ শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, একসময়ে মহাদেব যে তরবারি দিয়ে দানবদের সংহার করেছিলেন সেই তরবারি তিনি প্রথমে ভগবান বিষ্ণুকে দান করেন। বিষ্ণু মরীচিকে সেই তরবারি দান করেন। এইভাবে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রঘু থেকে হরিণাশ্ব, হরিণাশ্ব থেকে শুনক এবং শুনক থেকে উশীনর সেই তরবারি লাভ করেন। উশীনর থেকে যদুবংশীয় ভোজরাজা সেই তরবারি লাভ করেন।

[মহা (k) ১২.১৬৬.৭৯; (হরি) ১২.১৬১.৭৯]

☐ যেসব ধার্মিক রাজারা গো-সম্পদ দান করে স্বর্গলাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উশীনর

অন্যতম ছিলেন বলে মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.৭৬.২৫; (হরি) ১৩.৬২.২৫]

উশীনর$_{২}$ উশীনরের পৌত্র এবং শিবি রাজার পুত্র বৃষদর্ভকেও উশীনর বলা হয়েছে অনুশাসন পর্বে। সম্ভবতঃ উশীনরের বংশধর বলে বৃষদর্ভকে গৌরবে তাঁর নামেই ডাকা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.৩২.২২; (হরি) ১৩.৩১.২২]

উশীনর$_{৩}$ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যেসব বৃষ্ণিবংশীয়রা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উশীনর একজন। এই উশীনর অবশ্যই অনুবংশীয়দের সূত্রেই যদুবংশের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন।

[মহা (k) ১.১৮৬.২০; (হরি) ১.১৭৯.২০]

□ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, স্যমন্তপঞ্চকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য যেসব রাজারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উশীনর একজন। *[ভাগবত পু. ১০.৮২.১৩]*

উশীনর$_{৪}$ কুরুদেশের উত্তরে বসবাসকারী প্রাচীন এবং ঐতিহ্যশালী একটি জাতি। উশীনর রাজার নামেই এই জাতিটি 'উশীনর' নামে চিহ্নিত হয়েছে। ঋগ্‌বেদের সময় থেকেই উশীনররা খ্যাতি লাভ করেছিল। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে উশীনর-পত্নীর কথা উল্লিখিত হয়েছে।

গোপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, উত্তর-কুরুর অধিবাসীরা উশীনরদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় যে, কুরু, পঞ্চাল ও বৎস বংশীয় রাজারা তাঁদের শাসিত অঞ্চলের মধ্যবর্তী কোন স্থানে উশীনরদের নিয়োগ করেছিল। কৌষিতকী-উপনিষদও এই মতকে সমর্থন করেছে।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৫৯.১০; গোপথ ব্রাহ্মণ ২.৯; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮.১৪; কৌষিতকী উপনিষদ ৪.১]

□ পাণিনি উশীনরদের 'বাহিক' জাতির একটি শাখা বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে উশীনররা চন্দ্রভাগা (চেনাব) ও রাভী নদীর উত্তরে এবং দক্ষিণে অবস্থান করত। *[কাশিকা ৪.২.১১৮; IKP (Agrawala) p. 52-53]*

□ পণ্ডিত F.E. Pargiter -এর মতে উশীনর এবং তাঁর অনুগামীরা পঞ্জাবে অবস্থান করতেন।

[AIHT (Pargiter), p. 109]

□ পণ্ডিত V.S. Agrawala বলেছেন যে, উশীনররা মহাভারতের যুগে কুরুক্ষেত্রের উত্তরদিকে অবস্থান করতেন। যা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পঞ্জাব-প্রদেশ অঞ্চলকে বোঝায়। *[IKP (Agrawala), p. 52-53]*

□ মহাভারতের কর্ণপর্বে বলা হয়েছে যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন একাই মদ্রক, যৌধেয়, উশীনর প্রমুখ জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিহত করেন। *[মহা (k) ৮.৫.৪৭; (হরি) ৮.৩.৬৪]*

□ শান্তিপর্বে উশীনর জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই জাতির লোকেরা অত্যন্ত বলবান ও সমস্ত রকম অস্ত্র ব্যবহারে পটু ছিলেন।

[মহা (k) ১২.১০১.৪; (হরি) ১২.৯৮.৪]

□ পরবর্তীকালে এমন একটি সময় আসে যখন, সমৃদ্ধশালী এই উশীনর জাতি, যাদের অস্তিত্ব ঋগ্‌বেদের সময়কাল থেকেই ছিল, তাঁরা ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে যায়। মহাভারতেও তার আভাস পাওয়া যায়। অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে যে, উশীনর জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণদের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। সম্ভবত গাঙ্গেয় অববাহিকায় আর্যদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকলে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আর্যদের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঘটে। *[মহা (k) ১৩.৩৩.২২; (হরি) ১৩.৩২.২২]*

উশনা ব্রহ্মার মানস পুত্র কবি। কবি-র আটজন পুত্র মহাভারতে বারুণ নামে কথিত হয়েছেন। কবি-র এই আট পুত্রের প্রত্যেকে প্রজাপতি হিসাবে পরিচিত। উশনা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই উশনাই আবার শুক্রাচার্য নামে পরিচিত।

[মহা (k) ১৩.৮৫.১৩৩-১৩৪; (হরি) ১৩.৭৪.১৩১-১৩২]

ঋগ্‌বেদের মধ্যে বারবার উশনার নাম এসেছে এবং প্রায় সব জায়গাতেই তাঁকে কবির পুত্র 'কাব্য' উশনা বলে বলা হচ্ছে—

* আ গা আজদুশনা কাব্যঃ

* যং তে কাব্য উশনা মন্দিনং দাদ্‌বৃত্রহনম্‌

* উশনা কাব্যস্ত্বা নি হোতারমসাদয়ৎ

আর একটি মন্ত্রে কাব্য উশনাকে পরিষ্কারভাবে ঋষি হিসেবেই চিহ্নিত করে বলা হয়েছে—উশনা ঋষি বুদ্ধিমান এবং একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, তিনি উজ্জ্বল এবং ধীর—

ঋষি র্বিপ্রঃ পুর এতা
জনানামৃভুর্ধীর উশনা কাব্যে'ন।

যতগুলি সূক্তে কাব্য উশনার নাম আমরা পাই, তার সবগুলিই প্রায় তিনি ইন্দ্রের সহায়ক এক

ঋষি। ঋক্-মন্ত্রে বলা হয়েছে—হে ইন্দ্র! যখন উশনার বল দ্বারা তোমার বল তীক্ষ্ণতর হয়েছিল, তখন সেই বল বিশুদ্ধ তীক্ষ্ণতা লাভ করে আকাশ এবং পৃথিবীকেও ভেদ করেছিল—

ত্যক্ষদ্যত্ত উশনা সহসা সহো বি
রোদসী মজ্‌মনা বাধতে শবঃ।

এর ঠিক পরের মন্ত্রে উশনা কাব্য স্বয়ং ইন্দ্রের সঙ্গে স্তুত হন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে—

মন্দিষ্ট যৎ উশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্রঃ।

বস্তুত যতগুলি বৈদিক সূক্তে আমরা উশনার নাম পাই তার প্রায় সবগুলিই ইন্দ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত এবং একটি ঋক্‌মন্ত্রে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বৃত্র-বধের জন্য বজ্র নামক সেই বিখ্যাত অস্ত্রটি কাব্য উশনাই ইন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন—

যংতে কাব্য উশনা মন্দিনং দাদ্/
বৃত্রহনং পার্যং ততক্ষ বজ্রম্।

[ঋগ্‌বেদ, ১.৮৩.৫; ১.১২১.১২; ৮.২৩.১৭; ৯.৮৭.৩; ১.৫১.১০-১১; ১.১২১.১২]

উশনার সম্বন্ধে বৈদিক তথ্যভাণ্ডার থেকে আর একটি কথা না বললেই নয়। সেটা উশনার জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার কথা। একটি ঋক্‌মন্ত্রে নিজের বিভূতি উচ্চারণ করার সময় ইন্দ্র বলছেন—আমিই মনু, আমিই সূর্য, আমিই কবি উশনা, আমাকে দ্যাখো তোমরা—

অহং কবিরুশনা পশ্যতা মা।

কবি শব্দের অর্থ সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, ক্রান্তদর্শী—যেমন ঈশোপনিষদে কবির্মনীষী। কবি মানে বিদ্বান, পণ্ডিত, যেমন ভগবদ্‌গীতায়—পণ্ডিতজনেরাও কর্ম এবং বিকর্মের বিচারে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েন—

কবয়ো'প্যত্র মোহিতাঃ।

আবার কবি মানে কাব্যকারও বটে। আমরা বেদমন্ত্রে উশনার যে কবি উপাধি পাই তা এই সমস্ত অর্থ একত্রে ধরে। অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ পণ্ডিত, বিদ্বান এবং কাব্যকারও বটে। আমরা ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে দেখতে পাচ্ছি যে, সোমদেব উশনার মতো কাব্য উচ্চারণ করে দেবতাদের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করছেন—

প্রকাব্যম্ উশানেব ব্রুবাণো/
দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি।

দেবতারা কবিত্বের ব্যাপারে যাঁর অনুসরণ, অনুকরণ করছেন সেই উশনা কবিও বটে পণ্ডিতও বটে এবং সেই পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা এবং সর্বজ্ঞতার কারণেই ভগবদ্‌গীতায় ঈশ্বরীয় বিভূতি-বর্ণনায় ভগবানের মুখে উচ্চারিত হয়েছে—কবীনামুশনা কবিঃ—পণ্ডিত-বিদ্বানদের মধ্যে আমি হলাম উশনা। উশনা শুক্রাচার্য কীভাবে কবি উপাধি লাভ করেছিলেন, তার সম্বন্ধে একটি কথা বলা হয়েছে কবি-মনীষী রাজশেখরের কাব্য-মীমাংসায়। সেই কাহিনী হল—এক সময় ব্রহ্মা পুত্রার্থিনী সরস্বতীর পুত্র হিসেবে দান করেছিলেন কাব্যপুরুষকে, শব্দার্থ-শরীর সেই কাব্যপুরুষকে পুত্ররূপে দেখে ভারী খুশি হলেন সরস্বতী। পুত্রকে অবশ্য তিনি বললেন—তুমি যেন প্রগল্‌ভ চটুল পুরুষের মতো আচরণ কোরো না। তুমি ছোট্ট একটি বালকের মতো ব্যবহার করো। এ-কথা বলে তিনি আকাশগঙ্গায় স্নান করতে গেলেন।

কাব্যপুরুষ বালকের মতো বিচরণ করছেন, ইতোমধ্যে ঋষি উশনা যজ্ঞের জন্য সমিৎ-কুশ আহরণের প্রয়োজনে বাইরে এসে ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন একটি শিশু রোদের মধ্যে পড়ে আছে। আসলে ইতোমধ্যে সূর্যের স্থান পরিবর্তন হওয়ায় শিশুটির গায়ে রোদ লাগছে দেখে বেশ কষ্ট পেলেন উশনা। অনাথ শিশুটিকে তিনি আপন আশ্রমে নিয়ে এলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সরস্বতীর সেই পুত্র শিশুরূপী কাব্যপুরুষ উশনা শুক্রাচার্যের অন্তরে একটি ছন্দোময়ী বাণী নিহিত করলেন। উশনা হঠাৎই কবিতা উচ্চারণ করে বললেন—কবিরা নিত্যদিন বাক্‌ধেনু (শদার্থস্বরূপা গাভী) দোহন করেন। কিন্তু প্রতিদিন দোহন করা সত্ত্বেও যাঁকে দোহন করা হয়েছে বলে মনে হয় না, উৎকৃষ্ট উক্তিসমূহে পরিপূর্ণা সেই ধেনুরূপা সরস্বতী আমাদের হৃদয়ে সন্নিহিত হোন—

হৃদি নঃ সন্নিধত্তাং সন্নিধত্তাং সা
সূক্তিধেনুঃ সরস্বতী।

এই অসামান্য শ্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঘোষিত হল যে, উশনা-রচিত এই কবিতার আবৃত্তি পাঠককে মেধাবী করে তুলবে। সেই সময় থেকেই উশনা শুক্রাচার্যকে পণ্ডিতরা কবি বলে উল্লেখ করতে থাকলেন—

ততঃ প্রভৃতি তমুশনসং সন্তঃ কবিরিত্যাচক্ষতে।

[ঈশোপনিষদ (দুর্গাচরণ), শ্লোক নং ৮; ভগবদ্‌গীতা, ৪.১৬; ১০.৩৭; ঋগ্‌বেদ, ৯.৯৭.৭; রাজশেখরকৃত কাব্যমীমাংসা, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬]

বৈদিক স্তরেই উশনা কাব্যের যে পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যার কীর্তি চিহ্নিত হয়েছে, তাতে যজুর্বেদের মধ্যেই তাঁর উপাধিগত রূপান্তর দেখতে পাচ্ছি। ঋগ্‌বেদেই অগ্নি দেবতাদের দূত হিসেবে কীর্তিত হয়েছেন—

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে।

এই দেবদৌত্যের কথা উল্লেখ করেই কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে—অগ্নি যেমন দেবতাদের দূত, তেমনই অসুরদের দূত হলেন কাব্য উশনা—

অগ্নির্দেবানাং দূত আসীদ্ উশনা কাব্যো'সুরাণাম্।

অগ্নি যেমন দেবতাদের দূত তেমনই দেবতাদের পুরোহিত ও অগ্নি—

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।

হয়তো অগ্নির সমান্তরাল সূত্রেই তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণে কাব্য উশনা অসুরদের পুরোহিত—

উশনা বৈ কাব্যো'সুরাণাং পুরোহিত আসীৎ।

শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রেও অসুরদের পুরোহিত হিসেবে কাব্য উশনার নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম), ২.৫.৮.৫, পৃ. ১২৫১;
তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ (কাশী সংস্কৃত সিরিজ),
১ম খণ্ড, ৭.৫.২০, পৃ. ২৪৬; শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র
(Hillebrandt), ১৪.২৭.১, পৃ. ১৬৪]

মহাভারত কিংবা রামায়ণ-পুরাণে কাব্য উশনা প্রথম থেকেই শুক্রাচার্য নামে খ্যাত হয়েছেন। শুক্রাচার্য হলেন অসুরদের গুরু, উপাধ্যায়। তাঁর চারটি ছেলে 'ঔশনস' নামে খ্যাত অর্থাৎ উশনার ছেলে ঔশনস। এখানে প্রথম থেকেই শুক্রাচার্য এবং উশনাকে একাকার করে দেওয়া হল—

অসুরাণামুপাধ্যায়ঃ শুক্রস্ত্বৃষিসুতো'ভবৎ।
খ্যাতাশ্চৌশনসঃ পুত্রাশ্চত্বারো'সুরযাজকাঃ।

দেবাসুর সংগ্রামে দেবতারা অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছেন দেখে অসুরেরা কাব্য উশনাকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছিলেন—

পৌরোহিত্যে চ যাজ্যার্থে কাব্যং তূশনসং পরে।

কচ-দেবযানীর কাহিনীতে উশনার করা নিয়মেই ব্রাহ্মণের সুরাপান বন্ধ হয়ে যায়।

[মহা (k) ১.৬৫.৩৬; ১.৭৬.৬৫-৬৭;
(হরি) ১.৬০.৩৬; ১.৬৪.৬-৭]

মহাকাব্য-পুরাণে কাব্য উশনার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল—তিনি মহাজ্ঞানী, বিশেষত রাজনীতি এবং কূটনীতি তাঁর পরম অনুসন্ধেয় বিষয়। রাজনীতির কূটবিষয়ে উশনার মত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। রাজনৈতিক কুটিলতায় বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে যুধিষ্ঠির খুব তির্যকভাবে স্ত্রীবুদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন প্রথমে। কিন্তু উপমার জায়গায় যেসব মায়া-বঞ্চনাশীল অসুর-দৈত্যের উদাহরণ দিয়েছেন, সেখানে শম্বরাসুর, নমুচি, বলি এবং কুম্ভীনসির সঙ্গে দৈত্যগুরু উশনা এবং দেবগুরু বৃহস্পতির রাজনীতি-শাস্ত্রের কথাও এসেছে—

উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ।

'উশনা যে রাজনীতি জানতেন'—উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রম্—এই কথাটা প্রায় বাগ্‌ধারার মতো ব্যবহৃত হয়েছে মহাভারতের বিভিন্ন জায়গায়। কুরুপিতামহ ভীষ্ম স্বপক্ষীয়-বিপক্ষীয় সমস্ত রাজনীতি জানেন এই প্রসঙ্গে কুটিল রাজনীতির কথায় মহাভারতের আদিপর্বে একবার ভীষ্মের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—উশনা যা জানেন তা ইনিও জানেন; আবার শান্তিপর্বে রাজধর্ম ব্যাখ্যা করার সময় ভীষ্মের সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা হচ্ছে এইভাবে—দেবাসুর সবার গুরু সেই ব্রাহ্মণ উশনা যে রাজনীতিশাস্ত্র জানেন, তা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ জানেন এই পিতামহ ভীষ্ম—

উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং সুরাসুরগুরু
(দেবগুরু) র্দ্বিজঃ।
তচ্চ সর্বং সবৈয়াখ্যং প্রাপ্তবান্ কুরুসত্তমঃ॥

আসলে বিদ্যাবত্তা এবং জ্ঞানের ব্যাপারে উশনা এতটাই উচ্চমার্গের যে, রাজনীতি থেকে ধর্মশাস্ত্রের সর্বাঙ্গীন জ্ঞান তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল আদিম ধর্মপ্রবক্তা চিত্রশিখণ্ডীর কাছ থেকে। চিত্রশিখণ্ডী আসলে সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। মহাভারত বলেছে—এই সপ্তর্ষিদের সঙ্গে মনুর ধর্মশাস্ত্রের কথাও ভবিষ্যতে উচ্চারিত হবে উশনা এবং বৃহস্পতির মুখে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের মতো করেই সাজিয়ে এই পূর্বশাস্ত্রের কথা শোনাবেন—

উশনা বৃহস্পতিশ্চৈব যদোৎপন্নৌ ভবিষ্যতঃ।
তদা প্রবক্ষ্যতঃ শাস্ত্রং যুস্মন্মতিভিরুদ্‌ধৃতম্॥

কাব্য উশনার নামে যে উপদেশগুলি মহাভারতে বিখ্যাত হয়ে আছে, তার একটি-দুটি এখানে উল্লেখ করছি। একটি উপদেশে শরশয়ান ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে নিত্যোদ্যোগী, নিত্যোৎসাহ-সম্পন্ন রাজাদের প্রশংসা

করার সময় কাব্য উশনার বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন—সর্প যেমন গর্তের মধ্যে থাকা মূষিককে গ্রাস করে, সেইভাবেই এই ধরা-ভূমি পৃথিবী দুই প্রকার মানুষকে গ্রাস করে। প্রথম প্রকার হলেন 'অবিরোদ্ধা' রাজা অর্থাৎ কখনোই কারো সঙ্গে বিরোধ করেন না এমন রাজা। আর দ্বিতীয় প্রকার হলেন সেই ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা শুধু ঘরে বসে থাকতে চান, বিদেশে যেতে চান না। বিদেশে গেলে বিদ্যা এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার দুটোই পরীক্ষিত হয় বলে ব্রাহ্মণেরা অনেকেই আপন গ্রামে গ্রামযাজী হয়ে থাকেন। উশনা এমন ব্রাহ্মণদের পছন্দ করেন না। তিনি মনে করেন—রাজারা সদা-সর্বদা রাজ্য বাড়ানোর চেষ্টা এবং উৎসাহ না দেখালে, আর ব্রাহ্মণ যদি প্রবাস-জীবনের কোনো কৃচ্ছ্রতা সাধন না করে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে এই দুই প্রকারের মানুষকে ভূমি গ্রাস করে—

দ্বাবিমৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানঞ্চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণঞ্চাপ্রবাসিনম্॥

কাব্য উশনার আর এক বৈশিষ্ট্য হল—যুক্তিবাদী শাস্ত্রের প্রামাণ্যে বিশ্বাস। তিনি বলেছেন—শাস্ত্র যদি সঠিক জ্ঞানবুদ্ধির কথা বলে, তবেই সেটা মানতে হবে। যে শাস্ত্রের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধি থাকে না সেই শাস্ত্র যত প্রযত্নেই লেখা হোক না কেন তাকে ব্যর্থ বলে মনে করা উচিত—এই সংশয়চ্ছেদী কথাটা উশনাই একমাত্র বলেছিলেন—

অনয়া হতমেবেদমিতি শাস্ত্রমপার্থকম্।
দৈতেয়ানুশনা প্রাহ সংশয়চ্ছেদনং পুরা॥

উশনা আর একটি উপদেশ দিয়েছিলেন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে। তিনি বলেছিলেন—কৌতুকী বালক যদি বলে ওই শুকনো তৃণাচ্ছন্ন কুয়োটির মধ্যে মধু আছে, তাহলে সেই কথা বিশ্বাস করে কূপপ্রবিষ্ট মানুষটি যেমন মারা যায়, তেমনই শত্রুরা হল তৃণাচ্ছন্ন কূপের মতো—শত্রুর সত্য এবং মিথ্যাবাক্যে যারা বিশ্বাস করে, তারাও মরে। কেননা শত্রুতা জিনিসটা এমনই যে, বংশ-বংশ ধরে চললেও তার নিবৃত্তি হয় না। কেননা শত্রুতা খুঁচিয়ে তুলবে এমন বেশি কথা বলা মানুষও থাকবে, আবার বংশ বংশ ধরে সেই সব মানুষগুলিও থাকবে যারা সেই কথায় বিশ্বাস করে শত্রুতা চালিয়ে যাবে—

যে বৈরিণঃ শ্রদ্ধধতে সত্যে সত্যেতরে'পি বা।
বধ্যন্তে শ্রদ্ধধানাস্তু মধু শুষ্কতৃণৈর্যথা॥
ন হি বৈরাণি শাম্যন্তি কুলে দুঃখগতানি চ।
আখ্যাতারশ্চ বিদ্যন্তে কুলে বৈ ধ্রিয়তে পুমান্॥

[মহা (k) ১৩.৩৯.৮; ১.১০০.৩৬; ১২.৩৭.১০; ১২.৩৩৫.৩১-৪৭; ১২.৫৭.২-৩; ১২.১৪২.২২; ১২.১৩৯.৭১-৭২; (হরি) ১৩.৩৫.৮; ১.৯৪.৩৬; ১২.৩৭.১০; ১২.৩২১.৩০-৪৬; ১২.৫৬.২-৩; ১২.১৩৮.২২; ১২.১৩৫.৭১-৭২]

□ কাব্য উশনার নাম কীভাবে শুক্র বা শুক্রাচার্য হল, সে বিষয়ে একটি কাহিনী আছে মহাভারতে। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেছিলেন—কাব্য উশনা কেন সব সময়েই অসুরদেরই প্রিয় কাজ করতেন এবং দেবতাদের হিতের কথা চিন্তা করতেন না? কীভাবে তিনি শুক্রত্ব লাভ করেন এবং কেনই বা তিনি আকাশমার্গ দিয়ে চলতে পারতেন না?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম উশনার অসুর-পক্ষ অবলম্বন করার বুদ্ধিটা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েই উশনার শুক্রত্ব-প্রাপ্তির ঘটনা বলতে থাকেন। বলা হয়েছে—উশনা যোগসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন। এক সময় তিনি যোগবলে ধনপতি কুবেরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাঁর সমস্ত ধন হরণ করে নেন। কুবের অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে শিবের কাছে গিয়ে বললেন—উশনা যোগবলে আমাকে রুদ্ধ করে দিয়ে আমার সমস্ত ধন আত্মগত করে আমার শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। শিব উশনার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে শূল হাতে নিয়ে উশনাকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। উশনা কোনো পলায়ন-কুটিলতার মধ্যে না গিয়ে তপস্যার প্রভাবে মহাদেবের শূলাগ্রে জ্ঞানরূপে অবস্থান করতে লাগলেন। শিব তাঁকে ধরার জন্য শূলটাকে বাঁকালে উশনা শূলের মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়লেন। এই অবস্থায় তিনি উশনাকে হাতের মধ্যে ধরে আস্তে আস্তে গিলে ফেললেন তাঁকে।

যোগসিদ্ধ উশনা মহাদেবের উদরের মধ্যেই বিচরণ করতে লাগলেন। এই অবস্থায় মহাদেব জলের মধ্যে স্থাণুর মতো অচল হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যা সেরে মহাদেব গাত্রোত্থান করতেই দেখতে পেলেন যে, তাঁর দুষ্কর তপস্যায় পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত-সংপৃক্ত হয়ে উশনার আরও তপোবৃদ্ধি ঘটেছে—

তৎসংযোগেন বৃদ্ধিঞ্চাপ্যপশ্যৎ স তু শঙ্করঃ।

মহাযোগী উশনা তপস্যা এবং ধনসম্পত্তিতে ঋদ্ধ হয়ে সারা পৃথিবী বিচরণ করতে লাগলেন।

তারপর শিব-মহাদেব আবার ধ্যান আরম্ভ করলে উশনা উদ্বিগ্ন হয়ে আবার শিবের উদরে প্রবেশ করলেন। সেই উদরের মধ্যে থেকেই উশনা মহাদেবের স্তব করে তাঁর উদর থেকে বাইরে বেরোবার অনুমতি চাইলেন বারবার। বারবার তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করলেন।

দেবদেব মহাদেব এবার নিজদেহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে উশনাকে বললেন—তুমি আমার শিশ্নদ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে নিজেকে মুক্ত করো। বহু কষ্টে উশনা এবার মহাদেবের শিশ্নদ্বার দিয়ে বেরোনোর সময় শুক্রত্ব প্রাপ্ত হলেন। শুক্রের গতি যেহেতু ঊর্ধ্বমুখী হয় না, সেইজন্যই উশনা-শুক্র কখনো আকাশের মধ্য দিয়ে চলতে পারেন না। এদিকে উশনা মহাদেবের শুক্ররূপে নির্গত হবার পর শিবতেজে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠলেন। উশনার পূর্বকৃত কুটিলতা স্মরণ করে শিব-মহাদেব যেই শূল উত্তোলন করলেন আঘাত করার জন্য, অমনই দেবী পার্বতী ক্রুদ্ধ স্বামীকে আঘাত করতে বারণ করলেন এবং পার্বতীর এই মহিমা দেখে উশনা-শুক্র পার্বতীকে বললেন— আমি তোমার পুত্র হতে চাই। দেবী এবার শিবকে বললেন—এই মানুষটা আমার কাছে পুত্রত্ব ভিক্ষা করেছে, অতএব একে আপনি বধ করতে পারেন না। দেবতার উদর থেকে যার নির্গমন ঘটেছে, তার তো নাশ হতে পারে না। দেবী ভগবতীর কথা শুনে শিব উশনাকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু সেই সময় থেকেই হয়তো উশনা শুক্র নামে পরিচিত হলেন। *[দ্র. শুক্রাচার্য]*

[মহা (k) ১২.২৮৯.১-৩৮; (হরি) ১২.২৮২.১-৩৮]

উশীরবিন্দু মন্দর পর্বত সংলগ্ন একটি গিরিশ্রেণী। এই সমগ্র অঞ্চলটি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর অধিকারে ছিল বলে মনে হয়।

[মৎস্য পু. ১৬৩.৮৬]

উষঙ্গু$_১$ একজন ঋষি। ইনি পশ্চিম দিকে বসবাস করতেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ১২.২০৮.৩০; ১৩.১৬৫.৪১;]

উষঙ্গু$_২$ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। টীকাকার নীলকণ্ঠ 'উষঙ্গু' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

উষং দাহকং গাবঃ কিরণা যস্যেত্যুষঙ্গুঃ।

সংস্কৃত উষ্ ধাতুর অর্থ দহন করা। গো শব্দের অর্থ কিরণ। যাঁর প্রভা বা কিরণ জগতকে দগ্ধ করতে সমর্থ, তিনিই উষঙ্গু। এক্ষেত্রে শিব-মহাদেবকে সূর্যস্বরূপ বলেও যেমন কল্পনা করা যায়, তেমনই সহস্র সূর্যের প্রভাযুক্ত পরমেশ্বরের বিরাট রূপটিকেও আমরা 'উষঙ্গু' নামে চিহ্নিত করতে পারি।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৫; (হরি) ১৩.১৬.১০৫]

উষাক্ষ একজন দানব। মহাদেব নিজের সৈন্য ও দেবতাদের দানবরাজ শঙ্খচূড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করলে মঙ্গলগ্রহ উষাক্ষ নামক দানবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। *[দেবী ভাগবত পু. ৯.২২.৮]*

উষিত দ্বাদশ মন্বন্তরে যখন রুদ্রসাবর্ণি বা ঋতসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন সুমনা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে উষিত অন্যতম। *[বায়ু পু. ১০০.৯১-৯২]*

উষ্ট্রকর্ণ বিন্ধ্য পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত জনপদ তথা জনজাতি। পুরাণে গঙ্গার সপ্তধারার উল্লেখ আছে যার মধ্যে অন্যতম একটি ধারা বিন্ধ্যপর্বত থেকে প্রবাহিত হয়েছে। এই জলধারা যে সব জনপদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে উষ্ট্রকর্ণ তার মধ্যে অন্যতম। পরিব্রাজক অল-বেরুণির গ্রন্থেও এই জনজাতির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৪৭.৫২; Dr. Edward C. Sachan, Alberuni's India. (vol. I) p. 262]

উষ্ট্রকর্ণিক একটি মধ্য-দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন দেশ। সহদেব দিগ্‌বিজয়কালে এই দেশটি জয় করেছিলেন। *[মহা (k) ২.৩১.৭১; (হরি) ২.৩০.৬৯]*

□ মহাভারতে অন্ধ্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের জনপদের সঙ্গে উষ্ট্রকর্ণিকের নাম উল্লিখিত হওয়ায় পণ্ডিতরা এই জনপদটিকে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের তেলুগু ভাষাভাষী কোনো অঞ্চল বলে মনে করেন।

[TIM (Mishra) p. 84]

উষ্ট্রজিহ্ব তারকাসুর বধের সময় যে সব অনুচর যোদ্ধা স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন উষ্ট্রজিহ্ব তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬২; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৬]

উষ্ট্রমুখ প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতির আশি কোটি সন্তানের মধ্যে যাঁরা উটের মত মুখ বিশিষ্ট ছিলেন তাঁদের উষ্ট্রমুখ গণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

[মৎস্য পু. ৪.৫৩]

উক্ষ$_১$ ক্রৌঞ্চদ্বীপের রাজা দ্যুতিমানের সাত পুত্রের মধ্যে একজন হলেন উক্ষ। রাজা দ্যুতিমান

ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সাতটি বর্ষে ভাগ করেন এবং এক এক বর্ষে তাঁর এক এক পুত্রকে রাজা করেন। উক্ষ যে বর্ষে রাজা হয়েছিলেন সেটি তাঁর নামানুসারে উক্ষবর্ষ বা উক্ষদেশ নামে বিখ্যাত হয়। এটি ক্রৌঞ্চদ্বীপের তৃতীয় বর্ষ। *[বিষ্ণু পু. ২.৪.৪৮; বায়ু পু. ৩৩.২১-২২; ৪৯.৬৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.২২.২৫; ১.১৯.৭২; মৎস্য পু. ১২২.৮৫]*

উক্ষ$_২$ পুরাণে ভবিষ্যৎ কলিযুগ বর্ণনা করতে গিয়ে সে যুগের ভাবি রাজাদের নাম বর্ণনা করা হয়েছে। কলিযুগে চন্দ্রবংশীয় যেসব রাজা রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম নির্বক্তু। রাজা নির্বক্তুর পুত্র উক্ষ। অবশ্য বিষ্ণুপুরাণ তাঁকে চন্দ্রবংশীয় রাজা নিচক্ষুর পুত্র বলেছে। উক্ষ চিত্ররথ নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন এমন উল্লেখও রয়েছে। *[বায়ু পু. ৯৯.২৭২; বিষ্ণু পু. ৪.২১.৩]*

উক্ষ$_৩$ ক্রৌঞ্চপর্বতের নিকটবর্তী একটি দেশ। মনোহনুগ ও প্রাবরদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এটি অবস্থিত। এটি একটি তীর্থও বটে। দেবী সতী এই তীর্থে অভয়া নামে পূজিতা।

[মহা (k) ৬.১২.২১-২২; (হরি) ৬.১২.২১-২২; মৎস্য পু. ১৩.৪২]

উক্ষদেশ ক্রৌঞ্চ পর্বতের নিকটবর্তী একটি গন্ধর্ব অধ্যুষিত দেশ। মনো'নুগ এবং প্রাবরদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এটির অবস্থান।

[মহা (k) ৬.১২.২১-২২; (হরি) ৬.১২.২১-২২]

উষদ্রথ যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর বংশে জন্মগ্রহণকারী রাজর্ষি উশীনরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন তিতিক্ষু। তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ। ইনি পূর্বদেশের অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন বলে জানা যায়। হেম নামে উষদ্রথের এক পুত্রসন্তান হয়।

[বায়ু পু. ৯৯.২৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.২৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১]

উষ্ণীগঙ্গ ভৃগুতুঙ্গ পর্বত থেকে সৃষ্ট একটি পবিত্র নদী। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশে তুষ্ণীগঙ্গ পাঠ পাওয়া যায়। *[মহা (k) ৩.১৩৫.৭; (হরি) ৩.১১১.৭]*

উষ্ণীনাভ বিশ্বেদেবগণের একজন দেবতা।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে দাঁড়ায় সমস্ত দেবতা। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন—'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা-বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেবা বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবগণের পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিককালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

☐ পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

☐ বিশ্বেদেবগণের মধ্যে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নামের তালিকা পালটে যায় এবং সংখ্যাও একেক জায়গায় এক এক রকম। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যে সব নাম আছে তার মধ্যে অন্যতম হলেন উষ্ণীনাভ।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩৪; (হরি) ১৩.৭৮.৩৪]

উষ্ণীষী শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। 'উষ্ণীষ' শব্দের অর্থ শিরোবেষ্টক বা পাগড়ী অথবা মুকুট। মস্তকে মুকুট বা উষ্ণীষ ধারণ করেন বলেই মহাদেব উষ্ণীষী নামে খ্যাত। কিংবা জটাজুটধারী রুদ্রশিবের জটাটিই তাঁর উষ্ণীষ বা মুকুটের মতো শোভা পায়—এই অর্থে 'জটামুকুটবান্' মহাদেব উষ্ণীষী নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪৪; (হরি) ১৩.১৬.৪৪]

উষ্ণপ *[দ্র. তপস্বী]*

উহ্যক মৎস্য পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি উহ্যকের বংশ তার মধ্যে একটি। ইনি বশিষ্ঠ বংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক। *[মৎস্য পু. ২০০.৯]*

উ

উ সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চর্তুদশ স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই চর্তুদশ স্বরধ্বনির থেকেই চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপতি মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্ট এই চর্তুদশ স্বরধ্বনির ষষ্ঠতম হল 'উ' কার বর্ণ। এই 'উ' কার বর্ণ থেকে চরিষ্ণব মনুর সৃষ্টি হয়েছিল। বায়ু পুরাণে অ থেকে ঔ পর্যন্ত চর্তুদশ বর্ণকে মূর্তিমান দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মূর্তিমান উ-কার পীতবর্ণের ছিলেন বলে জানা যায়।

[বায়ু পু. ২৬.৩৭]

উরু$_{১}$ চাক্ষুষ মনুর ঔরসে বৈরাজ প্রজাপতি অরণ্যের কন্যা নড়্বলার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে উরু একজন।

[গরুড় পু. ১.৮৭.২১; বায়ু পু. ৬২.৯২; কূর্ম পু. ১.১৪.৭-৯; মৎস্য পু. ৪.৪০-৪১; মার্কণ্ডেয় পু. ৭৩.৫৫]

☐ চাক্ষুষ মন্বন্তরে উরু সপ্তর্ষিদের মধ্যেও একজন ছিলেন বলে বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[বিষ্ণু পু. ৩.১.২৭-৩০]*

উরু$_{২}$ গরুড় পুরাণ অনুসারে চতুর্দশ ভৌত্য মনুর পুত্রদের মধ্যে উরু একজন।

[গরুড় পু. ১.৮৭.৫৭]

☐ ভাগবত পুরাণ মতে চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্রদের মধ্যে একজন উরু। গম্ভীর, বুদ্ধি প্রমুখ উরুর ভ্রাতা। *[ভাগবত পু. ৮.১৩.৩৩]*

ঊর্জ$_{১}$ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবর বংশধারায় রাজা বৎসরের ঔরসে স্বর্বীথির গর্ভজাত পুত্রসন্তানদের মধ্যে একজন ছিলেন ঊর্জ।

[ভাগবত পু. ৪.১৩.১২]

ঊর্জ$_{২}$ ঊর্জ অর্থে কার্তিক মাসকে বোঝানো হয়। ভাগবত পুরাণ মতে, কার্তিক মাসে উদিত সূর্যের নাম বিষ্ণু। এই মাসে সূর্যরথে অশ্বতর নাগ, অপ্সরা রম্ভা, সূর্যবর্চা নামক গন্ধর্ব, সত্যজিৎ নামক যক্ষ, ঋষি বিশ্বামিত্র এবং রাক্ষস মখাপেত অবস্থান করেন।

বায়ু পুরাণে এ বিষয়ে ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণ মতে আশ্বিন-কার্তিক এই দুই মাসে সূর্যরথে পর্জন্য এবং পূষা নামক আদিত্য, ভরদ্বাজ ও গৌতম মুনি, বিশ্বাবসু ও সুরভি গন্ধর্ব, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী অপ্সরা, ঐরাবত ও ধনঞ্জয় নাগ, সেনজিৎ এবং সুষেণ নামক যক্ষ এবং আপ ও বাত রাক্ষস অবস্থান করেন।

[বায়ু পু. ৩০.৯; ৫২.১৫; ভাগবত পু. ১২.১১.৪৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.১০]

ঊর্জ$_{৩}$ স্বারোচিষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন। ইনি মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র ছিলেন।

[বায়ু পু. ৬২.১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১৭; বিষ্ণু পু. ৩.১.১১; মার্কণ্ডেয় পু. ৬৭.৪]

ঊর্জ$_{৪}$ ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তরে যখন রুদ্র সাবর্ণি বা ঋতসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় দেবতারা যে-সব গণে বিভক্ত হবেন হরিত তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঊর্জ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮৫; বায়ু পু. ১০০.৮৯]

ঊর্জ$_{৫}$ তৃতীয় মন্বন্তরাধিপতি ঔত্তম মনুর দশ পুত্র সন্তানের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ৯.১২]*

ঊর্জ$_{৬}$ মগধরাজ বৃহদ্রথের বংশধারায় সুধন্বার পুত্র ছিলেন ঊর্জ। তাঁর পুত্র নভঃ। *[বায়ু পু. ৯৯.২২৫]*

ঊর্জ$_{৭}$ নিমিবংশীয় রাজা শুচির পুত্র। বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে এবং অন্যান্য পুরাণে অবশ্য তাঁকে ঊর্জবহ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সত্যধ্বজ নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়।

[দ্র. ঊর্জবহ]

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১৩]

ঊর্জ$_{৮}$ জনৈক যক্ষ। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ইনি সূর্য রথে অবস্থান করেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ৫২.৪]*

ঊর্জ$_{৯}$ তৃতীয় মন্বন্তরে যখন উত্তম মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন সুধামা তাঁর মধ্যে অন্যতম প্রধান গণ। এই গণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঊর্জ। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.২৮]*

ঊর্জ$_{১০}$ ঊর্জ নামে ঋষিদের একটি গণ ছিল। এঁরা ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র।

শিবপুরাণ অনুসারে এই ঋষিরা বৈবস্বত মনুর কালে ধর্মশাস্ত্রের উপদেষ্টা ছিলেন।

[শিব পু. (ধর্ম) ৫৮.১৪-১৫]

উর্জ$_{১১}$ *[দ্র. শুচি$_{৪}$]*

উর্জকেতু নিমির বংশধারায় সনদ্বাজের পুত্র এবং অজের পিতা উর্জকেতু। *[ভাগবত পু. ৯.১৩.২২]*

উর্জবহ$_{১}$ *[দ্র. শুচি$_{৪}$]*

উর্জবহ$_{২}$ বায়ু পুরাণ অনুসারে নিমির বংশধারায় সুদ্যুম্নের পুত্র মুনি। মুনির পুত্র হলেন উর্জবহ এবং তিনি সুক্তদ্বাজের পিতা।

আবার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, প্রদ্যুম্নের পুত্র মুনি। উর্জ্জবহ ছিলেন মুনির পুত্র এবং সনদ্বাজ-এর পিতা।

[বায়ু পু. ৮৯.১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.২০]

উর্জযোনি মহাভারতের অনুশাসন পর্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যেসব ব্রহ্মবাদী পুত্রদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উর্জযোনি একজন।

[মহা (k) ১৩.৪.৫৯; (হরি) ১৩.৩.৭৮]

উর্জশ্রী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে শরৎ ঋতুর পত্নীদের মধ্যে একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৩২.৩৪]*

উর্জস্বতী$_{১}$ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের ঔরসে এবং বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর গর্ভে উর্জস্বতী জন্মগ্রহণ করেন।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। উর্জস্বতীর গর্ভে শুক্রাচার্যের দেবযানী নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৫.১.২৪, ৩৪;
দেবীভাগবত পু. ৮.৪.৩, ২৭]

উর্জস্বতী$_{২}$ ভাগবত পুরাণ অনুসারে অষ্টবসুর মধ্যে প্রাণ একজন। এই প্রাণের স্ত্রী উর্জস্বতী। প্রাণের ঔরসে উর্জস্বতীর গর্ভে সহ, আয়ু এবং পুরোজব এই তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৬.৬.১২]

উর্জস্বী$_{১}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে ভৌত্য মনুর পুত্রদের মধ্যে উর্জস্বী একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১১৫]

উর্জস্বী$_{২}$ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, বৈবস্বত মন্বন্তরে উর্জস্বী ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৯.৪]*

উর্জিত$_{১}$ কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন উর্জিত। *[ভাগবত পু. ৯.২৩.২৭]*

উর্জিত$_{২}$ বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম শরশয্যায় থাকার সময়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে ভগবান বিষ্ণুর যেসব নামকীর্তন করেছিলেন, উর্জিত তার মধ্যে অন্যতম।

টীকাকার শঙ্করাচার্য ভগবানের উর্জিত নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

বলপ্রকর্ষশালিত্বাৎ উর্জিত।

সংস্কৃতে উর্জঃ (উর্জস্) শব্দের অর্থ বল বা শক্তি। সেক্ষেত্রে উর্জিত বলতে যেমন তেজঃসম্পন্ন বা শক্তিমান বোঝানো হয়, তেমনই প্রাচুর্য্য বা আধিক্য বোঝাতেও উর্জিত শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। ঈশ্বর সর্ব-শক্তিমান, জগতের সমস্ত শক্তির তিনি আধারস্বরূপ বলেই তাঁর এক নাম উর্জিত। ভগবদ্‌গীতায় বিভূতিযোগে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—এই বিশ্বে যা কিছু বিভূতিযুক্ত শ্রীযুক্ত এবং উর্জিত অর্থাৎ আধিক্য সম্পন্ন—তাকে তুমি আমারই শক্তির অংশ বলে জেনো—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিত মেব বা।
তত্তদেবাব গচ্ছ ত্বং মম তেজো'শসম্ভবম্॥

বস্তুত জগতে একমাত্র তিনিই শক্তিমান, বল, বুদ্ধি-জ্ঞানের উৎস স্বরূপ। গ্রহ যেমন নক্ষত্রের আলোকে আলোকিত হয় তেমনই এই জগতে যা কিছু শক্তিমান শ্রীমান হিসেবে খ্যাত তা তাঁরই অংশমাত্র। এই কারণেই ভগবান বিষ্ণু উর্জিত নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩০; (হরি) ১৩.১২৭.৩০]

উর্জিতশাসন ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১০; (হরি) ১৩.১২৭.১১০]

উর্জ্জা$_{১}$ প্রজাপতি দক্ষের কন্যা এবং বশিষ্ঠের পত্নী উর্জ্জা। *[ভাগবত পু. ৪.১.৩৯;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৯.৫২, ৫৬;
বিষ্ণু পু. ১.৭.২৩; বায়ু পু. ১০.২৮, ৩২]

□ ভাগবত পুরাণ অনুসারে বশিষ্ঠের ঔরসে উর্জ্জার গর্ভজাত সন্তানরা হলেন চিত্রকেতু, বিরজা, সুরোচি, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্‌যান ও দ্যুমন্ প্রমুখ। *[ভাগবত পু. ৪.১.৪০]*

□ বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, উর্জ্জার গর্ভে বশিষ্ঠের যে সাতজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন রজঃ, গাত্র, উর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র। *[বিষ্ণু পু. ১.১০.১৩-১৪]*

□ বায়ু পুরাণ অনুসারে আবার বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্ররা হলেন—রজ, পুত্র, অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সুতপা এবং শুক্র।

পুণ্ডরীকা নামে উর্জ্জা এবং বশিষ্ঠের একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও

উর্জ্জা ও বশিষ্ঠের কন্যা পুণ্ডরীকার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ২৮.৩৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.৪০]

☐ মার্কণ্ডেয় পুরাণে অবশ্য উর্জ্জার পুত্রদের একটু ভিন্ন নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন—রজ, গাত্র, উর্দ্ধবাহু, সবল, অনঘ, সুতপা ও শুক্র।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫২.২৫-২৬]

উর্জ্জা$_2$ অপ্সরাদের চতুর্দশগণের মধ্যে অন্যতম। এই উর্জ্জা থেকে অপ্সরাদের অগ্নিসম্ভবগণের উৎপত্তি হয়েছে।

[বায়ু পু. ৬৯.৫৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৯]

উর্ণ ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন পার্বত্য জনপদ। এখানে বসবাসকারী জনজাতিটির নামও উর্ণ। উর্ণ অর্থাৎ ভেড়ার লোম। এই পার্বত্য জনপদে প্রচুর মেষলোমজাত বস্ত্র উৎপাদন করা হত বলে মনে হয়। *[মৎস্য পু. ১১৪.৫৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৬৭]*

উর্ণনাভ$_1$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৬; ১.১১৭.৫; (হরি) ১.৬২.৯৮; ১.১১১.৫]

উর্ণনাভ$_2$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত একজন দানব। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইনি চূর্ণনাভ নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[বায়ু পু. ৬৮.৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৯]

উর্ণনাভি পুরাণে মহর্ষি অত্রির গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। উর্ণনাভি সেই গোত্রের অন্যতম। অত্রি মুনি থেকে বংশপরম্পরায় বা শিষ্যপরম্পরায় এরাও আত্রেয় বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৭.৬]*

উর্ণা$_1$ ভাগবত পুরাণ অনুসারে ঋষভদেবের বংশধারায় গয়রাজার পুত্র চিত্ররথের পত্নী উর্ণা। উর্ণার গর্ভে চিত্ররথের সম্রাট নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। *[ভাগবত পু. ৫.১৫.১৪]*

উর্ণা$_2$ অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে যে, রাজ্যাভিষেকের সময় যেসব দেব-দেবী পূজিত হন, তাঁদের মধ্যে উর্ণা একজন দেবী। *[অগ্নি পু. ২১৯.১০]*

উর্ণা$_3$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি মরীচির ভার্যা উর্ণা। মরীচির ঔরসে উর্ণাদেবীর গর্ভে ধর্মপরায়ণ ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবী উর্ণার গর্ভজাত এই ছয় পুত্র 'ষড়্‌গর্ভ' নামে বিখ্যাত ছিলেন। ব্রহ্মার অভিশাপে উর্ণাদেবীর এই ছয় পুত্র জন্মান্তরে প্রথমে কালনেমির পুত্র এবং পরে হিরণ্যকশিপুর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। *[ভাগবত পু. ১০.৮৫.৪৭; দেবীভাগবত পু. ৪.২২.৭-১১]*

উর্ণায়ু মৌনেয় গন্ধর্বদের মধ্যে একজন। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে মুনির গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে উর্ণায়ু একজন। মুনির পুত্র বলে মৌনেয় নামে তিনি খ্যাত হয়েছেন। হেমন্ত ঋতুতে আদিত্য ও চিত্রসেন নামক গন্ধর্বের সঙ্গে তিনি সূর্যরথে অবস্থান করেন বলে পুরাণগুলিতে বলা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৬৯.১; ৫২.১৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১৭; বিষ্ণু পু. ২.১০.১৩]

উর্ণাশ পিশাচদের ষোলটি গণের মধ্যে একটি।

[বায়ু পু. ৬৯.২৬৪]

উর্ধ্ব$_1$ ভৃগুবংশীয় যেসব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উর্ধ্ব একজন। *[মৎস্য পু. ১৪৫.৯৯]*

উর্ধ্ব$_2$ শিবের অন্যতম নাম। বায়ু পুরাণ অনুসারে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সহস্র বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। দেবাদিদেব মহাদেব তুষ্ট হয়ে শুক্রাচার্যকে বর প্রদান করলে তিনি মহাদেবের স্তব শুরু করেন। উর্ধ্ব মহাদেবের সেই স্তবনামের মধ্যে একটি।

[বায়ু পু. ৯৭.১৮৮]

উর্ধ্বকেতু প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে সুরভির গর্ভজাত দ্বাদশ জন রুদ্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উর্ধ্বকেতু ওই রুদ্র পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৬.৬৯]

উর্ধ্বগ$_1$ ভাগবত পুরাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের ঔরসে মাদ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মণার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে **উর্ধ্বগ** একজন।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৫]

উর্ধ্বগ$_2$ বিষ্ণু সহস্রনামের মধ্যে একটি। টীকাকার শঙ্করাচার্য উর্ধ্বগ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

> সর্বেষামুপরি তিষ্ঠন উর্দ্ধগঃ।

তাঁর স্থান দেব-দানব-মানব সকলের উচ্চে, তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই অর্থে এটি ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১৫; (হরি) ১৩.১২৭.১১৫]

উর্ধ্বগাত্মা ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ভগবান শিবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

ঊর্ধ্বগাত্মা উপাধিত্রয়াদুপরিগত
আত্মা স্বরূপং যস্য।

এখানে 'উপাধিত্রয়' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণকে একত্রে 'উপাধি' বলা হয়ে থাকতে পারে। ভগবান শিব ত্রিগুণাতীত বলে ঊর্ধ্বগাত্মা নামে খ্যাত।

অমরকোষে গুণযোগ, দ্রব্যযোগ এবং ক্রিয়াযোগকে একত্রে উপাধিত্রয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

গুণদ্রব্যক্রিয়া যোগোপাধিভিঃ।

ভগবান শিব এই উপাধিত্রয়েরও ঊর্ধ্বে বলে তিনি ঊর্ধ্বগাত্মা নামে খ্যাত।

[অমরকোষ ৩. (লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গ) ৪৪; মহা (k) ১৩.১৭.১৩৬; (হরি) ১৩.১৬.১৩৫]

ঊর্ধ্বদৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, ঊর্ধ্বদৃষ্টি একজন বানর। তিনি শ্বেত-বানরের পুত্র এবং ব্যাঘ্রের পিতা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৮০, ২০৫]

ঊর্ধ্ববাহু$_{১}$ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে যে, যমের দক্ষিণদিকে যেসব ঋষিরা অবস্থান করতেন, তাঁদের মধ্যে ঊর্ধ্ববাহু অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১৫০.৩৪; (হরি) ১৩.১২৮.৩৩]

ঊর্ধ্ববাহু$_{২}$ বশিষ্ঠ মুনির ঔরসে উর্জার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ঊর্ধ্ববাহু। রৈবত মন্বন্তরে যখন বিভু ইন্দ্র হয়েছিলেন, তখন যেসব ঋষিরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন, ঊর্ধ্ববাহু তাঁদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ৮.৫.৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.৪১; ১.৩৬.৬২; বিষ্ণু পু. ১.১০.১৩; ৩.১.২২; বায়ু পু. ৬২.৫৩-৫৪; গরুড় পু. ১.৫.১৫; কূর্ম পু. ১.১৩.১৩; ব্রহ্ম পু. ৫.২৫; মার্কণ্ডেয় পু. ৫২.২৫; ৭৫.৭৩; শিব পু. (বায়বীয়) ১৫.৩৪-৩৬]*

ঊর্ধ্ববাহু$_{৩}$ গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে যে, ঔত্তম মনুর পুত্রদের মধ্যে ঊর্ধ্ববাহু অন্যতম।

[গরুড় পু. ১.৮৭.১০]

ঊর্ধ্ববাহু$_{৪}$ স্কন্দ পুরাণ মতে ঊর্ধ্ববাহু একজন দৈত্য। তিনি কুশ নামক এক দৈত্যরাজকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করেন।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/দ্বারকা) ২০.২৭]

ঊর্ধ্ববাহু$_{৫}$ একজন দানব। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষের তৃতীয় কন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[কালিকা পু. ৩৪.৫৫]*

ঊর্ধ্ববেণীধরা স্কন্দকার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৮; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৮ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

ঊর্ধ্বমনু সিন্ধুনদের জলসিঞ্চিত একটি পশ্চিমদেশীয় জনপদ। *[বায়ু পু. ৪৭.৪৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৪৯]*

ঊর্ধ্বায়ন ভাগবত পুরাণ অনুসারে প্লক্ষদ্বীপের অধিবাসীরা চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। এই বর্ণগুলির মধ্যে অন্যতম এবং তৃতীয় বর্ণটি হল ঊর্দ্ধায়ন। *[ভাগবত পু. ৫.২০.৪]*

ঊর্ধ্বরেতা (ঊর্ধ্বরেতস্) যাঁর রেত বা বীর্য্য ঊর্ধ্বপথ অবলম্বন করে, অর্থাৎ নিরন্তর অভ্যাসযোগ এবং সংযমশক্তিতে যাঁর তেজোবীর্য্য স্খলিত হয় না, তাঁকে ঊর্ধ্বরেতা বলা হয়। ঊর্ধ্বরেতার ক্ষেত্রে স্ত্রী-সঙ্গম বা সঙ্গমহীন অবস্থার কোনো ভেদ নেই। ভাগবত পুরাণের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষে ব্রজকুল-ললনা গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের যে মিলন ঘটেছিল, সেখানে কৃষ্ণের বিশেষণ হিসেবে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটিই ঊর্ধ্বরেতা শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য বহন করে। সেখানে বলা হয়েছে—সত্যকাম শ্রীকৃষ্ণ স্বানুরক্তা ব্রজরমণীদের সঙ্গে শরৎকালীন রাত্রিটি উপভোগ করলেন, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গানুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের মধ্যেই নিজের উদ্যত সুরত-তেজ অবরুদ্ধ করেছিলেন—

মিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ।
সর্বাঃ শরৎ কাব্যকথারসাশ্রয়াঃ।

শ্রীধর-টীকায় আত্মার মধ্যে অবরুদ্ধসৌরত কৃষ্ণের বিশেষণটি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—এইভাবে আত্মার মধ্যেই যাঁর সুরতবীর্য্য বা চরম ধাতু অবরুদ্ধ থাকে, চরম ধাতু স্খলিত হয় না, এটা তেমনই এক কামজয়ের কথা—

এবমপি আত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতশ্চরমধাতুর্ন
স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ।

[ভাগবত পু. ১০.৩৩.২৬; শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

□ কামনা-জয়ের অভিজ্ঞান হিসেবে এই ঊর্ধ্বরেতা নামটি শুধু কৃষ্ণের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, ভগবান শিবের একটি নাম বা epithet-ই হল ঊর্ধ্বরেতা। তিনি ছাড়া মুনি-ঋষি এবং

গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বী মানুষেরাও অনেকে **ঊর্ধ্বরেতা** ছিলেন, তার কিছু কিছু বিবরণ মহাভারতে আছে। মহাভারতে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনৎকুমার প্রমুখ ব্রহ্মর্ষিদের ঊর্ধ্বরেতা বলা হয়েছে। মহাভারতের সভাপর্বে ব্রহ্মার সভার যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানে উল্লিখিত হয়েছে অষ্টাশী হাজার ঊর্ধ্বরেতা ঋষি-মহর্ষি ব্রহ্মার সেই সভায় অবস্থান করেন—

অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্ধ্বরেতসাম্।

কুরুবংশীয় রাজা শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম দেবব্রত আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। পিতা শান্তনু দাসরাজের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু দাসরাজ শর্ত রাখেন যে, যদি সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রকেই রাজা নিজের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তাহলেই তিনি বিবাহে সম্মতি দেবেন। দেবব্রত সিংহাসন ত্যাগে সম্মত হলেন। তবু সমস্যা একটা থেকেই গেল। যদি দেবব্রতর বংশধররা রাজ্যভাগ চেয়ে বসেন। ঠিক এই সমস্যার সমাধানের জন্যই দেবব্রত আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিজ্ঞা করেন এবং এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যই তিনি ভীষ্ম নামে খ্যাত হন। মহাভারতে একাধিক শ্লোকে শান্তনব ভীষ্মকে ঊর্ধ্বরেতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে তাঁর এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতের জন্য।

[মহা (k) ২.১১.৪৯; (হরি) ২.১১.৫২]

☐ ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে **ঊর্ধ্বরেতাও** অন্যতম একটি নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার মহাদেব ঊর্ধ্বরেতা নামে সম্বোধিত হয়েছেন। এর মধ্যে একটি শ্লোকে মহাদেবের ঊর্ধ্বরেতা, ঊর্ধ্বলিঙ্গ, ঊর্ধ্বশায়ী নাম তিনটি একত্রে উচ্চারিত হয়েছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও একত্রে এই তিনটি নামের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। ঊর্ধ্বরেতা অর্থাৎ ব্রহ্মচারী। নীলকণ্ঠের টীকা অনুযায়ী, অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যঃ। অর্থাৎ যিনি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন বা যাঁর ব্রহ্মচর্য্যব্রত কখনোই ভঙ্গ হয় না। মহাকাব্য পুরাণে আমরা ভগবান শিবকে অন্যতম প্রজাস্রষ্টা বা প্রজাপতির ভূমিকায় দেখলেও মহাদেবের এই নাম তাঁর নিষ্কাম নিরাসক্ত সংযতেন্দ্রিয় ধ্যানমগ্ন যোগীর মূর্তিটিকেই স্পষ্ট করে তোলে। কামনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, তিনি প্রজাসৃষ্টির বাসনায় মৈথুনধর্মে রত নন, তাঁর রেতঃস্খলিত হয় না বলেই তিনি ঊর্ধ্বরেতা। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের একটি শ্লোকে শিব-মহাদেবকে ঊর্ধ্বরেতা নামে সম্বোধন করা হয়েছে। কুমার সম্ভবের টীকাকার মল্লিনাথও অনুরূপ ভাবনা থেকেই ঊর্ধ্বরেতা শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—

যতঃ ঊর্ধ্বম্ ঊর্ধ্বগামি ইত্যর্থঃ।
নত্বধোগামি তেন পার্বতীযোনৌ
ন পতিতমিতি ভাবঃ।

রেত বীর্য্যং যস্য তথাভূতঃ।

[কুমারসম্ভব ৯.১৪; মল্লিনাথ কৃতটীকা দ্রষ্টব্য]

একই ভাবনা থেকে মহাদেব-শিব ঊর্ধ্বলিঙ্গ এবং ঊর্ধ্বশায়ী নামেও বিখ্যাত। নীলকণ্ঠ এই নামত্রয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

এতেন নামত্রয়েণ উময়া শিবো ন গ্রস্ত ন চ
স্পৃষ্টঃ যতঃ অসঙ্গ ইতি অর্থত্রয়ং দর্শিতম্।

উপনিষদে ব্রহ্মকে ঊর্ধ্বরেতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

ঋতাং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্
ঊর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ॥

[মহানারায়ণোপনিষদ ১২.১]

মহাদেবই সেই শাশ্বত পরব্রহ্মস্বরূপ—এই ভাবনায় তাঁকেও ঊর্ধ্বরেতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *[মহা (k) ১৩.১৭.৪৬, ৯৯; (হরি) ১৩.১৬.৪৬, ৯৯]*

☐ মহাভারতে মহাদেবের ঊর্ধ্বরেতা হবার কারণ হিসেবে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। শূলপাণি মহাদেবের সঙ্গে দেবী ভগবতীর বিবাহের পর বারবার যখন তাঁদের দাম্পত্য সমাগম ঘটছে, তখন দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে উমা-মহেশ্বরকে প্রসন্ন করে বললেন—আপনি তপস্বী এবং অতিতেজস্বী, দেবী উমাও তপস্বিনী এবং তেজস্বিনী। আপনাদের দুয়ের সমাগমে যে পুত্র জন্মাবেন, তিনিও অতিশয় বলবান হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। আপনার সেই অতিতেজস্বী পুত্র দেবতাদের সকলকে অভিভূত পরাভূত করতে পারবেন অতি সহজেই। অতএব আমরা আপনার সঙ্গে এই বর চাই যে, আপনি আপনার সন্তান সৃষ্টিকারী তেজ নিগৃহীত করুন—

অপত্যার্থং নিগৃহীত্ব তেজঃ পরমকং বিভো।

বিশেষত আপনার তেজ ধারণ করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ কোনো স্থানেরই নেই বরঞ্চ

সে তেজ পতিত হলে তার প্রভাবে সম্পূর্ণ সৃষ্টি দগ্ধ হয়ে যাবে। অতএব এই উমা দেবীর গর্ভে আপনার যেন পুত্র না হয় সেইভাবে আপনি নিজেকে নিগৃহীত করুন। ভগবান রুদ্রশিব 'তথাস্তু' বলে দেবতাদের কথা মেনে নিয়ে নির্গমোদ্যত তেজ নিজের মধ্যে ধারণ করলেন এবং সেই সময় থেকে তিনি উর্ধ্বরেতা হলেন—

উর্ধ্বরেতাঃ সমভবত্ততঃ প্রভৃতি চাপি সঃ।

[মহা (k) ১৩.৮৪.৬০-৭৫;
(হরি) ১৩.৭৩.৬০-৭৫]

☐ বায়ু পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মার দেহ থেকে নীললোহিত রুদ্র রূপে মহাদেব জন্মগ্রহণ করেন। দেবী দাক্ষায়ণী সতী তাঁর পত্নী। শিব এবং সতীকে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করতে অনুরোধ করলে ভগবান শিব যে সন্তান উৎপাদন করলেন তাঁরা সকলেই রূপে-গুণে-শক্তিতে ভগবান শিবেরই সমতুল্য। সকলেই পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী, কপালহস্ত, ত্রিলোচন—তাঁরা জরা-মৃত্যুহীন, শিবের মতোই কখনো বা ধ্যানমগ্ন যোগী, কখনো বা ত্রিশূলহস্ত রুদ্রমূর্তি। ব্রহ্মা শিবের এমন শতসহস্র শিবতুল্য পুত্রকে দেখে ভীত হয়ে বললেন—আপনি এমন আত্মতুল্য, জরামৃত্যুহীন প্রজাসৃষ্টি থেকে বিরত হোন, আপনার এই পুত্রেরা ত্রিলোকে রুদ্রগণ নামে প্রসিদ্ধ হোক। কিন্তু এমন পুত্র আরও জন্ম নিলে তা দেব-দানব-মানব সকলের পক্ষেই ভয়ের কারণ হবে। ব্রহ্মার কথা শুনে শিব বললেন—ঠিক আছে, তাই হবে। আমি প্রজাসৃষ্টি থেকে বিরত হলাম—

প্রজাঃ স্রক্ষ্যামি ভদ্রন্তে স্থিতো'হং ত্বং সৃজপ্রজাঃ।

ভগবান শিব প্রজাসৃষ্টি থেকে বিরত হলেন বলেই তিনি উর্ধ্বরেতা নামে পরিচিত।

[বায়ু পু. ১০.৪৩-৬৪]

উর্ধ্বরোমা কুশদ্বীপের সাতটি বর্ষপর্বতের মধ্যে একটি। *[ভাগবত পু. ৫.২০.১৫;*
দেবী ভাগবত পু. ৮.১২.৩২-৩৩]

উর্ধ্বলিঙ্গ ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। *[দ্র. উর্ধ্বরেতা]*
[মহা (k) ১৩.১৭.৪৬; (হরি) ১৩.১৬.৪৬]

উর্ধ্বশায়ী শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান শিবের একটি নাম। *[দ্র. উর্ধ্বরেতা]*
[মহা (k) ১৩.১৭.৪৬; (হরি) ১৩.১৬.৪৬]

উর্ধ্বসংহনন শিবসহস্রনাম স্তোত্রে বর্ণিত শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

উর্ধ্বসংহনন; শ্রেষ্ঠো দৃঢ়শরীরশ্চেত্যর্থঃ।

সংহনন শব্দের অর্থ কঠিন বা দৃঢ়। নীলকণ্ঠ ভগবান শিবের এই নামটিকে তাঁর দীর্ঘ সুদৃঢ় দেহের বিশেষণ হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৩০; (হরি) ১৩.১৬.১২৯]

উর্বশীলিঙ্গতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৬৬]

উর্মি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অষ্টবসুদের মধ্যে একজন ছিলেন সোম। সোমের পুত্রদের মধ্যে একজন হলেন উর্মি।

[বায়ু পু. ৬৬.২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.২৩]

উর্মিমালী একটি হস্তী-নাম হিসেবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৪৬]

উর্মিলা জনক সীরধ্বজের দ্বিতীয়া কন্যা। লক্ষ্মণের পত্নী। তাড়কা-বধের প্রয়োজনে বিশ্বামিত্র যখন রামচন্দ্রকে অযোধ্যা থেকে নিয়ে গেলেন, তখন রামচন্দ্রের অনুগামী হলেন লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রের সঙ্গে তিনিও মিথিলায় যান। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার বিবাহ ঠিক হয়ে গেলে অন্যান্য ভাইদের বিবাহ-প্রসঙ্গ এল। তখন জনক সীরধ্বজ লক্ষ্মণের সঙ্গে উর্মিলার বিবাহ প্রস্তাব করেন। সেই মতো উর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিবাহ হয়। লক্ষ্মণের ঔরসে উর্মিলার গর্ভে অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু—এই দুই পুত্রের জন্ম হয়।

[রামায়ণ ১.৭১.২১-২২; ৭.১১৫.২]

বিবাহের পর বারো বছর অযোধ্যায় লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবন কেটেছে, কিন্তু একবারের জন্যও আমরা উর্মিলার নাম শুনিনি 'সংজ্ঞাম্পত্যে'। উর্মিলার জীবন এবং চরিত্র নিয়ে তাই এক ধরনের মহাকাব্যিক হতাশা আছে আমাদের মনে। রামচন্দ্র বনবাসে সীতাকে সঙ্গে পেয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ উর্মিলাকে বনে নিয়ে যাননি। অযোধ্যা থেকে বন-যাত্রার কালে লক্ষ্মণ সমস্ত গুরুজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও উর্মিলার কাছ থেকে কোনো বিদায় নেবার উদ্যোগ দেখিনি লক্ষ্মণের মধ্যে। যমুনার

উত্তর-তীরে রাত্রি যাপন করার সময় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ফিরে যেতে বলেন অযোধ্যায়। রামচন্দ্রের প্রতি দৃঢ় অনুগামীতায় লক্ষ্মণ তখন বলেন—তোমাকে ছেড়ে আমি পিতা দশরথ, ভাই শত্রুঘ্ন এমনকি জননী সুমিত্রাকেও দেখতে চাই না। এখানেও ঊর্মিলার নাম শুনতে পাই না আমরা এবং ঊর্মিলার সম্বন্ধে এই অনুচ্চারণ আমাদের অবাক করে দেয়। অবশেষে দুর্বাসা-অষ্টাবক্রের সদংশ-বাক্যজালে বিবশ হয়ে রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণকে ত্যাগ করছেন, তখন লক্ষ্মণ বিনা প্রত্যুত্তরে সরযূ-নদীতে দেহত্যাগ করতে গেছেন। একবারের জন্যও তিনি গৃহে যাননি। কিংবা দেখাও করেননি ঊর্মিলার সঙ্গে। কিন্তু লক্ষ্মণের বিশেষণ হিসেবে 'ঊর্মিলানন্দবর্ধন' কথাটি বাল্মীকির অতি প্রিয় প্রতিশব্দ। মহাকাব্যের এই-সব অনুচ্চারিত স্থান ..কে সূত্র সংগ্রহ করেই রবীন্দ্রনাথ হয়তো। 'কাব্যে উপেক্ষিতা'-র প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু তাতে অন্যতম উপেক্ষিতা হলেন ঊর্মিলা। এক বঞ্চিতা রমণী।

উষ্মপ$_{১}$ একপ্রকার পিতৃগণ। **উষ্মপ** পিতৃগণের বৈশিষ্ট্য হল যাঁরা উষ্ণ বস্তু পান করেন। শব্দের মধ্যে পান করা অর্থ থাকলেও ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত '**উষ্মপ**' শব্দের টীকায় মহামতি শ্রীধরস্বামী শ্রুতি-স্মৃতির বাক্য উদ্ধার করে বলেছেন যে, এই বিশেষ পিতৃগণ যজ্ঞের '**উষ্ম**' ভাগী—

'**উষ্মভাগা** হি পিতরঃ' ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

কিন্তু স্মৃতি প্রমাণে বলা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রাদ্ধে দেওয়া অন্ন উষ্ণ থাকে এবং শ্রাদ্ধদাতা উষ্ণ ঘৃতের গুণগান করতে থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই **উষ্মপ** পিতৃগণ শ্রাদ্ধ-দত্ত অন্ন ভোজন করতে থাকেন—

যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্যতাঃ।
পিতরস্তাবদশ্নন্তি যাবন্নোক্তো হবির্গুণাঃ।।

[ভগবদ্‌গীতা ১১.২২;
দ্র. শ্রীধরস্বামী কৃত সুবোধিনী টীকা]

□ যেসব পিতৃগণ যমরাজের সভায় অবস্থান করতেন এবং তাঁর আরাধনা করতেন, তাঁদের মধ্যে উষ্মপ পিতৃগণ একটি।

[মহা (k) ২.৮.৩০; (হরি) ২.৮.৩০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৭.১১১; ১.২৮.৯৩]

উষ্মপ$_{২}$ বায়ু পুরাণ অনুসারে পরাশর বংশীয় একজন ঋষি। আবার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে '**উষ্মপ**'-র পরিবর্তে '**উষ্মাদ**'-এই নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

[বায়ু পু. ৭০.৮৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৯৫]

উষ্ময় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে উষ্ময় একটি পিতৃগণ। সম্ভবত **উষ্মপ** পিতৃগণই পাঠান্তরে '**উষ্ময়**' নামে চিহ্নিত হয়েছেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৮.২৩]*

উসিজ ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে যখন তৃণবিন্দু ব্যাস হবেন তখন মহাদেব শ্বেত নামে মুনিপুত্র রূপে আবির্ভূত হবেন। সেইসময় শ্বেতের যে চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে **উসিজ** একজন।

[বায়ু পু. ২৩.২০৫]

ঋ

ঋ সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির থেকেই চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপতি মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা-সৃষ্ট এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির সপ্তমটি হল 'ঋ-কার। ব্রহ্মার সপ্তম মুখ থেকে এই বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল। এই 'ঋ'-কার থেকে বৈবস্বত মনুর সৃষ্টি হয়েছিল। বায়ু পুরাণে 'অ' থেকে 'ঔ' পর্যন্ত চতুর্দশ বর্ণকে মূর্তিমান দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মূর্তিমান 'ঋ'-কার কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ২৬.৩৯]*

ঋকসহস্রামিতেক্ষণ ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। 'ঈক্ষণ' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'ঈক্ষ্' ধাতু থেকে। এর অর্থ দেখা বা দর্শন করা। সেক্ষেত্রে অমিতেক্ষণ (অমিত + ঈক্ষণ) বলতে বোঝায় বহু সংখ্যক দর্শনেন্দ্রিয়। ঋগ্বেদের শতসহস্র মন্ত্রই জ্ঞানস্বরূপ মহাদেবের অসংখ্য জ্ঞানচক্ষুর স্বরূপ এই ভাবনা থেকে ঋক্‌সহস্রামিতেক্ষণ ভগবান শিবের নাম। এ নামটিকে একটু অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। সহস্র ঋক্‌মন্ত্র রূপ জ্ঞানচক্ষুর মাধ্যমেই তাঁর পরমেশ্বর স্বরূপতাকে সম্যকভাবে দর্শন করা যায় বলেই তিনি ঋক্‌সহস্রামিতেক্ষণ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯১; (হরি) ১৩.১৬.৯১]

ঋক্ মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে ঊনপঞ্চাশজন মরুৎ দেবতার জন্ম হয়। এই মরুৎ দেবতারা সাতটি গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে চতুর্থগণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঋক্। *[বায়ু পু. ৬৭.১২৭]*

ঋক্ষ$_১$ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে আমরা প্রাচীন ভারতে বসবাসকারী বানর প্রভৃতি জাতির পাশাপাশি ঋক্ষ জাতির নামোল্লেখ পাই। কখনো কখনো এই ঋক্ষদের বানরজাতি হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরাণ ও মহাভারতে বলা হয়েছে যে, কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী ক্রোধা বা ক্রোধবশার অন্যতমা কন্যা মৃগমন্দা ছিলেন এই ঋক্ষ জাতির জন্মদাত্রী। মৃগমন্দা প্রভৃতি ক্রোধবশার নয় কন্যা ছিলেন পুলহ প্রজাপতির পত্নী। বানর জাতির মতোই ঋক্ষরাও পুলহ প্রজাপতির বংশধর।

ঋক্ষ শব্দের আভিধানিক অর্থ ভল্লুক। রামায়ণে এবং পুরাণে আমরা ঋক্ষ-দলপতি জাম্ববানের নামোল্লেখ পাই। তাঁকে ঋক্ষ বলা হলেও তাঁর সহোদর ভাই ধূম্রকে বানর যূথপতি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। লক্ষণীয়, রামায়ণ এবং পুরাণের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই বানর-ঋক্ষরা ছিলেন বিন্ধ্য পর্বতের অদূরে অবস্থিত নর্মদাতীরস্থ ঋক্ষ পর্বতের অধিবাসী। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ স্যমন্তকমণির সন্ধান করতে করতে এই ঋক্ষ পর্বতেই এসে পৌঁছান, যেখানে জাম্ববানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই টুকরো টুকরো তথ্যগুলিকে জোড়া দিলে মনে হয়—ঋক্ষরা মূলত ঋক্ষ-পর্বতবাসী প্রাচীন কোনো উপজাতি, বানরজাতির সঙ্গেও এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই উপজাতির লোকেরা ভল্লুকের Totem ব্যবহার করত কী না এবিষয়েও চিন্তাভাবনার অবকাশ থাকছে।

[রামায়ণ ৪.৩৯.২৬; ৪.৫০.৭-৩৭; ৬.২৭.৯;
মহা (k) ১.৬৬.৬২; (হরি) ১.৬১.৬২;
ভাগবত পু. ৯.১০.১৯, ৪৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২১০-২১৭;
২.৭.১৭৪, ৩১৯]

ঋক্ষ$_২$ পুরুবংশীয় রাজা অজমীঢ়ের পত্নী ধূমিনীর গর্ভে জাত পুত্র সন্তানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঋক্ষ। অজমীঢ়ের এই পুত্রই সম্ভবত পুরুবংশের মূল ধারাটিকে ধারণ করছিলেন। কারণ ঋক্ষের পুত্র রাজা সংবরণের নাম আমরা মূল পুরুবংশীয় রাজাদের মধ্যে পাই।

[মহা (k) ১.৯৪.৩২, ৩৪; (হরি) ১.৮৯.২২-২৩;
ভাগবত পু. ৯.২২.৩; মৎস্য পু. ৫০.১৯;
বায়ু পু. ৯৯.২১৪; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৮]

ঋক্ষ$_৩$ পুরুবংশীয় রাজা অরিহের ঔরসে অঙ্গরাজকন্যা সুদেবার গর্ভজাত পুত্র ছিলেন ঋক্ষ। ইনি তক্ষকের কন্যা জ্বালাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করেন। ঋক্ষের ঔরসে জ্বালার গর্ভে মতিনার জন্মগ্রহণ করেন।

[মহা (k) ১.৯৫.২৪-২৫; (হরি) ১.৯০.৩০-৩১]

মহাভারতের পাঠ অনুযায়ী ঋক্ষ-র পিতা অরিহ ছিলেন রাজা দেবাতিথির পুত্র। পুরাণে ঋক্ষকে সরাসরি দেবাতিথির পুত্র বলেই চিহ্নিত

হতে দেখি, পৌত্র নয়। পুরাণ মতে ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন। *[বায়ু পু. ৯৯.২৩৩; বিষ্ণু পু. ৪.২০.৩-৪]*

ঋক্ষ$_{৪}$ পুরুবংশীয় রাজা অজমীঢ়ের পুত্র নীলের বংশধারায় পুরঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন ঋক্ষ। ঋক্ষের পুত্র ছিলেন হর্যাশ্ব। ইনি পঞ্চাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। *[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৯.৫৭-৫৮]*

ঋক্ষ$_{৫}$ পুরাণ মতে চতুর্বিংশতিতম (অন্যমতে পঞ্চবিংশতিতম) দ্বাপর যুগে মহর্ষি ঋক্ষ ব্যাস হবেন।

[বায়ু পু. ২৩.২০৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.১৮]

ঋক্ষ$_{৬}$ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের উল্লেখ পাই মহর্ষি ঋক্ষের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি ঋক্ষ পুরাণে অন্যতম আঙ্গিরস গোত্র প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৫০]

ঋক্ষ$_{৭}$ প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত পর্বতগুলির মধ্যে অন্যতম। মহাভারত পুরাণে একে ভারতবর্ষের অন্যতম কুলপর্বত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋক্ষ পর্বত মহাভারতে কখনো কখনো ঋক্ষবান পর্বত নামেও চিহ্নিত হয়েছে।

[মহা (k) ৬.৯.১১; (হরি) ৬.৯.১১;
ভাগবত পু. ৪.১.১৭; বায়ু পু. ৪৫.৮৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.১৮; বিষ্ণু পু. ২.৩.৩]

□ ঋক্ষ বা ঋক্ষবান পর্বতের অবস্থান প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিন্ধ্য পার্বত্য অঞ্চলের নিকটবর্তী এই পর্বত থেকেই নর্মদা নদীর উৎপত্তি। মহাভারতের বনপর্বে এই ঋক্ষবান পর্বতকে আর্যাবর্ত অর্থাৎ উত্তর ভারতের শেষ সীমা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর থেকেই দক্ষিণাপথ আরম্ভ—

এতে গচ্ছন্তি বহবঃ পন্থানো দক্ষিণাপথম্।
অবন্তীমৃক্ষবন্তঞ্চ সমতিক্রম্য পর্বতম্॥

রামায়ণ এবং মহাভারতে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে পণ্ডিতরা বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বভাগ এবং তৎসংলগ্ন ওড়িষা ও ছোটোনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলটিকে প্রাচীন ঋক্ষ পর্বত বলে মনে করেছেন। নর্মদা এবং শোণ নদীর উৎপত্তি এই পার্বত্য অঞ্চল থেকেই হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৬১.২১; ১২.৫২.৩২;
(হরি) ৩.৫১.২১; ১২.৫১.৩২;
রামায়ণ ৪.৫০ অধ্যায়;
GDAMI (Dey), p. 168-169]

□ এই ঋক্ষ পর্বত ভারতের প্রাচীন উপজাতি ঋক্ষ এবং বানরদের বাসভূমি। রামায়ণে জাম্ববান প্রভৃতিকে ঋক্ষ পর্বতবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণে স্যমন্তকমণির যে উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, সেখানেও উল্লেখ আছে যে, কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি খুঁজতে খুঁজতে ঋক্ষ পর্বতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন যেখানে জাম্ববানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। *[দ্র. ঋক্ষ$_{১}$]*

[বায়ু পু. ৯৬.৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.৩৯]

□ মহাভারতেও এই একই কথা বলা হয়েছে। পরশুরাম যখন নির্বিচারে ক্ষত্রিয় নিধন করছিলেন, সেই সময় পুরুবংশীয় রাজা বিদূরথের পুত্র এই ঋক্ষ পর্বতে অনার্য ঋক্ষ জাতির দ্বারা গোপনে প্রতিপালিত হন।

[মহা (k) ১২.৪৯.৭৬; (হরি) ১২.৪৮.৮৩]

□ ঋক্ষ পর্বত মূলত নর্মদার উৎপত্তিস্থল হিসেবে পরিচিত হলেও অন্যান্য অনেক ছোটো ছোটো নদী এই পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, শোণ, নর্মদা, তমসা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, করতোয়া প্রভৃতি বহুসংখ্যক নদী এই পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

[বায়ু পু. ৪৫.৯৮-১০১]

ঋক্ষ$_{৮}$ ঋক্ষ বলতে আভিধানিক অর্থে নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডলকেও বোঝানো হয়। মহাভারতে একাধিকবার এই অর্থে ঋক্ষ শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অনুশাসন পর্বে একজায়গায় তপস্যার জন্য কৃষ্ণ হিমালয়ে যেতে উদ্যত হলে, কৃষ্ণপত্নী জাম্ববতী তাঁর যাত্রা যেন নির্বিঘ্ন হয় এবং দেবতারা যেন তাঁকে রক্ষা করেন—এই মর্মে প্রার্থনা জানিয়েছেন। সেই সময় দেব-দেবী, নদী, ওষধি বৃক্ষ, ঋষিগণ প্রভৃতির সঙ্গে ঋক্ষদের উদ্দেশেও প্রার্থনা জানিয়েছেন তিনি। এই ঋক্ষ অবশ্যই শ্রবণা, ভদ্রা ইত্যাদি নক্ষত্র। এই নক্ষত্ররা, মেষ প্রভৃতি রাশিচক্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ যেন কৃষ্ণের সহায় হন—সেই জন্যই এই প্রার্থনা।

ব্রহ্মার উক্তিতে 'ঋক্ষ' শব্দের নক্ষত্র—এই অর্থটি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সৃষ্টির আদিতে প্রথমে দিন ও রাত্রি উৎপন্ন হয়, তারপর মাস, পক্ষ এবং শ্রবণা, ভদ্রা ইত্যাদি নক্ষত্রের জন্ম হয় বলে ব্রহ্মা বর্ণনা করেছেন—

অহঃ পূর্বং ততো রাত্রির্মাসা শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ।

[মহা (k) ১৩.১৪.৩৭; ১৪.৪৪.২;
(হরি) ১৩.১৩.৩৭; ১৪.৫৫.২]

ঋক্ষদেব শিখণ্ডীর পুত্র। ইনি অন্যত্র ক্ষত্রদেব নামে চিহ্নিত হয়েছেন। মহাভারতের দ্রোণপর্বে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধরত শিখণ্ডীপুত্রের রথ-ঘোড়া প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়। পদ্মফুলের মতো বর্ণযুক্ত বাহ্লীক দেশীয় অশ্বেরা তাঁর রথ বহন করছিল বলে উল্লেখ আছে। *[দ্র. ক্ষত্রদেব]*

[মহা (k) ৭.২৩.২৪-২৫; (হরি) ৭.২১.২৭নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য (ক্ষত্রদেব পাঠ ধৃত হয়েছে), খণ্ড ২১; পৃ. ১৮৮]

ঋক্ষরজা (ঋক্ষরজস্) পিতামহ ব্রহ্মার অশ্রু থেকে সৃষ্ট এক বলশালী বানর। পিতামহ ব্রহ্মা একদিন যোগাভ্যাস করার সময় তাঁর দু-চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয়। অশ্রুকণা হাতে নিয়ে, ব্রহ্মা তাঁর গায়ে মাখলেন এবং সেই অশ্রুকণার একাংশ ভূমিতে পড়া-মাত্রই তা থেকে ঋক্ষরজা (ঋক্ষরজস্)-এর জন্ম হয়। তিনি বালী এবং সুগ্রীবের পিতা। সমগ্র বানরজাতির রাজা ছিলেন তিনি।

□ জন্মের পর কিছুকাল তিনি মেরুপর্বতে ফলমূল আহার করে জীবনধারণ করেন। একদিন উত্তরমেরু শিখরে অবস্থিত একটি জলপূর্ণ সরোবরে জলপান করার সময় নিজের প্রতিবিম্বকে শত্রু ভেবে তাকে হত্যা করার জন্য তিনি সরোবরে প্রবেশ করেন। কিন্তু সরোবর থেকে উঠতেই তিনি এক পরমাসুন্দরী স্ত্রীতে রূপান্তরিত হন। তাঁকে দেখে ইন্দ্র ও সূর্য কামাসক্ত হয়ে পড়েন। ইন্দ্র ও সূর্যের বীর্য্য থেকে যথাক্রমে বালী ও সুগ্রীবের জন্ম হয়। রাত্রির অবসান হলে তিনি পুনরায় বানর রূপ লাভ করেন। তিনি তাঁর পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা নিযুক্ত করেন। *[রামায়ণ ৭.৪২.৯-১৩, ২০-৫৯]*

ঋক্ষা$_১$ কুরুবংশীয় রাজা অজমীঢ়ের অন্যতম পত্নী।

[মহা (k) ১.৯৫.৩৭; (হরি) ১.৯০.৪৭]

ঋক্ষা$_২$ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসেবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১২; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৬]

ঋগ্‌বেদ ভারতীয় তথা ইন্দো-ইয়োরোপীয় জনগোষ্ঠীর ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। চতুর্বেদের মধ্যেও প্রাচীনতম। খ্রিস্টজন্মের পূর্বে আনুমানিক অন্তত এক হাজার বছর আগে এই গ্রন্থের সৃষ্টিকাল, যদিও অনেক পণ্ডিতের মতে ঋগ্‌বেদের রচনা কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১৪০০ শতাব্দীর মধ্যে। ভারতীয় দার্শনিক এবং ধর্মপ্রবক্তারা এই গ্রন্থকে অপৌরুষেয় বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন—ঋষিরা দিব্যচক্ষে এই গ্রন্থোক্ত মন্ত্রবর্ণ দর্শন করেছিলেন, এই গ্রন্থ কেউ লেখেননি। ঋগ্‌বেদের অধ্যায় অথবা পর্ব দুভাবে ভাগ করা হত—(১) মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত এবং ঋক্। (২) অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ এবং মন্ত্র।

তিনটি চরণ বা চতুশ্চরণ মন্ত্রের এক-একটি স্তবককে *ঋক্* (verse) বলে। একত্রে কতগুলি ঋক্-সমূহকে সূক্ত (সু = শোভন, উক্ত = বাক্য, স্তুতি, প্রশংসা। সু + উক্ত = সূক্ত) বলে। সূক্তের মধ্যে একক দেবতার প্রশংসাও আছে, আবার কখনো দুই বা কয়েকজন দেবতার প্রশংসাও আছে। কয়েকটি সূক্ত নিয়ে একটি অনুবাক্ এবং কয়েকটি অনুবাক নিয়ে একটি মণ্ডল গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অনুযায়ী, কয়েকটি মন্ত্র নিয়ে একটি বর্গ। কয়েকটি বর্গ নিয়ে একটি অধ্যায় এবং নির্দিষ্ট আটটি অধ্যায় নিয়ে একটি অষ্টক গঠিত হয়েছে।

সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদে দশটি (১০) মণ্ডল, পঁচাশিটি (৮৫) অনুবাক, এক হাজার সতেরোটি (১০১৭) সূক্ত, এগারোটি (১১) বালখিল্য সূক্ত যোগ করলে সূক্ত-সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজার আটাশটি (১০২৮)। ঋগ্‌বেদের মন্ত্র-সংখ্যা দশ হাজার ছয়শোটি (১০৬০০)। দ্বিতীয় প্রকার অনুযায়ী, দশ হাজার ছশো মন্ত্র দুইহাজার ছয়টি (২০০৬) বর্গ তৈরি করেছে এবং এই বর্গসংখ্যা চৌষট্টি (৬৪) অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট। চৌষট্টিটি অধ্যায় আটটি (৮) অষ্টকে বিভক্ত।

ঋগ্‌বেদের প্রথম এবং দশম মণ্ডলে সূক্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদে সর্বনিম্ন ঋকের সংখ্যা এক এবং সর্বাধিক ঋকসংখ্যা আটান্ন। সমগ্র ঋগ্‌বেদে অক্ষরসংখ্যা চার লক্ষ বত্রিশ হাজার (৪,৩২,০০০)। ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয় থেকে সপ্তম—এই ছয়টি মণ্ডলকে ‘গোষ্ঠীমণ্ডল’ বলা হয়, কেননা এই মণ্ডলগুলির সূক্ত সমূহ কোনো-না-কোনো ঋষি অথবা তাঁর পরিবারের লোকেরা লিখেছেন। দ্বিতীয় মণ্ডলটি গৃৎসমদ নামে পরিচিত। এইভাবে তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্র বা কৌশিক, চতুর্থ মণ্ডল বামদেব, পঞ্চমটি অত্রি, ষষ্ঠ ভরদ্বাজ, সপ্তম বশিষ্ঠ

নামে পরিচিত। অষ্টম এবং প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাশটি সূক্ত মহর্ষি কণ্ঠ অথবা তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিরা রচনা করেছেন। নবম মণ্ডলের নাম সোম-পবমান, কেননা এখানে অধিকাংশ সূক্তই সোমের উদ্দেশে লেখা। দশম মণ্ডলের ঋষি অনেক, বিষয়বস্তুও বিচিত্র এবং অনেকেরই ধারণা এটি পরবর্তী কালের রচনা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বিখ্যাত পুরুষসূক্তটি পাওয়া যায় এবং এই সূক্তেই প্রথম চতুবর্ণের ভেদসম্বন্ধ উল্লিখিত হয়েছে *[১০.৯০.১২]*। ঋগ্বেদের প্রথম থেকে নবম মণ্ডল পর্যন্ত গঙ্গা নদীর নাম পাওয়া যায় না, যদিও *[৬.৪৫.৩১]* সংখ্যক মন্ত্রে 'গাঙ্গ্য' শব্দটি পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলেই প্রথম গঙ্গার নাম শুনতে পাই—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী...। *[১০.৭৫.৫]*

একেবারে দশম মণ্ডলে গঙ্গার নাম শ্রবণ করে পণ্ডিত জনে বলেছেন—এই মণ্ডল রচনার সময় আর্যরা সরস্বতীর জল-বিধৌত অঞ্চল থেকে গঙ্গার উপত্যকা অঞ্চলে চলে এসেছেন।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে স্তুতিবাক্য। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, আদিত্য, উষস্, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং আরও অনেক দেব-দেবীর সহায়তা লাভের জন্য সূক্তগুলি রচিত। অসংখ্য দেব-দেবীর মহিমাকীর্তনে বহু-ঈশ্বরবাদ আপাতত ঋগ্বেদের অভীষ্ট মনে হলেও আসলে এর মধ্যে একেশ্বরবাদের সূত্র আছে। এমন মন্ত্রও আছে—যেখানে বলা হচ্ছে—একই দেবতাকে অগ্নি, বরুণ সূর্য বলে ডাকা হয়েছে—দেবতা আসলে একজনই—

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

পণ্ডিতজনেরা এও বলেছেন যে, বেদের মধ্যে যখন যে দেবতার স্তুতি করা হচ্ছে, তখন অন্য দেবতাকে ভুলে তাঁরই চরম স্তুতি করা হচ্ছে বলে এই প্রবণতাকে monotheism বা politheism না বলে একে বলা উচিত henotheism—বা kathenotheism.

ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্তের মন্ত্রগুলিরই যাজ্ঞিক প্রয়োগের নিয়ম-বিধি আছে। একে বলে বিনিয়োগ। বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের কোথায় কোন অংশে কোন মন্ত্রের বিনিয়োগ ঘটবে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির বিষয়-বৈচিত্র্যও অসাধারণ। স্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য দেবতার স্তুতি ছাড়াও রাজা-রাজরা, সমাজের অন্য শ্রেণীর মানুষ, নদ-নদী, বৃক্ষ-লতা—সবকিছুই মন্ত্রবর্ণ অধিকার করে আছে। পাশাখেলায় হেরে জুয়ারি 'কিতবে'র যে পরিণতি ঘটেছিল—তার করুণ বর্ণনাও যেমন আছে, দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তেই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ, রাজন্য (ক্ষত্রিয়), বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের কথা শোনা যায়—

ব্রাহ্মণো'স্য মুখসাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো'জায়ত॥
[১০.৯০.১২]

দশম মণ্ডলে বেশ কিছু সূক্তে দার্শনিকতারও সূচনা হয়েছে ভালো ভাবে।

নারী-কবিদের রচিত ঋক্-সূক্তগুলি সামাজিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত নারী-কবির নাম ঋক্বেদে পাওয়া যায়, তাঁদের কিছু নাম হল—গোধা, ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, যমী, নারী, শশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রি, সূর্যা, সাবিত্রী ইত্যাদি। ঋগ্বেদের কবিতায় যে-সব বৈদিক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি হল—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিজগতী, শক্বরী, অতিশক্বরী, অষ্টি, অত্যষ্টি, ধৃতি, অতিধৃতি, দ্বিপদা গায়ত্রী, দ্বিপদা বিরাট, দ্বিপদা ত্রিষ্টুপ্, দ্বিপদা জগতী, একপদা বিরাট এবং একপদা ত্রিষ্টুপ। শুধু ছন্দোবদ্ধই নয়, ঋগ্বেদের বহু সূক্তে, বিশেষত সূর্য, পর্জন্য, মরুৎ, অপাং নপাৎ নামে বিদ্যুৎ দেবতা এবং সর্বোপরি সূর্য প্রণয়িণী উষার উদ্দেশে রচিত মন্ত্রগুলির কাব্য সৌন্দর্য্যের এমন সালংকার উপস্থিতি ঘোষিত হয়েছে যে, খ্রিষ্টপূর্ব অন্তত আড়াই/তিন হাজার বছর আগে এবং সাহিত্য সমুদয় ভারতবাসীর গর্বের কারণ হয়ে ওঠে।

[পঠিতব্য: S.S. Bhawe, The Sama Hymns of the Rigveda: A Fresh Interpretation; V.G. Rahurkar, The Seers of Rigveda; H.D. Griswold, The Religion of the Rigveda; M. Bloomfield, The Religion of the Vedas; L. Renew, The Destiny of the Vedas in India; Sukumari Bhattacharji, Literature in the Vedic Age, Vol. 1, pp. 1-157]

☐ রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্য এবং পুরাণগুলি যেহেতু ঋগ্‌বেদোত্তরকালে রচিত, সেহেতু ঋগ্‌বৈদিক ভাবনা, আচার-বিচার যেমন এই মহাকাব্যগুলিতে গৃহীত হয়েছে তেমনি ঋগ্‌বেদ এবং ঋক্‌মন্ত্রের কথা উল্লিখিতও হয়েছে অসংখ্যবার। পুরাণগুলিতে শিষ্যপরম্পরায় ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, যাঁরা ঋগ্‌বেদ সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন এবং আপন শিষ্যদের সেই সংহিতা অধ্যয়ন করিয়ে ছিলেন।

[বিষ্ণু পু. ৩.৪.৮-১৩, ১৬-২৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৪.১৪-৩০]

☐ পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রথম মুখ থেকে ঋগ্‌বেদের উৎপত্তি হয়। অবশ্য পুরাণে অন্যত্র ঋক্‌মন্ত্রগুলিকে প্রত্যঙ্গিরসের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. ১.৫.৫২; ১.১৫.১৩৬;
বায়ু পু. ৬৬.৭৮]

ঋচী$_{১}$ মহর্ষি অপ্রবাণের পত্নী।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৯৪]

ঋচী$_{২}$ নীপবংশীয় রাজা বিভ্রাজের পুত্র ছিলেন অণুহ। ঋচী এই অণুহের পত্নী ছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৯.১৭৯]

ঋচীক$_{১}$ মহর্ষি ভৃগুবংশীয় একজন ঋষি। মহাভারতে একস্থানে তাঁকে ভৃগুর পুত্র বলা হয়েছে। তবে কোনো কোনো পুরাণ মতে তিনি ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ঊর্ব বা আপ্নুবানের পুত্র। তাই তাঁকে ঔর্ব নামেও ডাকা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঋচীককে অজীগর্ত নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে তাঁকে ভৃগুবংশীয় চ্যবনপুত্র ঔর্বের পুত্র বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১.৬৬.৪৭; (হরি) ১.৬১.৪৭]

☐ চন্দ্রবংশীয় রাজা গাধির বনবাসকালে তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যা সত্যবতীর জন্ম হয়। সত্যবতী যৌবনে পদার্পণ করলে মহর্ষি ঋচীক গাধিরাজার কাছে গিয়ে সত্যবতীকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধ দরিদ্র মহর্ষিকে নিজের কন্যা দান করতে গাধিরাজা সম্মত ছিলেন না। তাই তিনি মহর্ষিকে বললেন—আমি আপনাকে কন্যা দান করতে পারি কিন্তু আমাদের বংশের চিরাচরিত প্রথা হল কন্যাপ্রার্থীকে উপযুক্ত কন্যাশুল্ক দিতে হয়। আপনি যদি আমার ইচ্ছানুসারে কন্যাশুল্ক দিতে প্রস্তুত থাকেন তবেই আপনার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেব। কানের ভিতরটা রক্তবর্ণ, বাইরে শ্যামবর্ণ এবং অন্যসমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ মহাবেগশালী এক সহস্র অশ্ব আমার কন্যাশুল্ক। মহর্ষি ঋচীক তাতেই সম্মত হলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বরুণদেব ঋষিকে অনুরূপ এক সহস্র অশ্ব দান করলেন। এরপর গাধি রাজা নিজের কন্যা সত্যবতীকে যথারীতি ঋচীকের হাতে সম্প্রদান করলেন। সত্যবতীর মত সুন্দরী এবং গুণবতী পত্নী লাভ করে ঋচীক অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

এরপর একসময় সত্যবতী স্বামীর কাছে নিজের এবং নিজের মাতার জন্য উপযুক্ত পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করলেন। মহর্ষি দুইভাগ চরু প্রস্তুত করে সত্যবতীকে বললেন তুমি ও তোমার মাতা নিজ নিজ চরু ভক্তি সহকারে ভক্ষণ কর। অবশ্যই তোমরা উপযুক্ত পুত্র সন্তান লাভ করবে। কিন্তু সত্যবতীর মাতা সত্যবতীকে বঞ্চনা করলেন। মায়ের আদেশে সত্যবতী নিজের জন্য নির্দিষ্ট চরু তাঁকে দান করলেন এবং স্বয়ং মাতৃচরু ভক্ষণ করলেন, তপোবলে এই ঘটনা জানতে পেরে ঋচীক তাঁর পত্নীকে বললেন—তুমি অজ্ঞানতাবশত তোমার মাতার দ্বারা প্রতারিত হয়েছ। আমি তোমার চরুতে অখিল শান্তি, জ্ঞান, মতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যসম্পদের সমাবেশ করেছিলাম, আর তোমার মাতার চরুতে ক্ষত্রতেজ ও অসীম বলবীর্য্যের সমাবেশ করেছিলাম। এখন বিপরীত চরু ভক্ষণের ফলস্বরূপ তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়বৃত্তি সম্পন্ন হবে এবং তোমার মাতার ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন পুত্র হবে।

সত্যবতী একথা শুনে দুঃখিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমার যেন ক্ষত্রিয়বৃত্তি সম্পন্ন পুত্র না হয়। বরং আমার পৌত্র এইরকম হোক। মহর্ষি ঋচীক পত্নীকে বললেন—আমি পুত্র এবং পৌত্রে প্রভেদ দেখিনা। তবু তুমি যখন চাও তখন তোমার পৌত্রই এইরকম হোক। এই ঘটনার ফলে সত্যবতী মহাতপস্বী মহর্ষি জমদগ্নিকে পুত্ররূপে লাভ করলেন। কিন্তু ঋচীকের পৌত্র জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম অতুল বলশালী এবং রুদ্রতেজ সম্পন্ন ছিলেন। অপরদিকে সত্যবতীর মাতা বিশ্বামিত্রকে পুত্র

রূপে লাভ করেন যিনি পরবর্তীকালে ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৩.১১৫.২০-৪৫; ১২.৪৯.৬-৩২;
(হরি) ৩.৯৬.২০-৪৬; ১২.৪৮.৬-৩২;
ভাগবত পু. ৯.১৫.৫-১৪; বিষ্ণু পু. ৪.৮.৫-১৬;
গরুড় পু. ১.১৪৩.৬-৭; হরিবংশ পু. ১.২৭.১৬-৩৭]

☐ মহর্ষি ঋচীকের জমদগ্নি ছাড়াও দুইটি পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে মধ্যমপুত্রের নাম শুনঃশেফ। কনিষ্ঠ পুত্র শুনঃপুচ্ছ। পুত্রদের নামে মিল থাকার কারণেই হয়তো ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে মহর্ষি অজীগর্তের উল্লেখ আছে তিনি এবং মহর্ষি ঋচীক অভিন্ন ব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে রামায়ণে ঋচীকের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শুনক বলে উল্লেখ আছে। *[রামায়ণ ১.৬১.১৬-২১]*

☐ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা অম্বরীষ একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বটি হরণ করলেন। ঘোড়া চুরি গেলে যজ্ঞের পুরোহিত রাজাকে বললেন—যজ্ঞের জন্য যে-পশুটি আনা হয়েছিল তা আপনার দোষেই অপহৃত হয়েছে। যে রাজা রক্ষা করতে অসমর্থ হন, নানা দোষ এসে তাঁকে ধ্বংস করে। এই অপরাধের বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। এই যজ্ঞের বলি হিসাবে অশ্বের পরিবর্তে একটি মানুষকে এই যজ্ঞ শেষ হবার পূর্বেই সংগ্রহ করুন। রাজা পুরোহিতের কথা শুনে সহস্র সহস্র গাভী এবং বিবিধ ধনসম্পদের বিনিময়ে এক নররূপী পশুর সন্ধান করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ভৃগুতুঙ্গ পর্বতে পৌঁছে রাজা অম্বরীষ মহর্ষি ঋচীককে দেখতে গেলেন। পুত্র এবং পত্নীসহ মহর্ষিকে দেখে রাজা তাঁকে প্রণাম করে বললেন—একলক্ষ গাভীর বিনিময়ে আপনার একটি পুত্রকে যদি যজ্ঞীয় পশুরূপে আমাকে বিক্রয় করেন, তবে আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে। আমিও কৃতার্থ হব। একথা শুনে মহর্ষি বললেন—জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমি কিছুতেই বিক্রয় করতে পারি না। ঋষিপত্নী কনিষ্ঠ পুত্রটিকে কাছে টেনে নিলেন। এই ঘটনা দেখে দুঃখিত মধ্যমপুত্র শুনঃশেফ রাজাকে বললেন—মহারাজ! পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে আর মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয়ের যোগ্য বলে মনে করেন না। অতএব মনে হয় মধ্যম পুত্রই বিক্রয়ের যোগ্য। অতএব আপনি আমাকে ক্রয় করুন। রাজা অম্বরীষ একথা শুনে আনন্দিত হয়ে শুনঃশেফের মূল্য স্বরূপ একলক্ষ গাভী এবং বহু কোটি স্বর্ণমুদ্রা মহর্ষিকে দান করলেন তারপর শুনঃশেফকে নিয়ে যজ্ঞস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

অম্বরীষ রাজা শুনঃশেফকে নিয়ে চলার পথে মধ্যাহ্নে পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হলেন। শুনঃশেফ সেখানে তাঁর মাতুল মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে দেখলেন। বিষণ্ণ ঋচীকপুত্র মাতুলের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন—আমার মা বাবা নেই। এই জগতে আমার আর কোনো রক্ষাকর্তাকেই দেখছি না। অতএব এ বিপদে আপনিই ধর্মের দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন, রাজা অম্বরীষ তাঁর যজ্ঞ সুসম্পন্ন করতে পাবেন আবার আমারও প্রাণ রক্ষা হয়—এমন কোনো উপায় বার করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। বিশ্বামিত্র নিজের পুত্রদের বললেন—শুনঃশেফের প্রাণ রক্ষা করার জন্য তোমাদের মধ্যে কোনো একজন নিজের প্রাণ দান কর। কিন্তু বিশ্বামিত্রের পুত্ররা তাতে সম্মত হলেন না। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রদের ধর্মচ্যুত ও নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হবার ভয়ানক অভিশাপ প্রদান করলেন। তারপর শুনঃশেফকে এক দিব্য গাথা শিক্ষা দিয়ে বললেন—তুমি যজ্ঞীয় পশুরূপে অম্বরীষ রাজার যজ্ঞসভায় চলে যাও। যখন তোমাকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করা হবে তখন অগ্নিদেবের উদ্দেশে এই দিব্য স্তুতি তুমি গান করবে। ভয় কোরো না। এইভাবে তুমি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবে। বিশ্বামিত্রের পরামর্শ মতো শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হয়ে স্তুতি গান করতে লাগলেন। তাঁর স্তবে প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্র তাঁর প্রাণদান করলেন এবং রাজা অম্বরীষও ইন্দ্রের কৃপায় যজ্ঞের প্রাপ্য ফল লাভ করলেন।

[রামায়ণ ১.৬১-৬২ অধ্যায়]

☐ পুরাকালে বিশ্বকর্মা দুইটি ধনুক নির্মাণ করেন। দুটিই শক্তিতে সমান। তার মধ্যে একটি বিশ্বকর্মা মহাদেবকে দান করেন যেটির দ্বারা মহাদেব ত্রিপুর ধ্বংস করেছিলেন। অপরটি দেবতারা ভগবান বিষ্ণুকে দেন। দুটি ধনুকের মধ্যে কোনটি অধিক শক্তি সম্পন্ন এই বিষয়ে দেবগণ নিজেদের মধ্যে চর্চা করতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। ব্রহ্মা দুই ধনুকের শক্তি পরীক্ষা করার

উদ্দেশ্যে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলেন। তাঁদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু জয়লাভ করলেন। শিব নিজের ধনুকটির উপরেই ক্রুদ্ধ হয়ে তা বিদেহরাজ দেবরাতকে দান করেন। বিদেহরাজ জনকের রাজত্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের পুত্র রাম সেই ধনুকটি ভেঙে ফেলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁর ধনুকটি মহর্ষি ঋচীকের কাছে গচ্ছিত রাখেন। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি এবং তাঁর পুত্র পরশুরাম এই ধনুক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। রামচন্দ্রের বিবাহের পর অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন-কালে পরশুরাম সেই ধনুকটি নিয়ে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। রাম সেই ধনুকে গুণ যোজনা করে পরশুরামের দর্পচূর্ণ করেন।

[রামায়ণ ১.৭৫.১১-২৮; ১.৭৬ অধ্যায়]

□ ঋচীকের পৌত্র পরশুরাম পিতৃহত্যার অপরাধে একুশবার পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়কে বধ করেন। পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করে সেই রক্তে কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চকে তিনি পাঁচটি হ্রদ সৃষ্টি করলেন। সেই রক্তে পরশুরাম পিতৃতর্পণ সম্পন্ন করেন। এইসময় তাঁর পিতামহ মহর্ষি ঋচীক তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং তাঁকে নানা উপদেশ দিয়ে এই ক্ষত্রিয়বধ থেকে নিবৃত্ত করেন।

[মহা (k) ৩.১১৭.৯-১০; ১৪.২৯.১৯-২০;
(হরি) ৩.৯৮.৯-১০; ১৪.৩৪.১৯-২০]

□ মহাভারতের অনুশাসন পর্ব থেকে জানা যায়, শাল্বরাজ দ্যুতিমান মহর্ষি ঋচীককে রাজ্য দান করেন।

[মহা (k) ১৩.১৩৭.২৩; (হরি) ১৩.১১৫.২৩]

ঋচীক$_{২}$ ব্রহ্মার ঔরসে দ্যৌ নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে দশটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে ঋচীক অন্যতম। ব্রহ্মাকে এক অর্থে বিবস্বান্ বলা হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে, দ্যৌ-এর পুত্রেরা পুংলিঙ্গে বিবস্বান্ সূর্যের বাচক অর্থাৎ এঁরা বিবস্বানের পুত্র যাঁকে এখানে ব্রহ্মা নামে বলা হয়েছে—

পুরেতি পুরাকল্পে এতে দিবঃ পুত্রাদয়ঃ
পুংশব্দা বিবস্বতো বাচকা পঠ্যন্তে পুরাকল্পবিদ্ভিঃ।

[মহা (k) ১.১.৪২-৪৩; (হরি) ১.১.৪২-৪৩
(নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]

ঋচীক$_{৩}$ হস্তিনাপুরের রাজা ভরতের পালিতপুত্র ভূমন্যুর ঔরসে তাঁর পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। এদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ঋচীক।

[মহা (k) ১.৯৪.২১-২৪; (হরি) ১.৮৯.১০-১৩]

ঋচীক$_{৪}$ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। *[দ্র. ত্রিবিমন্তগণ]*

ঋচীক$_{৫}$ ভবিষ্যৎ দ্বিতীয় দ্বাপরে ভগবান শিব সুতার নামে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। সেই সময় তাঁর যে চারটি পুত্রসন্তান হবে তার মধ্যে অন্যতম হলেন ঋচীক। *[বায়ু পু. ২৩.১২১]*

ঋচীক$_{৬}$ ভবিষ্যৎ অষ্টাদশ দ্বাপরে ভগবান শিব শিখণ্ডীরূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। সেই সময় তাঁর যে চার পুত্রসন্তান হবে তাদের মধ্যে ঋচীক অন্যতম। *[বায়ু পু. ২৩.১৪১]*

ঋচেয়ু যযাতির পুত্র পুরু। পুরুর তৃতীয় পুত্র রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে মহাপরাক্রান্ত যে দশটি পুত্র জন্মে তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং প্রধান হলেন ঋচেয়ু। ঋচেয়ু অত্যন্ত বলবান এবং বিক্রমশালী বলেই যুদ্ধে তাঁকে পরাভূত করা (ধর্ষণ করা) সম্ভব হত না। সেইজন্য তাঁর এক নাম অনাধৃষ্টি। (ধৃষ্ + অনট্ = ধর্ষণ; ধৃষ্ + ক্তিন্ = ধৃষ্টি; অর্থ একই)। অনাধৃষ্টি-ঋচেয়ু-র বিখ্যাত পুত্র হলেন মতিনার।

[দ্র. অনাধৃষ্টি]

তাঁর আরও একটি নাম 'অন্বগ্‌ভানু'— অর্থাৎ তাঁর তেজে ভানু সূর্যও যেন তাঁর অনুগমন করতেন। এই নামটি তাঁর এতই বিখ্যাত হয়েছিল যে, রৌদ্রাশ্বের পুত্রগণের পরিচয় দেবার সময় বলা হয়েছে যে, রৌদ্রাশ্ব মিশ্রকেশীর গর্ভে অন্বগ্‌ভানু প্রভৃতি দশ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম যথাক্রমে ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু ইত্যাদি—

অন্বগ্‌ভানুপ্রভৃতয়ো মিশ্রকেশ্যাং মনস্বিনঃ।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ভারতকৌমুদী টীকায় বলেছেন—রৌদ্রাশ্বের জ্যেষ্ঠপুত্রের তিনটি নাম—অন্বগ্‌ভানু, ঋচেয়ু এবং অনাধৃষ্টি—

এবঞ্চ রৌদ্রাশ্ব-জ্যেষ্ঠপুত্রস্যৈব অন্বগ্‌ভানু
ঋচেয়ুঃ অনাধৃষ্টিশ্চেতি নামত্রয়ং মন্তব্যম্।

[দ্র. অনাধৃষ্টি এবং অন্বগ্‌ভানু]

[মহা (k) ১.৯৪.৭.১২-১৩; (হরি) ১.৮১.৭-১২]

□ পুরাণে রাজর্ষি ঋচেয়ু ঋতেয়ু বা ঋতেষু নামে চিহ্নিত। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর পুত্রের নাম ছিল রন্তিনার অথবা রন্তিভার।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১-২; ভাগবত পু. ৯.২০.৪-৬]

ঋজুদায় *[দ্র. ঋষিবাস]*

ঋজুদাস *[দ্র. ঋষিবাস]*

ঋণতীর্থ নর্মদা নদী তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে মানুষ সকল প্রকার ঋণ থেকে মুক্ত হয়। *[মৎস্য পু. ১৯১.২৭; কূর্ম পু. ২.৩৯.১৯]*

ঋণবত্ *[দ্র. ঋণবান্]*

ঋণবান্ মৎস্য পুরাণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি ঋণবান্-এর বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি ঋণবান্ বিশ্বামিত্র বংশের অন্যতম গোত্র প্রবর্তক ছিলেন বলে জানা যায়।

[মৎস্য পু. (মহর্ষি) ১৯৮.১৯]

ঋণমোক্ষতীর্থ গয়ার অন্তর্গত একটি তীর্থ। ঋণমোক্ষতীর্থে বিষ্ণু জনার্দনের বাস।

[অগ্নি পু. ১১৬.৮]

ঋণমোচনতীর্থ$_১$ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। এটি সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী।

[বামন পু. ৪১.৬]

ঋণমোচনতীর্থ$_২$ প্রয়াগের দক্ষিণে ও যমুনা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত একটি পিতৃতীর্থ। শ্রাদ্ধকার্যের জন্য অত্যন্ত শুভস্থান। এই তীর্থ দর্শনে সমস্ত ধরনের ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

[মৎস্য পু. ২২.৬৭; ১০৭.২০]

ঋণমোচনতীর্থ$_৩$ গৌতমী গঙ্গা বা গোদাবরীর তীরবর্তী একটি পবিত্র তীর্থ। কাক্ষীবান রাজার দুই পুত্রই বিবাহ না করার জন্য বংশরক্ষার্থে অসমর্থ হন। এ কারণে তাদের পূর্বপুরুষরা ক্রুদ্ধ হলে ব্রহ্মা তাঁদের গোদাবরী তীরের একটি পবিত্র স্থানে গিয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করে তাঁদের পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। কাক্ষীবানের দুই পুত্র গৌতমী-গোদাবরীর তীরে যে স্থানে পিতৃঋণ মুক্ত হয়েছিলেন, সেই জায়গাটিই ঋণমোচনতীর্থ নামে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ হয়। *[ব্রহ্ম পু. ৯৯.১-১৩]*

ঋণমোচনতীর্থ$_৪$ আমলকগ্রামের অন্তর্গত একটি উপ-তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ২৫৫]

ঋত$_১$ মহাভারতের কথারম্ভেই উগ্রশ্রবা সৌতির মুখে প্রায় মঙ্গলাচরণের মতো আমরা 'ঋত'-শব্দের উচ্চারণ শুনি—

> ঋতম্ একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্।

এখানে ঋত-শব্দটি অনির্বচনীয় পরব্রহ্মের সঙ্গে যেমন একাকার হয়ে গেছে, তেমনই সাংখ্য-দর্শনের ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতি-পুরুষের সঙ্গেও একাত্মক হয়ে গেছে। তাতে বোঝা যায়—মহাভারতের মধ্যে ঋত-শব্দ পরম এক তত্ত্ব হিসেবেই প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত। হয়তো একই কারণে 'ঋত'কেই ভগবান নারায়ণের আত্মা বলা হয়েছে—

> ঋতং নারায়ণাত্মকম্।

লক্ষণীয়, পরবর্তী সময়ে ঋতকে সত্যের সঙ্গে প্রায় একাকার করে দেওয়া হলেও (এমনকী মহাভারতেও এই প্রবণতা আছে) অনেক সময়েই ঋত এবং সত্য পৃথকভাবে উল্লেখ করে পরব্রহ্মের সমতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মহাভারত-পুরাণে। বলা হয়েছে—এই ঋতকেই বৈদিক ঋষিরা সত্য এবং ব্রহ্ম বলে জেনেছেন। একইভাবে মহাভারতের অন্যত্র বেদের পুরুষসূক্তের মর্মার্থের সঙ্গে ঋত এবং সত্য পৃথকভাবেই একাকার—

> ইদং পুরুষসূক্ত হি সর্ববেদেষু পার্থিব।
> ঋতং সত্যং চ বিখ্যাতম্ ঋষিসিংহেন পার্থিব॥

[মহা (k) ১.১.২২; ১২.৩৪৭.৮২; ১২.৩৫০.৫; ১৩.১৬.৪৮-৪৯; (হরি) ১.১.২২; ১২.৩৩১.৮০; ১২.৩৩৪.৫; ১৩.১৫.৪৯-৫০]

□ ঋগ্‌বেদের মধ্যে আমরা প্রথম ঋত-শব্দের উল্লেখ পাই এবং সেই ঋত-শব্দ প্রথমত ব্যবহৃত হয়েছে জাগতিক এবং দিব্য জগতের শৃঙ্খলার ধর্ম বা order হিসেবে। ঋত যেন এক সর্বশক্তিমান নিয়ামক শক্তি এবং তাঁর জোরেই যেন মিত্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতারা সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য করছেন, জগৎ প্রকৃতি চলমান তাঁরই নিয়মে—

> ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বিরাজথঃ

এরপর সেই বিখ্যাত 'মধু বাতা ঋতায়তে' মন্ত্রে ঋত-শব্দটাকে ক্রিয়াপদে পরিণত করে বোঝানো হয়েছে যে, বায়ু যে মধু বর্ষণ করে, নদী যে মধুক্ষরণ করে, পার্থিব জনপদ যে মধুময় হয়ে ওঠে, তা সবই এই ঋতের প্রভাবে।

[ঋগ্‌বেদ ৫.৬৩.৭; ১.৯০.৬-৮]

ঋতের এই সার্বিক প্রভাব বেদের মধ্যে তাঁকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—বপুষ্মান ঋতের দৃঢ়, ধারক এবং আহ্লাদকর রূপ আছে। স্তুতিকারী বৈদিকেরা ঋতের কাছে প্রভূত অন্ন ইচ্ছা করেন। ধেনুরা ঋতের দ্বারাই দক্ষিণার মধ্যে প্রবেশ করে। আরও বলা হয়েছে—এই বিস্তীর্ণা, দুরবগাহা

দ্যাবাপৃথিবীটাই ঋতের অধিকারে আছে, সেই দ্যাবাপৃথিবী ঋতের জন্যই দুগ্ধ দোহন করে—

ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে/
ঋতায় ধেনু পরমে দুহাতে।

অপর একটি মন্ত্রে এই মহান ঋত কিন্তু দেবমাতা অদিতি, দ্যাবাপৃথিবী, ইন্দ্র, বিষ্ণু এবং মরুৎ দেবতার সঙ্গে একত্রে স্থান লাভ করেছেন। অর্থাৎ ঋত দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

[ঋগ্‌বেদ ৪.২৩.৮-১০; ১০.৬৬.৪]

☐ একেবারে নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে ঋত-শব্দের ব্যবহার হয়েছে ঋগ্‌বেদের যম-যমী-সংবাদে। ভাই-বোন হওয়া সত্ত্বেও এই সম্পর্কের মধ্যে যৌনতার সমাহ্বান জানিয়েছিলেন যমী। তাতে ভীষণভাবে বাধা দিয়ে যম বলেছিলেন—যা আমরা আগে কখনো করিনি, তা এখন করি কী করে? আমরা আগে যে ঋত উচ্চারণ করেছি, সেই আমরা কী অনৃত উচ্চারণ করবো—

ঋতা বদন্তো অনৃতং রপেম।

এখানে নৈতিকতার সঙ্গে সত্যপথে সত্য উচ্চারণ করা এবং অন্যায় পথে অসত্য উচ্চারণ এই দুয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে ঋত এবং সত্য। বলা উচিত, ঋত এবং সত্যকে আমরা পৃথক অর্থে পৃথক ভাবেই একই পংক্তিতে, একসঙ্গে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। একটি মন্ত্রে ঋত এবং সত্যের জন্ম দেখানো হচ্ছে তপস্ বা প্রজ্বলিত তপস্যা থেকে—

ঋতঞ্চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসো'ধ্যজায়ত।

এটা বোঝাও যায় যে, ঋতের ক্ষেত্র ছিল অনেক বিশদ, সমস্ত ন্যায় এবং ধর্মই যেন ঋতের ক্ষেত্র, অন্যদিকে সত্য ছিল সত্য এবং শৃঙ্খলার প্রতীকী ক্ষেত্র হিসেবে, যদিও ঋতের নঞর্থক অনৃত শব্দটি ঋত এবং সত্য—দুয়েরই নঞর্থক বিকল্প হিসেবে বেদেই যম-যমী-সংবাদে ব্যবহৃত হয়েছে।

'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য'
—শংকরাচার্যের উক্তি।

*[ঋগ্‌বেদ ১০.১০.৪; ৫.৫১.২; ১০.১৯০.১:
বেদান্তদর্শন, শারীরকভাষ্য ১.১.১]*

ঋতের সঙ্গে সত্যের এই পারস্পরিক সংসৃষ্টি অথবা জায়গা বদল এবং একই সঙ্গে এক সময় দুটি শব্দেরই একত্র ব্যবহার কালক্রমে এটাই বুঝিয়ে দিল যে, ঋত আর সত্য যেন পর্যায়বাচক শব্দ—

ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্য বদন্ সত্যকর্মন্।

এটা প্রায় প্রমাণিত হয়ে গেল, যখন ঋগ্‌বেদের মধ্যেই সত্য শব্দটির নঞর্থক রূপে অসত্য-শব্দ ব্যবহার না করে ঋতের নঞর্থক কল্প অনৃত-শব্দ ব্যবহার করা হল সত্যের সঙ্গে সমাস-বদ্ধ করে—

সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জলানাম্।

ঋত আর সত্যের এই বৈকল্পিক ভাব থেকেই পরবর্তীকালে ঋত শব্দটির ব্যবহার কমতে থাকে এবং উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটে যায় সত্যের। কিন্তু মনে রাখতে এই অবস্থাতেও ঋত এবং সত্যের প্রায় সমার্থক প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায় উপনিষদে, এমনকী মহাভারতে ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হল—

ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি।

অথবা এমনও বলা হল—

ঋতঞ্চ সাধ্যায়-প্রবচনে চ সত্যঞ্চ
স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ।

আর মহাভারতে—

ঋতং সত্যং হি বিখ্যাতং ঋষিসিংহেন পার্থিব।

*[ঋগ্‌বেদ ৯.১১৩.৪; ৭.৪৯.৩;
তৈত্তিরীয় উপনিষদ (দুর্গাচরণ), ব্রহ্মানন্দ বল্লী ১;
শিক্ষাবল্লী ১.৯.১; পৃ. ৭৯.৪৯;
মহা (k) ১২.৩৫০.৫; (হরি) ১২.৩৩৪.৫]*

ঋত$_{২}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতার জন্ম হয়। এই ঊনপঞ্চাশ জন দেবতা সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এর মধ্যে তৃতীয় গণের অন্তর্গত সাতজন দেবতার মধ্যে একজন ছিলেন ঋত। *[বায়ু পু. ৬৭.১২৬]*

ঋত$_{৩}$ চতুর্থ মন্বন্তরের অধিপতি তামস মনুর একজন পুত্র। *[বায়ু পু. ৬২.৪৩]*

ঋত$_{৪}$ মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে, মরীচির কন্যা সুরূপার গর্ভে দশ আঙ্গিরস দেবতার জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ঋত। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২]*

ঋত$_{৫}$ ভাগবত পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি চাক্ষুষ মনুর ঔরসে নড্বলার গর্ভে জাত পুত্র সন্তানদের মধ্যে একজন ছিলেন ঋত। *[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৬]*

ঋত$_{৬}$ ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে যখন সাবর্ণি মনু মন্বন্তরাধিপতি হবেন, সেই সময় দেবতারা যে-সব গণে বিভক্ত হবেন, সুখ তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে একজন ঋত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১৮]*

ঋত$_{৭}$ বায়ু পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সাবর্ণি মন্বন্তরে সুতপ নামক দেবগণের অন্তর্গত একজন দেবতা হলেন ঋত। *[বায়ু পু. ১০০.১৪]*

ঋত$_{৮}$ ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় রাজা বিজয়ের পুত্র ছিলেন ঋত। ঋত সুনক বা সুনয় নামে এক পুত্র লাভ করেন। *[ভাগবত পু. ৯.১৩.২৫-২৬; বায়ু পু. ৮৯.২২; বিষ্ণু পু. ৪.৫.১৪]*

ঋত$_{৯}$ দ্বিতীয় মন্বন্তরে যখন স্বারোচিষ মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, সুতপ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঋত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১২]

ঋত$_{১০}$ মৎস্য পুরাণ মতে, ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তরে যিনি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, তাঁর নাম ঋত।

[মৎস্য পু. ৯.৩৬]

ঋত$_{১১}$ একাদশ রুদ্রের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১৫০.১২; (হরি) ১৩.১২৮.১২]

ঋত$_{১২}$ পঞ্চম মন্বন্তরে যখন রৈবত মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, আভূতরয়স্ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঋত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৫]*

ঋতজিৎ$_{১}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতার জন্ম হয়। এই ঊনপঞ্চাশ জন দেবতা সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় গণের অন্তর্গত সাতজন দেবতার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঋতজিৎ।

[বায়ু পু. ৬৭.১২৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৯৩]

ঋতজিৎ$_{২}$ জনৈক গন্ধর্ব। মাঘ-ফাল্গুন মাসে ইনি সূর্যরথে অবস্থান করেন বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.২৩; বায়ু পু. ৫২.২২; বিষ্ণু পু. ২.১০.১৬]*

ঋতঞ্জয় অষ্টাদশ দ্বাপরে মহর্ষি ঋতঞ্জয় ব্যাস হবেন বলে বায়ু পুরাণে উল্লেখ আছে।

[বায়ু পু. ২৩.১৮১]

ঋতধামা$_{১}$ ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তরে যখন রুদ্রপুত্র ঋতসাবর্ণি বা রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন, সেই সময় ঋতধামা ইন্দ্রপদ লাভ করবেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ১০০.৯৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৪.১.৯১; ভাগবত পু. ৮.১৩.২৮; বিষ্ণু পু. ৩.২.৩২]

মৎস্য পুরাণ মতে, ভবিষ্যৎ ত্রয়োদশ মন্বন্তরে ঋতধামা মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন।

[মৎস্য পু. ৯.৩৬]

ঋতধামা$_{২}$ যদুবংশীয় রাজা উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র ছিলেন কঙ্ক। কঙ্কের পত্নীর নাম ছিল কর্ণিকা। কঙ্কের ঔরসে কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৪]

ঋতন সূর্যের মধ্যে অবস্থানকারী যে সব রশ্মি বা কিরণ পৃথিবীর জলভাগকে শোষণ করে এবং বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে, সেই বৃষ্টিপাতে সহায়ক কিরণ সমূহের মধ্যে ঋতন অন্যতম।

[বায়ু পু. ৫৩.২০]

ঋতবন্ধু চতুর্থ মন্বন্তরের অধিপতি তামস মনুর অন্যতম পুত্র। *[বায়ু পু. ৬২.৪৩]*

ঋতবাক্ একজন ঋষি। রেবতী নক্ষত্রের স্থিতিকাল সময়ের শেষ ভাগে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ঋতবাক্ তাঁর পুত্রকে যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং উপযুক্ত শিক্ষাদানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঋষিপুত্র অসচ্চরিত্র এবং কুলাঙ্গার হয়ে উঠল। ঋষি ঋতবাক্ এবং তাঁর পত্নী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উপরন্তু পুত্রের অপকর্ম তাঁদের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত পুত্রের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ ঋতবাক্ একদিন দুঃখিতভাবে মহর্ষি গর্গকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি একজন সচ্চরিত্র এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমি এবং আমার পত্নী দুজনেই ধর্ম অনুসারে জীবন যাপন করে এসেছি। তবে আমার পুত্র কেন এমন হল? গর্গ বললেন—তোমার বা তোমার বংশের দোষে নয়, রেবতী নক্ষত্রের অন্তভাগে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই তোমার পুত্র এমন দুরাচারী হয়েছে। একথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ঋতবাক্ শাপ দিলেন—যখন রেবতী নক্ষত্রের অন্তে জন্মগ্রহণ করে আমার পুত্র দুঃস্বভাব হয়েছে তখন রেবতী নক্ষত্র আকাশ থেকে পতিত হোক। ঋষির শাপে রেবতী নক্ষত্র

আকাশ থেকে মর্ত্যে কুমুদ পর্বতের উপর পতিত হল। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৫.১-২২]*

☐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে মহর্ষি ঋতবাক্ মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত, অর্থাৎ বংশ অথবা শিষ্য পরম্পরায় তিনি অঙ্গিরার বংশের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছে বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১০৭]*

ঋতম্ভরা পৌরাণিক প্লক্ষদ্বীপের মধ্য দিয়ে যে সাতটি প্রধান নদী বা বর্ষ নদী প্রবাহিত হয়েছে তার মধ্যে একটি।

[ভাগবত পু. ৫.২০.৪; দেবীভাগবত পু. ৮.১২.৯]

ঋতসাবর্ণি রুদ্র-শিবের পুত্র। ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তরে ইনি মন্বন্তরাধিপতি মনু হবেন। অন্যান্য পুরাণে অবশ্য ইনি রুদ্রসাবর্ণি নামেই চিহ্নিত হয়েছেন। *[বায়ু পু. ১০০.৮৬]*

ঋতু$_{১}$ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বর্ণিত বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রের অন্তর্গত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৫৮; (হরি) ১৩.১২৭.৫৮]

ঋতু$_{২}$ শিবসহস্রনাম স্তোত্রে বর্ণিত ভগবান শিবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনাম স্তোত্রের এই শ্লোকটিতে ভগবান শিবের ঋতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ—এই নামগুলি একত্রে উচ্চারিত হয়েছে। ভগবান শিব স্বয়ং মহাকালস্বরূপ, তাই তিনি কাল নামেও খ্যাত। আদি অন্তহীন সেই মহাকালকে আমরা আমাদের সুবিধার জন্য পক্ষ, মাস, বৎসর, ঋতু প্রভৃতি এককে আবদ্ধ করেছি গণনার সুবিধার্থে। তার মধ্যে আবার ঋতু এমন একটি একক, যাকে শুধুমাত্র চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি অনুযায়ী নয়, তদনুসারে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর যে পরিবর্তন লক্ষিত হয় তার দ্বারা গণনা করা হয়ে থাকে। ভগবান শিব যেহেতু মহাকাল স্বরূপ, অতএব তিনি কাল পরিমাণের এই গণনাযোগ্য এককগুলিরও স্বরূপ—এই ভাবনা থেকেই তিনি ঋতু নামেও খ্যাত—

> ঋতুঃ, সংবৎসরঃ, মাসঃ, পক্ষঃ,
> সংখ্যাসমাপনঃ ঋত্বাদি সংখ্যাসমাপ্তিরূপঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪১; (হরি) ১৩.১৬.১৪০]

☐ অথর্ববেদের অন্তর্গত মহানারায়ণোপনিষদে কলা, মুহূর্ত, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অর্ধমাস বা পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, কল্প প্রভৃতি কাল পরিমাণের সব কয়টি গণনাযোগ্য একককেই ভগবান বিষ্ণু-নারায়ণের স্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

> সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
> কলা মুহূর্তাঃ কাষ্ঠাশ্চাহোরত্রাশ্চ সর্বশঃ॥
> অর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরশ্চ কল্পতাম্।
> স আপঃ প্রদুঘে উভে ইমে অন্তরিক্ষমথো সুবঃ॥

উপনিষদের ভাবনায় পরমপুরুষ কখনো বিষ্ণুরূপে কল্পিত, কখনো বা রুদ্ররূপে। রুদ্র-শিব এবং ভগবান বিষ্ণু বস্তুত এক ও অভিন্ন। তাই কাল পরিমাণের এই এককগুলির স্বরূপতায় শিব সহস্রনাম স্তোত্রে ভগবান শিবের নাম হিসেবেও এগুলি আরোপিত হয়েছে।

[মহানারায়ণোপনিষদ (Jacob) ১.৮-৯]

ঋতুধামা একটি সুন্দর জ্যোতিবিশিষ্ট অগ্নি।

[বায়ু পু. ২৯.২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.২৪]

ঋতুধৃক্ শিবের অনুচর ভৈরবের বংশধারায় কুমুদের পুত্র দেবসেনের ঔরসে মান্ধাতার কন্যা কেশিনীর গর্ভজাত সাত পুত্রের মধ্যে একজন ঋতুধৃক্।

[কালিকা পু. ৮৯.৩৫-৩৬]

ঋতুপর্ণ অযোধ্যার রাজা। মহাভারতে তাঁকে ভঙ্গাসুরের পুত্র বা 'ভাঙ্গাসুরি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত মহাভারতে 'ভাগস্বরি' এই পাঠ ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইনি ভগস্বরের পুত্র। ভগস্বর বা ভঙ্গাসুরের পুত্র ঋতুপর্ণ কোন রাজবংশসম্ভূত ছিলেন এ বিষয়ে মহাভারতের পাঠ থেকে সংশয় হওয়াটাই স্বাভাবিক। বৈদিক সাহিত্যে আমরা জনৈক রাজা ভঙ্গাশ্বিনের নাম উল্লেখ পাচ্ছি, যিনি অযোধ্যার বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্রের নামও ঋতুপর্ণ। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে ঋতুপর্ণ এবং কয়োবিধিকে ভাঙ্গাশ্বিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রেও ঋতুপর্ণ যে রাজা ভঙ্গাশ্বিনের পুত্র ছিলেন এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তবে মহাভারতে কর্কোটক নাগ নলকে ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে যেতে পরামর্শ দেবার সময় ঋতুপর্ণরাজাকে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যের সমর্থন মেলে বিভিন্ন পুরাণে। সেখানে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণকে অম্বরীষের পৌত্র অযুতায়ু বা অযুতজিৎ-এর পুত্র বলা হয়েছে। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কল্মাষপাদের পিতা, মতান্তরে পিতামহ। শিবপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণে তাঁর পুত্র অনুপর্ণ বা আর্তপর্ণকে কল্মাষপাদের পিতা বলা

হয়েছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঋতুপর্ণ যে নিষধরাজ নলের সখা ছিলেন এ বিষয়ে পুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ভাঙ্গাশ্বিন ঋতুপর্ণ এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঋতুপর্ণ দুজনেই যেহেতু অযোধ্যার রাজা ছিলেন, সেহেতু মনে হয় মহাভারতের পাঠে এই দুই ঋতুপর্ণ রাজা একাত্ম হয়ে গেছেন।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ২১.২০.৩; বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ২০.১২; মৎস্য পু. ১২.৪৬; বায়ু পু. ৮৮.১৭৩-১৭৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৬৩.১৭৩; ভাগবত পু. ৯.৯.১৭; বিষ্ণু পু. ৪.৪.১৮-১৯; ব্রহ্ম পু. ৮.৭৯-৮০; শিব পু. (ধর্ম) ৬১.৬২-৬৩]

☐ ঋতুপর্ণ রাজা অক্ষসংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান অর্থাৎ অক্ষহৃদয় জানতেন। তিনি গণনাতেও পারদর্শী ছিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্ব হারিয়ে নিষধরাজ নল যখন গভীর অরণ্যে অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন কর্কোটক নাগ তাঁকে ছদ্মবেশ ধারণে সহায়তা করেন এবং ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাস করার পরামর্শ দেন। নল বাহুক নাম গ্রহণ করে ঋতুপর্ণ রাজার প্রধান সারথি নিযুক্ত হলেন। দময়ন্তীর আদেশে বিদর্ভের যেসব ব্রাহ্মণ নলের সন্ধান করছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম পর্ণাদ এই ঋতুপর্ণের সভাতেই বাহুক রূপধারী নলের সাক্ষাৎ পান। দময়ন্তী, বাহুকই নল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ সুদেবকে ঋতুপর্ণের সভায় পাঠিয়েছিলেন। সুদেব যখন জানালেন যে, দময়ন্তী দ্বিতীয়বার বিবাহ করবেন এবং মাত্র একদিন পরেই বিদর্ভ রাজ্যে তাঁর স্বয়ংবর সভা অনুষ্ঠিত হবে তখন রাজা ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর স্বয়ংবরে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাঁর আদেশে অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী বাহুক তাঁকে নিয়ে বিদর্ভদেশে যাত্রা করলেন। পথে ঋতুপর্ণ বাহুককে নিজের গণনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এরপর গণনা ও অক্ষবিদ্যার বিনিময়ে তিনি বাহুককে অশ্ববিদ্যা শিক্ষা দিতে অনুরোধ করলেন। ঋতুপর্ণের কাছ থেকে এই দুটি বিদ্যালাভ করেই বাহুক অর্থাৎ নল রাজা কলির প্রভাব থেকে মুক্ত হন।

বিদর্ভে পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে ঋতুপর্ণ দেখলেন যে, সেখানে স্বয়ংবরের কোনো আয়োজনই হয়নি। অপ্রস্তুত ঋতুপর্ণ হঠাৎ বিদর্ভদেশে আসার একটি বৃথা অজুহাত দিয়ে কোনরকমে মুখরক্ষা করলেন। তবে একথা সত্য যে, নল ও দময়ন্তীর পুণর্মিলনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

[মহা (k) ৩.৬৬.২০-২৬; ৩.৬৭,৭০-৭২ অধ্যায়; ৩.৭৩.১-৩৫; (হরি) ৩.৫৪.২০-২৬; ৩.৫৫ অধ্যায়; ৩.৫৭-৫৯ অধ্যায়; ৩.৬০.১-৩৭]

ঋতুস্থলা একজন বিশিষ্ট অপ্সরা। অর্জুনের জন্মোৎসবে যাঁরা সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন ঋতুস্থলা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১.১২৩.৬৫; (হরি) ১.১১৭.৬৮]

ঋতেয়ু$_1$ একজন ঋষি। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, অগস্ত্য প্রভৃতি যে সাতজন ঋষি দক্ষিণ দিকে বসবাস করেন ঋতেয়ু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই সাতজন ঋষি ধর্মরাজ অর্থাৎ যমের পুরোহিত ছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১৩.১৫০.৩৬; (হরি) ১৩.১২৮.৩৫]

ঋতেয়ু$_2$ *[দ্র. ঋচেয়ু]*

ঋতেষু *[দ্র. ঋচেয়ু]*

ঋত্বা একজন বিশিষ্ট দেবগন্ধর্ব। অর্জুনের জন্মোৎসবে অন্যান্য দেবগন্ধর্বদের সঙ্গে ইনিও উপস্থিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.১২৩.৫৭; (হরি) ১.১১৭.৬১]

ঋত্বিক্ মহাভারতের আরম্ভেই যখন জনমেজয়ের সর্পসত্র বা সর্পযজ্ঞের বর্ণনা করেছেন উগ্রশ্রবা সৌতি, তখন শৌনক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন—এই বিষাদসূচক দারুণ সর্পযজ্ঞে ঋত্বিক্ ছিলেন কারা? সদস্যই বা কারা ছিলেন? উগ্রশ্রবা বললেন—এই যজ্ঞে হোতা নিযুক্ত হয়েছিলেন মহর্ষি চ্যবনের বংশজাত ব্রাহ্মণ চণ্ডভার্গব। উদ্গাতা ছিলেন কৌৎস্য জৈমিনি, অধ্বর্যু ছিলেন মহর্ষি পিঙ্গল, ব্রহ্মা ছিলেন শার্ঙ্গরব। এই যজ্ঞের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পুত্র এবং শিষ্যসহ ব্যাস। আর সদস্যরা ছিলেন উদ্দালক প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অসিত-দেবল, নারদ, পর্বত এবং এইরকম আরো অনেকে—

> এতে চান্যে চ বহবঃ ...
> সদস্যাশ্চাভবংস্তত্র সত্রে পারিক্ষিতস্য হ।

[মহা (k) ১.৫৩.১-১০; (হরি) ১.৪৮.১-১০]

এই যে প্রধান চারজন ঋত্বিকের নাম পাওয়া গেল, এইরকম আবারও দেখতে পাই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে ব্রহ্মা হিসেবে

নিযুক্ত হয়েছিলেন স্বয়ং দ্বৈপায়ন ব্যাস। ধনঞ্জয়-গোত্রীয় ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুসামা ঋষি সামগান করার জন্য উদ্গাতা নিযুক্ত হলেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যুর কর্মে নিযুক্ত হলেন, আর বসুপুত্র পৈল ঋষিকে ধৌম্য-মুনির সঙ্গে একত্রে হোতা হিসেবে বরণ করা হল। এই ঋষিদের শিষ্য-সামন্তরাই হোত্রগ বা সপ্ত হোতা হিসেবে বৃত হলেন এবং আমাদের ধারণা, এঁরা সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন রাজসূয় যজ্ঞে।

[মহা (k) ২.৩৩.৩৩-৩৬; (হরি) ২.৩২.২৬-২৯]

☐ হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা—চতুর্বেদের চার প্রতিনিধি। বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক গ্রন্থগুলি লিখিত হবার কালের মধ্যেই যজ্ঞকর্মের চারটি প্রকার চতুর্বেদের চার রকমের ঋত্বিক্-পুরোহিতের বিশেষত্ব তৈরি করে দেয়। এই চার প্রকার প্রধান বা মহাঋত্বিক্-এর নাম ঋগ্বেদেও উল্লিখিত হয়েছে।

[ঋগ্বেদ ১০.৭১.১১; ২.৪৩.২; ১.১৬৪.৩৫]

বস্তুত যজ্ঞকর্মে দীক্ষিত আহুতিদাতা যজমান এবং আহুতি গ্রহণকারী দেবতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন ঋত্বিক্। সাধারণত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদেরই যজ্ঞের আগে বরণ করতেন ঋত্বিকরা। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে ঋত্বিকদের বলা হয়েছে যজ্ঞের রক্ষাকর্তা—

ব্রাহ্মণা অস্য যজ্ঞস্য প্রাবিতারঃ

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১.৫.১.১২]

তাঁদের সহায়তাতেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। একেবারে ঋগ্বেদের যুগে যজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধতি অনেক সরল ছিল। ফলে ঋগ্বেদীয় পুরোহিত হোতাই তখন প্রধান ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশেষত ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচনার যুগে যজ্ঞকর্ম অনেক জটিল হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যে ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক দেবতার আবাহন এবং যজ্ঞে হবিঃসমর্পণের কাজ একাই করতেন পরে তাঁর কাজ ভাগ হয়ে গেল। হবিঃসমর্পণ করতে আরম্ভ করলেন যজুর্বেদের ঋত্বিক্ অধ্বর্যু। এইভাবে যজ্ঞকর্ম যখন সম্পূর্ণ বিকশিত হল, তখন চার রকমের ঋত্বিকের প্রয়োজন হল। দেবতার আহ্বানের জন্য ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক হোতা, সামবেদীয় মন্ত্রগান করার জন্য সামবেদী ঋত্বিক উদ্গাতা, আহুতিদান ইত্যাদি সমস্ত যজ্ঞক্রিয়াগুলি বর্তাল যজুর্বেদী ঋত্বিক্ অধ্বর্যুর ওপর এবং সম্পূর্ণ যজ্ঞক্রিয়া—একেবারে দেবতার আহ্বান থেকে আহুতি দান পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গগুলির দেখভাল বা 'সুপারভাইজ' করতেন ব্রহ্মা নামে এক ঋত্বিক্। পুরাণের মধ্যে এই চার প্রকার ঋত্বিকেরই উল্লেখ পাই। হরিশ্চন্দ্রের পুরুষমেধ যজ্ঞে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ছিলেন হোতা, জমদগ্নি ছিলেন অধ্বর্যু, অয়াস্য মুনি ছিলেন উদ্গাতা সামগ এবং ব্রহ্মা ছিলেন বশিষ্ঠ—

বিশ্বামিত্রো'ভবত্তস্মিন্ হোতা চাধ্বর্যুরাত্মবান্।
জমদগ্নিরভূদ্ ব্রহ্মা বসিষ্ঠো'য়াস্যঃ সামগঃ॥

[ভাগবত পু. ৯.৭.২২]

গোপথ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মাকে অথর্ববেদীয় ঋত্বিক্ বলে পরিচিত করার চেষ্টা হয়েছে।

[গোপথ ব্রাহ্মণ ১.২.১৯]

কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণ এবং সূত্র সাহিত্যের প্রমাণে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন—তিন বেদের কর্মই যিনি জানতেন, এইরকম ত্রিবেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণকেই ব্রহ্মার পদে বরণ করা হত—তদাহুঃ। যদৃচা হোত্রং ক্রিয়তে যজুষাধ্বর্যবং সাম্নোদ্গীথো'থ কেন ব্রহ্মত্ব মিত্যনয়া ত্রয্যা বিদ্যয়েতি হ ব্রূয়াৎ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১১.৫.৮.৭; পৃ. ৮৬৮]

যজ্ঞকর্মের ক্ষেত্রে ব্রহ্মার মর্য্যাদা অন্য সব ঋত্বিকের চেয়ে বেশি ছিল। তাঁকে হোতার মতো বহু মন্ত্র পাঠ করতে হত না, উদ্গাতার মতো তাঁকে মন্ত্রগান করতে হত না, কিম্বা অধ্বর্যুর দেয় আহুতিও তিনি দিতেন না। কিন্তু এই সমস্ত কর্মই তিনি জানতেন এবং যজ্ঞক্রিয়ার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের জন্য যজ্ঞবেদির দক্ষিণ দিকে নিঃশব্দে বসে নিম্নমধুর (উপাংশু) স্বরে জপ করতেন। ব্রহ্মার এই গাম্ভীর্য্য এবং গৌরবের নিরিখেই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ব্রহ্মাকে যজ্ঞের অভিভাবক বা অভিগোপ্তা বলা হয়েছে।

[শতপথ ব্রা. ১.৭.৪.১৮; পৃ. ৭৪]

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচনার যুগে যজ্ঞকর্ম এতই জটিল হয়ে পড়ে যে প্রতিবেদের প্রধান ঋত্বিকদের তিনজন করে সহকারী ঋত্বিকের পদ সৃষ্টি হয়। এইভাবে প্রতিবেদের চারজন ঋত্বিক নিয়ে চতুর্বেদের চারটি গণ তৈরি হয়। ঋগ্বেদীয় হোতৃগণের মধ্যে আছেন হোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবক এবং গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতৃগণের মধ্যে আছেন—উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা এবং

সুব্রহ্মণ্য। অধ্বর্যুগণে—অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা এবং উন্নেতা। ব্রহ্মাগণে—ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা এবং আগ্নীধ্র। একমাত্র অনুষ্ঠানবহুল সোমযাগের সময়েই এই ষোলো জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হত, অন্যান্য যজ্ঞানুষ্ঠানে নয়। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে 'সদস্য' নামে সপ্তদশ একজন ঋত্বিকের নাম পাওয়া গেলেও, শতপথ ব্রাহ্মণের মতে ঋত্বিকের সংখ্যা ষোলো জনের বেশি হওয়া নিষিদ্ধ—

ন সপ্তদশমৃত্বিজং কুর্বীত।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১০.৪.১.১৯; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ৪.১.৬ (৭)]

বৃহৎ যজ্ঞ সোমযাগের আরম্ভে যজ্ঞের কর্মাঙ্গের সঙ্গে যুক্ত অধ্বর্যু গৃহপতি যজমানকে প্রথমে যজ্ঞে দীক্ষিত করতেন, তারপর ব্রহ্মাকে, তারপর উদ্গাতাকে এবং তারপর হোতাকে দীক্ষিত করতেন। স্বয়ং অধ্বর্যুকে দীক্ষিত করতেন তাঁরই গণের প্রতিপ্রস্থাতা। তিনি অন্যবেদীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋত্বিকদের বরণ করার পর অধর্যুগণের তৃতীয় ব্যক্তি নেষ্টা প্রতিপ্রস্থাতাকে দীক্ষিত করে তৃতীয় শ্রেণীর সকলকে বরণ করতেন। চতুর্থ শ্রেণীতে এই ভার ছিল উন্নেতার ওপর। তিনি নেষ্টাকে দীক্ষিত করে অন্য সকলকে দীক্ষিত করতেন।

[কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite) ৭.২.৬-৮; ১০.২.২৫]

পুরাণগুলির মধ্যে বার বার ঋত্বিক্ শব্দটি যজ্ঞ সম্পাদনকারী পুরোহিতের অর্থে ব্যবহৃত হলেও পৌরাণিক যুগে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মর্যাদা এবং বিস্তার লঘু হয়ে পড়ায় ঋত্বিক্ও প্রায় পূজা-অর্চনাকারী পুরোহিতের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েন।

ঋথু পুরাকালে যেসব ক্ষত্রিয় রাজর্ষি তপস্যার ফলে ঋষিত্ব বা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেছিলেন ঋথু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৯১.১১৬]*

ঋদ্ধ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান বিষ্ণু ঋদ্ধ নামে সম্বোধিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৩, ১৫; (হরি) ১৩.১২৭.৪৩, ৫১]

ঋদ্ধি বিশ্রবার পুত্র ধনপতি কুবেরের পত্নী। কুবেরের ঔরসে তাঁর গর্ভে নলকূবর জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুত আভিধানিক অর্থে ঋদ্ধি শব্দটি সম্পদ বা প্রাচুর্যের দ্যোতক। সেই কারণেই হয়তো পৌরাণিকরা সম্পদের দেবতা কুবেরের পত্নীর এই নাম কল্পনা করেছেন।

[মহা (k) ৫.১১৭.৯; ১৩.১৪৬.৪; (হরি) ৫.১০৮.৯; ১৩.১২৪.৪]

ঋদ্ধিমান্ গরুড়ের হাতে নিহত এক নাগ।

[মহা (k) ৩.১৬০.১৫; (হরি) ৩.১৩৩.১৬]

ঋষভ১ স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা প্রিয়ব্রতের বংশধারায় রাজা নাভি ভগবান বিষ্ণুর তুল্য একটি পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করেন। রাজা নাভির আরাধনায় তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বর দিলেন—যেহেতু জগতে আমার তুল্য আর কোনো ব্যক্তি নেই, সেহেতু আমি নিজেই আংশিক রূপে রাজা নাভির পুত্র রূপে অবতীর্ণ হব।

ভগবান বিষ্ণুর বরে নাভি রাজার ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হল তিনিই ঋষভ নামে খ্যাত। ঋষভ ভগবান বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে মহাযোগী এবং নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। নাভি রাজা পুত্র ঋষভকে অজনাভ বর্ষে রাজ্যাভিষেক করলেন। একসময় ইন্দ্র রাজা ঋষভের রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। ঋষভ যোগবলে অনাবৃষ্টি দূর করে বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তী রাজা ঋষভের পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে ঋষভের একশত পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ঋষভের এই শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ভরত। এছাড়াও কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ এবং কীকট নামে ঋষভের নয় পুত্র বিশিষ্ট রাজর্ষি হয়েছিলেন।

ঋষভের অবশিষ্ট পুত্রদের মধ্যে কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন—এই নয়জন ভাগবত ধর্মের উপদেষ্টা হয়েছিলেন। অবশিষ্ট একাশিজন ঋষভপুত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন।

ভগবান ঋষভ একসময় ব্রহ্মাবর্তে নিজের পুত্র ও প্রজাদের কর্মযোগ ও ভাগবত ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন প্রজাপালন করার পর ঋষভ জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতের হাতে শাসনভার অর্পণ করে তপস্যার জন্য বনে গমন করেন।

ভগবান ঋষভ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য এমনকী গাত্রবস্ত্রটিও ত্যাগ করে, মৌনব্রত অবলম্বন করে দেশে দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। কঠোর তপস্যার ফলে তাঁর সুন্দর দেহ কঙ্কালসার হয়ে গেল। তাঁর সেই জটাধারী মূর্তি দেখে লোকে হাস্য পরিহাস করতে লাগল, নানারকম অত্যাচার করতে লাগল। তখন ঋষভদেব অজগরব্রত অবলম্বন করলেন। এই অবস্থাতেই একসময় তিনি দেহত্যাগ করেন।

দেহত্যাগে ইচ্ছুক ঋষভদেব জীবন সায়াহ্নে নানা দেশ পরিভ্রমণ করতে করতে দক্ষিণ ভারতে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কূটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটকে ভ্রমণ করছিলেন এই সময় কোনো এক অরণ্যে দাবানলে তাঁর মৃত্যু হয়।

*[ভাগবত পু. ৫.৪-৬ অধ্যায়;
বায়ু পু. ৩৩.৫১; বিষ্ণু পু. ২.১.২৭-৩১]*

ঋষভ$_{২}$ পুরাণে যে অষ্টাবিংশতি কল্পের নাম বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে পঞ্চদশ কল্পটির নাম ছিল ঋষভ। পুরাণ মতে এই কল্পেই ঋষভ স্বর সৃষ্টি হয়েছিল।

[বায়ু পু. ২১.৩৩-৩৪; মৎস্য পু. ২৪৩.২১]

ঋষভ$_{৩}$ প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষপর্বতের মধ্যে অন্যতম। এই পর্বত সুমনা নামেও পরিচিত। কথিত আছে, ভগবান বরাহ এই পর্বতেই হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন।

[বায়ু পু. ৪২.১৯; ৪৯.১১]

ঋষভ$_{৪}$ মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে পথ্যার গর্ভে বিষ্ণু নামে এক পুত্র হয়। এই বিষ্ণুর পুত্র সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র ঋষভ। এই ঋষভ 'রথকার' নামক দেবগণ এবং ঋষিগণের জন্মদাতা ছিলেন।

[বায়ু পু. ৬৫.১০২]

ঋষভ$_{৫}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঋষভ। দনুর যেসব পুত্ররা হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে মনুষ্যধর্ম আচরণ করতেন ঋষভ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৮.১৫]

ঋষভ$_{৬}$ ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্য ব্রহ্মা নিজের মন থেকে বহু সংখ্যক মহাজ্ঞানী ঋষির জন্মদান করেন। মহর্ষি ঋষভ ব্রহ্মার এই মানস পুত্রদের অন্যতম। ব্রহ্মার যজ্ঞে ইনিও পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। *[বায়ু পু. ১০৬.৩৭]*

ঋষভ$_{৭}$ ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় এক নাগ। ইনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.৫৭.১৭; (হরি) ১.৫২.১৮]

ঋষভ$_{৮}$ কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যুধিষ্ঠির দ্বারকাবাসীদের, কৃষ্ণ এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। সেই কুশলপ্রশ্নের মধ্যে কৃষ্ণের অন্যান্য পুত্রের সঙ্গে ঋষভের নামও উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ১.১৪.৩১]

ঋষভ$_{৯}$ যেসব অসুর সেনাপতি ইন্দ্র-বৃত্রাসুরের যুদ্ধে বৃত্রাসুরের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ঋষভ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ভাগবত পু. ৬.১০.১৯]

ঋষভ$_{১০}$ দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে পৌলোমী শচীর গর্ভে জাত তিন পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঋষভ। *[ভাগবত পু. ৬.১৮.৭]*

ঋষভ$_{১১}$ মগধরাজ বৃহদ্রথের বংশধারায় বৃহদ্রথের পৌত্র ছিলেন ঋষভ। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র ঋষভের পিতা ছিলেন। ঋষভ সত্যহিত নামে এক পুত্র লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২২.৬-৭; বায়ু পু. ৯৯.২২৩]

ঋষভ$_{১২}$ কৃষ্ণের বাল্যকালে যেসব গোপ বালক তাঁর খেলার সাথী ছিলেন ঋষভ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ১০.২২.৩১]*

ঋষভ$_{১৩}$ ভবিষ্যৎ নবম মন্বন্তরে যখন দক্ষসাবর্ণি মনু হবেন, সেই সময় ভগবান বিষ্ণু আয়ুষ্মানের ঔরসে অম্বুধারার গর্ভে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর অবতারের নাম হবে ঋষভ।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.২০; বায়ু পু. ২৩.১৪৩, ১৪৬]

ঋষভ$_{১৪}$ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশজাত ঋষিদের নামোল্লেখ আছে। এঁরা সকলেই ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। অঙ্গিরার বংশধর এই সব মন্ত্রকৃৎ ঋষিদের মধ্যে ঋষভ ছিলেন অন্যতম।

[বায়ু পু. ৫৯.১০০]

ঋষভ$_{১৫}$ স্বারোচিষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম। পুরাণে ইনিও আঙ্গিরস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১৭]

ঋষভ$_{১৬}$ ভাগবত পুরাণ মতে চারজন দিগ্‌হস্তীর মধ্যে অন্যতম হলেন ঋষভ। *[ভাগবত পু. ৫.২০.৩৯]*

ঋষভ$_{১৭}$ প্রাচীন ভারতীয় আর্যসমাজের মতোই পৌরাণিক শাকদ্বীপের অধিবাসীরাও চতুর্বর্ণে

বিভক্ত ছিলেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। শাকদ্বীপের অধিবাসীরা যে চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিলেন তার মধ্যে ঋষভ অন্যতম। সম্ভবত ক্ষত্রিয়বর্ণের দ্যোতক হিসেবে ঋষভ শব্দের উল্লেখ আছে। *[ভাগবত পু. ৫.২০.২২]*

ঋষভ$_{১৮}$ এক বৃষরূপধারী রাক্ষস। মগধরাজ বৃহদ্রথ এই রাক্ষসকে বধ করেন এবং এর চর্ম ও নাড়ী দিয়ে তিনটে ভেরী নির্মাণ করিয়ে চৈত্যক পর্বতে স্থাপন করান।

[মহা (k) ২.২১.১৬; (হরি) ২.২০.১৫]

ঋষভ$_{১৯}$ একজন প্রাচীন ঋষি। মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত রাজধর্মপর্বাধ্যায়ে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে আশা কী এবং আশার ফলাফলই বা কী—এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পিতামহ ভীষ্ম মহর্ষি ঋষভ এবং রাজা সুমিত্রের সংবাদ বর্ণনা করেছেন। একবার রাজা সুমিত্র মৃগয়া করতে গিয়ে একটি হরিণ-এর পিছনে ছুটতে ছুটতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। শেষ পর্যন্ত হরিণটিকে আর খুঁজে না পেয়ে পরিশ্রান্ত, আশাহত রাজা নিকটবর্তী এক তপোবনে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মর্ষি ঋষভ সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজা সুমিত্রকে মহর্ষি তনু এবং রাজা বীরদ্যুম্নের উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন। এই কাহিনীর সার হিসেবে ঋষভ সুমিত্র রাজাকে সেই নিরুদ্দেশ মৃগের আশা ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১২.১২৫-১২৮ অধ্যায়;
(হরি) ১২.১২২-১২৪ অধ্যায়]

ঋষভ$_{২০}$ একজন ঋষি। মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্বে ঋষভকূট পর্বতের উল্লেখ পাই। একে হেমকূট পর্বতও বলা হয়েছে। এখানে উপস্থিত হয়ে পাণ্ডবরা দেখলেন যে, এই পর্বতে কোন কথা বলামাত্র অজস্র মেঘ ও প্রস্তরখণ্ড বক্তার দিকে ধেয়ে আসে, বেদপাঠের শব্দ শোনা যায় অথচ পাঠককে দেখা যায় না। পাণ্ডবদের তীর্থযাত্রার সঙ্গী মহর্ষি লোমশ বলেন যে ঋষভ নামে একজন কোপনস্বভাব ঋষি এই হেমকূট পর্বতে বাস করতেন। সাধারণ মানুষের চলাচল, কথাবার্তা, দর্শনার্থীদের ভীড় তাঁর তপস্যার বিঘ্ন ঘটাতো। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে ঋষি পর্বতকে আদেশ করেন যে কোনো লোক এখানে এলেই যেন তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। মহর্ষি ঋষভ বায়ুকেও আদেশ করেন যে, কোনো লোক কথা বললেই যেন বায়ুপ্রবাহ এবং মেঘ শব্দের দ্বারা তাকে বারণ করা হয়। এই কোপনস্বভাব ঋষির কারণেই হয়তো হেমকূট পর্বত ঋষভকূট নামেও খ্যাত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.১১০.৮-১১; (হরি) ৩.৯২.৮-১১]

ঋষভ$_{২১}$ একজন ব্রহ্মর্ষি। ইনি ব্রহ্মার সভায় অবস্থান করতেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.১১.২৪; (হরি) ২.১১.২৩]

ঋষভ$_{২২}$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে অংশগ্রহণকারী একজন যোদ্ধা। দ্রোণাচার্য কৌরবসেনাকে যে গরুড়ব্যূহে সন্নিবিষ্ট করেন, সেই ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে অন্যান্য কৌরব যোদ্ধাদের সঙ্গে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ৭.২০.১২; (হরি) ৭.১৮.১৩]

ঋষভ$_{২৩}$ একটি পবিত্র তীর্থ। এটি কোশল দেশে অবস্থিত ছিল বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে। মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মকে এই তীর্থ যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৩.৮৫.১০; (হরি) ৩.৭০.১০]

ঋষভ$_{২৪}$ ভারতবর্ষের জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। ইনি প্রিয়ব্রত বংশীয় ভরতের পিতা রাজর্ষি ঋষভ কিনা সে বিষয়ে অবশ্য সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ মেলে না।

[মহা (k) ৬.৯.৭; (হরি) ৬.৯.৭]

ঋষভ$_{২৫}$ মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত বলি-বাসব সংবাদে অহঙ্কারে মত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের উপহাসের উত্তরে অসুররাজ বলি রাজ্য-সম্পদ-ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্রাচীন অসুররাজের নামোল্লেখ করেছেন বলি, যাঁরা প্রত্যেকেই একসময় স্বর্গলোক জয় করেছেন, সেখানে আধিপত্য করেছেন এবং যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ভোগ করেছেন। অসুররাজ বলি এই প্রসঙ্গে ঋষভের নামও উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ১২.২২৭.৫১; (হরি) ১২.২২৫.৫১]

ঋষভ$_{২৬}$ মেরু পর্বতের উত্তরে অবস্থিত অন্যতম একটি পর্বত।

[বিষ্ণু পু. ২.২.২৮; ভাগবত পু. ৫.১৬.২৬]

ঋষভ$_{২৭}$ ভারতবর্ষের দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত একটি পর্বত। রামায়ণে ঋষভ নামে একটি পার্বত্য অঞ্চলের বিবরণ শুনতে পাই। সুগ্রীব যেসব বানরকে দক্ষিণ দেশে সীতার সন্ধানে

পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের ভোগবতী পুরী অতিক্রম করে ঋষভ পর্বতে যাবার নির্দেশ দেন। সুগ্রীব বলেছেন—ঋষভ পর্বত মূলত উৎকৃষ্ট চন্দন বনে সমৃদ্ধ। গোশীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যাম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চন্দনগাছ সেখানে দেখা যায়। রোহিত নামক গন্ধর্বরা এই ঋষভ পর্বতে বাস করেন এবং চন্দন বন রক্ষা করেন। ঋষভ পর্বতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি এই মূল্যবান চন্দনগাছ সম্পর্কে আলোচনা করলে নিশ্চিতভাবে গন্ধর্বদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। *[রামায়ণ ৪.৪১.৩৯-৪১]*

☐ মহাভারতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ঋষভ পর্বত দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত—

তদেষ ঋষভো নাম পর্বতঃ সাগরান্তিকে।

মহর্ষি পুলস্ত্য ঋষভ পর্বতের নাম উল্লেখ করেছেন পবিত্র তীর্থ হিসেবে। উদ্যোগপর্বে গরুড় ও গালব ঋষির উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্রাহ্মণী তপস্বিনী শাণ্ডিলী এই ঋষভ পর্বতে বাস করতেন।

[মহা (k) ৩.৮৫.২১; ৫.১১২.২২; ৫.১১৩.১;
(হরি) ৩.৭০.২১; ৫.১০৪.২২; ৫.১০৫.১]

☐ ভাগবত পুরাণে বলরামের তীর্থযাত্রার বিবরণে ঋষভ পর্বতের নামোল্লেখ পাই। দাক্ষিণাত্যে তীর্থযাত্রী বলরাম পাণ্ড্যদেশে অবস্থিত দক্ষিণ মথুরা (মাদুরাই) এবং ঋষভ পর্বতে গিয়েছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০:৭৯.১৫]

☐ রামায়ণ, মহাভারত-পুরাণের বিবরণ থেকে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বর্তমান তামিলনাড়ুর অন্তর্গত মাদুরাই জেলায় অবস্থিত পালনি পর্বত, আঞ্চলিক ভাষায় যেটি বরাহ পর্বত নামে খ্যাত, পূর্বঘাট পর্বতমালার সেই অঞ্চলটিই প্রাচীনকালে ঋষভ পর্বত নামে খ্যাত ছিল।

[GDAMI (Dey). p. 169]

ঋষভ$_{২৮}$ সুগ্রীবের অনুগত এক বানরবীর। লঙ্কাকাণ্ডের এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে ইনি বরুণের পুত্র ছিলেন। সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানের জন্য দক্ষিণ দিকে যে বানর দলটিকে পাঠিয়েছিলেন, সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ঋষভ। অঙ্গদ যখন বানরদলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে কে শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র এক লাফে পার হতে পারবে, তখন অন্যান্য বানরবীরের মতো ঋষভও নিজের শক্তির পরিমাপ এবং সীমাবদ্ধতা জানিয়ে বলেছেন—আমি চল্লিশ যোজন লাফিয়ে যেতে পারি। *[রামায়ণ ৪.৬৫.৫; ৬.৭০.৫৭-৬০]*

☐ রামচন্দ্র যখন বিশাল বানর সেনা নিয়ে লঙ্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন, তখন সেনাবাহিনীর দক্ষিণ পাশে অবস্থান করে আক্রমণ ও অন্যান্য সমস্যা প্রতিহত করার জন্য বানরবীর ঋষভ নিযুক্ত হন। সেনাবাহিনীর চলার পথ প্রশস্ত করার জন্য যাঁরা পথ পরিষ্কার করার দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের মধ্যেও ঋষভ অন্যতম।

[রামায়ণ ৬.৪.১৬; ৩০; ৬.২৪.১৫]

☐ রামচন্দ্র যখন বানরসেনা নিয়ে লঙ্কা অবরোধ করলেন সেই সময় লঙ্কার দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদের অধীনে যুদ্ধরত অবস্থায় আমরা ঋষভকে দেখতে পাই। ইন্দ্রজিৎ যখন মেঘের আড়াল থেকে মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করলেন, সেই সময় রাম ঋষভকে ইন্দ্রজিৎ কোথায় লুকিয়ে আছেন, তা অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেন। ঋষভ ইন্দ্রজিৎকে খোঁজার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলে ঋষভ প্রভৃতি বানরবীররা প্রস্তরখণ্ড হাতে নিয়ে রাবণকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। কুম্ভকর্ণকে আক্রমণ করতে গিয়ে ঋষভ গুরুতর আহত হয়েছিলেন। রাক্ষস— সেনাপতি মত্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঋষভের হাতে নিহত হন। ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করতে গিয়েও ইনি আহত হয়েছিলেন।

[রামায়ণ ৬.৪১.৩৯-৪০; ৬.৪৫.১-৫; ৬.৫৭.৩-৪;
৬.৬৭.২৪-২৭; ৬.৭০.৫০-৬৫; ৬.৭৩.৪৫]

☐ ঋষভকে এরপর আমরা রামের অভিষেক অনুষ্ঠানে দেখতে পাই। রামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য ইনি দক্ষিণ সমুদ্র থেকে কলস পূর্ণ করে জল নিয়ে এসেছিলেন। *[রামায়ণ ৬.১৩০.৫৪]*

ঋষভ$_{২৯}$ সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানের জন্য যে দলটিকে পূর্বদিকে পাঠান, তাদের নেতা বানরবীর বিনতকে তিনি ক্ষীরোদ সাগরের মধ্যবর্তী কোন এক ঋষভ পর্বতে সীতার অনুসন্ধান করার আদেশ দিয়েছেন। *[রামায়ণ ৪.৪০.৪৪-৪৫]*

ঋষভ$_{৩০}$ সপ্তস্বরের অন্যতম। ঋষভধ্বনি মূলত গম্ভীর মেঘমন্দ্রস্বরের সমার্থক। মহাভারত এবং পুরাণে একাধিকবার ঋষভ—ধ্বনির উল্লেখ পাই। দ্রোণপর্বে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনিকে গম্ভীর ঋষভ ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[মহা (k) ৭.১৪৭.৪৫; ১২.১৮৪.৩৯; ১৪.৫০.২১:
(হরি) ৭.১২৮.৪৪; ১২.১৭৮.৩৯; ১৪.৬৪.২১]

ঋষভ$_{৩১}$ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। স্থানটিকে ঋষভদ্বীপ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের অতি নিকটে অবস্থিত এই স্থানটি সরস্বতী নদীর মধ্যে অবস্থিত কোনো নদী-দ্বীপ কিনা এবিষয়ে চিন্তার অবকাশ থাকছে।

[মহা (k) ৩.৮৪.১৬০; ৯.৩৮.২৬;
(হরি) ৩.৬৯.১৬০; ৯.৩৬.২৭]

ঋষভস্কন্ধ একজন বানর প্রধানের নাম। ইন্দ্রজিৎ যখন অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করছিলেন, তখন রাম দশজন বানর সেনাপতিকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর সন্ধান করার জন্য। ঋষভস্কন্ধ তাঁদের অন্যতম। অন্যদের সঙ্গে তিনিও আকাশে প্রবেশ করেছিলেন ইন্দ্রজিৎকে খুঁজতে। কিন্তু ইন্দ্রজিতের বাণবৃষ্টিতে অন্যদের মতোই ঋষভস্কন্ধও আহত হন। ব্যর্থও হন। *[রামায়ণ ৬.৪৫.১-৫]*

ঋষভগীতা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবরা সকলে গেলেন কুরুক্ষেত্রে, শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের কাছে। মহাভারতের সম্পূর্ণ শান্তিপর্ব এবং অনুশাসন পর্ব জুড়ে পাণ্ডবদের প্রতি মরণাপন্ন ভীষ্মের শেষ উপদেশ বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে। পৌত্র যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘ রাজনৈতিক, দার্শনিক তথা আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়েছেন ভীষ্ম, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা যেন পরম্পরাক্রমে দিয়ে যেতে চাইছিলেন ভীষ্ম কুরুবংশের উত্তর প্রজন্মকে। ঋষভগীতা ভীষ্মের সেই মূল্যবান উপদেশেরই একাংশ।

শান্তিপর্বের রাজধর্মানুশাসন নামক উপপর্বের অন্তর্গত একটি অধ্যায় শুরু হচ্ছে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন দিয়ে—পিতামহ! আশা কীভাবে উৎপন্ন হয়? আর আশা বলতে ঠিক কী বোঝায়?

কথমাশা সমুৎপন্না কা চ সা তদ্বদস্ব মে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভয়াবহ লোকক্ষয় দেখে যুধিষ্ঠিরের অনুশোচনা হতে আরম্ভ করেছিল। এই বিপুল লোকক্ষয়ের জন্য তিনি নিজেকেই দোষী বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। 'আশা' সম্পর্কে যে প্রশ্ন তিনি রাখলেন, সেই প্রশ্নের মধ্যেও যুধিষ্ঠিরের আন্তরিক বেদনা এবং অনুশোচনাই ঝরে পড়েছে। যুধিষ্ঠির বলছেন—অজ্ঞাতবাস যখন শেষ হল, তখন আমার আশা ছিল যে, দুর্যোধন আমাকে আমার প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দেবে। সেই আশা প্রতিহত হতেই যেন দুর্বুদ্ধি গ্রাস করল আমাকে—যার পরিণাম এই যুদ্ধ—

পিতামহাশা মহতী মমাসীদ্ধি সুযোধনে।
প্রাপ্তে যুদ্ধে তু তদ্ যুক্তং তৎকর্তব্যমিতি প্রভো॥
সো'হং হতাশো দুর্বুদ্ধিঃ কৃতস্তেন দুরাত্মনা।

ভীষ্ম বুঝলেন, যুধিষ্ঠিরের মন থেকে এই বিপুল লোকক্ষয়কারী যুদ্ধের গ্লানি, অনুশোচনা এখনও মিলিয়ে যায়নি। তাই আশা কাকে বলে—সে কথা বিশদে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি পৌত্রকে সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করেছেন ভীষ্ম। আশা কাকে বলে এবং তা কতখানি দুঃখজনক তা বোঝাতে সুমিত্ররাজা এবং ঋষভ মুনির ইতিহাস উদ্ধার করেছেন তিনি। এই উপাখ্যানে আশা বিষয়ে মহর্ষি ঋষভ যে উপদেশ দিয়েছেন সেই উপদেশই ঋষভগীতা নামে খ্যাত। আশা মানব মনের এক অঙ্গ। তাকে সংজ্ঞায়িত করা বা তাকে দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যা করাও সহজ নয়। ভীষ্ম যে ঋষভের উপাখ্যানের অবতারণা করলেন, সেই উপাখ্যানে মহর্ষি ঋষভও আশার জন্ম এবং আশাহত মানসিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে একটি প্রাচীন উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। ভীষ্ম কথিত উপাখ্যান এবং তদন্তর্গত উপাখ্যানের সমন্বয় ঋষভগীতা। যা শুধুমাত্র আশার জন্ম বা আশাহত অবস্থার কথাই বলে না, জাগতিক মোহ, মায়া, আশা বাসনা থেকে মুক্ত হবার পথও নির্দেশ করে।

কুরুপিতামহ ভীষ্ম বলতে লাগলেন—হৈহয়বংশীয় রাজা ছিলেন সুমিত্র। একদিন মৃগয়ায় গিয়ে সেই সুমিত্র রাজা একটি হরিণ দেখতে পেলেন। হরিণটিকে লক্ষ্য করে শরক্ষেপও করলেন তিনি। কিন্তু হরিণটি আহত, শরবিদ্ধ অবস্থাতেই ছুটে পালাল। রাজা তাকে অনুসরণ করতে করতে পৌঁছালেন গহন বনে, কিন্তু কোথাও সেই হরিণের দেখা পেলেন না। বনের মধ্যে তপস্বী ঋষিদের এক আশ্রম ছিল। ক্লান্ত, অবসন্ন রাজা প্রবেশ করলেন সেই আশ্রমে। তপস্বী মুনি ঋষিরা পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত রাজার শুশ্রূষা করলেন, তাঁর বিশ্রাম এবং আহারের সুবন্দোবস্ত করে দিলেন তাঁরা। পরিশ্রান্ত রাজা ঋষিদের পরিচর্য্যায় খানিক সুস্থ হয়ে উঠলে সেই ঋষিরা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন এমন গভীর বনে আসার কারণ। রাজা সুমিত্র নিজের মৃগয়ার বৃত্তান্ত শোনালেন তপস্বীদের। হরিণটিকে খুঁজে না পেয়ে নিজের

দুঃখিত, আশাহত মানসিক অবস্থার কথাও তিনি গোপন করলেন না। অতিক্ষুদ্র বস্তুর আশাও প্রতিহত হলে কতখানি দুঃখের জন্ম দেয় তা বোঝা যায় সুমিত্র রাজার কথায়—হরিণের আশা নষ্ট হয়ে আজ আমার যত দুঃখ হচ্ছে, হয়তো রাজ্য বা রাজধানী ত্যাগ করতে হলেও তেমন দুঃখ আমার হত না। আশা এবং আশাহত হবার দুঃখ আমার মনকে এতটাই ব্যাপ্ত করেছে যে, মনে হচ্ছে এ দুঃখ যেন হিমালয়ের মতো পর্বতমালা, সমুদ্র, এমনকী আকাশের থেকেও বিশাল, একে অতিক্রম করার সাধ্য আমার নেই—

ন রাজলক্ষণত্যাগো ন পুরস্য তপোধনাঃ।
দুঃখং করোতি তত্তীব্রং যথাশা বিহতা মম॥
হিমবান্ বা মহাশৈলঃ সমুদ্রো বা মহোদধিঃ।
মহত্ত্বান্নান্বপদ্যেতাং নভসো বান্তরং তথা॥

নিজের হতাশা ব্যক্ত করার পর সবশেষে সেই মহাজ্ঞানী ঋষিদের সামনে রাজা প্রশ্ন রাখলেন—আপনারা সকলেই মহাজ্ঞানী, আপনারাই দয়া করে আমাকে বলুন, মানব মনের আশা এবং এই অন্তহীন আকাশ—এ দুয়ের মধ্যে কোনটি বিশালতর? আমি যে কোনো ভাবেই আশাকে অতিক্রম করতে পারছি না। আপনারাই পথ দেখান আমাকে—

ভবন্তঃ সুমহাভাগাস্তস্মাৎ পৃচ্ছামি সংশয়ম্।
আশাবান্ পুরুষো যঃ স্যাদন্তরিক্ষমথাপি বা॥

সেই তপোবনে অন্যান্য তপস্বীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহর্ষি ঋষভ। রাজা সুমিত্রর প্রশ্ন শুনে তিনিই রাজার মনের সংশয় দূর করতে উদ্যোগী হলেন। মহর্ষি ঋষভ বদরিকাশ্রমবাসী তনুমুনির উপাখ্যান শোনাতে লাগলেন রাজাকে। ঋষভ বললেন—একসময় আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেরাতে বেরাতে পৌঁছালাম বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণের তপোবনে। সেই পবিত্র তীর্থে স্নান, তর্পণ করার পর একসময় আমি দেখলাম, তনু নামে এক ঋষি সেই আশ্রমে আসছেন। তাঁর পরিধানে কৌপীন এবং কৃষ্ণমৃগের চর্ম, তিনি অত্যন্ত দীর্ঘদেহী, কিন্তু তাঁর দেহ অত্যন্ত কৃশ। মহর্ষি ঋষভ তনু মুনির চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন বিশদে। তনু মুনি উচ্চতায় যে কোনো সাধারণ মানুষের থেকে প্রায় আটগুণ বেশি অথচ শরীর এতটাই কৃশ যে তার তুলনা কেবলমাত্র মানুষের হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর সঙ্গেই করা চলে—

অন্যৈর্নরৈর্মহাবাহো বপুষাষ্টগুণান্বিতম্।
কৃশতা চাপি রাজর্ষে ন দৃষ্টা তাদৃশী ক্বচিৎ॥
শরীরমপি রাজেন্দ্র তস্য কনিষ্ঠিকাসমম্।

মহর্ষি ঋষভ সেই অদ্ভুতদর্শন ঋষিকে প্রণাম করলে তনু মুনি তাঁকে কাছে বসিয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন! তারপর সমবেত ঋষিদের নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন বীরদ্যুম্ন নামে এক রাজা। তাঁর একমাত্র পুত্র ভূরিদ্যুম্ন নিরুদ্দেশ বেশ কিছুদিন ধরে। পুত্রের সন্ধান করতে করতে বিষণ্ণ মনে সস্ত্রীক রাজা বীরদ্যুম্ন এসে পৌঁছেছেন বদরিকাশ্রমে। মনে আশা, হয়তো এখানে তাঁর পুত্রটির সন্ধান মিলবে। পুত্রের জন্য বিলাপ করতে করতে রাজা বীরদ্যুম্ন এসে দাঁড়ালেন তনু মুনির সামনে। তাঁরও মনে সেই একটিই প্রশ্ন—আশা কী? আর তাকে জয় করার উপয়ই বা কী? জগতের কোন বস্তু আশার চেয়ে মহৎ?

দুর্লভং কিং নু দেবর্ষে আশায়াশ্চৈব কিং মহৎ।

রাজার পুত্রশোক এবং বিলাপ শুনে তনু মুনি নিজেও কিছু বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। এখন রাজার প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত শান্তস্বরে বললেন—মহারাজ! একসময় আপনার পুত্রের কাছে একজন ঋষি একটি সোনার কলস এবং বল্কল চেয়েছিল। তাঁর আশা ছিল, আপনার পুত্র নিশ্চয় তাঁর প্রার্থনা পূরণ করবেন। কিন্তু প্রার্থনা পূরণ হল না, বরং জুটল অপমান, অবজ্ঞা, আশাহত ঋষির মন ভরে উঠল গ্লানিতে। এ পর্যন্ত বলে তনু মুনি চুপ করে মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। তনু মুনির প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মেলে যে, বীরদ্যুম্নের পুত্রের দ্বারা অপমানিত এবং আশাহত ঋষি অন্য কেউ নন, তনুমুনি স্বয়ং। তবু কতকটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই তনু মুনি বলে চললেন—মহারাজ! অপমানিত এবং আশাহত হবার পর সেই ঋষি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি জীবনে কখনো আর কোনো রাজার কাছ থেকে দান গ্রহণ করবেন না। তারপর কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন তিনি—

স হি তেন পুরা বিপ্রো রাজ্ঞা নাত্যর্থমানিতঃ।
আশাকৃতশ্চ রাজেন্দ্র তপো দীর্ঘং সমাশ্রিতঃ॥
প্রতিগ্রহমহং রাজ্ঞাং ন করিষ্যে কথঞ্চন।
অন্যোষাঞ্চৈব বর্ণানামিতি কৃত্বা ধিয়ং তদা॥

মহর্ষি ঋষভ বললেন—এরপর তনু মুনি আশা

বিষয়ে উপদেশ দিতে দিতে স্পষ্টভাবেই নিজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। যেন রাজা বীরদ্যুম্নকে তিনি নিজের পূর্ব অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান—

ততঃ সংস্মৃত্য তৎ সর্বং স্মারয়িষ্যন্নিবাব্রবীৎ।
রাজানং ভগবান্ বিপ্রস্ততঃ কৃশতনুস্তদা॥

এই প্রথম তনু মুনি উচ্চারণ করলেন নিজের কথা। বললেন—মহারাজ! আশার বস্তু অত্যন্ত দুর্লভ। তাই যে ব্যক্তি আশার দ্বারা চালিত হয় আর আশাহত হবার পর দুঃখ ভোগ করে—তার মতো কৃশ ব্যক্তি আর নেই। তনু মুনি কথিত এই কৃশতা অবশ্য শারীরিক কৃশতা নয়, মানসিক দুর্বলতা, মানসিক ভাবে শক্তিহীন, বিষণ্ণ হয়ে পড়ার অবস্থা।

বীরদ্যুম্নরাজা তখন জিজ্ঞাসা করলেন—মহর্ষি! আপনার থেকেও কৃশ কোনো বস্তু কি এ জগতে আছে? তনুমুনি এর উত্তরে নিজের দৈহিক কৃশতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করলেন— আমি নিজে আশাহত হবার পর যখন বুঝতে পারলাম যে আশাই মানব মনের যাবতীয় দুঃখের কারণ, তখন মানব মনের সঙ্গে সতত সংযুক্ত যে আশা আমি সেই আশাকে কৃশ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম এবং কঠোর তপস্যার ফলে শেষ পর্যন্ত আমি আশা ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছি। পুত্র নিরুদ্দেশ হলে তাকে খুঁজে পাবার যে আশা পিতার মধ্যে থাকে, বেশি বয়সেও বন্ধ্যা নারীর মনে যে সন্তানলাভের আশা থাকে এবং আরও গুরুতর যেসব পরিস্থিতিতে মানুষ যেসব অসম্ভব আশাকে অবলম্বন করে, সেই সমস্ত আশাকে ত্যাগ করতে পেরেছি বলেই আমার দেহ আজ এত কৃশ।

বীরদ্যুম্ন রাজা তনু মুনির অতীত অপমানের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন। যথেষ্ট অনুতপ্তও বোধ করছিলেন। কিন্তু তনুমুনির উপদেশ মতো পুত্রকে ফিরে পাবার আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে তাঁর মন চাইছিল না। রাজা তনুমুনির পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন—আশা ত্যাগ করার যে উপদেশ আপনি দিলেন তা আমি মনে রাখব, ভবিষ্যতে পালন করার চেষ্টাও করব। কিন্তু এখন আমার একমাত্র পুত্রটিকে আপনি ফিরিয়ে দিন। দয়ালু মহর্ষি তনু রাজার পুত্রটিকে ফিরিয়ে এনে দিলেন আপন তপস্যার বলে। তাঁর কৃতকর্মের জন্য ঈষৎ তিরস্কারও করলেন। তার পর ক্রোধ দ্বেষ শূন্য তনু মুনি চলে গেলেন বদরিকাশ্রম ছেড়ে।

ঋষভ কথিত মহর্ষি তনুর সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানের ইতি এখানেই। বীরদ্যুম্নের নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে ফিরে পাবার কথাটি এখানে কাহিনীর অংশমাত্র। তনু মুনির কৃশতা এবং জীবনদর্শনই ঋষভ কথিত এই উপাখ্যানের সারবস্তু। বস্তুত 'তনু' বলতে যেমন দেহ বোঝায় তেমনই তনু শব্দের একটি অর্থ কৃশ। তনুকরণ করা মানে ক্ষয় করা, কৃশ করা কিংবা সহজ কথায় চেঁছে ফেলা। তনু মুনির নামের মধ্যেই তাঁর দৈহিক কৃশতার আভাস মেলে। তবে এই কৃশতা এখানে কিছুটা প্রতীকিরূপে ব্যবহৃত। তনু মুনি আশাকে দুঃখের কারণ বলে অনুভব করার পর নিজের অন্তরস্থিত জাগতিক মায়া, মোহ, আশা বাসনা—সমস্ত ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সেই সর্বত্যাগী নির্মোহ অবস্থাটিই তাঁর দৈহিক কৃশতার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই উপাখ্যানে বর্ণিত কৃশতা এবং অকৃশতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন—যে ব্যক্তি আশাকে জয় করতে সমর্থ হয় বা সহজ কথা নিজের দেহ এবং অন্তর থেকে জাগতিক কামনা বাসনা ক্ষয় করতে বা চেঁছে ফেলতে সক্ষম হয়—সেই কৃশ। তার জাগতিক আসক্তিহীন নির্মোহ অবস্থাই তার কৃশত্ব। অন্যদিকে আশা যে ব্যক্তিকে জয় করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশা দ্বারা চালিত হয় তাকে অকৃশ বা পুষ্ট বলা চলে। কারণ সেই ব্যক্তি লৌকিক কামনা বাসনা ত্যাগ করতে সমর্থ হয় না, তার দেহ এবং অন্তর জাগতিক ভাবনাতেই নিমজ্জিত থাকে—

য আশাজ্জিতঃ স কৃশঃ, যেন আশা জিতা স পুষ্ট।

আশাকে জয় করেছেন বলেই তনু মুনির মনে ক্রোধ দ্বেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। বীরদ্যুম্ন রাজার আশাহত বিষণ্ণ অবস্থা দেখে তাঁকে পূর্বের অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও শোকার্ত বীরদ্যুম্ন যাতে পুত্রকে ফিরে পান সে চেষ্টাও করেছেন তিনি। পাশাপাশি আশা ত্যাগ করে নির্মোহ জীবন যাপনের উপদেশও দিয়েছেন। লক্ষণীয়, উপদেশ দেবার সময় তনু মুনি যেন রাজাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে,

রাজার কাছে অনেকেই প্রার্থী হয়ে আসেন। কেউ ধনপ্রার্থী, কেউ বা ন্যায়প্রার্থী। তাঁরা সাধারণ মানুষ, সকলেই নির্মোহ তপস্বী নন। প্রজাকল্যাণকারী রাজার উচিত যথাসম্ভব তাঁদের প্রার্থনা পূরণ করা। অপরদিকে রাজাকে আশা ত্যাগ করতে বলার মধ্যেও প্রজাকল্যাণের ভাবনা নিহিত আছে। আশা এবং তার থেকে জাত লোভ রাজা এবং তাঁর রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। অতিরিক্ত সম্পদলীপ্সা রাজাকে প্রজাপীড়ক করে তুলতে পারে আবার অতিরিক্ত পররাজ্যলোভ ডেকে আনতে পারে লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ। তাই আশাকে জয় করাও রাজার অন্যতম ধর্ম—এই ভাবনা থেকেই ঋষভকথিত উপদেশ স্থান পেয়েছে শান্তিপর্বের রাজধর্মানুশাসন পর্বে। পরিশেষে ঋষভ সুমিত্র রাজাকে বলেছেন—মহারাজ! বীরদ্যুম্ন রাজার পুত্রকে ফিরে পাবার যে আশা, তার তুলনায় আপনার সামান্য হরিণের আশা তো নিতান্তই তুচ্ছ। সে আশা আপনি ত্যাগ করুন। সুমিত্র রাজা হরিণ শিকারের আশা ত্যাগ করে শান্ত হলেন।

ঋষভগীতা বর্ণনা করার পর ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকেও আশা ত্যাগ করে পর্বতের মতো স্থির এবং নিশ্চলভাবে জীবন যাপনের এবং প্রজাপালনের উপদেশ দিয়েছেন—

স্থিরো ভব মহারাজ হিমবানিব পর্বতঃ।

পাশাপাশি জ্ঞাতিবধের অনুশোচনায় ক্লিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর উপদেশ—দুর্যোধনের সঙ্গে সন্ধি হল না এবং তার পরিণামে এমন ভয়াবহ যুদ্ধ হল—এ কথা ভেবে আর বৃথা মনোকষ্ট পেও না তুমি—

শ্রুত্বা মম মহারাজ ন সন্তপ্তুমিহার্হসি।

[মহা (k) ১২.১২৫-১২৮ অধ্যায়;
(হরি) ১২.১২২-১২৪ অধ্যায়]

ঋষা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে ক্রোধবশার গর্ভজাত কন্যাসন্তানদের মধ্যে অন্যতম। ইনি পুলহ প্রজাপতির পত্নী ছিলেন। পুলহের ঔরসে তাঁর গর্ভে পাঁচটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, যাঁরা নানা প্রকার জলজন্তুর জন্মদাত্রী ছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৭২, ৪১৩;
বায়ু পু. ৬৯.২৮৯-২৯১]

ঋষি ঋষ্ ধাতুর অর্থে গমন করা বোঝায়, শ্রুতি, সত্য, তপস্যা অর্থেও ঋষ্-ধাতুর প্রয়োগ করা হয়েছে। যাঁরা এই সমস্ত গুণ নিয়ে ব্রহ্মভাবনায় রত হন তাঁকেই ঋষি বলা হয়—

ঋষীত্যেষু গতৌ ধাতুঃ শ্রুতৌ সত্যে তপস্যথ।
এতৎ সন্নিয়তং তস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ॥

অন্য একটি মতে ঋষ্ ধাতু হিংসা এবং গতি অর্থের বাচক। দ্বিতীয় শব্দ গতি অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান, সত্য, বিদ্যা, তপস্যা এবং শাস্ত্রজ্ঞান যিনি অধিগত করেছেন, লাভ করেছেন, তিনিই ঋষি—সর্বোপরি যিনি ব্রহ্মবিদ্যায় রত তিনি ঋষি—

ঋষির্হিংসাগতৌ ধাতুর্বিদ্যা সত্যং তপঃ শ্রুতম্।
এবং সন্নিচয়ো যস্মাদ্ ব্রহ্মণস্তু ততস্ত্বৃষিঃ॥

[বায়ু পু. ৫৯.৭৯; ৪৯.১২৮; মৎস্য পু. ১৪৫.৮১]

□ ঋষি শব্দের সবচেয়ে প্রাচীন পরিচিত সাধারণ অর্থ দ্রষ্টা, যিনি দেখতে পান, প্রত্যক্ষের বাইরে পরোক্ষকেও দেখতে পান। নিরুক্তকার যাস্ক সবচেয়ে পুরাতন এই অর্থ ধরেই বলেছেন—যিনি দর্শন করতে পারেন, সব দেখতে পান, যিনি সূক্ষ্ম অর্থ, তত্ত্ব দর্শন করেন, তিনিই ঋষি—ঋষির্দর্শনাৎ। যাস্ক তাঁর পূর্বাচার্য উপমন্যুর নাম করে বলেছেন—উপমন্যু এবং তাঁর সম্প্রদায়ের আচার্যরা বলেছেন—যাঁরা মন্ত্র দর্শন করেছিলেন তাঁরাই ঋষি—

স্তোমান্ দদর্শ ইত্যৌপমন্যবঃ।

যাস্ক আরও গভীরে প্রবেশ করে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের স্বাধ্যায় ব্রাহ্মণের একটি প্রাচীন পংক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে লিখেছেন—যেহেতু স্বয়ং সমুদ্ভূত বেদরাশি (স্বয়ম্ভূ) এই সব ব্রহ্মভাবিত তপস্যারত ব্রাহ্মণদের কাছে নিজে-নিজেই প্রকট হয়েছিলেন সেইজন্যই তাঁরা ঋষি। অধ্যয়ন না করেও তপস্যার কারণে তাঁরা সমস্ত বৈদিক মন্ত্রকে তাদের স্বরূপে দর্শন করেছিলেন। দর্শন-ক্রিয়ার সঙ্গে এই সম্বন্ধের জন্যই ঋষিদের ঋষিত্ব—

তদ্ যদ্ এনান্ তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষৎ
তে ঋষয়োঽভবন্, তদ্
ঋষীণামৃষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।

[নিরুক্তম্ (ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস) ২.১.১২, পৃ. ১৩৩;
তৈত্তিরীয় আরণ্যক, (আনন্দাশ্রম, ২য় খণ্ড); ২.৯.১;
পৃ. ১৪১]

□ মন্ত্র উচ্চারণ নয়, মন্ত্রকে দেখতে পাওয়া, দেবতার স্বরূপ মন্ত্রের মধ্যে উপলব্ধি করা, এই ধরনের এক অলৌকিক প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতাই

তপস্বী মানুষকে ঋষির মর্য্যাদা দিয়েছে। মৎস্য পুরাণ বলেছে—আদিকালে ঋষিরা যখন পরম দুষ্কর তপস্যা করছিলেন সেই তপস্যারত ঋষিদের কাছে মন্ত্র আপনিই প্রকট হয়ে ওঠে। এই প্রচেষ্টাহীন দার্শনিক স্বভাবটাই ঋষি হয়ে ওঠার নিদান—

ঋষীণাং তপতাং (তপ্যতাং) তেষাং
তপঃ পরম-দুশ্চরম্।
মন্ত্রা প্রাদুর্ভবন্ত্যাদৌ পূর্বমন্বন্তরস্য চ॥

[মৎস্য পু. ১৪৫.৬২-৬৩]

☐ পরবর্তী সময়ে ঋষিদের নানান শ্রেণী-বিভাগ হয়েছে—সপ্তর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, আরও অনেক রকম। ব্রহ্মার মন থেকে যে মানস পুত্রেরা জন্মেছিলেন, তাঁরা প্রথমত সংখ্যায় দশজন হলেও পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্য থেকে তিন জনকে বাদ দিয়ে সাতজনের নাম করা হয় এবং তাঁরাই সপ্তর্ষি বলে বিখ্যাত হন। মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি সেই মানস পুত্রেরা ক্রমান্বয়ে দশজন—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং সর্বশেষে নারদ। পরবর্তী সময়ে এই মানস ঋষিদের জন্ম প্রসঙ্গে একটা মনুষ্যোচিত ভাবনা করে বলা হয়েছে যে, দেবমাতা এবং দেবপত্নীদের দেখে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শুক্রক্ষরণ হয়। ব্রহ্মা সেই শুক্র আগুনে আহুতি দেন, সেই হুতাশন থেকেই সাত ঋষি 'সপ্তর্ষি'-র জন্ম হয়। তাঁরা যথাক্রমে ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ এবং বশিষ্ঠ। সপ্তর্ষিদের পর আরও বহু বহু ঋষিদের কথা বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ৩.৫-৮; ১৯৫.৬-১১; ১৪৫.৮৯-১১৮]*

☐ ঋষিদের একটা দার্শনিক বিভাগও আছে। বলা হয়েছে ঋষিজাতি পাঁচ প্রকারের। সেই প্রকারগুলি হল—অব্যক্তাত্মা, মহাত্মা, অহঙ্কারাত্মা, ভূতাত্মা এবং ইন্দ্রিয়াত্মা। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যেন সাংখ্যদর্শনের অব্যক্তা প্রকৃতি, তার প্রথম ব্যক্ত পরিণাম মহান, তারপরের পরিণাম (evolute) অহঙ্কার, পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়—এই প্রাকৃত তত্ত্বগুলির রহস্যগুলি জেনে যাঁরা জীবন্মুক্ত হয়েছেন, তাঁদেরই ঋষি-প্রকার নির্ণয় করা হয়েছে এই সাংখ্যতত্ত্বগুলির মাধ্যমে। এরপরে যে পরমর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি অথবা শ্রুতর্ষিদের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা এই পূর্বতত্ত্বানুযায়ী বিশিষ্ট নামে বিভক্ত হয়েছেন বলে মনে হয়।

[মৎস্য পু. ১৪৫.৮২-৮৯; বায়ু পু. ৫৯.৭৯-৮৭]

☐ আসলে আমাদের সমস্ত বৈদিক ক্রিয়াকর্মে ঋষিদের গুরুত্ব এত বেশি যে, প্রত্যেকটি যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্মের প্রথমে মন্ত্রোচ্চারণের আগেই ঋষির কথা স্মরণ করতে হয়, ঋষির পরে সেই মন্ত্রের ছন্দ এবং তার পরে দেবতার উচ্চারণ, তারপর বিশেষ সেই মন্ত্রোচ্চারণ। বৃহদ্দেবতা লিখেছে—ঋষি, ছন্দ এবং দেবতার কথা না বলে যে মন্ত্রের উপদেশ করে, মন্ত্রজপ করে বা উচ্চারণ করে, সে পাপী মানুষ—

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ।
যো'ধ্যাপয়েজ্জপেদ্ বাপি পাপীয়ান্
জায়তে তুসঃ।

[বৃহদ্দেবতা (Lanman) ৮.১৩৬]

☐ ঋষির এই গৌরব মনে রেখেই সায়নাচার্য ঋগ্‌বেদের অগ্নিসূক্তের টীকায় লিখেছেন—যে মানুষ মন্ত্র উচ্চারণ করার সময় ঋষির নাম স্মরণ করে না, তাকে মন্ত্রের কাঁটা বা 'মন্ত্রকণ্টক' বলা হয়। একই সঙ্গে তিনি ঋষিদের অতীত ও অনাগত-বর্তমানের দৃষ্টি-মাহাত্ম্যের কথা বলে তাঁদের মন্ত্রদর্শনের সূক্ষ্ম ক্ষমতার কথাও বলেছেন। সায়ন বলেছেন—ঈশ্বরের অনুগ্রহে ঋষিরা অতীন্দ্রিয় বেদের মন্ত্রগুলি প্রথম দর্শন করেছিলেন বলেই তাঁরা ঋষি। মহাভারতে আছে—যুগক্ষয়ে প্রলয় ঘটে গেলে ঋষি-মহর্ষিরা তপস্যার মাধ্যমে বেদ এবং মহাভারত-রামায়ণের মত ইতিহাস লাভ করেছিলেন—

যুগান্তে'ন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা॥

[ঋগবেদ ১.১.১; দ্র. সায়নাচার্যের টীকা;
মহা (k) ১২.২১০.১৯; (হরি) ১২.২০৭.১৯]

পরমর্ষি—যে ঋষি ত্যাগ-বৈরাগ্যের মাধ্যমে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করে নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক বুদ্ধিতে সাংখ্যদর্শনোক্ত অব্যক্তস্বরূপ পরম তত্ত্বে বুদ্ধি নিবেশ করতে পারেন তাঁকে বলা হয় পরমর্ষি—

নিবৃত্তি-সমকালস্তু বুদ্ধ্যাব্যক্তমৃষিঃ স্বয়ম্।
পরং হি ঋষতে যস্মাৎ পরমর্ষিস্ততঃ স্মৃতঃ॥

[বায়ু পু. ৫৯.৮০; মৎস্য পু. ১৪৫.৮২]

মহর্ষি—গতি অর্থে ঋষি ধাতু (ঋষ্ ধাতু)

থেকে ঋষি। প্রথম থেকেই যাঁরা সংসার-নিবৃত্তি অবলম্বন করেছেন এবং আদিকালে জন্মেছেন বলেও যাঁরা ঋষি, তাঁরাই কিন্তু ব্রহ্মার মানস পুত্র বলে কথিত। এই বুদ্ধিমান তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পরিমাণহীন তথা সীমাহীন প্রকৃতির প্রথম ব্যক্তস্বরূপ মহান্ বা মহত্তত্ত্বকে আশ্রয় করে ভূততত্ত্বজ্ঞ হন বলেই তাঁরা মহর্ষি-পদবাচ্য—

নিবর্তমানৈস্তৈর্বুদ্ধ্যা মহান্ পরিগতঃ পরঃ।
যস্মাদৃষিঃ পরত্বেন সহ তস্মান্মহর্ষয়ঃ॥

ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ এবং পুলস্ত্য—এই দশজনের মধ্যে পরত্ব এবং ঋষিত্ব দুটিই আছে বলে এঁরা সব মহর্ষি। আসলে প্রকৃতির প্রথম ব্যক্ত স্বরূপ মহান প্রাণী জগতে প্রথম অস্তিত্বের প্রমাণ। ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা সেই মহানের প্রথম রূপ বলেই মহর্ষি।

[বায়ু পু. ৫৯.৮১-৮২; ৫৯.৮৮-৮৯;
মৎস্য পু. ১৪৫.৮৩-৮৫; ১৪৫.৯০-৯১]

শ্রুতর্ষি—শ্রুতর্ষি তাঁদের বলা উচিত যাঁরা স্বাধ্যায় অধ্যয়নের মাধ্যমে শ্রুতির দ্বারা গুরুর উচ্চারিত বেদমন্ত্র পুরোপুরি অধিগত করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত পৌরাণিকেরা বলেছেন—যাঁরা শ্রুত হওয়ার পর, অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করার পর মহত্তত্ত্বকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের শ্রুতর্ষি বলা হয়—

শ্রুত্বা ঋষিং পরত্বেন শ্রুতাস্তস্মাৎ শ্রুতর্ষয়ঃ।

এই রকম একটা সংজ্ঞা খুব স্পষ্ট কিছু ব্যাখ্যা করে না, যদিও বায়ু পুরাণ আর একটু পরিষ্কার করে বলেছে—গুরুপরম্পরায় অথবা শ্রুতিকথিত তত্ত্বগুলিতে যাঁরা বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট হন এবং তাতে যেহেতু শ্রুত বিষয়ে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাঁদের শ্রুতর্ষি বলা যায়—

ঋষন্তি বৈ শ্রুতং যস্মাদ্ বিশেষাচ্চৈব তত্ত্বতঃ।
তস্মাচ্ছ্রুতর্ষয়স্তেঽপি শ্রুতস্য পরিদর্শনাৎ।

[মৎস্য পু. ১৪৫.৮৮;
বায়ু পু. ৫৯.৮৬; ৬১.১২২; ৯৯.৪১৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.২; ১.৩৫.১৪৬]

☐ পুরাণগুলিতে পরমর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি এবং শ্রুতর্ষিদের একটা সাধারণ সংজ্ঞা পাওয়া গেলেও দেবর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি ঋষিদের সঠিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। আমরা শব্দকল্পদ্রুম বা বাচস্পত্যের মতো কোষগ্রন্থে 'রত্নকোষ' নামে অপর একটি কোষগ্রন্থ থেকে উল্লিখিত একটি শ্লোকে সাত প্রকারের ঋষিদের একটা বর্গ দেখতে পাই। এখানে বলা হয়েছে—

সপ্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-পরমর্ষয়ঃ।
কাণ্ডর্ষিশ্চ শ্রুতর্ষিশ্চ রাজর্ষিশ্চ ক্রমাবরাঃ॥

আবার কলিঙ্গরাজ পুরুষোত্তমদেবের লেখা ত্রিকাণ্ডশেষ নামক গ্রন্থে এই সাত প্রকার ঋষির কী উদাহরণ হতে পারে তার একটা নমুনা দেওয়া আছে। পুরুষোত্তমদেব লিখেছেন— মহর্ষি হলেন ব্যাস প্রভৃতি, পরমর্ষি হলেন ভেল প্রভৃতি, কণ্ব প্রভৃতিরা দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষির উদাহরণ বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিরা, শ্রুতর্ষিদের দৃষ্টান্ত সুশ্রুত-চরকেরা, ঋতুপর্ণ, জনক প্রভৃতি রাজর্ষির উদাহরণ, আর কাণ্ডর্ষির উদাহরণ জৈমিনি প্রভৃতি মুনি—

...ব্যাসাদ্যাস্তু মহর্ষয়ঃ॥
পরমর্ষয়স্তু ভেলাদ্যাঃ দেবর্ষয়ঃ কণ্বাদয়ঃ।
ব্রহ্মর্ষয়ঃ বশিষ্ঠাদ্যা সুশ্রুতাদ্যাঃ শ্রুতর্ষয়ঃ॥
ঋতুপর্ণাদয়ো রাজর্ষয়ঃ কাণ্ডর্ষয়স্ত্বমী।
জৈমিন্যাদ্যা নারদস্তু কপিবক্ত্রো বিধাতৃভূঃ॥

[শব্দকল্পদ্রুম দ্র. ঋষি;
ত্রিকাণ্ডশেষ ২.১৫-১৭, পৃ. ৫৯]

☐ ত্রিকাণ্ডশেষ নামক গ্রন্থে পুরুষোত্তমদেব 'ভেল' বলে যে পরমর্ষির কথা বলেছেন রামায়ণ-পুরাণ-মহাভারতে তাঁকে আমরা সেইভাবে দেখতেই পাই না। পরবর্তীকালে 'ভেল' যুক্ত হয়েছেন আয়ুর্বেদের সঙ্গে। ফলত ভেলসংহিতা নামে একটি আয়ুর্বেদের গ্রন্থ পাই আমরা। অন্যদিকে দেবর্ষি শব্দটা নারদ ঋষির সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, যাতে দেবর্ষি শব্দের একটা পৌরাণিক সংজ্ঞা পাওয়া উচিত ছিল। ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগে দেবর্ষিদের মধ্যে নারদের বিভূতিই সবচেয়ে বেশি বলে মানা হয়েছে—

দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।

আর এইখানেই শঙ্করাচার্য টীকা করার সময় বলেছেন—যাঁরা দেবতাই বটে, কিন্তু মন্ত্রদর্শন করার ফলে ঋষি হয়েছেন, তাঁরাই দেবর্ষি নামে পরিচিত—

দেবা এব সন্ত ঋষিত্বং প্রাপ্তা মন্ত্রদর্শিত্বাৎ।

[ভগবদ্গীতা ১০.২৬; শাঙ্করভাষ্য দ্র.]

একই ভাবে কাণ্ড-ঋষি যাঁরা, সেই কাণ্ডর্ষিদেরও সঠিক কোনো সংজ্ঞা পাই না। প্রথম

ভাবনায় যেটা আসে যে, বেদবিদ্যার দুই ভাগ—কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের ভাবনা নিয়ে যে মীমাংসাদর্শন গড়ে উঠেছে, তার প্রবর্তক হলেন সূত্রকার জৈমিনি। সেই কারণে তাঁকেই কাণ্ডর্ষি বা কাণ্ড-ঋষি বলা হয়। কিন্তু এই দৃষ্টিতে পূর্বমীমাংসা বা কর্মকাণ্ডের মতো উত্তরমীমাংসা বা জ্ঞানকাণ্ডের প্রবর্তক ব্যাসদেবকেও কাণ্ডর্ষি বলা উচিত। কিন্তু তিনি মহর্ষি বলেই এত পরিচিত যে, কাণ্ডর্ষি হিসেবে প্রথিত হয়ে গেছেন শুধু জৈমিনি।

রাজর্ষি কথাটাও তেমনই বহুশ্রুত বটে এবং তার কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকলেও রাজর্ষি নামটা থেকেই বোঝা যায় যে, রাজা হওয়া সত্ত্বেও যিনি ত্যাগ-বৈরাগ্য-নিষ্কাম কর্মভাবনায় ঋষিবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, তিনিই রাজর্ষি। মহাভারতে বহু বহু শান্ত সংযমী রাজাদের সম্বন্ধে রাজর্ষি শব্দ ব্যবহার হয়েছে, যদিও অনেক সময়ে এই শব্দ এমন একটা গৌরবে ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে রাজাদের সংযম-নিয়মের চাইতেও শ্রেষ্ঠ রাজার বা রাজশ্রেষ্ঠের বহুমাননায় রাজর্ষি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। ত্রিকাণ্ডশেষ নামক কোষগ্রন্থে ঋতুপর্ণ রাজার নাম যেভাবে রাজর্ষির উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে তাতে তাঁর ঋষিত্বের খ্যাতির চেয়েও পরম্পরাগত লোকভাবনা বেশি প্রতিফলিত। আমরা পরম্পরাগত একটি শ্লোকে প্রাতঃকালে স্মরণীয় কয়েকটি নাম পাই। তার মধ্যে নল, দময়ন্তী এবং কর্কোটক নাগের সঙ্গে ঋতুপর্ণ রাজার নাম আছে এবং এই নামের সবগুলিই নল-দময়ন্তী কাহিনীর সঙ্গে জড়িত—

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্তনং কলিনাশনম্॥

কাজেই রাজর্ষি বলতে ঋতুপর্ণের উদাহরণ আমরা খুব গ্রহণযোগ্য মনে করি না। বরঞ্চ ব্রাহ্মণ-উপনিষদ-খ্যাত জনক, যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞও বটে এবং রাজাও বটে, তিনি রাজর্ষি হিসেবে সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪.৪.২৩; ভগবদ্গীতা ৪.২; ৯.৩৩]

ঋষিক$_{১}$ একজন রাজর্ষি। পূর্বকল্পে ইনি অর্ক নামে এক দানব ছিলেন। *[দ্র. অর্ক]*

[মহা (k) ১.৬৭.৩২-৩৩; (হরি) ১.৬২.৩৩]

ঋষিক$_{২}$ *[দ্র. অর্ক$_{২}$]*

ঋষিকন্যাতীর্থ নর্মদা নদীর তীরবর্তী একটি তীর্থ। মহাদেব এই স্থানে অবিবাহিত বহু ঋষিকন্যার পাণিগ্রহণ করার পর থেকে এটি ঋষিকন্যা তীর্থ নামে খ্যাত হয়। তৎপূর্বে এটি ত্রিদশ-জ্যোতি তীর্থ নামে খ্যাত ছিল। *[মৎস্য পু. ১৯৪.১৪]*

ঋষিকুল্যা$_{১}$ মহেন্দ্রপর্বত থেকে নির্গত একটি পবিত্র নদী। অবশ্য বিষ্ণু পুরাণ মতে এটি শুক্তিমান্ পর্বতজাত। এই তীর্থ দর্শনে উপসদ্ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পবিত্র ঋষিকুল্যা নদীর জল আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয় জাতির লোকেরাই পান করে। তার মানে, এই নদী জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল।

[মহা (k) ৩.৮৪.৪৮-৫০; ৬.৯.৩৬; ১৩.১৬৫.২৬; (হরি) ৩.৬৯.৪৮-৫০; ৬.৯.৩৬; ১৩.১৪৩.২৬; ভাগবত পু. ৫.১৯.১৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩৭; মৎস্য পু. ১১৪.৩১; বিষ্ণু পু. ২.৩.১৩]

উড়িষ্যার গঞ্জাম ও কন্ধমাল জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। ঋষিকুল্যা নদীটির আরেক নাম রাশিকৈলা (**Rasikoila**) অবশ্য বিহারের শুক্তিমান্ পর্বত (মধ্যপ্রদেশের রায়গড় থেকে বিহারের সিংভূম জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গিরিশ্রেণী) থেকে উৎপন্ন কিয়াল (**kiyal**) নদীটিকেও অনেকে ঋষিকুল্যা বলে ধারণা করেন।

[GD (N.N. Bhattacharyya) p. 262: GDAMI (Dey) p. 169]

ঋষিকুল্যা$_{২}$ মহাভারতের সভাপর্বে অপর একটি ঋষিকুল্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সেটিকে কোনো একক নদী না বলে একাধিক ঋষির দ্বারা সৃষ্ট অনেক ক্ষুদ্র নদী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্জুন উত্তর মানসের কাছে এই নদীগুলিকে দেখতে পেয়েছিলেন—

তাংস্তু সান্ত্বেন নির্জিত্য মানসং সর উত্তমম্।
ঋষিকুল্যাস্তথা সর্বা দদর্শ কুরুনন্দনঃ॥

স্পষ্টতই বোঝা যায়, মধ্য-দক্ষিণ ভারতের ঋষিকুল্যা এবং উত্তর মানসের নিকট প্রবাহিত ঋষিকুল্যা ভৌগোলিক কারণেই অভিন্ন হতে পারে না। সম্ভবত মানস সরোবর সংলগ্ন ঋষিগণসৃষ্ট নদীর নামানুসারেই পরবর্তী সময়ে দাক্ষিণাত্যের নদীটির ঋষিকুল্যা নামকরণ হয়ে থাকবে। *[মহা (k) ২.২৮.৪; (হরি) ২.২৭.৪; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত ভারতকৌমুদী টীকা দ্রষ্টব্য]*

ঋষিগিরি জরাসন্ধের রাজধানী মগধকে বেষ্টন করে পাঁচটি পর্বত অবস্থান করতো। এই পাঁচটি পর্বতের মধ্যে ঋষিগিরি অন্যতম।

[মহা (k) ২.২১.২; (হরি) ২.২০.২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.]

পণ্ডিতদের মতে রত্নাগিরি পাহাড়ের কাছেই ঋষিগিরিও অবস্থিত ছিল।

[The Indian Encyclopaedia; Ed. Subodh Kapoor; New Delhi: Genesis Publications Pvt. Ltd. 2002; p.4434]

ঋষিজ্ঞ মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে সুরূপার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ। পুরাণে এঁকে অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অঙ্গিরার বংশের অন্যতম গোত্র প্রবর্তক ছিলেন মহর্ষি ঋষিজ্ঞ। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৪]*

ঋষিতীর্থ নর্মদার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। ঋষি তৃণবিন্দু এই তীর্থে শাপমুক্ত হয়েছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯১.২২.১৯৩.১৩-১৪]

ঋষিপুত্র বানর প্রধানদের একটি গোষ্ঠীবিশেষের নাম। সীতার সন্ধানে সুগ্রীব যখন চারিদিকে বানরদের পাঠাচ্ছিলেন, তখন এই ঋষিপুত্রদের তিনি যেতে বলেছিলেন পশ্চিমদিকে।

[রামায়ণ ৪.৪২.৫]

ঋষিবান্ (ঋষিবৎ) মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, মহর্ষি ঋষিবানের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ঋষিবান্ অন্যতম আঙ্গিরস গোত্র প্রবর্তক ছিলেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৫০]*

ঋষিবাস মৎস্য পুরাণ মতে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। কংস দেবকীর যে ছয় পুত্রকে হত্যা করেন ঋষিবাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। দেবকীর এই পুত্র বিষ্ণু পুরাণে ঋজুদাস এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ঋজুদায় নামে চিহ্নিত হয়েছেন। বায়ু পুরাণে যজুদায় পাঠ ধৃত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৪৬.১৩; বায়ু পু. ৯৬.১৭২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৫.১৩]

ঋষিসত্র গোদাবরী নদীর তীরবর্তী একটি তীর্থ। সপ্তর্ষিরা এই স্থানে যজ্ঞ করেছিলেন। এটি বৃত্রাসুরের জন্মস্থান বলে পৌরাণিক বিশ্বাস।

[ব্রহ্ম পু. ১৭৩.১-২]

ঋষ্টি ঋগ্বেদে সাধারণ একটি ধারালো অস্ত্র হিসেবেই ঋষ্টি-শব্দের প্রয়োগ হয়েছে—

বাশীমন্তঃ ঋষ্টিমন্তো মণীষিণঃ।

বিদ্যুৎরূপ ঋষ্টি নিক্ষেপ করছেন—এই কথাতে আরও স্পষ্ট হয় এই ধারণা—

আরুক্মৈরায়ুধা নর ঋষ্বা, ঋষ্টীরসৃক্ষত।

এই মন্ত্রে সায়নাচার্য ঋষ্টি-শব্দের অর্থ করেছেন 'আয়ুধ'—ঋষ্টীরায়ুধ বিশেষণ্।

[ঋগ্বেদ ৫.৫২.৬; ৫.৫৭.২; ১.১৬৬.৪]

□ কাঠের তৈরি এক ধরনের দণ্ড। নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায় এই অর্থ করেছেন—ঋষ্টয়ো দণ্ডাঃ। কৃষ্ণ বনপর্বে পাণ্ডবদের কাছে সৌভপতি শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ-বর্ণনায় শাল্বরাজার সৈন্যেরা যেসব অস্ত্র ব্যবহার করেছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে অসি-শক্তি-কুলিশ, পাশের সঙ্গে ঋষ্টির কথা বলেছেন বহুবচনে। আবার উদ্যোগপর্বে দুর্যোধন যখন সেনা-বিভাগ করছেন এমনভাবে যাতে বোঝা যায়—এক-একটি বিশেষ প্রকারের যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাদের দিয়ে একটি প্রাথমিক বিভাগ তৈরি করেছিলেন দুর্যোধন—যেমন যারা তোমর দিয়ে যুদ্ধ করবেন তাঁরা 'সতোমরাঃ', যারা শূল অথবা ভিন্দিপাল নিয়ে যুদ্ধ করবেন, তাঁরা 'সশূলভিন্দিপালাশ্চ' একই ভাবে—সহর্ষ্টয়ঃ (সহ + ঋষ্টয়ঃ)। টীকাকার নীলকণ্ঠ এবার আরও স্পষ্ট করে বললেন—ঋষ্টি হল খুব কঠিন কাঠের তৈরি বেশ ভারী এক ধরনের দণ্ড—

ঋষ্টির্গুরুতরঃ কাষ্ঠদণ্ডঃ।

পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ ঋষ্টিকে দুই দিকেই তীক্ষ্ণধার তলোয়ার বা অসি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন মহাভারতেরই অন্য একটি শ্লোক প্রমাণে। স্বয়ংবর-সভায় দ্রৌপদীকে লাভ করার পর পাণ্ডবদের রাজসভায় নিমন্ত্রণ করে আনার সময় দ্রুপদ নানান অস্ত্রসম্ভার সাজিয়ে রেখেছিলেন অজ্ঞাত-পরিচয় পাণ্ডবদের ক্ষত্রিয়ত্ব বোঝার জন্য। এখানে শক্তি-অস্ত্রের পাশেই ঋষ্টি আছে। আর ভাগবত পুরাণে শত্রুর গলা কেটে মুণ্ডু নামিয়ে দেবার প্রসঙ্গে (শিরাংসি চিচ্ছিদ্ধুঃ) চক্র এবং শক্তির সঙ্গে ঋষ্টি নামের অস্ত্রটি সন্নিবেশিত হওয়ায় ঋষ্টিকে অসির মতো ধারালো অস্ত্র বলে ভেবে নেওয়ার সিদ্ধান্তটা জোরালো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত এইজন্য সঠিক যে, অমরকোষ খড়্গের পর্যায় শব্দ হিসেবে অসি-শব্দের সঙ্গে ঋষ্টি-শব্দটি গ্রহণ করেছেন—

খড়্গে তু নিস্ত্রিংশ-চন্দ্রহাসাসিরিষ্টয়ঃ।

অমরকোষে 'রিষ্টি' পড়া হলেও টীকাকারেরা সকলেই এটাকে ঋষ্টি বলেছেন এবং সেটা অসির মতোই ধারালো। ত্রিকাণ্ডশেষ নামে অন্য একটি প্রাচীন কোষ ঋষ্টিকে সোজাসুজি খড়্গ এবং তরবারি বলেছে—

ঋষ্টিঃ খড়্গান্তরবারিঃ।

[মহা (k) ৩.২০.৩৪; ৫.১৫৪-১৩; ১.১৯৪.৭;
(হরি) ৩.১৭.৩৩; ৫.১৪৪.১৩; ১.১৮৭.৭;
ভাগবত পু. ৮.১০.৩৬;
অমরকোষ (Jhalkikar) ২ (ক্ষত্রিয়বর্গ) ৯০, পৃ. ২০১;
ত্রিকাণ্ডশেষ, ২ (ক্ষত্রিয়বর্গ) ৫৪, পৃ. ৬৯]

ঋষ্য রাজর্ষি কুরুর পুত্র জহ্নুর বংশে দেবতিথির পুত্র ছিলেন ঋষ্য। দিলীপ নামে ঋষ্যের এক পুত্র হয়।

[ভাগবত পু. ৯.২২.১১]

ঋষ্যন্ত পুরুবংশীয় রাজা ইলিনের ঔরসে উপদানবীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঋষ্যন্ত। মৎস্য পুরাণের পাঠে ঋষ্যন্ত নাম থাকলেও বায়ু পুরাণে তাঁকে সুষন্ত নামে চিহ্নিত হতে দেখা যায়। ইনি রাজা দুষ্মন্তের ভাই ছিলেন।

[মৎস্য পু. ৪৯.১০]

ঋষ্যমূক একটি পবিত্র পর্বত। পম্পা হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে এটির অবস্থান। মতঙ্গঋষির আশ্রম ঋষ্যমূক পর্বতে অবস্থিত ছিল। বালীর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সুগ্রীব তাঁর চারজন বানর অনুচর সহ এই পর্বতের উপর অবস্থিত একটি গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুন্দুভি নামে অসুরকে বধের পর বালী তার মৃতদেহ সবেগে উত্তোলন করে দূরে নিক্ষেপ করে। দুন্দুভির মৃতদেহ থেকে নির্গত রক্তবিন্দু এ সময় মতঙ্গঋষির আশ্রমে পড়ে। ক্রুদ্ধ মতঙ্গ, বালীর উদ্দেশে অভিশাপ দেন যে, তাঁর আশ্রম এবং তার আশেপাশের এক যোজনের মধ্যে বালী প্রবেশ করলেই তার মৃত্যু ঘটবে। সেই অভিশাপের ভয়েই বালী ঋষ্যমূক পর্বতে প্রবেশ করতে পারতেন না। কবন্ধ, রামচন্দ্রকে এই পর্বতে গিয়েই সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন। সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এক দীর্ঘ সময় ঋষ্যমূক পর্বতে অতিবাহিত করেন। রামায়ণে ঋষ্যমূক পর্বতের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়—

ঋষ্যমূক পর্বত মনোরম বৃক্ষে আবৃত ছিল। গৈরিকবর্ণের ধাতু সমূহের উপস্থিতির জন্য পর্বতটির রঙ গৈরিক। যূথবদ্ধ হাতি এবং বহু প্রকারের হরিণ পর্বতটির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বিচরণ করতে দেখা যেত। পর্বতটিতে একটি বৃহৎ সরোবরও ছিল।

[রামায়ণ ১.৩.২৩; ৩.৭২.১২, ২১; ৩.৭৩.৩১-
৪১; ৪.১.৭৩-৭৪, ১০.২৮, ৪.১১.৪৫-৫৬;
১১.৬৪, ২৪.৭, ৪৬.২৩;
মহা (k) ৩.২৫.৯; ৩.১৪৭.৩০; ৩.২৭৯.৪৪;
৩.২৮০.৯; (হরি) ৩.২২.৯; ৩.১২২.৩০; ৩.২৩৩.৪৪;
৩.২৩৪.৯; ভাগবত পু. ৫.১৯.১৬]

□ ঋষ্যমূক পর্বতের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়। অনেকে মনে করেন—কর্নাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় যে ত্রিভূজাকৃতি ভূ-খণ্ডটি রয়েছে, তার অন্তর্গত রায়চুর দোয়াবের গিরিশ্রেণীটিই ঋষ্যমূক পর্বত। আবার অনেক পণ্ডিতের মতে, তুঙ্গভদ্রা নদীর কাছে প্রবাহিতা অনগা নদীর আট মাইল দূরে অবস্থিত গিরিশ্রেণীটি প্রাচীন ঋষ্যমূক। এই গিরিশ্রেণীটি থেকেই পম্পা নদী উৎপন্ন হয়ে তুঙ্গভদ্রায় মিশেছে। *[EAIG (Kapoor) p. 566;*
A Short History of South India;
Sarojini Chaturvedi; Samskriti; 2006. p. 3]

ঋষ্যশৃঙ্গ১ একজন অতিশয় বিখ্যাত ঋষি। কশ্যপের পৌত্র। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র এই মহাতেজস্বী বনবাসী মুনি। পিতা বিভাণ্ডকের সঙ্গে তিনি নির্জন অরণ্যে বাস করতেন, এবং মুখ্য এবং গৌণ—দুই প্রকারেরই ব্রহ্মচর্য্য পালন করতেন। অন্য কিছুই তাঁর জানা ছিল না।

এই সময় অঙ্গদেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়। অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদ ব্রাহ্মণদের এর প্রতিকার করতে বললে তাঁরা বললেন, যে কোনো উপায়ে সেই বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে নিয়ে আসতে হবে। রোমপাদের কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হলেই অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টি হবে। রাজা পুরোহিত ও অমাত্যদের এই কাজের কথা বললেন, কিন্তু বিভাণ্ডকের ভয়ে কেউই ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। অবশেষে মন্ত্রীদের পরামর্শে রোমপাদ একদল বারাঙ্গনাকে দায়িত্ব দিলেন বনচর ঋষিকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসার। ঋষ্যশৃঙ্গ নারী-বিষয়ে কিছুই জানতেন না; ছলনাময়ী বারাঙ্গনারা তাঁকে প্রতারণা করে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে এলেন। মহাভারতে বারাঙ্গনার

সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের আলাপচারিতা এবং প্রথম নারীদর্শনে ঋষ্যশৃঙ্গের সরল প্রতিক্রিয়ার কথা বিশদে বর্ণিত হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করা মাত্র ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে বৃষ্টি দান করলেন। রাজা, মুনির সঙ্গে নিজের কন্যা শান্তার বিবাহ দিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নীর সঙ্গে অঙ্গদেশেই বাস করতে লাগলেন। সনৎকুমার আগেই এই সমস্ত ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সুমন্ত্র এই কাহিনী দশরথকে বলেন। *[রামায়ণ ১.৯-১০; মহা (k) ৩.১১০-১১৩ অধ্যায়; (হরি) ৩.৯৩-৯৫ অধ্যায়; ভাগবত পু. ৯.২৩.৮-১০; মৎস্য পু. ৪৮.৯৬; বায়ু পু. ৯৯.১০৪]*

☐ সুমন্ত্র দশরথকে এছাড়াও বললেন, সনৎকুমার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে—দশরথ যদি ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় নিয়ে এসে যজ্ঞ করেন, তাহলে তাঁর চারটি পুত্রসন্তান জন্ম নেবে। দশরথ এই কথা অনুযায়ী নিজেই অঙ্গরাজ্যে গিয়ে রোমপাদকে বলে ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় নিয়ে এলেন। সস্ত্রীক ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথের অতিথি-রূপে অযোধ্যায় বাস করতে লাগলেন।

অবশেষে বসন্তকালে দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন বলে স্থির করলেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে তিনি নিয়োগ করলেন এই মহাকর্মে। ঋষ্যশৃঙ্গ সম্মতি জানিয়ে সরযু নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। *[রামায়ণ ১.১১; ১২.১-৪]*

যজ্ঞভূমি তৈরি হয়ে গেলে ঋষ্যশৃঙ্গ শুভক্ষণে দশরথকে সেখানে যেতে বললেন। অন্যান্য মুনি-ঋষিরাও ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্তী করে যজ্ঞস্থানে এলেন। যজ্ঞ শুরু হল। ঋষ্যশৃঙ্গ ও অন্য ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের মাধ্যমে ইন্দ্রাদি দেবতাদের সেখানে আহ্বান করলেন এবং যথাবিধি আহূতি দিলেন। দশরথ যজ্ঞের শেষে যে দক্ষিণা দিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং বশিষ্ঠ তা সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। দশরথ তাঁর আশীর্বাদ চাইলে তিনি বললেন—দশরথের চারটি পুত্র জন্মাবে। দশরথ খুশি হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন—ঋষ্যশৃঙ্গ যেন সেই কর্মের সাধনে উদ্‌যোগী হন। *[রামায়ণ ১.১৩.৩৯-৪২; ১৪]*

দশরথের কথায় ঋষ্যশৃঙ্গ সমাধিস্থ হয়ে মনস্থির করলেন। তারপর বললেন, তিনি অথর্ববেদের মন্ত্র অনুযায়ী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন। ঋষ্যশৃঙ্গ নিজেই এই যজ্ঞ পরিচালনা করলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সস্ত্রীক ঋষ্যশৃঙ্গ ফিরে গেলেন অঙ্গদেশে। *[রামায়ণ ১.১৫.১-৩; ১৮.৬]*

☐ মহাভারতের সভাপর্বে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত ঋষিদের মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গের নাম উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ২.১১.২৩; (হরি) ২.১১.২২]*

ঋষ্যশৃঙ্গ$_২$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অলম্বুষ নামে এক রাক্ষস দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই অলম্বুষ রাক্ষসকে একাধিকবার আর্ষশৃঙ্গি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্ষশৃঙ্গি, অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র। সেক্ষেত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ নামে কোনো রাক্ষসবীর অলম্বুষের পিতা ছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। *[মহা (k) ৬.৯০.৪৮-৭৭; (হরি) ৬.৮৭.৪৭-৭৫]*

ঋষ্যশৃঙ্গ$_৩$ ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ৮.১৩.১৫; বিষ্ণু পু. ৩.২.১৭]*

এ

এ সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির থেকেই চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপতি মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মাসৃষ্ট এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির একাদশতম হল 'এ' কার বর্ণ। এই এ-কার বর্ণ থেকে পিশঙ্গী মনুর সৃষ্টি হয়েছিল। বায়ু পুরাণে অ থেকে ঔ পর্যন্ত চতুর্দশ বর্ণকে মূর্তিমান দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মূর্তিমান এ-কার পিশঙ্গ বা পিঙ্গল বর্ণ ছিলেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ২৬.৪৩]*

এক$_১$ ভাগবত পুরাণ মতে পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভজাতপুত্র ছিলেন রয়। এই রয়-এর পুত্র এক।

[ভাগবত পু. ৯.১৫.২]

এক$_২$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯১; (হরি) ১৩.১২৭.৯১]

এককর্ণ একটি প্রাচীন জনপদ। পুরাণ মতে গঙ্গা সপ্তধারায় বিভক্ত হয়ে মর্ত্যলোকে প্রবাহিত হয়েছেন। গঙ্গার যে ধারাটি পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে তার তীরে অবস্থিত জনপদগুলির মধ্যে এককর্ণ একটি। *[মৎস্য পু. ১২১.৫৩]*

একচক্র কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় দ্বাপরযুগে ইনি মর্ত্যে রাজা প্রতিবিন্ধ্য-রূপে অবতীর্ণ হন।

[মহা (k) ১.৬৫.২৫; ১.৬৭.২১; (হরি) ১.৬০.২৫; ১.৬২.২২; বায়ু পু. ৬৮.৭; মৎস্য পু. ৬.১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৭; বিষ্ণু পু. ১.২১.৫; ভাগবত পু. ৬.৬.৩১; গরুড় পু. ১.৬.৪৮; কালিকা পু. ৩৪.৫৫]

একচক্রা মহাভারতে উল্লিখিত একটি নগর। বারণাবতের জতুগৃহ থেকে প্রাণরক্ষার পর বেদব্যাসের পরামর্শ-মত পাণ্ডবরা দুর্যোধনের হাত থেকে জীবনরক্ষার জন্য ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময়েই ব্রহ্মচারীরূপী পাণ্ডবরা একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে কিছু সময় বাস করেন। আত্মগোপনের প্রয়োজনে ও প্রাণধারণের জন্য তাঁরা একচক্রা নগরীর পথে পথে ব্রহ্মচারীর বেশে ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। যেখানে তাঁরা বহু মনোরম বন, নদী ও সরোবর দর্শন করেছিলেন। একচক্রায় বাসকালেই ভীমসেন এই নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত বেত্রকীয় বন বা বক-বনে বসবাসকারী অত্যাচারী বকরাক্ষসকে হত্যা করে নগরের অধিবাসীদের জীবনরক্ষা করেন। একচক্রা থেকেই পাণ্ডবরা পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অংশ নিতে যান।

[মহা (k) ১.২.১০৯-১১০; ১.৬১.২৬-২৯; ১.৯৫.৭২-৭৩; ১.১৫৭.১-৪; ৩.১২.১১১-১১২; ৫.১২৮.১৪; (হরি) ১.২.১০৯-১১০; ১.৫৬.২৬-২৯; ১.৯০.৯৮-৯৯; ১.১৫১.১-৪; ৩.১১.১১১-১১২; ৫.১১৯.১৪]

N.L. Dey-এর মতে উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়া (Itawah) শহরের ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত চকর্‌নগর (Chakarnagar)। তবে অনেকে এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা মনে করেন বিহার রাজ্যের আরা নামের জায়গাটিই প্রাচীন একচক্রা। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে একচক্রা, পঞ্চাল রাজ্যের কাছেই অবস্থিত ছিল। তাতে উত্তরপ্রদেশেই একচক্রার প্রাচীন অবস্থান বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

[GDAMI (Dey) p. 59; A Short History of India: And of The Frontier States of Afghanistan; J.T. wheeler; London; Macmillan And Co; 1887; p. 9]

একচন্দ্রা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৯; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. শ্লোকসংখ্যা ২৯ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯)]

একচূড়া স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. শ্লোক সংখ্যা ৫ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

একচ্ছত্র 'একচ্ছত্র' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল যেখানে একের বা এক রাজার ছত্র বা অধিকার।

মহাপদ্মের রাজত্বকালে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বলে তাঁকে একচ্ছত্র বলা হত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৪০]

একজট স্কন্দ-কার্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ-কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৮; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

একত গৌতম মুনির পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। একত দ্বিত ও ত্রিত মুনির ভ্রাতা। একত, দ্বিত ও ত্রিত—এই তিন ভ্রাতার মধ্যে ত্রিত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদিন একত ও দ্বিত দুজনে মিলে পরামর্শ করেন যে, ত্রিতকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত যজমানদের কাছ থেকে তাঁরা পশু সংগ্রহ করবেন। সরস্বতী নদীর তীর দিয়ে রাত্রিবেলা একত ও তাঁর দুই ভাই যখন পশুগুলিকে নিয়ে ঘরে ফিরছিলেন তখন কিছুটা দূরে একটা বাঘ তাঁদের পথ আটকে বসেছিল। আর ওই স্থানে একটি বিশাল কূপও ছিল। বাঘটিকে দেখে একত ও দ্বিত ভয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু ত্রিত বাঘের ভয়ে পিছনের দিকে সরতে সরতে কূপের মধ্যে পড়ে যান। কূপের মধ্যে থেকে ত্রিত আর্তনাদ করতে থাকেন। একত ও দ্বিত সেই আর্তনাদ শুনেও বাঘের ভয়ে এবং পশুর লোভে সেই স্থান পরিত্যাগ করে চলে যান। তখন ত্রিত কূপের মধ্যে বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। কূপ-মধ্যস্থ জলকে যজ্ঞীয় ঘি হিসেবে কল্পনা করে তিনি যজ্ঞ করতে থাকেন। বেদ-ধ্বনি শুনে দেবতারা স্বর্গ থেকে যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করতে এলেন। অবশেষে ত্রিতকে দেবতারা কূপ থেকে উদ্ধার করেন। গৃহে ফিরে ত্রিত তাঁর অন্য দুই ভাই একত ও দ্বিতকে ভর্ৎসনা করেন। ত্রিত তাঁদের অভিশাপ দিয়ে বললেন যে, পশুর লোভে বিপদের সময় তাঁকে একা রেখে পালিয়ে এসে একত ও দ্বিত যে অন্যায় করেছেন তার জন্য তাঁরা দুজনেই তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত বাঘে পরিণত হবেন। আর তাঁদের সন্তানরাও ভল্লুক ও বানর হয়ে জন্মাবে।

[মহা (k) ৯.৩৬ অধ্যায়; (হরি) ৯.৩৪ অধ্যায়]

□ শান্তি পর্বে একত-র নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তিনি ত্রিভুবন সৃষ্টির সময় পশ্চিম দিকে অবস্থান করতেন এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিদের একজন।

[মহা (k) ১২.২০৮.৩১; (হরি) ১২.২০২.৩০]

□ ভীষ্মের শরশয্যার সময় যেসব মহর্ষিরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একত অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.২৬.৭; (হরি) ১৩.২৭.৭]

□ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে একত মুনি ভগবান ব্রহ্মার পুত্র। সমন্তপঞ্চকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য যেসব মহর্ষিরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একতও একজন।

[ভাগবত পু. ১০.৮৪.৫]

একত্বচা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. শ্লোকসংখ্যা ২৪ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯)]

একদন্ত পার্বতীপুত্র গণেশের অন্যতম নাম। গণেশ গজানন, এবং তাঁর হস্তীমুখের বামদিকের দাঁতটি ভেঙে যাবার ফলেই তিনি একদন্ত নামে বিখ্যাত হন।

গণেশের এই দাঁতটি কীভাবে ভেঙে গেল, এবিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কাহিনী আছে। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত কাহিনীটি এইরকম—

কার্তবীর্য্যার্জুনকে বধ করার পর মহর্ষি পরশুরাম কৈলাসে গিয়েছিলেন মহাদেবকে প্রণাম করার জন্য। কিন্তু মহাদেবের বাসভবনের দ্বারপ্রান্তে তাঁর পথরোধ করলেন গণেশ। মহাদেব এবং পার্বতী অন্তঃপুরে আছেন। এখন তাঁদের বিরক্ত করা যাবে না—এই কথা বলে গণেশ পরশুরামকে অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু পরশুরামও ছেড়ে দেবার পাত্র নন, তিনি তখনই মহাদেবের সঙ্গে দেখা করবেনই। এইভাবে বাদানুবাদ, কলহ থেকে শেষ পর্যন্ত গণেশ আর পরশুরামের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই যুদ্ধে পরশুরাম তাঁর শিবদত্ত কুঠারখানি প্রয়োগ করলেন গণেশের বিরুদ্ধে। শিবশক্তি-নির্মিত সেই কুঠার ব্যর্থ হলে শিবমাহাত্ম্য খণ্ডিত হবে—এই ভাবনায় গণেশ পরশুরামের নিক্ষিপ্ত কুঠারখানি তাঁর বাম দন্তে গ্রহণ করলেন। তাতেই তাঁর হস্তীমুখ থেকে বাম দন্তটি ভেঙে পড়ে গেল। সেই থেকেই তাঁর নাম হয়ে গেল একদন্ত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪১.৩১-৫৫; ২.৪২ অধ্যায়; ৩.৪৪.৬৬; ব্রহ্মবৈবর্ত পু. ৩.৪২-৪৪ অধ্যায়]

□ শিবপুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে যে শিব যখন ক্রুদ্ধ হয়ে গণেশের শিরচ্ছেদ করেন সেই

সময় পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি ধ্বংস করতে উদ্যত হন। দেবতারা এবং মহাদেব তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে শান্ত করেন, তাঁর পূজা ও স্তব করেন। এরপর গণেশের পুনর্জীবনের জন্য তাঁরা চেষ্টা করতে থাকেন। শিবের আদেশে দেবতারা উত্তরদিকে গিয়ে একটি একদন্ত হস্তী দেখতে পেয়ে তার মাথা কেটে এনে গণেশের মুণ্ডহীন দেহের সঙ্গে জুড়ে দেন। এইভাবে গণেশ পুনর্জীবন লাভ করেন এবং একদন্ত হস্তীর মস্তক তাঁর শরীরের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে তিনি একদন্ত নামে খ্যাত হন।

[দ্র. গণেশ]

[শিব পু. ১.৩৪.৩১-৩৬]

□ বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, নন্দী মহাদেবের আদেশে মুণ্ডহীন গণেশের দেহে প্রতিস্থাপনের জন্য মুণ্ড সন্ধান করতে গিয়ে ঐরাবত হাতিকে দেখতে পেলেন। নন্দী যখন ঐরাবতের মাথা কাটতে গেলেন তখন ঐরাবতের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ঐরাবতের একটি দাঁত ভেঙে যায়। নন্দী সেই একদন্ত ঐরাবতের মাথাটি কেটে এনে গণেশের ধড়ের সঙ্গে জুড়ে দেন। এই কারণেই গণেশ একদন্ত নামে খ্যাত। *[বৃহদ্ধর্ম পু. ২.৩০.৮৬-৮৭]*

একনন্দা দেবী ভাগবত পুরাণে যেসব প্রকৃতির অংশস্বরূপা দেবীদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে একনন্দা একজন।

[দেবী ভাগবত পু. ৯.১.১৩৬]

একপর্ণা পর্বতরাজ হিমালয়ের ঔরসে মেনার গর্ভজাত তিন কন্যা সন্তানের একজন। ইনি বটবৃক্ষের তলায় বসে দু-হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন বলে জানা যায়। একটি মাত্র বটপাতা খেয়ে এই দীর্ঘসময় তিনি জীবন ধারণ করেন। এই কারণেই তাঁর নাম হয় একপর্ণা। পরবর্তী সময়ে মহর্ষি অসিতের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অসিত এবং একপর্ণার মানসপুত্র ছিলেন মহর্ষি দেবল।

[দ্র. অসিত-দেবল]

[বায়ু পু. ৭০.২৭; ৭১.৪; ৭২.৭-১৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৩২; ২.৯.৩; ২.১০.৮, ১১;
মৎস্য পু. ১৩.৮-৯]

একপর্বত একটি প্রাচীন পর্বত। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন, জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজপুরের উদ্দেশে যাওয়ার সময় এই পর্বতটি অতিক্রম করেছিলেন। তাঁদের যাত্রাপথের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, কুরুজাঙ্গল থেকে মগধে যাওয়ার পথটি গণ্ডকী নদী, মহাশোন নদ, সদানীরা (রাপ্তি) নদী, কালকূট পর্বত এবং একপর্বতের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত ছিল। গিরিব্রজপুর যাওয়ার সময় কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন এই পথ ধরেই কোশল হয়ে মিথিলায় পৌঁছান। তবে একপর্বতের আধুনিক অবস্থান বা নাম সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত সঠিক কিছু জানা সম্ভব হয়নি। *[মহা (k) ২.২০.২৭; (হরি) ২.১৯.২৭;*
GM (Suryavanshi) p. 192]

একপাটলা হিমালয়ের ঔরসে মেনার গর্ভজাত তিন কন্যা সন্তানের মধ্যে একজন। ইনি পাটল বৃক্ষ (পারুল গাছ)-এর নীচে বসে দু-হাজার বছর তপস্যা করেন। পারুল গাছের একটি মাত্র পাতা খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করতেন। এই কারণে তাঁর নাম হয় একপাটলা। পরবর্তী সময়ে মহর্ষি জৈগীষব্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জৈগীষব্য এবং একপাটলার মানসপুত্র ছিলেন মহর্ষি শঙ্খ এবং লিখিত।

[বায়ু পু. ৭১.৪; ৭২.৭-১০, ১৮-১৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৯.৩; ২.১০.৮, ২০, ২১]

একপাৎ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯৫; (হরি) ১৩.১২৭.৯৫]

একপাদ$_{১}$ একটি প্রাচীন অনার্য জনজাতি। সহদেব তাঁর দিগ্‌বিজয়ের সময় দক্ষিণ দেশবাসী একপাদদের জয় করেছিলেন। এঁরা কর প্রদান করে পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

[মহা (k) ২.২৮.৬৭; (হরি) ২.৩০.৬৭]

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ইন্দ্রপ্রস্থে একপাদ জনজাতির উপস্থিতির কথা পাওয়া যায়। সভাপর্বে একপাদ জাতির বর্ণনায় বলা হয়েছে এঁরা দ্বিনয়ন বা ত্রিনয়ন বিশিষ্ট। মাথায় উষ্ণীষ এবং বস্ত্রহীন দেহ। সমস্ত দেহ রোমে আবৃত। এঁরা নরমাংস ভোজী এবং একপায়ে চলাচল করেন—

দ্ব্যক্ষাংস্ত্র্যক্ষান্ ললাটাক্ষান্
নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতান্।
ঔষ্ণীষানন্তবাসাংশ্চ রোমকান্ পুরুষাদকান্।
একপাদাংশ্চ তত্রাহমপশ্যং দ্বারি বারিতান্॥

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞক্ষেত্রের বাইরে অপেক্ষমান একপাদদের বর্ণনা শুনে সহজেই বোঝা যায় এঁরা অনার্য হীন জনজাতি বলেই বিবেচিত হতেন।

সেই কারণেই দৌবারিকেরা তাঁদের যজ্ঞস্থলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেয়নি।

তবে সভাপর্বের এই শ্লোকটি থেকে একপাদদের সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি পাওয়া গেল, তা হল—এঁরা একপায়ে সঞ্চরণকারী। মেগাস্থিনিস একপাদগণকে গ্রীক ভাষায় 'অকুপেদাস্' (okupedes) নামে উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারতীয় দার্শনিকদের থেকে জানতে পারেন যে, এই একপাদ বা 'অকুপেদাস্'-রা অশ্বের চেয়েও দ্রুত দৌড়াতে পারতেন। সম্ভবত তাঁদের অলৌকিক গতিবেগের কারণেই হঠাৎ দেখলে মনে হত হয়তো বা এঁরা একপায়ে সঞ্চরণ করছেন। এ থেকেই একপাদ নামটির উৎপত্তি বলে মনে হয়।

[মহা (k) ২.৪৭.১৪; (হরি) ২.৪৯.১৪; GESMUP (Moti Chandra) p. 60]

☐ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত একপাদ রাজারা পাণ্ডবদের বহু ধরনের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং তিনটি ভিন্ন প্রজাতির অশ্ব উপহার দিয়েছিলেন। এই তিনটি প্রজাতি হল— রংক্ষুনদীর তীর জাত অশ্ব, বাহ্লীকদেশীয় অশ্ব এবং পারস্যদেশের অশ্ব। প্রতিটি প্রজাতির অশ্বের বর্ণ এবং দেহের গঠন বিভিন্ন প্রকার। কিছু অশ্ব আকারে বৃহৎ, কিছু ইন্দ্রগোপকীট (রক্তবর্ণ) বর্ণ বিশিষ্ট, কিছু সবুজ বা হলুদ আবার কিছু মিশ্র বর্ণের—

প্রমাণায়ামসম্পন্নান্ রংক্ষুতীরসমুদ্ভবান্।
বাহ্লেয়ান্ পারসীয়াংশ্চ সুবর্ণরজতং বহু॥
ইন্দ্রগোপকবর্ণাভান্ শুকবর্ণান্ মনোজবান্।
তথৈবেন্দ্রায়ুধনিভান্ সন্ধ্যাভ্রকপিশানপি॥
অনেকবর্ণানন্যাংশ্চ গৃহীত্বাশ্বান্ মনোজবান্।
জাতরূপমনর্ঘঞ্চ দদুস্তস্যৈকপাদকাঃ॥

বহু প্রকারের (সম্ভবত বহু দেশের) মুদ্রা সবচেয়ে সহজলভ্য ব্যবসায়ীদের কাছে। সেই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে একপাদগণের হাতে বহু প্রকারের মুদ্রার সমাহার দেখে মনে হয়—এঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এঁরা কোন বিশেষ দ্রব্যের বাণিজ্য করতেন। উত্তর খুব সম্ভবত অশ্ব। আর সে কারণেই সম্পূর্ণ তিনটি পৃথক পৃথক প্রজাতির অশ্ব তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রংক্ষুনদীর তীর (অর্থাৎ চীন ও তিব্বত), বাহ্লীক (বর্তমান আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও তাজিকিস্তানের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ অঞ্চল) পারস্যদেশ (অর্থাৎ আধুনিক ইরান)—এই তিন অঞ্চলের অশ্ব নিয়ে একপাদরা ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন।

[মহা (k) ২.৪৭.১৬-১৮; (হরি) ২.৪৯.১৬-১৮; Moti Chandra, Trade and Trade Routes in Ancient India, p. 169]

☐ সভাপর্ব থেকে জানা যায় একপাদগণ দক্ষিণ দেশবাসী। সেকালের আর্যাবর্তের ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী বিচার করলে মহাভারত বর্ণিত দক্ষিণ দেশ এবং আজকের দক্ষিণ ভারতকে অভিন্ন বলে ধারণা করা ঠিক নয়। Moti Chandra-এর মতে, সহদেব দিগ্‌বিজয়ের সময় একপাদ জনজাতি অধ্যুষিত যে অঞ্চলে গিয়েছিলেন, সেটি সম্ভবত গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত কচ্ছ বা কাথিয়াবাড় সংলগ্ন কোনো স্থান। তাঁর মতে একপাদরাই গুজরাটের ভীল জনজাতিটির আদিপুরুষ। তবে গুজরাট বা কাথিয়াবাড় একপাদ জনজাতির আদি বাসভূমি ছিল কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। কারণ মেগাস্থিনিসের বিবরণে এঁদের উল্লেখ দেখে ধারণা হয়—ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তেও একপাদদের দেখা যেত। আবার পণ্ডিত K.C. Mishra তাঁর আলোচনায় স্বীকার করেছেন যে, উত্তর-পশ্চিম তথা পশ্চিম ভারতের একপাদ জনজাতিটি দেশান্তরিত হয়ে বর্তমান কর্ণাটকের কানাড়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। *[TIM (K.C. Mishra) p. 85: GESMUP (Moti Chandra) p. 59]*

একপাদ$_{২}$ শিবের অনুচররা যে-সব গণে বিভক্ত, তাঁদের মধ্যে একটি গণের অধিপতি ছিলেন একপাদ। *[শিব পু. (সনৎ কুমার) ৪৮.৪১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২০.৮২]*

একপাদ$_{৩}$ বিঘ্নবিনাশন গণেশের অপর নাম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৪৪.৬৮]

একপৃষ্ঠ ভীষ্মপর্বে উল্লিখিত একটি জাতি তথা সেই জাতি অধ্যুষিত জনপদের নাম। তবে 'একপৃষ্ঠ' শব্দটির একাধিক পাঠান্তর পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও একে নৈকপৃষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভীষ্মপর্বে জাতি ও দেশ নামের তালিকায় পঞ্চাল এবং যুগন্ধর (পাঠান্তরে ধুরন্ধর)-এর সঙ্গেই একত্রে একপৃষ্ঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। যা

থেকে একপৃষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে যুগন্ধর ইত্যাদির ভৌগোলিক নৈকট্যের ধারণা তৈরি হয়।

[মহা (k) ৬.৯.৪১; (হরি) ৬.৯.৪১]

□ পুরাণে একচরণ, একনেত্র ইত্যাদি নামে উত্তর-পশ্চিমের একাধিক জনজাতির কথা পাওয়া যায়। নামগত সাদৃশ্যের কারণে একপৃষ্ঠও এঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একচরণ এবং একনেত্র উভয়েই কিরাত জনজাতির শাখা বিশেষ।

[TIM (K.C. Mishra) p. 85]

একবীরা১ সহ্যাদ্রি পর্বত থেকে উৎপন্ন একটি নদী।

[ব্রহ্ম পু. ১৬১.৩]

একবীরা২ সহ্যাদ্রিতে দেবী শক্তি 'একবীরা' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন বলে মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১৩.৪০]

□ স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, অগুকটাহের লক্ষ যোজন দূরে গভীরতম প্রদেশে এই একবীরা দেবী বিরাজমানা। তিনি দণ্ড ধারণ করে সেই প্রদেশ পালন করছেন। তাঁরই অন্য নাম কপালীশা।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৯.৩২-৩৩]

একবীরা৩ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। একবীরা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.১৭]

একরাট্ ঋগ্‌বেদের মধ্যে বহুবার রাজা বা রাজন্ শব্দের যেমন প্রয়োগ হয়েছে তেমনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বসূচক কতগুলি উপাধি— 'অধিরাজ', 'সম্রাট্' এমনকি 'সার্বভৌম' ইত্যাদি শব্দও রাজার উপাধি হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে। সম্রাট্, স্বরাট্, একরাট্—এইসব শব্দগুলি অনেকটাই ব্যবহৃত হয়েছে সক্ষম এবং আত্মনির্ভর রাজাদের বিষয়ে। এমনকি, সার্বভৌম কথাটাও প্রায় একই অর্থে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত। কিন্তু একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, বৈদিক যুগের 'ইমপিরিয়ালিজম্'-এর ধারণাটাও এই সার্বভৌম শব্দটির মধ্যেই আছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বৈদিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে কিছু অতিশয়োক্তি আছে। কেননা, 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' বলেছে— 'সার্বভৌম' শব্দটি হল 'সামন্ত' বা সমন্ত শব্দের পর্যায় শব্দ, যাঁর রাজ্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত তিনিই সার্বভৌম নৃপতি, তিনিই একরাট্—

অয়ং সমন্তপর্যায়ী স্যাৎ সার্বভৌমঃ সর্বায়ুষঃ
. . . সমুদ্রপর্যন্তায়া একরাড়িতি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন—(ভূমির) অন্ত পর্যন্ত সার্বভৌম—

সমন্তপর্যায়ী স্যাৎ সার্বভৌমঃ।

অর্থাৎ, যাঁর রাষ্ট্রে ভূমির অধিকার সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সেই সমুদ্রান্তা পৃথিবীর অধীশ্বরই 'সমন্তপর্যায়ী সার্বভৌম'। 'সামন্ত' শব্দটিকে সার্বভৌম শব্দের প্রতিবেশী অর্থ ধরলে এখানে অর্থ করতে হবে—সামন্তদের অধিকারে থাকা রাষ্ট্রের ওপরেও যাঁর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে, তিনিই সার্বভৌম রাজা। এইরকম সার্বভৌম রাজাদেরই একরাট্ বলা হচ্ছে।

*[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম), ৮.৩৯.১, পৃ. ৯৩৬;
বায়ু পু. ৬৩.২৪; ৭৪.৩০; ৯৯.১৮৬;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৭.২৫; ২.১৬.৫৭; ২.৭৪.১৪০;
দ্র. ড. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, দণ্ডনীতি, পৃ. ৮০]*

একলব্য১ নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। বায়ু পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে যে, বসুদেবের ঔরসে অশ্মকীর গর্ভে একলব্য জন্মগ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে এই একলব্যই নিষাদ-সমাজে প্রতিপালিত হন বলে ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৯৬.১৮৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৯০]

□ কৌরবদের গৃহে বাস করে দ্রোণাচার্য কুরুবালক ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। অস্ত্রশিক্ষার সময় অর্জুনের নিপুণতা ও একাগ্রতা লক্ষ্য করে দ্রোণাচার্য তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, তোমাকে আমি এমনভাবে তৈরি করব, যাতে দ্বিতীয় আর কোনো ধনুর্ধর তোমার সমান না হতে পারে।

দ্রোণাচার্যের অস্ত্র-প্রশিক্ষণের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই হস্তিনাপুরের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে রাজকুমাররা এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই সময়ে নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যও দ্রোণের কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু নিষাদ-পুত্র হওয়ায় দ্রোণ একলব্যকে শিষ্য হিসেবে মেনে নিতে চাইলেন না। দ্রোণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিষাদপুত্র একলব্য মাথা নত করে দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি পরাজয়

স্বীকার করলেন না, অস্ত্রশিক্ষা থেকেও বিরত হলেন না। একলব্য মাটি দিয়ে দ্রোণাচার্যের একটি মূর্তি তৈরি করলেন। গুরু দ্রোণের সেই মৃন্ময় মূর্তিটিকেই তাঁর অস্ত্রশিক্ষার আচার্য হিসেবে মনে মনে স্থির করলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষার সমস্ত কৌশল তিনি শিখতে আরম্ভ করলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একলব্য সেই কৌশলগুলিতে সিদ্ধিলাভ করলেন। এরপর একদিন পাণ্ডব-কৌরবরা দ্রোণাচার্যের অনুমতি নিয়ে মৃগয়া করতে গেলেন। একজন অনুচর বিভিন্ন অস্ত্র ও মৃগয়ার সমস্ত উপকরণ এবং একটি শিকারী কুকুর নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে চলল। পাণ্ডবরা যখন মৃগের সন্ধান করছিলেন, তখন শিকারী কুকুরটি এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের কাছে গেল। একলব্য তখন বাণাভ্যাস করছিলেন। কৃষ্ণবর্ণ-মৃগচর্ম পরিহিত জটাধারী একলব্যকে দেখেই কুকুরটি ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একলব্য অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় সাতটি বাণ ছুঁড়ে কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দিলেন। কুকুরটি শরপূর্ণ মুখ নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে উপস্থিত হলে, তাঁরা নাম-না-জানা ধনুর্ধরের অস্ত্রপাতনের ক্ষিপ্রতা বুঝে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা যতখানি লজ্জিত হলেন, ততখানি প্রশংসাও করলেন সেই ধনুর্ধরের।

বনের ভিতর পাণ্ডবরা সেই ধনুর্ধরকে খুঁজতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাণ্ডবরা দেখলেন বনের মধ্যে কৌপীন পরিহিত, জটাধারী এক যুবক নিরন্তর ধনুক থেকে তীর ছোঁড়া অভ্যাস করে চলেছে। পাণ্ডবরা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন! ধনুর্ধর বললেন—আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্যের শিষ্য একলব্য। পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। অর্জুন একলব্যের পারদর্শিতার পরিচয় পেয়ে নির্জনে গুরুকে একটু অভিমানের সুরেই বললেন—আপনি একদিন ধনুর্বেদ শিক্ষায় আমার ওপর প্রীত হয়ে বলেছিলেন যে, আমার আর কোনো শিষ্য তোমার চাইতে বড়ো ধনুর্ধর হবে না। কিন্তু আজ যাকে দেখে এলাম, সেই একলব্য আমার থেকে এমনকী অন্যান্য বীর যোদ্ধাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হল কীভাবে?

শিষ্য অর্জুনের কথা শুনে দ্রোণাচার্য মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কর্তব্য স্থির করে নিলেন। অর্জুনকে সঙ্গে নিয়েই তিনি একলব্যের কাছে উপস্থিত হলেন। দ্রোণ দেখলেন একমনে সেই যুবক বাণাভ্যাস করে চলেছে। দ্রোণকে দেখেই একলব্য তাঁকে প্রণাম করলেন। এবার দ্রোণাচার্য একলব্যকে বললেন তুমি যদি আমার শিষ্য হও, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্যও সেই কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নেই, আপনি আদেশ করুন। দ্রোণ বললেন, আমি তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি দক্ষিণা হিসেবে চাই। দ্রোণাচার্যের এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনেও এতটুকু বিচলিত না হয়ে একলব্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে ফেললেন। এভাবেই একলব্য গুরুকে দক্ষিণা দিলেন। একলব্যের এই অঙ্গুলি-ছেদনের ফলে তিনি আগের মতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আর বাণ নিক্ষেপ করতে পারলেন না। এই ঘটনায় অর্জুনও সন্তুষ্ট হলেন। একলব্য তাঁর থেকেও বড়ো ধনুর্ধর—একথা মনে করে অর্জুনের যে মানসিক দুঃখ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হল।

'অর্জুনকে আর কোনো বীর পরাস্ত করতে পারবে না'—দ্রোণাচার্যের এই কথাও সত্য হয়ে রইল।

[মহা (k.) ১.১৩২ অধ্যায়; (হরি) ১.১২৮ অধ্যায়]

□ মহাভারতের খিল হরিবংশ পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে, যে, মহাভারত পুরাণ খ্যাত মগধরাজ জরাসন্ধের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন পৌণ্ড্রক বাসুদেব। আবার পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মিত্র গোষ্ঠীতে ছিলেন নিষাদরাজ একলব্য। তিনি মহাবীর ছিলেন এবং পৌণ্ড্রক-বাসুদেব যখন জরাসন্ধের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মথুরা আক্রমণ করেন, তখন সেই বাহিনীর মধ্যে নিষাদরাজ একলব্যও ছিলেন অন্যতম সেনাপতি। যদু-বৃষ্ণি-অন্ধকদের সঙ্গে পৌণ্ড্রকের যুদ্ধ লাগলে কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামের সম্মুখীন হন নিষাদরাজ একলব্য। শত শত নিষাদ-সৈন্য বলরামের ওপর অস্ত্রবর্ষণ করতে থাকে। একলব্যের সঙ্গে একক যুদ্ধে অবশ্য বলরামেরই প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। যদিও নিষাদরাজ একলব্যও বলরামকে কম বিপর্যস্ত করেননি। কিন্তু কৃষ্ণের হাতে পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের মৃত্যু হবার পর একলব্য বলরামের সঙ্গে খানিক গদা যুদ্ধ করার পর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে থাকেন। বলরাম অবশ্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন

করেন। এক সময় এমন হল একলব্য যেখানেই যান, সেখানেই বলরাম তাঁকে ধাওয়া করেন। এইভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে যেতে বহুপথ অতিক্রম করলেন একলব্য। অবশেষে এক নির্জন দ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করে বলরামের দৃষ্টিপথ থেকে অপসারিত হয়ে কোনো মতে প্রাণ বাঁচালেন নিজের। এই দ্বীপান্তর থেকে একলব্য আর নিষ্কৃতি পাননি বলেই মনে হয়।

[হরিবংশ পু. ৩.৯৮-৯৯ অধ্যায়; ৩.১০২.১-৭]

□ মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে কৃষ্ণের হাতে নিষাদরাজ একলব্যের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ৫.৪৮.৭৭; (হরি) ৫.৪৮.৭৭]*

□ দ্রোণপর্বেও বাসুদেব কৃষ্ণের হাতে নৈষাদি-একলব্যের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বাসুদেব-কৃষ্ণ, অর্জুনকে বলেন যে, দ্রোণাচার্য তাঁর হিতের জন্যই ছলনা করে গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ-ছেদন করিয়েছিলেন। একলব্যের সেই অঙ্গুষ্ঠ থাকলে তাঁকে দেবতা-দানব-রাক্ষস এমনকী নাগেরাও যুদ্ধে পরাজিত করতে পারত না। কৃষ্ণ, অর্জুনকে বলেন যে, তিনিই অর্জুনের হিতসাধনের জন্য একলব্যকে বধ করেছিলেন। *[মহা (k) ৭.১৮২.১৭-২০; (হরি) ৭.১৫৫.৪৯-৫২]*

একলব্য$_{২}$ কৃষ্ণকে শাস্তি দেবার জন্য জরাসন্ধ যখন মথুরা আক্রমণ করেছিলেন, তখন জনৈক অংশুমানের বীর পুত্র একলব্যকে মথুরাপুরীর পূর্বদ্বার রক্ষায় নিযুক্ত দেখতে পাচ্ছি। তবে তাঁর পিতৃনামের ভিন্নতার নিরিখে নৈষাদি একলব্য থেকে তাঁকে ভিন্নতর কোনো বীর বলেই মনে হয়।

[হরিবংশ পু. ২.৩৫.৪৫]

একলব্য$_{৩}$ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, একলব্য, ক্রোধবশার পুত্র ক্রোধবশ অসুরগণের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬৪; (হরি) ১.৬২.৬৪]

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে একলব্য কর হিসেবে তাঁকে দুটি চর্মপাদুকা দান করেন বলে সভাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ২.৫৩.৮; (হরি) ২.৫১.৮]

□ যুধিষ্ঠির যেসব ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে যুদ্ধের নিমন্ত্রণ প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একলব্য একজন।

[মহা (k) ৫.৪.১৭; (হরি) ৫.৪.১৭]

একলিঙ্গ একটি জনপদ বলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৩৭]*

একশফ 'শফ' কথাটির আভিধানিক অর্থ 'ক্ষুর' একশফ অর্থাৎ এক ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণী। গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে যে, গর্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গৌরনামক প্রাণী, শরভ এবং চমরী—এই ছয় প্রকার প্রাণীই একশফ। *[গরুড় পু. ২.৩.৮১]*

একশৃঙ্গ$_{১}$ মহাভারতের সভাপর্বে পিতৃলোকের সাতটি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে চারটি শরীরী এবং তিনটি অশরীরী।

একশৃঙ্গ সেই অশরীরী পিতৃলোকের সপ্ত শ্রেণীর মধ্যে একটি।

তাঁরা ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত থাকতেন বলে জানা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি চারটি বর্ণের মধ্যেই তাঁরা পূজিত হন।

[মহা (k) ২.১১.৪৭; (হরি) ২.১১.৪৫]

একশৃঙ্গ$_{২}$ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে প্রলয় সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ভগবান বিষ্ণু একশৃঙ্গ বরাহ রূপ ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে পৃথিবীকে প্রলয় সমুদ্র থেকে একটি শৃঙ্গের ওপর উত্তোলন করেছিলেন বলে তিনি একশৃঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

[মহা (k) ১২.৩৪২.৯২; (হরি) ১২.৩২৮.২৭৮]

□ এই একশৃঙ্গী বরাহের পুরাতন বৈদিক রূপ পাওয়া যায় 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র মধ্যে। সেখানে ভগবান বিষ্ণু 'এমূষ' নামে এক বরাহের রূপ ধারণ করে পৃথিবীকে রসাতল থেকে উত্তোলন করেছিলেন—তাম্ এমূষ ইতি বরাহ উজ্জঘান।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.১.২.১১]

একশৃঙ্গ$_{৩}$ মানস সরোবরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি পর্বত। এই পর্বত দেবতাদের আবাসস্থল, এমন কথা বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে। *[বায়ু পু. ৩৬.২৪]*

একশৃঙ্গা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে সাধ্য নামক পিতৃগণের মানস কন্যা যোগোৎপত্তি। এই যোগোৎপত্তি-র নামই পরবর্তীকালে একশৃঙ্গা হয়েছে। ব্রহ্মাপুত্র সনৎকুমার একশৃঙ্গার সঙ্গে শুক্রাচার্যের বিবাহ দেন। একশৃঙ্গাও বহু সন্তান উৎপাদন করে ভৃগু বংশের কীর্তিবর্ধন করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৮৬-৮৭]

□ বায়ু পুরাণ মতে পিতৃগণের মানস কন্যাটির নাম যোগোৎপত্তি নয়, তাঁর নাম গো। মৎস্য পুরাণেও 'গো' নামের এই মানসী কন্যার উল্লেখ

আছে। তবে বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, শুক্রাচার্যের এই পত্নীর একত্রিশটি সন্তান ছিল। সেই সন্তানের কারণেই তিনি ভৃগুবংশের কীর্তিবর্ধন করেছেন।

[বায়ু পু. ৭৩.৩৬-৩৭; মৎস্য পু. ১৫.১৫]

একহংসতীর্থ একটি পবিত্র তীর্থ। ঋষি পুলস্ত্য ভীষ্মকে এই তীর্থ দর্শন করতে বলেছিলেন বলে মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৮৩.২০; (হরি) ৩.৬৮.২০]

হরিয়ানা রাজ্যের জিন্দ (Jind) শহরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে ইক্কাস (Ikkas) নামে একটি গ্রামে একহংসতীর্থের আধুনিক অবস্থান বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এই জিন্দকে অনেকেই প্রাচীন জৈন্তাপুর (Jaintapur) বলেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। লোককথা অনুযায়ী পাণ্ডবরা এই অঞ্চলে জয়ন্তী দেবীর মন্দির স্থাপন করেছিলেন এবং দেবীর অর্চনা করেই তাঁরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই জয়ন্তী দেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করেই স্থানীয় জনবসতিটি গড়ে উঠেছিল বলে মনে করা হয়।

[Devendra Handa, Sculptures from, Haryana: Iconography and Style, Indian Institute of Advanced Study, Shimla 2006, p. 127; Haryana District Gazetteers, Gurgaon, p. 261]

একাক্ষ$_১$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব।

[মহা (k) ১.৬৫.২৯; (হরি) ১.৬০.২৯]

□ পুরাণে মনুষ্য ধর্মযুক্ত যেসব দানবদের কথা বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১৫; বায়ু পু. ৬৮.১৫]

একাক্ষ$_২$ স্কন্দ-কার্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৮; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

একাক্ষা কেতুমাল বর্ষের একটি নদী।

[বায়ু পৃ. ৪৪.২০]

একাক্ষী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। একাক্ষী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৫]*

একাত্মা ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১৬; (হরি) ১৩.১২৭.১১৬]

একাদশরথ যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশধারায় জনৈক রাজা দশরথের পুত্র এবং জনৈক শকুনির পিতা একাদশরথ।

[ব্রহ্মাণ্ড পৃ. (মহর্ষি) ২.৭০.৪৪; বায়ু পৃ. ৯৫.৪৩]

একাদশী পদ্ম পুরাণে অন্যান্য সমস্ত ব্রত এবং বড়ো বড়ো যজ্ঞানুষ্ঠানের থেকেও একাদশীব্রতের মাহাত্ম্য অনেক বেশী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তীর্থযাত্রা, দান কিংবা অন্যান্য ব্রতের মাহাত্ম্য ততকাল পর্যন্তই উচ্চস্বরে কীর্তিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না একাদশীতিথিতে উপবাস ব্রতের মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ আসছে—

তাবদ্‌গর্জন্তি তীর্থানি দানানি নিয়মানি চ।
যাবন্নোপোষয়েজ্জন্তুর্বাসরং বিষ্ণুবল্লভম্॥

একাদশীব্রতের এমন দুর্লভ পুণ্যফলের কথা শুনে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কাছে একাদশীব্রতের উৎপত্তির কথা শুনতে চাইলেন—

উৎপন্না সা কথং দেব পুণ্যা একাদশী তিথিঃ।
কথং পবিত্রা বিশ্বেঽস্মিন্ কথং বৈ দেবতাপ্রিয়া॥

যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে কৃষ্ণ বলতে লাগলেন—সত্যযুগে মুর নামে এক ভয়ংকর দানব ছিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের সে যুদ্ধে জয় করেছিল অনায়াসে। দেবতারা মুরের হাতে পরাজিত হয়ে স্বর্গলোক থেকে বিতাড়িত হলেন। স্বর্গলোক পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁরা শরণ নিলেন ভগবান রুদ্র-শিবের। দেবতাদের প্রার্থনা শুনে মহাদেব তাঁদের গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর শরণ নিতে বললেন। দেবতারা উপস্থিত হলেন নারায়ণের সামনে। পূজা ও স্তবে তুষ্ট করলেন ভগবান বিষ্ণুকে। ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন দেবশত্রু মুরদানবের কথা। ইন্দ্র তাঁকে সবিস্তারে শোনালেন তালজঙ্ঘ অসুরের পুত্র মুরের কথা, তাঁর হাতে দেবতাদের পরাজয়ের কথা। বিষ্ণু আশ্বাস দিলেন সব শুনে—আমি নিশ্চয় মুর দানবকে বধ করে স্বর্গলোক পুনরুদ্ধার করব। ভগবান বিষ্ণুর উদ্যোগে তাঁরই সেনাপতিত্বে দেবাসুর যুদ্ধ শুরু হল আবার। ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের আঘাতে দেখতে দেখতে সমস্ত অসুরবীররা নিহত হলেন, কিন্তু মুর একেবারে অক্ষত নির্জিত

অবস্থায় রইলেন। অবশেষে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে মুর-এর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। দীর্ঘকাল ধরে সে যুদ্ধ চলল। কিন্তু বিষ্ণু মুরকে পরাস্ত করতে পারলেন না। এদিকে দেবতারা ততদিনে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তা দেখে ভগবান বিষ্ণুও একসময় যুদ্ধ বন্ধ করে চলে গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ভগবান বিষ্ণু গিয়ে পৌঁছালেন বদরিকাশ্রমে। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সিংহাবতী নামে এক গুহা ছিল। রণক্লান্ত ভগবান বিষ্ণু সেই গুহার মধ্যে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এদিকে মুর দানব ভগবান বিষ্ণুকে অনুসরণ করতে করতে একসময় এসে পৌঁছালেন সেই গুহায়। সেখানে নারায়ণকে নিদ্রিত দেখে মুর ভাবলেন —ভগবান বিষ্ণুও আমাকে অজেয় যোদ্ধা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ে পালিয়ে এসে লুকিয়েছেন এই গুহায়। এই সব ভাবতে ভাবতে মুর পরিকল্পনা করলেন যে, গুহার মধ্যে নিদ্রিত অবস্থাতেই তিনি ভগবান বিষ্ণুকে বধ করবেন। ঠিক এই সময় ভগবান বিষ্ণুর দেহ থেকে নানা অস্ত্রে সুসজ্জিতা এক পরমাসুন্দরী কন্যা আবির্ভূত হলেন। সেই কন্যা যুদ্ধে আহ্বান করলেন মুরকে। ভগবান বিষ্ণুর অংশে জাত সেই কন্যার হাতে মুর দানব পরাজিত হলেন। তাঁর মৃত্যুও হল সেই কন্যার হাতে। এদিকে নারায়ণ নিদ্রা ভঙ্গ হতে দেখলেন—মুর দানব নিহত হয়েছে। তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—এমন অসাধ্য কাজ কার দ্বারা সম্পন্ন হল! তখন সেই কন্যা ভগবান বিষ্ণুকে বললেন—আমি দেখলাম, দেবতাদের অজেয় এই দানব আপনাকে সুপ্ত অবস্থায় বধ করার পরিকল্পনা করেছে। আপনি নিহত হলে সমস্ত সৃষ্টিই ধ্বংস হবে ভেবে আমিই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। তারপর আপনারই কৃপায় শেষ পর্যন্ত এই দৈত্য নিহত হয়েছে আমার হাতে। ভগবান বিষ্ণুর অংশজাত এই কন্যাই একাদশী নামে খ্যাত। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুও তাঁর পরাক্রম দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলেন। তা শুনে একাদশী বললেন—আমার একটি মাত্র মনোবাঞ্ছা আছে, আপনি যদি শপথ করেন যে, আপনি অবশ্যই তা পূরণ করবেন, তাহলেই আমি বর প্রার্থনা করতে পারি। ভগবান বিষ্ণু প্রতিজ্ঞা করলেন—তিনি একাদশীর প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ করবেন। তখন একাদশী বললেন—তাহলে শুনুন। আমাকে সম্পূর্ণ ত্রিলোকে, চারিযুগে এমন রূপে প্রতিষ্ঠা করুন, যাতে আপনার কৃপায় আমি সমস্ত তীর্থ, সমস্ত পুণ্যকর্মের থেকেও বেশী পুণ্যফল দায়িনী এবং সিদ্ধিদাত্রী হতে পারি। আমার জন্য নির্দিষ্ট দিনে যে ব্যক্তি উপবাস করবে তার সমস্ত মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়। ভগবান বিষ্ণু একাদশীকে বললেন—তাই হবে। তুমি আজ থেকে একাদশীতিথি রূপে প্রসিদ্ধ হবে। সেই তিথিতে যারা উপবাস করে আমার পূজা করবে, তারা অবশ্যই মোক্ষলাভ করবে। ভগবান বিষ্ণুর বরে সেই সময় থেকে একাদশীতিথি এবং সেই তিথিতে পালিত ব্রত-উপবাস অন্যান্য সমস্ত তিথি, সমস্ত ব্রত বা যজ্ঞের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে প্রসিদ্ধ হয়।

[পদ্ম পু. (নবভারত) উত্তর ৩৮.৪৬-১১৮]

□ ভারতবর্ষে ব্রত এবং তিথি পালনের যত বহুলতা আছে, তাতে বেশির ভাগ ব্রতই আর পালন করা হয় না। কিন্তু একাদশী-ব্রত বোধহয় একমাত্র ব্রত, যা এখনো পর্যন্ত অবশ্য পালনীয় তিথির মধ্যে পড়ে। সাধারণভাবে একাদশীতিথি পালনের নিয়ম জানিয়ে মৎস্য পুরাণ বলেছে—একাদশীর দিনে সকালে ভগবান কেশবকে অর্চনা করে উপবাস করার পর সারারাত্রি জাগরণে কাটাতে হবে। পরের দিন সকালে স্নান করে অগ্নিতে হোম করতে হবে এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে নিজে খেতে হবে। সারা রাত ভূমিশয্যায় শয়ন করা বিধেয়—

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য তু কেশবম্।
রাত্রিঞ্চ সকলাং স্থিত্বা স্নানঞ্চ পয়সা সহ॥

অগ্নিপুরাণে আর একটু বিস্তারিত ভাবে বলা আছে যে, একাদশী পালন করতে হলে দশমীর দিন থেকেই আহার-সংযম করতে হবে, মাংস এবং মৈথুন বর্জন করতে হবে। পরের দিন একাদশীতে সম্পূর্ণ উপবাস করে দিন-রাত কাটাতে এবং শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ—দুই একাদশীতেই একই ভাবে উপবাস করতে হবে—

দশম্যাং নিয়তাহারো মাংস-মৈথুন-বর্জিতঃ॥
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।

একাদশীর দিন উপবাসে থেকে পরের দিন দ্বাদশীতে পারণ করার জন্য একটি সংকল্পবাক্যও পাঠ করার বিধি আছে।

[মৎস্য পু. ৬৯.৩১-৩২; অগ্নি পু. ১৮৭.১-২, ৫]

□ একাদশীর উপবাস-বিধি নিয়ে স্মার্ত পণ্ডিতেরা পুরাণ-বচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, দুভাবে এই উপবাস পালন করার বিধি ছিল। তার মধ্যে একটি হল—একাদশীতিথিতে যা যা নিষেধ আছে, সেই নিষেধগুলি শুধু মেনে চলা। আর দ্বিতীয়টি হল, ব্রত পালনের যে-সব বিধি আছে, যেমন উপবাস, রাত্রি-জাগরণ, হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদি, সেইগুলি পালন করা। নিষেধাত্মক একাদশী যেমন—শঙ্খজাতীয় কোনো পাত্র ব্যবহার করে জল না খাওয়া, শুয়োর-কচ্ছপের মাংস না খাওয়া, এবং এই নিষেধ শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ দুই একাদশীতেই মানতে হবে। কমলাকর ভট্টের নির্ণয় সিন্ধুনামক গ্রন্থে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বচন উদ্ধার করে বলা হয়েছে যে, একাদশী তিথি পালনের নিয়ম হল—হরিবাসরের দিনে—হরিবাসর হল ভগবান শ্রীহরির নামাঙ্কিত দিন, যেটা একাদশীতিথির অন্য নাম—সেই হরিবাসরের দিনের আগের দিন, দশমীর রাত্রি থেকেই সংযম-নিয়ম পালন করে একাদশীর উপবাস করতে হবে।

নারদ পুরাণে একাদশীর ব্রতরূপ দেওয়া আছে সবিস্তারে। এখানে বলা হয়েছে— দশমীর দিনে সকালে উঠে, দাঁত মেজে নিজে স্নান করার পর পঞ্চামৃত তৈরি করে সেই পঞ্চামৃতে গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্তি স্নান করাবেন। তারপর বিভিন্ন উপচারে বিষ্ণুর পূজার্চনা করবেন। একাদশীর দিনে স্নানের পর পঞ্চামৃতে বিষ্ণুমূর্তিকে স্নান করাতে হবে, তারপর সচন্দন গন্ধপুষ্পে পূজা করতে হবি বিষ্ণুর। তারপর সংকল্প করে বলতে হবে—আমি একাদশী সম্পূর্ণ উপবাসে থেকে পরের দিন দ্বাদশীতিথিতে পুনরায় ভক্ষণ করবো। এই ব্রত পালনের জন্য শ্রীবিষ্ণু পুণ্ডরীকাক্ষের শরণ নিলাম আমি—

একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা চাহং পরে'হনি।
ভোক্ষ্যে'হং পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত॥

নারদ পুরাণে একাদশী তিথিকে ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়তমা তিথি বলা হয়েছে। একাদশীর উপবাস-পালনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নিয়ম-বিধি যা বলা হয়েছে, তাতে এই দিনটিতে ইষ্টদেবের সার্বত্রিক এবং সার্বিক সংসর্গে থাকাটাই খুব জরুরী হয়ে উঠছে। নারদ পুরাণ বলছে—ইন্দ্রিয়-সংযমাদি নীতির সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণু বিগ্রহের কাছাকাছি শোয়া, তাঁর পূর্জাচনা এবং একাদশীতে রাত্রি-জাগরণের সময় ভগবৎ কথা শ্রবণ, নৃত্য, গীত এবং বাদ্য সহকারে তাঁর লীলা-গুণ কীর্তন করে রাত্রি অতিবাহন করাটাই একাদশীর তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ করে—

দেবস্য পুরতঃ কুর্যাজ্জাগরং নিয়তো ব্রতী।
গীতবাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ পুরাণশ্রবণাদিভিঃ॥

ব্রহ্ম পুরাণে একাদশী-কৃত্যের নানান অঙ্গের সঙ্গে ভগবানের লীলাগুণ কীর্তন করে রাত্রি-জাগরণের বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অবন্তী নগরীতে এক বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল কীভাবে বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে প্রতি একাদশীতে নিষাদ, ষড়্জ, গান্ধার ইত্যাদি নানা স্বরে বিষ্ণুর নামগীতি কীর্তন করত, সেই কাহিনী বলা আছে। একাদশীর মাহাত্ম্যের সঙ্গে সেই বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালের মাহাত্ম্যও বলা হয়েছে কতগুলি অধ্যায় জুড়ে।

[নির্ণয়সিন্ধু পৃ. ২৪-২৫; ২৬-৩৪;
নারদ পু. (মহর্ষি) ২৩.১০-১৭;
পদ্ম পু. (উত্তর) ৩৭, ৬-৪৬;
ব্রহ্ম পু. ২২৮.৬-১৪ এবং ২২৮ অধ্যায় ২২৯ অধ্যায়]

□ একাদশী-তিথি পালনের মাহাত্ম্য এবং গৌরব-ঘোষণা পরবর্তী কালে এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, বছরে শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ মিলে অন্তত চব্বিশটি একাদশীর পৃথক নামকরণ করা হয়েছে পদ্ম পুরাণে এবং সেই বিশেষ নামের একাদশী পালনের বিশেষ মাহাত্ম্যও বলা হয়েছে এখানেই। এই চব্বিশটি একাদশীর নাম পদ্ম পুরাণে মাসানুক্রমে দেওয়া আছে, যদিও উনচল্লিশ অধ্যায় থেকে দীর্ঘ একষট্টি অধ্যায় পর্যন্ত একাদশীর বিভিন্ন নাম, সেই বিশেষ একাদশীর মাহাত্ম্য এবং সেই মাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য এক-একটি উপাখ্যান যুক্ত করার তাগিদে দু-চারটি একাদশীর নাম অনুল্লিখিত থেকে গেছে।

পদ্ম পুরাণ মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ন মাসের শুক্লা একাদশীর নাম 'মোক্ষা', কিন্তু মার্গশীর্ষের কৃষ্ণা একাদশীর নাম নেই। পৌষ মাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম 'সফলা', শুক্লা একাদশীর নাম 'পুত্রদা'। মাঘের কৃষ্ণা একাদশীর নাম 'ষট্‌তিলা',

শুক্লা একাদশীর নাম 'জয়া'। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা একাদশী— 'বিজয়া', শুক্লা একাদশী 'আমলকী'। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম 'পাপমোচনী', আর শুক্লা একাদশী হল 'কামদা', বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা একাদশী 'বরূথিনী', শুক্লা একাদশী 'মোহিনী'। জৈষ্ঠ্য মাসের কৃষ্ণা একাদশী 'অপরা', আর শুক্লা একাদশীর নাম 'নির্জলা'। আষাঢ়ের কৃষ্ণা একাদশীর নাম 'যোগিনী', শুক্লার নাম 'শয়নী'। শ্রাবণে কৃষ্ণা একাদশীর নাম 'কামিকা', শুক্লার নাম 'পুত্রদা'। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম 'অজা', কিন্তু শুক্লা একাদশীর কথা-উপাখ্যান না বলে আবারও শ্রাবণী শুক্লা একাদশীর দ্বিতীয় নামকরণ করা হল 'পদ্মা' বলে। অন্যত্র দেখেছি, ভাদ্রের শুক্লা একাদশীর নাম হল 'পরিবর্তিনী'। পদ্ম পুরাণে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম 'ইন্দিরা', আর আশ্বিনে শুক্লা একাদশী হল 'পাপাঙ্কুশা'। কার্তিকী কৃষ্ণা একাদশীর নাম রমা, এবং শুক্লা একাদশীর নাম প্রবোধিনী।

পদ্ম পুরাণের উপরি উক্ত অংশের উপর ভিত্তি করেই পণ্ডিতেরা অবশ্য চব্বিশটি একাদশীর নাম করে দিয়েছেন। চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পর পর কৃষ্ণা-শুক্লার নামগুলি হল— কামদা, বরূথিনী, মোহিনী, অপরা, নির্জলা, যোগিনী, শয়নী, কামিকা বা কামদা, পুত্রদা, অজা, পরিবর্তিনী, ইন্দিরা, পাপাঙ্কুশা, রমা, প্রবোধিনী অথবা বোধিনী, উৎপত্তি, মোক্ষদা, সফলা, পুত্রদা, ষট্‌তিলা, জয়া, বিজয়া, আমলকী অথবা আমর্দকী এবং পাপমোচিনী।

[পদ্ম পু. (উত্তরখণ্ড/নবভারত) ৩৯ অধ্যায়-৬১ অধ্যায়]

☐ এই সব নাম ছাড়াও আরও দুটি একাদশী বিখ্যাত হয়ে আছে। তার একটি শয়ন একাদশী, যেটা আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী। অন্যটি উত্থান একাদশী, যেটা কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী। প্রথমটিতে ভগবান শ্রীহরি শেষনাগের কুণ্ডলিনীতে শয়ন করেন, আর তিনি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন কার্তিকে—

একাদশ্যাং তু শুক্লায়ামাষাঢ়ে ভগবান্ হরিঃ।
ভুজঙ্গ-শয়নে শেতে যদা ক্ষীরার্ণবান্তরে॥
একাদশ্যাং তু শুক্লায়াং কার্তিকে মাসি কেশবম্।
প্রসুপ্তং বোধয়েদ্ রাত্রৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ॥

[বর্ষক্রিয়া কৌমুদী, গোবিন্দানন্দ-কৃত, পৃ. ২৮৭]

☐ একাদশীর তিথি-নির্ণয় নিয়ে পুরাণ এবং স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে নানান আলোচনা আছে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল—দশমী কিংবা দ্বাদশী তিথির দ্বারা একাদশী তিথি বিদ্ধ হল কিনা। সাধারণত তিথি বিচারের নিরিখে একাদশী দুই প্রকার—সম্পূর্ণা এবং বিদ্ধা, সম্পূর্ণা একাদশী সেটাই, যেখানে সূর্যোদয়ের সময় থেকে পূর্ণ ৬০ ঘটিকা পাওয়া যাবে; তবে স্মার্ত পৌরাণিকদের মতে এটা এক প্রকার আদর্শ কল্প, কোনো তিথির দ্বারা বিদ্ধা না হয়ে একেবারে সূর্যোদয় থেকে একাদশী পড়ল, এমনটা সাধারণত হয় না। সেইজন্যই হেমাদ্রি গরুড় পুরাণের বচন উদ্ধার করে বলেছেন—সূর্যোদয়ের আগে অন্তত দুই মুহূর্ত কাল আগেও যদি একাদশী তিথি আরম্ভ হয়, সেটাকেই সম্পূর্ণা একাদশী বলে—

* উদয়াৎ প্রাক্ যদা বিপ্রা মুহূর্তদ্বয়সংযুতা।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্‌গৃহী॥
* আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাক্ মুহূর্তদ্বয়সংযুতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্তিতা॥

দশমী-বিদ্ধা একাদশীতে ব্রতোপবাস পালন ভীষণভাবে নিন্দিত হয়েছে নারদ পুরাণে এবং গরুড় পুরাণে। এমনও বলা হয়েছে যে, মহাভারতের গান্ধারী দশমীবিদ্ধা একাদশীর উপবাস করেছিলেন বলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি তাঁর একশোটি পুত্রকেই হারিয়েছিলেন—

দশম্যেকাদশীমিশ্রা গান্ধার্য্যা সমুপোষিতা।
তস্য পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ॥

গরুড় পুরাণের মত হল—দশমীযুক্তা একাদশীতে অসুর আবিষ্ট হয়ে থাকে, আর দ্বাদশীযুক্তা একাদশীতে ভগবান হরি অধিশ্রিত থাকেন। তবে নানা শাস্ত্রের বিরোধে যদি এমন সন্দেহ তৈরি হয় যে, একই দিনে দশমী, একাদশী এবং দ্বাদশীতিথির যোগ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে দ্বাদশীতে একাদশীর উপবাস করে ত্রয়োদশীতে পারণ করতে হবে। যদি দ্বাদশীর দিনে এক কলাও একাদশী থাকে, তাহলে উপবাস করতে হবে দ্বাদশীর দিনেই।

[P.V. Kane, History of Dharmasnstra, Vol. Pt. 1, pp. 113-114; 103-117: গরুড় পু. ১.১২৩.১১-১৩; ১.১২৫.১-৮; চতুবর্গচিন্তামণি, হেমাদ্রিকৃত, কালনির্ণয়, অধ্যায় ৬, পৃ. ২৫৩-২৫৯, একাদশীতিথি সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা তদেব, অধ্যায় ৬, পৃ. ১৪৫-২৮৮]

একানংশা হরিবংশে একানংশা শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—তিনি প্রজাপালক ভগবান বিষ্ণুর অংশ থেকে উৎপন্ন হলেও তত্ত্বত এবং স্বরূপত তিনি এক এবং অংশরহিত। ইনি ভগবানের মায়াশক্তি—যোগমায়া—

বিদ্ধি চৈনামথোৎপন্নাথংশাদ্দেবীং প্রজাপতেঃ।
একানংশাং যোগকন্যাং রক্ষার্থং কেশবস্য তু॥

দেবীপুরাণে একানংশা নামের নিরুক্তিটি আরও ভালো ভাবে দেওয়া আছে। এখানে বলা হয়েছে—তিনি সমস্ত লোক ব্যাপ্ত করে আছেন, তিনি একাও বটে, আবার একাও-নন, বহুরূপা, আবার কারও অংশরূপেও নয়, পূর্ণরূপে তিনি অনংশা—

এতে অসতে চ লোকা ন একা ন চ সা স্মৃতা।
একা চা নাংশতো লোকা একানংশা চ সা স্মৃতা॥

[হরিবংশ পু. ২.৪.৪৭; দেবী পু. ৩৭.৪৯]

□ হরিবংশ অনুসারে কৃষ্ণের জন্মসময়ের প্রায় সম-সময়ে নন্দ-যশোদার যে সদ্যোজাতা কন্যাকে বসুদেব কংসের কারাগারে নিয়ে এসে দেবকীর কোলে দেন, সেই কন্যাই একানংশা। কংস সদ্যোজাতা সেই কন্যাকে পাথরে আঘাত করলে তিনি আকাশে উঠে গিয়ে অপূর্ব দেবীমূর্তি ধারণ করলেন—তিনি মুক্তকেশী, দিব্য গন্ধের অনুলেপন তাঁর গায়ে—

নীলপীতাম্বরধরা গজকুম্ভোপমস্তনী।
রথবিস্তীর্ণজঘনা চন্দ্রবক্ত্রা চতুর্ভুজা॥
বিদ্যুদ্‌বিস্পষ্টবর্ণাভা বালার্কসদৃশেক্ষণা।

[হরিবংশ পু. ২.৪.৩৬-৪০]

□ একানংশার এই স্বরূপ বস্তুত দেবী দুর্গারই রূপ। ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের অবতার গ্রহণের পূর্বেই বিশ্বাত্মা ভগবান কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজনেই যোগমায়াকে ব্রজমণ্ডলে যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন—

ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি।

এই আদেশের সঙ্গে জগতে সেই একানংশা যোগমায়া অন্যান্য কী কী রূপে অর্চিত হবেন, তার তালিকা দিয়ে বলা হয়েছে—

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ।
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥

অর্থাৎ এই সমস্ত দুর্গানামের সঙ্গে একানংশা অভিন্না। *[ভাগবত পু. ১০.২.৯-১২]*

□ হরিবংশে কৃষ্ণের ভয়ে আতঙ্কিত কংস নারদের কাছে খবর পেয়েছেন যে, যাঁকে শিশুকন্যা ভেবে কংস শিলায় আছাড় মেরেছিলেন, সেই কন্যাই দৈবী মায়ায় কৃষ্ণের জন্মের পর তাঁকে স্থানান্তরে রেখে আসতে এবং নিজের সঙ্গে কৃষ্ণকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছেন—

রাত্রৌ ব্যাবর্তিতাবেতৌ গর্ভৌ।

যশোদা-গর্ভ সম্ভূতা এই দৈবী কন্যা এখন বিন্ধ্যপর্বতে বাস করছেন। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ নামের দুই দানবকে হত্যা করে সেখানে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ভূতসংঘ তাঁকে সেবা করে এবং পরিবৃত করে রাখে। দস্যু-দৈত্য-দানবরা সেখানে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করে পূজা করে। সুরা এবং মাংসপূর্ণ দুটি পাত্র তাঁর শোভা বর্ধন করে। ময়ূর পুচ্ছে নির্মিত অঙ্গদ এবং ময়ূর-পুচ্ছের আভরণই তাঁর অলঙ্কার।

[হরিবংশ পু. ২.২২.৫০-৫৫]

হরিবংশের এই বিন্ধ্যবাসিনী দেবীই যে নারায়ণী দেবী দুর্গা এবং তিনিই যে একানংশার সঙ্গে একানংশা ভগবতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন, সে-কথা মহাভারতে যুধিষ্ঠির-কৃত দুর্গার স্তবে প্রতিভাত হয়। এখানে একানংশার নাম উচ্চারিত হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর অন্যতর বৈশিষ্ট্যগুলি একানংশারই। এখানেও তিনি যশোদা-গর্ভ-সম্ভূতা, নন্দগোপকুলে জাতা। তিনি কংসকে ত্রাসিত করেছেন এবং অন্যান্য অসুরেরা তাঁর হাতে নিহত হয়েছেন। তিনি বাসুদেব কৃষ্ণের ভগিনী—দিব্যমাল্য বিভূষিতা এবং খড়্গ-খেটক-ধারিণী।

[মহা (k) ৬.২৩.২-৮; (হরি) ৬.২৩.২-৮]

□ বাসুদেব কৃষ্ণের ভগিনী এই ভগবতী দেবী দার্শনিক তাত্ত্বিকতায় শক্তি এবং শক্তিমৎ তত্ত্বের লৌকিক প্রকাশ যদি হয়, তবে একানংশা এক পরম বৈষ্ণবী শক্তি হিসেবেই স্থান লাভ করেছেন জগন্নাথ এবং বলরামের মধ্যভাগে সুভদ্রা ভগিনী হিসেবে। বরাহমিহির বৃহৎ সংহিতায় একানংশার স্থান নির্দেশ করেছেন জগন্নাথ-বলরামের মাঝখানেই—

একানংশা কার্যা দেবী বলদেব-কৃষ্ণয়ো মধ্যে।

ফলত সেটা সুভদ্রারই সংস্থান, তিনি একানংশার সঙ্গে একাত্মক।

[বৃহৎ সংহিতা ৫৮.৩৭;
দ্র. The Sakti Cult and Tara,
Ed. D.C. Sircar, p. 84]

□ স্কন্দ পুরাণে একানংশা কালী-পার্বতীর অংশ, কালীর সঙ্গে তিনি একাত্মক। এই পুরাণে বলা হয়েছে—ব্রহ্মা নিশা দেবীকে আহ্বান করে মেনার গর্ভে থাকা পার্বতীর গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে দিতে বলেন। তারপর ভবিষ্যৎ-বাণী করে বললেন—পার্বতী যখন তপঃপ্রভাবে গৌরী হবেন, তখন নিশাদেবী পার্বতীর সমমর্যাদা লাভ করবেন, এবং তখন নিশার নাম হবে একানংশা গৌরী। রূপাংশের দ্বারা সংযুক্তা নিশা হবেন উমা, আর মানুষ পূর্বের সেই নিশাকে একানংশা বলে পূজা করবে—

রূপাংশেন চ সংযুক্তা ত্বমুমাখ্যা ভবিষ্যসি।
একানংশেতি লোকস্ত্বাং বরদে পূজয়িষ্যতি॥

লক্ষণীয়, হরিবংশে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী যেমন মদ্য-মাংসপ্রিয়া, এখানে কালীর সঙ্গে একাত্মক একানংশাও সুরা-মাংসের উপহার গ্রহণ করে ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। মহানবমীর দিন সেই একানংশার পূজায় মহিষ বা মেষ বলি দিতে হয়। আর পদ্ম পুরাণের সৃষ্টি খণ্ডে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, পার্বতী কালীর কৃষ্ণ ত্বক থেকে উৎপন্ন একানংশা ব্রহ্মার আদেশে বিন্ধ্য পর্বতে বাস করে বিন্ধ্যবাসিনী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। অন্যদিকে এটাও বোধহয় ভাবা উচিত কালী তাঁর চর্মকোশের কৃষ্ণকোশ ত্যাগ করে কৌশিকী কালী হয়েছিলেন। সেই কৌশিকী কালী এবং একানংশাও অভিন্না।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য) ১৮.১-২৫;
পদ্ম পু. (সৃষ্টি), ৪৩.৬৭-৭২; ৪৪.৮৭-৯২]

□ সুকুমার সেন জানিয়েছেন একানংশা শব্দটির প্রকৃত বানান হওয়া উচিত একানংসা। তাঁর মতে একানংসা বলতে বোঝায় অবিবাহিতা কুমারী দেবী—The name as it is means Single (eka) and unshared (an-amsa, i.e.unmarried). The correct reading of the name seems to be Ekānamsā (Lone. and virgin goddess) তবে পরবর্তী কালে এই একানংশা বা একানংসা দুটিই বিলুপ্ত হয়ে ভদ্রা, সুভদ্রা ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। ড. সেন-এর মতে কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী এবং একানংশা বৈদিক উষা এবং অদিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

[Sukumar Sen, The Great Goddess in
Indian Tradition, pp. 30, 57]

□ বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় একানংশা দেবীর মূর্তি কখনো দ্বিভুজা, কখনো চতুর্ভুজা, কখনো বা অষ্টভুজা। দ্বিভুজা মূর্তিতে তাঁর বাম হাত কটিদেশে সন্নিবিষ্ট এবং ডান হাতে থাকবে পদ্মফুল। চতুর্ভুজা মূর্তিতে বামের দুই হাতে পুস্তক এবং পদ্ম, ডান দুই হাতে ওপরে অভয়-দানকারী বরদমুদ্রা, আর নীচে অক্ষসূত্র। অষ্টভুজা মূর্তিতে কমণ্ডলু, ধনুক, পদ্ম এবং শাস্ত্রগ্রন্থ আর দক্ষিণ হস্তগুলিতে বরদমুদ্রা, বাণ, দর্পণ এবং অক্ষসূত্র।

[বৃহৎ সংহিতা ৫৮.৩৭-৩৯]

একানঙ্গা যশোদার কন্যার নাম একানঙ্গা।

[মহা (গীতা প্রেস) ২.৩৮.২৯নং শ্লোকের উত্তর
দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্র. পৃ. ৮২০]

সম্ভবত এই একানঙ্গা ভগবতী দেবী একানংশাই হবেন। পাঠক্রমে তিনি এখানে একানঙ্গা।

[দ্র. একানংশা]

একাম্রক একটি পবিত্র তীর্থ। দেবী সতী এই তীর্থে কীর্তিমতী নামে অধিষ্ঠিতা। এটি আম্রতক নামেও পরিচিত। শ্রাদ্ধকার্যের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট স্থান।

[মৎস্য পু. ১৩.২৯; ২২.৫১]

একায়ন একজন ঋষি। পুরাণে যেসব ঋষির নাম ভার্গব গোত্রপ্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, মহর্ষি একায়ন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৪৩]*

একার্ণব 'একার্ণব' কথাটির অর্থ হল জলে জলাকার। পুরাণগুলিতে বলা হয়েছে যে, অনাবৃষ্টির পর শত বছর ধরে অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ হতে থাকলে সমগ্র জগৎ জলে পরিপূর্ণ হয় এবং সমগ্র জীব জলে লীন হয়ে যায় সেই অবস্থায় সমগ্র জগৎকে দেখে একটিই মহাসমুদ্র বলে মনে হয়। প্রলয়কালীন এই অবস্থাকে তাই 'একার্ণব' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[দ্র. নৈমিত্তিক প্রলয়]*

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১৭৩, ১৮১, ২৩৪;
মৎস্য পু. ১৬৬.১৭; ১৬৭.১, ৪৮;
বায়ু পু. ১০০.১৮৩; ২৩.১১০; ২৪.৮; ২৬.৭]

একাসন একটি প্রাচীন অনার্য জনজাতি। মহাভারতের সভাপর্বের বর্ণনানুযায়ী সুমেরু ও মন্দর পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে শৈলোদা নদীর তটবরাবর বাঁশের অরণ্যে একাসন জনজাতির বাস—

মেরুমন্দরয়োর্মধ্যে শৈলোদামভিতো নদীম্।
যে তে কীচকবেণূনাং ছায়াং রম্যামুপাসতে॥
খসা একাসনা হ্যর্হাঃ প্রদরা দীর্ঘবেণবঃ।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে খস জনজাতির প্রতিনিধিরা তাঁকে দ্রোণ বা দ্রোণকলসে (কুনকের মত একটি পাত্র) মেপে রাশি রাশি পিপীলক স্বর্ণ পাণ্ডবদের উপহার দেন।

[মহা (k) ২.৫২.২-৪; (হরি) ২.৫০.২-৪]

পণ্ডিতরা প্রাচীন শৈলোদা নদী বলতে আধুনিক খোটান বা হোটান নদীকে বোঝান। কুনলুন (Kunlun) পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে খোটান নদীটি উত্তরে তাকলামাকান মরুভূমির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। চীনা ভাষায় খোটান বা হোটান নদীর আরেক নাম উতিয়ান (Yutian)।

[মহা (k) ২.৫২.২-৪; (হরি) ২.৫০.২-৪;
Moti Chandra; Trade and Trade Routes in
Ancient India; New Delhi:
Avinav Publications; 1977; p. 136]

☐ পরবর্তীকালে একাসনগণ হয়তো অন্যান্য বহু মধ্য এশিয়ার জনজাতির মতোই দেশান্তরিত হয়ে ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। পণ্ডিত Moti Chandra অবশ্য একাসনকে যাযাবর প্রকৃতির বলে স্বীকার করেননি।

[GESMUP (Moti Chandra) p. 128]

এড়ী স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচরী, একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৮.৪৬.১৩; (হরি) ৮.৪২.১৩নং
শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. পৃ. ৪৭৬]

এড়ূক কোষকার অমরসিংহ তাঁর কোষগ্রন্থ অমরকোষের পুরবর্গে জনপদে নির্মিত নানা ধরনের ভবনের মধ্যে 'এড়ূক'-এর নাম উল্লেখ করেছেন—

ভিত্তিঃ স্ত্রী কুড্যমেড়ূকং সদন্তর্যস্তকীকসম্।

'কীকস' শব্দের অর্থ দেহাবশেষ বা অস্থি। যে ভবনের মধ্যে দেহাবশেষ রক্ষিত হয় তা যে সাধারণ ভবনের মতো নয়, পৃথক আকৃতির এবং পৃথক শ্রেণীর তা সহজেই বোঝা যায়। কোষগ্রন্থগুলিতে এই ধরণের ভবনকেই 'এড়ূক' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোষগ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুমে মাধব নামে জনৈক কোষকারকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, মৃতব্যক্তির দেহাবশেষ বা অস্থি সংরক্ষণ করে তার উপর যে গৃহ নির্মাণ করা হয় তারই নাম এড়ূক—

মধ্যসংস্থাপিতাস্থ্যাদি কুড্যমেড়ূকমুচ্যতে।

কোষগ্রন্থে প্রাপ্ত সংজ্ঞা থেকে এড়ূককে সমাধিক্ষেত্র বা সমাধি মন্দির বলে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়।

[অমরকোষ ২. (পুরবর্গ) ৪; ২. (মনুষ্যবর্গ) ৬৮;
শব্দকল্পদ্রুম Vol.1, p. 297]

☐ 'এড়ূক' বা সমাধিগৃহের উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে। মহাভারতে কলিযুগের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে ধর্মলোপ পাবে, মানুষ তখন আর দেবমন্দিরে না গিয়ে এড়ূক বা সমাধিগুলিরই পূজা করবে—

এড়ূকান্ পূজয়িষ্যন্তি বর্জয়িষ্যন্তি দেবতাঃ।

শুধু তাই নয় বলা হয়েছে যে কলিযুগে জনপদগুলিতে মূলত এড়ূক বা সমাধিগৃহেরই সংখ্যাধিক্য দেখা দেবে—

এড়ূকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা।
ভবিষ্যতি যুগে ক্ষীণে তদ্‌যুগান্তস্য লক্ষণম্॥

[মহা (k) ৩.১৯০.৬৫-৬৭; (হরি) ৩.১৬১.৬৪-৬৬]

তবে মহাভারতে ব্যবহৃত এবং সংস্কৃত শব্দ হিসেবে গৃহীত হলেও এড়ূক শব্দটি সংস্কৃত শব্দ নয় বলেই পণ্ডিতদের মত। Julia Shaw -এর গবেষণা অনুযায়ী এড়ূক শব্দটির উৎপত্তি দ্রাবিড় ভাষার এলূক শব্দ থেকে। তামিল ভাষায় 'এলূক' বলতে সমাধিক্ষেত্র বা 'burial ground' বোঝানো হয়।

পণ্ডিত V.S. Agrawala মহাভারতের পরিশোধিত সংস্করণের (Critical Edition) পাদটীকায় প্রাপ্ত 'জালূক' বা 'জারূক' পাঠটিকেও গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও জারূক শব্দটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিত Agrawala লক্ষ্য করেছেন যে এই জারূক বা জালূক শব্দটি পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত না হলেও এর উৎপত্তির ইতিহাস হয়তো খুবই প্রাচীন। ইন্দো ইরানীয় ভাষা পরিবারেই হয়তো এই শব্দ প্রথম জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই কারণেই আধুনিক ইসলাম ধর্মবিষয়ক গ্রন্থগুলিতেও সমাধি বা সমাধিস্থল বোঝাতে ziggurut বা ziarat শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা জারূক বা জালূকের সমার্থকও বটে এবং শব্দ দুটি প্রায় সমোচ্চারিতও বটে।

বস্তুত মহাভারতে সমাধিমন্দির পূজার নিন্দা করা হলেও সমাধিস্তূপ নির্মাণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুধর্মোত্তর

পুরাণে প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকার গৃহ নির্মাণের বিধি আলোচনা করতে গিয়ে ঐড়ুক বা এড়ুক—অর্থাৎ সমাধিগৃহের আকৃতিও বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিবরণ অনুযায়ী সমাধিগৃহগুলি ত্রিতল প্রাসাদের মতো হত। একেবারে উপরের তলটিতে থাকত শিবলিঙ্গ। পণ্ডিত Agrawala -র মতে এই পুরাণ প্রায় গুপ্ত যুগের সমসাময়িক এবং এখানে যে এড়ুক নির্মাণের বিধি রয়েছে তাও খুব সম্ভব সেই সময়কার কারণ তখন থেকেই এই সমাধিগৃহগুলি দেবমন্দিরের মর্যাদা লাভ করতে শুরু করেছে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যের ফলে প্রাচীন অহিচ্ছত্র নগরীতে এরকম সমাধি মন্দির পাওয়াও গিয়েছে। মূলত বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধস্তূপ বা সমাধিগৃহ তীর্থ বা পবিত্র মন্দির হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। মহাভারতে সম্ভবত কলিযুগের লক্ষণের কথা বলতে গিয়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির তীর্থ এই বৌদ্ধস্তূপগুলির কথাই নিন্দার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে মহাকাব্য পরবর্তী যুগে যে বাস্তবিকই এগুলি দেবমন্দিরের অনুরূপ মর্যাদা পেতে আরম্ভ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

[বিষ্ণুধর্মোত্তর পু. Julia Shaw, Buddhist and non Buddhist Mortuary Traditions in Ancient India: Stupas, Relies and the Archaeological Landscape; Death Rituals and Social Order in Ancient World, Ed. by Colin Renfrew, Michael J.Boyd, Lain Morley, Cambridge University, Press, 2016; The Indian Historical Quarterly, Ed. Narendra Nath Law, Vol XXVII, Calcutta, 1951, Some Foreign Words in Ancient Sanskrit Literature by Dr. V.S. Agrawala]

এরক$_{১}$ 'এরক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ নলখাগড়া বা হোগলা।

চরক সংহিতার টীকায় 'এরক' শব্দের অর্থ হিসেবে বলা হয়েছে 'হোগ্গল' অর্থাৎ হোগলা।

[চরক সংহিতা (মহর্ষি) সূত্রস্থান, ৩.২৭]

□ কৃষ্ণপুত্র শাম্ব মুনিদের অভিশাপে লৌহ মুষল প্রসব করলে রাজা উগ্রসেন সেই মুষল চূর্ণবিচূর্ণ করে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করেন। সেই চূর্ণিত মুষল থেকে সমুদ্রতীরে 'এরক' নামে এক জাতীয় তৃণের উদ্ভব হয় অথবা এরক-সদৃশ শরবণের জন্ম হয়।

অন্ধক, ভোজ, শিনি ও বৃষ্ণিবংশীয়রা সেই চূর্ণিত মুষল থেকে উৎপন্ন শর দ্বারা যুদ্ধে পরস্পরকে বধ করেছিলেন।

[মহা (k) ১৬.১.২৫-২৭; ১৬.৩.৩৬-৩৮; (হরি) ১৬.১.২৮-৩০; ১৬.৩.৪০-৪২; ভাগবত পু. ১১.১.২২]

এরক$_{২}$ কৌরব্য কুলে জন্মগ্রহণকারী যে সব নাগ জনমেজয়ের সর্পসত্রের অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে এরক একজন।

[মহা (k) ১.৫৭.১৩; (হরি) ১.৫২.১৩]

এলপত্র *[দ্র. এলাপত্র]*

এলাপত্র প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত নাগ পুত্রদের মধ্যে একজন নাগ।

[মহা (k) ১.৩৫.৬; (হরি) ১.৩০.৬; বায়ু পু. ৬৯.৭০; মৎস্য পু. ৬.৪০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৪; গরুড় পু. ১.৬.৬০]

□ ভোগবতীপুরীতে নারদ, মাতলির কাছে যেসব প্রধান প্রধান নাগেদের নাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এলাপত্র একজন।

[মহা (k) ৫.১০৩.১০; (হরি) ৫.৯৬.১০]

□ দেবতারা ব্রহ্মার কাছে জনমেজয়ের সর্পসত্র বন্ধ করার উপায় জানতে চাইলে ভগবান ব্রহ্মা বলেন যে, মহর্ষি জরৎকারু তাঁর সমনাম্নী কন্যাকে বিবাহ করবেন এবং তাঁদের পুত্রই এই যজ্ঞকে আটকাতে পারবে। ব্রহ্মার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে এলাপত্র নাগ বাসুকিকে বলেন—জরৎকারু নামে আপনার ভগিনী তো আছেনই। মহর্ষি জরৎকারু যখন কন্যা ভিক্ষা করবেন, তখন নাগগণের মঙ্গলের জন্য তাঁর হাতে আপনি আপনার ভগিনীকে দান করবেন। বাসুকি ও অন্যান্য নাগেরা তখন এলাপত্রের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন এবং এলাপত্রকে সাধুবাদ জানান।

[মহা (k) ১.৩৮.১১-১৯; (হরি) ১.৩৩.১৪-২২]

□ মহাভারতের দ্রোণপর্বে বলা হয়েছে যে, ত্রিপুর দহনের সময় মহাদেব এলাপত্র নাগকে তাঁর রথের অণি অর্থাৎ চক্রদণ্ডের ওপরের (অক্ষাগ্রের) পেরেক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

[মহা (k) ৭.২০৩.৭২; (হরি) ৭.১৭০.৬৫; শিব পু. (ধর্ম) ৩.৬৬-৬৭]

□ স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে যে, শেষনাগ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের পূর্বদিকে যে পথ আছে, তার দ্বারা ভূতলে শ্রী পর্বতে যাওয়া যায়। এলাপত্র নাগগণের যাতায়াতের জন্য এই পথটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৬৩.৫৯-৬০]

□ ভাগবত ও মৎস্য পুরাণ মতে এলাপত্র নাগ শ্রাবণ মাসে সূর্যরথে অবস্থান করেন। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে এলাপত্র নাগ ভাদ্র মাসে সূর্যরথে অবস্থান করেন। *[ভাগবত পু. ১২.১১.৩৭; মৎস্য পু. ১২৬.১০; বিষ্ণু পু. ২.১০.৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.৯; বায়ু পু. ৫২.১০]*

□ প্রাচীনকালে ব্রহ্মা, ঋভুর কাছে ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন। ঋভুর কাছ থেকে আবার সেই পুরাণ প্রাপ্ত হন প্রিয়ব্রত। এইভাবে নাগরাজ বাসুকি প্রথমে বৎস ও বৎস অশ্বতর-র কাছে এই পুরাণ বর্ণনা করেন। অশ্বতর কম্বল ও কম্বল এলাপত্রকে সেই পুরাণ বর্ণনা করেন। *[বিষ্ণু পু. ৬.৮.৪৫-৪৬]*

এলাপর্ণ *[দ্র. এলাপত্র]*

এলাপুত্র *[দ্র. এলাপত্র]*

এলাপুর একটি পবিত্র পিতৃতীর্থ। শ্রাদ্ধকার্যের পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র। *[মৎস্য পু. ২২.৫০]*

□ সম্ভবত আধুনিক ইলোরা। তবে কানিংহ্যাম কাথিয়াওয়াড়ের ভেরাবল (Verawal) কেই প্রাচীন এলাপুর বলে চিহ্নিত করেছেন।

[AGI (Cunnigham) p. 319]

এলামুখ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, হিরণ্যকশিপু যখন স্বর্গ আক্রমণ করেন, তখন তাঁর পদভারে যেসব পাতালবাসী নাগেরা কম্পিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এলামুখ অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৬৩.৫৬]

ঐ

ঐ সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির থেকেই চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপতি মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্ট এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির দশমতম 'ঐ'কার বর্ণ। বায়ু পুরাণে অ থেকে ঔ পর্যন্ত চতুর্দশ বর্ণকে মূর্তিমান দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মূর্তিমান ঐ-কার পিশঙ্গ ও ভস্ম বর্ণের ছিলেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ২৬.৪৪]*

ঐক্ষ্বাকী$_{১}$ সুহোত্রের পত্নী। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকন্যা বলে তাঁকে ঐক্ষ্বাকী বলা হয়েছে। ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে সুহোত্রের অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[মহা (k) ১.৯৪.৩০; (হরি) ১.৮৯.১৮]

ঐক্ষ্বাকী$_{২}$ মৎস্য পুরাণ অনুসারে জ্যামঘ বংশীয় জন্তুর পত্নীর নাম ঐক্ষ্বাকী। তাঁর গর্ভে জন্তুর সাত্বত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ মতে জ্যামঘবংশীয় পুরুদ্বহের পত্নী ঐক্ষ্বাকী। পুরুদ্বহ ও ঐক্ষ্বাকীর পুত্র সত্ত্ব।

লিঙ্গ পুরাণে আবার বলা হয়েছে যে, অংশুর পত্নী ঐক্ষ্বাকী। অংশুর ঔরসে ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে সত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্ম পুরাণে অবশ্য ঐক্ষ্বাকী কে বৃষ্ণি বংশীয় মধুর পত্নী বলা হয়েছে। সেখানে মধু ও ঐক্ষ্বাকীর পুত্রের নাম হিসেবে 'সত্ত্বান্'—এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ৪৪.৪৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.৪৮; বায়ু পু. ৯৫.৪৭; লিঙ্গ পু. ১.৬৮.৪৯; ব্রহ্ম পু. ১৫.২৮]*

ঐক্ষ্বাকী$_{৩}$ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় একজন রাজকন্যা যাঁর গর্ভে ঈঢুষ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মপুরাণে অবশ্য 'ঈঢুষ'-এর পরিবর্তে 'মীঢুষ' নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৪৬.১; পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ১৩.১০৭]

ঐক্ষ্বাকী$_{৪}$ বৃষ্ণি বংশধারায় অনাধৃষ্টির পত্নী। ঐক্ষ্বাকীর গর্ভে অনাধৃষ্টির, শত্রুঘ্ন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। *[মৎস্য পু. ৪৬.২৪]*

ঐড়ণ্ডী নর্মদার তীরবর্তী একটি পুণ্যতীর্থ। একাধারে তীর্থ এবং নদীসঙ্গমস্থান বলে উল্লিখিত হওয়ায় (ঐড়ণ্ডী-নর্মদয়োশ্চ সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্)।

[মৎস্য পু. ১৯৪.৩১]

মনে হয় ঐড়ণ্ডী নর্মদার সঙ্গমস্থলটি আধুনিক বৈঙ্গানি থেকে এক মাইল দূরে কোল্যাদ নামের জায়গাটিতে চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিতেরা।

[GEAMI (Bajpai) p. 9]

আধুনিক ব্রোচ শহরে আরও একটি ঐড়ণ্ডী তীর্থের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি।

[মৎস্য পু.১৯১.৪১-৪৫; ১৯৩.৬৫-৬৭; কূর্ম পু. ২.৩৯.৮৩]

পণ্ডিতেরা এই তীর্থকে নর্মদার তীরে ধূতপাপ নামক তীর্থের কাছে চিহ্নিত করেছেন। অন্যমতে অনসূয়া তীর্থের উলটো দিকে নর্মদা এবং ঐরণ্ডী নদীর সঙ্গমস্থল সুবর্ণ-সীতা নামের গ্রামটিই প্রাচীন ঐরণ্ডী তীর্থের সঙ্গে একাত্মক। এই মতে নর্মদার উত্তর তীরে এই তীর্থ অবস্থিত।

[GEAMI (Bajpai) p. 9]

এই পবিত্র তীর্থে স্নান করলে প্রয়াগে তীর্থ করার ফল লাভ করা যায়।

[A. Taluqdar, The Sacred Books of the Hindus, Vol. 18, Part 2, p.193]

□ বর্তমানে নর্মদার শাখানদী উরি (Uri), যা বরোদা অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে—সেই নদীটিই হয়তো প্রাচীনকালে ঐরণ্ডী নামে বিখ্যাত ছিল। *[EAIG (Kapoor) p. 258]*

ঐড়বিড়$_{১}$ ইক্ষ্বাকুবংশধারায় দশরথের পুত্র এবং রাজা বিশ্বসহ-র পিতা ঐড়বিড়।

[ভাগবত পু. ৯.৯.৪২]

ঐড়বিড়$_{২}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে ঐড়বিড় একজন পৌলস্তেয় রাক্ষস। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৬০]*

ঐড়বিল *[দ্র. কুবের]*

ঐতরেয় মহর্ষি হারীতের বংশে মাণ্ডূকি নামে এক বেদ-বেদাঙ্গ-বিদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ইতরা—তিনি পতিব্রতা এবং সাধ্বীগুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল ঐতরেয়—বস্তুত মায়ের নামেই তাঁর নাম—ইতরার পুত্র ঐতরেয়। ঐতরেয় পূর্বজন্মের সংস্কারবশত বাল্যকাল থেকেই দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) জপ করতেন সব সময়। তিনি অন্য

কিছু শুনতেনও না, অন্য কথা বলতেনও না। পিতা মাণ্ডুকি শিশুপুত্রটিকে নানাভাবে পরীক্ষা করে ভাবলেন বুঝি—ছেলেটি মূক-বধির হবে। সঠিক পুত্রকামনায় মাণ্ডুকি শেষ পর্যন্ত পিঙ্গা নামে অন্য এক রমণীকে বিবাহ করলেন এবং তাঁর গর্ভে মাণ্ডুকির চারটি পুত্র হল। পিঙ্গার গর্ভজাত পুত্রেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেদ-বেদাঙ্গে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা যাগযজ্ঞে অংশ নিয়ে পিতার সহায়তা করতে লাগলেন। আর ওদিকে ঐতরেয়—ইতরার সেই পুত্র—তিনি অন্য কোনো কর্ম করেন না, তিনি সময় কাটান হরিমন্দিরে অহরহ জপ করেন সেই পরম মন্ত্র—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় জজাপ
পরমং মন্ত্রং নান্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

জননী ইতরার মনে কষ্ট হয়। তাঁর সপত্নী পিঙ্গার চার-চারটি ছেলেই কত কৃতী পুরুষ। তাঁর কষ্ট হয়—তাঁর স্বামীও অনেক বেশি পছন্দ করেন তাঁর সপত্নী পিঙ্গাকে, যেহেতু তাঁর গর্ভজাত পুত্রেরাই স্বামীর অত্যন্ত প্রিয়। ইতরা তাঁর পুত্র ঐতরেয়কে তাঁর মর্মান্তিক দুঃখের কথাগুলি জানিয়ে অপমান-শাস্তির জন্য আত্মহত্যা করতে চাইলেন। এই অবস্থায় পুত্র ঐতরেয় তাঁকে পাঞ্চভৌতিক শরীর এবং অন্যান্য জাগতিক বিষয় নিয়ে বিশদে তত্ত্বোপদেশ দেন। অবশেষে ঐতরেয়ের জপস্তুতিতে ভগবান শ্রীহরি স্বমূর্তি থেকে নির্গত হয়ে ঐতরেয়কে কোটিতীর্থে হরিমেধার যজ্ঞে যেতে বলেন। হরিমেধা ঐতরেয়কে বহু সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। ঐতরেয় ফিরে আসলে তাঁর জননীও এবার সানন্দে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কৌমারিকা) ৪২.২৯-২৫০]

☐ স্কন্দ পুরাণের এই ঐতরেয় ঋষি অবশ্যই সেই বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থকার, যাঁর নামে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয় আরণ্যক জগতে বিখ্যাত হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকের মধ্যে ইতরার এই বিখ্যাত পুত্রের প্রকৃত নাম মহিদাস এবং তিনি জননীর নামেই বিখ্যাত—তিনি মহিদাস ঐতরেয়—

এতদ্ হ স্ম বৈ তদ্‌বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ।

[ঐতরেয় আরণ্যক (Mitra) ২.১.৮.২; পৃ. ১৮৬]

☐ স্কন্দ পুরাণে ঐতরেয়-মহিদাসের কাহিনী বাসুদেব কৃষ্ণের জপ-ধ্যানের ভক্তি ভাবনায় ভাবিত হয়েছে, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ যুগের প্রেক্ষিতে ইতরা এবং ঐতরেয়ের কাহিনীর মধ্যে উপনিষদে বিবৃত সত্যকাম জাবালের মতো চরিত্রের ছায়া আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকায় সায়নাচার্য লিখেছেন—এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গ্রন্থকর্তা ব্রাহ্মণ ঋষির নাম ঐতরেয় কেন হল, সে বিষয়ে সম্প্রদায়বিদ পণ্ডিতেরা একটি আখ্যায়িকা শোনান। তাঁরা বলেন—কোনো এক মহর্ষির বহু পত্নী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইতরা। সেই ইতরার পুত্র ছিলেন এই মহিদাস, যাঁর কথা ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে—মহিদাসঃ ঐতরেয়ঃ। মহিদাসের পিতা সেই মহর্ষির কাছে তাঁর অন্য স্ত্রীদের পুত্রেরাই প্রিয়তর ছিল, মহিদাসের প্রতি তাঁর পিতার কোনো স্নেহাতিশয় ছিল না। একদিন কোনো এক বিদ্বৎসভায় মহর্ষি পিতা মহিদাসকে অবজ্ঞা করে অন্যান্য পুত্রদের নিজের কোলে বসিয়ে আদর করলেন। কিন্তু মহিদাসকে কোলে নিলেন না। খিন্নমুখ মহিদাসকে কষ্ট পেতে দেখে তাঁর মা ইতরা তাঁর কুলদেবতা ভূমিলক্ষ্মীর শরণ গ্রহণ করলেন। ভূমিদেবতা তখন আপন মূর্তিতে ধরা দিয়ে সেই বিদ্বৎসভায় মহিদাসকে এক দিব্য সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। উপস্থিত সবার সামনে সেই দিব্যমূর্তি ভূমিদেবতা জানালেন—অন্যান্য সমস্ত ঋষিকুমারদের চাইতে মহিদাসের পাণ্ডিত্য বেশি এবং এই মহিদাসের মুখেই একটি মহান ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ-রচনার প্রতিভা স্ফুরিত হবে। ভূমিদেবতার এই অনুগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে—'অগ্নি বৈ দেবানামবমঃ' ইত্যাদি চল্লিশ অধ্যায় জোড়া ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং 'অথ মহাব্রতম্' ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে 'আচার্য্যাঃ' পর্যন্ত আরণ্যক গ্রন্থ মহিদাসের মানস-প্রতিভায় উদিত হল। তাঁর নামেই পরিচিত হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয় আরণ্যক।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Samasrami) সায়নকৃত ভাষ্যভূমিকা পৃ. ৭-৮]

☐ সায়নভাষ্যে কথিত মহিদাস-ঐতরেয়ের কাহিনী এবং স্কন্দপুরাণে বর্ণিত ঐতরেয়ের জীবনকথা শুনে আমাদের ধারণা হয়—মহর্ষির বহু পত্নী থাকা সত্ত্বেও তিনি কামবশত যাঁর

পাণিগ্রহণ করেছিলেন, তিনি শূদ্রাজাতীয়া রমণী ছিলেন। তাঁর নিজস্ব নামে তাঁকে না ডেকে তাঁকে 'ইতরা' বা 'অন্যা' এমনই কোনো তাচ্ছিল্যের সম্ভাষণ করতেন মহিদাসের মহর্ষি পিতা। এখনকার পরিভাষায় এই শূদ্রাজাতীয় রমণী অতি সার্থকভাবেই 'The Other'। আমরা স্কন্দ পুরাণে দেখেছি—ঐতরেয় বলেছেন আমি পূর্বজন্মে শূদ্র ছিলাম—

পুরাহম্ অভবৎ শূদ্রো ভীতঃ সংসারদোষতঃ।

আমাদের ধারণা, এই শূদ্রত্ব তাঁর পূর্বজন্মের নয়, এটা ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্বাবস্থাসূচক শূদ্রত্ব, যেটা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকার আখ্যায়িকাতে মহিদাসের মায়ের নামেই ব্যক্ত হয়। এই সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নামের মধ্যেও ঐতরেয় নামটি 'ইতরা' নামটির হেয়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রব্রাহ্মণ-রচয়িতার মাহাত্ম্যও সূচিত হয় মাতৃনামে বিখ্যাত জাবাল সত্যকামের মতো।

ঐধন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে রৈবত মন্বন্তরে দেবতাদের গণগুলির মধ্যে আভূতরয় একটি গণ। এই আভূতরয় গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতা ঐধন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৫]

ঐন্দ্র$_1$ বায়ু পুরাণে যেসব দিনাশ্রিত মুহূর্তের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ঐন্দ্র। দিনাশ্রিত মুহূর্ত মানে দিনের একটি সময়। ঐন্দ্র মুহূর্তের সময় মোটামুটি সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে। ঐন্দ্র মুহূর্তে জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রের অবস্থান ঘটে; দিনের পনেরোটি মুহূর্তের মধ্যে অষ্টম মুহূর্তই ঐন্দ্র মুহূর্ত। এই সময়ে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়েছিল—

ঐন্দ্রে চন্দ্রে সমাযুক্তে মুহূর্তে'ভিজিতে'ষ্টমে।

[মহা (k) ১.১২৩.৬; (হরি) ১.১১৭.৮; বায়ু পু. ৬৬.৪১]

ঐন্দ্র$_2$ 'ঐন্দ্র' কথার একটি অর্থ পূর্বদিক। পিতৃগণের মুক্তির জন্য পূর্বদিকের ভূমিতে পিণ্ড দান করার কথা বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে।

[বায়ু পু. ১১১.৪০]

ঐন্দ্রী$_1$ দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি-রূপগুলির মধ্যে অন্যতম ঐন্দ্রী। দেবী চণ্ডিকা যখন শুম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীকে সহায়তা করার জন্য দেবী ঐন্দ্রী আবির্ভূত হন।

দেবী ভগবতীর যে আটটি প্রধান শক্তিরূপ, তাঁর মধ্যে ঐন্দ্রী একটি। এই ঐন্দ্রীকে দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী বা শক্তি বলা হয়েছে। শিব পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভগবান শিব যখন ইন্দ্ররূপে বিরাজ করেন, তখন তাঁর শক্তিস্বরূপা দেবী সতী ঐন্দ্রী রূপে অবতীর্ণ হন।

চম্পা, চম্পাবতী, প্রচম্পা, জ্বলিতাননা, পিশাচী, পিচুবক্ত্রা ও লোলুপা প্রমুখ শক্তি ঐন্দ্রী থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৮৮.২০; কূর্ম পু. ১.১২.১৭৩; বামন পু. ৫৬.৬২; শিব পু. (বায়বীয়) ২.৫.২৮; অগ্নি পু. ১৪৬.১৮-১৯]

ঐন্দ্রী$_2$ বাসুদেব-কৃষ্ণের ভগিনী একানংশার অপর নাম ঐন্দ্রী। একানংশা বস্তুত দুর্গাশক্তি মহামায়া।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৬৫.৪]

ঐন্দ্রী$_3$ ভগবান বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী দেবীর অপর নাম ঐন্দ্রী। *[নারদ পু. (মহর্ষি) ১.৩.১৩-১৫]*

ঐন্দ্রী$_4$ গায়ত্রী দেবীর সহস্রনামের মধ্যে একটি।

[দেবীভাগবত পু. ১২.৬.২৬]

ঐন্দ্রী$_5$ কালিকা পুরাণ মতে দেবী কৌশিকীর অষ্টযোগিনীর মধ্যে অন্যতম।

[কালিকা পু. ৬১.৮৪]

ঐন্দ্রী$_6$ *[দ্র. অমরাবতী]*

ঐরাবত$_1$ হস্তীকুলের রাজা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তী হিসেবে ঐরাবতের নাম মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। পুরাণগুলিতে চারজন (মতান্তরে আটজন) দিগ্‌হস্তীর নাম পাওয়া যায়, যাঁরা চারদিক থেকে পৃথিবীকে ধারণ করে থাকেন। ঐরাবত এই দিগ্‌হস্তীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। *[দ্র. দিগ্‌হস্তী]*

মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে, দক্ষকন্যা ক্রোধবশা, প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে যে নয়টি কন্যা সন্তানের জন্মদান করেন, ভদ্রমনা তাঁদের মধ্যে একজন। এই ভদ্রমনার পুত্র ছিলেন হস্তী শ্রেষ্ঠ ঐরাবত।

তবে মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ এবং পুরাণগুলিতে ঐরাবতের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। ঐরাবত বা ঐরাবণ-কে পুরাণগুলিতে ক্রোধবশার কন্যা ইরাবতীর পুত্র বলা হয়েছে। পুলহ প্রজাপতি ছিলেন ঐরাবতের পিতা। ইরাবতীর পুত্র বলেই ঐরাবত নাম।

পুরাণে ঐরাবতের জন্ম সম্পর্কে একাধিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত

হয়েছে যে, একসময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা এমন এক তেজোপুঞ্জ সৃষ্টি করলেন যা জগতকে আলোকিত করবে, যে তেজোরাশি হবে আলোক এবং তেজের উৎস স্বরূপ। ব্রহ্মার আদেশে দেবমাতা অদিতি সেই তেজঃপুঞ্জ ধারণ করলেন আপন গর্ভে। কিন্তু অদিতির গর্ভে সেই তেজ যখন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন সেই গর্ভস্থ শিশুর তেজেই সম্পূর্ণ সৃষ্টি সন্তপ্ত হয়ে উঠল। দেবতারা ভীত হলেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন—এই তেজ যখন ভূমিষ্ঠ হবে তখন তার প্রভাবে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই দগ্ধ হয়ে যাবে। ভীত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন অদিতির গর্ভের তেজ কিছুটা হ্রাস করার জন্য। ব্রহ্মা অদিতির গর্ভের তেজ কিছুটা হ্রাস করে তা দিয়ে একটি পৃথক, নতুন অণ্ড নির্মাণ করলেন। সেই অণ্ডটি ব্রহ্মা স্থাপন করলেন পুলহ প্রজাপতির পত্নী ইরাবতীর গর্ভে, তার থেকেই জন্ম নিলেন হস্তীশ্রেষ্ঠ ঐরাবত।

বায়ু পুরাণে আবার বলা হয়েছে যে, ভৌবন বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ হ্রাস করে একটি পৃথক তেজোময় অণ্ড নির্মাণ করেন। সেটি হাতে নিয়ে রথন্তর সামগান করতে করতে তিনি ইরাবতীর সামনে এলেন। ইরাবতী সেই তেজোদীপ্ত অণ্ডটি ধারণ করলেন আপন গর্ভে। ঠিক এই সময় ইরাবতীর চোখের সামনে একটি হস্তীর আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন। ইরাবতী মনে মনে ভাবলেন—আমার পুত্রটি যেন ঠিক এমনই আকার নিয়ে জন্মায়। ইরাবতীর কল্পনা মতো তাঁর পুত্র ঐরাবত জন্ম নিল হস্তীর রূপ ধারণ করে।

[মহা (k) ১.৬৬.৬৩; (হরি) ১.৬১.৬৩; বায়ু পু. ৬৯.২০৯-২১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৭৯-২৯২; মৎস্য পু. ৮.৭]

□ বিভিন্ন পুরাণে এবং মহাভারতে হস্তীরাজ ঐরাবতের আকৃতির একাধিক বিবরণ পাওয়া যায়। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে ঐরাবতের দাঁতের সংখ্যা চার—

ঐরাবতং চতুর্দন্তং কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।

ভাগবত পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ঐরাবত এবং ঐরাবত বংশীয় হস্তীরা সকলেই চতুর্দন্তযুক্ত, তাদের গায়ের রং সাদা। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐরাবতের গলায় এক জোড়া ঘণ্টা বাঁধা থাকে যাদের নাম বৈজয়ন্তী। মহাভারত পুরাণে বহু শ্লোকে গজরাজ ঐরাবতের উল্লেখ নানা ঘটনায় পাওয়া যায়। বহু পরাক্রমশালী রাজার বীরত্বকেও ঐরাবতের উপমায় ভূষিত করা হয়েছে একাধিক শ্লোকে।

[মহা (k) ৩.৪২.৪০; ৩.২৩১.১৮, ৩৩; ৫.১৮.১; ৫.১৬৭.৩৮; ৬.১২.৩৩; ৬.৬২.৪৬; ৬.৬৪.৫৬; (হরি) ৩.৩৭.৩৯; ৩.১৯৩.১৮; ৩.১৯৪.৬; ৫.১৮.১; ৫.১৫৬.৩৮; ৬.১২.৩৩; ৬.৬১.৮২; ৬.৬৩.৫৬; ভাগবত পু. ৮.৮.৪; ১০.৫৯.৩৭]

□ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে ইন্দ্রের অন্যতম সহায়ক বলেও কল্পিত হয়েছেন। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, হস্তীরাজ ঐরাবত পাতাল থেকে শীতল জল সংগ্রহ করে সেই জলে মেঘগুলিকে সিঞ্চিত করেন। তারপর ইন্দ্র সেই জল বর্ষণ করেন।

[মহা (k) ৫.৯৯.৭-৮; (হরি) ৫.৯২.৭-৮]

□ বিষ্ণু পুরাণে প্রাপ্ত উপাখ্যান থেকে মনে হয় যে, দেবরাজের বাহন ঐরাবত হস্তীই সমুদ্রমন্থনের অন্যতম পরোক্ষ কারণ। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো এক সময় মহর্ষি দুর্বাসা পৃথিবী পর্যটন করছিলেন। তাঁর হাতে ছিল পারিজাত ফুলের (অন্যমতে সন্তানক ফুলের) একটি দিব্য মালা। ঘুরতে ঘুরতে একসময় দুর্বাসার দেখা হল দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে। ইন্দ্র সে সময় ঐরাবতে আরোহণ করে ভ্রমণ করছিলেন। ইন্দ্রকে দেখে দুর্বাসা পারিজাত ফুলের সেই মালাটি তাঁকে উপহার দিলেন। ইন্দ্রও ঋষির দেওয়া উপহার গ্রহণ করলেন নতমস্তকে। তারপর সেই মালাটি তিনি স্থাপন করলেন বাহন ঐরাবতের মাথার উপর। ঐরাবত ফুলের উগ্র গন্ধে বিরক্ত হয়ে মালাটিকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। তা দেখে দুর্বাসা যথেষ্ট অপমানিত বোধ করলেন এবং কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসা এ ঘটনা দেখে এতটাই ক্রুদ্ধ হলেন যে ক্রোধে তাঁর আর কাণ্ডজ্ঞান রইল না। ক্রোধে অন্ধ হয়ে দুর্বাসা ইন্দ্রকে বললেন—বশিষ্ঠ গৌতম প্রমুখ ঋষিদের স্তব, মানুষের চাটুকারবৃত্তি আর দেবলোকের অতুল ঐশ্বর্য্য তোমাকে এমনই অহংকারী করে তুলেছে যে, আমার দেওয়া উপহার তুমি এমন অনাদরে ফেলে দিলে। এর ফলে সমস্ত দেবলোক শ্রীহীন হয়ে যাবে।

অচিরেই দুর্বাসার অভিশাপের ফল ফলতে শুরু করল। দেবলোক শ্রীহীন হয়ে পড়ল। মূলত হতশ্রী দেবলোকের শ্রী ফিরিয়ে আনার জন্যই দেবতারা অসুরদের সঙ্গে যৌথভাবে অমৃতমন্থনের উদ্যোগ নেন। তবে কোনো কোনো পুরাণে সমুদ্রমন্থনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ঐরাবত হস্তী সমুদ্রমন্থনের সময় ক্ষীরোদ সাগর থেকে উঠে এসেছিলেন।

[বিষ্ণু পু. ১.৯.১-৮০; ভাগবত পু. ৮.৮.৪]

☐ পুরাণ মতে, ঐরাবত হস্তীর পত্নীর নাম অভ্রমূ। ঐরাবতের ঔরসে অভ্রমূর গর্ভে চারটি হস্তীপুত্রের জন্ম হয়। এদের নাম—অঞ্জন, সুপ্রতীক, বামন এবং পদ্ম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩২৪-৩৩৩]*

ঐরাবত$_{২}$ কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতের আস্তীক পর্বে সর্পনাম কথনের সময়ে অন্যান্য কদ্রুপুত্রদের সঙ্গে ঐরাবতের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বস্তুত নাগ বলতে সর্প যেমন বোঝায় তেমনই হস্তীও বোঝায়। মহাকাব্য পুরাণে ঐরাবতের মতোই একাধিক নাম দেখা যায় যেগুলি কখনও বা সর্পের নাম হিসেবে আবার কখনো হস্তীর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই নাম সাদৃশ্য থেকে মনে হয় পৌরাণিকরা এঁদের সর্প বা হস্তী আখ্যা দিয়ে থাকলেও এঁরা সকলেই প্রাচীন ভারতবর্ষে ছড়িয়ে থাকা নাগ জনজাতির প্রতিনিধি। এই ঐরাবতও নাগ-জনজাতিরই একজন রাজা ছিলেন।

[মহা (k) ১.৩৫.৫; ৫.১০৩.১১;
(হরি) ১.৩০.৪; ৫.৯৬.১১; মৎস্য পু. ৬.৪০;
বায়ু পু. ৬৯.৭০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩]

☐ ঐরাবত বংশীয় নাগদের নানা কাহিনী মহাভারত মহাকাব্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বারো বৎসরের বনবাসের সময় অর্জুন যে নাগকন্যা উলূপীকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি ঐরাবতবংশীয় নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা ছিলেন বলে জানা যায়—

ঐরাবতকুলে জাতঃ কৌরব্যো নাম পন্নগঃ।

এই সম্পর্কের সুবাদে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঐরাবত বংশীয় নাগরা তাঁদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছিলেন, যে বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং অর্জুনপুত্র ইরাবান্।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে নারদ এবং মাতলির যে উপাখ্যান পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রের সারথি মাতলি আপন কন্যা গুণকেশীর উপযুক্ত পাত্র হিসেবে মনোনীত করেছিলেন ঐরাবতবংশীয় নাগ সুমুখকে। এই দুটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় নাগরা মূলত অনার্য জনজাতি হলেও মহাকাব্যের যুগে আর্যরা তাঁদের অনেকটাই আপন করে নিতে পেরেছিলেন। আর্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা।

পরবর্তী সময়ে অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ঐরাবতবংশীয় বহু নাগ ভস্মীভূত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.২১৪.১৮; ৬.৯০.৮; ৮.৮৭.৪৪;
৫.১০৩.২৩; ৫.১০৪.১০; ১.৫৭.১২;
(হরি) ১.২০৭.১৮; ৬.৮৭.৮; ৮.৬৪.৪৭;
৫.৯৬.২৩; ৫.৯৭.১১; ১.৫২.১২]

☐ বায়ু, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐরাবত নাগ কার্তিক মাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন। *[বায়ু পু. ৫২.১৪;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১৪;
বিষ্ণু পু. ২.১০.১১]

☐ তবে ভাগবত পুরাণে ফাল্গুন মাসে ঐরাবত নাগের সূর্যরথে অবস্থানের উল্লেখ মেলে।

ঐরাবতবর্ষ হিমালয় পর্বতের উত্তরে অবস্থিত একটি বর্ষ বা ভূখণ্ড। মহাভারতে একে 'নানাদেশযুক্ত' বর্ষ বা 'নানাজনপদাবৃতম্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শৃঙ্গিপর্বতের উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত ঐরাবতবর্ষের বিস্তার। হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ ও সর্বোত্তরে ঐরাবতবর্ষ—

উত্তরেণ তু শৃঙ্গস্য সমুদ্রান্তে জনাধিপ।
বর্ষমৈরাবতং নাম তস্মাচ্ছৃঙ্গবতঃ পরম্॥
ধনুঃ সংস্থে মহারাজ দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে।

নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের ঐরাবতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থিতির কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন—

এবমাকারং দক্ষিণে ভারতবর্ষম্
উত্তরে ঐরাবতম্...।

ভীষ্ম পর্বে ঐরাবতবর্ষের একাধিক স্থান-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, ঐরাবতবর্ষে সূর্যালোকের প্রখরতা কম। রাত্রে চন্দ্র ও দিনে অপর একটি নক্ষত্র সূর্যের মতোই আকাশে বিচরণ করে—

ন তত্র সূর্যস্তপতি ন জীর্যন্তে চ মানবাঃ।
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রো জ্যোতির্ভূত ইবাপরঃ॥

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যে জাতীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে সাইবেরিয়া সংলগ্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ এই অঞ্চলে বছরের ছয়মাস রাত্রি থাকার সময়ে একটি নক্ষত্র সব সময় আকাশে প্রদক্ষিণ করতে দেখা যায় এবং সাইবেরিয়াতেই ভৌগোলিক কারণেই সূর্যরশ্মির প্রখরতা অত্যন্ত কম। ভীষ্মপর্বে ঐরাবতবর্ষ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে, এখানে বসবাসকারী মানুষেরা প্রায় দেবতার মতোই সুন্দর, তাদের গায়ের রং লালচে সাদা (পদ্মবর্ণ) এবং এরা দীর্ঘজীবী।

[মহা (k) ৬.৬.৩৭-৩৮; ৬.৮.১১-১৫;
(হরি) ৬.৬.৩৭-৩৮; ৬.৮.১১-১৫]

পণ্ডিত Subodh Kapoor-এর মতে জম্বুদ্বীপের সর্বোত্তরে অবস্থিত ঐরাবতবর্ষ বৃহদাকার হস্তীদের দেশ বলে পরিচিত। অর্থাৎ এখানে 'ম্যামথ' জাতীয় হাতি পাওয়া যেত। সেই কারণেই সম্ভবত এই সমগ্র ভূ-ভাগটি ঐরাবতবর্ষ নামে বিখ্যাত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, এশিয়ার মধ্যে একমাত্র সাইবেরিয়াতেই ম্যামথের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে ঐরাবতবর্ষ বলতে আধুনিক সাইবেরিয়া অঞ্চলকেই বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। *[EAIG (Kapoor) p. 20]*

ঐরাবতী পুরাণোক্ত এই নদী ইরাবতী বা রাভি নদীর সঙ্গে একাত্মক এবং এটিই আরিয়ান-কথিত Hydraotes. মৎস্যপুরাণে মদ্রদেশের রাজা পুরূরবা তপশ্চর্যার জন্য রাজ্যের সীমান্তদেশ দিয়ে যেতে যেতে এই নদী দেখতে পান—

ঐরাবতীতি বিখ্যাতাং দদর্শাতিমনোরমাম্।

[মৎস্য পু. ১১৫.১৮]

রাজা বোধহয় যেতে যেতে হিমালয় থেকে এই নদীর উৎসভূমিও দেখতে পেয়েছিলেন—যার জন্য এই নদীকে হৈমবতী বলেও ডাকা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১১৬.১; মৎস্য পু. ১১৭.১]*

☐ এই নদীর নামে একটি তীর্থ রয়েছে।

☐ ঐরাবতীর আরেক নাম অচীরবতী নদীও বটে। *[দ্র. অচীরবতী]*

ঐরীড়ব একজন ঋষি। পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি ঐরীড়বের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৭]*

ঐলপত্র *[দ্র. এলাপত্র]*

ঐলবিল কুবেরের অপর নাম। মহাভারতে একাধিকবার কুবেরকে ঐলবিল বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৫.১০২.১০; ৫.১৩৯.১৪;
(হরি) ৫.৯৫.১০; ৫.১৩০.১৪]

কূর্ম পুরাণ অনুসারে পুলস্ত্য মুনির ঔরসে ঋষি তৃণবিন্দুর কন্যা ইলবিলার গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। ইলবিলার পুত্র বলে তিনি ঐলবিল নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। *[কূর্ম পু. ১.১৯.৯]*

ঐলিক পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় ঐলিক সেই গোত্রের অন্যতম। মহর্ষি ভৃগু থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও ভার্গব বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৫.২০]*

ঐলীন *[দ্র. ইলিন/ঈলিন]*

ঐশানী কালিকা পুরাণ মতে বাসুদেবের পূজায় বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, নরসিংহ এবং বরাহ—এই আটজন যোগী একত্রে অবস্থান করেন।

ঐশানী, বলভদ্র প্রভৃতির যোগিনীদের মধ্যে একজন। *[কালিকা পু. ৮০.১২৯]*

ঐশ্বর্য্য ভবিষ্যৎ দ্বিতীয় মন্বন্তরের মনু হবেন দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণি। ইনি রোহিত প্রজাপতি নামেও খ্যাত। তাঁর পুত্ররাই এই মন্বন্তরে দেবতা হবেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। রোহিত প্রজাপতির পুত্ররা মরীচি (অন্যমতে মরীচিগর্ভ), সুশর্মা এবং পার—এই তিনটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এর মধ্যে 'পার' গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্য একজন।

[বায়ু পু. ১০০.৬১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৫৭]

ঐষ্টিকবেদি দেবযজন ভূমিতে সোমযাগের আনুষঙ্গিক ইষ্টিযাগগুলি সম্পন্ন করার জন্য যে বেদি তৈরি করা হত, তার নামই ঐষ্টিক বেদি। ঐষ্টিক বেদির তিন পাশে তিনটি অগ্নিস্থান থাকত এবং ব্রহ্মা ইত্যাদি ঋত্বিকরা এই বেদির বিভিন্ন পাশে বসতেন। এই অগ্নিস্থানগুলিতে অধ্বর্যু নামক যজুর্বেদীয় ঋত্বিক দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবিরাহুতি দিতেন।

[রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র খণ্ড ২, পৃ. ৪৪]

ও

ও সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির থেকেই চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপতি মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্ট এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির ত্রয়োদশতম হল 'ও'কার বর্ণ। এই ও-কার বর্ণ থেকে উত্তম মনুর সৃষ্টি হয়েছিল। বায়ু পুরাণে অ থেকে ঔ পর্যন্ত চতুর্দশ বর্ণকে মূর্তিমান দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ও-কার পঞ্চবর্ণের সমন্বয়ে গঠিত ছিলেন বলে জানা যায়।

[বায়ু পু. ২৬.৪৫]

ওঘবতী ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ও পবিত্র একটি নদী। সরস্বতী নদী যে সাতটি রূপে প্রবাহিতা ওঘবতী তাদের মধ্যে অন্যতম—

রাজন্ সপ্তসরস্বত্যো যাভির্ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
আহূতা বলবদ্ভির্হি তত্র তত্র সরস্বতী।।
সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা।
সরস্বতী চোঘবতী সুরেণুর্বিমলোদকা।।

আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয় জাতীয় মানুষেরা ওঘবতীর জল পান করে জীবনধারণ করে। মহর্ষি বশিষ্ঠই কুরু রাজার যজ্ঞের সময় সরস্বতী নদীকে ওঘবতী নামে কুরুক্ষেত্রে আহ্বান করেছিলেন। এই নদী সেই পবিত্র ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত। *[মহা (k) ৬.৯.২২; ৯.৩৮.৪; ৯.৩৮.২৭; ৯.৬২.৩৯; (হরি) ৬.৯.২২; ৯.৩৬.৪; ৯.৩৬.২৭; ৯,৬২.৩৮]*

রাজা নৃগের পিতামহ ওঘবানের কন্যার নাম ছিল ওঘবতী। এক ব্রাহ্মণের আশীবাদে ওঘবান রাজার কন্যা ও বিদ্বান সুদর্শনের পত্নী ওঘবতীই জগৎকে পবিত্র করার জন্য নদীরূপ লাভ করেছিলেন।

সুদর্শন ও তাঁর পত্নী ওঘবতী কুরুক্ষেত্রে বাস করতেন। ধার্মিক সুদর্শন ওঘবতীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন যে, কোনো অতিথি তাঁদের গৃহে উপস্থিত হলে নিজের সমস্ত সম্পদ দিয়ে, এমনকী প্রয়োজনে অতিথির কাছে আত্মদান করেও প্রকৃত অতিথি সৎকার করতে হবে। একদিন সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ওঘবতী এক অভ্যাগত ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য হন। সুদর্শন সমস্ত ঘটনা জানার পরও অতিথি ব্রাহ্মণের প্রতি যথাযথ গৃহস্থের মতো ব্যবহার করেন। সুদর্শনের বিচক্ষণতা ও ওঘবতীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধতায় মুগ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁকে তপস্যা ও বেদপাঠের চলমানতার সাদৃশ্যে পবিত্র জলধারা—রূপে পৃথিবীতে প্রবাহিত হওয়ার বর দান করেন। তখন থেকেই রাজকন্যা ওঘবতীর অর্ধদেহ ওঘবতী নদী রূপে পৃথিবীতে প্রবাহিতা—

পাবনার্থঞ্চ লোকস্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা ভবিষ্যতি।।
অর্দ্ধেনৌঘবতী নাম ত্বামর্দ্ধেনানুযাস্যতি।

[মহা (k) ১৩.২.৩৭-৮৩; (হরি) ১৩.২.৩৭-৮৩; ভাগবত পু. ৯.২.১৮]

☐ কুরুবীর ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাণাহত অবস্থায় ওঘবতী নদীর তীরে শরশয্যা গ্রহণ করেছিলেন—

ততস্তে দদৃশুর্ভীষ্মং শরপ্রস্তরশায়িনম্।
স্বরশ্মিজালসংবীতসায়ং সূর্যসমপ্রভম্।।

[মহা (k) ১২.৫০.৭; (হরি) ১২.৪৯.৬]

☐ মৎস্য পুরাণে ওঘবতী নদীকে একটি পবিত্র তীর্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রাদ্ধকার্যের জন্য এটি উপযুক্ত। তবে মৎস্য পুরাণের পাঠে ঔঘবতী নামটি পাওয়া যায়। *[মৎস্য পু. ২২.৭১]*

☐ বামন পুরাণে উল্লেখ রয়েছে যে, ওঘবতী নদীও অনান্য নদীদের মতোই তাঁর অনুচরদের স্কন্দ-কার্তিকেয়র অনুচর রূপে দান করেছিলেন।

[বামন পু. ৫৭.৮৩]

☐ স্থাণুবট তীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত ওঘবতী নদীর তীরে পৃথূদক নামে এক বিখ্যাত তীর্থের অবস্থান। *[বামন পু. ৪৬.৫০; ৫৮.১১৫]*

☐ পণ্ডিত N.L. Dey ধারণা করেছেন যে, আপগা নদীরই আরেক নাম ওঘবতী। আবার তিনি নিজেই এ ধারণা সম্পর্কে ভিন্নমতও পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেছেন পৃথূদক (বা আধুনিক পেহোয়া), যা ওঘবতী নদীর তীরে অবস্থিত বলে মনে করা হয়, সে ধারণা সঠিক হলে ওঘবতী ও আপগাকে একাত্মক করে দেখা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মার্কণ্ড নামের নদীটি প্রাচীন

ওঘবতী হয়ে থাকতে পারে, কারণ এই মার্কণ্ড ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটেই পৃথূদক বা পেহোয়া অবস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যমুনার উপনদী মার্কণ্ডেরই প্রাচীন নাম ছিল অরুণা। অরুণার সঙ্গে সরস্বতীর মিলনস্থল অরুণা-সরস্বতী সঙ্গম নামে খ্যাত।

[GDAMI (Dey), p. 142]

ওঙ্কারপবন *[দ্র. ওঙ্কারভবন]*

ওঙ্কারভবন নর্মদা নদীর তীরবর্তী একটি পবিত্র পিতৃতীর্থ। এর অপর নাম ওঙ্কারেশ্বর। কিন্তু বায়ু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ওঙ্কারপবন নাম পাওয়া যায়। এটি শ্রাদ্ধকার্যের জন্য অত্যন্ত প্রশস্ত।

[মৎস্য পু. ২২.২৭; ১৮৬.২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.৭০; বায়ু পু. ৭৭.৬৮]

ওঙ্কারেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৫৭; স্কন্দ পু. (কাশী) ৩৩.১১৮]

ওজঃ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৩; (হরি) ১৩.১২৭.৪৩]

ওজস্$_{১}$ ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে বাসুদেব কৃষ্ণের ঔরসে লক্ষণার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে ওজস্ একজন।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৫]

ওজস্$_{২}$ একজন যক্ষ বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ১২.১১.৩৪]

ওজিষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে চাক্ষুষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হয়েছিলেন, পৃথুক সেগুলির মধ্যে একটি। এই পৃথুক গণের অন্তর্ভুক্ত একজন দেবতা হলেন ওজিষ্ঠ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৭৩]

ওড্র *[দ্র. উড্র]*

ওষধিপ্রস্থ হিমালয় পর্বতে অবস্থিত গিরিরাজ হিমালয়েরই কোলঘেঁষা একটি উপত্যকা নগরী। বৃষধ্বজ মহাদেব, ওষধিপ্রস্থের কাছে একটি গিরিশ্রেণীর উপর একবার অধিষ্ঠান করেছিলেন। স্থান-নাম শুনে মনে হয়, এই অঞ্চলে মানুষের প্রয়োজনীয় বহু ওষধি পাওয়া যেত।

[কালিকা পু. ১৮.১১৮, ৪২.২-৩]

ওজস্তেজোদ্যুতিধর মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বর্ণিত বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রের অন্তর্গত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৩; (হরি) ১৩.১২৭.৪৩]

ঔ

ঔ সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বরধ্বনি সৃষ্টি হয়। এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির থেকেই চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপতি মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মাসৃষ্ট এই চতুর্দশ স্বরধ্বনির শেষতম হল ঔ-কার বর্ণ। এই ঔ-কার বর্ণ থেকে সাবর্ণি মনুর সৃষ্টি হয়েছিল। বায়ু পুরাণে অ থেকে ঔ পর্যন্ত চতুর্দশ বর্ণকে মূর্তিমান দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মূর্তিমান ঔ-কার কর্বুর বর্ণ ছিলেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ২৬.৪৬]*

ঔক্ষি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি ঔক্ষির বংশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অর্থাৎ বংশ পরম্পরা অথবা শিষ্য পরম্পরায় মহর্ষি ঔক্ষি মহর্ষি ভৃগুর বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৪৩]*

ঔগজ মহর্ষি অঙ্গিরার বংশজাত ঋষিদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ঋষি ঔগজ বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বলে জানা যায়। *[বায়ু পু. ৫৯.১০২]*

ঔগ্রসেনী *[দ্র. উগ্রসেনা]*

ঔঘবতী *[দ্র. ওঘবতী]*

ঔক্ষ ইক্ষ্বাকুবংশে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের বংশধারায় বল রাজার পুত্র ছিলেন ঔক্ষ। ঔক্ষ বজ্রনাভ নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[বায়ু পু. ৮৮.২০৫]*

ঔচেয়ু যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশধারায় ভদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা ধৃতার গর্ভে দশ পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ভদ্রাশ্বের এই দশ পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ঔচেয়ু। রাজা ঔচেয়ু তক্ষকনাগের কন্যা জ্বলনাকে বিবাহ করেন। ঔচেয়ুর ঔরসে জ্বলনার গর্ভে রাজর্ষি রন্তিনার জন্মগ্রহণ করেন। *[মৎস্য পু. ৪৯.৫]*

ঔণ্ড্র বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থিত একটি জনপদ। *[মৎস্য পু. ১১৪.৫২]*

ঔৎকচেয় *[দ্র. উৎকচ]*

ঔৎকার্ষ্টেয় *[দ্র. উৎকৃষ্ট]*

ঔত্তম তৃতীয় মন্বন্তরের অধিপতি উত্তম মনু কোনো কোনো জায়গায় ঔত্তম মনু নামেও চিহ্নিত হয়েছেন। *[দ্র. উত্তম$_১$]*

ঔদক শব্দটি পুরাণে জলচর পক্ষীর অর্থ বহন করছে। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভে জাত কন্যাসন্তানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শুচি। এই শুচি ঔদক অর্থাৎ জলচর পক্ষীদের মাতা ছিলেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[বিষ্ণু পু. ১.২১.১৬]*

ঔদকা নরকাসুর শাসিত প্রাগজ্যোতিষপুরের জলবেষ্টিত একটি দুর্গ। এখানে নরকাসুরের একটি প্রাসাদ ছিল। সম্পূর্ণ ঔদকা জলবেষ্টিত হওয়ায় অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। সে কারণেই নরকাসুর এইস্থানে ষাট হাজার সুন্দরী রমণীকে সংগ্রহ করে বন্দি করেছিলেন। এটি আসামে মণি পর্বতের উপর অবস্থিত ছিল। পণ্ডিতরা মনে করেন মণি পর্বত বর্তমান আসাম রাজ্যের রাজধানী গুয়াহাটির কাছে অবস্থিত একটি পাহাড়। ফলে ঔদকাও গুয়াহাটির কাছেই অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়।
[মহা (গীতা প্রেস) ২.৩৮ পরবর্তী দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্র. পৃ. ৮০৫; EAIG (Kapoor) p. 87; Proceedings of North-East India History Association; Session 1993; p. 51]

ঔদার্য্য মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে সুরূপার গর্ভে দশজন সোমপায়ী, অঙ্গিরা-বংশীয় দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি অঙ্গিরার এই দশপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ঔদার্য্য। *[বায়ু পু. ৬৫.১০৫]*

ঔদুম্বর$_১$ একটি প্রাচীন জনজাতি। এই জনজাতির ক্ষত্রিয় রাজপুরুষদের যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হতে দেখা যায়। তাঁরা যজ্ঞের উপহারস্বরূপ যুধিষ্ঠিরকে প্রচুর ধনরত্ন দান করেন। *[মহা (k) ২.৫২.১৩; (হরি) ২.৫০.১৩]*

☐ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঔদুম্বরকে একটি মধ্যদেশীয় জনজাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৮.৯]*

☐ ঔদুম্বর জনজাতিটির অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। কানিংহ্যামের ধারণা-এঁরা মূলত বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত কচ্ছ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। অবশ্য K.C. Mishra প্রমুখের মতে,

প্রাচীনকালে ঔদুম্বরেরা বর্তমান হিমাচলপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত কাংড়া অঞ্চলের পূর্বাংশে বাস করতেন। তাঁদের মতে, ঔদুম্বর জনজাতিটি সেকালে হিমালয় পর্বত এবং তরাই অঞ্চলের জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক যোগসূত্রের তৈরি করার কাজটাই করতে পেরেছিলেন।

আধুনিক সময়ে কাংড়া, যা স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে বৃহত্তর পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা হয়, সেই কাংড়া থেকে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই মুদ্রাগুলিতে ঔদুম্বর জনজাতির উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায়। *[TAI (B.C. Law) p. 355; TIM (K.C. Mishra) p. 86]*

ঔদুম্বর$_{২}$ ভাগবত পুরাণে বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী তপস্বীদের যে চারটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে, ঔদুম্বর তাদের মধ্যে একটি শাখা। ঔদুম্বরের পরিবর্তে ঔড়ুম্বর পাঠও পাওয়া যায় কখনো কখনো। টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই ঔদুম্বর শাখার তপস্বীদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বলেছেন— যাঁরা সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই আহারের জন্য ফল-মূল সংগ্রহ করতে যান এবং তাই খেয়ে জীবনধারণ করেন—তাঁদেরই ঔদুম্বর বলা হয়—

ঔদুম্বরাঃ প্রাতরুত্থায় যাং দিশং প্রথমং
পশ্যন্তি তত আহৃতৈঃ ফলাদিভির্জীবন্তঃ।

[ভাগবত পু. ৩.১২.৪৩]

ঔদুম্বরী একটি পবিত্র তীর্থ। অগ্নি এইস্থানে ঋতুধাম নামে স্থাপিত।

[বায়ু পু. ২৯.২৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.২৪]

ঔদ্ভিদ$_{১}$ কুশদ্বীপের অন্তর্গত ছয়টি বর্ষ পর্বতের মধ্যে প্রথমটি। এটি দেবতা, গন্ধর্ব ও মানুষের ক্রীড়াস্থল। *[মহা (k) ৬.১২.১২; (হরি) ৬.১২.১২]*

ঔদ্ভিদ$_{২}$ কৃতমালা নদীসংলগ্ন একটি পর্বত। বহু প্রকারের উদ্ভিদের সঞ্চয় এখানে আছে বলেই এটির নাম ঔদ্ভিদ। পর্বতটিতে নানা ধরনের প্রাণী যেমন—বাঘ, সিংহ, হরিণ ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে দেখা যেতো।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩৫.১৭-২৯]

ঔদ্যানকতীর্থ এই পবিত্র তীর্থটির উল্লেখ পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়। *[পদ্ম পু. (স্বর্গ খণ্ড) (মহর্ষি) ৩৮.৭০]*

ঔপগব মৎস্য পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যে সব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি ঔপগবের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি ঔপগব বংশ পরম্পরা বা শিষ্য পরম্পরায় মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বলে মনে হয়।

[মৎস্য পু. ২০০.২]

ঔপদানবী *[দ্র. উপদানবী]*

ঔপনিষদ মহাভারতের শান্তিপর্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, চতুরাশ্রমের শেষতম আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের মূল আচরণীয় ধর্মই হল ঔপনিষদ ধর্ম—

চতুর্থশ্চৌপনিষদো ধর্মঃ সাধারণঃ স্মৃতঃ।

এই ঔপনিষদ ধর্মের অর্থ বোঝাতে গিয়ে টীকাকার নীলকণ্ঠ উপনিষদ থেকে উদ্ধার করেছেন—শান্তো দান্তো উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা'ত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—অর্থাৎ সন্ন্যাসী যখন শান্ত ভাবে ইন্দ্রিয় দমন করে ইহলৌকিক সমস্ত বিষয়ে নিরাসক্ত হবেন, তখনই সমাহিত অবস্থায় আত্মদর্শন সম্ভব। সেই আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শনই হল ঔপনিষদ ধর্ম।

ভাগবত পুরাণের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ তাঁরা বলেন ঔপনিষদ জ্ঞানকে অদ্বয় বা অদ্বিতীয় জ্ঞান বলা হয়। সেই জ্ঞানতত্ত্বকে কেউ ব্রহ্ম, কেউ পরমাত্মা এবং কেউ ভগবান বলে চিহ্নিত করেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এই শ্লোকে উল্লিখিত 'ব্রহ্ম' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখেছেন— ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি। অর্থাৎ যাঁরা ব্রহ্মানুসন্ধান করছেন তাদেরই ঔপনিষদ বলা হয়। বস্তুত উপনিষদগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'ব্রহ্ম' বলে, যাঁরাই ব্রহ্ম বিষয়ে ভাবনা করেন, সেই সম্প্রদায়কেই বলা হয় ঔপনিষদ।

[নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষদ ৬; ভাগবত পু. ১.২.১১ (শ্রীধর স্বামী টীকা দ্র.); মহা (k) ১২.২৪৪.১৫; (হরি) ১২.২৪১.১৫]

ঔপমন্যু ঋষি উপমন্যুর পুত্র অথবা শিষ্যরা ঔপমন্যু বা বহুবচনে ঔপমন্যব নামে চিহ্নিত হয়েছেন। ঔপমন্যুরা মূলত বৈদিক যুগে বৈয়াকরণ সম্প্রদায় হিসেবে খ্যাত ছিলেন। নিরুক্তকার যাস্ক বহু জায়গায় এই ঔপমন্যুদের মতামত উদ্ধৃত করেছেন। বায়ু পুরাণে গয়াসুরের পৃষ্ঠে ব্রহ্মা যে

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার এই যজ্ঞে ঔপমন্যুরাও অন্যতম হোতা ছিলেন। মৎস্য পুরাণ ঔপমন্যুদের নাম উল্লেখ করেছে মহর্ষি বশিষ্ঠ-এর গোত্রভুক্ত ঋষিবংশ হিসেবে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অবশ্য স্পষ্ট বলেছে যে, উপমন্যুর পুত্ররাই ঔপমন্যু নামে খ্যাতি লাভ করেন, বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত বলে এঁদের বাশিষ্ঠও বলা হয়।

[বায়ু পু. ১০৬.৩৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৮.৯৮; মৎস্য পু. ২০০.১১]

ঔপলোম মৎস্য পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি ঔপলোমের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি ঔপলোম বংশ পরম্পরা অথবা শিষ্য পরম্পরায় মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বলে মনে হয়। *[মৎস্য পু. ২০০.৩]*

ঔপস্থল মৎস্য পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি ঔপস্থলের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি ঔপস্থল বংশ পরম্পরা অথবা শিষ্য পরম্পরায় মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বলে মনে হয়।

[মৎস্য পু. ২০০.১৪]

ঔরস গান্ধারের নিকট অবস্থিত একটি জনপদ। এটি সিন্ধুনদের জলধারা দ্বারা সিঞ্চিত। জনপদটির আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কিছু জানা সম্ভব হয়নি। *[মৎস্য পু. ১২১.৪৬]*

ঔর্ব ভৃগুবংশজাত ঋষি। মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণগুলিতে মহর্ষি ঔর্বের জন্ম এবং জীবন সংক্রান্ত নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তবে ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ঔর্ব-র সব থেকে প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে। ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের একটি সূক্তে অগ্নি দেবতার উদ্দেশে ভৃগুগোত্রীয় ঋষিদের মন্ত্রোচ্চারণের সময় ভৃগুবংশীয় ঔর্ব-র নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐতশ নামে এক ঋষি সম্প্রদায়ের উল্লেখ মেলে যাদের পাপিষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণেও অনুরূপ উল্লেখ মেলে। লক্ষণীয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই ঐতশদের ঔর্ববংশীয় বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু কৌষীতকি ব্রাহ্মণে এদের সরাসরি ভৃগুবংশীয় বা ভার্গব বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থের এই প্রাচীন উল্লেখ থেকেই স্পষ্ট যে, মহর্ষি ঔর্ব এবং তাঁর বংশধররা মূলত ভৃগুবংশেরই একটি শাখা।

তৈত্তিরীয় সংহিতা থেকে জানা যায় যে, একসময় মহর্ষি অত্রির কৃপায় পুত্রার্থী ঔর্ব ঋষি সন্তান লাভ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে ঔর্ব-র বংশধরদের সঙ্গে অত্রি বংশেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করে নেওয়া যায়। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে একটি বাক্যে একত্রে দুজন ঔর্ব ঋষির উল্লেখ দেখে মনে হয় ব্রাহ্মণগ্রন্থের কালেই ঔর্ব এবং তাঁর বংশধর ও শিষ্যরা ঋষি হিসেবে যথেষ্টই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

[ঋগ্‌বেদ ৮.১০২.৪; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug ৬.৩৩; কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (Lindner) ৩০.৫; তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৭.১.৮.১; পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (caland) ২১.১০.৬]

□ বৈদিক গ্রন্থগুলি থেকে শুরু করে পুরাণ পর্যন্ত সর্বত্রই মহর্ষি ঔর্বকে ভৃগুবংশীয় ঋষি বলা হলেও মহাকাব্য পুরাণে ঔর্বের জন্ম পরিচয় বা পিতামাতার নাম নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মতভেদ খানিকটা বিভ্রান্তিও তৈরি করে।

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহর্ষি ভৃগুর সাত পুত্র সন্তানের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন ঔর্ব। আবার মহাভারতের আদিপর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে ভৃগুবংশীয় ঋষি চ্যবনের ঔরসে আরুষীর গর্ভজাত পুত্রছিলেন ঔর্ব। মহাভারতের আদিপর্বে ঔর্বের দশপুত্রের একতর হিসেবে জমদগ্নির নাম উল্লিখিত হয়েছে। যদিও মহাভারত এবং বেশির ভাগ পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী জমদগ্নি ছিলেন ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ঋচীকের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র।

পুরাণে, বিশেষত বায়ু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণে ভৃগুবংশের বংশলতিকা নিয়ে মহাভারতে যে সংশয় তৈরি হয়, তার একটা মোটামুটি সন্তোষজনক সমাধান মেলে। মৎস্য পুরাণ মতে, ভৃগুর দুই পুত্র—চ্যবন এবং আপ্নুবান্। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অবশ্য আপ্নুবানের পরিবর্তে আপ্রবান্ পাঠ মেলে। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পাঠ অনুযায়ী, ভৃগুর পুত্র চ্যবন এবং চ্যবনের দুই পুত্রের নাম যথাক্রমে আপ্নুবান্ (আপ্রবান) এবং দধীচি। চ্যবনের পুত্র আপ্নুবানের

পত্নী ছিলেন রুচি। আপ্নুবানের ঔরসে রুচির গর্ভে ঔর্ব জন্মগ্রহণ করেন। ঔর্বের পুত্র ঋচীক এবং ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। সেক্ষেত্রে মহর্ষি চ্যবন প্রকৃতপক্ষে ঔর্বর পিতামহ এবং স্বয়ং মহর্ষি ভৃগু ঔর্ব-র প্রপিতামহ। ঋষি হিসেবে ঔর্ব এতটাই বিখ্যাত ছিলেন যে ভৃগু বা চ্যবনের পুত্র হিসেবে তাঁর নাম পুরাণের কথক ঠাকুরের দ্বারা আরোপিত হয়ে যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। অপরদিকে, মহাভারতে জমদগ্নিকে ঔর্বের পুত্র বলায় যে সংশয় তৈরি হয় তারও সমাধান হয় পুরাণের বংশলতিকা থেকে। ঔর্ব প্রকৃতপক্ষে ঋচীকের পিতা, জমদগ্নির পিতামহ, সেক্ষেত্রে জমদগ্নির পিতৃত্ব তাঁর পিতামহের উপর আরোপিত হয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। পুরাণগুলিতে বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে ঔর্ব-র নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৫৫.১৬; ১.৬৬.৪৬, ৪৯; ১৩.৮৫.১২১; (হরি) ১.৫০.১৬; ১.৬১.৪৬, ৪৯; ১৩.৭৪.১২৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৯৫; ১.৩২.১০৫; ১.৩৮.২৭; বায়ু পু. ৫৯.৯৬; ৬৫.৯২; মৎস্য পু. ১৯৫.১৫-১৬]

□ মহর্ষি ঔর্বর জন্মের উপাখ্যানটিও অত্যন্ত বিচিত্র। পুরাকালে একসময় হৈহয়বংশীয় রাজাদের পুরোহিত ছিলেন ভৃগুবংশীয় ঋষিরা। হৈহয় রাজা কৃতবীর্য্য আপন রাজত্বকালে বহু যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং সেই যজ্ঞের দান-দক্ষিণা হিসেবে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্য তুলে দেন ভৃগুবংশীয় ঋষিদের হাতে। রাজা কৃতবীর্য্যের মৃত্যুর পর একসময় হৈহয় বংশীয়দের মধ্যে প্রচণ্ড অর্থাভাব দেখা দিল। তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের পুরোহিত ভৃগুরবংশীয় ঋষিরা প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তাই তাঁরা তখন ধনপ্রার্থী হয়ে ভৃগুবংশীয় ঋষিদের কাছে গেলেন। এদিকে ভৃগুবংশীয় ঋষিরা নিজেদের সম্পদ হৈহয়দের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা কেউ কেউ নিজের সম্পদ পুঁতে রাখলেন মাটির নীচে, কেউ বা ক্ষত্রিয়দের আক্রমণের ভয়ে তা বিলিয়ে দিলেন অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত হৈহয়রা একসময় মাটি খুঁড়ে কোনো এক ভৃগুবংশীয় ঋষির বিপুল সম্পদ উদ্ধার করলেন। তার পরেই আরও আরও সম্পদের লোভে হৈহয় তালজঙ্ঘরা ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করলেন। নির্বিচারে ভৃগুবংশীয়দের হত্যা করতে লাগলেন তাঁরা। এমনকী তাঁদের স্ত্রীরা, শিশু সন্তানরা, গর্ভস্থ ভ্রূণরা পর্যন্ত বাদ গেল না। আতঙ্কিত হয়ে ঔর্বের মাতা আপন গর্ভস্থ শিশুকে লুকিয়ে ফেললেন নিজে উরুতে, তারপর পালিয়ে গেলেন আশ্রম ছেড়ে। এদিকে হৈহয়রা ঔর্বর মাতাকেও হত্যা করবার জন্য খুঁজে বেড়াতে লাগলেন দিকে দিকে। একসময় তাঁকে খুঁজে পেয়েও গেলেন হৈহয়রা। ঠিক সেই সময়ই ঋষিপত্নীর উরুদেশ ভেদ করে জন্ম নিলেন ঔর্ব, যেন মূর্তিমান তেজঃপুঞ্জ। তাঁর সেই প্রচণ্ড তেজেই আক্রমণকারী হৈহয়রা অন্ধ হয়ে গেলেন। ভীত হয়ে তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন ঋষিপত্নীর কাছে, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার জন্য অনুনয়ও করতে লাগলেন কাতরস্বরে। দয়ালু ঋষিপত্নী তাঁদের নবজাত পুত্রের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। সদ্যোজাত ঋষিপুত্র তখন দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন ঠিকই কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রতি হৈহয়দের পাশবিক অত্যাচারের কথা তিনি ভুলতে পারলেন না। মাতার উরু ভেদ করে জন্মগ্রহণ করলেন বলে ঋষির নাম হল ঔর্ব। নিজের পূর্বপুরুষদের উপর হৈহয়দের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্রুদ্ধ ঔর্ব কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তাঁর তপস্যার তেজে ত্রিলোক সন্তপ্ত হয়ে উঠল। তা দেখে তাঁর স্বর্গত পূর্বপুরুষরা এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। তাঁরা ক্রোধ প্রশমন করার উপদেশ দিলেন ঔর্বকে। একথাও বললেন যে, আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হচ্ছে ক্ষত্রিয়রাই ঔর্বর পিতৃপুরুষদের বধ করেছেন, বাস্তবে কিন্তু ঠিক তা ঘটেনি। ভৃগুবংশীয় সেই ঋষিরা নিজেরাই মৃত্যু ইচ্ছা করছিলেন, অতি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পর প্রাণত্যাগ করতে চাইছিলেন তাঁরা। কিন্তু আত্মহত্যা পাপ, তাই তাঁরা হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়দের হাতে মৃত্যু ইচ্ছা করেছিলেন। পিতৃপুরুষদের কথা শুনে ঔর্ব বিস্মিত হলেন, খানিক শান্তও হলেন। তারপর বললেন— আমি ক্ষত্রিয়দের বধ করার প্রতিজ্ঞা করে তপস্যা আরম্ভ করেছি। আমার প্রতিজ্ঞা যাতে মিথ্যা না হয়, তার কোনো উপায় করুন আপনারা। তখন পিতৃলোক থেকে আগত ঔর্বর পূর্বপুরুষরা তাঁকে বললেন—প্রতিশোধের ভাবনা এবং কঠোর তপস্যার ফলে তোমার মধ্যে যে ক্রোধ রূপ অগ্নি

জন্ম নিয়েছে, সেই অগ্নিকে তুমি জলে নিক্ষেপ করো। জলই সমস্ত প্রাণীকুলের প্রতীক। তোমার ক্রোধাগ্নি জলে নিক্ষিপ্ত হলে ক্ষত্রিয় নাশ করার জন্য তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছ তা পূর্ণ হবে। একথা শুনে ঔর্ব তাঁর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করলেন মহাসমুদ্রে। ঔর্ব নামক সেই অগ্নি সমুদ্রের তলদেশে অশ্বী বা বড়বার রূপধারণ করে অবস্থান করেন এবং সমুদ্রের জল পান করেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৭৯-১৮০ অধ্যায়;
(হরি) ১.১৭১-১৭৩ অধ্যায়]

□ মহাভারতে মহর্ষি ঔর্ব এবং ঔর্ব নামক অগ্নির এই যে উপাখ্যান পাওয়া যায়, তার জন্ম কিন্তু ঋগ্‌বেদের মন্ত্র থেকেই। ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তে ভৃগুগোত্রীয় ঋষিদের মন্ত্রোচ্চারণের সময় ঔর্ব ঋষি এবং ঔর্ব অগ্নি একাকার হয়ে গিয়েছেন—

ঔর্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে।
অগ্নিং সমুদ্রবাসসং।

[ঋগ্‌বেদ ৮.১০২.৪]

□ তবে মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীর শেষে ঔর্ব ঋষি ক্রোধ প্রশমন করলেন বলে বর্ণনা করা হলেও মহাভারতেই অন্যত্র উল্লেখ পাওয়া যায় যে ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ঔর্ব ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে শস্ত্রধারণ করেছিলেন। অনুশাসনপর্বে ক্ষত্রিয়ের তুলনায় ব্রাহ্মণের তেজ এবং শক্তির আধিক্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহর্ষি ঔর্বের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি একাই নাকি তালজঙ্ঘবংশীয় ক্ষত্রিয়দের সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেন।

[মহা (k) ১৩.১৫৩.১১; (হরি) ১৩.১৩১.১১
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪৭.৭৯-৮৭]

□ পুরাণগুলিতে মহর্ষি ঔর্বের উপাখ্যান আরও একটু বিস্তারিত আকারে পাওয়া যায়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগরের পিতা বাহু বিলাসব্যসনে আসক্ত, রাজকার্যে মনোযোগহীন, অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁর অকর্মণ্যতার সুযোগে হৈহয় তালজঙ্ঘ এবং আরও বেশ কয়েকটি ক্ষত্রিয়কুল একত্রিত হয়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের রাজ্য আক্রমণ করেন। পরাজিত, রাজ্যচ্যুত বাহু তাঁর দুই পত্নীকে নিয়ে বনে চলে যান। বনে বাস করতে করতেই একসময় রাজা বাহুর মৃত্যু হয়। বাহুর পত্নী যাদবী স্বামীর চিতায় প্রাণ ত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু সেই বনে বাস করতেন মহর্ষি ঔর্ব। তিনিই এসে নিবৃত্ত করলেন রাজমহিষীকে। ঔর্ব বললেন—আপনার গর্ভে যে পুত্র রয়েছে, সে ইক্ষ্বাকুবংশের ভাবী রাজা। একদিন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর চক্রবর্তী সম্রাট হবে এই পুত্র। অতএব তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও আপনার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। রাজমহিষী আত্মহত্যার সংকল্প ত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন ঔর্বের আশ্রমে। ঔর্বের আশ্রমেই জন্ম নিলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগর। মহর্ষি ঔর্ব নিজে রাজপুত্রের জাতকর্ম সম্পন্ন করেন। সগরকে বেদ এবং অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাও দিলেন ঔর্ব নিজে। তারপর সগরের শিক্ষা সম্পন্ন হলে উপযুক্ত সময়ে ঔর্বই সগরকে হৈহয় তালজঙ্ঘদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দেন। ঔর্বের উপদেশে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সগর যুদ্ধযাত্রা করলেন। একে একে হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শক, যবন জাতি সগরের পদানত হল। লক্ষণীয়, হৈহয়, তালজঙ্ঘদের সঙ্গে ঔর্বর শত্রুতাও অত্যন্ত প্রাচীন। সগরের হাতে তাঁদের পরাজয়ের পিছনেও ঔর্বের অবদান ছিল যথেষ্টই। সুতরাং পুরাণের উপাখ্যান থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পিতৃপুরুষের উপদেশেই হোক বা অন্য কোনো কারণে—ঔর্বর ক্রোধ সাময়িকভাবে প্রশমিত হলেও তাঁর প্রতিশোধ স্পৃহা কখনোই পুরোপুরি শান্ত হয়নি।

[বায়ু পু. ৮৮.১২৩-১৪৩; বিষ্ণু পু. ৪.৩.১৫-২১;
শিব পু. ধর্ম ৬১.২৯-৪৩; ভাগবত পু. ৯.৮.২-৬]

□ পরবর্তী সময়ে সগর রাজার বংশধর পুত্র অসমঞ্জ এবং অন্য ষাট হাজার পুত্রও মহর্ষি ঔর্বের আশীর্বাদেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে পুরাণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৮৮.১৫৭-১৫৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৫৬-১৫৮]

□ সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞেও অন্যতম পুরোহিত হিসেবে ঔর্ব উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। *[ভাগবত পু. ৯.৮.৮, ৩১]*

□ পাণ্ডব অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত যখন প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের সংকল্প করেন, সেই সময় অন্যান্য ঋষি-মহর্ষিদের সঙ্গে ঔর্বও এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য।

[ভাগবত পু. ১.১৯.১০]

☐ পুরাণে মহর্ষি ঔর্বকে স্বারোচিষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ৯.৮]*

ঔষজিতি জনৈক ঋষি। পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি ঔষজিতির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৭]*

ঔষধ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৪৪; (হরি) ১৩.১২৭.৪৪]

ঔষধী মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, দেবী ভগবতী উত্তর কুরুতে ঔষধী নামে বিরাজমানা।

[মৎস্য পু. ১৩.৫০]

ঔষ্ট্রকর্ণ হ্লাদিনী নদীর তীরবর্তী একটি জনপদ। হ্লাদিনী নদী বলতে লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বশাখাকে বোঝানো হতো। পণ্ডিতরা মনে করেন আধুনিক ব্রহ্মপুত্র নদের উচ্চধারাটিই সেই শাখা। অর্থাৎ ঔষ্ট্রকর্ণ তীর্থটি পূর্ব হিমালয়ের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ছিল।

[দ্র. উষ্ট্রকর্ণ]

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৫৪;
EAIG (Kapoor) p. 168]

ঔষ্ণীক একটি যাযাবর উপজাতি, যাঁরা যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করে উপঢৌকনসহ তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। তবে এই জনজাতির বাসস্থান বা উৎপত্তি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

[মহা (k) ২.৫১.১৭; (হরি) ২.৪৯.১৪]

মৌল গ্রন্থপঞ্জী

- *অগ্নিপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৯৯
- *অগ্নিপুরাণ,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯০০
- *অথর্ববেদ সংহিতা ১-৪ খণ্ড,* সম্পাদনা: শঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত, বারাণসী: কৃষ্ণদাস আকাদেমি, ১৯৮৯
- *অথর্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৯ (১৯১৬)
- *অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৮ (১৯১৫)
- *অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ,* সম্পাদনা: শঙ্কররামশাস্ত্রী, মাদ্রাজ: বাল মনোরমা মুদ্রণালয়, ১৯৩৭

- *আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র,* গণেশ শাস্ত্রী গোখলে সম্পাদিত: পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯১৭
- *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী,* সম্পাদনা: বিনায়ক গণেশ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৩৬

- *ঋগ্বেদ সংহিতা প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড* (রমেশচন্দ্র দত্ত-এর অনুবাদ অবলম্বনে) সম্পাদনা: আব্দুল আজিজ আল আমান, কলকাতা: হরফ, আগস্ট ২০১

- *ঐতরেয় আরণ্যক, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯৮
- *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে ও কাশীনাথ শাস্ত্রী আগাশে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯৬

- *কালিকা পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, কার্তিক ১৩৮৪ (১৯৭৭)
- *কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩২৯ (১৯২৬)
- *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,* সম্পাদনা: রাধাগোবিন্দ বসাক, ১ম , ২য় খণ্ড, কলকাতা: ১৯৬৪

- *গরুড়পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, জৈষ্ঠ্য ১৩৯২ (১৯৮৫)
- *গীতগোবিন্দ* (পূজারীগোস্বামীকৃত টীকাসহ) উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত: কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৯২৮
- *গোপথ ব্রাহ্মণ,* সম্পাদনা: বিজয়পাল বিদ্যাবারিধি, কলকাতা: সাবিত্রী দেবী বাগড়িয়া ট্রাস্ট ১৯৫০

- *চরকসংহিতা আদ্য খণ্ড-তৃতীয় খণ্ড,* সম্পাদনা: নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত, কলকাতা: ধন্বন্তরি স্টীম প্রেস, ১৯০৬-১৯০৭
- *চৈতন্যচরিতামৃত,* রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত: কলিকাতা: ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ভাণ্ডার, ১৩৫৫-১৩৬০ বঙ্গাব্দ (খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৮-১৯৫৩)

- *ছান্দোগ্যোপনিষদ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার, ১৩৩৩ (১৯২৬)

- জৈমিনীয় ন্যায়মালা মাধবাচার্য রচিত টীকা সহ, *আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী গ্রন্থ ২৪,* সম্পাদনা: গঙ্গাধর বাপুজি কালে পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রাণালয়, ১৯৪৬

- *দেবী পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪০০ (১৯৯৩)
- *দেবীভাগবত পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৪০১ (১৯৯৪)

- *পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, মাঘ ১৪২০ (২০১৩)
- *পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগসার),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স
- *পদ্মপুরাণ (পাতাল খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, জৈষ্ঠ্য ১৪০২ (১৯৯৫)
- *পদ্মপুরাণ (ব্রহ্ম খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, রথযাত্রা ১৪১৬ (২০০৯)
- *পদ্মপুরাণ (ভূমি খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৭ (১৯৯০)
- *পদ্মপুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪১২ (২০০৫)
- *পদ্মপুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, মাঘ ১৩৯৬ (১৯৮৯)
- *পাতঞ্জল দর্শন,* সম্পাদনা: হরিহরানন্দ আরণ্য, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৮ (ষষ্ঠ সংস্করণ)
- *পাতঞ্জল দর্শন,* সম্পাদনা: হরিহরানন্দ আরণ্য, ধর্মমেঘ প্রকাশ ব্রহ্মচারী কর্তৃক কপিলাশ্রম থেকে প্রকাশিত, হুগলী: ১৯২৫
- *পাতঞ্জলদর্শনম্,* বাচস্পতি মিশ্র কৃত তত্ত্ববৈশারদীটীকা সহ, দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত: কলকাতা: সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (১৯৪৭)
- *পাতঞ্জল যোগদর্শন,* সম্পাদনা: হরিহরানন্দ আরণ্য, ধর্মমেঘ আরণ্য ও রায় যজ্ঞেশ্বর বাহাদুর, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮
- পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, *মেঘদূত পরিচয়,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৩৬
- *পুরুষোত্তমদেবকৃত একাক্ষরকোষ,* Asiatic Society MS. No. G 5291 Fol. 1

- *বরাহপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪০১ (১৯৯৪)
- *বামনপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৬ (১৯৮৯)
- *বায়ুপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৩৯৭ (১৯৯০)
- *বায়ুপুরাণ,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯০৫
- বাসুদেবশরণ অগ্রবাল, *ভারত সাবিত্রী খণ্ড ১-৩,* দিল্লী: সৎসাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৫৭
- *বিষ্ণুপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪১৭ (২০১০)
- *বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১-৮ খণ্ড,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩২২ (১৯১৯) - ১৩২৪ (১৯২১)
- *বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২য় খণ্ড,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ, কলকাতা: ক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদার, ১৩৪০ (১৯৩৩)

- *বৃহন্নারদীয় পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৬ (১৯৮৯)
- *বেতাল পঞ্চবিংশতি,* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কলকাতা: সংস্কৃত প্রেস, ১৮৫৮
- *বেদান্তদর্শনম্,* সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, কলিকাতা: ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার, ১ম খণ্ড ১৯৬৯, (পুণর্মুদ্রণ), ২য় খণ্ড, ১৯৫১, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৩
- *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, খণ্ড ১-২, সম্পাদনা: বিনায়ক গণেশ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৩৫
- *ব্রহ্মসূত্র,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯১১
- *ব্রহ্মসূত্র,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, খণ্ড ১, সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮২০
- *ব্রহ্মসূত্র,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, খণ্ড ২, সম্পাদনা: মহাদেব চিমণাজী আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯১
- *ব্রহ্মসূত্র সিদ্ধান্ত মুক্তাবলি,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, সম্পাদনা: বিনায়ক গণেশ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৪২
- *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৬ (১৯৮৯)
- *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯৫

- *ভবিষ্য পুরাণ,* সম্পাদনা: ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস, মুম্বই: বেঙ্কটেশ্বর স্টীম প্রেস, ১৯৫৯
- *ভাগবত পুরাণ ১-১২ খণ্ড,* সম্পাদনা: সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, কলকাতা: সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ, ১৪০৩ (১৯৯৬)

- *মৎস্য পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৫ (১৯৮৮)
- *মনুসংহিতা,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯৭ (১৯৯০)
- *মহাভারত, আদিপর্ব-খিলহরিবংশপর্ব,* সম্পাদনা: রামচন্দ্রশাস্ত্রী কিঞ্জাওয়াদেকর, পুণা: চিত্রশালা প্রেস, ১৯০৭-১৯৩৬; পুণর্মুদণ: Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi: 1979
- *মহাভারত, আদিপর্ব-ভীষ্মপর্ব,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য, কলকাতা: নটবর চক্রবর্তী, ১৮৩৭
- *মহাভারত, দ্রোণপর্ব-স্বর্গারোহণপর্ব,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য, কলকাতা: নুটবিহারি রায়, ১৮৮৩
- *মহাভারত, পঞ্চম খণ্ড শান্তিপর্ব,* সম্পাদনা: রামনারায়ণদত্ত শাস্ত্রী, গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস
- *মহাভারত ১-৪৩ খণ্ড,* হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য অনুদিত, কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৩-১৪০০ বঙ্গাব্দ (১৯৭৬-১৯৯৩)
- *মার্কণ্ডেয় পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৩৯০ (১৯৮৩)
- *মৈত্রায়ণী-সংহিতা,* সম্পাদনা: দামোদরভট্ট সাতবলেকর, ভারত: মুদ্রণালয়, ১৯৪১

- *যজুর্বেদীয় কঠোপনিষৎ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৮ (১৯১৫)
- *যুক্তিদীপিকা,* যদুপতি ত্রিপাঠী শাস্ত্রী সম্পাদিত: কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১

- *রামায়ণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, সংগ্রহ, অভিজিৎ শীল, কলকাতা: বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, আষাঢ় ১৪০৭ (২০০০)

- *লঘুভাগবতামৃত* (শ্রীরূপগোস্বামীকৃত), বলাইচাঁদ গোস্বামী এবং অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত: কলকাতা: সিমুলীয়া, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী লেন, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ (১৮৯৭)

- *লিঙ্গপুরাণ,* অনুবাদ: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৬ (১৯৮৯)

- *শতপথ ব্রাহ্মণ,* Albrecht Weber সম্পাদিত, বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৯৭
- *শব্দকল্পদ্রুম ১-৫ খণ্ড,* রাধাকান্তদেব, দিল্লী: মোতিলাল বানারসীদাস, ২০০৯ (১৮৮৬)
- *শাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণ,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুনা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯১১
- *শিবপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, পরিদৃষ্ট, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪১৬ (২০০৯)
- *শুক্ল-যর্জুর্বেদীয় ঈশোপনিষৎ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৮ (১৯১৫)
- *শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, শাঙ্করভাষ্যসমেত,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৫৪
- *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* স্বামী ভাবঘনানন্দ অনূদিত, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮

- *ষড়বিংশব্রাহ্মণ, সায়নাচার্যকৃত টীকাসহ,* খণ্ড ১-১২, সম্পাদনা: রামচন্দ্র শর্মা, বেদার্থ প্রকাশন, তিরুপতি: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, ১৯৮৩

- *সপ্তশতীসংগ্রহ (গাথা সপ্তশতী),* সম্পাদনা: রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী, নতুন দিল্লী: রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০১২
- সম্পাদনা: তারানাথ তর্কবাচস্পতি, *বাচস্পত্যম্,* খণ্ড ১, কলকাতা: ১৮৭৩
- সম্পাদনা: তারানাথ তর্কবাচস্পতি, *বাচস্পত্যম্,* খণ্ড ২-৬ (চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ), বেনারস: ১৯৬২
- *সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী,* সম্পাদনা: নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৪
- *সাংখ্যদর্শনম্,* ব্যাখ্যানুবাদ, কালীবর বেদান্ত বাগীশ, সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৯৫১
- *সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ বা কেনোপনিষৎ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৮ (১৯১৫)
- *সামবেদ সংহিতা,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: পরিতোষ ঠাকুর, কলকাতা: হরফ, আগস্ট ২০১১/ *অথর্ববেদ-সংহিতা,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: বিজনবিহারী গোস্বামী, কলকাতা: হরফ, আগস্ট ২০১১/ *যজুর্বেদ-সংহিতা,* শুক্ল ও কৃষ্ণ, অনুবাদ ও সম্পাদনা: বিজনবিহারী গোস্বামী, কলকাতা: হরফ, আগস্ট ২০১১
- *সুশ্রুতসংহিতা,* খণ্ড ১-৪, সম্পাদনা: মুরলীধর শর্মা, মুম্বই: বেঙ্কটেশ্বর স্টীম প্রেস, ১৮৩৩-১৯৫৩
- *সৌরপুরাণ,* সম্পাদনা: বিনায়ক গণেশ আপটে, আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯২৪
- *স্কন্দ পুরাণ ১-৭ খণ্ড,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৭ (১৯৯০)
- *স্মৃতি সন্দর্ভ, ১ম-৫ম খণ্ড,* কলকাতা: ১৯৫২-১৯৫৫

- *হরিবংশ পুরাণ,* সম্পাদনা: সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, কলকাতা: আর্যশাস্ত্র, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৮৪ (১৯৭৭)

- *Agnimahapuranam Vol. 1-2,* Ed. K.L Joshi, Delhi: Parimal Publications, 2010
- *Ahirbudhnya Samhita,* Ed. F. Otto Schrader, Madras: Adyar Library, 1916
- *Aitareya Aranyaka,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/

- *Aitareya Brahman,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Aitareyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series, Book 11,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1931
- *Amarakośa Vol 1-3,* Ed. A.A. Ramanathan, Madras: The Adyar Library and Research Centre, 1971-1983
- *Amarakośa,* Ed. Raghunath Sastri Talekar, Bombay: Government Central Book Depot, 1907
- *An English Translation of the Sushruta Samhita, Vol 1-3,* Ed. Kaviraj Kunjalal Bhihsagratna, Calcutta: 1907-1916
- *Atharvaveda Samhita,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection, (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Atharva-veda Saṃhitā,Vol 1-2, Harvard Oriental Series Vol 8,* Translated by W.D. Whitney, Ed. Charles Rockwell Lanman, Cambridge: Harvard University Press, 1905
- *Atharvaveda,* Maurice Bloomfield, K.J. Trübner, 1899
- *Atharva-Veda-Samhita,* Ed. R. Roth and W.D. Whitney, Berlin: Fred. Dummler's Verbagsbuchhaudlung, 1856
- *Athrvadveda Samhita, Vol 1-2,* Sriram Sharma Acharya, Haridwar: Brahmabarchas, 2002

- *Baudhāyana Śrauta Sūtra ,Vol 1-3,* Ed. W.Caland, Calcutta: Asiatic Society, 1904-1913
- *Bhagavata Purana Book 1-12,* Ed. Krishnashankar Shastri,Shrimadbhagavata Vidyapith, Ahmedabad: 1965-1975
- *Bharata-Savitri Vol-1-3,* Vasudev Sharan Agrawala, New Delhi: Satsahitya Prakashan, 1957-196
- *Bhava Prakash Nighantu,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Brahma-Sutras,* Ed. Vireswarananda, Almora: Advaita Ashrama, 1936
- *Brihadaranyaka- Upanishad, Part 1,* Translated by Sris Chandra Vasu in the Sacred Books of the Hindus Vol 14, General Editor B.D.Basu, Allahabad: Indian Press 1913
- *Brihadaranyakopanishad with Commentary of Anandagiri, Vol 1-3, in Anandashrama Sanskrit Series Book 16,* Ed. Mahadeb Chimnaji Apte, Poona: Anandashrama Press, 1891-1893
- *Brihaspati Sutra,* Ed. F.W.Thomas, Lahore: Punjab Sanskrit Series, 1921
- *Buddhacharita of Asvaghosha,* Translated and Ed. by E.H. Johnston, University of Punjab, Lahore: Calcutta Baptist Mission Press, 1933
- *Buddha-charitam,* Ed. Nandargikar, Poona: Aryabhushan Press, 1911
- *Buddhist Suttas,* Translated by T.W. Rhys Davids in the *Sacred Books of the East Vol 11,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1881

- *Chandogyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 14,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1934
- *Charakasamhita by Agniveśa,* Ed. Vaidya Yadavji Trikamji Acharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1935
- *Chhandogya Aranyaka,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Chhandogya Brahmana,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Chhandogyopanishad with Commentary of Ramanuja in Anandashrama Sanskrit Series Book 63,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1910

- *Dharmasūtras The Law Codes of Āpastamba Gautama Baudhāyana and Vasiṣṭha, Annoted Text and Translation* by Patrick Olivelle, Delhi: Motilal Banarsidass, 2000
- *Dhvanyaloka of Anandavardhana,* Ed. K. Krishnamoorthy, Dharwar: Karnatak University, 1974

- Ed. B.D. Basu, *The Sacred Books of the Hindus (the Sukraniti) Vol 13,* Allahabad: 1914
- Ed. Bhimacharya, *Nyāyakośa (Vol 1),* Bombay: Nirnaya-Sagara Press,1928
- Ed. Bimalacarya Jhalakikar, *Nyāyakośa* , Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1928
- Ed. by F. Max Muller, *The Sacred Books of the East Vol 19,* 27, Oxford: 1883,1885
- Ed. F. Max Muller, *Buddhist Mahāyāna Texts,* Part 1-2 in The Sacred Books of the East Vol-49, Oxford: 1985-1894
- Ed. F. Max Muller, *The Sacred Books of the East Vol-43-44,* Oxford: 1897-1900
- Ed. F. Max Muller, *The Sacred Books of the East: The Satapatha Brahmana* (translated by Julius Eggling) Part1-5, Vol.12,26,43,44; Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd, 2011(First published by Clarendon Press, 1885)
- Ed. K.V. Rangaswami, *Aiyangar Kṛtyakalpataru of Bhatta Laksmidhara,* Baroda: Oriental Institute, 1942
- Ed. S.R Sehgal, *Shankhayana Grihyasutram,* Delhi: Satguru Publications, 1987

- *Gobhilagṛhyasūtram, with Commentary of Bhaṭṭanārāyana,* Ed. Chintamani Bhattacharya, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1936
- *Gopatha Brahmana;* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/

- *Haracaritacintāmaṇi* by Bopadeva with a Commentary of Madhusudana Saraswati and Srimad Bhagavata (First Sloka) with Paramhamsapriya Commentary, Ed. Devi Datta Upadhyaya, Benaras: Chowkhamba Sanskrit Series, 1933

- *Hymns of the Athava-Veda,* Translated by Maurice Bloomfield in *The Sacred Books of the East Vol-42,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1897

- *Isavasya Upanishad in Anandashrama Sanskrit Series Book 5,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1905

- *Jaimini Talavakara Brahmana,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Jaiminiya Aranyaka;* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Jaiminiya Nyāya Mālā Vistara with Commentary of Madhvacharya,* Ed. Theodor Goldstucker, London: Trubner & Co. 1865
- *Jaina Sutra Part 1,* Translated by Hermann Jacobi in *The Sacred Books of the East Vol- 22,* Ed. F. Max Muller, Delhi: Motilal Banarsidass, 1980
  Jaina Sutras, Part 2, Translated by Hermann Jacobi in *The Sacred Books of the East Vol- 45,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1895
- *Jayadeva's Gitagovinda,* Ed Barbara Stoler Miller, Delhi: Motilal Banarsidass, 1984
- *Jīva Vicāra Prakaraṇam with Pathaka Ratnakara's Commentary,* Ed. Ratna-Prabha Vijaya, Ahmedabad: Sri Jaina Siddhanta Society, 1950

- K.S. Ramaswami Sastri, *The Dharmasastras and The Dharmasastras,* Tirupati: Tirumala-Tirupati Devasthanams Press; 1952
- *Kalhana's Rājatarañginī : A Chronicles of the Kings of Kashmir Vol.1, Book 1-7,* Ed. by M.A Stein, Westminster; 1900
- *Kalhana's Rājatarañginī : A Chronicles of the Kings of Kashmir Vol 2,* Ed. by M.A Stein, Bombay: Education Society Press, 1892
- *Kalhana's Rājatarañginī, Vol 2,* Ed. by M.A Stein, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 1900 (first edition)
- *Kālidāsa: Abhijñāna – Śakuntalam,* Ed. Ramendra Mohan Bose, Calcutta: Modern Book Agency Pvt. Ltd. 1950
- *Kalkipurāṇam, in Sarasvati Bhavana Granthamala,* Ed. Asoke Chatterjee Sastri, Varanasi: 1972
- *Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā,* Ed. Raghu Vira, Lahore: Sanskrit Book Depot, 1932
- *Kāśikā: A Commentary on Panini's Grammatical Aphorism,* by Jayaditya, Ed. Bala Sastri, Benares: 1876
- *Kathaka Brahman,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Kathaka Samhita,* Ed. Leopold von Schroeder, Leipzig: In Commission Bei F.A.Brockhaus, 1900
- *Kathakopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 7,* Ed. Vinayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1935

- *Kathasaritsagara,* Ed. Durgaprasad and Kashinath Pandurang Parab, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1893
- *Kātyāyana Śrautasutrawith a Commentary of Karkacharya,* Ed. Madanmohan Pathak, Benaras: Chowkhamba Sanskrit Book Depot, 1903
- *Kaula and other Upanishads in Tantrik Texts (Vol 11),* Ed. Sitarama Sastri, General Ed. Arthur Avalon, Calcutta: Agamanusandhana Samiti, 1922
- *Kautiliya Arthashastra,* Ed. Vishvanath Shastri Datara, Varanasi: Sampurnanand Sanskrit University, 1991
- *Kautilya's Arthasastra,* Ed. R. Shamasastry, Bangalore: The Govt Printing Press, 1915
- *Kautilya's Arthasastra,* Ed. R. Shamasastry, Mysore: Sri Raghuveer Printing Press, 1951
- *Kenopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 6,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press,1909
- *Krishnayajurvedia Taittiriya Samhita , Vol 1-2,* Ed. Vinayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1940
- *Krishnayajurvedia Taittiriya Samhita, Vol 1-8,* Ed. Mahadev Chimnaji Apte, Poona: Anandashrama Press, 1947-1949

- *Lalitopakhyana (from the Uttarakhanda of Brahmandapurana;* Ed. T.N.K. Tirumulpad, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1918
- *Linga Mahapurana (Translated by Shanti Lal Nagar) Vol. 1-2,* Delhi: Parimal Publications, 2011

- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Asvamedhikparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1910
- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Karnaparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1907
- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Udyogaparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1907
- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Vanaparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1908
- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Adiparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1906
- *Mahabharata (Translation according to M.N Dutt) Vol 1-9,* Delhi: Parimal Publications, 2008
- *Maitrāyani Samhitā Vol 4,* Ed. Leopold Von Schroeder, Leipzig, 1886
- *Maitrāyani Samhitā,* Ed. Leopold Von Schroeder, Leipzig, 1881
- *Maitrāyani Samhitā,* Ed. Satvalekar and P. Shripada Damodara, Satara: Bharatmudranalaya, 1941
- *Maitrāyani Samhitā,* Vol 3-4, Ed. Leopold Von Schroeder; Leipzig; 1923
- *Maitravaniya Aranyaka,* Maharishi University of Management Vedic Literature

Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/

- *Mānava Dharma Śāstra,* Ed. Vishvanath Narayan Mandlik, Bombay: Ganpat Krishnaji's Press, 1886
- *Manava-Srauta-Sutra Vol-1-5,* Ed. Friedrich Knauer, ST-Petersbourg: 1900
- *Mandukyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 10,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1921
- *Medini by Medinicara,* Ed. Somanatha Mukhopadhyaya, Calcutta, 1869
- *Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary,* Motilal Banarsidass, New Delhi: 2004 (First Edition: Oxford: Clarendon Press, 1872)
- *Muṇḍaka Upanisad,* Ed. Sirsa Chandra Vasu in the *Sacred Books of the Hindus Vol 1,* General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1909
- *Mundakopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 9,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1935

- *Nāradīya Dharma Śāstra,* ed. Julius Jolly, London: Turbner & Co, 1876
- *Nārāyaṇīya of Narayana Bhatta with the Commentary Bhaktapriya of Desamangalavarya,* Ed. T. Ganapati Sastri, Trivandrum: 1912
- *Nāṭyadarpaṇa,* G.K. Shigondekar and Gajanan Kushaba, Baroda: Oriental Institute, 1929
- *Natyasastra of Bharata Muni,* Ed. Sivadatta and Kasinath Pandurang Parab, Bombay: Nirnaya Sagara Press, 1894
- *Natyasastra of Bharatamuni Vol 1-3,* Ed. M. Ramkrishna Kavi, Baroda: Oriental Institute, 1934-1956
- *Nirukta by Maharshi Yaskacharya Vol-1-4, With a Commentary* by Bhagwat Durgacharya, Calcutta: 1952- 1953
- *Nitiprakashika,* Ed. T. Chandrasekharan, Madras: Govt. Press, 1953
- *Nrisimhapurvottaratapaniyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 30,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandrashrama Press, 1929

- *Padmapurana Vol 1-5,* Ed. Mahadev Chimanaji Apte, Anandrasrm Sanskrit Series: 1894
- *Pañcaviṃśa Brāhmana,* Translated by W. Caland, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1931
- *Patanjali's Yoga Sutras,* Translated by Rama Prasada in the *Sacred Books of the Hindus Vol 4,* General Editor: B.D.Basu, Allahabad: 1924
- *Prasnopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1911
- *Prasnopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 8;* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1932

- *Ṛgveda Brahmanas: The Aitareya and Kausitaki Brahmanas,* Translated by A.B. Keith, Cambridge: Harvard University Press, 1920
- *Ṛgveda Saṃhitā with the commentary of Sayanacharya Vol1-10,* Ed. N.S. Sontakke & C.G. Kashikar, Poona: Vedic Research Institute, 1933-1979
- *Richard Garbe, Samkhya-Sutra-vritti or Aniruddha's commentary and the original parts of Vedantin Mahadeva's commentary to Samkhya Sutras,* Calcutta: J.W. Thomas, Baptist Mission Press, 1988
- *Rig-Veda-Samhita The Sacred Hymns of the Brahamans together with the Commentary of Sayanacarya, Vol 1-4,* Ed. F. Max Muller, London: Oxford University Press, 1890-92

- Sanātana Dharma, *An Advanced Text Book of Hindu Religion and Ethics,* Benares: The Board of Trustees, 1903
- *Śāñkhayana Śrauta Sūtra, Together with the Commentary of Varadattasuta Ānartiya, Vol 2,* Ed. Alfred Hillebrandt, Calcutta: The Baptist Mission Press, 1891
- *Śāñkhayana Śrauta Sūtra, Together with the Commentary of Varadattasuta Ānartiya, Vol 2,* Ed. Alfred Hillebrandt, Calcutta: The Baptist Mission Press, 1891
- *Śāñkhayana Śrauta Sūtra, Together with the Commentary of Varadattasuta Ānartiya, Vol 3,* Ed. Alfred Hillebrandt, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1897
- *Śāñkhayana Śrauta Sūtra, translated in English* by W. Caland, Ed. Lokesh Chandra, Nagpur: The International Academy of Indian Culture, 1953
- *Sankhyayana Aranyaka;* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Sarada-Tilaka Tantram,* Ed. Arthur Avalon, Delhi: Motilal Banarsidass,1982
- *Sarvadarshanasamgraha with Commentary of Madhavacharya,* Ed. by Vinayak Ganesh Apte, *Anandashram Sanskrit Series Vol. 81,* Poona: Anandashram Press, 1950
- *Śatapatha Brāhmana , Part 1-3,* Translated by Julius Eggeling in *The Sacred Books of the East Vol- 12,* Ed. F. Max Muller; Delhi: Motilal Banarsidass; 1963
- *Śatapatha Brāhmana , Part 2,* Translated by Julius Eggeling in *The Sacred Books of the East Vol- 26,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1885
- *Shadvimsha Brahman,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- Shankaracharya Bhagavatapada, *The Vivekacudamani,* Ed. John Grimes,
- *Shvetashvatara Upanishad in Anandashrama Sanskrit Series Book 17,* Ed. Vinayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1927
- *Śrī Lalitā Sahasranāma,* D.S.Sharma, Madras: The Madras Law Journal Office, 1961
- *Sribhasya of Ramanujacharya Vol 1,* Translated by M. Rangacharya and M.B.V. Aiyangar, Madras: Educational Publication Company, 1961-65
- *Srimadbhagavadgita with the Commentaries,* Ed. Vasudev Laxman Shastri Pansikar, Bombay: Nirnaya Sagara Press, 1912

- *Srngaramanjari of Akbar Shah,* Ed. V. Raghavan, Madras: Hyderabad Govt. 1951
- *Śukra Nīti Sāra Part 1-2,* Translated by Benoy Kumar Sarkar in the *Sacred Books of the Hindus Vol 13,* General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1913
- *Sushrutasamhita,* Ed. Khemraj Shrikrishnadasshresthi, Bombay: Shri Venkateshvara Steam Press, 1911

- *Taittiriya Aranyaka with the Commentary of Bhattabhaskara Misra Vol 1-2,* Ed. Mahadeva Sastri, and K. Rangacharya, Mysore: Government Branch Press, 1900
- *Taittiriya Aranyaka, Vol 1,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1898
- *Taittiriya Aranyaka, Vol 2,* Ed. Vinayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1927
- *Taittiriya Aranyaka:* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Taittiriya Brahman,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Taittiriya Samhita, Vol 1-6,* Ed. Richard Garbe, Calcutta: Asiatic Society, 1882-1889
- *Taittiriyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 12,* Ed. Mahadeb Chimnaji Apte, Poona: Anandrashrama Press, 1889
- *Taittiriyopanishad with Commentary of Sureswaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 13,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandrashrama Press, 1911
- *Tandyamahabrahmana,* Ed: A. Chinnaswami Sastri, Banaras: The Chowkhamba Sanskrit Series Office,1936
- *Tāṇḍyamahābrāhmaṇa with Commentary of Sayana Acharya Vol 1-2;* Ed. Anandachandra Vedantavagisa, Calcutta: The New Sunskrit Press, 1870
- *Tāṇḍyamahābrāhmaṇa, belonging to the Sama Veda with the Commentary of Sayanacharya Part 1-2,* Ed. A. Chinnaswami Sastri, Benares: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1935-36
- *The Aitareya Brahmana Vol 1,* Ed. Acarya Satyavrata Samarsrami, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1895
- *The Aitareya Brahmana Vol 1,* Ed.R.Anantakrishna Sastri, Trivandrum: University of Travancore, 1942
- *The Aitareya Brahmana Vol 1-2,* Ed. Martin Haug, London: Turbner & Co. 1863
- *The Aitareya Brahmana Vol 2,* Ed. Acarya Satyavrata Samarsrami, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1896
- *The Aitareya Brahmana Vol 3,* Ed. Acarya Satyavrata Samarsrami, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1890
- *The Aitareya Brahmana Vol 4,* Ed. Acarya Satyavrata Samarsrami, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1906
- *The Aitareya Brahmanam with the Bhashya of Shrimat Sayanacharya,* Ed. Kasinath Sastry Agase, Poona: Anandashrama Press, 1896

- *The Anguttara-Nikaya, Part 1-5,* Ed. Richard Morris, London: The Pali Text Society, 1885-1900
- *The Atharvaveda,* M. Bloomfield, Strassburg: Verlag Von Karl J. Trubner, 1899
- *The Bhagavad-Gita with Eleven Commentaries,* Ed. Shastri Gajanana Shambhu Sadhale, Bombay: Gujarati Printing Press, 1935
- *The Bhagavadgita with the Sanatsujatiya and the Anugita,* Translated by Kashinath Trimbak Telang in the *Sacred Books of the East Vol 8,* Ed. E. Max Muller, Oxford: 1882
- *The Brahmanda Purana,* (Translated and annotated by Ganesh Vasudeo Tagare); *Ancient Indian Tradition & Mythology* (Ed: J.L. Saastri), Delhi: Motilal Banarsidass, 1999
- *The Brahmasūtra Śāñkara Bhāṣya with the Commentaries of Bhamati, Kalpataru and Parimala,* Ed. Anantkrisna Sastri, Bombay: Nirnaya Sagara Press, 1938
- *The Bṛhaddevatā attributed to Śaunaka (Part 1) in the Harvard Oriental Series Vol 5,* Ed by A.A. Macdonell, General Ed. C.R. Lanman, The Harvard University Press, 1904
- *The Gitagovinda by Jayadeva Goswami,* Ed. Jibanananda Vidyasagara, Calcutta: Sanskrit College, 1882
- *The Gopatha Brahmana,* Ed. Rajendralala Mitra and Harachandra Vidyabhusana; Calcutta: The Ganesa Press, 1872
- *The Great Liberation (Mahânirvâna Tantra),* Translated by Arthur Avalon, Madras, Ganesh & Co. 1953
- *The Grihya Sutra Part 2,* Translated by Hermann Oldenberg in *The Sacred Books of the East Vol- 30,* Ed. F. Max Muller, Delhi: Motilal Banarsidass, 1964
- *The Grihya Sutra, Part 1,* Translated by Hermann Oldenberg in *The Sacred Books of the East Vol- 29;* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1886
- *The Haracharitachintamani. of Rajanaka Jayaratha,* Ed. Sivadatta, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1897
- *The Hymns of Rigveda Vol.1-2,* Ed. F. Max Muller, London: Trubner & Co. 1877
- *The Jaimini Bharata, Daniel Sanderson,* Bangalore: Wesleyan Mission Press, 1852
- *The Jaiminiya or Talavakara Upanishad Brahmana in Journal of the American Oriental Society Vol 16,* Ed. Hanns Oertel, 1896
- *The Kamsavadha of Serakrisna,* Ed. Durgaprasada, Kasinath Pandurang Parab, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1935
- *The Kasika Vivarana Panjika, Vol 2, Part 1 (The Naya) A Commentary on Vamana-Jayaditya's Kasika,* Translated by Jinendra Buddhi, Ed. Sris Chandra Chakravarti, Rajshahi: Barendra Research Society, 1925
- *The KautiLiya ArthaShastra,* Ed. R. P.Kangle, Delhi, Motilal Banarsidass, 1969
- *The Kūrma Purāṇa in Ancient Indian Tradition and Mythology Vol 20-21,* Translated and Annotated by Ganesh Vasudeo Tagare, General Ed. J.L.Shastri, Delhi: Motilal Banarsidass,1981-1982

- *The Laws of Manu,* Translated by G. Buhler in *The Sacred Books of the East Vol-25,* Ed. F. Max Muller; Oxford: 1886
- *The Mahabharata Critical Edition (Adiparva),* V.S. Sukthankar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933
- *The Mahabharata Critical Edition (Anusasanaparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar, P.L Vaidya and R.N Dandekar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1966
- *The Mahabharata Critical Edition (Aranyakaparva),* V.S. Sukthankar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1942
- *The Mahabharata Critical Edition (Asramavasikaparva),* V.S. Sukthankar and S.K Belvalkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1959
- *The Mahabharata Critical Edition (Asvamedhikparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar, Raghunath Damodar Karmakar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1960
- *The Mahabharata Critical Edition (Bhismaparva),* V.S. Sukthankar and S.K Belvalkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1947
- *The Mahabharata Critical Edition (Dronaparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar and Sushil Kumar De, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1958
- *The Mahabharata Critical Edition (Harivamsa),* Ed. Vishnu S Sukthankar, S.K Belvalkar, P.L Vaidya, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1961-1971
- *The Mahabharata Critical Edition (Karnaparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar and P.L Vaidya, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1954
- *The Mahabharata Critical Edition (Sabhaparva),* V.S. Sukthankar and S.K. Belvalkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1944
- *The Mahabharata Critical Edition (Salyaparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar, P.L Vaidya and R.N Dandekar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1951
- *The Mahabharata Critical Edition (Santiparva), Part 1-3,* V.S. Sukthankar and S.K Belvalkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1954 (1951)
- *The Mahabharata Critical Edition (Udyogaparva),* V.S. Sukthankar and Sushil Kumar De, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute,1940
- *The Mahabharata Critical Edition (Virataparva),* V.S. Sukthankar and Raghu Vira, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1936
- *The Matsya Purana in the Sacred Books of the Hindus Vol 17,* General Editor B.D.Basu: Allahabad, 1916
- *The Meghaduta of Kalidasa, with the Commentary of Bharata Mallika in Pracyavani Mandira (Dr. K.N.Katju Series Vol 2),* J.B.Chaudhuri, Calcutta: 1950
- *The Mitakshara with Visvarupa and Commentaries of Subodhini and Balambhatti,* Ed. S.S. Setlur; Madras; Brahmavadin Press; 1912
- *The Narada Purana, in Ancient Indian Tradition and Mythology Vol 16,* Translated and Annotated by Ganesh Vasudeo Tagare, General Ed. J.L.Shastri, Delhi: Motilal Banarsidass,1998

- *The Nighantu and The Nirukta The Oldest Indian Treaties and Etymology, Philology and Semantics*, Ed. Lakshman Sarup, University of Punjab: 1927
- *The Nirukta of Yaska Vol 2*, Edited with Durga's commentary by R.G.Bhadkamkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1942
- *The Nirukta of Yaska Vol 2*, Edited with Durga's commentary by R.G.Bhadkamkar; Bombay: The Government Central Press, 1918
- *The Purva Mimamsa Sutras of Jaimini*, Ed. by Ganganath Jha in the *Sacred Books of the Hindus Vol 10, 28*, General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1916-1925
- *The Questions of King Milinda Part 1*, Translated by T.W. Rhys Davis in *The Sacred Books of the East Vol- 35*, Ed. F. Max Muller, Oxford: 1890
- *The Questions of King Milinda Part 2*, Translated by T.W. Rhys Davis in *The Sacred Books of the East Vol- 35*, Ed. F. Max Muller, Oxford: 1894
- *The Ramayana of Valmiki*, Translated by R.T.H Griffith, Benares: E.J. Lazarus, 1895
- *The Sacred Laws of the Aryas Part 1*, Translated by George Buhler in *The Sacred Books of the East Vol- 2*, Ed. F. Max Muller, Oxford: 1896
- *The Sacred Laws of the Aryas Part 2*, Translated by George Buhler in *The Sacred Books of the East Vol- 14*, Ed. F. Max Muller, Oxford: 1882
- *The Sankhya Karika of Iswara Krishna*, Translated by John Davies, Calcutta: Sushil Gupta Ltd. 1957 (1881)
- *The Sankhya Karika of Iswara Krishna*, Translated by John Davies, London: Trubner & Co. Ltd. 1894
- *The Siva Purana Vol 1-4*, Trans & Ed. By J.L. Shastri, Delhi: Motilal Banarsidass, 1970
- *The Śrauta Sūtra of Āpastamba*, Ed. S. Narasimhachar, Mysore: The Assistant Superintendent at the Govt. Branch Press, 1944
- *The Sukranitisara*, Ed. Jibananda Vidyasagara; Calcutta: Saraswati Press, 1882
- *The Sushruta Samhita, Vol 1-3*, Ed. Kunja Lal Bhisagratna, Calcutta: 1907-1916
- *The Taittīriya Brāhmana with the Commentary of Bhatta Bhaskara Misra Supplemented with Sayana's ASHTAKA 2*, Ed. R. Shama Sastry, Mysore: Government Branch Press,1921
- *The Taittīriya Brāhmana with the Commentary of Bhatta Bhaskara Misra Supplemented with Sayana's ASHTAKA 3 Part 1*, Ed. A. Mahadeva Sastri and L. Srinivasacharya, Mysore: Government Branch Press, 1911
- *The Taittīriya Brāhmana with the Commentary of Bhatta Bhaskara Misra Supplemented with Sayana's ASHTAKA 3 Part 2*, Ed. A. Mahadeva Sastri and L. Srinivasacharya, Mysore: Government Branch Press, 1918
- *The Tantrasamuccaya of Nārāyaṇa with the Commentary of Vimarsini of Sankara*, Ed. T. Ganapati Sastri, Delhi: Nag Publishers, 1919
- *The Upanishads Part 1*, Ed F. Max Muller in *The Sacred Books of the East Vol 1*, Oxford: 1879
- *The Upanishads Part 2*, Ed F. Max Muller in *The Sacred Books of the East Vol 15*, Oxford: 1884

- *The Vaiśeşika Sūtras of Kanāda,* Translated by Nandalal Sinha in *the Sacred Books of the Hindus Vol 6,* General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1923
- *The Varāha Purāṇa,* Ed. Anandaswarup Gupta and M.A. Shastri; Benaras; The All India Kashiraj Trust; 1960
- *The Varāha Purāṇa,* Ed. Hrishikesa Sastri, Calcutta: Asiatic Society, 1893
- *The Veda of the Black Yajus School entitled Taittiriya Samhita (Part 1 Kandas 1-3) in the Harvard Oriental Series Vol 18,* Ed by A.B.Keith, General Ed. C.R. Lanman, The Harvard University Press: 1914
- *The Veda of the Black Yajus School entitled Taittiriya Sanhita Part 1-2: Kandas 1-7,* Translated by A.B Keith, Cambridge: Massachusetts: The Harvard University Press, 1914
- *The Vedanta Sutras with Commentary of Sankarakarya Part 1-2,* Translated by George Thibaut in The Sacred Books of the East Vol 34, Oxford: 1890-1896
- *The Vedantasara with Commentaries of Nrisimhasarasvati and Ramatirtha;* Ed. G.A. Jacob; Bombay; Nirnaya-Sagar Press; 1934
- *The Vedanta-Sutras of Badarayana with the Commentary of Baladeva,* Ed. Sris Chandra Vasu in *the Sacred Books of the Hindus Vol 5,* General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1934
- *The Vishnupurana:* Ed. H.H.Wilson in *The System of Hindu Mythology and Tradition Vol 1- 5,* London: Trubner & Co. 1964-1868
- *The Works of Sankaracharya Vol 4-5,* Srirangam: Sri Vani Vilas Press,1910
- *Trikandasesha of Purushottamadeva,* Bombay: Venkateswara Steam Press, 1916

- *Upanishad Samuccayah in Anandashrama Sanskrit Series Book 29,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1895

- *V.S Apte, Sanskrit-English Dictionary Vol 1,* Poona: Prasad Prakashan, 1957-59
- *Vaikhānasa Śrauta Sūtra,* Ed. Parthasarathi Bhattacharya, Tirupati: Tirumala-Tirupati Devasthanams, 1997
- *Vaikhānasa Śrauta Sūtra,* Ed. W.Caland, Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1941
- *Vamana Purana,* Ed: K.L. Joshi, O.N. Bimali, Delhi: Parimal Publications, 2005
- *Vamsha Brahman;* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link:http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Varahamihira's Brhatsamhita,* Ed. M. Ramakishna Bhat, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2010
- *Vedāntasāra of Bhagavad Ramanuja,* Translated by M.B. Narasimha Ayangar and Ed. V.Krishnamacharya, Madras: The Adyar Library and Research Centre, 1979
- *Vedantasara with Commentary of Balabodhini of Apadeva, Srirangam,* Sri Vani Vilas Press, 1911
- *Vedic Hymns Part1-2,* Translated and Ed. by F. Max Muller in *the Sacred Books of the East Vol 32-46* Oxford: 1891-1897

- *Vinaya Texts Part 1*, Translated by T.W. Rhys Davids and Herman Oldenberg in *the Sacred Books of the East Vol 13, 20*, Ed F. Max Muller. Delhi: Motilal Banarsidass, 1965
- *Vinaya Texts Part 2*, Translated by T.W. Rhys Davids and Herman Oldenberg in the *Sacred Books of the East Vol 17;* Ed F. Max Muller; Oxford; 1882
- *Vinaya Texts;* Translated by T.W. Rhys Davids and Herman Oldenberg in the *Sacred Books of the East Vol 20;* Ed F. Max Muller; Delhi; Motilal Banarsidass; 1975
- *Vishnu Purana, A System of Hindu Mythology and Tradition*, Translated and Ed. by H.H Wilson, Calcutta: Punthi Pustak, 1972
- *VisnudharmottaraPurana Vol 1-3*, Dr. Priyabala Shah, Delhi: Parimal Publications, 2002
- *Vrihad-Devata*, Ed. Rajendralala Mitra, Calcutta: The Baptist Mission Press, 1892

- *Yajnavalkya Smriti in Anandashrama Sanskrit Series Book 46 Vol 1-2*. Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1903-1904
- *Yoga Sutras of Patanjali*, Ed. J.R. Ballantyne and Govind Sastri Deva, Calcutta: Susil Gupta Ltd. 1952

আনুষঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী

- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত,* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৯
- অশোক চট্টোপাধ্যায়, *পুরাণ পরিচয়,* কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭
- গিরীন্দ্রশেখর বসু, *পুরাণপ্রবেশ,* কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০০৭
- চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান,* প্যাপিরাস, কলকাতা: ২০০১
- জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার, *ভারতীয় ইতিহাস কি রূপরেখা,* এলাহাবাদ: হিন্দুস্তানি একাডেমি, ১৯৪১
- তাপসী মুখার্জী, *মহাভারত-পুরাণে সাংখ্যদর্শনের উত্তরাধিকার,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১২
- *বর্ষক্রিয়া কৌমুদী,* কবিকঙ্কনাচার্য গোবিন্দানন্দ বিরচিত, কলমকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত: এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা: ১৯০২
- বাল কৃষ্ণ ভরদ্বাজ, *মহাভারত যুদ্ধ কে আঠারো দিন,* কুরুক্ষেত্র: রজনী প্রকাশন, ১৯৯০
- বাসুদেবশরণ অগ্রবাল, *কলা অউর সংস্কৃতি,* এলাহাবাদ: সাহিত্য ভবন লিমিটেড, ১৯৫২
- *রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র,* সম্পাদনা: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, আষাঢ় ১৩৫৬-চৈত্র ১৩৬৩ (১৯৪৯-১৯৫৬)
- *রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড,* কলকাতা: গ্রন্থমেলা, ১৩৮৩ (১৯৭৬ খ্রি.)
- যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়,* ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা: ১৯৮০
- যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, *পৌরাণিক উপাখ্যান,* কলিকাতা: এম সি সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, ১৩৬১ (বঙ্গাব্দ)
- শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা: ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ (১৯৮৮ খ্রি.)
- শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, *প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি ও বিচার পদ্ধতি,* কলকাতা: ১৯৩০
- সুখময় ভট্টাচার্য, *মহাভারতের চরিতাবলী,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আষাঢ় ২০১৪, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬)
- সুখময় ভট্টাচার্য, *রামায়ণের চরিতাবলী,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আষাঢ় ১৪১৯ (২০১২), প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬ (১৯৬৯)
- A.A Macdonell and A.B Keith; *Vedic Index of Names and Subjects Vol 1-2,* Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Pvt Ltd, 1958
- A.A. Macdonell, *Vedic Mythology,* Delhi: Motilal Banarsidass, 2002 (Strassburg, 1898)
- A.A. Macdonell, *Vedic Mythology,* Strassburg: Verlag Von Karl J Trübner, 1897
- A.B. Keith, *The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd; 2007

- A. Cunningham, *Report of a Tour in the Punjab in 1978-79,* Archeological Survey of India, 1882
- A.E. Nordenshidd, *The Voyage of the Round Asia and Europe,* New York: Macmillan and Co, 1882
- A.R.Tripathi, *"The Concept of Shudras in Manu Smrti: A Reappraisal"* in Indologica Taurinensia, Online Journal of the International Association of Sanskrit Studies, Vol. 30, 2004
- Abinas Chandra Das, *Rig-Vedic India Vol 1,* Calcutta: University of Calcutta, 1921
- Ajaya Mitra Shastri, *India as Seen in the Bṛhatsamhitā of Varāhamihira,* Delhi: Motilal Banarsidass,1969
- Alain Daneilou, *The Myths and Gods of India, Rochester,* Vermont: Inner Traditions International, 1985
- *Albiruni's India (Vol 1-2),* Edward C. Sachau, London: Trubner & Co. 1910
- Albrecht Weber, *The History of Indian Literature* (Translated by John Mann and Theodor Zachariea), London: Trubner& Co.1892
- Alexander Cunningham, *The Ancient Geography of India,* London: Turbner & Co. 1871
- Alois Anton Fuhrer, *The Monumental Antiquities and Inscription: In the North-Western Provinces and Oudh,* Oudh: Government Press, 1891
- Amareswar Thakur, *Hindu Law of Evidence,* Calcutta: University of Calcutta, 1933
- Anukul Agarwal, *Mukund S.Babel, ShreedharMaskey,* Estimating the Impacts and Uncertainty of Climate Change on the Hydrology and Water Resources of Koshi River Basin, Springer International Publishing, Switzerland: 2015
- B.C Law, *Ancient Indian Tribes,* Lahore: Punjab Sanskrit Book Depot,1926
- B.C Law, *Geographical Essays Relating to Ancient Geography of India,* Delhi: Bharatiya Publishing House, 1976
- B.C Law, *Geography of Early Buddhism,* London: Kegan Paul. Trench. Trubner & Co. Ltd. 1932
- B.C Law, *Historical Geography of Ancient India,* Lucknow: Uttar Pradesh Hindi Granth Prakashani,1972
- B.C Law, *Tribes in Ancient India,* Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1943
- B.C. Law, *Indological Studies, Vol 1,* Calcutta: The Indian Research Institute, 1950
- B.C.Law, *Panchalas and Their Capital Ahichhatra,* Memoirs of Archeological Survey of India No. 67, Calcutta,1942
- Bal Kṛishnan, Kurukshetra: *Political and Cultural History,* New Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1978
- Bhagwan Singh Suryavanshi, *Geography of The Mahabharata,* New Delhi: Ramananda Vidya Bhawan, 1986
- Black & A Waldron, *The Modernization of the Inner Asia,* New York: East Gate Back, 1991
- *Bombay Gazetteer Vol 1,* 1896
- Buddha Prakash, *Social and Political Movements in Ancient Punjab,* Delhi: Motilal Banarsidass, 2008
- Buddhaprakash, *Political and Social Movement in Ancient Punjab,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, 2007

- C. Stainland Wake, *Serpent Worship,* London: George Redway, 1888
- C.L. Khanna, *Haryana General Knowledge,* Agra: UpkarPrakashan
- C.P. Khare, *Indian Herbal Remedies,* Springer Science and Business Media, 2004
- *Collected Works of R.G. Bhandarkar (Vol 1) in Government Oriental Series,* Ed. Narayan Bapuji Utgikar, Poone: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933, Cosmo Publications, 2008

- D.C Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India,* Delhi: MotilalBanarsidass Publishers Pvt. Ltd, 1960 (Old edition), 1971
- D.C Sirkar, *The SaktaPithas,* Delhi: Motilal Banarasidass; 2004
- D.C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India,* Delhi: Motilal Banarsidass Pvt Ltd, 1990
- D.C. Sircar, *The Úākta Pīthas,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1948
- D.C. Sircar, *Studies in the Society and Administration of Ancient and Medieval India (Vol 1),* Calcutta: Published by K.L.Mukhopadhyay, 1959
- D.D. Kosambi, *Myth and Reality,* Bombay: Popular Prakashan, 1962
- D.D. Kosambi, *The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline,* Delhi: Vikash Publishing House Pvt. Ltd, 1972
- D.P. Dubey, Prayaga: *The site of Kumbhamela,* New Delhi: Aryan Books, 2001
- D.R. Bhandarkar, A.B. Gajendragadkar, V.G. Paranjpe, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute Vol 15-17,* Poona: 1933-1936
- D.R. Bhandarkar, *Some Aspects of Ancient Indian Culture,* Madras: University of Madras, 1940
- David Frawley, Shiva: *The Lord of Yoga,* Twin Lake, USA: Lotus Press, 2015
- David Kinsley, *Hindu Goddesses,* London: University of California Press, 1988
- Devendra Hande, Sculptures from Haryana: Iconography and Style, Shimla: *Indian Institute of Advanced Study,* 2006
- Devendrakumar Rajaram Patil, *Cultural History from the Vayu Purana,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1973
- Diana L. Eck, Banaras: *City of Light,* New York: Alfred A. Knopf, 1982
- Donald Mackenzie, *Indian Myth and Legend,* London: Gresham Publishing Company, 1877

- E. Vernon Arnold, *Vedic Metre,* Cambridge University Press, 1905
- E.B. Havell, *Benares,* London: W.Thacker and Co. 2012
- E.H Bunbury, *A History of Ancient Geography (Vol 1-2),* London: John Murray, 1879
- E.J. Rapson, *Ancient India,* Cambridge University Press, 1914
- E.Washburn Hopkins, *Epic Mythology,* Strassburg: Verlag Von Karl J Trubner, 1915
- Ed. A.Taluqdar, *The Sacred Books of the Hindus (Vol 18 Part 2),* New Delhi.
- Ed. Bimal Krishna Matilal, Y. Krishnan, *"The Meaning of Purusartha-s in the Mahabharata"; In Moral Dilemmas in the Mahabharata;* Delhi: 1989
- Ed. E.J Rapson, *The Cambridge History of India Vol 1 (Ancient India),* Cambridge University Press, 1922
- Ed. Goel & Bushnai, *Gazetteer of India Haryana, Vol 2,* Haryana Gazetteers Organization, Chandigarh, 2009

- Ed. K. D. Bajpai, *The Geographical Encyclopedia of Ancient and Medieval India,* Varanasi: India Academy, 1967
- Ed. Kosla Vepa, *Astronomical Dating of Events & Select Vignettes from Indian History,* USA: Indic Studies Foundation, 2008
- Ed. R.C. Hazra, *Studies in the UpapuranasVol 1-2,* Calcutta: Sanskrit College, 1958-1963
- Ed. S.G. F Brandon, *The Saviour God,* Manchester University Press, 1963
- Ed. T.N. Madan, *Way of Life: Essays in Honour of Louis Dumont,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1988 (1982)
- Ed. D.C. Sircar, *The Sakti Cult and Tara,* Kolkata: University of Calcutta,1967
- Edward C. Sachau, *Alberuni's India (Vol 1-2),* London: Kegan Paul, Trench, Turbner & Co, 1910
- *Epigraphia Indica ,Vol 1,* Ed. Jas Burgess, Calcutta: The Superintendent of Govt. Printing (India), 1892
- *EpigraphiaIndica, Vol VI,* Ed. E. Hultzsch, Calcutta: The Superintendent of Govt. Printing Press, 1901
- *EpigraphiaIndica, Vol I;* Ed. Jas Burges; Calcutta: The Superintendent of Govt. Press, 1892
- F. Max Muller, India: *What can it teach us,* New Delhi: Cosmo Publications, 2003
- F.E. Pargiter, *"Ancient Countries in Eastern India"* in Journal of the (Royal) Asiatic Society of Bengal, Vol 66, Calcutta, 1897
- F.E. Pargiter, *Ancient Indian Historical Tradition,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd, 1997 (London, 1922)
- F.S. Growse, Mathura: *A District Memoir,* North Western Provinces and Oudh Govt. Press, 1883
- G. Parrinder, *Avatar and Incarnation,* London: Faber and Faber, 1970
- G.A Jacob, *A Concordance to Principal Upanishads and Bhagavadgita,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1963
- G.A. Jacob, *A Concordance to the Principal Upanisads and Bhagavadgita,* Delhi: Motilal Banarasidass, 1963 (old edition), 1999
- G.P. Singh, *Research into the History and Civilization of the Kiraatas,* Delhi: Singhal Print Media, 2008
- G.P. Singh, *Researches into the History and Civilization of the Kiraatas,* Delhi: Gyan Publishing House, 2008
- Gujarat State Gazetteers, Vadodara, 1979
- Gustav Oppert, *On The Original Inhabitants of Bharatavarsha or India,* Westminster: Archibald Constable & Co. 1898
- H.C. Raychaudhiri, *Political History of Ancient India,* Calcutta: University of Calcutta, 1972
- H.C. Raychaudhuri, *Studies in Indian Antiquities,* Calcutta: University of Calcutta, 1958
- H.D Griswold, *The Religion of the Ṛgveda,* Oxford University Press, 1923
- H.H Wilson, Macenzie Collection: *A Descriptive Catalogue of the Oriental Manuscripts,* Calcutta: Asiatic Press, 1928

- H.W. Bodewitz, *The Jyotistoma Ritual: Jaiminiya Brahmana I,* Leiden: E.J. Brill, 1990
- Harmut Scharfe, *The State in Indian Tradition,* Leiden: Netherlands, 1989
- Haryana District Gazetteers: *Gurgaoun,* Haryana Gazetteers Organisation, Revenue Department, 1983
- Heinrich Robert Zimmer, *Myths and Symbols in Indian Art and Civilization,* Princeton University Press, 1972

- *Indian Journal of Marine Sciences, Vol 20,* September 1921
- Indologica Jaipurensia, *Research Journal of the Historical Research Documentation Programme, Jaipur Vol. 1,* 1987

- J. Gonda, *The Change and Continuity in Indian Religion,* New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd; 1965
- J. Vogel, *Indian Serpent Lore or the Nagas in Hindu Legend and Art,* New Delhi: Prithvi Prakashan, 1926
- J.A.B Van Buitenen, *"Studies in Samkhya"* in Journal of the *American Oriental Society, Vol 76,* 1957
- J.C. Agarwal and S.P. Agarwal, Uttarakhand: *Past, Present and Future,* New Delhi: Concept Publishing Company, 1995
- J.F. Hewitt, *History and Chronology of Myth-Making Age,* London: James Parker and Co. 1902
- J.K. Dodiya, *Critical Perspective of the Ramayana,* New Delhi: Sarup & Sons, 2001
- J.L. Brockington, *Righteous Rama,* Delhi: Oxford University Press, 1984
- J.T Wheller, *A Short History of India: And of The Frontier States of Afghanistan,* London: Macmillan and Co, 1887
- J.W. Mc Crindle, *Ancient India As Described by Megasthenes and Arrian,* London: Turbner& Co,1877
- Jadunath Sinha, *Indian Psychology, Vol 2,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, 1986
- Jan Gonda, *A History of Indian Literature, Vol 1,* Wiesbaden, 1975
- Jogiraj Basu, *India of the Age of the Brahmanas,* Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1969
- John Dowaon, *A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion,* London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. 1928
- *Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 10,* Calcutta: 1841
- *Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 5,* Calcutta: 1836
- *Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 66,* Calcutta: Asiatic Society, 1898
- *Journal of the Bihar and Orissa Research Society Vol 11,* 1934
- *Journal of the Epigraphical Society of India, Vol 5,* Ed. S.H. Ritti, Ajaya Mitra Shastri, Mysore: The Epigraphical Society of India, 1978
- *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal (Letters Vol. 1),* Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1936
- *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol 15,* London: J.W. Parker and Son, 1852
- K.C. Singhal and Roshan Gupta, *The Ancient History of India (Vedic Period): A New Interpretation,* New Delhi: Atlanta Publishers and Distributors, 2003

- Kaliprasad Goswami, *Kamakhya Temple: Past and Present,* New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation, 1998
- Liny Srinivasan, *Desi Words Speaks of the Past,* Bloomington: Author House, 2011
- Louis Renou, *The Destiny of the Veda in India,* New Delhi: Motilal Banarsidass, 1965
- M. Bloomfield, *The Religion of the Veda,* New York & London: The Knicker bocker Press, 1908
- M. Krishnamachariar, *History of Classical Sanskrit Literature,* Madras: Tirumalai-Tirupati Devasthanams Press, 1937
- Manohar Lal Bhargava, *The Geography of Rgvedic India,* Lucknow: The Upper India Publishing House LTD, 1964
- Maurice Bloomfield, *A Vedic Concordance,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1906
- Max Muller, India: *What Can It Teach Us,* New York: John W. Lovell Company,1882
- Michel Hulin, *Samkhya Literature in a History of Indian Literature, Vol 6,* Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1978
- Mircea Eliade, *History of Religious Ideas: From Stone Age to the Abyssinian Mysteries, Vol 1,* University of Chicago Press, 1985
- MithilaSharanPandey, *The Historical Geography and Topography of Bihar,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1963
- Moti Chandra, *Geographical and Economic Studies in the Mahabharata: Upayana Parva,* Lucknow: The U.P Historical Society, 1945
- *Munshi Indological Felicitation, Volume (Vol 20-21);* Ed. J.H. Dave and H.D. Velankar, Bombay: Bharatiya VidyaBhavan, 1962
- N.L Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India,* New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1971 (1927)
- N.N. Bhattachryya, *The Geographical Dictionary,* Delhi: Munshiram Manoharlal Pvt. Ltd, 1991
- N.N. Misra, *Source Material of Kumaoni History,* UP: Shree Almora Book Depot; 1994
- Nicholas Sutton, *Religions Doctrines in the Mahabharata,* Delhi: Motilal Banarsidass, 2000
- O.P Bharadwaj, *Ancient Kurushetra: Studies in Historical and Cultural Geography,* New Delhi: Harman Publishing House; 1991
- P. Sensharma, *Kurukshetra War,* West Bengal: Darbari Udjog, 1975
- P.C.Chakravarti, *The Art of War in Ancient India,* Dhaka: The University of Dhaka, 1941
- P.K Bhattacharyya, *Historical Geography of Madhya Pradesh from Early Records,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, 2010 (1977)
- P.V. Kane, *History of Dharmasastra, Vol 5,* Poone, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1958
- Patrick Olivelle, *The Asrama System,* New Delhi: Munsiram Manoharlal Publ. Ltd, 2004 (OUP, 1993)
- Paul Hacker, *'Anviksiki'* In Wiener Zeitschrift fur die Kundesudund Ostasiems 2 (1958), pp. 54-83, as referred to in *The Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. 4,* Ed: Larson and Bhattacharya, Delhi: Motilal Banarsidass, 1987

- *Proceedings of North-East India History Association,* Shillong Sessio, 1993
- Purnendu Narayan Sinha, *A Study of the Bhagavata Purana,* Benares: Freman & Co. 1901
- R. Spence Hardy, *Manual of Buddhism,* USA: Kessinger Publishing Co, 2003
- R.C Majumdar, *The Classical Accounts of India,* Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhyay, 1960
- R.C.Hazra, *"The Smriti Chapters in the Puranas" . In The Indian Historical Quarterly,* Ed. Narendra Nath Law, Vol 11, 1935
- Radha Kumud Mukherji, *Hindu Civilization, Vol 1-2,* Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1957
- Ram Chandra Jain, *Ethnology of Ancient Bharata,* Chowkhamba: Sanskrit Series Office, 1970
- Rama Shankar Tripathi, *History of Kanauj,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1964
- Rhys Davids, *Psalms of the Early Buddhists,* London: Oxford University Press,1913
- Robert Shafer, *Ethnography of Ancient India,* Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1954

S. Jayashankar, *Temples of Kasaragod District,* Thiruvananthapuram: Directorate of Census Operations, 2001

- S. Kalyanaraman, *Vedic River Sarasvati and Hindu Civilization,* New Delhi: Aryan Book International, 2008
- S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy, Vol 1,* London: G Allen & Unwin Ltd. 1948
- S.B. Roy, Date of Mahabharata Battle, Gurgaon: Academic Press, 1976
- S.G Kantawala; *Kalyana Tirthanka;* January; 1952
- S.G. Talageri; *The Rigveda A Historical Analysis,* New Delhi: Aditya Prakashan, 1994
- S.M. Ali, *The Geography of The Puranas,* New Delhi: People's Publishing House; 1966
- S.N. Nair, *The Holy Himalayas,* Delhi: Pustak Mahal, 2007
- S.P. Tewari, *Contributions of Sanskrit Inscriptions to Lexicography,* Delhi: Agam Kala Prakashan, 1987
- S.S Bhawe, *The Soma Hymns of the Ṛgveda: A Fresh Interpretation,* M.S. University Research Series 6, Baroda: 1962
- Samarendra Narayan Arya, *History of Pilgrimage in Ancient India (AD 300-1200),* New Delhi: Mushiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 2004
- Sarojini Chaturvedi, *A Short History of South India,* New Delhi: Samskriti, 2006
- Sarva Daman Singh, *Ancient Indian Warfare,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd, 1997 (Leiden, 1965)
- Sashi Bhusan Chaudhuri, *Ethnic Settlements in Ancient India (Part 1—Northern India),* Calcutta: General Printers and Publishers Ltd, 1955
- Satis Chandra Vidyabhusana, *A History of Ancient Logic,* Calcutta: University of Calcutta, 1921
- Satish Chandra Banerjee, *Samkhya Philosophy (Samkhya Karika),* Hare Press: Calcutta, 1898
- Satish Chandra Vidyabhusana, *A History of Indian Logic,* Delhi: Motilal Banarsidass, 2002
- Sir Aurel Stein: *Archeological Explorer,* J. Mirsky; London: University of Chicago Press, 1977

- Sir W.W Hunter, *The Indian Empire,* London: Trubner & Co. Ludgate Hill, 1882
- Subodh Kapoor, *Encyclopaedia of Ancient Indian Geography,* New Delhi: Cosmo Publications, 2002
- Sukumari Bhattacharji, *Indian Theogony,* Britain: Cambridge University Press, 1970
- SukumariBhattacharji, *The Literature in the Vedic Age Vol-1,* Calcutta: K.P. Bagchi and Company, 1984
- SukumarSen, *The Great Goddess in Indian Tradition,* Calcutta: Papyrus, 1983
- Suniti Kumar Chatterji, *Kirāta-Jana-Kṛti,* Calcutta: The Asiatic Society, 1988 (1951)
- Surendra Kisor Chakraborty, *A Study of Ancient Indian Numismatics,* Calcutta, 1931

- T.R.V Murti, *'Rise of the Philosophical Schools' in The Cultural Heritage of India Vol 3,* Ed. Haridas Bhattacharyya, Calcutta: The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1937
- T.R.V Murti, *'The Rise of the Philosophical Schools' In the Cultural Heritage of India Vol 3,* Calcutta: Ramkrishna Mission,1953
- *The Imperial Gazetteer of India (Vol 14),* W.W. Hunter, London: Turbner & Co. 1887
- *Theodor Goldstucker,* Panini: His Place in Sanskrit Literature, London: Turbner & Co. 1861
- *Theodor Goldstucker,* Panini: His Place in Sanskrit Literature, London: Turbner & Co. 1861

- Uma Chakravarty, *Indra and Other Vedic Deities,* New Delhi, D.K. Printworld (P) Ltd. 1997
- Umakanth Thakur, *The Geographical Information in the Skanda Cult,* Mithila: Institute of Post-graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1979
- Uttar Pradesh District Gazetteers: *Etah,* 1988

- V.G. Rahurkar, *The Seers of Ṛgveda,* Poona: Poona University Press. 1964
- V.R. Ramachandra Dikshitar, *War in Ancient India,* Bombay: Macmillan and Co. Ltd, 1944
- V.S. Agrawala, *India as Known to Panini,* Lucknow: University of Lucknow, 1953
- Vaidya C.V, *Epic India (Vol 18);* New Delhi: Cosmo Publication, 1987
- Vaman Krishna Paranjpe, *Fresh Light on Kâlidâsa'sMeghadûta,* Poona: Kalidasa Sanshodhan Mandal, 1960
- *Vishesvaranand Indological Journal, Vol. 3-4,* Vishesvarananda Vedic Research Institute, 1965

- W. Norman Brown, *'The Sanctity of the Cow in Hinduism'* In India and Indology: Selected Articles, Delhi: Motilal Banarsidass, 1978
- W.E. Hale, *Asura in Early Vedic Religion,* Delhi: Motilal Banarsidass 1986
- Wendy Doniger O'Flaherty, *Hindu Myths,* New Delhi: Penguin Books India, 1994

- Y. Krishnan, *The Meaning of Purusartha-s in the Mahabharata"* In Moral Dilemmas in the Mahabharata, Ed. Bimal Krishna Matilal, Delhi: Indian Institute of Advanced Study, 1989